

CJK-H01911-77-P36148

প্রবাসী, ৪৭শ ভাগ, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩৫৪

সূচীপত্র

কার্তিক-৫৫৮

P 36,148

সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

লেখকগণ ও তাঁহাদের রচনা

77

বঙ্গ দত্ত	...	১৮২	শ্রীজগদীশ গুপ্ত	...	৪৫০
নিবাহন ও চলাচল ব্যবস্থায় অরাজকতা	...	৪৬১	—রামের টাকা (গল্প)	...	১৭০
প্রাজের সাধনা	...	২০৮	শ্রীজিতেন্দ্রকুমার নাগ	...	১৬৪
কৃষ্ণ ভট্টাচার্য	...	২৮১	—অন্তরাং ও তুলাহাঙ্গরা (সচিত্র)	...	১২২
বিদ্যা-নীরব রাতের মত (কবিতা)	...	২৭০	শ্রীজিতেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	...	১২১
জিন্দাধ ঠাকুর	...	২৭১	—বিটাতন (সচিত্র)	...	২০৮
"রামানন্দ জীবনী"	...	২৭১	শ্রীদীনেশনাথ	...	২০৮
বঙ্গ দত্ত	...	২৭১	—নববঙ্গের বয়স্কদের প্রাথমিক শিক্ষার কার্যকরী পরিকল্পনা	...	১২১
মুদ্রণ (কবিতা)	...	২৭১	শ্রীদীনেশনাথ	...	১২১
মূল্য	...	২৭১	—ভারতবর্ষে মজুর ধর্মঘট	...	১২১
—ব'হের গোড়ার কথা	...	২৭১	শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য	...	২০৮
তোষ স'ন্তাল	...	২৭১	—"কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ" (আলোচনা)	...	২০৮
বিদ্যা (কবিতা)	...	২৭১	—বালা-প্রতিভা	...	২০৮
রাণী মুখোপাধ্যায়	...	২৭১	—সঙ্গীত দামোদর	...	২০৮
বতচারিণী (গল্প)	...	২৭১	—বাধীন ত্রিপুরার রাজমালা	...	২০৮
সেন	...	২৭১	শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার	...	২০৮
বাটী ও রাসেলের সমাজ-দর্শন	...	২৭১	—কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ (আলোচনা)	...	২০৮
চন্দ্র ভট্টাচার্য	...	২৭১	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	...	২০৮
বু ও মুদ্রমান	...	২৭১	—বাঙালী ছাত্রদের কথা	...	২০৮
মুদ্র বহু	...	২৭১	শ্রীদেবেন্দ্রচন্দ্র দাশ	...	২০৮
ভূমি আর আমি (কবিতা)	...	২৭১	—ইউরোপের শরণ (কবিতা)	...	২০৮
জৈদ লালুয়ানী	...	২৭১	—সোনার সন্ধ্যা (গল্প)	...	২০৮
জগ-সমস্তার ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান	...	২৭১	শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ চন্দ্র	...	২০৮
ইলাল সাহা	...	২৭১	—কে বাঁগী বাজায় (কবিতা)	...	২০৮
জিত আদিত্য যুগের শিল্পের ধারা (সচিত্র)	...	২৭১	—চিরন্তন গীতি (ঐ)	...	২০৮
জগদ্বন সন্নিহিত	...	২৭১	—সাধ (ঐ)	...	২০৮
জগদ্বন সন্নিহিত (কবিতা)	...	২৭১	শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	...	২০৮
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (ঐ)	...	২৭১	—বাপুজী (কবিতা)	...	২০৮
জগদ্বন চড়ে বড় (ঐ)	...	২৭১	শ্রীনন্দনাথ চৌধুরী	...	২০৮
জগদ্বন দাশ	...	২৭১	—"নিউ ইন্ডিয়ান কালচারাল জার্নাল" (গল্প)	...	২০৮
কালিদাস সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ	...	২৭১	—বৈদিক আর্থ ও অরৈদিক আর্থ	...	২০৮
বিহারী রায়চৌধুরী	...	২৭১	—দিল্লি যুগ হইতে বৈদিক যুগ	...	২০৮
ধনিকবংশে ধনির জন্ম	...	২৭১	—দিল্লি সভ্যতা ও মেশোপটেমিয়া	...	২০৮
প্রাগৈতিহাসিক বাংলাদেশ	...	২৭১	শ্রীললিতাকুমার ভদ্র	...	২০৮
পালিলাল দে	...	২৭১	—অর্থ ও অনর্থ (গল্প)	...	২০৮
গোরা'র ভাবের আধুনিকতা	...	২৭১	—আশ্রয়প্রার্থী (গল্প)	...	২০৮
শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র রায় (কবিতা)	...	২৭১	—মুক্তরাষ্ট্রে কৃষিকর্মে বিমানের কার্যকারিতা (সচিত্র)	...	২০৮
গীনাথ সেন	...	২৭১	—শিল্পী হুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়ের ভাস্কর্য-শিল্প	...	২০৮
ঐতিহাসিক খননের কতিপয় সূত্র	...	২৭১	শ্রীনারায়ণ দত্ত	...	২০৮
ইরর চক্রবর্তী	...	২৭১	—ভাঙা-গড়া (কবিতা)	...	২০৮
ইররজীর বাংলা অনুবাদ	...	২৭১	—শতাব্দী চলে (ঐ)	...	২০৮
ইররজীর বাংলা অনুবাদ	...	২৭১		...	২০৮

শ্রীনিবাসচন্দ্র, কুশারী

—আদর্শ শিক্ষায় প্রাথমিক চিত্রাঙ্কন ও হস্ত-শিল্পের
দান (সচিত্র)

শ্রীনিখালা দাশগুপ্ত

—বাহাদুরী-বিহারী বিরোধ

শ্রীনিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

—সেমসাইড গোল (গল্প)

শ্রীপকানন চক্রবর্তী

—বিধু আজ কাপে ধরধর (কবিতা)

শ্রীপরিমল গোস্বামী

—আ মরি বাংলা ভাষা (সচিত্র গল্প)

শ্রীপিনাকীরঞ্জন কর্মকার

—পদ্মানদীর চরে (কবিতা)

প্রজ্ঞানানন্দ, স্বামী

—ভারতীয় সঙ্গীতে সাত স্বরের জন্মকথা

শ্রীপ্রভাত বসু

—সব-হারাদের কবি (কবিতা)

শ্রীপ্রভাবতী রায়

—সরলা রায়

শ্রীপ্রশান্তকুমার মিত্র

—আবেদন (কবিতা)

শ্রীপ্রগাথকুমার মজুমদার

—হুইজারন্যাণ্ডের সমৃদ্ধি

বজ্রসুর রণীন্দ্র, এ. এন. এম.

—এক প্রান্তে (কবিতা)

—সিদ্ধি কবি শাহ আবদুল নতিফ

শ্রীবিজয়কান্ত বসু

—স্বপ্ন ও শাস্তি

শ্রীবিজয়গোপাল বসু

—রেখাগণিতে পণ্ডিত জগন্নাথ

শ্রীবিজয়ভূষণ ঘোষ চৌধুরী

—নেপালীদের খাদ্যদ্রব্য

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য

—রবীন্দ্রসংলাপ কণিকা

শ্রীবিনয়ভূষণ দাসগুপ্ত

—বিমানে ভূ-প্রদক্ষিণ (সচিত্র)

শ্রীবিমল রায়

—শির ও শিল্পী (সচিত্র)

শ্রীবিমলচন্দ্র চক্রবর্তী

—রবীন্দ্র-চিত্রের ভূমিকা

শ্রীবিমলাচরণ দেব

—“বলম্ উপাসম্”

শ্রীবিমলাচরণ লাহা

—প্রাগজ্যোতিষ

শ্রীবিশু দত্ত

—বিবাক্ত যুগ (কবিতা)

শ্রীবিক্রপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

—রূপান্তর (কবিতা)

শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়

—“অসমারম্ভঃ শুভায় ভবত্” (কবিতা)

—বক্সিসচন্দ্র (ঐ)

শ্রীব্রজেনচন্দ্র ভট্টাচার্য

—স্বালাস্বা (সচিত্র)

—প্রশান্ত মহাসাগরের আদিম অধিবাসী (ঐ)

শ্রীব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

—কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ (সচিত্র)

—কালীপ্রসন্ন ঘোষ (ঐ)

—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (ঐ)

—বিজয়লাল রায় (ঐ)

—নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত (ঐ)

—রসরাজ অমৃতলাল বসু (ঐ)

শ্রীমণীন্দ্র গুপ্ত

—মুখ (কবিতা)

—স্বনিকা (ঐ)

শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত

—শিক্ষা ও স্বাধীন রাষ্ট্র

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

—বাগিচা-বাঘ (কবিতা)

শ্রীমনোমোহন ঘোষ

—ক্ষমা-হৃদয় (কবিতা)

শ্রীমায়ী গুপ্ত

—যুক্তপ্রদেশের প্রাস্তিক লোকসঙ্গীত

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

—ভরত, কথ ও বিশ্বামিত্র

শ্রীমৃণালকান্তি দাশ

—হুম (কবিতা)

শ্রীযতীন্দ্রবিমল-চৌধুরী

—সংস্কৃত সাহিত্যের প্রচার

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

—ওহাবী আন্দোলন ও মুসলমান সমাজের রাজনীতি

—ইউরোপের নিম্নভূমি—বেলজিয়াম ও হল্যান্ড (সচিত্র)

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, বিদ্যানিবি

—তত্ত্বের প্রাচীনতা

—দুর্গাদেবীর বোধন ও বিসর্জন (আলোচনা)

শ্রীরবীন্দ্রকুমার বসু

—স্বপ্ন (গল্প)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

—পত্রাবলী

শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত

—কৃষ্ণীদের সেবায় আশ্রয়বিদান

শ্রীরমা সরকার

—শুকতার (গল্প)

শ্রীরাখালচন্দ্র নাগ

—কোতলপুর থানার স্বাধা

শ্রীরাজমোহন নাথ

—দেবীর বোধন ও বিসর্জন

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

—আজ—আগামী কাল (উপহাস)

—উপনয়ন (গল্প)

শ্রীশশীভূষণ দাশগুপ্ত

—পূর্ববঙ্গের হিন্দুর সমস্তা

বিষয়-সূচী

শ্রীমদ চক্রবর্তী	...	৪২০	শ্রীমদীর সেনগুপ্ত	...	২৭২
চীনের সাম্প্রতিক অর্থনীতি	...	৪২০	— শরণাগতা (গল্প)	...	৬৫
ব্রজেন বন্দ্যোপাধ্যায়	...	৪২৪	শ্রীমদীলকুমার বহু	...	৬৫
ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত পুরাতন বাংলা পত্র-পত্রিকা	...	৪২৬	— এশিয়ার কথা	...	৬৫
ব্রজ চক্রবর্তী	...	৪২৬	শ্রীমদীলপ্রকাশ সোম	...	৬৫
চৈতন্য চাহনি (কবিতা)	...	২৬৩	— স্বাধীন ত্রিপুরা (সচিত্র)	...	৬৫
চৈতন্যকৃষ্ণ লাহা	...	২৬৩	শ্রীমদবর্ণকমল রায়	...	১২২
— বাস্তব ও কল্পনা (কবিতা)	...	২৬৩	— ফার্মেন্টেশন	...	১২২
— চন্দ্রা অমৃত করেদান	...	২৬৩	শ্রীমদবোধচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়	...	৪৮১
— শাশত বর্তমান (কবিতা)	...	২৬৩	— ব্রহ্মদেশের স্বাধীনতা লাভ (সচিত্র)	...	৪৮১
— স্বাধীনতা তীর্থে (ঐ)	...	৪৮	— সিংহলের স্বাধীনতা লাভ (ঐ)	...	৪৮১
ভ্যাকিঙ্কর চট্টোপাধ্যায়	...	৪৮	শ্রীমদমা সেনগুপ্ত	...	১২১
— ইন্দোনেশিয়া ও তাহার মুক্তি-সংগ্রাম (সচিত্র)	...	৪৮	— কণ্ট্রোলার দিনকাল	...	১২১
শ্রীমদীরকান্ত গুপ্ত	...	৮২	শ্রীমদপ্রসন্ন বাজপেয়ী চৌধুরী	...	৩০৬
— দুরাতীতের পটভূমিকায় বাংলা-কাব্যের সূচনা ও	...	৮২	— আর্টের ত্রিধারা	...	৩০৬
— প্রগতির আভাস	...	৮২	— সীতাকুণ্ড (সচিত্র)	...	৪০২
শ্রীমদরোজেননাথ রায়	...	১৬৫	শ্রীমদগোপাল বিশ্বাস	...	২২
— কবি শিবনাথ শাস্ত্রী	...	১৬৫	— খাদ্য ও পথ্য বিভ্রাট	...	২২
— টেবোয়াল	...	২৩৮	— পাণ্ডুরিয়া কয়লা হইতে বাংলার রাসায়নিক শিল্পের	...	১২৭
— হাদ (গল্প)	...	২৩৮	সম্ভাবনা	...	১২৭
— কবিমল মুখোপাধ্যায়	...	৬১৪	শ্রীমদমলতা দেবী	...	৬৮২
— মহাটানের এক দৃশক (১৯২১-৩৭)	...	৬১২	— ভূমার আবির্ভাব (কবিতা)	...	৬৮২
— মন ইয়াং-সেনের সাধনা	...	৬১২			

বিষয়-সূচী

— আদিম যুগের শিল্পের ধারা (সচিত্র)	...	২৪৮	উপনয়ন (গল্প)—শ্রীমদমল মুখোপাধ্যায়	...	২৫
— শ্রীকানাইলাল সাহা	...	২৪৮	এক প্রান্তে (কবিতা)—এ. এন. এম. বঙ্গবীর রশীদ	...	২২২
— ভুলান বহু (সচিত্র)—শ্রীমদরোজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	...	২৭১	এশিয়ার কথা—শ্রীমদীলকুমার বহু	...	৬৫
— “মারমু: শুভার ভবতু” (কবিতা)—শ্রীমদগঙ্গোপাধ্যায়	...	১৬৯	ঐতিহাসিক খননের কতিপয় স্তূপ—শ্রীমদগোপীনাথ সেন	...	৪১২
— ও অনর্থ (গল্প)—শ্রীমদললিতাকুমার ভট্ট	...	৮০	ওহাবী আন্দোলন ও মুসলমান সমাজের রাজনীতি	...	২৬৪
— “ও ভুলানাহারা (সচিত্র)—শ্রীমদভৈরবকুমার নাগ	...	১৭৫	— শ্রীমদগোপীনাথ বাগল	...	২৬৪
— “জাগানী কাল (উপনয়ন)—শ্রীমদমল মুখোপাধ্যায়	...	৬৮	কণ্ট্রোলার দিনকাল—শ্রীমদমা সেনগুপ্ত	...	১২০
১৩৫, ২৫০, ৩৪৪, ৪৬৫, ৫৫৬	...		কবি শিবনাথ শাস্ত্রী—শ্রীমদরোজেননাথ রায়	...	১৬৫
— শিক্ষায় প্রাথমিক চিত্রাঙ্কন ও হস্ত-শিল্পের দান (সচিত্র)	...	১৪১	ক্ষমা-হুম্মর (কবিতা)—শ্রীমদমোহন ঘোষ	...	৫১০
— শ্রীমদরায়চন্দ্র কুশারী	...	২৮৮	কালিদাস-সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ—শ্রীমদদ্বিজেন দাস	...	২০০
— “চন্দন (কবিতা)—শ্রীমদপ্রশান্তকুমার মিত্র	...	১৫	কালীদাস কব্যাভিলাষ (সচিত্র)	...	৪৭৪
— “কবি বাংলা ভাষা (সচিত্র গল্প)—শ্রীমদমল গোঁস্বামী	...	১৪৬	— শ্রীমদরোজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	...	১৫৭
— “কবি ত্রিধারা—শ্রীমদপ্রসন্ন বাজপেয়ী চৌধুরী	...	২০৬	কালীদাস ঘোষ (সচিত্র) - ঐ	...	১৫৭
— “কালিদাস (সচিত্র)—শ্রীমদভৈরবকুমার ভট্টাচার্য	...	২০৬	কুটীরের সেবায় আত্মবলিদান—শ্রীমদমলকুমার দত্তগুপ্ত	...	৩০৩
— “কালিদাস	...	২০৬, ৪১১, ৫১১	“কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ” (আলোচনা)	...	২০৭
— “কালিদাসপ্রার্থী (গল্প)—শ্রীমদললিতাকুমার ভট্ট	...	৪২৮	— শ্রীমদনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য	...	২০৭
— “পের নিরুত্তর—সেলজিয়ম ও হল্যাণ্ড (সচিত্র)	...	৮৫	— শ্রীমদনেশচন্দ্র সরকার	...	২০৪, ৪১১
— “শ্রীমদগোপীনাথ বাগল	...	৮৫	কে বাগী বাজায় (কবিতা)—শ্রীমদরোজেননাথ চন্দ্র	...	১৮১
— “শিলা ও তাহার মুক্তি-সংগ্রাম (সচিত্র)	...	৪৮	কোতুলপুর খানার স্বাস্থ্য—শ্রীমদখালচন্দ্র নাগ	...	২৮২
— “শ্রীমদভ্যাকিঙ্কর চট্টোপাধ্যায়	...	৪৮	খাদ্য ও পথ্য বিভ্রাট—শ্রীমদগোপাল বিশ্বাস	...	২২
— “পের শরণ (কবিতা)—শ্রীমদবোধচন্দ্র দাস	...	৩০	খাদ্য সমস্যার ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান	...	৪৮৭
— “র বাংলা অন্তর্ভুক্ত—শ্রীমদভৈরবকুমার চক্রবর্তী	...	৩৮৬	— শ্রীমদগুপ্তাচার্য লালুয়ানী	...	৪৮৭

সূচী-পত্র

গৌরীর ভাবের আধুনিকতা—শ্রীগোপাললাল দে	৬২১	ব্রহ্মদেশের স্বাধীনতা লাভ (সচিত্র)	৬২১
যুগ (কবিতা)—শ্রীমণিলাল দাশ	২৫২	—শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়	৬২২
চকিত চাহনি (কবিতা)—শ্রীশিবদাস চক্রবর্তী	৪৮৬	ব্রিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত পুরাতন বাংলা পত্র-পত্রিকা	৪৮৬
চিরন্তনী গীতি (কবিতা)—শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ চন্দ্র	৫০৩	—শ্রীশান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়	৫০৩
চীনের সাম্প্রতিক অর্থনীতি—শ্রীশান্তিরঞ্জন চক্রবর্তী	৪২০	ভরত, কণ ও বিখামিত—মুহম্মদ শহীদুল্লাহ	৪২০
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (সচিত্র)—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৫	ভাড়া-গড়া (কবিতা)—শ্রীনারায়ণ দত্ত	৪৪৫
তত্ত্বের প্রাচীনতা—শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়	৪৪৫	ভারতীয় মন্ত্রীতে সাত শরের জন্মকথা—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ	৪৪৫
তুমি আর আমি (কবিতা)—শ্রীকল্পনাময় বহু	১০৪	ভারতবর্ষে মজুর ধর্মঘট—শ্রীদীনবন্ধু দাস	১০৪
দ্বিধা অজ্ঞ কাঁপে খরখর (ঐ) — শ্রীপঞ্চানন চক্রবর্তী	১১৬	মহাচীনের এক দশক (১৯২৭-৩৭)	১১৬
দুর্গাবোধীর বোমন ও বিসর্জন—শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, বিভূতিনিধি	৫২১	—শ্রীমধাংশুবিমল মুখোপাধ্যায়	৫২১
দুর্য্যোতের পটভূমিকায় বাংলা-কাব্যের সূচনা ও প্রগতির আভাস		মহিলা-সংবাদ	১৭৬, ৫০২
—শ্রীসমীরকান্ত গুপ্ত	৮২	মানুষ ও মূল্যমান—শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	৮২
দেবীর বোধন ও বিসর্জন—শ্রীরাজমোহন নাথ	৩৫২	মৃত্যু অমৃত করে দান—শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা	৩৫২
দেশ-বিদেশের কথা	১১২, ২১৫, ৩১২, ৪২৩, ৫২৮, ৬৩২	ববনিকা (কবিতা)—শ্রীমণীন্দ্র গুপ্ত	৬৩২
বিক্রেন্দ্রলাল রায় (সচিত্র)—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৮৩	বাহাদুর ও চলালে ববহার অরাজকতা—শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত	৫৮৩
ধনিন্দ্রনাথ ধর্মির জন্ম—শ্রীগিরিদ্বারী রায় চৌধুরী	৩১৪	যুক্তপ্রদেশের প্রান্তিক লোকসঙ্গীত—শ্রীমারা গুপ্ত	৩১৪
নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত (সচিত্র)—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৭৪	যুক্তপ্রদেশে কৃষিক্ষেত্রে বিমানের কার্যকারিতা (সচিত্র)	৩৭৪
নববঙ্গের বয়স্কদের প্রাথমিক শিক্ষার কার্যকরী পরিকল্পনা		—শ্রীললিতাকুমার ভদ্র	
—শ্রীজীবনময় রায়	৫২২	রবীন্দ্র-চিত্রের ভূমিকা—শ্রীবিমলচন্দ্র চক্রবর্তী	৫২২
"নিউ ইন্ডিয়ান কালচারাল ড্যান্সারস" (গল্প)		রবীন্দ্রসংলাপ কণিকা—শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য	
—শ্রীনরীমাধব চৌধুরী	৩৬৬	রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (কবিতা)—শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক	৩৬৬
নন্দা-নীলব রাতে মত (কবিতা)—শ্রী অপরূপকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য	২০৮	"রামানন্দ-জীবনী"—শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	২০৮
নেপালীদের খাত্তব—শ্রীবিজয়ভূষণ ঘোষ চৌধুরী	১৬৬	রামের টাকা (গল্প)—শ্রীজগদীশ গুপ্ত	১৬৬
পত্রাবলী—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৩৩৭, ৪৪১, ৪৪৫	রাষ্ট্রের গোড়ার কথা—শ্রীআশা মুন্সী	৩৩৭, ৪৪১, ৪৪৫
পদ্মানন্দীর চরে (কবিতা)—শ্রীপিনাকীরঞ্জন সরকার	৪৬০	রূপান্তর (কবিতা)—শ্রীবিষ্ণু বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৬০
পাখুরিয়া কয়লা হইতে বাংলার রাসায়নিক শিল্পের সম্ভাবনা		সেখাগণিতে পণ্ডিত জগন্নাথ—শ্রীবিজয়গোপাল বহু	
—শ্রীহরগোপাল বিশ্বাস	১২৭	শতাব্দী চলে (কবিতা)—শ্রীনারায়ণ দত্ত	১২৭
পুস্তক-পরিচয়	১০৫, ২০২, ৩১৫, ৪১৭, ৫২২, ৫২৫	শরণাগতা (গল্প)—শ্রীহরী শেনগুপ্ত	৫২২
পূর্ববঙ্গের হিন্দুর সমস্যা—শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত	৪০৩	শহীদ (গল্প)—শ্রীসাবিত্রী ঘোষাল	৪০৩
প্রশান্ত মহাসাগরের আদিম অধিবাসী (সচিত্র)		শাখত বর্তমান (কবিতা)—শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা	
—শ্রীব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	৪৫৭	শিল্পী হুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় ভাষা-শিল্প (সচিত্র)	৪৫৭
প্রাগজ্যোতিষ—শ্রীবিমলাচরণ লাহা	৩০০	—শ্রীললিতাকুমার ভদ্র	৩০০
প্রাগৈতিহাসিক বাংলাদেশ—শ্রীগিরিদ্বারী রায়চৌধুরী	৩৬২	শিল্প ও শিল্পী (সচিত্র)—শ্রীবিমল রায়	৩৬২
ফারমেটেশন—শ্রীস্বর্ণকমল রায়	১২২	শিল্পশিক্ষা ও স্বাধীন রাষ্ট্র—শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত	১২২
বঙ্কিমচন্দ্র (কবিতা)—শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়	৪২৩	শুকতারা (গল্প)—শ্রীরমা সরকার	৪২৩
"বলম্ উপাস্থ"—শ্রীবিমলাচরণ দেব	৩৮১	শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় (কবিতা)—শ্রীগোপাললাল দে	৩৮১
বাউলের সাজ (কবিতা)—শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক	৩৪১	সঙ্গীত দামোদর—শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	৩৪১
বাঙালী ছাত্রদের কথা—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	২৩৩	সত্য চেয়ে বড় (কবিতা)—শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক	২৩৩
বাণিজ্য-বাণী (কবিতা)—শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়	৮৮	সব-হারাদের কবি (কবিতা)—শ্রীপ্রভাত বহু	৮৮
বাঙালী-বিহারী বিরোধ—শ্রীনির্মাল্য দাশগুপ্ত	৩৪২	সমর্পণ (কবিতা)—শ্রীঅমলেন্দু দত্ত	৩৪২
বাপুরী (কবিতা)—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	৫১৩	সরলা রায়—শ্রীপ্রভাবতী রায়	৫১৩
বার্ট্রাও রাসেলের সন্ন্যাস-দর্শন—শ্রীউমা সেন	৫৭৫	সংস্কৃত-সাহিত্যের প্রচার—শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী	৫৭৫
বাল-প্রতিভা—শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	২৪২	সাধ (কবিতা)—শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ চন্দ্র	২৪২
বাস্তব ও কল্পনা (কবিতা)—শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা	২৬৩	সান ইয়াং-সেনের সাধনা—শ্রীস্বধাংশুবিমল মুখোপাধ্যায়	২৬৩
বিটাটন (সচিত্র)—শ্রীজিতেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৫৬৪	সানি কবি শাহ্, আবদুল লতিফ—এ. এন. এম. বজলুর রশীদ	৫৬৪
বিহারী (কবিতা)—শ্রীঅশুতোষ সাত্তাল	২৩৭	সিন্ধুযুগ হইতে বৈদিকযুগ—শ্রীনরীমাধব চৌধুরী	২৩৭
বিবিধ প্রসঙ্গ	১, ১১৩, ২১৭, ৩২১, ৪২৫, ৫২৪	সিন্ধু সভ্যতা ও মেসোপটেমিয়া—শ্রীনরীমাধব চৌধুরী	১, ১১৩, ২১৭, ৩২১, ৪২৫, ৫২৪
বিমানে ভূ-প্রদক্ষিণ (সচিত্র)—শ্রীবিনয়ভূষণ দাসগুপ্ত	৭৫, ১৬৩, ২২৪, ৩২৪, ৪১৫, ৬০৮	সিংহলের স্বাধীনতা লাভ (সচিত্র)—শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়	৭৫, ১৬৩, ২২৪, ৩২৪, ৪১৫, ৬০৮
বিষাক্ত যুগ (কবিতা)—শ্রীবিশু দত্ত	১২২	সীতাকুণ্ড (সচিত্র)—শ্রীস্বধাংশু বাজপেয়ী চৌধুরী	১২২
বৈদিক আর্থ ও অবৈদিক আর্থ—শ্রীনরীমাধব চৌধুরী	১৭	হুইজারল্যাণ্ডের সমৃদ্ধি—শ্রীবর্গলাকুমার মজুমদার	১৭
ব্রতচারিণী (গল্প)—শ্রীইলারাগী মুখোপাধ্যায়	৩৯০	মুখ (কবিতা)—শ্রীমণীন্দ্র গুপ্ত	৩৯০
		মুখ ও শান্তি—শ্রীবিজয়কেন্দ্র বহু	

সাইড গোল (গল্প)—শ্রীনিবেশ চট্টোপাধ্যায়
 বীর সন্ধ্যা (গল্প)—শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ
 (গল্প)—শ্রীরবীন্দ্রকুমার বসু
 বরাজের সাধনা—শ্রীঅনাথবল্লভ দত্ত
 বীর ত্রিপুরা (সচিত্র)—শ্রীহনোলপ্রকাশ সোম

বিবিধ প্রসঙ্গ

... ১৭৭	বাহীন ত্রিপুরার রাজমালা—শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য	... ৪২৪
... ৫২৭	বাহীনতা ও বাংলা ভাষা—শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী	... ৩৫
... ১৪০	বাহীনতা-তীর্থে (কবিতা)—শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা	... ৪৪
... ৪৬১	ভূমার আবির্ভাব (কবিতা)—হেমলতা দেবী	... ৩৮৯

বিবিধ প্রসঙ্গ

বিহার ও ভারতের কৃষি
 মৌমাগণের সমগ্র আসামে প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা
 বীর দরগাহ
 আমে বাঙালী
 খাপে কৃষির উন্নতি
 বেশান্ত জন্মশতবার্ষিকী
 মূলি নেহি ছোড়তা—
 নিষ্ট পাটি বে-আইনী
 আর অভাব
 কাতা কর্পোরেশন
 কাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসব
 গ্রন্থের ভবিষ্যৎ
 গণকর রায়ের বিবৃতি
 সমস্তা সমাধান
 মহাপ্রয়াণ
 জীর প্রতি পণ্ডিত জহাঙ্গীরলাল নেহরুর অঙ্কাজলি
 জীর শেষ রচনা, কংগ্রেস সম্পর্কে
 নানক রক্ষায় গিয়াছিলেন
 ব-মন্ত্রীসভার অপহৃতি
 ব-মন্ত্রীসভার চার মাস
 নলাল শান্তলাল
 নদারির ক্ষতিপূরণ দানের উপায়
 জমিদারি লোপের পর ভারতবর্ষের কর্তব্য
 জলসেচনের অগ্রাভ্যাস ব্যবস্থা
 জাঙ্গানীর ভবিষ্যৎ
 ঢাকায় মিঃ জিন্না
 ত্রিপুরা রাজ্য অবরোধ
 দামোদর উপত্যকা
 দুর্নীতি দমনের পথ
 নব তালিম—নতুন শিক্ষা
 বসিহ চিন্তামন কেলকার
 ব্রী-উদ্ধারে বিপত্তি
 নিজেদের নাক কাটিয়া অপরের যাত্রাভঙ্গ
 নতুন মন্ত্রিসভা
 পণ্ডিত নেহরুর অভিযোগ
 গল্লাবাসীর সাময়িক শিক্ষা
 পশ্চিম-বঙ্গ মুসলমান সংশ্লেষন
 পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান
 পশ্চিমবঙ্গের সহিত যুক্ত হইবার জন্ত মানভূমবাসীদের দাবি
 পশ্চিম বাংলার উন্নয়ন ব্যবস্থা

... ১২	পশ্চিম বাংলার সীমান্ত রক্ষা	... ২২১
... ৮	"পাকিস্তান" মনোভাব	... ৩২৯
... ৫৪০	পাকিস্তানীর প্রতাবর্তন	... ৫৪০
... ৭	পার্বত্য জাতিদের স্বার্থ	... ৭
... ১৩	পুনর্বাসনের বিরাট আয়োজন	... ৩২৭
... ১৫	পুলিস কর্তৃক "ব্লাক মার্কেট হমন"	... ৫
... ২২৫	পূর্ববঙ্গের প্রকৃত অবস্থা	... ৫৩৩
... ৫৩৭	পূর্ববঙ্গের সমস্তা সমাধানের উপায়	... ৪
... ১০	পূর্ববঙ্গের হিন্দু	... ৩২৫
... ৫৩৬	পূর্ববঙ্গে হিন্দুর ভবিষ্যৎ	... ৫২৯
... ৫৪২	পূর্ব বাংলার একটি চিত্র	... ২২৪
... ৩২৪	পূর্বসীমান্ত রক্ষার ব্যবস্থা	... ১১৯
... ৩	প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন	... ৩৩৪
... ৩৩৪	প্রমাণে পণ্ডিত নেহরুর বক্তৃতা	... ৪৩১
... ৪২৫	ফিলিস্তিন	... ২২৮
... ৪২৯	বরিশালে দুর্গাপ্রতিমা নিরঞ্জন বাধা	... ১২৪
... ৪২৮	বঙ্গমুখ্য নিয়ন্ত্রণ	... ৩৩০
... ৩৩৬	বাংলা ও আসাম ব্রাহ্ম-সম্মিলনী	... ২২৬
... ৩২৩	বাংলা বনাম উর্দু	... ৩২৮
... ২১৮	বাংলার অবস্থা ও প্রতিকার	... ১
... ২৩২	বাংলার খাদ্য-সমস্তা	... ১২৫
... ১৪	বাংলার বাজেট	... ৪৩৩
... ১৪	বাংলার সমস্তা	... ১১৩
... ১২৬	বিলাতে বস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধি	... ১১
... ২২৭	বিশেষ ক্ষমতা আইন	... ২২০
... ৫৩০	বিশ্বের দরবারে ভারতবর্ষের স্থান	... ৩০৫
... ৩২৬	বৃহৎ উৎকল	... ৩৩২
... ২২৪	বেগীমাধব বড়ুয়া	... ৫৪৪
... ২	ব্রহ্মদেশের স্বাধীনতা	... ৩৩৩
... ৩৩১	ভাই পরমানন্দ	... ২৩১
... ২৩১	ভারত-ইতিহাসের প্রেরণা	... ৩৩১
... ৪৩৮	ভারতীয় পার্লামেন্টে পণ্ডিত নেহরুর ভাষণ	... ৪৩৬
... ৩২৯	ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রবিধি	... ৪৩৫
... ৩২২	ভারতবর্ষের "ঐতিহ্য"	... ৪৩৩
... ১১৪	ভারতবর্ষের মুসলমান	... ৩২৭
... ৩২৫	ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে নেতৃত্ব-সমস্তা	... ২১৭
... ২১	ভারত-রাষ্ট্রের প্রকৃতি	... ২২১
... ৫৩৯	ভারতে বস্ত্রের উৎপাদন হ্রাস	... ১০
... ১	ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ ও বিশ্ববিদ্যালয়	... ১২৭
... ২২৫	মহাস্বাধীনতার অনশন ব্রতের সমাপ্তি	... ৩২১
...	মহাস্বাধীনতার প্রতি বড়লাটের অঙ্কাজলি	... ৪৩২

মুক্তিভাষা ও প্রকাশ বিভাগ

মিত্র-সেবাসভ

মুজ্জে, বি. এস.

মুসলীম লীগের ভবিষ্যৎ

মুগালকান্তি ঘোষ

যোগেশচন্দ্র রায়, আচার্য

রেলওয়ে মাল বুকিং আপিসে দুর্নীতি

লাভলিমোহন মিত্র

লিয়ারকং আলি খানের প্রতিবাদে সন্দীর প্যাটেল

লিয়ারকং আলি খানের বক্তব্য

সূচী-পত্র

...	৪৪১	অমিক বিরোধের সমাধান
...	৪৪০	সদীর বলভতাই প্যাটেলের অন্ধাঙ্কলি
...	৪৪৪	সর্বোদয় সমাজ
...	২২৩	হুদীরকুমার লাহিড়ী
...	৭	হুদীরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
...	২২৮	সেচনের বাঁধ ও পুঙ্করিণী
...	৬	বাধীন ভারতে কারা-সংস্কার
...	২৩০	হরিণঘাটা পরিকল্পনা
...	১১৮	হায়দরাবাদী ব্যবস্থা
...	১১৬	হাসপাতালের অবস্থা

চিত্র-সূচী

রঙীন চিত্র

বর্ধার আবির্ভাব—শ্রীমহারঞ্জেন সেনগুপ্ত

বাপুজী—শ্রীমললাল বহু

মা ও ছেলে—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

যবন হরিদাসের মহাপ্রয়াণ—শ্রীসন্তোষ সেনগুপ্ত

জামা—শ্রীমহারঞ্জেন সেনগুপ্ত

স-রস তরু শ্রীমণিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

একবর্ণ চিত্র

অতি আদিম যুগের শিল্প

অমৃতলাল বহু

অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

অশোক চট্টোপাধ্যায়

আদিম অবিবাসী, প্রশান্ত মহাসাগরের

আলাহা : চিত্রাবলী

ইউ. এন্. ও. (স্বস্তি-পরিবহ)

ইন্দোনেশিয়া : চিত্রাবলী

ওয়ারিং নাট্যের অভিনেতা

বাটাভিয়া

কল্যাণী গুহ

কার্তিকচন্দ্র বহু, ডাঃ

কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ

কালীপ্রসন্ন ঘোষ

কাগীর :—গিলগিট ও হনজা অঞ্চল

বিলাস নদীতীর

শ্রীনগর

হনজা অঞ্চলে শস্তক্ষেত্র

ক্যাম্বোজের মডেল ডেপুটি (ব্যঙ্গচিত্র)

গান্ধীজী :

অন্তিম শয়নে

শোকযাত্রা

জবাহরলাল নেহরু

জেকারসন :—মর্মান্বর্ত্তি

—স্মৃতিভবন

ঝাড়গ্রাম সেবায়িতন

ত্রিপুরা : চিত্রাবলী

দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী : কুমার আসানের প্রতিমূর্ত্তি

ধিজেন্দ্রলাল রায় ও তাঁহার পত্নী

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

পল্লীগ্রামের দৃশ্য

পাটনা : কিশোর-মলের চিত্র

শ্রীবাসনা সেন

বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত

বিটাটন যন্ত্র

বিমল রায়-অঙ্কিত চিত্রাবলী

শ্রীবিমলাদেবী চক্রবর্ত্তী

ব্রহ্মদেশ : চিত্রাবলী

ঐ —স্বাধীনতা উৎসবের চিত্রাবলী

মহীশূর : পল্লীপথে

মাকুরিয়া : চাবী-গৃহস্থ

মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্র :

ওয়ারিংটন

ওয়ার্ড ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়

নিউ ইয়র্ক, বিমান হাইতে

জাশনাল গ্যালারি অব আর্ট

বিমানের কার্যকারিতা

মীনাক্ষী সেনগুপ্তা

রাঁচী : 'শান্তিধাম'

রামমোহন রায়ের সমাধি, ত্রিষ্টল

লণ্ডন : ইম্পিরিয়াল এয়ারওয়েজ

পার্লামেন্ট ভবন

লবণ প্রস্তুতির দৃশ্য, ছালাহাজরা ও অন্তরাং

লিঙ্কনের মর্মান্বর্ত্তি

শ্রীশান্তা দেবী

শিল্পী হুদীরকুমারের ভাস্কর্য

সাইক্লোটন যন্ত্র

সিংহল—এসেমারি হল

সীতাকুণ্ড, মুঙ্গের

শ্রীসীতা দেবী

হুদীরচন্দ্র লাহিড়ী

হরবালা দেবী

সেনানায়ক, ডন টিফেন

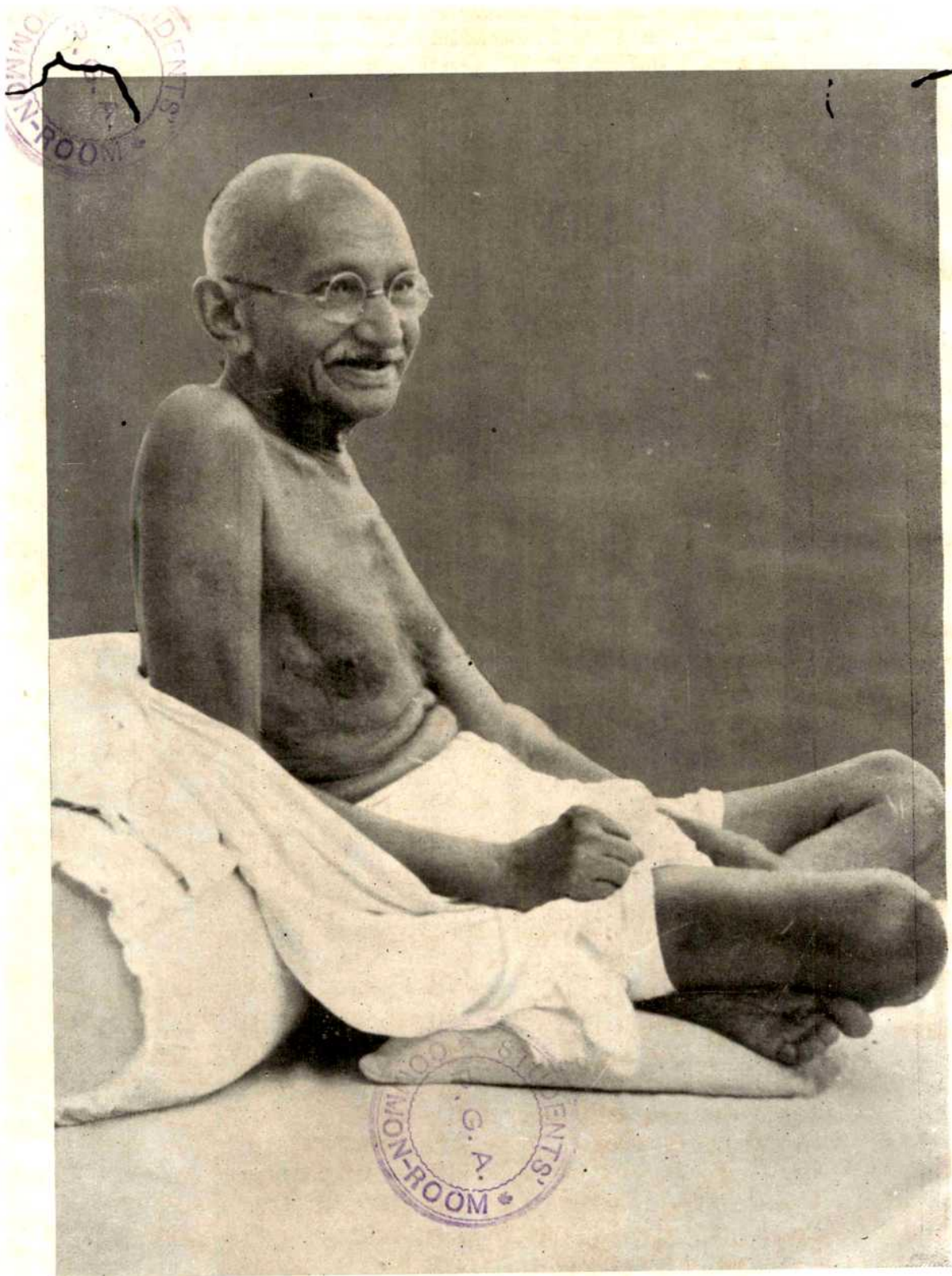
হল্যাও : চিত্রাবলী



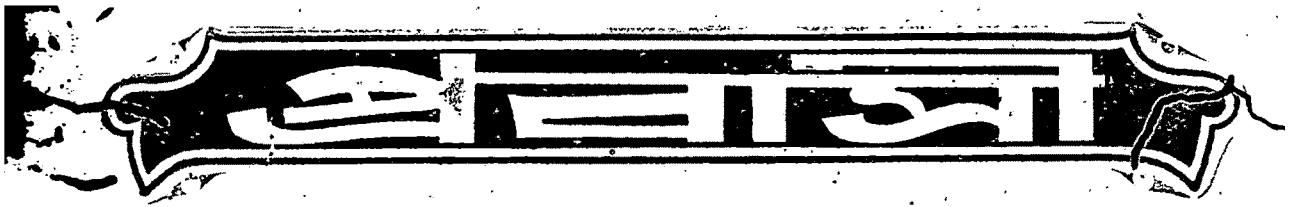
বর্ষার আবির্ভাব
 শ্রীমহারাজেন শেনগুপ্ত

আবাসী প্রেস, কলিকাতা





মহাত্মা গান্ধী



“সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্

বায়ুমাখা বলহীনেন লভ্যঃ”

৪৭শ ভাগ
২য় খণ্ড

কাঙ্ক্ষিক, ১৩৫৪

৩য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

বাংলার অবস্থা ও প্রতিকার

বাংলার অবস্থা ও প্রতিকার সম্পর্কে গত মাসে আমরা সবিশেষ লিখিয়াছিলাম। উহাতে আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির বর্তমান গভীর মধ্য হইতে ভাল লোক পাওয়া অসম্ভব। ঐ কমিটির কর্তব্য-দিগের মধ্যে নিজের স্বার্থ ও নিজের দলের স্বার্থ চিন্তা ভিন্ন আর কোনও চেষ্টার চিহ্ন বাংলাদেশ বিগত বিশ বৎসরের মধ্যে পায় নাই বলিলেও চলে এবং উহার কার্যপদ্ধতির আয়ুস পরিবর্তন না হইলে আগামী বিশ বৎসরেও ঐ অবস্থার অবনতি ভিন্ন আর কিছুই হওয়া সম্ভব নহে। সম্প্রতি যে ভাবে নতুন কমিটির সভ্য ও কংগ্রেসের দলবৃদ্ধির চেষ্টা চলিতেছে তাহার মধ্যেও ঐ একই পুরাতন কার্যপদ্ধতি পাওয়া গিয়াছে। ইহারও সংস্কার প্রয়োজন। বর্তমানে সারা বাংলাদেশের প্রতিনিধি নির্বাচন তিন চারি জন লোকের হাতে। ইহাদের মধ্যে ব্যক্তিগত সত্যতা কাহারও কাহারও আছে, অর্থাৎ অসং উপায়ে অর্থোপার্জন বা পরোপকারের তাঁহারা করেন না। কিন্তু নিজ দলের ক্ষমতা বা প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধির জন্য দেশের মঙ্গলচিন্তা কখনও বিসর্জন দেন নাই এরূপ একজনও ইহাদের মধ্যে নাই। নিজ দলের আজাবাহী চর নহে এরূপ সং ও কর্ণঠ লোক যাহাতে বি. পি. সি. সি.তে প্রবেশ ও প্রতিষ্ঠালাভ করিতে না পারে ইহার জন্য ইহারা সকলেই সত্য চেষ্টিত এবং দেশের মঙ্গলকামনায় নিজ দলের স্বার্থ বলিদান দিতে ইহারা কেহই প্রস্তুত নহেন। বরঞ্চ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইহারা দেশের ও দেশের কল্যাণের বিষয় জলাঞ্জলী দিয়া নিজেদের স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থাই এতদিন করিয়া আসিয়াছেন। ইহাদের বিষয়ে শেষ কথা এই যে, ইহাদের মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে সংব্যক্তিগণ প্রায়ই হিতোপদেশের জরদগব জাতীয় লোক এবং ইহাদের প্রত্যেকেরই গোষ্ঠিতে মার্জার শ্রেণীর নীচ লোক আছে, যাহাদের পক্ষে এমন কোনও অসং কাজ নাই যাহা অসম্ভব, এবং তাহারই ফলে বাংলার আজ এই দুর্দশা, যাহার আশু প্রতিকার না হইলে ক্ষয়িষ্ণু বাঙালী জাতি অতি শীঘ্রই চরম দুর্গতির পথে চিরদিনের মত নাহিয়া যাইবে।

এরূপ অবস্থায় দেশবাসীর কর্তব্য কি? দেশবাসীর সর্ব-প্রথমে জানিয়া রাখা প্রয়োজন যে কংগ্রেস কাহারও পৈতৃক জমিদারী নহে। যদি কোনও ক্ষেত্রে কোনও জেলায়, নগরে বা মহকুমায় দেখা যায় যে সং বা কর্ণঠ লোকের পরিবর্তে অসং বা অকর্ণগ্য লোক প্রাদেশিক কমিটিতে স্থান পাইয়াছে—যাহা পশ্চিমবঙ্গের সকল জেলায় সর্বত্রই এতদিন হইয়া আসিয়াছে—তাহা হইলে সেই অঞ্চলের যাহারা কর্মী বা দেশ-হিতকামী তাঁহারা সম্ভবতঃ ভাবে তাহার প্রতিকারের ক্ষমতা যেন তখনই উদ্ভূত হইয়া উঠেন। প্রয়োজন হইলে সেই স্থলে যেন তখনই একটি পৃথক কংগ্রেস দল গঠিত হয় যাহা কেন্দ্রীয় সমিতির নিকট প্রতিকার প্রার্থনা করে এবং সেখানে সুবিচার না পাইলে নিখিল ভারতীয় কংগ্রেসে প্রতিকার প্রার্থনা করিবে। যাহারা কর্ণঠ লোক তাঁহাদের সকলেরই অবিলম্বে কংগ্রেসে যোগদান করা প্রয়োজন এবং পরিচিত সকলকেই কংগ্রেস দলভুক্ত করা প্রয়োজন। আজাবাহী ভিন্ন অজ কেহই যাহাতে কংগ্রেসের দলভুক্ত না হয় এইরূপ অপচেষ্টা নানা অজুহাতে বহুদিন হইতেই এই প্রদেশে চলিতেছে। লোক মনোমত হইলে তাহার কর্তব্য পাইতে বা মেঘর হইতে এক মুহূর্তও লাগে না। অন্যথায় এক মাস চেষ্টা করিলেও কিছুই ফল হয় না ইহা পূর্বেরও দেখা গিয়াছে এবং এখনও দেখা যায়। এতদিন এই সকল গঠিত পদ্ধতি সম্বন্ধে কিছু বলা বা লেখা যায় নাই কেননা তাহাতে বিদেশী ও বিপক্ষের সম্মুখে কংগ্রেসকে অপদস্থ করার পথ ধোলা হইত, কিন্তু এখন এই সকল অনাচার দূর করিয়া পশ্চিম বাংলার কংগ্রেসকে সত্যসত্যই দেশের কল্যাণকর জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিতে হইবে। অন্যথায় বাংলা ক্রমেই সকল দিকে পিছাইয়া পড়িবে।

আজ বাংলাদেশ ভারত মুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে অতি অধম স্থানে পড়িয়া রহিয়াছে। বিহারী চোখ রাঙাইতেছে, আসামে বাঙালীর উপর ঘণেচ্ছাচার ও হুঁয়বহার চলিতেছে, অন্য প্রদেশের লোকে কুপা, অবজ্ঞা বা অবহেলার সহিত বাংলা ও বাঙালীর কথা মনে প্তানে। আশাদের অবনতি কি এতদূর গড়াইয়াছে যে ইহাতেও আমাদের চৈতন্য হইবে না, দৈনিক কাগজের

সমপাদনা মাদক অথবা তথাকথিত রাষ্ট্রচালকগণের স্বতন্ত্র-
প্রশান্তিতে সংশ্লিষ্ট হইয়া আমরা দেশের অবস্থার দিকে তাকাইব
না? দেশের পূর্বপৌরবের স্বাতিতে বা চতুর প্রদেশপরিচালকের
শৌকবাক্যে তুলিয়া অবস্থা ও আন্তরিকতা কাজে হাত না দিলে
আর দু'দিন পরে দেশের কি হইবে সে বিষয়ে চৈতন্য আমা-
দের কবে হইবে?

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির শুধু আহুল সংশোধন
প্রয়োজন নহে ইহা হইতে বহু অনিষ্টকারী উপাদানের
বহিষ্কারও অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। এই সকল উপাদান
যাহাদের হাতের অস্ত্র, যে অস্ত্রের সাহায্যে তাঁহারা এতদিন
দেশের জনসাধারণের চোখে ধূলা দিয়া মেকী চালাইতেছেন,
তাঁহাদেরও প্রকৃত পরিচয় পশ্চিমবঙ্গবাসীর পাওয়া প্রয়োজন;
নহিলে পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘিষ্ঠদল তো ডুবিলেই, পশ্চিমবঙ্গের
গরিষ্ঠ দলেরও পতন অনিবার্য হইয়া উঠিবে। এই উপাদান-
গুলির মধ্যে সর্বপ্রথম হইল কংগ্রেস প্রতিনিধি মনোনয়ন।
বাঙালী জনসাধারণের এতদিন একটা ধারণা ছিল যে তাঁহাদের
প্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচিত হইয়া যে সকল ব্যক্তি বিবিধ
ব্যবস্থাপক বা কার্য-নির্বাহক সভা সমিতি ও প্রতিষ্ঠানে স্থান
লাভ করেন তাঁহাদের সকলেই কংগ্রেসের গণতান্ত্রিক নিয়-
মামুসারে মনোনীত ও নির্বাচিত হন। এই ভুল শোধরাইবার
সময় হইয়াছে, কেননা এই ভুলেই দেশের সর্বনাশ হইতেছে।
বস্তুতঃপক্ষে তিন-চারি জন চক্রান্তকারী কন্দিবাজ লোক,
আপোষে মিলিয়া, সর্বপ্রথমে নিজ নিজ দলের ওজন হিসাবে
কাহার কয়জন চেলা-চাষুও দেশের লোকের মাথায় কাঁঠাল
ভাঙ্গিবার সুযোগ পাইবে ইহা স্থির করেন। তাহার পর
তাঁহারা নিজ নিজ দলের স্বার্থ অহুযারী যথাসংখ্যক কয়েক
ব্যক্তির পিঠে কংগ্রেসের সেবেল আঁটয়া জনসাধারণের প্রতি-
নিধিরূপে ভোটের বাজারে ছাড়িয়া দেন। এই প্রতিনিধি
দলের মধ্যে চোরাকারবারী স্থান পায় পার্টি-কণ্ঠে মোটা
টাকা দেওয়ার দরুন—যাহা সে দেশের লোককে আরও
ঠকাইয়া উত্তুল করিয়া লয় অল্পদিনেই—এবং স্থান পায় দুর্ভ,
চালবাজ, পেশাদার “দেশভক্ত”, যাহাদের মহিমায় আজ
বাংলার এই অধঃপতন, এবং সেই সঙ্গে স্থানলাভ করেন
কতিপয় মুকবিরপ্রায় অল্পভক্ত। স্থান পায় না শুধু সে,
যে প্রকৃত নিষ্কাম কর্মী, নির্বাচিত হয় না সে-ই যাহার সত্য-
সত্য জ্ঞান লোপ পায় নাই অল্পভক্তির প্রভাবে এবং বর্জিত
হয় সে জন যাহার পৌরুষ আছে, কার্য নির্বাহের ক্ষমতা
আছে, পাছে সে শক্তিমান দেশপরিচালকরূপে প্রতিষ্ঠালাভ
করে দেশের লোকের কাছে। বলা বাহুল্য, দেশের লোক
নির্বাচনের সময় কংগ্রেসের আদর্শের উপর আস্থা দেখাইবার
জন্য যাচাই না করিয়া শুধু সেবেল দেখিয়া, এই সকল মেকী
গ্রহণ করে খাঁটি সোনার দরে। অজ্ঞ বাংলার জনসাধারণকে
সতর্ক করার দিন আসিয়াছে, তাহাদের অবিলম্বে জানা

প্রয়োজন যে কংগ্রেস নামের এমন কোন সলোকিক মানস
নাই যাহাতে বুটা সাক্ষা হয়, জেতে প্রাণ আসে। দেশের
লোকের আঁখি বুঝিবার সময় হইয়াছে যে যাহারা তাঁহাদের
প্রতিনিধি সাক্ষিয়া দিল্লীতে ও কলিকাতায় বিরাজ করিতেছেন,
তাঁহাদের অবিকাংশ প্রকৃতপক্ষে কাহার প্রতিনিধি ও কাহার
স্বার্থের চিন্তা তাঁহারা করিয়া থাকেন।

দুর্নীতি দমনের পথ

দুর্নীতি দমনের জন্য ডাঃ ঘোষ আর্ডিনাল করিতেছেন,
নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে সরকারী কর্মচারীদের সম্পত্তির হিসাব
দাখিল করিবার জন্য সাকুলার দিয়াছেন। কিন্তু পুলিস
যে ভাবে এই সব আর্ডিনাল ও সাকুলার প্রভৃতি কার্যে পরিণত
করিবার চেষ্টা দেখাইতেছে তাহা গভীর হতাশাব্যঞ্জক।

সরকারী কর্মচারীদের দুর্নীতি নিবারণের ব্যবস্থা না হইলে
চোরাকারবার কিছুতেই বন্ধ হইতে পারে না। সরকারী চাউল
অন্যরূপে সরাইবার যে কয়টা চেষ্টা ইতিমধ্যে ধরা পড়িয়াছে
তাহার সহিত সিবিলায়ান কর্মচারী পর্যন্ত কেহ কেহ জড়িত
রহিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। মিঃ কেসী যখন বাংলার
গবর্নর ছিলেন তখন তিনি একবার এই দুর্নীতি বন্ধ করিবার
জন্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহার আগে রোলাও কমিটি দুর্নীতি
নিবারণের কতকগুলি উপায় নির্দেশ করিয়াছিলেন। রোলাও
কমিটির সুপারিশগুলির পরিসর কম ছিল বলিয়া মিঃ কেসী
ত্রিযুক্ত বিজয়বিহারী মুখোপাধ্যায়কে আহ্বান করিয়া তাঁহাকে
দুর্নীতি নিবারণের উপযুক্ত একটি পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা দাখিল
করিতে অনুরোধ করেন। ত্রিযুক্ত মুখোপাধ্যায় দীর্ঘকাল
জমি জরীপ বিভাগের ডিরেক্টর ছিলেন, শাসনকার্যে তাঁহার
দক্ষতা অসাধারণ এবং চরিত্র নিষ্কলঙ্ক। মিঃ কেসী উপযুক্ত
লোককেই ভার দিয়াছিলেন এবং তিনিও অল্প দিনের মধ্যেই
তাঁহার রিপোর্ট প্রস্তুত করিয়া দাখিল করেন। মিঃ কেসী
যখন তাঁহাকে নিযুক্ত করেন তখন ৩৩ বারার শেষের দিকে।
রিপোর্ট যখন তিনি দাখিল করেন তখন লীগ মন্ত্রীসভা কার্য-
ভার গ্রহণ করিয়াছে। বলা বাহুল্য, যে লীগ মন্ত্রীসভা ঐ
রিপোর্ট অহুসারে কাজ করেন নাই, এমন কি উহা প্রকাশও
করেন নাই। রিপোর্টটি ধামাচাপা পড়িয়াছে।

সরকারী কর্মচারীদের দুর্নীতি নিবারণে ডাঃ ঘোষের
আন্তরিকতা যদি সত্য হয়, ডাঃ ঘোষের মস্তিষ্ক স্বল্পশ্রী অল্পদা
চৌধুরী যদি সত্যই এ বিষয়ে আগ্রহশীল হন তবে তাঁহাদের সর্ব-
প্রথম ও সর্বপ্রধান কর্তব্য ঐ রিপোর্টটি বাহির করিয়া অভিনিবেশ
সহকারে উহা পাঠ করা এবং তদনুসারে অবিলম্বে কার্যে
ব্রতী হওয়া। রিপোর্ট দেখিবার সৌভাগ্য আমাদের হয় নাই
কিন্তু ত্রিযুক্ত মুখোপাধ্যায়কে আমরা ব্যক্তিগত ভাবে জানি,
বাংলার শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার রচনা পাঠ করিয়াছি।
আমরা ছোয় করিয়া বলিতে পারি যে ডাঃ ঘোষ এবং ত্রিযুক্ত
চৌধুরী রিপোর্টটি পাঠ করিলে পথের লঙ্কার পাইবেন।

খ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায়ের বিবৃতি

খ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায় এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, উত্তর ও পূর্ববঙ্গ হইতে বহু লোক চলিয়া আসিতেছে। পূর্ব বঙ্গের কোথায়ও কোন বড় ঘটনা না ঘটিলেও লীগ ডাশনাল পার্টিদের অত্যাচার এবং অজ্ঞাত কর্মকেট কারণে তাহারা আর পূর্ব পাকিস্থানে নিজেদের জীবন এবং বনসম্পত্তি নিরাপদ মনে করিতেছে না।

খ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায়ের বিবৃতির-মূল বক্তব্য এইরূপ :

“জনসাধারণ একথা জানেন যে, উত্তর এবং পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের মনে বিশেষ জ্বালায়ের ভাব দেখা দিয়াছে। তাহারা আশঙ্কা করিতেছে যে, পঞ্জাবে যাঁহা ঘটনা হইয়াছে তাহা পূর্ব এবং উত্তর বঙ্গও ঘটতে পারে। সেই কারণেই অনেকে পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া আসিতেছে। ইহার জন্ত তাহাদের দোষ দেওয়া যায় না। কারণ তাহারা আশঙ্কা করিতেছে যে, তাহাদের বন-সম্পত্তি, জীবন এবং তাহা অপেক্ষাও অধিকতর মূল্যবান তাহাদের জীলোকদের সম্মান পূর্ববঙ্গ সরকারের অধীনে নিরাপদ নয়। সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণ, খ্রীষ্টের মাজার উপর জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের উপর অত্যাচার, খুবতীদের পিতার নিকট রূপান্তর করিয়া পত্র প্রেরণ এবং লীগ ডাশনাল পার্টিদের দ্বারা হরণ হওয়ার বহু বিশ্বাসযোগ্য সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। এই সব বিষয়ে অভিযোগ করা সত্ত্বেও কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে বলিয়া শুনি নাই। শান্তি এবং শৃঙ্খলা রক্ষার কর্তারা হয় এবিষয়ে উদাসীন, না হয় বিশৃঙ্খলা দমনে অত্যন্ত দুর্বল। তাহার উপর এক দল মুসলমানের মধ্যে একটা মার-মুখো ভাব বর্ডমান। বিহার, পশ্চিমবঙ্গ এবং অজ্ঞাত প্রদেশ হইতে আগত মুসলমানরাও গণ্ডগোল করিতেছে। এই সমস্ত ব্যাপারের জন্তই পূর্ব এবং উত্তর বঙ্গের হিন্দুরা নিজেদের নিরাপত্তা সম্বন্ধে অত্যন্ত সন্দেহান্বিত হইয়া পড়িয়াছে। বড় রকমের ঘটনা কোথাও ঘটে নাই, সে কথা সত্য; কিন্তু লোকেরা কি ঘটনা হইতে তাহার জন্ত ভয় পাইতেছে না; তাহারা ভয় পাইতেছে কি ঘটতে পারে সেই কথা ভাবিয়া। তাহারা আশঙ্কা করিতেছে যে, পূর্ব এবং উত্তর বঙ্গ পুঙ্খানুপুঙ্খ সময় যদি কোন গণ্ডগোল হয় তবে গবর্নেন্ট তাহা আয়ত্তে আনিতে সমর্থ হইবে না।

“পূর্ববঙ্গ পরিভ্রমণ করিয়া এবং সেখানকার অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া আমার মনে হইয়াছে যে, অধিকাংশ মুসলমানই হিন্দুদের সহিত শান্তিতে মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে চায়। কিন্তু শুধু প্রকৃতির লোকেরা—তাহাদের সংখ্যা কম হইলেও—অধিকাংশ লোককে আতঙ্কিত করিয়া তুলিতেছে এবং গবর্নেন্টকে সম্পূর্ণ অসহায় অবস্থার মধ্যে আনিয়া ফেলিতেছে। শুভাদের কাজকে সহজ করিয়া তুলিতেছে ধবংসের কাগজগুলির মিথ্যা সংবাদ প্রচার। আমার এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই যে, গবর্নেন্ট যদি শুধু, মিথ্যা সংবাদপ্রচারক

এবং সমাজের অজ্ঞাত অহিতকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করেন তবে এই অবস্থা সহজেই আয়ত্তে আনা সম্ভব।

পূর্ব এবং উত্তর বঙ্গের প্রধান প্রধান সমাজগুলি সম্পর্কে মিঃ নাজিমুদ্দিন এবং তাঁহার কর্মকর্তাদের সহিত আমি খোলাখুলিভাবে আলাপ-আলোচনা করিয়াছিলাম। অজ্ঞাত উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের সম্বন্ধে আমাদের ধারণা যাই থাকুক না কেন, এ কথা আমি বিনা দ্বিধায় বলিতে পারি যে বিশৃঙ্খলা দমন এবং সাম্প্রদায়িক ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্ত মিঃ নাজিমুদ্দিন এবং তাঁহার সহকর্মীরা সত্যিই আগ্রহান্বিত। তাহাদের আন্তরিকতা সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকা উচিত নয়। তবে অসুবিধা এই যে, পূর্ববঙ্গের গবর্নেন্ট এখনও ঠিকভাবে চালু হয় নাই। তাহাদের নিজেদের প্রতিষ্ঠা করিতে কিছু সময়ের প্রয়োজন। মিঃ নাজিমুদ্দিনের সহিত আমার আলোচনার অজ্ঞাত প্রধান বিষয় ছিল, লীগ ডাশনাল পার্টিদের কার্যকলাপ বিশেষ করিয়া তাহাদের তত্ত্বাবধায় ব্যাপার। তিনি স্বীকার করেন যে, বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এইরূপ তত্ত্বাবধায় তাহারা অনুমোদন করেন নাই এবং উহা বে-আইনী। এইরূপ বে-আইনী কার্যকলাপ বন্ধ করার জন্ত তিনি নির্দেশ দিবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি আরও বলেন যে শান্তি রক্ষার পুলিশকে সাহায্য করার জন্ত তাহারা গবর্নেন্ট সকল সম্প্রদায়ের লোককে লইয়া হোম গার্ডের দ্বারা একটি রক্ষিবাহিনী গঠন করার কথা ভাবিয়াছেন। লীগ ডাশনাল পার্টিদের কার্যকলাপের পরেই যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশী অসুবিধা ঘটাইতেছে সেটি হইল জিনিষপত্র এবং যন্ত্রপাতি সরান সম্পর্কে গবর্নেন্টের কোন স্পষ্ট নীতির অভাব। এ বিষয়ে গবর্নেন্ট তাহাদের নীতি সম্পর্কে কোন কথা বলেন নাই। তবে মিঃ নাজিমুদ্দিন বলেন যে, এই বিষয়টি সম্পর্কে তিনি ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষের সহিত আলোচনা করিবেন এবং গবর্নেন্টের নীতি পরিষ্কারভাবে জানাইয়া দিবেন।

সরকারী কর্মচারীরা কোন রাষ্ট্রে যাইবেন সে সম্পর্কে তাহাদের মত পুনর্বিবেচনা করার জন্ত আর একটি প্রস্তাব দিবার যে অসুবিধা আমি করিয়াছিলাম পূর্ববঙ্গ সরকার তাহাতে সম্মতি দিতে পারেন নাই। আমার যত দূর মনে হয় এ বিষয়ে গবর্নেন্টের অসুবিধা হইল এই যে, হিন্দু অফিসাররা চলিয়া যাওয়ার কালে যে সব মুসলিম কর্মচারীর চাকুরীতে উন্নতি হইয়াছে, হিন্দু কর্মচারীরা কিরিতা গেলে তাহাদের আবার নামিয়া যাইতে হইবে। পূর্ববঙ্গ গবর্নেন্ট ইহাকে কার্যকরী বা ভাল প্রস্তাব বলিয়া মনে করেন না। তবে প্রধান মন্ত্রী আমাকে এ কথা বলেন যে বর্তমানে তাহারা কোন সম্প্রদায় হইতেই অফিসার লইতেছেন না। এই পদগুলি এক বিভাগ হইতে অল্প বিভাগে বদলীর দ্বারা পূর্ণ করা যাইতেছে। তাহারা শীঘ্রই পাবলিক সার্ভিস কমিশনের দ্বারা সাম্প্রদায়িক হার অসুবিধা অফিসার নিয়োগের ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া জানান।

কংগ্রেস-পতাকা উত্তোলন এবং বন্দোবস্তের মত সম্পর্কে

প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, ইহাতে বাধা দেওয়া কাহারও উচিত নহে। বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণের সময় এ বিষয়ে তিনি তাঁহার মতামত পরিষ্কারভাবে জানাইয়া দিবেন।

বাদ্যনৌতি এবং গৃহ দখল সম্পর্কে তিনি বলেন যে, এই দুইটি বিষয়ে প্রতি শহর, জেলা এবং মহকুমার বে-সরকারী কমিটিগুলির পরামর্শ অনুযায়ী পূর্ববঙ্গ গবর্নেন্ট কাজ করিতে প্রস্তুত।

প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁহার সহকর্মীদের মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব রহিয়াছে; কিন্তু কয়েকটি জেলা হইতে আমি খবর পাইয়াছি যে, সেখানকার উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীরা কংগ্রেস এবং হিন্দুদের সহযোগিতার প্রস্তাব উপেক্ষা করিয়াছেন। এই সব কর্মচারীর কথা বলিয়া আমি সকল অফিসারকেই দোষ দিতেছি না। উহারও ব্যক্তিগত আছে সত্য; তবে সাধারণভাবে অফিসারদের মধ্যে একটা উপেক্ষা বা অসহায়ের ভাবই লক্ষিত হয়। আমরা স্বীকার করি যে, পূর্ববঙ্গে একটি শক্তিশালী শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্ত উত্তর ও পূর্ব বঙ্গের হিন্দুদের গবর্নেন্টকে সাহায্য করা কর্তব্য। আমরা সহযোগিতা করার জন্ত সব সময়ই আগ্রহান্বিত। তবে সেই সহযোগিতার মূলে সংখ্যালঘুদের রক্ষার কথা থাকিবে না— থাকিবে তাহাদের অধিকার স্বীকৃতির অঙ্গীকার। এখন সবার আগে যে সমস্ত সেটি হইল আইন এবং শৃঙ্খলা। যদি তাহা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সমস্ত রকমের বিশৃঙ্খলা, কঠোরভাবে দমন করা হয়, তবে অত্যন্ত সমস্ত বিষয় পরে করা সম্ভব হইবে।

পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘুদের সম্পর্কে দুই-একটা কথা বলিতে চাই। তাহাদের অরণ রাধা উচিত যে, কংগ্রেস পূর্ববঙ্গে ক্ষমতার অধিকারী নয়। সেইজন্য সেখানে কংগ্রেসের পক্ষে তাহাদের রক্ষার নিশ্চয়তা দেওয়া সম্ভব নয়। এইরূপ অবস্থায় পূর্ববঙ্গ যাহারা ত্যাগ করিয়া আসিতে চান তাহারা আসিবেন। ইহাতে আমাদের বলায় কিছু যায় আসে না। তবে সকলেই চলিয়া আসিতে পারেন না। তাহাদের প্রতি কংগ্রেস তাহার কর্তব্য করিবে। তবে যাহারা পাকিস্তানে থাকিবেন তাহাদের প্রধানতঃ নিজেদের শক্তির উপরই নির্ভর করিতে হইবে। এ কথা আমাদের অরণ রাধা উচিত যে, পশ্চিম বঙ্গে ১ কোটি ৩০ লক্ষ হিন্দুর জায়গা নাই। আর যদি জায়গাও থাকে তাহা হইলেও এইরূপ স্থানান্তরকরণে কয়েক বৎসর সময় লাগিবে। আমি সেইজন্য একটি মধ্য-পথের কথা বলিতেছি।

গবর্নেন্টের সহযোগিতায় একটি জেলা, মহকুমা, এমন কি থানার মধ্যে লোকবিনিময়ের ব্যবস্থার জন্য আমাদের চেষ্টা করা উচিত। এই কাজটি কঠিন হইলেও দুইটি রাষ্ট্রের মধ্যে লোক-বিনিময়ের কাজ অপেক্ষা অনেক সহজ।

পূর্ববঙ্গের সমস্তা সমাধানের উপায়

পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘুদিগের আশঙ্কা উদ্বেগের কথা স্থির ভাবে বিবেচনা করিয়া এই সমস্তার সমাধানের কোন যথাযথ

চেষ্টা এত দিন হইয়াছে বলিয়া আমরা অবগত নহি। হিন্দু-মহাসভা যে ভাবে সে প্রশ্নের সমাধানের পথ দেখিয়াছেন তাহা অন্ধের ও অবিবেচকের পথ। কিরণবাবুর বিরুদ্ধে স্পষ্ট বুঝা যায় যে তিনি নিজের দায়িত্ব কালনের চেষ্টাই করিয়াছেন অধিক, তবে কিছু সুরক্ষিতও দিয়াছেন। সত্য কথা বলিতে কি, যুক্তপ্রদেশের মুসলমানদিগের জন্য চৌধুরী বালিকুজ্জমান বা পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদিগের জন্য সুরাবর্দা যাহা করিয়াছেন ও করিতেছেন পূর্ববঙ্গের হিন্দুদিগের জন্য কোনও হিন্দুনেতাকে তাহার এক-শতাংশ চেষ্টা করিতে বা দায়িত্ব-গ্রহণ করিতে প্রস্তুত দেখিতেছি না।

পলায়নের পথ দেখান অতি সহজ, কেননা পরে যদি কিছু ঘটে তবে নেতা মহাশয় আফালন করিয়া বলিতে পারিবেন, “আমি ত আগেই বলেছিলাম।” নেতৃহীনায় সকলকেই আমরা একথা ভাবিতে ও বলিতে দেখিতেছি। কিন্তু “যঃ পলায়তি স জীবতি” ইহা কি সম্পূর্ণ সত্য? যাহারা পলাইয়া আসিবে তাহাদের পথের ও পাথরের ব্যবস্থা করিবে কে? তাহাদের আশ্রয় ও ভবিষ্যতের কথা ভাবিতেছে কে? সুসময়ের “নেতা” হুঃসময়ে সংকীর্ণে ভীতচকিত এবং কিংকর্ষব্যবিশ্রুত হইয়া হাল ছাড়িবেন, ইহা ত বাংলা দেশের নিয়মই দাঁড়াইয়াছে। তাহাদের স্পষ্ট ভাবে একথা বলিবারও সাহস নাই যে যাহারা এই আতঙ্কিত লোকদের বলিবেন, “মাতৈঃ, নিজের জোরের উপর দাঁড়াও। চলিয়া আসিলে পথের বিপদ—যাহা দূলে দূলে পলাইতে আরম্ভ করিলেই চতুর্দিকে দেখা দিবে—কাটাইয়া যদিই-বা এদিকে পৌঁছাইতে পারা যায়, তবে এখানে পথের ভিখারীর মত ঘুরিতে হইবে। পিতৃ-পিতামহের অর্জিত ধনসম্পত্তি ত চিরদিনের মত যাইবেই, নূতন ভাবে জীবন আরম্ভ করার কোন উপায়ও পাওয়া যাইবে না। অতএব দলবদ্ধ হইয়া নিজের অধিকার, নিজের স্বত্ব-স্বামিত্ব রক্ষার জন্ত ফিরিয়া দাঁড়ানো ভিন্ন অন্য কোনও উপায় নাই।”

পূর্ববঙ্গে ভয়ের আশঙ্কা এখনও ছায়ার মত রহিয়াছে। তাহা যে ঘনীভূত হইবে না, একথা কেহই বলিতে পারে না। কিন্তু বিপদ হইতে পরিভ্রাণের একমাত্র পথ কি পলায়ন? আমরা জানি ঢাকা, বরিশাল, বিক্রমপুর, কুমিল্লা ইত্যাদি অঞ্চলে এখনও এরূপ লোক আছেন যাহারা চিরচরিত পৌরুষের পথই একমাত্র পথ বলিয়া জানেন। ইহাদের সহায়তা করা ও ভার লাঘব করাই আমাদের প্রথম কর্তব্য। নোয়াখালিতে সতীশবাবুর উজ্জ্বল দৃষ্টান্তে সকলে উদ্বুদ্ধ হউন।

পূর্ববঙ্গের বর্তমান সমস্তার দুইটি দিক আছে। পূজা ও ইদের সময়ে যে পোলযোগের আশঙ্কা হইতেছে তদ্বিষয়ে অবিলম্বে সতর্কতা অবলম্বন এবং স্থায়ীভাবে হিন্দুরা বাহাতে সেখানে বাস করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা। প্রথমটির সমাধানের জন্ত হিন্দু-মুসলমান নেতারা একত্রে প্রচারকার্যে বাহির হইবার সফল করিয়াছেন এবং ঢাকার কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, হিন্দু-মহাসভা প্রভৃতির এক মিলিত বৈঠকে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সভাপতিত্বে নিম্নলিখিত কর্মসূচী সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে—

(১) পূজা এবং বকর ইদ চিরাচরিত প্রথা স্বাভাবিক ভাবে উদ্ঘাপিত হইবে, কেহ তাহাতে বাধা দিবে না।

(২) মসজিদ হইতে ১০০ গজ দূরবর্তী বাড়ীতে পূজার বাতাসাও আপত্তি হইবে না।

(৩) মসজিদ হইতে ১০০ গজের মধ্যে যে সব বাড়ী অবস্থিত সেগুলিতে নমাজের সময় বাজনা বন্ধ থাকিবে।

(৪) নমাজের সময় নির্দিষ্ট থাকিবে এবং সকলকে তাহা জানাইয়া দেওয়া হইবে। যে সব লাইসেন্স দেওয়া হইবে তাহাতেও নমাজের সময়ের উল্লেখ থাকিবে।

(৫) বিজয়ার শোভাযাত্রা বাহির করা হইবে কিন্তু পূর্বের ভায় কোন মসজিদের ১০০ গজের মধ্যে বাজনা হইবে না। শোভাযাত্রীদের সঙ্গে কোন অস্ত্র অথবা আখাতের উদ্দেশ্যে বাবস্ত হইতে পারে এরূপ কোন বস্তু থাকিবে না। পটকা হাউই বা বোম ফাটানো হইবে না।

(৬) বকর ইদের সময় গো-কোরবানী হইবে কিন্তু চিরাচরিত প্রথা অপরের মনে আখাত না দিয়া বাহিরের লোকের চক্ষের অন্তরালে কোরবানী করা হইবে।

(৭) কেবলমাত্র আনন্দ-উৎসব প্রভৃতিতে হিন্দুরা মুসলমানদের নিমন্ত্রণ করিতে পারিবেন এবং মুসলমানেরা উহা গ্রহণ করিবেন। বকর ইদ উপলক্ষে উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরা পরস্পর শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিবেন।

(৮) পূজার কর দিন সময় জেলায় ১৪৪ ধারা জারী করিয়া একাঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র লইয়া চলাফেরা নিষিদ্ধ করা হইবে। এই আদেশ কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হইবে এবং যাহারা উহা ভঙ্গ করিবে তাহাদিগকে তৎক্ষণাৎ মামলায় নোপর্দ করা হইবে।

ত্রিযুক্ত কিরণশঙ্কর রায় বলিতেছেন যে কলিকাতা যদি বিজয়া এবং ইদে শান্ত থাকে তবে পূর্ববঙ্গেও কোন অশান্তি হইবে না। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস কলিকাতা শান্ত থাকিবে। সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ইহা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইয়াছে যে কলিকাতার লোক দেখাইয়াছেন যে তাহারা অশান্তি চান না, কোন ছুটবুড়ি লোক হাদামা বাধাইবার চেষ্টা করিলে ছাত্র ও ভরণেরা বুকের রক্ত ঢালিয়া তাহা ধামাইয়াছেন, ভবিষ্যতেও প্রয়োজন হইলে তাহারা পিছাইয়া থাকিবেন না। তবে এবার প্রথম হইতেই তাহাদের সতর্ক থাকা ভাল। বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দুমহাসভা পূর্ববঙ্গ সহজে যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন তাহা বিজ্ঞানোচিত হয় নাই। পূর্ববঙ্গ হইতে যাহারা অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া আসিতে আরম্ভ করিয়াছেন তাহাদের পিছনে হিন্দুমহাসভার কোন কোন “নেতার” উক্তানি রহিয়াছে ইহা ক্রমশঃ প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে। মাহুষের দুর্ভাগ্যের ও অসহায়তার সুযোগ লইয়া তাহাকে শোষণ করা যেমন ঘোর অত্যাচার, উহার দ্বারা রাজনৈতিক অতীষ্ট সিদ্ধিও ভেদনি অন্যায়। আতঙ্ক প্রচারের দ্বারা পশ্চিমবঙ্গে

ও কলিকাতায় বহু লোক আনিয়া ফেলিয়া যাবমার্কেটকে বিরত করিয়া রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির চেষ্টা করিতেছেন এরূপ লোক অনেক রহিয়াছেন, হিন্দুমহাসভা বর্তমানে তাহাদের এই কার্যের কেন্দ্র। মাহুষের প্রতি দরদ ইহাদের থাকিলে আমরা এই সকল লোককে রাণাঘাট, নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে সেবাকার্যে ব্রতী দেখিতে পাইতাম। হিন্দুমহাসভার নামে এইরূপ কার্যকলাপ এবং প্রচারকার্য যাহারা করিতেছেন তাহাদের উপর বাঙালীকে এখন তীব্র দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ইহারা দেশের মঙ্গল করিতে পারেন না কিন্তু অশান্তি করিবার ক্ষমতা যথেষ্টই রাখেন। গত এক বৎসরের দাঙ্গার এবং তৎপূর্বে দুর্ভিক্ষের সময় ইহাদের হাতে লক্ষ লক্ষ টাকা আসিয়াছে, তাহার সদ্ব্যয় হইয়াছে কিনা সে বিষয়েও লোকের সন্দেহ আছে। বেলিয়াঘাটা পান্ডীশিবিরের ঘটনাতেও ইহাদের সুনাম বাড়ে নাই। এই সকল “নেতা” এখনও যদি প্রকৃত দেশসেবার ব্রতী না হন, দুর্ভিক্ষ ও রাষ্ট্রবিপ্লবে ব্যক্তিগত ও দলগত সুবিধা সঞ্চয় যদি এখনও ইহাদের মূল উদ্দেশ্য থাকে তবে ইহাদের কার্যকলাপের পূর্ণ বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশ করা আবশ্যক হইয়া উঠিবে।

পূর্ববঙ্গে বড় ‘পকেট’ সৃষ্টি করিয়া হিন্দুদের স্বত্তি সহকারে রাঁচিবার সুযোগ করিয়া দিবার জন্ত ত্রিযুক্ত কিরণশঙ্কর রায় যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ সমীচীন। অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া বাস্তবত্যাগে কোন লাভ নাই, আর্থিক সর্বনাশ নিশ্চিত। তবে যাহারা আসিয়া পড়িতেছেন তাহারা যাহাতে রেল-স্টেশনে বা বাজারে অসহায় ভাবে বাস করিতে বাধ্য না হন তৎপ্রতি ঘোষ মন্ত্রিসভার দৃষ্টি রাখা উচিত। আমাদের বিশ্বাস পূর্ববঙ্গে পূজা ও ইদ নিরুপদ্রবে কাটিলে ইহাদের প্রায় সকলেই ফিরিয়া যাইবেন। আপাততঃ কিছুদিনের জন্ত ইহাদিগকে একটু নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্য দানের ব্যবস্থা করা হইলে মানবতার মর্যাদা রক্ষিত হইবে।

পুলিস কর্তৃক “ব্ল্যাকমার্কেট দমন”

ডাঃ ঘোষের মন্ত্রিসভা যেমন প্রথমটা সর্ববিষয়ে নীরব ও দাসীভূত দেখাইয়া আসিয়াছেন এবার ঘোষণার পর ঘোষণা, অর্ডিনালের পর অর্ডিনালের বিপুল সমারোহে ও কোলাহলে তাহা পোষাইয়া লইতে চাহিতেছেন। কিন্তু শুভ ইচ্ছা কার্যে পরিণত করিবার বাস্তব আশ্রয়ের অভাব আগেও যেমন ছিল এখনও তেমন রহিয়াছে। বহুতা ও অর্ডিনালেই যদি রাজ্যশাসন চলিত তবে সুরাবর্দী সাহেবের পতন কোনকালেও হইত না।

ডাঃ ঘোষ ব্ল্যাকমার্কেট অর্ডিনালের দ্বারা চোরাকারবারীদের পাঁচ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হইবে, যাবজীবন দ্বীপান্তর, বিরাট জরিমানা, ব্যবসায়ের লাইসেন্স ধারিক, প্রদেশ হইতে বহিষ্কার প্রভৃতি বড় বড় ভয় দেখাইয়াছেন কিন্তু অর্ডিনাল

প্রয়োগের ভার দিরাছেন পুলিশের সেই বিভাগের সেই সব পুরনো কর্মচারীদের উপর, যাহারা এতদিন চোরাকারবারীদের হাতে হাত মিলাইয়া চলিয়াছে। বিড়িওয়ালা দেশলাই-ওয়ালা প্রভৃতি ধরিয়া ইহারা কেবল দেখাইয়াছে এবং অজ্ঞাত কিন্তু অসুমানযোগ্য কারণে বড় বড় অসামান্য ব্যবসায়ীদের নিরীকভাবে ব্যবসায় চালাইবার সুযোগ্যকরিতা দিয়াছে। এবারও ঠিক তাহাই হইতেছে। লোকের বাড়ী বাড়ী চড়াও হইয়া পাঁচ দশ সের বা এক মণ অতিরিক্ত চাউল বাহির করিবার জুজু ইহাদের উৎসাহ অতি প্রচণ্ড, কিন্তু বড় ব্যবসায়ীদের অথবা অসামান্য সরকারী কর্মচারীদের নিকটবর্তী হইতে ইহারা একান্ত পরাধীন। অভিনাসের কথা প্রকাশ হইবার সময়েই কলিকাতার একটু দৈনিক পত্রিকা লিখিয়াছিলেন যে এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ পুলিশ এই অভিনাস প্রয়োগ করিবে তাহার কর্মচারীরা এ বিষয়ে উপযুক্ত অথবা নির্ভরযোগ্য কিনা ইহাদের সার্ভিস রেকর্ড দেখিয়া তাহা স্থির করা হউক। জীর্ণ আমলে এই লোক দেখানো বিভাগটির কর্মচারীরা দুর্নীতির প্রচুর অবসর পাইয়াছে, বড় বড় চোরাকারবারীদের সহিত ইহাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও বন্ধুত্বের সুযোগও ঘটয়াছে, ইহারা এখন সেই সব ব্যবসায়ীর বাড়ী তল্লাস করিবে ইহা আশা করাই অনায়াস। সার্ভিস রেকর্ড যাচাই করিলে এই বিভাগের প্রায় দেড় শত কর্মচারীর মধ্যে উদ্ভনধানেকও উপযুক্ত এবং নির্ভরযোগ্য লোক বাহির হইবে কিনা সে বিষয়ে আমাদেরও খোরতর সন্দেহ আছে। এখনই ইহারা পুরনো পদ্ধতিতে চুপাণুটি বরিবার চেষ্টায় নাচিয়া উঠিয়াছে। সরকারী দোকানে প্রায়ই চাউল বা আটা পাওয়া যায় না বলিয়া যাহারা বাধ্য হইয়া কয়েক সের বা এক আধ মণ চাউল বা আটা প্রাণের দায়ে ও শিশু পুত্র-কন্ডার মুখ চাখিয়া সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছে, এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চের পুলিশদল পরমাংসাহে খট্টা করিয়া তল্লাসী করিয়া ইহাদের এই সঞ্চিত চাউল উদ্ধার করিয়া বাহ্যিক দিরাইতেছে। সারাদিন ২৫ জায়গায় তল্লাসী করিয়া তিন মণ চাউল উদ্ধার করিয়া যাহারা বাহ্যিক দিরাই, অথচ ২৫ দিনের চেষ্টার পরও এক জন প্রকৃত চোরাকারবারী ধনীকে আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড় করাইতে পারে না তাহাদের প্রশংসা করার আমরা কিছু তো দেখিই না, উপরন্তু মজুমদারের উল্লাস ও কোয়ার্টার মত উচ্ছ্বাসের কারণও কিছুই পাই না। সুপ্রাচীর ভবনকে আইনের মর্যাদা দিয়া স্বাধীন ভারতে ছাপোষা গৃহস্থকে আরও বিব্রত করিয়া, নষ্টের মূল যাহারা তাহারিগকে নিশ্চিন্ত থাকিতে দেয় যে মজীসভা, তাহা কখনও মজলকর কাজ করিতে পারিবে না। খাজসংগ্রহের দায়িত্ব লইয়া ইহারা খাদ্যদানে অসমর্থ, সরকারী দোকানে প্রায়ই হয় চাউল না হয় আটা থাকে না, এই অবস্থায় খাওয়ার জুজু যাহারা সামান্য চাউল সংগ্রহ করিয়াছে তাহাদের মুখের প্রাস-কাড়িয়া লওয়ার রীতি ডাঃ ঘোষ অবিলম্বে বন্ধ করুন। জমির কাটিকাবাজী, বাড়ীর মেলামাী, জাহের গলাকাটা দর, ডাল

তেল খি কাপড় প্রভৃতির বড় বড় চোরাকারবারী বরিবার চেষ্টা তিনি করুন, খাদ্যভব্যে ভেজাল বন্ধ করিবার অন্য অঙ্গসর হউন। লোকে খাওয়ার অন্য মাধ্যমিছ দশ সের চালি রাখিতে পারিবে এইটুকু বলিয়া দিলেই পুলিশের এই অত্যাচার বন্ধ হইয়া যায়।

রেলওয়ে মাল বুকিং আপিসে দুর্নীতি

দৈনিক 'ভারত'-এর ১৫ই আশ্বিন তারিখের সংখ্যায় নিম্নলিখিত পত্রখানি প্রকাশিত হইয়াছে, উহার উপর মন্তব্য নিম্নপ্রয়োজন কিন্তু প্রতিকার আবশ্যক,—

আমাদের দেশে কি ঘুষ নেওয়ার চিরচরিত প্রথা কোনদিনও বন্ধ হইবে না? আজি রেলওয়ে বুকিং-এর কথাই বলিতেছি। যে-কোন ভ্রমলোক যে-কোন বুকিং আপিসে যান, দেখিবেন একটা মালের উপর কোন বাবু চার আনা, কোন বাবু আট আনা কোন বাবু ১১, ২১ লইতেছেন। আর যদি সেই মাল গবর্নমেন্ট কর্তৃক পাঠান নিষিদ্ধ হয় তবে তাহার উহার তিন গুণ হইতে চতুর্গুণ লইয়া থাকেন। ব্যবসায়ীরা অগ্নানবদনে উহা দিয়া যান। কিন্তু উহারা কি জনসাধারণের উপর হইতে চক্রবর্তি হারে সেই টাকা আদায় করেন না? বুকিং আপিসের সকল বাবুই 'ধরচা দিন' এই বলিয়া আদায় করেন। ধরচাটা কিসের? কোম্পানী কি ইহাদের মাহিনা দেন না? সমস্ত দিনে যে টাকাটা আদায় হয়, দারোয়ান হইতে বড় সাহেব পর্যন্ত সকলের মধ্যে ভাগ হয়—সেইজন্য এখনই কোন উপরওয়ালা তদারকে যান তখনই ইহারা সাবধান হইতে পারেন। এটা আমার নিজের চোখে দেখা। এই দুর্নীতি কম বেশী সমস্ত বুকিং আপিসেই চলিতেছে।

কিছুদিন পূর্বে নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে 'আরমানি ঘাট' হইতে (বি এন আর গুড্‌স্) রীচীতে এক বস্তা (১ হন্দর) নাট বণ্টু পাঠাই। ফরওয়ার্ডিং পাস করিতে ২১ ছাপ মারিতে ১০, ওজন করিতে ১০, মার্কা দিতে ১০, ইনচার্জ দিতে ১০, 'এ' ফর্ম লাগাইতে ১০ (দাবি ১০), রেক্সিট করিতে ১০, রসিদ আনিতে ১০, এতুনে ৩১/০—মনে রাখিতে হইবে একটা মালের উপর—অথচ ভাড়া ২ টাকার মধ্যে।

হয়ত বলিবেন মশায় দেন কেন? কিন্তু এমনই কল পাতিয়া রাখা হইয়াছে যে, না দিলেই বা উপায় কি? যিনি এই সব দক্ষিণা না দিবেন, পড়িয়া থাকিবে তার মাল অনির্দিষ্ট কালের জুজু। সুতরাং এই কলটাকে বিগড়াইয়া দেওয়া দরকার।

প্রত্যেকে যখন ১০টার সময় কাজে আসেন তখন শূন্য পকেট। কিন্তু বেলা ৪টার সময় পকেট এবং ডেক্স সার্জ করুন এক এক জনের নিকট কমপক্ষে ৫০, হইতে ২০০ পর্যন্ত পাইবেন। এরূপ প্রত্যক্ষ হইতেছে।

জনসাধারণকে এরূপ অহেতুক ক্ষতির হাত হইতে রক্ষা করার জন্ত সরকারের নিকট আবেদন করিতেছি এবং জনসাধারণকে অবহিত হইতে অনুরোধ করিতেছি। স্বাঃ গঙ্গেশ্বর নাথ মিত্র, ৪৭-এ, বীডন স্ট্রীট।

পরলোকে যুগলকান্তি ঘোষ

শ্রীযুক্ত যুগলকান্তি ঘোষ গত ২৪শে আশ্বিন সাতালী বঙ্গের বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। অমৃত বাজার পত্রিকার অত্যন্ত প্রতিষ্ঠাতা, শিশিরকুমার ঘোষের অধ্যাপক হেমন্তকুমার ঘোষ মহাশয়ের তিনি জ্যেষ্ঠপুত্র। পত্রিকার প্রায় প্রথমাবস্থা হইতে ইহার সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপিত হয়। যে সব কর্ম্মের অক্লান্ত পরিশ্রমে পত্রিকা আজ এত প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে তাঁহাদের মধ্যে যুগলকান্তি ছিলেন অত্যন্ত। তিনি নিজে পরম বৈষ্ণব ছিলেন। বৈষ্ণবশাস্ত্রে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ হইতে প্রকাশিত ‘গৌরপদ-তরঙ্গিণী’র সম্পাদনার এবং ‘গোবিন্দদাসের করচা’ নামক আলোচনা-পুস্তক রচনার ইহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার ‘পরলোকের কথা’ আর একখানি সুপাঠ্য গ্রন্থ। তিনি গবেষক ও সাহিত্য-সেবীদের প্রকৃত বন্ধু ছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সঙ্গেও তাঁহার গভীর যোগ ছিল। তাঁহার অমায়িক ব্যবহার সকলকে মুগ্ধ করিত। তাঁহার মৃত্যুতে আমরা একজন আত্মীয় বিষোপের বেদনা অনুভব করিতেছি।

পশ্চিমবঙ্গের সহিত যুক্ত হইবার জন্য

মানভূমবাসীদের দাবি

গত ৫ই অক্টোবর পুন্ডলিয়ার হরিপদ সাহিত্য-মন্দির হলে মানভূম জেলাবাসীদের এক বিরাট সভা হয়। সভায় দাবি করা হয় যে সমগ্র মানভূম জেলা, সিংভূম জেলার মূলভূম মহকুমা, হুমকা সদর মহকুমার দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল এবং পুণ্ডিয়া জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমা পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের সংলগ্ন। এই সকল অঞ্চল সম্পূর্ণরূপে বাংলাভাষাভাষী। বাংলার সহিত ইহাদের সর্বাঙ্গিক যোগসূত্র রহিয়াছে। কাজেই গণপরিষদ যেন এই সকল অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গের সহিত যুক্ত করিবার ব্যবস্থা করেন।

পুন্ডলিয়ার তরুণ সাহিত্য সঙ্ঘ-ও মাদলিক সাহিত্য-বীথির উদ্যোগে এই সভা হয়। সভাপতিত্ব করেন প্রবীণ ও বিশিষ্ট শিক্ষারত্নী শ্রীচাক্রক্স দাস। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন,

“আমাদের এই ভায়সরয় দাবি তুলবার সঙ্গে সঙ্গেই পাটনার কয়েকটি সংবাদপত্র যেভাবে আমাদের বিরুদ্ধে বিষ উদগীরণ করতে আরম্ভ করেছেন তাতে চূপ করে থাকি বা স্বল্প কথা বলার কর্তব্যের জট হবে। তাঁরা যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন যে, বিহারের এক ইঞ্চি ভূমিও তাঁরা কাকেও দেবেন না। বিহার সাংবাদিক মহলের এই যুদ্ধ ঘোষণা অশোভন। বিহারবাসী জনসাধারণের ওপর আমাদের পূর্ণ আস্থা আছে। আমাদের দাবির যৌক্তিকতা ও ভায়সরয়ত্ব স্বীকার করে যাতে আমাদের এই ভায়সরয় দাবি সাফল্যমণ্ডিত হয় সে বিষয়ে তাঁরা উদারতার সহিত যত্নশীল হবেন। আমাদের সঙ্গে তাঁরাও যোগ দেবেন। বিহার ও বিহারীদের সহিত আমরা

কোন রকম ভিত্তিভাবে যুক্ত করতে চাই না। আমরা মাত্র ফিরে যেতে চাই আপন মায়ের স্নেহের কোড়ে, এতে রাগ করার কোন স্থান নেই।

ভাষা, সংস্কৃতি, নীতিনিতি ইত্যাদির ভিত্তিতে বর্তমান প্রদেশগুলির সীমানা নির্ধারণ করতে হবে—এ কথা ভারতের জাতীয় কংগ্রেস বহুবার আনুষ্ঠানিকভাবে বলে এসেছেন। এ ছাড়া গণ-পরিষদ একটি সীমানা নির্ধারণ কমিটিও গঠন করেছেন এবং তার প্রাথমিক কাজ শুরু হয়েছে। এদের সমক্ষে বঙ্গভুক্তির আশা-আকাঙ্ক্ষার দাবি যুক্তি ও প্রমাণসহ উপস্থাপিত করতে হবে। কাজেই আমাদের চূপ করে থাকা চলে না। আমাদের দাবিতে আমরা অটল। আমরা অবশ্য প্রাদেশিক মৈত্রী ও সখ্যের কথা ভেবে, নিরপেক্ষ বিচার ও বিবেচ-বিহীন চিন্তে পরস্পরের সঙ্গে যুক্তিবাদমূলক আলোচনার প্রবৃত্তি হতে রাজী আছি। এ বিষয়ে বিহারের প্রধানমন্ত্রী শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ সিংহের আপোষ-মনোভাবমূলক আবেদনের আমি সমর্থন করি। বিহারী ভাইদেরও উচিত আমাদের প্রতি অবশ্য দোষারোপ ও বিবেচ প্রচার না করা। এই প্রসঙ্গে একটি ছুঁতোর ব্যাপারের উল্লেখ করতে বাধ্য হচ্ছি। শহরের দু-এক জন বহিরাগত বণিক মানভূমবাসীর মধ্যে শ্রেণী-বিবেচের বিষয় ছড়াবার চেষ্টা করছেন। বাংলার সঙ্গে মানভূমের নাতীর অচ্ছেদ্য যোগের কথা যদি অস্বীকার করতে হয় তা হলে অস্বীকার করতে হবে নিজেদেরই মাতৃভাষা বাংলাকে। মানভূমবাসী যদি বাংলাকে অস্বীকার করে তা হলে তার নিজের প্রকৃতি ও সভাকেই অস্বীকার করা হয়। মানভূম পশ্চিম বাংলার আর পশ্চিম বাংলা মানভূমের। এ দুয়ের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বর্তমান।”

সভায় মানভূম জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে বহু প্রতিনিধি-স্থানীয় ব্যক্তি আসিয়া যোগদান করেন। এই আন্দোলন আরও তীব্র ও ব্যাপক করিয়া তোলা একান্ত আবশ্যিক। প্রবল আন্দোলন ভিন্ন বাঙালীদের এই ভায়সরয় দাবি গণ-পরিষদের কর্ণগোচর করা কঠিন হইবে। এ কথা মনে রাখিতে হইবে যে, বাঙালীদের তরফ হইতে কথা বলিবার মত যোগ্য ব্যক্তি বর্তমানে গণ-পরিষদে বাংলার প্রতিনিধি দলের মধ্যে নাই বলিলেই চলে। সুতরাং বাহিরের আন্দোলনের দ্বারাই বাঙালীর কথা গণ-পরিষদকে শুনাইতে হইবে।

আসামে বাঙালী

আসামে বাঙালীদের উপর উৎপীড়ন পূর্বোদ্যমে চলিতেছে। গোঁহাট হইতে বাঙালী সমিতির সম্পাদক জানাইতেছেন যে ৪ঠা অক্টোবর সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার সময় এক অসমিয়া জনতা শহরের প্রধান প্রধান রাজপথের বাঙালী দোকানসমূহ হইতে বাংলায় লেখা সাইনবোর্ড জোর করিয়া টানিয়া নামাইয়াছে। তাহাদের আপত্তি এই যে, সাইনবোর্ড বাংলার না লিখিয়া

অসমিয়ায় লিখিতে হইবে। সাত দিন আগে ইহার সাইনবোর্ড বদলাইবার জন্ত নোটিশ দিয়া গিয়াছিল। জেলায় ডেপুটি কমিশনারকে উহা জানানও হইয়াছিল কিন্তু তিনি এই গুণামি বন্ধ করিতে পারেন নাই।

আসামে দীর্ঘকাল যাবৎ ‘বঙ্গাল-বেদা’ আন্দোলন চলিতেছে। আসাম রেলওয়েকে বি-এ-আর হইতে পৃথক করিয়া উহার হেড আপিস পৌহাটিতে স্থানান্তরিত হওয়ার বহু বাঙালী কর্মচারী সেখানে গিয়াছেন। ইহার কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারী। কেন্দ্রীয় সরকার ইচ্ছা করিলে পৌহাটি হেড আপিসে বাঙালী কর্মচারী না পাঠাইয়া মাদ্রাজী বা অন্ধ প্রদেশের লোক পাঠাইতেও পারিতেন। এই বাঙালী কর্মচারীরা অসমিয়াদের চক্ষুশূল হইয়াছেন এবং তাঁহাদের উপর নানা ভাবে নির্যাতন চলিতেছে। ত্রিঅধিকাগিরিয়ার চৌধুরীর নেতৃত্বে আসাম জাতীয় মহাসভা নামক একটি প্রতিষ্ঠান এই বঙ্গাল বেদা আন্দোলনের নামক এবং রেলের চাকরি অসমিয়াদের দিতে হইবে ইহাই ইহাদের প্রধান দাবি। ইহাদের আন্দোলন শুধু সভা-সমিতিতে আবদ্ধ থাকে নাই, বাঙালী দোকানে টিল ছুঁড়িয়া ক্ষতি করা, বাঙালীদের আক্রমণ করা প্রভৃতির সংবাদও আসিয়াছে। এই সব নিন্দনীয় কার্যের প্রতিবাদ হইলে আসামের প্রধান মন্ত্রী একটা ভাসা ভাসা রকমের জবাব দিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে প্রদেশের লোকের অভিযোগ থাকিলে তিনি আর কি করিতে পারেন। অসমিয়া সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে কেহ কেহ এই আন্দোলনের সহিত জড়িত একপং সংবাদও প্রকাশিত হইয়াছে। ত্রিযুক্ত বরদলৈর মন্তব্য, ঠিক মত রিপোর্ট হইয়াছে ‘কি না জানি’ না তবে এইটুকু দেখা যাইতেছে যে এই সব গুণামি বন্ধ করিবার জন্ত তিনি উল্লেখযোগ্য কোন চেষ্টা করেন নাই।

বাঙালীদের বিরুদ্ধে অভিযান এবং বাংলা হরণে আপত্তি অসমিয়াদের পক্ষে বিচিহ্নই বটে। আসামের নিজস্ব কোন অক্ষর নাই, বাংলা অক্ষরই তাহাদের অক্ষর, তফাৎ শুধু হুইট বর্ণের—এবং য। অসমিয়া ভাষার নিজস্ব কোন ব্যাকরণ নাই, বাংলা ব্যাকরণই তাহারও ব্যাকরণ। আসামের প্রতি বাংলা-দেশের দানের পুরনো কথা না ভুলিয়া গত কয়েক বৎসরের কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা যায়। ত্রিযুক্ত গৌলীনাথ বরদলৈ প্রধান মন্ত্রীর আসনে বসিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্রের চেষ্টায়। বাংলা ও আসাম লইয়া গ্রুপ গঠনের যে প্রস্তাব ক্যাবিনেট মিশন করিয়াছিলেন তাহাতে বাংলার লাভ ছিল, ক্ষতি ছিল আসামের। আসাম গ্রুপে বসিতে আপত্তি করে এবং আসামের প্রতি অত্যাচার হইয়াছে ইহা ভাবিয়া বাংলাদেশ নিজের স্বার্থের ক্ষতি করিয়াও আসামকে সমর্থন করে। বাঙালী ও ত্রিহুটবাসীরা আসামকে এ বিষয়ে সমর্থন না করিলে, বাংলার সংবাদপত্রসমূহে আসামের আপত্তি বিপুল ভাবে প্রচারিত না হইলে হয়ত

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পূর্ণ ভিন্ন আকার ধারণ করিত। উহাতে আসামের অভিজ্ঞ লোপের ব্যবস্থাও হয়ত হইতে পারিত। ময়মনসিংহে পূর্ব পাকিস্তান কিনা স্থাপন করিয়া আসামে যখন পাকিস্তান অভিযান আরম্ভ হয় তখন বাংলা ও ত্রিহুট তাহাকে সবচেয়ে বেশী সাহায্য করিয়াছিল। আসামের যে কুখ্যাত লাইন প্রধার বিরুদ্ধে পণ্ডিত নেহরু পর্যন্ত মন্তব্য করিয়াছিলেন, বাংলা ও ত্রিহুট তাহাও সমর্থন করিয়াছে এবং সমর্থন করিয়া আসামকে মুসলমান অভিযান হইতে বাঁচাইয়াছে। গত সাত বৎসরের মধ্যে বাংলার নিকট হইতে এত উপকার লাভ করিয়াও বাংলা ও ত্রিহুটের নিকট অসমিয়ারা যে কৃতজ্ঞতার অভাব প্রদর্শন করিলেন, তাঁহাদের সহিত যে তিক্ততার সম্পর্ক স্থাপ্ত করিলেন তাহার পরিণাম তাঁহাদের পক্ষেই অশুভ হইবে।

ত্রিহুটবাসী সরকারী কর্মচারীদের সহিত বরদলৈ গবর্নেন্ট যে ব্যবহার করিয়াছেন তাহা অতিশয় নিন্দনীয়। তরা জুনের পর আসামের ত্রিহুটবাসী সরকারী কর্মচারীরাই সরকারী সারকুলার অনুসারে ভারতীয় ইউনিয়নে কাজ করিবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করেন। ত্রিহুটে গণভোটের ফল বাহির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বরদলৈ গবর্নেন্ট ইহাদের সকলকে আসামের বিভিন্ন স্থান হইতে ত্রিহুট জেলায় বদলী করেন। অশান্ত প্রদেশ এ বিষয়ে যাহা করিয়াছে তদনুসারে ইহাদিগকে আসামে রাখিয়া ত্রিহুটে কর্মরত যে সব কর্মচারী ভারতীয় ইউনিয়নে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকেও আসামে বদলী করা উচিত ছিল। বরদলৈ গবর্নেন্ট ইহার ঠিক বিপরীত কাজ করিলেন এবং এই বলিয়া সাফ জবাব দিলেন যে ত্রিহুটের বাড়তি লোক লইয়া তাঁহারা স্থানীয় লোকদের সরকারী চাকুরিতে প্রবেশের পথ সমুচিত করিতে পারিবেন না। এ দিকে পাকিস্তান সরকার ইহাদিগকে চলিয়া যাইতে বলিতেছেন। এই অবস্থায় ত্রিহুটবাসী কর্মচারীদের দুর্দশার একশেষ হইয়াছে। বরদলৈ গবর্নেন্টের এই কার্য অতিশয় অসাধুতার নামান্তর এবং এ বিষয়ে ভারত-সরকারের হস্তক্ষেপ করা উচিত। ভারত-সরকার এপর্যন্ত যাহা করিয়াছেন তাহাতে বিশেষ কিছুই ফল হয় নাই।

অসমিয়াগণের সমগ্র আসামে প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা

অসমিয়ারা সমগ্র আসামে একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপনের চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহাদের কথায় ও কাজে এই ভাবটাই ফুটিয়া উঠিতেছে যে আসাম অসমিয়াদের, অপর সকলে অবাঞ্ছিত আগন্তুক মাত্র। এইটি ঐতিহাসিক সত্য নয়। আসামের খাসিয়া, গারো, নাগা, মিরি, মিশমি, আবর, কুকি, লুসাই, কাছাড়ী প্রভৃতি অসমিয়াদের চেয়ে অনেক প্রাচীন অধিবাসী, অসমিয়ারা মাত্র কয়েক শতাব্দী পূর্বে আসামে প্রবেশ করিয়াছে। ইংরেজ এই প্রদেশের নাম দিয়াছে আসাম এবং তাহারই জন্ত

অসমিয়ায় সমগ্র আসাম তাহাদেরই দেশ এই মনোভাব পোষণ ও প্রচার করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছে। ত্রিযুক্ত বরদলৈ জানাইয়াছেন যে আসামে অসমিয়া হইবে রাষ্ট্রভাষা এবং উহাই হইবে শিক্ষার বাহন। তবে পার্বত্য অঞ্চলগুলিতে পার্বত্য-জাতিদের ভাষা দ্বিতীয় ভাষারূপে গণ্য হইবে। গোমালপাড়া, কাছাড় ও ত্রিহট্টের বাংলাভাষাভাষীদের দাবি কোন ক্ষেত্রেই স্বীকার করা হয় নাই যদিও ইহারা অসমিয়াদের চেয়ে আসামের পুরাতন অধিবাসী। ভাষার দিক দিয়া দেখিতে গেলে দেখা যায় আসামে শতকরা প্রায় ২০ জন অসমিয়া ভাষী, ২৫ জন খাসিয়া, গারো, নাগা, মণিপুরী, কাছাড়ী প্রভৃতি ভাষা-ভাষী এবং বাংলাভাষাভাষী শতকরা ৪৩ জন। ত্রিহট্ট বাহির হইয়া যাওয়ার পর বাংলাভাষাভাষীর সংখ্যা কমিয়া গিয়াছে বটে, তবে যে অসমিয়া ভাষীদের চেয়ে খুব নীচে নামিয়া গিয়াছে তাহা বলা কঠিন। জাতি হিসাবে দেখিলেও দেখা যাইবে ত্রিহট্ট বিদ্যায়ের আগে আসামের এক-তৃতীয়াংশ ছিল হিন্দু, এক-তৃতীয়াংশ পার্বত্য জাতি এবং এক তৃতীয়াংশ মুসলমান। হিন্দুর মধ্যে অসমিয়া ও বাঙালী উভয়ই আছে। ত্রিহট্ট বাহির হইয়া যাওয়ার পর আসামের লোকসংখ্যা এখন হইতে প্রায় ৭১ লক্ষ; তন্মধ্যে ৩১ লক্ষ খাসিয়া, গারো, নাগা প্রভৃতি পার্বত্য জাতি, ২২ লক্ষ অসমিয়া এবং প্রায় ১৮ লক্ষ বাঙালী। এদিক দিয়াও অসমিয়ারা আসামের উপর একচ্ছত্র কর্তৃত্ব দাবি করিতে পারে না, সে অধিকার বরং পার্বত্যজাতিদের কতকটা আছে। আসাম ব্যবস্থাপক সভায় অসমিয়াদের যতগুলি সদস্য আছে—অপর সকলের মিলিত প্রতিনিধি সংখ্যা তার প্রায় দ্বিগুণ। পার্বত্য জাতিদিগকে বাঙালীদের বিরুদ্ধে নানা মিথ্যা প্রচারের দ্বারা উত্তেজিত করিয়া অসমিয়ারা তাহাদের একাংশও ইংরেজ চাকরদের সাহায্যে নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখিয়া চলিয়াছেন। এখন পার্বত্য জাতিরা এই ভাঁওতা বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন, ইংরেজ চাকরদের ক্ষমতাও অনেক কমিয়া গিয়াছে। এই অবস্থাতেও ত্রিযুক্ত বরদলৈ কোন্ ভরসায় বাঙালীদের বিরুদ্ধে অসমিয়াদের অভিযানে পরোক্ষে সহায়তা করিতেছেন তাহা উপলব্ধি করা বস্তুতঃই দুষ্কর। বরদলৈ মন্ত্রীসভার ধৈর্যচায়, সঙ্গীর্ণতা ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে পরিষদের অসমিয়া ভিন্ন অপর সকল দল মিলিত হইলে ত্রিযুক্ত বরদলৈ কিরূপে তাহার মন্ত্রীসভা বজায় রাখিবেন তাহা বুঝা দুষ্কর।

খাসিয়া নাগা প্রভৃতি জাতিরা বিদ্যায় ও বুদ্ধিতে অসমিয়াদের চেয়ে বিশেষ পিছনে নাই। খাসিয়া ও নাগাদের উপযুক্ত নেতা এবং কর্মীরও অভাব নাই। বাঙালীদের সহিত ইহাদের কোন বিরোধও নাই। আসামের উপর অসমিয়ারা যে অধিকার দাবি করেন, তাহাদের অধিকার ইতিহাস, জনসংখ্যা এবং প্রগতিশীলতা, কোন দিক দিয়াই তার চেয়ে কম নয়।

পার্বত্য জাতিদের স্বার্থ

১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইনে পার্বত্যজাতি অধ্যায়িত কতকগুলি অঞ্চলকে স্বায়ত্তশাসনের বহির্ভূত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এই সব এলাকার অধিবাসীদের নিজ নিজ প্রাদেশিক আইন সভায় প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার দেওয়া হয় নাই। এখানকার শাসনভার নামে ছিল গবর্নরের হাতে কিন্তু কার্যতঃ জেলা ম্যাজিস্ট্রেটরা ছিলেন সর্বস্বত্বাধী। পার্বত্য-জাতি অধ্যায়িত এলাকাগুলিতেই সাধারণতঃ বনিজ পদার্থগুলি পাওয়া যায় এবং বনিগুলি ইংরেজ বণিকদের হাতে। স্থানীয় লোকদের দ্বারা বনির কাছ করানো হয় এবং লাভ যায় ইংরেজের পকেটে। ম্যানানিজের বনিতে কাছ করিয়া পুরুষ-শ্রমিক যেখানে পায় চারি আনা এবং স্ত্রী-শ্রমিক দশ পয়সা, ইংরেজ কোম্পানীর অংশীদার সেখানে পায় চৌক টাকা এবং বনির ইংরেজ পরিচালক পায় তিন শত টাকা। মহাজনের হাত হইতে অশিক্ষিত আদিম অধিবাসীদের বাঁচাইবার জন্ত ইংরেজ এত ব্যাভুল যে ভারত-শাসন আইনে একটা আলাদা ব্যবস্থা করিয়া ইহাদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার খোদ লাট সাহেবদের হাতে রাখিয়া দিয়াছে। একটু সন্ধান লইলেই দেখা যাইবে যে দেশী মহাজনের হাত হইতে রক্ষা করিবার নামে ইহাদিগকে ইংরেজ শোষকের করলে হাত-পা রাখিয়া নিক্ষেপ করা হইয়াছে। এই সব অঞ্চল প্রদেশের আর সব স্থানের ভার আইন সভার অধীনে থাকিলে শ্রমিক আন্দোলন এখানেও ছড়াইয়া পড়িত এবং তাহার ক্ষতি হইত ইংরেজ বণিকদের।

শাসন-সংস্কার-বহির্ভূত এই সব অঞ্চল সম্পর্কিত সমস্তা বিবেচনা করিয়া রিপোর্ট দেওয়ার জন্ত গণপরিষদ একটা সাব-কমিটি গঠন করিয়া দিয়াছিলেন। এই সাব-কমিটি তাহাদের রিপোর্টে যে সকল সুপারিশ করিয়াছেন তন্মধ্যে নিম্নলিখিত-গুলি প্রধান :

(১) শাসনভুক্ত পার্বত্য জাতিদের মঙ্গলের জন্ত পৃথক বিভাগের ব্যবস্থা, (২) পার্বত্য অঞ্চলের মোট জনসংখ্যার ভিত্তিতে মুক্তরাষ্ট্রীয় আইন সভায় তাহাদের জন্ত কতকগুলি আসন সংরক্ষণ, (৩) অম্লমত ও পার্বত্য জাতিদের অবস্থা অনুসন্ধানের জন্ত একটা বিশেষ কমিশন নিয়োগ।

উক্ত বিবরণিতে আরও বলা হইয়াছে যে, পার্বত্য অধিবাসীদের সৈন্তবাহিনীতে গ্রহণ করিবার জন্ত বিশেষ মনোযোগ দেওয়া উচিত। মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা এবং বিহারে পার্বত্য জাতিদের মঙ্গলের জন্ত এক জন স্বতন্ত্র মন্ত্রী নিযুক্ত করা উচিত। মাদ্রাজ, বোম্বাই, বিহার, মধ্যপ্রদেশ এবং উড়িষ্যার পার্বত্য জাতিদের একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা উচিত।

যে সব অঞ্চল শাসন-বহির্ভূত নহে সেখানকার পার্বত্য জাতিদের সংখ্যালঘু বলিয়া গণ্য করা উচিত। তাহাদের জন্ত জনসংখ্যার অনুপাতে এবং বয়স লোকের ভৌতাদিকার সমেত যৌথ নির্বাচন ব্যবস্থায় কয়েকটি পৃথক আসন রাখা উচিত।

প্রাদেশিক গবর্নমেন্টের উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলি কার্যকরী করার কাজে কেন্দ্রীয়-সরকারের সাহায্যের প্রয়োজন হইবে। সাব-কমিটির অজ্ঞাত সুপারিশগুলি নিয়ে দেওয়া হইল :— (১) পার্শ্বত্ব জাতি সম্পর্কিত উপদেষ্টা পরিষদের পরামর্শ ব্যতীত পার্শ্বত্ব অঞ্চলে জমি ও সামাজিক রীতিনীতি সম্পর্কে কোন আইন প্রণয়ন করা উচিত হইবে না; (২) পার্শ্বত্ব অঞ্চলে যেখানে যেখানে সম্ভব সেখানে পঞ্চায়েৎ গঠন করা উচিত; (৩) মহাজনদের ব্যবসা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা উচিত; (৪) পার্শ্বত্বজাতীয় লোকদের নিকট হইতে জমি লইয়া অল্প লোকদের দেওয়া বন্ধ করা উচিত।

আদিবাসী নেতা জয়পাল সিং এই সম্পর্কে বলিয়াছেন যে, ভারত-সরকারকে পার্শ্বত্ব চটগ্রাম কিয়দা পাওয়ার দাবি জানাইতে হইবে। র‍্যাডক্লিফ বাটোয়ারার পরিবর্তন করিতে হইবে।

রিপোর্টে প্রকাশিত সারাংশে বলিতে ইংরেজের শোষণ বন্ধের কোন কথা নাই; মূল রিপোর্টে আছে কি না তাহা জানিবার সুযোগ আমাদের হয় নাই। না থাকিলে উহা সংযোজিত হওয়া উচিত এবং, বাংলা হইতে তাহার গণ-পরিষদে গিয়াছেন তাহার অনায়াসে উহা করিতে পারেন।

পার্শ্বত্ব চটগ্রামের প্রতি র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদে যে অজ্ঞান করা হইয়াছে তাহার ভুলনা নাই। ভৌগোলিক হিসাবে পার্শ্বত্ব চটগ্রাম বাংলার সীমানার অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু সেখানকার কোন প্রতিনিধি-বলী ব্যবস্থা-পরিষদে ছিলেন না, বন্ধ-বিভাগ সহজে আইন সত্তার মত প্রকাশের অধিকার তাহার পান নাই। ভারতবর্ষের অজ্ঞান শাসন-সংস্কার-বহির্ভূত অঞ্চল-গুলির সঙ্গে পার্শ্বত্ব চটগ্রামও এক পর্যায়ে পড়ে এবং সে দিক দিয়া অজ্ঞান হানের সঙ্গে পার্শ্বত্ব চটগ্রামও গণপরিষদ কর্তৃক নিষ্পত্ত শাসন-সংস্কার বহির্ভূত অঞ্চল সাব-কমিটির অধীন। এই অবস্থায় ঐ জেলাটিকে ভারতবর্ষ হইতে কাটিয়া পাকিস্থানে জড়িয়া দেওয়া ধোরতর অজ্ঞান কার্য হইয়াছে। পার্শ্বত্ব চটগ্রাম র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদের এই অজ্ঞান সিদ্ধান্ত মানিয়া লইতে অস্বীকার করিয়াছে এবং উহার পাকিস্থান ভুক্তিতে বাধাদানের সংগ্রামের ক্ষণ প্রস্তুত হইতেছে। অজ্ঞানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের চেষ্টা সকলের সহায়ত্ব ও সাহায্যলাভ করিবেই, পার্শ্বত্ব চটগ্রামের নেতারাও উহাতে বঞ্চিত হইবেন না ইহা নিশ্চিত।

কয়লার অভাব

বিহার ও বাংলার কয়লার তীব্র অভাব দেখা দিয়াছে। ব্রিটিশ হইতে প্রেরিত ইউনাইটেড প্রেসের এক সংবাদে জানা গিয়াছে যে মালগাড়ীর অভাব এই সত্ত্বের কারণ। মালগাড়ীর অভাবে মাল স্থানান্তরে প্রেরণের ব্যাঘাত সৃষ্টি হওয়ার বিহার ও বাংলার প্রায় সমস্ত খনিতে কয়লা কমিয়া যাইতেছে। ইহার ফলে রাশিগঞ্জের ছইটি কয়লার খনির মালিক খনির

কাজ বন্ধ রাখিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে এবং সংগে কয়লা চালান দেওয়ার বন্দোবস্ত না হইলে আরও অনেক খনি বন্ধ হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে।

স্বাধীনতা লাভের পরও আমাদের গতানুগতিক মনোবৃত্তি যে দূর হয় নাই এই শ্রেণীর সংবাদে তাহা ক্রমশঃ প্রকাশ পাইতেছে। মালগাড়ী মিলিলে তবে কয়লা খনি হইতে রওনা হইবে নচেৎ খনিতে পড়িয়া পড়িবে এবং খনির কাজ বন্ধ থাকিবে এই মনোবৃত্তি এখনও রহিয়াছে ইহাই আশ্চর্য। মালগাড়ী ছাড়া আর কি কোন উপায় নাই? কলিকাতা শহরে হাজার হাজার লরী রহিয়াছে। ছই বা তিন দিনের ভ্রম তাহা অর্ধেক লরী রিকুইজিশন করিয়াও কি কাজ সমাধা করা যায় না? যেদিনীপুরে মল্লীদের চেষ্টায় বহু চাউল-সংগৃহীত হইয়াছে কিন্তু খোলা জায়গায় ধান ও চাউল পড়িয়া পড়িতেছে। কৈফিয়ৎ সেই সনাতন, মালগাড়ীর অভাব। আজকের দিনে একটি চাউলের দানা অথবা এক টুকরা কয়লা নষ্ট হওয়া অমার্জনীয় অপরাধ—স্বাধাদের দোষে ইহা ঘটবে তাহারাত্ত উচ্চপদস্থই হউক না কেন তাহাদিগকে অপরাধী বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। অনশনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের সংগ্রাম রাশিয়ার বিরুদ্ধে জার্মানীর যুদ্ধ ঘোষণার চেয়ে কোন অংশে কম গুরুত্বপূর্ণ নহে। অন্ন ও ইন্ধনের সংস্থানের দায়িত্ব যে রাষ্ট্র বহুতে গ্রহণ করিয়াছে এবং নিজে এই ছই বস্ত্র সরবরাহের ভার লইয়া স্বাভাবিক ও সাধারণ উপায়ে ঐগুলি প্রাপ্তির পথ সকলের নিকট বন্ধ করিয়াছে তাহার পক্ষে উহা সরবরাহ করিতে না পারা ভয়চূড়ান্ত ব্যর্থতার পরিচয় নহে, অপরাধও বটে। চাউল, কয়লা প্রভৃতি আনিবার দায়িত্ব গবর্নমেন্টের, মালগাড়ীর অভাবের-দোহাই দিয়া নিজেদের অযোগ্যতা ঢাকিবার চেষ্টা না করিয়া কর্তৃপক্ষ যদি সকলকে লরী এবং নৌকা প্রভৃতি দেওয়ার ক্ষমতা অহরোহ জানাইতেন তবে লোকে সন্তুষ্ট হইত।

ভারতে রস্ত্রের উৎপাদন হ্রাস

বোম্বাই বস্ত্রশিল্পের কেন্দ্রস্থান। বর্তমানে এখানে মিলের মালিকদের সহিত শ্রমিকদের প্রবল বিরোধ চলিতেছে এবং বস্ত্রশিল্পের ফলে লক্ষ লক্ষ গজ বস্ত্র কম উৎপন্ন হইতেছে। যদি এখনও এই বিরোধ বন্ধ করা না হয়, তাহা হইলে অচিরেই ভারতবর্ষ অতি কঠোর বস্ত্রসঙ্কটের সম্মুখীন হইবে। ইহার কারণ অহুসধান করিলে মনে হয় যে, কিছুদিন পূর্বে বোম্বাই ইন্ডাস্ট্রিয়াল কোর্ট শ্রমিকদের বেতন সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন তাহার প্রতিবাদকল্পেই শ্রমিকগণ বস্ত্র-উৎপাদনের হার কমাইয়া দিয়াছে। এই কমিটি শ্রমিকদের মজুরীর হার নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। কমিটির নির্দেশে শ্রমিকদের কার্যের অহুপাতে মজুরী নির্ধারিত হইয়াছে। যেমন, যত গজ কাপড় বোনা হইবে, শ্রমিকেরা সেই অহুপাতে নির্দিষ্ট হারে তত পরমা পাইবে। বোম্বাই মিলমালিক সমিতির পরামর্শক্রমে

মিলনিকেরা কমিটির সিদ্ধান্ত কার্যকরী করিবার জন্য শ্রমিকদের মাসিক বেতনের পরিবর্তে মাসিক উৎপন্ন দ্রব্যের সাধারণ হার অনুসারে প্রতিটি কার্যের মজুরী নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, এবং ইহার ফলে বোম্বাইয়ে বহু মিলে শ্রমিকেরা স্ব স্ব বিভাগে কার্য কমানিয়া দিয়াছে। তাহার ইহা দ্বারা মালিকদের দেখাইতে চাহিতেছে যে তাহাদের কার্যের অল্পপাতে মাহিনা কম দেওয়া হইতেছে।

এই রূপে শ্রমিকেরা কাজ কম করার বোম্বাই কটন মিলে একমাত্র জুলাই মাসেই ২৭ লক্ষ বর্গ কাছের ফল পাওয়া যায় নাই। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে আগষ্ট মাসে গড়ে ৬৫০ টি তাঁতের কাজ বন্ধ ছিল। শ্রমিকদের কার্যে শিথিলতার জন্য যেখানে মাথাপিছু ৮৬ পাউণ্ড সুতা তৈয়ারি হইত, সেখানে জুলাই মাসে মাত্র ৪৮'১ পাউণ্ড সুতা প্রস্তুত হইয়াছে। শ্রমিকদের কার্যের শিথিলতার ফলে আছে শ্রমিকনেতাদের উত্থান। ইন্ডাস্ট্রিয়াল কোর্ট শ্রমিক ও মালিকদের মধ্যে বিরোধ মীমাংসা করিবার জন্য যে চেষ্টা করিয়াছিল, তাহা নষ্ট করিয়া দিবার জন্যই শ্রমিকনেতাদের এই প্রচেষ্টা। বোম্বাই গবন্মেণ্ট এই সকল সমস্যার সম্মুখীন হইয়া শ্রমিকদের কার্যে শিথিলতার তীব্র নিন্দা করিয়া সম্প্রতি এক প্রেসনোট বাহির করিয়াছেন। ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমিটির সুপারিশে শ্রমিকদের যদি আপত্তিজনক কিছু থাকে তবে গবন্মেণ্ট কর্তৃক যে অস্থায়ী কমিটি (Ad Hoc Committee) স্থাপিত হইয়াছে তাহাতে প্রতিনিধি পাঠাইবার জন্য উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের কোন প্রতিনিধি না পাওয়ায় মনে হয় যে শ্রমিকদের সত্যকার অভাব অসুবিধা কিছু নাই।

যুদ্ধপূর্বকালে সাধারণ সময়ে শ্রমিকদের কার্যশিথিলতার জন্য মাহিনা কমানিয়া দিলেই তাহারা ক্রমশঃ নিজেদের ভুল বুঝিতে পারিত। কিন্তু বর্তমানে সঙ্কটপূর্ণ পরিস্থিতিতে ইহা করা যায় না। কিছুদিন পূর্বে পণ্ডিত জগদহরলাল নেহেরু বলিয়াছেন যে বর্তমান অনটন অবস্থায় উৎপাদন বৃদ্ধি করা অত্যাবশ্যক। এখন উৎপাদন হ্রাস করা কেবলমাত্র স্বার্থান্বেষী নহে, গুরুতর অপরাধ। উৎপাদন হ্রাস করিবার ইচ্ছা সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় দেশের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িতেছে। ইহা দেশের পক্ষে অত্যন্ত অনিষ্টকর। ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমিটির দ্বারক বানচাল করিবার জন্য যে সুসংবদ্ধ দৃঢ় প্রচেষ্টা চলিতেছে তাহাতে আশঙ্কা হয়, শ্রমিকদের মনে একবার যদি ধারণা জন্মিয়া যায় যে নিরপেক্ষ বিচারকদের অভিমত যে কোন দল ইচ্ছা করিলে নিষ্ফল করিতে পারে, তাহা হইলে ভবিষ্যতে শ্রমিকদের কোন সমস্যারই শান্তিপূর্ণভাবে সমাধান করিবার আশা একেবারে থাকিবে না। গবন্মেণ্টের এখন চিন্তা করা প্রয়োজন যে মাহারা নিজেদের স্বার্থে দেশের লোকের অনিষ্ট ও বিদেশীর সুবিধা করিয়া এইরূপ উত্থান দিতেছে তাহাদের বিরুদ্ধে কি তাবের ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

বিলাতে বস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধি

ভারতীয় শিল্পের ভাগ্যাকাশে যখন নিত্যনূতন সমস্যার আবির্ভাব ঘন হুজুটকার সৃষ্টি করিয়া জনসাধারণকে বিপর্যস্ত করিয়া তুলিতেছে, তখন বিদেশের দিকে তাকাইয়া আমরা দেখিতে পাই যে ল্যাঙ্কাশায়ারের কটন মিলগুলি ধীরে ধীরে আধুনিক যন্ত্রপাতি প্রভৃতি স্থাপন করিয়া অতি সহজে জনসাধারণের চাহিদা মিটিাইতেছে। এমন কি যুদ্ধের সময়েও বিভিন্ন কারখানাগুলি পুরাতন যন্ত্রপাতি বদলাইয়া নূতন যন্ত্র স্থাপনের বিরাট ব্যয়ভার বহন করিয়াছে। এই সকল পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের পশ্চাতে ছিল ল্যাঙ্কাশায়ার কটন কর্পোরেশনের উৎসাহ ও পরিকল্পনা। গত ডিসেম্বর মাসে গবন্মেণ্ট যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেন, তাহার বহুপূর্বেই কর্পোরেশন ১,৫০০,০০০ পাউণ্ড ব্যয়ে একটি দাত বৎসরের পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে। কর্পোরেশনের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও ভাইস-চেয়ারম্যান বিখ্যাত শিল্পপতি সার ফ্রাঙ্ক প্লাট।

কয়লার সাহায্যে যে সকল মেশিন চলিত, তাহাদের পরিবর্তে এখন দ্রুতগতিশীল বৈদ্যুতিক যন্ত্রের আমদানী হইতেছে। কক্স মিল, ম্যাডেলিক মিল, হক মিল, কেট মিল প্রভৃতি স্থানে প্রচুর অর্থব্যয়ে নূতন মেশিন স্থাপন করা হইয়াছে। ম্যানর মিলে নূতন যন্ত্র প্রবর্তনের ফলে যে সকল শ্রমিক কর্মহীন হইয়াছিল, তাহাদের অচ্ছাদ কাজে নিয়োগ করা হইয়াছে।

কর্পোরেশনের ডিরেক্টরবর্গ শ্রমিকদের সুখ-সুবিধার জন্ত অর্থ ব্যয় করিতে কোনরূপ বিধাবোধ করেন নাই। মিলের অভ্যন্তরে বৈদ্যুতিক আলো, ক্যাটিন, শিশুদের জন্ত বিতালয় প্রভৃতির বন্দোবস্ত রহিয়াছে।

শিল্প কেন্দ্রগুলিতে উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ বাড়াইবার জন্ত অবসর সময়ে কাজ করিবার লোক (part-time worker) নিয়োগ করা হইতেছে ও জী মজুরদের খাওয়ানিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ম্যানচেষ্টার সম্পর্কে শ্রমিক মন্ত্রী এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন, যে সকল বিবাহিতা জীলোক মিলে কাজ করিতে উৎসুক, তাহাদের সুবিধা মত কাজ করিবার বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হইবে। ফলে, বহুসংখ্যক শ্রমিক রমণী কাজে যোগ দিতেছে। ইহাদের সংখ্যা প্রায় ১৫০০ এবং ইহার সংখ্যা ১৯ হইতে ২০ বর্গ কাজ করিতেছে। রাজিতেও তাঁত চলিতেছে। একটি মিলে সোমবার হইতে শুক্রবার পর্যন্ত সন্ধ্যা ৬টা হইতে রাজি ১০টা পর্যন্ত ৪০০ শত রমণী কাজ করিতেছে এবং আরও ২০০ জন কাজ করিবে বলিয়া আশা প্রকাশ করিতেছে। আর একটি মিলে বর্তমানে ১২০ জন কাজ করিতেছে এবং তালিকায় এখনও ৫০০ জনের নাম রহিয়াছে। দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনাকে কার্যকরী করিবার পক্ষে এই সকল শ্রমজীবিনীদের দিয়া কাজ করাইবার যথেষ্ট অসুবিধা আছে বটে, কিন্তু অল্পদিন সাপেক্ষ পরিকল্পনার পক্ষে

ইহাদের দ্বারা যথেষ্ট উপকার হয়। তুলা নিরন্তরনের দ্বারা বস্ত্রের মূল্য নিৰ্দ্ধারিত হইয়াছে। গত কয়েক বৎসর বরিশা বণিক সম্প্রদায় রপ্তানী মালের উপর যে লাভ করিতেছিল, তাহার কিয়দংশ বর্তমানে শ্রমিকরা পাইবে বলিয়া স্থির করা হইয়াছে।

গবর্নমেন্ট তুলা সম্পর্কে যে পন্থা অবলম্বন করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন তাহার সহিত বাণিজ্য মন্ত্রকের (Board of Trade) তুলা ক্রয় করিবার নীতির সামঞ্জস্য থাকিবে না। এখন পর্য্যন্ত প্ল্যান সম্বন্ধে কোন সুনির্দিষ্ট বিবৃতি প্রকাশিত হয় নাই; কিন্তু তুলা সম্বন্ধে পরামর্শদাতা কমিটি এই সমস্ত সম্পর্কে বহু চিন্তা করিয়াছেন। গত যুদ্ধের সময় শিশির হইতে প্রচুর তুলা আমদানী হইয়াছিল। বর্তমানে ব্যয়-সঙ্কোচের জন্ত সকল সাত্ত্বাজ্যেই তুলা অধিক পরিমাণে উৎপন্ন করিবার নিমিত্ত চেষ্টা চলিতেছে। সুদান প্ল্যানটেশন সিন্ডিকেট দ্বারা পরিচালিত এক পরিকল্পনা পূর্ব-আফ্রিকাতে কার্যকরী হইতেছে। তাহা ১৯৫০ সালে গবর্নমেন্ট স্বহস্তে গ্রহণ করিবেন বলিয়া স্থির হইয়াছে। উগান্ডার যে মৃত্তক গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত হইবে তাহাতে সুদানের কয়েকজন সুভিজ্ঞ লোককে পাঠান যাইতে পারে।

বিদেশের মিলগুলির উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আমাদের দেশের মিলগুলির সংস্কার করিতে হইবে ও উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া জনসাধারণের চাহিদা মিটিহিতে হইবে। তুলার ব্যবসায় অথবা কাপড় উৎপাদন সম্বন্ধেই আমাদের দেশ অত্যধিক পশ্চাতে রহিয়াছে। যুদ্ধের পর গত দুই বৎসরে যে সময় ও সুযোগ পাওয়া গিয়াছিল তাহার উপযুক্ত সদ্যবহার যদি হইত, গবর্নমেন্ট, মালিক এবং শ্রমিক তিনজনই যদি জনসাধারণের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কাজ করিতেন তবে বিলাতের চার আমরাও অনেক উন্নতি করিতে পারিতাম। দেশের এই ভীষণ বস্ত্রাভাব থাকিত না। আমেরিকা, ব্রিটেন ও জাপান হইতে যে পরিমাণ বস্ত্র আমদানী সুরু হইয়াছে তাহাতে ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের অবস্থা কি ঠাড়াইবে তাহাও চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে।

অষ্ট্রেলিয়ার ও ভারতের কৃষি

দক্ষিণ-অষ্ট্রেলিয়ার রাজধানী এডেলড গুণিবীর সর্বাঙ্গেক্ষা মনোরম ও সুসজ্জিত শহরগুলির মধ্যে অন্যতম। শহরটির চতুর্দিকে বিহাঙ্গভূমি; ইহার পরেই দেখা যায় সুবিস্তৃত আধুনিক শহরতলী। শীতকালে এখানে মাঝে মাঝে বৃষ্টি হয়, আবার তারপরেই দেখা দেয় চমৎকার চক চক মৌসুম। কৃষিকার্যের পক্ষে ইহার জলবায়ু অত্যন্ত অমূল্য। এডেলড শহরের চতুর্দিকের জেলাগুলিতে বৎসরে বিশ হইতে ত্রিশ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয়। ইহার মধ্যে যে হইতে সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত অধিক বারিপাত হয়। দক্ষিণ-অষ্ট্রেলিয়াতে কৃষকগণ ও

পশুপালকগণ তাহাদের যোগ্যতা ও নৈপুণ্যের জন্ত যথেষ্ট সুনাম অর্জন করিয়াছে।

অষ্ট্রেলিয়ার উপত্যকা ও চাঙ্গু স্থানগুলি ইক্ষুয়ক, বাদাম, জলপাই প্রভৃতি ফলের বাগানে পূর্ণ। ইহার জেলাগুলির কৃষিক্ষেত্র বিশেষ সমৃদ্ধ। তৃণভূমিতে গরু ও মেষ পালন করা হয়। বিস্তৃত জমিতে গম-চাষ হয় এবং প্রচুর গম পাওয়া যায়। এখানে ৫০০ একর জমির এক ফার্মে ৯০০ ভেড়ী, ৫০টি গাভী ও প্রায় ৭০টি শূকরশাবক পালন করা হয়। এই জোতজমির মাত্র ১৪ একর ভূমি চাষ করা হয়; ইহার মধ্যে আবার বালি ও শুট শুক করা হয়। বাকি অংশটিতে পশুচারণ ভূমি আছে। প্রত্যেক বৎসর ভূমিতে অধিক পরিমাণে সার দেওয়া হয়। ফলে নানা জাতীয় তৃণ জন্মায় প্রচুর।

ওয়েট এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট দক্ষিণ-অষ্ট্রেলিয়ার যুহুতম ও শ্রেষ্ঠ গবেষণাগার। এখানে যে বৈজ্ঞানিক গবেষণা চলিতেছে, তাহার জুড়ি দক্ষিণ-অষ্ট্রেলিয়াতে কৃষিকার্যের এত উন্নতি সম্ভবপর হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠান হইতে কৃষকগণ তাহাদের জাতব্য বিষয়গুলি জানিতে পারে ও উৎসাহ পাইয়া থাকে।

এডেলড শহরের চার মাইল দূরে ওয়েট ইনস্টিটিউট অবস্থিত। মিঃ পিটার ওয়েট এডেলড বিশ্ববিদ্যালয়কে যে অর্থ দান করিয়াছিলেন তাহার দ্বারা ১৯২৪ সালে এই বিদ্যালয়টি গঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানের পাঁচ শত একর জমি আছে এবং ভাল গবেষণাগার, কঁচের ঘর ও আধুনিক জোত-বাড়ীসকল রহিয়াছে। ইহার প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে, যে সকল লোক পশুপালন ও কৃষিকার্য করে তাহাদের জ্ঞানবৃদ্ধি করা। ওয়েট বিদ্যালয়ে প্রধানতঃ কৃষাদি ও জমি সম্বন্ধে গবেষণা করা হয় বটে, কিন্তু ইহা ব্যতীত এখানে একটি কৃষি বিদ্যালয় আছে এবং এখান হইতে ডিগ্রী পরীক্ষাও (B. Ag. Sc.) দিতে পারা যায়। এই বিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ কৃষি-বিভাগের মজী ও জনসাধারণকে কৃষি বিষয়ে নানাবিধ উপদেশ দিয়া থাকেন। এই প্রতিষ্ঠানের সহিত Agronomy, Agrostology এবং Plant Breeding এই তিনটি অধীতব্য বিষয় আছে। ভবিষ্যতে ভারতে যে কৃষি-বিষয়ক গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহার সহিত এই তিনটি অধীতব্য বিষয় অবশ্যই রাখিতে হইবে।

ওয়েট প্রতিষ্ঠানে যে বৈজ্ঞানিক গবেষণা চলিতেছে তাহার কার্যাবলী নিম্নলিখিত তিনটি ভাগে বিভক্ত। যথা—(১) স্থায়ী ও অস্থায়ী পশুচারণ ভূমির উন্নতিসাধন, (২) কৃষিক্ষেত্রে ও উদ্যানে উৎপন্ন শস্তে এবং বনভূমিতে যে সব অনিষ্টকর কীটপতঙ্গ জন্মে সে সম্বন্ধে গবেষণা এবং (৩) বিভিন্ন সময় বীজ বপনের কলাকল, সার ও শস্তের বিশেষতঃ গমের বীজ বপনের নানা-বিধ সমস্ত সম্বন্ধে পরীক্ষা। দক্ষিণ-অষ্ট্রেলিয়াতে সমগ্র শস্ত-ক্ষেত্রের দুই-তৃতীয়াংশ ভূমিতে গম উৎপন্ন হয়। তাঃ ট্রাইবল

দেখাইয়া দিয়াছেন যে, তিন-চার বৎসর গম উৎপাদনের পর ক্ষেত্রে কলাইহাট প্রভৃতি খুব ভাল উৎপন্ন হয় এবং ইহার দ্বারা ক্ষেত্রে উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হয়। অতীত কৃষিজাত ব্যবহার মধ্যে শণ, ভিসি ও তাক ফ্লাওয়ার নামক তৈলবীজ উল্লেখযোগ্য।

ওয়েট ইন্সটিটিউটের পার্শ্বে একটি কৃষিবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে এবং এই বিদ্যালয়ের পার্শ্ববর্তী স্থানটি ইন্সটিটিউট পত্রীক্ষামূলক কার্যের জন্য লীজ লইয়াছে। ইহার ফলে কৃষি-বিদ্যা ও কৃষিবিষয়ে গবেষণার মধ্যে নিকট সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে এবং তাহাদের এই সকল বিষয়ের সহিত সংযোগ আছে তাহাদের যথেষ্ট সুবিধা হইতেছে। ভারতে উক্ত ব্যবস্থা সম্ভব হইলে গবেষণার কার্য ও গবেষণা প্রতিনিবিগুলির নাম ও গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইবে। ওয়েট ইন্সটিটিউটের কৃষি পত্রীক্ষার ফলে কৃষির সমস্তাগুলির উপর আলোকপাত হইয়াছে এবং ক্ষেত্রে উৎকর্ষ সাধনের জন্য মূল্যবান তথ্যাদি প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার একটি মূল্যবান তথ্য হইতেছে এই যে ভূমির অধিকারভার সহিত চাষাগাছের এবং পশুর রোগের সহিত সম্বন্ধ আছে। এই সম্বন্ধ আরও গবেষণা করা প্রয়োজন।

অষ্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন পত্রীক্ষামে এগ্রিকালচারাল ব্যুরোর শাখা আছে। কৃষকেরাই এই শাখাগুলি গঠন করে। নির্দিষ্ট সময়ে ইহার অধিবেশন হয় এবং সেখানে সভ্য ও উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীরা কৃষিকার্যের সমস্তাগুলির আলোচনা করেন। দক্ষিণ-অষ্ট্রেলিয়াতে এইরূপ ৩৭০টি শাখা আছে। এই সকল শাখা হইতে প্রতিনিবি লইয়া প্রতি বৎসর একটি বার্ষিক অধিবেশন হইয়া থাকে।

আর আমাদের দেশে ৭ বাংলার বহু আন্দোলন ও আলোচনাতেও একটি কৃষি শিক্ষা ও গবেষণার উচ্চ প্রতিষ্ঠান গঠিত হইল না। কসল বৃদ্ধির আন্দোলনের নামে কোটি কোটি টাকা অপচয় হইয়াছে কিন্তু স্থায়ী কাঙ্ক্ষা কিছুই হয় নাই। এখন সময় আসিয়াছে। আমেরিকা, রাশিয়া, কানাডা, ব্রিটেন, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি যে যন্ত্র ও উদ্যমের সহিত কৃষিসমস্তা সমাধানে ত্রুটি হইয়াছে আমাদেরও তাহা করিতে হইবে। এডেলড আমাদের নিকট একটি ছোট দৃষ্টান্ত মাত্র।

ইউরোপে কৃষির উন্নতি

অনেক দিন হইতেই জমিদারি প্রথা বিরুদ্ধে জনসাধারণ আন্দোলন করিতেছে। বর্তমানে দেশের রাজনৈতিক সমস্তার সমাধান হইয়াছে। এখন আশা করা যায় জমিদারি প্রথা প্রভৃতি অর্থনৈতিক সমস্তাগুলির প্রতি প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট সকল মনোযোগ দিবেন। বিহারের মন্ত্রী ডাঃ সৈয়দ মাহমুদ একটি প্রবন্ধে জমিদারি প্রথা বিলোপের পর কি কর্তব্য এই সম্বন্ধে একটি স্ফুটিত পরিকল্পনা দিয়াছেন। বহু দিন ধরিয়া আন্দোলন করিবার ফলে জমিদারি প্রথা বিলোপ সন্নিকটবর্তী

হইয়াছে। এখন ভবিষ্যৎ কর্তব্য সম্বন্ধে চিন্তা করিবার সময় আসিয়াছে। আমাদের সম্মুখে নানা প্রকার সমস্যা দেখা দিয়াছে। জনসংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে, ফলে জমির মূল্য বাড়িয়া গিয়াছে। ভূমিহীন লোকের সংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধি পাইতেছে; মালিকগণ অত্যন্ত ভাবে জমি দখল করিতেছেন এবং বেশীর ভাগ কৃষক কপর্দকশূন্য, জল-সেচন বা জল-নিষ্কাশন করিবার কোন উপায়ই তাহাদের নাই। এই সকল অব্যবস্থার ফলে কৃষিকার্যে কোনই লাভ হয় না। জমিদারি প্রথা বিলোপ সাধনের সঙ্গে সঙ্গে এই সকল দুর্ভাব্যতার প্রতি-কার করিতে হইবে, নতুবা পুনরায় জমিদারি প্রথা দেখা দিবে এবং কৃষকদের দুর্গতির অন্ত থাকিবে না। কৃষিকার্যের আয়ুল পরিবর্তন দরকার। কৃষকের সহিত জমিদারের এবং গবর্ণমেন্টের কিরূপ সম্বন্ধ থাকিবে এবং তাহার আর ইত্যাদি প্রশ্নের উপর কৃষিকার্যের ভাল মন্দ নির্ভর করে।

কৃষিকার্যের উন্নতি এক দিকে যেরূপ কৃষকের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা এবং আইনগত অধিকারের উপর নির্ভর করে, অপর দিকে সেইরূপ কৃষিকার্যের উপকরণ ও পদ্ধতির উপরও নির্ভর করে। ভারতবর্ষে বহু দিন ধরিয়া বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষিকার্যের উন্নতির চেষ্টা চলিতেছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত তাহা আশাহীনরূপে ফলপ্রসূ হয় নাই। দুর্ভিক্ষ-ভরিত কমিশনের রিপোর্টে কৃষিবিভাগের এক জন বিচক্ষণ ডিরেক্টর বলিয়াছেন যে প্রচুর শস্ত উৎপাদনের পথে প্রধানতম বাধা হইতেছে কৃষক-দের দৈহিক। তাহাদের নিকট ইহা অপেক্ষা বেশী কসল আশা করা যায় না। আর এক জন বিশেষজ্ঞও বলিয়াছেন যে কৃষিকার্য করিবার যে পদ্ধতি প্রচলিত আছে তাহার উন্নতি অবিলম্বে প্রয়োজন। কিন্তু কৃষকগণ এতই ঋণগ্রস্ত যে তাহাদের নিকট এই সকল কথা বলা বুধা। উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপে কসল উৎপাদনের জন্য যে বৈজ্ঞানিক পরিবর্তন হইয়াছিল এবং কৃষিব্যবসায়ে যে নতুন পরিবর্তন আসিয়াছিল, তাহার মূলে ছিল কৃষি সম্বন্ধে পুরাতন আইনগুলির নতুনরূপে সংস্কার। এই-রূপ সংস্কার না হইলে কৃষিকার্যে কোন পরিবর্তনই হইত না। কৃষিকার্যের উন্নতি পরিকল্পনার কৃষি সম্বন্ধীয় আইনগুলির পুনর্গঠন যে একান্ত প্রয়োজন তাহা চিন্তা করিতে হইবে।

পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে কৃষিকার্যে আয়ুল পরিবর্তন হইয়াছে। জমিদারি প্রথা, শুল্ক, কৃষকের দুঃস্থ প্রভৃতির জন্য কৃষিকার্যের সকল প্রকার উন্নতি ব্যাহত হইতেছিল। এই পরিবর্তনের মূলে ছিল এক শক্তিশালী স্বাধীন কৃষকসম্প্র-দায়ের সৃষ্টি ও জমিতে অধিক কসল উৎপাদনের ইচ্ছা। নিম্ন-লিখিত নীতি অনুসারে এই পরিবর্তন হইয়াছে :

(১) জমিগুলি কৃষকদের মধ্যে বন্টন করিয়া দেওয়া হয়। ইহাতে তাহার স্ব স্ব জমির উন্নতির জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা করিতে থাকে। জমিদারের পরিবর্তে কৃষক জমির প্রকৃত মালিক হওয়ার স্বাধীন কৃষকের সংখ্যা বাড়িতে থাকে। (২) কৃষক ব্যতীত অন্ত কেহ-যাহাতে জমির মালিক না হইতে পারে সে

বিষয় লক্ষ্য রাখা হয়। (৩) দেশের ও দশের মঙ্গলের জন্ত এই জমির উপর কাহারও ব্যক্তিগত অধিকার (private ownership) থাকিতে দেওয়া হয় নাই। এই সকল নীতির প্রবর্তনের জন্ত পূর্ব-ইউরোপ কৃষির উন্নতিতে অতুতপূর্ব সাফল্য লাভ করিয়াছিল। পশ্চিম-ইউরোপে ১৯১৯-৩৮ সালে যেখানে শস্যাদি ও আলু শতকরা ৩৪.৫ উৎপন্ন হইত; পূর্ব-ইউরোপে সেখানে জমিত শতকরা ৪৯.৬।

১৯১৮ সালে চেকোস্লোভাকিয়ার গবর্নমেন্টে যে সংস্কার হয়, তাহার ফলে রাজনৈতিক ক্ষমতা আসে জনসাধারণের হস্তে। অবিলম্বে তাহার কৃষিক্ষেত্রের প্রতি মনোযোগ দেয় এবং কৃষকেরা জমির প্রকৃত মালিক বলিয়া নির্ধারিত হয়। ১৯১৯ সালের Land Restriction Act-এর জন্ত আরও সুবিধা হয়। বড় বড় জমিগুলি ভাগ করিয়া কৃষকদের দেওয়া হয় এবং কৃষকেরা প্রাপ্ত জমি ভাগ করিতে, ইজারা দিতে বা বন্ধক রাখিতে পারিবে না বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। পরবর্তী আইনের ফলে কৃষকেরা যে পরিমাণ জমি বাহিরের সাহায্য ব্যতিরেকে নিজেরা চাষ করিতে পারিবে সেই পরিমাণ জমির তাহার মালিক হইতে পারিবে বলিয়া স্থির হয়। ১৯১৩ হইতে ১৯১৫ সালের মধ্যে জমির যে মূল্য ছিল, জমিদারগণ ক্ষতিপূরণ স্বরূপ তাহাই পাইলেন। গবর্নমেন্ট শতকরা চার টাকা হিসাবে সুদ দিতে লাগিলেন এবং বৎসরে ঋণের অন্ততপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ শোধ দিবেন বলিয়া ঠিক করা হয়। ইহার ফলে, জমির উন্নতি হইল এবং সেই সঙ্গে সামাজিক পরিবর্তনও সাধিত হইল। কৃষকেরা নিজের জমিতে প্রচুর কলম উৎপাদন করিতে থাকে।

রুমানিয়াতেও জমিবিষয়ে পরিবর্তন হয় এবং ইহার ফলে উৎপন্ন কলমের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ইউরোপের দেশসমূহ যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছিল তাহাদের মধ্যে এইগুলি প্রধান যথা—(১) বড় বড় জমিগুলি ক্রয় করিয়া দরিদ্র কৃষক-দিগকে সেই স্থানে প্রতিষ্ঠিত করা, (২) জমি হস্তান্তর বিষয়ে আইন প্রণয়ন করা, (৩) জমি ক্রয় করিবার জন্ত প্রকৃতিগত আর্থিক সাহায্য করা এবং (৪) কৃষিকার্যের উন্নতির জন্ত সুযোগ-সুবিধা দান করা।

ভূরূপ দেশে জমিদারদিগকে ২০টি কিস্তিতে শতকরা চার টাকা সুদে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে বলিয়া ১৯৪৫ সালে জুন মাসে একটি আইন পাস হইয়াছিল। যাহারা জমি পাইল তাহারা বিনা সুদে ২০ কিস্তিতে এই টাকা দিবে। তাহাদের একটি সুবিধা করিয়া দেওয়া হইল যে তাহাদের ছেলেমেয়েদের যখন প্রাথমিক শিক্ষার বয়স হইবে তখন তাহাদের শতকরা পাঁচ টাকা করিয়া কম দিতে হইবে।

জমিদারি লোপের পর ভারতবর্ষের কর্তব্য

ভারতবর্ষে আমরা কেবলমাত্র জমিদারি প্রথা স্থানে রাখিওতয়ারি প্রথা চাহিতেছি না, কারণ এই উভয়বিধ প্রথাতেই কৃষকদের অবস্থা প্রায় সমান। দেশের মঙ্গলের জন্য গ্রামে

সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। কৃষক ও জমিদারের মধ্যবর্তী সম্প্রদায়ের সোপ করিয়া সর্বত্র সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। এখন হইতে কৃষিকার্যের সর্ব-প্রকার উন্নতিসাধন এবং নিজেদের জীবনযাত্রার উৎকর্ষসাধন করিবার জন্ত সমবায় সমিতিগুলিকে নিযুক্ত রাখিতে হইবে। গ্রামের সমবায় সমিতির নিকট অবশ্যই তাহাদের ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধাগুলি বিসর্জন দিতে হইবে। সমবায় সমিতিগুলি এই ভূসম্পত্তি পরিচালনা করিবে, বীজ, সার, কৃষিকার্যের যন্ত্র প্রভৃতি সংগ্রহ করিবে, জলসেচের বন্দোবস্ত করিবে, এবং গ্রামের কৃষিজাত দ্রব্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিবে। ইহা কৃষকদিগকে সজ্জবদ্ধ করিবে এবং দেশের শক্তিশালী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা গঠন করিবে।

১৯৩৮ সালে বঙ্গদেশে ক্লাউড কমিশন ও মাদ্রাজ প্রদেশে ল্যাণ্ড এস্টেটস্ এক্ট কমিটি নামক দুইটি ভূমি-ব্যবস্থা তদন্ত কমিটি স্থাপিত হয়। এই দুইটি কমিটিই জমিদারি প্রথা যাহাতে উন্নতি যায়, এবং প্রকৃত মালিক কৃষকেরা, যাহাতে জমি পায় তাহার জন্য সুপারিশ করিয়াছেন—জমিদারগণ ক্ষতিপূরণ পাইবেন বলিয়া স্থির হইয়াছে তবে প্রব অল্পদিনে ইহা নিষ্পন্ন হইবে না বলিয়া তাঁহারা ঘোষণা করিয়াছেন। কারণ তাহা হইলে তাহাদের মতে দেশের আর্থিক অবস্থার অবনতি হইবে। বিহার প্রদেশেও জমিদারি প্রথা রহিত হইবে এবং জমিদার শ্রেণীকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। কিন্তু আর্থিক সমস্যার সমাধান হইতে সময় লাগিবে।

জমিদারি প্রথা রহিত হইবে বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে বটে, কিন্তু জমিদারগণের কথা বিশেষভাবে চিন্তা করিতে হইবে। কারণ এক এক জন জমিদারের আশ্রিত লোকের সংখ্যা অত্যন্ত বেশী। পরিবারবর্গ ও আশ্রিতগণ লইয়া এই জমিদারগণের সংখ্যা প্রায় ৫০ হইতে ৭৫ লক্ষের মধ্যে। ইহাদের মধ্যে অনেকেই আবার প্রকৃত পক্ষে কৃষক। সুতরাং ইহাদের যদি অর্থ দিয়া সাহায্য করা যায়, তাহা হইলে তাহারা কৃষিকার্যের উন্নতি করিবার চেষ্টা করিবে এবং তাহাদের সঙ্গে গ্রীতির সম্পর্ক অটুট থাকিবে। তাহাদের পরিচালনা ক্ষমতার সহায়তায় গ্রামে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত করা এবং ব্যবসায় চালান সহজ হইবে। কিন্তু অপর পক্ষে এই সম্প্রদায়কে যদি শত্রু হিসাবে দেখা হয় তাহা হইলে দেশের ও দশের ক্ষতি হইবে।

জমির থাকনা আদায়ের জন্য যে সকল সরকারী কর্মচারী নিযুক্ত হইবে তাহারা কৃষকদের উপর যথেষ্ট অত্যাচার করিতে পারে। সমবায় সমিতি মারকং থাকনা আদায়ের ব্যবস্থা হইলে এই সম্ভাবনা থাকিবে না।

জমিদারির ক্ষতিপূরণ দানের উপায়

নিম্নলিখিত উপায়ে জমিদারদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা যায়। কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে

কৃষকদের আর বৃদ্ধি পাইয়াছে। অবশ্য জীবিকানির্ব্বাহের জন্য তাহাদের যথেষ্ট ব্যয়ও করিতে হয়। তথাপি তাহারা কিছু লাভ করিয়া থাকে। গত কয়েক বৎসরে তাহারা ইহার দ্বারা তাহাদের প্রায় সমস্ত ঋণ শোধ করিয়া দিয়াছে। গ্রামের উন্নতির জন্য তাহাদের লভ্যাংশ ব্যয় করা উচিত। তাহা না হইলে এই টাকা মামলা যোকদ্দমা প্রভৃতিতে অপব্যয় হইবে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর ঠিক এইরূপ হইয়াছিল। সেইজন্য এই অর্থদ্বারা আগামী তিন বৎসরের মধ্যে জমি ক্রয় করা ও জমিদারের ঋণ শোধ করিয়া দেওয়া উচিত। গ্রামের সমবায় সমিতি কৃষকদের সাহায্যে এই টাকা জোগাড় করিয়া এই সকল কার্য্য করিতে পারে। ইহার দ্বারা বার বৎসরের জমির রাজনা তিন বৎসরে আদায় করা যাইবে।

যুদ্ধের পূর্বে প্রতি একর জমির রাজনা পাঁচ টাকা করিয়া দিবার জন্য কৃষককে দেড় মণ চাউল বিক্রয় করিতে হইত। এই দেড় মণ চাউল দিয়া বর্তমানে সে কয়েক বৎসরের রাজনা দিতে পারে এবং তাহারও দ্বিগুণ রাজনা দিতে তাহার তিন মণ চাউল লাগিবে। সুতরাং এখন তাহার চাউল পূর্য্যাপেক্ষা অধিক লাগিতেছে না। যতদিন চাউলের মূল্য এইরূপ থাকিবে ততদিন পর্য্যন্ত সে নিয়মিত রাজনা দিতে পারিবে এবং আগামী কয়েক বৎসরেরও রাজনা দিয়া রাখিতে পারিবে। ইহার পর যখন চাউলের দাম কমিয়া যাইবে তখন সে যে কয়েক বৎসরের আগাম রাজনা দিয়া রাখিবে তাহা হইতে প্রতি বৎসর প্রকৃত রাজনার অর্ধেক করিয়া রাজনা হিসাবে লওয়া হইবে। সুতরাং তাহাদের দুর্ভিক্ষসহ্যে কিছু সুবিধা তাহারা পাইবে। এই প্রকারে অবশ্য গ্রামের সমবায় সমিতির আয়ের পরিমাণ যথেষ্ট কমিয়া যাইবে, তথাপি চাউলের মূল্য ও পারিশ্রমিক হ্রাস পাইলেও কৃষকগণ পূর্ব্বের মত জমির উন্নতির জন্য কাজ করিতে পাইবে। পরবর্তী কালে যে কৃষকের নির্ভারিত পরিমাণের জমি অপেক্ষা কম জমি আছে, তাহাকে রাজনা হইতে আংশিক মুক্তি দেওয়া সম্ভব হইতে পারে। ইহা না হইলেও সমবায়-সমিতি রাজনার পরিমাণ কমাইয়া দিতে পারে। এইরূপে গ্রাম্য সমবায়-সমিতি কৃষকদের সামাজিক ও আর্থিক সুখ-সুবিধা দিতে ও পাইক-পেয়াদাদের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিতে পারিবে।

জমিদারদের পক্ষে ক্ষতিপূরণের অর্ধেক টাকা পাইয়া ও বাকী অর্ধেক জাতীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠানের শেয়ার ক্রয় করিয়া শোধ লইলে ভাল হইবে। নতুবা কাঁচা টাকা মামলা যোকদ্দমা ও বাজে খরচে উড়াইয়া দিবার সম্ভাবনা অধিক। শেয়ার কেনা থাকিলে তাহারা প্রতিবৎসর নিয়মিত টাকা পাইতে থাকিবে। ইহার দ্বারা প্রধান প্রধান শ্রম-শিল্পকে জাতীয়করণ, কৃষিকার্যের উন্নতিসাধন প্রভৃতি কার্য্য করিতে পারা যাইবে।

দেশের জনসংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী হইলে কেবলমাত্র তাহাদেরই যে অন্নসংস্থান হইবে তাহা নহে, দুর্ভিক্ষগ্রস্ত গ্রাম্য জীবনেরও উন্নতি হইবে। দেশে এমন একটা আবহাওয়ার সৃষ্টি হইবে যাহাতে মেজুর্গ

তাহাদের শক্তির উপর নির্ভর না করিয়া নিজেদের প্রচেষ্টাতেই দেশের উন্নতি করিতে পারিবেন। গ্রামের লোকেরা সম্বন্ধ হইয়া গ্রামেরই কল্যাণ করিবে—এবং গবর্নেন্ট হইতে প্রাপ্ত যে কোন কল্যাণকর নীতি তাহারা দ্রুত কার্য্যকরী করিতে পারিবে। উৎপন্ন প্রযোজ্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহা বিক্রয় করিয়া লভ্যাংশও বৃদ্ধি পাইবে, এবং গ্রামের সমবায় সমিতিগুলি এই প্রকারে ক্রমশঃ শক্তিশালী হইয়া গ্রামের শিক্ষাবিভাগ, স্বাস্থ্যরক্ষা, সামাজিক ও আর্থিক সকল প্রকার উন্নতি করিতে সমর্থ হইবে। এইরূপে সমবায় সমিতিগুলি জনসাধারণের হস্তে প্রকৃত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা তুলিয়া দিয়া প্রজাতন্ত্র শাসন গঠন করিতে পারিবে।

এনি বেনশান্ত জন্মশতবার্ষিকী

গত ১লা অক্টোবর ভারতবর্ষের নানাহানে ভারতের যুক্তি-সংগ্রামের অত্যন্ত অগ্রদূত এনি বেনশান্তের জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ভারতের ভাবধারার সহিত নিবিড়ভাবে যুক্ত হইয়া যে কয়েকজন বিদেশী নয়নারী এদেশের কল্যাণ সাধনে ব্রতী হইয়া ভারতবাসীর জন্য অর্জন করিয়াছেন, এনি বেনশান্ত তাহাদের মধ্যে এক জন। “নয়নারী সকলের সমান অধিকার, যার আছে শক্তি পাবে যুক্তি নাহি ক্ষতিবিচার”—এই তত্ত্বের প্রত্যক্ষ প্রমাণ বেনশান্ত। বালিকা বয়সে ধর্মপ্রবণতা ইহার জীবনের বৈশিষ্ট্য ছিল। যৌবনের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মবিষয়ে প্রথমে একেশ্বরবাদী ভয়েসির শিক্ষা হন। পরে সংসার হইতে যুক্ত হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়েন। ব্রাডল’র সংস্পর্শে আসিয়া ইনি নাস্তিক্যবাদে আকৃষ্ট হন। ব্রাডল’র প্রভাবে জীবনের নানাক্ষেত্রে ইহার কর্ম্ম-পরিধি বিস্তৃত হয় এবং নিজের জ্ঞান-ভাণ্ডারের ত্রিবৃদ্ধির জন্য এই সময়ে বিজ্ঞানচর্চায় মনোনিবেশ করেন। ইহার কিছু দিন পর তিনি সাম্যবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং ইংলণ্ডের ফেব্রিয়ান সোসাইটির সহিত যুক্ত হইয়া সাম্যবাদ প্রচার আরম্ভ করেন। এই মতবাদ প্রচারের সময়েই তাহার অপূর্ণ বাগ্মিতার খ্যাতি সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে।

এই সময়ে তিনি যে সব কল্যাণকর কর্ম্মে রত হন তন্মধ্যে মনীষী লেখক জর্জ বার্নার্ড শ’কে আবিষ্কার করিয়া তাহার প্রথম জীবনের রচনা “ইরেশন্যাল নট” নামক পুস্তক প্রকাশ করা অত্যন্ত। কোন প্রকাশক না পাওয়াতে বার্নার্ড শ’ এই সময়ে ভগ্নোদ্যম হইয়া পড়িতেছিলেন। বেনশান্ত এই তরুণ লেখকের রচনার যুক্তি হইয়া তাহার পুস্তক প্রকাশের দ্বারা বার্নার্ড শ’র প্রতিভা বিকাশের সহায়ক হইলেন।

১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে বেনশান্তের জীবনে বিপর্য্যয়কর পরিবর্তন ঘটে। এই বৎসর তিনি ম্যাডাম ব্লাভাট্‌স্কির সাক্ষাৎ লাভ করেন এবং অতি সহজেই তাহার যুক্তি তত্ত্ব হইয়া পড়েন। তাহার যুক্তি ধর্মবোধ পুনরায় নব আকারে ফিরিয়া আসাতে তিনি এক নতুন মাহু হইয়া উঠেন। ব্লাভাট্‌স্কির প্রভাবে

ভারতীয় সংস্কৃতির সম্মান লাভ করিয়া এই ধারার সঙ্গে নিজের জীবনকে সিক্ত করিয়া তুলেন। তাঁহার মনে হইতে থাকে যে, এই ধারার সহিত যেন তাঁহার জন্ম-জন্মান্তরের যোগ আছে। তিনি থিওসফিক্যাল সোসাইটির কাজে উৎসাহের সহিত যোগদান করেন। এই সমিতির মতবাদ প্রচারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যখন তিনি ভ্রমণ করিতেছিলেন তখন মিঃ জি. এন. চক্রবর্তী নামক একজন অধ্যাপক ও প্রেততত্ত্বজ্ঞের সহিত পরিচিত হওয়াতে ভারতবর্ষে আসিবার অভিলাষ জন্মে। ম্যাডাম ব্ল্যাণ্টিস্‌কির মৃত্যুর পর কর্নেল অলকট থিওসফিক্যাল সোসাইটির সভাপতি পদে বৃত্ত হইলেও বার্কক্যবশতঃ তাঁহার কিছু করিবার ক্ষমতা অত্যন্ত কমিয়া যাওয়াতে বেশাভিই উক্ত সমিতির প্রকৃত কর্ণধার হন ও ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দে কর্নেল অলকটের মৃত্যু হইলে বেশাভি এই সমিতির সভানেত্রী পদে বৃত্ত হইয়া আইনতঃ ও কার্যতঃ এই উত্তম প্রকারেই অবিসম্বাদিত নেত্রী হন। আদিয়ারে (মাদ্রাজ) থিওসফিক্যাল সোসাইটির যে বিরাট কর্মক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার মূলে রহিয়াছে বেশান্তের কর্মদৃশলতা। ইহার অদ্ভুত কর্মদক্ষতা ও কার্য-পরিচালনক্ষমতার অত্যন্ত নিদর্শন হইতেছে কাশীর সেন্দ্রীল হিন্দু কলেজ। এই কলেজকেই মধ্যবিশুদ্ধপে পাওয়াতে পণ্ডিত রতনমোহন মালবীর বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বায় বিরাট শিক্ষা আয়ত্তন গড়িয়া তুলিতে পারিয়াছেন।

১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দ হইতে বেশান্ত ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের সহিত যুক্ত হন। “কমন উইল” ও “নিউ ইণ্ডিয়া” নামক পত্রিকা প্রকাশ করিয়া উহার দ্বারা প্রতি অল্পদিন পরেই “হোম-রুল” আন্দোলনের স্বপ্ন করিয়া ভারতের স্বয়ং-শাসনের অধিকার দাবি অত্যন্ত জোরের সহিত প্রচার করিতে থাকেন। ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দে ভারতীয় কংগ্রেস আন্দোলনের প্রথম উল্লেখ-যোগ্য ইতিহাস রচনা করিয়া তিনি “হাউ ইণ্ডিয়া রট ফর হার ফ্রিডম” (How India wrought for her Freedom) নামক পুস্তক প্রকাশ করেন। ইংলণ্ডের টি. অ্যাণ্ড সি. জ্যাক কোম্পানী প্রকাশিত “পিপলস সিরিজ” নামক বিশ্বের জ্ঞান-প্রচারক পুস্তকাবলীর অগ্রতম “ইণ্ডিয়া এ নেশন” নামক পুস্তক প্রকাশ করিয়া ভারতীয় রাষ্ট্রীয় কামনার কথা বহু প্রচার করিতে সহায়তা করেন। ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে “হোমরুল লীগ” নামক সংস্থা স্থাপন করিয়া তিনি সুসংগত রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনের দ্বারা ভারতের রাষ্ট্রিক প্রগতির সহায়তা করেন। এই আন্দোলনে ভীত হইয়া ভারতের আমলাতন্ত্র নির্ধাতন করিয়া তাঁহার কর্মপ্রচেষ্টা বন্ধ করিতে প্রয়াসী হয়। ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৬শে মে তারিখে “নিউ ইণ্ডিয়া” পত্রিকার নিকট দুই হাজার টাকা জামানত চাওয়া হয়। তাহার কিছুদিন পরেই অর্থাৎ ১০ই জুলাই তারিখে বোম্বাই-সরকার এক নিষেধাজ্ঞার বলে বেশান্তের বোম্বাই প্রদেশে প্রবেশ নিষিদ্ধ করেন। সেপ্টেম্বর মাসে মহাপ্রদেশ-সরকারও অস্বরূপ আদেশ জারি করেন। বেশান্ত দমিবার পাত্রী ছিলেন না, তাই এই

সব নির্ধাতনে তাঁহার উৎসাহ আরও বাড়িয়া গেল। ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ই জুন মাদ্রাজের গবর্নর লর্ড পেটল্যাণ্ড ত্রিমতী বেশান্তের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে হোমরুল বা অল্প কোনও রাষ্ট্রিক আন্দোলনে প্রবৃত্ত না হইতে অহরোধ করেন। বেশান্ত উহা বন্ধ রাখিতে অস্বীকার করেন। ইহার ফল কি হইবে বুঝিতে পারিয়া বেশান্ত “নিউ ইণ্ডিয়া”তে তাঁহার বিদায়-বাণী প্রকাশ করেন। তাহার সৌন্দর্য্য অহুবাধে নষ্ট না করিয়া তাঁহার ভাষাতেই বলি—

“I write plainly for this is my last word. I go into enforced silence and imprisonment because I love India and have striven to arouse her before it was too late. It is better to suffer than to consent to wrong. It is better to lose liberty than to lose honour. I.... God save India, Vande Mataram.”

বেশান্তের আশঙ্কা সত্যে পরিণত হইতে বিলম্ব হইল না। গবর্নরের সহিত সাক্ষাৎ পরিসমাপ্তির এক ঘণ্টা পরেই আনি বেশান্ত ও তাঁহার কর্মসহচর মিঃ বি. পি. ওয়াডিয়া ও মিষ্টার জি. এস. আরগুন্সের বিরুদ্ধে অন্তরীণের পরোয়ানা বাহির হইল। তাঁহার এই বন্দিধে ভারতে হোমরুল আন্দোলন আরও উগ্র হইয়া উঠিলে ব্রিটিশ সরকার প্রমাদ গণিলেন এবং লর্ড মর্ফেও ভারতে আসিয়া অনুসন্ধান করিয়া শাসন-সংস্কার সাধন করিবেন প্রতিশ্রুতি দিলেন। ইহার অল্পদিন পরেই জনমতের চাপে ভারত-সরকার বেশান্ত প্রভৃতিকে মুক্তি দিতে বাধ্য হইলেন।

কলিকাতায় কংগ্রেসের অরিবেশন তখন আসন্ন। বাংলার প্রগতিপন্থী দল সদ্যমুক্ত ভারতের এই মুক্তি সংগ্রামিকাকে সভানেত্রী করিতে চাহিলেন কিন্তু নরমপন্থী দল তাহার বিরোধিতা করেন। প্রগতিপন্থী দল কবিসত্ৰাট রবীন্দ্রনাথকে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নির্বাচন করিয়া বেশান্তকে সভানেত্রী করিতে উদ্যোগী হইলেন। নরমপন্থী দলের সহিত একটা রকম হয় যাহার ফলে বেশান্ত সভানেত্রী হইলেন বটে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ অভ্যর্থনা সভার সভাপতি পদ অগ্রতম নরমপন্থী নামক বৈকুণ্ঠনাথ সেনকে ছাড়িয়া দিলেন।

এ পর্যন্ত বেশান্তের কর্মধারা ভারতের মুক্তি আন্দোলনের সহিত এক ছিল, কিন্তু রাউলাট আইন ও জালিনওয়ালাবাগ হত্যার পর ভারতের রাষ্ট্রিক আন্দোলনের যে নবরূপান্তর মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ঘটে এই ইংরেজ-রমণী তাহার সহিত যুক্ত থাকিতে পারিলেন না। এই দিন হইতে বেশান্তের রাষ্ট্রিক ক্ষেত্র হইতে প্রত্যাহার করিতে থাকে। ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দের ২০শে সেপ্টেম্বর ভারতবর্ষেই এই নারীর দেহাবলান ঘটে।

পূজার ছুটি

শারদীয়া পূজা উপলক্ষে প্রবাসী কার্যালয় ২রা কার্তিক (২০শে অক্টোবর) হইতে ১৫ই কার্তিক (২রা নবেম্বর) পর্যন্ত বন্ধ থাকিবে। এই সময়ে প্রাপ্ত চিঠিপত্র-টাকাকড়ি প্রভৃতি সম্বন্ধে ব্যবস্থা কার্যালয় খুলিবার পর করা হইবে।

বৈদিক আৰ্য ও অবৈদিক আৰ্য

শ্রীননীমাধব চৌধুরী

পূর্বের এক প্রবন্ধে (বৈদিক আৰ্য ও অবৈদিক আৰ্য, প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৩) বৈদিক ও অবৈদিক আৰ্যজাতি সম্বন্ধে মতবাদের উল্লেখ করা হইয়াছে। বর্তমান প্রবন্ধে এই মতবাদের বিস্তারিত আলোচনা করিয়া আৰ্যজাতি সম্বন্ধে আলোচনা শেষ করা হইবে।

বৈদিক ও অবৈদিক আৰ্যজাতি সম্বন্ধে মতবাদকে নৃতত্ত্ববৈজ্ঞানিক মতবাদ আখ্যা দেওয়া যায়। এই মতবাদের জন্মবৃত্তান্ত সংক্ষেপে বর্ণনা করা প্রয়োজন।

শ্রর হারবার্ট রিজলের *People of India* প্রকাশিত হইলে এদেশে প্রতিবাদের একটা ঝড় উঠে। এই বিতর্ক এখন পুরাতন হইয়া গিয়াছে। রিজলে সাহেব নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞানের স্বত্বমতে মাপজোখ করিয়া এ দেশের অধিবাসীদের মধ্যে দুই শ্রেণীর লম্বা মুণ্ড ও দুই শ্রেণী গোল মুণ্ড টাইপ আবিষ্কার করেন। লম্বামুণ্ড টাইপের একটি আৰ্য ও অপরটি দ্রাবিড়, গোল মুণ্ডের একটি মোঙ্গলীয়ান ও অপরটি সিথিয়ান (Soythian)। মাপজোখ করিয়া যে সকল সংখ্যা তিনি পান তাহা বিশ্লেষণ করিয়া তিনি বলিয়া দিয়াছেন, কোন্ অঞ্চলে কোন্ টাইপের প্রাধান্য ও কোন্ অঞ্চলে বিভিন্ন টাইপের সংমিশ্রণ হইয়াছে। উত্তর ভারতের পঞ্জাব অঞ্চলে ইন্দো-এরিয়ান বা আৰ্য টাইপের প্রাধান্য। ইহা বাদে দেশের প্রায় সর্বত্র প্রাচীন অধিবাসী ছিল দ্রাবিড় জাতি। দ্রাবিড় জাতির সহিত কোথাও গোল মুণ্ড সিথিয়ান, কোথাও গোল মুণ্ড মোঙ্গলীয় সংমিশ্রণ হইয়াছে। কয়েকটি অঞ্চলে দ্রাবিড় ও সিথিয়ানের সহিত আৰ্য টাইপের সংমিশ্রণের কথা তিনি বলিয়াছেন। বাঙালী মোঙ্গলীয় গোষ্ঠীর প্রতিবেশী। কাজেই তাঁহার মতে দ্রাবিড় টাইপের সহিত মোঙ্গলীয় টাইপের সংমিশ্রণে বাঙালী টাইপের উৎপত্তি হইয়াছে।

আৰ্যকৃষ্টির উত্তরাধিকারী দলের মধ্যে পরিগণিত এবং আৰ্যভাষাভাষী বাঙালী হিন্দু স্বভাবতঃই রিজলে সাহেবের এই সিদ্ধান্তে আপনাকে অপমানিত জ্ঞান করিল। প্রতিবাদ অনেক হইল। কিন্তু নৃতত্ত্ববিজ্ঞানের স্বত্বমতে মাপজোখের ফলে যে গোল মুণ্ডের প্রাধান্য বাঙালীদের মধ্যে নির্ণিত হইয়াছে তাহা শুধু উচ্চাঙ্গের তোড়ে উড়াইয়া দিবার নহে। তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত বলিয়া প্রচারিত সিদ্ধান্তের প্রভাব শিক্ষিত মনের উপর বেশী হইয়া থাকে। এজ্ঞা দেখা যায় যে রিজলে সাহেবের গবেষণার ফলে বাঙালীর আৰ্যত্ব উড়িয়া গেলে একদল ক্ষুব্ধ হইয়া

আপত্তি তুলিলেন কিন্তু আর এক দল বাঙালীর মধ্যে এই মোঙ্গল-দ্রাবিড় সংমিশ্রণের খিওরী মানিয়া লইয়া বাঙালীর জাতীয় বৈশিষ্ট্যের ধূয়া তুলিয়া তাহাতেই আত্মপ্রসাদ লাভের ব্যবস্থা করিয়া লইলেন।

যাহারা ক্ষুব্ধ হইলেন তাহারা প্রতিকারের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। প্রতিকারের উপায় চোখের সম্মুখে ছিল কিন্তু দেশে নৃতত্ত্ববিজ্ঞানের আলোচনার তখনও বিশেষ প্রচার হয় নাই। প্রতিকারের উপায় হইল বাঙালীর মধ্যে এই গোল মুণ্ডের উৎপত্তির অল্প প্রকার ব্যাখ্যা।

রিজলে সাহেবের সিদ্ধান্তের কয়েকটি বাহিরের ত্রুটির উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রথমতঃ, ভাষাবিজ্ঞানের এ সম্পর্কে যাহা বক্তব্য আছে তাহা তিনি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়াছেন। তারপর পঞ্জাবের লম্বামুণ্ড টাইপকে আৰ্য টাইপ বলিয়া ঘোষণা করিবার মূলে রহিয়াছে যুরোপীয় আৰ্যবাদের প্রবল প্রভাব। আৰ্যজাতি যে লম্বামুণ্ড গোষ্ঠী ইহা যুরোপীয় আৰ্যবাদের স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্ত, যদিও যাহারা বাস্তবিক আপনাদিগকে আৰ্য বলিত তাহাদের মাথার মুাপ লওয়া কোন নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীর পক্ষে এখন আর সম্ভব নহে। তারপর, যে সিথিয়ান টাইপের উল্লেখ তিনি করিয়াছেন সে টাইপটি আসলে কি তাহা অজ্ঞাত, কারণ সিথিয়ান কথাটির মত অনির্দিষ্ট, অস্পষ্ট ও যথেষ্ট ব্যবহারে জর্জরিত জাতীয় সংজ্ঞাবাচক পদ প্রাচীন ইতিহাসে আর বিতীয়াটি আছে কিনা সন্দেহ।

সে যাহা হউক, পূর্ব-ভারতের মত পশ্চিম-ভারতেও গোলমুণ্ড টাইপের প্রাধান্য দেখা যায়। রিজলে সাহেবের মতে এই অঞ্চলে দ্রাবিড়গোষ্ঠীর সহিত সিথিয়ানগোষ্ঠীর সংমিশ্রণের ফলে এই গোলমুণ্ডের প্রাধান্য আসিয়াছে।

তাহা হইলে দাঁড়াইতেছে পঞ্জাবে ও আরও উত্তরে আৰ্য, যুক্তপ্রদেশে আৰ্য ও দ্রাবিড় সংমিশ্রণ, পূর্ব-ভারতে দ্রাবিড়ের সহিত মোঙ্গলীয় সংমিশ্রণ, পশ্চিম-ভারতে দ্রাবিড়ের সহিত সিথিয়ান সংমিশ্রণ হইয়াছে ও দক্ষিণ ভারতে দ্রাবিড় টাইপের প্রাধান্য। যে বৈদিক ও অবৈদিক আৰ্যজাতি সম্বন্ধে মতবাদের কথা বলা হইবে তাহা প্রধানতঃ পূর্ব ও পশ্চিম ভারতের অধিবাসীদিগের মধ্যে গোলমুণ্ড টাইপের উৎপত্তির একটি নূতন নৃতত্ত্ববৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা।

রিজলের সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হইবার পর যে প্রতিবাদের কলরব উখিত হইল তাহা বৈজ্ঞানিক রূপ পাইল প্রায় দশ বৎসর পরে রমাপ্রসাদ চন্দ্রের হাতে। তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থে

(Indo-Aryan Races, 1916) তিনি এই মত ব্যক্ত করিলেন যে পূর্ব ও পশ্চিম ভারতে গোলমুণ্ড টাইপের (brachycephaly) উৎপত্তি মোঙ্গলীয় ও সিথিয়ান সংমিশ্রণ হইতে হয় নাই। হিন্দুকুশ পর্বতের উত্তর পার্শ্বের উপত্যকাসমূহে বর্তমানকালে গোলমুণ্ড আর্ঘ-ভাষাভাষী জাতি দেখা যায়। পার্শ্বের পূর্বে তারিম অববাহিকায় ও আরও পূর্বে লপ মরুভূমির বালুকাভূমির নিয়ে এক কালে সমুদ্রকিনারী মল্লয়া-বসতির যে সকল ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা আর্ঘ গোষ্ঠীর জাতির কীর্তি বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। এই আর্ঘ গোষ্ঠী গোলমুণ্ড (Alpine)। পূর্ব-ভারতীয় ও পশ্চিম ভারতীয় গোলমুণ্ড টাইপ এই আলপাইন টাইপ, ইহা সিথিয়ান নহে, মোঙ্গলীয়ও নহে। এই আলপাইন জাতি হইতেছে অবৈদিক আর্ঘ জাতি।

ইতিহাস সাফ্য দেয় অতি প্রাচীনকাল হইতে বিভিন্ন জাতি নানা অঞ্চল হইতে হিন্দুকুশ অতিক্রম করিয়া ভারত-বর্ষে প্রবেশ করিয়াছে। বৈদিক আর্ঘজাতির সহিত ভাষা ও কৃষ্টির সম্বন্ধের দিক দিয়া এবং নৃতত্ত্ববিজ্ঞানের সূত্রের দিক দিয়া পূর্ব ও পশ্চিম ভারতীয় গোলমুণ্ড টাইপের উৎপত্তি সম্বন্ধে চন্দের এই ব্যাখ্যা একরূপ সন্তোষজনক যে নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞানীসমাজে উহা সম্পূর্ণরূপে গ্রাহ্য হইয়াছে।

রমাপ্রসাদ চন্দের প্রচারিত এবং প্রসিদ্ধ বৈদেশিক নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীদিগের দ্বারা গৃহীত এই মতবাদ অল্পসারে ভারতবর্ষে দুই টাইপের বা শ্রেণীর আর্ঘজাতি রহিয়াছে, এক শ্রেণী লম্বামুণ্ড ও অপর শ্রেণী গোলমুণ্ড। গোষ্ঠীলক্ষণ বা ethnic stock হিসাবে এবং অত্যাশ্চর্য বিষয়ে পার্থক্য থাকিলেও এই দুই টাইপের জাতিকে আর্ঘ বলিয়া বর্ণনা করিবার হেতু কি পরে দেখা যাইবে। এখানে এই মাত্র বলিয়া রাখা যাইতে পারে যে চন্দের বক্তব্য হইতে দেখা যায় যে গোলমুণ্ড জাতিকে তিনি round-headed invaders of Aryan speech বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

যে ভাবে চন্দ্র স্বীয় মতবাদ প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহা হইতে ঠাহারা তাহার পরবর্তী রচনার সঙ্গে বিশেষ পরিচিত নহেন তাহাদের সন্দেহ হইতে পারে যে তাহার পূর্ব ও পশ্চিম ভারতে alpine brachycephalyর মতবাদ সর-জর্জ গ্রীয়ারসনের ভাষা সম্বন্ধে মতবাদের নৃতত্ত্ববৈজ্ঞানিক ভাষ্য মাত্র। চন্দ্র গ্রীয়ারসনের ভাষাতাত্ত্বিক মতবাদের কাঠামোকে নিজে কাজে লাগাইয়াছেন ইহা সত্য, কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক অংশের যে ব্যাখ্যা তিনি দিয়াছেন তাহা মৌলিক। এখন যে মতবাদ বৈজ্ঞানিক সমাজে সাগ্রহে গৃহীত হইয়াছে সংক্ষেপে তাহার পটভূমির কিছু পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন।

চন্দ্র-শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে মধ্যদেশ ও তাহার চারিদিকের প্রতিবেশী অঞ্চলগুলির মধ্যে জাতিগত ও ভাষাগত পার্থক্য এবং সমাজ-ব্যবস্থার পার্থক্য অতি প্রাচীনকাল হইতে বর্তমান। এই পার্থক্য তাহার মতবাদের ভিত্তি। প্রকৃত অবস্থা কি দেখা যাউক।

মল্পুর মতে উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বিন্ধ্যগিরি ও এই উভয় পর্বতের মধ্যস্থানে বিনশন দেশের পূর্বে ও প্রয়াগের পশ্চিমে যে অঞ্চল তাহাকে মধ্যদেশ বলে। (মল্প ২।২১)। বিনশন দেশ বলিতে যে অঞ্চলে সরস্বতী নদী অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে তাহা বুঝায়। সরস্বতী অঞ্চলার নিকটে সিরমুর রাজ্য হইতে বহির্গত হইয়া পাতিয়ালা রাজ্যে ঘাঘরের সহিত মিলিত হইয়াছে। এখানে সরস্বতীর অন্তর্ধানের অর্থ সম্ভবতঃ ঘাঘরের সহিত মিলন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের মতে (৮।১৪) মধ্যদেশের অর্থ কুরুপঞ্চাল দেশ। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, সমাজ-সংগঠন ইত্যাদি এই কুরুপঞ্চাল দেশে সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় এবং এই কেন্দ্র হইতে ব্রাহ্মণ্য কৃষ্টি পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণে প্রসারিত হয় পণ্ডিতগণ এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। প্রধান ব্রাহ্মণগুলি কুরুপঞ্চাল দেশে রচিত হইয়াছিল। এই দেশের ভাষা, যজ্ঞানুষ্ঠান বিধি, আচার প্রভৃতির উচ্চ প্রশংসা, এই দেশের ব্রাহ্মণদিগের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থাদিতে অনেক স্থানে বিবোধিত হইয়াছে। শতপথ ব্রাহ্মণের মতে বিদেহ রাজসভার প্রসিদ্ধ ঋষি যজ্ঞ-বল্ক্য পঞ্চাল দেশের বিখ্যাত পণ্ডিত উদালক আকুণির শিষ্য।

ব্রাহ্মণ্য কৃষ্টির এই কেন্দ্রের পণ্ডিতগণের কেহ কেহ প্রাচ্য, পাশ্চাত্য ও উদীয় সকল দেশের সম্বন্ধে উপেক্ষার ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে প্রাচ্য দেশের প্রতি উপেক্ষাটা বেশী প্রকট। প্রাচ্য দেশ বলিতে পরবর্তী কালে কাশী, কোশল, বিদেহ ও সম্ভবতঃ মগধ বুঝাইত। কিন্তু প্রাচীনতম ব্রাহ্মণগুলিতে বৈদিক কৃষ্টির কেন্দ্র ছিল উদীয় বা সিন্ধু উপত্যকা। কুরুপঞ্চাল বা মধ্যদেশ তখন ছিল প্রাচ্য। তারপর বৈদিক কৃষ্টির কেন্দ্র কুরুপঞ্চাল দেশে সরিয়া আসিলে পূর্ব-ভারতীয় অঞ্চলগুলি প্রাচ্য দেশ বলিয়া পরিগণিত হইল। একদিকে কুরুপঞ্চাল ও অত্মদিকে কাশী, কোশল, বিদেহ ও মগধ—এই দুই অঞ্চলের মধ্যে রাজ-নৈতিক ও কৃষ্টিগত বিরোধের ইঙ্গিত করা হইয়াছে কিন্তু রাজনৈতিক বিরোধের স্পষ্ট উল্লেখ বিশেষ পাওয়া যায় না। কাশীর রাজা ধৃতরাষ্ট্র ভরতবংশীয় রাজা শতানীক সাত্রাজ্যিতের হস্তে পরাজিত হইলে কাশ্যগণ শতপথ ব্রাহ্মণের সময় পর্যন্ত পবিত্র অগ্নির প্রজ্জলন বন্ধ রাখিয়াছিলেন এইরূপ একটা কিম্বদন্তীর উল্লেখ পাওয়া যায়। সে যাহা হউক,

রাজনৈতিক বিরোধকে, অল্প প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাবে, জাতিগত পার্থক্যের ফল বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।

প্রাচীন ভারত ও পুরু গোষ্ঠী মিলিয়া পরবর্তীকালে কুরু গোষ্ঠীর উৎপত্তি হয়। পাঞ্চাল জাতির উৎপত্তি প্রাচীন কুবি, তুর্বশ, স্ত্রজয়, কেশিন ও সোমক গোষ্ঠীর সমবায়। ঋগ্বেদীয় বৈকর্ণ গোষ্ঠী কুবি ও কুরুদিগকে লইয়া গঠিত ছিল এইরূপ বলা হইয়াছে। ইহারা ব্যতীত ময়, উশীনর, চেদি, মৎস্য প্রভৃতি গোষ্ঠীকে মধ্যদেশের মধ্যে কেহ কেহ ধরেন। কেকয়গণ গান্ধারে বাস করিতেন। প্রাচ্যদেশের গোষ্ঠীগুলি যে কুরুপাঞ্চাল গোষ্ঠী হইতে ভিন্ন জাতীয় ছিলেন তাহার কোন উল্লেখ দেখা যায় না। ম্যাকডোনেলের মত এই যে কুরুপাঞ্চালের লোক প্রাচ্যদেশগুলিতে অগ্রসর হইয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। ডাঃ হেমচন্দ্র বায় চৌধুরীর মতে জনমেজয়ের অধস্তন কুরু-রাজাদিগের আমলে কুরুরাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়িতে থাকে এবং কুরুপাঞ্চাল গোষ্ঠীর বহু সাধারণ লোক ও রাজ-বংশীয়গণ প্রাচ্যদেশে বসতি স্থাপন করে। এই সময়ে কুরু বা ভারত বংশের রাজধানী কৌশাঘাটে স্থানান্তরিত হয়। কুরুরাজবংশের পতনের পরে বিদেহ রাজবংশের অভ্যুদয় হয়। বিদেহের রাজা জনকের বংশীয়গণের হাত হইতে রাজস্বক্তি লিচ্ছবীদিগের হাতে চলিয়া যায়। কান্ধী, কোশল ও মগধের অভ্যুদয় ইহার পরের ইতিহাস।

শতপথ ব্রাহ্মণের আমলে ব্রাহ্মণ্য কুষ্টির কেন্দ্র কুরু-পাঞ্চাল দেশ হইলেও দেখা যায় যে প্রাচ্য দেশ তখন এই কেন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। বিদেহের (বিদেহের প্রাচীন রূপ) রাজা ও তাহার পুরোহিত গোতম রাহগণের সঙ্গে অগ্নি-বৈশ্বানরের সরস্বতী নদীর অঞ্চল হইতে পূর্বদিকে আগমন ও সদানীর (গণ্ডক) নদীর তীরে আসিয়া অবস্থিতির যে পুরাণ শতপথে বর্ণিত হইয়াছে তাহাকে প্রাচ্যদেশে আর্থকৃষ্টি প্রচারের ইতিহাস বলিয়া পণ্ডিতগণ গ্রহণ করিয়াছেন। সদানীর বিদেহ ও কোশলের সীমানা বলিয়া পরিচিত ছিল। শতপথের আমলে ব্রাহ্মণ্যকৃষ্টি সদানীর অপর তীরবর্তী অঞ্চলে প্রসারিত হইয়াছিল এইরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়।

কিন্তু দেখা যায় যে অপেক্ষাকৃত আধুনিক শতপথেও প্রাচ্যদেশেব মৃত দেহ সংকার করিবার প্রথার নিন্দা করা হইয়াছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৮।১৪) দেখা যায় পশ্চিম দেশীয় রাজাদিগকে নীচ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রাচ্যদেশের মধ্যে মগধের প্রতি উপেক্ষার ভাব বেশী প্রকাশ পাইয়াছি বলা হইয়াছে। ম্যাকডোনেলের মতে বাজসনয়ী সংহিতায় পর্যন্ত এই উপেক্ষার পরিচয় পাওয়া যায় এবং কয়েকটি শ্রোত সূত্রে বিদেহের ভাব প্রকট হইয়াছে।

অথর্ববেদের অঙ্গ ও মগধ এবং বিভিন্ন শ্রোত সূত্রে ব্রাহ্মণ্যোমের বর্ণনায় মগধের অধিবাসীর উল্লেখ উপেক্ষা ও ঘৃণার পরিচায়ক। একটি কৌতুকজনক ব্যাপার এই যে অর্বাচীন ও অখ্যাত পুরাণকার পর্যন্ত প্রাচীন যুগের মধ্যদেশ বাসীর অন্ত্য অঞ্চলের প্রতি এই অবজ্ঞার ভাব অল্পকরণ করিয়াছে :

অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গাশ্চ সৌরাষ্ট্রং গুজরং তথা

আভীরং কোঙ্কণৈকৈব দ্রাবিড়ং দক্ষিণাপথম্

অজ্ঞাশ্চ মাগধশ্চৈব দেশনেনোতাশ্চ বর্জয়েৎ।

কেন এই সকল অঞ্চল বর্জন করিতে হইবে তাহার উল্লেখ নাই।

প্রাচ্যদেশ, বিশেষ করিয়া মগধের প্রতি মধ্যদেশবাসীর অবজ্ঞা ও বিরূপতার কারণ নানারূপে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। রাজনৈতিক কারণের উল্লেখ উপরে করা হইয়াছে। একটি ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে যে এই অবজ্ঞার কারণ মগধের লোকের আচার অনুষ্ঠানে নিষ্ঠার অভাব। ওলডেনবার্গের মতে মগধের অধিবাসী কোন কালে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম পুরাপুরি গ্রহণ করে নাই। ম্যাকডোনেল ও কীথের মতে

"It is probable that the East was less Aryan than the West, and that it was less completely reduced under Brahmanical supremacy."

এখানে "less Aryan" সম্ভবতঃ জাতিবাচক অর্থে ব্যবহার করা হইয়াছে। ওয়েবার মগধ সম্বন্ধে এইরূপ মত পোষণ করিতেন। তিনি বলেন যে মগধে আদিবাসীর প্রাধান্য ছিল। পার্জিটরের মতে মগধে আর্থগণ সমুদ্রপথে আগত এক দল ভিন্ন জাতির আক্রমণকারীর সম্মুখীন হইয়াছিল। ম্যাকডোনেল অতীত যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে। এই মতানুসারে কুরুপাঞ্চাল জাতির লোক প্রাচ্য প্রদেশগুলিতে অগ্রসর হইয়া বসতি স্থাপন করে কিন্তু দূরত্বের জ্ঞতা এবং আদিবাসীদিগকে সম্পূর্ণ বশীভূত করিতে অসমর্থ হওয়াতে তাহারা আপনাদিগের প্রাচীন ব্রাহ্মণ্যকৃষ্টি হারাইয়া ফেলিয়াছিল।

তাহা হইলে মোটামুটি এ সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মত এই দাঁড়াইতেছে যে আর্থজাতি প্রাচ্যদেশগুলিতে বসতি স্থাপন করিয়াছিল কিন্তু নানা কারণে ব্রাহ্মণ্যকৃষ্টির কেন্দ্র কর্তৃক তাহারা ব্রাত্য বা পতিত বলিয়া গণ্য হয়। ম্যাকডোনেল ও কীথের ভাষায় একটি ইঙ্গিত এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন।

"That the Kosala-Videhas were originally settlers of an older date than the Kuru-Pancalas is reasonably obvious from their geographical position."

অতঃ,

"The geographical position of the Kuru-Pancalas renders it probable that they were later immigrants into India than the Kosala-Videhas or the Kasis, who

must have been pushed into their most eastward territories by a new wave of Aryan immigration."

এই ইঙ্গিতের উল্লেখ পরে আবার করা হইবে।

এইবার রমাশ্রমাদ চন্দ্রের মতবাদের আলোচনায় ফিরিয়া আসা যাউক। প্রাচীন সাহিত্যে প্রাচ্যদেশবাসীর প্রতি মধ্যদেশীয়দিগের অবজ্ঞার উল্লেখ, গ্রীষ্মারসনের ভাষা ভাষিক গবেষণার ফলে Midland ও Outer Band এই দুই অংশে ভারতীয় আৰ্যভাষা অঞ্চলগুলির বিভাগ ও রিজলের আবিষ্কৃত পূর্ব ও পশ্চিম ভারতে গোলমুণ্ড গোষ্ঠীর প্রাধান্য এইগুলি মিলাইয়া চন্দ্রের মতবাদ গঠিত হইয়াছে।

নিজের মতবাদের ভিত্তি পত্তন করিতে গিয়া চন্দ্র বলিতেছেন,

"Not only social institutions and language but an important physical feature also, the shape of the skull, lends support to the testimony of the Sruti, Smriti and Purana that the Indo-Aryans of the outer countries originally came of an ethnic stock that was different from the stock from which the Vedic Aryans originated."

এখানে বৈদিক আৰ্য বলিতে তিনি সম্ভবতঃ মধ্যদেশবাসী কুরুপাঞ্চাল জাতির কথা বলিতেছেন। কিন্তু শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণের সাক্ষ্য হইতে এই পৃথক জাতীয়তার মত যে বিশেষ সমর্থিত হয় না উপরে তাহা খানিকটা দেখা গিয়াছে, পরে আরও বিশদভাবে দেখা যাইবে। অতঃপর বৈদিক আৰ্যজাতির পরিবর্তে তিনি "হিন্দুস্থানী" কথাটি ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন,

"To account for the linguistic, social and physical difference between the Hindusthanis on the one hand and the Indo-Aryans of the outer countries on the other, we have to assume the immigration of round and medium-headed invaders of Aryan speech in the pre-historic period."

ভাষা, সমাজ-ব্যবস্থা ও দৈহিক লক্ষণের যে পার্থক্যের উল্লেখ করা হইতেছে তাহার সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই একটা কথা বলা দরকার। ভাষার পার্থক্য প্রাচীন সাহিত্যের সাক্ষ্যের দ্বারা বিশেষ প্রমাণিত হয় না, ইহা প্রমাণিত হয় পরবর্তী সাহিত্যের সাক্ষ্যে ও গ্রীষ্মারসনের ভাষার শ্রেণী বিভাগের দ্বারা। ভারতীয় ভাষাসমূহের শ্রেণী বিভাগের বিস্তারিত বর্ণনার মধ্যে না যাইয়া সংক্ষেপে বলা যায় যে ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে ব্যবহৃত আৰ্য ভাষা দুইটি প্রধান শাখায় ভাগ করা হইয়াছে। ইন্দো-এরিয়ান ও দর্দিক। দর্দিক শাখার খোয়ার, দরদ ও কাফিরী ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের চিত্রাল প্রভৃতি অঞ্চলে, কাশ্মীরে, গিলগিট এজেলী অঞ্চলে, কোহিস্থানে এবং হিন্দু-কুশের কাফির উপজাতির মধ্যে প্রচলিত। এই দরদ শাখার প্রাচীন নাম পিশাচ ভাষা। ইন্দো-এরিয়ান শাখার উপ-শাখাগুলির মূল সংস্কৃত, ইহাদের পরস্পরের সম্বন্ধের মধ্যে

বিভিন্ন স্তর আছে এইমাত্র বলা যায়। প্রাচীন সাহিত্যে কখন উদীচ্যের ভাষার বিস্তৃততার প্রশংসা, কখন মধ্যদেশের ভাষার প্রশংসা দেখা যায়। প্রাচ্য দেশাদির ভাষা সম্বন্ধে যে অবজ্ঞার ভাব লক্ষ্য করা যায় তাহা ব্রাহ্মণ্যকৃষ্টির কেন্দ্রের পণ্ডিতগণের পক্ষে তেমন অমার্জনীয় নহে এবং তাহাকে ভাষার গুরুতর বা মৌলিক পার্থক্যের প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।

সমাজ-ব্যবস্থার দিক দিয়া ইহা স্বীকার্য যে চারি বর্ণের বিভাগ পূর্ব ও পশ্চিম ভারতে দুর্বল দেখা যায়। ইহাকে পৃথক জাতিত্বের প্রমাণ বলিয়া যাহারা মনে করেন তাঁহাদের দৃষ্টি প্রাচীন সাহিত্যে উল্লিখিত দুই একটি ঘটনার প্রতি আকৃষ্ট করা যাইতে পারে। বিশ্বামিত্রের বংশীয়গণ কি করিয়া পুলিন্দ, শবর, অঙ্গ, পুণ্ড্র ও মূতিবদিগের পূর্ব-পুরুষ হইতে পারেন তাহার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না, কিন্তু ঐতরেয় ব্রাহ্মণ হইতে আরম্ভ করিয়া অনেক গ্রন্থে এই কথা বলা হইয়াছে! যবন, শক, পারদ, পহুব, চীন দেশোদ্ভব ক্ষত্রিয়ের কথা মন্ত্র কি হিসাবে বলিতেছেন? তারপর একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে উপনিবিষ্ট আৰ্যজাতির একটি অংশের মধ্যে যে সমাজ-ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছিল বলিয়া মনে করা হয় অত্যাশ্চর্য অংশে সেই ব্যবস্থা পুরাপুরি গৃহীত হইয়া না থাকিলে উহা সেই সকল অংশের বিজাতীয়তা প্রমাণিত করে ইহা কি করিয়া মানিয়া লওয়া যায়? ভাষা ও সমাজ-ব্যবস্থার পার্থক্যের উপর চন্দ্র এত জোর দিয়াছেন কেন পরে দেখা যাইবে।

তারপর দৈহিক লক্ষণের পার্থক্য। স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, যে দৈহিক লক্ষণের পার্থক্যের কথা বলা হয় তাহা শুধু মস্তকের আকৃতিতে সীমাবদ্ধ, গাত্রবর্ণ, নাসিকার আকৃতি, কেশ, চক্ষু তারকার বর্ণ, দৈর্ঘ্য প্রভৃতি লক্ষণের পার্থক্যের কথা বলা হয় না। কিন্তু এখানেও দেখা যাইতেছে যে চন্দ্র স্বীকার করিতেছেন যে, গোলমুণ্ড আৰ্যজাতির মস্তকের আকৃতি নিষাদ, বৈদিক আৰ্য ও দ্রাবিড়গণের সংমিশ্রণে পরিবর্তিত হইয়াছে। "In India this type (অর্থাৎ আলপাইন টাইপ) has turned into mesaticepyalic Indo-Aryan of the outerland by Nisada, Vedic Aryan and Dravida admixture."

এখন চন্দ্রের গোল এবং মধ্যমাকৃতি মুণ্ডের আৰ্য-ভাষাভাষী আক্রমণকারীদের প্রসঙ্গে আসা যাউক।

এই গোলমুণ্ড আক্রমণকারীগণ বিভিন্নদলে ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। এ সম্বন্ধে চন্দ্রের বক্তব্য সংক্ষেপে এইরূপ: প্রথম দল গাজের উপত্যকায় প্রবেশ করে। অপর একটি দলের মধ্যে রাষ্ট্রিক বা রাট্টগণ ছিল। ইহাদের নাম হইতে মহারাষ্ট্র ও সৌরাষ্ট্র দেশের নাম আসিয়াছে। আর একটি

দলের মধ্যে ছিল পঞ্জাবের বাহীকগণ। সর্বশেষে আসে পিশাচ-পাশা-বাহী-কাশ্মীর, দরদিস্তান ও কাফিরিস্তানের অধিবাসী। এই গোলকুণ্ড আক্রমণকারীরা সিদ্ধ উপত্যকার বৈদিক কৃষ্টি প্রায় ধ্বংস করিয়া দেয়। পরবর্তী একখানি গ্রন্থে (*Indus valley in the Vedic Period*) চন্দ্র সূত্র সাহিত্য হইতে কতকগুলি বচন উদ্ধৃত করিয়া এই আক্রমণকারীদিগের তালিকা আরও সম্পূর্ণ করিতে চাহিয়াছেন। বোধায়ন শ্রোত সূত্রে (১৮।১০) অরট্ট, গান্ধার, সৌবীর, কারস্কার, কলিঙ্গের নাম আছে। চন্দ্রের ব্যাখ্যা মতে ইহারাই alien immigrants, যাহাদের আক্রমণে উদীচ্যের বৈদিক কৃষ্টি বিনষ্ট হয় এবং মধ্যদেশ ব্রাহ্মণ্য কৃষ্টির কেন্দ্র হইয়া দাঁড়ায়। বোধায়ন ধর্ম সূত্রে (১, ১, ৩২-৩৩) বলা হইতেছে যে অনর্ভ, অঙ্গ, মগধ, সৌরাষ্ট্র, দক্ষিণ উপবৃত্ত, সিদ্ধ ও সৌবীরগণ মিশ্র জাতি। যাহারা অরট্ট, কারস্কার, পুণ্ড্র, সৌবীর, বঙ্গ, কলিঙ্গ ইত্যাদি দেশে গমন করে তাহা-দিগকে সর্বপৃষ্টি যাগ করিতে হইবে।

প্রথম আক্রমণকারী দলের যে সকল জাতি গান্ধেয় উপত্যকায় প্রবেশ করে তাহাদের নাম চন্দ্র উল্লেখ করেন নাই। সম্ভবতঃ ইহারাই অঙ্গ, বঙ্গ, মগধ, কলিঙ্গ প্রভৃতি পূর্ব দেশীয় জাতি। সংস্কৃত সাহিত্যে ইহাদের সহিত গান্ধারের একত্র উল্লেখ দেখা যায় এই হেতুতে তাহারা মতে গান্ধারগণ ও ইহার। সম্ভবতঃ এক গোষ্ঠীয় ("of the same stock")। অথর্ব বেদে (৫।২২) গান্ধারের সঙ্গে মগধ, কলিঙ্গ, বাহ্লীক, মহাবৃষ ও মুজবৎদিগের উল্লেখ দেখা যায়। দ্বিতীয় দলের মধ্যে চন্দ্র শুধু রাষ্ট্রিকগণের নাম করিয়াছেন। আশোকের শিলালিপিতে (Asoka Edicts V and XIII) রাষ্ট্রিকগণের সঙ্গে ভোজ, অঙ্গ, ও পুলিন্দগণের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৭।১৮) আবার অঙ্গ ও পুলিন্দের সঙ্গে পুণ্ড্র, শবর ও মুতিবদিগের উল্লেখ দেখা যায়। মার্কণ্ডেয় পুরাণে পুলিন্দদিগের সঙ্গে পুণ্ড্রক, কেরল, কলিঙ্গ, অঙ্গ, আভীর, বিদর্ভ ও কুন্তল প্রভৃতির একত্র উল্লেখ দেখা যায়। বিষ্ণু পুরাণ পুলিন্দদিগের সঙ্গে এক দিকে ভোজ, দশার্ণ, মেকল, উৎকল ও অত্র দিকে সিদ্ধ ও করুণের একত্র উল্লেখ করা হইয়াছে। ভোজগণ বিদর্ভে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং সামন্ততগণ তাহাদের অধীন ছিল। সামন্ত, বৃষ্ণি ও অঙ্গকগণ এক জাতির শাখা। বৃষ্ণিগণের উল্লেখ ঋগ্বেদে পাওয়া যায়। মৎস্য পুরাণের মতে ভোজগণের সঙ্গে হৈহয়গণের সম্বন্ধ ছিল। মহাভারতের মতে (১।৮৫) ভোজগণ (বৈভোজ) ঋগ্বেদীয় ক্রতু গোষ্ঠী হইতে উদ্ভূত। ক্রতু যযাতির পুত্র। অপর তিন পুত্র যত্ন, অল্প ও পুরু হইতে যবন জাতি, স্নেহ জাতি ও পৌরব বংশের উৎপত্তি হইয়াছে। বোধায়ন সূত্রের অরট্টদেশের কথা

উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে। মহাভারতে অরট্ট, জর্তিক, বাহীক প্রভৃতির এক সঙ্গে উল্লেখ করা হইয়াছে। বাহীকদিগের একটি নাম জর্তিক। ইহাদিগের প্রধান নগর শাকল। মহাভারতে বাহীকদিগের বিশেষ করিয়া বাহীক জ্ঞাদিগের বর্ণনা যোবতর বস্ত্রতান্ত্রিক। বাহীকগণ গোড়ী সুরা, লম্বনের সহিত ভূষ্ট যব, অপুপ ও গোমাংস ভক্ষণ করিত। (৮।৪৪।১১) বাহীক কামিনী-গণ মত্ত, বিবস্ত্র ও মালাচন্দন রহিত হইয়া নগরের গৃহপ্রাচীর সমীপে নৃত্য এবং গর্দভ ও উষ্ট্রের ত্রায় চীৎকার করিয়া অশ্লীল সঙ্গীত করিয়া থাকে। বাহীকদিগের বর্ণনা, ব্রাত্যানাং দাসমীমানাং বাহীকানামযজ্ঞানাম্। দেখা যাইতেছে বাহীকদিগকে ব্রাত্য, দাস ও অযজ্ঞান বা যজ্ঞহীন বলা হইতেছে। ঋগ্বেদের আলোচনার কালে অযজ্ঞান কথাটির সহিত বিশেষ পরিচয় হইয়াছে। বাহীকদিগের সঙ্গে কারস্কার, মাহিবক, কলিঙ্গ, কেরল, কর্কোটকদিগকে ধর্ম-বর্জিত বলা হইয়াছে। বাহীকদিগের মত কুৎসিত আচার প্রস্থল, মজ্র, গান্ধার, খশ, বগাতি, সিদ্ধ ও সৌবীর দেশেও প্রচলিত।

বাহীকদিগের সম্বন্ধে একটা বড় সংবাদ মহাভারতে দেওয়া হইয়াছে। অরট্টদিগের পুত্রেরা ধনাধিকারী না হইয়া ভাগিনেয়রা ধনাধিকারী হয় (ভাগহরা ভাগিনেয়া ন সুনবঃ)। বাহীক, মজ্র ও পাক্ষদদিগের তুলনায় কুরু, পঞ্চাল, খাষ, মৎস্য, নৈমিষ, কোশল, কাশী, পৌণ্ড্র, কলিঙ্গ, মগধ ও চেদি প্রভৃতি দেশের অসাধু ব্যক্তিরাও ধর্মজ্ঞ হইয়া থাকে এইরূপ বলা হইতেছে। পাণিনি বাহীক সম্ভব (republic) সঙ্গে মালব্য ও ক্ষৌদ্রকদিগের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার। গ্রীক ঐতিহাসিকদিগের Malloi ও Oxydrakoi; শতপথ ব্রাহ্মণে বাহীকদিগের উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে যে তাহারা অগ্নিকে ভব নামে উপাসনা করিত এবং প্রাচ্যদেশে সর্ব নামে অগ্নি উপাসিত হইতেন। মহাভারতের কয়েকটি তালিকায় বাহ্লীক জাতির উল্লেখ দেখা যায়। কেহ কেহ এই বাহ্লীক ও বাহীক অভিন্ন মনে করেন। বাহ্লীকদিগের সঙ্গে কোন কোন তালিকায় কাশ্মীর, সিদ্ধ সৌবীর, গান্ধার, দর্শক, উলুত, অভীসার ও শৈবল দেশীয়দিগের উল্লেখ দেখা যায়। দ্রোণপর্বে কাশ্মীরকগণের সঙ্গে মুগল, কাষোজ, দরদ, ত্রিগর্ত, মালব প্রভৃতি দেশ এবং খশ, শক ও যবনগণের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই তালিকায় পিশাচ বলিয়া একটি জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়। বিষ্ণুপুরাণে দরদদিগকে আভীর ও কাশ্মীরকের সঙ্গে একত্র উল্লেখ করা হইয়াছে।

P 36148

এই বিবরণ আর না বাড়াইয়া বলা যায় যে দক্ষিণ

ভারতীয় বৌদ্ধায়ন মতের ধর্ম ও শ্রৌত সূত্রের যে ধরণের প্রমাণকে দুইটি পৃথক গোষ্ঠীর আর্ষজাতির ভারতবর্ষ আক্রমণের মতবাদ প্রতিষ্ঠার অতীতম সূত্ররূপে রমাশ্রমাদ চন্দ্র গ্রহণ করিয়াছেন সেই প্রমাণের মূল্য খুব বেশী নহে। বৌদ্ধায়ন সূত্রসমূহ যখন রচিত হয় সম্ভবতঃ সেই সময়ে উত্তর ভারতের রাজনৈতিক কর্মক্ষেত্র মগধে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ্যকৃষ্টির কেন্দ্রগুলি একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলে আবদ্ধ না থাকিয়া অতি প্রাচীনকাল হইতে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়াইয়া ছিল। এইরূপ না হইলে ১০০০ বৎসর দেশের প্রধান রাজশক্তি অভ্যন্তরীণ ধর্মাবলম্বীদিগের হস্তগত থাকিবার পথে দেশের প্রাচীন ধর্ম ও কৃষ্টির ধারা প্রাণবন্ত থাকিত না।

ব্রাহ্মণ্য কৃষ্টির কেন্দ্রসমূহ বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও প্রাচীন ঐতিহ্যের শাসনরক্ষকগণ আচার অনুষ্ঠানে নিষ্ঠার উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেন এবং সকল রকম ব্যতিক্রমকে স্বেচ্ছাচার বলিয়া আক্রমণ করিতেন। উপরে একত্র উল্লিখিত বিভিন্ন জাতির তালিকায় যে গরমিল চোখে পড়িবে সম্ভবতঃ তাহার কারণ এইরূপ। এই ধরণের আক্রমণ ও নিন্দাকে বৈজ্ঞানিক হিসাবে race বলিতে যাহা বুঝায় তাহার পার্থক্যসূচক প্রমাণরূপে ব্যবহার করিলে ভুল করা হইবে কিনা তাহা বিচার্য।

সে যাহা হউক, দেখা যাইতেছে যে গান্ধ্য উপত্যকার অধিবাসী, পঞ্জাবের বাহীকগণ ও পিশাচ ভাষাভাষী দরদগণ আক্রমণকারী দলসমূহের মধ্যে ছিল এইরূপ চন্দ্রের মত। ইহার সাক্ষ্যেই গোলমুণ্ড, আর্ষভাষাভাষী আক্রমণকারী। ইহাদের সহিত আর কোন্ কোন্ দল ছিল তাহা নির্ধারণ করিতে গিয়া “একত্র উল্লেখ”র যে সূত্র চন্দ্র ব্যবহার করিতেছেন সেই সূত্রানুসারে বিচার করিলে দেখা যায় যে ঠিক বাছিতে গাঁ উজাড় হইয়া যায়। মহাভারত ও রামায়ণের যুগে সিদ্ধনদের পশ্চিম ও পূর্বতীরবর্তী জাতিগুলি, পঞ্জাব হিমালয়ের বিভিন্ন জাতি, পশ্চিমের সিদ্ধসৌবীর প্রভৃতি জাতির তালিকা ও অগ্ন্যাত্ত অঞ্চলের জাতিসমূহের সহিত তাহাদের সম্বন্ধের ইতিহাস বিচার করিলে এ সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য সূত্র পাওয়া কঠিন। মধ্যদেশের শূরসেন গোষ্ঠীগণ পশ্চিম ভারতে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল ইহা প্রসিদ্ধ কিন্তু দেখা যায় যে বৃষ্ণি ও অন্ধকদিগকে মহাভারতে ব্রাত্য বলিয়া বর্ণনা করা হইতেছে।

এই বিচার ছাড়িয়া দেখা যাউক নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীদের মতে কোন্ পথে গোলমুণ্ড আর্ষ আক্রমণকারীগণ ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল। এই প্রশ্নে সন্দেহ রাখিতে হইবে যে গোলমুণ্ডের প্রাধান্য যে অঞ্চলে দেখা যায় সেই সকল অঞ্চলের

মধ্য দিয়া আক্রমণ ঘটিয়াছিল এইরূপ অনুমান করা হইয়াছে।

দেখা যায় যে পণ্ডিতগণের এক দলের মত এই যে গোলমুণ্ড গোষ্ঠীর জাতিগুলি, বেলুচীস্থান ও সিন্ধু হইতে কচ্ছ, গুজরাত, দক্ষিণ মারাঠা দেশের মধ্য দিয়া দক্ষিণ পশ্চিমে কুর্গ পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল। তারপর দক্ষিণের মালভূমির মধ্য দিয়া কৃষ্ণা ও গোদাবরী নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে পূর্ব উপকূল পর্যন্ত পৌঁছে। পূর্ব উপকূলের এই অঞ্চল হইতে তাহারা বঙ্গ ও বিহারে অগ্রসর হয়। চন্দ্রের মত এই যে ইহাদের প্রথম দল গান্ধ্য উপত্যকার উত্তর অংশ বৈদিক আর্ষগণের অধিকৃত দেখিয়া মধ্য ভারতের মালভূমি অতিক্রম করিয়া বিহারে উপস্থিত হয়। ডাঃ হার্টনের ব্যাখ্যা এই যে এই গোষ্ঠীর কয়েকটি দল পশ্চিম উপকূল বাহিয়া কুর্গ পর্যন্ত অগ্রসর হয়। অপর কয়েকটি দল অগ্রগ্রামী বৈদিক আর্ষদিগের চাপে গান্ধ্য উপত্যকা বাহিয়া বঙ্গদেশ পর্যন্ত অগ্রসর হয়। “Where the Bengali element seems very definitely intrusive, forming a wedge between Assam and Orissa.” এখানে লক্ষ্য করিতে হইবে অবৈদিক আর্ষগণ বৈদিক আর্ষগণের পূর্বে বা পরে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিল ইহা লইয়া মতবৈধ দেখা যাইতেছে। এ সম্বন্ধে পরে বলা হইতেছে। এই প্রশ্নে সন্দেহ রাখিতে হইবে যে নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীদের মত এই যে যাহাদিগকে গোলমুণ্ড ইন্দো-এরিয়ান জাতি নামে অভিহিত করা হইয়াছে তাহারা ছাড়াও তেলগু, কানাড়ী ও তামিল ভাষাভাষীদের মধ্যে বহুসংখ্যক গোল বা মধ্যমাকৃতি (round or medium-headed) মুণ্ডের লোক দেখিতে পাওয়া যায়।

উপরে উল্লিখিত অঞ্চলগুলির বর্তমান অধিবাসীদের মধ্যে কাহারো এই গোলমুণ্ড বা অবৈদিক আর্ষজাতির বংশধর কোন কোন নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী তাহাও বলিয়া দিয়াছেন। হার্টনের মতে প্রভু, মারাঠা, কুনবী, বিল্লাবা, কুমী, কাপু প্রভৃতি এই গোলমুণ্ড আর্ষদিগের বংশধর। হার্টনের আর একটি মত উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন কুনবী, কুমী কাপু প্রভৃতি কৃষিজীবী জাতি যাহারা গোলমুণ্ড আক্রমণকারীদিগের বংশধর তাহারা ইরানের প্রাচীন অধিবাসী তাজিক জাতির প্রতিনিধি। এখানে চন্দ্রের অবৈদিক আর্ষদিগকে তাজিকদিগের সহিত সম বা এক গোষ্ঠীয় বলিয়া মত প্রকাশ করা হইতেছে ইহা লক্ষ্য করিতে হইবে। চন্দ্র অবৈদিক আর্ষদিগকে প্রাচীন ইরানীদিগের সহিত সম্পর্কিত বলিয়া মনে করেন না।

অবৈদিক আর্ষগণের ভারত আক্রমণের সময় সম্বন্ধে

মতবাদের কথা বলা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে বলা যায় যে একা রমা প্রসাদ চন্দ্র ব্যতীত অন্যান্য নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী, যাহারা তাঁহার অবৈদিক, গোলমুণ্ড আৰ্যজাতির ভারতবর্ষ আক্রমণের মতবাদ গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা এই মত পোষণ করেন যে এই জাতি প্রথমে ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। তার পরে বৈদিক আৰ্যগণ ভারতবর্ষ আক্রমণ করে। হাটন প্রমুখ একদল পণ্ডিতের মতে এই গোলমুণ্ড আৰ্যভাষাভাষী জাতির আক্রমণে সিদ্ধ উপত্যকার তাম্র যুগের সভ্যতা ধ্বংস হয়, পরে বৈদিক আৰ্যজাতি ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। রমা প্রসাদ চন্দ্রের মত কতকটা এইরূপ যে সিদ্ধুসভ্যতা ধ্বংস হয় বৈদিক আৰ্যগণের আক্রমণে এবং উত্তর ভারতে বৈদিক কৃষ্টি বিনষ্ট হয় অবৈদিক আৰ্যগণের ক্রমাগত আক্রমণের ফলে। বর্তমান প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে আলোচনায় আর অধিক অগ্রসর না হইয়া এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে উপরের দুইটি মতের মধ্যে যে মতই গ্রাহ্য হউক ইহা বুঝা যাইতেছে যে আৰ্য জাতি সিদ্ধুসভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়াছিল।

চন্দ্র মধ্য দেশ ও চতুর্পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের (Outer Band) অধিবাসীদিগের মধ্যে ভাষা ও সমাজব্যবস্থার পার্থক্যের উপর অত্যধিক জোর দিয়াছেন উপরে এই কথা বলা হইয়াছে। এইরূপ করিবার একটি কারণ বৈদিক আৰ্যগণ, অবৈদিক আৰ্যগণের পূর্বে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিল, এই মত প্রতিষ্ঠা করিবার প্রয়াস।

গোলমুণ্ড অবৈদিক আৰ্যজাতি একদা ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিল এই মতবাদের পটভূমির ও আনুষঙ্গিক প্রশ্নগুলির পরিচয় দেওয়া হইল। এই মতবাদের ফলে মস্তকের গঠন, ভাষা, সমাজ ব্যবস্থা ও কৃষ্টিতে পরস্পর হইতে ভিন্ন দুইটি আৰ্যগোষ্ঠীর পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। এই দুইটি আৰ্যজাতির গোষ্ঠী (ethnic stock) ভিন্ন, উপস্থিতির স্থান ভিন্ন, ভারতবর্ষে প্রবেশের সময়ও ভিন্ন। এখন প্রশ্ন উঠে, এই দুইটি গোষ্ঠীর মধ্যে এত পার্থক্য সত্ত্বেও উভয় গোষ্ঠীকেই আৰ্য বলা হইতেছে কেন? বৈদিক আৰ্যগণের সম্বন্ধে বলা যায় যে ঋগ্বেদে তাঁহারা আপনাদিগকে আৰ্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু অবৈদিক আৰ্যগণের আৰ্যত্বের ভিত্তি কি? গোলমুণ্ড আক্রমণকারীদিগকে যে সকল পণ্ডিত আৰ্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন তাঁহাদের বক্তব্য বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় তাঁহারা আৰ্য-ভাষাভাষী ছিল, ইহাই তাহাদের আৰ্যত্বের একমাত্র দাবি। তাহা হইলে চন্দ্র ভাষার পার্থক্যের উপর যে জোর দিয়াছেন তাহা অনাবশ্যক বলিয়া দেখা যাইতেছে। ইহার পর অল্প প্রশ্ন উঠিবে। দুইটি এতগুলি বিষয়ে পৃথক গোষ্ঠীর জাতির মধ্যে এই ভাষার ঐক্য কি ভাবে আসিল? সমাজ ব্যবস্থা, কৃষ্টি ও ধর্ম—নিরপেক্ষ ভাষার ঐক্য কি ভাবে সম্ভব? দুইটি

পৃথক গোষ্ঠীর জাতির যদি সে কালে এক ভাষাভাষী হওয়া সম্ভব ছিল তাহা হইলে ভাষা বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের সাহায্যে নৃতত্ত্ববিজ্ঞানের মতবাদ গঠন করা কি নিরাপদ? ইত্যাদি।

এই সকল প্রশ্ন এড়াইয়া বৈদিক ও অবৈদিক আৰ্য জাতির মতবাদের আলোচনায় কিরা যাউক। এই মতবাদের পটভূমির যে আলোচনা উপরে করা হইয়াছে তাহাতে আর দুই একটি কথা যোগ করিতে হইবে।

বৈদিক ও অবৈদিক আৰ্যজাতির নৃতত্ত্ববৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা লম্বামুণ্ড এবং গোলমুণ্ড (dolichocephalic ও brachycephalic)। রমা প্রসাদ চন্দ্র ও তাঁহার মতের সমর্থনকারী নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীগণ পূর্ব ও পশ্চিম ভারতীয় গোলমুণ্ড গোষ্ঠীর জাতিসমূহ যে নিখিয়ান বা মোঙ্গলীয় নহে তাহা প্রতিপন্ন করিতে গিয়া প্রচলিত আৰ্যবাদ বা আৰ্যদিগের নৃতত্ত্ববৈজ্ঞানিক সংজ্ঞাটি মানিয়া লইয়াছেন। বিনা প্রশ্নে ইহা স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে যে বৈদিক আৰ্যগণ লম্বামুণ্ড গোষ্ঠীয় এবং উত্তর ভারতের লম্বামুণ্ড গোষ্ঠীর আৰ্যভাষাভাষী জাতিগুলি ইহাদের বংশধর। বৈদিক আৰ্যজাতি সম্বন্ধে এই প্রচলিত মতবাদ পুরাপুরি গ্রহণ করিবার ফলে গোলমুণ্ড গোষ্ঠীকে আৰ্যজাতি কিন্তু “অবৈদিক” বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্য অনেক কথা বলিতে হইয়াছে।

এই মতবাদের নৃতত্ত্ববৈজ্ঞানিক ভিত্তি পরীক্ষা করিবার অবসর এখানে নাই। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা বর্তমানে মূলতরী রাখিয়া সংক্ষেপে এইটুকু বলা যাইতে পারে যে বৈদিক আৰ্যগণ,—তাঁহাদের ৩০০০ বৎসরের পূর্বের উত্তর-ভারতীয় বংশধরদিগের কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাউক,—যে লম্বামুণ্ড গোষ্ঠীয় ছিলেন এই মত নৃতত্ত্ববিজ্ঞানের তথ্যের দ্বারা প্রমাণিত নহে, ইহা দাঁড়াইয়া আছে শুধু প্রেষ্টিজের উপর। যদি মস্তকের গঠনের মত একটি প্রধান গোষ্ঠীয় লক্ষণে দুইটি দল পৃথক বলিয়া স্বীকার করা হয় তবে প্রকৃত আৰ্য কাহারো ছিল? নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীগণের ভাব এ সম্বন্ধে অত্যন্ত অস্পষ্ট। মনে হয় একটিকে তাঁহারা racially আৰ্য ও অপরটিকে ভাষায় আৰ্য বলিয়া মনে করেন। তাঁহাদের হাতে আৰ্যপদের এইরূপ ব্যবহার বিজ্ঞানসম্মত নহে, সন্তোষজনকও নহে।

আৰ্যজাতির দৈহিক লক্ষণ (ethnic characteristics) সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করিতে হইলে যাহারা আপনাদিগকে আৰ্যনামে অভিহিত করিত তাহাদের প্রাচীন বাসস্থানের দিকে দৃষ্টি ফিরাইতে হইবে, উরল পর্বতের দক্ষিণপূর্বে দৃষ্টি আবদ্ধ রাখিলে বিশেষ ফল হইবে না। আৰ্যজাতির এই প্রাচীন বাসভূমির নাম আইরিয়ানা। এই আইরিয়ানা হইতে আৰ্যপদ আসিয়াছে।

অনুমান করা যায় যে অতি প্রাচীন যুগে, ঋগ্বেদ ও

জেন্দাবেস্তা রচিত হইবার বহু পূর্বে, এই বাসভূমি হইতে আৰ্যজাতি পশ্চিম, দক্ষিণ ও পূর্ব অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ঋগ্বেদের প্রমাণ হইতে এইরূপ অনুমান করা যায় যে ঋগ্বেদীয় ঋষিকুল যখন যমুনার পশ্চিমে বাস করিতেন আৰ্যজাতি ও আৰ্যকৃষ্টি তাহার পূর্বে পূর্বভারতে প্রসারিত হইয়াছিল। ম্যাকডোনেল ও ক্রীথের কাশী, কোশল ও বিদেহ এবং কুরুপঞ্চালের আৰ্যবসতির প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে যে ইঙ্গিতের উল্লেখ উপরে করা হইয়াছে তাহা এই প্রসঙ্গে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। যজ্ঞীয় দক্ষিণাসক্তার লইয়া বিশ্বামিত্রের পূর্বদিক হইতে শতদ্রু ও বিপাশা অতিক্রম করিবার কাহিনী তাৎপর্যহীন বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। শতপথ ব্রাহ্মণের অগ্নিবৈবানরের পূর্বদিকে অভিযানের কাহিনীকে প্রচলিত ব্যাখ্যা মতে আৰ্যসভ্যতা বা আৰ্যজাতির বিস্তৃতির ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ না করিয়া মনে করা যাইতে পারে যে এই প্রাচীন কাহিনীর ভিত্তি একটি প্রাচীনতর কিম্বদন্তী এবং যাহাকে আৰ্যসভ্যতা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে উহা বাস্তবিক ব্রাহ্মণ্যকৃষ্টি। ব্রাহ্মণ আৰ্য হইতে পারেন কিন্তু সকল আৰ্যই ব্রাহ্মণ নহেন। পারশ্বের হাকামনি সম্রাট প্রথম দারিয়ুস খ্রীঃ পূঃ ৫ম শতকে আপনাকে আৰ্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

সিন্ধুসভ্যতার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ যে সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন তাহা সঠিক হইলে দেখা যায় যে চন্দ্র যাহা-নিগকে গোলমুণ্ড অবৈদিক আৰ্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং বৈদিক আৰ্যদিগের পরবর্তী বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহারা সিন্ধুসভ্যতার অভ্যুদয়কালে অর্থাৎ ঋগ্বেদ রচনার সহস্রাব্দিক বৎসরের পূর্বে (ঋগ্বেদ রচনার কাল সম্বন্ধে প্রচলিত মতানুসারে) সিন্ধু উপত্যকায় বর্তমান ছিল। গোলমুণ্ড আৰ্যভাষাভাষী জাতি সিন্ধু সভ্যতার যুগে মোহেঙ্কো-দারো, হরাপ্পা প্রভৃতি নগরে বাস করিত এই তথ্য বৈজ্ঞানিক মহলে স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক মহলে স্বীকৃত হইলেও ইহার সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য উপেক্ষিত হইয়াছে, প্রচলিত, প্রাচীন যুরোপীয় আৰ্যবাদ সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তন করিবার প্রয়োজন অনুভূত হয় নাই। সিন্ধুসভ্যতার আলোচনা প্রসঙ্গে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিবার অবকাশ পাওয়া যাইবে।

গোলমুণ্ড অবৈদিক আৰ্যজাতি কোন অঞ্চল হইতে আসিয়াছিল সে সম্বন্ধে চন্দ্রের মতের উল্লেখ করা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে চন্দ্রের মতের ভিত্তি প্রসিদ্ধ নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী উজ্জ-ফালভি (Ujfalvy) ও ইংরেজ প্রত্নতত্ত্ববিজ্ঞানী স্যার অরেল

ষ্টাইনের সংগৃহীত নৃতত্ত্ববৈজ্ঞানিক তথ্যসমূহের জয়েস (T. A. Joyce) কৃত ব্যাখ্যা। কিন্তু দেখা যায় যে জয়েসের নৃতত্ত্ববৈজ্ঞানিক তথ্যের বিশ্লেষণের ফলে যে সিদ্ধান্ত অপরিহার্য তাহা গ্রহণ না করিয়া চন্দ্র তাকলা-মাকান মরুভূমির প্রাগৈতিহাসিক যুগের অধিবাসীদিগকেই অবৈদিক গোলমুণ্ড আৰ্যদিগের পূর্বপুরুষ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন যদিও এই অধিবাসীদিগকে একটি নিস্পর্কিত মনুষ্যগোষ্ঠী বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ দেখা যায় না। এই গোষ্ঠী প্রাচীন পামীরী বা ইরানী গোষ্ঠী, ইহাই জয়েসের সিদ্ধান্ত। আরেকটা কথার উল্লেখ করা যায়। তালকামাকান ও লপ মরুভূমির বালুকাস্তূপের নিম্নে প্রোথিত নগর সমূহের যে সকল ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা হান আমলের (খৃঃ পূঃ ২য় শতাব্দী) বা তাহার কিছু পূর্ববর্তী বলিয়া পণ্ডিতগণ মনে করেন। সে যাহা হউক, জয়েস ও অন্ত পণ্ডিতগণ তাকলামাকানের প্রাচীন অধিবাসী ও পামীরের অধিবাসীদিগকে ইরানী গোষ্ঠীভুক্ত বলিয়া মনে করেন। অতি প্রাচীনকালে পূর্ব ইরান অঞ্চল হইতে এই গোষ্ঠীর লোক পূর্বদিকে চীনের হোনান ও মাঞ্চুরিয়া পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল, পণ্ডিতগণ এইরূপ বলেন। এই প্রসঙ্গে রমাশ্রমাদ চন্দ্রের ব্যবহৃত যুক্তিকে অতি দুর্বল মনে না করিয়া উপায় নাই। এই দুর্বলতার কারণ তিনি বৈদিক আৰ্য ও আবেস্তিক বা ইরানী আৰ্য লম্বামুণ্ড গোষ্ঠীর এই মত গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার পরে দেখা যাইবে বৈদিক ও আবেস্তিক আৰ্য যে লম্বামুণ্ড গোষ্ঠীর ছিল ইহার কোন নৃতত্ত্ববৈজ্ঞানিক প্রমাণ নাই।

এ সম্বন্ধে আর আলোচনা না করিয়া সংক্ষেপে বলা যায় যে গোলমুণ্ড অবৈদিক আৰ্য বলিয়া যাহাদিগকে বর্ণনা করা হইয়াছে তাহারা তারিম অববাহিকার কোন স্বতন্ত্র মনুষ্যগোষ্ঠী নহে, তাহাদিগকে, পামীরের আলাই, রোশান, সিগনান, ওয়াখান উপত্যকা, তাসকুরগান, সারিকোল, বাদাকসান, বালখ, হিরাট, বোখারা, খোরাশানের ইরানী ভাষাভাষী তাজিক নামে পরিচিত যে গোষ্ঠী দেখা যায় তাহাদের সম বা এক গোষ্ঠীয় বলিয়া মনে করা হয়।

সুতরাং গোলমুণ্ড অবৈদিক আৰ্যদিগকে নিঃসন্দেহে পূর্ব ইরানীয় আৰ্যগোষ্ঠী হইতে অভিন্ন বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। যে পামীরী আলপাইন জাতি—সিন্ধু-সভ্যতার যুগে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিল তাহারা তাজিকদিগের প্রতিনিধি,—ডাঃ হার্টনের উপরে উল্লিখিত মত হইতে এই কথার সমর্থন পাওয়া যায়।

উপনয়ন

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

১

পত্রের বৃত্তান্ত শুনে হরিমতীর মুখ হাসিতে ভরে উঠল। বললেন, তাহলে কালই তো যাচ্ছা করতে হয়।

যজ্ঞেশ্বর বললেন, কাল কিংবা পরশু। কতকগুলি জিনিস আবার যোগাড় করে নিয়ে যেতে হবে তো? হোমের জন্ত বেল কাঠ—বেউড় বাঁশ—এক মালদা বাগি—

হরিমতী বললেন, ভারি তো—আজই যোগাড় হয়ে যাবে খন। ক্ষুদেকে বলে দাও না।

ওঁর তর সহছে না আর। শহর দেখার কৌতূহল ঠিক না হলেও—দুদিনের জন্ত ঠাইনাড়া হবার একটি ইচ্ছা মনের মধ্যে বলবতী হয়েছে—পত্রের মর্মান্থ জেনে। যৌবনের প্রান্ত-সীমায় সংসার কায়মীভাবে কাঁধে চেপেছে। রোজকার রোজ একঘেয়ে কাজ—এক রকমের কথাবার্তা—তাই পারি-পার্বিকে বাদহীন লাগে। প্রথম যৌবনে ছ'চার দিন বাপের বাড়ি গিয়ে স্থান বদল আর কাজ থেকে অবসর নেবার আনন্দ কিছু বা ভোগ করা যেত। তারপর মাঝে মাঝে দূর দূরান্তরের দেবতার মানত শোধের ব্যাপারে পুরো একটি দিন বৈচিত্র্যে অপরূপ হয়ে উঠত। কখনও কোন মেলায় বা রথ-দোল-দুর্গাপূজা উপলক্ষে একটানা সংসারের শ্রোতকে এক বেলায় জন্তও হাত দিয়ে ঠেলে একটুখানি শোভা—কিছু বা শব্দ-সমারোহ সঞ্চর করে মনে খুশির রং ধরত। এখন প্রৌঢ়ত্বের বাসু-বেলায় দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক চাইবার অবসর-টুকু তো গেছেই—মনেও নতুন রং ধরে না। তবু বৈচিত্র্য-লোভী মন কোথাও যাবার জন্ত উসখুস করে—নতুন কিছু দেখবার জন্তও আগ্রহ হয়। মাহুষের মন তো।

যজ্ঞেশ্বর বললেন, ছেলেদের নিয়ে যাবে তো?

ওমা—ওদের কোথায় রেখে যাব। একে তো বাছারা কোথাও যেতে পায় না—ভাল মন্দ কিছু খেতে পায় না—

যজ্ঞেশ্বর মারপথে বাধা দিয়ে বললেন, সংসার দেখবে কে? মেনী?

তা ছুটো দিন আর পারবে না? আমাদের দেশ ঘর—ভর জীত ভেমন নেই। আর বাড়ির পিঠে ভুষণোরা রয়েছে—জ্বোরে হাই ভুললে ওরা তুড়ি দিতে পারে—জান?

সুতরাং বিধবা মেয়ে মেনকাকে রেখে উপনয়নের ফর্দ মাফিক জিনিসগুলি সংগ্রহ করে পরের দিন ছপুয়ের ট্রেনে যজ্ঞেশ্বর সপরিবারে শহর বাছা করলেন।

২

টেশনে নেমেই দৃষ্টি আটকে যায়—ঠাসাঠালি বাড়ির স্তূপে। আবার বাড়ির মধ্যেও এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়াবার ঘো

নেই। সামান্য পৌটলা-পুঁটলি আর ছেলে মেয়েদের নিয়ে দাঁড়াতেই ছোট উঠোনটুকু ভর্তি হয়ে গেল। কাজের আগের দিনের বাড়ি—আত্মীয়-কুটুম্ব সমাগমে ধই ধই করছে। ভোজ রান্নার অতিকার বাসকোসনগুলি অনেকখানি জায়গা জুড়ে পড়ে আছে—কেনা আনাছপাতি আর উপনয়নের আবশ্যক জিনিসপত্রে একটা ঘর আকণ্ঠ বোঝাই। ন'মাসে ছ'মাসে নিমন্ত্রণ পেয়ে ভোজ খেয়ে দরিদ্র ব্রাহ্মণের যেমন অবস্থা হয় তেমনি আর কি। তবু বাড়িটা নেহাৎ ছোট নয়। উঠোন সর্পিণ বটে, উর্ধ্বমুখী; চার তলা পর্যন্ত পালা মেরে উঠেছে আকাশ ছোঁবার জন্ত। আকাশ ছুঁতে পারে নি বলেই বৃষ্টি চিলে কোঠার তর্জনী উঁচিয়ে মাহুষকে নির্দেশ দিচ্ছে—আর একটুখানি ভুলে দেবার জন্ত।

উঠোনে দাঁড়িয়ে হরিমতী ও যজ্ঞেশ্বর উপর পানে চাইলেন, অবশ্য বাড়ি দেখবার কৌতূহলে নয়—যদি কোথাও চেনা মুখ নজরে পড়ে এই আশায়। এক তলায় এঘরে ওঘরে যারা রয়েছে—যারা সিঁড়ি দিয়ে নামছে কিংবা উঠছে, যারা কুটনো কুটছে—বাইনা বাটছে—বাসনকোসন বুচ্ছে কি সোরগোল করছে তাদের কেউ এঁদের পরিচিত নয়। এঁদের অধিকাংশই সুবেশ;—অলঙ্কারে কাপড় জামায় প্রসাধিতা মেয়েরা ফান্তন দিনের অপরাহ্নে ভেদে-বেড়ান প্রজাপতির মতই বিচিত্র—আর ছেলেরা গঙ্গা কড়িড়ের মত লাকিয়ে লাকিয়ে অন্দর থেকে সদরে যাচ্ছে—সদর থেকে সিঁড়ি টপকে উপরে উঠছে। ক্রি চাকর জাতীয় যারা কাজ করছে তাদের মনোযোগও এই নবাগত দলটির উপর পড়ল না—আশ্চর্য। বরং কাজের অসুবিধা হওয়ায় একজন বললে, একটু সরে দাঁড়াও না গা—বাসন ধোয়া জল গায়ে লাগলে তখন বলবে—

কিন্তু সরে দাঁড়াবার জায়গা কোথায়? ঘরে জায়গা নেই, সিঁড়ির মুখে জনশ্রোত আটকে দাঁড়ানো চলবে না; সর্পিণ বারান্দায় তো অতিকার বাসনকোসন—জলের বাগতি—আর দালানটার জুতোর রাশি। দাঁড়াবার জায়গা কোথায়।

অবশেষে একজন ববিয়দী বিধবা ভাঁড়ার ঘর থেকে বেরিয়ে হরিমতীকে সামনে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের তো চিনতে পারছি না বাছা—

আমরা গুপ্তিপাড়া থেকে আসছি।

ও—গিন্নির বাপের বাড়ির লোক তোমরা। তা এখানে দাঁড়িয়ে কেন না—ওপরে যাও। একেবারে তেভলায় গিন্নি যেখানে আছেন।

অভ্যর্থনা না হোক—তবু ভাল যে এতক্ষেণে একটা নির্দেশ পাওয়া গেল। বাহিনী সমেত যজ্ঞেশ্বর আর হরিমতী উর্ধ্বমুখী হলেন।

৩

সম্পর্ক এককালে হয়ত নিকটই ছিল, দূরত্ব নিবন্ধন সেটির বাঁধন ক্রমশঃ শিথিল হয়েছে। গুপ্তিপাড়া থেকে কলকাতা এমন বেশী দূর নয়, কিন্তু সম্পদের সঙ্কলন পাহাড়ের অন্তরালে সে দূরত্বের পরিমাপ চলে না। যাজনিক ব্রাহ্মণের কুটির আর পদস্থ অফিসারের প্রাসাদ জাতিগোত্রে স্বর্গ রসাতলের মতই সম্পর্কহীন। তবু মাঝখানে মর্ডের হোঁয়া একটু-খানি আছে বলেই নিমন্ত্রণপত্রের স্বত্রে উঁদের শহরে আসবার সৌভাগ্য হয়েছে। এই বাড়ির গৃহিণী পিড়ালয় সম্পর্কীয় লোকদের একেবারে বিস্মৃত হন নি। সম্পদের চূড়ার উঠবার আগে যে ক'টি সিঁড়ি ছিল তা তাকে অতিক্রম করতে হয়েছে, এবং উপরে উঠেও সেই পুরাতন বাগগুলির দিকে মাকে মাকে তিনি চেয়ে থাকেন। কলে গ্রামস্থ বা দূরস্থ আত্মীয় স্বজনরা বাড়ির ক্রিয়াকর্মে নিমগ্ন হন। সকলে না হোক কেউ কেউ আসেন বৈকি।

লাল্‌ সিমেন্টের মেঝের পা ছড়িয়ে বসে মেদময়ী গৃহিণী কি হিসেব করছিলেন। তাঁর পাশে ক্যাসবান্ন কোলে করে বসে রয়েছে অলঙ্কারবহলা একটি গৌরী মেয়ে—আর সামনে কর্ণ হাতে দাঁড়িয়ে আছে একটি সুরেশ যুবক। যজ্ঞের এদের চেনেন বলেই সন্কোচ করলেন না, সরাসরি ঘরে ঢুকে গৃহিণীর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেন।

কে—যজ্ঞ? কখন এলি তাই? এই মাতুর? তা বউকে কি ছেলেমেয়েদের সঙ্গে করে আনতে নেই!

ওমাও এসেছে দিদি।

দিদি বাড়ি ফিরিয়ে দেখলেন—বারান্দা উপচে পড়ছে। যজ্ঞের কাউকে-না-আনার অহুযোগ করবার সুরোগ দেন নি। অহুযোগ না করতে পেলে মাহুয়ের স্বভাবের অঙ্গখানি হয় বুঝি—আর সেই কারণে গাছের-মাধার-জড়িয়ে-থাকা কুয়াসায় সবুজ পাতা ক্রমশঃ গুলির কিকে রোধ হয়। তবু তিনি মুখ ফিরিয়ে হাসলেন।

এস তাই এস—বস।

হরিমতী পায়ের ধুলো নিলে—ছেলে মেয়েরাও মায়ের দেখাদেখি পা ছুঁয়ে ভিড় করে দাঁড়াল ঘরের মধ্যে। মাধার ওপর পাখা চলছে। বন বন করে, তবু মনে হল—বাইরের বাতাসের সঙ্গে ঘরের বাতাসও বুঝি অসহযোগ করলে।

ক্যাসবান্ন কোলে করে বসেছিল যে মেয়েটি সে হাঁটু মুড়ে উঠবার উপক্রম করলে—ছেলেটিও কর্ণখানি গুটিয়ে পকেটে রাখলে। গৃহিণী ওদের মনোস্তাব বুঝে গলা ছেড়ে ডাকলেন, ও মনোর মা—মনোর মা। মাগি মরেছে নাকি?

ডেকে দিছি। বলে ছেলেটি ভিড় ঠেলে বাইরে এল।

মনোর মা না আসা পর্যন্ত গৃহিণী রাগে গজ গজ করতে লাগলেন। এরা যে ভিড় করে ঘরের মধ্যে রয়েছে—সেদিকে বুঝি তাঁর নজর নেই, কিনা বাপের বাড়ির সবচেয়ে আরও বড়

কথা জিজ্ঞাসা করবার ছিল—তাও ভুলে গেছেন। হরিমতী ছোট মেয়েটাকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে কাঁঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। কোথায় বা যাবেন—মাহুয়ের মত—ঘরগুলিও অপরিচিত অবিনয়ী।

মনোর মা আসতেই কেটে পড়লেন গৃহিণী, বলি নবাব-নন্দিনীর কি রাজকার্য্য হচ্ছিল। দাসী বাদীর কথা—

মনোর মা নাকে কাঁদতে আরম্ভ করলে, আমার কপালে... দোষ মা। ভাবছ চড়চড়ে রোদে বেলকাঠগুলো শুকোয় গেছে—এই বেল তুলে ফেলি। ছাদের ওপর থেকে হাঁক ডাক সৈন্দর বজ্জে?

আচ্ছা—আচ্ছা—এখন বক্তৃতা রেখে এদের বসবার জায়গা করে দে দিকি। দোতলায় কলঘরের পাশে—

ওমা—সেখানে যে কুঁচু মরেছেন। কাল হাজারীবাগ থেকে এল—

ও—তা কোথায় এদের জায়গা দিই—বলত। গরম কাল! বাড়িরে না হয় ছাদে শোবে'খন। দিনের বেলায় জিনিসটা পত্তরটা—

আর কোন ঘর তো খালি নেই মা। তোমার পাঁচ! মেয়ে—তিন না'তনী সবাই এয়েছেন। একটা ঘর তো দজি ০ ঘর হবে। আর নীচের রান্না ভাঁড়ার বৈঠকখানা। বউদের ঘরগুলো আর তোমার ঘরটা তো দেয়া চলবে না। থাকে একটা ঘর। তা এসোজন বসোজন—আছে—কোন কুঁচু হট করে কোথেকে এসবেন—

গৃহিণী বললেন, যে ঘরে দুঁটে রাখা হয়—সেটার কে আছে?

ওমা—দুঁটে কি কম তোমার। ঘর বোঝাই।

না-না-সরিয়ে ফেল ওসব। গরম কাল এখন বিষ্টি হক্কে না। যদিই হয়—ছাদের একধারে সাজিয়ে তেরপল ঢাকা দিয়ে রাখগে। তাই বলে কুঁচুমেরা ঘর পাবে না—এ কেমন কথা?

মনোর মা দলটির দিকে অপ্রসন্ন কটাক্ষ নিক্ষেপ করে বললে,—আমুন আপনারা—ছাদে বসবেন—আমি ভ্যাভক্কে মুক্ত করে ফেলি জায়গাটা।

গৃহিণী বললেন, তোর যদি একটু আঁকেল থাকে মনোর মা। একখানা মাহুর নিয়ে যা—পেতে দে ছাদে। বালজি করে ভল দিস পা ধোবার জেছে, আর—

বারান্দা থেকে একটা আধপুরানো মাহুর টেনে নিয়ে মনোর মা বললে, সে আর বলতে হবে নি মা—কুঁচুকে আদর যত্ন করতে হয় কি করে...আজই না হয় কপাল পুড়েছে...আমুন গো আপনারা।

৪

আকাশের দিকে আঙুল-উতানো চিলে কোঠার দেওয়াল ঘেঁষে বসলেন হরিমতী। ছেলেরা কেউ বসলে—কেউ বা

আগদেয় বুক দিয়ে খুঁকে পড়ে এদিক ওদিক দেখতে লাগল।
গিরিরিণের বাতানে দেহের ঘাম শুকিয়ে যেতেই শরীরটা ঠাণ্ডা
বোধ হ'ল।

হরিমতী জিজ্ঞাসা করলেন, হাঁগা—গিরির ক'টি ছেলে ?

পাঁচটি। যজ্ঞধর উত্তর দিলেন।

সবাই উপার্জন করে তো ?

না হলে সংসারের আর এমন ত্রি। বড়টি উকিল—
যেজটি ইঞ্জিনিয়ার—সেজ ডাক্তার—ন কোন আপিসে ভাল
চাকরি করে—আর ছোটটি বুকি এম-এ পড়ছে।

হরিমতী উজ্জলমুখে বললেন, আঁহা—তা হোক ভগমান
বাকে দেন—সব দিক দিয়েই ভরিয়ে দেন। সবাইর বিয়ে
হয়েছে তো ?

ছোটটির এখনও হয় নি। কেন—চিঠির কাহিলে ওদের
বিয়ের নেমন্তর চিঠিগুলো পাঁধা আছে দেখ নি ? কোন ক্রিয়া-
কর্মে আমাকে জানাতে তুলতেন না রঘু বাবু—আঁহা কি
মাহুষই ছিলেন।

গিরিও খুব ভাল। কেমন হাসি-হাসি মুখ। আমাদের
কষ্ট হবে বলে খুঁটেগুলো বার করে দিতে বললেন।

যজ্ঞধর কথা কইলেন না। সত্যি বলতে কি এরকম
অত্যাধনা উনি প্রত্যাশা করেন নি। যখনই যে কোন কাজে
উনি এসেছেন—প্রচুর না হোক পরিমিত আদর-আপ্যায়ন
পেয়েছেন। সংসারের মধ্যে তাঁই হয়েছে আর সংসারের
স্ববহুঃখের কাহিনীর আদান-প্রদানে বেশ সহজ হয়ে বাস
করবার সুযোগ লাভ করেছেন।

বর্গীয় কর্তার তুলনা হয় না—একথা একশো বার স্বীকার
করেন যজ্ঞধর। এমন কি কর্তার প্রাণে যখন আসেন—তখনও
সংসার থেকে ছাদে নির্বাসিত হন নি। এ কথা সত্য—ছেলে
মেয়ে নাতি নাতিনীতে ঘরগুলি ক্রমশঃ ভরে উঠছে—বাড়তি
লোকের মাথা গুঁড়বার স্থান সঙ্কলান হওয়ার কথা নয়। স্থান-
সঙ্কলান নাই যদি হয় তো ঘটা করে নিমন্ত্রণ করার অর্থ কি ?
তিনি একলা হলে কথা ছিল না। যেখানে হোক শুয়ে বসে—
যা কিছু হোক বেয়ে কাজের বাড়িতে খেটে খুঁটে—হৈ চৈ
করে কাটিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু ছেলে মেয়ে পরিবার
ওয়া তো তেমন ভাবে স্রোতে কুটোর মত ভেসে ভেসে বেড়াতে
পারবে না। ওদের ক্ষুধা তৃষ্ণা আছে—সময়ে অসময়ে ঘুম
আছে—মানান রকমের আহার অভিযোগ আছে—সংসার-
বহির্ভূত এই জারগাটিতে বাস করে এইসব চেকানো মীতিমত
ক্ষুধা।

হরিমতীর কোলের ছেলেটা খুঁত খুঁত করতে লাগল।
খুঁত খুঁত পারলেন বিদে পেয়েছে। এমন সময় বড়রাও শহর-
দেখা শেষ করে—মায়ের চারদিক ঘিরে বসল। মা বললেন—
ওদের নীরব ভাষা। ট্রেনের রাস্তা ক্রমখানি নয়। নতুন
নতুন দৃশ্য দেখার আনন্দ যতই থাকুক—ক্ষুধা তৃষ্ণা যথাসময়ে

তাদের দাবি জানাবেই। বরং ট্রেনে আসতে আসতে ওদের
দাবিটা অতিরিক্ত বলে বোধ হয়। হরিমতীর পর্যাপ্ত মনে
হচ্ছে এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল পেলে মন্দ হ'ত না।

খুঁটে সরাতে সরাতে মনোর মা একবার এদিকে এল।
বললে, হাত পা শুটো বসে রইলে কেন মা—উই হোথা ট্যাক্স
জল রয়েছে—মগ ডুবো বেশ করে হাত পা মুখ ধুয়ে নাও—
শরীর সুস্থ হোক।

বাহিনী সমেত হরিমতী ট্যাক্সর দিকে অগ্রসর হলেন।
ছেলেমা কেউ লাফিয়ে উঠল—ট্যাক্সের মাথায় কেউ বা—ওর
গায়ে হাত চাপড়ে বাজনার সুর তুললে—কেউ কেউ জলে-
ভাঙ্গা বলটাকে চেপে ধরে ছড় ছড়াং জলের শব্দ শুনে চৈচিয়ে
উঠল আনন্দে।

মনোর মা মুখ ফিরিয়ে বললে, ওমা একি কাণ্ড গো, ট্যাক্স
দফা গর্য করবে নাকি। এমন দণ্ডিবিভি করলে—মাহুষ
ক্যায় হয়ে যায়—তার টাক। নাব—নাব শীগগির। গিরি
দেখলে আমাকে আন্ত রাখবেক নি—মাইনের ট্যাকা খে যদি
না কাটে তো—

ছড়ছড় করে সবাই নেমে পড়লে।

মনোর মা বললে—মগে করে করে জল নেসে হাত পা
ধোও। ধুয়ে বসগে উই—হোথায়।

হাত পা মুখ ধুয়ে শরীর ঠাণ্ডা হ'ল—উই হয়ে উঠল পেটের
ক্ষুধা। আকাশ আর শহর পুরানো হয়ে গেছে কিংবা কাক
দেখিয়ে ছোটদের আর ভুলিয়ে রাখা সম্ভব নয় ; বড়রাও খুঁত
খুঁতনির রূপ স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করছে—মা বিদে পেয়েছে।
হরিমতীর মনে হচ্ছে, একটুখানি গুড়—আর ঠাণ্ডা জল পেলে
এদের খানিকক্ষণের ক্ষুধা শান্ত করা যেত। কিন্তু কাকেই বা
বলেন সে কথা।

মনোর মার ভঙ্গি তেমন সান্ত্বনাদায়ক নয়। মনিব বাড়িতে
কর্তব্যপারায়ণা বলে তার খ্যাতি আছে বলে যে কাজটি ও
ধরেছে সেটি শেষ না করে কর্মান্তরে মনোযোগ দেবে না বুকি।
ঘর ঠাঙ্গা রয়েছে খুঁটেতে—সবগুলি বার করতে আরও কত-
ক্ষণ লাগবে কে জানে।

উপায় না দেখে যজ্ঞধরকে বললেন, একবার নীচের
নেমে দেখ না—এক ঘটি জল যদি আনতে পার।

যজ্ঞধর মনে মনে যথেষ্ট উচ্চ হয়ে উঠছিলেন। এই
কথায় উদ্ভা প্রকাশ করে বললেন, হ—কাজের বাড়িতে
ঘটি যোগাড় করা সোজা নাকি। জল বললেই জল পাওয়া
যায় ? যত সব বক্সাটি।

হরিমতী মরমে মরে গেলেন। সত্যি বক্সাটি তিনিই
বাধিয়েছেন। কোন বারই বিদেশে যাবার হুজুতি তাঁর হয়
না—এবার কেন যে হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে মনে হ'ল—তাঁর
ইচ্ছাকে বলবতী করার মধ্যে যজ্ঞধরের সহযোগিতা আছে

বৈকি। প্রতি নিম্নজনের শেষে বাড়ি করে যে সমারোহ শহরের ও ভোজবাড়ির—যে আদর-আপ্যায়নের—যে ভূমি-ভোজের—যে লোক-সমাগমের বর্ণনা তিনি দিয়েছেন—তা সহজে মন থেকে মুছে যাবার নয়। যেমন ছেলেবেলায় শোনা রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী মনের কোণে অক্ষর হয়ে আছে—আর প্রতিদিন আকর্ষণ করে সেই পুণ্য তীর্থ-ভূমির দিকে। হয়ত তীর্থযাত্রার স্বপ্ন সকল হবে না কোন দিন—তবু তাদের আকর্ষণ শিথিল হয় না—এক মুহূর্তের জড়ও। তবে এ সব কথা বলে লাভ নেই; দায় দোষ যারই হোক—একবার এসে পড়েছেন যখন—মুখ বুকে সবই সম্মুখে যেতে হবে। নিজের বাড়ি হলে ঘ্যান ঘ্যানানির জড় ছেলেদের ছুটো চড়াচাপড় দিতে পারতেন—এখানে সে উপায় নেই।

যজ্ঞেশ্বর বললেন—এদের কোন দোষ নেই। এদের বাক্য—মেরে কিংবা হরিমতীর খাড়ে দোষ চাপিয়ে দিলেই ব্যাপারটির আন্ত নিষ্পত্তি হবে না। একটা মিষ্টি আর এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল—ভাঁড় ইচ্ছাকৃত করে উদ্বীণ করে তুলছে না? তিনি গাছোখান করলেন।

এদিকে যজ্ঞেশ্বরের ফিরে আসতে যত দেরী হচ্ছে—ছেলে-রাও বর উচ্চগ্রামে তুলছে। এই এল—এই এল করে আহ্বাস দিয়েও যখন তাদের বড়িত কোলাহল রোধ করা গেল না—তখন হরিমতী যে ক'টাকে হাতের নাগালে পেলেন—ছদ্মদাম করে পিটিয়ে দিলেন।

মর—মর তোরা—আপদ যা।

মনোর মা ছুঁটে হাতে এদিকে এগিয়ে এসে চোখ উল্টে বললে, ওমা কেমন পোরাতি গা আপনি—ছেলেগুলোকে না-হক পিটিতেছ।

হরিমতী রাগ করে বললেন, কি করব—জল খাব বলে সেই যে বায়না রয়েছে—

আহা বাছারে। ক্ষিপ্তে তাগুতে সহায়ত্বভিক্ষুক চুক চুক শব্দ করে মনোর মা বললে, এই আর ক'খন ছুঁটে সহ্যেই—এনে দিচ্ছি জল। আহা।

হরিমতী উঁকি মেরে দেখলেন—তখনও আশ ধর ছুঁটে রয়েছে—সন্নাতে অনেক সময় যাবে। বললেন, আমি সন্নাব ছুঁটে?

মনোর মা আঁতকে উঠে বললে, ওমা, কুটুম মাঝখ—আপনি সন্নাবে কি গো। আমিই এই ঝট করে...বাতের ব্যাধার হাত পা যেন আড়ষ্ট, তাই... আহা—হা—আবার আপনি হাত লাগালে? তা মা গিন্নী যেন জানতে না পারে। জানতে পারলে আমার পেটে পা দিয়ে দেবে মা।

এমন সময় নীচে থেকে গিন্নীর গলা শোনা গেল, মনোর মা—ও মনোর মা—বলি মরে গেলি নাকি।

মনোর মা জ্বন্তে ছুঁটে ফেলে হাঁক দিলে, যাই মা।

ধানিক পরে সে ফিরে এসে বললে, এস মা নাবোয় এস—

গিন্নী জল খেতে ডাকতেছে তোমাদের। ওমা—সব ছুঁটে যে সহ্যে রেখেছ? যাও—মা—যাও, ঘরটা ঝাঁট দিয়ে বুয়ে দিচ্ছি আমি।

৬

একরাশ আনন্দ-নাড়ু আঁচলে করে হরিমতী ছাদে এলেন। ডাকলেন ছেলেদের, ওরে—খাঁদা—গুটকে—ভোহল—পুঁটি—ভোঁদড়—মিটু—টুবিলা—ওপলু—হাবা—টুহু—ইদিকে আর, খাবার খেয়ে যা।

যজ্ঞেশ্বর এক কলসী জল নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে এই সময়ে উপরে উঠলেন। গোটা-ছই মাটির গ্লাস আর কলসীটা ছাদে নামিয়ে দিয়ে বললেন, জল আনা কি কম বকমারি। কলে এক কোঁটা জল নেই—সেই পথের টিউবওয়েল থেকে—

হরিমতী তত্ত্বক্ষণে ছেলে মেয়েদের ব্যাবস্ত্য হয়ে খাবার বটন করে দিচ্ছেন। বললেন—ভূমিও ছুটো নাড়ু নিয়ে একটু জল খাও।

নাড়ুতে কামড় দিয়ে যজ্ঞেশ্বর আঁতকে উঠলেন, ওরে খাঁবা—এযে লোহার কলাই—এর নাম আনন্দ-নাড়ু।

চিবোও—মিষ্টি লাগাবে'খন।

ভূমি চিবোও। বয়স আমার কম নয়—দাঁতের পোড়া একেই তো আসলগা মেরে গেছে—

বড় ছেলে খাঁদা বললে—রসগোল্লা আনলে না কেন মা?

রসগোল্লা। সে কাল খাবি পেট ভরে।

খাঁদা বললে, বাঃ রে, ভাঁড়ারে এক গামলা রয়েছে দেখলাম। পিসিমা তো একটা বউকে আর তার ছেলেদের খেতে দিলেন।

হরিমতী রেগে উঠলেন, দিয়েছেন—বেশ করেছেন। পরের বাড়ি এসে আকুণ্ঠেগিরি করিস—কোন লজ্জায় খাঁদা। কখনও কি খাসনি রসগোল্লা?

তাড়া খেয়ে খাঁদা বললে, এই মিটু—দেখবি একটা মজা? উই যে কাকটা বসে রয়েছে না চিলের ছাদে, ওকে বাঁটল মারি দেখ। বলে ঠাই করে একটা নাড়ু ছুড়ে দিলে সেদিকে। কাকটা কা—কা করে উড়ে গেল।

যজ্ঞেশ্বর বললেন, ছেলেটা মন্দ বলেছে কি। কতকগুলো শুকনো কটকটে নাড়ু না দিয়ে—একটা করে রসগোল্লাও যদি দিত—

চুপ কর—মনোর মা আসছে।

মনোর মা নেহাৎ হাবাপোবা নয়। এ বাড়ির হালচাল আর কুটুম সাক্ষাতের আদর যজ্ঞেশ্বর বহর দেখে বুকে নিয়েছে কে কোন দরের লোক। ছাদে উঠে একখানা ছোঁড়া ময়লা কাপড় হরিমতীর দিকে ফেলে দিয়ে বললে, ঘরটা মুছে নিও মা—আমার আবার নাবোয় কাজ করতে হবে। তোমাদেরই তো বাড়িঘর—দেখে শুনে নিও মা। আর উই যে কোণে তের-পল রয়েছে ওটা ছুঁটেগুলোর ওপর চাপা দিও। যদি একখানা

ঘুটে শুভ্র তো অন্ন করবে গিহী—দিষ্ট ওনার সর্বভরই
রঞ্জেহু কিনা।

ধর মোছা আর ঘুটে ঢাকা হবা মাজ মনোর মা ফিরে এসে
বললে—একবার নাবোয় এস মা—গিহী ডাকতেছে। বলতেছে
—কুটনোঙলো যদি কুটে দেয় সবাই মিলে—তো উবগার
হয়। এস মা—

রাত দুটো পর্যন্ত কুটনো কুটে শরীর ক্লান্ত হয়ে পড়ল।
সকলের অহরোধে ভাতের থালাটা টেনে নিয়ে বসলেন বটে
—কুচি হ'ল না আহারে। কোন্ বিকেলে রান্না তরকারি—
ঘেঁটে ঘেঁটে বিবাদ আর টক হয়ে গেছে। ভাতগুলো
দলা পাকানো, আর ডালের বর্ণ বা আকারে বুঝা দুসর। কি
জাতীয় জিনিস ওটা। মাছ নাকি ফুরিয়ে গেছে—মিষ্টি একটা
করে দেবার কথা ছিল, কিন্তু রাত বেশী হয়েছে বলে ভাড়ার
বন্ধ করে গিহী গেছেন শুতে। তাঁকে জাগিয়ে বরাবের মিষ্টি
বার করে নেওয়া মানে...

মনোর মা চোখ কপালে তুলে বললে, তার চেয়ে পেটে
একটা কিল মেয়ে মিষ্টি খেতু বলে মনকে পেরবোধ দেয়া ঢের
ভাল মা। ধাওয়ার পাট এই পঙ্কজ থাক—একটু গড়িয়ে নি
চল। কাল আবার গত্তর জল করে খাটতে হবে—নইলে
লুটির আশা নবডঙ্কা। উচ্ছিষ্ট বুড়ো আঙুল উঠিয়ে সে হাসতে
হাসতে উঠে পড়ল।

হরিমতী ছাদে এসে দেখলেন, সবাই সার বেঁধে ঘুচ্ছে।
কারো মাহুর আছে—কেউ বা লোটোচ্ছে হুলোয়। বালিশ
মস্ত বড় বিলাস বলেই কারো খিসীমাতে নেই। কাছের
চাপে পড়ে খোঁজ নেওয়া হয়নি এরা খেয়েছে কিনা। না
বেলে কি আর অকাতরে ঘুচ্ছে সব।

কৃষ্ণপক্ষ-বেঁসা তিথি—মাঝরাতে চাঁদ উঠেছে। মেটে
মেটে রং জ্যোৎস্নার। ওদের কারো মুখে—কারো বা পিঠে
পড়েছে সেই রং। অদ্ভুত দেখাচ্ছে মাত্রগুণিক। ওরা
যেন হরিমতীর কেউ নয়। এই অপরিচিত বাড়ির মতই
নিরাশঙ্ক নির্দ্বিকার। কলকাতার বাড়িগুলি এমনি বুঝি।
মাহুকে আশ্রয় দেয়—ভালবাসে না।

উপনয়নের প্রচণ্ড একটি ঢেউ এ বাড়ির গায়ে এসে লাগল।
এর নাম শুভকর্ষ—উৎসব। ছেলে বুড়ো-স্ত্রী-পুরুষ সবাই
হয়ে উঠল চঞ্চল। সবাই একসঙ্গে চাইছে কাজ করতে—
একসঙ্গে টেঁচাতে—একই সঙ্গে ব্যস্ত হয়ে এবার ওয়ার ঘুরতে।
পুরোহিতের উচ্চারিত মন্ত্রে আর হোমের ধোঁয়ায় বাড়িটা
গম গম করছে। সেই সঙ্গে মিশেছে জিহ্মানশালার ঘিরের গন্ধ
আর যজ্ঞশালার মাছের গন্ধ। কলতলার বাসনের ধনু খনু
বনু বনু খসর খসর শব্দের সঙ্গে তরকারি সীতলামোর শব্দ
মিশে মনে হচ্ছে প্লাটফর্মের সাহনে এসে রেলের এঞ্জিনটা
ধিম ছাড়ছে অমর্গল। মাঝ রাতে মনে হয়েছিল—এখানকার

বাড়ির কোন ভাষা নেই—সে সব বিষয়ে উদাসীন নির্দ্বিকার।
কিন্তু এই যুহুর্ভে মনে হচ্ছে উৎসবকে সর্বাঙ্গ সুন্দর করবার জুড়
এ-ও টেঁচাতে পারে অপরিমিত।

উপর থেকে হাঁকছেন একজন গিহী গোছের মহিলা :—
ওগো কে কে ভিক্ষে দেবেন—আমুন। হোম শেষ হয়েছে—
ব্রহ্মচারীকে কে ভিক্ষে দেবেন আমুন।

মাহুষের অবিচ্ছিন্ন প্রবাহে সিঁড়িতে উঠল ঢেউ। নানা
বর্ণের—নানা গোছের ও বিচিত্র বসনের মেয়ে পুরুষের চাপ
উঠোন থেকে দেখলে ঢেউ বলেই মনে হবে। কলকাতা
শহরের মাহুষ বুঝি মিলেছে এখানে। বুট বুট খটাস—
অগণিত জুতোর শব্দ উঠছে। নানা প্রকার অহুচ্চ আলাপ
আর নানা জাতীয় পুষ্পসার সৌরভ উঠোন থেকে সিঁড়ি—
সিঁড়ি থেকে দোতলার ধর আর সেখান থেকে বাড়িটার
সর্বোচ্চ ছড়িয়ে পড়ছে। গায়ের ভিতর কেমন যেন পাক
দিচ্ছে—তবু হরিমতী অসঙ্কোচে আঁচলের গেরোটা একবার
ডান হাত দিয়ে টিপে ধরে সেই শ্রোতে গা ঢেলে দিলেন।

মুণ্ডিতমণ্ডক গৈরিকবসনপরিহিত কৃশতনু গৌরবর্ণের
ছেলেটি দণ্ড আর গৈরিক খুলি নিয়ে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে
আছে। নির্দ্বিগত হোমায়ি—থেকে তখনও সামান্য ধোঁয়া
উঠছে আর গাওয়া ঘিরের সুগন্ধে ঘরের বাতাস মধুর। ঘরের
এক কোণে সাজানো রয়েছে মাত্রলিক জব্য—নৈবেদ্য গামছা
কাপড়। তেলভর্তি পিতলের বালতি—হরিমতী গুলেন
হুড়িটাই হবে। আলনার রয়েছে পরদের চেঁচি—কবলের
ওপর রয়েছে টোপর ছাতা—এসব রাজবেশ নেবার সমস্ত-
দরকার হবে।

ঘরের মধ্যে একখানি বড় আয়না আর অনেক রকমের
ছবি—আলোর যে শেডটা ঝুলছে তা-ও খানিকক্ষণ চোখে
দেখবার মত। তা ছাড়া ঘরের মধ্যে শুভে শুভে জমে উঠছে
জিহ্মার জিনিস। যেন মনোহারী দোকান সাজানো হয়েছে।
একখানি ফুলকাটা মিনে করা রূপোর ধালে জমেছে নোট আর
টাকা।

বহুদিন আগের একটা ছবি মনের কোণে ভেসে উঠল
হরিমতীর। তখন তিনি বালিকা মাত্র। পরলা বৈশাখ
ভগবতীষাঙ্গার দিন নতুন খাতা মহরতের নিমন্ত্রণে বাপের সঙ্গে
এ-দোকান সে-দোকান ঘুরতেন। ফরসা চাদর বিছিয়ে তার
ওপর শ্রু-চন্দন-শোভিত কাঠের বাজিট রেখে ফরসা জামা
কাপড় পরে বসতেন দোকানের মুহুরি। দোকানী টাকাটি
নিয়ে নাম হেঁকে হেঁকে ফেলতেন একখানা বড় থালার (সেটা
পিতলের কি কঁাসার ঠিক মনে নেই)। আর মুহুরি লাল
ধেরো-বাঁধানো খাতাটিতে জমার অঙ্কপাত করতেন। তারপর
হাতের কাড়নটাতে জমে উঠত মিঠাই বা ঐ জাতীয় কিছু মিষ্টি।
কোথাও বা জলযোগ সমাধা করতে হত। থালার ওপর নোট
ও টাকা জমে উঠতে দেখে হরিমতীর স্মৃতি পুরানো ও হারানো

দিনের মধ্যে পাক খেয়ে ফিরতে লাগল। খেরো-বাঁধানো খাতাটা শুধু নেই—কিন্তু গেরুয়া বুলি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে হাসিখুশি ভরা একটি ছেলে। ব্রহ্মচারী ছেলে—মুণ্ডিতমস্তক কানে বীরবোলি, গলায় শুভ্র যজ্ঞোপবীত, পায়ে বোলো দেওয়া খড়ম, মুখে সংস্কৃত শব্দ—‘ভবতি ভিক্ষাং দেহি’। এই কিছুক্ষণ আগে শাক্তবিধি-অনুসারে সে দ্বিজত্বে উন্নীত হয়েছে—নতুন জন্ম বলতে পারা যায়। তিন রাত্রি, তিন দিন এই দণ্ডী-ঘরে অর্ধ্য-বকিত হয়ে আরও অনেক অনুশাসন মেনে নিয়ে হবিষ্য ও কলমুলাহারে তাকে কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করতে হবে। সর্বপ্রকার সুখবিলাসসম্বন্ধ সৌধের একটি সুন্দরতম কক্ষে পুরাকালীন উপনয়ন-যজ্ঞের অনুবর্তন...জানালা দিয়ে দেখতে লাগলেন হরিমতী।

ছেলের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন গৃহিণী। ছেলের হাত থেকে নিয়ে তিনি গালচের ওপর সাজিয়ে রাখছিলেন ভিক্ষা-উপহারের সামগ্রীগুলি। বুলিটা ভারি হোক আর না হোক একজন ভিক্ষা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই সে জিনিস ধালার বা গালচের ওপর জমা হচ্ছে। হরিমতীর বার বার মনে হচ্ছে—জাল খেরো-বাঁধানো খাতাটা নেই শুধু—জমার ঘরে অঙ্ক পড়ছে নিভুল। মুছুরী করেছেন বেশ বদল।

ক্রমশঃ ভিড় কমে এল—জানালা থেকে সরে ঘরের সামনে দাঁড়াতে সাহস হ’ল না হরিমতীর। তাঁর অনভ্যস্ত দৃষ্টিতে ও গ্রাম্যরীতিপুষ্ঠ মনে কোথায় সংশয় জেগেছে, জেগেছে লজ্জা। নতুন ব্রহ্মচারীকে ভিক্ষা দিয়ে পূণ্য সঞ্চয়ের আকাঙ্ক্ষা বর্জিত সংশয় আর লজ্জার ভারে চাপা পড়ে গেছে। এ একটা উৎসবের ব্যাপার—উপহারে তার ছাপ স্পষ্ট; লজ্জা সংশয় কাটিয়ে উঠা ছড়র। অকল্যাণস্থিতিত একটি টাকা খরচসিদ্ধ হাতের মুঠোর ক্রমশঃই ভেতে উঠছে।

ভিড় সরে গেছে। এ বাড়ির কয়েকটি মেয়ে ও বউ এসে দাঁড়িয়েছেন ঘরের মধ্যে। তাঁদের মুখে চোখে খুশীর ছটা। উপহারের জিনিসগুলি গালচের উপর থেকে তুলে তুলে দেখছে ওরা—প্রশংসা করছে, হিসাব-নিকাশও হচ্ছে সেই সঙ্গে।

এই ক্যামেরাটা কে দিলে মা? বাঃ কি সুন্দর সেকান্সের

কলমটা। এভারসার্প আর পার্কারের জিনিসটাই বা মন্দ কি। রিটওয়াচটা তুমি দিলে বুঝি মা? নাতি কিনা। আংটির তো দেখছি বন্দাবন। বারটা না চোফটা? আবার বইও একরাশ দিয়েছে কারা। টাকা শুনেছ?

একটি মেয়ে হেঁট হয়ে টাকা গুনতে লাগল। গোনা শেষ হল সে বললে, একশ’ নিরেনকবই আর একটি হলেই দু’শ হয়। আমার কোশাকুশি বুঝি বড়দি দিলে? মাপো, কি বড়ুটে ধরণ। আংটি দিয়েছিলে—দিয়েছিলে—ওগব আবার কি হবে? দণ্ডী-ঘর থেকে বেরিয়ে ছেলে সন্ধ্যে আত্মিক যা করবে।

ভূই চূপ কর দিকি। মা সরেছ ধমক দিলেন। ওগুলো এক পাশে সাজিয়ে রাখ। রাজে অনেকে আসবেন খেতে—অনেকে ভিক্ষে দেবেন।

মেয়েটি ধমক খেয়ে হেসে উঠল। বললে, তা যাই বল মা—নাতির পৈতে দেওয়ার লাভ আছে। যা জিনিস পেয়েছ তাতে আর একটা পৈতে দেওয়া চলে।

ওর শিশু-সুন্দর মস্তব্যো লবাই হেসে উঠল শব্দ করে।

জানালা থেকে সরে আসছিলেন হরিমতী—গৃহিণীও সেই সময় ঘর থেকে বার হয়ে এলেন। সামনা-সামনি পড়ে গেলেন।

গৃহিণী হাসিমুখে বললেন, ভিক্ষে দেবে বউ? তা বেশ তো—যাও ঘরের মধ্যে। এতখানি বেলা হয়েছে—ভিক্ষে না দিয়ে তো জল খেতে পাবে না, যাও, ভিক্ষে দিয়ে এস।

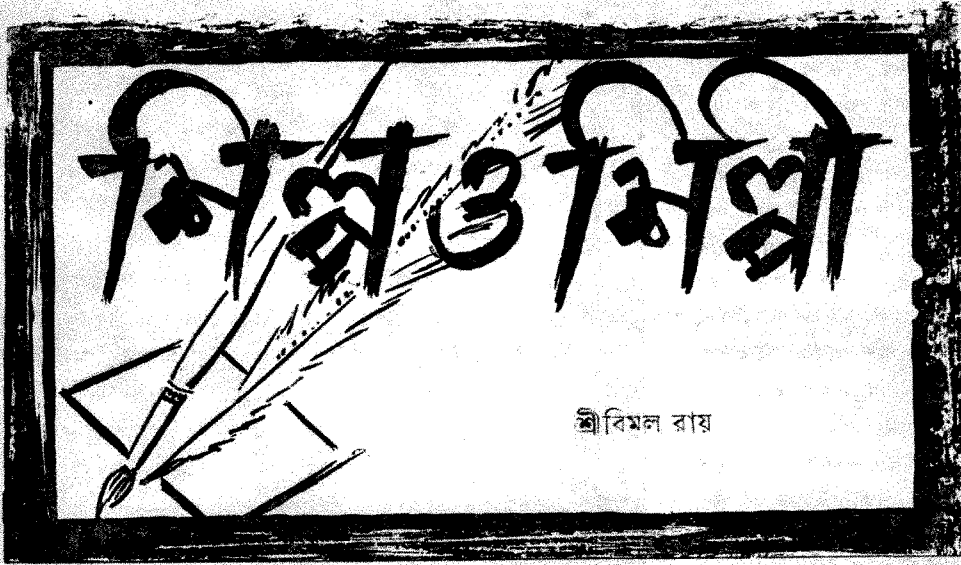
হরিমতীর মুখ চোখ তখন অত্যন্ত শুকনো-বোধ হচ্ছে—কানের গোড়ায় জালা তো করছেই—আর ভেঁ ভেঁ শব্দ হচ্ছে—গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। কোন রকমে টাকাটা তিনি ব্রহ্মচারীর প্রসারিত বুলিতে ফেলে দিলেন। তারপর আর চেয়ে দেখলেন না কোন দিকে, শুধু দেহটাকে টেনে কোনক্রমে ভেতালার সিঁড়িটার কাছে এসে বসে পড়লেন। সিঁড়ির ধাপের উপর একটা জলপূর্ণ খটি বসানো ছিল। হরিমতী সেটি তুলে নিয়ে ঢক্ ঢক্ করে জল পান করতে লাগলেন।

ইয়োরোপের শরৎ

শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ

বতায়ন পথে আসে সারাহের শেষ রশ্মি রেখা
কম্পিত বিহঙ্গসম যুগ্ম শান্ত ভীরু; যায় দেখা
নিম্নে পথে পদচারী ক্রীড়াকান্তা বালিকার হাসি
দিনান্তের অন্তরাগে ভরা। তরুর ঐশ্বর্য্যরাশি
ঝরে পড়ে উদাস বিধুরে; ক্ষুদ্র হ’তে ক্ষুদ্রতর
দিনগুলি রেখে যায় আনমনে সুদীর্ঘ স্বাক্ষর
দীন কক্ষকোণে মোর; নগরীর দূর কোলাহল
অস্পষ্ট আসিছে ভেসে তরীতলে ধীরে ছল ছল

সুদূর ভরদসম; অলক্ষিতে তরল আঁধার
ছড়াইছে পথ পুরে; অতীতের সুখস্মৃতি ভার
ব্যাকুল নিঃশ্বাস ফেলি’ ঘুরিছে আমারি চারি পাশ
দিগন্তের বর্ণরানিমা; চিন্তাহীন এ প্রবাসে
কত অতীতের সুখ, কত শ্রীতি, বিশ্বয়ের দান
শরতের নভতলে লভিছে করুণ অবসান।



শ্রীবিমল রায়

মাটির কথা লেখা হয় ভূগোলে, দেশের ও সময়ের কথা লেখা হয় ইতিহাসে, মানুষ প্রকাশিত হলে দেশের প্রকাশ। ইতিহাস কিংবা ভূগোলে রচনা থাকে না। শুধু ঘটনা ও ঘটনা থাকে। মানুষ যা রচনা করে ও সৃষ্টি করে, তার প্রকাশেই দেশেরও প্রকাশ। শিল্প, সাহিত্য, কবিতা ও বিজ্ঞান এই সব এক এক দেশে এক এক সময়ের বিচিত্র আবেশ সৃষ্টিতে রূপান্তরিত হয়। আমরা সাধারণতঃ যা কিছু চোখে দেখি, মনের উপর তার যে ছায়া পড়ে তাকেই ছবি বলি। যা কিছু কানে শুনি তাকে মনে মনে দেখি। রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ ও স্পর্শ এই সবগুলোকে নিয়ে অল্প কথার ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়, তবে সকল অনুভূতিই একই কোঠায় বাঁধা। স্মরণ্য এই দেখা-শোনার মধ্যে যে ছবি গড়ে উঠে তাকে প্রকাশ করাই হল তার অন্তরীকৃত ছবি। শব্দও চলে, নিঃশব্দও হয়। শব্দকে যা আশ্রয় করে সে ভাষা, নিঃশব্দে যা চলে সে ছবি। ভাষার সুর নিয়ে যে রূপ পায় সে মনের তরঙ্গই শুধু রচনা করে না, সে আসলে ছবি গড়ে। তাকেই বলা হয় গান।

যে কথা বলতে চাই এবং যা দেখাতে চাই, তার বিষয়বস্তুর প্রকাশ-ভঙ্গীই হচ্ছে তার 'আর্ট'। প্রাচীন কালের বিখ্যাত শিল্পী অথবা কবিরা যে নিদর্শন রেখে অমর হয়েছেন, তার প্রকাশ-ভঙ্গীর পরিবর্তন যদি কোন দিন না হতো দেওয়া হ'ত, তবে আজ সাহিত্য কিংবা শিল্পের অগ্রগতি ধেমে যেত। কারণ, আধুনিক কালের কোন কবি কিংবা লেখক পুরনো লেখার নকল না করে যদি নতুন ভাবে প্রকাশ করেই থাকেন তাতে তাঁদের সৃষ্টির মাহাত্ম্য কিছুমাত্র কমে নাই। শিল্পী বিভিন্ন রকমে চিরকাল ধরে একই কথাকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ করে আসছেন।

বিজ্ঞানের দিক থেকেও এ কথা বলা চলে যে, বৈজ্ঞানিক প্রকৃতির যে সব নিয়ম আবিষ্কার করেছেন সেগুলোকে কাজে

লাগিয়ে তাঁরা তাঁদের কল্পনাকে বাস্তবে পরিণত করেন এবং তার মধ্যেই রয়েছে তাঁদের সৃষ্টির পথ। সেইরূপ সকল



বনের ভিতর গরীবের ঘর

কেড়েই শিল্পে সত্যের স্পর্শ থাকা নিতান্তই প্রয়োজন। অবশ্য যখন 'রূপ কথা' মানে 'রূপ ও কথা' তখন কথা দিয়েই যে রূপ সৃষ্টি করা হয় সেটা নেহাৎ রূপক হলেও সত্যের কাঠামোটা কিছু থেকেই যায়। অগতঃ সব লোকের কাছেই ভাল লাগা

এবং না লাগার কথা আছে। স্তব্ধাং
পৃথক পৃথক ভালর প্রকাশ ভিন্ন ভিন্ন
শিল্পীর হাতে বিভিন্ন রকমে হয়। আসলে
মানুষ কত সুন্দর করে যে বাঁচতে জানে,
এই আশ্বপ্রেসাদ আছে সকল রচনার
পিছনে। বিজ্ঞানের কল এবং কলে গড়া
মানুষকে দ্রষ্টা বলা চলে না। জগবান ও
মানুষকেই শুধু দ্রষ্টা ও স্রষ্টা হুই-ই বলা
চলে।

ছবি আঁকা সহজে এখন গুটিকতক
কথা বলতে চাই। মোটামুটি ভাবে তা
হচ্ছে এই :

ল্যাঙ্কশেপ পোর্ট্রেট এবং সামাজিক
পৌরাণিক ও কাল্পনিক বিষয়বস্তু এই কয়
ধরনের ছবিই সচরাচর আঁকা হয়। কি
করে ল্যাঙ্কশেপ আঁকলে ভাল দে খাবে ?
দেখা গেল—বিরাট আকাশ, মাটি-জল
এবং তার পারিপার্শ্বিক সব কিছুকে নিয়ে
ভাল লাগছে। এই যে দেখছি আরও
এমন দেখেছি কিনা ? আর এর ভেতর
নূতন কি ? নূতন স্বভাবতই চোখে
আগে পড়ে। নূতন কিছু থাকলে মনে
একধেয়ে লাগে না এবং লাগে না বলেই
দুশী হয়।

আকাশ এবং মাটির ভিতর যা আছে
তার সব কিছুকে নিয়ে ছবি আঁকলে
সাধারণতঃ ভাল না লাগবারই কথা।
যখন টেনের কামরায় বসে জানালা দিয়ে
একই দৃষ্টিকে টুকরো টুকরো করে দেখি,
মনে হয়, ঠাঁড়িয়ে দেখার চেয়ে গতিশীল



শ্রীবিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত



ডাকঘর : রবীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ

অবস্থায় দেখাটাই ভাল লাগছে। একটা
গাছ, দিগন্ত ও হেঁটেচলা একটা লোক
—এইটাই চোখে পড়ল বেশী। এই
সামান্য দৃষ্টিকে ছবিতে পরিণত করে
যখন দেখি, তখন দেখা ও অদেখা অনেক
কিছু তার সঙ্গে যোগ করে দেখি। মনের
চোখ দিয়ে চাওয়া এবং চোখে দেখা এই
দুই ইচ্ছারই পরিতৃপ্তি হয়। ছবছ সবটুকু
আঁকলে মনে মনে আর দেখা হয় না,
মন ভাতে খালি থাকে। তাই বলে
বীথিকার মধ্যে গৃহস্থ-নারীদের সংসার-
যাত্রার ছবি আঁকলে যে অনেকগুলো
গাছপালা, ঘর ও কয়েকটি লোকজনের
ছবি বাপছাড়া হবে, তাও নয়। আবার
হাটের অথবা রাস্তার ছবি আঁকলে যে



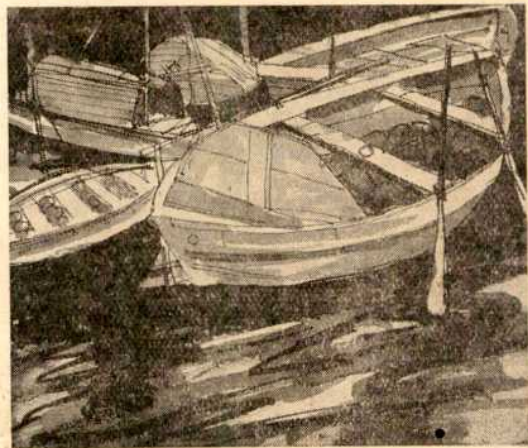
পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু

একটি মাত্র লোক দিয়ে হাট কিংবা রাস্তাকে পরিপূর্ণ বুঝাবে, তেমন কথাও বলি না।

উদ্দেশ্যের অসুপাতে যা দরকার এর বাইরে যেগুলো থাকবে তাকে বর্জন করতে হবে। আবর্জনাযুক্ত না করে মুক্ত করতে হবে। সাধারণতঃ সকল ক্ষেত্রেই এই রকম একটা নিয়ম গড়ে তোলা হ'ল বলে ব্যতিক্রম যে হওয়া নিষেধ এমন কোনও আইন নেই। নৌকাকে গতিশীল ও স্থিতিশীল উভয় অবস্থায় দেখায় একই ধরনের আনন্দ।

পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে জগৎব্যাপী সব কিছুই দ্রুত গতিতে চলেছে। চল্লিশ বছর যার আয়ু অর্ধেক জীবন তার ঘুমে কাটে, দশ বছর তার শৈশবকাল, লেখা-পড়া, মাঠের খেলাধুলা, আড্ডা দেওয়া ইত্যাদিতে সাত বছর, পেটের ঝাঁঝ দূরাকেরার আড়াই বছর। এই উচ্চলিঙ্গ বছর ছয় মাস

কুরিয়ে যাবার পর যখন দেখে যে, জগতের কোনও কাজে লাগে নাই—তখন হতাশার অনেকের জীবন-প্রদীপ ভিমিত-প্রায় হয়ে আসে। আজ সবাইকে জগতের অনেক সমস্যার বোঝা মাথা পেতে নিতে হচ্ছে। সময়ের অপব্যয়কে সংক্ষেপ না করলে বেঁচে থাকা দুষ্কর। এ যুগের শিল্পীর পক্ষে এ কেন সুন্দর, এ কিসে সুন্দর, এ সকল খণ্ডার পর খণ্ডা বিচার করে দেখার সময় ও সম্ভাবনা কম। সময় অল্প, কিন্তু দিতে হবে বেশী, এমন তাগিদে সকলের পক্ষেই গতিশীল না হয়ে আর উপায় রইল কই? স্থলে ও জলে গরুর গাড়ী ও নৌকার চেয়ে বর্তমানে মোটরগাড়ী জাহাজ ও উড়ো-জাহাজ বেশী প্রয়োজন। সময় অল্প বলে, অল্প কথায়, অল্প রেখায় ভাব-প্রকাশের ধরনে পরিবর্তন দেখা দিয়েছে, তার ভালমন্দের বিচার এখনও হচ্ছে, পরেও হবে। অল্প সময়ের দেখাকে ছবিতে হিজিবিজি লাইন টেনে প্রকাশ করা হয়। অবশ্য প্রকাশ করতে রেখার উপর অনেকখানি দখল থাকা দরকার। উদ্দেশ্যের নিয়মানুবর্তিতা ও লক্ষণ লাইনের Stroke এবং Force অনেকখানি ফুটিয়ে তোলে। তারই মধ্যে 'চাপ' অত্যন্ত বেশী, কেচ বলতে ঐ রকমই বুঝায়। একে অসম্পূর্ণ বলব, সম্পূর্ণ বললেও ক্ষতি নেই। কিন্তু সম্পূর্ণের সঙ্গে অসম্পূর্ণের প্রভেদ যেমন গুরুতর বলে মনে হয় আসলে তেমন নয়। কারণ অসম্পূর্ণকে মন



ঘাটের কোলে



বাহ্য শক্তি

দিয়ে পূরণ করে নিলেই, দর্শককে বঞ্চিত করা হয় না; বরং তৃপ্তি বেশী দেওয়া হয়। মনের ভেতর সাড়া বেশী জাগায়। রং দিয়েও এই পদ্ধতি কার্যে পরিণত করা যায় কিনা? এই প্রশ্নের উত্তরে বলব রং তুলির টানে এটা ওটার সঙ্গে সঙ্গে এদিক ওদিক গিয়ে যে-রূপ সৃষ্টি করে, তার মধ্যে সবলতা (boldness) প্রচুর ও বেগ (speed) অত্যন্ত প্রধর।

ছবির মধ্যে আলো-ছায়ার (Light and Shadow) দিকে নজর না রাখলেও ক্ষতি নাই। চাঁদকে অনেকে কালো করেও আঁকে। শুভ্র বস্তু কালোতে পরিণত হওয়ার ভাল লাগে, এও দেখা গেছে।

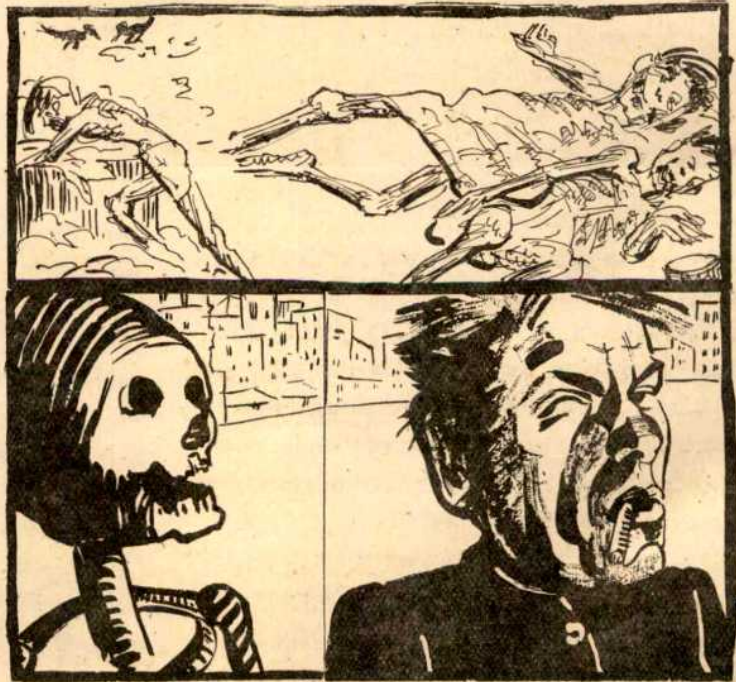
সামাজিক ছবির বেলায় যখন মজুর ও চাষীদের ছবি আঁকা হবে, তা দেখতে কেমন হবে? জীবিকা নির্বাহ তারা কি করে করে? শহরের বাইরে এদের বস্তু। এরা দৈনন্দিন জর্জরিত এবং মানুষের মত এদের বেঁচে থাকার নয়, ধনীর দরজার শক্তি ব্যয় করে এরা উদরপূর্তি করার চেষ্টা করে। এই অসমত্ব (contrast) দেখাতে হবে সমৃদ্ধিশালী নগর অথবা শহরের পাশে অত্যন্ত নোংরা অপরিচ্ছন্ন বস্তুর ছবি আঁকে। গণ-আন্দোলনকে যদি ছবিতে রূপায়িত করতে হয় তা হলে কি করতে হবে? গণ-আন্দোলনের ছবি হবে—‘বাদ্য, অর্ধ ও বজ্র চাই,’ এই মনোভাবের প্রকাশক। এরা কেমন করে এবং কি ভঙ্গীতে নিজেদের

দাবি জানাচ্ছে—তা ছবির দেখানো চাই।

জাহাজ অথবা কল-কারখানা কয়লার সাহায্যে চলে, নৌকা চলে বাহ্য শক্তিতে। পুঁজীবাদীর সঙ্গে শ্রমিকের এই যে তফাৎ তা দেখিয়ে তার জীবনযাত্রার প্রতিটি ঘটনার বহু রকমের ছবি আঁকা যায়। তেমনি দালাল ও মহাজন খাদ্য-শস্ত্র মজুত রেখে যে প্রলয়ঙ্করী দুর্ভিক্ষ ঘটলে তোলে তার ছবিও হবে এই ধরনের যেন তা মর্মে স্পর্শ করে। এ ধরনের ছবির উদ্দেশ্য হবে বৃহত্তর সমাজের সম্মুখে যারা লালিত ও অসহায় তাদের স্বরূপ উদ্ঘাটিত করা এবং কারা এর জন্ত দায়ী তা দেখিয়ে দেওয়া।

বর্তমান পরিস্থিতিতে দেশে

ও দেশের জনগণের মধ্যে ব্যাপকভাবে ওলটপালট চলেছে। মানুষ তাই নিয়ে যে সারাক্ষণ ব্যাপৃত। শিল্পীরও সমসাময়িক প্রতিটি ঘটনার ছবি আঁকা প্রয়োজন। অতীত কালের শিল্পকলা পর্যালোচনা করলেও দেখি, যখন যা ঘটেছিল তাই নিয়ে বহু ছবি আঁকা হয়েছিল। আজকের দিনে শিল্পকলার দ্বারা সমাজের কল্যাণে নিয়োজিত হওয়া



দুর্ভিক্ষ ও দুর্ভিক্ষকারী দালাল

অভ্যাবশ্যক, কারণ শিল্পই মানুষের মনে অনুপ্রেরণা জাগিয়ে তুলতে পারে। মনুষ্য-সমাজে একটা বিপর্যয় ব্যাপার যে বর্ধমানমূলক মনোবৃত্তির দ্বারা সংঘটিত হচ্ছে তার পুনরারুতি প্রতিরোধ করতে শিল্পীদের আজ দেশকর্মী হতে হবে। যত দিন পর্যন্ত সকলে মাথা তুলে দাঁড়ানোর ক্ষমতা না পাচ্ছে, তত দিন শিল্পীর তুলিতে গণ-আন্দোলনের ছবি ফুটিয়ে তুলতে হবে। আসলে news and views যে ছবির একটা প্রধা-
অঙ্গ এইটাই আজ বিশেষ করে উপলব্ধি করবার সময় এসেছে পোট্রেট ও পৌরাণিক ছবি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু লেখাও প্রয়োজন কম। তবে প্রতিকৃতির অর্থ প্রতিবিশ্ব নয়, কোনো

লোকের মুখের আদল ও ধরণ-ধারণ কোন প্রকারের তার উপর জোর দিয়ে, তার প্রকৃতিগত বিশেষত্ব ফুটিয়ে তোলাই প্রতিকৃতির মোটামুটি অর্থ। জোর করে স্মন্দ করাটা সুসমঞ্জস শিল্পজ্ঞানের পরিচায়ক নয়।

পৌরাণিক ছবিতে পুরনো গল্পের ব্যাখ্যা করাই প্রধান কাজ। কাল্পনিক ছবি ও পৌরাণিক ছবি বর্তমানে দুইই সমান, কারণ অতীতের ঘটনাকে বর্তমানে কল্পনা করেই নিতে হয়।

সামাজিক ছবি ছাড়া আর যে সব ছবি আঁকা হয় তারও প্রয়োজন সমাজের কাছে বেশ আছে।

স্বাধীনতা ও বাংলা ভাষা

অধ্যাপক শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

দীর্ঘকালের পরাধীনতার বন্ধন হইতে দেশ আজ মুক্ত। কলে গুরুদায়িত্ব আঁক তাহাকে মাথা পাতিয়া লইতে হইল। সকল বিষয়ে আজ তাহাকে স্বাবলম্বী হইতে হইবে—পরের মুখ চাবিয়া থাকিলে আর চলিবে না—বিদেশের অঙ্গ অনুকরণ আর তাহার পক্ষে শোভা পাইবে না। কেবল বাহির হইতে নয়, অন্তর হইতে তাহাকে বিদেশী পরগাছা উপড়াইয়া ফেলিতে হইবে। বিদেশ হইতে নানা উপকরণ তাহাকে সংগ্রহ করিতে হইবে নিজের পরিপুষ্টি ও শোভারুদ্ধির জন্ত—তাহারই চাপে যাহাতে নিজের আকৃতি ও প্রকৃতি বিকৃত না হইয়া যায় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্ত—আমাদের স্কুল কলেজ আপিস আদালত সভাসমিতির কাজকর্মে, এখন হইতে যথাসম্ভব দেশীয় ভাষার আশ্রয় লইতে হইবে। বিদেশী ভাষাকে অবশ্য ত্যাগ করিব না। বিদেশের সহিত, দেশের মধ্যে বিভিন্ন প্রদেশের সহিত ভাবের আদান-প্রদানের জন্ত বিদেশী ভাষাকে গ্রহণ করিতে হইবে, বিদেশী জ্ঞানবিজ্ঞানের দ্বারা নিজের দেশীয় সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতে বিদেশী ভাষা ও সাহিত্যে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য অর্জন করা অনেকের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় হইবে, কিন্তু তাই বলিয়া একই প্রদেশের মধ্যে পরস্পর কথা বলায়, চিঠিপত্র লেখায় যে ইংরেজী-মিশ্রিত দেশীয় ভাষাপ্রয়োগের ব্যাধি দেশের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে তাহার আশু প্রতিবিধান অবশ্যকর্তব্য। চিঠিখানি যদি বা বাংলায় লিখি, তাহার শিরোনামা ইংরেজী অক্ষরে লিখিবার লোভ আমরা করজন সংবরণ করিতে পারি? করজনে নিজের বইয়ে মালিকের নাম হিসাবে, নিজের নাম বাংলায় লিখিয়া রাবি? বাড়ীর নাম ও মালিকের নাম ইংরেজী হরফে বিজ্ঞাপিত করাই মর্যাদাহীন বুলিয়া ধারণা করি। অতি-সাধারণ ব্যক্তিও চিঠির কাগজের শিরোনামে ইংরেজী অক্ষরে

নিজের নাম মুদ্রিত করিয়াই পৌরবোধ করেন। ব্যাধির ব্যাপকতার ইহাই হইল প্রধান লক্ষণ। সকলকে সমবেত ভাবে একাগ্রচিত্তে সংকল্প করিয়া এই মানসিক ব্যাধি হইতে মুক্ত হইতে হইবে। ব্যাধিজনিত মোহ কাটিয়া গেলেই নিজের দেশের ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা জাগিয়া উঠিবে এবং তাহার উৎকর্ষ সাধনের জন্ত একান্তিক আগ্রহ ও চেষ্টা দেখা দিবে।

অনেকের ধারণা নিজের মাতৃভাষা শিক্ষার জন্য বিশেষ যত্ন ও প্রয়াসের প্রয়োজন নাই। ফলে ইংরেজী শিক্ষার জন্য আমরা যে পরিমাণ পরিশ্রম করি মাতৃভাষা শিক্ষার জন্য তদনুপাতে কিছুই করি না। তাই যখন মাতৃভাষার মধ্য দিয়া কোন গুরু বিষয়ের আলোচনা করি তখন ভাষার অন্তরালে বিদেশী ছাপ লক্ষ্য করা যায়। ইহার বিকট রূপ, ইহার দেশীয় আকৃতি ও বিদেশী প্রকৃতি সাধারণ পাঠকের চিত্তকে বিভ্রান্ত করিয়া তুলে। কারণ বিদেশী চিন্তাধারা দেশীয় ধরণে প্রকাশ করিবার ক্ষমতা আমাদের অনেকেরই নাই। অনুবাদের বেলা এই অক্ষমতা চরমমাত্রায় উঠে। তাই অনেক ক্ষেত্রে বাংলা সংবাদপত্রের ইংরেজী সংবাদের যে অনুবাদ প্রকাশিত হয় তাহা পাঠকের নিকট দুর্বোধ্য হইয়া পড়ে—তাহা পড়িয়া অনেক সময়ই মূলের তাৎপর্য ঠিক ধরিতে পারা যায় না। সেইজন্য অনেক বাংলা সংবাদপত্র না পড়িয়া ইংরেজী সংবাদপত্র পড়িতে বাধ্য হন। জনসাধারণকে কোন রূপে দুধের আশ্বাদ ঘোলে মিটাইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। বিদেশী ও দেশী উভয় ভাষারই দৌলদার ও মাধুর্যের আশ্বাদ হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত থাকিতে হয়।

এই অনুবিধা দূর করিতে হইবে—দেশের জ্ঞানসাধারণের মধ্যে দেশবিদেশের জ্ঞানভাণ্ডার উন্মুক্ত ও সুখপ্রবেশ করিয়া তুলিতে হইবে। স্বাধীনতাসৌধের ভিত্তিপত্তন এইরূপ ভাবেই

করিতে হইবে। দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের উৎকর্ষসাধন ব্যতীত দেশের প্রকৃত উন্নতি হইতে পারে না, একথা ভুলিলে চলিবে না। সুখের বিষয়—দেশের শাসনব্যবস্থার তার বাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা এ বিষয়ে উদাসীন নহেন। দেশের শিক্ষাব্যবস্থা সর্বোচ্চ মান পর্যন্ত দেশীয় ভাষার মধ্য দিয়াই হওয়া উচিত। পশ্চিম বাংলার প্রধান মন্ত্রী মহাশয় তাহা স্পষ্টতই স্বীকার করিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও এ বিষয়ে তাঁহাদের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। কলিকাতা কর্পোরেশনের অধিকনায়ক প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে আনুমানিক ব্যবস্থা সম্পন্ন হইলেই পৌর সভার কার্য বাংলা ভাষাতে নির্বাহিত হইবে। বাংলা ভাষার অনুরাগীদের পরম আশ্বাসের কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু সর্ব বিষয়ে বাংলা ভাষার প্রয়োগ সম্প্রদারণের পূর্বে বা সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে আধুনিক ভাবপ্রকাশের উপযোগী শব্দ সংকলনের ব্যবস্থা অবশ্য-করণীয়। এইরূপ ব্যবস্থার অভাবে ইংরেজীগন্ধি ভাষা অনেক ক্ষেত্রে ইংরেজী না জানা ব্যক্তির পক্ষে দুর্বোধ্য বা অস্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছে। লেখকগণ যে যাহার প্রয়োজন ও বেয়াল-মত ইংরেজী শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ সৃষ্টি করিয়া থাকেন—অনেক ক্ষেত্রে এক জনের সঙ্গে আর এক জনের কোনও মিল থাকে না। কোন কোন ক্ষেত্রে ভাল মন্দ বিচার না করিয়া এক জনের সৃষ্ট শব্দ অপরে গজালিকা প্রবাহের মত অহুঙ্করণ করিয়া চলেন—বহু স্থলে অপ্রসিদ্ধ লেখকের সৃষ্ট উৎকৃষ্ট শব্দ-সাহিত্য-ব্যবসায়ীর দৃষ্টি এড়াইয়া যায়। ফলে এ বিষয়ে বাংলা সাহিত্যে এক বিরাট বিশৃঙ্খলার রাজত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। 'সাহিত্যের হটগোলে এমন শব্দের আমদানি হয়, যা ভাষাকে চিরদিনই গীড়া দিতে থাকে।' রবীন্দ্রনাথের এই উক্তির যথার্থ্য আমরা পদে পদে অনুভব করিতেছি। মনীষিবর্গের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হয় নাই বলা যায় না। বহু দিন পূর্বে স্বর্গত সিরিশচন্দ্র বসু মহাশয় বিদেশী শব্দের আক্ষরিক অহুবাদের অসুবিধার উল্লেখ করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি আধুনিক বাংলার ব্যবহৃত এই জাতীয় শব্দের একটি তালিকা সংকলন করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এ সম্বন্ধে দুইটি প্রবন্ধ লিখিয়া-ছিলেন 'অনুবাদ-চর্চা' প্রবন্ধে তিনি ইংরেজীর অনুবাদে সাধারণতঃ যেরূপ ত্রুটিবিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়, তাহার আলোচনা করিয়াছিলেন। 'শব্দচয়ন' প্রবন্ধে তিনি ইংরেজী শব্দের অনুবাদ হিসাবে বাংলার ব্যবহৃত কতকগুলি শব্দের দোষত্রুটি দেখাইয়াছেন এবং অহুবাদের নমুনা হিসাবে সংস্কৃত শব্দভাণ্ডার হইতে কতকগুলি শব্দ সংকলন করিয়া দিয়াছেন। তাহা ছাড়া, বিভিন্ন পুস্তকে তিনি নানা প্রসঙ্গে অনেক উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট নূতন শব্দ তৈয়ার করিয়াছেন।

বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানও এই বিষয়ে অনেক কাজ করিয়াছেন। খ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদ হইতে প্রায় নিয়মিতভাবে বিভিন্ন বিজ্ঞানের পারিভাষিক শব্দের বাংলা

প্রতিশব্দ সংকলনের চেষ্টা হইতেছে। এই চেষ্টার ফল নানা সময় নানা পত্রিকায় স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রকাশিত গ্রন্থ ও নিবন্ধের একটি তালিকা কিছুদিন পূর্বে ত্রিযুক্ত জানেন্দ্রলাল ভাট্টা মহাশয় প্রকাশ করিয়াছেন। এই তালিকা যে সর্বাংশে সম্পূর্ণ তাহা বলা যায় না। তাহা ছাড়া, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে প্রকাশিত সংকলনও প্রচুর রহিয়াছে।

কিন্তু কার্য যতদূরই অগ্রসর হইয়া থাকুক না কেন এ বিষয়ে এখনও প্রচুর কাজ বাকী রহিয়াছে। বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের অপ্রাচুর্যবশতঃ অনেক পরিভাষা অব্যবহৃত রহিয়া গিয়াছে—অনেকগুলির ব্যবহারযোগ্যতা ও অর্থপ্রকাশক্ষমতা এখনও সম্যক আলোচিত হয় নাই। পরিভাষাগুলি সাধারণতঃ বৈজ্ঞানিকেরাই তৈয়ার করিয়াছিলেন। ভাষা ও সাহিত্যের দিক হইতে তাহাদের উপযোগিতা বিচার করা হয় নাই। এক্ষণে চাই সাহিত্যিক ও সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের সহযোগিতা। বস্তুতঃ পরিভাষা-রচনা কোন বিষয়বিশেষে পারদর্শী ব্যক্তিবিশেষের কার্য নহে। এই প্রসঙ্গে ত্রিযুক্ত রাজশেখর বসু মহাশয় তাঁহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে যাহা বলিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। বসু মহাশয় বলেন—

'বলা বাহুল্য এই কাজে বিভিন্ন বিদ্যায় বিশারদ বহুলোক চাই। তাঁদের মৌলিক গবেষণায় খ্যাতি অনাবশ্যক, কিন্তু বাংলা ভাষায় দখল থাকা একান্ত আবশ্যক। যে সমিতি সংকলন করবেন তাঁদের মধ্যে দু-এক জন সংস্কৃতজ্ঞ থাকি দরকার। এমন লোকও চাই যিনি হিন্দী উর্দু পরিভাষার ধর রাখেন। সর্বোপরি আবশ্যক এমন গুণী লোক যিনি শব্দের সৌষ্ঠব ও সুপ্রয়োজ্যতা বিচার করিতে পারেন, বিশেষতঃ সংস্কৃত শব্দের।'

এই ক্ষণেই প্রবেশিকা পরীক্ষায় সমস্ত বিষয়ের পঠনপাঠনে মাতৃভাষার প্রবর্তনের স্থচনায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞানের পরিভাষা সংকলনে যে ব্যবস্থা করিয়া-ছিলেন তাহাতে কেবল বৈজ্ঞানিকদিগের উপরই সমস্ত ভার দ্রুত হয় নাই। বৈজ্ঞানিকগণ স্ব স্ব বিষয়ে পরিভাষা সংকলন করিয়া কেন্দ্রীয় সমিতি বা সমন্বয় সমিতির নিকট উপস্থাপিত করিতেন। এই সমিতির সভ্য ছিলেন বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক ও সংস্কৃতব্যবসায়ী। দেখা গিয়াছে—এই সমিতির অধিবেশনে অনেক সময় এক একটি শব্দ লইয়া দীর্ঘকাল আলোচনা চলিয়াছে। বৈজ্ঞানিকের প্রস্তাবিত শব্দ সম্বন্ধে সাহিত্যিক ও সংস্কৃত পণ্ডিতের সম্মতি লওয়া হইত। কোন শব্দ সম্বন্ধে তাঁহাদের আপত্তি থাকিলে তাঁহারা অথানুসারে নূতন শব্দ গঠন করিয়া দিতেন এবং বৈজ্ঞানিকের সম্মতি হইলে উহা গৃহীত হইত। এই অতিসুন্দর পদ্ধতি অহুসারে কাজ হইলেও অবশ্য সর্বত্র সফল পাওয়া যায় নাই—প্রস্তাবিত সমস্ত শব্দ গ্রহণযোগ্য বা নির্দোষ হয় নাই। তবে সেজন্য পদ্ধতির ত্রুটি দেওয়া চলে না। এই পদ্ধতিকে সর্বথা কার্যকর ও সফল হইতে হইলে পরিভাষাসমিতির সকল সদস্যের ঐকান্তিকতা ও কর্মনিষ্ঠা অবশ্যপ্রয়োজনীয়—ইহার অভাবে প্রতিপদে ত্রুটির

সম্ভাবনা স্বাভাবিক। বিবিধ কর্মের মধ্যে বিক্ষিপ্ত চিত্ত লইয়া অবসরবিনোদনের ক্ষুদ্র সভায় বসিয়া কাজ করিবার উপায় নাই। এই সমিতির কার্যের উপর দেশীয় সাহিত্যের ভবিষ্যৎ ত্রিযুগি নির্ভর করিতেছে। সুতরাং ব্যস্ততাসহকারে দায়িত্ব উপেক্ষা করিয়া ‘ঘেন তেন প্রকারেণ’ কাজ করিলে চলিবে না, কয়েকজনকে এই কার্যের গুরু দায়িত্ব মাথা পাতিয়া লইতে হইবে—ইহাকে জীবনের ত্রুটি হিসাবে, সাধনা হিসাবে গ্রহণ করিতে হইবে।

কেবল বিভিন্ন বিজ্ঞানবিষয়ক শব্দ নয়, বিজ্ঞানের গুরুত্ব অনেক সাধারণ শব্দেরও সার্থক প্রতিশব্দ উদ্ভাবন করিতে হইবে। বৈজ্ঞানিক শব্দ অপেক্ষা ইহাদের দৈনন্দিন প্রয়োজন অনেক বেশী। প্রতিদিন ধবরের কাগজ মারফত এই জাতীয় বহু শব্দের সাফাংকার ঘটে—কিন্তু সূষ্ঠা অমুবাদের অভাবে অনেকক্ষেত্রে প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারা যায় না। যদুচ্ছাফ্রমে কয়েকটি উদ্ভূত করার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিতেছি না। নিশ্চল অবস্থা বা স্থিতাবস্থা (Standstill arrangement), হিন্দু-সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল (Hindu majority area), বায়ুশীতল (air-conditioned), প্রার্থনাস্তিক বক্তৃতা (post-prayer speech), গণপরিষদ (Constituent Assembly), বনিয়াদি শিক্ষা (basic education), যমবিপ্লু (freezing point)। এইরূপ আরও বহু শব্দ আছে, বিস্তৃত তালিকা উপস্থাপিত করার অবকাশ এখানে নাই। অবশ্য নিঃসংশয়ে বলা চলে যে একটু চিন্তা করিবার অবসর পাইলে এই সকল স্থলে সুন্দরতর অর্থক শব্দ নিরূপণ করা খুব কঠিন ব্যাপার নহে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যাহা বলিয়াছেন তাহা স্মরণ রাখা দরকার। তিনি বলিয়াছেন—‘ইংরেজীতে যে সব শব্দ অত্যন্ত সহজ ও নিত্যপ্রচলিত, দরকারের সময় বাংলার তার প্রতিশব্দ সহসা খুঁজে পাওয়া যায় না, তখন তাড়াতাড়ি যা হয় একটা বানিয়ে দিতে হয়। সেটা অনেক সময় বেখাপ্পা হয়ে ঝাঁড়ায়, অনেক সময় মূল ভাবটা ব্যবহার করাই স্থগিত থাকে। অথচ সংস্কৃত ভাষায় হয়তো তার অবিকল বা অমুরূপ ভাবের শব্দ চুল্লভ নয়।’ বস্তুতঃ সংস্কৃতের সাহায্যে প্রকৃতার্থবোধক শব্দপ্রণয়ন দুঃসাধ্য নহে। উদ্ভূত শব্দগুলির স্থলে আমিকুয়েকটার কিছু কিছু পরিবর্তন এই প্রসঙ্গে প্রস্তাব করিতে পারি। যথাপূর্ব বা যথাস্থিত ব্যবস্থা, হিন্দুবহুল বা হিন্দুভূমিষ্ঠ অঞ্চল, তাপনিয়ন্ত্রিত, প্রার্থনাস্ত বক্তৃতা, সংঘটন পরিষদ বা গঠন পরিষদ—এই শব্দগুলি বোধ হয় নিশ্চল অবস্থা বা স্থিতাবস্থা, হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল, বায়ুশীতল, প্রার্থনাস্তিক বক্তৃতা, গণ-পরিষদ প্রভৃতি নবপ্রবর্তিত শব্দ হইতে অধিক অর্থজোতক ও ভাষার দিক হইতে দোষমুক্ত।

তবে এই ব্যাপারে আমরা সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া পড়িয়াছি।

- বাংলা শব্দটি ভাল হইল কি মন্দ হইল তাহাতে সাধারণের কিছু আসিয়া যায় না, সাহিত্যিকেরাও অনেক ক্ষেত্রেই ইহা লইয়া আলোচনা করার প্রয়োজন অনুভব করেন না—অনেকে জনান্তিকে বাংলা লেখকদের যথেষ্টচারিতার ইঙ্গিত করি-

য়াই পরিতৃপ্তি লাভ করেন। জীবিত ভাষার দোহাই দিয়া ও এইরূপ আলোচনাকে পাণ্ডিত্যের আড়ম্বরমাত্র বলিয়া উপহাস করিয়া আলোচনার মুখ বন্ধ করিবার লোকেরও অভাব নাই। আমরা নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছি—জীবিত ভাষার নির্ধারিত গতিতে নিয়ন্ত্রিত, করিবার চেষ্টা বাতুলতামাত্র—উচ্ছ্বলতাই ইহার শোভা, নিয়মনিষ্ঠা ইহাকে পুঙ্খ ও বিকৃত করিয়া ফেলিবে। তবে বাস্তবিক্যে প্রচা করিলেও উচ্ছ্বলতার আবিপত্য কোনও ভাষাই উপেক্ষা করে বলিয়া মনে হয় না। তাই পণ্ডিতসমাজে ভাষার খুঁটিনাটি লইয়া আলোচনার প্রচলন সর্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। দুঃখের বিষয়, প্রায় দেড় শত বৎসর হইল শিক্ষিত বাঙ্গালী বাংলা ভাষার চর্চায় বীরে বীরে মনোনিবেশ করিতে থাকিলেও এ বিষয়ে তাহার তেমন দৃষ্টি পড়ে নাই। এ বিষয়ে বাঙ্গালীর মনোভাবের বিশ্লেষণ করিয়া রবীন্দ্রনাথ সত্যি বলিয়াছেন—‘পদ্মবনে মত্তকরীসম বাংলা-ভাষার বানান এবং ব্যাকরণ ক্রীড়াচ্ছলে পদদলিত করিতে পারেন অথচ ভ্রমক্রমে ইংরেজীর কোঁটা বা মাত্রার বিচ্যুতি ঘটিলে ধরণীকে দিবা হইতে বলেন।’

কিন্তু আজ আমাদের এ মনোভাব ত্যাগ করিতেই হইবে। বাংলা ভাষার বিস্তারিত ও বিকাশসাধনের ক্ষমতা আমাদের কাছে অনেক মনে-প্রাণে চেষ্টা করিতে হইবে। বিদেশী-ভাষাধারাকে নিজের ভাষায় নিজের মত করিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

এই কাজের ক্ষমতা বিশেষজ্ঞদের যদুচ্ছ সাধাবসর চেষ্টার উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে চলিবে না। আজ দেশের শাসন ও রক্ষণের ভার যাহারা গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদিগকে এ বিষয়ে অগ্রণী হইতে হইবে—শিক্ষা-বিভাগের সহযোগিতায় বিশেষজ্ঞদের লইয়া। একটি স্থায়ী সমিতি গঠন করিতে হইবে। সমিতির সদস্যগণের একমাত্র কাজ হইবে বাংলা ভাষায় আধুনিক ভাষা-প্রকাশের উপযোগী শব্দ সংকলন করা। এক্ষণে তাঁহাদিগকে জাপান তুর্কী প্রভৃতি দেশের ব্যবস্থা আলোচনা করিতে হইবে—অজ্ঞাত প্রদেশের অমুরূপ প্রতিষ্ঠানের সহিত সংযোগ স্থাপন করিতে হইবে—অজ্ঞাত প্রদেশে অমুরূপ প্রয়োজনে ব্যবহৃত শব্দ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইবে। সংস্কৃত সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগ মূল্যন করিতে হইবে—সম্পূর্ণরূপে এই কাজেই তাঁহাদিগকে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে—অজ্ঞাত কাজের ভার তাঁহাদের আর বহন করা চলিবে না—কারণ অজ্ঞাত কাজের অবসরে এ কাজ করিবার মত সময় সুবিধা ও মানসিক অবস্থা খুব কম লোকেরই হইতে পারে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিভাষা-সমিতির কর্মসম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে এটুকু নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে ঐ সমিতির কার্যের যাহা কিছু ক্ষুদ্র দেখা গিয়াছে বা যাইবে তাহার কারণ সমিতির সদস্যদের অনলক্ষ্য ও নিশ্চিন্ত হইয়া কাজ করিবার সুযোগের অভাব। ভবিষ্যতেও অমুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে অমুরূপ ক্ষুদ্র হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উপায় নাই—ইহা প্রবৃত্ত সত্য।

সঙ্গীতদামোদর

(বাঙ্গালীর রচিত চিরন্তন সঙ্গীত গ্রন্থ)

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

স্বর্গত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় একবার ছুঃখ করিয়াছিলেন, বাঙালী এক আত্মবিশ্বস্ত জাতি। সংস্কৃত সাহিত্যের বিরূপ ও সমৃদ্ধ ভাণ্ডারে বাঙালীর অবদান বিষয়ে বাংলার শিক্ষিত সমাজের অজ্ঞতা ও উদাসীনতাই তাঁহার ঐরূপ উক্তির মিতান। বর্তমানে বাংলাদেশে সংস্কৃতচর্চার শোচনীয় দুর্গতি ও দুর্দশার আর একটি তদ্রূপ পরিণতি দেখিয়া আমাদের আশঙ্কা হইয়াছে, বাঙালী আত্মবাস্তী জাতির মধ্যেও কালে পরিগণিত হইতে পারে। কোন প্রসিদ্ধ সংস্কৃতগ্রন্থকার বাঙালী ছিলেন বলিয়া উল্লেখযোগ্য প্রমাণ আবিষ্কৃত হইলে কোন কোন বাঙালী মনীষী ঐ প্রমাণ উপেক্ষা ও খণ্ডন করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। প্রাক্চৈতন্যযুগের একজন খাঁটি বাঙালীর রচিত সঙ্গীতশাস্ত্রের বিবরণ প্রকাশ করিয়া আমরা ঐরূপ আত্মহত্যা ও আত্মবিশ্বস্তির কলঙ্ক যৎকিঞ্চিৎ মোচন করিতে প্রয়াস পাইব।

“সঙ্গীত দামোদর” গ্রন্থের তিনটি মাত্র পৃষ্ঠা এখানে আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া আমরা জানি। তন্মধ্যে নবহীপাধিপতির গ্রন্থাগারে রক্ষিত ও রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র বণিত সম্পূর্ণ পুথি (L. 339, পত্রসংখ্যা ১২১, লিপিকাল ১৬৪৩ শক) এখন অপ্রাপ্য। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজেও একটি সম্পূর্ণ পুথি ছিল (Des. Cat., No. 30, 1913 pp. 420-24 জষ্টব্য, পত্র-সংখ্যা ৫৬, লিপিকাল ১৬৩৩ শক)। ছুঃখের বিষয়, বহুতর মূল্যবান পুথির সহিত ইহাও কলেজের পুথিশালা হইতে অদৃষ্ট হইয়াছে। আমাদের নিকট একটি বণিত পুথি আছে (পত্র সংখ্যা ৪৭) — তদ্বৃষ্টে এই বিবরণ সঙ্গীত হইল। গ্রন্থটি পাঁচ “শবকে” বিভক্ত। গ্রন্থারম্ভে প্রতিপাতবিষয় বর্ণনাজলে “কৃষ্ণলীলা” (১ম শ্লোক) ও “হরি”র তুষ্টি প্রার্থনা (২য় শ্লোক) করিয়া প্রমাণপত্নী উল্লিখিত হইয়াছে (Des. Cat., ঐ, পৃ, ৪২১ আমাদের পুথিতে এই অংশ লুপ্ত)। যথা—

জনয়তি সত্ততমিদমতীব মোদং লোচনমোঃ।

সঙ্গীতকল্পরূপে দশরূপে নাট্যদর্পণে যচ্ ॥৩

সঙ্গীতচূড়ামণি-রত্নকোষ-সঙ্গীতসর্কর-নটোরসীযু।

বসন্তি সর্বে চ গুণাঃ প্রযুক্তা ভাবাবলী-নারদসারদাসু ॥৪

যদ্যচ্ সারং ভরতাদিকেহু তত্তং সমাকৃষ্য রসাহুরাভং।

“ভক্তরঃ” সন্ত তমাদয়েণ সঙ্গীতদামোদরমাতনোতি ॥৫

“সঙ্গীতসর্কর” মৈথিল মধাপণ্ডিত জগদ্বরচিত বটে।

জগদ্বরের কালনির্ণয়ে ইহার উপযোগিতা লক্ষণীয়। গ্রন্থমধ্যে সর্বত্র উদাহরণজলে যমুনাবিহারী ত্রীকৃষ্ণের লীলা নিবদ্ধ হইয়াছে।

প্রথম শবকের প্রতিপাত বিষয় নাট্যভাব। তৎপ্রসঙ্গে ছয় জন আদি নাট্যশাস্ত্রকারের নামোল্লেখ আছে :—

বিরিক্ণিারদো রত্তা হুহুভরততুহুজ।

যডেতে নাট্যভাবানাং বজারো লোকবিশ্রুতাঃ ॥

স্বামিত্যব (৯) ব্যক্তিচারিত্যব (৩০) ও স্বাত্মিকতাব (৮) সমূহের নাম ও লক্ষণাদির পর চতুর্দশপ্রকার “হাবের” নাম ও লক্ষণ এবং অমুভাব বণিত হইয়াছে—

ভক্তরোক্তা ধৃতি চিত্রং নন্দননন্দয়ং।

জয়তি অ জয়ীকেশোঃ হুভাবৈবনীকৃতৈঃ ॥

তৎপরে ক্রমায়ত্তে অভিসারিকাদের গমনকাল (১২), নারিকাদের দশবিধ মনোভাব দশা, সঙ্কেতস্থান, দ্বাদশপ্রকার দূতী ও দ্বিবিধ বিভাবের ব্যাখ্যা শেষ করার পর সমাপ্তিহচক পরিচয়শ্লোক লিপিবদ্ধ আছে :—

খ্যাতো যঃ কবিত্ত্ববর্ধিপদভো বিভাচনৈরক্ষিতঃ

দৌভজ্জয়ময়ং যমজ্জয়মশাঃ সৌজ্জীকনং ত্রীধরঃ।

তস্ত্র ত্রীলভভক্তরত্ত ভণিতৌ সঙ্গীতদামোদরে

সঙ্গীতঃ তবকোঃ ভিলাকমভবো (৭) ভাবাদিনামাদিমঃ ॥পৃ৪

অর্থাৎ ভক্তরের পিতা ছিলেন বিদ্বৎপুঞ্জিত শুভ্রযশাঃ ত্রীধর “কবিত্ত্ববর্ধি” ও মাতা হুভবা। এই শ্লোকটিই কেবল শেষ পঙ্ক্তি পরিবর্তন করিয়া প্রত্যেক শবকের শেষে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। যথা—

বিস্তারী শবকো বকারিচরিতৈশ্চাক্ষরী দ্বিতীয়ো গতঃ ॥ পৃ ১২

তানাদ্যঃ শবকোঃ চ্যুতশবকুতো যাতত্বতীরঃ পটুঃ ॥ ১৯

বংহীয়াং শবকোঃ হারনটিনোচ্ছাটয়ন্তরীয়ো গতঃ ॥ ৩৯

সাভোগঃ শবকঃ প্রপকিতরসঃ ত্রীমানয়ং পৃকমঃ ॥ সর্বশেষে

দ্বিতীয়শবকে, (৪-১২) নানাবিধ নারিক (মোট সংখ্যা ৩৮৪, পৃ, ৫১২), চতুর্বিধ নায়ক, নাদ ও বহুবিধ গীতের বিবরণ আছে। স্থলে স্থলে বরাং আছে,

“এতেযামেলাদীনাং প্রবন্ধগীতানাং লক্ষণসহিতো ভেদঃ সঙ্গীতচূড়ামণি-সঙ্গীতরত্নাকরাদৌ বিশেষণ বোদ্ধব্যঃ।” (৭।১ “অতো লক্ষণমেভেযাং জেহং তুহুনাটিকে” (ঐ)। গ্রন্থকারের বিস্তৃত ব্যাখ্যার পর গ্রন্থকার লেখকের প্রতি সাবধানোক্তি করিয়াছেন,

অবলোপায়ুর্নো মগ্নমুদধার শুভকরঃ।

সাবধানৈরমং লেখ্যং লিপিদোষো যমঃ স্বয়ং।

কুজাটিনৈকোচ্ছাট্য তিমিরং যমনীপটঃ ॥ (১১।২)

গ্রন্থকার বহুস্থলে মনোহর শ্লোকে কৃষ্ণলীলা বর্ণন করিয়াছেন। দ্বিতীয় শবক হইতে একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইল :—

কণং-কনককিঙ্করগণিতসঙ্গিরঙ্গাঙ্গনে

মুদঙ্গননসৌভবধনিতভাজি বৃন্দাবনে।

সবংশমধুরাধরসুস্মিতগীতফুংকারতঃ

কুবদনয়নামনো বত জ্বহার হারী হরিঃ ॥ (১২।১)

তৃতীয় স্তবকে : (১২-১৩) স্বর, স্বরপ্রভার, গমক, গণ, মর্ছনা, বর্গ, তান, গ্রাম, রাগ রাগিণী, গীতপাদ, তাল, তাল-প্রভার ও তালবাতনপ্রকার বর্ণিত হইয়াছে। স্তবকসমাপ্তির একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইল :

শ্রীরঙ্গো মণিবন্ধকরণবহো মুক্তাবলীমণ্ডনঃ

কীড়াহেতুবসন্তরক্তহৃদয়ো গন্ধর্বলীলারতঃ ।

সাক্ষাৎপতিশচতুর্ধনতো যো রাজচূড়ামণিঃ

সৌম্য তালময়সুগেচু তৃণবৎ সংসারবন্ধং হরিঃ ॥

চতুর্থ স্তবক : (১৩-৩৯) সর্কাপেক্ষ, দীর্ঘ । ইহাতে শ্রুতি, বিদ্যুৎকাপি নামকসচিত্র, দূত, কলা, নানাবিধ বাদ্য, অঙ্গহার, বিষমাদ, নৃত্য, নাট্যাংগপুষ্টি প্রভৃতি নাটকীয় বস্তু বর্ণিত হইয়াছে। এক স্থলে (২৫।১) বর্ণিত “হস্তযুক্তাবলী” গ্রন্থের উল্লেখ আছে : “এতেষাং লক্ষণং মমৈব হস্তযুক্তাবলীগ্রন্থে জ্ঞাতব্যং ।”

“অতো মংকৃতহস্তযুক্তাবল্যাং সকলানি বিশেষতো বোদ্ধব্যানি ।

পঞ্চম স্তবকে : (৩৯-৪৭) প্রধানতঃ রসের লক্ষণাদিবিচার দৃষ্ট হয়। গ্রন্থকার বহুস্থলে অল্পবিস্তর নূতন কথা বলিয়াছেন, যাহা অন্যত্র পাওয়া যায় না। রূপকের উদাহরণস্থলে, “প্রহসন”মধ্যে “সুদৃং ক্রীড়াশঙ্করাখ্যাং সংকীর্ণং ভবদক্ষকং ।” যথা চ “ধূর্তসমগমং” নাম প্রহসনং (৩৪।২), উপরূপকের উদাহরণমধ্যে “দময়ন্তীসংহার” ও “বালিবধ” (প্রেক্ষণ) (৩৬।২), “সত্যভামা” (গোষ্ঠী) ও “মাহাত্ম্যাপালিক” (সংলাপ) (৩৭।১) উল্লেখযোগ্য। দ্বিতীয় স্তবকে নৃত্যে “বৃদ্ধা”র উল্লেখ কালে কৌতুকজনক কথা লিখিত হইয়াছে : “অথ “রাঢ়া”দি-দেশভেদেন কচিদন্থে বৃদ্ধা প্রকিংশতি । সা যথা ;

চক্ষুর্ভ্যাং কোটরাঙ্কী চ নাসয়া চৈব ঘেৎপরি ।

দন্তকঙ্কতিকাপাটী হস্তিকর্ণমুগা তথা ॥” ইত্যাদি (৫।২)

রসবিচারের শেষে আছে, “কচ্চিদন্থাৎ প্রেমমায়াহপবো রসোস্তি তন্মতে দশ রসা ভবন্তি ।...এতস্যৈব প্রেমমায়া রসস্ত “মালতীমাধবকীকায়ং” বৎসল ইতি নাম । অথাত্বে কেচিত্তু উদাত্তো বলদৈবতঃ উদ্ধতঃ পরশুরামদৈবত ইতি । বচনমক্ষিণা কাঞ্চনমিব চার্বীকাঃ ক্ষণভঙ্গমিব কদাচিৎ প্রাক্ষো ন মুঞ্চন্তি চেন তদানীং রসানাং দ্বাদশং ন ব্যভিচারতি । (৪৫।১) অর্থাৎ প্রেম অথবা বৎসলরস, উদাত্ত ও উদ্ধতরসের সংযোগে মোট রসের সংখ্যা প্রাচীনমতে দ্বাদশ, যদিও গ্রন্থকার স্বয়ং উদাত্ত ও উদ্ধত রসকে বীরকৌশলের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। রসের বিচারে এক জন প্রাচীন আচার্য্যের নামও গ্রন্থকার উল্লেখ করিয়াছেন :—

অতএবাহরাচার্য্য-“ভালুকি”প্রমুখা ইহ ।

অনৌচিত্যাদৃতে নান্যদ্রসভঙ্গ্য কারণং ॥(৪৫।২)

গ্রন্থশেষে রসবিচারের পর একটি মূল্যবান অঙ্কভিধান সংযোজিত হইয়াছে : “একঃ শান্তরসো ভক্তলোচনো রজনীমণিঃ ।” প্রভৃতি হইতে “হস্তিঃদবস্ত নৃপতঃ পুত্রাঃ কোটি

স্তম্বোদিতাঃ ।” পর্য্যন্ত (৪৫।৬) । দুঃখের বিষয়, একটি মাত্র পুঁথি অবলম্বনে এই গ্রন্থরত্ন মুদ্রিত করা যায় না।

গ্রন্থকারের পরিচয় : শেষস্তবকের পরিচয়শ্লোকে একটি বিশেষণ পদ আছে ‘নাভোগঃ’ স্তবকঃ । আভোগ হইতে একটি অংশবিশেষ—“যত্নৈব কবিনাম জ্ঞাৎ স আভোগ ইতীরিতঃ ।” (৭।২) পুরোক্ত অঙ্কভিধানের পর গ্রন্থকার সন্নিভার আশ্র-পরিচয় দিয়াছেন ।

নারায়ণানিরুদ্ধ-শ্রীধরকুলসিদ্ধকুমুদিনীবন্ধুঃ ।

দোষাকরতাড়কোহনকঃ স স্তম্বকরো জয়তি ॥

অর্থাৎ নারায়ণ, অনিরুদ্ধ ও শ্রীধরের বংশের অলঙ্কারস্বরূপ কলঙ্কহীন চন্দ্র স্তম্বকরের জয় হইতেছে। শ্লোকে তিন জন পূর্বপুরুষের নাম আছে ।

শ্রীদেবকীনন্দন-রাজশেখরো সুষেণ-দামোদরকো সহোদরো ।

এযাং মদীয়াঙ্গভুবাং চতুর্গাং কৃতে কৃতিং বিত্ত রসেন পূর্ণাং ॥

অর্থাৎ দুই পত্নীতে গ্রন্থকারের ৪ পুত্র হয়—দেবকীনন্দন ও রাজশেখর, সুষেণ ও দামোদর। ইহাদের জন্যই এই রসপূর্ণ গ্রন্থ রচিত হয়। স্তম্বকায় লক্ষ্য করিতে হইবে গ্রন্থকার বাক্যকো গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন ।

অপুনর্ভব এবাস্ত ভবশ্চেদিত্তি জগ্রহঃ ।

“লাহাড়ী”-কূলে জন্ম কবিতা-হরিভক্তয়ঃ ॥

অর্থাৎ কবিতা ও হরিভক্তি নামক দেবতা “লাহাড়ী” বংশে জন্মগ্রহণ করিলেন এই ভাবিয়া, যদি জন্মই হয় আর যেন পূর্নজন্ম না হয়। বুঝা যায় এই বংশে অবিস্মরণীয় বহু কবি ও বৈষ্ণব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ।

অতঃপর দুই শ্লোকে গ্রন্থে কোন কোন ক্ষুদ্র কথা অশার বস্তুর লক্ষণাদি কেন পরিত্যক্ত হইল তাহার কারণনির্দেশ আছে। তৎপর গ্রন্থকারের কৃতবিদ্যাত্মক শ্লোক যথা,

ব্যাকার-স্মৃতি-কাব্য-কোষ-ভরতালঙ্কার-তৎকাগম-

ক্যোতিঃপিঙ্গল-নাটক-প্রহসন-ক্রীড়াযুগলানিধিরঃ ।

যো দ্বৈপায়নবর্ণিতেহযুক্তকথোদ্যানে নিমগ্নান্তরঃ

স শ্রীমানকরোং স্তম্বকরকবিঃ সঙ্গীতদামোদরম্ ॥

অর্থাৎ কবি স্তম্বকর ব্যাকরণাদি ১৩টি শাস্ত্রের চর্চায় (পার্কীতীতে শিবের ন্যায়) রত ছিলেন। তৎপর রচিত গ্রন্থের নাম :

সঙ্গীতদামোদর-হস্তযুক্তা-বলী সূধাসেবনমেব সেবধিঃ ।

সঙ্গীতশাস্ত্রগদিতৈঃ কিমনৈর্যত্রাধিযুক্তৈশ্চ পুলাকসিবৃৎ ॥

অর্থাৎ গ্রন্থের যে অমূল্য সঞ্চিত হইল তাহাই নিম্নরূপ, তাহাতে তুণ্ড ব্যক্তির নিকট অন্য সঙ্গীতশাস্ত্রের প্রয়োজন নাই তুণ্ডব্যক্তির নিকট পোলাও যেমন নিরর্থক। অতঃপর দুই শ্লোকে সঙ্গীতদামোদর গ্রন্থের প্রশস্তি ও খ্যাতিপ্রার্থনা আছে। গ্রন্থের শেষ পুঁথিকা, “ইতি শ্রীলস্তম্বকরকৃতং সঙ্গীত-দামোদরং সমাপ্তং ।”

ইংরেজশাসনে পাশ্চাত্যপ্রভাবের একটি সুফল বাংলা

দেশে ব্যাপকভাবে দেখা দিয়াছে, পূর্বপুরুষের নামকীৰ্ত্তনে ও কীর্ত্তিখাপনে অবজ্ঞা। এই শোচনীয় অবজ্ঞার ফলে অদ্য প্রায় ১০০ বৎসর মধ্যে খটকসম্প্রদায় ও তাঁহাদের কুলপঞ্জী-সমূহ লোপ পাইয়াছে। শুভঙ্করের উপরিবৃত্ত পরিচয় অতি সামান্য চেষ্টায় বারেন্দ্র শ্রেণীর মুদ্রিত ও হস্তলিখিত সমস্ত কুল-পঞ্জী হইতে যথাযথ উদ্ধার করা যায় এবং তদ্বারা অবি-সংবাদিতরূপে তাঁহার অভ্যুদয় কালও নির্ণীত হয়। আমরা সংক্ষেপে তাহা বিবৃত করিতেছি। শুভঙ্করের উল্লিখিত “লাহাড়ী”-কুল সুপ্রসিদ্ধ বারেন্দ্রশ্রেণীর কুলীন “লাহাড়ী”-বংশই বটে। এই বংশের আদি কুলীন বঙ্গভাচার্য বিখ্যাত সামাজিক নেতা উদয়নাচার্য ভাট্টার কন্যা লীলাবতীকে বিবাহ করেন (নগেন বহু : বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বিবরণ, পৃ. ৫১)। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র “কেশাই” গেলেন নকৈড় (যাদব চক্রবর্তী : কুলশাস্ত্রদীপিকা, ২য় সং, ১৩১৩, পৃ. ১৬৪)। কেশাইর পুত্র ত্রীনারায়ণ “তস্য নাম খেবাই” (হস্তলিখিত পুঁথি), তাঁহার চ্যোষ্ঠ পুত্র “আনুয়াই” অর্থাৎ অনিরুদ্ধ (নগেন বহু, ঐ, পৃ. ৬৭)। তজ্জ্যোষ্ঠপুত্র “ত্রীধরাই”, তৎপুত্র “বাপি গনাই” পক্ষে নরসিংহ সহদেব কামদেব, অষ্ট পক্ষে শুভঙ্কর চক্রবর্তী, আর পক্ষে কোকাই (হস্তলিখিত লাহাড়ীকুলের বাঁধা, ২২ পত্র)। অর্থাৎ শুভঙ্করের পিতা ত্রীধরের ৪ পুত্রী ছিল, তৃতীয় পত্নী সুভদ্রার একমাত্র পুত্র শুভঙ্কর। শুভঙ্করও প্রসিদ্ধ কুলীন ছিলেন—“কালির দাগ” অবসাদ তাঁহা হইতে উৎপন্ন হয় (নগেন বহু, পৃ. ৭১-২)। শুভঙ্করের ৪ পুত্রের মধ্যে কুলপঞ্জীতে ৩ পুত্রের উল্লেখ দৃষ্ট হয়—শেখর, হুর্জভ, দামোদর (কুলশাস্ত্রদীপিকা, পৃ. ১৬৬)। শেখর অর্থাৎ রাজ-শেখরের পৌত্র গঙ্গাদাসের নামে “তের আনি” অবসাদ (নগেন বহু, পৃ. ৮৩) এবং তৎপুত্র মহেশের নামে “মুদাখানী” অবসাদ হইয়াছিল (ঐ, পৃ. ৮৭)। মহেশের পুত্র শিবনারায়ণ পর্য্যন্ত কুলপঞ্জীতে নাম পাওয়া যায়। লাহাড়ী বংশের এই বারা এখনও বিদ্যমান আছে কিনা অজ্ঞানসন্দানযোগ্য।

শুভঙ্করের অভ্যুদয়কাল : উক্ত বংশ পরিচয়ের আলোচনা দ্বারা শুভঙ্করের অভ্যুদয়কাল ও গ্রন্থরচনাকাল সহজেই নির্ণয় করা যায়। প্রাক-শিরোমণি যুগের বিখ্যাত নৈমারিক “প্রগল্ভাচার্য” (যাহাকে সকলেই, এবং বাংলার মনীষীগণও এককাল “মৈথিল” বলিয়া ধরিতেছিলেন) স্বরচিত ঋগ্বেদ-বাংলার টীকার প্রারম্ভে শুভঙ্করের ভাষার সহিত আশ্চর্যজনক সাদৃশ্য দেখাইয়া বংশের নাম ও পিতার নাম উল্লেখ করিয়াছেন :

যম্বিন্ দেবা অপি সুরপূরী বাসমাধাদয়ন্তে।
ধৃতাঃ স্মঃ কিং বরমিতি জনিং সাদরং কাময়ন্তে।

“লাড়ী” বংশে কলুষরহিতে তত্ত্ব পুণ্যপ্রভাবাং

ধীযুঃ “ত্রীম্বরপতি-মহামিশ্র”-বর্ষো বভূব।

অর্থাৎ (প্রগল্ভের পিতা) নরপতি মহামিশ্র পুণ্যবলে সেই “লাড়ী” বংশে জন্মিয়াছিলেন, যে বংশে আমরা বর্তমানে বাস

করার সুখ আবাদন করিয়াও দেবভারা। “আমরা কি ঋত্ব হইব ?” এই ভাবিয়া সাদরে জন্ম কামনা করেন।

এই মহামিশ্রের পিতা “মাধাই” (অর্থাৎ মধব) শুভঙ্কর জনক ত্রীধর কবিচক্রবর্তীর পিতা অনিরুদ্ধের সহোদর দ্বিতীয় ভ্রাতা ছিলেন এবং প্রগল্ভের মাতা “জাহবী” মহামিশ্রের দ্বিতীয় কন্যা তৃতীয় পত্নী ছিলেন (নগেন বহু, পৃ. ৮১, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৪৭, পৃ. ৭১-৭৩)। সুতরাং শুভঙ্কর ও প্রগল্ভাচার্য ভ্রাতৃসম্পর্কিত ও সমবয়স্ক ছিলেন নিঃসন্দেহ। প্রগল্ভাচার্য মৈথিল শঙ্করমিশ্রের কিঞ্চিৎ পরবর্তী এবং বাসুদেব সার্কভোমের কিঞ্চিৎ পূর্ববর্তী ছিলেন (সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা, ১৩৪৭, পৃ. ৭৫)। আমরা সার্কভোমের জন্মকাল ১৪৩০-৪০ খ্রীষ্টাব্দ মধ্যে অনুমান করিয়াছি (ঐ, ১৩৫৩, পৃ. ৯)। তদনু-সারে প্রগল্ভাচার্যের জন্ম ১৪১৫-২৫ সন মধ্যে অনুমান করিয়া তাঁহার গ্রন্থরচনাকাল ১৪৫০-৭৫ সন মধ্যে স্থাপনীয় (ঐ, ঐ, পৃ. ১১)। প্রগল্ভের পিতা “ভাসপ্রকাশ” নামক ব্যাকরণ-টীকার রচয়িতা মহাপণ্ডিত নরপতি মহামিশ্রের অভ্যুদয়কালও ১৪০০-৫০ সন মধ্যে আমরা নিরূপণ করিয়াছি (পূর্বযোক্তকের পরিভাষাবৃত্তি প্রভৃতি, রাজদাসী সংস্করণ, ভূমিকা, পৃ. ১৬)। প্রগল্ভের ভ্রাতৃসম্পর্কিত ও সমবয়স্ক শুভঙ্করের জন্ম ১৪১৫-২৫ সনে ধরিলেও শেষ বয়সে গ্রন্থ রচনা করার তাঁহার রচনাকাল ১৪৭৫-১৫০০ সনের মধ্যে স্থাপন করিতে হইবে। শুভঙ্করের গ্রন্থে ‘প্রেম’-রসের উল্লেখ থাকিলেও তাহা ‘বৎসল’-রসের নামান্তররূপে ধরা হইয়াছে, গৌড়ীয়বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের গোষ্ঠী-গণ যে “উজ্জল”-রস স্থাপনা করেন, তাহা শুভঙ্করের অজ্ঞাত। এখানে উল্লেখযোগ্য যে তিন পুরুষে এক শতাব্দী ধরিয়া প্রগল্ভ ও শুভঙ্করের অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহ বঙ্গভাচার্যের স্বস্তর সুবিখ্যাত উদয়নাচার্য ভাট্টার ও তদীয় সহকর্মী কুলকুজট প্রভৃতি খ্রীঃ ১৩শ শতাব্দীর প্রথম পাদে জন্মগ্রহণ করিয়া ঐ শতাব্দীর ৩য় ও ৪র্থ পাদে (১২৫০-১৩০০ সন) কর্মতৎপর ছিলেন নিঃসন্দেহে বলা যায়, তাহার পরেও নহে পূর্বেরও নহে। ইহাও উল্লেখ-যোগ্য যে উক্ত প্রগল্ভাচার্যেরও প্রকৃত নাম ছিল “শুভঙ্কর” (সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা, ১৩৪৭, পৃ. ৭০-১)। উপযুক্ত ভ্রাতার সহিত বিরোধাশঙ্কায় বোধ হয় প্রগল্ভ নামই অধিক প্রচারিত করা হইয়াছিল। প্রগল্ভের বংশ এখনও নানাহানে বিদ্যমান আছে।

বাঙালীর আত্মবিশ্বাস যদি শোচনীয় হয় বারেন্দ্রশ্রেণী ব্রাহ্মণদের আত্মবিশ্বাস অধিকতর শোচনীয়। মহামিশ্রের “ভাসপ্রকাশ”, প্রগল্ভরচিত নব্যভাষ্যের নানা গ্রন্থের উপরি টীকা (যাহা হইতে ৩৮১শীর্ষকে একশতাব্দী যাবৎ নব্যভাষ্যের একটি পৃথক সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছিল) এবং শুভঙ্করের “সদীত-দামোদর” ও “হস্তমুক্তাবলী”—একটিমাত্র বারেন্দ্র-পরিবারের এই বরগীষ অবদান বাংলার শিক্ষিত সমাজ এককাল পরের জিনিষ বলিয়া স্বকীয় ভাঙারে গ্রহণযোগ্য মনে করে

নাই। মিথিলার শিক্ষিত সমাজ শুভঙ্করকেও মৈথিল বলিয়া দাবি করিবেন (S. N. Sinha : Hist. of Tirhut, 1922, p. 172), তাহা মোটেই আশ্চর্যের বিষয় নহে। অন্তঃপ্রাদেশিক শান্তিকামনার আমাদের অকাট্য দাবীও এ সময়ে উপাধি পন করা অস্বাভাবিক বলিয়াই হয়ত কোন কোন বাঙালী মনীষী মন্তব্য করিবেন।

হস্তমুক্তাবলী : অভিনয়শাস্ত্রের এই গ্রন্থটি বহুল প্রচার লাভ করিয়াছিল। নেপালরাজ্যের গ্রন্থশালায় ইহার প্রতিলিপি রক্ষিত আছে (বঙ্গাক্ষরে লিখিত, পত্রসংখ্যা ৪২)। নেপালি-পতি জগজ্যোতির্বিজ্ঞানদেবের (১৬১৭-৩৩ খ্রিঃ) দৌহিত্র অনন্তের দ্বারা “বনগ্রাম” নামক পণ্ডিত হস্তমুক্তাবলীর এক বিস্তৃত টীকা রচনা করিয়াছিলেন। তাহারও প্রতিলিপি উক্ত গ্রন্থশালায় আছে (পত্রসংখ্যা ২৬৩, লিপিকাল ৭৯৫ নেপালিক অর্থাৎ ১৬৭৪ খ্রিঃ। H. P. Sastri : Darbar Lib. Cat., 1905, pp. 270-73 দ্রষ্টব্য)। রাজদরবারে এই গ্রন্থের সমাদর লাভ স্বাভাবিক। নবদ্বীপাধিপতি রাজা রাধব রায় (১৬২৫-৭৬ খ্রিঃ) স্বয়ং বিদ্বান্ এবং বিদ্বৎসেবী ছিলেন। তিনি “হস্ত-মুক্তাবলী” অবলম্বন করিয়া “হস্তরত্নাবলী” নামে এক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। বঙ্গাক্ষরে লিখিত ইহার প্রতিলিপি (পত্র সংখ্যা ৪০) এখন অক্সফোর্ডে রক্ষিত আছে (Aufrecht : Oxf. Cat., pp. 201-2)। গ্রন্থান্তরের চতুর্থ শ্লোকটি উদ্ধৃত হইল :—

ঐহস্তমুক্তাবলীকৃতং-প্রবন্ধে ভূয়ো যদুজ্ঞানং বিষয়ান্ ববদ।

ঐরাধবক্ষেপিতভিত্তদেতাং ঐহস্তরত্নাবলীমাত নোতি।
রাজা রাধব অভিনয় সংক্ষেপে একটি ক্ষুদ্র গ্রন্থ রচনা করাইয়া-
ছিলেন। ইহার একটি প্রতিলিপি আমরা নবদ্বীপে পরীক্ষা
করিয়াছিলাম (নবদ্বীপ এংলো-সেন্সক্রিট পাঠাগারে রক্ষিত
২৪৩ সংখ্যক পুঁথি, পত্রসংখ্যা ৩১—গ্রন্থমধ্যে গ্রন্থকারের নাম
বাই)। মেঘাংশ এই :—“ইতি সর্গাভিনয়নিরূপণং।

ব্রাহ্মণ্যমূর্তিঃ কুহুদেন্দুকীর্তিঃ, ঐরাধবো রায় ইতি ক্ষিতীশঃ।

জীয়াং স দৌৰ্ণে বিজিতারিবর্ণো গ্রন্থঃ সমাপ্যেয যদাজ্ঞায় ময়া।

ঐরগু।”

হস্তমুক্তাবলী আসামে মুদ্রিত হইতেছিল—Journal of Assam Research Society Vol. VIII-IX-এ মার্চ ১১৩ শ্লোক এযাবৎ প্রকাশিত হইয়াছে। মিথিলায়ও হস্তমুক্তাবলীর পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়াছে (Mithila mss, Vol. II pp. 170-2), তন্নিমিত্তই শুভঙ্করের উপর মিথিলার দাবী উঠিয়া থাকিবে। গ্রন্থের শেষ শ্লোকে গ্রন্থকারের প্রার্থনা অনেকাংশে সার্থক হইয়াছে। শ্লোকটি এই—

কীর্তিদিগন্তবিশ্রান্তা পূজ্যপোদ্ভেয়ু ***।

সর্বলোকানুগ্রাহক নৃপচিন্তে সদাস্থিতিঃ।

আরন্তের চারিটি শ্লোক ব্যতীত সমগ্র গ্রন্থই সরল অক্ষুপ্ত
স্থানে রচিত। সঙ্গীতদামোদর এক সময়ে পূর্বাঞ্চলে অতি

প্রামাণিকগ্রন্থ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল, এইরূপ নিদর্শন
পাওয়া যায়। কোচবিহারের শিববংশীয় রাজা মল্লদেব নর-
নারায়ণ অতি বিদ্বৎসেবী ছিলেন এবং তাহার সময়ে : (১৫৫৫-
৮৭ খ্রিঃ) তৎপ্রদেশে সংস্কৃতচর্চার যেরূপ উন্নতি সাধিত হইয়া-
ছিল পূর্বাঞ্চলে তাহার তুলনা হয় না। মল্লদেবের ভ্রাতা
যুবরাজ শুক্লধ্বজের আদেশে “সদর্পকম্পর্প” নামে কামশাস্ত্রের
একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। গ্রন্থশেষের সমাপ্তিশ্লোক
ও পুঁথিকা এই—

“আজ্ঞামবাপ্য বহুধাষরহস্যবন্দ্যং “শুক্লধ্বজ”-

ক্ষিতিপতেবুধবৎসলম্।

ব্যক্তীকৃতং সকলমন্মথতত্ত্বসার (মার) দ্বিভাষ্য কৃতিনো

ননু ভূষয়ন্ত।”

“ইতি মহামহোপাধ্যায়-ঐত্তবানন্দঠাকুরবিরচিত্তে সদর্প-
কম্পর্পে পঞ্চমো বাণঃ সমাপ্তঃ।”

(কলিকাতা রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটির পুঁথির পৃ. ২৩-
২৪ দ্রষ্টব্য)

গ্রন্থকার কামশাস্ত্রে কৃতবিদ্ব ছিলেন এবং বহুতর প্রাচীন
গ্রন্থের বচন উদ্ধৃত করিয়া গ্রন্থটিকে আলোকিত করিয়া রাখিয়া-
ছেন। আমরা একটি বর্ণানুক্রমিক প্রমাণপঞ্জী সংকলন করিয়া
দিলাম—যোগল-পাঠানের সংঘর্ষকালেও ভারতের পূর্বাংশে
নিজতে বসিয়া ভবানন্দ ঠাকুর কি কি গ্রন্থ পাঠ করিতেছিলেন
আমরা বিম্বিতচিত্তে জানিতে পারিব।

অমর। আচার্য্য। কণ্ঠান্তরণ। কথাসংগ্রহ (কামকবি-
কল্পহারো বিদ্যাপতিঃ কথাসংগ্রহে, পৃ. ২)। কামদীপিকা।
কাব্যপ্রকাশ। গীতগোবিন্দ। গুণপতাকা। ঘোটকমুখ।
জ্যোতীষর। তাৎপর্য্যটীকা। দামোদরভট্ট। দামোদরে।
ধরজরিস্বয়ং (পৃ. ১)। নাগরসর্গর। নাট্যালোচন। নারদ
("রস্তা-নারদ-বিরিঞ্চি ভুবুরুকু-ভরতচার্য্যপ্রভৃতীনাং মতং"
পৃ. ৭)। নিবন্ধ। পঞ্চশাস্ত্রক। ভরত। ভাহু। ভোজরাজ।
মঞ্জরী। মদনোদয়। মালভাণ্ডা ভবভূতিঃ। মূলদেব। রতি-
কম্পর্প। রতিরহস্ত। রুদ্রট। বর্ধমানচরণাঃ (পৃ. ১৫
নৈমায়িক)। বাৎসর্য্যন। বিদ্যাপতি। শারদাতিক। শৃঙ্গার-
ভিলক। ঐগর্ভাচার্য্য। সঙ্গীতদামোদর। সারদা। সুরত-
সর্গর। সুরদীপিকা।

গ্রন্থের “ভূতীয়বাপে” রসপ্রকরণে নিম্নলিখিত সন্দর্ভ উদ্ধৃত
হইয়াছে (পৃ. ১১) তথাচ “সঙ্গীতদামোদরে”

শৃঙ্গারে চ রতিঃ স্থায়ী বীরে চোৎসাহসংজ্ঞকঃ।

অন্যানকে ভয়ং ভাতি রৌদ্রে ক্রোধগুণোদয়ঃ।

বীভৎসে চ জুগুপ্সা স্তাৎ করুণে শোক উচ্যতে।

অভূতে বিন্ময়োনাম শান্তে শান্তিসমুদ্ভবঃ।

হাস্তে হাস ইতি স্থায়িত্বাবা এষ রসেশ্বরী।

স্থায়িত্বাবের গণনা সাহিত্যদর্পণাদি প্রাচীনতর গ্রন্থের
পরিবর্তে শুভঙ্করের অপেক্ষাকৃত আধুনিক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত

হওয়ায় বুঝা যায় শুভক্ষর তৎকালে পরমপ্রাণাধিকারপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন এবং হাস্যরসের বর্ণনাকালে সঙ্গীতদামোদর এত্রে শুভবর্ণ বস্ত্রসমূহের উৎকৃষ্ট পরিগণনায়ণ্যে শুভক্ষর স্বকৃত-এত্রে যে উদ্দেশ্য করিয়াছেন—“হস্তমুক্তাবলীকতুঁরিয়ং কবিমুদে কৃতিঃ” (৪১।২)—তাহাও সম্পূর্ণ সার্থক হইয়াছিল। বলা বাহুল্য হস্তমুক্তাবলী সঙ্গীতদামোদরের পূর্বে রচিত হইয়াছিল।

পরিশেষে আমরা শুভক্ষররচিত সঙ্গীতদামোদর এত্রে সহিত লক্ষ্মীধরস্বহ চতুর-দামোদর রচিত সঙ্গীতদর্পণ এত্রে পার্থক্যবিষয়ে অবহিত হইব। সঙ্গীতদর্পণকার কল্লিনাথের পরবর্তী এবং সম্ভবতঃ শুভক্ষরেরও পরবর্তী এবং ভিন্নদেশীয়। এহু ও এহুকারের প্রায় অভিন্ন নাম এখানে ভ্রান্তি উৎপাদন করিতে পারে।

রবীন্দ্রসংলাপ কণিকা

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য

১

“শান্তী মশায়ের মীনানশন।”

তখন আমি কানীতে। ছাত্রাবস্থা। এক দিন রসিয়া আছি, হঠাৎ মনে হইল ব্রাহ্মণের মাছ-মাংস খাওয়া ঠিক নহে। সঙ্গে-সঙ্গে ছাড়িয়া দিলাম।

শান্তিনিকেতনে আসিবার কয় মাস পরেই আমার পেটের অস্থখ হয়। বহু দিন হইলেও ইহা আর ভাল হইতে চায় না। আমার পেরের “ফ্যামিলী ফিজিশিয়ন” গুরুদেব আমাকে মাছ খাইবার জন্ত বলিতে লাগিলেন। কিন্তু আমার মন তাহাতে রাজি হইতেছিল না। এদিকে অস্থখটাও বাড়িতেছিল বৈ কমিতেছিল না। শেষে আমার পরাজয় হইল। গুরুদেবের সঙ্গে আমার এই একটা সর্ভ হইল যে, তাহার কথায় আমি এক মাস মাত্র মাছ খাইব। যদি ইহাতে অস্থখ সারে তবে আরো কিছু দিন খাইব। অগ্রথা সঙ্গে সঙ্গে বর্জন করিব। গুরুদেব ইহাতে খুব খুশি হইলেন। আমি মাছ খাইতাম না, পরে খাইতে যাইতেছি, ইহা লইয়া তখনকার ক্ষুদ্র আশ্রয়টির মধ্যে সকলেরই বেশ একটা কৌতুকের সৃষ্টি হইল। ইহার মধ্যে বেশী উৎসাহ ছিল। স্বয়ং গুরুদেবেরই। তিনি বলিতে লাগিলেন “শান্তী মশায়ের মীনানশন হইবে, ইহার উপযুক্ত ব্যবস্থা চাই।” নিজেই তাহা করিলেন। ব্যবস্থা হইল, প্রতিদিন দিনে ও রাত্রে এক-একটি মাগুর মাছের ঝোল। ইহার ভার দেওয়া হইয়াছিল, বোধ হয়, আমাদের সেই সময়ের আশ্রমের কর্মচারী ক্ষুদ্রিমাঝাবুর উপরে, এবং ইহা ঠিক মত চলিতেছে কি না, তাহার তত্ত্বাবধান করিতেন স্বয়ং গুরুদেব। এক মাসে ষাটটি মাগুর মাছের জীবন গেল, কিন্তু তাহাতে আমার জীবনের কোন কিছু ভাল হওয়ার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। আমি গুরুদেবকে ইহা জানাইয়া সর্ভ-অনুসারে উহা সঙ্গে সঙ্গেই বর্জন করিলাম। তাহার পর আমার নিরামিষ আহার অব্যাহত

আছে। আমি মনে করি ইহাতে আমি খুব ভাল আছি।

নিরামিষ আহারের আর একটা গুণ আমার মনে হয়। যখন মাছ খাইতাম তখন এক দিন তাহা না থাকিলে মনটা কেমন করিত, ভাল লাগিত না। কিন্তু তাহা বর্জন করিবার পর ভুলেও কখনো সেজন্ত আমার মনে ঐ অস্বস্তিভাব আসে না। শান্ত্রে পড়িয়াছি, কামনাই হইতেছে বন্ধন, অন্ন বন্ধন নাই—“কামবন্ধনমেবেদং নাগদন্তীহ বন্ধনম্।” এ যেমন ছোট বন্ধনের সম্বন্ধে তেমনি বৃহৎ বন্ধনেরও সম্বন্ধে।

পরে আমি দেশী ও বিদেশীদের লেখা নিরামিষ আহারের অনুকূলে ছোট-খাট অনেক বই পড়িয়াছি। এই সমস্ত বই-এর কোন-কোন খানিতে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে দেখান হইয়াছে যে, মানুষ মাংসাশী (carnivorous) জীব নহে, ফলানী (frugivorous)। একখানি পুস্তিকায় পড়িয়াছিলাম যে, বৈজ্ঞানিকেরা তো বহু বিষয় বিচার করেন, কিন্তু তাহারা প্রায়ই বিচার না করিয়াই আহার করেন, যাহা ভাল লাগে তাহাই তাহারা খান।

২

কাছে বস।

আমি গুরুদেবের কাছে প্রায়ই সন্ধ্যার সময় যাইতাম। গুরুদেবও প্রায় সেই সময়ে রাত্রির আহার গ্রহণ করিতেন। তিনি খাইতেন, আমি কাছে বসিয়া গল্প করিতাম। এক দিন তাহার কাছে গেলেই তিনি বলিলেন “শান্তী মশায়, আজ আপনি নিশ্চয়চিন্তে আমার খুব কাছে বসিতে পারেন।” তিনি কী বলিতে চাহিতেছেন, আমি বুঝিলাম। সেদিন তাহার খাদ্যের মধ্যে মাংস ছিল না।

গুরুদেব কখনো মাংস খাইতেন, কখনো বা অনেক দিন খাইতেনও না। কখনো কখনো খাণ্ড সম্বন্ধে পরীক্ষাও করিতেন। কখনো কখনো কাঁচা খাণ্ড খাইতেন। একটা

অদ্ভুত খাণ্ডের কথা বলি। ঘিয়ের ময়ন দিয়া রুটি-লুটির কথা সকলেই জানেন, কিন্তু গুরুদেব কখনো কখনো রেড়ির তেলের ময়ন দিয়া করা রুটি খাইতেন। একদিন তিনি ইহা নূতন-নূতন খাইয়া কতই না ইহার প্রশংসা করিলেন। আমি কিন্তু এ পর্যন্ত ইহার স্বাদ গ্রহণ করি নি, করিবারও আশা রাখি না। কোন রসজ্ঞ পাঠক পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। আমি যেদিনকার কথা বলিতেছি সেদিন প্রশান্তবাবু কলিকাতা হইতে শান্তিনিকেতনে আসিয়াছিলেন। গুরুদেবের জন্ম যে কয়খানি রুটি হইয়াছিল তাহা হইতে তিনি কিছু ভাগ পাইয়াছিলেন।

৩

মাংসাহার

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন আশ্রমে আমিষ আহার নিষিদ্ধ। ইহা একখানি প্রস্তরফলকে খোদাই করা আছে। প্রথমে ইহা ঠিক পালন করা হইত, তারপর, যেমন হইয়া থাকে, ইহা উল্লঙ্ঘন করা হয়, বা আঙুলের আড়াল দিয়া পালন করা হয়। মাঝে মাঝেই ইহা লইয়া আশ্রমে বাদান্ধবাদ হইত। দেখা গিয়াছে, কখনো ইহা বন্ধ করা হইয়াছে, কখনো বা আবার চালান হইয়াছে। গুরুদেবের মন এ বিষয়ে দৃঢ় ছিল না। এক দিন কথা হইল, এই বিষয়ে একটা আলোচনা করিয়া কিছু স্থির করিতে হইবে। রাত্রে সভা হইবে। নিজ-নিজ পক্ষ সমর্থনের জন্য আমরা প্রস্তুত হইতেছি। আমি ছিলাম নিরামিষ-ভোজীর পক্ষে। সকলেই ভাবিতেছেন, সেদিন তুমুল তর্ক হইবে। কিন্তু গুরুদেব অতি শান্ত ভাবে চমৎকার মীমাংসা করিলেন। তিনি বলিলেন, আমিষ আহার ভাল কি মন্দ ইহা লইয়া তর্ক করিয়া কাজ নাই। যে হেতু আমাদের দেশে অনেকে ইহা চান না, সেই জন্ম তাঁহাদের মনে যাহাতে কোন আঘাত না লাগে ইহাই ভাবিয়া আমাদের উহা ত্যাগ করাই উচিত। সকলে ইহা মানিয়া লইল। সেদিন যে রূপেই হউক জয়লাভ করিয়া আমি উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছিলাম।

ইহা লইয়া গুরুদেবের সঙ্গে আমার একাধিকবার তর্ক হইয়াছে। ইহা যে সব সময় খুব শান্ত ভাবে হইয়াছিল তাহা নহে। আমি যেন তাহাতে কিছু মনে না করি গুরুদেব ইহাও আমাকে বলেন।

আধুনিকদের মধ্যে অনেকেই ডিমকে নিরামিষ খাণ্ডের অন্তর্গত মনে করেন। তাহার আদ্যে বলেন যে, তাহাতে জীবহত্যা করার পাপও হয় না। আমার মত ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। আমি বলিতাম, যদি ডিম খাইলে জীবহত্যার পুণ্য না হয়, তবে জগৎহত্যা পাপ হয় না, ইহা বলিতে হইবে। যে সব ডিমে বাচ্চা হয় না সেই সব ডিমই খাওয়া

হয়, তাঁহাদের এই যুক্তিরও মূল্য অতি অল্প। কারণ, এইরূপ বাচ্চিয়া বাচ্চিয়া ডিম আনা হয় না। ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ শান্তিনিকেতনেই সেই সময়ে পাওয়া গিয়াছিল। এগুজ সাহেবের এক প্রিয় ও প্রাচীন বাবুচি ছিল, নামটি মনে আসিতেছে না। এগুজ সাহেব ঐ সময়ে “বেণুকুঞ্জ” থাকিতেন, পরে তিনি তাহা আমাকে থাকিবার জন্য দেন। একদিন দেখা যায় সেই ঘরে ঐ বাবুচি তাঁহার জন্ম যে সব ডিম আনিয়াছিল তাহার মধ্যে একটি ফুটিয়া গিয়া বাচ্চা হইয়াছে।

আজকাল সেখানে এ প্রশ্নের কোন বালাই নাই।

৪

সন্ন্যাসগ্রহণের কল্পনা

যখনকার কথা বলিতেছি তখন আমাদের আশ্রমের আর্থিক অবস্থা বড় খারাপ। এ জন্ম খুব ভাবনায় থাকিতে হইত। কিন্তু তাহা হইলেও, আশ্রমের দিক হইতে বলিতে হইলে বলা যাইতে পারে তাহাই ছিল সেখানে উৎকৃষ্ট কাল। আমরা শান্তিনিকেতনে বাস করিতাম। অর্থের চিন্তায় আমাদের মনে হইত, যদি আশ্রমে ১০০টি মাত্র ছাত্র হয় তবে আমাদের আর কোন অভাব থাকিবে না। কিন্তু পরে দেখা গিয়াছে, ছাত্র-সংখ্যার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অভাবও নানামুখে বাড়িয়া গিয়াছিল। যাহাই হউক, একদিন গুরুদেবের সঙ্গে কথাকৌতুক হইতেছে; প্রসঙ্গক্রমে আশ্রমের আর্থিক অবস্থার কথা উঠিল। আমি বলিলাম ‘একটা কাজ করুন। তা যদি করিতে পারেন, তবে আর কোন অভাব থাকিবে না। তা কেবল আশ্রমেরই নহে, আপনারও নহে, এই আমাদের সকলেরই। পরম স্তখে আমাদের দিন যাইবে।’

‘বলিয়া ফেলুন।’

‘সেটা খুব সোজা। আপনি যদি সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে পারেন। একটা কোপীন আঁটিয়া যদি কাশীর দশাশ্রমেঘ ঘাটে একবার বসিতে পারেন, তবে আর ভাবনা কী? আপনার দাড়ি-চুল তো লম্বা-লম্বা আছেই। চেহারা খানাও সুন্দর। লোকে যখন জানিবে, রবিঠাকুর সন্ন্যাস লইয়াছে, কোপীন আঁটিয়া, ছাই মাখিয়া দশাশ্রমেঘে বসিয়াছে, তখন টাকাকড়ি ফল-মূল ও অগ্ন্যস্ত্র খাদ্য সামগ্রীর কথা কী, দেখিতে-দেখিতে খেতপাথরের একটি মন্দির করিয়া তাহাতে আপনাকে স্থাপন করিবে।* সেখানে ভক্তদের শিষ্যদের ভিড় চেলা অসাধ্য হইয়া পড়িবে।’

‘কিন্তু আমি যে, সংস্কৃত বচন বাড়াইতে পারিব না।’

‘সেজন্য চিন্তা কী? ক্ষিতি ও আমি আপনার চেলা

* আমি এইরূপ একটি ঘটনার কথা জানি

হইয়া সঙ্গে সঙ্গেই থাকিব, থাকিতেই হইবে, অন্যথা ভক্তদের দানগুলি সামলাইবে কে? ক্ষিত্তির বপুখানিও তো স্বয়ংই একটি সন্ন্যাসীরই মত। তাহাকে বেশ মানাইবে। তা ছাড়া, আপনি মৌনী থাকিবেন। যাহা কিছু বলিবার-কহিবার থাকে আমরা দুই জনে তাহা করিব।’

‘তা ভালই হইবে। আমি মৌনী থাকিয়া একটি আঙুল তুলিব, আর আপনারা তাহা দেখিয়া দুইটি আঙুল তুলিয়া উহার এটা সেটা যা হয় একটি ব্যাখ্যা করিয়া, সমবেত ভক্ত ও শিষ্য-মণ্ডলীকে তাক করিয়া দিবেন।’

আমাদের মনে করা ভাল, শত-সহস্র অ-রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যেমন একটি মাত্র রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব ‘বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়’ হইয়াছে, শত-সহস্র ভণ্ডের মধ্যে একটি মাত্র সাধুর আবির্ভাবও তেমনি হইয়া থাকে।

৫

অনাবৃত স্থানে মৃত্যু

একদিন গুরুদেবের সঙ্গে কাশীর কথা হইতেছিল। কাশীর গঙ্গার ঘাটের সম্বন্ধে তিনি বলিতেছিলেন। তিনি বলিলেন ‘দেখিলাম মাঝ গঙ্গায় ছোট্ট একখানি নৌকায় একটি আসন্নমৃত্যু সন্ন্যাসীকে মণিকর্ণিকার ঘাটে গইয়া যাওয়া হইতেছে। নৌকাখানি তর-তর করিয়া চলিয়াছে। সন্ন্যাসী চিং হইয়া আকাশের দিকে মুখ করিয়া রহিয়াছেন।’

আমাদের সমাজে কাশীতে মৃত্যু, বিশেষতঃ মণিকর্ণিকায় মৃত্যু প্লাবনীয়।

গুরুদেব বলিতে লাগিলেন ‘সন্ন্যাসীকে ঐ ভাবে লইয়া যাওয়া হইতেছে দেখিয়া আমাকে খুবই ভাল লাগিয়াছিল। মরণের সময় এইরূপই মুক্ত অনাবৃত আকাশের দিকে তাকাইয়া থাকাই ভাল। চোখের সামনে যেন কোনরূপ আবরণ না থাকে। আমার মৃত্যু যেন এইরূপেই হয়। আপনার কাছে আমার অনুরোধ, আমাকে ঘরের মধ্যে মরিতে দিবেন না।’

ঘরের মধ্যে মরিতে না দেওয়া আমাদের সমাজের রীতি।

গুরুদেবের মৃত্যুর সময়ে এই কথাটি কর্তৃপক্ষের কয়েকজনকে জানাইয়াছিলাম, কিন্তু কাজে ইহা হয় নি। তাঁহার ঐ অনুরোধ আমি রক্ষা করিতে পারি নি। তাঁহার জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে ঐ সময়ে এত জনতা, এত ভিড় যে বলিবার নহে। কবির ন্যায় ব্যক্তির মৃত্যুতে সাধারণের যে সংঘম, ধৈর্য, গাভীর্ষ ও ভক্ততা পালন করা স্বভাবতই কর্তব্য ছিল, তাহা বিন্দুমাত্রও দেখা যায় নি। ঐ উচ্ছৃঙ্খলতা এতদূর উঠিয়াছিল যে, তাঁহার চিতায় তাঁহার একমাত্র পুত্র রবীন্দ্রনাথ অগ্নিসংযোগ করিতে পারেন নি, যদিও তিনি কাছেই ছিলেন। পুত্রই পিতার চিতায় অগ্নি-সংযোগ করিবেন ইহাই সামাজিক পদ্ধতি।

স্বাধীনতা-তীর্থে

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

আসিয়াছি পঞ্চপ্রান্তে।—ধেমো না, ধেমো না,
তীর্থযাত্রী, যাত্রা ভব হয় নাই শেষ,
হে বিশ্রাম, বাকি আছে আরো কিছু ক্লেশ,
গতি লগ্ন কোরো না কো, হোয়ো না বিমনা।
বিচারের কাল নাই, নাই বিবেচনা,
বিজ্ঞপ করেছে অস্ত্রে, সয়েছ সে স্নেহ,
তবু সে চলার হস্মে আসে নি আবেশ,
কিছু পথ বাকি আছে,—মিটিবে কামনা।

গঙ্গাব্যার সীমা এল, তবু উচ্ছৃঙ্খল।
মন্দিরের চূড়া ওই দেখা যায় হোঁধা।
ধৈর্য হুরায়ে না, আছ হোয়ো না চঞ্চল,
সেখায় বিরাজ করে আমার দেবতা।
চেনো তারে, হে দিগ্‌ভ্রান্ত ব্যগ্র যাত্রীদল?
সে কোন্ দেবতা জানো, সে যে স্বাধীনতা।

শোন, শোন বিশ্ববাসী দেখেছি তাঁহারে,
দেখেছি সে মন্দিরের অপূর্ণ দেবতা।
প্রাঙ্গণে মিলেছে আসি অগণ্য জনতা
প্রবেশের অধিকার লজ্জি’ মুক্ত দ্বারে,
উত্তীর্ণ হয়েছ তারা পরীক্ষার পারে।
মুগ্ধ হোক পঞ্চশ্রম, প্রতীক্ষার ব্যাধা,
মোছ অতীতের ধানি, কোরো না অজ্ঞাধা,
তোল দৃষ্টি, নহ নত শৃঙ্খলের ভারে।

চেনে দেখ পূর্বাকাশ নির্মেষ, নির্মল,
কোন্ বিভীষিকা পারে দেখাইতে ভয়?
এল দিন, এল দিন, হোয়ো না বিহ্বল,
চিন্ত হোক দ্বিধাহীন, হও স্তনিশ্চয়।
আবার ভারত হবে আলোকে উজ্জল,
শোন, শোন সে দেবতা দিব্য জ্যোতির্ময়।



প্রকাশ সভায় মাঝে মাঝে বাধা সৃষ্টি হওয়ার সম্প্রতি ধরোয়া বৈঠকেই আন্দোলনটা চালানো হচ্ছিল।

ধরনীকান্তের যুক্তি ক্রমশই ঘোরালো হয়ে উঠছিল। বহুদিন প্রবাসে বাস করেও বাঙালীত্বের অভিমানে তার অতি প্রবল। নানা নির্ধাতন সহ করেছে সে এজ্ঞে। সে চায় প্রবাসে থেকেও বাঙালী বাংলা ভাষায় কথা বলুক, বাংলা সাহিত্য বেশি করে চর্চা করুক, বাংলার সংস্কৃতিকে আরও উজ্জ্বল করে তুলুক। বলা বাহুল্য অবাঙালীরা এটাকে বাঙালীর ঔদ্ধত্য ভিন্ন আর কিছু ভাবতে পারেনি, তারা বলে, ধরনীকান্তের এই বাঙালীত্ববোধ ভারতবর্ষের পক্ষেই বিপজ্জনক। কারণ সমস্ত ভারতবর্ষ যখন দিল্লী ভাষা এবং দিল্লী সংস্কৃতির অধীন হতে চলেছে তখন তার মধ্যে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির কীলক প্রবেশ করালে দ্বিখণ্ডিত ভারত আরও কত ধ্বংস ভোগ হবে যাবে কে জানে।

কিন্তু এ সব কথাই মধ্যে কোনও যুক্তি নেই। ধরনীকান্তের এ বাধা ঠেলে চলায় উৎসাহ আছে।

সে দিন প্রবাসী বাঙালীদের আহুত সভায় সে এই কথাগুলো বলছিল—

“বাংলা সাহিত্য ভারতবর্ষের অজান্ত প্রদেশের সাহিত্য থেকে স্বতন্ত্র, উন্নতও বটে। রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত যে যুগ এসে শেষ হ’ল, শুধু সেই যুগের হিসাব ধরলেও দেখা যায় বাংলা ভাষায় যে সাহিত্য রচিত হয়েছে তা পৃথিবীর যে-কোন সাহিত্যের সঙ্গে সমান আসন দাবি করতে পারে, এবং সে দাবি তার স্বীকৃতিও হয়েছে এক দিক দিয়ে। কিন্তু একা

রবীন্দ্রনাথের রচনার মধ্যে দিয়ে আমাদের এই গৌরব লাভ হলেও রবীন্দ্রনাথের দ্বারা উদ্ভূত যুগে বাংলা ভাষায় যে উৎসৃষ্ট উপভাস, ছোট গল্প, কাব্য এবং নাটক রচিত হয়েছে তা ইউরোপে প্রচার না হলেও, বাঙালীর জাতীয় জীবনে এই উপলক্ষে যে সাহিত্যবোধ জেগেছে, বাঙালী বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হয়ে সাহিত্যমূল্য যাচাই করার যে ক্ষমতা লাভ করেছে, তার সাহায্যে সে স্পষ্ট উপলব্ধি করতে পারে যে সেগুলোও বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের সমপর্যায়ভূক্ত। আর এই উপলব্ধি রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবকেই সার্থক করেছে। এ থেকে আমরা আর একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছছি। সে হচ্ছে বাংলা ভাষা সম্পর্কে। আমাদের গল্প-উপভাস-কাব্য-নাটক বাংলা সাহিত্যকে যে গৌরব দান করেছে তাতে প্রমাণ হয় যে বাংলা ভাষাও এমন উৎকর্ষ লাভ করেছে যাতে তা শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের বাহন হবার উপযুক্ততা লাভ করেছে।

“কিন্তু বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের এটাই শেষ কথা নয়। সম্প্রতি বাংলা ভাষায় শিল্প-দর্শন বিজ্ঞান-ইতিহাস বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে এবং পৃথিবীর অজান্ত দেশের জ্ঞানভাণ্ডার থেকে আহৃত বিষয়গুলিও অমূল্য গ্রন্থরূপে বাংলা ভাষায় উৎকর্ষ প্রমাণ করেছে।

“কিন্তু এর চেয়েও বড় কথা হচ্ছে এই যে সমস্ত ভারতবর্ষে বাংলাভাষীর সংখ্যা অন্তত সাত কোটি। অতএব বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষার অমূল্য ভাষারূপে গ্রহণ না করার কোনও যুক্তি নেই। একাধিক ভাষা রাষ্ট্রীয় ভাষা হওয়ার আইনত কোন বাধাও নেই, এবং সুবিধার দিক বিবেচনা

করে, সাত কোটি বাঙালীর ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষার দিক বিবেচনা করে, এবং বঙ্গ ভঙ্গের কৈফিয়ৎ না দেখিয়ে এ দাবি পূরণ করা উচিত। বিভক্ত বঙ্গের ক্ষেত্রে বাঙালীরা বিভক্ত হয় নি, তা ছাড়া আমরা সবাই আশা করছি এই বিভাগ সাময়িক মাত্র, এবং ভবিষ্যতে সে কথা সবাই উপলব্ধি করে আবার আমরা এক সঙ্গে মিলব একথা প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই করছেন।”

এ ভিন্ন আরও অনেক যুক্তি সে দেখাল। বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করতেই হবে এই দাবির চাপ দিতে হবে গণসভার উপরে—উপস্থিত সবাই এ বিষয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হ’ল। সবাই উৎসাহিত এবং উল্লসিত বোধ করল সভার সাকল্যে।

ধরণীকান্ত উঠে পড়ে লাগল তার স্বপ্ন সকল করতে। হিন্দি ভাষা সে খুব ভালই জানে, কিন্তু তবু সে অবাঙালীর সঙ্গে বাংলা ভাষায় কথা বলতে চেষ্টা করে। হিন্দুস্থানীরা বাংলাদেশে এসেও হিন্দি ছাড়ে না, ইংরেজরা আমাদের দেশে এসে ইংরেজী বলে, শুধু বাঙালী ঘরে বাইরে সর্বত্র বাংলা বলতে লজ্জা পায়। এ লজ্জার হাত থেকে সে সমস্ত বাঙালীকে উদ্ধার করবে এই তার ব্রত। এ ব্রত সে অনেক দিন গ্রহণ করেছে। কিন্তু পদে পদে বাধা। বাঙালীরাই অনেক সময় নিজেকে উদ্বেষ্ট ভুলে যায়, অর্থাৎ আত্মসম্মান-বোধ হারিয়ে ফেলে।

ধরণীকান্ত সবাইকে বার বার বলেছে প্রবাসে থেকে হিন্দিভাষীদের মধ্যে বাংলা ভাষার প্রচার করতে, তাদের উপর ভাষার প্রভাব বিস্তার করতে। বাংলা শুনে শুনে যাতে অবাঙালীরা বাংলা ভাষাকে বিজ্ঞাতীয় মনে না করে এর রকম আবহাওয়া গড়ে তুলতে, কিন্তু অনেকেই তার মত সাহস পায় না। অসুবিধা বোধ করে অনেকে এবং সেই অসুবিধা সহ করতে চায় না। বিজ্ঞপ করে হিন্দুস্থানীরা। এ বিজ্ঞপ অনেকে সহ করতে পারে না। কিন্তু তবু ধরণীকান্ত ধৈর্যের সঙ্গে, অধ্যবসায়ের সঙ্গে, তার লক্ষ্য পথে এগিয়ে চলার সাধনা করে। বাংলাদেশের কোনো অপমান সে সহ করতে পারে না। বাঙালীকে কেউ ছোট করলে সে দগ করে জলে ওঠে, তার মাথা ঘুরে যায়। এ ক্ষেত্রে সে অনেকবার লাক্ষিতও হয়েছে অবাঙালীর হাতে। তার সভা আক্রান্ত হয়েছে কয়েকবার। ভাষার ভিত্তিতে নতুন ক’রে প্রদেশ বিভাগ হওয়া উচিত এ কথার সহিংস প্রতিবাদ হয়েছে। একটা সভায় মারপিটও হয়ে গেছে।

প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যে ধরণীকান্তের এই আন্দোলন অনেক দিনের হলেও ভারত স্বাধীন হওয়ার আগে অবাঙালীর বাঙালী বিদ্বেষ কখনও এমন প্রবল আকার ধারণ করেনি। কিন্তু ভারত স্বাধীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যখন ভারত বিভাগ হ’ল প্রদেশ বিভাগ হ’ল, তখন প্রাদেশিকতা নামক এক নতুন ধরনের উগ্র “ভাষাভালিভদ্ম” জাগতে লাগল অনেকগুলো

প্রদেশে। ধরণীকান্তের মনেও ক্রমশ নৈরাশ্র জাগতে লাগল তার ফলে।

বাঙালী বিদ্বেষ সর্বত্র অব্যক্ত অহেতুক নয়। ধরণীকান্ত তা জানে। কারণ সব বাঙালী সব জায়গায় অবাঙালীর সঙ্গে খোলাখুলি বন্ধুত্ব করেনি, তাদের স্বাতন্ত্র্যবোধ অনেক সময় অতি-অহঙ্কারে পরিণত হয়েছে এবং সে অনেক সময় অবাঙালীকে ছোট নজরে দেখেছে। কিন্তু তার ক্ষেত্রে ভারত ইউনিয়নভুক্ত প্রদেশগুলির মধ্যে হঠাৎ এরকম সঙ্কীর্ণতা জাগল কেন তা ধরণী বুঝতে পারে না। সে এসব ভাবতে গিয়ে আরও মমে যায়।

এমন সময় এক সমাজতন্ত্রীনেতা প্রচার করলেন ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ পুনর্বিভাগ আদ্বৈতবি কল্পনামাত্র, কারণ ভারত ভাগ হয়েছে, প্রদেশ ভাগ হয়েছে, এর পর যদি আরও ভাগ হতে থাকে ভাষার ভিত্তিতে তা হলে ভারতবর্ষের আর কোন আশা নেই।

ধরণী প্রথমে বেশ লজ্জা বোধ করল এরকম যুক্তি শুনে। এরকম নির্বোধ যে কোনো নেতা থাকতে পারে তা তার ধারণায় ছিল না। প্রদেশের জেলা অদলবদল করা আর প্রদেশ বহু খণ্ডে বিভক্ত হওয়া ধীর যুক্তিতে এক, তিনি কি বিচার-যুক্তিকে বিসর্জন দিয়ে ছুটিবুদ্ধির দ্বারা চালিত নন?

এই কথা কোনো নেতা সম্পর্কে ভাবতে গেলে লজ্জা হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু ধরণী লজ্জা পেয়ে পিছিয়ে যাবার পাত্র নয়। সে বরঞ্চ আরও নির্ভীক হয়ে উঠল তার মত প্রচারে। সে সমস্ত প্রবাসী বাঙালীকে ঐক্যবদ্ধ করে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে প্রাণপণে রক্ষার আবেদন প্রচার করে বেড়াতে লাগল। বঙ্কিম বিবেকানন্দ রবীন্দ্রনাথের ভাষার মানরক্ষা বাঙালী পৃথিবীর সর্বত্র করবে, কাউকে তার লজ্জা পাবার কারণ নেই।

এই ভাবে নানা অপ্রীতিকর ঘটনা ও বাধাকে অগ্রাহ্য করে ধরণী এগিয়ে যেতে লাগল তার আদর্শপথে। বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার আসনে বসাতে হবে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় পরিষদে তার আবেদন গ্রাহ্য হ’ল না। একমাত্র হিন্দুস্থানী হ’ল রষ্ট্রভাষা।

ধরণী প্রচণ্ড আঘাত পেলে তার এই ব্যর্থতায়। রাগে ক্ষোভে অপমানে সে অস্থির হয়ে উঠল। ধরণী দ্বিধাগ্রস্ত হ’ল। সে ক্রমে বুঝতে পারল এ আন্দোলন শুধু প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে আর চলবে না। বাংলাদেশে গিয়ে সেখানে প্রচার চালাতে হবে। সমস্ত বাঙালীকে এই আন্দোলনে টেনে আনতে হবে। এ কথা মনে হওয়ার আরও কারণ এই যে বাংলাদেশ থেকে তার সমর্থক কোনো প্রতিধ্বনি সে এখনও পর্যন্ত কিছু শোনে নি।

কিন্তু বাংলাদেশে আসায় তার কিঞ্চিৎ বাধা ছিল। তার কর্মস্থল হ’ল প্রবাসে, সেখানে তার জীবিকা উপার্জন। সংসার

চালাতে হয় সেখানে। বাংলাদেশে এসে দীর্ঘ দিন থাকার দরকার হবে। কারণ এলে সপরিবারেই আসতে হবে, এবং তাতে বহুদিনের ক্ষতি প্রবাসের সংশ্রব ত্যাগ করতে হবে।

এটা কঠিন কাজ। ধরনী ভাবতে লাগল।

কিন্তু এর পিছনে যে মহৎ উদ্দেশ্য আছে, সেই উদ্দেশ্যেই জয় হ'ল। এই উদ্দেশ্য স্বরণ করে ধরনী শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশে আসাই ঠিক করল। বাংলা-দেশের, বাংলা ভাষার এবং বাঙালীর সংস্কৃতির এত বড় অপমান সে আর সহ্য করবে না। যারা সহ্য করেছে তারা নিজেদের ক্ষতি করেছে, তারা বাংলা দেশের ক্ষতি করেছে। তাদের অনেকে এখন আর বাংলা ভাষায় কথা বলতে পারে না, তাদের পরিবারের মেয়েরাও হিন্দি বলে এবং হ'কো টানে। অনেকে

কিছু কিছু বাংলা বলতে পারে কিন্তু তাদের উচ্চারণ বিকৃত। ধরনী অনেক দিনের চেষ্টার এদের অনেকের মনে চেতনা-সঞ্চার করতে পেরেছে যে ভাষার পরাজয় মানেই জাতির পরাজয়।

ধরণীর প্রবাস ছেড়ে আসায় স্বভাবতই একটু দেরি হ'ল। এর মধ্যে একটি বছর কেটে গেছে। ১৯৪৮ সাল এসেছে। একটি বছর ধরে সে আঠার উনিশ বছরের প্রবাস বন্ধন একটু একটু করে ছিন্ন করল। কষ্ট হচ্ছিল খুবই, কিন্তু ধরনী কর্মী, সে কোথায়ও চূপ করে কেবলমাত্র ঘটনার স্রোতে গা ভাসিয়ে চলতে পারে না। নিজ হাতে তার কিছু গড়ে তোলা চাই, নিজ হাতে তার পারিপার্শ্বিকের পরিবর্তন ঘটান চাই, নইলে সে বাঁচতে পারে না।

সুতরাং তার সকল ছুঃখ সে তার সঙ্কল্পের দ্বারা অতি সহজে অতিক্রম করে গেল। তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হল ভবিষ্যতের দিকে।

সে চলেছে বাংলাদেশে যেখানে বাংলা কথায় বাংলা গানে সমস্ত আবহাওয়া মুগ্ধিত।

কিন্তু একটি কথা তার মনকে বড় বিষণ্ণ করে তুলল। বাংলাদেশ বড় অসহায়। সেখানে দুর্ভিক্ষ লেগে আছে বারো মাস। খাদ্য নেই, পরিবেশ নেই; আছে বহা, মহামারী আর ব্যাপক মৃত্যু। এ বিষয়ে ভারতবর্ষের অস্ত্র সব দেশ থেকেও যেন বাংলাদেশ একটু বেশি ভাগ্যহীন।

এই অভিশপ্ত প্রদেশে বাংলা-সংস্কৃতির আন্দোলন বুধা হবে না তো?

তার একমাত্র ভরসা বাংলার সাহিত্যিকেরা। তারা ছুঃখ-



দৈন্তের মধ্যে বসে দুঃখদৈন্তের গান গেয়েই তাকে অতিক্রম করে যায়।

ধরণীর মনে কিছু আশা জাগল। হয়তো সে সফল হবে, হয়তো দীর্ঘদিনের পরিত্যক্ত বঙ্গজননী তাকে স্থান দেবেন।

আপাতত তাকে সপরিবার তার কাকার বাড়িতেই উঠতে হবে। কাকার অবস্থা ভাল, কোনো অসুবিধা হবে না। পাঁচ বছর আগে কাকাও সপরিবারে ধরণীদের বাড়িতে গিয়ে উঠেছিলেন। রওনা হবার আগে সে ধবর জানিয়ে দিল, এবং রওনা হয়ে 'তার' পাঠাল।

শরৎকালের এক আলোঝলমল প্রভাতে এসে পৌছল ওরা হাওড়া ষ্টেশনে।

দেখে খুশি হ'ল যে তার কাকা কাকীমা ও তাঁদের ছোট ছেলেমেয়েরা ষ্টেশনে এসেছেন ওদের অভ্যর্থনা করতে।

কাকা ও কাকীমা ওদের দেখে খুশি হয়ে এগিয়ে গেলেন ওদের কামরার দিকে।

কাকা বললেন, "রাভার্মে কোই তক্কাফ ন'হী ছর্দী?"

কাকীমা ধরণীর জীকে বললেন, "যব তুম ইতনে লগে অর্পে বাদ বংগালমে আইহো, তো কুছ অধিক সময় তক যহা রহো ন।"

ছোট ছেলে বলে উঠল, "ভোজী, তুম্বারে গোদী মে চড়েঙ্গে।"

ধরনী খুব হেসে উঠল এদের হিন্দিতে কথা বলতে শুনে, বলল, "আমরা বাঙালীই আছি, হিন্দুস্তানী ব'নে যাই নি—বাংলাতেই বলুন।"

কাকা হিন্দিতেই বললেন, "নহী শায়দ তুম্লেগ নহী ছয়ে

পরন্তু হুমলোগ হয়ে যায়। অব্ হুমলোগ রাষ্ট্রভাষা মে' হী বাত চীত্ করতে যায়।”

ধরনী শুভিত হয়ে প্রশ্ন করল, “কেন?”

কাকা বললেন, “নহী কহনে সে অসন্মান হোতা ছায়।”

ধরনী কঠিন হয়ে উঠল। বলল “তা হোক আপনি বাংলার বলুন।”

কাকা এদিক ওদিক চেয়ে চাপা গলায় বাংলা ভাষাতে বললেন, “বেশ, আপাত্ত বলছি।”

ধরনী গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করল, “সবাই কি হিন্দি বলছে?”

“শিক্ষিতেরা সবাই। এ দেশ না, বাংলা ধবরের কাগজও কেউ বিশেষ পড়ে না। এক পরসাদা দামের একধানী করে বাংলা কাগজ ছাপা হয়, কিন্তু দেব, ইংরেজী কাগজগুলো সব হিন্দুস্থানীতে ছাপা হচ্ছে।”

ধরনী স্টলের দিকে চেয়ে দেখল, অমৃতবাজার পত্রিকার পায়ে দেবনাগরী ছাপ।

তার আর কথা বলার প্ররুতি ছিল না। তবু জিজ্ঞাসা করল “বাংলা দেশের সাহিত্যিকেরা কি করছে?”

“ভারা সবাই রাষ্ট্রভাষার লিখতে শুরু করেছে।”

ধরনী বলল, “কাকাবাবু, আপনাদের কষ্ট দিলাম ষ্টেশনে টেনে এনে। আমি আর যাব না।”

“সে কি কথা, যাবে না কেন? সে হয় না”—ইত্যাদি বলে ওদের টানতে লাগলেন সবাই মিলে।

ধরনী অটল।

কাকা খটখটানেক সাধাসাধি করেও ওদের সঙ্কলচ্যুত করাতে পারলেন না। ওরা সন্ধ্যা পর্যন্ত ঠায় প্ল্যাটফর্মে বসে থেকে ক্ষেত্র গাড়িতে ফিরে চলে গেল পুরাতন প্রবাসে।

ইন্দোনেশিয়া ও তাহার মুক্তি-সংগ্রাম

ক্রীসত্যকির চট্টোপাধ্যায়

মালয় উপদ্বীপের দক্ষিণ-পূর্ব দিকস্থ উপনিবেশটি বিশ্বের সুসমৃদ্ধ উপনিবেশগুলির মধ্যে অন্যতম। উহা ওলন্দাজ-অধিকৃত। এক্ষণে ঐশ্বর্যমণ্ডিত দেশের অধিকারী বলিয়া ওলন্দাজদের প্রতি ক্ষণতের শ্রেষ্ঠ শক্তিগুলি বিশেষ ঈর্ষান্বিত। ইহার কাঁচা মাল ও প্রাকৃতিক সম্পদ-আহরণ-লোভে উচ্চাকাঙ্ক্ষী জাপান সহজেই প্রলুব্ধ হইয়া পড়িল। যাতায়াত-ব্যবস্থা সহজসাধ্য থাকায় উহার ঐশ্বর্য অপহরণের লোভ বিহীন-গতিতে বর্ধিত হইল। জাপানজি যখন ‘বৃহত্তর পূর্ব-এসিয়া’ গঠনের ক্ষম সংগ্রামে উচ্চত তখন ওলন্দাজেরা ভিলমাত্র বাধা দিতে সমর্থ হয় নাই। সুদূর প্রাচ্যের যুদ্ধশেষে ওলন্দাজেরা ইন্দোনেশিয়ার পটভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া তাহাদের অভিলাষানুরূপ কাজ করিতে লাগিল।

ওলন্দাজ পূর্ব-ভারতীয় বণিকদল সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমেই এই সাম্রাজ্য গঠন করিয়াছিল। দুঃসাহসী ডাচ বণিক ও নাবিকগণ এই দ্বীপপুঞ্জেরই অন্তর্গত ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মশলাদ্বীপ বা মলাক্কায় ছোটখাট ব্যবসায় আরম্ভ করিল। ইংরেজ-ডাচ বাণিজ্য-প্রতিরুদ্ধিতার এবং ডাচদের একচেটিয়া মশলা-ব্যবসায়ের ফলেই সুদূর প্রাচ্যে ইতিহাস-বিখ্যাত এম-বেয়না (Amboina) হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। তারপর ব্রিটিশেরা ভারতে আসিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করে আর ডাচরা প্রাচ্য লাভ করে ইন্দোনেশিয়ায়। হল্যান্ডের রাজধানী হেগ নগরে অবস্থিত ডাচ-মন্ত্রিণের অধীনে ও তত্ত্বাবধানে একজন ডাচ-গবর্নর-জেনারেল দ্বারা পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ শাসিত হইতেছে।

বিষুববৃত্তের প্রায় সমান্তরে এসিয়া হইতে অষ্ট্রেলিয়া পর্যন্ত মালয় দ্বীপপুঞ্জ নামে যে সুদূরপ্রসারী দ্বীপমালা রহিয়াছে পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ তাহারই এলাকাভুক্ত। উহাতে সুমাত্রা, জাভা, বোর্নিও, সেলিবিস, বাকা, বিলিটন, বলী, লমবোক, সামবোয়া, সোয়েমবা, জোরোস, টিমর, মলাক্কা ইত্যাদি আরও বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ রহিয়াছে, তন্মির নিউগিনির সুবিশীর্ণ ভূ-ভাগও ইহারই অন্তর্ভুক্ত। উহাদের মধ্যে ছোট ছোট দ্বীপ-গুলিকে স্লাম্মা দ্বীপশ্রেণী এবং টিমর, মলাক্কা ও নিউগিনি প্রভৃতি লইয়া সমগ্র ভূভাগকে মালয়েসিয়া বলা হয়। এই দ্বীপশ্রেণী সুদূর প্রাচ্য ও অষ্ট্রেলিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত থাকায় ইহার ভৌগোলিক অবস্থান ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা সন্দেহে সহজেই একটা উচ্চ ধারণা হয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রাজধানী লন্ডন হইতে পোর্ট ডারউইন হইয়া সিডনী পর্যন্ত যে বিমান-পথ আছে বিমানগুলি ঐ দিক দিয়া যবদ্বীপস্থ বাটাভিয়া হইয়া যাতায়াত করে।

পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের আয়তন সর্বসাকুল্যে ৭৩০,০০০ বর্গমাইল। এই দ্বীপপুঞ্জ সুবিশীর্ণ মহাসাগরের উপর দিয়া প্রায় ৩০০০ মাইল বিস্তৃত। লিভারপুল হইতে নিউইয়র্ক পর্যন্ত যতটা দূরত্ব, যোঁটামুটি এই দ্বীপপুঞ্জেরও পূর্ব হইতে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত ততটা দূরত্ব বরা যাইতে পারে। বোর্নিওর উত্তর-পশ্চিম অংশের বৃহত্তম দ্বীপগুলিকে স্লাম্মা দ্বীপপুঞ্জ বলা হয়। এইগুলি ব্রিটিশ শাসনাধীন এবং তন্মধ্যে সারাবাক ও জুনি ব্রিটিশের আশ্রিত রাজ্য। এক জন খেতকার রাজা সারাবাকের এবং এক জন মালয়-জলতান জনির শাসনকার্য চালাইয়া থাকেন।

লবনস্ব সমৃদ্ধপ্রাণ কোন একটি কোম্পানী দ্বারা ব্রিটিশের উত্তর-বোর্নিও শাসিত হয়। কেবলমাত্র নিউগিনির পশ্চিমাংশ ডাচদের অধিকৃত। টিমর দ্বীপটি ওলন্দাজ ও পর্তুগীজ উভয়ের শাসনাধীন। নিউগিনি যদিও এই পূর্বভারতীয় দ্বীপ-পুঞ্জের এলাকাভুক্ত তথাপি ইহা অস্ট্রেলিয়ার একটি প্রাকৃতিক অংশ-মধ্যে পরিগণিত। ইহার স্বর্ণ, পেট্রোলিয়ম প্রভৃতি মূল্যবান বনিজ ও প্রাকৃতিক সম্পদ আজিও সম্পূর্ণ অজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে। ইহার অধিকাংশ স্থলভাগই নিবিড় বনভূমিসমাক্রম। যুদ্ধের কল্যাণে ইহার কোন কোন অংশ আজ আর পূর্বের মত অপরিজ্ঞাত নয় বটে, তবে অভ্যন্তর ভাগ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু আজও জানা যায় নাই। ইহার অধিবাসি-গণকে পাপুয়া বলা হয়। ইহাদের রীতিনীতি ও জীবনযাত্রা-প্রণালী দৃষ্টে বৃষ্টিতে পারা যায় যে, ইহারা আদিম জাতি এবং ইহাদের মধ্যে অনেকই এখনও নরবাদক।

ইন্দোনেশিয়া সমগ্র বিশ্বের মধ্যে একটি সমৃদ্ধিশালী দেশ। উহা প্রাকৃতিক সম্পদে অসম্ব্যদ। উহার বন-সম্পদে আজিও কেহ হস্তক্ষেপ করে নাই। উহার সুবিশীর্ণ বনভূমি নানা-প্রকার কাঠে, বিশেষতঃ সেগুন ও বাহাছরি কাঠে পরিপূর্ণ।



মাহুঘের মাথার চুল এবং পন্তলোমশোভিত ঢাল ও বর্শাধারী ভায়াক যোদ্ধা

এই দেশটি বনিজ সম্পদেও ভরপুর। এখানে কয়লা, লোহা, টিন, নিকেল, ম্যাঙ্গানীজ, স্বর্ণ, গন্ধক, তাম্র প্রভৃতি ধাতব দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। এই প্রসঙ্গে এখানকার জমির উর্বরতা এবং আবহাওয়ার কথা উল্লেখযোগ্য। কেননা এইরূপ আবহাওয়ার দরুনই এখানে রবার, তামাক, বান, ইক্ষু, সিনকোনা-ছাল, সাগু, তুলা, শুষ্ক নারিকেল-শাঁস, শগ, মশলা, কফি, চা প্রভৃতি নানাবিধ ঐশ্বর্যমণ্ডলীয় দ্রব্য প্রভূত পরিমাণে উৎপন্ন হয়।

ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ইন্দোনেশিয়া কয়লা, লোহা, টিন, রবার, তেল, উৎকৃষ্ট কাঠ প্রভৃতি শ্রমশিল্পের কাঁচা মাল



'প্রাউ' বা ডোডা নৌকায় ডায়াক জেলের মৎস্ত-শিকার

সম্বদ্ধ। সম্ভ্রুতি এই দেশ পেট্রোলিয়ম উৎপাদকরূপেও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ও ভারতের বাজারে উহা প্রচুর পরিমাণেই বিক্রীত হয়। দক্ষিণ-পূর্ব বোর্নিওর বাসিক-পাপান তৈল-বনি এবং তারাকানের তৈল-বনিগুলি গত যুদ্ধের সময় হইতে বিশেষভাবে পরিচিত হইয়াছে। ইন্দোনেশিয়া প্রচুর টিন ও রবার-উৎপাদনকারী একটি দেশ। টিন প্রধানতঃ সিঙ্গাপুরের দক্ষিণ-পূর্বস্থ বাকা ও বিলিটন হইতে এবং কয়লা যবদ্বীপ ও বোর্নিওর বনিগুলি হইতে উত্তোলিত হয়। যবদ্বীপে প্রচুর পরিমাণে উষ্ণমণ্ডলীয় কৃষিজ্রব্য উৎপাদিত ও সংরক্ষিত হয়। যবদ্বীপের পরেই সুরমাত্রাকে উন্নত ধরনের কৃষি-সম্পদে সম্বদ্ধ অঞ্চল হিসাবে ধরা যায়। সুরমাত্রায় বনিজ দ্রব্যও বিস্তর। উহা উষ্ণমণ্ডলীয় ফসল প্রচুর পরিমাণে রপ্তানী করিয়া থাকে। মলাকা ও সেলিবিস দ্বীপপুঞ্জে লঙ্কা, জায়ফল, লবঙ্গ প্রভৃতি মশলা এবং সেলিবিসে কাঠ, স্বর্ণ, লৌহ, গন্ধক ও টিন প্রভৃতি বনিজদ্রব্য যথেষ্ট পাওয়া যায়।

ইন্দোনেশিয়া শুধু উৎপাদনকারী দেশ নয়, উৎপন্ন দ্রব্যের প্রাচুর্য্যনিবন্ধন উহা রপ্তানীও করিয়া থাকে। যদি ইহার সম্পদ যথাযথভাবে আহরণ করা যায় তবে বিশ্বের মধ্যে উহা সর্বশ্রেষ্ঠ কাঁচামাল ও ষাণ্ড্যদ্রব্য রপ্তানির অঞ্চল বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। বর্তমানে যবদ্বীপ ছাড়া



বোর্গিও দ্বীপের আদিবাসী ডায়াকদের বিবাহ-বাসরে গ্রামের সর্দার বরকতাকে
আশীর্বাদ করিতেছে

ইন্দোনেশিয়ার সমগ্র অঞ্চলের অনেকাংশ প্রায় অপরিজ্ঞাত এবং বহুবিধ উদ্ভিজে সমাচ্ছন্ন। পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের শোষণকার্য্য সবেমাত্র শুরু হইয়াছে। ইন্দোনেশিয়ায় স্বাভাবিক সুযোগ-সুবিধা যাহা আছে তাহা যদি পরিপূর্ণভাবে কার্য্যকরী করিয়া তোলা যায় তবে তাহার কৃষিসম্পদ শতগুণ বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। শাসন-ক্ষমতা নিজেদের হাতে পাইলে এবং উপযুক্ত মূলধনের ব্যবস্থা হইলে দেশলাই, রবার, তামাক, রাসায়নিক দ্রব্য ইত্যাদি শ্রমশিল্পেও তাহাদের প্রচুর উন্নতি-সাধিত হইতে পারে।

যত দূর জানা যায়, ইন্দোনেশিয়ার মধ্যে যবদ্বীপই সর্বাপেক্ষা উন্নত ধরণের দেশ। উহার সমীপবর্তী মাদুরা প্রভৃতি দ্বীপ লইয়া উহার আয়তন প্রায় ৫০,০০০ বর্গ মাইল। উহার লোক-সংখ্যা ৫ কোটি। পৃথিবীর সর্ববসতিপূর্ণ দেশগুলির মধ্যে যবদ্বীপ অষ্টম। উহা আয়োগিসিরিসঙ্গুল দেশ। বহুপাত হইতে উহার উৎপত্তি। উহার উৎক্ষেপ হইতেই যবদ্বীপের সৃষ্টি ও আংশিক ক্ষয়ক্ষতি চলিয়া আসিতেছে এবং উহার উর্বরতা তাহাতেই বৃদ্ধি পাইতেছে। আদিম অরণ্যাদির অধিকাংশ পরিষ্কৃত হইয়াছে এবং তাহাতে চাষ-আবাদ চলিতেছে। যবদ্বীপে যখন সর্বপ্রথম মনুষ্যবসতি স্থাপিত হইল তখন উহার বহু আগাছা বিনষ্ট করা হয়। এখানে সারা বৎসর ধরিয়া প্রচুর পরিমাণে রপ্তাপাত হয়। সাগরের আবহাওয়ার প্রভাবে এখানকার জলবায়ুর রক্ষতা অনেকটা কমিয়া থাকে।

যবদ্বীপ ও পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের আয়োগিসিরি-উৎক্ষেপ যুক্তিকা অতীব উৎকৃষ্ট ও উর্বর। আবহাওয়ার নিয়ন্তা, যুক্তিকার উর্বরতা এবং অধিবাসিগণের শ্রমশীলতার যবদ্বীপ ছনিয়ার একটা কৃষিপ্রধান দেশে পরিণত হইয়াছে। এখানে জাপানের মত ব্যাপকভাবে কৃষিকার্য্য চলিতেছে।

পাহাড়ের শীর্ষে ও পার্শ্বদেশে লাঙ্গল দিয়া চষিয়া মাটির ঢিবি তৈরি করা হয়; হঠাৎ বৃষ্টি হইলে উহা ধুইয়া নামিয়া যাইতে পারে না। এখানকার আবাদী জমিগুলি সাধারণতঃ ওলন্দাজ ও চীনাদের অধিকৃত। যবদ্বীপবাসীদের অধিকারে অতি অল্প পরিমাণ ভূমিই আছে। যবদ্বীপের কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে রবার, ধান, তামাক, জনার, শুক নারিকেল-শাস, চা, সিনকোনা-জাল, কফি, নীল, সাণ্ড, চীনাবাদাম, শগ, গমজাতীয় দ্রব্য ও নানাবিধ ফল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই স্থানটি উষ্ণমণ্ডলীয় উৎপন্ন দ্রব্যের বিপুল ভাণ্ডার। উহা লোহা, কয়লা, টিন প্রভৃতি বহুবিধ খনিজ দ্রব্যের আগার। ইন্দোনেশিয়ায় গবাদি পশু যথেষ্ট পাওয়া যায় না বটে,

কিন্তু যবদ্বীপে এ সকল গৃহপালিত জীবজন্তুর মোটেই অভাব নাই।

ঐশ্বর্য্য ও সংস্কৃতি উভয়েরই জন্ম যবদ্বীপের যথেষ্ট প্রসিদ্ধি আছে। তাহার নিত্যজ অল্পমাত্র অংশগুলিতে পর্য্যন্ত যে ঘনবসতি ও বিন্ময়কর উন্নয়ন-ব্যবস্থা দেখা যায় তাহা ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপবাসীর অজ্ঞাত বিরল। জনবলই তাহার শ্রেষ্ঠবল। এই ঘন-বসতিপূর্ণ ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের ৭ কোটি বা তদূর্ধ্ব সংখ্যক লোকের দুই-তৃতীয়াংশই এখানে বাস করে। যবদ্বীপবাসিগণ বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণে উৎপন্ন হওয়ায় মালয়েসিয়া, মেলানেসিয়া ও পলিনেশিয়ার সমস্ত লোকের অপেক্ষা তাহারা অধিক পরিশ্রমী ও কর্ম্মঠ। কর্ম্মদক্ষ শ্রমিক এখানে প্রচুর পাওয়া যায়। এই শ্রমশীলতা সমগ্র ইন্দোনেশিয়ার সাধারণ ভাবে এবং যবদ্বীপে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। ইহা স্বরণ রাখা দরকার যে, লোকসংখ্যা অনেক সময় জাতির সবলতার কারণ না হইয়া দুর্বলতার কারণ হইয়া থাকে। পূর্ব-ভারতীয় অপরাপর দ্বীপের সঙ্গে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পার্থক্যই এই দু পটীর বিপদের কারণ হইয়াছে। যদি কোনপ্রকারে উহার অধিবাসিগণ এ বিপদ হইতে মুক্ত হইতে পারে তবে তাহারা যথেষ্ট উন্নতিলাভের সুযোগ পাইবে। উহার অধিবাসীদের স্থান-পরিবর্তন, শ্রমশিল্পের উন্নতিসাধন, সমস্ত কর্ণযোগ্য ভূমির চাষ-আবাদ ও সম্প্রদারণ, বৈজ্ঞানিক কৃষিপ্রণালীর প্রচলন, জনসংখ্যা-সমস্যার সমাধান প্রভৃতি কার্য্য সম্ভোষজনক ভাবে করতে পারিলে উহা উন্নতির চরম সীমায় পৌছবে। যবদ্বীপের অবস্থিতি ইন্দোনেশিয়ার মধ্যস্থলে এবং বিশ্ববাসিজ্যের চৌরাস্তায় বলিয়া উহার প্রাকৃতিক সম্পদ সহজেই আহরণ ও পৃথিবীর সর্বত্র প্রেরণ করা যায়। বড় বড় রাস্তা, রেলপথ ও তৎসহ বিস্তৃত খাল ও পন্থপ্রণালীর সংযোগ থাকায় এই দ্বীপটির সর্বত্র

যাতায়াতের উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা রহিয়াছে। এই সমস্ত কারণে এবং ওলন্দাজদের শ্রমশীলতার এই দ্বীপটি একটি বিশেষ কৃষিপ্রধান দেশে পরিণত হইয়াছে। তবুও সেখানে আরও অনেক কিছু করিবার আছে। অত্যন্ত দ্বীপের কথা জাতিয়া দিলেও শ্রম-শিল্পের উন্নতির জন্য আবশ্যক কাঁচামাল চলাচলের সুবিধা, দক্ষ শ্রমিক, বাজার ও সমুদ্রপথের সান্নিধ্য থাকা সত্ত্বেও এই দ্বীপটি শ্রম-শিল্পে যথেষ্ট পিছনেই রহিয়া গিয়াছে। স্বাভাবিক ইহার উন্নতির প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কারণ সুমাত্রা প্রভৃতি কয়েকটি দ্বীপ বনিজ ও তৈল সম্পদে ইহা অপেক্ষা অনেকাংশে সমৃদ্ধ। কতকগুলি ছোট ছোট শিল্প-প্রতিষ্ঠান এখানেই অবস্থিত এবং ইন্দোনেশিয়ার এই অংশটিও বনবসতি পূর্ণ ও বিশেষভাবে সুসমৃদ্ধ। বিগত দশ বৎসরের অর্থনৈতিক অবনতির পরে এই সকল শিল্প, বিশেষতঃ বস্ত্র- ও চিনি-শিল্প এবং রবার, তামাক, রাসায়নিক দ্রব্য ইত্যাদি কয়েকটি বড় শিল্পও বিশেষভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরোক্ষ প্রভাব এই সব শিল্প-প্রকৃতিতে বিশেষ কার্যকরী হইয়াছে। যুদ্ধের দরুন জাপানীদের সাময়িক অধিকার এবং আভ্যন্তরিক বিশৃঙ্খলা উহার শিল্পোন্নতির পথে অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইলেও ভবিষ্যতে এখানে শ্রম-শিল্পের প্রচুর উন্নতির সুবিধা রহিয়াছে।

যবদ্বীপের অধিবাসীদের প্রধান পেশা কৃষিকার্য; অবশ্য কেহ কেহ শ্রমশিল্প, বিশেষভাবে হস্তশিল্পে নিযুক্ত। বহুসংখ্যক লোক যন্ত্র-শিকারেও ব্যাপৃত। ব্যবসা-বাণিজ্য সাধারণতঃ আরব ও চীনাাদের হাতে। ইন্দোনেশিয়াবাসীদের পরেই চীনারা এখানকার প্রধান অধিবাসী; এখানে তাহাদের সংখ্যা প্রায় দশ লক্ষ। অত্যন্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে হাজার হাজার ইউরোপীয় ও ভারতীয় এখানে বাস করে। যুদ্ধের পূর্বে এই জনবহুল প্রদেশটি হল্যান্ডের উৎপন্ন শিল্পদ্রব্য এবং তাহাদের শ্রমশিল্পের জন্য আবশ্যক কাঁচামালের বাজার-স্বরূপ ছিল। যবদ্বীপ তাহার নিজ খাজদ্রব্য উৎপাদন করিয়াও চিনি, চা, কফি, সিনকোনা-ছাল, রবার, শুষ্ক নারিকেল-শাঁস ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি করিয়া থাকে। যুদ্ধের পূর্বে ভারতের প্রয়োজনীয় চিনির অধিকাংশই এখান হইতে সরবরাহ হইত। সিনকোনা ছাল হইতে কুইনিন প্রস্তুত হইয়া সমগ্র পৃথিবীর চাহিদা মিটার—তাহার বেশীর ভাগই ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, বিশেষতঃ যবদ্বীপ হইতেই আসে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের পরম শত্রু ম্যালেরিয়া দমনের অমোঘ ও মূল্যবান ঔষধ হইতেছে

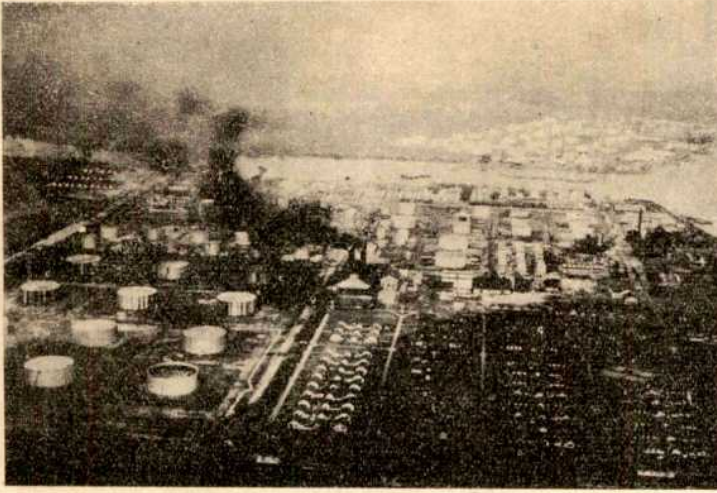


সুমাত্রার অন্তর্গত ডেলির রাজধানী মেডান। এখানে ডাচ রেসিডেন্সী এবং স্থলতানের আধুনিক প্রাসাদ বিদ্যমান

কুইনিন। উহা গ্রীষ্মপ্রধান দেশে যথেষ্ট বিক্রীত হইয়া থাকে। যুদ্ধের পূর্বে ভারতবর্ষ পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ হইতে প্রচুর কুইনিন আমদানী করিত। ঐ স্থান জাপানের হস্তগত হওয়ায় ভারত ইহা হইতে বঞ্চিত হয়। ঐ সময় স্থানীয় উৎপাদন অপ্রচুর হওয়ায় ভারতবাসীদের অপরিসীম কষ্টভোগ করিতে হইয়াছে। যুদ্ধকালীন প্রবল অর্থনৈতিক ভাঙনের দরুন ইন্দোনেশিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্যে বিপর্যয় দেখা দিয়াছিল। যুদ্ধোত্তর যুগে আবার উহার উন্নতি হইবে বলিয়া আশা করা যায়। বর্তমান সময়ে এবং কিছু দিন পরে এখানকার অধিবাসীরা ভারতের বাজারে যথেষ্ট উৎপন্ন দ্রব্য সরবরাহ করিতে পারিবে।

যদিও ভারতের মত যবদ্বীপের গ্রামগুলিতেই অধিকসংখ্যক লোক বাস করিয়া থাকে তথাপি অতীতে সেখানে অনেক শহর গড়িয়া উঠিয়াছে। বৃহৎ নগরী বাটাভিয়া যবদ্বীপ এবং ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী ও প্রধান বন্দর। প্রয়োজনীয়তার দিক দিয়া দেখিলে পূর্ব-যবদ্বীপস্থ প্রধান বন্দর ও পোতাশ্রয় সুরাবায়ার স্থান বাটাভিয়ার পরেই। উহার অভ্যন্তরভাগস্থ বাণ্ডুয়ং একটি বিখ্যাত নগরী ও পার্কত্যানিবাস। সামেরাং এবং ম্যাডেলং নামে আরো দুইটি প্রসিদ্ধ নগরী রহিয়াছে। ইহার অভ্যন্তর-ভাগে যোগজাকর্ভা ও সোয়েরাকর্ভা নামে আরও দুইটি অতি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ নগরী বিদ্যমান। জুই জন স্থলতানের নাম হইতেই শেযোক্ত নগরী জুইটির নামকরণ হইয়াছে।

ইন্দোনেশীয়গণ মালয়-বংশ হইতে উদ্ভূত। তাহারা অপরাপর জাতির সংস্পর্শে যথেষ্ট সভ্য ও উন্নত হইয়াছে। আদিম মালয়ের অধিবাসিগণ হিন্দু ও অপরাপর জাতিদের ঘনিষ্ঠ সংস্রবে আসিয়া শ্রমশীল হইয়া উঠিয়াছে। ইন্দোনেশীয়গণের



পালেমবাঙে তৈল উৎপাদন ও পরিষ্কৃত করিবার কারখানা

সংস্কৃতি ও সভ্যতা হিন্দু সংস্কৃতি ও সভ্যতা দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবান্বিত। যদিও তাহাদের অনেকেই মুসলমান ধর্ম স্বীকার করিয়া লইয়াছে তথাপি মূলতঃ যে তাহারা হিন্দুই ছিল তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। তাহারা ধর্ম সম্বন্ধে অতিশয় গোঁড়া বা ভাবপ্রবণ নহে। কোনো কোনো দিক দিয়া মুসলমান সংস্কৃতির বিরুদ্ধভাবাপন্ন হইলেও সকলেই নিজেদের মুসলমান বলিয়া পরিচয় দেয় এবং মন্ডায় তীর্থযাত্রী হইতে পারিলে গৌরব বোধ করে।

কৃষিকার্যে এবং কারুশিল্পেও ইন্দোনেশীয়দের দক্ষতা আছে। তাহারা সাধারণতঃ বাঁশের তৈরি গৃহে বাস করে এবং সাদাসিধা ভাবে জীবিকা নির্বাহ করে। ভাত ও মাছই তাহাদের প্রধান খাদ্য। এই দেশের অনেকগুলি দ্বীপে সাগু ও ঝাড়রূপে ব্যবহৃত হয়। তাহাদের প্রাচীন ইতি-বৃত্ত পাঠে জানা যায় যে, তাহারা বুদ্ধপ্রিয় ও শক্তিশালী জাতি ছিল। তাহারা অতি শাস্তিশিষ্ট, সরল, পরিশ্রমী, দক্ষ নাবিক এবং মৎস্যশিকারী। মালয়, পলিনেশিয়া ও পাণ্ডুর লোক-দের চেয়ে তাহারা অধিকতর সভ্য ও উন্নত।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং মালয় দ্বীপপুঞ্জের প্রাচীন ইতি-হাসের পৃষ্ঠায় একটু দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝা যাইবে যে বহু শত বৎসর পূর্বে হিন্দু সংস্কৃতির প্রভাব এই সকল দেশে বিস্তারলাভ করিয়াছিল। ইন্দোনেশিয়ার বিভিন্ন স্থান এবং কাছোঙ্গে সিয়া হিন্দুগণ বড় বড় রাজ্য ও উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। প্রত্ন-তাত্ত্বিক আবিষ্কার, প্রাচীন স্মৃতিস্তম্ভ, মন্দির, ভাষা, আচার-ব্যব-হার এবং ঐতিহাসিক ঘটনাবলী হইতে ইন্দোনেশিয়ায় হিন্দু-কৃষ্টির প্রভাবের স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। অতীতের হিন্দু-সভ্যতার বহু চিহ্ন ইন্দোনেশিয়ার নানাস্থানে ছড়াইয়া রহিয়াছে। যবদ্বীপের পূর্বদিকস্থ দুইটি ক্ষুদ্র দ্বীপ, বলী ও লাম্বকের অধি-

বাসীরা এখনও হিন্দু সভ্যতার উত্তরাধি-কারী বলিয়া গৌরব করিয়া থাকে। এই দুইটি দ্বীপের অধিবাসিগণের অধিকাংশই হিন্দুধর্মের অনুগামী এবং হিন্দু আচার-ব্যবহারই তাহারা অনুসরণ করিয়া থাকে। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ভারতবর্ষ ও ইন্দোনেশিয়া বহু শতাব্দী পূর্বে হইতেই আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক সূত্রে আবদ্ধ ছিল। বলীদ্বীপে ও যবদ্বীপে যে সমস্ত ঐতিহাসিক স্মৃতিচিহ্ন ও বিরাট দেবমন্দির রহিয়াছে তন্মধ্যে বোরো বুদ্ধর সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও জাঁকজমকপূর্ণ। ইহা পৃথিবীর স্থাপত্য-শিল্পের অস্বল্প শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। আথেন্সগিরি-সমুখিত বহু প্রস্তর কাটিয়া নির্মিত ঐ মন্দিরটি এবং উহার বোদিত মূর্তিগুলি সমগ্র বিশ্বের বিষয়-স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে।

পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মুসলমানদিগের আক্রমণের পর যবদ্বীপের ইতিহাসে দ্বিতীয় পর্গায়ের সূচনা হইল। ঐ সময়ের শেষের দিকে ওখানকার মোজাপাহিতের বৃহৎ হিন্দুরাজ্যের পতন এবং ব্রিটিউইজোয়া ও মাতরম্ প্রভৃতি অপরাপর হিন্দু রাজ্যের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে ইন্দোনেশিয়ায় মুসলমান প্রভাব প্রসার লাভ করিল। এইরূপে বহু ছোটবড় রাজ্য গড়িয়া উঠিল। চতুর্দশ খ্রিষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সেখানে যে হিন্দু ও বৌদ্ধপ্রভাব বিজয়মান ছিল তাহা বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িল এবং তৎপরিবর্তে মুসলমান-প্রাধিকার বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন হইল।

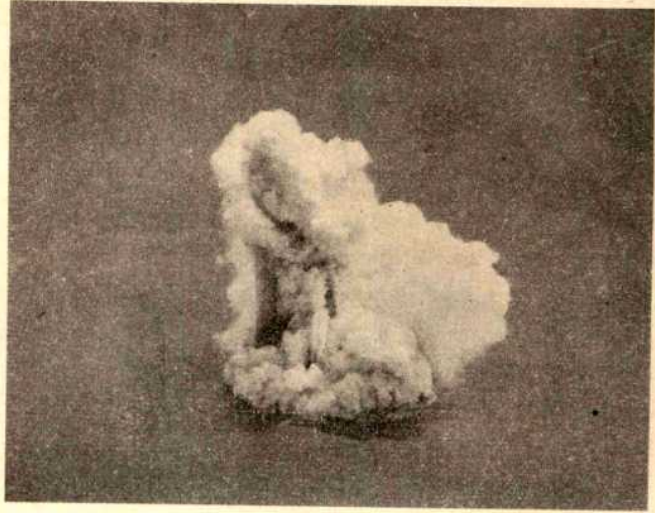
ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপীয়গণ, বিশেষতঃ পর্তুগীজরা, মালয় দ্বীপপুঞ্জে আসিয়া উপস্থিত হইল। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ওলন্দাজগণ ইন্দোনেশিয়ায় আগমন করিয়া প্রায় দুই শতাব্দীব্যাপী চেষ্টায় উহার অধিকাংশ অঞ্চলে নিজেদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করিল। ব্রিটিশ ও অপরাপর ইউরোপীয় শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং বিগত শতাব্দীর জন্মাবহ অন্তর্বিপ্লব সত্ত্বেও তাহারা পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অধিকাংশ রাজ্যে প্রাধান্য বিস্তার করিল। ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দে তাহারা দাসত্ব-প্রথা উচ্ছেদ করিল বটে, কিন্তু তৎপরিবর্তে বলপ্রয়োগে শ্রমিক নিয়োগ-প্রথা প্রবর্তন করিল। স্মৃষ্কল ও সমুদ্রত শাসন-প্রণালীর প্রচলন না করিয়া ঔপনিবেশিকদিগের উপর আর্থিক শোষণ-নীতি চালানোই তাহাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। যদিও ওলন্দাজরা ইন্দোনেশিয়ায় তিন শত বৎসরেরও অধিককাল অবস্থান করিতেছে তথাপি জনসাধারণের উন্নতির জন্ত তাহারা বিশেষ কিছুই করে নাই।

যুদ্ধের পূর্বে দেশরক্ষী বাহিনী, শাসকসম্প্রদায় ও অপরাপর কর্মচারীর সহায়তায় পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অধিকাংশ রাজ্যই একজন ওলন্দাজ গবর্নর-জেনারেল দ্বারা-

শাসিত হইত। ওলন্দাজদের অধীনে অনেক ছোট ছোট মুসলমান রাজ্য ও অজ্ঞাত রাজ্য ছিল। সেখানে ইন্দোনেশীয় ওলন্দাজদিগকে লইয়া একটি জনপরিষদও গঠিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু উহার কার্য কেবলমাত্র পরামর্শ দানেই সীমাবদ্ধ ছিল। প্রাক-যুদ্ধকালে এখানকার রাজনৈতিক অগ্রগতি অতিশয় মন্থর ছিল। সমস্ত ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব অল্পসংখ্যক ঔপনিবেশিক ওলন্দাজদের হাতে চাপ্ত ছিল এবং শাসনকার্য পরিচালনায় তথাকার জনগণের কোনো হাত ছিল না। শাসনকার্যে ওলন্দাজদের তিলমাত্র জায়পরায়ণতার পরিচয় পাওয়া যায় নাই; প্রজাগণকে শোষণ করিয়া তাহারা কেবল নিজেদের ভোগ-বিলাসের মানের উন্নয়ন ও ধনসম্পদ বৃদ্ধির জন্ত ব্যস্ত থাকিত। শাসন-সৌকর্যের দিকে তাহাদের মোটেই লক্ষ্য ছিল না। সেখানে যুদ্ধাঘস্তের স্বাধীনতা, ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং সম্মানসমিতি প্রতিষ্ঠারও স্বাধীনতা মোটেই ছিল না। শাসকসম্প্রদায় জনগণকে দরিদ্র, অজ্ঞ ও শিল্পের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অনগ্রসর করিয়া রাখিয়াছিল।

যুদ্ধের প্রারম্ভে দুর্দ্ব জাপানীরা যখন ধীরে ধীরে সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অধিকার করিয়া লইতেছিল তখন ওলন্দাজেরা তাহাদিগকে বাধা দিয়া দেশরক্ষা করিবার জন্ত তৎপর হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের সামরিক শক্তি যথেষ্ট না থাকায় তাহাদের চেষ্টা বার্য্যতায় পর্য্যবসিত হয়। যুদ্ধের শেষ অবস্থায় জাপানী শক্তি ভাঙিয়া পড়ায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় জাপ সাম্রাজ্যবাদের বজ্রযুগ্মি শিথিল হইয়া আসিল। তখন অকস্মাৎ জনগণের মধ্যে একটি স্বাধীনতা আন্দোলন আরম্ভ হইয়া তাহাদের সমস্ত পরিকল্পনা উল্টাইয়া দিল। উহাতে এমন একটি পরিস্থিতির উদ্ভব হইল যাহা ছিল ওলন্দাজদের সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। এই অবস্থায় ওলন্দাজের আবার যবদ্বীপে নিজেদের শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা শুরু করিল—সেখানকার অধিবাসীরা তখন স্বাধীনতা-আকাজ্জক অহুপ্রাপিত হইয়া বাধা প্রদান করিল। তাহাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামের অবসান আজও হয় নাই। বিশ্বের সকলের দৃষ্টি এখন উহার উপর নিবদ্ধ। মুক্তি-সংগ্রামে ব্যাপ্ত এশিয়ার বিভিন্ন দেশের পরাধীন জনগণ ইন্দোনেশীয়গণের মুক্তিযুদ্ধ যথেষ্ট সহানুভূতি ও ঔৎসুক্যের সহিত লক্ষ্য করিতেছে। তাহাদের রণহকার “মারদেকা” (স্বাধীনতা) আজ এশিয়ার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

বর্তমান সময়ে ইন্দোচীনেও যে অহরূপ মুক্তি-আন্দোলন চলিতেছে তাহাও ভুলিয়া যাওয়া উচিত নয়। আনামীরা যে



সুন্দা প্রণালীতে ফ্রাকাটাউ দ্বীপে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের অগ্ন্যুৎসার

জীষণ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে যুদ্ধ করিতেছে তাহা তাহাদিগকে চরম দৌরবের অধিকারী করিয়া তুলিয়াছে। ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চাপ ও চালের ফলেই ইন্দোনেশীয় ও আনামীদের মুক্তি-সংগ্রামের উদ্ভব হইয়াছে। এই যুদ্ধের অন্তর্নিহিত অর্থ ও তাৎপর্য্য পূর্ববর্ণিত ঘটনাবলী হইতে সহজেই অহুম্বেয়। বর্তমান যুদ্ধের তাৎপর্য্য জদ্বন্দ্বয় করিতে হইলে বৈশীদুর অহু-সন্ধান করিতে হইবে না। ইহার অর্থ পরিষ্কার—তাহা হইতেছে সাম্রাজ্যবাদীদের ঔপনিবেশিক শোষণকার্য্য। ওলন্দাজদের কুশাসন, জনগণের বিদ্রোহ, জাপানীদের আগমনজনিত বিশৃঙ্খলা ও সেজন্ত ইন্দোনেশীয়দের অস্ত্রশস্ত্র প্রাপ্তির সুযোগ, ওলন্দাজদের প্রতিশ্রুতিতে অনাস্থা, ওলন্দাজ ও অপরাপর ইউরোপীয় শক্তির সাময়িক সাময়িক প্রতিপত্তিহানি প্রভৃতি অজবিস নানা কারণেও বর্তমান অচল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল বলিয়া ধরা যাইতে পারে। কিন্তু সবল ও সুসংহত ওলন্দাজ-জাতি হুর্জল ও পদানত ইন্দোনেশীয়দিগের প্রতি দীর্ঘকাল নিষ্ঠুর শোষণ-কার্য্য চালাইয়া আসিতেছিল বলিয়াই গোড়ায় এইরূপ তিক্ততার উদ্ভব হইয়াছিল। তাহারা স্বায়ত্ত শাসনের উপযুক্ত কি অহুপযুক্ত সে বিষয়ে ওলন্দাজরা কিছুমাত্র ভাবিয়া দেবে নাই। এইরূপ অবস্থায় তাহারা যদি বহুভাবাপন্ন হইয়া যবদ্বীপবাসীদের অধিকার স্বীকার করিয়া লয় কেবলমাত্র তবেই ইন্দোনেশিয়ায় স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা ও উন্নতি সম্ভবপর হইতে পারে।

ইন্দোনেশিয়ার প্রাকৃতিক সম্পদ যদি স্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইতে পারে তবে উহা ভবিষ্যতে আদ্যু অধিকতর সমৃদ্ধিশালী একটি দেশে পরিণত হইবে এবং বিশ্বের বাজারে উহা বিস্তর কাঁচা মাল, খাদ্যশস্ত্র ও অজ্ঞাত শ্রীম্মণ্ডলীয় উৎপন্ন

দ্রব্য রপ্তানি করিতে সমর্থ হইবে। এই গ্রীষ্মমণ্ডলীয় প্রদেশটির বিশেষত্ব এই যে, এখানকার লোক অল্প পরিশ্রমে যথেষ্ট আয় করিতে পারে। বাস্তবিকই পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ প্রাকৃতিক পরিবেশে ও কাঁচামালে এত সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী যে ইহাকে বিশ্বের একটি সফলতার বলিলেও অত্যাক্তি হয় না। সুন্দা-দ্বীপপুঞ্জ আসলে প্রবালদ্বীপ—ইহা সৌন্দর্য্যমণ্ডিত সাগর অঞ্চলে অবস্থিত। এই দ্বীপশ্রেণীর পশ্চাদ্ভাগে বিশ্বের পর্বতশৃঙ্গ রহিয়াছে; তাহাদের কতকগুলি হইতে এখনও অগ্নি উদ্গীরিত হইতেছে এবং কতকগুলি চিরসবুজ বন তরুরাজিতে পরিপূর্ণ। নানা বর্ণ-সমন্বিত পূর্বদেশীয় এই দ্বীপগুলির জামসমারোহ যেমন আমাদের নয়নমনোমুগ্ধকর সেইরূপ এই স্থানের স্বদেশ-ভক্ত জনগণের মুক্তি-সংগ্রামও আমাদের হৃদয়ের প্রীতি-বর্দ্ধক। ইন্দোনেশিয়া এবং ইন্দোচীনে সাম্রাজ্যবাদীদের প্রভুত্ব ও শোষণ-কার্যের দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে এবং

ভবিষ্যতে ঐ সমস্ত অবাঞ্ছিত ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি হইবে বলিয়া মনে হয় না।

বর্তমান সময়ে ব্রিটিশ ও মার্কিন গবর্ণমেন্ট পৃথিবীর প্রতি-ক্রিয়াশীল শক্তিসমূহের সমর্থন করিয়া চলিয়াছে এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় তথাকথিত ট্রুমান-নীতির বিস্তার লাভের ফলে ওলন্দাজরা ইন্দোনেশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে সুরিধা পাইয়াছে। ইন্দোনেশিয়ার যুদ্ধ, তথাকার জনগণের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়াশীলদের যুদ্ধ। কেবলমাত্র ওলন্দাজরাই নহে, পরন্তু ইঙ্গ-মার্কিন প্রতিক্রিয়াশীল দলও এই যুদ্ধোদ্যমে সাহায্য করিয়াছে। জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষার জন্ত ইন্দো-নেশীয়দের প্রাণপাত মুক্তি-সংগ্রাম সাম্রাজ্যবাদী দলকে, তথা মার্কিন বণিকসম্প্রদায়কে আতঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছে। এই সংগ্রাম মীমাংসার ভার বর্তমানে স্বস্তি-পরিষদের উপর পড়িয়াছে। ইহার ফলাফল ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত।

শতাব্দী চলে

শ্রীনারায়ণ দত্ত

শতাব্দী চলে, শতাব্দী চলে, ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ে স্মৃতির পাড়,
শোণিত কোয়ার রাঙা ইতিহাস বাসুচরে লেখা আছে
এই বৃষ্টির নীরব সাক্ষী মরা মানুষের হাড়—
ইতিহাসের মরু অক্ষর পাড়ুর তার কাছে।

অজানা হাতের মায়া-সংকেতে সূর্য যে পুতুল খেলা
জীবনের পথে আশা-নিরাশার খেলা
রাঙা সকালের পাখীর কাকলি আর সায়াকুবেলা
সহসা ভাঙিয়া গেছে—
শতাব্দী বুকে দিনের চাওয়ায় অবসাদ খনায়েছে;
আকাশে আকাশে সীমাহীন হাহাকার
পথে পথে শুধু মহাযত্নের গাভী ব টংকার
বুকে বুকে শুধু রক্তের ঝলকানি
এই জীবনের প্রতি বাক্যে বাক্যে মানুষের হানাহানি
হারানো যুগের প্রেমের মন্ত্র আঁধার পাথারতলে
হিংস্র জনতা ছুটিয়াছে দলে দলে
জাসিত রক্ত শতাব্দী ছুটে চলে।

শতাব্দী চলে—

অনাহারীদের ক্ষুধার আগুনে দিগ্দিগন্ত রাঙা
ঘরে ঘরে ক্যাঁ মাটির পাজ ভাঙা
কারখানী-মিলে ধূমেল বাতাসে পেশীহীন হাতগুলি

মুঠো মুঠো শুধু কুড়ায় পাথর-খুলি
তাপচৌচির ক্ষেতের প্রান্তে মুগ্ধিত মানবতা—
শুও নয়নে দিগন্ত ছেয়ে আছে—
বাঁচিবার এক তীর নেশায় মিশে গেছে সব কথা
সোনার ফল অলীক তাহার কাছে।
গাছের আড়ালে নয়তা ঢাকি অীর চাহনীটি মেলি
শক্তিত চোখে এই পৃথিবীরই মধ্যে
অকারণে আছে চেয়ে
চোখ দুটো শুধু জলের নেশায় থেকে থেকে ওঠে জলে
শতাব্দী যায় চলে।

চলে শতাব্দী চলে—

তবু তার পথে মহামানবের থাকুক ফুটে ওঠে
একাকী চলার চরণচিহ্ন লোটে
হুগ্ধম অস্তিযানে
আশানের বুকে সাহসসত্ত্ব জীবনের বাণী আনে।
অন্ততামসী রজনীর বুকে কেঁপে ওঠে দীপশিখা
খুলে পড়ে যায় নিরাশার ঘবনিকা
মাতাল জনতা সহসা কেন যে ধামে
কোন সাপুড়ের যাহুর মস্তে, কোন দেবতার নামে?
দিগন্তলীন পাহাড় চূড়ায় শতাব্দী রবি ধামে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

২

‘হামচুপামূহাফ’ বা ‘সঞ্জীবনী সভা’

১৮৭৭ সনে (?) যুবক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের এক পোড়ো বাড়ীতে হামচুপামূহাফ বা সঞ্জীবনী সভা নামে মাংসিনীর ‘কার্বোনারি’র অনুরোধে একটি গুপ্ত সভা স্থাপন করেন। ইহার সভাপতি ছিলেন—অদেশপ্রেমিক বৃদ্ধ রাজনারায়ণ বসু। কিশোর রবীন্দ্রনাথ ও হিন্দুমেসার প্রধান উজ্জ্বল নবগোপাল মিত্র সভার সভ্য ছিলেন। নিয়মামুখায়ী সভ্যগণকে তাঁহাদের আয়ের দশমাংশ সভাকে দিতে হইত। এই সভা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন :—“জ্যোতিদাদা এক গুপ্তসভা স্থাপন করেছেন, একটি পোড়ো বাড়ীতে তার অধিবেশন, ঋগ্বেদের পুঁথি মড়ার মাথার খুলি আর খোলা তলোয়ার নিয়ে তার অন্তর্ধান, রাজনারায়ণ বসু তার পুরোহিত; সেখানে আমরা ভারত-উদ্ধারের দীক্ষা পেলেম” (‘আত্মপরিচয়,’ পৃ. ৮৭)। সঞ্জীবনী সভা সম্বন্ধে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতিতে যেটুকু সংবাদ পাওয়া যায়, নিয়ে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

“জাতীয় হিতকর ও উন্নতিকর সমস্ত কার্যই এই সভায় অনুষ্ঠিত হইবে, ইহাই সভার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। যেদিন নতুন কোনও সভা এই সভায় দীক্ষিত হইতেন, সেদিন অধ্যক্ষ মহাশয় লাল পটবস্ত্র পরিয়া সভায় আসিতেন। সভার নিয়মাবলী অনেকই ছিল, তাহার মধ্যে প্রধান ছিল, মন্ত্রগুপ্তি; অর্থাৎ এ সভায় যাহা কাপড় হইবে, যাহা কৃত হইবে এবং যাহা শ্রুত হইবে, তাহা অ-সভ্যদের নিকট কখনও প্রকাশ করিবার কাহারও অধিকার ছিল না।

“আদি ব্রাহ্মসমাজ-পুস্তকাগার হইতে লাল রেশমে জড়ান বেদমন্ত্রের একখানা পুঁথি, এই সভায় আনিয়া রাখা হইয়াছিল। টেবিলের দুই পাশে দুইটি মড়ার মাথা থাকিত, তাহার দুইটি চক্ষুকোটবে দুইটি মোমবাতি বসান ছিল। মড়ার মাথাটি যত ভারতের সাংস্কৃতিক চিহ্ন। বাতি দুইটি জ্বালাইবার অর্থ এই যে, যত ভারতের প্রাণসঞ্চার করিতে হইবে ও তাহার জ্ঞানচক্ষু ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। এ ব্যাপারের ইহাই মূল কল্পনা। সভার প্রারম্ভে বেদমন্ত্র গীত হইত—“সংগচ্ছধর্ম সংবদধর্ম।” সকলে সমস্তই এই বেদমন্ত্র গান করার পর, তবে সভার কার্য (অর্থাৎ কি না গল্প-গুজব) আরম্ভ হইত। কার্যবিবরণী জ্যোতিবাবুর উদ্ভাবিত এক গুপ্ত ভাষায় লিখিত হইত। এই গুপ্ত ভাষায় ‘সঞ্জীবনী সভা’কে ‘হামচুপামূহাফ’ বলা হইত।...ইহার দীক্ষা-অনুষ্ঠানে একটি ভীষণ গাভীর্য ছিল। দীক্ষাকালে, নবদীক্ষার্থীর সর্বদা একটি অজ্ঞাত ভাবাবেশে শিহরিয়া উঠিত।

“প্রথম প্রথম সভার কাজ পুরা দমেই চলিতে লাগিল। নিত্য নতুন প্রস্তাব গৃহীত হইত, কিন্তু কাজে পরিণত করা পর্যন্ত ধৈর্য কোনও বিষয়েই বড় কাহারও থাকিত না। যাহার যেরূপ কল্পনা খেলিত, সে সেইরূপই প্রস্তাব করিত। এইরূপ কাল্পনিক স্রুবে এক রকম দিন বেশ কাটিয়া যাইতেছিল। একদিন সভায় আমি প্রস্তাব করিলাম যে, ভারতবর্ষে সার্বজন্যিক ঐক্য-সাধন করিতে গেলে, একটা সার্বজনিক পোষাক হওয়া আবশ্যিক। এ প্রস্তাবটি সকলে একবাক্যে অমুমোদন করিলে, ভারতের আন্তর্জাতিক ভাবী ঐক্য-বিধায়ী, সার্বভৌম মিলনোপযোগী পোষাকের পরিকল্পনা করার ভার পড়িল আমারই উপর। শেষে স্থির হইল যে, মালকোঁচা মারিয়া কাপড় পরিলে যেমন হয়, ঐরূপ একটা পোষাক ও মাথায় বাহাতে বোঁজ-বুট্টি না লাগে এইরূপ একটা সোনার চুপির উপর পাগড়ী বসাইয়া একটা শিরজ্ঞান, বেশ সার্বজনীন পরিচ্ছদরূপে গৃহীত হইতে পারে। সকলেই দোংসাহে মহাকল্পনাব করিয়া এবং বিচিত্র অঙ্গভঙ্গীতে বলিল—‘ঠিক ঠিক।’...তৎক্ষণাৎ দক্ষিণ দোকানে গিয়া, মালকোঁচা-মারী কাপড় দেলাই ও পুরোঁজরূপ শিরজ্ঞান প্রস্তুত করিতে ছুঁমু দেওয়া হইল। যথাকালে পোষাক প্রস্তুত হইয়া আসিল; কিন্তু এ অভিনব পোষাক পরিয়া প্রথমে পথে বাহির হইবে কে? আমিই প্রথম বাহির হইব। একদিন মধ্যাহ্নের প্রথর আলোকে সার্বজনিক ঐক্যসাধক এই পোষাক পরিয়া, আমি কলিকাতা সহর ঘুরিয়া আসিলাম। লোকে এ পোষাকের অন্তর্গত হিতকর উদ্দেশ্য বুঝিল না কেবল পরিহাস-বিজ্ঞপই করিল, কিন্তু আমি সেদিকে জ্ঞেপুও করিলাম না।...একমাত্র আমি ছাড়া, কেহই এ পোষাক কখনও পরিধান করেন নাই। সভ্যগণ যখন দেখিলেন যে, আন্তর্জাতিক পোষাক দেশের কেহই গ্রহণ করিল না, তখন অগত্যা এককল্পনা ছাড়িয়া দিয়া, আমরা দেশে শিল্পবানিজ্যের কল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার প্রতি বিশেষ ভাবে মনোযোগী হইলাম। সর্বপ্রথমে দিয়াশলাইয়ের কল প্রতিষ্ঠিত হইল। অনেক আয়াদে এবং বহু অর্থব্যয়ে কয়েক বাজ দিয়াশলাই প্রস্তুত হইল বটে, কিন্তু এ পদার্থ সাধারণের পক্ষে ক্রয়সাধ্য বা ব্যবহারের মোটেই উপযোগী হইল না। একে ত খরচ খুব বেশী পড়িত, তাহা ব্যতীত দেশে কাঠির অভাব, সেজন্য যে-সে কাঠের কাঠি ব্যবহৃত হওয়াতে দিয়াশলাই শীঘ্র জলিতও না। এই জন্য লোকে এই দিয়াশলাই পছন্দ করিত না। যখন পদে পদে এইরূপ অনুরোধ হইতে লাগিল, তখন সভ্যগণ বুঝিলেন যে, এ অসাধ্য-সাধনে সময় নষ্ট করা অপেক্ষা, দেশের অন্য কোনও সহজসাধ্য মঙ্গলকর কার্যে হস্তক্ষেপ করাই উচিত।

“এই স্মৃতির কলে, সভায় এক নতুন কাপড়ের কল আনানো হইল। আবার প্রবলভাবে নানাবিধ কল্পনা-কল্পনা শুরু হইল। সভ্যদেরও উত্তম আবার দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল। সভায় ইহাও স্থির হইল যে, ভবিষ্যতে আরও কয়েকখানি তাঁত বদাইতে হইবে এবং একজন একখানি বাড়ীও প্রস্তুত করিতে হইবে। সভ্যেরা চাঁদা দিতেন, তাঁহাদের আয়ের দশমাংশ। এইরূপে যে সামান্য কিছু টাকা জমিয়াছিল, তাহাতেই এইরূপ এক বিরাট কল্পনা করা হইল। দেখিতে দেখিতে মনপ্রতিষ্ঠিত কাপড়ের কলে একদিন একখানি গামছা প্রস্তুত হইল। ব্রজ বাবু সেই গামছাখানি মাধব বাঁশিয়া উন্নতের মত ভাঙব নৃত্য শুরু করিয়া দিলেন। সভার সে এক স্মরণীয় দিন। একে একে প্রায় সকল সভাই শেষে তাঁহার সঙ্গে নৃত্যে যোগ দিলেন। তারপর কল উঠিয়া গেল। এই গামছাখানি ছাড়া, অন্য আর কিছুই সে কলে প্রস্তুত হয় নাই।

“এই ‘সঞ্জীবনী সভা’র সভ্যগণের মধ্যে জাতিবর্ণনির্বিশেষে আহারেরও একটি বিধি ছিল। আমাদের মধ্যে নানা জাতি-বর্ণের লোক ছিল। কুলীন ব্রাহ্মণ হইতে শুঁড়ী পর্যন্ত। কোন এক ব্রাহ্মণ জমিদার-সভ্যের গদ্যর ধারের একটি বাঁগান-বাড়ীতে একবার আমাদের একটা খ্রীতি-তোজ হয়। জমিদার-সভ্যটি একটু নিষ্ঠাবান হিন্দু হইলেও, তিনি সভার সভ্যদিগের সঙ্গে একত্র আহারাদি করিতে একেবারেই কুণ্ঠিত হইলেন না। বোধ হয়, তিনি সভার সভ্যকে জগন্নাথ-ক্ষেত্রেরই সামিল মনে করিতেন। খাওয়া-দাওয়া হইয়া গেলে খুব এক বড় উঠিল। রাজনারায়ণ বাবু সেই সময় গদ্যর ঘাটে দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া “আজি উন্নত পবনে—” বলিয়া রবীন্দ্রনাথের নবরচিত একটি গান আরম্ভ করিয়া দিলেন।”

এই সময়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ “বাঙ্গালীদের মধ্যে সংসাহস বর্ধিত করিবার জন্য...বন্দুক-ছোঁড়া ও শিকারের প্রবর্তন করিতে গিয়াছিলেন।”

সঞ্জীবনী সভা অল্প দিনই জীবিত ছিল। রবীন্দ্রনাথ ‘জীবন-স্মৃতি’তে লিখিয়াছেন :—“অবশেষে দুটি-একটি স্মৃতি লোক আসিয়া আমাদের সঙ্গে ভিড়িলেন, আমাদের সঙ্গে জ্ঞানস্বপ্নের ফল খাওয়াইলেন এবং এই স্বর্গলোক ভাঙিয়া গেল।”

পাট ও নীলের ব্যবসা

অতঃপর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ভগ্নীপতি জ্ঞানকীনাথ ঘোষালের সহযোগে হাটখোলায় একটি পাটের আড়ৎ খুলিয়াছিলেন। অল্প দিন পরেই এ কার্য বন্ধ করিয়া তিনি লাভের টাকায় শিলাইদহে নীলের চাষ আরম্ভ করেন। তিনি স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন :—

* গানটি প্রথমে ১২৮৪ সালের আখিন (সেপ্টেম্বর ১৮৭৭) সংখ্যা ‘ভারতী’তে (‘ভানুসিংহের কবিতা’) প্রকাশিত হয়।

“এইরূপে চার পাঁচ বৎসরেই আমার নীলের চাষে খুব উন্নতি হইল। কিন্তু হঠাৎ নীলের বাজার পড়িয়া গেল। শুনা গেল, জার্মানেরা রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা এক রকম কৃত্রিম নীল প্রস্তুত করিতেছে, তাহাতেই আসল নীলের বাজার একেবারে ধারাপ হইয়া গেল। আমিও কাজ উঠাইয়া দিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসিলাম।”

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই সময়ে ‘ভারতী’তে (জ্যৈষ্ঠ ১২৮৯, মে ১৮৮২) “নীলের বাণিজ্য” নামে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ইহাতে প্রকাশ :—“কিন্তু নীলের বাণিজ্য বোধ হয় আর থাকে না। সম্ভ্রতি একজন জার্মান পণ্ডিত রাসায়ন-বিজ্ঞান সাহায্যে এক প্রকার নীল রঙের সৃষ্টি করিয়াছেন।... নীলকরদিগের এক্ষণে সমূহ আশঙ্কার কারণ উপস্থিত।”

সারস্বত সমাজ

কলিকাতায় ফিরিয়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবার বাংলা ভাষার শ্রীযুক্তির জন্ত একটি সাহিত্য-সমালোচনী সভা স্থাপনে উদ্যোগী হইলেন। এই কল্পনা মাধব প্রবেশ করিবারাত্র তিনি রবীন্দ্রনাথকে সঙ্গে লইয়া বিভাসাগর মহাশয়ের পরামর্শ লইতে ছুটিলেন। সকল কথা শুনিয়া বিভাসাগর বলিলেন, “তোমরা বড় মানুষের ছেলে, কোনও বদখেয়ালি না করিয়া এই সব লইয়া যদি সময় কাটাও ত সে ভালই। কিন্তু, বাবা, একটা কথা আমি তোমাদের বলিয়া দিতেছি। বড় বড় হোমরা-চোমরা লোকদের ইহার মধ্যে লইও না—তাহা হইলেই সব মাটি হইয়া যাইবে।”

রবীন্দ্রনাথ বঙ্গ কথায় সভার উদ্দেশ্য ‘জীবন-স্মৃতি’তে এইরূপ বিবৃত করিয়াছেন :—

“বাংলার সাহিত্যিকগণকে একত্র করিয়া একটি পরিষৎ স্থাপন করিবার কল্পনা জ্যোতিদাদার মনে উদ্ভূত হইয়াছিল। বাংলার পরিভাষা বাঁশিয়া দেওয়া ও সাধারণত সর্বপ্রকার উপায়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পুষ্টিসাধন এই সভার উদ্দেশ্য ছিল। বর্তমান সাহিত্য-পরিষৎ যে-উদ্দেশ্য লইয়া আবির্ভূত হইয়াছে তাহার সঙ্গে সেই সংকল্পিত সভার প্রায় কোনো অনৈক্য ছিল না।”

১৭ জুলাই ১৮৮২ তারিখে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সভাপতিত্বে ঠাকুর-বাড়ীতে সভার প্রথম অধিবেশন হয়। উপস্থিত অধিকাংশ সভ্যের সম্মতিক্রমে সভার নামকরণ হয়—সারস্বত সমাজ। আরও স্থির হয় :—

“বিজ্ঞান উন্নতি সাধন করাই এই সমাজের উদ্দেশ্য।... যাহারা বঙ্গসাহিত্যে ব্যাতি লাভ করিয়াছেন এবং যাহারা বাংলা ভাষার উন্নতি সাধনে বিশেষ অগ্রগতি, তাহারা এই সমাজের সভ্য হইতে পারিবেন।... বর্তমান বর্ষের জন্ত নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সমাজের কর্মচারীরূপে নির্বাচিত হইলেন—

সভাপতি—ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র।

সহযোগী সভাপতি—শ্রীবক্ষিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ডাক্তার
ধীরেন্দ্রমোহন ঠাকুর। শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক—শ্রীকৃষ্ণবিহারী সেন। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।”

২ ডিসেম্বর ১৮৮২ তারিখে আলবার্ট-হলে সারস্বত সমাজের
দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। ইহার আর কোন অধিবেশনের
সংবাদ আমরা পাই নাই। রবীন্দ্রনাথ ‘জীবন-স্মৃতি’তে
লিখিয়াছেন :—

“বক্ষিমবাবু সভ্য হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে সভার কাজে
যে পাওয়া গিয়াছিল তাহা বলিতে পারি না। বলিতে গেলে
যে-কয়দিন সভা বাঁচিয়া ছিল, সমস্ত কাজ একা রাজেন্দ্রলাল
মিত্রই করিতেন। ভৌগোলিক পরিভাষানির্ণয়েই আমরা
প্রথম হস্তক্ষেপ করিয়াছিলাম। পরিভাষার প্রথম পদ্য সম্বন্ধে
রাজেন্দ্রলালই ঠিক করিয়া দিয়াছিলেন। সেটী ছাড়াইয়া অত্যন্ত
সভ্যদের আলোচনার ভক্ত সকলের হাতে বিতরণ করা হইয়া-
ছিল। পৃথিবীর সমস্ত দেশের নামগুলি সেই সেই দেশে
প্রচলিত উচ্চারণ অনুসারে লিপিবদ্ধ করিবার সংকল্পও আমাদের
ছিল।”

সারস্বত সমাজ মুকুলিত হইবার পূর্বেই অল্পরে বিনষ্ট হইয়া
ছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে বলিয়াছেন :—

“আমরা কিন্তু হোমরা-চোমরা লোক লইয়াই কাজ আরম্ভ
করিলাম।...হুই তিন অধিবেশন পর্য্যন্ত বেশ কাজ চলিয়া-
ছিল—কিন্তু তাহার পরেই নানা কারণে সভা বন্ধ হইয়া গেল।
বিভাসাগর মহাশয়ের কথা বর্ণে বর্ণে ফলিয়া গেল।”

পত্নীবিয়োগ

১৮৮৪ সনের ১৯এ এপ্রিল (১২৯১, ৮ বৈশাখ)
জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পত্নী কাদম্বরী দেবী অকস্মাৎ আত্মহত্যা
করেন। বোঁ-ঠাকুরাণীর যত্নে যুবক রবীন্দ্রনাথের মনে গভীর
বেদনাপাত করিয়াছিল। এই দুর্ঘটনার অব্যবহিত পরে
প্রকাশিত ‘প্রকৃতির প্রতিশোধ’ (২৯ এপ্রিল ১৮৮৪), ‘শৈশব
সঙ্গীত’ (২৯ মে) ও ‘ভাস্কর্য্য ঠাকুরের পদাবলী’ (১ জুলাই)
তিনি পরলোকগতা বোঁঠাকুরাণীকেই উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

সাহিত্যাহুরাগিণী কাদম্বরী দেবীর অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ, অক্ষয়চন্দ্র প্রমুখ ‘ভারতী’র পরি-
চালকগণ পত্রিকার প্রচার রহিত করাই সাব্যস্ত করেন।
দ্বিজেন্দ্রনাথ ‘তত্ত্ববোধিনী’ পত্রিকা’র ঘোষণা করেন :—“ভারতী
বিশেষ কারণে আর প্রকাশিত হইবে না।” কবি অক্ষয়চন্দ্রের
সহধর্ম্মিণী শরৎকুমারী চৌধুরাণী যথার্থই লিখিয়াছেন :—

“হুলের তোড়ার ফুলগুলিই সবাই দেখিতে পায়, যে-বাঁধনে
তাহা বাঁধা থাকে তাহার অভিন্নও কেহ জানিতে পারে না।
অহর্নি-পরিবারের গৃহলক্ষ্মী শ্রীমুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী
ছিলেন এই বাঁধন। বাঁধন ছিঁড়িল—ভারতীর সেবকেরা

আর ফুল তোলেন না, ভারতী ফুলার মলিন। এই দুর্দিনে
শ্রীমতী শরৎকুমারী দেবী ভারতীর পালন-শক্তির পরিচয় দিলেন।”

বরিশালে স্বদেশী প্রীমার

নীলের ব্যবসায়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মন্দ অর্থাগম হয় নাই।
এই টাকায় তিনি একটি নূতন ব্যবসায়ে ব্যাপৃত হইলেন ; উহা
বরিশালে প্রীমার পরিচালনা। তিনি শ্রুতিকথায় বলিয়াছেন :—

“নীলে আমি বেশ লাভ করিয়াছিলাম। এখন এই টাকা
লইয়া আমি কি করিব ? এই চিন্তা তখন আমার মনে খুব
প্রবল হইয়া উঠিল। এই সময় এক দিন হঠাৎ ‘একচেঞ্জ গেজেটে’
দেখিলাম, একটা জাহাজের খোল নিলাম হইবে। ভালই
হইল, এই খোলটা কিনিয়া একখানা জাহাজ তৈরি করাইয়া
জাহাজ চালান যাইবে, স্থির করিলাম। এই সময়ে আবার,
কলিকাতা হইতে খুলনা পর্য্যন্ত রেলও হইবে, কথা ছিল।
তাহা হইলেই খুলনা হইতে বরিশাল পর্য্যন্ত বেশ জাহাজ
চালান’ যাইতে পারে। খোল কেনার পক্ষে এ একটা বেশ
সুযুক্তিও হইল।...সেই খোলে যে প্রথম জাহাজ প্রস্তুত হইল,
তাহার নাম রাখিলাম ‘সরোজিনী’।”

২৩ মে ১৮৮৪ তারিখে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রথমে
‘সরোজিনী’ লইয়া কর্ণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। কার্য্য আরম্ভ
করিবার পর তাঁহাকে যে প্রতিযোগিতার সন্মুখীন হইতে হইয়া-
ছিল, তাহা তাঁহারই ভাষায় বর্ণনা করিতেছি :—

“‘সরোজিনী’ তৈরি হইতেই এত বেশী বিলম্ব হইয়া গেল
যে, আমি আসিবার অব্যবহিত পূর্বেই ফ্লোটলা কোম্পানি
কাজ কাঁদিয়া বসিয়াছিল। আমার জাহাজ যদি ঠিক সময়ে
তৈরি হইত, তাহা হইলে আমি ইহার অনেক আগেই কার্য্য
চালাইতে পারিতাম ; তাহা হইলে হয়ত এ কোম্পানি এদিকে
না-ও আসিতে পারিত। কিন্তু তাহা হয় নাই। এখন আমরা দুই
পক্ষই এই একই লাইনে প্রীমার চালাইতে লাগিলাম। কাজেই
উভয় দলে খুব প্রতিযোগিতাও আরম্ভ হইল। একখানি মাত্র
প্রীমার লইয়া কার্য্যে অগ্রবিধা হওয়ার আমি আরও চারখানি
জাহাজ ক্রমে ক্রমে ক্রয় করিলাম। এ জাহাজগুলির নাম
ছিল ‘বঙ্গলক্ষ্মী’ ‘স্বদেশী’ ‘ভারত’ এবং ‘লর্ড রিপন’। তখন
এই পাঁচখানি জাহাজ খুলনা হইতে বরিশাল পর্য্যন্ত যাত্রী লইয়া
গমনাগমন করিত এবং সময় সময় মাল লইয়া কলিকাতাও
আসিত। এ সময় আমি জাহাজেই বাস করিতাম। বাঙ্গালীর
জাহাজ-চালনায় তখন বরিশালের ছাত্রসমাজ এবং নব্য-
দলের মধ্যে একটা প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছিল।...
এইরূপে আমার কাজ বেশ দিন দিন লাভজনক হইয়া উন্নতির
পথে চলিতে লাগিল। আমার এই ব্যবসাকে যেন সমস্ত

* ১২৯১ সালের শ্রাবণ-ভাদ্র ও অগ্রহায়ণ-সংখ্যা ‘ভারতী’তে
প্রকাশিত ‘সরোজিনী প্রয়াণ’ জটব্য।

+ এই প্রসঙ্গে ‘বালকে’ (শ্রাবণ ১২৯২) প্রকাশিত জ্যোতিরিন্দ্র-
নাথের লিখিত ‘বরিশালের পত্র’ গঠিতব্য।

জাতির উদ্যম ভাবিয়া বরিশালবাসিগণ নিয়তই ইহার দীর্ঘজীবন কামনা করিতেন। কিন্তু এত সুখ আমার সহিল না। ইংরেজের ব্যবসায় ব্যাধাত লাগিয়াছে, আর কি তাহারা চুপ করিয়া থাকিতে পারে? ব্যবসায়ী সাহেবেরা আমার যৎপরোনাস্তি বিপক্ষতাচরণ করিতে লাগিল। তাহারা যখন দেখিল যে যাত্রী আর হয় না, তখন তাহারা ভাড়া কমাইতে আরম্ভ করিল, আমিও কমাইলাম। এইরূপে ক্ষতি স্বীকার করিয়াও আমি প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হইলাম।...এই সময় খুলনা হইতে মাল বোঝাই লইয়া 'বদেদী' কলিকাতা আসিতেছিল। সারা পথ বেশ নিরীয়ে কাটিয়া গেল—আলোকমালা-সম্বলিত কলিকাতা বন্দরেও প্রবেশ করিল। কিন্তু শেষে হাওড়ার পুলের নীচে দিয়া যাইবার সময় একখানা জেটেতে না-কিসে ধাক্কা লাগিয়া গীমারখানি নিমেষমধ্যে গঙ্গাগর্ভে নিমগ্ন হইল। এক জাহাজ মালের এক কণাও উঠিল না।...একে ত প্রতিযোগিতায় জঙ্ক কিছু দিন হইতেই আমি ক্ষতি স্বীকার করিতেছিলাম, যদি কোনও রূপে টিকিয়া যায়—এই ভরসায়; কিন্তু এবার এই দুর্ঘটনার জঙ্ক এক ক্ষতিগ্রন্থ ব্যাপারেই আমি অত্যন্ত ক্ষেব্বা হইয়া পড়িলাম, কিন্তু তবুও নিজে হইতে উঠাই কিরূপে?...এমন সময় ফ্লোটলা কোম্পানীর পক্ষ হইতে রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় (তখনও রাজা হন নাই) আমার নিকট এক সন্ধির প্রস্তাব লইয়া আসেন। তিনি বলিলেন, 'উভয় পক্ষেই আর এরূপ রুখা অর্থব্যয়ে লাভ কি? আপনি নিজেই একটা মূল্য বার্ষ্য করিয়া দিউন। ফ্লোটলা কোম্পানী আপনার সমস্ত কারবার কিনিতে প্রস্তুত আছে।' আমি দেখিলাম যে, এ একটা মহানুভোগ উপস্থিত।... আমি মগ্নাবশিষ্ট চারিখানি জাহাজ ও তৎসংক্রান্ত সমস্তই ফ্লোটলা কোম্পানীকে বিক্রয় করিয়া দিলাম। ফ্লোটলা কোম্পানীর নিকট হইতে যাহা ছায়া তাহাপেক্ষা অনেক বেশী টাকা পাইলেও, আমি আমার ধন-পরিশোধ করিতে পারিলাম না।

রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'তে লিখিয়াছেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সাত হাজার টাকার জীত শূন্ন খোল "একদা ভরতি হইয়া উঠিল শুধু কেবল এতদিনে এবং কামরায় নহে—ধনে এবং সর্বনাশে। কিন্তু তবু একথা মনে রাখিতে হইবে, এই-সকল চেষ্টার ক্ষতি যাহা সে একলা তিনিই স্বীকার করিয়াছেন আর ইহার লাভ যাহা তাহা নিশ্চয়ই এখনো তাহার দেশের ঋণাত্মক হইয়া আছে। পৃথিবীতে এইরূপ বেহিসাবি অব্যবসায়ী লোকেরাই দেশের কর্তৃক্ষেত্রের উপর দিয়া বারংবার নিফল অধ্যবসায়ের বজা বহাইয়া দিতে থাকেন; সে বজা হঠাৎ আসে এবং হঠাৎ চলিয়া যায়, কিন্তু তাহা শুধু শুধু যে-পলি রাখিয়া চলে তাহাতেই দেশের মাটিকে প্রাণপূর্ণ করিয়া তোলে—তাহার পর ফসলের দিন যখন আসে তখন তাহাদের কণ্ঠ কাহারও মনে থাকে

না বটে, কিন্তু সমস্ত জীবন ঋণাত্মক করিয়াই আসিয়াছেন, যত্নের পরবর্তী এই ক্ষতিটুকুও তাহারা অনায়াসে স্বীকার করিতে পারিবেন।"

ফ্রেনলজি বা শিরোমিতি-বিদ্যা

গীমার-পরিচালন কার্যে ব্যস্ত থাকিলেও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সাহিত্যের প্রতি একেবারে উদাসীন ছিলেন না। এই সময়ে তিনি ফ্রেনলজি বা শিরোমিতি-বিদ্যার রীতিমত চর্চা করিতেন। তাহার কয়েকটি রচনার নির্দেশ দিতেছি :—

(ক) "শিরোমিতি-বিদ্যা" (সচিত্র)—'কল্পনা', ৪র্থ বর্ষ (ইং ১৮৮৫)।

(খ) "মুখচেনা" (সচিত্র)—'বালক', বৈশাখ ১২৯২।

(গ) "আধুনিক মস্তিষ্কতত্ত্ব ও ফ্রেনলজি"—'সাধনা', আষাঢ় ১২৯৯।

শিরোমিতি বিদ্যার চর্চাকালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বহুবাস্তব অনেকের মাথা পরীক্ষা করিয়াছিলেন। "পণ্ডিত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য মহাশয়ের একবার মাথা দেখিয়াছিলেন। তাহার নিজের চরিত্র, বর্ণনার সঙ্গে মিলাইয়া পণ্ডিত মহাশয় বলিয়াছিলেন যে, তাহার স্বভাবের সহিত এই বর্ণনা অনেকটা মেলে বটে।"..."জ্যোতিবাবুর সঙ্গীতপ্রিয়তা, ফ্রেনলজি ও চিত্রাঙ্কন-পটুতা লক্ষ্য করিয়া দ্বিজেন্দ্রনাথ একবার একটি ব্যঙ্গ-কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, তাহা হইতে একটু উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

বেয়লা কি মিঠে অমৃতের দ্বিষ্টে

ঐ হাতটিতে স্তন্য,

পিয়ানো ঢং ঢং

ঢং ঢং,

সেতার স্তনুগণ্য।

মাথার তত্ত্ব বুজি, পুঁথি করেন পুঁজি,

মাথা পেলে আর কিছু চান না।

ল'ন যবে ছবি মনে ভাবে কবি

"হইয়াছে, ধামো—আমা,

চক্ষে আসিয়াছে যোর কারা।"

এই সময়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ "অতিলৌকিক ব্যাপার" উদ্ঘাটনের জঙ্ক আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন। তাহার জীবন-স্মৃতিতে প্রকাশ :—

"কোথাও কোনও প্রসিদ্ধ গণ্যকার বা ভবিষ্যদ্বক্তা বা ঐ জাতীয় একটা-কিছু আসিয়াছে শুনিলেই, তিনি অমনি বন্ধু-বান্ধবসহ সেইখানেই গিয়া হাজির হইতেন। কিন্তু পনের-আনা ভাগই আন্দাজ ও বাকিটুকু কাকি দেখিয়া অবিলম্বেই তাহার সে সখ মিটয়া গিয়াছিল। কোঙ্গীর ফলাফলেও তিনি আর বিশ্বাসস্থাপন করিতে পারেন নাই। তিনি বলেন, 'এ সমস্ত ব্যাপার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি-অনুসারে পরীক্ষিত হওয়া উচিত।'

প্লাগ্‌ফেটের কাণ্ড দেখিয়া, তিনি কখনও কখনও খুবই আশ্চর্য্য বোধ করিয়াছেন।"

অতঃপর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ পুনরায় সঙ্গীতে মনোনিবেশ করেন—সে কথা পরে আলোচিত হইবে।

পূনা-প্রবাস ও মরাঠী শিক্ষা

১৮৯৪ সনের মার্চ হইতে ১৮৯৭ সনের প্রথম ভাগে অবসরগ্রহণ পর্যন্ত সত্যেন্দ্রনাথের কর্মস্থল ছিল সাতারা।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই সময়ে যেকদাদার পুনরায় বাসায় কিছু দিন অবস্থান করিয়াছিলেন। সেখানে তিনি একজন মরাঠী পণ্ডিতের সাহায্যে মরাঠী ভাষা অধ্যয়ন করেন। ১৩০২ সালের (ইং ১৮৯৫) ‘সাধনা’ পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁহার “মারাঠী ও বাঙ্গলা”, “তুকারামের অভঙ্গ”, “ধাশির মহারাণী ক্রীমতী লক্ষ্মীবাই” প্রভৃতি রচনা এই মরাঠী শিক্ষারই ফল।

পুনায় অবস্থানকালে মেজ-বোঠাকুরাণীর গীতগীতিতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অনেক দিন পরে ‘হিতে বিপরীত’ নামে একখানি কোতুক-নাটক। কয়েক বর্টার মধ্যে রচনা করিয়াছিলেন। ইহা ছোড়াসাকো ঠাকুর-রাড়ীতে ও পরে ভারত-সঙ্গীতসমাজে অভিনীত হইয়াছিল।

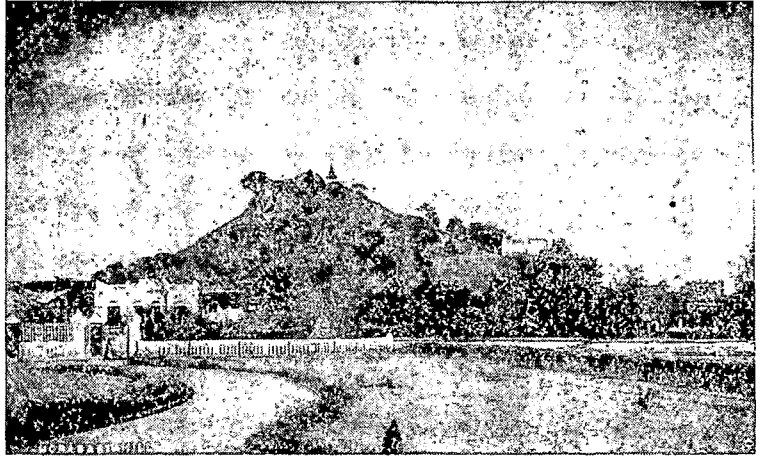
সঙ্গীত সাধনা

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কেবলমাত্র সঙ্গীত-রচয়িতা ছিলেন না—স্বরশিল্পীও ছিলেন। সঙ্গীতে তাঁহার বিশিষ্ট দান—বাংলা গানে নূতন রীতিতে সুর-সংযোজন। এই রীতির পূর্ণ বিকাশ দেখিতে পাই রবীন্দ্রনাথে। ‘জীবন-স্মৃতি’তে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন :—

“জ্যোতিদাদা তখন প্রত্যহই প্রায় সমস্ত দিন ওস্তাদি গান-ওলাকে শিখানো যন্ত্রের মধ্যে কেলিয়া তাহাদিগকে যথেষ্টা মন্থন করিতে প্রবৃত্ত ছিলেন। তাহাতে ক্ষণে ক্ষণে রাগিণী-গুলির এক-একটি অপূর্বমুষ্টি ও ভাবব্যঞ্জনা প্রকাশ পাইত। যে-সকল সুর বাঁধা নিয়মের মধ্যে মঙ্গলগতিতে দস্তুর রাখিয়া চলে তাহাদিগকে প্রধাবিরুদ্ধ বিপর্যয়ভাবে দৌড় করাইবামাত্র সেই বিপ্লবে তাহাদের প্রকৃতিতে নূতন নূতন অভাবনীয় শক্তি দেখা দিত এবং তাহাতে আমাদের চিত্তকে সর্বদা বিচলিত করিয়া তুলিত। সুরওলা যেন নানা প্রকার কথা কহিতেছে এইরূপ আমরা স্পষ্ট শুনিতে পাইতাম। আমি ও অক্ষয়বাবু অনেক সময়ে জ্যোতিদাদার সেই বাজনার সঙ্গে সঙ্গে সুরে কথাবোজনার চেষ্টা করিতাম।”

স্বরশিল্পিকার।—জ্যোতিরিন্দ্রনাথের চরিত্রকার লিখিয়াছেন :—“জ্যোতিরিন্দ্রনাথের চেষ্টায় ‘ভারতী’ ও ‘সাধনা’ মাসিকপত্রে সর্বপ্রথম বাঙ্গলা গানের স্বরলিপি প্রকাশিত

হয়।” এই উক্তি ঠিক নহে। মাসিকপত্রের পৃষ্ঠায় কথা ও সুর-সম্বলিত স্বরলিপি প্রথম প্রকাশের গৌরব জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথের। তিনি ১৭৯১ শকের কার্তিক (১৮৬৯, অক্টোবর) মাসের ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’র শেষে অতিরিক্ত ৬পৃষ্ঠায় “সঙ্গীত লিপিবদ্ধ করিবার প্রণালী” ও পাঁচটি ব্রহ্মসঙ্গীতের স্বরলিপি প্রকাশ করেন।* দ্বিজেন্দ্রনাথের



‘শান্তিধাম’—রাঁচী

স্বরলিপি-প্রণালী ‘বালকে’ও (১২৯২) অমুদ্রিত হইয়াছিল (আম্বিন-কার্তিক সংখ্যায় দ্বিজেন্দ্রনাথের “নূতন স্বরলিপি” প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কৃতিত্ব—স্বরলিপি-প্রণালী শিক্ষার্থীর পক্ষে অধিকতর সহজবোধ্য করা। তিনি ‘বালকে’ প্রকাশিত স্বরলিপি-প্রণালীর সংস্কার করিয়া সংখ্যা-মাত্রিক স্বরলিপি উদ্ভাবন করেন (১২৯৫ সালের পৌষ-সংখ্যা ‘ভারতী ও বালকে’ প্রকাশিত “গানের স্বর-লিপি” প্রবন্ধ পঠিতব্য)। ইহার তিন বৎসর পরে তিনি অধিকতর সহজ ও সরল আকার-মাত্রিক স্বরলিপি-পদ্ধতি প্রচলন করেন। এই প্রসঙ্গে ১২৯৮ সালের অগ্রহায়ণ-পৌষ সংখ্যা ‘সাধনা’র প্রকাশিত তাঁহার “সার্বম স্বরলিপির ‘আকার-মাত্রিক’ নূতন পদ্ধতি” ও ১৩০৯ সালের ভাদ্র-সংখ্যা ‘সমালোচনী’ পত্রে প্রকাশিত “আকারমাত্রিক স্বরলিপির চিহ্নাবলী” (রবীন্দ্রনাথের ‘মায়ার খেলা’র ১ম দৃষ্ট, ও ২য় দৃষ্টের প্রথমভাগের স্বরলিপি সহ) দ্রষ্টব্য। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উদ্ভাবিত আকার-মাত্রিক স্বরলিপিই বর্তমানে প্রচলিত; ইহা দ্বারা মাসিকপত্রে স্বরলিপি-প্রকাশের পথ সুগম হইয়াছে।

স্বরলিপি-গীতি-মালা।—১৮৯৭ সনের জুন মাসে বিখ্যাত বাজয়ন্ত্র-বিক্রেতা, ডোয়ার্কিন্ এণ্ড সন্ জ্যোতিরিন্দ্র-

* ১২৯২ সালের বৈশাখ-সংখ্যা ‘বালকে’ প্রকাশিত প্রতিভাহৃদয়ী দেবীর “সহজে গান-শিক্ষা” প্রবন্ধের ১৩ পৃষ্ঠায় পাণ্ডটীকা দ্রষ্টব্য।

নাথ কর্তৃক “সঙ্কলিত ও ব্যাখ্যাত” ‘স্বরলিপি-গীতি-মালা’ প্রকাশ করেন। ইহাতে দ্বিজেন্দ্রনাথ, স্বর্ণকুমারী, অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রভৃতির রচিত মোট ১৬৮টি গানের আকার-মাত্রিক স্বরলিপি আছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রচিত গানের সংখ্যা ৩২; তন্মধ্যে ২টি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ, এবং ১টি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও অক্ষয়চন্দ্রের সম্মিলিত রচনা।

‘বীণা-বাদিনী’—‘স্বরলিপি-গীতি-মালা’ প্রকাশের অব্যবহিত পরেই ১৩০৪ সালের শ্রাবণ (১৮৯৭, জুলাই) মাসে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ‘বীণা-বাদিনী’ নামে সঙ্গীতপ্রকাশিনী একধাণি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ডোরাকিন্ এণ্ড সন ইহার প্রকাশক ছিলেন। সঙ্গীত-বিষয়ক প্রথম মাসিক পত্রিকার গৌরব ‘বীণা-বাদিনী’রই প্রাপ্য। তৃতীয় সংখ্যা পত্রিকার শিরোভাগে “সাহিত্য সঙ্গীত কলাবিহীনঃ সাক্ষাৎপত্তঃ পুঙ্খ-বিষাণহীনঃ” মুদ্রিত হইয়াছে। পরবর্তী সংখ্যাগুলিতে পত্রিকার শীর্ষদেশে

বীণাবাদন ভজ্ঞঃ রাগবিভা-বিশারদঃ

মুচ্ছনাশ্রুতিসম্পন্নঃ যোক্ষমার্গঞ্চ গচ্ছতি

এই শ্লোকটি মুদ্রিত হইত। সঙ্গীত-বিষয়ক মূল প্রবন্ধ, প্রেরিত পত্র, স্বরলিপিতে ব্যবহৃত চিহ্নের ব্যাখ্যা, নানা-বিষয়ক বাংলা ও হিন্দী গানের এবং গানের স্বরলিপি এই পত্রিকার কলেবর পূর্ণ করিত। ইহাতে কয়েকটি গানের ইউরোপীয় পদ্ধতি অধ্যায়ী স্বরলিপিও প্রকাশিত হইয়াছিল। ‘বীণা-বাদিনী’র আয়ুষ্কাল দুই বৎসর।

‘ভারত-সঙ্গীতসমাজ’—পুনায় অবস্থানকালে স্থানীয় “গায়ন-সমাজ” দেখিয়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মনে কলিকাতায় অতুল্য একটা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার বাসনা হয়। ‘বীণা-বাদিনী’র ১ম সংখ্যায় তিনি এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেন :—

“কলিকাতা সঙ্গীত-সমাজ।—উৎসাহদাতার অভাবে, হিন্দু-সঙ্গীতের ক্রমশই অবনতি ও লোপাপত্তি হইতেছে। ইহার প্রতি-বিধানার্থ সঙ্গীত-সমাজ নামক একটা সভা যাহাতে আমাদের মধ্যে স্থাপিত হয়, তাহার চেষ্টা ও উদ্যোগ চলিতেছে। হিন্দু সঙ্গীতের সংরক্ষণ, ও উন্নতি সাধনই এই সভার মুখ্য উদ্দেশ্য। এই সমাজের অধীনে, একটা সঙ্গীত-শালা থাকিবে। সঙ্গীত-নিপুণ সঙ্গীতাত্মরাগি দৌজীন ব্যক্তিগণ প্রতিদিন কিম্বা আপাততঃ সপ্তাহের মধ্যে একদিন সাহায্যে, তথায় একত্র সমবেত হইয়া গান বাদ্য এবং সঙ্গীত সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন।

সভার বেতনভূক একজন উৎকৃষ্ট গায়ক ও বাদক সঙ্গীত-শালায় নিয়ত উপস্থিত থাকিবেন। উপস্থিত সভ্যদিগের মধ্যে যিনি যাহা পারেন, কেহ বা কোন যন্ত্র বাজাইবেন, কেহ বা গান গাহিবেন, কেহ বা সঙ্গীত সম্বন্ধে কোন প্রবন্ধ পাঠ করিবেন; [মধ্যে মধ্যে, কোন পেশাদার গুণীজনকে আহ্বান করিয়া তাহার

গান-বাদ্য শুনা যাইবে। কখন কখন উৎকৃষ্ট যন্ত্রা, কীর্তন, কথকতা প্রভৃতির বন্দোবস্ত করিয়া সভ্যগণের চিত্ত বিনোদন করা হইবে। বর্ষে বর্ষে, সভার সাংসারিক উৎসবের দিন, কিম্বা সরস্বতী পূজার দিন, দেশ-বিদেশ হইতে সঙ্গীত গুণীগণকে আহ্বান করিয়া সঙ্গীত-উৎসবের অনুষ্ঠান ও তাঁহাদিগকে পারিতোষিক বিতরণ করা হইবে। ২১ টাকা মাসিক টাঙ্গা ও দুই টাকা প্রবেশ-মুদ্রা প্রদান করিলে এই সভার সভ্য হওয়া যাইবে। আপাততঃ দেড় শত সভ্য জুটিলেই সভার কার্য আরম্ভ হইবে। যাহারা এই সভার সভ্য হইতে চাহেন, তাহারা সম্পাদকের ঠিকানায় পত্র লিখিয়া বাধিত করিবেন।” (শ্রাবণ ১৩০৪)

ইহার অল্প দিন পরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের চেষ্টায় কলিকাতায় ‘ভারত-সঙ্গীতসমাজ’ স্থাপিত হয়। বিস্তৃত সঙ্গীতের চর্চা হইবে শুনিয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এই প্রতিষ্ঠানের জন্ত সহস্র মুদ্রা টাঙ্গা দিয়াছিলেন।* ঠাকুর-পরিবারের আরও অনেকে অর্থসাহায্য করিয়াছিলেন, ইহার পরিমাণও বড় কম ছিল না। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ জীবনমু্যতিতে ভারত-সঙ্গীতসমাজ সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন :—

“প্রথমে সমাজ স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের বাগীতেই বসিত। সকলশ্রেণীর লোকেই এই সমাজের সভ্য হইতে লাগিলেন। সম্মিলিত উদ্যমে এবং ঐকান্তিক আগ্রহে বেশ কাজ চলিতে লাগিল; সমাজও নিজের উদ্দেশ্যপথে দ্রুত অগ্রসর হইতেছিল। কোনও গুণীব্যক্তি কলিকাতায় আসিলেই, এই সমাজে তাহার গানবাদনা হইত। কলিকাতার অনেক বড়-লোক এবং মধ্যবিত্ত গৃহস্থ নিয়মিতভাবে সভায় যোগদান করিতেন এবং পরস্পর বেশ মেলামেশাও হইত। কিন্তু বাদ্যালীর সমবেত কার্যে দেবতার অভিষাপ আছে, সেই অভিষাপের ফলে অনতিবিলম্বে মতদ্বৈধ ঘটিল এবং সমাজও দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িল।...অতঃ পরে বাড়ী ভাড়া লইয়া সেইখানে ‘ভারত-সঙ্গীতসমাজ’ নামে সমাজের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হইল।...এ দলের পৃষ্ঠপোষক হইলেন, কুমার মনমথনাথ মিত্র।”

জ্যোতিরিন্দ্রনাথই ভারত-সঙ্গীতসমাজের প্রথম সম্পাদক; পরে অল্পতম সভাপতিও নির্বাচিত হইয়াছিলেন। প্রথমাবস্থায় এই প্রতিষ্ঠানের জন্ত তাহাকে বিশেষ পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। তাহার ‘অশ্রুভী’, ‘পূর্বসঙ্গ’, ‘বসন্তলীলা’, ‘শ্যানভদ্র’, ‘হিতে বিপরীত’, ‘অলীক বাবু’ প্রভৃতি নাট্যগ্রন্থ এখানে বহুবার অভিনীত হইয়াছে।

সঙ্গীত-প্রকাশিকা।—‘বীণা-বাদিনী’ রহিত হইবার তিন বৎসর পরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, ত্রিপুরাধিপতি রাধাকিশোর মাণিক্য দেববর্ধনের অনুরোধে ও মাসিক ৫০ অর্থসাহায্যের

* জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর : “পিতৃদেব সম্বন্ধে আমার জীবনমু্যতি”—‘প্রবাসী’, মাঘ ১৩১৮।

প্রতিষ্ঠিত, ভারত-সঙ্গীতসমাজের মুখপত্র-স্বরূপ ‘সঙ্গীত-প্রকাশিকা’ নামে একখানি মাসিক পত্রিকা ১৩০৮ সালের আশ্বিন (সেপ্টেম্বর ১৯০১) মাসে প্রকাশ করেন। ইহার কণ্ঠে নিম্নলিখিত শ্লোকটি শোভা পাইত :—

নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।

মদন্তু যত্র পায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ ॥

পত্রিকা-প্রকাশের “প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য” সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যায় এইরূপ লিখিত হয় :—

“আজকাল, ঐতিহ্যুতি পুরাণ-কাব্য প্রভৃতি বিষয়ক সংস্কৃত গ্রন্থসকল অহুবাদিত হইয়া জনসাধারণের মধ্যে বহুলরূপে প্রচারিত হইতেছে। কিন্তু হুংখের বিষয়, এ পর্যন্ত সঙ্গীত বিষয়ক প্রাচীন গ্রন্থাদির অহুবাদ কার্য্যে কেহ হস্তক্ষেপ করেন নাই। সঙ্গীত-নির্ণয়, সঙ্গীত-দর্পণ, সঙ্গীত-দামোদর, রাগ-বিবোধ, রাগসর্ব্বস্ব-সার, রাগার্ণব, নারদ-সংহিতা, ধ্বনি-মঞ্জরী, প্রভৃতি বিবিধ সঙ্গীত-গ্রন্থের মধ্যে অধিকাংশই পাণ্ডুলিপি অবস্থায় রহিয়াছে—হুই একখানি পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে মাত্র। অনেক গুলি গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিও এখন হুস্তাপ্য এবং আরও কিছুকাল পরে একেবারে বিলুপ্ত হইবারই সম্ভাবনা। এই সকল গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া মূল ও অহুবাদ আমরা ক্রমশ এই পত্রিকায় প্রকাশ করিব, এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াছি। ইহার দ্বারা, ‘গ্রহ’, ‘অংশ’, ‘ভাস’, ‘গ্রাম’, ‘হুর্ছনা’, ‘বাদী’, ‘সম্বাদী’, ‘খাণ্ডব’, ‘ঐতব’, প্রভৃতি আর্ষ-সঙ্গীত-বিষয়ক পারিভাষিক শব্দের প্রকৃত অর্থ বোধগম্য হইবে এবং পূর্বে রাগ-রাগিণীর বিরূপ মূর্ত্তি ছিল ও কালক্রমে বিরূপ পরিবর্ত্তন ঘটয়াছে, তাহাও অবগত হওয়া যাইবে।

“আমাদের আর একটি উদ্দেশ্য,—তানসেন প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ওস্তাদগিরের পুরাতন গীতগুলি স্বরলিপিবদ্ধ করা। স্বরলিপির অভাবে, অনেক গুলি পুরাতন গান বিলুপ্ত হইয়াছে এবং যাহা এখনও প্রচলিত আছে, তাহাও কালক্রমে মুখ-পরম্পরায় বিরূত হইয়া যাইতেছে। অতএব, এ বিষয়ে আমাদের আর উদাসীন থাকা উচিত নহে; যাহাতে পুরাতন গীতগুলি স্বরলিপিবদ্ধ হয়, সঙ্গীত-বেত্তা মাত্রেই সে বিষয়ে চেষ্টা করা কর্তব্য।...

“আমাদের ভারতবর্ষই সঙ্গীত-কলার জন্মস্থান। কোন কোন পণ্ডিত বলেন, এইখানেই সপ্তম্বর প্রথমে উদ্ভাবিত হইয়া পরে দেশবিদেশে প্রচারিত হয়। আমাদের সঙ্গীত-পদ্ধতিতে, বিশেষতঃ আমাদের রাগ-রাগিণীর স্বরবিভাগে ও মূর্ত্তি-কল্পনায় যেমন একটি কলা-নৈপুণ্য ও গুণপনা দেখা যায়, তাহা অল্প কোন সভ্যজাতির মধ্যে দৃষ্ট হয় কি না সন্দেহ। এই সঙ্গীত-বিজ্ঞা আমরা কোন জাতির নিকট হইতে বার করিয়া পাই নাই—ইহা আমাদের নিজস্ব সম্পত্তি। এই ‘জ্ঞান’ বলিতেছি, বাহাতে আমাদের পুরাতন সঙ্গীত-বিজ্ঞা ও সঙ্গীত-কলার বহুল প্রচার ও স্থায়িত্ববিধান হয়, সে বিষয়ে শুধু সঙ্গীতাহুবাগী কেন বন্দোবস্ত করিয়া উৎসাহ প্রদান করা কর্তব্য।”

সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ

ভারত-সঙ্গীতসমাজের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকা কালেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সংস্কৃত নাটকগুলির বহুভাষ্যে হস্তক্ষেপ করেন। তিনি স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন,—

“একদিন মেজ’বোঠাহুবাগী আমাকে ‘শকুন্তলা’ পড়িতে বলিলেন। ইহার আগে আমি সংস্কৃত নাটক একখানিও পড়ি নাই। ‘শকুন্তলা’ পড়িয়া আমি বাস্তবিকই মুগ্ধ হইয়া গেলাম। তাবিলাম, এ জিনিষ এখনও কেন বাদলা ভাষায় তর্জমা হয় নাই। হুই-এক জনকে অহুবাদ করিতে অহুরোধও করিয়া-ছিলাম। কিন্তু কেহই তেমন গরজ করিলেন না। আমি নিজেই আরম্ভ করিয়া দিলাম।”

অক্সাণ্ড পরিভ্রমের কালে ১৮৯৯ হইতে ১৯০৪ সনের মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ১৭খানি সংস্কৃত নাটকের বহুভাষ্য প্রকাশ করেন—এই প্রবন্ধের ‘গ্রন্থপঞ্জী’-বিভাগে দ্রষ্টব্য। পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায়ের ভাষায়, ইহা “তাহার স্মৃতির, তাহার যোগ্য-তার, তাহার মেধার, তাহার পাণ্ডিত্যের, তাহার কবিত্বের অক্ষয় কীর্তিস্তম্ভ হইয়া থাকিবে” (‘রঙ্গালয়’, ৪ মাঘ ১৩০৮)।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

১৩০৯-১০ বঙ্গাব্দে (ইং ১৯০২-৩) জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এক বৎসরের জন্ত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অল্পতম সহকারী সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন। তিনি ১০ জ্যৈষ্ঠ ১৩১০ তারিখে পরিষদের মাসিক অধিবেশনে “ভারতে নাট্যের উৎপত্তি” নামে একটি সুলিখিত প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন।

চিত্রাঙ্কন

হিন্দুধর্মে পঠকশায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ শিক্ষকদের ছবি আঁকিতেন। চিত্রাঙ্কনের অভ্যাস তাহার বরাবরই ছিল। ইহাতে অহুরাগবশতঃ তিনি পরিচিত-অপরিচিত অনেকেরই মুখাকৃতি খাতায় আঁকিয়া রাখিতেন। ইহার কালেই আমরা ‘সারদামঙ্গল’ের কবি বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী এবং রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন বয়সের রেখাচিত্রগুলি লাভ করিয়াছি। ১৩১৮ সালের ফাল্গুন (ফেব্রুয়ারি ১৯১২) সংখ্যা ‘ভারতী’তে সরলা দেবীর “কবি-সম্বর্দ্ধনা” প্রবন্ধে প্রকাশিত, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অঙ্কিত রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন বয়সের (১৮৭৭-৮৩-৯০-৯২-১৯০৭ সালে রবীন্দ্রনাথ) পাঁচখানি রেখাচিত্র দেখিয়া বিলাতের বিখ্যাত চিত্রশিল্পী রোঠেনষ্টাইন (Rothenstein) আকৃষ্ট হন। তিনি তৎকালে-বিলাত-প্রবাসী রবীন্দ্রনাথকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অঙ্কিত কতকগুলি মূল চিত্র আনায়া দিবার জন্ত অহুরোধ করেন। চিত্রগুলি বিলাতে পৌছিলে রবীন্দ্রনাথ ও রোঠেন-ষ্টাইন উভয়ে ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯১২ তারিখে জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে যে হুইখানি পত্র লেখেন, ‘জ্যোতিরিন্দ্রনাথ’ পুস্তক হইতে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

ভাই জ্যোতি দাদা,—আপনার ছবির খাতা আমি

Rothensteinকে দেখিয়েছি। তিনি এখানকার একজন খুব বিখ্যাত artist; তিনি দেখে অভ্যস্ত আশ্চর্য্য হোয়ে গেছেন। তিনি আমাকে বলেন,—আমি তোমাকে বলছি, তোমার দাদা তোমাদের দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্রী। আমাদের দেশের প্রথম শ্রেণীর ড্রইং যারা করেন, তাঁদের সঙ্গেই তাঁর তুলনা হ'তে পারে। এত দিন যে আমাদের দেশে এ ছবির কোনো সমাদর হয় নি, এর মত এমন অদ্ভুত ঘটনা কিছু হ'তে পারে না। Most marvellous, most magnificent—এই ত তাঁর মত। তিনি বলেছেন, এখানকার সব চেয়ে বিখ্যাত art criticকে তিনি এই ছবি দেখাবেন, এবং এর একটা ছোট্ট সমালোচনা তিনি নিজে লিখবেন। Portfolioর আকারে একটা selection তোমাদের করা উচিত।...যেটা যথার্থ আপনার নিজের জিনিষ এবং যাতে আপনার শক্তি এমন আশ্চর্য্যরূপে প্রকাশ পেয়েছে, সেটাকে লুপ্ত হ'তে দেওয়া উচিত হয় না। আপনার এই ছবি এখানে যারাই দেখেছেন, সকলেই খুব প্রশংসা করছেন। রোটেনষ্টাইন খুব একজন গুণজ্ঞ লোক, এর মতে আপনার চিত্রশক্তি একেবারেই প্রথম শ্রেণীর গুণীর উপযুক্ত; এ কথা চাপা রাখলে চলবে না।—আপনার স্নেহের রবি। ২৯ জুলাই ১৩১১।

My dear sir,—Let me thank you for your kindness in sending over the three books containing your drawings. As I expected from the reproductions I saw in an article on your brother, they are admirable. I know of few drawings which show at the same time so much sensitiveness of line and sincerity in characterisation, and there is a beauty and nobility in the expression you give to your sitters which it would be difficult to match. I do not know which I prefer, the drawings of the men or of the women. Your drawing of ladies remind me of the early drawings by Dante Gabriel Rossetti and the admirable drawings by the great French artist, Puvis de Chavanes. Indeed the books have been—and still are a source of great delight to me, and all to whom I have shown them have had similar feelings regarding them...(Sept. 14, '12.)

১৯১৪ সনে রোটেনষ্টাইন একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা সহ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অঙ্কিত ২৫খানি রেখাচিত্র বিলাতে মুদ্রিত করেন। এই চিত্র-পুস্তকের নাম—*Twenty-five Collo-types* from the original Drawings of Jyotirindra Nath Tagore. 1914.

জাতীয় সঙ্গীত

বিগত প্রথম মহাযুদ্ধের সময় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ করাসী রাষ্ট্র-সঙ্গীত “লা-মাসে ইয়েজ” এবং ইহার মূল সুরের অল্পগত

বঙ্গানুবাদ ও স্বরলিপি ‘প্রবাসী’র পৃষ্ঠায় (জ্যৈষ্ঠ ১৩২২) প্রকাশ করেন। উহা এইরূপ:—

আয় রে আয় দেশের সন্তান
গৌরবের দিন এসেছে;
অভ্যাচার এ দ্যাধ—গগনে
রক্ত-ধ্বজা তুলেছে।
শুনিছ না ক্ষেত্র-মাঝে
ভীষণ সৈন্যের হুকার?
ওরা আসে বুকের পরে
করিতে জী-পুত্র সংহার।
ধর অস্ত্র পৌরন্দর
কর বাহু সংগঠন;
চলো—চলো—মোদের ক্ষেত্রে
শত্রু-রক্ত হোক সিকন।

পুনায় অবস্থানকালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যে মৌলিক জাতীয় সঙ্গীতটি রচনা করিয়াছিলেন, এখানে তাহা উদ্ধৃত করিলে অশোভন হইবে না। এই ভারত-গানটি স্বরলিপি সহ প্রথমে ১৩০৪ সালের চৈত্র-সংখ্যা ‘বীণা-বাদিনী’তে প্রকাশিত হয়।—

শঙ্কর—কাওয়ালী

চল রে চল সবে ভারত-সন্তান
মাতৃভূমি করে আহ্বান।
বীর-দর্পে পৌরুষ-গর্বে
সাহসে সাধু সবে দেশের কল্যাণ।

পুত্র ভিন্ন মাতৃ-দৈত্য
কে করে মোচন?
উঠ, জাগো, সবে বল—মা গো।
তব পদে সঁপিছ পরাণ।

এক তলে কর তপ,
এক মলে জপ;
শিক্ষা দীক্ষা লক্ষ্য মোক্ষ এক,
এক সুরে গাও সবে গান।

দেশ-দেশান্তে যাও রে আনুতে
নব নব জ্ঞান
নব ভাবে, নবোৎসাহে মাতে
উঠাও রে নবতর তান।

লোক-রঞ্জন লোক-গঞ্জন
না করি হৃৎপাত
যাহা শুভ, যাহা ধ্রুব, তাহা
তাহাতে জীবন কর দান।

দলাদলি সব ভুলি
হিন্দু-মুসলমান;
এক পথে এক সাপে চল
উড়াইয়ে একতা-নিশান।

জীবন-সায়াকে

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ জীবনের শেষ সতের বৎসর রাঁচীতে যাপন করিয়াছিলেন। ভাষায় তিনি মোরাবাদী নামে একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ে “শান্তিধাম” এবং পর্বতশীর্ষে উপাসনা-মন্দির রচনা করাইয়াছিলেন। শহরের কলকোলাহল হইতে বহু দূরে এই নিরালা পল্লীতে নিঃসঙ্গ অবস্থায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের শেষ দিনগুলি সাহিত্য-সঙ্গীত-চিত্রবিদ্যার অস্থূলীনে ও ভগবৎ-আরাধনায় অতিবাহিত হইয়াছে; মাঝে মাঝে আত্মীয়-বন্ধু-বিশ্বোগের বার্তা আসিয়া তাঁহার মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছে। তিনি ভগ্নী স্বর্ণকুমারীকে একখানি পত্রে লেখেন:—
রবিবার [৯ ডিসেম্বর ১৯২৩]

ভাই স্বর্ণ,—তোমার আন্তরিক শুভ কামনা পেয়ে খুব তৃপ্তি-লাভ করলাম। মেজদাদা [সত্যেন্দ্রনাথ] গেলেন, দিদি [সৌদামিনী] গেলেন, শরণ [কুমারী চৌধুরাণী] গেলেন, একে একে সবাই আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছেন, আমার পুরাতন বন্ধুবান্ধব আর একজনও নেই। এইবার আমার পালা। বোনের মধ্যে তুমি আর বর্ণ—তোমরা দীর্ঘজীবী হয়ে সুখে থাক, এই আমার একান্ত বাসনা। যতই দিন যাচ্ছে, যতই সংসারে শোক-তাপ পাওয়া যাচ্ছে, ততই স্নেহ-ভাল-বাসার লোকদের আঁকড়ে ধরে থাকতে ইচ্ছে করে। বোনদের স্নেহ-ভালবাসার মর্যাদা এখন আরও বৃদ্ধিতে পারছি। এমন নির্বোধ ভালবাসা কেউ দিতে পারবে না। তুমি দীর্ঘজীবী হয়ে সুখে থাক, ভগবানের কাছে আমার এই প্রার্থনা।—স্নেহের নতুন দাঁদা। (‘জ্যোতিরিন্দ্রনাথ,’ পৃ. ১৭৯-৮০)

মৃত্যু

৪ মার্চ ১৯২৫ (২০ ফাল্গুন ১৩৩১) তারিখে সায়াকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রাঁচীতে পরলোকগমন করেন। তাঁহার মৃত্যুতে বঁটা করিয়া একাধিক স্মৃতিসভার অনুষ্ঠান হইয়াছিল। কিন্তু কেবলমাত্র বক্তৃতা বা হা-হুতাশ স্মৃতিরক্ষার প্রকৃষ্ট পন্থা নহে। তাঁহার সমগ্র রচনাবলীর একটি সুস্থ সংস্করণ (জীবনী সহ) প্রকাশ করিলে তাঁহার স্মৃতির প্রতি যথার্থ সম্মান প্রকাশ করা হইবে। এই কার্যে বিশ্বভারতী অগ্রণী হইলে পুণ্যের ভাগী হইবেন।

গ্রন্থপঞ্জী

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সমগ্র গ্রন্থের প্রথম-প্রকাশকাল-সহ একটি কালানুক্রমিক তালিকা সংকলন করা সহজসাধ্য নয়। তাঁহার কোন কোন গ্রন্থে প্রকাশকাল মোটেই স্মৃতিত হয়

নাই। বঙ্গমতী-কাখ্যালয় হইতে ‘জ্যোতিরিন্দ্রনাথ গ্রন্থাবলী’ প্রকাশিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহাতে সকল গ্রন্থ স্থান পায় নাই, এমন কি কোন গ্রন্থ কোন সালে প্রথম প্রকাশিত তাহারও নির্দেশ নাই। শ্রীমত্তননাথ ঘোষ ‘জ্যোতিরিন্দ্রনাথ’ পুস্তকে সকল গ্রন্থের সঠিক প্রকাশকাল দিতে পারেন নাই। এই সকল কারণে আমরা বিশেষ পরিশ্রম সহকারে একটি নির্ভরযোগ্য গ্রন্থপঞ্জী প্রস্তুত করিয়াছি; তালিকায় বঙ্গনী-মধ্যে প্রদত্ত ইংরেজী প্রকাশকাল বেঙ্গল লাইব্রেরি-সঙ্কলিত মুদ্রিত-পুস্তকতালিকা হইতে গৃহীত।

১। কিঞ্চিং জলযোগ (প্রহসন)। ১৭৯৪ শক (২০ সেপ্টেম্বর ১৮৭২)। পৃ. ৮৬।

২। পুরুবিক্রম নাটক। ১৭৯৬ শকাব্দা (৯ জুলাই ১৮৭৪)। পৃ. ১৪৭।

ইহার ২য় সংস্করণে (ইং ১৮৭৯) মুদ্রিত “এক স্বপ্নে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন” গানটি রবীন্দ্রনাথের রচিত।

৩। সরোজিনী বা চিতোর আক্রমণ নাটক। ১৭৯৭ শকাব্দা (৩০ নবেম্বর ১৮৭৫)। পৃ. ২৪০।

ইহার অন্তর্গত “জল জল চিতা। দিগ্ধ, দিগ্ধ” গানটি যে রবীন্দ্রনাথের রচনা, ‘জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি’তে তাহার উল্লেখ আছে।

৪। এমন কর্ম্ম আর ক’রব না (প্রহসন)। আখ্যায় ১৭৯৯ শক (৭ জুলাই ১৮৭৭)। পৃ. ১১৬।

১৯০০ সনের এপ্রিল মাসে এই প্রহসনখানি ‘অলীক বাবু’ নামে প্রকাশিত হয়।

৫। অশ্রুমতী নাটক। প্রাবণ ১২৮৬ (৪ নবেম্বর ১৮৭৯)। পৃ. ২০৪।

ইহাভেও রবীন্দ্রনাথের রচিত গান আছে; দৃষ্টান্তস্বরূপ “গহন কুসুম-কুঞ্জ-মাঝে” গানটির উল্লেখ করা যাইতে পারে।

৬। মানময়ী (গীতি-নাটিকা)। ১৮০২ শক (ইং ১৮৮০)। পৃ. ১২।

ইহাভেও রবীন্দ্রনাথের গান, যথা, “আর তবে, সহচরী” আছে।

৭। স্বপ্নময়ী নাটক। ১২৮৮ সাল (২৪ মার্চ ১৮৮২)। পৃ. ১৮৯।

ইহাভেও রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক দ্বিতীয় বার হিন্দুমেলায় পঠিত কবিতাটি—“দেখিছ না অগ্নি ভারত-সাগর” কিঞ্চিং পরিবর্তিত আকারে স্থান পাইয়াছে।

৮। হঠাৎ-নবাব (প্রহসন, করাসী হইতে)। বৈশাখ ১৮০৬ শক (২৫ এপ্রিল ১৮৮৪)। পৃ. ১২৬।

মলিয়ের-কৃত ‘লে বর্জোয়া জ্যোতিষ্ম’ হইতে।

৯। দিতে বিপরীত (কৌতুক-নাটিকা)। ২৬ বৈশাখ ১৩০৩ শক (৭ মে ১৮৯৬)। পৃ. ৩০। গানের স্বরলিপি-সহ।

- ১০। স্বরলিপি-গীতি-মালা। ১৩০৪ সাল (১২ জুন ১৮৯৭)। পৃ. ৩২০।
- ১১। পূনর্বসত্ত (গীতিনাট্য)। ১ চৈত্র ১৩০৫ (১৪ মার্চ ১৮৯৯)। পৃ. ৩০+৪০
- ১২। অভিজ্ঞান শকুন্তলা (নাটক)। ১৩০৬ সাল (১৮ অক্টোবর ১৮৯৯)। পৃ. ১৪৬।
- ১৩। বসন্ত-লীলা (গীতি-নাটিকা)। ১৩০৬ সাল (২৯ মার্চ ১৯০০)। পৃ. ৩২।
- ১৪। দ্যান-ভঙ্গ (গীতি-নাটিকা)। ১৩০৬ সাল (১৫ এপ্রিল ১৯০০)। পৃ. ৪৮।
- ১৫। উত্তর-চরিত (নাটক)। জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭ (৭ জুন ১৯০০)। পৃ. ১৫২।
- ১৬। রত্নাবলী নাটক। শুদ্ধ ১৩০৭ (২৬ সেপ্টেম্বর ১৯০০)। পৃ. ৯৫।
- ১৭। মালতী-মাধব (নাটক)। ১৩০৭ সাল (২৯ সেপ্টেম্বর ১৯০০)। পৃ. ১৫১।
- ১৮। যুদ্ধকটিক (নাটক)। ৭ (৮ মার্চ ১৯০১)। পৃ. ২৩১।
- ১৯। মুদ্রা-রাক্ষস (নাটক)। ১৩০৭ সাল (১০ মার্চ ১৯০১)। পৃ. ১৫৭।
- ২০। বিক্রমোর্ধ্বশী (নাটক)। ১৩০৮ সাল (৪ জুন ১৯০১)। পৃ. ৮৪।
- ২১। মালবিকাগ্নিমিত্র (নাটক)। ১ আষাঢ় ১৩০৮ (১৫ জুন ১৯০১)। পৃ. ৯৫।
- ২২। মহাবীর-চরিত (নাটক)। ১৩০৮ সাল (৮ অক্টোবর ১৯০১)। পৃ. ১৮৫।
- ২৩। চণ্ডকৌশিক (নাটক)। ১৩০৮ সাল (৪ ডিসেম্বর ১৯০১)। পৃ. ৮৮।
- ২৪। বৈণীসংহার নাটক। ১৩০৮ সাল (১৪ ডিসেম্বর ১৯০১)। পৃ. ১৫৯।
- ২৫। প্রবোধ-চন্দ্রোদয় (নাটক)। ১৩০৮ সাল (২৪ মার্চ ১৯০২)। পৃ. ১১৭।
- ২৬। নাগানন্দ (নাটক)। ১৩০৯ সাল (১ আগষ্ট ১৯০২)। পৃ. ৮৭।
- ২৭। দায়ে পড়ে' দার-গ্রহ (গ্রহসন, করাসী হইতে)। ১৩০৯ সাল (১৬ সেপ্টেম্বর ১৯০২)। পৃ. ৫৯।
- মোল্লিয়ার-কৃত 'মারিয়াজ কোর্সে' অবলম্বনে।
- ২৮। ভারতবর্ষে (ভ্রমণ, করাসী হইতে)। ১৩১০ সাল (১ সেপ্টেম্বর ১৯০৩)। পৃ. ৬৫।
- জ্যোতিষ-শ্রেণী-কৃত গ্রন্থ অবলম্বনে।
- ২৯। বাণির রাণী (জীবনী, মরাসী হইতে)। ১৩১০ সাল (৩০ সেপ্টেম্বর ১৯০৩)। পৃ. ৭৩।
- ৩০। বিদ্য-শালভঙ্গিকা (নাটক)। ১৩১০ সাল (২০ ডিসেম্বর ১৯০৩)। পৃ. ৭৩।
- ৩১। রত্ন-মিরি (ব্রহ্মদেশীয় নাটক)। ১৩১০ সাল ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯০৪)। পৃ. ৫৮।
- ৩২। ধনঞ্জয়-বিজয় (নাটক)। ১৩১০ সাল (৩ মার্চ ১৯০৪)। পৃ. ৩৬।
- ৩৩। কপূর-মঞ্জরী (নাটক)। ১৩১১ সাল (২৩ এপ্রিল ১৯০৪)। পৃ. ৬৪।
- ৩৪। প্রিয়দর্শিকা (নাটক)। ১৩১১ সাল (২৩ মে ১৯০৪)। পৃ. ৫৪।
- ৩৫। করাসী-প্রশ্নন (গল্প-কবিতা, করাসী হইতে)। ১৩১১ সাল (২৪ সেপ্টেম্বর ১৯০৪)। পৃ. ২৫৬।
- ৩৬। প্রবন্ধ-মঞ্জরী। ১৩১২ সাল (১২ আগষ্ট ১৯০৫)। পৃ. ৫৮৬।
- ৩৭। এপিক্টেটসের উপদেশ (ইংরেজী হইতে)। ১৩১৪ সাল (১৮ জুন ১৯০৭)। পৃ. ১০+৮০।
- ৩৮। জুলিয়ন্স সীজার (নাটক, ইংরেজী হইতে)। ১৩১৪ সাল (২৮ অক্টোবর ১৯০৭)। পৃ. ১৩৩।
- ৩৯। ইংরাজ-বর্জিত ভারতবর্ষ (পিয়ের লোটের করাসী হইতে)। ৭ (১২ মার্চ ১৯০৯)। পৃ. ৩৭৫।
- ৪০। মার্কাস অরিলিয়সের আত্মচিহ্ন (ইংরেজী হইতে)। আষাঢ় ১৩১৮ (১২ নবেম্বর ১৯১১)। পৃ. ৯৫।
- ৪১। সত্য, জ্ঞান, মঙ্গল (ভিক্টর কুজ্যার করাসী হইতে)। ৭ (২০ ডিসেম্বর ১৯১১)। পৃ. ১৬০+৩৬৯।
- ৪২। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনন্যূতি। ফাল্গুন ১৩২৬ (ইং ১৯২০)। পৃ. ২৪০।
- জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কর্তৃক বিরত ও জীবনসংক্কার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক লিখিত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের লিখিত 'পিতৃদেব সম্বন্ধে আমার জীবনন্যূতি' ('প্রবাসী', মাঘ ১৩১৮) প্রবন্ধটি এই পুস্তকের পরিশিষ্ট-স্বরূপ মুদ্রিত হওয়া উচিত।
- ৪৩। শোণিত-সোপান (গল্প, করাসী হইতে)। জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭ (ইং ১৯২০)। পৃ. ১০৪।
- ৪৪। অবতার (উপভাস, গতিয়ের-এর করাসী হইতে)। আষাঢ় ১৩২৯ (ইং ১৯২২)। পৃ. ১৩২।
- ৪৫। মিলিতোনা (উপভাস, গতিয়ের-এর করাসী হইতে)। বৈশাখ ১৩৩০ (৭ জুন ১৯২৩)। পৃ. ১৫৫।
- ৫৬। ত্রিমুগ্ধগবদগীতা রহস্য অথবা কর্মযোগশাস্ত্র। ইং ১৯২৪। পৃ. ৮৭২।
- বালগঙ্গাধর তিলক-কৃত 'গীতারহস্য' নামক মরাসী গ্রন্থের অনুবাদ।
- জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রম্বাবলী, ১ম-৫ম ভাগ (বহুমতী)। ইং ১৯৩৬।

এশিয়ার কথা

শ্রীসুশীলকুমার বসু

মানব-সভ্যতার আদিম জন্মভূমি এশিয়া আজ নীতান্তের পুনর্নবীভূত সর্পের মত সমস্ত জড়িয়া, সকল আবিষ্টতা খেড়ে ফেলে নূতন অগ্রগতির অপ্রতিহত আবেগ নিয়ে ক্ষেপে উঠেছে। এক দিন ইতিহাসের এক আদিম উষ্ম এই এশিয়ার পর্বত-সঙ্কুল বক্ষ থেকে বেরিয়ে এসেছিল অভিযানী যাযাবর দল—মধ্য এশিয়ার ‘এট হেভন’ থেকে সেই প্রথম অভিযানের বিচ্ছিন্নকৃত ধারা একে একে বিশ্ব-ইতিহাসের বিস্তৃত সমতলকে সম্বল করেছে—পূর্বে জাপান থেকে শুরু করে পশ্চিমে বহুদূর পর্যন্ত, দক্ষিণে পঞ্চনদের তীরে, ইউরোপের ভল্গাভান পার হয়ে, ভূমধ্যসাগরের কূলে কূলে এশিয়ার ভ্রাম্যমাণ আত্মা নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছে, মিশিয়ে দিয়েছে, ভেঙেছে, আবার গড়েছে। এত বৈষম্য, এত বৈচিত্র্য, তবু কোথায় যেন লুকিয়ে আছে এশিয়ার প্রাণ—প্রতীচ্য ‘European mind’-এর অহমিকা নিয়ে যে প্রাণকে বৃথতে চায় নি, বৃথতে পারে নি। এই মূর-পর্বত-অরণ্যচারী ভ্রাম্যমাণের দল পশুপালন ছেড়ে কি করে হলকর্ষণ শিখল, লুণ্ঠন হত্যা ছেড়ে গড়ে তুলল জনপদ, যাদের হাতে ছিল ধ্বংসের মহামারী, কোথা থেকে তাদেরই হাতে এল কৃষ্টির বরাভয়, অগ্নিবর্ষা অস্ত্রের ফলকে কি করে কুটল শান্তির বাণী, সে কথা মানব-সভ্যতার এক মৃত্যুহীন মহাকাব্য। বর্তমান সমস্যা এই যে এই বিরাট মহাদেশের সমস্ত বৈষম্য, বিভেদ, বৈসাদৃশ্য ছাড়িয়ে, সমস্ত আবর্ত মছন করে যে আকোড়টির মত মানসমুষ্টি উঠেছে, কি তার রূপ, কোথায় তার সংহতির অদৃশ্য অঙ্গ।

এশিয়ার বৈশিষ্ট্য তার বৈচিত্র্য, তার বিভেদে। ‘ইউরোপীয়’ শব্দটি যে একা এবং সমতা অর্চিত করে, সে ধারণের বাহ্যিক সমতা এশিয়ার বিভিন্ন ভাষা, গোষ্ঠী, ধর্ম ও কৃষ্টির মধ্যে সম্ভব নয়। এশিয়ার সমতা তার আশায় ও আদর্শে। এশিয়ার প্রাণ সংগ্রাম ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভিতর দিয়ে অগ্রসর হতে চায়নি, চেয়েছে শান্তি ও নিরুপদ্রব জীবনযাত্রার ভিতর দিয়ে এগিয়ে যেতে;—যেমন চীন ও ভারতবর্ষ। তাই প্রবল ইউরোপকে সে বাহির থেকে বিদায় দৈব নি। বহু পাশ্চাত্য পর্যটক, ধর্ম-যাজক, এমন কি, লুণ্ঠনকারীও প্রাচ্যের আতিথ্যের স্রোতঃ গ্রহণ করেছে। মাত্র কিছু দিন পূর্বে টি, ই, লরেন্স হুর্দার আরব জাতির অন্তরে সাদরে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। এশিয়ার দুর্বলতা তার মহত্ত্ব—সে মহত্ত্বের স্রোতঃ নিয়ে ইউরোপ তার সর্বনাশ সাধন করতে চেয়েছে। রাজনৈতিক টাগ-অব-ওয়ারে মহত্ত্বের মূল্য না থাকায় এশিয়া ইউরোপের দাবা খেলার ছকে পরিণত হয়েছে। জন গান্ধার এ বিষয়ে বলেছেন,

• “The history of modern Asia has been that of Western Powers struggling among themselves for the rich and prostrate body of the eastern continent. Geographically Europe is an appendage of Asia. The appendage has wagged,—and perhaps poisoned the main body.”

ইউরোপের যে সব ভ্রাম্যমাণ দল ইংলণ্ড, ফ্রান্স, পর্তুগাল, হল্যান্ড প্রভৃতি দেশ থেকে নবাবিকৃত সমুদ্রপথে যাত্রা করেছিল প্রাচ্যের দিকে, তাদের মধ্যে এক দল ছিল ব্যবসায়ী যারা প্রয়োজনানুসারে জলদস্যু হয়ে উঠতে পারত, আর এক দল ছিল ধর্মযাজক, অশিক্ষিত প্রাচ্যকে অন্ধকার থেকে যারা আলোতে আনতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এদের সবাই আন্তরিক উদ্বেগ ছিল প্রাচ্যের অলুপ্তিত সন্নিহিত হস্তগত করা। তাই খ্রীষ্ট রাজ্যের স্থানে স্থাপিত হ’ল খ্রীষ্টান রাজ্য। তাই ভবঘুরে সাম্রাজ্যিক দস্যু হয়ে উঠল নো-সেনাপতি, নিরীহ বণিক হয়ে উঠল রাজ্যাদিকারের প্রধান সহায়। দস্যু, বণিক ও পাদ্রীর আবিষ্কৃত মন্বণ পথে এল সাম্রাজ্যবাদ। ভারতের উপকূলে ফরাশী ও ওলন্দাজদের বিয়োগান্তক নাটকের অবসানে শোনা গেল ব্রিটিশ সিংহের গর্জন। মালয় উপদ্বীপে ডাচ, পর্তুগীজ ও ইংরেজের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভিতর দিয়ে সাম্রাজ্যবাদ কায়ম হ’ল। পর্তুগীজরা ক্যান্টনের ব্যবসায়-বনিয়াদ রাখল দৃঢ় করে। এদেরই বাণিজ্যতরী চীনের কূলে এসে লাগল আগ্নেয়াস্ত্র, আফিং আর মিশনরির সপুনা নিয়ে। অনতিবিলম্বে জাপান পর্যন্ত বিস্তৃত হ’ল তাদের প্রাধাত্য। কিন্তু এই এশিয়া অভিযানে ইংরেজ-বণিকই বোধ হয় সব চেয়ে সুবিধাজনক ব্যবস্থা অবলম্বন করতে সমর্থ হয়েছিল। তাই যখন অচ্যুত ইউরোপীয় জাতিগুলি এশিয়ার কূলে কূলে মাত্র আংশিক প্রাধাত্য বিস্তার করতে পেরেছিল, ইংরেজ তখন রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হয়ে অকস্মাৎ অনেক পরিমাণে রাজনৈতিক শক্তি ও বাণিজ্যিক অধিকার করতলগত করেছিল—যেমন ভারতবর্ষ ও চীনে। এই অধিকার রক্ষা করতে ইংরেজ বারবার অস্ত্রধারণও করেছে। চীনের বেলায় সে অস্ত্র আফিং ও আগ্নেয়াস্ত্র। প্রথমটা অহিংস অস্ত্র, কিন্তু অত্যন্ত ফলপ্রসূ। তাই নানকিঙের সন্ধির সঙ্গে সঙ্গে দূর প্রাচ্যে ইংরেজের সার্বভৌমত্ব দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

সাম্রাজ্য-প্রতিযোগিতার হিংস্র রূপ আজও বদলে যায় নি। এশিয়া কিন্তু আজ আর নিজেকে লুণ্ঠের ভাণ্ডার হিসাবে দেখতে প্রস্তুত নয়। এশিয়ার সঙ্গে ইউরোপের বিভেদ এইখানে যে সে আত্মপ্রতিষ্ঠা চায়, সাম্রাজ্যপ্রতিষ্ঠা চায় না, সংগ্রাম চায় না, চায় শান্তি, যেত জাতির অজ্ঞান প্রাধাত্যের অবসান ঘটবে চায় সংহতি। পণ্ডিত নেহেরু সেজ্ঞে বলেছিলেন, “এই আণবিক বোমার যুগে শান্তিরক্ষার জন্ত এশিয়াকে তাই সাক্ষ্যের সহিত কার্য্য করিতে হইবে।” সন্ধীর্ণ ও সংগ্রামশীল যে জাতীয়তাবাদ ইউরোপকে দাহন্তুপে পরিণত করেছিল, এশিয়া সে জাতীয়তাবাদ স্বীকার করে না। রেস থিওরিকে সম্বল করে ইউরোপ এই দান্তিক জাতীয়তাবাদের কাছে অন্ধসমর্পণ করেছিল, যদিও জীবতাত্ত্বিকগণ একবাক্যে প্রমাণ করেছেন যে রক্তের অবিমিশ্রতার কথা কবি-কল্পনা মাত্র। সমস্ত ইউরোপ

এই জাতীয় আভিজাত্যের অহমিকার রাহুগ্রস্ত। কিন্তু অসংখ্য জাতির বাসভূমি এই এশিয়ার ঐ ধরণের জাতীয় আভিজাত্যের ও অবিমিশ্রতার অবকাশ নেই। প্রশান্ত মহাসাগর থেকে লোহিত সাগর পর্যন্ত বিরাট ভূখণ্ডে, বিভিন্ন ভাষাভাষী, বিভিন্ন আকৃতি-প্রকৃতিবিশিষ্ট নর-নারী বারবার কত বিভিন্ন ধরণের সভ্যতা সৃষ্টি করেছে। সেই সভ্যতার দুটি শাখা পৃথিবীর নব-বসন্তে ভারত ও চীনে পুঞ্জিত হয়ে উঠেছিল; দর্শন, শিল্প, কৃষি ও বাণিজ্যের মঙ্গলময় পথে অগ্রসর হয়েছিল শান্তির প্রবল ক্ষেত্র।

এশিয়ার জাতীয়তা যেমন বিকাশলাভ করতে পারে নি, একেবারে অতীতের তেমনি সেখানে গভীর ভাবে বর্তমান। একই এশিয়ার মধ্যে আর্ধ্য জাতিও থেকে শুরু করে কত বিভিন্ন জাতির বসবাস, একদিকে মরুচারী আরব, অপরদিকে পর্বতচারী মোদল। আবার সিদ্ধ-গঙ্গার শস্যভূমল উপত্যকায় শান্তি-প্রিয় ভারতবাসী, তাই 'রেন' ধিকুরি বা উগ্র নররাজ্যলোলুপ জাতীয়তা এখানে বিকশিত হয় নি। বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে এখানে সেই জাতীয়তাবাদ গড়ে উঠেছে, প্রথম যুদ্ধ যাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যাকে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ করেছিল— সে এক জুড় জায়গায় জাতীয় আত্মপ্রতিষ্ঠার দাবি। উদাহরণ-স্বরূপ, আরব-সম্রাজ্যের উল্লেখ করা যেতে পারে। ইউরোপে ঐষ্টধর্ম বিভিন্ন দেশ ও জাতির মধ্যে একটা বাহ্যিক সমতা সাধন করতে পেরেছিল—এশিয়ায় ধর্মমতের বিভিন্নতার জড় যা সম্ভব হয় নি। আজ অবস্থা বিজ্ঞানের প্রভাবে, উন্নততর রাজনৈতিক বিবর্তনের ফলে ধর্ম তার মুষ্টি শিথিল করেছে। প্যান-ইসলামের স্থানে এসেছে প্যান-আরব। সোভিয়েট-এশিয়া থেকে ধর্মাত্মতা দূর হয়েছে। ভারত ও চীন উদারতার ঐতিহ্য নিয়ে অগ্রসর হতে শুরু করেছে।

দহ্ম, বণিক ও ধর্মযাজকের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এল যে সাম্রাজ্যবাদ, তার আধিপত্যে বিদ্যুৎ ফটক কি করে? এশিয়ার বুকে যেত জাতি তো দেবতার মত বাস করছিল, ওলিমপাস নিবাসী উদাসীন দেবতার মত সাহসিত প্রাচ্যের পানে তাকিয়ে সে শুধু কৃপার হাসি হাসছিল। কি করে তার এই নিরাপত্তা হঠাৎ ভেঙে গেল? যেত জাতির এই ধ্বংসের বীজ লুকান ছিল তার নিজেরই আত্মগরিমার মধ্যে। যে সংঘর্ষের গর্ক নিয়ে সে প্রাচ্যকে করায়ত্ত করে রেখেছিল, দেখা গেল তা কল্যাণময় নয়, অতএব ধ্বংসাভিযুগী। দূর ভূমিসম্মত মধ্যযুগ থেকে বাণিজ্যের অধিকার নিয়ে জাতিমণ্ডলীর মধ্যে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে আসছিল তারই একটা উগ্ররূপ দেখা গিয়েছিল আধুনিক কালে। ইউরোপের অগ্রসর রাষ্ট্রগুলি চাইল উপনিবেশ, উপনিবেশ দ্রব্যসম্ভারের উপযুক্ত বিক্রয়স্থান, বর্ধিত জনসংখ্যার জঙ্ঘ আহার্য। বিরাট অনুষ্ঠিত এশিয়ার দিকে চলল তাদের অভিযান। প্রথম মহাসমরের পর পাশ্চাত্য জাতির কক্ষাল বেরিয়ে পড়ল আভিজাত্যের ছত্রবেশ বিদীর্ণ করে। এশিয়া দেখল,

নিহক সাম্রাজ্য নিয়ে স্তম্ভ্য পাশ্চাত্য জাতিগুলি কি পরিমাণে হিংস্র, অমাহুষিক হয়ে উঠতে পারে। এশিয়া বুঝল যে যেত জাতি শুধু দাস্তিক ও হিংস্র-ই নয়, প্রতারকও—মুখে তাদের বিশ্বমৈত্রীর রঙীন প্রলাপ, অন্তরে তাদের ক্লেবায়িত হিংসার বিষ। সেই দিন এশিয়ার জাগ্রত বুকে ইউরোপের মৃত্যু হ'ল।

এশিয়ার যেতাহিপত্য অবসানের আর একটি কারণ পাশ্চাত্য শিক্ষা। এই শিক্ষার ভিতর দিয়ে সমগ্র এশিয়ায় এক বিরাট আলোকপ্রাপ্ত যুব-সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছিল, জায় ও নীতি যাদের একমাত্র আদর্শ, ক্রশো-ভেন্টের যাদের অন্তরকে উদ্বোধিত করেছে, মিল-জেকারসন যাদের চোখে অন্তরের স্পর্শ বুজিয়েছে, বার্ক দিয়েছে যাদের মুখে বাণী। এই যুব-সম্প্রদায় দেখতে পেল কি করে পাশ্চাত্য রাজনীতি ও বাণিজ্যনীতি—হীন প্রতারণার পথ, প্রয়োজন হলে বর্বরতার পথ অবলম্বন করে সাম্রাজ্য-স্বার্থ কামের করে রাখবার চেষ্টা করেছে। পাশ্চাত্যের এই বিরাট বিশ্বব্যাপক প্রতারণা শুরু করল যুব-এশিয়াকে, যে যুব-এশিয়া পাশ্চাত্যের কাছে শিখেছে ব্যক্তি-স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও মানবতার আদর্শ, পাশ্চাত্যের আলোতেই দেখেছে সাম্য, স্বাধীনতা ও জায়ের উজ্জ্বল মুষ্টি। এর পর এই বিক্ষুব্ধ, ভ্রান্তিমুক্ত যুব-এশিয়ার হাতে এল ইউরোপের মারণাজ, সে-তার সময়-বিজ্ঞান। তাই প্রথম মহাযুদ্ধের অন্তে এশিয়ার অনেকগুলি রাষ্ট্র রণশ্রান্ত ইউরোপের শিথিল মুষ্টি থেকে বেরিয়ে আসবার আংশিক সফল প্রয়াস করেছিল। মরীয়া ইউরোপ প্রথম মহাসমরের পর রক্তমোক্ষণক্রান্ত হতে চরম চেষ্টা করল এশিয়ার উপর তার আধিপত্য বজায় রাখতে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর তাই ত দেখা যায় সাম্রাজ্য নিয়ে, অধিকার নিয়ে এত হিংস্র হানাহানি কাড়াকাড়ি বিভিন্ন শক্তির মধ্যে। সাম্রাজ্যবাদকে প্রথম মহাসমর যে ভাবে প্রচণ্ড ঝাঁকানি দিলে, তাতে করে ইউরোপ বুঝতে পারল যে তার কামেরী স্বার্থের দিন ফুরিয়ে এসেছে। এদিকে যুদ্ধের পর তুরস্ক নিজেকে সম্পূর্ণ রূপান্তরিত করে শক্তিশালী স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হল। এমনই পরিবর্তিত তার রূপ যে প্রাচ্য বলে তাকে আর চেনা যায় না। পশ্চিম এশিয়ার ভৌগোলিক অবস্থান, বাণিজ্য ও সামরিক গুরুত্ব উপলব্ধি করার ফলে ইউরোপের শক্তিগুলি সহজে তাকে মুক্তি দেয় নি, বন্ধনের মত কোটে কোটে ছোট ছোট রাষ্ট্রে ভাগ করে দিয়েছে, কামের স্বার্থকে অব্যাহত রাখতে। প্রাচ্য বারবার অধীকার করেছে এই কার্পণ্যের দান নিতে। ইবন সাউদের নূতন আরব রাষ্ট্রের মধ্যে, সিরিয়া ও লেবাননের গণতন্ত্রের মধ্যে, ইরাকের স্বাধীনতার স্বপ্নে আত্মপ্রতিষ্ঠার নূতন দাবি ও আংশিক সফলতা মূর্ত হয়ে উঠেছে। ভারতবর্ষে কি করে এই স্বাধীনতার স্বপ্ন জায়া বিক্ষোভ সৃষ্টি করেছিল তা সবাই জানা আছে। চীনে দীর্ঘ আত্মকলহের অবসানে সান-ইয়াং-সেন নূতন জাতীয়তাবাদের বনিয়াদ দৃঢ় করেন। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়,

যেখানে বণিকের মানদণ্ড কাৰ্য্যতঃ রাজদণ্ডৰূপে বহুদিন প্রতিষ্ঠিত, সেখানেও বন্দী থেকে মুক্ত করে ছাড়া, মালয়, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি স্থানে জাতীয়তায় তীব্র সুরণ সুরু হ'ল। জাপান খেতজাতির আধিপত্য ধ্বংস করবার জন্ত কূটনৈতিক সামরিক প্রচেষ্টা সুরু করল, মহা-এশিয়াৰ নামে। কোরিয়া উইলসনের চতুর্দশ পয়েন্ট নিয়ে স্বাভাৱম্ভাৱ ব্রতী হ'ল।

ইউৰোপের মুষ্টি শিথিলতর করল সাম্যবাদ ও রাশিয়া। প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইংলণ্ডে শ্রমিকদল সৰ্ব্বপ্রথম সাম্রাজ্যবাদেৰ তীব্র বিরোধিতা সুরু করেছিল। কিন্তু সাম্যবাদেৰ জীবন্ত লাবরেটরি রাশিয়া তখনও ইউৰোপে অপাংজেক্স জীগ-অব-নেঞ্চনসেৰ বহিষ্ঠৃত এবং ইউৰোপীয় সমাজেৰ অযোগ্য বলে পরিগণিত। ইউৰোপ থেকে এই নিৰ্বাসন রাশিয়াকে এশিয়াভিমুখী করবার জন্ত অনেক পরিমাণে দায়ী। তা ছাড়া, এশিয়াৰ রাজনৈতিক ও সামরিক সম্ভাবনাৰ যে আয়োজন ছিল তা রাশিয়াৰও দৃষ্টি এড়ায় নি। আরও একটু কথা এই যে, জাতি ও সংস্কৃতিৰ দিক দিয়ে রাশিয়া এশিয়া-সংশ্লিষ্ট। একজন মাৰ্কিন লেখক, বলছেন, "Russia is essentially Asiatic"—আমেৰিকা ও ইউৰোপ যেমন রাশিয়াকে অকোঁনত দেশ হিসাবে অবহেলিত মনে করত, সেইরূপ রাশিয়াৰ জনগণেৰ অন্তৰ ধীৰে ধীৰে এশিয়াৰ প্রাণ-স্পন্দনকে গ্রহণ করে নিয়েছে। এশিয়াৰ একটা বিরাট অংশ, জাৰদেৰ অধীনে যা 'Prison house of nations' বলে কথিত হ'ত, সেই অত্যাচারিত, অহুন্নত মানবসমাজেৰ অভিশপ্ত বাগভূমি সোভিয়েটেৰ শাসনাধীনে সুন্দর ছোট ছোট রাষ্ট্রে পরিণত হয়ে, বহুদিনেৰ অন্যায় ও অত্যাচারেৰ অবসানে, সুস্থ কল্যাণময় সম্ভাৱতা ও সংস্কৃতিৰ দ্বাৰায় মুক্তিলাভ করে উঠেছে।

পররাষ্ট্রনীতিৰ দিক দিয়ে দেখতে গেলে নিরাপত্তাৰ অপরিহার্য অভিযানে রাশিয়াকে এশিয়াভিমুখী হতে হয়েছিল। কোন লেখিকা বলেছেন যে, রাশিয়াৰ পররাষ্ট্রনীতিৰ পিছনে কোন আদৰ্শগত অগ্রগতি নেই, আছে সেই শাশ্বত এবং মৌলিক "Search for safety" (*Oxford Pamphlets*, no. 34)। এ কথা অনেকাংশে ঠিক, কিন্তু শুধু কূটনীতিৰ অতীত একটা সৌভ্রাত্যেৰ ভাব তাৰ পররাষ্ট্রনীতিতে দেখা যায়—যখন রাশিয়া উপযাচক হয়ে খেতজাতিৰ চক্রান্ত ব্যৰ্থ করে 'হ্যাওমিটাং' গঠনে চীনকে সহায়তা করে। রাশিয়াৰই অদৃষ্ট প্রেরণায় সান-ইয়াট-সেনেৰ Pan-Asianism শক্তিশালী হয়ে উঠে এবং অনেকটা বলশেভিক ভঙ্গিতে 'হ্যাওমিটাং' পুনর্গঠিত হয়। সেইরূপ তুৰক, পারস্য, আফগানিস্তান ও ভারতবৰ্ষ প্রভৃতি দেশে রাশিয়াৰ প্রেরণায় জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্ৰবাদ ও খেতবিরোধী মনোভাব দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হয়। যুক্তা কাৰ্মাল যখন খেতসাম্রাজ্যকে অগ্রাহ করে তুৰককে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন, তখন তাঁৰ পিছনে ছিল রাশিয়াৰ সহানুভূতি। ইরাণে জাতীয়তা, ভারতে গণ-আন্দোলন, এবং আফগানিস্থানে ব্ৰিটিশ বিরোধী মনোভাব অনেক পরিমাণে

রাশিয়াৰ আদৰ্শে উদ্ভূত হয়, বলা যেতে পারে। রাশিয়াৰ এই নূতন "live and let live" নীতি,—অনেকে যাৰ নাম দিতে চান "enlightened imperialism,"—সেই নীতি এশিয়াৰ অবহেলিত এবং নিপীড়িত দেশগুলিৰ কাছে অত্যন্ত প্ৰিয় হয়ে ওঠে।

এশিয়াৰ এক প্রান্তে তুৰক ও অপর প্রান্তে জাপান, চীন এবং ভারতেৰ মত শান্তি ও প্রেমের বাণী নিয়ে বিদেশীকে অভ্যর্থনা করে নি, তরবারিৰ সহায়তায় পররাষ্ট্রালোভী বিদেশীকে বিতাড়িত করার চেষ্টা করেছে। প্রথম মহাযুদ্ধেৰ অবসানে জাপান শক্তিশালী ও অগ্রগামী জাতি হিসাবে খেত-জাতিৰ সমকক্ষ হয়ে দেখা দিলে এবং দূৰ প্রাচ্যে এশিয়াৰ নেতৃত্ব গ্রহণ করলে। তুৰক যদিও প্রথম মহাসমরে লাভবান হয় নি, তবু বেনী দিন তাকে আর 'Sick man of Europe' হয়ে থাকতে হয় নি। যুক্তা কাৰ্মালৰ নেতৃত্বে পশ্চিম এশিয়াৰ নেতৃত্ব সে গ্রহণ করেছে।

আজ এশিয়াৰ খেতনেতৃত্ব নিৰ্ম্মম আবাত পেতে বসেছে, অথচ এই এশিয়াৰই আবাত তিনটি প্রধান খেতজাতিৰ মধ্যে পুনরায় সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতাৰ প্রাচীন মাটিক অভিনীত হতে সুরু হয়েছে। একদিকে দেখা যায় ভারতবৰ্ষ ও দক্ষিণ-পূৰ্ব এশিয়াৰ নবজাগৃত জাতীয়তাবাদেৰ সজীব সপোনৰ আত্মপ্রতিষ্ঠা; অন্য দিকে পরিলক্ষিত হয় আমেৰিকা, ইংলণ্ড ও রাশিয়াৰ মধ্যে সার্কভোমত্ব নিয়ে কুটিল যোৰাৱেৰি। আমেৰিকা কখনও এশিয়াকে ভালবাসে নি। উপরন্তু, বিভিন্ন এশিয়া-বিরোধী আইনেৰ দ্বাৰা এশিয়াবাসীৰ স্বাধীনতা ধৰ্ষ করতে চেষ্টা করেছে, যেমন Immigration Act of 1917। বাণিজ্যেৰ একটা বিরাট ক্ষেত্র হিসাবে আমেৰিকা চিরদিনই এশিয়াকে দেখেছে। তা ছাড়া, আমেৰিকা হচ্ছে পৃথিবীৰ ব্যাংকৰ এবং এশিয়াকে তাৰ কাছে থেকে সবচেয়ে বেশী ঋণ করতে হয়েছে। তাই ইউৰোপীয় রাজশক্তিগুলিৰ মত প্রত্যক্ষ সাম্রাজ্যবাদ বিস্তাৰ না করলেও আমেৰিকাৰ এশিয়া-নীতিকে 'enlightened imperialism' ছাড়া আর কিছু বলা চলে না। দ্বিতীয় মহাসমরেৰ পর ইংলণ্ডেৰ আধিপত্য অনেক পরিমাণে ধৰ্ষ হওয়ায় এশিয়াৰ আজ মাৰ্কিন-প্রাধাত্য সুরু হয়েছে।

দিল্লীৰ পুরান কিল্লাৰ নূতন করে এশিয়াৰ প্রাণপ্রতিষ্ঠা হ'ল। এশিয়াকে যদি আজ বাঁচতে হয়, তবে এই সংহতিৰ মধ্য দিয়ে বাঁচতে হবে। এশিয়াকে এই মহাব্রত গ্রহণ করতে হবে যে এশিয়া থেকে খেতজাতিৰ সমস্ত আধিপত্য নষ্ট করে দিয়ে 'Asia for Asiatics' এই নীতি অক্ষরে অক্ষরে প্রতি-পালন করতে হবে। এশিয়াৰ যা প্রাকৃতিক সম্পদ, এশিয়াৰ যে জনশক্তি, তাকে পাশ্চাত্য জাতিৰ লোভ ও স্বার্থেৰ যজ্ঞে আর ইন্ধন দেওয়া চলবে না। এশিয়াৰ প্রাকৃতিক সম্পদেৰ প্রতি কণা নিয়োজিত হবে তাৰ কোটি কোটি অহুন্নত, অকোঁনত নরনারীৰ জন্তে, আর তাৰ সম্ভাৱতা ও সংস্কৃতিৰ উদ্ধেহে।

আজ—আগামী কাল

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

৪

হেমলতার প্রকাশ-বেদনা শুরু হ'ল। মন্দাকিনী ও সূচিমা এরা ঘরের বউ—বাইরের মন-রোচক খবর রঙ ফলিয়ে বিস্তার করে রোজ দু'তিন বার বলে যে সাত্ত্বনা লাভ করবে—সে তো হাতের পাঁচ রইলই—বাইরের রটনা না হলে আপাতত তিনি সুস্থ হন কি করে। সূচিমা ধবরটা শুনলে—কোন যুক্তব্য করলে না। মন্দাকিনী যুক্তব্য করলে বটে—কথাটাকে বিস্তার করবার প্রয়াস পেল না—কাজেই তিনি দোস্তার কোঁটো আঁচলে বঁধে—বউদের উদ্দেশ্য করে বললেন, সদর দরজাটা দাও বউমা—আমি একবার আন্তর মায়ের বাড়ি থেকে ঘুরে আসি।

পথে বেরিয়ে মনে হ'ল—আন্তর মায়ের কাছে না গিয়ে প্রশান্তদের বাড়িতেই প্রথমে গেলে ভাল হয় না কি। খবর যতটুকু শুনেছেন—তাতে সবিস্তার পরিবেশনে বাধা জন্মাবে না—তবু সবটুকু বুট্টিয়ে শুনলে—রসবিস্তারে পাঁচ জনকে সুখী করে নিজেও পরিতৃপ্ত হবেন তো। তাই ভাল।

প্রশান্তর মা ঘরের ভিতর কুলোয় করে ভাল বাছছিলেন—যেয়ে শান্তি রোয়াকে ইট সাজিয়ে খুরি মুচি নিয়ে আসল সংসারের মজ্ঞ করছিল। দলিঙ্গ পেরিয়ে হেমলতা রোয়াকে উঠে বললেন, কিলো শান্তি—কি রাঁধলি? মা কোথায় গো?

শান্তি উত্তর দেবার আগেই ঘরের ভিতর থেকে প্রশান্তর মা বললেন, এস দিদি।

কুলো রেখে তাড়াতাড়ি তিনি একখানি আসন পেতে দিলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, পান ধাবে দিদি?

ওমা—পান আবার খাব না—বলে পান দোজা চা এই নিয়ে কোন রকমে বেঁচে আছি। নইলে বড় শত্রুর যে দাগ দিয়ে গেছে তারই জ্বালায় দিন রাত জ্বলে যাচ্ছে বুকের ভেতরটা। স্বরটি অশ্রুর আভাসে করুণ হয়ে উঠল—চোখে আঁচল ঘষে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন তিনি।

প্রশান্তর মা বললেন, তুমি ভেবনা দিদি—মথুরা তোমার ফিরে আসবে।

তোমরা সন্তানস্বামী সেই আশীর্বাদই কর মা। আর একবার চোখে আঁচল ঘষে তিনি ভাল হয়ে বসলেন।

প্রশান্তর মা দুট পান সেজে—ছোট রেকাবিতে করে তাঁর সামনে দিয়ে বললেন, দোজা লাগবে?

না ভাই—ওট আমার কাছ ছাড়া হলে চলে না। এই দেখ সন্দের সাধী। বলে অকল্যাণি যোচন করে কোঁটাটা বার করলেন।

চুন দেব?

না ভাই—তোমার হাতের পান এমন চমৎকার যে চুন

ধরের সব সমান সমান থাকে। এ গাঁয়ে এমন পান সাজতে তো আর কাউকে দেখি না। বলে—বাইরে উঠে গিয়ে বার দুই পিক ফেলে ঘরে এসে বসলেন।

তারপর—জিজ্ঞাসাবাদ হ'ল রান্না নিয়ে। মূগের ডাল খেলেই পেটে অম্বল গোলা ওঠে তাই সবিস্তারে জানিয়ে হেমলতা বললেন, তা অম্বলের আর দোষ কি ভাই—ভাবনার চিন্তায় দেহ পাত হয়ে গেল। ছেলে না হলে এক জালা—হলে শতেক জালা। এই দেখ না—নিদ্দুয়ী মথুরা—। নচ্ছার জমিদারের পাল্লায় পড়ে বাছা যে কোথায় গেল। ছোটটা তাও চাকরিতে স্থিতিভিত হ'ল না। শুনি তো—রোজগার করে হ'হাতে—ডোকলা গিরিও তেমনি। অম্বল খরচ ভাই। কি সব স্বদেশীর দল—তাদের পেছনেই ঢালছে টাকা। বাড়ীতে যখন দেয় ঢেলে দেয়—একেবারে দুশো পাঁচশো—তবে ন'মাসে ছ'মাসে তো। পেটের বলতে নেই—সংসার তো ছোট নয়—মাস গেলে চারশো-পাঁচশো টাকা খরচ। রোজ বাজার খরচই বলে—তিন টাকা। কর্তাদের যাই বিষয় সম্পত্তি কিছু ছিল তাই এতগুলি হাত মুখে উঠছে—নইলে কি হত ভাই।

তা ত বটেই। নিজেদের দিয়েই তো দেখছি ভাই—

এই বোক ভাই, নিজে হাতে সংসার না করলে কেউ খরচের মন্য বুঝতে পারে। সে দিন আন্তর মা বললে—রোজ তিন টাকা বাজার খরচ এ তোমার বড্ড বেশী ভাই। বড্ড বেশী হ'ল? এক টাকার জিনিষটা পাঁচ টাকায় কিনতে হচ্ছে, বেশী হ'ল? তবে যদি ছাই পাঁশ বেয়ে পেট ভরাতে হয় সে হলো গিয়ে আলাদা কথা। আলু কপি না হলে কেউ তরকারি পাতে পাড়বে না—চুনো মাছ আনবার যো নেই, শেষ পাতে দুধ সবারই একটু চাই—

তা ত বটেই।

এই যারা বুঝদার—তাদের ছবার বলতে হয় না। কথায় আছে না—

পড়ল কথা সত্যার মাঝে

যার কথা তার পায়ে বাজে।

আন্তর মার হলো গিয়ে তাই। বাপের বাড়ির যেমন হুদি খেতে গুদি নেই—স্বস্তরবাড়িতেও তেমনি। তোরা ভাল ধাওয়া ভাল পরার মন্য কি বুঝবি মা।

প্রশান্তর মা মাথা নেড়ে সাঙ্গ দিলেন।

হেমলতা বললেন, তাই বলছিলাম না—ছেলের মত পরম মিত্রও নেই—পরম শত্রুও আর নেই। এই তোমার প্রশান্তর কথাই ধর—রূপে গুণে বিদ্যেয় এমন ছেলে এ গ্রামে কমই দেখতে পাই। সোনা এক দিকে আর ছেলে এক দিকে—

ওজন করলে তুল্য-মূল্য তবু এ হেন সোনার ছেলের এমন মতিগতি হল কেন ভাই।

প্রশান্তর মা ক্ষুদ্র স্বরে বললেন, কেন দিদি—

না অজ্ঞ কিছু নয়। স্বভাব-চরিত্রের আচার-ব্যভার ওসবে ছেলে তোর মার পাত্রে গজাজল। সুনলম ভাল একটি চাকরিও পেয়েছে। কিন্তু ছেলের নাকি চাকরিতে মতিগতি নেই?

প্রশান্তর মা বললেন, আমাদের ঘরে চাকরি না করলে চলে? ও সব খেরালের কথা দিদি। কত বলছিলেন—সেখানে গিয়ে বৃত্তিরে বৃত্তিরে ছেলে যাতে চাকরি করে সেই ব্যবস্থা করবো।

বেশ বেশ ভাই, মাথার খামিজ না থাকলে ছেলে ভাল হয়। বেশ ভাই—ভগমান ওর সুমতি দিন। তাই সুনলম কিনা—কথা হচ্ছিল পাশা খেলতে খেলতে। মনটা খারাপ হয়ে গেল। বলি ওদের তো আর জমিজমা বিষয় আশয় নেই—চাকরি না করলে খাবে পরবে কি? আর একটি পান চেয়ে নিয়ে তিনি উঠলেন। আসল কথাটা জানা হয়ে গেছে—আশুর মার ওখানে এখন না গেলোই নয়।

সন্ধ্যা বেলায় বেড়িয়ে এসে দুর্গামোহন পত্নীকে ডেকে বললেন—এ সব কি কথা বলেছ তুমি মথুরার মাকে?

পত্নী বিরাজমোহিনী সান্ধর্যে বললেন, কি বলেছি?

যে প্রশান্ত আমার কথা না শুনলে—আমি ওকে ত্যাক্য-পুত্র করব।

বিরাজমোহিনী বিষয়ে কয়েক মুহূর্ত ধ মেরে রইলেন।

দুর্গামোহন বললেন, মথুরার মাকে তুমি ভালই জান—ওর সঙ্গে কোন কথা—

বিরাজমোহিনীর অত্যন্ত অস্তিমান হ'ল। মুখ ফিরিয়ে ভারি গলায় বললেন, ছেলেকে ত্যাক্যপুত্র করবে—এই কথা আমি বলেছি—তুমিও বিশ্বাস করলে।

দুর্গামোহন অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা নয়—এ সম্বন্ধে আলোচনাটা—মানে সংসারের ভেতরের ধর বার করা—

তোমার বৈঠকখানার উত্তর দিকের জানালাগুলো আগে বন্ধ কর দিকি—

দুর্গামোহন অপ্রতিভ ভাবে হেসে বললেন, ঠিক—ঠিক—খেলতে খেলতে মাথার ঠিক থাকে না—তা কালকেই কলকাতায় যাই—কি বল?

যাও—কিন্তু একটা কথা।

কি?

মল্লয়ের সঙ্গে দেখা করতে পারবে না—বা কোন অনুরোধ তাকে করবে না। নিজের ছেলেকে শাসন কর—উপদেশ দাও নিজেই করবে।

দুর্গামোহন বললেন, তুমি মিছে রাগ করছ। মল্লয়ের মার্তে আর মল্লয়ে আকাশ পাতাল তফাৎ।

তা জানি। কিন্তু পরের খোঁটা সহিতে পারব না তোমায় জানিয়ে দিচ্ছি।

দুর্গামোহন হেসে বললেন, আচ্ছা তাই হবে।

দোতলার সিঁড়ি দিয়ে উঠবার মুখে মল্লয়ের সঙ্গে প্রথমেই দেখা হয়ে গেল। মল্লয় হেঁট হয়ে প্রণাম করতেই জিজ্ঞাসা করলেন, ভাল আছ ত বাবা?

মাথা নেড়ে মল্লয় বললে, হ্যাঁ। আপনি হঠাৎ এলেন যে? কাকীমা ভাল আছেন?

ভাল। চল তোমার ঘরে। বলেই তার পালে পূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে কি ভেবে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি আপিসে চলেছে?

আপিস। অল্পক্ষণের মধ্যে বিষয় কাটিয়ে মল্লয় হাসি মুখে বললে, আমার ভাড়া নেই—আজ্ঞে।

মল্লয়ের ঘর—লম্বা চওড়ার বাসগৃহের মত নয়—কোন রকমে ছুটি গিটের ব্যবস্থা আছে। যারা সে ঘরে বাস করে তারাও গোছালো নয়—সারাদিন খাটুনির পর সন্ধ্যায় একটু বিশ্রাম ও রাত্রিতে নিদ্রা এই ছুটি কাক্স সন্স্পন্ন হলেই এর প্রয়োজন মিটে যায়। প্রয়োজনের বেশী কিছু করতে গেলে নিজের রুচি ও শিক্ষার স্বাধীনতা চাই—বারো রাজপুত্রের তের হাঁড়ির ব্যবস্থায় সে ত সম্ভব নয়, কাজেই শুধু দিন যাপনের শুধু প্রাণ ধারণের প্লানিটুকু গায়ে না মেখে দিনের পারে দিনকে আর রাজির পিঠে রাজিকে ঠেলে দেবার প্রয়োজন করে এরা। কক্ষক্ষেত্রের জগৎ—বিশ্রামক্ষেত্রের জগৎ—বাইরের জগৎ বা বাড়ীর জগৎ—এই ভিন্ন ভিন্ন জগতে বাস করে তারা—তারা কোন দিক দিয়েই অধুণ একটি সভা—তা সে রুচির হোক বৃত্তির বা চিন্তারই হোক গড়ে তুলতে পারে না। শ্রোতে ভাসা শেওলার মত—কিংবা শরৎকালের বায়ু স্তরবাহী হালকা মেঘের মত—তারা চলেছে ত চলেছেই। হাতের ব্যাগটিকে মাটিতে নামিয়ে শিমুল কাঠের তক্তার উপর আসন গ্রহণ করলেন দুর্গামোহন। বললেন, জানি তুমি আপিস যাচ্ছ না—খদ্দের জামা গায়ে দিয়ে কেউ আপিস যায় না।

মল্লয় বিনীত হাতে বললে, যার বৈকি কাকাবাবু।

সাম্বেবরা কিছু বলে না?

সাম্বেবদের আপিস নয় ত। তাকে বিশ্বাসের অবকাশ না দিয়ে মল্লয় বললে, ও সব কথা থাক—, আপনার নিশ্চয় খাওয়া হয় নি—ঠাকুরকে বলে দিই।

না—আজ একাদশী, ভাত খাব না। রাত্রিতে ফলমিষ্টি কিছু আনিয়ে নিলেই চলবে। কিন্তু তোমার কণ্ঠা ত আমি বুঝতে পারছি না বাবা। খদ্দের পরে আপিসে গেলে—

ও কিছু নয়—খদ্দের এমন কিছু মারাত্মক বস্ত্র নয় যা দেখলে

সাময়বরা ক্ষেপে উঠবে। তা ছাড়া পচিশ বছর একই জিনিস দেখে দেখে চোখন্দহা বা ভাতসহা হয়ে গেছে কাকাবাবু।

মল্লয়ের হাসির ধরণে দুর্গামোহন খ্রীত হলেন না।

ঈষৎ গম্ভীর স্বরে বললেন, যাই হোক চাকরি যারা করে তাদের এসব জেদ ভাল নয়।

হবে। মল্লয় অজ্ঞমনক ভাবে উত্তর দিলে।

যেখানে উন্নতি করবে—দেখানে একটি পথই বেছে নেয়া ভাল। না ঘাটের না ঘরের এতে কোন দিকেই সামঞ্জস্য থাকে না।

মল্লয় চুপ করে রইল।

দুর্গামোহন বললেন, প্রশান্ত কি করছেন? চাকরি, না না থকর পরে স্বদেশী?

ওঁর কথার ধরণে মল্লয় হেসে ফেললে। সংযত স্বরে বললে, এই দশ মিনিট আগে সে আপিসেই ত গেল।

সে নাকি চাকরি করবে না? স্বরে ঈষৎ জোর দিয়ে বললেন, চাকরি না করে কি করবে বলতে পার? আমি এমন কিছু তালুক মূল্য রেখে যাব না যাতে করে পায়ের উপর পা দিয়ে বসে তার দিন চলে যাবে।

মল্লয় হেসে বললে, তালুক মূল্য রেখে গেলেও পায়ের উপর পা দিয়ে বসে ঝাঁবার অ্যোপ কারও থাকবে না কাকাবাবু।

কেন হে ছোকরা—নিজের জমির ধান নিজের সংসারে আসবে—

না কাকাবাবু—জমি তারই যে চাষ করবে। চাষার রক্ত শুধে জমিদারদের দেহ মোটা হবার দিন চলে যাচ্ছে, ওসব উদাহরণ না রাখাই ভাল।

দুর্গামোহন নৃকোষে বললে, তবে সে করবে কি শুনি? ঘোড়ার ঘাস কাটবে?

...যে যা পারে সে তাই করবে। যার যোগ্যতা ঘোড়ার ঘাস কাটার সে তাই করেই বেঁচে থাকবে। পরের প্রায়ে পরিপুষ্ট হবার দিন চলে যাচ্ছে।

আচ্ছা—আচ্ছা দেখা হোক তার সঙ্গে সে বোঝাপড়া তখন হবে। আচ্ছা তুমি যে বড় লম্বা লম্বা লোকচার দিলে—শুনি ত তোমাদেরও জমি আছে—যার আয়ে পরিবার প্রতিপালন হচ্ছে, জমি গেলে তোমাদের দশা কি হবে শুনি?

মল্লয় হাসলে—কোন উত্তর দিলে না।

মল্লয়ের হাসিতে দুর্গামোহন বেশী মাত্রায় উক হয়ে উঠলেন। সেই সঙ্গে তিনি বুঝলেন—এদের সঙ্গে তর্ক করে কোন লাভ নেই। এরা চড়া কথা বলে তর্কে শাণিত হবার অবকাশ দেয় না—বের্ফাস বললেও হাসিমুখে জবাব দেয়। সেকালের ছেল্লোদের জিদ বা একগুয়েমি একালের ছেল্লোদের মনোযোগ যথেষ্ট আছে—রূপান্তর ধানিকটা হয়েছে শুধু। ওদের ওই নব্রতা বা হাসি-হাসি ভাবের মধ্যে দিয়ে উর্ধ্বপক্ষকে

অবজ্ঞা করার ভাবটি স্থম্পষ্ট। নিজের আপিস-জীকনের শেষ ভাগে এই রকম নব্র-উদ্ভবের নমুনা তিনি যথেষ্ট পেয়েছেন।

যাই হোক, কথা না বাড়িয়ে হেঁট হয়ে তিনি জুতোর ফিতে বুললেন—কাঁধের চাদরটা তক্তাপোষের উপর রাখলেন। তারপর বুক পকেট থেকে ঘড়িটা বার করে সময় দেখলেন।

মল্লয় জিজ্ঞাসা করলে, কোথাও যাবেন কি?

যাব। হাঁ ছই—এক জায়গায় ঘুরে প্রশান্তর আপিসে একবার যাব ভাবছি।

তা হলে এক কাজ করুন—চাবিটা রেখে দিন, আমি কখন ফিরব—

না—না চাবি তুমি রাখ। প্রশান্ত ওই সামনের ঘরেই থাকে ত? ওকে সঙ্গে করে একেবারে আসব।

মুখে হাতে জল দিয়ে একটু বিশ্রাম করুন।

তুমি ব্যস্ত হয়ে না—আমাদের হাড় অত পলকা নয় যে অল্প প্রমোই হয়ে পড়বে।

তিনি ঘরের চার দেয়ালে চোখ বুজিয়ে নিলেন। একটি তেরশো ছেচলিশের ইংরেজী ক্যালেন্ডার ছাড়া কোন ছবিপত্র কোথাও টাঙানো নেই। কোনের দিকে একটা কেরোসিন কাঠের র্যাকের উপর জুপাকার বই অগোছালো পড়ে রয়েছে—একটা বইয়েরও নাম পড়া যায় না এমন অগোছালো। যেসের ঘর কোনকালে গোছানো হয়—না তিনি জানেন তবু—এরা যেন বৈশীমাত্রায় বিশৃঙ্খল। তাঁদের সময়ে নির্বিকার চাকরীতে আর সংসার চালনার দায়িত্বে যে জীবন বীধাধরা হকের মত সরল ছিল আজ সেই কেল থেকে সে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে। এদের দেখে দুঃখ হয় তবু এদের ওপর মমত্ববোধও পোষণ করা দুঃস্ব। ছুটি যুদ্ধ দেশের ওপর যে ক্ষতচিহ্ন রেখে গেল—সমাজও সে আঘাত থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে নি। কিন্তু আত্মরক্ষা করা আশু প্রয়োজন। পশ্চিমের রাষ্ট্রযুদ্ধী মন পূর্বের সমাজযুদ্ধী মনের থেকে পৃথক নয় কি?

ভাবলেন এখন থাক—ফিরে এসে এ নিয়ে ওদের সঙ্গে তর্ক করা যাবে। মানে ওদের বুদ্ধির জট ছাড়াতে হলে কিছু শাণিত যুক্তির প্রয়োজন।

পথে বেরিয়ে মনে হ'ল বাহত শহরের কোন পরিবর্তন হয় নি। ছ' একটা বাড়ির সংস্কার হয়েছে—ছ' একটা পথের সৃষ্টি হয়েছে এই মাত্র। সনাতন ট্রাম, বাস, সনাতন প্রধায় চলছে, মোড়ের মাধায় সনাতন ট্রাফিক পুলিশ—তার উদ্যত করের ইঙ্গিতে যানবাহনের শ্রোত কখনও সচল কখনও বা স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে। যুদ্ধের মরশুম যে বিদেশী লাল মুণ্ডের প্রাচুর্য পথে, ফুটপাথে বা বিচিহ্ন যানবাহনে দেখা যেত আজ তা নেই বললেই হয়। অতিকার ট্রাকগুলিতে কচিং লালমুণ্ডে নরদেহ পোরা দেখা যায় নতুবা সবই দেশীয়দের রাজত্ব। এখনও ট্রাকের পর ট্রাক কনভয় প্রধায় চলে তবে

ঘণ্টার পর, ঘণ্টা ধরে 'অসামরিক মাহুষের অসুবিধা' ঘটায় না।
যুদ্ধ-জলের ভাটাটা স্পষ্ট-প্রত্যক্ষ।

তবু যুদ্ধ যে থামেনি সেটা নিত্যকার জীবন যাপনের মধ্যে
বুঝতে পারা যায়। আহা, পরিচ্ছেদে—দ্রব্যমূল্যে ওরা
ক্লেশভার বহন করছে সেটাও বাইরের, আর মনে জাগছে যে
অভাববোধ—তা প্রাক-যুদ্ধের সমাজ-শৃঙ্খলার সঙ্গে যুদ্ধোত্তর
সমাজ-বিপ্লবের সংঘাত ছাড়া আর কিছুই নয়।

গোলদীঘিতে পৌছবার যুগে মিটিং ভাঙ্গা ভিড় তাঁকে গ্রাস
করলে। কি যেন একটা প্রতিবাদ সভা বলেছিল এলবার্ট
হলে—জনস্রোতের সঙ্গে যথেষ্ট উত্তেজনা পথের মাঝে আছড়ে
পড়ল। ও দলে প্রোট বা বুদ্ধের অস্তিত্ব নাই, সবাই তরুণ—
মেয়ে আর পুরুষ। সবাই এক একটা দিক নিয়ে উত্তেজনার
স্রোত সৃষ্টি করে পথের চার দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। বিস্তীর্ণ
বালু-বেলায় সমুদ্রের ভাঙ্গা ঢেউ শেষ হয়েও খানিকটা গড়িয়ে
যায় যেমন—তেমনি। এদের ভঙ্গি দেখে মনে হয়—কোন
একটা মীমাংসা করতে এরা এক জায়গায় মিলে নি। হয়তো
এটা প্রতিবাদ সভা ছিল। কিন্তু প্রতিবাদের মধ্যে প্রতিকার
প্রার্থনার সুরটি শোনা গেল না তো। কি চায় এরা? এ যুগের
যৌবন—বিনয়ে উদ্ভত—নব্রত্ন অহংকারমত্ত—স্বাধিকারপ্রমত্ত
যৌবন—কিসের প্রতিবাদে আজ আর কাল, কাল কিবা পরশ
দিনের পর দিন ধরে বিদ্রোহ বোষণা করেছে? কার বিরুদ্ধে
বিদ্রোহ?

একটা কথা কানে গেল—ইংরেজকে ভারত ছাড়তেই
হবে। সাম্রাজ্যবাদের নাস্তিখাস উঠেছে। বেরনেট বন্ধুক—
আকাশচাষী লোহেছেন অথবা অতিকার 'ট্যাঙ্ক' কি যত্নবীজ-
বাহী মেশিনগান এসব সাম্রাজ্যবাদকে আসন্ন মৃত্যু থেকে
বাঁচাতে পারবে না। ওদের শব্দবল, জনবল ফাঁকা
ম্লোগানের চীৎকার ধ্বনিতে হতবল হয়ে গেল। দুর্গামোহন
অবিধাসের ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন। ঈশ্বর উচ্চস্বরে হেসে
উঠলেন।

পালের একজন তরুণ উক হয়ে উঠল, কি মশাই—হাসছেন
যে। ব্রিটিশ ভারত ছাড়বে এ বুদ্ধি বিখ্যাস হ'ল না?

একটি মেয়ে বললে, ওরা জনবলের যুগের লোক—তার
যুদ্ধের দাপটই জানেন।

দুর্গামোহন বাছা বাছা প্রমাণ প্রয়োগ করতে যাচ্ছিলেন—
কি ভেবে বিরত হলেন। শুধু বললেন, ওরা যতক্ষণ না কথা
রাখছে—

ছেলেটি উকস্বরে বললে, কথা রাখতে বাধ্য করাব আমরা।
ভাবছেন ওদের অস্ত্র আছে—

• দুর্গামোহন বললেন, সে ভাবনা তো তোমাদেরও রয়েছে—
ছেলেটি বললে, আছে। আর বিশ্বাসও করি আমরা যে
একদিন-না-একদিন নিজেদের অধিকার আমরা ফিরে পাবই।

• আরও কয়েকটি ছেলে মেয়ে দুর্গামোহনের চারদিকে জড়ো

হয়েছে দেখে উনি তর্ক করলেন না। শুধু বললেন, আমরা
হয়ত তেমন দিন চোখে না দেখেও যেতে পারি।

সে আপনার ভাগ্য। একজন পরিহাসের ভঙ্গিতে বললে।
আর সে সৌভাগ্য এলেও উপভোগ করতে পারবেন কি?
একটি তরুণী বললে, বাবা কিসের!

দেখছেন না—ব্রিটিশ দপ্তরের আর্থম্যাডাই কলে—কেমন
সহজে হজম হয়ে গেছেন উনি।

হো হো করে ওরা হেসে ছিটকে ছড়িয়ে পড়ল এপাশে
ওপাশে।

দুর্গামোহনের চোখ জ্বালা করে উঠল—সামনে গোলদীঘির
বেকে আশ্রয় না নিলে একটা দুর্ঘটনা হওয়া বিচিত্র ছিল না।

বেকের আর এক প্রান্তে একজন যুবক বসে ছিল। পরণে
তার আধময়লা কাপড়—জামার কাঁধের কাছটার একটা
তালি দেওয়া—একটু অভমনক ভাব। একটা বিড়ি ধরে সে
কয়েকবার টান দিলে—একবার কাসলে—দুর্গামোহনের দিকে
একটু নড়ে সরে বসলে। তারপর যুদ্ধবলে বললে, সর একটা
ববর জানেন? সাপ্লাই আপিসের হারিংটন সান্বেব আজকাল
কোন সেকশনের চার্জ নিয়ে আছেন?

দুর্গামোহন নিজের জগতে ফিরে এলেন। সেই সঙ্গে ফিরে
এল তাঁর আহত পৌরুষ। বললেন, আমরা দেখে, কি মনে
হয় যে আমি সাপ্লাই আপিসের বড়বাবু?

যুবকটি অপ্রতিভ না হয়ে বললে, কি জানেন সর অনেক
রিটার্নড হাও তো চাকরিতে চুকেছেন—তাঁরা ভাল রকম
ইন্ফরমেশন রাখেন বলেই—

দুর্গামোহন নরম গলায় বললেন, চাকরি করতে চান?

চাইব না কেন। চাকরি করতে কে না চায়। প্রতি-
বিন্ময়ে যুবক তাঁর পানে চেয়ে রইল।

দুর্গামোহন বললেন, একটু আগে ওই ছেলে মিটিং হয়ে
গেল ধবর রাখেন কি? আপনাদের মত যুবকরা তো ধোড়াই
কেয়ার করে চাকরির।

ও কথা বলবেন না আর, এখনও বুড়ো বাপ মা বেঁচে—
ভাইদের মাহুষ করতে হবে—বোন আছে একটি তার বিয়ে—

শহর সম্পূর্ণরূপে বদলায় নি তা হ'লে। দুর্গামোহন পূর্ণ-
দৃষ্টিতে চাইলেন যুবকটির পানে। দেহের প্রত্যেকটি ভঙ্গি
প্রাক-যুদ্ধ যুগের ক্রান্তিতে অভ্যস্ত জান। কণ্ঠস্বরে ভিক্ষার বিনম্র
সুর—যা আপিসের চেয়ারে বসে বহু বছর ধরে শুনে শুনে
ক্লাস্ত হয়েছেন তিনি। ঈশ্বর কোতুল হ'ল ছেলেটিকে ভাল
করে জানতে।

বললেন, চাকরি তো অমনি হয় না বাপু—কিছু দক্ষিণা
দিতে হয়।

ছেলেটির চোখে উৎসাহের দীপ্তি দেখা গেল। বললে,
বেশি তো পারব না—অবস্থা দেখছেনই তো—

তবু কত?

শব্দানেক টাকা—বলেই এগিয়ে এসে হেঁট হয়ে সে দুর্গামোহনের পায়ের দিকে হাত নাামালে।

দুর্গামোহন ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওর হাত ছাড়াই ধরে ফেললেন। কি কোমল অসহায় হাত! কি জ্ঞানি কেন—দেহ তাঁর ঘিন্ ঘিন্ করে উঠল—ক্রেদাজ পিচ্ছিল সরীসৃপের স্পর্শে যেমন স্নায়ুকেজে আঘাত লাগে। বলতে গেলে—এটি তাঁর অতীত স্মৃতির ক্ষণ—তাঁর সমাজে পরিবার-প্রতিপালনেচ্ছু এমনি এক বাধ্য ছেলের স্বপ্নকে না দেখেন! তিনি যে কলকাতায় এসেছেন—তার মূলেও ছেলের রাষ্ট্রচৈতন্যকে সমাজ-স্বর্গের সাধনার পানে পূর্ণ বিকশিত করে তুলবার কামনা। অথচ এই মুহূর্তে এই ছেলেটির স্পর্শ সহ্য করতে পারছেন না কেন?

নিজের বিরক্তি দমন করতে প্রয়াস করলেন, কতদূর পড়েছ তুমি?

মাটিক পাশ করেছি।

মাটিক! মন সাবুনা লাভ করলে। তাঁর ছেলের সঙ্গে এর তফাৎ অনেকখানি। কিন্তু আপিসে যখন ক্ষমতা তাঁর হাতে ছিল—তখন তাঁর ছেলের চেয়েও কত গুণী জ্ঞানী কিংবা মানী বংশের ছেলেরা তাঁর পায়ের কাছে এমনি ভিক্ষার আশায় নত হয়ে প্রার্থনা-বাণী উচ্চারণ করেছিল—তা তো তিনি ভোলেন নি। তাদের কাতর প্রার্থনায় মন তাঁর আত্মপ্রসাদে ক্ষীণ হয়ে উঠত না কি? বিদ্যাকে—ক্ষমতার সেবার কৃতার্থমুগ্ধ দেখে—ক্ষীত হওয়াই তো ক্ষমতার স্বপ্ন। আপিসের উচ্চ গদিতে বসে স্বপ্নেই অনেকগুলি বছর কেটে গেছে—সেই খুসির স্বর্গে বাস করে আজও তিনি সেই স্বর্গকে সমস্ত কামনায় ধরে রেখেছেন। তবু মলিনবেশী এই ছেলেটিকে তিনি সহ্য করতে পারলেন না। বললেন, শোন বাপু, চাকরি গোল-দীঘির বেষ্টিতে বসে লাভ করা যায় না। আপিসে যাও—খবর নাও—কে কোথায় আত্মীয় আছে ধর—

আপনি কিছু সাহায্য করতে পারেন না সার?

না। অত্যন্ত গভীর ভাবে কণ্ঠাট উচ্চারণ করে তিনি বেকি ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

গোলদীঘির জলে—দুপুরের বোদ ছোট ছোট তরঙ্গের মাধ্যম ছিটিয়ে পড়েছে। মাছগুলো লাকাছে বলেই বীচি-বিক্ষোভ, নতুবা স্রোতহীন জলে বিনা বাতাসে ঢেউ ওঠে না।

৬

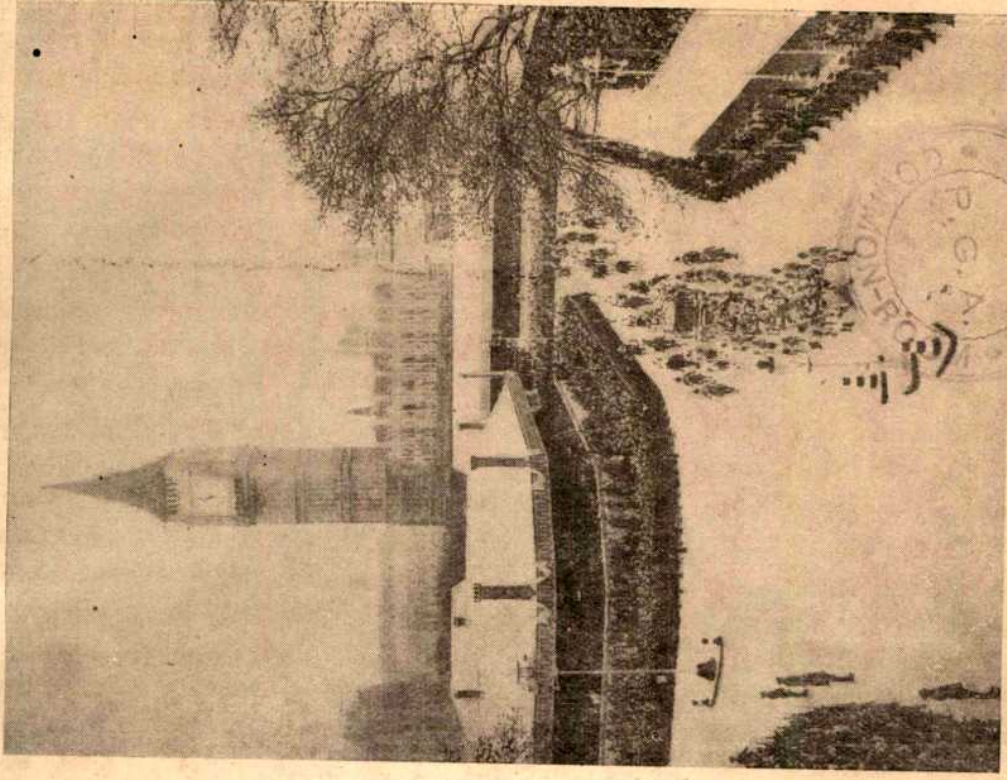
অবশ্য ছেলের সঙ্গে এ ভাবে সাক্ষাৎ হবে দুর্গামোহন আশা করেন নি।

গোলদীঘি থেকে গেলেন নিজের আপিসে। নিজের আপিস ছাড়া অল্প কণা তাঁর মনেই আসে না। জীবনের চল্লিশটি বছর—জীবনের সেরা দিনগুলি যে বিস্মৃতি সৌধের অর্ধে নির্ঝিয়ে কেটেছে তাকে নিজের নয় ভাবতেও কষ্ট বোধ হয়। যারা সহকর্মী ছিল তারা আজ নেই। কেউ অবসর

নিয়েছে—সংসার থেকে—কেউ বা আপিস থেকে। যে ঘরে বসে কাজ করতেন সে ঘরের চেহারাও বদলে গেছে আমূল। যে রাতের মাধ্যম ফাইলের ভূপ থাকতো আর রাতের গোড়ায় টুলের ওপর বসে কিম্বোতা দপ্তরী রহমৎ—তারা কাঠের পার্টিশনের কল্যাণে অদৃশ্য হয়েছে। এ ঘরে বড়বাবুর ছিল আধিপত্য—আজকাল কাঠের ছোট ঘরের মধ্যে রিডলভিং চেয়ারে বসে একজন নতুন গৌরব-ওঠা ছোকরা সায়ের ঘন ঘন পাইপ টানে আর কলিং-বেল বাজায়। সুইং ডোর ঠেলে বাবুরা আর চপরাসীরা মিনিটে মিনিটে যাওয়া আসা করছে। বাবুরা সব তরুণ। কিটফাট চটপটে। ফাইল সাক্ষিয়ে লেজার ছরসু রেখে—টেবিল সাক্ষ করে সিগারেট টানছে। তাঁদের কালের কাজগুলো তাদের যতটা কাবু করে রাখতো এদের কালের কাণ্ডগুলো সে অল্পপাতে লঘু বলতে হবে। এরা এত ঘেঁষাঘেঁষি বসে যে কোণের লোকের কাছে পৌঁছুতে হলে মাথের বা পাশের লোকগুলির চেয়ার সরিয়ে কাত হয়ে ছেলে দশ হাত দূরে যেতে রীতিমত পরিশ্রম হয় আর সময়ও লাগে। তবু এরা মানবে না—লোক বেড়েছে। বলে—আপনাদের কালে কাজের অত কৈকত ছিল না সার। এত নোটের পর নোট—এনকোয়রি, ডি ও লেটার এসবের হাদ্ধামা ছিল না। যুদ্ধ যেমন গতি এনে দিয়েছে—ডেমনি জটিল করে তুলেছে সব বিভাগকে।

বেশীর ভাগ লোকই তাঁকে চেনে না—কেউ কেউ খাতির করে। তবে খাতির করে বলে যে মুখ থেকে চুকট নামিয়ে শ্রদ্ধা জানায় তা নয়। যেমন গোলদীঘির ছোকরাটি প্রার্থী হয়েও সিগারেটে সব শেষ টান দিতে কার্গ্যা করে নি। লুকিয়ে ধূম পান করাটা এ কালের নীতিতে শ্রদ্ধাজ্ঞাপনচিহ্ন বলে স্বীকৃত না হলেও—সেকালের আচার-অভ্যাস মনে বিশেষ করে এই আপিসের পরিমণ্ডলে বেশী করেই দোলা দেয়। তবু কলকাতায় এলে কাজ না থাকলেও আপিসে তিনি একবার আসবেনই। যে টানে মানুষ দুই প্রবাসী হয়েও জন্মভিটা দেখতে আসে—সেই অলক্ষ্য-প্রসারিত রজ্জু তাঁকে আকর্ষণ করে কিনা বুঝা দুষ্কর—তবে এই পরিত্যক্ত কর্মক্ষেত্রে সর্বতোভাবে আপনার করেই নিয়েছেন তিনি। তাঁর যৌবন এই আপিসের কর্মসূত্রের সার্থকতার নিবেদিত হয়েছিল একদা—জন্মভূমির চেয়ে এই কর্মভূমি তাঁর কাছে তাই এত প্রিয়।

আপিসের সব তলায় ঘুরে ঘুরে দেখলেন—পরিচিত কয়েক জনের সঙ্গে আলাপ করলেন—কাজের ব্যবস্থা সম্বন্ধে কিছু কথা হ'ল—সায়েরা তাঁকে আপ্যায়িত করলেন। তার পর এলেন বড় গুরুজ্ঞালা জি, পি, ও, আপিসে। ছোট কাজ করে যে বিভাগে জানা ছিল—কিন্তু সে বিভাগে কেউ তার সন্ধান দিতে পারলে না। অনেক ঘুরলেন—তবু সে বিরাট আপিসে ঠিকমত সন্ধান পাওয়া গেল না। একবার



লণ্ডনের পার্লামেন্ট ভবন



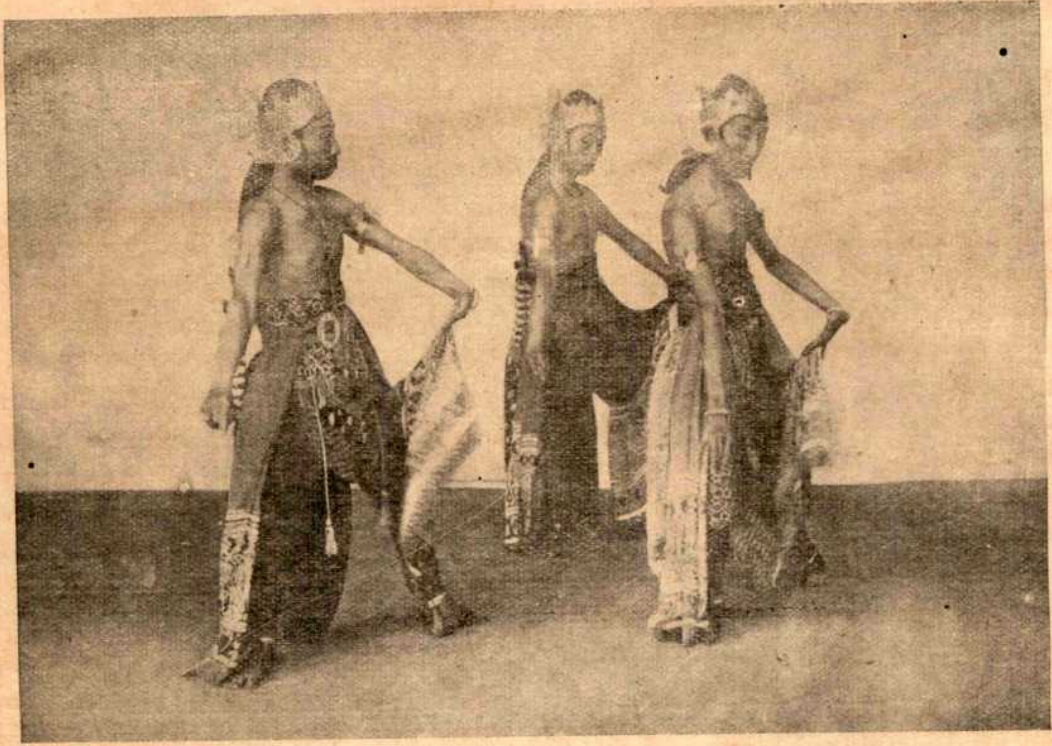
PRARTHANARATA
-MAHATMA-

S. O. H. R. E.

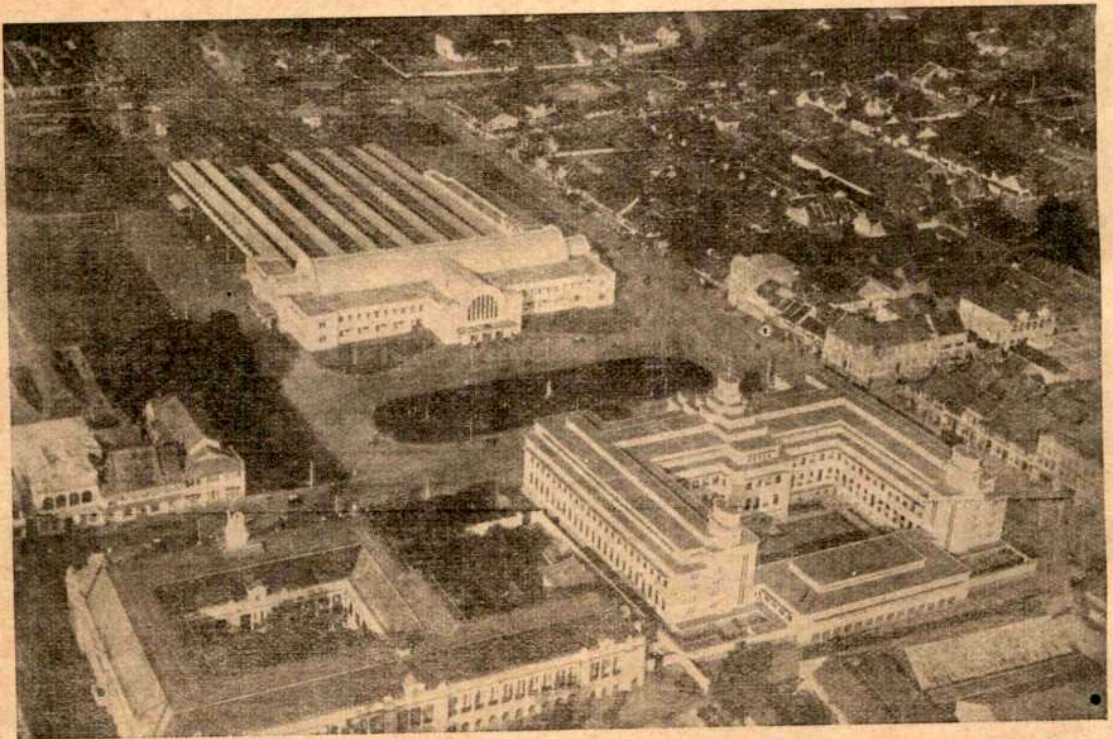
9.12.1954
5-12-54

১৫০০/১৮
১০২১১৭৭৭

মোদপুর আশ্রমে প্রাণনারত মহাত্মা গান্ধী
(প্রাণনা-শব্দায় ত্রিবিমল রায় কর্তৃক অঙ্কিত)



ସବହୀପେର 'ଓଡ଼ିଆ' ନାଟ୍ୟର ଅଭିନେତାଗଣ



ସବହୀପେର ରାଜଧାନୀ ବାଟାଭିନ୍ନା—ଓପରେ ଶିଟ୍ଟି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ, ନୀଚେ ନେଦାରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟ୍ରେଡିଂ କମ୍ପାନିର ଉତ୍ତର

মনে হ'ল এই আপিসটির বিরাট কঠরে আশ্রয় নিলে মানুষকে প্রাণতন পরিচয়ে বুঁজে পাওয়াই মুশকিল।

অবশেষে এক জন বুড়ো মত লোক বললে, বেশ করসা রঙ ফিটকাট ছোকরা—প্রায়ই সিগারেট টানছে—বুকে কাউন্টেন পেন সেই তো? সেত পরন্ত একখানা রেজিগনেশন লেটার সুপারিন্টেন্ডেন্টের আপিসে দিয়ে গেল।

সত্যাসত্য যাচাই করতে উদ্ধতন কর্মচারীর কাছে যাওয়া নিরর্থক ভেবে তিনি পথে বার হয়ে পড়লেন। লালদীঘির বেড়াগুলো রুদ্ধের সময় থেকেই ভেঙে দেওয়া হয়েছিল—দীঘিটা পথের সঙ্গে মিশে—আগেকার আভিজাত্য হারিয়েছে। নানান দিক দিয়ে তার পথ বেরিয়েছে—মাছঘের চলাকেরায় বাস নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে—মরুমুখী ফুলের কেয়ারীগুলি হতভী—বিলাতী পায় ফুঞ্জ ছাড়া ত দীঘিটার হৃদয় বসে ক্রান্তি দূর করবার আয়গাও বড় একটা নেই।

সেইখানে বসেই দুর্গামোহন ভাবতে লাগলেন—অন্তঃপুর কি করা কর্তব্য। দেশে ফিরে যাবেন—না প্রশান্তকে ভুল পথ থেকে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করবেন? পিতৃহের দাবিতে এই চেষ্টা সার্থক হবে কি? মাথা নেড়ে দৃঢ়নিশ্চয় হলেন—অবশ্য হবে। উপার্জন না করলে ছেলেদের ভরদা ত পিতৃবিত্ত। কাছেই তাঁর আদেশের গুরুত্ব অবীকার করা প্রশান্তের পক্ষে সহজ হবে না।

জি, সি, ও-র ঘড়িটার চারটে বাজেনি—তখন থেকেই অনেক লোক বাড়ি ফিরতে শুরু করেছে। এরা নিশ্চয় আপিস থেকে পালাচ্ছে। দুর্গামোহন ভাল করে এদের দেখতে লাগলেন। হাঁ—আপিস থেকে পালাচ্ছে এরা। সিনেমার তুরা না রেসের তাতা। আগে শনিবার ছাড়া রেস হতো না, আজ কাল ছুটির দিন মাজেই রেস হয়। রুদ্ধের বাজারে টাকাটা কেঁপে উঠেছে এ-ও একটি প্রমাণ। আজ ছুটির বার নয়—রেস হবে না। তবে রেসের প্রভৃতি আছে তো। সবাই তো স্বহস্তে টিকিট কিনে রেস গ্রাউণ্ডে বসে টেচামেচি করে না—বুকির মারকং খেলাটা চলে বলেই আট আনার খেপুড়ে কেরাগী একখানা বই কিনে বা খবরের কাগজ থেকে নিজের ইচ্ছামত খোড়ার নাম টুকে বুকির এজেন্টদের দেয়। এই তাবে ঠিকুজি কোণ্ডি মিলিয়ে অর্থ কষে অর্থের জাতি নির্ণয় করতে দীতিমত সময় নষ্ট হয় না কি? আর সিনেমা? রেসের মত তারও সার্বজনীনত্ব আছে বৈকি? কম আয়ের মানুষই তো কষ্টকে অগ্রাহ্য করবার সোজা পথটি বেছে নেয়। রেস্তোরাঁর বসে এহরে এহরে চা খাওয়া এও আজকালকার নেশা বা ক্যাশান। আর সিগারেট? এক বছর সিগারেট ত্যাগ করলে স্বরাজ আসবে এ প্রলোভনও একদিন দেখান হয়েছিল। কলে যে বেগ সেদিনকার প্রতিজ্ঞা পালনের তাড়ায় দেখা গিয়েছিল—আজ এহণের কোয়ার দেখলে ভাবা আশ্চর্য নয় যে তারত-বর্ধের আর কোথাও না হোক অন্তত আপিস কোয়ার্টারে

আহার-পানীয়ের সঙ্গে প্রধানতম রসদ হচ্ছে ঐ সিগারেট। দুর্গামোহন গুণতে আরম্ভ করলেন—এই দীঘির পথ দিয়ে যারা যাচ্ছে তাদের মধ্যে দুঃখপাত্রীর সংখ্যা কত।

গুণতে গুণতে তাঁর নেশা চেপে গেল—কাছের লোক-গুলিকে গুণে দূরের লোকগুলিকেও লক্ষ্য করতে লাগলেন। আর তারই ফলে—যা আশা করেন নি তাই ঘটে গেল অকস্মাৎ।

দূরে ঐ বিধ্বস্ত মরুমুখী ফুল-বাড়টার ওপাশে একটি মেয়ের সঙ্গে বৈষাদেয়ি করে যে লম্বা আর কদা মত যুবকটি সিগারেট টানতে টানতে আসছে—ওই প্রশান্ত না। প্রশান্তই তো।

আর একটু এগিয়ে এসে লক্ষ্য করলেন—বৈষাদেয়ি নয়—মেয়েটির ডান হাতের সঙ্গে ওর বাঁ হাতবানি সংযুক্ত। পথ ওরা চলছে বটে—লক্ষ্যটা পথের আলোপাশে বা সম্মুখে নয়। হাসি আর গল্প আর সিগারেট খাওয়া এই নিয়েই ওরা মশগুল। ওধারে লালদীঘির জল—এধারে বিশ্রামরত মানুষ কিছুই ওদের লক্ষ্যে পৌছচ্ছে না—ওরা স্বয়ংসম্পূর্ণ।

দুর্গামোহনের মনে হ'ল—পায়ের তলা থেকে হাতের তালু থেকে সব রক্ত মাধার উঠে আসছে—চন্‌চন্‌ করছে মাথাটা। রঙ্গের রক্তবাহী শিরাজুলি রক্ত চলাচলের ঋতুভার দপ্‌ দপ্‌ করছে—চোখেও হুপুরের বোদ লেপে বুঁজে এক হয়ে গেল। অসহ ক্রোধে চীৎকার করে উঠলেন—প্রশান্ত—প্রশান্ত।

একটা চাপা বিকৃত ধ্বনি বার হল গলা দিয়ে—কেউ চেয়ে দেখলে—কেউ চেয়ে দেখলে না। প্রশান্ত তার সন্নিহীত হাত ধরে নিরীকায় চিন্তে তাঁর সামনের রাস্তা দিয়ে মাত্র দশ পনের হাত ব্যবধানে গুঁট গুঁট করে চলে গেল।

অনেকক্ষণ পরে দুর্গামোহনের সর্বিং ফিরে এল। আকাশ ইতিমধ্যে ঝোলাটে বোধ হচ্ছে—গাছের ছায়া হয়েছে দীর্ঘতর আর লালদীঘির চারধারে বয়ে চলেছে মাছঘের বত। মাথার ওপর সেই সঙ্গে ভেসে চলেছে ঝোঁয়ার একটা বন স্তর—নীতের সন্ধ্যায় শহরের বস্তিপ্রধান আয়গাগুলি থেকে যেমন ঝোঁয়ার কুয়াসা জ্বায়া অনেকটা সেই রকম। ক'টা মানুষ সিগারেট টানছে—এ নির্ণয় করা সম্ভব নয়—সারা শহরটাই দুঃখপাত্রী হয়ে উঠেছে।

ধীরে ধীরে তিনি চোখ বুজলেন।

চোখ চেয়ে দেখলেন তখনো পৃথিবী উজ্জ্বল নয়। এটা ফাঁকা খোলা জায়গা নয়, মাথাটাও বেশ ভারি বোধ হচ্ছে। একটি সন্ধ্যায় ঘরে তিনি শুয়ে আছেন—ত্রাকেটে টুক টুক করে টাইমপিস চলছে। অদূরে কারা ফিস ফিস করে কি যেন বলছে। ঘরটার তরল ঝোঁয়ার স্রোত—নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। পান-কেরায় চেষ্টা করে অতিকটে হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, আমি কোথায়?

এক অচেনা স্বর তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল। বললে, তুমি নেই—একটু ঘুপ থাকবেন।

তার হাতে কিডিং কাপ দেখে দুর্গামোহন আচ্ছন্নের মত বললেন, না—না—আমি সিগারেট বাই না।

যুবকটি মিষ্টবরে বললে, সিগারেট না—হুঁ।

দুর্গামোহন মাথা নাড়লেন। যুবকটি এগিয়ে এসে তাঁর মুখে কাপটি ধরলে। গলাটা তুলিয়ে গেছে—তরল পানীয় এক নিঃশ্বাসে শেষ করলেন। একখানি তোয়ালে দিয়ে যুবক তাঁর মুখ মুছিয়ে দিলে।

দুর্গামোহনের নাসিকার নাতিতীর একটা গন্ধ ভেসে আসতেই তিনি প্রায় চীৎকার করে উঠলেন—তুমি সিগারেট খাও?

যুবক চমকে উঠে বললে, এখন তো বাইনি?

না—বেয়েছ? তোমার গায়ে সিগারেটের গন্ধ—তোমার হাতে—

যুবক কি বলতে যাচ্ছিল—দুর্গামোহন টেচিয়ে উঠলেন, গেট আউট, গেট আউট।

তাঁর উচ্চ চীৎকারে আর হুঁজন যুবক ছয়ার ঠেলে খরে হুকল। তাঁর মধ্যে এক জন মলয়।

মলয় বললে, ব্যাপার কি সুনীল?

মনে হয় ডিলিরিয়াম। আবার সেই সিগারেট—গন্ধ—

মলয় বললে, প্রশান্তর নাম করেন নি?

না।

দুর্গামোহনের কানে প্রশান্তর নাম গেল। যেন কত দূর থেকে কারা—পরম বার্তা বয়ে নিয়ে এল। খাড়া ফিরিয়ে তিনি বললেন—প্রশান্ত কই? প্রশান্ত।

মলয় কাছে বসে বললে, সে আসছে কাকা বাবু।

বটমাকেও আসতে বল—আমি ওদের আশীর্বাদ করব।

যুবক ক'জন পরস্পরের পানে চেয়ে কি ইঙ্গিতাভিনয় করলে। মলয় বাইরে এসে বললে, এর মানে কি সুনীল, উনি নিশ্চয় জানেন যে প্রশান্ত বিয়ে করে নি।

সুনীল বললে, ফ্রেড বলেছেন—মাহুঘের অবচেতন মনের স্তরে যে চিন্তা—

মলয় বিরক্ত হয়ে বললে, মেডিকেল লাইনে তোমার ফ্রেডের গবেষণা উপকার দেবে—আপাতত—

সুনীল বললে, এই প্রশান্ত আসছে—একেই জিজ্ঞাসা কর।

প্রশান্ত সব শুনে বললে, বাবার মাথা ঝাপ্পা হয়েছ।

সুনীল জিজ্ঞাসা করলে, তোমার কাছ থেকে কোন দিন কি উনি ইঙ্গিত পেয়েছেন—

প্রশান্ত হেসে বললে, আমার পথ খোলা না থাকলে মাহুঘের বিলাস-চিন্তা আসে?

সুনীল বললে, বিবাহ বিলাস?

মলয় বললে, মাই হোক—তোমার বাবা তোমাকে বুঝেছেন—একবার যাও।

প্রশান্ত বরে এসে ডাকলে, বাবা?

দুর্গামোহন পাশ ফিরে তুলেন—কোন উত্তর দিলেন না। আচ্ছন্ন অবস্থায় তাঁর নাক ও জুঁট বার কয়েক কুঞ্চিত হয়ে উঠল।

জান ফিরে আসতে আরও কয়েকদিন গেল। যে দিন বালিশ ঠেস দিয়ে বিছানায় উঠে বসলেন—সেদিন বাইরের আকাশটা ভারি ভাল লাগল তাঁর। পৃথিবীর রূপ আর রঙ মনের মধ্যে নতুন করে প্রলেপ লাগিয়ে দিলে। সেই সঙ্গে ফিরে এল পুরাতন কামনাগুলি। প্রশান্তর পানে ফিরে তিনি যুহু করে বললেন, চাকরি ছেড়ে দিয়েছ—কেমন?

সে মর্মভেদী দৃষ্টিপথ থেকে নিজেকে আড়াল করে অর্থাৎ যুহু ফিরিয়ে প্রশান্ত যুহু করে বললে, হাঁ।

ভারপর কি করে চলবে—কিছু ঠিক করেছ?

প্রশান্ত একটু নড়ে বসল—কোন জবাব দিলে না।

তুমি নিশ্চয় জান উপযুক্ত ছেলেকে বসে খাওয়াবার জুজ আমি পেনসন পাই না—সে প্রত্যাশা তুমিও কর না নিশ্চয়।

প্রশান্ত মাথা নেড়ে সংক্ষিপ্ত জবাব দিলে, না।

তবে করবে কি শুনি? ঈশ্বর উক বরেই তিনি প্রশ্ন করলেন।

খা হয় কিছু করব—কেরানীগিরি ছাড়া।

মানে—কেরানীগিরিটা তোমার কাছে সব চেয়ে নীচু চাকরি। প্রশান্তর উত্তর না দেওয়াতে তিনি অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন। ঝাঁকের সঙ্গে বললেন, স্বাধীনতা বলতে কি বোঝ তুমি? চাকরি না করা? সিগারেট টানা আর অনাড়ম্বর যেরকমে নিয়ে পথে পথে আড্ডা মারা?

প্রশান্ত সহসা ঘুরে দাঁড়াল। তাঁর চোখ দু'টিতে অস্বাভাবিক দীপ্তি—সুখখানা লাল টকটকে হয়ে উঠেছে—ঠোঁটের কাছটা কাঁপছে। একটা কঠিন প্রত্যুত্তরকে অত্যন্ত সংযমের সঙ্গে সে গুঠচ্যুত হতে দেয় নি বেশ বোকা গেল।

দুর্গামোহন বুঝলেন—মাত্রাটা বেশি হয়ে গেছে। হয় ত শাস্ত্রীনতার গতি ছাড়িয়েছে—কিন্তু বৈধেয় কি দোষ সে যদি আঘোবন প্রত্যাশার শেষ ভূগলাহট হতে অবলম্বনচ্যুত হয়ে পড়ে।

মিনিট দুই একদৃষ্টে বাপের মুখের পানে চেয়ে থেকে প্রশান্ত খর থেকে বেরিয়ে গেল।

সিঁড়ির মুখে মলয় টাড়িয়েছিল। জিজ্ঞাসা করলে, কাকাবাবু কি বুঝে গেছে উঠেছেন?

প্রশান্ত বললে, ওকে আজই দেশে পাঠাবার ব্যবস্থা কর তাই—নইলে ব্রাড প্রশ্নার বেড়ে যাবে।

ক্রমশঃ

বিমান ভূ-প্রদক্ষিণ

শ্রী বিনয়ভূষণ দাসগুপ্ত

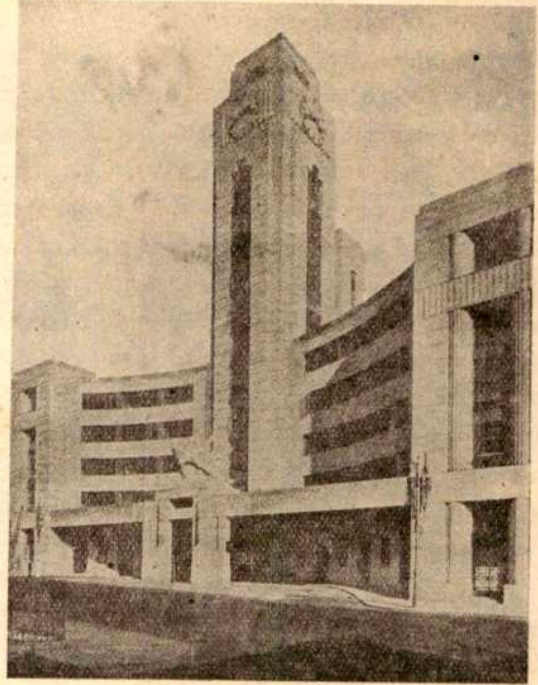


১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধের সময় লণ্ডনে মুর্শিদাবাদ অপেক্ষা কম লোকের বাস ছিল। সেদিন হইতে আজ পর্যন্ত দুই শত বৎসরও হয় নাই, ইহার মধ্যে লণ্ডন পৃথিবীর বৃহত্তম শহরে পরিণত হইয়াছে। ইংলণ্ড পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম শক্তিতে পরিণত হইয়াছিল, কিন্তু পর পর দুইটি মহাযুদ্ধের ফলে সে সেই পৌরব হারাইয়া কেলিয়াছে। ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রিভলিউশন বা শিল্প-বিপ্লবের ফলে যন্ত্রশক্তিতে ইংলণ্ড অগ্রণী হইয়াছিল; যন্ত্রশক্তির সহায়তাপূষ্ট ইংরেজ-মজুরের উৎপাদনীশক্তি সবাইকে ছাড়াইয়া পিয়াছিল; নির্ভীক, নিরলস ইংরেজ বণিক পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়িয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তিপত্তন করিয়াছিল। লণ্ডন হইয়াছিল সমস্ত পৃথিবীর বাণিজ্য-কেন্দ্র; সমস্ত পৃথিবীকে মূলধন যোগান দিত লণ্ডন এবং সমস্ত পৃথিবীর বাণিজ্যের মাল বহন করিত লণ্ডনের জাহাজ। লণ্ডনের সে পৌরব আজ আর নাই। যুদ্ধোত্তর লণ্ডনের রূপ, সমভা ও সমাধান-প্রয়াস বিশেষরূপে প্রদর্শনের বিষয়।

লণ্ডনের ডক এলাকায় বোমাবর্ষণের ফলে সংঘটিত বিস্তর ক্ষতি আজও দেখিতেছি। মধ্য-লণ্ডনের 'অক্সফোর্ড স্ট্রীট' এলাকায়ও কিছু কিছু বিধ্বস্ত গৃহ দেখিতেছি। পার্লামেন্টের কমন্স ভবনের এখনও পুনর্নির্মিত হইতেছে। ইহা ব্যতীত লণ্ডনের বাহ্যিক রূপের বিশেষ কোন পরিবর্তন দেখি না। কিন্তু ইংলণ্ডের অর্থনৈতিক ভিত্তি একদম ভাঙিয়া পড়িয়াছে। পূর্বে পৃথিবী ব্যাপিয়া ইংলণ্ডের মূলধন ষাটিত; তাহার সুদ ছিল ইংলণ্ডবাসীর একটা বড় আয়ের উপায়। আজ সে মূলধন নাই; উপরন্তু সে নানা জাতির নিকট ঋণিক। অল্প হইতে কোন সুদ আর ইংলণ্ডে আসে না; তাহার নিজের আয়ের এক অংশ গণশোধের জন্ত বাহিরে পাঠাইতে হইতেছে। পূর্বে সে যত জিনিষ বাহিরে পাঠাইত, বাহির হইতে আনিত তার অনেক বেশী। কারণ সুদ প্রভৃতি বাবদ সে অনেক মাল পাইত। এখন সেই মূল্যের মাল বাহির হইতে আনিতে হইলে তাহাকে পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী মাল বাহিরে চালান দিতে হইবে। তারপর দেনাশোধ ত আছেই। কাজেই পূর্বের চাল বজার রাখা তাহার পক্ষে কষ্টকর হইয়াছে। পূর্বের চাল বজার রাখিবার একমাত্র উপায় দেশের উৎপাদন-বৃদ্ধি এবং তৎসহ বহির্বাণিজ্যের উৎকর্ষ সাধন। প্রচুর জিনিষ উৎপাদন করিয়া বিদেশে বিক্রয় করিতে না পারিলে তাহার পূর্বোক্ত অবস্থা ত ফিরিয়া আসিবেই না, পরন্তু বিদেশ হইতে যথেষ্ট পরিমাণ ঋণবস্ত্র আমদানী করাই তাহার পক্ষে কষ্টকর হইবে। ইংলণ্ড এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অবহিত এবং এ দিকে তাহার চেষ্টার অবধি নাই।

প্রথমতঃ, ইংলণ্ড নিজেকে সর্বতোভাবে সংযমের শৃঙ্খলে

বাঁধিয়া রাখিয়াছে। খাদ্য এবং বস্ত্রের বেশন পূর্বদমে চলিয়াছে। প্রত্যেকের পরিমিত ঋণ বরাদ্দ আছে। রুটি, মাখন, মাছ, মাংস, ডিম, তরকারী, চিনি সবই নিয়মিত বরাদ্দপ্রদার অন্তর্গত। প্রান্তরাশ, মধ্যাহ্নভোজন এবং নৈশভোজন সাধারণের এই জিবিষ আহার। প্রতি বারে দু-এক টুকরো রুটি পাওয়া যায়। মাখন নামমাত্র। ডিম সপ্তাহে দুটো।



আধুনিক বিমান-কেন্দ্র—'ইম্পিরিয়াল এয়ারওয়েজ', লণ্ডন

মাংসের মধ্যে মেঘ-মাংসই বেশী। দুর্গা ছলভ। তরকারীর মধ্যে আলু প্রচুর। অল্প তরকারী খুব কম। ফলকপি ছলভ। বাঁধাকপি জম্মাইতে সময় বেশী লাগে; তার বদলে খুব ছোট বাঁধাকপি জাতীয় ব্রাসেল্স প্রাউট দেওয়া হয়। এগুলি খুব তাড়াতাড়ি জম্মায়। মধ্যাহ্ন ও নৈশভোজনে তিনটি পদ পাওয়া যায়। সাধারণতঃ একটি ডাল বা বোল; দ্বিতীয় পদে এক টুকরা মাছ বা এক টুকরা মাংস, সঙ্গে কিছু তরকারী-সিদ্ধ এবং তৃতীয় পদে এক টুকরা কেক, পুডিং বা অল্প জাতীয় মিষ্টান্ন। পরে আধ কাপ কফি বা এক কাপ চা দেওয়া হয়। ইহাই প্রত্যেকের প্রাত্যহিক খাদ্য। আইনতঃ কোন হোটেলে ৫ শিলিংয়ের বেশী দাম লইতে পারে না। বড় বড় হোটেলে অবজা ঘরভাড়া, বাসনভাড়া প্রভৃতি বাবদ আরও কিছু আদায় করিয়া লয়। খাদ্য একেধারে এবং অপ্রচুর। চকোলটে

কিনিতেও কুপন লাগে। সবাইকে এই আহারে সম্বলিত থাকিতে হয়। সকালে বিকালে গৃহিণীদের বেশনের দোকানে লাইন দিতে হয়।

মধ্যাহ্ন-ভোজনের সময় আপিসবহুল অফিসে হোটেলের সামনে লম্বা লাইন দেখা যায়। কখনও কখনও এক খণ্ড অপেক্ষা করিয়া তবে খাদ্য মেলে। কল অপ্রাপ্য। শিশু বা রোগীর জন্য বেশী ছুটি লাগিলে তাহার জন্য আলাদা কুপন সংগ্রহ করিতে হয়। বস্ত্রের কুপনও প্রচুর নয়। মোজা, জুতা, টুপি, টাই, শার্ট, কোট, স্ট, বর্ধাতি প্রত্যেক জিনিষটি কিনিতে কুপন চাই। সব সময় সকল জিনিষ পাওয়া যায় না। বড় বড় দোকান এক এক সময়ে মালশূন্য হইয়া যায়। শূণ্যের অভাব মিলে তিন মাসের কম পাওয়া যায় না। তৈরি জিনিষই বেশীর ভাগ কিনিতে হয়। সাধারণত লোকের প্রয়োজনীয় বস্ত্রাদির দায় অবশ্য হুবই কম। ৫ পাউণ্ড হইতে ১০ পাউণ্ডের মধ্যে শূট এবং ৫ পাউণ্ডে ওভারকোট পাওয়া যায়। গৃহের অভাব অত্যন্ত বেশী। হোটেলের স্থান নাই। যুদ্ধ হইতে কিরিয়া বিবাহিত ব্যক্তিগণ বাসোপযোগী গৃহ পাইতেছে না। সরকার গৃহনির্মাণ এবং ক্যার্টনের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন। সাধারণতঃ সরকার স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন-প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে গৃহ নির্মাণ করাইয়া বিলি করিতেছেন। রক্ষণশীল দল এই প্রকার পক্ষপাতী নন। তাহার মনে করেন ধনী-দরিদ্রকে গৃহনির্মাণের স্বাধীনতা মিলে বেশী গৃহ নির্মিত হইত। সরকার এ মত মানেন না। ইহা লইয়া তুমুল বিতর্ক চলিতেছে। মোটের উপর অন্ন, বস্ত্র এবং আশ্রয়স্থল সবই এখন সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত এবং কোনটাই প্রচুর নয়।

অন্নবস্ত্র তিন্ন অত্যন্ত দ্রব্যও অপ্রাপ্য বা হুপ্রাপ্য। আমদানী রপ্তানী এবং মুদ্রাবিনিময়ের উপর সরকারের কড়া শাসন। বিশেষ প্রয়োজনীয় দ্রব্য বা শিল্পের জন্য আবশ্যকীয় যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল ভিন্ন অল্প দ্রব্য বিদেশ হইতে আমদানী করিতে দেওয়া হয় না। স্বদেশে প্রস্তুত দ্রব্যাদির মধ্যেও বিশেষ প্রয়োজনীয় দ্রব্য ব্যতীত স্বদেশে বেচিবার অনুমতি মিলে না। আমার লগনে অবস্থানকালে এক বিরাট প্রদর্শনী হইয়াছিল। প্রত্যহ বিশহাজার লোক প্রবেশস্থল্য দিয়া এই প্রদর্শনী দেখিত। শিল্পজাত সর্ববিধ দ্রব্য এবং গৃহস্থের প্রয়োজনীয় যাবতীয় দ্রব্য ইহাতে দেখান হইয়াছিল। সবই ইংলণ্ডে প্রস্তুত। প্রদর্শনীটির নাম দেওয়া হইয়াছিল “ইংলণ্ড ইহা তৈরি করিতে পারে” প্রদর্শনী। কিন্তু ইহার কোন জিনিষই ইংলণ্ডে বিক্রয়ের জন্য নহে; সবই বিদেশে চালান দিবার জন্য। সাধারণ লোকে ইহার নাম দিয়াছিল “ইংলণ্ড ইহা পাইতে পারে না” প্রদর্শনী। অর্ধেক বিলিভী জিনিষ আমরা কলকাতায় পাই, কিন্তু তাহা বিলাতে অপ্রাপ্য। ভাল কাউন্টেন পেন, নাইলন প্রভৃতি জিনিষ বিলাতে শুধু হুপ্রাপ্য নয়, অপ্রাপ্য। সাবান ও ভোয়ালেও সম্বলিত পাওয়া যায় না।

সরকারের দ্বিতীয় প্রচেষ্টা হইতেছে সর্বভোক্তাভাবে দেশের উৎপাদনবৃদ্ধি। এ বিষয়ে মজুরদের নিকট প্রথমমন্ত্রী এটলীর ঘন ঘন আবেদন আমরা প্রায়ই শুনি। পূর্বোক্ত প্রদর্শনীটি এই উৎপাদনবৃদ্ধির প্রেরণা দিবার জন্যই করা হইয়াছিল। বিলিভী মালের অভাব বিষয়ে সুনাম থাকিলেও ডিকাইনের বিশেষ সুনাম নাই। তাই এঁরা এবার ডিকাইনের দিকে বিশেষ নজর দিয়াছেন। যাবতীয় জিনিষের কত রকমারি ডিকাইন হইতে পারে তাহাই এই প্রদর্শনীর প্রদর্শনীয় বিষয় ছিল। আমার ইংলণ্ডে অবস্থানকালে অপর একটি প্রদর্শনী হইয়াছিল। সেটি প্লাস্টিক্‌স্ প্রদর্শনী। কত রকমের প্লাস্টিক্‌স্ হইতে পারে, প্লাস্টিক্‌সের কত রকম ব্যবহার্য জিনিষ হইতে পারে এবং সেই সকল জিনিষের গুণ কি, ইহা দেখানোই ছিল এই প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য। আজকাল প্লাস্টিক্‌স্ দিয়া না হইতেছে এমন জিনিষ কম। কাপড় পর্যন্ত প্লাস্টিক্‌স্ দিয়া তৈরি হইতেছে।

শিল্পবিপ্লবের কালে যন্ত্রকৌশল এবং সংগঠনশক্তিতে ইংলণ্ড পৃথিবীর মধ্যে অগ্রগণ্য হইয়াছিল। বিশাল সাম্রাজ্য তাহাকে কাঁচামাল যোগান দিত এবং তাহার বিপুল শিল্পজাত দ্রব্যসম্ভার ধরিদ করিত। এশিয়া তখন অবনত। শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আমেরিকা শক্তিশালী। ইউরোপের উঠু এবং পড়ন্ত জাতিগণের মধ্যে শক্তিসাম্য রক্ষা করিত ইংলণ্ডের পররাষ্ট্রনীতি। তখন উৎপাদন যন্ত্রশক্তির সাহায্যে দ্রুত বাড়িয়া চলিয়াছিল; কাজেই আত্মরক্ষার অশান্তির সম্ভাবনা ছিল কম। কারণ সকলের ভাগেই যথেষ্ট জুটত এবং সকলেরই আয় বাড়িয়া চলিয়াছিল। ইংলণ্ড ছিল তখন জগতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু জনবল, প্রাকৃতিক সম্পদ, যন্ত্রকৌশল ও সংগঠনশক্তি—সব দিকেই আজ ইংলণ্ডের অগ্রগতি ব্যাহত হইয়াছে। রাশিয়া এবং আমেরিকা দ্রুত বাড়তির পথে চলিয়াছে। জনবল এবং প্রাকৃতিক সম্পদে উভয় দেশই আজ ইংলণ্ডের অগ্রগামী। যন্ত্রকৌশল এবং সংগঠন শক্তিতে আমেরিকা সবাইকে বহু পশ্চাতে ফেলিয়া গিয়াছে। রাশিয়া তাহার বলিষ্ঠ সংগঠন-শক্তির পরিচয় দিয়া জগৎকে চমৎকৃত করিয়াছে। ইংলণ্ডের ঔপনিবেশিক প্রধার মূলে কিন্তু ভাঙ্গন ধরিয়াছে। আমেরিকা বহু পূর্বেই ইংলণ্ডের স্বাধীনতাপাশ ছিন্ন করিয়াছে। ক্যানাডা ও অস্ট্রেলিয়া এখন সাম্রাজ্যের দূরতম অংশ। কিন্তু তাহাদের নিজেদেরই সাহায্য-প্রয়োজন হুব বেশী। ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশ ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্যবশে হুর্কল। ইউরোপে শক্তিসাম্যের দিনও ফুরাইয়া গিয়াছে। কাজেই আজ ইংলণ্ড নিজের উপর আস্থা হারাইয়া ফেলিয়াছে, জগতে একচ্ছত্র প্রভুত্ব বজায় রাখা সম্বন্ধে তাহার মনে সংশয় জাগিয়াছে। নব নব কৌশলের উদ্ভাবনী শক্তিতে পিছাইয়া পড়ায় ইংলণ্ডে উৎপাদন যথেষ্ট বাড়িতেছে না। কালে আত্মরক্ষার দৃষ্টে দেখা দিয়াছে। দীর্ঘকালীন কঠোরতার কালে এই দৃষ্টে বাড়িতেছে এবং কর্তব্যের

উৎসাহও কমিয়া যাইতেছে। যদি বেশী কাজের কলে বেশী ভোগ্যবস্তু না পাওয়া যায় তবে কাজে স্বতঃই উৎসাহ থাকে না। বর্ষভটের মীমাংসা করা এ অবস্থায় কঠিন হইয়া পড়ে। শিল্পপতিগণ এ অবস্থায় উৎসাহহীন হইয়া পড়িতে পারেন। ইংলণ্ড আজ সর্বপ্রকারেই বেতনভুক্তগণের গণতন্ত্রে পরিণত হইয়াছে। বেতনভুক্তের প্রধান স্বার্থ তাহার বেতনের পরিমাণে এবং কর্মের অবস্থায়; উৎপাদন-ব্যবস্থায় তার প্রত্যক্ষ স্বার্থ নাই। অথচ উৎপাদন না বাড়িলে তার ভাগ বাছানও কষ্টকর। প্রমিত পূর্ণমণ্ট বন ঘন মজুরদের প্রতি আবেদন জানাইয়া এবং কোন কোন শিল্প সরকারী নিয়ন্ত্রণে আনিয়া এই দ্বন্দ্বের মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু তথাপি আজ ইংলণ্ডের সর্বত্র এই দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব পরিস্ফুট। বহু চেষ্টা সত্ত্বেও ইচ্ছা বা প্রয়োজনানুসারে উৎপাদন বাড়িতেছে না। যদিও কঠোর ব্যবস্থার বিন্দুমাত্র লাভ করা হইতেছে না তথাপি ইংলণ্ড তাহার পূর্বের চাল কিরায় আনিতে পারিবে কিনা সন্দেহ। তাই তাহার বেচ্ছাকৃত কঠোরতা এবং অভিনব উৎপাদন প্রচেষ্টা বিশ্বব্যাপক হইলেও করুণারই উদ্ভেক করে।

আজ ইংলণ্ডকে নূতন আদর্শে ধর গুছাইতে হইবে। পরবর্তী বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে পর্যন্ত তাহার সময়। ভারতবর্ষ ও সাম্রাজ্যের অত্যন্ত অংশ যদি আজ দারিদ্র্য ও ভেদ-প্রবর্তক-শাসন-মুক্ত হইয়া স্বাধীন ও স্বাবলম্বীভাবে ক্রম-বর্ধমান শক্তি ও সম্পদে সমৃদ্ধ হইয়া ইংলণ্ডের বন্ধুত্ব লাভাইতে পারে তবেই পৃথিবীর ভবিষ্যৎ ইতিহাসের ঘটনাপ্রবাহ ইংলণ্ডের অস্থূল হইতে পারে। ভারতবর্ষ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে রহিল বা বাহিরে গেল সে কথা এখানে অবান্তর। সাম্রাজ্যভুক্ত আয়ারল্যান্ড অপেক্ষা সাম্রাজ্যবাহিনী আমেরিকাই গত যুদ্ধে ইংলণ্ডের অধিকতর মিত্রতা করিয়াছে। সকল বিষয়েই ইংলণ্ডের বর্তমানে চাই সাহস, দূরদৃষ্টি এবং সর্বতোমুখী প্রচেষ্টা। ভারতবর্ষের প্রতি ইংলণ্ডের নূতন নীতি এই দূরদৃষ্টি ও সাহসেরই ফল। ইহা আকস্মিক উদারতাও নয় বা তাহার দুর্বলতার পরিচায়কও নয়। তবে এইরূপ দূরদৃষ্টি ও সাহস ইংলণ্ডের বিশেষত্ব। শেষ পর্যন্ত নিজ শাসনাধীন দেশকে নিঃশেষে শোষণ করিবার চেষ্টা না করিয়া কালের ইঙ্গিত মানিয়া লইয়া অধীন দেশকে এবং স্বদেশকে পুনরুজ্জীবিত হইবার এইরূপ সুযোগ দিবার মত দূরদৃষ্টি, সাহস ও উদারতা অত কোন সাম্রাজ্যবাদী জাতির আছে কিনা সন্দেহ।

এ দুর্গসঙ্কীর্ণ ভারতবর্ষেরও আজ সাহস, উৎসাহ ও দূরদৃষ্টি প্রয়োজন। এই অপূর্ণ সুযোগের সম্যকহার তাহাকে করিতেই হইবে। কালের ইঙ্গিত আজ তাহার অস্থূল। এ ইঙ্গিতে সাড়া না দিলে সে আত্মহত্যার পাপ করিবে। যে আজ অন্ধকলেই ইচ্ছন যোগাইয়া বাধা সৃষ্টি করিবে সে দেশের শত্রু।

লণ্ডনে অবস্থানসময়ে রবিবারগুলি প্রায়ই বাহিরে কাটাই-

তাম। এইরূপে চারিটি রবিবার কেব্রিজ, অক্সফোর্ড, ব্রিষ্টল ও ব্রাইটনে কাটাই। এগুলি লণ্ডনের অনতিদূরবর্তী সুন্দর ছোট ছোট শহর। লণ্ডনের অগাধ জনসমুদ্র হইতে এখানে আসিয়া যেন বৈ পাওয়া যায়।

কেব্রিজ ও অক্সফোর্ড কলেজ-প্রধান শহর। শহর দুইটি লণ্ডন হইতে যথাক্রমে প্রায় ৬০ ও ৫০ মাইল দূরে অবস্থিত। রাস্তায় ঘাটে ছাড়াই বেশী নজরে পড়ে। কলেজগুলি বাস্তবিকই দর্শনীয় বটে। সেগুলির ভিতরে বৈ চৈ কম—সত্য সত্যই বিদ্যাচর্চার উপযুক্ত নিকেতন। ছাত্রদের নৌকাবিহারে খুব আগ্রহ। শীর্ণকায় ক্যাম নদী কেব্রিজের মধ্য দিয়া প্রবাহিত। নদীটি প্রশস্ততার কালীবাটের পদ্ধতি অর্দেক। লম্বা লম্বা নৌকায় চড়িয়া ইহাতেই ছাত্রগণ বাচ খেলে। নদীপথে ৪৫ মাইল অতিক্রম করিলে 'গ্র্যাণ্ট চেষ্টার' নামক স্থানে 'রেডল্যান্ড' হোটেল ও বায়রন লঞ্চে পৌছানো যায়। লর্ড বায়রন নাকি এই বাড়ীতে থাকিতেন এবং এই হোটেলের পানীয় পছন্দ করিতেন। বাড়ীটির বর্তমান অধিবাসিনী এক তরুণীর সহিত আলোচনা করিলাম। তিনি এ বিষয়ে খুব সচেতন বলিয়া বোধ হইল না। লর্ড বায়রন এ বাড়ীতে থাকিতেন কিনা জিজ্ঞাসা করায় তিনি স্মিত হান্তে সংক্ষেপে উত্তর করিলেন, 'লোক বলে।' অদূরে কবি কুপার্ট ক্রকের বাড়ী। আশে পাশে জনবসতি খুব বেশী নয়। রাস্তার দু'পাশে কিছু কিছু পাতলা জঙ্গল। অক্সফোর্ডের এক পাশে টেম্‌স্‌ নদী, অপর পাশে চেরডয়েল নদী। চেরডয়েল ক্যাম হইতেও ছোট। টেম্‌স্‌ নদীর এখানকার দৃষ্ট মননানন্দকর। নাতিপ্রশস্ত স্বচ্ছ-সলিলা এবং সলীলগমনা নদীটির পাড়ে বড় বড় ক্রাব ঘর। নদীতে বহু বাচের নৌকা। নদীর পাড় দিয়া ভ্রমণ খুব লোভনীয়। শহরের মধ্যে বিচরণকালে শেলী হাউস, অডিং হাউস প্রভৃতি মনের ঔৎসুক্য বাড়ায়। এখানকার বিখ্যাত বডলিন্ডন লাইব্রেরী অষ্টম হেনরীর আমলে নিৰ্মিত হয়। বর্তমানে আমেরিকার রক্‌-ফেলার ফাউন্ডেশনের অর্থসাহায্যে লাইব্রেরী-গৃহের আরতন বাড়ান হইতেছে। পুস্তকপ্রকাশের বর্তমান হার অপরিবর্তিত থাকিলে আগামী পাঁচ শত বৎসরে পুস্তক প্রকাশিত হইবে তাহা রাখিবার পক্ষে এই বর্ধিত অংশ (extension) পর্যাপ্ত। আমার লণ্ডনে অবস্থান কালে রাণী স্বয়ং এই বর্ধিত অংশের উদ্বোধন করেন। তখন ছাত্রগণ সেক্সপীয়রের একটি নাটক অভিনয় করে।

এই প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় দুইটি জী-শিক্ষা বিষয়ে তাহাদের পৌত্তামি আজও সম্পূর্ণ ছাড়িতে পারে নাই। পূর্বে জী-লোকের বিজ্ঞার অধিকার ছিল না। এখন জীলোকদিগকে পড়িতে দেওয়া হয় এবং পরীক্ষা দিতেও দেওয়া হয়। কিন্তু পাশ করিলে তাহাদিগকে অনেক বিষয়ে উপাধি দেওয়া হয় না; একটি ডিপ্লোমা দিয়াই বিদায় করা হয়। বিজ্ঞার অধিকার স্বীকৃত হইলেও ডিগ্রির অধিকার আজও স্বীকৃত হয় নাই।

ব্রিটল লন্ডন হইতে ১১৬ মাইল। যাইতে তিন ঘণ্টা লাগে। যোমাবিধবস্ত অনেক বাড়ীর ধ্বংসাবশেষ এখানে দেখিলাম। ভারতবাসীর নিকট ব্রিটল ভীষণরূপ। এখানে রামমোহন রায়ের সমাধি-মন্দির বিদ্যমান।

এতদ নদীর তীরে ছোট ছোট পাহাড়ময় ব্রিটল শহরটি দেখিতে মনোরম। পাহাড়ের পায়ে ও উপরে গৃহরাশি। শহরের বাহিরে একটি ব্লানো সেতু প্রকৃতির লীল-নিকেতনের শোভা বর্ধন করিতেছে। দুইটি জামল পাহাড়ের উচ্চ শৃঙ্গকে সংযোগ করিয়াছে এই সেতু। নীচে পর্বতদ্বয়ের মধ্য দিয়া এতদ নদী প্রবাহিত। তাহার পাড় দিয়া রেল লাইন চলিয়া গিয়াছে। পোলের উপর দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া রেলগাড়ীকে চলিতে দেখিয়া বক্রগতি অঙ্গগরের কথা মনে পড়ে।

রামমোহনের সমাধিস্থানটি শহরের মধ্যে সর্কাপেক্ষা মনোরম অংশে অবস্থিত। একটি অর্ধবৃত্তাকার পাহাড়। শিবর হইতে পাদদেশ পর্যন্ত ঢালু পর্বতগাত্রে সমাধি-মন্দিরের শ্রেণী। পাহাড়টি ষাড়া নয়। ধীরে ধীরে উঁচু হইয়া উঠিয়াছে। শিবরে অনেকটা সমতল-ভূমি। ঢালু অংশ সমাধিতে সমাধিতে ভর্তি হইয়া গিয়াছে। এখন শিবরস্থ সমতল অংশ ব্যবহৃত হইতেছে। রামমোহনের সমাধি পাহাড়ের পাদদেশে—ফটক দিয়া ঢুকিয়া ভাইনে। মন্দিরের ছবিটি ভারতীয়গণের নিকট পরিচিত। প্রবেশমাত্র সুপরিচিত ছবির বাস্তব বৃত্তি দৃষ্টিপথে পতিত হয়। রামমোহনের মৃত্যু হয় ১৮৩৩ খ্রিষ্টাব্দে। তৎপূর্ববর্তী কোন সমাধি দেখিলাম না। সে দিন রবিবার ১০ই কাঙ্কিক, ২৭শে অক্টোবর। অপরাহ্ন-স্বর্ধ্য পশ্চিমে হেলিয়া অর্ধবৃত্তাকার পর্বতগাত্রে সমাধিমন্দির-শ্রেণীর চূড়ায় স্বর্ণকিরণ ঢালিতেছিল। কত নরনারী তাহাদের প্রিয়জনের সমাধিপার্শ্বে বসিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিতেছে। কেহ সমাধিমন্দিরের গাভ সমাজিত করিয়া পুষ্পস্তবকে সাজাইতেছে। পাহাড়ের পাদদেশে লোকসমাগম নাই। সে সমাধিগুলি শতাধিক বর্ষের। শিবরে লোকসমাগম সর্কাপেক্ষা বেশী। সেখানকার সমাধিগুলি আধুনিক। অপরাহ্ন-স্বর্ঘ্যের ক্ষমবিলীয়মান কিরণ-লেখায়, প্রাকৃতিক শোভার অপূর্ব পরিবেশে, পর্বতগাত্রে সহস্রাধিক সমাধিশ্রেণীর মধ্যে শত শত নরনারীর নীরব আকৃতি যখন জীবন ও মরণের মধ্যে সেতু নির্মাণ করিতেছিল, তখন এক অভিনব অশ্রুভূতিতে হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। বেদনাকাতর চিত্তেই সে দিন লগনে কিরিয়ছিলাম।

ব্রিটলে দুইটি ভদ্রলোকের আচরণ বেশ মনে পড়ে। সে-দিন পূর্বাঙ্কে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল। রাত্ৰায় লোক খুব কম। জনৈক পথচারীর কাছে রাত্ৰায় কথা জিজ্ঞাসা করিয়া বুলন্ত সেতুর দিকে চলিয়াছি। ঋনিক দূর গিয়া রাত্ৰা জিজ্ঞাসা করি-বার লোক আর পাইতেছি না। এমন সময়ে একটি পথিক

সেই পথে আসিয়া উপস্থিত। তাহাকে রাত্ৰায় কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন—“আমি যুদ্ধের সময় অনেক দেশে গিয়াছি। কলিকাতাও ছিলাম। বিদেশে জিজ্ঞাসা করিয়া করিয়া অজানা পথ চলার অশ্রুবিধা আমার ভালই জানা আছে। আমার সঙ্গে আনুন।” আমার আপত্তি সত্ত্বেও ভদ্রলোক অনেক দূর পর্যন্ত আমাকে রাত্ৰা দেখাইয়া দিলেন। শেষে একটি পায়ে চলা পথের উপর দাঁড়াইয়া বলিলেন—“এই পথ ঘুরিয়া ঘুরিয়া সেতু পর্যন্ত উঠিয়াছে। আপনি এই পথ ছাড়িবেন না। তাহা হইলেই যথাস্থানে পৌছাইতে পারিবেন। সেতু কাছেই।” পাহাড়টির নাম ক্লিকটন। আঁকা বাঁকা পাহাড়ের রাত্ৰায় ঋনিকদূর উঠিয়া আবার সাহায্যের প্রয়োজন বোধ করিলাম। সহসা একটি যুবকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। রাত্ৰা জিজ্ঞাসা করিতেই যুবকটি আমাকে প্রশ্ন করিল—“আপনি ভারতীয়?”

আমি—“হ্যাঁ।”

যুবক—আমি যুদ্ধের সময় ভারতবর্ষে ছিলাম। কিছুদিন করাচীতে কাটাইয়াছি।

আমি—করাচী তাহার সুন্দরতম অংশের নাম আপনাদের শহর হইতেই বার করিয়াছে দেখিতেছি।

যুবক—হ্যাঁ, করাচীতে ক্লিকটনের সমুদ্রসৈকত সত্যই মনোরম।

যুবকটি আমাকে সেতুর খুব নিকট পর্যন্ত আগাইয়া দিল। তারপর আর কাহারো সাহায্য বিনাই সেতু পর্যন্ত গিয়াছিলাম।

লগনে পৌঁছিয়া একমাস বেশ ভাল আবহাওয়া পাইয়া-ছিলাম। গোটা অক্টোবর মাসটাই খুব রৌদ্র ছিল। কুয়াশা, মেঘ বা বৃষ্টি মোটেই ছিল না। তাপ সাধারণতঃ ৪৫° হইতে ৫৫° ডিগ্রী পর্যন্ত উঠা-নামা করিত। নবেম্বরের প্রথমে রৌদ্র কমিয়া আসিল। কুয়াশা, মেঘ ও বৃষ্টি দেখা দিল। তাপ কমিয়া ৪০° ডিগ্রীতে নামিল; কখনও বা আরও নীচে যাইতেছিল। দিন ছোট হইয়া আসিল। আমার কাজও তখন শেষ হইয়া আসিয়াছে। আমেরিকা যাত্রার জন্ত প্রস্তুত হইয়াছি। কবে বিমানে স্থান ছুটিবে সেই সংবাদের প্রতীক্ষা করিতেছি। বারাপ আবহাওয়া এবং ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার মধ্যে মন খুব প্রক্লান্ত নাই। এই অবস্থায় এক রবিবারে ব্রাইটন দর্শনে বহির্গত হইলাম। ব্রাইটন লগন হইতে ৫০ মাইল দক্ষিণে। রেল যাইতে এক ঘণ্টা লাগে।

ব্রাইটন নগর আটলান্টিক মহাসাগরের তীরে অবস্থিত। সম্রাট চতুর্থ জর্জ সমুদ্রবাসের জন্ম এখানে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করান। প্রাসাদটি ১৯১৪-১৮ খ্রিষ্টাব্দের যুদ্ধে ভারতীয় সৈন্তদের হাসপাতালরূপে ব্যবহৃত হয়। ভারতীয় সৈন্তদের প্রতি এই শহরের লোকেরা যে সদ্যবহার করিয়াছিলেন তজ্জন্মভূক্ততার চিহ্নস্বরূপ পাতিস্থালার মহারাজ প্রাসাদটির দক্ষিণে একটি সুন্দর বিলাসময় কটক তৈরী করাইয়া দেন। সেটি আজও স্থানটির

শোভা বর্ধন করিতেছে। ব্রাইটনের নাগরিকগণও ভারতীয় সৈন্যগণের প্রতি কৃতজ্ঞতার চিহ্নরূপ একটি স্থতিস্তম্ভ নির্মাণ করেন। স্তম্ভটি সুদৃশ্য। শহর হইতে দূরে।

এখানে সমুদ্রের তীরে বালি নাই। তীর অপ্রশস্ত। ছোট বড় নানারূপ হুড়িতে ভর্তি। প্রশস্ত বাঁধানো রাস্তা তীর ধরিয়া বরাবর চলিয়া গিয়াছে। বেড়াইবার বেশ সুবিধা। ছোট বড় বড় ঘাট বা 'পায়ার' আছে; বেশ সুন্দর। কাঠের মঞ্চ তীর হইতে সমুদ্রের মধ্যে অনেক দূর পর্যন্ত গিয়াছে। তার উপরে বড় বড় কাঠের ঘর ও অঙ্গন। বোলা আকিনায় বেড়াইতে বুঝ ভাল লাগে। বসিবার জন্ত চেয়ার পাতা আছে। বসিলে তিন পেনি ভাড়া দিতে হয়। একটি ঘরে বাইবার সু-বন্দোবস্ত আছে। বড় হলঘরে সমুদ্র দেখিতে দেখিতে আহার চলে। অজান্য ঘরে আমোদ-প্রমোদের নানারূপ বন্দোবস্ত। সর্বদাই উৎসব চলিতেছে। বেশ লোকের ভিড়। সমুদ্র দেখিতে অনেকটা মাদ্রাজের সমুদ্রের মত। পূর্বীর সমুদ্রের মত ঢেউ নাই। তীরের কাছে হংসশ্রেণী সাতার কাটিতেছে। বেড়াইবার জন্য ছোট ছোট নৌকাও ভাড়া পাওয়া যায়।

সেইদিন সকালে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল। বৈকালে বেশ রোদ্দ উঠিল। 'পায়ার'ের উপর ঝাঁড়াইয়া দিগন্তবিস্তৃত সমুদ্র দেখিতেছি। অপরাহ্ন সূর্য আকাশের গায়ে হেলিয়া পড়িয়াছে। কবি-কল্পনা যেন চোখের সামনে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে—

“বলিতেছে জল তরল অনল

গলিয়া পড়িছে অধর-ভল

দিক্‌বধু যেন ছল ছল আঁবি

অত্রজলে।”

দিগন্তের পরপারে এই উর্ধ্বমুখর মহাসমুদ্র পাড়ি দিয়া শীঘ্রই আমাকে আমেরিকায় যাইতে হইবে। কেবলই মনে হইতেছে

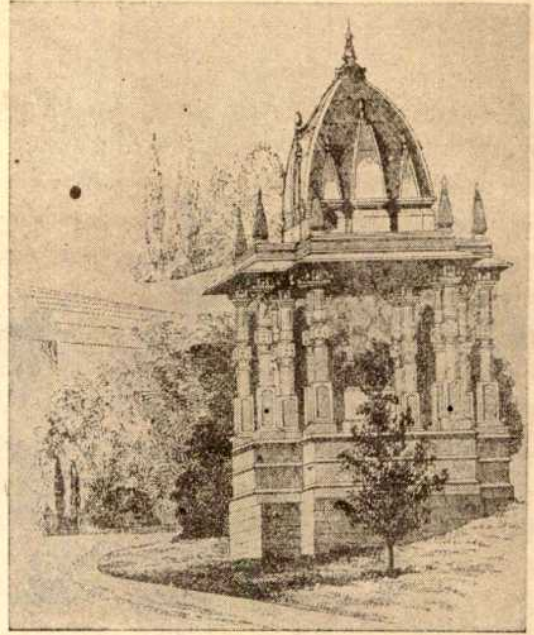
কি আছে ছোখায়—চলেছি কিসের

অবেষণে?

কিন্তু “সংশয়ময় ঘননীল নীর” নিরন্তর।

তপন নীরবে দূরে পশ্চিমে গগনকোলে ডুবিতেছেন। রবীন্দ্রনাথের “নিরুদ্দেশ যাত্রা” কবিতাটি মনে মনে আবৃত্তি করিতে করিতে ষ্টেশনান্তিমুখে ফিরিলাম।

৩রা নভেম্বর (১) রবিবার ব্রাইটন যাই। ১৪ই নভেম্বর লন্ডন হইতে আমেরিকা যাত্রা করি। এই কয়দিনে আব-হাওয়ার অবস্থা ক্রমশঃই ঝরাপ হইল। শীত বাড়িল। রোদ্দ অবলুপ্ত হইল। কুয়াশা ও মেঘে সর্বদাই আকাশ আচ্ছন্ন। মাঝে মাঝে টিপ টিপ করিয়া বৃষ্টি পড়ে।



রামমোহন বায়ের সমাধি-মন্দির, বৃহল

লোকজন দ্রুত কাজ সারিয়া গৃহে ফিরিয়া আগুন পোহায়। পাক জনশূন্য। আকিসের পর রাস্তাও প্রায় জনশূন্য। সাত আট তারিখের মধ্যে আমার কাজ শেষ হইয়া গেল। তখন এই আবহাওয়ার মনের একুন্ততা রাধা কষ্টকর হইল। ১০ই নবেম্বর রবিবার কিউ উদ্যানে গেলাম। কিন্তু সে সুরম্য উদ্যান আজ রিক্ত। গাছে পাতা নাই, ফুল নাই। বৃষ্টিপ্রাবিত হওয়ার ঘাসে ঢাকা মাঠগুলিরও আর সে নাই। লন্ডনের অবিভ্রাম জনস্রোতের মধ্যেও আর সজীবতা নাই বলিয়া মনে হয়। যেন যন্ত্র-চালিতের মত সবাই আপিসে যায়, আবার আপিসের কার্য্য অন্তে দ্রুত গৃহে ফেরে। মাঝে মাঝে মনে হইত চিড়িয়াখানায় গিয়া জীবজন্তুর গতিবিধি ও সজীবতা দেখিয়া আসি। এই সময় প্রায়ই ন্যাশন্যাল আর্ট গ্যালারীতে যাইতাম। এই গৃহটি সজীবতা ও আনন্দের নিত্য-লীলাভূমি; শীত ঋতুর জড়তা আনয়নকারী প্রভাবের অতীত। প্রবেশমাত্র মনের সমস্ত গ্রানি দূর হইয়া যায়। সমগ্র মানব-জাতির সুখ ও দুঃখ, প্রেম ও ঘৃণা, দম্ব ও বিনয়, বীরত্ব ও ভীর্ণতা, আকৃতি ও প্রত্যাখ্যান, দয়া ও হিংসা প্রকৃতি যাবতীয় ভাব ও রস শিল্পগণের প্রতিভায় যেন পরিপূর্ণ মহিমায় এই ঘরে বিরাজমান।

অর্থ ও অনর্থ

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

বিয়ের অনতিকাল পরে যশোদা যখন বিনাদোষে স্বামী-গৃহ থেকে বিতাড়িত হ'ল তখন পাপের পিচ্ছিল পথে পা বাড়াবার প্রচুর প্রলোভন তার সামনে এসে উপস্থিত হয়েছিল। কিন্তু যশোদা সকল প্রলোভন জয় করে মুড়াকরি এঁমে গিয়ে প্রভুনন্দন গোপামীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করলে। প্রথম যৌবনেই সে যোগিনী-বেশ ধারণ করলে। গলায় কণ্ঠী, পরণে ধানমুতি, ললাটে ও নাসিকায় চন্দনের অলকাভিলকা—এই তরুণী বৈষ্ণবী যেদিন রামচন্দ্রপুরের কাছারীতে এসে হাজির হ'ল সেদিন তার সম্বন্ধে কাছারীর লোকদের কৌতূহলের আর অন্ত ছিল না।

তার পর কেটে গেল দীর্ঘকাল। ধীরে ধীরে মাথলার ঝালের পাড়ে কেমন করে যশোদার আশ্রমটি গড়ে উঠল সে অনেক কথা—আর তা না জানলেও আপনাদের কোনো ক্ষতি নেই। কিন্তু কাছারীর দক্ষিণ দিক দিয়ে যে ঘেঁঠো রাস্তাটা বরাবর যেখনা নদীর তটান্তিমুখে চলে গিয়েছে সেইটি ধরে যদি একবার যশোদার আশ্রমে গিয়ে হাজির হন তা হলে চতুষ্পার্শ্বের প্রাকৃতিক পরিবেশ আপনাদের মনে এক অভিনব অহুত্বের সঞ্চার করবে। মনে হবে সম্পূর্ণ এক নতুন জগতে এসে হাজির হয়েছেন—আপনাদের পরিচিত পৃথিবীর সঙ্গে তার কত পার্থক্য। লোকালয়ের কোম কোলাহল সেই নিম্নত নিকেতনে এসে পৌঁছয় না। যে টিলার ওপর আশ্রমটি অবস্থিত তার পাদদেশে বৌত করে মাথলার ঝালের রক্ততন্ত্র কীণ জলধারা বিরাট শ্রামল প্রান্তরের প্রান্তদেশ দিয়ে বয়ে চলেছে—টিলার পূর্বদেশ থেকে তাকালে মনে হয়, পৃথিবীর বুকের ওপর করির পাড় দেওয়া একখানি সবুজ মথমলের শাড়ি বিছানো। মাথলার ঝাল গিয়ে মিশেছে মেঘনার সঙ্গে। নিঃসীম নীল আকাশের নীচে মেঘনার দিগন্তপ্রসারিত মসীবরণ বারিষাণির অনন্ত বিস্তার মনকে তুচ্ছতার গভীর থেকে দূরে টেনে নিয়ে যায়, হৃদয়ে আগায় অসীমের আভাস।

লোকালয়ের বাইরে এই পারিপার্শ্বিকের মধ্যে থেকে থেকে যশোদার প্রকৃতিও গিয়েছিল বদলে; সে বাস করত এক স্থি-ছাড়া জগতে আপনাদের চতুষ্পার্শ্ব এক বিরাট শূণ্যতার পরিমণ্ডল রচনা করে। পুরুষরা তাকে রীতিমত ভয় করত। তার তপ্ত-কাকনসম্বিত পৌরবর্ণ অনেকের চোখ বলসে দিয়েছিল; তার শাবিবালাঙ্কের জ্বলে যারা লালানিত হয়ে উঠেছিল, তার প্রদীপ্ত হুই চকুর জলজ দৃষ্টিকে তারা সহ করতে পারে নি। সেই তীব্র দৃষ্টিতে ছিল বকিত ভোগ-জীবনের বিফলতার তীব্র ছালা।

কিন্তু মেয়েমহলে তার খ্যাতিরের অন্ত ছিল না। কাছারীর প্রত্যেক পরিবারের অন্তঃপুরে তার অবাধ গভীরত। পাহাড়ের পাশাণ ওহাতি বরণাধারার মত তার কঠোর হৃদয়েও

হরের অমিয়ধারা ছিল সঞ্চিত। যশোদার মুখে আগমনী গান আর কীর্তন গান শুনে গায়ের মেয়েরা ভয় হয়ে যেতেন, অশ্রু সঞ্চার করতে পারতেন না।

বাইরে থেকে দেখলে অবশ্য মনে হয় যে, যশোদার হৃদয়ে দয়ামায়া ইত্যাদি অকুসুম রত্নের বালাই নেই। তার কৃষ্ণমুষ্টি হৃদয়ের তীতিরই উদ্ভেক করে, কিন্তু প্রতি সন্ধ্যায় যখন সে আশ্রমে প্রতিষ্ঠিত বালগোপালের মূর্তিটির সামনে আরতি করে, ভোগ দেয় তখন সে যেন সম্পূর্ণ আলাদা মানুষ হয়ে ওঠে। তার মুখের কঠিন রেখাগুলো যেন আচমকা মিলিয়ে যায়, সারা মুখখানি স্নেহে মমতায় করুণায় মেঘুর হয়ে ওঠে। সেই সময় তার আশ্র-বিশৃতি ঘুচে যায়। তার বুকের ভেতর কেঁপে উঠে চিরন্তনী মা। ঐ পাথরের মূর্তিটিকে অবলম্বন করেই সে মাতৃহের অপরিণীম বুড়ুস্বাক্ষকে প্রশমিত করবার প্রয়াস পায়।

এমনিধারা যশোদার দিনগুলো কেটে যাচ্ছিল একঘেয়ে ভাবে, এমন সময় দেখা দিলে পকাশের মনস্তর। অনাহারে আর রোগে ভুগে লোকেরা মরতে লাগল। যশোদা আর্ন্তের সেবার চেষ্টা দিলে মনঃপ্রাণ। যশোদার পাশাণ-বুকে যে এত স্নেহধারা জ্বলন্ত ছিল তার পরিচয় পেয়ে সবাই বিম্মিত হ'ল।

হকুম মণ্ডলের বিধবা বৌটি যখন ব্যাধিতে ভুগে ভুগে মৃত্যুপথযাত্রিণী হ'ল তখন যশোদা আহার-নিদ্রা বাদ দিয়ে দিনরাত তার সেবা-তত্ত্বা করাতে লাগল। কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টা করেও তাকে সে বাঁচাতে পারলে না। মরবার সময় হকুমের বৌ তার একমাত্র অনাথ ছেলেকে যশোদার হাতে পঁপে দিয়ে বললে, "বোষ্টমী দিদি, আমি চলে যাচ্ছি—কিন্তু এটাকে তোমার হাতেই দিয়ে গেলাম। যশোদা তোমার গোপালকে ভূমি দেবো।"

হকুমের বৌ মারা গেলে যশোদা গোপালকে কৈলে করে আশ্রমে ফিরে এল।

রক্ত-মাংসের গোপালের আগমনে যশোদার আশ্রমে পাথরের গোপালের সেবাস্বত্বের ক্রটি হতে লাগল। এই জীবন্ত গোপালটাই অহুস্ফণ তার কোল জুড়ে রইল। এতদিন পরে যশোদা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলে যে, পাথরের ঠাকুরের সেবায় সবটা মন ভরে না, যদিও তার পেট ভরাতে তিকালক হৃদকুঁড়াই যথেষ্ট। কিন্তু যে রক্ত-মাংসের হৃদে শিশুটি তার সমস্ত অন্তরকে অনির্বচনীয় মাধুর্যে পূর্ণ করে তুলেছে তাঁর উদরপুষ্টি করতে হলে শুধু তিকালরত্নের উপর নির্ভর করলে চলবে না। অজ ব্যবহার দরকার। কিন্তু কি করা যায়।

অনেক ভেবে চিন্তে যশোদা স্থির করলে যে, সে কাছারির

নায়েবের বীসায় চাকরি নেবে। একদিন সকালবেলা সে নায়েবগিরী কাছে গিয়ে হাজির হ'ল। নায়েবগিরী তাকে দেখে মহাখুশী, বললেন—“এলো, বোষ্টমী দিদি বস, ছুটো গোপালের গান পাও।” পুজা আসন্নপ্রায়। শরতের এক কালি সোনালী রোদ উঠানের একপার্শ্ব পেয়ারা গাছের মাথায় যেন সোনা মাখিয়ে দিয়েছে। গাছের ছায়ায় বসেই হুঁজনাতে কথাবাড়া হচ্ছিল। দূরে মাথলার ঝালের পেছনে মেঘনার কালো বারিরাশির অনন্ত প্রসার নজরে পড়ে। সুনীল আকাশে শেফালি ফুলের মত শাদা মেঘগুলো মেঘনার বৃকের উপর দিয়ে ওপারের উদ্দেশে পাড়ি জমিয়েছে। মাথলার ঝালের উপর দিয়ে ভেসে চলেছে নীল পাল তোলা একটি ছৈওয়লা নৌকা। মাঝি পিছনে হাল ধরে বসে তার-ধরে ভাটিয়ালা গান জুড়ে দিয়েছে। গানের ছুটো কলি নায়েব-গিরীর কানে ভেসে এল—

“মেঘনা নদীর ঐ পারে
ধানা নাছিরনগরে...”

—তুনে নায়েবগিরীর বৃকের ভেতরটা যেন কেমন করে উঠল, “মেঘনা নদীর ঐপারে, ধানা নাছিরনগরেই” যে তার কন্যার স্বপ্নবাড়ী।

নায়েবগিরীর অনুরোধে কণ্ঠের সবটুকু মাথুর্য্য ঢেলে দিয়ে যশোদা গাইতে শুরু করলে—

“গুন ব্রজরাজ স্বপনেতে আজ
দেখা দিয়ে গোপাল...”

গোপাল পর্য্যন্ত বলেই যশোদা থেমে গেল...তার নিরুত্তর আবেগ অশ্রুপ্রাবনের মধ্যে মুক্তি পেল—তার গোপাল যে আজ তিন দিন যাবৎ আশপেটা বেয়ে আছে।

নায়েবগিরী অবাক—সমবেদনার সুরে বললেন—“কি হ'ল বোষ্টমী দিদি, তোমার আবার হুঃখ কিসের, নাও চোখ মোছো—ছুটো বন্ধকথা শোনাও দিকি।”

যশোদা আঁচলের হুঁটে চোখ মুছে বললে—“না দিদি, বন্ধকথা শোনাবার মত অবস্থা এখন আমার নয়—আমার গোপাল আজ অভুক্ত। আজ্ঞা দিদি, আমাকে তোমাদের বাড়ীতে চাকুরাশী রাখবে—মাইনে যা খুশী দিয়ে—গোপালকে যে আমি ছুঁবেলা পেটতরে বেতে দিতে পারি নে।”

নায়েবগিরীর মুখে রা নেই। যশোদা বোষ্টমী তাঁর কাছে চাকরিপ্রার্থিনী হয়ে এসেছে—সেই যশোদা জীবনে যে কখনও কারও কাছে হাত পাতে নি।

শেষ পর্য্যন্ত নায়েবগিরী রাজী হলেন। সবেতনে যশোদা নায়েববাড়ীতে কাছে নিযুক্ত হ'ল। জল তোলা রাসন মাঝা কাপড় কাচা—এ সমস্ত টুকিটাকি কাজের তার পড়ল তার ওপর।

এদিকে নূতন পরিবেশে এসে ধীরে ধীরে যশোদার মনোজগতেও ঘটল বিরাট পরিবর্তন। এদের ঐশ্বর্য্যের ছটা,

বধূদের বেশভূষার বাহার, অলঙ্কারের প্রাচুর্য্য তার চোখ ঝলসে দিলে। নিজের নারী-সত্তা যেন এক নূতন তাৎপর্য্যে মণ্ডিত হয়ে তার কাছে দেখা দিলে। এতদিন পরে তার মনে হ'ল সংসারে তার যা পাওনা, সে তার কিছুই পায় নি। সারা জীবন সে শুধু বঞ্চিত হয়েই এসেছে। ঐ বিভলালী অভিজাত পরিবারের ঐশ্বর্য্যদন্ডার অনবরত তার মনকে প্রলুব্ধ করতে লাগল। তার সর্ব্বস্ববঞ্চিত জীবনের রিক্ততা অহুঙ্কণ তার মনকে গীড়া দিতে লাগল। অত্যন্ত বেদনার সহিত তার মনে পড়ল—বনী পরিবারে তার বিয়ে হয়েছিল, কিন্তু ঐশ্বর্য্যের পানপাত্র তার ওঠের সামনে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই যেন কার অভিশাপে দূরে সরে গেল। একটি সুধৈর্য্যপূর্ণ মেহনীদের মধ্যে কেন তার ঠাই হ'ল না। তার স্বপ্ন কেন ভেঙে গেল ?...

ক্রমে অর্থের প্রতি জমাল যশোদার উৎকর্ষ্য্য মোহ, তার প্রমাণ পাওয়া গেল যখন তার হাতে প্রথম মাইনের টাকা কয়টি এল সেদিন। বাড়ীতে এসে সে টাকা কয়টিকে যে কতবার নেড়ে চেড়ে হুঁটাং করে বাচ্চিয়ে দেবেতে লাগল তার আর অন্ত নেই, বার বার বৃকের উপর চেপে ধরে সেগুলোর স্পর্শস্বপ্ন সে অহুঙ্কণ করতে লাগল; তার পর এক টুকরো কাপড় দিয়ে মুড়ে ঘরের দুঁটির মধ্যে ছুটো করে তাতে রেখে দিলে।

স্বজনপরিভাষা যশোদা আবার গোপালকে কেজ করে ঘর-সংসারের নীড়-রচনার স্বপ্ন দেবেতে লাগল।...যদি তার হাতে প্রচুর টাকা হয়, তা বড় হলে গোপালকে বিয়ে করিয়ে সে ঘরে আনবে টুকটুকো রাঙা বোঁ, তার সর্ব্বস্ব দেবে সে সোনার গয়নার মুড়ে।...এমনি ভাবে চলল তার দিবা-স্বপ্নের জালবোনা।...একটি সংসারের সে হবে সর্ব্বমন্ত্রী কর্ত্তী। তার নীড়রচনার আকাঙ্ক্ষা ভবিষ্যতে সার্থক ও সফল হয়ে উঠবে।

যশোদাকে পেয়ে বসল সঞ্চয়ের মোহ—প্রাণ পেলেও সে ঐ টাকা থেকে পাই পরস্যাটী ধরচ করবে না এই হ'ল তার পণ। গোপালের জেভেই সে নায়েববাড়ীতে চাকরি নিয়েছিল। কিন্তু গোপালের ভবিষ্যতের কথা ভাবতে ভাবতে তার বর্ত্তমান সবচেয়ে সে হয়ে উঠল উদাসীন। টাকা জমানোর ব্যতিক্রম তার মাথায় এমনভাবে চেপে বসল যে প্রাণান্তেও সে তার মাইনের টাকা থেকে একটি পরস্যা ধরচ করত না—ফলে, আশপেটা বেয়েই গোপাল গোহুলে বাড়তে লাগল। এমনি করে লক্ষ্যের চেয়ে উপলব্ধি যশোদার কাছে বড় হয়ে উঠল।

এমনি ভাবে কাটল কয়েক মাস। যশোদার হাতে জমাল টাকা ত্রিশেক। এখন এই টাকাকে কি ভাবব বাতানো যায় সেই হ'ল তার বিঘ্ন চিন্তা। কেউ কেউ স্বপ্নে টাকা ষাটানোয় পরামর্শ দিলে—কিন্তু সে টাকা কবে পাওয়া যাবে

তার কোনো খরচা নেই সুতরাং প্রমোদী তার মনঃপূত হ'ল না। সে শুধু ভাবতে লাগল, এমন কোন উপায় যদি থাকত যাতে রাতারাতি অটেল টাকার মালিক হওয়া যায়।...

যশোদার একান্ত মনের প্রার্থনা ভগবান বোধ করি, শুনলেন। হঠাৎ কাছারীতে লটারীর টিকিট বিক্রীর হিড়িক পড়ে গেল। কাছারীর কয়েকজন ছোকরা জিপুয়া লটারীর টিকিট এনে ধনী গরীব সবাকারই কাছে বিক্রী করতে লাগল। যে যার সামর্থ্যমত টিকিট কিনতে লাগল।

যশোদা যখন শুনলে যে বরাতে থাকলে এই লটারীর দৌলতে সে লাখ টাকার পর্যন্ত মালিক হয়ে যেতে পারে তখন সেও টিকিট কিনলে—একখানা ছ'খানা নয় ছ'টাকা করে পনেরখানা জিশ টাকার টিকিট। এই কয় মাস হাড়ভাড়া খাটুনি বেটে যা সে জমিয়েছিল, তার বুদ্ধের পাঞ্জরের মত সেই জিশটি টাকা খরচ করে সে কিনলে পনেরখানি ছোট ছোট ছাপানো কাগজের টুকরো। সেগুলো সে সেই বাণেশ্বর খুঁটির মধ্যেই সম্বন্ধে রেখে দিলে।

তারপর প্রতি রাতে নিজের নিভৃত কুঠিরে হেঁচা কাঁধার শুয়ে শুয়ে যশোদা লাখ টাকার স্বপ্ন দেখতে লাগল।

যাকে পায় তাকেই সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লটারীর কথা জিজ্ঞাসা করে। লোকেরা তাকে নিয়ে একটু মজা করবার প্রলোভন সঞ্চার করতে পারে না, বানিয়ে বানিয়ে তারা লটারী সম্পর্কিত নানা কাহিনী বলতে শুরু করে। কোথায় কবে কোন পথের ভিখারী লটারীর টিকিট কিনে লক্ষপতি হয়েছিল মন্তব্যের মত সে কাহিনী শুনতে শুনতে যশোদা একেবারে তব্বর হয়ে যায়। তার ভাবান্তর দেখে গাঁয়ের লোকেরা তার নতুন নামকরণ করলে লটারী-বৈকুণ্ঠী।

লাখ টাকা হাতে পেলে যশোদা কি করবে তাই নিয়ে সে সময় সময় ভাবতে বসে। কিন্তু কি করবে সে সম্বন্ধে কোনও সুস্পষ্ট ধারণা তার মনে দানা বেঁধে ওঠে না। ধানিক-কণ চিন্তা করবার পর তার মনের মধ্যে সব যেন তালগোল পাকিয়ে যায়। মহাসমুদ্রের সামনে বসে তার বিরটিত্বের কথা চিন্তা করে মাহুস যেমন ভাবনার অতলে তলিয়ে যায়, যশোদার মনের অবস্থাও অনেকটা তেমনিধারা।

এমনি করে কাটল তিনটি মাস। শেষে লটারীর কল বেরল, অধিকাংশেরই অদৃষ্টে অষ্টরজা। ভাগ্যবান ছ'এক জনের নামে টিকিট উঠল বটে, কিন্তু কারুর প্রাপ্তির অঙ্কই লাখ তো দুয়ের কথা, শতের কাছ বেঁধেও গেল না।

যশোদার জিশটি টাকাই জলে গেল।

লটারীর কল বেরিয়েছে শুনে যশোদা খুশী হয়ে উঠল, তার প্রব বিশ্বাস টাকা তার নামে নিশ্চয়ই উঠেছে। হস্তদণ্ড হয়ে সে যে ছোকরাটি তার কাছে টিকিট বিক্রী করেছিল তার বাড়ীতে গিয়ে হাজির হ'ল। সামনে তাকে পেয়েই জিজ্ঞাসা করলে—“আমার নামে কত টাকা উঠল?” ছোকরাটি প্রথমে ব্যাপারটা

বুঝতে পারেন নি, প্রশ্ন করলে, “কিসের টাকা বোষ্টমী?” যশোদা এবার রীতিমত চটে গিয়ে বললে—“কিসের আবার! তোমার কাছ থেকেই তো টিকিট কিনলাম গো—সেই যে কি বলে লটারী না কি।” ছেলেটির নিকট এতকণে ব্যাপারটা খোলসা হ'ল। যশোদার লাখ টাকার স্বপ্ন দেখার কথা তার অজানা ছিল না, বরং দেখবার স্বপ্নে সে বললে—“তোমার নামে লাখ টাকাই তো উঠেছে।” “লাখ টাকা!”—আনন্দে যশোদা আকাশ কাটিয়ে চীংকার করে উঠল। পুলকে সে যেন উপচে পড়েছে—নিজেকে আর যেন ধরে রাখতে পারছে না। খুশীভরা সুরে বললে—“তা টাকাটা কখন কোথায় পাবো বল না গো।” ছোকরাটি ভাবলে বোষ্টমীকে নিয়ে একটু মজা করা যাক, বললে—“বল কি, টাকাটা এখনও তোমার হাতে আসে নি। সে তো অনেককণ হ'ল নায়েব বাবুকে দিয়ে এসেছি, তা তুমি পাওনি বুঝি।” শুনে যশোদা সেখানে আর দুহুর্ভকালও দাঁড়াল না, একছুটে চলে এল নায়েব-বাড়ীতে। হাঁপাতে হাঁপাতে নায়েব-মশায়ের সামনে হাজির হয়ে বললে—“আমার লাখ টাকা।” নায়েবমশাই তো হতভম্ব। ব্যাপারখানা কি? যশোদার মাথাটা কি শেষ পর্যন্ত ধারাপ হয়ে গেল নাকি। তিনি চুপ করে রইলেন, তাকে নীরব দেখে যশোদা আবার বললে—“সেই যে লটারীর টাকা গো—সত্য বললে, আপনার কাছেই নাকি আমার টাকাটা পাঠিয়েছে। এখন টাকাগুলো আমার দিয়ে দিন।” এবার আসল ব্যাপারটা কি তা বুঝতে নায়েবমশায়ের আর বাকী রইল না, সত্বর ছুটামির কথা চিন্তা করে তিনি হঠাৎ উচ্ছ্বাস করে উঠলেন। দেখে যশোদার মন সন্দেহে পূর্ণ হয়ে উঠল, এ বিষয়ে তার মনে লেশমাত্র সংশয় রইল না যে, নায়েব টাকাটা গাপ করবার মতলবে আছেন। সে মনিব-চাকরাণী সম্পর্ক ভুলে গিয়ে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বলে উঠল—“হয়েছে আর দাঁত বের করে হাসতে হবে না, ভালোয় ভালোয় আমার টাকাগুলো দিয়ে দাও দেখি।” নায়েব দেখলেন আচ্ছা বিপদ। তিনি ধমকে তাকে বিদায় করলেন।

ক্ষুর মনে যশোদা নিজের বাড়ীর পানে রওনা হ'ল। মনে মনে সে নায়েবের মুণ্ডপাত করতে লাগল।

এখন কি করে টাকাটা পাওয়া যায় তাই হ'ল তার একমাত্র চিন্তা। নায়েবমশাই টাকাটা ঘের দিয়েছেন, একথা ভাবতে ভাবতে তার মাথা প্রায় বিকৃত হবার উপক্রম হ'ল। নায়েব-বাড়ীর চাকরি সে ছেড়ে দিলে, নাওয়া-খাওয়াও এক রকম বন্ধ হবার যোগাড়। যেদিন মন-মেকাজ ভাল থাকত সেদিন বালগাপালের ভোগ দিত—তারপর রান্না-বাড়ী করত। কিন্তু প্রায়ই তার উননে হাড়ি চড়ত না, পাথরের দেবতার অদৃষ্টে ভোগ জুঁত না—আর একদিন যে সদ্য-মাতৃহারা অনাথ শিশুটিকে পরম স্নেহে সে নিজের বাড়ীতে আশ্রয় দিয়েছিল তার সেই আদরের গোপালের অদৃষ্টে

ঐত চূড়ান্ত দুৰ্ভোগ—কুটীরের আভিনায় পড়ে সে ফুঁবার জ্বালায় খুঁকত।

গোপাল যখন ফুঁবার জ্বালায় আকুলভাবে কাদত তখন যশোদা তার দিকে কেমন যেন অসহায়ভাবে ক্যাল ক্যাল করে তাকিয়ে থাকত। তারপর তাকে কোলে টেনে নিয়ে তার গায়ে মাধায় হাত বুলিয়ে বলত—“গোপাল বাপ আমার, কাদিসনে—আর ক’টা দিন। লটরীর টাকাটা হাতে এলেই আর আমাদের পায় কে? বড় হলে তোকে বিয়ে করা, রাজা বোঁ ঘরে আসবে।” রাজা বোঁয়ের আশ্বাসে গোপালের ফুঁবার যাতনা ভিলমাত্র প্রশমিত হ’ত কিনা কে জানে।

দিনকতকের মধ্যে তার বয়স যেন দশ বৎসর বেড়ে গেল। শেষ পর্যন্ত তার মনে এ বিষয়ে আর লেশমাত্র সংশয় রইল না যে, তার পাওনা লাখ টাকা এ জীবনে তার হাতে আসবে না। তার স্বপ্ন তো সকল হ’লই না, বরং অসম্ভবের প্রত্যাশায় তার এত কষ্টে সঞ্চিত সবগুলো টাকা জলে গেল—একথা ভাবতে ভাবতে যশোদার মস্তিষ্কের স্নায়ু-কেন্দ্রের মধ্যে কি যেন একটা বিপর্যয় হয়ে গেল। ঠিক পাগল সে হ’ল না বটে, কিন্তু তার চেহারায় আচরণে উজ্জ্বিত ধরণধারণে স্বাভাবিক সুস্থ মানুষের কোনো লক্ষণই রইল না। দিন-রাত সে শুধু হাতের আঙুলে গুণে কি হিসাব করে, আর মুখে বিড় বিড় করে আওড়ায়—“লাখ টাকা...এককুড়ি দশ টাকা আর এককুড়ি.....”

এককুড়ি দশ টাকার অর্থাৎ ত্রিশ টাকার কত গুণ লাখ টাকা তাই ভাবতে ভাবতে বোঁব করি সে দিশেহারা হয়ে যেত।

পাগল বাস্তবকে ভুলে যায়। সে বাস করে তার কল্পনার জগতে, কিন্তু কঠোর বাস্তব সত্য যশোদার মনে সদা জাগ্রত—তার বুকের রক্ত জল করা ত্রিশটি টাকা হারানোর হুং তার জীবনের মর্ম্মস্থলে বাসা বেঁধেছে, তার সমস্ত সত্যকে বিধিয়ে তুলেছে।

মানুষের দুর্ভাগ্য নিয়ে কৌতুক করা মানুষের চিরন্তন প্রবৃত্তি—এতে মানুষ একটা উৎকট উল্লাস অহুভব করে। মহা-পুরুষদের কথা আলাদা। কিন্তু কারো সর্বনাশ হয়েছে শুনলে সাধারণ মানুষের মনে প্রথম স্বতঃই যে অহুভূতি জাগে সে হচ্ছে পুলকানুভূতি। হুঃখবেদনার ভরা নিয়েই তাকে জীবন-নদীতে পাতি জমাতে হয়, তাই কারুর ভরাডুবি হতে দেখলেই সে মনে ধানিকটা সান্ত্বনা লাভ করে।

মালীপাড়ার বড় মালী একদিন হাটে যাচ্ছে, হঠাৎ যশোদা বোঁঠমী তার পথ আগলে দিচ্ছিল। করলে সেই একই প্রশ্ন—লটরীর টাকাটা কি করে পাওয়া যায়। নায়েবকে যে যশোদা সন্দেহ করত সেটা লোকের মুখে মুখে সারা গ্রামে প্রচারিত হয়ে গিয়েছিল। মজা করবার জন্তে বড় বললে—“তা যাও না গো, পেসিডেন্ন বাবুর কাছে। তাঁর কাছে গিয়ে

নাশিশ কর, তখন দেখা যাবে নায়েবের কত মুরদ—টাকা না দিয়ে তিনি কি করে পার পান।”

যশোদা ভেবে দেখলে পরামর্শটা যুক্তিযুক্ত বটে। নায়েবের বিরুদ্ধে নাশিশ করবার মন্তলবে সে সোজা গিয়ে হাছির হ’ল যুনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট সুরেশবাবুর কাছে।

নাশিশ শুনে প্রেসিডেন্ট একটুখানি মুচকি হাসলেন। বড় দুর্ভাবনায় পড়ে গেল যশোদা—তা’হলে টাকাটা ভাগ্যান্ধির ব্যাপারে ইনিও আছেন নাকি। ধানিক বাদে প্রেসিডেন্ট বললেন—“তা বোঁঠমী, তুমি হলে লম্বাসিনী, তোমার আবার টাকার দরকার কি? ধর না যে টাকাটা তোমার হাতছাড়াই হয়ে গেছে, তাতেই বা ক্ষতি কি?”

আগুনে যেন ঘুতাহতি পড়ল। যশোদা গলা একেবারে সপ্তমে চড়িয়ে গর্জ্জে উঠল—“কি বলল আমি সন্নিসী। আমি সন্নিসী হতে যাব কেন? আমার বাড়ী-ঘর নেই—আমার ছেলে নেই। গোপাল বড় হ’লে তাকে বিয়ে করিয়ে বোঁ আনতে হবে না। সে কি চাট্টিখানি কথা। তাতে কত টাকার দরকার ভেবে দেখেছ? তুমি সন্নিসী হওনা গো—না কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা জমিয়ে তোমরাই শুধু মজা পুটবে...আর...” যশোদা আর কিছু বলতে পারলে না, উত্তেজনার ধর ধর করে কাঁপতে লাগল।

হঠাৎ যেন প্রেসিডেন্টের দিব্যদৃষ্টি খুলে গেল—যশোদার অবচেতন মনের চেহারাটা যেন তিনি সুস্পষ্টরূপে দেখতে পেলেন, বুঝলেন কল্পনার স্বর্গলোক রচনা করে যশোদা তার বিভ্রান্ত রিক্ত জীবনের ব্যাভাবের ভুলবার জন্তে প্রাণপণ প্রয়াস পাচ্ছে। তিনি ভেবে দেখলেন, যশোদার এ স্বপ্ন ভেঙে দিয়ে তাকে আশাহত করে লাভ নেই। বরং এমন কথা তাকে বলে দেওয়া যাক যাতে টাকাটা এক সময় তার হাতে আসবে এই আশা নিয়েই সে দীর্ঘকাল কাটিয়ে দিতে পারে। ধানিক বাদে খুব দরদ ভরা সুরে তিনি বললেন—“বোঁঠমী, তোমাকে ওরা ভুল ধর দিয়েছে। টাকা তুমি পেয়েছ বটে, কাগজে তোমার নামও বেরিয়েছে আমি নিজে দেখেছি, কিন্তু টাকাটা এখনো আসে নি। তা আসবে পাঁচ আপিসে তোমার নামে। তোমাকে ওরা ভুল বুঝিয়েছে। তোমাকে ছাড়া আর কাউকে তো টাকা দেবে না।”

শুনে যশোদার মনের ওপর থেকে একটা দুর্ভাবনার বোঁবা যেন নেমে গেল। এক মুহূর্তেই সে সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে উঠল। প্রাণের আকাশ থেকে বহু দিনের পুঞ্জীকৃত মেঘভার কেটে গিয়ে হঠাৎ একদিন যেমন সারাদি আকাশ উজ্জল সূর্য্যকিরণে বলমল করতে থাকে তেমনি প্রায় হাতে যশোদার সারা মুখখানি উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

এর পর থেকে যশোদার কাজ হ’ল রোজই একবার বিকালের দিকে পোস্ট আপিসে হাজিরা দেওয়া। গ্রাম-গ্রামে

বাঁশঝাড়ের তলায় ছায়ানিভৃত পোস্ট আপিসটিতে বোজাই বৈকালিক আড্ডা জমে, এক একজন করে গ্রামের লোকেরা সেখানে এসে জড়ো হয়—গল্প-গুজবে সেই নিরালা জায়গাটি মুগ্ধরিত হয়ে ওঠে। সন্ধ্যার প্রাক্কালে পিয়ন আসে ডাক বাড় করে। চিঠি মনি অর্ডার ইত্যাদি লোকেরা পোস্ট আপিস থেকেই নিয়ে যায়।

প্রতিদিন বিকালের পড়ন্ত রোদে বাঁশঝাড়ের মগ-ডালের মন্থন-চিকণ পাতাগুলো যখন সবুজে শোনার মেশানো বালরের মত বলমল করতে থাকে তখন নিয়মিত ভাবে পোস্ট আপিসে এসে হাজির হয় যশোদা। যতক্ষণ চিঠি মনি অর্ডার ইত্যাদি বিলি হয় ততক্ষণ সে ডাকের টেবিলের উপর বুক পড়ে নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে থাকে—চোখে তার একাধি প্রলুব্ধ দৃষ্টি। যখন এক এক জন মনিঅর্ডারের টাকা নেয় তখন তার কোটরগত চোখ দুটো স্থাপদের মতো জলে ওঠে, সে ভাবে এবার তার পালা—লাখ টাকা হাতের মুঠোর মধ্যে এল বলে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন চিঠি মনি অর্ডার ইত্যাদি বিলি শেষ হয়ে যায়—সুঝ হয় ডাকঘর বন্ধ করবার তোড়-জোড় তখন তার চোখের সে অস্বাভাবিক দীপ্তি নিবে যায়। তার মুখে ধনিয়ে আসে হতাশার কালো ছায়া।

বোজাই সে নিরাশ হয়, কিন্তু তাই বলে হাল ছেড়ে দেয় না। নিত্যনিয়মিত সময়ে ডাকঘরে এসে হাজিরা দেওয়া তার চাই-ই।...

সন্ধ্যার ছায়া ডাকঘর সংলগ্ন বাঁশ-বনে ধনিয়ে এসেছে। সবেমাত্র পোষ্ট আপিস বন্ধ হ'ল। সবাই যে যার ঘরে ফিরে গেছে। যশোদা তখনো ঠাণ্ড বসে আছে পোস্ট আপিসের বারান্দায় পেঠার উপর। খানিক বাদে সে উঠে দাঁড়াল, তার পর ছায়াঙ্ককার বাঁশবনের ভেতর খানিকক্ষণ অকারণে ঘুরে বেড়াল—শেষে মাথলার বালের পাড়ের খুঁড়ি পথ ধরে রওনা হ'ল বরাবর মেথনা নদীর পানে।

সারারাত হয় তো সে লক্ষ্যহীন ভাবে মেথনার তীরে বিচরণ করেই কাটিয়ে দেবে। অসম্ভব অবাস্তবের আশা তার দিনের শান্তি, রাতের ঘুম সব কিছুই হরণ করে নিয়েছে।

উর্ধ্বমুখর মেথনার কূলে বসে সারারাত সে হয় তো স্বপ্ন দেখবে—লাখ টাকার স্বপ্ন—টাকাগুলো তার হাতে এসে পড়ল। আর তার অভাব নেই। দেখতে দেখতে গোপাল বড় হয়ে উঠল—ঘরে এল রাজা বো। ধনজনপরিপূর্ণ শান্তিভরা একটি পরিবার—আর যশোদার সেই পরিবারে একচ্ছত্র আধিপত্য।

যশোদার রাতের পর রাত হয় তো এমনি করে স্বপ্ন দেখেই কাটিবে, কিন্তু তার কুটীরে ব্যথিত কন্ডালসার যে শিশুটি ক্ষুধায় ভয়ে মৃতপ্রায় হয়ে বাল গোপালের মূর্তির পাশে পড়ে থুঁকছে, যাকে কেন্দ্র করে যশোদার এই স্বপ্নলোভ রচনা—তার এ রাত হয় তো কাটিবে না। চারদিকে মৃত্যুপূরীর নিস্তব্ধতা, বনের ভেতর থেকে ভেসে আসছে একটা পেঁচকের কর্কশ কণ্ঠের জীতিজাগানো চীৎকার। ঘরের ভেতর মিট মিট করে জ্বলছে একটি মাটির প্রদীপ। সেই ক্ষীণ আলো চারদিকের নিরানন্দ পরিবেশকে যেন শতগুণে উজ্জ্বল করে তুলেছে। গোপাল অতি কষ্টে ক্লান্ত দেহটাকে টেনে নিয়ে গেল বাল-গোপালের মূর্তির সামনে। একটা পাথরের বাটিতে খানিকটা চালকলা মাখানো শুকনো জুগুৎযুক্ত পদার্থ—যাকে প্রসাদ বললে প্রসাদ কথাটার অপমান করা হয়। তাতে পোকা কিলবিল করছে।

কবে যে যশোদা বালগোপালকে এই ভোগ দিয়েছিল তা গবেষণার বিষয়।...

ঘরে এক কথাও বাজতব্য নেই।

চার দিনের অল্পক্ষণ গোপাল সেই মহাপ্রসাদই গোত্রাদে সিলতে লাগল।

যবনিকা

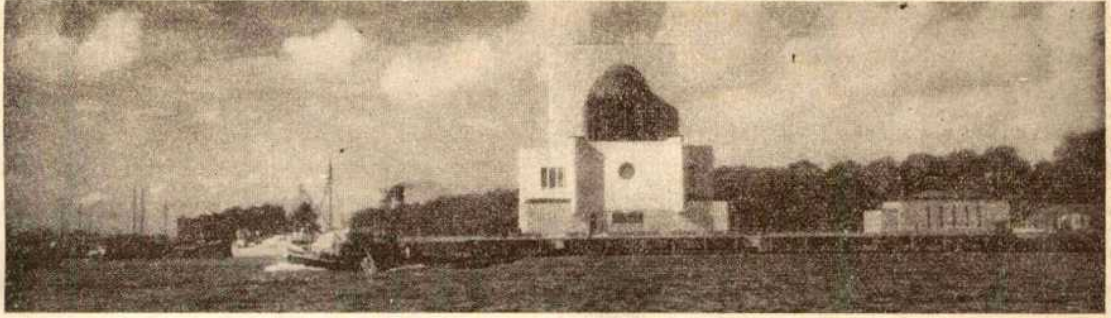
শ্রীমণীন্দ্র গুপ্ত

ধূ ধূ করা পথে রৌদ্র যখন বরে পড়ে
সরু হয়ে নীল পৃথিবীটা ছোট হয়ে;
তারি ভালো লাগে ভাবতে তখন মনে মনে
তোমার যে কথা ফুল হয়ে দোলে মন-বনে।

কখনো প্রভাত চায় না তোমার ভালোবাসি,
বিন্ধাট আকাশে আসেনাকো তাই রাজা হাসি;
অথচ জ্যোৎস্না জীবনে আসে না একবারো
তাইতো আমার সন্ধ্যা স্বপ্ন-ঘুমে পাচ।

এদিকে তোমার মুকুলিত দেধি মঞ্জরী,
একটি কুসুম হির হয়ে চায় শরীরী;
অন্ধনে ছায়া, কাণ্ডন ছড়ানো নীল চোখে,
ছোট কুটির তবু ভরা যেন মায়ালোকে।

অথচ আমার পৃথিবী কেন যে শেষ হোলো,
মালতী লতায় ফুল বরে গেল ছলছলো;
তুমি ছায়া হ'লে প্রদীপে ছড়ালে বিভীষিকা,
পায়ে পায়ে তাই একে দিয়ে গেল যবনিকা।



রটারডামের নিকটবর্তী মাস নদীর নীচেকার সুড়ঙ্গের একটি আলোবাতাসযুক্ত গৃহ

ইউরোপের নিম্নভূমি—বেলজিয়ম ও হল্যান্ড

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

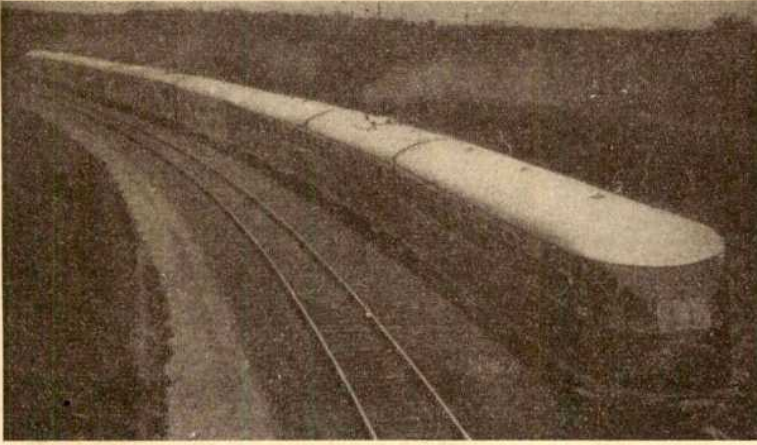
ইংরেজী 'নেদারল্যান্ডস' মানে নিম্নভূমি বা নিম্নপ্রদেশ। 'নেদারল্যান্ডস' বলিতে পূর্বে হল্যান্ড ও বেলজিয়ম ও ইদানীং রাজনৈতিক কারণে মাত্র হল্যান্ডকে বুঝায়। কিন্তু এই উভয় অঞ্চলকে নৈসর্গিক অবস্থার গতিতে ঐ নাম দেওয়া হইয়াছিল। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে এই স্থল নিম্নে, এইজন্তই ইহার ঐ নাম। এই দুইটি দেশ সমুদ্রতীরে অবস্থিত হইয়াও কেন জলে প্লাবিত হয় না, বা ডুবিয়া যায় না? ইহার কারণ সমুদ্রতীর ধরিয়া উঁচু বাঁধ নির্মিত রহিয়াছে। বাঁধের কোন অংশ ভাঙিয়া গেলে যে উচ্চ জলে প্লাবিত বা নিমগ্ন হইয়া যাইতে পারে তাহা সত্তগত মহাসমরকালেই বুঝা গিয়াছে। জার্মান নাৎসীগণ যুদ্ধের মধ্যে বাঁধ ভাঙিয়া দিয়া হল্যান্ডের বহু অঞ্চল জলে একেবারে ডাসাইয়া দেয় এবং সেখানকার জীবজন্তু, কৃষিক্ষেত্র সমস্তই বিনষ্ট করিয়া ফেলে। গত মহাসমরে বেলজিয়ম হল্যান্ড উভয় দেশেরই বিস্তার ক্ষতি হইয়াছে। তাহাদের এই ক্ষতির তুলনাই হয় না। তবে যুদ্ধ ধামিবার তিন বৎসরের মধ্যেই দুইটি দেশ পুনরুদ্ধার ও পুনর্গঠন কার্যে আশ্চর্য-রকম অগ্রসর হইয়াছে। বিধ্বস্ত নগরী পুনর্গঠন, রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ী পুনর্নির্মাণ, ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি, শাদ্যসমস্তার সমাধান প্রভৃতি কার্যে দুইটি দেশই যেরূপ সাফল্য অর্জন করিয়াছে তাহা শুনিলে বিশ্বব্দের অবধি থাকে না। অথচ দুইটিই ইউরোপের অতি ক্ষুদ্র রাজ্য, প্রত্যেকটিরই জনসংখ্যা এক কোটিও হইবে না। আয়তনেও আমাদের এখানকার দুই তিনটি জেলার সমান। এক জন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ হইতে উভয় দেশের বর্তমান কার্যকলাপ সম্বন্ধে এখানে কিছু বলিব। প্রথমেই হল্যান্ডের কথা বলি।

হল্যান্ড

নাৎসীদের উপদ্রবের বিষয় একটি আগেই উল্লেখ

করিয়াছি। যুদ্ধের বাঁধ ভাঙিয়া দিয়া উহার হল্যান্ডের অধিবাসীদের যে ভীষণ ক্ষতি করিয়াছিল তাহা নিঃসন্দেহ। কিন্তু জার্মানীর পতনের সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতা কিরিয়া পাইবার অল্প সময়ের মধ্যেই তাহার এই ক্ষতি অনেকটা পূরণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। অধিকতর আশ্চর্যের বিষয়, পূর্বেকার যান-বাহন ব্যবস্থা একেবারে বাতিল করিয়া দিয়া আধুনিকতম বিজ্ঞানের সহায়তা গ্রহণপূর্বক নূতন ব্যবস্থা করা হইয়াছে ও হইতেছে। হল্যান্ডের রেল লাইনের দুই-তৃতীয়াংশ নাৎসীরা যুদ্ধের মধ্যেই তুলিয়া লইয়া যায়। এখন রেল লাইনও পুনঃস্থাপিত হইয়াছে এবং পূর্বে ব্যবস্থা বাতিল করিয়া দিয়া দ্বৈতাত্মিক রেলপথ স্থাপিত হইয়াছে। ১৯৫৩ সন নাগাদ হল্যান্ডের সর্বত্রই বৈদ্যুতিক রেলগাড়ীর প্রচলনের পরিকল্পনা কার্যকরী করা হইবে বলিয়া সরকার আশ্বাস দিয়াছেন। হল্যান্ডের মোয়ারজিক সেতু ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যার একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন। নাৎসীরা ইহারও কতকটা ধ্বংস করিয়া দিয়াছিল। সেতুটির ভগ্ন অংশ ইদানীং সম্পূর্ণ মেরামত হইয়া গিয়াছে।

হল্যান্ডের নগরী-পুনর্গঠন কার্যও একটি সুস্থ পরিচালনা অমুযায়ী পরিচালিত হইতেছে। 'দি হেগ' নগরী বিখ্যাত স্থপতি উইলিয়ম মেরিনাস ভাডকের নির্দেশে পুনর্নির্মিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সাধারণে পুরাতন রীতি-পদ্ধতি আর পছন্দ করে না, তাহার নূতনেরই পক্ষপাতী। হেগ নগরী একটি নূতন ধরনের শহর হইবে, না গতানুগতিক পুরাতন প্রথাঅুযায়ী ইহাকে গড়া হইবে এ বিষয় লইয়া সেখানে জোর তর্ক চলে। ডাডক বলেন, মানুষের কর্ম ও বাসোপযোগী করিতে পারিলেই নূতন নগরী নির্মাণের সার্থকতা। দেশের সংস্কৃতি ও সরকারী কর্ম-ক্ষেত্র হইবে এই নূতন শহর। শহরের কেন্দ্রস্থলে থাকিবে একটি লেকাও পার্ক, প্রতিটি অঞ্চলেও এক একটি ছোট পার্ক



হল্যান্ডে বৈহ্যতিকশক্তি চালিত আধুনিক ট্রেন

ধাকিবে। স্থপতি ডাডক পুরাতন রীতির মধ্যে যাহা ভাল তাহা গ্রহণ করিয়া সম্পূর্ণ নূতন ভিত্তিতে শহর গড়িতে লাগিয়া গিয়াছেন।

নাংসী আক্রমণ হইতে আমষ্টার্ডাম আকস্মিকভাবে রক্ষা পায়। এ শহরটি হইল “Venice of the North” অর্থাৎ উত্তরের ভেনিস। এই নগরীর মধ্যে বহু খাল, প্রত্যেকটি খালের দুই তীরে তরুবাধি। গৃহাদি প্রাচীন শিল্পের নিদর্শনস্বরূপ এখনও এখানে বিদ্যমান। সাধারণগণ্য পার্ক বা উদ্যানও বিস্তর। উদ্যানে উদ্যানে ফুলের কেরিওয়ালার প্রাচুর্য্য অধিবাসীদের সৌন্দর্য-প্রিয়তার দ্যোতক। এখানকার রিক্স্ মিউজিয়ম বা যাহুঘরটি হল্যান্ডের খ্যাতনামা শিল্পীদের চিত্রে সমৃদ্ধ। নাংসীদের আমলে এই সকল শিল্পীর চিত্রভাণ্ডার বিস্তর বিনষ্ট হইয়াছে, আবার বহু চিত্র দেশান্তরিত হইয়া তবে আপন অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছে। রেমব্রাঁ, ফ্রাঙ্ক-হল্ম, মেইজ, জিন-গ্লিন প্রভৃতি প্রখ্যাত শিল্পীদের কত চিত্র যে নষ্ট হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। ভ্যান পগের বহু ভাল ভাল ছবি কোপেন-হেগেনে চলিয়া গিয়াছে। ব্রাসেল্‌স এবং প্যারিসেও কিছু কিছু গিয়াছে। বিদেশে যুত শিল্পীই পার্লামেন্টের সদস্য, বনিক প্রভৃতি অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর রাজদূত বা দেশ-প্রতিনিধি।

প্রাচীন হল্যান্ডের অস্তিত্ব বা কিছু আমষ্টার্ডামেই অক্ষুণ্ণ হইয়াছে। কিন্তু রটার্ডাম সহজে তাহা আদৌ প্রযোজ্য নয়। এই বন্দরটির ডকে আগে কিছু কম করিয়াও প্রতি মাসে অন্ততঃ ছাওয়ারখানা জাহাজ নদর করিত। নাংসী আক্রমণে, বিশেষতঃ ১৯৪০ সনের তীষণ বোমাবর্ষণের ফলে এই ডকটি চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যায়। রটার্ডাম বন্দরটি পুনর্গঠনের জন্ত বর্তমানে সেখানে অতি দ্রুত কাজ হইতেছে। কিন্তু এখনও পূর্বাবস্থা প্রাপ্ত হইতে বেশ সময় লাগিবে। প্রত্যহ সকালে বিকালে মোটর বাসে করিয়া লোকে রটার্ডামের পুনর্গঠন কার্য দেখিতে যায়।

প্রথম বার দেখিবার কয়েক দিন অন্তর আর এক বার সেখানে গেলে বুঝা যাইবে পুনর্গঠন কার্য কত দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। যেখানে কয়েক দিন পূর্বেও কোন ঘর-বাড়ী দেখা যায় নাই, দ্বিতীয় বারে গিয়া সেখানে নূতন নূতন বড় বড় বাড়ী দৃষ্টিগোচর হইবে নিশ্চয়।

রটার্ডামের ইঞ্জিনিয়ার হইলেন ভ্যান ট্রা। রট নদীর উপর এই বন্দরটি অবস্থিত। ইহাকে সম্পূর্ণ আধুনিক বন্দর ও শিল্পনগরীর মত করিয়া গঠন করা তাহার উদ্দেশ্য। শহরের একাংশে উন্মুক্ত অঞ্চলে শিল্পকারখানাগুলি

প্রতিষ্ঠিত হইবে। ইহাতে শ্রমিকগণের স্বাস্থ্য অটুট থাকিবে। তাহাদের নিমিত্ত অল্প নানা রকম সুখ-সুবিধারও ব্যবস্থা করা যাইবে। জাহাজগুলি নগরীর মধ্যে রেল-স্টেশন এবং ব্যবসায়-কেন্দ্রের নিকট যাহাতে পৌঁছিতে পারে এইজন্ত সমুদ্র হইতে শহরের মধ্য দিকে কিয়দংশ গভীরভাবে কাটিবারও ব্যবস্থা করা হইতেছে। ব্যবসায়-কেন্দ্রে লোকের বাসগৃহ খুব কমই থাকিবে। লোকের বাসভবন, বাগান, বিজালয় দূরে দূরে যথাযোগ্য স্থানেই করার ব্যবস্থা হইতেছে।

হল্যান্ডে যে পুনর্গঠন কার্য এত দ্রুত অগ্রসর হইতে পারিয়াছে তাহার একটি প্রধান কারণ লোকজনের আর্থিক সুখ-সুবিধার দিকে সরকার পক্ষ হইতে প্রথম দিকেই বিশেষ দৃষ্টি রাখা। শ্রমিক সঙ্ঘগুলি খাদ্যশস্ত্র, প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য এবং শ্রমিকদের বেতনের হার উভয়ই কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণের সম্মতি দেওয়াতে ইহা সম্ভবপর হইয়াছে। কারণ তাহারা বুঝিতে পারিয়াছে যে, একতর ব্যবস্থা করা না হইলে হুঃখদের অভাব কোন মতেই মিটিতে পারে না। শিল্পব্যয়ের উৎপাদন ও রপ্তানি, নগর ও রাস্তাঘাট পুনর্নির্মাণ এবং আবহুয্যিক কার্যাদি একটি চতুর্বার্ষিক পরিকল্পনামুযায়ী নিয়ম-শৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন করা হইতেছে।

বড়ই সুখের বিষয়, হল্যান্ডে চোরাকারবারের মাথ তুলিবার আর সাধা নাই। আমাদের—ভারতবাসীদের পক্ষেও ইহা অনেকটা আশার কথা বটে। কারণ হস্ত এক দিন হল্যান্ডে যাহা হইয়াছে এখানেও উপযুক্ত পন্থা অবলম্বিত হইলে তাহা সম্ভব হইবে। এখনও হস্ত হল্যান্ডে কাপড়চোপড়, রেডিও-যন্ত্র, সিগারেট প্রভৃতিতে কতকটা চোরাকারবার চলিতেছে, কিন্তু তাহা একেবারেই নগণ্য। দুইটি উপায়ে হল্যান্ডের কর্তৃপক্ষ চোরাকারবারের পথ বন্ধ করিয়াছেন—প্রথমতঃ,

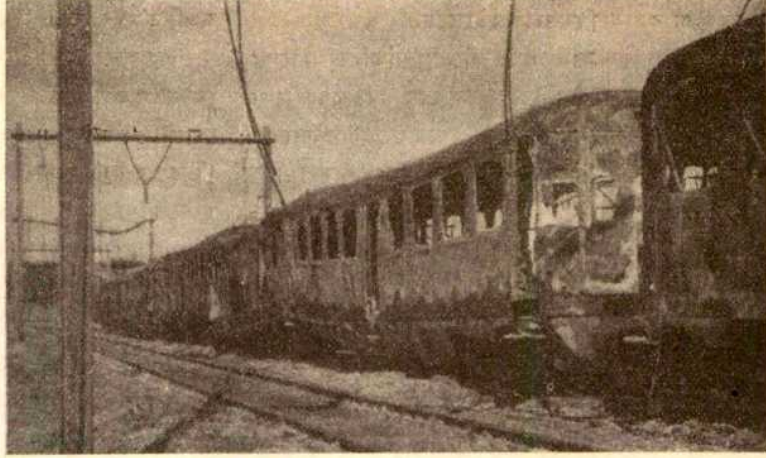
কম দামে প্রচুর খাদ্যবোঝ আমদানী এবং দ্বিতীয়তঃ চোরা-বাজারের চড়া দামের ভিত্তিতে বেতনের হার বাড়াইয়া লইতে অস্বীকৃতি। প্রথমটি কার্যে পরিণত করা হইয়াছে এই রূপে, —অত্যাবশ্যক খাদ্যবোঝের জন্য লোকের রেশন-কুপন শুধু দেওয়া হয় না, কম-আবী প্রত্যেক পরিবারের ক্রয়শক্তির সাক্ষ্যরূপ ক্রেডিট কুপনও প্রদত্ত হইয়া থাকে।

প্রচুর খাদ্যশস্ত্র রপ্তানী করিয়াও হল্যান্ডে যথেষ্ট খাদ্যবোঝ মজুত রহিয়াছে। এখানকার হোটেল রেষ্টুরাঁতেও আহারাদির জন্য ভাষ্য দামই লওয়া হয়। খাদ্যবোঝের সুবিধা হেতু বিদেশ হইতে বিস্তর লোক হল্যান্ড ভ্রমণে যায়। এবারে লাঞ্ছনাক্রমে মার্কিনীও হয়ত সেখানে গিয়া ভিড় জমাইবে।

বেলজিয়ম

হল্যান্ডের প্রতিবেশী হইল বেলজিয়ম। এই দুইটি ক্ষুদ্র রাজ্য ১৮১৫ হইতে ১৮৩০ সন পর্যন্ত এক রাজ্যই অধীন ছিল। শেষোক্ত বৎসরে বেলজিয়ানরা বিদ্রোহী হয় এবং হল্যান্ড হইতে আলাদা হইয়া স্বতন্ত্র রাজ্য ও রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে। তদবধি স্বতন্ত্র পথে চলিলেও একটি বিষয়ে উভয়েরই মিল রহিয়াছে, তাহা হইল আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাষ্ট্র কর্তৃক উহাদের নিরপেক্ষতা (neutrality) নীতি স্বীকৃতি। প্রথম মহাসমরে জার্মানী এই নীতি অস্বীকার করিয়া বেলজিয়ম আক্রমণ ও অধিকার করে। দ্বিতীয় মহাসমরে জার্মানী এই একই অপরাধে অপরাধী হয়। দ্বিতীয় মহাসমরে বেলজিয়মে বসিয়া ব্রিটিশ সেনা জার্মানীর সঙ্গে যখন আর কিছুতেই পারিয়া উঠিল না তখন তাহারা কিরূপে এখানকার সেতু ভাঙিয়া, রাস্তা কাটিয়া, শস্যের বীজ ভাঙিয়া দিয়া বেলজিয়মকে জলে প্লাবিত করিয়া দেয় এবং ফ্লাণ্ডার্স হইতে সর্বত্র পলায়ন করে সে কথা এখনও আমাদের মনে আছে। বেলজিয়মও হল্যান্ডের মত নিম্নভূমি বলিয়া তখন জলে প্লাবিত করা সম্ভব হইয়াছিল।

নাৎসী জার্মানীর পরাজয়ের পর বেলজিয়মও পুনরায় স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে এবং বিধ্বস্ত অঞ্চলসমূহের পুনর্গঠনে কর্তৃপক্ষ সম্যক অবহিত হইয়াছেন। কিন্তু তাহাদের পথ হল্যান্ডে অবলম্বিত পন্থা অপেক্ষা অনেকটা স্বতন্ত্র। চোরা-কারবার দমনেও বেলজিয়ম তির পন্থা অবলম্বন করিয়াছে। বেলজিয়মে বিদেশী মূলধন রহিয়াছে প্রচুর। তাহার নিজস্ব



হল্যান্ডের রেলপথে যুদ্ধের সময় আংশিকভাবে ভগ্ন আগেকার আমলের একটি রেলগাড়ি

মূলধনই একুশ শত কোটি স্বর্ণ-ফ্রাঁ। মার্কিনী সেনাদল যখন বেলজিয়মে অবস্থিতি করিতেছিল সেই সময়ে বিশেষ করিয়া এই দেশে খরচ করিবার জন্য প্রত্যেক সৈন্যকে "সেনা ডলার" দেওয়া হইত। নাৎসীরা বেলজিয়মে দ্রুত রণসম্ভার প্রস্তুত করার জন্য যে সব কাঁচামাল ও রসদাদি আমদানী করিয়াছিল তাহারা চলিয়া যাইতে বাধ্য হইলে এই সকল বেলজিয়ানদের অধিকারে আসে। তখন তাহারা চড়া দামে যুক্তরাষ্ট্র বাহিনীর নিকট এইসব বিক্রয় করিয়া প্রচুর অর্থ লাভ করে। ইহা ছাড়া আফ্রিকায় বেলজিয়ান কলোনিও বেলজিয়মের একটি মন্ত বড় সম্পদ। এখানে তামা ও রবার এবং ইউরেনিয়াম ষাট প্রচুর আছে। ইউরেনিয়াম ষাট এখানে যে পরিমাণে আছে এমনটি আর কোথাও নাই। এই সকল কারণে অর্থের প্রাচুর্য হেতু কারখানার নুতন করিয়া দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইবার পূর্বেই বেলজিয়ম বিদেশ হইতে দ্রব্যাদি আমদানী করিতে সক্ষম হয়।

অর্থের প্রাচুর্য হেতু বেলজিয়ম সরকারের কর্তৃপক্ষতিও অনেকটা স্বতন্ত্র রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। চোরাকারবারের বিরুদ্ধে অবলম্বিত পদ্ধতির কথাই এখানে ধরা যাক। স্বাধীনতা পুনর্লাভের অব্যবহিত পরেই ব্যাংক টাকা আবদ্ধ করিয়া রাখার ব্যবস্থা হয়। দৈনন্দিন প্রয়োজনের অতিরিক্ত সামান্য টাকাই তাহারা ব্যাংক হইতে তুলিতে পারিত। দেনা-পাওনা শুধু কাগজে-কলমে এক ব্যাংক হইতে আর এক ব্যাংকের মারফত চুকাইয়া দেওয়া যাইত। ইতিমধ্যে বাজারে মাল ছাড়িয়া দেওয়া হইল। বাহির হইতে বেশী পরিমাণ কাপড়-চোপড় এবং অন্ত ব্যবহার্য জিনিষপত্রও আমদানী করা হইল। ইহার ফলে লোকের ক্রয়শক্তির অল্পপাতে অতিরিক্ত মাল পাওয়া যাইতে

লাগিল। রেশন-মূল্য দ্বিগুণ হইলই না, বরং ক্রালের মত মধ্যে মধ্যে কমাইয়া দেওয়াই হইতেছে।

লোকের ক্ষয়শক্তি হ্রাস এবং প্রয়োজনাত্মিক মালের আমদানী এই দুই কারণে চোরাবান্ধারের জিনিষের মূল্য ক্রমশঃ কমিতে কমিতে এখন প্রায় ইহার উচ্ছেদ ঘটয়াছে। কিন্তু বিদেশ হইতে এতাদৃশ অতিরিক্ত মাল আমদানীতে বেলজিয়মে শিল্পদ্রব্য উৎপাদনে ভাটা পড়িয়াছে, লোকের ক্ষয়-শক্তিও ক্রমে কমিয়া যাইতেছে। অতুনা ব্রাসেলসের বিপণি-সমূহে ময়ন-মনোহারী মালের অভাব নাই, কিন্তু কিনিবে কে? লোকের হাতে যে ধরত করিবার মত পণ্যাদ উপলব্ধ নাই। বেলজিয়ানরা বিজয় লাভের পুলকে তখন আমেরিকা হইতে বিস্তর জিনিষ ক্রয় করে। আজ কোন আমেরিকান বেলজিয়মে তাহার স্বদেশজাত দ্রব্য কম দামেই কিনিতে পারিবে।

লারোচ বেলজিয়মের একটি ছোট শহর, ছোট হইলেও বহু বিদেশী এখানে যুদ্ধের আগে আগমন করিত এবং এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য প্রাণ ভরিয়া উপভোগ করিত। আমেরিকান পর্যটকের নিকট এই শহরট বড়ই প্রিয় ছিল। আজ কিন্তু ইহার রূপ একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে। কার্গান নাংসীরা বেলজিয়ম অধিকার করিয়া এই ছোট শহরটিতে একটি বাট করে। এই বাটটি ছিল গুরুত্বপূর্ণ। এই স্থানটি শত্রুহস্ত হইতে অধিকার করা মিত্রশক্তির পক্ষে একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়ে, এ কারণ মার্কিন বাহিনী এখানে উপরূপরি বোমাবর্ষণ করিতে বাধ্য হয়। আজ নাংসীদের নামগন্ধও নাই, বেলজিয়মও তাহার স্বাধীনতা ফিরিয়া

পাইয়াছে, কিন্তু লারোচ শহরটির পূর্বসৌন্দর্য্য একেবারে অন্তর্হিত হইয়াছে।

এই লারোচ নগরীকে কেন্দ্র করিয়াই বেলজিয়মের যুক্তি-কৌজ গড়িয়া উঠে। গির্জার রোমান কাথলিক পুরোহিত, হোটেলের মালিক ও অভ্যন্তর উদ্যোগীদের লইয়া এই বাহিনী গঠিত হয়। নাংসী-গুপ্তচরের চক্ষে ধূলি দিয়া আর কত কাল স্বদেশে বিচরণ করা যায়? তাই তাহারা একে একে লারোচ ছাড়িয়া গিয়া ক্রালে আশ্রয় লয়। এখানে ষাণ্ডাও নিরাপদ ছিল না। কেননা এ দেশটি এ তখন নাংসী তাঁবেদার। তথাপি এখানে বসিয়াই স্বদেশ উদ্ধারের আয়োজন করিতে লারোচের রোমান কাথলিক গির্জার পুরোহিত রত ছিলেন। এই পুরোহিতটি এখন জনবিরল লারোচে বসিয়া লোকহিতে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছেন এবং প্রত্যাবৃত্ত নরনারীর বাসস্থান ও ষাণ্ডা-পরার ব্যবস্থা করিতে তৎপর রহিয়াছেন। লারোচের এই কাথলিক গির্জাটি নাংসী বোমায় বিধ্বস্ত হয় নাই।

শত্রু দ্বারা বেলজিয়মের যেমন অশেষ ক্ষতি হইয়াছে, এক লারোচ হইতেই দেখা যায় মিত্রবাহিনীর পুনরধিকার কাণ্ডেও তাহার কম ক্ষতি স্বীকার করিতে হয় নাই। বেলজিয়মের বহু নরনারী-শিশু, ধরবাড়ী, হাসপাতাল, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান মিত্র-শক্তির বোমায়ও নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আজ এ কথা নিতান্তই অবাস্তব। এহেন স্বার্থভ্যাগের কলে বিশ্ববাসীর সঙ্গে বেলজিয়মের যে যোগসুত্র স্থাপিত হইয়াছে তাহা অবিচ্ছেদ্য। হল্যান্ড ও বেলজিয়ম নতুন জগৎ সৃষ্টিতে নিজ নিজ ভাবে সচেষ্ট রহিয়াছে। ইহার মধ্যে চোরাকারবার উচ্ছেদে তাহাদের কৃতিত্ব আমাদের রাষ্ট্র-পরিচালকদের বিশেষ অবধানের বিষয়।

বাণিজ্য-বায়ু

John Masfield-এর Trade Winds কবিতার তর্জমা

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

বন্দরে আর দীপে-দীপে, স্পেনীয় সাগর পারে
ভেসে ভেসে ওঠে সাদা বাতীগুলি—কমলা-লেবুর বন,
বাণিজ্য-বায়ু সেখায় এখন তুলিছে গুঞ্জরণ।

স্পেনীয় হুবা যে লাল হ'ল হোবা, ডালিমের রঙে রাস্তা;
দেশায় বিতোল নৃত্যকীকুল, মোন্ডা দেহ ও মন;
হলনা-কলায় অহুসারে হ'ল কত কি যে গড়া-ভাঙা;
বাণিজ্য-বায়ু সেখায় এখন তুলিছে গুঞ্জরণ।

রাঙে যেখানে জোনাকীরা ডলে, আকাশে হলুদে চাঁদ,
ভৌতিক যতো দেবদারু গাছ দুমায় হুশাসন;
বাণিজ্য-বায়ু সেখায় এখন তুলিছে গুঞ্জরণ।

দূরাতীতের পটভূমিকার বাংলা-কাব্যের সূচনা ও প্রগতির আভাস

ত্রীসমীরকান্ত গুপ্ত

আমাদের পরম গৌরবের সামগ্রী এবং প্রিয় কাব্য-সাহিত্য কোন এক যুগে আকস্মিকভাবে আবির্ভূত হয় নি অথবা প্রথম প্রকাশেই পূর্ণরূপ গ্রহণ করে নি। অধু-পরমাণু পরিমাণ সঞ্চয় ক্রমান্বয়ে পুঞ্জীভূত হয়ে যেমন প্রবালদ্বীপ বিশাল বারিধির অন্ধে আকৃতি ও আয়তন লাভ করে তেমনিভাবে পুষ্টি ও ক্ষুষ্টি হয়েছে বাংলা কাব্যের—বিস্মৃতপ্রায় অতীতে কত কবির রচনা, কত কথকের ছড়া ও বাণীবিত্তাস, কত গায়কের, বাউল চারণের গান তার মধ্যে ঢেলে দিয়েছে তাদের অন্তরের আবেগ, প্রাণের নিভৃতপুরের মধুর ও স্নিগ্ধকর মূর্ছনাটি, তাদের নিরহঙ্কার সহজ সাধনার ফল। এই অসংখ্য কবির অগণিত কাব্যের জটিলতা অতিক্রম করে প্রাচীনের কাব্য-প্রাণ কি অপরূপ উল্লাসে আপনার অস্তিত্ব-ভঙ্গিটি সম্বন্ধ রেখায় টেনে নিয়ে এসে পরিচিত কালের কল্লোলিত মহাসমুদ্রের মধ্যে, তার ইতিহাস বিচিত্র। এই ভারতবর্ষে, কত বিবিধ মানবের সম্মেলন ঘটেছে এই পৃথিবীতীরে—বৈদেশিক আর স্বাদেশিকে, পরিচিত আর অপরিচিতকে, প্রবীণ আর নবীনে (“শক ছগ-দল পাঠান মোগল এক দেখে হ’ল জীন”) ; কত বিচিত্র ভাবধারা বাহির হতে এসে আপনাদের মিশিয়ে দিয়েছে ভারতীয় ভাবধারা ও সংস্কৃতির সঙ্গে ; কত বিভিন্ন ভাষার নিবিড় সান্নিধ্য এবং সংমিশ্রণ ঘটেছে এখানে—পারস্পরিক ব্যবহারিক আদান-প্রদান তাদের কোনটির উত্তরকালে ঘটেছে সমৃদ্ধি, কোনটির হয়ত হয়েছে বিপুল পরিবর্তন, আবার কোনটি হয়ত ঘটনার রূঢ় নিষ্পেষণে হারিয়ে বসেছে প্রাণশক্তি। পালি, প্রাকৃত, চর্যাপদ, অপভ্রংশের ভাষা আজ জাতির প্রগতিশীল চিন্তাশক্তি থেকে বিযুক্ত হয়ে অতীতের সামগ্রী রূপে স্থতির কক্ষে গিয়ে স্থান লাভ করেছে। অপর পক্ষে প্রাদীপ সংস্কৃতির স্নেহরসপুষ্ট বাংলার প্রাবলীধারা আজ বঙ্গসীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে এবং বহির্ভারতে পৌঁছে দিয়ে চলেছে তার অন্তর্নিহিত রসের, অমৃতত্বের বাণী। এই রসের উৎস অনুসন্ধান করতে হলে অবশ্যই প্রান্তরর্ভা হলেই চলবে না, তার অন্তঃপুরে ঐশ্বর্যমণ্ডিত কক্ষের ভিতর উপস্থিত হওয়া চাই। কি কারণে তার উন্মেষ করছি। সাধারণ দৃষ্টিতে দেখি ভারতবর্ষের বিপুল-বিস্তৃত স্থলভূমি, এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তের হ্রদ ব্যবধান, এক সীমান্তে ব্যবহৃত লিপিপদ্ধতির সঙ্গে আর এক প্রান্তের লিপির বৈসাদৃশ্য, তার উপর একের পর এক বহিঃশক্তির

উপর্যুপরি আধিপত্য, চিরকাল এক বর্ষদীক্ষার অমৃগত ধাক্কা পরিবর্তে কত বিভিন্ন ধর্মের আবির্ভাব, প্রতিষ্ঠা ও বিলয় এখানে ; কাল যেন এখানে ধেমে ধেমে চলেছে, ঝঞ্ঝিত গতিতে, যতি টেনে টেনে। এই ভাবে ভারতবর্ষের শতাব্দীদীর্ঘ ইতিহাস কল্পনা করলে, তাকে সংকীর্ণ স্থান এবং কালের মধ্যে নিবদ্ধ করে দেখলে, বাংলা কাব্যের সূচনার প্রসঙ্গে সংস্কৃতির আলোচনা না করলেও চলে। তবে এই কালসংক্ষেপের সার্থকতা একটা বিশেষ সীমায়িত কালের উপর অত্যধিক লক্ষ্য বা মনোযোগ নিবদ্ধ করার সহায়ক হতে পারে, কিন্তু আমরা যেখানে দেখছি ভারতবর্ষের বিপরীত রূপ, আমরা যেখানে সাহিত্যের স্বল্পতম মূল ধারাটি অবলম্বন করে তার বহিঃপ্রকাশকে নির্ণয় করতে, চিন্তিত করতে চাই সেখানে এই কালের স্বল্প পরিসরের সীমা লঙ্ঘন করে চলার বাধা নেই। তদ্বিবেচনার আমরা এখানে বৈদিক কাব্যের থেকেই আলোচনার সূচনা করতে চাই। তবে পূর্বাঙ্কে তার সপক্ষে আর একটি কথা বলা প্রয়োজন মনে হয়। দুটি জিনিষের উপর লক্ষ্য দিতে হবে। প্রথমত, সভ্যতা-সংস্কৃতির ক্ষুরণ হয়েছে বিক্ষিপ্তভাবে, এখানে ওখানে, কয়েকটি স্বল্পপরিসর ভূমির আয়তনকে কেন্দ্র করে—যেমন প্রাচীন পঞ্জাব বা গান্ধার উপত্যকা। পরবর্তী কালে যে সকল সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আত্মপ্রকাশ করল তাদের মধ্যে তক্ষশীলা, নালন্দা বিহার বা বিক্রমশীলার নাম স্বতঃই মনে হয়। এই সাংস্কৃতিক ক্ষুরণ যে বিভিন্ন স্থানে ঘটেছে তাদের প্রত্যেকের মধ্যে একটা একান্তভাবে নিজস্বতা বা বৈশিষ্ট্য আছে। অর্থাৎ একই জিনিষের প্রতিচ্ছায়া অপরগুলি নয়। তবে সেই সঙ্গে আর একটি মহামূল্য বস্তু সকল প্রকার বিভিন্নতা, বৈশিষ্ট্যের মধ্য দিয়েও এক ভাবে আবহমান কাল চলে এসেছে, সকলের মধ্য একটি মর্ম্মগ্রাহী ঐক্যের সুর বেঁধে দিয়ে—সেটি ভারতীয় চেতনার সুর। আমি ভারতীয় এই মূল অন্তঃপ্রেরণার, বিকাশের দিকে লক্ষ্য রেখেই বর্তমান আলোচনার অগ্রসর হব। ভারতীয় চেতনার গভীর রহস্যের যে অপূর্ব প্রকাশ হয়েছিল ঋগ্বেদের কাব্যে, ভারতের আন্তর ঐশ্বর্যের যে প্রথম ক্ষুরণ হয়েছিল ঋষি-কবির মস্তিষ্কে, তার বেশ আজ পর্যন্ত চলে এসেছে। তাই ভারতের ভাষাগত বিভিন্নতার ভিতরেও তার চিত্রকলা ও শিল্পসাহিত্যকে আশ্রয় করে একটা দেশব্যাপী সত্যকার ঐক্য ভিতরে ভিতরে রূপ নিয়েছে। তাকে

বিশুদ্ধ দুগ্ধজাত

বাসন্তী স্নাত

টেলি—বাসন্তী বি ফোন—বি,বি, ৫৭৩৮ পোঃ বক্স ৬৮৩৬ কলিঃ

বি, হুগারমার্চেন্টস, একস্পোর্টারস, ইম্পোর্টারস ও

জেনারেল অর্ডার সাপ্লায়ারস

প্রমথনাথ পান এণ্ড সন্স

২সি, রামকুমার রক্ষিত লেন, কলিকাতা—৭

সহজে দেখা যায় না বলে অস্বীকার করা চলে না। সৌন্দর্য-সুখ বা রূপবোধ বললে তার ব্যাখ্যা হয় না, তার প্রকৃতির বিশেষত্ব, অলৌকিক কিছুর প্রতি আকর্ষণ—মানবিকতার পার্শ্ববের মধ্যেই, ক্ষণিকের তুচ্ছের মধ্যেই আপনাকে নিঃশেষে হারিয়ে ফেলা নয়। আধুনিক কবির কণ্ঠে তারই প্রতিধ্বনি শুনি—

“হেথা নয়, অস্ত্র কোথা, অস্ত্র কোথা, অস্ত্র কোন্‌ খানে।”*

কোন সুদূর অতীতে যে মানুষ পেয়েছিল উচ্চতম জ্ঞান তা চিন্তা করলে বিশ্বস্তর মনে হয়। বৈদিক কবির যে সৃষ্টি তা থেকে প্রাচীন মানব-মনের এবং মানবসমাজের যে মহান চিহ্ন পাই তার মহিমার তুলনা হয় না। শুধু সাহিত্যের কথা নয়, প্রাচীন সমাজের যে পূর্ণ শ্রী ও শৃঙ্খলা ছিল, প্রত্নতাত্ত্বিকের কাছে বিংশ শতাব্দীতে তার জলন্ত প্রমাণ ধরা পড়েছে। হয়গ্গা, মোহেঞ্জো-দারো তার দৃষ্টান্ত। হরত ভবিষ্যতে এরূপ দৃষ্টান্ত আরো পাওয়া যাবে। এখন, মানুষের ভাষাকে আশ্রয় করে ভারতের আশ্রয় প্রথম যে সমর্থ সুন্দর প্রকাশ বৈদিক সংস্কৃত তারই বাহন হয়েছিল; সেই দেশগত আশ্রয় বাণী অজাপি ধ্বনিত হয়ে চলেছে, কিন্তু যে আকারে, সংস্কৃত ভাষার রূপে, এক বিশেষ মুণ্ডিতে সে একদা আপনাকে প্রকট করে ধরেছিল আজ তার পরিবর্তন ঘটেছে। কিহা বলতে

পারি, বিবিধ রূপের মধ্যে আপনাকে এখন সেই যেন ঢেলে দিয়েছে। বৈদিক কবির ভাষা একটা বিশেষ ধরনের চেতনারই প্রতিভাস নিয়ে আসে। ভারতের চেতনার কেন্দ্রমধ্যে যখন এসেছিল একটা সত্যের ঋজুতা, স্বচ্ছতা, দৃঢ়তা, তখন সেই রূপ প্রকাশের ভাষা প্রাচীন সংস্কৃত। বৈদিক কাব্য রচনা করেছিলেন ধারা তারা পেয়েছিলেন মানসোত্তর লোকের আলো, মনের অসামর্থ্যকে অতিক্রম করে গিয়েছিলেন এই কবিরা। ঋষি-কবির মন্ত্রকাব্যের মধ্যে ছিল এমন অনির্বচনীয়তা যে তা যথার্থই হয়ে উঠেছিল দেবতার ভাষা বা দেব-ভাষা—উপলব্ধির গভীর-তম রহস্যাবলী তাতে সম্পূর্ণ ধরা যেত, অপারিষ অলৌকিকের সত্য যেন তার মধ্যে নেমে এসেছিল অক্লেশে। উপনিষদের কাব্যেও রয়েছে লোকোত্তর প্রতিভার স্পর্শ। তবে উপনিষদের কবি হয়ে উঠেছেন বুদ্ধির আরও নিকটযুগী। পুরাণে বুদ্ধি যেন আরো আচ্ছন্ন হয়ে এসেছে—তার সঙ্গে বহুল পরিমাণে মিশেছে মানসেতর স্তরের জগৎ। বাস্তবিক একটা সত্যাকারের পুনর্জীবন ফিরিয়ে আনলেন এই কাব্যজগতের চেতনাত্তে। মন এবং হৃদয় যেন তাঁর মধ্যে এক হয়ে মিশে গিয়েছে; শ্রেষ্ঠ কাব্যের এই একটা নিশ্চিত স্তম্ভ লক্ষণ। মন বলতে এখানে দৈনন্দিন জীবনের স্থল প্রয়োজন মিটিয়ে চলে যে মন তার কথা বলছি না, আর এক যে মন, মনসো মনঃ, স্বার্থের ক্ষুদ্রতার উর্ধ্বে বিশ্বব্যাপী বৃহত্তর সত্যের সঙ্গে একান্ত ভাবে

* ‘বলাকা’—রবীন্দ্রনাথ।

নেতাজীর অনুসরণে :—

বাংলার বিখ্যাত স্নাত ব্যবসায়ী শ্রীঅশোকচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় ও তাঁহার “শ্রী” মার্কী স্নাতের নূতন পরিচয় বাঙ্গলাদেশে নিম্নপ্রয়োজন। আজকাল বাংলার প্রতি গৃহে, উৎসবে, আনন্দে ‘শ্রী’ স্নাতের ব্যবহার অত্যাৱশুক হইয়া পড়িয়াছে, বাজারে ভেজাল স্নাতের যেরূপ প্রয়াস দেখা যায়, তাহার মধ্যে শ্রীযুক্ত অশোকবাবুর বিশুদ্ধ স্নাত যে খ্যাতি অর্জন করিয়াছে, তাহা স্নাত ব্যবসায়ী মাত্রেরই অনুকরণীয়।

স্বাঃ শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু

‘থেকে যে’ দেখে তারই কথা বলছি। ক্রৌঞ্চমিথুনের কাহিনীর কতটা সত্য তা নিয়ে তর্ক চলতে পারে, কিন্তু কবির হৃদয়ভূতির যে সাক্ষ্য তার মধ্যে প্রকাশ করা হয়েছে* সমগ্র রামায়ণ তার সপক্ষে সঙ্গতি দান করবে। কবিসত্তার এই দুই কেন্দ্র ধরে রামায়ণে দেখা দিয়েছে এক মহান জীবনাদর্শ ও ভাষার অল্পময় ললিত ধ্বনিশিল্প। পৃথিবীর যে-কোন ভাষায় বাঙ্গালীর সমতুল্য কবি বিরল। রামায়ণে মহাভারতে এসেও কবিচেতনা চলছিল উর্দ্ধলোকেরই আব-হাওয়া অটুট রেখে। রামায়ণ বা মহাভারতে দেখি সে যুগের কবির স্বস্ববোধকে আশ্রয় করে সমষ্টিগত চেতনারই একটা আভ্যন্তরিক প্রতিকলন। তাই এই দুই মহাকাব্য প্রকাশ হয়েছে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ভাবে, কবিদ্বয়কে আদর্শের জন্ত কোথাও কষ্টকল্পনার আশ্রয় নিতে হয় নি।

মানুষের চেতনায় তারপর এল আর একটা পরিবর্তন। পঞ্চম শতাব্দীর কাছাকাছি সংস্কৃত সাহিত্যে আর সেই বৈদিক কবির উর্দ্ধলোকপারমিতার ইঙ্গিত পাওয়া যায় না, তখন তার মধ্যে এসে পড়েছে স্থলসভ্যতার চারুতা ও মার্জনা, মননজাত সঙ্গতিবোধ এবং পারিপার্শ্য। কালিদাসের ধীর পর্যন্ত কতখানি আত্মমর্যাদাবোধ নিয়ে কথা বলছে† বাণভট্টের রচনার মধ্যেও এই মানসিক আভিধাত্য, সর্বত্র তার স্বপুণি

* “মা নিষাধ প্রতিষ্ঠাৎ ত্রয়গমঃ শাস্ত্রীঃ সমাঃ।”

† “ভট্টা মা এবং ভগ্ন”—ভর্তঃ, মা এবং ভগ্ন।

হস্তের সমস্ত স্পর্শ লেগে রয়েছে। মনের থেকে মানুষের প্রচ্ছন্ন গতির ইতিহাস নেমে এল যেন আর এক মোহের শক্তির টানে,—শক্তির, শৃঙ্খলার, সৌন্দর্যের রাজ্য ছেড়ে নীতিহ্রদের আচার-বিচারের বিধানের মধ্যে। বাহিরের ইতিহাসেও অল্পরূপ একটা বিপর্যয় লক্ষ্য করা যায়। গুপ্তযুগের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা অনিশ্চিত হয়ে উঠল। যশোধর্ম, ললিতাদিত্য প্রভৃতি কর্তৃক পৌনঃপুনিক আক্রমণে ও অন্তর্বিবাদে ফলে দেশে এল বিশৃঙ্খলা। বাহিরাগত আরবজাতি ইতিমধ্যে সিন্ধুদেশে এসে উপস্থিত হয়েছিল। ক্রমশঃ বৈদেশিকরা ভারতীয় জীবনের একেবারে অন্তস্তলে এসে উপনীত হ’ল। এই রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে বাংলাকাব্যের আদিযুগের সূচনা। দেশ ও দেশের মধ্যে সীমানা যখন অলঙ্ঘন্য নয়, দেশ ও দেশের সীমা ছাপিয়ে যখন জনতার বজা সর্বত্র প্রাবিত করে ফেলেছে, জাতীয় জীবনে এমনই যখন একটা বিশৃঙ্খলিত প্রাণের খেলা, তখন থেকেই বাংলাকাব্যের আদিযুগের আরম্ভ। এই নূতন যুগের বিশিষ্টতার কথা বিচার করে দেখা যাক।

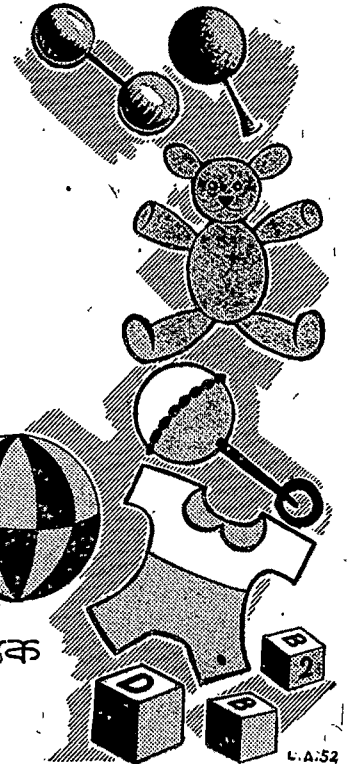
অতীতে বৈদিক যুগের সংস্কৃত ছিল অধ্যাত্ম-সাধকের ভাষা। তারপরে বহুদূর পথ অতিক্রম করে এসেও সংস্কৃত হয়েছে অভিন্নপভূমিষ্টের ভাষা, শিক্ষিত বিদগ্ধজনের ভাষা, রাজসভার অলঙ্কার-স্বরূপ। যে শিক্ষা, যে উপলব্ধির গাভীরা, ভাষার যে গরিমা একদা এক মহা কৌলীচবোধ নিয়ে আপনার

মায়ের কণ্ঠস্ব

শিশুপালনের সম্যক জ্ঞানের অভাবে এদেশে শিশু-মৃত্যুর হার এত ভয়াবহ। বিবটন শিশুদের দৈহিক সর্বাঙ্গীণ পুষ্টিবিধান করিতে অধিতায়। ভিটামিন ডি, বি১, বি২ সহিত মূল্যবান উদ্ভিজ্জ ও রাসায়নিক উপাদানের সংমিশ্রণে প্রস্তুত এই পূর্ণাঙ্গ টনিকটি প্রত্যেক শিশুকেই, বিশেষ করিয়া দন্তোদগমের সময়, সেবন করান উচিত। বিবটন নিম্নলিখিত রোগে বিশেষ উপকারীঃ—শিশুদের যকৃতের গীড়া, অজীর্ণতা, হৃৎতলা, পেট ফাঁপা, কোষ্ঠকাঠিন্য, রক্তশূন্যতা, রক্ততা, ব্রুইটিস, রিকেটস ইত্যাদি।



নিষ্ঠার এন্টিসেপটিকস্ • কলিকাতা



আত্মকেন্দ্রিক বৃত্তের মধ্যে আত্মরক্ষা করে চলছিল তার একটা পরিবর্তন ঘটল বৃত্তের সময়ে। বৃহদেব ভাষাকে, তাঁর সাহিত্যের ভাষাকে, আপামর সাধারণের কাছে স্থলভ্য এবং সহজবোধ্য করে তুললেন। জনসাধারণের 'ভাষাকেই মর্গ্যাদা' দিলেন তিনি। এইরূপে প্রাকৃতজন ভাব ও ভাষার দরবারে এসে আত্মপ্রতিষ্ঠা স্থাপন করল। একটা উদাহরণ গ্রহণ করছি—

“আইএ অর্ঘ্যমাত্র জগ রে ভাংতি এসো পড়িহাই
রাজদাপ দেখি কো চমকিই যারে কিং তং বোড়ো খাই।
অকট ছোইআ রে মা কর বে যা ধোনা
আইস সভাবে জই জগ বুঝি তুট বাষণা তোরা।
মরু মরীচিগন্ধন ইরীদাপতি বিধু জইসা
বাতাবণ্ডে সো দিট অপে পাথর জইসা।”*

* জগৎ যে অমৃতপত্র, পরমার্থজ্ঞ ধীর, তাঁরা একথা জানেন। তাঁরা জানেন যে, জগৎকে সং বলা আশ্চর্য্য মাত্র। দড়িকে রাজ-সাপ বলিয়া যাহারা চমকিয়া ওঠে, সত্য সত্যই কি বোড়া সাপে তাদের খায়? ভ্রম গেলোই সত্য প্রকাশ হয়। কি আশ্চর্য্য, যে বালযোগিনী, ইহাতে হাত লোনা করিও না, যদি জগতের শূন্যতাব অবগত হও তাহা হইলে তোমার বাসনা দূর হইবে। মরীচিকা, গন্ধর্ব্ব-নগর, দর্পণ-প্রতিবিম্ব যেরূপ, জগৎও সেইরূপ।

—মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কৃত অমৃতবাদ

এখানে ভাষার, উপরন্তু ভাবের উপরেও, বৌদ্ধধর্ম কি অসীম প্রভাব বিস্তার করেছিল তারও চিহ্ন পরিস্ফুট। ক্রমে জন-সাধারণের দ্বার থেকে যখন কবি মুখর হয়ে উঠল তখন সাধারণের সহজ ধর্মবিখ্যাস, অকৃত্রিম বোধ, মানস জগতের অথবা প্রাণজগতের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াই তার বিষয়বস্তুর রূপ পরিগ্রহ করল। এই সমসাময়িক রচনার মধ্যে স্থানে স্থানে বিভিন্ন ধর্মের বিরোধী উক্তি লিপিবদ্ধ আছে। তবে সে সমুদয় নীরস্ত্র যুক্তিতর্কের উপর নির্ভর করে নি, অনেক পরে ঈশ্বর শ্রুতির যে সরস শ্লেষাত্মক রচনা দেখি এ ভ্রমিষ তা-ও নয়, এখানে মূল অসহিষ্ণুতা, ক্ষুদ্র প্রাণাবেগের আবর্তই প্রেরণা-দাতা। এই যে কাব্যের একটা পরিবর্তনের ধারা নিয়ে নেমে আসার উল্লেখ করলাম, আমাদের পক্ষে মনে রাখা ভাল, সেটি ঋজু ধারায় ঘটে নি; অনেক বিচিহ্নতার মধ্য দিয়ে তাকে আসতে হয়েছে, কখনো একই উপলক্ষের পুনরুক্তি করে। হয়ত তার অন্তঃশক্তির সারবত্তার পরীক্ষার প্রয়োজনে এই পুনরাবৃত্তি ঘটে। সেই যেতুই সম্ভবত সময়ের দীর্ঘ ইতিহাসে এক যুগের বহুল প্রতিচ্ছায়া আর এক যুগে ফুটে উঠতে দেখি। উপনিষদের আবহাওয়া ও ভাবরাশি রবীন্দ্রনাথ যেমন প্রচুর নিয়ে এসেছেন বিংশ শতাব্দীর পৃথক জগতে। তা হলেও সব মিলিয়ে আসলে কিন্তু ঘটতে থাকে কোন একটা অস্তিত্ব পরিণতির সার্থকতার দিকে অগ্রগতি। একটা জাতির যে

স্বাধীন ভারতে

অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সংগঠনে

জীবন-বীমা অপরিহার্য উপাদান।

এবং

জাতীয় জীবন সংগঠনে বীমাকর্মীর

স্থান মহান।

প্যালেডিয়াম এডুকেশন কোং লিঃ

১১, ভ্যানিটার্ট রো, কলিকাতা ১

ফোন : কলিঃ ৯৭২

গ্রাম : “প্যালেডিয়ামস” কলিঃ

প্রতিভা, যে বিশেষত্ব, কলা-সাহিত্য-শিল্পকে আশ্রয় করেও তার রম্মি বিকীরণ হতে থাকে। ভারতে শিল্পসাদনার অন্তর্দর্শে ছিল ভারতের অন্তরাঙ্গারই সমর্থন এবং অমুপ্রেরণ।

তা হলেও এই সময়কার বাংলাকাব্যের সৃষ্টি উপযুক্ত স্তরের হতে পারে নি। তার হেতু কি? সাহিত্য শিল্প কাব্যের জীবন ছুটি দিক নিয়ে তৈরী—ভিতরের ভাব এবং বাহিরের আকার-গত রূপ। বাংলা কাব্যের শৈশবে এই পর্য্যন্ত আমরা দেখেছি, একটা দ্রুত রূপ পরিবর্তন এবং আকৃতির পরীক্ষা চলছিল, ছন্দগত পরিবর্তন নয়, ভাষাগত পরিবর্তনের কথাই বলছি। প্রাচীন প্রাকৃত-জঙ্ঘরিত গালাগানগুলি ছন্দের নিষ্ঠুরতা বা সূঁঠু এবং বহুবিধ বিকাশের দিকে লক্ষ্য রেখে চলছিল না। কুন্ডিবাস, কাশীরাম দাস, গোবিন্দদাসের হাতে পরার ক্রমে ত্রিবিধলাভ করতে থাকে। প্রতিভার সংস্পর্শে, শব্দ-সম্ভারের গুণে, ভাষা যতই পূর্ণতা পেয়ে ওঠে ততই ভাবকে নিপুণভাবে প্রকাশ করার ততই তার সুবিধা।

এই পূর্ণতার সার্থকতার ক্ষেত্রে আবার চাই নূতন উপলব্ধির উদ্বেগ (ঋষেদের ঋষিরা যখন বিচিত্র উষার বার বার আগমন হতে বলেছেন জীবনে)। সংস্কৃতে জঙ্ঘদেব 'গীতগোবিন্দ'র সুললিত পদে (কবির নিজের ভাষায়, 'মঙ্গলযুজ্জলগীতি') এক নূতন ভাবরসের প্রবাহ নিয়ে এসেছিলেন। তারই অনুভাবে বাংলা-কাব্যে চণ্ডীদাস এবং বিজাপতি নবযুগের উদ্বোধন করলেন।† প্রেমের, ভক্তির, হৃদয়ের উজ্জ্বলতা, এই নবযুগ হয়েছে অপূর্ণ ত্রি-মণ্ডিত। আমরা পড়েছি বেহলা-লখিন্দরের কথা, লাউসেনের কথা, শোণীচাঁদের কথা, কালকেতু-নিশাপতি-ত্রিমস্তুর কথা; বিশেষ করে বেহলা-লখিন্দরের কথার মধ্যে যে হৃদয়ের কথা, কারুণ্যত্রী, নৈই তা নয়, তবে তার এক রুহৎশ চলেছে প্রাণের অমুভূতিতেই আচ্ছন্ন হয়ে,‡ আপনায় রুহত্তর ধর্মের স্বাভাবিক প্রেরণাবশে উর্দ্ধমুখী হয়নি।

কাশীরাম দাস এবং কুন্ডিবাস যখন এলেন বাঙালীর কবি-চিত্তে প্রেমোচ্ছাস তখন যেন মন্দীভূত হয়ে এসেছে। মামব-জীবনকে আরও বিস্তৃততর পরিসরের মধ্যে এহণ করা প্রয়োজন তখন। রামায়ণ মহাভারতের বিচিত্র সমৃদ্ধ অমুভূতি, বহুবিধ ভাবের প্রাচুর্য এই অভাব পূর্ণ করে দিল—যদিও ভাষায় দিক বিবেচনা করলে বাংলা কাব্য পূর্ণতার মস্তুর থেকে তখনও অনেক দূরে। উনবিংশ শতাব্দীতে এলেন মধুসূদন। মধুসূদনের মধ্যবর্তিতার প্রথম পাশ্চাত্যের প্রভাব বাংলা-কাব্যের উপর পড়ল। মধুসূদনে আরম্ভ হ'ল কাব্যের অত্যাশ্চর্য গুণাবলীর একটা গাঢ় সময়ের প্রায়শ—ভাবাবেগ, ভাষাশক্তি এবং অঙ্গগঠন—এই ত্রয়ীর একত্রীকরণের দ্রুত সাধনা। কিন্তু

* "তব বিরহে বনমালী সখি সীদতি।"—জঙ্ঘদেব

† "মামব, সো অব সূন্দরী বালা।

অবিরত নয়নে বারি বরু নীলর

জহু ঘন সাঙন বালা।"—বিদ্যাপতি

‡ "অভাগিনী বেহলার সহায় কেবা আছে"—বিজয় গুপ্ত

বলতে হবে মধুসূদন এই আদর্শ সাধনে পূর্ণাঙ্গ সফলতা লাভ করতে পারেন নি। এই মাত্র যে ত্রিগুণের উল্লেখ করা হ'ল কবির চেতনায় তারা একেবারে মিশে এক অভিন্নাঙ্গ হয়ে যায় নি। মধুসূদনে ছিল যার শুভ সূচনা রবীন্দ্রনাথের হয়েছে তার পরিণতির সফলতা। বর্তমান যুগে মধুসূদনই প্রথম আধুনিকের দাবি নিয়ে (অতি আধুনিকেরা আবার এক পৃথক শ্রেণীর বলে গণ্য), আধুনিক মনোবৃত্তির প্রতিনিধি হয়ে বাংলা-কাব্যের সমগ্র প্রবেশ করেছিলেন। মাইকেলের পরবর্তী ইতিহাস আমাদের নিয়ে এল পরিচিত সমসাময়িক কালের নিবিড় সংস্পর্শের মধ্যে, প্রাচীনের প্রসঙ্গে যার আলোচনা অপরিহার্য নয়।

বাহির হইল

ত্রীকৈদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

চীনমাত্রী (২য় সংস্করণ)

প্রকাশের অপেক্ষায়

ত্রিবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের নৃভন বই

অষ্টক

কলিকাতার সমস্ত সম্ভ্রান্ত পুস্তকালয়েই পাওয়া যাইবে।

বিহার সাহিত্য-ভবন

কলিকাতা

দা'-গোঁসাই ও আরো গল্প

ত্রীশুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

বালাসাহিত্যে এমন সর্বাঙ্গহন্দর ছোট গল্প এ পর্য্যন্ত বের হয় নাই।

মূল্য—তিন টাকা

মহামানব-গ্রন্থমালা—১ম খণ্ড

ত্রীশুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত

যারা নিজে বড় হয়ে জাতি ও দেশকে বড় করেছেন, তাঁদের সাহিত্যরসপূর্ণ

গৌরবময় কাহিনী। মূল্য—দেড় টাকা

মহারাত্রী জীবন-প্রভাত

ত্রীশুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের 'মহারাত্রী জীবন-প্রভাত'-এর সংক্ষিপ্ত

কিশোর সংস্করণ। মূল্য—পাঁচ সিকা

ক্যালকাটা বুক ষ্টোরস্

৪১৫সি, হেরম্ব দাস লেন, কলিকাতা

যুক্তপ্রদেশের প্রান্তিক লোকসঙ্গীত

শ্রীমায়ী গুপ্ত

বিবাহ-সঙ্গীত বর ও বধু উভয়ের গৃহেই গাওয়া হয়। অবশ্য কছার গৃহেই সঙ্গীতের, তথা অল্প সমারোহের ব্যাপার অধিক থাকে। কিছু কিছু গান উভয় পরিবারেই গীত হয়। এখানে কয়েকটি বিবাহ-সঙ্গীতের উল্লেখ করা হবে—যা বরের গৃহেই গাওয়া হয়। প্রবাসীর বিগত এক সংখ্যায় বিবাহের যাবতীয় অহুষ্ঠানেরই কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া হয়েছে। বরের বিবাহের গানও বিশেষ বিশেষ অহুষ্ঠানে গীত হয়।

নিম্নলিখিত গানটি পুরাতন—সেকালে বরকে কছার-সন্ধান ঘুরে বেড়াতে হ'ত এবং সবিনয়ে কছার পাণিপ্রার্থনা করতে হ'ত। পশ্চিম ভারতের নারীদের সেই গৌরবময় যুগের গান এটি :

কেহি কেরা পুত তপসিয়া আদন মোরে তপ কই রে
এজি কেহি কেরী বেগী কুঁজারী সুন্দর বর মা'গৈ রে।
বাপ ক পুত তপসিয়া আদন মোরে তপ করে রে
এজি বাপ কী বেগী কুঁজারী সুন্দর বর মা'গৈ রে।
জিতরাগে নিকনৌ সাগজী আর ভর মোতী লিয়ে রে
এজি লেজ তপসী আপনি ভিচ্ছা আদন মোর ছোড়উ রে।

নিমল সিংহের প্রযোজনায়

অবি বঙ্কিমচন্দ্রের

* * * আনন্দ মঠ * * *

পরিচালনা : সন্তোষ হাজরা

চিত্রনাট্য—অনাথ মুখোপাধ্যায়

চিত্রগ্রহণ—রাইমোহন দত্ত

প্রধান ব্যবস্থাপক—বিমল মুখার্জি

শিল্প নির্দেশক—বিমল দেব

রূপায়নে :-

সত্যানন্দ—কৃষ্ণ সরকার	শান্তি—নীতা দেবী
ভবানন্দ—দীনেশ অধিকারী	কল্যাণী—মণিমালা
মহেন্দ্র—অরু মুখার্জী	নিমাই—চিত্রা দেবী
জীবানন্দ—কালী ব্যানার্জী	আরো অনেকে

একমাত্র পরিবেশক :

কৃষ্ণ ফিল্ম এন্ড ষ্টুডিও লিঃ

মোতিয়া তো अपनी घरहै बरौ अपनी सैती बरौ

ये साहू तुमवर कछा कुँजारी तपछा मोर पुरअह रे।

“কার তপসী পুত্র আমার অঙ্গনে তপস্যা করছে আর কার কুমারী কছা সুন্দর বর চায়? অমকের পুত্র আর অমকের কছা এরা। ঘরের ভিতর হতে স্বজ্ঞাতা ধালা ভরে রত্ন-ভিক্ষা দিতে এসেছেন—‘ভিক্ষা নিয়ে আমার অঙ্গন ত্যাগ কর।’ বর বলছেন, ‘তোমার ধন রত্ন ভিক্ষা চাইতে আমি আসি নি, এসব ঘরেই রাখ। তোমার কুমারী কছাকেই আমি ভিক্ষা চাই।’”

মোরে পিছবরবা বাস বসেরী কোইলী লীনহ বসের
ছোড়উ ন কোইলী মোরা পিছ বরবা জাও নন্দন বন লেউ
ম'ডবন ম'ডবন ঘুমে ছলছে রাম বাপ কোইলী হম লেব
কোইলী বেটে ন মাট কী মিলিহৈ না চটি হাট বিকার।
কোইলী তো ছোইহৈ সম্বীজীকে ম'ডয়ে জিন ঘর কছা

কুঁজারী

গলিয়ন গলিয়ন ঘুমে ছলছে রাম কোন হৈ সম্বর কুঁজার।
সোনেকে কলম পর দিয়না জরত হৈ বহ দেখো সম্বর ছয়ার।
ম'ডবে কী ধুনী লাগে ঠাটি ছলহিন দেই ছলছে জো পুছত বাত
তুম হরে দাহলিজীকে সোনে ধোঁরাহর হমহু কা দেব বসের।

“আমার গৃহের পিছনে কোকিল বাসা নিয়েছে। হে কোকিল, নন্দন-বনে বাসা নাও, এখন এ স্থান ত্যাগ কর।’ ওদিকে অযুক বর কুঞ্জে কুঞ্জে কোকিল হুঁজে বেড়াচ্ছে—‘হে পিতা আমি কোকিল মেব।’ পিতা বলছেন, ‘কোকিল মাটি দিয়ে তৈরী হয় না এবং বাজারেও বিক্রয় হয় না। বৈবাহিক মহাশয়ের বাড়ীর পিছনে কোকিল আছে—যাঁর ঘরে কছা কুমারী। বর গলি গলি হুঁজে ফিরছেন—‘যস্তর মহাশয়ের ঘর কোথায়?’ যেখানে সোনার শুভে দীপ জ্বলছে সেইখানে। দ্বারের কাছে কছা ছিলেন, বর তাঁকে অহরোধ করছেন—‘তোমার পিতৃদেবের স্বর্ণমণ্ডিত ঘর, আমার সেইখানে বাস করতে দাও।’

প্রকৃতির কোলে লালিত, গ্রাম্য জীবনের উপযুক্ত গান। কোন আড়ম্বরের কথা অবশ্য এ গানে নেই, তবে স্বর্ণপ্রসূ ভারতের সমস্ত প্রদেশের লোকসঙ্গীতে স্বর্ণের ছুরি ছুরি উল্লেখ আছে। অবশ্য তাই বলে একথা ভাববার কোন কারণ নেই যে, সেকালে গ্রামের ঘরে ঘরে স্বর্ণদ্বার থাকত।

কোইলী জো বোলৈ অমবা কেরা কগিয়া

ভৌরা বোললে কচনার জী

বোলৈ ছলরইতা ছলহা সম্বরজীকে বাগিয়া

হাধে ভুলে মূখ পান জী।

কাহে লোভ গৈলি বহুআ অমবা কী বাগিয়া
কাহে লোভ গৈলি সত্তার জী।
অমবা লোভে গেলু' অমবা অমবা কি বাগিয়া
ধনী লোভে গেলু' সত্তার জী।
কা কা থৈলো' বাবু অমবা কী বাগিয়া
কা কা থৈলো' সত্তার জী
অমবা ফলল থৈলু' অমবা কি বাগিয়া
খাঁড় হুধ থৈলু' সত্তার জী।
নওই মহীনা তৌহি বাবু কোথিয়া রথলু'
অবরু দস হুধবা পিলায় জী
হুধ পানি বাবু একো ন দিহলে
কৈসে চিন্‌হল সত্তার জী।
হুধ পানী অমবা জবে হম দীহব
জবো ধনী লৈবো লিআয় জী
হমহ' জে হোইবো অমবা বাবু জী সেবকিয়া
ধনী হইবো দাসী তোহার জী।

“কোকিল আমার শাখায় গান গাইছে, ভ্রমর কচনারের উপর
গুঞ্জন করছে। আদরের বর খন্তরের ঘরে কথা বলছে—হাতে
ফুল এবং মুখে পান। মা জিজ্ঞাসা করছেন ‘পুত্র তুমি কিসের

লোভে আমার কুঞ্জে যাও এবং কিসের লোভে খন্তর-গৃহে
আস।’ পুত্র উত্তর দিচ্ছেন, ‘আমের লোভে যাই বাগানে, আর
পত্নীর সন্ধানে আসি খন্তরগৃহে।’ মা আবার জিজ্ঞাসা করছেন
‘কি খাও সেখানে?’ উত্তর হ’ল, ‘বাগানে আম এবং খন্তরগৃহে
ভুড় ও হুধ।’”

মা বলছেন ‘আমি তোমায় নয় মাস গর্ভে ধারণ করেছি
এবং পরে দশ মাস দুগ্ধ পান করিয়েছি। তুমি তো আমায়
হুধ-জল কিছুই দিলে না। তুমি খন্তরের গৃহ চিনলে কি করে?’
পুত্র বলছেন, “জীকে আনলে তবেই আমি তোমায় হুধ-জল
দিতে পারব। আমি পিতার সেবা করব এবং আমার জী
তোমায় দাসী হয়ে থাকবেন।”

পুত্রের বিবাহে জননীর আশঙ্কাধর্মী মেহপ্রবণ চিরন্তন
মনোভাবের ইঙ্গিত এই গানটতে আছে। পুত্রটি পাছে পুর
হয়ে যায় এই আশঙ্কায় বিচলিত জননীর ঈর্ষা ও অভিমানের
স্বর এই গানটতে অধ্বনিত।

এবার একটি মজার গানের পরিচয় দিচ্ছি। গানটি নিশ্চয়
লোকশিক্ষার জড় রচিত হয়েছিল। দীর্ঘদিন ধরে কড়াপক্ষকে
শোষণ করার যে রীতি চলে আসছে তারই বিরুদ্ধে যেন একটি
আদর্শ স্থাপিত করার জন্ত কোন নারী-কবি গানটি রচনা করে-

শাসনদীপার আনন্দোৎসবে—

জনগণের স্বাস্থ্য, শক্তি, কমনীয় শ্রী ও কল্যাণ কামনায়—

ঔষধ • পথ্য • প্রসাধনী

* ম্যালেরিয়া—

ডিকেলিন

ভারতীয় ভৈষজ্যসমূহের সারাংশ ও ম্যানানিজ
প্রভৃতি বহু মূল্যবান খনিজ পদার্থের সংমিশ্রণে
বহু গবেষণায় প্রস্তুত। একদিনে জ্বর উপশম হয়, পুনরাক্রমণের ভয় থাকে না।

• শক্তিদায়ক :

বলকলিকষায়

• রক্তপরিশোধক :

মহাবলকলিকষায়

• সংজীবনী শক্তি :

কোয়েল বালি

• চর্মরোগে :

কমলেশ মলম

• আয়ুর্বেদোক্ত :

মধুলীন মকরধ্বজ

• মধুমেলা তালমিছরী

স্বাস্থ্যকল্যাণে—

নলি-ভুঙ্কল

সুস্বাদু কেশ তৈল

• কেশত্রী সম্পাদনে

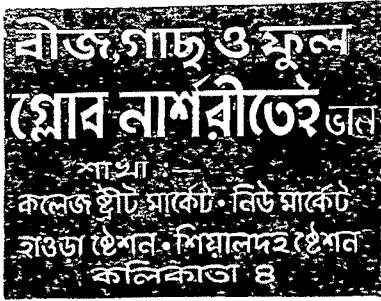
টান্ডানা মার্কা

লক্ষী নিলাস

সর্বত্র সম্ভ্রান্ত এজেন্ট আবশ্যক

ডি, কে, পাল এণ্ড কোং

৭৪-এ নলিনী শেঠ রোড, বড়বাজার, কলিকাতা—৭



কৃষিনন্দী পত্রিকার সম্পাদক ও শ্রীমতী নারায়ণীর স্বত্বাধিকারী

শ্রী অমরনাথ রায়, এফ, আর, এইচ, এস (লণ্ডন) প্রণীত

কয়েকখানি উৎকৃষ্ট কৃষি পুস্তক

১। বাংলার সজ্জা	২।।০
২। চাষীর ফসল	২।।০
৩। আদর্শ ফলকর	২।।০
৪। পুষ্পোত্তান	২।।০
৫। সরল পোল্টি পালন	২।।০
৬। সরল সারের ব্যবহার	১।।০
৭। মাছের চাষ	১।।০
৮। পশু খাতের চাষ	১।।০

সবের বের হল

শ্রীমতী বাণী রায়ের অভিনব গল্পের বই

“শূন্যের অঙ্ক”

ভূমিকা লিখেছেন—শ্রীমতী সূচেনা কপালন্যী

কিন্তু কেন? নোয়াখালীর পটভূমিকায় “রমার” চিত্ত শুদ্ধির জন্ত, না, আরও কিছু যা দৈনন্দিন জীবনে “কুমারী”, “বধূ” ও “জননী” মনকে পীড়া দেয় তার জন্ত! দাম—২।।০ টাকা

মানবেন্দ্রনাথ রায়ের—ভারতীয় নারীত্বের আদর্শ
(শ্রীমতী মায়া গুপ্ত অনূদিত) দাম—১।।০

চীনে কংগ্রেস মেডিক্যাল মিশনের বিবরণ

ডাঃ কোটনিসের অমর কাহিনী

ফেরে নাই শুধু একজন

অনুবাদক—শ্রীনেপালশঙ্কর সরকার। দাম ৩ টাকা

জি জা সা

পুস্তক-প্রকাশক ও বিক্রেতা
১৩৩এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৯

ছিলেন। কষ্টাপেক্ষের হাতে শোষণরোধের ক্ষমতা নেই, বরপেক্ষের বা বরের উদারতাই একমাত্র ভরসা।

সম্ভবত সম্প্রদানের সময়কার গান এটি :—

কনক দিয়ট দিয়না বরৈ : দিয়না বরা হৈ আকাশ

আহো ছলহ ছলহী গজ চৌকী

ছলহকে চীরা সোনহলা জৈসে সন্ঝা পলাস কৈ চৈল

অহো রদহ ন বাবুল খিচিয়া।

“ধর্ণ-দেউটিতে দীপ জলছে,—সু-উচ্ছে আকাশের উপর যেন প্রদীপ জলছে, বরকড়া গজচৌকির উপর আসীন। বরের শিরজ্ঞাণ কনকবর্ণের—যেন সন্ধ্যাকালে পলাশের ফুল। ‘হে পিতা, ঐ কনক-শিরজ্ঞাণ বিভিন্ন রং দিয়ে রঙিন করে দাও।’

তারপর হ’ল কি—বর বৈকে বসেছেন :—

সম্মুখ মনাবন বৈ চলে বাবুল

লেহ ন গজবা পচাস

সে হাথ উঠাবহ ন।

গজ বরি রাখহ গজ সার মে

হমর গজ হৈ অনেক

বাবা নাহি ভুলহ হাথী হউদকে।

সার মনাবন বৈ চলে জীজা লেহ ন তরঙ্গ পচাস

আহো হাত উঠাবহ তই দেব সে।

বরি রাখহ খোড় খোড়সার মে

হমরে খোড়ে হৈ অনেক

বাবু ভুবে নহী হম খোড়ে জীন কো।

স্বপ্নের এসেছেন জামাইকে প্রলোভন দেখিয়ে ভোলাতে—বলছেন, ‘হাতীশালা হতে পঞ্চাশটি হাতী নিয়ে নাও এবং হাত তোলা।’ জামাই উত্তর দিচ্ছেন ‘হে পিতা, হাতী আপনার হাতীশালার ঝাক—আমার পিতার অনেক হাতী আছে, তিনি গজের কাদাল নন।’ তারপর এলেন খালক—এবারে লোভ দেখালেন পঞ্চাশটি খোড়ার। বড়ই বিলম্ব হয়ে যাচ্ছে, লগ্ন সমাগত। উত্তর হ’ল, খোড়ার কাদাল তিনি নন, তাঁর পিতার আলয়ে বহু খোড়া আছে।”

এবার এলেন শান্তী—

সাম্মুখ মনাবন বৈ চলে বাবুল

লেহন মানিক হুঁদরিয়া

সে হাথ উঠাবহ ন।

ধরি রাখহ হীরা মোতী সাম্মুজী

হীরন তরা হৈ অমার।

আহো নহী ভুবে হুঁদরী মালকে।

সরহজ মনাবন বৈ চলী বাবুল

লেহ ন হাথনা বিজারট

সে হাথ উঠাবহ ন।

ধরি রাখহ আপনা বিজারট

গহন ন তরি হৈ সন্দুক,

বীণা নাহী বিজারট সাধ হৈ।

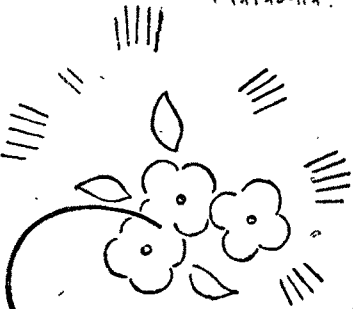
আরোপের
বিপাক্তর (৩)



শিল্পীমাঝেই সৌন্দর্যপ্রাপ্ত। রূপদক্ষ শিল্পীর যাতুস্পর্শে কঠিন প্রস্তরখণ্ডও অপরূপ হয়ে ওঠে।

তেমন, সৌন্দর্যের পূজারিণী আধুনিক তরুণী যদি শিল্পীর মন নিয়ে নিত্যপ্রসাদনে যত্ন নেন, তবে তিনিও আপন তনুশ্রীর অপরূপ রূপান্তর ঘটাতে পারেন। কেবলমাত্র উচ্চাঙ্গের স্বপ্রসাদনাই যে-কোন নারীকে ভয়ঙ্কর ঘন চিকন কেশরাশি, অঙ্গে অঙ্গে কমনীয় কান্তি, তনুতটে ঘোঁবনোজ্জল লাবণ্যের অপূর্ব সুষমা, কুন্দধবল দস্তপাতিতে মৌক্তিক ছাতি এনে তাঁর তনুশ্রীর রূপান্তর ঘটাতে সাহায্য করতে পারে।

ক্যালকেমিকোর অভুলনীয় প্রসাদনসম্ভারে তরুণীদের রূপায়নের সব কিছু উপকরণই সঞ্চিত আছে : অঙ্গরাগে—মার্গো সোপ, দশন শোভায়—নিম টুথ পেপ্ট, তনুহৃষমায়—লাবনি ক্রীম ও স্নো, রূপদীপনে—রঙকা পাউডার, কেশমার্জনে—সিলট্রেস শ্যাম্পু, কবরীরচনায়—স্বরভিন্মিষ্ট কেশ তৈল ক্যান্ডিউরল এমনি আরও কত কি।



দি ক্যালকার্টা কোমিক্যাল কোং লিঃ

মার্গো সোপ • নিম টুথ পেপ্ট
ক্যান্ডিউরল • সিলট্রেস
রঙকা পাউডার
লাবনি স্নো

শাওড়ী এলেন, বেকে বস। জামাইকে বাগ মানাতে মাণিক মুঁদরী হাতে—‘বাছা এই নাও অলঙ্কার, এবার হাত ভোলো।’ উত্তর হ’ল ‘হে মাতা, হীরা মোতী তোমার ঘরেই রাখ, আমার ও বস্ত্র যথেষ্ট আছে—আমি অলঙ্কারের কাঙ্গাল নই।’

তখন এলেন ঞালিক-পত্নী ‘বিজ্ঞানট’ হাতে—বর বলছেন, ‘অলঙ্কারে আমার বাস্তব ভরা আছে, আপনার ‘বিজ্ঞানট’ রাখুন আমার ও জিনিষের সাধ নেই।’

সবশেষে এলেন ঞালিকা, বিনয়ের সঙ্গে বললেন,—

সারী মনাবন বৈ চলী
জীজা হমরে ন ফুটবী কউড়িয়া।
কা তোহরে ডেট ধৈ।
জীজা আপন রাদ্ দেই জাহ
অহো জীজা অপনে পরেম
ডেট দেউ দে হববা উঠাবহ ন।

ইতনা বচন নৌসে সুনলৈ আহো সুনহ ন পবলৈ
সে চৌকী বইঠ জেবনা সে জেবলৈ সে পান দেই দ্বারে গয়ে।

ঞালিকা বলছেন, ‘হে জীজা, আমার কাছে তো ফুটো কড়িও নেই, তোমাকে আর আমি কি উপহার দেব? তোমার স্মৃতি এখানে রেখে যাও। আমার স্নেহ-ভালবাসার দান গ্রহণ কর এবং হাত ভোলো।’

এতক্ষণে বর বিগলিত হলেন, এবার তিনি হার মানিলেন। ঞালিকার কথা শেষ হতে না হতেই ‘চৌকায়’ বসে ভোজন করলেন এবং পান খেয়ে বাইরে গেলেন।

বিবাহের পর রতনের স্থানে (চৌকা) বসে আহার করার রীতি আছে। গানটি সম্ভবতঃ সম্প্রদানকালে, আর নয় তো বিবাহের পর চৌকায় বসে ভোজনের সময়ই গাওয়া হয়। এ গানটি ছেলের বাড়ীতে কেন গাওয়া হয় তা বুঝতে পারা যায় না—আসলে এটিতো মেয়ের বাড়ীতেই গীত হওয়া উচিত।

পশ্চিম বাংলার বর্দ্ধমান জেলায়—

● চাষের ও বাসের জমি ●

রূপনা নানান পুর
স্যা না তৌ নি সান
বাংলার সীমান্তে সাওতাল পরগণার
স্বাস্থ্যকর ও মনোরম প্রাকৃতিক
সৌন্দর্য্যমণ্ডিত শত শত বঙ্গালী
অধ্যুষিত হাজার হাজার বিঘা জমির
উপর প্রতিষ্ঠিত আদর্শ স্বাস্থ্যনিবাস।

জমি.

মোরনী মোকররী সর্ভে প্রতি
বিঘার মূল্য ৩৫০ ও তদুর্দ্ধে গ্লটের
অবস্থান অল্পঘায়া।

* * *

বিস্তারিত বিবরণসহ
জমির নক্সা প্রত্নতির জন্য
১. অগ্রিম পাঠাইতে
হয়।

এই জমি এবং আমাদের
গৃহ - নির্মাণ - বিভাগের
শেয়ারের বিস্তারিত বিব-
রণের জন্য পত্র লিখুন।

নবদ্বীপ উপকণ্ঠে

নূতন কলোনি :

৬গঙ্গাশ্রীরে এবং নবদ্বীপ হইতে মাত্র ৩৮
মাইল দূরে ই, আই, রেলওয়ের পূর্বস্থলী স্টেশন-
সংলগ্ন কয়েক শত বিঘা জমির উপর বর্দ্ধিষ্ণু
পরিবারবেষ্টিত।

নবদ্বীপধামের ষাণ্ডাতীয় স্বথস্ববিধাসহ স্বল্পব্যয়ে
স্বাস্থ্যকর স্থানে স্থায়ী বসবাসের আদর্শ স্থান।
খানা, ডাকঘর, ছেলেমেয়েদের স্কুল-কলেজ,
ডাক্তার, বৈজ্ঞ, হাসপাতাল, দেবালয়, সমস্তই
অদূরে অবস্থিত, কৃষির যোগ্য জমিও সহজলভ্য।
বাসের জমি প্রতি গ্লট ৪-৮ কাঠা মূল্য অবস্থান
অল্পঘায়া প্রতি কাঠা ২৫ টাকা ও তদুর্দ্ধে।

ইউনিয়ন ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড

[স্থাপিত—ইং ১৯৪১]

৫, কমার্শিয়াল বিল্ডিংস
১০১, নেতাজী স্বভাষ রোড,
কলিকাতা।
ফোন—ক্যাল ৫৭৭৮

খাদ্য ও পথ্য বিভাগ

শ্রীহরগোপাল বিশ্বাস, এম, এসসি

যে সময় অল্পসঙ্কট চরমতম অবস্থায় উপনীত সে সময় খাদ্যের গুণাগুণের আলোচনা সাধারণতঃ অপ্রীতিকর হওয়াই বাস্তবিক। তথাপি খাদ্য সংক্রমে কয়েকটি জ্ঞানধারণার নিরসন জাতির প্রকৃত কল্যাণের দিক হইতে অসমীচীন হইবে না বলিয়াই মনে হয়।

আবহমানকাল হইতে আমাদের ধারণা আছে যে, আতপ চাউল সিদ্ধ চাউল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট; কিন্তু বর্তমান বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে সে ধারণা ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। সিদ্ধ চাউলে আতপ চাউলের চেয়ে ভিটামিন বি_১, নিকোটিনিক এসিড-প্রভৃতি উপকারী ভিটামিন বেশী থাকে বলিয়া জানা গিয়াছে। অনেকেই অবগত আছেন যে, বি-এসিডের ভিটামিন-গুলি সহজেই জলে দ্রবীভূত হয় এবং এগুলির অধিকাংশই থাকে ধানের ভূষের ঠিক নীচেই চাউলের উপরের পর্দাতে। ধান সিদ্ধ করিবার সময় ভিটামিনগুলি জলে দ্রবীভূত হয় এবং চাউলের দানা নরম হইয়া ফুলিয়া উঠিলে তাহার মধ্যে ভিটামিনযুক্ত জল শোষিত হয় এবং ধান শুকাইলে ভিটামিন-গুলি চাউলের ভিতরে আটকা পড়িয়া যায়। এখন একই

জাতীয় সিদ্ধ করা এবং অসিদ্ধ ধান যদি সমভাবে ছাঁটা বা ভানা হয় তবে সিদ্ধ চাউলের মধ্যে আতপের অপেক্ষা অধিক পরিমাণে ভিটামিন থাকিবে, তাহা সহজেই বুঝা যাইতেছে। কেহ কেহ জিজ্ঞাসা থাকিবেন যে, আমেরিকার ব্যবসায়ীগণ রাসায়নিক উপায়ে প্রস্তুত বি-ভিটামিন মিশ্রিত চাউল বিক্রয়ের চেষ্টা করিতেছেন, ইহাকে নাকি 'রি-এনফোর্সড রাইস' আখ্যা দেওয়া হইবে। আশ্বাসের কথা এই যে, প্রস্তাবিত এই চাউলের অপেক্ষা আমাদের সিদ্ধ চাউল, বিশেষতঃ টেকি-ছাঁটা সিদ্ধ চাউল আদৌ নিকৃষ্ট হইবে না; সুতরাং বাংলা দেশে ঐ চাউল কাটতির আশা কমা আর একটি কথা এই যে দুই বার সিদ্ধ বলিয়া সিদ্ধ চাউলের ভাত আতপ অল্পের চেয়ে সহজপাচ্য।

চাউল-প্রসঙ্গে পথ্য সংক্রমেও একটি কথার উল্লেখ আবশ্যক। অমৃৎধর পর অনেক চিকিৎসক প্রথম পথ্য হিসাবে আটা বা ময়দার রুটির ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। ঐ রুটির চেয়ে সরু চাউলের ভাত অনেক সহজে হজম হয়; সুতরাং প্রচলিত ধারণার পরিবর্তন বাঞ্ছনীয়।

১৯৪৬

আমর একটি সাফল্যপূর্ণ বৎসর

১৯৪৬ সালে নূতন জীবন বীমার কাজ	...	...	...	১২,৩৯,৭১,০০০/-
১৯৪৫ " " " " "	...	...	...	৮,৩৮,৩১,০০০/-
১৯৪৪ " " " " "	...	...	...	৬,০৭,১২৫,০০০/-
১৯৪৩ " " " " "	...	...	...	৪,৫৪,২১,০০০/-
১৯৪২ " " " " "	...	...	...	২,৩৩,৮৬,০০০/-

নিউ ইন্ডিয়া এজুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড

—হেড অফিস—

বোম্বাই

—কলিকাতা অফিস—

৯, নেতাজী সুভাষ রোড

সর্বপ্রকার বীমার বৃহত্তম ভারতীয় প্রতিষ্ঠান

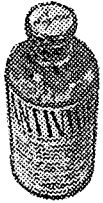
জীবন • অগ্নি • নৌ • দুর্ঘটনা

পারিবারিক জীবনে এ্যান্টিভায়স

মুখ ও গলদেশের সর্বাঙ্গীণ স্বাস্থ্যরক্ষায় এ্যান্টিভায়স কুলির শ্রেষ্ঠ ঔষধ, প্রতিষেধক ও বীজাণুনাশক। ইহার বীজাণুনাশক শক্তি মুখগহ্বর ও গলদেশকে পরিস্কৃত, তৃপ্তিপ্রদ ও রোগমুক্ত রাখে এবং হাসিকে মধুর ও উজ্জ্বল করে। মাতৃদুগ্ধের ক্ষীণতা বৃদ্ধি করে, জিহ্বাকৃত বা গল-ক্ষতে ইহা কুলি করিবার শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

পোড়া ক্ষত, ডেব্রু ক্ষত, কার্বাইল, দূষিত ক্ষত, গ্রীষ্ম-প্রদাহজনিত ক্ষত বা চর্মরোগ, সেলুলাইটিস, আঘাত-আঁচড়-হাড়ভাঙ্গা বা পোকা-মাকড়ের দংশন প্রভৃতি জনিত ক্ষীণতা, বেদনা বা প্রদাহ এ্যান্টিভায়স আশু নিরাময় করে।

পোড়া ক্ষতে সস্তর জ্বালা প্রশমিত হয় এবং
ফোস্কা পড়ে না



Antivios
Ideal healing antiseptic and gargle.

নাম-ঠিকানা সহ এই বিজ্ঞাপন পাঠাইলে
বিনামূল্যে নমুনা পাইবেন।

I. C. & Co., Calcutta.

বাহির হইল!

বাহির হইল!!

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের

সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

শ্রী উপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত

জাতীয় কংগ্রেসের ইতিহাস, বৈপ্লবিক যুগের ইতিহাস, অহিংস আন্দোলনের ইতিহাস, আজাদ হিন্দ ফৌজের ইতিহাস, স্বাধীনতা দিবসের ইতিহাস, স্বাধীনতা দিবসে জননায়কগণের বাণী, স্বদেশী যুগ হইতে আজ অবধি ভাল ভাল জাতীয় সঙ্গীত এবং বিশিষ্ট জননায়কগণের ছবি সম্বলিত এই পুস্তক পাঠ করিলে স্বাধীনতা সংগ্রামের সমস্ত তথ্য পাওয়া যাইবে। গ্রন্থকার নিজে ১৯০২ সাল হইতে আজ অবধি বাংলার প্রায় সমস্ত জননায়ক ও বিপ্লবীদের সঙ্গে মিশিবার সুযোগ পাওয়ায় এই ইতিহাস প্রণয়ন সম্ভব হইয়াছে। কাগজ দুস্তাপ্যাহেতু অল্পসংখ্যক ছাপা হইল। মূল্য দুই টাকা মাত্র।

মডার্ন বুক এজেন্সি

১০নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা—১২

এতদিন আমরা মস্তুর ডালকেই আমিষ বলিয়া ধরিয়া আসিতেছি। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে কিঞ্চিৎ দেখা যায়, মস্তুর ছোলা মাষকলাই অর্ধহর খেসারি প্রভৃতি ডালের আমিষের অংশ ও মস্তুর ডালের আমিষের পরিমাণেরই (শতকরা ২৫) কাছাকাছি। এ বিষয়ে একটি নূতন তথ্য এই যে, মস্তুর ডালের আমিষ-পদার্থ অপরাপর ডাল অপেক্ষা আমাদের শরীরের পক্ষে যে অনেক কম উপকারী তাহা চাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োকেমিক্যাল বিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যাপক ও বর্তমানে বাদ্যালোরের রাজকীয় ডেমারি রিসার্চ প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ডক্টর কালীপদ বসু মহাশয় পরীক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছেন। ডাল সম্বন্ধে একটি অবজ্ঞাতব্য বিষয় এই যে, রান্নার সময় উহা সুলভি করিবার উদ্দেশ্যে কদাচ সোডা দেওয়া উচিত নয়, কারণ তাহাতে ডালের উপকারী বি-ভিটামিনগুলি নষ্ট হইয়া যায়।

ডিম কদাচ কাঁচা খাওয়া উচিত নয়। অনেক খাদ্যতত্ত্ববিদের পরীক্ষায় ইহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে যে, ডিম কাঁচা খাইলে উহার স্বেভাংশ বা অ্যালবুমিন আদৌ হজম হয় না। চিকিৎসকগণের ইহা বিশেষভাবে স্মরণ রাখা দরকার।

অনেক ক্ষেত্রে ডিমের মধ্যে এক প্রকারের ব্যাক্টেরিয়া বিদ্যমান থাকিতে দেখা যায়—উহা অল্প উত্তাপেও মরে না, ফলে উহা খাইলে এক প্রকার সংক্রামক রোগ দেখা দেয়। সুতরাং কাঁচা ডিম কোনও ক্রমেই খাওয়া উচিত নয়। আমাদের প্রচলিত ধারণা, মহিষের দুধ গরুর দুধের চেয়ে হজম করা কঠিন। এই ধারণাবশতঃ কলিকাতা প্রভৃতি শহরে অনেকে আর্থিক সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও খাঁটি গোহুগ্ধ দুগ্ধ বিধায় দুধ খাওয়াই ছাড়িয়া দেন। মহিষ ও গোহুগ্ধের প্রধান প্রধান উপাদানগুলি নিয়ে উল্লেখ করা হইল—

দুগ্ধ	আমিষপদার্থ	মাখন	দুগ্ধশর্করা	লবণপদার্থ	জল
গোহুগ্ধ	৩.৪	৪	৫	০.৭	৮৭
মহিষদুগ্ধ	৪.৪	৭.৩	৪.৫	০.৮	৮৩

উপরের তালিকায় দেখা যাইতেছে যে, মহিষদুগ্ধে একমাত্র মাখনের পরিমাণই অনেক বেশী। গোহুগ্ধের সহিত ইহার অন্যান্য উপাদানের পার্থক্য তেমন অধিক নয়। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় কিঞ্চিৎ দেখা গিয়াছে যে, মাখনের পরিমাণ বেশী থাকা সত্ত্বেও মহিষদুগ্ধ গোহুগ্ধের মতই সহজে পরিপাক হয়।

যাহারা অগ্নিমান্যবশতঃ পাতলা দুধ সহ্য করিতে পারেন না তাহারা দুধ ঘন করিয়া বা ছানা কাটিয়া খাইলে উহা সহজে হজম করিতে পারিবেন। এই প্রসঙ্গে একটি কথা স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, ছানার জল যেন তাহারা ফেলিয়া না দেন; কারণ ছানার জলে ল্যাক্ট অ্যালবুমিন নামক দুধের একটি উপকারী আমিষপদার্থ, দুগ্ধশর্করা, লবণ-পদার্থ এবং রিবো-ফ্লাভিন, এনিউরিন, অ্যাসকরবিক এসিড (বি২, বি৩, সি), প্রভৃতি অত্যাবশ্যক ভিটামিন থাকে।

• তৈল সঙ্কেৎ একটি জাতি বারবার উল্লেখ করা যাইতেছে। ভিটামিন তালিকার কোনও নিদর্শন না দেখিয়া অনেক শিক্ষিত লোকেও সরিষার তৈলে দেহপুষ্টিকারক কিছুই নাই বলিয়া মন্তব্য করেন। হুই-একখানি খাত্ত-বিষয়ক পুস্তকেও ইহা দেখা গিয়াছে। এ কথা সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে, উদ্ভিজ্জ তৈলে সচরাচর ভিটামিন না থাকিলেও স্নেহপদার্থের প্রধান যে গুণ শক্তি সরবরাহ করা তাহা সরিষার তৈলে প্রামাণ্য আছে।

পূর্ব-বাংলার কলিকাতা-প্রবাসী মধ্যবিত্ত সচ্ছল পরিবারের বাঁহারা বাল্যে ও কৈশোরে পদ্ম, ব্রহ্মপুত্র, আড়িয়াল বাঁ, ধলেশ্বরী, মেঘনা বা মধুমতীর সুবাহু টাটকা মৎস্ত খাইয়া আসিয়াছেন—রবীন্দ্রনাথের একটি পঙ্ক্তির দ্বয় পরিবর্তিত করিয়া বাঁহাদের সম্বন্ধে বলা যায়—“এখনো সে সব মৎস্ত অমৃত-পিপাসা মুখেতে রয়েছে লাগি”—তাঁহারা বরফ দেওয়া ইলিশ প্রভৃতি মৎস্ত ভালবাসেন না। ‘এ যেন মাছ খাওয়াই নয়’ বলিয়া তাঁহারা কেহ কেহ অসুযোগ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের অসুযোগ অস্বীকার করা যায় না, তবে তাঁহাদের একথা মনে রাখা উচিত যে, বরফে মাছের মৎস্যজ্ব নষ্ট হয় না। উহার আমিষ-পদার্থ অক্ষুণ্ণ থাকে, হাদের কিঞ্চিৎ তারতম্য হয় মাত্র। অবশ্য তাই বলিয়া সময়ে বরফ না দেওয়ায় যে মাছ পচিয়া গিয়াছে তাহা খাইবার পরামর্শ কেহই দিবে না। জাহাজের ক্ষীভল কক্ষে রক্ষিত অষ্টেলিয়া, নিউজিল্যান্ড প্রভৃতি স্থানের আমদানী মাংস বিলাতের লোকেরা পরম পরিতোষের সহিতই খাইয়া থাকে। সুতরাং গোয়ালন্দে ইলিশ বরফ দেওয়া বলিয়া নাক সিটকাইলে আমাদের চলিবে না; বরং যাঁহাতে মাছ অধিকতর সুরক্ষিতভাবে ও প্রভূত পরিমাণে কলিকাতায় আমদানীর ব্যবস্থা হয় গবর্ণমেন্টের তরফ হইতে তাহার ব্যবস্থা

করার জন্ত আন্দোলন আবশ্যিক। প্রবন্ধের পোড়াতোই ডালের আমিষ-পদার্থ আমাদের শরীর রক্ষার্থে যথেষ্ট নয় বলা হইয়াছে। উহার সহিত উপযুক্ত পরিমাণে দুধ বা ছানা খাইলে শরীরের যথাযথ পরিপুষ্টি হইতে পারে; অল্পখা উপযুক্ত পরিমাণে মাছ বা মাংস না খাইলে সুস্থদেহে মানুষের মত বাঁচা অসম্ভব। দুধ যখন দুর্লভ তখন মাছের প্রতি অধিকতর মনোযোগ দেওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নাই।

কিঞ্চিৎ অবান্তর হইলেও একটি বিষয় উল্লেখ করিতে হইতেছে তাহা পূর্ববঙ্গবাসীদের স্থানত্যাগ সম্পর্কিত। পূর্ববঙ্গের অপরিপাণ্ড মাছ-হুধে সুরক্ষিত দেহ, সবল মন ও সতেজ সর্বগ্রাহী মেধা লইয়া একদা বাঁহারা কলিকাতায় আসিয়া বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের ভবিষ্যৎকালের হৃদয় বর্ধমান প্রভৃতি জেলায় বাস। বাঁহারা অপ্রচুর মৎস্যসাহার করিয়া আর কত দিন নিজেদের স্বাস্থ্যসম্পদ বজায় রাখিতে সমর্থ হইবেন? এক্ষেত্রে দুটি পন্থার নির্দেশ দেওয়া যাইতে পারে। যদি অগত্যা মাটির মায়া ছাড়িয়া আসিতেই হয় তবে বাঁহারা আসিবেন তাঁহাদের রুচির আনন্দ পরিবর্তনপূর্বক প্রচুর পরিমাণে মাংসাহারের অভ্যাস করা; দ্বিতীয় এবং প্রকৃষ্ট পন্থা হইতেছে অসীম মনোবল ও আত্মত্যাগ বরণ করিয়া সংঘবদ্ধভাবে পৈতৃক ভিটা আঁকড়াইয়া থাকা।

খাত্তপ্রসঙ্গে বর্তমান প্রবন্ধে যে বিষয়গুলির উল্লেখ করা হইল আশা করা যায়, তাহাতে দেশবাসীর উপকার সাধিত হইবে।*

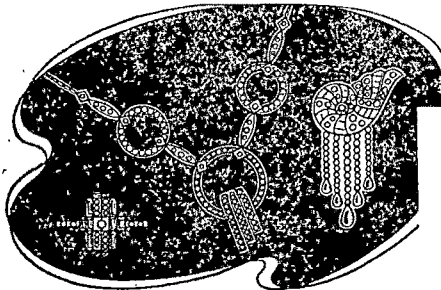
* প্রবন্ধটি লেখার নির্দেশদানে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু মহোদয় আমার কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

মফঃস্বলের অর্ডার ভিঃপিতে পাঠান হয়। আমাদের তৈরি N. J. ষ্ট্যাম্পযুক্ত গহনা ব্যবহারান্তে গিনি সোনার মূল্যে খরিদ করি।

*

বালীগঞ্জ ব্রাঞ্চ :—

১৬১/১এ, রাসবিহারী এভিনিউ
(গড়িয়াহাটা জংসনের নিকট)



গঠন বৈশিষ্ট

রূপ সজ্জা অলঙ্কার
অপরিহার্য যদি তার কোন
নূতনত্বের বিশেষত্ব থাকে।

ন্যাশানাল জুয়েলারী ওয়ার্কস

ফোন সাউথ-২৬৩৯
২০নং কালীঘাট রোড
শোকার্ম-১৬১, রাসা রোড

সুইজারল্যান্ডের সমৃদ্ধি

শ্রীবগলাকুমার মজুমদার

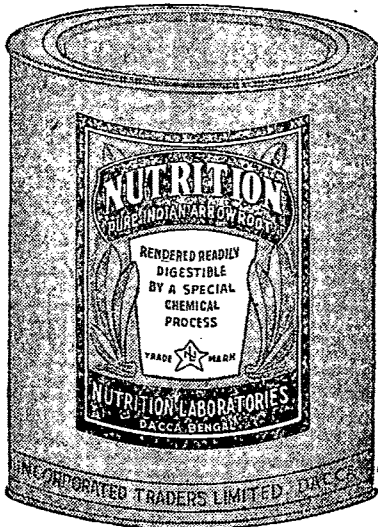
আর্থিক উন্নতির উৎকর্ষ আকাশ। যে তীব্র প্রতিযোগিতার সৃষ্টি করেছে, তাতে করে একদিকে যেমন কাল্পনিক অভাবের মাত্রা বেড়ে চলেছে, অপর দিকে তেমন অনর্থের আশ্রয় মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে এবং আন্তরিকতা একেবারে বিদায় নিতে বসেছে। বিজ্ঞান এর ইন্ধন যোগাচ্ছে। ধনিক ও শ্রমিকের মধ্যে বিরোধ আজ নানাভাবে মানবীয় সম্বন্ধকে কলুষিত করছে। অর্থোপার্জনর চেয়ে অর্থবর্জনে সামঞ্জস্য বিধান করা জটিল ব্যাপার। কৃষিপ্রধান দেশে এই সমস্যা ততটা তিক্ততা এনে দেয় নি যতটা দৃষ্টিগোচর হয় শিল্পপ্রধানদেশগুলিতে। জ্ঞানের রুদ্ধদ্বার উদ্বাটন করেছে বিজ্ঞান—তাতে তার দানও অসুস্থ ও বিষমকর। কিন্তু অর্থোপার্জন ও শক্তিপ্রয়োগের যন্ত্র হিসেবে যখন একে ব্যবহার করা হ'ল, যত জটিল সমস্যা তখন এসে জটিল। মানুষের মানুষের সম্বন্ধ জটিল হয়ে উঠল। ভারতীয় সভ্যতার মূলগত আদর্শ হ'ল শান্তি ও সংযম। প্রাণের প্রাচুর্য এনে দেয় প্রেম। অর্থের প্রাচুর্য বিভ্রান্তি এনে দেয় রাষ্ট্র ও সমাজ-জীবনে। মানবীয় স্বর্গকে বাদ দিয়ে যারা ক্ষুধবস্তুর প্রাধান্য মেনে নেয় তারা মহতী বিনষ্টির পথ প্রশস্ত করে দেয়।

এমন সুন্দরী পৃথিবী সুন্দরতর হয়েছে মানুষের জ্ঞান ও বিজ্ঞানের আলোকে। যে বিজ্ঞানের বিষমকর আবিষ্কার সমূহের দ্বারা বিভিন্ন দেশ সমৃদ্ধি লাভ করেছে, ও জাতিতে জাতিতে ধর্মিষ্ঠতম সম্বন্ধ স্থাপিত হতে চলেছে, তার অগ্রগতি প্রতিরোধ করার মানে মানুষের মনীষা ও স্বজনীশক্তির বিরুদ্ধাচারণ করা।

বিজ্ঞানের দান ব্যবসায় ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে যে আকাশ-পাতাল আর্থিক অনমতার সৃষ্টি করা হয়েছে তার সামঞ্জস্য বিধান করবার ক্ষমতা চেষ্টা চলেছে সত্য; কিন্তু আন্তরিকতার আলো এখনও পথের সন্ধান দেয় নি।

বনভূমি দেশগুলির মধ্যে ক্ষুদ্র সুইজারল্যান্ড যেভাবে ধনিক ও শ্রমিক উভয়ের পার্থক্য ব্যবস্থা করেছে তাতে বিস্মিত হতে হয়। সুইজারল্যান্ডে কৃষির উপযোগী এমন জমি নাই যা সেধানকার অধিবাসীদের অধিকতরও বাঁচিয়ে রাখতে পারে। না আছে তার কয়লা, না আছে লৌহখনি বা অস্ত্র-ধনিক পদার্থ, এমন কি কাঁচা মাল পর্যন্ত নেই। সমুদ্রের বের হবার পথ নেই তার। তবু যুদ্ধের দুর্ভিক্ষেরও তার

একটি বলকারী খাদ্য !



বিলাত ও আমেরিকার শিশুবিদ্যায় পারদর্শী ডাক্তারগণ বলেন যে দুধের সহিত অস্তিত্ব: ৮১০০ ভাগ কার্বো-হাইড্রেট বোগ দিয়া শিশুদের খাইতে দেওয়া উচিত। “নিউট্রিশন” একটি পরিপূর্ণ কার্বোহাইড্রেট ফুড।

যাহারা দুধ হজম করিতে পারে না অথবা আশাশয় বা অজীর্ণ রোগে ভোগে তাহাদের পক্ষে বিশেষ উপকারী। সর্বত্র পাওয়া যায়।

ইনকর্পোরেটেড ট্রেডার্স লিঃ

সুভাষ এভেনিউ : ঢাকা

মহাত্মা গান্ধীর আশীর্বাদপূত ও আদর্শপবিত্র অভিনব উপন্যাস

সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

হিন্দু-মুসলমান

দ্বন্দ্ব ও হিংসার মাঝে মিলনের সেতু বাধিয়াছে। করুণ ও বাস্তব বর্ণনা ভবিষ্যতের পথ দেখাইবে। বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হইতেছে। আজই সংগ্রহ করুন।

ক্যান্সার, ব্যবসায়ী ও অর্থনীতির ছাত্রগণের অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থ

দেবেশ রায় প্রণীত

ভারতীয় ব্যাঙ্ক ও অর্থনীতি

সকল পত্রিকায় উচ্চপ্রশংসিত। সঞ্চয়ীর বন্ধুত্ব।

হিন্দী ভাষা শিক্ষা করিবার একটি শ্রেষ্ঠ পুস্তক

হিন্দুস্থানী টিচার

বাংলা ও ইংরাজি ভাষাসহ হিন্দি পরিচয়

সরস্বতী বুক ডিপো

৮১নং সিমলা স্ট্রিট, কলিকাতা

এবং সকল পুস্তকালয়।

আর্থিক অবস্থা জটিল হয়ে উঠে নি—বেকার-সমতা দেখা দেয় নি। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকায় মাথাপিছু ২০৯৮ টালিং আয় ছিল, অথচ সুইজারল্যান্ডে ছিল ৩১২৬ টালিং।

শিল্পের জাতীয়করণের দ্বারা যখন চারদিকে উঠছে ভবন ধনতন্ত্রী সুইজারল্যান্ড ব্যক্তিগত শিল্পনিয়ন্ত্রণের সাহায্যে শিল্পপতি ও শ্রমিকের মধ্যে অনেকটা সমতা রক্ষা করতে পেরেছে। এটা সম্ভব হয়েছে তার রাজনৈতিক স্বাধীনতার সহিত বিশেষ অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর সমন্বয়ের জন্ত। ধনতন্ত্রী-দেশে শ্রমিকগণ অবিকতর বনী হয় এবং দরিদ্রেরা আরও দরিদ্র হয়—এটা মার্কস ও অ্যান্ড সমাজতন্ত্রীদের মত। বস্তুত সুইজারল্যান্ডে বহু মূলধন ঘাটে ও অপৰ্য্যাপ্ত লাভ হতে পারে এমন শিল্প-প্রতিষ্ঠান খুব কমই আছে। সুইজারল্যান্ডের অর্থনীতি আর্থিক প্রাচুর্যের স্বষ্টি করে না। প্রত্যেক ঘড়ি-শ্রমিক ১০ টালিং হতে ২০ টালিং আয় করে থাকে। অ্যান্ড শিল্পেও শ্রমিকগণ অল্প আয় করে থাকে। বড় বড় কোম্পানীতে ১০০ বা তার কিছু বেশী শ্রমিক কাজ করে থাকে। তা ছাড়া বেশীর ভাগ প্রতিষ্ঠানেই ২০ জনের কম লোক কাজ করে। কোন কোন আদর্শ ছাত্তি বা বড় ঘড়ি-শিল্পপ্রতিষ্ঠানে ১০ থেকে ১৫ জন লোক বেটে থাকে এবং ম্যানেজারই হ'ল ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের মালিক। মালিক ও কর্মীর মধ্যে বড় একটা তফাৎ দেখা যায় না। কোন সুইস-সহরে গেলে দেখতে পাওয়া যায়, মালিক ও কর্মীরা একই বাড়ীতে বাস করছে এবং ভাড়াটে মটরে চড়ে কার-খানায় যাচ্ছে।

সুইজারল্যান্ডের প্রতিটি অধিবাসী যে কিরূপ আত্মনির্ভরশীল ও কর্মঠ তা সেখানকার গোয়ালারের কথা পর্য্যালোচনা করলে জ্ঞাত হওয়া যায়। সু-উচ্চ আল্পসের গায়ে তারা বাস করে। সাধারণতঃ ৭ বা ৮ একর জমির মালিক হচ্ছে এক-একটি গোয়াল। পান্থর, হুড়ি ইত্যাদি পরিষ্কার করে সেখানে সারমাটি দিয়ে সে অপৰ্য্যাপ্ত বিচালী জন্মায়। এই ঘাস সে গরুগুলিকে ষাওয়ায়। যুরগীছানা ও শূকর পুষে থাকে। শক্ত মাটিতে জলপেচন করবার জন্ত নিকটবর্তী একটি পাহাড়িয়া নদীর জল কোণে ফেতে নিয়ে আসে।

শীতকালে সেই গোয়ালার ও তার পরিবারস্ব সকলে নীচে সমতলভূমিতে নেমে আসে। তাদের একটা ছোট কারখানা আছে। নদীর জলের দ্বারা পরিচালিত একটা কুঁদও আছে। ঘড়ির বিভিন্ন অংশ, কাঠের পাত্রাদি এবং চুর্কট প্রভৃতি তারা তৈরি করে। মেয়েরা সূচীকর্ম করে ও তৃণাদি দ্বারা বেগী, খোঁশা ও ডালা প্রস্তুত করে। ঘড়ির অংশগুলি অল্প কারখানা হতে এনে সম্পূর্ণ রূপে ছোড়া দিয়ে দেয়। এ কাজেও তাদের বিশেষ দক্ষতা পরিদৃষ্ট হয়। তাদের মজুরীও বেশী।

সুইসরা পরিবার নিয়ে একত্রে থাকতে ভালবাসে। তা বলে তারা উপত্যকার অ্যান্ড পরিবারের সহিত মেলামেশা

যে করে না তা নয়—বাস্তবিক নানাভাবেই উপত্যকাবাসীদের সহিত তারা সংযোগ রক্ষা করে থাকে। গ্রীষ্মকালে সকলের সমবেত চেষ্টায় নিযুক্ত রাবালের তত্ত্বাবধানে সকলের গরু পাহাড়ের তৃণবহুল সাহুদেশে পাঠান হয়। গ্রামস্থ পনিরের কারখানা সমবায়-প্রতিষ্ঠান বিশেষ। প্রত্যেক চাষীরই তাতে অংশ আছে। অংশের অহুপাতে সে লাভ ও খবরদারি করে থাকে। সমবায় সমিতিতে প্রত্যেকের যোগদান করা ব্যক্তি-গত ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে। তাকে পনিরের কারখানায় দুগ্ধ দিয়ে আসতে হয় না। কৃষক নিজে অন্নের সহিত কাজ করে; বৎসরান্তে কিছু জমাতেও পারে।

এইরূপ জীবন কঠোর কিন্তু শান্তিদায়ক। দিনান্তে টেবিলের একপাশে মেয়ে ও মা, অল্প পাশে ছেলেরা বসে এবং তাদের মাঝখানে সজ্জির ঝোল, শূকর-মাংস, পনির ও লাল-রুড়ী থাকে।

কৃষকের বেলায় যা বলা হ'ল সুইস শ্রমিকদের বেলায়ও তা সত্য। কঠোর পরিশ্রম ও ব্যক্তিগত কর্মদক্ষতার দ্বারা তারা বেশ ভালভাবে জীবিকা-নির্ভর করতে পারে। তারা বেশীক্ষণ পরিশ্রম করে, দক্ষতাও তাদের অত্যন্ত চেষ্টে বেশী। তাদের জিনিষগুলো এত খাসা যে প্রতিবেশী দেশের কাঁচা মাল থেকে তৈরি পাকা মালগুলো সেই সেই দেশই আবার কিনে নিয়ে থাকে। রপ্তানীর ওপরই তাদের জীবিকা নির্ভর করে। বড় ঘড়ি, ছোট ঘড়ি, মাপযন্ত্র, রাসায়নিক দ্রব্য, বারি-বিজ্ঞান যন্ত্র প্রভৃতি তাদের প্রস্তুত জিনিষগুলি বিশেষ উন্নত ধরনের। শুণাধিক্যই তাদের শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির উন্নতির মূলে।

সুইস-সরকার বৈজ্ঞানিক ও অ্যান্ড আবিষ্কারের জন্ত বেশ উৎসাহ দিয়ে থাকেন। আমেরিকা প্রতি বৎসর ১০ লক্ষে ৩০০টি পেটেন্ট মঞ্জুর করে থাকে। অপর পক্ষে সুইস-সরকার করে ৯০০টি পেটেন্ট। নতুন আবিষ্কারের জন্ত প্রত্যেক কারিগর অনবরত গবেষণা ও পরীক্ষা করে থাকে। এটা কেবল বড় বড় কর্পোরেশনের গবেষণাগারে সীমাবদ্ধ নহে, ছোট ছোট ব্যবসায়-ক্ষেত্র ও ব্যক্তিবিশেষও এ বিষয়ে উৎসাহী। প্রতিবেশী দেশের অধিবাসীদের অপেক্ষা সুইসদের উদ্ভাবনী-শক্তি ঢের বেশী। অবশ্য সুইজারল্যান্ডে শিল্পের জগতে সামরাজ্য প্রতিষ্ঠিত একথা মনে করবার কারণ নেই; এখানেও বর্ষদ্বট, কারখানা-বহু, তিক্ততা স্বষ্টি ও মারামারি চলে থাকে। তবে অল্প দেশের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম।

এ দেশের শ্রমিকসম্ম বৈষ্য জোরালো। আবার অল্প কারিগর-সমিতিও আছে। কোনটাই অপরের অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে পারে না। প্রত্যেক শিল্পপ্রতিষ্ঠানেই মজুরি, কাজের সময়, ব্যবসায়ের অবস্থা ও বিরোধ ষমাধানকল্পে ফড়াকড়ি ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়ে থাকে। প্রত্যেক কোম্পানীতে শিল্পী ও শ্রমিকের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রক্ষা করার ব্যবস্থা

আছে। মিলিত সমিতিতে উভয় পক্ষের সমসংখ্যক সদস্য থাকে। এই সকল সভায় মালিকরা শুধু শ্রমিকদের সম্বন্ধে আলোচনা করে না, শিল্পের আর্থিক অবস্থা, নীতি, তার অসুবিধা ও সম্ভাব্যতা এই বিষয়গুলি নিয়েও আলোচনা হয়ে থাকে।

সুইস সরকার সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক আইন প্রণয়ন করে থাকে। এ বিষয়ে সুইসগণ তিনটি নীতি দ্বারা পরিচালিত—প্রথম, ব্যক্তিগত আয়নির্ভরশীলতা ফুর করতে পারে এমন কোন আইন প্রণয়ন করা যাবে না; দ্বিতীয়, বেচ্ছায় প্রত্যেকে নিরাপত্তা রক্ষা করবে; তৃতীয়, স্থানীয় অবস্থা দৃষ্টে আইন বিধিবদ্ধ হবে।

একটি বড় কথা হ'ল এই যে সুইসরা নিজেরাই সাধারণের উপযোগী আইন প্রণয়ন করে থাকে—এর জন্য সরকারের কাছে আবেদন নিবেদনের ধার ধারে না। প্রত্যেক শিল্প-প্রতিষ্ঠানেই স্বত্বের বীমা, বেকার বীমা, রুগ্নের সুবিধাদান ইত্যাদি বিষয়ের সুব্যবস্থা আছে। এতে মালিক, শ্রমিক এবং সরকারও চাঁদা দিতে থাকেন। প্রচলিত নিয়ম এই যে, যে রক্ষা-ব্যবস্থা না চায়, তাকে টাকা দিতে হবে না, আর এই সুবিধা থেকেও সে বঞ্চিত হবে। সুইসগণ ব্যক্তিগত প্রতি-

যোগিতামূলক শিল্পে বিশ্বাসী, কিন্তু একচেটিয়া ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের বিরোধী। যখন কোন শিল্পপ্রতিষ্ঠান বিশেষ কারণে একচেটিয়া হতে বাধ্য হয় তখন সুইস-সরকার তাকে নিজের হাতে নেয় অথবা নিয়ন্ত্রিত করে।

সুইজারল্যান্ডে একটিমাত্র রেলওয়ে আছে এবং সেটি সরকারের অধীনে। চলাচল বিভাগ, পূর্ববিভাগ, স্থানীয় ধারভা-শাসনবিভাগের অধীনে পরিচালিত হয়ে থাকে। শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য সরকার থেকে পরিকল্পনা করা হয় না। যেহেতু এ দেশের উৎপন্ন জিনিষপত্রের শতকরা ৯০ ভাগ বিদেশে রপ্তানি হয় সেইজন্য তারা অল্প দেশের মুদ্রামূল্যের সমতা কামনা করে। সুইসগণ স্বাধীনতা ও সচ্ছলতা অবিভাজ্য বলে মনে করে—তাদের মতে একটি অপরটির পরিপূরক। যদিও সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির দিকে আগুনিকদের ঝোঁক বেশী এবং তার মুক্তিসঙ্গত কারণও আছে তবুও ধনতান্ত্রিক দেশ শিল্পে ও ব্যবসাতে উদারনীতি অস্বরণ ও ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অবলম্বন দ্বারা যে ধনিক এবং ব্যবসায়ের ও কারখানার মালিকদের লাভ কম হয়ে শ্রমিকদের উন্নতি হতে পারে, সুইজারল্যান্ডের সমৃদ্ধির কারণ বলিয়ে দেখলে সেটা উপলব্ধি করা যায়।

তুমি আর আমি

শ্রীকরুণাময় বসু

সোনালি পাখার মতো তোমার শাড়ীর প্রান্ত উড়িয়েছ দূর নত পারে,
সৌন্দর্যের গিরিশৃঙ্গে চলো যাই ছ'জনাতে, সেথা আছে বলন্ত আকাশ,
আধখানি ঝাঁক চাঁদ লাজুক মেয়ের মতো দেখা দেবে ছায়া অন্ধকারে,
নিখর ঝঝর জলে বাজবে তোমার চুড়ী, শালবনে ববে দীর্ঘশ্বাস।

চলো যাই লক্ষ্মী মেয়ে, পৃথিবীতে কাজ নাই, এ জীবন পিছে পড়ে থাক,
বিকীর্ত্ত্বম বনে ছ'জনে গাঁধিব মালা, কতো কথা হ'বে চোখে চোখে,
পড়িব করুণ ধরে রবীন্দ্রের সুধাকাব্য, সে মুহূর্ত চকিতে মেলুক,
ভালো যদি লাগে তবে কুহুম-মঞ্জরী কটি বেঁধে দিব তোমার অলকে।

মৌমাছি গুঞ্জন ক্রান্ত বসন্তের ছায়া-মৌজে নীলপুঞ্জ নিঃশব্দ আকাশ,
তার নিম্নে বয়ে যাবে নিঃসঙ্গ নদীর ধারা, তার তীরে বাঁধিব কুটির;
দিনগুলি উড়ে যাবে যেন কোন পথভোলা পরদেশী শূন্যচারী হাঁস,
নায়েক নায়িকা মোরা একান্ত নেপথ্যে র'বো, কেহ আসি করিবে না ভিড়।

চলো যাই, ফিরে যাই চাদের সোনালি দেশে, রূঢ় গদ্য পৃথিবী কি হবে?
এসো হেথা হাত ধরি মুখোমুখি ছ'জনাতে, যদি মরি, মরিব নীরবে।

পুস্তক-পরিচয়

চারশ' বছরের পাশ্চাত্য দর্শন—অধ্যাপক ক্রীটমেশ-
চন্দ্র ভট্টাচার্য। সংস্কৃতি বৈঠক, বালিগঞ্জ, কলিকাতা। মূল্য ২।০।

সমালোচ্য পুস্তকটি সম্বন্ধে কিছু বলিতে হইলে প্রথমেই বলিতে হয় গ্রন্থকারের ভাবার কথা। শুধু-সরল নয়, এমন সরল বাংলা ভাষায় যে দর্শনশাস্ত্রের বিষয়বস্তু সঙ্ক্ষে আলোচনা করিতে পারা যায় তাহা নিশ্চয়ই অনেকেরই ধারণার অতীত। অধ্যাপক মহাশয়ের বলিবার ভঙ্গীও এরূপ মনোরম যে ভাল গল্পের বইয়ের মত পড়িয়া যাইবার একটি আগ্রহ শেষ পর্যন্ত স্বতঃই জাগরুক থাকে।

দর্শনশাস্ত্রের চিরন্তন বিষয়বস্তু সম্বন্ধে পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ গত চারি শত বৎসর ধরিয়া যে ভাবে গবেষণা করিয়া আসিয়াছেন তাহারই একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রায় গল্পের মত করিয়াই গ্রন্থকার এই পুস্তকে দিয়াছেন। বিষয়বস্তু সম্বন্ধে মৌলিক কোন কথা বলিবার অবশ্য তাহার অবসর ছিল না, বলেনও নাই। শুধু শেষের দিকে ঈশ্বর সম্বন্ধে তাহার ব্যক্তিগত ধারণা কিছু জানাইয়াছেন। পাশ্চাত্য দর্শন হইতেও যে প্রজ্ঞা-ভক্তির সহিত গ্রন্থ করিবার অনেককিছু আছে উপসংহারে এই কথা তিনি বলিয়াছেন। সমালোচক এ বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে তাহার সহিত একমত। পাশ্চাত্য দর্শন জড়বাদী বা পদার্থবাদী (materialistic) বলিয়া নাসিকা-কুঞ্ঝের সাহায্যে তাহার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করা এই দেশীয় অনেক তথাকথিত দার্শনিকের প্রায় ফাশান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার বিরুদ্ধে

অভিমত প্রকাশ করিয়া অধ্যাপক মহাশয়ের সংসাহনের পরিচয় দিয়াছেন।

এই ধরণের পুস্তকে স্বতঃই অনেক বিষয়েরই যথাযথ আলোচনা অসম্ভব, অনেক বস্তুই অনুলিখিত থাকিয়া যায়। মূল গবেষণা কিছু বাদ না পড়িলে এই অনুলেখ ক্রটি বলিয়া ধরা যায় না। একটি কথা শুধু বলিতে চাই। গ্রন্থকার মনোবিজ্ঞানের আবির্ভাবের কথা যেখানে আলোচনা করিয়াছেন সেখানে ভুণ্ডট-এর (Wundt) নামোল্লেখের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। লাইপ্‌জিগ বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন-শাস্ত্রেরই অধ্যাপক ভুণ্ডট মনোবিজ্ঞানকে বিজ্ঞানের আসরে আনয়ন করেন। মনোবিজ্ঞানের ইতিহাসে ক্রেয়ডের আসিয়া পড়া একটি আকস্মিক ঘটনা।

ছাপার ভুলের কথা গ্রন্থকার নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। আশা-করি দ্বিতীয় সংস্করণে এগুলি আর থাকিবে না। Spinoza'র উচ্চারণ স্পিনোজা, স্পাইনোজা নয়। ৭৫ পৃষ্ঠায় যে ইংরেজী কবিতাটি উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা এইরূপ—

But let a lord once own the happy lives,
How the wit frightens! How the style refines!
—Pope's 'Essay on Criticism', Lines 420—21

প্রাচ্য দর্শন সম্বন্ধে এইরূপ একখানি মনোরম পুস্তক গ্রন্থকারের নিকট দাবি করিলে নিশ্চয়ই অসম্ভব হইবে না।

শ্রীমুহুচন্দ্র মিত্র

৩ শা র দী য়া পু জা র অ ধ্য !

যোগেশচন্দ্র চৌধুরী সামাজিক নাটক পতিব্রতা ১।০ বাংলার মেয়ে ১।০ পরিণীতা ১।১০ মাকড়সার জাল ১।০ পটের সাথী ১।০	দীনেশ্বরকুমার রায়ের ঐতিহাসিক উপন্যাস নানাসাহেব ৩. চরণদাস ঘোষের অভিনব উপন্যাস তেপান্তর ২. সৌরীন্দ্র মুখোপাধ্যায় শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বহুশিক্ষা ২।০ প্রবোধকুমার সাত্তাল সামান্য ১।০	প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় নূতন সংস্করণ হিমালয় পারে কৈলাস ও মানস সরোবর চার টাকা তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গ ৫. অনুরূপা দেবী উত্তরাখণ্ডের গল্প কেদারবন্দরী সম্বন্ধে অভিজ্ঞতাপূর্ণ গাইডবুক। দাম : দুই টাকা	কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের সত্তাপ্রকাশিত অভিনব সংস্করণ শ্রেষ্ঠ কাব্য-গ্রন্থ বেণু ও বীণা 'ভাবে, ভাষায়, অলঙ্কারে, ছন্দে, বঙ্কারে—কবির অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় এ গ্রন্থে পদে পদে।'—বঙ্গ বাসী 'বেণু ও বীণা পাঠ করিয়া অনেক দিনের পর একটু খাঁটি কবিত্ব রস উপভোগ করিলাম।' —জ্যোতিষনাথ ঠাকুর তীর্থরেণু ৩. 'এই অনুবাদগুলি যেন জন্মান্তর প্রাপ্তি—আত্মা এক দেহ হইতে অন্য দেহে সঞ্চারিত হইয়াছে—ইহা শিল্প- কাব্য নহে, ইহা সৃষ্টিকাব্য।' —রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বেলাশেষের গান ৩.
ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সামাজিক নাটক. বাসালী ১।০ পৌরাণিক নাটক ক্ষত্রবীর ১।১০ শিবপ্রসাদ কর পৌরাণিক নাটক স্বর্ণলক্ষ্মী ১.৫০ নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য অভিষেক ১।০	ডাঃ নরেশ সেনগুপ্ত সতী ২।০ লুপ্তশিক্ষা ২. লক্ষ্মীছাড়া ২. রূপের অভিলাষ ২. তারিঙ্গ ১।১০	অতনু গুপ্তের রোমাঞ্চকর এডভেঞ্চারের বই ভয়ঙ্কর দুন্দরবন ১. আবৃত্তি-ধারা ১।১০ চমৎকার রেসিটেশনের বই মিহির আচার্য্যার ভানুমুখের প্রথম অভিযান পাঁচ টাকা	

প্রকাশক—আর, এইচ, শ্রীমানী এণ্ড সন্স ১০৪নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা।

পদব্রজা—শ্রীপদ্মপতি ভট্টাচার্য। ডি. এম. লাইব্রেরী।
মূল্য চার টাকা। পৃ. ২৩৩।

যরের বন্ধন কাটিয়া গেলে মানুষ যখন বাহিরে আসিয়া দাঁড়ায় তখনই তার সমুখের পথ নব নব বৈচিত্র্যের সন্ধান দেয়। নিরাসক্ত দৃষ্টিতে সেই পথের দু-ধারে তাকাইবার কালে মন কখন যে তাহাতেই জড়াইয়া পড়ে—সে তথ্য সে নিজেও জানে না। এই ভাবে দেশ-দেশান্তরে ভ্রমণকালে শৌকভারতক অন্তরের বেদনাকে লঘু করিবার প্রয়াসের মধ্যেই অলক্ষ্য-প্রসারিত স্নেহ-ভালবাসার সূত্রে নূতন করিয়া গ্রহি পড়ে; নব-শৃষ্টির কামনায় আবার সে চঞ্চল হইয়া উঠে।

নারক রাসবিহারীর জীবনে এই ধরণের বৈরাগ্য ও বন্ধনের চিত্রটি লেখক দক্ষতার সঙ্গে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। তার পথ-চলার সঙ্গে বাংলা, বিহার ও বৃজপ্রদেশের খানিকটা অংশ—সেখানকার বিভিন্ন নরনারীর চরিত্র, আচার-অনুষ্ঠান বিধি-বিধান সব মিলাইয়া যে ছবিগুলি পাওয়া যায় তাহা চমৎকার। কোথাও অতিরঞ্জন চোখে পড়ে না, কোন চরিত্রেই প্রাণহীন বলিয়াও মনে হয় না। বিশেষ প্রশংসার কথা—উন্নত ধরণের ইচ্ছা-চাষ ও শরীরা-শিল্প প্রতিষ্ঠার কথা গল্পাংশকে ব্যাহত করে নাই। শেষ পর্যন্ত ঐশ্বর্যের স্বর্ণভূপে পশপক্ষানী মানুষকে অবলুপ্ত করিয়া দিয়া বিরোগের সুরটি লেখক পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছেন।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

হে নারী রহস্যময়ী—শ্রীপৌরগোপাল বিভাবিনোদ।
বরেন্দ্র লাইব্রেরী। ২০৪, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিট, কলিকাতা।
পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৫৮, মূল্য ২।০।

বিশ্বসাহিত্য গ্রন্থমালা

সম্পাদনা : জগদিন্দ্র বাগচী

১৪ই ডিসেম্বর

মেরজ কোব্‌লীর সুবিখ্যাত উপন্যাসের অনুবাদ করেছেন শ্রীচিন্তরঞ্জন রায় ও শ্রীঅশোক ঘোষ। জারের অপসারণের জন্তে প্রথম বারী দান করেছিল বন্ধনোপিত, বার্ষ হয়েছিল তারা, তবুও তাদেরই রক্তের আভাষ রাশিয়ায় আজ রক্তরবির অভ্যুদয়। তারই মর্মস্বদ কাহিনী। দাম—৩।০।

পঙ্কিল

আলেকজান্ডার কুপরিণের সুবিখ্যাত উপন্যাস 'ইরামা'র অনুবাদ। গণিকা-বুড়ির বাস্তব কথাচিত্র। নদ'মার'এ নোঙরা ঘাঁটা কেন?—নিজেদেরই স্বাস্থ্যরক্ষার জন্ত। দাম—৩।০।

নূতন চীনা গল্প—শ্রীগোবিন্দপ্রসাদ বসু কর্তৃক অনূদিত

শ্রীকুমারেশ ঘোষের

ভাষ্যগড়

আধুনিক সমসাময়িক উপন্যাস। বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র হয়েও কলমের বদলে সগর্বে যে ধরতে পারে ছেনি-হাডুড়ি শুধু সেই বলতে পারে দোষী কে? আমি? না, অসুস্থ? না, আমাদের ভীষণ সমাজ। দাম—২।০।

অ্যানিমা

শ্রীভূমিকা ও দৃশ্যপটবর্জিত ছেলেমেয়েদের অভিনয়োপযোগী রসনাটিকা। ১।

নিপ্লেনের সপ্তশিখা

পদ্মনাভ রচিত বাঙালার বিপ্লবী সহীদের কাহিনী। ১।০।

রীডার্স কর্ণার :: ৫, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা—৬

উপন্যাস। শ্রীযুক্ত বিদ্যাবিনোদ মহাশয় ইতিপূর্বে বড়দেয়, কিশোর এবং ছোটদেয় জন্ত বহু নানা জাতীয় পুস্তক রচনা করিয়াছেন। কিন্তু আলোচ্য উপন্যাসখানিতে পাকা হাতের মুসীমানার বিশেষ অভাব পরিলক্ষিত হইল। স্থানে স্থানে আমাদের বর্তমান সামাজিক জীবনের বহু জটিল অংশ লইয়া তিনি লাভ্য দিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, কিন্তু যতখানি শক্তির প্রয়োজন ছিল তার অভাবে ঘটনগুলি স্পষ্ট এবং গভীর হইয়া উঠিবার অবকাশ পায় নাই।

উপন্যাসের প্রধান নায়িকা জয়ন্তী এবং মৈত্রেয়ী। মৈত্রেয়ীকে চিনিতে কষ্ট হয় না। ভালবাসা তাকে আত্মত্যাগী করিয়াছে। সে ত্যাগ দয়িতাকে স্বামী দেখিতে সজাগ এবং সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু জয়ন্তীকে আগাগোড়া যে পরিবেশের মধ্যে পাই-রাছি—যে তেজস্বিতা এবং আত্মনির্ভরতা তার প্রতিটি কালে এবং কথায় আপন স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া আসিয়াছে, উপন্যাসের শেষে যেন সে জয়ন্তীকে হুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অমিতান্তকে সে ভালবাসিত এবং উভয়ের মধ্যে বিবাহের কথাবার্তাও বহুদূর অগ্রসর হইয়াছিল। কিন্তু যেহেতু অমিতান্ত সোজা ভাষায় জয়ন্তীকে বিবাহ করিতে দিবা দেখাইয়াছে সেই হেতু জয়ন্তী তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। প্রত্যাখ্যান করিয়াছে এই আশঙ্কায় পাছে তার নির্মূল ভালবাসায় কোথাও এতটুকু দাগ লাগে। ভাল কথা—কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে শেখরকে বিবাহ করিল কিসের অহুপ্রেরণায়? নারীমনের রহস্য কি লেখক এই পথেই দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন?

উপন্যাসে চম্পার আকস্মিক আবির্ভাব এবং তিরোধান ঘটান হইয়াছে নিতান্তই উপন্যাসের গতি ভিন্ন পথে চালনা করিবার জন্ত। কিন্তু অমিতান্তের ভুল ভাড়াইবার প্রয়োজনে চম্পার চরিত্রের যে দিকটী আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তার প্রকাশ-ভঙ্গি চিত্তাকর্ষক হয় নাই।

ইডিয়ম সম্বন্ধেও বলিবার আছে—যেমন "পোয়াসে চা গেলা"। এল্প অপপ্রয়োগ আশা করি পরবর্তী সংস্করণে সংশোধিত হইবে।

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

দৃষ্টিপাত—যাযাবর। নিউ এজ পাবলিশার্স লিঃ,
২২ ক্যানিং স্ট্রিট, কলিকাতা। মূল্য ৩.০ টাকা।

বাংলা ভাষায় গত কয়েক বৎসরে যে অল্প কয়েকখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে 'দৃষ্টিপাত' তাহাদের মধ্যে একটি, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। ইংরেজী সাহিত্যে বাহাকে বেলে-সেটাস বলা হয়, 'দৃষ্টিপাত' সেই ধরণের বই। চৌদ্দটি পত্রের সমষ্টিতে বইখানি সম্পূর্ণ। প্রত্যেকটি পত্রের নিজস্ব বিশেষ আঙ্গ, আবার সবগুলি পত্রের সমষ্টি এই বইখানিকে একটি সর্বস্বসুন্দর গ্রন্থের রূপ দান করিয়াছে। পত্রগুলির রচনামূল্য নয়া দিল্লী এবং উপলক্ষ্য ক্রিপস মিশন। পত্রলেখক সাংবাদিক। সমাজের মর্ম-

১৩৮৪-তে যে কব্জি নতুন বই প্রকাশিত হয়েছে

সঞ্জয় ভট্টাচার্যের উপন্যাস

কল্লোল

পাঁচ টাকা

'সঞ্জয়বাবু জড়িশাশ্রু ভাষার গুণে ইতিহাসের গতির সঙ্গে নায়ক প্রতীপের ভাবধারার কোন সংঘাত ঘটে নাই। সঞ্জয়বাবু বনেন্দ্রী উপন্যাসিকের মনোরম সংঘম অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। এই উপন্যাসখানি গতানুগতিক পুস্তক-তালিকার বাহিরে একটি বিশেষ স্থান দাবী করিতে পারে।'—আনন্দবাজার

'সঞ্জয়বাবু ছোটগল্প আর উপন্যাসের একটা সিন্থেসিস বের করতে পেরেছেন এই গ্রন্থে—আবিষ্কার করেছেন এক নতুন ফর্ম। অর্থাৎ অল্পপরিমিত সহর কোলকাতার মধ্যে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন সারা ভারতবর্ষ, দেড় বছর কি তারও কম সময়ের মধ্যে ছবি এঁকেছেন ভারতের তথা সারা পৃথিবীর চিরন্তন অস্তিত্বের—বাণীনতার পথে, শান্তির পথে, ইন্টেলেকচুয়ালিজমের পথে। আর 'কল্লোল'ের কয়েকটি মাত্র চরিত্র চোখের সামনে উপস্থিত করেছে সারা ভারতের অগণিত দল আর মতের মানুষকে।'—বসুভট্টাচার্য

'কল্লোল' বাণীন বাংলার নতুন উপন্যাস।...জাতীয় আন্দোলনের কাহিনী লইয়া উপন্যাস রচনার এতদিন অনেক বাধা ছিল, সে বাধা অপসারিত হইয়াছে বলিয়াই হয়তো বাংলা সাহিত্যে এমন একখানি হৃদয় উপন্যাস পাঠের সুযোগ পাওয়া গেল।'—যুগান্তর

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের

ছোটগল্প-সংকলন

পতাকা

ছই টাকা

সাহিত্যক্ষেত্রে নেমে খুব অল্প দিনের মধ্যেই যারা পাঠকসাধারণের কাছ থেকে অকুণ্ঠ অভিনন্দন লাভ করতে সমর্থ হন, তাঁদের সংখ্যা সাম্প্রতিক বাংলা-সাহিত্যে খুব বেশী নয়, কিন্তু নরেন্দ্রনাথ সেই স্বল্পসংখ্যক লেখকদের অন্ততম। ছোটো ছোটো ঘটনার মধ্য দিয়ে মানবমনের যে আবর্তন, তাই নিখুঁতভাবে ধরা পড়েছে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের রচনায়। পতাকা তাঁর সর্বাধুনিক গল্পগ্রন্থ।

অজিত দত্তের

কবিতার বই

পুনর্নব

দেড় টাকা

'কল্লোল' ও 'প্রগতির যুগকে কেন্দ্র করে যে কয়জন কবি-সাহিত্যিক এককালে বাংলা-সাহিত্যক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন, এবং সেদিন কিঞ্চিৎ প্রশংসা পেয়ে এবং অপরিণীত অপ্রশংসার বাধা ঠেলে অবশেষে নিশ্চিতরূপে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন, কবি অজিত দত্ত তাঁদের অন্ততম। তাঁর সাহিত্য-সাধনার সর্বাধুনিক ফল এই কবিতা-সঙ্কলন। হৃদয়ং আধুনিক বাংলা কাব্যসাহিত্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ পরিচয় পেতে হলে 'পুনর্নব' কাব্যগ্রন্থের প্রয়োজন অপরিহার্য।

ডাঃ লোকনাথন সম্পাদিত

মুক্কাভূত অর্থনীতি

বারো আনা

যুদ্ধকালীন অর্থনীতি কেমন করে শান্তিকালীন অর্থনীতিতে রূপান্তর লাভ করতে পারে। বিশদভাবে তারই প্রমাণসিদ্ধ ব্যাখ্যা করা হয়েছে এই গ্রন্থে।

লুই ফিশারের

মহাজিজ্ঞাসা

(যন্ত্রস্থ)

বর্তমান জগতে যারা প্রখ্যাত রাষ্ট্রনায়ক বলে পরিচিত, তাঁদেরই বর্ষা স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়েছে এই গ্রন্থে। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে মিলেছে হৃদয় বাচনভঙ্গী।

'বস্তুর বিশ্লেষণী ক্ষমতা, বিচারবুদ্ধি এবং নিরূপিত সত্যকে প্রমাণসহ পাঠকের নিকট উপস্থিত করবার সংসাহস প্রবোধচন্দ্রের রচনার বিশেষত্ব। ভাষাও যেমন সরল, প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী, প্রকাশভঙ্গিও তেমন মনোহর ও হৃদয়। তাঁর এই কৈশোরাগত গুণগুলি 'ধর্মবিজয়ী অশোক' পুস্তকেও সর্বত্র ফুটে উঠেছে।...লেখকের স্বদত্ত তথ্য এবং মৌলিক যুক্তি ও বিচারগুলি আমার খুবই উপাদেয় মনে হয়েছে। আমার বিশ্বাস গ্রন্থটি যেভাবে লেখা তাতে এটি সকল শ্রেণীর পাঠকের কাছেই সমাদৃত হবে।'—শ্রীবেণীমাহব বড়ুয়া

প্রবোধচন্দ্র সেনের

ধর্মবিজয়ী অশোক

তিন টাকা

'Though there are several excellent books on the great Mauryan Emperor, we have long been looking for a monograph like the present one which is comprehensive, yet not big satisfying yet not boring. The students of Indian history will accord warm welcome to Prof. Sen's volume.'—Amrita Baxar

প্রকাশকঃ

পূর্বাশা লিমিটেড—পি ১৩, গণেশচন্দ্র এভেন্যু, কলিকাতা ১৩

স্থলে তাঁহার অন্তর্ভেদী দৃষ্টি যেমন সঞ্চালিত হইয়াছে, তেমন ইতিহাসের পুরানো পাতার উপরেও প্রতিফলিত হইয়া পুরাতন কাহিনীকে নূতন আলোকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। দিল্লীর ইতিহাসপ্রসিদ্ধ দুর্গ, দরগা, দীঘি অথবা মিনারের বর্ণনার সহিত উহাদের প্রাচীন ইতিহাস এত গভীর দরদ দিয়া ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে যে, প্রতিটি স্মৃতিসৌধ যেন জীবন্ত হইয়া চোখের সামনে ভাসিয়া উঠে। চতুর্থ পত্রে সম্রাট সাজাহানের নন্দিনী জাহানারার সমাধিক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া লেখক বলিতেছেন, “জাহানারার অল্পগ্রহে ইংরেজেরা বাণিজ্য নিরঙ্কুশ করলেন ভারতবর্ষে, সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপনা করলেন সকলের অলক্ষ্যে। সেই জাহানারার চরিত্রেই কলঙ্ক আরোপ করে ইতিহাস রচনা করেছে ইংরেজ। এতে বিম্মিত হই নে। যে সিভিলিয়ান ভারতবর্ষের পেঙ্গনে ষ্ট্রাফোর্ডশায়ারে বাড়ী হাঁকিয়ে জ্ঞাচ্ছেন, তিনিই ভারতের নিন্দা করেন সবচেয়ে জোর গলায়। লিওপোল্ড এমারীই ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সবচেয়ে বড় শত্রু, কারণ তাঁর জন্মস্থান গোরখপুরে।”

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের লোকদের জাতীয় চরিত্রের উপর লেখকের দৃষ্টি অন্তর্ভেদী। দশম পত্রটিতে ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট কর্তৃক ভারতবাসীকে সামরিক ও অসামরিক জাতিতে ভাগ করার উদ্দেশ্য ও তাহার কুফল আলোচনা করিয়া লেখক বলিতেছেন, “কোন বিশেষ অঞ্চল থেকে সৈন্য সংগ্রহের সুবিধা এই যে, তার ফলে একটা নতুন জাতি প্রথা সৃষ্টি করা চলে।...পুরুষাবলুক্রমে পিতামহ থেকে পিতা এবং পিতা থেকে পুত্র সেই বৃত্তি প্রসারিত হয় এবং একই বাহিনীতে বংশপরম্পরা চাকুরির দ্বারা বাহিনীর প্রতি একটা কায়মী স্বার্থবোধ জাগে।...বিদেশী শাসকের পক্ষে শাসন-যন্ত্রের প্রতি শাসিতদের এই মমত্ববোধসৃষ্টির সার্থকতা সামান্য নয়।” সামরিক জাতির প্রতি এই পক্ষপাত ব্রিটিশ শাসনের পক্ষে সহায়ক হইয়াছে সন্দেহ নাই। পঞ্জাবের বর্তমান অধঃপতনের অজুতম মূল কারণও ইহাই। সিপাহী বিদ্রোহের সময় পঞ্জাব ছিল একমাত্র প্রদেশ যেখানে ইংরেজের বিরুদ্ধে দেশীয় জনগণ অস্ত্র ধরে নাই। আধুনিক কালেও পঞ্জাবে জাতীয় জাগরণের চিহ্ন অনেকটা ক্ষীণ। সাধারণ পঞ্জাবী সচ্ছল জীবনযাত্রা, মোটা আয়, অজস্র আহার ও দামী পোশাক পাইলেই খুশী থাকে, দেশ লইয়া বড় একটা মাথা ঘামায় না। ভগৎ সিংহেরা সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম মাত্র। সেনাবাহিনীর সংহিতায় বাঙালীরা ‘হরিজন’ এবং কেন তার কারণ সকলেরই জানা আছে।

প্রত্যেকটি চিঠি এক দিকে যেমন ঐতিহাসিক তথ্যের সমাবেশে সারগর্ভ, তেমন অপর দিকে সামাজিক ও ব্যক্তিগত চরিত্রচিত্রণে উজ্জ্বল। ‘গান্ধীর্ষ্য ও তরলতা, ইতিহাস ও প্রেমের কাহিনী’ কেমন করিয়া এক একটি পত্রের স্বল্পপরিসরে অপূর্ব রসসৃষ্টি করিতে পারে ‘দৃষ্টিপাত’ তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

শ্রীদেবজ্যোতি বর্মন

জয়হিন্দ বা সোনার স্বপন (নাটক)—শ্রীজ্ঞানেন্দ্র নাথ চৌধুরী। আলবার্ট লাইব্রেরী। নবাবপুর রোড, ঢাকা। মূল্য—১। ‘জয় হিন্দ’ বা ‘সোনার স্বপন’ একখানি প্রতীক-নাট্য (Symbolic Drama)। মাটি, সাগর, বায়ু, আশ্রন প্রভৃতিকে যথাক্রমে চাষী, নাবিক, শ্রমিক ও শৃঙ্খলিত ভারতীয় রূপে কল্পনা করিয়া জাতির পরবর্ত্ততার দুঃখ, বিদেশী শাসনের নিষ্ঠুর পীড়ন এবং শেষ পর্যন্ত ঐক্যবদ্ধ জাতির স্বাধীনতা

লাভের কাহিনীই নাট্যকার এই নাটকে রূপকভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। আজ নাট্যকারের ‘সোনার স্বপন’ বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করিতেছে। সম-সামরিক রাষ্ট্রীয় আন্দোলন চিরকাল লেখকদের কল্পনাকে উদ্ভুদ্ধ করিয়াছে। বর্ত্তমান নাট্যকারও জাতির মুক্তি-সংগ্রামের বিপুল আবেগকে রচনার মধ্যে দিয়া পাঠকের মনে সঞ্চালিত করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন এবং কিছু সাফল্যও লাভ করিয়াছেন। এইজন্য তিনি প্রশংসার দাবি করিতে পারেন। কিন্তু পাজপাজীর মুখে, সংলাপের ভিতর দিয়া কাহিনীর গ্রন্থি-বিস্তার বা কোন মহৎ তত্ত্ব প্রচারই নাটকের বড় কথা নয়। নাটকের নিজস্ব একটা ধর্ম আছে। গঠন-পদ্ধতি পরিবেশন-কৌশলে নাট্যকার যেমন খুশি নুতনত্বের আমদানী করুন ক্ষতি নাই, কিন্তু তাঁহাকে নাটকের সেই বিশিষ্ট ‘ধর্ম’ ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। আলোচ্য নাটকে নাট্যকার সংঘাতের অভাব এবং দীর্ঘ বক্তৃতা-গদ্য সংলাপের দরুন নাট্যরস বহুলাংশে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে—লেখককে নাট্যরচনার এই মূল নীতির কথা স্মরণ রাখিতে বলি। সঙ্গীতাংশ চমৎকার। শেষের গানটিতে বিশেষ শক্তির পরিচয় আছে।

তরঙ্গ—শ্রীদিগন্তচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। পুস্তকালয়, ২২ বাল্লভ বাগান রো, কলিকাতা। মূল্য—দুই টাকা।

সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যে দেশের রাজনৈতিক মুক্তি-আন্দোলনকে উপলক্ষ্য করিয়া উপন্যাস ও নাটক রচনার হিড়িক পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু, দুঃখের বিষয় তন্মধ্যে বেশীর ভাগই প্রচারমূলক হওয়ার সাহিত্য-সৃষ্টি হিসাবে সার্থক হইয়া উঠিতে পারিতেছে না। ‘তরঙ্গ’ নাটকখানিও রাজনৈতিক ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া লিখিত হইলেও, ঠিক সেগুলির মগোত্র নহে। লেখক নিজেকে কাহিনী হইতে নিলিখিত রাখিতে পারিয়াছেন বলিয়া নাটকটি রসোত্তীর্ণ হইয়াছে। পূর্ববঙ্গের এক গল্লীকে পটভূমিকা করিয়া লেখক এই নাটক রচনা করিয়াছেন। পল্লীর জনজাগৃতি, দেশের মুক্তিকল্পে পল্লীবাসী হিন্দু-মুসলমানের মিলিত চেষ্টা, সরকারের দমননীতি, হিন্দু-মুসলমান বিরোধের পূর্বভাঙ্গ, এই সমস্ত বিষয়কে একটি স্বন্দ্র, স্বদৃঢ় নিরবচ্ছিন্ন স্রোতে বিধৃত করিয়া তিনি কাহিনীটিকে গড়িয়া তুলিয়াছেন। গোপাল, নন্দ, মইনুদ্দীন প্রভৃতি গ্রাম্য লোকের মুখে পূর্ববঙ্গের কথা ভাবা ব্যবহার করায় সংলাপ অত্যন্ত স্বাভাবিক হইয়াছে এবং নাট্যকারের পক্ষে বিশেষ কৃতিত্বের কথা যে ইহাতে রসসৃষ্টি কোথাও বাহত হয় নাই। এই ভাবা নাটকের চরিত্রগুলির ভাবাবেগ প্রকাশের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী হইয়াছে। দিগন্তবাবু পূর্ববঙ্গের কথা ভাবাকে সাহিত্যের আসরে জাতে তুলিয়াছেন। নাটকের শেষ দৃশ্যটি সবচেয়ে বেশী উৎসাহীয়াছে এবং কাহিনীটি একটি অপূর্ব নাট্যরস পরিবেশনের মধ্যে সমাপ্তি লাভ করিয়াছে। গোপালের শেষ উক্তিটি সর্বপ্রকার বাহ্যাবজ্ঞিত, লেখক ঐ দৃশ্যের গোড়ার দিক হইতে এমন চমৎকার ‘সিচুয়েশ্যন’ সৃষ্টি করিয়া আনিয়াছেন যে, তাহা মনকে বিশেষভাবে নাড়া দেয়। ভূমিকার শ্রীযুক্ত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় নাটকের মর্ম-কথাটি বড় হৃদয়ভাবে বলিয়াছেন।

শ্রীমমথকুমার চৌধুরী

জগতের সেরা মানুষ (সচিত্র)—শ্রীপ্রভাত বসু। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং। ৮সি রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রিট, কলিকাতা। পৃ. ৬৯, মূল্য ৮।

ছেলেদের উপযোগী সহজ সরল ভাবায় বুদ্ধদেব, বাণেশ্বরী, হজরত মোহাম্মদ, গুরু নানক ও শ্রীচৈতন্য জগতের এই পাঁচজন শ্রেষ্ঠ মহাত্মন্যের জীবনকথা হৃদয়ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীমমথ ও মহাত্মা গান্ধীর

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

আশাপূর্ণা দেবী

সুবোধ বসু

‘বনফুল’

বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়

অচিন্ত্য সেনগুপ্ত

বিভূতি মুখোপাধ্যায়

কথাশিল্প



সরোজ রায়চৌধুরী

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

অন্নদাশঙ্কর রায়

প্রবোধকুমার সান্যাল

তারানাথকর বন্দ্যোপাধ্যায়

বানী রায়

বাংলার কথাশিল্প সাহিত্যে নূতন অভিযান

শ্রীরাধারানী দেবী ও শ্রীনরেন্দ্র দেব সম্পাদিত

“রাধারানী দেবী ও নরেন্দ্র দেব ‘কথাশিল্প’ নাম দিয়ে আধুনিক প্রখ্যাতনামা গল্পলেখকদের যে গল্প কয়টি প্রকাশ করেছেন, প্রত্যেক লেখকের নিজস্ব বৈচিত্র্যগুণে তা বিচিত্র হয়েছে। বইটিকে চিত্তাকর্ষক বলতে পারি।”

—শ্রীমজনীকান্ত দাস (বেতার সমালোচনা)

“আধুনিক কালের বিভিন্ন লেখকদের লেখা চৌদ্দটি ছোট গল্প আছে। রচনার সঙ্গে সম্পাদকদ্বয় লেখকদের জীবনেরও কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়াছেন। গল্পগুলি স্থানবিশিষ্ট, গ্রন্থ স্থপাঠ্য, সুমুদ্রিত ও সুসম্পাদিত।” —প্রবাসী

“বইটিকে আধুনিক বাংলা গল্পের একটি সম্পূর্ণ সঙ্কলনরূপে গণ্য করা যাইতে পারে। বইটির সম্পাদন ও বিতাস লক্ষণীয় পরিচ্ছন্নতা ও স্বকৃতির পরিচায়ক। প্রত্যেক গল্পের প্রারম্ভে লেখকের বেখচিত্র, স্বাক্ষর ও জীবন-পরিচিতি দেওয়া হইয়াছে। আমরা প্রকাশক ও সম্পাদকবর্গের উত্তোষের প্রশংসা করি।” —যুগান্তর

“এই গল্পসংগ্রহের অধিকাংশ গল্পই স্থানবিশিষ্ট, স্থপাঠ্য এবং লেখকলেখিকাগণের প্রায় সকলেই লব্ধ-প্রতিষ্ঠ কথাসাহিত্যিক। এই হিসাবে এই গল্পসংগ্রহখানির বৈশিষ্ট্য অসম্বোধে স্বীকার করিতে হয়। গল্পসংগ্রহখানির অঙ্গসজ্জা, মুদ্রণ ও বাঁধাই মনোজ্ঞ ও স্বকৃতিসম্মত।” —দেশ

“বাংলা সাহিত্যের চৌদ্দজন বিখ্যাত শিল্পীর রচনাসম্ভারে এই গ্রন্থখানি সমৃদ্ধ। প্রত্যেক গল্পের প্রারম্ভে রচয়িতার প্রকৃতি, হস্তাক্ষরে নাম স্বাক্ষর ও সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠকের সঙ্গে পরিচয়ের সুবিধা করিয়া দিয়াছে।”

—দৈনিক বসুমতী

“প্রত্যেকটি গল্পের মধ্য দিয়া লেখকের রচনাভঙ্গির বৈশিষ্ট্য অনেকখানি প্রস্ফুটিত হইয়াছে। সেদিক দিয়া এই গল্প সঙ্কলনকে সার্থক বলা চলে।” —ভারত

মূল্য মাত্র সাড়ে তিন টাকা

হাজার টাকা পুরস্কার

যে গল্পটি অধিকাংশ পাঠকের মতে শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য হবে সেই গল্পের লেখককে ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোম্পানী এক হাজার টাকা পুরস্কার দেবেন বলে ঘোষণা করেছেন। আশা করি, পাঠকপাঠিকারা এই সুযোগ গ্রহণ করে প্রত্যেকেই ভোট পাঠিয়ে তাঁদের রসবোধের পরিচয় দেবেন। ভোটের কার্ড বইয়ের মধ্যেই পাওয়া যাবে।

কার্ডে মুদ্রিত ভোট গ্রহণের শেষ তারিখ ৩০শে ভাদ্রের পরিবর্তে

৩০শে চৈত্র ১৩৫৪ পর্যন্ত ভোট নেওয়া হবে।

এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স

২৪, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

জীবনী এই সঙ্গে গ্রথিত হইলে বইটি আরও উপাদেয় হইত। যাহাতে অল্প বয়স হইতে ছেলেদের মনে ধর্মশিক্ষা এবং মানব-জীবনের উদ্দেশ্য ও মহান আদর্শ সম্বন্ধে হৃদয়ঙ্গম জন্মে, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই ধরণের পুস্তকের যতই প্রচার হয়, ততই দেশের মঙ্গল।

অভয়-বাণী—শ্রীকণীভূষণ বিশ্বাস। প্রকাশক—শ্রীঅরুণকুমার বসু, বিশ্বাস-নিকেতন, কৃষ্ণনগর। পৃ. ৩২, মূল্য ১০।

কবিতার বই। ঘুম-ভাঙানো, দেশ-জাগানো মুক্তিযন্ত্রের অভয়-বাণী বিঘোষক কবিতাগুলি পড়িয়া মুগ্ধ হইলাম। ছন্দের উপর লেখকের বেশ দখল আছে, কবিতাগুলিতে নজরুল ও রবীন্দ্রনাথের প্রভাবের ছাপ খুব বেশী ধরা পড়ে। কয়েকটি বানান ভুল বিসদৃশভাবে বইটির সৌন্দর্য্যহানি করিয়াছে।

শ্রীবিজয়েন্দ্রকৃষ্ণ শীল

তৃত্বিত মরু—শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য। রবীন্দ্র পাবলিশিং হাউস; ৫০, পটলডাঙ্গা স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—৩ টাকা।

উপভাস্যটির আখ্যানবস্তু জটিল, অনেকগুলি নরনারীর চরিত্র এবং বহু-বিচিত্র ঘটনার সমাবেশ হইয়াছে পুস্তকটিতে। তবে মূলতঃ করবীর সহিত কবি সন্দীপের ব্যাঙ্গপ্রেম লইয়া ইহার আরম্ভ এবং করবীর অন্তরের একটি মহান আদর্শের মধ্যে ইহার সমাপ্তি—লেখক, নিপুণতার সহিত অঙ্কিত করিয়াছেন। ক্ষণিকা ও প্রদীপের স্নেহের আবেষ্টনীতে করবীর অন্তরের পরিপূষ্টি এবং ছন্দার সাহচর্য্যে সন্দীপের জীবনে বৈচিত্র্যের বিকাশ বিশেষ উপভোগ্য। নিবারণ নামক জনৈক ব্যক্তির আবির্ভাবে ছন্দার

শ্রীশিশিরকুমার আচার্য্য চৌধুরী সম্পাদিত

বাংলা বর্ষালিপি

১৩৫৪ (৪র্থ বর্ষ) সালের বর্ষালিপি—অধিকতর তথ্যসম্ভারে সমৃদ্ধ হইয়া বাহির হইয়াছে। দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় তথ্যে পূর্ণ। মূল্য দুই টাকা, ভি-পি-তে ২১/০।

অভিজ্ঞ মনোবিদ ও কলিকাতা

বিজ্ঞান কলেজের উপাধ্যায়

ডাঃ নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

নিজ্ঞান মন

প্রণীত
ডাঃ গিরীন্দ্রশেখর বসুর মুখবন্ধ সম্বলিত। এই গ্রন্থে সহজ ভাষায় মনের বিচিত্র ক্রিয়া-কলাপের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। মনোবিজ্ঞানের একখানি উপাদেয় গ্রন্থ। আড়াই টাকা।

অধ্যাপক উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের

সহজ ভাষায় গত চারশ' চারশ' বছরের

বছরের ইউরো-আমেরিকার

দর্শনের আলোচনা সরল

অথচ তথ্যপূর্ণ। আড়াই টাকা।

পাশ্চাত্য দর্শন

সংস্কৃতি বৈঠক—১৭, পণ্ডিতিয়া প্লেস, বালিগঞ্জ, কলিঃ
কলিকাতার পরিবেশক : জিজ্ঞাসা—কলিকাতা ২৯

জীবনে ছন্দপতনের হুচনা ইত্যাদির মধ্যে যে মনস্তাত্ত্বিক নিপুণতা আছে তাহা পাঠকের অন্তরকে স্পর্শ করে। মালবিকার চরিত্রটিও ভালই ফুটিয়াছে—কিন্তু তাহার অঙ্কিত বাংলার পল্লীর সমাজ-জীবনের চিত্র, সংমা এবং সংমার দ্বারা প্রভাবিত গিতার চরিত্র যেন একটু অস্বাভাবিক ও বিসদৃশ মনে হয়।

শেষের দিকে পরানের চরিত্রে যে দৃঢ়তা এবং নিষ্ঠা লেখক দেখাইয়াছেন, তাহা প্রশংসনীয়। কয়েকটি মারাত্মক ছাপার ভুল নজরে পড়িল। প্রচ্ছদপট স্থল্লর।

শ্রীফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়

বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ—শ্রীললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়।

বেঙ্গল পাবলিশার্স ১৪, বঙ্কিম চারুজ্জ্বে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২।
মূল্য—১৫০।

ভারতবর্ষ আজ ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের মর্যাদা লাভ করিয়াছে। পূর্ণ স্বাধীনতা এখনো আমাদের কায়মনে হয় নাই বটে, কিন্তু স্বাধীনতার পথে আমরা যে অনেকদূর আগাইয়া আসিয়াছি তাহাতে সন্দেহ নাই। গোড়া হইতেই এই স্বাধীনতা আন্দোলন দুইটি পথ ধরিয়া চলিয়া আসিয়াছে—একটি নিয়ম-তান্ত্রিক আন্দোলনের পথ, আর অপরটি বৈপ্লবিক পথ। এই বৈপ্লবিক আন্দোলনে বাংলাদেশ সমগ্র ভারতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছে।

বাংলার বিপ্লব আন্দোলনকে দুই অধ্যায়ে বিভক্ত করা যায়। যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, অরবিন্দ, বারীন্দ্র প্রভৃতি প্রথম অধ্যায়ের নায়ক। ১৯১৪ সাল হইতে বিপ্লব আন্দোলনের দ্বিতীয় অধ্যায় আরম্ভ হয়। ১৯১৫ সালে ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে সমগ্র ভারত-ব্যাপী বিদ্রোহের যে পরিকল্পনা করা হয়, সর্বসম্মতিক্রমে বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাহাতে বাংলাদেশের নেতৃত্বদেব বৃত্ত হন। বাংলার বৈপ্লবিক আন্দোলনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের অধিনায়করূপে যতীন্দ্রনাথ ইতিহাসে অরবিন্দ হইয়া থাকিবেন। বালেশ্বরের কোপতিপোদার জঙ্গলে পুলিশ ও সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে সশস্ত্র সংগ্রামে তাঁর মৃত্যুবরণের গৌরবোজ্জ্বল কাহিনী যুগ যুগ ধরিয়া সকল দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের সৈনিকদের অহুপ্রাণিত করিবে।

বর্তমান পুস্তকে বাংলার এই বিপ্লবী বীর সন্তানের আংশিক জীবনকাহিনী প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। লেখক যতীন্দ্রনাথের মাতুল। তাহার সহকর্মীরূপে বৈপ্লবিক আন্দোলনে সংশ্লিষ্ট থাকিয়া তিনি যথেষ্ট নিষ্ঠাতন ভোগ করিয়াছিলেন এবং যতীন্দ্রনাথকে বৃষ্টিবার ও জানিবার হ্রদভ স্মরণ লাভ করিয়াছিলেন। এই পুস্তকে তিনি বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথের প্রকৃত স্বরূপটিকেই ফুটিয়া তুলিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। পুস্তকের ভাষা ওজ্জ্বলী এবং বর্ণনা আবেগমুখর। পড়িতে পড়িতে মনে হয়, একটা পুরুষসিংহের জীবনকাহিনী পড়িতেছি বটে।

এই কাহিনীতে বর্ণিত যতীন্দ্রনাথের জীবনের যাবতীয় ঘটনা এই কথাই আমাদের স্মরণ করাইয়া দেয় যে তার “বাবা যতীন” উপাধি সর্বতোভাবে সার্থক হইয়া ছিল। যে বৈপ্লবিক আন্দোলনের পটভূমিকায় যতীন্দ্রনাথের জীবন-দর্শন ও জীবনদর্শন

ঘুমতাড়ানী ছড়া

স্বকান্ত ভট্টাচার্য, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র,
মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, বিষ্ণু দে

ঘুমপাড়ানী নয়, ঘুমতাড়ানী ছড়া। ঠাকুরা, দিদিমার মুখে শোনা
বিগত যুগের স্মৃতি-মলিন দিনের স্বথ-দুঃখের গান নয়; হাল-আমলের
ঘটনার ওপর ছড়া কেটেছেন চার জন কবি। সিপাহী বিদ্রোহ থেকে
মন্ত্রীমিশন—সব কিছুই অপরূপ রসোত্তীর্ণ কবিতার আকারে সাজান। স্বর্থ
রায়ের অজস্র রঙীন ছবি। দাম—৩/-

পুতুল নাচের ইতিকথা

মানিক বন্দোপাধ্যায়

আমাদের চেনা প্রতিদিনের এই আদ্যিম পৃথিবী নানা কবির চোখে কত
ভাবেই না প্রকাশ পেয়েছে। সেক্সপীয়র বলেছেন পৃথিবী একটা রঙ্গমঞ্চ। যেন
এক অদৃশ্য স্রুতোর টানাপোড়নে আপন সত্তা বিসর্জন দিয়ে কয়েক দিনের
জন্তে মানুষ এই রঙ্গমঞ্চে দেখা দেয়। এই সব মানুষ-পুতুলের যাত্রিক
জীবনের নিখুঁত ছবি। দ্বিতীয় সংস্করণ। দাম—৬/-

পারীর পতন

ইলিয়া এরেনবুর্গ

১৯৪২ সালে ষ্টালিন - পুরস্কার
পাওয়া উপন্যাসের বাংলা অনূবাদ।
পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র
পারীর বুকে নাৎসী অধিকার
কায়েম হওয়ার মর্যাদিক কাহিনী।
ফ্রান্সের ধনী ও অভিজাতদের
শত্রুর সঙ্গে সহযোগিতা, অল্প
দিকে জনগণের প্রতিরোধ-
আন্দোলন—এই দুয়ের বৈপরীত্য
পারীর পতনের বৈশিষ্ট্য। তিন
খণ্ডে সমাপ্ত। অনূবাদ করেছেন :
অমল দাশগুপ্ত, রবীন্দ্র মজুমদার,
অনিলকুমার সিংহ।

দাম : ১ম খণ্ড—৪/-, ২য় খণ্ড—৩/-

৩য় খণ্ড—৩/-

তিন খণ্ড একত্রে—১০/-

— অন্যান্য বই —

সমুদ্রের স্বাদ (গল্প-সংকলন)

মানিক বন্দোপাধ্যায় ৩০/-

ধানকানা (গল্প-সংগ্রহ)

ননী ভৌমিক ২৫/-

সোভিয়েট বিজ্ঞান

ডাইসন কার্টার ২০/-

নতুন দিনের আলো (উপন্যাস)

লিও কিসাচেলী ৪০/-

বিপ্লবোত্তর রাশিয়া

প্যাট স্লোন ৪/-

সোভিয়েট রাশিয়ার

শিক্ষাব্যবস্থা

ডিয়ানা লেভিন ৩০/-

ছোটদের সোভিয়েট

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত ৩০/-

ছাড়পত্র (কবিতা)

স্বকান্ত ভট্টাচার্য ১০/-

আধুনিক চীনা গল্প

লু সুন, লাও চাং, তিঙ লিঙ এবং অন্যান্য

বর্তমান চীনের আটজন সেরা সাহিত্যিকের লেখা এগারোটি সমাজ-সচেতন
গল্পের সংকলন। ভারতের প্রতিবেশী মহাচীনের সমাজিক এবং রাজনৈতিক
জীবনে সম্প্রতি গণচেতনার যে জোয়ার এসেছে তারই প্রতিফলন এই গল্প
কটিতে। সাম্প্রতিক চীনা সাহিত্যে প্রগতির যে লক্ষণ পরিস্ফুট সে পরিচয়ের
সেতু আধুনিক চীনা গল্প। অনূবাদ করেছেন অমল দাশগুপ্ত। দাম—৩০/-

নবজাতক

ম্যাক্সিম গোর্কী

বহু যুগের পুঞ্জীভূত অবহেলায় যারা স্নান, যারা অবজ্ঞাত, তাদের আশা-
আকাঙ্ক্ষা, স্বথ-দুঃখের ওপর লেখা গোর্কীর সাতটি শ্রেষ্ঠ গল্পের সংকলন।
যে মানুষ চাষ করে আর হাতুড়ী পেটে—সমাজের নিচুতলায় বদ্ধ অন্ধকার
ঘরে যারা জীবন কাটায়—শক্তিমান আর বিত্তশালীর বঞ্চনা যাদের মনুষ্যত্বকে
আর দাবিয়ে রাখতে পারছে না আগামীদিনের গণশক্তির বাহক সেই সব
মানুষের রসোত্তীর্ণ কাহিনী। অনূবাদ করেছেন নীহার দাশগুপ্ত। দাম—৩০/-

সচিত্র তালিকার জন্য চিঠি লিখুন

ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশিং হাউস লিমিটেড

৩০, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা—১৬; ফোন—কলিকাতা ৩১০৮

বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল, গ্রন্থায়ত্তে তাহার স্বরূপ-বিশ্লেষণে লেখক নিজের যুক্তিবাদী মন ও বিশ্লেষণ-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন। পুস্তকের উপসংহারটি চমৎকার—তাহা সাহিত্যিক সৌন্দর্যে ভরপুর।

লেখক যতীন্দ্রনাথের জীবনের যতটুকু কাহিনী আমাদের শুনাইয়াছেন সেজন্য তাহার নিকট আমরা কৃতজ্ঞ, কিন্তু মনে হয়—তিনি আমাদের ক্ষুদ্রকুঁড়া দিয়া বিদায় করিয়াছেন। সাধারণ পাঠক শুধু যতীন্দ্রনাথের বিপ্লব-প্রচেষ্টার কথা জানিয়াই পরিতৃপ্ত হইবে না—সবলতা-দুর্বলতা, দোষ-গুণ সবকিছু লইয়া ‘মায়ব’ যতীন্দ্রনাথকে পুরাপুরি জানিবার জন্য তাহার আশ্রয়ের অন্ত নাই। এই পুস্তকের সেই আকাঙ্ক্ষায় পরিতৃপ্তি কিন্তু হইবে না।

যুযুৎসু জাপান—জীরামনাথ বিশ্বাস। বেঙ্গল পাবলিশার্স। ১৪, বঙ্কিম চ্যাট্জে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য তিন টাকা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপান হঠাৎ পূর্ণ হারবার আক্রমণ করিয়া সমস্ত পৃথিবীর বিশ্বয়ের উদ্ভেক করিয়াছিল। সাম্রাজ্যবাদের বুদ্ধিদায়ী যে সেদিন তাহাকে মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রবৃত্ত করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। যুযুৎসু জাপানের পরাজয়-প্রাসের উৎকট মনোবৃত্তির পরিচয় কিন্তু পাওয়া যায় ১৯৩১ সাল হইতেই যখন সে মার্কুরিয়া আক্রমণ করে। বিখ্যাত ভূপর্ধ্যটক রামনাথ বিশ্বাস এই সময়েই সাইকেলে জাপানে বেড়াইতে যান। তিনি জাপানের কোবে, ওসাকা, নারা, ইয়াকোহামা, টোকিও প্রভৃতি নগরীতে পর্যটন করিয়া জাপান ও জাপানীদের সম্বন্ধে

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। ইতিপূর্বে বিদেশে জাপানীদের আচার-ব্যবহার দেখিয়া তাহাদের সম্বন্ধে তাহার যে ধারণা হয় খাস জাপানে গিয়া তাহা বদলাইয়া যায় এবং দোষত্রুটি দুর্বলতা সম্বন্ধে জাপানীদের জাতিগত মহত্ত্ব এবং শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে তিনি সচেতন হইয়া উঠেন। একটা জাতিকে পুরাপুরি ভাবে জানিতে হইলে দেশের যারা প্রাণ, জাতির যারা মেরুদণ্ড সেই সমস্ত গরীব লোকদের সঙ্গেই প্রাণ খুলিয়া মেলামেশা করা দরকার। রামনাথ বাবু একদা ভিক্ষার ঝুলি হাতে লইয়া নিঃসম্বল অবস্থায় ভূপর্ধ্যটনে বাহির হইয়া ছিলেন, অন্যান্য স্থানের ন্যায় জাপানের দরিদ্র লোকেরাই তাঁর ঝুলি পূর্ণ করিয়া দিয়াছিল। তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিয়া তিনি জাপানের সমাজ-জীবনের ভিতরের কথা যতটা জানিতে পারিয়াছিলেন কেবলমাত্র পুস্তক পাঠ করিয়া বা বাহির হইতে ভাঙ্গা ভাগা ভাবে দেখিয়া তাহা অবগত হওয়া সম্ভব নহে।

যুযুৎসু জাপানের কথা রামনাথবাবু বড় চিত্তাকর্ষক ভাবে বলিয়াছেন। তাহার ভ্রমণ-কথা গল্পের মত মনকে শেষ পর্যন্ত টানিয়া লইয়া যায়। ভাষার মারপ্যাচ নাই, বিজ্ঞা ফলানোর উৎকট প্রয়াস নাই—নিজের চোখে যেমনটি তিনি দেখিয়া থাকেন এবং নানা মুনির মুখে নানা মত ও পথের যে সমস্ত ব্যাখ্যা শ্রবণ করেন কেবলমাত্র তাহাই বর্ণনা করিয়া যান। তাঁর চোখ দিয়া একটা দেশের আসল চেহারাকে যেন আমরা সুপষ্টরূপে দেখিতে পাই।

পুস্তকটিতে বর্ণনা আছে, চিন্তা আছে—কতকগুলি কাহিনী রচনাকে আরো সরস করিয়াছে। ‘জাপানের বাহাদুর ছেলের বীরত্ব-কথা’ আর ‘রাসবিহারী বসুর রোমঞ্চকর জীবন কথা’ এই স্বন্দর ভ্রমণ-কাহিনীকে অধিকতর উপভোগ্য করিয়াছে।

শ্রীমলিনীকুমার ভদ্র

পুরোহিত-দর্পণ—পণ্ডিত হরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য সঙ্কলিত এবং কলিকাতা, ২০৪, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটস্থ শ্রীগুরু লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত। পৃ. ১০১৬। মূল্য নয় টাকা।

পুরোহিত ব্রাহ্মণদের এবং ধর্মনিষ্ঠ হিন্দু নরনারীদের একান্ত প্রয়োজনীয় নিত্যকর্ম, দেবদেবীপূজা, ব্রতকথা শুভমালা এবং ক্রিয়াকাণ্ডের বিবিসম্বলিত এই বিরাট গ্রন্থের ২৮তম সংস্করণ প্রকাশিত হইতে দেখিয়া আনন্দিত হইলাম।

শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্তী

সদ্য-প্রকাশিত!

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের নূতনতম গল্প-সংগ্রহ

হাতে খড়ি ৩ কায়কম্প
তিন টাকা

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের রামপদ মুখোপাধ্যায়ের

চুয়াচন্দন ৩, জাতিস্মরণ ২, মায়াজাল ৪,

দস্তুরুচি ২, পটভূমিকা ২৥০

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

অতনী ২৥০ তালনবন্দী ১৥০

প্রকাশক : রমেশ ঘোষাল : ৩৫, রামানন্দ চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলি:

দেশ-বিদেশের কথা

বিবেকানন্দ স্মৃতি-মন্দির ও ভবন

কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটি ইংরেজী ১৯০২ সনে ভগিনী নিবেদিতা কর্তৃক স্থাপিত একট বর্ষ ও সেবা প্রতিষ্ঠান। চল্লিশ বৎসরের অধিক কাল যাবৎ এই প্রতিষ্ঠান ভারতের জাতীয় আদর্শ—ভ্যাগ ও সেবার মহান ভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া জনগণের স্বেচ্ছায় আত্মনিয়োগ করিয়াছে। সোসাইটি বেঙ্গল রামকৃষ্ণ মিশনের সহযোগিতায় দীর্ঘকাল যাবৎ বিবিধ জন-হিতকর কার্য করিয়া আসিতেছে। স্বামী বিবেকানন্দের

স্মৃতি-রক্ষাকল্পে কলিকাতা নগরীতে একটি উপযুক্ত স্মৃতিমন্দির ও ভবন নির্মাণ সোসাইটির অন্যতম উদ্দেশ্য। এই মহৎ উদ্দেশ্যের সাফল্য দেশবাসীর অর্থ-সাহায্য, অকুণ্ঠ সহায়ত্ব ও সহযোগিতার উপর নির্ভর করিতেছে। প্রস্তাবিত পরি-কল্পনাটির জন্য প্রায় দুই লক্ষ টাকা আবশ্যক। তন্মধ্যে শ্রীয পঞ্চাশ হাজার টাকার কাছাকাছি ইতিমধ্যে সংগৃহীত হইয়াছে। এই স্মৃতি-মন্দিরের জন্য যিনি যাহা দান করিবেন তাহা সম্পাদক, বিবেকানন্দ সোসাইটি, ২১, বন্দাবন বস্তু লেন, কলিকাতা—এই ঠিকানায় প্রেরিতব্য।

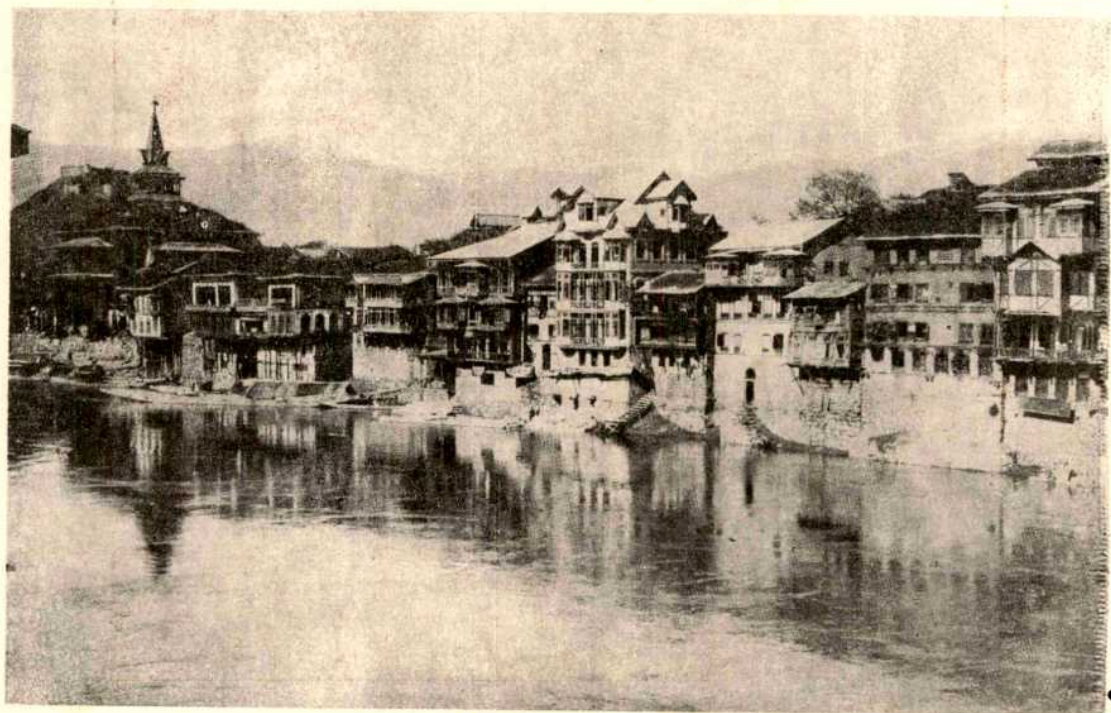


প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

স রস তরু
শ্রীমানিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায়



କାଞ୍ଚିବେର ରାଜଧାନୀ ଶ୍ରୀନଗର—ସାଧାରଣ ଦୃଶ୍ୟ



ବିଲାମ ନଦୀତୀରେର ଦୃଶ୍ୟ

অবস্থা

“সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্

নামস্যাগ্না বলহীনেন সত্যঃ”

৪৭শ ভাগ
২য় খণ্ড

অগ্রহায়ণ, ১৩৮৪

২য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

বাংলার সমস্যা

বাংলার সমস্যা ক্রমেই জটিলতর হইয়া উঠিতেছে। এমনই দেশে নিদাক্ষণ অববজ্ঞের অভাব, বালি ঘরবাড়ী তো নাই বলিলেই হয়, উপরন্তু উদ্বাস্ত ও সন্ত্রস্ত আশ্রয়প্রার্থীর দল বাড়িয়াই চলিয়াছে। কাজকর্মের বিশৃঙ্খলা, শ্রমিকনেতা ও তথাকথিত কমিউনিষ্ট দলের কুপায় বাড়িয়াই চলিয়াছে। বাংলা দেশের আয়ব্যয়ের হিসাব-বতিয়ানের কৈফিয়ৎ এখনকার মত ভাল, কেননা কেন্দ্রীয় সরকার এত দিন হু'হাতে যে টাকা চালিয়াছেন তাহা হইতে লীগমন্ত্রীদলের জুটপার্ট সত্ত্বেও কোষাগারে কিছু রস থাকিয়া গিয়াছিল, সুতরাং পশ্চিমবঙ্গের তহবিলে বৎসরের শেষে তিন কোটি টাকাও উদ্ধৃত থাকিতে পারে বলিয়া আশা দেওয়া হইয়াছে। অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকারের স্বপ্ন পরিশোধের কথা এখন ভাবিতে হয় নাই, নহিলে অবস্থা বিপরীত দাঁড়াইত। কিন্তু তিন কোটি টাকায় দেশের গঠন ও রক্ষণের কাজ কতটাই বা অগ্রসর হইবে?

বাদ্য্যভাবের জন্ত চাষের জমি বাড়াইতে হইবে, সঙ্গে সঙ্গে জমির উৎপাদন শক্তিও অনেক বাড়াইতে হইবে। অত্যাশ্রয়িত পুরণের জন্য দেশের লোকের আয় বাড়াইতে হইবে, শিল্পে, বাণিজ্যে, কৃষিতে, শ্রমিতে ও অরণ্যে অতি শীঘ্রই আয় বৃদ্ধির ও উন্নতির পথ বাহির করিতে হইবে; কেননা দেশের হৃদশা বৃদ্ধি যে ভাবে হইতেছে তাহাতে বাংলার ও বাঙালীর চরম দুর্গতির দিন আসিতে আর বেশী দেরি নাই। কিন্তু সে পথ খুঁজিবেই বা কে এবং সে কথা ভাবিবেই বা কে? যে বাক্যবাণীশ বুদ্ধিমানের দলের হাতে দেশ এখন রহিয়াছে তাহারী ফাঁকি দিয়া স্বার্থসিদ্ধিতেই পট্ট এবং ততোধিক পট্ট ভোতাপাণীর মত উর্জ্বতন নেতৃবর্গের শিখানো ফাঁকা বুলি আওড়াইতে।

আজ প্রায় ছয় মাস যাবৎ ইঁহার পশ্চিমবঙ্গের কর্ণধার-রূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। প্রথম আড়াই মাস কাটাইয়া-

ছেন লীগদলের সঙ্গে ছাত্রাঙ্গণে অর্থাৎ “শ্যাজো ক্যাবিনেটে”—এবং তৎপরে, কারাগারান্তি ঘটবার পর, বিরাজ করিয়া-ছেন আরও তিন মাসের উপর। অবশ্য আমরা অনেকের মুখেই শুনিতেছি যে কাজ দেখাইবার মত সময় ইঁহার কাছে এখনো পান নাই। কিন্তু যোগ্যতার পরিচয় মাত্র দিবার পক্ষেও কি ছয় মাস সময় যথেষ্ট নয়? বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন সেবামাত্র আরম্ভ হইয়াছে; সুতরাং এই সভার সভ্যগণের ভাবিতরে আমাদের আরও কিছু সময় হয়ত দেওয়া উচিত, যাহাতে তাঁহারাই এই যাচাইয়ের কাজটা করিয়া অন্ততঃপক্ষে নিজেদের যোগ্যতার প্রমাণটাও দিতে পারেন। অতএব আমরা আরও এক মাস পদে পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রীমণ্ডলের যোগ্যতার বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করিব এবং সেই সঙ্গে ইঁহার দেশোদ্ধারে দ্রুতী বলিয়া বিভিন্ন লেবেল লাগাইয়া দেশের প্রতিনিধিরূপে ব্যবস্থাপক সভায় আসন লাভ করিয়াছেন তাঁহাদেরও কৃতিত্বের আলোচনা করিব।

সময়ের বিষয়ে ইঁহার উদারভাবে লম্বা করমাহিশ করেন এবং দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা ও রায়সাহ্য স্থাপিত হইবার আশায় বৈধের সহিত বলিয়া থাকিতে বলেন তাঁহাদের প্রতিও আমাদের কিছু নিবেদন আছে। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের শত্রুর অভাব নাই, মিত্রের একান্ত অভাব। ঘরের ভিতরে বিশ্বাসঘাতকের দল স্বার্থসিদ্ধির জন্ত নিত্যই চতুর্দিকে গোলমালের স্বষ্টি করিতেছে, যাহার কলে দেশের শিল্প ও কৃষির উৎপাদন-ক্ষমতা ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে ও দ্রব্যমূল্য বাড়িয়া চলিয়াছে, উপরন্তু আছে অর্থপিপাচ চোরাকারবারির দল যাহাদের চক্রান্তে আজ চতুর্দিকে অতাব-অনটন বাড়িয়াই চলিতেছে। দেশের গৃহস্থ সাধারণের হৃদশা দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে, কমিবার কোনই লক্ষণ নাই, অবশ্য বক্তৃতা ও উপদেশের অতীব নাই, অতাব কেবলমাত্র ব্যবহার। ঘরের বাহিরে আছে বিদেশী শত্রু, নুতন ও পুরাতন, যাহাদের গুপ্তচর ও পক্ষযাহিনী

দেশের ভিতরেই শিকড় গজাইয়া বিরাজ করিতেছে। একপ অবস্থায় সুদিনের অপেক্ষায় বসিয়া থাকিলে দেশের ও দেশের উন্নতির কোন আশা আছে একথা ভাবাই বাতুলতা। লীগের হাতে দেশের অবনতি হইয়াছে যোগ্য লোককে বঞ্চিত করিয়া অযোগ্য লোককে উচ্চাসনে বসাইয়া, দেশের সর্বনাশ হইয়াছে অকর্মণ্য ও অধিকাংশ ক্ষেত্রে অসাধু আমলাতন্ত্রের হাতে দেশের সকল ব্যবস্থার ভার দেওয়ায় এবং দেশের চরম দুর্গতি হইয়াছে স্বাধীনতা চক্রান্তকারী দলের নিযুক্ত মন্ত্রীমণ্ডলীর হাতে দেশ শাসনের ভার দেওয়ায়। আজ পশ্চিম বাংলার লীগের বদলে আসিয়াছে কংগ্রেস। কিন্তু ফলে মার্কী বদল ও টুপী বদল তিন্ন আর যদি বিশেষ কিছু না হয় তবে দিন যতই কাটিবে ততই দেশের দুর্দশা বাড়িবে না কমিবে ?

দেশে শান্তিশৃঙ্খলা তখনই আসিবে যখন দেশবাসী অভাব-মুক্ত হইয়া সবল ও সতেজ জাতিতে পরিণত হইবে, নতুবা কখনও নহে। চীনদেশে শান্তিকামী হইয়া পরের মুখ চাহিয়া পঁচিশ বৎসর ঘোর অশান্তি ও গৃহ-বিবাদে কাটাইয়া প্রায় সর্বশান্ত হয়, তাহার পর সে যখন অতি দুর্বল তখন বাহিরের শত্রু তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। ভারত যুক্তরাষ্ট্রেও কি সেই অবস্থা হইবে ? যদি তাহা হয় তবে বাঙালীর অস্তিত্ব লোপ পাইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অন্য দিকে দেখুন রুশ সোভিয়েটের চিত্র। কি অসীম বিশৃঙ্খলা ও নিদারুণ দুর্দশার মধ্য দিয়া কিরূপ পৌরুষের সহিত তাহারা দেশকে ও জাতিকে সবল ও সতেজরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। আমাদের প্রয়োজন এখন ঐরূপ সচেতন ও কর্মঠ নেতৃত্বের। বাকসর্বস্ব অভ্যন্তরতের স্তোকবাক্যে দেশের প্রগতি ত দুয়ের কথা, পতন অনিবার্য।

পণ্ডিত নেহরুর অভিযোগ :

বাহিরের শত্রুর সশস্ত্র অভিযান এবং তাহার পর মিথ্যার জালে দোষ ফালনের চেষ্টার জাগ্রত উদাহরণ আমরা কাশ্মীরের ব্যাপারেই পাইতেছি। পণ্ডিত নেহরুর বিবৃতিতে তাহার প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রধান মন্ত্রীর বক্তৃতার পূর্ণ বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল :—

অন্য রাজ্যে আমি আপনাদের নিকট কাশ্মীর সম্পর্কে কিছু বলিতে চাই—কাশ্মীর উপত্যকার অসীম সৌন্দর্য সম্পর্কে নয়। সম্ভ্রান্তি কাশ্মীর যে বিপদ ও বিভীষিকার সম্মুখীন সেই সম্পর্কেই আমি আপনাদের নিকট বলিব। আমরা সন্তোষের মধ্য দিয়া চলিতেছি, গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার ভার আমাদের উপর পড়িয়াছে। আমরা যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছি সেই সম্পর্কেই আপনাদের নিকট বলিব।

কাশ্মীর ভারতীয় রাষ্ট্রে যোগদান করার প্রতিবেদী গবর্নেন্ট এই সম্পর্কে ভারত গবর্নেন্টের বিরুদ্ধে ধাপ্পাবাজীর অভিযোগ করিয়াছেন। এই অভিযোগ করার ব্যাপারে যে ভাষা ব্যবহার

করা হইয়াছে তাহা কোন গবর্নেন্টের ভাষা নহে, কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তির ভাষাও হইতে পারে না। সে ভাষা প্রয়োগে প্রতিযোগিতা করা আমার পক্ষে সম্ভব নহে, কারণ এক দায়িত্বশীল গবর্নেন্টের পক্ষে, এক দায়িত্বশীল জাতির পক্ষে আমি কথা বলিতেছি। কাশ্মীরে ধাপ্পাবাজী হইয়াছে আমি স্বীকার করি কিন্তু এ ক্ষমতায়ী কে ? বাহির হইতে সূক্ষ্মজ্ঞ এবং সশস্ত্র আক্রমণকারী দল আসিয়া জম্মু ও কাশ্মীরের অনেকখানি অংশ দখল করিয়াছে। তাহার শহর ও গ্রাম-সমূহ লুণ্ঠন করিয়াছে, অধিবাসীদের হত্যা করিয়াছে। এই সূক্ষ্ম এবং শান্তিপূর্ণ রাজ্যে হঠাৎ বিভীষিকার সঞ্চার হইয়াছে। শ্রীনগর শহর ধ্বংস হইবার উপক্রম হইয়াছে।

পণ্ডিত নেহরু বলেন, কাশ্মীর সম্পর্কে আমরা যাহা করিয়াছি, তাহা বিশেষ বিবেচনার পরই করা হইয়াছে।

গত কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া আমরা সংবাদ পাইতেছি যে, আক্রমণকারী দল জম্মু রাজ্যে আসিয়া হানা দিতেছে এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের নিকট কাশ্মীর সীমান্তের সশস্ত্র লোকজন একত্র হইতেছে। কাশ্মীর ও কাশ্মীরের অধিবাসীদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক বলিয়াই যে এ ব্যাপারে আমাদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ তাহা নয়, কাশ্মীর রাজ্য কয়েকটি বিরাট দেশের সীমান্তবর্তী অঞ্চল। সেইজন্য সেখানে কি ঘটতেছে না ঘটতেছে সে দিকে আমাদের লক্ষ্য রাখা দরকার। কিন্তু সেখানকার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার উদ্দেশ্য আমাদের ছিল না। আক্রমণকারীরা জম্মুর একাংশ দখল করিলেও আমরা হস্তক্ষেপ করি নাই।

বলা হইয়াছে জম্মু হইতে পাকিস্তান সীমান্তে হানা দেওয়া হইয়াছে এবং জম্মুতে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা আছে ও মুসলমান-গণকে বিতাড়িত করা হইয়াছে। অস্ত্রার কার্য হিন্দু, মুসলমান, শিখ যেই করুক না কেন অতীতে আমরা ইহার নিম্না করিতে বিধা করি নাই। স্মরণীয় হিন্দু, শিখ অথবা জম্মু রাজ্যের কোন কর্মচারীদল যদি এই অস্ত্রার করিয়া থাকে আমরা তাহাদের নিম্না করিতেছি এবং একত্র আমরা হুঃখিত। কিন্তু পাকিস্তান হইতে আগত আক্রমণকারীদল জম্মু রাজ্যে ২৫টি গ্রামে ধ্বংসকার্য চালাইয়াছে। এই সকল গ্রামের তালিকা আমার নিকট আছে। ভীষর শহর লুণ্ঠিত ও ধ্বংস করা হইয়াছে। অস্ত্রাঙ্গ শহরও অবরুদ্ধ হইয়াছে। পুষ্ক ও ওমীরপুরের অধিকাংশ আক্রমণকারীদের দখলে আছে। ইহার দ্বারা কি মনে হয় কাশ্মীর হইতে পশ্চিম পঞ্জাবেই প্রথম হানা দেওয়া হইয়াছিল ? ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় নাকি যে, পশ্চিম পঞ্জাব হইতেই কাশ্মীর রাজ্যে সূপরিচালিত ভাবে আক্রমণ করা হইতেছিল ? এই সকল আক্রমণকারী সর্বাধিক আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত।

এই সময়ে কাশ্মীর রাজ্য অস্ত্রদ্বারা তাহাদের সাহায্য করিতে আমাদের অহরোধ করেন। এ সম্পর্কে আমরা তদা-

যিভভাবে কিছুই করি নাই এবং রাষ্ট্র ও দেশরক্ষা বিভাগ অহুমোদন করিলেও কোন অন্তই পাঠান হয় নাই।

২৪শে অক্টোবর রাতে আমি আর একটি আক্রমণের সংবাদ পাই। আক্রমণকারী দল এবেটাবাদ-মানসারা রাস্তা ধরিয়া কাশ্মীরে প্রবেশ করে। সশস্ত্র এবং সুসজ্জিত আক্রমণকারী দল প্রায় একশত লরীতে মুজাফফরাবাদে হানা দেয়। তাহারা মুজাফফরাবাদ লুণ্ঠন করে এবং জিলা ম্যাজিস্ট্রেট প্রমুখ বহু লোককে হত্যা করে, তাহারা বিলাম উপত্যকা ধরিয়া ত্রীনগরের নিকে অগ্রসর হইতে থাকে। রাজ্যের সৈন্যদল অল্পসংখ্যায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিল এবং এই আক্রমণে বাধা দিতে পারে নাই। আক্রমণকারীদের দৈনিক অসামরিক হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণ পরাভূত করে।

২৪শে অক্টোবর রাতেই কাশ্মীর রাজ্য প্রথম ভারতীয় রাষ্ট্রে যোগদানের ইচ্ছা প্রকাশ করে এবং আমাদের নিকট সামরিক সাহায্য চাহে। ২৫শে অক্টোবর সকালে দেশরক্ষা কমিটিতে এই সম্পর্কে আলোচনা হয়, কিন্তু নানা অস্থবিধার জন্তই দৈনিক পাঠান সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত করা হয় না। ২৬শে অক্টোবর প্রাতে এই সম্পর্কে আবার বিবেচনা করা হয়। পরিস্থিতি তখন সঙ্কটজনক হইয়াছে। আক্রমণকারী দল কতকগুলি শহর লুণ্ঠন করিয়াছে এবং তাহারা মাহোরা পাওয়ার হাউস ধ্বংস করে। এই পাওয়ার হাউস হইতেই সমগ্র কাশ্মীরে বিদ্যুৎ সরবরাহ হইয়া থাকে। তাহারা উপত্যকা অঞ্চলে প্রবেশ করিবার উপক্রম করিতেছিল। ত্রীনগর ও সমগ্র কাশ্মীরের ভাগ্য অনিশ্চিতের উপর নির্ভর করিতেছিল।

আমরা মহারাজের গবর্নমেন্টের নিকট হইতে এবং জনসাধারণের প্রতিনিধিদের পক্ষ হইতে সাহায্যের জন্ত জরুরী আবেদন পাই। কাশ্মীর গবর্নমেন্ট এবং জাতীয় সম্মেলন আমাদের কাশ্মীরের ভারতীয় রাষ্ট্রে যোগদান অহুমোদন করিতে বলেন। আমরা এই যোগদান অহুমোদন করিয়া বিমানযোগে সৈন্য প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। কিন্তু এই সম্পর্কে আরও সতর্ক আরোপ করি যে, শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইলে এই যোগদান ব্যাপারে জনসাধারণের মতামত গ্রহণ করা হইবে। এই সঙ্কট সময়ে কাশ্মীরের জনসাধারণকে তাহাদের মতামত প্রকাশের অযোগ্য না দিয়া আমরা কিছুই চূড়ান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে চাহি নাই। ডোমিনিয়নে যোগদান সম্পর্কে যেখানেই কোন মতবিরোধ আছে সেখানেই এই সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার ভার জনসাধারণের উপর চাপ্ত করাই আমাদের নীতি। এই নীতি অনুযায়ীই কাশ্মীরের ভারতীয় রাষ্ট্রে যোগদান ব্যাপারে আমরা এই সতর্ক আরোপ করি।

২৬শে অক্টোবর অপরাহ্নে আমরা সৈন্যদল প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত করি, তখন ত্রীনগর বিপন্ন, পরিস্থিতি সঙ্কটজনক। সেই দিন ও রাতিতে আমাদের কর্মচারিগণ কঠোর পরিশ্রম করেন। ২৭শে অক্টোবর প্রত্যুষে আমাদের সৈন্যদল বিমানযোগে যাত্রা করে। তাহারা সংখ্যার অল্প, কিন্তু ত্রীনগর পৌছিয়াই তাহারা

আক্রমণকারীদের প্রতিরোধে অগ্রসর হয়। তাহাদের সেনাপতি পরদিন নিহত হন।

তার পূর্ব প্রত্যুষেই সৈন্যদল ও অস্ত্রস্ত্র সরঞ্জাম পাঠানো হইতেছে। আমাদের কর্মচারিগণ, বৈমানিকগণ ও বিমান কর্মচারীদল যে প্রশংসনীয় কার্য্য করিয়াছে আমি ও আমার গবর্নমেন্ট তাহা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতেছি। বিমান চলাচল ব্যবস্থা আমাদের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করিয়াছে। সৈন্য তাহাদের নিকট আমি কৃতজ্ঞ। সঙ্কটজনক মুহূর্তে কি ভাবে দেশসেবায় উদ্বুদ্ধ হইতে হয় আমাদের যুবকদল তাহা দেখাইয়াছেন।

ত্রীনগরের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হইয়া পড়ে। আক্রমণকারিগণ প্রায় দ্বারে উপনীত। সেখানে কোন শাসনব্যবস্থা, সৈন্য বা পুলিশ কিছুই ছিল না। আলো ও বিজুলী বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। সেখানে বহু আশ্রয়প্রার্থী ছিল। কিন্তু ত্রীনগরে কোন আতঙ্ক ছিল না। দোকানপাট খোলা ছিল এবং লোকজন রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইত। ইহা কেন সম্ভব হইল? সেখ আবহুদ্বার ও তাঁহার জাতীয় সম্মেলনের সহকর্মিগণ এবং তাঁহাদের হিন্দু মুসলমান শিখ মিলিত নিরস্ত্র বেছাসেবকগণ ইহার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া শৃঙ্খলা রক্ষা এবং আতঙ্ক দূর করেন। যে অবস্থায় অধিকাংশ লোকেরই মনোবল নষ্ট হইয়া যায় সেই সঙ্কট মুহূর্তে তাঁহারা এই আশ্চর্যজনক কাজ করেন। তাঁহাদের সংগঠন শক্তির জন্তই তাঁহারা ইহা করিয়াছেন। যে সমস্ত আক্রমণকারী তাহাদের দেশ আক্রমণ করিয়া তাঁহাদিগকে পাকিস্তানে যোগদান করিতে বাধ্য করার চেষ্টা করিতেছে, তাহাদের নিকট হইতে দেশকে রক্ষা করার জন্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন বলিয়াই তাঁহারা ইহা করিতে পারিয়াছেন। ভবিষ্যতে যাহাই ঘটুক না কেন কাশ্মীরের জনগণ গত কয়েকদিনে অপূর্ব সাহস, সংগঠন-ক্ষমতা ও একতা দেখাইয়াছেন। সাম্প্রদায়িক অনৈক্যে বিষাক্ত সমগ্র ভারত ইহা হইতে শিক্ষালাভ করিতে পারিলে উত্তম হইত। মহান নেতা সেখ আবহুদ্বার নেতৃত্বে উপত্যকার হিন্দু-মুসলমান-শিখ অধিবাসিবৃন্দ আক্রমণকারীদের হাত হইতে নিজেদের দেশরক্ষার জন্ত একত্র সমবেত হয়। তাহাদের সমর্থন ও সহযোগিতা ব্যতীত আমাদের সৈন্যদল প্রায় কিছুই করিতে পারিত না।

এই সঙ্কট মুহূর্তে সেখ আবহুদ্বাকে শাসন কর্তৃত্বের ভার দেওয়ার সিদ্ধান্ত করার কাশ্মীরের মহারাজকে অভিনন্দন জানাইতেছি। তাঁহার এই বিজ্ঞানোচিত কার্য্য অস্ত্রস্ত্র রাজাদেরও অহুসরণ করা কতব্য।

ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, কাশ্মীরের সংগ্রাম আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে কাশ্মীরের জনগণেরই সংগ্রাম। আমাদের সৈন্যগণ এই সংগ্রামে সাহায্য করার জন্তই সেখানে গিয়াছে। কাশ্মীর আক্রমণকারীদের হাত হইতে মুক্ত হইলেই আমাদের সৈন্যদের আর সেখানে থাকার প্রয়োজন হইবে না। কাশ্মীরের ভাগ্য কাশ্মীরের জনগণের হাতেই থাকিবে।

আমরা কেবলমাত্র কাশ্মীরের জুড়ই এই সঙ্কটপূর্ণ দিন কাটাই নাই, সমগ্র ভারতবর্ষের জুড়ও। সেই বিপদ বতমানে কম কিন্তু এখনও তাহা কাটে নাই। আমাদের সম্মুখে অনেক বিপদ আসিতেছে। যে কোন অবস্থার জন্ম আমাদেরকে অত্যন্ত সজাগ ও প্রস্তুত থাকিতে হইবে। প্রকৃতির প্রথম ধাপ হিসাবে ভারতে সর্বোপায়ে সাম্প্রদায়িক বিরোধের অবসান ঘটাইতে হইবে এবং আমাদের স্বাধীনতা রক্ষার জন্ত সমস্ত বিপদের সম্মুখীন হইতে গেলে এক ঐক্যবদ্ধ জাতি হিসাবে দাঁড়াইতে হইবে। আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় থাকিলে এবং জাতি সুগঠিত হইলেই কার্যকরীভাবে বাহিরের বিপদের সম্মুখীন হওয়া যায়।

আমরা কাশ্মীরে আক্রমণকারী ও হানাদারদের কথা বলিয়া থাকি; কিন্তু এই সমস্ত লোক সমস্ত ও সুশিক্ষিত এবং তাহাদের উপযুক্ত নেতা আছে। এই সমস্তই পাকিস্তান হইতে ও তাহার মধ্য দিয়া আসিয়াছে। ইহারা কেন এবং কি করিয়া সীমান্ত প্রদেশ ও পঞ্জাব অতিক্রম করিয়া আসিতে সমর্থ হইল এবং কিরূপে তাহারা অল্পসজ্জিত হইল তাহা পাকিস্তান গবর্নমেন্টকে জিজ্ঞাসা করার অধিকার আমাদের আছে। ইহা কি আন্তর্জাতিক আইনভঙ্গ নয়? ইহা কি প্রতিবেশী দেশের বিরুদ্ধে অসহৃদয়ের কাজ নয়? পাকিস্তান গবর্নমেন্ট কি এতই দুর্বল যে, তাহারা অল্প দেশ আক্রমণের জন্ত তাহাদের অঞ্চলের মধ্য দিয়া অল্পসজ্জিত আসা বন্ধ করিতে পারেন না? অথবা ইহাই কি তাহাদের ইচ্ছা? তৃতীয় কোন কারণ নাই।

হানাদারদের আসা বন্ধ করিতে এবং যাহারা আসিয়াছে তাহাদিগকে সরাইয়া লওয়ার জন্ত আমরা পাকিস্তান গবর্নমেন্টকে বার বার অনুরোধ করিয়াছি। ইহাদের আসা বন্ধ করা তাহাদের পক্ষে সহজ। কারণ কাশ্মীরে যাওয়ার পথ খুব কম এবং কতকগুলি পুলের উপর দিয়া যাইতে হয়। আক্রমণের বিপদ কাটিয়া গেলে কাশ্মীরে আমাদের সৈন্তসমূহকে কাজে লাগানোর ইচ্ছা আমাদের নাই। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, কাশ্মীরের ভাগ্য জনসাধারণই নিয়ন্ত্রণ করিবে।

কেবলমাত্র কাশ্মীরের জনগণের নিকটই আমরা এ প্রতিশ্রুতি দিই নাই, সমগ্র বিশ্বের নিকটই দিয়াছি। মহারাজ ও তাহা সমর্থন করিয়াছেন। আমরা এই কথা খেলাপ করিতে পারি না এবং করিব না; শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হইলে পর সম্মিলিত যুক্তরাষ্ট্রের দ্বারা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে গণভোট গ্রহণ করিতে আমরা প্রস্তুত। আমরা জনগণের নিকটই ইহা প্রেরণ করিতে চাই এবং তাহাদের সিদ্ধান্তই আমরা মানিয়া লইব। আমি ইহা হইতে অধিকতর যুক্তিসঙ্গত প্রস্তাবের কথা ভাবিতে পারি না। ইতিমধ্যে আক্রমণকারীদের হাত হইতে কাশ্মীরকে রক্ষার যে প্রতিশ্রুতি আমরা কাশ্মীরের অধিবাসীদিগকে দিয়াছি তাহা আমরা রক্ষা করিব।

লিয়াকৎ আলি খানের বক্তব্য

মিঃ লিয়াকৎ আলি খানের পূর্ণ বেতার-বক্তৃতাটি নিম্নরূপ :
অজ্ঞ রাষ্ট্রে আমি আপনাদের নিকট রোগশয্যা হইতে এই আলোচনা করিতেছি। আপনাদের নিকট আমি কাশ্মীর সম্পর্কে আলোচনা করিব, কারণ কাশ্মীরের পরিস্থিতি বতমানে এক সঙ্কটজনক পর্যায়ে উপস্থিত হইয়াছে এবং আন্তর্জাতিক গুরুত্ব লাভ করিয়াছে। আমি জানি, আমার ভায় আপনাদেরও মনে কাশ্মীর সর্বাধিক গুরুত্ব লাভ করিতেছে।

নিজদের বহুবিধোন্মিত শৌর্ষ ও বীর্যে আত্মহারা হইয়া কাশ্মীরের নির্ধাতিত জনগণের কতিপয় তথাকথিত অত্যাচারী লহাভুতিশীল ব্যক্তি এই মনোরম জনপদের ইতিহাস ভুলিয়া গিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। স্মরণ্য তাহাদেরই হিতার্থে আমরা সংক্ষেপে উহার আলোচনা করিতে পারি।

কাশ্মীরের পর্বত ও উপত্যকার অধিবাসীসহ আশ্রয় হই এই মনোরম জনপদ কৃষ্যাত অমৃতসর-চুক্তি অনুসারে ব্রিটিশ কর্তৃক সামান্য ৭৫ লক্ষ টাকার বিনিময়ে এক ভোগরা প্রধানের নিকট বিক্রীত হয়। কাশ্মীরের বর্তমান মহারাজা কাশ্মীরের জনগণকে পৌ-মহিষাদি পশুর দ্বারা পূর্বপুরুষের নিকট হইতে উত্তরাধিকারস্বত্ব পাইয়াছেন। ব্রিটিশ কর্তৃক বিক্রীত নির্ধাতিত দাসদের রক্তশ্রোত বহাইয়া বর্তমানে ভারতীয় সৈন্যদল শৌর্ষ-বীর্যের পরিচয় দিয়া এই নীতি-বিরুদ্ধ ও বে-আইনী মালিকানা রক্ষা করিতেছে।

অতীত শত বৎসরের ভোগরা শাসনে অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী ও সর্বাধিক আকর্ষণীয় কাশ্মীরী জাতি দুর্ভাগ্যের চরম পর্যায়ে উপনীত হইয়াছে। সাম্প্রতিক কয়েক বৎসরে তাহারা স্বাধীনতা-সংগ্রামের বহু চেষ্টা করিয়াছে। বারংবার তাহাদিগকে দমন করা হইয়াছে এবং বারংবার তাহারা অত্যাচার মুক্ত হইবার জন্ত জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে।

অক্টোবর মাসের প্রারম্ভ হইতে কাশ্মীরের নিরপরাধ জনগণের উপর পৈশাচিক অত্যাচারের ছিটেফোঁটা সংবাদ পাওয়া যাইতে থাকে। অনতিকাল মধ্যেই এইরূপ সংবাদ শ্রোতবারার মত পৌছিতে থাকে। মারি পাহাড় হইতে প্রজ্বলিত গ্রামসমূহের দৃষ্ট দোষা যাইতে থাকে। সহস্র সহস্র আতঙ্কগ্রস্ত শরণাগত পাকিস্তানে প্রবেশ করিতে থাকে।

এইরূপ অবস্থায় কাশ্মীরের জনগণ মরিয়া হইয়া জালামুদের বিরুদ্ধে ফিরিয়া দাঁড়ায়। হাজরা ও পশ্চিম পঞ্জাবে কাশ্মীরীদের ও বিশেষভাবে পুন্ডবাসীদের বহু আত্মীয়স্বজন রহিয়াছে। ফলে পাকিস্তানের কোন কোন অংশের মনোভাব বিশেষ উত্তেজিত হইয়া উঠে এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত ও উপজাতীয় অঞ্চলের কতক লোক কাশ্মীরের জুলুমে বিচঞ্চল হইয়া তাহাদের ভ্রাতৃত্ববন্ধের সাহায্যের জন্ত অগ্রসর হয়। ইহা কাশ্মীরের নির্ধাতিত, দাসত্বে আবদ্ধ ও জালবদ্ধ জনগণের স্বাধীনতার সংগ্রাম এবং তাহাদের ও তাহাদের প্রতি

সহানুভূতিশীলীদের জীবনরক্ষার সংগ্রাম—গাহাদিগকে নিশ্চিহ্ন করার জন্ত ভারত-সরকার সাহায্য করিতেছেন। ভারত-সরকারের বিধোষিত নীতি হইতেছে মহারাজার হস্তকে বলিষ্ঠ করা। এই হস্ত যে কতটা শোণিতসিক্ত, ভারতীয় নেতৃবৃন্দ তাহা ভালভাবেই জানেন, যদিও তাঁহারা বর্তমানে সুবিধামত উহা ভুলিবার চেষ্টা করিতে পারেন।

তথাকথিত হানাদারদের উপর ইচ্ছা করিয়াই অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইতেছে, যেন কাশ্মীরের জনগণ আকস্মিকভাবে শতাব্দীর নির্ধাতনের স্মৃতি মনে হইতে মুগ্ধিয়া কেলিয়াছে এবং জালাম নির্ধাতনকারীর প্রেমে রাতারাতি মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ জনগণের বিদ্রোহকে বাহিরের কতক লোকের সহানুভূতি আছে বলিয়াই বহিরা-ক্রমণ বলিয়া ঘোষণা করা ইতিহাসের অসাধু পুনর্নিখন বাতীত আর কিছুই নয়। সৈন্তবাহিনীর বিরুদ্ধে আধুনিক অস্ত্র প্রয়োগের অভিযোগ করিয়া বহু আলোচনা করা হইয়াছে এবং উহার খুঁটনাটি বিষয় লইয়া অবমাননা ও পরোক্ষ ইঙ্গিতের একটা বিরাট কাঠামো তৈরি করা হইয়াছে। ইহা অবশ্য ভুলিয়া যাওয়া হইয়াছে যে ভারতের আক্রমণকারী সৈন্ত-বাহিনীর সহিত সংগ্রামরত ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকে পকাশ-ঘাট হাজার প্রাক্তন সৈনিকের অন্তর্ভুক্ত, যাহারা শত্রুদের নিকট হইতে অস্ত্র কাড়িয়া লইতে মোটেই অসমর্থ নহে।

হানাদারদের বিরুদ্ধে কাশ্মীরের মনোরম জনপদ ও উহার অধিবাসীদের রক্ষার জন্ত “সাহসী” ভারতীয় সৈনিকদের ব্যাপকভাবে চিত্রিত কষ্ট-কল্পিত চিত্র দর্শনে আমাদের বিভ্রান্ত হইলে চলিবে না, ভারতীয় বাহিনী কাশ্মীরের দেশপ্রেমিকদের উপর গুলি ও বোমাবর্ষণ করিয়াছে—হানাদার দলের উপর নহে। ভারত-সরকার ও তাঁহাদের ভাবেদার দল কাশ্মীরকে রক্ষা করার চেষ্টা করিতেছে না—এক ঐয়াচারী পতনোন্মুখ সরকারের রক্ষা চেষ্টা করিতেছে।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী তাঁহার বেতার-ভাষণে বাস্তবায়িত যন্ত্রের মত ক্রমাগত খোঁচা দিয়া চলিয়াছেন। জুনাগড় ও মান-ভাদার রাজ্য পাকিস্থানে যুক্ত হওয়ার পর ভারতীয় সৈন্তবাহিনী যেমন যে-কোন অভ্যুত্থানে ঐ সকল রাজ্যের মধ্যে অগ্রসর হইয়াছে, পাকিস্থান বাহিনী তেমন কাশ্মীর রাজ্যে প্রবেশ করে নাই। ভারত-সরকার জুনাগড়ের পাকিস্থানে যোগদানকে তাঁহাদের নিরাপত্তার বিরুদ্ধে বিপদ-সম্ভাবনা বলিয়া মনে করেন। কাশ্মীরের ভারতে যোগদান পাকিস্থানের নিরাপত্তার পক্ষে বৃহত্তর বিপদ-সম্ভাবনার কারণ। আমরা এই যোগদান স্বীকার করিয়া লইতে পারি না। কাশ্মীরের ভারতে যোগদানে ভারত-সরকারের আক্রমণমূলক সাহায্য লইয়া কাপুরুষ মনো-ভাবসম্পন্ন শাসক কাশ্মীরী জনগণকে প্রভারণা করিয়াছেন। গুরুতর রাজদ্রোহের অপরাধে কারারুদ্ধ শেখ আবদুল্লাহ মুক্তি এবং খুঁটনাটি অপরাধে দণ্ডিত মোসলেম সম্মেলনের নেতৃবৃন্দের

ক্রমাগত কারাবাস যত্নবলের অংশ মাত্র। এই বিরোধান্ত ঘটনাবলীর ইতিহাস যখন লিপিবদ্ধ হইবে, তখন বহু আশু-প্রভারণাকারী দেশপ্রেমিক ও বিচারপ্রেমিকের বিশ্বাসঘাতকতা প্রকাশ পাইবে, কিন্তু কাশ্মীরের প্রকৃত দেশপ্রেমিকগণ শীঘ্র হটক বা বিলম্বে হটক, এই যত্নবলের মুখোমুখি কেলিতে সমর্থ হইবেন—তাঁহাদের বিরুদ্ধে যত বেশী শক্তি সমাবেশ করা হটক। এই নৈতিক সংগ্রামে আমাদের অন্তর আমাদের জাতবৃন্দের সঙ্গেই রহিয়াছে, কারণ তাঁহাদের বর্তমান নির্বাচনীয় বিষয় স্বাধীনতা অথবা মৃত্যু। শত্রুদের পরিকল্পনা সার্থক হইলে ভারতের বিভিন্ন স্থানের মুসলমানদের দ্বার তাহারাও নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে। সম্ভবতঃ এই পরীক্ষার পরেই ভারত-সরকার গণভোটের ব্যবস্থা করিতে চাহেন। ভোটারগণকে গৃহ হইতে বিতাড়ন বা মৃত্যুর কবলে কেলিয়া গণভোট এখানে কি লাভ হইবে?

কাশ্মীর-সরকারের সহিত সম্মানজনক মীমাংসার জন্ত আমরা সুসমঞ্জসভাবে বারংবার চেষ্টা করিয়াছি, তাহা বিশ্বের নিকট বিদিত। কাশ্মীর-সরকার সকল অহরোধ অবহেলা বা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। ২রা অক্টোবর তারিখে আমি কাশ্মীরের প্রধান মন্ত্রীর নিকট প্রস্তাব করি যে, দুই রাষ্ট্রের অবশিষ্ট প্রস্তাবলী স্থিতিবস্থা চুক্তিতে জনগণের সমতা ও সীমান্ত হানা সম্পর্কে পারস্পরিক অভিযোগ সম্বন্ধে দুই সরকারের প্রতিনিধিবৃন্দের মধ্যে আলোচনার প্রয়োজন। কাশ্মীরের প্রধান মন্ত্রী উত্তরে জানান যে, তিনি বর্তমানে এত ব্যস্ত যে, তিনি এইসব ব্যাপারের আলোচনা করিতে পারিতেছেন না। এতৎসঙ্গেও আমরা কাশ্মীর রাজ্যের সহিত আলোচনার জন্ত আমাদের প্রতিনিধিকে ত্রীনগরে প্রেরণ করি। অবশ্য প্রধান মন্ত্রী তাঁহার সহিত আলোচনার স্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন, এবং আমাদের প্রতিনিধিকে কিরিনা আসিতে হয়। ১৪ই অক্টোবর কাশ্মীরের প্রধান মন্ত্রী আমার নিকট প্রেরিত তারবার্তায় ছয়কী দেন যে, পাকিস্থান নিরপেক্ষ তদন্তে সন্মত না হইলে কাশ্মীর সীমান্তে পাকিস্থানের জনগণের বন্ধুত্ববিরোধী কার্য-কলাপ প্রতিরোধের জন্ত তিনি বাহিরের সাহায্য চাহিতে বাধ্য হইবেন। তৎক্ষণাৎ আমি নিরপেক্ষ তদন্তের প্রস্তাবে সন্মতি জ্ঞাপন করি এবং এই উদ্দেশ্যে একজন প্রতিনিধি মনোনয়নের জন্ত আমি কাশ্মীরের প্রধান মন্ত্রীকে অহরোধ করি। কাশ্মীর-সরকার অতঃপর এ সম্পর্কে আর কোন পজালাপ করেন নাই। ২০শে অক্টোবর কাশ্মীর-সরকারের এক ভূর-বার্তার উত্তরে কারেদে-আজম কাশ্মীরের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া বলেন যে, কাশ্মীরের সহিত সম্পর্কের উন্নতিবিধানের জন্ত বারংবার চেষ্টা চলিতেছে এবং কাশ্মীরের প্রধান মন্ত্রীকে করাচীতে আসিয়া আলোচনা করার অহরোধ করেন। এই অহরোধের কোন উত্তর দেওয়া হয় নাই। কারেদে-আজম আরও নির্দেশ করেন যে, বাহিরের সাহায্য লওয়ার ছয়কী

অনেকটা চরমপন্থার অম্লরূপ এবং উহাতে দেখা যায় যে, কাশ্মীর-সরকারের নীতির প্রকৃত লক্ষ্য বে-আইনী জবরদস্তি-মূলক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন দ্বারা ভারতীয় ইউনিয়নের সহিত যোগদানের সুবিধা খোঁজা।

কাশ্মীর সমস্তার আলোচনার ক্ষুদ্র প্রতিনিধি প্রেরণ ও নিরপেক্ষ তদন্তের ক্ষুদ্র প্রতিনিধি মনোনয়নে কাশ্মীর-সরকারের অস্বীকৃতি, করাচীতে আগমনের ক্ষুদ্র প্রধান মন্ত্রীর নিকট কায়েদে-আজমের আমন্ত্রণের উত্তরদানে কাশ্মীর-সরকারের অসামর্থ্য, তাহাদের সৈন্তদল দ্বারা মুসলমানদের উপর আক্রমণ চালাইয়া বেচ্ছাকৃত উপদ্রব সৃষ্টি, ভারতীয় ইউনিয়নে কাশ্মীরের যোগদানের দিন পূর্বাহ্ন ১৫টার বিমানবাহিত ভারতীয় সৈন্ত দলের ত্রীনগরে অবতরণ ইত্যাদি হইতে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ইউনিয়নে যোগদানের পরি-কল্পনা পূর্ব হইতেই চলিয়াছিল এবং উহা ভারতীয় সৈন্তদল কর্তৃক কাশ্মীর দখল দ্বারাই মাত্র সম্ভব হইতে পারে।

যদিও কাশ্মীর-সরকার পাকিস্থানের বিরুদ্ধে সর্বপ্রকার দোষারোপ করিয়াছেন (এবং এই তথাকথিত অভিযোগের প্রতি-কারের ক্ষুদ্র ভারত-সরকারের নিকট সাময়িক সাহায্য প্রেরণের দাবি কাশ্মীর-সরকার করিতেছেন) তথাপি কোন ক্ষেত্রেই ভারত ডোমিনিয়ন এই সব দোষারোপ সম্পর্কে পাকি-স্থান-সরকারের নিকট কোনরূপ প্রশ্ন করেন নাই বা যুক্ত আলোচনা দ্বারা এই সমস্তা সমাধানের কোনরূপ চেষ্টা করেন নাই। ভারত কর্তৃক কাশ্মীরের যোগদান প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার ও কাশ্মীরে সৈন্ত প্রেরণের পরেই মাত্র পাকিস্থান-সরকারকে অবলম্বিত ব্যবস্থা সম্পর্কে জানাম হয়।

ভারত-সরকার কর্তৃক কাশ্মীর রাজ্য অবাঞ্ছিতভাবে দখলের পর কায়েদে-আজম প্রস্তাব করেন যে, অবিলম্বে লাহোরে এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন। উহাতে উভয় ডোমিনিয়নের গবর্নর-জেনারেল, প্রধান মন্ত্রীদ্বয় এবং কাশ্মীরের মহারাজা ও তাহার প্রধান মন্ত্রী যোগদান করিবেন। তাহার আমন্ত্রণ গৃহীত হয় এবং ২৯শে অক্টোবর সম্মেলনের তারিখ ঘাষণা হয়। শেষ মুহূর্তে পণ্ডিত নেহরু পীড়িত থাকায় সম্মেলন স্থগিত থাকে। অতঃপর ব্যবস্থা হয় যে, ১লা নবেম্বর সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে এবং উভয় গবর্নর-জেনারেল ও প্রধান মন্ত্রীদ্বয় উহাতে যোগদান করিবেন। এই সম্মেলনও অনুষ্ঠিত হয় নাই, কারণ ১লা নবেম্বর পূর্বাহ্নে পুনরায় শেষ মুহূর্তে আশাধিকারকে জানান হয় যে, পণ্ডিত নেহরু লাহোরে আসার মত সুস্থ নহেন। এইভাবে ভারতীয় ডোমিনিয়ন কর্তৃক সম্মেলনের ধারণা পশ্চাতে নিক্ষিপ্ত হয়। ভারত-সরকার যদি প্রকৃতপক্ষে এই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী ব্যাপারের আলোচনা করিতে চাহেন, তাহা হইলে পণ্ডিত নেহরুর স্থলে সহকারী প্রধান মন্ত্রীও আসিতে পারিতেন। ১লা নবেম্বর কেবল লর্ড মাউন্ট-ব্যাটেন লাহোরে যুক্ত দেশরক্ষা পরিষদে যোগদানের ক্ষুদ্র

আসেন এবং কায়েদে-আজমের সহিত সাক্ষাৎ করেন। এই সাক্ষাৎকারের সময়ে লর্ড মাউন্টব্যাটেনের নিকট কতিপয় প্রস্তাব করা হয়, কিন্তু আমি বা কায়েদে-আজম ভারত-সরকারের নিকট হইতে আর কোন সংবাদ পাই নাই। তৎপরিবর্তে সত্য ঘটনা বিবেচনা না করিয়া পণ্ডিত নেহরু নির্বিচারে পাকিস্থান সরকারের বিরুদ্ধে দোষারোপ করিতে-ছেন। লর্ড মাউন্টব্যাটেনের দিল্লী প্রত্যাবর্তনের পর তাহার বেতার-ভাষণের ব্যবস্থা হয় এবং তাহার অভিযোগের তাৎপর্য আমি পূর্বেই আপনাদিগকে বলিয়াছি। ভারত-সরকারের বর্তমান পরিস্থিতি ইহাই। এই সমস্তার বিচার ভার আপনাদের ও বিশ্ববাসীর উপর ন্যস্ত রহিয়াছে।

লিয়াকৎ আলি খানের প্রতিবাদে সদীর পাটেল

সদীরজী বলেন, বরমুলায় ধর্মযাজকশ্রেণীর কতিপয় ব্রিটিশকে নৃশংসভাবে হত্যা এবং কয়েকটি ইউরোপীয় পরিবারকে অতি নির্যম ভাবে নিহত করার মধ্যে এই সব তথাকথিত যুক্তিকামী সৈনিকের চরিত্রের আসল রূপটি স্পষ্টতঃ প্রকাশ পাইয়াছে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের প্রধান মন্ত্রী ক্রমাগত যে সব প্রলাপোক্তি করিতেছেন এবং আক্রমণ-কারীরা যে সব লোক লইয়া গঠিত ও তাহারা যে সব অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত বলিয়া জানা গিয়াছে, তাহাতে পার্শ্ববর্তী একটি রাষ্ট্র এ সম্পর্কে যে ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে, তাহা স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হইতেছে। অথচ সেই রাষ্ট্রের নেতৃমণ্ডলই একদিন সার্বভৌম ক্ষমতার অবসানের পর দেশীয় রাজ্যগুলির স্বাধীন সত্তা এবং যে কোন ডোমিনিয়নে যোগদানে দেশীয় রাজ্যগুলির পূর্ণ স্বাধীনতার কথা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছিলেন।

পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী শুধু যে কাশ্মীরের বিরুদ্ধে বিধোদগার করিয়াছেন, তাহা নহে, তিনি ভারতপূর্ব, পাতিয়ালা, ক্রিয়দকোট এবং কপূরতলা রাজ্য সম্পর্কেও অভিযোগ করিয়াছেন। অথচ এই রাজ্যগুলি ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদান করিয়াছে এবং পাকিস্থানের সহিত ভারতীয় ইউনিয়নের সৌহার্দের সম্পর্ক রহিয়াছে। প্রধান মন্ত্রী যে চিত্র আঁকিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাতে তিনি নিজের সুবিধা অমুখ্যায়ী সত্যকে এড়াইয়া গিয়াছেন অথবা সম্পূর্ণ বিকৃত করিয়া দেখাইয়াছেন।

আলোয়ার ও ভরতপুর রাজ্যে যখন গোলযোগ হয়, তখন পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী ভারতীয় শাসন-পরিষদের একজন বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন এবং ইহাও তাহার জানা উচিত যে, তখন দেশীয় রাজ্যসমূহের ব্যাপার রাজপ্রতিনিধি কর্তৃক পরিচালিত হইত। এ সকল গোলযোগ প্রথম যেওরা আরম্ভ করে। জাঠ ও রাজপুতদের সহিত সময় সময় তাহাদের কলহ হইত। এই সকল গোলযোগের ফলে অমুসলমানদের

বাড়ীঘর ভস্মীভূত ও গবাদি পশু হুমুসিত হয় এবং ক্ষেত-খামারে আশ্রয় লাগাইয়া দেওয়া হয়।

এ বিষয়ে আমার কোনই সন্দেহ নাই। যে, মুসলিম লীগ যদি দুই-জাতি মতবাদের প্রচারকার্য দ্বারা জাতির মজ্জায় মজ্জায় সাম্প্রদায়িকতার বিষ ঢুকাইয়া না দিত, তবে এই জাতীয় সমস্ত বিবাদই আপোষ-আলোচনা দ্বারা সম্ভোষজনক-ভাবে মিটাইয়া ফেলা যাইত। কিন্তু বাহিরের স্বার্থসংশ্লিষ্ট দলগুলির কারসাজিতে এমন অবস্থা দেখা দেয়, যাহার ফলে উভয় পক্ষই পরস্পরের বিরুদ্ধে নির্মম হইয়া উঠে।

তাহা সবেও মেওরা পুনরায় হাজারে হাজারে এই সকল রাজ্যে ফিরিয়া আসিয়াছে। যাহারা চলিয়া যাইতে ইচ্ছুক তাহাদিগকে কোন মুক্তি দ্বারাই আটকাইয়া রাখা যাইবে না; কারণ অমুসলমানদের বাড়ীঘর ও সম্পত্তির কি পরিমাণ তাহারা ধ্বংস করিয়াছে, তাহা তাহারা জানে।

পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রীর যদি কোন গোপন অভিসন্ধি না থাকিয়া থাকে, তবে পাতিয়ালা, ফরিদকোট ও কর্ণওয়াল রাজ্যের গোলযোগকে তাঁহার পূর্ব ও পশ্চিম পঞ্জাবের সাধারণ হাদামা হইতে পৃথক করিয়া দেখার কি কারণ আছে, আমি বুঝিতে পারি না। পঞ্জাবের গোলযোগের জন্ত কোন একটি মাত্র সম্প্রদায়ের উপর সমস্ত দোষ চাপাইয়া দেওয়া যাইতে পারে না। এই সকল রাজ্যের শাসনকর্তারা সাম্প্রদায়িক গোলযোগ বন্ধ করিয়া মুসলমানদের স্থানান্তর গমন বন্ধ করিতে না পারায় যদি কলঙ্কভাজন হইয়া থাকেন, তবে পাকিস্তানসহ অত্যন্ত গবর্নেন্টেও সেই কলঙ্ক হইতে মুক্ত নহেন। পাকিস্তানও অমুসলমানদের স্থানান্তর গমন বন্ধ করিতে পারে নাই।

পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী মুসলমানদের নিহুল করিবার জন্ত এক ব্যাপক পরিকল্পনার কথা বলিয়া থাকেন, কিন্তু যে রাজ্যটি পাকিস্তানের সম্পূর্ণ প্রতাবাবীন এবং যাহা কিছুকাল পূর্বে পাকিস্তানে যোগ দিয়াছে—সেই শাওরালপুর রাজ্যে অমুসলমানদের উপর অগ্রুজিত অবর্ণনীয় অত্যাচারের কথা তিনি নিজের সুবিধার্থে চাপিয়া গিয়াছেন। এই রাজ্যে বহু অমুসলমান নারী, পুরুষ ও শিশু হতাহত হইয়াছে এবং তাহাদের ধনসম্পত্তি বিনষ্ট হইয়াছে। পাকিস্তান গবর্নেন্ট নিশ্চয়ই মনে করেন যে, পাকিস্তানের যাহা করিতে দোষ নাই, ভারতীয় ইউনিয়নের পক্ষে তাহা ঘোষণা করিবে।

পাকিস্তান ও উহার প্রতিবেশী দেশীয় রাজ্য হইতে অমুসলমানদের বর্ধরভাবে উৎসাদন করায় ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে উহার অনিষ্টকর প্রতিফলিত দেখা দেয়; কারণ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীরা পূর্বোক্ত রাজ্যে তাহাদের স্বধর্ম্মাধার যৌনভাবে ভাগ্যের নিকট নতি স্বীকার করিয়াছে, তাহারা আদৌ তাহা মানিয়া লয় নাই। এই বিকৃত যুক্তির উপর পাকিস্তান গবর্নেন্টের সমগ্র নীতি ও তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত, এই বিকৃত যুক্তিতর্কই পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী তাঁহার শ্রোতা ও বিশ্ববাসীকে বিচার করিতে বলিয়াছেন।

পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী নিম্নোক্ত বিবৃতিও দিয়াছেন—
“আমরা যখন এই সব দেশীয় রাজ্যের মুসলমানদের রক্ষার জন্ত ভারত গবর্নেন্টকে অনুরোধ করি তখন আমাদের বলা হয় যে, উহা দেশীয় রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার এবং ভারত গবর্নেন্ট উহাতে হস্তক্ষেপ করিতে অপারগ।”

যখনই উভয় গবর্নেন্টের মধ্যে এ জাতীয় প্রসঙ্গ উপস্থিত হইয়াছে তখনই দেশীয় রাজ্যের ব্যাপারে হস্তক্ষেপের সীমাবদ্ধ অধিকার স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। ১৯৪৭ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর শেষবার উভয় গবর্নেন্টের প্রতিনিধিদের বৈঠকে এই প্রশ্ন আনুষ্ঠানিকভাবে পেশ করা হয়। প্রকৃত-পক্ষে অতীতে লীগ নেতৃবৃন্দই ব্রিটেনের অধিরাজ ক্ষমতার অবসানে দেশীয় রাজ্যসমূহের আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ব্যাপারে সর্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা আছে বলিয়া সরবে ঘোষণা করিয়াছেন।

এখন পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রীর যুগে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ও উহাতে যোগদানকারী দেশীয় রাজ্যের শাসনতাত্ত্বিক সম্পর্ক বিকৃত করিয়া দেখান শোভা পায় না। তিনি যদি আন্তরিক-ভাবে অথবা সুরুত্বপূর্ণ ভাবে এ সব কথা বলিয়া থাকেন তাহা হইলে তিনি যেন নিজের খর প্রথমে গুছাইয়া পাকিস্তানে যোগদানকারী শাওরালপুর রাজ্যের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানকারী যে সব দেশীয় রাজ্যে অগ্রুজিত অত্যাচারের বিষয় তিনি উল্লেখ করিয়াছেন, শাওরালপুর এ ক্ষেত্রে তাহাদের চেয়ে কম দোষী নয়।

স্পষ্টতঃই দেখা যাইতেছে যে, সংবাদের বিকৃতি, ভুল সংবাদ প্রচার, গোপনীয়তা ও ঘটনার এক তরফা বিবরণ প্রদান পাকিস্তান গবর্নেন্টের পক্ষে একটি প্রচার-কৌশল হইয়া উঠিতেছে। গত মহাযুদ্ধের পূর্বে ও যুদ্ধ চালবার সময় ডাঃ গোয়েবলসের প্রচারকার্যের সহিত জগদ্বাসীর পরিচয় আছে। ডাঃ গোয়েবলস পরলোকগত হইলেও তাঁহার প্রচার-পদ্ধতির পুনর্জন্ম হইয়াছে। কিন্তু এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই যে, পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী সমস্ত ব্যাপার বিচারের ভার যে জগদ্বাসীর বিবেচনার উপর ছাড়িয়া দিয়াছেন, সেই জগদ্বাসীকে তিনি প্রতারণা করিতে পারিবেন না।

পূর্বসীমান্ত রক্ষার ব্যবস্থা

নববঙ্গ সমিতির সভাপতি ডাঃ এস কে গাঙ্গুলী ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বসীমান্ত রক্ষার ব্যবস্থা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মর্মে এক বিবৃতি দিয়াছেন :

“পঞ্জাবের হাদামা ও কাশ্মীরে হানা প্রদান হইতে আমরা এই শিক্ষাই লাভ করিয়াছি যে, আন্ত সমাজগুলি সম্পর্কে আমাদের অদৃঢ় কর্মপন্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতীয় জনসাধারণের নিরাপত্তা লইয়া আমরা এই ধরনের ছিনিমিনি খেলা চলিতে দিতে পারি না।” বিবৃতিটিতে আরও বলা হইয়াছে, “ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব সীমান্তে পশ্চিম বদই তাহার সীমান্ত-প্রদেশ। এই নূতন সীমান্তের রক্ষার জন্ত উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা অত্যাৱতক। অস্ত্রধার, উত্তর ও

পশ্চিম সীমান্তে আমাদের যে বিপদের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে, পূর্ব সীমান্তে আমাদের যে অপেক্ষাও ব্যাপক বিপদের সম্মুখীন হইতে হইবে। পশ্চিমবঙ্গের রক্ষাব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করিয়া তুলিবার ব্যাপারে এ যাবৎ কিছুই করা হয় নাই। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপনের মধুর বাণী যেন আমাদের প্রকৃত বিপদ সম্পর্কে উদাসীন না করিয়া তোলে। দুর্বলতার সুযোগে বিপদ আরও ঘনাইয়া আসে।”

এ সম্পর্কে নববঙ্গ সমিতির পাঁচ দফা কর্মনীতি বর্ণনা প্রসঙ্গে ডাঃ গাঙ্গুলী আরও বলিয়াছেন, “উপযুক্তসংখ্যক সশস্ত্র সৈন্য দিয়া ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বসীমান্ত রক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বাণিজ্য ও যোগাযোগ অক্ষর রাখিবার জন্ত সীমান্তে যাত্রা একটি পথ উন্মুক্ত রাখিয়া অজান্ত পথ অবিলম্বে বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। একটি বাঙালী সৈন্যবাহিনী গঠন করিয়া উহাতে লোক ভর্তি করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই সৈন্যবাহিনীর সহায়তার জন্ত একটি গৃহরক্ষী দল গঠন করিতে হইবে এবং ২১ বৎসর হইতে ৪০ বৎসর বয়স প্রত্যেক অস্থায়ী ব্যক্তিকে উহাতে বাধ্যতামূলকভাবে যোগদান করাইতে হইবে। তাহা ছাড়া পশ্চিমবঙ্গে ভারত-সরকারের নৌ ও বিমানবাহিনীর কয়েকটি স্থায়ী বাটী স্থাপন করিতে হইবে।”

এই দাবি কলিকাতার এক বিরাট জনসভাতেও ধ্বনিত হইয়াছে কিন্তু এখনও পর্যন্ত উহা কার্যে পরিণত করিবার কোন লক্ষণ দেখা যায় নাই।

ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষের মজীসভা তিন মাস যাবৎ বহাল রহিয়াছেন। পশ্চিম বাংলা এখনও ভারতের পূর্ব সীমান্ত প্রদেশ। এই তিন মাসের মধ্যে সীমান্ত রক্ষার ব্যবস্থা তো করাই হয় নাই, বরং বাহারা এই দাবি করিয়াছেন তাঁহা-দিগকে ‘ওয়ার-মংগার’ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। ভাবী বিপদের সংবাদ না রাখা এবং তাহার জন্ত প্রস্তুত না হওয়া যে কত বড় মারাত্মক ও লোকক্ষয়কর হইতে পারে, কলিকাতার প্রত্যক্ষ সংগ্রামে এবং পঞ্জাবে তাহা নিঃসংশয় প্রমাণিত হইয়াছে। পশ্চিম পঞ্জাবে আক্রমণের প্রস্তুতি কিভাবে চলিতেছিল তাহার সংবাদ রাখা হয় নাই বলিয়াই হিন্দু ও শিখদের বাস্তবতা না করিবার জন্ত উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল, তার পর কি ঘটনা ঘটে তাহা সর্বজনবিদিত।

পাকিস্তান অস্ত্র সংগ্রহ করিতেছে গত এক বৎসর যাবৎ। ভারত-সরকার সে সংবাদ রাখিয়াছিলেন এমন কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তান গবর্নেন্ট ব্রিটিশ আইন বাতিল করিয়া সবল দেহ প্রত্যেক মুসলমানের হাতে অস্ত্র দিয়াছেন। ভারত-সরকার এ বিষয়ে প্রস্তুত থাকিলে পশ্চিম পঞ্জাবের আক্রমণ আরম্ভ হওয়ার সম্ভাবনা বুঝিতে পারিতেন এবং তৎক্ষণাত হিন্দু ও শিখদের আত্মরক্ষার অস্ত্র দিলে এত লোকক্ষয় হইত না।

পূর্ববঙ্গেও এইরূপ কখনও ঘটবে কিনা তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। পাকিস্তান তাহার মাইনরিটি সমস্যা কিভাবে সমাধান

করিবে পঞ্জাবে ও সীমান্তে তাহার পরিচয় দিয়াছে। পশ্চিম-বঙ্গে কয়েক লক্ষ লোক যদি অস্ত্র চালনার দক্ষতা অর্জন করে এবং অস্ত্রের লাইসেন্স দানের রূপগতা বাতিল করিয়া উপযুক্ত লোকদের হাতে যদি পর্যাপ্ত পরিমাণ অস্ত্র দিয়া রাখা যায় তবে পূর্ববঙ্গের পাকিস্তানীরা হিন্দুদের উপর উপদ্রব করিবার পূর্বে চিন্তা করিতে বাধ্য হইবে। পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের স্বগৃহে স্বচ্ছন্দে বাস করিবার সুযোগ দানের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় পশ্চিমবঙ্গ কর্তৃক শক্তি সংগ্রহ। ডাঃ ঘোষ এই সহজ পথে পদাঙ্গণের লক্ষণ দেখানো তো বহু দূরের কথা, তাঁর সাধের পুলিশ-বাহিনীর সুপারিশকে বেদবাক্য জ্ঞান করিয়া অস্ত্রের লাইসেন্স দান বন্ধ করিয়া বসিয়া আছেন এবং বে-আইনী অস্ত্র আদায়ের জন্ত বর্গসিন্ধু কবুল করিয়া কতব্য সমাপন করিতেছেন।

অদূরদর্শী ও অযোগ্য নেতারা কংগ্রেসী চক্রান্তের দ্বারা গবর্নেন্ট দখল করিতে পারেন কিন্তু অস্ত্রের মত হুঁহাদিগকে অহুসরণের পরিণাম কি ভয়াবহ হইতে পারে দেশ কি আজও তাহা বুঝিবে না? নিরস্ত্র দেশ কখনও কোন সমস্তার সমাধান করিতে পারে না এই সহজ সত্য ডাঃ ঘোষের মস্তিষ্কে প্রবেশ করাইতে না পারিলে বাঙালীকে আরও ভয়াবহ লাঞ্ছনার ও রক্তপাতের সম্মুখীন হইতে হইবে।

বিপদের সময় এই শ্রেণীর কংগ্রেস নেতারা কোথায় থাকেন জনৈক পঞ্জাবেরক মহাত্মা গান্ধীকে তাহা লিখিয়া জানাইলে গান্ধীজী এক প্রার্থনা সভায় তাহার উল্লেখ করেন। পঞ্জাবেরক লিখিয়াছেন—

“জনসাধারণকে দাবার ঘূষে ফেলিয়া রাখিয়া পশ্চিম পঞ্জাব ও পাকিস্তানের অজান্ত বহু স্থানের বিশিষ্ট কংগ্রেস-নেতারা নিরাপদ স্থানে পলাইয়া আসিয়া সেখানে হইতে আতঙ্কিত না হইবার এবং সাম্প্রদায়িক মৈত্রী রক্ষার জন্ত জনসাধারণের উৎকণ্ঠে বড় বড় বুলি ও লড়া লড়া কতোরা ঝাড়িতেছেন। আশ্রয়প্রার্থীদের সঙ্গে থাকিয়া তাহাদের দুঃখ-হৃদয়শার অংশ গ্রহণ করা তো দূরের কথা এইসব কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ দাঙ্গা-হাঙ্গামা হইতে বহু দূরে পলাইয়া আসিয়া প্রাসাদোপম অট্টালিকায় নিশ্চিন্ত আরামে নির্ভয়ে দিনযাপন করিতেছেন। অথচ দাঙ্গাহুগত আশ্রয়প্রার্থীদের মাথা ভূজিবার স্থান নাই। ক্ষুরিযুক্তির শাও নাই, শীত নিবারণের উপযুক্ত বস্ত্র এমন কি বদলানোর মত ছুশানি বস্ত্র পর্যন্ত নাই।”

বাংলাদেশেও ঠিক ইহাই ঘটনা ঘটেছে। কলিকাতার প্রত্যক্ষ সংগ্রাম এবং নোয়াখালীর বীভৎসতার দিনে বাহারা নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন, আজ তাঁহারা ই বাংলা-সরকাররূপে বঙ্গদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের কর্ণধার। আমরা মনে করি জনসাধারণের অপরাধ ইহাদের চেয়েও গুরুতর। বার বার একই ব্যাপার ঘটিয়া ও ঘাহাদের চোখ ধোলে নাই, অকর্মণ্য “নেতা” এবং তাঁহার স্বার্থাঘেযী দলকেই ভোটের সময় ভোট দিয়া বাহারা ক্ষমতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করে, প্রাপ্তিকৃত তাহাদেরই করিতে হইবে।

শ্রমিক বিরোধের সমাধান

বোম্বাই গবর্নমেন্টের শ্রমমন্ত্রী শ্রীযুক্ত গুলজারীলাল বন্দ এক বেতার বক্তৃতায় শ্রমিকদের নিকট শ্রম সংক্রান্ত বিরোধ সম্বন্ধে আপোষকারী আবেদন জানাইয়া জাতীয় জীবনের এই সঙ্কটময় মুহূর্তে উৎপাদন বৃদ্ধিতে সাহায্য করিবার জন্ত শ্রমিকদের অনুরোধ করিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতার সারাংশ এইরূপ :—

(১) শ্রমিকদের নেতৃ-নির্বাচনে সদ্বিবেচনার পরিচয় দিতে হইবে। অতিরিক্ত দাবি উত্থাপন করিয়া যাহারা শ্রমিকদের সমর্থন লাভ করিতে চায় এবং শ্রমিক বিরোধ সম্পর্কে একটা মীমাংসায় আসা অপেক্ষা বিরোধকে জীয়াইয়া রাখিতে এবং গোলমাল পাকাইতে যাহারা ভালবাসে সেইসব নেতৃ-বৃন্দ হইতে শ্রমিকদের দূরে থাকিতে হইবে। (২) উপযুক্তসদস্য লইয়া শক্তিশালী ইউনিয়ন গঠন, সালিশীর দ্বারা শ্রমিক বিরোধ মিটান যতক্ষণ সম্ভবপর ততক্ষণ ধর্মঘট সর্বতোভাবে বর্জনের নীতিই শ্রমিকদের গ্রহণ করা উচিত। (৩) শ্রমিকদের অভাব-অভিযোগ দ্রুতকরণের এবং বিরোধ মীমাংসায় যে সকল ব্যবস্থা সরকারী আইনে আছে তাহার পূর্ণ সম্ভাবনার শ্রমিকদের করিতে হইবে। শ্রমিক বিরোধ সংক্রান্ত বিষয়ের মীমাংসার কোনরূপ দেরি বা অন্ত্রবিধা দেখা দিলে তৎপ্রতি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি শ্রমিকগণ আকর্ষণ করিবেন। (৪) অনিবার্য কারণ ব্যতীত শ্রমিকগণ কাজে যোগদানে বিরত থাকিবেন না। (৫) কাজের সময় মনোযোগ দিয়া কাজ করিবেন; (৬) মনুষ্য গতিতে কাজ করা অত্যন্ত অসম্ভব। শ্রমিকগণ যত বেশী সম্ভব উৎপাদনে সচেষ্ট হইবেন। (৭) প্রতিষ্ঠানের কল্যাণে যাহাতে উৎপাদন সম্পর্কে একটি যুক্ত কমিটি গঠন সম্ভব হয় শ্রমিকদের সে সম্বন্ধে তৎপর হইতে হইবে। এই কমিটি যাহাতে ক্রয়কাৰ্য্য হইতে পারে তজ্জন্ত শ্রমিকদের সচেষ্ট হইতে হইবে। (৮) শ্রমিকদের মনে রাখিতে হইবে যে, প্রতিষ্ঠানের কলকজা এবং অজ্ঞাত সম্পত্তির অপচয় ও ক্ষতিতে জাতিবৈদ্য় ক্ষতি এবং (৯) উৎপাদন বৃদ্ধির সম্ভাব্য উপায় সম্পর্কে শ্রমিকদের যদি কোন প্রস্তাব থাকে তাহা হইলে তাহারা ইউনিয়ন বা উৎপাদন কমিটির নিকট তাহা পেশ করিবেন।

পশ্চিম বাংলা গবর্নমেন্টও এক প্রেস নোটে জানাইতেছেন যে অবস্থান ধর্মঘটকারী এবং “সত্যপ্রিয়”গণ কর্তৃক কর্তব্য সম্পাদনে ইচ্ছুক শ্রমিক ও কর্মচারীদিগকে কারখানা বা আপিসে প্রবেশে বাধা দানের জন্ত কম কাজ হইতেছে এবং ইহাতে দেশের ক্ষতি হইতেছে। এই ধরনের বাধা দান বন্ধ করিবার জন্ত গবর্নমেন্ট অতঃপর কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন বলিয়া জানাইয়া দিয়াছেন।

ভারতবর্ষের বিশেষতঃ বাংলাদেশে শ্রমিক আন্দোলন এক অতি কদর্য্য অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এই প্রদেশে

আন্দোলনের নেতারা প্রায় সকলেই বাঙালী মধ্যবিত্ত পরি-
বারের সন্তান এবং ইহাদের দ্বারা যাহারা উপকৃত হইতেছে তাহারা প্রায় সকলেই অবাঙালী, বাংলার অর্থ শোষণ গির
বাংলাদেশে তাহাদের আর কোন স্বার্থ নাই। কলকারখানার
শ্রমিক হইতে শুরু করিয়া বিড়িওয়াল, চৈলাওয়াল, ফেরি-
ওয়াল, রিক্সাওয়াল, মুটে প্রভৃতি ইউনিয়নের গঠন প্রণালীর
প্রতি ভাঙাইলেই দেখা যাইবে ইউনিয়নের কর্মকর্তারা
বাঙালী এবং শ্রমিকেরা অবাঙালী, আসানসোলে পা দিয়াই
যাহারা ‘কম্বোয়ারিকা পানি’ বলিয়া বাংলাদেশকে কটুক্তি বর্ষণ
করিতে আরম্ভ করে, ইউনিয়নের দৌলতে মজুরি বৃদ্ধি করিয়া
লইয়া দেশে বেশী করিয়া টাকা পাঠায় এবং এ দেশে একটা
পয়সা খরচ করিতে চায় না। কেননা বাংলা ও বাঙালীর
সর্বনাশেও তাহাদের কিছুই আসে যায় না। ষ্টেশনে মালে
হাত দিয়াই এক টাকা, রিক্সা হু’ পা গেলে আট আনা, চৈলা
গাড়ীতে মাইলখানেক দূরে ঘোট পাঠাইলে তিন টাকা
প্রভৃতি ইহাদের দাবি, না দিলেই কটুক্তি। পিছনে ইউ-
নিয়ন অত্যাচারের সার্টিফিকেট লইয়া বসিয়া আছে, বাধা
দানের উপায় নাই। কাজ পারতপক্ষে করিবে না, করিলেও
যথাসম্ভব ফাঁকি দিবে, মজুরির বেলা যোল আনা, তার উপর
কথায় কথায় বোনাস দাবি। কল দাঁড়াইয়াছে এই যে মূলত
কেহ আর কলকারখানা ব্যবসা-বাণিজ্যে নামিতে চাহে না।

বাঙালী ব্যবসা করে সকলের শেষে, কমিউনিজম করে
সবার আগে। কমিউনিজম করিবার আগে ভাবিয়া দেখে
না চাপটা কাহার উপর পড়ে। শ্রমিকের বেপরোয়া মজুরি
বৃদ্ধিতে জিনিষপত্রের দাম চড়িতেছে, অবাঙালীর লাভ
হইতেছে কিন্তু মরিতেছে বাঁধা আয়ের গৃহস্থ-সাধারণ, কমিউ-
নিষ্টদেরই আত্মীয়স্বজন, স্ব সমাজের লোক। মজুরি বাড়িতে
বাড়িতে এমন এক কোঠার আসিয়া ঠেকিতেছে যে শ্রমিককে
আর পুরা সপ্তাহ কাজ না করিলেও চলে। কাজে উপস্থিত
হইয়া ফাঁকি তো নিত্যকার ব্যাপার। মালিকের কিছু বলিবার
উপায় নাই, অমনি ধর্মঘট এবং কলকজার সর্বনাশ। এই
অত্যাচারে একে একে কারখানা বন্ধ হইতেছে, বিদেশী মাল
আমদানী ছ ছ করিয়া বাড়িতেছে, দেশের শিল্প-বাণিজ্যের
সর্বনাশ হইতেছে। কমিউনিষ্টদের ইহা কাম্য হইতে পারে কিন্তু
দেশের সমালোচক স্বাধীনতা রক্ষার এত বড় পরিপন্থী আর কিছু
হইতে পারে না। স্বাধীনতা লাভের পর যে সময়ে দেশের
প্রত্যেকটি নাগরিকের উচিত ছিল সর্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া
উৎপাদন বৃদ্ধি সেই সময়ে উৎপাদন হ্রাসের চেষ্টা ‘সাবোটাজ’
ভিন্ন আর কিছু নহে।

স্বাধীনতা লাভের পর শ্রমিকদের আলাদা প্রতিষ্ঠানেরও
কোন প্রয়োজন আর নাই, তাহারা ইচ্ছা করিলেই কংগ্রেসে
যোগদান করিতে পারে। কংগ্রেস গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান, সর্ব-
সাধারণের উহাতে যোগদানের অধিকার আছে এবং কংগ্রেসের

অমনীতি, কৃষিনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি সবই নির্ধারণের অধিকার আছে সাধারণ সদস্যদের। কমিউনিষ্টদের পরিচালনায় দেশের বৃহত্তর স্বার্থ হইতে নিজেদের স্বার্থ আলাদা করিয়া ফেলিয়া অমিকেরা এখনও যে ভুল করিতেছে তাহা আর বেশী দিন চলিলে, তাহাদিগকে তার জন্ত ভবিষ্যতে গভীর অনুভূতি করিতে হইবে। যুদ্ধের সময় যখন কৃষক এবং অজ্ঞাত দরিদ্রেরা অনশনে ও বিনা চিকিৎসায় লাঞ্চে মরিয়াছে, অমিকদের জন্ত তখন বাধ্য ও ঔষধের দরাজ বন্দোবস্ত হইয়াছিল। কারণ সে দিন তাহাদের সাহায্য ইংরেজের একান্ত প্রয়োজন ছিল। স্বাধীনতা-সংগ্রামে লেশমাত্র সাহায্য কমিউনিষ্ট-পরিচালিত শ্রমিক সংঘেরা করে নাই, অথচ যুদ্ধের সময়, বিশেষতঃ বিদ্রোহের বিপক্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য চিরন্তন শত্রু হইয়া দেওয়ার ক্ষমতা ইহাদেরই হাতে আসিয়াছিল। দেশের স্বাধীনতার চেয়ে মজুরি এবং রেশন সেদিন ইহাদের নিকট বড় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল একথা সাধারণ দেশবাসী যেন কখনও না ভুলে। কৃষক ভুলিতে পারে না যে তাহাকে চাষ প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করিয়াই সম্ভাব্য শ্রমিকের গ্রাস জোপানো হইয়াছে এবং তার খেসারত ট্যাক্সের আকারে তারই বাড়ি চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সিভিল সাপ্লাইয়ের ড্রাইভার বর্মঘটে দেশবাসী যে কঠোর মনোভাব দেখাইয়াছে ভবিষ্যতে সর্বপ্রকার শ্রমিক বর্মঘটের চেষ্টায় সেরূপ ঘটবে; লক্ষণ ক্রমশঃ পরিষ্কার হইয়া আসিতেছে। বর্মঘটের বা উৎপাদন হ্রাসের দ্বারা দাবি আদায়ের চেষ্টায় কোন প্রয়োজন এখন আর নাই, কারণ গবর্নেন্টকে এখন জনমত মানিয়া চলিতে হইবে।

সোভিয়েট রাশিয়ায় উৎপাদন হ্রাস সাবোটাজ বলিয়া গণ্য হয়। বাংলাদেশেও এরূপ আইন প্রণীত হওয়া আবশ্যিক যাহাতে শ্রমিকদের অজ্ঞতার সুযোগ লইয়া কোন রাজনৈতিক দল উৎপাদন হ্রাসের দ্বারা গবর্নেন্টকে বিব্রত করিবার জন্ত দেশের অনিষ্ট সাধন করিতে না পারে। রাশিয়ায় সাবোটাজের জন্ত যুদ্ধাদেশের বিধি আছে, আমাদের দেশে অন্ততঃ দীপান্তরের বিধান থাকা আবশ্যিক।

পশ্চিম-বঙ্গ মুসলমান সম্মেলন

কলিকাতার ডাঃ আর আহমদের সভাপতিত্বে পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের এক প্রকাণ্ড সম্মেলনে স্পষ্ট ভাষায় বলা হইয়াছে যে সঙ্গীর্ণ ছই জাতিত্ব পরিচয় করিয়া মুসলমানদিগকে এখন কংগ্রেস-যোগ দিতে হইবে এবং ভারতের সংখ্যালঘু মুসলমানদের স্বার্থ কোন সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান বা রাজনীতির দ্বারা রক্ষিত হইতে পারে না। ঐ দিন মিঃ সুরাবর্দীও একটি গোপন বৈঠক আহ্বান করিয়া উহাতে মুসলমানদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। উহাতে বাঙালী মুসলমানেরা উপস্থিত ছিলেন না। সুরাবর্দী সম্মেলনে ছই জাতিত্ব সম্বন্ধে কোন মন্তব্য প্রকাশ না করিয়া উহা এড়াইয়া যাওয়া

হয় এবং লীগকে আরও শক্তিশালী করিয়া নতুন ভাবে গড়িয়া তুলিবার দিকেই যৌক দেখা যায়।

মুসলিম লীগ পরিত্যাগের জন্য মুসলমানদের আহ্বান জানাইয়া ডাক্তার আর আহমদ যে অভিভাষণ প্রদান করেন তাহার সারমর্ম এইরূপ :

“ছই জাতিত্বের ভিত্তিতে ভারত বিভক্ত হইয়াছে। লীগ-নেতারা মুসলমানদের বুঝাইয়াছিলেন যে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হইলেই তাহাদের পরমার্থ লাভ হইবে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে আমরা কি দেখিতেছি? পাকিস্তানের সংগঠনে পর্যন্ত ব্রিটিশ ও মার্কিন বিশেষজ্ঞদের শরণাপন্ন হইতে হইয়াছে। এই সকল বিদেশী ব্যবসায়ীরা আর যাহাই করুক না কেন, জনসাধারণের কোন উপকার করিবে না—এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

“সাম্প্রদায়িক লীগওয়ালারা বলিতেছেন যে তাহারা ঐ প্রতিষ্ঠানের মারফতে ভারতের মুসলমানদের স্বার্থরক্ষা করিবেন। আবার এ বিষয়ে নাকি পাকিস্তান-সরকারের সাহায্যও পাওয়া যাইবে।

“এদিকে চৌধুরী খালেদুজ্জামান ভারত রাষ্ট্রের প্রতি একান্ত আনুগত্য জ্ঞাপন করিয়াছেন। তাহার উপর একটি পৃথকরাষ্ট্র হইতে লীগনায়করা ভারতীয় মুসলমানদের চালিত করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। ভারতরাষ্ট্র ও মুসলিম লীগ এই দুইটির প্রতি একযোগে আনুগত্য রক্ষা করিতে গিয়া মুসলমানগণ নিজেদের বিরুদ্ধে সন্দেহ সৃষ্টি করিতেছেন।

‘এই সুযোগ লইয়া সাম্প্রদায়িকতাবাদী হিন্দুরা মুসলমানদের পাকিস্তানের পক্ষ বাহিনী বলিয়া প্রমাণ দাখিলের সুবিধা পাইতেছে। মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের সুবিধা করিয়া দিতেছে। ইহাতে হিন্দু-মুসলমান উভয়ের ক্ষতি হইতেছে। কিন্তু মুসলমানদের ক্ষতি হইতেছে বেশী।

“এই অবস্থায় আমাদের অধিকার রক্ষার উপায় কি? উপায় অতি সহজ। দেশের গণতান্ত্রিক শক্তিশালীকরণ আরও বলশালী করিয়া, তুলিলেই আমাদের অধিকার সুরক্ষিত হইবে। এই জন্ত আমরা মুসলমানদের কংগ্রেসে যোগ দিতে আহ্বান জানাইয়াছি। আমরা জানি যে, কংগ্রেসেও কিছু প্রগতি-বিরোধী আছে। কিন্তু কংগ্রেসে প্রগতিপন্থীরাই শক্তিশালী, এই কথা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবে না। পণ্ডিত নেহরুর নেতৃত্বেই এই কথার প্রমাণ।

“কলিকাতার সাম্প্রতিক ঘটনাবলীতেই প্রমাণ হইয়াছে যে, সম্মিলিত গণতান্ত্রিক শক্তি দ্বারাই সকল সম্প্রদায়ের বিপরীত-পন্থীদের পরাজিত করিয়া মুসলমানদের এবং অপর সকলের স্বার্থরক্ষা করা যায়।

“স্বাধীনতা দিবসের এক্য ও মৈত্রীর পর দৈনন্দিন যখন কলিকাতার মুসলমানদের সঙ্কট উপস্থিত হইল তখন তাহাদের মুসলিম লীগ বা পাকিস্তান রক্ষা করিতে আসে নাই। মহাত্মা

গাছীর ডাকে শান্তিকামী হিন্দু-মুসলমান তাহাদের রক্ষা করিতে অগ্রসর হইয়াছিল—সেই চেষ্টার শচীন মিত্র, শ্বশীশ ব্যানার্জী শহীদ হইয়াছেন।

“আমরা স্বাধীন ভারতের নাগরিক হিসাবে পূর্ণ অধিকার লইয়া বাঁচিতে চাই। আমরা উপযুক্ত বেতন, কার্য, ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার অধিকারী হইয়া মাহুষের মত বাঁচিবার দাবি করি। এই দাবি হিন্দু-মুসলমান সকলের। এই দাবি আদায় করিতে হইলে দেশের সকল গণতান্ত্রিক শক্তির সহিত হাতে হাত মিলাইয়া জমিদার, সামন্তরাজ, পুঁজিপতি, হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িকতাবাদী প্রভৃতি বিপরীতপন্থীদের সহিত সংগ্রাম করিতে হইবে।

“আমরা চিরদিন পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার বিরোধী হইলেও এখন উত্তর রাষ্ট্রের মধ্যে শান্তির পক্ষপাতী। কাম্বীর ও দেশীয়রাজ্য সম্পর্কে ভারত-সরকারের নীতি ও কার্যাবলী আমরা সর্বাঙ্গ-করণে সমর্থন করি। পাকিস্থানের প্রগতিপন্থীদের আমরা অস্তিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

“আমরা বিশ্বাস করি যে, ভারত ও পাকিস্থানে প্রগতি-বিরোধী ও সাম্রাজ্যবাদীরা পরাস্ত হইলে পর গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে আবার এই দুই রাষ্ট্র যুক্ত হইবে। এই গণতন্ত্রসম্মত সমাজতান্ত্রিক অর্থও ভারতই আমাদের লক্ষ্য ও আদর্শ। জয় হিন্দ!”

সৈয়দ নোশের আলি বলেন যে মুসলমানদিগকে এক কথা আজ স্বীকার করিতেই হইবে যে মুসলিম লীগের অনুসরণ করিয়া তাহারা অপরাধ করিয়াছে। লীগ শুধু মন্ত কতাই করে নাই, তাহাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে। লীগের পতাকা ভলে তাহারা সুখশান্তি সমৃদ্ধ আবাসভূমি লাভ করিবে—এই অলৌক স্বপ্নের পিছনে যাহারা ছুটিয়াছিল আজ মুক্তিভেদে তাহারা মহা ভুল করিয়াছে। কাজেই বিভক্ত ভারত যাহাতে পুনরায় এক্যবদ্ধ হইতে পারে তদ্বদন্তে সমাজ-তান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের জন্ত তাহাদিগকে দেশের প্রগতিশীল দল-গুলিতে যোগ দিতে হইবে।

সম্মেলনে কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। একটিতে বলা হয় যে, মুসলিম লীগের পাকিস্থানের দাবি মিথ্যা দ্বিজাতি তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত; দেশ বিভাগের জন্ত এবং দেশ বিভাগের ফলে যে বিপর্যয়ের সৃষ্টি হইয়াছে তজ্জন্ত ইহাই দায়ী। মুসলমান-দিগকে দ্বিজাতিতত্ত্ব তুলিয়া গিয়া মুসলিম লীগের সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া তাহাদের নিজস্ব নিরাপত্তার জন্ত এবং তাহাদেরও সমগ্র দেশের উন্নতি বিধানের জন্ত কংগ্রেসে যোগ দিব্যর আহ্বান জানানো হয়। সাম্প্রদায়িকতা দেশের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতির কারণ হইয়াছে। এই অবস্থায় যে কোন সাম্প্র-দায়িক প্রতিষ্ঠান গড়িলে তাহা আত্মহত্যার সামিল হইবে। অতএব প্রগতি বিরোধী শক্তিকে দমন করিয়া গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল শক্তিকে সম্মবর করিবার জন্ত মুসলমানদিগকে

কংগ্রেসেই যোগ দিতে হইবে। আর একটি প্রস্তাবে বলা হয় যে মিঃ সুরাবর্দী তাহার কার্যের দ্বারা মুসলমান-সমাজের ধ্বংস সাধন করিয়াছেন। পাকিস্থানের প্রতি তিনি আত্মগত্য স্বীকার করিয়াছেন। কাজেই ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের মুসলমানদের সম্মেলন আহ্বান করিবার কোন অধিকার তাহার নাই। মুসলমানদিগকে মোলানা আছাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিতেও বলা হয়।

মিঃ সুরাবর্দী তাহার পৃথক বৈঠকের বক্তৃতায় শুধু যে আপল সমস্তা এড়াইয়া যান তাহা নহে, সাম্প্রদায়িক দাবিতে সেনাবাহিনী, পুলিশ, সরকারী চাকুরি, এমন কি মন্ত্রীমণ্ডলে লীগ মুসলমান লওয়ার দাবিও তিনি তুলিয়াছেন। ট্রেন আক্রমণ, নরহত্যা, নারীহরণ, নারীবর্ষণ, বলপূর্বক ধর্মাস্ত্রকরণ প্রভৃতি যে সব কার্য পাকিস্থানে অবাধে চলিতেছে সেগুলি চাপা দিবার জন্ত তিনি এমন ভাব দেখান যেন উভয় ভোমিনিয়নেই এই সব ব্যাপার চলিতেছে। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র সম্বন্ধে ইহা যে কত দূর মিথ্যা তাহা মিঃ সুরাবর্দী খুব ভাল করিয়াই জানেন।

কলিকাতার সব কল্পখানি লীগ পত্রিকা মিঃ সুরাবর্দীর সম্মেলনকে সমর্থন করিয়া ডাঃ আহমদ ও তাহার সহকর্মীদের প্রতি বক্তোক্তি করেন। লীগ পত্রিকাগুলি দাবি করিয়াছেন যে বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদী বা কংগ্রেসী মুসলমান বলিতে অতি সামান্য কয়েকজন মাত্র আছেন তাহারা মুসলমানদের প্রতিনিধি নহেন, লীগওয়াল মুসলমানেরাই মুসলিম সমাজের প্রকৃত প্রতিনিধি। অদূর ভবিষ্যতে পশ্চিমবঙ্গের ব্যবস্থা-পরিষদের কোন মুসলমান আসন শূন্য না হইলে বাঙালী মুসলমানেরা সত্যই লীগ অথবা কংগ্রেস কোনটি চাহেন তাহার যথার্থ যাচাই করা যাইবে না। বাঙালী মুসলমানদের ইহাই হইবে চরম পরীক্ষা। ছুই-জাতিতত্ত্বে বিশ্বাসী মুসল-মানের স্থান ভারতবর্ষে হইবে না ইহা এতদিনে পরিষ্কার ভাবেই তাহাদিগকে উপলব্ধি করিবার সুযোগ দেওয়া হইয়াছে। চরম পরীক্ষার দিন আর খুব বেশী দূরে নয়। কথায় ও কাজে, মনে ও মুখে গরমিলের অবসান হইয়াছে ভারতীয় মুসলমানদিগকে এবার ইহা সপ্রমাণ করিতে হইবে। যুক্ত প্রদেশের জনরক্ষা আদেশ সংশোধনী বিলের বিতর্কে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ সরকার-বিরোধী লীগ সদস্যদিগকে বলেন, “শান্তিরক্ষার বাতিরে আপনারা সরকার এবং সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের উপর দোষ চাপাইবার পুরাতন নীতি পরিহার করুন এবং মুসলিম লীগ ভাঙিয়া দিন। কারণ সমস্ত সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার মূল হইতেছে মুসলিম লীগ। এই প্রতিষ্ঠানটিই দেশে বিভেদ ও ঘৃণার বীজ বপন করিয়াছে। আমি চাই মুসলিম লীগ ভাঙিয়া দেওয়া হউক। যদি একটি ধর্ম নিরপেক্ষ গণ-রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিতে হয় তবে সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব সহ করা অসম্ভব।

যে সব লীগপহী পাকিস্থানে যাইতে চায় তাহার। অনায়াসেই যাইতে পারে।”

বরিশালে দুর্গাপ্রতিমা নিরঞ্জন বাধা

সংখ্যালঘুদের ধর্মকর্মের অধিকার পূর্ববঙ্গে কি ভাবে ব্যাহত হইতেছে তাহার কিছু কিছু নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে। ঢাকায় জম্মাঠমীর মিছিল শেষ পর্যন্ত বর্জন করিতে হইয়াছিল। বরিশালে দুর্গাপ্রতিমা নিরঞ্জন শোভাযাত্রাও বাতিল করিতে হইয়াছে। এ বিষয়ে বাধারগল্প জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সংখ্যালঘুদের প্রাথমিক অধিকার কি ভাবে সেখানে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে বিবৃতিটি পাঠ করিলেই তাহা বুঝা যাইবে :

পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেন্টের প্রধানমন্ত্রীগণ এবং প্রাদেশিক মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট মৌলানা আকাম খাঁ অনুমিত ও সুস্পষ্টভাবে এই ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, ঈদ ও পূজার শোভাযাত্রা সম্পর্কে পূর্ব প্রধাই বলবৎ থাকিবে।

পূর্ববঙ্গের মন্ত্রী মিঃ আফজল খান তাঁহার শান্তি মিশন সম্পর্কে বরিশাল আসিয়াছিলেন, তখন তিনিও এই বিষয়ের উপর জোর দেন।

এমন কি ১৯২৮ সালে মিঃ ডোনোভান যখন ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন সেই সময় শোভাযাত্রার অধিকার সম্পর্কে এই বৎসরের ৭ই জুলাই হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টানদের মধ্যে এক চুক্তি হয়।

- বিভিন্ন সভার শোভাযাত্রা সম্পর্কে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে আলোচনা হয়। মিঃ আফজল ইহার একটিকে ঘোষণা করিয়াছিলেন। প্রস্তাব উঠিয়াছিল যে, চক্‌বাজার দিয়া (ইহার পাশে একটি মসজিদ আছে) শোভাযাত্রা যাইতে পারে কিনা। হিন্দুরা তাঁহাদের চিরাচরিত অধিকারের দাবি করিলে মুসলিম নেতারা তাহাতে আপত্তি করেন। ফলে কর্তৃপক্ষ চক্‌বাজার দিয়া শোভাযাত্রা বাহির হইতে দেন না।

এই চক্‌বাজার দিয়া জম্মাঠমীর শোভাযাত্রা বাহির করিতে দেওয়া হয় নাই, গান্ধী-জয়ন্তী সপ্তাহেও শোভাযাত্রা বাহির করিতে দেওয়া হয় নাই। তার পর আসিল দুর্গাপূজার নিরঞ্জন শোভাযাত্রা।

বরিশাল শান্ত ছিল। কোন হাঙ্গামার আশঙ্কা ছিল না। হিন্দুরা স্বভাবতঃই ভাবিয়াছিল যে, চক্‌বাজার দিয়া শোভাযাত্রা বাহির হইবার কোন আপত্তির কারণ থাকিতে পারে না। যখন এই অধিকার অস্বীকার করা হয়, তখনই শোভাযাত্রা বাহির করিবার প্রস্তাব বর্জন করা হয়। প্রতিমাসমূহ নিকটবর্তী পুহর, ষাল অথবা নদীতে বিসর্জন দেওয়া হয়।

হাসপাতালের অবস্থা

কলিকাতা শহরের বড় বড় হাসপাতালগুলিতে প্রবেশ দরিদ্র এবং মধ্যবিত্ত রোগীদের পক্ষে এক প্রকার নিষিদ্ধ হইয়া উঠিতেছে। হাসপাতালের অনাচারের প্রতিকারকল্পে অনেক দিন আগেই আন্দোলন আরম্ভ হওয়া উচিত ছিল কিন্তু সংবাদপত্র এবং নেতৃবৃন্দ সকলেই এ বিষয়ে এখনও নীরব রহিয়াছেন। স্বপ্নের বিষয়, ‘সুগান্তর’ পত্রিকা এই অত্যা-বক্তব্য সমস্তটির প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। মেডিকেল কলেজ, মারোয়াড়ী হাসপাতাল, হাওড়া হাসপাতাল প্রভৃতির কার্যকলাপ সম্বন্ধে কিছু কিছু অভিযোগ উহাতে সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। ২০শে কার্তিকের ‘সুগান্তরে’ যে মন্তব্য প্রকাশ হইয়াছে তাহার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করা যাইতেছে। হাসপাতালগুলির অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইয়াছে উহা হইতে তাহা কতকটা জদয়ঙ্গম করা যাইবে। মনে রাখিতে হইবে যে ১৫ই আগস্টের পর হাসপাতালগুলির বিধি-ব্যবহার কোন পরিবর্তন হইয়া নাই, ডাক্তার নাস বাঁড়ুদার প্রভৃতির মনোবৃত্তিও ঠিক একই রহিয়াছে।—

সহায়সহলহীন দীন-দরিদ্র রোগীর পক্ষে অভ্যাগতবাসী রোগীরূপে হাসপাতালে প্রবেশই হুঃসাধ্য—সাধারণতঃ বিশেষ বিশেষ ওয়ার্ডের ভারপ্রাপ্ত ডাক্তার বাঁহারা থাকেন তাঁহাদিগকে আগে বাড়ীতে ‘কল’ দিয়া, তাঁহাদের পদ ও পদবী অল্পযাত্রী দক্ষিণা জোগাইলে, তবেই তাঁহাদের আদেশে হাসপাতালে সিটের ব্যবস্থা হয়, নতুবা সিট থাকুক আর না থাকুক, ঠাই নাই বলিয়া বিদায় দেওয়াই হইল প্রচলিত রীতি। এ রীতি আগেও ছিল, এখনও আছে, নূতন রাজনীতিক পরিবর্তনের কলে এ মুহূর্ত্তে কোন পরিবর্তন হয় নাই। এই বাধা অতিক্রম করিয়া বাঁহারা কোনক্রমে হাসপাতালে মাথা গলাইতে পারেন, তাঁহারাও যে যথেষ্ট স্মৃতিকিংশা ও সদ্যবহার পান, তাহারও কোন উল্লেখযোগ্য নজীর নাই। চিকিৎসক, নাস হইতে সুর করিয়া বাঁড়ু, মেথর পর্যন্ত সকলেরই মনোযোগ দক্ষিণাদানে সমর্থ কেবিনবাসী রোগীদের উপর নিবদ্ধ—পক্ষান্তরে ওয়ার্ডে অবস্থিত অবৈতনিক রোগীদের সম্পর্কে সকলেই উদাসীন, উপেক্ষাপরায়ণ, উদ্ধত। তাঁহাদের জন্ত অভিপ্রেত ঔষধ অনেক সময়ই মেলে না, ইঞ্জেকশন, অস্ত্রোপচার ইত্যাদি ব্যাপারে যথোচিত মনোযোগ দেওয়া হয় না, তাঁহাদের কষ্টও অসুবিধা লাঘবের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয় না, সঙ্গত দাবি-দাওয়ার কর্ণপাত করা হয় না, ইত্যাদি ইত্যাদি যত অভিযোগ প্রতিনিষ্পত্ত পাওয়া যায়, তাহার খুব কম অংশই জনগণ জানিতে পারেন।

হাসপাতাল হইল আরোগ্য-শালা—কর, আত,

অতশক্তি নরনারী সেখানে যায় রোগযুক্ত হইতে। ষাঁহাদের হাতে তাঁহারা গিয়া পড়েন, তাঁহারা যদি মানব-করণাবোধবিবর্জিত হন, যদি হন বেভনভুক চাকুরিয়া মাত্র, যথারীতি হাক্কিরা বজায় রাখা, যেন তেন প্রকারে ডিউটি হাসিল করা এবং যা পান তাহা পকেটে পোরাই যদি হয় তাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য, তাহা হইলে তাঁহাদের দ্বারা হাসপাতালের কাজ চলিবে না, চলিতে পারে না। তাঁহাদের জ্ঞত বিধিসম্মত প্রাসাঙ্গিকদের ব্যবস্থা অবজ্ঞা করিতে হইবে, কিন্তু তাঁহাদিগকেও দায়িত্বশীল, কতব্য-নিষ্ঠ সেবক মনোভাবাপন্ন হইতে হইবে। বিপন্ন, গীড়িত মানুষকে বিপদযুক্ত করিবার জ্ঞত যে বিজ্ঞানের উদ্ভব সেই বিজ্ঞানের প্রাত্যহিক প্রয়োগে ষাঁহারা নিয়োজিত তাঁহারা যদি নিছক জীবিকাধারী মনোভাবাপন্ন হইয়া পড়েন, তাহা হইলে তাহা অপেক্ষা পরিভাপের বিষয় আর কি আছে? এতদিন এই সব অনাচারের দোষ লীগের ঘাড়ে চাপান হইয়াছে। কিন্তু এখনও উহা চলিতেছে কেন? ত্রিযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরী অর্থ, স্বাস্থ্য ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন এই তিনটি বড় বড় বিভাগের পরিচালন ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন এবং মেডিকেল কলেজ ও অস্ত্রাচ হাসপাতালে নিজের প্রিয়পাত্রদের উচ্চতম পদে অধিষ্ঠিত করিয়াছেন। নিজের দেশের সময় নাই বলিয়াই হয়ত তিনি নিজের লোক বসাইয়াছেন কিন্তু তিন মাসের পরেও ইঁহারা একটি হাসপাতালেরও সামান্য উন্নতি মাত্র দেখাইতে পারিতেছেন না কেন? মেডিকেল কলেজে আর একটি নতুন জিনিষ অনেক লক্ষ্য করিতেছেন। মস্ত্রীদের প্রিয়পাত্র এবং ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্যদের লইয়া নতুন আর একটা বিশেষ শ্রেণী গড়িয়া উঠিতেছে। ইঁহাদের এবং ইঁহাদের প্রিয়পাত্রদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা ও বিশেষ মনোযোগ লাভ সহজেই মিলিতেছে।

বাংলার খাদ্য-সমস্যা

সংবাদপত্রে প্রকাশ যে বাংলা-সরকার খাদ্যসমস্যার সমাধান করিবার জন্য চাষের জমি বিস্তৃতির চেষ্টা করিতেছেন। পশ্চিমবঙ্গ আজ এক সঙ্কটময় অবস্থায় সম্মুখীন হইয়াছে। ব্রিটিশ ও সম্প্রতি লীগ-শাসনের ফলে অল্পা অল্পা শস্যভ্রামল্য বঙ্গদেশে খাদ্যশস্যেরও ঘাটতি হইয়াছিল; এবং ব্রহ্মদেশে ব্রিটিশবাহিনীর পরাজয়ের ফলে এই ঘাটতি গুরুতর আকার ধারণ করে। সেই অবধি আমরা গুরুতর অন্নসমস্যার মধ্য দিয়া চলিয়াছি।

সম্প্রতি র‍্যাডক্লিফ সাহেবের অদ্ভুত রোয়েদাদের ফলে অত্রিক উত্তর জেলাগুলি পূর্ব-পাকিস্তানভুক্ত হইয়াছে এবং যে সকল অঞ্চল লইয়া পশ্চিমবঙ্গ গঠিত হইয়াছে তাহা অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক।

গত পাঁচবৎসর ধরিয়া চাউল ও অন্যান্য খাদ্যশস্যের মূল্য চতুর্ভুজের অধিক বাড়িয়া গিয়াছে। সুতরাং যে জমি পূর্বে

চাষ হইত না, তাহাতে ফসল উৎপন্ন করিয়া লাভবান হইবার ইচ্ছা কৃষকগণের পক্ষে স্বাভাবিক। এই কারণে চাষের সীমা বিস্তৃত হইয়াছে; সুতরাং এখন যে সকল চাষের জমি অনাবাদী হইয়া আছে তাহার আবাদ না হওয়ার কারণ বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া আইন বা অর্ডিনাল দ্বারা সেই মত জমিতে হস্তক্ষেপ করা কতব্য।

ব্রিটিশ শাসক সম্প্রদায়ের মধ্যে ষাঁহারা এই দেশের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া ভারতবর্ষের অর্থনীতির বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহারা ব্রিটিশ শাসনের কলঙ্কহীনতার কৈফিয়ৎ দিবার উদ্দেশ্যে ভারতীয় কৃষকের বুদ্ধিহীনতা ও উদ্যমের অভাব বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ভারতীয় অর্থনীতিকারগণ উত্তরাধিকার স্বত্ব এই মনোবৃত্তি লাভ করিয়াছেন। আমাদের মনে হয় সাধারণ বাঙালী কৃষকের তথাকথিত উদ্যমহীনতার উপর ভিত্তি করিয়াই বর্তমান বাংলা-সরকার এই অকথিত ভূমি গ্রহণ অর্ডিনাল লিপিবদ্ধ করিতে মনস্থ করিয়াছেন।

এই ব্যবস্থাকে চলতি ইংরেজী ভাষায় “ঘোড়ার সামনে গাড়ী জুড়িয়া দেওয়া”—অভিহিত করা চলে। পশ্চিমবঙ্গের যে সকল অংশে ভূ-ভাগ অসমতল, অল্পবয়স্ক ও প্রস্তর কঙ্করময় তাহা আবাদের চেষ্টা করিবার পূর্বে যথোপযুক্ত সেচের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। যে সকল উদ্যোগী পুরুষের চেষ্টায় এই সকল অঞ্চলে কৃষির প্রবর্তন হইয়াছিল তাঁহারা এই সত্য মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের সাধ্য ও সামর্থ্য অহুসারে সর্বত্রই ক্ষেত্রে সেচনের জন্য জলের ব্যবস্থা করিয়া কৃষির সূচনা করিয়াছিলেন।

অন্নরূপে রাখিতে হইবে যে সেই সময় রেলযোগে দক্ষিণ বা পশ্চিম ভারত হইতে বা প্রিমারযোগে বর্ম্মা বা অন্য দূরদেশ হইতে খাদ্যশস্য আমদানী করিবার উপায় ছিল না এবং সময় মত পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত না হইলে যখন গ্রামের ফসল শুকাইয়া যাইত তখন রাজার ঘাশাখ্য চেষ্টা সত্ত্বেও সহস্র সহস্র লোক প্রাণত্যাগ করিত। এই ভয়াবহ হুঁত্বের চিত্র আনন্দমঠের প্রথম অধ্যায়ে উদ্ঘাটিত হইয়াছে।

সেচনের বাঁধ ও পুষ্করিণী

কৃষির সকলতার জন্য বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। বিহার, যুক্ত-প্রদেশ ও পঞ্জাবে কূপ হইতে জল লইয়া ভূমি সেচন করা হয়। কিন্তু বাংলাদেশের যে অংশে সেচনের আবশ্যকতা আছে সেখানে বহু শত বৎসর হইতেই বাঁধ ও পুষ্করিণীর দ্বারা সেচনের প্রথা প্রচলিত আছে। সেচনের জন্য কূপ এই অঞ্চলের উপযোগী নয়। প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্বে গুরুসদয় মত মহাশয় যখন বাঁকুড়া জেলার কলেট্টর ছিলেন তখন তিনি এই সকল সমস্যা পুষ্করিণীপুষ্করিণীপে আলোচনা করিয়া গবর্নেন্ট ও সাধারণের গোচরীভূত করিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় ও তৎকালীন সমবায় সমিতির যেক্ট্রার বামিনীমোহন মিত্র মহাশয়ের সহায়তায় সমবায়

পদ্ধতি অনুসারে এই সকল মজা ও নষ্ট বাঁধ পুঙ্খের পঙ্কো-
দ্ধারের চেষ্টা করা হয়। কিছু কাজও হইয়াছিল কিন্তু মিত্র
মহাশয়ের পরবর্তী যেক্ট্রায়গণের অকর্মণ্যতা ও ঔদাসীন্যের
ফলে এই চেষ্টা প্রসারলাভ করে নাই। যে সকল সমিতি
পঠিত হইয়াছিল তাহাও কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানের অভাবে
কালক্রমে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইহার প্রায় পনের বৎসর পরে
সরকারী মহলে আলোচনা হয় যে, সমবায় প্রথা এই ক্ষেত্রে
ফলপ্রসূ হইবে না; কারণ প্রতি গ্রামেই দলাদলি আছে এবং
যাহাদের স্বার্থ আছে তাহারা সকলে স্ব-ইচ্ছায় সমিতিতে
যোগদান না করিলে অচল অবস্থার উদ্ভব হয়। পরে বঙ্গদেশে
প্রচলিত সমবায় আইন সংশোধন করার সময় ইহার প্রতি-
কারের ব্যবস্থা হইয়াছে।

যাহা হউক, উল্লিখিত আলোচনার ফলে ১৯৩৯ সালে
সেচনের পুঙ্খের পঙ্কোদ্ধারকল্পে একটি আইন লিপিবদ্ধ হয়।
১৯৪০-৪১ সালে বীরভূম জেলায় স্তরুতর ছুড়িফের সময়
তদানীন্তন কালেক্টর শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী সরকার এই আইন
জারী করিয়া প্রায় পাঁচশত বাঁধ ও পুঙ্খের পঙ্কোদ্ধার করেন
এবং পূর্ব-পূর্ব ছুড়িফের সময় সরকারী ও বেসরকারী সড়কের
পার্শ্বের অনাবজ্ঞ মাটি কাটিয়া সাধারণের টাকার যে অনর্থক
অপব্যয় হইত তাহা নিবারণ করেন।

তখন বাংলাদেশে লীগ মজ্জীমগুলী অপ্রতিহতভাবে কর্তৃত্ব
করিতেছিল। পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু-প্রধান অঞ্চলের প্রতি
ঔহাদের কোনও দরদ ছিল না, সুতরাং এই আইন অনুসারে
বিশেষ কোনও কাজ হয় নাই। ১৯৪৫ সালে মজ্জীমগুলী
অপসারণের পর যখন বাংলার গবর্নর স্বহস্তে শাসনভার গ্রহণ
করিয়াছিলেন এবং পশ্চিমবঙ্গে পুনরায় ছুড়িফের আশঙ্কা দেখা
দিয়াছিল তখন এই আইন পরিচালনা করিবার জন্ত এক জন
পৃথক কর্মচারী নিযুক্ত করা হইয়াছিল, কিন্তু নানা কারণে
আশাহুত্বপূর্ণ কাজ হয় নাই এবং এখনও হইতেছে না। সংবাদ-
পত্রের রিপোর্টে প্রকাশ, দেশের উন্নতিকর নানাবিধ পরি-
কল্পনা বোম্ব-মজ্জীমগুলীর বিবেচনাধীন আছে। তাহার
কার্যক্ষেত্রে শীঘ্রই অগ্রসর হইবেন এইরূপ আশা দেওয়া
হইয়াছে।

বাঁধ-পুঙ্খের পঙ্কোদ্ধার ও মেরামতের জন্ত কোনো পরি-
কল্পনা, আলোচনা বা পরীক্ষার প্রয়োজন নাই। জেলায় জেলায়
এই কার্যের জন্ত যথেষ্ট কর্মচারী নিযুক্ত আছে এবং পূর্ববঙ্গ
হইতে আতঙ্কগ্রস্ত বহু কর্মচারীর আগমনে ইহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি
হইয়াছে। কিন্তু মজ্জীমগুলীর নির্দেশ এবং কলিকাতা হইতে
পরিচালনার অভাবে এই কার্যে নানাপ্রকার অব্যবস্থার উদ্ভব
হইয়াছে। সুতরাং বোম্ব-মজ্জীমগুলী যদি বাংলায় প্রকৃতই
খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করার ব্যাপারে কৃতসম্মত হন
তাহা হইলে এই বিষয়ে কালক্ষেপ করা অসুচিত। কারণ
হেমন্তের প্রারম্ভ হইতে মজা ও স্তরুট পুঙ্খগুলির পঙ্কোদ্ধার

করার সময় আসিবে এবং হৈমন্তিক ষাট গৃহজাত হইলে
গ্রামের কৃষিমজুরগণের কোন কাজ থাকিবে না।

জলসেচনের অন্যান্য ব্যবস্থা

কৃষিক্ষেত্রে সেচনের জন্য সাধারণতঃ বাঁধ ও পুঙ্খের
ব্যবস্থা থাকিলেও এই অঞ্চলে কৃষক ও জমিদারগণ সাধারণ-
সারে অল্প ব্যবস্থাও করিতেন, তাহার অনেক নিদর্শন পাওয়া
যায়। বিষ্ণুপুর রাজসরকারের দেওয়ান বিখ্যাত গণিত-
শাস্ত্রবিদ স্তরুতর তাঁহার নিজগ্রামে ও সমীপবর্তী অঞ্চলে জল-
সেচনের জন্ত দামোদর নদের সমান্তরালে যে প্রণালী প্রস্তুত
করেন তাহা এখনও বিদ্যমান আছে কিন্তু কালক্রমে মেরা-
মতের অভাবে অকেজো হইয়া গিয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গের যে সকল অঞ্চলের কথা আমরা আলোচনা
করিতেছি তাহার মধ্য দিয়া বহুসংখ্যক ছোট ছোট স্রোতস্বতী
বা ছোড় প্রবাহিত হইয়া নিম্নদেশে ছোট বড় নদীর সহিত
সংযুক্ত হইয়াছে। ইহার বাঁধার সময় মৈত্রিক জলপ্রবাহে
পরিপূর্ণ হয় কিন্তু অল্প সময়ে শুকাইয়া যায়। কোথাও বা
বালির মধ্য দিয়া ক্ষীণ জলধারা প্রবাহিত হয় এবং কোথাও
বালি বুড়িলে সামান্য জলের সন্ধান পাওয়া যায়।

প্রাচীন কালে এই সকল ছোড় বাঁধিয়া বাঁধে আবদ্ধ জল-
প্রণালীর দ্বারা পরিচালিত করিয়া আপন আপন কৃষিক্ষেত্রে
সেচন করিত এবং অনেক স্থলে নিম্নভাগে অবস্থিত পুঙ্খবিলীতে
সঞ্চার করিয়া শীতকালের আবাদের ব্যবস্থা করিত। পূর্বে
উল্লেখ করা হইয়াছে যে তৎকালে রেল বা ষ্ট্রামারের উদ্ভাবন
হয় নাই। সুতরাং গম, ডাল, ইক্ষু ও সরিষা ইত্যাদি নিত্য
ব্যবহার্য দ্রব্য দূরদেশ হইতে বহন করিয়া আনিবার উপায়
ছিল না; প্রয়োজন মত দেশেই উৎপন্ন করিতে হইত।

ব্রিটিশ শাসনের কল্যাণে ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে
জমিদার সম্প্রদায় ক্রমে ক্রমে কৃষকদের স্বার্থের প্রতি উদাসীন
হইলেন এবং শিক্ষিত ও সঙ্গতিশালী ব্যক্তিগণ আমাঞ্চল ছাড়িয়া
চাকুরী ও ব্যবসা করিতে শহরে বাসস্থাপন করিলেন। সুতরাং
দেশের কৃষি পল্লীসমাজের নিম্নতম স্তরের অশিক্ষিত, সঙ্গতি-
হীন কৃষকগণের হাতে থাকিল। তাহাদিগকে সাহায্য,
উৎসাহ ও সংহতি দিবার লোক গ্রামে রহিল না বলিলেই
হয়।

ব্রিটিশ সরকার কৃষির উন্নতির জন্য কোথাও কিছু করে
নাই বলিলে সত্যের অপলাপ হয়। পঞ্জাব ও সিন্ধুপ্রদেশে
নদ ও নদীতে বাঁধ দিয়া জমিতে জলসেচন করার জন্য বহু
কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে। ইহার ফলে ঐ সব অঞ্চলের
প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছে এবং পঞ্জাবের অন্তর্গত লাহোর-
পুর জেলার অর্ধবর্ষ ও বালুকাময় ভূমি আজ এশিয়া মহাদেশের
মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কৃষিক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। দক্ষিণ ভারত-
বর্ষেও স্থানে স্থানে বহু অর্থ ব্যয়ে জলসেচনের ব্যবস্থা
হইয়াছে।

কিন্তু এ কথাও সত্য যে বাংলাদেশের সরকার চিরকালই দেশবাসীর স্বার্থের প্রতি ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়াছেন এবং জলসেচনের অসংখ্য বাঁধ ও পুষ্করিণীগুলি মজিয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছে। উহাদের উদ্ধারের কোনো চেষ্টাই হয় নাই, এবং গত পঁচিশ বৎসরে যাহা হইয়াছে তাহা অভ্যন্ত অসন্তোষজনক।

গুরুত্বপূর্ণ দত্ত মহাশয়ের যখন পশ্চিমবঙ্গের দৃষ্টান্ত সমস্তার সহিত সেচন-ব্যবহার খনিষ্ঠ সম্পর্ক সাধারণের গোচরীভূত করিলেন তখন সরকাররূপী কুস্তকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ হইল এবং সেচ-বিভাগের কর্তাদের আকস্মিক কর্মতৎপরতা লক্ষিত হইল। কল যাহা হইয়াছে তাহা ‘পূর্বতের মুখিক প্রসব’ বলিলেই চলে।

সরকারী দপ্তরের যাবতীয় সংবাদে আমরা ওয়াকিবহাল নহি কিন্তু আমাদের নিজেদের জেলা বাঁকুড়া হইতে যাহা জানি তাহা হইতে সরকারী কার্যপদ্ধতির কিকিৎ পরিচয় পাওয়া যাইবে।

দত্ত মহাশয়ের প্রাণপণ চেষ্টার ফলে ১৯২২ সালে বাঁকুড়ার সেচ-বিভাগের একটি আপিস স্থাপিত হয় এবং গত পঁচিশ বৎসর ধরিয়া এই আপিস চালানো হইতেছে। যাহারা এই আপিসের ভার-প্রাপ্ত কর্মচারী ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে দুই জন বিলাতে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন এবং এক জন বাংলার চীক ইঞ্জিনিয়ারের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া সম্প্রতি দামোদর-পরিকল্পনার উপদেষ্টা রূপে নিযুক্ত আছেন। এই সকল কর্মচারী গত পঁচিশ বৎসরে ছোট বড় অনেক কীর্তি পরীক্ষা করিয়া ও তৎসংক্রান্ত জ্ঞানপূর্বক তথ্য সংগ্রহ করিয়া নজা ও এন্টিমেটসহ পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন। কিন্তু ১৯২৩ সালে আমকোড় ও শালবাঁধ নামক দুইটি ক্ষুদ্র বাঁধ ব্যতীত অতাববি আর কোন কাজ এই জেলার হয় নাই। এখন আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, দরিদ্র করদাতাগণের অর্থে ছোট বড় কর্মচারী সম্বিত বাঁকুড়ার সেচ-আপিস কি কারণে চালানো হইয়াছিল?

কিন্তু যাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিব সেই সকল ব্রিটিশ ও লীগ শাসকগণ আমাদের প্রয়োজনের সীমার বাহিরে চলিয়া গিয়াছেন। সুতরাং প্রশ্ন করা নিরর্থক। নবনিযুক্ত মন্ত্রীমণ্ডলী আমাদের বার বার আশ্বাস দিতেছেন যে তাঁহারা দরিদ্র কৃষক মজদুরগণের স্বার্থের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন এবং যাহাতে দেশবাসী সকলে পেট ভরিয়া খাইতে পারা তাহার ব্যবস্থা করিবেন। কয়েক দিন পূর্বে প্রধান মন্ত্রী ডাঃ ঘোষ বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, বিদেশ হইতে শিক্ষা করিয়া ষাণ্মশস্য সংগ্রহ করিলে চলিবে না, আমাদের প্রদেশকে নিজের পায়ে ভর করিয়া দাঁড়াইতে হইবে অর্থাৎ আমাদের প্রয়োজনমত ষাণ্মশস্য বাহাতে আমরাই উৎপন্ন করিতে পারি, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহা যদি ডাঃ ঘোষের অন্তরের কথা হয়, তবে তাঁহার মত বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকের জ্ঞান

উচিত যে সেচনের ব্যবহার অতাববি আমাদের কৃষির পক্ষে প্রধান অন্তরায়।

সুতরাং প্রধান মন্ত্রী মহাশয় ও তাঁহার সহকারী-কৃষীমন্ত্রী ও সেচ-মন্ত্রীগণের বর্তমান অবস্থার বিশেষ জরুরী কর্তব্য এই যে পশ্চিমবঙ্গের সেচ-ব্যবহার অতাবব দূরীকরণার্থ কি করা হইবে তাহা পরিষ্কার ভাবে বিবৃত করা এবং সেচ-বিভাগের যে সকল ছোট বড় কর্মচারী প্রকৃতপক্ষে কোন কাজ না করিয়া বিরাট শাসনযন্ত্রের অঙ্গপ্রত্যঙ্গরূপে বিরাজমান ছিলেন তাঁহাদের পঁচিশ বৎসব্যাপী কার্যকলাপের একটি হিসাব-নিকাশ তলব করা।

যদি এই কথাই সত্য হয় যে, প্রাকৃতিক অবস্থার তারতম্য হেতু ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মত পশ্চিমবঙ্গের নদী-নালায় উপর বাঁধ নির্মাণ করিয়া সেচ-ব্যবহার উন্নতি সাধন অসম্ভব হয় তবে নিরর্থক এই সকল কর্মচারীকে পোষণ করিয়া কোন লাভ নাই। অনতিবিলম্বে ইহাদের অবসর গ্রহণের ব্যবস্থা করা কর্তব্য। কিন্তু যদি সম্ভব হয় এবং বিভাগীয় কর্মচারীগণের অকর্মণ্যতা ও শাসক সম্প্রদায়ের ঔদাসীন্যের ফলেই এত দিন কোন পরিকল্পনা বাস্তবে পরিণত না হইয়া থাকে, তবে আশা করি মন্ত্রীমণ্ডলী এই বিভাগের কর্মচারীগণের প্রতি তীব্র দৃষ্টি রাখিবেন এবং তাঁহাদিগকে বিশেষভাবে সতর্ক করিয়া দিবেন।

মন্ত্রীগণের আরও একটি কর্তব্য আছে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে বর্তমান বৎসরের মধ্যে ২২টি জল-সেচনের কীম প্রণয়ন সম্পূর্ণ করা হইবে, কিন্তু তাহার কোন তালিকা প্রকাশিত হয় নাই। একবার শুনিলাম যে বাঁকুড়া জেলার মধ্যে শুভকরী দাঁড়া ও বিড়াই বাঁধের নির্মাণ কার্য নীত্রে আরম্ভ হইবে কিন্তু এখন শুনিতেছি যে বিলম্ব হইতে পারে। সংবাদপত্রে ইহাদের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট আবেদন করিয়াও সকল সময় সংবাদ সংগ্রহ করা যায় না। বাংলা-সরকারের প্রচার-বিভাগের দ্বারা এই সকল প্রয়োজনীয় সংবাদ সাধারণের নিকট প্রকাশিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ ও বিশ্ববিদ্যালয়

মহাত্মা গান্ধী ‘হরিজন’ পত্রিকায় “নূতন বিশ্ববিদ্যালয়” শীর্ষক এক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে নূতন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আগে ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ পুনর্গঠন আবশ্যক। গান্ধীজী লিখিতেছেন—

“প্রত্যেক প্রদেশে নূতন নূতন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার একটা হিড়িক পড়িয়া গিয়াছে। শুক্রাটী শুক্রাটীদের জন্ত, মহারাষ্ট্র মারাঠীদের জন্ত, কর্ণাট কন্নড়দের জন্ত, উড়িষ্যা উড়িয়াদের জন্ত, আসাম আসামীদের জন্ত এক-একটা বিশ্ববিদ্যালয় চাহিতেছে। কে যে চাহিতেছে না জানি না। আমি মনে করি, এই সকল সমৃদ্ধ প্রাদেশিক ভাষাকে ও এই ভাষাভাষী লোকদিগকে যদি যথোচিত উন্নতি লাভ করিতে হয়, তাহা হইলে এইরূপ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিশ্চয়ই প্রয়োজন আছে।

“কিন্তু সেই সবে আমার এ কথাও মনে হইতেছে যে, আমরা অত্যন্ত বেশী ভাড়াভাড়া করিতেছি। এ বিষয়ে প্রথম কত ব্য হইল ভাষা অঙ্গসারে প্রদেশগুলির পুনর্গঠন। ভাষা অঙ্গসারে পৃথক পৃথক প্রদেশ গঠিত হইলে, যেখানে বিশ্ব-বিদ্যালয় নাই সেখানে স্বাভাবিকভাবেই এক-একটি বিশ্ববিদ্যালয় গড়িয়া উঠিবে। বোম্বাই প্রদেশ গুজরাট, মারাঠী ও কন্নড় এই তিনটি ভাষাকে আয়সাং করিয়া রাখিয়াছে এবং সেইজন্য কোনটাই উন্নতি হইতেছে না। মাদ্রাজ প্রদেশে চারিটি ভাষা : তামিল, তেলুগু, মালয়ালম ও কন্নড়। সুতরাং দুই প্রদেশে এক ভাষাও আছে। অঙ্গদেশে একটি অঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় আছে সত্য। কিন্তু আমার মতে অঙ্গ বিদেশীশাসনযুক্ত একটি প্রথক প্রদেশ না হওয়ায় এই বিশ্ববিদ্যালয় যেরূপ উন্নতিলাভ করিতে পারিত তাহা করে নাই। মাত্র দুই মাস হইল ভারত-বর্ষ বিদেশী শাসন হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছে। আনামালাই বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধেও সেই একই কথা। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে তামিল কি তাহার প্রাপ্য অধিকার পাইয়াছে ?

“নূতন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে তাহার জন্য উপযুক্ত ক্ষেত্র চাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য স্থল-কলেজের প্রয়োজন। এই সকল স্থল-কলেজে প্রাদেশিক ভাষার মধ্য দিয়া শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাহা হইলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপযুক্ত ক্ষেত্র রচিত হইবে। বিশ্ববিদ্যালয় তো উপরের জিনিস। উপরের জিনিসকে বড় তখনই করা যায় যখন নীচের ভিত শক্ত হয়।

“আমার মতে, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য লোকায়ত্ত রাষ্ট্রের টাকার নিমিত্ত চিন্তার প্রয়োজন নাই যদি লোকে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রয়োজন অস্বীকার করে, তাহা হইলে তাহারাই ইহার জন্য টাকা দিবে। এইভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলে সে বিশ্ব-বিদ্যালয় সেই দেশের অলঙ্কারস্বরূপ হইবে। যেখানে দেশের শাসনভার বিদেশীদের হাতে থাকে, সেখানে যাহা কিছু লোকের কাছে আসে তাহাই উপর হইতে আসে এবং তাহার ফলে লোকে ক্রমশঃই বেশী পরনির্ভরপরায়ণ হইয়া পড়ে। দেশের শাসন যেখানে দেশের লোকের ইচ্ছার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় সেখানে সমস্তই নীচে হইতে উপরে যায় এবং তাহা স্থায়ী হয়। ইহা দেখিতেও ভাল হয় এবং ইহার ফলে লোকের শক্তিও বৃদ্ধি পায়। উর্বর ভূমিতে একটা বীজ পুঁতিলে তাহাতে যেমন ফল ভাল হয়, তেমনই এইরূপ লোকায়ত্ত শাসন-ব্যবস্থার শিক্ষা বিভাগের জন্য যে অর্থ ব্যরিত হয় তাহা দশগুণ ফল দিয়া থাকে। বিদেশীর প্রভুত্বাধীনে যে সকল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহার ফল উল্টাই হইয়াছে। অন্যরূপ ফল হওয়া বোধ হয় সম্ভবও ছিল না। এইজন্য যত দিন না আমরা আমাদের নবলব্ধ স্বাধীনতা হজম করিতে পারিতেছি, তত দিন নূতন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিষয়ে সাবধান হইয়া চলাই যুক্তিযুক্ত।”

গান্ধীজী বলিতেছেন যে, আমরা আপাততঃ রাজনীতি ক্ষেত্রে বিদেশীপ্রভু হইতে মুক্তি পাইয়াছি বলিয়াই যে আমরা

বিদেশী ভাষা ও বিদেশী চিন্তার হুম প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়াছি একথা হয়ত কেহ বলিবেন না। নূতন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পূর্বে নবলব্ধ স্বাধীনতার স্বাভাবিক নিম্নলিখিত বারুতে বুকটা তরিয়া লওয়াই কি যুক্তিযুক্ত নয় ? আমাদের দেশের প্রতি কত ব্য-বোধ কি এই কথাই বলে না ? বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জড় বড় বড় অট্টালিকা এবং রাশি রাশি অর্থের প্রয়োজন নাই। এক্ষণে যাহা সকলের চেয়ে বেশী প্রয়োজন তাহা হইতেছে জ্ঞাত জনমতের সূচিস্তিত সমর্থন। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে বহু শিক্ষকের প্রয়োজন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতাদের দূরদর্শী হওয়া আবশ্যিক।

দেশের মুক্তিসংগ্রামে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন দেশে যে ভূমিকা অভিনয় করিয়া থাকে, ভারতবর্ষের বিশ্ববিদ্যালয়-সমূহ তাহা করিতে পারে নাই। চানদেশে এখনও বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলি চিয়াং কাই-শেককে অতুতপূর্ণ সাহায্য করিতেছে। দেশের বিভিন্ন সমস্তার তথ্য সংগ্রহ, আলোচনা ও সমাধান চেষ্টার অসাধারণ সুযোগ বিশ্ববিদ্যালয়গুলির হাতে আছে। ধান্যসমস্তার কথাই বরা যাউক। “ফুড ষ্টাটিষ্টিক্স” বলিয়া যে বস্তুটি প্রস্তুত করা হইয়া থাকে এবং যাহার উপর ভিত্তি করিয়া ভারতব্যাণী কন্ট্রোল বোর্ড করিয়া সাধারণের অর্থ, স্বাস্থ্য, সময় ও শক্তির বিপুল অপচয় চলিতেছে তাহার মূলে আছে অশিক্ষিত চৌকিদারদের আত্মাঙ্গী হিসাব। গ্রামাঞ্চলের কসল সম্বন্ধে তথ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা দেশের স্থলের শিক্ষক ও ছাত্রদের দ্বারা সংগৃহীত হইলে উহা নিরক্ষর চৌকিদার সংগৃহীত ‘ষ্ট্যাটিস্টিক্স’ অপেক্ষা সহস্রগুণে সঠিক ও নির্ভরযোগ্য হইবে-ইহাতে সন্দেহমাত্র নাই। বিশ্ববিদ্যালয়-গুলি ইচ্ছা করিলে এই কাজ করিতে পারিতেন না বা এখনও পারেন না ইহা অবিস্বাসযোগ্য কথা।

ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশগুলির পুনর্গঠন করিয়া প্রত্যেক প্রদেশে নিজস্ব বিশ্ববিদ্যালয় গঠন আবশ্যিক ইহা নিঃসন্দেহ কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতি বৎসর অন্ততঃ কয়েকটি করিয়া তরুণকে উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া দিবে ইহা কি আশা করা যায় না ? কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতি বৎসর পঞ্চাশ-ষাট ছাত্রের ছাত্র ম্যাট্রিক পাস করিয়া থাকে এবং এম-এ পাস করে কয়েক ছাত্র। কিন্তু বাংলাদেশের যে কোন বিভাগে কাদের জড় উপযুক্ত লোকের একান্ত অভাব দেখা যায় ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। শাসন-কার্য, অধ্যাপনা, শিক্ষকতা, সাংবাদিকতা বা ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য পদের উপযুক্ত একটি ছাত্রও কি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আড়কাল বাহির হয় ? বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ ও অধ্যাপকবৃন্দ আন্তরিক চেষ্টা করিলে বৎসরে দশটি দক্ষ ও উপযুক্ত চরিত্রবান ছাত্র কি দেশকে দিতে পারেন না ? রাশি রাশি অর্থব্যয়ে অট্টালিকা নির্মাণ করার চেয়ে মানুষ গড়ার দিকে মনোযোগ দিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপযোগিতা সর্বসাধারণ উপলব্ধি করিয়া উহাকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইত।

সিন্ধু যুগ হইতে বৈদিক যুগ

শ্রীননীমাধব চৌধুরী

সিন্ধুসভ্যতা সম্বন্ধে এ পর্যন্ত যে আলোচনা হইয়াছে তাহার বৈজ্ঞানিক অংশ, অর্থাৎ পূর্বে হরাপ্পা হইতে পশ্চিমে বেলুচীস্থানের প্রাগৈতিহাসিক যুগের বিভিন্ন ধ্বংসস্তুপ হইতে যে সকল বস্তু উদ্ধার করা হইয়াছে তাহাদের বিস্তৃত বিবরণ বাদ দিলে যাহা থাকে তাহা হইতেছে প্রত্নতত্ত্ব-বিজ্ঞানীগণের তথ্য বিশ্লেষণ, তুলনামূলক আলোচনা ও ব্যাখ্যা। অবিশেষজ্ঞ শিক্ষিত ব্যক্তি আলোচনার এই অংশ হইতে প্রেরণা সংগ্রহ করিয়া আপনার মতামত গঠন করিয়া থাকেন। বর্তমান আলোচনায় এই অংশের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা হইবে।

সিন্ধুসভ্যতা সম্বন্ধে আলোচনার এই দ্বিতীয় অংশ সম্পর্কে সকল জিজ্ঞাসু ব্যক্তির স্মরণ রাখিতে হইবে যে যাহাকে Indus Script বলে তাহার বৈজ্ঞানিক মহলে সর্বসম্মতভাবে গ্রাহ্য পাঠোদ্ধার এখনও হয় নাই। স্বতরাং সিন্ধুসভ্যতার বৈশিষ্ট্য, প্রকৃতি, অস্তিত্ব প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার সঙ্গে উহার সম্বন্ধ ইত্যাদি সম্বন্ধে যে সকল ব্যাখ্যা পণ্ডিতগণ প্রচার করিয়াছেন যে কোন দিন উহার একটা বড় অংশ বাতিল হইয়া যাইতে পারে। গোড়ার এই ক্রটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া সিন্ধুসভ্যতা সম্বন্ধে আলোচনায় অগ্রসর হওয়া যাইতে পারে।

সিন্ধু-উপত্যকার এই প্রাগৈতিহাসিক তাম্রযুগের (Chalcolithic) সভ্যতা সম্বন্ধে আলোচনাকে মোটামুটি ঐতিহাসিক, ধর্মসম্বন্ধীয় ও নৃতত্ত্ববৈজ্ঞানিক, এই কয়টি শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে। শ্রেণী বিভাগ করিয়া আলোচনায় অগ্রসর হইবার ফলে আশা করা যায় যে, বিভিন্ন বিভাগের জ্ঞাতব্য তথ্য ও মতবাদগুলি বিশ্লেষণ করিয়া সমগ্র সিন্ধুসভ্যতা সম্বন্ধে পরিচ্ছন্ন ধারণা করিবার অবকাশ পাওয়া যাইবে। ঐতিহাসিক, ধর্মসম্বন্ধীয় এবং নৃতত্ত্ববৈজ্ঞানিক আলোচনার মূল ভিত্তি বিভিন্ন ধ্বংসস্তুপ হইতে প্রত্নতত্ত্ববিজ্ঞানীগণ যে সকল বস্তু উদ্ধার করিয়াছেন। এই সকলের বিস্তারিত পরিচয় সর জন মার্শাল, ডাঃ ম্যাকে ও মাথো স্বরূপ ভার্টসের গ্রন্থে এবং প্রত্নতত্ত্ববিভাগের ১৯২৩-২৪ হইতে আরম্ভ করিয়া বার্ষিক রিপোর্টগুলিতে প্ৰাপ্ত হইবে। এ সম্বন্ধে পৃথক কোন আলোচনা বাহ্যিক।

সিন্ধুসভ্যতা সম্বন্ধে ঐতিহাসিক আলোচনা আরম্ভ করা যাইতে পারে সিন্ধুযুগের সহিত বৈদিক যুগের সম্পর্কের প্রসঙ্গ অবলম্বন করিয়া।

প্রচলিত মত এই যে সিন্ধুযুগ ও বৈদিক যুগের মধ্যে যে ব্যবধান বর্তমান কোন প্রকার সেতুবন্ধন দ্বারা তাহাদের মধ্যে সংযোগ সাধন করা সম্ভব নহে। কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিজ্ঞানী মত প্রকাশ করিয়াছেন 'the gulf is unbridgeable'। ইহার অর্থ এই যে বৈদিক যুগ হইতে ভারতীয় সভ্যতার যে ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যায় বৈদিক যুগের পূর্বে সেইরূপ কোন ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যায় না। সিন্ধুসভ্যতা প্রাক-বৈদিক ও প্রাক-আর্য, বৈদিক সভ্যতার সহিত সম্পর্কবিহীন। এই দুই যুগের মধ্যে ১০০০ হইতে ১৫০০ বৎসরের ব্যবধান বর্তমান। সিন্ধু-সভ্যতা ধ্বংস হইবার সহস্রাধিক বৎসর পরে আর্যজাতি দূর অঞ্চল হইতে আসিয়া একটি নূতন সভ্যতার পত্তন করে। সিন্ধু-উপত্যকার তাম্রযুগের সভ্যতা সম্পূর্ণ ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল, নূতন যে সভ্যতা খ্রীঃপূঃ ২০০০-১৫০০ বৎসরের মধ্যে সিন্ধু-উপত্যকায় গড়িয়া উঠে তাহার সহিত উহার কোন সম্পর্ক নাই।

এই মত কতখানি যুক্তিসহ বর্তমান প্রবন্ধে সংক্ষেপে তাহার আলোচনা করা হইবে। প্রথমে সিন্ধুযুগ ও বৈদিক যুগের যে কাল নির্ণয় করা হইয়াছে তাহার উল্লেখ করা প্রয়োজন।

সিন্ধুযুগের কাল নির্ণয় করা হইয়াছে প্রধানতঃ দুই প্রকার প্রমাণের সাহায্যে। একটি প্রমাণ geological stratification, অর্থাৎ প্রাচীন ধ্বংস স্তুপ খননকালে বৈজ্ঞানিক মতে ভূ-স্তরের বিকাশ হইতে কোন নির্দিষ্ট স্তরের বয়স বিচার করিবার যে সূত্র আছে, সেই সূত্র অনুসারে প্রাপ্ত হিসাব। দ্বিতীয় প্রমাণ dating of analogical archaeological finds from pre-historic sites in other countries, অর্থাৎ অন্যান্য দেশের প্রাগৈতিহাসিক যুগের স্তুপ হইতে প্রাপ্ত অনুরূপ দ্রব্যাদির যে বয়স নির্ণয় করা হইয়াছে সেই বয়সের হিসাব। সর জন মার্শাল তাহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থে এই দুইটি প্রমাণ ব্যবহার করিয়াছেন এবং দ্বিতীয় প্রমাণটি তিনি সিন্ধুসভ্যতার, বিশেষতঃ সিন্ধুযুগের ধর্মের ব্যাখ্যা করিবার কাজেও ব্যবহার করিয়াছেন। বৈদিক যুগের কাল নির্ণয় করা হইয়াছে কতকটা অনুমানের সাহায্যে এবং কতকটা খ্রীঃপূঃ-১৬শ হইতে ১৫শ শতাব্দীর মধ্যে পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে যাহাদের মধ্যে আর্যভাষা-ভাষী লোক ছিল এইরূপ কয়েকটি জাতির অভ্যুদয়ের প্রমাণ অবলম্বন করিয়া। যে অনুমানের সাহায্য লওয়া

হইয়াছে তাহার ভিত্তি দক্ষিণ-পূর্ব রুশিয়ায় আর্ঘজাতির আদি বাসস্থান হইতে ইরান ও ভারতবর্ষের দিকে আর্ঘজাতির সম্প্রসারণের মতবাদ।

সিন্ধুযুগের কালনির্ণয় সম্বন্ধে যে geological stratification এর প্রমাণের কথা বলা হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণরূপে বিশেষজ্ঞদিগের ব্যাপার। সুতরাং এ সম্বন্ধে কোন মত প্রকাশ করা বাহুল্য। মার্শালের হিসাবমতে মোহেঞ্জোদারোর স্তূপ হইতে প্রাপ্ত নিদর্শনগুলি হইতে যে- সভ্যতার পরিচয় পাওয়া যায় তাহা মোটামুটি খ্রীঃ পূঃ ৩২৫০ অব্দের। এই সভ্যতার বাহকগণ অল্পমান ৫০০ বৎসর মোহেঞ্জোদারোতে বসবাস করিয়াছিল এবং এই সভ্যতা সম্পূর্ণরূপে গড়িয়া উঠিতে অল্পমান হাজার বৎসর লাগিয়াছিল। (M.I.C.I. pp. 107-108)। এই হিসাবের মধ্যে যে ফাঁক দেখা যায় সে সম্বন্ধে পরে বলা হইবে। লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে geological stratification এর প্রসঙ্গে পণ্ডিতগণ ফুরিয়া ফিরিয়া দ্বিতীয় প্রমাণের উপর অধিক নির্ভর করিতেছেন। প্রত্নতত্ত্ববিভাগের ১৯২৩-২৪ সনের বার্ষিক বিবরণীতে সর জন মার্শাল বলিতেছেন, ১৯২১-২২ খ্রীঃাব্দে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মোহেঞ্জোদারোর স্তূপ খনন করিতে আরম্ভ করেন এবং “it is to him that we mainly owe the subsequent discoveries that have been made.” তারপর তিনি বলিতেছেন মোহেঞ্জোদারো ও হরাপ্পার মত পরস্পর হইতে দূরবর্তী ও সমুদ্র হইতে দূরে অবস্থিত অঞ্চলে স্মেরীয় টাইপের সীল (seal) ইত্যাদি ভূপৃষ্ঠ হইতে অল্প নিম্নে পাওয়া গিয়াছে। যে স্তরে এই প্রকারের সীল পাওয়া গিয়াছে তাহার নীচে অনেকগুলি স্তর দেখা যায় (“clear evidence of multiple strata lower down.”) ইহাতে প্রমাণ হয় যে মেশোপটেমিয়ায় স্মেরীয়দিগের ইতিহাস যাহাট হউক সিন্ধু-উপত্যকায় স্মেরীয় সভ্যতার অল্পরূপ একটি সভ্যতা বহু বিস্তৃত ছিল এবং এই সভ্যতা আরও প্রাচীনযুগে অগণিত শতাব্দী ধরিয়া ভারতবর্ষের ভূমিতে বিকাশ লাভ করিয়াছিল (“undergone a development reaching back incalculable ages”)।

Geological stratification এর প্রমাণ হইতে দাঁড়াইতেছে যে স্মেরীয় সভ্যতার সহিত সংযোগ সিন্ধু-সভ্যতার পরিণত অবস্থায়, ঐ সভ্যতার বাহকগণ মোহেঞ্জোদারো ও হরাপ্পা পরিভ্রমণ করিবার বা ঐ দুই নগর ধ্বংস হইবার কিছু পূর্বে ঘটিয়াছিল। স্মেরীয় সভ্যতার সহিত সংযোগ ইতিহাসের হিসাবে খ্রীঃ পূঃ কোন সহস্রকে ঘটবার সম্ভাবনা পরে তাহা দেখা যাইবে। এখানে এই তথ্য পাওয়া যাইতেছে যে সিন্ধু-সভ্যতার আদিযুগ ও মধ্যযুগ

পশ্চিম এশিয়ার প্রাচীনতম সভ্যতার সহিত হৃদয় সম্পর্কহীন ছিল। এই তথ্যের বিশেষ তাৎপৰ্য আছে। পণ্ডিতগণের মতে স্মেরীয় সভ্যতা প্রাচীন বাবিলোনীয়, আসিরীয় ও সাধারণ ভাবে পশ্চিম এশিয়ার প্রাচীন সভ্যতার ভিত্তি এবং প্রাচীন ইতিহাসের যত্থানি উদ্ধার করা হইয়াছে তাহার সাহায্যে এ কথা মোটামুটি প্রমাণিত হইয়াছে বলা যায়। মার্শাল নিজেও এই কথা স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন যে যদি Sayce ও Goddard-এর মতে স্মেরীয়গণ অস্তিত্ব হইতে মেশোপটেমিয়ায় গিয়াছিল একথা সত্য হয় তবে ইহা অসম্ভব নহে যে ভারতবর্ষই স্মেরীয় সভ্যতার জন্মভূমি (“the possibility is clearly suggested of India proving ultimately to be the cradle of their civilisation.”)। কিন্তু সিন্ধু-সভ্যতার ব্যাখ্যাতা অনেক পণ্ডিত এই সম্ভাবনা উড়াইয়া দিয়া পশ্চিম এশিয়ার ভূমধ্য সাগরীয় অঞ্চল হইতে সিন্ধু-সভ্যতার আমদানীর কথা বলেন, geological stratification এর ইঙ্গিতকে তাহার পাশ কাটিয়া গিয়াছেন।

পূর্বের এক প্রবন্ধে (বৈদিক আর্ঘগণ কি সেমিটিক? প্রবাসী, পৌষ ১৩৫২) প্রাচীন মেশোপটেমিয়ার সভ্যতা অর্থাৎ স্মেরীয়, বাবিলোনীয় ও আসিরীয় সভ্যতার সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলা হইয়াছে। সিন্ধু সভ্যতার সহিত মেশোপটেমিয়ার সম্পর্ক এ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নহে, স্মেরীয়গণের ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা করিবার স্থান এখানে নাই। কিন্তু সিন্ধু সভ্যতার কালনির্ণয় প্রসঙ্গে যে স্মেরীয় সভ্যতার সহিত সংযোগের কথা উঠে তাহা প্রথম সারণণের পূর্ববর্তী স্মেরীয় সভ্যতা, অথবা স্মেরীয় সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় কালের সভ্যতা, অথবা পরবর্তী কালের অর্থাৎ বাবিলোনীয় আমলের পরিবর্তিত স্মেরীয় সভ্যতার ভগ্নাবশেষের সহিত সংযোগ, তাহা সঠিক নির্ণয় করিবার উপায় নাই। মার্শাল এই মত পোষণ করেন যে কতকগুলি একরূপ নিদর্শন বা বস্তু পাওয়া গিয়াছে যাহা “prove active intercourse between Mesopotamia and the Indus valley in pre-Sargonic or relay Sargonic times.” দেখা যায় যে নিও-বাবিলোনীয় কিশদন্তী মতে আকাদের অধিপতি সারগণ বা সারুকিনের (Sharrukin) অভ্যুদয় কাল খ্রীঃপূঃ ৩৮০০। কেহ কেহ বলেন যে ইহা খ্রীঃপূঃ ৪৮০০ হইবে। সে যাহা হউক মার্শালের উপরে উল্লিখিত মত হইতে অল্পমান করিতে হয় যে সিন্ধু সভ্যতার পরিণত অবস্থা সারণণের অন্ততঃ সমসাময়িক, অর্থাৎ খ্রীঃ পূঃ ৩৮০০ বৎসরের ব্যাপার। যদি সিন্ধু সভ্যতা পরিণত অবস্থা লাভ করিতে পূর্বের হিসাবমত

• ১০০০ বৎসর লাগিয়াছিল ধরা যায় তাহা হইলে অনুমান করিতে হয় ঐ সভ্যতার পতন হয় খ্রীঃ পূঃ ৪৮০০ অব্দে।

বলা বাহুল্য এই প্রকারের হিসাব সম্পূর্ণ অনুমানমূলক যদিও এই অনুমানের একটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি দেখা যায়। পণ্ডিতগণের অনুমান অনুসারে সিন্ধু সভ্যতা কত প্রাচীন হইতে পারে তাহা দেখান ছাড়া আর একটি উদ্দেশ্যে এই হিসাব দেওয়া হইল। সিন্ধু-উপত্যকায় ধর্মের যে ব্যাখ্যা পণ্ডিতগণ করিয়াছেন তাহা আলোচনা করিবার সময় দেখা যাইবে যে সিন্ধু সভ্যতার এই আনুমানিক কাল নির্দেশের কথা স্মরণ রাখা তাহার আবশ্যক মনে করেন নাই। তারপর পশ্চিম এশিয়া, ভূমধ্যসাগর, ঈজিয়ান সাগর প্রভৃতি অঞ্চলের প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার যে সকল analogical finds বা অনুরূপ নিদর্শন আবিষ্কারের প্রমাণে সিন্ধু সভ্যতার বিভিন্ন অঙ্গের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে সেই সকল সভ্যতা সিন্ধু সভ্যতার সমসাময়িক বলিয়া প্রমাণিত না হইলে তাহাদের সিদ্ধান্তে অনেক ক্রটি আসিয়া যায়। দেখা যাইবে যে গোড়ার এই ক্রটি তাহা-দিগকে মিরস্ত বা দ্বিধাগ্রস্ত করিতে পারে নাই।

উপরে যাহা বলা হইল তাহার মোটামুটি তাৎপৰ্য্য এই যে দুই প্রকার প্রমাণের বলে সিন্ধু সভ্যতার যে কাল নির্ণয় করা হইয়াছে তাহার মধ্যে অনেকখানি অনিশ্চয়তা রহিয়াছে। এই প্রসঙ্গে আরও বলা যাইতে পারে যে, অভ্যন্তরীণ প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার সহিত তুলনামূলক আলোচনায় যে জাতীয় যুক্তি ব্যবহার করা হইয়াছে তাহাতে ভারতবর্ষের সভ্যতার ইতিহাসের সম্পূর্ণ মাপের মধ্যে সিন্ধু যুগের প্রকৃত স্থান কোথায় তাহা অস্পষ্ট রহিয়া গিয়াছে।

যে সকল যুক্তির বলে বৈদিক যুগের কাল নির্ণয় করা হইয়াছে তাহা বিস্তারিত আলোচনা ইতিপূর্বের কতকগুলি প্রবন্ধে করা হইয়াছে। এখানে সংক্ষেপে বলা যায় যে-পশ্চিম এশিয়ার মিটানী, কাসাইট, হিটাইট প্রভৃতি জাতীয় কতকগুলি দলিলের প্রমাণ ও উত্তর-পশ্চিম থিরগিজ অঞ্চল বা দক্ষিণ-পূর্ব রুশিয়ায় আর্যজাতির আদি বাসভূমি হইতে আর্যজাতির বিভিন্ন দলের পশ্চিম ও পূর্ব দিকে অভিযান করিবার কালনিক ইতিহাস মিলাইয়া যে মতবাদ প্রচারিত হইয়াছে এবং এই মতবাদের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া বৈদিক যুগের যে কাল নির্ণয় করা হইয়াছে তাহা সন্তোষজনক নহে। খ্রীঃ পূঃ ২৫০০ বা ২০০০ হইতে ১৫০০ বৎসরের মধ্যে আর্যজাতি ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া সিন্ধু উপত্যকায় আপনাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল ধরিয়া লইলে পশ্চিম এশিয়ার উপরে উল্লিখিত জাতিসমূহের

বৈদিক আর্যদিগের সহিত সম্পর্কের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না, আবেস্তা ও বেদের এবং আবেস্তিক আর্য ও বৈদিক আর্যদিগের সম্পর্কের সন্তোষজনক ব্যাখ্যাও পাওয়া যায় না।

সিন্ধু যুগ ও বৈদিক যুগের সম্পর্ক নির্ণয়ের ব্যাপারে প্রধান ক্রটি আসিয়াছে পণ্ডিতগণের অপ্রমাণিত যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এই ধারণা যে বৈদিক সভ্যতা ভারতবর্ষের পক্ষে কতকটা exotic বা বিদেশীয়। ইহা যে অভ্যাক্তি নহে স্বয়ংদের অধিকাংশ সূত্র ভারতবর্ষের বাহিরে রচিত হইয়াছিল ওল্ডেনবার্গ প্রমুখ পণ্ডিতগণের মতবাদ তাহার প্রমাণ। আর্যজাতির ভারতবর্ষে আগমন এবং স্বয়ংদের রচনা আরম্ভ অনেক পণ্ডিতের মতে সমসাময়িক। এই মত ও বৈদিক সভ্যতা যে খানিকটা exotic এই ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহার পরে দেখা যাইবে যে সমগ্র সিন্ধু সভ্যতা বিদেশীয়—কোন কোন পণ্ডিত এইরূপ মত প্রকাশ করিতে দ্বিধা করেন নাই। বৈদিক সভ্যতা সম্বন্ধে যে মতের উল্লেখ করা হইল তাহা খণ্ডন করিবার একটি প্রধান উপায়ের অভাব দেখা যায়। বৈদিক সভ্যতা বা বৈদিক যুগের সঙ্গে যুক্ত করা যায় এরূপ কোন প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের দাবি এ পর্যন্ত করা হয় নাই। বলা বাহুল্য, এই অণাবের ফলে সিন্ধু-সভ্যতার সহিত বৈদিক সভ্যতার সম্পর্ক নির্ণয় করিবার ব্যাপারেও খানিকটা সমস্ত্রার উদ্ভব হইয়াছে।

সিন্ধু যুগ ও বৈদিক যুগের কালনির্ণয় সম্পর্কে যে অনিশ্চয়তা দেখা যায় এবং সেই অনিশ্চয়তার দরুণ এই দুই যুগের পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ বিচারে যে সমস্ত্রা দেখা যায় সে প্রসঙ্গ আপাততঃ তাগ করিয়া বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী দিয়া সমগ্র বিষয়টির বিচার করিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে। এই চেষ্টার ফলে কি তথ্য পাওয়া যায় দেখা যাউক। এই তথ্যের আলোকে দুই যুগের ব্যবধান কিরূপ মনে হয় দেখা যাইবে।

উপরে বলা হইয়াছে যে পণ্ডিতগণের কেহ কেহ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে মোহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার স্থূপের বিভিন্ন স্তর হইতে যে সকল নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে মনে করা যাইতে পারে যে সিন্ধু সভ্যতা গড়িয়া উঠিতে হাজার বৎসর সময় লাগিয়াছিল। এই দুই নগরের স্তূপ হইতে প্রাপ্ত নিদর্শনসমূহ যে সমৃদ্ধ ও বলিষ্ঠ সভ্যতার পরিচয় দেয় হযত প্রাকৃতিক চৌখোঁগের অথবা শত্রু আক্রমণের ফলে মোহেঞ্জোদারো ও হরপ্পা পরিত্যক্ত হইবার পরেও যে তাহা ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল তাহা মনে করা কঠিন। এই সভ্যতার উত্তরাধিকার যাহাদের উপর বর্তিয়াছিল তাহারা কাহারো ?

কোন একটি বিশেষ ধরণের প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার

কত দূর বিস্তৃতি ঘটিয়াছিল তাহা নির্ণয় করিবার একটি প্রধান উপায় সেরামিকস বা পোড়ামাটির তৈজসপত্র। পটারির রং, উহার উপরের নক্সা, উহার গঠন প্রভৃতি সেরামিকস-বিশেষজ্ঞদিগের নিকট মূল্যবান তথ্য। এই জাতীয় বহু তথ্যের সমাবেশ, তুলনামূলক আলোচনা ইত্যাদির সাহায্যে বিশেষজ্ঞগণ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতাসমূহের প্রাচীনত্ব, উৎপত্তি ও বিকাশ, বৈশিষ্ট্য, পরস্পরের সহিত সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে মূল্যবান গবেষণা করিয়াছেন।

পটারির প্রমাণে এই তথ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে বেলুচীস্থানের পূর্বাঞ্চল, দক্ষিণ ওয়াজিরিস্থান এবং সিন্ধুনদের পশ্চিমে দেবরাজ্যত এবং কেজ ও কলবা উপত্যকা সিন্ধু কৃষ্টির অধ্যুষিত এলাকার মধ্যে। এই কৃষ্টি পশ্চিম বেলুচীস্থানে ইরানের সীমানা পর্যন্ত প্রসারিত হইয়াছিল, কিন্তু এই অঞ্চলে সিন্ধু কৃষ্টি ইরান হইতে পূর্বগামী একটি বৈদেশিক কৃষ্টির সম্মুখীন হইয়াছিল। সিন্ধুর পূর্বে স্বদূর মধ্য পঞ্জাবে রাভী নদীর কূলে অবস্থিত হরপ্পা সিন্ধু কৃষ্টির একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। ব্রুসফুটের (R. Bruce-Foote, *Indian Pre-historic and Proto-historic Antiquities*) সং-গৃহীত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহের প্রমাণে মার্শাল মত প্রকাশ করিয়াছেন সিন্ধুর দক্ষিণ-পূর্বে কাথিয়াবাড়ের ক্যাশে (Gulf of Cambay) পর্যন্ত সিন্ধুকৃষ্টি প্রসারিত হইয়াছিল এবং সম্ভবতঃ ক্যাশের উত্তরে ও পূর্বে রাজ-পুতানায় ইহা বিস্তৃত হইয়াছিল। ইহার পরে মার্শাল যাহা বলিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করা যাইতে পারে,—

“It is difficult to believe that, while the Punjab and Sind were in possession of this highly advanced culture the valleys of the Jumna and the Ganges, of the Narbada and the Tapti, could have been far behind them.”—(M.L.O.I, p. 96)

মার্শালের উদ্যত কল্পনায়, গঙ্গা হইতে নীলনদ (মিশর) পর্যন্ত বিস্তৃত যে বিশাল সভ্যতার চিত্র প্রতিভাত হইয়াছিল তাহার সম্বন্ধে এখানে কোন মন্তব্য না করিয়া এই পর্যন্ত বলা যাইতে পারে যে তিনি মনে করিতেন যে সিন্ধু-সভ্যতার প্রধান কেন্দ্র সিন্ধু ও পঞ্জাবে অবিকৃত হইলেও সিন্ধু হইতে গঙ্গা ও গঙ্গা হইতে তাপ্তী পর্যন্ত অর্থাৎ সমগ্র উত্তর ও মধ্য ভারতে বিক্ষিপ্ত পর্বতের দক্ষিণেও এই সভ্যতা বিস্তৃত হইয়াছিল।

এই মত পুরাপুরি প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের উপরে প্রতিষ্ঠিত করা এখনও সম্ভব না হইয়া থাকিলেও ইহার মধ্যে অসম্ভব বা অযৌক্তিক কিছু নাই। তাহা হইলে প্রশ্ন উঠে, এই সমৃদ্ধ, বলিষ্ঠ, বহুবিস্তৃত সভ্যতা কি বৈদিক যুগের পূর্বে লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল?

দেখা যায় যে পণ্ডিতগণের মতে ইহা লুপ্ত হয় নাই। মার্শাল এবং অত্র কোন কোন পণ্ডিত বলিয়াছেন যে বর্তমান কালের হিন্দু ধর্মের অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য সিন্ধু যুগের ধর্ম হইতে আসিয়াছে। সিন্ধু ধর্মে পৌরাণিক শিবের অল্পরূপ যোগী, উর্দ্ধলিঙ্গ পশুপতির উপাসনা, লিঙ্গ উপাসনা, স্ত্রী-দেবতার (Mother-Goddess) উপাসনা প্রভৃতি সম্বন্ধে মার্শালের প্রচারিত মত সুপরিচিত এবং পণ্ডিত সমাজের অনেকে এই সকল মত গ্রহণ করিয়াছেন। মার্শালের এই সকল মত সম্বন্ধে কোন আলোচনা বর্তমান প্রবন্ধে করা হইবে না; এখানে শুধু একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইতেছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগের সিন্ধু ধর্মের সহিত বর্তমান কালের হিন্দু ধর্মের এই সংযোগ ধাহারা স্বীকার করেন তাহারা সিন্ধুধর্ম ও হিন্দুধর্ম এই দুইয়ের মধ্যবর্তী বৈদিক ধর্মকে শূন্যে ঝুলাইয়া রাখিতে চাহিয়াছেন। সিন্ধু-ধর্ম বৈদিক ধর্মকে প্রভাবিত না করিয়াও বহু পরবর্তী কালের হিন্দু ধর্মকে প্রভাবিত করিয়াছে এই ধরণের অবিশ্বাস্য কথাই তাহারা বলিতে চাহেন। ইহা একটা কৌতুকজনক ব্যাপার যে এই প্রকারের মতবাদের পক্ষে বিশ্বাস ও সন্দেহ উদ্ভেদক করা স্বাভাবিক হইলেও অনেকের বিশ্বাসপ্রবণতা এত প্রবল যে বিন্দুমাত্র বিশ্বাস ও সন্দেহ উদ্ভিষ্ট হইবার অবসর মিলে নাই। এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যে ইউরোপের আর্থ ও অনার্থ সম্পর্কিত মতবাদ দীর্ঘকাল দ্বিধাহীন মনে গ্রহণ করিবার ফলে এই অগম্যমন্তব্য ও লঘু-চিন্ততা আসিয়াছে।

প্রশ্ন উঠে, তাম্রযুগের সিন্ধুধর্ম বা উহার কোন কোন অংশ যদি বিলুপ্ত না হইয়া থাকে তাহা হইলে কি এই অল্পমান করিতে হয় না যে যাহারা এই ধর্ম আচরণ করিত তাহাদের মন্ত্রশিষ্য, সম্ভবতঃ বংশধর, বরাবর বর্তমান ছিল এবং আছে? এই বংশধর বৈদিক যুগেও বর্তমান ছিল এইরূপ অল্পমান করা অসঙ্গত নহে। তাহারা বৈদিক ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল এবং সম্ভবতঃ বৈদিক ধর্মকেও প্রভাবিত করিয়াছিল এই প্রকার অল্পমান করাও অসঙ্গত নহে। সিন্ধুধর্মের প্রভাব হিন্দুধর্মের উপর আসিয়াছে পণ্ডিতগণের মত যখন এইরূপ তখন জিজ্ঞাসা করিতে হয় যাহারা এই প্রভাব বহন করিয়া আনিয়াছে তাহারা কাহারো?

এই প্রশ্নের অতি সহজ উত্তর দিয়াছেন কোন কোন পণ্ডিত। এই প্রভাব বহন করিয়া আনিয়াছে “অনার্য” দ্রাবিড় জাতি।

কিন্তু সিন্ধু উপত্যকা, বেলুচীস্থান ও পঞ্জাবে হরপ্পা হইতে যে সকল মনুষ্য করোটি, কঙ্কাল প্রভৃতি আবিষ্কৃত হইয়াছে সেগুলি পরীক্ষা করিয়া নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীগণ (কর্ণেল

সেওয়েল ও ডাঃ গুহ) যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে এমন একটি গোলমুণ্ড ও লম্বা-মুণ্ড টাইপের জাতির অস্তিত্ব সিদ্ধ উপত্যকায় ছিল যাহা-দিগকে পণ্ডিতগণ “আর্য” বা আর্যসম্পর্কিত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। পূর্বের এক প্রবন্ধে (বৈদিক ও অবৈদিক আর্য—প্রবাসী, কার্তিক ১৩৫৪) বলা হইয়াছে যে অবৈদিক আর্যজাতিকে পশ্চিম ও পূর্বভারতের গোলমুণ্ড জাতিগুলির পূর্বপুরুষ বলিয়া মত প্রকাশ করা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা পরে হইবে, এখানে নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী-দিগের উপরে উল্লিখিত মতের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইতেছে। এই মত গ্রহণ করিলে দাঁড়ায় যে, যে সিদ্ধ সভ্যতাকে প্রাক-আর্য ও প্রাক-বৈদিক বলিয়া বর্ণনা করা হইয়া থাকে সে সভ্যতার অভ্যুদয়ের যুগে আর্যজাতির সিদ্ধ উপত্যকায় উপস্থিতির সম্ভাবনা কোন বৈজ্ঞানিকের পক্ষে সরাসরি অগ্রাহ্য করা সম্ভব নহে। এই প্রসঙ্গে বলা আবশ্যক যে উপরে উল্লিখিত মতের একাংশ, অর্থাৎ যে গোলমুণ্ড জাতির ভারতবর্ষে উপস্থিতির পরিচয় সিদ্ধযুগে পাওয়া যায় তাহারা যে পশ্চিম ও পূর্বভারতের গোলমুণ্ড আর্যভাষাভাষী জাতিসমূহের পূর্বপুরুষ বৈজ্ঞানিক সমাজে এই মত গ্রাহ্য হইয়াছে।

ইহা একটি আশ্চর্য ব্যাপার যে এই মত গ্রাহ্য করিবার পরেও সিদ্ধ উপত্যকায় যে সকল জাতির উপস্থিতির পরিচয় পাওয়া যায় তাহাদের মধ্যে কোন জাতি সিদ্ধ সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছিল তাহা বিচার করিতে গিয়া নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞানীদিগের কেহ কেহ এই গোলমুণ্ড ও আর্যভাষাভাষী (ডাঃ হার্টনের মত) জাতিকে উপেক্ষা করিয়াছেন।

সে যাহা হউক, দেখা যাইতেছে যে ধর্মের দিক দিয়া এবং জাতির দিক দিয়া সিদ্ধযুগ ও বর্তমান যুগের মধ্যে একটা সেতু রচনা করা সম্ভব। পণ্ডিতগণের হিসাব যদি খ্রীষ্টপূর্ব ৪র্থ বা ৩য় সহস্রক ও খ্রীষ্টাব্দের ২য় সহস্রকে, অর্থাৎ অনুন ৫০০০ বৎসরের ব্যবধানকে ধর্ম ও জাতির উল থিলানের সেতুর দ্বারা বর্তমানের সহিত সংযুক্ত করা সম্ভব হয় তাহা হইলে এই ব্যবধানের মধ্যে অবস্থিত খ্রীঃ পূঃ ২য় সহস্রকের বৈদিক যুগকে কি ভাবে উপেক্ষা করা যায়? বৈদিক ধর্মকে অতিক্রম করিয়া সিদ্ধধর্ম বর্তমান কালের হিন্দুধর্মকে প্রভাবিত করিয়াছে ইহা কল্পনা করা তাহাদের পক্ষেই সম্ভব যাহারা বৈদিক আর্যজাতিকে বৈদেশিক বলিয়া মনে করেন। কিন্তু আর্যজাতি যে খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় সহস্রকে ভারতবর্ষে বৈদেশিকরূপে প্রবেশ করে নাই উপরে উল্লিখিত নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীদিগের সিদ্ধান্ত তাহাই বলে। সুতরাং একথা পরিষ্কার করিয়া বলিবার সময় আসিয়াছে যে খ্রীঃ পূঃ ২০০০—১০০০ বৎসরের মধ্যে আর্যজাতি উত্তর-পশ্চিম এশিয়া

বা দক্ষিণ-পূর্ব রুশিয়া হইতে ইরান ও আফগানিস্থানের বা বেলুচীস্থানের পথে সিদ্ধ উপত্যকায় প্রবেশ করিয়া অনার্য আদিবাসীদিগকে বিতাড়িত করিয়া সেখানে আপনাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল—প্রচলিত এই মতবাদের মধ্যে যথেষ্ট গলদ রহিয়াছে।

এখানে এ সম্বন্ধে আর বিস্তারিত আলোচনার মধ্যে না গিয়া পণ্ডিতগণের কয়েকটি অভিমতের উল্লেখ করা হইতেছে। এই সকল অভিমত নির্দিষ্ট তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সিদ্ধযুগ ও বৈদিক যুগের মধ্যে যে সংযোগ ছিল এই সকল অভিমতের তাহা দ্বারা সমর্থিত হয়।

সর জন মার্শাল মোহেঞ্জোদারো ও হরাপ্পা যুগপাত্রে মৃত ব্যক্তির অস্থি সমাহিত করিবার প্রথা (fractional burials) হইতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে এই দুই নগরের আদিবাসীদিগের মধ্যে পশ্চিম হইতে আগত “বৈদেশিক লোক” (foreign elements) ছিল এবং এই প্রথা তাহারা অনুসরণ করিত। প্রসিদ্ধ নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী ডাঃ হার্টনের মতে এই বৈদেশিক জাতি ইরানের মালভূমি ও পামীর হইতে আসিয়াছিল। তাহার মতে খ্রীঃ পূঃ ৩য় সহস্রকে ইরান ও পামীর হইতে আগত এই জাতির দ্বারা সিদ্ধ সভ্যতা ধ্বংস হয়। তারপর তিনি বলিতেছেন, “Here it seems is the explanation of the break of continuity between the Indus vally civilisation and the arrival of the Rigvedic Aryans.” এই ইরানী ও পামিরী জাতিকে হার্টন দর্দিক (শিশাচ) ভাষাভাষী বলিয়া মনে করেন। অধ্যাপক ল্যাংডনের মতে ব্রাহ্মী লিপির উৎপত্তি হইয়াছে সিদ্ধলিপি হইতে। তিনি বলেন যে আর্যজাতি খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় সহস্রকে ভারতবর্ষে আসিয়াছিল অধিকাংশ বৈদিক পণ্ডিতের এই মত ভুল, খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় সহস্রকের বহুপূর্বে আর্যজাতি ভারতবর্ষে আসিয়াছিল এবং সিদ্ধ সভ্যতার বাহকদিগের সহিত তাহাদের সংযোগ স্থাপিত হইয়াছিল। আর্যজাতি সিদ্ধ সভ্যতার প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক ল্যাংডন স্পষ্ট করিয়া এই মত প্রকাশ করেন নাই।

রমাশ্রসাদ চন্দ মহাশয় তাঁহার *Indo Aryan Races* গ্রন্থে যে সকল মত প্রকাশ করিয়াছেন পরবর্তী কালে তাঁহার সেই সকল মতের অনেক পরিবর্তন হইয়াছিল। একস্থানে (*Memoir of the Archaeological Survey of India No. 41*) তিনি এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে স্বল্পেদে যে সকল গোষ্ঠীর (warrior tribes) উল্লেখ দেখা যায়, যথা, ভরত, পুরু, যতু, ইত্যাদি, তাহারা তাম্রযুগের সিদ্ধ উপত্যকার শাসকশ্রেণীর প্রতিনিধি (“representatives of the ruling class of the indigenous chalcolithic

population of the Indus valley")। আৰ্যজাতির প্রতিনিধি ছিল ঋষিকুলগুলি। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি প্রভৃতি দেবতার উপাসনার প্রচারকরূপে তাঁহারা ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া সিদ্ধ উপত্যকার এই সকল দেশীয় রাজ্যের আশ্রয়ে বসবাস করিতে আরম্ভ করেন। দেশীয় রাজত্বগোষ্ঠীকে তাঁহারা আৰ্য দেবতার উপাসনায় দীক্ষিত করেন। তিনি আরও মত প্রকাশ করিয়াছেন যে প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে যে যতির উল্লেখ দেখা যায় তাহারা ছিল সিদ্ধ উপত্যকায় প্রাক-আৰ্য অধিবাসীদিগের পুরোহিত শ্রেণী, ("priests of non-Vedic rites practised by the indigenous pre-Aryan population of the Indus valley.") বৈদিক ধর্ম প্রচারিত হইলে এই পুরোহিত শ্রেণী ব্রাত্য নামে পরিচিত হন। পণি নামক ঋগ্বেদে উল্লিখিত দক্ষা জাতি তাঁহার মতে তাম্র যুগের সিদ্ধ উপত্যকার বণিক শ্রেণীর প্রতিনিধি।

উপরে লিখিত চন্দ্র মহাশয়ের অভিমতের মধ্যে একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতে পারে। তিনি তাম্র-যুগের সিদ্ধ উপত্যকার অধিবাসীদিগকে প্রাক-আৰ্য বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন আবার ঋগ্বেদের প্রসিদ্ধ ভরত, পুরু, যদু প্রভৃতি গোষ্ঠীকে এই তাম্রযুগের সিদ্ধ উপত্যকার শাসক-শ্রেণীর প্রতিনিধি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার অর্থ এই সকল ঋগ্বেদীয় গোষ্ঠীও প্রাক-আৰ্য এইরূপ মনে হইতে পারে। হাটন, ল্যাংডন, হেডন, জিউফ্রিডা রুগ গেরী প্রভৃতি পণ্ডিতের মতে যে দরদ ভাষা (আৰ্য ভাষা)ভাষী-গোলমুণ্ড পামারী বা ইংগী জাতি সিদ্ধ সভ্যতার অভ্যুদয়ের যুগে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিল এবং *Inlo-Aryan Races* গ্রন্থে যাহাদিগকে অ-বৈদিক আৰ্য জাতি বলিয়া চন্দ্র মহাশয় বর্ণনা করিয়াছেন তাম্রযুগের সিদ্ধ উপত্যকার অধিবাসীদিগের কথা বলিবার সময় তিনি তাহাদিগকে তুলিয়া গিয়াছেন। ইহার একটি হেতু এই যে ইহারা তাঁহার মতে বৈদিক আৰ্যদিগের পরে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিল। নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত অরূপ এবং অধিকাংশ পণ্ডিত এই মত অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

সে যাহা হউক, উপরে উদ্ধৃত অভিমতসমূহ হইতে সিদ্ধ যুগ ও বৈদিক যুগের মধ্যে সংযোগ ছিল ইহা সহজে অল্পমান করা যায়।

জাতি, রাজত্বগোষ্ঠী ও অন্ত্যস্ত সম্প্রদায় (পুরোহিত ও বণিক সম্প্রদায়), ধর্ম এবং ভাষার দিক দিয়া সিদ্ধ যুগ ও বৈদিক যুগের মধ্যে যে সংযোগের কথা পণ্ডিতগণ বলিয়া-

ছেন, তাহার পর সিদ্ধ সভ্যতাকে প্রাক-আৰ্য সভ্যতা বলিবার কি বিচারসহ যুক্তি আছে? নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীগণ যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহার পর বেদসমূহ বা ঋগ্বেদ রচিত হইবার পূর্বে ভারতবর্ষে আৰ্যজাতি ছিল না এ কথা কি করিয়া বলা সম্ভব? প্রাক-আৰ্য ও প্রাক-বৈদিক যে একার্থবাচক নহে তাহা উপলব্ধি করা প্রয়োজন। তারপর বৈদিক ধর্ম ও ঋগ্বেদ বলিয়া যাহা পরিচিত আৰ্যজাতির প্রাচীন কৃতিত্বের তাহাই একমাত্র বা প্রথম নিদর্শন ইহা কি কারণে মনে করিতে হইবে?

সিদ্ধ যুগ ও বৈদিক যুগের যে সময় নির্দেশ করা হইয়াছে তাহার ভিত্তি যতটা অনুমান ততটা প্রমাণিত তথ্য নহে একথা বলা হইয়াছে। সিদ্ধ যুগ বৈদিক যুগের পূর্ববর্তী যোঁটামুটি এই মত গ্রহণ করিয়া অনুমানমূলক সময়নির্দেশের ফলে দুই যুগের মধ্যে যে কালনিক ব্যবধানের প্রাচীর তোলা হইয়াছে এই দুই যুগের মধ্যে বাস্তবিক এই প্রকার কোন ব্যবধান ছিল না এ কথা মনে করা যাইতে পারে। যদি তর্কের খাতিরে এই কথা স্বীকার করা যায় তাহা হইলে কি দেখা যায়?

আনুমানিক সন ও তারিখের উপর অন্ধ বিশ্বাস, ভারতবর্ষের প্রাগৈতিহাসিক আৰ্য এবং প্রাক-আৰ্য বা অনাৰ্য সভ্যতা সম্বন্ধে প্রচলিত মতবাদ ও আৰ্যজাতি সম্বন্ধে কতকগুলি বদ্ধমূল সংস্কার ত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষের সভ্যতা ও ঋগ্বেদের পরিচিত ইতিহাস হইতে অপরিচিত ইতিহাসের যে সন্ধান মিলে তাহার প্রতি দৃষ্টি ফিরাইলে উপলব্ধি করা যায় যে পণ্ডিতগণ ভারতবর্ষের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাহার দুইটি প্রাগৈতিহাসিক ঋগ্বেদ—সিদ্ধ ঋগ্বেদ ও বৈদিক ঋগ্বেদ—যে চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন তাহা নূতন করিয়া অঙ্কন করিবার প্রয়োজন হইয়াছে। এই নব অঙ্কিত চিত্রের পটভূমিতে দৃষ্ট হইবে হিমালয় ও হিন্দুকুশের তুষারমণ্ডিত শৃঙ্গসমূহ অতিক্রম করিয়া আমুদরিয়ার আবলগামী জলপ্রবাহ। দক্ষিণে সিদ্ধ-গান্ধেয় উপত্যকা ও উত্তরে অকসাস উপত্যকা এই সীমানার মধ্যে মধ্য-এশিয়া বা ব্যাক্টিয়ার সভ্যতা, সিদ্ধ সভ্যতা, বৈদিক সভ্যতা ও আবেস্তিক সভ্যতার উদ্ভব হইয়াছিল। এই সকল সভ্যতার সম্মেলনের ফল ফুটাইয়া তুলিতে হইবে এই নব অঙ্কিত চিত্রে। পূর্বগামীদিগের অপ্রমাণিত বা যথেষ্ট সিদ্ধান্তের গুরুত্বের যাহাদের কল্পনা-শক্তি ও অনুসন্ধিৎসা পিষ্ট ও ক্লিষ্ট হয় নাই সেই সকল নবীন পণ্ডিতকে এই কার্যে অবহিত হইতে হইবে।

আজ—আগামী কাল

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

৭

অতীতকে সম্পূর্ণ মুছে ফেলে—নতুন করে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করা—সকল বাক্য আর কার্যে অনেকখানি তফাৎ।

প্রশান্ত পথ চলতে চলতে ডাবহিল, চাকরিটা ছেড়ে দিয়েও উপার্জনের চিন্তা মন থেকে যায় না—এ বড় আশ্চর্য্য। যে বিজ্ঞা সে অর্জন করেছে—তার মূলে রয়েছে এই প্রেরণা। না হলে হাতে কলমে সে এমন কিছু শিখল না কেন—মা বইয়ের হরপের চেয়ে বেশী কার্য্যকরী। স্থূল সংসারকে অগ্রাহ্য করা চলে না—যেহেতু ক্ষুধা-তৃষ্ণা-আরাম-শয়নের দাবি দিয়ে দেহ প্রতি দণ্ডে মানুষকে ভাঙনা করছে। তার দাবি মিটিয়ে যে উদ্বৃদ্ধ সময় পাওয়া যায়—তাই নিয়েই তো জ্ঞানের বড়াই ভাল লাগে।

দুর্গামোহন এই ভাবের রুঢ় কথা বলবেন—সে অহুমান করা কঠিন নয়। নিজ উপার্জনের উপর আশ্রয় না করলে—পৃথিবী সত্যাকার রূপে বারবার দেখা দেবেই। স্নেহ-ভালবাসার রঙীন উত্তরীয়ে নিজেকে শোভন করে রাখা সহজ ততক্ষণ—যতক্ষণ না বড় উঠে সব বিপর্য্যস্ত করে দেয়। যে কোন প্রকারে উপার্জনের দায়িত্ব নিয়ে সংসার প্রতিষ্ঠার আশ্রয় কল্পনা তার ছিল না—অথচ দৈবচক্রে সংসার গুটিয়ে আসছে তার চার দিকে।

কালও শুভার সঙ্গে তার কথা হয়েছে। নীড়-বাঁধার তাগিদ কোন দিক থেকেই নেই—তবু ছোট মত একটি বাসা চাই। শুভা করবে উপার্জন—সেও বলে থাকবে না। কি কি দিয়ে সাহায্যে গৃহ—কোণার কোন্ জিনিসটি রাখলে মানাবে—তার একটা ছক প্রশান্ত মুখে মুখেই দিতে পারে।

শুভার তাতেই আপত্তি। এই নিয়ে ও বহুবাব পরিহাস করেছে। বলেছে, কমরেড, খুব বড় ঘরের ছেলে তুমি নও—তবু বুজোয়া মনোভাব তোমার কেন?

প্রশান্ত জবাব দিয়েছে, নিজস্ব একখানি ঘরের দাবিকে তুমি কি বলতে চাও—

হেঁদে জবাব দিয়েছিল শুভা, কিছুই বলব না কমরেড। যত সামান্যই হোক—পুঞ্জির বাজ যেন মনের মধ্যে না থাকে। আমাদের সাম্যবাদের স্লোগান—ঘনীদের হিংসা করে তৈরি হয় নি—নিজেদের শুদ্ধ করে নেবার মন্ত্র ওট। ওদের ঘন ঘুটিয়ে নিজেদের আরাম চাই না আমরা—সমস্ত জগৎকে অসাম্য থেকে বাঁচানোই হচ্ছে আমাদের নীতি।

তা কি করে হবে। ঘনটা কমিয়ে না বাড়িয়ে অসাম্য দূর করবে? ঘন কমবে কেন—বাস্তবিকতায় মুনাফা শুধু থাকবে না। তোমার মোটা দেহের চর্কি বৃদ্ধি করতে আমরা দেহের

রক্ত ব্যয় করব কেন। তোমরা চড়বে মোটর আমরা পড়ব তার তলায় চাপা—এ কেনন বিধান কমরেড?

তা হলে-সকলের একখানি করে মোটর থাকুক এই চেষ্টাই করতে হবে তো?

না কমরেড, মানুষের মনের খবর ধারা জানেন তারা বলেন—মনকে রাখতে হবে লোভের সীমানার বাইরে। বাস্তবিকতায় আরাম বিলাস একটুতেই মানুষকে পেয়ে বসে—ওটা একেবারে বাড়তে না দেওয়াই ভাল।

মানুষের স্বত্তিকে হেঁটে ফেলবার ব্যবস্থা। এতে তোমরা স্বস্তি পেতে পার—জগৎ স্থব্র থাকবে তো।

কেন?

এই ঘর, প্রতিষ্ঠাহীনতার পর্য্যায় যদি প্রতিষ্ঠাবানদের ফেলা যায়—জগৎ আবার পিছিয়ে যাবে না কি।

তুমি হাসালে—প্রতিভাকে অস্বীকার করবে কে? সোভিয়েটে এর প্রথম পরীক্ষা কি হয় নি? সোভিয়েট কি পিছিয়ে পড়েছে জগতের অগ্রগতি থেকে।

তাকেও অনেক জিনিস বর্জন করতে হয়েছে তো যা তোমাদের নীতিভুক্ত ছিল না।

তাও না। নীতির পরিমার্জন মানে আত্ম বদল নয়। পরীক্ষার কষ্ট-পাথরে যাচাই না করলে কাজের সোনাটুকু বার করবে কি করে।...একটু ধৈর্য বলেছে, তোমার পৃথিবী তোমার ক্ষমা করবে না কমরেড যদি নীতিকে কষে মেজে জীবনযাত্রার উপযোগি করে না নাও। ছোট ঘর বাঁধবার আশ্বাস দিয়েছ কিন্তু—বড় ঘর যখন ডাক দেবে তখন সে ঘরের মায়া তোমাকে ছাড়তেই হবে। ঘন হচ্ছে নদীর জল ওকে কোথাও আটকে রাখলে চলবে না।

তা হলে মোটর থাকবে না কারও? পরিহাসের ভঙ্গিতে প্রশান্ত কথাটি উচ্চারণ করেই হেসে ফেলেছে। শুভাও হেসেছে সেই সঙ্গে।

না—না প্রশান্ত, আমাদের মতো মরিচে চাহি না আমি স্বন্দর ভুবনে—মানুষের মত বেঁচে থাকিবারে চাই। একটু পরিবর্তন করলাম—মানেটা স্বচ্ছ হ'ল না?

হাঁ, যে মানুষ কীর্তিহীন তার পক্ষে যথেষ্ট স্বন্দর বলা যেতে পারে।

একটু একটু করে এগিয়ে এসেছে প্রশান্ত। শিরায় তার নীল রক্ত ছিল না কিন্তু নীল রক্তের মোহ তো ছিল যথেষ্ট। যে বিজ্ঞা সে সঞ্চয় করেছে—উপকথা শুনে দৃষ্টান্ত ঘুমে স্থব্র সৌভাগ্যের নিরিখ নির্ণয় করে—তারই মাঝে আত্মনিমজ্জন করা সহজ ছিল না কি! একটু চেষ্টা—হয়তো বিশেষভাবে

চেহা—তা কে না করে থাকে। উচ্চপদ, অট্টালিকা, মোটর, ব্যাঙ্ক-ব্যালাস, কেশবতী রাজকন্ঠা, সোনার পালঙ্ক, এর মধ্যেই তো রয়েছে সাম্রাজ্যবাদের ছোট্ট একটি বীজ। এর মধ্যেই কি ছিল না জীবনের শ্রেষ্ঠ কামনা—চরম স্বর্গবাস কল্পনা? তবু সে কেন থেকে সরে এসে কিসের প্রেরণায়? শুভার?

প্রশান্ত অস্বীকার করে না—যৌবনের নীতিকে। সেই সঙ্গে অস্বীকার করে দেহগত বিলাসকে। দ্বিতীয় মহামুদ্রের সর্বোত্তম পরীক্ষা হয়ে যায় নি কি সোভিয়েট রণভূমিতে? ক্যাসিবাদকে ধ্বংস করতে ওরা ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করেছিল। সে ব্রহ্মাস্ত্র সহস্রালব্ধ কোন দিব্যাস্ত্র নয়—রীতিমত তপস্যার দ্বারা আয়ত্ত করতে হয়েছে। কত বিপ্লব—কত অনর্থপাত, জুলজ্যা বাধা আর রক্তনদী অতিক্রম করে একে আয়ত্ত করতে হয়েছে। একটি অনগ্রসর বহুজাতি অধ্যুষিত, বহুধর্ম ও কুসংস্কার পোষিত দেশে যা সম্ভব হয়েছে—পৃথিবীতে তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত না বলে অগ্রাহ্য করবে কে? তবে এ কথা ঠিক, এক মাটিতে যে গাছ যে ফল প্রসব করে অল্প মাটিতে তার তারতম্য ঘটবেই। যারা জানী ওণী তাঁরা মূল নীতিকে অস্বীকার করেন না; উপযুক্ত সার দিয়ে আবহাওয়াকে অহুকুল করে সামান্য অদল বদল করে কসলকে তাজা রাখবার চেষ্টাই করে থাকেন। প্রশান্তর প্রথমটা মনে হয়েছিল—মামুষের জয়গত বৃত্তি হিংসাকে সহজে লাগান করা যায় বলেই বৃত্তি সাম্যবাদকে সে অত শীঘ্র মনে নিতে পারলে। চিন্তাটার তলায় কিছু সত্য যে যেই তা নয় তবে ওগুলিকে সাধনার পথে বাধা বলে জয় করার চেষ্টা করতে ক্ষতি কি। ক্রমে সত্য আলোকের পুণ্যভূমিতে সে পৌঁছবে আশা হচ্ছে। সন্দেহ এখনও লেগে রয়েছে মনে—জয় সম্বন্ধে সন্দেহ নয়—প্রকৃত কল্যাণ বা সত্য এই পথে লাভ হবে কিনা এবং এই নীতিতে আত্মবান পৃথিবী স্বর্গভূমি হয়ে উঠবে কিনা। একই সন্দেহ থেকে যায় বই কি। কার্দ্দানী থেকে নাংসীরা ইহুদি বিভাডন সম্পূর্ণ করে ভেবেছিল—যুদ্ধ জয়ের বাধা সম্পূর্ণরূপে অপসারিত হ'ল। গায়ের জোরে মামুষকে কোন কিছুতে আটকে রাখা—তা সে যতই কল্যাণ-প্রসু ও উত্তম প্রথা হোক—সম্ভব নয়। হু ও হু প্রবৃত্তির দ্বন্দ্ব জীবন দোলায়িত। চির শান্তি—জীবনকে অস্বীকার করার আর একটি স্বাদহীন শোভাহীন বৈচিত্র্যহীন দিক নয় কি। তা ছাড়া রক্তবাদলোলুপ বৃত্তিকে বিলুপ্ত করতে হলে আরও কঠিন ও বৃহত্তর পরীক্ষা দিতে হয়।

শুভার প্রতি মোহ—যার জন্ম এই নীতিতে তার অহুরাগ বেড়েছে—এটা ঠিক নয়। যে নীতিতেই সে বিশ্বাস করুক—যৌবন তার ধর্ম পালন করবেই। আর যৌবন তার ধর্মে যে প্রভাব বিস্তার করে তাতে চোখ কান বুজে ঝাঁপ দেওয়াকেই বলে মোহ। এমন মোহ মনের কোথাও ছায়াপাত করে নি। শুভা যদি বলত—একশো টাকার চাকরি না ছাড়লে আমার পাথে না—তা হলে ধোলা চোখে মোহের একটি রূপ দেখা

যেত। ওরা বলে না যে চাকরি করো না—শুধু বলে ধন উপার্জনে সঞ্চয়ের নেশা যেন না লাগে। তর্ক হয়েছিল পুঁজি-বাণীর চাকরি করে পুঁজিবাদকে ধ্বংস করার চেষ্টা চলে কি না। চলবে না কেন। টাকাটাকে অস্বীকার করছে না কেউ—জীবন যাত্রার মানে ওট অপরিহার্য বলে—কিন্তু মামুষের প্রতি মামুষের যে অচ্যুত অত্যাচার—যে লোভ বহু-জনকে নামিয়ে একজনকে উঁচুতে তোলে—বহু অস্থিচূর্ণ সাত্রে পরিবর্তিত একটি সুন্দর গোলাপ গাছ—এ কোন কল্যাণ-কামীই চাইবে না। একে ধনীরা প্রতি ধনহীনের হিংসা বলে না—মামুষের জাতি অধিকারে বেঁচে থাকবার সহজ ও সুসদত একটি দাবি।

তবু সে চাকরি ছেড়ে দিলে। চাকরি অসহ বোধ হ'ল। চাইবৃত্তি—দাসমনোভাব সকলের ঘাতে নয় না। হু'গুরুষের বৃত্তি—বন্দীর বন্দনা ছাড়া কি। আপিসকে প্রথমটা মনে হয়েছিল—নিরাকার একটি প্রতিষ্ঠান। বনিকতাবাদের উদ্ভূত অর্থমিকার লেকচারও দুর্গতিকে বাড়িয়ে না বরং বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টাই করেছে। কিন্তু সে প্রতিষ্ঠানের চাকর্য তেল দিতে গিয়ে বুকে দেহের রক্তকে বিস্তৃত রাখা সম্ভব নয়। এই প্রতিষ্ঠানের মূলে—সহস্রটা শিকড় রয়েছে, রস শোষণ-ক্রিয়া চলেছে অলক্ষিতে। অত্যন্ত শান্ত ও নিয়মানুগ বিভাগ—তবু কিছুদিন আগে নিরুপায়ের শেষ অস্ত্র ধর্মঘট ঘোষণা করেছিল। ধর্মঘট সাকল্য লাভ করে নি। পুঁজিবাদ হু'র কোশলে ভেদনীতির প্রয়োগে তা ব্যর্থ করে দিয়েছে। একটা লাভ হয়েছে এই যারা মাসমাহিনায় চোখ বুজে হু'র অভাবকে ঘাড় দিয়ে মনে করত ভগবানের দান—কর্মকল—কিংবা অলুঠ—ভায়াও এইটুকু বুকে যে মামুষ অনেক কিছুই নির্জিবাদে স্বীকার করে আর নির্জিচারে মেনে নেয় বলেই সেগুলি চিরকালের সত্য নয়। আর একটা মহৎ শিক্ষা তারা পেয়েছে যে—সব জায়গার নির্ধাতিভরাই এক গোত্রের। স্বদেশী হোক কিংবা বিদেশীই হোক—বনিকদেরও গোত্রভেদ নেই। দুই গোত্রকে সমভূমিতে দাঁড় করাবার চেষ্টাই হ'ল সাম্যবাদের মূল নীতি।

এসপ্ল্যানেডে শুভা অপেক্ষা করছিল। প্রশান্তকে আসতে দেখে চীৎকার করে বললে, হালো কমরেড—এত ভাবছ কি? ধর একটা ঠিক করলে বৃষ্টি?

প্রশান্ত রান হেসে বললে, তা করলাম। আকাশ তার আচ্ছাদন।—কুলোবে না আমাদের হু'জনকে?

শুভা বললে, অবশ্য। কিন্তু তবু পেয়েছ মনে হচ্ছে।

প্রশান্ত বললে, পিতৃবিত্তের যত নিম্নাই করি—আহারভোজ আচ্ছাদন থেকে সে যে নিশ্চিত করে রাখে।

শুভা বললে, নিজের উপর নির্ভরতা কবে গেলেই মামুষ সব দিকে উপায়হীন মনে করে। নিজেকে হু'টি করে নাও না কমরেড—জীবনে সম্পদ কিছুমাত্র কমবে না।

না শুভা—পূজিবাদ যে ক্ষাতেরই হোক—বিষবৎ পরিত্যাজ্য।

হু'জনে হেসে ঘাসের ওপর বসলে। মাধার ওপর একটি পুষ্পাকীর্ণ অজানা গাছ ছায়া বিস্তার করেছে—হুপূরের রোদ গরম লাগছে। ওদিকে চলছে ট্রাম—বিদ্যুৎবাহিত রঙ করা কভারগুলি সন্ন্যাসের মত একেবেঁকে চলছে—এদিকে অতিকায় বাস—আর মন্থন গতি মোটর। রাজকীয় উজান পরিষ্কর্য্য এর। পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমেছে।

ব্রিটিশ পতাকা লাঠিভবনের মাধার পত পত করে উড়ছে।

সামনের ও হু'বারের সৌধশ্রেণীকে—ট্রামকে, মোটর ও অতিকায় বাসকে প্রতিযোগিতায়—উৎসাহিত করেছে। এদের সৌভ্রাতৃকে ধাপড জানাচ্ছে আরও উপরের আকাশ। ঘাসের আসনে বসে শুভা বললে, পরিত্যাগ করলে তোমার বাহাহুরিটা কি। ওদের জয় করে নিজের করে নিতে হবে।

আপাতত আমায় আশ্রয় দাও।

শুভা বললে, দিলাম আশ্রয়। তবে এ আশ্রয়ে এলে নিজেকে মনে রাখলে চলবে না কয়েকট।

শুভা পরিহাস করছে মনে করে প্রশান্ত সব বুলে বললে।

শুভা বললে, ওঠ।

প্রশান্ত উঠলে।

শুভা তার হাত ধরে বললে, এস।

কোথায়?

শুভা হাসতে হাসতে বললে, রাসাতলে।

চ

জয়গাচী রাসাতলের কাছাকাছিই বটে। চন্দ্রস্বর্ধ্য-লাগিত এক গলির গহ্বরে নোনাধরা স্নাতস্নেতে দেওয়াল-ঘেরা একখানি বাড়ি। এমন জীর্ণ বাড়ি কি করে যে পৌর আইনকে বৃদ্ধান্ত দেখিয়ে আজও ষাড়া রয়েছে ভাবলে আশ্চর্য্য হতে হয়। অথচ সে বাড়িতেও মানুষ বাস করছে।

শুভা বললে, আমার একটি অহুসোহ—এখানে যা কিছু চোখে পড়বে তাতে আশ্চর্য্য হবে না—কোন কথা জিজ্ঞাসা করবে না। শুধু জানবে পৃথিবীতে এমন অনেক জিনিস আছে যা তোমার কল্পনার বাইরে। অথচ তা সত্য।

অলিভার্স বুদ্ধের মত সিঁড়ি একটা পাওয়া গেল। কিন্তু একতলার সঙ্গে দোতলার পার্থক্য খুব কম। সেই পলস্তরা-বসা হীট-বার-করা দেওয়াল—দেওয়ালের গায়ে জল চুইয়ে পড়ছে—হু' পাশের বাড়ির পক্ষপুটে ঢাকা পড়ে শীত না থাক। সত্ত্বেও বাড়িখানা ঘেন কাঁপছে। ব্যারিগ্রন্থ বাড়ি।

ওরই মধ্যে চওড়া একখানি ঘরে প্রবেশ করে শুভা বললে, বস।

প্রশান্ত ইতস্ততঃ চাইলে—বসবে কোথায়। ঘরের অগ্রচর আলো ভেদ করে দৃষ্টি বেশী দূর অগ্রসর হচ্ছে না। মনে হচ্ছে একটুও জানালা নেই—আলো আসবে কোন্ কীকে।

শুভা ওর হাত ধরে মেঝের ওপর বসালে। একটা মাহুরের ওপরই বসলে—যদিও সেটার চেহারা স্পষ্ট নয়। শুভা ডাকলে, নানিয়া রে—

একটা যোমবাতি নিয়ে আবহুড়ি গোছের একটি মেয়ে ঘরে ঢুকলে। বাড়িটা মেঝের বসিয়ে বললে, নেটুর বোখার হয়েছে দিদিজী। বহুং তাঁত আছে—

আচ্ছা আমি যাচ্ছি।

মেয়েটি চলে গেলে প্রশান্ত জিজ্ঞাসা করলে, ওট কি কি? কি। এই বাড়িতে কি রাখা চলে—না আমাদের কি রাখা সম্ভব।

শুভার হাসিতে অপ্রতিভ হয়ে প্রশান্ত বললে, কিন্তু ওতো বাদালী নয়।

বাদালী পরিবারের সঙ্গে এক হ'ল কি করে এই চাইছ জানতে? একটু বিশ্রাম কর সব জানতে পারবে।

প্রশান্ত ঘরের চারি দিকে চাইছে দেখে হেসে বললে, পছন্দ হয় তো এই ঘরখানি নিতে পার। বাড়ির এক টেব্রে—কেউ তোমায় বিরক্ত করবে না।

প্রশান্ত মনে মনে বললে, সব সময়ে মাহুইই মাহুকে বিরক্ত করে কি।

এই ঘর—কারাক্ষের সঙ্গে ভার সাক্ষাৎ পরিচয় নেই তবু এর চেয়ে নিষ্কণ্ট বন্দীনিবাস কল্পনাতে আসে না। এ ঘরের কোন দিকে একটি মাত্র দরজা ছাড়া আর কিছু নেই কেন। ঘরে দিনের বেলায় আলো জ্বলে পরিচিতকে সন্ধ্যায় না করলে ভ্রত্ভতার বাধে। সুস্থ মন বা সুস্থ দেহ নিয়ে এ আশ্রয়ে একটি রাজি কাটানো দুর্কর।

শুভা বললে, এ ঘরটি পৃথিবীর আরও বহু অকল্পিত আশ্চর্য্য জিনিসের অন্তর্গত। অথচ এদের পারহার করবার উপায় নেই।

অসাম্যের এই রূপ প্রশান্ত কখনো দেখে নি। এ বস্তু অকল্পিতই বটে। সে বললে, চল না ছাদে গিয়ে বসি।

ছাদ। এত বড় বিলাস আশা কর তুমি কয়েকট।

তবে মাহুই থাকে কি করে এখানে। সান্ধ্যের প্রশান্ত প্রশ্ন করলে।

শহরের পথ নিরাপদ নয় বলে।

বুড়িটা ছুটি ঠোঙা নিয়ে ফিরে এস। বললে, লাই চান। আছে দিদিজী। ঠোঙা ছুটি মাহুরের ওপর নামিয়ে দিলে।

নাস্তা কর, কয়েকট—বুড়ি আর ছোলা। একটা ঠোঙা সে ভুলে নিলে।

প্রশান্ত তবু সহজ হতে পারছে না। এই ভাবের জীবন যাপন—সে পারবে কি? এ বাড়িতে আলো রোদ নেই—আকাশ দেখা যায় না, শুধু নোনাধরা নির্ধন ইটের দেয়াল চার ধারে শাঙ্গীর মত ষাড়া হয়ে পাহারা দিচ্ছে।

বললে, তুমি নিশ্চয়—এই বাড়িতে থাক না শুভা?

• পিঠোপিঠি ঘর। এ ঘরেও একখানি খাটের পাতা, তবে খাটির ওপর কেউ শুয়ে নেই—মেঝেতে বসে এক বর্ষায়সী কি যেন করছিলেন। শুভা ডাকলে, মা। এই এরই কথা তোমার বলেছিলেন—প্রশান্ত।

প্রশান্ত অদূরেই দাঁড়িয়ে রইল—প্রথম পরিচয়ের ক্ষেত্রে একটা প্রণাম—অন্তত কিছু সম্বোধন করা উচিত এ তার মনেই হ'ল না। বর্ষায়সী এদিকে মুখ ফিরিয়ে যুহুযরে কি যেন বললেন—প্রশান্ত অর্ধহীন দৃষ্টিতে তাঁর পানে চেয়েই রইল। বর্ণহীন, অবয়বহীন এমন অস্থি-কাঠামো তার চোখে পড়ে নি এর আগে। যুহুয লাভণ্য মারীচিকে নিঃশেষিত—জতে বা চোখের পাতায় নেই লোম—গুণস্থিতে চোখ দুটি অপ্রকট—প্রৈতিনী ছাড়া এ যুগ্মিকে কিছু বলা যায় না।

বর্ষায়সী হতবাক প্রশান্তর মনোভাব বুঝলেন কিনা—কে জানে। শুধু বললেন, হেলেকে ও ঘরে নিয়ে গিয়ে বসা—কিছু খেতে দে

ওঘরে মানে আগের ঘরখানিতে। প্রশান্তই এবার প্রথম পা বাড়ালে। মনে হ'ল আগের ঘরখানি এ বাড়ির মধ্যে সত্যিই ভাল। ঈষৎ প্রশান্ত বলে নয়—নির্জন বলেও নয়—জীবনের বিকৃত রূপ ওখানে অন্ততঃ চোখে পড়বে না—এই আশ্বাসে ও কৃত পা চালালে।

শুভা বললে, আন্তে হাঁটু প্রশান্ত—এ বাড়ি সহজ মানুষের পক্ষে গুরুপাক ভো বটেই।

শুভা হাসলে কি নিঃশব্দে? হাহুক। বাড়ির সঙ্গে নতুন পরিচয়টা কোন দিক দিয়েই ভদ্রতার গুণিতে বাঁধবার উপযুক্ত নয়। স্থল্লির মাঝে স্থল্লিছাড়া এই সব বস্তু—এরা মানুষের সহজাত আচার-ব্যবহার আদর-আপ্যায়ন এ সব দাবি করতে পারে না নিশ্চয়।

আগেকার ঘরে ফিরে আসতেই জীবনের আভাস পাওয়া গেল। দশ-বারো বছরের একটু মেয়ে কোন অন্ধকারের গহ্বর থেকে বেরিয়ে এল। বেরিয়ে এসে সে শুভার কোল বেঁধে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে প্রশান্তর পানে চেয়ে অশ্রুটর বসলে, দিদি—

শুভা হেসে বললে, তোর দাদা—প্রণাম কর খুক।

মেয়েটি সসঙ্কোচে এগিয়ে এসে প্রশান্তর পায়ে হাত রাখলো। প্রশান্ত তাকে দু'হাতে তুলে ধরতেই ও কলকণ্ঠে হেসে উঠল। সেই হাসিতে যুহুযুরী নিম্নকতা ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে কোথায় ছিটিয়ে পড়ল—প্রশান্ত ফিরে এল জীবনের রাজ্যে।

২

ক্রমশ সহজ হয়ে এল পারিপাশ্বিক। গভীর অন্ধকারে পথে নামলে প্রথমটা নিখাস রোষ হয়ে আসে দৃষ্টি অন্ধকারে থাকে খেয়ে ফিরে আসে—এক পা এগিয়ে যাওয়া প্রায় অসম্ভব বোধ হয়—সে মাত্র কয়েক দণ্ডের ব্যাপার। তারপর দৃষ্টিতে

সরে যায় অন্ধকার—অন্ধকার তরল হয়—যুক্ত প্রান্তর হাত-ছানি দিয়ে ডাকে রহস্যপূরীর অভিমুখে। একবার চলা শুরু হলে সঙ্কোচ ভয়, ইতস্ততঃ ভাব কিছুই বাধা জন্মায় না।

তবু একটা কিছু করা দরকার। সংসারে ভার হয়ে থাকলে চলে না। এটি পরের দিন সকালে মনে হ'ল।

পরের দিন সকালে সবে ঘুম ভেঙে সে উঠে বসেছে বিহানায়—শুভার মা এসে দাঁড়ালেন ঘরের সামনে। ওঁরা এ ঘরে বড় একটা আসেন না।

তাড়াতাড়ি বিহানা থেকে উঠে ও জিজ্ঞাসা করলে, আমার কিছু বলছেন?

শুভার মা বললেন, একটা টাকা দিতে পার বাবা—শুভা কোথায় বেরুল—সে এলেই দিয়ে দেব।

কয়েকটি টাকা মাত্র পকেটে আছে—তা থেকে একটা টাকা অন্যায়সে দেওয়া যায়। তার নিজের খরচও তো আছে। কিন্তু টাকাটা ধার দেওয়ার মত করে চাইলেন কেন শুভার মা। উনি কি জানেন না—শুধু কয়েক দিনের ক্ষণ প্রশান্ত এ বাড়িতে বাস করতে আসে নি।

টাকাটা দিয়ে আরও তার মনে হ'ল—উপার্জন চাই বইকি। সাম্যবাদী হওয়ায় আপত্তি করবে না কেউ (বাবা-মায়ের কথা বাদ দেওয়া যাক—ওঁরা নিজ স্বার্থবিরোধী যে কোন সংকাজেই আপত্তি তোলেন।) কিন্তু যে নীতিতেই আত্মবান থাকুক—অলস হয়ে বসে থাকলে যুগে প্রবিশস্তি যুগাঃ হয় না। জীবন রাখতে জীবিকা বেছে নিতেই হবে। রেজিগনেশন-পত্রটা আপিসের উর্দ্ধতন কর্মীর কাছে যদি না পৌঁছে থাকে তো ফিরিয়ে নিতে হবে। আত্মসম্মানে বাধবে? সেখানে কিংবা এখানে সর্বত্র আত্মসম্মানকে অক্ষুর রাখা চলে না।

শুভা এলে সে বললে, আমি যদি আপিসের চাকরিটা ফিরে পেতে চেষ্টা করি—অভার হবে কি?

শুভা বললে, নিশ্চয় নয়। বাঁচবার দাবিটা আমাদের জন্মগত দাবি।

প্রশান্ত ইতস্তত করে বললে, একবার রেজিগনেশন দিয়ে—

শুভা বললে, পুরাতন বৃত্তিকে শেষ করে দাও কমরেড। মান-সম্মান ভক্তি ও সব নতুন পৃথিবীতে মানাচ্ছে না—অনেক দিনের পুরনো জিনিস।

প্রশান্ত বললে, তাই বলে মানুষ আত্মসম্মান বিসর্জন দেবে?

শুভা বললে, আত্ম-সম্মান তো পরের কাছ থেকে ধার করা জিনিস নয় যে নষ্ট হবে। যা তোমার মনের সঙ্গে জড়িয়ে বেড়ে উঠেছে—তা মনেরই জিনিস, কিন্তু কমরেড, বড় সাংঘাতিক জিনিস ওই আত্ম-সম্মান। ওকে যতই বাড়তে দেবে—অহঙ্কার ততই প্রবল হবে। সামাজিক মূল্য আদায়ের চেষ্টা করে যারা ওই আত্ম-সম্মানের দাবি জানিয়ে তাদের মনোভাব জনকল্যাণ-প্রবৃত্ত নয়।

প্রশান্ত বললে, পথের ধুলোর সব মিশিয়ে হীন হয়ে যাওয়া সেও তো ভাল নয়।

কে করবে কাকে হীন। বিত্ত নিয়ে এক দিন সমাজবিধান তৈরি হয়েছিল—শ্রেণী বিভাগে বৃত্তির বা প্রতিভার ইতরবিশেষ প্রভেদ অধীকার করি না—কিন্তু বিত্তবানেরা কি তথাকথিত মর্যাদা মান পূজা ভক্তি এ সবার বিধান দেন নি? তাঁরা পৃথক হয়ে গড়লেন রাজাকে—দেবতাকে। শ্রেণী ভাগ হ'ল। আরম্ভ হ'ল মানুষের হুঃখ-হুঃখ।

প্রশান্ত বললে, আজ এসব তর্ক করব না—মানুষের বিধি-বিধানে যথেষ্ট গলদ ছিল বলেই এতবড় প্রমাদ ঘটতে পেরেছে আজ। এসব দূর করা কর্তব্য এও বুদ্ধি, কিন্তু পুরাতন জিনিস মাজেই যে ধারাপ এ সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

কি জানি কমরেড—শ্রেণীস্বার্থ—বাস্তবস্বার্থ থেকে দানা বেঁধেছে। শুভা দুয়ারে দুটি টোকা মেরে হাসলে। পৃথিতে বিধানকে আটকে ফেলতে পারলেই—ব্যবস্থা পাকা হয়ে গেল—কিংবা অপৌরুষেয় কিছু লাভ করলাম এ তাবা উচিত নয়। দেশের সঙ্গে দেশ মিশছে—মহাদেশে—মহাদেশে আজ কোলাহুলি—পৃথিবীর বিস্তার কমে যে এসেছে সে তো অস্বীকার করে লাভ নেই। নানান দেশের সেরা মানুষরা চেষ্টা করছেন কিসে মানুষ স্বহৃৎ থাকতে পারে—স্বচ্ছন্দে চলতে পারে—বার বার যুদ্ধের নামে যে নরহত্যার অভিনয় হয়—তা থেকে নিষ্কৃতি লাভ করতে পারে। সত্য কিনা?

প্রশান্ত বললে, যাই হোক—ভূমি বলছ পুঁজিবাদীর দুয়ারে বর্না দিতে আমার লজ্জা হওয়া উচিত নয়।

শুভা বললো, যা তোমার প্রাণ্য—তা আদায় করতে দিবা করবে কেন? পুঁজিবাদকে ধ্বংস করতে হলে তার মধ্যে না নিয়ে উপায় কি। দূর থেকে আগুন জ্বলছে দেখে হায় হায় করা—আর ভাল ভাল স্লোগান আউড়ে—জনযুদ্ধ জয় করা—একই ধরনের।

তর্ককে চালিয়ে যেতে উৎসাহ আসছে না। মনের সন্ধানে অটুট থেকে প্রশান্ত বললে, একবার যুঁকে আসি।

ব্যাগে কয়েকটা টাকা ছিল—সোজা গিরে উঠল একটা মাঝারি গোছের রেন্টোররী। একই রাজিতে দ্বিহবার রুচিবোধ প্রবল হয়ে উঠেছে।

অনেক ঘুরে সে এল আপিসের সামনে। কত লোকই স্বচ্ছন্দে গোল গবুজশোভিত আপিসের বিরাট জুঁরে প্রবেশ করেছে—বেরিয়ে আসছে। রামায়ণের একটা বর্ণনা মনে পড়ল। নিদ্রিত কুন্তকর্ণের বিরাট দেহ ঘুমে অচেতন—তার ব্যাদিত বদনের মধ্যে নিশ্বাসের টানে যে সব প্রাণী যুহুর্ভেকে অদৃষ্ট হয়ে যাচ্ছে—তারাই নাসিকা-ও শ্রবণ-হ্রদ পথে শ্রোতের মত বার হয়ে আসছে। বস্ত্র গ্রহণ ও বর্জনের লীলায় নিদ্রা ভালই ক্ষমেছে কুন্তকর্ণের। জি. পি. ও'র গোল গবুজ ওয়ালা সাদা বাড়িটাকে তেমনি মনে হচ্ছে। সময়ের সঙ্কেত তার তিন

পিঠ ওয়ালা বাড়িটার—তিনটি বুজু জু চোখে—যারা আসছে আর যারা যাচ্ছে—তাদের লেহন করছে—ওর বিরাট জুঁরে যারা উদযান্ত কলম চালনা করে—তারাই কি স্বাভাবিক পরিপুষ্ট করছে না কুন্তকর্ণকে। রাজকীয় উপচারে কুন্তকর্ণের দেহে জমছে মেদ—চোখে জলছে বিশ্বাসী ক্ষুধা—নিশ্বাসে বেজে চলেছে কালের জয়ডরা—কত এল আর কত গেল—এক পুরুষ—দুই পুরুষ—বহু পুরুষ রাজ্যস্বত্বের প্রমাণ রেখে গেল—ধুলো-জমা পুরাতন ফাইলে তাদের জাতি গোত্র লেখা আছে। অল্প মূল্যে জীবন বিক্রি করে যার—গবুজের বাড়িতে টুং টাং করে শব্দ করে মহাকাশ—মানুষ যুদ্ধ হয়ে শোনে আর এগিয়ে যায়।

প্রশান্ত ফিরে এল। আত্মসন্ধান বটগাছের শিকড় ও পুরাতন ইমারতের প্রতিটি অস্থিপঞ্জরে—তার দাঁত স্পষ্ট হয়ে জড়িয়ে আছে—উপড়ে ফেলব বললেই উপড়ানো সহজ নয়। অজ আপিসে চেষ্টা দেখা ভাল তার চেয়ে।

যুদ্ধ থেমে গেছে—পৃথিবীতে শান্তি ফিরে এসেছে কি? হয়ত শান্তি আসবে এই আশ্বাসে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলছে সবাই। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ চেষ্টা করছেন যাতে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় বিশ্বে। কিন্তু জাতিতে জাতিতে দরকষাকষির ব্যাপারটা চলছে পুরোদমে। যারা যা এগিয়ে আসছে—তারাতা কণামাজও ছাড়বে না। সাম্রাজ্যবাদ শিথিল করবে না তার হাতের মুঠো—গণ-তন্ত্রীরা নতুন পৃথিবীর নতুন বিধান তৈরি করে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করবেন—এই আন্দোলন মশগুল। আমেরিকা জয়ের পথে সৌভাগ্যের সন্ধান পেয়েছে—নিজেদের নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে জলে স্থলে অন্তরীক্ষে প্রসারিত হতে চাইছে—রাশিয়া যুরোপে সাম্যবাদের জিগির তুলছে—আর বৃটিশ সম্রাজ্য দৃষ্টিতে সন্দেহ-দোলায়িত মনে একবার চাইছে রাশিয়ার পানে আর বার স্বস্তি উচ্চারণ করছে নতুন পৃথিবীর। তার উপনিবেশে যুদ্ধ দোলা দিয়েছে প্রচণ্ড ভাবে—তার অতীত রাষ্ট্রগুলি নব কামনার বহিঃবেদনার বিপ্লবোন্মুখ। এশিয়ার গণ-বিদ্রোহের বীজ মহীকূষে পরিণত হতে চায়। আগুন জ্বলছে ভারতবর্ষে—ব্রহ্মে—ইন্দোনেশিয়া—ইন্দোনেশিয়ায় দ্বীপ-ময় ভারতের সমুদ্রে দাবানল প্রসারিত হচ্ছে। সুদূর ফিলিপাইনে তার অগ্রগামী লিবা পৌঁছে গেছে—কোরিয়ার তার একটি স্কুলিক জিটকে পড়েছে। পারস্তে—প্যাংগোইনে—মিশরে—প্রশান্ত মহাসাগর থেকে ভারত মহাসাগরে—সেখান থেকে—আরব সাগরে—ভূমধ্যসাগরে পৌঁছে গেছে বার্ডা। লেক্ সাক্সেনে—লডনে—প্যারীতে—কাসারাক্স—তেহরান—ইয়ান্টার প্রতিক্রিয়া চলছে। এক একটা বোষণায় অগ্নু-পাতের দীপ্তি বিশ্বের আকাশ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে—ইনি ভাবছেন ওঁর ত্যাগেই শান্তি প্রতিষ্ঠা—উনি ভাবছেন—প্রথমে এস করেছেন বলেই সম্প্রতি চিরকালের থাকবে এই বা কোন কথা—সুতরাং ছাড় তার স্বপ্ন—শান্তি আসবে। ইহুদী আর

আরব—পারস্য আর আফ্রিকাবাইজন—কংগ্রেস আর লীগ—
ব্রহ্মের জাতীয় দল ও সীমান্ত দল—কুওমিটাং ও কম্যুনিষ্ট—
সাম্রাজ্য নীতির দাবার হুকে চালের পর চাল দিয়ে যাচ্ছে।
আগে-আসার দাবিতে ও ডলার পাউণ্ডের স্বর্ণ ভারে—
পৃথিবীকে ডাইনে থেকে বাঁয়ে—আর উর্দ্ধ থেকে नीচে
হেলাচ্ছে যারা—তাদের গোত্র বর্ণ চিহ্নিত হলোও—অবশিষ্ট
যে ক্ষমতা তাদের হাতে আছে—তাতে দাবার হুকে খেলাটা
আরও ধানিক চলবে। তবে সব খেলারই যেমন শেষ আছে
—এ খেলাও এক দিন থামবে। সাম্রাজ্যবাদ ভেঙে পড়বার
আগে যে চরম আঘাত হানবে—তারই স্বচনা দ্বিতীয় মহা-
যুদ্ধের শেষে দেখা দিয়েছে।

কতক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধের মত বসেছিল প্রশান্ত জানে না। পায়ে
পায়ে সে অনেক দূর এগিয়ে এসেছে মহামেকের ডলার—
স্লোগানবিধ পতাকা হাতে অপরিমিত চেষ্টাচ্ছে—মজহুর দল।
ওদের ক্ষোভ অভিযোগ প্রকাশ করবার দ্বিতীয় রাস্তা নাই।
মার্চের চারদ্বারে যে সব প্রাসাদ কেলা প্রমোদ-উদ্যান চোখ
রাঙিয়ে শালন করছে—এই অল্প পরিসর মাঠকে আর অব্যাহত
আকাশকে—তারা কেঁপে উঠছে কি ধ্বংস কামনার উফ
নিখাদে? ওরাই হানবে শেষ আঘাত শান্তিপ্রিয় মানুষকে—
আর ওরাই মিশে যাবে এই নব জাগ্রত জীবনের উদ্বোধন

মন্ত্রে? ভাবতে ভালই লাগছে। দিবান্বপের মত মধুর—
আবেগ-মদির চিন্তা। এ চিন্তা সফল হবেই—আসিবে সে দিক
আসিবে।

কিসের মিছিল তোমাদের? চাকরি ছাটাইয়ের। কিসের
অভিযোগ করছ তোমরা? মাগুপি ভাতা—বেতন বৃদ্ধির?
ধর্মঘটের হুকুম কেন? মানুষের নিম্নতম পর্যায়ের বেঁচে
থাকবার অধিকারটুকু চাই আমরা। আমাদের বাঁচতে দাও
স্বপ্ন। রেশনে অর্জাধার—বসনে আদিম যুগের ব্যবস্থা—
পশুত্বের স্তরে নামাবার প্রাণপণ আয়োজন কেন? তোমাদেরই
স্বপ্ন সভ্যতাকে তোমরা হনন করছ। স্বর্ণ সঙ্কয়ের বাসনাকে
নিরুদ্ধ কর—বাঁচাও আমাদের। দূরে চলে যাচ্ছে চক্চকে
মোটর—মোটরের গর্ভশায়ী কোন স্রবশ—মানুষ 'চেসে
দেখছে ময়দানের দিকে সকৌতুকেই। রেন্টোরায় বাজছে
কম্প ট্রেনের হাক্ক সুর—মেট্রোর নিম্ন লাইটের নীলিমায় অগ্নি-
অক্ষরে 'বেদিং বিউটি'র ঘোষণা—আর রেড ক্লবটনের প্রায়-
নয় নির্লজ্জ দেহভঙ্গিমা। পণ্যসম্ভারে চৌরঙ্গী কণ্টকিত,
দোকানে কত রকমের ধাবার—সাজে সজ্জায় নব নব
ফ্যাসানের রীতি—সাম্রাজ্যবাদ শেষে আঘাত দেবার জন্য প্রস্তুত
হয়েছে।

(ক্রমশঃ)

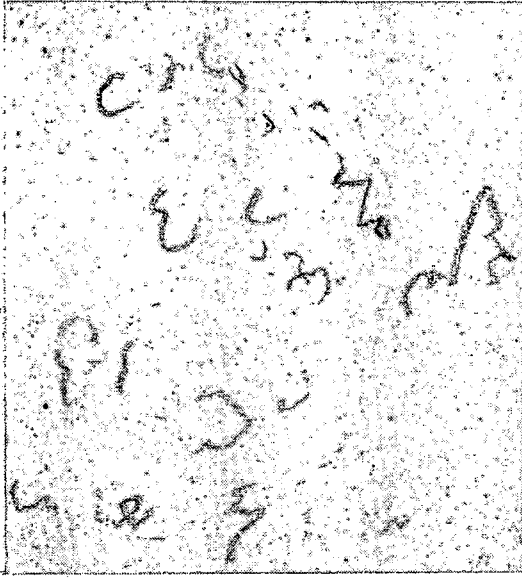
আদর্শ শিক্ষার প্রাথমিক চিত্রাঙ্কন ও হস্ত-শিল্পের দান

শ্রীনারায়ণচন্দ্র কুশারী

আদর্শ শিক্ষার মানুষের বৃত্তিগুলি এমন পরিমার্জিত হয়
যে, সংসারে মাথা টুঁ করে ঠাণ্ডাবার শক্তি সে লাভ করতে
পারে। চার্লস ডারউইন তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা থেকে
প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে, মানুষকে কেবল বৃত্তিজীবী
করবার চেষ্টা করলে তার অজ্ঞাত উৎকৃষ্ট সূক্ষ্মতার বৃত্তিগুলি নষ্ট
হয়ে যায় এবং বহুযুগী শিক্ষালাভে বঞ্চিত হওয়ার এক-
ধেয়েমিতে ও অবসাদে তার জীবন পূর্ণ হয়ে ওঠে।

আমাদের শিক্ষা-প্রণালীতে বহুযুগী শিক্ষার অভাব এত
বেশী যে, বৈচিত্র্যহীন জীবনে নতুনত্বের উদ্দীপনা সঞ্চার
করবার এতটুকু সামর্থ্য তার নেই। মনের সঙ্গে মাংসপেশীর
যোগাযোগ স্থাপনের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমাদের শিক্ষা-
পদ্ধতি গড়ে ওঠে নি, তাই আজ পরের যুগের দিকে
চেষ্টা আমাদের দিন কাটে। আমাদের বিদ্যালয়সমূহে
শিশুশিক্ষা যে আজ উপযুক্ত মর্যাদালাভ করছে না, বিদেশী
শিক্ষানায়কগণই চোখে আঁচুল দিয়ে তা আমাদের দেখিয়ে
দিয়েছেন। প্রত্যক্ষজ্ঞান ও পর্যবেক্ষণ-শক্তি যে চিত্রাঙ্কন ও
হস্ত-শিল্প শিক্ষার মূলভিত্তি-রূপ বৈদেশিক শিক্ষাতাত্ত্বিক-

দেয় কাছ থেকে আত্মতা আমাদের শিখতে হচ্ছে। দেশের
উৎপন্ন কাঁচামাল বিদেশে যায়। সেখানকার কারখানায়
সেইসব মাল থেকে বিলাসের সামগ্রী প্রস্তুত হয়ে আসে,
আমরা নিত্য ব্যবহার করে সখ মেটাই। উদ্ভাবনী-শক্তি ও
হস্ত-শিল্প শিক্ষার জগতের অভাব দেশের তুলনায় আমরা যে
অনেক পিছনে পড়ে আছি তাতে সন্দেহ নেই। প্রাথমিক
শিক্ষার কথাই বরা বাক না। এ দিক দিয়ে ইউরোপ,
আমেরিকা প্রভৃতি দেশের সঙ্গে কি আমাদের তুলনা চলে?
এক আমেরিকার প্রায় ২,০০,০০০ লক্ষ প্রাথমিক ও উচ্চ
বিদ্যালয় আছে। প্রতিটি বিদ্যালয়ে কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের স্বাধীন
মনোবৃত্তি বিকাশের উপযুক্ত ব্যবস্থা করেছেন। এইসব
বিদ্যালয়ের শিক্ষার ভিত্তি হল ভবিষ্যৎ জীবন গঠনোপযোগী
কার্যকরী শিক্ষাদান। তাদের শিক্ষাতত্ত্বে আছে লেখাপড়া,
ভাষাশিক্ষা, সংখ্যা ও রাশিগণিত, ইতিহাস, ভূগোল, চিত্র-
কলা, সঙ্গীত, সমাজনীতি, বিজ্ঞান, স্বাস্থ্যরক্ষা ও ব্যায়ামচর্চা
ইত্যাদি বহু বিষয় শেখাবার ব্যবস্থা। অনেক ক্ষেত্রে চিত্র-
কলার সঙ্গে থাকে অভ্যন্তরীণ হাতের কাজ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা।



অন্ধনের প্রথম অবস্থা

সত্যজিত কুশারী, বয়স ২ বৎসর, ১০ মাস। ফেব্রুয়ারী—১৯৪৫

ছবি আঁকা, হাতের কাজ ও গান-বাজনা আমাদের বিদ্যালয়-মন্দিরে এত কাল অপাণ্ডিত্য ছিল একথা বললে অত্যাশ্চর্য্য হয় না। এখন এগুলো বিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার পেয়েছে বটে, কিন্তু উপযুক্ত মর্যাদা লাভ করেছে, একথা বলা চলে না। অনেকের ধারণা, সাধারণ বিদ্যালয়ে এ সকল শিক্ষার ব্যবস্থা থাকলে ছেলেদের বিদ্যাচর্চার ব্যাঘাত হবে। এ ধারণা যে কতদূর ভ্রমাত্মক তা আজ বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করা প্রয়োজন।

এমার্সন বলেন, "The healthy growth of the mind is just in proportion to the activity of thoughts on the study of outward objects."

অর্থাৎ—বাস্তব পদার্থের বিচার-জ্ঞানের অল্পপাতে মানসিক উৎকর্ষ বৃদ্ধি পায়।

দৃষ্টিশক্তি ও স্পর্শশক্তির দৌলতে বাস্তবের জ্ঞান আমরা লাভ করে থাকি। মনোবিদগণ বলেন শিশু প্রথমে লাভ করে স্পর্শজ্ঞান। শুধু বস্তুর গুণ বা বর্ণ্য জেনে নিলে সে বস্তু সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান লাভ হয় না। তার ব্যবহার জানতে হয়। প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ হয় দৃষ্টিশক্তি ও স্পর্শশক্তির যোগাযোগ হলে এবং এই জ্ঞান যখন সক্রিয় হয় তখনই বাহ্য জগতের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ স্থাপিত হয়। অভ্যাস ও অনুশীলন দ্বারা দৃষ্টি ও স্পর্শশক্তির মধ্যে সহযোগিতা স্থাপন করা যায়। ব্যবহারিক জীবনে এই যুগ্ম শক্তিই আমাদের চিন্তা-রাজ্যের ভিত্তিধরূপ।

পুথিগত জ্ঞান লাভ করে বুদ্ধিবী বৃদ্ধি হয়, কিন্তু তা

দ্বারা পর্যবেক্ষণ শক্তি লাভ করা অসম্ভব। স্নায়ুশুল্লীর উপর শিশুদের কর্তৃত্ব না থাকায় তাদের মাংসপেশীগুলো অনিয়ন্ত্রিত গতিতে চলতে থাকে। তাই তারা ভ্রাম্যমান বিচার-সমতাকে অগ্রাহ্য করে কলম বা পেন্সিলের সাহায্যে পর্যবেক্ষণশক্তিকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করে।

১ নং চিত্রে দেখা যাচ্ছে শিশুটি কতকগুলি ডিম্বাকৃতি দাগ কেটেছে যার কোনই অর্থ হয় না। শিশুটির বয়স ৩৪ মাস। তার দু-বৎসর বয়সের সময় ছবি আঁকাবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু কাগজের কোন নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আঁকা তার পক্ষে সম্ভবপর হয় নি। এ চিত্র দেখলে মনে হবে তার পর্যবেক্ষণশক্তিকে সে কাজে লাগায় নি অথবা কাজে লাগাতে পারে নি, শুধু খেলা হিসাবেই ঐরূপ এঁকেছে। এগুলো তাদের সহজ জ্ঞানের প্রেরণা দ্বারা সম্পন্ন হয়।

শিশুগণ কতকগুলি সংস্কার নিয়ে জন্মিত হয়। হিন্দুশাস্ত্র মতে এই সংস্কার বা সহজ জ্ঞান পূর্জন্মজাত। অভ্যাসের দ্বারা এই জ্ঞানের পরিবর্তন হয়। শিশুদের ভবিষ্যৎ জীবন গঠনে এর প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না।

শিশুগণ বালক বয়সে পা দিবার পূর্বে পর্যাপ্ত নিরবচ্ছিন্ন মনঃসংযোগ দ্বারা কোন বস্তু নিরীক্ষণ করতে পারে না, তাদের অঙ্কিত রেখা বা বর্ণ সমাবেশে তার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। মনের চিত্র অপরিমূর্ত হলে অঙ্কিত চিত্রে তারই ছায়া-পাত হবে। তাদের হাতের মাংসপেশী প্রথমে থাকে অনিয়ন্ত্রিত, মনের ছবিকে অন্ধনের ভাষায় ব্যক্ত করতে গিয়ে তাদের হাতে পেন্সিল ইত্যাদির ডগায় হিজিবিজি রেখাই কেবল ফুটে ওঠে। সৃষ্টিশক্তির অভাব ও ভাব প্রকাশের অক্ষমতাই এর কারণ।

২ নং চিত্রে দেখা যাচ্ছে শিশুর বয়োবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার পর্যবেক্ষণশক্তিও বাড়ছে। বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, ছবিটি লেখকের সাত্বে তিন বৎসর বয়স্ক পুত্রের আঁকা। এক সময় আমি ইংরেজীতে একটি প্রবন্ধ লেখার মনোযোগ দিয়েছিলাম, সেই সময় শিশু আমার কাছে এসে আমি কি করছি তা নিরীক্ষণ করতে লাগল। আমিও তার কৌতূহল জাগাবার অভিপ্রায়ে আমার লেখার অঙ্ককরণ করে লেখবার চেষ্টা করতে উপদেশ দিই। এ ভাবে কিছু দিন গেলে এক সময় দেখতে পেলাম আমারই নিকটে মেঝের উপর ঝড়িমাটি দিয়ে সে হিজিবিজি আঁকছে এবং মাঝে মাঝে আমার লেখার হরফগুলো দেখে নিচ্ছে। কালবিলম্ব না করে আমি তাকে দিয়ে ছুঁতিনখানা চিত্র আঁকিয়ে নিয়েছি। চিত্রটি যে ইংরেজী হরকের অঙ্করণে আঁকা হয়েছে তা বুঝতে কষ্ট হয় না।

ছবি আঁকা, হাতের কাজ এবং লেখা ইত্যাদি দ্বারা পর্যবেক্ষণশক্তি বৃদ্ধি পায় এবং বস্তুর বাহ্যরূপ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ হয়। পৈশিক স্পর্শশক্তি বাড়িয়ে দিতে এদের ক্ষমতা অপরিমীম।

অর্নল্ড বলেন, “The value of art of drawing has become so self-evident that it provides a most excellent means of training the eye to an accurate perception of form and its beauty and of cultivating a habit of exact observation.”

পর্যবেক্ষণ দ্বারা মনের ভেতরে বস্তুর রূপ গ্রহণ করা ও হস্তদ্বারা তা প্রকাশ করা—এ উভয়বিধ কার্যের মধ্যে অবিরত প্রেরণা যোগায় একটা শক্তি—মন সে শক্তির বাহন এবং প্রেরণা চালিত হয় স্নায়ু দ্বারা। বহির্মুখী ও অন্তর্মুখী স্নায়ু আদান-প্রদানে সর্বদাই ব্যস্ত থাকে। অন্তর্মুখী স্নায়ু বস্তুর রূপ দর্শনেক্রিয়ের ভিতর দিয়ে বয়ে নিয়ে যায় মস্তিষ্কে। সেখান থেকে বহির্মুখী স্নায়ু কতব্যের প্রেরণা বয়ে নিয়ে এসে হাতের মাংসপেশীকে সজাগ করে দেয়। এভাবেই বাহ্য জগতের সঙ্গে মনের যোগাযোগ স্থাপিত হচ্ছে। চক্ষু ও হস্ত এই দুই কর্মেক্রিয় মনকে প্রেরণা যোগায় আর মন আপনাকে প্রকাশ করে অঙ্কুতি, ইচ্ছাশক্তি ও জ্ঞানের ভিতর দিয়ে।

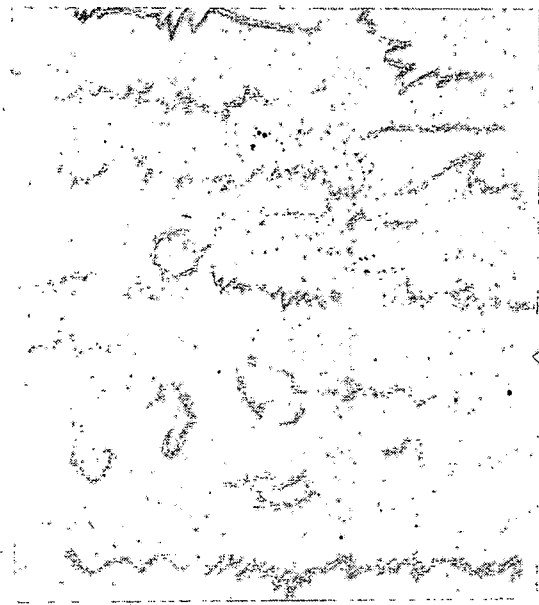
ছবি আঁকতে হলে প্রথমে অঙ্কনীয় বস্তুকে মনে টেনে আনতে হবে—অর্থাৎ তার রূপ অধ্যয়ন করতে হবে একাধিক বার তাকে নিরীক্ষণ করে। এই নিরীক্ষণ করার ফলে বস্তুর বর্ণ ও আকৃতি সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা হয়।

তাই বলছিলেন মানুষকে আদর্শ শিক্ষা দিতে হলে তার যাবতীয় জ্ঞানেক্রিয় ও কর্মেক্রিয়ের অংশীদারের ব্যবস্থা করে দেওয়া আবশ্যিক।

মনোবিদগণ সম্বন্ধে বলছেন, “The factual sense is the basis of all sense.” কিন্তু এ কথার যথার্থ্য সম্বন্ধে আমরা এখনো সচেতন হয়ে উঠি নি। স্পর্শনেক্রিয় ও দর্শনেক্রিয়ের অংশীদার বাদ দিয়ে আমাদের শিক্ষানীতি চলে আসছে দীর্ঘকাল ধরে।

চিত্রাঙ্কন ব্যতীত শিশুর মন ও মস্তিষ্কের শক্তি এবং জ্ঞান-বৃত্তির সহায়ক আরো কতকগুলো বিষয় আছে যেগুলোকে উপেক্ষা করা চলে না। আমাদের দেশের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহ চিত্রাঙ্কনকে একটু স্থান দিয়ে থাকেন বটে, কিন্তু মাটির কাজকে নিভাত্ত অবজ্ঞা ও অনাদরের চক্ষে দেখে থাকেন। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় মাটির কাজ শিক্ষার প্রয়োজন চিত্রাঙ্কনের চেয়েও বেশি। সমস্তল পৃষ্ঠে কতিপয় রেখা, বর্ণ অথবা আলোছায়া প্রতিফলিত করে একটি ফলের প্রতিকল্প অঙ্কন করার তুলনায় নরম মাটি দিয়ে তা প্রস্তুত করা অনেক সহজ এবং ফলের স্বাভাবিক আকৃতি ও ঘনত্ব বিকাশের ক্ষমতা শিশুদের কাছে এটা বেশ চিত্তাকর্ষক হয়।

প্রাথমিক হস্তশিল্প শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের দেশের শিক্ষাবিদগণ একান্ত উদাসীন। এই শিক্ষা ব্যবহারিক বৃত্তিমূলক শিক্ষার ভিত্তিরূপ। কতিপয় টেকনিক্যাল বিদ্যালয় ব্যতীত যথাযোগ্য ভাবে এ শিক্ষার প্রেরণা খুব অল্প স্থানেই হয়েছে। এ দেশের বিদ্যালয়সমূহে যে পরিমাণ ছাত্র



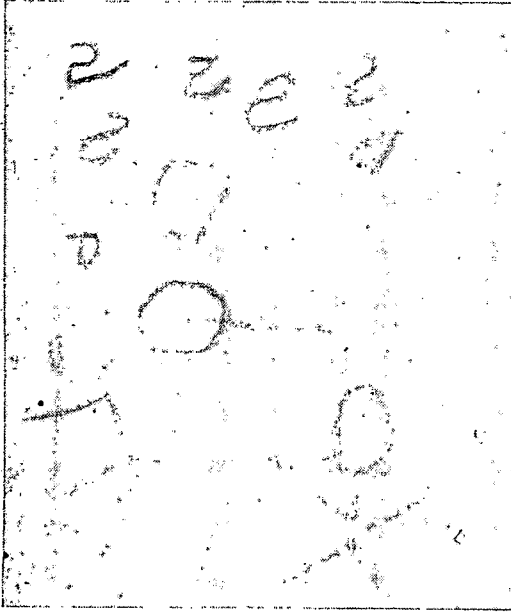
অঙ্কনের দ্বিতীয় অবস্থা

সত্যজিত কুশারী, বয়স ৩ বৎসর, ৬ মাস। অক্টোবর—১৯৪৬

শিক্ষালভ করে তন্মধ্যে শতকরা প্রায় ৪০ জন মাত্র হস্তশিল্প, চিত্রশিল্প, কারুশিল্প, শ্রমশিল্প প্রভৃতি বিষয়ে যৎসামান্য শিক্ষালভ করেই জীবিকা অর্জনে রত হয়। আমাদের যে শিক্ষাপ্রণালী নির্দিষ্ট আছে তাতে দেখা যায়, ছাত্রগণ প্রকৃত ব্যবহারিক বৃত্তিমূলক শিক্ষার কংগ আরম্ভ করে প্রায় ১৬ কি ১৭ বৎসর বয়সে। তাতেও সুনিয়ন্ত্রিত প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা খুব অল্পই দেখা যায়। আবার কতক ছেলে অভিভাবককে সঙ্কট রাবার জন্ত বছরের পর বছর, যেভাবেই হোক ক্লাস ডিম্বিয়ে যাচ্ছে, পাস দিতে হবে বলে। কেউ তাদের মনের দিকে, কর্মশক্তির দিকে, রুচির দিকে তাকায় না। অভিভাবকগণও এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন।

শিক্ষায় অগ্রগামী প্রত্যেক দেশেই প্রাথমিক হস্তশিল্প শিক্ষা বিষয়ে ব্যাপক আন্দোলন চলছে। তথায় শিক্ষাবিদ ও মনোবিদগণ সমিতি গঠন করে এ বিষয়ে নতুন নতুন পরিকল্পনা করছেন। সে সমস্ত পরিকল্পনাকে কার্যে পরিণত করার ক্ষেত্রেও সাধ্যমত প্রয়াস চলছে। এমনভাবে পরীক্ষা ও গবেষণা দ্বারা শিক্ষার নব নব অধ্যায় রচিত হচ্ছে। আর আমরা সকল সমতাকে ধামাচাপা দিয়ে গতানুগতিক রীতি-পদ্ধতিরই অহুসরণ করে চলছি।

অতীত কোন কোন বিদ্যালয়ে প্রাথমিক হস্তশিল্প শিক্ষার প্রচলন হয়েছে। এটা আশার কথা। আমাদের দেশে প্রাথমিক ও উচ্চবিদ্যালয়সমূহের শিক্ষালভে অঙ্কন, মাটির কাজ ও প্রাথমিক হস্তশিল্প শিক্ষা, অত্যন্ত বিষয়ের মত বাধ্যতামূলক



অঙ্কনের তৃতীয় অবস্থা

সত্যজ্ঞত কুশারী, বয়স ৪ বৎসর, ২ মাস। জুন—১৯৪৭

বয়োরুদ্ধির সঙ্গে শিশুর প্রকৃতিগত পর্যবেক্ষণ শক্তি কিরূপ বৃদ্ধি পায় এই চিত্রে তার নিদর্শন পাওয়া যাবে।

শিক্ষা হিসাবে নিদৃষ্ট হলে, শিক্ষা সম্পর্কিত ব্যবহারিক জীবনের এক বড় সমস্যার সমাধান হয়। প্রাথমিক হস্ত-শিল্প শিক্ষার জন্ত পৃথক বিদ্যালয় স্থাপনের কোনই প্রয়োজন হয় না।

অনেকের ধারণা লেখা-পড়া শিক্ষাদানের বিদ্যালয়ে শিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা রাখা শুধু অবসর বিনোদনের জন্ত—অর্থাৎ শিক্ষার একঘেয়েমিকে পরিহার করার জন্ত। কিন্তু সত্যি কি তাই? অবসর বিনোদনের জন্ত আছে খেলা ও সঙ্গীত। অবশ্য শিশুদের চিত্রাঙ্কন ও হাতের কাজ অনেকটা সে পর্যায়ে পড়ে। কিন্তু বালকদের জন্ত শুধু অবসর বিনোদনের উদ্দেশ্যে শিল্প শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করলে আদর্শ শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে বলে আমার ধারণা।

এবার প্রাথমিক চিত্রাঙ্কন ও হস্তশিল্পের ব্যবহারিক দিকটা সম্বন্ধে একটু বলব।

অঙ্কন শিক্ষা দেবার জন্ত ছাপানো আদর্শ চিত্রের প্রচলন আছে। একটু বয়স্ক বালক-বালিকাদের শিক্ষায় কোন বিশেষ ঐশ্বর্যের পক্ষে এ সব চলতে পারে কিন্তু কচি শিশুদের এ সকল আদর্শ চিত্র দৃষ্টে আঁকতে উৎসাহিত করা অসুচিত। ছবির অনুকরণ করা শিক্ষার আদর্শ হতে পারে না। প্রাকৃতিক বস্তুকে আদর্শরূপে গ্রহণ করাই সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়, বিশেষত শিশুশিক্ষায়। আদর্শ চিত্র সর্বদা অসম্ভব

হওয়া উচিত। বাজারে এমন কতকগুলি আদর্শ চিত্রাঙ্কন-গুস্তক চাণু হয়েছে যাতে আদর্শ চিত্র বলে কিছু নেই।

শিশু কি আঁকতে পারে, তার মনের অবস্থা প্রবণতা কোন্ বরণের ছবি আঁকার দিকে, প্রথমে তা পরীক্ষার দ্বারা বুঝে নিতে হবে। কোনরূপ হুঁসি না দিয়ে তাদের ইচ্ছামত আঁকতে দিলেই শিক্ষক বুঝে নিতে পারবেন, কোন্ বরণের ছবির দিকে তাদের আকর্ষণ, দর্শনেন্দ্রিয় ও হস্তের উপর কতটা অধিকার তাদের আছে, পর্যবেক্ষণশক্তি কি পরিমাণ আছে ইত্যাদি। পরীক্ষার পর নতুন নতুন বিষয় তাদের সামনে উপস্থিত করতে হবে এবং সতর্কতার সহিত লেগুণে তাদের দিয়ে আঁকার ব্যবস্থা করতে হবে যেন তাদের কোতূহল কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ না হয়। শিশুদের এমনভাবে উপদেশ দিতে হবে যেন তারা সে উপদেশ অনুসারে নিজেমাই প্রয়োজনমত স্ব স্ব চিত্রের সংশোধন করে নিতে পারে। একান্ত অপারগ হলে শিক্ষক সাহায্য করবেন। অতিরিক্ত উপদেশ বা একই চিত্র নিয়ে তাদের বৈধীচ্যুতি ঘটান অসঙ্গত। উপদেশের ভিতর দিয়ে শিশুদের সহজাত সংস্কার তাদের সৃতিপথে টেনে আনতে হবে।

ছাত্রগণ সাধারণত যন্ত্রাদি ব্যবহারের যোগ্যতা অর্জন করে ১২ বৎসর বয়সে। এই সময় থেকেই তারা প্রাথমিক হস্তশিল্প শিক্ষা আরম্ভ করবে। বিদ্যালয়ের অন্যান্য পাঠ্য বিষয়ের সঙ্গে, সকল দিক বজায় রেখে, কি প্রকারে প্রাথমিক হস্তশিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায় নিয়ে সেইরূপ একটি পরিকল্পনা দিলাম :—

১ম বৎসর (বয়স ১২)

১। হস্তশিল্পে প্রয়োজনীয় ভাষা ও অঙ্ক শিক্ষা—

	সপ্তাহে	২ ঘণ্টা
২। অঙ্কন শিক্ষা—	"	২ ঘণ্টা
৩। মাটির কাজ—	"	২ ঘণ্টা
৪। কাঠের কাজ—	"	২ ঘণ্টা
৫। রঙের কাজ—	"	২ ঘণ্টা

২য় বৎসর (বয়স ১৩)

	বৎসরে ৪	সপ্তাহে
১। অঙ্কন—	৪	"
২। রঙের কাজ—	৪	"
৩। মাটির কাজ—	৩	"
৪। কাঠের কাজ—	৪	"
৫। দণ্ডরীর কাজ—	৩	"
৬। সেলাইয়ের কাজ—	৪	"
৭। যেসিন সপ—	৪	"
৮। শিথি	৩	"
৯। খেলনা তৈরি—	৩	"

এই ব্যবস্থার সপ্তাহে ৩ ঘণ্টা হিসাবে কাজ চলবে।

৩য় বৎসর—(বয়স ১৪)

১। উপরিউক্ত ১ টি বিষয়ের যে কোন ৩টি বিষয় গ্রহণ করে তার প্রত্যেকটি বিষয়ের জন্য ১০ সপ্তাহ করে শিক্ষার সময় নির্দিষ্ট থাকবে।

২। মেকানিক্যাল ড্রইং—সপ্তাহে ২ ঘণ্টা।

হস্তশিল্প ব্যবহারিক বৃত্তিমূলক শিক্ষা হিসাবে যাত্রা গ্রহণ করবে কেবল তারাই ৩য় বৎসরের শিক্ষাপ্রণালী অনুসরণ করবে। যারা শিল্প বিভাগের শিক্ষক, সুপারভাইজার, সুপারিন্টেন্ডেন্ট ও ডিরেক্টর তাঁরাও উপরি-উক্ত পাঠ্যতালিকা অনুযায়ী শিক্ষাপাঠ করে অতিজ্ঞতা সঞ্চয় করবেন। হাতে কলমে কাজ শিক্ষা না করে শিল্প-প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করতে যাওয়ার বিপদ অনেক। অনতিজ্ঞ শিক্ষকের হাতে ছাত্রদের শিক্ষা অথবা তত্ত্বাবধানের দায়িত্বভার ভুল করলে তার পরিণাম অন্তত না হয়ে যায় না। বলা বাহুল্য যে ১ম ও ২য় বৎসরের শিক্ষা-ব্যবস্থা সকলের পক্ষেই বাধ্যতামূলক হওয়া বাঞ্ছনীয়।

অনেকে মনে করতে পারেন প্রাথমিক হস্তশিল্প শিক্ষার নির্বাচিত বিষয়গুলির পরিমাণ অর্ধেক হওয়ার কলে এ শিক্ষা আশানুরূপ ফলপ্রসূ হবে না। এ ধারণার মূলে কোন সত্য নেই। প্রাথমিক শিক্ষা কেবল পূর্ণ শিক্ষাপাঠের সহায়তা করে মাত্র। বালকবালিকাদের স্বভাব, একটা বা দুটো ছিনিস নিয়ে বেশী সময় তারা ব্যাপৃত থাকতে ভালবাসে না। এর আর একটা দিক আছে। ঐ বিষয়গুলি কার্যে পরিণত করতে গিয়ে পৌনঃপুনিক অভ্যাসের দ্বারা তারা যে অতিজ্ঞতা লাভ করবে সেই অতিজ্ঞতা তাদের ভবিষ্যৎ জীবন পঠনে সাহায্য করবে। হারবার্ট বলেছেন, "Interest is the keystone of instruction." *

কৌতূহল জাগিয়ে দিতে না পারলে শিক্ষা সফল হবে না। এই কৌতূহল সৃষ্টির অভাবই হ'ল আমাদের শিক্ষার গলদ। বালাশিক্ষা থেকে আরম্ভ করে সকল শিক্ষাতেই এই ক্রটি কায়েম হয়ে বসেছে। বালকবালিকাদের এমন শিক্ষা দিতে হবে যেন ভবিষ্যৎ জীবনে জ্ঞানের সকল বিষয়েই তাদের কৌতূহল উদ্ভিজ্জ হয়।

ড্রইং শিক্ষকের শিক্ষাপদ্ধতি বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক। লেখা পড়া শিখলে যেমন বুদ্ধিবীণী হওয়া যায়, হাতের কাজ শিখলে তেমনি কারিগর হওয়া যায়। এই উভয়ের সামঞ্জস্য রাখা করে যিনি অতিজ্ঞতা সঞ্চয় করবেন তিনিই আদর্শ শিক্ষক

হবার উপযুক্ত। সাধারণতঃ দেখা যায়, যারা শিল্পকলা প্রকৃতি হাতের কাজ শিক্ষা করেন, পুঁথিপাঠ বিদ্যার দিকে তাঁরা বিশেষ নজর দেন না। এরূপ হওয়া মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। কাজ যেমনই থাক, আদর্শ শিক্ষার ভিত্তি কোনক্রমেই শিথিল হওয়া সম্ভব নয়। নিম্নলিখিত বিষয়গুলো ড্রইং শিক্ষকের শিক্ষণীয় :—

১। মনোবিদ্যা (ড্রইং এবং হাতের কাজের উপযোগী যতটা প্রয়োজন) শিক্ষা করতে হবে।

২। বৈজ্ঞানিকদের নির্দেশিত পথে গবেষণা করে বৈজ্ঞানিক তথ্যাদির সত্যতা প্রমাণিত করবার চেষ্টা করতে হবে।

৩। দেশ-বিদেশের শিক্ষাবিদ ও মনোবিদগণ কি বলেন সে সকল বিবরণ পড়ে প্রয়োজনীয় তথ্য অবগত হতে হবে।

৪। চিত্রাঙ্কনের যাবতীয় বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান লাভ করতে হবে এবং অভ্যাসের দ্বারা অঙ্কন-বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করতে হবে।

৫। যে পাঠ্যতালিকা প্রাথমিক হস্তশিল্পের জন্য নির্দিষ্ট হবে, হাতেকলমে তা শিক্ষা করতে হবে।

মুক-বহির শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিশু ও বালকদের সঙ্গে প্রায় ২৫ বৎসর ধর্মিষ্ঠ ভাবে মেলামেশা করে যে অতিজ্ঞতা লাভ করেছি তারই উপর নির্ভর করে চিত্রাঙ্কন ও হস্তশিল্প শিক্ষা সম্বন্ধে হুচারটি কথা বললাম।

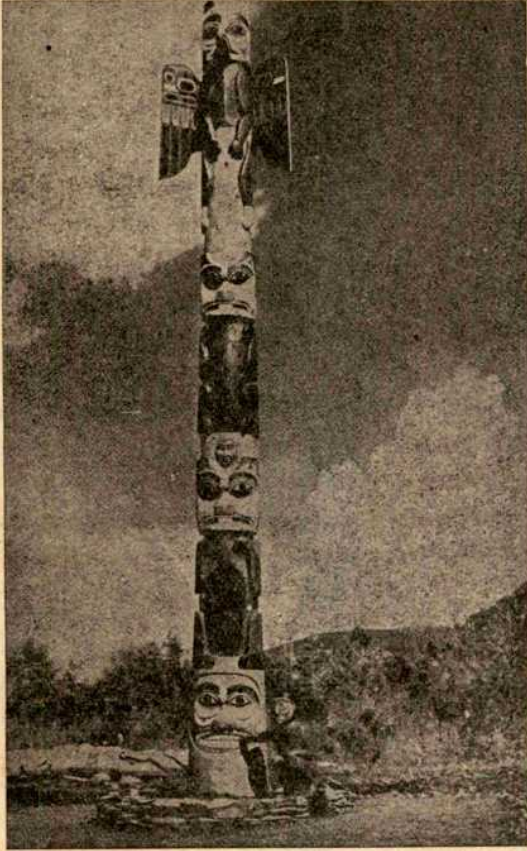
সম্প্রতি বৈশাখের 'প্রবাসী'তে ত্রিযুক্ত অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় "ভারতের শিক্ষাতত্ত্বে কলাশিল্পের স্থান" শীর্ষক প্রবন্ধে শিক্ষার উদ্দেশ্য, সৌন্দর্য্যজ্ঞান, সুরজ্ঞান প্রকৃতি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। প্রবাসীতে মিঃ এস, এম, হুদকুদ্দিন "হাইস্কুল ও শিল্পশিক্ষা" নামক প্রবন্ধে এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। আমাদের দেশের শিক্ষিত সমাজ যে এ সকল বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাতে আরম্ভ করেছেন এটা বুঝি আশার কথা। আমাদের শিক্ষানীতিকে প্রকৃত পথে পরিচালিত করবার জন্যে আজ সকলের সমবেত চেষ্টার প্রয়োজন।

ভবিষ্যৎ বংশধরদের অগ্রগতির পথ আমাদের সর্বপ্রযত্নে খুলে দিতে হবে। দেশের আশাতরঙ্গা শিশুসমাজ। সর্বোপরে তাদের আদর্শ শিক্ষার ব্যবস্থা না হলে কোন শিক্ষাই সার্থক হবে না।

আলাস্কা

শ্রীব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

বিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীতে যে দুইটি মহাসমর হইয়া গেল তাহার ফল প্রত্যেকটি দেশকে ভোগ করিতে হইয়াছে। বিশেষ করিয়া সভ্যতা-বিশ্ববাসী দ্বিতীয় মহাসমরের হাঙ্গামা এত প্রবল হইয়াছিল যে এখনও তাহার যন্ত্রণা হইতে পৃথিবী মুক্তিলাভ করিতে পারে নাই; অদূর ভবিষ্যতে যে পারিবে তাহারও



বোধিত কাঠনির্মিত স্তম্ভ। কবে কাহার দ্বারা নির্মিত হইয়াছিল তাহা জানা যায় নাই

বিশেষ কোন সম্ভাবনা নাই। কিন্তু আমেরিকাই একমাত্র সৌভাগ্যবানী মহাদেশ যাহাকে সর্বশ্রাসী মহাযুদ্ধ আংশিক ভাবেও বিধ্বস্ত করিতে পারে নাই। দুইটি মহাসমরেই আমেরিকা (অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) অভিভাবকের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে এবং এখনও অভিভাবকত্ব ফলাইতেছে। প্রকৃতির বিধানে আমেরিকার অবস্থিতি এমন এক কাম্যগায় যেখানে প্রবেশ সহজসাধ্য নহে। অতএব এইবারের জার্মান বোমার হাত হইতে তাহারও নিষ্কৃতি ছিল না।

কিন্তু আমেরিকার এবার চিন্তা চুকিয়াছে। এইবার যদি মহাযুদ্ধ বাধে, যাহা দুদিন আগে আর পরে হোক বাধিবেই, তবে আমেরিকার প্রতিপক্ষ যে রাশিয়া হইবে তাহা সকলেরই জানা আছে। সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমরবিভাগের সর্বাধিনায়ক এক বিজ্ঞপ্তি বাহির করিয়া মার্কিন সেনা-বাহিনীতে আমেরিকার ভৌগোলিক বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। ঐ বিবরণে দেখা যায় যে, রাশিয়ার পক্ষে আলাস্কার পথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে আক্রমণ করা মোটেই কঠিন ব্যাপার নহে। প্রকৃতপক্ষে গত মহাযুদ্ধের সময়ই এমন একটা কথা উঠিয়াছিল যে জাপান আলাস্কা দিয়া আমেরিকা-প্রবেশের চেষ্টায় আছে। আলাস্কা হইতে মার্কিন সরকারের নিকট এমন অভিযোগ গিয়াছিল যে জাপানী দীবরেরা মাছ ধরবার ছলে আলাস্কার উপকূলের মানচিত্র গ্রহণ করিয়া বেড়াইতেছে। তখনই সর্বপ্রথম সভ্যজগতের দৃষ্টি আলাস্কার উপর পতিত হয়। তবে জাপানের পরাজয়ের ফলে ঐ প্রসঙ্গ তখনকার মত

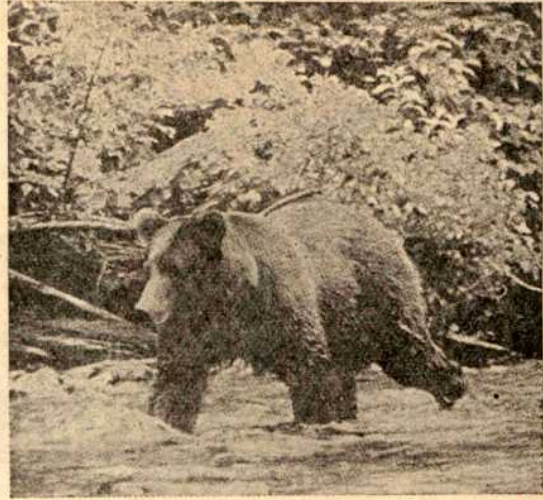


সর্বোত্তোলন কাণ্ডে নিরত শ্রমিক

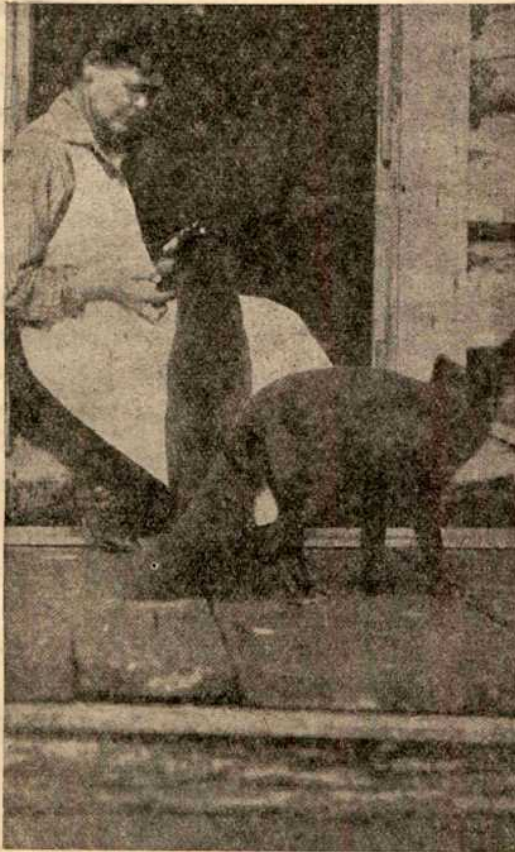
চাপা পড়ে। বর্তমানে আন্তর্জাতিক আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হওয়ার আবার আলাস্কার কথা উঠিয়াছে। কাজেই এই প্রান্ত-অপরিচিত দেশটির পরিচয় গ্রহণের চেষ্টা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

কানাডার উত্তর-পশ্চিমে গা বেষ্টিয়া যে দেশটি দাঁড়াইয়া রহিয়াছে তাহাই আলাস্কা। এশিয়ার মানচিত্র পুলিশে জাপানের আরও অনেকটা উত্তরে হাতীর শুঁড়ের মত যে স্থানটিকে আমরা দেখিতে পাই তাহার নাম হইল কামচাটকা। কামচাটকার আরও একটু উত্তর-পূর্বে গেলে সাইবেরিয়ার

সীমা শেষ হইয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়। ঐ সীমারেখা হইতে আলাস্কার দূরত্ব মাত্র ৫৬ মাইল। ঐ ৫৬ মাইল স্থান জুড়িয়া বেরিং উপসাগর অবস্থিত। এতটী বাবধানের জুড়ই আমেরিকা পৃথিবীতে একক হইয়া পড়িয়াছে। অকথ্য এশিয়া হইতে পদব্রজে ওয়াশিংটনে গিয়া পৌঁছান যাইত। ভৌগোলিক এবং ভূতত্ত্ববিদরা বলেন যে প্রকৃতপক্ষে এশিয়া এবং আমেরিকা একই ভূভাগে অবস্থিত। ৫৬ মাইলের বাবধানকে তাঁহারা স্বীকার করিতে চাহেন না। তাঁহারা মনে

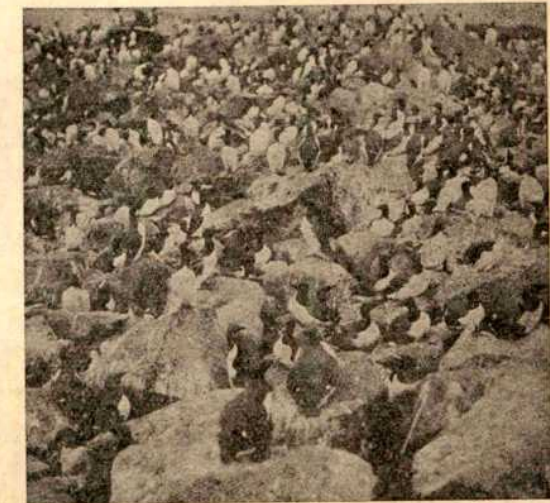


বাদামী স্তরের ভালুক। পৃথিবীর আর কোথায়ও ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় না।

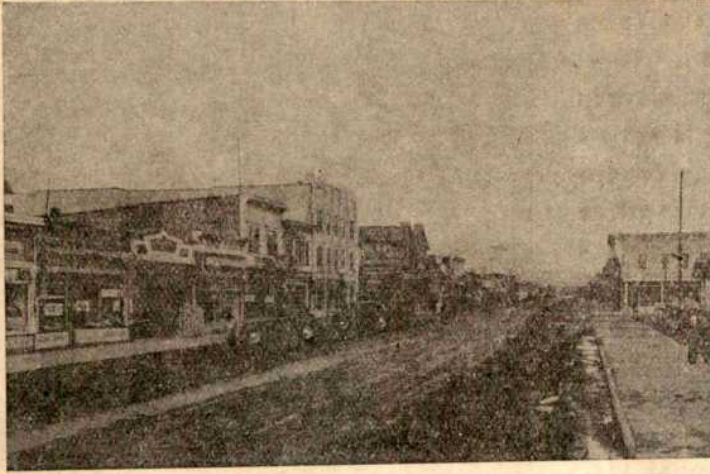


একপ্রকার নীলবর্ণের শূগল। পৃথিবীর আর কোথায়ও ইহাদের দোসর নাই।

করেন যে পৃথিবীর অনন্ত জলরাশি যখন শুষ্ক হইয়া স্থলভাগ-সমূহের সৃষ্টি হইতেছিল তখন যদি ঐ শুষ্ক হওয়া কাঁধ্য আর কয়েক দিন মাত্র চলিত তবে ঐ ব্যবধানের কোন চিহ্নই আজ আমরা দেখিতে পাইতাম না। যাহা হোক, এই আণবিক বোমার যুগে ৫৬ মাইল ব্যবধান কিছুই নহে। আর বেরিং উপসাগরের জল এত অগভীর যে নৌকায়োগে পর্যাপ্ত উহা অতিক্রম করা যায়। কাজেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিরঃপীড়ার কারণ আছে বৈকি ?



পেট্রুইনের মত একপ্রকার পাথর। আলাস্কার উপকূলে অহরহ ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়।



সিটকা সহরের একটি রাস্তার দৃশ্য

আলাস্কার প্রধান সম্পদ হইতেছে শীল ও তাম্র মৎস্ত। ১৯৪১ সালে আলাস্কা প্রায় ১৫ কোটি টাকার মৎস্ত সরবরাহ করিয়াছিল। মৎস্তের তৈল সরবরাহ করিয়াও আলাস্কা প্রতি বৎসর কয়েক কোটি টাকা পাইয়া থাকে। এখানে নানাবিধ লোমশ জন্তু আছে। এই জন্তু এখানে কয়েকটি বৃহৎ পশুশিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। আলাস্কার আরণ্যসম্পদও কম নহে। তাম্র প্রায় মেরু-অঞ্চলে অবস্থিত বলিয়া কৃষিসম্পদ এখানে বিশেষ নাই। তবে মার্কিনরা আলাস্কাতে কৃষিসম্পদে পূর্ণ করিবার জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। স্বর্ণই আলাস্কার একমাত্র বনিজ সম্পদ।

আলাস্কার জলবায়ু মোটেই অস্বাস্থ্যকর নহে। তবে ইহার উত্তরাংশের অর্ধাংশ মেরু-অঞ্চলের সংলগ্ন স্থানের জলবায়ু মনুষ্যবাসের উপযোগী নহে।

আলাস্কার মোটামুটি গোটা ত্রিশেক শহর আছে এবং সমস্ত অধিবাসী শহরে বাস করিয়া থাকে। ১৯০৯ সালের আদমশুমারীতে দেখা যায় যে, আলাস্কার জনসংখ্যা মাত্র ৭২,৫২৪ জন। ইহার মধ্যে ৩৯,১৭০ জন বিদেশী অর্থাৎ শ্বেতকায় এবং অবশিষ্ট অজাতরা—রেড ইন্ডিয়ান, এক্সিমো প্রভৃতি স্থানীয় অধিবাসী। শ্বেতকায়দের অধিকাংশই হইতেছে নরওয়ে, সুইডেন এবং ফিনল্যান্ডের বাসিন্দা। সুখের বিষয়, সেখানে এক জনও ইংরেজ নাই।

আলাস্কার শাসনকার্য মার্কিন পদ্ধতিতেই হইয়া থাকে। আইনপ্রণয়ন ও শাসনকার্য পরিচালনার জন্ত একটি সেনেট সত্তা আছে। ইহার সদস্যসংখ্যা

মাত্র আট জন। সর্বোপরি আছেন এক জন গবর্নর। সেনেটের পরামর্শক্রমে প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট গবর্নর নিযুক্ত করিয়া থাকেন। আইন-আদালত, মিউনিসিপ্যালিটি, স্কুল-কলেজ, গির্জা, রেলওয়ে, এমন কি বায়ুযান ও পশুশালা পর্যন্ত এখানে আছে। আলাস্কাতে পৃথিবীর উন্নত দেশসমূহের অত্যন্তম বলিলে অতুক্তি করা হইবে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও তাহার বিপুল সম্পদের সাহায্যে আলাস্কার সর্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধনে তৎপর রহিয়াছে। অবশ্য ইহা নিছক স্বার্থত্যাগ নহে। আলাস্কার প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ ঐশ্বর্যাশালী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষেও উপেক্ষণীয় নহে।

সিটকা আলাস্কার প্রধান নগর।

অনেকে হয়তো জানেন না যে এক শত বৎসর পূর্বেও আলাস্কা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধীনে ছিল না। কি করিয়া ইহা মার্কিনের হাতে যার তাহার ইতিহাস বড়ই চিত্তাকর্ষক।

রাশিয়ার সর্ক্সপ্রেষ্ট সম্রাট মহামতি পিটার তাহার মৃত্যুর (১৭২৫ খ্রিষ্টাব্দ) কিছুদিন পূর্বে অজ্ঞাত সাইবেরিয়ায় এক বিদ্রুত অভিয়ান চালাইবার জন্ত রুশীয় একাডেমী অব সায়েন্স এবং রুশীয় নৌবাহিনীকে নির্দেশ দেন। পিটার অবশ্য স্বচক্ষে এই অভিয়ানের ফলাফল দেখিয়া যাইতে পারেন নাই।

পিটারের নির্দেশক্রমে ১৭২৮ খ্রিষ্টাব্দে ডেন ভাইটাস বেরিং-এর নেতৃত্বে এক দল অভিয়ানকারী সাইবেরিয়ার প্রান্ত-সীমায় আসিয়া উপনীত হন এবং এক উপসাগরের সন্ধান পান। বেরিং-এর নামানুসারে ইহার নাম হয় বেরিং



আলাস্কার বিদ্রুত অরণ্যময় একাংশ

উপসাগর। গুহানকার স্থানীয় অধিবাসীরা বেরিংকে জানায় যে ঐ উপসাগর অতিক্রম করিলেই এক বিস্তীর্ণ ভূভাগের সম্ভান পাওয়া যাইবে। কিন্তু বেরিং তাহাদের কথা বিশ্বাস না করিয়া ফিরিয়া আসেন। এইভাবে তখনও আলাস্কা সম্ভারগতের নিকট অজ্ঞাত থাকিয়া যায়।

১৭৪১ খ্রিষ্টাব্দে বেরিং পুনরায় কামচাটকা হইতে এক অভিযান চালান এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেন যে ঐ উপসাগরের অপর পার্শ্বে কি আছে তাহা না দেখিয়া তিনি ফিরিয়া আসিবেন না। ঐ অভিযানের কাহিনী বড়ই রোমাঞ্চকর। বহু বড়বৃদ্ধা এবং বিপদ আপদ অতিক্রম করিয়া বেরিং আলাস্কার উপকূলে পিয়া অবতীর্ণ হন। ফিরিবার পথে এক হ্রস্ব আসিয়া রুশীয় সরকারের নিকট আলাস্কার প্রাকৃতিক ব্যাধিতে বেরিং প্রাণ হারান। তাহার দলের লোকেরা সম্পদের বিবরণী দাখিল করেন। রুশীয় সরকার কিছু



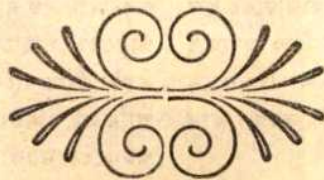
দেশীয় ছেলেমেয়েরা মার্কিন শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে বিদ্যাভ্যাস করিতেছে

প্রায় পঞ্চাশ বৎসর কাল চেষ্টা করিয়াও আলাস্কার সম্পদ আহরণের বিশেষ কোন সুবিধা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। অবশেষে অনেক চেষ্টা করিয়া ১৮০৫ সালে সিটুকাতে একটি বন্দর স্থাপন করিলেন এবং আমেরিকাকে বন্দরের অংশীদার করিয়া দিলেন। এইভাবে প্রায় ৬০ বৎসর কাটিয়া যায়।



অসংখ্য সাল মৎস্য আলাস্কার সমুদ্রসৈকতে রৌদ্র পোহাইতেছে। ইহারা আলাস্কার এক অমূল্য সম্পদ

তারপর টাকার লোভেই হোক অথবা অন্য যে কোন কারণেই হোক ১৮৬৭ সালে রাশিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট মাত্র ২১ লক্ষ টাকায় সমগ্র আলাস্কা বিক্রয় করিয়া দেয়। তদবধি আলাস্কা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাতেই আছে।



স্বপ্ন

শ্রীরবীন্দ্রকুমার বসু

১

অনুচ্চ পর্বতে গ্রীষ্মাধিক্য অনুভূত হয়। মনে হয় এখনি নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে যাবে। আমি সারাদিন ঘুরেই বেড়াচ্ছি, এবং সেইজন্য আমার আপাদমস্তক ঘর্মাক্ত। পা দুটোতে কোঁড়াও পড়ে গিয়েছে। আর পারা যায় না। অবসাদে সমস্ত দেহ শক্তিহীন। বিশ্রাম গ্রহণ না করলে মৃত্যু অনিবার্য বলেই যেন আমার মনে হতে লাগল।

অবশেষে এক সময়ে পর্বতের এক ক্রমনিয় হলে উপনীত হলাম। ক্রমাগত নীচে নামতে নামতে একটা হ্রদ আমার দৃষ্টিপথে পড়ল। তৎতিং হ্রদ। সূর্য্য তখন অস্তোমুখ। [সুহৃৎ-মন্ড শীতল বাতাস বইছে। এই হ্রদের আশেপাশে কোথাও আশ্রয়প্রার্থীর সমাগম দেখা যায় না। পথে ঘাটে লোক চলাচলের একটুও ভিড় নেই। এ ছাড়া জাপানী বিমানকেও মাঝার উপর ঘুরতে দেখা যায় না। আমার নাসারন্ধ্রের মধ্য দিয়ে একটা পরম পরিভ্রমের দীর্ঘবাস পড়ে। জলাশয়ের অপর প্রান্ত থেকে ঋতিমধুর একটা জলপ্রবাহের ধ্বনি কানে এল। কিন্তু সেটা কণকালের তরে। সেই কণ-কালটি অতিবাহিত হবার পর হ্রদের চারদিকে বিরাজ করতে থাকে প্রগাঢ় নিস্তব্ধতা।

আমার পিঠের উপর একটা পুঁটুলি বাঁধা। এই পুঁটুলির মধ্যে আছে—ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন কতকগুলি জামাকাপড়। পুঁটুলিটা পিঠ থেকে নামিয়ে ঘাসের উপর রাখলাম। ঘাসের উপর যেখানে সেই পুঁটুলিটাকেই মাঝার বালিশ করে, ঘাসের উপরেই লগ্না হয়ে শুয়ে পড়লাম। 'মাঝার উপরে স্বচ্ছ নীলাকাশ— ঠিক আকাশের নীচে ঐ জলাশয়ের নির্মল নীলজলের মতোই।

পশ্চিমাকাশের দিকে এক ঝাঁক হাঁস হ্রদটার উপর দিয়ে উঠে গেল। বোধ করি এরা কিরে যাচ্ছে নিজেদের নীড়ে।

উড়ে বাবার সময় ওদের ডাক কানে আসে। সেই ডাকে আনন্দের কোনো রেশ নেই; আছে বিঘাদের করুণ সুর।

সূর্য্য গিয়েছে অস্তাচলে।

কয়েক মুহূর্তের জন্ত এখানে কোনো শব্দই শোনা যায় না। এমনকি এখানে আসবার পথে যে গন্ধাকড়িঙের শব্দ শুনেছিলাম, তাও আর কানে আসে না। কিন্তু ক্রমাগত একটা ক্ষীণ সুর বহুদূর থেকে ভেসে এসে আমার কানে প্রবেশ করে। সুরটা এত ক্ষীণ যে প্রথমটা বহুক্ষণ কান পেতে থাকলে তবে বরা পড়ে।

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত এই সুরটা যে কি, তা আমার কাছে বরা পড়ে। গান—গানের সুর এটা। একটা অত্যন্ত প্রিয়

গান। মনে হ'ল, এই গান আমি মধ্য-চীনের দিগন্তপ্রসারিত গোচারণভূমিতে নারীদের মুখে বহুবার শুনেছি। শুনেছি তখন, যখন আমি ছিলাম রাখাল, মাঠে মাঠে গরু চরিয়ে বেড়াতাম। এই গানটা আমাকে ব্যথিত করে তুলত—

'তোমার সঙ্গে আমাকে আকাশপথে নিয়ে চল,
তোমার সঙ্গে আমাকে সমুদ্রের শেষপ্রান্তে নিয়ে চল
সমুদ্র যেতে পারে শুষ্ক হয়ে,
পর্বত হতে পারে বিলুপ্ত;

কিন্তু হৃদয় আমার কতু হবে না পরিবর্তিত,
ওরে। আমার হৃদয় কতু হবে না পরিবর্তিত।'

এই গান, এই জনশ্রুত, নির্জন স্থানে?—আমার বিশ্বাসের অন্ত রইল না। চিন্তা করতে লাগলাম, এই অতি সাধারণ সঙ্গীতের মধ্যে মানবতার কত বড় না পরিচয়ই পাওয়া যায়। মানবতা। আশ্চর্য্য, যে মুহূর্তে এসম্বন্ধে নির্বিচ্ছিন্ন চিন্তা করতে গেলাম, সেই মুহূর্তে সহসা আহাৰ্য্যের কথা আমার মনে পড়ল। মজা এই যে, যতই আহাৰ্য্যের কথা ভাবতে থাকি, ততই আমার ক্ষুধার আধিক্য অনুভূত হতে থাকে। আর ক্ষুধারই বা অপরাধ কি? আজ সারাদিনই আছি উপবাসী। পেটে কিছু পড়ে নি।

খাই নি, বেতে পাই নি, আজ সমস্ত দিন ধরে এই কথাটা বারংবার আমার মনে হচ্ছিল। শুধু আজ বলেই নয়, এক সপ্তাহ আমি অভুক্ত আছি।

কিন্তু নির্ঝোঁধের মতো আর কতক্ষণ এই ঘাসের উপর শুয়ে আকাশের দিকে চেয়ে থাকব? শুদিকে আকাশ তো লম্বার আগমনে দূরবর্ণ ধারণ করছে। না—আর এমনি ভাবে নিশ্চেষ্ট থাকা যায় না। সুতরাং গাছোখান করলাম। যেদিক থেকে সঙ্গীতের স্তললিত সুর আসছিল তেঁসে, বোঁচকা পিঠে ঝুলিয়ে সেই দিক পানে পা বাড়লাম।

ম্যাপেল-বৃক্ষের পশ্চাড্ভাগে, হ্রদের দক্ষিণ দিকে একটা গ্রাম আমার দৃষ্টিগোচর হ'ল। এই গ্রামে এক দল চাষী মেরে-পুরুষের দেখা পেলাম। এদের মধ্যে আছে যৌবনভারে অবনমিত বহু নারী। জীর্ণ-শীর্ণ শিশুকুল। বুড়াদের লগ্না পাইপের সাহায্যে ধূমপান করতে দেখা গেল। এরা সবাই একটা গ্রাম্য বাগের মধ্য থেকে বীরে বীরে আসছিল বেরিয়ে। আমি এই বাগটির দিকে এগিয়ে গেলাম। সেখানে তখনো জটিলকয়েক নর্ডকীর চারপাশে অনেকগুলি লোক দাঁড়িয়ে। মনে হ'ল, সবে নর্ডকীরা তাদের নৃত্য ধামিয়েছে। ওদের মুখের দিকে চোখ মেলে তাকাতেই দেখা গেল স্তম্ভের মুখগুলিতে

বিশ্ববতার রেখাসমূহ অপরিষ্কৃত, কারো বা আশ্রয় ক্লাস্ত মুখে চোখের জল গড়িয়ে পড়ছে। বাগ থেকে বেরিয়ে আসতেই তিন জনের সঙ্গে একেবারে সামনাসামনি দেখা হয়ে গেল। এরা প্রত্যেকেই অপরিচিত। একজন বৃদ্ধ। একে দেখলেই মনে হয় অত্যন্ত সরল প্রকৃতির লোক। সোজা কথায় যাকে আমরা বোকা বলি। ভবঘুরে। সঙ্গে আর দু'জন তরুণী। একজন একটু স্থূলকায়, কিন্তু চোখে মুখে বেশ কমলীয়তা। অপরটি শাশাশ্রমী লতার মতোই ক্ষীণ। এই নিরতিশয় ক্ষীণ-কায় তরুণীটি স্নগুধের পানে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বোধ করি ভাবে বিভোর হয়েই আছে।

আমরা পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে থাকি কিছুক্ষণ। কিন্তু বৃদ্ধ লোকটি সহসা এক সময়ে বেশ সহজ কণ্ঠেই আমাদের লক্ষ্য করে প্রশ্ন করে, তুমি বুঝি আমাদেরই মতো ছন্নছাড়া ভবঘুরে ?

একটা ক্ষুদ্র দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলি, হ্যাঁ, জাপানীদের হাত থেকে কোনো মতে পরিজ্ঞান পেয়েছি। মধ্য-চীনের রাজধানী ওয়াচাং জাপানীরা দখল করেছে।

‘তা হলে বলো, আমরা সকলেই সমুদ্রযাত্রী। কিন্তু আমাদের একটা আশ্রয় বৃক্ষভেঁ হবে যে, রাত কাটাবার মতো আশ্রয়।’

এই বলে বৃদ্ধ অঙ্গসর হয়। আমি ওকে অঙ্গসরণ করি। ঠিক যেন সম্মোহিত সাপ, সাপুড়েকে অঙ্গসরণ করে।

আমার পিছনে—সেই ছুটি তরুণী।

কিন্তু আমার মনটা এক অব্যক্ত অস্থিতিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। ছুটি অপরিচিতা তরুণী আমার পিছন পিছন আসছে। এতে আমি অত্যন্ত সন্মোহিত বোধ করতে লাগলাম।

যাই হোক, বৃদ্ধ হঠাৎ কথা বলতে শুরু করে। তার কথাগুলি অস্পষ্ট। কারণ, সন্মুখভাগের অনেকগুলি দাঁত ওর পড়ে গিয়েছে।

বৃদ্ধ বলে, বুঝেছ হোকরা, আমি একজন বাজিয়ে, বুঝেছ ? উত্তরে জানালাম, হ্যাঁ, বুঝেছি।

ওর কাঁধের উপর দিয়ে প্রায় হাত দুই লম্বা আর দু’ আঙুল চওড়া একটা চামড়ার জীর্ণ বস্ত্র নীচের দিকে নেমে এসেছে। একটা ছোট ড্রাম বাঁধা ঐ চামড়ার বস্ত্রনীতে। স্পষ্টই বোকা গেল—বৃদ্ধ একজন বাদক এবং ঐ ড্রামই ও বাজায়, তথাপি ইচ্ছা করেই ওকে প্রশ্ন করলাম, বুড়ো, কি বাজনা আপনি বাজান বলুন তো ?

বৃদ্ধ বললে, আমি ড্রাম বাজাই। আমার কাঁধে ঝোলানো ড্রামটা দেখে কি বুঝতে পারছ না ?

•এই বলে ও এক যুহুর্ভ নীরব থেকে দৃঢ়কণ্ঠে পুনশ্চ বললে, আমি একটা দলের ম্যানেজারও বটে।

বিশ্বয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, ম্যানেজার ? কোন্ দলের ম্যানেজার ?

বৃদ্ধ ভৎক্ষণাৎ বললে, থিয়েটারের ম্যানেজার আমি। হ্যাঁ

থিয়েটারের ম্যানেজারই তো বটে। তোমার পেছনে ছুটি মেয়েকে দেখতে পাচ্ছ না ? ওরা আমার মেয়ে। ওরা নাচিয়েও বটে। কি চমৎকারই না নাচতে পারে। একেবারে চমৎকার। যাকে বলে চমৎকার, সুন্দর, অপূর্ণ।

কথায় কথায় আমরা আর একটা ছোট-বাটো পাহাড়ের পাদদেশে এসে পৌঁছলাম। এখানে একটা অতি পুরাতন মন্দির দেখা গেল।

বৃদ্ধ লোকটি আমাদের উদ্দেশ্য করে বললে, এই মন্দিরেই আমাদের থাকতে হবে।

সকলেই ভিতরে প্রবেশ করলাম।

সম্পূর্ণ নির্জন, নিস্তব্ধ, অন্ধকার স্থান। কিছুই দেখা যায় না।

বৃদ্ধ এক সময়ে বললে, তোমার কাছে দেশলাই আছে হোকরা ? দেখ দিকিন, কি মুশকিলেই পড়া গেল। দেশলাই, একটা দেশলাই তো আমার কাছে ছিল বলেই মনে হচ্ছে। বিনা বাক্যব্যয়ে একটা দেশলাই বের করে একটা কাঠি ফস করে জেলে দেখি, স্নগুধেই একটা কাচের চিমুনির ভিতর একটা বড় মোমবাতি। বাতিটার পল্লভেতে আমার হাতের প্রজ্জ্বলিত কাঠিটা স্পর্শ করাতোই বাতিটা উঠল জ্বলে। কিছু আলো হ’ল। কিন্তু এই স্বল্পালোক যথেষ্ট নয়। বিশাল মন্দিরের কতটুকু অংশই বা এ দিয়ে দেখা যেতে পারে ?

আমার স্নগুধে সেই স্থলাদী তরুণীটি দাঁড়িয়ে ছিল। বৃদ্ধ ওর দিকে একটা আঙুল দেখিয়ে আমাদের উদ্দেশ্য করে বললে, ও আমার বড় মেয়ে। ‘ভায়লেট’ ওর নাম। একটু চুপ করে থেকে আবার বললে, আর ও হ’ল স্প্রিং—আমার ছোট মেয়ে। এই বলে বৃদ্ধ ছোট মেয়েটিকে দেখিয়ে, নিজে একগাদা শুক খড়ের উপর ধীরে ধীরে উপবেশন করল। তারপর পরিতৃপ্তির একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস মোচন করলে।

কিছুক্ষণ নীরবতার মধ্যে অভিবাহিত হয়।

এক সময়ে বলি ভগবানকে ধন্যবাদ যে, দিন অবসান হয়েছে। নর্ভকী ছুটির মুখের পানে চেয়ে নিঃশব্দেই হাসি। ওরাও হাসে। নীরবেই হাসি বটে, কিন্তু এই মৌন হাসির মধ্য থেকে ক্রীতির আভা বিচ্ছুরিত হয়ে এল। ওদের হাসি দেখে মনে হ’ল, ওরা আমার সদলাভ করে অতিমাত্রায় প্রফুল্ল হয়ে উঠেছে।

সহসা বৃদ্ধকে লক্ষ্য করে বললাম, বুড়ো, আপনাদের দলে আমি ভর্তি হতে পারি ?

ভনে বৃদ্ধ পরম বিশ্বাসে আমার মুখের পানে স্থিরদৃষ্টিতে তাকায়। বলে, সে কি ? তোমার বয়স অল্প। মনে হচ্ছে তুমি এখনো লেখাপড়া ছাড় নি। না না, তোমার এক-কাজ সহ হবে না। সত্যি কথা বলতে কি, এ অতি ছোট কাজ। এ কাজের যোগ্য ব্যক্তি আমরাই। তুমি নও, বাবা।

দৃঢ় কণ্ঠে বলি, হোকগে ছোট কাজ। আমি ছ’ তারের

‘এক’ বাজাতে জানি। আপনি নিজে একজন ওস্তাদ বাজিয়ে, মনে হয় আপনার কিছু কাজে আমিও আসতে পারি। আপনার কাজে আমাকে নিয়োজিত করতে পারেন অনায়াসে। আমাকে বাজিয়ে হিসেবে আপনার দলভুক্ত করলে আপনি ঠকবেন না, এটা সুনিশ্চিত।

বুড় আমার এই দৃঢ় উক্তিতে সন্তুষ্টঃ মনে মনে খুশী হয়ে উঠলেন। বললেন, ভাল কথা, তুমি যদি তাই চাও, আমার আপত্তি করবার নেই কিছুই। আমার কাছে সব মাছুষই ভাই। সবাইকে আমি ভাই বলেই জানি।

সত্য কথা বলতে কি, বুড়ের এই আন্তরিকতাপূর্ণ উক্তিতে আমি সাতিশর আনন্দিত হলাম। পূর্বে যেয়ে দুটির সম্বন্ধে যেটুকু বিতর্কাত্মক ভাব আমার মনকে আগ্রহ করেছিল, এখন সেটুকুও অপসারিত হয়ে গেল। ওদের রচনাকার্যে স্বতঃপ্রসূত হয়ে সাহায্য করতে শুরু করলাম।

ক্রমে আমাদের কথাবার্তা, আলাপ-আলোচনা চলতে থাকে। চলতে থাকে প্রাণবোলা ভাবে। ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় ভাব থাকে না মোটেই। বেশ সৌন্দর্যপূর্ণ পরিষ্কার আলো-চনা—বড় তৃপ্তি হ’ল আমার।

আহারাদির পর বুড় বিনা বাক্যব্যয়ে খড়ের গাদার উপর শয়ন করলেন এবং ক্ষণকাল পরেই তন্দ্রালু হয়ে পড়লেন। কিন্তু আশ্চর্যজনক ব্যাপার এই যে, নিদ্রিতাবস্থায়ও তাঁর জিহ্বা ওঠেই লেহন করতে শুরু করে। তাঁর মুখের দিকে নিম্পলকচক্ষে চেয়ে আমি বেশ মজা উপভোগ করতে লাগলাম। ঘুমন্ত অবস্থায় কোন লোককেই আমি ইতিপূর্বে এরকম করতে দেখি নি। এই প্রথম।

ভায়লেটের কর্ণধরে আমার চমক ভাঙে। ও আমাকেই লক্ষ্য করে কোমল কণ্ঠে বলছে, ওরকমভাবে ওর দিকে দেখবেন না। তাঁদের পানে চোখ ফিরিয়ে দেখুন তো, কি সুন্দর চাঁদ, আর কি নির্মল ওঁর জ্যোৎস্নাধারা।

মাথা তুলে দেখলাম—মন্দিরের প্রাঙ্গণে এসে পড়েছে ফুটফুটে জ্যোৎস্না। মেঘশূন্য আকাশে পরিষ্কার চাঁদ। প্রাঙ্গণের ভিতর একটা অব্যক্ত আনন্দ আমার সর্বদেহ রোমাঞ্চিত করে জ্বললে। এমনতর বিমল জ্যোৎস্নাধারা বহুদিন আমার চক্ষে পড়েনি। চক্ষে পড়েনি—যেদিন থেকে জাপানীরা মধ্য-চীনে আক্রমণ আরম্ভ করেছিল।

আনন্দের আতিশয্যে চীৎকার করে উঠি, অপূর্ণ, সত্যি অপূর্ণ এ।

কিন্তু স্ত্রীঃ আমাকে বাধা দেয়। একটু জুড়ব্বরে বলে, চুপ। দেখুন, ওখানে কি হয়েছে।

বলার সঙ্গে সঙ্গে প্রাঙ্গণের প্রাচীন দেবদারু বৃক্ষটার পানে অঙ্গুলি নির্দেশ করে।

বহু প্রাচীন দেবদারু বৃক্ষ। বোধ করি একশো বছরের পুরানো গাছ। বৃক্ষটার পানে পলকহীন দৃষ্টিতে বহুক্ষণ

নিঃশব্দেই চেয়ে থাকি। মনেতে পাই—ঐ দেবদারু বৃক্ষের শাখার উপর একটা পাখীর ডানা বাপটা মারার শব্দ। হার রে। বেচারী বুঝি ঘুমের মধ্যেই হঠাৎ কোন কারণে অভিমানীয় সন্তুষ্ট হয়ে উঠেছে।

স্ত্রীঃ পূর্বাপেক্ষা কোমল কণ্ঠে বললে, প্রবাস আছে, কেউ যদি একটা ঘুমন্ত পাখীকে তিন বার ডানা ঝাড়তে শোনে, তা হলে ঘুমের সময় সে সুখ-স্বপ্ন দেখতে পায়। আর সেই স্বপ্ন তার জীবনে সত্যি হয়ে দেখা দেয়।

অভিশয় ব্যগ্রতা সহকারে প্রশ্ন করলাম, কিন্তু আপনি ক’বার মনেতে পেয়েছেন? ক’বার?

—তিন বার। তিন বার শুনেছি। ঠিক তিন বার।

—তবে তো আপনি সুখ-স্বপ্ন দেখবেনই।

স্ত্রীঃ অভিমানযুক্ত বিমর্ষতায় ক্ষীণকণ্ঠে বললে, তিনটি বছর ধরে আমরা রাজিবোলা কেবল ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন দেখেই এসেছি। বোবার পাওয়া দুঃস্বপ্ন।

—সুখ-স্বপ্ন আদৌ এতকাল দেখেন নি আপনারা? তারি আশ্চর্য্য! কিন্তু কেন বসুন তো?

আমার এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে স্ত্রীঃ কিছুই বলতে পারলে না। শুধু নিজের একজোড়া কালো হরিণ-চোখের স্থির চাহনি আমার মুখের উপর নিক্ষেপ করলে। ওর চেহারায় দেখে মনে হ’ল, কি একটা দুর্কৌণ্ড্য জিনিষ বুঝতে না পেরে ও দিবার মধ্যে পড়ে গিয়েছে।

স্ত্রীঃ-এর এই অবস্থা দেখে আমার নিজের বুকখানা সহসা টন্-টন্ করে উঠল। টন্-টন্ করে উঠল অসহ বেদনার। ওর নিজের অসহায়তার দ্রষ্টা আমার অন্তঃকরণ কেন যে এতখানি আকুল হয়ে উঠল, বুঝতে পারলাম না।

কিন্তু চালাক মেয়ে—ভায়লেট। সে নিশ্চিন্ত ভঙ্গ করে বলে উঠল, সুখ-স্বপ্ন দেখি নি এই কারণে যে, আমাদের জীবন-মন চকল, বিস্কু এবং উদ্বেলিত। আজ থেকে চার বছর পূর্বে জাপানীরা আমাদের গ্রাম পুড়িয়ে ছাই করে ফেলে। সেই থেকে আজ পর্যন্ত একটু দিনের তরেও শান্তি কাকে বলে, বুঝতে পারি নি।

বলতে বলতে ভায়লেটের চোখ দুটি অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে। চোখ দুখবার কোন চেষ্টা না করে পুনর্বার বলে, যেখানেই আমরা বাই না কেন, জাপানীরা, আমাদের শত্রু জাপানীরা, আমাদের অহুসরণ করে।

স্ত্রীঃ সহসা বলে উঠল, কিন্তু এখন আমরা বেশ শান্তিতে আছি। আজ তিন দিন হতে চলল, এখানে জাপানীদের কোন উপদ্রবের কথা শোনা যায় নি।

ওর কথাটা আমার মনে লাগল না। তবুও ওকে উৎসাহিত করে বললাম, তা হলে সুখ-স্বপ্ন আপনারা দেখবেন। দেখবেন নিশ্চয়। কিন্তু কি কারণের সুখ-স্বপ্নের প্রতীক্ষা করেন আপনারা? একটা যাহুদগ হাতের মধ্যে পাবেন, আর তাই

জিসে দাতা পৃথিবীটাকে সোনার পহিণ্ড করবেন ? কিংবা একজোড়া ডান, আর দাঁতগুলো আপনাদের নন্দনকাননে নিমেষের মধ্যেই গিয়ে পৌঁছবেন ?

আমার এই উজ্জ্বল স্মৃতি একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ভাঙ্গ করলে। তারপর ধীরে ধীরে বললে, তবুও তবুও দেয়ে আঁমরা—
আকাশ সুস্থের আনা আঁরা করি না। আমার একান্ত মনের কামনা ছিটকাল ডাকী হয়ে থাক। আঁরীম লেখা-পড়ার চর্চা নিয়ে থাকব, এই আমার কামনা, এই আমার সুখ-স্বপ্ন।

একটুখানি মৌন থেকে বললে, আপনি এটা ভাল করে ভেবে চাওন, গানের রস উপলব্ধি করতে পারা এবং গান রচনা করতে দেখা আমার বড়দিনের ইচ্ছা। মনে পড়ে, যা যখন যুগে যুগে আসে তে করে আমাদের গান, শেখাভেন, তখন কি ভালই না লাগত। যা বিখ্যাত না'চেরে ছিলেন। তাঁর রোজ-গার আমাদের বাগ্মীর চেয়ে অনেক বেশি ছিল।

ভারলেট একজন কোন কথা কর নি। কিন্তু এইবার সে কথা কইতে শুরু করে। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করে উদ্যানভর্তি বললে, স্মিৎ-এর মত আমারও গান শেখবার আকাঙ্ক্ষা আছে।

ছোটা ভগিনীর কথা শুনে স্মিৎ মুহূর্ত-ভংগনা করে। বলে, তুমি থামো দিদি। কত আগেই তো তোমার সকল সাধ মিটিয়ে পারত। আজ তোমার মনের ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি বলে হুঃ করছ। কিন্তু মনে কর দেদিনের কথা যেদিন গ্রামের বাগে তোমার মাচ দেবে, গ্রামের জমিদার যখন তোমাকে আহ্বান করবার ইচ্ছা প্রকাশ করে তোমাকে নিয়ে যাবার জন্যে বাগীর কাছে মিলতি করলে, তখন তুমি রাজী হওনি। তোমাকে হুলে পাঠিয়ে লেখা-পড়া শেখাবারও তার প্রবল বাসনা ছিল। কিন্তু তুমি কি ভাবলে, তুমিই তখন। বলে বললে—তুমি ওদব চাও না। বাগীর হুঃখের জীবনের সঙ্গে নিমেষের জীবনকে মিলিয়ে দিতে চাও।

কিন্তু ভগিনীর কথা শুনে ভারলেটের সারা মুখে বিষজিহ্ন প্রায়াপাত হ'ল। একটু পরে রক্তকণ্ঠে বললে, কিন্তু সেই বৃদ্ধ জমিদারের মনে ভিন্নরূপ অস্তিত্ব ছিল। ছবিসিঁড়ি বলা যেতে পারে অনারাসে। তুমি তাকে ভাল মাহুং সবেবে ? আসলে সে কিও ঠিক এর বিপরীত।

এই সময় অকস্মাৎ একটা আর্দ্রর কানে এসে :—রক্ষা কর। রক্ষা কর। আমার জীকে দাও, কিরিয়ে।

স্বরটা এসেছে বুকের কণ্ঠ থেকে।

তখনও সে খড়ের গাদার উপর শয়ন করে নাসিকাস্রব করছে।

ভারলাম, বোধ করি সাপ-খোপ কিছু ওকে দংশন করতে উদ্ভত হয়েছে। একটা লাঠির খোঁজ করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠে পড়লাম।

কিন্তু ভারলেট আমাকে নিবৃত্ত করলে। বললে, ভয় পাবেন না। আপানীরা যে'দন থেকে আমাদের আঁম হতে মা'কে ধরে নিয়ে গিয়েছে, সেদিন থেকে বাগী মো'র রাজ্যে এই রকম চীৎকার করে উঠে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে চীৎকার করে। এই বলে কখনকাল ও নীরবে শুক হয়ে বসে রইল। তারপর এক সময়ের সন্তান ঢকে বললে, আপানীরা আমার মা'কে ধরে নিয়ে যাবার পর থেকে আর আমরা কোনো সংবাদই তাঁর পাই নি। মনে হয়, যা আর ইচ্ছগতে নেই।

লবই বুঝলাম। বুঝতে আর কিছু বাকী রইল না। ওদের জীবনের সঙ্গে যে ওভঃপ্রোভ তা'বে জড়িয়ে আছে একটা বেদনাকরুণ শোচনীয় কাহিনী। ওদের মনকে ভিন্ন দিকে নিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে বললাম, আর নয়। রাজি বোধ করি অনেক হয়েছে। এখন শুয়ে পড়বার আয়োজন করা যাক। কাল সকালে আপনাদের আবার কাছের চাপ পড়বে। তখননা, আমি একটা বাড়তি মাহুং। আমার খাওয়া লাওয়ার দায়িত্ব পড়েছে আপনাদের উপর। বেশী রাজি করে ঘুমালে সকালে উঠতে পারবেন না।

বলে অলক্ষণের দৃষ্ট মৌন থেকে ওদের মনে আশার সঞ্চার করবার উদ্দেশ্যে বলি, আমাদের দেশ যখন শত্রুকবল-মুক্ত হবে, যখন আমরা স্বাধীন হবো, তখন প্রত্যেকের জন্যে অবৈজ্ঞানিক বিদ্যালয় আরম্ভ প্রতিষ্ঠা করবো। তখন সকলেই স্বাধীনভাবে বিদ্যার্জন করবে, সকলেই স্বাধীনভাবে মান রচনা করতে পারবে।

২

পরদিন প্রভাত বেলায় এই গ্রামের নিকটবর্তী ভিন্ন গ্রামের একটু বাগে আমরা সকলে উপনীত হলাম। আমি হু-ভারের 'এক' বাঁকাতে শুরু করতেই, স্বতঃ তার ড্রাম বাজিয়ে সঙ্গত আরম্ভ করলে। সঙ্গতের দৌলতে আমার বাজনার হাত খুলে গেল, এক বাজনা চলল চমৎকার ভাবে। মনে হ'ল, এমনি নিখুঁত ভাবে বহুকাল 'এক' বাঁকাতে পারি নি। নিমেষের বাজনার নিজেই মুগ্ধ হয়ে গেলাম।

ওদিকে আবার ভারলেট নৃত্য শুরু করে দিয়েছে। আমার স্মরণে যন্ত্রলীতে বোধ করি ও মুগ্ধ হয়ে নাচ শুরু করে দিয়েছে। ওর দেহ যদিও কিঞ্চিৎ স্থূল, তবুও নৃত্যভঙ্গায় ওর যথেষ্ট নৈপুণ্য পরিলক্ষিত হ'ল। খাসা নাচে ও। নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে ভারলেট গান গাইতে আরম্ভ করলে। প্রাণস্পর্শী সে গানের কথা। ওর অপূর্ণ কণ্ঠের আমাকে মোহিত করে।

কিন্তু আশাহ্রুপ দর্শক সমাগম হয় না। বেচারী ভারলেটের জন্য আমার কষ্ট হ'ল। মনোহরকর সঙ্গীত ও নৃত্য উপভোগ করবার মত কি তেউ এ গ্রামে নেই ? একখানি পরিশ্রম করা সড়কও কারুর হাতভালি পর্যন্ত ভারলেট পায় না ? মনতাপ্য বৃষ্টি শেষের দিকে মিনিট কয়েক ধরে পাগলের

যত একটানা ডায় বাজিয়ে লহনা এক সময়ে ডায়ের কাঠি ছুটি ঘুরে নিক্ষেপ করে একটা পাথরের উপর গিয়ে বসল। হাঁপাতে হাঁপাতে টেনে টেনে বলে, ভায়লেট মা, তুমি অত্যন্ত ক্লান্ত হয়েছ। আর নয়। এইবার তুমি বিশ্রাম করগে, যাও মা।

ভায়লেট দ্বিভুক্তি না করে ধীরে ধীরে গিয়ে পিতার পাশে বসে। তখনও ওর নাসারাজের মধ্য দিয়ে ঘন ঘন উচ্চ নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস বইছে।

কিছুকাল পরে আমরা বাধ্যতামূলক বৈধেহেদে নিয়ে আবার আর একটা গ্রামের দিকে পা বাড়ালাম। মধ্যাহ্নকাল। পথে বহু পথচারীর দেখা পেলাম। এদের মাথা স্তম্ভধর্ম পানে হয়ে পড়েছে। পৃষ্ঠে এদের খুড়ি বাঁধা, আর দেহেই খুড়িতে বসে আছে ছেলেপুলে। গোটা কয়েক কুহুরকেও এদের সঙ্গে যেতে দেখা গেল। কুহুরগুলির দ্বিত মুখের বাইরে এই এতখানি বেরিয়ে আছে। টুস-টুস করে জিত দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে লালা। পথচারীদের তামাটে ললাটে প্রখর স্বর্ষ্যের কিরণ ধরে পড়ছে। ক্লান্তপরিশ্রান্ত তাদের দেহ। কি ঘটেছে সেটা অস্বাভাবিক করলাম। তবু নিঃসন্দেহ স্বাভাবিক একজন বৃদ্ধ কৃষককে কাছে ডেকে ব্যাপারটা কি জিজ্ঞাসা করি।

ও বললে, জাপানীরা আমাদের খাড়ে এসে পড়ল বলে। আজ সকাল বেলায় প্রকাণ্ড একটা লোহার ইগলপাখী আমাদের গায়ে অসংখ্য ডিম্ব প্রসব করে। ঐ ইগল পাখীর ডিম্ব খানা পঁচিশ বহু লোক, ছুটি শিশু এবং তিনটি গাভীর জবলীলা সাক্ষ্য করেছে।

তুনে ভায়লেটের বাবা সন্ধ্যারে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করলে। বললে, একবার হুনিয়ার বিচারটা দেখো। আজ চার বছর ধরে এই ভয়েই আমি পালিয়ে বেড়াচ্ছি, অথচ এখনও পর্যন্ত কোথাও একটুখানিও শান্তির আলো দেখতে পেলাম না, কোনো ভরসাও পেলাম না।

বলেই ও কভাদের মুখের পানে তাকাল, বললে, কি করে যে তোমাদের আমি রক্ষা করব, ভেবে পাইনে। আমাদের হাড়ের ভেতর পর্যন্ত ঘৃণ ধরে গিয়েছে। তোমরা বড় হয়ে উঠেছ—তোমাদের কি করেই বা রক্ষা করা যাবে?

ওরা উত্তরেই কোন জবাব দিতে পারে না। আনতমুখে নীরবে নিস্তব্ধ ভাবে বলে থাকে।

গ্রামের পর গ্রাম প্রদক্ষিণ করলাম। কোন গ্রামেই লোকজনের চিহ্নমাত্রও দেখা গেল না। সব গ্রাম জনশূন্য। যেম যক্ষ্মাদ। বাঁ বাঁ করছে। আমরা তখনও পর্যন্ত অক্লান্ত। কারণ আজ এক কপর্দকও উপার্জন হয়নি।

বৃদ্ধ এক সময়ে বললে, গতকাল যে মন্দিরে আমরা রাত্রি যাপন করেছিলাম, চল সকলে দেখানে। ওখান থেকে বেরিয়ে এসে কোনই লাভ হ'ল না। আর আমি যুবতে পারি নে। একেবারে ভেঙে পড়েছি আমি।

ওর কথামত আমরা চলতে আরম্ভ করলাম। বৃদ্ধ যায় এগিয়ে। আমরা তাকে অনুসরণ করি। ক্রমে আমরা মন্দিরে এসে পৌঁছলাম। ক্লান্তিতে আমরা এত অবসর হয়ে পড়েছিলাম যে ঠাড়িয়ে থাকা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠল। আর ঠাড়িয়ে থাকতে পারলাম না। ভুরুগীরা তো বড়ের গাদার উপরই উপবেশন করলে। ওদের একটু তক্তাতে একটা স্থান বেছে নিয়ে আমিও বসে পড়লাম। বৃদ্ধ আমাদের বিপরীত দিকে আসন গ্রহণ করলে। আমরা সবাই চুপ করে রইলাম, কথা বলি না কেউ। যেম আমাদের দ্বিভুক্তি বসে গিয়েছে।

কিন্তু সেই সরলপ্রাণ ভুরুগী ছুটির নিঃশ্বাস চক্ষে হঠাৎ এমন একটা ক্রিয় আবিষ্কার করলাম, যার অর্থ অবিসম্বাদিত রূপে উচ্চারিত বাক্যের অপেক্ষাও সুস্পষ্ট, পরিষ্কার। ওদের দ্বিভুক্তি বৃদ্ধের মুখের উপর ভক্ত। বৃদ্ধ তার কেশবিরল মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলাতে বুলাতে হঠাৎ এক সময়ে লাফিয়ে উঠল; বললে, অন্ন, অন্ন চাই আমাদের। যে করেই হউক আমাদের সামান্য কিছু পেটে পড়া দরকার। এই গাঁয়ের জমিদারের কাছ থেকে কিছু চাল ধার করে নিয়ে আসি। বৃদ্ধ ভায়লেটের মুখের পানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে। পুনশ্চ বললে, তত্রলোককে ত ধারাপ লোক বলে মনে হয় না। বরঞ্চ ভাল বলেই ধারণা জন্মে। তোমার ভরণপোষণের ভার উনি স্বেচ্ছায় নিতে চেয়েছিলেন। সজ্জন ছাড়া কি কেউ অনাঙ্গীতের সমস্ত দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিতে চায়?

এই বলে বৃদ্ধ আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে না। বাতাসের বেগে মন্দির থেকে বেরিয়ে যায়।

প্রায় ঘণ্টা দুই পরে বৃদ্ধ ফিরে এল। হাতে একটা বলি। বলিতে চাল ভরা। আমাদের সকলেরই মনে আশার সঞ্চার হ'ল। যাক, তা হলে আজ কিছু পেটে পড়বে। ভাড়াভাড়ি বৃদ্ধের হাত থেকে বলিটা গ্রহণ করে মাটিতে নামিয়ে রাখি। বেশ ভারি বলেই মনে হ'ল। ওদিকে স্ত্রিং ওকে হাত ধরে বসিয়ে দেয়। ভায়লেট বাতাস করতে থাকে ধীরে ধীরে।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম করবার পর, বৃদ্ধের বুক ভেদ করে বেরিয়ে আসে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস—মুখের নিঃশ্বাস। বলে, ভায়লেট, স্ত্রিং বস তোমরা। একটু খেয়ে শুধু ভায়লেটের মুখের পানে একদৃষ্টে তাকায়। বলে, মা ভায়লেট, তোমার একটা ব্যবস্থা আমি করে এসেছি। ভাল ব্যবস্থা, ইয়া নিশ্চয়ই ভাল উপায়। ভাল, ভাল—বুঝ ভাল, বুঝ ভাল উপায়।

ভায়লেট কিছু বুঝতে পারে না। বোকাম মত বাপের

হুঁধের দিকে ক্যাল-ক্যাল করে চেয়ে থাকে। একটা টোক পিলে প্রহ্ন করলে, তুমি কি বলছ বাণী ?

বৃদ্ধ বরাগলায় ধেম ধেম-বললে, তুমি বুঝতে পেরেছ, কার কাছ থেকে আমি চাল এনেছি ভিক্ষা করে। সেই জমিদার, যিনি এক সময়ে তোমার ভরণপোষণের ভার নিতে চেয়েছিলেন, সেই জমিদারের কাছ থেকে ঐ ধলি ভটি চাল পেয়েছি। কিন্তু এখন তিনি চান তোমাকে বিয়ে করতে। তোমার স্বাকী করবেন, এ প্রতিজ্ঞা আমি আদায় দিয়েছেন।

ভায়লেটের হুট চোখে জল এল। বাস্পরূপে হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, তুমি কি তাকে কথা দিয়েছ, বাণী ?

—নিশ্চয়ই।

বাণী। আমি তোমার সঙ্গেই থাকতে চাই। তোমাকে ছেড়ে আমি কোথাও যেতে পারব না।

ভায়লেটের চোখের জল আশ্রণের ধারার মত গাল বেয়ে নিঃশব্দে ঝরে পড়তে লাগল।

বৃদ্ধ ভুত হয়ে কর্ণ কণ্ঠে বললে, আহাম্যক কোথাকার। নিজের জীবনটা আমার সঙ্গে থেকে মাটি করবে ? না, এ কোনমতেই আমি হতে দেব না।—এই বলে মূহুর্তকাল নীরব থেকে স্নেহাঙ্গি কণ্ঠে বললে, তাঁর বয়েস হয়েছে চের সত্যি। তোমার বয়েসের অল্পপাতে তাঁকে তোমার পাশে মানায় না। কিন্তু মা, তবে দেখো, আমার সঙ্গে এভাবে থেকে তুমি কোন দিনই স্বাকী হবে না। তোমার বয়েস বাড়ছে। আমিও বুড়ো হয়ে গেছি। আমার অবস্থার পরিবর্তন আর এ জীবনে হবে না। কিন্তু জমিদার হচ্ছেন মৃত্ত বড়লোক। ষাওয়া-পরার কষ্ট তাঁর ওখানে কোনদিনই হবে না। ভবিষ্যতে তোমার ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া শিখে মাহুদ হবে। কিন্তু আমি তোমার কি করতে পেরেছি ? অবস্থার মধ্যে ছাড়া তোমার আর কি পরিচয় আছে ?

—তুনে ভায়লেট মাথা হেঁট করে পাঁচাণের মতো স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। বাপের দিকে-তাকাতো ওর তরঙ্গা হ'ল না।

বৃদ্ধ কর্ণকাল চুপ করে থেকে আবার বলতে শুরু করলে, জমিদার তোমাকে তাঁর বাড়ীতে নিয়ে যেতে চান। শক্ররা এগিয়ে আসছে। আর সময় নেই। অনর্থক কালক্ষেপ করা আর সমীচীন নয়। জমিদার একটা নিরুপকৃত অকলে চলে যাবেন। বোকারি করো না। তুমি প্রস্তুত হও।

যথাসময়ে মন্দিরদ্বারে একটা লাল রঙের ঘেরা-টোপ দেওয়া কেদারা এসে থামল। সুসজ্জিত কেদারা। ভিতর থেকে বেরিয়ে এল একটা সুবাপুরুষ। অতি রুদ্ধ চেহারা ওর। দোকটি নাকি জমিদারের দেওয়ান।

দেওয়ান মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করলে।

বৃদ্ধ দেখলে ওকে। কিন্তু স্বাগত করলে না। উদাস মনে বহুক্ষণ মৌন ভাবে বসে থেকে হঠাৎ এক সময়ে বলে উঠল, আদাকে যদি তুমি কোনো দিন মূহুর্তের তরেও ভালবেসে

থাক ভায়লেট, তা হলে আমার কথা শোন। কেদারা এসেছে জমিদারের কাছ থেকে। উঠে বস ওতে। আমি তোমার বাবা। তোমাকে সংসারে আমিই এনেছি। আমারই চোখের সামনে কেমন ভাবে একটু একটু করে বেড়ে উঠে এত বড়টি হয়েছ, তাও দেখেছি। তোমার সুখার্থ্য আমার একমাত্র কামনা। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি—তুমি জমিদার-পরিবারে সুগৃহিণী হয়ে সুপুত্রের জননী হও।

বৃদ্ধ প্রাণপণে উদ্গত অশ্রু দমন করতে চেষ্টা করে। কিন্তু পারে না। হ-হ করে শিশুর মতই কেঁদে ফেলে।

ভায়লেটের মুখে কথা নেই। ঠিক যেন সন্দোহিতের মতো উঠে সেই কেদারার কাছে গিয়ে ভিতরে ঢুকলে।

সন্ধ্যা নেমে আসছে। আকাশের পূর্ব দিকে একটা অসম্পূর্ণ চমৎকার রামবহু দৃষ্টিগোচর হ'ল। বোধ করি কোথাও বড় উঠেছে। বাতাসে শৈত্য অহুত হচ্ছে।

ভায়লেট চলে গেল। জীবনে আর হয়ত দেখা হবে না। আমার অন্তরাগ্না চীৎকার করে বলতে চাইল—এই আমার দেশের সমাজ, এই আমাদের জীবন।

মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলাম, প্রতিকূল অবস্থা থেকে পরিজ্ঞান পাবার কোনো পথ আপাততঃ আমাদের নেই। আর কোথাও আশ্রয় মিলবার সম্ভাবনা নেই। এখানকার মাটিতে আমি জন্মেছিলাম। এই মাটির বুকেই আমাদের কীবিকা অর্জনের ব্যবস্থা করতে হবে।

হুঁধের কাছে এসিয়ে আসি।

বৃদ্ধ হুট চোখ মুদিত করে অনড় পাঁচাণের মত এক পাশে শুয়ে ছিল। বললাম, কমা করুন। আপনার হুঁধের ব্যাঘাত করলাম। একটু থেমে আবার বললাম, আপানীদের বাবা দিতে আমি গরীলা বাহিনীতে যোগদান করবো। আপনাকে ছেড়ে যেতে আমার ইচ্ছা হচ্ছে না, কিন্তু না গিয়েও উপায় নেই। আপানীদের বাবা দিতেই হবে।

বৃদ্ধ বাতকর ধীরে ধীরে চোখ মেলে আমার দিকে চাইল।—ভারপর অত্যন্ত ক্রীণ কণ্ঠে বললে, ভাল কথা। হুনিয়ার অত্যাচার বিরুদ্ধে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে ঠাড়াবার মত লোক তৈ তোমরাই। যাক সে কথা। কিন্তু আজ এখনো পর্যন্ত তোমার কিছুই ষাওয়া হয় নি। ষাওয়া-দাওয়া করে রাড়িটী এখানে থাক। কাল যেও, কিন্তু আজ নয়। অতুত অবস্থায় আমি কোনো অতিথিকে ছাড়ি নে। কাল যেয়ো।

বৃদ্ধ আবার চোখ বুজল।

প্রিং-এর কাছে ফিরে এলাম।

মনে হয়েছিল দিদির হুঁধে মুহুমান হয়ে পোপনে সে অশ্রুপাত করছে। কিন্তু তার সন্নিকটে গিয়ে বুঝলাম, আমার অহুমান সত্য নয়। প্রিং-ম্যাপেল বৃক্ষের ছাওয়ার-দোল-ষাওয়া পাতাগুলির দিকে অপলক নেত্র চেয়ে থেকে আপন মনেই কিস্ কিস্ করে বলছে, আশ্রয়। গত রাতে আমি

তো কোনো স্বপ্ন দেখলাম না। অথচ স্পষ্টই আমি পাখীটাকে তিন বার ডান নাড়তে শুনেছিলাম।

বললাম, ওটা কুসংস্কার।

আমার এই মন্তব্যে স্প্রিং-এর চমক ভাঙে। কিরে তাকায় আমার পানে। বলে, কি বললেন?

বলছিলাম ওটা কুসংস্কার।

স্প্রিং-এর চেহারা দেখে মনে হ'ল, আমার এই কথাটা ও মেনে নিতে পারতে না। দৃঢ় কণ্ঠে আমার কথার প্রতিবাদ করলে, বললে—আপনি কি বলছেন? কুসংস্কার এটা হতেই পারে না। যদি কুসংস্কার হবে, তা হলে আমার মা কেন এই লচ'লত বিশ্রামকে অগ্রান্ত বলে মনে করতেন।

তা জানি নে। কিন্তু ওটা কুসংস্কার ছাড়া আর কিছুই না।

আপনি জানলেন কি করে?

প্রচুর পড়াশুনা করলে এদব জানা যায়।

আপনি তা হলে খুব লেখাপড়ার চর্চা করেছেন বলুন?

তা করেছি বৈকি।

স্প্রিং যেন হাতে টান পেলে। নিঃসঙ্কোচে আমার এক-খানা হাত ধরে আমাকে পাশে বসালে এক প্রকার জোর করেই। তার পর মিনতিভরা হয়ে বললে, তা হলে যুগ্ম সময় নষ্ট না করে তিন্ন তিন্ন বস্তু কি করে বিশ্লেষণ করে দেখতে হয়, আমাকে তাই আপনি একটু ভাল করে বুঝিয়ে দিন।

স্প্রিং নাছোড়বান্দা। অগত্যা বাবুর উপর একটা কক্ষির জায়াঘে রামধনুর ছবি এঁকে তার স্বরূপ বি শ্রবণ করতে লেগে গেলাম।

আমি অনেকটা বক্তৃতার ভঙ্গীতে একটু উচ্ছ্বসিত ভাবেই ব্যাখ্যা করছিলাম। তখনও তখনও স্প্রিং হঠাৎ বলে উঠল, আমাদের ভাষা কি অশ্লীল? কি চমৎকার, কবিত্বময় ভাষা। যাড়ভাষা ভাল করে শেখবার ইচ্ছা আমার প্রবল। আমার মা যে সব গান আমাকে গেয়ে শোনাতে, সেই সব গান ছাপার অক্ষরে পড়তে আমার ভারি ইচ্ছা হয়। আমাকে আপনি পড়তে দেখান।

স্প্রিং-এর হেলোমাহুয়ের মত কথা শুনে আমার রাগ হ'ল। এদিকে পেটের অন্ন জুটবার উপায় নেই, ভাষা শিক্ষার উপযুক্ত সময়ই বটে এটা।

আমি তার কথার কোন জবাব দিলাম না। শুধু পড়লাম অল্প এক স্থানে—স্প্রিং-এর কাছ থেকে বেশ একটু ব্যবধান। নিজের চেষ্টা করতে লাগলাম। কিন্তু কোথায় নিজের চোখ

বুজলেই যে তারলেটের সেই করুণ মুখের চোখের উপর নুঁচ হয়ে ওঠে।

* * *

পরদিন সন্ধ্যাবেলা আমিই ঘুম থেকে উঠলাম। রওনা হবার পূর্বে তাবলাম—বুকের এবং তার কণার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যাওয়াটাই সমীচীন। কিন্তু বুকের মুখের পানে চোখ ফেরাতেই দেখলাম—ওর চমকুটি মুদিত, কর্ণাধারার মতই অশ্রুধারা ওর শুকনো গালের উপর দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে। মন চাইল না ওকে আবার নতুন করে হৃৎক হিতে। স্প্রিং-এর দিকে চোখ ফেরালাম। নেও নিমীলিত চক্ষে নিশ্চল ভাবে এক পার্শ্বে পড়ে আছে।

শুভরাত্রি বিদায় না নিয়েই চলে আসবার ক্ষমতা বাইরের দিকে পা বাড়ালাম।

হঠাৎ কানে এল :—চলে যাচ্ছেন? শুধু—কাল রাতে কিন্তু আমি স্বপ্ন দেখেছি।

সেই কণ্ঠের অস্বস্তি করে স্প্রিং-এর মুখপানে দৃষ্টিপাত করলাম। ওর চোখের কোণে অশ্রু সঞ্চিত হয়ে উঠেছে।

বললাম, স্বপ্ন-স্বপ্ন তো?

ওঠপ্রাণে একটা কীট হান্তরেখা জোর করে টেনে এনে স্প্রিং জবাব দিলে—হ্যাঁ, স্বপ্ন-স্বপ্নই বটে। স্বপ্ন দেখলাম—স্বপ্নের একটি দিক্শিত ঘেলের সঙ্গে তারলেটের বিয়ে হয়েছে, এবং সে এখন গান পড়ে তার মানে বুঝতে এবং গান রচনাও করতে পারে।

বলতে, ইচ্ছা হ'ল, আচ্ছা, তাই যেন হয়। স্বপ্ন যেন ভোমার সভ্য হচ্ছেই দেখা দেয়। কিন্তু শত চেষ্টা করেও মুখ দিয়ে একটা কথা বেরল না। কি একটা অজানা শক্তি আমার কণ্ঠরোধ করে আমাকে নির্বাক করে মিলে। নির্বোধের মত ওর দিকে চেয়ে নির্বাকো দাঁড়িয়ে রইলাম।

অবশেষে এক সময়ে স্প্রিং-ই বেছায় আমাকে বিদায় দিলে। তার মুখ দিয়ে বিদায়-সম্ভাষণ-বাক্যটিই তরু উচ্ছ্বাসিত হ'ল।

ওর চোখের দৃষ্টি হয়ে উঠল অরণ্যাবীর মত গভীর, সেই দৃষ্টির ভাংপড়া আমি উপলব্ধি করতে পারলাম না।

যুদ্ধ এবং তার কণাকে মস্তির বেবে আমি চিরকালের মত চলে এলাম।

তখন বরষার স্প্রিং-এর সেই দৃষ্টির মত বসন্তে হৃৎক হেঁটা করেছিলাম। কিন্তু সে চেষ্টা আমার ব্যর্থ হয়েছিল।

কিন্তু আত্ম তার অর্থ ব্যাখ্যা, নিকট বসন্তে বসন্তে পরিণাম। আত্ম ভাঙে হৃৎকোভা কিছুই ঘেঁ।

৩ চীনা লেখক লুং চাং ইয়ের গল্প অবলম্বনে।

কালীপ্রসন্ন ঘোষ

१८४९-१८५०

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

জন্ম :

তিনি দীনবন্ধু গোস্বামী নামক প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণের নিকট

ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত ভরাকর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। রত্নবংশ ও যথনুত এবং শরচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য নামক এক সম্ভ্রান্ত কায়স্থ পরিবারে ২৩ জুলাই ১৮৪৩ (৮ শ্রাবণ ১২৯৯) খ্রীঃাব্দে একটি পণ্ডিতের নিকট ভট্ট পণ্ডিতে আরম্ভ করিলেন, ১২৪০*) কালীপ্রসঙ্গের জন্ম হয়। ভাষার পিতার নাম এজিবৎ পাঠ্য পুস্তক উপেক্ষা করিয়া সংস্কৃত শিক্ষার পুরস্কীণ শিবনাথ ষোম।

বাল্য-শিক্ষা

বঙ্গবাসী-কার্যালয়ের সহিতে ১৩১১ সালে প্রকাশিত 'বঙ্গ-
ভাষার লেখক' গ্রন্থে কাঙ্গালীপ্রসন্নের জীবিতকালে তাঁহার
সংক্ষিপ্ত জীবনী মুদ্রিত হয়। ইহা সহিতে তাঁহার বাণ্য-শিক্ষার
কথা উদ্ধৃত করিতেছি :—

“কালীপ্রসন্নের পিতা শিবনাথ বসু প্রগাঢ় বিশ্বাসী ও
 তত্ত্ববান বিদ্যু ছিলেন। পাশ্বে কালীপ্রসন্ন ইংরেজী শিখিয়া
 যথেষ্ট ঘন, তিনি এই বেঙ্গলী ভাষাতে ইংরেজী পড়িতে দিবে
 না। বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, এবং বাড়ীতে যে একটি কাপড়
 প্রকৃতব ছিল, তাহাতেই কালীপ্রসন্নকে ভিন্ন বৎসর বস্ত্রপরি
 স্রময় প্রথম শিক্ষার প্রবীষ্ট করিয়া দিলেন।...তাহার বন্দ
 বসন পাঁচ বৎসর, ওখন ‘পল্লবমালা’র বস্ত্রাং ও কীৰ্ত্তিবাসের
 পয়স তাহার কর্ণে।...চল্লি কিছু দিনের মধ্যে কালীপ্রসন্ন নামের
 মহাত্ম্যতত্ত্ব কালীপ্রসন্নের কর্ণে হইল।...তাহার স্রোত তখন
 কলাপ ব্যাকরণের একটি বহু।...চৌল ছিল।...বহু বৎসরে
 কালীপ্রসন্ন কলাপের প্রবন্ধ অর্থাৎ চতুর্থ নুতি পড়িতে আরম্ভ
 করিলেন। বাড়ীর সমস্ত বালককেই ওখন ইংরেজী পড়ে।

কালীপ্রসন্ন ইংরেজী পড়িতে সুযোগ পাইতেনেন বা বলিয়া
সময় সময় সন্ধান-বরফদিগের বিকট চাক্ষুঃ ছল দেখিতে।
ইংরেজ ইচ্ছাম, অল্প দিনের মধ্যেই গাঁহার প্রাণিত সুযোগ
ঘটিত।... তিনি বরফালে গাঁহার ঘোষ্ঠভাণ্ড পল্লবায় যোগ
স্বাদনের বাসায় থাকিয়া [পালীদেয় হুল] ইংরেজী
পড়িতে লাগিলেন।... গাঁহার সব্ব বর্ষ বয়সের সময় বরফালে
পর্ববর্ষেই ছল প্রতিক্রিত হইল। কালীপ্রসন্ন দুই বৎসর সেখানে
অধ্যয়ন করিয়া গাঁহার দশম বর্ষ বয়সের সময়ই তিনি ঢাকা
কলেজিওয়েট ছলে জাষ্ট্রা প্রবিষ্ট হইলেন এবং সেখানে দুটি
বৎসর কাল বিশেষ উচ্চ ও আগ্রহের সহিত ইংরেজী
পড়িলেন। এই দুই বৎসর তিনি ইংরেজী ও বাংলা সাহিত্য
এবং ইতিহাস ও জ্যোতিষ পত্রিকা সমস্ত গ্রন্থই অল্প
বুদ্ধিমান হুইতে উঠিলেন, সেই বৎসর গাঁহার বৃত্ত বিমলাইল।
এইটুকু হুইতে উঠিলেন, সেই বৎসর গাঁহার বৃত্ত বিমলাইল।

কালীপ্রসন্ন ঘোষ

উৎসাহে ভূষিতা গেলেন। আট নম্ব মাসে সংকুলে তাঁহার
 প্রভাব প্রবেশ হইল, এবং এই সময়ে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত দু-একটি
 প্রাথমিক প্রবন্ধ পত্রিকাদ্বয়ের স্থিতি আশ্চর্য কল্পিত। কিন্তু
 কলেজের শিক্ষা এক প্রকার ঘাট হইয়া গেল। ঐ সময়ে ঢাকা
 কলেজে Lewis Society নামে একটি প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক
 সমিতি ছিল।...কালীপ্রসন্ন সেই সময়ে তাঁহার তের বৎসর
 বয়সের সমগ্র "পদার্থবিদ্যা সম্বন্ধীলবের কল" এবং "বহুভাষা
 সমগ্র-বহুভাষা" এই নামে দুইটি গীর্ষ প্রবন্ধ পাঠ করিয়া খুব বেশী
 প্রভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।...কিন্তু কালেজে কীতিবত্ত অধ্যাপক
 করিলেন না বসিয়া তাঁহার অভিভাবকদ্বয়ের দ্বারা কেহ কেহ
 তাঁহার কলটি ভিত্তিকার করিলেন। এই ভিত্তিকার তাঁহার প্রাথমিক
 চেষ্টা ছিল না। তিনি কিছু কাল পরেই কলিকাতা চলিতা গেলেন
 এবং...ইংরেজী পত্রিতে লিখিতেন। সে সময়ে কলিকাতায়
 প্রাথমিক সাহিত্যের প্রতি লোকের উৎসাহ অত্যন্ত ছিল না।...

৩ "ডালি" : ত্রিভুজের বোধ।—জাতি বিভিট, জগৎকালীন্দ্রের দায়িত্ব জোড়ে প্রবাহিত হয়। ইংরেজী বিদ্যায়নই
অমূল্য, প্রাণ ১৩২৮।

সাহিত্য, ইতিহাস, মনোবিজ্ঞান, নীতিবিজ্ঞান এবং বর্ণভেদের ইতিহাস বা ধর্মলজ্জি প্রভৃতি গ্রন্থাবলি পাঠ করিয়া ইংরেজী ভাষায় অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন। তিনি এ সময়ে প্রতিদিন দিবা স্নানান্তে অতি কম হইলেও চৌদ্দ পনর ঘণ্টা অধ্যয়ন করিতেন।...

“তাহার বয়স যখন সবে বিশ বৎসর, লেই সময় তিনি ইংরেজী বক্তা বলিয়া বিখ্যাত হন। তাহার বক্তৃতার প্রথম আরম্ভ ভবানীপুরে। সে সময় ভবানীপুরে একটি সুপরিচিত সাহিত্যসভা ছিল।...ভবানীপুরস্থ বহুবাকবর্ণের অহরহোষে কালীপ্রসন্ন...সেখানে The Christianity of Christ and the Christianity of Church অর্থাৎ খৃষ্টধর্ম ও প্রচলিত খৃষ্টধর্ম এই দুইয়ের পার্থক্য বিষয়ে এক দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। শ্রোতৃবর্গ তিন ঘণ্টা কাল মন্তব্যবৎ উপবিষ্ট ছিলেন।...বক্তৃতার পর...মহাশি দেবেজনাথ দ্রুতপদে নিকট আসিয়া কালীপ্রসন্নকে গাঢ় আলিঙ্গন ও ললাটে চুসন দানেন কৃতার্থ করিলেন। আর মেভারেও ডলও (Dall) তাহাকে নানারূপ প্রশ্ন বাক্যে অভিনন্দিত করিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে উপদেশ দিলেন। একদিন ডল সাহেবের একটী কথায় তাহার জীবনের স্রোতে এক আশ্চর্য্য পরিবর্তন ঘটিল। ডল সাহেব তাহাকে বলিলেন, “দেখ কালীপ্রসন্ন, ইংরেজী আমাদিগের বক্তা। উহা ভোমাদিগের মাতৃভাষা নহে। তোমরা ইংরেজীর জন্ত যত কেন পরিশ্রম না কর, উহা কখনও ভোমাদিগের নাম-রুদ্রায় মুদ্রিত হইয়া পৃথিবীতে প্রচলিত হইবে না। যদি স্বদেশের জন্ত প্রকৃত কিছু কার্য্য করিতে চাও, তাহা হইলে আপনার মাতৃভাষায় সেবা কর। পৃথিবীর যে সকল মহাত্মা মানব জাতিকে হাসাইয়া কিংবা কাঁদাইয়া জাতীয় জীবন স্রোতে পরিবর্তন ঘটাইয়াছেন, তাহারা সকলেই মাতৃভাষায় সেবা করিয়াছেন।” ডল সাহেবের কথামূলক কালীপ্রসন্নের অন্তরে প্রস্থিত লিখিত হইল এবং তিনি কিরূপে বাংলা সাহিত্যের উৎকর্ষসাধন করিবেন ও বর্তমান কালের ল্পথবিলম্বিত মেয়েদি রায়লার শক্তি ও উন্নীপনার একটা তরঙ্গ প্রবাহিত করিবেন—এই চিন্তাই তাহার চিন্তের প্রধান চিন্তা হইল। তিনি ইহার পর একদিন অতি গভীর তত্ত্বের সহিত সঙ্গম ও প্রতিজ্ঞা করিয়া বাংলা ভাষার সেবান্নত গ্রহণ করিলেন। বাংলার তৎকালে যে সকল ভাল পুস্তক পাওয়া গেল, তাহা বিশেষ মনোযোগের সহিত পুনঃ পুনঃ পড়িলেন এবং সংস্কৃত ব্যাকরণে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি না জন্মিলে বাংলা ভাষার উপর যথার্থ আধিপত্য হয় না বলিয়া এবার তিনি পানিনি পড়িতে আরম্ভ করিলেন। পানিনি অষ্টাধ্যায়ী, বৃত্তি ও ব্যাকরণের সহিত বিশাল গ্রন্থ। উহা পড়িতে হইলে হুল গ্রন্থ এবং তটোকা দীক্ষিতের প্রক্রিয়া-বিবৃতি স্বস্ত্রে স্বস্ত্রে মিলাইয়া পড়িতে হয়। তিনি উহার সহিত আবার কলাপ ও মুদ্রবোধের স্বত্র মিলাইয়া পড়িলেন এবং কয়েক বৎসরেই পানিনি ব্যাকরণে অসাধারণ অধিকার লাভ

করিলেন। এখন হইতে বাংলা ভাষার চক্ষে তাহা এক বস্তু মত হইল। তিনি বাংলা ভাষার প্রসারণ-স্থানে পৌঁছিয়া, উহাকে ইচ্ছামত চালনা করিবার শক্তি লাভ করিলেন। এবং তাহার সংস্কৃত অধ্যয়ন শেষ হইবার পূর্বেই, তিনি বাকালার গ্রন্থ রচনা আরম্ভ করিলেন।”

সরকারী চাকুরী

বাইশ বৎসর বয়সের সময় কালীপ্রসন্ন ঢাকা ছোট আদালতের ‘ক্লার্ক অফ দি কোর্ট’ পদে নিযুক্ত হন। এই সময় হইতেই তিনি স্থায়ী ভাবে ঢাকায় বাস করিতে থাকেন।

“যোষ মহাশয় তাহার অসাধারণ বাগ্মিতার প্রভাবে ও বিদ্যাবস্তার মৌরবে ঢাকার সাহেবদিগের নিকট বড় সম্মানিত ছিলেন। তখন এ দেশে কংগ্রেস ও কনকারেশন হয় নাই; সাহেবেরা এ দেশের প্রায় সমস্ত সভাসমিতিতেই বাঙালীর সহিত মিশিতেন; কোন কোন সভার নামভঃ ‘পৃষ্ঠভূমিতে ধাক্কা’ সভার সমস্ত কার্য্য কর্তৃত্বের সহিত চালাইতেন। ঐরূপ সভাসমিতিতে যোষ মহাশয়ই তাহাদিগের অগ্রণীকপে কার্য্য করিতেন; এবং সভায় বক্তৃতা ও সভাসংক্রান্ত অত্যন্ত কার্য্য সম্পাদনের দ্বারা বাঙালীর সহিত সাহেবদিগের সৌহার্দ্যবন্ধনে যত্নপর হইতেন। এই সকল কারণে দেশের একজন উচ্চ-শ্রেণীর সমাজচালকের জায় সাহেবদিগের নিকট তাহার প্রতিপত্তি ছিল।”

চাকুরীতে নিযুক্ত থাকিলেও কালীপ্রসন্ন কখনও অধ্যয়নে বিরত হন নাই। তাহার অধ্যয়নের প্রথম ফল ‘নারীজাতি-বিষয়ক প্রস্তাব’ ২৬ বৎসর বয়সে ১৮৬৯ সনে ঢাকা হইতে প্রকাশিত হয়। ঢাকায় অবস্থানকালেই তিনি ১৮৭৪ সনে ‘বাহুব’ পত্র প্রকাশ করেন। এই সময়ে কার্য্যোপলক্ষে ঢাকায় আগত বহু সুসাহিত্যিক—দীনবন্ধু মিত্র, অন্নভদ্র বসু, গঙ্গা-চরণ সরকার ও তদীয় পুত্র অক্ষয়চন্দ্র প্রভৃতির সহিত তিনি পরিচিত হইবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। অক্ষয়চন্দ্র সরকার “পিতা-পুত্র” প্রবন্ধে লিখিয়াছেন :—“পিতা যখন প্রথম ঢাকায় গেলেন [১৮৭৬-৮২], তখন সাহিত্য-রসী ক্রীড়ক কালীপ্রসন্ন যোষ সরকারী চাকুরী করিতেছিলেন। তিনি সর্বদাই পিতার কাছে আসিতেন। সাহিত্য, অসাহিত্য, অনেক বিষয়েই পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। বাহুবের প্রসারে কালীপ্রসন্ন বাহুব কীর্ত্তি প্রসারিত হইল। তিনি বন্ধের সর্বজন কীর্ত্তিমান বলিয়া প্রথিত হইলেন।” (‘বঙ্গ-ভাষার সেবক’, পৃ. ৫৬৩)

কালীপ্রসন্ন ১১ বৎসর ঢাকা ছোট আদালতের হেড ক্লার্কের কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। কর্ম্মদক্ষতাগুণে চাকুরীতে তাহার খ্যাত হইয়াছিল।

ব্রাহ্মসমাজ

কালীপ্রসন্ন পূর্ববঙ্গ ব্রাহ্মসমাজের পরম হিতৈষী ছিলেন।

ঢাকা ব্রাহ্ম স্কুলের সম্পাদক-রূপে ১৭ জানুয়ারি ১৮৬৯ তারিখের 'ঢাকাক্ষণক'ে তাঁহার একটি বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইয়াছে। ১৮৬৯ সনের এই ডিসেম্বর পূর্ববাকলা ব্রাহ্ম-সমাজ-স্থল প্রতিষ্ঠিত হয়; পর-বৎসরের ২৩শে জানুয়ারি (১১ মাঘ ১২৭৬) এই পুর্বে অমুদ্রিত ব্রাহ্মসমাজের অধিমবসীর উৎসব উপলক্ষে "ব্রাহ্মসমাজের পরম হিতৈষী শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় একটি সুদীর্ঘ উৎকৃষ্ট বক্তৃতা করেন, বক্তৃতাটি আদ্যোপাংগ ব্রাহ্ম ধর্মের পৌরব ও মহিমার কথাতে পরিপূর্ণ এবং অতীব ক্ষতিমণুর ছিল। ব্রাহ্ম ধর্মকে সম্মাননা ও শ্রীতি করিবার ব্রাহ্ম ধর্ম যে অতীব প্রাচীন, প্রাকৃতিক, বৃদ্ধিমানের তুষ্টিকর, শান্তি ও যুক্তিপ্রদ ধর্ম বক্তৃতায় তাহা বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে" ('ঢাকাক্ষণক', ৩০-১-৭০)।

ব্রাহ্ম যুবকগণের দ্বারা ঢাকার পূর্ববঙ্গ সন্তসাধিনী নামে একটি সভা প্রতিষ্ঠিত হয় (কালান্দ ১২৭৬)। সভার মুখপত্র-রূপে ১২৭৭ সালের বৈশাখ (১৮৭০, এপ্রিল) মাসে 'সন্তসাধিনী' নামে মূলত মূল্যের একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। কালীপ্রসন্ন এই সাপ্তাহিক পত্রিকা সম্পাদন করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। 'সন্তসাধিনী'র পরমায় এক বৎসর।*

বাহুব

বক্তিমচন্দ্রের 'বদ্বর্শন'ের আদর্শে পূর্ববঙ্গ হইতে একখানি উচ্চাঙ্গের মাসিকপত্র প্রকাশের সঙ্কল্প করিয়া কালীপ্রসন্ন ১২৮১ সালের আষাঢ় (১৮৭৪, জুন) মাসে ঢাকা হইতে মূলত মূল্যে (সডাক বার্ষিক ১৫০) 'বাহুব' প্রচার করেন। এই মাসিক-পত্রের কার্যাব্যাক ছিলেন, আনন্দচন্দ্র দাস। প্রথম সংখ্যায় মুদ্রিত 'অবতরণিকা'র সম্পাদক লেখেন :—

"বাহুব আজ হইতে বঙ্গীয় বিজ্ঞানসাহিত্যের অগ্রদূতের ভিহারী হইয়া রহিল। ইহার ভবিষ্যৎ ও ভরসা তাঁহাদিগের হস্তে। ইহা অবশ্যই, অমূল্যত সুসজ্জনের দ্বারা সন্তত সাবধান থাকিয়া, যানাবিধ বিষয়ের প্রসঙ্গে পার্থক্যসমাজের মনোমোদনে যত্নসীল হইবে,—বাংলার প্রতি বাহাতে বাঙালীর অগ্রদূত মুক্তি পায় এবং বঙ্গদেশ বলিয়া বাহাতে দেশীয়দিগের মনে মমতার সঞ্চার হয়, অবশ্যই তদর্থে ইহার নিয়ত চেষ্টা থাকিবে;—কি পরিমাণে কৃতকার্য হইবে, তাহা বলা আমাদের সাধ্যাত্ত নহে। যাহার ইচ্ছা ও আশা যে গগনে উড্ডীন হয়, ক্ষমতা তাহার অর্ধ পথে আরোহণ করিতে সমর্থ হয় কি না, সন্দেহের বিষয়।"

প্রথম সংখ্যা 'বাহুব'র সমালোচনা প্রসঙ্গে বক্তিমচন্দ্র 'বদ্বর্শন' (প্রাচীন ১২৮১) যে অমূল্য মন্তব্য করিয়াছিলেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

৩. কদম্বনাথ মজুমদার : 'বাদালা সাময়িক সাহিত্য', পৃ. ৩২৩-২৪

"ইহা একখানি উৎকৃষ্ট মাসিকপত্র।...আকারে ক্ষুদ্র হইলেও ভগ্নে, অল্প কয়েক পত্রাপেক্ষা লব্ধ বলিয়া আমাদের যৌবন হইল না। রচনা অতি সুন্দর এবং লেখকদিগের চিন্তাশক্তি অসামান্য। ইহা যে বাংলার একখানি সর্বোৎকৃষ্ট পত্রমধ্যে গণ্য হইবে, তদ্বিষয়ে আমাদের সংশয় নাই।"

"মাসিক পত্রের সম্পাদকের দায়িত্ব বড়ই কঠিন এবং গুরুতর বলিয়া কালীপ্রসন্নের ধারণা ছিল। এ সম্বন্ধে তিনি একটি সুন্দর কথা বলিতেছেন, তাহা এই—'সম্পাদক কেবল তাঁহার পক্ষে প্রকাশিত প্রবন্ধাদির ভাষার শুদ্ধি রক্ষা দায়ী, তাহাই নহেন। প্রত্যেক পত্রেরই একটা সম্পাদকীয় বাণী সুর থাকা চাই। যাত্রাপান কিংবা বিয়েটোরে যেমন প্রথমেই একটা সুর বাঁধিয়া লওয়া হয় এবং তারপর যিনিই যা পান না কেন, সেই সুরেই গাহিতে হয়। তেমনিই প্রত্যেক মাসিক পত্রেরই সম্পাদকের একটা সুর থাকা আবশ্যিক। লেখকদের দ্বারা যে সুরে ইচ্ছা লিখিয়া যাইবেন, ইহা ঠিক নহে।' বাদালা মাসিকপত্রের মধ্যে তিনি 'সাহিত্য'কে বড় ভালবাসিতেন।"—চন্দ্রশেখর কর : 'পরলোকগত কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর' (১৩১৭) পৃ. ১৫।

'বাহুব' কালীপ্রসন্নের অভুলনীর কাক্তি। ১২৮২ সালের চৈত্র মাসে "বদ্বর্শনের বিদায় গ্রন্থ" প্রসঙ্গে বক্তিমচন্দ্র লিখিয়া ছিলেন :—"যে অভাব পূর্ণ করিবার তার বদ্বর্শন গ্রন্থ করিয়াছিল, এক্ষণে বাহুব, আর্ধ্যদর্শন প্রভৃতির দ্বারা তাহা পূরিত হইবে। অতএব বদ্বর্শন, রাধিবীর, আর প্রত্যেক জন নাই।" লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠ লেখকগণের রচনা 'বাহুব'ের পৃষ্ঠা অলঙ্ঘিত করিত। রমেশচন্দ্রের 'জীবন-প্রভাত' ইহাতেই প্রথম প্রকাশিত হয়। পুস্তকাকারে প্রকাশিত কালীপ্রসন্নের অধিকাংশ রচনাই 'বাহুব'ে প্রকাশিত প্রবন্ধের মাণিত রূপ। 'বাহুব'-সম্পাদন-কালে কালীপ্রসন্নের স্বস্তে ভাওয়াল-রাজ্যের গুরুতর ভ্রষ্ট হয়; ইহার ফলে 'বাহুব' কিছুকাল অনিয়মে প্রকাশিত হইয়া শেষে লোপ পাইয়াছিল। ভাওয়াল হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি 'বাহুব'কে পুনর্জীবিত করিয়াছিলেন। 'বাহুব'ের বিভিন্ন খণ্ডগুলি এইভাবে প্রকাশিত হয় :—

১ম বর্ষ...১২৮১, আষাঢ়-চৈত্র। ২য় বর্ষ...১২৮২, বৈশাখ-চৈত্র। ৩য় বর্ষ...১২৮৩, বৈশাখ-চৈত্র। ৪র্থ বর্ষ...১২৮৪। ৫ম বর্ষ...১২৮৭। ৬ষ্ঠ বর্ষ...১২৮৮। ৭ম বর্ষ...১২৮৯। ৮ম বর্ষ...১২৯১। ৯ম বর্ষ...১২৯২ (বৈশাখ-আশ্বিন)। ১২৯৩ (কাঠিক-চৈত্র)। ১০ম বর্ষ...১২৯৪, ১ম-৫ম সংখ্যা। ১১শ বর্ষ...১২৯৫, ১ম-২য় (৭)। (পুনঃপ্রচার) ১ম বর্ষ...১৩০৮ কালান্দ—১৩০৯ মাঘ। ২য় বর্ষ...১৩১০ (বৈশাখ-চৈত্র)। ৩য় বর্ষ...১৩১১। ৪র্থ বর্ষ...১৩১২। ৫ম বর্ষ...১৩১৩, বৈশাখ-ভাদ্র।

ভাওয়াল-রাজ্যের কর্মসচিব

ভাওয়ালের রাজ্যে ভূম্যবিকারী বঙ্গদেশবাসল কালীদাসদাস

স্বাধীন হওয়ার একজন যোগ্য প্রতিনিধিত্ব সন্ধান করিতে— অল্পমতামের ফলে রাজ্যসংক্রান্ত অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হইয়া যিলেন,—বিশেষতঃ ভাষার একমাত্র পুণ্ড, রাজ্যের ভাবী পুণ্ডিত। তার পর... ১৩০৮ সনের ১৪ই অগ্রহায়ণ [৩০ নবেম্বর উক্তাব্দিকালী, কুমার, রাজেন্দ্রনারায়ণ ভবন আশ্রয়িত। ১৯০১] বোধ মহাশয়কে দ্ব্যনেকবারে গদ্য দ্বিভাষ্য 'বাংলা-সম্পাদক কালীপ্রসন্ন বিজ্ঞান' ও 'প্রবাসী' পুস্তকাদি প্রেরণ করেন। বোধ মহাশয়ও লাল্য বিজ্ঞানটি পঠিত হইয়া তাৎক্ষণিক কথ্য ভাষায় কর্ণপোচর হইয়াছিলেন, তিনি এক দিন কালী-পুস্তিকাাদি ক'রেনেব। পরে বহু চেষ্টায় দেহী বোকদ্বারা প্রদত্ত আশ্রয় কারিগর ভাষ্যসময় কর্ণপোচর পদ প্রদত্তে বাণোদ্যে দ্বিভাষ্য দায়। ৩

ক'র অগ্রহায়ণ করিলেন। কালীনারায়ণ নিম্নোক্তাতিসময়ের

সংস্থিত করিলেন—আমার কার্যভার গ্রহণ করলে আপনাকে

সাহিত্যগোষ্ঠীর বিদ্য হইবে না, অতঃপর আমার পুণ্ড উপকার

হইবে। আপন আপন কৰ্ত্তব্য বোধ অনুসারে, যখন ইচ্ছা

করেন তাকার সাহিত্যে পারিবেম এবং জয়দেবপুত্র থাকিয়া

চাকার পেন্সে ভৃত্যবধান করিতে প্রয়োগ পাইবেন। পুণ্ড

আপনি এখানে কোন অধীনতার জ্ঞান পাইবেন না। আমি

এক্ষণে কর্ণে অগ্ৰহ, তাই আমি আপনায় হাতে সমস্ত সাপিন

দিতে ইচ্ছা করি। আপন আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রত্যা

ব্রাহ্মণের সহিত পরামর্শ করিয়া কার্য করবেন। এই তাৎ

আপনি বাধ্য করিবেন, তাহাই আমার কার্যরূপে পরিগণিত

হইবে। কালীপ্রসন্ন যুগের এ অগ্রহায়ণ প্রত্যাখ্যান করেন

নাই; তিনি ২৮ মার্চ ১৮৭৭ (১৬ চৈত্র-১২৮৩) প্রবাস কর্ণ

চাকার পদ গ্রহণ করেন। তাঁহার ভায় সুধী ও বিচক্ষণ ব্যক্তির

তত্ত্বাবধানে কুমার রাজেন্দ্রনারায়ণ কে অচিরে স্থাপিত হইয়া

উঠিবেন, বহু কালীনারায়ণ এইরূপ আশাই করিয়াছিলেন;

এমন কি পুত্র বাঘাতে বিষয়কার্যে পারদর্শী হইয়া উঠিতে

পারে, এতদ্বি ভিনি ভাষায় হস্তে রাজকার্যের কতক কতক

ভারও হস্ত করিয়াছিলেন। অল্প দিন পরেই রাজা কালী-

নারায়ণ পরলোকগমন করেন (১৬ জুন ১৮৭৮)। রাজ্য-

প্রাঞ্জির সঙ্গে সঙ্গে রাজেন্দ্রনারায়ণ (তখন ১৬ বর্ষ বয়স)

উদায় হইয়া উঠিলেন; তিনি অল্প বিদ্যানে রাজ্যের সম্পূর্ণ

কর্তৃত্ব-ভার প্রতিষ্ঠা কালীপ্রসন্নের উপর হস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত

মনে বসিজনগুণত আমার আশ্রয়-প্রদানে মত্ত হন। কালী-

প্রসন্ন দীর্ঘ ২৫ বৎসর কাল ভাওয়াল-রাজ্যের গুরুভার বহন

করিয়াছিলেন। ১৯০১ সনের ২৬এ এপ্রিল রাজা রাজেন্দ্র-

নারায়ণের মৃত্যু হয়; ইহার অব্যবহিত পরেই তিনি ভাওয়াল-

রাজ্য হইতে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

"১৩০৮ সনের ১৩ই বৈশাখ রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ পুণ্ড-

লোক গমন করিলে, তদীয় বিধবা রাণি বিলাসমণি দেবী

চাকার দ্বিতীয় সবজ্ঞ আদালতে কালীপ্রসন্ন বোধ মহাশয়ের

নামে কিয়দশিক দণ্ড লক্ষ সাড়ে বাঘটি চাকার চাকার দাবীতে

এক অভিযোগ করেন। রাজ্যের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে রাজ্যের

শোচনীয় অবস্থা দর্শনে রাণি বিলাসমণি দেবী রাজকার্যের

আত্মসমীক্ষণ অনেক বিষয়ের অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। তিনি

প্রথমা বৃত্তমতী রমণী ছিলেন বলিয়া রাজ্যের জীবিতাবস্থাতেই

রাজ্যের বিস্তারিত বিবরণ লম্বা অবগত ছিলেন। তাঁহার

সাহিত্য-সমালোচনী সভা

ভাওয়াল-রাজসদনে কার্যকালে কালীপ্রসন্ন এতট মনঃ কর্ণে অগ্ৰহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারই ঐকান্তিক যত্ন-চেষ্টায় ও রাজেন্দ্রনারায়ণের আনুকূল্যে জয়দেবপুত্রের 'সাহিত্য-সমালোচনী সভা' প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাবিধি কালীপ্রসন্ন এই সভায় বারক যিলেন। 'বাঘবে' মুক্তি বিদ্যেভূত বিজ্ঞান হইতে সভার উদ্ভেদ পতিষ্ঠিত হইবে:—

সাহিত্য-সমালোচনী সভার বিজ্ঞাপন।

নিম্ন লিখিত মহাপ্রসঙ্গ জয়দেবপুত্রের জীবিত কুমার রাজেন্দ্র-নারায়ণ রাজ্যের প্রতিষ্ঠিত সাহিত্য-সমালোচনী সভার অব্যাক কথিতীয় সভ্য হইলেন। এই কথিতীয় কোন সভা কোন বাঙ্গলা গ্রন্থ বাঙ্গলা ভাষার উন্নতি কি জীবিতের অনুকূল জ্ঞান করিয়া গুণতালয়ে কিংবা বিদ্যেজগৎ-বিস্তরণের জ্ঞান লই গ্রহের বহু এত করিয়া লইবেন, অথবা লজ প্রকারে প্রসকারের সাহায্য করিবেন। এইরূপ পুস্তক বিস্তরণ কিংবা সাহায্য দানে সম্পাদকের পূর্ববৎ অধিকার থাকিবে এবং সম্পাদকও উল্লিখিত অব্যাক কথিতীয় অগ্ৰহণ সভ্য বলিয়া পরিগণিত হইবেন।

অব্যাক কথিতীয় সভ্যদিগের নাম।

জীবিত বাবু রাজকর যোগোপাধ্যায় এম এ, বি এল। জীবিত বাবু চক্রবর্ত্ত যম এম এ, বি এল। জীবিত বাবু বসন্তচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। জীবিত বাবু গঙ্গাচরণ সরকার। জীবিত চাকার রাজেন্দ্রলাল মিত্র দায়বাহাদুর C. I. E. জীবিত রেবারেও চাকার জয়মোহন বসোপাধ্যায়। জীবিত বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার। জীবিত বাবু ইন্দ্রনাথ বসোপাধ্যায় বি, এল। জীবিত বাবু যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাক্ষয় এম, এ। জীবিত বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত।

চাকা জয়দেবপুত্র,

২৮ এ ফাল্গুন, ১২৮৮

ত্রিকালীপ্রসন্ন বোধ।

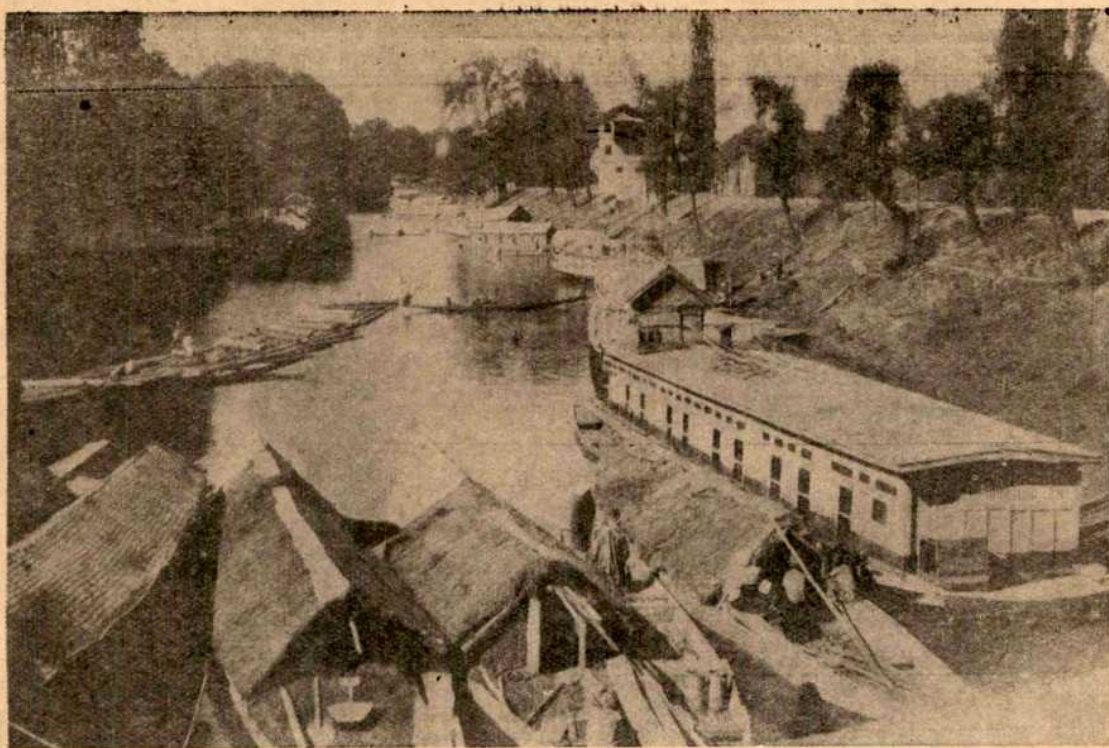
সম্পাদক

১৮ জাহ্নস্মি ১৮৮৯ তারিখের 'সুন্দর' সভাচার ও কুমার

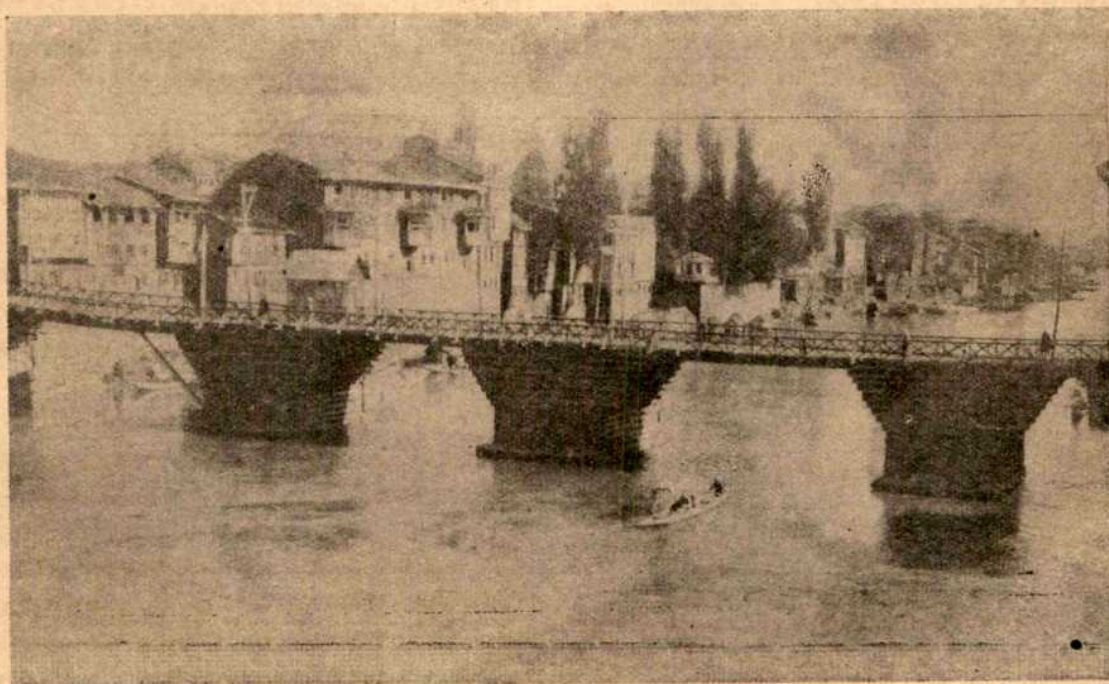
* হেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী: 'সত্য-কবি পৌরন্দর' (১৩৩০), পৃ. ৩৩-৪; ১৫১-২। এই মামলা সম্পর্কে 'ভাওয়াল মামলার দায় ও কুমারের আত্মকথা' (১৩৪৩) পুস্তকের পরিণতি পৃ. ৯২, ৯৫ পঠিতব্য।



বিমান হইতে নিউ ইয়র্কের দৃশ্য



শ্রীনগর : চেনার বাগ খালের দৃশ্য



পুরনো সীকো,—শ্রীনগর

বিমান ভূ-প্রদক্ষিণ

শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

তৃতীয় অধ্যায় : আটলাণ্টিক মহাসাগর অতিক্রম

সেদিন ২৮শে কার্তিক, ১৪ই নবেম্বর বুধস্পতিবার। সারা দিন টপ টপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। দুর্ভাগ্যে পশ্চিম মাজাই গৃহ-প্রত্যাবর্তনে ত্বরান্বিত। ক্ষীণ ও ক্ষণস্থায়ী দিবালোক নিকর হইবার অনতিকাল পরেই আমি হোটেল হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া বিমান কোম্পানীর সহরের আপিসে উপনীত হইলাম।

কোম্পানীর বাস যাত্রিদল লইয়া ৭টা ৩৫ মিনিটে আপিস ত্যাগ করিল। প্রায় সাড়ে আটটার আমরা পুল বিমান-ঘাটিতে পৌছাই। পুলিশ ও স্ক্রু-ঘাটি অতিক্রম করিয়া, চাপানে পরিভ্রমণ হইয়া রাজি দশটার বিমানে উঠি। সাড়ে দশটার বিমান উড়িতে আরম্ভ করে। কৃষ্ণা বগীর মেঘে ঢাকা “দ্বিগুণ রাত”। সাড়ে ছ’ হাজার ফুট উঁচু দিয়া ঘণ্টায় ২৭৪ মাইল বেগে উড়িয়া রাজি বারটার আইরিশ স্বাধীন রাষ্ট্রের স্থান বিমান-ঘাটিতে অবতরণ করি। স্থান আটলাণ্টিক মহাসাগরের তীরে অবস্থিত। এখান হইতে বিমান মহাসাগর অতিক্রম শুরু করিবে। এখানে যাত্রীদের প্রচুর খাইবার ব্যবস্থা ছিল। ভিন্ন, মাখন, চিনি ও বিস্কুট ভাজা মেঘমাংসের প্রাচুর্য দর্শনে অনটন-ক্লিষ্ট ইংরেজ নরনারীগণ আনন্দ চাপিয়া রাখিবার চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিলেন।

রাজি প্রায় আড়াইটার বিমান উড়িতে শুরু করিল। বিমানটি পিডবার্ড শ্রেণীর। ইয়র্ক শ্রেণীর বিমান অপেক্ষা অনেক বড়; কিন্তু গর্জন কম। চারিট ইঞ্জিন। চল্লিশটি আসনে কুড়িজন যাত্রী। প্রত্যেককে পাশাপাশি দুইটি করিয়া আসন দেওয়া হইয়াছে। আসনগুলি বেশ প্রশস্ত। দুইটি আসনের মধ্যবর্তী হাতলটি উঠাইয়া লওয়া যায়। প্রত্যেক আসনের পিঠ ইচ্ছামত উঠান বা নামান যায়। যাত্রীগণ কখনও ইচ্ছামত আসনের পিঠ নামাইয়া আরাম করিতেছেন, কখনও বা আসনদ্বয়ের মধ্যবর্তী হাতলটি তুলিয়া লইয়া দুইটি আসনের উপর একটু লম্বা হইতেছেন। একটি ঝুঁঝা ও একটি ঝুঁঝাডেস যাত্রীগণের সুখ-স্বাস্থ্য ও আহার সম্বন্ধে সর্বদা তত্ত্বাবধান করিতেছেন।

আটলাণ্টিক মহাসাগরের উপর দিয়া উড়িতেছি। আট হাজার ফুট উচ্চে ঘণ্টায় প্রায় দুই শত মাইল বেগে বিমান সগর্জনে ছুটিয়াছে। একঘেয়ে গর্জন ও অসীমদ্য অন্ধকারের মধ্যে ঘুমাইয়া পড়িয়াছি। যাত্রীগণ সকলেই নিদ্রাচ্ছন্ন। যখন ঘুম ভাঙিল তখন আমার ঘড়িতে সাড়ট। উপরে স্বচ্ছ উদার নীলাকাশে কৃষ্ণা বগীর চাঁদ উজ্জল লাভণ্য বিকীরণ করিতেছে। কালপুরুষ ও অজ্ঞ দু’ একটি

তার পরিষ্কার দেখা যাইতেছে। নীচে পুঞ্জীভূত মেঘ ও কুয়াশা মহাসাগরকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। এত পরিষ্কার আকাশ পূর্বে কখনো দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। বিমানে যে মহাসাগর অতিক্রম করা কতিপয় বৎসর পূর্বে হুঃসাহসিক যুবকের স্বপ্নমাত্র ছিল, আজ তাহা তত্ত্বা-চূষিত-নেত্রে এই প্রসন্ন আকাশেরই মত প্রফুল্লচিত্তে অতিক্রম করিতেছি।

সাড়ে আটটা বাড়িতে পূর্বদিগন্তে দ্রব্য রক্তিমাতা দেখা দিল। চাঁদ ও তারাজলি ধীরে ধীরে নিশ্চত হইতে লাগিল। নীচে মেঘমালার মধ্য দিয়া নীলাবুরাশি দৃষ্টিগোচর হইল। সাড়ে ন’টা বাড়িবার আগেই পূবের লাল আভা কাটিয়া গেল।

পূর্বদিগন্তে আকাশের বানিকটা অংশ পরিষ্কার হইল। তাহার কিঞ্চিৎ উর্ধ্বে নানা বর্ণের কৃষ্ণাভ মেঘ দেখা দিল। ক্রমশঃ এই কৃষ্ণাভ মেঘে লাল রঙ ফুটিয়া উঠিল। বিচিত্র রঙের খেলা শুরু হইল। তপ্ত-কাঞ্চনবর্ণ দেবকল্যাণ যেন সুবর্ণ-মণ্ডিত হইয়া সূর্য্যদেবকে অভ্যর্থনা করিবার জন্ত গলানো স্বর্ণাঞ্চল বিছাইতেছেন। কি রঙের খেলা আর কি সাজের আড়ম্বর! চোখ ফেরানো যায় না। ঠিক দশটার নীলাবুরাশি ভেদ করিয়া সূর্য্য দ্রব্য আশ্রয়-প্রকাশ করিলেন। সূর্য্যের সবটা দৃষ্টিগোচর হইতে পাঁচ মিনিট লাগিল। তখনও সূর্য্য দ্রব্য লম্বা আকারের। সম্পূর্ণ গোলাকার হইতে আরও দু-তিন মিনিট লাগিল। তখন বাল-সূর্য্যোদাসিত আটলাণ্টিক মহাসাগর ও আকাশের সুনীল রূপ সম্পূর্ণ সুপ্রকট। চারি দিকে প্রসন্নতা বিরাজ করিতেছে। আকাশ, মহাসাগর ও সমস্ত প্রকৃতি শান্ত। দুই শত মাইল বেগে চলন্ত বিমানও যেন স্থির। লোকালয়ের বহুদূরে আকাশ-ঘেরা মহাসাগরের মধ্যে আট হাজার ফুট উর্ধ্বে প্রকৃতির অন্তঃপুরে বসিয়া আছি। রাতে চন্দ্রকিরণ-রিমৌত নীলাকাশ যখন হাসাচ্ছটা বিস্তার করিতেছিল, তখন মেঘলোকের উর্ধ্বে বসিয়া ভাবাবেশে সেই রূপরাশি উপভোগ করিতেছিলাম। প্রাতঃকালে সমুদ্রস্রোত ধরিয়া যখন বালসূর্য্যের সিন্দূর-বিন্দু নীলাকাশ-সীমন্তে ধারণ করিয়া নবরূপে আশ্রয়-প্রকাশ করিলেন, তখন মেঘলোকের উর্ধ্বে থাকিয়াও—“সম্রাট ভরে রয়েছি দাঁড়য়ে দূরে অবনত শিরে।”

লগুন সময় দশটার ঠিক সূর্য্যোদয়কালে বিমানে প্রাতঃরাশ পরিবেশিত হইল। মহাসাগরের উপর দিয়া চলিয়াছি। নীচে মসৃণ নীলাবুরাশি। উপরে ও চারি দিকে নীলাকাশ। মাঝে মাঝে পাতলা মেঘের সজ্জা। সহসা স্থলভাগ দৃষ্টিগোচর হইল। পূর্বের বহুর প্রান্তর। মহাসাগর যেন পৃথিবীর সমস্ত গ্রানি ধোয়াইয়া দিয়া তাহাকে ধীরে ধীরে আদর করিতেছেন। লগুন-সময় একটা পনের মিনিটে আটলাণ্টিক মহাসাগরের পশ্চিম তীরবর্তী গেলার বিমান-ঘাটিতে অবতরণ করিলাম।

গেভার নিউফাউন্ডল্যান্ডে অবস্থিত। সমুদ্র-তীরবর্তী অল্পক্ষর জমি। ইতস্ততঃ ছোট ছোট পাহাড়। সবুজের রেখা দেখা যায় না। বহুক্ষণ জলের উপর দিয়া উড়িবার পর পৃথিবীর পর্বত-সমূহ ধূসর রূপে বেশ লাগিতেছে। গেভারে মধ্যাহ্ন-ভোজন সমাপন করিয়া লণ্ডন-সময় আড়াইটার পুনরায় উড়িলাম। নীচে শুধু সাদা মেঘের রাশি বিস্তীর্ণ সমতল ক্ষেত্রে বিছানো একটি বিরাট করাসের মত-পড়িয়া আছে। উপর হইতে তাহার 'পর প্রথর রৌদ্র পতিত হওয়ার মেঘমালা আরও সজ্জ দেখাইতেছে। উপরে পরিষ্কার নীলাকাশ। আট হাজার ফুট উচ্চে ঘণ্টায় দুই শত পদমুখি মাইল বেগে উড়িতেছি। নিউ ফাউন্ডল্যান্ড পাড়ি দিয়া একটি সমুদ্রের খাড়ির উপর আসিলাম। খাড়ি পার হইয়া নোভাস্কটিয়ার উপকূল দিয়া উড়িতেছি। দূরে সমুদ্র দেখা যাইতেছে। উপকূলভাগ: জলা, স্নাতসেঁতে, অক্ষর ও লোকবসতিশূন্য। আর একটি সমুদ্রের খাড়ি পার হইয়া আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে পড়িলাম। লণ্ডন সময় প্রায় সাড়ে পাঁচটার নিউ ইয়র্কের লাগার্ডিয়া বিমান-বাটিতে অবতরণ করিলাম।

স্কক, পুলিশ ও স্বাস্থ্য বিভাগের ঘাটি অতিক্রম করিতে প্রায় আধঘণ্টা গেল। আমার জন্ত ওয়াশিংটনের টিকিট লইয়া এক জন আমেরিকান ভ্রমলোক বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিলেন। বাহিরে আসিয়া তাঁহার সহিত দেখা হইল। আমার খড়িতে তখন বৈকাল সোয়া ছয়টা। তখন স্থানীয় সময় সওয়া একটা। ঘড়ি পাঁচ ঘণ্টা পিছাইয়া দিলাম। পার্শ্ববর্তী একটি ভ্রমলোক বলিয়া উঠিলেন—আপনি দেখিতেছি কাকি দিয়া পাঁচ ঘণ্টা সময় লাভ করিয়া লইলেন।

আমি (সহান্তে)—আবার আগামী মাসেই অষ্ট্রেলিয়া যাইবার সময় স্তদসহ এই লাভ শোধ করিতে হইবে।

ভ্রমলোকটি (সহান্তে)—এত লীজ। এই বলিয়া চলিয়া গেলেন।

যে ভ্রমলোকটি আমাকে অভ্যর্থনা করিতে আসিয়াছিলেন তিনি বলিলেন, এখন মাত্র দেড়টা। আপনার ওয়াশিংটনের বিমান চারটার ছাড়িবে। এখন মধ্যাহ্নভোজন সমাপনান্তে খানিকটা বেড়াইয়া লইতে পারেন। এই বলিয়া ওয়াশিংটনের টিকিট আমাকে দিয়া দিলেন। আমি বলিলাম, এখানে এখন মধ্যাহ্ন-ভোজনের সময় বটে, কিন্তু আমার মধ্যাহ্ন-ভোজন গেভারে হইয়া গিয়াছে, আমি ক্ষুধার্ত নই। মালের

ব্যবস্থা করিয়া খানিকটা ঘুরিতেই চাই। ভ্রমলোক আমার লগেজ লগনের বিমান হইতে খালাস করিয়া ওয়াশিংটনের বিমান-কর্মচারীদের হেফাজতে দিলেন। তারপর আমাকে চা ও "হট-ডগ" খাওয়াইয়া আপ্যায়িত করিলেন। "হট-ডগ" ছোট এক টুকরা গরমবরাহ-মাংস সহ ছোট এক টুকরা রুটি। রাস্তায় বা মাঠে যাইয়া আমরা যেমন চানাহুর বা আলুভাজা খাই, আমেরিকানরা সেইরূপ "হট-ডগ" খায়। কয়েকদিন পরে কাগজে দেখিয়াছিলাম যে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান খেলা দেখিতে গিয়া খেলার মাঠে সবার সঙ্গে "হট-ডগ" খাইলেন।

"হট-ডগ" খাইয়া ভ্রমলোকটির সহিত ইতস্ততঃ ঘুরিলাম। নির্মল আকাশ। চমৎকার রৌদ্র। এমন সুন্দর দিন ভারতবর্ষ ছাড়িবার পর দেখি নাই। লাগার্ডিয়া বিমান-ঘাটি পৃথিবীর স্বহস্তম বিমান-ঘাটি। এক অংশ বিদেশে যাতায়াতের বিমানের জন্ত এবং অপর অংশ আভ্যন্তরীণ বিমানের জন্ত নির্ভিষ্ট। অনবরতই যাত্রী লইয়া বিমান উড়িতেছে বা নামিতেছে। আমেরিকা বৃহৎ দেশ। আয়তনে ভারতবর্ষের দেড়গুণ। ধনে ও ব্যবসায় আমেরিকাবাসীরা পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ। কাজেই এখানে বিমানের যাতায়াত খুব বেশী। নিউ ইয়র্ক সহরের কেন্দ্রস্থল বিমান-ঘাটি হইতে ১২১৩ মাইল হইবে। বিমান-ঘাটির চারি দিকে ঘুরিয়া ভ্রমলোকটির নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া ওয়াশিংটনের বিমানে চড়িলাম। বিমানটি বিরাট, কনট্রিলেছন শ্রেণীর। এই শ্রেণীর বিমানই নাকি এখন সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত। বিমানটিতে চারটি ইঞ্জিন। পঞ্চাশটি আসনে পঞ্চাশ জন যাত্রী। এক জন তত্ত্বাবধায়িকা যাত্রীদের সর্বদা তত্ত্বাবধান করিতেছেন ও আহাতি পরিবেশন করিতেছেন। নিউইয়র্ক হইতে ওয়াশিংটন দুই শত মাইলের কিছু বেশী। যাইতে এক ঘণ্টা লাগিল। চারিটার রওনা হইয়া ঠিক পাঁচটার ওয়াশিংটন পৌঁছিলাম।

লণ্ডন হইতে নিউইয়র্ক পর্যন্ত তিন লক্ষে ৩২৭৩ মাইল পথ উড়িয়াছি। লণ্ডন হইতে স্থানন ৩৭২ মাইল এবং স্থানন হইতে গেভার ১৯৭৫ মাইল এবং গেভার হইতে নিউইয়র্ক ১২৬ মাইল। স্থানন ও গেভার আটলান্টিক মহাসাগরের উত্তর তীরে অবস্থিত। স্থানন হইতে মহাসাগর অতিক্রম সূর্য হয় এবং মহাসাগর পাড়ি দিয়াই গেভার। নৈশভোজনের পর লণ্ডন ত্যাগ করিয়া পরদিন মধ্যাহ্ন-ভোজনের সময় বিমান নিউ ইয়র্কে উপনীত হইল।



কবি শিবনাথ শাস্ত্রী

শ্রীসরোজেন্দ্রনাথ রায়

যাহারা পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়কে দেখিয়াছেন ও তাঁহার উজ্জ্বলিত আবেগময়ী বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছেন, কিম্বা তাঁহার সুললিত রচনাবলী বা উপদেশমালা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদের মনে স্বভাবতঃই এই কথা উপস্থিত হইয়াছে যে, শাস্ত্রী মহাশয় যদি ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকার্যে তাঁহার সমস্ত শক্তি নিয়োগ না করিয়া তাহার কিয়দংশ সাহিত্যসেবায় ব্যয় করিতেন তবে তিনি যে আজ বাংলা সাহিত্যে একটি অতি সুপরিচিত স্থান অধিকার করিতেন এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই।

হেমলতা সরকার লিখিত শাস্ত্রী মহাশয়ের জীবনচরিত হইতে জানা যায় যে, রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ও এইরূপ বৈদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। বসু মহাশয় শাস্ত্রী মহাশয়কে নবীনচন্দ্র, অক্ষয়কুমার, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ তদানীন্তন বাঙালী কবিদের সমকক্ষ মনে করিতেন, এবং সেইজন্য তিনি বলিয়াছিলেন, “হায়, কি পরিভাষা, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের যাতায় পড়িয়া শিবনাথের সাহিত্যিক জীবন ধরি হইল। এত বড় কবিকে ব্রাহ্মসমাজ মারিয়া ফেলিল।” সাহিত্যের দিক দিয়া দেখিতে গেলে ইহা সত্যই পরিভাষার বিষয় মনে হয়। কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয়ের নিজের এ বিষয়ে কোন ক্ষোভ ছিল না। তিনি লিখিয়াছেন—“আমার জীবনের লক্ষ্য বঙ্গীয় যুবকযুবতীর মনে নৈতিক বল, ধর্ম্মানুরাগ উদ্দীপ্ত করিয়া যাওয়া। বিধাতা সেই দিকেই আমাকে লইয়া আসিয়াছেন। আমার বক্তৃতা, আমার প্রবন্ধাবলী, আমার কবিতা সকলেরই এই দিকে গতি। আমি অনেক বার আপনার মনে মনে এইরূপ প্রশ্ন করিয়াছি, আচ্ছা, যদি আমার প্রণীত সমুদয় গ্রন্থ পুড়িয়া যায় এবং আমার নামগন্ধ না থাকে তাহাৎ আমি হুঃখিত হই কিনা। আমি মনকে বেশ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, তাহাৎ আমার হুঃখ হয় না, কারণ আমি যে পরিমাণে জাতীয় জীবনে নৈতিক বলের সঞ্চার করিতে পারিয়াছি সেইটুকু আমি। আমার নাম থাকুক না থাকুক, সেই পরিমাণে আমার জীবন সার্থক হইয়াছে।”

সুতরাং এই শ্রেণীর ক্ষোভের বিশেষ কোন অর্থ নাই। শিবনাথের শ্রেষ্ঠ কাব্য হইতেছে তাঁহার জীবন। জীবনের প্রারম্ভ হইতেই তিনি প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁহার জীবনবীণার তারগুলি ঝুঁঝিয়া আসিয়াছেন, যাহাতে তাঁহার সমগ্র জীবনের গভীরতম আকাঙ্ক্ষা ও স্রুতী অহুভূতিসকল পরিপূর্ণরূপে স্বরূপ হইয়া উঠে। তিনি চাহিয়াছিলেন, সত্যের যে জ্বর আত্মান, প্রেমের যে নিবিড় বিনিময়, পবিত্রতার যে উন্নত স্পর্শ, সকলই যেন ধ্বনিত হয় সেই বীণায়। তাঁহার কল্পনা, সাধনা

দ্বারা তিনি চাহিয়াছিলেন আমাদের বাঙালী সমাজকে একটি শ্রেষ্ঠ কাব্যরূপান্তরিত করিতে। তাই রূপলোকের কল্পরচনাকে পশ্চাতে ফেলিয়া তিনি সম্মুখে চলিয়া গিয়াছিলেন এই বস্তুলোকের মধ্যে তাঁহার জীবনের পরম স্নানরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে। তাঁহার কাব্য ছিল তাঁহার প্রতিদিনের আশা ও আকাঙ্ক্ষার প্রতিচ্ছবি। জীবনে তিনি ছিলেন প্রচারক। অলক্ষিতে তাই তাঁহার রচনাও অনেক ক্ষেত্রে হইয়া উঠিয়াছিল প্রচারেরই আর একটা অঙ্গরূপ। সেই জন্য লোক তাঁহার কাব্য অপেক্ষা তাঁহার জীবনকে বেশী মূল্য দিয়াছিল।

অবশ্য এ কথা সত্য যে, সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহার যা দান তাহার সমুচিত মূল্য তিনি লাভ করেন নাই। তাঁহার কবিতা, ইতিহাস ও জীবনী, তাঁহার উপন্যাস ও ধর্ম্মগ্রন্থসমূহ বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁহাকে একটি প্রকৃষ্ট স্থান দিতে বাধ্য। কিন্তু সে-স্থান যে তিনি লাভ করেন নাই তাহার দুইটি কারণ আছে। প্রথম, বাংলা সাহিত্যের যাহারা পসারী তাহারা অনেক বিষয়ে অজ্ঞ—মোহাশয় বটে। বাংলা সাহিত্যে ব্রাহ্মসমাজের দানের কথা উল্লেখ না করিয়াও বাংলা সাহিত্যের “সম্পূর্ণ” ইতিহাস প্রকাশিত হইতেছে। দ্বিতীয়, শাস্ত্রী মহাশয়ের ধর্ম্মগ্রন্থ সকল পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাঁহার কবিতা ও উপন্যাস জলভ হইয়া পড়িয়াছে।

যাহাই হোক শাস্ত্রীমহাশয়ের রচনা যে কতখানি আদরণীয় তাহা বিচার করিবার সময় আসিয়াছে। এই উদ্দেশ্যেই বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি তাঁহার কবিতার কিঞ্চিৎ আভাস দিব বলিয়া অভিপ্রায় করিয়াছি। কিন্তু তাঁহার কবিতা ও অপরাপর লেখার মধ্যে এত অঙ্গাঙ্গি যোগ আছে যে প্রসঙ্গতঃ সেগুলির উল্লেখ না করিলে তাঁহার কবিতার রসোপলব্ধি সম্পূর্ণ হইবে না।

শাস্ত্রী মহাশয় একাধারে কবি, ঔপন্যাসিক, প্রবন্ধকার, ঐতিহাসিক, ব্যাখ্যাতা ও ধর্ম্মতাত্ত্বিক ছিলেন। নৈতিক প্রেরণা ও আধ্যাত্মিক উদ্দীপনা তাঁহার সকল রচনাকে অমুপ্রাণিত করিয়াছে। নূতন সত্যের উজ্জ্বল আলোকে স্রষ্টা চেতনাকে জাগ্রত করা ও মানব-মনকে উচ্চ গ্রামে উন্নীত করাই তাঁহার সকল প্রচেষ্টার মূল ছিল। পক্ষের মধ্যে যে পবিত্রতা, বিচ্ছিন্নের মধ্যে যে স্নেহ, ধর্ম্মের মধ্যে যে অশঙ্কতা, ক্ষুদ্রের মধ্যে যে বৃহৎ এবং সত্য, প্রেম, পবিত্রতা তাঁহার সকল লেখার মূল উপাদান।

সাধারণতঃ তিনি “মোহ বটে”, “রামতল্লাহ লাহিড়ী” ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ ও তাঁহার “আত্ম-চরিতে”র জন্য

সুপরিচিত। কিন্তু এতদ্ব্যতীত তিনি আরও কয়েকখানি উপজ্ঞান ও ধর্মগ্রন্থাবলীর রচয়িতা, যথা—নয়নভাষা, যুগান্তর ও বিধবার ছেলে, ধর্মজীবন, গৃহধর্ম ও প্রবচাবলী। তাঁহার বহু উপদেশ এবং বক্তৃতাও অমূল্যবিত্ত হইয়া এতদ্ব্যতীত প্রকাশিত হইয়াছে। কাব্যগ্রন্থের মধ্যে “নির্বাসিতের বিলাপ,” “পুষ্পমালা,” “পুষ্পাঞ্জলি,” “হিমাদ্রিকুম্ভ” ও “ছায়াময়ীর পরিণয়” উল্লেখযোগ্য। তিনি ইংরেজীতে যে সকল লেখা প্রকাশ করিয়াছেন তাহার মধ্যে *The Man I have seen* ও *The History of the Brahmo Samaj* সুপ্রসিদ্ধ।

তাঁহার কবিতাসকল পাঠ করিলে স্বতঃই এই কথা মনে আসে যে তিনি স্বভাবকবি ছিলেন। কবিপ্রতিভা তাঁহার জন্মগত। তাঁহার কবিতার আর যত দোষই থাকুক কেহ বলিতে পারিবে না যে ইহা চেষ্টাপ্রসূত ও কষ্টকল্পনাদোষে দুষ্ট। তাঁহার কবিতা ছিল স্বতচ্ছূর্ত, বেগবতী, আগ্রহগিরির গলিত ধাতুস্রোতের মত নির্ঝাঁপ, অদমনীয়। তাঁহার সতের বৎসর বয়সের লেখা ‘নির্বাসিতের বিলাপ’ হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার সর্বশেষ কবিতাগ্রন্থ ‘ছায়াময়ীর পরিণয়’ পর্যন্ত সর্বত্রই এই বাধাহীন গতিশীলতা তাঁহার রচনার প্রধান লক্ষণ মনে হয়। নির্বাসিতের বিলাপের শেষ পর্ব ‘হরিষে বিবাদে’র কয়েকটি পঙ্ক্তি দেখুন :

শুভ্র শুভ্র নেত্রেরে পাপলসের প্রায়,
শ্রুৎ, কেশ, পরিচ্ছদ ধূসর ধূলায়।
এদিকে দিবস শেষ ডুবু ডুবু রবি,
আঁধি-মুহূ-মুহূ যেন প্রকৃতির ছবি।

তাঁহার শ্রেষ্ঠ কবিতাগ্রন্থ ‘পুষ্পমালা’র প্রায় প্রত্যেক কবিতাতেই এই স্বতচ্ছূর্ত গতি লক্ষিত হয়। এই গ্রন্থের ‘উৎসর্গে’ প্রায় প্রত্যেক কবিতাই এই সামান্য বহন করিতেছে :

চাই না সভ্যতা, চাষা হয়ে থাকি
দেও ধর্মধন প্রাণে পুরে রাখি।
হায় জন্মভূমি! পুণ্যভূমি ভূমি।
দেও পুণ্যবারি দক্ষ প্রাণে রাখি।

তাঁহার কবিতাসকলের মধ্যে ‘ছায়াময়ীর পরিণয়’ সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। ইহা ১৮৮৯ সালে লিখিত। কবি এখন প্রৌঢ়ত্বে উপনীত ও গৃহস্বাক্ষের চাপে তাঁহার কাব্যচর্চা উপেক্ষিত। কবির প্রাণ সজীব বটে, কিন্তু কবিকণ্ঠ শুষ্কতাগ্রস্ত। কবিতা এখন নিরাভরণ হইয়া উঠিয়াছে :

ফুলের বনে ফুল-কুমারী বেড়ায় সেধেনে,
সাজি শুভে যতন করে কতই ফুল তোলে।
ফুলের ডালা, ফুলের মালা, কাণে ফুলের ঢুল,
সোণার হাতে ফুলের বালা, খোঁপা-ভরা ফুল।
কিন্তু এই নিরাভরণতার মধ্যে প্রাণশক্তির নাশ হয় নি :

নির্জন্মে—নির্জন্মে—যোর গভীর নির্জন্মে,
নিখরিগী গাইছে যথায় ;

উপলে শৈবাল-শয্যা পাতিয়া গোপনে,
তাতে শুয়ে প্রকৃতি ঘুমায়ে।

শিবনাথ যে যুগে কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন সেই যুগ ছিল হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের। মাইকেল মধুসূদনের প্রভাব তখনও জীবন্ত। এই সকল প্রভাব ও সংস্পর্শের মধ্যে মাহুঘ হইয়া শিবনাথও তাঁহার সমসাময়িকদিগের মত নূতন নূতন ছন্দ, পদসমষ্টি ও পদচ্ছেদ বাংলা কবিতায় প্রয়োগ করিয়াছেন। পয়ার, অমিত্রাক্ষর, ত্রিপদী, প্রকৃতি ছন্দ ও ষটপদী, অষ্টপদী, দশপদী প্রভৃতি বহুবিধ পদভঙ্গ ব্যবহার করিয়া বাংলা কবিতাকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। মেঘনাদবধ কাব্যের উদাত্ত গভীর সুর তাঁহার কবিতায় যেমন আমরা পাই, তেমনি পাই হেমচন্দ্রের বিখ্যাত ছন্দ :

কোটি বিশ্ব, কোটি চন্দ্র তারা,
কোটি পৃথ্বী, কোটি জীব, শুদ্ধ যার ভয়ে,
সেই ভূমি। আমি কীট কি আর বর্ণিবে !

অথবা

ক্ষত্রিয়ের তরবার সহ করে সাধ্য কার।

ভূতলে লুটাবে আঁধ ভূধর শিখর।

গজ বাজী রথ রথী কে পাবে নিস্তার রে

কে পাবে নিস্তার ?

ইংরেজী কবিতার সঙ্গে নূতন পরিচিত এই যুগ বহুবিধ পাশ্চাত্য ছন্দ বাংলা কবিতায় আমদানী করিতে আরম্ভ করে। ফলতঃ এই যুগের বহু সুপরিচিত কবিতা ইংরেজী ছন্দ ও অলঙ্কারের অহুয়ত্তি মাত্র। কিন্তু এই যুগেই আবার নূতন নূতন ভাব আসিয়া জাতীয় জীবনকে প্রভুত্বাবে আলোড়িত করিতে আরম্ভ করে, কলে বাংলা সাহিত্যও নূতন ভাবধারা দ্বারা অহুপ্রাণিত হয়। এই যুগ সংস্কারের যুগ। এই সময়ে নূতন ধর্মভাব ও স্বদেশপ্রেমিত বঙ্গীয় সমাজকে আন্দোলিত করে ও বাংলা সাহিত্যকে তাহার নিভৃত কুঞ্জগৃহ হইতে লোকালয়ের কোলাহলের মধ্যে আনিয়া উপস্থিত করে। মধুসূদনের কাব্যকে কতকটা সমাজনিরপেক্ষ আটের অভিব্যক্তি বলিয়া ধরা যাইতে পারে, কিন্তু হেমচন্দ্রের “বাজ রে শিক্ষা বাজ এই রবে”কে বা নবীনচন্দ্রের “পলাশীর যুদ্ধ”কে শুধু সৌন্দর্যবিলাসী কবির কল্পনা বলিয়া মনে করা যায় না। যাহা হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের পক্ষে সত্য তাহা শিবনাথের পক্ষে অধিকতরভাবে সত্য, কেননা তিনি ছিলেন সেই নূতন প্রাণধারার একজন বিশিষ্ট আবাহক, সেই আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা, সেই সংগ্রামের বিশিষ্ট যোদ্ধা। যুদ্ধক্ষেত্রের অন্তর্ভূলে বসিয়া তিনি কাব্য রচনা করিয়াছেন। কাজেই তাঁহার কবিতায় তাঁহার সংগ্রামময় প্রাণের গভীরতম বাণীটি মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে।

বাল্যকাল হইতেই শিবনাথ একটা গভীর ভাবাবর্তের মধ্যে বদ্ধিত হইয়াছেন যাহার ছবি পাই আমরা নয়নভাষায়

পক্ষে প্রকাশিত কবি রাজকৃষ্ণ রায়ের একখানি পত্র উদ্ধৃত করিতেছি। ইহা হইতে সাহিত্য-সমালোচনী সভার বদাঙ্কতার পরিচয় পাওয়া যাইবে। রাজকৃষ্ণ লেখেন :—

“আমি হৃদয়ের কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, ভাওয়ালবিশিষ্ট ও সাহিত্য সমালোচনী সভার প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর মহোদয় আমার পদাভ্যুদিত মহাভারতের রাজকীয় সংস্করণের সমস্ত মুদ্রণ-ব্যয় ১২,০০০/- বার হাজার টাকা দান করিতে অকুণ্ঠিত হইয়া, অল্পপ্রাপ্তকর সংখ্যানুক্রমে টাকা পাঠাইতেছেন। আমি তজ্জন্ত তাঁহাকে এবং তাঁহার সুযোগ্য প্রধান মন্ত্রী ও বাহুব পত্রের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়কে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।”

‘সাহিত্য-সমালোচনী সভা’র দ্বারা কালীপ্রসন্ন বহু সাহিত্যিকের কৃতজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু “গৈয়ো যোষি ভিৎ, পায় না” এই প্রবাদ-বাক্যের সার্থকতা ভাওয়ালের বৃত্তাব-কবি গোবিন্দচন্দ্র দাসের জীবনে দেখিতে পাই। তাঁহার দুর্ভাগ্যময় জীবনের ইতিহাস কালীপ্রসন্নের কর্তৃত্বাধীন ভাওয়ালের সহিত জড়িত হইয়া আছে।

বাগ্মিতা

কালীপ্রসন্ন বাগ্মী ছিলেন। তিনি ইংরেজী ও বাংলা উভয় ভাষাতেই অনর্গল বক্তৃতা করিতে পারিতেন। তাঁহার কণ্ঠের মধুর এবং ভাষা মার্জিত ও আবেগময়ী ছিল। ১৩১০ সালের ৩১শে জ্যৈষ্ঠ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের আমন্ত্রণে তিনি ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে (সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে) “বঙ্গভাষার ক্রমোন্নতি” বিষয়ে যে বক্তৃতা করেন, তাহা শুনিবার সৌভাগ্য যাহার ঘটয়াছে তিনিই জানেন কালীপ্রসন্ন কি অপূর্ণ বাগ্মিতা-শক্তির অধিকারী ছিলেন।

শুণের সম্মান

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সাহিত্যের একনিষ্ঠ সাধক কালীপ্রসন্নকে ১৩০১ সনে “বিশিষ্ট সদস্য,” ১৩০৪-৫-৭ সালে অজ্ঞতম সহকারী সভাপতি, ও ৪ আষাঢ় ১৩১০ তারিখে সম্বন্ধিত করিয়া যথার্থই ‘ঐতিহাসিকতার পরিচয় দিয়াছেন।

‘অনুসন্ধান’-কার্য্যাব্যক্ষ দুর্গাদাস লাহিড়ীর ঐকান্তিক যত্নে, “বিবিধ বিষানে বঙ্গভাষার শ্রীযুক্তিকল্পে,” ১৩০৬ সালের ৯ই আষাঢ় কলিকাতায় ‘সাহিত্য-সন্মিলন’ের জন্ম হয়। কালীপ্রসন্ন এই প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী সভাপতি নির্বাচিত হন।

সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠার জন্য কালীপ্রসন্ন শেষ জীবনে বঙ্গের পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট হইতে “বিদ্যাসাগর” উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।

• ৬ বৈশাখ ১৩০৭ তারিখের ‘অনুসন্ধান’ পক্ষে “সাহিত্য-সন্মিলন” প্রবন্ধ প্রণয়।

গবর্নেন্ট ও তাঁহার প্রতি উদাসীন ছিলেন না। কালীপ্রসন্ন মহাশয় ষিষ্টোরিয়ায় জুবিলী উপলক্ষে (জুন ১৮৯৭) “রায়-বাহাদুর” ও ১৯০৯ সনের ১লা জাহুয়ারি “সি-আই-ই” উপাধি ভূষিত হইয়াছিলেন। তিনি এক সময়ে অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সভ্য ও সদর-লোক্যাল বোর্ডের সভাপতিও নির্বাচিত হইয়াছিলেন।

মৃত্যু

কালীপ্রসন্ন ২৯ জুলাই ১৯১০ (১৩ শ্রাবণ ১৩১৭) তারিখে ঢাকায় পরলোকগমন করেন।† মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম ৬৭ বৎসর হইয়াছিল।

গ্রন্থাবলী

কালীপ্রসন্নের রচিত গ্রন্থাবলীর একটি কালানুক্রমিক তালিকা দিতেছি। তালিকায় বঙ্গনী-মধ্যে প্রদত্ত ইংরেজী প্রকাশকাল বঙ্গল লাইব্রেরি-সংকলিত মুদ্রিত-পুস্তকের তালিকা হইতে গৃহীত।

১। নারীজাতি-বিষয়ক প্রস্তাব। আখ্যিন ১৯২৬ সংবৎ (৫ ডিসেম্বর ১৮৬৯)। পৃ. ২৪২।

“ইহা কোন পুস্তক বিশেষ অবলম্বন করিয়া লিখিত হয় নাই। কিন্তু যে সকল ঐতিহাসিক বিবরণ ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে তৎসমুদয়ই ইংলণ্ড ও আমেরিকার নানাবিধ পুস্তক ও প্রবন্ধ হইতে সংগৃহীত এবং কতিপয় প্রধান ব্যক্তির বাক্যও ইহার স্থানে স্থানে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।”

২। সমাজশোধনী। (১৩ মার্চ ১৮৭২)। পৃ. ২৬।
কৌলীক-প্রচার সমালোচনা।

৩। সঙ্গীতমঞ্জরী। (২৪ সেপ্টেম্বর ১৮৭২)। পৃ. ৭১।
ভক্তিরসায়ক, গীতাবলী।

৪। প্রভাত-চিন্তা। ২২ শ্রাবণ ১২৮৪ (৭ আগষ্ট ১৮৭৭)। পৃ. ১৩০।

সূচী : নীরব কবি, অভিমান, প্রকৃতিভেদে রুচিভেদ, মনুষ্যের জীবনচরিত, ক্রিওপেট্রা, শক্তি, ভালবাসে কে? লোকারণ্য, রাজা ও প্রজা, হরনৌরী, বিশিষ্ট, বিনয়ে বাবা, সাধনা ও সিদ্ধি।

৫। ভ্রান্তিবিমোদ। ইং ১৮৮১ (২৫ আগষ্ট)। পৃ. ১৩৬।

সূচী : রসিকতা ও রসের কথা, স্বার্থপরতার স্বল্পভেদ, চাটুকার, ঘটকারক, সামাজিক নিগ্রহ, চোরচরিত, প্রচলিত

† কালীপ্রসন্ন সেদিন দেহত্যাগ করিয়াছেন বলিলেই হয়, প্রায় সকল সাময়িক-পক্ষেই তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে, কিন্তু ইতিমধ্যেই তাঁহার মৃত্যু-তারিখ গবেষণার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসকার—ডঃ স্কুম্বার সেনের মতে তাঁহার মৃত্যু-সন “১৯০৭,” আবার স্থবল মিজের অভিধান অনুসারে উহা “১৯১১”।

ও অপ্রচলিত মিথ্যা কথা, কারারুদ্ধ ধর্ম, দেবতার বাহন, ব্যুৎপত্তিবাদ, মানবজীবন, দ্বিপশুস্মিলন।

৬। নিতৃত-চিন্তা। ১২৮৯ সাল (২৯ মার্চ ১৮৮৩)। পৃ. ১৪২।

স্রুতি : অমৃত, ঐহিক অমরতা, বিরাট পুরুষ, রাজা ও রাজ-শক্তি, জীবনের ভার, মহত্ত্ব ও মিতব্যয়, লোকরঞ্জন, আশ্বিন আর আকাজক্ষা, সাহিত্য ও জাতীয় বিকাশ।

৭। প্রমোদলহরী অথবা বিবাহ-রহস্য। ১৮ চৈত্র ১৩০১ (ইং ১৮৯৫)। পৃ. ১৮৩।

স্রুতি : বিবাহ (প্রলাপ), বিবাহ (ব্যাকরণ-রহস্য), ঘোমটা, মুখেরা ভাষা অথবা গৃহিণীরোগ, বিবাহ কত প্রকার।

৮। ভক্তির জয় অথবা হরিদাসের জীবন-যজ্ঞ। ১৮ শ্রাবণ ১৩০২ (১৭ আগষ্ট ১৮৯৫)। পৃ. ২২২।

ঠাকুর হরিদাসের ভক্তিলীলায়ক বিচিত্র জীবন-কথা।

৯। নিশীথ-চিন্তা। আশ্বিন ১৩০৩ (২১ সেপ্টেম্বর ১৮৯৬)। পৃ. ১৮০।

স্রুতি : রাজিকাল, নদীর জল, দুঃখে সুখ, তারা আর ফুল, বিরহ, আশার ছলনা, চন্দ্রবদন।

১০। মা না মহাশক্তি। অগ্রহায়ণ ১৩১১ (১৪ জানুয়ারি ১৯০৫)। পৃ. ১০৪।

১১। জানকীর অগ্নি-পরীক্ষা। ফাল্গুন ১৩১১ (২০ এপ্রিল ১৯০৫)। পৃ. ১৩৪।

১২। জ্ঞানদর্শন (The Philosophy of Apparitions)। মাঘ ১৩১৬ (ইং ১৯১০)। পৃ. ৩৭০+২৭৬।

“ত্রিউমেশচন্দ্র বহু কর্তৃক সম্পাদিত।”

পাঠ্য পুস্তক।—কালীপ্রসন্ন কয়েকখানি শিশুপাঠ্য পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন; সেগুলি—‘কোমল কবিতা’ (ইং ১৮৮৮); ‘বর্ণপাঠ’ (ইং ১৮৯৬); ‘আদর্শ’ (বড় অক্ষরে মুদ্রিত দেবদ্বা লিখিবার বিবিধ পাঠ); ‘ভারতবর্ষের ইতিহাস’, ১ম ও ২য় খণ্ড (ইং ১৯০৯) ও ‘সুপ্রভাত’।

অপ্রকাশিত রচনা

কালীপ্রসন্নের কতকগুলি অপ্রকাশিত রচনা,—প্রবন্ধ, কবিতা ও গান তাঁহার মৃত্যুর পরে ‘ঢাকা রিভিউ ও সন্মিলন’ (১৩২২, ১৩২৫-২৮) ও ‘মানসী ও মর্ম্মবাণী’তে (১৩২৫) প্রকাশিত হইয়াছে। এগুলির মধ্যে “নাটক” প্রবন্ধটি (‘ঢাকা রিভিউ ও সন্মিলন’, কার্তিক-পৌষ ১৩২৮) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কালীপ্রসন্ন ও বাংলা-সাহিত্য

বাংলা-সাহিত্যে কালীপ্রসন্ন তাঁহার চিন্তা ও ভাষার অপূর্ণ সম্বন্ধে অমর হইয়া আছেন। তাঁহার রচিত ‘প্রভাত-চিন্তা,’ ‘নিতৃত-চিন্তা,’ ‘নিশীথ-চিন্তা’ বাংলা-সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। কালীপ্রসন্নের রচনার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া চল্লিশের কর লিখিয়াছেন :—“সকল সাধনারই একটি সংকল্প এবং একটি মূলমন্ত্র থাকে। কালীপ্রসন্নের সংকল্প ছিল—মাতৃভাষার সেবা, আর মূলমন্ত্র ছিল—শুদ্ধি এবং সৌন্দর্যের সমাবেশ।...জ্ঞান-বুদ্ধ সাহিত্যসাধক এক দিন আমাকে কহিয়াছিলেন—‘আমার জীবনের ব্রত বঙ্গ-সাহিত্যে শুদ্ধি এবং সৌন্দর্যের একত্র সমাবেশ করা।—শুদ্ধি বিভাগাগরের, আর সৌন্দর্য ইংরেজী নবিসদিগের অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্র, অক্ষয়চন্দ্র, চন্দ্রনাথ প্রভৃতির।’ বাঁহারা কালীপ্রসন্নের গ্রন্থগুলি এবং তাঁহার রচিত প্রবন্ধাদি পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, তিনি ভাষার শুদ্ধি-সংরক্ষণে কেমন যত্নবান ছিলেন। সৌন্দর্য-স্থূলভেদেও তাঁহার চেষ্টা যথেষ্ট ছিল। কালীপ্রসন্ন শুদ্ধিকে উপাত্ত দেবতার দায় ভক্তি করিতেন, আর সৌন্দর্যকে প্রিয় স্নহদের দায় ভালবাসিতেন। সৌন্দর্য শুদ্ধির বিরোধী হইলে, তিনি কখনই তাহার প্রশ্রয় দিতেন না। ফলতঃ ইহাই কালী-প্রসন্নের বিশেষত্ব।...তিনি সর্বদাই বলিতেন, ‘মাতৃ ভাষার সেবা করিতে হইলে, ভক্তির সহিত করা কর্তব্য এবং শব্দ-প্রয়োগে বিশেষ সাবধানতা আবশ্যক। অন্ততঃ শব্দ ব্যবহার করিলে, মায়ের অবমাননা করা হয়।’ মাতৃভাষার প্রতি কালীপ্রসন্নের প্রগাঢ় ভক্তি এবং ঐকান্তিক অহু-রাগের নিদর্শন-স্বরূপ ‘সাহিত্য-সন্মিলন’-সম্পাদক দুর্গাদাস লাহিড়ীকে লিখিত তাঁহার একখানি পত্রের অংশ উদ্ধৃত করিয়া প্রসন্নের উপসংহার করিতেছি :—

“বাঙ্গালা ভাষা যেমন আপনার, তেমন আমার এবং সেইরূপ আমাদের প্রত্যেকেরই মাতৃস্বরূপ। বিখ্যাত দার্শনিক অগস্ত কোম্ সমগ্র মানব জাতিকে একটি মনঃকল্পিত দেবতা-জ্ঞানে ধ্যান ও আরাধনা করিতে উপদেশ করিয়াছেন। আমার মনঃকল্পিত দেবতা মাতৃরূপিণী বঙ্গভাষা। আমি প্রায় অর্ধ শতাব্দী কাল বঙ্গভাষাকে মনে মনে মা বলিয়া ডাকিয়াছি—মা বলিয়া ভাল বাসিয়াছি, এবং মাতৃজ্ঞানে—আমার এ ক্ষুদ্র হৃদয়ের পরিমাণে পূজা করিয়াছি। আর, বাঁহারা ভক্তি ও প্রহার সহিত বাঙ্গালা ভাষার সেবা করিয়াছেন, তাঁহাদিগকেও মায়ের স্নহসত্তা মনে করিয়া ভ্রাতৃসম্বন্ধে সন্মান করিয়াছি। ৯ই ফাল্গুন ১৩০৬।” (‘অহুসন্ধান’, ৬ বৈশাখ-১৩০৭)

ও যুগান্তরে, এমন কি মেজবৌ-এ। ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে ও ব্রাহ্মধর্মের আধাতের কলে প্রাচীন সনাতন সমাজের দুর্ভেদ্য প্রাচীর ভাঙিয়া পড়িতেছিল। যাহা চিরন্তন, সনাতন ও অনতিক্রমণীয় বলিয়া এককাল সমাদৃত হইয়া আসিতেছিল তাহা হঠাৎ চারিদিক হইতে আক্রান্ত হইয়া ব্যাকুল আত্ম-সমর্পণে ব্যাপৃত হইল। যাহা এককাল শৈলভিত্তির উপর সুরভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল তাহাকে একদিন বজ্রের জলে ভাসিতে দেখা গেল ও প্রসারিতবাছ হইয়া আবার সৈকত-ভূমির নিশ্চিন্ত আশ্রয় সন্ধান করিতে উদ্যত হইল।

বাঙালী হিন্দুসমাজের এই জীবনসঙ্কটক্ষেপে, এই ভাসিয়া যাওয়ার যুগে, যাহারা জীবনের স্থিরভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে চাহিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে শিবনাথ একজন প্রধান। আদর্শ-দ্বন্দ্ব তাঁহাদের নিকট কি আকার ধারণ করিয়াছিল তাহার প্রকৃত রূপ বৃত্তিতে হইলে আমাদের ফিরিয়া যাইতে হইবে তাঁহার ‘যুগান্তরে’। নিজ নিজ আত্মার মুক্তির সংগ্রাম তাঁহাদের প্রাণবায়ুর কণ্ঠরোধ করিবার উপক্রম করিয়াছিল। শাস্ত্রী মহাশয় বলিতেন যে তাঁহার জীবনে এমন বহুদিন গিয়াছে যখন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রমুখ বহুগুণের সহিত গোলদীঘির আলোক-গুহ্য ধরিয়া আলোচনা করিতে করিতে রাত্রি প্রভাত হইয়া গিয়াছে। এই সত্য-সন্ধানের যুগে, এই ধ্বসিয়া-পড়া ভিতের উপর নূতন সৃষ্টির যুগে যাহারা নিজ নিজ জীবনে অন্তরের আহ্বান লাভ করিয়াছিলেন শিবনাথ তাঁহাদের অন্ততম। একদিকে করাসী মেতিবাদ ও অপরদিকে অন্ধ প্রাচীনাসক্তির মধ্যে নূতন সৃষ্টির আকর্ষণ উদ্বুদ্ধ শিবনাথ তাঁহার জীবনের যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ তাহা বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হইলেন :—

যার আছে ভাষা, দিক সে রসনা ;
কবি যদি থাকে দিক সে কলনা ;
শিবরাত্রি মন্ত থাকে অবিরত
জালায় সলিতা বসে মৃত জনা ।
হবে না কথাতে কেবল লেখাতে
করিতে হইবে কঠোর সাধনা ।

তিনি দরিদ্রের সন্তান। তাঁহার পিতামাতা আত্মীয়স্বজন আশা করিয়াছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী সন্তান তিনি, উপার্জন করিয়া সকলের দুঃখ ঘুচাইবেন। কিন্তু কি হইল ? যে-দারিদ্র্যের মধ্যে জন্মলাভ করিয়াছিলেন “কুশির-শোষণী পৈতৃক দেবতা”কেই তিনি আশ্রয় করিয়া লইলেন। কেননা তাহার মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠতর সৃষ্টির সন্ধান পাইয়াছিলেন :

আমি বড় দুঃখী তাতে দুঃখ নাই
পরে অধী করে অধী হতে চাই ;
নিজের কাঁদিব কিন্তু মুছাইব,
অপরের আঁধি এই ভিক্ষা চাই ।

সত্য,—ধন মান চাহে না এ প্রাণ,
যদি কাজে আসে তবে বেঁচে যাই ;
ঘাটিতে বাঁচিব ঘাটিয়া মরিব
এই বড় আশা, পূর্ণ কর তাই ।

এই আকাজক্ষা তাঁহার জীবনকে এমনভাবে পূর্ণ করিয়াছিল যে নির্জন উদ্যানে পাখীর বর-সুধা স্তনিত স্তনিত প্রকৃতির শোভা তাঁহার চিত্তকে আবিষ্ট করিয়া রাখিতে পারিল না। স্বদেশের জাগরণ, স্বাধীনতার সংগ্রাম ও আত্মিক দ্বন্দ্বের সমাধানের প্রশ্ন তাঁহার প্রাণকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল :—

নির্জন কাননে আপনার মনে
কি হবে তাকিলে ? কি হবে স্তনিলে
একা এই স্বর ? ইচ্ছা দেশবাসী
শুধুক সকলে ; ইচ্ছা দলে দলে
উঠুক সকলে নয়ন বিকাশি ।

দেশপ্রেম হইতেই শিবনাথের ত্যাগৈশ্বর্য জন্ম। দেশকে তুলিয়া ধরিতে এমন কিছু ছিল না যাহা তিনি করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। ইহার জন্ত অদের কোন বস্তু ছিল না, অগ্রহণীয় কোন পণ ছিল না। তাহার উপজ্ঞান ও কাব্যে তাঁহার জীবনের একটু প্রতিবিশ্ব প্রতিফলিত :

জীবন-আকাশ, বিপদ-হৃদিনে
ঘেরিয়া আমার হোক অন্ধকার ;
সব কষ্ট সয়ে সব স্থির হয়ে,
কে পায় পৌরুষ দুঃখ কষ্ট বিনে ?

তাঁহার জীবন সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া যখন সকলে বিস্ময় দিতেছিল, তখন কোন সান্ত্বনা তাঁহার বল জোগাইতেছিল ?

রক্ত-বিন্দু হতে স্তনি এ জগতে
শত রক্ত-বীজ জন্মে যে প্রকার ।
জীবন সংগ্রামে ভারতের নামে
যত রক্ত-বিন্দু পড়িল এবার
শত পুত্র হবে বীর অবতার ।
ভারত আঁধার ভারতের ভার,
ঘুচাইবে তারা, ভেবে মরে যাই ।

তাঁহার দৃঢ় প্রতীতি এই ছিল যে বিশ্বাস, বৈরাগ্য ও শুদ্ধ চরিত্র ব্যতীত এদেশের স্বাধীনতা কখনও আসিবে না :

ইঞ্জিরের দাস, যেবা বার মাস,
দেশের উদ্ধার তার কর্ম নয় ।

তাঁহার ‘উৎসর্গ’ নামক কবিতা, যাহাতে এই সকল উচ্চশ্রেণীর ভাব সম্ভবত আছে সেগুলিকে রবীন্দ্রনাথের “এবার ফিরাও মোরে”র সমধর্মী বলা যাইতে পারে। রবীন্দ্রনাথের মত শিবনাথও এই কবিতার মধ্য দিয়া দেশের কাছে তাঁহার সকল শক্তি সমর্পণ করিতেছেন। আর্টের রূপলোক হইতে অবতরণ করিয়া দেশের সেবাতে তাঁহার সর্বস্ব বিসর্জন দিতেছেন। কেননা তিনি দেখিয়াছিলেন :—

কোটি কোটি লোক
চির যুগ, যেন
দারিদ্র্য ভাবনা,
শোণিত শুষিছে
নির্ঝাঁক হইয়া

অজ্ঞান-অঁধারে
আছে কারাগারে;
অসহ যাতনা
তাদের সংসারে,
কাঁদে পরস্পরে।

[বহু দূর নয়]

শুধু বাংলাদেশ লইয়া তাঁহার এই আকাজক্ষা ছিল না।
অঞ্চল ভারতের পরিপূর্ণ মুক্তি তাঁহার হৃদয়কে আকুল
করিয়া তুলিল। তাই তিনি ডাকিলেন বোম্বাই, মাদ্রাজকে।
ডাকিলেন মহারাষ্ট্র, রাজপুত, শিবকে যাহাতে সকলে পরস্পরের
প্রতি বিদ্বেষ ছুলিয়া একপ্রাণ হইয়া, তাই তাই হইয়া দেশের
স্বাধীনতা-সংগ্রামে উন্মূখ হইতে পারে :

আমি রাজপুত আমি প্রিয় শিব,
জাতি-ধর্ম-ভেদ সকলি অলীক,
ভারত রক্ষিবে সবার শরীরে
তাই বলে নিতে তবে শক্তা করে।

[“বহু দূর নয়”]

এই যুক্তির বিপুল আবেগে তিনি মুসলমানকেও ভুলেন নাই :

শেষে ডেকে বলি ওরে যুগ তাই
প্রাচীন শত্রুতা এয়োজন নাই;
দেশের দুর্দশা দেশ হলো ঢের
ভোরা ত সম্মান প্রিয় ভারতের,
সে শত্রুতা তুলে আমি প্রাণ বুলে,
পুতে রাখ কথা মল্লম কাকের,
বল শুধু—“মোরা প্রিয় ভারতের”।

[“বহু দূর নয়”]

সমাজক্ষেত্রে তথাকথিত সত্যজীবন হইতে চাষার সরল সাধু
জীবন তাঁহাকে অধিকতর আকৃষ্ট করিয়াছিল। “চাষার
অহংকার” ও “মহেশ” নামক কবিতাদ্বয়ে তিনি দারিদ্র্যের মধ্যে
সাধুতার সৌন্দর্য্য বিকশিত করিয়াছেন। ইউরোপীয় শিক্ষা
আমাদের যে নৈতিক অবনতি আনয়ন করিয়াছে তাহার স্বরূপ
উজ্জলভাবে ফুটিয়া উঠে যখন আমরা সরল চাষার জীবনের
মহত্ত্ব উপলব্ধি করি। বীৰ্য্য ছিল তাঁহার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ
সামান্য। এইজন্ত যেখানে বীরত্বের কাহিনী পাইয়াছেন
সেইখানেই আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন। এইজন্ত রাণী দুর্গাবতীর
বীরত্ব তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছে :

হের হের রণ মাঝে নাচিছে, হৃদয়ী রে
নাচিছে হৃদয়ী।
করে অসি ধরশাণ যুধে ডাক হান হান
পদতলে কাঁপে ধরা ধর ধর করি।
রণমদে মত্ত সতী পাগলিনী প্রায় রে
পাগলিনী প্রায়।

বীরত্বের ভার পবিত্রতা ও ধর্মপ্রাণতা তাঁহার হৃদয়কে অতি

সহজেই আকুল করিয়া তুলিত। তাই এক দিকে সীতার
পবিত্রতা, অপর দিকে ত্রিচৈতন্যের প্রেমোচ্ছাস তাঁহার কবিতার
বিষয়বস্তু হইয়া পড়ে। তাঁহার অধিকাংশ কবিতা যদি বাংলা
দেশ ছুলিয়া যায় তবু তাঁহার “চৈতন্যের সম্মান” কখনও
বিস্মৃত হইবে না।

ঐতিহাসিক বিষয় লইয়া তিনি কতকগুলি অতি উপাদেয়
গাথা রচনা করিয়াছেন এই সকল গাথার মধ্যে “মোহিনী”,
“মহেশ” ও “বিধবার হরিণ” অতুলনীয়।

মোহিনী একটি কুৎসিত অন্ধ রমণী। শহরের একটি গাছ-
তলায় বসিয়া সে গান ধরিয়াছে। তাহাকে এমনি দেখিলে
ঘৃণা হয়। কিন্তু তাহার গান যেই কানে আসে অমনি লোকে
ভক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া যায়। একটি ভারবাহী ঝাঁকাপুঠে সেই
দিক দিয়া যাইতেছিল। কিন্তু যেই তার গান শুনিল অমনি

ঝাঁকা পুঠে এক দৃষ্টে আনন্দে মগন,
সর্বেরঞ্জিত সে রসে ডুবিল।

তার শ্রম, তার কষ্ট, তার অনাহার,

কোথা আজ। আজ রাজপথে

দেহ তার, প্রাণ কিন্তু গগনে বিহার

করে যেন কল্পনার রথে।

এইরূপে সেখানে আসিল একজন বৃদ্ধ ব্রহ্মধর, “ব্রহ্মতত্ত্ব কৃষ্ণবর্ণ-
কায়” কর্মকার, তারপর তিনজন কেরাণী, একজন বার-
বিলাসিনী “হেলে ছলে উড়ায় অকল।” কিন্তু “চারিনেত্রে শুধু
বহে জল।” এইরূপে যেই আসে সেই মগ্ন হইয়া যায় :

কাণা, খোঁড়া, ধনী, ভৃত্য, বার-বিলাসিনী

আজ অশ্রু বহে শত যুগে।

সে সঙ্গীত, যোগীবর ব্রহ্মাবাদ সম,

ভাবে ভাবে উঠায় লহরী ;

গভীর অক্ষুট সুখ দেয় নিরূপম,

ডোবে জীব আপনা পাসরি।

তাঁহার “বিধবার হরিণ” একটি করুণ মর্ম্মস্পর্শী কাহিনী।

হতভাগিনী বিধবা একমাত্র প্রিয় পুত্র হারাইয়া একটি হরিণ
শিশুর মধ্যে তাহাকে ফিরিয়া পাইয়াছিল।

গীযুষ-পুত্রিত স্তন দিল তার যুগে,

যুগশিশু মহানন্দে ধায় ;

কোলে করি যেন নারী পাসরিল হৃদে,

হৃৎকপোলে চুপ্সিল তাহার।

বিধবা মাতা কড়ি গাঁধিয়া তাহার গলায় ঝুলাইল, কচি তৃণ
কাটিয়া তাহাকে রোজ খাওয়ায়, তাহাকে বাবা বলিয়া ডাকে।
যুগশিশু পায় পায় ঘুরিয়া বেড়ায়, বম্ বম্ করিয়া বাজে
তাঁহার পায়ের নুপুর। এইভাবে তাহার যৌবন উদগত হয়,
আর তার সৌন্দর্য্য বিগুণ বর্ধিত হয়।

কিবা চক্ষু। কিবা গতি। সব মনোহর,

শূন্যেখা মত্তক উপর।

বহিরে গেলে বালকেরা তাক্য করিয়া ঘরিতে আসে আর সে তিন লাকে ধানাবল ঝাঁপাইয়া তাহার মাতার কাছে আসিয়া ছাড়াই। এইরূপে নিরন্তর যুগে দিন কাটিয়া যায়। একদিন সন্ধ্যা হইয়া গেল অথচ সেই যুগ আর ফিরে না। ভীত মাতা পথে পথে কাদিয়া বেড়ায়। কেহ ধবর দিতে পারে না। অবশেষে সন্ধ্যার অন্ধকারে এক হিংস্র কুক্ক দ্বারা ভাঙিত ও আহত হইয়া হুড়-হুড় করিয়া সে বাড়ীর মধ্যে আসিয়া পড়ে। বিধবার দেহে প্রাণ আসিল বটে, কিন্তু সে দেহে যুগের সর্বদা কবিরাগ্রুত ও দংষ্ট্রাহত। সে আবার তাহার যুগে কচি ঘাস ধরে, দুধ আনিয়া যুগে ঢালিয়া দেয়। কিন্তু কিছুতেই যুগের প্রাণ রক্ষা পায় না। তখন সে নারীর দশা যে কি হইল তাহা বর্ণনা করা কঠিন।

কচি ঘাস কচি পাতা, লইয়া যতনে,
পথে পথে ডাকিয়া বেড়ায়।
ধূলা মাটি ফেলে মারে যত শিশুগণে,
“কেণী কেণী” বলিয়া কেপায়।

শাস্ত্রী মহাশয়ের “হিমাদ্রি-কুসুম”ও একটি পদ্যে বিবচিত কথিকা। ১৮৮৬ সনে কাসিয়াঙে বাসকালে এই কবিতা লিখিত হয়। কবি এখন নানাপ্রকার সদহুষ্ঠানের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার নায়কও এইরূপ নানাবিধ ভাগ, সংস্কার ও সংকর্ষের মধ্যে নিমগ্ন হইয়া জীবনের নষ্ট শক্তি ফিরিয়া পাইল। নায়কটি বনীর সম্ভান ও পত্নীপ্রেমে আত্মহারা। কিন্তু হুষ্ঠানের বিষয় এই যে, তাহার পত্নী তাহার প্রেমের যথাযোগ্য সমাদর করিতে না পারিয়া একদিন তাহাকে ভাগ করিয়া চলিয়া গেল। তাহার জীবনে আসিল ঘোর আত্মগ্লানি, লোকবিতৃষ্ণা ও নিরাশা। সংসারের প্রতি যুগায় পূর্ণ হৃদয় লইয়া বাড়ীঘর ছাড়িয়া সে দেশভ্রমণে চলিল। সন্ধ্যা চলিল তাহার স্নেহময়ী ভগ্নী। তাহারা অবশেষে হিমালয়ে আসিয়া পৌঁছিল ও প্রকৃতির মনোরম দৃশ্যের মধ্যে

প্রাণ ছুড়াইল। একদিন ভগ্নী ভরষি যেমন জীবনের ঘোরতর হুর্দিনে জাতি ওয়ার্ডবার্কে প্রকৃতির মধুর স্পর্শের মধ্য দিয়া সুস্থ করিয়া তুলিয়াছিলেন, সেইরূপে এই নায়কের ভগ্নীও আবার তাহার জাতাকে নিরাময় করিয়া তুলিল। আবার তাহার আত্মার মুদিত চক্ষু উদ্বীলিত হইল। মাদুসকে আবার ভাল-বাসিবার ইচ্ছা জাগ্রত হইল এবং মাদুসের কল্যাণকর্মে জাতি ও ভগ্নী জীবন উৎসর্গ করিল।

তাঁহার শেষ কবিতাপুস্তক হইতেছে ‘ছায়াময়ী পরিণয়’-কাব্য। ইহা ১৮৮৯ সনে রচিত। ইহা সংকেতাত্মক কবিতা, পাঠকালে বানিয়ানের পিলগ্রিমস্ প্রোগ্রেসের কথা স্মরণ হয়। বর্ষসাপ্তাহন সম্বন্ধে শাস্ত্রী মহাশয়ের বহু ষড় কবিতা আছে। যথা “আসক্তি, বিরক্তি ও তক্তি”, “ব্রহ্মবিদ্যা” প্রভৃতি। এইবার তিনি বর্ষজীবনের পথে যত প্রকার পরীক্ষা, বাধা ও প্রলোভন আছে ও তাহা কি ভাবে অতিক্রম করা যায় তাহা বিন্যাস করিয়া এই কবিতা রচনা করিলেন। কবিতা হিসাবে ইহা তাঁহার কবিতাসকলের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দুর্বল। কবিতার ছন্দ পদ্য, ভাষা গদ্যপ্রধান ও নিরলঙ্কার, ভাবও পুরাতন। মনের মধ্যে বিশেষ বিষয় বা পুঙ্কলের স্ফূর্তি হয় না। কবিতার বেশীর ভাগ পদ্যার ছন্দে লেখা। ত্রিপদী ও হেমচন্দ্রীয় ছন্দও বিশেষ বিশেষ স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং এইগুলিই একমাত্র ছন্দকে আকর্ষণ করে। তবে স্বীকার করিতে হইবে যে ইহার অন্তর্নিহিত শিক্ষা চিরন্তন ও কবির নিজ জীবনের সাধনার সাক্ষী-স্বরূপ।

উপসংহারে এই কথা বলিতে হইবে যে, তাঁহার কবিতার অনেকগুলি বিশেষ আনন্দ ও অশ্রুপ্ৰেরণা দেয় ও সেগুলি বাঁচিয়া থাকিবে। বিগত শতাব্দীর বাংলা কবিতার ইতিহাসে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর বিশেষ উল্লেখ যদি না থাকে তবে সে ইতিহাস অসঙ্গত হইবে।

“অন্নমারম্ভঃ শুভায় ভবতু”

শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়

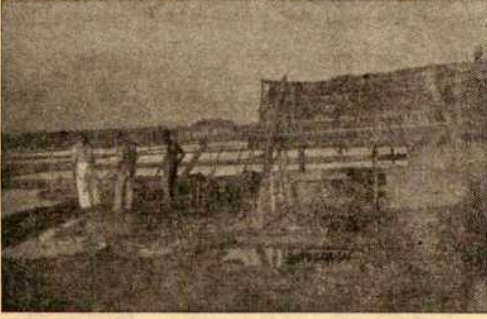
রাজবদ্ধ্য রাঙিয়াছে তাকা রক্ত-শ্রোতে,
দেশ-ব্রতী সম্ভানের আশ্র-বলিদানে।
বজ্রাহত বেদনাত বীর জন্মগণ
তবু চলেছিল ধৈর্যে যুক্তির সম্মানে।
তাই ছুই শতাব্দীর তমিষ্রা তেদিয়া
ভাঙিল নবীন ভাঙ্গু পূর্ব দিগন্ধনে।
ত্রিধর্ণ পতাকা উড়ে প্রতি ধরে ধরে,
সমাপ্ত স্বাধীনতা শুভ-সংবৎসরে।

সাধনা লভেছে সিঁদ্বি লক্ষ শহীদেয়।
মুচ জন্মগণ আজ পাইয়াছে ভাষা।
হঃধ এক, মাতৃভূমি হলেন ষড়ভিতা,
পুরোপুরি মিটল না স্বাধীনতা-আশা।
শুভ হোক, ধ্রুব হোক, এ যাত্রার পথ।
একতার বীর্ষ-দৃষ্ট হউক ভারত।

অন্তরাং ও দুলাহাজরা

শ্রীজিতেন্দ্রকুমার নাগ

কোণার অন্তরাং আর কোণার দুলাহাজরা, কিন্তু দুটি মনোরম স্থানের স্মৃতি মাঝে মাঝে এক সঙ্গেই জাগিয়া উঠে— কারণ পশ্চিম বাংলার সমুদ্রতটের পুনর্বিকশিত লবণশিল্পের কথা ভাবিতে গিয়া সমুদ্রোপকূলবর্তী এই দুটি স্থানের উন্নত লবণশিল্পের কথা মনে পড়ে। বোধ হয় অতি অল্প লোকের নিকট ইহাদের প্রকৃত পরিচয় জানা আছে। ভাষাক্রমে গত বৎসর আমার এই দুটি জায়গা পরিদর্শন করিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল।



চট্টগ্রামের দুলাহাজরায় ব্রহ্মদেশীয় পদ্ধতিতে লবণ প্রস্তুতি

অন্তরাং হিন্দুস্থানের অন্তর্গত, কিন্তু বঙ্গবিভাগের ফলে আজ দুলাহাজরা পাকিস্তানের মধ্যে পড়িয়াছে। সেইজন্য দুলাহাজরাকে এখন বিশেষ করিয়া মনে পড়ে। অন্তরাং পুরী জেলার কোণারক মন্দিরের কিছু উত্তরে সমুদ্রতীরের নিকট একটি অজপাড়াগাঁ। ডাক পৌছিতে সপ্তাহের উপর লাগে। ইহা কাকটপুৰ থানার অন্তর্গত একটি লবণ প্রস্তুতির কেন্দ্র। এখানে ভ্রমণের গল্প পরে বলিতেছি।

দুলাহাজরা চট্টগ্রাম জেলায়, কক্সবাজারের ১৬ মাইল উত্তরে। চট্টগ্রাম শহর হইতে বোধ করি ৭০ মাইল হইবে; একেবারে পার্বত্য চট্টগ্রামের সীমানা বৈশিষ্ট্য ইহার অবস্থিতি। কক্সবাজার রোডের প্রায় পাশেই বলা চলে। দুলাহাজরা নিত্যন্ত অজ্ঞাত অধ্যাত পন্নীগ্রাম নয়। বিপত মহামুন্দের সময় ইহা বেশ ত্রিভুজি লাভ করিয়াছে। এখানকার অধিবাসীদের অবস্থাও উন্নত। ইহার এক পাশে বনভূমিতে আরণ্য সম্পদের প্রাচুর্য, অপর পাশে মহিষবাণীর তীরে নিম্নভূমিতে পৌষ হইতে বর্ষার পূর্ব পর্যন্ত বিপুল পরিমাণে লবণ প্রস্তুত হয়।

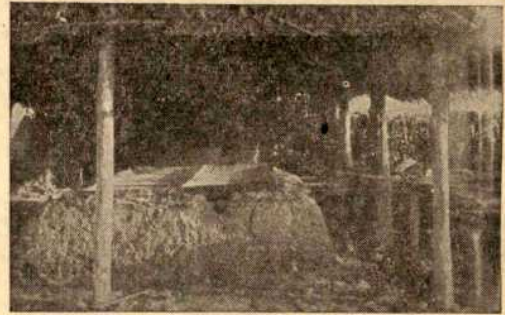
দুলাহাজরার প্রাকৃতিক দৃশ্যদৈর্ঘ্য আমাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। বিশেষতঃ বনবিভাগের ডাকবাংলোটি এমন সুন্দর জায়গায় অবস্থিত যে ইচ্ছা করে দিন কতকের জন্ত সেখানে আবার গিয়া গ্রামবাসীদের সঙ্গে মেলামেশা করিয়া আসি।

তখন বাংলার ভাষ্যাকাশ সাম্প্রদায়িক বিবেচনের মেঘে সমাচ্ছন্ন ছিল না। নিশ্চিত মনে চট্টগ্রামের স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে যাত্রি ৯টা ১০টা পর্যন্ত টাদের আলোয় পূর্ণন গাছের তলায় বসিয়া আড্ডা দিয়াছি, গল্প-জল্পবে মাতিয়া উঠিয়াছি এবং লবণ-শিল্পের প্রসারের জন্ত কত কথাই না কহিয়াছি। চট্টগ্রামের ছুঁবোধ্য ভাষা আমাদের পারস্পরিক ভাববিনিময়ের পথে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিতে পারে নাই।

এবার ভ্রমণ-কথা শুরু করা যাক—

সে সময়টি বোধ হয় ফাল্গুনের শেষ বা চৈত্রের প্রারম্ভ হইবে। চট্টগ্রাম পৌছিয়া সকাল সাড়ে নয়টার পট্টয়া লাইনের একটি ট্রেন ধরলাম। এই লাইনের শেষ স্টেশন দোহাজারীতে পৌছিয়া বেলা বারটার রাহুর একটি বাস ধরা গেল। পট্টনে শখ নদী পার হইয়া অটোবাসবানি তরফায়িত পাহাড়ের চড়াই উৎরাই ভাদিয়া কক্সবাজার রোডের উপর দিয়া দ্রুতবেগে ছুটিয়া চলিল। কি মনোরম দৃশ্য! রাস্তার এক দিকে সমতল-ভূমি, মাঝে মাঝে চষা ক্ষেত, আর অল্প দিকে বনাকীর্ণ গিরিমালা। বহুদূরে সু-উচ্চ পাহাড়ের ধূসর রেখায়িত শৃঙ্গরাজি পাণ্ডুলীল আকাশের গায়ে মিশিয়া রহিয়াছে যেন।

কাঠের সাঁকোয় মাতারমন্ডি পার হইয়া চক্টিড়িপ্পা। পথে চুনটা, এটামগরা প্রভৃতি বড়িষ্ গ্ৰামগুলি অতিক্রম করিয়া আসা গেল।

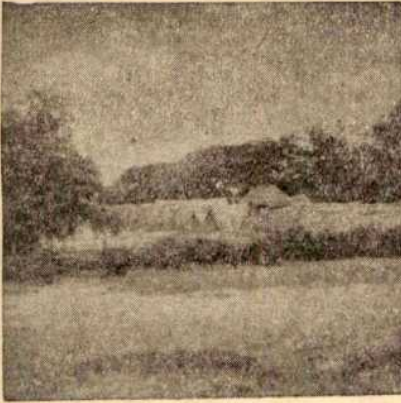


লবণ-ভল জাল দিবার একটি চুন্নি—কক্সবাজার

মাঝে মাঝে বৃষ্টিপাত হইয়া গেছে—মেঘলা দিনের পড়ন্ত অপঃ রু বেলার খনবনাচ্ছন্ন পার্বত্য পথের দৃশ্য মনোরম লাগিল। কক্সবাজার পৌছিয়ায় সন্ধ্যায়—বহুবর ত্রিভুজি রিলিক অকিসার, লবে চা খাবার আয়োজন করিতেছিল।

কক্সবাজার রোডের ভ্রমণ, চট্টগ্রাম কক্সবাজার সীমার ভ্রমণ অপেক্ষা কিছু কম ভাল লাগে নাই। তাত মাংস কফি না পাওয়া গেলেও চা কলা বিহুট প্রায়ই মিলিটারি রোডের পার্শ্ব

দোকানে পাওয়া যায়। অবশ্য তফাৎ বেশ—এক ড্রাম জলপথে, অণ্টা স্থলপথে—এখানে পাহাড় ওখানে সমুদ্র। কজবাজার কিছ্র আমার পুরী পোপালপুরের মত ভাল লাগে নাই, সমুদ্র বড়ই অগভীর—যদিও পটুখুমিকায় গিরিমালার দৃষ্ট মনোরম। তটস্থিতে বালিঘাড়ি সমস্তল করিয়া, রানওয়ে তৈরী করাতে সমস্ত সৌন্দর্য্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সহরের মধ্যকার পথগুলি অবশ্য বাট কক্ষচড়ার আচ্ছাদনীতে ভারি সুন্দর। রঙীন লুঙ্গী ও পোষাক পরা ইত্যন্ত: বিচরণশীল মগেরা দৃষ্টিকে বিশেষ-ভাবেই আকর্ষণ করিতেছিল।



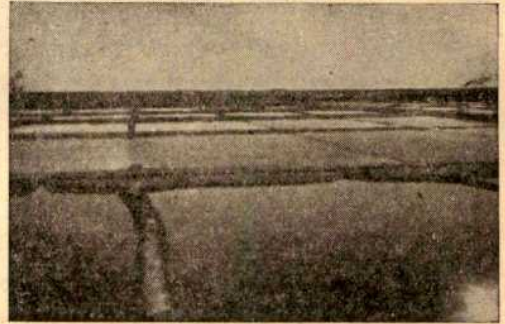
লবণ-গোলা অষ্টং

ঢুলাহাজরায় করেই বাংলাতে আমার অবস্থান করার উদ্দেশ্য ছিল—কি ভাবে ওখানকার লবণশিল্প সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে তাহা পর্যবেক্ষণ করা। মাতারমন্ডি চ্যানেলের জল বেশ লোণা—সেই জল জোয়ারের সময় নিম্নভূমিতে বহু ঝাড়ি দিয়া প্রবেশ করে। গ্রামবাসীরা সেই জল চারিটা করিয়া আল-দেওয়া চাতরে (Condenser) রৌদ্র-তাপের সাহায্যে ঘনীভূত করিয়া জমা করে। নিকটেই চুঙ্গী বসাইয়া লোহার কটাহে এই ঘন ব্রাইন বা লোণা জল জাল দিয়া পরিকার দানা দানা লবণ প্রস্তুত করে। এই প্রণালীটা মাত্র ৪৫ বৎসর ওই অঞ্চলে চালু হয় বর্ষা ইত্যাকৃষ্টদের কল্যাণে। নিকটস্থ জঙ্গল হইতে জালানী কাঠ তাহারা বিনা ব্যয়েই পায় দেখিলাম। কি ব্যাপক ভাবে ইহারা লবণ প্রস্তুত করিতেছে তাহা না দেখিলে বিশ্বাস করা যায় না। ইহাদের এক একটি বড় ইউনিটের উৎপাদনের সহিত বোধ করি পশ্চিম বাংলার কোন কারখানার তুলনা করিতে পারা যায় না।

অথচ ঐ অঞ্চলের বারিপাতের পরিমাণ পশ্চিম বাংলার সমুদ্রতীরস্থ স্থানসমূহের তুলনায় দ্বিগুণ এবং যে মাস পড়িতে না পড়িতে এমন বর্ষা আরম্ভ হইয়া যায় যে লবণ প্রস্তুত বন্ধ রাখিতে হয়। মাত্র ৪৫ মাস কাজ করিয়া গ্রামবাসীরা প্রায় দুই লক্ষ মণ লবণ প্রস্তুত করে। ইহারা

বড় বড় উচ্চ বাঁধ দিয়া বা বড় বড় জলাধার নির্মাণ করিয়া অর্থ ও শ্রম উভয়েরই অযথা অপব্যয় করে না। উহারা জানে বজার হাত হইতে রক্ষা পাইলেও বর্ষার অবিশ্রান্ত বারিপাত হইতে লবণ বাঁচানো সম্ভব নয়। অন্তএব বর্ষণের সময় কাজ বন্ধ রাখাই সমীচীন। বর্ষান্তে সামান্য বাঁধ দিয়াই আবার যথারীতি তাহাদের কাজ চলিতে থাকে।

প্রবাসী বাঙালী প্রদেয় ক্রীশরং চন্দ্র দত্তের সহায়তা ও আতিথ্য না পাইলে বোধ করি অন্তরাং যাওয়া বটত না। এক দিন সকালে তিনি তাঁহার নিজস্ব মোটরে আমাদের পুরী হইতে নিম্নাপাড়া ডাকবাংলোয় লইয়া গেলেন। এই নিম্নাপাড়া হইতে একটা পথ কোণারকুর দিকে চলিয়া গিয়াছে, আর একটা পথ কাকটপুর হইয়া অন্তরাং গিয়াছে।



নৌপদায় লবণ-জল ঘনীভূত করিবার আধার

নিম্নাপাড়ার রাস্তাটি পুরী রোড হইতে পিপলীর নিকট শাখারূপে দক্ষিণাভিমুখে চলিয়া গিয়াছে। পুরী-ভুবনেশ্বর বাস সার্ভিসে পিপলীতে নামিয়া নিম্নাপাড়া যাওয়া যায়। পূর্বে একবার এই পথে কোণারকুর যাইবার সুযোগ আমার ঘটয়াছিল। নিম্নাপাড়ায় এক দিন থাকিয়া পরদিন প্রত্যুষে অন্তরাং যাই। রাস্তাসাহেব ইন্সপেক্টরসনে বাহির হইয়াছেন। আবগারী বিভাগের সকল কর্মচারী খুব ব্যস্ত। অন্তরাং পৌছাইতে বেশ বেলা হইয়া গেল। পথ এতই দুর্গম যে মোটরের গতি বাতান অসম্ভব। কাঁচা মেঠো পথ অজুঁনপুর, কাকটপুর হইয়া অন্তরাঙে দেবী নদীর মুখ পর্যন্ত আসিয়াছে।

অন্তরাং অস্থায়ী পল্লীগাম হইলেও লবণ-শিল্পের ক্ষমোদ্রতিতে ইহার গুরুত্ব যথেষ্ট বাড়িয়া গিয়াছে। উদ্ভিদায় প্রথম লবণ প্রস্তুতির সমবায় প্রতিষ্ঠানটি এই স্থানে কি ভাবে সাফল্য অর্জন করিয়াছে তাহা বিশেষ করিয়া প্রশিধানযোগ্য। পুরীর এই সমস্ত সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলে কেবলমাত্র রৌদ্র-সাহায্যে কিরূপে লবণ-প্রস্তুতির প্রসার ঘটতেছে তাহাও দেখিবার জিনিষ বটে।

* পিপলী হইতে পুরী মাত্র ২৫ মাইল। পিপলী ঐষ্টান মিশনরীদের একটি কেন্দ্র।

এই অঞ্চলের সীমানা অতিক্রম করিবার পর হইতেই উত্তর দিকে দেখা যায়, বালেশ্বর, মেদিনীপুর, ২৪ পরগণা ইত্যাদি সর্বত্রই জাল দিয়া পাখী লবণ প্রস্তুত হয়। কোম্পানীর একেবারে অধীনে এখানেও জাল দিয়াই লবণ প্রস্তুত হইত, কিন্তু ১৯৩১ সনের গান্ধী-আরউইন চুক্তির পর হইতে এখানে মাদ্রাজের প্রণালী চালু হইয়াছে।

রৌদ্র-সাহায্যে কি ভাবে ইছারা লবণ প্রস্তুত করিতেছে এবং এই প্রণালী কি উপায়ে বাংলায় চালু করা যায় তাহা অহুসস্থান করিতেই আমার অন্তরাং আসা।



নৌপদার লবণ-প্রস্তুতি কেন্দ্র

জালানীর অভাবে আমাদের বাংলাদেশের লবণ-শিল্প প্রায় নষ্ট হইতে বসিয়াছে, কিন্তু আমাদের লবণ উৎপাদনকারী গ্রামবাসীরা যদি এই বিষয়ে পুরী জেলার দৃষ্টান্ত অহুসরণ করে, তাহা হইলে বোধ করি এই ধ্বংসোদ্ভূত শিল্প আবার উন্নতি লাভ করিতে পারিবে।

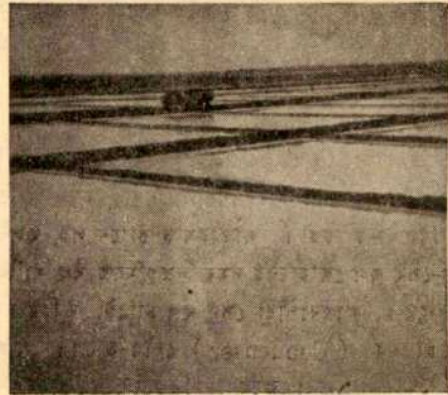
অন্তরাংয়ের প্রাকৃতিক পরিবেশ ছালাছালার সম্পূর্ণ বিপরীত। বাপুময়, অল্প ঢেউ-বেলানো পথ বরাবর দূরের পানি চলিয়া গিয়াছে। হুঁপারে মাঝে মাঝে ঘানের ক্ষেত, আশেপাশে পাহাড়ের লেশমাত্র নাই। অদূর আকাশের পটে পূর্ববাটের গিরিমালার রেখাগুলি অস্পষ্ট দৃশ্যমান হয় মাত্র। রাস্তা এত কাঁচা যে অল্প বর্ষণ হইলেই মোটরে পার হওয়া বিপজ্জনক। সেইজন্য নৈমগত কোণে ঘন মেঘের উদয় হওয়াতে অন্তরাং হইতে সেই দিনই আমাদের কিরিতে হইল।

নিত্যন্ত পাড়ারী হইলেও ওখানে ডাকবাংলো দাতব্য চিকিৎসালয় এবং একটা ডাকঘর আছে। তাহার উপর লবণ প্রস্তুতি ও বিক্রয়ের সমবায় প্রতিষ্ঠানটির জন্ম সরকারী কর্মচারী ও আবগারী ইন্সপেক্টর কয়েকজন এখানে বাস করেন। পুরী হইতে সমুদ্রের ধার দিয়া গোপ এবং কোণারকে আসা যায়, আর একটু উত্তরে আসিলেই অন্তরাং। গোপের নিকট কুশভদ্রা নদী পার হইতে হয়।

প্রাচীনদীর কোলে কাকটপূর। আমরা কিছুক্ষণের জন্ম দাতব্য চিকিৎসালয়ের ডাক্তার বাবুর আতিথ্য গ্রহণ করিলাম। এখানে ঠাকুরাণী মন্দির উল্লেখযোগ্য—চৈত্র সংক্রান্তিতে বহু তীর্থযাত্রী সমবেত হয়।

অন্তরাং পৌছিতে অল্প বেলা হইল। অর্ধের তেজ রীতিমত প্রধর। ডাকবাংলোয় আসিয়া চা পান করিয়া ডাক্তার বাবু ও সমবায় প্রতিষ্ঠানের রেজিষ্টার প্রভৃতি কয়েকজন সহ 'সেন্ট গার্ডেন' দেখিতে গেলাম। অন্তরাংয়ের লবণ-ক্ষেত্র দেখিয়া কেবলই মনে হইতে লাগিল আমাদের বাংলাদেশে এই বিষয়ে কতই না পিছনে পড়িয়া আছে। বাংলার লবণের কারখানা-সমূহের কর্তৃপক্ষের উত্তমহীনতা আমার মনে হতাশার সঞ্চার করে। এই অন্তরাং প্রতি বর্ষায় আসিয়া যায়, কিন্তু মাঘ কান্ডন হইতে আষাঢ়ের বর্ষণ পর্যন্ত গ্রামবাসীরা তারই বুকে লক্ষাধিক মণ লবণ প্রস্তুত করে।

এ বৎসর খবর পাইয়াছি, সমবায় প্রতিষ্ঠানটি ১২০ একর জমিতে তিন মাস মাত্র কাজ করিয়া প্রায় ৫০ হাজার মণ লবণ প্রস্তুত করিয়াছে। আসা-যাওয়ার সুব্যবস্থা না থাকায় এবং লবণ প্রেরণের অসুবিধার জন্মই ইছারা গত কয়েক বৎসর যাবৎ সে রকম প্রচুর পরিমাণ লবণ প্রস্তুত করিতে পারে নাই। সমবায় প্রতিষ্ঠানটি ছাড়া ব্যক্তিগতভাবেও কাহারও কাহারও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লবণক্ষেত্র আছে। ইছারা নিকটস্থ বাজারে বা দূর ব্যবসায়-ক্ষেত্রেও লবণ বিক্রয় করিয়া আসে।



নৌপদার আর একটু দৃশ্য

ইছা যখন সম্ভব হইয়াছে তখন আশা করা যায় উড়িষ্যার গঞ্জাম, ইচ্ছাপুরম হইতে অন্তরাং এবং অন্তরাং হইতে বালেশ্বর-তালপাদা পর্যন্ত রৌদ্রতাপে লবণ প্রস্তুতি এক দিন না এক দিন বিস্তার লাভ করিবে। এই সমস্ত অঞ্চলের তুলনায় কাঁধির বৃষ্টিপাতের পরিমাণ খুব বেশী নহে। কাঁধির সমুদ্রোপ-কূলে এই প্রণালী প্রত্যেক লবণ উৎপাদন কেন্দ্রে চালু হওয়া চাই। জালানী পুড়াইয়া এত ধরচ করিয়া লবণ প্রস্তুতি আধিক দিক দিয়া আশাহুজ্ঞ লাভজনক নহে। অন্তরাং মাদ্রাজের মত আর একটু জিনিষের রেওয়াজ হইয়াছে। এখানেও উদ্বুদ্ধ স্থানে লবণের পাহাড় করিয়া প্রত্যেকটি স্তূপকে ষড় চাটাই বা তালপাতার আবরণ দিয়া ঢাকিয়া রাখা হয়। এখানকার লবণ উৎপাদনকারীরা গোলার জন্ম বিশেষ ওদামের ব্যবস্থা করিয়া দ্বয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করে না।

সান ইয়াং-সেনের সাধনা

অধ্যাপক শ্রীমুখাংশুবিমল মুখোপাধ্যায়

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পর রাষ্ট্রপতি উইলসনের ঘোষণা এবং বিশ্ব-শান্তির দৃঢ় জাতি-সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত জাতিপুঞ্জের মনে আশা এবং আনন্দের দীপশিখা প্রজ্জ্বলিত করিয়াছিল। ইহার পর যখন আন্তর্জাতিক শান্তিবৈঠকে যুদ্ধ-কালে জাপান চীনের যে অংশ গ্রাস করিয়াছিল, তাহার উপর জাপানের অধিকার স্বীকার করিয়া লওয়া হইল এবং জাতি-সাম্য সম্বন্ধে জাতি-সঙ্ঘ তুচ্ছীভাব অবলম্বন করিল তখনও এই আশাদীপ নির্বাপিত হয় নাই।

আধুনিক চীনের জনক সান ইয়াং-সেন এবং অজ্ঞাত অনেকেই প্রথমে বিশ্বাস করিতেন যে, প্রতিক্রিয়াপন্থীদের এই জয় স্থায়ী হইতে পারে না। সান বিশ্বাস করিতেন যে বৈদেশিকগণ চীনের উপর ভবিষ্যতে আর জুলুমবাজি না করিয়া তাহাকে আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত করিতে সর্বপ্রকার সহায়তা করিবেন। ‘দি ইণ্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট অব চায়না’ নামক গ্রন্থে তিনি এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ‘গ্রাম-শিল্পে উন্নত দেশসমূহের পক্ষে চীনে গণ-তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ও তাহার শিল্পোন্নতির সহায়তা করা একান্ত কর্তব্য—ফলে সংশ্লিষ্ট সকলেরই উপকার হইবে। কিন্তু ইংলণ্ড এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ডাঃ সানকে উবাদ কল্পনাবিলাসী বলিয়া উপেক্ষা করিল। চীন সম্বন্ধে ইহাদিগের নীতির কোন পরিবর্তন ঘটিল না।

ইহারই ফলে সান ইয়াং-সেন সোভিয়েট রুশিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন এবং চীন-সোভিয়েট যৈত্রী স্থাপিত হইয়াছিল (১৯২৩)। সোভিয়েট রাষ্ট্র ঘোষণা করিয়াছিল যে, সে চীনকে সর্বপ্রকারে নিজের সমকক্ষ বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত। রুশিয়ার অন্তর্বিদ্বেষ তখন সবেমাত্র শেষ হইয়াছে। চীনের শিল্পোন্নতির মূলধন জোগাইবার বা চীনকে কোন প্রকার আর্থিক সহায়তা করিবার ক্রমতা তাহার ছিল না। তবে ক্যাণ্টন জাতীয় সরকারের দৃঢ় রুশিয়া হইতে পরামর্শদাতা এবং কিছু অস্ত্রশস্ত্র প্রেরিত হইল। সোভিয়েট বিরোধী প্রতিক্রিয়াপন্থীগণ ছোরগলার প্রচার করিতে লাগিলেন যে ক্যাণ্টন সরকার বলশেভিকদিগের সহিত যোগদান করিয়াছেন। (১)

ডাঃ সান এবং ক্যাণ্টনে প্রেরিত সোভিয়েট প্রতিনিধি মিঃ জোফের একটি বিবৃতি হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে এই

অভিযোগ একেবারেই ভিত্তিহীন। এই বিবৃতিতে বলা হইয়াছে যে ডাঃ সান মনে করেন চীনে সাম্যবাদ অথবা সোভিয়েট শাসন প্রতিষ্ঠা করা কোনক্রমেই সম্ভব নহে; কারণ চীনের অবস্থা সাম্যবাদ বা সোভিয়েটতন্ত্র স্থাপনের অসম্ভব নহে। মিঃ জোফও তাহাই মনে করেন। তাহার (মিঃ জোফের) মতে জাতীয় এক্য স্থাপন এবং পূর্ণ স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা চীনের সর্বাপেক্ষা গুরুতর সমস্যা। এই দ্বিবিধ সমস্যার সমাধানকল্পে তিনি চীনকে সোভিয়েট সরকারের পক্ষ হইতে সর্বপ্রকার সাহায্যের প্রতিক্রিয়া দিলেন। (২)

ডাঃ সানের আন্তরিকতার সন্দেহ করিবার কোন যুক্তি-সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। রুশিয়া কি কারণে চীনকে সহায়তা করিতে সম্মত হইয়াছিল তাহাও সম্বন্ধেই বুঝা যায়। রুশিয়া চীনের একান্ত নিকট-প্রতিবেশী। সুতরাং চীন যদি পূর্বের জায় সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রসমূহের শোষণের ক্ষেত্রেই থাকিয়া যায়, তাহা হইলে অদূর ভবিষ্যতে সাম্যবাদী রুশিয়ার বিপদ অবশ্যজ্ঞাবী। এইজন্যই রুশিয়া মনে প্রাণে কামনা করিতেছিল যে চীন এক্যবদ্ধ এবং বৈদেশিক প্রভাব-মুক্ত হইয়া একটি শক্তিশালী, প্রগতিশীল রাষ্ট্রে পরিণত হোক। এই অবস্থায় উন্নীত চীন কোন দিনই যেচ্ছায় রুশিয়ার বিরুদ্ধাচরণ করবে না। সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ ডাঃ সান প্রতিষ্ঠিত ক্যাণ্টন সরকারকে প্রগতিশীল মনে করিতেন বলিয়াই ইহাকে সহায়তা করিতে সম্মত হইয়াছিলেন।

এই সময়কার ক্যাণ্টন সরকারকে কোনক্রমেই সাম্যবাদী মনে করা চলে না। বরোভির্নের মতে কয়েক শতাব্দী পূর্বে অজ্ঞাত দেশে রাষ্ট্রিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতির দৃঢ় যে সংগ্রামের অবসান ঘটয়াছে, ক্যাণ্টন সরকারের অধীনস্থ অঞ্চলসমূহে সেই সংগ্রাম তখন সবেমাত্র আরম্ভ হইয়াছে। (৩)

(২) “Dr. Sun Yat-Sen holds that the communistic order or even the Soviet system cannot actually be introduced into China, because there do not exist here the conditions for the successful establishment of communism or socialism. This view is entirely shared by Mr. Joffe, who is further of the opinion that China’s paramount and most pressing problem is to achieve national unification and attain full national independence, and regarding this task he has assured Dr. Sun that China . . . can count on the support of Russia.”

(১) “Shanghai journalists like Rodney Gilbert . . . manufactured tales in which both Sun and his military lieutenant, Chiang-Ki-Shek, were assailed daily as blood-stained anarchists, who had gone over to the enemies of mankind. Actually, nobody had gone over to anybody.”—The Unfinished Revolution in China by L. Epstein, p. 41.

(৩) “Canton is not communistic; there is a hard struggle for political, economic, and social progress, such as other countries have gone through several hundred years ago.”—Borodin.

ডাঃ সানের চরমপন্থা পাঠে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে একমাত্র রুশিয়াই চীনকে সমকক্ষ রাষ্ট্রের মর্যাদা দান করিতে প্রস্তুত ছিল বলিয়াই তিনি রুশিয়ার সহিত মৈত্রী স্থাপন করিয়াছিলেন। যে-কোন রাষ্ট্র চীনকে এই মর্যাদা দান করিত বা নিজে এই মর্যাদা লাভের জন্ত সচেষ্ট হইত, তাহার সহিতই তিনি মৈত্রী স্থাপন করিতে প্রস্তুত ছিলেন। সুতরাং তিনি চীনের সাম্যবাদী এবং অস্ত্রাজ্য দেশে প্রতিক্রিয়াবিরোধীদিগের সহযোগিতা কামনা করিতেন।

রুশিয়ার দৃষ্টান্ত হইতে সান এই শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন যে মুক্তির জন্ত জনসাধারণকে সংগ্রামে অবতীর্ণ হইতে হইবে। চীন-সোভিয়েট মৈত্রী স্থাপনের পর তিনি ক্যুওমিটাং দলকে আবার চালিয়া সাজিলেন। প্রতিক্রিয়াবিরোধী যে-কোন ব্যক্তির পক্ষে দলের সদস্য হওয়ার পথে আর কোন বাধা রহিল না। সাম্যবাদীগণ ইতঃপূর্বেই প্রমজীবীদিগের মধ্যে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা এবং প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। বরোডিনের পরামর্শে সান ইহাদিগকে ক্যুওমিটাং দলের সদস্য হইবার অধুমতি প্রদান করিলেন। ক্যুওমিটাং এবং কম্যুনিষ্ট এই উভয় দলের গ্রহণযোগ্য একটি কর্মসূচী গৃহীত হইল। কৃষকদিগের মধ্যে রাজনৈতিক প্রচার কার্য আরম্ভ করা হইল।

কেহ কেহ বলেন যে ডাঃ সান যত্নের পূর্বে সাম্যবাদ নীতি এবং আদর্শ পরিচয় করিয়াছিলেন। প্রকৃত কথা এই যে তিনি কোন দিনই সাম্যবাদী ছিলেন না। তবে এক কথা সত্য যে তিনি সামন্ত-তন্ত্র এবং সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংস সাধন করিয়া এক নতুন রাষ্ট্র সৃষ্টি করিবার স্বপ্ন দেখিতেন। সাম্যবাদীগণও ভাল করিয়াই জানিতেন যে প্রতিক্রিয়ার দুইটি প্রধান বাহন সামন্ত-তন্ত্র এবং সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংস সাধন ব্যতীত তাহাদের স্বপ্ন কোন দিনই সফল হইবে না। ডাঃ সান বুঝিয়াছিলেন, ক্যুওমিটাং ও কম্যুনিষ্ট দলকে বহুদিন একযোগে কাজ করিতে হইবে, আর আদর্শের দিক হইতেও তাহাদিগের বিরোধ শীঘ্র প্রবল আকার ধারণ করিবে না।

১৯২৫ সালে যখন সান ইয়াং-সেন যত্নমুখে পতিত হন, সেই সময় চীন বিপ্লবের পথে অনেক দূর অগ্রসর হইয়া গেলেও তখন পর্যন্ত বৈপ্লবিক আদর্শ ক্ষয়যুক্ত হয় নাই। তিনি নিজেও ইহা ভাল করিয়াই জানিতেন। তাহার অন্তিম পক্ষে তিনি লিখিয়া গিয়াছেন—৪০ বৎসর কাল আমি গণ-বিপ্লব আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করিয়াছি। চীনের স্বাধীনতা অর্জন এবং অস্ত্রাজ্য রাষ্ট্রের সহিত তাহার সমকক্ষতা স্থাপন আমার উদ্দেশ্য। ৪০ বৎসরের অভিজ্ঞতা হইতে আমি এই শিক্ষা লাভ করিয়াছি যে, লক্ষ্যে পৌঁছিতে হইলে আমাদেরকে মহাচীনের গণ-চেতনা জাগ্রত করিয়া, যে সমস্ত জাতি আমাদেরকে নিজেদের সমকক্ষ মনে করে তাহাদিগের সহিত মিত্রতা স্থাপনপূর্বক তাহাদের সমর্থন এবং সহযোগিতায় সংগ্রাম পরিচালনা করিতে হইবে। আরও বিপ্লবের অবসান ঘটে নাই। আমার লক্ষ্যমাত্রা

যেন আমার জাতীয় পুনর্গঠন পরিকল্পনা অল্পসারে কাৰ্য্য করেন। তাহারা যেন আমাদের দলের প্রথম জাতীয় অধিবেশন কর্তৃক প্রকাশিত বোষণা অল্পসারে কাৰ্য্য করিয়া এই বোষণা এবং জাতীয় পুনর্গঠন পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করিতে সচেষ্ট হইয়ন। চীনের জনসাধারণের জাতীয় সম্মেলন আহ্বান এবং অসম সন্ধিবন্ধনসমূহ ছিন্ন করা সম্বন্ধে আমার সাম্প্রতিক বোষণাবলী অবিলম্বে যেন কার্য্যে পরিণত করা হয়। (৪)

ডাঃ সানের জাতীয় পুনর্গঠন পরিকল্পনায় সরকারকে জনসাধারণের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান এবং যাতায়াত ব্যবহার জন্ত দায়ী করা হইয়াছে। জনসাধারণ যাহাতে রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে এবং যাহাতে আমলাতন্ত্রের উদ্ভব হইতে না পারে সেইজন্ত তিনি প্রত্যেক জেলায় নির্বাচনমূলক শাসন-ব্যবস্থা এবং জেলা কর্তৃপক্ষের হাতে স্থানীয় শাসনব্যবহার সর্বময় কর্তৃত্ব অর্পণ করিবার কথা বলিতেন। ডাঃ সান জাতীয় মূলধন নিয়ন্ত্রিত করিবার স্বপ্নও দেখিতেন এবং রেলপথ, সংবাদ আদানপ্রদান-ব্যবস্থা এবং প্রধান প্রধান প্রশিক্ষণগুলির উপর রাষ্ট্রকর্তৃত্ব স্থাপনের পক্ষপাতী ছিলেন। তাহার ‘সান-মিন্চুই’ বা জনগণের তিনটি নীতির উদ্দেশ্য : চীনের জাতীয়তা-বোধের বিকাশ, গণতন্ত্র স্থাপন এবং জনসাধারণের জীবন-যাত্রার সৌকর্য্যসাধন। এই শেষোক্ত কথাটিকে তিনি কখনও কখনও সমাজতন্ত্রবাদ বা ‘সোশালিজমের’ পরিবর্তে ব্যবহার করিতেন। তিনি আরও বলিতেন যে, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা, সোভিয়েট রাষ্ট্রের সহিত সহযোগিতা এবং কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনে উৎসাহ দান করিয়া ‘সান-মিন্চুইয়ের’ আদর্শকে বাস্তব রূপদান করিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

চীনের অধিবাসী বিভিন্ন জাতিকে একতাবদ্ধ করিয়া তাহাদের মধ্যে রাষ্ট্রিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সাম্য স্থাপন ডাঃ সান পরিকল্পিত জাতীয়তার আদর্শ। জাতীয়তার আদর্শে অল্পপ্রাণিত চীনের অধিবাসিগণ চিরাচরিত প্রথা

(৪) “For forty years I have devoted myself to the cause of the people's revolution with but one end in view: the elevation of China to a position of freedom and equality among the nations. My experiences during these forty years have convinced me that to attain this we must bring about an awakening for our own people and ally ourselves in a common struggle with those peoples of the world who treat us as equals.

The Revolution is not yet finished. Let all our comrades follow my plan for National Reconstruction and the Manifesto issued by the First National Convention of our party, and make every effort to carry them out. Above all, my recent declarations in favour of holding a National Convention of the people of China and abolishing the unequal treaties should be carried into effect as soon as possible.”—The Will of Dr. Sun Yat-Sen.

অজুযায়ী কেবলমাত্র স্ব-স্ব পরিবার এবং বংশের প্রতি অহুগত না থাকিয়া সমগ্র জাতির প্রতি কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হইবে। তিনি জানিতেন যে জাতীয়তাবোধের বিকাশ হইলে চীন বৈদেশিক রাষ্ট্রপুঞ্জের চাপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করিতে সমর্থ হইবে।

লোকায়ত্ত রাষ্ট্র এবং সরকারের প্রতিষ্ঠা ডাঃ সান পরিকল্পিত গণতন্ত্রের উদ্দেশ্য। এই ধরনের রাষ্ট্র এবং সরকারই জন-কল্যাণে সর্বশক্তি নিয়োগ করিতে সমর্থ। জীবনযাত্রার সৌকর্য্যসাধন বলিতে তিনি বুঝিতেন শ্রমিকদিগকে অজ্ঞায় উৎপীড়নের হাত হইতে রক্ষার ব্যবস্থা। তিনি বলিতেন যে ভূমি-ব্যবস্থার আমূল সংস্কারসাধন পূর্বক কৃষক এবং শ্রমিকদের আন্দোলনকে শক্তিশালী করিয়া উভয়েরই রাজনৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। তিনি সর্বদাই বলিতেন, কৃষককে জমির মালিক বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে (“The land must belong to the tillers”)।

১৯২৪ সনে যে জাতীয় সম্মেলনের (The First National Convention) অধিবেশন হয় তাহাতে চীনের মুক্তির জ্ঞপ্তি ‘সান-মিন্চুই’য়ের আদর্শে কার্য্যসূচী স্থিরীকৃত হয়, এই অধিবেশনেই ক্যুওমিটাং এবং কমুনিষ্ট এই দুই দলের মধ্যে সহযোগিতার পথ প্রশস্ত এবং স্পষ্ট হয়।

‘সান মিন্চুই’য়ের স্বল্প বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে ইহার আদর্শ সাম্যবাদবিরোধী নহে। বিনা প্রয়োজনে বৈদেশিকগণের বিরুদ্ধাচরণ করাও ইহার উদ্দেশ্য নহে। চীনে গণতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতির প্রবর্তন করিয়া তাহাকে অচ্যুত প্রগতিশীল এবং প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্রের সমকক্ষ করিয়া তোলা ইহার লক্ষ্য।

ডাঃ সান বলিতেন যে নূতন চীনরাষ্ট্র গঠন করিতে হইলে পর পর তিনটি ধাপ অতিক্রম করিতে হইবে। সর্বপ্রায়ে বিপ্লবী সৈন্তবাহিনীকে দেশে একতা প্রতিষ্ঠার জ্ঞপ্তি সংগ্রাম করিতে এবং বৈপ্লবিক আদর্শের প্রতি জনসাধারণের মনোযোগ আকৃষ্ট করিয়া তাহাদিগকে তৎপ্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন করিয়া তুলিতে হইবে। ইহার পর প্রচার এবং সংগঠনে অভিজ্ঞ ক্যুওমিটাং সদস্যদিগকে ক্যুওমিটাং সৈন্তদল কর্তৃক অধিকৃত অঞ্চলসমূহে প্রেরণ করিয়া জনসাধারণকে স্বায়ত্ত শাসন পদ্ধতি শিখাইতে হইবে। এই শিক্ষাদানকার্য্য সমাপ্ত হইবার পর প্রত্যেক জেলা হইতে প্রতিনিধি আহ্বান করিয়া স্থানীয় প্রবাহুযায়ী প্রাদেশিক আইন প্রণয়ন এবং গণভোটদ্বারা প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা নির্বাচন করিতে হইবে। সমগ্র চীনের অর্ধেকের অধিক প্রদেশে যখন এইরূপ ব্যবস্থা করা সম্ভব হইবে তখন গণ-পরিষদ আহ্বান করা যাইবে। এই পরিষদ সমগ্র চীনের জ্ঞপ্তি একটি রাষ্ট্র-বিধি প্রণয়ন করিয়া দেশে নিয়মতান্ত্রিক শাসন প্রবর্তন করিবেন।

সান ইয়াং-সেনের মৃত্যুর পর তাঁহার পরিকল্পিত প্রণালীতে কাজ হয় নাই সত্য, কিন্তু তাঁহার নির্দেশ অজুযায়ী কোন কাজই যে হয় নাই এমন কথাও বলা চলে না। এক দিক

হইতে দেখিতে গেলে ডাঃ সান উল্লিখিত প্রথম সোপান অর্থাৎ যুদ্ধের যুগ এখনও অতিক্রান্ত হয় নাই। রণ-নায়কগণের সহিত ক্যুওমিটাং বাহিনীর সংগ্রাম শেষ হইতে না হইতেই ক্যুওমিটাং-কমুনিষ্ট সংঘর্ষ আরম্ভ হইয়া যায়। আবার এই দুই দলের মধ্যে এক্য প্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই গুরু হইল জাপানের বিরুদ্ধে চীনের জীবন-মরণ সংগ্রাম। দীর্ঘ ৯ বৎসরব্যাপী অবিরাম যুদ্ধক্লান্ত ক্ষয়ক্ষতির পূরণ হইতে না হইতেই আবার কমুনিষ্ট-ক্যুওমিটাং বিরোধের আগুন সর্বত্রব্যাপী গৃহযুদ্ধের আকারে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এই জটিল স্বীকার করিতে হয় যে ডাঃ সান-কথিত সংগ্রামের অধ্যায় এখনও শেষ হয় নাই।

কিন্তু তাহা হইলেও দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্তরের কাজ আরম্ভ হয় নাই এমন কথা বলা চলে না। কমুনিষ্ট ক্যুওমিটাং সংঘর্ষের প্রথম পর্ব হইতেই এই দুই বিরোধী দল ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যে চীনের অধিবাসীসমূহকে রাজনীতির দিক হইতে সচেতন এবং সক্রিয় করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে। চীন-জাপান যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে যখন কমুনিষ্ট এবং ক্যুওমিটাং দলের মধ্যে একটা আপোষ রক্ষা হয় (ডিসেম্বর, ১৯৩৬), তখন শাসনযন্ত্রের উপর জনসাধারণের আংশিক কর্তৃত্ব স্বীকৃত হইয়াছিল। এই সময় গঠিত ‘পিপল্‌স্ কাউন্সিলের’ সহায়তায় জনসাধারণকে প্রকৃত প্রস্তাবে না হইলেও নামে শাসন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছিল। সাম্প্রতিক চীন রাষ্ট্রবিধি পূর্ণ-মাত্রায় গণতান্ত্রিক না হইলেও ইহা পূর্ববর্তী যে-কোন যুগে চীনে প্রচলিত শাসন-ব্যবস্থা অপেক্ষা অধিকতর গণতান্ত্রিক তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

ডাঃ সানের চরমপুঞ্জের একটি প্রধান কথা এই যে “The revolution is not yet finished” অর্থাৎ এখনও বিপ্লবের অবসান ঘটে নাই। ১৯২৫ সনের চায় আজ ১৯৪৭ সনেও এই উক্তির সত্যতা অনস্বীকার্য্য। বিগত দ্বাবিংশতি বৎসরে এক দিকে যেমন কোন কোন ক্ষেত্রে চীনের অগ্রগতি হইয়াছে তেমনই আবার কোন কোন ক্ষেত্রে অবনতিও ঘটিয়াছে। সদ্যগত যুদ্ধের ফলে চীন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাহ্যতঃ পূর্বাশ্রয় অধিক পরিমাণে অচ্যুত রাষ্ট্রের সমকক্ষতা লাভ করিলেও বাস্তব ক্ষেত্রে ইহা এখনও সম্পূর্ণভাবে স্বীকৃত হয় নাই। সান ইয়াং-সেনের স্থানীয় শাসনব্যবস্থা সংক্রান্ত পরিকল্পনা চীনের কোন কোন অঞ্চলে রূপ পরিগ্রহ করিলেও অধিকাংশ স্থানে ইহা এখনও কল্পনাই রহিয়া গিয়াছে। তিনি যে ধরনের জাতীয় মহাসম্মেলন আহ্বান করিবার কথা বলিয়াছিলেন আজ পর্য্যন্ত সে প্রকার সম্মেলন আহূত হয় নাই। ১৯৪৬ সনের নবেম্বর মাসে চিয়াং কাই-শেক উল্লিখিত শাসন-ব্যবস্থা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে যে সমিতি আহ্বান করিয়াছিলেন, তাহা জাতির সর্বশ্রেণীর প্রতিনিধিদের দাবি করিতে পারে না। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও সান ইয়াং-সেনের স্বপ্ন আজ পর্য্যন্ত সফল হয় নাই।

মহিলা-সংবাদ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৪৫ সনের এম-বি পরীক্ষায় ত্রীমতী মীনাঙ্কী সেনগুপ্তা যাবতীয় ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। বিভিন্ন বিষয়ে প্রথম হওয়ার দরুন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত সমাবর্তন উৎসবের সময় ইঁহাকে নিম্নলিখিত চারিটি সুবর্ণপদক প্রদান করা হইয়াছে: (১) রায় ডাঃ সরোজকুমার সর্বাধিকারী বাহাদুর সুবর্ণপদক, (২) স্বাভাবিক সম্পর্কিত সুবর্ণপদক, (৩) ডাঃ মহেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলি স্বর্ণপদক ও (৪) রমাপদক। এতদ্ব্যতীত তিনি 'স্বাধীন্য' এবং জনস্বাস্থ্য বিষয়েও 'সার্টিফিকেট অব অনার্স' লাভ করিয়াছেন। পরীক্ষায় ত্রীমতী মীনাঙ্কী যেরূপ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন মেডিক্যাল কলেজের ইতিহাসে তাহা বিরল। সম্রতি তিনি চিত্তরঞ্জন সেবা-সদনে সিনিয়র হাউস সার্জনের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

ডাঃ মীনাঙ্কী সেনগুপ্তা এডভোকেট মিঃ বি. পি. সেনগুপ্তের দ্বিতীয়া কন্যা। ইঁহার মাতা ত্রীযুক্তা সুধমা সেনগুপ্তা এম-এ একজন বিহুযী মহিলা। তিনি লেক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপ্যাল ও সেক্রেটারী।



ডাঃ মীনাঙ্কী সেনগুপ্তা

রূপান্তর

ত্রিবিম্বুপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

ছুটি তারা,—ওরা যুঝেযুঝী আছে দাঁড়িয়ে
নীলিমার পথে ওরা যাবে কি গো হারিয়ে।
কালো দাগ কেটে উড়ে চলে পাখী,
উলটো দোয়াত, কালি মাঝামাঝি,
আকাশে কে বুঝি লেপে দিলে ভূষা
অদেখা হস্ত বাড়িয়ে।
ছুটি হাতে ঢাকে তলতরা চোখ,
ওরা চোবোচোবী দাঁড়িয়ে।
গগনের নীল হারিয়ে যাবে কি এখুনি—
আকাশের মেঘে, কার কাছে বেলে বহুনি।
ছুটি তারা ডাকে অস্ত তারারে,
রঙের কলসী ধালি কি তাড়ারে—
কলে কুলে-কুলে, শাখায় শাখায়,
কালী মাঝামাঝি পাখীর পাখায়,

বলেছে বুঝি সে নামহারা কোন
কালো পাখারের শবুনি—
রক্ত অবরে রং নিভে গেছে
কার কাছে বেলে বহুনি।
কালো ঘোড়া চ'ড়ে ছুটে ছুটে বুঝি আসে এ—
উলটো দোয়াত, দিকে দিকে কালী ঐ ঐ,
পোষাক পরেছে কালো পর্দার,
কালো ঘোড়া চ'ড়ে আসে সর্দার;
কোন তারা ওরা, হার নামহারা
সাজা প'ড়ে গেছে এ পাড়া ও পাড়া—
কালো ঘোড়া চ'ড়ে আসে সর্দার,
অধর ভরা, 'বরা ঐ,
রূপের জলধি উৎলিয়া ওঠে
ভূবনবিজয়ী আসে এ।

সেমসাইড গোল

ত্রিনিদেদ চট্টোপাধ্যায়

আমার যে একটা ভাল নাম আছে, সে আমি কেন, আমার মাতাপিতারও বোধ হয় মনে নেই। ফুটবলের মাঠে, চায়ের দোকানে, আশীষবন্ধু সকলের কাছেই আমি ডাক নামে পরিচিত। ভাল নামটি আমার সেই কোন্ অতীতে একবার ইঙ্কলের খাতায় প্রবেশ করেছিল, তার পর আর একবার কলেজের খাতায়—বাস্, তার পর সেই সীমাবদ্ধ গভী থেকে বেরিয়ে বাইরের মুক্ত বায়ুতে এসে ছাড়াবহা আর কোন দিনই আমার সঙ্গে আমার নামের স্তম্ভ সংযোগ ঘটতে পারে নি। অবশ্য এখন আমি ভাল নামেই পরিচিত, ধবরের কাগজ খুলুন, কোন ডাইবেট্টরী দেখুন, বাড়ীর দেয়ালে মার্বেল-পাথরে খচিত আমার পরিচয়পত্র দেখুন, সর্বত্রই আমি উক্ত অকোমল ডাটু, বামিংহামের পাস করা বিখ্যাত ডাক্তার।

অনেকের ভাল নামের সঙ্গে ডাকনামের একটা সম্বন্ধ থাকে, যেমন সত্যেন ভাল নাম হলে ডাকনাম সাধারণত হয় সহু, গণপতি ভাল নাম হলে গনা বা গহু হতে পারে ডাকনাম। অনেকের আবার নাম নির্ভর করে জন্ম-মুহূর্তের পারিপার্শ্বিক অবস্থার ওপর। পূর্ণিমার রাতে তাঁদের হাসি প্লাবন এনেছে পৃথিবীর বুকে, এমন মুহূর্তে নবজাতকের ভাল নাম পূর্ণশশী এবং ডাকনাম সংক্ষেপে শশী হওয়া বিচিত্র নয়। আবার আবারের আর্দ্র সন্ধ্যায় জন্মগ্রহণ করলে শিশুর বাদলা নামই সাধারণত হয়ে থাকে। আবার অনেকের নামকরণ হয় আকৃতির নৌদাড়ের ওপর, শ্রামবর্ণ নিয়ে জন্মায় যে শিশু তার নাম কালো হতে পারে, জন্মের সময় মাথার চুল না থাকলে ডাক নাম লাড়া হতেও শোনা যায়। আর এক শ্রেণীর নামকরণের বছর দেখে মনে হয় বাঙালী সমস্ত মাতাপিতাই কবি। এক একটা পুত্র যেন তাঁদের কবিতার এক একটা চরণ। প্রথম পুত্রের নাম বীরেন্দ্র হলে, দ্বিতীয়, তৃতীয় পুত্রের নাম যথাক্রমে হীরেন্দ্র, হীরেন্দ্র হতে পারে; কবিতায় লহরী ডাকনামের পাহাড়েও বাধা পায় না, ছন্দ বজায় রেখে ডাকনামের কবিতা গেয়ে চলে বীরু, বীরু, বীরু।

কিন্তু ওপরের কোন করতলাতেই আমার নামের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না, না ভাল নামের, না ডাকনামের। ডাকনাম আমার ভালনামের খলিত অংশবিশেষ তো নশ্বই, এমন কি স্বর্গ ও মর্ত্যেও এত পার্থক্য বোধ করি নেই। ভাল নাম আমার আগেই শুনেছেন, এখন ভাবতে পারেন আমার ডাকনামটা কি হতে পারে? কোনই কলকিনারা পাবেন না ভেবে—ডাকনাম আমার বহু। বহু যদি সব সময় বহুই থাকত তাহলেও হ'ত, মাতাপিতার মনোভাবের তারতম্যের ওপর আবার বহুর প্রকারভেদ ঘটত। লক্ষী ছেলে হয়ে

পড়াশুনা শেষ করে উঠলাম, মা আদর করে ডাকলেন, বটুমণি, ছুধ খাবি আর। ছুধ খাওয়ার পর ছোট বোনটির গালে এক চড় কসিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে সে যদি ডুকরে কেঁদে ওঠে, মায়ের কণ্ঠে বহু তখন হয় বটা।

যাক, যে সময়ের কথা বলছি, তখন আমার ছাড়াবহা। বহু নামেই পরিচিত। মেডিক্যাল কলেজে পড়ি, থাকি হোষ্টেলে। ছেলে ভালই ছিলাম, সত্যি কথা বলতে কি ফুটবলের মাঠে, চায়ের দোকানে, কলেজের লেকচার হলে, সেকেন্ড কখন হই নি। ভারতের ডাক্তারি-শাস্ত্রের সমুদ্র মন্থন করার পর, বিলাতের চিকিৎসা-শাস্ত্রের সমুদ্রেও ডুব দেবার ইচ্ছাটা আমার প্রবল, বাড়ীর অবস্থাও ভাল; পিতা ইচ্ছা করলেই বিলাতে পাঠাতে পারেন, কিন্তু তাঁর বারণা বিলাতের কলেজ শিক্ষার দিক থেকে কলকাতার কলেজ অপেক্ষা কোন অংশেই উন্নত নয়। প্রচুর অর্থ নষ্ট করে এদেশের যাবতীয় কল্যাণকর আচার-ব্যবহার পরিত্যাগ করে ওদেশের নিদারুণ অন্তত দোষগুলি আয়ত্ত করতে যাবার কোনই মানে হয় না। অবশ্য একথাও স্বীকার করেন, ওদেশের ডিগ্রির দাম আছে চাকরির বাজারে, কিন্তু চাকরির প্রয়োজনে আমি ডাক্তারি পড়ছি না, আমার অভিযন্ত নির্ভর করবে নিজের শিক্ষা ও পারদর্শিতার ওপর। বিলাতী ডিগ্রির প্রলেপে চাকরি সুলভ হতে পারে, কিন্তু রোগী আরোপ্য হয় নিজের শিক্ষার হুম্মতার দ্বারা, যা ইচ্ছা থাকলে কলকাতাতেই আয়ত্ত করা সম্ভব। সুতরাং পিতৃ অর্থে যে বিলাত যাওয়া আমার অদৃষ্টে নেই, তা পূর্বদিকে স্বর্ষ ওঠার নির্মম-সত্যের মতই বুঝতে পেরেছিলাম।

বিলাত যাওয়ার রঙীন নেশা কিন্তু কাটে না। চিন্তাতেও আনন্দ। বহুতে জাহাজে উঠলাম, আরব্যোপসাগরের নীল ঢেউয়ের দোলায় ছুঁলছি, দূর থেকে এডেন বন্দরের লাল নীল আলোগুলো হাতছানি দিয়ে ডাকছে, লোহিত সাগরের স্তিমিত স্রোতধারায় তাঁদের জুকোচুরি, অয়েজের ছ'পাড়ের ভাল-বেজুরের তীরভূমি, ভূমধ্যসাগরের তরঙ্গায়িত ফেনিল উচ্ছ্বাস।

যৌবনকালের উচ্ছ্বাস, জাগেও যেমন হঠাৎ, নিবেও যায় তেমনি অন্তর্কিতে। ফ্রেড অবশ্য বলেন, নিবে সে যায় না, জাগ্রত চেতনা থেকে বিদায় নিয়ে চলে যায় মনের অপর এক কুঠিরিতে, ঝিমিয়ে থাকে সেখানে, মাকে মাকে উঁকিরুঁকিও মারে, লাকিয়ে আবার বেরিয়ে আসে অযোগ্য পেলেই।

যাই হোক, বিলাত যাওয়া হবে না এইটাই ধরে নিয়েছিলাম। আর এক চিন্তায় সময় কাটাবার অযোগ্য বা কোথায় বহু দণ্ডের। ফুটবল মাঠে বহু দণ্ড না হলে ইঙ্গিত

শীত বিদ্যাসাগর কলেজেরই মেয়ে নেবার সভাবনা। আমার খেলার তারিক সকলেই করে, তবে অ্যানাটমির বৃত্ত প্রফেসর জানবাবু ক্লাসে একবার যা বলেছিলেন, তা ক্লাসিক হয়ে আছে। আগের দিন বিদ্যাসাগর কলেজকে তিন গোলে হারিয়ে ইলিয়ট শীত পেয়েছি আমরা, তিনটি গোলেই করে-ছিলাম আমি। ক্লাসে খেলার কথাই ছিল, জানবাবু বললেন, খেলে তো বই দত্ত, স্কোর করতে করতে বল নিয়ে যায়। সেই থেকে ফুটবলের কথা উঠলেই সকলে বলত, বটুর সঙ্গে চাপাকি নয়, স্কোর করতে করতে বল নিয়ে যায়।

চায়ের দোকানের আড্ডা—বই দত্ত না হলে গরম চা-ও আসির গরম করতে পারে না। এই চায়ের দোকান থেকেই আদর্শ শব্দের স্রুত। রবিবারের সকাল, পূর্ব রাত্রে নাইট-ডিউটি ছেড়ে ঘুম ভেঙেছে বেলায়, দেবি করেই এসেছি দোকানে। দেবি চায়ের হাট আগে থেকেই বলে গেছে নিশীথই প্রধান বক্তা, এক হাতে একটা সিগারেট, তখনও ধরানো হয় নি, আর এক হাতে একটা চিঠি, মুখ চলছে অনর্গল। সকলকে উদ্দেশ্য করে হলেও সমরেশের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রেখে বলছে, তুই একটা লিষ্ট করে ফেল, কে কে যাবে, উত্তরপাড়া তো হাতের কাছেই, সন্ধ্যাবেলা গিয়ে রাজেই ফেরা যাবে।—সমরেশের হাতের লেখা ভাল, লেখার ভার তার ওপরেই পড়ে। তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই, কিন্তু ভেবে পেলাম না, এমন কি ঘটল যাতে লিষ্ট তৈরি করতে হবে, উত্তরপাড়া সন্ধ্যাবেলা গিয়ে আবার রাজেই ফিরে আসতে হবে। আর এত কার্যগা থাকতে উত্তরপাড়াই বা কেন? সকলেই ঘটনার আকস্মিকতায় বা অভিনবত্বে এতই বিভোর যে, বই দত্তের আগমনও যেন লক্ষ্য করবার মত নয়।

হোটেল থেকে চায়ের দোকানে আসতে পথের মাঝেই স্লিপারের একটা ট্র্যাপ-বিশ্বাসঘাতকতা করায় পায়ের বুড়ো আঙুল আর তার পাশের আঙুল দিয়ে সাঁড়াশি বা তৈরি করে অপর ট্র্যাপটাকে কোন রকমে কায়দা করে ধরে আমাকে একটু আলগা ভাবে খুঁড়িয়ে চলতে হচ্ছিল। সেই অবস্থায় চায়ের দোকানে ঢুকে, অমির পাশের বালি চেয়ারটা দখল করে বসে চায়ের অর্ডার দিলাম। নিশীথ ততক্ষণে হাতের সিগারেটটা ধরিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বলে চলছে, প্রজেক্ট কিনতে সকলের যাওয়ার দরকার নেই, টাকা দিয়ে দাও, শরৎ-দা আর বই দত্ত বেঙ্গল টোয় থেকে কিনে নিয়ে আসুক। আর রবীন যেন ডিউটি-সুপারিন্টেন্ডেন্টের সঙ্গে দেখা করে রাজের ডিউটি থেকে আমাদের—আমি চায়ে চুপু দিয়ে নিশীথের কথার মাঝখানে আবৃত্তি করার ভঙ্গীতে বলে উঠলাম—“আর কত দূরে নিয়ে যাবে যোরে হে হৃন্দরি, বল কোন পাবে তিড়িবে ভোমার সোনার তরী”—তার পর আবৃত্তির ভাষ্য করে বললাম, আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না, লিষ্ট, উত্তরপাড়া যাওয়া, ফিরে আসা, প্রজেক্ট, বেঙ্গল টোয়—আর

কত দূরে নিয়ে যাবে বল!—এতক্ষণে যেন সভার আর সকলের চোখ পড়ল আমার ওপর।

শরৎ-দা বেঙ্গল টোয়ে প্রজেক্ট কিনতে যাওয়ার পার্টনার। মেডিক্যাল কলেজে ঢুকেছে সেই দূর অতীতের কোন এক শুভ প্রভাতে, সে প্রভাতের সন্ধ্যা তার জীবনে আর এসে না। বৈষ্ণব অকুরন্ত হিমাচল শরৎ-দা। জ্যৈ, পুজ, কড়া নিয়ে কলকাতাভেই বাস করেন। পিতাও ডাক্তার, বেশ বড় ডাক্তার, নামডাক আছে। পিতার ইচ্ছা বাড়ী, গাড়ি, অর্থ-সম্পত্তি উত্তরাধিকারসূত্রে পুত্রকে ডাক্তারিবিজ্ঞানও কায়দা করে দিয়ে যান। শরৎ-দা কিন্তু বলে, রাজার ছেলে রাজা হয়, তা সে মুখ হোক, রোগা হোক, অসুস্থ হোক; রাজকার্য্য চালানো বিজ্ঞান পাসই করুক আর ফেলই করুক। যত গোলমাল ডাক্তারের ছেলের বেলায়। রাজপুত্র যে সূত্রে রাজা হবে, ডাক্তারপুত্রও সেই সূত্রে ডাক্তার হবার অধিকারী। যদি বলা হয়, ডাক্তারের হাতে নির্ভর করে লোকের জীবন, স্মরণ্য এ শাস্ত্র ঠিকমত না শিখলে ভোমার লোকের জীবন নিয়ে খেলা করতে দেবে কেন, তার উত্তরও শরৎ-দার তৈরি—বলে, রাজার হাতেও তো রাজ্যের লোকের জীবন নির্ভর করে, আমরা এক একটা ডাক্তার জীবনে আর কত লোককেই বা পরপারে পাঠাতে পারি, কিন্তু ভাব দেবি এক-বার রাজার কথা, তাঁর ডায়াগনোসিসের ভুলে রাজ্যসূত্র লোক যে পরপারে যেতে পারে, এবং গিয়েছেও কতবার।—এই হল শরৎ-দার সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

শরৎ-দা আমার আবৃত্তির উত্তর দিলে একটি গানের কয়েকটি চরণ আবৃত্তি করে, ‘বন্ধু হে চল চল, মিলিত প্রাণের উৎসবে, প্রিয় পুষ্পের ধন সৌরভে, নিবিল দিনের সামগানে, বন্ধু হে চল চল।’ আবৃত্তি শেষ করে আমার দিকে তাকিয়ে বললে, মিলিত প্রাণের উৎসব উত্তরপাড়ায়। একটি প্রাণ নিখিলের, অপর প্রাণ গীতারঙ্গীর, এইমাত্র চিঠি এসেছে নিশীথের কাছে।

আঙুলের সাঁড়াশির মধ্যে স্লিপারটিকে কায়দা করতে করতে শরৎ-দার পাশে গিয়ে বসে বললাম, তা উত্তরপাড়ার কেন, নিখিলের যাতায়াত তো ছিল বালীগঞ্জে দক্ষিণ পাড়ার দিকে।

শরৎ-দা হিউমার ছাড়া কথা বলে না, এক মিনিট ভেবে বললে, তুমিও তো প্রথমে উত্তরপাড়ার গোল আগলে দক্ষিণ-দিকের গোলে স্কোর করতে করতে বল নিয়ে যাও। কিন্তু হাকটাইমের পর দক্ষিণ পাড়া ত্যাগ করে উত্তরপাড়ার দিকে যাওয়া কর কেন? নিখিলেরও তাই, দক্ষিণ পাড়া হাকটাইমের আগে, এখন লক্ষ্য উত্তরপাড়ার গোল।

আমার আজ সকালের আবৃত্তি ঐ ট্র্যাপ-হেঁড়া স্লিপার পায়ের নীচে থেকে কখন দূরে সরে গেছে, সাঁড়াশির মধ্যে ওটাকে বাগ মানাবার চেষ্টা করতে করতে অজমনক ভাবে বলে উঠলাম, সে তো বিপক্ষকে বিবর্ত করবার জুড়ে। মুখের

কথা কেড়ে নিয়ে শরৎ-দা বললে, নিখিলও কিছু বিপক্ষে আস্ত রাখবে না, শুধু বিধ্বস্ত কেন, তাকে সন্তুষ্ট করে ছাড়বে, গেলের মালা পরিয়ে দেবে দেখে নিও। হাসির ধুম পড়ে গেল। একটু থেমে আবার বললে, বন্ধু নিখিল আবার উত্তরপাড়ার পর পশ্চিম পাড়া যাত্রা করবেন, টাকা দেবেন গৌরী সেন।

আবার সমস্ত অবস্থাটা হৃদযোজ্য হয়ে উঠল, পশ্চিম পাড়া আবার কোথায়, তাতে টাকারই বা প্রয়োজন কিদের, আর গৌরী সেনই বা কে? আমি বললাম, নাঃ, আজ দেরি করে আসার সব বিষয়েই আমার পরাজয়, হৈয়ালির পর হৈয়ালি!

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে শরৎ-দার বোধ হয় একটু মায়া হ'ল, চায়ে চুপ করে বসলে, নিখিল এবার এখানকার পাঠ সাক্ষ্য করে নরমের-যজ্ঞের বিলাতী উপায় শিখতে যাচ্ছেন, রসদ যোগাবেন লিগ্যাল-ফাদার, ফাদার-ইন-ল।

নিখিলের বিলাত যাওয়ার কথায় ক্রয়েডের মতে অল্প কুঠুরিতে অল্প আমার বিলাত যাওয়ার কল্পনা তড়িৎবেগে একটা অস্বস্তিকর প্রেরণ আকারে আমার জাগ্রত মনের পর্দায় কুটে উঠল। নিখিলের পক্ষে বা সম্ভব হ'ল, তা কি আমার হয় না? কিন্তু সে নেহাতই ফণিকের ভরে, চায়ের দোকানে চাঁদের ছাট এমন কল্পনার পরিপোষক নয়, তাই যুহুর্ন্তেই আবার ভলিয়ে গেলাম ছেঁড়া শ্লিপারের বিরক্তিকর অস্বস্তির ভিতর।

নিখিলের বিয়ে হয়ে গেছে। তার বিলাত যাওয়ার সম্ভাবনাকে ধরে আমার মনের যে অল্প বাসনা প্রেরণ আকারে মনের ছয়রে একবার উঁকি দিয়ে চায়ের দোকানের প্রতিফল আবহাওয়ায় মিলিয়ে গিয়েছিল, সেই প্রেরণ উত্তরে নিখিলের কাছে এইটুকু তথ্য সংগ্রহ করতে পারলাম যে, ধবরের কাগজের পাত্রপাত্রীর বিজ্ঞাপনের তালিকার মধ্যে গীতারাগীর পিতার মত অর্ধেক রাজত্বসম্মত রাজকুমার প্রদানকারী পিতার সন্ধান মিলতে পারে। বিলাত কত দিনের স্বপ্ন আমার, সে কি শুধু স্বপ্নই থেকে যাবে।

ধবরের কাগজ লোকে পড়ে ধবরের জন্মে, আমি পড়তে লাগলাম পাত্র-পাত্রীর তালিকা। ভগবানের রূপায় তিন-চার দিনের মধ্যেই উপযুক্ত এক কন্ডার পিতার সন্ধানও মিলে গেল। কন্ডার পিতা চান কার্যস্থ ডাক্তার অথবা ইঞ্জিনিয়ার পাত্র—মনোনীত হলে নিজ খরচে বিলাত পাঠাবেন। এ যেন আমাকে লক্ষ্য করেই শরৎসন্ধান। তবে ঠিকানা দেওয়া নেই, চিঠি দিতে হবে পোষ্ট-বক্স নম্বরে।

শরৎ-দার সঙ্গে একবার আলোচনা করতে হবে। একে তো এত বড় ব্যাপারে অভিযান পিতার মত না নিয়ে, এমন কি তাঁকে গোপন ক'রে। গোপন অবস্থা থাকবে না তিনি জানবেনই, তবে সে একেবারে একাদশ খটিকার, যখন মত তাঁকে দিতেই হবে। আর মত না দেবারই বা কি আছে, পুত্রের বিবাহে তাঁর আপত্তি নেই, বরং বিয়ে করার অহুযোগ ইতিমধ্যেই

হু-চার বার মার দিক থেকে এসেছে, আমিই হেসে উড়িয়ে দিয়েছি। বিলাত যাওয়াতেও পিতার সেরকম আপত্তি নেই, আপত্তি তাঁর নিজের অর্থ নষ্ট করে বিলাত যাওয়া, স্তত্রাং যে অর্থ বিলাত পমনে নষ্ট হবে, তা যদি তাঁর বৈবাহিকের হয়, তা হলে তিনি আপত্তি করবেন কেন?

শরৎ-দার বাড়ী গেলাম। যেমন শরৎ-দা তেমনি তাঁর জী, হুঁজনেই সমান। তিন জনে পরামর্শ করা গেল। বউদি উর্মিলাকে শরণ করে বললেন, বিলাত তো যাবে, কিন্তু স্নানযুগী সেই তরুণী যিনি একবার মাত্র তোমার জীবনে উদ্ভিত হয়ে মাদুলিক রচনা ক'রে চোখের জলে পরদিন তোমাকে জাসিয়ে দেবেন। সাগর-দোলার বিলাতের পথে, তারপর কোথায় তার উদয়চল আর কোথায় অন্ত্যচল সে কথা ভুলে যাবে না তো?

আমি হেসে কাব্যের স্বর বজায় রেখেই বললাম, বাব্বীকির হাতে উপেক্ষিতা হয়ে যেটুকু হুঃখ উর্মিলার ছিল, রবীন্দ্রনাথের করম্পর্শে তা বোধ হয় আর নেই। বাব্বীকির উপেক্ষা না পেলে রবীন্দ্রনাথের লেখনীস্পর্শের গর্ব তার থাকত কোথায়? আমার উর্মিলা উপেক্ষিতা হয়ে রবীন্দ্রের আশীর্বাদ না পেলেও শরৎ চঞ্জের কমণ্ডলুর বারিসিকনও কি পাবে না—বলে হেসে শরৎ-দার দিকে তাকালাম।

এত কাব্য আলোচনার মাঝে চূপ করে থাকতে শরৎ-দার কষ্টই হচ্ছিল, এতক্ষণে কথা বলবার অবকাশ পেয়ে যেন বেঁচে গেল, বললে, শরৎ চঞ্জ ও সব কাব্যের উপেক্ষিতার ধার ধারে না, সমাজের উপেক্ষিতা, পরিত্যক্তা, এদের ওপরই আমার দরদ বেশী। তোমার উনি যদি উর্মিলা না হয়ে সাবিত্রী হয় তো চেষ্টা করতে পারি।

আমি কৃত্রিম কোপ দেখিয়ে বউদিকে মধ্যস্থ মেনে বললাম, দেখছেন বউদি, ভদ্র-কন্ডাকে উনি সাবিত্রী বানাচ্ছেন। বউদিও উত্তর নিয়ে প্রস্তুত, বললেন, সাবিত্রীও তো ভদ্রকন্ডা ছিল বলেই মনে হয়, তবে সত্যবান ডাক্তারী পড়তে বিলাত পিয়েছিল কিনা জানি না।

বললাম, বউদি, আমি পরাজিত, এখন আমার কার্ণো-ডায়ের উপায় ঠিক করে বাতলে দিন, নাইট ডিউটি আছে, উঠতে হবে এবার।

বউদির মতে ঠিক হ'ল পাত্রীর পিতার নিকট চিঠি আমিই লিখব, তবে ঠিকানা থাকবে শরৎ-দার। কারণ, হঠাৎ যদি আমার উর্মিলা বা সাবিত্রীর পিতা যথারীতি পাত্র দেখে ব্যবস্থা করতে আমার ঠিকানা অহুযারী সোজা ছোট্টেলে এসে ওঠেন, সেটা আমার পক্ষে অস্বস্তিকর হয়ে উঠতে পারে। চিঠিতে তাঁকে গোপনও করা হবে না কিছু, শুধু একটা মাত্র অহুরোধ থাকবে, আমার পিতার সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা—পাত্র দেখার পর তাঁর পছন্দ যদি হয়, তখন হবে, তার আপেক্ষ নয়।

ভগবানের নাম করে শরৎ-দার ঠিকানা দিয়ে চিঠি দিলাম

ছেড়ে। বহুদিন পরে ভাল নামটা ব্যবহার করবার সুযোগ ঘটল। চিঠি দেওয়ার পর শুরু হ'ল আশা-বিরোধের দ্বন্দ্ব। প্রথমে মনে হয়েছিল, বিলাত যাওয়া সুখি হয়েই গেল, কয়েক সপ্তাহের বাপার মাঝ। কিন্তু যতই দিন যায় আশার আলোক ক্ষেমেই ক্ষীণতর হয়ে আসে। এমন কি, বিলাত যাওয়ার রঙীন কল্পনা মনের পর্দায় আবার যেন ঝাপসা হয়ে এল।

আশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছি, এমন সময় একদিন শরৎ-দা এসে হাসতে হাসতে বললে, একটুটা টাইমে হলেও, ফার্ট-রাউণ্ডে জিত। এই দেখ চিঠি, বলে একবারা খাম আমার হাতে দিলে। চিঠি এসেছে দিল্লী থেকে, ভদ্রলোক সেখানে রেলওয়ের বড় অফিসার, লিখেছেন, কতটা তাঁর শিক্ষিতা, সুন্দরী কিনা সে বিচার পাত্রের ওপর, পাত্র মনোনীত হলে অর্থব্যয় করতে কার্পণ্য নেই। শীঘ্রই কলকাতা আসবেন, পাত্র দেখবেন, অত্যাধ বিষয়েও বিবেচনা করবেন। আরও দু-একটি উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান কলকাতায় পেয়েছেন, তাদেরও দেখবেন—সংক্ষিপ্ত চিঠি।

আরও ক'দিন পরে। বোধ হয় মেডিসিনের ক্লাস। আমার সবাই হাঁ ক'রে ভয়ভক্তত্বের কথা শুনেছি, এমন সময় ডাক এল শরৎ-দার, ফোন এসেছে। ফোন শুনে, শরৎ-দা ফিরে এসে গ্যালারিতে আমার পাশে বসে বললে, সেই ভদ্রলোক দিল্লী থেকে এসেছেন, আমার মিসেস এখনি ফোনে বললে। আদর-আপ্যায়নের কোন ক্ষতি হয় নি, ক্রীমতীকে তো জানিসই, সব স্তূর্ভভাবে পালন করেছে, আমাকে যেতে বলেছে এখনি। আমি ভদ্রলোককে নিয়ে ঠিক পাঁচটার সময় তাঁর ওখানে আসব। ঘরটা শুষ্কিয়ে রাখিস, বড় নাকি সাহেব আবার, বিলাত স্কেরত।—প্রিন্সিপ্যালের কাছে সেদিনকার মত ছুটি নিয়ে শরৎ-দা চলে গেল বাড়ী, আমি হোষ্টেলে।...

ঘরের এক অবস্থা। টেবিলের উপর ছোট্ট জুম্বর ক্যাণ্ডেলারে এপ্রিলের তিন তারিখের পর আর হাত পড়ে নি যদিও সেদিন জুন মাসের মাঝামাঝি। ময়লা তোয়ালের সঙ্গে কোলাহুলি ক'রে অন্তত শরীরের পনরটা বিভিন্ন অংশের পরিধেয় বস্ত্র, আলনায নয়, চেয়ারেও নয়, বিছানায় শায়িত। যেভাবে বইগুলো ধাকা উচিত নয়, ঠিক সেই ভাবেই রয়েছে; কতক বিছানায়, কতক টেবিলে, কতক চেয়ারে, এমন কি টেবিলের তলায়ও দু-একটা। জুতো আর গ্লিপারের রাশি ছড়িয়ে আছে ঘরের সর্বত্র, কেউই আপন আপন স্থান মূল্যবোধে নয়। সে যেন এক বৈরাচারের রাজত্ব—গ্রিসিয়ান গ্লিপার কেডসের আলিঙ্গনে, অলফোর্ড স্যু-এর একপাটি জড়িয়ে রয়েছে অ্যালবার্টের আর এক পাটিকে। এহেন ঘরকে পরিষ্কার করতে হবে। একবার ভাবলাম, বিলাত গিয়ে দরকার নেই, বরঞ্চ শুয়ে খানিকক্ষণ বিশ্রাম করা যাক। কিন্তু তা হয় না, উঠে লেগে গেলাম কাজে অশুভ হাতে যতটা সম্ভব ঘরখানার সংস্কার করলাম।

পরে নিজেই অবাক হয়ে গেলাম ঘরের পরিপাটি মূর্তি দেখে, দেখালে টাঙানো নরকফালটা পর্যন্ত ভদ্র দেখাচ্ছে।

নমস্কার মেয়েদের। কোমল শরীরের মধ্যে এত কঠিন শক্ত মন থাকে কি ক'রে; অবলীলাক্রমে রূপ আর গুণের পরিচয় দিতে বসে কুতূহলী পুরুষের চোখের সামনে। পাঁচটার সময় শরৎ-দা আসবে দিল্লীর সেই সাহেবকে নিয়ে, রূপের পরীক্ষা দিতে হবে না, চুল বুকে চুলের বহনও দেখাতে হবে না, হাত ঘষে পাউডার ভুলে প্রকৃত বর্ণের পরিচয়ও দিতে হবে না, ভবু আমার অবস্থা সঙ্গীন, করুণ।

ছয়ারে শব্দ হ'ল। যুখে পাইপ, হাতে ভার্জিনিয়া টোবাকোর টিন, পরনে সাহেবী হ্যাট, শরৎ-দার সঙ্গে প্রবেশ করলেন লিলির পিতা, আমার পিসেমশাই। তবে কি—! হঠাৎ আসা কালবৈশাখীর বড়ের মত কি যেন আমার সমস্ত মনটাকে প্রচণ্ড নাড়া দিয়ে গেল, সমস্ত পৃথিবীটাকে, সীমাহীন একটা অন্ধকার এঁস করতে আসছে আর সেই সর্বগ্রাসী অন্ধকারের মধ্যে অসহায় আমি ভেসে চলেছি। মণিরত্ন পাবার নিশ্চিত আশা নিয়ে হাত বাড়িয়ে হাতে যেন লাগল সাপের শীতল পিছল স্পর্শ। লম্বুখে হাড়িরে পিসেমশাই, পাত্র দেখতে এসেছেন—আমাকে। পাতাল-প্রবেশের পূর্বে সীতার মানসিক অবস্থা এর চেয়ে খারাপ হয়েছিল কি না জানি না।

পিসেমশাই ঘরের মধ্যে সুকোমলকে না পেয়ে তার জায়গায় আমাকে বসে থাকতে দেখে একটু অবাক হলেন। আমার দিকে চেয়ে বললেন, হ্যালো বটু, ইউ আর হিয়ার।—আমার উত্তর দেবার মত অবস্থা নয়। শরৎ-দাও অবাক, কতটা পিতা বটুকে আগে থেকে চিনলেন কি করে? পিসেমশাই একটা চেয়ার টেনে বসে শরৎ-দাকে আরও বিস্মিত করে জিজ্ঞাসা করলেন, সুকোমল কোথায়, আই মিন, পাত্র? তারপর আমার দিকে তাকিয়ে আবার বলতে লাগলেন, হ' বহর পর দেশে এলাম, তুই ত বেশ বড় হয়েছিস। চিঠি-পত্রও লেখা হয় না, রওয়ালপিভি থেকে যে দিল্লী বদলী হয়েছি সে খবরটাও তোদের দেওয়া হয় নি। এবার ঠিক করেছি, বাংলাদেশে যখন এসেছি, সব দেখাশুনা করে তবে যাব। তাঁর পিসিমা, লিলি, এরাও এসেছে।

পিসেমশাই কি বকে যাচ্ছেন, তার একটা বর্ণও আমার কানে প্রবেশ করছে না, তাঁর কথা বলার এক অসত্যক মুহূর্তের সুযোগ নিয়ে শুধু ইসারায় নিজের ঠোটে আঙুল রেখে শরৎদাকে কথা বলতে বাধ্য করে দিয়েছি। শরৎ-দা সব কিছু পরিষ্কার বুঝতে না পারলেও, কোথাও যে একটা গোল-মাল রয়েছে তা বুঝে নিয়েছে। ভগবান বাঁচিয়েছেন ভাল নামটার আমার ব্যবহার হয় না। পিসেমশাই চুপ করতাই, শরৎ-দা কিছু বলার আগেই আমি বলে উঠলাম, সুকোমল এই ঘরেই থাকে, কলেজ থেকে ফিরে এক টেলিগ্রাম পায়,

বাঁবার অশ্রু, এই চারটের ট্রেনে দেশে চলে গেছে। আপনি আসবেন, তাই আমাকে তার হয়ে রেখে গেছে এখানে— বলে করুণ মিনতিভরা চোখে শরৎ-দার দিকে তাকালাম। পিসেমশাই বললেন, পুরো চ্যাপ, বাট হাইলি ইন অসুপিসাস্ ফর নিগোসিয়েসন্স টু ট্রাট (বেচারি, তবে বিশ্বের কথা-বার্তার স্বরূপেই এটা অন্তত)।

শরৎ-দা এতক্ষণে যুগ খুলবার অবসর পেলে, পিসেমশাইয়ের দিকে তাকিয়ে বললে, আপনি বটুকে চেনেন নাকি ? পাইপটা

ভাল করে টেনে পিসেমশাই হিউমার করে বললেন, চিনি না, এ যে আমার শালার ছেলে। শরৎ-দা এবং পিসেমশাই হো হো করে হেসে উঠলেন। অতি সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতেও তরল করতে শরৎ-দার তুলনা নেই, শরৎ-দার কৃপায় সে যাত্রা মানরক্ষা হ'ল। শুধু পিসেমশাই যখন নিবে যাওয়া পাইপটা ধরাতে ব্যস্ত, সেই সুযোগে একবার চুপি চুপি আমার বললে, শেষে সেমসাইড পোল।

কে বাঁশী বাজায়

শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ চন্দ্র

ডাকিছে নিকট শোনো ডাকিছে সূর্য,
প্রিয় বাঁধে বাছ-ডোরে, অজানা বঁধু
উদাত্ত আহ্বান আসে সীমাহীন স্রোতে
সীমাহারা আকাশের তট-প্রান্ত হতে
নিভৃত অন্তরে। চকিতে ফিরিয়া চাই।
ডাকিল যে সে কি হেথা আছে কি নাহি।
স্বপ্ন যেন, মোহ যেন, যেন কিছু নয়।
তবু যেন তার চেয়ে বড় পরিচয়
বিকশিতা ওঠে নিত্য প্রভাত-সমীরে,
উষার উদয়-তটে, রজনী-তিমিরে,
শিখরের শীর্ষে শীর্ষে, সমুদ্র বেলায়,
বিচিত্র আকাশ-বক্ষে মেঘের লীলায়,
কুসুমিত কাননের পল্লবে পল্লবে,
পাপিয়ার কল-কণ্ঠে পিক-কলরবে।
কামনার উদ্বেলিত শ্রান্ত স্বপ্নের
নিমীলিত আঁধি-পাতে স্বপ্ন পরশের
কমনীয় স্পর্শটুকু যেন ছুঁয়ে যায়
সুখাতীত স্বপ্নে ভরা স্বপ্ন-বেলায়।
ভুনেছি আহ্বান। অজ্ঞাত পুলিনে বসি'
কে বাঁশী বাজায়। তাই ছোটো রবি শশী
গ্রহ উপগ্রহ আর ছুটে যায় তারা,
উন্মত্ত পৃথিবী ছোটো শ্রান্তি-ক্লান্তিহারা।
অই যে ধূসর বালু, ভ্রান্ত মরীচিকা,
হৃৎধরে নিবিড় করি' আসে কুজটিকা,
উন্মাদ পবন আসে ছুঁনিবার বেগে
ব্রজ-অগ্নি গর্ভে নিয়ে ঘন নীল মেঘে,

সেও শোনো সে আহ্বান উদাত্ত গম্ভীর।
তাই এ বিপুল বিধে কেহ নহে স্থির।
পাষণ কারায় রক্ত নির্যয়ের কানে,
মাটির আড়ালে লুপ্ত স্তম্ভ বীজ-প্রাণে,
পশে সে আহ্বান। তাই পাষণ পঙ্কর
খুলে দেয় রক্ত দ্বার, মাটির অন্তর
স্নেহেতে সরস হয়ে মুকুলের ডাকে।
পত্রে পুষ্পে ফলে ফুলে ছড়াইতে থাকে
চিরন্তন সে আহ্বান। পথের ধূলয়
প্রতিধ্বনি পদচিহ্ন একে রেখে যায়
অযত্ন-বর্জিত গুল্মে লতার ও তুণে,
খরা পত্রে ঢাকি পথ রাজি আর দিনে।
যারা আসে তারা যায়, কেহ নাহি জানে
কোন লোকাতীত লোকে অমৃত-সন্ধানে।
কবে যাত্রা হ'ল সুরু—সে এক বিশ্বয়।
কবে যাত্রা হবে শেষ, তার পরিচয়
কেহ নাহি জানে। শুধু শুনি সে আহ্বান—
বাঁধে প্রেমে, আর গাছে বৈরাগ্যের গান।
তাই যারা এসেছিল, যারা আসে নাই,
এখানে পেয়েছে যারা ক্ষণেকের ঠাই,
যারা আপনার, আর যারা কেহ নয়,
চিনি যাহাদের, যে অজ্ঞাত পরিচয়,
সকলের সাপে তুমি বাঁধিলে যে মোরে
বাণীশূন্য সীমাহীন আহ্বানের ডোরে।

যানবাহন ও চলাচল ব্যবস্থায় অরাজকতা

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

বিভিন্ন দেশের উৎপন্ন দ্রব্যাদি যাহাতে সুষ্ঠুভাবে খাদকগণের (consumers) নিকট পৌঁছায় তাহার উপযুক্ত বন্দোবস্ত থাকার প্রয়োজন। এক্ষণে উৎপাদক ও খাদকের উভয়ের স্বার্থের জন্য উন্নত যানবাহন চলাচল-ব্যবস্থা বাঞ্ছনীয়। ইহাতে বাধা হইলেই ক্ষতি। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও চলাচল নিয়ন্ত্রণকারিগণ লাভের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কাজ করেন, সাধারণের স্বার্থ তাঁহাদের কাম্য নহে।

চলাচল যাহাতে সুষ্ঠু ভাবে হয় এবং যাহাতে কোনরূপ অপচয় বা অসুবিধা না হয় এক্ষণে জল, স্থল ও আকাশ যানের চলাচল সম্পর্কে পারস্পরিক সহযোগিতার প্রয়োজন। কিন্তু তাহা না হইয়া পরস্পর প্রতিযোগিতার দরুন প্রতিপদেই অপচয় লাগিয়াই আছে। বিভিন্ন গবর্ণমেন্টের সাহায্যে জাহাজ কোম্পানীগুলি খোলাখুলিভাবে অপব্যয়ের প্রতিযোগিতা চালাইতেছে। নদী ও খালের জলযানগুলি রেলের সঙ্গে অথবা বিজ্ঞানের মধ্যে এবং কখনও কখনও স্থলপথের যানবাহনের সহিত প্রতিযোগিতা চালাইতেছে। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন দেশের মধ্যেও আকাশযানের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা শুরু হইয়াছে।

আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আশ্রয় জাহাজের প্রয়োজন সর্বাপেক্ষা বেশী। কৃষি ও শিল্পে কোন ভুখণ্ড উন্নত হইলে স্থলপথের উন্নতি সাধন করিয়া উহাকে নিকটবর্তী সামুদ্রিক বন্দরের সহিত যোগ করিয়া দেওয়া হয় এবং সেখান হইতে বড় বড় জাহাজে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে বাণিজ্য চলে।

আজ পৃথিবীর সপ্ত সমুদ্র অর্ধবৃত্তে ছাইয়া গিয়াছে। কিন্তু আন্তর্জাতিকভাবে কোণার সকলে সহযোগিতা দ্বারা অপব্যয় কমাইবে, না তাহার বদলে বিভিন্ন রাষ্ট্রসমূহ বহু অনাবশ্যক জাহাজ চাণু রাখিয়াছে। আন্তর্জাতিকতার দিক দিয়া এই নীতি একটি গুরুতর অপরাধ এবং করাসীদেশ এই বিষয়ে বড় অপরাধী। লৌহ-শিল্পকে সাহায্য দিবার জন্যই জাহাজ নির্মাণ ও জাহাজ চলাচলে সরকারী সাহায্য দেওয়া হয়। এই উদ্দেশ্যে রাজকোষ হইতে জাহাজের মালিকগণকে অর্থ দেওয়া হয়, অথচ গবর্ণমেন্ট ইহার বদলে কিছুই পান না।

এইরূপ অর্থ সাহায্যের পরিমাণ ক্রমে বাড়িয়া বাড়িয়া বর্তমানে অসম্ভব বকম ক্ষতি লাভ করিয়াছে এবং শেষে ঐ সাহায্য বন্ধ করিয়া দিতে হইয়াছে। সাহায্য আবার নূতন ভাবে শুরু হইল ডাক বহিবার জন্য জাহাজ কোম্পানীগুলিকে—বিশেষতঃ মাদাগাস্কার, সোমালীল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া এবং নিউ কেলিডোনিয়া প্রভৃতি দেশের জন্য

প্রচুর অর্থসাহায্য দেওয়া হইল। এই সকল স্থানের মেল চলাচল কার্যের জন্য অসম্ভবরকম বেশী অর্থসাহায্য দেওয়া হইত। ভৌগোলিক অবস্থান ও আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করিলে করাসী দেশের পক্ষে বিরাট নৌবহর অনাবশ্যক। করাসী দেশ নিজের খাজ নিজেই উৎপাদন করে আর বাহির হইতে কাঁচা মালের আমদানীর আবশ্যকতাও তাহার কম।

ইটালীও স্বীয় স্বার্থের প্রয়োজনে বহু অর্থ অপব্যয় করিয়া বিরাট নৌবহর পোষণ করিত। বিদেশের বাণিজ্যক্ষেত্রের সহিত স্বদেশের ও আফ্রিকায়িত উপনিবেশের সহিত যোগাযোগ রাখিবার জন্য ইটালীকে বহু অর্থ ব্যয় করিতে হইত।

প্রশান্ত মহাসাগরের নৌবহরের কথা আলোচনা করিলে দেখা যায় যে ১৮৯৬ হইতে ১৮৯৯ সন পর্যন্ত এই চারি বৎসরে জাপান জাহাজ নির্মাণ, জাহাজ চলাচল ও ডাক বহনের জন্য ছয় গুণ খরচ বাড়াইয়াছিল। কেবলমাত্র লাভের আশাতেই জাহাজী ব্যবসা বাড়িয়া চলিয়াছিল। প্রতিযোগিতার ফলে মালের হাঙলও খুব কমিয়া গেল এবং জাহাজ কোম্পানীগুলির ঘণ্টে লোকসান হইতে লাগিল। পরে যখন জাহাজ তৈরির উপরে সরকারী সাহায্য বন্ধ করা হইল, তখনও পরোক্ষভাবে জাহাজে ব্যবহৃত ইল্পাতনির্মিত দ্রব্যাদি সরকারী সাহায্য পাইত। এইরূপে সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত জাহাজ কোম্পানীগুলি পরস্পরের সহিত ও বিদেশী বাণিজ্য-জাহাজের সহিত প্রতিযোগিতা করিত। এইরূপ ব্যবস্থা থাকার দরুন অল্পদিনের মধ্যেই জাপান সমুদ্রে পৃথিবীর তৃতীয় শক্তিরূপে প্রাধান্য লাভ করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জাপানের নৌশক্তি পঙ্খ হইয়া গিয়াছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও প্রশান্ত মহাসাগরে ঐ একই পন্থা ধরিয়াছে। ইহারই ফলে আমেরিকার জাহাজ-ব্যবসা ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছিল। বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে পর্যন্ত আমেরিকা এই নীতি অমুযায়ী বহু বাণিজ্য জাহাজ তৈয়ারি করিয়া নিজের মাল স্বদেশী জাহাজে চালান করিয়াছে এবং সরকারী সাহায্যপুষ্ট জাহাজ কোম্পানী দ্বারা অষ্ট্রেলিয়া ও নিউ জিল্যান্ড লাইনে যোগাযোগ রক্ষা করিয়াছে। এই কার্যে মার্কিন সরকার কোটি কোটি ডলার খরচ যোগাইয়াছে। মার্কিন ডলারের ও আইনের প্রভাবে কেবল বিদেশী জাহাজী কোম্পানী ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই। আমেরিকার সমুদ্রতীর এবং দেশের মধ্যকার নদীসমূহ হইতে বিদেশী জাহাজীরা বিভাঙ্কিত হইয়াছে। প্রশান্ত মহাসাগরে মার্কিন প্রভুত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—অর্থাৎ আমেরিকা এবং আলাস্কা, হাউয়াই, মার্কিন

শামোয়া, টুইইলা ও প্রশান্ত সাগরস্থ অন্যান্য বন্দরে বিদেশী জাহাজের যাতায়াত নিষিদ্ধ হইয়াছে।

নিজের বিরূপ জাহাজ-শিল্প ও ব্যবসায়ের উপর খুব বেশী নির্ভর করিতে হয় বলিয়া আমেরিকার 'বদেশী' নীতিতে ইংলণ্ডই অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। শতাব্দীকাল ধরিয়া ব্রিটিশ বাণিজ্য-পোত পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক আন্তর্জাতিক বাণিজ্য-সম্ভার বহন করিয়াছিল।

ইংলণ্ডের ভৌগোলিক অবস্থান জাহাজ-শিল্পের উন্নতির সহায়ক হইয়াছিল। জাহাজ নির্মাণে অত্যাশ্চর্য কয়লার খনি ও লৌহখনি উভয়ই নিকটে থাকার দরুন এই সুবিধা হয়। ইংলণ্ডের সমুদ্রতটও বহুবিস্তৃত এবং বন্দরগুলির অবস্থানও উহার পৃথিবীবাণী বাণিজ্য বিস্তারের অস্বকুলে। কিন্তু ইহা সর্বোৎকৃষ্ট দেশ লোকসান দিয়াও নিজ নিজ নৌ-শিল্পকে দাঁড় করাইবার চেষ্টা করিতে থাকায় ইংলণ্ডের নৌ-বাণিজ্যের ক্ষতি হইতেছিল এবং এইজন্য বৎসরের বিভিন্ন সময় বহু জাহাজ বন্দরে নোঙ্গর করিয়া থাকিত। এই সকল জাহাজের দ্বারা অস্বস্তি জাতির বাণিজ্যে সহায়তা করার দরুন ইংলণ্ডের যে লাভ হইত তাহা হ্রাস পাওয়ায় ইংরেজ জাতির এতৎসম্পর্কীয় "অদেখা রপ্তানী" কমিয়া গিয়া দিন দিন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক লেন-দেনের গতি ইংলণ্ডের বিপক্ষে যাইতেছিল। বর্তমানে ইংরেজ জাতি এই জটিল চরম আর্থিক দুর্গতির সম্মুখীন হইয়া ঋণের জন্য মার্কিনের দ্বারস্থ হইয়াছে।

অবস্থার উন্নতির জন্য গবর্ণমেন্ট প্রথমে জাহাজ নির্মাণ কমাইতে চেষ্টা করে, কিন্তু তাহা সম্ভব না হওয়ার জাহাজ কোম্পানীগুলিকে বৎসরে ২০ লক্ষ পাউণ্ড দান- (bounty) করিবার ব্যবস্থা করে। অতলান্তিক মহাসাগরের কোম্পানী-গুলিকে ডাক-চলাচলের অল্প ব্যবস্থার মোটা টাকা দিবার ব্যবস্থা হয়। আমেরিকাও এই উপায়ে উহার জাহাজ কোম্পানীগুলিকে চাঙ্গা করিতেছিল। ইহা ব্যতীত প্রবল জার্মান প্রতিযোগিতা এড়াইবার জন্য নামমাত্র হুদে কোম্পানী-গুলিকে বিস্তৃত মূলধন যোগানো হইয়াছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে এই ব্যবস্থা পূর্ণমাত্রায় চলিতেছিল। সাম্রাজ্যবাদী নীতি হিসাবেও ইংলণ্ড যাহাতে সমস্ত সমুদ্রপথে প্রভুত্ব করিতে পারে সেদিকে গবর্ণমেন্টের স্নতীক্স দৃষ্টি ছিল। ভারতবর্ষে যাইবার পথ ছিল ইংলণ্ডের পক্ষে 'সব লাল' (all red) অর্থাৎ জিভ্রালটার, মার্টা, এডেন, সাইপ্রাস এবং সুয়েজ খাল সমস্তই ছিল ইংরেজের করতলগত।

হুই সমুদ্রের সংযোগকারী হিসাবে সুয়েজখালই ছিল পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জলপথ। ইংলণ্ড এই বাণিজ্য-সরণী দখলে রাখিবার জন্যই বিশ্ব দেশকে ভাবে রাখিয়াছে এবং খালটা ফরাসীদের কাটা হইলেও স্বকোশলে ইহার বড় অংশীদার হইয়াছে।

এ একই কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পানামা খাল আরও দৃঢ়

ভাবে দখল করিয়া বসিয়াছে। আমেরিকার প্রশান্ত ও অতলান্তিক মহাসাগরের মধ্যে যাতায়াতের ইহাই একমাত্র জলপথ। দেশরক্ষার অজুহাতে এই খালটা আমেরিকা খুব সুরক্ষিত করিয়া রাখিয়াছে এবং সুয়েজ খালে বিভিন্ন জাতির জাহাজ চলাচলের যে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা আছে এখানে সে বালাই নাই। এই খাল এলাকা (canal zone) সম্পূর্ণরূপে করায়ত্ত রাখিবার জন্য আমেরিকাকে ম্যালেরিয়া, চতুষ্পার্শ্বের ক্রমবর্ধমান ও অবাঞ্ছিত নিগ্রো জনসংখ্যা এবং নিজ দেশের ও বিহরাগত শ্রমিকদের প্রতিযোগিতা প্রভৃতি নানা সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। বহু অর্থব্যয় করিয়া তবে পানামা অঞ্চলে খাঁটি মার্কিন উপনিবেশে স্থাপন করা হইয়াছে

যদিও জাহাজের ব্যবসা আন্তর্জাতিক হওয়াই বাঞ্ছনীয় তবু প্রত্যেক জাতিই ইহাকে বিশেষভাবে নিজের আয়ত্তে রাখিবার চেষ্টা করিতেছে। উদ্বেষ্ট অস্বস্তি সর্বল জাতিকে তাঁরে রাখা। ইহা ব্যতীত রেল কোম্পানী অল্প দূরত্বের পথে জাহাজ-কোম্পানীকে কাবু করিবার চেষ্টা করে, কারণ সাধারণতঃ জলপথেই সম্ভার মাল চলাচলের ব্যবস্থা করা যায়। স্থলপথে মাল চলাচল বেশীর ভাগ রেলের সাহায্যেই হইয়া থাকে। জলপথে অনেক স্থানে খুব ঘুরিয়া যাইতে হয়। রেলপথে দ্রুত কম হয়, কিন্তু খরচ বেশী পড়ে। রেলপথ নির্মাণেও খরচ খুব বেশী পড়ে। বড় জাহাজ কোম্পানী আন্তর্জাতিক হিসাবে গঠিত হইয়াছে কিন্তু রেলপথগুলি দেশের মধ্যেই বড়, তাহাও আবার বহু প্রতিষ্ঠানদ্বারা পরিচালিত। সকল দেশে এখনও রেলের মালিক গবর্ণমেন্ট নহে। ভারতবর্ষে অবশ্য গত কয়েক বৎসরের মধ্যে সমস্ত রেলই সরকারের হাতে আসিয়াছে। কোন কোন দেশে গবর্ণমেন্ট রেলের আংশিক মালিক মাত্র, আবার কোথাও নিছক কোম্পানীর হাতে রেল পরিচালনের দায়িত্ব আজও রহিয়াছে। এই প্রাইভেট রেলের দুইটি অতিদ্রুত মার্কিন রেলপথ। আমেরিকায় আড়াই লক্ষ মাইল রেলপথ রহিয়াছে। ইহা ইংলণ্ড ও পৃথিবীর অস্বস্তি দেশের মোট রেলপথের ছয় গুণ। আমেরিকায় আজও ১৫৫টি বিভিন্ন রেল কোম্পানী আছে। ইহাদের বৎসরে প্রায় দশ লক্ষ ডলার মুনাফা হইয়া থাকে। বেগরোয়া প্রতিযোগিতা দ্বারা কিরূপ আর্থিক ক্ষতি হয় তাহার অস্বস্তি দুইটি ইংলণ্ড। এখানে কোন প্ল্যান বা জাতীয় পরিকল্পনা না করিয়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান রেল লাইন বসাইয়াছে, এবং 'ফলং অপচয়ং'। ১৮৪৪ হইতে ১৮৪৭ সালের মধ্যে ইংলণ্ডে অনূন ৬০৭ রেল কোম্পানী রেজিষ্ট্রী হয় এবং অবাধ প্রতিযোগিতা শুরু হয়। খাল, রাস্তা, জমি সব কিছুর মালিকগণই প্রতিযোগিতায় ব্যতিব্যস্ত হয়। অবশ্য এই কোম্পানীগুলির সংখ্যা পরে অনেক কমিয়া যায়, কিন্তু রেল ব্যবসা গোড়ার অপব্যয়ের ও অপচয়ের বোঝা এখনও বহন করিতেছে। এইজন্য দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বড় পূর্বেই সার উইলিয়ম একওয়ার্থ রেল কোম্পানীগুলিকে

জাতীয়করণের সপক্ষে মত দিয়াছেন। ইহা অপচয় নিবারণেরই পন্থা বলিয়া বর্ণিত হয়।

ইংলণ্ড বা আমেরিকা অপেক্ষা পশ্চাৎপদ দেশে প্রতিযোগিতা দ্বারা আরও বেশী ক্ষতি হইতেছে। অনেক সময় পরস্পর প্রতিযোগী কোম্পানীগুলি বেপরোয়াভাবে খরচ করিয়া এবং অনাবশ্যক রেল-লাইন নির্মাণ করিয়া অপচয়ের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছে।

চীন দেশে তিনটি পৃথক পৃথক রেল-লাইন আছে। দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়া রেলপথকে সাইবেরিয়ার রেলপথের বিস্তার বলা চলে—ইহা চওড়া গেজের (Broad gauge)। কিন্তু চাইনিজ ইন্টার্নেল রেল আর এক গেজের। চীন-সরকারের নিজ রেলপথ আবার অল্প মাপের। সুতরাং কোন রেলপথের সহিত অপর রেল-পথের যোগাযোগ নাই, ফলে চলাচলে অসুবিধা। নানা বিদেশী পুঁজিপতিগণকে রেলপথ নির্মাণ করিতে দেওয়ায় এইরূপ অপচয়ের সৃষ্টি হইয়াছে। ১৮৯৪-৯৫ সনের চীন-জাপান যুদ্ধে চীন পরাজিত হইলে বিদেশী শক্তিগুলি চীনকে নানা সুবিধার স্বত্ব হুকুমি করে। শেষে রুশকে উত্তর মাঞ্চুরিয়ায় রেললাইন নির্মাণ করিতে, জার্মানীকে উক্ত লাইন পোর্ট আর্থারের সহিত যুক্ত করিতে, ইংরেজ কোম্পানীকে ইয়াংসা উপত্যকায়, বেলজিয়ান কোম্পানীকে পিকিং হইতে হাঙ্গাও, মার্কিন কোম্পানীকে হাঙ্গাও হইতে ক্যান্টন পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণ করিতে অধুমতি দেওয়া হইল। ১৯২০ সনে আবার ফরাসী, ইংরেজ, মার্কিন ও জাপানী পুঁজিপতিগণকে যুক্তভাবে ভবিষ্যতের রেললাইন নির্মাণের সুবিধা দেওয়া হইল।

দক্ষিণ আমেরিকায় এই একই অব্যবস্থা। আরজেন্টাইনে রেলপথ অপেক্ষাকৃত বেশী, কিন্তু এখানে ইংরেজ, ফরাসী ও দেশীয় পুঁজিপতিগণের হাতেই সমস্ত কর্তৃত্ব। একমাত্র ইংরেজ কোম্পানীগুলির হাতেই ১৫০০০ মাইল রেলপথ। দশটি রেলপথ দশটি এলাকায় যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ করে, এবং সমস্ত লাইনই বিয়ানো আয়ার (Buenos Aires) বা অপর সমুদ্র-বন্দরে গিয়া পড়িয়াছে। রেল-লাইনগুলি তিন মাপের (gauges), সুতরাং দেশের মধ্যে অবাধ চলাচল বিশেষভাবে ব্যাহত হইয়াছে। অথচ রেল-ব্যবস্থা রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত হইলে এই পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী পুঁজিপতিদের স্বার্থ রক্ষিত না হইয়া দেশের সর্বসাধারণের সুখ ও সুবিধাই দেখা হইত।

ভারতের রেলপথেও জটিল অভাব নাই। এখানে বিদেশী গবর্ণমেন্ট বেশীর ভাগ মূলধনের মালিক হইলেও বিভিন্ন ইংরেজ কোম্পানীকে তাহাদের স্বার্থসিদ্ধির উপযোগী যথেষ্টভাবে রেল-লাইন নির্মাণ করিতে অধুমতি দিয়াছে। ইহাতে এক দিকে পরিকল্পনার অভাব এবং বিভিন্ন মাপের রেল-লাইন হওয়ায় চলাচলের অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে। অবশ্য বর্তমানে ভারতের অধিকাংশ রেলপথ জাতীয় গবর্ণমেন্টের হাতে আসিয়াছে এবং ভবিষ্যতে এগুলির উন্নতির আশা করা যায়।

অষ্ট্রেলিয়ায় রেলপথ প্রায় ২০,০০০ মাইল অর্থাৎ ভারতের প্রায় অর্ধেক। এখানেও বিভিন্ন ষ্টেটে বিভিন্ন মাপের রেলপথ ও তৎক্ষণিত অসুবিধা বিস্তার। বৎসরের পর বৎসর বিভিন্ন ষ্টেটের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের হার, বাড়িতেছে এবং সেই সঙ্গে রেল চলাচলের যাতায়াতেও অসুবিধাও বৃদ্ধি পাইতেছে।

অষ্ট্রেলিয়ায় যানবাহন চলাচল ব্যাপারে বিপর্যয় দেখা দিয়াছে। রেলগুলি বিভিন্ন ষ্টেটের মধ্যে যাতায়াত ব্যাপারে গীমারের সহিত প্রতিযোগিতা করে। মোটর-যান মাল আমদানী রপ্তানীতে রেলের সহিত প্রতিযোগিতা চালায়। আকাশ-যান রেল, জাহাজ ও মোটরের সহিত প্রতিযোগিতা চালাইয়া ডাক ও যাত্রী বহন করে। যানসমূহের মধ্যে দর কষাকষি লাগিয়াই আছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে দেখা গিয়াছিল রেল কোম্পানী, জাহাজ কোম্পানী ও মোটর কোম্পানীগুলি সকলেই লোকসান দিতেছে, আর আকাশ-যান কোম্পানীগুলি লরকারী সাহায্যে বাঁচিয়া আছে। এইরূপ অদ্ভুত ব্যাপার পুঁজিপতি-সমাজেই সম্ভব।

রেল এবং মোটরে প্রতিযোগিতা আর পৃথিবীব্যাপী। যে সকল দেশ শিল্পপ্রধান সেখানে উৎকট অবস্থা যথা—আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র। যুক্তরাষ্ট্রে ত্রিশ লক্ষ মাইল পথ—পৃথিবীর মোট রাস্তার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ এবং সে দেশের মোটর চলাচলও পৃথিবীর সকল দেশ অপেক্ষা বেশী। মোটর চলাচলের দ্রুত পনর বৎসরে আমেরিকার রেল-রাজস্ব শতকরা ৬৬ ভাগ কমিয়া গিয়াছিল। দুই কোটি সত্তর লক্ষ প্রাইভেট মোটর গাড়ী থাকায় রেলযাত্রীর ভাড়ার দ্বিগুণ পড়িয়াছিল এবং পচিশ লক্ষ মোটর-লরী রেলের মাণ্ডল কমাইয়া দিয়াছিল। ছোট ছোট রেলপথগুলি সম্পূর্ণ লোকসান দিয়া চালাইতে হইয়াছিল। এট ব্রিটেনেও মোটর প্রতিযোগিতার স্বল্প রেল কোম্পানীগুলি বৎসরে এক কোটি ষাট লক্ষ পাউণ্ড লোকসান দিয়াছিল। অথচ জার্মানীতে রেলরাস্তাগুলি সুবিস্তৃত ও রাষ্ট্র-নায়েকদের দ্বারা পরিচালিত বলিয়া সেখানকার অধিবাসীরা এই সকল অপচয় হইতে রক্ষা পাইত। ইহাতেই প্রমাণ হয় যে সুপরিচালিত রেলপথ ও মোটরলরী কম ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অবশ্য অল্প দূরের পথে লরী দ্বারাই সম্ভাব্য কাজ হয় এবং দূরপথে রেল-লাইন সুবিধাজনক।

আবার রেলপথের সহিত দেশান্তরস্থ জলপথেরও প্রতিযোগিতা হইয়া থাকে। ভারী ও সহজে নষ্ট হয় না এরূপ দ্রব্য জলপথেই পাঠানো সহজ ও স্বল্পব্যয়সাপেক্ষ। কোন কোন অঞ্চলে নদী, হ্রদ ও ঝালের ভিতর দিয়া বুঝ সম্ভাব্য মাল চালান হয়। জার্মানীর জলপথগুলি অতি উৎকৃষ্ট, কিন্তু রেলের ভাড়া কমানোর প্রতিযোগিতায় এই জলপথগুলিও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। রাইনের জলপথ কেবল ইউরোপে নয় পৃথিবীর মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট জলপথ। কিন্তু বেলজিয়ান ও ফরাসী রেল কোম্পানীগুলির প্রতিযোগিতায় (ভাড়া

কমাইয়া) এই জলপথের বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। সার উপত্যকার কয়লা, আল্‌জেনের তুলাজাত দ্রব্য, এবং লোয়ার লোহ-প্রস্তর রপ্তানী এবং নানা খাজনায় আমদানী এই রাইনের জলপথেই হইত। কিন্তু রেল-কোম্পানীগুলি ভাড়া অসম্ভব রকম কমাইবার জন্ত রাইনের বাণিজ্য আন্তঃসার্প বন্দরে স্থানান্তরিত হইয়াছে এবং ঐ পথেই ফরাসী ও লজীয়ান্ বেরেলে সুইজারলণ্ডগামী বিদেশী বাণিজ্য-জাহাজ যাতায়াত করিতেছে। দানিউব নদীপথের বাণিজ্যও রেলের প্রতিযোগিতায় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, অবশ্য ক্ষতির পরিমাণ রাইন অপেক্ষা কম। ইউরোপের অভ্যন্তরস্থ দেশগুলি নদীর মারকতাই সমুদ্রের সঙ্গে তথা বহির্জগতের সহিত যোগাযোগ রাখিত এবং নদী-জলিকেও আন্তর্জাতিক যাতায়াতের পথ বলিয়া স্বীকার করা হইত। কিন্তু জার্মানী যখন নিজ এলাকায় নদীগুলিকে নিজের বলিয়া দাবি করিয়া ইহাদের আন্তর্জাতিক চলাচল বন্ধ করিল তখন এক বিপর্যয়ের সৃষ্টি হইয়াছিল।

ইউরোপের নদীসমূহের যোগাযোগের জন্ত যে সকল খাল কাটা হইয়াছে সেই সকল বাণিজ্য-পথগুলিও প্রতিযোগিতার শক্তায় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। অনেকগুলি খালে বাণিজ্য-দ্রব্যের চলাচল একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ইংলণ্ডে এই খাল খননের চরম অপব্যয়ের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। রেল-লাইনগুলি ব্যাপক ভাবে তৈরি হইবার প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে এই খালগুলি পুঁজিপতিগণ ব্যক্তিগত দায়িত্বে খনন করে। নানা-লোকের কাজ বলিয়া এই সকল খাল আকার-প্রকারে, লক্ষ-বন্দোবস্তে, গভীরতায় ও অজ্ঞাত বিষয়ে বিভিন্ন রকমের ছিল এবং একজ প্রণয়দ্রব্য চলাচল ব্যবস্থায় পদে পদে বাধার সৃষ্টি হইত। কৃত আদায়েরও বহু খাঁটি ছিল। কিন্তু এত অসুবিধা সত্ত্বেও অল্প খরচ এবং সৌজাপথে ভারি মালগুলির চলাচলের ব্যবস্থা করা হইত এবং খালের মালিকগণও যথেষ্ট লাভ পাইত। দক্ষিণ ল্যাফাশায়ার ও ওয়েস্ট রাইডিঙের নিকটবর্তী স্থানসমূহে কয়লা ও লৌহ-প্রস্তর চালান দেওয়ার সহায়তা করিয়া ঐ খালগুলি শিল্প-বিল্লের সহায়ক হইয়াছিল। কিন্তু রেলপথের বেপরোয়া প্রতিযোগিতায় শেষে জলপথগুলি অকেজো হইয়া পড়ে। কোন কোন রেল কোম্পানী নিজেদের লাভ বাড়াইবার জন্ত জলপথগুলি কিনিয়া লইয়া ফেলিয়া রাখে ও অপব্যয়ের চরম দৃষ্টান্ত দেখায়। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রেও খাল ও রেলের প্রতিযোগিতায় ঐ একই ব্যাপার দেখা যায়। অবশ্য এট লেক্ অফলে জলপথের বাণিজ্যকে রেললাইন হঠাইতে পারে নাই। কিন্তু দরকষাকষি করিয়া রেল জলপথের বাণিজ্যকে বেশ কিছু ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে। খালপথে চলাচলের জন্ত বহু নতুন সুবিধার চেষ্টা করা হইয়াছে, এমন কি ২০ কোটি ডলার খরচ করিয়াও বিশেষ কোন উন্নতি সম্ভব হয় নাই। জলপথ ও রেলপথ পারস্পরিক প্রতিযোগিতায় অপব্যয় বাড়াইয়া চলিয়াছে মাত্র।

চলাচল-পথে নতুন প্রতিযোগিতা আনিয়াছে আকাশ-যান। প্রায় ও রেল উত্তরের সহিত ইহার প্রতিযোগিতা চলিয়াছে, তবে এখন পর্যন্ত প্রতিযোগিতা যাত্রী ও ভাড়া এবং কতকাংশে মূল্যবান দ্রব্যাদির চলাচলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। চলাচল-ব্যবস্থার এই ক্ষেত্রে দ্রুত পরিবর্তন হইতেছে। সদ্যগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকে নানা দিক দিয়াই যুগান্তকারী বল্য যাইতে পারে। প্রথম মহাযুদ্ধের শেষ ভাগেই আকাশ-যানের বিপুল সম্ভাবনা দেখা যায়। দুই মহাযুদ্ধের মধ্যেই সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী দেশে ইহার প্রভূত উন্নতি হয়। রুশ দেশে ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে আকাশ-যানের উন্নতির পরাকাষ্ঠা পরিলক্ষিত হয়। ফ্রান্স, হল্যান্ড প্রভৃতি উপনিবেশ স্থাপনকারী দেশসমূহও সুদূর সাম্রাজ্যে যোগাযোগ রক্ষার জন্ত বিরাট আকাশপথ রক্ষা করিতে বাধ্য ও মনোযোগী হন। প্রথম মহাযুদ্ধের পরই বহু মনীষী ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে পরবর্তী মহাযুদ্ধ আকাশ-পথে হইবে এবং যে জাতি তাহাতে শক্তিমান হইবে সে-ই জয়ী হইবে। সে ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হইয়াছে। কিন্তু এই সকলতার পশ্চাতে কোটি কোটি সরকারী মুদ্রার অপব্যয় দেখা যায়। অনেক পুঁজিপতির দ্বারা খরচ হইলেও ইহার পশ্চাতে রাষ্ট্রের বেপরোয়া সাহায্য ছিল। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে অবশ্য প্রত্যক্ষ ভাবে কোন কোম্পানীকে সাহায্য দেয় নাই তবে ডাক প্রভৃতি বহিবার জন্ত যে খরচ দিয়াছে তাহা সাধারণের নিকট হইতে প্রাপ্ত মাসুলের বহু গুণ। মহাযুদ্ধে যুদ্ধপক্ষ জয়ী হওয়ার আকাশপথে যাতায়াতের নতুন নতুন সম্ভা দেখা দিয়াছে। জার্মানী, ইতালী ও জাপান একেবারে দমিয়া গেলেন বর্তমানে আমেরিকা ও সোভিয়েটের মধ্যে প্রতিযোগিতা মারাত্মক আকার ধারণ করিতেছে। দূরবর্তী দেশের সহিত যোগাযোগের আকাশপথগুলি বহু দেশের উপর সম্ভ্রান্ত হইয়া থাকে। কিন্তু কোন বিবাদের কারণ ঘটিলে সংশ্লিষ্ট যে কোন দেশ চলাচলে বাধা দিতে পারে। সম্ভ্রান্ত ভারতীয় ডোমিনিয়ন ভারতবর্ষের আকাশপথে ওলন্দাজ বিমানের চলাচল নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছে কারণ ডাচ ও ইন্দোনেশীয় বিবাদে ভারতবর্ষ ওলন্দাজদের সঙ্গে কোনরূপ সহযোগিতা করিতে প্রস্তুত নহে।

অল্পদিনের মধ্যে ভারতবর্ষও কয়েকটি এরোপ্লেন কোম্পানী স্থাপিত হইয়াছে। গবর্ণমেন্ট অসুবিধা দিবার পূর্বে অবশ্য অসুবিধা ও তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া কার্য করিতেছেন। তবুও এ বিষয়ে কড়াকড়ি ব্যবস্থা না করিলে অবাধ প্রতিযোগিতার ফলে অপচয়ের সম্ভাবনা রহিয়াছে। আকাশপথের ব্যাপার একেবারে রাষ্ট্রের নিজের অধিকারে রাখা বাঞ্ছনীয় কিনা তাহাও বিশেষ ভাবে চিন্তার প্রয়োজন। সৌভাগ্যক্রমে রেলপথগুলি রাষ্ট্রের নিজের মালিকানায় আসায় সরকার তথা দেশবাসী লাভবান হইয়াছে এবং কোম্পানীগুলির পরস্পর প্রতিযোগিতায় অপচয় ও অপব্যয় বন্ধ হইয়াছে। আকাশ-

যানের বৃত্তন প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে যাহাতে অপচয়ের আশঙ্কানী না হয় রাষ্ট্রকে সেই দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। সুষ্ঠুভাবে জাতীয়করণ দ্বারাই সকল অপব্যয় নিবারণ হইতে পারে, কিন্তু নানা অবস্থা ও স্বার্থের চাপে পড়িয়া সকল রাষ্ট্রের

পক্ষে তাহা সম্ভব হয় না। কিন্তু বেপরোয়া প্রতিযোগিতা বর্তমান কালে কোন রাষ্ট্রই বরদাস্ত করে না, কারণ একালে ব্যক্তির স্বাধীনতা ও স্বার্থ জাতির ও সমষ্টির স্বার্থের নিয়ে এ কথা সকল সভ্য দেশই স্বীকার করিয়া লইয়াছে।

নেপালীদের খাদ্যদ্রব্য

শ্রীবিজয়ভূষণ ঘোষ চৌধুরী

নেপালী শ্রী-পুরুষ উভয়ে রন্ধনকার্য করিয়া থাকেন। কাঠমাণ্ডু সহরে সম্পন্ন শুভ্রলোকের বাড়িতে কেবল স্ত্রীলোকেরা রান্না করেন। নেপালী ব্রাহ্মণ মাজেই রন্ধন ও ভোজনকালে বৃত্তি পরিধান করেন। * যেখানে রন্ধন করা হয়, সেই স্থানকে 'চৌকা' বলে। রন্ধন-স্থানটি একটু উঁচু করিয়া লওয়া হয়। রন্ধনকালে 'চৌকা' ছাড়িয়া কাহারও বাহির হওয়া দেশাচারবিরুদ্ধ। চৌকার পার্শ্বে আর একটু 'চৌকা' থাকে। যিনি রন্ধন করেন, সেখানে তিনি খাদ্যদ্রব্য রাখিয়া দেন এবং সেখানে হইতে উহা বর্জন করা হয়। নেপালে এক জাতি অপর জাতির লোককে হৈসেলে প্রবেশ করিতে দেয় না, কিংবা এক জাতি অপর জাতির প্রস্তুত অন্ন আহাৰ করে না। অল্প জাতিকে স্পর্শ করিয়া জলপান করা কিংবা 'চৌকা'র বাহিরে বসিয়া প্রস্তুত অন্ন ভোজন করা চলে না। সকলে স্ব স্ব 'চৌকার' ভোজন করিয়া থাকে। প্রত্যেক সংসারে দুই-তিনটি করিয়া 'চৌকা' থাকে। যদি স্বজাতীয় কাহারও 'চৌকা' ব্যবহার করিবার আবশ্যক হয়, তিনি শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করিয়া পবিত্রভাবে তাহা করিতে পারেন।

নেপালে ভাত রাঁধার বে-কোনও হাঁড়িকে 'তসলা' বলে। এখানে পিতলের হাঁড়ি ভিন্ন মাটির হাঁড়িতে কেহ রন্ধন করে না। নেপালে ভাত পিতল পাওয়া যায়। চাউল নেপালী-দিগের প্রধান খাদ্যদ্রব্য। তাহার প্রধানতঃ আতপ চাউল রন্ধন করিয়া ভোজন করিয়া থাকে। নেপালে প্রচলিত পাহাড়িয়া ভাষায় আতপ চাউলকে 'স্বেত চামল' এবং নেওয়ারী ভাষায় 'জাকি' বলে। নেপালে সিদ্ধ চাউলের প্রচলন থাকিলেও সেখানকার কোনও সদাচারী হিন্দু উহা কদাচ ব্যবহার করে না। নেপালীরা ভাতের ফেন গালে না। নেপালে অনেক রকম চাউল দৃষ্ট হয়, যথা—মসিনা, দুত্তরাজ, ঝাপাচিঙা, খাপামাসি, চিনিয়া চামল, পঠুয়া চামল, বৈয়া চামল (ইহা ভাদ্র, আশ্বিন মাসে হয়), গোল-মাসি প্রভৃতি। ঝাপাচিঙা দেখিতে একটু লাল বর্ণের। চিনিয়া

চামল দাধারণতঃ ভাজিয়া খাওয়া হয়। এই চাউলের ভাত ভাল হয় না। বৈয়া চামলে নেপালীরা বেশীর ভাগ চিঁড়া প্রস্তুত করে। ঝাপামাসিতে চিঁড়া এবং ভাত দুই-এক প্রস্তুত হইতে পারে। জুংরি ধান, ঝাপা চিনিয়া ধান, মাসি ধান কিংবা গোল মাসি ধানেও খই হয়। নেপালীরা চাউল ভাজাকে 'খটে' এবং খইকে 'লাজা' বলে। নেপালে জলচল নেওয়ার জাতির লোকেরা মুড়ি ভাজে; কিন্তু ব্রাহ্মণ ও ছত্রি (ক্ষত্রিয়) জাতির মধ্যে ইহার রেওয়াজ নাই। সেখানে চিঁড়াকে 'চিউড়া' বলে। ব্রাহ্মণ হইতে ছোট পৰ্য্যন্ত সকল জাতির লোকেরা 'চিউড়া' প্রস্তুত করে।

নেপালীরা আটাকে 'পিঠো' বলে। সে দেশে গম, ভুট্টা (মক্কা) ও ফাপর হইতে তিনটি বিভিন্ন প্রকারের 'পিঠো' প্রস্তুত করা হয়। তন্মধ্যে ভুট্টার 'পিঠো'ই বেশী তৈরি হয়। নেপালে 'ফাপর' কম জন্মে। উহা দেখিতে খেদারীর ডালের মত, কিন্তু গোল ও কাল বর্ণের। নেপালীরা 'তাপকে' নামক লৌহ-কটাছে জল গরম করিয়া উহাতে মুঠা মুঠা 'ভুট্টার পিঠো' (মক্কার গুঁড়া) ফেলিয়া দেয়। এক এক বার নিক্ষেপ করিবার কালে তাহার 'পানিউ' (তাতু অথবা হাতা) বা থুতা দিয়া যথাসক্তি মাড়িয়া লয়। মাড়িবার পূর্বে বাম হাত দিয়া 'তাপকের' দণ্ডটি দৃঢ় ভাবে ধারণ করিতে হয়। উক্ত গরম জলে নিক্ষিপ্ত ভুট্টার গুঁড়া সকল অনবরত মাড়ার কলে কাইয়ের আকারে পরিণত হয়। এই কাইকে নেপালীরা 'চিঁড়ো' বলে। পার্বত্য অঞ্চলের যে সকল স্থানে শীতের প্রকোপ অধিক, তথায় ভাত রাখা করা অত্যন্ত কষ্টকর। এ কারণ 'চিঁড়ো' কেবল শীতপ্রধান অঞ্চলস্থ নেপালীদেরই প্রিয় খাদ্য নহে; তিব্বত ও ভুটানের অধিবাসীরাও ভাতের পরিবর্তে 'চিঁড়ো' খাইতে ভালবাসে। আশ্বিন হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত নেপাল, ভুটান ও তিব্বত অঞ্চলের সাধারণ লোকেরা চিঁড়ো আহাৰ করে। নেপালীরা রাইশাকের ঝোলে চিঁড়ো ভিজাইয়া লইয়া খাইয়া থাকে। কাঠমাণ্ডু উপত্যকার সম্পন্ন শুভ্র গৃহস্থদের মধ্যে চিঁড়োর প্রচলন গৃহীত হয়।

* সাধারণতঃ সমস্ত মারাঠা গৃহস্থেরা 'সোলা' (রেশমের পটবস্ত্র) পরিধান করিয়া থাকেন।

নেপালীরা বুকুরী (ভোজালী) দিয়া কুটনা কোটে, বটর ব্যবহার তাহাদের মধ্যে খুবই কম। তাহারা প্রত্যেক তরকারিতে যথেষ্ট লব্ধা এবং আবশ্যিকমত জিরা, মরিচ, ঘৃত বা তৈল ও লবণ ব্যবহার করে। পার্শ্বভাষা ভাষায় ঘৃতকে 'বিট' এবং নেওয়ারী ভাষায় 'বিয়' বলে। নেপালে লবণ উৎপন্ন হয় না। পূর্বে ভূটান হইতে নেপালে লবণ আমদানি হইত। নেপালীরা ইহাকে 'সু'দো লবণ' বলে। এখন বাংলা এবং অন্ধ্র প্রদেশ হইতে নেপালে লবণ রপ্তানি হয়। নেপালীদের দ্বারা তরকারিগুলিতে মারাঠাদিগের মত খালের আধিক্য। তাহারা মারাঠাদের মত দুই তিনটি তরকারি মিশ্রিত করিয়া রান্নাভিতে জানেন না—প্রত্যেক তরকারি স্বতন্ত্র ভাবে রান্না করা থাকে। কেবল সম্পন্ন নেপালীদের বাগীতে অধুনা পাঁচশালী দ্বারা হইয়া থাকে।

অড়হর এবং মাষকলাইয়ের ডাল নেপালীদের অত্যন্ত প্রিয় খাদ্য। এই দুইটি তাহারা প্রচুর পরিমাণে খায়। নেপালীরা কলায়ের ডালকে 'মাষকো ডাল' বলে। তাহারা কলাই ডাল প্রথমে বুইয়া সিদ্ধ করে। সিদ্ধ হইলে উহাতে লবণ দিয়া একটু ফুটান হয়। তৎপরে উহাকে উত্তন হইতে নামায়। ঘৃত গরম করিয়া উহাতে 'জিন্দু' (তিক্তত দেশীয় এক প্রকার শুকনা শাক) ফেলিয়া দেওয়া হয়। সেই 'জিন্দু' কড়া হইলে ডালে ফেলিয়া দিয়া অল্পক্ষণ পরে নামান হয়। জিন্দু দেওয়া না হইলে তৈলে বা ঘৃতে পাঁচফোড়ন দেয়। পাঁচ-ফোড়ন কড়া হইলে পর উহাতে কাঁচা মনেপাতা ও লব্ধা কুচি কুচি করিয়া দিয়া 'পানিট' (হাতা) দ্বারা নাড়িয়া লওয়া হয়। উহা কড়া হইলে উহাতে ডাল ঢালিয়া দেয়। সেই ডাল নামাইয়া একটু ফুটাইয়া লওয়া হয়। নেপালীদের মধ্যে মন্থর ও মূপের ডাল ষাওয়ার রেওয়াজ নাই। কোন কোনও নেপালীর বাগীতে মন্থর ডাল তো অস্পৃশ্য বলিয়া গণ্য।

নেপালীরা সচরাচর যে সকল শাক ষাওরূপে ব্যবহার করিয়া থাকে, সেগুলির নাম—পালং, কদী শাক, (কুমড়া শাক), কেরাউ (মটর শাক), তুরি (সরিষা শাক), চমশু, বড়ুয়া, ভাদ্দেরাজ প্রভৃতি। শেষোক্ত শাক তিনটি বাংলা দেশে জন্মে না। কুমড়ার ডাঁটা ষাওয়ার প্রথা নেপালীদিগের মধ্যে প্রচলিত থাকিলেও তাহারা কদাচ উহার কচি পাতা খায় না এমন কি গরুকেও বাইতে দেয় না। শুকনা শাক পাতা ষাওয়ার রেওয়াজও নেপালীদের মধ্যে যথেষ্ট আছে। তাহারা উহাকে 'গুগজক' বলে। কেহ 'গুগজক' ভাজা খায় না। নেপালীরা ইহার সহিত 'বড়ি' (বড়বট কড়াই) দিয়া মদলা সংযোগে অল্প ঝোলসিদ্ধ করে। 'গুগজক' দ্বারা চাটনিও হয়। তিব্বত ও ভূটান হইতে এক জাতীয় শুকনা শাক প্রচুর পরিমাণে নেপালে আমদানি হইয়া থাকে। কাঠমণ্ডুতে অবস্থান কালে কয়েকজন নেপালী ভদ্রলোকের নিকট অহুসদ্বানান্তে আমরা জানিতে পারি—উক্ত দুই অঞ্চলে উহাকে কি

বলে নেপালীরা তাহা অবগত নহে। তাহারা উহাকে জিন্দু বা জিন্দু বলে। নেপালী মাঝেই তৃপ্তি সহকারে জিন্দু খাইয়া থাকে। সরিষার তৈলে উহা ফোড়ন দিলে উহা হইতে পিঁঝাজের গন্ধ বেশ পাওয়া যায়। নেপালীরা ডালে, মাংসে ও চাটনিতে জিন্দু ব্যবহার করিয়া থাকে।

আলুর বড়া করিয়া ষাওয়ার বহুল প্রচলন নেপালীদের মধ্যে আছে। নেপালীরা ভাজাভুক্তি জাতীয় জিনিসকে বলে তারে, যথা—আলু ভাজা=আলু তারে, শাক ভাজা=শাক তারে। গরীব নেপালীরা ভটমাস (swabean) নামক এক প্রকার কড়াই ভাজিয়া চিঁড়া অথবা ভুট্টা কিংবা গমের সঙ্গে খাইয়া থাকে। ভটমাসের আচারও প্রস্তুত হয়। বাংলা দেশে যাহাকে 'বটবট কড়াই' বলে, নেপাল উপত্যকায় তাহাকে বড়ি বলা হয়। বড়ির গাছ লতানে। নেপালীরা বড়ির ব্যবহার যথেষ্ট করিয়া থাকে। বাংলাদেশের পদ্ধতি অনুযায়ী নেপালের ভদ্রসমাজেও বাটা ডাল হইতে 'বড়ি' প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করা হয়। নেপালীরা এই বড়িকে মশোরা বলে। নেপালে মাষকলাই ডালের বড়ি গৃহস্থরা প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত করিয়া থাকে। সে দেশে কলার ষোড় তরকারি রান্নায়া খাইবার রীতি নাই। নেপালীরা স্বস্ত প্রস্তুত করিতে জানেন না। কোনও নেপালী হিংচা কিংবা গলতার ব্যঞ্জন করিয়া খান না। শতমূল জাতীয় কুলিরা নামক গাছের এবং ডুসা নামক এক জাতীয় বাঁশের ডগা নেপালীদের উপাদেয় খাদ্য। 'ডুসা' কাটিয়া চাকা চাকা করিয়া শুকান হয়। ইহা হইতে নেপালীরা চাটনিও প্রস্তুত করে।

কোনও নেপালী সিদ্ধ বা ভাজা কাঁচকলা এবং ওল ভাজা দিয়া ভাত খায় না। কাঁচকলা কেবল পুষ্কার অর্থে আবহুক হয়। ওল সিদ্ধ করিয়া উহাতে জিরাবাটা ও লবণ মাখাইয়া ভাতের সুদে খাইবার রীতি তাহাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। তাহারা ওলের ডালনা খাইয়া থাকে। ওল চাকা চাকা করিয়া কাটিয়া উত্তমরূপে বুইয়া মদলা মাখান হয় এবং তৎপরে তৈলে ভাজিয়া লইয়া আলু ও পিঁঝা সহ সিদ্ধ করা হয়। যথা সময়ে উহা নামাইয়া ঘৃত সংযোগ করা হয়। নেপালীরা এই-রূপে ওলের ডালনা প্রস্তুত করে। পার্শ্বভাষা ভাষায় ডালনাকে মসভরকো তরকারি বলে। নেপালীরা মানকচু ও জলকচুর তরকারি রান্নায়া থাকে। পাহাড়িয়া ভাষায় জলকচুকে গীড়ালো এবং নেওয়ারী ভাষায় বিধি বলে। নেওয়ার জাতির লোকেরা তরকারিতে শলকচুর ব্যবহার অধিক করে। এই কচুকে তাহারা 'ক্যাক' বলে। নেওয়াররা ছুনি ও ত্যাতল নামক তরকারি খাইতে খুব ভালবাসে। কচু গাছ প্রথমে কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লওয়া হয়। যাহাতে কোনরূপ ময়লা না থাকে, তজ্জন্ত উহাকে জল দিয়া বুইয়া লইয়া তৈল-সংযোগে ভাজিয়া লওয়া হয়। ইহাকেই

‘ছুকুনির তরকারি’ বলে। ছুকুনিতে জল দিয়া মর্কার শুঁড়া সহ তরকারী রাখিলে উহাকে ‘ভাতন’ বলে।

অন্ন ও চাটনি :—নেপালীরা অন্ন খাইতে অত্যন্ত ভাল-বাসে। পূর্বে শীতকালে ঘটা করিয়া অন্ন খাইবার জন্য একটি বিশেষ দিন নির্দিষ্ট ছিল। তদুপলক্ষে নেপালীরা কাজকর্ম বন্ধ করিত এবং বিড়ালয় ইত্যাদিরও ছুটি হইত। কার্তিক মাসে তাহার পাতি ও কাগজি নেবুর আচার বা চাটনি যথেষ্ট ব্যবহার করিয়া থাকে। নেপালীরা অত্যন্ত চাটনিপ্রিয়। তাহার কমলা লেবুর খোসা দিয়া এক প্রকার চাটনি করে। উহা খাইতে বড় উপাদেয়। নেপালীরা ঘত প্রকার চাটনি প্রস্তুত করে, তত প্রকার চাটনি ভারত-বর্ষের ‘অল্প আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। কতকগুলি চাটনির নাম, যথা :—আমের চাটনি, অমিলির (তঁতুলের) চাটনি, কমলা লেবুর চাটনি, পাতি নেবুর চাটনি, আলুর চাটনি, বেগুনের চাটনি, টমাতোর চাটনি, কচি লঙ্কার চাটনি, তিলের চাটনি, কচি রসুনের চাটনি, ধনে পাতার চাটনি, কালতরি শাকের চাটনি, দুর্কার চাটনি, কর্কসোর (কচু নাছের) চাটনি, শুটমাসের চাটনি, ডিম ও টমাতোর চাটনি ইত্যাদি।

মৎস্য :—গো-ছকের জায় মৎস্যও নেপালে দুপ্রাপ্য। একারণ মৎস্যাহারে নেপালীদিগের আসক্তি কম। বর্ষাকাল ভিন্ন অল্প সময়ে কাঠমণ্ডুতে ও অল্প মৎস্য পাওয়া যায় না। সে সময় নেপালের অনেক স্থানে রুই, বাটা, পুঁটি, প্রাবদা, সিঙ্গি প্রভৃতি মাছ পাওয়া যায়। নেপালে প্রচুর পরিমাণে তপসে মাছ পাওয়া যায়। এত বড় আকারের তপসে বহু-দেশের কোথায়ও মিলে কি না সন্দেহ। নেপালী ব্রাহ্মণ ও হিন্দু ব্যতীত অন্যান্য জাতির লোকেরা তপসে ভোজন করে। উচ্চ শ্রেণীর নেপালী হিন্দুরাও ‘বাম’ (বান মাছ) ও সিঙ্গি মাছ খায়। নেপালী ব্রাহ্মণ ও হিন্দুর (হজির) বিধবাদের মধ্যে মৎস্য ভোজনের রীতি আছে। শুকনা মাছ আহারের বহুল প্রচলন আমরা নেপালে দেখিয়াছি। নেপালের শুঁট মাছ দেখিতে হিলে মাছের মত। এই মাছের রং কাল এবং লম্বাটে আকারের। হিলে মাছ সাধারণতঃ এক ছটাকের বেশী হয় না। হিলে মাছ একটু কাল রঙের। পাহাড়ী ভাষায় মাছকে ‘মাছা’ এবং নেওয়ারি ভাষায় ‘নিয়া’ বলে।

মাংস ভোজন :—একাদশী তিথিতে এবং অমাবস্যা (পিতৃপক্ষ বা প্রেতপক্ষ বলিয়া) এই দুই তিথিতে মাংসভোজন করা নেপালী হিন্দু মাঝেই ধর্মবিরুদ্ধ বলিয়া মনে করে। পূর্ণিমা তিথিতে মাংসভোজনের প্রথা তাহাদের সমাজে প্রচলিত আছে। নেপালী মাঝেই মাংসাহারী। কেবল নেপাল রাজ্যের লক্ষ্মী, উপাধ্যায় এবং শুঁড় উপাধিধারী ব্রাহ্মণেরা কোনও প্রকার জীবজন্তুর মাংসভোজন করেন না। তাহারা নিরা-মিষাণী সেবানকার অন্যান্য ব্রাহ্মণেরা কিন্তু পাঁঠা, হরিণ,

ভূটে, ভেড়া, ছেঁড়া (এক জাতীয় হরিণ), কালিজ, কবুতর, তিথির প্রভৃতি পক্ষীর মাংস ও হাঁসের মাংস ভক্ষণ করেন। নেপালে শুকনা মাছের জায় শুকনা মাংসেরও বহুল প্রচলন আছে। সাধারণতঃ নেপালীরা মাংসের শুকট, মাংসের কাবাব, মাংসের ভালনা (আলু ও পিঁয়াজ সংযোগে), মাংসের সুপ, মাংসের বন্দিকী, মাংসের চপ, মাংসের শিকর্ধি এবং মাংসের লড্ডু খাইয়া থাকে। নিম্নে কয়েকটির প্রস্তুত প্রণালী বিবৃত করা হইল :—

(ক) মাংসের শুকট—মাংস আগুনে কিংবা বোয়ে ঝলসাইয়া লওয়া হয়। তৎপরে মসলাসহ বেসন মিশাইয়া তৈল সংযোগে ভাজিয়া লওয়া হয়। মাংসের শুকটের মসলাদি হইতেছে ধনিয়া, লঙ্গা, জিরা, আদা ও রসুন। এইরূপে মাংসের শুকট প্রস্তুত করা হয়। (খ) মাংসের কাবাব—ইহাতে সকল রকম মসলা ও হিং দেওয়া হয়। মাংসের সুপ—সম্ভ্রান্ত লোকেরা মাংসের ঝোলকে ‘সুপ’ও বলেন। পাঁঠার মাথার মুড়া কিংবা ঠ্যাং দিয়া ইহা প্রস্তুত হয়। মুড়া হইতে চক্ষু ও জিহ্বা তুলিয়া ফেলা হয়। মাতা অথবা পিতা বিদ্যমান থাকিতে কোনও সদাচারী নেপালী হিন্দু উহা ভক্ষণ করেন না। অল্পমাত্রা এই দুইটি প্রত্যক্ষ তাহাদের নিষিদ্ধ খাদ্য নহে। পূর্বোক্ত প্রতিবন্ধকাদি না থাকিলে জিহ্বা ও চক্ষু সহ মুড়াটি কাটারী দ্বারা কাটাইয়া টুকরা টুকরা করিবার পর সেগুলিকে সিদ্ধ করিবার জন্য গরম জলে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। সিদ্ধ হইলে উহাতে মসলা দেওয়া হয় এবং অল্প ঝোল থাকিতে নামাইয়া লওয়া হয়। পাঁঠা-বাগীর ঠ্যাং দিয়া সুপ প্রস্তুতপ্রণালী নিম্নলিখিত রূপ :—বাগীর ঠ্যাং ছাল সহ কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া অন্যান্য দুই খণ্টা কাল জলে সিদ্ধ করা হয়। তৎপরে উহাতে মসলা দিয়া স্বতন্ত্র পাত্রে চাপা দেওয়া হয়। ঝোল অগ্নির উত্তাপে মরিয়া সামান্য পরিমাণে থাকা পর্যন্ত উহাকে উনানে চড়াইয়া রাখা হয়। তৎপরে উহা নামাইয়া টুকরাগুলি হইতে ছাল ছাড়াইয়া ফেলিয়া দিয়া ভোজন করা হয়। আমরা শুনিয়াছি—পাঁঠা বা বাগীর মুড়ি হইতে উক্ত প্রকারে প্রস্তুত ‘সুপ’ বলবর্ধক এবং ঠ্যাং হইতে প্রস্তুত সুপ এবং ঝোল রোগীর পক্ষে বিশেষ উপকারী।

মাংসের বন্দিকী—ইহা প্রস্তুত করিতে অধিক পরিমাণ আদা, জিরা, লঙ্গা, হরিদ্রা, ধনিয়া ও ছোট এলাচ-চূর্ণ—এই এই কয়টি সংমিশ্রিত দ্রব্য, রক্ত এবং ঘৃত আবশ্যক। সুদীর্ঘ অল্পটর অভ্যন্তরভাগ সর্বপ্রথম জল দিয়া উত্তমরূপে পরিষ্কার করা হয়। তৎপরে ঐগুলি দিয়া ভর্তি করিবার পর উহার দুই প্রান্ত স্ততার সাহায্যে বন্ধ করা হয়। তৎপরে সেটিকে গরম জলে ফেলিয়া সিদ্ধ করা হইলে তুলিয়া লইয়া প্রায় এক অঙ্গুলি পরিমাণ মাংস কাটিয়া সরিষার তৈলে ভাজিয়া লওয়া হয়।

মাংসের লড্ডু—দা দিয়া মাংসখণ্ড গুলি কুচি কুচি করিয়া

কর্তন করা হয়। তৎপরে একসঙ্গে উত্তমরূপে বাঁচা ধন্য পাতা, ছিরা ও ছোট এলাচ সহ ঐ কর্তিত মাংস এবং পরিমাণমত লবণ সংমিশ্রিত করিয়া গুলি পাকান হয়। ইহার পর সেগুলিকে লইয়া দধি মাখাইয়া ঘৃত দিয়া ভাজিবার পর পুরাতন আচারের মধ্যে কেলিমা দেওয়া হয়। দুই দিন পরে ঐগুলিকে স্বতন্ত্র পাত্রে তুলিয়া রাখা হয়। নেপালীরা এইরূপ প্রণালীতে মাংসের লজ্জ প্রস্তুত করিয়া থাকে।

শূকর ও মহিষ-মাংস—ব্রাহ্মণ ব্যতিরেকে ছত্রি, নেওয়ার প্রভৃতি জাতির লোকেরা বড় বরাহের মাংস ভোজন করিয়া থাকে। উহা তাহাদিগের উপাদেয় খাদ্য। উৎসবের কয়েক দিন পূর্বে হইতে নেপালী ছত্রিরা বড় বরাহ ধরিয়া রাখে। ভোজনের জন্য উহাকে গুলি করিয়া মারা হয়। বাংলা দেশে শূকরকে যেদ্রুপ নৃশংস ও বীভৎস ভাবে হত্যা করা হয়, নেপালে তদ্রূপ প্রথা অজ্ঞাত। বরাহের মাংসকে নেপালীরা বৈদেশ বলে। নেপালে নেওয়ার জাতির মধ্যে চাষী, কসাই ও পো-ডে—এই তিন শ্রেণীর লোক ও লিঙ্গু বা রাই আদি অন্ত্যজ জাতির লোকেরা তৃপ্তি সহকারে মহিষের মাংস খাইয়া থাকে। কাঠমণ্ডু সহরের মধ্যে মহিষের মাংস বিক্রয় করিবার অধিকার কাহারও নাই। সহরের বাহিরে পর্যাপ্ত পরিমাণে উহা বিক্রয় হয়। সহরের মধ্যে মহিষের মাংস আনিতে হইলে উহাকে বড় অথবা অল্প কিছু দ্বারা উত্তমরূপে আচ্ছাদন করিয়া লইতে হইবে, যেন ঘরা পড়িবার সম্ভাবনা না থাকে, নতুবা অর্ধদণ্ড অনিবার্য।

নেপালে গো-হত্যার রীতি নাই, তবে মশর, তামাং ও ভোটে এবং হিন্দুভারাপন্ন নেওয়ার জাতির অন্তর্গত অন্ত্যজ শ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে কালী, দমাই ও সাকি—এই তিন শ্রেণীর লোকেরা মরা গরুর মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে। নেপাল হিন্দুরাজ্য বলিয়া এখানে গো-হত্যা করিলে প্রাণদণ্ড হইয়া থাকে।

নেপালের ব্রাহ্মণেরা ‘কালিজ’ নামে এক জাতীয় পক্ষীর মাংস খাইয়া থাকেন। এই পাখীর আকৃতি অনেকটা মূর্গীর

মত। এতদ্ব্যতীত অন্ত্যজ জাতির বহু লোক কবুতর, তিতির আদি পক্ষীর মাংস খাইতে ভালবাসে। নেপালের ব্রাহ্মণেরা হংস কিংবা উহার ডিম্ব খান না। সেধানকার ছত্রি ও অন্ত্যজ জাতির লোকদিগের কিন্তু এই দুইটি দ্রব্য ভোজন করা সামাজিক রীতিবিরুদ্ধ নহে। কোনও নেপালী ব্রাহ্মণ বা ছত্রি কুহুট মাংসও ভোজন করেন না। অন্ত্যজ শ্রেণীর হিন্দুরা অবশ্য কুহুট-মাংস ও কুহুট-ডিম্ব ভক্ষণ করিয়া থাকে। পার্বত্য ভাষায় হংসডিম্বকে হাঁসেকুল এবং নেওয়ারী ভাষায় হাঁহেধে বলে, প্রথমোক্ত ভাষায় মূর্গীর ডিম্বকে কুখুখুল এবং নেওয়ারী ভাষায় খাঁধে বলা হয়। Sir Edward Blunt তাঁহার *The Social Economy of Himalayan* নামক গ্রন্থে (পৃ. ১২৬) লিখিয়াছেন :—“Poultry farming in Kumayan is confined to depressed classes only but in the neighbouring kingdom of Nepal. Conditions are quite different and every household owns a few hens and ducks.” এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে বিগত ১৩৫২ বঙ্গাব্দে কাঠমণ্ডু উপত্যকার বহু হিন্দুর বাটিতেও আমরা ছাঁদরেল চেহারার ঘোরগ ও মূর্গা দেখিয়াছি।

কোনও ভদ্রলোক বাড়ীতে আসিলে তাহাকে তামাক ও পানের মসলা দিয়া অভ্যর্থনা করাই ঐ দেশের চিরন্তন রীতি। সম্বল অবস্থার ব্যক্তির বাটিতে একটি রেকাবে করিয়া জলখাবার দেওয়া হয়। এই জলখাবারের উপকরণ হইতেছে মিষ্টায়, ছত্র ও দধি, চিউড়া (চিঁড়া), আলুভাড়া, ডিমের যামলেট ও আচার। এতদ্রূপলক্ষে তুলার বিছানা পাতিয়া দেওয়া হয়। অভ্যাগত উহাতে উপবেশনপূর্বক ভোজন করেন। উক্ত রেকাবের দুই পার্শ্বে দুইটি জলের গ্লাস দেওয়া হয়। তদ্ব্যপেক্ষ একটি গ্লাসের জল পান করা হয় এবং আর একটি গ্লাসের জল দ্বারা মুখ প্রক্ষালন করা হয়। ইহার পর পানের মসলা দেওয়া হয়। এই মসলাতে সুপারি, লবঙ্গ, দারুচিনি, শুকমেল (ছোট এলাচ), জিঙ্গান, কাজু, ওঁধর, সোপ, ছোরা, পেতা, মনকা, মিছরির কুচি বা টুকরা ও মাখন—এই কয়টি দ্রব্য থাকে।

বিষাক্ত যুগ

শ্রীবিষ্ণু দত্ত

নগরীর বৃকে ঘোলাটে চাঁদের স্নান আলো পড়ে নামি,
শেষ ট্রাম চলি গেছে তুলি তার খর্বর কোলাহল।
দূরে বহুদূরে হয়তো রয়েছে যুগ-অন্তর্ধামী,
কাজ নাই কিছু, শুধু আছে তার বিচার করার হল।

পথ-ভিখারীরা রাজপথে পড়ি পোছাইছে কাল রাত্তি,
আগামী কালের দিনের আলোতে আছে কিছু আশ্বাস ?
হয়তো সহিবে ক্ষুধার যাতনা, হয়তো নেশার মাত্তি
দেখিতেও পারে নবীন যুগের ক্ষণিক পূর্বাভাস।

কারাগারীদিগের অন্তরালেতে এখন জাসিছে কারা ?
এ যুগকে শুধু মেনে নিতে হবে, যদি বিষাক্ত তার
বাহু ছুটি মেলি ক’রে ফেলে প্রাণ। হে কবি আত্মহারা,
আমাদের তবু তার কাছে আজ নিষ্কৃতি নাই আর।

সাগর-বেলায় ফুঁসিতেছে শুধু নীল সাগরের ঢেউ,
কোথায় শান্তি ? কবে হবে বসো এ যুগের সব শেষ ?
জনগণ-মনে উঠিয়াছে ক্ষোভ, তোমরা দেবেছ কেউ ?
এ যুগের শেষে হয়তো দেখিব “সকল পাওয়ার দেশ”।

কণ্টোলার দিনকাল

শ্রীসুখমা সেনগুপ্ত, এম-এ

ধোপার সঙ্গে দিশাবটা কেবল মেলাতে আরম্ভ করেছেন গিন্নী—“অ, কেশব, তুমি তো ভোবাবে বাবা এই রেশনের দিনে, এ ধোপেও বাবুর ধুতি একধালা দাও নি, গত ধোপের বাকী গেলিটা ভো বসছ এ বারেও আন নি, এ ভাবে তো চলে না বাছা, বাবু তো শুনলে রোগে অনর্থ করবেন।” হঠাৎ পক্ষীর আড়াল থেকে আওয়াজ এল—“মা এশম এনেছি, কোথায় রাখব বলে দিন শীগ্গির, কাছের টাইন্ চলে যায়।” (কি-চাকররা আজকাল সময়কে বলে টাইন্)। একটু বিরক্ত হয়েই উত্তর দেন গিন্নী “রাখ না বাছা, ওঘরের মটকিতে, এত দিন ধরে কাজ করছিস, এর এত বলাবলি কি? আমার তো দশটা হাত নেই।” চাকর চলে যায়। হঠাৎ কি মনে পড়ে, গিন্নী ছুটে যান পাশের ঘরে। হরি সব মটকির ওপর থেকে সারি সারি সাজানো তিনটে লস্প্যান নামিয়েছে, সেদিক পানে হাত বাড়িয়ে বলেন, “ও হরি, থাম থাম বাবা। দেখি কি চাল দিয়েছে, ভুলেই গেছলাম, ধুতি হারানোর তালে।” একটু ধেমঃ “ওমা, এ যে দেখছি আতপ চাল দিয়েছে, ঠাঁড়া, ঠাঁড়া, মটকিতে ঢালিস না বাছা, দেখি একটু”—এই না বলে গিন্নী সারি সারি টিন, লস্প্যান এসবের ঢাকা খুলে নতুন আনা চালের সঙ্গে মিলিয়ে দেখেন, কোনটার সঙ্গে মিলে না। হরি ঝাঁঝালো সুরে বলে ওঠে, “মা, একটু ভাড়াভাড়ি করুন, চারের বাসন পড়ে আছে, ঘর মুছেতে বাকী।” সংসার যেন তারই। গিন্নী বলেন অপরাধীর মত, “তা বাবা। একটু দেরি হ’ল, কিন্তু কোনটার সঙ্গেই তো মিলছে না, যা লক্ষ্মী সোনা দৌড়ে নীচের থেকে আর একটা টিন নিয়ে আর।” “টিন আর কোথায় পাব মা? এই তো এ ঘরেই সাতটা রয়েছে। ওঘরে চার রকমের ময়দা, আটা, চারটি টিনে রেবেছি, তারপর দু-রকমের চিনি আছে আলাদা আলাদা টিনে, গত বার আপনি তাই তো লস্প্যানে চাল আটা সব রাখলেন, ভুলে গেলেন নাকি?” অপ্রস্তুত হয়ে গিন্নী বলেন, “তাই তো, তাই তো, মনের কি আর কিছু ঠিক আছে বাবা। নানারকম বন্দে, আচ্ছা ঠাঁড়া একটু, ও কেশব, চলে যেয়ো না, একটু বসো বাছা”—হেঁকে বলেন ধোপাকে উদ্দেশ্য করে। তারপর চলে যান নীচে। বাসনের সিন্দুক খুলে বের করে আনেন দাগধরা একটা বড় পেতলের হাঁড়ি। বাপ দিয়েছিলেন বিয়ের সময়, সেকালের ভাঁড়ী জিনিষ, আজকালকার হাক। এগুয়িনিয়মের বাসনের আমলে কাছে লাগে না, তোলাই আছে। এনে ঘরে নামান, হাঁপাতে হাঁপাতে বলেন, “নে বাবা টাল এতে।” ঘরের মধ্যে সাজানো অজস্র টিন, হাঁড়ি, প্যান, একটার ওপর আর একটা। কোনটাতে এক পো চাল,

কোনটাতে আধ সের, কোনটাতে এক সের, সব ভিন্ন ভিন্ন রকমের চাল, মেলাতে পারেন না গিন্নী। সে কালে ছিল বটে, চিনিওড়ো চাল, বাতাসাভোগ, গোবিন্দভোগ, কাটারী-ভোগ, কত কি, কি তাতে সুগন্ধ, আর কি তার স্বাদ। তা সে সব চলে গেল কোথা? ভাবেন গিন্নী, এখনকার রেশনের পঞ্চাশ রকমের চাল, সবই অধাত, তবু একটার সঙ্গে আর একটাকে মেলাতে প্রবৃত্তি হয় না।

ঘরের এক কোণে টেবিলে বসে মেয়ে পড়া করছিল। পেতলের হাঁড়ি মেখে ফেপে ওঠে “আচ্ছা মা, তোমার কি হয়েছে বলত? পড়ার ঘরটাকে তো ভাঁড়ার করে তুললে, বরং ভাঁড়ারটাই পরিষ্কার করে দাও, সেখানেই গিয়ে পড়া-শুনো করি।” মা বলেন, “তা কি করবে মা, যখনকার যে হাল, তা বুকে তো চলতে হয়। তোমরা হলে গিয়ে মেয়ে-ছেলে, এটুকু বুদ্ধি-বিবেচনা তো তোমাদের থাকে উচিত। এই দুর্বৎসরে চাল ভাঁড়ারে রাখলে কি আর হুগা কুলোত? ওপরে রাখি বলেই না কিছু জমেছে। নইলে সব সাবাড় হয়ে যেত।” “তা ভাঁড়ারে তোমার অত বড় ভালাটা ঝুলছে, এ অবস্থায় চুরিই বা হবে কেমন করে।”—জবাব দেয় মেয়ে। “তালা দিলে কি হবে? ভাঁড়ার দিয়ে, কুটনো কুটে ওপরে তো এলাম। সঙ্গে সঙ্গেই হয় দুটো তেজপাতা চাই, নয় নয়ম-মশলা, নয় বেশন, এমন একটা না একটা ছুতো করে বার বার কি-চাকরগুলো ওপরে আসবেই—চাবি ওদের হাতে দিতেই হয়, পারি না বাবা বার বার ওপর নীচ করতে।...তা মশলা-পাতি কিছু তো ওপরে আনি নি, চাল হ’ল গিয়ে লক্ষ্মী, তাকে অশ্রদ্ধা করতে নেই, আছে এক পাশে, তাতে তোমার পড়ার ক্ষতিটা কি হচ্ছে বল? বার বার পারি না বাপু ওপর নীচ করতে মোটা শরীর নিয়ে।” “না, ক্ষতিটা আর কি, তবে আরগুলো আর হাঁহরের উৎপাতে ঘরে টেকা দায় হ’ল যে। তা চাল যখন হ’ল গিয়ে লক্ষ্মী, এক কাজ কর না কেন, ড্রিং-রুমের এক পাশে সাজিয়ে রেবে দাও। লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান ঠিক জায়গায়ই হবে।” লেখাপড়া জানা মেয়ের লম্বা লেকচার শুনবার সময় নেই, পড়ে রয়েছে শত কাজ, করবার সময় নেই, ঘর থেকে বেরিয়ে যান গিন্নী। শুধুই যে মেয়েদের পড়ার ঘরে তা নয় নিজেও শোবার ঘরে, খাটের নীচে, দরজার আড়ালে, আলমারীর ফাঁকে রয়েছে আটটা টিন, ঘিয়ের টিন, চিনির বয়াম, বাতাসার কোটা, ওড়ের ভাঁড়, তবে অতটা চোখের উপর নয়, কর্তার নজর এড়িয়ে। মাঝে মাঝে কর্তা বলেন একটু লেখাপড়ার চর্চা করতে, করত করত করে উড়ে বেড়ায় আরশোলা—টেটিয়ে ওঠেন

কর্তা, “তোমার ভাড়ার নীচে সরাবে কিনা বল। নয়তো ভাড়ারখর পরিহার করে দাও। আমি না হয় সেখানে গিয়েই আশ্রয় নিই।” এসব কথাই জবাব দেন না গিন্নী, লংসারে থাকতে হলে এসব কথাই কান দিলে কি আর চলে।

কর্তার পাঞ্জাবী সব ছিঁড়ে গেছে। কিন্তু কালোবাড়ীয়ে কাপড়-চোপড় কেনবার পক্ষপাতী নন তিনি। গিন্নী আর ছেলেমেয়ে বাড়ীঘর সবাইকে স্পষ্টাক্ষরে একথা জানিয়ে দিয়েছেন—ওসব চলবে না।

সবাই ধেয়ে-ধেয়ে বেরিয়ে গেলে, কাপড়ের কার্ড ক’খনা হাতে নিয়ে গিন্নী দীর্ঘ মন্থর গতিতে রওনা হন রেশনের কাপড় আনতে। এবারে লোকানে এসেছে শুধুই ড্রিল। তাই কেনেন ১২ গজ, কিছু পাওনা কাপড় বাকি রেখেই ফিরে আসেন, কর্তার পাঞ্জাবী না বানালেই নয়। অথচ ওমাসে উনি টাউজার বানাবার জন্ত বাজারে কাপড় বুঁড়ে না পেয়ে, দোকান থেকে অর্ডার দিয়ে বানিয়ে আনলেন, তাতে খরচ পড়ল চের বেশী।

বিকেলে ইকুল থেকে বাড়ী এসে মেয়ে বলে, “মা, তুমি ক্ষেপেছ, ড্রিল দিয়ে পাঞ্জাবী হবে কি করে?” “তা কি করি মা, সব তো আর ইচ্ছেমত পাওয়া যায় না, যা দিনকাল পড়েছে।” কর্তা দেখে বলেন, “ঠিক আছে, ওটা সংস্কার বই তো নয়। যে কাপড়ে প্যান্ট কোট তৈরি হয় তাতে পাঞ্জাবী হবে না, এ কোন শাজ্জে লেখা আছে? সবাই পরতে শুরু করলে হু’দিনেই চালু হয়ে যাবে।”—সপ্তাহ ধানেক বাদে কর্তার গায়ে চড়ে ড্রিলের পাঞ্জাবী।

আর তিনখানা কার্ডের কাপড় পাওনা আছে। সামনের সপ্তাহে যেতে বলে দিয়েছে, মিহি কাপড় আশতে পারে। নির্দিষ্ট তারিখে গিন্নী গিয়ে দাঁড়ান লাইনে, বৈষ্যের চরম পরীক্ষার উত্তীর্ণ হয়ে পান বেশ চমৎকার মিহি মলমল। ভাবেন, আহা, কিছুদিন অপেক্ষা করলেই হ’ত, মোটা মানুষ গরমে এই ভারী পাঞ্জাবী গায়ে দিয়ে বেড়ান, তা রেশনের কাপড়-ওয়ালারা শুধু মিথ্যা আশ্বাস দেয় এটাই তো হামেশা দেখে আসছি, এরা যে আবার সত্য কথা বলবে তা কে জানত। মলমল নিয়ে আসতে কর্তা বলেন, “পাঞ্জাবী তো হ’ল, এখন চারটে পারজামা করিয়ে নিই এবারকার কাপড় দিয়ে।” ধুতি পরা ছেড়েছেন বহুকাল, আপিসে যান প্যান্ট কোট পরে, বাড়ীতে পারজামা। গিন্নী বলেন, “সে কি গো, এই পাতলা কাপড়ে পারজামা?” কর্তা বলেন, “তাতে কি হয়েছে, কিন্ন-কিনে ঢাকাই, শান্তিপুরে ধুতি পরতে দেখি বাবুদের? এত পাতলা কাপড় পরা যদি চলতে পারে তো পারজামার কথাই চমকানোর কি আছে?”

হাফা মলমলের পারজামার ওপর মোটা জিনের পাঞ্জাবী চড়িয়ে নিরীকার চিন্তে ঘুরে বেড়ান কর্তা, হাটে বাজারে পার্কে। হুশানা ধুতি আছে, শুভবিশ্বাসী হয়ে নিম্নগণের

আসর ইত্যাদিতে গিয়ে লৌকিকতা রক্ষার সেই একমাত্র সম্বল।

“মা, একটা টাকা দিও, আজ সেলাইয়ের কাপড় দেবেন বলেছেন টিচার” মেয়ে এসে জানায়। হঠাৎ গিন্নী প্রশ্ন করেন, “আচ্ছা তোদের ইকুলেও রেশন কার্ড দেয় নাকি রে? কাপড় কেনে কোথা থেকে?” “ও, সে আমাদের সরকার থেকেই দেয়, দরখাস্ত দিতে হয়।”—বিজ্ঞের মত জবাব দেয় মেয়ে।

মেয়ে বিকেলে ইকুল থেকে হু’ টুকরো কাপড় এনে দেখায়, চমৎকার মিলের শাড়ী-কাটা একটা টুকরো, একটা টুকরো, ধুতি-কাটা। “এ কিরে। আহা, এমন কাইন শাড়ী ধুতি কেটে এ দশা করলে গো। তোদের টিচারদের এ কি কাজ?” “বাঃ রে, এ ছাড়া কি আর করবে, আমাদের যে সেলাই শেখবার জন্য সরকার থেকে কাপড় বলতে পাঠিয়েছে শুধু ধুতি আর শাড়ী, তাই দিয়েই নাকি কাজ চালাতে হবে। তাই তো কেটে কেটে দিচ্ছে আমাদের সব, এক টুকরো দিয়ে হবে রাউজ, আর এক টুকরোতে কুমাল করতে হবে আমাদের।” গিন্নীর পরনে রঙীন লংস্লিভের শাড়ী, পুরনো পাড় বসানো। তিনি ভাবেন মনে মনে, হাড় জ্বালানে সরকার, ব্যবসা যদি ঠিকমত করতেই না পারবি তো ককি নেওয়া কেন খাড়ে? তোদেরও জোড়াতালি, আমাদেরও হয়রানি।

* * *

এদিকে ভোরের বেলা চায়ের টেবিলে বসে ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে টেচিয়ে ওঠে, “মা, বুড়ি কেন সকালেই?” কর্তা বলেন, “হুম থেকে উঠেই বুড়ি চিবোবার মত দাঁতের জোর কি আর আছে? চা দাও এক পেয়লা, গিলে উঠি।” “পাঁটুরুটি পাওয়া যাচ্ছে না।”—বললেন গিন্নী। কর্তা বলেন, “হাতে গড়া রুটি তো চলতে পারে।” “রেশনে আটাই নেই ক’ হপ্তা ধরে, তা হাতগড়া রুটি।”

হুপুরে বেতে বসেন কর্তা, গিন্নী সামনে বসেন হাত-পাখা নিয়ে, এটা দীর্ঘকালের অভ্যাস। পাতে পড়ে ডেলা ডেলা ভাতের দলা, গরম হয়ে ওঠেন কর্তা, “ঠাকুর ভাত চড়িয়ে কোথায় বুঝেওসর্গ শ্রাদ্ধ সারতে গিয়েছিলে, ভাত যে একেবারে পুলিশিঠে হয়ে উঠেছে।” ঠাকুর উত্তর দেয়—“তা কি করব বাবু, একে আতপ চাল ভাত আবার নয়া পুরোনো মেশানো, পুরোনো চাল সেজ হতে-হতে নয়া চাল যায় গলে, তা আমি কি করব।” গিন্নীর ওপর চটে ওঠেন কর্তা “বলি টিনে টিনে রকমারি চাল সাজিয়ে তো গোটা বাড়ীটাকে চালের একটা প্রদর্শনী করে তুলেছ। এখনকার রেশনের চালের সঙ্গে সর্ব চাল না মেশাবার জন্তে রোজ তারতরে ঠাকুরকে যে নির্দেশ দিয়ে থাক তাও কানে আসে। ও সর্ব চাল রেবেছ কি আমার শ্রাদ্ধের জন্ত?” গিন্নী বলেন, “কথার ছিঁরি দেখ না, ওই দুটি তো মোটে চাল, অহুধ-বহুধ আছে, লোকজনকে বাঁচানো-দাওয়ালা আছে, মেয়ে জামাই আত্মীয় বৃষ্টম আসে—” দুটি

কমা না রাখলে চলে কি করে?” চুপ করে যান কর্তা, সেই ভাতের ওপর ডাল ঢেলে নিয়ে গর্জে ওঠেন—“তা ভাতের নামে তোমার পুলিশিঠেই না হয় গিলতে হবে কিন্তু ডালে এমন ঝোঁরাটে ঝোঁরাটে গজ কেন? এসব কি তুমি পিণ্ডি চটকাচ্ছ ঠাকুর।” মুখ কাঁচু-মাচু করে বলে ঠাকুর, “গজ। পোড়া তো লাগে নি।” নির্ঝিকার ভাবে ডালের বাটি নাকের কাছে তুলে বলে, “ওঃ। ঝোঁরার গজ হবে, বাবু ও কিছ না, ভালটা হতে হতে আঁচটা নিবে গেল কিনা, তা ছুটি করলা দিয়ে হাওয়া করে আঁচটা ঠিক করে নিলাম, নইলে তো আপনাদের টাইনের ভাত হবে না। তা কণ্ট্রোলে এবার করলা দিয়েছে একদম কাঁচা, বেজার ঝোঁরা উঠল, ডালটা উত্থনের ধারে ছিল কিনা তাই একটু গজ হ’ল বটে, তা খেয়ে নিন্, কি আর করবেন? কণ্ট্রোলের বাজারে এমন একটু আধটু হয়।”—বলে ঠাকুর নির্ঝিকারভাবে পরিবেশনে মনো-নিবেশ করে। অনেক দিনের পুরোনো লোক, কর্তার ধমকানি তার গা-সওয়া হয়ে গেছে। কর্তা আর কথা বলেন না, ডালের ওপর ঝোল তরকারি সব ঢেলে নিয়ে কোনমতে

গলাধঃকরণ করেন নিঃশব্দে। ঝাওয়া শেষ হলে উঠতে উঠতে গিন্নীকে বলেন, “দেখ, এক কাজ করা যাক, কি দরকার এত সব ঝামেলার? সকালে উঠে এক হাঁড়ি জলে চাল, ডাল, তেল, মুন, তরকারি, মশলা একত্র মিশিয়ে ঘেঁটে নিলেই ল্যাঠা চুকে যায় আর ঠাকুর চাকরের খরচটাও বাঁচে।”

সবাই খেয়েদেয়ে চলে যায়। গিন্নীর চোখে জল এসে পড়ে। কর্তা চিরকাল ঝাইয়ে লোক, তাঁকে যে অবাচ্চ গলাধঃকরণ করে কোন মতে পিড়রক্ষা করতে হয় এ ছুঃখ তাঁর মনে বড় বাজে। মনে মনে কণ্ট্রোলের দিনকালকে তিনি অভিসম্পাত দেন। খেয়ে উঠে ভাবেন, বিকেলে কি জলখাবার করি? হঠাৎ মনে পড়ে রেডিম্বোতে শুবেছিলেন কুমড়োর হালুয়া, আর চালকুমড়োর পোলাও, এ দুটির প্রস্তুত-প্রণালীর কথা। অর্ধে জলে যেন ডাঙার আশ্রয় পান গিন্নী। রান্নাঘরে গিয়ে বসেন তরকারির ডালা নিয়ে। কুচি কুচি করে কাটতে থাকেন কুমড়া আর চালকুমড়া—তাই দিয়ে তৈরি হবে কণ্ট্রোলের দিনের অভিনব হালুয়া আর পোলাও।

ফারমেটেশন

অধ্যাপক জীসুবর্ণকমল রায়

এ বিশ্বজগতে প্রাণিদেহ এবং বিভিন্ন বস্তুর রূপান্তরের মূলে যে রাসায়নিক প্রক্রিয়া বিজ্ঞান সাধারণের তাহা জানা নাই। ক্ষুদ্র উদ্ভিদ-বীজের বিশাল মহীকুহে পরিণত হওয়ার মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়ার একটি প্রশস্ত অধ্যায় নিহিত আছে। পাহাড়ের ক্রমবিবর্ধন বা ক্রম-সংকোচন, ছুগের অল্পতাপ্রাপ্তি, পচনশীল বস্তুদি ময়লতাপাতা, জীব-জন্তুর পুষ্টিগতময় অবস্থা, বাতব পদার্থের মরিচা, অগ্নি-কর্তৃক কাঠদাহন প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয়—এ রাসায়নিক প্রক্রিয়ারই বৈচিত্র্যের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। জলজ চিনি যেদিন সুরাসারে পরিণত হইয়াছে সেই দিন হইতে রসায়ন-শাস্ত্রের কিধন বা ফারমেটেশন অধ্যায়ের সূচনা হইয়াছে। ইহা রসায়নশাস্ত্রবিদগণ কর্তৃক প্রাকৃতিক পরিবর্তনের দিক দিয়া বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।

প্রকৃতির মহলে সংযোজন ও বিয়োজন অনবরত প্রকট। ফারমেটেশন সাধারণতঃ রাসায়নিক বিয়োজনের অঙ্গ। ইহার ফলে উত্তাপ বৃদ্ধি পায় আবার কখন কখন গ্যাস সৃষ্টি হয়। ইহার প্রকৃত স্বরূপ কি, ইহার কাজই বা কি এ প্রশ্ন স্বভাবঃ মনে উদ্ভিত হয়। এক প্রকার সূক্ষ্ম জীবাণু বা উদ্ভিদ-শরীর ফারমেটেশনের উৎপাদক বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

উহার নিজেই অথবা উহাদের প্রতিনিধিগণ ফারমেটেশন উৎপাদনকার্য সাধন করে। এ প্রতিনিধিগণ রাসায়নিক জৈব পদার্থ এবং প্রোটিন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। বিজ্ঞানীরা উহাদের এনজাইম বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

ফারমেটেশন কথাটি কিন্তু বহুদিন আগেকার। প্রাচীন-কালে চিনি বা শুড় হইতে সুরাপ্রস্তুত-পদ্ধতির নাম ছিল ফারমেটেশন। উক্ত ব্যাপারে একটি গ্যাস উৎপিত হইতে দেখিয়া সম্ভবতঃ এ নামটা দেওয়া হইয়াছিল। উক্ত গ্যাসের উৎপত্তি ও ক্রমবিলীম্বমানতাই ফারমেটেশনের পরিচয় দিত। পুরাতন মিশরীয়গণ মদ তৈয়ার করিবার প্রণালী জানিতেন। ক্রমে ফরাসীদেশ ইহা বিশেষ করিয়া গ্রহণ করে এবং প্রস্তুত-প্রণালীটির সম্যক উন্নতিসাধন করে। বর্তমানে পৃথিবীর সমস্ত সভ্যদেশে মদ প্রস্তুতের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। আশ বা সেলুলুজ, খেতসার ও শর্করা প্রভৃতি পদার্থকে সাধারণতঃ সুরায় পরিণত করা যায়। যদি আর্দ্র তৃণ বা গুড়কুটাকে কোথাও শুপাকারে সঞ্চিত করিয়া রাখা হয়, কিছুদিন পরে দেখা যাইবে উহাদের মধ্যে পচন আরম্ভ হইয়াছে। এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় উহাদের মধ্যে তাপোদ্ভেদ হইয়াছে। ফেলিয়া রাখিলে ফল, মূল, পত্র, কুল ইত্যাদি পদার্থেরও একই

পরিণত হয়। জীবশরীরও এই অবস্থায় পলিভূগলিত পুষ্টি-গন্ধযুক্ত হয়। এগুলি সবই কারমেণ্টেশনের দৃষ্টান্ত। বৃক্ষচ্যুত পত্র বা ডালপালা ডোবা বা পুকুরে পতিত হইলে ক্রমশঃ পচিয়া একটি গ্যাস উৎপাদন করিয়া থাকে। ইহা কারমেণ্টেশনের আর একটি উদাহরণ। এমনকি ভূগর্ভে কয়লায় উপস্থিতও কতকটা কারমেণ্টেশনের দরুন হইয়া থাকে।

কারমেণ্টেশনের স্থগির রাসায়নিক তাৎপর্যটি কি? কোন অদ্ভুত একেণ্ট ইহার পেছনে আছে কিনা। এ সমস্ত প্রশ্ন লইয়া অনেক জল্পনাকল্পনা হইয়াছে। এদিকে বহু বিজ্ঞানী নিজেদের অভিজ্ঞতার ফলাফল ব্যক্ত করিয়াছেন। উক্ত গবেষকদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক লাভোর্সিও, গে-লুজাক, গান্ডুর, ট্রিবে, বুকনার প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। লাভোর্সিও প্রমাণ করেন যে যদ্য প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গে যে গ্যাস উৎপন্ন হয় তাহা অজ্ঞার গ্যাস। গে-লুজাক দেখাইলেন যে, কারমেণ্টেশনে বায়ুর বিদ্যমানতা একান্ত আবশ্যক। কগনিয়ার্ড প্রমাণ করেন যে ইষ্ট নামক যে ক্ষুদ্র জৈব পদার্থ দ্বারা চিনি পচান হয়, তাহা একটি অতি সূক্ষ্ম এক-কোষ উদ্ভিদশরীর। তিনি ইহাও প্রমাণ করেন, প্রথমে অক্সিজেনগম হইয়া ইষ্ট ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। মনীষী পাস্তুর বলেন, কারমেণ্টেশনের পিছনে ক্ষুদ্র জীবাণু ক্রিয়া বর্তমান। উহাদের পরিবর্তনে কারমেণ্টেশন সম্ভাব্য হয়। পাস্তুরের গবেষণা বিখ্যাত জ্ঞানভান্ডারের পুষ্টিসাধন করিয়াছে। কিন্তু তিনি কারমেণ্টেশনের রাসায়নিক ব্যাখ্যার দিকে বিশেষ অবহিত হন নাই। ১৮৫৮ সনে ট্রিবে যে বিশ্লেষণ উপস্থাপিত করেন তাহার মোটামুটি যুক্তিযুক্ততা বৈজ্ঞানিক জগৎ গ্রহণ করিয়াছে। ট্রিবে বলেন যে উক্ত প্রক্রিয়াটির পিছনে একটি রাসায়নিক পদার্থ সক্রিয় থাকে। এই পদার্থটি নিজ দেহ হইতে ক্ষুদ্র জীবাণু সরবরাহ করে। কারমেণ্টেশনের স্বরূপ ও ক্রিয়া সম্বন্ধে ট্রিবের ব্যাখ্যা মনীষী বুকনার কর্তৃক বিশেষভাবে সমর্থিত হয়। বুকনার ইষ্ট পিষিয়া নির্ধাণ গ্রহণ করেন এবং প্রমাণ করেন যে উক্ত রস দ্বারাও কারমেণ্টেশন সমুৎপন্ন হইতে পারে। তিনি ইষ্টের মধ্যে ‘জাইমেজ’ নামক এনজাইমটির বিদ্যমানতা নির্ধারণ করেন। এনজাইম গোষ্ঠীর মধ্যে জাইমেজের সঙ্গেই প্রকৃতপক্ষে আমাদের প্রথম পরিচয় স্থাপিত হয়।

এনজাইম সরবরাহের ক্ষুদ্র জীবাণুসকল উপযুক্ত আয়োজন করিয়া রাখিয়াছে। এই জীবাণুদের সহায়তা ছাড়া এনজাইম পাওয়া কঠিন। উহাদের সরবরাহের ব্যবস্থা অতি চমৎকার। উহার অতি শান্ত আবহাওয়ার মধ্যে কারমেণ্টেশন স্বজন করে। অত্যন্ত কঠিন জটিল রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মধ্যে পর্যাপ্ত

উহার তাপের সমতা রক্ষা করিতে পারে। দেখা গিয়াছে, কারমেণ্টেশন বা পচন-ক্রিয়াকে সাধারণতঃ উষ্ণতা থাকে ৩০°—৪৫° মাত্র। মাহুষের রাসায়নিক বিক্রিয়া ও প্রাকৃতিক রাসায়নিক বিক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য এক্ষেপে সম্যক অজ্ঞাত হয়।

ইষ্ট কোষগুলি এনজাইম (জাইমেজ ইত্যাদি) কোপান দিয়া চিনিকে মদে পরিণত করে। কারমেণ্টেশন ব্যাপারে এনজাইমের এরূপ আরও অনেক প্রকার কর্মতৎপরতা দেখা গিয়াছে। কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবাণুদ্বারা যে বহুবিধ কারমেণ্টেশন সম্ভাব্য হয় তাহার প্রমাণও বিরল নহে। সেখানেও সম্ভবতঃ এনজাইমগুলির ক্রিয়া বিদ্যমান থাকে। বুটাইল এসকহল, এসিটোন, এসেটিক এসিড প্রভৃতি কতকগুলি জৈব পদার্থ প্রকৃতিতে ক্ষুদ্র জীবন্ত কোষের ক্রিয়া আমরা প্রত্যক্ষ দৈখিতে পাই। কারণ এই সমস্ত রাসায়নিক পদার্থ তৈয়ার করিবার ক্ষুদ্র জীবাণুদের সাহায্য লওয়া হয়। উদ্ভিদ জাতীয় সূক্ষ্ম কোষের কর্মতৎপরতা ইষ্টের মধ্য দিয়া প্রমাণিত হয়। অজুরিত বালি বা মণ্টদ্বারা খেতসার যে কারমেণ্টেজ হয় ইহারও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। আজকাল মদ প্রকৃতিতে কাঁচামাল হিসাবে খেতসারই ব্যবহৃত হয়। ইহা মণ্ট ও ইষ্টের মিশ্রণজাত প্রক্রিয়াজাত ক্রমশঃ মদে পরিণত হয়। এক প্রকার ব্যাঙের ছাতা বা মউল্ড (mould) দ্বারাও কারমেণ্টেশন উৎপাদন সম্ভব হয়। জার্মানী, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, ইটালী ও স্পেন প্রভৃতি স্থানে মদ প্রকৃতিতে এই মউল্ডই ব্যবহৃত হয়। মিউকব বিটা বা মিক্রোপাস নামক এক জাতীয় ছত্রাক (mushroom) খেতসারকে বিচূর্ণ করিয়া মদ প্রস্তুত করে। সে সমস্ত জীবাণু বা কোষ কারমেণ্টেশনের মূল্যবান তাহাদিগকে কারমেণ্ট নামেও অভিহিত করা হয়। কারমেণ্টগণ উপযুক্ত আহার পাইলে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। সাধারণতঃ উহার নাইট্রোজেন, কফরস, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম যুক্ত খাদ্য পছন্দ করে। উক্ত মৌলিক পদার্থযুক্ত খাদ্য সরবরাহ করিয়া ইষ্ট ব্যবসায়ীগণ প্রচুর ইষ্ট তৈয়ার করেন। এনজাইমগুলি প্রোটিনজাতীয় রাসায়নিক পদার্থ। কারমেণ্ট নামক সূক্ষ্ম কোষগুলিতে যথেষ্ট এনজাইম থাকায় আজকাল এরূপ কোন কোন রাসায়নিক পদার্থ মদ্য-খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হইতেছে। বলবর্দ্ধক খাদ্য বা ঔষধ হিসাবে ইষ্ট বটিকা বাজারে নাম করিয়াছে।

কারমেণ্টেশন দ্বারা ল্যাকটিক এসিড ও সাইট্রিক এসিড প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হয়। ল্যাকটিক কারমেণ্ট নামক একটি জীবাণু দুষ্ট হইতে ল্যাকটিক এসিড আহরণ করে এবং এলপার গিলাস নাইগার জাতীয় ছাতা গ্লুকোজকে সাইট্রিক এসিড রূপে দিয়া থাকে।

রাষ্ট্রের গোড়ার কথা

শ্রীআশা মূলী

রাষ্ট্রের গোড়ার কথা বলতে গেলে মানুষের সামাজিক জীবনের ক্রমবিকাশের কথা প্রথমে বলতে হয়। মানুষ সামাজিক জীব, সমাজ ছাড়া তার চলে না। রাষ্ট্র সমাজেরই একটি বিশেষ অঙ্গ। প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে গ্রীক দার্শনিক এ্যারিস্টটল রাজনীতি বিষয়ক তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থে লিখেছিলেন, 'মানুষ রাষ্ট্রীয় জীব' (political animal)। গ্রীক-সমাজে তখনকার দিনে সমাজ বলতে রাষ্ট্রই বোঝাত। সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে যে বিশেষ কোনও পার্থক্য আছে তা গ্রীক মনীষীরা মানতেন না। রাষ্ট্রের যখন সৃষ্টি হয় নি, তখনও মানুষ ছিল সামাজিক জীব। সমাজে এক একটি গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে তারা বাস করত। রাষ্ট্রের গোড়া-পত্তন কবে থেকে হ'ল, সে বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করতে হলে সমাজের ক্রমোন্নতি কি করে হ'ল, সেইটে আগে দেখতে হয়।

সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে দার্শনিকেরা গবেষণা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন, মানুষ রাষ্ট্রের ভিত্তি পত্তন করে পারম্পরিক চুক্তির দ্বারা। চুক্তিটি নিষ্পন্ন হবার আগে মানুষ ছিল নিছক প্রকৃতির সন্তান। যে জগতে সে বাস করত তাকে বলা চলে প্রকৃতির রাজ্য। সে রাজ্যে মানুষ প্রকৃতির নিয়মের দাস ছিল। মানুষের তৈরী আইন কাহ্নন মেনে চলবার কোনও বাধ্যবাধকতা সেখানে ছিল না। সে রাজ্যে না ছিল রাজা, না ছিল প্রজা। বিভিন্ন দার্শনিক এই প্রকৃতির রাজ্যের বিভিন্ন প্রকার বর্ণনা করেছেন। ইংরেজ দার্শনিক টমাস হব্‌স তাঁর বই *Leviathan*-এ এই প্রকৃতির রাজ্যের যে বর্ণনা করেছেন, তা ভয়াবহ। তাঁর মতে তখন মানুষের একমাত্র চিন্তা ছিল 'কি করে আর একজনের সর্বনাশ করা যায়।' তিনি বলেছেন সেই আদিম যুগে—'A life was solitary, poor, short, brutish, nasty'। এ ধরনের জীবন যাপন করে যখন মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠল, তখন সবাই মিলে নিয়ন্ত্রিত মর্মে এক চুক্তি করলে। তারা সম্মিলিত ভাবে বললে, 'আমাদের প্রত্যেকের শক্তি আমরা আজ থেকে একজনের হাতে দিয়ে দিলাম, আমাদের সম্মিলিত শক্তি সেই একজনকে মহাশক্তিশালী করে তুলবে। আজ থেকে সে হ'ল আমাদের রাজা, আর আমরা হলাম তাঁর প্রজা। এই রাজার আদেশ নির্বিশেষে মেনে নিতে আমরা বাধ্য।' রাজা হলেন সর্বশক্তিশালী, তাঁর বিরুদ্ধে প্রজার আর কোনও শক্তিই রইল না, হব্‌সের মতে এই হ'ল রাষ্ট্রের ভিত্তিপত্তনের মূল কথা। প্রকৃতির রাজ্যের যারপায় এবার এল মানুষের রাজ্য বা রাষ্ট্র। লঙ্‌ তাঁর *Treatise of Civil Govern-*

ment-এ আবার প্রকৃতির রাজ্যের অন্তরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেন, মানুষ প্রকৃতির রাজ্যে মোটের ওপর সুখেই ছিল, কিন্তু তাদের শাসন করবার কেউ ছিল না বলে, মানা রকম অসুবিধা তাদের ভোগ করতে হ'ত। সবাই মিলে তখন তারা এক চুক্তি করে একটি শাসনতন্ত্র তৈরী করলে। সকলের সম্মিলিত শক্তি এই শাসনতন্ত্র বা গবর্নমেন্টকে ক্ষমতা-শালী করে তুললে। কিন্তু গবর্নমেন্টের এই দায়িত্ব রইল যে, তার সকল শক্তি সর্বসাধারণের হিতকর কাজে লাগাতে হবে। ক্ষমতার অপব্যবহার হলেই তার ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হবে। যতদিন গবর্নমেন্ট এই সর্ব মেনে চলবে ততদিন সবাই তাঁর নির্দেশ বা আইন মেনে চলতে বাধ্য। এমনি ভাবেই সৃষ্টি হ'ল শাসক ও শাসিত এই দুই সম্প্রদায়—যাদের নিয়ে গঠিত হ'ল রাষ্ট্র। ফরাসী দার্শনিক রুশো তাঁর *Contract Social*-এ লিখেছেন, প্রকৃতির রাজ্যের মূল ছিল স্বর্গমূল। মানুষ সে-মুগে নিজেদের পরম সুখী মনে করত। অবাধ স্বাধীনতা ছিল তার, কোনও রকম সামাজিক বিধিনিষেধ ছিল না। অতঃপরে রাজ্যেও এমন কয়েকটি অসুবিধা দেখা দিলে যাতে মানুষ উপলব্ধি করলে যে, তার শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করবার জন্তে শাসকের প্রয়োজন, আইনের প্রয়োজন। তখন তারা নিজেদের মধ্যে এক চুক্তি করে, সকলের ইচ্ছা বা will দিয়ে সম্মিলিত এক ইচ্ছাশক্তি বা General will গড়ে তুলল; স্থির হ'ল এই General will কার্যকরী হবে গবর্নমেন্টের হাত দিয়ে, যার আদেশ বা আইন মেনে নিতে সবাই বাধ্য। মানুষের অবাধ স্বাধীনতা গেল, কিন্তু গড়ে উঠল রাষ্ট্র—যার ভেতরে মানুষ হ'ল আইনের নিগড়ে আবদ্ধ।

ঐতিহাসিকেরা কিন্তু রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন সম্পর্কিত এই মতবাদ মেনে নিতে রাজী নন। তাঁদের মতে রাষ্ট্রের উৎপত্তি একটি চুক্তির ওপর নির্ভর করে হয়েছে, এ ধরনের উক্তি কোনও ইতিহাসের পাতায় দেখা যায় না। তাঁরা বলেন, রাষ্ট্রের ক্রমবিকাশ হয়েছে—তা হঠাৎ গজিয়ে ওঠে নি। যুক্তি-বাদীরা বলেন, চুক্তি-মতবাদ গ্রহণযোগ্য নয়। তাঁরা এই যুক্তি উত্থাপন করেন যে, মানুষ চুক্তি করেই যদি রাষ্ট্রের সৃষ্টি করে থাকে, তা হলে তখন রাষ্ট্র সম্বন্ধে নিশ্চয়ই তার সম্পূর্ণ জ্ঞান ছিল। কিন্তু রাষ্ট্রের জন্মই যদি চুক্তির পর হয়ে থাকে তা হলে চুক্তির আগে মানুষের রাষ্ট্র সম্বন্ধে জ্ঞান এল কোথা থেকে? এই সমস্ত যুক্তি প্রদর্শনের দরুন এবং আরো নানা কারণে চুক্তি-মতবাদ আর টিকল না।

মধ্যযুগীয় ইউরোপে লোকদের ধারণা ছিল রাষ্ট্র ঈশ্বরের সৃষ্টি, রাজা ঈশ্বরের প্রতিনিধি। প্রজার পৃথকধর্মহীনতা

সন্তুষ্ট হয়ে ঈশ্বর ভায়বান, দয়ালু রাজা পাঠাতেন। আবার প্রকার পাপের শাস্তিরূপ আসতেন অত্যাচারী রাজা। বৈজ্ঞানিক যুগে মানুষ রাষ্ট্রের উৎপত্তির এত সহজ ও আশ্চর্য্যবিশীর্ণভাবে সন্তুষ্ট নয়। তা ছাড়া রাজাকে নির্বিকারে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলে মেনে নেবার মত মনোজ্ঞাবও আর লোকের মনেই।

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে আর একটি মতবাদ আছে—যাকে বলা হয় Theory of Force বা বলপ্রয়োগনীতি। এই মতবাদ অনুসারে গোড়ার রাষ্ট্র দৈহিক শক্তি বা বাহুবল দ্বারা সৃষ্ট হয়। কি করে হয়, ওপেনহায়ম তাঁর বই 'দি টেট'-এ তাঁর বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, মানব-সত্যতার ক্রমবিকাশে কয়েকটি ধাপ বা যুগ আছে। সেই আদিম যুগে মানুষ বনে-জঙ্গলে বিচরণ করত আর শিকার করে জীবিকা অর্জন করত। এই যুগে মানুষ স্বাধীনভাবে কোনও এক জায়গায় বসবাস করত না। শিকারের অবশেষে ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াত। তারপর এল পশু-পালনের যুগ। সে যুগে মানুষ, যতদিন পর্যন্ত এক জায়গায় পশুর আহার মিলত, ততদিন পর্যন্ত সেখানেই আস্তানা গেড়ে বাস করত। পশুর আহার ফুরিয়ে এলেই, যেখানে পশু-খাতের প্রাচুর্য্য তেমন কোনো জায়গায় সরে যেত। তারপর এল চাষবাসের যুগ, এই যুগে মানুষ যে জমি চাষ করত, সেই জমির নিকটেই স্থায়ীভাবে বাস করতে লাগল কারণ তা না হলে জমি চাষ করে বীজ বপন করে কসল তোলা সম্ভবপর নয়।

মানুষের সামাজিক জীবনের উন্নতি সকল জায়গায় সম-ভাবে হয় নি। কোথাও কেউ এগিয়ে গেছে আবার কোথাও বা কেউ পিছিয়ে পড়েছে। এক জায়গায় যখন একদল শুধু শিকার করে জীবনধারণ করছে, অন্য জায়গায় তখন আর একদল পশুপালন করছে, আবার আর এক জায়গায় হয়তো তখন আর একদল চাষবাস করতে শুরু করেছে, এই সব বিভিন্ন দলে প্রায়ই সংঘর্ষ বাধত। একদল শিকারী এসে হয়তো একদল পশুপালক বা চাষীকে আক্রমণ করলে, বা এক দল পশুপালক হয়তো চাষী বা গৃহস্থদের এলাকার এসে চড়াও হ'ল। এই সব সংঘর্ষের ফলে বিশ্বের প্রাণহানি ও প্রচুর কতি হ'ত। প্রথম প্রথম বিজয়ী দল বিজিত দলকে একেবারে নির্মূল করে দিয়ে তাদের যা কিছু পুঁজিপাটা সব নিয়ে চলে যেত। বীরে বীরে মানুষের এই জ্ঞান হ'ল যে এই নির্ধুম হত্যাকাণ্ডের দ্বারা আশেপাশে তারা খুব লাভবান হচ্ছে না। পরাজিতকে একেবারে নির্মূল না করে যদি বাঁচিয়ে রাখা যায়, তা হলে ভবিষ্যতে তাদের নানাভাবে খাটিয়ে নিজেদের মতলব হাসিল করার আশা থাকে। এরপর শুরু হ'ল পরাজিতের উপর বিজয়ীর প্রভুত্ব কলানোর প্রচেষ্টা। বিজিতেরা মৃত্যুর হাত থেকে অব্যাহতি পেল বটে, কিন্তু এই অনুগ্রহ লাভের পরিবর্তে তাদের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হ'ল যে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যথা-

নির্দিষ্ট বনরত্ন বা প্রয়োজনীয় বস্তু তারা বিজেতাদের হাণ্ডারে এনে জমা করবে। এইখানে বিজেতা হ'ল প্রভু, বিজিত হ'ল তার দাস। প্রথমোক্তের দায়িত্ব রইল, বাইরের আক্রমণ থেকে শেথোক্তকে তার রক্ষা করতে হবে। পরাজিতেরা তখন বিজেতাদের অধীনে থেকে তাদের আদেশ অনুসারে চলতে বাধ্য হ'ল। Theory of Force বা বলপ্রয়োগনীতি অনুসারে এমনি করে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হ'ল। বলপ্রয়োগনীতির মূল কথা—হুর্কলের ওপর সবলের অত্যাচারই হচ্ছে রাষ্ট্রের সৃষ্টি। এখনও রাষ্ট্রের পেছনে অনেকখানি ক্ষমতা আছে বলেই আমরা রাষ্ট্রের আদেশ মেনে চলতে বাধ্য হই। ঐতিহাসিকেরা স্বীকার করেন, এই মতবাদে যথেষ্ট সত্যতা আছে। কিন্তু তবু তাঁরা এটাকে গুরোপুরি ভাবে মেনে নিতে রাজী নন। তাঁরা বলেন, হুর্কলের ওপর সবলের অত্যাচার রাষ্ট্রসৃষ্টির একটা কারণ হতে পারে, কিন্তু এইটাই একমাত্র কারণ নয়—রাষ্ট্রসৃষ্টির মূলে আরো নানাবিধ কারণ কার্যকরী হয়েছিল। রাষ্ট্রের সৃষ্টি সম্বন্ধে ক্রমবিকাশ মতবাদই যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়। এই মতবাদই আজকালকার পণ্ডিতগণ স্বীকার করে নিয়েছেন, চলেন, তাঁরা বলেন, রাষ্ট্রের সৃষ্টি আকস্মিক নয়। মানুষের সমাজ-জীবনে নানা অবস্থার দ্ব্যর্থপ্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে রাষ্ট্রের ক্রমবিকাশ সাধিত হয়েছে। মানুষ পৃথিবীর বুকে জন্ম নেবার পর থেকেই নিজেকে তার পারিবারিক অবস্থার সঙ্গে ঋণ ঋণাত্মকভাবে প্রাণপণ চেষ্টা করে থাকে। যুগ-যুগান্তর ধরে সেই চেষ্টা চলে আসছে এবং এরই ফলে ক্রমবিকাশের পথ ধরে রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছে।

মানুষের সঙ্গে পশুর একটা মূলগত পার্থক্য এই যে শেথোক্তটির তুলনায় মানুষের শৈশবকাল দীর্ঘ। মানবশিশুকে দীর্ঘকাল অসহায় অবস্থায় কাটাতে হয়। এই সময়টা তাকে মাতা পিতা বা অতের ওপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে থাকতে হয়। দীর্ঘকাল একসঙ্গে বাস করার ফলে স্বভাবতই স্নেহ গভীরতর হয়। এই স্নেহের জড়িয়ে শিশু যখন স্বাংলগ্নী হয়, তখন সে তার মাতাপিতা বা প্রতিপালকদের সহজে ত্যাগ করে যেতে পারে না। মাতাপিতা ও সন্তানকে নিয়ে এমনি করে পরিবারের সৃষ্টি হয়। মৃতাত্তিক তথ্যানুসন্ধানের ফলে দেখা যায় যে এই পরিবার থেকেই রাষ্ট্রের প্রাথমিক ভিত্তি স্থাপিত হয়। মাতাপিতা ও সন্তানকে নিয়ে পরিবার ক্রমশঃ যৌথ পরিবারে বা Clan-এ সংস্কারিত হয়। কয়েকটি গোষ্ঠী (Clan) নিয়ে এক একটি জাতির (tribe) সৃষ্টি হয়। সর্বকোষ্ঠ পুরুষ যিনি তিনিই হন এই বৃহৎ পরিবারের কর্তা। তাঁর আদেশ মেনে চলতে আর সকলে বাধ্য, এইখানে আমরা রাষ্ট্রের সৃষ্টির মূলস্রোতের সন্ধান পাই। মানব-সত্যতার ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত দেখা যায়, যেখানে একটি tribe বা জাতি পরিচালিত হ'ত একটি বয়স্কদের সভা (Council of Elders) দ্বারা—এরই মধ্যে শাসনতন্ত্র বা গবর্নমেন্টের বীজ

নিহিত। কালক্রমে কাউন্সিল অব এলডার্স ই পর্বণমেটে নামান্তরিত ও রূপান্তরিত হয়।

অনেক ক্ষেত্রে আবার দেখা যায়, যার উপর ধর্মসংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন করবার ভার ছিল, তিনিই ক্রমে একাধিপত্য বিস্তার করে সকলের উপর কর্তৃত্ব ফলাতে বসতেন। আদিম যুগে প্রকৃতির রহস্য মানুষ বুকে উঠতে পারত না। কাজেই তাদের মনে প্রকৃতি-ভীতি বিদ্যমান ছিল। যে-কোনও বুদ্ধিমান লোক যদি প্রকৃতির উপর খানিকটাও আধিপত্য লাভ করে লোককে ভয় দেখাতে বা ভোলাতে পারত, তা হলে তার কর্তৃত্ব তারা অবশত মন্তকে স্বীকার করে নিত।

কোনও কোনও ক্ষেত্রে মানুষকে সংযত হতে হয়েছিল প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার জন্যে। শুধু প্রকৃতি নয়, মানুষের বিরুদ্ধে লড়াই করবার ক্ষেত্রেও মানুষকে একাধিক হতে হয়েছিল। আদিম কালে মানুষকে যুদ্ধের ক্ষেত্রে প্রায়ই প্রস্তুত থাকতে হ'ত। যুদ্ধ করতে হলে শৃংখলা বজায় রাখা একান্ত আবশ্যিক। শৃংখলা রক্ষা যাতে হয় তা দেখবার ক্ষেত্রে বা দলবিশেষকে শৃংখল ভাবে পরিচালিত করবার ক্ষেত্রে দলপতির প্রয়োজন, দলপতির আদেশ নির্বিরোধে মেনে না চললে শৃংখলা বজায় থাকে না, শৃংখলা না থাকলে শত্রুকবল থেকে আত্মরক্ষা করা যায় না, কাজেই আত্মরক্ষার

ক্ষেত্রে মানুষকে সংযত হতে হয়, দলপতির আত্মগত স্বীকার করতে হয়। এক পক্ষে আধিপত্য ও অল্প পক্ষে আত্মগত স্বীকার থেকেই রাষ্ট্রোৎপত্তির সূচনা, কাজেই এখন আমরা এ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি যে, অতীতে মানুষ প্রয়োজনবশতঃই প্রথমে সংযত হয়েই রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করেছিল। এই প্রয়োজন হচ্ছে তার জীবন ধারণের ব্যবস্থা করা, তার আহার সংগ্রহের, তার আত্মরক্ষার উপায় নিদান। এই প্রয়োজন থেকেই উৎপত্তি তার দলে থাকবার প্রবৃত্তির বা gregarious instinct-এর। মানুষ একা থাকতে পারে না, সমাজে বা দলে থাকবার আকাজকা তার স্বভাবজাত। এই আকাজকার ক্ষেত্রেই বিভিন্ন দলের, গোষ্ঠীর বা সমাজের সৃষ্টি। সমাজের যখন সৃষ্টি হ'ল, মানুষ তখন এমন একটি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন বোধ করলে, যে প্রতিষ্ঠান সমগ্র সমাজে শান্তি ও শৃংখলা বজায় রাখতে পারে, মানুষকে বাইরের ও ভেতরের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে পারে, মানুষ যাতে নিরুপদ্রবে জীবিকা অর্জন করতে পারে তার ব্যবস্থা করে দেয়। মানুষ-সমাজে এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রাষ্ট্রেরও তিস্তিপত্তন হ'ল। রাষ্ট্রের গোড়াকার কথা সম্বন্ধে এইটাই সর্বাপেক্ষা যুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্ত বলে মনে হয়।

দিগ্ধু আজ কাঁপে থরোথর

শ্রীপঞ্চানন চক্রবর্ত্ত

মণিবেন্দী হ'তে দেবতা আমার আজ কি এসেছে নেমে ?
অতীত যুগের গুপ্তন হ'তে ধ্যান কি গিয়েছে ভেঙে।
ক্ষমাসুন্দর দেবতা আমার কোথা আজ তব বাণী,
কোথা আজ ক্ষমা, কোথা ভালবাসা, শুধু ক্লেশাক্ত গ্লানি।
আজ কি জেগেছে বাহুকী নাগের শতসহস্র কণা,
কুটিল জিহ্বায় লেলিহ শিখায় বিষবাপ্পের কণা ;
ছেয়েছে ধরণী দিগ্ দিগন্তে নিরুই স্বার্থজালে
দিগ্ধু আজ কাঁপে থরোথর অঞ্চল পড়ে খুলে।

হুঃশাসনের কামনা বেড়েছে পাকালী কাঁদে একা,
নিবিড় ভিমিরে অমানিশা রাতে জালে ধুমকেতুলেখা।
অমললের কালো শয়তান উঁকি দেয় ঘরে ঘরে
জ্বরের পুতুল জ্বননী ধরণী তিতিছে রক্তনীরে।

গুপ্তানপ্রান্তে হাঁকে ফেরপাল ক্ষমা নাই, ক্ষমা নাই
মণিবেন্দী হ'তে দেবতা আমার আজ কি নেমেছে তাই ?

তুমি এস আজ সবাকার মাঝে ছায়াল চক্রপাণি
দূর করে তুমি কাল ভেদাভেদ দীনতা ছীনতা গ্লানি।
দূর ক'রে দাও ফেরপালে সব, টুটুয়া নিবিড় অন্ধকার
শতদীপালোকে আলোকিত হোক সবার প্রাণের গোপন দ্বার,
সামসামোর নবীন হৃদয় ভরিয়া তুলুক ধরণীতল
শুভ ক্ষমার মধুমহিমায় জাগুক বক্ষে দৃষ্টবল ;
মিলনায়ত্ন সিকন করে ধরণীর গেহে গেহে
তব আগমন উজ্জ্বল হোক মুক্তির সমারোহে।

পাথুরিয়া কয়লা হইতে বাংলায় রাসায়নিক শিল্পের সম্ভাবনা

শ্রীহরগোপাল বিশ্বাস, এম-এসসি, ডি-ফিল

সকলেই জানেন ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলাদেশেই পাথুরিয়া কয়লা-সম্পদ সবচেয়ে বেশী। আমরা পাথুরিয়া কয়লাকে শুধু উত্তাপ উৎপাদনের প্রধান উৎসরূপেই জানি—কারণ রেলগাড়ী ষ্টীমার প্রভৃতি চালানায় এবং আমাদের দৈনন্দিন রতনকার্যে পাথুরিয়া কয়লার ব্যবহার প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। কিন্তু পাথুরিয়া কয়লা যে রাসায়নিক শিল্পের অপরিহার্য একটী মূল উপাদান তৎসম্বন্ধে আমাদের অনেকেরই ধারণা নাই। ধারণা না থাকায় জ্ঞান আমাদের দোষী করা যায় না; কারণ আমাদের দেশে রাসায়নিক শিল্প, বিশেষতঃ রাসায়নিক শিল্পের যে বিভাগ পাথুরিয়া কয়লার উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা খুব বিকাশলাভ করে নাই। তারপর সাধারণের বোধগম্যতাভূত্বাধার মাধ্যমে শিল্পবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় পুস্তকাদিরও আমাদের দেশে যথেষ্ট অভাব। দেশের শতকরা দশ জন মাত্র লোক লেখাপড়া জানেন। শিল্পী যেমন রসনাভূক্তিকর স্বাবারের প্রতিই বেনী আকৃষ্ট হয় আমাদের মধ্যেও যাহারা বর্ণজ্ঞান লাভের সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছেন তাহারাও লঘু সাহিত্য কাব্যাদিরই বেশী অহরন্তর। কঠিন জ্ঞানগর্ভ বিষয় সম্বলিত পুস্তকাদি পাঠে আমরা এখনও ততটা আগ্রহাবৃত্ত হইয়া উঠি নাই। যাহা হটুক, আশা করা যায় দেশের স্বাধীনতালাভের লক্ষে সবে জনসাধারণের এই মনোভাবের পরিবর্তন হইবে এবং বর্ণজ্ঞানসম্পন্ন লোকেরা শিল্পবিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তকপাঠে অধিকতর মনোযোগী হইবেন। এতদিন আমরা শুনিভাম কয়লা হইতে উৎপন্ন হয় কুহুমের স্বকুমার বর্ণচ্ছটাকে হার মানায় এরূপ অসংখ্য কৃত্রিম রং, বিবিধ স্নজ্জি পুষ্ণ ও ফলের গন্ধসার, কালাজর, ম্যালেরিয়া, আমাশয় প্রভৃতি বহুবিধ ব্যাধি প্রতিষেধক ঔষধ, টি-এন-টি, পিকুরিক এসিড প্রভৃতি, প্রলয়ঙ্কর বিস্ফোরক পদার্থ ও আধের চিনির চেয়ে পাঁচ শত গুণ অধিক মিষ্টতায়ুক্ত স্যাকারিন। বর্তমানে নানা প্রকারের প্লাসটিক, এরোগেন, মোটর প্রভৃতি চালানায় পেট্রোল, চিনির চেয়ে চার হাজার গুণ মিষ্ট এন-গ্লোপোক্সি নামক দ্রব্য, বিবিধ ডিটার্জেন্ট এবং শরীর রক্ষার অন্যতম অপরিহার্য উপাদান স্বেদ-পদার্থও (কৃত্রিম মাখন) প্রকৃত প্রস্তাবে কয়লা হইতেই প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

আমি এক নিম্নসে যে বিষয়গুলির উল্লেখ করিলাম তাহা কার্যে পরবর্ত্ত করিতে লাগিয়াছে হাজার হাজার বৈজ্ঞানিকের পরিশ্রমক বর্ষব্যাপী অক্লান্ত পরিশ্রম ও অসাধারণ অধাবসায়। পাথুরিয়া কয়লা হইতে যে রাসায়নিক শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার পিছনে রহিয়াছে লিবিগ, ফ্যারাডে, হুম্যান, পার্কিন, উইলিয়ামসন, পিটার গ্রিস, কেবুলে, বুনাসন, বেয়ার, কারো,

ফিশার, বার্থেলো, বার্গিন্স প্রভৃতি প্রতিভাশালী রাসায়নিকগণের জীবনব্যাপী সাধনা। স্বক্কে পত্রপুস্তকশোভিত সৌন্দর্য্যই আমাদের চোখে পড়ে, কিন্তু যে মূল নম্রত নিভৃত্তে পুষ্টি যোগায় তাহার কথা সাধারণতঃ আমরা ভাবিয়া দেখি না। পাথুরিয়া কয়লাজাত রাসায়নিক শিল্পের পৌরবর্মান্ত বিরাটক্ষেই আমরা মুগ্ধ হই; কিন্তু সেই গৌরবের মূলে যে একাত্তা, যে তথ্য সাধনা এবং যে সত্য ও জ্ঞান পিপাসা রহিয়াছে তাহার খবর আমরা কল্পনেনেই বা রাখি? যে সব মনোহর নাট্যোন্মেষ করা হইল তাহাদের কাহাকে বাদ দিয়া কাহার কথা বলিব? তবে ইহাদের সম্বন্ধে দুই-একটি কথা না বলিয়া পারিতেছি না। মহামতি কেবুলে বলিতেন—রসায়ন-শাস্ত্রের পুস্তকাদি পড়িতে পড়িতে স্বাভাবিক না ঘটাইলে ঐ শাস্ত্রে কেহ পারদর্শিতা অর্জন করিতে পারেন না। আর পড়িতেও হইবে বিভিন্ন ভাষায়, বিশেষ করিয়া জার্মান ভাষায় মাধ্যমে। কেবুলে এই বাক্য অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতেন। তিনি বলিতেন, এক রাজি পড়া-শুনায় জাগিয়া কাটানো তিনি স্বতঃব্যের মধ্যেই মনে করিতেন না। যখন পর পর দুই তিন রাজি একাদিক্রমে জাগিয়া পাঠে নিমগ্ন থাকিয়া কাটাইতেন তখনই তিনি অনেকটা আনন্দপ্রসাদ লাভ করিতেন। আর ল্যাবরেটরিতে পরিগ্রমণ করিতেন তিনি অসাধারণ বৈধ্য সহকারে। অনেকেরই জানেন এই কেবুলের বেনজিন করমুলা আবিষ্কৃত না হইলে আজ জৈব রসায়নশাস্ত্র ও তৎসংশ্লিষ্ট শিল্পগুলি এত দূর উন্নতি লাভ করিতে পারিত কিনা তদ্বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ রহিয়াছে। অধ্যাপক বেয়ারের সম্বন্ধে কথিত আছে, নির্লোভ নিম্প্রহভাবে তিনি ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষার পর পরীক্ষার আনন্দ-নির্যোজিত থাকতেন—তাঁহার গবেষণার ফলে অ্যালজারিন, নীল প্রভৃতি মূল্যবান রঞ্জক-পদার্থ বিরাট শিল্পের রূপ পরিগ্রহ করে, কিন্তু তিনি কখনও কোনও বিষয় পেটেক্ট করিয়া লইবার পক্ষপাতী ছিলেন না। শিক্ষার্থীদেরও তিনি সাহায্য করিতেন প্রাণ দিয়া—তাহাদের সমস্ত পথ দেখাইয়া জ্ঞান-রাজ্যের পরিচিত জীমা হইতে অজানা রাজ্যের ভিতর লইয়া যাইতেন, কিন্তু তাহাদের সাফল্য-গৌরবে তিনি কখন ইর্ষ্যবোধ করিতেন না। নিভৃত্তে সাধনা করিতেন বেয়ার—প্রাক্ত সন্ধ্যাসমিতিতে নিজের কাজের প্রচারে তিনি সমস্ত কুণ্ঠাবোধ করিতেন। ফলতঃ এই মনোহর নিষ্ঠা ও চরিত্রাভার্সে আমাদের বর্তমান বিজ্ঞানসেবীদের অহুপ্রাণিত হওয়া নিতান্তই প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। আমরা কাজ করি কম কিন্তু কথা বলি বড় বেশী।

এই প্রসঙ্গে আজ একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, উনবিংশ শতাব্দীতে যে সব ভারতবাসী কালাপানি পাড়ি দিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন তাঁহারা যদি উচ্চ রাজপদের মোহে ইংলণ্ডে না গিয়া জার্মানীর তদানীন্তন দিকপাল রাসায়নিকগণের নিকট শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করিতেন তবে রসায়নশাস্ত্র ও রসায়নশিল্পে আমাদের দেশ আজ এত শোচনীয়ভাবে পিছনে পড়িয়া থাকিত না।

এখন রাসায়নিক শিল্পের ক্রমবিকাশ ও আমাদের দেশে তাহার কি কি সম্ভাবনা রহিয়াছে তৎসম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাইতেছে।

পলথুরিয়া কয়লা পোড়াইয়া যে কোক প্রস্তুত হয়, জালানিরূপে ব্যবহৃত হওয়া ছাড়া উহা বাতব লৌহ নিষ্কাশনের একটি অপরিহার্য উপকরণ। এই কোক হইতে আর একটি বিরাট রাসায়নিক শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে— তাহা হইতেছে ক্যালসিয়াম কার্বাইড শিল্প। চুন ও কোক বৈজ্যাতিক চুল্লীতে একত্রে নির্দিষ্ট অনুপাতে মিশ্রিত অবস্থায় উত্তপ্ত করিলে উৎপন্ন হয় ক্যালসিয়াম কার্বাইড। বহুবিধ অত্যাবশ্যক রাসায়নিক শিল্পের কাঁচামাল প্রস্তুত হয় এই ক্যালসিয়াম কার্বাইড হইতে। আমরা কেবলমাত্র পাড়া-গাঁয়ের মেলায় বা বিবাহাদি ব্যাপারে ক্যালসিয়াম কার্বাইড দ্বারা বাতি জ্বালাইতে দেখিতে অভ্যস্ত, কিন্তু ইহা হইতে যে কত বিচিত্র রকমের রাসায়নিক পদার্থ সঞ্চারিত হয় তৎসম্বন্ধে আমাদের হৃৎপিঠ ধারণা নাই বলিলে চলে। কার্বাইডের উপর নাইট্রোজেন গ্যাসের ক্রিয়াতে উৎপন্ন হয় ক্যালসিয়াম সাইান-অ্যামাইড। ইহা জমির পক্ষে একটি উৎকৃষ্ট সার। সাইান-অ্যামাইড হইতে অ্যামোনিয়া গ্যাস এবং তাহা হইতে জমির অপর একটি সুপরিচিত সার অ্যামোনিয়াম সালফেটও প্রস্তুত করা যায়। সাইান-অ্যামাইড ও সাধারণ লবণ একত্রে উত্তপ্ত করিলে উৎপন্ন হয় সোডিয়াম সাইানাইড। সোডিয়াম এবং পটাশ সাইানাইড তীব্র বিষ বলিয়া সকলেই জানেন। কিন্তু বনি হইতে স্বর্ণ নিষ্কাশনে এই সাইানাইড একমাত্র শ্রেষ্ঠ উপকরণ। একমাত্র দাক্ষিণাত্যের কোলার স্বর্ণখনির জন্যই প্রতি বৎসর আমাদের দেশে তিন লক্ষ টাকার সাইানাইড আমদানী করিতে হয়। সুতরাং ক্যালসিয়াম কার্বাইড শিল্প প্রতিষ্ঠা করা যে আমাদের দেশে অপরিহার্য তাহা সহজেই বুঝা যাইতেছে। তাহার পর দেশের ভূমির উর্বরতাসঞ্জি বৃদ্ধি করিয়া অধিক শস্য-ফলানোর ব্যাপারেও কার্বাইড শিল্প প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়। দেশে চুন বা কোকের অভাব নাই, এখন মূলত বৈজ্যাতিক শক্তি ও উপযুক্ত যন্ত্রপাতি যোগাড় করিতে পারিলেই কার্বাইড শিল্প প্রতিষ্ঠার বাধা বিদূরিত হয়। এই কারণেই দামোদর-পরিকল্পনা যত শীঘ্র কার্য্যে পরিণত হয় ততই দেশের পক্ষে মঙ্গল।

আজকাল এদেশে গ্যাসট্যাক্স, কৃত্রিম রেশম প্রভৃতি শিল্পের ভিত্তিপত্তনের জন্য দেশের অনেক সুখী ব্যক্তিই মাথা ঝামাইতেছেন—বেতের বহুতাতেও এই বিষয়ের গুরুত্ব ঘোষিত হইতেছে, কিন্তু এই সব শিল্পের কাঁচামালও উৎপন্ন হয় ক্যালসিয়াম কার্বাইড হইতে। ক্যালসিয়াম কার্বাইডের উপর জলের ক্রিয়াতে জন্মে অ্যাসেটিলিন গ্যাস। এই অ্যাসেটিলিন গ্যাস আজকাল আলাদীনের প্রদীপের মত আশ্চর্য বস্তুতে পরিণত হইয়াছে। কারণ ইহা হইতেই উৎপন্ন হয়—অ্যাসিট অ্যালডিহাইড, অ্যাসেটিক এসিড, অ্যাসেটিক অ্যানহাইড্রাইড, অ্যাসেটোন, ইথাইল অ্যাসিটেট প্রভৃতি মূল্যবান রাসায়নিক পদার্থ এবং পলিডিনাইল অ্যাসিট্যাল জাতীয় গ্যাসট্যাক্স। অ্যাসিটোন, অ্যাসিটিক এসিড ও অ্যাসিটিক অ্যানহাইড্রাইড প্রভৃতি পদার্থ যে শুধু কৃত্রিম রেশমশিল্পেরই অপরিহার্য উপাদান তাহা নহে, বিবিধ রঞ্জন-পদার্থ, ঔষধ ও বিস্ফোরক পদার্থেরও এগুলি অত্যাবশ্যক উপাদান ও জীবকরূপে পরিচিত।

অনেকেই জানেন কয়লা পোড়াইলে কার্বন ডাই অক্সাইড নামে গ্যাস জন্মে। মানুষ এবং প্রাণীমাজেই প্রতিদিনিয়ত এই গ্যাস নিঃশ্বাসের সঙ্গে ছাড়িতেছে। উত্তপ্ত কয়লার উপরে জলীয় বাষ্প চালিত করিলে জন্মে হাইড্রোজেন ও কার্বন মনঅক্সাইড। এই মিশ্র গ্যাসের কার্বন মনঅক্সাইডকে প্রক্রিয়া বিশেষ দ্বারা কার্বন ডাইঅক্সাইডে পরিণত করা হইয়া থাকে। এই কার্বন-ডাইঅক্সাইড জলে দ্রবীভূত অবস্থায় সংগ্রহ করা হয় এবং বিশুদ্ধ হাইড্রোজেন পাওয়া যায়। এই হাইড্রোজেন গ্যাস বহুবিধ রাসায়নিক শিল্পের অপরিহার্য উপাদান। দুর্গন্ধ তেলকে গন্ধহীন কঠিন পদার্থে পরিণত করিতে, নাইট্রোজেন গ্যাসের সম্মিলনে এমোনিয়া প্রস্তুত করিতে এবং কয়লা হইতে পেট্রোল জাতীয় তেল প্রস্তুত করিতে হাইড্রোজেনের ব্যবহার সুপরিচিত। শেঘোক্ত উপায়ে কয়লা হইতে প্রস্তুত প্যারাক্সিন শ্রেণীর হাইড্রো-কার্বন হইতে চর্বিজ অম্ল (fatty acid) তৈয়ারী করিতে এবং সেগুলিকে গ্লিসারিনের রাসায়নিক সম্মিলনে কৃত্রিম চর্বিতেও পরিণত করিতে জার্মান রাসায়নিক-গণ গত যুদ্ধের সময় সমর্থ হইয়াছেন। এই কৃত্রিম চর্বি যে কেবল সাবানশিল্পেই ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা নহে; পরন্তু জার্মানীর চরম ষাটসংকটের দিনে ইহা হইতে মার্গারিন প্রস্তুত করিয়াও লোকেরা বাঁচিয়াছেন। ফলতঃ কয়লা হইতে ষাট প্রস্তুতের ব্যবস্থা এই সর্বপ্রথম হয়।

হাইড্রোজেন তৈরির সময় যে কার্বন-ডাইঅক্সাইড গ্যাস জন্মে উহা যে কেবল সোডা-ওয়াটার প্রস্তুতেই লাগে তাহা নহে; কার্বন-ডাইঅক্সাইড লবণজল হইতে এমোনিয়া সাহায্যে সোডা তৈরি করিতে ইহা প্রধান উপাদান রূপে ব্যবহৃত হয়। তদ্বিত্ত কার্বন-ডাইঅক্সাইড ও এমোনিয়ার রাসায়নিক সম্মিলনে উৎপন্ন হয় ইউরিয়া। ডাক্তার উপেক্ষনাথ ব্রহ্মচারী আবিষ্কৃত

কালাজরের ঔষধ ইউরিয়া ষ্ট্রিমিনের কল্যাণে ইউরিয়া কণাটি শিফিত বাঙালী মাঝেরই পরিচিত। ঘূমের ঔষধ লুমিনাল প্রভৃতিরও ইউরিয়া একটি প্রধান উপাদান। ইউরিয়া ফরম্যালডিহাইড রেজিন নামক প্লাস্টিকের জড় ইউরিয়া একটি অত্যাবশ্যক রাসায়নিক পদার্থ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বর্তমানে জমির সাররূপে ইউরিয়ার ব্যবহারের পরীক্ষা চলিতেছে। সুতরাং কার্বন-ডাইঅক্সাইড রাসায়নিক শিল্পের যে একটি বিশিষ্ট কাঁচামাল-স্বরূপ ব্যবহৃত হইতে পারে তাহার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে উত্তপ্ত কয়লার উপরে জলীয় বাষ্প চালিত করিলে হাইড্রোজেন ও কার্বন-মনঅক্সাইড গ্যাস জন্মে। অনেক ক্ষেত্রে কার্বন-মনঅক্সাইডকে কার্বন-ডাইঅক্সাইডরূপে পৃথক না করিয়া বিশেষ প্রকার প্রক্রিয়া সাহায্যে প্রথমোক্তটিকে হাইড্রোজেন গ্যাস হইতে বিযুক্ত করিয়া বিভিৎত অবস্থায় সংগ্রহ করা হইয়া থাকে। এই কার্বন-মনঅক্সাইডও কয়েকটি বিশিষ্ট রাসায়নিক শিল্পের কাঁচামালে পরিণত হইয়াছে।

এতদিন আমরা শুনিয়া আসিতেছি ভাত গুড় প্রভৃতি পচাইয়া কোহল বা সুরা প্রস্তুত হইয়া থাকে। কিন্তু রাসায়নিকগণের চেষ্টায় এই কার্বন-মনঅক্সাইড গ্যাস হইতে হাইড্রোজেন গ্যাসের সাহায্যে অপরিপাক্ত পরিমাণে সুরা প্রস্তুত আরম্ভ হইয়াছে। সাধারণ সুরাকে রাসায়নিকগণ বলেন

ইথাইল এসকহল। রসায়ন-শাস্ত্রে এসকহল অনেক প্রকারের আছে। আমাদের সুপরিচিত সুরা বা কোহল এই শ্রেণীর দ্বিতীয় স্থানীয়। প্রথম হইতেছে মিথাইল এসকহল। ইহা পূর্বে কাঠ distil (পরিশোধন) করিয়া পাওয়া যাইত, কিন্তু কয়লা হইতে ক্যাটালিটিক উপায়ে কার্বন-মনঅক্সাইড ও হাইড্রোজেন প্রস্তুতপ্রণালী আবিষ্কৃত হওয়ায় ইহা যথেষ্ট পরিমাণে পাইবার সুবিধা হইয়াছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৩০ সনেই এক কোটি গ্যালন মিথাইল এসকহল প্রস্তুত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। অনেকে জিজ্ঞাসা করিতেন এত মিথাইল এসকহল কোন্ কাজে লাগে? অনেকেই ফরম্যালিন বা ফরম্যালডিহাইডের নাম শুনিয়াছেন। বীজের হিসাবে ফরম্যালিনের ব্যবহার সুপরিচিত। রজন-পদার্থ ও কৃত্রিম আধুনিক ঔষধপত্রাদিতে যথেষ্ট পরিমাণে মিথাইল এসকহল ও ফরম্যালডিহাইড ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তদ্বিন্ন ইউরিয়া ফরম্যালডিহাইড, কিনোল ফরম্যালডিহাইড প্রভৃতি শ্রেণীর প্লাসটিক্‌স্ প্রস্তুতকল্পে টন টন ফরম্যালডিহাইড আজকাল দরকার হয়।

পাণ্ডুরিয়া কয়লা হইতে প্রক্রিয়াবিশেষ দ্বারা কোক করিবার সময় কয়েক প্রকার তেল ও আলকাতরা পাওয়া যায়। আলকাতরা আধুনিক অনেক ঔষধপত্র, কৃত্রিম রজন ও বিস্ফোরক পদার্থ এবং কৃত্রিম অগ্নি-দ্রব্যের মূল্যবানস্বরূপ।

সবহারাদের কবি

শ্রীপ্রভাত বসু

সোনার রঙে যে রাজকুমার আসে
আমার তুলি আঁকে না তার ছবি;
ব্যর্থ যারা, সদাই কাঁপে জ্ঞানে
আমি যে সেই সবহারাদের কবি।

জয়ের তিলক যাদের ললাট 'পরে
অত্যাচারী গর্ভী সমাজপতি—
যশের ভেরী বাজায় সাড়বরে,
তাদের পায়ে জানাই নে ক' নতি।

রক্তমাধা কঠিন রণভূমে
যুত্মযুধে পড়ে আছে যারা;
আমার এ মুখ তাদের শির চূমে,
কাব্যে আমার অমর হবে তারা।

দেশের মাঝে বিখ্যাত লোক যিনি,
বিলাত-ফেরত সিবিগিয়ান ছেলে

অচেনা মোর—আমি কেবল চিনি
হৃগতদের, বন্দী যারা জেলে।

গাঁয়ের মাঝি, তাঁতি, মজুর, চাষী,
শ্রান্তদেহ ক্লান্ত কলের তুলি;
তারা আমার কল্পভুবনবাসী,
তাদের ছবি আঁকে আমার তুলি।

সুরা, নারী, চাঁদের হাসি নিয়ে
অন্ত লোকে রচুক কাব্যকলা;
কণ্ঠ ভরে' হুঃসহ বিষ পিয়ে
মিথ্যা আমার মধুর বাণী বলা।

স্বর্ণপ্রদীপ জলুক তাদের ঘরে
সোনার রঙে যারা ছবি আঁকে;
ধর-ছাড়া ঐ সবহারাদের তরে
দাঁড়িয়ে আমি রইছ পথের বঁকে।*

কালিদাস-সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ

অধ্যাপক শ্রীক্ষুরাম দাশ

প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ কবি সম্পর্কে ইতিহাস শুরু থাকিলেও কবিগণ নীরব নছেন। ভবভূতি মাধ হইতে আরম্ভ করিয়া অদ্যাবধি সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার ক্ষুদ্র-বৃহৎ কত কবি যে কত বিচিত্র ভাবে কালিদাসের কথা আমাদের কাছে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। অন্তর্যমণি, সাদৃশ্য, ভাবান্তরে, রূপান্তরে এই মহাকবি ভারতীয় কবিত্বকে অভিত্ব করিয়া অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। একগুণ ব্যক্তিত্বশালী কবির প্রভাব অতিক্রম করা সহজসাধ্যও নহে। কিন্তু এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে যুরোপীয় সংস্কৃতি ও সাহিত্যের বিজয়গৌরবের কালে কেনো কোনো দিক দিয়া তাঁহার সমধর্মী ও সমকক্ষ অপর এক মহাকবির দৃষ্টিতে যতক্ষণ না তাঁহার স্বরূপের পরিচয় পাওয়া গেল ততক্ষণ আমাদের নিকট তাঁহার পরিচয় অসম্পূর্ণই ছিল। সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আলোচনায় এবং মল্লিনাথ প্রমুখ পণ্ডিতগণের ব্যাখ্যায় কাব্যরসিকগণ যে রসাহার করিয়া আসিতেছিলেন তাহাকে রবীন্দ্রনাথ এক অভিনব উন্নত স্তরে স্থাপন করিলেন। এক বিরাট কবিপ্রতিভা অতীতের অপর এক অপূর্ণ কবিপ্রতিভার অভিনব রূপ আবিষ্কার করিল। ইতিপূর্বে কালিদাস-সম্পর্কে একগুণ স্বল্প অথচ ব্যাপক রস-বিচার আর কেহই করেন নাই, একগুণ অহুরাগের সহিত কালিদাসের যুগকে চিত্রিত করিতেও কেহ সাহসী হন নাই।

ঊনবিংশ শতকের বাংলা-সাহিত্যের স্বর্ণযুগের কথা স্মরণ করা যাক। হেঁয়াল-মিষ্টান এবং সেক্সপীয়র-কট্টই তখন সাহিত্যিকগণের আদর্শ ও শিক্ষিত বঙ্গবাসীর পূজ্য। ব্যাস-বাস্তবিক-কালিদাসের নাম প্রচার সহিত স্মরণ করিলেও মণুস্মৃতি কাব্য-প্রেরণার জল পাশ্চাত্যের ঋণ নরকতোভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। সেকালে আইনের বলে মাতৃভাষা বিকৃত হইল, সংস্কৃত-শিক্ষার প্রতি ঊদাস্য অবমাননায় পর্যাবসিত হইল। যেরূপ ও নৈষণ চরিত, পাণিনি ও রঘুনাথ বিজয় গরীর যুগটুকুই রসবোধহীন ব্যাখ্যাকারদিগের ভাষায় স্থানরোধ হইতে কণ্ঠে আগ্রহ কমিতে লাগিল। শিক্ষা, ধর্ম, দর্শন, রাষ্ট্রনীতি, লোকব্যবহার—সর্বত্র পাশ্চাত্যের প্রভাব বিস্তৃত হইল। এ সম্পর্কে বিস্তৃত বর্ণনা বাহুল্য মাত্র। কেবল এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে পাশ্চাত্যের এ ছেন বিজয়গৌরবের কালে এমন এক অনন্ত-সাধারণ প্রতিভার আবির্ভাব হইল যাহা স্বাভাবিক প্রবণতাবশেই স্বদেশের প্রাচীন সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হইল। এই প্রতিভাই কবিতায়, গানে, প্রবন্ধে, এবং সভা-সমিতিতে

বাঙালীর তথা ভারতীয়দের সাক্ষাত্যবোধ জাগ্রত করিয়া তুলিল।

রবীন্দ্র-প্রতিভার এই বৈশিষ্ট্য বিশেষ ভাবে অনুধাবন করিতে হইবে। প্রাচীন ভারতীয় মানস-প্রকৃতির সহিত রবীন্দ্রনাথের কবিমানসের একটি অবিচ্ছেদ্য যোগ রহিয়াছে, এবং যেহেতু কালিদাসের কাব্যে ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য সর্বাপেক্ষা স্পষ্ট ও ব্যাপক ভাবে রূপময় ভাষায় প্রকাশ লাভ করিয়াছে সেই হেতু রবীন্দ্রনাথ কালিদাসকে লইয়া এত কবিতা ও প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন এবং প্রসঙ্গক্রমে বহু স্থানে আন্তরিক অহুরাগের সহিত কালিদাসের কবি-প্রকৃতি ও কাব্যসৌন্দর্য্য সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। আমরা-অবশ্য একথা মনে করি না যে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কবি-ব্যক্তিত্বই কালিদাস তথা প্রাচীন ভারতের দান। ঊনবিংশ শতাব্দীর রোমান্টিক সৌন্দর্য্য-চেতনা, নূতন জীবন-বেদ, দুঃখ ও যত্ন সম্পর্কে অভিনব ধারণা, বিচিত্র কল্পনার বর্ণে রঞ্জিত হইয়া তাঁহার কাব্যকে যথার্থ ভাবে আধুনিক মনের উপযোগী করিয়া তুলিয়াছে। এমন কি কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে তিনি অত্যাধুনিকও বটেন। কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও দেখিতে হইবে যে প্রাচীন ভারতের তপোবনের আদর্শ ও মহিমা কবি কেবল কবিতা ও প্রবন্ধের মধ্যে বর্ণনা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, কাব্যেও তাহার রূপ দিতে চাহিয়াছেন। অতি প্রাচীন ভারতের তপোবনের চিত্র শকুন্তলা, কুমারসম্ভব ও রঘুবংশে যেরূপ মনোরম ও পরিপূর্ণ সেরূপ অল্প কোথাও নহে, অপর কোনও কবিই তপোবনাদর্শে সেরূপ আকৃষ্ট হন নাই। কালিদাসের পর বর্তমান কালে একমাত্র রবীন্দ্রনাথেই সেই আদর্শের পুনরাবৃত্তি দেখিতেছি। শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপনের পূর্বে হইতেই কবির চিত্ত কালিদাস ও প্রাচীন ভারতের তপোবনের জীবনাদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছিল। অতঃপর তাঁহার কণ্ঠ হইতে এই আদর্শের জয়গান নানাভাবে উৎসারিত হইয়া উঠিল। কবি আধুনিক সভ্যতার দান—এই ভোগসর্বস্ব সর্গীয় অথচ জটিল জীবনযাত্রা হইতে মুক্তি চাহিলেন—

দাও সেই তপোবন পুণ্য ছায়াবাশি,
প্রানিহীন দিনগুলি, সেই সত্যস্নান,
সেই গোচারণ সেই শান্ত সামগান,
নীবার ধাতের মুষ্টি, বকল বসন,
ময় হয়ে আত্মমাবে নিত্য আলোচন
মহাতত্ত্বগুলি।

কখনও বিশ্বদেবতাকে প্রাচীন ভারতের আদর্শের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেখিলেন—

তিনিহু তোমার স্তবের মন্ত্র অতীতের তপোবনেতে ।
অমর ধর্মের হৃদয় ভেদিয়া ধ্বনিতোছে দ্রিষ্টবনেতে ।
নববর্ষের দিনে কবি প্রাচীন ভারতের মন্ত্রে দীক্ষা লইয়া
তাহার আদর্শ অমৃতস্রবের ক্ষুদ্র প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন—

যে জীবন ছিল তব তপোবনে
যে জীবন ছিল তব রাজ্যসনে
মুক্তদীপ্ত সে মহাজীবনে চিত্ত ভরিয়া লব ।
মৃত্যুতরণ শব্দহরণ দাও সে মন্ত্র তব ।

এইরূপ বহু কবিতায় এবং বর্ষ, বর্ষদেশ প্রভৃতি নানা
প্রবন্ধে কবি কালিদাস-বর্ণিত তপোবন ও জীবনাদর্শের প্রতি
অনুরাগ জ্ঞাপন করিয়াছেন । ব্যাপক দৃষ্টিতে দেখিলে পুরা-
তনের প্রতি এই অনুরাগ কবির রোমাঞ্চিক কবিসত্তার বিরোধী
নহে । যাঁহা আমাদের যুগ হইতে বহু পশ্চাতে, যাঁহা আমা-
দের নিকটে কতক আলো কতক ছায়া মেশানো, ইতিহাস
ও কল্পনায় মিশ্রিত সেই যুগ আধুনিক কবির নূতন বর্ণসম্পাতে
আমাদের চক্ষে মোহাজন লাগাইয়া দেয়, কল্পনায় সুদূরকে
নিকটে আনিয়া তাহার সহিত চিত্তের ভাবসম্মিলন সাধিত
করে । কবিগুরুর মেঘদূত, স্বপ্ন, সেকাল প্রভৃতি কবিতা
এবং ‘কথা’ ও ‘কাহিনী’ কাব্য এই দিক দিয়া সার্থক সৃষ্টি ।
এতদ্ব্যতীত ইহাও মন্যবা করা অসম্ভব হইবে না যে, কালিদাস
ক্লাসিক্যাল কবি হইলেও তাঁহার কাব্যে আধুনিক মনকে
মুগ্ধ করিবার উপযোগী উপকরণ প্রচুর রহিয়াছে । হৃদয়
সকল বড় কবির কাব্যেই এইরূপ থাকে । মেঘদূতের বিরহ,
কুমারসম্ভবের ও শকুন্তলার প্রেম, কবির বিশিষ্ট প্রকৃতিপ্রীতি
এবং আরো নানা বিষয় কবিগণের চিত্তা ও অহুত্বের
একান্ত উপযোগী । তাই প্রাচীন কালের কালিদাস ও আধুনিক
আমাদের রবীন্দ্রনাথ সমধর্মী ।

রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ঋতু-উৎসব ও বৃক্ষরোপণ
উৎসব প্রবর্তিত করেন । ইহার প্রেরণা হৃদয় তিনি কালিদাস
হইতে পাইয়াছিলেন । মুক্ত প্রকৃতির সহিত মানবের ঘনিষ্ঠ
সম্পর্ক ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য । ইহা কালিদাস শকুন্তলা ও
পার্বতীর বৃক্ষপালনের চিত্রে পরিস্ফুট করিয়াছেন । রবীন্দ্র-
নাথ-প্রবর্তিত বৃক্ষরোপণ উৎসব হইতে ও উত্তরকালে রচিত
তাঁহার ‘বনবাণী’র কবিতাগুলি পাঠ করিয়া মনে হয় কবির
জীবন ও কাব্যের উপর কালিদাসের বিশেষ প্রভাব রহি-
য়াছে । কিন্তু এ সকল বর্তমানে আমাদের আলোচ্য নহে ।
কালিদাসের সহিত স্বীয় চিত্তের ঘনিষ্ঠ যোগ আবিষ্কারের
পথে কবিগুরু কালিদাস ও তাঁহার কাব্য-সম্পর্কে কোথায়
কি আলোচনা করিয়াছেন সর্বপ্রথম তাহাই দেখিতে হইবে ।
এই পথেই উভয়ের মানসিক যোগসূত্র আবিষ্কার করা সহজ
হইবে ।

কালিদাস ও তাঁহার কাব্যসম্পর্কে কবিগুরু যে
সকল কবিতা লিখিয়াছেন এবং সময় সময় গদ্যে

আলোচনা করিয়াছেন তাহা মোটামুটি উল্লিখিত হইতেছে ।

(১) মেঘদূত, চৈতালির কয়েকটি কবিতা, সেকাল, বিচ্ছেদ
এবং যক্ষ প্রভৃতি কবিতা, (২) শকুন্তলা ও কুমারসম্ভব
সম্পর্কে আলোচনা এবং The message of the forest
প্রবন্ধ, (৩) অল্প বয়স ইংরেজী ও বাংলা প্রবন্ধে ও পক্ষে
প্রাসঙ্গিক আলোচনা ।

‘চৈতালি’-কাব্যে ঋতুসংহার, কুমারসম্ভব ও মেঘদূত সম্বন্ধে
একটি করিয়া এবং কালিদাস সম্বন্ধে তিনটি চতুর্দশপদী কবিতা
রহিয়াছে । সবগুলিতেই কালিদাস ও তাঁহার কাব্য সম্পর্কে
কবির মুগ্ধ হৃদয়ের অনুরক্তির প্রকাশ । ঋতুসংহারের যৌবনপ্রীতি,
মেঘদূতের প্রকৃতি, আর কুমারসম্ভবের প্রেমের মাধুর্যের বর্ণনা
কবিকে কি পরিমাণ আকৃষ্ট করিয়াছিল তাহার পরিচয়
পাওয়া যায় এই কবিতাগুলিতে । এগুলিতে মুগ্ধ কবিহৃদয়ের
গুণিগান আছে । কালিদাস-বর্ণিত প্রাচীন ভারতের মহিমা-
মণ্ডিত জীবনযাত্রা ও তপোবনের আদর্শ সম্পর্কিত আরও
কয়েকটি কবিতা ‘চৈতালি’তে রহিয়াছে । ব্রহ্মচর্যাশ্রম
প্রতিষ্ঠার পূর্বে রবীন্দ্রনাথের চিত্ত প্রাচীন ভারতের প্রতি
কিরণ আকৃষ্ট হইতেছিল এগুলি তাহারই প্রত্যক্ষ প্রমাণ ।
‘তপোবন’ কবিতাটি শকুন্তলার প্রণয়নের একটি মনোরম
শব্দ-চিত্র । গোটা চৈতালি কাব্যেই রবীন্দ্রনাথের গভীর প্রকৃতি-
প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায় । তপোবনে মানবের সহিত বৃক্ষ-
লতা, পশুপক্ষীর সম্পর্ক অতিশয় ঘনিষ্ঠ ছিল । সেখানে যেমন
চৈতালি কাব্যেও তেমনি প্রকৃতির সব কিছুই কবির অতিশয়
প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে । শকুন্তলা-রত্নবংশে আমাদের প্রাচীন
কবি যেমন বৃক্ষলতা, পশুপক্ষীর সহিত মানবের আত্মীয়তার
চিত্র আঁকিয়াছেন এখানেও আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ কবি তাহারই
অনুগামী । হৃদয়-ধর্ম শীর্ষক কবিতায় কবি বলিতেছেন—

হৃদয় পাষাণভেদী নিকরৈর প্রায়,
জড়জন্তু সবাপানে নামিবারে চায় ।
মধ্য দিনে দক্ষদেহে ঋণ দিয়া নীরে ।
মা বলে’ সে ডেকে উঠে স্নিগ্ধ তটনীরে ।
যে চাঁদ ঘরের মাঝে হেসে দেয় উঁকি,
সে যেন ঘরেরি মেয়ে শিশু স্খামুখী ।
যে সকল তরুলতা রচি উপবন
গৃহপার্শ্বে বাড়িয়াছে তারা ভাইবোন ।
যে পশুরে জন্ম হ’তে আপনার জানি,
হৃদয় আপনি তারে ডাকে পুঁটুবাণী ।

‘হুই বহু’ কবিতায় মাহু ও পশুর স্নেহসম্পর্ক কবি পুনশ্চ ব্যক্ত
করিতেছেন—

সে দিনের আত্মীয়তা গেছে বহুদূরে—
ভবুও সহসা কোন কথাহীন সুরে
পরানে আগিয়া উঠে ক্ষণ পূর্বস্মৃতি,
অন্তরে উছলি উঠে স্খামুখী প্রীতি;

যুদ্ধ যুদ্ধ স্নিগ্ধ চোখে পশু চাহে যুধে
মাহুষ তাহারে হেরে স্নেহের কোথুকে।
যেন ছুই ছন্নবেশে ছ' বজুর মেলা—
তার পরে ছুই জীবে অপরাপ খেলা।

কালিদাসের কবিত্বকৃতির সহিত 'চৈতালি'র রবীন্দ্র-
মানসের সম্বন্ধিত্ব বুঝাইতে অধিক উদাহরণের প্রয়োজন নাই।
কালিদাসের রচনার সহিত পরিচিত পাঠক 'চৈতালি' পাঠ
করিলেই উহা দেখিতে পাইবেন। তথাপি সমর্থন্য উভয় কবির
আর একটি বিশেষ সাদৃশ্যের উল্লেখ না করিলেই নয়। কালি-

দৌন্দর্য্যলোকে বিরহিণী দৌন্দর্য্য-প্রতিমা এবং অপর দিকের
বিরহী মানবচিত্ত এই দুইয়ের বিরহব্যাকুলতা বর্ণিত। কবিত্ব
মতে একমাত্র কালিদাস ব্যতীত অপর কোন কবিই দৌন্দর্য্য-
লোকের এরূপ অপূর্ণ চিত্র অঙ্কন করিতে পারিতেন না।

সেথা কে পারিত
লয়ে যেতে তুমি ছাড়া করি অব্যাহিত—
লক্ষ্মীর বিলাসপুরী—অমর ভুবনে।

এই 'দৌন্দর্য্য-লোকের বিরহিণীর সহিত' যক্ষের বিরহকল্পনা
হইতে কবির চিত্তে এই দৌন্দর্য্য-বিচ্ছেদ-বেদনা সঞ্চারিত

আনন্দরূপের উল্লেখ করিয়াছেন। রূঢ় বাস্তব জগৎকে অবলম্বন
করিয়া কালিদাস তাহার কাব্যকে রসোত্তীর্ণ করিতে চাহেন
নাই। ব্যবহারিক জীবনের নৈরাশ্র ও দম্ভকে অতিক্রম করিয়া
তাহার কাব্য অপার্থিব আনন্দ ও সৌন্দর্য্যের বাণী বহন
করিতেছে। বাস্তব জগতের জীবনসংঘাত ও কোলাহলকে
দূরে পরিহার করিয়া তিনি কাব্যসৃষ্টিকে দৌন্দর্য্যের রসলোকে
স্থাপিত করিয়াছেন; কবিগুরুর মতে ইহাই কালিদাসের
কাব্যের বৈশিষ্ট্য।

তবু সে সবার উর্দ্ধে নির্লিপ্ত নির্মল
ফুটিয়াছে কাব্য তব দৌন্দর্য্য-কমল
আনন্দের স্বর্ধ্যপানে; তার কোনো ঠাই

ছেন—

কবি, তব মস্ত্রে আজি যুক্ত হয়ে যার
রক্ত এই জগতের বস্ত্রের ব্যথা।
লভিয়াছি বিরহের স্বর্গলোক—

পরবর্তীকালে রচিত মেঘদূত প্রবন্ধে কবি এই বিরহ-
বেদনাকে বিশ্লেষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কবিতার শেষে
কবির যে বেদনার প্রকাশ, উক্ত প্রবন্ধেও তাহারই আভাস
পাওয়া যায়।

“আমরা যাহার সহিত মিলিত হইতে চাহি, সে আপনায়
মানস সরোবরের অগম্যতীরে বাস করিতেছে, সেখানে কেবল
কল্পনাকে পাঠানো যায়, সেখানে সশরীরে উপনীত হইবার

এবং অসামান্য কবিতাশক্তি তাঁহার কবি-প্রকৃতির প্রকৃত পরিচয় দিতেছে। কালিদাসের কাব্যে তৎকালীন ভারতের জীবন-আত্মার যে চিত্র দেখিতে পাওয়া যায় তাহা যেরূপ অনাড়ম্বর সেরূপ আনন্দময়। তাহাতে অভাব-অভিযোগের দ্বন্দ্ব নাই, জীবনমুহুরেরও ক্ষয়-ক্ষতির হিসাব-নিকাশ নাই। মেঘদূতের স্তোম্য—

আনন্দোৎসব নয়নসলিলং যন্ত নাট্যনির্মিতঃ

নাট্যভাণ্ডঃ কুসুমশরদ্বাদিষ্ট সংযোগসাধ্যাং ।

হুঃখ যেটুকু আছে তাহাকে অস্বীকার করিয়া প্রেম ও সৌন্দর্য্যস্বাহাকে সকলের উর্ধ্বে স্থান দিয়া তাঁহার কাব্যে চিত্রিত অনন্যরী জীবন-রস উপভোগের যে দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছে কণিকার কবি তাহার দ্বারা সহজেই আচ্ছন্ন হইয়াছেন। ‘সেকাল’ কবিতাটির মধ্যে এই রমণীর সুহৃৎ জীবনের ছবিই কবি আঁকিয়াছেন। কবিতাটি পাঠকালে মেঘদূতের জীবন-চিত্র সুহৃৎস্থ স্মৃতিপথে উদ্ভূত হয়। তৎকালীন নায়ক-নায়িকার আশঙ্কলির প্রতি কবিগুরুর কি অপরিণীম মোহ। প্রাচীন আশঙ্কলির মধ্যে যে এক মাধুর্য্য আছে তাহা কবিগুরুই আমাদের সর্বপ্রথম দেখাইয়া দিলেন। কালিদাসের যুগে জন্ম হইলে কবি তাঁহার ভাবনাহীন জীবন কিরূপ উপভোগ করিতে পারিতেন তাহার একটি বর্ণনা দিয়াছেন। বর্তমান জীবনে উক্ত পরিবেশের অভাবে সেকালের জন্ম আক্ষেপ হওয়াই স্বাভাবিক। কবিতাটির শেষের দিকে এরূপ আক্ষেপের আভাসও রহিয়াছে।

হায়রে কবে কেটে গেছে কালিদাসের কাল

এবং

যাদের সঙ্গে ছয়নি মিলন সে সব বরাদ্দনা

বিচ্ছেদেরই হুঃখ আমার করেছে অত্মনা

কিন্তু বর্তমান কালের আনন্দর সাধাদানের জয়গান গাহিয়াই কবিগুরু কবিতাটি শেষ করিয়াছেন—

মরব না ভাই নিপুণিকা চতুরিকার শোকে

তারা সবাই অত্ননামে আছেন মর্ত্যালোকে ॥

‘অভিজ্ঞানশকুন্তল’ ও ‘কুমারসম্ভবের’ পত্নীভার প্রবেশ করিয়া কবি যে নিগূঢ় সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিয়াছেন তাহা আমাদের কাছে বিনিমিত করে। এই আলোচনা ছুটিতে আছে ভারতীয় আদর্শের সহিত মিলাইয়া সমগ্রভাবে কালিদাসের অনির্কলনীয় রসস্বষ্টি অধ্যয়ন করিবার প্রয়াস। সৌন্দর্য্য ও প্রেমের জয়গান গাহিয়া পরিসমাপ্তিতে তাহাকে কল্যাণের মধ্যে স্থাপন করা ইহা কালিদাসের কাব্যের একটি বৈশিষ্ট্য। বিশ্বের কল্যাণই ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির মূল কথা। পাশ্চাত্য সাহিত্যে কল্যাণের রূপ ভারতীয় সাহিত্যের মত বিকাশ লাভ করে নাই। ভারতীয় সাহিত্যে কেবল মানুষ নহে, জড়প্রকৃতির সহিতও কিরূপ হৃদয়ের সম্পর্ক স্থাপন করা যাইতে পারে তাহার আদর্শ দেখাইয়াছে। কবিগুরু ‘শকুন্তলা’ সম্পর্কে আলোচনা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের

এই মূলগত পার্থক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। টেম্পেট ও শকুন্তলা নাটকের আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলিতেছেন—“টেম্পেটে পীড়ন, শাসন, দমন—শকুন্তলার প্রীতি, শান্তি, সদ্ভাব। টেম্পেটে প্রকৃতি মানুষের আকার ধারণ করিয়াও তাহার সহিত হৃদয়ের সম্বন্ধে বদ্ধ হয় নাই—শকুন্তলার গাছপালা পশুপক্ষী আত্মভাবে রক্ষা করিয়াও মানুষের সহিত মধুর আত্মীয়ভাবে মিলিত হইয়া গেছে। বহিঃপ্রকৃতিকে যেখানে দূর করিয়া পর করিয়া ভাবে, যেখানে মানুষ আপনার চারিদিকে প্রাচীর ভুলিয়া জগতের সর্বত্র কেবল ব্যবধান রচনা করিতে থাকে, সেখানকার সাহিত্যে এরূপ সৃষ্টি সম্ভবপর হইতে পারে না।” The Message of the Forest প্রবন্ধে এ সম্পর্কে অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত আলোচনা আছে। সেখানে কবিগুরু শেকসপীয়ার ও মিলটনের রচনায় মানব ও প্রকৃতির এই বিরোধ দেখিয়া হুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন এবং তাহার কারণ নির্দেশ করিয়াছেন, “At the bottom of this gulf between man and Nature there is the lack of the message”—‘ঈশাবাস্ত মিদং সর্বম্—know all that is, as enveloped by God—’ অর্থাৎ ‘মানুষ ও প্রকৃতির এই পার্থক্যের মূলে এই বাণীর অভাব রহিয়াছে,—‘ঈশাবাস্ত মিদং সর্বম্’—বিষে ঘাহা কিছু বর্তমান তাহা সমস্তই ভগবানের শক্তি দ্বারা আবৃত বলিয়া মনে করিতে হইবে।’ পাশ্চাত্যে রোমান্টিক যুগে ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কোলরিজ প্রকৃতির কবিতায় হঠাৎ এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন যে হইয়াছিল—“তাহার মূলে রহিয়াছে জাদুনির মধ্য/দিয়া নবাগত প্রাচ্য দর্শনের প্রভাব।”

কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা প্রসঙ্গে কবিগুরু কালিদাসের রসদৃষ্টি সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা করিয়াছেন। সৌন্দর্য্য ও প্রেম বর্ণনায় কালিদাসের অসামান্য কৃতিত্বের কথা কবিগুরুর অপূর্ণ আলোচনায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এ সকলের উর্ধ্বে কালিদাসের কবিপ্রকৃতি যে মহত্তর ও পরিপূর্ণতার আদর্শে অহুপ্রাণিত বিশ্লেষণের দ্বারা কবিগুরু তাহা বুঝাইয়া দিয়াছেন। কালিদাসের কাব্যে নরনারীর প্রেম সম্বন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন, “যে প্রেমের কোনও বন্ধন নাই, কোন নিয়ম নাই; যাহা অকস্মাৎ নরনারীকে অভিভূত করিয়া সংযম-হর্গের ভয় প্রাকারের উপর আপনার জয়ধ্বজা নিখাত করে, কালিদাস তাহার শক্তি স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু তাহার কাছে আত্মসমর্পণ করেন নাই। তিনি দেখাইয়াছেন, যে অল্প প্রেমসম্ভোগ আমাদের কাছে স্বাধিকারপ্রসূত করে, তাহা ভর্তৃশাপের দ্বারা শঙ্কিত, ঋণিশাপের দ্বারা প্রতিহত ও দেবরোষের দ্বারা ভয়ানক হইয়া থাকে।” সৌন্দর্য্য ও আর্ট সম্বন্ধে কবিগুরু শ্রেয়বাদী। ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যও কল্যাণপ্রিয়। কবিগুরুর মতে সৌন্দর্য্যের সহিত ‘শিবমে’র অর্থাৎ কল্যাণের যোগ যেখানে সেখানেই

সাহিত্যসৃষ্টি সার্থক। সৌন্দর্য্যবোধ সম্বন্ধে আলোচনায় কবি কুমারসম্ভব ও শকুন্তলার এই দিকের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন (সাহিত্য)।

বলা বাহুল্য; এই নূতন রসদৃষ্টি অলঙ্কার-শাস্ত্রে মিলিবে না, কিন্তু আধুনিক কালের মহাকবি অভিনব দৃষ্টিতে কয়েকখানি

সংস্কৃত কাব্যের যে বিচার করিলেন তাহার ভুলনার পূর্বহরিগণের বিচার য়ান হইয়া পড়িয়াছে। কবিকৃতির উপর নূতন আলোক সম্পাত করিয়া পাঠকের চিত্তকে উদ্বুদ্ধরেন রসলোকে আকর্ষণ করিবার এই প্রয়াস চিরকাল সাহিত্যের অমূল্য সম্পদরূপে গণ্য হইবে।

আলোচনা

“কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ”

অধ্যাপক শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার, এম-এ, পিএচ-ডি

গত শ্রাবণ সংখ্যা প্রবাসীতে (পৃ. ৩৮২-৮৫) আমি তন্ত্রসার-রচয়িতা কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলাম। উহাতে প্রসঙ্গক্রমে দেখানো হইয়াছিল যে, কৃষ্ণানন্দের অবস্তুন সপ্তম পুরুষ রামতোষণ ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে প্রাণতোষণীতন্ত্র রচনা করেন; সুতরাং প্রবীণ ঐতিহাসিক-গণের সিদ্ধান্ত অম্বারী ২৫ বৎসরে এক পুরুষ গণনা করিলে, ঐ সময়ের প্রায় ১৫০ বৎসর পূর্বে অর্থাৎ আনুমানিক ১৬৭০ খ্রীষ্টাব্দের নিকটবর্তী কোন সময়ে কৃষ্ণানন্দ তন্ত্রসার রচনা করিয়া থাকিবেন। অধিকন্তু, ১৫৮০ শকাব্দ বা ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে অম্বলিখিত তন্ত্রসারের একখানি পুথির কথা শুনা যায়। একথা সত্য হইলে, কৃষ্ণানন্দ যৌবনে অর্থাৎ সম্ভবতঃ সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তন্ত্রসার রচনা করিয়া থাকিবেন। তবে এ বিষয় নিশ্চিত হইবার পূর্বে উক্ত পুথির তারিখটি পরীক্ষা করিয়া দেখা প্রয়োজন। এতৎ সম্পর্কিত তথ্য নির্ণয়ে কেহ আমাকে সাহায্য করিলে অমুগৃহীত হইব।...ইত্যাদি। উক্ত তারিখ পরীক্ষা বিষয়ক প্রয়োজন ব্যোমের কারণ এই যে, ঐতিহাসিক তথ্যনির্ণয় ও লিপিবদ্ধ বিষয়ে বাঁহারা বিশেষ শিক্ষা পান নাই, তাহাদিগকে অনেক সময় উদ্ধত পাঠের মূল্যগুণ্য সম্পর্কে সম্যক সচেতন দেখা যায় না। এইজন্য তাহাদের উদ্ধৃত ভ্রান্ত বা কাল্পনিক পাঠ অনেক সময় প্রকৃত তথ্য নির্ণয়ের অমূল্য হয় না।

ভাস্করসংখ্যা প্রবাসীতে (পৃ. ৫০৬-৮) শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য আমার প্রবন্ধটির সমালোচনা করিয়াছেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কয়েকটি যুক্তির সারবত্তা স্বীকার করা যায় না। কৃষ্ণানন্দ যদি গোঁড়া শাক্ত ছিলেন, তবে তিনি কেন কৃষ্ণবন্দনা দ্বারা গ্রন্থ রচনা করিলেন, ইহার ব্যাখ্যায় তিনি যে যুক্তি দিয়াছেন, তাহার আলোচনা বাহুল্যমাত্র। ভট্টাচার্য্য মহাশয় কুলপঞ্জিকাগুলির অম্বারী গবেষক; তাহার মতে এগুলি অশাস্ত্র এবং যেখানেই কুলশাস্ত্রোদ্ধৃত বংশলতার সহিত অশ্লীল প্রাপ্ত নামের অমিল দেখা যায়, সেখানে কোন কোনটিকে

প্রকৃত নাম, কোনটিকে রাশিনাম ও কোনটিকে বা ভাকনাম ইত্যাদি কল্পনা করিয়া সামঞ্জস্য আনিতে হইবে। হুৎধের বিষয়, এইরূপ ব্যাখ্যায় তথ্যস্বার্থের সঙ্কট হওয়া অসম্ভব এবং সেইজন্য তাহাকে সংস্কৃতনবীশের বিরূপ সমালোচনা সহ্য করিতেই হইবে। বহুকাল পূর্বে স্বর্গীয় পণ্ডিত ভগবান্দলাল ইন্দ্রজী এবং ব্যালার সাহেব দেখাইয়াছিলেন যে, “in India the duration of a generation amounts, as the statistical tables of the life-insurance companies show, at the outside to only 26 years”, অর্থাৎ কোন বংশের অনেক পুরুষের কালগণনা ব্যাপারে ভারতবর্ষে গড়পড়তা একপুরুষে ২৬ বৎসরের অধিক ধরা চলে না। অম্বনা ভট্টাচার্য্য মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন দত্ত গবেষণা করিয়া একপুরুষে ৩০।৪০ বৎসর স্থির করিলে তাহাতে কাহারও কাহারও আপত্তি না হইতে পারে। কিন্তু সেই অভিনব সিদ্ধান্ত কেহ গ্রহণের অযোগ্য মনে করিলে, তাহাকে অর্ধাচীন বলিয়া উপহাস করা অশোভন। চারুশাস্ত্রের ইতিহাস রচয়িতা সতীশচন্দ্র বিদ্যভূষণ মহাশয় রঘুনাথ শিরোমণির জন্মকাল লিখিয়াছেন আনুমানিক ১৪৭৭ খ্রীষ্টাব্দ; ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলেন যে, উহা ১৪৬০-৬৫ খ্রীষ্টাব্দ হইবে। এখন কেহ যদি দ্বিতীয় অম্বমানটি অগ্রাহ করিয়া প্রথম অম্বমানের অম্ববর্তী হয়, তবে উহাতে নিশ্চয়ই প্রমাণ হয় না যে, সে ব্যক্তি কাণ্ড-জানহীন এবং দ্বিতীয় অম্বমানটির প্রবর্তকের দ্বার পণ্ডিত ব্যক্তি বিরল। বঙ্গবাসী প্রকাশিত তন্ত্রসার-সম্পাদনায় ব্যবহৃত সমস্ত অথও পুথিতেই এক স্থলে পূর্ণানন্দের এবং অপর এক স্থলে তৎকৃত শ্রীভক্তিস্তায়ণির (১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দ) উল্লেখ আছে। তন্ত্রসারের কোন সম্পূর্ণ এবং নির্ভরযোগ্য পুথিতে এই দুটি উল্লেখের অনন্তিম প্রমাণিত না হওয়া পর্য্যন্ত ইহাকেই তন্ত্রসার রচনাকাল সম্পর্কিত আদি সীমাবোধক অকাট্য ও শ্রেষ্ঠ প্রমাণ স্বীকার করিতে হইবে। ভট্টাচার্য্য মহাশয় ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট প্রমাণ কিছুই দিতে না পারিলেও আমাকে উপহাস করিতে কণ্ঠিত হন নাই।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় তন্ত্রসারের তিনখানি প্রাচীন পুথির পরিচয় দিয়া ঐতিহাসিক সমাজের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন

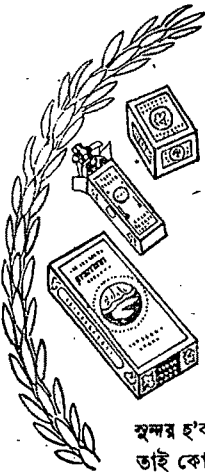
প্রতি উৎসবে



কাদম্বার
প্রধান অঙ্গ

সি. আর. দাশের

রাঙ্গাজবা
● সিন্দুর
● কুমকুম
● আলতা



“রূপং দেহি, জয়ং দেহি”—রূপের এই আরাধনা বিলাস প্রচেষ্টা নহে।
হৃদয় হ'বার হৃনিবিড় আকান মানুষ পেয়েছে তার অন্তর-পুরুষের কাছ থেকে।
তাই কোটর ছেড়ে প্রাসাদ-বকল ছেড়ে সে হৃষ্টি করেছে বিচিত্র বসন-ভূষণ। এ
তার কত বড় গর্ব ও আনন্দ। প্রসাধন দ্রব্যও ক্রমোন্নতির পথ ধরে অনেক দূর
এগিয়ে এসেছে। তার পরিচয় পাওয়া যায় ঘরে ঘরে “রাঙ্গাজবা”র নিত্য
ব্যবহারে। বিস্ময়কর ও বর্ণসম্পদে নারীকে সে দিয়েছে পরিপূর্ণ তৃপ্তি, তাই আজ
প্রতি উৎসবে “রাঙ্গাজবা”র স্থান সবার উপরে। জাতি, ধর্ম ও বয়স নির্বিশেষে
ভারতনারীর প্রিয়তম প্রসাধন সি, আর, দাশের রাঙ্গাজবা-সিন্দুর, কুমকুম ও আলতা।

অনুম্পা কেমিক্যাল: কলিকাতা

সন্দেহ নাই। চাট্টিগ্রাম হইতে তিনি একখানি পুঁথি পাইয়াছেন; উহার লিপিকাল “রূপাধরমন্দিরো চ ত্তো মাসে চ তার্গবে। লিখিতা পুস্তিকা চৈব ত্রিকৃৎবল্লভবীমতা ॥” অর্থাৎ ১৬০১ শকাব্দ বা ১৬৭১ খ্রীষ্টাব্দ রূপে উল্লিখিত হইয়াছে। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের উক্তন নবম পুরুষ বলিয়া কথিত নরসিংহ বাচস্পতি মহাশয়ের নামান্বিত তন্ত্রসার পুঁথিখানির তারিখ লিখিত হইয়াছে ১৫৬৮ শকাব্দ অর্থাৎ ১৬৪৬ খ্রীষ্টাব্দ। অতঃপর তিনি বকীয় সাহিত্য-পরিষৎ সংগৃহীত এবং ১৫৫৪ শকাব্দ অর্থাৎ ১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দের তারিখ সংবলিত একখানি তন্ত্রসার পুঁথিকে এই গ্রন্থের সর্বপ্রাচীন পুঁথি বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন এবং আমাদের উক্ত তারিখটি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে অস্বরোধ করিয়াছেন। সম্প্রতি বকীয় সাহিত্য-পরিষদের গ্রন্থাধ্যক্ষ ত্রৈলোক্যব্রহ্মেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তত্তত পুঁথিশালার তত্তাবধায়ক পণ্ডিত মহাশয়ের অনুরোধে আমি এই পুঁথিখানি পরীক্ষা করিবার সুযোগ পাইয়াছি। আশ্চর্য্যের বিষয়, যে তারিখটি ১৫৫৪ শকাব্দরূপে পড়া হইয়াছে, উহার তৃতীয় অঙ্কটির নিম্নাংশ অব-

লুপ্ত এবং উহার অধুনা বর্তমান উর্দ্ধাংশের আকার দ্বিতীয় অঙ্কটির উর্দ্ধাংশের অনুরূপ নহে। চতুর্থ অঙ্কটিরও নিম্নাংশ অবলুপ্ত দেখা যায়। সুতরাং এই তারিখের পাঠ অনিশ্চিত। অবশ্য আমি বলিতেছি না যে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রবন্ধে উক্ত সমস্ত পাঠই বর্তমান তারিখ পাঠের অনুরূপ কাল্পনিক; কারণ তাহা এই সকল পুঁথি পরীক্ষা না করিয়া বলা সম্ভব নহে।

যাহা হউক, কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের জীবনকাল যদি আনুমানিক ১৫১৫-১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দ হয় এবং তিনি যদি জীবনের প্রথমার্ধে তন্ত্রসার গ্রন্থখানি রচনা করিয়া থাকেন, তাহাতে আপত্তি করিবার মত আমি কিছু দেখিতে পাইতেছি না। আমি শুধু বলিতে চাই যে, তন্ত্রসারের তথাকথিত প্রাচীন প্রাচীন পুঁথিসমূহের তারিখ পরীক্ষা করিয়া এ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন। সেই পরীক্ষাকার্য্যে ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমাদের সাহায্য করিলে আমি উপকৃত হইব। প্রকৃত তথ্য নির্ণয়ই ঐতিহাসিকের উদ্দেশ্য; আমি কোন ভুল করিলে আমিই সর্বপ্রথমে উহার সংশোধন কামনা করিব।



ক্যালকাটা
কেমিক্যাল

দুর্লভ নয় মোটেই—

তহুদেহের পেলব কোমলতা ও লাবণ্যমণ্ডিত সৌন্দর্য্য স্বম্মা প্রকৃতির দুর্লভ দান। নিখিল তরুণীর পরম কাম্যবস্তুরূপের এই ঐশ্বর্য্য। প্রাকৃতিক যুগে নারীর পক্ষে এ সম্পদ দুর্লভ ছিল বটে, কিন্তু একালে ‘কাল-কেমিকো’র সম্বন্ধে প্রস্তুত প্রসাধনী দেহের সৌন্দর্য্যকে প্রত্যেক রমণীর হাতের কাছে এনে দিয়েছে।

★ **তুহিনা বিউটিফিক**
★ **সেনুকা টয়লেট পাউডার**
★ **লাবনী মো এবং ক্রীম**

যৎকিঞ্চিৎ বক্তব্য

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

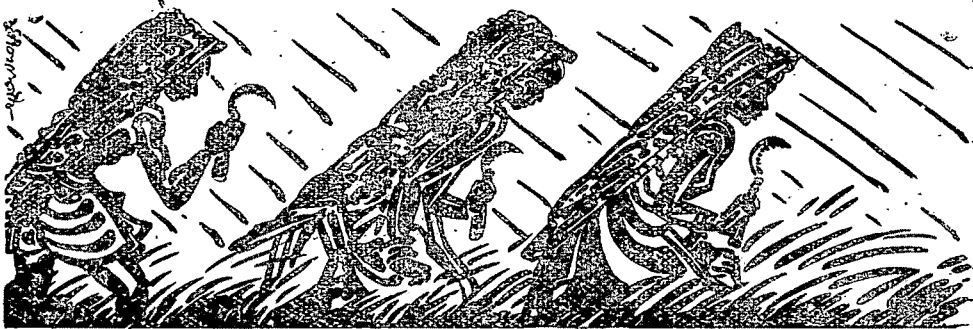
ডঃ সরকারের দ্বিতীয় আলোচনাটির ভাষায় যে উদ্দেশ্য প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতে আমরা অত্যন্ত কৌতুক বোধ করিয়াছি। মজা এই যে, এই বিস্ময় সমালোচনার অন্তরালে মূল বিষয়ে তাঁহার নিজের ভ্রম স্বীকার লুকায়িত আছে। পৌড়াই হটুক আর কোমলই হটুক “শাক্ত” অর্থ শক্তি-মন্ত্রে দীক্ষিত তান্ত্রিক, বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষিত তান্ত্রিক নহে। ডঃ সরকার এবার কৃষ্ণানন্দ্র জীবনকাল আত্মমানিক ১৫৯৫-১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দ ও তত্ত্বদ্বারের রচনাকাল তাহার “প্রথমার্ধে” ধরিয়াছেন। অর্থাৎ রচনাকাল হয় ১৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে, কিংবা ‘যৌবন’ অর্থে অনধিক ৩০ বৎসর বয়স ধরিলে হয় ১৬২৫ খ্রীষ্টাব্দ। তদনুসারে এক পুরুষের গড়পড়তা কিন্তু ২৫-২৬ বৎসরের বেশী হয় এবং ডঃ সরকারের নিজ পক্ষই “অগ্রাহ্য” হইয়া যায়।

পরিসরের জীর্ণ পুঁথিটির লিপিকাল (১৫৫৪ শক)। ডঃ সরকার ‘অনিশ্চিত’ কিংবা ‘কাল্পনিক’ বলিয়াছেন, অথচ স্বয়ং অপর কোন পাঠ দেন নাই। ‘আশ্রম’ না হইয়া বীর ভাবে পরীক্ষা করিলে তিনি দেখিতে পারিতেন (আমরা তাঁহাকে সাদরে আহ্বান করিতেছি) তৃতীয় অঙ্কটির বিজ্ঞান উদ্ভাষণ ০ হইতে ৯ পর্য্যন্ত ১০টি অঙ্কের মধ্যে একমাত্র ৫ অঙ্কের সহিত মিলে। ৫ অঙ্কের দুইটি পৃথক রূপ পুঁথিটির শেষ পত্রের সূচিতে এবং অঙ্ক বহুস্থলে বিজ্ঞান আছে—৫৫ পাঠ্যর ত্রুটিত পত্রাঙ্কে ও পাশাপাশি দুইটি ৫ কিকিং বিভিন্ন। তৃতীয় অঙ্কটি যে ৭ নহে তাহা ৫৭ পত্রাঙ্কের সহিত মিলাইলে স্পষ্ট বুঝা যায়। অতঃ কোন অঙ্কের সহিত দুগুণকরেও সাদৃশ্য নাই।

আমাদের বহু কথার বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়া পাঠকদের বিভ্রান্ত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। “এ স্থলে মূল কল্পপঞ্জীতে কোনই ভুল নাই” বলায় তিনি বুঝিয়াছেন, আমার মতে সব কল্পপঞ্জীই “অভ্রান্ত”। গড়পড়তা বিষয়ে আমরা তাঁহাকে “অর্ধাচীন বলিয়া উপহাস করি” নাই, ভ্রান্ত বলিয়াছিলাম। শিরোমণির কালনির্দেশ বিনা যুক্তিবিচারে “অগ্রাহ্য” করা “কাণ্ডজ্ঞানহীন”র কাজ—ইহা আমাদের বক্তব্যও নহে, এবস্থিৎ ভাষা প্রয়োগও আমাদের নহে, তিনি অকারণ উদ্ভা প্রকাশ করিয়া নিজেই হাত্তান্দ করিয়া ভুলিয়াছেন।

তত্ত্বদ্বারে পূর্ণানন্দের ও তদীয় শ্রীতত্ত্বচিন্তামণির উল্লেখ বঙ্গ-বাসী স্তম্ভ অপর কোন মুদ্রিত সংস্করণে নাই—রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায়ের ১২৮৫ সনের সংস্করণ পৃ. ১৫৮ ও ৩১৫-৬, প্রসন্ন কুমার শাস্ত্রীর চতুর্থ সং (১৩১৮) পৃ. ১০৪ ও ৩১৫, বহুমতীর ৩য় সং পৃ. ৮৪ ও ২৪২-৩ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য—এবং কোন পুঁথিতেও আমরা পাই নাই। তথাপি এখনও ঐ উল্লেখ “অকাটা ও শ্রেষ্ঠ প্রমাণ” বলিয়া স্বীকার করিতে ডঃ সরকারের দ্বিধা নাই। অথচ বঙ্গবাসী সংস্করণে ব্যবহৃত ১৫৮০ শকাব্দের পুঁথি সম্পর্কে মহামহোপাধ্যায় পঞ্চানন ভট্টরত্ন প্রমুখ পণ্ডিতগণের শকাব্দ পাঠ, “ভ্রান্ত বা কাল্পনিক” বলিয়া সন্দেহ করিয়াছেন। কারণ, “ঐতিহাসিক তথ্য নির্ণয় ও লিপিবদ্ধ বিষয়ে তাঁহার বিশেষ শিক্ষা পান নাই।”

ডঃ সরকার যদি ১৬০১ শকের পুঁথি দেখিতে চান কিংবা কৃষ্ণানন্দের কাল নির্ণয়ে অপরাপর উপকরণ রাখি আলোচনা করিতে চান, আমরা তাঁহাকে আমাদের বাসগৃহে সাদরে আহ্বান করিতেছি।



ভাঙা-গড়া

শ্রীনারায়ণ দত্ত

এই তো সেদিন জয়যাত্রার পথে
অরু-প্রান্তরে দিগন্তব্যাপী বড়...
আর বিদ্যুৎ...
শাণিত হাসিতে এসেছিল তারা যুত্যাভূত,
এই সেদিনো তো দ্রুত ধাবমান রবে
অন বৈদ্যুত অথের গুরে গুরে ;
কালবোশেখীর ঝঙ্কার-কঠিন সুরে
বেজেছে প্রত্যাদেশ
এই পৃথিবীর যা-কিছু সৃষ্টি আজ হ'তে হোক শেষ।

কঠিন প্রত্যাদেশ
সৈন্যের কদল ঢেকেছে সহসা মানুষের কংকাল ;
বোমারে বোমারে এ আকাশ উত্তাল
রেখার রেখার কৈপে কৈপে মিলে-মিলে গেছে কত দেশ
মানচিত্রের বুকে ফুটিয়াছে রক্তরঙীন মহা যুত্য়ার রেশ
অহাসময়ের সংকটভরা গভীর প্রত্যাদেশ।

যত ভয়সায় পিচঢালা হোক সেদিনের সেই নিশা
মানুষের বুকে ছেগে তবু ছিল স্তবীর জিজীবিষা।
অসীতা ধরার যুতিকি চিরে চিরে
শত সংহারের অলক্ষ্যে ধীরে ধীরে
শক্তি ভাবে তবু ছেগেছিল স্বপ্নের অঙ্গুর
অবজাতকের আতঙ্ক নিয়ে—কম্পিত ব্যাধাতুর।

সে দিনের সেই সৃষ্টি-প্রভাতে দেখেছিলে চেয়ে ভূমি
দিগন্ত জুড়ে অটুট সম্ভাবনা,
ঝঙ্কারলিন ধরণীরে আছে চুমি ?
অব আতঙ্কের কণ্ঠে শোন নি সেদিনের বন্দনা।
শোন নি মানুষ ভূমি
অরণ্যতলে দেখ নি তন্ত্রাতুর
অজানা স্বপ্নে কৈপে উঠেছিল সেদিনের অঙ্গুর ?

আজি দিকে দিকে জীবনের সাড়া আবার উঠেছে ছেগে
রেখার রেখার তপন উঠেছে ঝঙ্কার কালো মেঘে ;
অঙ্গুরে আজ বনস্পতির ছায়া
আশঙ্কা নেই অনাগত দিনে এ ছায়াও পাবে কাঁদা
ব্যর্থ হবে না কখনো বিবর্তন
শতাব্দীব্যাপী ইতিবৃত্তের এ ধারা চিরন্তন।

নিজা-নীরব রাতের মত

শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

নদীতীরের ভায়ল ছায়া ভুলায় আমার মন,
আশেপাশে কিশলয়ের গান।
সন্ধ্যাপ্রান্তে স্নেহের পরশ বুলায় সমীরণ,
কানে আসে শ্রোতের কলতান।
ঘাটের ধারে হুত্থে তরী আলোধারায় নেয়ে,
পারে যাবার সাধ হয়েছে বইঠাখানি বেয়ে।

নিজা-নীরব রাতের মত শান্তি পেলেম মনে,
বনতলে বেড়ায় প্রাণের মারা।
সাদা মেঘের টুকরোগুলো নীল আকাশের কোণে
কালো জলে পড়ছে তাদের ছায়া।
ঝড়ের বীধি তুপের ধারে পাইছে অবিরত,
বেগুনাধার অন্তরালে দুয়ার স্মৃতি কত।

সুদূরে ওই দেউলচূড়া বনের শিরে জাগে,
পথ-রেখা পাইনে বুজেতো ভাই।
পলকছারা নয়নতারা পারের অহরাগে ;
জানা শোনা গ্রাম তো কোনো নাই।
পারে-চলা পথের সনে নেইকো পরিচয়,
তবু আমার যেতেই হবে দিনটি মধ্যম।

বাবুই পাখী বাঁধছে বাসা তরা দুপুর বেলা,
ভরুয়ে কুলের পরাগ করে।
আনন্দেতে বকের সাথে গাঙ শালিকের খেলা
নদীকূলে নিরুপ পথের পরে।
শুভচরে হাঁসের দল হ'ল যে আনন্দনা,
ভূগের জালে জড়িয়ে আছে কুলের আল্পনা।

ভূমি হেথায় একেলা রহ টেউ-মোলানো বাক,
পাতাঝরা ভাঙা ঘাটের কোলে ;
বন্ধু আমার আসবে যখন বুঝিয়ে বলা তাকে',
আলোভরা পারে গেলাম চলে।

এ পার হ'ত ও পারে মোর হুইবে তরী বেগে,
জলয়ে মোর টেউ উঠেছে উত্তল হাওয়া লেগে।

পুস্তক-পরিচয়

ভারত-মুক্তি-সাধক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও
অর্ধ শতাব্দীর বাংলা—শ্রীশান্তা দেবী। পৃ: ১৪+৩২।
প্রাপ্তিস্থান—পি ২৬ রাজা বসন্ত রায় রোড, কলিকাতা। ১৯৪৭
অক্টোবর। সচিত্র মূল্য—ছয় টাকা।

এই বইখানি বিশেষ সময়োপযোগী হইয়াছে এবং একাধারে
স্নেহশীল ও গুণজ্ঞ কঙ্কার দ্বারা লিখিত পুণ্যচরিত পিতার জীবন-
কথা বলিয়া এই বই বাঙ্গালা সাহিত্যে চিরকাল নিজ বিশিষ্ট
আসনে বিরাজমান থাকিবে। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের তিরোধান
ঘটিয়াছে চারি বৎসর পূর্বে। কিন্তু বাহার স্মৃতি তিনি সারা জীবন
ধরিয়া সাধনা করিয়া গিয়াছেন, সেই ভারতবর্ষের মুক্তি, পূরাপুরি
না হোক, আংশিক ভাবে ঘটিয়াছে, মাত্র দুই মাস হইল। এই
মুক্তি বা মুক্তির আভাস আমরা পাইয়াছি যে সমস্ত ত্যাগী অক্লান্তি-
কর্মী দেশসেবকের ভাবগুচ্ছ নিষ্ঠা ও শ্রমের ফলস্বরূপ, রামানন্দ
চট্টোপাধ্যায় তাঁহাদের মধ্যে অত্যন্ত প্রধান পুরুষ ছিলেন।
কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তাঁহাদের প্রতি সমগ্র জাতির শ্রদ্ধানিবেদন করি-
বার উপযুক্ত অবসর এখনই। জীবনের বহু বিভিন্ন ও বিচিত্র
পথে আমাদের দেশের মুক্তি-কামীরা তাঁহাদের অবদান দ্বারা
ভারতের আধুনিক ইতিহাসকে গৌরবময় করিয়া গিয়াছেন। কেহ
জ্ঞান-সাধনার পথে গিয়াছেন, কেহ বা আমাদের অল্পভূতি-শক্তির
উদ্বোধন করিয়াছেন, অর্থনৈতিক পরবশতা হইতে মুক্তি দিতে
কেহ চেষ্টা করিয়াছেন, কেহ বা সক্রিয় প্রতিরোধের দ্বারা
অত্যাচার অবমাননার কবল হইতে স্বজাতিকে বাঁচাইতে চেষ্টা
করিয়া সজ্ঞানে ও কোনও রূপ ক্ষোভ না করিয়া প্রাণ বিসর্জন
করিয়াছেন। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় শিক্ষার মাধ্যমে দেশের
প্রাণশক্তির উদ্বোধনে ব্যাপৃত ছিলেন; সাধারণ শিক্ষক হিসাবে
তিনি প্রথম তরুণদের চিত্তবৃত্তির উন্মেষ করিয়া দিবার জন্য আত্ম-
নিয়োজিত হন এবং পরে এই অধ্যাপক জীবন ছাড়িয়া দিয়া,
মাসিক পত্রের সম্পাদক রূপে জনগণের শিক্ষায় ব্রতী হন। এই
পথে তাঁহার সমস্ত শক্তির পূর্ণতম প্রকাশ ঘটে এবং বাঙ্গলার ও
ভারতবর্ষের জনগণও তাঁহার এই সেবার দ্বারা স্বাধীনতার পথে
অগ্রসর হইবার উপযোগী পাথের বহুল পরিমাণে অর্জন করে।
দেশের সাধারণ পত্রিকা-পাঠক, রাজনীতির অথবা রাষ্ট্রীয় ঘটনা-
বলীর গতিব সহিত লাক্ষ্য বা ঘনিষ্ঠ পরিচয় যাহাদের পক্ষে সম্ভব-
পর ছিল না তাহাদের জন্য নিরপেক্ষ ভাবে তথ্য সংগ্রহ করিয়া
দিয়া, ও অবস্থা সম্বন্ধে যুক্তিপূর্ণ মনোভাব গড়িয়া তুলিতে সাহায্য

করিয়া, মাসের পর মাস বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া অত্যন্ত ভাবে
পরিশ্রম তিনি করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার “প্রবাসী” ও “মডার্ন-
রিভিউ” পত্রিকা দুইটি এই রাজনৈতিক বোধকে দেশের শিক্ষিত
সমাজের মধ্যে দৃঢ় করিয়া দিতে অপূর্ব কাজ করিয়াছে। কেবল
রাজনৈতিক ব্যাপারে যাহা এই দুই পত্রিকা দ্বারা সংগঠিত
হইয়াছে, তাহার কৃতিত্ব মুখ্যতঃ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের
প্রাণ্য। রাজনৈতিক ব্যতীত, সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক ব্যাপারে
রামানন্দ বাবু যে সমস্ত শিল্পী ও সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক ও
বৈজ্ঞানিক প্রভৃতির সহযোগিতা লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের
সহায়তায় তিনি বঙ্গদেশ তথা ভারতবর্ষের চিন্তকে সুসংস্কৃত ও
সমৃদ্ধ করিবার জ্ঞানপকাশ বৎসর ধরিয়া শ্রেষ্ঠ মানসিক ও সাংস্কৃতিক
রসবস্ত্র উপস্থাপিত করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গলার ও ভারতবর্ষের
তাবৎ লোকহিতকর চিন্তা ও কর্মের সঙ্গে রামানন্দ বাবু জীবনের
অক্লান্তকর ধরিয়া ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত ছিলেন।

এ হেন কর্মী ও চিন্তা-নেতা মহাপুরুষের প্রসঙ্গ দেশের মধ্যে
যত হয় ততই ভাল। সুখের বিষয়, রামানন্দ-সম্বন্ধে প্রথম এই
যে লক্ষণীয় বইখানি বাহির হইল, এখানি তাঁহার কন্যারই লেখা।
শ্রীযুক্তা শান্তা দেবী সুসাহিত্যিকা, বাঙ্গালা ভাষার সাহিত্য
তাঁহার দানের দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়াছে। একপ মহৎ চরিত্রের
পিতার সান্নিধ্য তাঁহার দৃষ্টি ও লিখনভঙ্গীকে যে এই পুণ্যলোক
পুরুষের জীবনী লিখিবার জন্য উপযোগী করিবে, তাহা সহজেই
আশা করা যায়। প্রস্তুত রামানন্দ-জীবনীতে যথা-আবশ্যক
তথ্যের সমাবেশ আছে। রামানন্দ-জীবনীর পারিপার্শ্বিকের
উপযুক্ত বিচার-বিশ্লেষণও আছে এবং রামানন্দ-চরিত্রের মহৎ ও
বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করিবার সার্থক প্রয়াসও আছে। এই বই বিশেষ
কঠোর ভাবে লিখিত হইয়াছে এবং ইহা হইতে রামানন্দ-চরিত্রের
বহুমুখতার একটি ভাল পরিচয় পাওয়া যাইবে। ভক্তির অসংযত
উচ্ছ্বাসে লেখিকা এবং তাঁহার পিতা উভয়েরই কৃতিত্বকে ক্ষুণ্ণ করা
হয় নাই, লেখিকা যথাসম্ভব নির্বৈয়ক্তিক ভাবেই এই চরিত্রকথা
লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বাঙ্গালাদেশ তথা ভারতবর্ষের শতাব্দীর
রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের একটা মনোজ্ঞ দিগ্‌দর্শন এই
বই হইতে পাওয়া যাইবে এবং ইহা হইতেই এই বইয়ের অন্তিম
উপযোগিতা। আশা করি এই বইয়ের যোগ্য সমাদর বাঙ্গালার
পাঠক সমাজে হইবে।

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

বিশুদ্ধ দুগ্ধজাত

বাসন্তী ঘৃত

টেলি—বাসন্তী ঘি ফোন—বি.বি, ৫৭৩৮ পো: বঙ্গ ৬৮৩৬ কলি:

ঘি, স্বগারমার্কেটস্, একস্পোর্টারস্, ইম্পোর্টারস্ ও
জেনারেল অর্ডার সাপ্লায়ারস্

প্রমথনাথ পাল এণ্ড সন্স

২সি, রামকুমার রক্ষিত লেন, কলিকাতা—৭

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—পঞ্চম খণ্ড। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ২৪৩১ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা। ১৩৫৩।

শ্রীযুক্ত ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুসন্ধিৎসা ও অধ্যবসায়ের অন্ত নাই, এবং বর্তমান সময়ের নানাবিধ সঙ্কট ও চিত্তবিক্ষেপের মধ্যেও তাঁহার একাগ্রতার ব্যাঘাত নাই। এই গ্রন্থমালায় এ পর্যন্ত আশী জনেরও অধিক খ্যাতিমান বাঙালী সাহিত্য-সাধক ও তাঁহাদের গ্রন্থাবলীর যে সংক্ষিপ্ত অথচ তথ্যবহুল পরিচয় লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, তাহা মূলগ্রন্থ ও সাময়িক নথিপত্রাদি হইতে বহু যত্নে উদ্ধার করা হইয়াছে বলিয়া যেমন প্রামাণ্য তেমনই মূল্যবান। অজ্ঞাত খণ্ডের বিস্তৃত সমালোচনায় আমরা বাহা বলিয়াছিলাম তাহার পুনরুল্লেখ নিম্নয়োজন; কিন্তু বর্তমান পঞ্চম খণ্ড প্রথম চারি খণ্ডের মর্যাদা ও গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। এই খণ্ডের একটি আকর্ষণ এই যে, ইহাতে যে-সকল লোকপ্রিয় লেখকের প্রতিষ্ঠা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে, তাঁহারা সকলেই অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী সময়ের—যথা, প্রভাতকুমার, তারকনাথ, গিরীন্দ্রমোহিনী, অক্ষয় বড়াল, দেবেন্দ্র সেন, কামিনী রায়, সত্যেন্দ্র দত্ত, স্বরেশ সনাত্তপতি, অক্ষয় মৈত্রেয় প্রভৃতি।

একনিষ্ঠ ও অক্লান্তকর্মী ব্রজেননাথ বাংলা-সাহিত্যের যে বহু অজ্ঞাত ও বিক্ষিপ্ত উপাদান এই ক্ষুদ্র পুস্তিকান্তলিতে সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন, তাহার মূল্য বাংলা-সাহিত্যের ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকের নিকট ক্ষুদ্র হইবে না। কিন্তু এ সংকলন শুধু বিশেষজ্ঞের জ্ঞান নয়, সাধারণ পাঠকের জ্ঞানও রচিত বলিয়া, গৃহ-যুগের বিস্মৃতপ্রায় সাহিত্যিক কীর্তি-কাহিনী সকলেরই চিন্তাকর্ষক হইবার কথা।

শ্রীশুশীলকুমার দে

রাত্রির যাত্রী—শ্রীপকানন চট্টোপাধ্যায়। দেবপ্রী সাহিত্য সমিতি। ২২এ, তারক প্রামাণিক রোড, কলিকাতা। মূল্য ৩।

রাজনৈতিক উপন্যাস। বর্তমানে রাজনৈতিক বাংলা-সাহিত্যে উপন্যাসের প্রাবল্য আসিয়াছে। কিন্তু পড়িবার মত বই সচরাচর চোখে পড়ে না। আলোচ্য উপন্যাসখানি কিন্তু ভাল লাগিল। পকাননবাব বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে নিতান্ত অপরিচিত নহেন। ইতিপূর্বে খানকরক কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়া তিনি কবি পরিচিতি লাভ করিয়াছেন। উপন্যাস রচনায়ও তাঁর পাকা হাতের পরিচয় পাওয়া গেল।

উপন্যাসের আরম্ভ হইয়াছে শিবানী গ্রামকে কেন্দ্র করিয়া। ম্যালেরিয়া-জর্জরিত ক্ষয়লাকীর্ণ গ্রামখানি যে সময় জনকরক বণিকের [ইংরেজ] শ্রেনদৃষ্টিতে পড়িয়া একটি শিকাগলে পরিণত হইয়াছে, সেই সময় হইতেই কাহিনীর আরম্ভ। ইন্দ্রদেব এই গ্রামের ছেলে—বার মনের বিকাশ ঘটাইয়াছে এই গ্রামের পরিবর্তনশীল আবহাওয়ায় এবং চরিত্রের প্রকাশ দেখা গিয়াছে গান্ধীজীর লবণ-আইন ভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করিয়া। বিপিন বাবু এ গ্রামের লোক নন, কিন্তু বাবসা উপলক্ষে এখানে আসিয়া শেষ পর্যন্ত রহিয়া গিয়াছেন। শাশুতী এর কন্যা, উপন্যাসের প্রধান নায়িকা। বলদেব, আভা রায়, দুর্গা, দারোগা বাবু, পুলিশ সাহেব মিঃ লাহিড়ী, রাইচরণ আরও বহু বিভিন্ন চরিত্র উপন্যাসে ভিড় করিয়া আছে, কিন্তু প্রধান চরিত্রগুলি আপন আপন বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে; ভিড়ের মধ্যে হারাইয়া যায় নাই। শাশুতীর চরিত্র বিশেষভাবে ভাল লাগিল। ইন্দ্রদেবের প্রতি তার আসক্তির কোথাও উদ্দাম প্রকাশ নাই, কিন্তুধারার মতই তাহা নিঃশব্দে বহিয়া গিয়াছে। কোথাও সঙ্কীর্ণ স্বার্থের জগ্ন সে আদর্শচ্যুত হয় নাই। লেখকের ভাষা সাবলীল, সংলাপ প্রশংসনীয়।

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

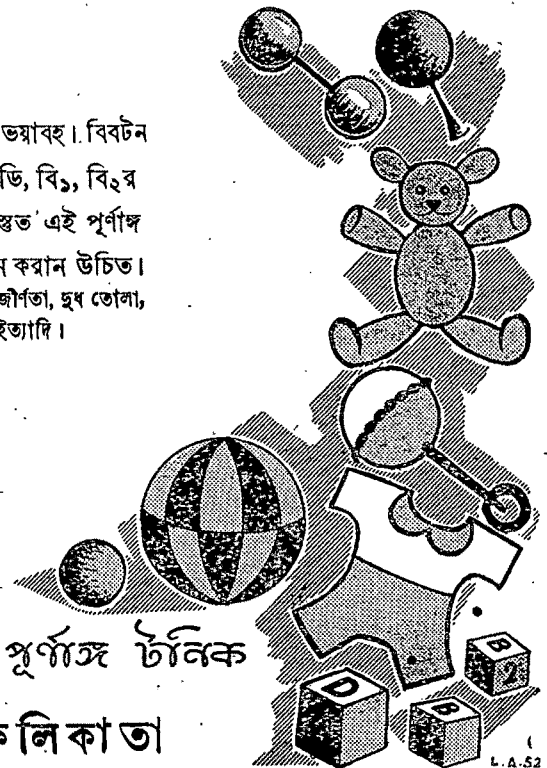
মায়ের কর্তব্য

শিশুপালনের সম্যক জ্ঞানের অভাবে এদেশে শিশু-মৃত্যুর হার এত ভয়াবহ। বিবটন শিশুদের দৈহিক সর্বাঙ্গীণ পুষ্টিবিধান করিতে অদ্বিতীয়। ভিটামিন ডি, বি১, বি২ সহিত মূল্যবান উদ্ভিজ্জ ও রাসায়নিক উপাদানের সংমিশ্রণে প্রস্তুত এই পূর্ণাঙ্গ টনিকটি প্রত্যেক শিশুকেই, বিশেষ করিয়া দন্তোদ্যমের সময়, সেবন করান উচিত। বিবটন নিম্নলিখিত রোগে বিশেষ উপকারীঃ—শিশুদের যকৃতের পীড়া, অজীর্ণতা, দুধ তোলা, পেট ফাঁপা, কোষ্ঠকাঠিন্য, রক্তশূন্যতা, রুগ্নতা, ব্রুকাইটিস, রিকেটস ইত্যাদি।



একটি পূর্ণাঙ্গ টনিক

লিষ্টার এন্টিসেপটিকস্ • কলিকাতা



সঙ্গম ভট্টাচার্যের

ফসল

দ্বিতীয় সংস্করণ

এক টাকা চার আনা ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রমাণ পাওয়া যায়।...ভাষা ও রসপরিবেশ গল্পে যেখানে যাহা অপরিহার্য, লেখক তাহা প্রকৃত আর্টিষ্টের মত সম্পাদনা করিয়াছেন।' আনন্দবাজার

ধাণ

বাঙালীর সমাজ ও পারিবারিক জীবনের পারস্পরিক সম্বন্ধের মধুরতা অন্তর্গত হতে চলেছে, বিশেষ করে এক টাকা সাড়ে ছয় আনা অর্থনৈতিক কারণে। যে আর্থিক মাছিয়া পারিবারিক শান্তি ও মাধুর্য রক্ষা করিবার পক্ষে অপরিহার্য তার অভাবে পিতামাতার প্রতি ভক্তি, স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসা, অপত্য স্নেহ, বন্ধুত্বস্বভাব সবই ধীরে ধীরে কমে আসছে। বাংলার এই পণ্ডিত সমাজজীবনের রূপটিই প্রতিফলিত হয়েছে 'ধাণ' গল্পগ্রন্থে।

নতুন দিনের কাহিনী

দুই টাকা

স্বপ্নের অতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ। 'ভাষা বলিষ্ঠ, বর্ণনাভঙ্গী চিত্তাকর্ষক।' আনন্দবাজার 'চিত্রাচরিত পরিবেশে গল্পগুলি দাঁড় করান হইয়াছে বটে, কিন্তু ভাষার সৌন্দর্য্য এবং রচনা-শৈলীর নিপুণতায় সেগুলি আকর্ষণীয়।'—যুগান্তর

সুবোধ ঘোষের

পরশুরামের কুঠার

দ্বিতীয় সংস্করণ। দুই টাকা

'রবীন্দ্রনাথের পর কি বিষয়বস্তুতে কি রচনাশৈলীতে বাংলা ছোটগল্পের মোড়কে তিনিই দিয়েছেন নতুন যাত্রাপথের ইঙ্গিত। সুবোধবাবুর গল্প দুঃখ বিলাসের কান্না নয়, মুক্তির বাণীর অদম্য প্রেরণাতেই সেগুলি গতিবান, ফলে শিল্পচাতুর্য্যের অপূর্ব নিদর্শন।'—চতুর্ভুজ

শুক্লাভিসার

দুই টাকা চার আনা

'সুবোধবাবুর গল্পগুলির মধ্যে আমরা এক নতুন সম্মান পাইয়াছি এবং তাহাকে অবলম্বন করিয়া বাংলা সাহিত্যের গতানুগতিকতার মোড় ফিরিতেছে এবং ফিরিবে।'—আনন্দবাজার 'সুবোধবাবুর দৃষ্টি আধুনিকতার দৃষ্টি—সত্যের প্রত্যক্ষতায় তাহার লেখা সরস এবং সমৃদ্ধ লাভ করিয়াছে।'—দেশ সমাজ-বিজ্ঞানের স্বত্রকে কাজে লাগিয়ে অমন পূর্ণাঙ্গ গল্প তৈরী করা বিস্ময়কর।'—পরিচয়

প্রমোদ মিত্রের

বহানগর

যে কয়জন লেখকের সাধনার মধ্যে দিয়ে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের পথপরিভ্রমণ শুরু হয়েছিল প্রমোদ মিত্র তাঁদের অন্যতম। সকল দ্বিতীয় সংস্করণ। দুই টাকা গল্পরচনায় তাঁর প্রতিষ্ঠা বহুদিনের। সব জড়িয়ে তিনি তাঁর গল্পে যে ভাবটি পরিস্ফুট করে তোলেন তা এমনি অনির্বচনীয় রূপে পরিপূর্ণ যে আপনি যদি রসের অভিযাত্রী হন এবং জীবনে দার্শনিক তাত্ত্বিক উপলব্ধি করবার দিকে যদি আপনার মনের সহজ প্রবণতা থাকে, সোজা কথায় আপনার যদি জীবন-বোধ থাকে, তাহলে তাঁর দ্বারা আপনি অভিভূত হবেনই হবেন।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের

নয়নচারা

'লেখকের মধ্যে যে সম্ভাবনা রহিয়াছে গল্পগুলি পাঠে তাহার পরিচয় মিলিবে। ঘটনার বিশ্লেষণ, সূক্ষ্ম মনোবিশ্লেষণ ও আবহ সৃষ্টিতে 'নয়নচারা'র মধ্যে মূলীয়মানের পরিচয় আছে।'—আনন্দবাজার 'মহাস্থরের পটভূমিকায় নয়নচারার গল্পগুলো যথার্থ গল্পের রূপ নিয়েছে। জাহাজের সারেং এবং নৌকার দাঁড়ি মাঝি-মাঝার অপরিচিত জগতে লেখক সর্বিয়নে প্রবেশ করেছেন এবং তাদের সঙ্গে আমাদের সার্বক পরিচয় ঘটিয়েছেন।'—যুগান্তর 'নয়নচারায় কয়েকটি গল্প আছে যা সত্যি রূপ পেয়েছে প্রাণের দরদে, বেদনাময় অনুভূতির সৌন্দর্য্যে।'—মল্লিকা

জ্যোতির্বিজ্ঞান নন্দীর

খেলনা

আজকের দিনের উদ্ভ্রান্ত অনিশ্চয়তার ঝুঁকো খেলনার মতোই দেখায় আজ মধ্যবিত্তের নষ্টলষ্ট জীবনের ছবি। জ্যোতির্বিজ্ঞান নন্দী সাম্প্রতিক গল্প-সাহিত্যে এ-জন্মই বিশিষ্ট যে তাঁর নায়ক-নায়িকার চরিত্রে বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে ভদ্র খেলনারই রূপ প্রতিভাস। 'নদী ও নারী, সিংহরাশি, সন্ততি, থাকি ও খেলনা বাংলা সাহিত্যের ছোট গল্পগুলির মধ্যে বিশিষ্ট আসন লাভ করিবে। ভাষা ও ভঙ্গি হালদার।'—আনন্দবাজার

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের

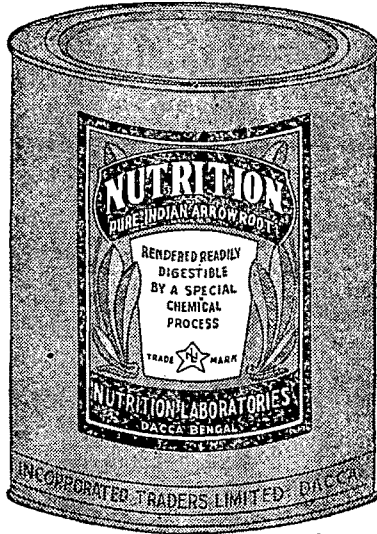
পতাকা

সাহিত্যক্ষেত্রে নেমে খুব অল্প দিনের মধ্যেই তাঁরা পাঠকসাধারণের কাছ থেকে অকুণ্ঠ অভিনন্দন লাভ করতে সমর্থ হন, তাঁদের সংখ্যা সাম্প্রতিক বাংলা-সাহিত্যে খুব বেশী নয়, কিন্তু নরেন্দ্রনাথ সেই স্বল্পসংখ্যক লেখকদের অন্যতম। ছোটো ছোটো ঘটনার মধ্য দিয়ে মানবমনের যে আকর্ষণ, তাই নিখুঁত ভাবে ধরা পড়েছে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের রচনায়। পতাকা তাঁর সর্বপ্রথম গল্পগ্রন্থ।

প্রকাশক :

পূর্বাশা লিমিটেড—পি ১৩, গণেশচন্দ্র এভেন্যু, কলিকাতা ১৩

একটী বলকারী খাদ্য !



বিনামূল্যে ও
আমেরিকার
শিশুবিজ্ঞান
পারদর্শী
ডাক্তারগণ বলেন
যে ছুধের সহিত
অন্ততঃ ৮।১০
ভাগ কার্বো-
হাইড্রেট যোগ
দিয়া শিশুদের
খাইতে দেওয়া
উচিত।
“নিউ টি শ নু”
একটী পরিপূর্ণ
কার্বোহাইড্রেট
ফুড।

যাহারা দুধ হজম করিতে পারে না অথবা আশায় বা অজীর্ণ রোগে
ভোগে তাহাদের পক্ষে বিশেষ উপকারী। সর্বত্র পাওয়া যায়।

ইনকর্পোরেটেড ট্রেডার্স লিঃ

সুভাষ এভেনিউ : ঢাকা

সবের সেরা হল

শ্রীমতী বাণী রায়ের অভিনব গল্পের বই

“শূন্যের অঙ্ক”

ভূমিকা লিখেছেন—শ্রীমতী সূচেনা কপালনীর

কিন্তু কেন? নোয়াখালীর পটভূমিকায় “রমার”
চিন্তা শুদ্ধির জন্ত, না, আরও কিছু যা দৈনন্দিন
জীবনে “কুমারী”, “বধূ” ও “জননী” মনকে পীড়া
দেয় তার জন্ত! দাম—২৫০ টাকা

মানবেন্দ্রনাথ রায়ের—ভারতীয় নারীত্বের আদর্শ
(শ্রীমতী মায়ী গুপ্ত অনূদিত) দাম—১৫০

চীনে কংগ্রেস মেডিক্যাল মিশনের বিবরণ
ডাঃ কোটনিসের অমর কাহিনী

ফেরে নাই শুধু একজন

অনুবাদক—শ্রীনেপালেশ্বর সরকার। দাম ৩ টাকা

জি জা মা

পুস্তক-প্রকাশক ও বিক্রেতা

১৩৩এ, রাসবিহারী এডিনিউ, কলিকাতা-২২

স্বরাজ ও গান্ধীবাদ—শ্রীনির্মলকুমার বহু। আই, এ, পি,
কোং লিঃ। ৮মি, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রিট, কলিকাতা। পৃঃ ২১৫,
মূল্য—তিন টাকা মাত্র।

ভারতীয় জনগণের আত্মশক্তির উদ্বোধন করিয়া স্বরাজলাভ ও বিখ-
মানবের কল্যাণ সাধনই মহাত্মা গান্ধীর জীবনের ব্রত। এই উদ্দেশ্যে
তিনি যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন তাহাও পৃথিবীতে অভিনব এবং
যুগান্তরকারী সম্ভাবনায় পূর্ণ। মুষ্টিমেয় বিপ্লবী সশস্ত্র বিদ্রোহের দ্বারা
রাষ্ট্রশক্তি ধূলিসাৎ করিয়া দিয়া উপর হইতে জনসাধারণের স্বক্কে স্বরাজ
চাপাইয়া দিবে না, বরং অহিংস বিপ্লবের দ্বারা জনসাধারণ রাষ্ট্রের পূর্ণ
কর্তৃত্ব লাভ করিবে, অহিংস অসহযোগের প্রয়োগে শোষিত মানব শোষক
সম্প্রদায়ের হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটাইয়া পরস্পরের মধ্যে শ্রীতির সম্বন্ধ
গড়িয়া তুলিবে ইহাই মহাত্মাজীর অভিপ্রায়।

গান্ধীজী বর্তমান জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ মানবশ্রেমিক। হিংসাদেব-কলুষিত
পৃথিবীতে তিনি অটল শাস্তিসাধক; ভারতভূমিতে সাম্প্রদায়িক হানাহানি
নিবারণে জীবন পণ করিয়া শ্রদ্ধাশ্রমের প্রেতনৃত্যের মধ্যে তিনি যোগীশ্বরের
মত শান্তির সাধনায় রত।

ভারত আজ স্বাধীন, কিন্তু মহাত্মাজীর অভিপ্রায় প্রকৃত স্বরাজ এখনো
বহুদূরে। ইহার জন্ত জনসাধারণকে আত্মশুদ্ধি, মানসিক বল ও
নিঃস্বার্থপরতা অর্জন করিতে হইবে। আলোচ্য গ্রন্থে গান্ধীজীর সহচর
অধ্যাপক বহু মহাত্মার রাজনৈতিক মতবাদ মনোজ্ঞভাবে আলোচনা
করিয়াছেন। ‘নিবারণের চিহ্ন’তে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র সিংহের
একটি প্রবন্ধ সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিয়া তদুত্তরে নির্মলবাবু গান্ধীজীর অহিংস
বিপ্লবের আদর্শ, স্বরূপ ও পন্থা বিবৃত করিয়াছেন। লেখকের ভাষা স্বচ্ছ
ও সাবলীল। বাঙালার রাজনৈতিক সাহিত্যে ‘স্বরাজ ও গান্ধীবাদ’ এক
বিশিষ্টস্থান গ্রহণ করিবে, সন্দেহ নাই। মহাত্মা গান্ধীর রাষ্ট্রনৈতিক ও
অর্থনৈতিক মতবাদের নিপুণ বিশ্লেষণ হিসাবে বাংলা ভাষায় পুস্তকখানির
জুড়ি নাই। মহাত্মাজীর মত ও পন্থার সহিত ভালভাবে পরিচিত হইতে
হইলে এ গ্রন্থ প্রত্যেক বাঙালীর অবশ্যপাঠ্য।

শ্রীনারায়ণচন্দ্র চন্দ

নিবুম রাতের প্রেম—শ্রীউমাপদ দাশ। প্রকাশক—
রাউজী ভাই প্যাটেল, পশুপতি বুক ডিপো, ২৮২, অপার চিংপুর রোড,
কলিকাতা। পৃষ্ঠা ১২৪, মূল্য ১৫০।

আলোচ্য গ্রন্থখানি উপাত্তাস। বহু নববিধানের দূরসম্পর্কীয়া
বিধবা বোন মীনােকে শৈলেন ভালবাসে,—বাধা দেয় সমাজ, বাধা দেয়
আত্মীয়স্বজন,—নববিধানের স্বীর মনে হিংসার আগুন জলে উঠে। বার্ষ-
প্রেমিক শৈলেন শেষে এক বিড়ির ব্যবসায়ীর অর্থ-সাহায্যে বিলাতে
ডাক্তারী পড়তে যায়। ফিরে এসে সে মেডিক্যাল কলেজের
ভিজিটিং সার্জন হয়। ঘটনাক্রমে মীনা ‘ট্রাম-একসিডেন্টে’ আহত
হয়ে মেডিক্যাল কলেজে এসে তার শৈলেনদার সামনেই মারা যায়।

তরুণী বিধবাদের প্রতি গ্রন্থকারের গভীর সহানুভূতি আছে। কাহিনী
কিন্তু সার্থক হয়ে ওঠে নি। মাঝে মাঝে উদ্ভট বানান ও শব্দপ্রয়োগে
রচনা শ্রুতি ও দৃষ্টিকণ্ঠ হয়ে উঠেছে,—‘হ’একটি যথা,—অস্যাখ্যাত, না
হেসে পারলাম না, ছলের অধিবধি থাকে না, তাত এতদিন করি গী, বল
দিকি গী...

শ্রীতারাপদ রাহা

প্রেমানন্দ—প্রথম ভাগ (২য় সং) ১৪৬ পৃ. এবং দ্বিতীয় ভাগ
(১ম সং) ১৯০ পৃ. স্বামী ওকারেখরানন্দ সঙ্কলিত ও বৈদ্যনাথ দাস
দেওযর, পোঃ কুণ্ডা, শ্রীরামকৃষ্ণ সাধন মন্দির হইতে শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ
গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য যথাক্রমে ২।০ ও ২৫০।

স্বাহার নামাঙ্কিত এই গ্রন্থ, তিনি পুস্তকসংগ্রহ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষ্য

শিঙের অন্ততম। তাঁহার সন্ন্যাস আশ্রমের নাম স্বামী প্রেমানন্দ হইলেও জন-সাধারণের কাছে তিনি বাবুরাম মহারাজ বলিয়াই বিখ্যাত ছিলেন। এই সর্বভাগী সন্ন্যাসী বেলুড়মঠাঙ্গত ব্রহ্মচারীদের সর্ববিষয়ে দোষত্রুটিহীন ও হৃদয়বৃত্তি করার জন্য প্রাণপাত চেষ্টা করিতেন। শ্রীশ্রীমা সারদামণি দেবী একদা বলিয়াছিলেন,—‘সঠের শক্তি, ভক্তি, মুক্তি সব আমার বাবুরামরূপে গঙ্গাতীরে আলো করে বেড়াত।’

এই গঙ্গাতীরে আলোকরা শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাসহচর বাবুরাম মহারাজ বা প্রেমানন্দ স্বামীর সংস্পর্শে গিয়া তাঁহার মুখনিঃসৃত যেসব অমূল্য আলোচনা শুনিবার ও জানিবার সৌভাগ্য সঞ্চলনকারীর হইয়াছিল তৎসমুদয় এই দুই খণ্ড গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এতদ্বিত্ত পত্রাবলী, উপদেশাবলী, ঠাকুর ও মা ঠাকুরাণীর চিত্রাবলী দ্বারাও গ্রন্থ হৃদয়মুগ্ধ। ভাব্যর সরলভাষ্য, ঘটনার বিচিত্রভাষ্য, ঐতিহাসিক তথ্য বর্ণনায়, সাম্প্রদায়িক সমস্ত সমাধানের সত্য পরিকল্পনায়, হাশুরসের মধুরভাষ্য এবং মানব মহত্বের উচ্চ চিন্তাধারায় সকলকেই এই গ্রন্থ তৃপ্তি দান করিবে।

শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্তী

ফেরে নাই শুধু একজন—(সচিত্র অনুবাদগ্রন্থ)—

অনুবাদক : শ্রীনেপালেশ্বর সরকার। জিজ্ঞাসা ১৩৩-এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

১৯৩৮ সনের আগষ্ট মাসের শেষ দিকে জাপানী আক্রমণে বিপর্যস্ত চীনের সাহায্যার্থে ভারতীয় কংগ্রেস কর্তৃক যে মেডিকেল মিশন প্রেরিত হয় তাঃ অটল, ডাঃ চোলকার, ডাঃ মুখার্জি, ডাঃ বিজয়কুমার বহু এবং ডাঃ দ্বারকানাথ কোটনিস এই পাঁচ জন ছিলেন তার সদস্য। এঁদের মধ্যে চার জন চার বৎসর চীনপ্রবাসের পর দেশে ফিরিয়া আসেন—ফেরেন নাই শুধু এক জন; তিনি মারাঠী যুবক, ডাক্তার কোটনিস। তিনি কমরেড কুও চিন লাং নামক একটি চীনা মেয়েকে বিবাহ করেন এবং চীনেদেশেই ১৯৪২-এর ৩ই ডিসেম্বর তাঁহার মৃত্যু হয়। উক্ত মিশনের সদস্য ডাঃ বহুর ডায়েরি এবং তাহার প্রদত্ত উপকরণাদি অবলম্বনে ইংরেজী ভাষায় স্মরণীয় খাজা আহম্মদ আব্বাস *And one who did not come back* নামক যে বিখ্যাত পুস্তকখানি রচনা করেন তাহা প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করে। সমালোচ্য পুস্তকখানি ইহারই বঙ্গানুবাদ।

পুস্তকখানি আগাগোড়া সত্য ঘটনামূলক হইলেও ইহাতে স্থানে স্থানে উপস্থাসের চমৎকারিত্ব আছে। ইহাতে “নরকের রাজপথ” প্রভৃতি

অধ্যায়ে যুদ্ধের ধ্বংসলীলার যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে তাহা কল্পে ভীতির সঞ্চার করে। ৬৪ নং শিবির হাসপাতালের বর্ণনা, রিমার্কের “অল কোয়ার্টার অন দি ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট”র হাসপাতালের কথা শ্রবণ করাইয়া দেয় এবং যুদ্ধক্ষেত্রে আহত সৈনিকদের অবস্থা অবগত হইয়া রিমার্কের কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতে ইচ্ছা হয়—‘A single hospital alone shows what war is!’ যে দরদ দূরকে নিকট এবং পরকে আপন করে তাহা এই পুস্তকের প্রতিটি অধ্যায়ে ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং সেইজন্যই মিঃ এলে প্রভৃতির লিপিচিত্রও সার্থক হইয়াছে। মেডিক্যাল মিশনের যে কর্মজন সদস্য চীনে গিয়াছিলেন তাহারা সে দেশের প্রকৃতি ও মানুষের সঙ্গে একাত্ম হইয়া গিয়াছিলেন। ভারত ও চীনের মধ্যে মৈত্রী স্থাপন ছিল তাহাদের ব্রত। পুস্তকখানি পড়িয়া চীন ও ভারতের চিরন্তন মৈত্রীর সম্পর্কের কথাই নূতন করিয়া মনে উদ্ভিত হয়। ডাঃ বহুকে লেখা ডাঃ কোটনিসের মৃত্যুর পূর্বের কতকগুলি চিঠি, উত্তরচীনের একে অজ্ঞাত অখ্যাত পল্লীগ্রামে মাটির কুটরে কোটনিসের মৃত্যুর মর্মস্পর্শী বর্ণনা এই সর্বের দক্ষন ভ্রমণ-কথার উপসংহারে বিয়োগান্ত উপস্থাসের স্বর বাজিয়া উঠিয়াছে। অনুবাদকের ভাষা যেমন মূল্যবান তেমনি শ্রীমণ্ডিত। ‘Good earth’এর বাংলা রূপান্তর ‘শ্রীমহী ধরিত্রী’ বড় ভাল লাগিল।

রাজজ্যোতিষামূলক বলিয়া গভর্ণমেন্ট কর্তৃক ‘বাজেয়াপ্ত’

বন্দনা

সঞ্চালক : শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

“স্বদেশী” যুগ হইতে বর্তমান বাঙলার নবযুগ পর্যন্ত দেশের জাতীয় সঙ্গীতের পরিবর্তিত অপরূপ সঞ্চয়ন। বিশ্বজাতির জাতীয় সঙ্গীতের পরিপ্রেক্ষিতে বাঙলার তথা ভারতের জাতীয় সঙ্গীতের ক্রমপরিণতির তথ্যসম্বলিত ৫২ পৃষ্ঠাব্যাপী ভূমিকা। খ্যাত, অখ্যাত, অজ্ঞাত ও বিখ্যাত কবিদের অসংখ্য সঙ্গীতে সমৃদ্ধ।

প্রকাশিত হইল

মূল্য পাঁচ টাকা

প্রকাশক—উষা পাবলিশিং হাউস

৩৪নং মহিম হালাদার স্ট্রীট, কালিঘাট, কলিকাতা

ভারতের নব অভ্যুদয়, সাহিত্যিক ও সাংবাদিক শ্রীগোপালচন্দ্র রায় প্রণীত, একখানি গৌরবময় জাতীয় গ্রন্থ

ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান

দাম ৩ টাকা

মন্ত্রীমিশন কেন ভারতে আসিতে বাধ্য হইল তাহার কারণসহ, মন্ত্রীমিশনের ভারত-আগমনের পর হইতে ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর কাল পর্যন্ত দেশের রাজনীতিতে যে যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটে, তাহারই এক সম্পূর্ণ নিখুঁত ও সুবৃহৎ ইতিহাস। গ্রন্থের সমস্ত বিষয় ৩২টি সূচিপত্র প্রবন্ধে ক্রমানুসারে, নিপুণ ও হৃদয়বৃত্তিভাবে প্রণীত। অনেকগুলি মূল্যবান চিত্রও গ্রন্থখানির সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছে। স্কুল, কলেজ ও সাধারণ লাইব্রেরিতে এবং প্রতি শিক্ষিত পরিবারে রাখিবার মত একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ।

প্রাপ্তিস্থান :—

দি সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি :: ১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট :: কলিকাতা

ছাড়পত্র—শ্রীমুকান্ত ভট্টাচার্য্য। দি বুকম্যান, ৮৭
চৌরঙ্গী রোড। মূল্য দেড় টাকা।

এই কাব্যগ্রন্থখানি প্রকাশিত হইবার পূর্বেই মাত্র উনিশ
বৎসর বয়সে লেখক পরলোকগমন করিয়াছেন। গ্রন্থখানিতে
লোকান্তরিত কবির মোট পঁয়ত্রিশটি কবিতা স্থান পাইয়াছে।
অধিকাংশ কবিতাতেই স্ফুটনোন্মুখ প্রতিভার স্বাক্ষর রহিয়াছে।
তন্মধ্যে 'ছাড়পত্র' 'আগামী' 'চারা গাছ' 'প্রস্তুত' 'প্রার্থা' 'আগ্নেয়
গিরি' ঠিকানা, বিরুতি, চট্টগ্রাম ১৯৪০ 'ঐতিহাসিক ও 'বোধন' এই
কয়টিকে আমরা নিঃসংশয়ে প্রথম শ্রেণীর কবিতা বলিতে পারি।
পুষ্করালী রচনাভঙ্গী মুকান্তের কবিতার একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।
তার প্রকাশভঙ্গীর দৃঢ়তা ও বলিষ্ঠতা মনকে গভীরভাবে
নাড়া দেয় :

আমি ধাযাবর কুড়াই পথের হুড়ি,
হাজার জনতা যেখানে, সেখানে
আমি প্রতিদিন ঘুরি,
বন্ধু, ঘরের খুঁজে পাইনাকো পথ,
তাইতো পথের হুড়িতে গড়বো
মজবুত ইমারত।

বন্ধু, আজকে আঘাত দিও না

তোমাদের দেওয়া ক্ষতে

আমার ঠিকানা খোঁজ ক'রো শুধু

স্বর্ষোদয়ের পথে।" (ঠিকানা)

মুকান্ত ছিলেন আশাবাদী কবি। এই আশাবাদ পরিপূর্ণ
আত্মবিশ্বাস ও আদর্শবাদ সঙ্গীত। উনিশ বৎসর বয়সেই কবি
বলিতে পারিয়াছেন ; "হৃস্পষ্ট আমার কাছে জীবনের হৃদয়
সংকেত" (ফসলের ডাক : ১৩৫১)। আশাবাদে উদ্দীপ্ত কবি
বলিয়াছেন—

"বিপন্ন পৃথিবীর আজ শুনি শেষ মুহূর্ত ডাক
আমাদের দুগুণ মুঠি আজ তার উত্তর পাঠ্যক।
ফিরুক দুয়ার থেকে সন্ধানী মৃত্যুর পরোয়ানা,
ব্যর্থ হোক কুচক্রান্ত, অবিয়াম বিপক্ষের হানা।"
(বিরুতি)

বাঁচিয়া থাকিলে এই প্রতিভাশালী কবির রচনাধারা বাংলা
সাহিত্য যে বিশেষ সমৃদ্ধ হইত তাহাতে সন্দেহ নাই।

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

নেতাজীর অনুসরণে :—

বাংলার বিখ্যাত স্নাত ব্যবসায়ী শ্রীঅশোকচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় ও
তাহার "শ্রী" মার্কা স্নাতের নূতন পরিচয় বাংলাদেশে নিম্নপ্রয়োজন। আজকাল
বাংলার প্রতি গৃহে, উৎসবে, আনন্দে 'শ্রী' স্নাতের ব্যবহার অত্যাধিক
হইয়া পড়িয়াছে, বাজারে ভেজাল স্নাতের যেরূপ প্রয়াস দেখা যায়, তাহার
মধ্যে শ্রীযুক্ত অশোকবাবুর বিশুদ্ধ স্নাত যে খ্যাতি অর্জন করিয়াছে, তাহা
স্নাত ব্যবসায়ী মাত্রেরই অনুকরণীয়।

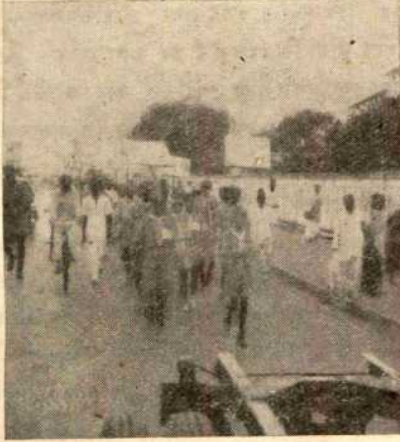
স্বাঃ শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু

দেশ-বিদেশের কথা

পাটনায় “কিশোর-সপ্তাহ”

সম্প্রতি পাটনা রোটারি ক্লাবের সহযোগিতায় ও পাটনা কেন্দ্রের “কিশোর দলের” উদ্যোগে ১৫ই অক্টোবর হইতে ২০শে অক্টোবর পর্যন্ত “কিশোর-সপ্তাহ” উদ্‌যাপিত হইয়াছে। স্থানীয় ছাত্রবল ও প্রাদেশিক প্রতিনিধিরা এই কিশোর সপ্তাহের

প্রাদেশিক আন্তঃ-বিদ্যালয় বক্তৃতা প্রতিযোগিতা, ছোটদের সিনেমা এবং কিশোর-কর্মী-পরিষদের অধিবেশন প্রভৃতি কয়েকটি অল্পাধিক দর্শকদের বিশেষ প্রাণস্রা অর্জন করে। পাটনার ও অন্যান্য প্রদেশের যে সকল বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী সাংবাদিক, সমাজ-কর্মী ও সাহিত্যিক এই অল্পাধিক সহযোগিতা করেন তন্মধ্যে অধ্যাপক হরিপদ মাইতি, কাদার মোরান, ডাঃ জে, সি,



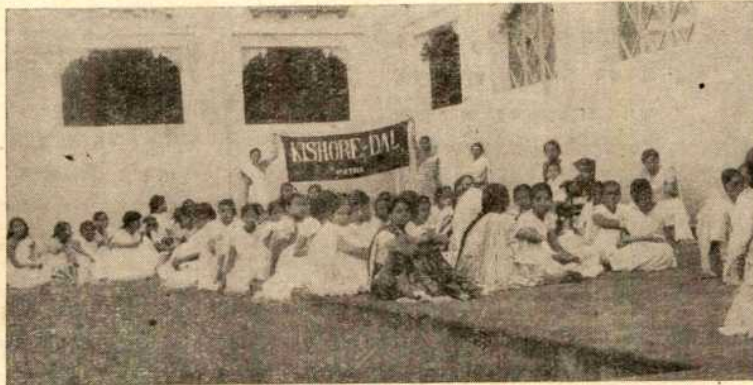
ভারতীয় বয় স্কাউট দল পরিচালিত কিশোর শোভা-যাত্রা

বিভিন্ন অল্পাধিক বোগদান করে। এই সম্মেলনের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, কিশোররাই ইহার যাবতীয় কার্য পরিচালনা করে। ভারতীয় বয় স্কাউট পরিচালিত কিশোর-মিছিল, কিশোর-কল্যাণ-সম্মেলন, কিশোর-পার্টি, কিশোর-সামাজিক-বৈঠক, বিহার



কমলা সমাদ্দার পরিচালিত কিশোরপার্টির মিছিল

মুখোপাধ্যায়, ডক্টর শচীন সেন, ডক্টর বিনয় দাশগুপ্ত, বিচারপতি বি. পি. সিংহ, মণীন্দ্রচন্দ্র সমাদ্দার, শিবকুমার মিত্র, মিসেস কাম-কল্পিতা বেগম প্রভৃতির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এই ধরণের “কিশোর-সপ্তাহের” আয়োজন আমাদের দেশে ইহাই সর্বপ্রথম।



পাটনা মিউজিয়াম পরিদর্শনে কিশোর-দলের সভাগণ

বহুমূত্র

বিশ্ববিখ্যাত “সোম মহাস্তক” সেবন করুন, ব্যাধি পুণাতন ও জটিল হইলেও ইহা সেবনে সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হইবেন। ইহা রোগের মূল কারণগুলি নাশ করিয়া অতিরিক্ত মূত্রনিঃসরণ, প্রস্রাবে জ্বগার ও এলবুমেন হ্রাস করে এবং দেহযন্ত্রকে সবল ও স্বস্থ করে। বিনা ইন্জেকশনে স্থায়ী ফলসাপ্রদ “সোমমহাস্তক” অতুলনীয়। ইহা বৃদ্ধ ও চিন্তাশীল ব্যক্তির শ্রেষ্ঠ টনিক। মূল্য ৫।০ (১০ দিনের), ১৫.০ (১ মাসের) মাস্তলাদি ৬০ আনা। কবিরাজ এম. ভট্টাচার্য কাব্যব্যাকরণতীর্থ ভিষগাচার্য—১২০।১১, (পি) আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা—২।

অম্বুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

গত ১০ই কার্তিক, মঙ্গলবার, মাত্র ৪৯ বৎসর বয়সে অম্বুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পরলোকগমন করেছেন। তাঁর এই শোচনীয় অকালমৃত্যুর সংবাদ বাংলাদেশের বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে।



অম্বুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলাদেশের অনেকেই অম্বুজনাথকে জানতেন; অনেকে জানতেনও না। আমি তাঁর একজন নিকট-আত্মীয় বলেই যে তাঁকে জানতাম তা নয়; ব্যক্তিগত প্রয়োজনের অতিক্রান্ত ক্ষেত্রেও বহু বার তাঁর সংস্পর্শে আসতে হয়েছিল বলে আমি তাঁর পরিচয় পাবার কিঞ্চিৎ সুযোগ লাভ করেছিলাম।

সুবিখ্যাত কথাসাহিত্যিক শ্রীযুক্তা অম্বরূপা দেবীর তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃত্তী ছাত্র, দর্শন-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিখরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর পিতা; নিজে তিনি প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের দুই বিভিন্ন বিভাগে ছ'বার (তন্মধ্যে একবার প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করে) এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে পরে মূল্যবান গবেষণাত্মক আলোচনার ফলে পি-আর-এস সম্মান লাভ করেন। ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, মুদ্রাতত্ত্ব, মুণ্ডিতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে তিনি গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন, এ সকল পরিচয় নগণ্য পরিচয় না হলেও ইহা অপেক্ষাও দুর্লভ এবং গৌরবজনক যে

পরিচয়ের তিনি অধিকারী ছিলেন, সে পরিচয় অনেকেরই নিকট অবিস্মৃত ছিল। সে পরিচয় ছিল, তাঁর প্রবল কর্ম-প্রচেষ্টায় মধ্যে নিজেই পরিপূর্ণভাবে নীরব এবং নির্নিরাক্য করে রাখবার ঐকান্তিক সংগ্রাম এবং নিষ্ঠা।

গাছ যেমন তার মূল সত্তাকে ভূমির মধ্যে লুক্কায়িত রেখে শাখা-প্রশাখাকে আকাশের বায়ুতে তুলে দেয়, অম্বুজনাথও তেমনি কর্মের মধ্যে আবৃত হয়ে থেকে নিজেই লোকচক্ষুর বহির্ভূত করে রাখতেন। সন্ধানী লোকেরা কিন্তু অম্বুজনাথের জ্ঞানবৃক্ষের সন্ধান রাখত এবং প্রয়োজনকালে বৃক্ষতলে উপস্থিত হয়ে নাড়া দিয়ে অভীষ্ট ফল লাভ করত। এই সন্ধানী দলের মধ্যে দেশবিখ্যাত ঐতিহাসিক, হাইকোর্টের বিচারপতি একনিষ্ঠ দেশসেবক প্রভৃতি সকল শ্রেণীর লোককেই দেখা যেত।

ইংরেজীতে একটা কথা আছে, No man is educated until he has forgotten his Latin। অম্বুজনাথ তাঁর Latin অর্থাৎ বিদ্যার কচকচি সম্পূর্ণরূপে ভুলেছিলেন। তাই অনেকেই তাঁর শিশুসুলভ সরলতা এবং অকৃত্রিম নিরহঙ্কার ভাব দেখে ভুল করত, তিনি বুঝি এক ষণ্ড নিপুণ তামার তার; কিন্তু স্পর্শ করবার প্রয়োজন হলে চমকিত হয়ে দেখত, সে তারের মধ্যে প্রবহমান বিদ্যা এবং জ্ঞানের উচ্চ ভোল্টের বৈদ্যুতিক শক্তি।

সর্বদিক দিয়ে আমাদের দেশকে গড়ে তোলবার প্রচেষ্টায় যে সকল নীরব কর্মীর কর্মসাধনা প্রতিনিয়ত সক্রিয় আছে, সেই কর্মীদের অন্ততম ছিলেন অম্বুজনাথ এ কথা বললে একটুও অত্যাক্তি হবে না।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

গৌরীহর মিত্র

সুসাহিত্যিক গৌরীহর মিত্র গত ২০এ আশ্বিন পরলোকগমন করিয়াছেন। দীর্ঘকাল একনিষ্ঠ ভাবে তিনি সাহিত্যসেবা করিয়া গিয়াছেন। প্রবাসী প্রভৃতি বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় তাঁহার প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইত। তাঁহার লিখিত পুস্তকসমূহের মধ্যে “বীরভূমের ইতিহাস”, “চরিত কৌর্টন”, “জ্ঞানের জাহাজ”, “ভারত কথা”, “মহাপুরুষ প্রসঙ্গ”, “বিজ্ঞানের বাহাদুরী”, “ছেলেদের উপকথা” ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। বীরভূমের ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব প্রভৃতির গবেষণায় তাঁহার ঐকান্তিকতা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। “বীরভূমের ইতিহাস” নামক পুস্তকখানি তাঁহার সমগ্র জীবনের সাধনার ফল। দুঃখের বিষয়, তাঁহার জীবিতাবস্থার উহার দুইখণ্ড মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে, বাকী বিরাট দুইখণ্ডের পাণ্ডুলিপি অপ্ৰকাশিত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে।

অম্ব-সংশোধন ৪—পৃ. ১৫৭, পংক্তি ৪, “১২৪৩৪” স্থলে “১২৫০৪” পড়িতে হইবে।

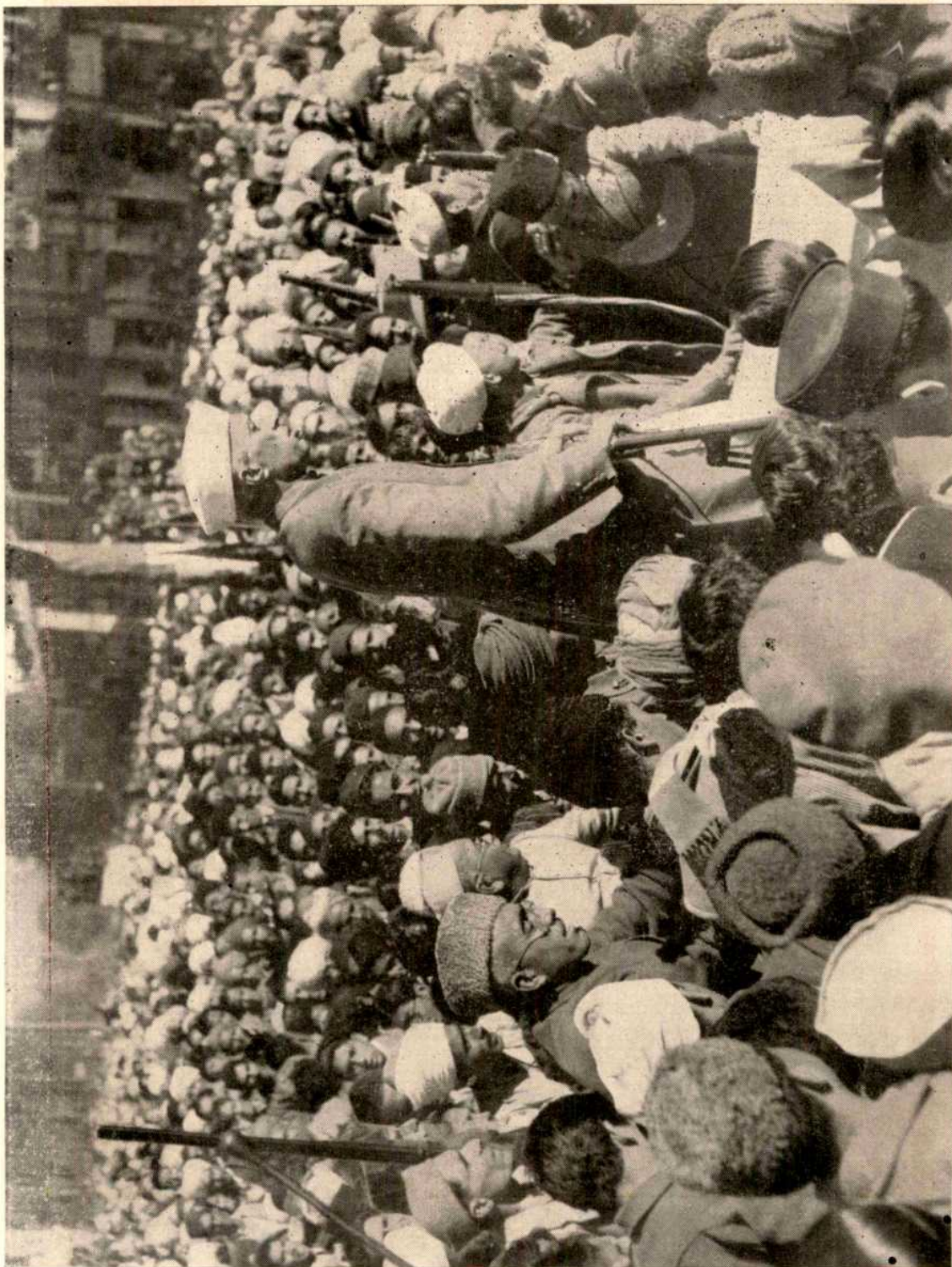


মহাশয়
 তাঁনিয়া ওহিল শ্যামা, আশা মরিয়া
 মতেনিদিও ওবি উন্নতদর্শন
 ওহে ওদি ওহে আলো মোহেমন
 ওহি শৃঙ্খলে।...

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

শ্রীমা
 শ্রীনীহাররঞ্জন সেনগুপ্ত

রবীন্দ্রনাথের 'পরিশোধ' হইতে



ক্রীলপরে একটি জনসভায় বক্তৃতা প্রদানরত পণ্ডিত জবাবরহমান নেহরু

একাত্তর

“সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্”

নায়সাম্বা বলহীনেন জন্মঃ”

৪৭শ ভাগ
২য় খণ্ড

পৌষ, ১৩৫৪

৩য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে নেতৃত্ব সমস্যা

পশ্চিম-পূর্বাণে, কাশ্মীরে, হায়দরাবাদে ও অণ্ডাল পাকিস্তান সংযুক্ত বা প্রভাবিত প্রদেশে যাহা ঘটিয়াছে ও ঘটতেছে তাহাতে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের শত্রুদিগের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া গিয়াছে এবং তাহাদের মনোবৃত্তি এবং কার্য-ক্রমের অভ্যন্তর ও সুস্পষ্ট নির্দেশও পাওয়া গিয়াছে। সেই সঙ্গে আমাদের বুঝিবার ও বিচার করিবার সময় আসিয়াছে যে কংগ্রেসের মনোনীত নেতৃবর্গের ঐ শত্রুদিগের মুক্ত ও শুষ্ঠ অভিযান ব্যর্থ করিয়া এই রাষ্ট্রের গঠন ও পরিচালনার ক্ষমতা সন্মত ও যথার্থ বৃত্তিবিবেচনা ও ক্ষমতা আছে কিনা। আচার্য্য কৃপালনী তাহার ইচ্ছাপূরণ দাবি করার সময় যে বিয়তি দিবসে তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে স্বয়ং রাষ্ট্রপতিই সে বিষয়ে বিশেষ সন্নিধি। যে বিশেষ উদ্বেগ ও সংকল্প লইয়া বর্তমান কংগ্রেস গঠিত, চালিত ও উদ্দীপিত হইয়াছিল তাহা ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছেদ সাধন করিয়া ভারতে স্বাধীনতা ও স্বাভাব্য প্রতিষ্ঠা করা। আজ সে উদ্বেগ সফল হইয়াছে কিন্তু সম্পূর্ণরূপে নহে। কেননা ভারত-ভাগের পূর্বে ঐ দেশের ব্রিটিশ শাসক ও শোষকবর্গ দেশ বিভাগ করিয়া, অশেষ নূতন সমস্যার সৃষ্টি করিয়া এমন এক পরিস্থিতির সূচনা করিয়া গিয়াছে যাহা অতি বিচক্ষণ, অতি নিপুণ রাষ্ট্র-নীতিজ্ঞ রাষ্ট্রপরিচালকবর্গের পক্ষেও বিষম কঠিন। উপরন্তু এখন বিশ্বের রাষ্ট্রনৈতিক পরিস্থিতিও ক্রমেই অত্যন্ত শঙ্কাজনক ও সমস্যাবহুল হইয়া গড়িতেছে। এরূপ অবস্থায় ভারত-রাষ্ট্রের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের ভার বহন করিবার যোগ্যতা ও ক্ষমতা আমাদের নেতৃবর্গের কাহার কতটা আছে তাহার বিচার এখনই প্রয়োজন, কেননা বিলম্বে এইরূপ কষ্টাঙ্কিত স্বাধীনতা ও স্বাভাব্য বিপাকে পড়িয়া নষ্টপ্রায় হইতে পারে।

অনেকের ধারণা, সময় পাইলে এই নেতৃবর্গ সমস্ত সমস্যাইয়া অনেক অসাধ্য সাধনে দেশকে ঠিকপথে চালাইয়া লইয়া গন্তব্য স্থলে পৌছাইয়া দিতে পারিবেন। এইরূপ ধারণা যে শুধু ভ্রান্ত তাহা নহে, বর্তমান পরিস্থিতিতে উহা অত্যন্ত বিপজ্জনক। আমাদের বুঝা উচিত যে আমরা সময় দিতে প্রস্তুত থাকিলেও বিপদ তাহাতে রাজী হইতে পারেন না।

পাকিস্তান ও কাশ্মীরের ঘটনাবলী তাহার জাজল্যমান প্রমাণ। আমাদের জানা উচিত যে বিদেশী শোষকবর্গের বিচারে আমাদের ধ্বংস ও পরাজয় যত শীঘ্র হয় তত শীঘ্রই তাহাদের মঙ্গল, এবং ইহাও জানা উচিত যে আমাদের অভিজ্ঞতা ও দূরদৃষ্টির অভাব, দীর্ঘহস্তিতা ও অস্বাভাবিক দুর্বলতা যত দিন আছে তত দিনই আমাদের শত্রুপক্ষের সুবর্ণ সুযোগ। তাহার যথেষ্ট সুযোগ ত্যাগ করিয়া, আমাদের প্রতি দয়া-দাক্ষিণ্য দেখাইয়া আমাদের জ্ঞানবুদ্ধি-বিবেচনা উদ্বেকের অপেক্ষায় অসঙ্গতবরণ করিয়া হাত শুটাইয়া বসিয়া থাকিবে একথা মনে স্থান দেওয়াই বাতুলতার পরিচায়ক। অল্প দিকে তাহার সেই সুযোগ পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ করিয়া আমাদের দুর্বলতার অবকাশে তাহাদের উদ্বেগ সিদ্ধি করিলে যদি আমরা অহিংসা, আদর্শবাদ বা অল্প অভ্যুত্থানে কেবলমাত্র আক্ষেপ ও নিশাবাদ প্রচার করিয়া ভোষণনীতির পথেই চলিতে থাকি, তবে সময় যতই বহিয়া যাইবে বিপদ ততই সর্বল-সক্ষম হইবে এবং আমরা ততই দুর্বল ও অক্ষম হইতে থাকিব। রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে সময় অক্ষমের সহায়ক নহে, সংহারক।

বস্তুতঃপক্ষে ভারত-যুক্তরাষ্ট্র এখন যে পরিবেশের মধ্যে রহিয়াছে, তাহাতে রাষ্ট্রনেতৃত্বে দৃঢ়চেতা, অভিজ্ঞ বাস্তববাদীর প্রয়োজন চতুর্দিকে, কেবলমাত্র আদর্শবাদ সংলগ্ন করিয়া কল্পনা-ক্ষেত্রে বিচরণ করার অবকাশ আর নাই। দেশের বাহিরে শত্রু ও দেশের ভিতরেও নানাপ্রকারের অসংখ্য প্রচ্ছন্ন শত্রু রাষ্ট্রের সর্কনাশের চেষ্টায় ক্রিয়িতেছে। এখন বাধাবিহীন সত্ত্বেও অতি দ্রুত গতিতে রাষ্ট্রকে সর্বল ও সক্ষম করিয়া তুলিতে হইবে। নচেৎ দেশের উন্নতির আশা ত সুদূরপরাহত হইবেই, দেশকে ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা করাই অসম্ভব হইয়া উঠিবে। দেশের লোক বাহাদিগকে রাষ্ট্রনেতৃত্বে বরণ করিয়াছে তাহাদের বৃত্তিতে হইবে, যে দেশ এখন প্রতি পদে প্রতি বৃহত্তে তাহাদের নিকট হইতে কার্যতঃ যোগ্যতার পরিচয় ও সর্বল, সক্ষমতার নিদর্শন চাহিতেছে। ভোকবাক্যে জনসাধারণ আর ভুলিবে না। দেশ এখন চাহিতেছে প্রতিষ্ঠার পূরণ।

বর্তমান গণতন্ত্রের যুগে দেশের জনসাধারণের সমষ্টিগত সম্মতিই (sanction) রাষ্ট্রের প্রবলতম শক্তি। এই শক্তিকে

সংঘত ও নিরমাহবর্তী করিয়া চালনা করিতে পারিলেই রাষ্ট্রের মঙ্গল, না হইলে বিপদ। জনমতকে উপেক্ষা বা অবহেলা করিয়া চলিলে হয় সে শক্তি ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া রাষ্ট্রকে দুর্বল করিয়া কেলিবে নচেৎ সে শক্তি বিপরীতগামী হইয়া রাষ্ট্রবিপ্লবে দেশকে বিপন্ন করিয়া তুলিবে। চীনদেশে আজ এই দুর্বিপাকের পূর্ণ নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে। আমাদেরও বিচারের সময় আসিয়াছে যে আমাদের নেতৃবর্গই বা রাষ্ট্রকে কোন পথে লইয়া যাইতেছেন। তাহারা দেশের জনসাধারণের যে পরিস্থিতির সম্মতি, সহায়তা ও সমর্থনের ফলে আজ রাষ্ট্র-পরিচালনার অধিকার লাভ করিয়াছেন, কাধ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া সেই সমর্থকদিগের পূর্ণ বিশ্বাস ও অবিশ্রান্ত সম্মতি তাহারা রাখিতে পারিতেছেন কিনা। রাষ্ট্রে এখন চতুর্দিকে অজ্ঞান-অভিযোগের শ্রোত বহিতেছে। লক্ষ লক্ষ সর্বস্বস্বার্থী হা-হুতাশ ও অভিশাপে লোকের মন ক্রিষ্ট, শত-সহস্র ব্যক্তি ও অগণতা নারীর শোচনীয় অবস্থার চিত্রায় জনমত বিচলিত ও বিকৃত। ইহা ছাড়া আছে দুই স্বার্থাঘেয চক্রান্তকারীর প্রকাশ ও প্রচ্ছন্ন বিপ্লব-প্রচেষ্টা। এতপ অবস্থায় রাষ্ট্রের চালক-দিগের যোগ্যতার অধিপরাধার দিন ঘনাইয়া আসিতেছে।

বাংলার জনবিক্ষোভ ও তাহার কারণ

বাংলার পরিস্থিতি বিচার ইতিপূর্বেই কয়েক সংখ্যায় আমরা করিয়াছি। এই সংখ্যায় আরও বিস্তারিত বিচার করিবার ইচ্ছা আমাদের ছিল কিন্তু সম্মতি 'নিরাপত্তা বিল' লইয়া যে জনবিক্ষোভ ও আন্দোলন হইয়া গিয়াছে তাহাতে আমাদের সেরূপ বিচার সাময়িক ভাবে স্থগিত রাখিতে হইতেছে। নিজের বুদ্ধিবিচারের উপর অপরিণীয় বিশ্বাসের ফলে প্রকৃষ্টবাসু পশ্চিম বঙ্গের জনসাধারণের প্রভা ও বিশ্বাস হারাইতে বসিয়াছেন দেখিয়া তাহার প্রতিদ্বন্দী দলসমূহ তাহার সঙ্গী-দলবলের চেষ্টায় এইরূপ জনবিক্ষোভের সৃষ্টি করিয়াছে। এই চক্রান্তে বাংলার অপরিণত মস্তক যুবশক্তি ও পেশাদার বিক্ষোভ ও আন্দোলনকারীদের নিয়োগ করিয়া যাহারা এই গোলমাল বাড়াইয়া তুলিয়াছেন সেই মহাশয় ব্যক্তিগণের হাতে রাষ্ট্রের ক্ষমতা যাওয়ার অর্ধ-দেশের সর্বনাশের চূড়ান্ত ব্যবস্থা করা। সেরূপ অবস্থায় আমরা প্রথমতঃ বলিতে বাধ্য যে এই ব্যাপারে দেশের লোক ভুল পথে চলিয়াছে।

রাষ্ট্র এখন আমাদের হাতে। রাষ্ট্রচালক যদি ভুল বা ভ্রান্তির করে তবে তাহাকে সে ভুল সংশোধনে বা পদভ্যাগে বাধ্য করিতে হইবে। কিন্তু তাহাকে শাস্তিবিধান করিবার অধুহাতে রাষ্ট্রের নিরম-শৃঙ্খলা ভঙ্গ করিয়া দেশে বিশৃঙ্খলার শ্রোত বহাইতে যে চাহে সে হুঁচকার রাষ্ট্রের আরও বিষম শত্রু। বাংলার যুবক ও তরুণদের এখন বুঝিতে হইবে যে, তাহাদের এইরূপ উদার উচ্ছালনের ফলে কিছুকাল যাবৎ দেশের অবনতিই হইতেছে এবং তাহাদের নিবেদনের ভবিষ্যৎও যোরডর অন্ধ-কোরাচ্ছন্ন হইতেছে। বাংলার ছাত্রমণ্ডলী কুটিল চক্রান্তকারী মাদ্রের হাতে কলের পুতুল হইয়া দাঁড়াইতেছে ইহা নিউজই ছুন্দের বিষয়।

কিন্তু অতঃপক্ষে ইহাও ঠিক কথা যে প্রকৃষ্টবাসু দেশের লোককে সবেগেই অবকাশ না দিলে তাহাদিগের বিশ্বাস ও

আস্থা পূর্বককার মতই তাহার প্রতি থাকিত এবং সে অবস্থায় ঐরূপ জনবিক্ষোভ সৃষ্টি করিতেও কেহ সাহস পাইত না।

যোষ মন্ত্রীসভার চার মাস

ডাঃ ঘোষের মন্ত্রীসভা আজ চার মাস যাবৎ পশ্চিম বঙ্গের পরিচালক। ইহার মধ্যে বহুতা ও বিবৃতির ভুবদীবাঙ্গী অনেক ছুটিয়াছে কিন্তু জাতির কল্যাণকর একটি কাজও হইয়াছে বলিয়াস্ত আমরা দেখিতে পাইতেছি না। দেশের চতুর্দিকে যে সব বিপদ ঘনাইয়া উঠিতেছে তার ক্ষয় প্রভুতি, ঘরের পাশে পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের মনে সাহস ও বিশ্বাস সঞ্চারিত করিবার আয়োজন, উপাদান ব্যক্তি, শিক্ষাব্যবস্থার আনুল সংস্কার প্রভৃতি কোন গঠনমূলক কাজ আরম্ভ হইবার নিদর্শনটুকুও এই চার মাসে পাওয়া গেল না। শিক্ষা সংস্কার সম্বন্ধে দেখা যাইতেছে কয়েক জন মামুলী লোক লইয়া একটি মামুলি কমিটি গঠিত হইয়াছে এবং তাহারাতঃ স্বধার্মীতি "অভিন্নত" সংগ্রহের সদতিপ্রায়বাক্য করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইতিমধ্যে সার্জেন্ট কীম অহুসারে কয়েকজনকে রিলাতে ও ভারতে ট্রেনিং দিয়া প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের যেটুকু আয়োজন লীপ আমলে হইয়াছিল তাহা বাতিল করিয়া দিয়া অমরাভ্রমের দিকালজ মহাজানীদের সুপারিশক্রমে তাহাদের মধ্য হইতে জন ছয়েককে আবার নতুন করিয়া শিক্ষা বিভাগের জন্য ওয়াকী পাঠানো হইয়াছে। সার্জেন্ট কীম অহুসারে যতটা কাজ অগ্রসর হইয়াছিল তাহাতে এই ভাবে বাধা না পাড়িলে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা এত দিনে অনেকটা আদায় হইতে পারিত। প্রাথমিক শিক্ষার মূল কথা উপযুক্ত "শিক্ষিত" শিক্ষক, তাহার জন্য সর্বপ্রায়ে দরকার টিচাং ট্রেনিং কলেজ। ভারত-সরকারের চাপে পড়িয়া লীপ গবর্নেন্ট এইরূপ দুইটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ডাঃ ঘোষ সর্বপ্রথমে উহার মূলোচ্ছেদ করিয়া উহার শিক্ষিত, অভিজ্ঞ ও ট্রেনিংপ্রাপ্ত অধ্যাপকদের কয়েক জনকে ওয়াকী পাঠাইয়াছেন। শোনা যাইতেছে ইহাদিগকে বিশেষভাবে হিন্দীর মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষাদানের কামনা আরম্ভ করিতে হইবে। বাঙালী ছাত্রদের তাহাতে লাভ-লোকসান কি হইবে তাহার বিচার নিম্নরোজন, অবশ্য প্রকৃষ্টবাসুর "উপরওয়াল"রা বুঝি হইতে পারেন।

প্রদেশের দ্বিতীয় সমস্তা শান্তিরক্ষা এবং পশ্চিম বঙ্গ হইতে পাকিস্তানে চাউল চিনি কয়লা কাপড় অল্পশয় প্রভৃতির বে-আইনী চালান নিবারণ। শান্তিরক্ষায় কলিকাতার তরুণ-তরুণীদের আন্তরিক পরিগ্রহ, বিপদ বরণ ও আত্মবলিদানের কৃতিত্ব লইতেছে পুলিশ এবং পুলিশের মধ্যে যাহারা ডাঃ ঘোষের প্রিয়পাত্র—তাহাদিগকে বেশী সংখ্যায় উচ্চতম ও ক্ষমতাপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত করা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। পুলিশে যে কয়েক জন দক্ষ ও সংকল্পকারী ছিলেন তাহাদিগকে এমন সব কাজে দেওয়া হইতেছে যাহাতে কোনরূপ দক্ষতা প্রদর্শনের সুযোগ তাহারা না পান। কিন্তু যোগ্যতা চাপা থাকে না বলিয়া বঙ্গবান অবস্থাতেও ইহারা য য ক্ষেত্রে দক্ষতা প্রদর্শন করিতেছেন। ডাঃ ঘোষ এবার বেঙ্গল পুলিশ ও কলিকাতা পুলিশ একত্র করিয়া কলিকাতা পুলিশের কমান্ডিংগণ্ডার দক্ষ নিকাল করিতে উত্তোষ হইয়াছেন। লীপ আমলে কলিকাতার ২৪টি

ধানীর মধ্যে ১৪টি অব্যাপ্য মুসলমান কর্মচারীদের হাতে পড়ার শহররাসীর লাঞ্ছনার একশেষ হইয়াছিল। এবারও ১৪টি ধানীর বেঙ্গল পুলিশের অনজিহ্ব ও অব্যাপ্য লোক আমদানী হওয়ার লব্ধে হুগলৈর উপদ্রব ধুব বেশী বাড়িয়া গিয়াছে। মুসলিম দাঁপের যে সব কর্মচারী ভারতে থাকিয়া ইসলামের সেবা করিবার আশ্রয়ে পশ্চিমবঙ্গে রহিয়া গিয়াছে, পুলিশের উচ্চতম পদগুলিতে তাহাদিগকে অবস্থিত রাখা হইয়াছে। পোর্ট এলাকা অঙ্গশল ও অন্যান্য বে-আইনী জবাবদিহ আমদানী-রপ্তানীর কেন্দ্র। সেখানে সবচেয়ে দুর্বল ও লীগের প্রাক্তন-সামান্য এক জন হিন্দু ডেপুটি কমিশনার দেওয়া হইয়াছে এবং তাহার পাশে দক্ষিণ কলিকাতার ওয়াটসন বিভাগে উই সাব-দায়িত্বাবাদী লীগওয়াল। একজন মুসলমান এ্যাসিষ্ট্যান্ট কমিশনার নিযুক্ত করা হইয়াছে। পোর্ট এলাকার ইনি সুপরিত্ত এবং উহার অতি নিকটেই তিনি বাস করেন। কোড়ানীকো জ্যাকেরিয়া দ্বীপ প্রভৃতি লীগ দ্বীপ যে এলাকায় অবস্থিত সেখানেও এক জন মুসলমান এ্যাসিষ্ট্যান্ট কমিশনার দেওয়া হইয়াছে।

এক সাংবাদিক সম্মিলনে ডাঃ বোম্ব বসিয়াছেন যে কলিকাতার পাকিস্তানী গণচরিত্র চলিতেছে এবং তাহা ধরিবার জন্য নাকি চেষ্টাও হইতেছে। চেষ্টার কিছু নমুনা তো উপরে দেখা গেল। ব্যবহার নিদর্শন আরও চরকপ্রদ। লব্ধের গুণে সংবাদ সংগ্রহের দায়িত্ব স্পেশাল ব্রাক পুলিশের। এই ব্রাকে আগে দুই জন ডেপুটি কমিশনার ছিলেন, এখন আছেন তিন জন। তন্মধ্যে আছেন লীগওয়াল। ডেপুটি কমিশনার বরানগর রেকা সাহেব; এক জন ইংরেজ আসিয়াছেন, উপরন্তু ইংরেজ ও লীগ উভয় শাসককেই যিনি তুষ্ট করিতে পারিয়াছিলেন তেহনি এক জন হিন্দু স্ত্রীমদানী হইয়াছেন। স্পেশাল ব্রাকের নীচের পদগুলিতেও বেঙ্গল পুলিশ হইতে লোক আনিয়া তত্ত্ব করা হইয়াছে। ইহার। বেঙ্গল পুলিশের সর্বাপেক্ষা কতী পুরুষ বলিনী মজুমদারের ট্রাডিশন বজায় রাখিবেন। যে পাকিস্তানী গণচরিত্র যত্নবদ্ধ করা এবং উহার সংবাদ সংগ্রহ করা স্পেশাল ব্রাকের এমন সর্বপ্রধান কাজ হওয়া উচিত। বিবিবাবহার তাহার বিপরীতই হইতেছে মনে হয়। একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। গত আগষ্ট মাসে বারতলা দ্বীপে এক জন মুসলমান নাবিক বহু অঙ্গশলসমেত ধরা পড়ে। উহার নিকট ডিনারাইট এবং তদপেক্ষা তদানক বিক্ষোভকও পাওয়া যায়। লোকটি ধরা পড়ে ভালতলা ধানীর এলাকার। ভালতলায় তখন বেঙ্গল পুলিশের এক জন সাব-ইনসপেক্টরকে অফিসার-ইন-চার্জের পদে নিযুক্ত করা হইয়াছে। তিনি ঐ সময়টাতে বেয়াগুম চাখিয়া যান। ম্যাজিষ্ট্রেট বার বার তাহাকে তাগাদা দেওয়া সত্ত্বেও তিনি উহাকে হাজতে রাখিবার অহমতি প্রার্থনা করিলেন না এবং ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন। পুলিশে বাহারা ডাঃ বোম্বের বিশেষ প্রিয়পাত্র আছেন উক্ত অফিসারটি

তাহাদের বিশেষ অগ্রদূতজন, কাজেই ইহার পর তাহার শাস্তি না হইয়া প্রমোশনের বন্দোবস্ত হইতেছে। এত বড় অঙ্গ-স্বাধিকারের পর উহা অবলম্বন করিয়া স্পেশাল ব্রাক পুলিশ আরও কোম বাস্তী তদ্বাসী বা ক্রাহকেও গ্রেপ্তার করিয়াছে বজিয়া আমরা অবগত নহি। কলিকাতা করপোরেশন নির্বাচন সম্বন্ধেও যথাপূর্ব লীগত্যাগ চলিতেছে। নির্বাচক-মণ্ডলী ও প্রার্থী আসনের প্রথম যে তালিকা প্রকাশিত হয় তাহাতে একটী ওয়ার্ডে ৮০০ মুসলমানের জন্য একটী আসন ও এক লক্ষ হিন্দুর জন্য একটী আসন নির্দিষ্ট হয়। ইহা লইয়া আলোচন হইলে তালিকা পরিবর্তিত হয় এবং উহাতে সমস্ত ক্রটি সংশোধিত হয়। দ্বিতীয় তালিকা অমুসারে নির্বাচন হইলে জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের সুবিধা হইত। লীগ ইহার প্রতিবাদ করে এবং তলে তলে তদ্বিরাদিও চলিতে থাকে। ইহার ফল কলিতেও বিলম্ব হয় নাই। সৈয়দ নোশের আলি, ডাঃ আর আহমদ প্রমুখ কংগ্রেস ও জাতীয়তাবাদী মুসলিম নেতৃবৃন্দের অভিমত অগ্রাহ হইয়াছে এবং মুসলিম লীগের আবদার যোল আনা বজায় রাখিয়া ডাঃ বোম্বের তৃতীয় পরিবর্তিত তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে।

শাসন বিভাগের বিভিন্ন ক্ষেত্রেও শৈথিল্য এবং বে-বন্দোবস্তের জড় নিশ্চলতা ক্রমশঃই বাড়িয়া উঠিতেছে। বাড়তি কর্মচারীদের তিন মাসের মধ্যেও কাজ দেওয়া যায় নাই এবং বাহা দেওয়া হইয়াছে তাহাতে কাজের চেয়ে স্কাঙ্ক এবং ক্ষতি বেশী হইবে। সেলস ট্যাক্স আপিসে সমবায় বিভাগের উক্ত অডিটর ও একাউন্ট্যান্টদের দেওয়া উচিত ছিল; তৎকালে দেওয়া হইয়াছে এক দল সাব-রেজিষ্টার। ইহার। সুমি-আইন কতকটা জানেন এবং হারিসী করিতে সক্ষম। হিসাব পরীক্ষার কঠিন কাজ ইহাদের নিকট আশা করা যি বা। ইহার। ফল হইয়াছে এই যে জনসাধারণ প্রত্যেকটি জিনিস চার অণ দামে কিনিয়া তার উপর টাকার তিন পরস্বা হারে ট্যাক্স দিতেছে কিন্তু উহার অধিকাংশই সরকারী তহবিলে জমা পড়িতেছে না। গত কয়েক বৎসর যাবৎ ব্যবস্থা-পরিষদের প্রত্যাশালী সমস্ত অথবা বড় চাকরীদের আত্মীয়স্বজনরাই মণিক পরিমাণে সাব-রেজিষ্টার পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। সাদিক দিয়া ইহাদের অনেকেই যুক্তবীর জোর এত বেশী যে তাহাদিগকে যক্ষ্মলে পাঠাইতে চাহিলে দেফেক্টারিয়েটের উচ্চতম পদাধিকারীদের টেলিকোন পাইয়া সেলস কমিশনারকে কাহারও কাহারও বদলীর আদেশ নাকচ করিতে হইয়াছে। এই অবস্থায় আপিসের শৃঙ্খলা থাকে না এবং বিক্রম-কর আপিসের শৃঙ্খলা নষ্ট হওয়ার অর্থ সমগ্র ব্যবসায়ী ও হুণীতি-পরায়ণ অফিসারদের পৌষ মাস এবং জনসাধারণের সহুহ ক্ষতি ঘটতেছে।

সাময়িক শিক্ষা প্রবর্তনের দ্বারা দেশের যুব-সমাজকে ডাঃ বোম্ব কাঙ্ক্ষ দিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি তাহা করেন

নাই। পূর্ববঙ্গে হিন্দুদের বাস সম্ভব করিতে হইলে পশ্চিম-বঙ্গকে শক্তি সঞ্চয় করিতে হইবে ও শক্তির বাহ্যিক প্রকাশ দেখাইতে হইবে—ইহা আমরা বহু বার বলিয়াছি। পশ্চিম-বঙ্গের শক্তির উপর পূর্ববঙ্গে ও বঙ্গের বাহিরে বাঙালীর মর্যাদা ও স্বার্থ বজায় থাকা নির্ভর করে। জিপুরার ব্যাপারে দেখা গিয়াছে পাকিস্তানী কর্তারা একমাত্র শক্তির কথাই মানেন।

বিশেষ ক্ষমতা আইন

পশ্চিমবঙ্গের সমুদ্রে যখন সহস্র সমস্ত বিস্তারিত, সেই সময়েও ডাঃ ঘোষ বিশেষ ক্ষমতা বিল ব্যবস্থা-পরিষদে উপস্থিত করিয়া আর এক নতুন অশান্তি সৃষ্টি করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। এই বিল আইনে পরিণত হইলে পুলিশের হাতে অপরিমিত ক্ষমতা আসিবে এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সম্পর্কে হাইকোর্টের ক্ষমতা একেবারে লুপ্ত হইয়া যাইবে। বিনা বিচারে গ্রেপ্তার, আটক, সংবাদপত্রের কঠোর প্রভৃতি ব্যক্তি-স্বাধীনতার হানিকর সর্ববিধ ক্ষমতা ডাঃ ঘোষ এই আইনের বলে নিজের হাতে আনিতে চাহিতেছেন। শাসনযন্ত্রের গঠন, শাসক ও পুলিশ নিয়োগ ও ব্যবহার যে সব নিদর্শন প্রকাশ পাইতেছে তাহাতে সাধারণের এই সন্দেহ হওয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক যে ডাঃ ঘোষ নিজ দলের বিরুদ্ধবাদীরা যাহাতে প্রকাশ আন্দোলনের দ্বারা মাথা তুলিতে না পারে তার জন্তই এই আইনটি পাস করাইয়া লইতে চাহিতেছেন।

বীরভূম নির্বাচনে ডাঃ ঘোষ ভোটে জয়লাভ করিয়াছেন বটে, কিন্তু নৈতিক দিক হইতে দেখিতে গেলে তাঁহারই সম্পূর্ণ পরাজয় হইয়াছে। প্রথমতঃ তিনি তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে সন্তোষনোন্মুখের বেশী প্রচারকার্যের সুযোগ দেন নাই। তাহা সত্ত্বেও বিপদের আশঙ্কায় কংগ্রেস-সভাপতি আচার্য্য কৃপালনীর নিকট হইতে এই মর্মে ক্ষতোরি আনিহিতে হয় যে তাঁহার বিরোধিতা করার অর্থ দেশের বিরুদ্ধাচরণ। কলিকাতার সমস্ত সংবাদপত্র কংগ্রেসের মানহীন রফার জন্ত তাঁহাকে সমর্থন করিয়াছে। মন্ত্রীরাও কেহ কেহ সমলে বীরভূম যাত্রা করেন। ইহাতেও অবস্থা সঙ্গীন দেখিয়া তিনি হুগলী ও বর্ধমানের যে সব নেতাকে অভিযয় অজ্ঞায় ও অসদত্ব ভাবে স্থানীয় মন্ত্রীসভা গঠনের সময় বাদ দিয়াছিলেন তাঁহাদের শরণাপন্ন হন। সপ্ততিপন্ন বৃদ্ধ ত্রিযাদবজ্ঞনাথ পাঁজার প্রতি ডাঃ ঘোষ সবচেয়ে বেশী অজ্ঞায় করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা মনে না রাখিয়া পাঁজা মহাশয়কে লইয়া যাওয়া হয় নির্বাচন-ক্ষেত্রে এবং তাঁহার যাওয়ার পর ঐ ভোটদাতাদের মন কিরিতে আরম্ভ করে। হুগলীর ত্রিপ্রসন্ন সেন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ অকুণ্ঠভাবে ডাঃ ঘোষকে ভোট দেওয়ার জন্ত আবেদন প্রকাশ করেন। কথুনিষ্ঠ কর্মী, সুভাষকগণও দল প্রভৃতি এবং অনেক ছাত্রকেও বীরভূমে পাঠানো হয়। এইরূপ এবল চেষ্টার পর প্রধানমন্ত্রী ডাঃ ঘোষ তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করিতে সমর্থ হন। কিন্তু তাঁহার হিন্দু

মহাশয় নির্বাচিত জ্ঞাতনামা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রায় এগার হাজার ভোট পান। এত দিন দেশের নিয়ম এই ছিল যে কংগ্রেস-প্রার্থীর বিরুদ্ধে যিনি দাঁড়াইতেন তাঁহার জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত হইত। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদের গত নির্বাচনে ডাঃ জামাঙ্গলাদ মুখোপাধ্যায় হুগলী জেলার একজন অল্প পরিচিত কর্মীর নিকট অল্পরূপ ভাবেই পরাজিত হন। আমাদের যত দূর মনে পড়িতেছে, বীরভূমে যে আসনে ডাঃ ঘোষ নির্বাচিত হইয়াছেন উহাতে ত্রিমিহির চট্টোপাধ্যায় বিনা বাধায় নির্বাচিত হইয়াছিলেন। ত্রিমিহির চট্টোপাধ্যায়কে অথবা গণ-পরিষদে উন্নীত করিয়া ঐ আসনটি খালি করা হয় এবং উহাই সর্কাপেকা নিরাপদ মনে করিয়া ডাঃ ঘোষ সেখানে গিয়াছিলেন। সেখানে এরূপ নাশানা বৃদ্ধ হইয়াও যদি প্রফুল্লবাবু জনমতের গতি না বুঝিয়া থাকেন তবে তাঁহাকে কে বুঝাইবে?

সৌম্যেন ঠাকুরকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে বিশেষ ক্ষমতা বলে, অস্ত্রবলে গবর্নমেন্টের উচ্ছেদ সাধন চেষ্টার যড়যন্ত্রের অভিযোগে, কিন্তু প্রথমেই জিজ্ঞাস্য সৌম্যেনের শক্তি কতটুকু? কয়জন লোক এবং কয়টা অস্ত্র তাঁহার দলে আছে বা সন্ধান পাওয়া গিয়াছে? উহার দ্বারা একটা কংগ্রেস গবর্নমেন্ট ধ্বংস করিয়া রাষ্ট্র দখল করা কি চূড়ান্ত পাগলামির কথা নহে? ব্রহ্মদেশে উ স সৌম্যেন ঠাকুরের চেয়ে অনেক শক্তিশালী, অনেক বেশী অস্ত্রশস্ত্র লোকজন তাঁহার আছে, দেশের একটা বড় দলও তাঁহার সমর্থক। তৎসত্ত্বেও তিনি আউকসান ও অপর কয়েক জন মন্ত্রীকে হত্যা করিতে পারিয়াছেন মাত্র, গবর্নমেন্ট দখলত করিতে পারেনই নাই; বরঞ্চ বুনের দ্বারে তাঁহাকে কাঠগড়ায় দাঁড়াইতে হইয়াছে। আউকসানের কথা মনে করিয়া অস্ত্রের কথা শুনিলেই ডাঃ ঘোষ যদি প্রাণের ভয়ে বিচলিত হন তবে অবশ্য 'আলাদা' কথা, কিন্তু তিনি যদি সাহসের ও নিষ্ঠার সহিত প্রধানমন্ত্রী থাকিয়া দেশ শাসন করিতে চাহেন তবে তাঁহাকে স্বীকার করিতেই হইবে যে আধুনিক যে কোন গবর্নমেন্টের শক্তি ও স্থায়িত্ব নির্ভর করে জন-প্রিয়তার উপর, অস্ত্রের বা পুলিশী সহচরের উপর নয়। আজ যদি ডাঃ ঘোষ গঠনমূলক কাজে প্রবৃত্ত হইতেন, দেশের সম্মান বিচক্ষণ লোকের সংগ্রাম লইয়া কাজ করিতেন, কর্মঠ লোকদের উৎসাহ ও কাজ দিতেন, শিক্ষা-বিস্তার ও উৎপাদনবৃদ্ধির জন্ত আর্থনিয়োগ করিতেন, তাহা হইলে দেখিতেন সৌম্যেন ঠাকুর বা এরূপ কাহারও দ্বারা তাঁহার গবর্নমেন্ট ভাঙিবার চেষ্টা হইতেছে ইহা জানিবারাজ দেশের জনশক্তিই তাহাদের সংযত করিবার বা শাস্তিদানের জার লইত। অথবা বিশেষ ক্ষমতা গ্রহণের নিত্যন্ত আবশ্যক হইয়াছে এবং সেই ক্ষমতা প্রয়োগের জন্ত বিশ্বস্ত লোক নিযুক্ত হইয়াছে ইহা বুঝিলে দেশের লোক বিনা বাধায় সে ক্ষমতা মন্ত্রীমণ্ডলীর হাতে তুলিয়া দিত।

পশ্চিম বাংলার সীমান্ত রক্ষা

বাংলাদেশ দুই ভাগ হইয়া গিয়াছে। পূর্ব বাংলার সঙ্গে পশ্চিম বাংলার সম্বন্ধ আজ বন্ধ হইয়াছে। যে ভাবের প্রেরণায় বাংলাদেশে এই নতুন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইয়াছে, তার মধ্যে সন্দেহ বন্ধ ভাব ছিল না, এখনও নাই। সত্যতা আজ যদি পূর্ব বাংলার প্রধান মন্ত্রী থাকে। নাজিমুদ্দিন চীংকার করিতে থাকেন যে তাদের নতুন রাষ্ট্র শত্রুপরিবেষ্টিত এবং চীংকার করে শত্রুপক্ষ তার গলা টিপিয়া মারিবার চেষ্টা করিতেছে, তাহা হইলে আশ্চর্য হইবার কোন কারণ নাই। কিন্তু চিন্তিত হইবার আমাদের কারণ আছে, যখন দেখি যে পশ্চিম বাংলার মজিবসুলী এই পট-পরিবর্তনের অবস্থা সম্বন্ধে এক প্রকার নির্বিকার। ব্রিটিশ শাসনের সময়ে বাংলাদেশের রক্ষণাবেক্ষণ সম্বন্ধে প্রাদেশিক শাসন-কর্তৃপক্ষের কোন দায়িত্ব ছিল না। বাংলাদেশের লোকে পারের উপর পা তুলিয়া নিজের দেশের রক্ষা সম্বন্ধে নির্বিকার থাকিবার শিক্ষা পাইয়াছিল ভূখণ্ড, শিখ, পাঠানের উপর নির্ভর করিয়া। সেইরূপ ১৫ই আগস্টের পরেও দেখিতেছি, সর্দার বলদেব সিংহের যুদ্ধের দিকে চাহিয়া ভীঃ প্রকল্পচক্র ঘোষ আপনাতর কর্তব্য সম্পন্ন করিতেছেন। স্থানীয় লোক পূর্বে—ব্রিটিশ যুগে—যেমন দেশের সীমান্ত-রক্ষা সম্বন্ধে অজ্ঞ ও নিরুৎসাহ ছিল, আজও সেই ভূমির অবস্থায় আছে। পূর্ববঙ্গের প্রধান মন্ত্রী তাঁর রাষ্ট্রের মুসলিম গণশক্তিকে উদ্ধৃত করিতে চেষ্টা করিতেছেন দেশরক্ষার জন্ত কিন্তু ডাঃ প্রকল্পচক্র ঘোষ এরূপ কোন কিছুই করিতে পারিতেছেন না। পূর্ববঙ্গে স্বাভাবিক আছে, তার তুলনায় পশ্চিম বঙ্গের অবস্থা ভাল। পূর্ববঙ্গের বঙ্গ-সঙ্ঘট আরও কঠিন। মুসলিম জনতার মনে এই বিষয়ে কোন কোড যে নাই তাহা নহে, কিন্তু তাহারা রাষ্ট্রের রক্ষা সম্বন্ধে সচেতন; তাহাদের জাতিগত গাউ অনেক ক্ষেত্রে পুলিশের কাজ করিতেছে, তাহাদের উৎসাহের আভিযো নাজিমুদ্দিন মজিবসুলীকে অনেক সময় লজ্জা পাইতে হয়। কিন্তু এই উৎসাহ তাহারা দমন করেন না। এই উৎসাহ সঙ্ঘ হস্ত হইয়া রাষ্ট্রের স্বার্থরক্ষা করে; সঙ্ঘ চক্র সজাগ রাখিয়া রাষ্ট্রের শত্রুর গতিবিধির প্রতি দৃষ্টি রাখে। পশ্চিম বাংলার এরূপ গণ-জাগরণ নাই; ১৫ই আগস্টে যাহা কুটিল উদ্ভিগাছিল, তাহা ডাঃ প্রকল্পচক্র ঘোষের অবহেলার ফলাফল হইয়া গিয়াছে। গণশক্তি আজ পশ্চিম বাংলার রাষ্ট্রের পরিচালকদের নিকট-বিশ্বাসীক হইয়া চাঁড়াইয়াছে। যে নিরাপত্তা বিল প্রস্তাব করা হইয়াছে, তাহাই ইহার প্রমাণ। অথচ এই গণশক্তির উৎসাহ-উদ্বীপনা কত সহজে রাষ্ট্রের সেবায় লাগান যাইত। দেশবাসীকে সংযত হইয়া সত্বর তামিল করিয়া যাইতে বধ্য হইতেছে। কিন্তু কোন কর্তৃকের নির্দেশ নাই। বাঙালী যুবক আজ দেড় শত বৎসরের অসামরিক জাতি বলিয়া তাহার কপালে যে কলঙ্কের দীকা টিপিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহার অপমান হুজিরা, দেশ-রক্ষার পৌরবের পদ

অধিকার করিবার সুযোগ পাইতে চায়। সে যে অবৈধ হইয়া, ডাক শুনিতে না পাইয়া, কাঁছে-অকাঁছে মাতিয়া উঠিয়াছে তাহার জন্ত রাষ্ট্রের কর্তব্যধারণ দায়ী। তাহারা এই যুব-শক্তির সম্মুখে কোন আদর্শ ধরিতে পারিতেছেন না যাহার মধ্যে বাঙালী যুবক ভূমিতে পাইবে স্বদেশবাসীর স্বর্জ্য আস্থান। এতদিন সে পোপনে এই আদর্শের সেবা করিতে গিয়া প্রাণ দিয়াছে। আজ সে চায় পৌরবে মাতৃভূমির সীমান্ত রক্ষার প্রাণ দিতে। চারি শত মাইল বিস্তৃত সর্পিলা সীমান্ত রেখার প্রায়ে প্রায়ে সংগঠনের ব্যবস্থা হইলে বাংলার যুবশক্তি একটা কর্তব্যের সন্ধান পাইত; কলিকাতা মহানগরীর রাস্তায় রাস্তায় ধোপান তুলিয়া নিজের শক্তিকর্য করিত না। পশ্চিম পঙ্গাবের শাসক-সম্প্রদায় হির করিয়াছেন যে, তাহাদের পূর্ব-সীমান্তে নতুন নতুন গ্রামের পত্তন করিতে হইবে; দৈর্ঘ্যে তাহা হইবে প্রায় তিন শত মাইল, ভাওয়ালপুর রাজ্য পর্যন্ত; প্রায়ে হইবে দেশ হইতে পনের মাইল। এই প্রায়ে জমায়েত করা হইবে পৈনিক পরিবার। পশ্চিম বঙ্গের পূর্ব সীমান্তের প্রায়ে প্রায়ে এরূপ একটা ব্যবস্থা করিতে হইবে, এবং এই অঞ্চলের গ্রামবাসীকে নতুন রক্ষাদল গড়িয়া তুলিতে হইবে।

ভারত-রাষ্ট্রের প্রকৃতি

রাষ্ট্রের নামে পাকিস্তানীরা আমাদের দেশকে ভাগ-বাঁটোয়ারা করিয়া লইয়াছে। এই ভাবে তাহারা মুসলিম দেশের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করিয়াছে বলিয়া বড়াই করে। তাহার জন্ত তাহাদের ইংরেজের বিরুদ্ধে কোন আন্দোলন করিতে হয় নাই; ইংরেজ সাহায্য করিয়া তাহাদের এই স্বাধীনতা দিয়া দিয়াছে। তাহারা হিন্দু নামে অজ একটা দেশের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়াছে; তাহাদের রক্তপাত করিয়াছে, তাহাদের ঘন-সম্পদ লুটিয়াছে, তাহাদের অপমান করিয়াছে। এই অপকর্মে উৎসাহী ছিল সেখানকার মুসলমানরা যেখানে তাহারা সংখ্যা-গরিষ্ঠ; যেখানে কোন চায়ের মুক্তি মুসলিম প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। আজ সেই স্থানের মুসলমানদের অবস্থা হইয়াছে শোচনীয়। যে হিন্দু প্রাধান্যের বৃদ্ধি তুলিয়া তাহারা দেশের বুকের উপর বিভাগের কাল কাটিয়া দিয়াছে, সেই হিন্দু প্রাধান্য অটুট, অনড় হইয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহাদের উপর। ভারতবর্ষের বুক হইতে তাহারা কয়েক টুকরা প্রদেশ ছিনাইয়া লইয়া গিয়াছে এই মুক্তি যে তাহারা সেই সব অঞ্চলে সংখ্যা-গরিষ্ঠ, এবং এই সংখ্যা-গরিষ্ঠতাই তাদের দেশত্বের পরিচয় ও প্রমাণ। আজ তাহারা সেইরূপ শরিয়ত মতে তাহাদের পাকিস্তানে রাজ্য-শাসন-ব্যবস্থা প্রচলন করিতে পারে। প্রায় দুই কোটি অ-মুসলমান তাহাদের প্রদেশে আছে। তাহাদের অধিকার সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ধারণা করা কঠিন। শরিয়ত মতে অ-মুসলমানদের অধিকার কি হইতে পারে ভৎসনকে পাকিস্তানের শাসকসম্প্রদায় নীরব। পশ্চিম পঙ্গাব ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত

প্রদেশের অভিজ্ঞতার আলোকে ইহা নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিলে বলিতে হয় যে পাকিস্তানে মুসলমান ছাড়া কাহারও ধর্ম-কর্ম-মান-মর্যাদা পাইতে পারে না। বর্তমান অগতে সাময়িক বলিতে বাহা বুঝায় সেই অধিকার সেখানে মুসলমান ছাড়া অপর কাহারও প্রাপ্য নয়। এই অবস্থায় এই সমস্ত স্বাভাবিকই দেখা দিয়াছে—ভারতবর্ষে যে পাকিস্তানীরা বহিয়া গিয়াছে তাহাদের অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা এখনই হওয়া দরকার। ভারতবর্ষের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু অকুণ্ঠ ভাষায় বলিতেছেন যে ভারত-রাষ্ট্রে কোন ধর্ম সম্প্রদায়ের একচেটিয়া অধিকার থাকিবে না। ভারত-রাষ্ট্রের প্রকৃতি হইবে ধর্ম-প্রজ্ঞাব হুক্ত (secular)। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের মহাবর্ষক উৎসব উপলক্ষে তিনি সেই কথাই পুনরুক্তি করিয়াছেন।

গান্ধীজী হই বিরুদ্ধ নেশনের নীতি-কথা স্বীকার করেন না। তিনি ভারত-রাষ্ট্রে পাকিস্তানীদের অধিকার সম্বন্ধে সাক্ষ্যের কথা বলেন; ভারত-রাষ্ট্রে তাহাদের অধিকার অন্য কাহারও অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইবে, এই কল্পনা সঠ্য করিতে পারেন না। এই বিষয়ে পাকিস্তানীদের মনোভাব অনিশ্চিত বিধা-বিভক্ত। এই বিষয়ে একটা সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত করিবার জন্য কতটা নগরীতে সর্ক-ভারতীয় মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় পরিচালক সভার অধিবেশন হয়। এই মন্তব্য লিখিবার সময় ইহা প্রকাশিত হয় নাই। পণ্ডিত নেহরু ও গান্ধীজী যে নীতি প্রচার করিতেছেন তাহার সঙ্গে বর্তমান অবস্থার সঙ্গতি আছে বলিয়া মনে হয় না। পাকিস্তানীরা অ-মুসলমানের মুণ্ডপাত্ত করিবে এবং অযোগ্য পাইলে ভারত-রাষ্ট্রের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিবে, এই আচরণ সহ করিয়া চলিলে আমাদের রাষ্ট্র বিপর্যস হইবে, কখনও সবল হইয়া উঠিতে পারিবে না।

পাকিস্তানীদের পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে কাশ্মীরের উপর তাহাদের আক্রমণ উপলক্ষে। আজ পর্যন্ত কোন মুসলিম লীগ নেতা অকুণ্ঠ ভাষায় ইজ্জত নিন্দা করেন নাই। ভারতবর্ষের মুসলমানদের কর্তব্য সম্বন্ধে ইহাদের মধ্যে অনেকেই হ-নোকার পা দিয়া দাঁড়াইবার কোশল আরম্ভ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। মুসলিম লীগের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মিঃ আবদুর রহমান সিদ্দিকির বিবৃতি এই মনোভাবের পরিচায়ক। সিদ্দিকি সাহেব সিদ্ধ দেশবাসী, গত পঁচিশ বৎসর কলিকাতার ব্যবসায়-বাণিজ্যের দৌলতে গণমাছ হইয়াছেন। তিনি কলিকাতা কংগ্রেসশনের মেম্বর নির্বাচিত হইয়াছিলেন। তিনি একজন নামজাদা পাকিস্তানী। ১৬ই ডিসেম্বর (১৯৪৭) এক বিবৃতি-প্রসঙ্গে তিনি আমাদের ভয় দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। সুতরাং ভারত ডোমিনিয়নের মুসলমানদের কর্তব্য সম্বন্ধে যে অংশে নির্দেশ আছে বিবৃতির সেই অংশটি নিয়ে উদ্ধৃত হইল:

ভারত ডোমিনিয়নের মুসলমানগণ বিভাগ ব্যবস্থার

কলোভূত-পরিস্থিতি বিবেচনা করিবেন এবং এক্যবদভাবে তাহাদের অবলম্বনীয় ব্যবস্থা নির্ধারণ করিবেন।

সংজ্ঞামক ব্যাধির দ্বায় ক্রমবর্ধিত আতঙ্ক ও উদ্বেগ-প্রভুরাই বর্তমান শাসকদের সাম্রাজ্য করুণা লাভের জন্য আত্ম-অধীকৃতিমূলক ও সম্পূর্ণ আত্ম-বিশ্বংসী নীতি সমর্থন করিতে পারেন। আবার মনে হয় এই মনোভাব হতাশার কলোভূত। বর্তমান জটিল পরিস্থিতি সহজ হইয়া আসিবেই। অনির্দিষ্ট কালের জন্য এই অবস্থা চলিতে পারে না। সংখ্যায় অধরা চারি কোটি এবং আমাদের শাসকগণ যদি দেশের শাসনকার্যে আমাদের হাতসম্মত অধিকার দিতে সম্মত নাও হন, তাহা হইলেও নীচ হটক অথবা বিলম্ব হটক, তাহারা দেশের স্বাভ্যন্তরীণ ও বাহিরের সমস্তায় আমাদের প্রয়োজন উপলব্ধি করিবেন। সুতরাং আমাদের মুসলিম বলিয়া পরিচয় দেওয়ার কোন লজ্জার কারণ নাই, বিশেষ ভাবে যখন কংগ্রেস নেতৃবল আমাদের প্রতিজ্ঞা দিয়াছেন যে কংগ্রেস যত দিন ভারত ডোমিনিয়নের আধ্যনিয়ন্ত্রণ করিবেন, তত দিন উহা হিন্দু রাষ্ট্রে পরিণত হইবে না।

মিঃ সিদ্দিকি “দেশের স্বাভ্যন্তরীণ ও বাহিরের সমস্তা সম্বন্ধে বাহা বলিয়াছেন তাহার অর্থ সুস্পষ্ট। এই সমস্তা-সমাপ্তান্তের সম্মুখীন হইয়া ভারত-রাষ্ট্রের কর্তব্যবর্গ চারি কোটি মুসলমানের “প্রয়োজন উপলব্ধি করিবেন।” এই ভরসার মধ্যে একটা ভীতি-প্রদর্শনের ইঙ্গিত আছে, পাঁচ খেলিয়া কিছু পাকারের ভাব আছে। এই ইঙ্গিতের প্রকৃত উদ্দেশ্য, আসা করি, আমরা সকলে বুঝি। পাকিস্তানে সেইরূপ “প্রয়োজন” উপলব্ধি করিবার প্রয়োজন হইবে না। কারণ পাকিস্তান হইতে সকল অ-মুসলমানকে ভিটে-মাটি-ছাড়া করিবার ব্যবস্থা তা ইতিমধ্যেই হইয়া গিয়াছে। এই নীতি ভারত-রাষ্ট্রে চলিতে পারে না। এক শত বৎসর পূর্বে রামমোহন রায় বলিয়াছিলেন যে হিন্দুরা “অতি ভদ্র” হইয়া তাহাদের স্বাধীনতা হারাইয়াছিল; “excess of civilization” এর কল্যাণে হিন্দুর শক্তি-ক্ষয় হইয়াছিল। আজ হিন্দুর অনিচ্ছায় ভারতবর্ষ বিভক্ত হইয়াছে; হিন্দু প্রধানগণ মুসলমান-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় নিজেই রাণা দিতেছেন। এই চেষ্টার পরিণতি কোথায় এখন পরিষ্কার দেখা বাইতেছে না। এই বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা অনেকটা নির্ভর করে পাকিস্তানের কার্য-কলাপের উপর; ততোধিক নির্ভর করিবে ভারত-রাষ্ট্রে পাকিস্তানী মনোভাবাপন্ন মুসলমানদের কর্তব্য-অকর্তব্য উপর। সজাগ, সতর্ক দৃষ্টি দিয়া স্বাধীন রাষ্ট্রের নাগরিক জীবনের সকল দায়িত্ব আমাদের পালন করিয়া যাইতে হইবে। অসাবধান হইবার চরমলতা যেন আমাদের জীবনে না আসে; প্রব চিন্তা আমাদের কর্তব্য-প্রচেষ্টাকে যেন ক্ষয় না করে।

মুসলীম লীগের ভবিষ্যৎ

নিম্নলিখিত-ভারত মুসলীম লীগ দুই ভাগ হইল। পাকিস্থানে যে লীগ কার্য করিবে তার নাম হইবে পাকিস্থান জাশনা লীগ; ভারতবর্ষে যে লীগ কার্য করিবে, তাহার পূর্ব নামই বহাল থাকিবে। পাকিস্থানে লীগের নাম জাশনা লীগ হইলেও তাহাতে সকল লোকের অধিকার থাকিবে না, কারণ পাকিস্থানে মুসলমান ছাড়া আর কেহই নেতৃত্ব মর্যাদার দাবি করিতে পারে না। এই পরিবর্তন গত ১৫ই ডিসেম্বর তারিখের লীগ কাউন্সিলের ৩য় প্রস্তাব অনুসারে সম্পাদিত হইয়াছে। এই প্রস্তাবের কার্যকরী অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল,—

নিম্নলিখিত-ভারত মুসলিম লীগের প্রধান উদ্দেশ্য সকল হওয়ায় এবং ভারত দুইটি স্বাধীন ও স্বার্বভৌম রাষ্ট্রে বিভক্ত হওয়ায় নিম্নলিখিত ভারত মুসলিম লীগের সংগঠন, উদ্দেশ্য এবং নীতি পরিবর্তন করা অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছে। ইহা সম্পষ্ট যে, পাকিস্থান ও ভারতের মুসলমানগণ একই রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে থাকিতে পারেন না।

সুতরাং লীগ কাউন্সিল সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে—

(ক) নিম্নলিখিত-ভারত মুসলিম লীগের পরিবর্তে পাকিস্থান ও ভারতীয় ইউনিয়নের স্বতন্ত্র পৃথক পৃথক লীগ সংগঠন থাকিবে।

(খ) নিম্নলিখিত-ভারত মুসলিম লীগের যে সমস্ত বর্তমান সদস্য সাধারণভাবে পাকিস্থানের বাসিন্দা হইয়া পড়িয়াছেন অথবা তথায় বসতি স্থাপন করিয়াছেন এবং পাকিস্থান গণপরিষদের যে সব মুসলমান সদস্য মুসলিম লীগের প্রাথমিক সদস্য রহিয়াছেন; তাহাদের সকলকে লইয়া পাকিস্থান মুসলিম লীগ কাউন্সিল গঠন করা হইল।

(গ) নিম্নলিখিত-ভারত মুসলিম লীগের যে সমস্ত বর্তমান সদস্য সাধারণভাবে ভারতীয় ইউনিয়নের বাসিন্দা হইয়া পড়িয়াছেন অথবা তথায় বসতি স্থাপন করিয়াছেন এবং ভারতীয় গণপরিষদের যে সব মুসলমান সদস্য মুসলিম লীগের প্রাথমিক সদস্য রহিয়াছেন; তাহাদের সকলকে লইয়া ভারতীয় ইউনিয়ন মুসলিম লীগ কাউন্সিল গঠন করা হইল।

(ঘ) পাকিস্থান মুসলিম লীগ ও ভারতীয় ইউনিয়ন মুসলিম লীগ প্রত্যেকের জন্য এক জন কমিটি আহার্যক নিয়ন্ত্রণ করিয়া তাহাদিগকে এই মর্মে নির্দেশ দেওয়া হইল যে, তাহারা উপরোক্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্বাধীনভাবে নিজ নিজ লীগ কাউন্সিলের অধিবেশন আহ্বান করিবেন। এই সভার কার্যকর্তা নির্বাচন, গঠন, তত্ত্বাবধান ও অত্যাধিকারের নীতিমালা করা হইবে।

(ঙ) পাকিস্থান মুসলিম লীগের ক্ষমতা, যি-

লিয়াকৎ আলী খান এবং ভারতীয় ইউনিয়ন মুসলিম লীগের জন্য মাদ্রাজ প্রাদেশিক মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট মিঃ মোহাম্মদ এসমাইল আহার্যক নির্বাচিত হইলেন।

(চ) কলকাতাতে পাকিস্থান মুসলিম লীগ কাউন্সিল ও মাদ্রাজ ভারতীয় ইউনিয়ন মুসলিম লীগ কাউন্সিলের অধিবেশন হইবে।

২। নিম্নলিখিত-ভারত মুসলিম লীগের যে সব প্রাথমিক সদস্য পাকিস্থানের বাসিন্দা হইয়া পড়িয়াছেন অথবা তথায় বসতি স্থাপন করিয়াছেন, তাহারা সকলেই বাস্তবিক পক্ষে পাকিস্থান মুসলিম লীগের প্রাথমিক সদস্য হইয়াছেন বলিয়া মনে করা হইবে এবং নিম্নলিখিত-ভারত মুসলিম লীগের যে সব সদস্য ভারতীয় ইউনিয়নের বাসিন্দা হইয়া পড়িয়াছেন অথবা তথায় বসতি স্থাপন করিয়াছেন তাহারা সকলেই বাস্তবিক পক্ষে ভারতীয় ইউনিয়ন মুসলিম লীগের প্রাথমিক সদস্য হইয়াছেন বলিয়া বলিয়া গণ্য হইবে।

পাকিস্থান লীগ 'জাশনা' নাম গ্রহণ করিলেও, লোকে এই বোকার ভুলিবে না। কারণ সাড়ে পাঁচ কোটি মুসলমান ছাড়া দেড় কোটি অমুসলমান সেখানে এখনও ঘোষ হয় আছে, যদিও গলাশ লক্ষ অমুসলমানকে পাকিস্থানীরা তাহাদের পিতৃ-পিতামহের দেশে থাকিতে দেয় নাই। এই নিষ্ঠুরতার প্রতিফল দেখা দিরাছে সম-সংখ্যক মুসলমানদের জীবনে বাহাদুরী পূর্ব পঞ্জাব, দিল্লী ও যুক্তপ্রদেশ হইতে তাড়িত হইয়াছে পাকিস্থানে বা অথবা পলাইয়া গিয়াছে রামপুর, ছুপাল, হারমাবাদ নামক গ্রামে। তারতবর্ষ বিভাগের এই ফলাফল গ্রহণ করিয়া আমাদের চমিতো হইতেছে, যদিও অনেক কংগ্রেস-নেতা বিভক্ত ভারত আবার কোড়া লাগিবে, বলিয়া মনে থাকে তাহাদের ভাব-প্রবণতার প্রায় দ্বিগুণ থাকেনা। সাধারণ বুদ্ধি বহুভাষী মুহুর্তে বুঝে না থাকিলে তাহারা এরূপ ধনী ভুলিতে নানা ব্যবহারিক জীবনে দেখা যায় যে দুই ভাই সম্পত্তি লুপ্ত করিলে আর জোড়া লাগেনা। এক ভাই যদি চাঁকার ক্রিতে থাকেন তবে অপর ভাইকে ঠেকার পড়িয়া আবার একাত্তর পড়িবারে কিরিয়া আদিতে হইবে, তবে অপর ভাইয়ের জেদ চড়িয়া যার পৃথক ব্যবহাট্টাকে কার্ণাট করিবার। তার পর সাধারণতঃ দেখা যায় দুই ভাই একে অতর্কিত চিঠি কাটিতেছেন, মাথামাথি করিয়া দুই জনেই সর্বস্বান্ত হইতেছেন আর পেটা ভরাইতেছেন উকীল-ব্যারি-টারের। ভারতবর্ষ ও পাকিস্থানের মধ্যে যে বাটোয়ারা হইল, ইহার ফলাফল জাগতিক মিশ্রণ মানিবে না; দুই জনে সুখে-শান্তিতে থাকিবে, এরূপ আশা অনেকের হৃদয় করেন। আশা এতটা আশাবাদী নহি।

লেখক মনে করি যে মুসলিম লীগ কাউন্সিলের প্রস্তাবে

কিছুই নীমাংশা হয় নাই। পূর্বপদ ত হওয়া গেল ঘটা করিয়া। এই উৎসবের দের আরও অনেক দিন চলিবে। কারণ দৈত্য কোটি হিন্দু-শিব পাকিস্থান হইতে চলিয়া আসিতে পারে এবং ভারতবর্ষে নূতন জীবন গড়িয়া তুলিতে পারে। কিন্তু লাভে তিন কোটি মুসলমান ভারতবর্ষে বর্তমানে আছে। তাহাদের মধ্যে অনেকেই হিন্দু-মুসলমান “হুই-মেশান” এই বুলি লইয়া মাতামাতি করিয়াছে; এখনও মনে মনে হয়ত এই বুলি জপ করে। কিন্তু মুসলিম লীগের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাহারা ত ভারতবর্ষের নেতৃমণ্ডল মধ্যে স্থান পাইতে পারে না, নাগরিকের মর্যাদার দাবি করিতে পারে না যখন পাকিস্থান জাতিগত লীগে মুসলমানদের কোন স্থান নাই। হয়ত বা ভারতবর্ষের মুসলমানগণ এই নীতিতে বিশ্বাস হারাইয়া কেলিয়াছেন কিন্তু বিশ্বাস পরিবর্তন লোকে সহজে ও অল্প সময়ে করিতে পারে না, পরিবর্তনের ভান করিতে পারে। মিঃ হুসেন শহীদ সুরাবর্কীও হয়ত কোন দিন হিন্দু-মুসলমান “এক-মেশান”, এই মন্ত্রে বিশ্বাসী হইয়া উঠিবেন; কিন্তু এই সাধনা সময়-সাপেক্ষ। তত দিন ভারতবর্ষের মুসলমান কি করিবে, তাহার নির্দেশ মুসলিম লীগ কাউন্সিল দিতে পারে নাই।

পূর্ব বাংলার একটি চিত্র

কেন্দ্রীয় সরকার একটি বিষয়টিতে বলিয়াছেন যে প্রায় দুই লক্ষ লোক পূর্ববঙ্গ হইতে চলিয়া আসিয়াছে। এই হিসাব বেশিরা মনে হয় যে সরকার বিচ্ছেদের প্রথম কয় মাসের কথাই বলিতেছেন। একটা ব্যাপার দেখিতেছি যে উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুরাই এই ব্যাপারে পণ দেখাইয়া যাইতেছেন। গান্ধীজীর কথার এই ব্যাপারটা পরিকার হইয়া উঠিয়াছে—“যদি পূর্ব বাংলা হইতে চলিয়া আসাই ঠিক হয়, তবে ডাক্তার, উকীল, ব্যবসায়ী প্রভৃতি উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদের ইহা দেখা কর্তব্য যে গরিব হরিজনদের ও অভ্যস্ত সকলে যেন আগে আসিতে পারে। উচ্চ শ্রেণীরা যেন আগে না আসিয়া সকলের শেষে স্থান ত্যাগ করে।” বর্তমানে যে ভাবে স্থানত্যাগ চলিতেছে তাহার ফল হিন্দু সমাজের পক্ষে কল্যাণকর হইতে পারে না। এই কথাটিই ‘দৈনিক’ নামক সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রকাশিত হুইশানি পত্রে বলা হইয়াছে। একখানি পত্র আসিয়াছে চট্টগ্রাম হইতে আর একখানি নারায়ণগঞ্জ হইতে।

...রিশেষতঃ হিন্দুরা নিজেদের অসহায় মনে করছে। এমকে এম হেঁচো হিন্দুরা চলে যাচ্ছে—কোন প্রকার ভয়ে নয় শুধু বাঁচবার আশায়। মুসলমানের মধ্যে ‘পাকিস্থানে’র কোন উৎসাহ নাই—তারা কিছুই অশুভ করতে পারছে না। সকলের শুধু হায় বোদা, কিংলো এই ভাব।...

...সংখ্যাগরিষ্ঠ-মনে এই ধারণা, বড়মূল হয়ে নিচ্ছে যে সংখ্যালঘুদের দু’ দিন আগে হটক বা

পরে হটক চলে যেতে হবেই বা রমজান এখন করতে হবে।...

দামোদর উপত্যকা

ভারত পবিত্রের প্রায় ৬০ কোটি টাকা ব্যয় করিয়া দামোদর নদীর স্রোত নিয়ন্ত্রিত করিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভারতীয় আইন সভায় এই পরিকল্পনা ও তৎসম্বন্ধে সমস্ত ব্যবস্থা স্বীকৃত হইয়াছে। এই পরিকল্পনা বিহারের হাতারীবাগ অঞ্চলের প্রায় লক্ষ লোককে ভিটে-ছাড়া করিবে। কিন্তু এই পরিকল্পনার ফলে যে সর্বাঙ্গীণ উন্নতির আশা করা যাইতেছে, তাহা হইলে এই এক লক্ষ লোকের ক্ষতিপূরণ হইয়া যাইবে; কিন্তু এই পরিকল্পনায় বিশেষ উপকার হইবে পশ্চিম বঙ্গের বর্তমান জেলা ও তৎসংলগ্ন স্থানের। বাকুড়া, মেদিনীপুর এই ব্যবস্থার প্রভাব কতটা কার্যকরী হইবে, তাহা এখন বলা কঠিন। কারণ দামোদরের বতীর অঙ্গকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিলে পার্শ্ববর্তী নদী-নালায় উন্নতি হইবে, এবং অপেক্ষাকৃত অধিক স্থানে দামোদরের পলিমাটি কিছু কিছু বিস্তার লাভ করিবে, এই ভরসা করা যাইতেছে। এই কাজের সম্ভাবনা সম্পর্কে “সংগঠন” পত্রিকার অগ্রদূত সংখ্যায় অধ্যাপক কাননগোপাল বাগচি কিছু রেখাপাত করিয়াছেন,—

“বিভিন্ন বাল ও ষাউনের (বর্তমান জেলার জল নিয়ে বাওয়ার ছোট নালাকে ‘ষাউন’ বলে) মাঝকত, এবং বাকা, বেহলা ও মুড়ুর প্রভৃতি লুপ্তপ্রায় শাখা-নদীর সাহায্যে দামোদরের জল চালিয়ে বর্তমান ও পার্শ্ব জেলাগুলিতে কিছু কিছু সেচের কার্য এখনই হইয়া থাকে। তাহা প্রায় এক লক্ষ পঁচিশ হাজার একর বা তিন লক্ষ পঁচাত্তর হাজার বিঘা জমিতে এই ভাবে চাষের ব্যবস্থা আছে বলে সরকারের দপ্তরে প্রকাশ। দামোদর পরিকল্পনায় যারী এ জমিগুলিতে ত বটেই। আরও পাঁচ-ছয় লক্ষ জমিতে সেচের প্রবর্তন হবে। লক্ষসম্মত তার পরিমাণ দাঁড়াবে ৭,৬৩,৮০০ একর (২২,৯১,৪০০ বিঘা)।

আরও একটি কথা হয়ত বলা রাজ্যই হবে। বর্ধার অবসানেও, দীত ও গ্রীষ্মব্যাপী সেচের জল পাইয়া জমিতে সারা বছর ধরে আলুটা, তরকারিটা রপ্তা রপ্ত হতে থাকবে।...

ইহার উপর আছে, বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদনের কথা। পটী-প্রায়ের গৃহাদি বিদ্যুতের আলোকে উদ্ভাসিত হইবে, একর ন্যা উদ্ভট নয়। বিদ্যুতের শক্তিতে নানা কলকারখানা চালিত হইবে; নানা শিল্পের প্রতিষ্ঠা হইবে; লোকের বেকার সমস্তা মিটবার সম্ভাবনা দেখা দিবে; পশ্চিম বঙ্গ আবার শত-আমল, সাহোদর হইয়া উঠিবে। একর ন্যা করিতেও যথ।

“কমুলি নেহি ছোড়্তা”—

আমাদের অনেক সময় ইচ্ছা হয় ব্রিটিশ রাজনীতিকদের লীলাধোলা ভুলিয়া যাইতে, কিন্তু কান্দীর ব্যাপারে বিলাতের পত্রিকাগুলি যেদ্রুপ “পাকিস্থানী” মনোভাব দেখাইয়াছে তাহাতে আমাদের সাবধান হইতে হইবে। “টাইমস্” ও “ম্যাক্লেট্টার গার্ডেন” পত্রিকা দুইখানি উৎকট সাম্রাজ্যবাদী নয়। তাহারাও যখন প্রভাব করিয়াছে যে কান্দীর ও জম্মুকে দুই ভাগ করিয়া দিলে আমাদের পক্ষে মঙ্গল, তখন বুঝিতে হইবে যে পণ্ডিত জবাবহরলালের গবর্নমেন্টের নিকট এইরূপ প্রভাব আসিয়াছে। কান্দীর পড়িবে পাকিস্থানের ভাগে, জম্মু পড়িবে ভারতবর্ষের। এই ব্যবস্থার ব্রিটিশের স্বার্থ কি ঠিক বুঝা যাইতেছে না। যে রাশিয়াকে ব্রিটেন এত ভয় করিয়া আসিতেছে তাহার দাপটে পাকিস্থানকে ফেলিয়া দিবার সার্বকভা কি? এক হইতে পারে যে কান্দীর “পাকিস্থানে”র হাতে গেলে স্বাধীন রাজ্য দ্বারা ভারতবর্ষ আর একটু বেশী বেঞ্জীত হইয়া পড়িবে। সে বাহাই হউক, মিঃ ক্রেমেন্ট এটলি পণ্ডিত জবাবহরলাল নেহরুকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন; তাহার কারণের অনুসন্ধান আমাদের করিতে হইবে। ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বর মাসে লণ্ডনে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া মিঃ এটলি কি খেলা খেলিয়াছিলেন তাহা আমাদের ভুলিলে চলিবে না। কান্দীর সম্পর্কে সেরূপ কোন চালাকীর প্রণয় দেওয়া উচিত হইবে না এবং উচিত হইবে না ব্রিটেনের সঙ্গে কোন সন্ধিস্থলে আবদ্ধ হইতে, তাহার আকর্ষণে আমরা আন্তর্জাতিক ঘুরপাকের মধ্যে পড়িতে পারি। একটা কথা শোনা যাইতেছে যে পাকিস্থান, ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ, মালয়, সিংহল লইয়া ইংরেজ একটা মণ্ডল স্থাপিত করিতে চায়। কালে তাহা ইন্ডোনেশিয়া, অস্ট্রেলিয়ায় ব্যাপ্ত হইবে। এই ব্যবস্থা ব্রিটেন এখন হইতেই করিয়া ফেলিতেছে। মিশর ও প্যালাস্তাইন হইতে তাহার রণসস্তার সে আফ্রিকার পূর্বাঞ্চলে সরাইয়া আসিতেছে। ভূমধ্যসাগরের উপর প্রভুত্ব সে ছাড়িয়া দিতেছে, পশ্চিম এশিয়া হইতে সে সরিয়া আসিতেছে। মিশর হইতে আফগানিস্থান পর্যন্ত ভূখণ্ডে যে প্রভাব-প্রতিপত্তি সে ভোগ করিতেছিল তাহা হইয়া সে ছাড়ে নাই। এই মুসলিম দেশসমূহকে এখন সোভিয়েট রাশিয়ার মন জোগাইয়া চলিতে হইবে। ভবুও ব্রিটেন পাকিস্থানের মায়া ছাড়িতে পারিতেছে না এবং ভারত মহাসাগরের উপকূলে সে তাহার ঝাঁট বৃচতর করিতেছে। আফ্রিকার পূর্বাঞ্চল হইতে সিংহলে জিনকমেসি রঙ্গর পর্যন্ত তাহার নৌবহর অপ্রতিষ্ঠিত রাশিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। বঙ্গোপসাগরের আন্দামান দ্বীপ ভারতবর্ষের হাতে ছাড়িয়া দিলেও সে সিঙ্গাপুর বন্দরের ঝাঁট সুচর রাখিতেছে। এই উদ্যোগ কার ভোগে লাগিবে জানি না।

স্বাধীন ভারতে কারা-সংস্কার

মহাত্মা গান্ধী দিল্লী সেক্টার্স জেলে বন্দীদের দ্রষ্টা একদিন

তাঁহার প্রার্থনা সভার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। স্বাধীন ভারতের কারাগার কিরূপ হওয়া উচিত তৎসম্বন্ধে গান্ধীজী বলেন—

“দীর্ঘদিন ধরিয়া তিনি এই অভিমত পোষণ করিয়া আসিতেছেন যে, সমস্ত দাগী অপরাধীকে রোগী বলিয়া এবং কারাগারসমূহকে তাহাদের চিকিৎসাগার ও আরোগ্য নিকেতন বলিয়া ধরিতে হইবে। সখ করিয়া কেহই অপরাধ করে না। অপরাধ অসুস্থ মনের লক্ষণ। বিশেষ কোন রোগের কারণ অনুসন্ধান করিয়া তাহা দূর করিতে হইবে। এই অপরাধীদের কারাগারকে হাতপাতালে রূপান্তরিত করিতে গিয়া রাজপ্রাসাদের প্রয়োজন হইবে না। কোন দেশই এই ব্যবস্থা করিতে পারে না, ভারতের মত দরিদ্র দেশের কথা ত উঠেই না। কিন্তু জেলের কর্মচারীদের দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তন করিতে হইবে, তাহাদের দৃষ্টিভঙ্গী হইবে হাসপাতালের চিকিৎসকের মত। লোকায়ত্ত সরকারগুলিকে প্রয়োজনীয় আদেশজারী করিতে হইবে। কিন্তু নিজেদের শাসন-ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করিতে জেল কর্তৃপক্ষকেও যথেষ্ট উদ্যোগী হইতে হইবে। এখন বন্দীদের কর্তব্য কি? প্রাক্তন বন্দী হিসাবে তিনি এই উপদেশ দিতে পারেন যে, তাহাদের উচিত আদর্শ বন্দীর মত ব্যবহার করা। বন্দীদের যে অভিযোগই থাকুক না কেন, যথোপযুক্ত ধরণে তাহা কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত করিতে হইবে। বন্দীদের মধ্যে তাহাদিগকে আদর্শ নাগরিকের মত চলাকোরা করিতে হইবে। তাহা হইলেই মুক্ত হওয়ার সময় তাহারা অনেক ভাল হইয়া সাধারণের মধ্যে ফিরিয়া আসিতে পারিবে।”

ভারতবর্ষের আরও বহু সমস্তার ভার কারা-সমস্যাও লোকলোচনের অন্তরালে রহিয়া গিয়াছে। অনশনে যতীন দাসের আত্মদানের পূর্ব পর্যন্ত জেলের নিয়মকানুন ছিল তরানক কড়া। রাজনৈতিক বন্দীদের সাধারণ দাগী আসামীদের সঙ্গে রাখা হইত এবং একই প্রকার দুর্ব্যবহার তাহাদের সহিতও করা হইত। সাধারণ করেদী এবং রাজবন্দীদের মধ্যে কোন বৈষম্য রাখা হইত না। কারাগারে রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি এইরূপ ব্যবহারের জন্য ভারতবাসীর মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া উদ্ধাকে আন্দোলনের বস্তু করিয়া তুলেন লাহোর যড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত ভগৎ সিং, রাজ-ভদ্র শঙ্করদেব এবং যতীন দাস। যতীন দাস শেষ পর্যন্ত অনশনে আত্মদান করিয়া এবিষয়ে ভারতবাসী এমন আলোড়ন সৃষ্টি করিতে সক্ষম হন যে শেষ পর্যন্ত ভারত-সরকার রাজনৈতিক বন্দীদের দ্রষ্টা কর্তৃক বিধি করা দিতে বাধ্য হন।

পশ্চিম বাংলার উন্নয়ন ব্যবস্থা

পশ্চিম বঙ্গের মন্ত্রীমণ্ডলী সংবাদপত্র মারফত প্রচার করিয়াছেন যে তাহারা আর কালবিলম্ব না করিয়া এই প্রদেশের লক্ষ্যদীপ উন্নতিকর কার্যপদ্ধতি অবলম্বন করিবেন এবং এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বিভাগে নানাপ্রকার পরিকল্পনা (scheme)

বিবেচনা করা হইতেছে এবং এক্ষিকবার ডাঃ ঘোষ ও তাঁহার সহকারীগণ উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন যে দেশের দরিদ্র জনসাধারণের অনবজ্ঞের অভাব দূরীকরণ এবং স্বাস্থ্য ও শিক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য চেষ্টার ক্রটি হইবে না। আমাদের জানিতে ইচ্ছা করে যে, যে সকল উন্নতিকর ব্যবস্থার পরিকল্পনা বাংলার মন্ত্রিগণ বিবেচনা করিয়াছেন বা করিতেছেন তাহাদের কি প্রকারে উদ্ভব হইল। উত্তরাধিকারস্বত্বে বর্তমান মন্ত্রীমণ্ডলী এই প্রদেশে নিযুক্ত আমলাতন্ত্রের অংশ এবং কিছু নবীপত্র লীপ সরকারের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। উন্নয়নের পরিকল্পনাগুলিও সেই সপ্তে পাইয়াছেন; না তাহাদের নিজের আমলে প্রস্তুত হইয়াছে, জানিবার কোন উপায় নাই।

লীগমন্ত্রীমণ্ডলীর ও তৎকালীন কর্মচারীগণের কার্য-তৎপরতার যে নমুনা আমরা দেখিয়াছি তাহার কলে তাহাদের পরিকল্পিত কোন ব্যবস্থার উপরে আমরা আস্থা স্থাপন করিতে পারি না। কৃষি, শিক্ষা, শিল্প, স্বাস্থ্য ইত্যাদি জনহিতকর কার্যে তাহাদের কোন উৎসাহের পরিচয় পাই নাই। সেই আমলে “অধিক শুল্ক ফলাও” আন্দোলন ব্যর্থতার সীমা অতিক্রম করিয়া প্রহসনে পরিণত হইয়াছিল। সরকারী ব্যবস্থার দ্বারা জনসাধারণের অভাব মোচন হইবে কিনা এই চিন্তা তাহাদের ছিল না, কেবল কি শ্রেণীর পরিকল্পনার অধিক সংখ্যক কর্মচারী নিযুক্ত করা এবং কর্তৃত্ব বিলি করিয়া আত্মীয় ও আশ্রিতবর্গ প্রতিপালিত করা হইবে তাহাই একমাত্র লক্ষ্য ছিল।

এই বিষয়ে অধিক আলোচনা করিয়া লাভ নাই। কিন্তু বর্তমানে যে মন্ত্রীমণ্ডলীর উপরে বাংলার রাষ্ট্র পরিচালনার ভার ন্যস্ত আছে, তাহাদের নিকট আমরা নিশ্চিত প্রত্যাশা করিব যে, প্রত্যেক জেলার প্রতিনিধিস্বানীয় চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া জনসাধারণের প্রয়োজন ও কল্যাণের কঠিনপথে বিচার করিয়া যেন তাহারা কার্যপদ্ধতি স্থির করেন।

লীপ আমলে ১৯৪৪:৪৫ সালে ‘উন্নয়ন বিভাগ’ (Development Department) নাম দিয়া অকস্মাৎ একটি ভূ-ই-ফৌড় বিভাগ গড়াইয়া উঠিয়াছিল, এবং সেই বিভাগের ছোট বড় কর্মচারী পদপালের মত সমস্ত দেশ ছাইয়া ফেলিয়াছিল। তাহার দ্বারা বাংলার কোনও অংশে যে কোনও উন্নতিকর কার্য সম্পন্ন হইয়াছিল তাহা আমরা জ্ঞাত নহি। পরে রোল্যান্ড কমিটির পরামর্শ অনুসারে এই বিভাগের বিলোপ সাধন হয় এবং প্রধান মন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে সরকারী দপ্তরবানার একটি উন্নয়ন বিভাগ গঠিত হইল। রোল্যান্ড কমিটির নির্দেশ অনুসারে জেলার বাবতীর উন্নয়ন কার্যের ভার জেলার ম্যাজি-স্ট্রেটের উপর অর্পিত হইয়াছিল এবং তাহাকে স্থানীয় অবস্থা বিষয়ে অবহিত করিবার জন্য জেলার জেলায় পরামর্শ-সভাও গঠিত হইয়াছিল।

জেলার সমতাসমূহ কি প্রকারে মীমাংসা করা যাইতে পারে তদ্বিষয়ে অধিবাসিগণের মতামত কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত করিবার জন্য বাঁকুড়া জেলার একটি বে-সরকারী ‘জেলা উন্নয়ন সমিতি’ গঠিত হইয়াছে। বাংলার মন্ত্রী বাঁকুড়াবাসী ত্রিযুক্ত কমলকৃষ্ণ রায় মহাশয় ইহার পৃষ্ঠ-পোষক এবং ত্রিনিকেতনের প্রাক্তন কর্মী ত্রিযুক্ত চট্টো-পাধ্যায় ইহার সভাপতি। জেলায় যে সকল লোক বহু-কাল ধরিয়া দেশসেবার আত্মনিয়োগ করিয়াছেন এবং জেলার অবস্থার সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ ও ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে তাহাদের অনেকেই ইহার সভ্য। কৃষি, সমবায় ইত্যাদি বিভাগের সরকারী কর্মচারীগণকেও সমিতির অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

আলোচনা ও পরিকল্পনার সৌকর্য্য নিম্নলিখিত বিষয়-সমূহের জন্য সাতটি উপশাখা গঠিত হইয়াছে—

(ক) কৃষি, (খ) সেচ, (গ) বনরক্ষণ ও ভূমিসংরক্ষণ (anti-erosion), (ঘ) কৃষি সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়, (ঙ) গৃহশিল্প, (চ) স্বাস্থ্য, (ছ) সমবায়।

দেশের অন্তরতর সমতাসমূহের সমাধানের জন্য মন্ত্রী-মণ্ডলীকে সাহায্য করিবার এবং স্থানীয় অবস্থার উপযোগী পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যে বাঁকুড়া জেলাবাসিগণ যে ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা আমরা সমর্থন করি এবং উন্নয়ন সমিতির প্রচেষ্টার সকলতা কামনা করি। কিন্তু কেবল উপর হইতে সরকারী চেষ্টায় কোনও স্থায়ী ও ফলপ্রসূ উন্নতি সাধিত হইতে পারে না—সে সরকার স্বদেশীই হউক বা বিদেশীই হউক। সেইজন্ত বাঁকুড়া উন্নয়ন সমিতি জেলার মধ্যে এই সকল বিষয়ে প্রচার কার্য ও জনমত গঠনের জন্তও ব্যবস্থা করিবেন। জনসাধারণের মধ্যে এই সকল প্রয়োজনীয় বিষয়ে কর্ম প্রসারের জন্ত সমিতি একটি সাপ্তাহিক প্রচারপত্র প্রকাশ করিতে মনস্থ করিয়াছেন।

বাংলা ও আসাম ব্রাহ্ম-সম্মিলনী

বাংলা ও আসাম ব্রাহ্ম সম্মিলনীর ৫৬তম বার্ষিক অধিবেশন বিগত ২৫শে হইতে ২৮শে অক্টোবর পর্যন্ত মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত কাঁচি সহরে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

২৫শে অক্টোবর সভ্যার সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক ডাঃ দেবপ্রসাদ মিত্র প্রারম্ভিক উপাসনা করেন। তৎপরে অধ্যয়ন-সমিতির সভাপতি ত্রিযুক্ত বরদীন্দ্র দাস তাহার সুলিখিত অভিভাষণ পাঠ করিয়া অভ্যাগত অতিথিবৃন্দকে সাদর সম্ভাবণ জ্ঞাপন করেন। অতঃপর সম্মিলনীর সভাপতি ডাঃ সরোজকুমার দাস তাহার তথ্যপূর্ণ অভিভাষণটি পাঠ করেন। ডাঃ দাস বলেন :

এই কাঁচি শহরটি—যথার্থপক্ষে পল্লীশহরটি—আরতন হিসাবে জুড় হইলেও অধ্যয়নসম্পদে ও ঐতিহ্যগোব মেদিনী-

পুর জেলার হংগাররূপ। কাঁথির পথ যে কঠোপনিষদ প্রোক্ত
বর্ষের পথ, সে বিষয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষাপূর্ব প্রাথমিক জ্ঞানলাভ
করিয়া আমরা এখানে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু পথের
শেষে প্রবেশদ্বারেই শহরের পোয়ুজ, আমাদের উপবাসক্রিষ্ট
মন ও আত্মা, পরীমাতার স্নেহ স্নানিবিভ্র ভ্রামলাকুল স্পর্শে যেন
নবজীবন লাভ করিল। যে উদার, উজ্জ্বল আকাশে সুর্য্যোদয়
তন্ত্রির পূজাগুলির মত নিভ্যই প্রতিভাত হয় এবং যে নীরব
সৌম্য গভীর আকাশে সুর্যাস্ত ভক্তের প্রণামের মতই অব-
নমিত হয়, যেখানে দিগন্ত-প্রসারিতা বরীজী অঞ্চল আকাশের
সহিত মিলিত হইয়া ‘ভাবা পৃথিবী’—‘ভোঃ পিতা, মহী মাতা’
আদি জনকজননীকে আত্মা দেয়, সেখানে বর্ষজীবনের উৎসী-
তৃত অনন্তের বোধ এত সহজ, সরল ও সুগম, তাহা যেন এই
প্রথম প্রত্যক্ষজ্ঞানে পাইলাম। ঐতিহাসিক পরিবেশও এই
প্রাকৃতিক পরিস্থিতির অঙ্গরূপ। ইতিহাসপ্রসিদ্ধি আছে যে,
খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষভাগে কিংবা একাদশ শতাব্দীর
প্রথমভাগে পশ্চিম বঙ্গের এই বিভাগে বৌদ্ধধর্মের একাদ
“বর্ষপূজা” নামে প্রচলিত ছিল। ময়নাপুত্র ও তরিকটবর্তী
অনেক স্থানে এখনও এই “বর্ষপূজার” প্রচলন আছে এবং
তজ্জুই বঙ্গ-সাহিত্যে “বর্ষ মঙ্গল” নামক গ্রন্থের আবির্ভাব।
বস্তুতঃ বৌদ্ধমতের এই রূপান্তর ব্যতীত মেদিনীপুর জেলার
যোগপন্থ নিরঞ্জন মত প্রভৃতি বিবিধ মতবাদ ও পূজাপদ্ধতি এবং
সহজিয়া আটল, বাউল, দরবেশ সম্প্রদায়ের পূজার্কনা ও মত-
বাদ প্রচলিত দেখা যায়। বিশেষতঃ উত্তরের আখ্য সন্ত্যতা
ও দক্ষিণের দ্রাবিড় সন্ত্যতা মিলিত হইয়া মেদিনীপুর জেলার
দ্বিতীয় প্রয়াগ তীর্থ রচনা করিয়াছে এবং মেদিনীপুর জেলা
বহু দিন পর্য্যন্ত জগন্নাথধামের দ্বারপথ থাকায় আখ্যপন্থর,
রামাহুজ, রামানন্দ, কবীর, নানক, চৈতন্য মহাপ্রভু প্রভৃতি
সম্প্রদায় প্রবর্তক মহাপুরুষদিগের চরণস্পর্শে মহীয়ান হইয়াছে।
সর্বশেষে উল্লেখ করি মহর্ষি দেবেজনাথ ঠাকুরের সহকারী ও
সহধর্মী সত্য, শিব ও সুলসের পূজারী শিবচন্দ্র দেব ও রাজ-
নারায়ণ বহুর ধর্মসাধনা ও ব্রহ্মোপাসনা। শিবচন্দ্রদেবের
‘আত্ম-শিক্ষা’ ও ‘একতানবিশিষ্ট মন’ সম্পর্কিত সাধনা এবং
তাবজ্ঞানপ্রবণচিত্ত রাজনারায়ণ বহুর ‘বসন্ত-কুচন’ ও গোপ-
সিঁরিতে বসন্তকালে ব্রহ্মোপাসনা (খ্রীষ্টাব্দ ১৮৬০-১৮৬৫ পর্য্যন্ত)
মেদিনীপুরের আধ্যাত্মিক সম্পদের অত্যন্ত নিদর্শন। বর্ষ
সাধনার দিক হইতে এই জেলাটি যেমন মহাপুরুষদিগের পুণ্য-
স্পর্শ লাভে সৌভাগ্যবান ছিল, তেমনিই ধর্ম ও কর্তব্যনিষ্ঠার
জন্য ইহাকে নানাবিধ হুঃসহ হুঃখ দুর্গতি লাঞ্ছনা নিগীড়ন
সহিতে হইয়াছে। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর সপ্তম দশকে
ইতিহাসবিজ্ঞাত কালাপাহাড়ের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া
বিংশ শতাব্দীর পঞ্চম দশক পর্য্যন্ত হুঃখ দুর্গতি পৌনঃপুনিক
দশমিকের মত বারংবার এই মেদিনীপুর জেলার উপর আঘাত
করিয়াছে। “মেদিনী”র একটি প্রতিশব্দ “সর্বংসহা” কেন

হইয়াছে ইহাই বোধ হয় একটি ইঙ্গিত। হুঃখের হোমারিপুত্র
এই প্রদেশ বিশেষতঃ কাঁথি, বঙ্গ হইয়াছে বর্তমান জগন্নের সর্ব-
শ্রেষ্ঠ মানবের চরণস্পর্শে, যিনি এই হুঃখের তপস্যায় জয়
লাভ করিয়া বিধাতার সাধর্ম লাভ করিয়াছেন।

জার্মানীর ভবিষ্যৎ

যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট রাষ্ট্র, ব্রিটেন ও ফ্রান্সের আন্তর্জাতিক
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিগণ লণ্ডন নগরীতে আজ বিশ দিন হইল
আলোচনা আরম্ভ করিয়াছেন জার্মানীর ভবিষ্যৎ স্থির করিবার
জন্য। আড়াই বৎসর—১৯৪৫ সালের—মে মাস হইতে আজ পর্য্যন্ত
—এই বিষয় লইয়া অনেক টানা-হেঁচকা হইল, কিন্তু কোন
মীমাংসা হইতেছে না। গত এপ্রিল মাসে স্কো নগরীতে
চতুঃশক্তির পরামর্শ সভায় তর্ক করিয়া মিঃ মার্শাল, মলোটভ,
বেভিন ও বিবোলভ্ সন্মত কাটাইলেন কিন্তু কোন স্থির
সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারিলেন না। কেন পারিলেন না
তাহার কারণ সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু
গোড়ার কথা এক—যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন যে তাহা জার্মানীর
ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করিতে চান, সোভিয়েট রাষ্ট্রের তাহাতে
জরুর আপত্তি আছে, যদিও উভয় পক্ষই জার্মানীর উন্নতির
জন্য উদ্ভাবী বলিয়া প্রচার করেন। জার্মানী ছয় বৎসর যুদ্ধ
করিয়া প্রমাণ করিয়াছে তাহার শক্তি কত বড়। একা সে
যুদ্ধ করিয়াছে ইউরোপ-আমেরিকার সমবেত শক্তির বিরুদ্ধে।
এই শক্তিবরকে হ্রাস করিয়া রাখিতে হইবে—এ বিষয়ে
মতভেদ নাই। জার্মানীর নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ আদায়
করিতে হইবে—এই বিষয়েও মতভেদ নাই, যদিও ক্ষতি-
পূরণের ভাগ-বীটোয়ারা লইয়া তর্কের অন্ত নাই। ক্ষতিপূরণ
দিতে হইলে জার্মানীর শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার প্রয়োজন।
জার্মানী যাহা উৎপাদন করিবে তাহা হইতে দেশের প্রয়োজন
মিটিয়া উদ্ভূত থাকিলে তবেই তাহা সম্ভব। ক্ষতিপূরণের
জন্য উদ্ভূত উৎপাদন করিতে গেলে যে শিল্প-কৌশলের প্রয়োজন
তাহাতে উৎসাহ দিতে যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট রাষ্ট্র প্রভৃতি
অনিচ্ছুক। কারণ জার্মানীর উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় তাহারা
পাইয়াছেন এবং সেই শক্তির পুনরুত্থানে তাহাদের এমন
একটা ভীতি দেখা দিয়াছে যে জার্মানীতে সমস্ত কর্ম-প্রচেষ্টা
ব্যাহত হইয়া আছে। জার্মানীর কলকারখানা তাহারা তানিয়া
ফেলিতেছে বা ক্ষতিপূরণের দ্বারে বিদেশে চালান দিতেছে;
জার্মানীর শিল্পীকুল ও বৈজ্ঞানিকদিগকে এলোভন দেখাইয়া
লইয়া বাইতেছে। এই অবস্থায় জার্মানীর উৎপাদন বাড়াইয়া,
উদ্ভূত শিল্পসম্ভার ও কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া,
ক্ষতিপূরণ আদায় যে কি করিয়া তাহারা করিবে তাহা
এখনও স্থির হয় নাই।

আবার বর্তমান যুগে শিল্প-বাণিজ্য ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থায়
যে কেন্দ্রীয় শক্তির প্রয়োজন জার্মানীতে তাহা পুনঃ-
প্রতিষ্ঠা করিতে কেহই ইচ্ছুক নয়। কাইজার উইলিয়ম

ও হিটলারের সময়ে এরূপ শক্তির পরিচয় তাহারা পাই-
রাছে; সাত কোটি জার্মানকে এক উদ্দেশ্যে, এক লক্ষ্যে
প্রণোদিত করিয়া কি ভাবে তাহা ত্রিশ বৎসরের মধ্যে দুইটি
বিশ্ব-সংগ্রামের আয়োজন করিয়াছিল, তাহার ধ্বংসলীলার
চিহ্ন আজিও ইউরোপের বুকে, দেশে দেশে একটি হইয়া
রহিয়াছে। ১৯৪৫ সালের মে মাসে বার্লিনের পটপটম
পন্নীতে যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট রাষ্ট্র ও ব্রিটেনের প্রধানদের
মধ্যে যে চুক্তি হয়, তাহাতে এই বীভূতিটাই ছিল যে জার্মানীর
অর্থনীতিক প্রতিষ্ঠান বা কাঠামো বজায় রাখিতে হইবে।
বিজয়ী রাষ্ট্রগুলি ইহা করিতে পারে নাই। সোভিয়েট
চলিয়াছে তাহার সমাজতান্ত্রিক প্রেরণা লইয়া; জার্মানীর
পূর্বীকালে সে সমস্ত ব্যবস্থাকে ওলটপালট করিয়া নিজেদের
সুবিধায় রূপান্তরিত করিয়া ফেলিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও ফ্রান্স
তাহাদের বিশ্বাস-মতে ব্যক্তি-তান্ত্রিক ব্যবস্থার টাট বজায় রাখি-
বার চেষ্টা করিতেছে। এইখানেই বিরোধ এবং এই বিরোধ
লগ্নন কনফারেন্সে সমাধান হইতেছে না, যেমন গত এপ্রিল
মাসে, মস্কো কনফারেন্সে হয় নাই এবং যত দিন এই
বিরোধের শান্তি না হইবে, তত দিন ইউরোপে কোন গঠনমূলক
উদ্দেশ্য সফল হইবে না; মার্কিন কলনামহয়ারী মার্কিন
দেশের টাকা ইউরোপের পুনর্গঠনের জন্ত নানাভাবে আসিতে
পারে। কিন্তু ইউরোপ ও আজ এক ভাবের ভাবুক নয়।
ব্যক্তি-তন্ত্র ও সমাজ-তন্ত্র এই দুই মতের বিরোধের মধ্যে পড়িয়া
কেহই মার্কিনের এই সাহায্য স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করিতে
পারিতেছে না। ইহাই গোড়ার কথা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর
ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মধ্যে একটা প্রতিযোগিতা চলিয়াছিল।
জার্মানী তাহার সুযোগ গ্রহণ করিয়া পরাজয়ের গ্লানির হাত
হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিল হিটলারের নেতৃত্বে। আজ
সেই ইতিহাসের পুনরুত্থান যে হইবে না তাহা কেহ নিশ্চয়
করিয়া বলিতে পারে না। প্রতিপক্ষ দুই দেশের নাম
বদলাইয়াছে মাত্র। আজ যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট রাষ্ট্রের মধ্যে
প্রতিযোগিতা চলিতেছে।

ফিলিস্তিন

ইউরোপের এই ডামাডোলের মধ্যে ভূমধ্যসাগরের উপকূলে
ফিলিস্তিন লইয়া একটা অটলতার স্থিতি হইতেছে। গত পঁচিশ
বৎসর ব্রিটেন এই দেশের উপর কর্তৃত্ব করিতেছিল জাতি
সংঘের (League of Nations) পক্ষ হইতে ম্যান্ডেট নামে
এক অদ্ভুত ব্যবস্থার কল্যাণে। এই ব্যবস্থায় ফিলিস্তিনবাসী
আরবেরা সুখী হইতে পারে নাই। তাহারা অধিকাংশই মুসল-
মান; তাহাদের দেশের উপর ব্রিটেন একটা নতুন রাষ্ট্রের
গোড়া-পত্তন করিল "ইহুদিহান" নাম দিয়া—অর্থাৎ "Jewish
Home" নামে এই প্রচেষ্টা পরিচয় লাভ করিল। আরব
মুসলমানেরা এই "উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বলা" ব্যবস্থাকে সহ্য
করিতে পারিল না, যদিও দুই হাজার বৎসর পূর্বে ইহুদিদের

পূর্বপুরুষেরাই এই ভূমিখণ্ডের অধিবাসী ও অধিপতি ছিল।
ভাগ্যের তাড়নার তাহারা নানাদেশে ছড়াইয়া পড়িয়া
ছিল। অল্পব্যয় অত্যাচার সহ্য করিয়াও তাহারা তাহাদের
প্রাচীন জন্মভূমির স্মৃতি আঁকড়াইয়া ধরিয়া ছিল; এই জন্ম-
ভূমিতে তাহারা ফিরিয়া আসিবে এই আশা দুই হাজার
বৎসরের মধ্যে একদিনও তাহারা ছাড়িতে পারে নাই। প্রথম
বিশ্বসংগ্রামের সময় তাহারা ব্রিটেনকে সাহায্য করিয়াছিল।
উইজম্যান নামক একজন বৈজ্ঞানিক এই সময়ে একটি আবিষ্কার
দ্বারা ব্রিটেনের একটা আসন্ন অভাব মিটাইতে সাহায্য
করেন। কৃতজ্ঞতার মূল্যস্বরূপ তিনি ফিলিস্তিনে "ইহুদিহান"
গঠন করিবার অধিকার দাবি করেন। ১৯১৭ সালে ব্রিটেন
এই অধিকার স্বীকার করিয়া লয়। তখন ফিলিস্তিনে ইহুদির
সংখ্যা ছিল আশী-নব্বই হাজার মাত্র; গত পঁচিশ বৎসরে তাহা
বাড়িয়াছে ছয় লক্ষে। ফিলিস্তিনের মরুভূমিতে তাহারা বহু
শত-শ্রমল কৃষি-ক্ষেত্র স্থাপিত করিয়াছে, দুই হাজার বৎসরের
মধ্যে আরবেরা বাহা করিতে পারে নাই। এই কার্যের দ্বারা
তাহারা নতুন করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে নিজেদের অধিকার
তাহাদের ধর্মের পুণ্যভূমিতে। আরব মুসলমানেরা এই
অধিকার মানিয়া লইতে চায় না। তাহারা এই অধিকার
ঠেকাইয়া রাখিবার জন্ত যত্ন করিতে প্রস্তুত হইতেছে। চতুর্দিকের
আরব রাষ্ট্র হইতে তাহারা সাহায্য পাইবার দাবি রাখে, সেই
সাহায্যের আয়োজন আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। মুসলমান ইহুদি
উভয়েই রণসজ্জার মাতিয়া গিয়াছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতি-
ষ্ঠানের (United Nations Organization) হাতে তাহার
দায়িত্ব অর্পণ করিয়া ব্রিটেন তাহার শাসন-ব্যবস্থা গুটাইতে
আরম্ভ করিয়াছে। ভূমধ্যসাগরের পূর্ব উপকূলে একটা
যুগ পরিবর্তনের সূচনা হইতেছে। "বেলাকং" আন্দোলনের
পরিণতির কথা অরণ্য থাকিলে আমরা এই আন্দোলনে সাফা
দিতে পারি না।

আচার্য যোগেন্দ্রচন্দ্র রায়

আচার্য যোগেন্দ্রচন্দ্র রায়ের উন্নয়নবিশিষ্ট জন্মতিথি উপলক্ষে
বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ এক সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করেন।
বীকুণা শহরে এই অমূল্য সম্পদ হয়। আচার্য যদুনাথ
সরকার এই অমূল্যে পৌরোহিত্য করেন। মানপত্র বলা হয়—
"আপনার সুবীর্ণ কর্মের জীবনের অধিকাংশকাল
কঠোর জ্ঞান-সাধনার অতিবাহিত করিয়া আপনি যে
গৌরবময় আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন, তাহা চিরদিন
আমাদের অমূল্যের হইয়া থাকিবে; আশীর্বাদ করুন,
সে আদর্শে আমরা যেন অগ্রপ্রাণিত হইতে পারি।"
"আপনার ধর্মতুল্য সরল জীবনযাত্রা, শিক্ষাদানে
একনিষ্ঠ তৎপরতা, স্থানীয় সর্ববিধ জনহিতকর কার্যে
পথ প্রদর্শন আপনার প্রধান কর্মক্ষেত্র উড়িয়া প্রদেশে
চিরস্মরণীয় হইয়াছে; আপনি সেখানে বহু যুগের তত্ত্ব

বেশীতে আজ প্রতিষ্ঠিত। আপনার স্বদেশবাসী বাঙালীকে মাতৃভাষায় ছরছ বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষা দিবার জন্য আপনার প্রথম জীবনের একক সাধনার কথা আজ আমরা কৃতজ্ঞ-চিত্তে স্মরণ করিতেছি। আপনার অক্লান্ত লেখনী দীর্ঘকাল ধরিয়া কত বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেশবাসীদের শিক্ষিত, উদ্বুদ্ধ ও সতর্ক করিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও করিতে থাকিবে। বিজ্ঞানকে সাহিত্যের আধারে পরিবেশন করিয়া আপনি ভাবপ্রবণ বাঙালী জাতিতে নুতন পথে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন। রসায়ন, পদার্থ বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিজ্ঞান প্রভৃতি বিজ্ঞানের বিবিধ বিভাগে বহুবিধ গবেষণা করিয়া আপনি মাতৃভাষায় তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ভাষাতত্ত্ব ইতিহাস ও সমাজতত্ত্বের নিবৃত্ত সত্যগুলি আপনার অপূর্ণ প্রতিভাবলে বঙ্গ সাহিত্যের সম্পদ হইয়া উঠিয়াছে। আপনি বঙ্গ-ভাষার মধ্য দিয়া আমাদের জাতীয় জীবনে জাহ্নবীধারা প্রবাহিত করিয়াছেন। আপনার এই অমরকীর্তি স্মরণ করিয়া আমরা আপনাকে অভিনন্দিত করিতে আসিয়াছি।”

এই মানপত্রের উত্তরে আচার্য্য যোগেশচন্দ্র তাঁহার জীবন-ব্যাপী সাধনার কথা বর্ণনা করেন। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের জন্মস্থতান্তের সঙ্গে তাহা সংযুক্ত। ১৯০১ সালে ইহার প্রতিষ্ঠা হয়; ১৯০২ সালে যোগেশচন্দ্র তাঁহার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯০৮ সালে রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষার ক্রিয়াপদ সংগ্রহ আরম্ভ করেন; পরিষদের সহকারী সম্পাদক ব্যোমকেশ মুস্তফী যোগেশচন্দ্রকে অগ্ররোধ করেন “বাকী বাদ যে সব শব্দ আছে তাহা যোগ করে দিতে।” এইভাবে আরম্ভ হইল ভাষাতত্ত্বের আলোচনার সাধনা। বাংলার বর্ণমালার যুক্তাক্ষর সমস্তা সহজ করিতে না পারিলে অন্য ভাষাভাষী লোকের পক্ষে বাংলা ভাষা শিক্ষা কঠিন হইতেছে। এই বাধা দূর করিতে হইবে। “অক্ষর-সংস্কার” আরম্ভ হইল। তাঁহার নিজের কথায় এই অবহার বর্ণনা দিতেছি,—

বাংলা কঠিন করেছে এর যুক্তাক্ষর। যুক্তাক্ষর শিখতে শিখতে শিশুর প্রাণ বেরিয়ে যায়। বিভাগাগর মহাশয়ের প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ দেখলে ভর হ’ত। অক্ষর পরিবর্তন করতে না পারলে এক সহজ ভাষা বলা যায় না। তাবলাম, অল্প প্রদেশের লোক যাতে বাংলা ভাষা সহজে শিখতে পারে এক্ষেত্রে অক্ষর ও বানান সহজ করতে হবে। “অক্ষর-সংস্কার” লিখতে লাগলাম। অনেক লোক আমার উপর বিরক্ত হলেন। বললেন ফোঁধাকার কে এক উড়িয়া এসেছে। ভাগলপুর সাহিত্য সম্মেলনে ললিতরুমার বন্দ্যোপাধ্যায় “বর্ণমালার অভিযোগ” নামে এক প্রবন্ধে আমার খুব সমালোচনা করেন। সম্মেলনে বহু প্রোত্‌তার সমাগম হয়। তারা শুনে হাসতে লাগল। জগদীশ বসুর কথা বতল। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা

করলেন, ‘আপনি কি বাংলা বানান বদলাতে চান?’ আমি বললাম, না, ‘বানান নয়, অক্ষর।’ এ কথাটা বোঝাতে আমার ২৪ বৎসর লেগেছে।

তারপর আরম্ভ হইল বাংলা ভাষার বৈজ্ঞানিক তথ্যাবলীর প্রচার। নিজের কণ্ঠ-জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে তিনি বুঝিয়াছেন ও বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে ইহা সম্ভব। সেই অভিজ্ঞতা অর্জন করেন তিনি কটক মেডিক্যাল স্কুলে।

যোগেশচন্দ্রের বক্তৃতার যে বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা অসম্পূর্ণ। তাঁহার সাহিত্যিক জীবনের পরিচয় সম্বন্ধে তিনি আরও অনেক কথা বলিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে রায়ানন্দ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত নানা পত্রিকার সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ সহস্রের কথা বর্ণনা করিয়াছিলেন। “প্রদীপ”, “প্রবাসী”র পৃষ্ঠায় তাহার নিদর্শন আছে। ৫০ বৎসর পূর্বে যে পরিচয়ের হ্রস্বপাত হয়, আজও তাহা অটুট আছে। তাঁহার নিকট আমাদের ধন অপরিশোধনীয়। বাঙালী জাতি এই জ্ঞান-যোগীর নিকট যে কত ধনী তাহার সম্যক ধারণা আজ আমরা হয়ত করিতে পারিব না। কিন্তু বাংলা ভাষা আজ যে নুতন জীবনের বিজয়-ভেরী হইয়া উঠিয়াছে, তাহার শব্দ-সম্পদ যোগেশচন্দ্রের সাধনালব্ধ।

৩ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সুরেন্দ্রনাথের জন্ম-শতবার্ষিকী উৎসব আরম্ভ হইয়াছে। আজ একশ বৎসর তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁর কীর্তি-কথা দেশের লোকে ভুলিয়া যাইতেছে। শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে যদি তাহা আমাদের স্মৃতিপটে ফুটাইয়া তুলিতে পারা যায়, তবে দেশের কল্যাণ হইবে। পিতৃমাতৃ ঋণের মত সুরেন্দ্রনাথ সহজে আমাদের একটা দায়িত্ব আছে। শতবার্ষিকী উৎসব সভার সভাপতিত্বপে ত্রৈলোক্যবর্তী রাজা-পোপালাচারিয়ার গত ১৩ই ডিসেম্বর এই ঋণের প্রকৃতি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কথাগুলি বলেন :

ভারতে জাতীয়তার প্রথম প্রভাত সুরেন্দ্রনাথের মধ্য দিয়া বুর্জ ও প্রতিফলিত হইয়াছিল। কি বর্ষ, কি সমাজ-নীতি, কি রাজনীতি, প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে বাংলা বহু বিরাট পুরুষের জন্ম দিয়াছে। সুরেন্দ্রনাথের জীবনেতিহাস বাংলার গৌরবশ্রেষ্ঠ অধ্যায়সমূহের অন্ততম। কংগ্রেসের জন্ম হইতে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত কংগ্রেস বলিতে তাঁহাকেই বুঝাইত। কংগ্রেসের বাহারা জনক, তিনি তাঁহাদের অন্ততম।”

এই করুণী পংক্তির মধ্যে ভারতের প্রায় এক শত বৎসরের ইতিহাস উহা আছে। সে ইতিহাসকে জানিলেই ভারতের নব-জাগরণের সম্যক যাহাওয়া উপলব্ধি করা যাইবে। এই ইতিহাসের পুরোত্তাগে দেখিতে পাই রাজা রামমোহন রায়ের বিরাট মূর্তি। এক হাতে তিনি দেশের সামাজিক জগল সব সরাইয়া কেজিবার চেষ্টা করিতেছেন; অপর হাতে করিতে-

ছেন কৃষ্ণনীতির বেষ্টিত হইতে দেশের মন-বুদ্ধিকে মুক্তিদান। ১৮২০ সাল হইতে ১৮৭০ সাল পর্য্যন্ত মুক্ত-আত্মা ভারতের একটা রূপ দেখিতে পাই। এই সময়ের মধ্যে “ইয়ং বেঙ্গল”, “ইয়ং বোম্বাই” দেশের অনেক সংস্কারের উপর আঘাত করিয়াছে, অনেক সংস্কারের বহন হইতে দেশের মনকে মুক্ত করিয়াছে। এই আঘাতের প্রয়োজন ছিল দেশের মনকে মোহ-মুক্ত করিয়া মুমুগু অবস্থা হইতে জাগাইবার জন্ত। এই জাগরণের শেষে আমরা দেখিতে পাই বাংলাদেশে “হিন্দুমেলা”, উত্তর-ভারতে মুসলমান সমাজে মৃতন শিক্ষার প্রতি আগ্রহ। এই কথাই বলিয়াছিলেন হেনরী কটন সাহেব তাঁর “নিউ ইন্ডিয়া” নামক পুস্তকে—“The Bengalee Baboos new rule public opinion from Peshawar to Chittagong.”—বাঙালী বাবু পেশোয়ার হইতে চাটগাঁ পর্য্যন্ত ভূ-খণ্ডে জনমত গঠন করে, গতিশীল করে। এই বাঙালী বাবু নানা মুক্তিতে বিদ্যালয় হইতে বিদ্যাচল পর্য্যন্ত ভূ-খণ্ডে নব-ভারতের নানা উপাদান ও উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছে—শিক্ষকরূপে, আইনজ্ঞরূপে, চিকিৎসকরূপে, সাংবাদিকরূপে, ধর্মপ্রচারকরূপে, সমাজ-সেবকরূপে। এই সংগঠনের ইতিহাস ভারতবর্ষের উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস।

এই বাঙালী বাবুর মধ্যে প্রধান ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ। বাংলা-দেশে তাঁহার সহকর্মী ছিলেন আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, শিশিরকুমার ঘোষ, বতিলাল ঘোষ। ভারত-সভা (Indian Association) প্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি দেশাইয়া দেন আমাদের সমগ্র রাজনীতির কর্তৃ-প্রচেষ্টার আদর্শ ও লক্ষ্য। কংগ্রেসের জন্মের দুই বৎসর পূর্বে ইণ্ডিয়ান জাশনাল কনফারেন্সের উদ্যোগ করিয়া সর্বভারতীয় রাজনীতিক কর্মের তিনি নির্দেশ দেন। তারপর ১৮৮৬ সাল হইতে কংগ্রেস ও সুরেন্দ্রনাথ হইয়া পড়িলেন অভিন্ন, সুরেন্দ্রনাথ হইলেন কংগ্রেসের বাণীমুখ। এই মুক্তি ছাড়া আর এক মুক্তি ছিল তাঁহার। সেই মুক্তি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল কংগ্রেসনেতৃত্ব লাভের পূর্বে শিক্ষকরূপে, ছাত্রসমাজের নেতাকরূপে। কলিকাতা ও বাংলার ছাত্রসমাজ, দেশের ভবিষ্যৎ চিন্তানায়ক ও কর্তৃ-নায়কবর্গ, উনবিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ ও সপ্তম দশকে গড়িয়া উঠে কেশবচন্দ্র সেন ও সুরেন্দ্রনাথের অঙ্গপ্রেরণায়। নব্য ইটালীর স্ত্রী ম্যাটিনি, গারিবল্ডি, শিব-বালসার স্ত্রী গুয় গোবিন্দ-সিংহ, ক্রিচেতন্যের আপার প্রেরণাদান এই নরশ্রেষ্ঠদের জীবন-কথা বলিয়া আমাদের পূর্বজগৎ জীবনে এক বিপ্লবের সৃষ্টি করেন সুরেন্দ্রনাথ। সেই যুগের যুবকদের স্বতিকাধায় পড়িয়াছি যে রাজনীতিক উদ্বেগ সাধনের জন্ত গুপ্তসমিতির প্রতিষ্ঠা সুরেন্দ্রনাথের অঙ্গপ্রাণনায়ই সম্ভব হইয়াছিল। জিহ্ন বৎসর পরে বার্লিন-উপেক্ষ-উল্লাসকর ইহাকে রূপদান করেন। তখন সুরেন্দ্রনাথ হইয়া উঠিয়াছেন কংগ্রেস-নেতা। কিন্তু তিনি বিপ্লবীদের নিরুৎসাহ করেন নাই; নীরস উপদেশ

তলাইয়া কখনও তাহাদের বিদায় দেন নাই। এই বৈশিষ্ট্য সুরেন্দ্রনাথের ছিল।

সুরেন্দ্রনাথের যুগে যে সম্প্রদায় দেশের রাজনীতিক মান-অপমানের ব্যাধায় ক্ষুব্ধ হইতেন, দেশের অভাব-অভিযোগের প্রতিকার চেষ্টা করিতেন, যে সম্প্রদায় শ্রেণীস্বার্থ ও শ্রেণী-সংগ্রামের কথা জানিতেন না। একটা সহজ, সরল সন্তমবোধ ছিল তাঁহাদের। সেই তাব বিদেশী রাষ্ট্র ব্যবহার পদে পদে অপমানিত হইত। সেই অপমান তাঁহাদের রাজনীতিক প্রচেষ্টার প্রেরণা জোগাইত। সেই যুগে জাতীয় আত্মসম্মান পুনরুদ্ধারের জন্ত রাজনীতিক আন্দোলন ছিল একমাত্র অস্ত্র। বহুভঙ্গ আন্দোলনে নেতৃত্ব করিয়া সুরেন্দ্রনাথ প্রমাণ করিয়া-ছিলেন যে রাজনীতিক সংঘর্ষ তিনি ভয় করেন না। তাঁহার যুগে রাজনীতি সাম্প্রদায়িক আশা-আকাঙ্ক্ষার বাহন হইয়া উঠে নাই। সেইজন্য তাঁহারা জাতিবর্ণ-নির্কিলেশে সকলের সেবা করিতে পারিয়াছিলেন। ধর্মের প্রভেদ, অবস্থার ভেদাভেদ তাঁহাদের কর্তব্যপথে কোন বাধার সৃষ্টি করে নাই। আজ বিস্তৃত ভারতবর্ষে সেই সরল, সহজ রাজনীতির অভাব আমরা অমুভব করি।

পরলোকে অধ্যাপক লাডলিমোহন মিত্র

বঙ্গবাসী কলেজের রসায়নশাস্ত্রের ব্যাচনামা অধ্যাপক লাডলিমোহন মিত্র মাত্র ৫৫ বৎসর বয়সে সম্রাস রোগে পরলোকগমন করিয়াছেন। আধুনিক কালে শিক্ষাজাতী হিসাবে বাহারা সাকল্য অর্জন করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অধ্যাপক লাডলিমোহন অঙ্গতম। যৌবনে অমূল্যলন সমিতিতে যোগদান করিয়া তিনি দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করিবার সজ্জ করেন এবং শিক্ষাক্ষেত্রে আপনার সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। কলেজ ছিল তাঁর প্রাণ, অপর অধ্যাপকদের ছুটি ছিল কিন্তু তাঁর ছিল না। ছুটিতে কলেজে আসিয়া তিনি ল্যাবরেটরির সমস্ত দোষত্রুটি সংশোধন করিতেন। পূর্ব-বঙ্গের সমস্ত স্কুল-কলেজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার বাঙালী ছাত্রদের সম্মুখে যে সমস্যা দেখা দেয় তিনি তাহাতে বিচলিত হন। যে সব ছাত্রকে হঠাৎ এই ভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হইল, মূলতঃ তাহারা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েরই ছাত্র; কলিকাতার কলেজে তাহাদের স্থান বাহাতে হয় তাহার জন্ত তিনি একান্ত আগ্রহান্বিত হন। বঙ্গবাসী কলেজে সকালে ও সন্ধ্যায় ক্লাস পুলিশা তিনি আগন্ত ছাত্রদের শিক্ষার সুযোগ করিয়া দেন। নিজে তিনি সকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত সমস্ত বিভাগের কাজ করিতেন।

অধ্যাপক মিত্রের ন্যায় নিরলোভ মানুষ এ যুগে কিতান্ত বিরল। তাঁহার লিখিত ইন্টারমিডিয়েট কেমিস্ট্রি বইখানি ভারতবর্ষের ও ভারতের বাহিরে দক্ষিণ-আফ্রিকা, সিংহল, সুমাত্রা, জাভা, জাপান প্রভৃতির বহু কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্য হইয়াছে। প্রায় ছয় শত রেখাচিত্র সমেত প্রায় সাত

শত পৃষ্ঠার পুস্তকের দাম তিনি যুদ্ধের বাজারেও তিন টাকার বেশী করেন নাই। ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন যে দরিদ্র ছাত্র হিসাবে পাঠ্যাবস্থায় যে অন্তর্বিধা তাঁহাকে সহ্য করিতে হইয়াছে তাহা তিনি ভুলিতে পারেন নাই। অথচ এই একধানি পুস্তকের দ্বারা তিনি লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করিতে পারিতেন। একটি ইংরেজ পুস্তক প্রকাশক কোম্পানীর প্রাক্তন ম্যানেজারের নিকট স্তনিয়োগ পুস্তক-প্রকাশের স্বল্পটি এড়াইবার জন্য একবার তিনি উহার প্রকাশের দায়িত্ব ঐ কোম্পানীকে দিতে চান এবং সেই মর্মে চুক্তিপত্র সম্পাদিত হয়। চুক্তি স্বাক্ষরের সময় তিনি বলেন যে একটা বিষয় ভুল হইয়া গিয়াছে, পুস্তকের দাম বাড়ানো যাইবে না এবং প্রতি বৎসর এক শত ছাত্রকে তিনি যে পুস্তক বিতরণ করিয়া থাকেন তাহা তাঁহাকে দিতে হইবে ইহা চুক্তিনামায় লেখা হয় নাই। ইংরেজ কোম্পানী ইহাতে অসম্মত হয়।

ভাই পরমানন্দ

পঞ্জাবের উপর দুর্ভিক্ষের ঘনঘটা বিস্তার লাভ করিয়াছে এবং সেই সময়ে এই আর্থ্যসমাজী নেতার তিরোধান এক যুগ-পরিবর্তনের পরিচয় দিতেছে। যে আদর্শ ও কর্ম-প্রচেষ্টায় ভাই পরমানন্দ আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন পঞ্জাব বিভাগে তাহার লাক্ষ্য ব্যাহত হইয়াছে। পঞ্চদশ ভীরে আর্থ্যসমাজ এক নতুন প্রবাহের সৃষ্টি করিয়া পঞ্জাবের হিন্দু সমাজকে নবরূপ দান করে। মুঘল সম্রাটের অত্যাচারে স্তব্ধ নানদের শিখগণ “খালসায়” পরিণত হয়। ইংরেজ শাসনের সময় পঞ্জাবের হিন্দুগণ আর্থ্যসমাজের প্রেরণায় এক নতুন রূপ লাভ করে। ইহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পায় লাল লাক্ষ্য রায়, স্বামী প্রদানন্দ ও লাল হংসরাজের জীবনে। ভাই পরমানন্দ ইহাদের মন্ত্র-শিষ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সেইজন্য দেখিতে পাই প্রথম জীবনেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ-শিক্ষায় উচ্চ সমাধি লাভ করিয়া তিনি আর্থ্যসমাজের সেবার জীবন উৎসর্গ করেন। ত্যাগের পথে চলিতে চলিতে যাইতে হয় তাঁহাকে দক্ষিণ-আফ্রিকায়, দক্ষিণ-আমেরিকায়, যুক্তরাষ্ট্রে। শেষোক্ত দেশে অমজীবী পঞ্জাবীরা একটা ক্ষুদ্র উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। তাঁহাদের সংগঠনে ভাই পরমানন্দ ১৯১২ সাল হইতে প্রবৃত্ত ছিলেন। ১৯১৪ সালে প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়। যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় পঞ্জাবীরা তখন রণোন্মাদনায় মাতিয়া উঠে। গদর পার্টি নামে এক বিদ্রোহী দল গড়িয়া উঠে লাল হরদয়াল ও ভাই পরমানন্দের নেতৃত্বে। এইজন্য যখন ভাই পরমানন্দ ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসেন তখন রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। এই আদেশ রূপান্তরিত হয় স্বাভাবিক দণ্ডপাত্রে। ১৯২০ সালে অনেক বিপ্লবীকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়; ভাই পরমানন্দ তাঁহাদের একজন।

যুক্তিলাভ করিয়া তিনি অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়েন। এই আন্দোলন যখন দুর্বল হইল এবং গান্ধীজী খৃষ্ট হিন্দু-মুসলিম সৌহার্দ্য বৃদ্ধির চায় উড়িয়া গেল, তখন ভাই পরমানন্দ সাম্প্রদায়িক মেল-বহনে বিশ্বাস হারাষ্ট্রা ফেলিলেন, ভারতীয় মুসলমানের রাজনীতিক বিশ্বস্ততায় ও সাহচর্যে আস্থা হারাষ্ট্রা ফেলিলেন। ইহার প্রতিফলরূপে তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম হিন্দু মহাসভার নেতৃত্বপে। বিগত পঁচিশ বৎসর হিন্দু সমাজকে স্বয়ংসিদ্ধ করিবার জন্য তাঁহার চেষ্টার অণু ছিল না।

সুধীরকুমার লাহিড়ী

সুধীরকুমার লাহিড়ী মহাশয়ের দেহত্যাগে “প্রবাসী”, “মহাশ্রমিক” পত্রিকা মণ্ডলীর একজন পরম স্নেহদাত্র হারাষ্ট্রা আমরা আত্মীয় বিষোগ ব্যথা অনুভব করিতেছি। প্রথম যৌবনে তিনি সংবাদপত্র সেবায় আত্মনিয়োগ করেন এবং পরিণত বয়সে সাধনোচিত লোকে গমন করিয়াছেন। গোপালকৃষ্ণ গোস্বালের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হয় ডাঃ নীলরতন সরকারের মাধ্যমে। এই মহারাষ্ট্র নেতা তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া লক্ষ্মীনের গঙ্গাপ্রসাদ বর্মার সঙ্গে তাঁহার সংযোগ ঘটাইয়া দেন এবং সুধীরকুমার এডভোকেট পত্রিকার সম্পাদকরূপে লক্ষ্মী গমন করেন। তদনন্তর “পঞ্জাবী” দৈনিক পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক হইয়া লাহোরে গমন করেন। চার-পাঁচ বৎসর পরে তিনি লাহোরের “ট্রিবিউন” দৈনিকের সহযোগী সম্পাদক পদে বৃত্ত হন; কালীনাথ রায় মহাশয় তখন ঐ পত্রিকার সম্পাদক। কালিয়ানওয়ালাবাপ হত্যাকাণ্ডের পর পঞ্জাবে সাময়িক আইন জারী হয়; ট্রিবিউন পত্রিকা সাময়িকভাবে বন্ধ হইয়া যায়, এবং সুধীরকুমার কলিকাতা চলিয়া আসেন। তখন বাংলাদেশের পাট-ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে বণিকের একচেটিয়া আধিপত্য ছিল। বিড়লা প্রমুখ মাদোয়ারী ব্যবসায়ীগণ এই চক্র ভাঙিতে চেষ্টা করেন। সুধীরকুমার এই কাজে আত্মনিয়োগ করেন এবং পাট-ব্যবসায়ের কি করিয়া পাট-চাষীদের বঞ্চিত করা হয় তৎসম্বন্ধে প্রভাঙ্ক জ্ঞানলাভ করেন। পবনোত্তর এই বিষয়ে চিন্তা করিতেছিলেন, এবং যামিনীমোহন মিত্র সম্ভার প্রধায় পাটের বেচা-কেনার ব্যবস্থা করেন। সুধীরকুমার দরিক্রমের সেবার এই সুর্যোগ পাইয়া দুইখানি সম্ভার পত্রিকার (বাংলা ও ইংরেজী) সম্পাদকীয় দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এত দিন সম্ভার প্রধায় প্রকৃত পরীক্ষা বাংলাদেশে হইতে পারে নাই। অ্যুজ স্বাধীন রাষ্ট্রে সুধীরকুমারের নানা স্বপ্ন সফল হইতে পারে।

নরসিংহ চিন্তামন কেলকার

বলবন্ত গঙ্গাধর টিলক আমাদের জাতীয় জীবনে যে যুগ-পরিবর্তন সূচনা করেন তাহার শেষ সাক্ষী পৃথিবী হইতে চলিয়া

গেলেন। বলবন্তরাওএর মল্লশিষ্যদের মধ্যে নরসিংহ চিন্তামন কেলকার এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। দেশের চিন্তাজগতে উনবিংশ শতাব্দীর শেষে যে আত্ম-প্রতিষ্ঠার ভাব সহস্র ধারায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, তার ধারক ছিলেন বহু জনের মধ্যে এক জন—বলবন্ত গঙ্গাধর টিলক। ইহার পূর্বে প্রায় তিন-পুরুষ আমরা ইংরেজী সভ্যতার প্রোত্ৰাহ স্বীকার করিয়া লইয়াছি, এবং ইংরেজের অঙ্কুরণকে চতুর্ধর্ষ ভাঙের প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। মধ্যযুগে দেবেজনাথের জীবনে আমরা প্রথম দেখিতে পাই ইহার বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহচেষ্টা। উনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশকে তার প্রকাশ পাই ভাবজগতে আধ্যাত্মমাজে, থিয়োসফিক্যাল সোসাইটিতে; বস্তুমতজ্ঞের “বদমর্শনে”, পুণার বিশ্বশাস্ত্রী চিপলুকারের “বিবদ্ধ-মালার”। বলবন্ত গঙ্গাধর টিলক মহারাষ্ট্রদেশে ছিলেন এই বিদ্রোহের চিন্তানায়ক। “কেশরী” পত্রিকার জনপ্রিয়তা ইহার সাক্ষী। আবেদন-নিবেদনের ডালা বহিয়া লইবার যে অপমান আমাদের রাজনীতি ক্ষেত্রে সহজ হইয়া উঠিয়াছিল, এই পত্রিকা মহারাষ্ট্রে তাহা প্রত্যাখ্যান করিতে শিক্ষা দেয়। প্রথম যৌবনে নরসিং চিন্তামন কেলকার এই বিদ্রোহের আলোড়নের মধ্যে পড়েন; এবং আজীবন এই মনোভাবের পতাকাবাহক ছিলেন। গান্ধীযুগে যে নতুন চিন্তাজগতের সৃষ্টি হইল তাহা পূর্বের উত্তরাধিকারী হইলেও, টিলকের শিষ্যবৃন্দ ইহা অকুণ্ঠ চিত্তে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। অসংযোগ আন্দোলনে, আইন অমান্য আন্দোলনে তাঁহারা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিলেও তাঁহাদের মন ও বুদ্ধি ইহাতে সায় ও সাড়া দেয় নাই। নরসিংহ চিন্তামন কেলকার তাঁহার ক্ষুর দেখত্যাগের পর অতীত যুগের চিন্তাধারার সহিত বর্তমান যুগের সঙ্গতিসাধন করিবার একটা চেষ্টা করেন “কেশরী” পত্রিকার সম্পাদকরূপে, সাহিত্যস্রষ্টারূপে কাব্যে, নাটকে, প্রবন্ধে। এই ভাবে তিনি মহারাষ্ট্র দেশের চিন্তানায়কদের মধ্যে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতার স্বর্গোদয় দেখিয়া পিয়াছেন, ইহাই আমাদের সান্ত্বনা।

চিমনলাল শিতলবাদ

বর্তমান ভারতের রাজনীতিকগণের নিকট চিমনলাল শিতলবাদ অল্প কোন নক্ষত্রলোকের অধিবাসী। কারণ তাঁহারা শিবিয়াছেন যে বর্তমান যুগে যে কলে ও কূলে আমাদের রাজনীতিক জীবন উদ্ভল হইয়া উঠিয়াছে, তাহার অল্প কাহাকেও জমি চাষ করিতে হয় নাই; আপনা হইতে ইহারা কৃষ্টিরা উঠিয়াছে। ইহারা ভুলিয়া গিয়াছেন যে, কোন জগতেই এরূপ অবতন ঘটে না; আমাদের দৃষ্টির অলঙ্কিতে প্রকৃতির সৃজন-চেষ্টা গায়ে না। সামাজিক জীবনে ও রাষ্ট্রীয় জীবনে দেশের মানব-মন কখনও অকর্ষিত থাকে না। আধিকার শতসন্তারের পশ্চাতে আছে বহু জনের জাগ্রত চেষ্টা; সেই বহু জনের

অনেকেই অজ্ঞাত থাকিয়া যান। চিমনলাল শিতলবাদ এরূপ ইতিহাসের অঙ্গ, এরূপ ইতিহাসের সৃষ্টিতে অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি যে সময়ে জন্মগ্রহণ করেন তখন দেশের চিন্তাজগতে ও কর্মজগতে পশ্চিম ভারতে দিকপালরূপে বিরাজিত ছিলেন দাদাভাই নৌরোজি, মহাদেব গোবিন্দ রানাড়ে। ফিরোজ শাহ মেহটা, নারায়ণ গণেশ চন্দ্রসরকার, গোপালকৃষ্ণ গোখলে ইহাদের শিষ্য। চিমনলাল শিতলবাদ ইহাদের বয়ঃকনিষ্ঠ। রাজনীতিক জীবনে ইহারা ব্রিটিশ শাসনকে ভগবানের মঙ্গলবিধান বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন এবং এই বিধানের সঙ্গে সহযোগিতা করিয়া ভারতের স্বাধীনতা অর্জনে সাহায্য করা কর্তব্য বলিয়া মনে করিতেন। নানা কুব্যবস্থা, অব্যবস্থা আমাদের সমাজের জীবনকে দুর্বল ও অপটু করিয়াছে। এই কুব্যবস্থা ও অব্যবস্থার সংস্কার সাধন না করিলে আমরা রাজনীতিক জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারিব না। এই বিশ্বাসের বশে আমাদের এই পূর্বজগণ চিন্তা করিতেন, কর্ম করিতেন। যত দিন আমাদের সমাজ জীবন সংস্কৃত ও শোষিত না হইয়া সুগঠিত ও সুসমৃদ্ধ হইয়াছে, তত দিন ব্রিটিশ-শাসনের শৃঙ্খল আমাদের মানিয়া লইতে হইবে; না হইলে দেশে আসিবে অরাজকতা; উদ্যম জনগণ সভ্য জীবনের সকল আয়োজন ভাঙ্গিয়া কেলিবে। এবং এই কারণেই যখন বাংলাদেশে ১৯০৫ সনে আত্মবিভাগের বিকাশ দেখা দিল তখন এক দাদাভাই নৌরোজী ছাড়া কোন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিই ইহাকে অভিনন্দিত করিতে পারেন নাই। কিন্তু দাদাভাইয়ের স্বীকৃতি প্রমাণ করে যে আমাদের পূর্বজগণের মন নবজীবনের বিরোধী ছিল না, যদিও কর্মক্ষেত্রে তার প্রমাণ দিতে তাহা পরাজয় ছিল। এই দুর্বলতার মূল্য দিতে হইয়াছে তাঁহাদের বিগত চল্লিশ বৎসর ধরিয়া। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত স্বভাব-বিলম্বী গান্ধী-যুগের পরোষি জলে ডাসিয়া গেলেন। এইরূপ একটা বিরাট পরিবর্তন মানুষের মন সহজে স্বীকার করিয়া লইতে পারে না। চিমনলাল শিতলবাদ ছিলেন প্রসিদ্ধ আইন-ব্যবসায়ী, রাজনীতিক নেতৃত্ব গান্ধী-পূর্ব-যুগে ইহাদের হাতে সহজে চলিয়া আসিত। তিনি অনেক বৎসর ছিলেন বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন্স-চ্যান্সেলর; শিক্ষাক্ষেত্রে ব্রিটিশ শাসক-গোষ্ঠীর নবাবীর বিরোধী। তাঁহার রাজনীতিক জীবনযাত্রা সুর হয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে; সেই যুগের রাজনীতিক কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যে ইংরেজের সঙ্গে বিরোধ যেখানে অপরিহার্য হইয়া পড়িত সেখানে ফিরোজ শাহ মেহটা প্রভৃতি নেতৃবর্গ পশ্চাৎপদ হইতেন না। চিমনলাল শিতলবাদ এই কর্মপন্থায় বিশ্বাসী ছিলেন; যুগধর্ম্মানুযায়ী কোন কর্তব্য তিনি অবহেলা করেন নাই। গান্ধীজীর জীবনে সে যুগের কোন প্রভাব নাই, এমন কথাও নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না।

বাঙালী ছাত্রদের কথা

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

আজকাল প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায় যে, বাঙালী ছাত্রদের বিদ্যাবুদ্ধির দিক দিয়া অধঃপতন হইয়াছে, কেননা সর্ব-ভারতীয় পরীক্ষায় বাঙালী ছাত্রেরা আগেকার মত কৃতিত্ব দেখাইতে পারিতেছে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষকগণ নিশ্চয়ই বলিবেন যে, গত আট-দশ বৎসর হইতে বাঙালী সাধারণ ছাত্রদের বিদ্যাবুদ্ধির পরিমাণ মোটের উপর বেশ কমিয়াছে। যত দিন যাইতেছে পরীক্ষায় ছাত্রদের অযোগ্যতা ততই তীব্রতর ভাবে প্রকট হইতেছে। গড়ে ছাত্রদের বুদ্ধি যে কমিয়াছে তাহা পরীক্ষক মাঝেই স্বীকার করিবেন। ছাত্রদের বুদ্ধি কমিবার নানা কারণ বর্তমান; তাহার মধ্যে দেশের রাজনৈতিক অবস্থা, দুঃখ-কষ্ট, উপস্থিত শাসন-ব্যবস্থার উপর তীব্র অসন্তোষ ও নানা ঘটনা উপলক্ষে তাহার স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক প্রকাশ, ছাত্রদের নিজস্ব রাজনীতিক মতামত, দলাদলি, অছাত্রীয় ব্যাপারে তাহাদের উৎকট আগ্রহ ও খেলাধুলা, সিনেমা, থিয়েটার এবং সভা-সমিতিতে তাহাদের অত্যধিক সময়ক্ষেপ প্রভৃতি কারণ উল্লেখযোগ্য।

ছাত্র-আন্দোলন যে পথে গত কয়েক বৎসর হইতে চলিতে আরম্ভ হইয়াছে তাহাতে আমরা শিক্ষক-সম্প্রদায় কিঞ্চিৎ বিভ্রান্ত হইয়াছি। ছাত্রদের মধ্যে উৎসাহ বা উচ্ছ্বাসের আধিক্য হেতু তাহাদের সত্যকার মনের চিত্র ধানিকটা বিকৃত হইয়া আমাদের চক্ষে পড়া স্বাভাবিক। তাহাদের আন্দোলন সম্বন্ধে বিকৃত ধারণাও অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু যদি বলা যায়, ছাত্রেরা ঠিক পথে চলিতেছে না তাহা হইলে তাহাদের দিক হইতে তীব্রভাবে আপত্তি উঠিবে; অবশ্য আপত্তিটা যুক্তি নয় তাহা ছাত্রেরা স্বীকার না করিলেও তাহাদের শিক্ষকগণ আশা করি স্বীকার করিবেন। ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক উৎসাহিত হইয়াছে। তাহাদের অধিকার স্বীকার করা যে সম্ভব ও কলেজ কর্তৃপক্ষের উচিত তাহাদের সহিত আলোচনা করিয়া কাজ করা, এই ধরনের কথা অধ্যাপক সম্মেলনে মিঃ কেলাস একবার বলিয়াছেন। অত্যাশ্চর্য্যে ছাত্রদের এই অধিকার স্বীকার করায় কি না তাহার প্রশ্ন আজ তুলিব না। ছাত্রদের রাজনৈতিক জ্ঞান ও কর্মপন্থার সমালোচনাও করিতে চাহি না। পণ্ডিত জব্বাহরলাল নেহরুর মত বলিতেও চাহি না যে ছাত্রদের রাজনীতি লইয়া মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু ছাত্রেরা যে ছাত্রদের দিক দিয়া ব্যর্থ ও পঙ্গু

হইয়া যাইতেছে এবং বুদ্ধি ও মনোবৃত্তির দিক দিয়া দেশের প্রকৃত মঙ্গলকে তাহাদের চাপল্য ও অশুভ বুদ্ধি দিয়া ক্ষণ করিতেছে তাহা তাহাদের শিক্ষক হইয়া আমরা বলিতে বাধ্য হইতেছি। ছাত্রেরা রাজনীতি, আন্দোলন, দলাদলি, ষ্ট্রাইক প্রভৃতি বিষয়ে উৎসাহ দেখাইলেও বা ভারতীয় বিশ্বরাজনীতি সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ রাজনীতিজ্ঞদের সমতুল্যভাবে সমালোচনা করিলেও ছাত্রদের উন্নতি, বিদ্যালয়ের আগ্রহ প্রভৃতি বিষয়ে তাহারা সন্মিলিত ভাবে কতটুকু কাজ করিয়াছে তাহাই আমরা জানিতে চাই। সম্ভবতঃ দৃষ্টি-ভঙ্গীর পার্থক্যহেতু ছাত্রদের চক্ষু ও মন লইয়া আমরা তাহাদের বিচার করিতে পারি না। সেইজন্য ছাত্র-জীবন সম্বন্ধে ছাত্রদের মতামত উল্লেখ করিলে আশা করি অনেকটা নিরপেক্ষ ভাবে এদেশীয় ছাত্রদের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা বা ভয়ের কথা স্পষ্ট রূপে বুঝিতে পারিব।

একটি পরীক্ষায় কলেজ-জীবন সম্বন্ধে কলেজের ছাত্রদের লেখা প্রায় দুই শত হইতে আড়াই শত প্রবন্ধ পরীক্ষা করিবার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য বর্তমান লেখকের হইয়াছে। ছাত্রদের খাতা হইতে আমি অনেক অংশ লিখিয়া লইয়াছি, তাহা দ্বারা ছাত্রজীবনের আদর্শ, দোষ-গুণ প্রভৃতির একটি বেশ স্বন্দর চিত্র আঁকিতে পারা যায়। এই ছাত্রদের মধ্যে বুদ্ধিমান ও নির্দোষ, কংগ্রেসপন্থী কম্যুনিষ্ট ও সোশ্যালিষ্ট, দলীয় ও অদলীয়, সকল প্রকারের ছাত্র আছে। কেহ বা নিষ্ঠুর ভাবে ছাত্রদের রাজনীতি ও ষ্ট্রাইক-প্রীতিকে আক্রমণ করিয়াছে, কেহ বা ছাত্রজীবনের দলাদলি, চুরি, অসাধুতা প্রভৃতির কঠোর সমালোচনা করিয়াছে। কেহ বা অতুতপ্ত; একটিমাত্র ছাত্র জাতীয় জীবনে উচ্চ আদর্শের কথা অবতারণা করিয়াছে; কাহারও বা ছাত্রদের রাজনীতিতে বিরাট দানের প্রসঙ্গে বেশ একটু গর্ব্ববোধ আছে। মোটের উপর যে চিত্র পাইয়াছি তাহাতে মনে আশা জাগে না।

স্কুল হইতে কলেজে আসিয়া ছাত্রেরা বৃহত্তর জগতেরও স্বাধীনতার স্বাদ পায়। তাহাদের দায়িত্বও যে বাড়িয়া যায় তাহা অধিকাংশ ছাত্রই ভুলিয়া যায়। ছাত্রেরা নানা সঙ্গ ও দলে পড়িয়া তাহাদের পূর্ব্বজ্ঞিত ধারণা ত্যাগ করিতে থাকে। নানা মতবাদের ঘূর্ণিপাকে পড়িয়া অনেকেরই মাথা ঘুরিয়া যায়। স্কুলে শিক্ষকদের সাহচর্য্য ও সতর্ক দৃষ্টি কলেজের অধ্যাপকদের নিকট পাওয়া যায় না। অধ্যাপকেরা

ছাত্রদের অন্তরে প্রবেশ করিতে চাহেন না। তাঁহাদের কাজ বক্তৃতা দেওয়া, ছাত্রদের কাজ শুনিয়া যাওয়া। স্বতরাং ছাত্রেরা অনেকটা স্বাধীনতা পায় ও অবাস্তিত সংসর্গে পড়িয়া তাহার অপব্যবহার করে। ক্লাস পলায়ন একটা নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। অধ্যাপকদের সহিত ব্যবহার ঈষৎ অশিষ্ট। একটি ছাত্র বলিতেছে—

Now-a-days it is often seen that students do not talk politely with their professors. They try to oppose the very teaching of the professors.

অপর একটি ছাত্র বলিতেছে—

What struck me much was the behaviour of the students towards our Venerable teachers. Most of them are so rough in manners that it is shameful for the student community.

আর একটি ছাত্র বলিয়াছে—

College students cannot show unquestioned reverence to their professors and the principal and argue on points they do not know well.

সকল ছাত্রই অশিষ্টাচারী নহে। অধ্যাপকেরাও দোষ-শূন্য নহেন। একটি ছাত্র লিখিতেছে—

The professors do not mix with the students. They have superiority complex.

আবার সকল অধ্যাপকই ভাল শিক্ষক নহেন, একটি ছাত্রের ভাষায়—there are good scholars but bad teachers. এই কারণেই ছাত্রদের জীবন সম্পূর্ণ হইতে পায় না ও পাণ্ডিত্যের উপর প্রীতি গভীর হইতে পারে না। ছাত্র ও অধ্যাপকের মন রুচি আদর্শ একমুখী না হইলে শিক্ষা সার্থক হইতে পারে না। কলেজ, অধ্যাপক ও তাহাদের আবেষ্টনের উপর একটা মমত্ববোধ বা গর্ববোধ অতি অল্প ছাত্রেরই আছে। প্রতি কলেজের একটা ঐতিহ্য আছে, প্রতিবার যাহারা কলেজে ভর্তি হইতেছে তাহাদের সেই ঐতিহ্যের উপর অতুরাগ থাকা দর। বোধ হয় একটি মাত্র ছাত্র কলেজের মজলাকাজ্জা প্রকাশ করিয়াছে। ইহা যে ছাত্রদের একটা ধর্ম এ বোধ অল্প কোন ছাত্রের মধ্যে দেখিলাম না। একটি ছাত্র ভাল ছেলেদের সম্বন্ধে লিখিয়াছে—I find in the scholars deep curiosity and hankering for knowledge. তাহারা অধ্যাপকদের সহিত মিশিতে চায়, নানা প্রশ্ন উত্থাপন করে ও নতুন নতুন বই পড়িতে চায়।

অল্প ছাত্রই কলেজকে শিক্ষার স্থান হিসাবে গণ্য করে।* তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবনের ভিত্তি যে এখানে স্থাপিত হয় তাহার উল্লেখমাত্র পাই নাই। একটি ছাত্র বলিয়াছে, কলেজে—Thoughts and visions have been widened.” ছাত্রদের মন জুড়িয়া বসিয়াছে রাজনীতি ও তাহাকে অবলম্বন করিয়া দলাদলি। পরাধীন দেশের হৃদয়বান

তরুণরা যে দাসত্ব ও দারিদ্র্যের কথাকে সকলের উর্দ্ধে স্থান দিবে তাহা অবশ্যই স্বাভাবিক। কিন্তু কলেজে ‘ইউনিয়ন’ লইয়া ছাত্রদের যে দলাদলি সে সম্বন্ধে তাহাদের মত প্রাধিকারযোগ্য। ইউনিয়নের মধ্য দিয়া ছাত্রদের ঐক্য থাকে, তাহাদের চিন্তা দানা বাঁধিতে পায়, চিন্তা কার্যে রূপান্তরিত হইতে চায়। বক্তা, গায়ক, রসিক ও কবি যাহারা তাহারা এই ইউনিয়নের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিতে পারে ও ভবিষ্যতের রাজনৈতিক ইহার মধ্য দিয়াই রাষ্ট্রচালনার প্রথম পাঠ শিখিতে পারে। একটি ছাত্র লিখিতেছে—

There was a union of our college. I am ashamed of writing that it did nothing. Students can do many things. They have a fresh mind and a wide outlook. But all the energies of the young students, all their potentialities are frittered away without guidance. . . . We criticised political matters and the leaders foolishly. We did little to understand the things of the world. We did not study much. We only idled away time. I saw the students are divided into political and fanatical groups with no perfect idea of the situation. We are politically a dependent country hopelessly wasting our energy. . . . There are none to look after us. Those who look cannot either impress us or do only nominal duties.

আত্মস্বীকৃতি হিসাবে ইহার যথেষ্ট মূল্য আছে। সাধারণ ছাত্রেরা এতখানি বিনয় সহকারে আপনাদের ক্রটি স্বীকার করিতে চাহে না। নিজেদের সম্বন্ধে তাহাদের ধারণা বিশেষ উচ্চ। তাহারা নিজেদের কেবল দেশের আশাভরসা-স্থল হিসাবে গণ্য করে না, তাহারাও রাজনীতিতে পাকা রাজনীতিজ্ঞদের অপেক্ষা কম নহে এ ধারণাও কাহারও কাহারও আছে। এই ধারণার বশবর্তী হইয়া একটি ছাত্র লিখিয়াছে—

In the practical life of a country students play the most important part.

অপর একটি ছাত্র ছাত্রদের রাজনীতি সম্বন্ধে লিখিয়াছে—

I see that student politics is nothing but fanaticism. They are excited by some emotional speeches, face the lathi charges and firings and waste their lives.

অবশ্য এই ফ্যানাটিসিজমেই জাতি বড় হয়। যাহারা হাসিমুখে মৃত্যুবরণ করিতে পারে জাতির যৌবনকে গৌরবের মাণ্ডো তাহারাই ভূষিত করিতে পারিয়াছে। উপরে উক্ত ছাত্রটির কথাই ঠিক—There are none to look after us. এমন হীরার টুকরা ছাত্রদের ভাল নেতা নাই, তাই বেঘোরে তাহাদের প্রাণ যাইতেছে। তাহারা ঠিক পথে চলিতেছে না; উদার হৃদয়বৃত্তি তাহাদের দেশের

* যদি সে fanaticism ঠিক পথে ও ঠিক ভাবে চালিত হয়। নহিলে ফল সম্পূর্ণ বিপরীত হইয়া থাকে। ক্রুসেডের ইতিহাসে, চীন-দেশের প্রথম ছাত্র-আন্দোলনে, এবং অন্যান্য বহু ক্ষেত্রে তাহা দেখা গিয়াছে।—প্রঃ সঃ

* ইহাই বর্তমানে ছাত্রজীবনের ব্যর্থতার প্রধান কারণ।—প্রঃ সঃ

মুক্তির জন্ত ব্যাকুল করিলেও, মোটের উপর তাহারা অছাত্র-মূলক ব্যাপারে এতই মত্ত যে ছাত্রজীবনের দায়িত্ব বহন তাহারা করিতে পারে না। হজুগে পড়িয়া অনেকে মতিয়া উঠে; ইহারাই অধিকাংশ স্থলে আদর্শভ্রষ্ট হইয়া আপনাদের ও দলের ক্ষতি করিয়া বসে।

হুঃখের কথা ছাত্রেরা বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা চালিত হয় না; অনেকস্থলেই হৃদয়বেগ তাহাদের রাজনীতিক্ষেত্রে টানিয়া আনে। যাহারা রাজনীতি করিতে চাহে তাহাদের বাধা দিবার অধিকার আমার নাই কিন্তু তাহারা কেন নামমাত্র ছাত্র থাকিয়া যাইতে চায়? পড়াশুনার দায়িত্ব তাহারা বহিবে না, অপরাপর ছাত্রকে নিজেদের দলভুক্ত করিতে চায়। মনে হয় ছাত্রজীবনের দায়িত্বের উপর ইহাদের কোন মায়া মমতা বা অহুরাগ নাই। ছাত্র আন্দোলন সম্বন্ধে আমাদের আপত্তি এইখানে। খাওয়া-পরাহ ভাবনা পিতামাতার উপর ছাড়িয়া দিয়া বিমুগ্ধ দায়িত্বজ্ঞানহীন রাজনীতি চর্চা, ইহাই যদি ছাত্রেরা করিতে চায় তাহা হইলে স্কুল-কলেজ বন্ধ করিয়া দেওয়াই যুক্তি-সঙ্গত। পড়াশুনা না করায় অধিকাংশ ছাত্র পরীক্ষায় অকৃত-কার্য্য হয়, কলেজের পাঠ অল্পেতেই শেষ হয়, অনেকে নন-কলেজিয়েট হইয়া যায় ও শতকরা ২৫।৩০টি ছাত্র পরীক্ষায় পাস করিতে পারে। অপরাপর ছাত্রদের দয়া-দাক্ষিণ্যের সুযোগে পাস করা সম্ভব হয়।

কলেজ ইউনিয়ন সম্পর্কে একটি ছাত্র লিখিয়াছে—

It is the greatest place of party politics. There are different political parties. It is natural that it would create chaos and quarrel among the students. In my opinion, the Students' Union should be rectified (?) by selecting proper representatives who are free from fanatic and blind view about politics and free from communal passion . . . Party politics creates a bitter feeling. There are many leaders of different political parties who do not deserve to be called leaders. They do not lead the students but they take them astray. They rather disorganise the students. There should be one party.

এই ইউনিয়নের কাজ পর্য্যবসিত হইয়াছে ছাত্রদের সজ্জবদ্ধ করায় এবং দলাদলি ও ধর্মঘট চালানোতে। একটি ছাত্র লিখিতেছে—

The students seem to be well-disciplined, but mostly in the case of holding strikes only.

ষ্ট্রাইক বস্তুটি ছাত্রদের ব্রহ্মাস্ত্র। সকল দলই ষ্ট্রাইকের নামে এক হয় এবং কারণে ও অকারণে এই অস্ত্র ব্যবহৃত হয়। পড়াশুনা বন্ধ হয়, পথে পথে বিক্ষোভপ্রদর্শন চলে, কেহ কেহ সিনেমায় যায়। অবশ্য ছাত্র-সম্প্রদায় সময়-বিশেষে ষেদৃঢ়তা ও চরিত্রবল দেখাইয়াছে তাহা সত্যই বিস্ময়কর। যাহারা সত্যই চরিত্রহীন ও অপদার্থ তাহারা পুলিশ ও মিলিটারীর আগ্রহান্নকে তুচ্ছ করিয়া স্বাধীনতার দাবি এমন অকুণ্ঠ ভাবে ও দলাদলি বিসর্জন

দিয়া প্রকাশ করিতে পারিত না। যাহাদের মনোবল এত দৃঢ় তাহারা কেমন করিয়া নির্বোধের মত আত্ম-শক্তির অপব্যয় করে, দেশের মননশক্তিকে ক্ষুণ্ণ করে বা বুদ্ধিবৃত্তির অসম্মান করে তাহা ভাবিয়া উঠা যায় না। কিন্তু তাহাদের মানসিক অধঃপতন হইয়াছেই—তাহা না হইলে অসংযম, দলাদলি, মারামারি, ইত্যরতা কখনই প্রবল হইত না। ছাত্র-আন্দোলনের রন্ধ্রে শনি ঢুকিয়াছে। ছাত্রেরা দলগত রাজনীতিকদের আওতা কাটাইয়া উঠুক ইহাই আমরা চাই। তাহাদের মধ্যে কেহ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্ত ছাত্রদের অকাজে লাগাইতে পারিবে না। ছাত্রদের পড়াশুনা, চিন্তাশক্তি, সহনশীলতা অসম্ভব রকমে কমিয়াছে। বৎসরের মধ্যে কারণে-অকারণে মাসাধিককাল ধর্মঘট করিলে ইহা হইতে বাধ্য। ছাত্র হইয়া এ কার্য্য করা অবশ্যই গর্হিত। একটি ছাত্র ধর্মঘট সম্বন্ধে লিখিতেছে—

But the first thing that I consider to be the most hard obstacle in the path of attending lectures is the continual strikes. The students may strike for their grievances against the educational authorities. But such cause is one in a thousand, students' strikes are often political strikes, in sympathy for the labour movement. But these were so continual that the same thing happened day after day, for which every student's study was obstructed. It is not a surprise that 30 per cent of the students come out successful in a university examination when we consider these things as strikes.

এই ষ্ট্রাইক কি কাজে লাগানো হয়? একটি ছাত্র লিখিতেছে—

Whenever a professor went against us we all united together and urged the professor to give (?) our demand.

অপর একটি ছাত্র লিখিতেছে—

The notice for the examination was served. The students were quite unprepared for it. They made an application to the Principal requesting him to stop the examination. The Principal paid no heed to them. They made an arrangement for a strike and said that they would not appear in the examination. In this way they stopped the examination.

যাহারা ভালহোসী অভিযান করে, ভিয়েৎনাম দিবস প্রতিপালন করিতে গিয়া গুলি খায় তাহারা দল পাকাইয়া কত লজ্জাজনক ব্যাপার ঘটাইতে পারে ইহাই হইতেছে তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ছাত্রদের শুভবুদ্ধি কে হরণ করিয়াছে?

পড়াশুনার ব্যাপারে যাহাদের আগ্রহ এইরূপ তাহারা পরীক্ষায় পাস করে কেমন করিয়া? একটি ছাত্র ইহার উত্তর দিয়াছে—

In the examination most of the students pass. It is because though they read nothing they are very apt to copy from their friends.

এই ব্যাপার এত পরিচিত যে ইহার সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করা নিম্প্রয়োজন। প্রমথপ্রভু দুরূহ হইলেও ছাত্রেরা

বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের আদ্যশ্রদ্ধ পাকাইয়া তুলে। তাহাদের সম্মিলিত ঔক্যতোর কাছে শুধু কলিকাতা নহে, মফঃস্বলেও শিক্ষকগণ তটস্থ হইয়া থাকেন। তাহাদের আচরণ দেখিলে মনে হয় তাহাদিগকে উন্নয়নগামী করিবার জন্য যেন ইংরেজ গবর্ণমেন্ট বহু অর্থব্যয়ে প্রাণ করিয়া দক্ষ এজেন্টদের ছাত্রদলে ছাড়িয়া দিয়াছে। আজ ভারত-বর্ষ স্বাধীন; ছাত্রেরা তো আর বলিতে পারিবে না—Education can wait, Swaraj cannot ও সেই অজুহাতে দিনের পর দিন স্কুল বা কলেজ কামাই করিতে পারিবে না। অন্য সভ্যদেশের ছাত্রদের সমকক্ষ হইতে হইলে, ভারতের স্বাধীনতাকে সার্থক করিতে হইলে তাহাদের ভাল ছাত্র হইতে হইবে; রাজনীতিতে মাতিয়া আপনাদের ক্ষতি করিলে চলিবে না। একটি বিষয় বড় আশ্চর্য লাগে যে এতগুলি ছাত্রসম্মেলন থাকিতেও অন্যান্য আচরণকারী ছাত্রদের শাস্তি দিতে বা তাহাদের অসদ্ব্যবহার কার্যাবলী ব্যর্থ করিতে কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা রক্ষা করিতে প্রস্তাব পাস ছাড়া বড় একটা কিছু তাহারা আজও করিতে পারে নাই। এইজন্যই মনে হয় ছাত্রদের শুভ-বুদ্ধির মূলে শনি লাগিয়াছে তাহা না হইলে কেমন করিয়া ছাত্রনেতাদের সম্বন্ধে এমন কথা একটি ছাত্র লিখিতে পারে?—

The representatives of the Union are very selfish and they try to take money from the College Students' Funds.

একটি বিষয় অবাস্তব হইলেও দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি। ছাত্রদের হৃদয় উদার, তাহারা ইন্দো-নেশিয়া বা ভিয়েনামের জন্য কাঁদিয়া ভাসায়; ইহাতে আমাদের বলিবার কিছু নাই। কিন্তু মুসলিম লীগ গবর্ণমেন্ট কলিকাতা ও নোয়াখালিতে যে অত্যাচারের বন্যা বহাইয়া দিয়াছিল, ১০০ নং হারিসন রোডের মত কত শত ঘটনা তাহাদের আমলে ঘটয়াছিল কিন্তু এক সম্প্রদায়ের ছাত্রেরা ইহা লইয়া মাথা ঘামায় নাই। মিথ্যা উদারতার মোহে বাংলার ছাত্রসমাজ অনেকখানি নামিয়া গিয়াছে। মুসলিম লীগের অল্পস্থিত অত্যাচার সাম্প্রদায়িকতার প্রকাশ নয়; ইহার মূলে আছে ইংরেজ কুটনীতির চক্রান্ত। স্ত্রুয়াং ছাত্রদের প্রথম হইতেই লীগের দুষ্টবুদ্ধিকে আঘাত দেওয়া উচিত ছিল বলিয়া মনে করি। ইহাতে হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রসম্মেলন ভাঙিয়া দুই দলে বিভক্ত হইয়া ছাত্র-আন্দোলনকে দুর্বল করিত একথা মনে করা দূরদর্শিতার পরিচায়ক নহে। আমাদের দেশের দুঃখ বা সমস্যার সমাধান করিব আমরাই। দেশ ও সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আমাদের মনকে বিদেশীভাবাপন্ন ও বেদরদী করিল কে?

ছাত্রদের উচ্ছৃঙ্খলতাকে সকলে ক্ষমার চক্ষে দেখেন। তাহাদের শাস্তি দিবার কথা কেহ তুলেন না। ইহার পশ্চাতেও একটি গুঢ় উদ্দেশ্য আছে। নেতারা তাহাদের কিছু না বলার কারণ দর্শাইয়াছে একটি ছাত্র তাহার অন্তর ইংরেজীতে—Because of getting liberty no one tells them nothing. অসাধু উপায় দ্বারা সং উদ্দেশ্য লাভ করিতে গেলে যে মার খাইতে হয় নেতারা তাহা কেমন করিয়া যে ভুলিতে পারেন তাহা ভাবিয়া পাই না। ছাত্রদের হাতে অসম্মান নেতারা পাইতেছেন ও বোধ হয় আরও পাইবেন। একটি ছাত্র বলিয়াছে—They are misled by political parties. ইহা ছাত্রেরা যদি বুঝিয়া থাকে তবে আশার কথা। কিন্তু রাজনীতির স্বাদ ছাত্রদের দৃষ্টিভঙ্গী বিকৃত করিয়াছে বলিয়াই মনে হয়। পেশাদার রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে তাহারা যেন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে চায়। একটি ছাত্র স্পষ্টই বলিয়াছে—In practical life the students play the most important part. তাহারা কলেজে অধ্যাপক, অধ্যক্ষ প্রভৃতির বিরুদ্ধে ধর্মঘট করিয়া যে শক্তি অর্জন করিয়াছে দেশের নানা সমস্যায় তাহারই প্রয়োগ করিয়া বসে। অনেকে গবর্ণরের সহিত উল্লেখ করিয়াছে যে তাহারা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়িয়াছে, মরিয়াছে তবু পুলিশকে ভরায় নাই। তাহাদের ক্রটিও দেখিয়া ট্রাম কোম্পানীর ধর্মঘটীরা, অমৃতবাজার পত্রিকার ধর্মঘটীরা তাহাদের সহানুভূতি কামনা করিয়াছে। ছাত্রদের দেশ-বিদেশের অবস্থার সঙ্গে ওয়াকিবহাল হওয়া বাঞ্ছনীয়, কিন্তু তাই বলিয়া কারণে-অকারণে স্কুল-কলেজ বন্ধ করিয়া যত্রতত্র সহানুভূতি দেখাইতে যাওয়া সম্মীচীন নহে।

দোষের কথা অনেক বলিয়াছি। গুণের কথাও কিছু বলিতে হইবে। আজকালকার ছাত্রেরা ক্লাসের পড়াশুনার ভাল না হইলেও দেশ-বিদেশের খবর রাখে; বিশেষ করিয়া কম্যুনিষ্ট ছাত্রেরা এ বিষয়ে বিশেষ পরিপক্ব। তবে তাহাদের চিন্তা রেজিমেন্টাল ও একদেশদর্শী। ইংরেজীতে যাহাকে বলে ইণ্টেলেকচুয়াল কিউরিয়সিটি অর্থাৎ জানিবার আগ্রহ—তাহাদের যথেষ্ট আছে। অনেকে আবার দলের কর্মী; দেশের অনেক কথাই তাহারা হাতে-নাতে জানে। পড়াশুনায় ভাল ছাত্রও আছে, তাহারা কখনও রাজনীতির ধার দিয়াও যায় না। কলেজে অনেকে ভাল বক্তা ও তর্কিক। বাংলা-সাহিত্য সমিতির কথা একটি ছাত্র উল্লেখ করিয়াছে। অনেকে সেন্ট জুস এম্বুলেন্স কোরের সদস্য। তাহারা কলিকাতার গত প্রত্যক্ষ সংগ্রামে সেবাকার্য্য করিয়াছে। দেশের দাবি গবর্ণমেন্টের গোচর করিয়াছে, লাঠি ও গুলি খাইয়াছে; ভাল খেলোয়াড়ও

হইয়াছে। একটি মাত্র ছাত্র বিবেকানন্দের কথা উদ্ধৃত করিয়া ছাত্রদের উচ্চতর আদর্শের কথা তুলিয়াছে—

The duties of our boys are among the lowliest and the lost. What they need are muscles of iron and nerves of steel.

দেখিয়া আনন্দ হইল কয়েকটি ছাত্র কলেজের পড়াশুনা বিষয়ে সন্তুষ্ট নহে, তাহারা প্রচলিত রীতির পরিবর্তন চায়। একটি ছাত্র বলিয়াছে, প্রতি ক্লাসে ছাত্রের সংখ্যা অত্যধিক। ছাত্র ও অধ্যাপকদের মধ্যে কোন সম্পর্ক এই কারণেই গড়িয়া উঠিতে পায় না। এইজন্য ছাত্রের সংখ্যা কমাইতে হইবে। কলেজে পড়াশুনার ধারাও বদলাইতে হইবে। অধ্যাপকরা দেন কেবল বক্তৃতা, ছাত্রদের কাজ শোনা। ইহাতে পড়াশুনা ভাল হয় না। একটি ছাত্র বলিয়াছে—

The college is only for show, only to make oneself a bonafide student of the university and to make oneself able to appear in the university examination. But if anyone wants to learn he must not depend upon the college.

অনেকে কলেজ-পুস্তকাগারের দৈন্যের কথা বলিয়াছে।

মোটের উপর যাহা দেখিলাম তাহাতে বলা চলে যে বাঙালী ছাত্রদের ভাল অপেক্ষা মন্দই অধিকতর প্রকট। পরীক্ষার ফলাফলে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। স্বাধীনতা যতই নিকটবর্তী হইতেছে দলাদলি ততই প্রবল হইতেছে ও ছাত্রদের মন পড়াশুনা হইতে বিক্ষিপ্ত হইয়া দলগত রাজনীতি, কলেজের বাহিরের আন্দোলন, সিনেমা, সভা

প্রভৃতিতে ছড়াইয়া পড়িতেছে। জাতি ও জগৎ বুদ্ধির দিক দিয়া অধঃপতন ক্ষমা করিবে না। স্বাধীন ভারতে শরীর ও মনে সুস্থ সবল যুবক দরকার। ছাত্রেরা যাহাই করুক জাতির সেবায় যেন এই রূপ সুস্থ সবল বুদ্ধিমান, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, কর্মী, কবি, ভাবুক, রাজনীতিক, সেবক অপরিপাণ্ড পাওয়া যায়। তরুণ সময় সময় উন্ন্যাসগামী হয়, কিন্তু তাহার প্রাণের প্রাচুর্য, আদর্শের উপর শ্রদ্ধাই তাহাকে বাঁচায়। প্রাণের দিক দিয়া, শ্রদ্ধার দিক দিয়া, আদর্শনিষ্ঠার দিক দিয়া আমাদের তরুণরা মাথা তুলিয়া দাঁড়াক ইহাই আমাদের কাম্য। দলাদলি, নিকোঁথ আত্ম-সর্বস্বতা, অহমিকা, আদর্শহীনতা অনেক স্থলেই তাহাদের বিভ্রান্ত করে। দিগভ্রান্তরা দিশা খুঁজিয়া পাক, জাতির আশাকে পূর্ণ করিয়া তুলুক ইহাই কাম্য।*

* বর্তমান প্রবন্ধে যে বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে, সমগ্র ছাত্র সমাজের কল্যাণ এবং জাতি-গঠন প্রচেষ্টার সাফল্যের দিক হইতে তাহা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। শৃঙ্খলা, সংযম এবং শিক্ষার প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধা ছাত্রদের উন্নতির মূলে, কিন্তু দুঃখের বিষয়, ছাত্র সমাজে ইদানীং ইহার বড়ই অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। ছাত্রদের অভিভাবক, শিক্ষাদাতী, শিক্ষক সম্মেলন, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ-গণের এ সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তা করিবার সময় আসিয়াছে। আমরা এদিকে তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।—প্রবাসীর সম্পাদক।

বিদায়ী

শ্রী আশুতোষ সাহা

বিদায় জম্বুভূমি।

আমি চাহি নাই—কোল থেকে ঠেলে

ফেলে দিলে মোরে ভূমি।

ছিল বড় সাধ তব মাঠে খাটে,

বকুল-বিছানো পল্লীর বাটে

ষাপিব প্রবাস-ক্রান্ত জীবন।

তব পদরেণু চুমি'।

ভাবি নাই কোনো দিন—

তোমার কুঙ্গীরে পড়িবে না আর

আমার পায়ের চিন্।

• ভাবি নাই কভু—হয়ে গৃহহারা

সহলহীন যাযাবর-পারা

বেড়াইব ঘুরে—স্বপন-সৌধ

খুলিভলে হবে লীন।



দয়—বহুদূর থেকে ডাকে মোকে

তোমার কুঙ্গীরে

তোমার স্নিগ্ধ ঘন বটছায়া

আর কোনো দিন জুড়াবে না কায়া,

তব নদীজলে দগ্ধ জীবন

করিব না স্মৃতিভল।

কিরে কিরে শুধু চাই,—

তাড়াইয়া দিলে তবু মায়াবিনী,—

তব লাগি' ব্যথা পাই।

স্নিগ্ধ শীতল কুলায়ে তোমার

নীড়-বায়া পানী কিরিবে কি আর ?

সজ্জা-আধারে নিভুতে নীরবে

ভাবি আজ ব'লে তাই।

শাহীদ

ক্রীসাবিদ্রী ঘোষাল

মিসেস ওয়াগাকে সব সময়েই ভয়ে ভয়ে একটা অদ্ভুত অস্থির ভিতর দিন কাটাতে হ'ত।

ইয়ানেক যখনই বাইরে যেত, তিনি তাকে সময় মত করে ফেরার কথা মনে করিয়ে দিতে কখনই ভুলতেন না। ছেলেকে নিয়ে তাঁর দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না, তাই সব সময় খ্যান খ্যান করতেন, ছোর করতেন, এমন কি কোন সময় অভিমানও করে থাকতেন।

কোন দিন হয়ত রাত হয়ে যাচ্ছে, ইয়ানেক ফিরছে না, বিলম্বিত যুহুর্ন্তগুলো অসহ অত্যাচারের মত মায়ের বুকে বি'ধছে। প্রতিটা যুহুর্ন্ত একটা নতুন বিভীষিকার স্বপ্ন বয়ে আনছে। কি রকম যেন একটা অদ্ভুত ভয়ে মার মন অবশ হয়ে আসে, আতুল মাতৃহৃদয় সন্তানের কল্যাণ-কামনায় অদ্ভুত দেবতার পায়ে মাথা বুঁড়তে থাকে।

কিন্তু মায়ের এই যে দুশ্চিন্তা, এই যে ভয়, এটা মোটেই অসম্ভব ছিল না। বাস্তবিক ওয়ারস'র অবস্থা তখন এমন এক ভরে এসে পৌঁছেছে যে রাত্তার দু'জন পরিচিত লোকের দেখা হলে প্রথমেই মুখ দিয়ে বেরোয়, 'কিহে এখনও টর্কে আছ?' আর সাঁঝ-বাতির সময় পার হয়ে গেলেও যদি কেউ ঘরে ফিরে না আসে, তবে সে আর ফিরবে না, সকলেই নিশ্চিত হয়ে নেয়।

মিসেস ওয়াগার স্বামী ছিলেন একজন আইনব্যবসায়ী। লড়াই শুরু হওয়ার পরই তিনি একজন অফিসার হন আর দিন গুনতে থাকেন কবে তাঁর ডাক পড়বে। ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বরে অবশেষে ডাক এসে পড়ল। খবর পেয়ে সোঁকা আপিস থেকেই তাঁকে চলে যেতে হয়েছে, জী-পুত্রের কাছ থেকে বিদায় নেবার অবসরটুকুও তিনি পান নি।

যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর এক মাস পরেই না পরেই পোন্ডাও হয়েছে ঠিক যেন নরককুণ্ড। এই কুংসিত অবস্থাতিকে কেউ মেনে নিতে পারছে না, সকলেই মনে মনে ভাবছে একটা দুঃখগ্রন্থি কেটে গেল বলে। কিন্তু দুঃখের দিনগুলো একঘেয়ে ভাবেই চলেছে, এর যেন আর শেষ নেই। অন্ধকারে দিক-দিগন্ত ছেয়ে গেল, নতুন স্বর্ষ্যের রশ্মি-সম্পাতে কবে যে আবার দিগ্বিদিক উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে! মিসেস ওয়াগা বহু চেষ্টা করেও স্বামীর কোন খোঁজ পেলেন না।

সাবেক বাড়ীর রাতাটা আক্রমণের প্রথম চোটেই ভেঙে গেছে। মিসেস ওয়াগাকে উঠে আসতে হয়েছে ছোট একটা ফ্ল্যাটে। ফ্ল্যাটটাতে একটা মাত্র ঘর, তবে বেশ বড়—মা আর ছেলের পক্ষে যথেষ্টই। ঘরের দামী জিনিষপত্র একে একে সবই বিক্রি করে গেছে, একমাত্র লক্ষ্য কোনমতে বাঁচার

মত সংস্থান রাখা। মাঝে মাঝে গ্রামে কোন আত্মীয়স্বজন বা বন্ধুবান্ধবের বাড়ীতে মা বেড়াতে যেতেন আর ফেরার সময় বেশ কিছুদিনের মত খাবার-দাবার জোগাড় করে আনতেন। হঠাৎ এক এক সময় এই উল্লুপুত্রে তাঁর মনে প্রচণ্ড বিকার আসত, মনে মনে ঠিক করতেন এই শেষ, আর নয়।

ক্রমে ক্রমে তিনি নিজেকে নানাভাবে বঞ্চিত করতে শুরু করলেন। কম করে যেতেন যাতে সস্তায় বেশ কিছু দিন স্থায়ী হয়, ছেলেটির খাবার অভাব না ঘটে। এই ছেলেটিই তাঁর জীবনের একমাত্র অবলম্বন—কেবল এর জুড়েই তিনি কোন মতে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে চেষ্টা করতেন।

ক্রমে ইয়ানেকও নিজেদের অবস্থাটা বেশ ভালভাবেই বুঝতে পারলে। সঙ্গে সঙ্গে সে এমন ব্যবহার করতে লাগল যেন সে-ই বাড়ীর অভিভাবক। বয়সে যদিও সে নিতান্তই ছোট, সব ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাসে পড়ছে, কিন্তু তার আচরণে মনে হতে লাগল যেন সে একজন বৃদ্ধ, কত দামি তার মাথায়। কিন্তু এই আঠার বছরের ছেলেটির মাথায় যত প্ল্যান ছিল, সেগুলো কাছে লাগাবার আর কোন পথই রইল না। এমন কি পড়াশুনাটাও বন্ধ হয়ে গেল, চালাবার মত অর্থও ছিল না, আর তা ছাড়া জার্মানরা শহরের জলগুলো সব বন্ধও করে দিয়েছিল।

সেই সেপ্টেম্বর আক্রমণের পর থেকে সমস্ত ওয়ারস শহরটাই ব্যবসায় লেগে গেল—সঙ্গে সঙ্গে ইয়ানেকও তাতে যোগ দিলে। সিগারেট দিয়েই তার হাতে ধড়ি হ'ল। নতুন জীবন প্রথম প্রথম বেশ ভালই লাগতে লাগল, আর লাভটাও মন্দ হচ্ছিল না। খরচ-খরচা বাদ দিয়েও দিনে বেশ কিছু আয় হ'ত।

ইয়ানেকের মন এই দিকে গেছে, তা মা জানতেন না। এক দিন তিনি পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ একদিকে চোপ পড়তে পা যেন তাঁর মাটির সঙ্গে গেঁথে গেল। নিজের চোখকেও যেন তাঁর বিশ্বাস হচ্ছিল না! একটা গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে ইয়ানেক চীৎকার করে সিগারেট ফেরি করছে।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা ছেলে ঘরে ফিরতে, দুঃখে অভিমানে মা একেবারে ভেঙে পড়লেন; কেঁদে-কেঁদে তাঁর মন গলাতে চাইলেন, কিন্তু ছেলে নাছোড়বান্দা। সে মাঝে বার বার করে বোকাতে লাগল, কেন এতে দোষের কি আছে? তার পরিচিত কত ছেলেই ত এরকম কোন না কোন একটা কাজ করছে। তার মধ্যে কয়েক জন ত বেশ ভাল বংশের ছেলে। সবাই করতে পারে আর সেই বুকি কেবল বসে বসে থাকে, সংসারের দায় বুড়ো মায়ের ঘাড়ের ফেলে? তার পরে আবার

সে কাছের সঙ্গে সঙ্গে পড়াশুনাও করছে। প্রমাণ করার জুট তখন সে একটা বই থেকে ধানিকটা আওড়ে দিলে। যুদ্ধ শেষ হ'তে বেশী দেরি নেই, শীগ্গির ফিরে আসবে পোলেরা আর তাদের সঙ্গে মিজপক্ষ। আর—আর তারপরে মা দেখবেন ইয়ানেক কেমন করে চলে যায় ক্র্যাকাও বিশ্ব-বিদ্যালয়ে, আর সেখান থেকে অল্পকোর্টে। ইয়ানেক হেসে মাকে আদর করে বললে, “কিন্তু এখন আনন্দ করবার সময় নেই। এখন খালি কাজ আর কাজ।”

ইয়ানেক ক্রমেই একজন পাকা ব্যবসায়ী হয়ে উঠছে।

ওয়ারস'র প্রমিক ছেলেগুলোর সঙ্গে মিশে ইতিমধ্যেই আইনকে বেশ কীকি দিতে শুরু করেছে। সে আজকাল ক্র্যাকাও যাচ্ছে ভড় কার জুট, লুবলিনে তামাক-পাতার খোঁজে; এর মধ্যেই জিনিষপত্র বাছাই ব্যাপারে বেশ ওস্তাদ হয়ে উঠেছে। মাল কিনবার কীকি সে ট্যাক্স কীকি দিয়ে মাল চালান নিয়ে আসে। সে জানে একবার কোন রকমে ডেবলিন পার হতে পারলেই, তার মাল ছুনা লাভে বিক্রী হবে। জার্মান-গুলোর ঐখানেই ধানাতল্লাসীর যত কড়াকড়ি। ট্রেনের কামরাগুলোতে ত বটেই, মাল যাত্রীদের কাপড়-জামা খুলে দেখতেও কষ্টের করে না।

কখনো কখনো ইয়ানেকেরও দুর্দিন আসে। সেদিন যখন সে ঘরে কেয়ে, তার চোখের কোণে কালি, ভারি মুখ, সর্দীয়ে আঘাতের চিহ্ন—রক্ষ মেজাজ থাকে ঠিক রাজির মত ধমধমে। তবে এ রকম ঘটে কদাচিৎ।

কিছু দিনের মধ্যেই মিসেস ওয়াগা, তাঁর ছেলের জীবন-যাত্রা সম্বন্ধে সন্দেহাভুল হয়ে উঠলেন। কেন না ছেলেরা এ বয়সে করতে পারে না এমন কাজ নেই। বিশেষ করে তাঁর ছেলে নানা ধরণের লোকের সঙ্গে মিশছে, আইনকে কীকি দিয়ে ব্যবসা করছে, যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে; মার কেবলই আশঙ্কা পাছে ছেলে কুসঙ্গে মিশে ধারাপ হয়ে যায়।

বহু দিন ধরেই ইয়ানেক সন্ধ্যাবেলায় ঠিক সময়মত বাড়ীতে ফিরছিল, কিন্তু মা লক্ষ্য করতে লাগলেন গত কয়েক দিন যাবৎ আবার সে গোলমাল করছে—প্রায়ই আটটার কারফিউর ঘণ্টা পড়ে গেলে তবে সে বাড়ী ফেরে। গ্রীষ্ম কালে কারফিউর সময় যখন ছিল এগারটা তখন সে ফিরত এগারটার পরে। কোন কোন রাতে হয়তো ফিরলই না। মা জানতেন কাজ উপলক্ষে শহরের বাইরে যাবার প্রয়োজন তার নেই। আর যখন সত্যি সত্যি প্রয়োজন হ'ত তখন প্রতি-বারেই সে মাকে জানিয়ে যেত, সাবধান করে যেত যে রাতে সে বাড়ী ফিরবে না; কিন্তু কি যে করবে সে সম্বন্ধে কোন রকম উচ্চবাচ্চ্য করত না।

এক দিন সন্ধ্যায় হঠাৎ ইয়ানেক ফিরে এল কি রকম একটা মানসিক বিপর্যয় অবস্থায়। আড়চোখে একবার

মায়ের দিকে চেয়ে সে আনমনে সারা ঘরে পায়চারি করতে শুরু করলে। হাঁটছে, আর মাঝে মাঝে স্পোর্টস্ ক্রিকেটের পকেটটা হাঁটকাচ্ছে। ভুতে যাবার আগে জামা কাপড়গুলো যথারীতি একটা চেয়ারের উপর ঝুলে রাধলে, কিন্তু চেয়ারটা টেনে একেবারে বিছানার পাশে নিয়ে এল। তার পর মা কাগজপত্র নাড়াচাড়া বসবসানি শব্দ শুনতে পেলেন।

আমার কাছ থেকে ও কি যেন জুকেছে—তিনি ভাবলেন। মায়ের মন স্বভাবতই ব্যথাতুর হয়ে উঠল। প্রথমে সন্দেহ, তার পরেই সেটা অতিমানে রূপান্তরিত হয়ে অশ্রু-রূপে ঝরে পড়তে লাগল।

সন্তানের অন্তত আশঙ্কায় মায়ের মন সর্দুদাই ক্লিষ্ট থাকে, কিন্তু মিসেস ওয়াগা তা কেবল অলীক কল্পনা নিয়েই থাকেন নি। এ কথা একান্ত সত্য যে জার্মানরা চৌকবার পর থেকেই ওয়ারস'র স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ধ্বংস হয়ে গেছে। সংসার ভেঙে গেছে, অগণিত গৃহহারা নরনারী পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তরুণেরা অভিভাবকহীন, স্বাভাবিক জীবনযাত্রা থেকে ছিটকে পড়েছে। স্কুল-কলেজ নেই—পথে ঘাটে জিনিষপত্র কেনা-বেচা চলে, তার ওপরে নানা রকম দলবলের কথাও লোকের মুখে শোনা যায়। মিসেস ওয়াগার কানেও ত কত কথাই এসেছে, তাই একমাত্র সন্তানের জুট তাঁর এত ভয়।

ইয়ানেক ঘুমিয়ে পড়লে মা টেবিলের পাশের আলোটার এক দিক আড়াল করে সেলাই নিয়ে বসলেন। ঘুম কিছুতেই আসছে না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যেতে লাগল, মা শুদ্ধ হয়ে বসে আছেন। মনের মধ্যে কে যেন অবিরাম ফিস্ ফিস্ ক'রে বলতে লাগল, তোমার ছেলে কি করতে চায় খুঁজে বার করো, তুমি মা, তোমার ছেলে কি করেছে তোমার জানবার অধিকার আছে।

মা প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগলেন নিজেকে দমন করতে। এত কাল স্বামী বা ছেলের কোন কাজের প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করা বা সে সম্বন্ধে কোন খোঁজখবর নেওয়ারকে তিনি বিশ্বাসঘাতকতার সামিল মনে করতেন। পরস্পরের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও নির্ভরতাকেই তিনি স্বামী-স্ত্রী, মা-ছেলের মধ্যে একমাত্র সম্বন্ধ বলে জানতেন। কিন্তু এখন পরম দুঃসময়, হয় ত তাঁর সন্তানের সামনে সমূহ বিপদ, তিনি মা—তাকে একটা কিছু প্রতিকার করতেই হবে।

ঘীরে ঘীরে তিনি উঠলেন, অনিচ্ছুক পদক্ষেপে সন্তানের শিয়রে গিয়ে ঠাড়ালেন। কহল মুড়ি দিয়ে ছেলে নিঃশাড়ে ঘুমোচ্ছে। মা নিঃশঙ্কে ইয়ানেকের কোটের পকেটে হাত দিলেন, কম্পান আঁতুল দিয়ে হাতড়াতে হাতড়াতে ঠাণ্ডা বাঁকা একটা কাঠের হাতল হাতে ঠেকল। হাতলটার মাথায় একটা ছোট রিং। অজানা আশঙ্কায় তাঁর সমস্ত শরীর শিউরে উঠল। তার পর কাগজের গোছাটা ধরলেন।

মনের মধ্যে কে যেন ছুপি ছুপি বলে চলছে—বাই
ঘটক না কেন ভোমাকে জানতেই হবে ব্যাপারটা কি ?
কাঠের হাতলটা তিনি শক্ত করে চেপে বরলেন...। কাঁপতে
কাঁপতে কোন রকমে টেবিলের কাছে এসে জিনিষটা ধুলে
দেখলেন। প্রদীপের আলোর ঝক ঝক করে উঠল একটা
কোন্ট রিভলবার আর এক ভাড়া কাগজ। আতঙ্কে
মাঝের শরীরের সমস্ত শক্তি অবলুপ্ত হয়ে গেছে। কয়েক
যুহুর্কের ক্ষণ তিনি আচ্ছন্নের মত বসে রইলেন। অবসাদগ্রস্ত
মন কোন রকম চিন্তা করতেও চাইলে না। টেবিলের ওপর
ছন্দ রঙের কাগজের ভাড়াটার দিকে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে
রইল আর কল্পিত আত্মলগ্নো দড়ির বাধন খুলতে চেষ্টা করে
চলল। অতি ধীরে ধীরে তাঁর মানসিক জড়তা একটু একটু
করে কমে আসতে লাগল আর সঙ্গে সঙ্গে ময়লা শক্ত
কাগজের ওপরকার লেখাগুলো ফুটে উঠতে লাগল :—

“পোল্যাণ্ড মরে নি।”—পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতাকামীদের
মুখপত্র (সাপ্তাহিক)।

ভোরের আলো না কোটা পর্যন্ত যা সেই ছাপা লাইন-
গুলোর সামনে শুক হয়ে বসে রইলেন—কালো কালো অক্ষর-
গুলো যেন তাঁর চোখের সামনে নেচে বেড়াচ্ছে। বার বার
করে লেখাটা পড়ছেন, কিন্তু তার অর্থের কোন পরিবর্তন ঘটছে
না। টোঁট ছুটি ছুপিছুপি অস্পষ্ট হয়ে উচ্চারণ করছে, প্রথম লাইন
ক’টাতেই দৃষ্টিটা আটকে রয়েছে।...সেদিন সকালে ইয়ানেকের
যখন ঘুম ভাঙল তখন সে ঘুণাক্ষরেও জানতে পারলে না
মাঝের বুকের মাঝে কতবড় গোপন কথা চাপা রয়েছে।

...ইয়ানেককে আমি বহুদিন ধরেই জানতাম, সে ছিল
আমার ছাত্র। ১৯৩৯-এর দশকের পরে তার সঙ্গে বহুবার
আমার দেখাদাফাং হয়েছে, নানা কারণে নানা পারিপার্শ্বিক।
তাকে আমার ভাবি ভাল লাগত। আমাদের মধ্যে একটা
বিশ্বাস ও বন্ধুত্বের বন্ধন ছিল।

বেআইনী ধবরের কাগজ বিতরণকারী বলে তার মনে
বেশ একটা গর্ব ছিল—বিশেষ করে যখন একটা কোন্ট
রিভলবার সঙ্গে নিয়ে চলাফেরা করত। আমার সাবধান-
বাণী শুনে সামান্য একটু হাসত মাত্র। আমি যখন বলতাম
যে সৈনিক-জীবনে সাবধানতাই হচ্ছে সর্বপ্রধান শিক্ষা, তখন
সে কোন্টটাকে নিয়ে স্নেহভরে একটু নাড়াচাড়া করে বলত
সে তীতু নয় আর এটা সঙ্গে থাকতে ধরা সে কিছুতেই পড়বে
না। সে নেহাত শিষ্ট নয়।

তবুও এই নীলচোখ লম্বা হুজী ছেলেটিকে দেখলে নিতান্ত
শিষ্ট বলেই মনে হ’ত। শিশুর মতই সরল অকপট বিশ্বাসে
সে সবকিছুকে গ্রহণ করত। তার দেশবাসী যে আসন্ন
স্বাধীনতা-সংগ্রামে জয়যুক্ত হবেই তাতে তার বিশ্বাস সংশয়
ছিল না। তার দৃঢ় বিশ্বাসের কাছে আমি নিজেও কত সময়

ভেসে গিয়েছি। ওর সঙ্গে এসব কথা নিয়ে আলোচনা করার
পর ওর বিশ্বাসের শক্তি যেন আমার প্রাণেও সঞ্চারিত
হয়ে যেত, নববলে মূতন উত্তমে আমি সজীবিত হয়ে উঠতাম।

সবকিছুর ভেতরেই সে আশার আলো দেখতে পেত,
যেখানে মিত্রপক্ষ চরম পরাধর্যকে বরণ করে নিত সেখানে
ভাবত মিত্রপক্ষ শত্রুদের জন্তে জাল পাতছে মাত্র। ওর
নিকট ধারণা কিছু নেই। ক্ষমতা থাকলে সিক্রেস্কির নামের
আগে ও নিশ্চয়ই ‘সেক্ট’ বসাত। পোলিশ কমান্ডার-ইন-
চীফের মতলবের দুটিনাটি সব ওর জানা, যেন ও তাঁর
সহকারী। পোল্যাণ্ডের সৈন্তরা কোথায় কোথায় যুদ্ধ করছে,
রেজিমেন্ট সংখ্যা কত, তাদের জয় আর বিশেষ করে পোলিশ
নোসেনা ও বিমানবহরের কথা সব ওর কর্ণে।

আমি যদি কখনো ওর সংবাদে সত্যতায় বিশ্বাস সন্দেহ
প্রকাশ করেছি ত, ও তখনই একজন কড়া ভূগোলের মাস্টারের
মত বলত—একখানা মানচিত্র কিহন, কিন্তু পৃথিবীর মানচিত্র
হওয়া চাই বুঝলেন। একখানা পৃথিবীর মানচিত্র—তা হলোই
বুঝতে পারবেন আমাদের সৈন্তরা কোথায় কি করছে। ব্যস,
একদিন চা খেতে খেতে ইয়ানেক কিস্ কিস্ করে আমাকে
বললে, আমার মনে হয় আপনি আমাদের মিত্রপক্ষীয় কাউকে
কখনও দেখেন নি, না? যেন ও নিজে কত জনকে
দেখেছে।

বসন্তের প্রথম দিকে এক দিন যে ব্যাপারটা ঘটল, তার
স্মৃতি আজও আমার মনে জলজল করছে। মনে হচ্ছে এই তো
সবে সেদিনের কথা। স্বর্ধ্য উঠেছে, ভাড়া বাতীগুলোর
জালালার সার্শিতে ধাক্কা খেয়ে স্বর্ষ্যের আলো চারদিকে
ঠিক করে পড়ছে, বরফ গলতে শুরু করেছে। রাস্তার দু’পাশে
গাছগুলো সারি সারি দাঁড়িয়ে, রক্ষ নিপাত্ত ডালপালায় ঠিক
ভিক্ষকের মত রিক্ত। এক ঝাঁক চড়ুই পাখী ডালে ডালে
কিচিরমিচির করে বেড়াচ্ছে। কুরাসা কেটে গেছে, মাহু-
গুলোকেও অনেকটা সজীব দেখাচ্ছে, তাদের চলাফেরায়
যেন একটু প্রাণসঞ্চার হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। শীতের
চেয়ে ধারণা সময় আর কি আছে।

আমি তখন পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম ইয়ানেকের সঙ্গে দেখা
করতে, রেল-স্টেশনের কাছে একটা নির্জন কফিনার
আমাদের দেখা হবার কথা। কতকগুলো বেআইনী ধবরের
কাগজ নিয়ে আমাকে প্রদেশের বাইরে চলে যেতে হবে।
সব বন্দোবস্ত করা ছিল, কেবলমাত্র ইয়ানেকের কাছ থেকে
আমাকে জিনিষগুলো সংগ্রহ করে নিতে হবে।

হঠাৎ রাস্তার ওলির শব্দ শোনা গেল। পথচারীরা সকলে
ছুটল দোকান বা অটো কোথাও আশ্রয় নিতে। যুহুর্কের মধ্যে
রাস্তা একেবারে ফাঁক। নিশ্চয় কোন অঞ্চল ঘেরাও করে
প্রেরণ করা হচ্ছে, অথবা আমাদের শহরের নব আগন্তুকদের
রঙীন নেশার কোন একটা ঝোঁল।

পড়ীর হুশিড়া আমাকে আচ্ছন্ন করে দিলে। আমার অন্তর বলে দিলে কোন মাল্লবকে গুলি করা হ'ল। আমি কোরে পা চালালাম, অবশেষে প্রায় এক রকম ছুটতে ছুটতেই কফিখানার কাছে পৌঁছলাম। সেখানে ইতিমধ্যেই বেশ ভিড় জমে গেছে। ভেতর থেকে শোনা যাচ্ছে চিংকার, আদেশ—জার্মান পুলিশও চোখে পড়ল।

আমি সোজা ভিড় তেলে এসিয়ে গেলাম। জার্মান পুলিশকে -চেষ্টা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ব্যাপার কি এখানে? গোলমাল কিসের?' বর্বরটা একটা হাত দিয়ে মাটির দিকে ইঙ্গিত করে জার্মান ভাষায় জবাব দিলে, 'দেখ, এই হতভাগাটাকে দেখ।'

সিঁড়ির উপরে লম্বা হয়ে পড়ে আছে ইয়ানেকের দেহ। কাগজপত্রগুলো কাদায় মাখামাখি, এক হাতে শক্ত করে ধরা রয়েছে কোন্ট রিভলবারটা। পা দুটো পর থর করে কাঁপছে, মাথা থেকে রক্তের ধারার মুখচোখ ভেসে যাচ্ছে। খুব অল্পটুকু স্বরে ঠোট দুটো যেন কি উচ্চারণ করছে, মুখের হ'পাশে ফেনা, চোখের তারা স্থির।

মুখের ওপর খুঁকে পড়ে মাথার লাল দাগটার ওপর আঙুল আঙুল হাত রেখে কিস্ কিস্ করে বলতে লাগলাম, ইয়ানেক বল, কি করে এ ঘটল, বল ইয়ানেক, ...ইয়ানেক।

উঠে এস—একটা জার্মান সালী চিংকার করে উঠল।

আমি লাফিয়ে উঠলাম, ঠিক যেন একটা কুকুরকে কেউ লাঠি দিয়ে ঝোঁটা মেরেছে। তীক্ষ্ণ চিংকারটা যেন আমার কান কেটে কেটে বসে যাচ্ছে। উঠে আঙুল আঙুল জনতার ভিড়ে মিশে গেলাম। আমি যেন আর সে মাহুষ নই। কিছু ভাবতে পারছি না, কিছু বুঝতেও পারছি না। দেহটাকে কোনমতে টানতে টানতে লক্ষ্যহীন ভাবে পথ চলতে লাগলাম—চলৎ-শক্তিহীন একজন স্থবিরের মত। আমার আর কোন প্রয়োজন নেই, কারুর সঙ্গে দেখা করতে হবে না।

মিসেস ওয়াভা হয়তো তাঁর ছেলের অপেক্ষায় রাত বেগে বসে আছেন।*

* Majewski-র *Yanek the Distributor*-এর অনুবাদ

সত্য চেয়ে বড়

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

কাঠবিড়ালেতে সাগর বেঁধেছে রামায়ণে লেশা নাই
তাতে কিবা আসে যায়?
কে বা তা দেখিতে চায়?
চিরদিন ধরে আমরা সবাই বিশ্বাস করি তাই।

রামের হাতের ছাপ গায়ের তার—আদরের ছাপ আঁধা,
এখনো মুছেনি কই?
হাসি—বিস্মিত হই
রামচন্দ্রের সোহাগের বিনা কেমনে মুছিবো তাহা?

হয় ত অজানা সদয় হৃদয় ভক্ত বা কোনো কবি
রয়েছে এ কথা ভাই,
সন্দেহ তাতে নাই
হৃদয় মহতে এক করে—এক একেছে মধুর জ্বি।

বিরিচি সাগরবধন কোথা? কোথা দুর্বল প্রাণী?
আকাজকা তার কত—
আপন সাধ্যমত,
পুষ্ট করেছে পরিকল্পনা—ক্ষীণ সাহায্য দানি।

হৃদয় হ'লেও মহাপুরুষের লেহেছে আশীর্বাদ,
পেয়েছে আদর তার,
বাকি পেতে কিবা আর?
অনুতোৎসবে পংক্তিভোজনে সেও পড়ে নাই বাদ।

মুগের মুগের বালক-বালিকা ওই কাহিনীর লাসি
কাঠবিড়ালের প্রতি
সদয় সকলে অতি,
রামের হাতের ছাপ খুঁজে দেখে শিশু হিয়া অহুসাসি।

হয় ত নেহাত কল্পনা উহা—সত্য নাহিক কিছু,
তবু বিশ্বাস করি,
তবু স্মৃতি পাই স্মরি
জীবের দয়া নামে রুচিবান তাঁরা—পদে মাথা করি নীহ।

মাল্লবকে যাঁহা মহত্ত্ব লয়—ভগবানে করে প্রিয়,
সে কাহিনী রচা যারা
কবি ও সাধক তারা
তাঁরা যা বলেন সত্যের চেয়ে বড় বেশী বরষিয়।

বাল্য-প্রতিভা

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

জগতের বিস্ময়জনক সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের মধ্যে মানবজাতি বুদ্ধিবলে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে বটে, কিন্তু মাছুষে মাছুষেও বুদ্ধিবৃত্তির তারতম্য পরিস্ফুট করিয়া বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইতে হয়। পৃথিবীর নানাদেশীয় সভ্যসমাজে যুগে যুগে এক একজন অসাধারণ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়া অদ্ভুত প্রতিভাধারা সকলকে চমৎকৃত করিয়া গিয়াছেন। ভারতবর্ষেও অতি প্রাচীনকাল হইতে বহু মহাপুরুষের উদ্ভব হইয়াছে যাহাদের প্রতিভার বিচিত্র সৃষ্টি অতিশৈশবেই খট্টয়াছিল। পৌরাণিক যুগে অদ্বিতীয় পুত্র ব্রহ্মপতি “শিশু” কালেই অধ্যাপনা আরম্ভ করেন—ছাত্রদের মধ্যে পিতৃব্য, পিতৃব্যপুত্র প্রভৃতি বয়স্ক আত্মীয়সংগকেও “পুত্রকাঃ” বলিয়া সম্বোধন করায় তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইয়া দেবতাদের নিকট অহুযোগ করেন। দেবতারা একবাক্যে বলিলেন, “শিশু ঠিকই সম্বোধন করিয়াছে” (মহুসংহিতা, ২য় অধ্যায়, ১৫১-২ শ্লোক)। শিশু-প্রতিভার চূড়ান্ত উদাহরণ অপ্রসিদ্ধ অষ্টাবক্র যুনি। তিনি মাতৃগর্ভে থাকি অবস্থায়ই সাক্ষবেদ ও সমস্ত শাস্ত্র পিতার পাঠ শুনিয়া শিখিয়া ফেলেন এবং এক দিন মাতৃগর্ভ হইতেই অধ্যয়নরত পিতাকে মাতার প্রতি উপেক্ষাভাবের জন্ত ভৎসনা করিতে যাওয়ার পিতার অস্তিসম্পাতে অষ্টাবক্র হইয়া ভূমিষ্ঠ হন। দশ বৎসর বয়সে জমক রাজার যজ্ঞসভায় অষ্টাবক্রের বিস্ময়জনক বাদিজয় বৃত্তান্ত মহাভারতে পাওয়া যায় (বনপর্ব, ১৩২-৪ অ'ায়)। রাজা এক স্থানে তাঁহাকে “দেবময়” বলিয়া সম্বোধন করেন।

ঐতিহাসিক যুগে শিশু-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ শঙ্করাচার্য্য। আনন্দলহরীর ৭৬ শ্লোকে শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন, জগবতীর স্তন্যপান করিয়া “ঐবিড়শিশু” অপূর্ব কবিত্বশক্তি লাভ করেন। দীক্ষাকারদের মধ্যে এই ঐবিড়শিশু স্বয়ং শঙ্করাচার্য্য। কৈবল্যাশ্রমযতি-রচিত “সৌভাগ্যবর্জিনী” দীক্ষা হইতে এই “চিরন্তনাখ্যানের” সারাংশ উদ্ধৃত হইল। শঙ্করাচার্য্যের পরমেশ্বরীভক্ত পিতা প্রতিদিন প্রাতঃকালে এক মন্দিরে যাইয়া ছুঙ্করাদেবীকে স্নান করাইয়া পূজা সারিয়া অবশিষ্ট কিঞ্চিৎ ছুঙ্কর স্নানর পুত্রকে বাইতে দিভেন। পুত্রের মনে হইত, দেবী স্বয়ংই ছুঙ্কর পান করেন, পীতাম্বশিষ্ট ছুঙ্কর পিতা তাঁহাকে দেন। এক দিন পিতার অহুপস্থিতিতে অশক্ত মাতার নির্দেশে বালক শঙ্করই ছুঙ্কর লইয়া মন্দিরে যান এবং জগবতীর সম্মুখে রাখিয়া বলেন, “ধাও।” বিলম্ব দেখিয়া বালক কাদিয়া উঠিলে জগবতী দয়াবশতঃ আবির্ভূত হইয়া ছুঙ্কর সবটা পান করেন। পরে পাত্র শূণ্য দেখিয়া বালক আবার কাদিয়া উঠিলে জগবতী স্বয়ং কোলে লইয়া তাঁহাকে শুভ-দান করেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহাতে সর্ববিদ্যার সৃষ্টি হয়

(“ততো জগদধিকার্যঃ স্তন্যপানেন সর্ববিদ্যা তদানীমেব সৃষ্টিকাং জাতা”—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৪০৭ সংখ্যক সংস্কৃত পুথির ৭৪-৫ পত্র দ্রষ্টব্য)।

বাংলাদেশেও যুগে যুগে এইরূপ অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন “দেবাংশ” মহাপুরুষ (prodigy) আবির্ভূত হইয়াছেন। তাঁহাদের নাম বিস্মৃতির অন্ধকারে বিদূষপ্রায় হইয়া যাইতেছে। জাতীয় জীবনে অসামান্য প্রতিভার সঞ্চিত স্মৃতিরক্ষা হওয়া কর্তব্য। আমরা বর্তমান প্রবন্ধে ৭ জন বাঙালী দেবাংশের বিবরণ সংকলন করিয়া প্রকাশ করিতেছি। আশা করি অজিহ্ব মনীষিগণ এই জাতীয় বহুতর প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তির নামোচ্চারণ করিয়া বাঙালীর পূর্বতন গৌরবোজ্জ্বল চিত্র আবার নুতন করিয়া প্রকাশ করিবেন।

১। রঘুনাথ শিরোমণি (খ্রিঃ ১৫শ শতাব্দী)

রঘুনাথের কিম্বদন্তীমূলক জীবনীর ঘটনা বাংলা-সাহিত্যে অনেকটা প্রচারলাভ করিয়াছে বটে, কিন্তু বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে তাঁহার কথা এখনও গবেষিত হয় নাই। অথচ বিগত সহস্র বৎসর মধ্যে বাংলাদেশে রঘুনাথ শিরোমণির ন্যায় ভাগ্যবান মহাপণ্ডিত আর কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই। কারণ, তাঁহার প্রধান গ্রন্থ “অমৃতমণ্ডিত” অধ্য ৪০০ বৎসর যাবৎ ভারতবর্ষের সর্বত্র—আসাম হইতে গুজরাট এবং কাশ্মীর হইতে কোচীন পর্যন্ত—ভারতীয় দর্শনের উচ্চতম বিদ্যারতন-সমূহে হ্রস্বতম আকরগ্রন্থরূপে প্রতিভাশালী ছাত্রের বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা পরিমাপ করিয়া আসিতেছে। ইংরেজ-অধিকারের প্রারম্ভকালেও ক্ষুধার বুদ্ধির এই বিচিত্র বিলাসের মূল উৎস নবদ্বীপে অধিষ্ঠিত ছিল—কবি ভারতচন্দ্রের ভাষায় নবদ্বীপ তখন “ভারতীর রাজধানী, ক্ষিতির প্রদীপ”। শিরোমণির “দ্বিক-দীপিকা” দীর্ঘিগ্রন্থই এই সারস্বত উৎসের পরম উপাদান। শিরোমণির বিষয়ে বহুতর্য্য অন্যান্য লিখিয়াছি (সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৪৯, পৃ. ১১৭-২৬; ১৩৫০, পৃ. ৬-১৬; ১৩৫৩, পৃ. ১-৩)। তিনি রাষ্ট্রীয় শ্রেষ্ঠের ভ্রাতৃপুত্র মূলপাণির দৌহিত্র ছিলেন, মহাপ্রভুর এক পুরুষ পূর্ববর্তী ছিলেন এবং একমাত্র বাঙ্গালদেব সার্বভৌমের ছাত্র ছিলেন। তিনি অধ্যয়নার্থ মিথিলায় যান নাই এবং মহাপ্রভুর সহাধ্যায়ী ছিলেন না। তাঁহার এক চক্ষু নষ্ট ছিল।

তাঁহার বাল্যপ্রতিভার নিদর্শন তিনটি উপাখ্যানে চির-প্রসিদ্ধ আছে। (১) নবদ্বীপে বাঙ্গালদেব সার্বভৌমের টৌলের নিকটে (মূলপাণি মহামহোপাধ্যায়ের) বিধবা কন্যা জগবতী পাঁচ বৎসরের শিশু লইয়া বাস করিত—সার্বভৌম তাঁহাকে “ভগী” বলিয়া ডাকিতেন। এক দিন ক্ষার সিদ্ধ করিবার জন্য

শিল্পকে চোখে আঙুন আনিতে পারাইল। সার্কভোমের এক ছাত্র এক হাত আঙুন লইয়া বলিলেন—“ধব্ ধব্, হাত পেতে আঙুন নে।” শিল্প ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া এক অঙ্কলি ধুলা লইয়া আঙুন লইল। বালকের বুদ্ধিমত্তা দৃশ্য হইতে সার্কভোম দোষদৃষ্টি করেন এবং সত্বর ভগবতীর নিকট আসিয়া বলিলেন—“ভগ্নী, ভগ্নী, তোর এই ছেলেটি আমায় দে।” বালকের মাতা তৎক্ষণাৎ সম্মত হইল।

(২) ভারতব্রসিদ্ধ মহাপণ্ডিত বাহুবল সার্কভোম বালকের বিচারকৃত করিতে গিয়া মহাবিপদে পড়িলেন। ‘ক’ আঁপে না বলিয়া ‘খ’ আঁপে বলিলে কি দোষ হয়, দুইটি ‘ন’ কেন, তিনটি ‘স’ কেন প্রভৃতি প্রশ্নদ্বারা বালক তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। অর্থাৎ বালককে ক, খ শিখাইতে গিয়া সমগ্র ব্যাকরণই সংক্ষেপে শিখাইতে হইয়াছিল। এই বালকই রঘুনাথ শিরোমণি।

(৩) অতি অল্প বয়সেই রঘুনাথ পাঠ্য সমাপ্ত করিয়া অধ্যাপনা আরম্ভ করেন এবং অবিলম্বে বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক বলিয়া পরিচিত হন। এই সময়ে মিথিলার সুবিখ্যাত পঞ্চধর মিশ্র দ্বিবিজয়ে বহির্গত হইয়া নানাদেশ ভ্রম করিয়া দিগ বিজয়ী রাজার মত হাতী, ঘোড়া প্রভৃতি পরিজনবর্গসহ নবদ্বীপে আবির্ভূত হন এবং বাংলার প্রধান পণ্ডিতের সহিত বিচার প্রার্থনা করেন। নবদ্বীপের পণ্ডিতসমাজ কাণা রঘুনাথকেই প্রধান বলিয়া উপস্থিত করিলে পঞ্চধর মিশ্র বলিয়া উঠেন—“অজ্ঞান্য গোড়দেশস্থ যত্র কাণঃ শিরোমণিঃ।” বিচারের বিষয় ছিল “সামান্যলক্ষণা” নামক ন্যায়শাস্ত্রসম্বন্ধে আলৌকিক সন্ধিকর্ষ। রঘুনাথ চিরন্তন পক্ষ বর্জন পূর্বক “সামান্যলক্ষণা” অস্বীকার করিয়াই তত্তৎস্থলের উপপত্তি দেখাইয়া পঞ্চধর মিশ্রকে নিরস্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই বিচারকালে উভয়ের মধ্যে যে কথো-কটাকটি হইয়াছিল তন্মধ্যে পরাজিত পঞ্চধরের একটি ক্রোধবাক্যক প্লোক বহুল প্রচার লাভ করিয়াছে :—

বক্ষোদ্ধপানকুং কাণ । সংশয়ে জ্ঞাপতি স্মৃটং ।

সামান্যলক্ষণা কস্মাদকস্মাদবলুপ্যতে ॥

(গদেশের মতে সামান্যলক্ষণা ছাড়া ধুমাদিতে ব্যতিচার সংশয় হয় না। সামান্যলক্ষণা একরূপের দীর্ঘিতি আছে “অজ্ঞ বদন্তি” কল্পে বস্তুতই শিরোমণি মৌলিকভাবে সামান্যলক্ষণা ছাড়াও সংশয়ের উপপত্তি করিয়াছেন। বুঝা যায়, এই বিচারের সারাংশ পরে দীর্ঘিতিগ্রহে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল।) প্লোকে শিরোমণিকে ‘কাণ’ ও ‘বক্ষোদ্ধপানকুং’ (অর্থাৎ ক্রোধপোষ শিল্প) বলিয়া আখ্যাত করা হয়। এই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিচারের ফলে মিথিলার প্রধান বিলুপ্ত হইয়া নবদ্বীপই নব্যভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্র হইয়া পড়ে। ইহা প্রায় ১৪৮০-৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনা—তৎকালে পঞ্চধর মিশ্র প্রবীণ ও ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক ছিলেন। মতান্তরে, এই বিচার

মিথিলাতেই ঘটয়াছিল, শিরোমণি পৌড় হইতে নিম্নলিখিত হইয়া গিয়াছিলেন। বাংলার সংস্কৃতির ইতিহাসে শিরোমণির কৃতিত্বপূর্ণ মিথিলাজয় প্রায় সহস্র বৎসর মধ্যে এক অসামান্য ঘটনা। দুঃখের বিষয় এই মহাপুরুষের জীবনকথা ও স্মৃতি অতাবধি সমুচিত আদরসহকারে আলোচিত হয় নাই।

২। কবিকর্ণপুর (১৫২৬-৭৬ খ্রিঃ)

মহাপ্রভু খ্রীষ্টিচৈতন্যদেবের আলৌকিক যোগৈশ্বর্যের বহু অকাট্য নিদর্শন বিদ্যমান আছে। কবিকর্ণপুরের শৈশবকালে অদ্ভুত কবিত্বশক্তির সকার এইরূপ একটি বিস্ময়কর অর্ঘ্য প্রমাণসিদ্ধ ঘটনা। দুঃখের বিষয়, মহাপ্রভুর ভক্তগণ এইরূপ প্রামাণিক ঘটনার যথোচিত চর্চা না করিয়া শিরোমণির সহায়্যনাদি অবাধব এবং কল্পিত বস্তু অবলম্বন করিয়া তাঁহার পবিত্র চরিত-কথা কলঙ্কিত করিয়া তুলিতেছেন। পরমানন্দদাস কবিকর্ণপুর কানুনগরী নিবাসী সুবিখ্যাত চৈতন্যপার্ষদ সেন বংশীয় শিবানন্দের তৃতীয় বা কনিষ্ঠ পুত্র। সাত বৎসর বয়ঃক্রম কালে তিনি পিতার সহিত পুরীধামে গিয়া মহাপ্রভুর দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর উজ্জ্বল ভক্তগণের পরেই তৎকালে বালকের যুগ হইতে মধুর রসায়নক আধ্যাত্মিকের শ্লোক নির্গত হয়। চরিতকারগণ একটি শ্লোক লিপিবদ্ধ করিয়াছেন :—

প্রবসোঃ কুবলয়মক্ষোদয়নয়নসো মহেঞ্জমণিদাম ।

বৃন্দাবন-রমণীনাং মণ্ডনমখিলং হরিভয়তি ॥

কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই বিস্ময়কর ঘটনা বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছেন :—

সাত বৎসরের শিল্প, নাট্যিক অধ্যয়ন।

এঁহে শ্লোক করে, শ্লোক চমৎকার মন ॥

চৈতন্য প্রভুর এই কৃপার মহিমা।

ব্রহ্মাদিদেব ধীর নাহি-পার সীমা ॥ (চৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্যলীলা, ১৬ পরিচ্ছেদ)

কৃষ্ণদাস কবিরাজের এই বর্ণনা অতিরঞ্জিত বলিয়া এই বৈজ্ঞানিক যুগে উপেক্ষিত হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু ইহা যে অতিরঞ্জিত নহে এবং অনধিক সাত বৎসর বয়সেই যে মহাপ্রভুর কৃপায় কবিকর্ণপুর কবিত্বশক্তি লাভ করিয়াছিলেন তাহার বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ বিদ্যমান আছে। কবিকর্ণপুর স্বয়ং “চৈতন্যচন্দ্রোদয়” নাটকের শেষে লিখিয়াছেন :—

যস্যোজ্জ্বলপ্রসাদাদয়মজনি মম প্রৌঢ়িমা কাব্যরঙ্গী, ইত্যাদি।

সুতরাং নিজের উজ্জ্বল অমুরেই কবিকর্ণপুরের কবিত্বশক্তি বিনা অধ্যয়নে স্মৃতি হইয়াছিল। এই ঘটনা ১৫৩২ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমার্ধেই সংঘটিত হইয়াছিল। উল্লিখিত চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের দশমাক্ষের ঘটনারপর মধ্য শিবানন্দের ছোট ছেলের সম্বন্ধে মহাপ্রভুর প্রতি শিবানন্দের ভাগিনের ত্রীকাজের উজ্জ্বল পাণ্ডুরায়—“কণীয়াংস্ত যঃ সোহনুঃ-ত্রীচরণঃ”। অর্থাৎ শিবানন্দের প্রথম দুই পুত্রকে তিনি পূর্বেই দেখিয়াছিলেন (“তো দৃষ্টপূর্বো”), কিন্তু ছোট ছেলেকে এই

প্রথম দেখিলেন। দশমাকে যে বৎসরের ঘটনাবলী চিত্রিত হইয়াছে রাজ্য প্রতাপরত্নের একটি শ্লোক হইতে জানা যায় যে বৎসর “মহাকৈাঙ্গী” নামক অতি দুর্ভাগ্য এক পুণ্যযোগ সংঘটিত হইয়াছিল :—

“রাজা—পশু, পশু, মহাদিগমার্শবৎ,

মহাকৈাঙ্গীযোগে ভবতি ভগবদ্ভবকুলজা,

পতাকোদকজীত্যতিভূবিদিতোয়ং জনরবঃ।”

অর্থাৎ ঐ যোগে পুরীর মন্দিরে পতাকা উড্ডীয়মান হয়। কারণ স্মৃতিশাস্ত্রানুসারে এই পুণ্যতিথি পুরুষোত্তমক্ষেত্রেই বিশেষভাবে পালনীয়। মৈথিল বাচস্পতিমিশ্রের “কৃত্যচিন্তামণি” গ্রন্থে পাওয়া যায় :—(কাশী ১৭, ১৮-১৪ শক, পৃ. ৮)

মহাকৈাঙ্গীয়াং নরো দৃষ্টা প্রযতঃ পুরুষোত্তমং।

“উর্দ্ধধ্বজাভ্যন্তকং” সর্বান পিতৃন্তারয়তে ধ্রুবম্॥

বুঝা যায় শিবানন্দ সেন এই মহাযোগ উপলক্ষেই তিন পুত্রকে সঙ্গে করিয়া পুরী গিয়াছিলেন। মহাকৈাঙ্গী-পদের নানারকম ব্যাখ্যা আছে। অন্ততঃ ব্যাখ্যা গ্রন্থ করিয়া মহাপ্রভুর পুত্রী-অবস্থানকালে দুই বার মাত্র মহাকৈাঙ্গীযোগ গণনা দ্বারা পাওয়া যায়—২১ মে ১৫২১ (২৪ জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার, পূর্ণিমাতিথি, জ্যোষ্ঠানক্ষত্র, রবি রোহিণী নক্ষত্রে এবং বৃহস্পতি মূলানক্ষত্রে) এবং ১৮ মে ১৫৩২ খ্রিঃ (২১ জ্যৈষ্ঠ, শনিবার, পূর্ণিমা, অমরাবাসী নক্ষত্র, রবি রোহিণীতে এবং বৃহস্পতি-অমরাবাসী)। তথ্যে ১৫২১ সন বর্তমানস্থলে গ্রহণীয় নহে। কারণ, উক্ত নাটকের দশমাকে মহাপ্রভুর তিরোধানের অব্যবহিত পূর্ববর্তী ঘটনা চিত্রিত হইয়াছে। ১৫৩২ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসে কবিকর্ণপুরের ৭ বৎসর বয়স হইলে তাঁহার জন্মক হয় ঠিক ১৫২৬ সন। ইহার সমর্থক প্রমাণান্তর প্রদে লিখিত হইতেছে।

সম্প্রতি নবদ্বীপের হরিবোলহুদীর হইতে “ত্ৰীত্ৰিপৌণ্ডীয়-গৌরবগ্রন্থগুচ্ছে” কবিকর্ণপুরের “আধীশতক” খণ্ডিত পুঁষিদ্ভূটে মুদ্রিত হইয়াছে (৪৬১ পৌর্বাষা, ১০-১১৯ শ্লোক)। এই বিলুপ্তপ্রায় গ্রন্থের লুপ্তাংশ হইতেই পূর্বোক্ত মনোহর শ্লোকটি উদ্ধৃত বলিয়া অহমিত হয়। সাত বৎসরের শিশুর রচনা বলিয়া এই গ্রন্থের প্রচারে জগতের যে কোন সভ্যলম্বাঙ্কে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করিত। মহাপ্রভুর জন্মভূমিতে মহাপ্রভুর আলৌকিক মহিমার এই অভিনব নিদর্শন কল্পজনের চিত্র আলোড়িত করিয়াছে, আজ বহনমুজ্ঞ দেশের সাহিত্যিকগণ গণনা করিয়া বিশ্লেষণ করুন।

কবিকর্ণপুর “চৈতন্যচরিতামৃত” নামে একটি পূর্ণাঙ্গ বিংশ-সর্গাঙ্ক সংস্কৃত মহাকাব্য রচনা করেন। ইহার রচনাকাল, “বেদা রসাঃ ক্ষণ্ডয় ইন্দুরিতি প্রসিদ্ধে, শাক্যে...” অর্থাৎ ১৪৬৪ শক (১৫৪২ খ্রিঃ) গ্রন্থশেষে লিখিত আছে। ইহা বহু পূর্বেই মুদ্রিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ মাত্র ১৬ বৎসর বয়সে কবিকর্ণপুর রচনা করেন, এরূপ প্রমাণ আছে এবং গ্রন্থরচনার মাত্র ৩ বৎসর পরে রূপ গোস্বামী স্বহস্তে ইহার অঙ্গুলিপি করিয়া-

হিলেন। এই মূল্যবান তথ্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁষিশালার সংগৃহীত একটি প্রতিলিপির শেষে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ইহার সমাপ্তি বাক্য—“সমাপ্তমিদং ত্রীকুচৈতন্যচরিতামৃতং কাব্য-মিতি। শকাব্দা ১৪৬৪। আষাঢ়কৃষ্ণদ্বিতীয়া সোমবারে।” তৎপরে রূপগোস্বামীর শিষ্য বিষ্ণুদাস গোস্বামী-বিরচিত ৪টি শ্লোক আছে। তৃতীয় শ্লোকটি এই :—

চৈতন্যচরিতামৃতমদ্ভুতাতৈ “দ্যষ্টাঙ্গিকৈ”—বিরচিতং

কবিকর্ণপুরৈঃ।

রূপাধ্যায়গ্রন্থবরৈঃ স্বকরাবুজাভ্যন্তঃ শাক্যে হর্যভুভুবনে

লিখিতং পুরা যৎ॥

(অর্থাৎ চৈতন্যচরিতামৃত কাব্য অদ্ভুতচরিত্র যোড়শবন্ধ কবিকর্ণপুরকর্তৃক রচিত। মৎ-প্রভু রূপগোস্বামী ১৪৬৭ শকে ইহা পূর্বে স্বকীর করকমলাগ্রে লিখিয়া লইয়াছিলেন)। “দ্যষ্টাঙ্গিক”—শব্দে বহুব্রীহি সমাস দ্বারা ১০ কিংবা ১৬ বুঝায়, ২৮ নহে। ২৮ হইলে “অদ্ভুতভ” পদের সার্থকতা থাকে না। গ্রন্থ মধ্যেও এক স্থলে দ্যষ্টাঙ্গিক শব্দ ১৬ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। এতদমু-সারেও কর্ণপুরের জন্মন হয় ১৫২৬ খ্রিঃ। ১৬ বৎসরের বালক-রচিত সংস্কৃত মহাকাব্য বিশ্বসাহিত্যের এক আশ্চর্য্য বস্তু বলিয়া পরিগণিত হওয়া উচিত এবং ভিন্নমিত্র রূপগোস্বামী বার্তাকো-ষয়ং অঙ্গুলিপি করিয়া ইহার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। কর্ণ-পুরের অভ্যন্ত গ্রন্থ প্রবন্ধে আলোচিত হইল না।

৩। রাঘবেজ শতাবধান ভট্টাচার্য্য—(খ্রিঃ ১৭শ শতাব্দী)

চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য্য রচিত “বিদ্যোদ্যোতনরঞ্জনী” সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত কাব্য ৮ ভরঙ্গে সমাপ্ত। ইহার প্রথম ভরঙ্গে গ্রন্থকার স্ববংশের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার পিতা “মহাপুরুষ” রাঘবেজের কীর্তিকথার সারাংশ এখানে উদ্ধৃত হইল। রাঘবেজ তিন ভাইয়ের মধ্যে সপ্তমোত্তর ও লক্ষণযুত ছিলেন। তিনি বিদ্যাসমাজের প্রভূত আনন্দবিধানপূর্বক মাত্র ১৬ বৎসর বয়সে বিদ্যালয়ভুক্ত পার হইয়া “ভট্টাচার্য্যশতাবধান” উপাধি পাইয়া-ছিলেন। (“লেভে যোড়শবারিকঃ কৃতিমতামানন্দবৃন্দারো, ভট্টাচার্য্যশতাবধানপদবীং যন্তীর্ণ-বিদ্যার্বঃ।”) তিনি বাল্য-কালেই নবদ্বীপনিবাসী মহানৈয়ায়িক ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগিনের নিকট সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বৃহস্পতিভূলা বাদিবিজয়ী এবং মহাকবি হইয়াছিলেন। তাঁহার বিচিত্র উপাধির মধ্যে যে অসামান্য কাব্যরচনা শক্তি অন্তর্নিহিত আছে চিরঞ্জীব তাহা ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়াছেন। একজন কবি একটি শ্লোক রচনা করিলে সেই শ্লোকে এক একটি অক্ষর যে কয়বার প্রয়োগ হইয়াছে, রাঘবেজ তিনিয়া ঐ অক্ষর ঠিক ভতবারই প্রয়োগ করিয়া ১০০ শ্লোক রচনা করিতেন। এই রীতিতে ১০০ কবির ১০০ শ্লোক তিনিয়া স্বয়ং ১০০ শ্লোকে সমস্ত পূরণ করিতেন—এই অনন্তসাধারণ শক্তির স্রষ্টা তাঁহার “শতাবধান” উপাধি হইয়াছিল। তাঁহার শক্তিদর্শনে চমকিত হইয়া তাঁহার অধ্যাপক ভবানন্দ দেবতাবিশেষ বলিয়া তাঁহাকে ধ্যাপন করিয়াছিলেন :—

অলীয়ানমুন্সিচ চাৰ্যাপকোৱং তবানন্দসিদ্ধান্তবাগীশ উচে।
অৱং কোপি দেবোহনবদ্যাতিবিদ্যা-চমৎকাৰ-ৰামাপাৰাং
বিভৰ্ণি ॥

চিৱজীব তাঁহাৰ পিতৃকৃত দুইটি এছের নামোল্লেখ কৰিয়া-
ছেন, “মন্ত্ৰাৰ্ণৱীপ” ও “ৰামপ্ৰকাশ”। প্ৰথমটি এখনও আবিষ্কৃত
হয় নাই। “ৰামপ্ৰকাশে”ৰ দুইটি প্ৰতিলিপি লণ্ডনে ৰক্ষিত
আছে। আমৰা ৯ বৎসৰ পূৰ্বে “ৰামপ্ৰকাশে”ৰ একটো অতি
মূল্যবান প্ৰতিলিপি নবদ্বীপস্থ সাধাৰণ পাঠাগাৰে আবিষ্কাৰ
কৰিয়া পৰীক্ষা কৰিয়াছিলোম। নাগৰাক্ৰে লিখিত এই
বিবৰ্ণিত অতি এছের বিবৰণ অন্যত্ৰ ঐশ্বৰ্য (*Indian Hist.
Quarterly*, XVII, pp. 6-10)। সত্যহি শাহজাহানৰ
ৰাজত্বকালে ১৭০৪ সনতে (১৬৪৭ সনে) ইহা ৰচিত
হয়। এছকাৰেৰ পৃষ্ঠপোষক ৰাজা কুপাৰামেৰ নামে ইহা
প্ৰচাৰিত হইয়াছিল। এই কুপাৰামেৰ পৌত্ৰই চিৱজীবৰ
পোষ্ঠা “ৰাজা যশবন্তসিংহ”। এই “গৌড়”-কব্জি ৰাজ-
বংশেৰ ৰাজধানীৰ নাম এছমধ্যে আবিষ্কৃত হওৱাৰ বহু
কাল সন্ধিত একটো ভ্ৰম সংশোধিত হইয়াছে। “অগস্ত্যোদয়”
প্ৰকৰণে লিখিত আছে :—(৪৩১-২ পঙ্কে), “এবঞ্চ অৰ্গলায়াং
মহাৰাজচক্ৰবৰ্ত্তিনগরে যজ্ঞস্থলপৰিমিতা...সিংহস্থৰ্ণল্য ২০-
তমাংশোনন্তরে নিশান্তে অৰ্গলাপুৰে অগস্ত্যোদয়ঃ। “লাহাৱিৰ”-
মধ্যেপি ভূপতি-কুপাৰামৰাজ্যভাং প্ৰায়ন্তবৈবেতি।” অৰ্থাৎ
কুপাৰামেৰ ৰাজধানী “লাহাৱিৰ” অৰ্গলাপুৰেৰ (তৎকালীন
মোগল ৰাজধানী আগ্ৰানগৰীৰ) সন্নিহিত ছিল। বৰ্ত্তমানে
লাহাৱি ও তন্ত্ৰিকটবৰ্তী “ইশ্বৰখী” নগৰ (নবদ্বীপেৰ প্ৰতি-
লিপিতে শেৰোক্তস্থলে এইৰচনাৰ উল্লেখ আছে) গোয়ালিয়ৰ
ৰাজ্যেৰ এক প্ৰান্তে বৃষ্ট হয়। সেখানেই ৰাজা কুপাৰামেৰ
ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠিত ছিল, গৌড় দেশেৰ কোন অংশে নহে এবং
তিনি অভূতকৰ্ম্ম শতাবধান ভট্টাচাৰ্য্যকে সভাপণ্ডিত কৰিয়া
আনয়ন কৰেন। তাঁহাৰ পৌত্ৰ ৰাজা যশবন্তেৰ সময়ে শতা-
বধানৰ যোগ্যপুত্ৰ চিৱজীব সভাপণ্ডিত ছিলেন। বিষ্ণুমোদ-
তন্ত্ৰলিপিতে পাওয়া যায়, শতাবধান কাণীতে স্বৰ্গী হইয়াছিলেন
এবং চিৱজীবও তৎকালে কাণীতেই অধ্যাপনা কৰিতেন।
কিন্তু চিৱজীবৰ মাধবচম্পুৰ শেষে পাওয়া যায় তাঁহাৰ জন্ম
হইয়াছিল নবদ্বীপে। অৰ্থাৎ শতাবধান প্ৰথম জীবনে নব-
দ্বীপেই অধ্যাপক ছিলেন। পৰে পিতা-পুত্ৰ ২ পুৰুষ বাংলাৰ
বাহিৰে গিয়া অপূৰ্ব কীৰ্ত্তি অৰ্জন কৰিয়াছিলেন।

শতাবধানৰ নিবাস গ্ৰাম হুগলিৰ অন্তৰ্গত শুষ্টিপাড়া।
আমৰা কুলপঞ্জীতে তাঁহাৰ বংশপৰিচয় আবিষ্কাৰ কৰিয়াছি।
তিনি অবসৰী চট্টবংশীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ব্ৰাহ্মণ ছিলেন। তাঁহাৰ শেষ
বংশধৰ হেমচন্দ্ৰ ভট্টাচাৰ্য্যেৰ ১৮৯৮ সনে পৰলোকপ্ৰাপ্তি
হইলে বংশলোপ হইয়াছে। তাঁহাৰ অসামান্য প্ৰতিভাৰ কথা
বাংলাৰ ইতিহাসে চিৱস্মৰণেৰ হওয়া উচিত।

৪। অভয়ানন্দ তৰ্কালঙ্কাৰ (মৃত্যু ১৮২২ খ্ৰীঃ)

নব্যভাৰেৰ চৰ্চ্চা বাংলাদেশে যখন চন্দ্ৰমলীয়াৰ পৌছিয়াছে
সেই সময়ে এই আসামান্য প্ৰতিভাশালী নৈসৰ্গিক অপ্ৰতিদ্বন্দ্বী
বিচাৰমন্ত্ৰৰূপে সকলকে চমৎকৃত কৰিয়া দিয়াছিলেন এবং
বিভাৰ উপাৰি ব্যতীত তাঁহাৰ একটো বিষয়জনক লৌকিক
উপাৰি “চমৎকাৰ” জনসমাজে প্ৰচাৰিত হইয়াছিল। কৰিদপুৰ
জিলাৰ অধুনা নদীয়াৰ স্প্ৰেচিড “জপসা” গ্ৰামে এক পাশ্চাত্য
বৈদিক বংশে ইহাৰ জন্ম হয়। ইহাৰা ৫ ভাই ছিলেন, সৰ্ব
ক্ৰোধ ৰামানন্দ ভাৰ্যবাগীশ বিজয়পুৰেৰ সৰ্বক্ৰোধ পাঠক
ছিলেন। এই পাঠক বংশ এখনও বিত্তমান আছে। ইহাদেৰ
বাড়ীতে দালান ও দীৰ্ঘ পুষ্কৰিণী প্ৰভৃতি ছিল। কোনও
ঘটনায় ইহাৰা জপসা পৰিত্যাগ কৰিয়া যান। পৰে ইহাদেৰ
বাড়ীতে উত্তৰলাহাবাজপুৰ নিবাসী হৰচৰণ সিদ্ধান্তবাগীশ
আসিয়া টোল কৰিয়া বহু ছাত্ৰ থড়াইয়াছিলেন। তৎকালে
নবদ্বীপেৰ পণ্ডিতগণ পূৰ্ববঙ্গে যাতায়াত কালে জপসাৰ বাবু-
দেৰ আতিথ্য গ্ৰহণ কৰিতেন এবং সন্ধান লইয়া অভয়ানন্দেৰ
পৰিচয় জন্মপুৰ পৰিদৰ্শন কৰিতেন।

অভয়ানন্দ জপসাৰ পণ্ডিতবংশীয় কালিকাপ্ৰসাদ চক্ৰ-
বৰ্ত্তীৰ নিকট সামান্য ব্যাকৰণ পড়িয়া নবদ্বীপে আসেন। তখন
শত্ৰু তৰ্কবাগীশ অতি প্ৰাচীন, তথাকথিত একটো “অন্তৰ্গত পুস্তক”
সমালোচনা কৰিতে দিয়া নবাগত পণ্ডিত কিতা ছাত্ৰেৰ পৰীক্ষা
কৰিতেন। অভয়ানন্দ ঐ পুস্তকেৰ সমন্বয় কৰিতে সমৰ্থ
হইয়াছিলেন। মাত্ৰ ২০ বৎসৰ বয়সে ১৮১৬ খ্ৰীষ্টাব্দে শত্ৰু
তৰ্কবাগীশেৰ পৰলোকগমনেৰ স্মৃতিত তাঁহাৰ পাঠ সমাপ্তি
হয়। তিনি নবদ্বীপেৰ তৎকালীন সমস্ত পণ্ডিতকে বিচাৰে
পৰাস্ত কৰিয়াছিলেন। তাঁহাৰ অসামান্য প্ৰতিভা দেখিয়া
নবদ্বীপবাসিগণ নবদ্বীপেই তাঁহাকে চতুষ্পাঠী কৰিতে বলায়
তিনি আৰ দেশে ক্ৰিয়েন নাই। ওয়াৰ্ড সাহেবেৰেৰে ১৮১৭
সনে নবদ্বীপেৰ প্ৰধান চতুষ্পাঠীসমূহেৰ তালিকামধ্যে অভয়া-
নন্দেৰ নাম চতুৰ্থ, ছাত্ৰসংখ্যা ২০ (সংবাদপত্ৰে সেকালেৰ
কথা, ১ম ভাগ, ২য় সং, পৃ. ৪২৩ ঐশ্বৰ্য)। তিনি পৰে ভট্ট-
পঞ্জীতে বাঙী কৰেন এবং ১২২৯ সনেৰ ১১ বৈশাখ পৰ্ণিমাত্ৰে
স্বৰ্গত হইলে ভট্টপঞ্জী হইতে যাইয়া তাঁহাৰ পত্নী সহগমন
কৰিয়াছিলেন (ঐ, ঐ, পৃ. ৪৬-৭)। আমৰা স্বৰ্গত পঞ্চানন
তৰ্কৰত্ন মহাশয়েৰ প্ৰমুখ্যে শুনিয়াছি অভয়ানন্দ বেশ বলিষ্ঠ
ছিলেন এবং ছুটিৰ দিনে নবদ্বীপ হইতে (প্ৰায় ৪০ মাইল)
ইটিয়া ভট্টপঞ্জীৰ বাড়ীতে আসিতেন। তিনি মাত্ৰ ২৫ বৎসৰ
বয়সে স্বৰ্গী হন এবং স্বকীয় ছাত্ৰদেৰ পাঠ পৰিসমাপ্ত কৰিয়া
যাইতে পাৰেন নাই। অধিকাচৰণ ধোষ-ৰচিত “বিজয়পুৰেৰ
ইতিহাস” (১২৭৫, পৃ. ৫৪-৫) হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল :
—“অনেক দিন অতীত হইল বিজয়পুৰ অপর একটো পণ্ডিত-
বৃত্তে বসিত হইয়াছেন, ইহাৰ নাম অভয়চৰণ (৭) চমৎকাৰ।
ইনি এত অল্প সময়ের মধ্যে সংস্কৃত শাস্ত্ৰে বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি ও
বিচক্ষণতা লাভ করেন যে, তুলিলে, যাবতীয় নাই চমৎকৃত

হইতে হয়। ইনি এই নিমিত্তই ‘চমৎকার’ এই উপাধি প্রাপ্ত হন। তদবধি এই মহাত্মা অন্তর চমৎকার নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন।’

রায়গতি ভায়রতের “গোষ্ঠিকথা” হইতে তাঁহার একটি উৎকৃষ্ট গল্প (“পাঠা ভাঁড়াইয়া মহিষ”) উদ্ধৃত হইল। “অভয়ানন্দ ভট্টাচার্য্য বড় নৈয়ামিক ছিলেন। একদা তিনি কোনও সভায় গরু করিয়া বলিলেন যে, আমার নিকটে যে কেহ পূর্বপক্ষ করুক, একেবারেই তাহার উত্তর করিব। বাহার বাগীতে সভা, তিনি ঠিকাইবার জন্ত একজন ভাল অধ্যাপককে ছাত্ররূপে উপস্থিত করিয়া তাঁহার দ্বারা পূর্বপক্ষ করাইলেন। অভয়ানন্দ পূর্বপক্ষকারীকে সামান্য ছাত্র জ্ঞান করিয়া যেমন তাহার উত্তর করিলেন, পূর্বপক্ষকারী অমনি সে উত্তরে দোষ দিলেন। তখন অভয়ানন্দ চকিত হইলেন এবং বুঝিলেন ইনি ছাত্র নহেন— একজন ভাল অধ্যাপক। তখন তিনি দে দোষের খণ্ডন করিয়া পুনর্বীর উত্তর প্রদান করিলেন; দেবাবে আর পূর্বপক্ষকারী কোনও দোষ দিতে পারিলেন না। তখন বাগীর কর্ত্তা হাসিয়া কহিলেন কৈ ভট্টাচার্য্য মহাশয়। এ পূর্বপক্ষে আপনকার উত্তর একেবারে ত হইল না? অভয়ানন্দ কহিলেন বাবু। তুমি যে অভয় করিয়াছিলে; তুমি পাঠা ভাঁড়াইয়া মহিষ দিয়াছিলে কেন? আমি প্রথমে পাঠা ধনে করিয়া পাঠাকাটা কোপ মারিয়াছিলাম। কিন্তু পরে বুঝিলাম এ পাঠা নহে মহিষ; এখন মহিষকাটা কোপ মারিলাম—কাটিয়া গেল।” (পৃ. ৬৫, ৬৬ সংখ্যক কথা)

তিনি জীবনে দুই-বার রাজ্য বিচারে পরাস্ত হইয়াছিলেন। কালী সংস্কৃত কলেজে বিক্রমপুর বাহুকা-নিবাসী বঙ্গের তদানীন্তন সর্বশ্রেষ্ঠ নৈয়ামিক চন্দ্রনারায়ণ ভায়-পঞ্চানন দীর্ঘকাল (১৮১৩-৩৩ খ্রিঃ) অধ্যাপক ছিলেন। অভয়ানন্দ পঠদশায় গরু করিয়া বলিতেন, “চাঁদা আমার ভয়ে কানীতে গিয়াছে।” পরে পাঠ সমাপন করিয়া কানীতে গিয়া তাঁহার সহিত বিচার করেন, কিন্তু কিছুতেই পরাস্ত করিতে পারেন নাই (অর্চনা, ভাদ্র ১৩২৭, পৃ. ২৪২; প্রবাসী, চৈত্র, ১৩৩২, পৃ. ৭৬৩ দ্রষ্টব্য)। চন্দ্রনারায়ণ বলিলেন, ‘তুমি শিঙ—এত অল্প বয়সে পাঠ সমাপ্ত করিলে কেন? তোমার যেরূপ বুদ্ধি ও বিচারশক্তি, আরও কিছুদিন পড়িলে তুমি বঙ্গের অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইবে।’ অপর এক ‘দেবাংশ’ পণ্ডিতের সহিত তাঁহার দ্বিতীয় বিষয়বাহ বিচার পরে লিখিত হইল। অভয়ানন্দ বিচারমঙ্গ হইলেও অধ্যয়নশীল ছিলেন এবং প্রাচীন গ্রন্থাদি সংগ্রহ করিয়া পড়িতেন। নদীয়া বহিরগাছীর সুপ্রসিদ্ধ রত্নমণি বিদ্যাভূষণের গৃহে একটি পুথির পক্ষে আমরা নিম্নলিখিত আরকলিপি দেখিয়াছি:—“সন ১২২৭ সাল ১০ কাঠিক নবমীপের গ্রীষ্মত অভয়ানন্দ তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য অল্পমানবৎসর আলোকগ্রহ মিশ্রকৃত লইয়া যান লিখিয়া আনিয়া দিবেন ইতি।” নব্যভার চর্চার এই সুবর্ণ যুগ অচিরেই অবলান প্রাপ্ত হয়। পরবর্তী শ্রেষ্ঠ নৈয়ামিক-

গণ আলোকগ্রহের নামও অবগত ছিলেন কি না সন্দেহ, সংগ্রহ করা ত দূরের কথা। অভয়ানন্দের বহু কথা আমরা জপসার সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ও আনন্দনাথ রায় (১২৬২-১৩৪০ সন) মহাশয়ের নিকট জ্ঞাত হইয়াছিলাম।

৫। ভৈরবচন্দ্র তর্কপঞ্চানন (মৃত্যু ১৮১৮)

ঢাকা জিলায় সোনারগাঁ পরগণার “কৃষ্ণপুরা” গ্রামে রাঢ়ীয় বাৎসলগোত্রীয় (শিমলাল) ভট্টাচার্য্যবংশ পাণ্ডিত্যের জন্ম বিখ্যাত ছিল। এই বংশে দৈবশক্তিসম্পন্ন ভৈরবচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন এবং ১২২৫ সনে ২৬ বৎসর বয়সে মাত্র ৫ বৎসর অধ্যাপনা করিয়া (প্রবাদ অনুসারে এক ব্রাহ্মণের অভি-সম্পাতে) পরলোক গমন করেন। তিনি কাহারও নিকট বিচারে পরাস্ত হন নাই এবং নব্যভারের যে কোন কুট-প্রশ্নের উত্তর দানে সমর্থ ছিলেন। তাঁহার ললাটে একটি “রাজদণ্ড” রেখা ছিল এবং শাস্ত্রীয় বিচারকালে তাহা ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া—তাঁহার অপরাধের শক্তির লোভন রূপে লক্ষ্যকে অভিব্যক্ত করিত। তাঁহার বহু কীর্ত্তি কথার মধ্যে চুইটি উল্লেখযোগ্য। বিক্রমপুরের তদানীন্তন প্রধান নৈয়ামিক বিখ্যাত “পঞ্জিকা”কার কালীশঙ্কর সিদ্ধান্তবাগীশ (১৭৮১-১৮৩০ খ্রিঃ) দ্বিতীয়পক্ষে ভৈরবচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্রী স্বরমোহিনী দেবীকে বিবাহ করেন। কালীশঙ্কর বিচারমঙ্গ ছিলেন না। ভৈরবচন্দ্র পরিহাসমুখে দাদাকে বলেন, “যেহে সন্দেহই যেহে বিবাহ দিয়াছেন” ॥ কথাটা কালীশঙ্করের কর্ণগোচর হইলে তিনি অবিলম্বে আসিয়া ভৈরবচন্দ্রের সহিত শাস্ত্রীয় বিচারে প্রবৃত্ত হন এবং প্রত্যেক স্থলে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইয়া লজ্জিত হন।

কালীশঙ্কর যৈয়মনসিংহ সুব্রহ্মণ্যের বিতোঃসাহী রাজা রাজসিংহের (১৭৮৪-১৮২২ খ্রিঃ) সভাপণ্ডিত ছিলেন, কেবল প্রাধাত্য রক্ষার জন্ত বৎসরে ছয় মাস দেশে আসিয়া থাকিতেন। কালীশঙ্করের চেষ্টায় কোন উৎসব উপলক্ষে সুব্রহ্মণ্য রাজবাড়ীতে অভয়ানন্দ ও ভৈরবচন্দ্রের মধ্যে এক বিষয়বাহ শাস্ত্রীয়বিচার সংঘটিত হয়—উভয়েই দৈবশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ। ভৈরবচন্দ্র বিচারে জয়ী হইয়া রাজপ্রদত্ত হাতীর পৃষ্ঠে দেশে ফিরিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুকাল পরেই স্বর্গী হন। সোনারগাঁর তদানীন্তন একজন “কবি” কুশাই দাস গান বাঁধিয়াছিলেন:—

সুব্রহ্মণ্য রাজার বাড়ী বিচার করি দ্বারে বাঁধল হাতী।

তার মধ্যে পড়ে কত গভীর রক্ষা পেল জাতি ॥

দে যে ভৈরবচন্দ্র তর্কপঞ্চানন,

সশরীরে স্বর্গে গেল করে রথে আরোহণ,

কাদিলে কি আর পাবে রে সে জন ॥

৬। বনেন্দ্র ভট্টাচার্য্য

উদীচ্য রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য (খ্রিঃ ১৭শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ) রঘুনন্দনের আর্দ্রমত সংশোধন করিয়া “কৌমুদী” নামক বহু স্থতির গ্রন্থ রচনা করেন। উত্তরবঙ্গে তাঁহার মতই বহুল

পরিমাণে প্রচলিত ছিল। রঙ্গপুর ইটাকুমারীর ভট্টাচার্য্যবংশে তাঁহার জন্ম (বারেন্দ্রশ্রেণী, বাংলুগোত্র)। তাঁহার অশ্রুতন বর্ষ পুরুষ স্বপ্রসিদ্ধ মহামহোপাধ্যায় যাদবেন্দ্র তর্করত্ন মহাশয় ১৩১৮ সনে সম্বন্ধনির্ণয়ের তৃতীয় পরিশিষ্টে তাঁহাদের বংশবৃত্তান্ত মুদ্রিত করেন (পৃ. ১৬২-৮৩)। তন্মধ্যে বালক কবি বনেন্দ্র-রচিত “বাংলুবংশচরিত্রম্” (পৃ. ১৬২-৭৭) নামে “শার্দূল-বিক্রীড়িত” ছন্দের ৮৭ শ্লোকান্তর এক অতি বিস্ময়কর ক্ষুদ্রকাব্য আছে। দুঃশেষ বিষয় এই অসামান্য বস্তুটুকুহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। আমরা বাংলায় সংস্কৃতবিৎ পণ্ডিতগণকে মৈবশক্তি সম্পন্ন বনেন্দ্রের রচনাটি পড়িয়া দেখিতে অমরোচক করি। বনেন্দ্রের ছাত্র রাসেশ্বর ৮ শ্লোকে “বনেন্দ্র-চরিত্র” লিখিয়াছেন (ঐ, পৃ. ১৭৮-৯)। তাঁহার সারাংশ এই—উদীচ্যের এক প্রপৌত্র ইজ্ঞেশ্বর চূড়ামণি, বনেন্দ্র ৮ শ্লোকে (৭৯-৮৬) তাঁহার পাণ্ডিত্যকীর্তন করিয়াছেন। তাঁহার স্মৃতিপুত্র বনেন্দ্র শৈশবে কাতজের সন্ধিবৃত্তি মাত্র পড়িয়াছিলেন, এক রাজিতে নিদ্রিত পিতার মুখনির্গত এক মন্ত্র শুনিয়া এবং পরদিন পিতার নিকট ঐ মন্ত্রেই দীক্ষিত হইয়া হঠাৎ তাঁহার সমস্ত শাস্ত্রে জ্ঞান জন্মে। এক দিগবিজয়ী পণ্ডিতকে বিচারে পরাস্ত করিয়া তিনি অদ্বৈত প্রদর্শন করিয়া অপমান করিয়াছিলেন—তাঁহার অভিসম্পাতে তৃতীয় দিন মাত্র ১৫ বৎসর বয়সে বনেন্দ্র যুত্মাযুগে পতিত হন। অনধিক ১৫ বৎসরে তিনি কি অদ্ভুত কবিত্বশক্তি লাভ করিয়াছিলেন ৮৭ শ্লোকের প্রত্যেকটি তাঁহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্তরূপ। উদীচ্য রামকৃষ্ণ সরস্বতীর দর্শন লাভ করিয়া বর পাইয়াছিলেন। বনেন্দ্র ১১ শ্লোকে (২০-৩০) উদীচ্যের বৃত্তান্ত দিয়াছেন। বনেন্দ্রের ভাগিনের রুদ্রমঙ্গল ছায়ালাকার (মৃত্যু ১২৬০ সন) নবদ্বীপের ত্রিরাশি শিরোমণির এক প্রধান ছাত্র ছিলেন। বনেন্দ্রের কীর্তি স্মরণ্য ১৮২৫-৪০ খ্রিঃ মধ্যে স্থাপন করা যায়।

৭। নন্দকুমার ভায়চুড় (১৮৩৫-৬২ খ্রিঃ)

বাল্যাদেশে নব্যন্যায়ের প্রতিভার শেষ অবতার নন্দকুমার স্বর্গত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সর্বজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। “নৈহাঙ্গির ভট্টাচার্য্যবংশঃ” নামক পারিবারিক গ্রন্থে তাঁহার অসামান্য কীর্তির বিবরণ মুদ্রিত হইয়াছে (পৃ. ১৮-২৬)। মাত্র ১১১২ বৎসর বয়সে তিনি মাতামহ রামমণিক্য বিজ্ঞানস্বায়ের (সংস্কৃত কলেজের এসিষ্ট্যান্ট সেক্রেটারী, মৃত্যু ১৮৪৬

খ্রিঃ) নিকট নব্যভাষ্যের কৃষ্টিবিচার-প্রণালী শিখিয়াছিলেন। রামমণিক্য স্বয়ং নবদ্বীপের শব্দ তর্কবাগীশ, নৈহাঙ্গির মণিক্য তর্কভূষণ এবং যুরসিলাবাদের ত্তকনাথ চারুপঞ্চাননের নিকট পাঠ স্বীকার করিয়া তিন সম্প্রদায়ের পদ্ধতি আয়ত্ত করিয়া ছিলেন এবং উপযুক্ত দৌহিত্রকে প্রাণ থলিয়া তাহা শিখাইয়া যান। তাঁহার মৃত্যুর পর নন্দকুমার পিতার নিকট পড়িয়া মাত্র ১৮ বৎসর বয়সে পাঠ সমাপ্ত করেন। তাঁহার এই “অসাধারণ” (extraordinary) কৃতিত্ব নড়াইলের রতন রায়, বিজ্ঞানাগর মহাশয়, রাজা রাধাকান্তদেব, রমাপ্রসাদ রায় প্রভৃতি বহু প্রধান ব্যক্তি প্রশংসা করিয়া ধ্যাপন করিয়াছেন। বিজ্ঞানাগর মহাশয় তাঁহাকে সংস্কৃত কলেজের সহকারী অধ্যাপক নিযুক্ত করেন। তিনি প্রায় ৪ বৎসর (১৮৫৬-৬০ খ্রিঃ) সংস্কৃত কলেজে ছিলেন, পরে বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের চেষ্টায় অধিক বেতনে কান্দী জুগের হেড পণ্ডিত হইয়া যান, কিন্তু ১২৬৯ সনের কার্তিক মাসে (১৮৬২ খ্রিঃ) মাত্র ২৮ বৎসর বয়সে ক্ষয় রোগে নিঃসন্তান পরলোকগত হন। “সংস্কৃত প্রভাব” নামে একটি ক্ষুদ্র পুস্তক (১৯১৬ সম্বৎ, পৃ. ২৮) তিনি মুদ্রিত করিয়াছিলেন—আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীতে বহুভাষার উন্নতি বিধানের প্রয়োজন ইহাতে যেভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে তাহা বস্তুতই আশ্চর্য্যজনক।

নন্দকুমার ভায়শাস্ত্রের বিচারে অতি অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। নবদ্বীপের ত্রিরাশি শিরোমণি ও তদীয় সর্বপ্রধান ছাত্র গোলোকনাথ ভায়রত্নকে তিনি মাত্র ১৯ বৎসর বয়সে যেভাবে বিচারে পরাস্ত করেন তাহার বিবরণ “সংবাদভাস্কর” হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে (সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম ভাগ, ২য় সং, পৃ. ৪২৭, ৪৭৭-৮)। প্রথম বিচারে বিষয় ছিল “কেবলাধরী পাদাধরী”র একটি পঙ্ক্তি এবং দ্বিতীয় বিচারে ছিল পদাধরের “শক্তিবাদে”র একটি পঙ্ক্তি। নন্দকুমার জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চাননকেও বিচারে পরাস্ত করিয়াছিলেন। ৪০০ বৎসর পূর্বে প্রবীণ পক্ষধর মিশ্রের সহিত বালক রঘুনাথের বিচারকাহিনী এখানে তুলনাচ্ছলে স্মরণীয়। বাংলায় নব্যভাষ্যের গৌরবোজ্জ্বল প্রতিষ্ঠা ও নব্যভাষ্যের শোচনীয় অবসান রঘুনাথ ও নন্দকুমারের জীবনে মধ্যযুগে প্রতিফলিত হইয়াছিল। রঘুনাথের খ্যাতি সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়াইয়া যায়, আর নন্দকুমার নিঃস্ব অবস্থায় গ্রাম্য বিদ্যালয়ে পণ্ডিতী করিয়া মারা যান।

অতি-আদিম যুগের শিল্পের ধারা

শ্রীকানাইলাল সাহা

প্রত্নতত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা বলেন : প্রস্তর-যুগে ইউরোপে তিনটি সভ্যতা বিস্তার লাভ করে। প্রথমটিকে বলা হয় অ্যুরগ্নেশীয় (Aurignasian), দ্বিতীয়টি সলুট্রীয় (Solutrian), আর তৃতীয়টি ম্যাগডালেনীয় (Magdalenian)।

প্রস্তর-যুগের প্রথম দিকের আধবাসীদের ব্যবহৃত কিছু কিছু অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গেছে অ্যুরগ্নাক (Aurignac) নামে একটি পাহাড়ের ওপর। তাই এই যুগের সভ্যতাকে বলা হয় অ্যুরগ্নেশীয় সভ্যতা। জাল, বেলজিয়ম, স্পেনের উত্তর ভাগ, পোলাণ্ড, অস্ট্রিয়া প্রভৃতি স্থানে এই সভ্যতার কিছু আভাস পাওয়া গেছে। তাই অনেকে অনুমান করেন, ইউরোপের সর্বত্রই এই সভ্যতার ধারা ছড়িয়ে পড়েছিল।

এই যুগের অধিবাসীদের জীবনধারণের প্রধান অবলম্বন ছিল শিকার। তাই তারা পাহাড়ের ধারে বসে পাখরের অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করত, আর শিকারে যাবার পূর্বে পাহাড়ের গায়ে বা ওয়ার তেতর জীব-জন্তুর ছবি আঁকে পূজা করত। তখন ওরা খেসব ছবি আঁকেছে সেগুলো ছোট ছেলেদের আঁকা ছবির মতই। রেখা-চিত্রের আদিকের সঙ্গে তখনও ওদের ভাল করে পরিচয় হয় নি বলেই বোধ হয় তারা শুধু বেঠনী-রেখা (outline) দিয়ে কোন রকমে জন্তুটিকে বোঝাতে চেষ্টা করত। এই প্রাথমিক চিত্রগুলির শিল্পগত সৌন্দর্য বা মূল্য কিছু থাক বা না থাক ঐতিহাসিক মূল্য একটা আছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

বহুকাল ধরে ছবি আঁকতে আঁকতে ক্রমে ওরা অভ্যস্ত হয়ে উঠল রেখা-চিত্রের আদিকে এবং ওদের মনেও ধীরে ধীরে জাগল শিল্পবোধ। আর সেই সঙ্গে বেড়ে যেতে লাগল ওদের পর্যবেক্ষণ-শক্তি যা শিল্পের অভিব্যক্তির অপরিহার্য অঙ্গ। এই পর্যবেক্ষণ-শক্তির জন্মেই কালক্রমে ওদের শিল্প হয়ে উঠল পূর্ণাঙ্গ।

পরবর্তী যুগের শিল্প সম্বন্ধে আলোচনা করলে আরও স্পষ্টভাবেই আমরা এ বিষয়টা বুঝতে পারব।

অ্যুরগ্নেশীয় যুগের অবসানের পর নতুন এক ধরনের সভ্যতার আলো প্রস্তর-যুগে অধিবাসীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। ফ্রান্সের সলুট্র (Solutre) নামে একটি জায়গায় এই যুগের শিল্পের কিছু কিছু নমুনা পাওয়া গেছে। পবেষকেরা তাই এই স্থানটির নাম অনুযায়ী এই যুগের সভ্যতার নাম দিয়েছেন সলুট্রীয় সভ্যতা। তাঁরা অনুমান করেন এই যুগের সভ্যতার অগ্রদূত পশ্চিম এশিয়ার স্টেপ্পে প্রদেশের এক অভিজাতী দল। খুব সম্ভব ওরা তুর্কিস্থান বা তার কাছাকাছি কোন জায়গা থেকে পশ্চিম ইউরোপের দিকে অগ্রসর হয়। ক্রমে

ওরা ফ্রান্সের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে উপস্থিত হয়ে অ্যুরগ্নাকের অধিবাসীদের সঙ্গে বসবাস শুরু করে। ওরা কিন্তু অস্ত্র-শস্ত্র তৈরি করতে ভত দক্ষ ছিল না। পরে আর একদল অভিব্যক্তী ওখানে উপস্থিত হয়। এরা অ্যুরগ্নেশীয়দের অস্ত্র তৈরী করার কায়দাটুকু আয়ত্ত করে নিয়ে শেষে ওদের চেয়েও স্থলর স্তম্ভর অস্ত্র-শস্ত্র তৈরি করতে শুরু করে দিলে।

অ্যুরগ্নেশীয়দের মত এরাও ছবি আঁকত পাহাড়ের গায়ে ও ওয়ার। তবে পূর্বপ্রচলিত আদিকের একটু-আধটু অমল-বদল করার এদের ছবিগুলো হয়েছিল কিছু উন্নত ধরনের। এরাও বেঠনী-রেখা দিয়ে জীব-জন্তুর ছবি আঁকত রটে, তবে সেগুলোর চোখ আঁকত ফুটুকি দিয়ে। ছোট বড় রেখা দিয়ে ওরা ক্রমে পস্তর গায়ের সোম আঁকাও শুরু করে দিলে। এই দুই যুগের ছবি তুলনা করলে দেখা যায়, অ্যুরগ্নেশীয়দের চেয়ে সলুট্রীয়দের শিল্প-বোধ ছিল একটু উন্নত।

সলুট্রীয় যুগের অবসানের পর শুরু হয় ম্যাগডালেনীয় যুগ। প্রস্তর-যুগের রেখা-চিত্র ও চিত্রকলার চরম উন্নতি হয়েছিল এই সময়। ১৮৬৩-৬৪ খ্রীষ্টাব্দে লার্তেট (Lartet) ও ক্রিস্টি নামে দুজন গবেষক লা মডেলা (La Madeleine) ওয়ার এই যুগের শিল্পের - কিছু নিদর্শন আবিষ্কার করেছেন।

প্রত্নতত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা বলেন : এই যুগের শিল্প শুধু ফ্রান্সের ভেতরেই সীমাবদ্ধ ছিল। দক্ষিণে ইটালীর ক্রিম্যালাউ নামক স্থানে আর একটি স্বতন্ত্র সভ্যতা গড়ে ওঠে। একে বলা হয় গ্রাভিটিনীয় সভ্যতা। মধ্য ইউরোপে কিন্তু গ্রাভিটিনীয় ও ম্যাগডালেনীয় সভ্যতার সংযিশ্রণে আর একটি নতুন ধরনের সভ্যতা গড়ে ওঠে। ওদিকে দক্ষিণ রাশিয়ার তখন ক্রিম্যালাউ সভ্যতার চেয়ে কিছু নিকৃষ্ট ধরনের অল্প এক সভ্যতা প্রচলিত ছিল।

অন্ত্যযুগের শিল্পের সঙ্গে মধ্যযুগের শিল্পের বিশেষ কিছু মিল দেখা যায় না। এর প্রধান কারণ, এই সময়ের শিল্পের আদিকের আমূল পরিবর্তন হয়েছিল। এই যুগের অধিবাসীরা যে মধ্যযুগের শিল্পের সঙ্গে পরিচিত ছিল তার প্রমাণ আছে। ঐ উত্তর যুগের শিল্পের নমুনা একই জায়গায় পাশাপাশি পাওয়া যায়। এই যুগের শিল্পীরা কিন্তু সব সময়ই নিজেদের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখবার চেষ্টা করত।

শিল্পীরা এই সময় শিল্পকর্মের অন্যতম উপাদানবরণ পস্তর হাড় ব্যবহার করা শুরু করে। পূর্ববর্তী যুগের লোকদের অস্ত্রশস্ত্রের অঙ্গকরণে তারা হাড়ের বর্শা তৈরি করত। এই সব বর্শাকে আবার সুদৃঢ় করার জন্মে বাঁটগুলি চিহ্নিত করত জীব-জন্তুর মূর্তি খোদাই করে। এই খোদাই-শিল্পের

আদিক পরীক্ষা করে গবেষকরা বলেছেন, এগুলি প্রস্তর-যুগের শেষ সময়কারই জিনিষ।

প্রত্নতত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা বলেন : ম্যাগডালেনীয় যুগের অধিবাসীরা শিকারে তত অন্ত্যস্ত ছিল না। কাজেই জীবনধারণের ক্ষেত্রে তাদের বনের পশুর ওপর আদৌ নির্ভর করতে হ'ত না। তারা জীবনধারণ করত নদীর মাছ ধরে। তাই ওরা কয়েকটি অস্ত্র তৈরি করেছিল মাছ ধরবার ক্ষেত্রে। এইসব অস্ত্র-শস্ত্র আবিষ্কার হবার পর গবেষকদের ধারণা হয়েছে যে, পশু-শিকারের চেয়ে মৎস্যশিকারেই বোধ হয় ওদের আনন্দ ছিল বেশী।

পুরুষরা তো সারা দিন ঘুরে বেড়াত নদীর ধারে ধারে, আর মহিলারা সময় কাটাত জ্বার ধারে বসে পোশাক-পরিচ্ছদ তৈরি করে। চক্ৰমকি পাথরের ধারালো ছুরি দিয়ে পশুর চামড়া কেটে ওরা সুন্দর সুন্দর পোশাক তৈরি করত। অনেক সময় দেগুলিকে আবার চিত্রিত করত ছোট ছোট ছেঁদা-করা ঝিনুক বসিয়ে। এই থেকে এ যুগের মেয়েদেরও শিল্পীমনোভঙ্গির আভাস পাওয়া যায় এবং শিল্প সত্ত্বে ওরা যে কতটা সজাগ ছিল তাও বেশ বোঝা যায়।

মেয়েদের দেলাইয়ের অঁচগুলি প্রায়ই হারিয়ে যেত, তাই ওরা সেগুলি অতি যত্নে পাখীর কাঁপা হাড়ের ভেতর পুরে রাখত। জামায় ওরা হাড়ের বোতামও ব্যবহার করত কখনও কখনও হাতীর দাঁতের তৈরি আলপিনের মত এক প্রকার স্বয়ং জিনিষ ও জামা আটকাবার ক্ষেত্রে ব্যবহার করত। এই সব জিনিষের নমুনা ব্রিটিশ মিউজিয়ামে অতি যত্নে রক্ষিত আছে।

প্রত্নতত্ত্ববিদেরা বলেন, প্রস্তর-যুগের অধিবাসীদের মধ্যে ম্যাগডালেনীয়দের শিল্প-বোধ ছিল অন্ত্যস্ত উন্নত। অপরাপর শিল্পের চেয়ে ওদের চিত্র-কলাই আমাদের দৃষ্টি বশী আকর্ষণ করে। পাহাড়ের গায়ে ও গুহায় আঁকা ছবিগুলি ওদের সহজাত শিল্প-প্রবৃত্তির স্পষ্ট পরিচয় দেয়। ইতিহাস ওদের সত্ত্বে বিশেষ কিছু না বললেও ওদের আঁকা ছবিগুলি, আঁকবার সরঞ্জাম, ওদের ব্যবহার করা অস্ত্র-শস্ত্র ও পোশাক-পরিচ্ছদ ওদের জীবনযাপন প্রণালী ও মানসিক প্রবণতা সত্ত্বে অনেক তথ্যই আমাদের জানিয়ে দেয়।

চক্ৰমকি পাথরের যন্ত্রপাতি ও ব্যবহারযোগ্য জিনিষের উপর ধোঁদাই করা ছবিগুলি দেখলে বেশ বোঝা যায়, কত গভীর ছিল ওদের শিল্পানুরাগ। এগুলো থেকে বুঝতে পারা যায়, ওরা শুধু চিত্র-কলার অহুয়ানী ছিল না, ভাঙ্কর্যেও ছিল এদের দক্ষতা। ক্রমে ওরা ভাঙ্কর্যে এত নিপুণ হয়ে উঠেছিল যে, ওদের ধোঁদাই করা চিত্রগুলির সঙ্গে জীবন্ত প্রাণীদের কোন বৈসাদৃশ্য নজরে পড়ে না। সর্বমোট আঁচড়ে ধোঁদাই করা ছবিকে নিখুঁত করবার ক্ষেত্রে ছিল ওদের অক্লান্ত চেষ্টা।

নীচের বুনো-মহিষের ছবিটি (নং ১) ভাল করে লক্ষ্য করলে ওদের ভাঙ্কর্যের আদিকটুকু সত্ত্বে কিছু ধারণা জন্মাতে পারে। এর গায়ের লোমগুলি আঁকা হয়েছে কতকগুলি বিচ্ছিন্ন খাড়া খাড়া আঁচড় দিয়ে। লোমগুলি এই ভাবে আঁকায় জীবটর

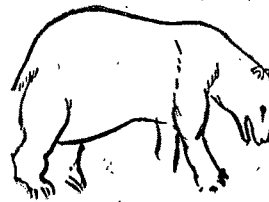


১ নং চিত্র

দৈহিক বৈশিষ্ট্য খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ছোট ছোট কাঁকগুলিকে নিখুঁত করবার ক্ষেত্রে ওরা সময়ের সময়ে এত সূক্ষ্ম আঁচড় দিয়েছে যে, আজকালকার খুব জোরাল বিজলী বাতির আলোতেও সেগুলি স্পষ্ট দেখা যায় না।

কোন জীবন্ত প্রাণী দেখলে আমাদের মনে তার আকৃতির যে রেখাপাত হয়, অসমঞ্জস রেখা দিয়ে ছবিগুলি তৈরী অর্থাৎ জীবন্ত করবার ক্ষেত্রে ওরা যথেষ্ট চেষ্টা করত। নিখুঁত রেখার টানে স্পষ্ট হয়ে উঠত প্রত্যেকটি পশুর গতি-তন্দ্রা ও প্রকৃতির বিশেষত্ব।

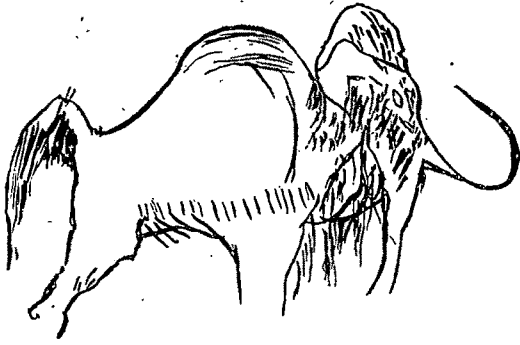
লা মাদেলে (La Madeleine) গুহার গুহা-ভল্লুক ও ম্যামথের ছবি ছটিকে ভাল করে লক্ষ্য করলে বোঝা যায়, ভালুকটি উগ্র প্রকৃতির, আর ম্যামথটি আক্রমণোদ্ভূত (নং ২ ও ৩)। এই ধরনের ছবি এর চেয়ে নিখুঁত করে আঁকা খুব



২ নং চিত্র

কঠিন বলে মনে হয়। এই ছবিগুলি দেখলে ওদের পর্যবেক্ষণ-শক্তি ও নিপুণ রেখা-সংযোজন-শক্তির প্রশংসা করতে হয়।

চক্ৰমকি পাথরের ছুরি দিয়ে পাথর বা হাতের ওপর নিখুঁত ছবি আঁকা বেশ একটু অসম্ভাব্য ব্যাপার। তাই ওরা



৩ নং চিত্র

অত্যন্ত সতর্ক হয়ে থাকত ছবি আঁকবার সময়। ওরা জানত, অসতর্কতার কোন অপ্রয়োজনীয় রেখাপাত হলে তা মুছে কেলা কত কষ্টসাধ্য। এই সতর্কতার ফলেই এদের ছবিতে অপ্রয়োজনীয় রেখা বড় একটা দেখা যায় না।

এর আরও একটি কারণ আছে। কোন আদর্শ বা মডেল থেকে ওরা ছবি আঁকত না। শিল্পী যে জীবটির ছবি আঁকবার ইচ্ছা করত সেই জীবটিকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, কখনও বা দিনের পর দিন অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে দেখত। দেখবার সময় গভীরভাবে চিন্তা করত রেখার ধরণ ও ভঙ্গী সহজে। দেখতে দেখতে জীবটির সম্পূর্ণ ছবিটি যখন মনে গভীর রেখাপাত করত তখনই ওরা সেই জীবটির ছবি আঁকতে বলত।

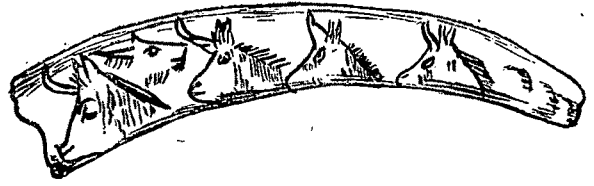
সুইজারল্যান্ডের কেসলারসকে শস্প-ভক্ষণরত বলগা হরিণটি প্রস্তর-যুগের ভাস্কর্যের একটি অণুর্বি নিদর্শন (নং ৪)।



৪ নং চিত্র

এই ছবিটিতে একটি নতুন আঙ্গিকের সহান পাওয়া যায়। ছোট বড় সরল-রেখার বদলে আঁকা-বাঁকা রেখা দিয়ে মুক্তিটির পায়ের লোম দেখানো হয়েছে। পায়ের অবস্থান দেখে বোঝা যায়, জীবটি ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে। যে-কোন শিল্পরসিক এই মুক্তিটি দেখে বীকার করবেন, এর চেয়ে নিখুঁত ও প্রাণবন্ত মুক্তি খোঁধাই করা অসম্ভব।

নীচের ছবিটিতে বলগা হরিণের শিরের উপর হরিণের যে মুখগুলি খোঁধাই করা হয়েছে জীবন্ত প্রাণীর মুখের সঙ্গে সেগুলির তফাৎ আছে বলে মনে হয় না (নং ৫)। একটি জিনিষ কিন্তু এতে লক্ষ্য করবার আছে। পাঁচটি মুখের



৫ নং চিত্র

কোনটির সঙ্গে কোনটির মিল নেই অথচ প্রত্যেকটি মুখেরই একটি বিশেষত্ব আছে।

বড় বড় ছবি আঁকবার সময় ওরা যে পরিশ্রম ও সতর্কতা অবলম্বন করত ছোট ছোট ছবি আঁকবার সময়ও তার এতটুকু শৈথিল্য দেখা যায় নি। শিল্পায়ুরাগ যে ছিল এদের রক্তমজ্জাগত তার প্রমাণ এই ছবিগুলি। এই অহুরাগের জন্মেই ওরা কিছু আঁকবার সময় এতটুকু অবহেলা বা অসতর্কতা দেখাত না।

নীচের ছবিটি লক্ষ্য করলে বেশ বোঝা যায়, এটি অত্যন্ত ভাড়াভাড়ি মাত্র কয়েকটি রেখার সমাবেশে আঁকা হয়েছে। এতে কোন আড়ম্বর না থাকলেও সৈশ্ব প্রদেশের খোঁড়ার দেহগত বৈশিষ্ট্যটুকু বজায় আছে (নং ৬)।



৬ নং চিত্র

দিন যতই যেতে লাগল শিল্পীরা ততই নিপুণ হয়ে উঠতে লাগল রেখাঙ্কনে। ক্রমে রেখার সাহায্যেই ওরা দেখাতে শুরু করে দিলে আলো-ছায়ার (light and shade) খেলা। আজ-বাজে রেখা না টেনে সামান্য একটু ছোঁয়া (touch) দিয়েই এই আলো-ছায়ার খেলা দেখিয়ে ওরা ছবিগুলিকে প্রাণবন্ত করে তুলত।

গভীর রেখাবিচ্ছাদে ছবি আঁকা ছিল আরগ্নেশীয় শিল্পীদের রেখা-চিত্রের প্রধান আঙ্গিক। ক্রমে ক্রমে ওদের শিল্প-বোধ যতই গভীর হতে লাগল ততই ছবিগুলিকে আকর্ষণযোগ্য করবার দিকে ওদের ঝোঁক বাড়তে লাগল। স্বল্পশিল্পবোধ তখনও কিন্তু ওদের মনে জাগে নি। তাই দৌলখ্যাগ্রীতি ও শিল্পীমনের অচূড়িত ভাঙনার কোন এক অসতর্ক মুহূর্তে, ওরা রেখা-চিত্রের বেষ্টনী-রেখার তেজস্বরং-লেপা শুরু করে দিলে।

ম্যাগডালেনিয় যুগে কিন্তু সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়েছিল এই

আঙ্গিকের। রং-লেপা (Silhouette) ছবিগুলি ওরা কিন্তু আঁকত রঙের ফুটকি দিয়ে। কোন কোন ছবিতে আবার সৰু-মোটী ফুটকি দিয়ে আলো-ছায়ার খেলা দেখাতে চেষ্টা করেছে। এই ক্রমোন্নতি দেখে মনে হয়, রঙের তুলি ধরার পর রঙের ঘাছ দেখাতে ওরা যেন সুরু করে দিয়েছিল।

যে-কোন আঙ্গিকের ছবি ওরা আঁকুক না কেন, সব সময়ই ওদের লক্ষ্য থাকতো ছবিটিকে নিখুঁত করার দিকে। কোন কোন ছবিতে হালকা রঙের স্পর্শে বেঁটনী-রেখাটী একে ভেতরেও লেপে দিত হালকা রং। এই সব ছবির জায়গায় জায়গায় আবার পতীর রঙের স্পর্শ দিয়ে আলো-ছায়ার খেলা দেখিয়েছে।

কোন কোন ছবির বহিবেষ্টনীটুকু কালো রং দিয়ে একে ভেতরে দিয়েছে অল্প রঙের স্পর্শ। এই আঙ্গিকের ছবিগুলি এত আকর্ষণযোগ্য যে সম্পূর্ণ ছবিটির ওপর দর্শকের দৃষ্টি পুরোপুরি আটকে যায়।

এক-রঙা ছবিগুলিতেও ক্রমে ওরা আলো-ছায়ার খেলা দেখাতে সুরু করে দিলে। এই ধরনের ছবিগুলিতে রঙ দেওয়ার পর চক্ষু মকি পাথরের ছুরি দিয়ে জায়গায় জায়গায় টেঁচে হালকা করে রঙের পরশ দিয়েছে। ফলে সমগ্র ছবিটিতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে আলো-ছায়ার খেলা।

রঙের-নেশা ওদের এমন করে পেয়ে বলল যে, খোঁদাই-করা মূর্তিগুলিতেও রঙ দেওয়ার একটা ঝোঁক এদের চেপে গেল। এতে মূর্তিগুলি বেশ সুন্দরই দেখাত। রঙের স্পর্শে ছবি ও খোঁদাই করা মূর্তিগুলি যত সুদৃষ্ট হতে লাগল ততই ওদের নানা রং ব্যবহার করবার আগ্রহ উত্তরোত্তর বেড়ে উঠল।

সে যুগের যে-ক'ট বহু-রঙা ছবি ও-ভাস্কর্যের সন্ধান আজ পর্যন্ত পাওয়া গেছে তার সব কয়টাই অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও শিল্প-চাতুর্যপূর্ণ। এই সব ছবিতে ওরা ব্যবহার করেছে মাত্র চার-পাঁচটি রং—লাল, কালো, পাটকিলে, আর হলদে।

রং ব্যবহার করতে করতে ওরা হঠাৎ আবিষ্কার করলে—কোন একটি বিশেষ রঙের ওপর অল্প রঙের ছায়া দেওয়াও সম্ভবপর এবং এতে ছবিগুলির রূপান্তর সাধন হয়। এই আঙ্গিক আবিষ্কৃত হবার পর শিল্পীরা পুরোনো পছা ছেড়ে দিয়ে নতুন আঙ্গিকের ওপরই মনোযোগ দিলে। এই ধরনের কতকগুলি ছবির অন্তর্ভুক্ত এখনও আছে। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, আঁকবার সময় ওরা যেছায়ার রং ব্যবহার করেছিল সেই রং এখনও কিছুমাত্র ক্যাকাশে হয় নি।

প্রাগৈতিহাসিক যুগেই মিশরবাদীদের শিল্প খুব উন্নতিলাভ করেছিল। ওদের বিশেষ লক্ষ্য ছিল অলঙ্করণের (Decoration) দিকে। বহু-রঙা ছবিগুলির শ্রেষ্ঠত্বের দিক দিয়ে বিচার করতে গেলে ম্যাগডালেনীয় শিল্পীদের ছবিগুলি অত্যন্ত সাদাসিধে হলেও মিশরীয় শিল্পীদের ছবির চেয়ে অধিকতর আকর্ষণীয়।

স্পেনের আলটামিরা গুহার ভেতর কয়েকটি বুনোমহিষের

ছবির সন্ধান পাওয়া গেছে। এখনও এগুলি প্রায় অক্ষত অবস্থাতেই আছে। কোনটির রং এতটুকু বয়ে পড়ে নি বা ক্যাকাশে হয় নি।

ফঁ-জ-গিয় গুহার গায়ে কতকগুলি সুন্দর সুন্দর জীব-জন্তুর ছবির সন্ধান পাওয়া গেছে। এগুলির প্রায় সব কয়টাই বহু-রঙা।

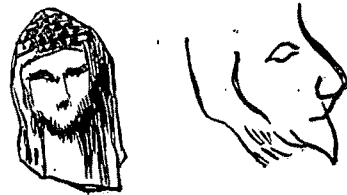
এই যুগের শিল্পীরা মাটির মূর্তি তৈরি করতেও অত্যন্ত ছিল। ত্যুক দো'হুবের (Tuc d'Audoubert) গুহার কাদার তৈরি ছোট বুনোমহিষের মূর্তি পাওয়া গেছে। এ ছবিতে অনেকটা জীবন্ত মহিষেরই মত। এমন নিপুণ হস্তে এ ছবি তৈরি করা হয়েছে যে হঠাৎ দেখলে জীবন্ত মহিষ বলেই ভ্রম হয়। বর্তমান যুগের শিল্পীরা তাই এগুলিকে যুগশিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলে স্বীকার করেন। এই মূর্তি দুটির কাছে আরও একটি অসম্পূর্ণ মূর্তি দেখা যায়। এখনও এর গায়ে শিল্পীর আঙুলের ছাপ বিদ্যমান। এ যুগের শিল্পীদের যে শিল্পের সব দিকেই সজাগ দৃষ্টি ছিল তা বেশ বোঝা যায়।

ক্যাপ-ব্লাক গুহার প্রায় সাত ফুট লম্বা কয়েকটি চুন-পাথরের খোঁদাই-করা খোঁড়ার মূর্তি পাওয়া গেছে। অধ্যাপক অসুবর্ণ বলেন, এ গুলি ম্যাগডালেনীয় শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

এই যুগের শিল্পীদের শিল্প-বোধ এত উন্নত ছিল যে কেবল গুহা-চিত্র বা ভাস্কর্যে ওরা সন্তুষ্ট হতে পারে নি। ব্যবহারযোগ্য জিনিষের ওপরও শিল্প-চাতুর্য দেখাতে চেষ্টা করেছে। অস্ত্র-শস্ত্রের বাটের ওপর খোঁদাই করেছে নানা জীব-জন্তুর মূর্তি। এই ধরনের শিল্পকে বাংলায় বলা যেতে পারে চলমান শিল্প। ইংরেজীতে বলে মোবাইল (mobile) বা চ্যাটেল (chattel) আর্ট।

এই যুগের শিল্পীরা পশু-মূর্তি আঁকতে সিদ্ধ-হস্ত ছিল। কখনও কখনও ওরা মাছ, হাঁস, বক, বহু-মোরগ প্রভৃতির ছবিও আঁকেছে। এগুলি কিন্তু মোটেই শিল্প-পদবাচ্য নয়।

এই সম্পর্কে একটি জিনিষ কিন্তু লক্ষ্য করবার আছে। এই সব শিকারী-শিল্পীরা কোন গাছের ছবি আঁকে নি বা খোঁদাইও করে নি। মানুষের মূর্তিও ওরা আঁকেছে খুব কম। যে কয়টির সন্ধান পাওয়া গেছে সেগুলি আবার শিল্প-দৃষ্টি হিসাবে খুব উচ্চ দরের (নং ৭)। মানুষের মূর্তি আঁকবার কায়দাটুকু বোধ হয়



৭ নং চিত্র

ওরা ভাল করে আরও করতে পারে নি, অনেক গবেষকের এইরূপ অনুমান। যে সব মানুষের ছবি ওরা আঁকেছে সেগুলির

দৈনিক গঠন মাহুষের মত হলেও যুগ্ম পক্ষর যুগ্মোদ পড়ানো।
এগুলির প্রায় সব কয়টিতেই আবার নাচের ভঙ্গী বিদ্যমান।
তাই এগুলিকে ব্যঙ্গ-চিত্রের নমুনা হিসাবে ধরে নেওয়াই ভাল
(নং ৮)।

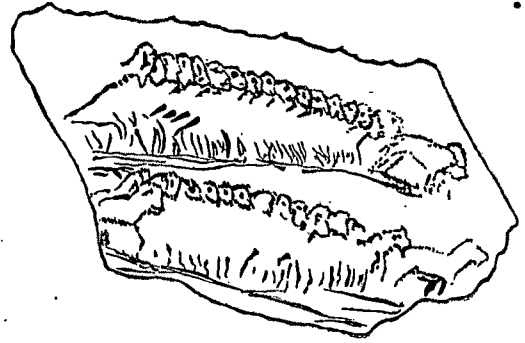


৮ নং চিত্র

সাধারণতঃ দেখা যায়, ম্যাগডালেনী শিল্পীদের আঁকা যে
সব ছবির সন্ধান আজ পর্যন্ত পাওয়া গেছে তার অধিকাংশই
জীব-জন্তুর ছবি। এর প্রধান কারণ, ওদের মধ্যে প্রচলিত
ডাকিনী-বিজা বা যাহু-বিদ্যার অঙ্গ হিসেবে প্রায় সমস্ত শিকারী-
শিল্পীকেই পক্ষর ছবি আঁকার অভ্যাস হতে হ'ত। জীব-জন্তুর
মূর্তি ছাড়া আর যা কিছু ওরা এঁকেছে তা খেরালী শিল্পীর
অবসর বিনোদনের খেলা মাত্র। তাই এই সব ছবি আঁকার
সময় তারা খুব বেশী যত্ন নিত না।

এই যুগের কোন কোন শিল্পী দৃশ্যচিত্র (landscape)
আঁকতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু সেগুলি ওরা বিশেষ মনোযোগ
দিয়ে আঁকে নি। যে কয়টি আবিষ্কৃত হয়েছে, মনে হয় সেগুলি
শিল্পীর এই ধরনের ছবির প্রাথমিক ছবির নমুনা (নং ৯)।

এই যুগের শিল্পের সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয়—প্রায় সব ক'টি
জীব-জন্তুর ছবির একদিকেরই প্রতিকৃতি (profile) দেখান
হয়েছে। এর থেকে অনুমান করা যায়, ওরা ছবি আঁকার
সময় জীবগুলিকে লক্ষ্য করত এক পাশ থেকে। এইভাবে



৯ নং চিত্র

দেখতে দেখতে ওরা শুধু এক পাশের প্রতিকৃতি আঁকতেই
অভ্যস্ত হয়েছিল। সাধনে থেকে দেখে চিত্রে রেখায়িত
করবার আঙ্গিকটুকু হয়ত ওদের একেবারে অজানা ছিল।

হাড়ের ওপর মূর্তি খোদাই করার ষাঁক কেন যে ওদের
চেপেছিল তা আল্টামিরা গুহার ছবিটি দেখলে কতকটা
হয়ত অনুমান করা যেতে পারে। এই গুহার ভিতর হাড়ের
ওপর খোদাই করা একটি হরিণের মূর্তি পাওয়া গেছে।
গুহার গায়েও কিছু ঠিক সেই রকমের একটি মূর্তি আঁকা
আছে। গবেষকরা তাই অনুমান করেন, গুহার বাইরে বসে
জীবটিকে লক্ষ্য করবার সময় শিল্পীরা বোধ হয় হাড়ের ওপর
তার একটি খসড়া (sketch) করে নিত। পরে গুহার
গায়ে আঁকত সেই ছবিরই অঙ্কলিপি। হাড়ের ওপর খোদাই-
করা মূর্তিটিকে ভাঙন ব্যবহার করত মডেল হিসেবে।

ম্যাগডালেনী যুগের অবসানের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু
এই যুগের শিল্পের অবসান ঘটে। কালক্রমে শিল্পীদের হস্ত
শিল্প-বোধে ভাটা পড়তে থাকে, ওদের শিল্পের সজীবতাও
হান হতে থাকে। তবে এই যুগের যে সব গুহাচিত্র ও
ভাস্কর্যের সন্ধান পাওয়া গেছে তার অধিকাংশই যে পৃথিবীর
শিল্পকলার ভাঙারে অমূল্য সম্পদ হিসেবেই গণ্য হবে, সে
বিষয়ে সন্দেহ নেই।

যুম

শ্রীমৃণালকান্তি দাশ

ঐ চেয়ে দেখ ভারায় ভারায়
তোমার আকাশে স্বপ্ন ছড়ায়,
মেল গো নয়ন ভ্রাতার।
নিশার ঘণ্টা ঘুরে বেজে যায়
শোন কান পেতে রাতের গান।

চেয়ে দেখ রাত কি যে মোহময়,
জ্যোৎস্না করিছে দূর বনময়।
উষাও সময়—স্বপ্ন মিলায়,
ঘুমের গহনে রজনী যায়,
মোহময় মধু রজনী যায়।

আজ—আগামী কাল

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

১০

ফিরে এসে শ্রান্ত ক্লান্ত অবসন্ন দেখে। বাড়িটা শ্রান্তি দূর করবার মত নয়—তবু এই হ'ল তার আশ্রয়।...

দোতলায় উঠবার মুখে একটি উচ্ছ্বসিত হাসির সঙ্গে আরও কয়েকটি পলা শোনা গেল। বাইরের কেউ এসেছেন।

একটি বড় মোমবাতি জ্বলছে ঘরে—ঘরটা বেশ আলোকিত হয়েছে। মাহুরের ওপর বসে ছ'তিন জন যুবক আর শুভা একটা বড় কলাইকরা প্লেট থেকে খাবার ভুলে নিয়ে খাচ্ছে—পাশের প্রকাণ্ড শালপাতার চৌঙাতেও রয়েছে খাবার। খাবার নিয়ে চলছে ছেলেমা'হুসি—কাড়াকাড়ি—আর চলছে গল্প আর হাসি। অন্তরঙ্গতার পরিমণ্ডলে বাতিটাকে বেশী উজ্জ্বল মনে হচ্ছে আর ঘরের শোকসুন্ধ নির্জনতাটা উপলব্ধি হচ্ছে না।

প্রশান্তকে দেখে শুভা কোলাহল করে উঠল, এস কমরেড—বসে পড়। তার পর যুবক তিনটির পানে ফিরে ওর পরিচয় সাধন করিয়ে দিলে।

প্রশান্ত আপন গ্রহণ করলে। বাতির আলোর অত্যন্ত রক্ষ চেহারার মাহুরকেও কিছু কোমল বোধ হয়—একজনকে ওরই মধ্যে সমগোত্রীয় মনে হ'ল প্রশান্তর। আর ছ'জন নিভাস্ত পথে-বেড়ানো পৌছের চেহারা। যেমন উষ্ণবুক চুল—ভেমনি, আঁধা ময়লা পাঞ্জাবী গায়ে—মুখ রক্ষ—আর খাবার খাওয়ার যুহুর্ভে চোখ দুটিতে বাদ্য-লালসার চিহ্ন ফুটে রয়েছে। অতীন আর চারু ওদের নাম। কমরেড অতীন—কমরেড চারু—পদবীপুঙ্খ উল্লেখের প্রয়োজন নাই। কমরেড অবন্তীকে মোটের ওপর মন্দ লাগল না। বেশবাসে রুচি আছে—আর মুখে আছে লালিত্য। মাথার একপাশে টেরি কাটা—ভেল কিংবা লাইমজুসের কল্যাণে চুলগুলি চকচক করছে।...সে-ই বললে, আরম্ভ কর কমরেড—নইলে হ্যাড-নটদের দলে পড়বে।

শুভা বললে, এটাকে ভোজও বলতে পার। অবন্তী মীরাট যাচ্ছে কাল চাকরি নিয়ে—তারই খাওয়া।

কোন আপিস? জিজ্ঞাসা করলে প্রশান্ত।

মিলিটারি একাউন্টস্। মাইনেটা মন্দ নয়—আর শুনেছি—অনেক বাঙালীও আছে ওখানে।

অতীন বললে, বাঙালী না থাকলেই বা কি? দিস ওয়ার্ল্ড ইজ আওয়ার হোম।

চারু বললে, পার তো আমাদেরও টেনে নিও। যুদ্ধের পর পৃথিবীটা বেশী অশান্ত হয়ে উঠেছে।

শুভা বললে, হোক অশান্ত—নব বিধান রচনার পক্ষে

এই তো সুযোগ। আরে—হাত গুটিয়ে বসে রইলে কেন—নাও। ছুখানা সিগাড়া ও প্রশান্তর হাতে ভুলে দিলে।

চারু বললে, সন্ধ্যা বেলায় এই জলখাবার খেয়ে আমি কিন্তু রাত কাটাতে রাজী নই।

শুভা বললে, আচ্ছ রাহাখর থেকে ছুটি নিরেছি কমরেড—উঠুন জলবে না।

চারু বললে, বেশ তো—তোমাকে ছুটি দেওয়া গেল। কি যে অতীন—খিচুড়িটা নামাডে পারবে?

অতীন বললে, কেন পারব না—কিন্তু কমরেড-খিচুড়ি নয়—রীতি মত যি চাই।

অবন্তী বললে, জগাখিচুড়ি বল। তার চেয়ে ব্যবস্থা যখন করবেই—আর একটু ওঠ। যি ভাত—খাটি বুর্জোয়া রীতিতে।

একটা হর্ষধ্বনি উঠল। অতীন ছ'হাতে চাপড়ালে মেঝে—চারু দিলে করতালি—শুভা চাপড়ালে অবন্তীর পিঠ। প্রশান্তর মুখ ঈষৎ পঙ্কীর হ'ল। মনে হ'ল ওরা অত্যন্ত ছেলেমা'হুস।

শুভা বক্র দৃষ্টিতে প্রশান্তর পানে চেয়ে বললে,—যি ভাত তোমার মনঃপূত নয়—প্রশান্ত?

অমৃতে আর কার অরুচি।

ব্যস—ব্যস—। অতীন আর একটা চাপড় মারলে মেঝেতে।

প্রশান্ত বললে, কিন্তু...রসনাকে প্রস্তর দেওয়া উচিত হবে কি? যে কোন ছিদ্রপথে—একটু আরাম প্রবেশ করলে—

অবন্তী বললে, পিউরিটানদের মত কথা বলছ কমরেড।

অতীন বললে, যা হাতে আসছে—তাকে না নিয়ে জাঁক করব এত বড় বোকা আমরা নই। কাল হয়ত পাশ্চাত্য ভাত জুটবে না—তা বলে আজকের ভোজ ছেড়ে দেব। একটু থেমে বললে—আমরা হচ্ছি জানী লোক—বোকাদের টাকায় ভোজ বাগিয়ে বুদ্ধি প্রকাশ করতে ভালবাসি।

শুভা অবন্তীর কাঁধে যুহু চাপড় মেরে বললে, শুনলে তো—প্রকারান্তরে ও তোমাকে বোকা বলছে।

চারু বললে—কাজের কথা কও। একটা কাগজ আর পেলিস দাও—কদ্দটা করে ফেলি চটপট।

অবন্তী বুকপকেট থেকে ছোট নোটবই আর কাউন্টেন বার করে বললে, বল। কলম উত্তত করে সে বললে, কিন্তু ভাল চাল জোগাড় করবে কোথায়?

চারু বললে, সে ভার আমার। র‍্যাশন হয়েছে বলে কলকাতায় পোলাওয়ার চাল মেলে না—এ কথা ভুলে যাও।

র‍্যাকমার্কেট তো! তাতে আমি রাজী নই। অবন্তী নোটবই বন্ধ করলে।

অতীন বললে, আরে—চালের অভাবে গোলাও বন্ধ হবে—বাই নো মীনু। এক জায়গার আছে চাল—ভায়া দামে পাওয়া যাবে। আলো চাল—গম্ভটা নেই।

চারু বললে, ওতেই হবে।

অবন্তী বললে, যা ব্যাপার তাতে রাজিতে বাড়ি ফেরা সম্ভব বলে বোধ হয় না।

শুভা বললে, নাই বা ফিরলে।

অতীন বললে, এর আগে যেন কোনদিন এখানে রাত কাটাও নি? তুমিও কম পিউরিটান নও কমরেড। হাসতে হাসতে সে প্রশান্তের পানে ফিরে চাইলে।

ভাবটা তোমার হয়ে—প্রভাতেরটা আমিই দিলাম।

একটু ধেমেলি বললে, চাকরি করেন তো?

প্রশান্ত বললে, না।

ও—মাথা চুলকে সে একবার কাসলে।

চারু বললে, আর একটা খ্যাঁচ পাওনা রইল অতীন, নোটবইয়ে টুকে রাখ।

প্রশান্ত বললে, চাকরি পাই যদি—

পাবেই চাকরি, বাংলাদেশের পাস করা ছেলে চাকরি পাবে না ত পাবে কে শুনি। চাকরি তুমি পাবেই।

চারুর অদ্ভুত যুক্তিতে প্রশান্ত হেসে ফেললে। বললে, শুধু বাংলার দোষ দিও না। কিন্তু তুমিও ত চাকরি করছ না।

করব বৈকি—কলেজ থেকে বার হই আগে।

কলেজ!—প্রশান্ত একটু অবাক হ'ল। এই ছন্নছাড়া চেহারার ছেলেটি কলেজে পড়ে?—বিত্তহীন পথে-খোরা ছেলে বলেই সে প্রথম দর্শনে একে অবহেলা করেছিল।

কিন্তু কলেজ থেকে বেরিয়ে চাকরিই বা করবে কেন তুমি? বিষয়কে সে এইভাবে প্রকাশ করলে।

চারু বললে, মহাজনদের পুছাই জানি—তাই বলেছি। হাঁ অবিধা হলে অল্প কিছুও করতে পারি। তবে সেই অল্প কিছুটা যেহেতু জানি না কি—

ওঠ—ওঠ—যথেষ্ট বধাঘো হয়েচে—। অতীন তাকে একটা ঠেলা দিলে।

কর্দটা কিন্তু পাই নি। আর—

অবন্তী পকেট থেকে একখানি দশ টাকার নোট বার করে তার হাতে দিলে।

শুভা বললে, সেরখানেক বি আর এলাচ লবঙ্গ কিছুমিস সামান্য আনবে। অতীন বাজারটা তুমি করবে আর চাল।

টাকা নিয়ে ছ'জনে বার হয়ে গেল।

মিষ্টির ঠোঙাটা হাতে নিয়ে শুভাও ঠাড়ালে। বললে, বুড়িকে মিষ্টি খাইয়ে আসি—বোস কমরেড।

বাড়িটা আধাআধি পুড়ে গেছে—আলোর জোর বেড়েছে। ছ'জনকে ছ'জনে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। চূপ করে থাক।

অশোভন। ছ'জনের চিত্তার ধারা তিরস্রাণী বলে কয়েকটি মিনিট নীরবে কেটে গেল।

প্রশান্ত ভাবছে—অবন্তী ভাগ্যবান। আত্মকের রাজিটা ওরই নিছক বলতে পারা যায়।—এই নিরানন্দ পুরীতে আনন্দ-সৃষ্টি করেছে সে।

অবন্তী ভাবছে, কালকের কথা। নির্বাসিত দূরদেশ—একা—অজানা আপিস। চাকরির জগতে এই তার প্রথম প্রবেশ—সহ হবে ত।

হঠাৎ সে প্রশান্তকে প্রশ্ন করলে, আপনি চাকরি করেছেন কখনও?

প্রশান্ত একটু অবাক হ'ল তার প্রশ্নের ধরণে। ছ'জনে মুখোমুখি বসেই—কথার সুর পালটে গেল। আপনি সম্বোধন এই প্রথম অবন্তীর মুখ থেকে বেরল। এটা কি চাকরি পাওয়ার সুর—অজ্ঞতার সুর? বললে, হ্যাঁ—তবে বেশী দিন নয়।

অবন্তী বললে, চাকরি করা শক্ত—না চাকরি রাখা শক্ত? এ প্রশ্নও অদ্ভুত। প্রশান্ত বললে, আমি দশ-বার দিনের বেশী চাকরি রাখতে পারি নি। তবে সকলের হাত ত সমান নয়।

অবন্তী মাথা নাড়লে। ঠিক বলেছেন আপনি। চাকরিটা বলতে গেলে আমি নিচ্ছি না—সংসারই নেওয়াচ্ছে।

তাই নেওয়ার। সংসার সাহুযের কাছে দাবি করে—পাওয়ার বেশী—অনেক বেশী। অভিজ্ঞজনের মত প্রশান্ত জবাব দিলে।

আপনার সঙ্গে আমার মিলছে। আপনার ভাইরা নিশ্চয় ইঞ্জল কলেজে পড়ে—বোনেরা বিবাহযোগ্য। বাবা ইন্ডিয়ালিড—আর মা নেই।—ঘরেআছেন বিববা পিসি আর নিফন্দী কাকা।

প্রশান্ত হেসে বললে, সব না মিলুক কতক মেলে।

তা হলে আমিই বা চাকরি রাখব কি করে? চিন্তায় ওর জ হুট কুঞ্চিত হয়ে উঠল।

তা জানি না। তবে চাকরির মাইনে হাতে না পেয়েও ভোজের ব্যবস্থা করতে পারেন যখন—কথাটা বোঁচার মত নিজের কানেই বেহুরো বাজতে ও সহসা ধেমেল গেল।

অবন্তী বললে, পয়সার চেয়ে বন্ধুবান্ধবদের দাবি অগ্রগণ্য নয় কি? ওদের সহ থেকে যে আনন্দ আমি পেয়েছি তার মূল্যও অন্তত দেব না।

প্রশান্ত চূপ করে রইল। মনে মনে বললে, পৃথিবীতে সব জিনিসেরই দাম দিতে হয়। সে মূল্য ন্যায্য কিংবা অন্যায় সে তা'আর সাম্যবাদ ঠিক করে দিচ্ছে না। বিশেষ করে এই ঐতিহ্যের ব্যাপারটার।

শুভা ফিরে এল। বললে, অবন্তী, মা তোমাকে ডাকছেন। অবন্তী শুভার সাহায্য না নিয়ে ভিতরে চলে গেল। অন্দর-

মহল তার অপরিচিত নয়—স্তম্ভের মায়ের সঙ্গেও স্নেহমধুর একটু সঞ্চয় যে বিদ্যমান সে অনুমান করা বিচিত্র নয়।

প্রশান্ত বললে, আজ আমি আসি শুভা?

আসবে? কোথায় আসবে? ইস তোমার যুগ এত শুকিয়ে গেছে। শরীর ধারাপ হ'ল নাকি? শুভা এগিয়ে এসে ওর ডান হাতখানি তুলে নিলে।

তুমি নাড়ী দেখতেও জান?

জানি—অত্যন্ত চঞ্চল তোমার নাড়ি—বায়ুটা বেড়েছে। গভীরভাবে শুভা বললে।

আর কিছু বুঝতে পারছ না? কোমল স্বরে প্রশান্ত প্রশ্ন করলে।

আরও কিছু? হ—তাও আছে, কিন্তু সে রোগের নিদান যে শাস্ত্রে আছে—তার ব্যবস্থা আপাতত চলবে না। শুভা অতি কষ্টে হাসি টিপে গভীর ভাবে মুখ ফিরিয়ে নিলে।

প্রশান্তর বুকে প্রবল রক্তোচ্ছ্বাস নেমে এসে—সহসা ও শুভার হাতখানা চেপে ধরে তীষণ বেগে নিজের দিকে আকর্ষণ করতে করতে বলে উঠল, তুমি জান শুভা—তুমি জান।

শুভা সে বেগের টান সহ্য করতে না পেরে তার বক্ষোন্মল হ'ল। কিন্তু সে কোণ প্রকাশ করলে না—বা নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার জন্য অথবা বলপ্রকাশের অভিনয় করলে না।

কয়েকটি মুহূর্ত। শুভার কপোলের উপর উষ্ণ নিখাদ অনুভূত হতেই সে অত্যন্ত সহজ ভাবে প্রশান্তর হাত ছাড়িয়ে সোজা হয়ে বসলে—বিস্তৃত কাপড়খানা গুছিয়ে নিয়ে বসলে, আমি জানি। দেহের দাবিটা অস্বীকার করে লাভ নেই কমরেড কিন্তু মনকে ওর থেকে আলাদা করে রাখাই ভাল।

ওর এই নিরুদ্ভাপ উত্তরে প্রশান্তর রক্ত কয়েক ডিগ্রি নেমে এসে। এত বড় কথা বললে শুভা। শুভান্তঃপুরের কোন বাঙালী মেয়েই এ ধরনের কথা উচ্চারণ করতে পারে না। ও সন্তুষ্ট হয়ে হাতখানি গুটিয়ে নিলে।

শুভা বুঝলে এই উত্তর প্রশান্তর মনে কি প্রতিফ্রিয়া এনেছে। গৃহধর্ম বলতে যা বোঝায়—ও জিনিস তার অন্তর্ভুক্ত নয়।...মন যুক্ত হোক আর নাই হোক, সামাজিক ক্রিয়াকলাপ দিয়ে গপ্তনদীর মন্ত্র উচ্চারণ—এ সবার মারফৎ যে বাঁধন দেহগত দাবির প্রতিষ্ঠা করে—তারই আবহাওয়ায় প্রশান্ত মাহুষ হয়ে উঠেছে। এই সমাজ-বিদ্রোহমূলক কথা ওদের কানে বেহুতো লাগবেই।

কি প্রশান্ত, আমার কথায় দুঃখ পেলো?

প্রশান্ত জান হাসি হেসে বললে, এ ছাড়া তুমি কি-ই বা বলতে পারতে শুভা।

অভিমানের অন্তর্নিহিত স্মরণটা শুভা বুঝলে। কিন্তু এ নিয়ে আপাতত তর্ক করে লাভ নেই। অবশ্তী কিরে আসছে।

অবশ্তী এসে ওদের বৈলক্ষণ্য লক্ষ্য করলে না; বললে,

তোমার মার অদ্ভুত স্নেহ শুভা—বলেন—দূর দেশে নাই বা গেলে।

শুভা মাথা নেড়ে বললে, ঠাকুরমা কি বললেন?

বললেন—পশ্চিমে নাকি অনেক তীর্থ আছে সেগুলি দেখতে ভুল না করি।

শুভা বললে, তুমি বুঝি বললে—তীর্থ দেখবার ব্যয়স আগে হোক—

প্রশান্ত বললে, যাই বল তোমার তীর্থস্থান নিয়ে এমন উপহাস করা ভাল নয়।

ওর স্বরে চমকে উঠল হুজনে। অবশ্তী বললে, দেবদেবীর ওকালতনামা নিশ্চয়ই মেনে নি।

না, দেবদেবী না মেনেও এটা মানতে বোধ হয় আপত্তি করবে না যে—দেশভ্রমণে অভিজ্ঞতা বাড়ে—মনের প্রসার হয়।

তেমনি করে দেশভ্রমণ করি আমরা? ফোন তীর্থে কখনও কি যান নি, না মা ঠাকুরমার মুখে সেখানকার গল্প শোনেন নি? দেবতার নামে এই যে বিরাট ব্যবসা—

শুভা বললে, প্রশান্ত জানে বৈকি—শুধু তর্কের খাতিরে—

প্রশান্ত বেগের সঙ্গে বললে, শুধু তর্কের খাতিরে নয়—

তুমি বয়সের কথাটা তুললে—

বয়সের কথাটাই তো আসল। শরীরের সামর্থ্য গেলে তীর্থ করা ছুটির হয়ে ওঠে—এটা তোমরা বলে থাক কিন্তু আমি জানি দেহের রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে না এলে যথার্থ ধর্ম—অবশ্য ধর্ম বলতে সাধারণে যা বোঝে তারই কথা বলছি—যথার্থ ধর্ম সাধন হয় না। কেন?—শক্তি প্রবল থাকলে—মন ভক্তির চেয়ে যুক্তিকে মেনে নিতে ভালবাসে—কিন্তু শক্তিহীনদের অবলম্বন যে অদৃশ্য শক্তি সে অস্বীকার করি কি করে। সুতরাং পলিত কেশ, পলিত দন্ত, পরনির্ভরশীল বুড়োবুড়ীদের ওই তো হ'ল একমাত্র আশ্রয়।

অবশ্তী হেসে উঠে বললে, তোমার তর্কে যুক্তি আছে—কিন্তু যুক্তির চেয়েও বেশী আছে স্বাক্ষর।

প্রশান্ত বললে, ধর্মকে অস্বীকার কর—

অস্বীকার করলাম কোথায়। শুভা হাসিমুখে বললে, ধর্ম—আর ধর্মের আচার আচরণ ছুটকে মিশিয়ে গোল পাকাই নি। সব মানুষের সমান অধিকার—এও কি বিশেষ একটা ধর্ম নয়। আমরা ধর্মের বিচার করি তার pragmatic value দিয়ে।

অবশ্তী বললে, ব্যস—ব্যস আর নয়। উল্লেখটায় এই বেলা কিছু করলা দিয়ে দাও—

শুভা বললে, আজ আমার ছুটি বলি নি।

বলেছ—কিন্তু রান্নার উদ্যোগ করে দেবে না—এত বলি নি।

অতীন ও চারু শুধু ঘি-ভাতের জিনিষপত্র নিয়ে ফিরে এসে না—তার সঙ্গে এসে হুজনে মহিলা আর তিন জন পুরুষ বসে।

১৫-১৬ রীতিমত হ'ল—রাত্রিও করলে সবাই মিলে। ষাণ্ডয়া-দাওয়া শেষ হতে রাত্রি ছুটো বেজে গেল। তারপর সেই ঘরেই মাহুর, চট, সত্তরজি বিছিয়ে ঢালা বিছানা হ'ল। জী-পুরুষ শুয়ে পড়ল পাশাপাশি। শুয়ে শুয়ে ষানিক চলল গল্প—তর্ক—পুঁজিবাদীদের নিয়ে—আচার প্রথা নিয়ে হাসিঠাট্টা—তারপর একে একে সবাই ঘুমিয়ে পড়ল।

প্রশান্তর চোখে ঘুম এল না। এক ঘর লোকের নিদ্রাস পতনের দরুন ঘরের বায়ুস্তর উষ্ণ হয়ে উঠেছে। এ রকম অভিজ্ঞতা তার জীবনে এই প্রথম। যদিও ঘরে আলো নেই তবু সে কল্পনায় অনেক কিছু প্রত্যক্ষ করেছে। নিজার অসতর্ক যুহুর্ডে—মাছুষ কত অসহায়—। আলোর শাসন কোন কোন বস্তির পক্ষে পরম কল্যাণকর—অন্ধকারের আশ্রয়ে তারা নিরঙ্কুশ। ঘুমিয়ে পড়লে হয়তো মস্তিষ্কের রক্ত চালনা স্বাভাবিক নিয়মে ঘটে—কিন্তু মাধার রক্তে যদি কামনার আগুন জ্বলে ঘুম আসবে কোথা থেকে। শুভার সব কথা ভখন যুছে গেছে—তবু জাগছে ওই কথাটি :

দেহের দাবিটা অস্বীকার করে লাভ নেই কমরেড। দেহের দাবি—শুভাকে সে ভালবেসেছে? এ ভালবাসার কি অর্থ? সে অর্থ কি ওর কথার পরিচ্ছূট হয় নি? তবু প্রশ্ন জাগে—মাছুষের মন কিছু জ্বলে-জোবা পদ্মপাতা নয়—কিংবা হাঁসের পালকও নয়। আগুন নিয়ে খেলতে গেলে হাত পুড়বেই—অথচ আগুন নিয়ে খেলতে না গেলেও মনের অতৃপ্তি ধোচে না। মন না জড়িয়ে পড়লে সে এতদূরে এল কেন? আর কোন মেয়েকে না চেয়ে শুভাকেই বা কামনা করে কেন? অথচ শুভা—ব্যক্তিগত সম্পত্তি সঞ্চয়ের বিরোধী। মাছুষ কি সম্পত্তি? হাঁ—ওরা বলবে ভালবেসে যাকে আপন করে নিতে চাও তার স্বাধীনতা হরণ করবার জুটই তোমার আবেগ—উচ্ছ্বাস—ভ্যাগ এসবের কলকৌশল। দুটি স্বাধীন মাছুষ—তাদের স্বাধীন মত নিয়ে মিলতে পারে শুধু সাময়িক ভাবে কতকগুলি সুবিধা—সুবিধা বলতে আপত্তি হয়—সহযোগিতা বলতে পার—এই নিয়ে তারা পরস্পরের সহযোগিতা করবে—একটি মহৎ প্রচেষ্টা অর্থাৎ ভালবাসা থাকবে এই মিলনের মূলে। কিন্তু কায়ার সাম্যীয় থেকে মনের গভীরে যদি প্রসারিত হয় সেই মহৎ প্রচেষ্টা অর্থাৎ ভালবাসা—তা হলেই কি বলতে পারবে তোমার স্বাধীন সত্তাকে অপহরণ করবার কৌশল। মাছুষকে সম্পত্তির মধ্যে গণ্য করে পেতে গেলেই যত আপত্তি, অথচ—মাছুষের মুখ্য বৃত্তি এই একান্ত করে পাওয়ার সাধনাতেই সারা জীবন উৎসর্গ করে দিয়ে ধন্য হচ্ছে। পুঁজি-পতিরা নিজেদের সুযোগসুবিধা কামেরি করবার জুড় যেমন সৃষ্টি করেছে অতিমানবীয় সভা—কিনা ঈশ্বর—তেমনি দেহকে আর মনকে এক সঙ্গে কিনে নেবার জুড় সঞ্চারিত করেছে এই আবেগ অর্থাৎ ভালবাসা। ঈশ্বরের সঙ্গে স্বর্গের যোগাযোগে এই বৃত্তিকেও সে আখ্যা দিয়েছে স্বর্গীয় সম্পদ। সমাজ সম-

স্যের মূলে ঈশ্বরকে অস্বীকার করতাই হবে, কেননা ষনিকর্তা-বাদের যে ক'টি দৃঢ় ভিত্তি ভূমিসাৎ না করলে সমভূমিতে দাঁড়িয়ে হাতে হাত মেলানো যাবে না—এটি তার অন্তঃস্ব। প্রধানস্বয়ং বলা যায়। কিন্তু ষনিকর্তাবাদ থাক—আজ রাত্রিতে কিম্বতেই কি ঘুম আসবে না। কিশের উত্তাপে মস্তিষ্কের রক্ত প্রবাহ নিজার আলস্তে শীতল হচ্ছে না? কেন এ উত্তেজনা?

টং টং করে তিনটে বাজল—সাতো তিনটে—চারটে। প্রশান্ত বিছানায় উঠে বসল। নিরুপ্ত নরনারীর নিদ্রাসে কেমন একটা গছ ঘরের বাতাসকে করেছে ভারি। অত্যন্ত গাঢ় হয়ে উঠছে চিন্তা—একযুধীন চিন্তা, উগ্র কামনা-কণ্ঠস্বিত চিন্তা। দেহলয় শুভার দেহ-আবাদ-লোপুপ চঞ্চল রক্ত কণিকায় তরল আগুন জ্বলে দিয়েছিল যে যুহুর্ডে—তা যেন নতুন আবেগে ফিরে এল এই নিজাধীন প্রহরে। নিজেকে সধারণ করা অত্যন্ত কঠিন।

গলা শুকিয়ে গেছে, জল ছুঁকার ছাতি কাটছে। একটু জল চাই—আলোটা জ্বালবে কি? না শুভাকে ডাকবে?

ভখনই মনে হ'ল এসবের দরকার হবে না। জলের ঝুঁকোটা কোণের দিকেই আছে—যেসিকে সে শুয়ে আছে সেই কোণের দিকে। একটু হাত বাড়ালেই ঝুঁকোটা হাতে ঠেকবে। কিন্তু শুভাও বেশী দূরে নেই। এক, দুই, তিন। ঠিক দোরের সামনে। শিয়রের দিকে বালিশের নিশানা ঘরে অন্যদিকে সে ওখানেও পৌছতে পারে। এক, দুই, তিন। ওরা ঘুমুচ্ছে নিশ্চিন্তে—নির্ভয়ে। গভীর রাত্রি ওদের মস্তিষ্ক-কোষে ঘুমের স্নিগ্ধতা ভরে দিয়েছে।

বিছানা থেকে এমিয়ে গেল প্রশান্ত। এক, দুই, না ঝুঁকোটাই ঠেকল হাতে। গ্লাসটাও রয়েছে ঝুঁকোর মুখে। গ্লাস ভরে সে জল নিলে—ঢক ঢক করে পান করলে আকর্ষ। সেই জলে হাত ডুবিয়ে কপালে, গালে, বুকে, ঘাড়ে, পায়ের পাতায় ও হাতের চোটোর ভাল করে সেপে সেপে দিলে। তারপর বিছানায় শুয়ে কল্পনায় টেনে আনলে নিজের ঐশ্ব-খানিকে। সেই সঙ্গে ভেসে এল অশ্রুসজল একখানি মুখ—সেই করুণান্নিঃ মুখখানি আর কারও নয়—তার মায়ের।

এতক্ষণে প্রশান্ত সত্য সত্যই ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুম ভাঙল পরিপূর্ণ নিজার শেষে। এ ঘরে সময়ের পরি-মাণ করা যায় না—অন্ধকার অনেকখানি তরল হয়েছে এই মাত্র। রাত্রি নেই বেশ বোঝা যায়। প্রশান্ত উঠে বসল। চারদিকে চেয়ে দেখলে—ঘরে কেউ নেই। তবে কি বেলা অনেকখানি হয়েছে? অতঃপর সে কি করবে? এ বাড়িতে এই তার প্রথম রাত্রি যাপন। কোথায় কলতলা—কোথায় শৌচাগার কিছুই তার জানা নেই। আশ্চর্য—তাকে কিছু না জানিয়েই ওরা চলে গেল।

শরীরে আলস্য লেগে রয়েছে—আরও খানিকটা ঘুম দিলে মন্দ হয় না। কিন্তু এ বাড়ি থেকে আজই বিদায় নিতে হবে। এখানকার আবহাওয়া স্বাস্থ্যকর নয়। মহুশ্বের দাবি জানাতে গিয়ে মানুষ হারিয়ে যায় এর স্বভাবের। স্বভাবের বসে আলোকের সাধনা।

নড়বড়ে দরজায় শব্দ হ'ল—কে এল বুঝি? চোখ চাইবার আগেই সে ডাকলে, ঘুম ভাঙল প্রশান্ত?

তড়াক করে সে বিছানায় সোজা হয়ে বসল। বললে, কোথায় গেছেল সব?

অবশ্যকে তুলে দিতে হাওড়া ষ্টেশনে গিয়েছিলাম প্রথমে—তারপর—

হাওড়া ষ্টেশনে? কিন্তু ক্যালকাটা-দিল্লী মেল তো—

ও পাটনার হন্ট করবে—পাঞ্জাব এক্সপ্রেসে গেল। একটু হেসে বললে, সারারাত জাগলে বেলায় পরিমাণ ঠিক রাখা যায় কি কমরেড?

কে তোমার বলছে আমি সারারাত জেগেছি?

কথাটা ভুল বলেছি কি?

ভাগ্যে খরটা সব সময়েই আলো-আঁধারি। বুকের ভাব গোপন করতে মুখ ফিরিয়ে নেবার দরকার হয় না। প্রশান্ত বললে, তা হলে তুমিও ঘুমোও নি শুভা?

কেন ঘুমোব না—যথেষ্ট ঘুমিয়েছি।

তবে কি করে বুকে-আর একজন জেগে রয়েছে?

অত্যন্ত সোজা জিনিস। ঠাইনাড়া হলে শীগগির ঘুম আসে না।

আর সকলের এল কি করে?

ওদের অভ্যাস আছে। তা ছাড়া কালই প্রথম রাত কাটিয়ে গেল না এ বাড়িতে।

প্রশান্ত বললে, এ রকম করে ছন্ডাড়া করে লাভ কি। এতে আসল কাজের ক্ষতি হয় না?

কিছুমাত্র না। যে কাজ আমরা হাতে নিয়েছি—তাতে মানুষের মানুষের বত জন্মতা বাড়ে ততই কাজটা সহজ হয়ে আসে। নিজের একটা বাড়ি—নিজের একখানি ঘর—নিজের কচিমত শয্যা—এর মোহ না কাটলে জগৎকে টেনে নিতে পারব কেন নিজের মধ্যে।

জগৎকে কোন দিনই এ ভাবে টেনে নেওয়া যাবে না। মানুষের প্রবৃত্তির ওপর জুলুম খাটাতে গেলে—

শুভা বললে, জুলুম এর কোনখানে দেখলে? একটু ছেলেকে জমাবণি বিলিতে রাখলে সে যদি কথায় আচার্য ব্যবহারে সায়েব হয়ে ওঠে—তার ভারতীয় রক্ত বারী বিজাতীয় প্রভাবে ভারতীয় সংস্কারযুক্ত হয়, তবে—যদি বাড়িয়ে নেবার মন্ত্রটি সহজাত প্রবৃত্তির মত করে কেন গড়ে তোলা যাবে না। মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি বলছ থাকে—সে প্রতিবেশ-অর্জিত কতকগুলি সংস্কার

মাত্র। বুনিয়াদি শিক্ষার দ্বারা এ সংস্কার দূর করা অত্যন্ত সহজ।

প্রশান্ত বললে, তেমনি যাদের এই রকম বুনিয়াদি শিক্ষার অভাব তাদের পক্ষে তা অর্জন করা শক্ত নয় কি?

কেন শক্ত? অভ্যাস—চেহারা—বলতে পার সাধনা—এগুলি আছে কি করতে। আশাদের ত্যাগের দ্বারা—সহের দ্বারা গড়ে তুলব এই রকম জগৎ। প্রথমটা সাম্য আনতে অনেক বাধা বাইরে থেকে আর ভেতর থেকে আসবে বইকি—তবু সব বাধার শেষ আছে এ-ও আমরা জানি।

প্রশান্ত কথা কইলে না। সে ভাবতে লাগল। এখনিও সময় আছে। ঘরকে সে ভুলতে পারছে না। নীতিকল্পমিত আবহাওয়া—হাঁ বার বার তার মনে হচ্ছে এ আবহাওয়ায় নৈতিক পবিত্রতা নেই। কাল রাত্রিতে নিজেকে সে স্পষ্ট চিনতে পেরেছে—সর্বমানবীয় কল্যাণবোধের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে নয়—নিজেরই কামনাকে পরিতৃপ্ত করতে সে এই পথে পা দিয়েছে। বাইরে স্বার্থত্যাগের বড়াই করে লাভ কি—মনের অসামঞ্জস্য বার বার তাকে পীড়ন করছে।

শুভা বললে, ওঠ শিশু মুখ ধোও—

রহস্যময় বললেও সে স্বীকার করলে, সে শিশু। ছেলেরা চাদের লোভে আকাশে আঙুল তুলে বায়না ধরে—আর যৌবনের ধর্মবশত সে এসেছে এই পরিমণ্ডলে। শুভাকে সরিয়ে নিলে তার ত্যাগের কোন মূল্যই থাকবে না।

সত্যিই সে কি অর্দেক পথ এগিয়েছে? পিছু হটে যাত্রা আরম্ভ করা তার পক্ষে আর সম্ভব নয়!

১১

বিরাজমোহিনী মলয়কে একান্তে ডেকে বললেন, তুমি আমার ঘরের ছেলের মত—হাঁ বাবা, সত্যি করে বল ত—প্রশান্ত কি সত্যিই বয়ে গেছে?

তার অক্ষ-গদগদ কর্তব্যের মলয় বেদনা বোধ করলে। মিথ্যা করে 'সাত্ত্বনা' দিতে তার মন সরল না। বললে, কাকিমা, সত্যি কথা বলব রাগ করবেন না। কাকে আপনারা বয়ে যাওয়া বলেন? যে ছেলে চাকরি করতে চায় না—দেশের কাজে ছেলখানার যায়—যন্মায় ভোগে—

বিরাজমোহিনী বললেন, লেখাপড়া জানি না বলে কি ভালমন্দও বুঝতে পারি না বাবা। ও সব কাজ করে অধ্যাত্ম পেয়েছে কেউ সে কথা তো জানি না। অবশ্য—যে ছেলে সংসার-বর্ধ্য কি উপার্জন করে না তাকে ছুনিয়ার বার বলে থাকি আর সেই ছেলের জন্তই মায়ের মন পোড়ে বেশি।

মলয় বললে, তবে কি ভেবে আপনি বললেন ও কথা?

বিরাজমোহিনী মনে মনে কি যেন হিসাব করলেন। কথাটা বলা যুক্তিযুক্ত কিনা হয়তো ভাবলেন মুহূর্তকাল—কিন্তু মনের সন্দেহ ও বেদনাকে মুক্ত করে না দিলেও তো

নিজার নাই। অবশেষে বললেন, মায়ের মনের সাধ-
আজ্ঞাদের কথা তো বুঝতে পার বাবা, একটি মনের মত
টুকটুক বউ পেলে সংসারটা তাদের ভরে ওঠে—

মলয় বললে, টুকটুক বউ হলেই তো মনের মত হয় না
কাকীমা।

তা না হোক—ছেলে সুখী হলেই আর সমাজে নিষে না
হলেই আমাদের শান্তি। একটু ধৈর্য বললেন, সুনাম একটু
মেয়ের সঙ্গে প্রশান্তির ভাব হয়েছে। আর মেয়েটি নাকি
আমাদের স্বজাতি নয়।

ওর প্রকৃত ব্যাধি বুঝতে পেরেও মলয় বললে, নাইবা হ'ল
স্বজাতি কাকীমা—প্রশান্ত যদি এতে সুখী হয়—

সমাজ সে মেয়ের মর্যাদা দেবে কেন বাবা। এখনও
তো জীর্ণ হই নি আমরা।

মলয় বললে, আপনি ভাববেন না কাকীমা—হয়ত—
এমনটা না-ও ঘটতে পারে। কিন্তু যদি ঘটেই—তো একটি
ছেলে আপনার—তার জন্ত সমাজ ছাড়তে পারবেন না?

না বাবা—আমাকেও পাঁচ জন আত্মীয়-কুটুম্ব নিয়ে ঘর
করতে হয়। বড় মেয়ের বিয়ে হয়েছে—ছোট মেয়েটিকেও পার
করতে হবে। আমি সমাজে চিরকাল মাথা উঁচু করে এসে
কিসের জন্ত হেনস্থা সহিব সকলের বল তো। শেষের দিকে
হয়ে তাঁর দুচ্ছতা ফুটে উঠল।

মলয় বুঝলে উনি মনে মনে অসন্তুষ্ট হয়েছেন। মায়ের
মনে অজুজির ঠাই নেই—পুরুষের কালধর্মের শ্রোতে পা
রেখেও যখন পরিবর্তনকে সর্বান্তঃকরণ দিয়ে মানতে পারেন
না—জুজির সারবত্তা করেন না স্বীকার—আচার-পদ্ধতিকে
প্রকৃত ধর্ম বলে সামাজিক বিদ্রোহকে বলেন অনাচার—সে
অনাচারের অহুতাশদের গালিগালাজ করেন নির্মমভাবে
জ্ঞদ্রতালেশহীন হয়ে—তখন অন্তঃপুরের বিধিতে ও সমাজের
বিধানে অভ্যন্তর মেয়েদের কাছ থেকে কি বা প্রত্যাশা করতে
পারা যায়।

বিরাজমোহিনী পুনরায় অহুনয়ভরা কণ্ঠে বলিলেন, সত্যি
করে বল তো বাবা—সে কি সেই মেয়েটিকেই বিয়ে করবে?

মলয় বললে, আমি বিশেষ কিছু জানি না কাকীমা, খোঁজ
দেব।

তু ধু খোঁজ নিলে হবে না, এগিয়ে এসে তিনি মলয়ের দুটি
হাত চেপে ধরলেন, এর উপায় তোমার করতে হবে।

উপায়! কি উপায় করব আমি? মূঢ়ের মত প্রশ্ন
করলে মলয়।

যাতে এ বিয়ে না হয়—

মাপ করবেন কাকীমা, তাদের মধ্যে যদি ভালবাসা হয়ে
থাকে...না, না, আমার মাপ করবেন।

বিরাজমোহিনী ঋণিকটা অভিভূতের মত চেয়ে রইলেন
মলয়ের পানে। তারপর মনে হ'ল—ও তো হেমলতারই

ছেলে। নিকট প্রতিবেশিনী—যারা সর্বদাই অস্বেষণ করছে
প্রতিবেশীর ছিদ্র তাদের সন্তোষ বিখ্যাস রাখা কঠিন—অত্যন্ত
কঠিন। প্রতিবেশীরা ভাল—একথা পাঁচিলের পিঠে ঘর তুলে
স্বীকার করা কঠিনই তো।

দুঃখ কণ্ঠে বললেন, তা চলবে কেন বাবা, তুমি তো
অজ্ঞাতের মেয়ে ঘরে আন নি—সমাজে কোন নিষেও হয় নি
তোমাদের—

মলয় হুয়ারের কাছ থেকে ফিরে এল। নীচু গলার
বললে, আপনি হুখু পাবেন জানলে একথা কখনই বলতাম
না কাকীমা। কিন্তু এ-ও ছেনে রাখবেন—প্রশান্তকে যদি
আমাদের সমাজ ঠাই না দেয়—আমার ঘরে ওদের জায়গা
আমি রেখে দেব।

বিরাজমোহিনী এ কথায় সাত্ত্বনা লাভ করে থাক—
রীতিমত রুষ্ট হয়ে উঠলেন। মলয় ভাগ্যিস তাঁর সামনে নেই—
না হলে ক্রোধের বশে তাকে কটু-কাটব্য করা তাঁর পক্ষে
একটুও অসম্ভব ছিল না। দ্রুতপদে তিনি হুর্গামোহনের
শোবার ঘরে এলেন।

কিন্তু ওই বার্কাক্য-পীড়িত শয্যাশায়ী মানুষটিকে তিনি কি
বলতে পারেন। তাঁর মনে যে বেদনা—সে কি তাঁর মনেও
গুরুভার হয়ে নেই। উনি বার বার ক্রুদ্ধ কণ্ঠে ঘোষণা করে—
ছেন, প্রশান্ত তাঁর ছেলে নয়—সে যদি অসবর্ণের মেয়ের পাণি-
গ্রহণ করে—ও ঘরে তার স্থান হবে না—এক কাণাকড়িও
তাকে দেবেন না উনি। পিতামাতার প্রতি কর্তব্য-উদাসীন
ছেলের প্রতি কিসের বা মমতা।

হুর্গামোহন মাথা তুলে বললেন...এখন তো ওষুধ খাবার
সময় হয় নি—

না—এমনি দেখতে এলাম ঘুমিয়েছি কি না?

হুর্গামোহন একদৃষ্টে তাঁর পানে চেয়ে বললেন, কীদৃষ্টি
বুঝি?

বিরাজমোহিনী অস্তে চোখের কোলে তর্জনীটা বুজিয়ে
নিয়ে হাসলেন। বললেন, তুমি শীগ্গির করে সেয়ে ওঠ দেখি—

আমি সেয়ে উঠলেও তোমার চোখের জল শুকোবে না—
শুকোবে না—শুকোবে না। ছেলেমানুষের মত তিনি হেসে
উঠলেন।

বিরাজমোহিনীর বুকখানা কেঁপে উঠল। হুর্গামোহনের
মাথার গোলমাল হয় নি তো। সত্যিই তাঁর চোখের জল
শুকিয়ে গেল। বেদনাকে ঢাকা দিতে হুঁচকুতার মত বস্ত
আর নেই।

শিয়রের টুলের ওপর বসে বললেন, মাথায় হাত বুজিয়ে
দেব?

তা দাও। তবে কিছুতেই কিছু হবার নয়। বলে একটু
হেসে বিরাজমোহিনীর হাতখানি টেনে এনে বুকের ওপর
রাখলেন।

• বিরাজমোহিনী বললেন, আজও কি বুকে তেল মালিশ করে দেব ?

না—হাতখানা রাখ। তাঁর হাতখানি চেপে বরলেন।

আর কোন কথা হ'ল না—ঘড়িটা টিক্ টিক্ করে ছুটি অন্তরের মর্মব্যথা প্রকাশ করতে লাগল।

১২

মলয় বাড়ি এসে দেখল—ছলছল ব্যাপার লেগে গেছে। মা পা ছড়িয়ে বসে কাঁদছেন, দোতলার ছোটোছুট দোঁড়াদোঁড়ি চলছে। বড় বউয়ের ফিট হয়েছে। খবরটা কাঁদতে কাঁদতে মা-ই দিলেন।

এর বেশী কিছু জানতে হলে সূচিমা ছাড়া গতি নেই। ও এতক্ষণ বড় বউয়ের স্তম্ভাশয় লেগে রয়েছে। ছেলেরা গোলমাল করছে—হয়ত বা ভিড়ও জমিয়েছে।

উপরে উঠে দেখে—সত্যিই ব্যাপারটা কিছু গুরুতর। একটি ঘটি কাত হয়ে বারান্দার রেলিঙে ঠেকেছে—জল গড়াচ্ছে সারা মেঝেয়। পাখা বান ছুই এসেছে—আর জলে ভিজে লপ লপ করছে। রোগীর সারা দেহে আক্ষেপ তো আছেই—মাথার চুল আর বিশৃঙ্খল পরিবেশ থেকে জল পড়ছে পড়িয়ে। দশ বছরের ভাইঝিটা শিয়রের দিকে ঠাঁড়িয়ে প্রাণপণে পাখা নাড়ছে। হাওয়াটা রোগীর মাথায় লাগছে না—মেঝেয় লাগছে। দাঁতে দাঁত লেগেছে রোগীর। একটি মাঝারি গোছের চাবি অতি কষ্টে সূচিমা দাঁতের মাঝখানে বসাতে পেরেছে। এখন সে হাঁটু গেড়ে বসে রোগীর হাতের মুঠো ধুলে দিচ্ছে—আর চাবিটা যাতে দাঁতের চাপ থেকে আলগা হয়ে না পড়ে সেই চেষ্টা করছে।

মলয় বললে, হঠাৎ এ রকম হ'ল কেন ?

বলছি। তুমি ভাল করে হাওয়া লাগাও তো মাথায়।

কেন...রেলিং সন্টের শিশিটা কোথায় গেল ?

বড়দির হাট খুব উইক—এ্যামোনিয়া চলবে না। ব্লটিং পুড়িয়ে ঝোঁয়া দিতেও পারতাম—সাহস হ'ল না।

মেয়েটির হাত থেকে পাখাখানি নিয়ে মলয় বাতাস করতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে আঁ-আঁ-করে রোগী পাশ ফিরল। হাতের মুঠি নরম বোধ হ'ল।

সূচিমা বললে—তুমি ঘরে গিয়ে বোস—এখনি জ্ঞান হবে বড়দির।

...বাড়ির এই আবহাওয়া কোন কালেই ভাল লাগে না মলয়ের। বহু পুরাতন জটিল রোগের তীব্রতা না থাকলেও—নিত্য নূতন উপসর্গে যেমন বিরক্তি জন্মায়—তেমনই মনে হয় বাড়িটাকে। কয়েক বিধা জমির মালিক হয়ে—নানা প্রকারের অশান্তি বাধা বেঁধেছে এখানে। বাপ ঠাকুরদাদারা চেয়েছিলেন—উপার্জনের অর্থে ভাবী বংশধরদের ষাওয়া-পারার সুব্যবস্থা করতে। লক্ষী যে চঞ্চল—বাদের জমি আছে—তাঁরা

এ প্রবাদবাক্যের মর্ম বোঝেন। আজ জমির স্বত্ব থেকে সংসার-যাত্রা নির্বাহ হয় না—জমির হাঙ্গামা পোহাতে হয় শুধু!... চাষার হাল বন্দ দিয়ে জমি চাষ দেয়—ভাগ আধাআধি। কিন্তু সেই আধাআধি ভাগের সিকিও ঘরে ওঠে না যথাসময়ে তদারক না করলে। ষাঁজনা মিটাবার দায় তাদের—জমিতে সার দেবার খরচ দেও তাদের—আবার কোন জমিতে কি কসল দেওয়া কর্তব্য এ নির্দেশ দিতে পারলেও ভাল হয়। প্রাণে বা ভাদ্রে বান রোয়া শেষ হলেই চাষের কর্তব্য শেষ হবে না। কার্তিকে একবার জমি দেখা দরকার—কি কসল হ'ল। তার পর পৌষে দিন পনের পরে সেই কসল কাটা—ভাগ বুকে নেওয়া—খড় বিক্রী করা—ধান গোলাজাত করা—গেল বার যাদের বান বার দেওয়া হয়েছে—তাদের কাছ থেকে বুকে নেওয়া—এ সব বহু জটিল ব্যাপারের অন্তর্গত। বার দুই মলয়কে এই সব তদারক করার জঙ্ক যেতে হয়েছিল। বড়দা থাকতে তিনি পোষাতেন এসব হাঙ্গামা। তাঁর অবর্তমানে মেজদা প্রতি বছরে এই সময়টুকু এক মাস করে ছুটি নিতেন। কিন্তু একবার বিশেষ জরুরি কাজ পড়াতে অফিসার মেজদাদাকে ছুটি দেয় নি—আর একবার উনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। সেই হ'বারের অভিজ্ঞতা—সারাক্ষর বনে ভুলতে পারবে না মলয়। বনধাড়ে পুষ্পে ভরা—বা মাঠে মাঠে ভরা সোনার বান—মনে হয়েছিল কবিদের অত্যাশ্রিত। যে কবির জমি ছিল না—পাকা বান ভরা মাঠের শোভা দেখে মুগ্ধ হওয়া তাঁরই মানাভো। কিন্তু সরল চাষীদের কাছে ভাগ বুকে নেওয়া ও হিসাব মিল করা—ধান কাটা—আছড়ানো—কড়তা বাদ—সুদের হিসাব—পায়ে ধরাধরি...কাকি দেবার কচকচি...এ সব বাস্তব ব্যাপারকে লক্ষীর আবাহন বলে ভুল করবেন না কেউ। চাষারা সরল ছুখী আর নিকোঁধও বটে—তবে পয়সার দিক দিয়ে তারা শক্ত। একটি পয়সার জঙ্ক তারা অজস্র কথা বানিয়ে বলবে—রাতারাতি মাঠের মাড়াই বান সরিয়ে ফেলবে—না দেখলে ত কথাই নেই। সব চাষার সম্বন্ধে এক কথা খাটে না—তবে মলয় যাদের সংস্পর্শে এসেছে তাদের কথা ভোলা শক্ত। হয়তো অনেক দিনের অত্যাচার সয়ে—এই সংস্কার তাদের মনে বদ্ধমূল হয়েছে যে যারা হিসেব বুকে নিজে আসে তাদের সঙ্গে শঠতা না করলে সর্করাপ্ত হতে হবেই। হয়তো পাইকদের হাতে লাঞ্ছনা সয়ে—নায়েবের ধমক ও চোপ রাঙানী পেয়ে স্বভাবটা ওদের অমনিই ঠাঁড়িয়েছে। পীড়ন শুধু দেখেই পছন্দ করে না—মনকে সত্য থেকে বিচ্যুত করে—নীতি থেকে করে ভ্রষ্ট। ওরা যা হতে পারত তা হতে পারে নি—লাঞ্ছনা ও বঞ্চনা রয়েছে এর মূলে। সেইজন্য প্রভু জাতীয় যে কোন লোককে ঠকাতে ওরা সিদ্ধহস্ত। এই বঞ্চনা যে ঘৃণার নামান্তর নয় তাই বা কে বলবে ?

বহুদিন থেকে একটা কথা কাণাকাণি হচ্ছে। চিরস্থায়ী

বন্দোবস্ত নাকি থাকবে না। মধ্যস্থতাকারীদের সুবিধাটুকুও আইন করে কেড়ে নেওয়া হবে। যে নিজের হাতে হাল বলদ দিয়ে যতটুকু জমি চষতে পারবে—তারই স্বত্ত্ব সে হবে স্বত্ত্ববান। এতে করে প্রত্যেক রাস্তার হাতে জমি আসবে—ঋণের দ্বারে মহাজনের কাছে তাদের মাথা বিকিয়ে থাকবে না। সরকার বাহাদুর আর প্রজা—মাঝখানে হিসাবদার কেউ থাকবে না। হোক না আইন—মলয় এতে অমদল কিছু দেখতে পায় না। লোকে বলে বটে—লক্ষী বসতি করেন তারই ঘরে—যার ছ'বিধে আছে। গত মহা দুর্ভিক্ষে সে সত্য প্রমাণিত হয়েছে। যাদের জমি ছিল—তারা পেট ভরে খেয়েছে আর সিন্দুক ভরে জমিয়েছে টাকা। সম্পন্ন চাষা দ্রুপ টাকা দামের শাড়ি কিনে গৃহীকে উপহার দিয়েছে, নিজের জুট কিনেছে সাইকেল। যারা জনমজুরি করে খায় ছ' এক বিধে জমিতে ভাঙা লাঙ্গল ও রুগ্ন বলদ বেদিয়ে চাষ দেয়—তারাই মরেছে দুর্ভিক্ষে। এই ব্যবস্থা হলে—সামান্য জমির মালিকরা কিংবা যাদের জমি নেই তারা অন্তত খেয়ে পরে বাঁচবে।—মধ্যস্থতাকারেরা যাবে কোথায়? জমির উপরস্থ যাদের উপরি আয়ের সামিল—তারা করুক না যা খুশী। নিজের হাতে লাঙ্গল ধরতে পারে জমি থাকবে হাতে—না পারে যার শ্রম—তারই ঘরে বিতরিত হোক কমলার রূপা। এতে দুঃখ করবার কি আছে।

সুচিন্তা ঘরে এসে বললে, একবার নন্দ-দাহুর কাছে যাও তো। তিনি নাকি বট ঠাকুরের কি ধরন এনেছেন।

দাদার ধরন? কে বললে তোমাদের?

কেন—পটার মা এই মাত্র বলে গেলেন মাকে। তা তিনি যদি ধরনটা চুপি চুপি বলেন তো বড়দির ফিট হয় না।

কি বললে পটার মা?

নাকি—মথুরা না স্বর্ধাকন কোথায় যেন এক সাধুর সঙ্গে তাঁদের দেখা হয়। সাধু তাঁদের গ্রামের নাম জিজ্ঞাসা করে—আরও অনেক কথা শুধায়। এক সময়ে নাকি বললো কেলেন—ভে-মাথা রাস্তায় যে বড় বটগাছটা আছে সেটা এখনও আছে—না কেটে কেলা হয়েছে? যেমন বলা নন্দ-দাহু চেপে ধরেন—তিনি জানলেন কি করে ভে-মাথা রাস্তায় বটগাছ আছে। সাধু একটু হেসে বলেন, ও গ্রামে আমি একবার গিয়েছি। কবে? কেন? কত দিন ছিলেন সেখানে? এই সব জিজ্ঞাসার সাধুকে স্তব্ধবার করে কেলবার পর নন্দ দাহু বুঝতে পারলেন—এক বার নয়—হয়তো অনেক বার উনি ওখানে গেছেন আর অনেক দিন ছিলেনও ওখানে। কোন জংশনে পাড়ী বদল হতেই সাধুর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়—কিন্তু তাঁর আশ্রমের ঠিকানা তাঁরা নিয়ে এসেছেন।

ও—তাদের বিশ্বাস হয়েছে দাদাই সেই সাধু?

সুচিন্তা বললে, বিশ্বাস কি সাধে হয়েছে। নামবার সময়

সাধু আমাদের বাড়ির কে কেমন আছে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিয়েছেন যে।

তারপর?

তারপর—তোমার তো অনেক বন্ধুবান্ধব আছে বহু জায়গায়—বৌদ্ধ নাও।

আর বৌদ্ধ না পেলে নিজে কে সেই আশ্রমের ঠিকানা বুঝে বার করতে হবে?

কেন—সে কি তোমার কর্তব্য নয়?

কিন্তু দাদার বিরুদ্ধে খুনের চার্জ উইথড হয় নি। এ্যাবস্কেণ্ডারকে বুঝে বার করার মানে বোঝ তো?

সুচিন্তা শুক হয়ে বললে, এত দিন পরেও কি—

রাজার আইন কাউকে অম্মা করে না।

কিন্তু মা যে কাদছেন।

কাঁহুন।

বড়দির জীবনটা নষ্ট হয়ে যায়, সে কথা ভাবছ কি।

মলয় মাথা নেড়ে বললে, যদি কোন দিন আইন হয় দুহুতিবান স্বামীকে হিন্দু-স্ত্রী অনায়াসে বর্জন করতে পারবে—আমি সে আইন সমর্থন করব।

তুমি তো আইন সভার কেউকেটা নও—তোমার সমর্থনের মূল্য কি। সুচিন্তা হাসলে।

কিন্তু এ নিয়ে প্রোপাগান্ডা করতেও তো পারি।

ক'রো—উপস্থিত ধরনটা বেবে কিনা ভাল করে?

চটী পায়ে দিয়ে মলয় বললে, এইদুহুতি বাড়িতে আসতে চাই না—একটা-না-একটা হাদ্যামা তোমরা বাধাবেই।

হাদ্যামা! তোমরা যে স্বদেশী কর—সেকি বিনা হাদ্যামায়? মলয় উত্তর না দিয়ে বার হয়ে গেল।

নন্দ-দাহুর পুরো নাম নারায়ণ রায়। বয়স সত্তর টাড়িয়েছে—তবু দেহের প্রান্তে যৌবনের পঙ্কজ রোদটুকু লেগে রয়েছে। এ বয়সে মাথার চুল ক'গাছি পেকেছে শুণে বলে দেওয়া যায়। চাল, ছোলা ভাজা চিবোবার মত মজবুত দাঁতের অভাব নেই। যৌবনকালে তিনি নাকি দুঃসাহসিক ছিলেন। লোকে বলত উচ্ছৃঙ্খল। এখন বছরের তিন-চার মাস ঘুরে বেড়ান তীর্থে তীর্থে। একই তীর্থে বহু বার গেছেন—তীর্থরূত্য তাও নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পন্ন করে থাকেন। সকালে আর সন্ধ্যায় পুরো ছুটি ঘণ্টা কাটে তাঁর রক্ত-দার ঠাকুরঘরে। যৌবনে যে উদ্যমে একটিও দেবতাকে মাথা হুইয়ে স্বীকার করেন নি—জন্মের অবিকারে এসে তেমনি উদ্যমে তাদের তেত্রিশ কোটিকে জীবনের জপমালায় গুঁথে নিয়েছেন। সংসার তাঁকে সৌভাগ্য দিয়েছে—আধাত দিয়েছে। নারায়ণ রায় আর এক দিক দিয়ে গ্রামের অগ্রণী হয়েছেন বলা যায়। তাঁকে সেধো করে প্রতি বছর বহু নরনারী তারতের বিভিন্ন তীর্থে পুণ্য সঞ্চয় করে বেড়ায়। তাঁর আহার, গাভী-ভাড়া, সুখ-স্বচ্ছন্দ্য সব কিছুর দায়িত্ব বহন করে—এই পুণ্যকাষীরা।

* তা ছাড়া দেশ-বিদেশের গল্প বলার—পুরাণ-ইতিহাস মিলিয়ে সে গল্পকে মিষ্ট করার কৌশল তিনি জানেন। তাঁর বাইরের ঘরে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ছাড়াও সব রকম বয়সের মেয়েপুরুষের ভিড় প্রায় সর্বক্ষণ লেগেই থাকে।

মলয় ঘরে ঢুকে দেখলে ক'টি শিশুকে নিয়ে তিনি আসন্ন জমিয়েছেন। ছেলেরা সব গল্পের চেয়ে ভূত পেত্নী রাক্ষস ব্রহ্মদৈত্য বা যুদ্ধের গল্প শুনে ভালবাসে। নন্দ-দাছ রামায়ণ মহাভারত বা পুরাণ থেকে গল্প বলেন—দৈত্য রাক্ষস আর যুদ্ধ এ সব প্রচুর থাকে তাঁর গল্পে।

তিনি বলছিলেন, জানিস দাছ—ব্রহ্মার বরে কুন্তকর্ণ দিচ্ছিলেন ঘুম। হ' মাস ঘুমের পর এক দিন তিনি জাগেন—সেই এক দিনই সারা পৃথিবীতে স্বর্গে আর পাতালে হুলস্থূল কাণ্ড। যেমন তেমন রাক্ষস ত নন্দ। যে ঘরে তিনি ঘুমোতেন—সেই ঘরটা লম্বায় হ'ল ত্রিশ যোজন আর চওড়ায় দশ যোজন। ছয়োরের ফাঁদ হ'ল চার কোশ—সে ছয়োর উঁচু হ'ল আট যোজন—এই থেকে বোঝ কত বড় রাক্ষস তিনি।

মলয় ঘরে ঢুকে বললে, থাক দাছ—বেচারী কুন্তকর্ণকে আর অকাল নিদ্রা ভাঙিয়ে তুলবেন না—

তিনি হেসে বললেন, বোস রে ভাই—বোস। ছেলে-শুণ্ডলোর এই ত চেহারা কিন্তু ভীষণ ভীষণ রাক্ষস দৈত্য এ-সবের গল্প না শুনে ওরা ঘুমোতেই পারবে না।

ছেলেরা গল্পে বাধা পড়তে বিরক্ত হ'ল। বললে, গল্পটা শেষ কর দাছ নইলে—

নন্দ-দাছ হেসে বললেন, না করলে কি যে হবে তা জানি। পাছের পেয়ারা কুল কি বাগানের আম একটুও থাকবে না।

বাঃ রে, আমরা কুন্নি আপনার গাছে হাত দিই ?

কেন দিবি নে ভাই—কল ত ভোদেরই জড়ে। কুল পেয়ারা ও সব বুড়ো বয়সের জন্ত নন্দ—তবে আমটা যদি ভাল হয়—

আচ্ছা দাছ—আম আপনার একটুও নষ্ট হবে না। দেখবেন পাকা আম পেড়ে কেমন না দিদিমাকে দিয়ে যাই।

পাকা আম খাওয়াবি এ যশু প্রলোভন বটে। মলয়ের পানে চেয়ে হাসলেন, কিন্তু কাঁচা আমগুলো যদি ভোদের লোভ থেকে বাঁচে...আহা হা—রাগ করিস কেন ভাই—বুড়ো হয়েছি বলেই কি চিরকালে বুড়ো আমি। আমাদেরও ছেলে বয়স ছিল।

মলয় বললে, গল্পটা সেরে নিন—কিছু কথা আছে দাছ।

খানিকক্ষণ মলয়ও সে গল্প শুনলে। দাছ বলেন ভারি মিষ্ট করে—রসিয়ে রসিয়ে—কৌতূহলকে জাগ্রত করে। মন্দ লাগছে না গল্প।

ছেলেরা চলে যেতেই ও প্রশ্ন করলে, আচ্ছা দাছ, এমন আকর্ষণীয় গল্প শুনিব কি লাভ। চার কোশ ঘরে কপাটের পাজায় যে রাক্ষস থাকত—তাকে আঁটতে গোটা লক্ষা লক্ষটাই যে লাগে। আর প্রত্যেক রাক্ষসের সঙ্গে দশ

কোটি বিশ কোটি—বীর চলতো যুদ্ধ করতে—বানরদের এক এক জনের সঙ্গে আশি কোটি নব্বুই কোটি সৈন্ত—এ সব সারা ভারতবর্ষে ঘরে না—লক্ষায় ধরল কি করে।

দাছ বললেন, যুদ্ধের বর্ণনা অনেক বাড়ানো—নাতি। তোদের কালটারই কথা ধর। এই যে দুর্ভিক্ষে বাংলাদেশে লোক মরলে—কেউ বলছে দশ লক্ষ—কেউ বলছে পনেরো—কেউ বা বলেন—ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ লক্ষ। এ মহাযুদ্ধের হিসাব-নিকাশ এখনো হয় নি—পেল মহাযুদ্ধে সব যুদ্ধ আশি লক্ষ লোক মরেছিল—এটাও ঠিক বলে যেনে নেওয়া যায়। যুদ্ধের ব্যাপারে কিছু উনিশ-বিশ হয়ই।

কিছু নয়—আকাশ-পাতাল তফাৎ। আর এই আকর্ষণীয় গল্প—

দাছ বললেন, পৃথিবীতে কোন্টা আকর্ষণীয় আর কোন্টা সত্যি কে বলবে ভাই। দুটো বোমা ধেয়ে দুর্ভিক্ষ জাপান খাল হ'ল—একথা তোমরাই কোন দিন বিশ্বাস করতে কি ? অথচ তাই হ'ল। যখন তর্ক করার প্রবৃত্তি থাকে মাহুষের তখন বয়সটা থাকে ভোদের কোঠায়—আমাদের কোঠায় বয়স পড়ালে বিশ্বাসই হ'ল আসল বস্তু। দাছের কথার সুর ঈষৎ গম্ভীর হ'ল।

বেশি দিনের কথা নয়—সেকেন্ড ইয়ারের গ্রীষ্মের ছুটিতে মলয় তখন দেশেই রয়েছে। দাছের ছোট ছেলে মলয়ের বড়ুই ছিল সে—নিশীথ তার নাম—কাজ করত একটি মার্কেট আপিসে, এক শনিবারে জ্বর নিয়ে বাড়ি এল। দারুণ জ্বর, বেহুঁস অবস্থা। ডাক্তাররা কেউ বললেন, পল্ল—কেউ বললেন ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া—কেউ বা বললেন মেনিনজাইটিস্। মোট কথা তিন জনের মতভেদ হওয়াতে সে রোগিতে ক্ষিভার মিক্চার ছাড়া বিশেষ কিছু পড়ল না—তার পর দিন আসল রোগ ঠিক হ'ল বটে—রোগীকে ফেরানো পেল না। সেইট দাছ শেষ ছেলে। তার পরই দাছ মলয় নিলেন—নিয়ম করে গীতা, রামায়ণ, মহাভারত পড়তে লাগলেন। কেউ তর্ক করতে এলে বলেন, ও সব পাট মিটিয়ে দিয়েছি ভাই—আর কেন।

আপনার মনের বল কবে গেছে দাছ।

দেহের বলও কমছে যে ভাই। কিন্তু সে কথা নয়। আমরা খাড়া হয়ে দাঁড়াতে পারি একটি অবলম্বন পেলে। সে মাহুষই হোক আর ঈশ্বরই হোক। তুমি তো বলবে ঈশ্বর নেই। আমাদের কাজ যথেষ্ট—নতুন পৃথিবী না হোক—পৃথিবীতে নতুন বিধান তৈরি করবে এই আশ্বাসে আর উৎসাহে মাহুষের বেশী কিছু স্বীকার করতে চাও না। কিন্তু আমরা জানি পৃথিবী পুরাতন। নতুন মাহুষের মনে বার বার নতুন হয়ে সে ফিরে আসে—এই মাত্র।

কিন্তু দাছ আপনারা ছেলেবেলাকার পৃথিবীর সঙ্গে আজকের পৃথিবীর কত তফাৎ দেখুন ভো।

হাঁ—বিজ্ঞান পৃথিবীকে নতুন করে তৈরি করেছে। আমাদের কালে যে পৃথিবী প্রকাণ্ড ছিল—আজ সে ছোট হয়ে গেছে। তবু এ তার বাইরের সাক্ষর। আমার এই ময়লা কাপড়টার সঙ্গে তোমার ধবধবে শব্দের 'পোষাক'টার যেমন তফাৎ—তোমার দেহের সঙ্গে আমার দেহের গঠন মিলবে না—তবু ভূমি মানুষ—আর আমি মানুষ ছাড়া আর কিছু এও তো ঠিক নয়। বুড়ো হলেই মানুষের লাঠির দরকার হয় তার দিয়ে চলবার জন্ত। ঈশ্বরে বিশ্বাস আমার সেই লাঠি দাছ।

এ সব তর্ক বহু বার হয়ে গেছে। যুক্তির শক্ত পথ থেকে দাছ বিশ্বাসের নরম ভূমিতে নেমেছেন; এ পরিবর্তনের গভীরে রয়েছে যে ছেঁচু—তা বিয়োগ-বেদনার বাপ্পাকুল। বেশী তর্ক করে তাকে উদ্ঘাটন করা চলে না। শোকে সাহস না দেওয়া মানুষি প্রথা—তাতে আশ্রয় পাওয়াও দুর্ঘট। নিজের মন থেকে সহজাত প্রবোধ-আশ্বাস না দিলে—কোন যুক্তিতে সে চিত্ত স্থির করতে পারে।

মলয় এক মুহূর্তে অনেক কিছু ভেবে নিয়ে বললে, দাদার খবর জানতে এলাম দাছ—সত্যিই কি তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল?

দাছ বললেন, এরই মধ্যে খবরটা পাড়ায় রটে গেছে। ভাল হয় নি দাছ। তোমার মাকে সামলানো কঠিন।

মার চেয়ে বৌদিদির অবস্থা খারাপ—তাঁর কিট হচ্ছে।

দাছ বললেন, আমার কথা যদি শোন তো তাঁর খোঁজ করো না ভাই।

কেন দাছ?

মানুষ এক বারই জন্মায় না ভাই—যুঁচুও তার বহু বার ঘটে।

যদি বলি জন্মান্তর মানি না।

দাছ হেসে বললেন—দেহ বদলে যে জন্ম তার কথা তো বলি নি ভাই। তোমার মন—বুদ্ধি—কুচি—প্রবৃত্তি বা সংস্কার জন্ম থেকে যুঁচু পর্যন্ত বহু বার বদলাবে। তারই জন্মে ছেলে বেলায় নাস্তিক—দাছ তাদের আন্তিক হয়েছে রে। একটু ধেমো হেনে বললেন, সন্দেহবনে ঘাবার পথে যে সন্ন্যাসীকে দেখে আমার সন্দেহ হয়—তাকেই আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম—আচ্ছা আপনি তো সংস্কারমুক্ত পুরুষ—বিশেষ করে ওই গ্রামবাসির কথা জিজ্ঞাসা করছেন কেন? সন্ন্যাসী হেসে উত্তর দিয়েছিলেন—পূর্বে জন্মের সংস্কার হতেও পারে।

জিজ্ঞাসা করলাম—জাতিস্মরণে শুনেছি পূর্বজন্মের কথা ঠিকমত বলতে পারেন।

সন্ন্যাসী বললেন—জাতিস্মরণ না হয়েছে কি মানুষের জন্মান্তর হয় না? দ্বিজেন্দ্র ওঠে কি করে মানুষ? আপনার দশ বছরের দেহে আর বিশ বছরের বেহা কি এক? সেই সঙ্গে মনও শোলদ বদল করেছে বার বার।

সাহস করে বললাম—তবু হারানো জনকে ফিরে পেলে আত্মীয়বন্ধুরা কম সুখী হয় না। তাদের মধ্যে বাস করার যে শান্তি—

সন্ন্যাসী হেসে বললেন—শান্তির স্তরভেদ আছে জানেন কি? যে মধুর স্বাদ পেয়েছে—চিনিতে স্বভাবতই তার স্পৃহা থাকবে না—পরম সঙ্গ পেলে আসক্তলিপ্সা ভেঁমনি ফিকে বোধ হয়। আপনি জানী—সংসারের স্বাদ আর পরব্রহ্মের স্পর্শ—একের সঙ্গে অন্নের তুলনা—এ তো চলে না জানেন।

মলয় জিজ্ঞাসা করলে—তা হলে তিনিই যে আমার দাদা—এ সম্বন্ধে আপনার সন্দেহ নেই।

কিন্তু তিনি নবজন্ম লাভ করেছেন—তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক টানতে গেলে তোমরা হয়ত ছুঃখই পাবে ভাই। অন্তত বড় বোমাকে এ সব না শোনানই ভাল।

কিন্তু দাছ, মল যা তা খেটে গেছে।

তারা তারা! দাছ একটি গভীর নিশ্বাস কেললেন। যা ভাল বোধ কর ভাই—না ছাড় তাঁর আশ্রয়ের ঠিকানাটি দিচ্ছি, কিন্তু মেয়েদের নিয়ে সেখানে যেও না। মানুষের ইচ্ছা ব'লে যে জিনিষটি আছে তার প্রতিকূলে কিছু করা যুক্তিসঙ্গত নয় ভাই।

মলয় বললে, তা কি সম্ভব দাছ! তবে আমাদের কর্তব্যো যেটুকু না করলে নয়—আচ্ছা আসি—দাছ।

দাছ তার কাঁধে হাত রেখে সম্বোধন হাসি হেসে বললেন, হাঁ রে—তুই নাকি একবার জেল খেটেছিলি?

মলয় মাথা নীচু করে হাসলে, সে আর বেশী কি দাছ।

কবে?—আমি তো শুনি নি—

সে এমন কিছু নয় শোনাবার মত। ওই যে আগষ্ট মাসে 'হুইট ইন্ডিয়া'-রেকলুশন হ'ল না—তারই কলে ভারতবর্ষে একটা টেউ বয়ে গিয়েছিল তো—

বলিস কি—আগষ্ট হুজুমেন্ট! সিপাহী বিদ্রোহের পরও ধরণের বিকোভ ভারতবর্ষে আর দেখা দেয় নি। শুনি তো বহুলোক রক্ত দিয়ে তাদের তুল কাছের প্রায়শ্চিত্ত করেছে।

মলয় মাথা উঁচু করে স্থির দৃষ্টিতে চাইলে তাঁর দিকে। অসহায় জোষ কিংবা বেদনা—কয়েকটি রেখার ক্রকনে যুঁখে কুঁড়ে তুলল যৌন প্রতিবাদ। ভদ্রিটা তার উন্নত নয়—উদ্বীণ। যুঁহু—অগচ্ স্পষ্ট হয়ে বললে; তুল কাছের নয় দাছ—সময়ের। নেতাজীও তা হলে তুল করেছিলেন বলতে চান?

তুল যারই হোক ভাই—রক্ত দিয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত—

পাণের প্রায়শ্চিত্ত করা যায়—ভুলেরও দণ্ড নিতে হয়, বারে বারে যত রক্ত দিয়েছে ভারতবর্ষ তা প্রায়শ্চিত্ত বা দণ্ড নয়। জয়গত অধিকার ফিরে পাবার জন্মে বার বার এগিয়ে আসে মানুষ—প্রাণ দেয়, নির্ধাতন সম—তার জন্ত ছুঃখ কিসের!

দাছ বললেন, তোমাদের বিশ্বাস—

আপনিই একটু আগে বললেন না—একটি জিনিসে নির্ভরতা না থাকলে—মানুষের জীবনের অর্থও থাকে না।

আমাদের বয়সে নতুন পৃথিবী গড়ার স্বপ্ন নিয়ে আমরা যেতে উঠেছি এ কথার চেয়ে—নতুন পৃথিবীতে আমাদের সম্মান আর গৌরব যাতে সবাই স্বীকার করে নেয়—সেই মহৎ চেষ্টায় জীবনপাত হ'ল সবচেয়ে বড় সত্য। পৃথিবীর ইতিহাসে আমরা একটু টাই পেতে চাই—এ কি আমাদের অভায় ইচ্ছা? না রক্ত দিয়ে ছ' এক বার প্রায়শ্চিত্ত করলেই এই ভুল শুধরে যাবে?

দাছ অবাধ হয়ে মলয়ের জলন্ত চোখ দুটির পানে চেয়ে রইলেন। তরুণ বয়স—সংসারের বন্ধন বেছায় গলায় পরেছে। মায়ের স্নেহ—প্রিয়ার ভালবাসা—জীবিকার সংস্থানে নির্বিঘ্ন সংসারে লেখাপড়া শিখে জগৎকে জেনেছে মোহযুক্ত বুদ্ধির দ্বারা—পরিণাম-অমঙ্গল উচ্ছ্বাস-প্রবণ যুবক মাজ নয়—একে পথের নির্দেশ দেবার ছলে কি উপদেশ দেবেন

তিনি? নির্দেশ দিতে যাবার দৃষ্টতাও তাঁর নেই। তীর্থে তীর্থে সংসারযুক্ত বহু সন্ন্যাসীকে দেখেছেন দাছ—আর স্বাধীনতাকামী এদের করে কজনকেও দেখেছেন। সম্পূর্ণ ভিন্ন-মুখী ছই জ্ঞানের সাধনাতে আশ্চর্য্য রকমের মিল তাঁর দৃষ্টিতে পড়ল আজ। ছই সাধকই তো যত্নকে ভয় করেন না—ছই যোগীই ধ্যাননিবদ্ধ দৃষ্টিতে দেবভূমির মহিমা নিরীক্ষণ করছেন। এক জন দেবতার জ্যোতিকে আর এক জন তাঁর মহিমাকে আয়ত্ত করতে চায়। এদের মধ্যে বড় ছোট কেউ নেই।

দাছ প্রশ্নর স্বরে বললেন, আমার ভুলটাই মেনে নিলাম ভাই—

মলয় হেসে বললে, ছি দাছ—বুড়ো হয়ে আপনি সত্যিই দুর্বল হয়ে পড়েছেন। মনের আনন্দে পাক খেয়ে পেঁ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ক্রমশঃ

বাস্তব ও কল্পনা

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

গেঁথেছি অনেক মালা আকাশ-কুহুমে,
সে ফুল যে ফোটে শুধু মনের আকাশে।
শিহরি কাহার স্পর্শে পেলো কি পাখা সে?
ফুল-বিহবেরা দূর নীল নভু চূমে।
কি ক'রে প্রভেদ করি জাগরণে ঘুমে?
জীবন জাগিয়া থাকে সে স্বপ্নের পাশে,
অপূর্ব্বের পরিচয় পাই যে আভাসে,
একাকার হয়ে যায় স্বর্গ মর্ত্যভূমে।

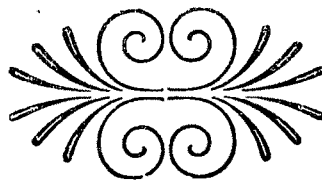
কল্পনা সে পায় রূপ। সেখা যায় দেখা,
অসীমের সীমা রচে দিগন্তের রেখা।
সূন্তব ও অসূন্তব কে ক'রেছে ঠিক,
মনের মায়ার সঙ্গে পারি না জাঁটিতে।
আকাশে কুহু ফোটে, নহে তা অলৌক,
সে পুষ্পতরুর মূল মর্ত্যের মাটিতে।

শাস্ত্রত বর্তমান

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

“আরো দূরে যেতে হবে।” কোথায়—কে জানে
দূরান্তরে লি লি করে পথের নিশানা,
সে পথের শেষ নাই, সে পথ অজানা,
ডাকিছে সে অনাগত সন্ধ্যার পানে।
“কি্রে চাপ, চলিয়াছ কিসের সন্ধানে?”
“আমারে চিনিতে পার?” “শোন বন্ধু মানা,
কেন যাবে যে-পথের নাই কো সীমানা?”
কেবলি পশ্চাতে যোরে গত-কল্যা টানে।

অতীতে জড়ানো কত আনন্দ ও ব্যথা,
আমার স্মৃতির মাঝে তার অমরতা,
ও যে সত্য। সত্যতর সে আগামী কাল
স্বপ্নে যে সার্থক করে জগতের মাঝ।
স্মৃতি ও স্বপ্নের তবে ছিন্ন কর ছাল,
সকলের চেয়ে সত্য জীবনের ‘আজ’।



ওহাবী আন্দোলন ও মুসলমান সমাজের রাজনীতি

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

আমরা ছেলেবেলায় কোন কোন মুসলমানকে 'করাজী' বা 'কেরাজী' বলিতে শুনিয়াছি। তখন করাজী বলিতে বুঝিতাম—আচারনিষ্ঠ ধর্মপরায়ণ মুসলমান। বদদেশে কিন্তু এই করাজীরাই সত্যিকার ওহাবী। বাংলার জল মাটির গুণে ওহাবী আদর্শ যেমন ঋণিকটা বদলাইয়া যায়, উহাদের নামেও তেমনি এইরূপ পরিবর্তন ঘটে।

ওহাবী আমাদের দেশী কথা নয়। আরব দেশে ওহাবী আন্দোলনের উদ্ভব। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে সেখানে আবদুল ওহাব নামক এক ব্যক্তির আবির্ভাব হয়। তিনিই ওহাবী আন্দোলনের প্রবর্তক। তুর্কীর অধীনে অবস্থান কালে নানাদিক দিয়াই আরব জাতির বিশেষ অবনতি ঘটে। মুসলমানগণ ইসলাম ধর্মের মূল তত্ত্ব জুলিয়া গিয়া বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানের বশীভূত হয়। ওহাব এই সকল আবর্জনা দূর করিয়া মন্বদ-প্রতিষ্ঠিত আচার-অনুষ্ঠান বর্জিত খাঁটি ইসলাম ধর্মের পুনঃপ্রবর্তনে সবিশেষ তৎপর হইলেন। আরব সমাজের বিস্তর লোক তাঁহার অনুবর্তী হইল। ওহাব দেখিলেন তাঁহার এই সংস্কার-কার্যের প্রধান বাধা তুর্কী-রাজ। তাই তিনি স্বদল গুষ্ঠ করিয়া আরবের মক্কা-মদিনা প্রভৃতি তীর্থস্থানগুলি হইতে তুরস্ক-প্রভৃতি উচ্ছিন্ন করিতে বহুপরিকর হইলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ্বে সমগ্র আরবে আবদুল ওহাবের প্রাধিক সংস্থাপিত হইল। ইসলাম ধর্মও সংস্কৃত হইল। কিন্তু ওহাবের কর্তৃত্ব বেশী দিন স্থায়ী হইতে পারিল না। তাঁহার মৃত্যুর কিয়ৎকাল পরে তুর্কী-রাজ পুনরায় আরবের উপরে আধিপত্য স্থাপন করিলেন। কিন্তু ওহাবের আদর্শ আরব জাতির মনে স্থায়ী আসন লাভ করে। বহিরাগত তীর্থযাত্রীরাও অনেকে এই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়। ওহাবী আদর্শে অনুপ্রাণিত এইরূপ এক জন তীর্থযাত্রী ছিলেন সৈয়দ আহমেদ।

রায় বেরিলীতে ১৭৮৬ খ্রিষ্টাব্দে মহরম মাসে সৈয়দ আহমেদ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কৈশোরে মুক্তবিদ্যা শিক্ষা করিয়া পিণ্ডারীদের অধীনে অস্বারোহী সৈনিকের কার্য করেন। তখন উত্তর-ভারতে ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ওয়ারেন হেস্টিংস সর্বপ্রথম পিণ্ডারীদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হন এবং উহাদের কঠোর হস্তে দমন করেন। পিণ্ডারীরা অতঃপর বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া পড়ে এবং লুণ্ঠ-তরাজ করিতে থাকে। সৈয়দ আহমেদও প্রথম জীবনে এইরূপ কৃষ্টিয়াসক্ত হইয়া পড়েন। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতেই উত্তর-পশ্চিম ভারতে শিখশক্তি প্রবল হইয়া উঠে এবং পঞ্জাবে শিখরাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। তখন লুণ্ঠ-তরাজ, ডাকাতি, রাহাজানি প্রভৃতি

সমাজবিরোধী কার্যের ভেমন সুযোগ আর রহিল না। পঞ্জাবে শিখরাজ্য তথা হিন্দু প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান সৈয়দ আহমেদের জীবনে এক পরিবর্তন দেখা দিল। হিন্দুদের সংস্পর্শে আসিয়া ইসলাম ধর্মে যে সব আচার-অনুষ্ঠান ও পৌত্তলিক প্রভাব প্রবেশ করে, তৎসমুদয় বিদূরিত করিয়া ইহাকে সুসংস্কৃত করিবার উদ্দেশ্যে সৈয়দ আহমেদ বিশেষ ভাবে তৎপর হইলেন। তিনি ইসলামের সারমর্ম উপলব্ধির জন্ত কিছুকাল দিল্লীতে থাকিয়া মৌলানাদের নিকট মুসলমান শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। এই সুসংস্কৃত ও সংশোধিত ইসলাম ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠান তিনি একদিকে যেমন মুসলমান ধর্মশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের পূর্ব সমর্থন লাভ করিলেন অতদিকে তেমনি সাধারণ মুসলমানগণও তাঁহার অনুবর্তী হইতে লাগিল। সৈয়দ আহমেদ যখন যেখানে গমন করিতেন বিখ্যাত মৌলানাগণ তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া তত্ত্বের স্তায় তাঁহার সেবা-যত্ন করিতেন। ইহাতেও সাধারণ মুসলমান সমাজ তাঁহার দিকে বিশেষ আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। ঈশ্বর এক এবং মুসলমানমাজ্জেই সমান—আহমেদের এই দুইটি কথা সহজেই সকলের চিত্ত জয় করিল।

সৈয়দ আহমেদ ১৮২০-২২ সনে সমগ্র উত্তর-ভারত পরি-ক্রমা করেন। তিনি যে যে স্থলে গমন করেন সেই সেই স্থলেই বিস্তর লোক তাঁহার শিক্ষায় গ্রহণ করে। তিনি সর্বত্র উপযুক্ত ও বিশ্বাসী লোকদের প্রতিনিধি বা একেট নিযুক্ত করিলেন। তাঁহার অত্যন্ত কার্য শিষ্যদের নিকট হইতে 'ধর্ম-কর' সংগ্রহ। পাটনায় তাঁহার ধর্মপ্রচারের একটি প্রধান কেন্দ্র স্থাপিত হইল। এখানে তিনি চারি জন ঋণিকা নিযুক্ত করিলেন। এই চারি জনের মধ্যে ইনায়েত আলি ও বিলায়েত আলির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহারা পূর্বে-ভারতে সৈয়দ আহমেদের মতবাদ প্রচারে প্রধান সহায়ক হইলেন। পাটনায় প্রচার-কেন্দ্র স্থাপনান্তর আহমেদ নৌকাযোগে কলিকাতায় আগমন করেন। পৰিমাণ্যেও তাঁহার বিস্তর শিষ্য জোটে। কলিকাতায় অবস্থানকালে তাঁহার মতবাদ বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের মুসলমানদের মধ্যেও প্রচারিত হইবার সুযোগ ঘটিল।

ইহার পর সৈয়দ আহমেদ মক্কাভীর্ষে গমন করিলেন। এই সময় তিনি ওহাবীদের সংস্পর্শে আসেন। সৈয়দ এত দিন ধর্ম-সংস্কারে মন দিয়াছিলেন, এবার ওহাবীদের মতবাদে ও কার্য-কলাপের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে পরিচিত হইয়া বুঝিলেন, ধর্ম-রাজ্য প্রতিষ্ঠিত না হইলে বিস্তৃত ইসলাম ধর্ম প্রবর্তিত হওয়া অসম্ভব। তিনি স্বয়ং ওহাবী দলভুক্ত হইলেন। ওহাবী মত্রে দীক্ষিত হইয়া খাঁটি ওহাবীরূপে তিনি বোম্বাইয়ের পথে স্বদেশে ফিরিলেন।

• ওহাবী মতবাদ প্রচারোদ্দেশ্যে সৈয়দ আহমেদ ১৮২৪ সনে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের পার্বত্য উপজাতিদের মধ্যে কর্মক্ষেত্র স্থাপন করিলেন। ইহার পর হইতে তাঁহার প্রধান লক্ষ্য হইল পার্বত্য অঞ্চল হইতে সমস্ত ভূমিতে আসিয়া মুসলমান প্রভুত্ব বা রাজত্ব প্রতিষ্ঠা। তিনি ইতিপূর্বে সমগ্র উত্তর-ভারতে যে কর্মসম্পন্ন গঠন করিয়াছিলেন এইবারে তাহা দ্বারা তাঁহার কাজ হাসিল করিতে উদ্ভূত হইলেন। তাঁহার নির্দেশে ধনবল ও জনবল সংগৃহীত হইতে লাগিল। উদেচ্ছ, নিকটবর্তী শিখ (বা হিন্দু) রাজ্যের উচ্ছেদ। ১৮২৭ সন হইতে শিখ রাজ্যে উপপাত-উপদ্রব আরম্ভ হইল। ডাকাতি, নরহত্যা, নারী-ধর্ষণ, রাহাজানি, লুণ্ঠতরাজ প্রভৃতি অবাধে চলিতে থাকে। ওহাবী দল ক্রমশঃ এত কমতাশালী হইয়া উঠে যে, ১৮৩০ সন নাগাদ পশ্চিম-পঞ্জাবের রাজধানী পেশোয়ার নগরী ইহার অধিকার করিয়া ফেলিল। তখন পঞ্জাবের অধিপতি রণজিং সিংহ উহাদের উপেক্ষা না করিয়া দমন করিতে অগ্রসর হইলেন। সৈয়দের শিষ্যগণ ও শিখসৈন্য সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হইল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সৈয়দ-শিষ্যগণকে রণে ভঙ্গ দিতে হয়। ১৮৩১ সনে এক শিখ সেনার হস্তিতে সৈয়দ আহমেদ ইহলীলা সংবরণ করিলেন।

তদবধি তাঁহার প্রধান শিষ্যগণ সাধারণের মধ্যে এই সংবাদ প্রচার করিতে থাকে যে, সৈয়দ আহমেদের যুত্ব হয় নাই। তিনি গুপ্তভাবে বিচরণ করিতেছেন, এবং শিষ্যবর্গ তাঁহার উপদেশ মত কার্য করিয়া সফলকাম হইলে তিনি আবার লশরীয়ে আবির্ভূত হইবেন। নিরীহ মুসলমান জন-সাধারণ এ কথায় আস্থা স্থাপন করিয়া, পূর্বাশঙ্কায় অধিকতর ধনজন দিয়া ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার কর্মসংঘটকে সহায়তা করিতে লাগিল। পরবর্ত্তের নিভৃত প্রদেশে সিভানায় ওহাবীদের দুর্গ স্থাপিত হইল। পঞ্জাবের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে রসদ সংগৃহীত হইতে আরম্ভ হইল। ব্রিটিশ অধিকৃত অঞ্চল হইতেও নানারূপ সাহায্য সেখানে পৌঁছিতে লাগিল। অতঃপর বড় রকম কোন অভিযান বা আক্রমণ না চালাইলেও ওহাবারা শিখরাজ্যে নানারূপ উপদ্রব করিতে থাকে।

বকে করাচী বা ওহাবী আদর্শ যে ভাবে শিকড় গাড়িয়া বসে সে এক বিচিত্র কাহিনী। তিভুমিঞা বা তিভুমির নাম মধ্য-বাংলায় প্রায় সকলেই শুনিয়া থাকিবেন। তিভুমির চাষী গৃহস্থের পুত্র; ছোটখাট এক জমিদারের কন্ডার পাণিগ্রহণ করায় তাঁহার অবস্থার কিঞ্চিৎ উন্নতি হয়। কিন্তু আরামের জীবন তিনি পছন্দ করিলেন না। কুস্তি, লাঠি ও অসি খেলা, ভীর ছোড়া প্রভৃতি শিখিয়া তিন নদীয়ার এক জমিদারের বরকন্দাজ হইলেন। মারপিটে সংশ্লিষ্ট হওয়ার অপরাধে তাঁহার একবার কারাদণ্ড হয়। কারারুদ্ধির পর তিভুমির দিল্লী গমন করেন এবং সেখানে হইতে বাদশা পরিবারের সঙ্গে মজা যান। এখানে আসিয়া বিখ্যাত ধর্মসংস্কারক ও পরবর্ত্তীকালের ওহাবী

নেতা সৈয়দ আহমেদের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হইল। সৈয়দ আহমেদের সংস্পর্শে আসিয়া তিভুমিরের জীবনে আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটে। বাংলাদেশে কিরিয়ান তিনি একান্ত মনে ওহাবী মতবাদ প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন বদে ইংরেজ শাসন অপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তিভুমির প্রথমেই ইংরেজের বিরুদ্ধে যাওয়া সমীচীন বোধ করেন নাই। ওহাবী মতবাদ তখনকার প্রচলিত ইসলাম ধর্মেরও বিরোধী ছিল, এ কারণ মুসলমান জমিদার বা প্রতিপত্তিশালী মুসলমানগণ ইহা সমর্থন করিতে পারিলেন না। তিভুমির ইহাদিগকে স্বমতে আনিবার জন্য ইহাদের উপরও অত্যাচার চালাইতে দ্বিধা করেন নাই। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলেও ওহাবীদের হস্তে প্রাচীনপন্থী প্রতিপত্তিশালী মুসলমানগণ কম নির্ধাত্ত হন নাই। কিন্তু ওহাবীরা সর্বদা মূল লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া চলিত। তাহারা মনে প্রাণে বিশ্বাস করিত, মুসলমান ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার হিন্দুরাই তাহাদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। বদে তিভুমির দলবল সহ অচিরে হিন্দুদের উপর চড়াও হইলেন। হিন্দু গ্রাম লুণ্ঠ করিয়া, ঘর বাড়ী পুড়াইয়া দিয়া, দেবমন্দির কদুড়িত করিয়া তিভুমিরের দলের লোকেরা নিজেদের বিবর্ণা দলনস্পৃহা চরিতার্থ করিতে লাগিল। গোবর-ডাঙ্গা-নিবাসী জমিদার কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্য হিন্দুগণ বিশেষ ভাবে এই দলের হস্তে নিপীড়িত হইলেন।*

হিন্দু সমাজেও সত্তর ইহার প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। হিন্দু জমিদারগণ ওহাবীদের দমন করিতে অগ্রসর হইলেন। ক্রমে ওহাবীদের উপপাত এত বাড়িয়া যায় যে, হিন্দুদের তরফেও তাহাদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণের মানারূপ ব্যবস্থা হয়। ওহাবীরা দাড়ি রাখিত। বারাসতের অধীন যুড়াগড়গাছির জমিদার কৃষ্ণচন্দ্র রায় প্রতি ওহাবী প্রকার দাড়ির উপর আড়াই টাকা কর বসান। এই ব্যাপারে জমিদারের লোকজন এবং ওহাবীদের মধ্যে একটি দাঙ্গা হয় এবং বারাসতের ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট ইহা লইয়া মামলাও উপস্থিত হয়। ইহার পর তিভুমির শিষ্যদের সম্বন্ধ করণাত্মক হিন্দুদের গ্রামগুলি পুনরায় আক্রমণ করিয়া লুণ্ঠতরাজ করিতে আরম্ভ করেন। ওহাবীদের অত্যাচারে শাসকবর্গেরও ক্রমে কতকটা চৈতন্যদায় হইল। তিভুমির ও সরকারের মধ্যে শৃঙ্খল সংঘর্ষ বাধিল। এই সম্পর্কে ১৮৭০ সনের ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখের 'অমৃত বাজার পত্রিকা'র এই বিবরণটি পাওয়া যাইতেছে,—

“১৮৩১ সালে একটি খাওয়া দাওয়া উপলক্ষে তিভু তাহার সমুদয় শিষ্য একত্রিত করিয়া বাঁশ দিয়া কেল্লা প্রস্তুত করে এবং ৫০০ লোক সমভিযাধারে পূর্ণ গ্রাম লুণ্ঠ করে। তাহার পর তাহারা কৃষ্ণনগর জেলার লাউবাটা গ্রাম লুণ্ঠ করে। তাহারা শেষে ক্রমেই অত্যাচারের বাড়াবাড়ি করিতে আরম্ভ করে। তাহার পর গবর্ণমেন্ট ২০ জন সিপাহী, এক জন জমিদার ও এক জন হাবিলদার তাহাদিগকে দমন করিতে পাঠান। এলেকজান্ডার নামক এক জন সাহেব সিপাহীদিগের ক্যাপ্টেন

* সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৭১।

হইয়া যান। তিনি দারগা এবং তাহাদের সঙ্গে বরকন্দাজ প্রভৃতি ১২০ জন যোদ্ধা লন এবং এলেকজান্ডার তিভুমীরের হস্তে পরাস্ত হন। তাহার দারগাকে মারিয়া ফেলে, সিপাহী বরকন্দাজও বিস্তর মারা পড়ে। নদীয়ার মাজিষ্ট্রেটও তাহাদের নিকট পরাস্ত হন। ১৮৩২ খ্রিঃ অঃ এলেকজান্ডার আবার অধিক সৈন্য সমস্ত লইয়া তিভুকে আক্রমণ করেন। যুদ্ধে জিত্ত এবং তাহার দল ধ্বংস হয় এবং তাহার সেনাপতি গোলাম মন্সুম ধৃত হইয়া আলীপুরে তাহার কাঁসী হয়।” *

তিভুমীরের পরাজয় ও যত্না ওহাবী বা ফরাজীদের বিশেষ আভ্যন্তরীণ কারণ হইল। ‘অমৃত বাজার পত্রিকা’ (৩ সেপ্টেম্বর ১৮৬৮) এই প্রসঙ্গে দেশ-প্রচলিত প্রবাদের উল্লেখ করিয়া লেখেন—

“কিন্নেপে তিভুমির কামানের গোলা ‘খাডলা’ বলিয়া উদ্ভূত সহচরগণের উৎসাহের বৃদ্ধি করিয়া দেয়—কিন্নেপে কুকের কেমার মধ্যে থাকিয়া তাহার সহচরগণ সেই সময়ে ‘গুলি খাডলা’ বলিয়া গুলি ফাটায়, কিন্নেপে তিভুমির প্রথম গুলিতে হত হয় ও তাহার সহচরগণ চতুর্দিকে পলায়ন করে, ও পরিশেষে কিন্নেপে নাপিতকে ৫ টাকা পর্য্যন্ত দিয়া ফরাজীরা খাড়া হুগুন করে, এ সমুদয় দেশময় প্রবাদ আছে। তখনকার গোটা হই গান,—

“হায় কি বুজুরগী বেড়েছে
উত্তরে এক গ্রাম আছে নাম নারিকেল বেড়ে।
জুটল এসে ষাট হাজার দেড়ে ॥

দেড়ের নামে ছুর।
বলে জলদি আন খুর ॥
তার সব গোলার চোটে কাছা ধুলে
সিটকে মরে রয়েছে ॥

ফকিরানি বলে ফকির রাত পোহালি হাট,
দাড়ি কাইচি দিয়ে ছাট ॥ ইত্যাদি”†

এইরূপে ফরাজী বা ওহাবীদের নিপীড়ন ব্যাহত হইল বটে, কিন্তু তাহা নিতান্তই সাময়িক। ইহার পুনরায় হিন্দু দলন কার্য আরম্ভ করিয়া দিল। ১৮৩৭ সন মাদাদ দেখা যাইতেছে, ফরিদপুর ও ঢাকার সন্নিকটস্থ ফরাজীগণ ভীষণ অনর্থের সৃষ্টি করিতেছে। এই সম্পর্কে ‘জিলা ঢাকা নিবাসী ছুখী তাপাগণ্ড’ একখানি পত্র ২২শে এপ্রিল তারিখের ‘সমাচার দর্পণে’ প্রকাশিত হয়। ইহার ক্রিয়াদংশ এখানে প্রদত্ত হইল,—

“ইদানীং জিলা ফরিদপুরের অন্তঃপাতি শিবচর থানার সম্বন্ধে বাহাদুর গ্রামে সন্নিকটস্থ নামক এক জবন বাদশাহি লগনেছক হইয়া ন্যূনাবিক ১২০০০ জোলা ও মোসলমান দলবদ্ধ করিয়া নতুন এক সরা জারী করিয়া নিজ মতাবলম্বী

লোকদিগের মুখে দাড়ি কাছাখোলা কটদেশে চর্খের রজ্জু ভৈল করিয়া তৎক্ষণাৎ হিন্দুদিগের বাড়ি চড়াও হইয়া দেব দেবীর পূজার প্রতি অশেষ প্রকার আঘাত জমাইতেছে এবং এই জিলা ঢাকার অন্তঃপাতি মলকংগ থানার সম্বন্ধে রাজ-নগর নিবাসী দেওয়ান মুতাজুজ রায়ের স্থাপিত দ্বাদশ-শিবলিঙ্গ ভাঙ্গিয়া নদীতে বিসর্জন দিয়াছে এবং এই থানার সম্বন্ধে পোড়ামাছা গ্রামে একজন ভ্রমলোকের বাড়িতে রাজিষোপে চড়াও হইয়া সর্ব্বত্র হরণ করিয়া তাহার গৃহে অগ্নি দিয়া অবশিষ্ট যে ছিল তন্ময় রাশি করিলে একজন জবন ধৃত হইয়া ঢাকার দণ্ডায় অপিত হইয়াছিল... আর শ্রুত হওয়া গেল তাহার জন্ত রায় অপিত হইয়াছে। আর শ্রুত হওয়া গেল সন্নিকটস্থ দলভুক্ত দুই জবনেরা এই ফরিদপুরের অন্তঃপাতি পাটকালা গ্রামের তারিখচরণ মজুমদারের প্রতি নানা প্রকার দৌরাখ্য অর্থাৎ তাঁহার বাড়িতে দেবদেবী পূজার আঘাত জমাইয়া গোহত্যা ইত্যাদি কুকর্ম উপস্থিত করিলে মজুমদার বাবু জবনদিগের সহিত সম্মুখ যুদ্ধ অশুচিত বোধ করিয়া এই সকল দৌরাখ্য ফরিদপুরের মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হজুরে জ্ঞাপন করিলে এই সাহেব বিচারপূর্ব্বক এক জন জবনকে কারাগারে বদ্ধ করিয়াছেন এবং এ বিষয়ের বিলক্ষণ অনুসন্ধান করিতেছেন। যে সম্পাদক মহাশয় দুই জবনেরা মফঃসলে এ সকল অত্যাচার ও দৌরাখ্যে ক্ষান্ত না হইয়া বরং বিচার গৃহে আক্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। শ্রুত হওয়া গেল ফরিদপুরের মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হজুরে যে সকল আমলা ও মোক্তারকারেরা নিযুক্ত আছে তাহার সকলেই সন্নিকটস্থ জবনের মতাবলম্বী তাহারদিগের রীতি এই যদি কাহার নামে মিথ্যা অভিযোগ করিতে হয় তবে কেহ করিয়া দী কেহ বা সাক্ষী হইয়া মোকদ্দমা উপস্থিত করে সুতরাং ১২০০০ হাজার লোক দলবদ্ধ ইহাতে ফরিদপুরের সাক্ষীর ক্রটি কি আছে।... আমি বোধ করি সন্নিকটস্থ জবন যে প্রকার দলবদ্ধ হইয়া উত্তর প্রবল হইতেছে অল্প দিনের মধ্যে হিন্দু ধর্ম লোপ পাইয়া অকালে প্রলয় হইবেক। সন্নিকটস্থ জোট পাটের শত অংশের এক অংশ তিভুমির করিয়া ছিল না।... ইতি সন ১২৪৩ সাল তারিখ ২৪ চৈত্র ॥”

সন্নিকটস্থ ফরিদপুরে ‘হুছমিয়া’ নামে আর এক জন ওহাবী-নেতা আবিভূত হন। তাঁহার সম্বন্ধে এখনও ঢাকা, ফরিদপুর, বরিশাল অঞ্চলে নানারূপ জনশ্রুতি আছে। হুছমিয়ার আমলে বঙ্গের ওহাবী আন্দোলন কতকটা অর্থনৈতিক রূপ ধারণ করে। ৩ সেপ্টেম্বর ১৮৬৮ দিবসীয় ‘অমৃত বাজার পত্রিকা’ হুছমিয়া সম্পর্কে লেখেন,—

“ফরিদপুরের হুছমিয়া ফরাজীদের গুরু ছিলেন। কালে তাঁহার প্রভাব এতদূর বৃদ্ধি হয় যে, তিনি মনে করিলে ৫০ সহস্র লোক সংগ্রহ করিতে পারিতেন। ইহার সমুদয় বড়বড় করিয়া ফরিদপুর ও কুষ্টিয়াগণকে একেবারে অগ্রাহ করিয়া

* প্রবন্ধ-লেখকের “ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও অজ্ঞানতা প্রসঙ্গ,” পৃ. ১৮১-২ দ্রষ্টব্য।

† প্র., পৃ. ১৭৭-৮।

* “সংবাদ-পত্রে সেকালের কথা,” ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৭২-৮০।

ফেলে। গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে তিনি কখন কিছু করেন নাই বটে, কিন্তু গবর্ণমেন্ট তাঁহাকে ভয় করিতেন।

“পরে ১৮৪৬ সালে জমিদারে ও কৃষিকালে জুটরা তাঁহার বাগ্মী লুঠ করেন, ও ১৮৪৭ সালে তাঁহাকে সেসন আদালতে দণ্ড দেন। ১৮৫৭ সালে যখন সিপাহী যুদ্ধ বড় জাঁকিয়া উঠে, তখন হুহুমিয়াকে গবর্ণমেন্ট আশংকাক্রমে কয়েদ করিয়া কিছুকালের নিমিত্ত আলিপুরের জেলে রাখেন।”*

বঙ্গদেশে ওহাবী আন্দোলন ক্ষেমে মূতন রূপ ধারণ করিল এবং বারাসত, সাতক্ষীরা, যশোহর, ঢাকা, ফরিদপুর, বরিশাল, নদীয়া, পাবনা, রাঙ্গসাহী, রংপুর, ত্রিপুরা, নোয়াখালি, ময়মনসিংহ, ত্রিহুট প্রভৃতি বঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ছড়াইয়া পড়িল। কিন্তু গিভানা কেন্দ্রে মূল উদ্দেশ্য অহযায়ীই কাঁধ্য হইতে লাগিল। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল হইতেও ধন-জন ও অজ্ঞাত রসদপত্র বিস্তার প্রেরিত হইতে থাকে। ১৮৪৮ সন নাগাদ পঞ্জাবে শিখশক্তির পতন হয় এবং ৭৫০ সনে সমগ্র পঞ্জাবই ইংরেজের অধিকারে আসে। ওহাবীদের নিকট হিন্দু, শিখ বা খ্রীষ্টান ইংরেজ সকলেই বিধর্মী, শ্রেষ্ঠ; খাঁটি ইসলাম ধর্ম প্রতিষ্ঠায় সকলেই প্রতিবাদী। এক জন ইংরেজ

লেখক সত্যই বলিয়াছেন, ওহাবী বিরোধিতা উত্তরাধিকার স্বত্ব শিখদের নিকট হইতে ইংরেজেরা লাভ করে। ইংরেজ ঐতিহাসিকের এই কথা কয়টি যে কত দূর সত্য তাহা ওহাবী দের পরবর্তী কার্যক্রম আলোচনা করিলে স্পষ্ট বুঝা যায়।

সৈয়দ আব্দুল হকের মৃত্যুর পর তাঁহার প্রধান শিষ্যবর্গ ওহাবী মতবাদ সুচরুপে প্রচারোদ্দেশ্যে নানা উপায় অবলম্বন করিলেন। সুদূর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত হইতে পূর্ব-প্রান্তিক বাংলা—এই দুই হাজার মাইলের মধ্যে ওহাবীদের বিভিন্ন আড্ডা বা শাখা কর্মক্ষেত্র স্থাপিত হইল। এই সকল কর্মক্ষেত্রে ভাবী প্রচারকদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়। সাধারণ অজ্ঞ মুসলমানদের স্বমতে আনয়নের জন্য এই প্রচারকগণ অনেকে তাহাদের মধ্যে গিয়া বসবাস করিত, এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে বিবাহাদি পর্যন্ত করিয়া তাহাদের সঙ্গে একাত্ম হইয়া যাইত। কার্গী, উর্দু প্রভৃতি ভাষায় ওহাবী মতবাদ বিশ্লেষণ ও ওহাবী আন্দোলনের উদ্দেশ্য বিবৃত করিয়া প্রচার-পত্রী রচিত হইত এবং সাধারণের মধ্যে তাহা বিলি করিবারও ব্যবস্থা ছিল। বহু পুস্তক ও পুস্তিকা এই সম্পর্কে লিখিত হয়।

*“ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও অজ্ঞাত প্রসঙ্গ”, পৃ. ১৭৮ দ্রষ্টব্য।

করাঙ্গী-নেতা হুহুমিয়া সম্পর্কে ২৩ এপ্রিল ১৮৭০ তারিখের “হিন্দু-হিউমিগ” সাপ্তাহিকেও অনেক তথ্য-বাহির হয়। ইহার কিয়দংশ এই—

“আজি প্রায় ২০১২৫ বৎসর হইল হুহুমিয়া নামে একজন মোসলমান পূর্ব বাংলায় প্রোতুভ হইয়া ফরিদপুর ও ঢাকার মুসলমান সমাজকে ব্যতিব্যস্ত করিয়াছিলেন, ইতর শ্রেণীর মোসলমান মাত্রই কাছা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার অধীনতা বা দাসত্ব স্বীকার করিয়াছিল। হুহুমিয়ার মত মোসলমান ধর্মশাস্ত্রের এবং প্রাচীন ও ধার্মিক মোসলমানদিগের মতের সহিত সম্পূর্ণ ঐক্য হইত না, তজ্জ্ব অনেক সম্ভ্রান্ত মোসলমান তাঁহার মত অনুমোদন করিতেন না। শুনা আছে, হুহুমিয়ার সোয়াহল পরিমিত একখানি বিনামার নাম ‘সামাদার’ ছিল, কোন শিষ্যদিগের ত্রুটি লক্ষিত অথবা কাহাকে স্বমতে আনয়ন করিতে হইলে উক্ত সামাদার দ্বারা শাসন এবং সাহসের সহিত অর্থদণ্ড করা হইত। ইহার অধীনে কয়েকজন খলিফা নিযুক্ত হয়, ইহারা তাঁহার মতের উপদেশক। ইহাদের সর্বকর্ত্তব্য ক্ষমতা ছিল। ঐ সময়ে প্রায় স্থলের বদমায়েস মোসলমান লোকই কাছা পরিত্যাগ পূর্বক তাঁহার আত্মগত স্বীকার করিয়া স্বার্থ সাধনের বিলক্ষণ সুযোগ পায়। তখন কত জীর সত্য নষ্ট, কত জী-পুরুষের পতি-পত্নী বিচ্ছেদ ঘটয়াছে। কত নিরীহ লোকের প্রাণদণ্ড, সম্পত্তি-অপহরণ, গৃহদাহ এবং অজ্ঞাত প্রকারের যন্ত্রণা হইয়াছে, তাহা বর্ণনা করিতে গেলে হৃদয় বিদীর্ণ এবং হৃৎখে আপ্লুত হইতে হয়। লোক প্রযুক্তির অহুরোধে হুহুমিয়াও সে সকল কার্যকে ধর্মসদত বলিয়া স্বীকার করিতে শিখিয়া সর্বত্রই তাঁহাকে ঈশ্বরপ্রেরিত মনে করিয়া তাঁহার যশোগান ও মত

প্রচার করিত। সেই সময়ে এদেশে নীলকরনিগেরও ভয়ানক অভ্যুত্থান ছিল, কিন্তু হুহুমিয়ার অভ্যুত্থানে নীলকরের প্রভা একতালীন মলিন হইয়া পড়ে; হুহুমিয়া সম্পত্তিহীন হইয়াও এভাবে আধিপত্য বিস্তার করিয়া জমিদারী স্থাপন ও অনেক ধন সঞ্চয় করিয়াছিলেন। তখন লোক এরূপ অভ্যুত্থান পীড়িত হইয়াছিল যে অনেকে দেশ ত্যাগ করিয়াছিলেন। অভ্যুত্থানের প্রতিবিধান জন্য কোন মোকদ্দমা করিলে তাহা নিফল এবং অভ্যুত্থানের ব্যুতি হইত। কিন্তু কেহই পার্থক্যানে প্রতিপক্ষ হইত না বরং শরীর পাতিয়া তাঁহার অভ্যুত্থান সহ্য করিত।

“সামাদার দ্বারা শাসিত হইয়া অথবা ইচ্ছাপূর্বক কাছা ছাড়িয়া যাহারা হুহুমিয়ার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিল, তাহারা ‘কেরাজী’। পূর্বে যে খলিফার কথা বলা হইয়াছে, তাহাদের এক এক জনের অধীনে বহু কেরাজী থাকিত, কেরাজীদের উপর তাহাদের সম্পূর্ণ প্রভুত্ব ছিল, তজ্জ্ব খলিফারা হুহুমিয়ার প্রসাদে এক এক জন বড় মাসুম মধ্যে গণ্য হইয়া উঠে। হুহুমিয়া শিষ্যদিগের প্রবৃত্তির প্রতিকূলে চলিতেন না; লোক প্রযুক্তি যে দিকে যাইত সবার মতকেও সেই দিকে চালাইতেন। তিনি এইভাবে অনেক কাল অভ্যুত্থান চালাইয়া শেষ ধর্মের প্রভাবেই হটক অথবা লোকের অভিলাষেই হটক ভয়ানকরূপে আক্রান্ত হন। অবশেষ পদ পচিয়া মৃত্যুস্থখে পতিত হইতে হয়। পরক্ষণে তাঁহার অনেক সম্পত্তি নীলাম হইয়া যায়। ফলকথা, হুহুমিয়া মরিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার অভ্যুত্থান জনিত অনেক পরিবারের হৃদয়ে চিরস্থায়ী সন্ধিত রহিয়াছে, অনেক পরিবার উৎসন্ন গিয়াছে। অদ্যাপিও সেই হুহুমিয়ার খলিফা ও শিষ্য কেরাজীরা চর অঞ্চলে থাকিয়া অবসরকালে লোকের প্রতি অভ্যুত্থান ও চুরি ডাকাইতি করিয়া থাকে। এই অভ্যুত্থান নিবন্ধন অদ্যাপিও এদেশ ঠাণ্ডা হয় নাই।...”

বিধর্মীদের বিরুদ্ধে সমর-উদ্দেশ্যক অনেক গান রচনা করা হয়। ওহাবী দলভুক্ত নতুন নতুন লোকদের সম্মুখে এবং ওহাবী সেনাদলের হৃৎকাণ্ডস্বাদের সময় এই সকল গান গীত হইত। ইহার মধ্যে যে গানটি একটি বিশেষ সমর-সঙ্গীত রূপে জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল তাহার তাৎপর্য এইরূপ,—

"First I glorify God, who is beyond all praise ;
I laud his prophet, and write a song on Holy War :
Holy war is a war carried on for religion, without
any lust of Power. In the Sacred Scriptures its
glories are related : I mention a few.
War against the infidel is incumbent on all Musalmans ;
make provision for it before all things.
He who from his heart gives one farthing to the cause,
shall hereafter receive seven hundredfold ;
And he who both gives and joins in the fight, shall
receive seven thousand fold from God.
He who shall equip a warrior in the cause of God shall
obtain a martyr's reward.
His children dread not the trouble of the grave; nor
the last trump ; nor the day of judgment.
Cease to be cowards; join the divine leader, and smite
the infidel.
I give thanks to God that a great leader has been
born in the thirteenth century of Hijra.
Oh friend, since you must sometime die, is it not
better to offer up your life in the service of the
Lord ?
Thousands go to war and come back unhurt ! thousands
remain at home and die.
You are filled with worldly care, and have forgotten
your Maker in thinking of your wives and children.
How long will you be able to remain with your wives
and children ? How long to escape death ?
If you give up this world for the sake of God, you
enjoy the pleasures of Heaven for ever.
Fill the uttermost ends of India with Islam, so that
no sounds may be heard but "Allah ! Allah !""*

ওহাবীরা সাধারণ মুসলমানদিগকে এই বলিয়া উদ্বেজিত করে যে, বিধর্মীর রাজ্য দার-উল-হায্ব। এখানে বসবাস করা ধর্মবিরুদ্ধ কার্য। হয় এই রাজ্যকে একটি পুরাপুরি মুসলমান রাষ্ট্রে পরিণত কর, নতুবা এদেশ হইতে বাধীন মুসলমান রাজ্যে (দার-উল-ইসলাম) চলিয়া যাও। ইহাতেও অপরিণামদর্শী মুসলমান সমাজ ভারতবর্ষে একটি মুসলমান [ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠাকল্পে] মাতিয়া উঠে। পূর্বেই বুল কেন্দ্র সীতানার উল্লেখ করা হইয়াছে। পঞ্জাব অধিকারের পর ভারত-দখলভাগ ১৮৫০-৫৮ সনের মধ্যে ওহাবীদের বিরুদ্ধে ষোলটি এবং '৬৩ সনের মধ্যে অন্যান্য কুড়িটি অভিযান চালান। সিপাহী যুদ্ধ-কালেও ওহাবীরা বেশ সক্রিয় ছিল। তবে ১৮৫৮ সনের শেষভাগেই—তখন সিপাহী যুদ্ধ একেবারে শেষ হয় নাই—ওহাবীগণ পশ্চিমাঞ্চলের ইংরেজ অধিকারের মধ্যে আধিপত্য বিস্তারে প্রয়াসী হইয়া উঠে। এই সময় সুদূর সীতানা কেন্দ্রে "বেহারের ও বাদশাহার মধ্যে

বারাসত, সাতক্ষীরা, যশোর, ফরিদপুর, বরিশাল প্রভৃতি স্থানের ফরাজীরা বন ও জন দিয়া বিস্তর সাহায্য করে।"*

ইংরেজরা প্রথমে ওহাবীদের শক্তি পরিমাপ করিতে পারে নাই। কিন্তু ইংরেজাধিকার যখন সত্য সত্যই আক্রান্ত হইল তখন তাহারা সর সিডনি কটনের নেতৃত্বে উপযুক্ত সংখ্যক সেনা প্রেরণ করিয়া সম্মুখ যুদ্ধে ওহাবীদের পরাজিত করে। সীতানার ওহাবী দুর্গও ধ্বংস করিয়া ফেলা হইল। কিন্তু তবু ওহাবীরা দমিয়া গেল না। সীতানা হইতে কিয়দূরে মহবান নামক পার্শ্বভাগ প্রদেশে মল্কায়ে গিয়া তাহারা আশ্রয় লইল।

ইহার পর কিয়ৎকাল পর্যন্ত ওহাবীরা একাঞ্চে তেমন কিছু উপাভাদি করে নাই। তবে লোকজন ও রসদপত্র সংগ্রহ পূর্ববৎই চলিতে থাকে। পার্শ্বভাগ-উপজাতিদের মধ্যে কখন কখন 'ধর্ম-কর' আদায় লইয়া ও কোন কোন আর্থিক প্রয়োজন সম্পর্কে মতবৈধ উপস্থিত হইত বটে, কিন্তু 'ধর্ম-রাজ্য' প্রতিষ্ঠা করিতে তাহারা সকলেই সমান তৎপর ছিল এবং যখনময় এই সকল উপজাতীয়েরা ওহাবীদের সহায় হইত। কয়েক বৎসর চূপচাপ থাকিয়া ওহাবীরা ১৮৬৩ সনে পুনরায় ব্রিটিশের বিরুদ্ধে উদ্ভিত হয়। ১৮২৭-৩০ সনে তাহারা রণজিং সিংহের রাজ্যে যেকপ উপদ্রব আর করিয়া দিয়াছিল এবারেও প্রায় তাহারই পুনরাবৃত্তি হইল। ১৮৬৩ সনের সেপ্টেম্বর হইতে ওহাবী ও ব্রিটিশ সেনার মধ্যে প্রকৃত প্রস্তাবে সংঘর্ষ আরম্ভ হইল। এবারকার সেনাধ্যক্ষ ছিলেন সর নেভিল চেম্বারলেন। আবেলা গিরিসঙ্কটে যে শেষ সংগ্রাম হইল তাহাতে ব্রিটিশ বাহিনী জয়লাভ করে বটে, কিন্তু তাহাতে তাহাদের বিস্তর নৈজ হতাহত হয়। শেষ পর্যন্ত উপজাতীয় দলসমূহের মধ্যে মতবিরোধ উপস্থিত হওয়াতেও ব্রিটিশের অনেকটা সুবিধা হইয়াছিল। কূটনীতি এ ক্ষেত্রে তাহাদের বিশেষ সহায় হয়।

দ্বিতীয় বার সম্মুখ সমরে পরাজিত হইয়াও কিন্তু ওহাবীরা আদৌ নিরস্ত হয় নাই। এই দলটি কতকটা পণতন্ত্রের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এক জন নেতার মৃত্যুতে বা প্রধান কর্মকে ধ্বংস হইলেই তাহাদের কার্য বন্ধ হইত না। আসল উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত বিভিন্ন শাখাকেই হইতে প্রচারকার্য এবং বন ও জনবল সংগ্রহ আপের মতই চলিতেছিল। ১৮৬৮ সনে পুনরায় ব্রিটিশ ও ওহাবীদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। পার্শ্বভাগ উপজাতীয়েরা পূর্ব পূর্ব বারের ভায় এবারেও ওহাবীদের বিশেষ সাহায্য করিল। এবার বাস জঙ্গীলাটি ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে অভিযান পরিচালনা করেন। এবারকার যুদ্ধেও, বিস্তর ব্রিটিশ সেনা হতাহত হয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহাদেরই জয় হইল। প্রাণপণ করিয়া লড়িয়াও উন্নত বৈজ্ঞানিক রণাঙ্গ ও

* The Indian Musalmans. By W. W. Hunter. 1871. Pp. 65-6.

* 'অমৃত বাজার পত্রিকা', ৩ সেপ্টেম্বর ১৮৬৮। "ভারতের স্বাধীনতা ও অন্তান্ত প্রসঙ্গ", পৃ: ১৭৮ দ্রষ্টব্য।

সমরকৌশলের নিকটে। দুর্জয় ওহাবী সেনা হার মানিতে বাধ্য হয়।

সরকার ওহাবীদের কার্যকলাপের প্রতি প্রথমে তেমন গুরুত্ব আরোপ করেন নাই, কিন্তু দ্বিতীয় বারের সংঘর্ষের পর হইতেই তাঁহারা এ সম্বন্ধে নিয়মিত অহুসন্মানে প্রবৃত্ত হন। এইরূপ অহুসন্মানের ফলে ওহাবীদের নজিসামর্থ্য, প্রচার-কৌশল, পুস্তক-পুস্তিকা, রসদ সংগ্রহ এবং মুসলমান জন-সাধারণের সঙ্গে তাহাদের যোগাযোগ প্রভৃতির বিষয় প্রকাশ হইয়া পড়ে। এ সকলের কতকটা আভাস আমরা পূর্বেরই পাইয়াছি। ১৮৬৪ সনে পঞ্জাবের আখালা শহরে ব্রিটিশ বিচারদালতে রাজদ্রোহাঙ্ক কার্যের অপরাধে ওহাবীদের বিরুদ্ধে সরকার পক্ষে মোকদ্দমা রুজু হইল। এই মোকদ্দমায় এগার জনের বিচার হয় এবং প্রত্যেকেই কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। এই আসামীদের মধ্যে একজন ছিল নদারা জেলার হুমারখালি গ্রাম-নিবাসী মুসলমান। বহু সরকারী মুসলমান কর্মচারীও যে ওহাবী দলের সঙ্গে যুক্ত ছিল তাহাও এই সময় বিশেষ করিয়া জানা গেল।

ইহার পর বৎসর ১৮৬৫ সনে পার্টনার ওহাবীদের দ্বিতীয় মোকদ্দমা হয়। ১৮৬৯-৭০ সনে মালদহ, রাজমহল, রাজশাহী প্রভৃতি স্থানেও বিচার আরম্ভ হইল। এবারে হাকিম জন ওহাবীর বিচার হয়। ইহাদের মধ্যে পাঁচ জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইল। এই দলের মধ্যে কলুটোলার বিখ্যাত ব্যবসায়ী আমীর খাঁ ছিলেন প্রধান। আমীর খাঁ কলিকাতা হাইকোর্ট পর্যন্ত লড়িয়াছিলেন। হাইকোর্টের আপীলে তাঁহার পক্ষ সমর্থন করেন বোর্ডার হাইকোর্টের বিখ্যাত এডভোকেট এনেস্ট সাহেব। মনীষী বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় এই মর্মে লিখিয়াছেন যে, এই মামলার আমীর খাঁর পক্ষে এনেস্ট সাহেব যে সওয়াল করেন তাহা পাঠ করিয়া তরুণ বয়সেই তাঁহারা স্বাধীনতার পূজারী হইয়া উঠেন।

আমীর খাঁর মোকদ্দমার বিচার করেন কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি নর্ম্যান। ১৮৭১ সনে এই মামলার চূড়ান্ত বিচার হইয়া যায়। বিচারে আমীর খাঁর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়। ইহার অল্পকাল পরেই, ১৮৭১ সনের ২০শে অক্টোবর তারিখে উক্ত বিচারপতি নর্ম্যান সাহেব এক মুসলমান আভতায়ীর নির্দয় আঘাতে প্রাণ হারাইলেন। ইহার মাত্র তিন মাস পরে ১৮৭২ সনের ৮ই ফেব্রুয়ারী তৎকালীন বড়লাট লর্ড মেও আশ্বামান পরিভ্রমণ কালে পোর্ট ব্লেয়ারে সন্ধ্যার অন্ধকারে শের আলি নায়ক এক মুসলমান কয়েদীর হস্তে প্রাণ বিসর্জন দেন। উক্ত আভতায়ীই ওহাবী বলভুক্ত বলিয়া সম্ভব দৃঢ়ীভূত হইল। ওহাবীদের দমনের কষ্ট সরকার তিন বার প্রত্যক্ষ সংগ্রামে লিপ্ত হন, বিভিন্ন স্থানে ওহাবী-নেতাদের আটক করিয়া বিচারান্তর তাহাদের কারাদণ্ডেও দণ্ডিত করা হয়, রাজ-দ্রোহাঙ্ক প্রচারকার্য বন্ধ করিবার জন্য কোঁকদারী আইনও সংশোধন করিয়া

লওয়া হয়, কিন্তু এত করিয়াও ওহাবীদের দমন করা গেল না। মাঝধান হইতে উহাদেরই দুই জনের হস্তে দুই জন ইংরেজ রাজপুরুষের প্রাণ দিতে হইল। ভারতবর্ষে মুসলমান রাজ্য প্রতিষ্ঠা কল্পে ওহাবীরা কিরূপ ত্যাগস্বীকারপূরক মন্ত্রণাতি সহকারে কার্যে লব্ধী হয়, সে সম্বন্ধে অমৃত বাজার পত্রিকা ১৮৭২ সনের ২৫ এপ্রিল তারিখে একটি সুচিন্তিত প্রস্তাব লেখেন। ইহা হইতে কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করা হইল,—

“পৃথিবীর মধ্যে রাজনৈতিক যড়যন্ত্র যখন যেখানে হইয়াছে, এক স্রোত না এক স্রোত প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু ওহাবী যড়যন্ত্রের অভিজ্ঞের প্রমাণ আমরা পদে পদে পাইতেছি অথচ উহা বরিবার যো নাই। এই যড়যন্ত্রের একটি বিষয় দেখিয়া আমরা অবাক হই। দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ সবল সাহসী ধর্মোন্মত্ত, অকাতরে প্রাণ দিতে পারে অথচ কিছু প্রকাশ করিবে না এরূপ লোক এক কোটির মধ্যে একজন পাওয়া সুকঠিন। এরূপ লোক অহুসন্ধান করিয়া বাহির করা কেবল অসাধ্য নহে, কিন্তু অহুসন্মানে প্রবৃত্ত হইলে তাহা প্রকাশ না হইয়া যায় না। আমাদের রাজ-পুরুষদিগের ক্ষমতা বিস্তার সত্ত্বেও ইহার নিগূঢ় কারণ-তাঁহারা পুঁজিয়া বাহির করিতে পারিলেন না। যে যড়যন্ত্র এরূপ লোক দ্বারা সৃষ্ট বাহা কল্পনা চক্ষেও অদৃশ্য, যাহার প্রকৃতি এরূপ অশেত, এবং যাহা সম্ভবতঃ ভারতবর্ষের প্রতি লোমকূপে প্রবেশ করিয়াছে, তাহা শাসন দ্বারা দমন করা সম্পূর্ণ অসম্ভব।...মুসলমানেরা ভারি ইঞ্জিরপরাধ, স্বর্গরূপ তাহাদের ইঞ্জিরস্থলের পরাকাষ্ঠা, তাহারা ইংরেজী অভ্যাস করে না। কোরাণে তাহাদের অবিচলিত বিশ্বাস এবং শুদ্ধ কাকের হত্যা করিলে তাহারা স্বর্গরূপ তত অধিক ভোগ করিবে এই তাহাদের বিশ্বাস। তাহারা এক একটি হত্যাকে অনন্ত-স্থলের দ্বার বিবেচনা করে সুতরাং কোনরূপ শাসন তাহারা লক্ষ্য করে না। প্রত্যুত অহুসন্মানে ভায় শাসনেও তাহাদিগকে আরও অধিক প্রতিজ্ঞারূঢ় ও উৎসাহী করিতে পারে।”*

ওহাবীদের মন্ত্রণাতি এবং ওহাবী মতবাদের ব্যাপক প্রচারের জন্য কর্তৃপক্ষ ইতিকর্ষ্য নির্ভারণে সহসা পারগ হন নাই। পরে তাহারা ওহাবীদের নিহুল করিবার জন্য উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিন্তু এ বিষয় এখন বলিব না। বঙ্গদেশের পূর্বাঞ্চলে ওহাবী বা ফরাজীদের উৎপীড়নে ১৮৭০ সন নাগাদ জনসাধারণ কিরূপ উদ্ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ ঢাকা হইতে প্রকাশিত ২৮ মে ১৮৭০ তারিখের ‘হিন্দু হিতৈষিণী’তে প্রদত্ত হয়। ‘হিন্দু হিতৈষিণী’ লেখেন—

“যখন ছহুমিয়া এদেশে প্রাচলিত হন, তখন হইতেই মোসলমান ধর্মে...কেন্দ্রীকী মত প্রচলিত হয়। ছহুমিয়ার এমনই প্রতাপ ছিল যে একমাত্র সামাদার অহুসলে ঢাকা, ফরিদপুর, বাকরগঞ্জ, জিপুরা এবং নোয়াখালী জেলার প্রায় ইত্তর প্রদেশ মোসলমানই তাহার বশতা ও মত স্বীকার করে। যাহারা প্রথম

*“ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও অশান্ত প্রসঙ্গ,” পৃ. ২২৬-৭।

আপত্ত্য করিয়াছে তাহারা সাদাদারের অশাসনে তৎপরক্ষেণেই অধীনতা স্বীকার করিয়াছে। ইতর লোকেরা কোন উচ্চ লোকের সাহায্য পাইলে নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া উঠে। হুহুমিয়ার যত প্রতাপ বৃদ্ধি হইতে লাগিল, ততই লোকের প্রতি বিষম অত্যাচার হয়। হুহুমিয়ার মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত কত লোকের সর্বনাশ হইয়াছে, তাহা বলা সুকঠিন। তাঁহার মৃত্যুর পর কয়েক বৎসর লোকে এক প্রকার শান্তি ভোগ করে। প্রায় ৬৭ মাস যাবৎ পুনরায় সেই সকল দুর্ব্বল ফরাজীরা মাদারিপুর সব ডিসনের অন্তর্গত স্থানসমূহে ভয়ানক অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে। আমরা পূর্বেও এ বিষয় উল্লেখ করিয়াছিলাম, অন্য তৎসম্বন্ধে দুইখানি পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহার একখানি যথাস্থানে প্রকাশ করা গেল।

“মাদারিপুর সব ডিভিসনের লোকেরা গত ২২শে এপ্রিল বঙ্গদেশের লেপ্টেনেন্ট গবর্নর উইলিয়াম এম মহোদয়ের নিকট হুহুমিয়ার পুত্রদ্বয়ের অত্যাচার উল্লেখ করিয়া এক আবেদন করে। আজ পর্যন্ত তাহার কোন সফল হইল কি না জানা যায় না। কেহও বলেন, মাদারিপুর সব ডিভিসনে যখন অযোগ্য ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট বাবু দীনবন্ধু মৌলিক ছিলেন, তখন তাঁহার অশাসনে ফেরাজীরা নিরন্তর ছিল, তৎপর যখন তথায় একজন মুসলমান ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট যান তখন হইতেই পুনরায় ফেরাজীরা প্রায় পাইয়া অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে। ইহারা আদালতের আদেশও অবজ্ঞা করে, ২৩ মাস হইল ছোট আদালতের ডিক্রী ক্রমে একজন গোমস্তাকে ধৃত করে, ফেরাজীরা প্যাদাকে প্রহার করিয়া দায়িককে কাড়িয়া রাখে। আর এক কৌজদারী মোকদ্দমায় ২ জন কনেষ্টবল প্রহারিত হইয়াছে। এতদ্বিধ প্রজা ও ভূম্যধিকারীর মধ্যে অবগৎ ঘটাইয়া ভূমির কর আদায়ের নানা বিঘ্ন জন্মাইতেছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে আজি উনবিংশ শতাব্দীতে চতুর্দিকের কোলাহল শুনিয়াও এরূপ অত্যাচার অধিক দিন বর্তমান রহিয়াছে। গবর্নমেন্ট অবশ্যই এ সকল অত্যাচার অবগত হইতেছেন, যদি এ অত্যাচারের কোন প্রতিবিধান না হয় তবে ব্রিটিশ অশাসন আমাদের

কি উপকারে আসিল? অন্যান্য স্থানের কথা বলিতে পারি না, মাদারিপুর সব ডিভিসনের এলাকার লোকেরা এ সকল অত্যাচারে পরিবার ও সম্পত্তি আপনাদিগের গলগ্রহ মনে করিতেছে। কোথায় রাখিলে নির্বিঘ্নে থাকিবে তাহা স্থির করিতে পারিতেছে না। ফেরাজীদিগের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করা দূরে থাকুক, কথা বলিলেই তাহার বিপদ ঘটে; অভিযোগ করিয়াও সফল লাভ হয় না। যত ইতর শ্রেণীর মোসলমান সমুদয়ই ফেরাজী, তন্মধ্যে ৫৭ জন উহাদের বর্হোপদেশক (খলিফা) আছে। মোকদ্দমা উপস্থিত হইলেই উহারা সাক্ষী প্রভৃতির প্রতি অত্যাচারের ভয় প্রদর্শন করে, বোধ হয় সেইজন্যই পার্থক্যমানে কেহ প্রকৃত সাক্ষ্য প্রদান করিতে সাহস পায় না।....”

ওহাবী তথা ফরাজীদের মূল উদ্দেশ্য ভারতবর্ষের সর্বত্র একটী মুসলমান স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা, এ কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। এই উদ্দেশ্য সাফল্যমণ্ডিত করিবার পক্ষে ব্রিটিশরা ছিল প্রবল প্রতিবাদী। তাই তাহাদের বিরুদ্ধে ছিল এই সকল যড়যন্ত্র ও সশস্ত্র অভিযান। কিন্তু ইংরেজ লক্ষ্য হইলেও ওহাবীদের অত্যাচার-উৎপীড়ন প্রতিবেশী হিন্দুদেরই বিশেষ করিয়া সহ্য করিতে হয়। হিন্দু (অজকালকার ভাষায় অ-মুসলমান) সমাজ যে নিছক মুসলমান রাজ্য স্থাপনে ভবিষ্যতে প্রতিবন্ধক হইবে তাহা তাহারা জানিত, এবং জানিত বলিয়াই ইংরেজের বিরুদ্ধে যড়যন্ত্র চালাইলেও হিন্দুদেরই সম্পত্তি লুণ্ঠন, ধরবাড়ী পোড়ান, নারীর উপর অত্যাচার, মারপিট, নরহত্যা প্রভৃতিতে লিপ্ত হইত। ওহাবীদের কার্যকলাপ ঠিক ১৬ই আগস্টের (১৯৪৬) মুসলিম লীগ পরিচালিত প্রত্যক্ষ সংগ্রামের কথা শ্রবণ করাইয়া দেয়। ব্রিটিশগণ ওহাবীদের ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব বিদূরিত করিয়া কিরূপে তাহাদের হিন্দু বিদ্বেষ সমগ্র মুসলমান সমাজে ছড়াইয়া দিতে সরকারী ও বেসরকারী ভাবে প্ররোচিত হয় সে এক অভিনব ব্যাপার। এই প্রচেষ্টার পরিণতি আজ ষড়্ভিত-ভারতে লক্ষ্য করি।

সমর্পণ

শ্রীঅমলেন্দু দত্ত

বিপুল উল্কা আগের জন্মের গোপন কোঠায় :

ওই মসীমাখা নভ—তারি মাঝে অজস্র তারকা—

যোর চিত্রাকাশে তারা কত শত মুকুল ফোটার।

ওই দীর্ঘ স্তোভোজল ছায়াপথ—দিগন্তবিসারী রেখা

অপূর্ব আবেগ তোলে। আলো-ছায়া স্তম্ভ-ভীষণ

মিলিয়া আমার চোখে ধরা দেয় অপকূপ রূপে।

পুঞ্জীভূত ঘন মেঘ বীরে বীরে তাজি জ্বালাস

দূরান্তরে চলে যায় জমেছে বা' মর্ম্মমাঝে চুপে।

কল্পনা-প্রবাহ মোরে নিয়ে চলে ধরা হতে দূরে

হৃদয়-মুকুল যেথা ফুটে রয় করে না কখন,

বাস্তব-সীমার শেষে বিচরণ করি কল্পপুরে।

চিরস্মরণের ধ্যানে মগ্ন রাতে হই নিঃসঙ্গন।

আপনারে ফিরে পাই, জন্মান্তর-স্মৃতি আগে মনে

নিঃশেষে সঁপিয়া দিহু দেহমন অক্ষর-চরণে।

রসরাজ অমৃতলাল বসু

১৮৫৩ - ১৯২৯

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

জন্ম; শৈশব-শিক্ষা

১৮৫৩ সনের ১৭ই এপ্রিল (১২৬০, ৬ই বৈশাখ) শ্রীরাম নবমীর দিন কলিকাতায় অমৃতলালের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম—কৈলাসচন্দ্র বসু; তিনি এক সময়ে যথাক্রমে ওরিয়েন্টাল সেমিনারীর সহকারী শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষকের কৰ্ম করিয়াছিলেন।

অমৃতলালের শৈশব-শিক্ষা স্বল্প হয়—পিতৃপ্রতিষ্ঠিত কল্লিয়ারাটোলা বদবিদ্যালয়ে (বৰ্ত্তমানে ‘আমবাজার এ. ডি. স্কুল’) ; এই সময়ে অর্দৈন্দুশেখর মুন্সকী তাঁহার সতীর্থ বন্ধু ছিলেন। এখানকার পাঠ সাধ করিয়া তিনি দুই বৎসর হিন্দু স্কুলে অধ্যয়ন করেন। ১৮৬৯ সনে জেনারেল এসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশন হইতে এনট্রান্স পরীক্ষা দিয়া অমৃতলাল দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।

বিবাহ

এনট্রান্স পরীক্ষা দিবার অব্যবহিত পূর্বে, ১৫ বৎসর বয়সে, অমৃতলালের বিবাহ হইয়াছিল। পাত্রী—শালিধার ভূম্যধিকারী স্বয়মনারায়ণ ঘোষের পৌত্রী, বয়স ৯ বৎসর। কৈলাসচন্দ্র পুত্রবধূর মুখ দেখিয়া ঘাইতে পারেন নাই; এই ঘটনার তিন বৎসর পূর্বেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল।

ডাক্তারি

ছেলেবেলা হইতেই চিকিৎসা-বিদ্যার দিকে অমৃতলালের ঝোঁক ছিল। তিনি এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশ করেন; এখানে রাধাপোবিন্দু কর (আর. ডি. কর) তাঁহার সহাধ্যায়ী ছিলেন। অমৃতলাল মাকে মাকে কাশী গিয়া পিতৃবন্ধু প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথ লোকনাথ মৈত্রের নিকট অবস্থান করিতেন। মোটের উপর দুই বৎসর মেডিক্যাল কলেজে অধ্যয়নের পর, এলোপ্যাথির পন্থা পরিত্যাগ করিয়া তিনি হোমিওপ্যাথি চর্চার জন্ত কাশীতে রহিয়া গেলেন।

কাশীতে অবস্থানকালে অমৃতলালের ইংরেজী পড়ার নেশা জন্মিয়া উঠিয়াছিল। কুইল কলেজের গ্রন্থাধ্যক্ষ রামচন্দ্র সাত্তাল তাঁহাকে লাইব্রেরী হইতে ইংলণ্ডের ও ফ্রান্সের ইতিহাস, নাটক, উপভাস ইত্যাদি অনেক বিষয় পড়িবার সুযোগ দান করিয়াছিলেন। অমৃতলাল বলিয়াছেন, “জীবনে যদি আমি কিছুমাত্র কৃতিত্বের পরিচয় দিয়া থাকি, তৎকর্ত্ত সাত্তাল মহাশয়ের নিকটে আমি অনেক অংশে ঋণী।”

১৮৭২ সনের মাঝামাঝি, লোকনাথবাবুর পত্র লইয়া, অমৃতলাল বাকিপুরে ডাক্তারি করিতে যান। কিন্তু মাস-

কয়েক পরেই তাঁহার জীবনের গতি ভিন্ন দিকে প্রবাহিত হইয়াছিল। তিনি স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন :—

“কাশী হইতে মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় আসিতাম। এখানে অবস্থানকালে আমাদের কল্লিয়ারাটোলায় স্কুলে শিক্ষকতা করিতাম; বেতন লইতাম না। ভূপেন্দ্রনাথ বসু, চণ্ডীলাল বসু, প্রিয়নাথ সেন আমার ছাত্র। অর্দৈন্দুশেখর ও ধর্মদাস স্মর তখন এই স্কুলে মাষ্টারি করিত। আমার বাবা, কাকা, মামা, সকলেই ইংলু-মাষ্টারি করিয়াছিলেন; আমিও মাষ্টারি করিতাম। অর্দৈন্দু বলিলেন—‘তুমি এসেছ ভালই হয়েছে; লীলাবতীর অভিনয় করতে হবে।’ নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সমস্ত ব্যবস্থা করিবার ভার লইলেন।...লীলাবতীর রিহার্সাল চলিতে লাগিল। অর্দৈন্দু আমাকে জোর করিয়া যোগজীবনের ভূমিকা লওয়াইলেন।...আমাদের রিহার্সাল হইত গোবিন্দ গাঙ্গুলীর বাড়ীতে; গাঙ্গুলী হাইকোর্টের কর্মচারী ছিলেন।...এক দিন আমাদের পূর্বা মঞ্জলি বসিয়াছে, গোবিন্দ হাইকোর্টে হইতে প্রত্যাগমন করিয়া অত্যন্ত গম্ভীরস্বরে আমাদের কাছে বলিলেন—‘দেখ, হাইকোর্টে শুনে এলাম, সত্য মিথ্যা বলিতে পারি না, লর্ড মেরোকে না কি আভ্যমান দীপে খুন করেছে [৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৭২]।’ সেদিন মঞ্জলি বন্ধ হইয়া গেল।...তালিম দেওয়া যখন শেষ হইয়া আসিল, কাশী হইতে লোকনাথ বাবু কলিকাতায় আসিয়া আমাকে কাশীতে ফিরাইয়া লইয়া গেলেন। বহুরূপ কত কাকুতি মিনতি করিলেন; তিনি কাহারও কথায় বিচলিত হইলেন না। আমার আর ঠেঁকে দাঁড়ান হইল না।

“১৮৭২ সালের গোড়ায় কাশী পরিত্যাগ করিয়া বাকিপুরে আসিলাম। ঐ বৎসরের নবেম্বর মাসে বাকিপুর হইতে কলিকাতায় আসিলাম। বাড়ীতে জগদ্বাদী পুজার উপলক্ষে এই যে বাকিপুর ছাড়িলাম, আর সেখানে ডাক্তারি করিবার জন্ত ফিরিয়া যাইতে হইল না।

“কলিকাতায় আসিয়া যেদিন প্রথম আমি আমাদের স্কুল দর্শন করিতে যাই, অর্দৈন্দু আমাকে দেখিয়া ক্লাস হইতে বাহির হইয়া আসিল। তখনই হেড মাষ্টারের নিকট হইতে ছুটি লইয়া আমাকে সঙ্গে করিয়া ভুবন নিয়োগীর বাগবাড়ারের গদ্যভীরব বৈঠকখানায় গেল। গদ্যভীরে সেই স্মৃতির অট্টালিকার কোনও চিহ্ন এখন নাই; পোর্ট-ট্রেষ্টের কল্যাণে সেটি ধুও হইয়াছে। পথে যাইতে যাইতে অর্দৈন্দু আমাকে সকল কথা বলিয়া বলিল। গিরিশবাবুর সঙ্গে মনোমালিন্য হইয়াছে।... গিরিশবাবু বলিয়াছিলেন, ‘বিদ্যেটরের জন্ত একখানা ভাল

বাড়ী না করিয়া টিকিট বেচিবার ব্যবস্থা করিলে কিছুই হইবে না ; আগে ভাল বাড়ী, ভাল ষ্টেজ কর, তারপরে টিকিট বিক্রয় কর ; নইলে লোকে টিকিট কিনিবে কেন ?' অর্কেন্দু ও নগেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বলিলেন—‘আমরা ছোট বাড়ীতেই আরম্ভ করি, ছোটখাটো ষ্টেজ করি ; একেবারে বড় বাড়ী বড় ষ্টেজ কোথায় পাওয়া যাবে ?’ এই কথা লইয়া দলাদলির স্বরূপ হইয়াছিল। এ সকল বিষয় আমি কিছুই জানিতাম না ; আমি তখন কলিকাতায় ছিলাম না। যখন গঙ্গার তীরে ভুবন নিয়োগীর বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম, তখন বুঝিলাম গিরিশ বাবুকে বাদ দিয়াই থিয়েটার করিতে হইবে।...জিতলের প্রকাণ্ড হলে আমরা নীলদর্পণের অভিনয় চালাইতাম। আমার কোনও পার্ট লইবার বিশেষ ইচ্ছা ছিল না ; কিন্তু সকলে মিলিয়া চাপাচাপি করিয়া ধরিল ; বলিল—‘তুমি সৈরিক্সীর পার্টটা নাও ; বেশী নয়, দু-এক রাত্রি তুমি প্লে কর ; তার পর না হয় আমরা অন্য ব্যবস্থা করে নেবো।’ সেই দু-এক রাত্রি করিতে করিতে আকস্মিক বহর কাটয়া গেল।” (‘পুরাতন প্রসঙ্গ,’ ২য় পর্যায়, পৃ. ২৪-২৭)।

রুজমতের পাদপ্রদীপে

১৮৭২ সনের ৭ই ডিসেম্বর শনিবার বিশেষভাবে অরণীয়। এই দিন কলিকাতায় সাধারণ-রঙ্গালয়ের (‘জাশনাল থিয়েটারের’) প্রতিষ্ঠা হয়। এই তারিখে অস্তিনীত দীনবন্ধু মজুমদার ‘নীলদর্পণ’ নাটকে ১৯ বৎসর বয়স্ক অমৃতলাল সৈরিক্সীর ভূমিকায় সর্বপ্রথম পাদপ্রদীপের সম্মুখীন হন। তিনি বলিয়াছেন :—

“যথাসময়ে তৃতীয় দৃষ্টে সীন উঠিল ; আমি সৈরিক্সী বেশে ষ্টেজের উপর উপবিষ্ট। চাহিয়া দেখি, আমার গুরুস্থানীয় কয়েক জন ভদ্রলোক সম্মুখে বসিয়া আছেন। মুহূর্তের ক্ষণ আমার বুক কাঁপিয়া উঠিল ; আমি যেন তখন সমাজচ্যুত, জাতিচ্যুত, বর্ণচ্যুত হইয়া আমার ব্যর্থ জীবনের সমস্ত লজ্জার ভার শিরে বহন করিয়া আমার গুরুজনদিগের সম্মুখে মারী-বেশে উপবিষ্ট হইয়াছি ; যেন মনে হইল, টিকিট বেচিয়া পাবলিক ষ্টেজে অভিনয় করিয়া আমি আমার সমাজকে, স্বদেশকে, আত্মীয় বন্ধুবান্ধবকে আজ যে লজ্জা দিতেছি তাহার একমাত্র শাস্তি—বহিষ্করণ। আমার তখনকার মনের ভাব আজ আপনারা বুঝিতে পারিবেন না। তখন সমাজ ছিল, সমাজ বন্ধন ছিল, সমাজস্বাধিকার শাস্তি ছিল। মুহূর্তের ক্ষণ আমার মাথা ঘুরিয়া গেল ; পরক্ষণেই ভাবিলাম এ বা হবার তা ত হ’ল ; এখন যদি ভাল করিয়া প্লে করিতে না পারি, তাহা হইলে গঙ্গনা লাহরীর সীমা থাকিবে না। কার-মনোবাক্যে নীলদর্পণের সৈরিক্সী হইলাম। বাহবা ধনীর তালে তালে ‘সীন’ পরিবর্তিত হইয়া গেল।...পর সপ্তাহে অমৃত বাজার পত্রিকা সৈরিক্সীর সমালোচনা করিয়া লিখিলেন—‘তাহার রোদনধর অপরূপ বলিতে হইবে।’

অমৃতলালের অবশিষ্ট জীবন কলিকাতার সাধারণ রঙ্গালয়—জাশনাল, গ্রেট জাশনাল, গ্রেট জাশনাল অপেরা কোম্পানী, বেঙ্গল, ষ্টার, মিনার্ভা প্রভৃতির সহিত ওতপ্রোত হইয়া আছে। নাট্যজীবনে অমৃতলালের প্রথম গুরু—অর্কেন্দ্রশেখর মুখার্জী। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন, “কবির গিরিশচন্দ্র সাধারণ-নাট্যালা-স্থাপনের কতকটা বিরোধীই ছিলেন, সুতরাং এক-মাত্র এই অর্কেন্দ্রই জাশনাল থিয়েটারের তৎকালীন স্রষ্টা অভিনেতাগণকে শিক্ষা-পরামর্শদানে প্রস্তুত করিয়া তুলেন। নীলদর্পণের সৈরিক্সী, নবীন তপস্বিনীর বিজয় ও নব-নাটকের সুবোধ প্রভৃতি প্রথম নাট্যজীবনের কয়েকটি ভূমিকা প্রকার ইহারই নিকটে শিক্ষা করেন” (‘অমৃত-মন্দির’)। গুরুদেব জ্ঞান অমৃতলালও প্রকৃতপক্ষে প্রথম শ্রেণীর অভিনেতার গৌরব অর্জন করিয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্রের ভাষায়—“হাস্য-রসাত্মক অর্কেন্দ্রবাবু, বেঙ্গল বাবু এবং ভূনিবাবু (নাট্যা-চার্য ত্রীমুক্ত অমৃতলাল বসু) এই তিন জনেই সর্ব-শ্রেষ্ঠ।...যে চরিত্রে প্লেস আছে—তাহার অভিনয়ে ভূনিবাবু অতুলনীয়।”

যৌবনে অমৃতলাল বীহাদের সহিত নাট্যজীবনের যোগদান করিয়াছিলেন, কালসহকারে তাহাদের অনেকে প্রতিদ্বন্দ্বী রঙ্গালয়ের সহিত যুক্ত হইলেও পরস্পরের মধ্যে একটা অপূর্ণ প্রীতির আকর্ষণ ছিল। মহেন্দ্রলাল বসুর মৃত্যু হইলে অমৃতলাল গিরিশচন্দ্রকে যে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন তাহা উদ্ধার-যোগ্য ; পত্রখানি এইরূপ :—

“মহেন্দ্র সকলকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে, আমার প্রাণে কি ব্যথা লাগিয়াছে, তাহা আপনিই বুঝিবেন। আমাদের সেই সুদূরগত প্রথম নাট্যজীবনের স্বর্ণযুগ Romantic প্রেমের দৃষ্টান্ত রূপে যে অধিক মিলিতে পারে, এমন বোধ হয় না। গত বৃহস্পতিবারে আমার একটি প্রায় তিন বৎসরের মধুরভাবী দৌহিত্রী আমাদের ত্যাগ করিয়া গিয়াছে, কত আমার হৃদয়কাগরে পড়িয়া কাঁদিতেছে, আমার বড় কষ্ট, তবু বুঝিতেছি যে, এ শোক সোড়া ওয়াটারের তুল্য ; কিন্তু বেঙ্গল, মতি, মহেন্দ্রের শোক জীতাহুতের জ্বর চিরদিন তপ্তভাবে ফুটিতে থাকিবে। কতবার স্বপ্নে করিয়াছি—সেই বগড়ার মধ্যেও কি মধুর মিলনাকাঙ্ক্ষা ছিল।

“তথাপি আপনার লিখিত মহেন্দ্রের স্মৃতি-উপহাররূপ লবল সত্য বিষাদ-গাভীরাপূর্ণ হৃদয়ের কথা কয়টি পড়িয়া ইচ্ছা হইতেছে যে, আমি যেন আগে মরি, আপনি আমার মনে করিয়া দু-কোঁটা চক্ষের জল কেহুন। অতি চমৎকার লেখা—স্বর্গদেব আপনি সাবধানে অন্তরে রাখিয়া চক্ষে ফুটিতে দিয়াছেন ; কিন্তু যে জানে, সে বুঝিতেছে যে—স্বর্গের কিরণই চক্ষে প্রতিকলিত হইয়া এত মনোহর হইয়াছে। প্রায় অষ্ট-তায়ই এই আঁকা-বাঁকা লেখা। ১৭-৩-১৯০১।—মহেন্দ্র অমৃত।”

প্রাথমিক রচনা

অমৃতলাল শৈশবাবধি বাংলা-সাহিত্যে অম্বরাসী ছিলেন। তাঁহার বাংলা রচনার—বিশেষতঃ ‘প্যারডি’ রচনার গোড়ার দিকে তিনি স্মৃতিকথায় এইরূপ বিবৃত করিয়াছেন :—

“আমার একজন দূরসম্পর্কীয় কাকা ছিলেন ; তাঁহার নাম প্যারিমোহন বসু।...তখনকার খুটান পাদরীর স্কুলে বিদ্যালাত্ত



রসরাজ অমৃতলাল বসু

করিয়া তাঁহার পঠদশায় বাংলা ভাষার চর্চা করিবার বড় একটা অবসর পান নাই, কিন্তু ল্যাটিন গ্রীক পড়িয়াছিলেন।... তিনি আমাকে একটু একটু ল্যাটিন গ্রীক পড়াইতেন, আমি তাঁহাকে বাংলা বই পড়িয়া শুনাইতাম ; ‘ভাক্সর’ কাগজখানা প্রায়ই তাঁহাকে শুনাইতে হইত। ক্রমশঃ তাঁহার বাংলা রচনার দিকে একটা প্রবল ঝোঁক হইল। তিনি শ্লেষ-রচনায় লিপ্ত হইলেন ; ‘ভাক্সর’ে তাঁহার সেই সকল parody প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইল। মাইকেলকে লইয়া তিনি parody করিতেন। মাইকেল লিখিয়াছেন—

আহা, শৈবালের দলে শোভে যেই রত্নরাজি,
প্যারিকাকা লিখিলেন—

আহা, যুবতীর ল্যাজে শোভে যেই গুহ্মরাজি,...
পুনশ্চ, মাইকেলকে অহুকরণ করিয়া তিনি লিখিলেন—
আমি হুহু, এ বিপুল বিধে কে না ডরে
দেখি ঘোর লাক।

তাঁহার এই সকল শ্লেষ-রচনায় ক্রমে আমি তাঁহার লাক-রেড হইয়া উঠিলাম ; অনেক সময়ে তিনি আমাকে পাদপুরণের জন্ত আহ্বান করিতেন। আমার রচনায় তিনি সন্তোষ প্রকাশ করিলে আমি কৃতার্থ হইতাম। ইহার পূর্বে কবিতা রচনায় আমার হাতে ঝড় দিয়াছিলেন আমাদের এই ভ্রামবাক্য

স্কুলের পণ্ডিত ব্রহ্মানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়।...আমরা বিদ্যালয়ে নানা ছন্দে কবিতা রচনা করিতে অভ্যাস করিলাম। পরে প্যারিকাকার নিকটে অস্তর পাইয়া জ্যোদশ বৎসর বয়সে আমার প্রথম চিত্রকাব্য রচিত হয়। আমার সেই প্রথম রচনাটি মোটেই রসাত্মক নহে, কয়েকটি ছন্দোবদ্ধ শব্দ মাত্র। আদ্য-ক্ষরগুলি একত্র জুড়িলে আমার নামটি বানান করা হয়। এখনও আমার সেটি মুখস্থ আছে—

ঐত্ৰীহরিপদে যে বা করয়ে স্মরণ।
অবনী ভিতরে সেই আদরের ধন ॥
মৃত্যুভয় নাহি থাকে সদা আনন্দিত।
তপ জপ করে সদা মনের সহিত ॥
লালসা নাহিক ধনে মোক্ষ প্রয়োজন।
লজিতে লালসা মাত্র ঈশ্বর চরণ ॥
বন্দি ঈশ্বর চরণ বোঁধে মোক্ষপথ।
পুজন স্বজন তার শত্রু হয় হত ॥

এ কবিতাটি লিখিয়া আমার মোটেই আনন্দ হয় নাই। কোমণ্ড রকম করিয়া মিল চাই ; এ ত হইল শব্দের পৌজামিল মাত্র। প্যারীকাকা বলিলেন—‘একটা ভাল ক’রে পদ্য লেখ না।’ তখন সবেমাত্র স্তর রাধাকান্ত দেবের মৃত্যু [১৯ এপ্রিল ১৮৬৭] হইয়াছে। তিনি বলিলেন—‘স্তর রাধাকান্ত দেবের উদ্দেশে একটা কবিতা লেখ না।’ আমি তাঁহার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া মাইকেলের ‘রেখো মা দাসেরে মনে’ কবিতাটির ছন্দে একটা পদ্য রচনা করিলাম। প্যারীকাকার তাহা এত ভাল লাগিল যে তিনি তাহা ‘ভাক্সর’ে প্রকাশিত করিয়া দিলেন। এই আমি প্রথম আমার লেখা ছাপার অক্ষরে দেখি। কবিতাটি আমার নিজেরও বেশ পছন্দসই হইয়াছিল। কিন্তু শ্লেষ-রচনার দিকেই আমার প্রবণতা বেশী রহিয়া গেল। আমার মধ্যে কিছু সহজ সরসতা, native wit, ছিল ; তিনি তাহা ফুটাইয়া তুলিলেন।...

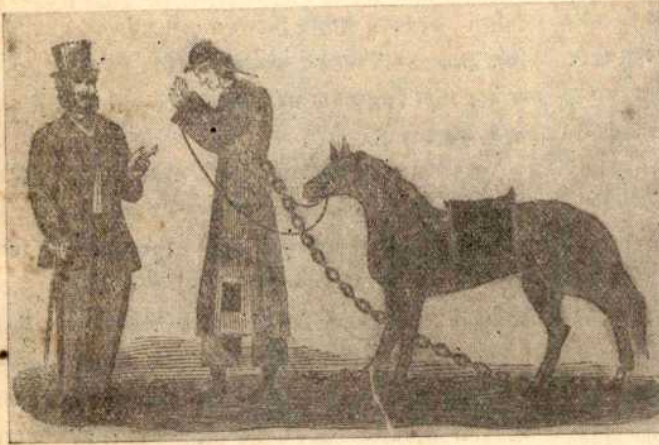
প্যারীকাকার মৃত্যুর পরে আমার বাংলা রচনা দিন কতক বন্ধ ছিল। ঘটনাচক্রে আমি একখানা প্রহসন নাটক লিখিয়া ফেলিলাম। আমাদের পাড়ায় একটা সবেম যাত্রার দল ছিল। এক দিন তাহারা আমাকে বলিয়া বলিল—‘আপনি একটা আমাদের পালা লিখে দিন।’ আমি বলিলাম, ‘আমি কি লিখে দেব ?’ তাহারা পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল ; একইও দাপ্তরায়ের পাঁচালি আমার কাছে রাখিয়া গেল। আমি তখন সবেমাত্র পড়িয়াছি ‘একেই কি বলে সত্যতা ?’ তাহারই অহুকরণে আমি একখানা Farce রচনা করিলাম ; নামটা বড় ছোটখাট হইল না—‘একেই কি বলে তোদের বাংলা সাহিত্যের উন্নতি করা ?’ এই রচনাটি এখন একেবারে লুপ্ত।...

রস-সাহিত্য-রচনার জন্ত আমি আর একজনের নিকট অন্ত্যস্ত গুণী। তিনি ‘অমৃত বাজার পত্রিকা’র সম্পাদক শিশির ঘোষ। কালীতে যখন লোকনাথ বাবুর বাসায় ছিলাম,

‘অমৃত বাজার পত্রিকা’ পাঠ করিতাম। তখন কাগজখানি বাংলা ভাষায় পরিচালিত হইত; যশোর হইতে নিয়মিতভাবে কাগজ বাহির হইত; কলিকাতা সহরে তখনও বড় একটা জাহির হয় নাই। ‘অমৃত বাজার পত্রিকা’র হাণ্ডোকাপক প্রসঙ্গ ‘বিবিধ’ নামে প্রায়ই প্রকাশিত হইত। তেমন সরস Comic titbits আমাদের সাহিত্যে অভ্যস্ত দুর্লভ। পকানন্দের প্রথম আমলে অনেকটা ইংলনাথে সেই ঝাঁটা রস উপভোগ করা যাইত। আমি পত্রিকার সেই অংশটার রসপ্রাচুর্য্য মুগ্ধ হইয়া যাইতাম।” (‘পুরাতন প্রসঙ্গ,’ দ্বিতীয় পর্ধ্যায়, পৃ. ৮২-৬)

অমৃতলালের ঠেঁকে লেখার প্রথম হাতে ঝড়ি ‘মডেল স্কুল’ নামে একটা নকশা; ইহা ১৫ জানুয়ারি ১৮৭৩ তারিখে ভাণ-নাল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়। এই প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন :—

“লেকটেনাণ্ট গবর্নর সার জন ক্যাথেলের মাধ্যম চুকলো যে শিক্ষিত বাঙ্গালীর জন্ম এমন একটা সার্ভিস তৈরি করতে হবে, যাতে এক-একজন এক-একটা বিদ্যাকল্পজন্ম হ’তে পারে। সাধারণ কেতাবি বিদ্যোভ থাকবেই, তার ওপর একটু কেমিষ্ট্রি, একটু বোট্যানি, সারভেয়িং, জিম্জাট্রিক, সীতার ইত্যাদি ইত্যাদি। সুরসিক শিশিরবাবু ক্যাথেলি সত্তরকে রত্ন কোরে তাঁর ‘অমৃত বাজারে’ [২ মে ১৮৭২] একটি কার্টুন ছাপান, জিম্জাট্রিকের পোষাক-পরা, কোমরে একটি পেছন দিকে ঝোলান শিকলি আর কানে একটি চিমটে (চিমটেটা হচ্ছে কম্পাস).....



ক্যাথেলের মডেল ডেপুটি (ব্যঙ্গচিত্র)

এ কার্টুন দেখে-ই ও শিশিরবাবুর ইচ্ছিতে আমি এক নক্সা লিখি, জোড়াসাঁকোর সাহ্যাল-বাড়ীতে তার অভিনয় হয়; ঋক্ণবিহীন ছোকরা আমি, তাতে প্রফেসর আর বড় বড় বাড়ী পৌর-পরা ছিঁচু-মুসলমান ছাত্র, পরিচ্ছদ শিশিরবাবুর কার্টুনের অঙ্কুরে কানে চিমটে কোমরে শিকলি,

খালি প্রফেসরের পেটুলেন চাপকান। কচুপাতা কেঁটে ঝণ্ড ঝণ্ড ক’রে বুঝিয়ে দিই, যত-ই ঝণ্ড ঝণ্ড করিয়াছি, তত-ই কচুপাতা হচ্ছে, একখানাও কলাপাতা হচ্ছে না, দেখ বোট্যানির কি আশ্চর্য্য মহিমা। দেশলাই জেলে কেমিষ্ট্রির আশ্চর্য্য শক্তি দেখিয়ে বলতুম যে, দেখ, দেশী আগুনের চেয়ে বিলিভী আগুনের তিতর কি গুণ্ড তেজ, তোমরা হাকিম হয়ে মফঃ্বলে গিয়ে সবাইকে বুঝিয়ে দেবে, যেন সকলে বিলিভী আগুন ধরে ধরে রাখে; জমীতেই সীতার শেখবার কসরত হ’ত, আর আমি নানা-রকম সেলামের উপর এক লম্বা লেকচার ঝড়তুম। ঐ মডেল স্কুলের ‘নক্সাই’ বোধ হয় আমার ঠেঁকে লেখার প্রথম হাতে ঝড়ি; আর-ও নানা বিষয়ে ও রকম ৮।১০ খানা নক্সা নিজে একা বা গিরিশবাবুর সাহায্যে সে সময়ে বা তার কিছু পরে লেখা হয়েছিল; ২।১ খানা বোধ হয় গিরিশ-গ্রন্থাবলীতে স্থান পেয়েছে, আর সব কোথায় গিয়েছে।” (‘পুরাতন পত্রিকা’ : ‘মাসিক বহুমতী,’ বৈশাখ ১৩৩১)

অমৃতলালের রচিত প্রথম নাটক—‘হীরকচূর্ণ’ ১৮৭৫ সনের জুন মাসে প্রকাশিত হয়, তখন তাঁহার বয়স ২২ বৎসর। “তখন মল্লহার রাও গাইকবাড় ও কর্ণেল ফেরার ঘটত ব্যাপার লইয়া দেশময় জল্পনা কল্পনা হইতেছিল; রেসিডেন্ট সাহেবকে হীরকচূর্ণের সহিত বিষ মিশ্রিত করিয়া ঝাণ্ডান হইয়াছিল; এই অপরাধে গাইকবাড় অভিযুক্ত। কৃষ্ণদাস পাল ‘হিন্দু পেট্রিরিষ্ট’ পত্রিকায় লিখিলেন—‘আমরা এক শত গাইকবাড়কে হারাইতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু একজন নরকজকে হারাইতে

প্রস্তুত নছি।’—আমি এই ঘটনা উপলক্ষ করিয়া ‘হীরকচূর্ণ’ নামে একখানি নাটক লিখিলাম; ছুটুমি করিয়া কিছু হাসি ঠাট্টা করিলাম। নাট্য-সাহিত্যে এই নাটকখানি আমার প্রথম রচনা।” প্রকৃতপক্ষে, নাট্যকার-হিসাবে অমৃতলাল প্রতিষ্ঠা লাভ করেন ইহারও ৯ বৎসর পরে—‘বিবাহ বিজাট’ রচনা করিয়া।

রঙ্গালয়ে অধ্যাক্ষতা

গ্রেট শাশনাল।—১৮৭৫ সনের শেষ ভাগে অমৃতলাল ২২ বৎসর বয়সে সর্বপ্রথম রঙ্গালয়ের ম্যানেজার বা অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন; তখন তিনি ভুবনমোহন নিয়োগী-প্রতিষ্ঠিত গ্রেট শাশনাল থিয়েটারে। এই সময়ে তাঁহার রচিত প্রথম নাটক—‘হীরকচূর্ণ’ অভিনীত হয় (২৫

ডিসেম্বর) ; ইহাতে তিনি নিজেও একটু ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার প্রায় দুই মাস পরে—১৮৭৬, ১৯এ ফেব্রুয়ারি গ্রেট শাশনালে যে অভিনয় হয় উহা বঙ্গীয় নাট্যশালায় ইতিহাসে একটী স্মরণীয় ঘটনা; কারণ, এই অভিনয়ের কলেই গবর্নমেন্ট নাট্যশালাকে দমন করিবার জন্ম আইন

করেন। ঘটনাটি এই :—সম্রাট সপ্তম-এডওয়ার্ড প্রিন্স-অব-ওয়েসক্সে কলিকাতার আসিলে ১৮৭৬ সনের জানুয়ারি মাসের পৌষায় হাইকোর্টের লর্ডপ্রিভি টকীল জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় তাঁহাকে নিজের বাড়ীতে আহ্বান করেন। সুবরাজ তাঁহার বাড়ীতে পদার্পণ করিলে মুখোপাধ্যায়-গৃহিণী ও অজ্ঞাত মহিলারা তাঁহাকে শত্ৰুঘনি ও চলুঘনি করিয়া ভারতীয় প্রণাম বরণ করেন। এই ব্যাপারে কলিকাতার বাঙালী সমাজে অত্যন্ত আন্দোলন উপস্থিত হয়। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের “বাকীমাং” শীর্ষক কবিতা এই উপলক্ষেই লেখা। গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারও এই ব্যাপার অবলম্বন করিয়া একখানি প্রহসন অভিনয় করেন। প্রহসনখানির নাম—‘জগদানন্দ ও সুবরাজ’। একজন সম্রাট ও রাজতন্ত্র প্রজাকে ব্যঙ্গ করিয়া হীন প্রতিপন্ন করিবার জন্য পুলিশ হইতে এই প্রহসনের অভিনয় বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ২৬এ ফেব্রুয়ারি ‘কর্বাটুয়ার নাটক’ এবং ‘জগদানন্দ ও সুবরাজ’ প্রহসনটিকে ‘হুমান চরিত্র’ নাম দিয়া আবার উহার অভিনয় করা হইল—ইহাও পুলিশের আদেশে বন্ধ হইয়া গেল। ১লা মার্চ তারিখে পুলিশকে ব্যঙ্গ করিয়া ‘The Police of Pig and Sheep’ নামে প্রহসন ও ‘সুরেন্দ্র-বিনোদিনী’ নাটক অভিনীত হইল। গবর্নেন্ট এক দিকে যেমন নাট্যশালাকে সংযত করিবার জন্য আইন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, অপর দিকে তেমনই গ্রেট-ন্যাশনালের কর্তৃকর্তাদিগকে অন্য উপায়ে শান্তি দিবার উদ্যোগ করা হইল। ৪ঠা মার্চ যখন অভিনয় চলিতেছিল, তখন পুলিশের ডেপুটি কমিশনার সদলবলে গিয়া গ্রেট ন্যাশনালের ডিরেক্টর উপেন্দ্রনাথ দাস, ম্যানেজার অমৃতলাল বসু, এবং মতিলাল সুর, বেলবাবু-প্রমুখ আট জন অভিনেতাকে গ্রেপ্তার করিয়া আনিলেন। অপরাধ—পূর্বে অভিনীত ‘সুরেন্দ্র-বিনোদিনী’ নাটক অশ্লীল। ৮ই মার্চ ম্যাজিস্ট্রেটের বিচারে ডিরেক্টর উপেন্দ্রবাবু ও ম্যানেজার অমৃতলালের এক মাস করিয়া বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইল; অন্য সকলে মুক্তিলাভ করিলেন। এই বিচারের পর দিন ম্যাজিস্ট্রেটের রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল হইল। আপীলে উপেন্দ্রনাথ ও অমৃতলাল উভয়েই মুক্তি পাইলেন।

এই ঘটনার অল্প দিন পরেই—অমৃতলাল পুলিশের চাহুরী লইয়া পোর্ট ব্রোয়ারে গমন করেন (এপ্রিল ১৮৭৭)। তথায় এক বৎসর কাটাঁইবার পর তিনি কলিকাতা ফিরিয়া আবার রঙ্গালয়ে যোগদান করিয়াছিলেন।

ফাঁর।—পূর্বে যেখানে মনোমোহন থিয়েটার অবস্থিত ছিল, সেই জমি ভাড়া লইয়া, গুরুধর রায় নামে জনৈক মাজোরারী ঠার থিয়েটারের পত্তন করেন। ২১ জুলাই ১৮৮৩ (৬ শ্রাবণ ১২৯০) তারিখে গিরিশচন্দ্রের ‘দক্ষয়জ’ লইয়া এই রঙ্গমঞ্চের দ্বার উদ্বাটিত হয়। অমৃতলালও এই দলে ছিলেন।

বৎসরাবধি থিয়েটার চালাইয়া গুরুধর অবসর গ্রহণ করেন। ইহার তিন বৎসর পরে, যে জমির উপর ঠার রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত ছিল তথায় ‘এমারেন্ড থিয়েটার’ স্থাপনের মানসে গোপাললাল শীল উচ্চা ক্রয় করেন। ঠার-সম্প্রদায় ১৮৮৭ সনের মধ্য ভাগে, ইঞ্জিনিয়ার যোগেন্দ্রনাথ নিজের পরিকল্পনা অনুসারে, হাতী-বাগানে নূতন রঙ্গালয় নির্মাণে হস্তক্ষেপ করেন; গিরিশচন্দ্রের ‘নন্দীরাহ’ নাটক লইয়া নবনির্মিত ঠার রঙ্গমঞ্চে প্রথম অভিনয় হয়—১৮৮৮, ২৫এ মে (১৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৫) ফুলদোলের দিন। অমৃতলালই ঠারের অধ্যক্ষ (অন্ততঃ বহুবিধকারীও বটে) নিযুক্ত হন। এই পদ তিনি ২৫ বৎসর অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষ হিসাবে অমৃতলাল হৃদয়কর্ম করিয়াছিলেন যে, উপযুক্ত নাট্যগ্রন্থের অভাবে কোন রঙ্গালয়ই সুস্থভাবে চলিতে পারে না। তাই তিনি নব নব নাট্যগ্রন্থ রচনা করিয়া ঠার থিয়েটারের সে অভাব বহুলাংশে পূরণ করিয়াছিলেন। ‘নন্দীরাহ’ অভিনয়ের অল্প দিন পরেই ঠারে ‘সরলা’ অভিনীত হয়। ‘সরলা’ তারকনাথ মুখোপাধ্যায়-রচিত ‘স্বর্ণলতা’ উপজ্ঞাসের অমৃতলাল-কৃত নাট্য-রূপ। ইহার অভিনয় কিরূপ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল, সেকালের পাক্ষিক ‘অনুসন্ধান’ের নিম্নোক্ত মন্তব্য হইতে তাহার আভাস পাওয়া যাইবে :—

“ঠার কোম্পানী সময় বুঝিয়া—লোকের রুচির প্রতি লক্ষ্য করিয়া নাটক-চিত্রের উৎকর্ষ দেখাইতে অগ্রসর হইলেন। কোম্পানীর সুযোগ্য অধ্যক্ষ শ্রীযুত অমৃতলাল বসু মহাশয়কেও বক্তবাদ না দিয়া থাকা যায় না; সুপ্রসিদ্ধ ‘স্বর্ণলতা’ উপজ্ঞাস হইতে তিনি বেশ দক্ষতার সহিত “সরলা”—চরিত্র নাটকাকারে প্রবর্তিত করিয়াছেন। ধর্মের চেষ্টা, হরিবালের ধ্রু এবং কিছু মন্দীভূত হইতে চলিল। যে অভিনয় দর্শনে আশ্চর্য্য হইয়া অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্তও মন তগ্নত্ব ভাবে বিভোর হয়, যাঁহা দেখিয়া সুগপং বিশ্বাস, হর্ষ, শোক, ক্রোধ, বীভৎস প্রভৃতি রসের আবির্ভাব হইয়া থাকে, সেই ত অভিনয়, সেই ত নাট্য-চিত্র। উপস্থিত ‘সরলা’ নাটকের অভিনয় দেখিয়া আমরা সে আশার সম্পূর্ণরূপে চরিতার্থ করিয়াছি। ইহার কাহাকে ফেলিয়া কাহাকে সুখ্যাতি করিব?—এ অভিনয়ে, সমাজের যথেষ্ট উপকার হইবে তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই অভিনয়ে আমরা কায়মনবাক্যে কোম্পানীর মঙ্গল প্রার্থনা করি।” (৩০ সেপ্টেম্বর, ১৮৮৮)

রঙ্গালয়ের উপযোগী নাটক রচনা সম্বন্ধে অমৃতলাল কিরূপ সজাগ ছিলেন, ১৮৯৫ সনে ঢাকার কালীপ্রসন্ন ঘোষকে লিখিত তাঁহার একখানি পত্রে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। পত্রখানি এইরূপ :—

“পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রদ্ধারহস্য,—...একখানি নূতন নাটক শীঘ্র লিখিতে হইবে এক্ষণে অত্যন্ত চিন্তিত আছি। শেষ নূতন নাটক ‘চন্দ্রশেখর’ ও শেষ নূতন প্রহসন ‘একাকার’ সাধারণের

বিশেষ সম্ভাব্য বিধান করিয়াছে। এবার যাহা অভিনীত হইবে তাহা উক্ত পুস্তকবয় অপেক্ষা জয়গ্রাহী হওয়া চাই। কলিকাতার দর্শকের নিকট নাটকের গুণাগুণ এইরূপে বিচার হইয়া থাকে—কচুরি কচুরির মত ও রসগোল্লা রসগোল্লার মত সুবাহু হইলে হইবে না। কচুরির পর রসগোল্লা আহার করিলে রসগোল্লার লবণত্বের অভাবের অভিযোগ হইবে এবং ঐরূপ রসগোল্লার পর কচুরি দিলে কচুরির তিত্তর শার্কর রস নাই বলিয়া ভোক্তা মুগ্ধ বিকৃত করিবেন। অনন্তগতি হইয়া চির-অত্যন্ত প্রধায় দয়াময়কে বলিতেছি “হরি—লেখনীতে আসিয়া অবতীর্ণ হও—নাতিগতিরগণ্য।।... ২ জ্যৈষ্ঠ ১৩০২ (‘ঢাকা রিভিউ ও সন্নিহন,’ কৃত্তিক ১৩২৮)

স্বাধ্যক্ষরূপে অমৃতলাল ঠাঁর রক্ষয়কে কিরূপ নিয়ম-শৃঙ্খলা ও সংঘবের উচ্চ আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন, অপরেণচক্র যুগোপাধ্যায়ের ভাবায় তাহার বর্ণনা করিতেছি :—

“রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষ হিসাবে অমৃতলালের ভূলনা নাই। তিনি নিয়ম ও নিষ্ঠার বলে থিয়েটারে সর্বরকমের উচ্ছৃঙ্খলতাকে নিবারণ করিয়া তাঁহার পরিচালিত ঠাঁর থিয়েটারকে এক সময়ে আদর্শ থিয়েটারে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। আত্মমর্যাদা অক্ষর রাখিয়া, কি ভাবে থিয়েটার চালাইতে হয়, অতীত ঠাঁর থিয়েটার তাহার সাক্ষ্য। আমি নিজে তাঁহার সময়ে ঠাঁরে কায করিয়া দেখিয়াছি, এমন অপরূপ নিয়মাহুভিত্তা, এমন শৃঙ্খলাবদ্ধ কার্যপ্রণালী, খুঁটিনাটি প্রত্যেক জিনিষটির প্রতি এমন অক্ষ দৃষ্টি, এমন ব্যবহার-কৌশল আর কোথায়ও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।...একাদিক্রমে প্রায় পঁচিশ বৎসরকাল এই ভাবে থিয়েটার চালাইয়া অমৃতলাল থিয়েটারের কর্তব্যরত পরিভ্রমণ করেন।” (“অমৃতলাল” : ‘মাসিক বনুমতী,’ প্রাবণ ১৩৩৬)

এই প্রসঙ্গে কালীপ্রসন্ন বোষকে লিখিত অমৃতলালের একখানি পত্রও উদ্ধারযোগ্য। তিনি লেখেন :—

“পরমশ্রদ্ধাস্পদেষু,—...একপে সংক্ষেপে এই রাজ্য বলিতেছি যে আমি যদি আমার ব্যবসায়কে—সম্প্রদায়কে ঘৃণা করিব, তবে অপরে কেন সম্মান করিবে? অঙ্গদীপ্তের অগার করুণায় আমার অটল বিশ্বাস আছে, তাঁহারি কৃপায় আপনার জায় সাহিত্যগর্ভনের প্রভাকরকে সুহৃদরূপে আমার জীবনে আলোকপ্রদানের জন্ত লাভ করিয়াছি। আলীকর্দ কল্পন যেন আমি বিজ্ঞ হুঁকিয়া ঠাঁর থিয়েটারের নাম হইতে থিয়েটারী কলক মোচন করিতে সমর্থ হই। গৌড়ার দল বা থিয়েটারকে ঘৃণা দেখান যাহাদের স্বার্থের সহিত জড়িত, তাঁহারি তিন্ন অপর সমস্ত উচ্চ সম্প্রদায়ের নিকট ঠাঁর থিয়েটার একপে সাধারণ থিয়েটার অপেক্ষা শৃঙ্খলাসম্পন্ন বিজ্ঞতাবে পরিচালিত নাট্যশালা বলিয়া সাধরে পরিচিত হইয়াছে।...সেহাতিলাসী—অমৃত।” (‘ঢাকা রিভিউ ও সন্নিহন,’ মার্চ ১৩২৭)

সার্ব শতাব্দীরও অধিক কাল রঙ্গালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া অমৃতলাল নানা ভাবে ইহার কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন। সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রথম রূপে অভিনেতা ও রঙ্গালয়ের নামে লোকে নাসিকা কুঞ্জন করিত। অমৃতলাল ‘অমৃত-মদিরা’র লিখিয়াছেন :—

মিষ্ণু-পরিবার-মাকে বিরক্তিকারণ।

কুটুম্বমাছে লজ্জা মিন্দার ভাজন।

বেশের দশের পাশে শ্বেষ ব্যঙ্গ হাঁসি।

স’রে গেছে বালাসখা তাছিল্য একাশি।

অভিনেতা ও জনসাধারণের মধ্যে সেই অবাস্তিত ব্যবধান দূরীভূত হইয়াছে। এই সংযোগ-সেতু সংগঠনের ফলে অমৃতলালের প্রভাব বড় কম ছিল না।

অদৈশী আন্দোলন

অমৃতলাল বদেশপ্রেমিক ছিলেন; বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের সময় আমরা তাঁহাকে সুরেন্দ্রনাথের সহিত কর্ণকক্ষে অবতীর্ণ দেখি। তিনি বক্তৃতাাদিও করিয়াছেন; তাঁহার বাগ্মিতা-শক্তি ছিল। বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলন উপলক্ষে (ইং ১৯০৫) তাঁহার রচিত একটি সুপরিচিত গান উদ্ধৃত করিতেছি :—

(বাউলের সুর)

ওরা কোর ক’রে দেয় দিক না বদলিমান।

আমরা রব অন্তরঙ্গ, এক অঙ্গে মনের সঙ্গে মিশিয়ে প্রাণ।

আমরা জাত বাঙালী প্রেম-কাঙালী—

ভাবচিস্তা ভোরা মন ভাঙালি,

তা নয়, জালিয়ে আগুন ক’রে দিগুণ বাড়িয়ে দিলি
প্রাণের টান।

আমাদের চোখ কিরেছে মায়ের কুঁড়েতে,

বিদেশী চিনির চেয়ে দেশের শুঁড়েতে,

আবার কর্ণচেতে হয়েছে রুচি, চাই নে তোদের লবণ দান।

আমাদের ভাতের সঙ্গে তাঁত বজার থাক্,

নাই বা দেবাই লাভের জাঁক,

তোদের, ওই চক্চকান মথুর চাকে কর্ণবো না আর
বিষ পান।

তোদের কাচের বাসন কাচের চুড়ি,

কেলুবো তেঙে মেরে তুড়ি,

ক’রে দেবতা সাক্ষী ঘরের লজ্জা পাঁথার আবার রাগবে মান।

তোদের শাপে হ’ল আশীর্বাদ

দুচ হ’ল মনের বাঁধ,

এই, বিসংবাদে বঙ্গভেদে, আমরা হলুম আবার ভেজীয়ান।

পেরে মর্মে আঘাত, কর্ণে হাত বাকিয়া ছেড়ে দেবে বুজিয়ান।

শ্যামবাজার এ. ভি. স্কুল

“অমৃতলাল ছিলেন শিক্ষকের পুত্র এবং তিনি নিজেও ছিলেন আজীবন শিক্ষক—কি সমাজে, কি রঙ্গালয়ে, কি

বিদ্যালয়ে। সেইসকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল অসীম—বিশেষতঃ পিতৃপ্রতিষ্ঠিত এবং তাঁহার বাল্যশিক্ষাহান গ্রামবাজার এ. ডি. স্কুলটির প্রতি তাঁহার স্নেহভালবাসার অন্ত ছিল না। তিনি দীর্ঘ বাইশ বৎসরেরও অধিক কাল এই বিদ্যালয়টির প্রথমে সহকারী সম্পাদক এবং পরে সম্পাদকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বস্তুতঃ তাঁহারই যত্নে এবং চেষ্টায় এই পুরাতন মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয়টি উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয়ে উন্নীত হয় এবং নিজস্ব গৃহে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া আদর্শ বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। এই বিদ্যালয়টিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা অমৃতলালের শেষ জীবনের কীর্তি এবং ইহার জমীদার এবং বাটিনির্মাণ উপলক্ষে তিনি তাঁহার অত্যন্ত সহকর্মিগণের সহিত জনসাধারণ এবং গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে লক্ষাধিক টাকা টাকা সংগ্রহ করেন। (“অমৃতলাল বসু” : ক্ষেত্রভূষণ বসু—‘বিশ্বকোষ,’ ২য় সং.)

প্রতিভার সম্মান

অমৃতলাল দেশবাসীর শ্রদ্ধা ও প্রীতি অর্জন করিয়াছিলেন। দেশের অগ্রদূত-প্রতিষ্ঠানগুলিও তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করিতে ক্রটি প্রদর্শন করে নাই। ১৩৩০ সালে (ইং ১৯২৩) বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহাকে অত্যন্ত সহকারী সভাপতি নির্বাচন, এবং ১৯২৫ সনে কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ‘জগত্তারিণী স্বর্ণপদক’ দান করিয়া গুণেরই সমাদর করিয়াছেন। তিনি ১৯২৩ সনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের ১৪শ অধিবেশনে (নৈহাটি, ৮-৯ আষাঢ় ১৩৩০) সাহিত্য-নাট্য সভাপতি, ও ১৯২৬ সনে ১৭শ অধিবেশনে (সিউড়ি, বীরভূম, ২০-২১ চৈত্র ১৩৩২) মূল সভাপতি মনোনীত হইয়াছিলেন। রসরচনার ক্ষেত্রে তিনি স্বদেশবাসীর নিকট “রসরাজ” নামে পরিচিত ছিলেন।

মৃত্যু

৭৭ বৎসর বয়সে, ২ জুলাই ১৯২৯ (১৮ আষাঢ় ১৩৩৬) তারিখে অমৃতলাল পরলোকগমন করিয়াছেন।

রচনাপঞ্জী

রচিত গ্রন্থ।—অমৃতলালের গ্রন্থাবলীর একটি কালামু-ক্রমিক তালিকা দিতেছি। তালিকার বহুনি-মধ্যে যে ইংরেজী প্রকাশকাল দেওয়া হইয়াছে তাহা বেকল লাইব্রেরি-সঙ্কলিত মুদ্রিত-পুস্তক-তালিকা হইতে গৃহীত।

১। হীরকচূর্ণ নাটক। ১২৮২ সাল (১ জুন ১৮৭৫)। পৃ. ৬৮।...এট জাশনাল ২৫ ডিসেম্বর ১৮৭৫। প্রথম সংস্করণের পুস্তকের আখ্যাপত্রে গ্রন্থকারের নামের স্থলে “By an Actor” মুদ্রিত ছিল।

২। চৌর্যের উপর বাটপাড়ি (গ্রন্থন)। ১২৮৩ সাল (১১ নবেম্বর ১৮৭৬)। পৃ. ৩৪।...এট জাশনাল ১৮৭৫।

৩। তিলতর্পণ। (৪ জাহুয়ারি ১৮৮১)। পৃ. ৪৩।

৪। লজলীলা (নাট্যরাসক)। ১২৮৯ সাল (৩০ নবেম্বর ১৮৮২)। পৃ. ২৩।

৫। ডিস্মিশ (গ্রন্থন)। ১২৮৯ সাল (২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৩)। পৃ. ৩১।...বেকল ১২৮৯।

৬। চাঁচুজ্যো ও বাঁড়ুজ্যো। ইং ১৮৮৪. (৭)।...১৮৮৪। ১৩০৪ সালে ‘লজলীলা’ ও ‘চাঁচুজ্যো ও বাঁড়ুজ্যো’ একত্রে প্রকাশিত হয়।

৭। বিবাহ বিডাট। ১২৯১ সাল (৯ ডিসেম্বর ১৮৮৪)। পৃ. ৬৯।...১২৯১।

৮। নিমাইচাঁদ (গল্প)। (২২ সেপ্টেম্বর ১৮৮৯)। পৃ. ২৪।

৯। ভাস্কর ব্যাপার (গীতিরস)। ১২৯৭ সাল (২ আগষ্ট ১৮৯০)। পৃ. ৩০।

১০। ভরুবালা (সামাজিক নাটক)। ১২৯৭ সাল (২ ফেব্রুয়ারি ১৮৯১)। পৃ. ১৪৭।...১২৯৭।

১১। বিলাপ। বা বিভাসাগরের স্বর্ণে আবাহন। ১২৯৮ সাল (২২ আগষ্ট ১৮৯১)। পৃ. ২৬।...১২৯৮।

১২। রাজা বাহাদুর (সং—২৭)। ১২৯৮ সাল (ইং ১৮৯২)। পৃ. ৪৮।...১২৯৮।

১৩। কালাপানি বা হিন্দুযতে সমুদ্র যাত্রা। ১২৯৯ সাল (ইং ১৮৯৩)। পৃ. ৫১।...১২৯৯।

১৪। বিমাতা বা বিজয়-বসন্ত (পারিবারিক নাটক)। ১৩০০ সাল (ইং ১৮৯৩)। পৃ. ১৫১।...১৩০০।

১৫। বাবু (সামাজিক নজ্জা)। ১৩০০ সাল (২৭ জাহুয়ারি ১৮৯৪)। পৃ. ৯১।...১৩০০।

১৬। একাকার। ১৩০১ সাল (১৯ জাহুয়ারি ১৮৯৫)। পৃ. ৯৫।...১৩০১।

১৭। বোঁ-মা (সামাজিক নজ্জা)। ২৫ পৌষ ১৩০৩ (১১ জাহুয়ারি ১৮৯৭)। পৃ. ১০০।...১৩০৩।

১৮। অবলা বল (উপভাস)। (২৭ আগষ্ট ১৮৯৭)। পৃ. ১২৫।

১৯। চক্কা (উপভাস)। (২৭ আগষ্ট ১৮৯৭)। পৃ. ১৬২।

২০। গ্রাম্য-বিডাট (সামাজিক নজ্জা)। মাঘ ১৩০৪ (২ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৮)। পৃ. ১১৬।...১৩০৪।

২১। সাবাস আটাশ (নজ্জা)। আশ্বিন ১৩০৬ (১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯০০)। পৃ. ৬৫।...১৩০৬।

২২। রূপণের ধন (প্রমোদ-গ্রন্থন)। ১৩০৭ সাল (৯ জুন ১৯০০)। পৃ. ৮০।...১৩০৭।

২৩। আদর্শ-বসু (নাটক)। বৈশাখ ১৩০৭ (৫ আগষ্ট ১৯০০)। পৃ. ২১৪।...১৩০৭।

২৪। যাহুকরী (পঞ্চরং)। ১৫ পৌষ ১৩০৭ (৩০ জাহুয়ারি ১৯০১)। পৃ. ৭৮।...১৩০৭।

২৫। বৈজয়ন্ত-বাস। মাঘ ১৩০৭ (২ ফেব্রুয়ারি ১৯০১)। পৃ. ১৭।...১৩০৭।

২৬। নবজীবন (মাতৃপূজা ও রাজতন্ত্রের উজ্জ্বলপূর্ণ একাক

নাট্যালীলা)। ১৩০৮ সাল (২৫ মার্চ ১৯০২)। পৃ. ৩৫।
...ষ্টার ১ জানুয়ারি ১৯০২।

২৭। অবতারণ (প্র-পরা-অপ-সং-হসন)। মাঘ ১৩০৮
(২ এপ্রিল ১৯০১)। পৃ. ৯০+১।...ষ্টার ২৫ ডিসেম্বর ১৯০১।

২৮। অমৃত-মদিরা (কবিতা)। কার্তিক ১৩১০ (২০
অক্টোবর ১৯০৩)। পৃ. ২৯০।

২৯। সাবাস বাঙ্গালী (সামাজিক নজর)। ১৩১২ সাল
(২৮ জানুয়ারি ১৯০৬)। পৃ. ৬২।...ষ্টার ১০ পৌষ ১৩১২।

৩০। অমৃত-প্রহাবলী, ১—৪ ভাগ। ইং ১৯০৬-৭, ১৯১১
(বহুমতী)। প্রহাবলীর ১ম ভাগে মুদ্রিত 'হরিশ্চন্দ্র' নাটক
(ভাদ্র ১৩০৬, পৃ. ১২৪) প্রকৃতপক্ষে নৃত্যগোপাল রায় কবি-
রত্নের রচনা; উহা "শ্রীঅমৃতলাল বসু কর্তৃক প্রকাশিত"।
প্রহাবলীর ২য় ভাগে মুদ্রিত নাট্যরাসক 'সতী কি কলঙ্কিনী বা
কলঙ্ক-ভঞ্জন' নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা। এই দুইটি
নাট্যগ্রন্থ অমৃত-প্রহাবলীর অন্তর্ভুক্ত করা সমীচীন হয় নাই।
এই প্রসঙ্গে 'শনিবারের চিঠি' আশ্বিন ১৩৫২ ও কার্তিক ১৩৫৪
দ্রষ্টব্য। চতুর্থ ভাগে মুদ্রিত 'সম্মতি-সঙ্কট', বিরাট বৃহৎপতি,
বাহবা বাতিক ও আরও কয়েকটি রচনা সাময়িক-পত্রের পৃষ্ঠা
হইতে পুনর্মুদ্রিত। সম্মতি-সঙ্কট দুর্গদাস দে-সম্পাদিত 'মজলিস'
পত্রের ১ম বর্ষে (মাঘ ও ফাল্গুন ১২৯৭) প্রকাশিত হয়।

৩১। বাস-দখল (নাট্যালীলা)। ১ (২৮ এপ্রিল ১৯১২)।
পৃ. ১৪৩।...ষ্টার ১৭ চৈত্র ১৩১৮।

৩২। নব-যৌবন (নাটিকা)। ১ (১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯১৪)।
পৃ. ২১১।...মিনার্ভা ২০ ডিসেম্বর ১৯১৩।

৩৩। পুরাতন-প্রসঙ্গ, ২য় পর্যায়। ১৩৩০ সাল (১
ডিসেম্বর ১৯২৩)।

বিপিনবিহারী গুপ্ত এই পুস্তকের ৬৩-১৩৬ পৃষ্ঠায় ১৩২২-২৩
সালে অমৃতলাল কর্তৃক বিবৃত স্মৃতিকথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

৩৪। বিষবৃক্ষ (নাট্য-রূপ)। ১ (২৩ মার্চ ১৯২৫)।
পৃ. ১৯১।

৩৫। চন্দ্রশেখর (নাট্য-রূপ)। ১ (১৫ সেপ্টেম্বর
১৯২৫)। পৃ. ১৭২।

৩৬। রাক্ষসিংহ (নাট্য-রূপ)। ১ (১৮ মে ১৯২৬)।
পৃ. ১৮৮।

৩৭। কোড়ক-কোড়ক (নজর ও গল্প)। ১৩৩৩ সাল
(১২ জুন ১৯২৬)। পৃ. ২৫৬।

সূচী :—আমের ধুমধাম, পণ্ডিত ডাক্তার, কৌলিক দুর্গোৎ-
সব, শারদা-মঙ্গল, মোদ-দা, বিজা "অমূল্য ধন," বৃন্দার আনন্দ,
মাতৃভক্তি, গ্রহিণী গৃহমুচ্যতে, বিধবপূজা, কবির ভাব
এসেছে, হিন্দুর নব নামকরণ, বজীর প্রভাত, প্রতাপের গল্প,
উমাকান্তের গল্প, গো-গোলযোগ, ইলিশ, নলের নব কলেবর,
বিষম সমস্তা, আগমনী, ধিয়েটারের পিছু, প্রেমের আবেগ।

৩৮। ব্যাপিকা-বিদায় (প্রমোদ-প্রহসন)। ১ (ইং
১৯২৬)। পৃ. ৮২।...মিনার্ভা ২৫ আষাঢ় ১৩৩৩।

৪০। দ্বন্দ্ব মাতনয় (হাত্তোৎসব)। কার্তিক ১৩৩৩
(১৭ নবেম্বর ১৯২৬)। পৃ. ৫০।...ষ্টার ২৪ কার্তিক ১৩৩৩।

৪১। যাজ্ঞসেনী (নাটক)। জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫ (ইং ১৯২৮)।
পৃ. ১৭৬।...মিনার্ভা ২২ বৈশাখ ১৩৩৫।

[মৃত্যুর পরে প্রকাশিত]

৪২। ভগবান শ্রীকীর্ত্তনকৃষ্ণদেবের বাঙ্গালী (কাব্য)।
১৩৩৬ সাল। পৃ. ৪১।

সম্পাদিত গ্রন্থ।—অমৃতলাল বহুমতী-কাঞ্চালয় হইতে
১৩১৯ (শ্রীপক্ষ্মী) সালে প্রকাশিত সচিত্র 'বীণার বন্ধার'
(নির্ধাচিত গীত, রঙ্গরস প্রভৃতি) সম্পাদন করিয়াছিলেন।
তিনি অনেক উদীয়মান লেখককে উৎসাহিত করিবার জন্ত
সামলে তাঁহাদের পুস্তকের ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছিলেন; দৃষ্টান্ত-
স্বরূপ—সুরেন্দ্রনাথ রায়ের 'শৈব্যা', আন্তর্যম ভট্টাচার্যের
'রাণীর কবর', নন্দলাল দাসের 'মৃগাবর্ত' ও পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্যের
'বাঙ্গালীর গল্প' পুস্তকের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনা।—পুরাতন
সাময়িক-পত্রের পৃষ্ঠায় পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত অমৃতলালের
বহু রচনা আত্মগোপন করিয়া আছে। এই শ্রেণীর রচনার
নির্ভরযোগ্য তালিকা 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'র (৫৪শ বর্ষ,
১ম-২য় সংখ্যা) দ্রষ্টব্য।

অমৃতলাল ও বাংলা-সাহিত্য

নাট্যালয় ও রঙ্গমঞ্চের সহিত অভিনেতা হিসাবে প্রত্যক্ষ
ও ধর্মিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকিয়া যে দুই জন সাধক বাংলাদেশে
সাহিত্য-খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন, অমৃতলাল তাঁহাদের
অন্যতর। অপর জন নাট্যসম্রাট গিরিশচন্দ্র—শুরু-গৌরবে
নাট্যসাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত হইলেও সাধারণ সাহিত্য-ক্ষেত্রে তিনি
অমৃতলালের মত যশস্বী হইতে পারেন নাই। যাহাকে চৌকস
বলা যায়, অমৃতলাল তাহাই ছিলেন। কি প্রবন্ধে কি কবিতায়
অন্যবিধ হাতে ও ব্যঞ্জে ও সরস রসিকতায় তিনি একটি বিশিষ্ট
আসন অধিকার করিয়াছিলেন—নাটক-প্রহসনের ব্যাতি ত
ছিলই। 'অমৃত-মদিরা' প্রভৃতি গ্রন্থে তিনি যে-জাতীয় রস
পরিবেশন করিয়াছেন তাহা অতুলনীয়। তাঁহার এই রসের
বহু রচনা এখনও সাময়িক-পত্রের পৃষ্ঠায় আত্মগোপন করিয়া
আছে; সংগৃহীত হইয়া একত্র প্রকাশিত হইলে আমরা অমৃত-
সাহিত্যের যথার্থ মূল্য নিরূপণ করিতে পারিব। 'বিবাহ-
বিজাট' ও 'বাবু'র অমৃতলাল এককালে যেমন বঙ্গীয় জন-
সাধারণের হৃদয় জয় করিয়াছিলেন, ব্যঙ্গ ও হাস্যরসিক অমৃত-
লাল তেমনই প্রকাশিত হইলে বর্তমান ও অনাগত বাঙালী
রসিক সমাজে মর্যাদা লাভ করিবেন। রঙ্গমঞ্চের সহিত
ওতপ্রোতভাবে জড়িত হইয়াও তিনি স্ত্রী সাহিত্যিক সমাজের
একজন দিক্‌পাল হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়া-
ছিলেন শুধু তাঁহার বহুমুখী প্রতিভার বলে। 'কোড়ক-কোড়ক',
'অমৃত-মদিরা' প্রভৃতি হইতে চিরজীবী অমৃতলালের প্রতিভার
বহু নিদর্শন মিলিবে।

শরণাগতা

শ্রীসুধীর সেনগুপ্ত

আয়নামতি কাপড়খানা পেয়েই তাঁটখানা একটু বেকিয়ে ফিক করে হেসে ফেলল। বিজয়ের গর্ব ও নতুন পুরস্কার লাভের আনন্দে গদগদ রূপাই বলে—নাচের শেষের দিকটার সাঁওতালী ঢঙে পা-টা এগিয়ে ঘুঁচিটা মাথার চারদিকে ঘুরিয়ে এনে যেমনি সামনে রাখলুম অমনি ঢাক-ঢোলের বাজনার সঙ্গে সঙ্গে পড়ে গেল ঠেং ঠেং রব। সেজবাবু বলেছিলেন পাশেই একটা ইকি-চেয়ারে, কাপড়খানা ছুড়ে দিলেন আমার গায়ে।

আয়নামতির বহু দিনের সাধ টকটকে লাল শাড়ীর একটা ধোমটা মাথায় টেনে পাড়ায় বিজয়ার দিন তাঁকুর দেখতে যাবে। তাই স্বামীর লব্ধ পুরস্কার একবার বুকে চেপে ধরে, আবার ঘুরে বেঁচে চেয়ে থাকে, আবার নাকের কাছে এনে গন্ধ ভক্তিতে থাকে। স্বামীর প্রতিযোগিতার সাফল্য ও নৃতনের গন্ধ ভরে দিয়েছে তার অন্তর। আয়নামতি রূপাইর বাঁ কাঁধ থেকে গামছাটা টেনে নিয়ে ক্রান্ত স্বামীর মিশমিশে কাল গায়ের ওপরের শিশিরবিম্বের মত ধামগুলো পুঁছে দেয়, এগিয়ে দেয় হুকোটা, আর কলকেটাতে নিয়ে আসে কয়েক খণ্ড টকটকে লাল কাঠকয়লার আঙন। কলকের আঙন ফুঁয়োতে ফুঁয়োতে আয়নামতির নিটোল গালের উপর পড়ে তার ভণ্ড আভা, সেই ফিনুকি হাসির দেশটুকু তখনও তার রক্তিম অবশরে লেগেই আছে।

রূপাই হুকোটাতে টান দেয়, আর বলে, আসছে বহর দেবীর রূপা হলে নতুন নাচের ঢঙ দেখাব, বুঝলি।

নবমীর শেষ আঁটির সঙ্গে সঙ্গে অবিরত ঢাক-ঢোলের ধ্বনিও একটা নিশ্চকতার যবনিকা ফেলেছে। এই গভীর রাত্রির নীরবতা ভঙ্গ করছে— শুধু তারই একটা প্রতি-ধ্বনি। আঁটির শেষ। আয়নামতি শত ছিন্ন মাহুরটার উপর আড়াই ইকি মোটা কাঁধাখানা বিছিয়ে দিলে। এক যুগের পুঞ্জীভূত ময়লা যেন তাকে বেশ গরম করে রেখেছে। শিয়রে চটের লম্বা বালিশটার তৈলাক্ত ময়লা জমে ভেলভেটের মতই চিক্চিক করছে। তারই উপর আয়নামতি ও রূপাই ক্রান্ত দেহ এলিয়ে দিলে। কি এক আনন্দ-প্রবাহ তাদের ঘুম আজ কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। কেগেই আজ দেখছে তারা স্নেহের স্বপ্ন। স্নেহের রাজপুত্রী গড়ে, ভাঙে, আবার গড়ে, যে স্নেহের ইমারত গড়ে উঠে সমান ভাবেই ধনীর পালকে আর দরিদ্রের জীর্ণ কহার। বিগত বাদলের শেষ বর্ষণ ঘরের ছাউনির মাঝে মাঝে কঁতকটা অংশ উড়িয়ে নিয়ে গেছে, তাই এই স্নেহ-স্বপ্নে বিভোর দুইটি প্রাণীর স্বপ্নকথা স্তনবার জুড়ে শরভের খণ্ডমেঘের কঁকে কঁকে চাঁদ এসে উঁকি দেবার সুযোগ পায়।

খানিক পরে আকাশের খণ্ডমেঘ যখন ঘরে চলে যায়, ফুটফুটে জ্যোৎস্না এসে বিছিয়ে দিয়ে যায় শতজীর্ণ মলিন বিছানাখানা ঢেকে একখানা রূপালি বেনারসী। আয়নামতি ও রূপাই প্রকৃতির এই অমূল্য সম্পদের অজ্ঞাত স্পর্শে ঘুমিয়ে পড়ে।

সুগন্ধানদীর চর। নদী থেকে বহু দূরে ছোট ঘরখানি। চরের উপর অদূরপ্রসারী ধানের ক্ষেত। নদী সেখানে পূর্ব থেকে দক্ষিণে বেকে গিয়েছে। ওপারের অনেকখানি বাজুতট যখন অপরাহ্নের আভার রঙীন হয়ে উঠে সুগন্ধানদীর তরঙ্গের উপর লক্ষ মাণিক ছড়িয়ে দেয়, এপারের ছোট কুটির-প্রাঙ্গণের তুলসীতলায় ভক্তি-প্রদীপটি তখন তার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করে। প্রতি বছর মা-লক্ষ্মী এই সুবিশীর্ণ ধানের ক্ষেতে সোনা কলিয়ে দিয়ে যান।

জমির মালিক চৌধুরীরাই। রূপাই তার কতক অংশে চাষবাস করে। রূপাইর ঘরের ভেতর থেকে ঠিকরে পড়া আলো নৌকারোহীদের দিক নির্ণয়ে সাহায্য করে। গরীব রূপাইর চালাঘরখানি চাষীদের বিশ্রামস্থল, শ্রান্ত কিষাণদের তামাক খাবার আড্ডা। ঘরের অল্প মাটির দেয়াল থেকে মাটি পড়ে গিয়ে বাঁশের কঞ্চি বেরিয়ে পড়েছে। ছাউনি খানিকটা খড়কুটার, খানিকটা শুকনো পলাপাতার ঢাকা। ঘরের বাইরে অদূরেই তুলসীমঞ্চ। প্রতিদিন সকালে আয়নামতি একটা বা দুটো করবী নিয়ে তুলসীমঞ্চে প্রণাম করে। বাড়ীতে জবা ও করবীর গাছ অনেক। কোনো বিশিষ্ট স্নেহ ফুলের কোলিত সেখানে অশ্রুতার স্রষ্টা করে নি। পাশের বাড়ীর মুরলা পিসি রোজ ডালা ভরে জবা ও করবী নিয়ে যায়, বলে, তোরা শাঁধা-সিন্দুর অক্ষয় হোক করান্তি-বোঁ, আমার তাঁকুরের পুজার ফুল যে তোরা এখন থেকেই হচ্ছে।

ভোরে উঠে রূপাই পাড়াভাত ধরে এক ছিলিম তামাক টেনে মাঠে যায়, আয়নামতি বাঁ হাতে তার লাল শাড়ীর ধোমটাটি ঝুঁক টেনে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে রূপাইর দিকে যতক্ষণ না লম্বা লম্বা ধানের শীষগুলো তার সর্কাদ ঢেকে দেয়। রূপাই ছুপুর্বে ঘুমোচ্ছিলেন কান্ডে হাতে ফিরে আসে, আয়নামতি ভাঙা তক্তাখানা এগিয়ে দেয় বসবার জুড়, তামাক দেজে আনে, হাতে বাড়িয়ে দেয় যুখে নল-লাপান দড়ি বাঁধা ছোট তেলের শিশিটা। কখনও বা রূপাইর পায়ের ও পরের ফুলে-ওঠা শিরাগুলোর তেল রগড়ে দেয়। খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে রূপাইর পাশেই ছেঁড়া মাহুরটার একটা

অংশ বিছিয়ে আয়নামতিও শুয়ে পড়ে, নদীর ওপার থেকে হাওয়া এসে চামর বুলিয়ে দিয়ে যায়।

রূপাই বিকেলে আর মাঠের কাজে যায় না। চৌধুরী বাড়ীর ছেলে মহলে তার আসর জমে। পিপলিতার লাঠিঘাল-দের গল্প, বাঘমারার মগনুতা, রামনগরের হাসহুবাইজীর নাচ, এই তার গল্পের উপকরণ। ছেলেদেরও স্মৃতি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তখন যখন রূপাই-করাতি তাদের সাধ্য আসরে নায়কের পদ নিয়ে বসে। গল্পে রূপাই কল্পতরু। চাহিদা মাস্তিক গল্প তার মুখে লেগেই আছে।

পূজা এলে সবচেয়ে বেশী সাড়া পড়ে চৌধুরী-বাড়ীর ছেলেমহলে। প্রায় তিন মাস হ'ল মিলিটারী এসে মাঠের অর্ধেক ইজারা নিয়েছে। রূপাইর মাঠের কাজ আর নেই। তাই এখন থেকে হু'বেলাই রূপাইর আড্ডা এই ছেলেদের ভেতরে। গেল বছরে আরতির নাচে সে পেয়েছে লাল টুক-টুক শাড়ী। তার রং তার গন্ধ সে আছড় ভোলে নি। এবারের পূজার সে দেখাবে নতুন ঢঙের নাচ। তাই ছেলে-দের আসরে তার গল্পের প্রধান বিষয় বিভিন্ন পাড়ার নৃত্যভঙ্গী ও তার দোষত্রুটি।

ওপাড়ার কালু নন্দীর দশ বছরের ছেলে নেচে নেচে বাজার বেশ—কিন্তু সে একটু ভালকানা, ছোট্ট শান-দাবের সানাই—সুনুগেই যেন আপনা থেকে পা নাচতে নাচতে চলতে থাকে, কিন্তু সে যখন ফের দম নেবার জন্তে হাঁপ ছাড়ে তখন তাকে বেহুড় বেরসিক বলেই মনে হয়। হারাণ ঢাকি ওস্তাদ বটে, কিন্তু এই রূপাই-করাতির নাচের সঙ্গে ক্রান্ত চলতে পারে না—বুড়ো কিনা,—ভুই তার হাত কাঁপে। সবচেয়ে জমিয়ে রাখে অমরী নটের কাঁদর বাজনা। বুকের উপর কাঁদরখানা রেখে যখন টান্ডের এক পাটি বার করে ডাইনে বামে মাথাটা হেলিয়ে ছলিয়ে ঢং ঢং করতে থাকে, তখন একেবারে বেতাল। বুড়ো হরু ঠাকুরও তাঁর চুপকাম-করা পাকা দাড়িতে ভাল ধরতে থাকে।

রূপাই এই সব গল্প করে। আর মাঝে মাঝে তার প্রশস্ত বুকখানার পুতীর গহ্বর থেকে বেরিয়ে আসে শুষ্ক-পড়া এক একটা দীর্ঘশ্বাস, তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে আয়নামতির কঙ্কালসার দেহ। আয়নামতি ম্যালেরিয়ায় ভুগছে আড়াই মাসের বেশী। যখন তার জ্বর আসে, সে মোটা কাঁথাখানা গায়ের পুর ফেলে দিয়ে রূপাইকে বলে তার পরে চেপে বসতে। এই কাঁথাখানা যেমন লজ্জা নিবারণের সম্বল তেমনই জ্বরেরও মহোষধ।

গেল বছরের চৌধুরী-বাড়ীর পুরস্কারের শাড়ীখানা এক বছরে এসে ছিন্নভিন্ন হয়ে মাজ আড়াই হাতে দাঁড়িয়েছে। রূপাই যখন সেই ভাকড়াটুকু পরে চৌধুরীদের বাড়ী যায়, আয়নামতি পরে থাকে ঘরের ভিতর কাঁথাখানা জড়িয়ে। কিরে এলে,

রূপাইকে কাঁথাখানা দিয়ে ঐ ভাকড়ায় লজ্জা নিবারণ করে বাইরে চলে আসে। আয়নামতি নিষেকের দিনের আলো থেকে ঘুরে গোপনতার ঢাকা দিয়ে রাখতে চায়। টাদিনী রাত ভাঙা বেড়ার ফাঁকে ফাঁকে তাকে খুঁজে বেড়ায়, আয়না-মতি বেড়ার ফাঁকে মুখ রেখে নীরব ভাষায় তাকে মনের কত বেদনা জানায়। কিন্তু সে যেন তার প্রতিদানে পায় শুধু ব্যঙ্গ, শুধু পরিহাস। তাই তার ভাল লাগে অমানিশার জমাট আঁধার। অন্ধকার যেন তার কত আপনায়। স্নেহময়ী মায়ের মতই সে নিজের আঁচল দিয়ে সন্তানকে ঢেকে রাখতে চায়। তাই গভীরতর রাতে আঁধার যখন ঘনিয়ে আসে তখন ভাকড়াখানা জড়িয়ে ছানামুণ্ডির মতই সে বাইরে চলে আসে, প্রত্যহর কাছটি শেষ করে আবার ভোরের আলোর আগেই ঘরে চলে যায়। যে বিশ্ব-দেবতা এই ঘনান্ধকার সৃষ্টি করেছেন তাঁকেই নিবেদন করে মনে মনে প্রাণের ঐকান্তিক কৃতজ্ঞতা। সে দিন রাতে ছানামুণ্ডি দেখে সনাতন মিজী নামে এক পবিত্র তত্ত্ব পেয়েছিল, সেই লজ্জা সেই ক্ষোভ সে আছড় ভুলতে পারে নি।

পূজা যতই কাছে আসে আয়নামতি ও রূপাইর প্রাণে আশার যুহু হাওয়া বইতে থাকে। এ বছরের আরতি-প্রতি-যোগিতার শাড়ী যে তাদেরই প্রাপ্য। এই আশায় আয়না-মতির শুক পাণ্ডুর মুখ রক্তাক্ত হয়ে ওঠে। তাই রূপাইও চৌধুরী-বাড়ীর ছেলেদের সঙ্গে ছাড়তে চায় না।

সেজবাবু বাড়ী এসেছেন। পূজার আর চার দিন বাকী। কলকাতা থেকে তাদের বহু আকাজক্ষিত পুরস্কার ত এসেই গেছে। রূপাই বাড়ীতে বসে শুধু একটা গুহুচি নিয়ে হাত-পা ঘুরায়। আয়নামতির মলিন মুখে বরাকুলের মতই হাসি কোটে। নবমীর দিন রূপাই তার এক বছরের সঞ্চিত নৃত্যকলার ভাতার উজাড় করতে কার্পণ্য করবে না। আয়নামতির শীর্ণ দেহে জড়িয়ে দেবে লাল শাড়ী। হয় ত তার জীবনে এই শেষ পুরস্কার। আফ্লাদ ও বিষাদে তার চোখের কোণে জলভরা হাসির ক্ষীণ রেখা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

আজ নবমী। সকাল সকাল রূপাই তার ভাকড়াখানা পরিষ্কার করে নিয়েছে। আয়নামতির আজ হু'দিন জ্বর নেই। কাঁথাখানা থেকে মুখ বার করে দেখে রূপাইর নৃত্যভঙ্গী। আর ভাবে তার বামী আছড় রাতে কিরে এলেই সে তার হাড় ক'খানা নতুন কাপড়ে ঢেকে একবার টেনে নিয়ে যাবে চৌধুরীদের ঠাকুর প্রণাম করতে।

দেখতে দেখতে রাত নটা হ'ল। ঢাকি ছলি সানাইদার সব হাজির। প্রথমে ছেলের দল ছোট ছোট গুহুচি হাতে ঘুরে ঘুরে দেবীর আরতি করে। পরে আসে পাড়ার অস্তিত্ব প্রতিযোগীরা। এইবার রূপাইর পালা।

গুহুচি হাতে রূপাই আসলে পা দিতেই চারদিক থেকে উঠল হৈ হৈ রব। রূপাই প্রথমে বীর ভালে পা ফেলতে

থাকে। ঢাক ঢোল কারার দ্রুতগতির সঙ্গে ক্রমে সে চঞ্চল হয়। রূপাই ঘুরে ফিরে ছুই হাতে ঘুচি দিয়ে নৃত্য করে, বাগকেরা তাকে ঘিরে চারদিক থেকে মুহূর্তে ঘুরে চন্দন গুণ্ডল নিক্ষেপ করে। রূপাইর হাতের ঘুচি থেকে তালে তালে ধোয়ার কুণ্ডলী উর্ধ্বে উঠে ছড়িয়ে পড়ে। ঢাক ঢোল কঁাল-খটোর শব্দ ও জয় জয়কার উল্লুখনিত মগপ-প্রাঙ্গণ মুখর। অথ্যে অথ্যে রূপাই অর্ধনিম্নলিত চোখে নৃত্যতরীতে মাথা নীচু করে ভক্তিভরে প্রণাম জানায় আবার ছুই চোখ বিক্ষিপ্ত করে রক্তাশ্রুভূষিতা প্রতিমার দিকে অপলক দৃষ্টি নিবদ্ধ করে থাকে। হাতময়ী দেবীপ্রতিমা লক্ষ্মী, সরস্বতী, কাষ্টিক, পণেশ পরিবৃত হয়ে যেন সকলের শিরে আশিস বর্ষণ করছেন। পার্শ্বে কলা-বধূ তার চওড়া লালপাড় শাড়ীতে দেহ আবৃত করে দেহহাত ঘোমটা টেনে সলজ্জ ঝাড়িয়ে। আরতির কুণ্ডলাকৃতি ঘূমে ও মুহূর্তে হাওয়ায় তার ঘোমটার মুহূর্তে কম্পন নৃত্যরত রূপাইর বুকে এক অপূর্ণ পুলকের শিহরণ তুলছে। ঢাকি ঢুলির ক্রান্তি আসে, রূপাইর ক্রান্তি নেই। তার এক বছরের কসরত সব কটাই দেখান হয়েছে। এখন সে এক একবার নৃত্যের বেগ সংযত করে আর সেজবাবু দিকে তায়।

কিছুক্ষণ পরে বাজনা গেল ধ্যেমে। রূপাই ঘুচিটা সামনে রেখে সেজবাবুকে প্রণাম করলে। সেজবাবু বললেন—সুন্দর তোর নাচ, রূপাই। মা যেন তোর নাচ দেখে হাসছেন। মা তোর সর্বপ্রকার মঙ্গল করবেন। এই নে তোর বকশিস। বলে রূপাইর দিকে একটা টাকা ছুঁড়ে দিলেন, আর বললেন, আসছে বছর তোর মনের আশা মিটিয়ে দেব।

রূপাইর মুখে রা-টি নেই। নীরবে টাকটা হুড়িয়ে প্রণাম করে ধীরে ধীরে বাড়ীর দিকে পা ফেলতে লাগল।

আয়নামতি এতক্ষণ কাঁধাখানা ভড়িয়ে ছায়ার ধরে বসেছিল স্বামীর প্রত্যাগমন-প্রতীক্ষায়।

রূপাইর বুখানা ফেটে বেড়িয়ে এল একটা দীর্ঘশ্বাস। বললে—এই নে তোর বকশিস—বলে, টাকটা ফেলে দিল আয়নামতির গারে।

এক হিলিম ভামাক টানতে টানতে রূপাই বিমিয়ে পড়ল দেয়ালের 'পরে। আয়নামতি ছায়ারের অপর দিকে ঠেস দিয়ে বলে আক্রান্তের খণ্ডমেঘের দ্রুত গতি নিরীক্ষণ করছে, আর অলক্ষ্যে ক্ষীণ হাত ছ'খানি তুলে উর্ধ্বে প্রণাম জানাচ্ছে।

রাজি গভীর। চাঁদ হেলে পড়েছে অনেকক্ষণ। পূজার তিন দিনের ক্রান্তি নিয়ে সমস্ত পাড়াটা পড়েছে ঘুমিয়ে। চৌধুরীদের চণ্ডীমণ্ডপের বড় আলোটা নিবিয়ে দিয়ে পুরোহিত এক কোণে নাক ডাকাচ্ছেন। ক্রমে অন্ধকার গাঢ়তর হয়ে আসে। হঠাৎ কিদের শব্দে পুরোহিতের ঘুম যায় ভেঙে। চেয়ে দেখেন সমুখে এক ছায়াবৃত্তি-নরককাল।

পুরোহিতের বিহ্বল চীৎকারে বড়গিরী রাজেশ্বরী বাড়ীর তেতর থেকে ছুটে আসেন, প্রদীপের পলতেটা বাড়িয়ে দিতেই দেখেন, এক ককালসার নিরাবরণ-স্ত্রী-বৃত্তি কলা-বোয়ের বজ্রাঙ্গল আকর্ষণ করছে।

ভোর হয়ে এল প্রায়। বাড়ীস্থ লোক ভেঙে পড়েছে চণ্ডীমণ্ডপের প্রাঙ্গণে। প্রভাতের বালহুর্বা তার রক্তিম আবরণ-খানি বিছিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল রমণীর দেহ দেবীর পদতলে মুছিত, শাড়ীর আঁচলখানা তখনও তার মুষ্টিবদ্ধ।

“রামানন্দ-জীবনী”

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[শ্রীশান্তা দেবীকে লিখিত]

গুপ্ত নিবাস

বারাকপুর ট্রাংক রোড,

পোঃ, বেলঘরিয়া, ২৪ পরগণা।

২৭. ১০. ৪৭.

কল্যাণীয়া শান্তা—

রামানন্দ বাবুর জীবনী আর তোমার চিঠি ঠিক সময়ে পেয়েছি, চোখের ভেজ কমে গেছে তাই আগাগোড়া পড়ে জ্বাব-দিতে দেবী হয়ে গেছে। বইখানি পড়ে মনে হ'ল—এ যেন সুপাঠ-সুখপাঠা গল্পের বই অনেক দিন পরে হাতে এলো।

তোমার লেখা এমন সুন্দর করে ফুটিয়েছে—পূর্বাণুর ঘটনা—সমস্ত সহজ আর সরলভাবে যে আরস্ত করলে ছাড়া যায় না শেষ পর্যন্ত না পৌছে।

গল্পকথার মতো বড় সুন্দর ও সহজ করে তুমি বলেছো বহুবরের জীবনের ঘটনাবলী,—সকালের সব দিনগুলি একটি অপূর্ণ দীপ্তি পেয়ে ফুটেছে এই গ্রন্থে—সেই ভরদ্বাজ আশ্রম চিন্তামণি বাবু বামনদাস বাবু সবাইকে মনে পড়ে, যেন সেই সময়েই আছি মনে করি। আমার খুব ভাল লেগেছে বই-খানি। তোমার শিক্ষা-দীক্ষা সার্থক হয়েছে, এই বই পঠে যে তুমি দিয়েছো দেশের মানুষদের, এতে তোমার পুণ্য করা এবং তীর্থ করার কাজ হ'ল। আমার আন্তরিক আশীর্বাদ নিও।

তোমাদেরই

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুঃ—একটা কথা ভুলেছি; ‘প্রবাসী’ আর ‘মজার রিভিউ’র প্রথম বছরের ছ'খানি মলাটের ছবি বইখানিতে দিলে হতো, এখন আর উপায় নাই।

কোতুলপুর থানার স্বাস্থ্য

ক্রীরাখালচন্দ্র নাগ

বাঁকুড়া জেলার পূর্বপ্রান্তে কোতুলপুর থানা অবস্থিত। ম্যালেরিয়া-প্রলীড়িত স্থান বলিয়া ইহা সর্বত্র প্রসিদ্ধ। বর্তমান সময়ে কোতুলপুর থানার জনস্বাস্থ্যের অবস্থা দেখিলে হৃদয় আতঙ্কে পূর্ণ হইয়া উঠে। সম্প্রতি দেশে নবযুগ আসিয়াছে, কংগ্রেসের মনোনীত মন্ত্রীমণ্ডলী আজ পশ্চিম বাংলার কর্ণধার। এখন তাঁহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারিলে কোতুলপুর থানার জনসাধারণ হস্ত অস্থদেহে বাঁচিতে পারে।

কোতুলপুর থানার কয়েক বৎসরের জন-মৃত্যু-হিসাব :

বৎসর	জন্ম	মৃত্যু
১৯৩৯	১২৭৪	১৭৮১
১৯৪০	১৩৮১	১৩৮৭
১৯৪১	১৩৫১	১৪৫৯
১৯৪২	১৪৮৭	১৪৫৩
১৯৪৩	১৪৪৪	১৯৩৭
১৯৪৪	১০৩২	১৮৬৫
১৯৪৫	১২১৩	১৫২০
১৯৪৬	১৫৫৬	১৪০৩

মোট সংখ্যা— ১০৭৩৮ ১২৮০৫

এই আট বৎসরে জন্মের অপেক্ষা মৃত্যুর সংখ্যা বেধী হওয়ায় কোতুলপুর থানার ৫৪৭২২ জন অধিবাসীর মধ্যে ২০৬৭ জন কমিয়া গিয়াছে। ১৯৩২ হইতে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত ৭ বৎসরের হিসাবে কোতুলপুর থানার মধ্যে জন্ম ১০৮২২ ও মৃত্যু ১১৪৪৬। ইহাতে দেখা যায় এই ৭ বৎসরের মধ্যে মোট জনসংখ্যা হইতে ৫৬৪ জন কমিয়াছে। গত ৭ বৎসরের জনসংখ্যা হ্রাসের অন্ত্রপাত দেখিয়া বুঝা যাইতেছে যে বর্তমান বৎসরের হিসাবে জনসংখ্যা প্রায় চতুর্ভাগ হ্রাস পাইয়াছে। এই ভাবে যদি কোতুলপুর থানার জনসংখ্যা ক্রমশঃ কমিতে থাকে তাহা হইলে অল্প দিনের মধ্যেই কোতুলপুর থানার তিন শত পল্লী আশানে পরিণত হইবে।

ম্যালেরিয়া এখানকার সর্বপ্রধান ব্যাধি। আর এই ম্যালেরিয়া হইতে কত রোগ যে হইতে পারে তাহার অন্ত নাই।

কোতুলপুর থানার গত ৮ বৎসরে ম্যালেরিয়ায় জন্ম মৃত্যু :

বৎসর	ম্যালেরিয়ায় মৃত্যু
১৯৩৯	৮৯৬
১৯৪০	৬৬৬
১৯৪১	৬৩১
১৯৪২	৭০৭
১৯৪৩	১১১৭
১৯৪৪	৯৯৯
১৯৪৫	৬২৯
১৯৪৬	৪৪৪

মোট— ৬০৮৯

বর্তমান আট বৎসরের হিসাব ও তাহার পূর্বেকার সাত বৎসর পর্যন্ত হিসাবে দেখা যায়, ১৯৩২ হইতে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত ৫১৬৭ জন ম্যালেরিয়ায় মরণে মরিয়াছে। ম্যালেরিয়ায় জন্ম মৃত্যুসংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িতেছে। যে থানার জনসংখ্যা ৫৪৭২২ সেই থানা হইতে ৮ বৎসরে যদি ৬০৮৯ জন লোক ম্যালেরিয়ায় প্রকোপে মৃত্যুমুখে পতিত হয় তাহা হইলে কোতুলপুর থানার ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন বলিয়াই মনে হয়। জাতীয় সরকারের সহযোগিতায় যদি এই সমস্ত দরিদ্র পল্লীকে বাঁচাইবার জন্ত জনসাধারণ এখনো সত্ববত্বভাবে চেষ্টা না করে তাহা হইলে এই পল্লীগুলিকে কিছুতেই স্বাস্থ্যের হাত হইতে রক্ষা করা যাইবে না।

তথু ম্যালেরিয়ায়ই যে কোতুলপুর উৎসন্ন যাইতেছে তাহা নহে, অন্যান্য ব্যাধির প্রকোপও এ অঞ্চলে কম নয়। এখানকার শিশুমৃত্যুর হারও ভয়াবহ। এক বৎসরের কমবয়স্ক শিশু-মৃত্যুর হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল :—

বৎসর	এক বৎসরবয়স্ক শিশুর মৃত্যুসংখ্যা
১৯৩৯	৩৪০
১৯৪০	২৮৯
১৯৪১	২৬৩
১৯৪২	৩০২
১৯৪৩	৩২৫
১৯৪৪	২৭৬
১৯৪৫	২৫৫
১৯৪৬	২৯৯

মোট— ২৩৪৯

এই আট বৎসরে এক বৎসরের কমবয়স্ক শিশু-মৃত্যুসংখ্যাও কম নয়—২৩৪৯টি। হাফুজ জমিদার আগে করুণাময় পরমেশ্বর মাতৃভূমে যে ক্ষীরধারা সঞ্চিত করিয়া রাখেন দারিদ্র্য-নিবন্ধন আজ মাতা উদয়পূর্ণ করিয়া থাইতে না পাওয়ায় হৃৎকণ্ডা সন্তান সেই অমিরধারা হইতে বঞ্চিত। গো-দুগ্ধ দ্বারা শিশুসন্তানকে বাঁচাইবার উপায়ও আজ আর নাই। বাংলার গো-দুগ্ধের অভাব আজ চরম সীমায় পৌছিয়াছে। এক টাকার ষোল সের খাঁট দুধ ঘেখানে পাওয়া যাইত আজ সে স্থলে টাকায় দুই সেরও দুধ পাওয়া যায় না। স্বাধীনতা লাভ হইলে কি হইবে, দেশের ভবিষ্যৎ আশাতরসার স্থল এই লকল শিশুকে বাঁচাইতে না পারিলে সবই ভ্রান্ত হইবে। কোতুলপুর থানায়, যেখানে ৫৪৭২২ জন লোকের বাস সেখানে এক জনও শিক্ষিতা বাকী নাই। অশিক্ষিতা বাকীর হস্তে পড়িয়া কত শিশু যে অকালে মারা যাইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে, খাদ্য না পাওয়ায় ও শিশু-পালনে অজ্ঞতাবশতঃ অনেক শিশু ক্ষুধিত হইবার দিন কয়েক পরেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করে। অনেক শিশুর জননীও অজ্ঞের অভাবে এবং স্বামীজীর অজ্ঞতাবশতঃ মারা যান।

কোতুলপুর থানার সম্ভানজন্মের ১৪ দিন মধ্যে প্রসূতির মৃত্যুর হিসাব নিম্নলিখিত রূপ :

বৎসর	প্রসূতির মৃত্যু-সংখ্যা
১৯৩৯	২৬
১৯৪০	১৮
১৯৪১	২৭
১৯৪২	৩২
১৯৪৩	৩০
১৯৪৪	১৭
১৯৪৫	৩২
১৯৪৬	২৪

মোট ২০৬

১৯৩৩ হইতে ১৯৩৮ সন পর্য্যন্ত ছয় বৎসরে ১৯৮টি প্রসূতি এই ভাবে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে। ১৯৩৯-৪৬ এই ৮ বৎসরে ২০৬টি জননীর অকালমৃত্যু হইল। ঐযুক্ত জ্ঞানাজ্ঞান নিয়োগ কর্তৃক সংগৃহীত একটি চার্টে দেখিয়াছি, প্রতি ৮ মিনিটে এই সোনার বাংলা হইতে একটি করিয়া মাতা প্রসবকালে বা প্রসবের অব্যবহিত পরে মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই সব পন্নীগ্রামের স্বতিকাগারের অবস্থা দেখিলে জন্মের জ্ঞানের লক্ষ্য হয়—যে দেশে সম্ভানজন্মের পর তাহাকে মৃত্যু-বাসের অযোগ্য গৃহে রাখা হয়, সে দেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকার, পূর্বকালে কখনই এরূপ ব্যবস্থা ছিল না। সে যুগে ত্রিকাল-জ্ঞানী আধ্যাত্মগণের নির্দেশানুযায়ী প্রসবের বহুপূর্বে স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানসম্মত স্বতিকাগৃহ নির্মাণ করা হইত। কিন্তু গৃহস্থ আজ চরম দারিদ্র্যপীড়িত। ইচ্ছা থাকিলেও পন্নীবাসীরা অভাবের তাড়নায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও বিত্তবাহু চলাচলের ব্যবস্থায় স্বতিকাগৃহ নির্মাণের ব্যবস্থা করিতে পারিতেছে না। প্রসূতি-পরিচর্যা-শিক্ষাও এদেশ হইতে লোপ পাইতে বলিয়াছে।

ম্যালেরিয়ার ভূমিরা ভূমিরা যে লম্বা লোক জীবনীশক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছে তাহাদের মধ্যে যক্ষ্মারোগ দ্রুত প্রসারলাভ করিতেছে। কোতুলপুর থানার অধিবাসিগণের মধ্যে যক্ষ্মা-রোগে মৃত্যুর হারও ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিয়াছে।

কোতুলপুর থানার যক্ষ্মারোগে মৃত্যু—

বৎসর	মৃত্যু-সংখ্যা
১৯৩৯	১৩
১৯৪০	২১
১৯৪১	২০
১৯৪২	১১
১৯৪৩	৭
১৯৪৪	১৯
১৯৪৫	১৬
১৯৪৬	২৪

মোট ১২১

১৯৩৩ হইতে ১৯৩৮ সন পর্য্যন্ত এই ছয় বৎসরে যক্ষ্মারোগে মৃত্যুসংখ্যা ছিল ১৭৫ জন। এর পরবর্তী ৮ বৎসরে ১২১ জন যক্ষ্মারোগে মারা গিয়াছে। প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ দান স্বরূপকিরণ ও বিত্তবাহু বাতাসের অভাব যেখানে নাই সেই পন্নীভেও এই ভীষণ ব্যাধি প্রবেশ করিয়াছে।

বর্তমান কালে যথেষ্ট আহার, যক্ষ্মারোগীর সহিত মেলা-মেশা ইত্যাদি যক্ষ্মা বিস্তারে সহায়তা করিতেছে। যক্ষ্মা ছাড়া দস্তগীড়া ও অজ্ঞাত নানা ব্যাধিও শহর হইতে যক্ষ্মারোগে আসিতেছে। যক্ষ্মারোগ সংক্রামক হইলে পন্নীগ্রামে অধিকাংশ রোগী বিনা চিকিৎসাভেই মারা যায়। সংক্রামক রোগের মধ্যে কলেরা এবং বসন্ত রোগ মধ্যে মধ্যে এখানে দেখা দেয়, তবে সহরের তুলনায় অনেক কম।

গত ৮ বৎসরের কলেরা ও বসন্ত রোগে মৃত্যুসংখ্যা :

বৎসর	কলেরা	বসন্ত
১৯৩৯	১৪	১
১৯৪০	৯	১
১৯৪১	২৭	৪
১৯৪২	১২	০
১৯৪৩	১১৫	০
১৯৪৪	৩	৩
১৯৪৫	৮	২২
১৯৪৬	১৮	১

মোট ২০৬

৩২

এই ৮ বৎসরে কলেরা বা ওলাউরা রোগে মৃত্যুসংখ্যা ২০৬। তন্মধ্যে ১৯৪৩ সালে ইহার আক্রমণ ব্যাপক আকার ধারণ করে, ফলে উক্ত বৎসরে কোতুলপুর থানার ১১৫ জন লোক কলেরা রোগে মারা যায়। গত ১৯৩৩-৩৮ পর্য্যন্ত এই ছয় বৎসরে কলেরা রোগে মৃত্যুসংখ্যা ছিল ৯১, পন্নীগ্রামে অজ্ঞতাবশতঃ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রোগ ব্যাপক ভাবে সংক্রামিত হইয়া পড়ে। ১৯৪৪ সাল হইতে কলেরার টিকা দিবার প্রচলন বেশী হওয়ায় মৃত্যুসংখ্যা অনেক কমিয়াছে। গরীব রোগীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিনা চিকিৎসায় মারা যায়। অবশ্য কোতুলপুর থানার ডেহরা পাড়ায় একটি এমার্জেন্সী হাসপাতাল আছে ও তাহাতে কলেরা রোগীকে রাখা যায়, কিন্তু বিশেষ কোন সুবন্দোবস্ত সেখানে নাই। এখানকার অব্যবস্থা সত্ত্বেও একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। একবার একটি রোগীকে দেখানে পাঠাইয়াছিলাম, শুষ্ক-কারিগণের লক্ষ্য না থাকায় ইউরিনিয়া অবস্থায়—সে হাসপাতালের বাহিরে চলিয়া যায়। এ ধরনের ব্যাপার যাহাতে না ঘটে সেজন্য প্রত্যেক ইউরিনিয়ার তরফ হইতে বিধিত ব্যবস্থা করা দরকার। আর একটি মাত্র হাসপাতাল দ্বারা বিশেষ কিছুই হইবারও নয়।

কলেরার ভায় বসন্ত রোগের বীজও শহর হইতে এখানে আমদানী হয়। বসন্ত রোগে মৃত্যুসংখ্যা গত ৮ বৎসরে ৩২ ও

পূর্ববর্তী ১৯৩৩-১৯৩৮ পর্যন্ত এই ৭ বৎসরে ৫৭। এই হিসাবে হইতে দেখা যায় যে, বঙ্গ রোগের প্রকোপ ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে। অবশ্য সময়মত টিকা লওয়াই ইহার কারণ। রোগ-প্রতিষেধ ও চিকিৎসাদির ব্যবস্থা কোভুলপুর থানায় আশাহরূপ নহে। সারা গ্রাম বন-জঙ্গল, পচা ভোবায় ভরিয়া গিয়াছে, দেশবাসী অনবজ্ঞের চিন্তায় বিভ্রত হইয়া এমন অবস্থায় আসিয়া পৌছিয়াছে যে তাহাদের পক্ষে গ্রামের উন্নতির কথা চিন্তা করাই অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

মধ্যে মধ্যে পল্লী-সংস্কার কার্যের জন্য যা একটু আশু সরকারী ব্যবস্থা হয় তাহা উল্লেখযোগ্য নহে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নবপত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিয়া যায়। ডাঃ শ্রীযুক্ত পোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহোদয়ের চেয়ার স্থানে স্থানে ম্যালেরিয়া নিবারণী সমিতি প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, কিন্তু সরকারী সাহায্য ও বাঁকুড়া জেলা বোর্ডের দান বন্ধ হওয়ার ঐ সময় পল্লী সমিতি নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়িয়াছে। কোভুলপুর জেলা বোর্ডের একটি দাতব্য চিকিৎসালয় ছিল। বহুদিন আগে তাহা উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। জেলাবোর্ড দাতব্য চিকিৎসালয় পুনঃপ্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন,

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা কার্যকরী হয় নাই। প্রত্যেক ইউনিয়নে একটি করিয়া দাতব্য চিকিৎসালয় ও ক্ষুদ্র হাস-পাতাল থাকা একান্ত আবশ্যিক। মেদিনীপুর জেলার ধিরপাই পল্লীবাসী শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরী স্বাস্থ্য বিভাগের মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত হওয়ার তদ্রূপ পল্লীবাসীদের প্রাণে আশার সঞ্চার হইতেছে। চম্বকোণা থানা ম্যালেরিয়ার পীড়নে ধ্বংস হইতেছে। ধিরপাই পল্লীতে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ কোভুলপুর অপেক্ষা কম নয়। পল্লীস্বাস্থ্য সম্বন্ধে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের পরিকল্পনা যত দীর্ঘ কার্যে পরিণত হয় ততই মঙ্গল। নূতন কর স্থাপন করিয়া ইহা করা খুবই কষ্টকর হইবে। একে তো পল্লীর অধিবাসীরা নানাবিধ করভারে প্রলীড়িত, তত্পরি শিক্ষা-করের বোঝাও তাহাদের উপর চাপানো হইয়াছে। বাঁকুড়া জেলা বোর্ড এখানে শিক্ষা বোর্ড স্থাপনের অর্থোক্তিকতা প্রদর্শন করিলেও তদানীন্তন সরকার তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই।

আমি পশ্চিম বাংলার ধ্বংসোন্মুখ একটি থানার চিহ্ন আঁকিবার প্রয়াস পাইয়াছি। এ প্রসঙ্গে একথা মনে রাখিতে হইবে যে, এদেশের বহু অঞ্চল এইভাবে আধিবাসীর প্রকোপে ধ্বংসের পথে চলিয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্রে কৃষিক্ষেত্রে বিমানের কার্যকারিতা

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার থানা-উৎপাদকগণ ধানের চাষের এক অভিনব এবং পুরাপুরি যান্ত্রিক উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে। তাহাদের উদ্ভাবনীশক্তির দরুন বিমানদ্বারা তাহাদের দৈনন্দিন জীবনের বহু প্রয়োজন সাধিত হইতেছে। এমন কি আধুনিক আমেরিকায় অত্যন্ত কৃষিযন্ত্ররূপেও বিমানের ব্যবহার চালু হইয়াছে এবং ইহার কার্যকারিতা অপরিমীম বলিয়া দক্ষিণ-আমেরিকার ধানের আবাদে ব্যাপকভাবে ইহার প্রচলন হইতেছে।

ক্যালিফোর্নিয়ার বাগ্‌ফ্রেসমুহের কতকগুলি বিশেষ অবস্থার ভিত্তিতে এই নূতন পন্থা উদ্ভাবিত হয়। প্রচুর গবেষণা-দির পর কৃষিবিদগণ বুঝিতে পারেন যে, উক্ত ষ্টেটের বিরাট কৃষিক্ষেত্রসমূহে যান্ত্রিক কৃষি-পদ্ধতি প্রবর্তন আবশ্যিক, উপরন্তু ধানগাছগুলিকে আগাছার আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্ত এমন কোন উপায় অবলম্বন করা দরকার যাহাতে সময় ও শ্রম দুই-ই বাঁচিতে পারে। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল যে, আগাছাগুলির অবাধবৃদ্ধি নিবারণ করিয়া ধানের আবাদ বাড়াইবার সর্বাপেক্ষা কার্যকরী পন্থা হইতেছে বীজ বপনের পূর্বে ক্ষেত্রসমূহকে জলপ্রাণিত করিয়া দেওয়া। এখন সমস্ত ঝাঁড়াইল জলময় ক্ষেত্রসমূহে বীজবপনের প্রকৃষ্ট উপায় কি ?

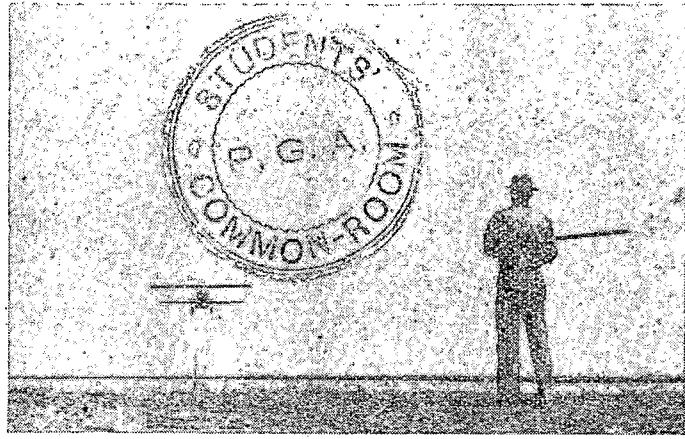
ইহারও সমাধান হইতে দেরি হইল না। বিশেষজ্ঞগণ বলিলেন যে, একমাত্র বিমানের সাহায্যেই এই কাজ সুসম্পন্ন হইতে পারে। নিম্নে আমেরিকার বাগ-উৎপাদনের সাম্প্রতিক পদ্ধতির পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দেওয়া যাইতেছে।

প্রথমে কলের লাঙ্গল এবং মই দিয়া জমি চাষ করিবার পর বাহির হইতে জল আনিয়া ক্ষেত্র প্রাণিত করিয়া দেওয়া হয়। এই জলধারার উচ্চতা হয় সাধারণতঃ আনুজ্জ্বল্য ৫ ফুট (১৫ সেন্টিমিটার) পর্যন্ত। তারপর খুব নীচু দিয়া উজ্জীর্ণমান বিমান হইতে জলে-ভিড়ানো, দিনেকের অল্প বাহির হওয়া ধানের বীজসমূহ নিক্ষেপ করা হয়। সেগুলি জলে ডুবিয়া যায় এবং নীচেকার জমিতে শিকড় গাড়ে। আগাছাগুলি জলে ইতস্ততঃ ভাসিয়া বেড়াইতে থাকে, মাটিতে শিকড় মেলিতে পারে না। কাজেই তাহারা জন্ম হইতে সারা জীবন লইতে পারে না। ওদিকে যথাসময়ে ধানগাছগুলির মাথা জলের উপর জাসিয়া উঠে। তারপর তাহারা মাহুষ অথবা যন্ত্রের সাহায্য ছাড়াই পরিপুষ্ট এবং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। শস্তকর্ভনের ঋতুতে ধান কাটিবার মাসখানেক আগে ক্ষেত্রগুলিকে শুকাইবার জল নালা কাটিয়া জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা হয়। কৃষিক্ষেত্রে গিয়া শস্তকর্ভনকারীরা যাহাতে

বৃহৎ এবং অল্পায়ুসে ধানকাটা, ভূষাড়া ইত্যাদি কাজ সম্পন্ন করিতে পারে সেইজন্য এই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়।

বাঙ উৎপাদনে এই যান্ত্রিক পদ্ধতি অবলম্বিত হওয়ায় মুক্তরাষ্ট্রে ধানের ফলন যে কম হইতেছে তাহা নহে। আমেরিকায় গড়পড়তা একর-প্রতি ২০০০ পাউন্ড ধান উৎপন্ন হয়। দক্ষিণ অঞ্চলে যন্ত্রপাতির সাহায্যে শুকনো জমিতে বীজবপন করিয়া যে পরিমাণ ধান ফলানো হয় তাহাও এই হিসাবের মধ্যে ধরা হইয়াছে। ক্যালিফোর্নিয়ার বিমান-যোগে বীজবপন-পদ্ধতি দ্বারা কিন্তু একর-প্রতি গড়পড়তা অন্ততঃ তিন হাজার পাউন্ড ধান জন্মে। এই কারণে আমেরিকার বিভিন্ন রাষ্ট্রের চাষীরা বিমানের সাহায্যে বীজ বপনের অমূল্য হইয়া উঠিয়াছে এবং এই পদ্ধতি তাহাদের মধ্যে দ্রুত প্রসারলাভ করিতেছে।

প্রতি বৎসর যে মাসে ক্যালিফোর্নিয়ার অন্তর্গত সেক্রো-মেন্টোর উত্তর দিকস্থ উপত্যকা-অঞ্চলের রাস্তাঘাটে সৈনিক-প্রহরীরা মোটর আর্মোরহীদে অভিযোগ শুনিতে শুনিতে অতিষ্ঠ হইয়া উঠে। তাহাদের মাথার মাজ কয়েক হাত উপর দিয়া উজ্জীৱমান যে-সকল বিমানের বিরামহীন গর্জন তাহাদের কানে তালা লাগাইয়া দেয় সেগুলির বিরুদ্ধেই তাহাদের নালিশ। তাহাদের অভিযোগ যতই হুক্তিযুক্ত বলিয়া প্রতীয়মান হোক না কেন, পুলিশ বিমানচালক অথবা স্থানীয় লোকেরা কেহই তাহাতে কর্ণপাত করে না। কেননা এই সমস্ত শব্দসমূহ অঞ্চলের অধিবাসীদের নিকট এই সকল বিমান—(ভনধ্যে অরিকাংশই দ্বি-পক্ষবিশিষ্ট এবং তাহাদের ও চালকদের বয়স ১৫ হইতে ২০ বৎসরের মধ্যে)—জলসেচের ঝালের কীলক (irrigation lock), কলের ল্যাঙ্গল বা শব্দ-সংগ্রাহক-যন্ত্রের মতই অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে। এই অভিনব কৃষিযন্ত্রের দৌলতে বিগত পাঁচ হইতে দশ বৎসরের মধ্যে সেক্রোমেন্টো এবং ফিয়ার নদীর মধ্যবর্তী বিরাট ক্ষেত্রসমূহে এত বেশী বাঙ উৎপন্ন হইতেছে যে, ইহা আমেরিকার একটি শ্রেষ্ঠ বাঙাঞ্চলে পরিণত হইয়াছে। ক্যালিফোর্নিয়ার বাঙ উৎপাদনের পরিমাণ যে কিরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা সরকারী কৃষি-বিভাগের ১৯৪৬-এর হিসাব পর্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায়। সমগ্র মুক্তরাষ্ট্রে একর-প্রতি যে ২০০০ পাউন্ড বাঙ উৎপাদনের কথা বলা হইয়াছে তাহা গত বৎসরেরই হিষ্টাব। উক্ত বৎসরে ‘ক্যালিফোর্নিয়ার কোন কোন উৎকৃষ্ট বাঙক্ষেত্রে কিন্তু একর-প্রতি ছয় হাজার পাউন্ড পর্যন্ত ধান জন্মিয়াছে। অবশ্য একথা সত্য যে উক্তম সার



ক্যালিফোর্নিয়ার একটি ক্ষেত্রে ধানের বীজ বপনরত একটি বিমান। ডানদিকের লোকটি ক্ষেত্রের সীমানা নির্দেশক পতাকা হস্তে দণ্ডায়মান

প্রয়োগ দ্বারা জমির উর্বরতা বিধান এই উচ্চহারে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য আংশিকভাবে দায়ী, কিন্তু বিমানে বীজবপন-ব্যবস্থা যে এই ফলনবৃদ্ধির মুখ্য কারণ সে বিষয়ে কৃষি-বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতবৈধ নাই। হাত দিয়া চারা রোপণ করিবার যে পুরনো পচা পদ্ধতি মাছাতার আমল হইতে প্রচলিত ছিল যন্ত্রের কল্যাণে তাহার আমূল পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। ইহা চাষবাসের কার্যকে যে কতদূর সহজসাধ্য করিয়া তুলিয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। অথচ ইহার দরুন ক্ষেত্রের উৎপাদিকাশক্তি কিন্তু তিল পরিমাণও হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই।

রিচডেইলের গ্লেন হারিস ক্যালিফোর্নিয়ার এই অভিনব কৃষিপদ্ধতি প্রবর্তকদের অন্যতম। এ প্রসঙ্গে তিনি বলিতেছেন—“ক্যালিফোর্নিয়ার আমাদের কৃষি-সমস্তা ছিল অজ্ঞাত অঞ্চল হইতে আলাদা ধরণের ও বিশেষ জটিল। কি ভাবে ধানপাছের উপর জলজ তৃণ এবং অন্যান্য আগাছার আক্রমণ নিয়ন্ত্রণ করা যায় তাহা লইয়া আমরা অনেক মাথা বামাইয়াছি। শেষ পর্যন্ত আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌছিলাম যে, বীজ বপন হইতে শব্দ-কর্তনের সময় পর্যন্ত—এই কয়েক মাস যদি ক্ষেতগুলিকে জলমগ্ন রাখিবার ব্যবস্থা করা যায়, কেবলমাত্র তাহা হইলেই এই সমস্তার সমাধান হইতে পারে। এর পরে জলপ্রাণিত ক্ষেত্রে কি করিয়া বীজ বপন করা যায় তাহা আর এক সমস্তা হইয়া দাঁড়াইল। হাত দিয়া তো কিছুতেই এগুলোতে বীজ বপন বা চারা রোপণ করা সম্ভবপর নয়। এখন কি করা যায়? শেষে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া আমরা দেখিলাম একমাত্র কার্যকরী পন্থা হইতেছে বিমান হইতে জলপ্রাণিত ক্ষেত্রে বীজ নিক্ষেপ করা। এমনি ভাবেই আবিস্কৃত হইল আমাদের অভিনব বৈজ্ঞানিক বীজ বপন পদ্ধতি এবং গোটা যে মাস জুড়িয়া বাঙক্ষেত্রের উপর দিয়া যে সকল গর্জনশীল বিমান

উড়িয়া বেড়ায় সেগুলি দ্বারা আমাদের পরিকল্পনা কার্যে পরিণত হইতেছে।

বিমানে বীজ বপন চালু হওয়ার ক্যালিকোনিয়ার কৃষিকর্মের বারাই বদলাইয়া গিয়াছে। পূর্বনো আমলের সঙ্গে আজকের ক্যালিকোনিয়ার কৃষির সাদৃশ্য কেবল এইটুকু যে তখনকার ভায় এখনো জলমগ্ন ক্ষেত্রেই বানগাছগুলি বাড়িয়া থাকে—অবশ্য পদ্ধতিটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। যুক্তরাষ্ট্রের সর্বত্র গম এবং অল্পাংশ শস্য উৎপাদনে বিদ্যুৎচালিত যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা যেমন আমেরিকার কৃষিকর্মের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য তেমনি এই সাম্প্রতিক পদ্ধতিটিও সম্পূর্ণ তাহার নিজস্ব। ক্যালিকোনিয়ার কৃষির কতকগুলি বিশেষত্ব আছে। প্রথমত, এখানে যে বান গাছ উৎপন্ন হয় তাহা বেশ বড় আকারের; দ্বিতীয়তঃ, ক্ষেত্রসমূহে জলসেচের যে বিয়ার্ট ও ব্যাপক ব্যবস্থা এখানকার রাষ্ট্র করিয়াছে তাহার দরুন একদা যে সকল জমি ছিল উষ্মর আজ তাহা উর্বর কৃষিক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে, এবং ইহার সঙ্গে বিমানে বীজ বপন প্রণালীর সংমিশ্রণ হওয়ার এখানে কৃষির চরম উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

এই নতুন ধরণের-কৃষিকার্যের জন্ম ক্ষেত্রে প্রচুর জল সরবরাহের প্রয়োজন হইয়া থাকে। এই বিষয়ে প্লেন হারিসের কথাই আবার উদ্ধৃত করিতেছি। তিনি বলেন—“আমাদের এই নতুন প্রণালীর কৃষির জন্ম জলের আবদ্ধকতা অত্যধিক। আগাছার অব্যাহিত বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করা যাইতে পারে একটি মাত্র উপায়ে। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে ক্ষেতের জল যদি গভীর হয় তাহা হইলে আগাছাগুলি বাড়িতে পারে না, বানগাছগুলি কিন্তু সেই গভীর জল ভেদ করিয়া সুস্থভাবেই বাড়িয়া উঠে।”

বৎসরের প্রথম ভাগে সিমেরা নেভাদা পর্বতমালায় তুষার গলিতে আরু হইবার সঙ্গে সঙ্গে এই মাসিক পদ্ধতিতে ক্ষেত্র-কর্মাদির ভোড়ভোড় আরম্ভ হয়। এই ঋতুতে যখন মাউন্ট লেসেন নামক আন্ড্রেয়সিরির নিকটবর্তী সাষ্টা বাধের এবং অনেকগুলি উন্নত উপত্যকার বিয়ার্ট জলাধারসমূহ গলিত তুষারের জলধারায় কানায় কানায় পূর্ণ হইয়া যায়, তখন নীচেকার বিভিন্ন সমভল ক্ষেত্রসমূহ শুষ্কই থাকে। উচ্চস্থান হইতে এগুলিতে যে বারি পতিত হয় তাহার পরিমাণ বার্ষিক ১৫ হইতে ২০ ইঞ্চি মাত্র। এ গুলিতে তুষারপতন এবং বৃষ্টিপাত এত কম হয় যে তাহা জমিকে আর্দ্র করিতে পারে না। জমি এত ঝটখাটে শুকনো ও শক্ত থাকে যে তাহার উপর দিয়া অনায়াসে ভারী যন্ত্র চালাইয়া লওয়া যায়। ট্রাকটর টানা লাফল, মই এবং অল্পাংশ যন্ত্রপাতি দ্বারা জমি চাষ, মাটির ডেলা ভাঙা ইত্যাদি কার্য সম্পন্ন হয়। চলমান যন্ত্রগুলির পিছনে ধুলির ঝড় ওঠে, কখনো কখনো সংঘত ধূলিকণা স্তম্ভাকৃতি মেঘের মত দৃশ্যমান হয়। পার্শ্ববর্তী ঝটিকার পতিকে প্রতিহত করিবার জন্য বানক্ষেতের প্রান্তে রোপিত

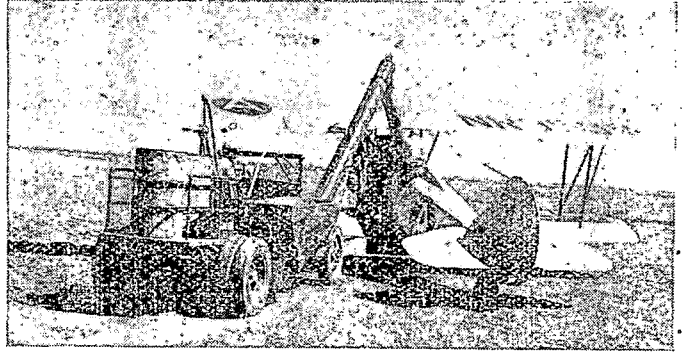
ইউকেলিপটাস বৃক্ষে আসিয়া অবশেষে সেই ধূলিরাশি আশ্রয় গ্রহণ করে। এপ্রিলের শেষ ভাগে অথবা মে মাসের গোড়ার দিকে বাধের ক্রীলকসমূহ ধুলিয়া দেওয়া হয়, আর শত শত খাল নালা ইত্যাদির ভিতর দিয়া সেই সঞ্চিত জলধারা বান্যক্ষেত্রে গিয়া পতিত হয়।

আজকাল কখনো ক্ষেত্র জলপ্রাণিত করিবার পূর্বে বীজ বপন করা হয় না। আগে কিন্তু প্রথমে শুকনো জমির উপর বীজ ছড়ানো হইত এবং তার পরে জমিকে জলপূর্ণ করা হইত। কিন্তু ইহার অসুবিধা ছিল বিস্তর এবং ইহা ছিল ক্ষতিকর। বহু বীজ মাটির ডেলার ফাটলের মধ্যে ঢুকিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইত, অথবা বীজের গায়ে ইক্ষিধানেক মাটির প্রলেপ লাগায় তাহা অকুরিত এবং জলগর্ভ হইতে বহির্গত হইতে পারিত না। আজকের দিনে কিন্তু একটি মাত্র বানের বীজ বপন করিবার আগেই ক্ষেতটিকে জলে ভাসাইয়া দেওয়া হয়।

সাধারণতঃ যে জল দেওয়া হয় তাহার সর্বোচ্চ পরিমাণ হইতেছে প্রায় ছয় ইঞ্চি। মোটামুটি সাধারণ আকারের ৩০০ একর একটি ক্ষেত্রের বাধের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত জলপ্রাণিত করিতে প্রায় দুই সপ্তাহ লাগে। এই কয় দিন অন্য ক্ষেত্রকর্মাদি বিশেষ কিছু করা যায় না—বেশী কিছু করিবার দরকারও হয় না; কেননা এই ব্যবস্থার দরুন আগাছা বাড়িতে পারে না, জমির উৎপাদিকাশক্তিও সংরক্ষিত হয়। যুদ্ধের সময় এই ব্যবস্থার দরুন একই ক্ষেত্রে বৎসরের এ মাধায় এক বার এবং ও মাধায় আর এক বার ফসল ফলানো সম্ভবপর হইয়াছিল। ইহা দ্বারা আগাছা ধ্বংস এবং জমির সার সংরক্ষণ তো হয়ই, উপরন্তু এরোপ্লেন হইতে অকুরিত বীজ বপন করিলে যাহাতে তাহা নষ্ট না হইয়া অচিরেই চাষাগাছে পরিণত হইতে পারে জমিকে তাহার উপযোগী করিয়া তৈরি করিয়া রাখা।

এই কৃষি-বিমান চালানোর জন্ম পাকা বৈমানিকের প্রয়োজন। এগুলি খুব নীচু দিয়া—কতকগুলি মাটি হইতে মাত্র পঞ্চাশ ফুট উপরে—ঘণ্টায় পঞ্চাশ এবং একশ মাইল বেগে উড়ে। এগুলি চালাইতে বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন। চালকদের মধ্যে অধিকাংশেরই বয়স কুড়ির নীচে—তাহারা সকলেই যুদ্ধের সময় বিমান-চালনা-বিভাগ গভীর ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছে। এখন তাহারা সকলেই উৎসাহী বৈমানিক। বিমান চালানোর যাবতীয় কৌশল, এর অভ্যাসসি সব কিছু তাদের নন্দদর্পণে। যাহাতে এক ইঞ্চি পরিমাণ জমিতেও বীজ বপন বাদ না পড়ে সে জন্ম ইলেকট্রিক পাওয়ার লাইনের উপর দিয়া কেমন করিয়া বিমান চালাইতে হয়, ঝটিকা-প্রতিরোধক ইলেকট্রিক কুঞ্জের উপর দিয়া কিরূপ কৌশলে বিমানকে লইয়া যাইতে হয়, এ সবই তাদের জানা। সকল সময় প্রতিবেগের একই মাত্রা রক্ষা করাও তাদের আর একটি বিশেষ গুণ

বায়ু-প্রবাহের মাত্রার যতই তারতম্য হোক না কেন, এই সকল বিমান-চালককে সর্বাবস্থায়ই একই গতিতে বিমান চালাইতে হইবে। প্রত্যেকটি বিমান অন্ততঃ পক্ষে ১,০০০ পাউণ্ড (৪৫০ কিলোগ্রাম) বীজ বহন করে। মাঝে মাঝে বোকা ঝালাস করা, উচ্চ স্থানে আরোহণ, মোড় ফেরা, প্রত্যেক পাঁচ মিনিট পরে এক বার মাটিতে নামিয়া বীজ দিয়া বিমান বোকাই করিয়া লওয়া ইত্যাদির দরুন এই সকল বিমান চালানো অত্যন্ত দুষ্কর ও বিরক্তিকর ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়।



একটি ট্রাক বহিতে বিমানে ধানের বীজ বোকাই করা হইতেছে।

সমগ্র সেক্সোমেন্টো উপত্যকায় পনর হইতে কুড়ি জন বৈমানিক ফার্মের মালিকদের কৃষিকর্মে সাহায্য করিয়া থাকে। তাহারা শুধু যে কায়িক পরিশ্রম দ্বারাই তাহাদের সহায়তা করে তাহা নয়, তাহারা নিজেদের বিমান পর্যাপ্ত দিয়া কৃষিকর্মকারীদের উপকার করিয়া থাকে। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে তাহাদের মধ্যে দুই জন পাওয়ার লাইন পরিষ্কার করিতে না পারায় এক সাংঘাতিক বিমান-দুর্ঘটনায় বিপর্যয় হয়। অবশ্য একথা সত্য যে হেলিকপ্টারগুলো অধিকতর নিরাপদ, কিন্তু এগুলিতে এনোপ্লেনের প্রপেলারের মত কোনো যন্ত্র না থাকায় বিশেষ অসুবিধা হয়।

যদিও আজকালকার বীজাবরণগুলি বিরাট আকারের নয় বলিয়া এগুলির বীজ বহন করিবার ক্ষমতা বিশেষ সীমাবদ্ধ, তথাপি বিমানে-বীজ বপন করিলে সময় এবং শ্রমমূল্য দুই-ই বাঁচে। শুকনো জমির উপর সাধারণ ভাবে যন্ত্র-সাহায্যে বীজ বপন করার শ্রমমূল্য পড়িত একর-প্রতি ৪ শিলিং হইতে ছয় শিলিং পর্যন্ত। কিন্তু আজকের দিনে বিমানযোগে বীজ বপনের খরচ পড়ে একর-প্রতি ১ শিলিং হইতে দেড় শিলিং। বিমানদ্বারা যে কৃষির পথ সুগম ও অপেক্ষাকৃত স্বল্পব্যয়নাপেক্ষ হইতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে কৃষিমন্ত্র রূপে বিমানের ব্যবহার অল্পকালের পরিকল্পনা বলিয়া ইহাতে কতকগুলি অসুবিধাও আছে এবং সেগুলির আশু প্রতিকার প্রয়োজন। প্রত্যেক কৃষি-বিমানকে প্রতিদিন ৬০০ একর পরিভ্রমণ করিতে হয়। কাজেই ক্রমাগত বীজ বোকাই এবং ঝালাস করিবার জন্য এক জায়গায় বেশীক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকা বিমানগুলির পক্ষে দুশকিল হইয়া দাঁড়ায়। অথচ অপেক্ষা না করিলে উপযুক্ত পরিমাণ বীজ বোকাই করাও সম্ভবপর হয় না।

এই সকল কারণে, কৃষিকর্মে ব্যবহারের জন্য বিশেষ ধরনের বিমানের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়া ক্যালিফোর্নিয়ার বিমান প্রস্তুতকারীগণ নানা পরিকল্পনা করিতেছেন। সানডিয়েগোর 'কনসোলিডেটেড ভালটি এয়ারক্রাফট কর্পোরেশন' তাহাদের এঞ্জিনিয়ার-ফার্মের বিশেষজ্ঞদের একটি দলকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য বাতাকলসবুর্ছে পাঠাইয়াছেন

এবং তাহারা খুবই আশা করেন যে, এই এঞ্জিনিয়ারগণ অচিরে এমন এক ধরনের হেলিকপ্টার নির্মাণ করিতে পারিবেন যাহাতে বীজ ছড়ানোর জন্য একটি বিশিষ্ট ব্লাষ্ট প্রোপেলার থাকিবে। বীজাবরণের মালবহন-ক্ষমতা বাড়াইবার জন্যও তাহারা চেষ্টা করিতেছেন।

বিমানবাহিত বীজগুলি কিন্তু শুকনো বীজ নয়, এগুলিকে বলা যাইতে পারে ধানের চারার জগাবহা। বিমান হইতে ক্ষেতে বীজ ছড়াইবার আগে সেগুলিকে কতকগুলো ধলেন্দু ভিতরে পুরিয়া, জলসেচের ষাতে ভিজাইয়া রাখা হয়। চব্বিশ ঘণ্টা পরে বীজগুলি অঙ্কুরিত হয় এবং সে অবস্থায় এগুলিকে আরো একটি দিন ষাতের মধ্যে রাখা হয়। বিমান হইতে নিক্ষিপ্ত হইবার পর এই জলসিক্ত বীজ ক্ষেতের জলে ডুবিয়া যায় এবং ছোট ছোট অঙ্কুরনমুহ শীঘ্রই জলের নীচেকার ভিজা মাটিতে শিকড় গাড়িয়া বসে।

এর পর হইতে প্রকৃতির সাহায্যেই চারাগাছগুলি জল-তলে বীরে বীরে বাড়িতে থাকে—মাছুষ বা যন্ত্রের সহায়তার আবশ্যক হয় না। এমনিভাবে প্রায় অর্ধ বৎসরকাল ক্ষেতগুলি যন্ত্রাদি-স্পৃষ্ট না হইয়া ক্যালিকোর্নিয়ার রৌদ্রকরোচ্ছল আকাশের নীচে পড়িয়া থাকে, চারাগাছগুলি প্রকৃতির তত্ত্বাবধানেই প্রতিপালিত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। সেপ্টেম্বরের গোড়ার দিকে শতকর্ষনের প্রায় মাসখানেক আগে কৃষকেরা ক্ষেতে গিয়া সেখানকার জল বহিষ্করণার্থ জলসেচের ষাতের কীলক খুলিয়া দেয়। এমনিভাবে বীরে বীরে সবটুকু জল বাহির হইয়া যায়। অক্টোবরের শেষে কিংবা নবেম্বরের গোড়ার দিকে জমি এত শুকনো হয় যে তাহার উপর দিয়া অনায়াসে শস্তসংগ্রাহক-যন্ত্র চালানো যাইতে পারে। প্রথমে ক্ষেত্রকর্মের জুড়ই বিশেষ-ভাবে তৈরি এক প্রকার যন্ত্র দ্বারা চতুষ্পার্শ্বের ঘাস কাটিয়া ক্ষেতের মুখ খুলিয়া দেওয়া হয়। এমনিভাবে শস্ত-সংগ্রাহক যন্ত্রের এক পার্শ্বে একটি ঘাসকাটা কল জুড়িয়া দিয়া ক্ষেত্রকর্ম শুরু হয়। এই যন্ত্র দুটিকে কিল কেবলমাত্র সমতল জমির উপর দিয়াই চালানো যায়, ধানক্ষেতে চতুষ্পার্শ্ব উঁচু বাঁধের উপর

এগুলি দিয়া কোনও কাজ হয় না। শস্ত-সংগ্রাহক-যন্ত্র সংলগ্ন ছেদক যন্ত্রটি (cutting rig) ক্ষেত্রের চতুর্স্পার্শ্ব ১২ হইতে ১৫ ফুট জায়গার ঘাস কাটিয়া সাফ করিয়া উহার চলাচলের পথকে সুগম করিয়া দেয়।

শস্তসংগ্রাহকারীদের সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়া অত্যন্ত ক্ষিপ্ততার সহিত শস্ত আহরণ করিতে হয়। কেননা, জল ভাঁটা পড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই নানা প্রকার ঘাস এবং আগাছা অত্যন্ত ক্রান্তগতিতে বাড়িতে থাকে। কাজেই তাহারা যুগ্মপ্রাপ্ত হইয়া শস্তসংগ্রাহক যন্ত্রের নাটাইয়ের নাগালের মধ্যে আসিবার আগেই ঘাসেতে ঘান কাটা সারা হইয়া যায় সেদিকে বিশেষ অবহিত হইতে হয়। এই সমস্ত তৃণরাজির মধ্যে একমাত্র বার্ণইয়ার্ড ঘাসই এত তাড়াতাড়ি বাড়ে যে তাহা শস্তসংগ্রাহক যন্ত্রের নাগালের মধ্যে আসিয়া পৌঁছে। শুধু এই ক্রটিটুকু ছাড়া এই অভিনব বাতায়নপাদন-পদ্ধতি আর সকল দিক দিয়াই সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

এই প্রণালীতে আগাছা নিয়ন্ত্রণ প্রবর্তিত হওয়ার আগেকার দিনে হস্ত সাহায্যে আগাছা বাহিতে যে খরচ পড়িত তাহার ছাত হইতে কৃষিকর্মকারীগণ রেহাই পাইয়াছেন। আর খরচও তখন নেহাত কম ছিল না—একর-প্রতি ৩ শিলিং হইতে ৫ শিলিং পড়িত। যন্ত্র দ্বারা ঘান কাটার পর ক্ষেতেই তুষ ঝাড়া সম্পন্ন হয় বলিয়া চাল শুকাইয়া লইতেও বিশেষ বেগ পাইতে তা খরচ করিতে হয় না। এ ছাড়া, আরও এমন কতকগুলি যন্ত্র উদ্ভাবিত হইয়াছে যেগুলির সাহায্যে বস্তার পুরিবার আগেই ঘানের গাছসংলগ্ন আঁকে-বাঁকে জিনিষ, পোকা ইত্যাদি দূর

করা যাইতে পারে। সাম্প্রতিক ব্যবহার বাতায়নপাদনের প্রথমূল্যে যে শুধু কমিয়াছে তাহা নয়, ঘানের পরিমাণ এবং গুণও বৃদ্ধি পাইয়াছে।

এমনি ভাবে এই নূতন প্রচেষ্টা অসামান্য সাফল্যলাভ করিতে আশা করা যায় যে, অদূর ভবিষ্যতে যুক্তরাষ্ট্রে বাতায়নপাদনের এই পুরোপুরি যান্ত্রিক পদ্ধতিই আদর্শ পদ্ধতি হইয়া দাঁড়াইবে। ফলে অদূর ভবিষ্যতে স্বাক্ষরক্ষেত্রে হস্ত দ্বারা বীজ বপনরত লোকদের অবনমিত মুষ্টিগুলি আর দৃশ্যমান হইবে না। দক্ষিণ অঞ্চলের টেক্সাস, লুইশিয়ানা, আর্কানশাস এবং যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য প্রধান প্রধান বাতাকলসমূহে ব্যাপকভাবে এই ক্যালিকোনিয়া-পদ্ধতিই গ্রহণ করা হইতেছে।

এখন গ্লেন হারিসের কথা উদ্ধৃত করিয়াই প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি—“১৯৩০ সনে আমি প্রথম বিমানে ঘানের বীজ বপন করি এবং তারপর হইতে প্রতি বৎসরই এই উপায়ে অন্ততঃ আংশিকভাবে হইলেও আমার নিজের ক্ষেত্রে ঘান জমাইতেছি। ক্যালিকোনিয়ার স্বয়ং—যে নিজের কর্মক্ষমতায় হর্বৎসময়ও একর-প্রতি অন্ততঃ ১৮০০ পাউণ্ড শস্ত উৎপাদন করে, তাহার পক্ষে কৃষি-বিমান যে কত উপযোগী তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। ইহা দ্বারা তাহার সময় ও শ্রম দুই-ই বাঁচিবে—ট্রাক্টর এবং কলের মইয়ের মত ইহাও এক দিন তাহার নিকট স্বাভাবিক এবং অপরিহার্য কৃষিযন্ত্র হইয়া দাঁড়াইবে। আমার ধ্রুব বিশ্বাস যে, ইহা দ্বারা ভবিষ্যতে অপরিখ্যাত স্বাক্ষ উৎপাদনপূর্বক দেশের সম্পদ বৃদ্ধি করিয়া আমরা সম্মত হইতে পারিব।”

আবেদন

শ্রীপ্রশান্তকুমার মিত্র

স্বাধীনতা-স্বর্ঘ্য বুকি দেখা দিল পূর্বোদয়-পারে,
ভারতের দিগন্তে, আরক্তিম স্বর্ণ-রশ্মি-বারে।
উৎসুক নয়নে সবে নেহারিছে স্নায়ুগিরি শেষ—
প্রাচ্যের এ জাগরণে চেতনার নবীন উন্মেষ।
মুকুলিত আশা কত আঁক বুকি স্ফুটন উন্মুখ;
আনন্দ উদ্বেগ ভরা শত ভগ্ন নিপীড়িত বুক।
এর মাঝে কোথা হতে অর্ধনয় বুজুফুর দল
ভিক্ষাপাত্র লয়ে হাতে টাড়াইয়া করে কোলাহল।
লক্ষ লক্ষ নর-নারী কার পানে বাড়াইয়া হাত
জানাইছে আবেদন, “দাও শুধু এক মুঠা ভাত।”

‘স্বাধীনতা’ নাম শুনি চাহে তারা বিমিত্ত নয়নে,—
‘কি ফল মিলিবে এতে, তাই বুকি ভাবে মনে মনে।
‘মিলিবে কি অন্ন মুঠি’ বজ্রধ্বজ লজ্জা নিবারণী;
ঘুচিবে কি ব্যাধি জ্বালা, শুষ্ক রক্ত বহিবে ধমনী ?
ঢালিয়া বৃকের রক্ত বিনিময়ে কেন নাহি পাই ?
কোন পথে চলে যায়—মোরা শুধু শূন্য চোখে চাই।
স্বাধীনতা দিবে মুক্তি এই ক্রুর নাগপাশ হতে;
মৃগাসক্তসঞ্চিত ক্ষুধা মিটবে কি স্বাধীন ভারতে ?
তাই যবে আর সবে নিরবিচ্ছেদ নবীন প্রভাত,
লক্ষ নরনারী কাদে, “দাও শুধু এক মুঠা ভাত।”

সংস্কৃত-সাহিত্যের প্রচার

ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

এই প্রবন্ধে আমরা প্রথমে (১) বর্তমান ভারতে সংস্কৃত-সাহিত্যের প্রতি অবজ্ঞাপ্রদর্শনের কারণ নির্ণয় করব; এবং তারপর (২) সংস্কৃতসাহিত্যের উন্নতিকল্পে পরিকল্পনাদি বিষয়ে আলোচনা করব।

(১) বর্তমান ভারতে সংস্কৃত-সাহিত্যের প্রতি

অবজ্ঞা-প্রদর্শনের কারণ-নির্ণয়

অতীব দুঃখের বিষয়, সংস্কৃত-সাহিত্যের প্রতি অবজ্ঞা-প্রদর্শনে আমাদের দেশের কয়েক শ্রেণীর লোক সর্বদা তৎপর। (ক) প্রথমতঃ ইন্দ-ভারতীয় সমাজ। এ শ্রেণীর লোকেরা ভারতীয় সভ্যতার স্বশোভন কিছুই সম্মান পান না, এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার অহরাগবশতঃ পাশ্চাত্য ধরণের জীবন-যাপনে আনন্দ পান। সুতরাং এঁরা যে সংস্কৃতশিক্ষার পক্ষপাতী নন, সংস্কৃতসাহিত্যে কোনও আনন্দ পান না, এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নাই। তবে আনন্দের কথা, এ জাতীয় লোকের সংখ্যা জাতীয় ভাবোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অনেকটা কম হয়ে আসছে। (খ) দ্বিতীয়তঃ বৈজ্ঞানিক ও বণিক সম্প্রদায়। এ সম্প্রদায়ের অনেকেই ভাবেন, অন্ততঃ বাইরে প্রকাশ করেন যে, কেবল ব্যবসা-বাণিজ্য, কল-কারখানার ঐক্যসাধনেই ভারতের মুক্তি, অগ্রগতি নয়, অতীত ভারতের যুগ অছি টেনে ধাড়া করার প্রয়োজন আজ আর কিছুই নাই। ফলতঃ যান্ত্রিক সভ্যতার মোহে এঁরা আরণ্য সভ্যতার ভেতরে অন্ধকার ব্যতীত আর কিছুই দেখতে পান না। তাঁরা মনে করেন যে, সংস্কৃতবিদেতা কুসংস্কারাচ্ছন্ন এবং প্রগতিবিরোধী কুপনমুগ। প্রাচীন ভারতের অত্যাচ শিক্ষা-সম্বন্ধে তাঁদের অল্পত ধারণা; তাঁদের কাছে উপনিষদ্ গীতাবৃত্তি, দ্বৈতসংস্কৃত কাব্য অম্লীল; সংস্কৃত জটিল, সংস্কৃত কামশাস্ত্র কদর্ভ, আয়ুর্বেদ শাস্ত্র জঙ্গলের নামমাত্র। যদি বলি হস্তায়ুর্বেদ, অশ্বায়ুর্বেদ, বৃক্ষায়ুর্বেদ; এমন কি, কত আয়ুর্বেদ, কত পুষ্কারপুষ্কার আলোচনা আমাদের সংস্কৃত-সাহিত্য পুষ্ঠ করেছে—যার ভুলনার বর্তমান পাশ্চাত্য জগৎও অনেক পেরেছে পড়ে আছে, তাঁরা তাতে নিজেদের অপমান বলে মনে করেন। কাজেই তাঁরা সংস্কৃতের প্রতি অবজ্ঞা পোষণ করেন। তাঁরা ভারতের অধুনা, নৈরাশ্রবাদ ভারতীয় দর্শনেরই শিক্ষা বলে মনে করেন এবং ভারতীয়দের যাবতীয় চৈতন্যপ্তির জ্ঞান ভারতীয় দর্শনকেই দোষারোপ করেন। (গ) তৃতীয়তঃ, বহির্জন সম্প্রদায়। এ সম্প্রদায়ের অনেকেই আজকাল ভাবেন যে মজ, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্রকারগণ এবং ন্যূনাবিক—সংস্কৃতশাস্ত্রকার মাঝেই তাঁদের সামাজিক

অবমাননার নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁদের তাই ধারণা যে সংস্কৃতশাস্ত্র গদ্যর জলে যত দিন না নিমজ্জিত হয়, তত দিন তাঁদের আর এ কলকলেপ থেকে মুক্ত হবার আশা অধুনা পরাহত। (ঘ) চতুর্থতঃ, প্রাদেশিক ভাষার সমুন্নতিবিধায়ক দল। প্রাদেশিক ভাষার উন্নতি হিতকামিগণ বলেন—মহৎ সহস্র বর্ষ ধরে সংস্কৃতশিক্ষার দ্বারা এ দেশে চলে এসেছে; তাতে তার প্রাণবেগ গেছে যেম। তত্পরি এর কাঠিও হেতু অতি কঠোর পারিশ্রমে এ ভাষাজ্ঞান অর্জন করতে হয়, তার প্রয়োজনীয়তা নহ।

অল্প সময়ের মধ্যে এঁদের প্রত্যেক সম্প্রদায়ের যুক্তির যথাযথ বিস্তৃত প্রত্যুত্তর দেওয়া সম্ভবপর নয়। তা হলেও আজকে ভারতের জাতীয় হৃদনে একেবারে মূল্য এত সমধিক যে এ সব বিষয়ে আলোচনা অতীব প্রয়োজন এবং এঁদের কাছে সংস্কৃতসাহিত্যের উৎকর্ষ, সংস্কৃতশিক্ষার আদর্শ এবং জাতীয় সমুন্নতির দিক থেকে সংস্কৃত-সাহিত্য পঠন-পাঠনের একান্ত প্রয়োজনীয়ত্ব সম্যক বিশ্লেষণ নিতান্ত প্রয়োজন। তাই সংক্ষেপে দু'একটা কথা বলছি।

ইন্দ-বঙ্গ সমাজকে লক্ষ্য করে বলা যেতে পারে যে পরের মাকে মা বলে ছদ্মবেশে তুষ্টি ও গর্ব অগ্রহণ করার যে মিথ্যা আভাসের অবতারণা, এতে কেবল নিজের পায়েই কুঠারাবাত করা হয়, সত্যিকার শান্তি এতে পাওয়া যায় না। নিজের যা পুরুষাঙ্কুরে প্রাপ্ত সম্পদ, তা অতি নিজস্ব, পরম আদরের সামগ্রী, তাকে উপেক্ষা করা নিছক বাতুলতা। অতীত থেকে সংস্কৃত-সাহিত্য জগতে সর্বদা অতুলনীয়, সুতরাং ইবুশ সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হওয়া নিতান্তই দুঃখের পরিচায়ক যাত্র।

ব্যবশায়ী ও বৈজ্ঞানিকদের সম্বোধনঃ এ কথা সুস্পষ্ট বলতে চাই—তাঁদের বিষয়ের বহুলাংশ সংস্কৃত সাহিত্যে সুবিগত আছে; নুতনত্বের গর্বে সংস্কৃতের প্রতি রক্তচক্ষু বা অনাদর প্রদর্শন নিতান্ত অশোভন ও অযৌক্তিক। দ্বিতীয়তঃ, তাঁদের স্মরণ রাখা কতব্য যে জুল বহির্জগৎই জগতের সব নয়, অভ্যন্তর ও তার সমস্ত বহির্জগতের থেকেও কঠিনতর। বাহ্যের সমস্তা আকুল করে, অন্তরের সমস্তা মানুষকে পাগল করে দেয়। দেহ ও আত্মা উভয়ের সুসমঞ্জস বিনোদন অতীব প্রয়োজন। কেবল উদরপূতিতে আত্মার পরিপূতি সাধিত হয় না; তজ্জল সংস্কৃতে সুরক্ষিত ধর্মোপদেশ ও দর্শনবাদেরই প্রয়োজন সমধিক। শূদ্রেরা বেদ-পাঠে অধিকারী ছিল না, ইত্যাদি ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। একটি যাত্র উদাহরণ দিই। রামায়ণে দশরথ-কর্তৃক নিহত সিদ্ধক-মুনির পুত্র করণের সম্মান হয়েও নিত্য বেদ পাঠ করে বেড়াত

—ইহা স্পষ্টই প্রমাণে বলা আছে। প্রয়োজনানুসারে দেশ-বিপ্লববাদিতে শূন্যেরাও যুদ্ধ করবে, এবং ফলতঃ যুদ্ধবিভাগ তাদেরও পারদত হওয়া প্রয়োজন—ইহা শাস্ত্রের বিধান। আমাদের বর্তমান যে দৃষ্টিভঙ্গী, ইহা সম্পূর্ণ আধুনিক ভারতের; স্বাধীন সৰল আশ্রয়িত গঠিত অতীত ভারতের নয়। একই মাত্রাজে পুষ্ট সন্তানকে ভারতজননীর জ্ঞানদীপ্ত জগৎপ্রেম সন্তানবৃত্ত উপেক্ষার প্রানিতে জর্জরিত করার অন্তত বিধান কখনও দেন নি। ফলতঃ “চাতুৰ্য্যং যয়া সৃষ্টং গুণ-কর্মবিভাগশঃ”—এই উক্তির সার্থকতা হচ্ছে এই যে, গুণ ও কর্ম হিসাবে চতুৰ্ণ বিভাগের উপপত্তি, ব্রাহ্মণের ছেলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের সন্তানই কেবল ক্ষত্রিয় হত না, গুণ ও কর্ম অনুসারেই হ'ত। তা না হলে ব্রাহ্মণ ভ্রোণ—ক্ষত্রিয় অজু'নাদির অঙ্গগুরু এবং শ্রেষ্ঠ যোদ্ধারূপে মহাত্মারতের জগৎজোড়া সিংহাসন জুড়ে বসে থাকতে পারত না। সত্যি, আমাদের বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন একান্ত প্রয়োজন; বিদেশী কাঁচের ভেতর দিয়ে না দেখে স্বদেশী বহু চশমার ভেতর দিয়ে দেশমাতৃকার দিবা মূর্তি দর্শনই আজ সমধিক প্রয়োজন।

বঙ্গভাষার দ্বিত্যধিকারের অবহিত হওয়া প্রয়োজন যে বুদ্ধের শিকড় ও কাণ্ড ব্যতীত বৃক্ষ বাঁচতে পারে না; মাইকেল, হেম, নবীন, বঙ্কিম, রবী—এঁরা সকলেই সংস্কৃত-বুদ্ধেরই সুপক ফল। সমগ্র ভারতব্যাপী সংস্কৃতই মহা-মহীকর; মহারাষ্ট্র, গুজরাত, গাঁকান, মজ, চোল, কর্ণাট, অন্ধ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, অযোধ্যা, অবন্তী প্রভৃতির ভাষা তারই ফলমাত্র। ঐ বুদ্ধের সরসতা ব্যতীত সবই শুষ্ক হয়ে যাবে, কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।

সমালোচকদের উত্তর দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই কয়টি কথা আমাদের মনে ছাগে—সত্যি, সংস্কৃতশিক্ষা পদ্ধতির মধ্যে বা অত কোথাও কি কোনও প্রানি নাই? সে সব প্রানি কি এবং কিসে তার প্রতীকার?

পূর্বোক্ত সম্প্রদায়-বিশেষের সংস্কৃতশিক্ষার বিরুদ্ধে যুক্তি থেকে এটা স্পষ্ট যে সংস্কৃতভাষা ও সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য, উৎকর্ষ, সভ্যনির্দেশ প্রভৃতি বিষয়ে জনসাধারণ কেন, ভারতের অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিও একেবারে অজ্ঞ। তাঁদের অজ্ঞতা দূরীকরণের জন্ত আমাদের প্রাদেশিক ভাষায় কৃষ্টি বিষয়ক গ্রন্থাদি বিরচন, অনুবাদের সাহায্যে সংস্কৃতবিষয়ক জ্ঞান বিতরণ নিত্য প্রয়োজন। নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে প্রচারক প্রেরণ পূর্বক বক্তৃতাতির ব্যবস্থাও অত্যাৱশ্যক।

বলা বাহুল্য, বর্তমান সংস্কৃত শিক্ষাপদ্ধতিও নির্দোষ নয়। এমন কি, বি-এ শ্রেণী পর্যন্ত মাতৃরূপ, শব্দরূপ, কারক-বিভক্তি ও ব্যাকরণের অগাধ বিষয় নিয়ে এমন এক অসম্ভব বিভীষিকার সৃষ্টি করা হয়—যাতে ছাত্র ও বাইরের লোকেরা সকলে সংস্কৃত বলতে একটীব্যাকরণের বিভীষিকাই বোঝে। এ বিভীষিকার

হাত থেকে ছাত্রদের অব্যাহতি দেওয়া সত্যি দরকার। তার পর উচ্চ শ্রেণীতে বিষয়বৈচিত্র্য এবং ভাবগাম্ভীর্য স্পষ্ট করার নিমিত্ত ভিন্ন বিষয়ায়ক গ্রন্থ পাঠ্য করাও প্রয়োজন। এ সব বিষয় পরে আলোচনা করছি। কিন্তু যে ক্রিয়াকাণ্ড সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন, সেটা হচ্ছে শিক্ষা-প্রণালীর ধারার কিং পরিবর্তন। আমাদের স্কুলে-কলেজে সংস্কৃতশিক্ষা দেবার সময় ব্যাকরণের উপর এমন একটা অসম্ভব জোর দেওয়া হয়, যার ফলে কাব্যরস সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয়, তৎ-সম্ভোগ থেকে ছাত্রবৃন্দ সর্বথা বঞ্চিত হয়। ফলতঃ পাশাপাশি ইংরেজী ও সংস্কৃত গ্রন্থ পাঠের এ অশাস্ত্রমূল্যে তারা নিজেদের যেন স্কুল হতে থাকে। এর বিহিত বিধান নিত্য প্রয়োজন। অজ্ঞাত প্রতিকারও নিয়ে বিবেচিত হবে।

(২) সংস্কৃত-সাহিত্যের উন্নতিকল্পে যুদ্ধোত্তর

পরিকল্পনা

কার্যব্যপদেশে মাত্রাজ, বোম্বে, মাদ্রাসা প্রভৃতি প্রদেশে যখন গিয়েছি, তখন অনেক স্থলে দেখেছি—ইংরেজী ভাষার মাধ্যমিকভাষা কোনও কাজ হয় না। আমাদের দেশী ভ্রাতৃবৃন্দের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদানের জন্ত দেশীয় একটি ভাষার মাধ্যমিকতা খুঁজে বের করতেই হয়। বলা বাহুল্য, ভারতের সর্বত্র অগণিত লোক আছেন, যাদের সঙ্গে সংস্কৃতভাষার মাধ্যমিকভাষা এ কার্য অভি-স্বচরূপে সম্পাদিত হয়। ভারতের সর্বত্র সকলেই আমাকে বলেছেন যে, মালয়ালম, ক্যানারিস, তেলুগু, গুরুখী, উড়িয়া, বাংলা প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষার আকৃতি বিশেষ থেকে ভাষা-জননীকে উদ্ধার করে নিলেই ভারতের বৈশ্বীয় ভাগ ভাষাই ভারতীয়মাত্রেরই সহজে বোধগম্য হয়। বিভিন্ন ব্রহ্মের হরকের জন্তই আমরা সর্বাধিক বিপদগ্রস্ত হই। এ কথাটা যে কত বড় সত্য, তা আমি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাচ্যগ্রন্থাগার লণ্ডনস্থ ইণ্ডিয়া অফিসের লাইব্রেরীর সংস্কৃতবিভাগের কর্মদচিব হিসাবে বিভিন্ন প্রাদেশিক অফিসে প্রকাশিত সংস্কৃত-গ্রন্থাদি পর্যালোচনা কালে বিশেষ করে ব্যক্তিগত ভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছি। আজ সেদিন এসেছে যখন জাতীয়তাবাদের ও কার্য-কলাপের পরিচুষ্টি ও অনুসন্ধানের নিমিত্ত আমাদের স্বকীয় সাময়িক অনুবিধা সহ করা শুধু প্রয়োজন নয়, একান্ত কর্তব্য। এ কথা অস্বীকার করার কোনও উপায় নাই যে, সংস্কৃত-ভাষাই প্রকারান্তরে ভারতের একমাত্র সার্বজনীন ভাষা। “প্রকারান্তরে” এ কথাটি বলার উদ্দেশ্য এই যে, সংস্কৃত-ভাষাবিদদের সংখ্যা ভারতে অত্যধিক না হলেও এক তামিল ব্যতীত আধুনিক প্রত্যেক ভাষার ভেতরে সংস্কৃত শব্দসংখ্যা এবং সাহিত্যানুগ রচনা এত সমধিক যে, এ সর্বের মাধ্যমিক-ভাষা ভারতের এক প্রদেশের লোকের অল্প প্রদেশের ভাষা বুঝতে খুব অনুবিধা হয় না। আসন্ন দুই দশক কল্যাণসাগর

থেকে মণিপুর পর্যন্ত ভারতের সর্বত্র একটা সভ্যতা ও কৃষ্টির সামঞ্জস্য আছে, চিন্তার ধারায় ঐক্য আছে, বাক্যবিভাগের পদ্ধতি আছে। সংস্কৃতভাষা সংস্কৃতির একটা বিশিষ্ট ছাপ আছে—যার অবলম্বনে ভারতীয় মাজেই ভারতের বিভিন্ন স্থলের ভাষা ও ভাবধারার সঙ্গে মিলেমিশে যেতে পারে, এবং এটা সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের মাধ্যমিকতা বেহু সন্তবপন হয়েছে। এমন কে আছে যিনি উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, চরকসুশ্রুত প্রভৃতির জ্ঞত পরীক্ষণ না করেন? ভারতের এমন কোন নামোন্মেষ যোগ্য ভাষা আছে, যাতে এমন গ্রন্থাদির অস্থবদ, এবং এই সব গ্রন্থাবলম্বনে বহুল প্বেষণ হয় নি? স্মরণ্য বাইরের কিছু বিদগ্ধবাদ সত্ত্বেও স্থিরচিত্তে ভেবে দেখলে দেখা যাবে যে, সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যই প্রকৃতকল্পে ভারতীয়-মাজেরই মিলনের একমাত্র স্রজ এবং একটাই একে ভারতের রাষ্ট্রভাষারূপে স্বীকার করা যেতে পারে। তা হলে সর্ব-প্রথমেই কথা উঠে,—এ যে অঞ্চল ভারতভূমির, রাষ্ট্রীয় ভাষা সংস্কৃত—এর সর্বাঙ্গীণ উন্নতিবিধানের নিমিত্ত বর্তমান যুগে কি কি করণীয়, কি কি বিষয়ে সর্বাঙ্গে মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা নিতান্ত কৰ্তব্য মনে করি।

বহিদৃষ্টিতে কেন, বস্তুত, কার্যতও এটা ঠিক যে বর্তমান যুগে সংস্কৃতশিক্ষা যেন কালোপযোগী হয়ে উঠছে না। এ জ্ঞত বাহিরের ও ভেতরের দিক থেকে এর বহুল সংশোধন অতীব প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। বারাগঙ্গী, কলিকাতা ও অজ্ঞাত সর্বস্থলের সংস্কৃতপরীক্ষাও এক এক বিষয় অবলম্বনে নেওয়া হয়। তাতে যেমন এক দিকে বিষয়-বিশেষের প্রতি মনোযোগ-নিবন্ধন সমগ্র সংস্কৃত-সাহিত্যের প্রকৃষ্ট রূপ দৃষ্টিগোচর হয় না, তেমনি পাঠ্য-তালিকা থেকে আধুনিক বিষয়গুলি সম্পূর্ণ বিবাক্ত হয়েছে বলে আমরা সংস্কৃতবিদ্যার্থীরা যেন বর্তমান কালোপযোগী হয়ে উঠতে পারছি না। দৈনন্দিন কার্যকলাপের সুযোগ-সুবিধা সংঘটনের নিমিত্ত কিছু আধুনিক ভাষা, কিছু গণিত ও বিজ্ঞান সংস্কৃত প্রত্যেক বিষয়েরই প্রথম হু' পরীক্ষায় অন্ততঃ সংযোজিত করে দেওয়া একান্ত কৰ্তব্য। অন্ততঃ ইংরেজী একটি পত্র বোঝার, বা একটি টেলিগ্রাম বুঝতে পারার মত বিদ্যার্জন করা সংস্কৃতবিদদেরও কৰ্তব্য। এক কথায় সংস্কৃত-বিদ্যাকে বর্তমান কালোপযোগী করার নিমিত্ত যা যা করা প্রয়োজন, তদনুরূপ পাঠ্য-তালিকা তৈরী হওয়া প্রয়োজন।

বর্তমানে আমাদের সাধারণ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির (স্কুল-কলেজ প্রভৃতির) সঙ্গে সংস্কৃতের জ্ঞত বিশেষ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান-গুলির (টোলগুলির) বিশেষ কোনও সম্পর্ক নেই। আমার মনে হয়, এ দু'প্রকারের শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে একটা সামঞ্জস্য-বিধান একান্ত প্রয়োজন। এদের দুটিকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন দুটি

বিভাগরূপে পরিগণিত না করে কিছু দূর পর্যন্ত একটা সাধারণ বিভাগে পরিণত করা বিধেয়—যাতে পণ্ডিতেরাও অজ্ঞাত বিষয়-বিশেষে কিছু অধিকার লাভ করেন এবং সাধারণ ছাত্রেরাও সংস্কৃত বিষয়ে অধিকতর শিক্ষা লাভ করতে পারেন।

কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পরে অবশ্য ছাত্রমণ্ডলী স্বকীয় অতীষ্ট পথে উত্তরোত্তর অগ্রসর হতে পারেন, এরূপ ব্যবহারও প্রয়োজন। নূতন শিক্ষা-প্রণালীর প্রণয়নকালে দেশের শিক্ষা-বিদেব্রা যেন এদিকে বিশেষ দৃষ্টিপাত করেন, তজ্জত আমি তাঁদের সনির্বন্ধ অহুরোধ জ্ঞাপন করছি।

দ্বিতীয়তঃ, আমাদের সংস্কৃত-শাজের যে যে বিষয়ের অস্থ-ধাবনে আর্থিক সংস্থানের সুযোগ-সুবিধা ঘটতে পারে, যেমন আয়ুর্বেদ, কলিত জ্যোতিষ প্রভৃতি, সে সব বিষয়ের প্রতি বিশেষ মনোযোগ প্রদান অবশ্য কৰ্তব্য। সংস্কৃতবিদ্যার্থীদের আর্থিক-দুর্গতিই চরম সমতা এবং এর থেকে এর কথঞ্চিৎ সমাধান সন্তবপন হবে নিশ্চয়ই। এটা অত্যন্ত ঠিক যে, এখনও পর্যন্ত আয়ুর্বেদ জগতের চিকিৎসা-পদ্ধতির মধ্যে অজ্ঞতম শ্রেষ্ঠ-রূপে সর্বাঙ্গীণ স্বীকৃত হয়; এর প্রমাণের প্রয়োজন নেই, এ একে-বারে প্রত্যক্ষ সত্য। কলিত জ্যোতিষের অস্থলীনকারীদের অর্থগমও প্রত্যক্ষ সত্য।

ধর্মকে ব্যবসারে রূপান্তরিত বা পরিগণিত করার কোনও চেষ্টা না করেও ধর্মদংরুগণের নিমিত্তই স্বকঠোর আচার-ব্যবহার ও রীতি-নীতির প্রবর্তন ও অস্থবর্তনে ধর্মযাজী সংস্কৃতবিদদের জীবিকানির্বাছ স্তরারূপে চলতে পারে।

আমরা পূর্বেই বলেছি যে বাস্তববিদ্যা, স্থাপত্য, তক্ষণ, রত্ন-পরীক্ষা, কৃষি প্রভৃতি বহু বহু শিল্প শাস্ত্রাদি আমাদের অনাদৃত অবস্থায় পড়ে আছে। এ সব এছাে অস্থ্য সারভগ্ন নিহিত আছে। সে সব তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করে তত্ত্বদ্বিষয়ে প্রকৃষ্ট অস্থলীন একান্ত কৰ্তব্য। এ সব অর্থকরী বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করতে পারলে অর্থগম অনিবার্য। সমগ্র জগতের ধনার্জন নির্ভর করে এর উপরেই। অধচ এ সবে প্রকৃষ্ট বিকাশ আমাদের সংস্কৃত গ্রন্থনিচয়ে নিবন্ধ থাকে সত্ত্বেও অতীব পরি-তাপের বিষয় যে এ সব বিষয়ের আমরা সম্পূর্ণ অনাদর করেছি—যার ফলে আমাদের সংস্কৃত বিদ্যা একান্তই ভাব্বিক বিদ্যা হয়ে পড়েছে; ব্যবহারিক দিক আমরা ছেড়েই দিয়েছি। আমাদের এ সব দিকে অদূর ভবিষ্যতে বিশেষ দৃষ্টিপাত একান্ত প্রয়োজন। এ সঙ্গে সঙ্গীত, চিত্রণ, নৃত্য-সঙ্গীতাদি, অভিনয় প্রভৃতি গলিতকলার যথোপযুক্ত অস্থলীননেও মানসিক আনন্দ ও আর্থিক সাচ্ছল্য—উভয় দিক থেকে আমাদের যথেষ্ট সহায়তা হতে পারে। তজ্জত তদ্বিষয়েও অবহিত হওয়া কৰ্তব্য।

তৃতীয়তঃ, ভারতবর্ষীয়দের স্ব-হস্তে দেশের শাসনক্ষমতা এসে পড়ায় আজ স্বতঃই আমাদের মণ্ডনীতি প্রভৃতির প্রতি নজর দেওয়া অবশ্য কৰ্তব্য হয়ে পড়েছে। মহাভারতোক্ত

রাজনীতি, দণ্ডনীতি প্রভৃতি, অর্থ-শাস্ত্রোক্ত পদ্ধতির সম্যক পর্যালোচনা আজ একান্ত কৰ্তব্য। কালক্রমে আমাদের অবঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে আমরা নারী-চরিত্রের উন্নতিবিধান এবং শূদ্র ও নারীকে সমপর্যায়ভুক্ত করে উত্তরকে হীন প্রতিপন্ন করার উপায় উদ্ভাবন করাকেই শাস্ত্রীয় কাজ মনে করেছিলাম। সৌভাগ্যক্রমে আজ সেকালের অবসান হয়েছে এবং আবার দেশের সকলের সমভাবে সর্ব কার্ণে শ্রেষ্ঠ অবদানের সুযোগ-সুবিধা ফিরে এসেছে, আইনের বলে সম্প্রদায়-বিশেষকে সম্পূর্ণ ভাবে ক্ষমতাচ্যুত করার দিন একেবারে তিরোহিত হয়ে গেছে। দেশবাণীই আমাদের একমাত্র উপাশ্রয়; ব্যক্তিগত স্বার্থের দিকে দৃকপাত করার সময় আমাদের আজ নাই। পরের হাতে রাজনীতির ভার চাপিয়ে দিয়ে নিজেরা গৃহকোণে বসে নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ জীবনযাপনের সময় আজ চলে গেছে। প্রাণমন সম্পূর্ণ সমর্পণ করে “রাজনীতি”র অনুশীলনে—অতীতের সঙ্গে বর্তমানের সংযোগ ও সামঞ্জস্য বিধানে আমাদের বঙ্গপরিকর হতে হবে।

চতুর্থতঃ, সংস্কৃত-সাহিত্যে বৈজ্ঞানিক, শিল্পকলাবিদ প্রভৃতি অনেকেরই অনুরাগ আছে। এঁদের সহযোগিতায় আমাদের প্রাচীন ভারতের তত্ত্ববিষয়ক জ্ঞানরাশির প্রকৃষ্ট আলোচনা এবং বিশ্বসমক্ষে প্রচার আজ অতি প্রয়োজন। এতদিন পর্যন্ত সংস্কৃতবিদেরা বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে যোগ দিয়ে বিশেষ কাজ কিছুই করেন নি। স্বল্প পরিমাণ কাজ হয়েছে মাত্র, তাই বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতবর্গের সঙ্গে সংস্কৃতপণ্ডিতমণ্ডলীর বিশেষ সংযোগ স্থাপন অত্যাৱশ্যক। এ প্রসঙ্গে এও বলা দরকার যে, পণ্ডিতমণ্ডলীর সঙ্গে পাশ্চাত্য ভাষাবিদ ভারতীয় বা অভ্যন্তরীণ সংস্কৃতজ্ঞদের সঙ্গে আরও নিবিড়তর সম্পর্ক গড়ে তোলা আজ অত্যাবশ্যিক প্রয়োজন। কেবল সংস্কৃত-ভাষাবিদ যারা, তাঁরা অল্প ভাষায় লিখিত জ্ঞান আহরণে সক্ষম হন না—জগতের বিভিন্ন ভাষাবিদ পণ্ডিতমণ্ডলীর সহযোগিতায় তাঁরা সে জ্ঞানের সন্ধান পান; অল্প দিকে পণ্ডিতমণ্ডলী পাশ্চাত্য ভাষাবিদ পণ্ডিতকে সংস্কৃতের গোপন মণিরাশির সন্ধান দিতে পারেন। এ উভয় প্রকারের সংস্কৃতবিদের মিলন—কর্মক্ষেত্রে মিলন—সর্বথা বাঞ্ছনীয়। বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতে ডিগ্রীধারীরা অর্ধার্জনে কষ্ট-ভোগ করেন বলে আমরা সংস্কৃতে তেমন অত্যাংকুষ্ট ছাত্র পাই না; অল্প দিকে সংস্কৃতবিষয়ক পাণ্ডিত্যের প্রতি জনসাধারণের অনাদর হেতু আর তেমন বড় বড় পণ্ডিতও নুতন করে দেখা দিচ্ছেন না। এর থেকে দুঃখের বিষয় আর কি হতে পারে? এখনও যে সব পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁদের বিশাল পঞ্চপুটে সংস্কৃত শাস্ত্রকে আশ্রয় দান করে রেখেছেন, তাঁদের সংখ্যা একেবারে কমে এসেছে। এঁদের তিরোধানের পরে তাদৃশ সংস্কৃতবিদ মনীষী যে ভারতবাসী পূর্ববৎ সমলস্কৃত করতে পারবেন, আজ আর তেমন মনে হয় না।

বর্তমানে আমাদের অভাব-অতিযোগ কোথায় তা বিশেষ চিন্তনীয়।

১। ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীর মত একটি বিশিষ্ট পাঠাগার আমাদের নিত্য প্রয়োজন—যাতে এক কায়গার বসে সকল প্রকারের গ্রন্থ আলোচনা করা যায়, সব প্রকারের পুঁথি যথাসম্ভব দেখা যায়। আমাদের কলিকাতা নগরী ভারতীয় কৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সংরক্ষণ-স্থল; ইংলিশ স্থানেও এমন কোনও পুস্তকাগার নাই যাতে কোনও গ্রন্থ-বিশেষের দু-তিন ধানার বেশী সংস্করণ পাওয়া যায়; এবং সহস্র সহস্র বিশেষ উপযোগী সংস্কৃত গ্রন্থ আছে—যা কলিকাতার কোনও লাইব্রেরীতে কোনও দিন রক্ষিত হয় নি। একটি উদাহরণ দিয়ে এ কথাটি পরিষ্কার করা দরকার। ধরুন ক্রীমদ্ভগবদ্গীতার কোনও বিষয়বিশেষে আমার হৃদয়ে কোনও এক নুতন চিন্তা যদি জাগে, আমার সর্বপ্রথম জ্ঞান দরকার—জগতের কোন্ বরণ্য স্থা এই বিষয়ে কি বলেছেন, কে কি ভাবে এ জিনিষটাকে দেখেছেন, তা না হলে গবেষণা হয় না, নুতন জিনিষ আবিষ্কার করা হতে পারে না। এ যদি জ্ঞানতে হয়, তা হলে যত যত পণ্ডিত ক্রীমদ্ভগবদ্গীতা নিয়ে যা যা কাজ করেছেন, আমার দেবে নেওয়া দরকার। তা যদি হয়—আমার একটি পাঠাগারের দরকার যাতে সব করুটি ভগবদ্গীতার সংস্করণ, অনুবাদ, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি এবং বিশেষতঃ ভগবদ্গীতার উপরে লিখিত সমস্ত গ্রন্থের বিবরণ-সংবলিত গ্রন্থপঞ্জী প্রকৃতি রয়েছে। আজ আমাদের দেশে এমন কোনও পাঠাগার নাই যাতে এর কিছুই পাওয়া যায়। ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে ভগবদ্গীতার ৪১৮টি অনুবাদ-সংবলিত বিভিন্ন সংস্করণ, ১৬৪টি বিভিন্ন টীকা এবং হুঁশতাবিক অংশবিশেষের মুদ্রিত সংস্করণ আছে। তহুপরি ৬০০ বিভিন্ন অনুবাদ এবং নয়টি বিভিন্ন প্রকারের সূচী আছে। স্মরণ্য চাওয়া মাত্রই ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী যে কোন পাঠককে ১৫০০ পনের শতের অধিক ক্রীমদ্ভগবদ্গীতা গ্রন্থ দিতে পারে, এবং তহুপরি অল্প গবেষণামূলক গ্রন্থ নাম বলার সঙ্গে সঙ্গেই এনে দিতে পারে। তাঁদের তদনুযায়ী ক্যাটালগ, গ্রন্থাগারাবক্ষ, গ্রন্থাগারের জনসম্পদ প্রভৃতি সব কিছুই আছে। স্মরণ্য তাদৃশ একটি গ্রন্থাগার পেলে যে কাজ তিন-চার ঘণ্টা হয়ে যায়, আমাদের তাদৃশ কাজ যাবজ্জীবনও হয় না। তহুপরি সেখানে ব্যক্তিগত হিংসা-দেবাদি আমাদের তুলনায় নিত্য কম, স্বীকার করতেই হয়—অন্য দিকে রাষ্ট্রীয় সাহায্য ব্যক্তিগত সাহায্য সব কিছু বজার ধারে যেন ছুটে চলে আসে। দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতেই হয় যে আমাদের যদি কেউ কিছু জানেনও, অনেক ক্ষেত্রে তাঁরা বিজ্ঞানীকে তত্ত্ববিষয়ক সন্ধান দিতে অনিচ্ছুক থাকেন। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে দেখছি যে প্রকৃত জ্ঞানপিপাসুকে সাহায্য করতে সেধানকার পণ্ডিতমণ্ডলী অতীব উদ্যম। আজ

আমরা শুধু কল্পনা করতে পারি যে আমাদের দেশেও এমনি এক দিন ছিল; তা না হইলে এ বিশ্ববিজয়ী দর্শনশাস্ত্র এদেশে তৈরী হতে পারত না। যা হোক, ইংলিশ গ্রন্থাগার আমাদেব আজ এ যুগোত্তর যুগে সর্বপ্রথমে প্রয়োজন।

দেশের সর্বত্র যে সব গ্রন্থ লুক্কায়িত আছে, রাজ্য, মহারাজ, জমিদার বা বিশিষ্ট পণ্ডিতের গ্রন্থাগারে যে সব গ্রন্থ ও হস্তলিখিত পুঁথি ইত্যন্তঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে তার যথাযথ ব্যবহারের নিমিত্ত এ সব গ্রন্থ ও পুঁথির সঠিক বিবরণ, প্রাপ্তিস্থান প্রভৃতি জানা থাকা দরকার। ইংলণ্ডের জাশনাল লাইব্রেরী এ কাজ করে। এটি অত্যন্ত প্রয়োজন।

তারপর যত বিষয়ে যত কাজ হচ্ছে, তার একটি হুচী—বারাবাহিক হুচী, অত্যন্ত প্রয়োজন। বলা বাহুল্য, তা না হলে উচ্চদরের অভিনব গবেষণা অতি কষ্টসাধ্য ও সময় সাপেক্ষ হয়ে পড়ে, অনেক ক্ষেত্রে সম্ভবপরও হয় না।

ভারতবর্ষের সর্বত্র এক শতাধিক প্রাচ্যাতত্ত্ব বিষয়ক পত্রিকা সম্পাদিত হচ্ছে বর্তমানে। এ সব মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষাণ্মাসিক বা বার্ষিক পত্রিকায় অল্প নূতন নূতন বিষয় নিরন্তর প্রকাশিত হচ্ছে। এ সব জ্ঞানেরও সংহতি প্রয়োজন এবং তজ্জন্ত একটি বিষয়হুচী অভ্যাবশ্যক। বোধে থেকে এজাতীয় কাজ কিছু কিছু হচ্ছে; আরও পূর্ণাঙ্গ কাজ আমাদের প্রয়োজন।

অত্যন্ত হুঃখের বিষয়, এমন কি কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতির শব্দহুচী, বিষয়হুচী বা তাঁদের উপরে লিখিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধাবলীর নির্ণায়ক কোনও গ্রন্থ অজ্ঞাপি আমরা রচনা করি নি। এ অপরাধ নিশ্চয়ই অমার্জনীয়।

জগতের বিশাল সাহিত্যের সঙ্গে আমরা বিশেষ করে ইংরেজী সাহিত্যের মাধ্যমিকভাষ্য সুপরিচিত। এ সব সাহিত্যের বিশিষ্ট বিশিষ্ট গ্রন্থ থেকে আহৃত জ্ঞান আমাদের সংস্কৃত সাহিত্যে অন্তর্ভুক্ত করার দিন আজ এসেছে। হারুণ এককালে বহু সংস্কৃত সাহিত্যের অনুবাদের দ্বারা ফার্সী সাহিত্যে সমৃদ্ধ করেছিলেন। ভারতের মধ্যযুগে অগণিত সংস্কৃতগ্রন্থের অনুবাদাদির দ্বারা মহামতি সন্ধ্যাই আকবর ফার্সী সাহিত্যের সমৃদ্ধি সাধন করেছিলেন। অল্প দিকে বহু ফার্সী গ্রন্থের সংস্কৃতানুবাদ দ্বারা তৎকালীন পণ্ডিতসমাজ সংস্কৃত সাহিত্যের ত্রীভুজ সাধন করেছেন। আজও এ জিনিষের নিতান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

পরিশেষে আমাদের কর্তব্য এই যে, একাধি স্মরণহত করার নিমিত্ত সমগ্র ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশে এক একটি বিশ্ববিদ্যালয় এবং কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থাপন অতীব প্রয়োজন। কিছু দিন পূর্বে আলোরারের মহারাজা একটি সংস্কৃত বিভাগের স্থাপনের নিমিত্ত বিদ্রুত ভূষণ এবং দশ লক্ষ টাকা দানের প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করেছিলেন। লক্ষ্যে থেকেও একটি বিরাট পরিকল্পনা ঘোষিত হয়েছে। দক্ষিণাত্য এবং পশ্চিম-ভারতের লোকেরাও এ বিষয়ে তৎপর হয়েছেন। কেবল দিবালোকের প্রথমোক্তের স্থলেই অর্থাৎ আমাদের এ পূর্ব-ভারতেই আমরা যেন অমালোকে নিমজ্জিত হয়ে আছি, নির্জীব ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পরমুখাপেক্ষী হয়ে অপেক্ষা করছি। আজ সংস্কৃতভাষ্যবাহী ব্যক্তিমাঝেরই সর্বস্ব পণ করেও সংস্কৃত সাহিত্যের সম্যক উন্নতি সাধন করতেই হবে।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি, পূর্বভারত এককালে সংস্কৃত সাহিত্যে বিশিষ্টতম দান করেছে। আজও পুনরায় তার জন্ত আহ্বান এসেছে। আমরা যদি দেশমাতৃকার মুখ উজ্জ্বল করতে চাই, আমাদের সর্বপ্রথমে প্রয়োজন—সংস্কৃত-সাহিত্যের ত্রীভুজ সাধনের নিমিত্ত বহুপরিকর হওয়া, সম্ভব হওয়া, পরস্পর হিংসা বিদ্বেষ বিমূঢ় হয়ে কেবল লক্ষ্যের পশ্চাদ্ভাবন করা। এতেই আমাদের অপবর্গ নিহিত আছে।

কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বিভাগ ও প্রাদেশিক সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি সংস্থাপনের এবং বর্তমান সময়ের মধ্যবর্তী অবস্থায় আমাদের অবশ্য কর্তব্য—বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত-সাহিত্যের প্রতি যা অবিচার চলেছে, তার প্রতিবিধান করা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাতীর্ণ ছাত্রদের যথাযথ মানমর্যাদার প্রতি দৃষ্টি রাখা। অজ্ঞাত ছাত্রদের সমান সুযোগ-সুবিধা, স্বত্তি-নির্ধারণ প্রভৃতি আমাদের সংস্কৃতের ছাত্রদের জন্ত নিতান্ত প্রয়োজন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় সংস্কৃতের পূর্বাবস্থার পুনর্ব্যবস্থাপন প্রয়োজন, এবং অল্প বিষয়ের পরিবর্তে যে অগণগণ্য সংস্কৃত ছিল, তজ্জন্তও প্রচেষ্টা অবশ্য কর্তব্য। প্রবেশিকা পরীক্ষার পাঠ্যসূচীতে সংস্কৃতকে বাধ্যতামূলক না রেখে ইচ্ছামূলক বিষয়ে পর্যাবসিত করার যে প্রচেষ্টা অধুনা দৃষ্ট হচ্ছে, তার বিরুদ্ধেও আমাদের অভিযান নাতিবিলম্বে অবশ্য কর্তব্য।



বিমানে ভূ-প্রদক্ষিণ

ক্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

চতুর্থ অধ্যায়
ওয়ারশিংটন

পটোম্যাক নদীতীরে উত্তর ওয়াশিংটন-স্মিথ-সন্ড-চিহ্নিত
স্বসজ্জিত ওয়াশিংটন শহর। আকাশ হইতে শহরের মনোরম
শোভা দেখিতে দেখিতে বিমান-বাঁটিতে অবতরণ করিলাম।
তখন বৈকাল পাঁচটা। অহুসান-টেবিলে বোঁজ লইয়া
জানিলাম যে, ওয়াশিংটনস্থ ভারতীয় দূতাবাসের জনৈক
আমেরিকান কর্মচারী আমার জন্য বাঁটিতে অপেক্ষা
করিতেছেন। তাঁহার সাক্ষাৎ পাইয়া আশ্বস্ত হইলাম। মাল
খালাস করিতে গিয়া দেখি মাল আসে নাই। বাঁটির ভার-
প্রাপ্ত কর্মচারীর নিকট এ বিষয় বলিলাম। তিনি তৎক্ষণাৎ
টেলিফোন-যোগে নিউইয়র্ক এবং অন্যান্য স্থানে কথা বলিয়া
দশ মিনিটের মধ্যে মালের সংবাদ সংগ্রহ করিয়া ফেলিলেন।
সবিনয়ে বলিলেন, ‘আপনার মাল ভুলক্রমে নিউইয়র্ক হইতে
বোষ্টন চলিয়া গিয়াছে। আমরা পরবর্তী বিমানে বোষ্টন হইতে
মাল আনাইয়া রাত্রি দশটার মধ্যে আপনাদের হোটেলের
পৌছাইয়া দিব। আপনার খুবই অসুবিধা হইবে। আমাদের
বড় যত্নসঙ্গেও কতিং এরূপ ভুল ঘটয়া যায়। আশা
করি আমাদের অবস্থা বিবেচনা করিয়া মার্জনা করিবেন।’
আমার মালের মধ্যে ছিল দুইটি থলি। একটি ছোট ও একটি
বড়। ক্ষুর, দাঁতের মাজন প্রভৃতি নিত্য ব্যবহার্য বস্তুগুলি একটি
ক্ষুদ্র ছাত-ব্যাগের মধ্যে ছিল। সেটিকে বড় থলির মধ্যে
রাখিয়াছিলাম। কাজেই এত লম্বা ভ্রমণের পর দস্তখাবন,
বস্ত্রপরিবর্তন প্রভৃতি কিছুই করিতে পারিব না মনে করিয়া
বড়ই অশুভি বোধ করিলাম। যদিও ইহারা বলিল, রাত্রি
দশটা অর্থাৎ মাত্র সাড়ে চার ঘণ্টার মধ্যে ইহারা আমার মাল
পাঁচ শত মাইল দূরবর্তী বোষ্টন হইতে আনাইয়া নিজেদেরই
হোটেলের পৌছাইয়া দিবে তথাপি ভারতবর্ষীয় অভিজ্ঞতা-পুষ্ট
আমার মনে এ কথায় আস্থা স্থাপন করিতে পারিতেছিল না।
অনন্যোপায় হইয়া ক্ষুর মনে দূতাবাসের বজুটির সঙ্গে তাঁহারই
গাড়ীতে হোটেলের দিকে চলিলাম। এখানে কোন ভারতীয়ের
সাক্ষাৎ বিয়ল হইবে এ চিন্তাও মনে উদ্ভিত হইল। দূতাবাসের
বজুটির সঙ্গে আলাপ করিতে করিতে শহরের মধ্য দিয়া
চলিয়াছি। তখন দিবালোক নির্বাপিতপ্রায়। রাস্তার
প্রশস্ততা, মন্থণতা ও পরিচ্ছন্নতা চোখের তৃপ্তি উৎপাদন
করিল। লিঙ্কন-স্মিথ-মন্দিরে আলোকোদ্ভাসিত লিঙ্কনের মুখ-
খানি ছবির মত চোখের উপর দিয়া ভাসিয়া গেল। এক
সুন্দর উদ্যান-মধ্যবর্তী রাস্তা অতিক্রম করিয়া এক বিরাট
হোটেলের উঠিলাম। ভিতরে চুকিয়াই দেখি অস্বাভাবিক-কক্ষে

ক্রীযুত রাধাকৃষ্ণ ও রাধাকমল দুখোপাধ্যায় আমার সম্মুখে।
ইহাদের অপ্রত্যাশিত দর্শনে মনের প্লানি অনেকটা দূর হইল।
সাড়ে দশটা বাজিতে ঘরে বসিয়া হোটেলের আপিস হইতে
টেলিফোনে সংবাদ পাইলাম যে বিমান-বাঁটি হইতে আমার
কত দুইটা থলি আসিয়াছে। দুই মিনিটের মধ্যে বগুহে আমার
বোষ্টন-ফেরত থলিঘর-দর্শনে প্রিয়-মিলনের আনন্দ অমূল্য
করিলাম।

পরদিন শনিবার, ১৬ই নভেম্বর ৩০শে কার্তিক। আমেরিকার
সমস্ত সরকারী আপিস ও ব্যাংক বন্ধ। কিন্তু ভারতীয় দূতাবাস
খোলা। সকালে দূতাবাসে গিয়া ক্রীযুত সিরিহাশঙ্কর বাজপেয়ী
ও অত্যন্ত কর্মচারিবৃন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। আমার প্রদেয়
অধ্যাপক ক্রীযুত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশের বোঁজ লইতেছি,
এমন সময় তিনি তদীর সহকর্মী ছাত্র ক্রীযুত পীতাম্বর পালের
সহিত দূতাবাসে আসিয়া উপস্থিত। জনিলাম তাঁহারা শহরের
কেজ্বলে “মের্সাওয়ার” নামক একটি হোটেলের আছেন।
দূতাবাসের কর্ম সমাপনান্তে তাঁহাদের সহিত নিকটবর্তী
একটি “কেকিটেরিয়া”র মধ্যাহ্নভোজন শেষ করিয়া তাঁহাদের
হোটেলের পেলাম। মহলানবীশ মধ্যাহ্ন তিন-চারি দিনের
মধ্যেই ওয়াশিংটন ত্যাগ করিবেন এবং শীঘ্রই ভারতবর্ষে
ফিরিবেন। এ কয়েক দিন তাঁহার সঙ্গে ওয়াশিংটনস্থ সরকারী
কর্মচারিসমাজে পরিচিত হইবার চেষ্টা করিলাম।

ক্রীযুত মহলানবীশ-গৃহিণী তখন ওয়াশিংটনে। সেদিন
তিনি ডাক্তার ডেমিং-এর গৃহে আতিথ্যস্বীকার করিয়া বাস
করিতেছিলেন। ঐ দিন রাতে এতদুপলক্ষে ডেমিং এক
ভোজের ব্যবস্থা করিলেন। আমিও সেই ভোজে নিমন্ত্রিত
হইলাম। ডেমিং “বাজেট-ব্লোর” সংখ্যাবিজ্ঞান বিভাগে
একজন বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞ। ঐ দিন ভোজে স্ত্রী-পুরুষে প্রায়
কুড়ি জন অতিথি ছিলেন। পুরুষগণ সকলেই প্রতিষ্ঠাবান-
সরকারী কর্মচারী। কেহ আর্থিক গবেষণার, কেহ গণিতে,
কেহ সংখ্যাবিজ্ঞানে, কেহ অর্থনীতিতে, কেহ বা বাণিজ্য-
বিজ্ঞানে সুপণ্ডিত। সকলেরই মন সজীব ও সতেজ; সকলেই
বলিষ্ঠ আশাবাদী। ইহাদের ও ইহাদের পত্নীগণের সঙ্গে
পরিচিত হইয়া ও আলাপ করিয়া পরম আপ্যায়িত বোধ
করিলাম।

সেদিন অতিবিক্রমের মধ্যে নানা বিষয়ে তর্কবিভর্ক
হইয়াছিল। গত নির্বাচনে রিপাবলিকান পার্টি চৌদ্ধ বৎসরের
পর—কংগ্রেসে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিয়াছে। প্রেসিডেন্ট
ডিমোক্র্যাটিক পার্টিরই রহিয়া গিয়াছেন। এ অবস্থার শাসন-
ব্যবস্থার বিরূপ পরিবর্তন ঘটে—সে বিষয়ে সকলেরই বিশেষ

উৎকর্ষ। এদেশে প্রেসিডেন্ট চারি বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন। কিন্তু কংগ্রেস নির্বাচিত হয় দুই বৎসরের জন্য। কংগ্রেসে প্রেসিডেন্টের দলগত সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকিলে শাসনকাণ্ডে বিভ্রাট উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। বিলাতী প্রথায় হাউস অব কমন্সে যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়, তাহারই নেতা প্রধানমন্ত্রী-রূপে শাসন-ভরণের কর্তার হন। কাজেই তিনি যেভাবে শাসন-ভরণী চালাইতে চাহেন, কমন্সগণ তাহা অমুসোদন করেন। আর যদি কখনও মন্ত্রিগণ কমন্সগণের অমুসোদন লাভে অসমর্থ হন তাহা হইলে তাঁহারা তৎক্ষণাৎ পদত্যাগ করেন। তাহারাই কমন্সগণের অমুসোদন লাভ করিতে পারিবেন তাহারা ভরন মন্ত্রী হন। কাজেই বিলাতে মন্ত্রিগণ ও কমন্সগণের মধ্যে কখনও দলগত বা নীতিগত অসামঞ্জস্য বা বিরোধ উপস্থিত হয় না। কিন্তু আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ও কংগ্রেস স্বতন্ত্রভাবে দেশবাসীর ভোটে নির্বাচিত হন। ফলে প্রেসিডেন্ট ও কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সমদলীয় নাও হইতে পারেন। কিন্তু দল দুইটি এখানে এরূপ শক্তিশালী যে যখন প্রেসিডেন্ট ও কংগ্রেসের যুগপৎ নির্বাচন হইয়াছে তখন কদাপি তাঁহাদের দলগত বৈষম্য হয় নাই। কিন্তু যখন কংগ্রেস প্রেসিডেন্টের কার্যকালের মধ্যভাগে নির্বাচিত হইয়াছে, তখন কখন কখন দলগত বৈষম্য উপস্থিত হইয়াছে, এবং যখনই এইরূপ হইয়াছে তখনই প্রেসিডেন্টের শাসন-ভরণী চালানায় বিভ্রাট উপস্থিত হইয়াছে। প্রেসিডেন্ট উইলসন ও প্রেসিডেন্ট হুভারের শেষের দুই বৎসর এইরূপ ঘটয়াছিল। প্রেসিডেন্ট উইলসন ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে লীগ অব নেশন্স সংগঠন করিয়া আসিলে কংগ্রেস তাহার মেয়র হইতে অস্বীকার করে, ইহা স্ববিদিত ঘটনা। এবার সেরূপ বিভ্রাট হইবে কিনা এবং হইলে কি পরিমাণে হইবে ইহা বর্তমানে সকলের আলোচ্য বিষয়। পূর্বে দেখা গিয়াছে এরূপ অবস্থায় পরবর্তী নির্বাচনে প্রেসিডেন্টের দল আর প্রেসিডেন্ট পদটি রাখিতে পারেন নাই। এবারে পরবর্তী নির্বাচনে রিপাবলিকান দল প্রেসিডেন্ট পদটিও অধিকার করিবে কিনা ইহা দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয়। ইহা হইতে গুরুত্বসে আরও দুইটি প্রশ্ন স্বতঃই উপস্থিত হয়। প্রেসিডেন্টের কার্যকালের প্রধাবর্তী কংগ্রেস নির্বাচন উঠাইয়া দেওয়া উচিত কিনা? প্রেসিডেন্ট ও কংগ্রেসের স্বতন্ত্র নির্বাচনই ভাল, না বিলাতী প্রধামত আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হইতেই প্রেসিডেন্ট বা মন্ত্রিসভা নির্বাচন ভাল? দ্বিতীয় প্রশ্নটি অবশ্য খুব কমই আলোচিত হয়। কারণ এদেশের লোক স্বতন্ত্র নির্বাচনে এত অভ্যস্ত যে বিলাতী প্রধামত অ-স্বতন্ত্র নির্বাচনের কথা সহসা ভাবিতে পারে না।

আমেরিকার তথা পৃথিবীর অর্থনৈতিক ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা সহজে আলোচনা উঠিল। উদ্বৃগতি বাণিজ্য-চক্র আর কত দিন উর্দ্ধমুখী থাকিবে? কত দিনে ইহার অধোগতি শুরু হইবে? আমেরিকার রিপাবলিকান দলের নীতি এই

চক্রগতি রোধ করিতে পারিবে কিনা? এই সব বিষয়ে আলোচনা চলিল। তখন মূল্যশাসন সবে উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে। উঠাইয়া লইবার অব্যবহিত পরে মূল্য খুব বাড়িয়া গিয়াছিল। কিন্তু যে সব দ্রব্য মূল্যশাসনের ফলে বাজার হইতে অভ্যর্হিত হইয়াছিল সে সব দ্রব্য আবার দেখা দিল, উৎপাদন বাড়িয়া গেল; ফলে দাম আবার কমিয়া গেল। রিপাবলিকান দল যখন বাণিজ্য-স্বার্থের প্রতিনিধি। তাহারাই মূল্যশাসন, বা প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের “নিউডিল” বা “নতুন কারবার” পছন্দ করেন না। তাঁহারা অবার উৎপাদনের পক্ষ-পাতি। মূল্যশাসন উঠাইয়া লওয়াতে মূল্য হ্রাস পাওয়ায় জনসাধারণ ইহা পছন্দ করিতেছে। তবে এ মূল্য-হ্রাস কি বাণিজ্য-চক্রের নিম্ন আবর্তন ঘটনা করিতেছে? অনেকে মনে করেন যে জিনিষপত্রের এত চড়া দাম থাকিতে পারে না। কারণ এত দামে যথেষ্ট ক্ষেত্র জুটবে না। কাজেই মূল্য-হ্রাস অনিবার্য। তবে অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি হইলে মূল্য-হ্রাসও ক্ষত হইবে। ফলে বহু ব্যবসা গুটাইতে হইবে। তাঁহার ফল অদূরপ্রসারী হইতে পারে। কিন্তু ১৯২৯ সালে যেরূপ প্রত্যেকেই দায়িক ছিল, এবার সেরূপ নাই। কেহ কাহারও কাছে বিশেষ ধারে না। কিস্তিবন্দীতে কারবারও বিশেষ নাই। দেশের ব্যাংকগুলির মধ্যেও অধিকতর সহযোগিতা ও শৃঙ্খলা বিদ্যমান। কাজেই একজনকে বিফলতা বা বিপদ অল্প লোকের উপর সংক্রমিত হইবার সুযোগ কম। শৃঙ্খলার সহিত মূল্য স্তরে স্তরে নামাইয়া আনিবার সুযোগ ও সম্ভাবনা অনেক বেধী। আর এই মূল্যবতরণের সঙ্গে সঙ্গে যদি যথেষ্ট পরিমাণে যন্ত্রশক্তির উন্নতির দ্বারা উৎপাদন-ব্যয় কমাইতে পারা যায় তবে তো মূল্য-হ্রাস সঙ্গেও ব্যবসায়িক বিফলতার সম্ভাবনা থাকে না। আমরা আমেরিকার বাহিরের লোক কিন্তু ভীত হইয়া পড়িতেছি। এখন পৃথিবীর বাণিজ্যের উপর আমেরিকার বিশেষ প্রভাব। আমেরিকার বাণিজ্যচক্র যখন নিয়ন্ত্রণে আবর্তিত হইবে, তাহার বেগ ধনী আমেরিকা সামলাইতে পারিলেও আমরা পারিব না। ইংলণ্ডের মুদ্রানীতি ও বাণিজ্য-নীতিতে এই ভয় বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতেছে।

ইংলণ্ডের কথা উঠিতেই দেখিলাম যে ইহাদের প্রায় সকলেরই মতে ইংলণ্ডের অগ্রগতির প্রধান অন্তরায় তাহার আধুনিক যন্ত্রপাতির অভাব। যন্ত্রশক্তিতে পিছাইয়া পড়িলে উৎপাদন যথেষ্ট বাড়ে না। তখন সকলের ভাগই কমিয়া যায়। ভাগ লইয়া টানাটানি আরম্ভ হয়। সমস্ত সমস্তার সমাধানই ছুরক হইয়া পড়ে। বহু বিষয়ে আলোচনা চলিল। সমস্ত বিতর্কে সোৎসাহে যোগদান করিয়া বিশেষ আনন্দ পাইলাম।

আমেরিকান অতিথিগণকে ভারতীয় ধাতে পরিভূষিত করিবার উদ্দেশ্যে ঐ দিন ত্রিযুক্তা মহলানবীশ-গৃহিণী স্বয়ং রান্না করিয়াছিলেন। পোলাও, ডাল, কপির ডালনা, মাংস, চাটনী ও ছানার পায়স আমেরিকান ভ্রমলোকগণ পরম পরিতোষের

সহিত আহার করিলেন। বহুদিন পরে সুপক স্বদেশী খাণ্ড পাইয়া প্রচুর আহার করিয়া ফেলিলাম। আহারান্তে ডেমিং ও তাহার বালিকা-কণ্ঠ গান গাহিয়া অতিথিগণকে আপ্যায়িত করিলেন। পিয়ানো বাজাইলেন অতিথিদের মধ্যে সর্কাপেফা বয়ঃকনিষ্ঠ যুবকটি। ইনি গণিতে পারদর্শী। যুদ্ধের সময় যুদ্ধ-জাহাজের নব-নব ডিজাইন স্থপতির জ্ঞান বহু দূরদূর অল্প ক্রান্ত কথিত্য প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। রাত্রি প্রায় বারটার হোটেল ফিরিলাম।

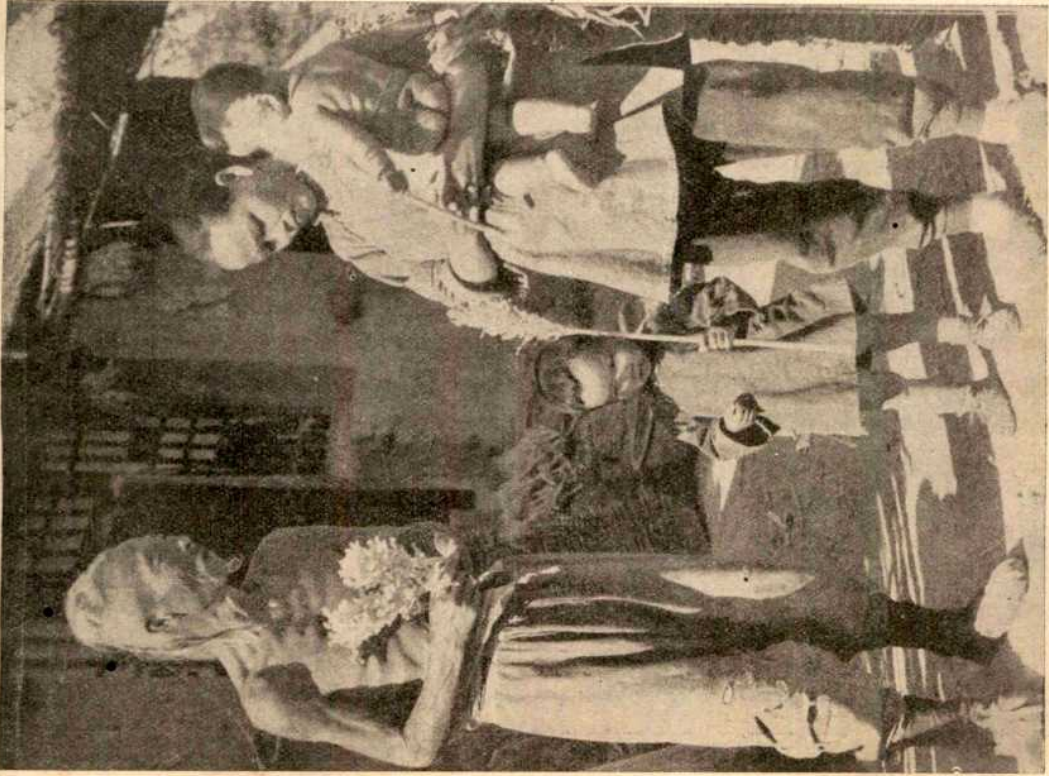
পরদিন রবিবার। দিনটা ভাল না। টপ টপ বৃষ্টি পড়িতেছিল। আমি যে হোটেলের ছিলাম তাহার নাম শোরহাম হোটেল। তখন ঐ হোটেলের দশ-বার জন ভারতীয় ছিলেন। তাহার মধ্যে প্রায় সকলেই ফুড ও এগ্রিকালচারাল অরগানাইজেশনে ভারতীয় প্রতিনিধিগণের সভ্য। সম্মিলিত জাতি-পুঞ্জের অংশীভূত ঐ প্রতিষ্ঠানটি পৃথিবীর খাণ্ড-সমস্তা সমাধানে দৃষ্টি। সমস্ত জাতির প্রতিনিধিগণ ওয়াশিংটনে মিলিত হইয়াছেন। প্রায়ই ইহাদের সভা হইতেছে। ভারতীয় দলের নেতা সু-প্রসিদ্ধ আইনজীবী ও কংগ্রেস-নেতা ডাক্তার কাইহু। ইহাদের সেক্রেটারী আজিজ আমেদ। অধ্যক্ষ মেথর—রামমুর্তি (মাদ্রাজের চীফ সেক্রেটারী), গোরওয়াল (বম্বের ফাইনাল সেক্রেটারী), ভকিল, রাত (যথাক্রমে বোম্বাই ও দিল্লীর ইকনমিকসের অধ্যাপক), রাধাকমল মুখার্জি ও রাধাকৃষ্ণ মুখার্জি। ভাবিয়াছিলাম ছুটির দিনটা ইহাদের কাহারও সঙ্গে ঘুরিব। কিন্তু এমন দুর্দিনে তাহা সম্ভব হইল না। সকালটা হোটেলের কাটাইলাম।

বিরামিত সুসজ্জিত হোটেল। কোথাও কোন বিষয়ে ক্রটি নাই। সর্বত্রই প্রাচুর্য, শোভা ও সুবন্দোবস্ত। শয়নকক্ষ ও স্নানাগার পরিপাটীরূপে সুসজ্জিত। নীচে প্রশস্ত ও সুসজ্জিত লাউঞ্জটি প্রকৃত নরনারী সমাগমে সর্বদা আনন্দময়। পিছনে নাতিবহু উঠান। তাহাতে পায়চারি করার ও বসিবার বন্দোবস্ত আছে। সমস্ত হোটেলটিকে ইচ্ছাক্রমে উত্তম রাবিবার জ্ঞান কেন্দ্রীয় উত্তাপ-ব্যবস্থা আছে। বাইরে যত শীতই হউক না কেন ভিতরে সর্বদা ৭০° হইতে ৭৫° ডিগ্রি তাপ রাখা হয়। ফলে নিদারুণ শীতেও হোটেলের মধ্যে সামান্য একটা কমল গায়ে ৬০° ছুমান যায়। বাবার ঘর তিনটি। প্রত্যেকটির মূল্য-তালিকা পৃথক। খাণ্ড যেরূপ রকমারি সেইরূপ প্রচুর। কোন জিনিষেরই অভাব বা অপ্রতুলতা নাই। ফল ও ফুলের বাহুতা ও প্রাচুর্য অতুলনীয়। প্রাতরাশে ইহার প্রথমই ফল খায়। আট আউন্স এক গ্লাস সুখাহ ও স্বচ্ছ আনারসের রস পান করিলে প্রাণ ঠাণ্ডা হয়। এরূপ কমলা, পেঁপে, বাতাবি লেবু, সবুজ লেবু ও অন্যান্য ফলের রসও প্রচুর। কেহ কেহ নির্গলিত রস পান না করিয়া ফল চিবাইয়া খান। বাতাবিটাই ইহাদের বেশী প্রিয় দেখিতেছি। কেহ স্মিট কদলী চাক্ চাক্ করিয়া কাটিয়া খন দুধ ও চিনি

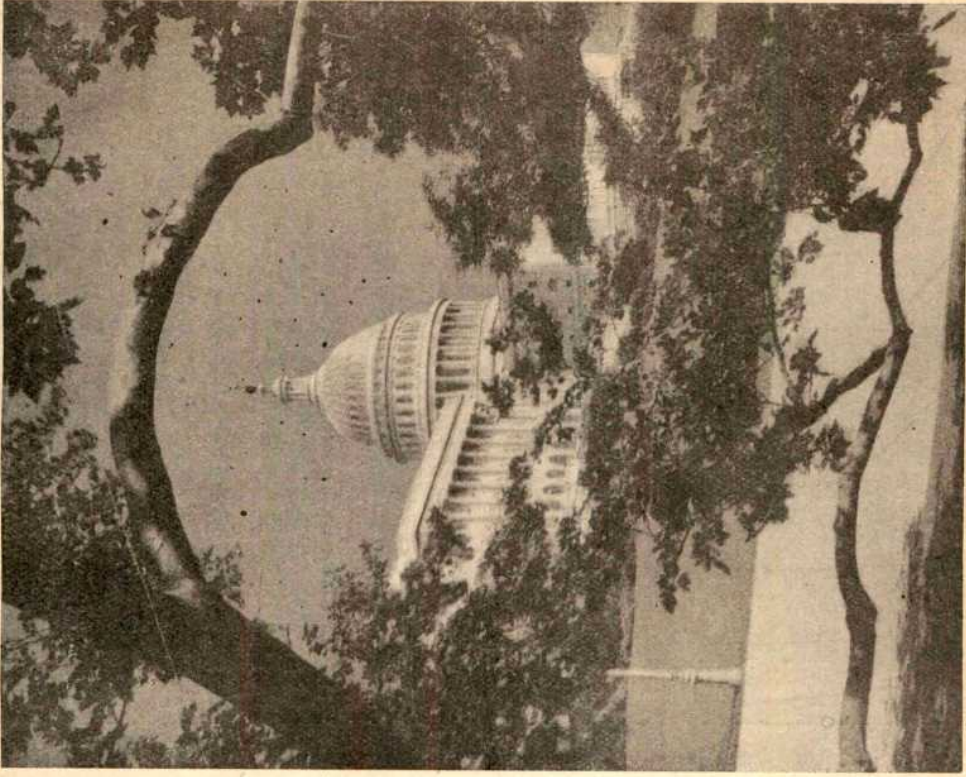
সহযোগে খাইতেছেন। মধ্যাহ্ন ভোজনে বা নৈশ ভোজনেও অনেকে ফল খান। সে সময় দেখিতেছি ধরমুজটাই বেশী চলিতেছে। ডিম, মাছ, মাংস, তরকারি সবই যথেষ্ট খাওয়ার কোন বাধা নাই। আমার সুপরিচিত মাছের মধ্যে এদেশে শুধু চিংড়ি মাছই দেখিতেছি। গলদা চিংড়ি ইহার অনেকটা মালাইকারীর মতই রান্না করে। তবে মাথাটা কাটিয়া ফেলিয়া দেয়। ছোট চিংড়ি সিদ্ধ না করিয়া বরকের মধ্যে ভিনিগার-সংযোগে ফেলিয়া দেয়। খাইতে মন্দ লাগে না। ভাতম্ন মাছের সালাদও ভাল খাইয়াছি। আইসক্রীম খুব সুখাহ। কাঁচা ছানাও দেখিতেছি এদের বেশ প্রিয়। এক প্লেট কাঁচা ছানা, আনারস, আপেল, কমলা, চেবী প্রভৃতি নানাবিধ স্মিট ফল সহযোগে খাইতে বেশ লাগে। প্রাতরাশে ফলের পর চাউল বা গমের একটি খাণ্ড চলে। এ পদেও বহু রকমারি। কেহ মুড়ি, কেহ কর্ণফেল, কেহ বা পরিজ ইত্যাদি দুধ ও চিনি সংযোগে খাইতেছে। বড় বড় হোটেলের যখন এক চৌদ্দা মুড়ি দিয়াছে তখন প্রথম আশ্চর্যই হইয়াছি। ভুট্টার খইও এদেশে খুব প্রিয়। শিকাগোর রাস্তার দুই ধারে খই ভাজিতে দেখিয়া অবাক হইয়াছি।

বাদ্যযন্ত্রের মূল্য এখানে খুব বেশী। একটি গলদা চিংড়ি ভিন ডলার বা দশ টাকা। এক প্লেট হরিণের মাংস চার ডলার বা তের টাকা সওয়া পাঁচ আনা। ফল বরং সস্তা। এক গ্লাস আনারস বা আপেলের রস হুড়ি-পচিশ সেন্ট বা দশ বার আনা। এরূপ এক গ্লাস ফলের রস আমাদের দেশে ঐ দামে এখন পাওয়া যায় না। পচিশ সেন্টে চারটি বড় বড় সুখাহ ফল এবং দশ বার সেন্টে একটি আপেল-কিনিয়াছি। আপেলগুলি খুব বড় এবং স্মিট, মুখে দিলে গলিয়া যায়। ক্যালিফোর্নিয়ার খেজুরও খুব সুখাহ এবং দামও খুব বেশী নয়। ওয়াশিংটনে দৈনিক ছয় ডলার বা হুড়ি টাকা ঘর-ভাড়া দিয়াছি। শিকাগোতে ঘর-ভাড়া ছিল আরও বেশী। বাবার ঘর চ দৈনিক প্রায় আট ডলার বা প্রায় সাতাইশ টাকা পড়িয়াছে। লওনের প্রায় তিনগুণ ঘর চ আমেরিকায়। ওয়াশিংটন হইতে শিকাগো বা নিউ ইয়র্কে ঘর চ আরও বেশী।

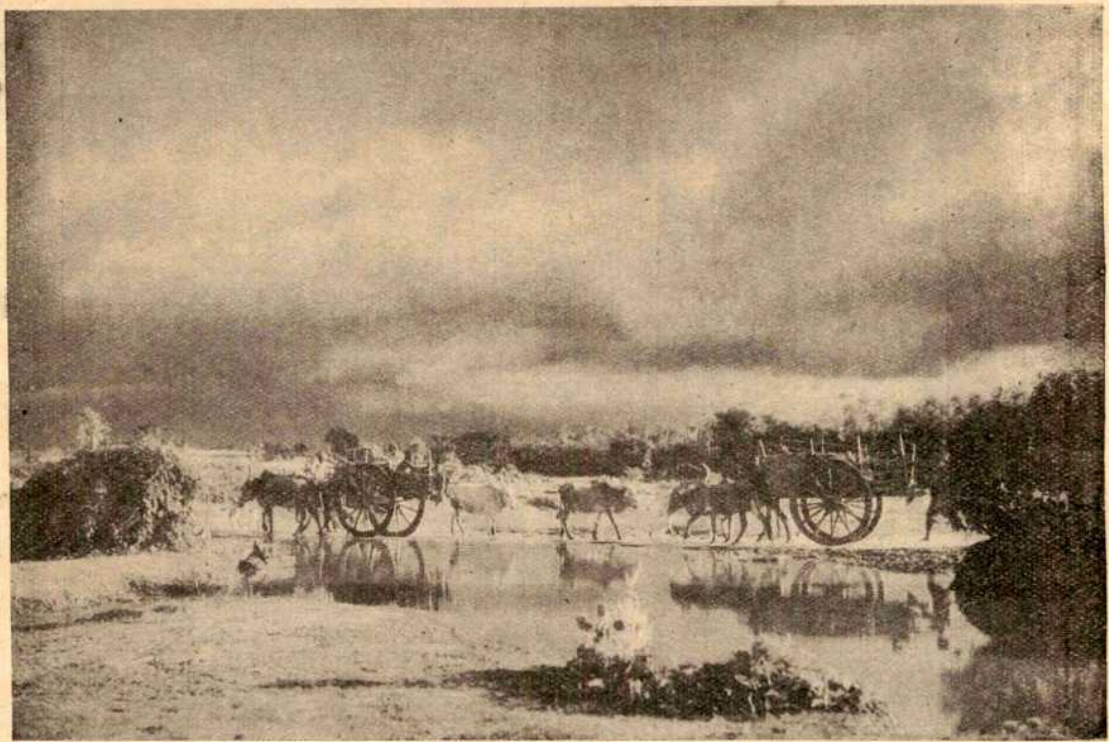
এদেশে হোটেল ভিন্ন আরও দুই প্রকারের ভোজনালয় আছে। কেকিটোরিয়া ও ড্রাগ্‌ স্টোর বা ওষধ-ভাণ্ডার। কেকিটোরিয়ার গৃহপ্রান্তে লম্বা মকের উপর সমস্ত বাদ্যযন্ত্র সাজান থাকে। প্রথমেই থাকে বারকোষ, কাঁটা চামচ প্রভৃতি ও কাগজের সার্ভিয়েৎ বা কাপড়-চাকুনি। চুকিয়া একটি বারকোষ ও প্রয়োজনমত কাঁটা-চামচ ও সার্ভিয়েৎ লইয়া মকের পাশ ধরিয়া অগ্রসর হইলাম। খাইতে খাইতে আমার ইচ্ছামত বাদ্য বাজিয়া বারকোষে রাখিলাম। মকের শেষে একটি লোক বাজ লইয়া বসিয়া আছে। সে বারকোষ দেখিয়া মূল্য বলিয়া দিল। তাহাকে মূল্য দিয়া বারকোষ লইয়া সামনে চলিয়া আসিলাম। সেখানে টেবিল চেয়ার পাড়া



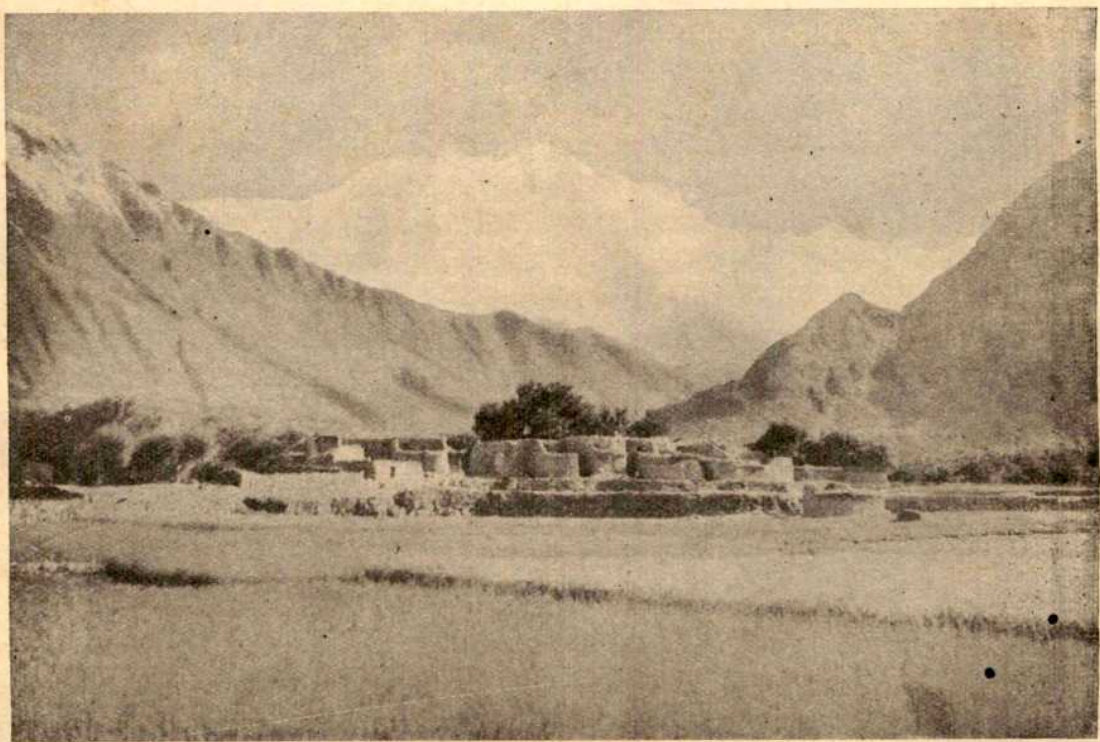
মাগধিমার চায়ী-গৃহস্থ—বর্তমান চীনের কমুনিষ্ট পার্টি এবং জাতীয় সরকারের
সংগ্রামের পরিণাম-কলে ইহাদের ভাগ্য নিশ্চিত হইবে



মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটনের কংগ্রেস-ভবন



মহীশূরের পল্লীপথে



কাশ্মীরের উত্তর দিকস্থ হুথল। অকলের চাষীদের কুটীর-সংলগ্ন শতক্ষেত্র

রহিয়াছে। ইচ্ছামত সেখানে বলিয়া ধাইয়া চলিয়া গেলাম। এখানে বেশ দ্রুত খাওয়া শেষ করা যায় এবং দামও হোটেল অপেক্ষা কম। নিউ ইয়র্কে কেকিটেরিয়ার এক প্রকার স্থানিক সংস্করণ আছে। নাম “অটোমেটন” বা “স্বয়ংক্রিয়”। সেখানে অধিকাংশ খাদ্যই যন্ত্রের মধ্যে থাকে। সামনে নাম ও দাম লেখা আছে। কোনটা পাঁচ সেন্ট, কোনটা দশ সেন্ট, কোনটা পঁচিশ সেন্ট। যন্ত্রটির সামনে গিয়া নির্দিষ্ট ছিদ্রে দামটি ফেলিয়া দিলেই এক প্লেট খাবার আপনা হইতেই বাহির হইয়া আসে। চা বা কফির যন্ত্রের সামনে বাটি সাঁজান থাকে।

দাম ফেলিয়া দিলেই যন্ত্রের সমুখের ঘূর্ণ দিয়া চা বা কফি পড়িতে আরম্ভ করে। বাটি পাতিয়া ধরিয়া নিতে হয়। বাটি ভরিলেই আবার ঘূর্ণ বন্ধ হইয়া যায়।

ড্রাগ ষ্টোরগুলিতে খাদ্য আরও সস্তা, সেখানে একটি মকের উপর বলিয়া লগ্না টেবিলে খাইতে হয়। অল্প দামে মোটামুটি খাইবার পক্ষে এগুলি বেশ।

হোটেল বক্শিশ দিবার প্রথা আছে। খাদ্যমূল্যের অন্ততঃ দশমাংশ বক্শিশ দেওয়া রীতিসম্মত। কেকিটেরিয়া বা ড্রাগ ষ্টোরে এ প্রথা নাই।

সারাদিন হোটেল থাকিয়া বৈকালে ত্রিযুত রামমূর্তি ও ডকিল মহাশয়ের সঙ্গে চান্দাল আর্ট গ্যালারী দেখিতে গেলাম। সুবিশাল সুরম্য প্রাসাদে অসংখ্য ছবির মালা। প্রাসাদটি আর্ট গ্যালারীরই উপযুক্ত। পঠনভঙ্গীতে দৃঢ়তা ও সৌন্দর্য্য যুগপৎ অভিব্যক্ত। দোতলার মধ্যস্থলে কক্ষমন্দিরের বিরাট শুভমালা পরিবেষ্টিত কলের ফোয়ারা। হৃদিকে যরের পর ঘর ছবিতে সাঁজান। যুরোপীয় শিল্পীগণের ছবিই বেশী। যে সব জগদ্বিখ্যাত ছবি লভনে দেখিয়াছি তাহাদের অনেকগুলি এখানেও দেখিলাম। কোনটি আসল কোনটি নকল জানি না। আমেরিকান শিল্পীগণের অস্বিত অর্জ ওয়াশিংটন ও তাহার ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে অনেক ছবি দেখিলাম।

পরদিন ১৮ই নভেম্বর সোমবার। বুয়ো অব দি সেজাঙ্গে গেলাম। আপিসটি মেরিল্যান্ড রাষ্ট্রের অন্তর্গত স্টুটল্যান্ড নামক স্থানে, ওয়াশিংটন হইতে দশ-বার মাইল দূরে। যাইবার রাস্তা যেমন সুনির্মিত তেমনি সুশোভন। পথে নগর-প্রান্তে বস্তি অকল দেখিলাম। বস্তির বাড়ীগুলি অল্প পরিচ্ছন্ন এবং অসংজ্ঞিত। আমাদের দেশের অবস্থাপন্ন লোকদের ক্লাউ অপেক্ষা ছোট বলিয়া মনে হইল না। বিস্তীর্ণ প্রান্তরের মধ্য দিয়া রাস্তা চলিয়াছে। লোকের ভিড় বেশী নাই।

সেজাঙ্গ আপিসে সেদিন ত্রিযুত মহলানবীশ মহাশয়ের বক্তৃতা হইতেছিল। আপিসের ডিরেক্টর হইতে প্রায় সমস্ত কর্মচারী আত্মীয় সহকারে বক্তৃতা শুনিলেন। পরে তাহার নানাবিধ প্রশ্ন করিলেন এবং মহলানবীশ মহাশয় তাহার জবাব দিলেন। আপিস-সংলগ্ন একটি কেকিটেরিয়া আছে। এখানে

আপিসের প্রধানগণের সহিত মধ্যাহ্নভোজন সমাপন করিলাম। প্রধানগণ হইতে কেরাণী ও বেহারাগণ পর্যন্ত সকলেই একই লাইনে দাঁড়াইয়া খাওয়া সংগ্রহ করিয়া একই ঘরে পাশাপাশি বসিয়া খায়। তাহাতে কোন মধ্যাহ্ন অমর্যাদার প্রশ্নই উঠে না। এ যেন খুব সহজ ও স্বাভাবিক ব্যাপার। বৈকালে মহলানবীশ মহাশয়ের সঙ্গে থাকিয়া এদের সমস্ত কার্য দেখিলাম। এরা আপিসের কাজে বহু প্রকারের যন্ত্র ব্যবহার করে। একটি প্রকাণ্ড লম্বা ঘরে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে সজ্জিত শত শত যন্ত্র দেখিয়া মহলানবীশ মহাশয়ও আশ্চর্য্যাব্বিত হইলেন।

পর দিন মহলানবীশ মহাশয়ের সঙ্গে বুয়ো অব এগ্রিকালচারে গেলাম। সেখানেও তিনি বক্তৃতা করিলেন এবং বক্তৃতান্তে সকলের প্রশ্নের জবাব দিলেন। বৈকালে “আর-কাইন্ড হলে” ত্রিযুত মহলানবীশের সংখ্যাতত্ত্ব-বিষয়ক একটি বক্তৃতা হইল। এটি তাহার ঐ বিষয়ের তৃতীয় বক্তৃতা। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিতে ঘরটি পূর্ণ।

মহলানবীশ মহাশয় “নয়না জরীপ” বিষয়ে গবেষণা করিয়া প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছেন। বহু বস্তুর পরিমাণ বা গুণ নির্ণয় করিতে হইলে সমস্ত জিনিষ পরীক্ষা না করিয়া বিশেষ রূপে নির্ধারিত কয়েকটি নমুনার পরীক্ষা দ্বারাই কাজ চলিতে পারে। দেশে এবার কত ক্ষমিতে পাট বোনা হইয়াছে ইহা নির্ণয়ের জন্য সমস্ত পাটের জমি না মাপিয়া কয়েকটি জমি নমুনাররূপে দেখিলেই চলিবে। সম্পূর্ণ জরীপ ব্যয়সাধ্য এবং অনেক ক্ষেত্রে অসাধ্য। নমুনা জরীপ সুলভ ও সুকর। অধ্যাপক-মহাশয়ের মতে নমুনা জরীপ অপেক্ষা সম্পূর্ণ জরীপ অধিকতর ভ্রাম্যশ্রমকণ্ড বটে, কারণ সম্পূর্ণ জরীপে বহু-সংখ্যক এবং বহু রকমের লোকের রিপোর্টের উপর নির্ভর করিতে হয়, অথচ তাহাদের রিপোর্টের সত্যতা নির্ণয়ের কোন বৈজ্ঞানিক উপায় নাই। নমুনা জরীপে অল্প লোকের প্রয়োজন, সুতরাং তাহাদের পটুতা ও সাধুতা সাধারণতঃ উচ্চতর হয় এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে তাহাদের রিপোর্টের সত্যতা নির্ণয়ও সম্ভব। নমুনা জরীপের দ্বারা সরকারের বহু কার্য সুগম হইতেছে। আমেরিকায় ইহার ব্যবহার সর্বাপেক্ষা বেশী; নমুনা জরীপে ইহার বৎসরে কোটি কোটি ডলার খরচ করিতেছে। যদিও ইহার সম্পূর্ণ জরীপের দ্বারা দশ বৎসর অন্তর সেলাশ বা লোকগণনা করে, তথাপি প্রতি বৎসর নমুনা জরীপের দ্বারা নূতন করিয়া লোকসংখ্যা নির্ণয় করে। ফসলের পরিমাণ নির্ণয়েও ইহার নমুনা জরীপের বহুল ব্যবহার করে। স্বতঃই ইহার নমুনা জরীপের অত্যন্তম প্রযুক্তি মহলানবীশ মহাশয়ের বক্তৃতা শ্রবণ করিতে বিশেষ উৎসুক। অধ্যাপকবরের প্রতিষ্ঠা এবং ইহাদের জানিবার ও আরও ভাল করিয়া কাজ করিবার আশ্রয় দেখিয়া বিশেষ আনন্দবোধ করিলাম। ঐ সময় মহলানবীশ মহাশয় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের “ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল কমিশনের” নমুনা জরীপ

লাব্ কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯শে নবেম্বর মঙ্গল-বারের পর তিনি ওয়াশিংটন ত্যাগ করেন।

২০শে নবেম্বর বুধবার বাজেট ব্যুরোতে গিয়া তত্ত্বা-কর্মচারিগণের সহিত পরিচিত হইলাম। এখানে সি, আর, রোজেন নামক বাজেট ব্যুরোর জনৈক উচ্চপদস্থ কর্মচারী আমার কাজের সর্ব বিষয়ে সহায়তা করেন। তাঁহার অমায়িক ব্যবহার এবং সাহায্যপারায়ণতার জন্য আমার আমেরিকার কাজ স্পন্দিত হয়। বাজেট ব্যুরোতেই আমি আমার মূল কর্মস্থল স্থাপন করিলাম।

দক্ষিণ আমেরিকা ও চীনের কয়েকজন সরকারী কর্মচারী আমেরিকার বাজেট নির্মাণ প্রণালী শিক্ষা করিবার জন্য তখন বাজেট ব্যুরোতে কাজ করিতেছিলেন। এই শিক্ষা সমাপ্ত করিতে তাঁহাদের দুই বৎসর লাগিবে। কেহ বৎসরাধিক এখানে আছেন। তাঁহারা সকলেই সঙ্গতিপূর্ণ যুবক। উরু-গয়ার আর, জে, বারু, পরাগয়ার জেরেটিন, কিউবার রোডল কো ভিয়েগাস, পানামার এলবার্দো ম্যাক্সালা, মেক্সিকোর এলবার্দো বোটার্স এবং চীনের লিয়েন ইছো—ইহারা সকলেই সদালাপী। দক্ষিণ-আমেরিকার ভ্রমলোকগণের মাতৃভাষা স্প্যানিশ অথবা পর্তুগীজ। সকলেই ইংরেজি জানেন, তবে কথ্য বাক্যে বা ক্রত নয়। চীনা যুবকটি সর্বদা কর্মগতচিত্ত। টেকারীর কর্মচারিগণের এক দিন আমাকে বলিয়াছিলেন যে এই চীনা যুবকটি তাঁহাদের একাউন্টের নিয়মগুলি তাঁহাদের অপেক্ষাও ভাল আয়ত্ত করিয়াছেন। এক দিন ইহাদের সহিত একটি কিউবান ভোক্তাশ্রম সমাঙ্গ পোলাও-সংযোগে মধ্যাহ্নভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছিলাম। ভিয়েগাসের সঙ্গে আরও দু-একদিন মধ্যাহ্নভোজন করিয়াছি। দক্ষিণ-আমেরিকার দেশগুলির রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা সত্ত্বেও শিলাদি বিষয়ে অসহায়তার কথা ইহারা হৃৎকের সহিত বিবৃত করিয়াছে। ভারতবর্ষের প্রতি ইহাদের সহজ সমবেদনা আছে এবং ভারতবর্ষের কথা শুনিতে ইহাদের খুব আগ্রহ। আমার ওয়াশিংটন অবস্থান কালে নিউইয়র্কে সম্মিলিত জাতি-পুঞ্জের সভায় দক্ষিণ-আফ্রিকার ভারতীয় দলনের বিরুদ্ধে ভারত-সরকারের অভিযোগ আলোচনার উপস্থিত হয়। ত্রিযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত এই অভিযোগ সভায় উত্থাপিত করেন। জেনারেল স্মিথস্বয়ং এই অভিযোগের উত্তর দিবার জন্য উপস্থিত হন। ইংরেজ সরকার ও মার্কিন সরকার দক্ষিণ-আফ্রিকার পক্ষে ভোট দেন। তৎসত্ত্বেও দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে ভারতবর্ষের জয়লাভে বিশ্ব বিশ্বস্ত হইয়াছিল। দক্ষিণ-আমেরিকার সমস্ত রাষ্ট্র তখন ভারত-সরকারের অঙ্গুলে ভোট দেন। ধবরের কাগজওয়ালারা লিখিল, বর্তমানে জাতিপুঞ্জের সভায় অশ্রুত জাতিগণের একটি ভোট হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

পরে শিকাগোতে ব্রেজিলের একটি সরকারী কর্মচারীর

সহিত আমার আলাপ হইয়াছিল। ইনিও যুবক এবং এ দেশের বাজেট তৈরির কাজ শিখিতে আসিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, ভারতবর্ষ, চীন এবং ব্রেজিলের ভবিষ্যৎ সমুজ্জ্বল। ভবিষ্যতের পৃথিবী ইহাদেরই।

এদেশের দৈনিক ধবরের কাগজ দেখিয়া আশ্চর্য হইয়াছি। সব শহরেই ধবরের কাগজ আছে। বড় শহরে একাধিক কাগজ প্রকাশিত হয়। নিউইয়র্ক টাইমসই সমধিক প্রসিদ্ধ। ইহার পৃষ্ঠাসংখ্যা নির্দিষ্ট নহে। যেদিন যেকোনো ছাপাইবার উপযুক্ত ধবর থাকে সেই অনুসারে পৃষ্ঠাসংখ্যা বাড়ে বা কমে। আমি ৪৮ পৃষ্ঠার কম কখনও দেখি নাই। বহুদিনই ৬৪ পৃষ্ঠা দেখিয়াছি। রবিবারে ২৫০ পৃষ্ঠা দেখিয়াছি। একখানা ২৫০ পৃষ্ঠার ধবরের কাগজ আমাদের বিশ্বকর ত বটেই, নাড়াচাড়া করাও কষ্টকর। আমাদের দেশের ষ্টেটসম্যান বা আনন্দবাজার পত্রিকা সাধারণতঃ আট-দশ পৃষ্ঠা মাত্র থাকে। বিলাতের কাগজেও তাহার বেশী থাকে না। লন্ডন টাইমস ব্যতীত অল্পাংশ কাগজের আয়তন তো আরও কম। আমেরিকার ধবরের কাগজে প্রথম পৃষ্ঠার ধবর থাকে, লন্ডন টাইমসে প্রথম পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন থাকে।

এ বিষয়ে আমাদের দেশের কাগজগুলি পূর্বে বিলিতি প্রথা অনুসরণ করিত, এখন আমেরিকান প্রথা অনুসরণ করে। পৃথিবীর সব দেশের ধবরই নিউইয়র্ক টাইমসে থাকে। ভারতবর্ষের ধবর যথেষ্ট থাকে। ডিসেম্বরের প্রথম একটি রবিবারের সংখ্যার নেহেরু ও জিন্নার বড় বড় ছবি দিয়া তাঁহাদের সম্বন্ধে একটি স্থলর প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল। প্রবন্ধকারের মতে জিন্না নিপুণ উকিলের ভায় স্ব-মতে অটল, আর নেহেরু সর্বদাই পরমত্তের সহিত নিঃসমত্তের সামঞ্জস্য বিধানে প্রস্তুত, সর্বদা নুতন সত্যে উপনীত হইবার জন্য উৎসুক। প্রবন্ধটিতে নেতৃত্বের বিপরীত-গুণ-মূলক মহত্ব বিশদ ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। সাধারণতঃ ইহাদের প্রকাশিত ভারতবর্ষের ধবরে কোন ভুল দোষ নাই। সাগ্রহে স্বদেশের ধবর পাঠ করিভাম। হিন্দু-মুসলমানে থাকিরা থাকিরা দাড়া চলিতেছে। কন্সটিটিউশন্ট এ্যাসেম্বরির আরম্ভ হইল। আমেরিকা-সরকার সরকারী ভাবে ইহার কার্যের সাফল্য কামনা করিয়া বাণী প্রেরণ করিলেন। নেহেরু জিন্না ও বলদেব সিং সহ লর্ড ওয়াত্তেল লণ্ডন যাত্রা করিলেন। সেখানে বিলাতি মন্ত্রিসভার সহিত তাঁহাদের আলোচনা ব্যর্থ হইল। মন্ত্রিমন্ত্রনের প্রস্তাবের যে অংশের অর্থ লইয়া মতবিরোধ চলিতেছিল, বিলাতি মন্ত্রিসভা ৬ই ডিসেম্বর তারিখে তাঁহার নিজস্ব ভাষা প্রচার করিলেন। পরে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি সে ভাষা স্বীকার করিয়া লইলেন। শরণ বহু ও জয়প্রকাশনারায়ণ ব্রিটিশের সহৃদয় সম্বন্ধে সন্নিধান হইয়া কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি হইতে পদত্যাগ করিলেন। ভারত-সরকার ও আমেরিকা-সরকার দুতবিনিময়ে স্বীকৃত হইলেন।

আসক আলি ওয়াশিংটনের ভারতীয় দূত নিযুক্ত হইলেন।
নেহেরু বড়লারের বদলে এসোসিয়েটেড চেম্বার অব
কমার্সের কলিকাতার বার্ষিক অধিবেশনে বক্তৃতা করিয়া
স্বাধীন ভারতে ইংরেজ ব্যবসাদারগণকে অভয় দিলেন।
তঁাহাদিগকে সাম্রাজ্যবাদী মতবাদ পরিত্যাগ করিতে উপদেশ
দিতে গিয়া বলিলেন যে, এমন যে ব্রিটিশরা তাহাও সাম্রাজ্য-
বাদী সরকারের সম্পর্কে আসিয়া এক সময়ে লোকের আস্থা
হারাইয়া ফেলিয়াছিল। মজুমিশনের ১৬ই মে তারিখের
প্রস্তাব কি সত্যই সাধুতা-প্রস্তুত, না উহা ইংরেজের পুরাতন
কপট-লীলার একটি নূতন প্রকাশ মাত্র ইহা তখন ভারতবর্ষে
খুব আলোচিত হইতেছে। এই সব খবর সাগ্রহে বুঝিয়া
দেখিতাম।

এখানকার বাসে কণাকটর নাই, টিকিট নাই, ভাড়ার
ভারতম্য নাই। এক দিকে যত দূরই যাই না কেন ভাড়া পাঁচ
সেন্ট। ঐ ভাড়ায় একবার বাস বদলানও চলে। প্রবেশ-
দ্বারের পাশে একটি বাস আছে। তার উপরে একটি ছোট
ছিন্ন। যাত্রীগণ বাসে উঠিয়াই ঐ বাসের মধ্যে একটি পাঁচ
সেন্ট মুদ্রা ফেলিয়া দেয়। আমি প্রথম দিন বাসে উঠিয়া নিয়ম
না জানায় বাসে মুদ্রা না ফেলিয়াই বসিয়া পড়িলাম। কোন
কণাকটর দেখি না। কেহ ভাড়া চায় না। নামিবার সময়
ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করিয়া বাসে পরস্যা ফেলিয়া নামিলাম।
সাধারণ লোকের এই সাধুতা দেখিয়া বিস্মিত হইলাম।
ভাবিলাম আমাদের দেশে এইরূপ হইলে বাস কোম্পানী

হুদিনেই ফেল পড়িত। যাহাদের বাস বদলাইবার দরকার
তাহারা ড্রাইভারের নিকট হইতে একখানি টিকিট চাহিয়া
লয়। উহা পরবর্তী বাসের ড্রাইভারকে দিয়া দিতে হয়।
এই ব্যবস্থায় ইহাদের বাস চালাইবার খরচ কম পড়ে।

যে টাকারটা বাঁচিল তাহা দ্বারা ড্রাইভারকে বেণী মাহিনা
দিতে পারে অথবা বাসের ভাড়া হাস করিতে পারে।
সামান্য সাধুতার দ্বারা কিরূপে কম প্রমে কাজ হয়, লোকের
আয় বাড়ি ও খরচ কমে ইহা তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

সেদিন রাজ্যে ডাক্তার কাইজুর সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ
হইল। তাঁহার ছেলে এদেশে লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন।
পুত্রের অসুস্থতায় পিতা তাহার বাল্যকালের একটি সহ-
পাঠিনীর সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলেন। তিনি এখন
বিবাহিত। স্বামী লক্ষপ্রতিষ্ঠ উকিল। তাঁহাদের অসুস্থতায়
এড়াইতে না পারিয়া কাইজুর মহাশয় তাঁহাদের সঙ্গে দু-এক দিন
বাস করিয়া তাঁহাদের সঙ্গে পরম পরিচুষ্টি হইয়াছেন। কাইজুর
মহাশয় উৎসাহের সহিত ইহাদের স্তুতি করিলেন। তিনি
বলিলেন, “আমরা দূর হইতে শুনি আমেরিকানরা শুধু ডলার
এবং যন্ত্রের পূজারী এবং ইহাদের পারিবারিক জীবন মোটেই
স্বপ্নের নয়। কিন্তু একথা মিথ্যা। ইহাদের স্তম্ভুর পারি-
বারিক জীবন এবং আভিপ্রেরণা দেখিয়া আমি বিস্মিত
হইয়াছি। ইহাদের জ্ঞানস্পৃহাও অসাধারণ। ইহাদের
লাইব্রেরিতে ভারতীয় আইনের যত বই দেখিয়াছি তত বই
ভারতবর্ষের কোন লাইব্রেরিতেও দেখি নাই।”

এক প্রান্তে

এ. এন. এম. বজলুর রশীদ

অসহায় পথপ্রান্তে যারা পড়ে আছে,
যাদের প্রাণের সোনা ধুলি-ধুলরিত
যাদের আকাশভরা অন্ধকার প্রেরণিত রাত,
ধুমায়িত সকল বাসনা,
কে তাদের ভাষা দেবে,
অন্ন দেবে—পথের সঞ্চয়,
স্বর্ধের আলোক যুষ্টি যুষ্টি,
সবুজের ভায়ল বিলাস ?
যুগে যুগে বঞ্চিত প্রাণের
জমেছে অনেক ধূলা,

বহু অভিযোগ,
কঙ্কালের শত হিমালয়
পৃথিবীর পথ ঢাকিয়াছে—
যুক্তির আশ্বাদ কোথা ?
কে আমিবে মননের শেষে
প্রাণের অমৃত-মধু
বিপুল বিধান
উন্মুক্ত-প্রসার দৃষ্টি ?
আজি তার অবজ্ঞাত নাম—
অজানা সে পাছ লাগি
এ কবির রহিল প্রণাম।

প্রাগ্‌জ্যোতিষ

ডক্টর শ্রীবিমলাচরণ লাহা, এম-এ, বি-এল, পিএইচ. ডি ; ডি. লিট

পুরাকালে প্রাগ্‌জ্যোতিষের অপর একটি নাম ছিল কামরূপ। প্রাগ্‌জ্যোতিষ কামরূপ অপেক্ষা বৃহত্তর ছিল। ইহা পূর্বা-জ্যোতিষ শাস্ত্রের একটি কেন্দ্র। শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণেরা কামরূপে আসিয়াছিল। বঙ্গদেশে ইহারা আচার্য্য বলিয়া বিদিত এবং আসামে দৈবজ্ঞ বলিয়া পরিচিত। ইহাদের পূর্ব পুরুষেরা জ্যোতিষ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিত। প্রত্যেক রাজ্যের একটি করিয়া জ্যোতিষি ছিল। জ্যোতিষির প্রধান কার্য্য ছিল গ্রহদিগকে পূজা করিয়া সন্তুষ্ট রাখা। রামায়ণ এবং মহাভারতে প্রাগ্‌জ্যোতিষের উল্লেখ আছে। এই দুইটি গ্রন্থের মতে ইহারা সুবিখ্যাত জাতি। মহাভারতে প্রাগ্‌জ্যোতিষ একটি ব্রহ্ম রাজ্য বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ইহার রাজা ছিল ভগদত্ত। মহাভারত হইতে আরও আমরা জানিতে পারি যে প্রাগ্‌জ্যোতিষ নামে একটি অম্বর রাজ্যে মরক ও যুদ্ধ নামে দুইটি অম্বর রাজ্য করিত। কিরাত এবং চীনদিগের রাজ্যের সীমান্তে প্রাগ্‌জ্যোতিষ অবস্থিত। ভারতযুদ্ধে প্রাগ্‌জ্যোতিষের রাজা ভগদত্ত কুরুদিগের মিত্র ছিল। ভারতযুদ্ধে ভগদত্ত চীন-দিগের সৈন্য লইয়া যুদ্ধ করেন। সমগ্র উত্তর এবং পূর্ব বঙ্গদেশ প্রাগ্‌জ্যোতিষ রাজ্যের অধীনে ছিল। বরাহমিহির পূর্ব দিকস্থ যে সকল দেশের উল্লেখ করেন তাহাদের মধ্যে প্রাগ্‌জ্যোতিষ একটি। রঘুবংশের মতে ব্রহ্মপুত্র নদীর উত্তর দিকে প্রাগ্‌জ্যোতিষ দেশ অবস্থিত; সেইজন্য আমাদের মনে হয় কেবল কামরূপ এই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল তাহা নয়। উত্তর বঙ্গ এবং উত্তর বিহারের অনেক অংশ ইহার অন্তর্গত ছিল। যোগিনীভক্ত হইতে জানা যায় যে সমগ্র ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা, রংপুর এবং কুচবিহার সমেত কামরূপের অন্তর্ভুক্ত। হেমচন্দ্রের অভিধানচিন্তামণিতে প্রাগ্‌জ্যোতিষ কামরূপের উল্লেখ আছে। রঘুবংশে ইহারা দুইটি বিভিন্ন জাতি বলিয়া বর্ণিত। মহাভারতে গৌহাটীর নিকটস্থ কামাখ্যার উল্লেখ আছে। কামাখ্যার মন্দির শাক্ত হিন্দুদিগের একটি পবিত্র স্থান। পুরাকালে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা তিন ভাগে বিভক্ত :

- (১) সাদির (পূর্ব জিলা),
- (২) আসাম (মধ্য জিলা),
- এবং (৩) কামরূপ (পশ্চিম জিলা)

কামরূপের পশ্চিম বিভাগের অপর একটি নাম ছিল কুশ-বিহার। এখানে রাজাদিগের প্রাসাদ ছিল এবং ইহার রাজধানী কামাতিপুর হইতে সমগ্র দেশের নামকরণ করা হইয়াছে। ব্রহ্মপুত্র নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত গৌহাটী কাম-রূপের প্রাচীন রাজধানী। কুশবিহারের রাজধানী কামাতি-পুর পাবনা হইতে ১০০ মাইল দূরে অবস্থিত। গৌহাটী পাবনা

হইতে ইহার দিগন্ত দূরে অবস্থিত। পূর্ব দিকে চীনদিগের স্থ নামে একটি দেশের দক্ষিণ পশ্চিম বর্কের জাতির সীমান্ত দেশ-গুলি পর্য্যন্ত কামরূপ বিস্তৃত। দক্ষিণ-পূর্ব দিকের জঙ্গলগুলিতে হাতীর বাস ছিল। কামরূপে একটি ব্রাহ্মণ রাজা ছিলেন। যদিও তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন বটে, অন্তরে তিনি বৌদ্ধধর্মের প্রগাঢ় ভক্ত ছিলেন। কনৌজের রাজা হর্ষবর্দ্ধনের সহিত তাঁহার বর্ষদ্বাভায় তিনি মিলিত হন। পুরাকালে কামরূপ পশ্চিমদিকে করতোয়া নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ স্তম্ভ শিলালিপিতে জগদ্রাজ্যের বাহিরে একটি সীমান্ত দেশ বলিয়া কামরূপের উল্লেখ আছে। পুরাণের মতে রংপুরের অন্তর্ভুক্ত করতোয়া নদী হইতে পূর্বদিকে প্রাগ্‌জ্যোতিষের রাজধানী কামরূপ বিস্তৃত। মণিপুর, জয়ন্তিয়া, কাছার, পশ্চিম আসাম, ময়মনসিংহ এবং শ্রীহট্টের কতকগুলি অংশ কামরূপ রাজ্যের অন্তর্গত। বর্তমান যুগে গৌয়াপাড়া হইতে গৌহাটী পর্য্যন্ত কামরূপ বিস্তৃত। পুরাকালে কামরূপ দেশ প্রায় দশ হাজার লি বিস্তৃত ছিল। ইহার জমিগুলি উর্বর এবং চাষের সুবিধার জন্য প্রচুর জল পাওয়া যাইত। উত্তরে ভূটান কামরূপের অন্তর্গত। দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্র এবং লখ্যার সঙ্গম পর্য্যন্ত কামরূপ-দেশের সীমা ছিল। কালিকাপুরাণের মতে প্রাগ্‌জ্যোতিষ এবং কামাখ্যা কিংবা গৌহাটী অভিন্ন। কামাখ্যার নীলকূট পর্বতে কামাখ্যা দেবীর মন্দির আছে। তাম্রেশ্বরী দেবীর মন্দির প্রাচীন কামরূপের উত্তর-পূর্ব সীমার নিকটে অবস্থিত। রাজশেখরের কাব্যমীমাংসায় প্রাগ্‌জ্যোতিষের স্থান পূর্বদিকে দেখা যায়।

প্রাগ্‌জ্যোতিষ রাজ্যে আত্র, বেল, বট প্রভৃতি অনেক ফল এবং বৃক্ষ ছিল। প্রজাদের নিকট হইতে কর আদায় করা হইত না। দোষের জন্য দণ্ডপ্রদানও বিরল ছিল। কামরূপে অনেক প্রকার চন্দন, ধূপ ও ধূনা পাওয়া যাইত। যখন চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েন সাং কামরূপে আসেন তখন এখানে তিনি দেখেন যে জাম এবং নারিকেল প্রচুর। এখানকার জল-হাওয়া ভাল ছিল। লোকেরা সৎ, ধর্মভীরু এবং বৈধ্যাশীল ছিল; তাহারা দেবতার পূজা করিত কিন্তু বৌদ্ধধর্ম তাহাদের আস্থা ছিল না। চৈনিক পরিব্রাজক এখানে কোনও বৌদ্ধ-বিহার দেখেন নাই। এখানে অনেক দেবমন্দির ছিল; রাজা বিজোংসাহী ছিলেন; বড়দূর হইতে ভাল ছাত্ররা এখানে অধ্যয়ন করিতে আসিত। যদিও রাজা বৌদ্ধ ছিলেন না, তিনি বীশজিসম্পন্ন বৌদ্ধ ভ্রমণদিগকে যথেষ্ট সম্মান করিতেন।

কামরূপের পূর্ব দিকে অনেক পর্বত ছিল। ইহার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বন্যহস্তী পাওয়া যাইত এবং যুদ্ধের জন্য হস্তী পাঠান

হইত। চৈনিক পরিব্রাজকের মতে বর্তমান কামরূপ এবং ক-মো-জু-পো অভিন্ন। বর্তমান কামরূপের রাজধানী গৌহাটী। উচ্চ ব্রহ্মদেশের পশ্চিম দিকে কামরূপ ১৬০০ লি বিস্তৃত। আলবেরুণির মতে কামরূপ কনৌজ রাজ্যের পূর্বদিক পর্যন্ত বিস্তৃত। উত্তর-পূর্বদিকে কামরূপ রাজ্য স্বাধীন বলিয়া মনে হয়। কামরূপের রাজা গুপ্তসম্রাট সমুদ্রগুপ্তকে কর দিতেন। বহুদিন ধরিয়া কামরূপে ব্রাহ্মণের প্রাধান্য ছিল। যদিও এই রাজ্য গুপ্ত রাজাদিগকে কর দিত, আভ্যন্তরীণ শাসনে ইহা স্বাধীন ছিল। হর্ষবর্ধন কামরূপের রাজা ভাস্করবর্ষের সহিত একটি সন্ধি করেন। ভাস্করবর্ষের পিতা স্থিতিবর্ষ যুগাক মহাসেনগুপ্তের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। এই সন্ধিতে গৌড়দিগের ক্ষতি হইয়াছিল। গৌড়ের রাজা শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণস্বর্ণ ভাস্করবর্ষের আয়ত্তাধীনে আসে।

হর্ষচরিত হইতে জানা যায় যে, প্রাগজ্যোতিষের যুবরাজ ভাস্করহ্যতি নামে একজন দূতকে হর্ষের নিকটে পাঠান। যখন হর্ষবর্ধন শশাঙ্কের সহিত যুদ্ধ করিতে চান, কামরূপের যুবরাজ ভাস্করবর্ষ কর্তৃক প্রেরিত হংসবেগ নামে একজন দূতের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। ভাস্করবর্ষ হর্ষের সহিত সন্ধিহুঁজে আবদ্ধ হইবার জন্য অনেক উপচৌকন পাঠান। হর্ষ এবং ভাস্কর বর্ষ কর্তৃক শশাঙ্ক পরাজিত হন। কামরূপের রাজা হর্ষের আদেশ মানিতেন। কামরূপের রাজা কুমার হর্ষের মিত্র ছিলেন। ঐহর্ষের উৎসবে ভাস্করবর্ষ যোগদান করেন। কামরূপ পরে হর্ষের হস্তগত হয়। কামরূপের রাজা স্থিতি বর্ষকে পরাজিত করিয়া মহাসেনগুপ্ত সুষা অর্জন করেন। স্থিতিবর্ষ বাস্তবিক একজন যৌধরি ছিলেন এবং তিনি কনৌজের ঐহবর্ষ এবং অবন্তিবর্ষের পূর্বপুরুষ।

যখন চৈনিক পরিব্রাজক ছয়েন সাং নালন্দায় ছিলেন কামরূপের রাজা ভাস্করবর্ষ তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করেন। সর্ব-প্রথমে এই নিমন্ত্রণ তিনি এতৎ করেন নাই কিন্তু তাঁহার শিক্ষক শীলভদ্রের অনুরোধে তিনি কামরূপে আসেন এবং ইহার রাজা ভাস্করবর্ষ তাঁহাকে সাদরে আহ্বান করেন। যখন ভাস্করবর্ষ তাঁহার জম্বুদ্বীপ সন্দর্শন করেন তিনি উত্তরে বলেন যে তিনি ভাঙ্গ দেশের লোক।

যদিও ভাস্কর বর্ষ জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন, তিনি নিজেকে ক্ষত্রিয় কিংবা রাজপুত্র বলিয়া মনে করিতেন। যখন ভাস্কর বর্ষ বর্ধর শালস্তম্ভ কর্তৃক পরাজিত হন, কাশ্মীরের রাজা ললিতাদিত্য কামরূপ জয় করেন।

নরক কামরূপদেশ জয় করিয়া প্রাগজ্যোতিষে বাস করেন। এখানে তিনি বিচারালয় স্থাপন করেন। তাঁহার পুত্র ভগদত্ত পিতার সকল লগুণ পাইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র বজ্রদত্ত কোত্রিবংশের মর্যাদা অক্ষর রাখেন। তাঁহার পুত্র রত্নপাল অত্যন্ত বলশালী রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্র পুরন্দর-পাল ধার্মিক ও কবি ছিলেন। পুরন্দরপালের পুত্র ইন্দ্রপাল

ধার্মিক এবং জায়পন্নায়ক ছিলেন। ইন্দ্রপালের মোহর হইতে জানা যায় যে তিনি প্রাগজ্যোতিষের রাজা এবং মহারাজা-ধিরাজ উপাধিধারী ছিলেন। কামরূপের রাজা বজ্রদত্ত শিবের উপাসক। রাজা বনমাগদেবও শিবপূজা করিতেন। রাজা বীরবাহু যুদ্ধে সুষা অর্জন করেন এবং অশ্বা নামে একটি জ্বীলোকের পাণিগ্রহণ করেন। নেপালের লিচ্ছবী বংশজাত বৎসদেবী এবং শিবদেবের পুত্র জয়দেব কামরূপের রাজা ঐহর্ষদেবের কন্যা রাজ্যমতীকে বিবাহ করেন। রাজ্যমতী ভগদত্তরাজকুলজা নামে স্নাত ছিলেন। কামরূপের রাজা ভাস্করবর্ষের নিধনপূরে আবিষ্কৃত তাম্রলিপি হইতে কামরূপ রাজবংশের পরিচয় পাওয়া যায়। তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

পুণ্ড্রবর্ষা

সমুদ্রবর্ষা

বলবর্ষা

কল্যাণবর্ষা

গণপতিবর্ষা

মহেন্দ্রবর্ষা

নারায়ণবর্ষা

মহাভূতবর্ষা

চন্দ্রবর্ষা

স্থিতিবর্ষা

স্থিতিবর্ষা (অপর নাম যুগাক)

সুপ্রতিষ্ঠিতবর্ষা

ভাস্করবর্ষা

পালবংশীয় রাজা ধর্মপালের পুত্র দেবপাল কামরূপ জয় করেন। রামচরিতের মতে রামপাল নামে এক জন সীমান্ত নৃপতি কামরূপ জয় করিয়াছিলেন। গৌড়ের রাজারা উপহ্যুপরি এদেশ জয় করেন। কামরূপ রাজ্য বাংলার পালরাজাদিগের রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। ঐঃ দাদশ শতাব্দীতে কামরূপ শাসনের জন্য কুমারপাল তাঁহার মন্ত্রী বৈদ্যদেবকে যথেষ্ট ক্ষমতা দেন। বাংলার পালরাজার আশামের অন্তর্গত প্রাগজ্যোতিষভূতিকে শাসন করিত। রসপালের পুত্র ধর্মপাল কামরূপ জয় করেন। কামরূপের রাজা জয়পাল বরেন্দ্রের এক জন ব্রাহ্মণকে নয়-শত সুষা দান করেন। বৈদ্যদেবের কমেসি দানপত্র হইতে জানা যায় যে প্রদত্ত ঐষটি কামরূপমণ্ডল এবং প্রাগজ্যোতিষভূতিকে অবস্থিত। প্রাগজ্যোতিষের রাজা দেবপালের বক্ততা স্বীকার করেন। লক্ষণসেন কামরূপ জয় করেন। লক্ষণসেনের সভাকবি

উদ্যাপতিধর প্রাগজ্যোতিষ-জয় সহস্রে একটি কবিতা লেখেন। শরণ নামে লক্ষণ সেনের আর একজন সভাকবি কামরূপ জয় বর্ণনা করেন। চন্দ্ররাজা বলচন্দ্রের পুত্র বিমলচন্দ্র কামরূপ শাসন করেন। তিনি মালব রাজবংশীয় রাজা ভরুহরির স্ত্রীকে বিবাহ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র গোবিন্দচন্দ্র এবং তাঁহার পরে ললিতচন্দ্র কামরূপ শাসন করেন।

খ্রীঃ দ্বয়োদশ শতাব্দীতে বাংলা এবং বিহারের বিজেতা বখতিয়ারের পুত্র মহম্মদ কামরূপ আক্রমণ করেন। করতোয়া নদীর তীর দিয়া তিনি উত্তর দিকে ষাণ্ডিক হন কিন্তু পরে পরাজিত হইয়া প্রত্যাবর্তন করেন। ১৮১৬ সাল পর্যন্ত কামরূপ নিজের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল।

রেখাগণিতে পণ্ডিত জগন্নাথ

শ্রীবিজয়গোপাল বসু

কথিত আছে, স্থপতিকর্তা ব্রহ্মা প্রজাদের সুবিধার জন্ত রেখাগণিত আবিষ্কার করেন। তাঁহার নিকট হইতে বিশ্বকর্মা ইহা প্রাপ্ত হন এবং কালক্রমে বিশ্বকর্মার এই শাস্ত্র ধরনীতলে প্রচার করেন।

রেখাগণিতের আধুনিক বাংলা নাম জ্যামিতি। এক সময় জলদ্বন্দ্ব নামেও ইহা পরিচিত ছিল। Geometry ইহার বৈদেশিক সংজ্ঞা। তিনটি শব্দের বিশ্লেষণে একই অর্থ পাওয়া যায়।

সূত্র—ক স্তম্ভরতি বেধা পৃথিবীং পরিমাপ্তি স্ফুটতি বা ইত্যর্থঃ।

জ্যামিতি—জ্যা (বলুধা)+মিতি (মানম্ পরিমাণম্)। জিওমেট্রি (geometry)—জি (ge=earth—পৃথিবী)+মেট্রন (Metron=Measure—পরিমাপ)।

বৈদেশিক সংঘাতের ফলে ভারতবর্ষ হইতে এক সময় এই গণিতবিজ্ঞান বিলুপ্ত হয়।

মুসলমান আধিপত্য কালে পাশ্চাত্য দেশ হইতে রেখাগণিত পুনরায় ভারতে আনীত হয়। ইউক্লিডের গ্রন্থাবলম্বনে আরবী ভাষায় “মিজাতি” গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থ ভারতবর্ষেও প্রচারিত হয়। ইহা অধ্যয়ন করিয়া সে যুগে কেহ কেহ জমিজমীপ ইত্যাদিতে ব্যুৎপত্তিলাভ করিয়া রাজকার্য্য পরিচালনায় পর্যন্ত সহায়তা করিয়াছিলেন। আকবরের রাজসভার অন্যতম রত্ন মহারাজ তৌড়রমর ক্ষেত্রভূ-বিদ্যায় প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়াছিলেন। শাহজাহানের রাজত্বকালে যিনি বঙ্গাধিপ মুর্শিদকুলি খাঁকে ভূচ্ছ তাচ্ছিল্য করিতে সাহসী হইয়াছিলেন সেই দর্পনারায়ণ কাহ্ননগো ছিলেন ক্ষেত্রভূ-বিজ্ঞান বিশেষ ব্যুৎপন্ন। এই বিদ্যা আয়ত্ত করিয়াছিলেন বলিয়া রাজ্যের আয়গা-জমির সকল তথ্য তাঁর নবদর্পণে ছিল।

ভৈলঙ্গ দেশীয় সুপণ্ডিত জগন্নাথ ক্ষেত্রভূবিদ্যায় পারদর্শী

ছিলেন। তিনি ছিলেন বাদশাহ আওরঙ্গজেবের সভার অল্পতম রত্ন। জয়পুরাধিপতি মহারাজ জয়সিংহ এই গুণী ব্যক্তিকে নিজ রাজ্যে আনয়ন করেন। মহারাজের উৎসাহে এবং প্রেরণায় জগন্নাথ ১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত ভাষায় রেখাগণিত প্রণয়ন করেন। যুগবন্ধে গ্রন্থকার বলিতেছেন—

অপূর্ব বিহিতং শাস্ত্রং যত কোণাব বোধনং।

ক্ষেত্রেষু জায়তে সম্যক্ ব্যুৎপত্তির্গণিতে তথা ॥

শিল্পশাস্ত্রমিদং প্রোক্তং ব্রহ্মণা বিশ্বকর্মেণে।

পারম্পর্য্য বশাদেভদাগত্যং ধরনীতলে ॥

ভূচ্ছিন্নং মহারাজ জয় সিংহাজয়া পুনঃ।

প্রকাশিতং ময়া লম্যক্ পণকানন্দ হেতবে ॥

বিন্দু, রেখা, ক্ষেত্র প্রভৃতির সূত্র তাঁহার গ্রন্থে এইরূপে দৃষ্ট হয় :—

যঃ পদার্থ দর্শনযোগ্যঃ বিভাগানর্হ স বিন্দুর্বাচ্যঃ। যঃ পদার্থঃ দীর্ঘঃ বিভাগরহিতঃ বিভাগার্হঃ স রেখাপদবাচ্যঃ। বিভাগ দৈর্ঘ্যয়ো যদ্ ভিদ্যাতে তদ্ব্যবস্থায় দেবক্ষেত্রং। ইত্যাদি।

রেখাগণিতের অপর একটি সূত্রে গ্রন্থকারের রচনা-মার্গের এবং নীরস বিষয়কে চিত্তাকর্ষক করিয়া বলিবার ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। যথা—

যন্ত ত্রিভুজস্য ভূজদ্বয়ং অঙ্গ ত্রিভুজস্য ভূজৈঃ সমানং ভবতি তদা ভূজ্য কোণত্রয়মপি অঙ্গ ত্রিভুজস্য কোণৈরবশ্যং সমানং ভবিষ্যতি।

এই প্রকার সহজ, সরল এবং প্রাঞ্জল ভাষায় সম্পূর্ণ রেখাগণিত-শাস্ত্রের জটিল সূত্রগুলি বিবৃত করিয়া পণ্ডিত জগন্নাথ ক্ষেত্রভূকে সহজ ও সুখবোধ্য করিয়া গিয়াছেন। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন ভাষায় যে জ্যামিতি-শাস্ত্র অধীত হইতেছে, তাহা অল্পবিস্তর জগন্নাথেরই রেখাগণিতে রূপান্তর।

কুণ্ঠীদের সেবার আত্মবলিদান

শ্রীমণীকুমার দত্তগুপ্ত বি-এল্

খ্রীষ্ট তাঁহার শিষ্যগণকে টিপদেশে বসিয়াছিলেন, "He that findeth his life shall lose it; and he that loseth his life for my sake shall find it. He that taketh not his cross and followeth not after me, is not worthy of me. Heal the sick, cleanse the lepers; freely you have received, freely give." অর্থাৎ—'যে ব্যক্তি নিজের জীবনের সুখের দিকে তাকাইবে সে জীবন হারাইবে, আর যে আমার জন্য জীবন বিসর্জন দিবে সে প্রকৃত জীবন লাভ করিবে। যে ব্যক্তি ক্ষুধা গ্রহণ করিয়া আমার অনুসরণ না করে সে আমার উপযুক্ত শিষ্য নয়। পীড়িতের রোগ দূর কর, কুণ্ঠীদের সেবা কর। অযাচিতভাবে তুমি যাঁহা পাইয়াছ তাহা মুক্তহস্তে দান কর।' খ্রীষ্টের সমসাময়িক শিষ্যমণ্ডলী এবং পরবর্তী অনুগামীগণের মধ্যে যাহারা তাঁহার এই বাণী অনুসরণ করিয়া বহুজনের হিত ও সুখের জন্ত জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে দেবাবধের বৃদ্ধ প্রতীক কাদার ড্যামিয়েনের নাম খ্রীষ্টধর্মের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। পরহিতের জন্ত এরূপ একজন মহান সেবাজাতীর আত্মবলিদানের আদর্শ সর্বদেশে সর্বকালে অনুকরণীয়। 'কুণ্ঠীদের সেবা কর'—খ্রীষ্টের এই উপদেশটি জীবনের মূলমন্ত্র-রূপ গ্রহণ করিয়া তদুদ্দেশ্যে জীবনপাত করিবার জন্তই বেন মহাত্মা ড্যামিয়েন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

প্রায় আশী বৎসর পূর্বে ইউরোপে বেলজিয়মের অন্তর্গত এক গওগ্রামে যোশেক ডি ভিয়াষ্টার নামে এক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার বাল্যজীবনের বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা পাওয়া যায় না। তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত একই বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেন এবং স্বীয় অসামান্য প্রতিভাবলে নানা বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পরবর্তী জীবন আলোচনা করিলে দেখা যায় যে তিনি একই সময়ে চিকিৎসক, স্ত্রীশাকারী, স্ত্রীধর, গৃহনির্মাতা, শিক্ষক, পাচক, উদ্যানরক্ষক ও চিত্রকররূপে বিভিন্নমুখী কর্মপ্রচেষ্টার পরিচয় দিয়াছিলেন—ইহা হইতে স্বতঃই অস্বীকৃত হয় যে যোশেক বাল্যকাল হইতেই এই সকল বিষয়ে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্ত সচেষ্ট ছিলেন।

তিনি বাল্যকালেই তাঁহার জীবনের লক্ষ্য স্থির করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পেপ্পিলাস প্রসিদ্ধ লুডেইন নগরের আঠের ধর্মযাজক ছিলেন। বালক ভিয়াষ্টার লুডেইন মঠে থাকিয়া ধর্মপ্রচারকের কার্য শিক্ষা করিবার জন্য পিতার অনুমতি চাহিলেন। পিতা পুত্রের দৃঢ় সংকল্প দেখিয়া সন্মতি দিলেন। এই মঠে ধর্মপ্রচারের শিক্ষা লাভ করিয়া ভিয়াষ্টার ড্যামিয়েন নামে অভিহিত হইলেন।

এই সময়ে ড্যামিয়েনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পেপ্পিলাসের বিদেশে ধর্মপ্রচারের জন্য যাইবার কথা স্থিরীকৃত হয়। যাত্রার দিন নিকটবর্তী হইলে পেপ্পিলাস গুরুতর পীড়ার আক্রান্ত হইলেন। দুই দিবস পর যে জাহাজ ছাড়িবার কথা সে জাহাজে যাত্রা করিবার তাঁহার কোন সম্ভাবনাই রহিল না, কারণ তিনি যথাসময়ে আরোগ্যলাভ করিতে পারেন নাই। এই শুভকার্যে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া পেপ্পিলাস অতীব মর্মান্বিত হইলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বিষন্ন দেখিয়া ড্যামিয়েন বলিলেন, "ভ্রাতঃ, আপনার পরিবর্তে আমি যাইব—ইহাতে কি আপনার মনে শান্তি ও আনন্দ হইবে?" পীড়িত ভ্রাতা সানন্দে বলিয়া উঠিলেন, "আমি নিশ্চিতই সুখী হইব। তুমি যদি আমার হৃদয়ভিষিক্ত হইয়া ধর্মপ্রচারের কার্যে বিদেশে গমন কর, তাহা হইলে আমি মনে করিব যে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে।"

ড্যামিয়েন অনতিবিলম্বে ভ্রাতার প্রতিনিধিত্বপে ধর্মপ্রচারের জন্ত বিদেশে গমন করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিয়া সজ্ঞানায়ককে (Head of the Order) লিখিলেন। অনুমতি প্রদত্ত হইল। ড্যামিয়েন পরিবারবর্গের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া চিরদিনের জন্ত দক্ষিণসমুদ্রের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন।

প্রশান্ত মহাসাগরের কতকগুলি দ্বীপ ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে কাপ্তেন কুক আবিষ্কার করেন। এই দ্বীপশ্রেণী অতি মনোরম এবং বিচিত্র বৃক্ষাদি দ্বারা সুশোভিত। অসংখ্য নারিকেল-বৃক্ষ তারতুমিতে সগর্বে মস্তক উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান আছে। এই স্থানেই কাদার ড্যামিয়েন ধর্মপ্রচারের জন্ত গমন করিয়া তথায় সুদীর্ঘ নয় বৎসর কাল হতভাগ্য কুণ্ঠীদের সেবার আত্মনিয়োগ করেন। এই সকল দ্বীপের অধিবাসিগণ খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী। এক শত বৎসর পূর্বে কতিপয় খ্রীষ্টান মিশনারী এই স্থানে গমন করিয়া তদন্ত্য অধিবাসিগণকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। এই দ্বীপপুঞ্জের মধ্যভাগে অবস্থিত হাওয়াই নামক বৃহত্তম দ্বীপে একটি আয়েয়গিরি আছে। এই আয়েয়গিরি বিস্তারিত থাকায় দ্বীপের অধিবাসিকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করিতে খ্রীষ্টান মিশনারীদের অভিশয় বেগ পাইতে হইয়াছিল। এই আয়েয়গিরির অধুনাপাতে মাঝে মাঝে নিকটবর্তী স্থানগুলির প্রভূত অনিষ্ট সংসাধিত হইয়াছে। দ্বীপবাসিগণ এই ভয়ঙ্কর আয়েয়গিরিকে দেবী পিলির (Pele) আবাসস্থান বলিয়া বিশ্বাস করিত। তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে যদি তাহারা দেবীর পূজা পরিত্যাগ করে, তবে দেবী কোপাঘিতা হইয়া আয়েয়গিরি হইতে উষ্ণ গলিত পদার্থ নিক্ষেপ করিয়া তাহাদের বিনাশ করিবেন। তাহারা অনেক

বার জনবহুল গ্রামগুলিকে এই আগ্নেয়গিরির ভীষণ অগ্ন্যুৎপাতে একেবারে নিশ্চিহ্ন হইতে দেখিয়াছে। সুতরাং তাহারা সর্বদাই সম্ভ্রান্ত থাকিত এবং কেহই দেবী পিলির পূজা পরিত্যাগ করিয়া মিশনরীদের প্রচারিত খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিতে সাহসী হইত না।

হাওয়াই দ্বীপের রাণী দ্বীপবাসিগণের খ্রীষ্টধর্মে দাক্ষিত হইবার আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়া এক অভিনব উপায় উদ্ভাবন করিলেন। এক দিন রাণী একাকিনী আগ্নেয়গিরির চতুর্দিকস্থ বিস্তীর্ণ সমতলভূমি অতিক্রম করিয়া পর্বতপার্শ্বে আরোহণ করিলেন। তিনি বহুদিনে পুঞ্জীভূত আগ্নেয় পদার্থ দেখিতে পাইলেন। দেবী পিলির নিকট পবিত্র বলিয়া পরিগণিত এক বৃক্ষের শাখা রাণী আগ্নেয়গিরির মুখে নিক্ষেপ করিলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া বলিলেন—“পিলি, যদি তুমি প্রকৃতপক্ষেই দ্বাদশ দেবী হইয়া থাক, তাহা হইলে এই অপমানের প্রতিশোধ লও।” দেবীর কোণের কোন পরিচয় পাওয়া গেল না; ভূগর্ভ হইতে কোন গর্জন শ্রুত হইল না, বীরহৃদয়া রাণীকে বিনাশ করিবার জন্ত কোন গলিত স্রাবও নির্গত হইল না। বীরাদনা রাণী বিজয়গর্বে প্রমত্তা হইয়া অক্ষতদেহে আগ্নেয়গিরি হইতে অবতরণ করিলেন এবং দ্বীপবাসিগণকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন—“তোমরা সকলেই দেখিলে দেবী পিলি শক্তিহীন। এই খ্রীষ্টান মিশনরীগণ যে পরমেশ্বরের বার্তা প্রচার করিতেছেন সেই পরমেশ্বর ব্যতীত অন্য দেবতা নাই এবং খ্রীষ্ট ব্যতীত মানবজাতির অভ্যর্থনাকর্তা নাই।” দ্বীপবাসিগণ এই অত্যন্ত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া এবং রাণীর আশ্বাস বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া খ্রীষ্টান প্রচারকগণের নিকট পরমেশ্বরের কণা শুনিতে আরম্ভ করিল এবং কালক্রমে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হইল।

প্রশান্ত মহাসাগরের এই দ্বীপগুলি দেখিতে মনোরম হইলেও একটি দোষে এগুলি কলঙ্কিত এবং ভীতির কারণ হইয়া উঠিয়াছে। এই সকল দ্বীপের অধিবাসিগণ ভীষণ কুষ্ঠ ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া অসহ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে। দক্ষিণ-সমুদ্রে এই দ্বীপগুলিতে কুষ্ঠব্যাধি এত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল যে গবর্ণমেন্ট ইহার সংক্রমণ প্রতিরোধ-মানসে কুষ্ঠদিগের বাসের জন্ত একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ পৃথকরূপে নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। অত্যন্ত দীপগুলি হইতে ঘনকণ্ঠ অজ্ঞান গিরিশ্রেণীর দ্বারা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন একটি ক্ষুদ্র দ্বীপের দুইটি পটীতে এই হতভাগ্য কুষ্ঠগণ নিঃসহায় অবস্থায় নিরানন্দ জীবন যাপন করিত। তাহাদিগের সঙ্গে কোন চিকিৎসক এবং ধর্মযাজক বাস করিতেন না। অজ্ঞানের নিরাপত্তার জন্য এই কুষ্ঠদিগকে নির্জন দ্বীপে চিরদিনের জন্য নির্বাসিত করা হইত।

দ্বীপগুলির প্রধান ধর্মযাজক যখনই পারিতেন তখনই কুষ্ঠদিগকে দেখিতে যাইতেন। হতভাগ্য কুষ্ঠদিগকে নিঃসহায় অবস্থায় দ্বীপে কেলিয়া যাইতে প্রধান ধর্মযাজকের প্রাণে দুঃখ

হইত। অন্যত্র ধর্মপ্রচারের কার্য চালাইবার লোক বিশেষর হস্তে অতি অল্পই ছিল; ইহা ছাড়া কুষ্ঠদিগের সহিত বাস করিবার জন্য কাহাকেও পাঠাইলেই সে নিশ্চিতরূপে কুষ্ঠ-রোগে আক্রান্ত হইয়া পরিণামে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে—এই আশঙ্কাও ছিল। কাজেই প্রধান ধর্মযাজক বিষম সমস্যায় পড়িলেন। কিন্তু হতভাগ্য কুষ্ঠদিগের জন্য ড্যামিয়েনের হৃদয় করুণায় বিগলিত হইল। এক দিন ইউরোপ হইতে কতিপয় ধর্মপ্রচারক আসিয়া উপস্থিত হইলে ড্যামিয়েন তৎক্ষণাৎ প্রধান ধর্মযাজকের নিকট গিয়া বলিলেন, “এই ধর্মপ্রচারকগণই এক্ষণে আমার কাজ করিতে পারিবেন। আমাকেই মোলাকাই যাইতে অনুমতি দিন।” ড্যামিয়েনের অসাধারণ আত্ম-ত্যাগের ভাব দেখিয়া বিশপ বিস্মিত হইলেন এবং মোলাকাই দ্বীপে যাইতে তাঁহাকে অনুমতি দিলেন। ড্যামিয়েন তখন তেজস্বী বৎসরবয়স্ক বলিষ্ঠ ও করিৎকর্য্য যুবক। তিনি তৎক্ষণাৎ পিতামাতা, গৃহ ও আত্মীয়স্বজনদিগকে পুনরায় দেখিবার আশা চিরন্তরে বিসর্জন দিলেন। এই কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবার ভাবনাও তাঁহার মনে উপস্থিত হইল না। কুষ্ঠ যে কি ভাংঘ ব্যাধি এবং মোলাকাইয়ে গমন করিলেই যে তিনি এই রোগে আক্রান্ত হইতে পারেন তিনি ইহা সম্যকরূপে অবগত ছিলেন। মোলাকাইয়ে যাইবার জন্ত ড্যামিয়েন এত দূর ব্যস্ত হইলেন যে তিনি কাহারও নিকট হইতে যথোচিত বিদায় গ্রহণ না করিয়া এবং কোনও নূতন পোশাক-পরিচ্ছদ সংগ্রহ না করিয়াই সেই দিবসই রওনা হইলেন।

একধা নি ক্ষুদ্র নৌকা ড্যামিয়েনকে ভাড়া হইতে সমুদ্র-ভীরে লইয়া গেলে তিনি অসংখ্য নিঃসহায় কুষ্ঠিকে প্রেমবহু ভাবে দণ্ডায়মান দেখিতে পাইলেন। ড্যামিয়েন ইহাতে বিচলিত হইলেন না। তিনি মনে মনে নিজেকে বলিতে লাগিলেন, “যোশেফ, এই তোমার জীবনের প্রধান দ্রব্য; এই কুষ্ঠদিগের সেবায়ই তোমার জীবন উৎসর্গ করিতে হইবে।” মোলাকাই দ্বীপে ড্যামিয়েন যখন প্রথম উপনীত হইলেন, তখন তাঁহার বাসস্থানের কোন বন্দোবস্ত ছিল না; তিনি এক প্রকাণ্ড বৃক্ষের নীচে উন্মুক্ত স্থানে নিজা যাইতেন। প্রায় আট শত কুষ্ঠি নিজেদের তৈরি জীর্ণ কুঠীয়ে নিরানন্দ জীবন যাপন করিত। ড্যামিয়েন কালবিলম্ব না করিয়া কুষ্ঠদিগের জন্ত বাস্ত্য-কর কুঠির নির্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন। কাঠাদি প্রেরণ করিবার জন্ত গবর্ণমেন্টকে লিখিয়া পাঠাইলেন। তিনি যে কেবল গৃহনির্মাণের পরিকল্পনাই করিয়াছিলেন তাহা নহে। পূর্বে কুষ্ঠগণ সাময়িকভাবে কতকটা দুঃখ-যন্ত্রণা ভুলিবার জন্ত সুরাপান করিয়া সময় অতিবাহিত করিত। এক্ষণে ড্যামিয়েনের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া কুষ্ঠদিগের মধ্যে অনেকেই কুঠার, করাত প্রভৃতি যন্ত্রপাতির সাহায্যে নিজেদের বাসোপ-যোগ্য কুঠির নির্মাণ করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সারি সারি সুন্দর বাস্ত্যকর কুঠির নির্মিত হইয়া গেল।

কুষ্ঠীদের পল্লীতে প্রচুর জল সন্নিবেশের বন্দোবস্ত ছিল না। জলের অভাবে পল্লীগুলি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিতে পারা যাইত না। ফাদার ড্যামিয়েন পাহাড়ে একটি ঝরণার কথা শুনিয়া কতিপয় বাসকের সহিত উহার অনুসন্ধানে বাহির হইলেন। এক উপত্যকার উপরিভাগে বৃহৎ একটি ঝরণা দেখিতে পাইলেন। ঝরণাটি গ্রীষ্মকালের প্রথমে উত্তাপে শুষ্ক হইয়া যাইত না; উহাতে সর্বদাই অক্লান্ত জল পাওয়া যাইত। ড্যামিয়েন নলসংযোগে ঝরণা হইতে কুষ্ঠীদের পল্লীতে জল আনয়ন করিলেন। তদবধি কুষ্ঠীদের জলের আর কোন অভাব রহিল না।

এইরূপে দিন যাইতে লাগিল। ড্যামিয়েন প্রতিদিন প্রাতে গির্জায় উপাসনা সমাপন করিয়া দৈনন্দিন কাজে নিযুক্ত হইতেন। এই দৈনিক উপাসনাই তাঁহাকে প্রতিকার্য্যে অপূর্ব প্রেরণা ও শক্তি প্রদান করিত। প্রথমতঃ, তিনি মোলাকাই দ্বীপের পিতৃমাতৃহীন শিশুদের জন্য প্রতিষ্ঠিত অনাথ-ভবনে যাইতেন, পরে বালকবালিকাদের বিভাগে যাইয়া তাহাদিগকে শিক্ষা দিতেন; তৎপর গৃহে ও হাসপাতালে রোগীদের দেখিতেন। এই সকল নির্দিষ্ট কাজ সমাপন করিয়া ড্যামিয়েন মিশ্রীর কাজও কিছু কিছু করিতেন। শত্রু-সমর্থ কুষ্ঠীদের সহায়তায় তিনি ক্ষুদ্র গির্জাটির পরিসর আরও বাড়াইলেন। ছুইটি নতুন গির্জাও নির্মিত হইল। ধর্ম্মবাজক রূপে ড্যামিয়েনকে দীক্ষা, বিবাহ, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া প্রভৃতি অধুষ্ঠানেও যোগদান করিতে হইত। প্রকৃতপক্ষে ফাদার ড্যামিয়েন মোলাকাই দ্বীপে কুষ্ঠীদের বিচারক, পিতা, শাসক ও জাগরু ছিলেন। “Come unto me, all ye that labour and are heavy laden, and I will give you rest” অর্থাৎ ভোমরা যাহারা হুঃখকষ্টে জর্জরিত আছ, আমার নিকট এস; আমি তোমাদিগকে শান্তি দিব—যীশুখ্রীষ্টের এই আশ্বাসবাণী লইয়াই ফাদার ড্যামিয়েন কুষ্ঠীদের নিকট যাইতেন, হতভাগাদের শারীরিক ক্লেশ দূর করিতেন এবং ভগবানের কথা শুনাইয়া তাহাদের নিরানন্দ জীবনে আনন্দ ও আশার সঞ্চার করিতেন। বহু বৎসর কুষ্ঠিপল্লীতে বাস করিয়া কুষ্ঠীদের সেবায় তিনি দেহ-মন-প্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহার এই অলোক-সামান্য নিঃস্বার্থ সেবায় কলে মোলাকাই দ্বীপের কুষ্ঠীদের সুখস্বচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি পাইয়াছিল। একাদশ বৎসর একনিষ্ঠ সেবায় পরও কৃষ্ঠব্যাধি তাঁহার শরীরে সংক্রমিত হয় নাই। কিন্তু তিনি বেশী দিন এই সংক্রমণ হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে পারিলেন না। তিনি পীড়িত ও যত্ন কুষ্ঠীদের বর্নিত সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, হুতরাং তাঁহার নিজ শরীরে এই ব্যাধির সংক্রমণ অবশ্যম্ভাবী। অবশেষে তদৈক ডাক্তার চিকিৎসা ব্যপদেশে মোলাকাইয়ে আসিয়া ড্যামিয়েনের শরীরে কৃষ্ঠ-ব্যাধির লক্ষণ দেখিতে পাইলেন। ব্যাধির আক্রমণ দেখিতে

পাইয়া ডাক্তার ড্যামিয়েনকে এ বিষয়ে সতর্ক করিয়া দিয়া ছিলেন।

ড্যামিয়েন হাসিয়া উত্তর দিলেন, “আমি অনেক পূর্বেই ইহা আশঙ্কা করিয়াছিলাম। ভূমি যদি বলিতে এখানকার কাজ পরিচাণ করিয়া অন্যত্র চলিয়া গেলে আমার এই ব্যাধি সারিয়া যাইবে, তাহা হইলেও আমি এ স্থান পরিচাণ করিতাম না। আমি এই হতভাগ্য কুষ্ঠীদের সেবার ভার দেখ্কার গ্রহণ করিয়াছি—ইহাদের সেবায়ই আমি প্রাণ বিসর্জন করিব।” আর প্রকৃতপক্ষে তিনি কুষ্ঠীদের সেবায়ই প্রাণ বিসর্জন করিয়াছিলেন; ‘কুষ্ঠীদের সেবা কর’—শিষ্টগণের নিকট প্রভু যীশুর এই উপদেশ শুদ্ধ ফাদার ড্যামিয়েন তাঁহার নিজ জীবনে অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া ছিলেন। এই কাল ব্যাধিতেই ড্যামিয়েনের অমূল্য জীবন তিলে তিলে ক্ষয়প্রাপ্ত হইল। তাঁহার জীবনের ব্রত শেষ হইল। তিনি যে কার্য্যের সূচনা করিয়াছিলেন, তাঁহার জাতি উহা গ্রহণ করিলে অন্যান্য ধর্ম্মবাজকগণ দেখ্কার এই কার্য্যে যোগদান করিলেন। আজকাল চিকিৎসক ও শুদ্ধবাসীরা দ্বিগুণ হাসপাতালে কুষ্ঠদিগকে দেখিতেছেন, শিক্ষকগণ বিদ্যালয়ে কুষ্ঠ বালক-বালিকাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন। কিন্তু ফাদার ড্যামিয়েন যখন প্রথম এই কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন তখন কেহই তাঁহাকে উৎসাহ দেন নাই, কোন সহায়ত্বই দেখান নাই। সুদূর প্রশান্ত মহাসাগরস্থিত একটি ক্ষুদ্র দ্বীপে বেল-জিম্বাবাসী জনৈক ধর্ম্মবাজক হতভাগ্য কুষ্ঠীদের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, বহির্জগৎ এই সময়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল। ক্রমে ক্রমে সমগ্র ইউরোপ এই মহাপুরুষের অলৌকিক আত্মবলিদানের কথা জানিতে পারিল। ইংলণ্ডের সংবাদপত্র-গুলিতে মোলাকাই দ্বীপের কুষ্ঠ-পল্লীর বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হইতে লাগিল। ইহার জন্য অর্থ সংগৃহীত হইতে লাগিল। ইউরোপবাসীগণ ড্যামিয়েনের অলোকসামান্য সেবাপরায়ণতা ও স্বার্থত্যাগের কথা শুনিয়া শুভিত হইলেন। তাঁহার ড্যামিয়েনের অপূর্ব সেবাকার্য্যের ভূমী প্রশংসা করিয়া প্রকৃত অর্থ সাহায্য প্রেরণ করিতে লাগিলেন। ড্যামিয়েন তাঁহার জীবনসময়ই ইউরোপীয়গণের সহায়ত্ব ও অর্থস্বত্বের কথা জানিতে পারিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিয়াছিলেন। ইংলণ্ড হইতে ম্যাজিক ল্যাক্টার্ন, মানচিত্র, কলের গান, চিত্র প্রভৃতি বিবিধ দ্রব্য উপহার-স্বরূপ ড্যামিয়েনের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। এই সকল দ্রব্যের মধ্যে একটি মূল্যবান উপহার ড্যামিয়েন সময়ে ও পরম আদরে নিজ কুঠীরে রক্ষা করিয়াছিলেন—এই উপহার সাধু জ্ঞানিসের নিকট প্রভুর আবির্ভাবের ক্ষুদ্র চিত্র-খানি। ইহা ইংলণ্ডের একজন বিখ্যাত চিত্রকর কর্তৃক অঙ্কিত। শুদ্ধ ড্যামিয়েন নিজ প্রকোষ্ঠে শয্যার পাদদেশে প্রাচীরগায়ে এই চিত্রখানি প্রলম্বিত করিয়া রাখিয়াছিলেন।

আজকাল মোলাকাই কুষ্ঠ-পল্লীর প্রকৃত উন্নতি দাখিত

হইয়াছে। কৃষ্ণদিগের সেবা ও তত্ত্বাবধানের জন্য ভাল অভাবনীয় পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। পৃথিবীতে যত দিন বন্দোবস্ত হইয়াছে। তত্ত্ব জ্যামিতির জীবনব্যাপী তপস্যা, সেবার্থের মহিমা থাকিবে তত দিন তত্ত্ব জ্যামিতির নিকাম নিকাম সেবা ও আত্মত্যাগের কলেই কৃষ্ণ-পত্নীর একম সেবা ও আত্মবলিদানের কাহিনী পরিকীর্ণিত হইতে থাকিবে।

আর্টের ত্রিধারা

শ্রীসূর্য্যপ্রসন্ন বাজপেয়ী চৌধুরী

ভারতবর্ষের চিত্রাঙ্কন, ভাস্কর্য, স্থাপত্য ও অজ্ঞাত সূক্ষ্মার কলা-শিল্প একদা সমগ্র বিশ্বে সমাদৃত হয়েছিল; কিন্তু আজ ভার শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে বৈদেশিক সকার করে।

বর্তমান সময়ে অনেকের একটা ধারণা জন্মেছে যে, আর্ট বা শিল্প-কলা তার আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে উদারগামী হয়েছে। আধুনিক সভ্যতা বহুক্ষেত্রে কলা-বিদ্যাকে উপযুক্ত মর্যাদা দিতে কুণ্ঠিত হচ্ছে। আধুনিক আর্টও তাই স্বর্ণমুণ্ডে গিয়ে মিথ্যা আড়ম্বর ও সৌধীনতার আভরণ নিয়ে আপনার দৈহিক চাকবীর প্রয়োগ পাচ্ছে।

মনে প্রশ্ন জাগে, আর্ট বর্তমান অবস্থা থেকে কবে মুক্তি পাবে? আর কলা-বিজ্ঞানের অমূল্যমানুষের মানবজাতির পার্থক্য উন্নতির অন্তরায়-স্বরূপ বলে যে একটা কথা মাঝে মাঝে শোনা যায় তারও কোন ভিত্তি আছে কিনা সে কথাটাও ভেবে দেখতে হবে।

ইউরোপের প্রায় সকল দেশেই কলা-বিজ্ঞানের প্রকৃত উন্নতি সাধিত হয়েছে এবং তার কলে তত্ত্বাবধানী জীবন হয়ে উঠেছে। আনন্দময়, আর তাদের দেশের সর্বত্র কলা-বিজ্ঞানের প্রচার ও প্রসার হয়েছে। অবশ্য প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ওদেশে শিল্পকলার যে অপার ক্ষতি হয়েছে, সহজে তা পূরণ হওয়া সম্ভবপর নয়। সাম্প্রতিক রাশিয়ার শিল্প ও কলা-বিজ্ঞানের প্রকৃত স্বরূপ আজও আমাদের নিকটে পূর্ণতর পরিচয়ের অপেক্ষার আছে।

সভ্যতা ও কলা-বিজ্ঞানের সম্বন্ধ গভীর। তার কারণ সভ্যতার কেন্দ্রস্থল বড়-বড় নগরী, আর সেগুলোকে কেন্দ্র করেই কলা-বিজ্ঞান ক্রমবিকাশিত হয়ে উঠতে থাকে। শিল্পকলা হচ্ছে সভ্যতার অলঙ্কার-স্বরূপ। দেশ সমৃদ্ধ হলে কলা-বিজ্ঞান জন-গণের নিকটে সমাদৃত হয়।

শিল্প-কলার মূল আদর্শ হল সভ্যতা, শিবম, সুন্দরমের সাধনা। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই উন্নত আদর্শকে উপলব্ধি করাই ছিল ভারতীয় শিল্প-সাধনার মর্মকথা। শুধু ভারতের নয়, জগতের সকল দেশেরই শ্রেষ্ঠ সূক্ষ্মার কলা এই আদর্শকেই অষ্ট্রিয় ক্ষেত্রে রূপায়িত করবার চেষ্টা করে আসছে। প্রথমে চিত্রকলার বিষয় আলোচনা করা যাক। চিত্রকলার প্রধান

তিনটি ধারা দেখা যায়। তার মধ্যে একটি হল চীন ও জাপান দেশে প্রচলিত পদ্ধতি। দ্বিতীয়টি হল ইউরোপ ও ইউনানের চিত্রাঙ্কন পদ্ধতি; আর তৃতীয়টি হচ্ছে ভারতীয় চিত্রকলা। এর মধ্যে কোনটি সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও শ্রেষ্ঠ সে সম্বন্ধে গবেষণা যুক্ত বা তুলনামূলক আলোচনা এখানে আমরা করতে যাচ্ছি না।

চীনা ও জাপানী চিত্র বহু বৎসর যাবৎ ভারতবর্ষে খুব সমাদৃত। এগুলো শুধু যে আমাদের দেশে বনী লোকদের বৈঠকখানার শোভারূপে করে তা নয়, এদেশের শিল্পী ও শিল্পরসিকদের মধ্যেও এগুলোর আদর ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এসব চিত্রে এমন একটা বৈশিষ্ট্য ও স্বকীয়তা রয়েছে যা পৃথিবীর অজ্ঞাত দেশের চিত্রে পাওয়া যায় না।

জাপানী চিত্রকলা চীনা চিত্রকলার আদর্শে বিশেষভাবে প্রভাবিত। এই হিসাবে চিত্রকলার ক্ষেত্রে জাপানকে চীনের শিল্পহানীর বলা যেতে পারে। চীনা ও জাপানী চিত্রকলাকে একই বৃক্ষের দুটি শাখা বললে অসঙ্গত হয় না। জাপানী চিত্রকলার ওপর চীনা অঙ্কন-পদ্ধতির ছাপ সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। চীন জাতি পৃথিবীর প্রাচীনতম জাতিদের মধ্যে একটি। নবীন জাপান তার চিত্রকলার ক্ষেত্রে চীনের নিকট ঋণী বটে, কিন্তু সে শুধু ব্যর্থ অঙ্কন করছেই করে নি, তার চিত্রকলা স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ হলে উঠেছে।

ইউনানের ভাস্কর্য্য অতি উচ্চদরের, কিন্তু তার চিত্রকলা ভারতবর্ষ বা ইউরোপের তায় উন্নত নয়। ভারতবর্ষের ও ইউরোপের চিত্রকলা উচ্চদরের হলেও তার প্রামাণিক ধারা-বাহিক ইতিহাস বা পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ পাওয়া যায় না। চার্লস হোম তার বিশ্বকোষ গ্রন্থে বলেছেন যে, চীনের চিত্রাঙ্কন-প্রথা বহু পুরাতন ও শ্রেষ্ঠ। চীনের চিত্রাঙ্কন-বিদ্যার বার শত বৎসরের প্রামাণিক ইতিহাস আছে। পৃথিবীতে আর কোন দেশে এরূপ দৃষ্টান্ত দেখা যায় না। বাস্তবিক চীনা সূক্ষ্মার শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হল তার চিত্রকলা।

হোম সাহেব আরও বলেছেন যে, চীনের চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতির উদ্দেশ্য হল বস্তুর আন্তর্নিহিত পূর্ণ সৌন্দর্য্য প্রকাশ করা, ঘটনা চিত্রিত করা নয়। তাই চীনদেশে চিত্রকে শব্দহীন কবিতা বলা হয়ে থাকে। তাই সে দেশে চিত্রকর ও কবি উভয়েই সম্মান্য।

চীনা শিল্পীরা প্রাকৃতিক দৃশ্যের চিত্রাবলী খুব বেশী করে আঁকেন। চিত্রাঙ্কন ও কবিতা-রচনা এই উভয় ক্ষেত্রেই শিল্পী ও কবিরা প্রকৃতি থেকে প্রচুর উপকরণ আহরণ করেন।

এই প্রাকৃতিক দৃশ্যের চিত্রাবলীতে আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। এই চিত্রগুলিতে মানুষ, পশু, পাখী ইত্যাদিও স্থান পেয়েছে, কিন্তু প্রাকৃতিক দৃশ্যই তাতে মুখ্য স্থান অধিকার করে আছে। যেমন শিল্পী নীলাকাশের পট্টে খেতবলাকা আঁকে পটভূমিকার দৃশ্য-সৌন্দর্যকেই বাড়িয়ে দেবার উদ্দেশ্যে—বস্তুতঃ চীনা চিত্রকর পাখী আঁকে তার আকাশের চিত্রকে আরও সুসমঞ্জস করতে। অনন্ত আকাশের সৌন্দর্য্য তাতে অধিকতর পরিপূর্ণ হয়।

জাপানের চিত্রকলাও অনেকটা এইরূপ। এই কারণে চীনা ও জাপানী চিত্রকলা, ভারতবর্ষ ও অন্যান্য দেশের চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতি থেকে স্বতন্ত্র ধরনের। বর্তমান সময়ে ভারতবর্ষের চিত্রকলা মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের ঘটনার সহিত সংস্পর্শ-বিহীন হওয়ার যথোচিত আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে নি। প্রাকৃতিক দৃশ্য-চিত্রাঙ্কনের যে সমস্ত নমুনা পাওয়া যায় চীনা বা জাপানী চিত্রের সহিত সেগুলোর তুলনা করা চলে না।

ইউরোপের চিত্রেও প্রাকৃতিক দৃশ্যের সৌন্দর্য্য দেখান হয়, কিন্তু তাতে প্রকৃতির অন্তর্নিহিত আনন্দের আভাস বুঁজে পাওয়া শক্ত হয়ে পড়ে। সে ছবি নয়নানন্দকর বটে, কিন্তু তাতে দর্শকের মন্থ চোখই ভোলে, মন ভরে ওঠে না।

প্রকৃতির অন্তর্ভূলে যে অনন্ত প্রাণ-সীল আত্মপ্রকাশের ক্ষমতাব্যাকুল তার স্বরূপ ইউরোপীয় চিত্রকর উপলব্ধি করতে পারেন নি। একমাত্র রেষ্ট্রাকে বাদ দিলে আর সকলের সহজেই একথা প্রত্যোক্ত্য। এ বিষয় স্টক হোল্ম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক সাইরেন সাহেব বলেছেন—

প্রাকৃতিক দৃশ্যের চিত্র যা চীনা শিল্পীরা আঁকেছে তত সুন্দর চিত্র ইউরোপের চিত্রকরগণ আঁকতে পারে নি। চীনা চিত্রকর প্রাকৃতিক দৃশ্য আঁকতে গিয়ে তুলির টানে এমন এক সৌন্দর্য্যলোকের আভাস ফুটিয়ে তোলে, যা ইউরোপের চিত্র-শিল্পীদের চোখে পড়ে না। প্রকৃতি-নিরীক্ষণ-ক্ষমতা চীনা শিল্পীদের অসাধারণ—তা মানতেই হবে। প্রকৃতির রূপ-রস-গন্ধ, আত্মার নীরব সঙ্গীত তার চিত্রে ধরা পড়েছে।

জাপানীদের চিত্রেও প্রাকৃতিক দৃশ্যের সৌন্দর্য্য বিশেষ ভাবেই চোখে পড়ে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই উভয় শিল্পে বৈষম্য আছে।

এটা সুস্পষ্টরূপে বোঝা যায় যে, জাপানী চিত্রকর চীনা চিত্রশিল্পীর ছায় ততটা ভাবনা-প্রবণ ও কল্পনাপ্রিয় নয়। জাপানী শিল্পীর প্রধানতঃ সৌন্দর্য্যপ্রিয় এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যই তাদের আদর্শ সৌন্দর্য্য বা সৌন্দর্য্যের আদর্শ। চীনারা ভাবুক তাই আকাশ তাদের খুব প্রিয়। জাপানীরাও নীলাকাশ

ভালবাসে, কিন্তু চীনাগণের ছায় তাকে দিগন্ত-প্রসারী রূপ দিয়ে মহিমাম্বিত করে না। জাপানীদের অঙ্কিত আকাশ সাদা ধূস-মেঘশোভিত ও স্বর্ঘ্যের কিরণসম্পাতে সমুজ্জ্বল—এমনি নয়নাভিরাম ছবিই তারা প্রধানতঃ আঁকে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে জাপানীদের মণ্ডন-শিল্পের (decorative art) দিকেই আকর্ষণ বেশী। জাপানীদের ছবিতে বর্ণবিভাসের বৈচিত্র্য চীনাচিত্রের চেয়ে বেশী লক্ষণীয়।

প্রসিদ্ধ কলা-সমালোচক উইলিয়াম এডার্সন লিখেছেন যে, চীনাগণের রেখা-চিত্র আর জাপানীদের রঙীন চিত্র তাদের স্বকীয়তার ক্ষেত্রে সহজেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকে।

মানব-জীবনের দৈনন্দিন ঘটনাবলী ও ঐতিহাসিক আখ্যানকে বিষয়বস্তু করে চীনারা বহু চিত্র আঁকেছে। পুরনো চিত্রগুলির মধ্যে য়ু য়াৎজী (Wu Yotzi) অঙ্কিত বুদ্ধের মূর্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই চিত্রের অঙ্কন-পদ্ধতি সিংহলের 'ঘ্যানী বুদ্ধের চিত্র থেকে নেওয়া হয়েছে। ঐ মূর্তি বর্তমান সময়ে মাদ্রাজের মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। এক সময় বৌদ্ধ প্রভাব সময় এশিয়ার শিল্পকলাকে প্রভাবিত করে-ছিল—এই চিত্র তারই সাক্ষ্য প্রদান করছে। চীনে ও জাপানে সেই সুদূর কাল থেকেই বুদ্ধ ও তাঁর জীবনের ঘটনা-গুলিকে বিষয়বস্তু করে ছবি আঁকার রেওয়াজ চলে আসছে।

চীন ও জাপানের চিত্র-ঈর্ষণ্য ছেড়ে যখন ইউরোপের চিত্রশালায় প্রবেশ করি তখন মনে হয় যেন আমরা এক নতুন রাজ্যে, নতুন পরিবেশের মধ্যে উপস্থিত হয়েছি।

ইউরোপের চিত্রকলার আলোচনা করতে গেলে প্রথমে ইউরোপীয় সভ্যতার আদি জননী গ্রীস দেশ ও তৎপরে ইটালীর সুবিখ্যাত চিত্রকলার অধ্যয়নের ইতিহাস অধ্যয়ন আবশ্যক।

ইউরোপের চিত্রাবলী অতি সুন্দর ভাবে অঙ্কিত, কিন্তু তাতে একটা অভাব বিশেষ করে চোখে পড়ে। শিল্পী তার ছবিতে নরনারীর দেহসৌষ্ঠবকে নিখুঁত ভাবে ফুটিয়েছেন সত্য, কিন্তু তার আত্মার স্বরূপকে উদ্ঘাটিত করতে পারেন নি। তাদের ছবিতে পাই ইঞ্জিয়গ্রাহ্য বাস্তব জগতের লব্ধ অহঙ্করণ কিন্তু তাতে ইঞ্জিয়াতীতের আভাস নাই, ইঙ্গিত নাই, ব্যঞ্জনা নাই। 'মিনার্তা' ও 'এপলো' নারী ও নরের প্রেষ্ঠ নিখুঁত ও সুন্দরতম প্রতিকৃতি সন্দেহ নেই—তাদের অঙ্গসৌষ্ঠব, দেহ-লাবণ্য অতুলনীয়, কিন্তু তাদের যে সৌন্দর্য্য তা অবিদ্যমান নয়। ইটালীর চিত্রকরগণ চিত্রাঙ্কনে এই বাস্তবতার প্রভাব এড়াতে পারে নি—যদিও তারা তাদের ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত দেব-দেবীর ছবিই আঁকেছে খুব বেশী সংখ্যায়।

রাফেলের 'মোডোনা', মাইকেল এঞ্জেলোর 'সেন্ট পল', প্রভৃতি চিত্র স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্য ও প্রেষ্ঠতার কালজয়ী হয়ে থাকবে নিঃসন্দেহ।

কিন্তু এ তো গেল চিত্রকলার এক দিক মাত্র, এর আর

এক দিকের বিকাশ হয়েছে ভারতে। ভারতের শিল্পী একেছে আরও সুন্দর, আরও প্রাণবান, আধ্যাত্মিক ভাবধারার সঞ্জীবিত চিত্রাবলী। প্রাচীন ভারতে কলাশিল্পের উন্নয়নের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে চিত্রশিল্পের উৎকর্ষ সাধনের ক্ষেত্রে যারা প্রকৃত পন্থার নির্দেশ দিয়েছিলেন তদ্ব্যতীত কামরূপপ্রণেতা বাংসারনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শিল্পীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেছেন : প্রকৃতির নয়নাভিরাম রূপ ক্রমে ক্রমে বদলাচ্ছে—নব নব পরিবর্তিত মূর্তিতে তা আমাদের আনন্দ দিচ্ছে। শিল্পী যারা তারা প্রকৃতির এই অপার সৌন্দর্যের বিবর্তন অঙ্গসংগ করে চিত্র আঁকবে। যে মূর্তি গড়ে তুলবে, যে চিত্র আঁকতে হবে, তার রূপ চর্যচক্ষে দেখে ও মানসপটে কল্পনা করে, তুলির টানে বা ভাস্করের হাতুড়ি দিয়ে যথাযথ ভাবে ফুটিয়ে তুলতে হবে।

ইউরোপের কুশলী শিল্পীগণও গৌরব অর্জন করেছেন প্রকৃতি ও মানুষের বাহ্যিক রূপের ব্যঞ্জনাত্মক চিত্রে ফুটিয়ে। কিন্তু ইজিপ্তগ্রাহ্য জগতের অভ্যুদয়ে যে রত্নসমর শকাব্দীত স্পর্শাত্মক রূপলোক বিজয়মান, তাঁকে তাঁরা তাদের চিত্রে রূপায়িত করতে পারেন নি—সুতরাং তাঁদের চিত্রাবলী অতি উচ্চতরের হলেও মানুষের আত্মার কুণা মেটাবার উপযোগী নহে।

বাঘগুহা, অজন্তা ও ইলোরার পরম রমণীয় চিত্রাবলী সমগ্র ভগ্নতে অতুলনীয়। তাতে অজন্তা দেশের চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতির জায় রঙের সমাবেশ, অলঙ্করণ ও রেখাঙ্কননৈপুণ্য সব কিছুই চোখে পড়ে, কিন্তু অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত ভাব-ব্যঞ্জন এই চিত্রসমূহে এমনি সুন্দর ভাবে রূপ পরিগ্রহ করেছে যে সেগুলো সমগ্র পৃথিবীর শিল্পী-সৌন্দর্যকে এবং শিল্পরসিকদের শুধু আনন্দই দেয় নি, তাদের বিস্মিতও করেছে। একাধারে বাহ্যিক ও আন্তরিক, দৈহিক ও মানসিক এই উভয়বিধ সৌন্দর্যের অপূর্ণ সমাবেশ এই চিত্রাবলীকে একটা অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য দান করেছে। ভারতীয় ও বিদেশীয় চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতির এই পার্থক্যের কথা ডাক্তার কুমারস্বামী এই ভাবে ব্যক্ত করেছেন—

অন্তর্জগতের সহিত ইউরোপীয় শিল্পকলার সম্পর্ক অতি অল্পই চোখে পড়ে। ওখানকার চিত্রশিল্পীদের কল্পনাসজ্জা বহির্জগতেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু ভারতীয় চিত্র ও অজন্তা কলা-

শিল্পের দৃষ্টি ও রূপভাবনা চিরদিনই অসীমের ও মানসিক সৌন্দর্যের অঙ্গসংগে ব্যগ্র। ভারতের পূর্ব ও জীব চিত্র শুধু শারীরিক সৌন্দর্য ও দেহনৈষ্ঠব প্রদর্শনের ক্ষেত্রে অঙ্কিত হয় নি—তার ভেতরের, অন্তর্জগতের উচ্চভাবের আদর্শকে তাতে রূপায়িত করা হয়েছে। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যেতে পারে—যেমন সরস্বতী, প্রজ্ঞাপারমিতা ও তারার মূর্তি আর নটরাজ শিব ও দ্যানী বৃদ্ধের মূর্তি।

বিশ্ববিখ্যাত কলাবিদ হাওয়ার্ড সাহেব বলেছেন যে দ্যানী বৃদ্ধের চিত্র বা মূর্তি বিশ্বাণের পরিকল্পনাও ইউরোপে হওয়া অসম্ভব।

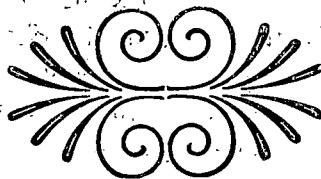
অনেক বিশ্ব-বিখ্যাত শিল্প-সমালোচক বলেছেন যে, মূভমেন্ট পিকচার বা গতিব্যাঞ্জক ছবির মধ্যে ভারতীয় শিল্পীদের আঁকা শিবের ভাঙব-ভুঁয়ের ছবির জায় দ্বিতীয় ছবি আর পৃথিবীতে নেই।

ভারতীয় দর্শনের স্বতন্ত্র ও অমূল্য রূপ পরিগ্রহ করেছে শিবের বিভিন্ন মূর্তিতে চিত্রে। শিব সংহারকর্তা ও সৃষ্টিকর্তা দুই-ই। নটরাজ শিবের মূর্তিতে যে ভাবব্যঞ্জন প্রকাশ পেয়েছে তা অতুলনীয়।

ভারতের চিত্রাঙ্কন ও ভাস্কর্য সমূহে আরো অনেক বলবার আছে, কিন্তু এখানে তার স্থানান্তর। এ প্রসঙ্গে একটা কথা বলা একান্ত প্রয়োজন যে আমাদের এ অতুলনীয় জাতীয় সম্পদ সমূহে আমরা বেলীয়াভাগই অজ্ঞ ও উদাসীন। বহু শতাব্দীর পরাধীনতা আমাদের সৌন্দর্য্যবোধকে ও স্বল্প দৃষ্টিকে বিলুপ্ত করে দিয়েছে। তারই ফলে আমরা আমাদের অনেক পৌরবের জিনিষ, বিশেষ করে ভারতীয় চিত্রাঙ্কন, ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের মাহাত্ম্য সমূহে সম্যক সচেতন নই।

কিন্তু আশার কথা এই যে অবনীন্দ্রনাথ, কুমারস্বামী প্রভৃতি জ্ঞানী জ্ঞানীদের প্রাণপণ চেষ্টায় ভারতীয় চিত্রকলা আজ সমগ্র ভগ্নতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

ভারতবর্ষ আজ পরাধীনতার অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়ে ধীরে ধীরে পূর্ণ স্বাধীনতার পথে এগিয়ে চলেছে। আশা করা যায় চিত্রাঙ্কন, ভাস্কর্য, স্থাপত্য ও অজন্তা শিল্পকলা অদূর ভবিষ্যতে পূর্ণ গৌরবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে এবং ভারতীয় শিল্পের এই নব অভ্যুদয় এ দেশবাসীর ক্ষেত্রে অশেষ কল্যাণ বহন করে আনবে।



সরলা রায়

[স্মৃতিচিহ্ন উপলক্ষে প্রকাশিত অর্পণ—২৬শে নবেম্বর ১৯৪৭]

শ্রীপ্রভাবতী রায়

মাতৃসমা যে পুণ্যনদীয়া মহিলার আজ জন্মতিথি তাঁহার বিষয় কিছুই বলিবার যোগ্যতা আমার নাই। কিন্তু তাঁহার নিকট আমি মায়ের মেহমত পাইয়াছি, অনেক শিক্ষা লাভ করিয়াছি। তাঁহার প্রভাবে আসিয়া তাঁহারই শিক্ষার গুণে নিছের পায়ে ঠাঁড়াইতে পারিয়াছি—তাঁহার প্রতি আমার হৃদয় চিরদিনই প্রভাতজ্বলে পূর্ণ। সেই প্রভাতজ্বল অঞ্জলি নিবেদন করিবার জুই আজ দুই-চারিটি কথা বলিতে সাহসী হইয়াছি।

বি-এ পাস করিবার পরই আমি, তাঁহার সংস্পর্শে আসি। একাদশ মাসের সঙ্গে তাঁহার সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলাম। সেই দিনই তিনি মায়ের নিকট আমাকে তাঁহার কোনও কাজে লইবার জন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিলেন এবং বাবাকেও অনুরোধ করিয়া চিঠি লিখিলেন। তখন আমার বয়স অল্প, বাবা আমাকে চাকরী করিতে দিতে ইচ্ছুক নন, নিজেও তেমন সাহস পাই না; কিন্তু মিসেস রায় এমন করিয়া বাবাকে লিখিলেন যে, বাবা আর আপত্তি করিতে পারিলেন না।

যে কারণেই হোক, ব্রাহ্ম স্কুলের তখন অতি বিশৃঙ্খল অবস্থা। গবর্ণমেন্টের হাতে দিবার কথা চলিতেছে, নতুবা স্কুল উঠিয়া যাইবে। এমন সময়ে ব্রাহ্মসমাজের কাহারও কাহারও মনে হইল মিসেস রায়ের হাতে স্কুলের ভার অর্পণ করিলে, গবর্ণমেন্টকে না দিলেও স্কুলটি পুনরায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। ব্রাহ্ম-সমাজের কর্তৃপক্ষ মিসেস রায়ের নিকট এই প্রস্তাব লইয়া উপস্থিত হইলে তিনি স্কুলের ভার গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন। সেই দিন হইতেই তিনি স্কুলের জন্ত যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে আরম্ভ করিলেন, তাহা স্বচক্ষে দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। আমাকে ব্রাহ্ম স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রীর কাজ করিতে দিলেন। আমি তখন সবে কলেজ হইতে বাহির হইয়াছি, কাজের কিছুই জানি না—মিসেস রায় নিজ হাতে আমাকে কাজ শিখাইতে লাগিলেন। শিক্ষয়িত্রীদের ভার তিনিও ঠিক সাত্ত্ব দশটার স্কুলে উপস্থিত হইতেন; স্কুল ও হোষ্টেলের সব বিষয়ের হুঁটিনাটি যাবতীয় সংবাদ লইতেন এবং ঘেরানে যে ভাবে কাজ করিতে হইবে, সে বিষয়ে সকলকে যথাযথ উপদেশ দান করিতেন। দ্রুততা কাহাকে বলে, মিসেস রায় জানিতেন না। সকলের

সঙ্গেই সর্বদা হাসিমুখে মিষ্ট ভাষায় কথা কহিতেন, কাজেই কেহ কখনও তাঁহার কথার রুগ্ন হইত না। কেহ আপত্তিকর আচরণ করিলে ক্রোধপ্রকাশ না করিয়া এমন দৃঢ়ভাবে তাকে নিষেধ করিতেন যে, সে ঐ কাজ আর কখনও করিতে সাহস পাইত না। শিক্ষয়িত্রীরা সকলে স্কুলের কাজ শেষ করিয়া গৃহে ফিরিয়া যাইতেন, মিসেস রায়ের কাজ কিন্তু সন্ধ্যার পূর্বে কখনও শেষ হইত না। সন্ধ্যার পর বাড়ী ফিরিতেন। এক একদিন আমাকে সঙ্গে লইয়া যাইতেন; রাত্রি ১২টা ১টা পর্যন্ত আমাকে লইয়া কাজ করিতেন।

স্কুলের বিশৃঙ্খল অবস্থাকে শুষ্কতার আনিতে অনেক সময় অধ্যবসায়, বৈষ্য ও পরিশ্রমের আবশ্যক হইয়াছিল। মিসেস রায় দিনের পর দিন অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া চলিলেন, সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে ভীত সমালোচনা চলিতে লাগিল। স্কুলে সর্ব-বিষয়ে নিয়মাহু-বর্ত্তিতা এবং শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া চলাকে বাধ্যতা-মূলক করাতেই এ ধরনের বিরূপ সমালোচনা শুরু হইয়াছিল। একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, আমাদের দেশে নিয়মাহু-বর্ত্তিতা এবং শৃঙ্খলার বড়ই অভাব। ইহা আমরা আজও ছোট বড় সকল কাজেই দেখিতে পাই এবং এ ছটির অভাবের জুই আমরা অনেক কাজে অকৃতকার্য হই। তথাপি নিয়মাহু-বর্ত্তিতার মূল্য আমরা আজও বুঝিলাম না, জীবনে কৃতকার্য হইতে হইলে সর্বপ্রথম যে আমাদের সময়াহু-বর্ত্তিতা, নিয়মাহু-বর্ত্তিতা এবং শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে শিখিতে হইবে, ইহা আমরা আজও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না। উপরন্তু এইগুলি সম্বন্ধে কেহ গীড়াগীড়ি করিতে গেলেই কি গৃহে, কি বাহিরে—সর্বত্র গোলযোগ ও অশান্তির সৃষ্টি হয়।

ব্রাহ্ম স্কুলে ঠিক এরূপই হইয়াছিল। মিসেস রায় ছিলেন বিলিভী ধরণে শিক্ষিতা; বিদেশী আবহাওয়ার প্রতিপালিতা। বিলিভী সমাজের ভাল জিনিষগুলি তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি অল্প বয়স হইতেই উপরোক্ত তিনটি বিষয়ের মূল্য হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন এবং জানিতেন যে স্কুলে সময়াহু-বর্ত্তিতা, নিয়মাহু-বর্ত্তিতা এবং শৃঙ্খলার রক্ষা না হইলে ছাত্রীদের প্রকৃত শিক্ষালাভ হইবে না—শিক্ষার প্রধান অঙ্গই বাদ পড়িয়া যাইবে এবং স্কুল পরিচালনা করাও অসম্ভব হইয়া উঠিবে। তাই

বিশুদ্ধ দুগ্ধজাত

বাসন্তী ঘৃত

টেলি—বাসন্তী ঘি ফোন—বি.বি. ৫৭০৮ পোঃ বক্স ৬৮৩৬ কলি:

বি, সুগারমার্কেটস, এক্সপোর্টার্স, ইম্পোর্টার্স ও

জেনারেল অর্ডার সাপ্লায়ার্স

প্রমথনাথ পাল এণ্ড সন্স

২সি, রামকুমার রক্ষিত লেন, কলিকাতা-৭

তিনি সকল বিরুদ্ধ সমালোচনা ও অপবাদ অগ্রাহ্য করিয়া চলিতে লাগিলেন। কত সময়ে কত মিথ্যা অপবাদ ও নিন্দা ব্যক্তিগতভাবেও আমাদেরই কানে আসিত, কত তীব্র সমালোচনা কাগজে বাহির হইত, আমরা সবই তাঁহাকে বলিতাম; তিনি হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন। ঐ সকল নিন্দাবাদ যে তাঁহার মনে কোনও রেখাপাতই করিত না, তাহা আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারিতাম। তিনি যেমন কোনও দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া আপন কর্তব্য দৃঢ়ভাবে পালন করিয়া যাইতেন, আমাদেরও তেমনি উপদেশ দিতেন। এই শিক্ষাটুকু তাঁহার প্রভাবে আমরা বিশেষভাবে পাইয়াছিলাম এবং তাঁহার সেই উপদেশই এ যাবৎ পালন করিয়া আসিতেছি—তাঁহার অন্য আজ পর্যন্ত অন্ততাপ করিতে হয় নাই। তাঁহার হৃদয় ছিল আকাশের ন্যায় উদার, ধর্মাত্মীর ন্যায় সহিষ্ণু এবং সহৃদয়ের ন্যায় গভীর। তাই তিনি অনায়াসকেও সহজেই আত্মীয় মনে করিতে পারিতেন, মাছুষের দোষত্রুটি সহজেই ক্ষমা করিতে পারিতেন এবং নিন্দা, প্রশংসা বা অজ্ঞ কোনও কারণেই সহজে বিচলিত হইতেন না। এই সকল গুণ না থাকিলে কোনও বৃহৎ কার্যে কি কেহ সফলতা লাভ করিতে পারে?

অভিভাবকেরা কোনও অভিযোগ করিয়া পাঠাইলেই তিনি তাঁহাদের দেখা করিতে আসিতে বলিতেন। অনেক সময়ে দেখিয়াছি কেহ হস্ত অভিযোগ জানাইবার উদ্দেশ্যে বিরূপ

মনোভাব লইয়া উপস্থিত হইয়াছেন, কিন্তু মিসেস্ রায়ের সঙ্গে আলোচনা করিয়া নিজের ভুল ত বুঝিয়াছেনই, উপরন্তু তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া এসময় চিত্তে বাড়ী কিরিয়াছেন। স্থলের কর্তৃপক্ষের কোনও ভুল বা ত্রুটি হইয়া থাকিলে মিসেস্ রায় তাহা সরল ভাবে জানিয়া লইয়া তাহার প্রতি-বিধান করিবার প্রতিশ্রুতি দিতেন এবং তদনুযায়ী কার্য করিতেন। যাহার কাছে যে প্রকার সাহায্য পাইবেন বলিয়া বুঝিতেন, তাহার নিকটে সেইরূপ সাহায্যই চাহিতেন। এই বিষয়ে তাঁহার কোনও অস্থিমান বা অহংকার ছিল না। স্থলটি ব্রাহ্মসমাজের, প্রত্যেক শিক্ষাশ্রমই জনসাধারণের মঙ্গলের জন্ত, তাহা কোনও ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি নয়, ইহা মনে করিয়াই তিনি কাহারও নিকট সাহায্য চাহিতে কৃপা বোধ করিতেন না। তাঁহার ব্যক্তিত্বের প্রভাব ছিল অসাধারণ। সেই প্রভাবের জন্ত তিনি সাহায্য চাহিয়া কখনও বিমুগ্ধ হন নাই। ব্রাহ্ম পার্লস্‌ স্কুলের আর্থিক অবস্থাও তখন শোচনীয়। সরকারী সাহায্য বন্ধ হইয়া গিয়াছে। স্থলের উন্নতি দেখাইতে না পারিলে আর পাওয়া যাইবে না। অর্থ বিনা উন্নতি সম্ভবপর নয়, তাই মিসেস্ রায় অর্থসংগ্রহ করিতে বাহির হইলেন। কোনও স্থান হইতেই তাঁহাকে ব্যর্থমনোরণ হইয়া ফিরিতে হয় নাই। তাঁহার অদম্য উৎসাহ, উজ্জম ও নিঃস্বার্থ কর্মতৎপরতা দেখিয়া সকলেই তাঁহার মহান উদ্দেশ্যকে সফল করিবার জন্ত যুক্তবশ্তে দান

নেতাজীর অনুসরণে :—

বাংলার বিখ্যাত স্বত ব্যবসায়ী শ্রীঅশোকচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় ও তাঁহার “শ্রী” মার্কা স্বতের নূতন পরিচয় বাঙ্গলাদেশে নিম্নপ্রয়োজন। আজকাল বাংলার প্রতি গৃহে, উৎসবে, আনন্দে ‘শ্রী’ স্বতের ব্যবহার অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে, বাজারে ভেজাল স্বতের যেরূপ প্রয়াস দেখা যায়, তাহার মধ্যে শ্রীযুক্ত অশোকবাবুর বিশুদ্ধ স্বত যে খ্যাতি অর্জন করিয়াছে, তাহা স্বত ব্যবসায়ী মাত্রেই অনুকরণীয়।

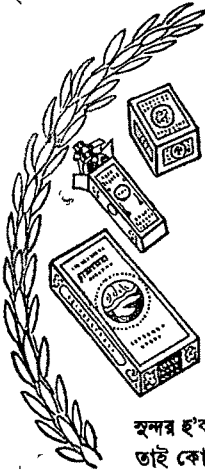
স্বাঃ শ্রীমুভাষচন্দ্র বসু

প্রতি উৎসবে



সি. আর. দাশের
প্রধান অঙ্ক

সি. আর. দাশের



রাঙ্গাজবা
● মিন্দুর
● কুম্‌কুম
● আলতা

“রূপং দেহি, জয়ং দেহি”—রূপের এই আরাধনা বিলাসপ্রচেষ্টা নহে।
হৃদয় হ'বার হৃনিবিড় আলোক মানুষ পেয়েছে তার অন্তর-পুরুষের কাছ থেকে।
তাই কোটির ছেড়ে প্রাসাদ—বঙ্কল ছেড়ে সে সৃষ্টি করেছে বিচিত্র বসন-ভূষণ। এ
তার কত বড় গর্ব ও আনন্দ! প্রসাধন দ্রব্যও ক্রমোন্নতির পথ ধরে অনেক দূর
এগিয়ে এসেছে। তার পরিচয় পাওয়া যায় যেরে যেরে “রাঙ্গাজবা”র নিভা
ব্যবহারে। বিশুদ্ধতার ও বর্ণসম্পদে নারীকে সে দিয়েছে পরিপূর্ণ ভূষ্টি, তাই আজ
প্রতি উৎসবে “রাঙ্গাজবা”র স্থান সবার উপরে। জাতি, ধর্ম ও বয়স নির্বিশেষে
ভারতনারীর প্রিয়তম প্রসাধন সি, আর, দাশের রাঙ্গাজবা-মিন্দুর, কুম্‌কুম ও আলতা।

অনুম্পা কেমিক্যাল: কলিকাতা

করিতে লাগিলেন। এক বৎসরের মধ্যেই স্কুলের চেহারা বদলাইয়া গেল। সেই ব্রাহ্মবালিকা বিদ্যালয়কে তিনি যে রূপ দিয়াছিলেন, তিনি তাহাকে যে আদর্শে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, সেই রূপ, সেই আদর্শ লইয়াই উক্ত বিদ্যালয়টি আজ সুপ্রতিষ্ঠিত। ত্রিশ বৎসর যাবৎ বিভিন্ন স্কুল ও কলেজে শিক্ষাদান কার্যে ব্যাপৃত থাকিয়া কিছু অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছি, সেই জন্য দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি যে, ব্রাহ্ম স্কুলের মত মেয়েদের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে বিরল। এই স্কুলের মত নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলা বাঙালি মেয়েদের আর কমটি স্কুলে আছে জানি না। ইহার নৈতিক আদর্শ-অতি উচ্চ স্তরের।

বৎসর দেড়েকের মধ্যেই মিসেস্ রায় এ স্কুলের ভার ত্যাগ স্বযোগ্যা জ্যেষ্ঠা কস্তুর, হস্তে সমর্পণ করিয়া বিলাত-গেলেন। সেখানে বহু স্থান পর্যটন করিয়া বিস্তৃত অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিলেন কিন্তু, ব্রাহ্ম স্কুলের ভার আর গ্রহণ করিলেন না। তখন তিনি একটি নতুন স্কুল অল্প আদর্শে গঠন করিবার বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন। লরেটো স্কুলে বাঙালী মেয়েদের স্থান পাওয়া চিরদিনই কষ্টকর। পাশ্চাত্য শিক্ষার অহরাসি বনোরা তাহাদের কথা বা আত্মীয়দিগকে লরেটোতে শিক্ষা দিতে চাহিলেও ভক্তি করিবার সময় তাহাদের অনেককে নানা কারণে নিরাশ হইয়া ফিরিতে হইত।

তাই মিসেস্ রায় লরেটোর আদর্শে বাঙালী মেয়েদের একটি নতুন স্কুল স্থাপন করিতে মনস্থ করিয়া আত্মীয়বন্ধুদের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

জী-শিক্ষা তখন দেশের সকলেরই মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। আদর্শ বিভিন্ন হইলেও, মেয়েদের শিক্ষা দিয়া তাহাদিগকে গৃহ ও সমাজের কাজের উপযোগী করা, তাহাদিগকে পরিবারে ও সমাজে-সম্মানের অধিকারী করা যে প্রত্যেক অভিভাবকেরই অবশ্যকর্তব্য, এ কথা তখন আর কাহারও বৃত্তিতে বাকী নাই। মিসেস্ রায়ের নতুন স্কুলের আদর্শের সহিত সকলের সহায়ত্ব নীতি থাকিলেও তাহাকে সমর্থন ও সাহায্য করিবার লোকও একেবারে অভাব হয় নাই। তাহার ব্যক্তিগত, উৎসাহ ও অনাধারণ কর্মক্ষমতা লোককে এমনই আকৃষ্ট করিয়াছিল যে, এ ক্ষেত্রে ক্রমে সবই তাহার জুটয়াছিল। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি বহু অর্থ সংগ্রহ করিয়া ফেলিলেন, ছাত্রীরাও অভাব হইল না, শিক্ষয়িত্রীরাও অগ্রতুল হইল না। এই স্কুলটি তিনি তাহার ঘনিষ্ঠ বন্ধু স্বর্গীয় গোপাল-কৃষ্ণ গোস্বামীর নামে উৎসর্গ করিয়া ইহার নাম রাখিলেন গোপাল মেমোরিয়াল স্কুল। এই স্কুলেই পরে কলেজও খোলা হয়। মিসেস্-রায়ের উদার হৃদয়ে প্রাদেশিকতার স্থান ছিল না। তাই তাহার স্কুল ও কলেজে জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে সকল প্রদেশের ছাত্রী ও শিক্ষয়িত্রীদের সাগরে



ক্যালকাটা
কেমিক্যাল

দুর্লভ নয় মোটেই -

তরুণদের পেলব কৌমল্য ও লাবণ্যমণ্ডিত সৌন্দর্য্য স্ববমা প্রকৃতির দুর্লভ দান। নিখিল তরুণীর পরম কাম্য-বস্তু রূপের এই ঐশ্বর্য্য। প্রাকৃতিক যুগে নারীর পক্ষে এ সম্পদ দুর্লভ ছিল বটে, কিন্তু একালে 'ক্যাল-কেমিক্যাল'র সময়ে প্রস্তুত প্রসাধনী দেহের সৌন্দর্য্যকে প্রত্যেক রমণীর হাতের কাছে এনে দিয়েছে।

★ তুহি না বিউটিফিক
★ রেগু বগা টেম্পেট পাউডার
★ লাবনী মো এক ক্রীম

এষণ করা হইয়া থাকে। মেয়েদের স্কুলগুলি মেয়েদের দ্বারাই পরিচালিত হওয়া উচিত, এই ধারণা লইয়া মিসেস্ রায় প্রথমে ব্রাহ্ম স্কুলে ও পরে পৌঞ্চলে মেমোরিয়াল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কেবলমাত্র মহিলাদের দ্বারাই শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহার ধারণা যে ভ্রান্ত ছিল না, তাহা আজ আর প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। এখন মেয়েদের প্রায় সব স্কুল-কলেজে যেহেতুই শিক্ষাদান করিয়া থাকেন এবং তাহার ফলাফলও আজ কাহারও অবিদিত নাই। এই প্রথা প্রচলিত করিয়া মিসেস্ রায় যে জীর্ণাতিত্ব কি উপকার সাধন করিয়াছেন সে বিষয়ে বেশী কিছু বলা নিম্প্রয়োজন। তিনি শিক্ষিতা মহিলাদের একটি কর্তৃক্ষের খুলিয়া দিয়াছেন এবং তাহাদিগকে সমাজের নিকট সম্মানিতা করিয়া গিয়াছেন।

তাঁহার চিন্তা সর্ববিষয়েই স্বাধীন ছিল। ইন্সপেক্ট্রেস্ বা ডিরেক্টর কর্তৃক অনুমোদিত পুস্তক তিনি সকল শ্রেণীর জন্য উপযোগী মনে করিতেন না। ইংরাজ, রজনীকান্ত, প্রভৃতি পুরাতন লেখকদিগের ভাব ও ভাষা তিনি বড় পছন্দ করিতেন এবং শিশু ও অল্পবয়স্ক বালিকাদের পক্ষে উক্ত লেখকদিগের পুস্তকই উপযোগী মনে করিয়া যথাসম্ভব ঐ সকল পুস্তকই নিজের স্কুলের জন্য নির্বাচন করিতেন। ইংরেজী সাহিত্য সম্বন্ধেও তাই। তিনি নিজের পছন্দমত পুস্তক নির্বাচন ও পাঠ্য নির্দেশ করিতেন। শিক্ষা বিভাগের কর্তৃ-

পক্ষ তাঁহার এই সকল কাজে বড় একটা হস্তক্ষেপ করিতেন না—মিসেস্ রায়ের উপর তাঁহাদের প্রগাঢ় আস্থা ছিল।

এইরূপে নানাভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁহার দান যে কত বড়, তাহা বিচার করিবার সময় বোধ হয় আজও উপস্থিত হয় নাই। তবে মাত্র তাঁহার কর্মের জীবনের অবসান ঘটয়াছে। এখনও তাঁহার অভাব আমরা যথাযথ ভাবে অনুভব করিতে পারিতেছি না। কিন্তু এমন সময় আসিবে, যখন বঙ্গবাসী জীর্ণাতিত্ব বিষয়ে এই মহীয়সী মহিলার মহান অবদানের কথা স্মৃতিজ্ঞাতপূর্ণ অন্তঃকরণে স্মরণ করিয়া তাঁহার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাইবে।

বাঁচি ব্রহ্মচর্যাশ্রমচার্য স্বামী সত্যানন্দজী পরিচালিত বিস্তীর্ণ জলাশয় ও শালবন বেষ্টিত বাংলার মনোরম স্বাস্থ্যনিবাসে ভারতীয় সাধনা ও সংস্কৃতিমূলক শিক্ষা, গ্রন্থাগার, সেবা, কৃষি, শিল্প, গোপালন, খেলাধুলা প্রভৃতির ব্যবস্থাসহ ম্যাট্রিক মানের আদর্শ স্কুল ও বোর্ডিং—

সেবায়তন বিদ্যালয়

পোঃ বাড়গ্রাম (মেদিনীপুর)
ভতির জন্ত সম্পাদকের নিকট লিখুন।

মায়ের কর্তব্য

শিশুপালনের সময়কাল জ্ঞানের অভাবে এদেশে শিশু-মৃত্যুর হার এত ভয়াবহ। বিবটন শিশুদের দৈহিক সর্বাঙ্গীণ পুষ্টিবিধান করিতে অদ্বিতীয়। ভিটামিন ডি, বি, বি২ সহিত মূল্যবান উদ্ভিজ্জ ও রাসায়নিক উপাদানের সংমিশ্রণে প্রস্তুত এই পূর্ণাঙ্গ টনিকটি প্রত্যেক শিশুকেই, বিশেষ করিয়া দন্তোদগমের সময়, সেবন করান উচিত। বিবটন নিম্নলিখিত রোগে বিশেষ উপকারীঃ—শিশুদের যকৃতের পীড়া, অজীর্ণতা, হৃৎ তোলা, পেট ফাঁপা, কোষ্ঠকাঠিন্য, রক্তশূন্যতা, রক্ততা, ব্রঙ্কাইটিস, রিকেটস ইত্যাদি।

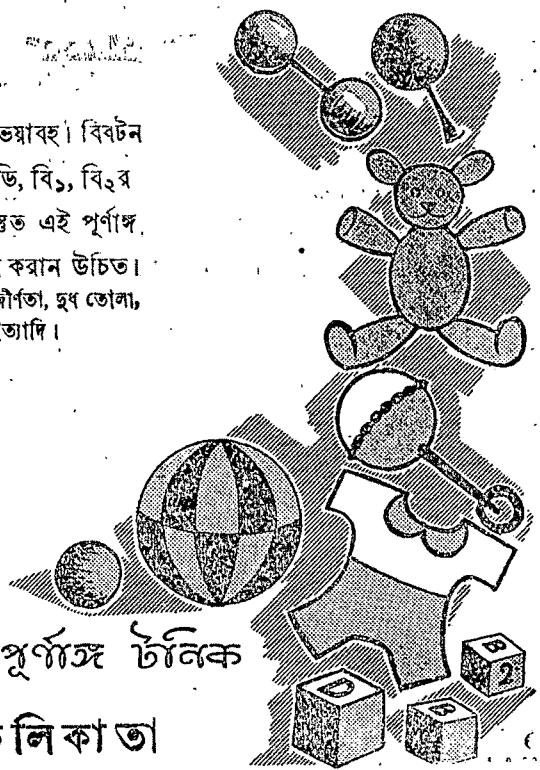


শিশুর স্বাস্থ্যের জন্য

বিবটন

একটি পূর্ণাঙ্গ টনিক

লিষ্টার এন্টিসেপটিকস্ • কলিকাতা



ধনিধ্বংসে ধনির জন্ম

শ্রীগিরিধারী রায় চৌধুরী

প্রাচীন ভারতীয় আধ্যাত্মিক ধনির, ধ্বংসে ধনির, জন্মের কথা এখানে কিছু বলব। বিষয়বস্তুটি কঠিন হলেও সহজবোধ্য করে বলবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করব।

সংস্কৃত “প্রাচীন” আর “অপ্রাচীন” বলে দুটি শব্দ আছে। তাদের অর্থ যথাক্রমে, পুরানো ও নতুন। “প্রাক্” অর্থাৎ পূর্বে, আবার তা থেকে “প্রাচী,” অর্থাৎ পূর্বদিক। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে পূর্বদিক সবচেয়ে আগের বা প্রাথমিক সেই অর্থেই “প্রাচীন” শব্দে চলে গিয়ে তাকে—আগের বা পুরানো—এই অর্থ প্রদত্ত করল। আবার, নতুন কি পরবর্তী—বোঝাতে এই প্রাচীন শব্দের পূর্বে নঞর্থক অ যোগ করে “অপ্রাচীন” শব্দের সৃষ্টি হ’ল এবং প্রয়োগ হতে লাগল। প্রাকৃত-প্রভাবের যুগে ‘প্রাচীন’ ঠিক প্রাচীনই রয়ে গেল, যা খেল অপ্রাচীন। ‘মৈত্রীমিস্র’র বড়ো শব্দটির মধ্যকার ‘ম-ফল’ বন্ধ হয়ে এল এগিয়ে, আর, “প”-টা মোটা হয়ে “ব” বনে গেল। ফলে রূপ বেরল “অপ্রাচীন”। পঞ্চতন্ত্রের নীলবর্ণ শৃঙ্গলের মত এই শব্দটিরও বাহ্যিক ছদ্ম আবরণের মধ্যে তার আসল রূপটি লুকিয়ে আছে। আরও এই রকমের নীলবর্ণ শৃঙ্গল-জাতীয় শব্দ ভারতীয় আধ্যাত্মিক জগতে অনেক রয়ে গেছে। উদাহরণ-স্বরূপ, বৌদ্ধ-মত “হীনযান” আর “মহাযানে”র ইতিহাসটাই বলি। কথা দুটি আসলে ছিল “হীনজ্ঞান”, “মহাজ্ঞান”—কিনা, সামান্য উপলব্ধি আর মহান উপলব্ধি। প্রাচীন ভারতীয় আধ্যাত্মিক “জ্ঞান” শব্দের উচ্চারণ ছিল “জ-ঞান”। “হীন” আর “মহা” ঠিকই রইল, কিন্তু বিপর্যয় ঘটল ‘জ্ঞানের’ বেলার অর্থাৎ—“জ-ঞান”—এর ‘ঞ’-ধ্বনি গেল হারিয়ে, পড়ে রইল “জ-ন”। কিংবা এও বলা চলে যে “ঞ”-র প্রভাবে “জ”, তার বর্গীয় হারিয়ে “হ” হয়ে পড়ল। অবশ্য “ঞ”-র অল্পনাটিকত্বও ঘটে গেল। ফলে বেরিয়ে এল “যান” শব্দ। প্রাচীন ভারতীয় আধ্যাত্মিক গাভী অর্থে “যান” শব্দের প্রচলন আগে থেকেই ছিল। স্মৃতরাং কোনও অসুবিধা হ’ল না। লোকে “হীনযান” ও “মহাযান” শব্দের অর্থ করে নিলে—ছোট গাভী আর বড় গাভী।

“বরাহমিহির” নামেও জনসাধারণের ভুল বোঝার বেশ একটু ছিটকোটা রয়ে গেছে। পুরাকালে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের অনেকের “মিত্র” উপাধি থাকত, তদনুযায়ী নামটি আসলে ছিল “বরাহমিত্র”। খুব সম্ভব তিনি সিংহলে ফলিত-জ্যোতিষ, কি সামুদ্রিক বিজ্ঞা শিখে গিয়েছিলেন,—কেননা তখনকার দিনে সিংহলে ঐ সকল বিজ্ঞার খুবই চর্চা হ’ত। ফলে, সিংহলীরা এলু ভাষায় ও সিংহলবাদীদের মুখে মুখে তাঁর “মিত্র” উপাধি “মিহ-র” হয়ে দাঁড়াল। তারপর তিনি যখন জ্যোতিষবিজ্ঞা শিখে নিজের দেশে ফিরে এলেন, তখন তাঁর বদেশবাসীর কাছে যোগিক শব্দটির “মিহ-র” অংশটা নেহাত নিরর্থক মালুম হওয়ার, তারা সেটাকে “মিহির” করে নিলে। মিহির কথাটা আগে থেকেই এতদেখে প্রচলিত ছিল। “মিত্র” বা “মিহ-র” শব্দের ধ্বনি-ধ্বংসের ফলে শব্দটি উৎপন্ন হয়েছিল, যার অর্থ করা হ’ত সূর্য। বরাহ-পণ্ডিত জ্যোতিষবিদ বলে লোকে সেই ছাপটা ওই উপাধির মধ্যে জড়িয়ে দিলে। ফলে তিনি সমাজে বরাহমিহির বলেই পরিচিত হতে লাগলেন। বরাহমিহিরের সময়ের বহু আগের যুগে বৈদিক সংস্কৃত ভাষা আখ্যোরা এতদেখের আদিম অধিবাসীদের “কুহু” অর্থাৎ হীন বা ছোট লোক আখ্যা দিয়েছিল। “কুহু” শব্দের উচ্চারণ তখন ছিল “কুহুদর”। পরে আখ্য অনাখ্য-মিত্র হিন্দু জাতির মুখে তাই “কুহু” হয়ে দাঁড়াল। তাতে ব্যাপারটা হ’ল এই—অজ্ঞাতসারে তারা নিজেরাই নিজেদের ছোটলোক আখ্যার অভিহিত করতে লাগল। “অজ্ঞত” শব্দের উৎপত্তিও তারি মজার। প্রাকৃত যুগের মাঝামাঝি কোন সময়ে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলবাসী আধ্যাত্মিক দলবিশেষের মুখে মধ্য-ভারতীয় আধ্যাত্মিক “সহস্র” শব্দটি—যার অর্থ হাজার, উদ্ভব হারিয়ে “হব্-স-র” হয়ে দাঁড়ায়। তা থেকে কালক্রমে “অজ্ঞত” রূপের অবতরণ ঘটল। আবার পারত থেকে “হব্-স-র” থেকে উদ্ভূত ‘হাজার’ রূপ এসে জুটে ঐ একই সংখ্যাবাচক শব্দটিকে বেশ তারিকি করে তুলল। ফলে আমাদের হ’ল বিপদ,—কাকে রাধি আর কাকে ফেলি।

বহুমুত্র

বিশ্ববিখ্যাত “সোম মহাস্তব” সেবন করুন, ব্যাধি পুরাতন ও জটিল হইলেও ইহা সেবনে সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হইবেন। ইহা রোগের মূল কারণগুলি নাশ করিয়া অতিরিক্ত মুত্রনিঃসরণ, প্রস্রাবে স্ফগার ও এলবুমেন-ব্রাস করে এবং দেহময়কে সবল ও সুস্থ করে। বিনা ইঞ্জেকশনে স্থায়ী ফলসাধনে “সোমমহাস্তব” অতুলনীয়। ইহা বৃদ্ধ ও চিন্তাশীল ব্যক্তির প্রেষ্ঠ টনিক। মূল্য ৫।০ (১০ দিনের), ১৫.০ (১ মাসের) মাণ্ডলাদি ৮০ আনা। কবিরাজ এম, ভট্টাচার্য কাব্যব্যাকরণতীর্থ ত্রিগাচার্য—১২০।১১, (পি) আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা—২।

পুস্তক-পরিচয়

প্রেমরাগ—শ্রীদেবেশচন্দ্র দাস। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩/১১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

কাব্য-সম্পর্কে চিরকালীন ধারণার পরিবর্তনের একটি বিশেষ প্রয়াস কিছু দিন হইতে পরিলক্ষিত হইতেছে। সাহিত্যে তখনই নূতন যুগ আসে, বিশিষ্ট সৃষ্টি-প্রতিভা যখন স্বতঃই ভিন্ন পথ বাছিয়া লয়। পরিবর্তনের জন্যই পরিবর্তন প্রকৃত সাহিত্যের লক্ষণ নয়। অত্যন্ত সজ্ঞান প্রয়াস সাহিত্যকে বিকৃত করে। 'প্রেমরাগ'ের কবি নব যুগ আনিবার চেষ্টায় নিজের শক্তিকে বৃথা ব্যয়িত করেন নাই। যুগধর্মের প্রভাব মানিয়া লইয়া তিনি কাব্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীদেবেশচন্দ্র দাস পাঠকের নিকট সুপরিচিত। 'ইয়োরোপা' লিখিয়া তিনি সাহিত্য-খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। 'প্রেমরাগ' তাঁহার প্রথম কাব্যগ্রন্থ। গ্রন্থখানি অনেকগুলি গীতি-কবিতার সমষ্টি। কবির অনুরূপ যখন পাঠকের হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়, কাব্য তখনই সার্থক হইয়া উঠে। প্রেম মানুষের মনের একটি মৌলিক বৃত্তি। ইহা সকল দেশ এবং সকল কালের মানব-মনকে আলোড়িত করে। এই প্রেমের অনুরূপকে দেবেশচন্দ্র নানা ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। 'কবিপরিচিতি'তে শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী বলিতেছেন, "কবিতা-গুলির অধিকাংশই ব্যক্তিগত বা আদর্শগত প্রণয়ধর্মী, কিন্তু সচরাচর দৃষ্ট প্রেমের কবিতার হৃদয় রূপ হইতে এগুলি স্বতন্ত্র ও ভিন্ন-গোষ্ঠীয়। মাত্র হৃৎখবলাস নয়, হৃষ্ট বলিষ্ঠতায় ইহাদের জন্ম।" 'বন্ধু' কবিতায় কবি বলিতেছেন,

"আমার জীবনে বিলায়ে জীবন তব

দিবেছ আমারে তোমার অমৃত আনি।"

অন্যত্র বলিতেছেন,

"স্পর্শ-দাও, আলো দাও, হৃৎস্পর্শধারা—

তুমি বঁধু মম, তুমি মোর প্রবতারা।"

'ভূমিকা'য় শ্রীকালিদাস রায় লিখিতেছেন,—"কবি আত্মহৃদয় বিগলিত প্রেমরাগকে নিজে তদগত হইয়া উপভোগ করিয়াছেন এবং সেই উপভোগের আনন্দকে এই কবিতাগুলিতে বাণীরূপ দিয়াছেন।"

রাজজ্যোতিভাষ্যমূলক বলিয়া গভর্নমেন্ট কর্তৃক 'বাজেয়াপ্ত'

বন্দনা

সঙ্কলক : শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

"স্বদেশী" যুগ হইতে বর্তমান বাঙলার নবযুগ পর্য্যন্ত দেশের জাতীয় সঙ্গীতের পরিবর্তিত অপূর্ণ সংকলন। বিশ্বজাতির জাতীয় সঙ্গীতের পরিপ্রেক্ষিতে বাঙলার তথা ভারতের জাতীয় সঙ্গীতের ক্রমপরিণতির তথ্যসম্বলিত ৫২ পৃষ্ঠাব্যাপী ভূমিকা। শ্রীভ, অখ্যাত, অজ্ঞাত ও বিখ্যাত কবিদের অসংখ্য সঙ্গীতে সমৃদ্ধ।

প্রকাশিত হইল

মূল্য পাঁচ টাকা

প্রকাশক—উষা পাবলিশিং হাউস

৩৪নং মহিম হালদার স্ট্রীট, কালিঘাট, কলিকাতা

'ভালবাসি' কবিতায় পাই,

"আপন অন্তর হতে মধুরে উছাসি
পুষ্প-সম বাণী ফুটে।"

'স্বপ্নবাত্রি'তে পাই

"শুধু ছুটি কথা,

বাণীতে ধরিবে রূপ বাত্রি-নীরবতা।"

কাব্য প্রাত্যহিক জীবনের আলোচনা নয়। ইহা মানস-জীবনকে প্রতিকলিত করে। প্রেম মনের ধর্ম।

"জীবনে আলোক রেখা অন্ধকারে করেছিছ ধ্যান,
নয়নে অমৃতবর্তি জালি' তুমি দিবেছ সন্ধান।"

'ব্যথা'য় আছে, "ছিল মরু মালক করেছি হিমা।"

"অশ্রুর কালিমা হতে বহু উদ্ধলোকে" কবি বাস্তবতার দেখা পাইয়াছেন।

"এ হৃদয়ে চিরকাল থেকো—

মিশেছে তোমার মাঝে শেষ কথা মোরে মনে রেখো।"

অন্তরের সাড়া পাই বলিয়া "প্রেমরাগ" সার্থক হইয়াছে। কবিতাগুলি পাঠকের চিত্তকেও নন্দিত করিবে।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

জারপোনা বহুবিধ
যান্ত্রিক ব্যাধির বাহন!
মার্কিট
তরল ও গুঁড়া ভিডিটি

তাহাদের
নির্মাণ প্রাণমাতক
আরসোলা, মশা
মাছি প্রভৃতিতেও
কার্য্যকর
বিজ্ঞানসম্মত উপারে
প্রস্তুত
বেঙ্গল কেমিক্যাল
ফ্যাক্টরি, কলিকাতা

সংকলন সজ্জা সন্ধান
পাওড়া হাফ



‘সমগ্রবাবুর জড়িমাশ’ শু ভাবার গুণে ইতিহাসের গতির সঙ্গে নায়ক প্রতীপের ভাবধারার কোন সংঘাত ঘটে নাই। সমগ্রবাবু বনেনী উপন্যাসিকের মনোরম সংযম অক্ষুণ্ণ রাখিরাজেন। এই উপন্যাসবাণি গতানুগতিক পুস্তক-তালিকার বাহিরে একটি বিশেষ স্থান দাবী করিতে পারে।’—জা ব ন্দ বা জা র

"কলো" স্বাধীন বাংলার নতুন উপস্থাপন। বিপ্লবের পটভূমিকায় এই উপস্থাপনখানি চিত্রকর্মী পোমের মত-
 লনের কাহিনী লইয়া

খারায় আনন্দবহু, বিস্তারিত
দল-উপদলের 'ধনি'
নামঞ্জুরে অপরূপ।...
...স্বাতীয়া আলো-
সাহিত্যে এমন একখানি হৃদয় উপভাস পাঠের

—युगांतर

সঙ্গরবাবু হোটেগল আর উপস্থানের একটা দিনখেনিস বের করতে পেরেছেন এই গ্রন্থে—অধিকার করেছেন এক নতুন ফর্ম। অর্থাৎ অল্পপিসর সহর কোলকাতার মধ্যে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন সারা ভারতবর্ষ, দেড় বছর কি তারও কম সময়ের মধ্যে ছবি এঁকেছেন ভারতের তথা সারা পৃথিবীর চিত্রন অন্তিমানে—স্বাধীনতার পথে, শান্তির পথে, ইন্টেলেকচুয়ালিজমের পথে। আর 'কলোলে'র কয়েকটি মাজ চরিত্র চোখের সামনে উপস্থিত করেছে সারা ভারতের অগণিত দল আর মতের মানুষকে।... 'কলোলে' সত্যিকারের সাহিত্য রূপ দিতে পেরেছে আজকের রাজনীতিকে।—ব স্ত্র ম ভী

—*Amrita Bazar*

'The author displays unique gift for delving deep into emotional realities and portraying contrasting characters.'—*Amrita Bazar*

‘এই উপস্থানখানি সঙ্ঘঘাবুর পূর্বার্জিত খ্যাতি বৃদ্ধি করবে, এ ভবিষ্যদ্বাণী করা সহজেই চলে। পার্থক্যগোষ্ঠীও যে উপস্থাসটির যথাযোগ্য সমাদর করতে ভোলে ন, দর্তমান’ বিভিন্ন সংস্করণই তার প্রমাণ।’—ব স্ত্র ম ভী

'...altogether the book is an interesting reading and amply merits the popularity it has won.' —*Hindusthan Standard*

‘The volume contains incidents & characters which will leave a deep impress on your mind. Mr. Bhattacharya wields a powerful pen and he does it with consciousness. Every character in the book has its own distinct individuality....It is a novel which not only offer you entertainment but also make you think.’—*Amrita Bazar*

ବତ୍ତ

বৃত্ত

‘বৃত্ত’ বেশ হয়েছে। সভাবান-বনানীর
সম্বন্ধটি খুলেছে ভাল। এরই বর্ণনায় এমন
একাধিক স্থান আছে যেখানে ভূমি সমাই
এক টাক। সার্থক হয়েছে। তাছাড়া বৃত্তটি সম্পূর্ণ রচনার
এগারো আনা দিক থেকে হলেও মন ছুটে যায় বৃত্তের
বাইরে, তার রঙীন পারিপার্শ্বিকে। অর্থাৎ, সভাবান-বনানীর
সম্বন্ধের রেশ চলছে, যদিও তোমার হাত থেকে বেহালার
ছড়ি নাবানো। এইটাই stream of consciousness-এর
আঙ্গিক চায়। বলা বাহুল্য তোমার কাব্যশক্তি তোমাকে
সাহায্য করেছে — **ব্রজটি প্রসাদ** **মুখোপাধ্যায়**

যব্বাযাটি

মরাণাটি 'সংঘত ভাবের সঙ্গে ভাবীর জড়ুত
যোগসাধন ঘটাইয়াছে গজ বলার
সহজ রীতি।...লেখক কোন
ছ' টাকা চার আনা চরিত্রের মধ্যে করণ রস ফুটাই-
বার জন্য ঘটনাবলির প্রয়াস মাত্র করেন নাই, সে বেন জমিতে
লাঙ্গল দেওয়ার সঙ্গে, ফসল বোনার সঙ্গে, নিত্যপ্রয়োজনীয়
জিনিসপত্র কেনার সঙ্গে, সামাজিক ক্ষুদ্র আনন্দ-উৎসব হৃৎ-
বেদনার সঙ্গে, আপনি জমিয়া উঠিয়াছে।'—প্র বাঙ্গী
'বাংলার কৃষক জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, বন্দ-অভ্যাসের
এমন হলর জীবন্ত চিত্র ইতিপূর্বে কোন বাঙালী
উপন্যাসে পেরেছি বলে মনে পড়ে না।'—স্বা ত ভ নি

পূর্বাশা - প্রকাশিত অন্যান্য

'The psychology of our young men and women has been critically discussed in a unique way in the light of the present-day social and political idealism.'
—*Hindusthan Standard*

‘বিষয়বস্তু এবং দৃষ্টিভঙ্গী এই উভয় দিক মিলাই এই বিরাট উপজাতিটির অভিন্নবদ্ধ আছে। মনস্তত্ত্ব এবং মতবাদ বিষয়ে লেখকের ক্ষমতার পরিচয় পাই এবং বর্তমান বাংলা তথা ভারতের রাজনৈতিক চিন্তা এবং কর্মকে রসবস্তুতে পরিণত করিবার ক্ষমতা দেখি। মুগ্ধ হই।...লেখক যে খাঁটি শিল্পীমনের অধিকারী তাহার পরিচয় মেলে তাহার স্বতঃস্ফূর্ত রসিকতায়, ভাবার প্রসাধন-নৈপুণ্য এবং কবিত্বপূর্ণ বর্ণনায়।’—প্রবাসী

‘১৯৩৯-এর যুদ্ধারম্ভ থেকে
স্বল্প করে ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষ
পর্যন্ত আমাদের জাতীয়
জীবনে যে দারুণ দুর্বিপাক
নেমে এসেছিল ‘রাত্রি’তে
আমাদের সমাজ-জীবনের
মেসার প্রদর্শন পেয়েছেন। নিঃসঙ্কেচে বলতে পারি। তাঁর সে প্রদর্শন সার্থক
হয়েছে। আলোচ্য বিষয় নিয়ে এ-পর্যন্ত বাংলা-সাহিত্যে যে কল্পনামূলক উপস্থাপনা
লেখা হয়েছে, ‘রাত্রি’ তাঁর মধ্যে শ্রেষ্ঠ আদান দখল করে।’—কুমার
‘অভিনবমন্ডের দিক থেকে ‘রাত্রি’ অতুলনীয়। প্রত্যেকটি চরিত্র যে
অপরিচীত সমাজের সমস্ত বাস্তব লালন করেছেন, যে সহজ হৃদয়ের ভাবে
তিনি তাঁর রূপ দিয়েছেন, তাতে যুদ্ধ হতে হয়।’—যুগান্তর

বইএর তালিকা সংগ্রহ করুন

পূর্বাশা - প্রকাশিত অন্যান্য বইএর তালিকা সংগ্রহ করুন

प्रकाशक ११

পূর্বাশা নিমিটেড—খি ১৩, গণেশচন্দ্র এভেন্যু, কলিকাতা ১৩

কঠৈ দেবায়—শ্রীদত্ত ভট্টাচার্য। পূর্বাশা লিমিটেড, পি.৩, গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা। দাম তিন টাকা। দ্বিতীয় সংস্করণ।

উপন্যাসখানির পটভূমি—স্বাধীনতাকামী ভারতবর্ষ, ঘটনাস্থল—বাংলাদেশ, পাত্রপাত্রী—বিভিন্ন রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদের কয়েকটি চরিত্র। বিভিন্ন মতবাদের সংঘর্ষে বিপ্লবী বাংলার ভরুণ মনে যে বিক্ষোভ জাগিয়াছে—তাহার সঙ্গে সখ্য ভালবাসা আশা-অভিমান প্রভৃতি বৃত্তিগুলি মিলিয়া এই কাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছে। দুটি নারী-চরিত্র এক কেন্দ্রে সংলগ্ন হইয়াও মিলিতে পারে নাই; আত্মকেন্দ্রিকতার প্রাচীরে বাধা পাইয়া ভিন্নমুখী হইয়াছে। এই কেন্দ্রাতিগ নারী-মনস্তত্ত্বের সুস্থ বিশ্লেষণ লেখকের তুলিকায় এমন হইয়াই ফুটিয়াছে। দীপালী ও চিত্রা-চরিত্র দুটিকে আপাত-বিচ্ছিন্ন মনে হইলেও—পরস্পরের পরিপূরক। কোন কোন স্থলে বিতর্ক দীর্ঘ হওয়ায় গল্পের বাধুনি কিছু মিথিল হইয়াছে—কিন্তু প্রধান চরিত্রগুলি অস্পষ্ট হয় নাই।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

হে বিহঙ্গ মোর—শ্রীমৎস দে। দি বুক হাউস, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য নয় সিকা।

১৯৪২ হইতে ১৯৪৫-এর মধ্যে বাংলার সমস্তা সবচেয়ে ঘনীভূত হইয়া ওঠে। যুদ্ধ, বিপ্লব, দমননীতি, হত্যাকাণ্ড—এই চারের সমন্বয়ে সমাজ-জীবন একেবারে ওলট-পালট হইয়া যায়। এই চরম ছবিপাকের মধ্যে বৈপ্লবিক চেতনাই জাতিকে মাথা সিঁধা করিয়া দাঁড়াইতে সচেষ্ট করিয়াছিল, কিন্তু সে পূর্ণ-সফলতা লাভ করিতে পারে নাই। সম্ভবও ছিল না। সমাজের নৈতিক জীবনে দুই দিক দিয়া ভাঙন ধরিতেছিল, এক দিকে নিদারুণ বৃত্তক, এক মুষ্টি অল্পের জন্ত লালায়ন, অল্প দিকে চোরাবাড়ার অমোঘ আকর্ষণ, রাতারাতি লক্ষপতি হইয়া উঠিবার লোভ এবং হযোগ।

এই পরিপ্রেক্ষিতে উপন্যাসখানি রচিত। লেখক যে বেশ দরদ দিয়াই দেশের এই বেদনা অল্পভব করিয়াছিলেন তাহার লেখার মধ্যে তাহার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। ঘটনার বর্ণনা তথা বিন্যাসের মধ্যে কুশল শিল্পীর হাতের ছাপ আছে, যদিও ভাষাভাষার জারগার একটু কাঁচা।

লেখক আদর্শবাদী ভাে। বটেই, সেই সঙ্গে বেশ স্ববলভাবে আশাবাদীও, যদিও সেজন্য কম বিরাগিষ্ট নহেন। তাহার কাছে বিপর্যয় খুবই সত্য, তবু মানুষের সর্বজয়ী আত্মা তাহার অনেক উর্ধ্বে; তাহার আশা অনেক, গতি অক্ষুণ্ণ, শত পরাজয়ের মধ্যেও সে অস্তিম বিজয়ের স্বপ্ন দেখিয়া চলে। গল্পের নায়ক স্বধনের মধ্যে এই সত্যটি বেশ ভালো ভাবে ফুটিয়াছে।

বাংলার চরম দুঃখের দিনের এই আলোখটকুর পাঠকসমাজে কদর হওয়া উচিত।

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

মুহাওয়া গাফী—রোম। রোল। অনুবাদক রবি দাস। ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, ৯, ছায়াচরণ দে স্ট্রিট, কলিকাতা। বঙ্গানুবাদ ১৯৪৭। দাম: ছাড়াই টাকা। পৃ-১৩৩।

১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের পরে রোল। গাফীজীর সম্বন্ধে একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। এতদিনে তাহার বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইল। রূপ বিপ্লবের পরে রোল।র মতের পরিণতি ঘটিয়াছিল এবং

ইন্টারন্যাশনালের

পুতুলনাচের ইতিকথা

মানিক বন্দোপাধ্যায়

অসংখ্য বিধিনিষেধের শেকলে বাঁধা আধুনিক কৃত্রিম সমাজে মানুষের চরম বিকাশের হযোগ কোথায়? হতাশ আর ভয়োত্তম সেই সব মানুষ-পুতুলের যান্ত্রিক জীবনের অপরূপ কাহিনী। পরিমার্জিত ও শোভন দ্বিতীয় সংস্করণ। দাম পাঁচ টাকা।

সমুদ্রের স্বাদ

মানিক বন্দোপাধ্যায়

বাঙালী মধ্যবিত্তের আশা-ভঙ্গের করুণ কাহিনী। কাঠ-হাসির অন্তরালে দুঃখের ক্ষুধারার রসোত্তীর্ণ রূপায়ণ। দাম তিন টাকা আট আনা।

ধানকান

ননী ভৌমিক

বাংলার সমাজ-জীবনকে বিধ্বস্ত করে গত দশকে যুদ্ধ ও হত্যাকাণ্ডের যে সর্বনাশা বড় করেছিল তারই সার্থক ছবি। জনগণের দুঃখ-দুর্দশার তুলনার মুষ্টিমেয়ের বিলাসের কাহিনী। দাম দুই টাকা বারো আনা।

আধুনিক চীনা গল্প

লু হুন, লাও চান, তিঙ লিঙ প্রভৃতি চীনের আটজন আধুনিক সাহিত্যিকের লেখা এগারোটি গল্প। বর্তমান চীনের সামাজিক ও রাজনৈতিক গণচেতনার নিখুঁত ছবি। অমল দাশগুপ্তের অনুবাদ। দাম তিন টাকা আট আনা।

ডাক

ইলিয়া এরেনবুর্গ ও অ্যান্ড্রু আটজন সেরা সোভিয়েট সাহিত্যিকের বাছাই করা গল্পের সংকলন। গল্প পড়ে চোখে পড়ে একটি পরিবর্তনশীল সমাজে গণমিছিলের প্রাণস্পন্দন যা আগামী রূপের প্রতিফলনে উজ্জল। দাম দুই টাকা আট আনা।

পারীর পতন

ইলিয়া এরেনবুর্গের যুগান্তকারী উপন্যাস *Fall of Paris*-এর বঙ্গানুবাদ। গত মহাযুদ্ধ ও তার আগেকার সময়ের ফরাসী জীবনের নিভুল ও বলিষ্ঠ চিত্র। পারীর বুলভার ও কাকের কঁদারোঁর খড়বুদ্ধি সমুদ্র, ফ্লোরির বনানীচিহ্নিত প্রান্তর, মাসারিএর বিচিত্র জীবন, টেকের কাদা আর উকুন, নিশ্চরীপ শহরের বিজাতি ও অস্থিরতা—বিচ্ছিন্ন দৃশ্যগুলো একটা আশ্চর্য ও ভয়ংকর কবিতার স্তবকের মতো অনন্তসাধারণ। অনুবাদ করেছেন—অমল দাশগুপ্ত, রবীন্দ্র মজুমদার ও অনিলকুমার সিংহ। তিন খণ্ড একত্রে দাম দশ টাকা।

সচিত্র তালিকার জন্ত চিঠি লিখুন

ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশিং হাউস লিঃ

৩০, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা—১৬

বর্তমান বইখানি লিখবার সময়ও তিনি গান্ধীজীর নেতৃত্বমূলক কর্ম-প্রচেষ্টাকে যেমন ভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন, গঠনকর্মের ভিতর দিয়া গান্ধীজী যে নূতন জীবন রচনার প্রচেষ্টা করিতেছিলেন, তাহার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি তত দূর আকৃষ্ট হয় নাই। তৎসঙ্গেও রোলার মত একজন মনীষী ও প্রতিভাসম্পন্ন শিল্পীর দৃষ্টিতে গান্ধী এবং রবীন্দ্রনাথ কি ভাবে প্রতিভাত হইয়াছিলেন, তাহা আমাদের সকলের পক্ষে শিক্ষণীয়।

অনুবাদকের দায়িত্ব অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। যেখানে বিষয়বস্তুই অভ্যস্ত গূঢ় বা জটিল, সেখানে ব্যাখ্যা না করিয়া পুরাপুরি লেখকের ভাব জ্ঞাপন করা কঠিন। অথচ অনুবাদকের পক্ষে সেরূপ অধিকার গ্রহণ করা উচিত নয়। এইরূপ নানা বিষয় সত্ত্বেও শ্রীযুক্ত রবি দাসের অনুবাদ সার্থক হইয়াছে। ভাষার বাস্তবতার জন্ত পাঠকের মনে কোন গীড়া জন্মায় না।

গীতা-বোধ—মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। অনুবাদক ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীকুমারচন্দ্র দ্বান। ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, ২, স্ট্রামচরণ দে স্ট্রিট, কলিকাতা। গুজরাতি সংস্করণ ১৯৩০, বঙ্গানুবাদ ১৯৪৭। পৃ. ১০—১১০। দাম বার আনা, বিশেষ সংস্করণ, এক টাকা।

গান্ধীজী লবণ-সত্যাগ্রহের পর যখন য়েরোড়া জেলে বন্দী ছিলেন তখন অল্পে অল্পে গীতার একটি সরল উপক্রমণিকা লেখেন। প্রতি অধ্যায়ের তাৎপর্য অত্যন্ত সরল গুজরাতি ভাষায় জনসাধারণের বোধের জন্মই লেখা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। উক্তর ঘোষ এবং কুমার বাবু উভয়ের সেই লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া অনুবাদ করিয়াছেন। ভাষা সরল হইয়াছে, এবং পড়িতে কোথাও বাধে না।

গান্ধীজীর ধর্মমতের সম্যক পরিচয় বাঁহারা লাভ করিতে চান, অথবা গীতার শিক্ষাকে ভিত্তি করিয়া সরলভাবে নিজের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিতে চান তাঁহাদের পক্ষে বইখানি পড়া বিশেষ দরকার।

শ্রীনির্মলকুমার বসু

গান্ধীজী কি চান—শ্রীনির্মলচন্দ্র বসু। সাহিত্যিক, ১২৩, আমহাট স্ট্রিট, কলিকাতা। পৃ. ৮০। মূল্য ১২ টাকা।

এই পুস্তকে প্রকাশিত ছয়টি প্রবন্ধ ধারাবাহিক রূপে শনিবারের চিঠিতে প্রকাশিত হইয়াছিল। মহাত্মাজীর কর্মপন্থা ও আদর্শ সম্বন্ধে সাধারণ পাঠক এমন কি অনেক শিক্ষিত-ব্যক্তিরও ভ্রান্ত ধারণা আছে। লেখক গান্ধীবাদের নানা দিক বিশ্লেষণ করিয়া এই ভ্রমাত্মক ধারণাগুলি দূর করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। মহাত্মাজীর গঠনমূলক কার্যকেও অনেকে পুরাতনের প্রতি অশ্রদ্ধাভাবিক আগ্রহপ্রসূত বলিয়া মনে করেন এবং তাঁহার কুটীর-শিল্প-উন্নয়ন পরিকল্পনাকে প্রগতিবিরোধী বলিয়া ভয় পান। অধ্যাপক বহু মহাশয় অতি হঠাৎ আলোচনাঘারা বুঝাইতে সক্ষম হইয়াছেন যে, বর্তমান হজুগের সময় বাহা ভাল ও মানবকল্যাণকর বলিয়া চলিতেছে এবং আরও ব্যাপকভাবে চালাইবার চেষ্টা হইতেছে তাহার মধ্যে অনেক গলদ আছে। এই গলদ এড়াইয়া চলিতে পারিলেই তবে ভারতের প্রকৃত মঙ্গল হইবে, অন্তথা নহে।

দেশের হিতকামী ব্যক্তিমাত্রেই এই পুস্তকপাঠে উপকৃত হইবেন এবং প্রকৃত গান্ধী-দর্শনের মর্মার্থ উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

বিজ্ঞানী ও বীজাণু—শ্রীখগেন্দ্রনাথ সিংহ। আশুতোষ লাইব্রেরী, কলিকাতা, ঢাকা। পৃ. ৭৪; মূল্য দশ আনা।

অনেকেরই ধারণা—যথেষ্ট অর্থ, বাস্তব্যা এবং সুসজ্জিত পরীক্ষাগার ব্যতিরেকে বৈজ্ঞানিক তথ্যানুসন্ধান সাফল্য লাভ করা দুস্বপ্ন; কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই একথা সত্য নহে। আসল কথা হইতেছে—একান্ত অনু-সন্ধিৎসাশ্রবণ এবং অদমা অধ্যবসায়। ইহারই বলে জ্ঞানোদযৌ প্রবল

বাধাবিহীন অতিক্রম করিয়াও সত্যের সন্ধান পাইয়া থাকেন। বিজ্ঞানের বহুবিধ ক্ষেত্রেই এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। গোড়ার বাঁহারা জীবাণু-জগতের সন্ধান পাইয়াছিলেন এবং বাঁহারা তাহাদের রহস্যসন্ধান ব্যাপ্ত ছিলেন তাহাদের সকলেরই কাহিনী গভীর কৌতুহলোদ্দীপক। “মাইক্রোব-হাটারস” নামক বইখানিতে তাহাদের অভিনব আবিষ্কার সম্পর্কিত ঘটনাবলী বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। আলোচ্য পুস্তকখানিতে গ্রন্থকার বাংলা ভাষায় তাহাদেরই কথা বেশ প্রাঞ্জলভাবে আলোচনা করিয়াছেন। লেখার ভঙ্গী সহজ ও হৃদয়। বইখানি পড়িয়া প্রত্যেকেই তৃপ্তি লাভ করিবেন বলিয়া মনে হয়।

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

দেশ বাদের ডাকে—শ্রীশান্তিকুমার দাশগুপ্ত। মুখার্জী গুপ্ত এণ্ড কোং। ৪৫, ধর্মতলা লেন, শিবপুর, হাওড়া। দাম ১৮০।

ছেলেদের উপস্থান। যদিও গল্পের মধ্যে বিশেষ কিছু নূতনত্ব নাই তথাপি সহজ ভঙ্গীতে বলিবার কৌশল লেখকের আয়ত্ত থাকায় উপস্থানস্থানি ভাল লাগিল।

বিশ্বরূপা—সম্পাদক : শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সিংহ। শ্রীগুরু লাইব্রেরী ২০৪, কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট, কলিকাতা। দাম ১০।

সঙ্কলন-গ্রন্থ। খ্যাত এবং অখ্যাত বহু লেখকের লেখা গ্রন্থখানিতে স্থান লাভ করিয়াছে। তন্মধ্যে অধ্যাপক হুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং অধ্যাপক শ্রুতুমার সেনের প্রবন্ধ দুইটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থখানি শুধু প্রবন্ধসঙ্কলন হইলে সম্পাদনার বিরুদ্ধে বলিবার তেমন কিছু ছিল না। কিন্তু গল্প এবং কবিতাও ইহাতে স্থান লাভ করিয়াছে অথচ সেদিকে সম্পাদক মহাশয় বিশেষ দৃষ্টি দিয়াছেন বলিয়া মনে হইল না। অল্পসংখ্যাপার ভুল বিরক্তিকর।

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

ফুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী—শ্রী গোপাল ভৌমিক। বেঙ্গল পাবলিশার্স। ১৪ বক্সি চার্ট্রুজ স্ট্রিট, কলিকাতা—১২, মূল্য এক টাকা।

ভারতবর্ষ আজ পূর্ণ স্বাধীনতার দ্বারপ্রান্তে উপনীত হইয়াছে। আজকের দিনে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলার অবদানের কথা বিশেষ ভাবে স্মরণ করা উচিত। মুক্তিপাগল বাদ্দালী একদিন ব্রিটিশ শাসনের উচ্ছেদ করিবার জন্ত জগৎ সমিতি স্থাপন করিয়া সশস্ত্র বিদ্রোহের আয়োজন করিয়াছিল। এই বিপ্লব-আন্দোলনে বাংলার যে সমস্ত তরুণকে আত্মাহুতি দিতে হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে প্রফুল্ল চাকী ও ফুদিরাম বহু বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন। মুক্তি-সংগ্রামে বাংলার প্রথম শহীদ হওয়ার গৌরব প্রফুল্ল চাকীরই প্রাপ্য—ফুদিরাম ছিলেন বিপ্লবী গুপ্ত-সমিতির মেদিনীপুর শাখার কর্মী। লেখক সরকারী রিপোর্ট এবং ফুদিরামের স্মৃতি ভাষা অপরূপা দেবীর রচনাদি হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। গুপ্ত সমিতির কার্যক্রম ও স্বরূপ বিশ্লেষণে লেখক বাংলার বিপ্লব আন্দোলনের মর্মকথাটি অসুব্যবস্থা করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন।

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

দেশ-বিদেশের কথা

বাঁকুড়া শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ১৯৪৬ সনের
সংক্ষিপ্ত কার্যবিবরণী

অগ্ৰাজ বৎসরের জায় এ বারেও বাঁকুড়া শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন কেন্দ্রে সেবা পূজা ধর্মালোচনা সভা ও বৈঠকাদি নিয়মিত ভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বর্তমান বৎসরে সর্বসাধারণের জন্ম কয়েকটি ধর্মসভার এবং মঠ ও মিশনের অন্তঃবাসিগণের মধ্যে ২৯৪টি ধর্মালোচনা বৈঠকের আধিবেশন হইয়াছে। মিশনের বিভিন্ন বিভাগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিয়ে দেওয়া হইতেছে। ইহার পুস্তকাগারে মোট পুস্তকসংখ্যা ১৩৪১। মোট চলিশখানা মাসিক পত্রিকা ও দু'খানা দৈনিক সংবাদপত্র নিয়মিতভাবে পাঠাগারে গৃহীত হয়।

মিশন কর্তৃক তিনটি দাতব্য চিকিৎসালয় পরিচালিত হই-
তেছে। আলোচ্য বর্ষে মোট ৬৫৬২৭ জন রোগী চিকিৎসিত
হইয়াছে। তন্মধ্যে মিশনের হাসপাতালে সর্বসমেত ২১১৫ জন
রোগীকে স্থান দেওয়া হইয়াছে। এবার মোট ১০ জন ছাত্র
বিবেকানন্দ হোমিও বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছে।

রামহরিপুর অবৈতনিক উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কার্য
নিয়মিত ভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। উহাকে মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ে
পরিণত করিবার চেষ্টা চলিয়াছে। মোট ছাত্র সংখ্যা ১২৩ জন।

কাল পাথর, আন্দার খোল ও গঙ্গাজলঘাটা থানার ১২টি
গ্রামের ৭২০টি পরিবারের ১৪০০ লোকের মধ্যে মোট ২৯১৯
সের চাউল, ৪৩৮খানা কাপড় ও ৫৫টি কোট বিতরণ করা
হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ব্যাপকভাবে আরো নানা জনহিতকর
কার্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

চাংড়ীপোতা গ্রামে প্রসূতি-সদনের ভিত্তি স্থাপন

গত ১৬ই নবেম্বর চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত চাংড়ীপোতা
গ্রামে "রাজলক্ষ্মী প্রসূতি ও শিশুসদনে"র ভিত্তি প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে
মেজর জেনারেল এ. সি. চাটার্জির পৌরোহিত্যে এক সভা হইয়া
গিয়াছে। কলিকাতার খ্যাতনামা চিকিৎসক, 'ডাক্তার বঙ্গের
লেবরেটরী'র স্বত্বাধিকারী ডাক্তার শ্রীযুক্ত কার্তিকচন্দ্র বসু মহাশয়
তাহার মাতার স্মৃতি রক্ষার্থে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া উক্ত প্রতিষ্ঠান
নির্মাণের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। পশ্চিম
বঙ্গের স্বাস্থ্য ও অর্থসচিব শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরী এই নব-
পরিকল্পিত জনহিতকর প্রতিষ্ঠানটির ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া
ডাঃ বসুকে তাহার জনহিতৈষণার জন্ম অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন
করেন এবং এই প্রতিষ্ঠানটির জন্ম সরকারী সাহায্যের প্রতিশ্রুতি
দিয়া গ্রামবাসীদেরও দেশের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্ম নিজ নিজ কর্তব্য
সম্বন্ধে অবহিত হইতে অনুরোধ করেন। এই অনুষ্ঠানেরই অন্ততম
অঙ্গ হিসাবে ডঃ বিজ্ঞেন্দ্রনাথ মৈত্র মহাশয়ের সভাপতিত্বে ডাঃ
বসুকে তাহার ৭৪ বৎসর পূর্ণ হওয়ার জন্ম অভিনন্দিত করা হয়।
ইতিপূর্বে পল্লী উন্নয়নের জন্ম তিনি যে অর্ন্তলক্ষ্যাদিক মূদ্রা দান
করিয়াছেন সভাপতি মহাশয় বক্তৃতা-প্রসঙ্গে সে কথার উল্লেখ

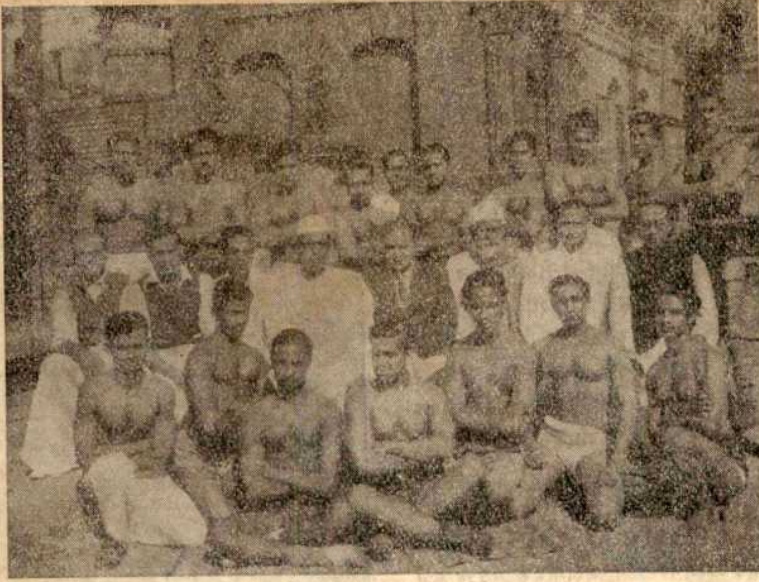
করেন। স্বাস্থ্যধর্মসমাজের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বসু
সভায় উপস্থিত ছিলেন।



প্রসূতিসদনের ভিত্তিস্থাপন। দণ্ডায়মান দক্ষিণ দিক হইতে দ্বিতীয়
ডাঃ কার্তিকচন্দ্র বসু



হরীরচন্দ্র লাহিড়ী
('বিবিধ প্রসঙ্গে' প্রবন্ধ)



সদ্য বিলাত-প্রত্যাগত শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়ের সংবর্ধনা । দ্বিতীয় সারিতে
উপরিস্থ বাম দিক হইতে পঞ্চম শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত অশোক চট্টোপাধ্যায়ের সংবর্ধনা

সদ্য বিলাত-প্রত্যাগত শ্রীযুক্ত অশোক চট্টোপাধ্যায়ের সংবর্ধনার্থ খ্যাতনামা ব্যায়ামকুশলী প্রফেসর শ্রীবিজয় মল্লিকের উদ্যোগে বিগত ২৩শে নবেম্বর "মরিকস হেল্থ হোম" নামক ক্লাবে এক চায়ের আসরের আয়োজন হয়। এই উপলক্ষ্যে প্রফেসর মল্লিকের শিষ্যবৃন্দ কর্তৃক বিবিধ ব্যায়াম কৌশল প্রদর্শিত হয়। এ সমস্ত অমুষ্ঠান শেষ হইলে অশোকবাবু শারীরিক ব্যায়ামের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। তিনি বাঙালী যুবকদের সর্বোপায় শরীর সামলাইবার জন্য অবহিত হইতে অমুদ্বোধ করেন। অশোকবাবু নিজে বিবিধ ব্যায়াম ও ক্রীড়াদিতে হনিপুণ। বাঙালী যুবকদের মধ্যে ব্যাপকভাবে মুষ্টিযুদ্ধ শিক্ষা ও নানা ব্যায়াম-কৌশল প্রবর্তনের জন্য তিনি এক সময় যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। দেহাশুশীলন সম্বন্ধে তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতামূলক বক্তৃতা শ্রোতবৃন্দের পক্ষে বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছিল। ডাক্তার কে. ডি. ঘোষ, ডাঃ অমর মুখোপাধ্যায়, ডাঃ আদিত্য গুপ্ত, শ্রীশিখর কুমার কর, শ্রীসন্তোষকুমার দে, শ্রীপ্রমথ চৌধুরী প্রমুখ বিশিষ্ট ভদ্র মহোদয়গণ উক্ত আসরে যোগদান করিয়াছিলেন।

রাঁচিতে স্কাউট ক্যাম্প

দ্বিতীয় কলিকাতা বনস্কাউট এসোসিয়েশনের উনবিংশতি দল শ্রীকানাই বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধিনায়কত্বে বিগত অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে রাঁচিতে ক্যাম্পের অমুষ্ঠান করে। ব্যারিষ্টার শ্রীদীতান্য পালের রাঁচিস্থ ভবনে স্কাউটদের শিবির সংস্থাপিত হয়। হুড়ু ও জোনা জলপ্রপাত এবং অশ্রদ্ধ প্রাকৃতিক দৃশ্য দর্শনে ব্রতীবৃন্দ প্রভূত আনন্দ লাভ করে। সম্ভ্রান্ত নাগরিক শ্রীঅর্জুন আগরওয়াল ইহাদিগকে তাঁহার সুবিস্তৃত ভবনে নিমন্ত্রণ করিয়া চা-পানে

আপ্যায়িত করেন। বিহারের লাট-প্রাসাদেও অতিথিগণ-সহ ব্রতীবৃন্দ নিমন্ত্রিত হন। অবিলম্বে পাটনা যাওয়ার প্রয়োজন সম্বন্ধে বিহারের গভর্ণর শ্রীজয়রামদাস দৌলতরাম সপরিবারে প্রায় ত্রিশ মিনিট কাল ইহাদের মধ্যে থাকিয়া স্কাউট, কাব ও বোতারদের কার্যাবলী পরিদর্শন করেন। উনবিংশ গ্রুপের ব্রতীবৃন্দ ছাড়াও লাটপ্রাসাদের অতিথিগণের মধ্যে সেখানকার পুলস কমিশনার, গবর্ণরের এ. ডি. সি., কবি শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, কলিকাতা কর্পোরেশনের ভূতপূর্ব কোর্সিলর শ্রীহরীকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীকালীকৃষ্ণ রায় প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। গবর্ণরের একটি নাতিদীর্ঘ হৃদয় অভিভাষণের পর সেখানকার আধ ঘণ্টার চিন্তাকর্ষক কার্যসূচী সমাপ্ত হয়।

পরলোকে হরেন্দ্রনাথ বস্থ

গত ১লা পৌষ (১৭ই ডিসেম্বর) বেঙ্গল কেমিক্যাল প্রতিষ্ঠানের অন্যতম জনপ্রিয় উৎসাহী বন্দী হরেন্দ্রনাথ বস্থ মহাশয় পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি ১৯০২ সনে এট্টেল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সরকারী কর্মে লিপ্ত হন। জীবনের শেষ আঠার বৎসর কাল তিনি বেঙ্গল কেমিক্যালের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। হরেন্দ্রনাথ খেলাধুলায় বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করিতেন। যৌবনে তিনি একজন ফুটবল খেলোয়াড় রূপে খ্যাতিলাভ করেন। সাহিত্যের প্রতিও তাঁহার অসামান্য প্রীতি ছিল। তাঁহার অমায়িক ব্যবহার ও সৌজন্যগুণে সকলেই মুগ্ধ ছিলেন। কলিকাতার সন্নিকটস্থ সোদপুরে তিনি দীর্ঘকাল অবস্থান করেন। তিনি তথাকার বিভিন্ন ক্লাব ও প্রতিষ্ঠানের একজন উৎসাহী সভ্য ছিলেন।



যবন হরিদাসের মহাপ্রয়াণ
কিশোর সেনগুপ্ত

STUDENTS' A. ROOM

COMMON-ROOM STUDENTS' A. ROOM

ব্রাহ্মী হোস, কলিকাতা

STUDENTS'
P. G. A.
COMMON-ROOM



STUDENTS'
P. G. A.
COMMON-ROOM

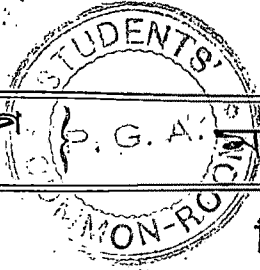
ভাস্কর ও শিল্পী ত্রিদেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী কৃত মালাবার-কবি কুমার আসানের প্রস্তরমূর্তি

আমরা

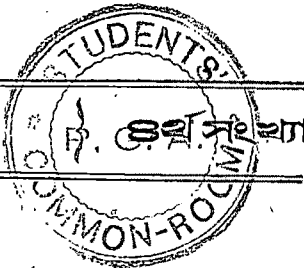
“সত্য শিবম্ সুন্দরম্

মায়াম্মা বলহীনেন লভ্যঃ”

৪৭শ ভাগ
২য় খণ্ড



জানুয়ারী, ১৩৮৪



বিবিধ প্রসঙ্গ

মহাত্মাজীর অনশন ভ্রতের সমাপ্তি

মহাত্মাজীর সর্ব দিল্লীর অমূল্যমান অধিবাসীগণ মানিয়া লওয়ায় তাঁহার অনশন ভ্রতের সমাপ্তি হইয়াছে। এই ব্যাপারে সারা জগতে সাক্ষ্য পড়ে এবং চতুর্দিক হইতে এই মহাত্মানবের মঙ্গলের জ্ঞাত্যাত্মিক ব্যাকুলতা প্রকাশ হয়। অনশন ভ্রমে সমস্ত ভারত এবং জগতের সুশীলবর্গের এক বিশিষ্ট অংশ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। মহাত্মাজী নিজের জীবন যে বিশেষ মঙ্গল কার্য সাধনের জন্ত পণ করিয়াছিলেন তাহা সফল হইয়াছে এবং তাহাতে দিল্লীর কল্যাণ হইবে ও বিশ্বমানবের চক্ষে গান্ধীজীর মহান আদর্শ আরও উজ্জ্বল হইবে। কিন্তু এবারকার অনশন ভ্রত সম্বন্ধে কেবলমাত্র মহাত্মাজীর প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস নিবেদন করিয়া ক্ষান্ত হইলে আমাদের পক্ষে কর্তব্যের দারুণ অবহেলা করা হইবে; সুতরাং সুবিধাবাদের সহজ পথ ছাড়িয়া উহার কলাকল সম্বন্ধে কঠোর বাস্তববাদের দ্বায় অমূল্যারে বিচার করিতে হইবে। আজ আমরা স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়াছি এবং দুইদিন পরে সম্পূর্ণ স্বাধীনতালাভ করিব আশা করিতেছি। সুতরাং ভারতবর্ষের শুভাশুভ এখন আমাদের নিজের হাতে, সব দোষ ইংরেজের ক্ষেত্রে চাপাইয়া নিস্তার পাওয়ার উপায় আর আমাদের নাই, সেই কারণে ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের কর্ণধার বাহাদুর তাঁহাদের কার্যাবলীর আলোচনা, যতই অগ্রিয় হউক, আমাদের করিতেই হইবে নহিলে এই নূতন রাষ্ট্রের সমুদ্র বিপদ ও অমঙ্গল অবজ্ঞাবী। কেবলমাত্র ভাবের উচ্ছ্বাসে গদগদ হইয়া, চক্ষু মুদ্রিয়া, সহজ পথে চলিয়া, আমাদের কতবার কি নির্দারুণ দুর্দশায় পড়িয়া দাসত্ববরণ করিতে হইয়াছে তাহার বিবরণ ইতিহাসের শত সহস্র পৃষ্ঠা ভরিয়া গিয়াছে। আবার সেই পথে চলিলে ফল একই হইবে।

মহাত্মাজীর অনশনের উদ্দেশ্য মহান ছিল এবং তিনি আমাদের সকলের কল্যাণকামনা করিয়াই এই ভ্রত গ্রহণ করেন সে বিষয়ে কাহারও মনে কোনও সন্দেহের অবকাশ নাই। কিন্তু আমরা জানি অনেক ক্ষেত্রে কল্যাণ কামনা করিয়া যে কাজ করা হয় তাহার ফল নিরবচ্ছিন্ন কল্যাণপ্রসূ হয় না। যেমন চিকিৎসার ক্ষেত্রে অনেক ঔষধ আবিষ্কৃত হয় যাহা রোগ-

বিশেষে অমোঘ অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইতে পারে কিন্তু যাহাতে রোগীর দেহে বিষম প্রতিক্রিয়া হওয়ায় অনেক সময় তাহার প্রাণ বিপর্য হইয়া পড়ে। সে কথা মনে রাখিয়া আমাদের এখন বিচার করা প্রয়োজন যে এই আমরগ অনশন ভ্রতরূপ ঔষধ প্রয়োগে সমগ্র রাষ্ট্রের দেহে কলাকল কি ঘটয়াছে। কংগ্রেসের আদর্শ যদি সত্য হয় তবে ভারতযুক্তরাষ্ট্রের জনসাধারণের অংশ রূপে রাষ্ট্রের মঙ্গল-অমঙ্গল বিচারের অধিকার আমাদের সকলেরই সম্পূর্ণ আছে।

মহাত্মাজীর অনশন ভ্রতে উপকার হইয়াছে দিল্লীর মুসলমান ও অমূল্যমান অধিবাসীদিগের প্রত্যক্ষ ভাবে এবং পরোক্ষ ভাবে, দিল্লীর উদাহরণ দেখিয়া, সেই সকল অঞ্চলের লোকের যথানে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের আগুন এখনও জ্বলিতেছে। ভারতযুক্তরাষ্ট্রের পনেরো আনা অংশে ঐ রোগ এখন নাই সুতরাং ঐ ঔষধের দরুন কোনও সুফল দেখানে হওয়া সম্ভব নহে। এক কথায় মহাত্মাজীর এই প্রচেষ্টায় যুক্ত ঔষধ এবারে ব্যবহৃত হইয়াছে ভারতযুক্তরাষ্ট্রের অতি ক্ষুদ্র অংশের জন্ত।

কিন্তু ঔষধের বিষয় প্রতিক্রিয়া হইয়াছে সমস্ত রাষ্ট্রের উপর, এ বিষয়েও সন্দেহের অবকাশ নাই। এবং সেই প্রতিক্রিয়ার কারণ মহাত্মাজীর ঔষধ তাহাও নিঃসন্দেহ। কেননা এবার তিনি জনসাধারণকে পূর্বাঙ্কে বলেন নাই যে তিনি কি কারণে এইরূপ ভ্রত অবলম্বন করিতে যাইতেছেন, এবং কি সর্গে তিনি অনশন ভ্রম করিবেন। উপরন্তু ভ্রত গ্রহণের সময়ের উপযোগিতা বা ভ্রতকালে আন্তর্জাতিক সাময়িক পরিস্থিতির বিচার করা তিনি প্রয়োজন মনে করেন নাই।

অনশনের প্রথম প্রতিক্রিয়া আমরা দেখিলাম পণ্ডিত নেহরুর পাকিস্তানকে পঞ্চায় কোটি টাকা দিবার সংকল্পে। আমরা পরে একথাও শুনিয়াছি যে, এই পঞ্চায় কোটি টাকা দেওয়া বা না দেওয়ার সহিত মহাত্মাজীর অনশনের কোনও সম্পর্ক ছিল না, উহা পণ্ডিত নেহরুর বিচারের ভুল। কিন্তু যেহেতু মহাত্মাজী অনশনের পূর্বে সর্বশেষ সর্ব জাপন করেন নাই—এবং পরেও স্পষ্ট কিছু বলেন নাই—সেইজন্য আজ পাকিস্তানির দল সারা জগৎকে বুঝাইতে সমর্থ হইয়াছে যে ঐ টাকা

তাহাদের প্রাপ্য ছিল এবং এতদিন ভারতযুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রীসংসদ দুর্নীতির আশ্রয় করিয়া উহাদের বক্ষিত করিতে চেষ্টা ছিল। এইভাবে পঞ্চাশ কোটি টাকা দেওয়ায় আজ ভারতরাষ্ট্র প্রথমতঃ জগতের চক্ষে হীন প্রতিপন্ন হইল এবং দ্বিতীয়তঃ পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে প্রকাশ ও গোপন যুদ্ধের ক্ষমতা অর্জন পাইল। অনশনের দ্বিতীয় প্রতিক্রিয়া হইয়াছে সম্মিলিত জাতি-সংসদের (U. N. O.) পরিষদে। ঠিক যে সময়ে সেখানে ভারতযুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কাস্মীর সম্পর্কে অভিযোগ উপস্থাপন করে, সেই সময়েই মহাত্মাজী অনশন ব্রত আরম্ভ করিয়া জগতের কাছে সমগ্র ভারতীয় অসুসলমানদিগের মুসলমানের প্রতি অবিচার, অনাচার ও অত্যাচারের কথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত করিয়া দিলেন। তিনি অনশনের পূর্বে বলেন নাই যে তিনি কেবল দিল্লীর কথা ভাবিতেছেন, সুতরাং সম্মিলিত জাতি-সংসদে ভারতযুক্তরাষ্ট্রের সম্বন্ধে সন্দেহ জন্মিয়াছে। ইহা ভিন্ন সর্বোপেক্ষ বিষয় প্রতিক্রিয়া হইয়াছে ভারতযুক্তরাষ্ট্রের চালনার ব্যবস্থায়। চিন্তাশীল ব্যক্তিমাঝেই এবার বুঝিল যে মহাত্মাজী কার্যতঃ ভারতযুক্তরাষ্ট্রে একনায়কত্ব (dictatorship) স্থাপন করিয়াছেন।

নূতন মন্ত্রিসভা

নূতন প্রধান মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এবং তাঁহার মন্ত্রীসভার এগার জন সদস্য ২৩শে জাভুয়ারী কার্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। নূতন মন্ত্রীদের মধ্যে নিম্নলিখিত ভাবে মন্ত্রণ বণ্টন করা হইয়াছে :

প্রধান মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়—স্বরাষ্ট্র, স্বাস্থ্য ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন।

ত্রীনলিনীরঞ্জন সরকার—অর্থ, বাণিজ্য ও শিল্প।

রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী—শিক্ষা।

ঐপ্রফুল্লচন্দ্র সেন—অসামরিক সরবরাহ।

শ্রীযাদবেন্দ্রনাথ পাক্সা—কৃষি ও পশু চিকিৎসা।

ত্রীনকুলবিহারী মাইতি—সমবায়, দুর্গতজ্ঞান ও পুনর্বাসতি।

শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ—পুর্ন ও যোগাযোগ।

শ্রীমোহিনীমোহন বর্মন—ভূমি ও ভূমিরাজস্ব।

শ্রীনীহারেন্দ্র দত্ত মজুমদার—বিচার ও আইন।

শ্রীভূপতি মজুমদার—সেচ ও জলপথ।

শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায়—শ্রমিক।

শ্রীহেমচন্দ্র নন্দর—বন ও মৎস্য।

কার্যভার গ্রহণের পর ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় একটি সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে দেশের প্রয়োজন মিটাইবার চেষ্টাই তাঁহার প্রথম কর্তব্য হইবে। তিনি বলেন, বর্তমানে তিনটি সমস্যা তাহাদের সম্মুখে বিদ্যমান। প্রথমটি হইতেছে ঋণ, বন্ধ ও জীবনযাত্রা নির্বাহের পক্ষে আবশ্যিক দ্রব্যাদির অভাব মিটানো। দ্বিতীয় সমস্যা হইতেছে গৃহ সঙ্কট,

বিশেষতঃ পূর্ববঙ্গ হইতে যে বহু লোক এই প্রদেশে চলিয়া আসিয়াছে তাহাদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা। আসলে কলিকাতা এখনও পঞ্চাশের মনস্তত্ত্বের এবং তাহার পরবর্তী মহামারীর ঝুঁকি কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই। তৃতীয়তঃ তিনি পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের মন হইতে শঙ্কা দূর করিয়া তাহাদের মনে আস্থা ফিরাইয়া আনিতে চাহেন। পূর্ববঙ্গ হইতে বহু লোক যে পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া আসিয়াছে তিনি তাহা জানেন। কর্মক্ষেত্র হইতে বিচ্যুত হইয়া তাহারা যে ক্লেশ ভোগ করিতেছে তাহাও তিনি অবগত আছেন। সীমান্ত রক্ষার নিমিত্ত এবং বাঙ্গালীর মনে আস্থা স্কাবের উদ্দেশ্যে একটি বেসরকারী কিসা সরকারের উদ্যোগে গঠিত একটি প্রাদেশিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা যত শীঘ্র সম্ভব করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে তিনি ইতিমধ্যেই ভারত সরকারের দেশরক্ষা বিভাগের সুচিত্র আলোচনা আরম্ভ করিয়াছেন। শীঘ্রই তিনি এ বিষয়ে কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য অধিকতর সচেষ্ট হইবেন। ঋণ সমস্যা সম্পর্কে ডাঃ রায় বলেন যে কি ভাবে বর্তমান অর্থ-নৈতিক বিশৃঙ্খলা দূর করা যায় সে বিষয়ে তিনি এখনও কোন মতামত স্থির করেন নাই। গাছীজী কোনরূপ নিয়ন্ত্রণের ঘোর বিরোধী। সেই নীতি পশ্চিমবঙ্গে প্রয়োগ করা যায় কি না তাহা তিনি বলিতে পারেন না। শ্রমিক সমস্যা সম্বন্ধে ডাঃ রায় বলেন যে সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে অস্থগীত সম্মেলনে নির্দ্ধারিত পথেই তিনি চলিবেন।

মন্ত্রী সভায় ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ডেপুটি প্রধান মন্ত্রী হিসাবে যোগ দিবেন কিনা তাহা এখনও সঠিক বুঝা যাইতেছে না। কার্যভার গ্রহণের পূর্বদিন এক সাংবাদিক বৈঠকে ডাঃ রায় বলিয়াছিলেন যে মন্ত্রী সভায় যোগদান সম্পর্কে ডাঃ ঘোষের মতামত চূড়ান্ত ভাবে জানা যায় নাই, তিনি দিল্লী হইতে ফিরিলে জানা যাইবে। এই কথা সাংবাদিকপত্রে প্রকাশিত হইলে ডাঃ ঘোষ নিম্নলিখিত বিবৃতি দেন—

“আমি ডাঃ রায়ের মন্ত্রী সভায় যোগ দিব কি না সে সম্পর্কে তিনি আমার নিকট হইতে কোন শেষ কথা পান নাই বলিয়া পশ্চিমবঙ্গের নূতন প্রধান মন্ত্রী যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি। তিনি যে আমাকে মন্ত্রী সভায় লইতে চাহিয়াছিলেন সেজন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। কিন্তু আমি তাঁহার মন্ত্রী সভায় যোগ দানে অক্ষম এবং ইহাই আমার শেষ কথা বলিয়া আমি সুস্পষ্টভাবে তাঁহাকে টেলিফোনে জানাইয়াছি। সুতরাং দিল্লী হইতে ফিরিয়া তাঁহাকে আর কোন পত্র দেওয়া নিম্প্রয়োজন।”

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষের এই বিবৃতি দেখানো হইলে তখনও তিনি বলেন যে ডাঃ ঘোষ মন্ত্রী সভায় যোগদানে অক্ষমতা জ্ঞাপন করেন নাই। দিল্লী হইতে ফিরিয়া ডাঃ ঘোষ মন্ত্রী সভায় যোগ দিবেন বলিয়া ডাঃ রায় এখনও আশা রাখেন বলিয়া তিনি জানান।

ঘোষ-মন্ত্রীসভার অপসৃতি

পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা-পরিষদের কংগ্রেস দলের অধিকাংশ সদস্য ডাঃ ঘোষের উপর অনাস্থা জ্ঞাপন করিয়া ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে একটি নূতন মন্ত্রীমণ্ডল গঠনের দাবী জানাইলে কংগ্রেস পার্লামেন্টারী দলের সভায় উহা আলোচিত হয় এবং ডাঃ ঘোষ স্বৈচ্ছায় প্রধানমন্ত্রীত্ব ত্যাগ করিয়া ডাঃ রায়কে ঐ দায়িত্ব গ্রহণে আহ্বান করেন।

ডাঃ ঘোষ দেশবাসীর বহুলাংশের যে প্রজ্ঞা ও বিশ্বাস লইয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহা অতি অল্প লোকের ভাগ্যে ঘটয়া থাকে। কিন্তু তৎসম্বন্ধে কেন তাঁহাকে পাঁচ মাসের মধ্যে সরিতে হইল তাহার আলোচনা আবশ্যিক। ঘটনাটিকে কেবলমাত্র অবিমিশ্র দলগত চক্রান্তের পরিণতি ভাবিলে ভুল করা হইবে।

ডাঃ ঘোষের পদত্যাগে অনেক লোক “একটি ভাল মানুষ বিদায় হইলেন” ভাবিয়া দুঃখিত হইয়াছেন। যেভাবে ঘোষ-মন্ত্রীসভার অপসৃতি ঘটিল তাহা অনেক দিক দিয়াই সমর্থন-যোগ্য নহে, তথাপি জনসাধারণের তরফ হইতে সভাসমিতি বা সংবাদপত্রের মারফৎ ঘোষ-মন্ত্রীসভা বজায় রাখিবার জন্ত কোন দাবী উঠে নাই ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

ডাঃ ঘোষের প্রথম ভুল, জনসাধারণ শাসনযন্ত্র গঠন সম্পর্কে তাঁহার নিকট যাঁহা আশা করিয়াছিল তাহার কোনটিই জড়ই তিনি বিশেষ সচেতন ছিলেন না। তাঁহার পবনোক্তের উচ্চ-পদস্থ কর্মচারীদের নামের তালিকা প্রণয়নের সংবাদে লোকে ইহাই আশা করিয়াছিল যে, যে সমস্ত সরকারী কর্মচারী ও পুলিশ ইংরেজ এবং লীগ আমলে দেশবাসীকে লাঞ্ছনা করিয়াছে তাহাদের অপসৃতি ঘটবে এবং যে সব কর্মচারী ঐ দুই আমলে বিবেকবুদ্ধি বা স্বদেশপ্রেম বিসর্জন দেন নাই বলিয়া অবহেলিত হইয়া কাল কাটাইয়াছেন, তাহাদিগকে উপযুক্ত পদে নিযুক্ত করা হইবে। কিন্তু তালিকা প্রকাশের পর দেখা গেল ইংরেজ ও লীগ আমলের অধ্যাত-দুধ্যাত কর্মচারীদের অনেকেই পদোন্নতি হইয়াছে। ইহার অবশেষতাবী পরিণাম এই হইল যে, বহু কৃতী কর্মচারী ক্ষুব্ধ হইল এবং স্বাধীনতা লাভের পরেও দক্ষতা ও সততা উপেক্ষিত হওয়ার শাসনযন্ত্রে ফাটল ধরিল। ডাঃ ঘোষের শাসনকালে অল্প সময়ের মধ্যে শাসনযন্ত্রের দ্রুত অবনতির ইহাই মূল কারণ। আদর্শবাদী বলিয়া বাংলাদেশ বাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছিল এই কার্য্যে তাঁহার উপর প্রথম সংশয় জন্মিল।

ডাঃ ঘোষের দ্বিতীয় ভুল, জনমতকে উপেক্ষা করিয়া কেবলমাত্র ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্যদের মধ্যে দলগত সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে মন্ত্রী বজায় রাখার চেষ্টা। ছায়া মন্ত্রীসভাকে যখন তিনি পুনর্গঠন করেন তখন ত্রীযাদবেশ পাঁজাকে যেভাবে বাদ দেন তাহা বহুলোকে সন্তোষে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। ডাঃ ঘোষের বিরোধী দল হইতে বিশাল তরঙ্গ করিয়া যে দুই জন

আসিয়া তাঁহার সহিত যোগদান করেন সেই দুই জনকে ডাঃ ঘোষ মন্ত্রীসভায় স্থান দেন কিন্তু ত্রীমুখ পাঁজার দ্বায় নিফলক-চরিত্র লোকের স্থান সেখানে হয় না। এখানেও ডাঃ ঘোষ তাঁহার আদর্শবাদ অমান রাখিতে পারিলেন না। পদত্যাগের পর ত্রীমুখ পাঁজা যে বিবৃতি দেন তাহাতে পাঁজা মহাশয়ের উপরেই লোকের প্রজ্ঞা বাড়ে। অভয়াশ্রমের ত্রীশ্রদা চৌধুরীকে মন্ত্রীসভায় স্থান দেওয়ার জন্ত ডাঃ ঘোষ জিদ করেন এবং অনেকে ইহাতে আপত্তি করেন। পরিষদ-সদস্যদের লইয়া দল পাকাইয়া ডাঃ ঘোষ তাহার জোরে বর্তমান বিভাগের প্রতিনিধিদের তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও চৌধুরী মহাশয়কে মন্ত্রীসভায় গ্রহণ করেন। দল ঠিক রাখিবার জন্ত ডাঃ ঘোষকে মুর্শাহার দলের সহিত আপোষ করিয়া তাঁহাদের এক জনকে মন্ত্রী এবং অপর এক জনকে চীফ হুইপ পদে নিযুক্ত করিতে হয়। এখানে ডাঃ ঘোষ জনসাধারণকে সঙ্গে রাখার চেয়ে দল পাকানোর উপর বেশী জোর দেন। কংগ্রেসের আদর্শ ইহাতে পুনর্বার ক্ষুণ্ণ হয়।

ডাঃ ঘোষ বাংলায় চোরাকারবার বা অভায় লাভ গ্রহণ দমনের ব্যবস্থা বা সবল চেষ্টা করিতে পারেন নাই। দলগত চক্রান্তের চালের উপর নব্বয় রাখিতে তাঁহার সময় গিয়াছে এবং চাহুকায় ভিন্ন অঙ্গ সকলের উপদেশ বা প্রস্তাব অবহেলা করায় যোগ্য পরামর্শদাতার অভাব তাঁহার ঘটে। কলে তাঁহার কার্য্যক্ষমতার উপর লোকে আস্থা হারায়। বাংলাদেশ সকল প্রদেশের মধ্যে দুর্বলতা ও অভাব জনিত ক্রেশে অধিক জর্জরিত। ডাঃ ঘোষের মন্ত্রীত্বের মধ্যে এই ক্রেশ উপশমের কোনও চিহ্ন পাওয়া যায় নাই।

ডাঃ ঘোষ পূর্ববঙ্গ হইতে আগত লোকদের বসবাসের কোন ব্যবস্থা করেন নাই, কেন্দ্রীয় সরকার তাঁহাকে সম্যক অবস্থা জানাইবার জন্য অগ্ররোধ করিলে তাহাও জানান নাই, শিক্ষা-ব্যবস্থা পুনর্গঠনের প্রথম বাস্তবরূপ বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজগুলির সহিত বিরোধ বাধাইয়া তুলিয়াছেন, খাজ-সমস্তার কোন সমাধান করিতে পারেন নাই, বিহারের বাংলা ভাষাভাষী অকলগুলি বাংলায় প্রত্যর্পণের দাবী কেন্দ্রীয় সরকারকে নিজে জানান নাই, পশ্চিমবঙ্গ পরিষদের জনৈক সদস্য এই মর্মে পরিষদে একটি প্রস্তাবের নোটশ দিলে তাহা উপাধিত হইতে দেন নাই, এই সমুদয়ও তাঁহার বিরুদ্ধে বড় কম অভিযোগ নয়। অভয়াশ্রমের লোকদের অথবা বড় চাহুরি দেওয়া হইয়াছে এবং ইহাতেও লোকে সন্তোষ হইতে পারে নাই। পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সেক্রেটারীর ন্যায় গুরু দায়িত্ব পদে এমন একজনকে নিযুক্ত করা হইয়াছে যিনি মানবেন্দ্র রায়ের দলের অন্যতম নায়করূপে দীর্ঘকাল কংগ্রেস বিরোধিতা করিয়াছেন। তাঁহার কি বিশেষ গুণ ভাঙার ঘোষ দেখিয়াছিলেন আমরা জানি না।

মুসলীম লীগ ও মুসলীম লীগ পবনোক্ত যখন কলিকাতা

অধিকারের অভিধান চালাইতেছিল তখন শহরের যে সকল সাহসী যুবক জীবন বিপন্ন করিয়া লীগ গবর্নমেন্টের এই আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া দিয়াছিল, তাহাদের প্রতি ডাঃ বোমের আচরণ প্রশংসার যোগ্য নহে। এই যুবকেরা যে সাহস ও সংগ্রামকুশলতা দেখাইয়াছিল তাহাতে ইহাদিগকে পুলিশ সার্কেণ্ট, সশস্ত্র পুলিশ এবং সীমান্তরক্ষী বাহিনীতে গ্রহণ করিলে দেশের শক্তিবৃদ্ধি হইত, ইহাদের মধ্যে যে কেহ কেহ বিপদগামী হইয়াছে তাহারও সুযোগ মিলিত না। অতীত হইয়াও ডাঃ বোম ইহা করেন নাই, অধিকতর এই সব যুবকের উপর গোয়েন্দা পুলিশ সেলাইয়া দিয়াছেন। নিরাপত্তা বিল সম্পর্কে যে কয়েকটি সাংবাদিক বৈঠকে ডাঃ বোম উপস্থিত ছিলেন তাহার প্রত্যেকটিতে তাঁহার এই মনোভাবই ফুটিয়া উঠিয়াছে যে এই যুবকদলকে বিধ্বস্ত করাই তাঁহার উক্ত ক্ষমতা গ্রহণের প্রধান অভিপ্রায়। পাকিস্তান কি করিবে তাহা জানা নাই। বাংলা এখন একটি সীমান্ত প্রদেশ, দেশরক্ষার একটি বড় আয়োজন এখানে বাক্য দরকার এবং ইহার জন্ত এখন হইতেই যুবকদের সামরিক শিক্ষা দেওয়া একান্ত আবশ্যিক ইহা লইয়া সংবাদপত্রে ও সভা-সমিতিতে বহু আন্দোলন গত কয়েকমাস যাবৎ হইতেছে কিন্তু ডাঃ বোম নির্দিকার ছিলেন। সামরিক শিক্ষার আয়োজন বিশ্ববিদ্যালয়ের মারফতেও তিনি করিতে রাজী হন নাই। দেশরক্ষার তাঁহার এই উদাসীনতা লোকে সন্তুষ্ট চিত্তে মানিয়া লইতে পারে নাই।

আদর্শরক্ষা এবং শাসনযন্ত্র পরিচালনে দক্ষতা—এই দুইটির একটিতেও ডাঃ বোম উপযুক্ত দৃঢ়তা, দূরদর্শিতা বা যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারেন নাই।

কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ

জাতীয় মহাসমিতির ভবিষ্যৎ লইয়া ইতিমধ্যেই নানা আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। ভারত রাষ্ট্রের সব প্রদেশেই কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা শাসনকার্য্য চালাইতেছে। ১৯৪৬ সালে যে নির্বাচন-সংগ্রাম চলিয়াছিল, কংগ্রেস তাহাতে জয়লাভ করে। সেই অধিকারে আজ ভারত রাষ্ট্রের শাসনকার্য্যে তাঁহার ক্ষমতা নিরঙ্কুশ। এইরূপ ক্ষমতার ব্যবহার জাতীয় স্বার্থের পক্ষে উপকারী কিনা তৎসম্বন্ধেই আলোচনা চলিতেছে। কারণ নিরঙ্কুশ ক্ষমতার ব্যবহারে একটা মোহের সৃষ্টি করে, যাহা কোথাও কল্যাণজনক হয় নাই। পশ্চিম বাংলায় ত্রিপুরাচক্র বোমের মন্ত্রীদের অবশ্যেই আমরা তাহার পরিচয় পাইয়াছি। তাঁহার বিরোধী কংগ্রেসী সভ্যগণ-বীরভূম নির্বাচনের সময়ও তাঁহার উপর অকৃত্রিম আস্থা প্রকাশ করিয়াছিলেন। এক মাস যাইতে না যাইতে তাঁহার ত্রিপুরাচক্র বোমের মন্ত্রীসভার উপর আস্থা হারািয়া ফেলিলেন। নির্বাচকমণ্ডলীকে মুর্থ ও অসহায় বোঝে, তাঁহার এই পার্থক্যপরিবর্তনের কারণ সম্বন্ধে কিছুই জানাইলেন না। জনমতের প্রতি শ্রদ্ধার কোনও পরিচয় এই গুপ্তচক্রান্তে

পাওয়া যায় নাই। মাদ্রাজেও এইরূপ একটা ঘটনা ঘটিয়াছিল, যাহার জন্ত ত্রিপুরাচক্রের মন্ত্রীসভার পতন হয়, এবং ত্রিপুরাচক্রের রেড্ডি প্রধানমন্ত্রী পদে বৃত্ত হন। মাদ্রাজের নির্বাচকমণ্ডলীকে এই পরিবর্তনের কারণ সম্বন্ধে কিছুই বলা হয় নাই। মাদ্রাজের একখানি পত্রিকার দেখলাম যে একজন বিজ্ঞপ করিয়া বলিতেছে—কংগ্রেসপন্থীরা আজ হয় মন্ত্রী হইয়াছে না হয় হইয়াছে দেশের দোকানের মালিক। অত্র দেশের প্রবীণতম নেতা ত্রিপুরাচক্র ডেক্টরিয়া বলিয়াছেন যে ব্যবস্থাপক সভার কংগ্রেসী সভ্যরা জনসাধারণের ভীতির কারণ হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের প্রতিবেশী বিহার প্রদেশের মন্ত্রীবর্গের কীর্তি-কথা অসংখ্য। সেখানে গুড়ের কনট্রাক্ট লইয়া একটা কলেজারীর সৃষ্টি হইয়াছে। মন্ত্রীদলের পোয়বর্গ বা বন্ধুবর্গের নামে গুড়ের ব্যবসারে প্রায় একচেটিয়া অধিকার দেওয়া হইয়াছিল। ডাঃ সৈয়দ নাসির ও জনাব আবদুল কাযুম আনসারীর নামও এই সম্পর্কে দেখা দিয়াছে। বাংলার কংগ্রেস-সভ্য সংগ্রহের জঘন্য ব্যাপার এতই নীচ যে তাহা চোরাকারবারীদের হারায়া দিয়াছে। সম্প্রতি আমাদের আপিসে তাঁহার একটি অদ্ভুত প্রমাণ ডাকে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। কলিকাতার একখানি ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্রিকাকে যে কাগজের মোড়কে জড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে তাহা একখানি কংগ্রেস সভ্য-সংগ্রহের রসিদ এবং তাহার উপর আমহাষ্ট প্লট পোষ্ট আপিসের মার্ক দেওয়া। এই রসিদে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদকের নাম আছে। অনিতে পাই, কংগ্রেস-সভ্য সংগ্রহের জন্ত রসিদ বই পাওয়া কঠিন। কিন্তু সংবাদপত্র প্যাক করিবার জন্ত তাহা সহজপ্রাপ্য বলিয়া মনে হয়। দুই দিন পরে মমলায় দোকানেও তাহা দেখা দিবে। তখন জনপ্রিয়তর চূড়ান্ত পরিচয় মিলিবে।

এই অবস্থায় অনেকেই মনে করেন যে কংগ্রেসের মধ্যেই একটা বিরোধী দল সৃষ্টি করা প্রয়োজন। এই দল ভবিষ্যতের ভয় দেখাইয়া সংযত রাখিবে তাঁহাদের, যাহাদের হাতে বর্তমানে সমস্ত ক্ষমতা চলিয়া গিয়াছে। তাহা সহজ বলিয়া মনে করা সম্ভব নয়। কিন্তু এখন নিতান্তই প্রয়োজন। কংগ্রেস আজ দলগত স্বার্থের প্রতীক, না জাতীয় জীবনের নিয়ামক, তাহাই নির্ধারণ করিতে হইবে। বর্তমানে যাহারা কংগ্রেসে প্রধান হইয়া আছেন, তাঁহারা কোন একটি দলের প্রতিনিধি বলিয়া মনে হয় না। অন্ততঃ দুইটি দল আপনার শক্তি সংহত করিয়া নিজেদের প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছে। ১৯৫৫ আগস্টের পূর্বে কংগ্রেসের একমাত্র উদ্বেষ্ট ছিল ব্রিটিশের হাত হইতে ক্ষমতা কাড়িয়া লওয়া। আজ সেই তথাকথিত একপ্রাণতা ক্ষয়িত হইতেছে না। এই অবস্থায় কংগ্রেসের মধ্যে নানা দলের উৎপত্তি হইতে পারে। যদি প্রাদেশিক কংগ্রেস সমিতির ভিতরে, মোড়লদিগের চক্রান্তের ছোরে, তাহা গঠন সম্ভব না হয় তবে দল ভাঙ্গিয়া বিস্তৃত জাতীয়তাবাদের নামে অন্য দল

গড়িতে হইবে। ইংরেজ শাসন যতদিন এদেশে ছিল, ততদিন কংগ্রেসের বিরোধিতা দেশজোড়ের নামান্তর ছিল। আজ দে কলকাতার আশঙ্কা নাই। সুতরাং ভারত রাষ্ট্রে কংগ্রেসের অপ্রতিদ্বন্দ্বিতা ক্ষমতার প্রয়োজন শেষ হইয়াছে সে কথা উচ্চারণ করিলেই দেশজোড়ী নামে পরিচিত হইতে হইবে না। বাংলা দেশ, মাদ্রাজ, বিহার ও অন্যান্য প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রীত্বের যে পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে মনে হয় যে কংগ্রেসের দলভুক্ত কৃষ্ণদীপের বিরুদ্ধে একটা বিরোধী দল গঠিত হওয়া প্রয়োজন। এরূপ পরিণতি আপাতত সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু এই পরিণতি অবশ্যস্বার্থী।

পল্লীবাসীর সামরিক শিক্ষা

গত ২৪শে পৌষের “ভারত” (দৈনিক) পত্রিকায় “নাগপুরের চিঠি”তে নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হয়।

“মধ্য-প্রদেশের বিভিন্ন কলেজের অল্পপরিচালনা শিক্ষকেরা হায়দরাবাদ-বেরার সীমান্তে সহস্রাবিক পল্লীবাসীকে রাইফেল চালান শিক্ষা দিতেছেন। হায়দরাবাদ-মধ্য-প্রদেশ সীমান্তের সাম্প্রতিক ঘটনাবলীতে পল্লীবাসীরা বিশেষ আতঙ্কিত হইয়া পড়ার তাহাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগ্রত করার জন্য এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহাদের অধিকাংশকে পরে জাতীয় রক্ষিবাহিনীতে লওয়া হইবে। আত্মরক্ষার্থে পল্লীবাসীদের অল্পশল্প শিক্ষাদানের কাজ চলিতে থাকিবে।”

মধ্যপ্রদেশে কংগ্রেস-মন্ত্রীমণ্ডলী প্রতিষ্ঠিত। প্রধান মন্ত্রী গণ্ডিত রবিশঙ্কর শঙ্কর শঙ্কর বংসরের বৃদ্ধ। হায়দরাবাদ রাষ্ট্রের “পাকিস্তানী” মনোভাবের জন্য তাহাকে সর্বদা সাবধানে থাকিতে হয়। উপরোক্ত সংবাদটি তার প্রমাণ। কংগ্রেস মন্ত্রীমণ্ডলী পশ্চিম বঙ্গে আজ পাঁচ মাস হইতে অপ্রতিষ্ঠিত। এই রাষ্ট্রের পূর্বাঞ্চলে “পাকিস্তানী” দাপটের অন্ত নাই। চর সরনদাজপুর ও চর রায়নগর তার সাক্ষ্য দিতেছে। কয়েক দিন পূর্বে পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলার সীমান্তে পূর্ব-বঙ্গের তেজুলিয়া থানার হাটে হাটে “পাকিস্তানী” ন্যাশনাল গার্ডের জমাদারের বিবরণও প্রকাশিত হইয়াছিল। পশ্চিম বঙ্গের গবর্নেন্ট কেবল অন্তর দিতেছেন যে পুলিশ বাটীর সংখ্যা পূর্বাঞ্চলে বৃদ্ধি করা হইবে; তাহার মধ্যে অল্পধারী পুলিশও থাকিবে। আমরা কেবল দেখিতেছি যে এই সরকারী ব্যবস্থায় দেশের লোকের, সীমান্তবাসীর, কোন কর্তব্যের নির্দেশ নাই। পুলিশ ও সৈন্যবাহিনী তাহাদের রক্ষা করিবে, এবং তাহাদের কর্তব্য শেষ হইবে ট্যাক্স দিয়া। ব্যক্তিগত ভাবে বা সমষ্টিগত ভাবে তাহাদের করণীয় কিছু নাই। পশ্চিম বঙ্গের গবর্নেন্ট তাহাদের কোনরূপ কর্তব্যের নির্দেশ দিতে পারিতেছেন না, যেমন দিয়াছেন মধ্যপ্রদেশের গবর্নেন্ট। এই পার্থক্যের কারণ কি? পশ্চিম বঙ্গের জন-

গণকে তাহা বুঝিয়া বাহির করিতে হইবে। গবর্নেন্টের নিকট হইতে তাহার জবাব আদায় করিয়া লইতে হইবে।

আজ যখন ইংরেজের ষাড়ে দোষ চাপাইয়া দিবার সুযোগ নাই, এবং আমাদের নিজের গবর্নেন্ট ইংরেজ-কৃত নানা অত্যাচার ও অবিচারের শেষ করিতে দুটসংকল্প, তখন পশ্চিম বঙ্গের নাগরিক জীবনের একটা প্রধান অভাব আমাদের গবর্নেন্টের নিজ হইতেই অগ্রসর হইয়া দূর করা উচিত ছিল। ইংরেজের কল্যাণে বাঙালী কেরাণীগিরি করিয়াছে তার আপিসে আপিসে, জজ মাজিষ্ট্রেট হইয়া তাহার শাসন দণ্ডের পতিও অব্যাহত রাখিয়াছে। কিন্তু বাঙালী কোনদিন সৈন্যবাহিনীতে চুক্তিতে পারে নাই। দেড় শত বংসরের মধ্যে বাঙালীর মন হইতে সমস্ত সামরিক ঐতিহ্য মুছিয়া গিয়াছে। রাষ্ট্রের অনাদরে তাহা শুকাইয়া গিয়াছে। চল্লিশ বংসর পূর্বে যখন “বিপ্লববাদ” বাংলা দেশে দেখা দেয়, তখন তার কারণ অসুস্থকান করিতে গিয়া অনেক ব্রিটিশ গবেষক বলিয়াছিলেন যে বাঙালী যুবক বোম্বা-রিস্তলবারের আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছে অপমানের জ্বালায়। ভীক, অসামরিক জাতি বলিয়া যে অপমানের ছাপ ইংরেজ শাসক তার জাতির কপালে দাগিয়া দিয়াছে, তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে বাঙালী বিপ্লবী বোম্বা রিস্তলবার, গোপন হত্যাকাণ্ডের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া। এই নিদানের মধ্যে অনেক অভ্যুত্থি আছে, কারণ সামরিক জাতিও গোপন হত্যার পথ অবলম্বন করিয়া পরদেশী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এই তর্কের মধ্যে সত্য যেখানেই থাকুক, এই কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে ইংরেজের আমলে বাঙালী সামরিক বিভাগে স্থান পায় নাই। আজ সেই ব্যবস্থা অনতিবিলম্বে উল্টাইয়া দিতে হইবে।

পূর্ববঙ্গের হিন্দু

“পাকিস্তানী” প্রতিবেশীদের ভাব ভঙ্গীতে অতিষ্ঠ হইয়া পূর্ব-বঙ্গের হিন্দু অনেককেই পিতৃ-পিতামহের স্মৃতিপুত্র বাসস্থান ত্যাগ করিয়া আসিতেছেন। ১৯৪৬ সালের অক্টোবর মাসে নোয়া-খালি-ত্রিপুরা জেলায় স্থানে স্থানে যে ভাঙবের স্বচনা হয়, তখন হইতে আজ পর্যন্ত কত হিন্দু চিরকালের জঙ্গ পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করিয়াছেন, তাহার কোন হিসাব নাই। কেহ বলিতেছেন ২০ লক্ষ, কেহ বলিতেছেন ১০ লক্ষ। পূর্ববঙ্গে হিন্দুর সংখ্যা ১ কোটি ৩০ লক্ষ। সুতরাং বলিতে হয় স্খতি অল্পসংখ্যক হিন্দু পূর্ববঙ্গ ছাড়িয়া আসিতে পারিয়াছেন। এই হিসাবের মধ্যে পশ্চিম বঙ্গে আগত হিন্দুর সংখ্যাই ধরা হইয়াছে; বাহারা বিহার, আসাম, ত্রিপুরা রাজ্যে যাইতে পারিয়াছেন এই হিসাবে তাহাদের ধরা হয় নাই। এবং পশ্চিম বঙ্গ গবর্নেন্টের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হইতেছে যে তাহারা এই বিষয়ে মনোযোগ দিতেছেন না বা অবস্থার গুরুত্ব বুঝিতেছেন না। ডিসেম্বর মাসের ৯ তারিখে প্রেরিত একটি সংবাদে দেখা যায় যে কেন্দ্রীয় পরিষদ এই বিষয়ে প্রস্তোত্তর হলে পুনর্বাসতি সচিব

ত্রিফিত্তিশচন্দ্র নিরোধী পশ্চিম বঙ্গ গবর্নেন্টকে একেবারে নির্দোষ প্রতিপন্ন করিতে পারেন নাই। যুক্তপ্রদেশের অ-কংগ্রেসী নেতা ত্রিহদয়নাথ কুঞ্জরু এই প্রস্তোত্তরে বিশেষ আগ্রহ দেখান। এই উপলক্ষেই আমরা জানিতে পারি যে ১৫ই আগস্টের পরে পূর্ববঙ্গ হইতে পশ্চিমবঙ্গে আগতের সংখ্যা ২ লক্ষ মাত্র, এবং অধিকাংশ আশ্রয়প্রার্থী নিজেদের পুনর্বাসতির ব্যবস্থা করিতে সক্ষম। সুতরাং সাহায্য ও পুনর্বাসতির কোন ব্যাপক ব্যবস্থা করা হয় নাই। পাঠকবর্গের অবগতির জন্ত নিম্নে এই প্রস্তোত্তরের কিয়দংশ তুলিয়া দিলাম।

পণ্ডিত কুঞ্জরু—পূর্ব-বাংলা হইতে আশ্রয়প্রার্থীদের চলিয়া আসার কারণ কি?

ত্রিযুত নিরোধী—উৎপীড়ন করা হইবে এই আতঙ্ক হইতেই আশ্রয়প্রার্থীরা চলিয়া আসিতেছে। কতকগুলি ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় কর্তৃক অর্থনৈতিক বস্তুকটের কলেই আশ্রয়প্রার্থীরা চলিয়া আসিয়াছে।

পণ্ডিত কুঞ্জরু—হুই মাসের অধিককাল ধরিয়া আশ্রয়-প্রার্থীরা চলিয়া আসিতেছে। ভারত সরকার এখনও বিষয়টি পাকিস্তান সরকারের সহিত আলোচনা করিবেন কি না, ইহা ভাবিয়া দেখিতেছেন, ইহার অর্থ কি?

ত্রিযুত নিরোধী—এই সমস্যার গুরুত্ব নিরূপণ করা সম্পর্কে আমরা বহুলাংশে পশ্চিম-বাংলা সরকারের উপর নির্ভর করি। পশ্চিম-বাংলা সরকারের নিকট হইতে এ পর্যন্ত আমরা যে রিপোর্ট পাইয়াছি, তাহাতে কোন নির্দিষ্ট কর্মপন্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয় নাই।

পণ্ডিত কুঞ্জরু—ভারত সরকার আশ্রয়প্রার্থীদের সঠিক সংখ্যা অবগত নহেন কেন?

ত্রিযুত নিরোধী—আমরা কয়েকদিন পূর্বে এ সম্পর্কে খোঁজ করিয়াছিলাম এবং আমি ইহার ফলাফল জানাইয়াছি।

পণ্ডিত কুঞ্জরু—আপনি কি বলিতে চাহেন যে, ভারত সরকার খোঁজ না করিলে পশ্চিম-বাংলা সরকার পূর্ব-বাংলা হইতে বহুসংখ্যক আশ্রয়প্রার্থীর আগমনের সংবাদ জানাইতেন না?

ত্রিযুত নিরোধী—এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নহে। আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত যে, পশ্চিম-বাংলা সরকার ভারত সরকারের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখা করিতেছেন, কিন্তু পশ্চিম-বাংলা সরকার এ সম্পর্কে ভারত সরকারকে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বলিয়াছেন কি না সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত নহি।

নিরোধী মহাশয়ের উত্তরে সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে পশ্চিমবঙ্গ গবর্নেন্টের কর্তব্যচ্যুতি হইয়াছে। যেমন কেন্দ্রীয় গবর্নেন্ট তেমনি পশ্চিমবঙ্গ গবর্নেন্ট চোখ বুজিয়া চলিয়াছেন। বিপদের

জন্ত প্রস্তুত না হওয়ায় পঞ্জাবে ঘটনাঘটনা বিপর্যয়; সেইরূপে বিপদ ঘটিলে পর পশ্চিমবঙ্গ গবর্নেন্ট তাড়াহুড়া করিয়া কিছু করিবেন।

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গেই কেবল পূর্ববঙ্গের হিন্দু ভিড় করিয়া আসেন নাই। আসামেও অনেকে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের সংখ্যা কত আমরা জানি না। কিন্তু ইহা আমরা জানি যে ১৫ই আগস্টের পূর্বে পূর্ববঙ্গের অনেক হিন্দু ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায়—গোয়ালপাড়া জেলায়, শিলং-গৌহাটি সহরে, আসামের চা বাগিচায়, ডিব্রুগড়ের তেলের বনিতে নানা বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা উপার্জন করিতেছিলেন। আজ তাঁহারা “পাকিস্তানে”র কল্যাণে হইয়া পড়িয়াছেন “বিদেশী”। ভারতীয় ইউনিয়ন রাষ্ট্রে এখনও তাঁহারা আইনের চক্ষে “বিদেশী” বলিয়া গণ্য হন নাই। কিন্তু বাস্তব জগতে, বিশেষ করিয়া আসাম প্রদেশে তাঁহারা “বিদেশী”র মতনই ব্যবহার পাইতেছেন। আসামের গবর্নর সার আকবর হায়াদরী ত এই বলিয়াই ত্রিহট্টের হিন্দুকে গালি দিয়াছেন—যদিও গবর্নর বাহাছরের বাণী, বোম্ব হয়, বোম্বাই প্রদেশে এবং “হুই নেশন” তত্ত্ব মতে তিনি ত তদপেক্ষা “বিদেশী”। আমরা জানি যে আসাম প্রদেশের একটি শ্রেণী চায় যে বাংলাভাষাভাষী কেহই যেন আসামে স্থান পায় না। আসাম প্রদেশে বাঙালীর সংখ্যা প্রায় ২৬ লক্ষ এবং অসমীয়া ভাষাভাষীর সংখ্যা ২৫ লক্ষের কম। বাসিয়া প্রকৃতি অন্য ভাষাভাষী লোকসংখ্যা হিসাবের মধ্যে ধরিলে অসমীয়া ভাষা আসাম প্রদেশের রাষ্ট্রভাষা হইতে পারে না। এই বিষয়েই বিরোধ বাধিয়াছে আসামে। একটি সংখ্যালঘিষ্ঠ শ্রেণীর ভাষা ৪৫ লক্ষ লোকের উপর চাপাইয়া দিবার চেষ্টা চলিতেছে। এইজন্তই কথা উঠিয়াছে বর্তমান আসামের বাঙালী-অধ্যুষিত অঞ্চল লইয়া ভারতীয় ইউনিয়নের অধীনে নূতন একটা প্রদেশ সৃষ্টি করা হউক।

ত্রিপুরা রাজ্য অবরোধ

“পাকিস্তানীদের” কার্য-কলাপ আজ কাহারও অবদিত নাই। কাম্বীর লইয়া ভাবনার অন্ত নাই। ভারত ইউনিয়নের পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত ত্রিপুরা রাজ্যে কি ঘটতেছে তাহার সঠিক কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। নিম্নলিখিত সংবাদটি ত্রিপুরা রাজ্যের বিপদের উপর কিছু আলোকপাত করিতেছে,—

“ত্রিপুরা রাজ্যের সর্বোপেক্ষা জনবহুল ডিব্রুগড় কৈলাসহর টাউন ত্রিহট্ট জেলার অন্তর্গত সমসেরনগর রেল স্টেশন হইতে ৯ মাইল পূর্বে অবস্থিত। পূর্ব পাকিস্তানের দক্ষিণ-ত্রিহট্টের মৌলবীবাজার সবডিভিসনের সাপ্লাই ও পুলিশ অফিসারগণ সম্মতি কৈলাসহর-সমসেরনগর লোকাল বোর্ড রাস্তা ৩টি বাঁটি বদাইয়াছেন। ঐ রাস্তা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত এবং উহাই কৈলাসহর হইতে রেল স্টেশনে যাওয়ার একমাত্র রাস্তা। শত শত পথচারী প্রত্যহ ঐ রাস্তায় চলাফেরা করে। এক্ষণে

• প্রত্যেক পথচারীকে সাপ্লাই ও পুলিশ বাটীতে তল্লাসী করে এবং পথিকগণ বিশেষভাবে লালিত হয়। ব্যবসায়ীগণ রেল বা নৌকাযোগে যে সব মালপত্র জিপুরা রাজ্যে আমদানী করে তাহাও আটক করা হয় এবং সময় সময় কিছু কিছু ঘুঘর বিনিময়ে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। স্থানীয় ব্যবসায়ীগণ এই সম্পর্কে মৌলবীবাছারের এম-ডি-ও ও ত্রিহটের ডেপুটি কমিশনারের নিকট দরখাস্ত করিয়াও কোন ফল পায় নাই। এখানে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, যে সব জিনিস আটক করা হয় তাহা সবই ভারত ডোমিনিয়ন হইতে আসে। এ বিষয় জিপুরা রাজ্যের কর্তৃপক্ষকেও জানান হইয়াছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় জিপুরা রাজ্যে অর্থনৈতিক লকট ঘটাঁইবার জন্ত গভীর মত্য়ন্ত্র করা হইতেছে।”

এই ব্যাপার হইল জিপুরা রাজ্যের উত্তর অঞ্চলের সম্বন্ধে। রাজ্যের পশ্চিম ও দক্ষিণাঞ্চলের অবস্থাও এইরূপ বিপৎসঙ্কুল। হানাদারগণ আক্রমণ করে নাই বা আক্রমণ করিতে সাহস পাইতেছে না। কিন্তু বিপদ যখন ঘনাইয়া আসিবে তখন দিল্লী ও শিলং হইতে সাহায্য আসিবে, তাহা জানিয়াও নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত নয়। মহারাষ্ট্র ও তাঁহার পরামর্শদাতাগণ যদি পূর্ববঙ্গের হিন্দুর অংশবিশেষকে এই রাজ্যে বসতি স্থাপন করিতে আহ্বান করেন, তবে পাকিস্তানী আক্রমণের বিরুদ্ধে একটা বিরাট প্রতিরোধ-ব্যবস্থার আয়োজন করিয়া তুলিতে পারিবেন। এই বিষয়ে পূর্ববঙ্গ ও ত্রিহটের হিন্দু সম্প্রদায় নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না।

পুনর্বাসনের বিরাট আয়োজন

কয়েকদিন পূর্বে জনিয়াছিলাম যে, “পাকিস্তানী” হিংস্রতায় পীড়িত হইয়া যে লক্ষ লক্ষ হিন্দু ও শিখ পশ্চিম পঞ্জাব হইতে চলিয়া আসিতে বাধ্য হইতেছে, এবং তাহাদের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্ত ভারত গবর্নমেন্টের দৈনিক ব্যয় হইতেছে ত্রিশ লক্ষ টাকা। তখন এই বিতাড়িতদের সংখ্যা জানা যায় নাই। এখন এই সংখ্যার একটা হিসাব পাওয়া গিয়াছে। ৪৫ লক্ষ হিন্দু শিখ আপনাদের পিতৃপুরুষের ঘর-বাড়ী ছাড়িয়া আসিয়াছে। ইহাদের মধ্যে প্রায় সাড়ে বার লক্ষ লোক এখনও নানা প্রদেশের আশ্রয়শিবিরে বাস করিতেছে; এখনও সাত লক্ষ লোক পূর্ব-পঞ্জাবের নানাস্থানে তাঁবুর নীচে বাস করিতেছে। ইহাদের বাসের জন্ত পূর্ব-পঞ্জাবের প্রায় পঁচিশটি সহরের নিকটবর্তী অঞ্চলে দুই লক্ষ লোকের বাসোপযোগী বাড়ী-ঘর তৈয়ার হইবে। ১লা মার্চের সংবাদে প্রকাশ যে এইজন্ত ব্যয় হইবে দুই কোটি টাকা। এই অর্ধ-কোটি লোকের জীবিকা-উপার্জনের সব ব্যবস্থা করিয়া দিবার দায়িত্ব পড়িয়াছে ভারত গবর্নমেন্টের উপরে। গ্রামে বা সহরে বাহারা বসতি করিতে চাহেন, সকলকেই সরকার কর্তৃক ঋণ দেওয়া হইবে। পূর্ব-পঞ্জাবের অনেক স্থান হইতে প্রায় সম-সংখ্যক মুসলমান তাড়িত হইয়াছে “পাকিস্তানে”।

ইহাদের পরিত্যক্ত জমি বিলি করিয়া দেওয়া হইয়াছে হিন্দু ও শিখ চাষীর মধ্যে। আগামী ফসল কাটার সময় পর্যন্ত ইহাদিগকে খাদ্য-সামগ্রী বিনামূল্যে সরবরাহ করা হইবে; ইহাদের পশুর খাদ্যও সরকার হইতে দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। শিল্পী, ব্যবসায়ী, দোকানদার, চিকিৎসক, আইন-ব্যবসায়ী সকলকেই ঋণ দেওয়া হইবে; চারি বৎসরে তাহা শোধ করিতে হইবে। ঋণের পরিমাণ জনপ্রতি ৫০০ টাকার কম হইবে না।

ভারতবর্ষে আগত এই ৪৫ লক্ষ লোকের মধ্যে প্রায় ৩২ লক্ষ প্রমাকলের লোক বসিয়া হিসাবে বরা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে প্রায় ১৫ লক্ষ মুসলমান-পরিত্যক্ত পূর্ব-পঞ্জাবে ৭৮ লক্ষ ৬০ হাজার বিঘা জমিতে চাষ-বাস আরম্ভ করিয়াছে। কৃষি-ঋণের জন্ত মঞ্জুর করা হইয়াছে ১ কোটি ৫৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা; ইহার মধ্যে শতাবীজের জন্ত ৩২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা; চাষের বলদের জন্ত ২৫ লক্ষ টাকা; পশু-খাতের জন্ত ৫০ লক্ষ টাকা, এবং গৃহ নির্মাণ বা সংস্কার ও কুপ খনন বা সংস্কারের জন্ত ২৫ লক্ষ টাকা দেওয়া হইবে। গ্রাম্য শিল্পীদের ও জমিবিহীন মজুরশ্রেণীর গ্রামে বাসস্থান দিয়া রাখিবার জন্ত একটা পরিকল্পনা প্রস্তুত হইয়াছে। ৫০টি বয়ন-কেন্দ্র স্থাপনের ব্যবস্থা এই পরিকল্পনার অঙ্গ।

পশ্চিম পঞ্জাবের ৫০ হাজার ও বাহাওয়ালপুর রাজ্য ও সিঙ্গু হইতে আগত ৩০ হাজার চাষী পরিবারের পূর্ব-পঞ্জাবের দেশীয় রাজ্যসমূহে বসবাসের ব্যবস্থা প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছে। পাতিয়ালা রাজ্যে ৬,৩০,০০০ বিঘা জমিতে ১ লক্ষ ২০ হাজার লোকের ব্যবস্থা হইয়া গিয়াছে; আরও এই পরিমাণ জমিতে ১২ হাজার পরিবারের ব্যবস্থা হইবে। ঝিলে ১ হাজার ১ শত ৬৯টি পরিবারের স্থান হইয়াছে; নাভা রাজ্যে স্থায়ী বসতি স্থাপন করিয়াছে ১২ হাজার পরিবার। কপূরতলায় বসতি স্থাপন করিয়াছে ১০ হাজার পরিবার; আরও ৩ হাজার চাষী-পরিবারের ব্যবস্থা হইয়া আছে। ভারতবর্ষের অন্তর্গত রাজ্যে ও প্রদেশে এইরূপ ব্যবস্থা হইতেছে। আলোয়ার রাজ্য ৫০ হাজার লোকের ভার লইতে প্রস্তুত; ভরতপুর—১৫ হাজার, মেওয়া—১০ হাজার; মধ্যপ্রদেশ ও বেয়ার—১০ হাজার; উৎকল—২৫০০ শত; বিহার—৩ হাজার। এই ব্যবস্থার পরেও সহরবাসী হিন্দু শিখের ৫ লক্ষ লোক শীঘ্র গৃহ পাইবে না।

এই বিরাট আয়োজনের বিবরণ সংক্ষেপে দিলাম অল্প একটা কারণে। যে হিংস্র উগ্রত পঞ্জাব ও দিল্লী প্রদেশকে যেভাবে বিধ্বস্ত করিয়াছে তাহার প্রকৃতি আমাদের বুঝিতে হইবে, এবং পূর্ববঙ্গে এইরূপ বিপর্যয়ের জন্ত প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

ভারতবর্ষের মুসলমান

লক্ষ্য নগরীতে ভারতবর্ষের মুসলমান সম্প্রদায়ের একটা বিরাট সম্মেলন হইয়া গেল। প্রায় ৬০,০০০ লোক নাকি এই

সভায় উপস্থিত ছিলেন। মুসলীম লীগের কল্যাণে ভারতবর্ষের মুসলমান যে ভাবে দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছে, তার গোলক-বাঁধা হইতে বাহির হইবার একটা পথ বুঝিয়া লইবার জন্য এই সম্মেলন আহুত হইয়াছিল। সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ বলিয়াছেন যে তরা জুনের পর ভারতবর্ষের নানা স্থানের মুসলীম লীগ এবং অ-লীগ ও অ-দলীয় মুসলমান নায়কগণ এইরূপ একটা সম্মেলন আহ্বান করিবার জন্য নানা ভাবে তাঁহাকে অনুরোধ জানাইয়াছেন; এবং এই সম্মেলন আহ্বান করিবার কি প্রয়োজন ছিল, তাহা তিনি তাঁহার বক্তৃতায় স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

“একথা সত্য যে, ভারতীয় মুসলমানেরা আমাদের সমাজের কতিপয় নেতার ভ্রান্ত নীতির পশ্চাদ্গমন করার দরুন আজ আমাদের এই প্রকার ভয়াবহ ধ্বংসলীলার সম্মুখে পড়িয়া দিশাহারা হইতে হইয়াছে। কিন্তু সেইজন্য আমি কাহাকেও তিরস্কার করিব না এবং আপনাদিগকে উহা বর্জন করিতে অনুরোধ জানাইতেছি। আমরা কাহাকে তিরস্কার করিব? যাহাদিগকে তিরস্কার করিব তাঁহারা যে আমাদের ভ্রাতা। সুতরাং এক ভ্রাতার ভুলের দরুন যদি অপর ভ্রাতৃমণ্ডলীকে সর্বস্বান্ত হইতে হয়, তবুও ভাই হইয়া ভাইকে তিরস্কার করা সম্ভব হইতে পারে না। এইজন্য আমি বলিতে চাহিতেছি যে, কাহারও অথবা কোন দলের সমালোচনা শুনাইবার জন্য আমি আপনাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হই না। কোন উপায় অবলম্বন করিলে বিপদের এই বনাক্কারের মধ্য হইতে মুক্তির পথ পাওয়া যাইতে পারে তাহাই আলোচনা করিবার জন্য এখানে আসিয়াছি।”

মৌলানা আজাদের বক্তৃতার যে চূড়ক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে আমরা ভারতবর্ষের মুসলমান সমাজকে যে “ভয়াবহ ধ্বংসলীলার” সম্মুখীন হইয়া “দিশাহারা” হইতে হইয়াছে বলিয়া শোনা যায়, তাহার পতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে কোন নির্দেশ পাই না। পাইলে সন্দিগ্ধ হইত। আমরা বুঝিতে পারিতাম ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী মুসলমান প্রধানগণ এই ধ্বংসলীলার কারণ সম্বন্ধে কি মনোভাব পোষণ করেন এবং বিপদের হাত হইতে উদ্ধার পাওয়ার উপায় সম্বন্ধে তাঁরা কি ভাবে চিন্তা করিতেছেন। ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগষ্ট হইতে যে ধ্বংসের আগুন দেশে জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, মিঃ হুসেন শহিদ সোরওয়ার্দির নেতৃত্ব তাহাতে ইতন যোগাইয়া দিয়াছিল। এর প্রায় দশ বৎসর পূর্ব হইতে মুসলীম লীগের নেতৃবর্গ প্রকাশে প্রচার করিয়াছে যে হিন্দু কেবল “কাফের” নয়, সে ভারতীয় মুসলমানের বিশেষ শত্রু। জাতীয়তাবাদী মুসলমান এইরূপ প্রচারের বিষ-ক্রিয়া রোধ করিতে পারেন নাই। কেন পারেন নাই, সেই সম্বন্ধে তাঁহাদের স্পষ্ট অভিযত আমরা জানি না। তাঁহাদের সম্প্রদায়ের মনোভাবের মধ্যে এই হিন্দু-বিদ্বেষ এত

সহজে ফুটিয়া দাবানলের দৃষ্টি করে কেন তৎসম্বন্ধে কোন আলোচনা তাঁহাদের মধ্যে দেখি নাই। আর এই মনো-বিকারের মূল বুঝিয়া বাহির করিতে না পারিলে হিন্দু-মুসল-মানের মধ্যে যে বিরোধ দেশে আশ্রয় লাগাইয়াছে, সেই উদ্ধারনার কোন চিকিৎসা হইতে পারিবে না। ক্ষেমাধেরা করিয়া এই বিরোধের মীমাংসা হয় না, সহনশীলতার কথা শুনাইয়া এই রোগের মূল চিকিৎসা হয় না।

ভারতীয় মুসলমানের মনে এক নতুন আগাছা জন্মিয়াছে; সেই গাছে যে ফল দেখা দিয়াছে তাহা বিষাক্ত। তাহা? শাইয়া কেবল হিন্দু মরে নাই, মুসলমান মরিয়াছে এবং আরও মরিবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে বলিয়াই ভারতীয় মুসলিম লীগ নেতৃগণ অনেক বর্ষকথা আমাদের শুনাইতেছে। কিন্তু যে চামা পাই তাহারো রোপণ করিয়াছে সেটি উপভাইয়া ফেলিয়া নতুন গাছ রোপণ করিবার চেষ্টা তি দেখি না। মুসলমানের মনের জমিতে নতুন ফসল ফলাইতে হইলে, আগাছা সব উপভাইয়া ফেলিতে হইবে, পরগাছা অনেক পুড়াইয়া ফেলিতে হইবে। এই আগাছা পরগাছার মধ্যে অনেক কিছু আছে যা বর্ষসংস্কারের সঙ্গে জড়ানো, যা অহমিকার জলে বর্জিত। হিন্দু সমাজের মধ্যেও তাহা আছে। আজ এক শত বৎসর পূর্ব হইতে “সমাজ-সংস্কার” প্রচেষ্টার নানাক্রমের মধ্যে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। মুসলমান সমাজের মধ্যে তার কোন ব্যাপক চেষ্টা আমরা দেখি নাই। আলিগড়ের সৈয়দ আহমদের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। কারণ মুসলমান সমাজ তার যুক্তি ও নীতি গ্রহণ করিতে পারে নাই। সেইজন্য ভারতীয় মুসলমান নিজেদের সংস্কারের, সু-ও-কু-সংস্কারের, যুগোপযোগী কোন পরিবর্তন করিতে স্বীকার করে নাই। তার ফল আমরা দেখিয়াছি কলিকাতার নোয়াখালি-জিপুরায়, বিহার-মুজফ্ফেরে, পঞ্জাব, দিল্লী, কাশ্মীর, সিন্ধু ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে। এই ফল যার জমিতে কলিয়াছে, সেই মালিককেই তার ধ্বংস করিতে হইবে। সেই সাহস ভারতীয় মুসলমান-সমাজের আছে কিনা তাহার পরীক্ষা আজ তাঁদের দিতে হইবে।

বাংলা বনাম উর্দু

বাংলা বনাম উর্দু তর্ক রক্তাক্তিতে পরিণত হইয়াছে ঢাকা শহরে। জন্মাব করিম আহমদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী ভাষার অধ্যাপক। তিনি বাংলায়—নিজের মাতৃ-ভাষায়—পক্ষ লইয়া উৎসাহী ছিলেন বলিয়া পূর্ববঙ্গ গবর্নমেন্টের অ-বাঙালী কর্ণারবৃন্দের নিকট ভিন্নত্ব হওয়ার অপমানে পদত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার পদত্যাগের আর একটা কারণ তিনি দিয়াছেন। সরকারী চাকুরীতে প্রবেশ-প্রার্থীদের নানা ভাষার পরীক্ষা দিতে হয়। পূর্ববঙ্গের পাবলিক সার্ভিস কমিশন এই পরীক্ষার জন্য আটটি ভাষার নাম নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন। বাংলা ভাষার নাম এই নির্দেশনামার মধ্যে

নাই। এই সম্বন্ধে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলীম লীগের সভাপতি মোলানা আকরাম খাঁ চাকার গিয়া বলিয়াছিলেন যদি পূর্বে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না হইয়া অল্প কোন ভাষা হয়, তবে তিনি তাঁহার বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেতৃত্ব গ্রহণ করিবেন। পূর্ববঙ্গের অ-বাঙালী প্রধানগণ মোলানার এই উক্তির উত্তর দিয়াছেন। তার প্রতি-উত্তর কোন্ মুহুর্তে দেখা দিবে, তার অপেক্ষায় রহিলাম। ইতিমধ্যে দেখিতেছি যে পাকিস্তানী সংবাদপত্রে বাংলা বনাম উর্দু, এই দুই ভাষার মামলা লইয়া খুব বাসবিত্তা চলিতেছে। ১৯শে পৌষের “ইত্তেহাদ” দৈনিক পত্রিকার জনাব মোহাম্মদ ওয়াজিদ আলীর একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। এই বিশ্লেষণের মধ্যে বাঙালী সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। সেইজন্য তাবিবার অনেক কথা আছে। সেইজন্য তাবিবার অনেক কথা আছে। সেইজন্য তাবিবার অনেক কথা আছে।

মুসলীম সাহিত্যিকদের অনেকেরই ধারণা বোধ হয় একরূপ যে, পাকিস্তান-যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী হবে করাচী কিংবা লাহোর এবং আমাদের বাংলা দেশটি এই যুক্তরাষ্ট্রের অধীন একটি প্রদেশমাঝে পর্যাবসিত হয়ে থাকবে। অতরাং বঙ্গীয় পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু, এবং বাংলা মাত্র একটি তুচ্ছ প্রাদেশিক ভাষা হয়ে থাকবে। মানে, আমাদের সাহিত্যিকরা যেরে নিয়েছেন যে, উর্দু হবে রাজ্য, আর বাংলা হবে তার প্রজা বা গোলাম বা ক্রীতদাস। মনিবের গরজ-বেগরজ সব রকমেরই বোঝা বইতে গোলাম বাধ্য, অতরাং দাস-বাংলাকে রাজ্য উর্দু তার বওয়ার জন্যে এখন থেকেই তৈরি করা দরকার। মুসলীম সাহিত্যিকদের মনে এই দাস-মনোবৃত্তি পুরাতনই সক্রিয় হয়ে উঠছে। তাই তাঁরা সম্পূর্ণ অনাবৃত্ত ও পরিহার্য আরবী-ফার্সী-উর্দু শব্দ দেবার বাংলা ভাষায় চাপিয়ে দিয়ে তার লগাটে গোলামীর চিহ্ন অনপনের করতে চাচ্ছেন।

“পাকিস্তানি” মনোভাব

১৯৪৬ সালের এপ্রিল মাসে দিল্লী নগরীতে ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক সভার মুসলীম সভ্যগণের এক বিশেষ অধিবেশন হয়। সেই সময় সবে মাত্র মন্ত্রী-মিশন দিল্লী আসিয়া পৌঁছিয়াছে। সেই সভার বক্তৃতা উপলক্ষে বাংলা দেশের তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী জনাব হুসেন শহিদ শোরওয়ার্দি বলিয়াছিলেন যে “পাকিস্তান আমাদের শেষ দাবী নয়।” এই কথার অর্থ বুঝিতে আমাদের কোন কষ্ট হয় নাই; আজিও পাকিস্তানীদের উদ্দেশ্য লক্ষ্যে আমাদের কোন সন্দেহ নাই। প্রায় বাইশ মাস পরে কলিকাতায় প্রকাশিত “পাকিস্তানি” পত্রিকা “আজাদ” আবাক আমাদের এই কথা মনে করাইয়া দিয়াছেন। মুসলীম লীগের লাহোর প্রস্তাবে (১৯৪০) মুসলীম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে “পাকিস্তান” প্রতিষ্ঠার কথাই বলা হইয়াছিল। ১৩ই

অক্টোবরের সংখ্যায় “আজাদ” সেই দাবীর নুতন ব্যাখ্যা করিয়াছেন এই ভাবে—

“...ভারতবর্ষের মুসলমান নিজেদের হিন্দুদের হইতে পৃথক সভা হিসাবে উপলব্ধি করিয়াছে বটে, কিন্তু যেহেতু সে অল্পসারে দেশ ভাগ করিতে গেলে তাহাকে দেশের এক-চতুর্থাংশ দাবী করিতে হয় এবং বিস্তৃত দেশের উত্তর অংশ হইতে লোকবিনিময় প্রভৃতির দরুণ কোটি কোটি জীবনের মূলচ্ছেদ ও বিপর্যয় ঘটাইতে হয়, সেহেতু মোহাম্মদ লীগ কার্যকালে দ্বি-জাতিতত্ত্বের অল্পসারে দেশ বিভাগ দাবী করিতে ক্ষান্ত রহিয়াছে। সে সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে দেশ বিভাগেই সম্মত হইয়াছে, এমন কি সেজন্য পাক্কাব ও বন্দু বিভাগও মানিয়া লইয়াছে। সংখ্যাগরিষ্ঠতা অল্পসারী দেশ বিভাগে উত্তর রাষ্ট্রেই উত্তর সম্ভাব্যতার লোক রহিয়া-পিয়াছে। তাহাদিগকে সরাইবার কোনো রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা হয় নাই। পরে সাম্প্রদায়িক অশান্তির দরুণ কিছু লোকের সাময়িক অপসারণ হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহাও স্থায়ী ভাবে নহে। অতএব দ্বিজাতিতত্ত্ব অল্পসারী দেশ-বিভাগ হইয়াছে, এ কথা বলা সম্পূর্ণ বৃথা ও অন্যায্য। তবুও যাহারা দ্বি-জাতিতত্ত্বের কথা তুলেন, এমন কি সে অজুহাতে হিন্দুস্তান হইতে মুহাম্মদানদিগকে বিতাড়নের কথা পর্যন্ত বলিয়া থাকেন, তাহাদের শ্রমণ রাশা উচিত যে, তাহাদের কথা মতো যদি কাজ করিতে হয়, তবে বর্তমান দেশবিভাগই চরম হইয়া থাকিবে না। পাকিস্তান এলাকাকে তবে বর্তমান পরিধিতেই আবদ্ধ রাখা চলিবে না, দশ কোটি মুহাম্মদানের স্থান দিবার মতো উহার প্রসার করিতে হইবে।”

এই নুতন ব্যাখ্যার জন্য ঘন্যবাদ।

নিজের নাক কাটিয়া অপরের যাত্রাভঙ্গ

সম্প্রতি আসামের বড়দলে মন্ত্রীসভার দুইখানি নির্দেশ আসাম সরকারের নানা বিভাগে প্রচারিত হইয়াছে। বিপ্লবী ১লা ডিসেম্বর মন্ত্রীসভা স্থির করিয়াছেন, যেন ত্রিহটবাসী যেসব কর্মচারী বা ত্রিহটের সরকারী আপিস বা প্রতিষ্ঠানে যেসব কর্মচারী ভারত রাষ্ট্রে (Rest of India) চাকুরী করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন, আসামে তাহাদের স্থান হইবে না। স্থির হইয়াছে, যে সব কর্মচারীকে আসামের নানা বিভাগে নিযুক্ত করা সম্ভব নয়, তাহাদের পেনসন বা “নগদ বিদায়” দিয়া সরাইয়া ফেলা হইবে। অথচ আমরা জানি যে বর্তমান আসামের অনেক আপিসে, স্কুলে, কলেজে এইরূপ অভিজ্ঞ লোকের স্থান আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ শিলচর গবর্নমেন্ট হাই স্কুলের নাম করিতে পারি। মোহাট্টর কটন কলেজে বোটানি ও ফিজিওলজি বিভাগের অধ্যাপক পদও শালি আছে। এইরূপ অনেক স্কুল-কলেজে আছে যেখানে ত্রিহটবাসী বাঙালী ও অন্যান্য

বাঙালীর ব্যবস্থা করিতে পারা যায়। খ্রীষ্টের বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীদের ছাড়াইরা দেওয়া হইতেছে একটা অজুহাতে যার কোন অর্থ হয় না। এই সম্বন্ধে ভুক্তভোগী এক জনের নিকট হইতে একখানি পত্র নিয়ে উদ্ধৃত করিলাম—

“নূতন রাষ্ট্রে নেতাদের যুগ দিয়া যখন শিক্ষার আয়ুস পরিবর্তনের কথা শুনি, নূতন নূতন পরিকল্পনার কথাও তাঁহারা বলেন, ঠিক সেই সময় অভিজ্ঞ ও শিক্ষিত শিক্ষকদের “বাড়তি” হিসাবে ছাঁটাইয়ের ব্যবস্থা চলছে। অভিনব ব্যবস্থা। তিনি (কেন্দ্রীয় গবর্নমেন্টের শিক্ষা মন্ত্রী) আরও বলিয়াছেন যে ছয় হইতে এগার বৎসর বয়স্ক বালক-বালিকারা সংখ্যার তিন কোটি; ইহাদের ক্ষমতায় লক্ষ শিক্ষিত শিক্ষকের প্রয়োজন।...শিক্ষা বিভাগের কর্মসূচি, সক্ষম ও অভিজ্ঞ কর্মচারীদের আজ আর স্বাধীন রাষ্ট্রে প্রয়োজন নাই।...”

এই বৈষম্যের কারণ সুবিদিত। গত ২২রা জানুয়ারী তারিখে সর্দার বরজভাই প্যাটেলের নিকট এই সম্বন্ধে বহু আরকলিপি উপস্থিত করা হয়। খ্রীষ্ট সম্মেলনের পক্ষ হইতে যাহা বলা হয়, তাহা জনমতের প্রতিভূ বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

“পুনর্গঠিত আসামের যে সব অধিবাসীর জন্মস্থান পাকিস্তানে পড়িয়াছে এবং যাহারা লোকবল ও অর্থ দিয়া আসামের যে কোন নাগরিকের মতই আসামকে শিল্প-বাণিজ্যে, আর্থিক সম্পদে, শাসন-ব্যবস্থায় ও অগাধ ক্ষেত্রে উন্নত করার সাহায্য করিয়াছেন, তাহা-দিগকে বিদেশী বলিয়া গণ্য করা হইতেছে, এবং (১) জীবিকা অর্জনের বিভিন্ন পেশা; (২) সরকারী চাকুরীতে নিয়োগ ও পদোন্নতি; (৩) ছাত্রদের সুবিধান; (৪) স্থল-কলেজে প্রবেশাধিকার; (৫) ভূসম্পত্তি ক্ষয় ও ভোগদখল, ইজারা গ্রহণ ইত্যাদি ব্যাপারে কতকগুলি নিষেধাত্মক ও বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা আসাম সরকার কর্তৃক অবলম্বিত হইয়াছে।”

এই অভিযোগের উত্তরে সর্দার প্যাটেল সাহসনা দিয়াছেন এই বলিয়া যে,

“খ্রীষ্টের সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় সংখ্যায় প্রায় ১২ লক্ষ। তাহাদের মধ্যে যে কেহ বিশেষতঃ হিন্দুরা যদি আসামে আসিয়া বসবাস করিতে চাহে, তাহা হইলে সাদরে গ্রহণ করা হইবে। তাহাদের নাগরিক অধিকার লাভেও কোন অসুবিধা হইবে না, কারণ, কেবলমাত্র ঘোষণার দ্বারা পাকিস্তানের প্রত্যেক লোকই ভারতীয় রাষ্ট্রের অধিকার লাভ করিতে পারে।”

এই ঘোষণা একটা বড় নজীর। কিন্তু আসামের প্রাধান-মন্ত্রী খ্রীষ্ট গোপীনাথ বড়দলের প্রশংসাতে যে শ্রেণীর সমর্থন আছে তাহারা এই প্রাণিত ব্যবস্থা কি বানচাল করিবার চেষ্টা

করিতেছে না? সর্দার বরজভাই প্যাটেল কি এই কথা জানেন না? এবং জানিলে, আপনার নাক কাটিয়া অপরের যাঁড়াভঙ্গ করার যে নীতি বড়দলে মঞ্জীপড়া গ্রহণ করিয়াছে এবং সহস্র সহস্র লোকের অনিষ্ট করিতেছে, তাহাতে তিনি কি করিয়া বাধা দিবেন? সেই ক্ষমতা তাঁহার হয়ত আছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের সব নির্দেশ অমান্য করিয়া বড়দলে মঞ্জী-পড়া চলিতেছেন, এবং সর্দার প্যাটেলের নির্দেশ অমান্য করিতেছেন।/কি উপায়ে এই মারাত্মক অন্যায় বিদূষিত করা যাইতে পারে, তাহা কেন্দ্রীয় গবর্নমেন্টকে বুজিয়া বাহির করিতে হইবে।

বস্ত্রমূল্য নিয়ন্ত্রণ

গান্ধীজী নিয়ন্ত্রণ প্রচার বিরুদ্ধে। শির ইহার বিরুদ্ধে। কিন্তু এই মতেকোর ক নিয়ন্ত্রণ রদের ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা প্রমাণিত হয় যে আমাদের দেশের শিল্পপতি ও সত্ততার উপর, নির্যাতনের উপর নির্ভর করা যায় না। কথটা প্রায় পনের দিন পূর্বে দিল্লীর হার্ডিঞ্জ লাইনে অন্তর্ভুক্ত ব্যবসায়ীদের এক সভায় গান্ধীজী স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

“ব্যবসায়ীদের অসাধুতা বা অতি-লোভের ভয়েই কন্ট্রলের উৎপত্তি। একজন মজুর স্বীয় পরিশ্রমের মূল্য যাহা পায় একজন ব্যবসায়ী তাহার চেয়ে বেশী পাইবে কেন?”

দিল্লীর সভায় ব্যবসায়ীরা এই প্রশ্নের কোন উত্তর দিয়াছিলেন বলিয়া শুনি নাই। কিন্তু দেশের তিক্ত অভিজ্ঞতা হইতে ইহা বলা যায় যে শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরা এই প্রশ্নের সত্ত্বত্তর দিতে পারিতেছেন না। তাহার ফলে দেশে রাষ্ট্র-বিপ্লবের পটভূমি প্রস্তুত হইতেছে। গান্ধীজীর প্রাণান্ত চেষ্টায়ও তাহা আটকাইয়া রাখা যাইবে না এই কথা মনে করিয়া আমাদের স্বাধীন রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দেশের লোকে নানা বিপর্যয়ের জন্য আশঙ্কা করিতেছে। আর এক পরীক্ষা আসিতেছে দেশের লোকের সম্মুখে কাপড়ের নিয়ন্ত্রণ প্রচার করার ফলে। পশ্চিম বাংলায় কাপড়ের কলগুলি ও কাপড়ের বিক্রয় সমিতির নিকট মজুত সকল গাঁট কাপড়ের বিক্রয় বন্ধ করা হইয়াছে; তাহাদের ওদিকে তালা লাগাইয়া পুলিশের হেঁকাতে রাখা হইয়াছে। চিনির সম্বন্ধেও একরূপ করা হইয়াছিল। কিন্তু ইহাতে চিনির কলগুলির বা মজুত-দারের হাতে সমাজের গলা কাটিবার পথে কোন কাঁটা পড়ে নাই। যে চিনি কলিকাতায় সাড়ে দশ আনা সেৱ হিসাবে পাওয়া যাইত, বিজ্ঞাপন দিয়া চিনির মজুতদার তাহা এক টাকা সেরে বিক্রয় করিতেছে। লজ্জা বা ভয় তাহার করিবার নাই। মূল্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের ভূতপূর্ব সভাপতি মিঃ গোরওয়াল, বলিয়াছেন যে এই মূল্য নিয়ন্ত্রণ রদে চিনির মজুতদারদের

পত্রাবলী

[রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে লিখিত]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিখ্যাতরতীর অনুমতিক্রমে প্রকাশিত

ও

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

আমার লিখিত ইংরেজি পত্রখানি *Modern Review* পত্রে ছাপাইবার যোগ্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন, আশা করি বিচারে ভুল করেন নাই।

প্রক্ষে দ্বিতীয় গেলির শেষ প্রান্তে একটি প্যারাগ্রাফ যোগ করিয়াছি। ইহার ভাষা, ব্যাকরণ ও পদচ্ছেদ সম্বন্ধে উদ্ভিন্ন আছি—দয়া করিয়া যথেষ্ট সংশোধন করিয়া দিবেন।

নেপালবাসী^১ কিছু দিনের জ্ঞাত এখানকার অধ্যাপনার ভার গ্রহণ করিতে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। সেই কিছুকালের মেয়াদ যদি ক্রমে বাড়িয়া চলিতে থাকে তবে আরও আনন্দের কারণ হইবে।

আশা করি আপনার শরীর এক্ষণে ভাল আছে। ইতি ২ই শ্রাবণ ১৩১৭

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পু: আজ রবিবার বলিয়া প্রফ রেজিষ্ট্রি ডাকে পাঠানো গেল না—তাহাতে ক্ষতির আশঙ্কা আছে কি? প্রবাসীর জ্ঞাত চাকুরে গুটি তিনেক কবিতা পাঠাইয়াছি, এখনো প্রাপ্তি নংবাদ পাই নাই।

ও

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

কুমারস্বামী^২ আশ্রমে আসিয়াছিলেন, তিনি আমার কতকগুলি কবিতা অনুবাদ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। সেইজন্ত তাঁহাকে সাহায্য করিবার উদ্দেশে আমি তাড়াতাড়ি গোটা তিন-চার কবিতা নিতান্ত নীরস গদ্যে তর্জমা করিয়া দিয়াছিলাম। কুমারস্বামী যদি সেগুলি অবলম্বন করিয়া লিখিয়া দেন তবে *Modern Review* পত্রিকায় ছাপাইবেন। তাঁহার হাত দিয়া বাহির হইয়া আনিলে আমার আপত্তির কারণ থাকিবে না। অজিত^৩ কতকগুলি তর্জমা করিয়াছিল, সেও কুমারস্বামীর হাতে আছে। তিনি যাহা ছাপাইবার যোগ্য বলিয়া আপনার হাতে দিবেন তাহা আপনি প্রকাশ করিবেন। কিন্তু স্বকৃত তর্জমার বিড়ম্বনা-গুলিকে কুমারস্বামী মাজিয়া ঘষিয়া দিলে তাহাতে অনুবাদক বলিয়া আমার নাম সংযোগ করা সম্ভব হইবে না।

১। নেপালচন্দ্র রায়।

২। আনন্দ কুমারস্বামী।

৩। অজিতকুমার চক্রবর্তী।

ডাক্তার বহু^৪ বলিতেছিলেন, Sister Nivedita আমার দুইটি ছোট গল্প (কাবুলিওয়াল ও ছুটি) ইংরেজিতে তর্জমা করিয়াছেন—তাহা বিশেষ উপদেশ হইয়াছে, শুনিয়াছি সে দুটি আপনার কাগজে ছাপিতে দিতে তাঁহার আপত্তি নাই। ইতি ৮ই ফাল্গুন ১৩১৭

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ও

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

আমার জীবনশ্রুতি প্রবাসীতে বাহির করিবার পক্ষে আপনার অনুরোধ ছাড়া আর একটি কারণ ঘটয়াছে। আমার বিদ্যালয়ের কোনো অত্যুৎসাহী শিক্ষক আমার ঐ লেখা নকল করিয়া যক্ষ্মলে কোনো সভায় আমার জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে পাঠ করিতে পাঠাইয়াছেন। প্রকাশ না করিবার জ্ঞাত তিনি অনুরোধ করিয়াছেন কিন্তু ইহার অথবা ব্যবহার হওয়ার আশঙ্কা যখন আছে তখন বিকৃতি লাভের পূর্বেই ওটাকে ছাপার অক্ষরে প্রব করিয়া রাখা ভাল। কিন্তু আগে অজিতের লেখাটা বাহির হইয়া গেলে তাহার পরে এটা প্রকাশ হওয়া কি ভাল নয়? ভাবিয়া দেখিবেন। আমি ঐ লেখাটার ফাঁক ভরাইয়া আবার একটু সংশোধন করিয়া লইতেছি। যখন ইচ্ছা করেন পাইবেন।

মাতা শান্তা^৫র শরীর এখনো সম্পূর্ণ সুস্থ হয় নাই শুনিয়া হৃৎকণ্ঠে বোধ করিতেছি, তাঁহার এই অস্বাস্থ্যের জ্ঞাত আমাদের আতিথ্য যদি কোনো অংশে দায়ী হয় তবে সে আমার পক্ষে অত্যন্ত পরিতাপের কথা।

চাকুরকে বলিয়া দিবেন, বড়দাদার লেখাটা কম্পোজ হইবামাত্র সেটা ছাপিবার জ্ঞাত যেন তত্ত্বাবোধিনীতে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। ইতি ২ই জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ও

শিলাইদা
নদীয়া

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

জীবনশ্রুতি কাপি করিতে দিলাম। কিন্তু আমার মনে হয় অজিতের লেখার প্রথম কিস্তি অন্তত বাহির

৪। জগদীশচন্দ্র বহু।

৫। শ্রীশান্তা দেবী।

৬। চাকুর বংশোদ্ভূত।

হইয়া গেলে এই প্রবন্ধ প্রকাশ হওয়া উচিত। অজিত আমার জীবনের সঙ্গে কাব্যকে মিলাইয়া সমালোচনা করিয়াছেন—তাঁহার লেখা পড়িয়া যদি পাঠকদের মনে কোতূহল জাগ্রত হয় তবে এ লেখাটা তাঁহারা ঠিকভাবে গ্রহণ করিতে পারিবেন। এবং অজিতেরই লেখার অনু-বৃত্তিক্রমে এই জীবনস্মৃতির উপযোগিতা কতকটা পরিমাণে আছে। ইতিমধ্যে আমি ...কে বিশেষ করিয়া লিখিয়া দিতেছি তিনি আমার লেখাটাকে যেন প্রচার না করেন।

জীবনস্মৃতি অনেকটা পরিবর্তিত ও পরিবর্তিত হইতেছে—সমস্তটাই আবার নতুন করিয়া লিখিতে হইতেছে। যখন প্রবন্ধটা হাতে পাইবেন একবার ভাল করিয়া আগাগোড়া পড়িয়া দেখিবেন যদি কোনোখানে লেশমাত্র অহমিকা বা অনাবশ্যক প্রগল্ভতা প্রকাশ হইয়া থাকে তাহা নির্মমভাবে কাটিয়া দিবেন। নিজের কথা বলিবার সময় কথার ওজন থাকে না। যে সব বৃত্তান্তকে অত্যন্ত ঔৎসুক্যজনক বলিয়া বোধ করি তাহা সাধারণের কাছে তুচ্ছ ও বিরক্তিকর হইতে পারে। ইতি ১৩ই জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ও

শিলাইদা
নদীয়া

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

প্রতীক্ষা নামক লেখাটি অল্প স্বল্প সংশোধন করিয়া দিলাম। গোড়ার দিকে দুই চার লাইন বর্ণনা ছিল যাহা বাহুল্য এবং নিতান্ত দস্তরমত, সেইগুলি বাদ দিয়াছি। শেষটুকুতেও অল্প একটু হস্তক্ষেপ করিয়াছি।

সাময়িক পত্র যাহা পান তাহার ব্যবহার শেষ হইয়া গেলে আমাকে পাঠাইয়া দিতে অনুরোধ করিবার জন্ত আজই আপনাকে চিঠি লিখিতে যাইতেছিলাম এমন সময়ে আপনার পত্রে তাহার উল্লেখ পাইলাম। অবশ্য, এখন নিজের সম্পাদকীয় দফতরের জন্তই ইহাদের প্রয়োজন অল্পভব করিতেছি। তত্ত্ববোধিনীর রুচি এবং ক্ষুধা দুইই সঙ্গীর্ণ অতএব প্রবাসীর জন্তও কিছু উদ্ধৃত থাকিতে পারে এমন আশা করা যায়। আপাততঃ কাগজগুলি এই ঠিকানাতেই পাঠাইবেন। এখানে আমার সঞ্চালনকারী দুই একটি আছে।

কাল জ্ঞানের হাত দিয়া আমার জীবনস্মৃতির কাপি আপনার কাছে পাঠাইয়াছি, বোধ হয় পাইয়াছেন। আশা করি আমার এই লেখাটিতে আমার শত্রু-মিত্র কোনো পক্ষকেই উদ্বেজিত করিয়া তুলিবে না। যে পর্যন্ত পাঠাইয়াছি ইহার পরেও আরো খানিকটা লেখা আছে।

১। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

তাহাতে ক্রমশ অধিক করিয়া আমার রচনার কথা আসিয়া পড়িয়াছে। আর একবার সংশোধন করিয়া লিখিয়া তাহার পরে বিবেচনা করা যাইবে সে অংশটা বাহির করা চলিবে কিনা। ইতি ১৮ই জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ও

শিলাইদা
নদীয়া

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

আজ সেই নিবেদিতা সঞ্চয়ী লেখাটা শেষ করিয়াছি—যদি সময় থাকে তবে আজই পাঠাইব কিন্তু রেজিষ্ট্রি করিবার অবসর যদি না পাওয়া যায় তবে মঙ্গলবারে পাইবেন। নিতান্ত ছোট হইবে না প্রায় এক ফর্ম হইবে।

একটা কথা বলিতে তুলিয়াছি। সেই যে পুস্তিকা প্রকাশের প্রস্তাব করিয়াছিলাম সে সঙ্ক্ষে আমার ইচ্ছার উপর লেশমাত্র নির্ভর করিবেন না। যে সকল প্রবন্ধ জনসমাজের বিচারবুদ্ধিকে আঘাত করিয়া উদ্বেজিত করিবার উদ্দেশে লিখিত সেগুলি এইভাবে প্রচার করিলে যদি কোনো উপকার প্রত্যাশা করেন তবেই চেষ্টা করিবেন। আর একটি কথা মনে রাখিবেন আপনি নিজে যে প্রবন্ধগুলিকে যোগা মনে করিবেন সেইগুলিই ছাপিবেন। আমি এ সঙ্ক্ষে কোনো বিচার করিতে পারিব না। আপনার মনে যেটা ভাল লাগিবে অর্থাৎ যাহাতে কোনো উপকারের সম্ভাবনা বৃদ্ধিবেন সেইটেই নিজের দায়িত্বে আপনি এইরূপ ছাপিবেন। আমার সকল প্রবন্ধ সঙ্ক্ষেই আপনার এই অধিকার রহিল—যাহা প্রবাসীতে বাহির হইবে বা যাহা অগ্রহ।

কিন্তু আপনি লেশমাত্র সঙ্কোচ মনে রাখিবেন না। আপনি যদি কোনো প্রবন্ধ ত্যাগ করেন তবে আমি তাহাতে কিছুমাত্র রাগ করিব না।

নিবেদিতা আমার “কাবুলিওয়ালার” যে ইংরেজি তর্জমা করিয়াছেন তাহার পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে। আপনি জগদীশের কাছে সম্মান লইবেন।

Mrs. Shomeকে আপনি বোধ হয় জানেন। তাঁহারই এক কন্যাকে বোম্বার শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করিবার কথা চলিতেছে—যদি তাঁহাকে না পাওয়া যায় তবে আপনাকে জানাইব। ইতি ১৮ই কার্তিক ১৩১৮

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ও

বোলপুর

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

বিদ্যালয়ের জন্ত একটি অধ্যক্ষসভা স্থাপনের প্রস্তাব আপনাকে পূর্বেই জানাইয়াছি। আপনি ছাড়া আর কাহারও নাম মনে পড়িতেছে না। আপনার সঙ্গে রথীন্দ্র ও হরেন্দ্রকে স্থান দেওয়া যাইতে পারে—কেননা তাঁহাদের দুই জনের কাছ হইতে বিপদে আপদে অর্থের প্রত্যাশা করা যাইতে পারিবে।

আমি এখানে থাকিতে থাকিতে আপনি কি দুই-এক দিনের জন্ত এখানে আসিবার অবসর করিতে পারিবেন? আমি বোধ হয় আগামী বৃহস্পতিবার পর্যন্ত থাকিতে পারি। একবার যদি আসা সম্ভব হয় তবে আর্থিক ও অন্যান্য অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া যাইতে পারেন। যদি ব্যাঘাত না থাকে তবে কবে আসিতে পারেন জানাইবেন। ইতি ২৬শে মাঘ ১৩১৮

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ও

শিলাইদা
নদীয়া

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

জীবনস্মৃতির প্রফ্ না ইউক ফাইলটা আমার কাছে পাঠাইবেন কেননা কিছু কিছু বাড়ান চলিতেছে। আমার মেয়াদ ফুরাইয়া আসিল—আর ২০।২২ দিন লিখিতে পাইব ইহার মধ্যে সমস্ত ঠিকঠাক করিয়া দিয়া যাইতে হইবে। অতএব আপনি যদি “জীবনস্মৃতি”র সমস্ত কাপি আমার কাছে রেজিষ্ট্রি করিয়া পাঠান তবে তাহার উপর শেষ তুলির পৌচ দিয়া সমস্তটা সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারি। সীতা^{১০}র ইচ্ছা জীবনস্মৃতি আরো খানিকটা অগ্রসর করিয়া দিই—তাহাও নিতান্ত অসম্ভব নহে অতএব কাপিগুলো একবার শীঘ্র করিয়া পাঠাইয়া দিবেন। ইতি ৮ই ফাল্গুন ১৩১৮

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ও

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

আজ প্রফ্ পাইলাম। ইহার শেষ প্যারাগ্রাফটায় কিছু যোগ করিয়া দিতে হইবে। আজই তাড়াতাড়ি

৮। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৯। হরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১০। সীতা দেবী।

লেখার সুবিধা হইল না, কারণ হাতে এখন একটা অল্প লেখার উপদ্রব আছে। “ভগ্নহৃদয়” শীর্ষক এই প্যারাগ্রাফটিক বৈশাখের কিস্তিতে চালাইয়া দিবেন। সেই হইলেই ঠিক ভাল হয়—চৈত্রের শেষে ওটা ঠিক সঙ্গত হয় নাই—তাই এই প্যারাগ্রাফটা কাটিয়া রাখিলাম।

সেই বইটার নাম “পাঠসঙ্কয়” দিলে কেমন হয়? যে প্রবন্ধগুলি পাঠাইয়াছি তাহার মধ্যে কোনোটা যদি অল্প-যুক্ত মনে করেন তবে বাদ দিয়া দিবেন।

“জীবনস্মৃতি”র শেষের কথাগুলো মোটামুটি ভাবে লিখিয়া ফেলিতে ইচ্ছা আছে। কিন্তু মেয়াদ ফুরাইয়া আসিল—ছুটি আর ত বাকি নাই। এই কয় দিনের মধ্যে কতটুকুই বা লিখিতে পারিব? বিশেষতঃ ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে একটা বড় প্রবন্ধ লিখিতে হাত দিয়াছি—এটা লিখিতে সময় যাইবে বলিয়া আশঙ্কা করিতেছি। দেখা যাক কতদূর কি হইয়া দাঁড়ায়। ইতি ১৩ই ফাল্গুন ১৩১৮

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ও

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

পাঠসঙ্কয় লইয়া ত বিপদে পড়া গেল। গ্রন্থাবলী বাটিয়া ছেলেদের উপযোগী আর একটি প্রবন্ধও পাওয়া গেল না। এক্ষণে আমার প্রস্তাব এই যে, প্রবাসীতে কয়েক বৎসর ধরিয়া যে সকল সঙ্কলন চলিয়াছে তাহার যদ্য হইতে আমার লেখা এবং মীরা^{১১}র ও হেমলতা^{১২} বোমার লেখা হইতে বাছিয়া যতগুলো প্রবন্ধ উপযুক্ত বোধ করেন জুড়িয়া দিবেন। সেই প্রবাসীগুলি হাতের কাছে থাকিলে নিজেই দেখিয়া দিতাম। স্বরণশক্তির অবস্থাও এমন যে কখন কি লিখিয়াছি তাহা মনেও নাই। শিক্ষা সম্বন্ধে আমেরিকার দুই একটা ইস্কুল সম্বন্ধে কিছু যেন লিখিয়া-ছিলাম। এমন আরো কিছু না কিছু পাওয়া যাইবে। ইহাতে যদি না কুলায় তবে আর ত উপায় দেখি না। তাহা হইলে অগত্যা প্রাইভেট পড়ার জন্তই এই পাঠসঙ্কয়টা তৈরি করিতে হইবে।

আমার প্রবন্ধ পাঠ সভায় সভাপতি কে হইবেন সেটা বিচার করিয়া স্থির করিবেন। আগু^{১৩}র কথা ত পূর্বেই লিখিয়াছি—আগু মুখুযো মশায়ের কথাও চিন্তা করিয়া

১১। কস্তা শ্রীমীরা দেবী।

১২। শ্রীহেমলতা ঠাকুর।

১৩। আগুতোষ চৌধুরী।

দেখিবেন—তিনিও ত বিচারক মানুষ। অবশ্য আমার মতামত তাঁহার কাছে কেমন ঠেকিবে তাহা জানি না। সভাপতির হাতে যেরূপ ক্ষমতা আছে তাহাতে সমস্ত বক্তৃতার মাথায় ঘোল ঢালিয়া দিয়া তিনি অক্ষত শরীরে বাড়ি চলিয়া যাইতে পারেন এইটাই ভাবনার কথা। যাহার কথার জবাব চলে তাঁহাকে ভয় করা কাপুরুষতা, কিন্তু সভাপতি যদি বিমুখ হন তবে সভার শেষ মুহূর্তটা রামমোহন রায়ের গানের “শেষের সে দিন” এর মতই ভয়ঙ্কর—কারণ তখন “অন্তে বাক্য কবে কিন্তু তুমি রবে নিরুত্তর।”

আগামী সোমবার চাটগাঁ মেলে কলিকাতা যাওয়া স্থির করিয়াছি। দেখা হইলে সকল কথা আলোচনা হইবে। ইতি ২৪শে ফাল্গুন ১৩১৮

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ও

শিলাইদা

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

কয়েকদিন থেকে আবার অসুস্থ বোধ করছি। জীবন-স্থিতি শ্রাবণের কিস্তিতে শেষ করে দিয়েছি—দেখলুম আর লেখবার সময়ও পাব না—ক্রমে জটিলতার অরণ্য ভেদ করে কলমও চলবে না।

লোকেন^১কে লিখে দেখব। আজকাল সে লেখায় অনভ্যস্ত হয়ে পড়েছে বলে কি হয় বলা যায় না।

এখান থেকে ৭ই জ্যৈষ্ঠ কলিকাতায় ও বোধ হয় ১০ই বোম্বাই রওনা হব।

শান্তা ও সীতাকে আমার আশীর্বাদ জানাবেন। সীতাকে বলবেন শ্রাবণের জীবনস্থিতির পাণ্ডুলিপিটা তাঁর কাছেই পাঠাব—সেটা আর এক ব্যক্তির দ্বারা কাপি করিয়ে নিয়েছি। ইতি ৩০শে বৈশাখ ১৩১৯

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ও

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

আমি ছাত্রদের এই প্রবন্ধটা বাংলা হইতে ইংরেজি করিয়া মুখে মুখে বলিয়া যাইতেছিলাম এণ্ড্রুজ লিখিয়া লইতেছিলেন। তারপরে সেইটেকে দুঃস্থ করিয়া তিনি লিখিয়া দিলে আমি আবার তাহার উপর কিছু কারিগরি করিয়া তবে জিনিষটা দাঁড়াইয়াছে।

জীবনস্থিতির তর্জমাটার প্রফ কাল সংশোধন করিয়া দেওয়া হইয়াছে সেটা পাইয়া থাকিবেন। মাঝে মাঝে স্বরেন^{১৫} দুই-এক জায়গায় ছাড়িয়া দিয়াছিল সেইগুলো পূরণ করিয়াছি দু-এক জায়গায় কিছু বদল করিতেও হইয়াছে।

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ও

এখন হইতে আমার ঠিকানা
O/o Prof. Seymour.
Urbana,
Illinois
U.S.A.

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

বিদ্যালয়ের বর্তমান আর্থিক অবস্থা আপনার পক্ষে বিস্তারিতরূপে জানিতে পারিলাম।

আমার মনে হয় বিদ্যালয়ের প্রয়োজন জানাইয়া অভি-ভাবকদের নিকট মাসিক আরো দুই টাকা বেতন দাবি করার সময় আসিয়াছে। ইহাতে সকলেই সন্মত না হইতে পারেন কিন্তু যাহাদের অবস্থা ভাল তাহারা বিবেচনা করিয়া দেখিতে পারেন। বর্তমানে যে সকল ছাত্র আছে তাহাদের অভিভাবকেরা ইচ্ছাপূর্বক ২০ টাকা বেতন যদি না দেন তবে তাহাদিগকে রাখিতেই হইবে কিন্তু ভবিষ্যতে ২০ টাকার কমে ছাত্র লওয়া হইবে না এইরূপ নিয়ম করা অবশ্যস্বাভাবিক হইয়াছে।

বিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে অধ্যাপকদের বেতন কম করিবার প্রস্তাব করা আমি ঠিক মনে করি না। কিন্তু তাহারা ইচ্ছাপূর্বক নিজে হইতে কিছু কি ত্যাগ করিবার কথা বলিতে পারেন না? তাহাদের মধ্যে কেহ একজন দৃষ্টান্ত দেখাইলেই পথ সরল হইতে পারে।

আমি জানি না আমাদের বিদ্যালয়ের বেতনের হার অত্যন্ত অপেক্ষা বেশি কিনা কিন্তু আমি ইহাদের কাহারও কাছে কিছু দাবি করিতে পারি না। ত্যাগ করিবার দাবি একমাত্র আমারই উপর আছে—বিদ্যালয়ের আইডিয়া আমাকেই ডাক দিয়াছিল অতএব যথার্থভাবে আমারই গরজ। যতক্ষণ আমার কিছুমাত্র সামর্থ্য আছে ততক্ষণ আমি অগ্রের কাছে হাত পাতিতে পারি না। অতএব বিদ্যালয়ে অনটন ঘাটা কিছু ঘটতেছে তাহার মূলে আমারই অপরাধ আছে—সেজন্য আমি অগ্রকে দণ্ডনীয় করিব কি করিয়া? অধিক বেতনের অধ্যাপকদিগকে বিদায় করা একটা পহা বটে কিন্তু তাহা হইলে প্রাণ নষ্ট করিয়া ব্যয় বাঁচানোর চেষ্টা করা হয়। কারণ তাহারাই বিদ্যালয়ের মর্মস্থান অধিকার করিয়া আছেন।

যেমন করিয়া হোক একদিন ইহার সমস্ত দায় আমাকেই স্বীকার করিয়া লইতে হইবে একথা মনে মনে ভাবিয়াছি। অবশ্য আমার সামর্থ্যেরও সীমা আছে সে সীমা যে বেশি দূরে তাহা নহে—কারণ, আমি ঋণে মগ্ন। তা ছাড়া আমার আয়ুর চেয়ে বিদ্যালয়ের আয়ু বেশি এই কথাই ধরিয়া লওয়া উচিত—অতএব আমার আয়ের সঙ্গে বিদ্যালয়ের আয়কে এক করিয়া দেখিলে এক দিন বিপদ ঘটবেই।

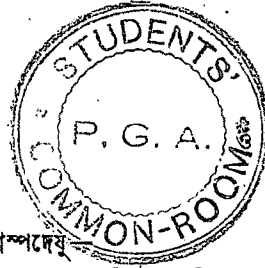
আসল কথা, যে জিনিষের প্রয়োজনকে সকলে সত্য-ভাবে স্বীকার না করে তাহাকে কৃত্রিম উপায়ে বাঁচাইয়া রাখা বিড়ম্বনা। যেটুকু আমার শক্তির উপর নির্ভর করিতেছে বিদ্যালয়ের মধ্যে সেইটুকুই যদি সত্য হয় তবে সেই শক্তির শেষ পর্য্যন্তই চলুক। দেশলাই জলে বাতিকে জ্বালাইবার জন্ত, কিন্তু বাতি যদি না জলে তবে দেশলাইয়ের শেষটুকু পর্য্যন্ত জলুক—ততক্ষণ যতটুকু পথ পার হওয়া যায় ততটুকুই ভাল।

বিদ্যালয়ের আর্থিক সম্বন্ধের কথা শুনিয়া দেশে ফিরিবার জন্ত আমার মন টলিয়াছিল। কিন্তু আমার এখানকার বন্ধুরা বারম্বার আমাকে আশ্বাস দিতেছেন যে আমার বই ছাপার ভালরূপ ব্যবস্থা করিতে পারিলে বিদ্যালয়ের আয় সম্বন্ধে অনেকটা নিশ্চিন্ত হওয়া যাইতে পারে। সেইজন্ত আশাপথ চাহিয়া বসিয়া আছি। কিন্তু বই বিক্রী করিয়া কিছু পাইব এ কথা বিশ্বাস করিবার ভরসা আমার চলিয়া গিয়াছে।...

আমেরিকা যাইবার প্রস্তাব চলিতেছে। সেখানে কিছু সুবিধা হইতে পারে কিনা দেখিব। কিন্তু ভিক্ষা করিবার বিদ্যা আমি একেবারেই জানি না—এবং দেশের কাজের জন্ত বিদেশে ভিক্ষার বুলি বাহির করিতে আমার অত্যন্ত লজ্জা করে। অতএব আমার বিশ্বাস বুলিটা লুকানোই থাকিবে এবং যখন ফিরিয়া আসিব তখন শূন্য হাতেই ফিরিব।

জোর করিয়া বলিতে পারি না তবে আন্দাজে বলিতে পারি হয় ত হাজার খানেক টাকা নূতন বাড়ি তৈরি করিবার জন্ত পাঠাইতেও পারি কিন্তু তাহাতেই কি সমস্যা পূরণ হইবে? অন্তর্ধামী যিনি অন্তরে বসিয়া বাহিরে ফল দিয়া থাকেন তিনি দেখিতেছেন আমাদের তপস্যা সম্পূর্ণ হইয়া উঠে নাই। তিনি মিথ্যাকে প্রশ্রয় দিয়া বাঁচাইয়া রাখিবে না। যাহার আয়ু নাই তাহাকে মরিতে দিতেই হইবে। বাহিরে যে টানাটানি দেখিতেছেন সেটা অন্তরের টানাটানির বাহ্য লক্ষণ মাত্র। বাহির হইতে জোড়াতাড়া

দিয়া একটা ইস্কুলকে খাড়া করিয়া রাখা চলে কারণ তাহা প্রাণের জিনিষ নহে কিন্তু আশ্রমকে বাঁচাইয়া রাখা চলে না। অতএব যদি সামর্থ্য না থাকে তবে লোভ করিব না—আমাকে জবাব দিলেও তাঁহার সেবকের অভাব ঘটিবে না এই কথাই মনকে বুঝাইয়াছি। ইতি ২১শে আশ্বিন, ১৩১২



আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শিলাইয়া
নদীয়া

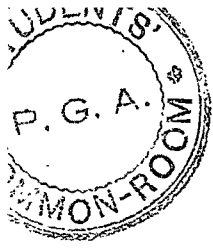
শ্রদ্ধাশ্রমে

চোখের বালি ইংরেজিতে তর্জমা করা আমার পক্ষে বড় কঠিন। অন্তত এ কাজ করিতে আমার বিস্তর সময় লাগিবে। Anderson^{১৩} চোখের বালির বিশেষ ভক্ত—তিনি ঐ বইয়ের সমালোচনা উপলক্ষ্যে উহার একটি অংশ তর্জমা করিয়াছিলেন সেটুকু স্মন্দর হইয়াছিল। আমার বিশ্বাস তাঁহাকে অল্পরোধ করিলে তিনি রাজি হইবেন। ইংরেজি করিতে হইলে যে যে অংশ বাদ দেওয়া দরকার তাহা আমি দেখিয়া ঠিক করিয়া দিতে পারি। এবং তাঁহার তর্জমা হইলেও আমি একবার দেখিয়া ঠিক করিয়া দিলে তাঁহার বুঝিবার ভুলের ভ্রুটি সংশোধন হইতে পারিবে।

আপনি শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের জন্ত যে তিনটি ছাত্রের কথা লিখিয়াছেন তাহার মধ্যে তৃতীয়টিকে ছাড়া অগ্রাহ্য করিতেও লওয়া সম্ভব হইবে না। স্থানাভাব ঘটয়াছে, এ স্থলে অধিক বয়সের ছাত্র লইয়া ছোট ছেলেদের স্থান জুড়িয়া ফেলা আমাদের পক্ষে সকল প্রকারেই ক্ষতিকর। চতুর্থ শ্রেণীতেও বাহিরের ছাত্র লওয়া আমাদের অনভিমত—কারণ তাহাতে আমাদের চতুর্থ শ্রেণীর অনিষ্ট হয়—অত্র বিদ্যালয়ের সঙ্গে আমাদের অধ্যাপনার পার্থক্য থাকাতে বাহিরের ছাত্রকে মাঝখানে লইলে আমাদের কাজ বাড়িয়া যায় ও অত্র ছাত্রদের ক্ষতি ঘটে—এই জন্ত উমাপদ বাবুর দোহিত্রটিকে বিদ্যালয়ে লওয়া সম্বন্ধে অধ্যাপকদের সম্মতি পাওয়া কঠিন হইবে। এই সম্বন্ধে তাঁহারা বারবার অনেক দুঃখ পাইয়াছেন বলিয়া বিশেষ সতর্ক হইয়াছেন—বস্তুত বিনা বেতনে ছাত্র লওয়া তেমন গুরুতর বাধা নহে। ইতি ২১শে অগ্রহায়ণ ১৩২০

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



বাপ্পালী-বিহারী বিরোধ

শ্রীনির্মাল্য দাশগুপ্ত

সাম্প্রতিকতার বিষে দেশ আজ এত জর্জরিত আর একটু হুট ব্যাধি যে ধীরে ধীরে মাথা তুলিতেছে সেদিকে লোকের পরিপূর্ণ দৃষ্টি এখনও পড়ে নাই। দেশের নেতৃবর্গও সাম্প্রতিকতার ঠেলা সামলাইতে ব্যস্ত। তবু এই নতুন ব্যাধি—প্রাদেশিকতা, এখন এমন পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে যে প্রতিকারে সচেষ্ট না হইলে দেশ অচিরেই বিপর্য হইবে। যে অঞ্চল ভারতের স্বপ্ন দেশবাসী দেখিয়া আসিতেছে, সে স্বপ্ন দুলায় লুটাইবে।

— প্রাদেশিকতার মূল কারণ আর্থিক অভাব। বাঙ্গালী চাকুরী লইয়া নানা প্রদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ইহাতে সেই সব প্রদেশের অধিবাসীদের মনে এই বলিয়া ফোড় ও ঈর্ষার উদ্ভেক হইতেছে যে তাহাদের মুখের গ্রাস বাঙ্গালী কাড়িয়া লইল। প্রাদেশিকতা বাঙ্গালীকে লক্ষ্য করিয়া বর্ধিত হইতেছে, যেহেতু সে চাকুরীজীবী। বাঙ্গালী নিজেদের প্রদেশ ছাড়িয়া অল্প প্রদেশের চাকুরীতেও হাত বাড়াইয়াছে। মাড়ওয়ামী, কচ্ছি, বোম্বাইওয়ালারা ইহারা প্রতি বৎসর বিভিন্ন প্রদেশ হইতে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা লইয়া যায় তবু তাহাদের লইয়া বিরোধ নাই; তাহারা যৎ-ব্যবসায়ী। তাহারা ব্যবসা করিয়া টাকা লইতেছে, তেমনি তাহাদের ব্যবসায়ের সেই সেই প্রদেশের লোকেরাও কাজে লাগিতেছে। তাহা ছাড়া ব্যবসা চাকুরীর মত সহজও নয়। সেইজন্য চাকুরীগতপ্রাণ বাঙ্গালীরাই এই বিরোধের কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছে।

যুদ্ধের সময় বহু নতুন নতুন কাজের সৃষ্টি হইয়াছিল, সেই কত প্রাদেশিকতাও চাপা পড়িয়াছিল। যুদ্ধশেষে বেকার-সমস্তা বাড়িয়াছে, সেই সঙ্গে প্রাদেশিকতার তীব্রতাও দেখা দিয়াছে।

ইহার উপর বিহার ও আসামের লোকদের কতকটা 'হীন-ফিরিয়ট কমপ্লেক্স' বা হীনমন্ত্রতা আছে। বাঙ্গালীর বুদ্ধি ও বিজ্ঞাবত্তার জন্য তাহারা তাহাকে ঈর্ষার চক্ষে দেখে। তাহারা মনে করে 'বিহার বিহারীদের জন্য' 'আসাম আসামবাসীর জন্য'—এইরূপ রক্ষা-কবচ না থাকিলে জীবন-যুদ্ধে বাঙ্গালীর নিকট তাহারা হারিয়া যাইবে।

সম্প্রতি কামেশ্বরপুরের ব্যাপার লইয়া তীব্র আলোচনা চলিতেছে এবং নতুন করিয়া আন্দোলন গড়িয়া উঠিতেছে। তবু এ আন্দোলন নতুন নয়। বিহারে বিগত কংগ্রেস মন্ত্রিদের সময়ই প্রাদেশিকতা প্রথম সুস্পষ্টভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। মন্ত্রীরা ক্ষমতা হাতে পাইবার সঙ্গে সঙ্গেই বাঙ্গালীদের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক আচরণ শুরু করেন। চাকুরী, চাকুরীতে পদোন্নতি, কনট্রাক্ট, জল কলেজে বৃত্তি—সর্ববিধেই বাঙ্গালীকে দমন করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করা হয়।

এই দমন-নীতির বিরুদ্ধেই ১৯৩৭ সালে বিহারে বাঙ্গালী সমিতি গঠিত হইয়াছিল। সমিতির উদ্দেশ্য ছিল প্রাদেশিকতা দূর করিয়া জাতীয়তাবাদ প্রচার করা এবং বিহারে প্রাদেশিকতার প্রকোপে পড়িয়া বাঙ্গালীরা যাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেজন্য বাঙ্গালীর সামাজিক, আর্থিক ও শিক্ষা সমস্যার উন্নতির জন্য চেষ্টা করা। সমিতির কাজ বেশী দূর অগ্রসর হয় নাই, যদিও সমিতি এখনও বর্তমান আছে। বহু উচ্চ আদর্শ থাকিলেও ইহার কার্যক্ষেত্র চাকুরী ও ডোমিসাইল সার্টিফিকেট লইয়া আন্দোলনেই সীমাবদ্ধ ছিল। বাঙ্গালীদের নিজেদের যে সমস্ত দোষত্রুটি আছে সে বিষয়েও সমিতির লোকেরা বা সাধারণভাবে বিহার-প্রবাসী বাঙ্গালীরা মোটেই সজ্ঞান ছিলেন না।

স্বীকার না করিয়া উপায় নাই যে বিহারে এই বাঙ্গালী বিদ্বেষের জন্য বাঙ্গালীরাও কতক অংশ দায়ী। বিহারীদের তাহারা কখনও সমচক্ষে দেখে নাই; বরং বরাবরই অবজার চোখে দেখিয়াছে। পূজাপার্বণ, উৎসবাদিতে বাঙ্গালীরা সাধারণতঃ বিহারীদের আমন্ত্রণ জানায় না। বিহারীদের সহিত মেলা-মেশায় তাহাদের বিশেষ আগ্রহ নাই। অবশ্য ইহার ব্যতিক্রমও আছে তবে সাধারণতঃ এইরূপই দেখা যায়। বিহারে অনেক শহরেই 'বাঙ্গালী পাড়া' নামে পল্লী আছে। বাঙ্গালীরা শহরের নানাস্থানে থাকিলেও এই বাঙ্গালী-পাড়াতেই অধিক সংখ্যায় থাকে। ভাষা ও সংস্কৃতিগত মিল যেখানে আছে সেখানেই ঘনিষ্ঠ হইয়া থাকা মানুষের স্বভাব, সুতরাং বাঙ্গালীদের এই একত্ব-বাস-শ্রীতিতে বিন্মিত হইবার কিছু নাই। কিন্তু এই ভাবে এক জায়গায় দলবদ্ধ হইয়া থাকিয়া বাঙ্গালীরা সঙ্গীর্ণ গভীতে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের মেলামেশা, সামাজিকতা বীর সমাজেই নিবদ্ধ রহিয়াছে। বিহারী-সমাজ হইতে তাহারা দূরেই রহিয়া গিয়াছে। বিহারীরা বাঙ্গালীর এই আত্মকেন্দ্রিকতা ভুলিতে পারে নাই। তাহারা ভুলিতে পারে না যে, বাঙ্গালীরা তাহাদের মধ্যে থাকিয়াও দূরে রহিয়াছে। বাঙ্গালী সমিতির দৃষ্টি এই দিকে পড়ে নাই। বিহারে থাকিয়া শুধু বাঙ্গালীদের স্বার্থ দেখিলে বিহারীদের সহানুভূতি ও সমর্থন পাওয়া যাইবে না। 'বাঙ্গালীকে বাঙ্গালী না বাঁচাইলে কে বাঁচাইবে'—এই-নীতি বাংলা দেশে চলিতে পারে; কিন্তু বিহারে থাকিয়া শুধু বাঙ্গালীদের বাঁচাইবার চেষ্টা না করিয়া উত্তর সম্প্রদায়ের স্বার্থই দেখা উচিত। বিহারীদের স্বার্থ দেখিবার জন্য বিহারীরাই আছে সত্য, তবু বাঙ্গালীদেরও এ বিষয়ে সহযোগিতা দেখিলে বিহার বুঝিবে বাঙ্গালী তাহার পর নয়, আপন।

এই যে বাঙ্গালী-বিরোধ কংগ্রেস দলীদের আমলে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল যুদ্ধের সময় ইহা মন্দীভূত হয়। যুদ্ধের মধ্যে বহু নতুন নতুন কাছের সৃষ্টি হইয়া বেকার-সমস্যা কমিয়া গিয়াছিল, সেইজন্য প্রাদেশিকতাও চাপা পড়িয়াছিল। যুদ্ধ-শেষে বেকার সমস্যা এবং সেই সঙ্গে প্রাদেশিকতাও বাড়িয়াছে। ইহাতেই বুঝিতে পারা যায় যে, প্রাদেশিকতার ক্ষত দায়ী আমাদের আর্থিক অবস্থা।

যুদ্ধান্তে বেকার-সমস্যা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই বিহার ভয় পাইতেছে যে, ভবিষ্যতে এই সমস্যা আরও গভীর হইয়া উঠিবে। সেই জন্য কোন চাকুরীই বাঙ্গালী পাইলে সে ভাবে একটি বিহারী যুবকের বিষম ক্ষতি হইল। এই বেকার-সমস্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রাদেশিকতা ক্রমেই তীব্র হইতে তীব্রতর হইতেছে। জামশেদপুরের ঘটনা ত বাঙ্গালীর বিরুদ্ধে বিহারীদের সংগ্রাম চালাইবার উপলক্ষ্য মাত্র। যে বিদ্রোহ বহু দিন ধরিয়া সঞ্চিত হইতেছিল তাহা এই প্রযোগে ব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

জামশেদপুরে বাঙ্গালী সমিতি যে দাবি উত্থাপন করিয়াছিল তাহা অযৌক্তিক নয়। ভাষা ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে প্রদেশ পুনর্গঠন করা কংগ্রেসেরই অভিপ্রায়। সেই নীতি অনুযায়ী বিহারের বাংলাভাষী মানভূম ও সিংভূম অঞ্চল বাংলাদেশে ফিরাইয়া দেওয়া হউক—এই ছিল বাঙ্গালী সমিতির দাবি। বিশেষতঃ এই অঞ্চল পূর্বে বাংলাদেশেরই অন্তর্গত ছিল। ১৯১২ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজ গবর্ণমেন্ট এইগুলিকে বাংলা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া বিহারের অন্তর্ভুক্ত করে। সুতরাং এই সব অঞ্চলে যে সকল বাঙ্গালী আছে তাহারা আপনা হইতেই বিহারবাসী হইয়া পড়িল। তাহারা বাহির হইতে বিহারে আসে নাই। ভৌগোলিক নীমা অনুযায়ীই তাহারা বিহারী। তথাপি ইহাদের ক্ষতও ডোমিনাইল সার্টিকিফিকেট চাই এবং চাকুরী, শিক্ষা ইত্যাদি ব্যাপারেও বিহারীদের সহিত তাহাদের ভারতীয় করা হয়। ইহা তাহাদের পক্ষে অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। একদিকে তাহাদের জোর করিয়া 'বিহারী' করা হইয়াছে, কিন্তু অপরদিকে বিহারীদের প্রাপ্য সুখ-সুবিধা হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত রাখা হইয়াছে।

কিন্তু বাঙ্গালীদের এই দাবি পূর্ণ করা হইলে বিহারের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইবে। সিংভূম, মানভূম বনিজ সম্পদে পরিপূর্ণ। একে ত বিহার রাষ্ট্র-বিষয়ে বাটতি-প্রদেশ। ইহার উপর এই বনিজ সম্পদও যদি তাহার চলিয়া যায় তাহা হইলে বিহারের অস্তিত্ব নামমাত্র হইয়া পড়িবে। এইজন্যই বিহার এই আন্দোলনে ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

বাঙ্গালীদের বিরুদ্ধে বিহারীদের এই সংগ্রাম এখনও চলিতেছে। কাগজে-কলমে কঠোরতার কিছু হ্রাস হইলেও আসলে কিছুই হয় নাই। পূর্বে নিয়ম ছিল ডোমিনাইল সার্টিকিফিকেট পাইতে হইলে বিহারে জমি বা বাড়ি অর্থাৎ স্থাবর সম্পত্তি থাকা চাই। এমন কি ভগিনীর বাংলা দেশে বিবাহ হইয়াছে কি না সে খবরও লওয়া হইত। অথচ ১৯১২ সালে বিহার বাংলা হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার পর যে সব বাঙ্গালীকে বিহারে সরকারী কার্যব্যপদেশে রাখা হইয়াছিল তাহাদের সকলের বাড়ী তৈরি করিবার সঙ্গতি ছিল না। বর্তমান নিয়ম এই যে,

বিহারে জমি বা দশ বৎসর বাস হইলেই ডোমিনাইলড হইবে। কিন্তু ডোমিনাইলড হইলেও বিহারে বাঙ্গালীর চাকরী পাইবার সম্ভাবনা ক্রমেই হ্রাস পাইয়া আসিতেছে।

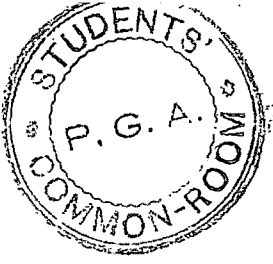
বাঙ্গালীর প্রতি অবিচারের কয়েকটি দৃষ্টান্ত এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতেছে। বিহারে পঁচিশ বৎসর আছেন এমন বাঙ্গালী ডাক্তারের এক ছেলে ডোমিনাইলড সার্টিকিফিকেট পান নাই। অথচ এই ছেলেটির বিহারে জন্ম ও বিহারে বিশ বৎসরের উপর কাটিয়াছে এবং বিহারে তাহাদের বাড়ীও তৈরি হইতেছে।

দ্বিতীয়, এই বৎসরই এক বিহারী মহিলা বিহারে সুযোগের অভাবে কানী হইতে ডোমেটিক সারেন্স (ঘরকন্না বিদ্যা) পাশ করিয়া আসিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে যে বাঙ্গালী মহিলাটি পত চার-পাঁচ বৎসর ধরিয়া পাটনায় মেয়েদের কলেজে উচ্চ বিষয়টি পড়াইতেন তাহার চাকুরী গেল। বিহারী মহিলাটি সেই স্থলে নিযুক্ত হইয়াছেন। উপযুক্ত বিহারী পাওয়া গেলেই তাহার ক্ষত বাঙ্গালীকে স্থান ছাড়িয়া দিতে বাধ্য করা হয়—এইরূপ দৃষ্টান্ত বিহারে বিরল নয়। ছাড়াইবার ওজুহাত একটা দেখানো হয় অবশ্য।

শুধু চাকুরীক্ষেত্রেই নহে, শিক্ষাক্ষেত্রেও যে এইরূপ প্রাদেশিকতা আত্মপ্রকাশ করিতেছে তাহা অত্যন্ত লজ্জাজনক ও শোচনীয়। এ বৎসর বিহারে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার প্রথম দশটি স্থানের মধ্যে আটটিই বাঙ্গালীর অধিকার করিয়াছিল। মাতৃভাষায় ইতিহাস ভূগোল পরীক্ষা হওয়ায় বাঙ্গালী পরীক্ষকেরা বাঙ্গালী ছাত্রদিগকে অধিক মন্বয় দিয়াছেন এই সন্দেহ করিয়া পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকের ফ্রুটনি বোর্ড ইতিহাসের খাতা পরীক্ষকের কাছে পুনরায় পরীক্ষার্থ পাঠাইয়া দেন। এই সকল খাতা পাঠাইবার আগে বাঙ্গালী প্রধান পরীক্ষককে একবার জানানোও আবশ্যক মনে করে নাই—তাঁহার সঙ্গে পরামর্শ করা ত দূরের কথা। এই যে সন্দেহ ও অপমান তাহা শুধু পরীক্ষকের নয়, সমগ্র বাঙ্গালী জাতির।

এই বাঙ্গালী-বিহারী বিরোধের অবসান কিসে? ইতিপূর্বেই দেখা গিয়াছে প্রধান কারণ আর্থিক। দেশের আর্থিক অবস্থা এমন ভাবে ঢালিয়া নতুন করিয়া সাজিতে হইবে যে লোকের অভাব অনটন থাকিবে না। তাহা হইলে এই বিরোধ দূর হইতে পারে। অতাবে স্বভাব নষ্ট হয়। লোকের অনুব্রজের অভাব থাকিলেই তাহারা অজ্ঞের উপর বিরূপ হইয়া উঠে, ভাবে যে অপরেই তাহাদের বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে। যেদিন অন্ন, বস্ত্র ও শিক্ষা সকলেরই নিকট সুলভ হইবে সেদিন প্রদেশে প্রদেশে এত ঘেঘারেঘি থাকিবে না। তবে সেদিন কবে আসিবে কেহ বলিতে পারে না।

বর্তমানে আমরা স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি—যদিও আংশিক। এই সন্ধিক্ষণে পরস্পর কলহ করিলেই সকলেরই সর্বনাশ। রাষ্ট্র ও বস্ত্রের অভাবে সকল প্রদেশই দারুণ দুঃখে দিনাতিপাত করিতেছে। প্রাদেশিকতা ভুলিয়া সকল প্রদেশ একযোগে একপ্রাণ হইয়া না চলিলে অশুভ স্বাধীন ভারতের আশা স্বপ্নই রহিয়া যাইবে।



আজ—আগামী কাল

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

১৩

বাড়িতে পা দিতেই হেমলতা একখানা পাঁজি এনে বললেন, এই মাসে কবে ভাল যাত্রার দিন আছে দেখ তো ? যাত্রার দিন । কেউ বাপের বাড়ি যাবেন বুঝি । মার হাত থেকে পাঁজিখান নিয়ে—মলয় উল্টাতে লাগল ।

হেমলতা বললেন, আমি তীর্থে যাব । আর তুমি আমাকে নিয়ে যাবে ।

ওরে বাপের—এরই মধ্যে আমার তীর্থে যাবার বয়স হয়েছে ।

অতি দুঃখে হেমলতা ঘেসে ফেললেন ।

আমাকে তীর্থে ছুটিয়ে আনা তোমাদের উচিত নয় ? অধর্ম হয়ে পড়লে ধর্ম কর্ম হয় ?

মলয় বললে, মেজদাকে চিঠি লেখ—ওসব কাজ সে ভালই পারবে ।

হেমলতা গম্ভীর হলেন । বললেন, বলতে গেলে এত বড় সংসারটা তারই বাড়ি । সাহেবের আপিসে চাকরী—হুট বলতে কোথায় নিয়ে যাবে স্তনি ।

আমিও এবার সাহেবের আপিসে চাকরী নেব মা ।

মা হাসলেন না—গম্ভীর স্বরে বললেন, তখন তোমাকে কোন কথা বলব না—এখন তো চল ।

রহস্যম্বলে কথাটা উড়িয়ে দেওয়া গেল না । মা তীর্থে যাবেনই । শুধু তীর্থ করার আকাজকা থাকলে নিজেদের অহুবিষাঙ্কলি বড় করে স্নেহাতুর মাকে সে প্রতিনিবৃত্ত করতে পারত, কিন্তু পুণ্যসঞ্চয় এ ক্ষেত্রে উপলক্ষ মাত্র । নষ্ট-দাহুর কাছে সন্তান্দী-ছেলের বার্তা পেয়ে মার মন ছুটেছে সেই দূর-ভ্রম দেশে । যে স্নেহ পুণ্য-সম্বন্ধকে বার বার স্নেহের লেখার মত মুছে দেয় সেই স্নেহই বাইরে যাবার ক্ষমতা টান দিচ্ছে । মা শুনবেন না ।

সুচিন্তা বললে, তবু মা নয় দিদিও কাপড় ছাড়া পোছাচ্ছে ।

মলয় বললে, তাহলে আমার হুটকেসটাও আজ রাতিরে গুছিয়ে দাও ।

তবে যে বললে যাব না ?

না গিয়ে উপায় আছে ? তোমায় তো বলেছি—আলস্যের পিছনে ছোট্ট আমার কর্ম নয় । হাঁ করে ভাবছ কি—তীর্থে যাব না—কলকাতায় পালাব ।

সুচিন্তা বললে, সব কথা হাফা মনে করে উড়িয়ে দাও কেন ।—মার ব্যাঘাটা বোঝ না ।

মলয় বললে,—বুঝি বলছি ওঁকে তীর্থে নিয়ে যাব না ।

আশা তখন সব মাহুষ কি সামলে উঠতে পারে । তখন বিদেশে আমি কি করব বল তো ।

সুচিন্তা বললে, সে কথা আমিও ভেবেছি । উপায় ভেবেছ কিছু ?

তারপর দু'জনে উপায় উদ্ভাবন করতে লেগে গেল । একের উপায় অন্বেষণে যুক্তিতে কেটে যেতে লাগল । কোনটা বুদ্ধিগ্রাহ্য হ'ল না—কোনটা মনে হ'ল ছেলেমানুষি—কোনটা আখ্যাত দেওয়ার মত পরিত্যক্ত হ'ল ।

অবশেষে মলয় বললে, আমার হঠাৎ যদি জ্বর হয় তো ভাল হয় ।

সুচিন্তা হেসে বললে, সেটা তো তোমার হাত নয় ।

নিশ্চয় আমার হাত । মলয় সোংসাহে বিছানায় উঠে বসল । জ্বর না হয়ে এমন কোন অল্পখণ্ড তো হতে পারে যা অন্বেষণে চোখে ধরা পড়ে না অথচ বিছানা ছেড়ে ওঠা নিষেধ । এমন কোন অল্পখণ্ডের নাম কর দিকি ?

সুচিন্তা বললে,—মাকে ঠকানো যেতে পারে কোন অল্পখণ্ডের দোহাই না দিয়েও—কিন্তু সেটা উচিত হবে কি ?

মলয় মাথা নেড়ে বললে, ঠিক বলেছ । একটু পরে বললে, আজকের রাতটাও বড় কম সময় নয়—

সুচিন্তা বললে, তাহলে আজ্ঞা দিচ্ছি—কোজের গল্প বল ।

মলয় বললে, সে তো তুমি কাগজে পড়েছ ।

সুচিন্তা বললে, তবু বল ।

মলয় বললে, কাহুল থেকে রাশিয়া দিয়ে বাগিন গেলেন নেতাজী । সেখানে প্রথমে আজাদ হিন্দ দল গড়লেন—সাড়ে তিন হাজারের বেশী লোক পাওয়া গেল না ।—পাওয়া যাবে কোথেকে । বেনগাজী—এল্-আলমেয়ন মানে লিবিয়া থেকে যুদ্ধ-বন্দী ভারতীয় যে ক'জনকে পাওয়া গেল—তারাই নাম লেখালে দলে । তারপর জাপানী সাবমেরিন করে নেতাজী এলেন সিঙ্গাপুরে । সেখানে জাপানের সঙ্গে সন্ধি করে নতুন করে গড়লেন আজাদী দল । হাজারে হাজারে এল মাহুষ—লক্ষ লক্ষ উঠল টাকা ।

অদ্ভুত জীবন, অদ্ভুত তাঁর কর্মপ্রণালী আর তেমনি বিপুল কর্মক্ষেত্র । ইংরেজের নজরবন্দী থেকে পলায়নকাহিনী কি কম বৈচিত্র্যবহুল । কোথায় কাবুল, কোথায় বাগিন—সিঙ্গাপুর টোকিও—সাইগন—ও রেজুন । তারই আজাদী দল ছন্দো বছরের পরাধীন ভারতের মাটিতে নতুন করে বুনলে স্বাধীনতার বীজ । ইম্ফালের যুদ্ধিকার স্বাধীন বীরের দল নিয়ে এল সমুদ্রের কোয়ার—যার আখ্যাত আজও কেঁপে উঠছে এর

• মাটি—আর আকাশ। যে মানুষ চল্লিশ কোটি মানুষের বৃকে জীবন এনে দেয়—তার মৃত্যু ঘোষণা করবে বিধে এমন হুঃসাহসিক কে আছে।

• গল্প শেষ হ'ল—নিমন্ত্রণ রাত্রির প্রহরগুলি শূন্য পথে চলে যেতে যেতে সূচিয়ার জানালায় ধারে নির্ঝাঁক-বিশ্ময়ে ধানিক উঁকি দিয়ে গেল। সময়ের স্রোতে তারা ভেসেই চলেছে। তারা ভেসে যেতে যেতে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে কোথাও—কোথাও অম্ল্যগলিগু আরক্ত কপোলের মত প্রকুমার—কোথাও বা বিদ্যুৎ-বিদীর্ণ মেঘের গায়ে অগ্নি-তরবারির আবাত করছে। কোন ছদয়ে আনন্দ-উত্তেজনা—কারো কণ্ঠে প্রেরণা—কারো কল্পনায় মত্ত—কারো জ্ঞানের বৃত্তিকায় একটি নতুন শিখা জ্বলে দিতে দিতে চলেছে তারা। বর্তমান বয়ে নিয়ে যাচ্ছে অতীতকে এক অনাগত কালের সমুদ্রসমীপে।

প্রহর ঘোষণা করে শৃগাল ডেকে উঠল—প্রাণের প্রান্তে।

চমকে উঠে সূচিয়া বললে, ঘুমোও।

মলয় দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললে, ঘুম আসছে না।

জর নয়—এক অস্তাবিত ঘটনা মলয়কে তীর্থ যাত্রার দায় থেকে উদ্ধার করলে।

সকাল থেকেই গোছগাছ আরক্ত হয়েছে। বাই বললেই কিছু যাওয়া সম্ভব নয়। সহস্রটা শিকড়ে বনম্পতি আঁকড়ে আছে সংসারের মাটি। তার থেকে শুটুয়ে গুহিয়ে নেওয়া দুই-এক দিনের ব্যাপার নয় তো। তবু হেমলতা অনেক কাজ ভাড়াভাড়া সারলেন। রান্না ষাওয়ার উপদেশগুলি সংক্ষেপে দিলেন—কাঠ বা কয়লা কোন রীতিতে পোড়ালে অপচয় হয় না—ভাড়া তরকারিগুলোয় হিসেব করে ডেল দিবার প্রণালী কি—গরু দুটিকে ক'বার জাবনা আর ক'বার শুকনো বিচালো দিতে হয়—ছেলেদের সর্দি কাসি ইত্যাদির ওপর নজর রেখে—গরম-ঠাণ্ডা জল মিশিয়ে স্নান করানো—গৃহদেবতা নারায়ণের জলপানি কাঁচা তসর বা গরদ পুরে দেওয়ার বিধান—কোনটাই বাদ গেল না—ভাঁড়ার গুছোতে পুরো একটি দিন যাবে। চাল ভাল যুগ কলাই গুড় চিনি বি ময়দা মশলা—এক মাসের মত আলাদা করে—আর ঢেকে ঢেকে না গেলে ধরচ বেশী হবে—ইঁহুরে পোকায় নষ্টও করবে। এসব সেরে ঢেকে রাখা—আম্বাজ মত নেওয়া ঝাড়া—রোদে দেওয়া...সংসারের ক্ষতি ঠেকানো যে সে গৃহস্থিতে পারে না। কথার বলে না :

আট পিঠে দড়—

তো খোড়ার ওপর চড়।

সংসার হচ্ছে তেমনি বস্ত্র—চারদিকে চোখ আর হাঁস রেখে চালাতে হয়। এই সব গোছানোর কাজ পুরো দমে চলছে।

বেলা দশটা আম্বাজ মলয় বাজারের দিক থেকে ফিরছিল

গাঁয়ের এক ছোকরা বললে, মলয়দা আপনার একজন খুঁজছিলেন।

কে ?

মনে হ'ল বিদেশী। কুলির মাথায় মোটা রয়েছে সঙ্গে একজন দ্বীলোকও রয়েছে দেখলাম — বললেন—বিদেশ থেকে আসছি।

কে এল কোথা থেকে ? নিকট বা দূরের বন্ধু অনেকের নাম মনে এল—কিন্তু তাদের কেউ হঠাৎ বোঁজ করে এই গাঁয়েই বা আসবে কেন।

বাড়ি আসতেই সন্দেহ ভঞ্জন হ'ল। মনীশ—তার কলেজ-বন্ধু ; তারপর কর্তৃক্ষেত্রেও ওরা দু'জনে এক সঙ্গে নেমেছিল। যুদ্ধের মধ্যেই ওদের আলাপ-পরিচয় আবার যুদ্ধের মধ্যেই ছাড়াছাড়ি। এই যুদ্ধে ভারত স্বত্ব—ব্রিটিশের নীতি স্পষ্ট রূপ না নেওয়ার কংগ্রেস যোগ দেয় নি। সুতরাং কংগ্রেস-সেবক হয়ে এদেরও যুদ্ধে যোগ দেবার যুক্তি ছিল না। একদিন মনীশ বললে, যুদ্ধ শেষা আমাদের দরকার।

মলয় বললে, কিন্তু কংগ্রেসের নির্দেশ—

মনীশ হেসে বললে, আত্মনিং সত্যতঃ রক্ষণ—এই নীতিই সবচেয়ে বড়। সে যুদ্ধে নাম লিখিয়ে রেছেন চলে গেল।

তারপর প্রাচ্যে সুর হ'ল স্বৈত্জাতির ভাগ্যবিপর্যয়। ভারতীয় সেনাদলও সেই বিপর্যয়ের মুখে পড়ল। কিন্তু তারা ভেসে গেল না। এক শক্তিশালী নেতা তাদের একত্রিত করলেন। এ যুদ্ধের প্রকৃত অর্থ তাঁর কাছ থেকেই তারা জানলে—অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা হয়ে গেল। দিল্লীর লাল কেল্লার বিচারের সমারোহ করে—কারা প্রচার করলে এই গৌরব কাহিনীকে এক গোলার্ধ থেকে আর এক গোলার্ধে।...এ সব কালেরই বিচিত্র রহস্যে বটল। যুদ্ধোত্তর জগতে এশিয়াও জেগে উঠল—বিচিত্র ছলনাজাল বহুশতাব্দী সঞ্চিত জাভ্য তার আর ভাকে মোহগ্রস্ত করতে পারছে না। লাল কেল্লার বিচারপ্রহসন শেষ হ'ল—বন্দীরা অধিকাংশই মুক্তি পেলেন... মনীশও মুক্তি পেয়ে ফিরে এসেছিল কলকাতায়। এসব মার্চ মাসের কথা। তার পর সে চলে যায়—পশ্চিম বঙ্গের কোন একটি জেলা-শহরে। ঝাঁসীর রাণী দলের অহু করণে মেয়েদের সাময়িক শিক্ষা দেবার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন সেখানকার কংগ্রেসকর্মীরা। তাঁদের নির্দেশ সে মেনে নেয়। জাতীয় সৈনিক হওয়ার সুবিধাটুকু এই যে বিদেশীয় কোন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে শ্রমবিনিময় করার প্রবৃত্তি জাগে না। তাদের দিক থেকে এই সব লোক অবাহিত ত বটেই। অথচ জাতীয় সৈনিক বা তার আত্মীয়স্বজনের জীবন রক্ষার দায়িত্ব অধীকার করা যায় না। স্বাধীন জাতি হলে—এদের জীবিকা অর্জনের পথ—সসন্মানে খোলা থাকত—কিন্তু স্বাধীনতার দ্বারদেশে পৌঁছলেও—ভারতবর্ষীয়দের সে অধিকার এখনও বর্জ্য নি।

সেই ফেলা-শহর থেকে হঠাৎ মনীশ কেনই বা এল—
আর সঙ্গে নিয়ে এল একটা মেয়েকে—মলয় বুঝতে পারলে না।

সুচিন্তার ব্যবস্থায়—মেয়েটি অদূর মন্ডলে জায়গা পেয়েছে—
মনীশ ইতিমধ্যেই হাত মুখ ধুয়ে এক কাপ চা নিয়ে বসেছে
বাইরের ঘরে।

প্রথম পরিচয়সম্বন্ধনা সংক্ষেপেই শেষ হ'ল। মনীশ
বললে, আপাতত দুই এক সপ্তাহের ক্ষুদ্র আশ্রয় দিতে হবে।

কেন—এ গাঁয়েও কি স্থানীয় রাণী কোঁজ তৈরী হবে?

দরকার হলে হবে বৈকি। আমার কথাটা শোন তবে।

এখন নয়—নাওয়া-বোওয়া আহ্বারাদি কর—

কিন্তু সব না শুনে তুমিও আমাকে আশ্রয় দিতে পারবে
কি?

দেটা এমন কিছু গুরুতর কাজ নয়। যিনি আশ্রয় দেবার
তিনি ত সব ব্যবস্থা করেছেন।

কিন্তু তিনি জানেন না—

না-ই বা জানলেন—

বাধা দিয়ে মনীশ বললে, যদি কোন গুরুতর অপরাধ করে
এখানে এসে থাকি—

গুরুতর অপরাধ করা তোমার পক্ষে বিচিত্র নয়—যেহেতু
তুমি লালকেদার আটক ছিলে।

রাজনৈতিক অপরাধের কথা বলছি না—সামাজিক—

মলয় শব্দ করে হেসে উঠল।

মনীশ ত্রা কুক্ষিত করে বললে, যদি আমি মেয়েটিকে ইলোপ
করে নিয়ে আসি?

মলয় বললে, ইলোপমেন্ট? মেয়েটি কি সাবালিকা?

আইনকে ভয় করছ ত?

ভয় করছি একটা বিক্রী ব্যাপার না ঘটো। তোমরা
অভিধি—তোমাদের অসম্মান না হয় এটুকু দেখা অন্ততঃ
আমার কর্তব্য।

নিজের সামাজিক অসম্মানকে ভয় কর না?

মলয় জবাব না দিয়ে হাসলে। বললে, এক মিনিট—
আমি আসছি।

নিজের মনে বিচার শুরু হ'ল, মনে হয় না এরা সামাজিক
কোন অপরাধে অপরাধী।

দোস্তলায় উঠবার মুখে যা তাকলেন, যলু—তুনে যা তো।

সে এলে বললেন, সুনলাম ছেলেটি তোমার বন্ধু। বউমার
সঙ্গে মেয়েটি যখন ওপরে যায় মনে হল সে কাঁদছে। ওর
শান্ত্তী কি ওকে খুব যত্ননা দিত?

মলয় বললে, জানি না তো?

মায়ের অহুসধিংলা পরিভৃগু হ'ল না। বললেন,
যাই হোক—ব্যাপারটা ভাল করে জান। একে আমার
কপাল মন্দ—অশান্তির ওপর না অশান্তি জোটে।

মলয় বললে, আচ্ছা মা—বউটি শান্ত্তীর অভ্যাচারে

যদি পালিয়েই আসে—তুমি তাকে জায়গা দেবে না
বাড়িতে?

মা বললে, জায়গা দেব না এমন কথা বলিনি তো—
তবে অশান্তি খিটমিটি এসব আমি ভালবাসি না। আমার
শোকা-তাপা শরীর—এত হাস্যাত্মা পোয়াতে পারব না
বাধা।

আচ্ছা কেনে বলব তোমায়। মলয় যাবার উত্তোপ করতেই
তিনি বললেন, জিজ্ঞেস কর বউটির বাওয়া হয়েছে কিনা।
আমাদের স্বজাতি তো?

মলয় বললে, বন্ধুটিকে জানি ত স্বজাতি কিন্তু মেয়েটি—

মা বললেন, আর জালাসনে বাপু। একটু চুপ করে থেকে
বললেন, তা কথাটা মন্দই বা বলেছি কি। জাত নিয়ে তো
তোদের ভারি মাথা ব্যথা। অজাতের ঘরে নিয়ে যা
হচ্ছে না—এই নিয়েই ত বাপে-ছেলে-মায়ে-বোয়ে এত
খেয়োখেয়ি।

মলয় নীরবে সেধান থেকে উঠে গেল। কয়েক বছর
আপেকার কথা, তার মনে পড়ল। ক্ষুর-স্বার্থের অছিলাতেই
—সাক্ষাত্যভিমান মার মনে কি প্রবল হয়ে ওঠে নি?
সুচিন্তাকে মানিয়ে নিতে এ সংসারে বেশ বড় রকমের টেউ
ওঠেনি কি।

সুচিন্তাকে একান্তে পেয়ে সে শুধোলে, ওদের কথা কিছু
শুনেছ?

সুচিন্তা বললে, এমন কথা কিছু আছে নাকি?

মনীশ বলছিল কিনা যে আমাদের কথা শুনেলে তোমরা
হয়ত—

আশ্রয় দেব না। সুচিন্তা সাধারণভাবে কথাটা শেষ করে
দিলে।

মলয় অবাক চোখে সুচিন্তার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করলে।
খানিকক্ষণ পরে বললে, যদি ওরা সামাজিক কোন অভিযন্ত্র করে
এখানে এসে থাকে—

সে বিচার পরেই করব বা হয়।

না না, যদি—মলয় ইতস্ততঃ করলে।

মলয়কে আশ্বস্ত করে সুচিন্তা বলে উঠল, ইলোপমেন্ট
পর্যন্ত মেনে নেওয়া যেতে পারে—কি বল?

মলয় ওর হাত চেপে ধরলে, সুচিন্তা তুমি তা হলে সব
শুনেছ। আমি ঠাট্টা মনে—

চুপ। ওঠে তর্জনী চেপে দে চোখের ইঙ্গিত করলে।

মেয়েটি ততক্ষণে বারান্দার বেরিয়ে এসেছে। মলয় ও
সুচিন্তাকে একত্রে দেখেও ও ধামলে না—অকুণ্ঠিত পুণ্ডিতে
ওদের সামনে এসে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে এক মুহূর্ত্ত কি ভাবলে।
তার পর মলয়ের পায়ের কাছে হেঁট হতেই ও বিব্রত ভাবে
সরে যাবার চেষ্টা করলে।

মেয়েটি ততক্ষণে ওর পা ছুঁয়ে প্রণাম শেষ করেছে।

হিসাবে প্রায় বিশ কোটি টাকা অতিরিক্ত লাভ হইবে। কাপড়ের সম্বন্ধেও আমরা একই খেলা দেখিব। ১৯৪৩ সালে বাংলা দেশের এক জন কাপড়ের কলওয়ালা বলিয়াছিলেন যে এক ছোড়া কাপড় তাহার চারি টাকা মূল্যে দিতে পারেন। সেই সময় আমাদের সাত আট টাকা দরে সেই কাপড় কিনিতে হইত। এই তিন চার টাকা মুনাফা যাইত কাপড়ের ব্যবসায়ীদের হাতে। আজ যে তাহার ব্যতিক্রম হইবে তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। তাই আমরা ভাবি-তেছি, ভারতের স্বাধীন রাষ্ট্রের কর্ণধারেরা এরূপ শোষণ হইতে দেশের লোককে বাঁচাইতে পারিতেছেন না কেন? শুনিয়াছি ও দেখিতেছি যে সরকারী চাকুরিয়ারা প্রলোভনের ভাঙনায় কালোবাজার চালাইবার যত্নরূপে ব্যবহৃত হইতেছে। এই নৈতিক অবনতি রোধ করিতে পারা যাইতেছে না, এবং এই অশান্ততা সামাজিক রীতিনীতির অপরিহার্য অঙ্গরূপে স্বীকার করিয়া লইবার প্রয়োজন দেশের লোকের মনে দেখা দিয়াছে। এই দুর্বলতার কারণ কি? যাহারা ইংরেজের অত্যাচারের বিরুদ্ধে এত বৎসর ধরিয়া সংগ্রাম করিয়া দেশে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করিল, তাহারা অন্যায়ের প্রতিরোধ করিতে পারিতেছেন না কেন?

ভারত-ইতিহাসের প্রেরণা

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার দেশকে “মহাযানবের সাগর তীর” বলিয়া অভিনন্দিত করিয়াছেন। এই দেশে নানা জাতি, নানা লোক মিলিত হইয়াছে; এই দেশের চিন্তানায়কগণ বলিয়াছেন যে এই বৈচিত্র্যের মধ্যে একোয় প্রতিষ্ঠা করাই ভারত-ইতিহাসে প্রেরণা দিয়াছে। আজ দ্বি-বর্ষিত ভারতে এই কথা বলিয়া দাঁড়াইবার লোক খুব কম। ভারত-বর্ষের লোকসমষ্টির এক বৃহৎ অংশ, প্রায় দশ কোটি লোক, বিশ্বাস করে যে তারা একটা পৃথক “নেশন”, এবং এই নেশনের জ্ঞান চাই পৃথক একটা রাষ্ট্র। এই আন্দোলন পরিণতি লাভ করে ১৯৪৭ সালের ৩রা জুন তারিখে, যখন ব্রিটিশের অলক্ষ্য চাপে পড়িয়া কংগ্রেস মুসলীম লীগের দাবী মানিয়া লয়। ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হইয়া পড়ে। এই বিভাগে আলীগড় মুসলিম বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ছিল উৎকর্ষ উৎসাহী। লোকের ধারণা ছিল যে, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকবৃন্দ প্রায় সকলেই বোর পাকিস্তানী। কিন্তু এখন দেখিতেছি যে এই ধারণা ভুল। এবং এই ভুল ভাঙ্গিয়াছেন আলীগড় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক মোহাম্মদ হবিব। ইতিহাস কংগ্রেসের বিগত অধিবেশন বোম্বাই-মসরীতে অহুত হইত এবং অধ্যাপক হবিব তার সভাপতিপদে বৃত্ত হন। এই উপলক্ষে তাঁহার অভিভাষনে তিনি ভারতবর্ষের এই একোয় কথা আমাদের মনে করাইয়া বলেন যে, ভাবের রাজ্যে এই একোয় অহুত ও জ্ঞান আমাদের জীবনের প্রতি স্তরে ব্যাপ্ত হইয়াছে, রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় তাহা বারে বারে স্বীকৃত হইয়াছে

এবং ভারত-ইতিহাসে বর্ষকে রাষ্ট্রের নিয়ামক হইতে কখনও দেখা যায় নাই; মুসলমানধর্মী পাঠান মুঘল যখন দিল্লীর রাজত্বকে বসিতেন তখনও নয়। এক ধর্মাবলম্বী বলিয়া ভারতবর্ষজাত মুসলীমগণ রাষ্ট্রে কোন বিশেষ ক্ষমতা বা অধিকার পাইতেন না। পাঠান মুঘল এই দেশের মুসলীম-গণকে তাহা হইলে এরূপভাবে হেনস্তা করিতেন না। এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করিবার জন্ত অধ্যাপক হবিব ভারত-ইতিহাসের বহু প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতার এই অংশ তাঁহার নিজের ভাষায় উদ্ধৃত করিয়া দিলাম,—

The Unity of India has been one of the fundamental postulates of Indian moral consciousness, and the longing for a centralized administration has been one of the most visible and persistent demands of the political spirit of Indians throughout the ages. The breaking up of India under two separate States or law-making organizations with exclusive citizenship which creates a spirit of hostility not only between the Governments but also between the people, and the monstrosity of the establishment of states on purely religious and communal basis have never been known to the history of our land.

“নঈ তালিম”—নূতন শিক্ষা

“নঈ তালিম” এই কথাটা কংগ্রেস মন্ত্রিবর্গের অনেকের মুখে শোনা যায়। স্বাধীন দেশ নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে গেলে নূতন মানুষ সৃষ্টি করিতে হইবে; এই কার্যে নূতন শিক্ষার প্রয়োজন। আট দশ বৎসর হইতে এই নূতন শিক্ষার একটা কাঠামো প্রস্তুত করিবার চেষ্টা চলিতেছে। গান্ধীজী তার প্রবর্তক। ১৯৩৭ সালে যখন সাত আটটি প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডল প্রতিষ্ঠিত হয় তখন কয়েকটি স্থল স্থাপিত হয় এই শিক্ষা পদ্ধতি পরীক্ষা করিবার জন্ত। “Basic Education” এই দুইটি ইংরেজী শব্দের বাংলা করিয়া “বনিয়াদি শিক্ষার” সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়। পরিচয়-বর্নিত হইতে পারে নাই। কারণ ১৯৩৯ সালের অক্টোবর মাসে কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলী পদ-ত্যাগ করেন এবং “বনিয়াদি শিক্ষার” পরীক্ষাগারগুলিও একে একে সংকুচিত হয়। আজ কংগ্রেস নেতৃত্বে দেশ সংগঠিত হইতেছে। “বনিয়াদি শিক্ষা” নবরূপ ধারণ করিতেছে “নঈ তালিম”রূপে। এই শিক্ষার ভাব ও রূপ সম্বন্ধে গান্ধীজীর কথাই প্রামাণ্য। দিল্লীর এক ভাষণ হইতে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি,—

নঈ তালিমের বয়স মাত্র ৮ বৎসর; একটু নিখিল ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের পক্ষে নূতন ভিত্তিতে একটা জাতির শিক্ষাব্যাপার সম্পর্কে এই অভিজ্ঞতা দীর্ঘ নয়। নঈ তালিমকে হাতের কাজের ভিত্তির দিয়া শিক্ষা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এই বর্ণনা ঠিক, আর লোকে ইহা বুঝিবে। তবে ইহা এই সম্পর্কে সত্যের একটা দিক মাত্র। এই নবশিক্ষার মূল গিয়াছে আরও গভীরে, মানুষের সর্ববিধ

কার্যে সত্য ও প্রেমের প্রয়োগের মধ্যে—সে কার্য ব্যক্তি-গত বা সমষ্টিগত যে জীবনেরই হউক না কেন। জীবনের সকল কার্যে সত্য ও প্রেম অনুপ্রবেশিত হইয়া আছে, এই ধ্যান হইতেই হস্ত-শিল্পের মধ্য দিয়া শিক্ষার দারপার উদ্ভব হইয়াছে। প্রেম চার শিক্ষা সকলেরই সহজলভ্য হউক আর প্রেমের প্রত্যেক লোকের প্রতিদিনের জীবনে তাহা কাজে লাগুক। এই শিক্ষা পুঁথি হইতে আসে না এবং পুঁথির উপর নির্ভর করে না। সাম্প্রদায়িক ধর্মের সহিতও ইহার কোন সম্পর্ক নাই। এই শিক্ষাকে যদি স্বাধীনগত বলা যায়, তবে সে ধর্ম সার্বজনীন—যে ধর্মসমূহ তাহা হইতেই আসিয়াছে। অতএব জীবন-পুঁথি হইতেই এই শিক্ষা গ্রহণ করা হইবে। ইহাতে অর্থব্যয় হইবে না, পুঁথিবীতে কেহই জোর করিয়া কাহারও নিকট হইতে এই শিক্ষা কাড়িয়া লইতে পারিবে না।

এই নई তালিমের গভীর মূল তত্ত্ব সাধারণে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন কিনা জানি না। অনেকে না বুঝিয়াই কেবল গান্ধীজীর সুপারিশ শিরোধার্য্য করিতে প্রস্তুত, অতেরা এ বিষয়ে খোঁজই করেন নাই। এই নই তালিমকে কার্য্যকরী করার জন্য প্রসিদ্ধ ব্রিটিশ শিক্ষাবিদ প্রায় আট বৎসর যাবৎ অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় সরকার এ পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপ দানের জন্য প্রায় এক বৎসর পূর্বে তাহাকে পুনরায় আনয়ন করেন। সম্মতি মৌলানা আজাদের নিকট কোনও উৎসাহ না পাওয়ায় এবং নানারূপে অবহেলা অপমানের ইঙ্গিত মনে করায় তিনি পদ-ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন।

মৌলানা আজাদের এই মতান্তরের প্রভাব শেষে প্রদেশে প্রদেশে এই শিক্ষা প্রবর্তনের উপর পড়িবে না কি? পশ্চিম বঙ্গে “বনিয়াদি শিক্ষা”—প্রেমিক কয়েকজন বলরামপুর “বনিয়াদি শিক্ষা” কেন্দ্রে মিলিত হইয়াছিলেন বলিয়া সংবাদপত্রে একটি বিবরণ দেখিলাম। তদুপলক্ষে পশ্চিম বঙ্গের তখনকার প্রধান-মন্ত্রী শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র বোস নাকি বলিয়াছিলেন যে তিনি “সার্কেটে পরিকল্পনা বুঝেন না; গান্ধীজীর পরিকল্পনা বুঝিতে পারেন।” এই কথাই মধ্য এই-ছই পরিকল্পনার ভিতরে বিরোধ বা পার্থক্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। দেশের লোকে তাহাতে বিভ্রান্ত হইতে পারে। এই বিষয়ে কলিকাতার কোন ইংরেজী দৈনিক পত্রিকায় “বনিয়াদি শিক্ষা” একটি বিরাট পরিকল্পনা দিনের পর দিন প্রকাশিত হইতেছে। বলরামপুর সভায় স্থির হইয়াছে বিপ দাঁড়ার লোককে “বনিয়াদি শিক্ষা”—দানের জন্য ঐশ্বর্য্য করিয়া লইতে হইবে। ইহারা হইবেন “নই তালিমের” শিক্ষক। ছই দাঁড়ার “বনিয়াদি” মূল ধুলিতে হইবে। এই সব বিরাট পরিকল্পনার কথা শুনিতে ভাল লাগে। কিন্তু আমরা এ কথাও ভুলিতে পারি না যে বর্তমানে পশ্চিম বাংলার পল্লীগ্রামের বিজালয়ে প্রায় এক

লক্ষ লোক শিক্ষাদান কার্যে বৃত্ত আছেন। একটা শিক্ষার ব্যবস্থা মানিয়া তাহারা কাজ করিয়া যাইতেছেন। “বনিয়াদি শিক্ষা”র যুগে তাহাদের অভিজ্ঞতার স্থান কোথায়, তাহাদের বিভাগগুলির স্থান কোথায়—এই ছইট প্রশ্ন উঠিয়াছে। শিক্ষামন্ত্রীর নিকট এই সম্বন্ধে সজ্ঞতর তাহারা পাইয়াছেন কি না জানি না। প্রাথমিক শিক্ষার উপরেও একটা শিক্ষার ব্যবস্থা চলিতেছে। এই শিক্ষার সঙ্গে “বনিয়াদি শিক্ষা” কি করিয়া খাপ খাওয়াইয়া লওয়া হইবে বা এই শিক্ষাকে কি করিয়া “বনিয়াদি শিক্ষা”র সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া লওয়া যাইবে তৎসম্বন্ধেও প্রশ্ন জাগিয়াছে। শিক্ষাবিদগণ অনেকেই নীরব হইয়া আছেন দেখিতেছি। হয়ত বা তাহাদের মূল মূল সম্মিতিকে সত্য তৎসম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছে। কিন্তু এই বিরাট পরিবর্তন সম্বন্ধে কোন উৎসাহের পরিচয় দেশের লোকের মনে দেখিতে পাইতেছি না। লালদীঘীর পাড়ের অটালিকার কোন কোন ঘরে এই বিষয় লইয়া কর্ণব্যস্ততা দেখা যায়। শিক্ষা ক্ষণতে একটা বিপ্লব দেখা দিয়াছে, তৎসম্বন্ধে লোকের বুদ্ধি সজাগ নয়। এই দুর্গতি কেন দেখা দিল, এই নিশ্চেষ্টতা কেন আমাদের দেশের লোকের মনকে বিকল করিল, তৎসম্বন্ধে নানা মূন্নির নানা মত আছে। এটা কিন্তু সুলক্ষণ নয়। মন্ত্রিমণ্ডলী বা সরকারী চাকুরিয়ার উপর শিক্ষা সম্বন্ধে সব চিন্তা ভাবনার ভার দিয়া দেশের লোক যদি নিশ্চিন্ত হইতে চাচ্ছেন তবে নিজের পায়ে নিজে কুঠার মাঝা হইবে।

বৃহৎ উৎকল

প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে মধুসূদন দাশ সমস্ত উড়িষ্যা ভাষা-ভাষীকে এক শাসনাধীনে একত্র করিয়া একটি বৃহৎ উৎকল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিবার কল্পনা লইয়া উৎকল ইউনিয়ন কন্ফারেন্স নামে একটি সভা গড়িয়া তুলেন। মধুরভঞ্জের মহারাজা, বর্তমান মহারাজের পিতা শ্রীরামচন্দ্র ভট্টদেও এই পরিকল্পনার উৎসাহী ছিলেন। ১৯৩৫ সালের ভারত আইন অনুসারে উৎকল পৃথক প্রদেশের মর্যাদা লাভ করে, ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে জয় লাভ করিয়া কংগ্রেস পার্টি মন্ত্রিপদ গ্রহণ করে। উৎকল ইউনিয়ন কন্ফারেন্সের আশা তাহাতে কথঞ্চিৎ সার্থক হয়। ১৯৪৮ সালের ১লা জানুয়ারী মাসে ইহা পূর্ণতা লাভ করিয়াছে; ২৫টি উড়িষ্যা ভাষাভাষী অধ্যুষিত দেশীয় রাজ্য উৎকল প্রদেশের সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া এক বৃহৎ উৎকলের সৃষ্টি হইয়াছে। কেবল মাত্র মধুরভঞ্জ রাজ্য দূরে সরিয়া আছে এবং সেরাইকলা ও খারশোয়ান রাজ্য লইয়া বিবাদ লাগিয়াছে উৎকল ও বিহার গবর্নমেন্টের মধ্যে। এই বিবাদ মীমাংসার জন্য কেন্দ্রীয় গবর্নমেন্ট একটি কমিশন বসাইয়াছেন। তাহারা অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন এই-ছই রাজ্যে উড়িষ্যা না বিহারীর জনসংখ্যা বেশী। অবস্থা দেখিয়া মনে হয় যে পশ্চিম বঙ্গের নির্জীব গবর্নমেন্ট এই বিবাদে “ট্যাঙিয়ে থাকি তক্ষাতে” এই নীতি—বা নীতির

দেবীর বোধন ও বিসর্জন

শ্রীরাজমোহন নাথ, বি-ই, তত্ত্বভূষণ

পরম শ্রদ্ধাশ্রদ্ধ শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় হুর্গাপূজা সম্পর্কে গবেষণামূলক ছয়টি প্রবন্ধ ধারাবাহিক ভাবে ১০৫৩ সালের প্রবাসী কার্তিক-চৈত্র—ছয় সংখ্যাতে লিখিয়াছেন। প্রবন্ধ লিখিবার সময় প্রাচীন কামরূপের পুরাতত্ত্ব সম্পর্কে কোন বিষয়ে অল্পপ্রবন্ধক আমার দৃষ্টি পড়ায়োঁগে আলোচনা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রবন্ধে এই সামান্য বিষয়টির উল্লেখ করিয়া তিনি আমার প্রতি তাঁহার স্নেহের নিদর্শন প্রকাশ করিয়াছেন।

প্রবীণ তত্ত্বাত্মসন্ধিস্থ বিদ্যানিধি মহাশয়ের তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ-গুলিতে হুর্গাপূজার উৎপত্তি সম্পর্কে নানাদিক হইতে আলোচনা করা হইয়াছে, তন্মধ্যে জ্যোতিষিক আলোচনাই অধিক। কিন্তু দেবীর বোধন সম্পর্কে তিনি লিখিয়াছেন—“আমি নব পঞ্জিকার উৎপত্তি ও প্রয়োজন বিন্দুমাত্র বুঝিতে পারি নাই। নব পঞ্জিকা, নবহুর্গা, ইহার দ্বারা কিছুই বুঝিলাম না।” (ফাল্গুন)।

তিনি আরও লিখিয়াছেন—“নাম নবপঞ্জিকা, কিন্তু নবটি বুকের পত্র না হইয়া নবটি বৃক্ষ কিংবা নবটি বুকের শাখা রজ্জ্বর দ্বারা বাঁধিয়া স্থাপিত হয়। সে নবটি বৃক্ষ এই—রস্তা, কচু, ধরিয়া, জয়ন্তী, বিলু, দাড়িম, অশোক, মান ও বাঙ।” (কার্তিক)। * * * “বোধনের নিমিত্ত এক পুণ্ড্র বস্ত্রগৃহ নির্মিত করা হয়। এক বেদীর চারি কোণে শর পুঁতিয়া কয়েকবার অন্ন বেঠেন পূর্বক বস্ত্রগৃহ নির্মাণ করা হয়। সেই বস্ত্রগৃহে যুগ্ম ফলবিশিষ্ট বিলুশাখা স্থাপিত হয়। বেদীতে অলঙ্কৃত, স্নান ও ছুরি রাখা হয়। ভাবিয়া দেখিলে এই বস্ত্র-গৃহ স্ত্রীতিকা গৃহ, যুগ্ম ফলের একটি মাতার কুক্ষি, অপরটি জগৎ। নাড়ীজ্ঞেদের নিমিত্ত ছুরি। নাড়ীবন্ধনের নিমিত্ত স্নান। অলঙ্কৃত মোণিতের দ্যোতক। ইতিপূর্বে প্রতিপদ হইতে পঞ্চমী পর্যন্ত ষট্‌শ দেবীর নিমিত্তে কেশ-সংস্কার দ্রব্য, অলঙ্কার, দ্রব্য, অলঙ্কার ও মধুপূর্ব প্রদত্ত হইয়াছে। গর্ভ সন্তাননা না করিলে এই সবের প্রয়োজন থাকে না। অতএব বিলুশাখা ও ফলে দেবীর বোধন অর্থে বুঝিতে হইতেছে বিলুশাখায় হুর্গারূপ অগ্নির আবির্ভাব। বিলুফল দেবীর প্রতিরূপক। * * * সাধারণকালে বোধন অকাল বোধন। সাধারণকাল কেন? কারণ রাজি সন্তান প্রসবের কাল।” (ফাল্গুন)

দেবী বিসর্জনের সম্পর্কে তিনি লিখিয়াছেন—“নদীর স্রোতে প্রতিমা বিসর্জনের পর শবরোৎসব, জল ও কর্দ্দম ক্রীড়া। সে সময় অশ্রাব্য, অকণ্ঠ্য ভাষায় গান হইত। ইহা হুর্গোৎসবের অঙ্গ, কালিকাপুরাণ ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাহাতে কেহ রুগ্ন হইত না। * * * আমার মনে হয় লোকের বিশ্বাস ছিল,

নব বর্ষের প্রথম দিন অল্লীল ভাষা শুনিলে দেহ তৃষ্ণা হয়, যম রাজা সে বৎসর স্পর্শ করেন না।” (ফাল্গুন)

হুর্গাপূজার আত্মবুদ্ধিক—বিশেষতঃ কামরূপে সমধিক প্রচলিত—হুমারী পূজা সম্পর্কে—বিদ্যানিধি মহাশয় প্রশ্ন করিয়াছেন—“হুমারী পূজার হেতু কি?”

শ্রদ্ধাশ্রদ্ধ বিদ্যানিধি মহাশয় কর্তৃক উপস্থাপিত প্রশ্নের যথা-সাধ্য মীমাংসা করিতে হইলে প্রথমে প্রাচীন কামরূপের আদি অধিবাসী সম্পর্কে যৎকিঞ্চিৎ বিস্তৃত আলোচনা করা প্রয়োজন।

অতি প্রাচীনকালে আত্মমানিক খ্রীঃ পূঃ ২৭৫০ অব্দে বর্তমান চীনদেশের মধ্য অঞ্চল হইতে এক জাতীয় লোক মল-বদ্ধ হইয়া চীনদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল হইতে সমুচিত এক নদীপথ ধরিয়া বর্তমান আলামের পূর্বপ্রান্ত দিয়া কামরূপ দেশে প্রবেশ করে। চীনদেশস্থিত আবাসভূমিকে উহারা চাও-থিউস্ (Chao-Thieus) বা চোহ্-থিস্ অর্থাৎ দেবতার দেশ বা স্বর্গভূমি বলিত। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে ঐক্‌ নাবিক কর্তৃক লিখিত পেরিপ্লাস গ্রন্থে ঐ দেশকে থিস্ দেশ (Land of This) বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। পেরিপ্লাসের টীকাকার শ্রবণ নাহেবওঁ থিস্ দেশ চীনদেশে অবস্থিত ছিল বলিয়াই স্থির করিয়াছেন। উত্তর ব্রহ্মদেশের লোকেরা এখনও চীনদেশকে থিস্ (স উহ) বা স্বর্গ বলে।

যে নদীপথ ধরিয়া ঐ লোকগুলি আসিয়াছিল, উহা কাম-রূপে প্রবেশ করিয়া অত্যন্ত জল-স্রোতের সংযোগে বৃহদাকার ধারণ করায়, উহারা ইহাকে লাও-তু (বৃহদাকার জলরাশি) নাম দিয়াছিল। এই লাও-তুই পরবর্তীকালে দুইত, লোহিত বা লোহিত্য নামে পরিচিত হইয়াছে। চোহ্-থিস্ পরবর্তীকালে জোহ-থিস্ রূপে উচ্চারিত হয় এবং ঐ দেশাগত লোকেরাও অভ্যন্তরবাসীর নিকট জোহথিস্ জাতিরূপেই পরিচিত ছিল। এই জোহ-থিস্ শব্দ পরবর্তীকালে সংস্কৃত জ্যোতিষ রূপ ধারণ করিয়াছে। আধুনিক বৃত্ততত্ত্ববিদগণ এই জাতীয় লোককে অষ্ট্রিক (অষ্ট্রো-এসিয়াটিক) নাম দিয়াছেন।

জোহ-থিস্‌রা কামরূপে অনেক শতাব্দীকাল পর্যন্ত প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া বসবাস করিয়াছিল, এবং পরে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মধ্যভারত ও আফগানিস্তান পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে। যুক্তপ্রদেশে মধ্য জ্যোতিষ ও আফগানিস্তানে উত্তর জ্যোতিষ দেশ এইভাবে সৃষ্ট হইয়াছিল। চাও, গৌহ বা জোহ শব্দের অর্থ পরবর্তীকালে উচ্চভূমি অর্থে ব্যবহৃত হইত। ঐ জাতীয় লোকেরা পার্বত্যভূমি বুঁড়িয়া গর্ভ করিয়া উহাতে হলুদ, কচু, ধান ইত্যাদির বীজ বপন করিয়া শস্য উৎপাদন করিত। ঐরূপ কৃষিকে জোহ-মো (উচ্চভূমি কর্ষণ) বা জুম

ভোর বেলা মন্দাকিনী হেমলতার দরজায় ধাক্কা দিয়ে
ডাকলে, মা—মা—সুনছেন?

হেমলতা জেগেই ছিলেন। খুব ভোরবেলাতেই তাঁর ঘুম
ভেঙে গেলেও বিছানা ছেড়ে তিনি ওঠেন না। ঘরের বাইরে
থেকে তাঁর কণ্ঠস্বর শোনা যায়—অনুচ্চ সুরময় উচ্চারণে ঠাকুর-
দেবতার স্তব পাঠ করেন—পঞ্চকঙ্কাকে স্মরণ করে মহাপাতক
ক্ষয় করেন—আর যে দিন আসছে তাকে স্বাগত জানিয়ে
তেজিশ কোটর কাছে সংসারের কল্যাণ কামনা করেন।
আজও জেগেছিলেন—তবে মন ভাল ছিল না বলে বিছানায়
বসে ফিস ফিস করে ঠাকুরদেবতাকে স্মরণ করছিলেন।

কে—মেজবউমা—?

হাঁ মা—একবার শুভুন ত।

ওর কণ্ঠস্বরে ভয়ের আভাস পেয়ে মন্দাকিনী ধড়মড় করে
উঠে ছুরের খুলে বারান্দায় বেরলেন।

কি মেজবউমা—ভয় পেয়েছ নাকি?

না মা—ছোট বউ আর ঠাকুরপোকে কোথাও দেখতে
পাচ্ছি না।

সে কি কথা—ওদের ঘরে ঘুচ্ছে না ওরা?

ঘরের ছয়দার ধোলা খাঁ খাঁ করছে।

বাইরের দরজাটা দেখেছ কি?

না মা, একলা যেতে ভয়-ভয় করছে বলে আপনাকে ডাক-
ছিলাম।

আচ্ছা চল দেখে আসি।

হারিকেনের দম বাড়িয়ে হেমলতা সদর দরজা পরীক্ষা
করতে চললেন।

সদর দরজায়, টানা খিলট ছাড়া আর একটি ছোট
ঘুরনো খিল আছে—যেটা বাইরে থেকেও দেওয়া যায়।
সেইটাই দেওয়া রয়েছে।

হেমলতা ফিরে এসে বসলেন, কাল সন্ধ্যাবেলায় সদরের
খিলটা বৃষ্টি দেখ নি কেউ?

ওমা—সে কি কথা। অন্ধকারে ঠাকুরপো যখন আসে
তখন ত আমি জেগে। খিল দেওয়ার শব্দ স্পষ্ট শুনেছি।

ভাল করে উট্টকে দেখ ত বাইরের ঘর, ছাদ, বড়বোয়ের
ঘর—

ওপর নীচে আলো হাতে করে হেমলতা নিজেই বোঁজা-
বুঁজি সুর করলেন। এক-একটি জায়গা বালি দেবেন আর
তাঁর বুক ঠেলে ঠেলে কান্না আসে। শেষে তিনি চীৎকার
করে ডাকলেন, মলয়—মলয়, ছোটবউমা—ওরে মলু রে—

পুষ দিক করসা হতে সুর হয়েছে, আমগাছে বসে
দোয়েল প্রভাতী শিশু দিয়ে প্রভাতকে স্বাগত জানাচ্ছে।

মলয়ের ঘরের মেঝের ওপর বসে পড়ে পরিশ্রান্ত হেমলতা
আর্জকণ্ঠে কঁদে উঠলেন, ওরা চলে গেছে—মেজবউমা—ওরা
আর আসবে না।

বাউলের সাজ

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

বাউল আমি, আমিই রাজা—

আমিই যুবরাজ রে,

আঙরাধা মোর সর্বের পোষাক

অভিষেকের সাজ রে।

ওইট পায়েরে, নুপুর পায়েরে,

গান গেয়েছি বাদল বায়ে,

আমার সাধের 'গাব গুবাব'

লগ্নে নাহি আজ রে।

নাচের ছিল শুধী কত,

ময়ূর ছিল চিত্ত,

মন যে তখন দেহের সাধে

করতো লদাই নৃত্য।

হাজির তালির আঙরাধাতে,

লাগতো হাওয়া লক্ষ্য প্রাতে,

গুণ গুণানির উন ঘুনানি—

আর ছিল না কাজ রে।

চংটি নুতন, রংটি ছিল,

গৈরিক এবং বৈরা,

যেন যুগের জম্বাট প্লক

উল্লাসে সে তৈরী।

সে কি অগাধ ক্ষুধা তাহার,

যেমন হুঁত তেমনি বাহার,

অদে তাহার শান্তিপূরের

সাতটা রাসের ঝাঁক রে।

যাবার সময় বলতে আমার

নাই কো মোটেই লজ্জা।

জীর্ণ আমি, ওইট আমার

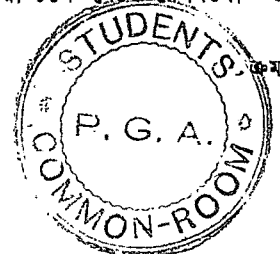
আঙ্গল আমার সজ্জা।

ওভেই আমি জড়িয়ে আছি,

ইচ্ছা যে স্বয়ং আবার নাচি,

মনের বাউল লুকিয়ে আছি

আজ ও উহার মাঝ রে।



সঙ্গে থাকলেও—এবার যেসবনেস্ত একটা করবেনই এঁরা।
এ, ভি, আলেকজান্ডার জাঁদরেল লোক—তার সঙ্গে আজেন
ভারত সচিব প্যাথিক লরেল। প্যাথিক লরেলকে দেখলেই
মনে হয়—লোকটা এ দেশেরই একজন—হাসিমুখ—গায়ের
রংটাও উগ্র রকমের শাদা নয়, হতে পারে ওটা কটোগ্রাফির
খুঁৎ—কিন্তু তাঁর মুখের হাসিটি যে নির্ভুৎ। ওটি যেন
সমবেদনা-জাতীয় হাসি। যাই হোক—ভারতবর্ষ যে পরি-
বর্তনের মুখে এ বিষয়ে সংশয় নেই।

মলয় ভাবছিল, আজ বাড়ি ফেরা অসম্ভব। মায়ের
রোষ কোন্ পথ ধরবে সে জানে না—তবু সে না থাকলে তা
হয়ত তেমন উগ্র না-ও হতে পারে। নন্দ-দাহুর ওখানেই
রাতটা কাটিয়ে দেয়া যাক না।

বটতলায় খুব ঠেঁচ ঠেঁচ হচ্ছে। কোন সভা বসেছে—না
সভার প্রভৃতি? অর হিল্ল—বন্দেমাতরম্ ধ্বনি শোনা গেল—
সেই সঙ্গে বাছা বাছা শ্লোগান।

হঠাৎ কি হ'ল যে ওরা এমন করে আনন্দ প্রকাশ করছে?
কাছে আসতে-না-আসতেই একটা ছেলে লাফিয়ে দল
থেকে বেরিয়ে এল, মাদ্রিস্ কেঁদে। মলয়দা—কংগ্রেস
লং-টার্ম অ্যাকশন করছে। এই মাত্র টেলিগ্রাম এল।

মলয় ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল। তারপর চলল কল্লনা-
কল্লনা ভর্তি উল্লাস। ভিড়ের মধ্যে থেকে যখন বেরিয়ে এল
সে—তখন ভারতের ভাগ্যবিপর্যয়ের চিন্তায় বাড়ির অস্তিত্তি
নিঃশেষে মুছে গেছে।

সভার পর সে বাড়িতেই ফিরে এল।

নিমন্তক বাড়ি—নিম্প্রদীপ। কংগ্রেসের মন্ত্রী-মিশন-প্রস্তাব
যেনে নেওয়ার পর ভারতের স্বয়ং অংশ যেমন বস্তুর বিধাস
ফেলেছে তেমনি মনে হ'ল বাড়িটাকে। মনীশরা গেল
কোথায়? সবাই ঘুমিয়েছে কি?

সুচিয়ার বরেন্দ্র আলো নেই—বরেন্দ্র মাহুষ নেই—এমনি
নিমন্তকতা।

অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে ও বরের মাঝখান পর্যন্ত এসে
ডাকলে, ঘুমুলে কি? চিহ্ন—

শাড়ির ধসু ধসু শব্দ হ'ল—কে যেন বিছানার ওপর উঠে
বসল। দেশলাই খোলার শব্দ—কাঠি ঘষার শব্দ—ক্যাস
করে আলো জ্বলে উঠল। শিররের কাছে একটা টুলের
ওপর মোমবাতি ছিল—দেটা জ্বলে দিয়ে সুচিয়া বিছানা
থেকে মেঝের এসে দাঁড়াল।

অদ্বুত আলো—এই মোমবাতির। কোমল আধ-আলো
আধ-ছায়ায় রহস্যময়। সুচিয়ার ঘুম-ভাঙা চোখে সে আলো
পড়ে ওকে গভীর আর বিষন্ন বোধ হচ্ছে। মুখখানাও ওর
হুলো হুলো—অকাল নিদ্রাভঙ্গনিত কিনা কে জানে।

মনীশ কোথায়?

সুচিয়া অদ্বুত চোখে মলয়ের পাতন চাইল। মনীশ

কোথায় সে কথাটা তার চেয়ে মলয়ই ভাল জানে না? কার
পরিচয়ে মনীশ এ বাড়িতে এসেছিলেন?

ও—চলে গেছে বুঝি?

অনেকক্ষণ—ভূমি বাবার সঙ্গে সঙ্গেই।

মোমবাতিটি কখনও স্নান—কখনও উজ্জ্বল হয়ে উঠছে।

আর কিছু ভিজ্ঞান করবার নেই সুচিয়াকে। আলোর
স্নান শিথায় কাঁপছে অদম্য। গভীর অস্বস্তিতে স্তব্ধ হয়ে
আছে জানালার বাইরে আকাশ—পৃথিবী তমোবসনারত।

ওকি সুচিয়ার চোখের কোল চক্চক করছে না? হুঁ গাল
বেয়ে ছুটি ধারা নামছে? মোমবাতির কাঁপনি সুচিয়ার
ঠোঁটের কাঁপনির সঙ্গে মিশে গেল এই মুহুর্তে। মলয় এগিয়ে
এল সুচিয়ার দিকে।

সে রাজি অন্ধকারেই গভীর হ'ল। বাতাস ভারি নিখাসের
মত—আর থেকে থেকে পেঁচার ডাকটা বুকচাপা কান্নার
মত। পৃথিবী সমবেদনা জানাচ্ছে।

মনীশরা চলে গেছে—বড় ধামে নি। প্রথম বিয়ে হয়ে
সুচিয়া যদি এ বাড়িতে আসে সেদিনকার চাপা অসন্তোষ
আজ মনে পড়ছে। মাহুষের মন থেকে কিছুই কি মুছে যায়
না? কতকগুলি প্রবল বস্তুর প্রতিযোগিতা চলছে মনের
মধ্যে। কোনটা স্বযোগ পেয়ে কোনটিকে হটিয়ে দেয়—
কোনটা বা স্পর্শভীর। নিঃশেষে লুপ্ত হয় না কোনটাই।
মাহুষী-প্রবৃত্তির তাড়নায় মাহুষ বুঝি পূর্ণ হতে পারবে না কোন
মুহুর্তে? যে মানদণ্ডের চার পাশে এই বৃত্তিগুলি পাক ধাচ্ছে,
তাকে নিজ ইষ্ট কি না স্বার্থ বলাই সম্ভব। এরই মাঝে মানছে
সে মাহুষকে পৃথিবীকে—নব বিধানকে। যাই হোক—এ বাড়ি
আজ মুখ ফিরিয়েছে সুচিয়ার দিক থেকে। এক পক্ষে ত
জালই হ'ল। নিত্য অদম্যানের দায় থেকে সে অন্তত বাঁচল।
নিত্য অদম্যানের দায় নয় তো কি? সুচিয়ার তো মনে
পড়ে না হেমলতা তার হাতের নিরামিষ রান্না খেয়েছেন কোন
দিন। রান্নাঘরেই তার অধিকার লাব্যন্ত হয় নি। মন্দাকিনী
বলে—তোমরা ছেলেমানুষ—এখন সেজেগুজে হাসি-আহ্লাদ
করে কাটাবে—হাতাবেড়ি খুঁজি ঠন্ ঠন্ এসব কি মানায়
ভাই। কথাকলি স্নেহ-কোমল কিন্তু ওখান থেকে দূরে
রাখার প্রচেষ্টা তার মধ্যে নেই কি? খাওয়াটাই জাত-
বিচারের কষ্টপাথর এ কথাটা আজ স্পষ্ট করেই বলেন নি কি
হেমলতা? ওরা এ বাড়িতে থাকলে আমি জলস্পর্শ করব না।

অভিমানের বার বার চোখের কোল ভিজে উঠছে।

আজ কারও খাওয়া হয় নি। ছেলেগুলোকে মুড়ি মিষ্টি,
ও বেলায় ভাত রুটি বা অবশিষ্ট ছিল তাই খাইয়ে ঘুম
পাড়ান হয়েছিল। সুচিয়াকে খাবার জুজ অহরোহ করেছিল
মন্দাকিনী—ও উত্তর দেয় নি। এ ঘটনার পর এ বাড়িতে
ধাকা কিংবা এ বাড়ির অন্ন মুখে তোলা ওর পক্ষে অসম্ভব
নয় কি?

বারান্দায় পৌছে মলয় বললে, ওদের বুঝিয়ে বলো সূচিঙ্গা,
—আমি খুব দেখাতে পারব না। সে নীচের নেমে গেল।

হাজ্যের লজ্জা মাধার নিয়ে সূচিঙ্গা ঘরের মধ্যে এসে
দাঁড়াল। ধমধমে কয়েকটি বৃহত্তর মাধার ভর দিয়ে বাতাস
হ'ল নিশ্চল।

মনীশ বললে, বউদি আপনাদের দুঃখের জন্ত নিজেদের
দায়ী করছি না। এইটেই যে আমরা আশা করেছিলাম।
পুরনো সমাজ খোঁসে মত জড়িয়ে আছে গায়ে। দেশের
গৌরবের আলোর তার অন্ধকার দূর হবেই—তবে সে দিন
আজ নয়।

সূচিঙ্গা মুখ তুললে না। ওর হ' চোখের কোল সিক্ত হয়ে
উঠল।

মণীশ বললে, আমরা কলকাতায় যাব। আজই। আপনার
কাছে নাপ চেয়ে আপনার কষ্ট বাড়াব না—তবু একটা কিছু
বলা দরকার কেবলই মনে হচ্ছে। আপনাদের কি যে
বলব—। দারুণ অবস্থিতে ও হু' হাত বুলে চেপে ধরল।

সূচিঙ্গা এতক্ষণে শক্তি সঞ্চয় করে নিয়েছে। সহজ ভাবে
বললে, বেশ ত এক সঙ্কেই যাওয়া যাক।

মনীশ বললে, যাবেন বইকি—নিশ্চয় যাবেন। আজ নয়
বউদি, একটা আশ্রয় ঠিক করি আগে—

ওরা প্রথম করলে সূচিঙ্গাকে। মনীশ হাত ছোঁড় ক'রে—
অনিমা হেঁট হয়ে পায়ে হাত দিয়ে। কাউকে ও নিষেধ করলে
না। ক্ষমা চাওয়া—দোষ স্বীকার করা—হু'পক্ষের কাছে
ভদ্রতার বাঁধাবুলি আওড়ানো এ সব থাকুক। —মাধু্য সহজ
হলেও আচরণে সরল হতে পারে না। ক্ষমাপ্রার্থনার মধ্যে
নতি স্বীকারের ভঙ্গি সব সময়ে স্পষ্ট কি? না, সংসারে
স্বাভাবিক নিয়মে যা আসবে—প্রকৃতির বিপর্যয়ের মত,
তাকেই অক্ষুণ্ণ চিত্তে গ্রহণ করতে হবে। তোমার চোখের
জল আমার স্নায়ুকেজে যদি আঘাত করেই—চোখের জল
ফেলেই জানাব সমবেদনা। মুখের ভাষায় বাহ্যিক প্রকাশ
করে নিজেদের খাটো করব কেন।

সূচিঙ্গার কাছে বিদায় নিয়ে ওরা নীচের নেমে এল
এ বাড়িতে আর যেন প্রাণী নেই—আর কারও কাছে
বিদায় নিতে গেলে আঘাত না নিয়ে ফিরতে পারবে না।

এমন কি মলয় কোথায় এ প্রসঙ্গ মাত্র ওরা উত্থাপন করলে
না।

বাইরের দরজার কাছে এসে অনিমা সহসা ফিরে
দাঁড়াল। এদিয়ে এসে সূচিঙ্গার একখানি হাত পরম সমাদরে
টেনে নিয়ে বললে, আপনি যাবেন ত দিদি? আমরা চিঠি
দেব কিন্তু।

চোখের কোলে অবাধ্য অশ্রুকে আর সামলে রাখা গেল
না—সূচিঙ্গা অশ্রু গোপনের প্রয়াস না করে ধরা গলায় বললে,
যাব।

এই সংসারের মত ভারতের রক্ষণক্ষেত্রে ভাগ্যবিপর্যয়ের
পালা স্তব্ধ হয়েছে। ঠিক স্বাধীনতা নয়—তবে ভারত যাতে
সেই পথে দ্রুত অগ্রসর হয়ে লক্ষ্যে পৌছতে পারে তার জন্ত
বিলাতের অমিক গবর্ণমেন্ট মন্ত্রী মিশন পাঠিয়েছেন। তাঁরা
একটা কিছু দেবেনই—এই প্রতিজ্ঞা করে ভারতের মাটিতে
পা দিয়েছেন। বিভিন্ন দলকে নিয়ে তাঁদের বৈঠক বসল
দিল্লীতে। সকাল বিকাল সন্ধ্যায়—বিভিন্ন শ্রেণীর লোক—তা
তাঁরা অল্প নামজাদা বা অধিক খ্যাতিসম্পন্ন—নরম, গরম কিংবা
মধ্যপন্থী যাই হোন না কেন—সেই সঙ্গে ভারতবর্ষের সব
দলের মাথা-ধরা গুলিকেও—মহারাজা কিংবা তপস্বী নেতা,
দবাইকে নিমন্ত্রণ পত্র পাঠালেন। লোকে ভাবল বৈঠক বটে
এঁদের। সব দলকে এক করে—আলাদা আলাদা তাদের মত
নিয়ে সুবিধা-অসুবিধা বুঝে যে শাসনতন্ত্রের ধসড়া ছকে
দিয়ে যাবেন—সর্ব-ছাতি-বর্ষ ও মত সম্বন্ধে না জানি সে
কি অগূর্ব বস্ত্রই দাঁড়াবে। বিভিন্ন দলের মত-স্বাতন্ত্র্যে বৈঠক
টলমল করে উঠল। দিল্লীর গরমে তিষ্ঠতে না পেরে মন্ত্রীরা
গেলেন সিমলায়, দেখানকার ঠাণ্ডা আবহাওয়ার মতবিরোধ
মিটল না। স্বল্প বা দীর্ঘমেয়াদী শাসনতন্ত্র নিয়ে বাধল
গোলমাল। অবশেষে তিনটি গ্রুপে ভাগ করা হ'ল ভারত-
বর্ষকে—পঞ্জাবের সঙ্গে সীমান্ত আর বেঙ্গলিহানের লেজুড়
জুড়ে দেওয়া হ'ল—আসামের কাঁধে চাপানো হ'ল বাংলাকে।
মন্ত্রী মিশন ঘোষণা করলেন—পাকিস্থানের দাবি অস্বীকারিক।
তবে সংখ্যাগরিষ্ঠরা যাতে সংখ্যালঘুদের মন্তব্য করতে না
পারে তার জন্ত যথোচিত রক্ষা-কবচের ব্যবস্থা রইল। কোন
কোন রাজনীতিবিদ বললেন—বাহত পাকিস্থানকে অস্বীকার
করে—কার্য্যত গ্রুপের মধ্য দিয়ে তাকে স্বীকার করেই নেয়া
হ'ল। ল্যাঙ্কা যুদ্ধের পাকিস্থানী প্রেলপ লাগিয়ে ঘড়টাকে
চাকের বাদ্যে মোহিত করে দেবার ব্যবস্থা—এ কথাও
বললেন কেউ কেউ। স্বল্পমেয়াদী স্বত্ব বাতিল করলে
কংগ্রেস—লীগ দুটোই মেনে নিলে। কিন্তু মন্ত্রীদের জিদ
কংগ্রেসকে এর মধ্যে ঢোকাতেই হবে। পনেরই মে-য়
ঘোষণার ভাষ্য—টীকা ইত্যাদি স্তব্ধ হ'ল। কিন্তু ইংরেজী
ভাষাটাই এমন যে রবারের মত যতই টেনে নেয়া যায়—
বিভিন্ন অর্থসম্পদে ততই ওটি প্রসারিত হতে থাকে। প্রদেশ-
সমূহকে এক জোড়ালে জুতলেও—আলাদা হয়ে যাবার ক্ষমতা
ওদের থাকবে। তা ছাড়া অনিচ্ছুক কোন প্রদেশের ঘাড়ে
বাধ্যতাগুলক বিধান চাপানো চলবে না। ইচ্ছে করলে
প্রদেশসমূহে গ্রুপিং-এর বাইরে চলে যেতে পারে। কংগ্রেসের
মিটিং চলছে ক'দিন ধরে। কি-হয় কি-হয়—এই উত্তেজনাতে
বঙ্গদেশের দূর প্রান্তের এক অধ্যাত গ্রামেও তর্ক-আলোচনা
চলছে।

কেউ বলছেন, উনিশ শো বিয়ানিশের ক্রীপস্ সায়েব

দ্রবতারার ঠিক নীচের দিকে। নিমুণ্ড গ্রাম। হু'মাইল গেলে তবে ষ্টেশন পাওয়া যায়। একলা মানুষ—প্রয়োজনীয় বস্তু গুলি নিয়ে নিতে সময় লাগল না। একটা ব্যাগের মধ্যে সবকিছু নিয়ে পিঠে তুলিয়ে দিল ব্যাগটি—তার পর যাত্রা। নিজের পায়ের শব্দ নিমুণ্ড রাজপথে বেজে উঠল। খানিকদূর এসে মনে হ'ল নিজের পায়ের শব্দই। মনে হচ্ছে গভীর রাত্রির বুকে তার যুহু প্রতিধ্বনি...কখনও দূর থেকে মিলিয়ে যাচ্ছে দূরে—কখনও দূর থেকে এগিয়ে আসছে কাছে। হাঁ—এগিয়েই আসছে—কাছে—আরও কাছে।

অনিমা বললে, আমিও যাব তোমার সঙ্গে।

মণীশ বিস্মিত হ'ল—আনন্দিত হ'ল। মাথার ওপর একটা তাম্রা সহসা খুব জলজল করে কঁপে উঠল। ওদের মনের খুপী গ্রহের অন্তর স্পর্শ করেছে—তাই ছাতিময় হয়ে শিউরে উঠল সে। পুলক শিহরণ।

আত্মবিস্মৃত মুহূর্তে, মণীশ প্রশ্ন করল তবু, এর অর্থ—বোঝ ? অনিমা মাথা নেড়ে স্বীকার করলে, বাধা বা কলঙ্কের কথা। অনিমা এগিয়ে এসে ওর হাত ধরলে। বললে, চল। তাই চলে এলাম। গল্প শেষ করে মণীশ হাসলে।

সুচিমা বললে, ঠাকুরপো একটা কথা জিজ্ঞাসা করি রাগ করবেন না। লোকাচার রক্ষার দায়টা নিলে কি ভালবাসার অসম্মান হ'ত ?

মণীশ বললে, কোথায় পেলাম সে অবসর। ওতে আপত্তি নেই আমার—না হলেও ফোভ নেই। সমাজের চোখে সমান অপরাধীই থেকে যাব ত।

সুচিমা বললে, বিবেকে বাধবে না ?

মণীশ বললে, বাধবে অনিমা ?

অনিমা মুখ ফিরিয়ে নিলে। রাত্রিশেষের তারার আলোর পথ চলতে চলতে সেই উত্তর কি দেয়নি সে ?

মলয় বললে, যতই দেশপ্রেমের সার্টিফিকেট নিয়ে এসে তাই—সামাজিক লালনা তোমাদের বুচবে না।

মণীশ ও অনিমা দু'জনেই মুখ তুলে চাইলে তার দিকে। মলয় বললে, আশা করি সব কিছু সহ্য করবার মনোবল নি তোমরা—

মণীশ বললে, না তাই দৈববশে আমরা মিলেছি—দৈবের হাতেই আমাদের দিয়েছি ছেড়ে। অনিমা ট্রেনে আসতে আসতে আমাকে বলছিল যে আকাশের স্বর্ষ্য আর দিখীর পদ্ম যেমন দৈববশে মেলে—

অনিমা বললে, আপনারা সাহস করেন আমাদের আশ্রয় দিতে ?

মলয় বললে, সুচিমা, উত্তর দাও।

সুচিমা বললে, সাহস করি। সেই সঙ্গে একটু নিবেদন আছে ভাই। যদি তোমাদের জন্ত আমাদের লালনাও ঘটে—তোমরা তোমাদের দোষী মনে করবে না ?

মণীশ সপ্রশংস দৃষ্টিতে তার পানে চেয়ে বললে, আপনার কথায় বড় আনন্দ পেলাম বউদি, সেই সঙ্গে আক্ষেপও।

মানে ?

মানে—এতক্ষণ আমাদের লালনার দিকটিই দেখছিলাম—অল্প দিকের কথা ভাবি নি। ঠিকই বলেছেন—অজ্ঞের শান্তি নষ্ট করে নিজের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখতে পারব না।

আমাদের আপনি আত্মীয় মনে করেন না ?

অনুযোগের উত্তরে মণীশ হাসলে। বললে, মলয়কে জানতাম—আপনার সঙ্গে আজ মাত্র পরিচয় হ'ল। তবু আপনাকে বহুদিনের চেনা বলে মনে হচ্ছে।

মলয় বললে, এই গ্রামেই তোমার প্রচার-কেন্দ্র স্থাপন কর না।

মণীশ বললে, কিছুদিন যাক। আইন মতে বিয়েটা চুকিয়ে ফেলে—তার পর,—ও কি। চারজনই চমকে উঠল।

ধরের বাইরে গুরুভার দ্রব্য পতনের শব্দ হ'ল।

সুচিমা বাইরে এসে তার পিছনে মলয়। কোথাও কেউ নেই। ওরা সিঁড়ির ধারে এসে দেখল—বহু দিনের পুরনো ষাঁড়ের একাংশ কোথা থেকে গড়িয়ে ধরের দেওয়ালে কাত হয়ে পড়েছে। বাতাস নেই—ছেলেরাও বারান্দায় খেলা করছে না—অথচ—

সুচিমা বললে, ছাদে কেউ নেই ত—দেখে আসি। সিঁড়ি দিয়ে তর তর করে সে উপরে উঠে গেল।

হেমলতা ভারি তোষকটা হু' হাতে উণ্টে দেবার চেষ্টা করছেন দেখে সুচিমা তাঁর সাহায্যার্থে এগিয়ে এল।

হেমলতা গভীর মুখে বললেন, ধাক—ধাক—আমিই পারব'ধন। তোষক উলটে দিয়ে তিনি হাঁপাতে লাগলেন।

সুচিমা বললে, আমাদের কাউকে ডাকলেন না কেন মা ? তোমাদের ডেকে আমার লাভ। গভীর মুখে জবাব দিলেন হেমলতা। এই অবেলার তোষক কাচলে শুকোবে ?

তোষক কাচবেন কেন ?

এত কচি মুকী নও বউমা যে একধা বোর না। বলি এটা হিঁহুর বাড়ি এটা মান তো ?

সুচিমা শুস্তিত হয়ে তাঁর পানে চেয়ে রইল। ফ্রোথের আবেগে যুগা প্রকাশটা সহজ হয়ে আসে। হেমলতা শেষ আঘাত হানলেন। আমি তো পা বাড়িয়েই আছি, কিন্তু তোমাদের আক্ষেপটা কি ? পরপুরুষের সঙ্গে যে মেয়ে বেরিয়ে আসে—তাকে তোমরা জায়গা দাও কোন্ সাহসে তুমি ?

মলয় ছাদে আসতেই হেমলতা কান্নায় ভেঙে পড়লেন। বললেন, ওদের না ভাড়াতে আমি ধাতে কুটো ভাঙব না—আগুহত্যে হব। তোদের এত বড় আসপদা হু—

ধাকে প্রবোধ দেওয়া মলয়ের সাধ্যাতীত। মাথা নীচু করে ওরা সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে লাগল।

সুচিহ্না মুখ টিপে টিপে হাসছিল। বললে, অজায় করলে ভাই।

মেয়েটি মুখ তুলে বললে, অজায় করলাম দাদা?

এ প্রশ্ন সরাসরি দে মলয়কেই করলে। আর কুঠী প্রকাশ করলে ওকে অদম্যমান করা হবে। কণ্ঠে ওর সিদ্ধ করণ হ্রস্ব—প্রশ্নের ভঙ্গিতে সুবিচারের প্রত্যাশা। মলয় চোখ তুলে বললে, না—অজায় করনি।

ছুটি মেয়ে পরস্পরের পানে চেয়ে ইঙ্গিতময় হাসি হাসলে।

মেয়েটি বললে, কোন অজায় করে আপনার বাড়িতে ঢুকবার সাহস হ'ত না দাদা। তবুও অনেক কথা বলবার আছে।

আচ্ছা—খাওয়া-দাওয়া হলে সবাই এক লড়ে বসে শুনব।

আহারাদি শেষে ওরা চারজন মলয়ের শোবার ঘরে একত্রিত হ'ল। মলয় আপত্তি করলে, একটু বিশ্রাম কর।

মনীশ বললে, যথেষ্ট বিশ্রাম হয়েছে—এবার বস। বউদি আপনাকেও বসতে হবে।

মেয়েটি উঠে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলে।

সুচিহ্না বললে, দরজা বন্ধ করার দরকার ছিল না ভোমরা রয়েছ, এ ঘরে কেউ আসবেন না।

মেয়েটি বললে, কেউ আমাদের কথা শুনলে কোন ক্ষতি হবে না—ভবে ছেলেরা এসে গোল করতে পারে এই ভেবে—। সে অর্গল মুক্ত করবার ক্ষমতা এগিয়ে গেল।

সুচিহ্না বললে, থাক—। ঠাকুরপো খুব সংক্ষেপে বলুন। উনি আবার ভাল বা মন্দ কোন কাছেরই ব্যাখ্যা শুনতে ভাল-বাসেন না।

মলয় বললে, আর তুমি?

হেমলতা ডাকলেন—ছোট বোমা শোন।

উপর থেকে সম্ভরণে নেমে এল মন্দাকিনী। বললে—ছোট বউকে এখন ডাকবেন না মা—ওরা চারজনে মিলে ছয়োরে খিল দিয়ে গল্প করছে।

কিসের গল্প?

কি জানি মেয়েটি কেন ওর স্বামীর সঙ্গে চলে এসেছে—সেই গল্পই হবে হয়ত।

হেমলতার মুখখানা চক্ চক্ করে উঠল।

মন্দাকিনী বললে—আপনার দোস্তা দেওয়া পান আর জল—

ধাক্কা বাছা—তুমি বরং নীচের ভাঁড়ার গুছিয়ে নাও—আমি একবার ছাদের বিছানাপতরগুলো রোদ্ধুরে উণ্টে দিয়ে আসি।

ছাদে যাবার পথে—সুচিহ্নার ঘরের পাশে একবার উঁকি মারলেন। একটু এগিয়ে গেলেন—ওদের ঘরের দিকে। যে

ফালি ঢাকা বারান্দাটা ওদের ঘরের উত্তর কোণ ঘেঁসে—সিঁড়ির গোড়ায় মিশেছে—সেইখানে এসে দাঁড়ালেন। দেওয়ালের একটু ওপরে ঘুলঘুলি মত—কিংবা হাওয়া চলাচলের পথও বলা যায়—সেখান দিয়েই ঘরের ভেতরের কথাগুলি অবিচ্ছিন্ন শব্দপ্রবাহে ভেসে আসছে। মনোযোগী শ্রোতার পক্ষে সে ধ্বনির অর্থ উদ্ধার করা কঠিন নয়।

অতরাং হেমলতা ছাদে যাবার কথা ভুলে গেলেন।

সাধারণত প্রশ্ন-কাহিনী ঘেমন হয়ে থাকে, মনীশ-অনিমার গল্পও সেই ধরনের। সামাজিক বাধা প্রবল না হোক—অল্প বাধা ছিল। আই, এন, এ সারা দেশকে ছুঁশো বছরের ভুলে-যাওয়া অপূর্ণ এক বস্তুর আবাদ দিয়েছে; অভাবিত জিনিস। এ জিনিস পেয়ে জাতি আত্মসম্মানে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে—আশা হচ্ছে ভাবের বজা মিলিয়ে গেলেও বস্তুর কাঠিন্য লুপ্ত হবে না—হয়ত নতুন জগতের মাঝে—নতুন ভারত নতুন পৌরবে স্থান নেবে—নতুন মানুষরা—নতুন সমাজ বিধি-বিধানের অর্থও একটি সমতাকে রূপ দেবেন। কিন্তু আপাততঃ বজার বেগ প্রবল। ঢেউ দেখে সবাই উল্লসিত। এ ঢেউ ফিরে গেলেও যে টান গভীরে আকর্ষণ করবে—তার পরীক্ষা অত্যন্ত কঠিন।

মনীশ আই, এন, এর পৌরব নিয়ে ফিরে এলেও—সামাজিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয় নি। সে উপার্জনশীল নয়—পুৰাতন সমাজ—তাকে সর্ব্বনাশ করলেও—সংসার পরিচালনার দায়িত্ব সে নিতে পারবে কিনা সে বিষয়ে সংশয়শীল। কাজেই অনিমার সঙ্গে তার মিলনটা জাতি গোত্রের দিক দিয়ে না বাধলেও—এই দিক দিয়ে বাধল। ফলে এই ইলোপ-মেন্ট। অনাস্থ্য নরনারীর সর্ব্ব নিয়ে—মাংসঘের যেমন আলোচনার উৎসাহ নেই—তেমনি সমাজকে সে গড়েছে গুচিশীল করে। এ গুচিতার অর্থ নিছক পবিত্রতা নয়। যাই হোক এর অর্থ—মনীশ...নিজের প্রবৃত্তির বেগে ভেসে গিয়ে সমাজগত এমন ধরনের কাজটা করতে পারে—আর এতে আই, এন, এ-র পৌরব ক্ষুর হতে পারে—এটি তার কল্পনাতেই আসে নি। আর্থখানি মানুষ—আর আর্থখানি সামাজিক নিষ্ঠা—এমন উপকরণে সে সৃষ্ট নয়। এই ব্যাপারের মূলে যা রয়েছে—সেটি দৈব—আর তাকেই ইলোপমেন্টের হেতু বলা সম্ভব।

অনিমাও কম হুঃসাহসী নয়। আগের দিন রাত্রিতে তাদের কথাবার্তায় ঠিক হয়েছিল—দেশসেবাব্রতটিকে মুখ্য করে নিয়ে এই বিচ্ছেদ বেদনা, অনারাসে না হোক, কর্তব্য ভেবেও গ্রহণ করবে তারা। মনীশ ক্ষেত্রান্তরে গিয়ে—গঠন-মূলক কাজ করবে। অনিমা নেবে এখানকার ভার।

তখনও ভোর হয় নি। সুরূপকের প্রথম দিকের কোন একটি তিথি—শেষ রাত্রের অন্ধকার আকাশ আর গাছের মাথার জড়িয়ে আছে; সপ্তর্ষি দিকপ্রান্তে হেলে পড়েছে—

“আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ভারত কোনদিনই মধ্যমশ্রেণীভুক্ত হইয়া থাকিবে না। ভারতবর্ষ হয় একটি সুমহান রাষ্ট্রে পরিণত হইবে, না হয় অত্যন্ত ক্ষুদ্র রাষ্ট্র হইয়া পড়িবে। যদি আমরা যথাযথ দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া সমস্তার সম্মুখীন হইতে পারি এবং আমাদের মন যদি উদার হয় তাহা হইলে ভারতবর্ষ বিশ্বের রাষ্ট্র-দরবারে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিতে পারিবে এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই।”

কোন ক্ষণের অধিকারী হইলে ভারতবর্ষ বিশ্বের দরবারে সম্মানের পদ অধিকার করিবে, তাহাও পণ্ডিতজী বর্ণনা করেন। “ভারত কখনই একটি সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র হইবে না। আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া ভারতবর্ষের কার্য পরিচালিত হইবে; সঙ্গীর্ণ জাতীয়তাবাদের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক থাকিবে না।” এই আদর্শ অমুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা আমাদের রাষ্ট্র-চালকবৃন্দ করিতে পারিবেন কিনা জানি না। সম্মিলিত জাতিসংঘের দরবারে ত এই আদর্শের অমুযায়ী কোন কর্ম-প্রচেষ্টার পরিচয় পাই না। পণ্ডিতজী নিজেই কেল্লীর পরিষদে বলিয়াছিলেন যে যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট রাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধে কোন পক্ষ অবলম্বন করিতে অনিচ্ছুক হওয়ায় ভারতবর্ষ অনেকটা “একধরে” হইয়া আছে; “একাই নিজের লাঙ্গল ঠেলিয়া চলিয়াছে।” কিন্তু এরূপ স্বয়ংসিদ্ধ হইয়া বেশী দিন চালাইয়া যাওয়া সম্ভব হইবে না। যুক্তরাষ্ট্র আমাদের দেশ হইতে বহুদূরে, প্রায় তের হাজার মাইল দূরে। এটিম বোমার যুগে এই দূরত্ব কিছু নয়। সোভিয়েট রাষ্ট্র সম্বন্ধে এই দূরত্বের অজুহাতও টিকে না। কাশ্মীরের মাধ্যম আছে সোভিয়েট রাষ্ট্রের মুসলিম স্বাধীন সাধারণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি। সেইজন্য অনেকেই বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে কাশ্মীরের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সোভিয়েট রাষ্ট্র নিরুদ্বেগ থাকিতে পারে না। কাবুলের ভূতপূর্ব ব্রিটিশ দূত সন্ন্যাসী কের ফ্রেডার ইটলার এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে এই সম্ভাবনার কথা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন।

“অকুসাস নদীর অপর পারে সোভিয়েট রিপাব্লিক-গুলিকে শিল্পসমৃদ্ধ করার পর রাশিয়া যে দক্ষিণে করাচীর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রাই, তাহা অবিস্মৃত। শীঘ্রই হটক, বিল্‌হেই হটক ককেশাস হইতে পারস্য পর্যন্ত দক্ষিণ সীমান্তে উচ্ছলবিশিষ্ট একটি বন্দরের প্রয়োজন হইবে। আফগানিস্থানকে দ্বিধাবিভক্ত করিয়া যে হিন্দুকুশ পর্বত-মালা দাঁড়াইয়া আছে, সেই হিন্দুকুশ পর্বতমালায় উপর যাহার অধিকার থাকিবে, ভারতে প্রবেশের চাবিকাঠিও তাহার হাতে পাওয়া যাইবে।”

প্রকৃতি এই ভাবেই বিশ্বের দরবারে ভারতবর্ষের একটা স্থান নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন। বঙ্গোপসাগরের পূর্বপ্রান্তে যে স্বাধীন ব্রহ্মরাষ্ট্র গড়িয়া উঠিতেছে তৎসম্বন্ধে আমাদের রাষ্ট্রচালকগণকে সজাগ থাকিতে হইবে। সিঙ্গাপুর ও সিংহলের ত্রিকনমেলি বন্দরে ব্রিটিশের নৌ-বাহিনী এখনও অব্যাহত আছে। ব্রিটিশ রাষ্ট্রের সঙ্গে এখনও আমাদের একটা সম্বন্ধ আছে। এ বন্ধন ছিন্ন করিয়া একটা নতুন সম্বন্ধের পরিকল্পনা নাকি লর্ড মাইল্টবার্টনের মাধ্যমে ধেলিতেছে। ব্রিটিশ রাষ্ট্রসংঘ (British Commonwealth of Nations) ভাঙ্গিয়া দেওয়া

হইবে। ব্রিটিশ রাজ্যের নামে এই সম্বন্ধের শাসনকার্য আর চলিবে না। ব্রিটেন, আয়ার, কানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, ভারতবর্ষ, “পাকিস্তান” এই রাষ্ট্রগুলি স্বাধীন হইয়া যাইবে। কিন্তু সব সম্বন্ধ ছিন্ন হইয়া যাইবে না। এই পরিকল্পনার ব্রিটিশ রাজ্যের স্থান কোথায়, তাহা এখনও স্পষ্ট দেখা যাইতেছে না। গত মহাযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ রক্ষণ-নীতি (British scheme of Defence) বলিয়া একটা কথা শুনিয়াছিলাম। এই রক্ষণ ও আক্রমণ নীতির কল্যাণে হয়ত একটা সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিতে পারে, এই আদর্শই বোধ হয় মাইল্টবার্টনের পরিকল্পনার মূল কথা। সেইজন্যই সিঙ্গাপুর ও ত্রিকনমেলি বন্দরের একটা মাহাত্ম্য বুঝিয়া পাওয়া যায়। ব্যাপার এখানেই শেষ নয়। ভারতবর্ষের পশ্চিমে সিন্ধু ও পশ্চিম পঞ্জাব হইতে আরম্ভ করিয়া আফ্রিকা মহাসাগরের মরক্কো পর্যন্ত প্রায় দশটি মুসলিম রাষ্ট্র বিস্তারিত আছে। একক কোনটাই পরাক্রান্ত নয়, অনেকগুলিই স্বাধীনগের চিন্তাধারার মধ্যে নিমজ্জিত। এদের সম্বন্ধে ভারতবর্ষ নিস্পৃহ হইতে পারে না এইজন্য যে, ভারতবর্ষের মধ্যে চারি কোটি মুসলমান আছে, যাহাদের ভাব ও আবেগ অনেক সময় এই মুসলিম দেশসমূহের ঘটনার সঙ্গে জড়াইয়া পড়ে, এবং অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভারতবর্ষকে এই সব দেশের ব্যাপারে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে হয়। খেলাফৎ আন্দোলনের সময় তাহা প্রমাণিত হইয়াছে।

গুরু নানক মক্কায় গিয়াছিলেন

প্রয়াগের পণ্ডিত সুলতানলাল ৪ঠা জাহ্নসারী তারিখের “হরি-জ্ঞান” পত্রিকায় শিব সম্প্রদায়ের কর্তব্য সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। গাভীজী প্রধান প্রবন্ধের স্থানে ইহা ছাপিয়াছেন। হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের সমন্বয় সাধন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন গুরু নানক। এই তথ্যের প্রতিষ্ঠাকল্পে পণ্ডিতজী বর্তমান প্রবন্ধ লিখিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। গুরু নানকের “জীবনযাত্রা” প্রণালী না ছিল হিন্দুধর্মীয়সারী, না ছিল ইসলাম অমুসারী। তাহা ছিল উভয় ধর্মের সংমিশ্রণ। এই কথার প্রমাণ করিতে গিয়া পণ্ডিতজী বলিয়াছেন, শিব-ধর্ম-গ্রন্থের নামকরণে “সংস্কৃত ‘গ্রন্থ’ শব্দের সহিত আরবী ‘সাহেব’ শব্দ জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।” এই সম্বন্ধে চেষ্টা গুরু নানকের জীবনেই শেষ হয় নাই; তার পরবর্তী শিব গুরুবৃন্দও এই ভাবের ভাবুক ছিলেন। পণ্ডিতজী বলিয়াছেন, “অনুভবসম্বন্ধের স্বর্ণমন্দিরের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা কাহার হাতে করা হইবে, প্রশ্ন উঠিলে গুরু অর্জুন দেব এই পবিত্র অমৃতধানের পৌরহিত্য করিতে মুসলমান ফকির সাইন মিঞা মীরকে আহ্বান করিয়াছিলেন।” গুরু নানক সমদর্শী ছিলেন—রামেশ্বর-মক্কা উভয় তীর্থে গিয়াছিলেন এই বিষয়দ্বী তাহার আত্মজিক চেষ্টার পরিচয় বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। আরও অনেক হিন্দু সন্ন্যাসী মক্কা গিয়াছিলেন বলিয়া শুনিয়াছি। পকাশ বংসর পূর্বে বারদীর ব্রহ্মচারী লোকনাথ জীবিত ছিলেন। তার মক্কা পর্যটনের বৃত্তান্ত তার জীবনচরিতে বর্ণিত হইয়াছে। পূর্ব যুগের হিন্দু সন্ন্যাসীরা এই তীর্থ পর্যটন অবশ্য কর্তব্য বলিয়া মনে করিতেন। কেন করিতেন তার উত্তর নিশ্চয়ই একটা ছিল। আচ্ছা লোকে তাহা ভুলিয়া গিয়াছে।

সম্মেলনের সভাপতি কমিটির সভাপতি ছিলেন শিল্পপতি ত্রিবিচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ঐকলবন্ত রাও খেরের উদ্বোধন অভিভাষণের মধ্যে একটা ইঙ্গিত ছিল যে বাঙালী যে প্রদেশে থাকে সেখানকার অধিবাসীদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ ভাবে মিশিতে পারে না। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই “নালিশ” সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে একটা প্রশ্ন করিয়া তার উত্তর দিয়াছেন—“বাংলা দেশে আজ বিহারী, মাদ্রাসারী, মাদ্রাজী ও গুজরাটী থাকেন, কিন্তু তাঁহারা সাধারণ বাঙালীদের সঙ্গে কতটা মিশেন?” এই বিষয়ে আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে আমাদের—বাঙালী, বিহারী, মাদ্রাজী, উড়িয়া, গুজরাটী, মারাঠি, পাঞ্জাবী, আর্যবাদের স্বাতন্ত্র্যবোধ এত প্রবল যে আমরা বিদেশেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাংলা, বিহার, মাদ্রাজ, উৎকল, মহারাষ্ট্র, গুজর, পাঞ্জাব, আসাম সৃষ্টি করিয়া সাংস্কৃতিক বৈষম্যের নামে নিজ নিজ কূপের ভিতরে থাকিতে ভালবাসি। এই সংকীর্ণতার কারণ একটা আছে নিশ্চয়ই। সেই কারণ অসু-সন্ধান করিয়া বাহির করিতে হইবে। আমাদের প্রত্যেকের সামাজিক রীতিনীতি, আচার-আচরণে ছুৎমার্গের মধ্যে তাহা আছে।

এই সম্মেলনের মূল সভাপতি ছিলেন বোম্বাই হাইকোর্টের জজ ত্রিফিথীশচন্দ্র সেন। তিনি বাঙালী জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুখ, আবেগ-উত্তেজনা, বাংলা সাহিত্যের মাধ্যমে কি করিয়া প্রকাশ পাইয়াছে এবং বাঙালী জীবন সার্থক ও সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে, তাহার পরিচয় দেন। অল্প এক উপলক্ষে বোম্বাইয়ের প্রধান মন্ত্রী বলিয়াছিলেন যে হুইল্ডন মহারাজী একজ্ঞ হইলে করে ঝগড়া, তাঁহার পর গড়িয়া ভুলে মহারাজীমণ্ডল একটা। সেইরূপ হুই জন বাঙালী একজ্ঞ হইলে “মিলিত হইবার পূর্বে দলাদলি করিয়া লয়; পরে বয়স একটু বাড়িলে তাহারা একটু কালী-বাড়ী স্থাপন করে।” পূর্বতন যুগে এই “কালী-বাড়ীর মধ্যদ্বারা প্রবাসী বাঙালী বাদ্যলার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছে।” কিন্তু আজ যদিও সে ঘটা করিয়া দুর্গা পূজা করে, তবুও তাঁহার মন ভাতে যেন সন্তুষ্ট নয়। আরও কিছু চায় যাহা অবলম্বন করিয়া মাতৃভূমির সঙ্গে তাহার সম্পর্ক আরও নিবিড় হয়। প্রবাসী বাঙালীর পক্ষে বাংলা সাহিত্যই সেই আশ্রয়। সংসারের বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্যে আর কোথাও তাহার অন্তঃপ্রকৃতির সে ফুটা মিটে না। সভাপতি মহাশয় সেই প্রকৃতির এই বর্ণনা দিয়াছেন, এবং সেই প্রকৃতির কল্যাণে সে কি করিয়া নব-ভারত গঠনে সাহায্য করিয়াছে তাহার ইঙ্গিত করিয়াছেন।

“নানা দেশ গ্রাম ও সহরের জমিপ্রসূত পলিমাটি হইতে যেমন বাংলার মাটির স্রব, তেমনি নানা ঐতিহ্য, নানা ক্রান্তির রিস্তির সংস্কার, নানা সংস্কৃতি সংমিশ্রণ আমাদের জাতীয় চিন্তের নানা স্তরে নিহিত আছে। এই কুপ্তসংস্কার

লঙ্কার বিষয় নহে, কারণ ইহা হইতেই আসিয়াছে আমাদের চিন্তের সাবলীল দৃষ্টিপ্রসার, নিঃসঙ্কোচ গ্রহণ সামর্থ্য, সমন্বয়ে পেলব নৈপুণ্য, সৃষ্টিতে শক্তি ও সৌন্দর্যের মিলন। আমরা বাহির হইতে গ্রহণ করিয়াছি অনেক, কিন্তু সমস্তই আমাদের মননশক্তি ও অন্তঃপ্রকৃতির জারক রসে পরিপাক করিয়া নিজের করিয়া লইয়াছি। ইহার দৃষ্টান্ত—রামমোহন রায়, মণ্ডন, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন। বাংলা ও ভারতের বাহিরের অনেক বস্তু ইহারা সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহারা বাংলার একান্ত আপনায়, বাংলার স্রবস্থতীর বরপুত্র। বাংলার মাটি লেটারাইট বা গ্রানাইটে তৈরী নয় যে কালের স্রোতের সহিত উহা সংগ্রাম করিবে; কবির ভাষায় উহা জ্বলন্ত জ্বলন্ত মলয়জশীতলা, অর্ধচ অসীম শক্তির আধার ইহাই তাহার বৈশিষ্ট্য—এক সঙ্গে কোমলতা ও শক্তির আধার হওয়া। এজন্তই যখন পশ্চিম জগতের চিন্তাধারা এদেশে আসিয়া পড়িল তখন বাংলাই প্রথম নিখিল ভারতের পথনির্দেশ করিয়াছিল—শিক্ষার, সামাজিক প্রগতিতে, সাহিত্যে, রাজনীতিতে যথেষ্ট ও কর্মে।”

এই বিশ্লেষণের মধ্যে নুতন কথা বেশী নাই। কিন্তু পুরাতন কথা যাহা আছে তাহা মনে করাইয়া দিবার প্রয়োজন আছে, মনে করিয়া রাখিবার প্রয়োজন আছে আজ যখন নানা বর্করোচিত আক্রমণে সমগ্র দেশের জীবন বিপন্ন। আজ ইহা মনে করিবার প্রয়োজন আছে যে নানা ভাবের সজ্জাতে যে আলোড়নের সৃষ্টি হইয়াছে, বাঙালী সাহিত্য-সাধকের সেই ক্ষণে নিশ্চল হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না; তাঁহার বিশেষ সংস্কৃতির আলোকে নব-ভারতের পথে নুতন আলোক দেখা ফেলিয়া দেশের জয়-যাত্রায় যোগদান করিতে হইবে। প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের সার্থকতা হইবে তখন যখন প্রবাসী বাঙালী নিজের সংস্কৃতি অঙ্গ-সংস্কৃতি প্রভাবিত অঞ্চলে অনুবাদ করিতে পারিবে এবং অঙ্গ সংস্কৃতির বাণী নিজের লোকের নিকট পৌছাইয়া দিতে পারিবে। এই যোগ-স্বজ্ঞ স্থাপন করিয়া দেওয়া হইল প্রবাসী বাঙালীর কর্তব্য। সেই কর্তব্য সম্পন্ন করিতে হইলে তাহার মন রাখিতে হইবে জাগ্রত, তাহার বুদ্ধি রাখিতে হইবে পর-মত প্রত্যাশীল, তাহার অন্তঃপ্রকৃতি রাখিতে হইবে শতদল পদের মতন সূর্যালোক পিয়াসী। বর্তমান শতকের প্রথমে অনেক বাঙালী এই মননশীলতার জন্তই ভারতবর্ষের মানসলোকের অনেক ক্ষেত্রে নব-জীবন-প্রবর্তকরূপে দেখা দিয়াছিলেন। আজও সে মেধা, বুদ্ধি ও কর্ম-শক্তি পরিশ্রান্ত হইয়া যায় নাই।

বিশ্বের দরবারে ভারতবর্ষের স্থান

প্রায় এক মাস পূর্বে ভারতীয় বিমানবাহিনীর কর্মসূচ্যের এক সত্য পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন—

অভাব—অবলম্বন করিয়া চলিয়াছিলেন এবং কেন্দ্রীয় গবর্নেন্ট, “দিন গত পাণ ফয়”, এই নীতি অনুসরণ করিয়াছেন ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের প্রশ্ন সম্বন্ধে। পণ্ডিত নেহেরু কেন্দ্রীয় পরিষদে এক আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে ভাষার ভিত্তির উপর ভারতীয় ইউনিয়নের নানা প্রদেশ পুনর্গঠন করিবার নীতি তাঁরা গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু—। গান্ধীজী এই “কিন্তু” ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মুসলীম লীগের “হুই মেশন” তত্ত্বের মীমাংসা করিতে সফলেই বিরত; এই সময়েই ভাষার পার্থক্যের জন্ত নানা অঞ্চলে যে বিক্ষোভ জমাট বাঁধিতেছে, তাহা লইয়া মাথা ঘামাইবার সময় নাই; অস্থির হইলে চলিবে না। উড়িষ্যা ও বিহার প্রদেশ কংগ্রেস-ভাবাপন্ন হইয়াও বিবাদ এড়াইতে পারে নাই। ইহা লইয়া সর্দার প্যাটেলকে ব্যস্ত হইতে হইতেছে। এই উপলক্ষে পশ্চিম বঙ্গের জনমত উড়িয়া-বিহারী সংঘর্ষের মতন কোন একটা ব্যাপার ঘটাইতে পারে নাই বলিয়াই পশ্চিম বঙ্গের সেরাইকলা ও খারশোয়ান সম্বন্ধে একটা দাবী-দাওয়া যে আছে বা থাকিতে পারে, তৎসম্বন্ধে কেন্দ্রীয় গবর্নেন্টের মাথা ঘামাইবার কোন কারণ দেখা দেয় নাই। কলিকাতা হাইকোর্টের উকিলসম্মেলন এই সম্বন্ধে বাঙালীর আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা শুনাইয়া দিয়াছেন। সেরাইকলা ও খারশোয়ান রাজ্য সিংহভূম জিলার অন্তর্ভুক্ত। এই জিলার কোন কোন অংশে বাঙালীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। কেন্দ্রীয় গবর্নেন্ট কর্তৃক নিযুক্ত কমিশন পশ্চিম বঙ্গের সঙ্গে তাহাদের তদন্তের একটা সম্বন্ধ আছে, এই কথা বিবেচনা করিবেন কি না জানি না; পশ্চিম বঙ্গ গবর্নেন্ট এই বিষয়ে বলিবার অধিকার দাবী না করিলে অত্যন্ত অজ্ঞান করিবেন। কেন্দ্রীয় গবর্নেন্টের সঙ্গে এই বিষয়ে বোঝাপড়া করিবার সময় কি আসে নাই? ১৯১২ সালে বঙ্গভঙ্গ রদের সময় বিহারের শাসন কার্যের সুবিধার জন্ত প্রায় ১৫২০ লক্ষ বাঙালীকে তাদের পৈত্রিক ভিটে-মাটি সহ নতুন প্রদেশে চালান দিয়াছিলেন বড়লাট হার্ডিঞ্জ সর আসী ইমামের পরামর্শে। সেই সময় হইতে বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের কর্ণভূমির প্রধানেরা এই বাঙালীদের সঙ্গে ব্যবহার করিতেছেন বিমাতার মতন। প্রায় পঁচিশ বৎসর বিহারের সঙ্গে উৎকল এক শাসনাধীনে সংযুক্ত ছিল। এই যোটক ভাঙ্গিয়া যখন উৎকল হইল স্বপ্রতিষ্ঠ, তখন সিংহভূম জিলার উড়িয়া অঞ্চল লইয়া একটা রেষারেষি চলিতেছিল বিহারের সঙ্গে; যেমন চলিতেছে মেদিনীপুর জিলার হাভন অঞ্চল ইত্যাদি লইয়া পশ্চিম বঙ্গের সঙ্গে। গত বৎসর, বোধ হয়, এই অঞ্চলে উৎকল ইউনিয়ন কনফারেন্সের একটি অধিবেশন বসিয়াছিল, উৎকলের দাবীর একটা সাক্ষ্যপ্রমাণ তৈয়ার করিবার জন্ত। তেলেগু ভাষাভাষীর সঙ্গে উড়িয়া ভাষাভাষীর একটা বিরোধ চলিতেছে দক্ষিণ অঞ্চল লইয়া। কোন কোন তেলেগু অঞ্চল, মনে হয়, উৎকলে আসিয়া পড়িয়াছে; দাবী-প্রতিদাবী উগ্র হইয়া উঠিয়া-

ছিল দুমহুমার মূলপ্রপাণ্ড লইয়া। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে স্বয়ং উৎকলের স্বয়ং-সম্পূর্ণ রূপ দিতে হইলে আমাদের উড়িয়া প্রতিবেশীদের বোঝাপড়া করিতে হইবে বাঙালী, বিহারী, তেলেগুর সঙ্গে। কেন্দ্রীয় গবর্নেন্ট সজাগ থাকিলে খারশোয়ানে যে সংঘর্ষ বাধিয়া উঠিয়াছে সে রূপ ঘটবে না। বিহারের কংগ্রেস নেতৃবর্গ এই সংঘর্ষের প্রশ্ন দিয়াছেন বলিয়া নানা দিক হইতে অভিযোগ শোনা যাইতেছে। স্বাধীন রাষ্ট্রের শাসক-শ্রেণী অনেক সময় ইচ্ছা করিয়াই বিবাদের এইরূপ উপকরণ সৃষ্টি করেন। রাষ্ট্রনীতিতে এইরূপ বলপ্রয়োগ দোষের নয়।

ব্রহ্মদেশের স্বাধীনতা

বিগত ১৯শে পৌষ (৪ঠা জানুয়ারী) ব্রহ্মদেশ ব্রিটিশ-শাসন হইতে মুক্তিলভ করিল। সার্কভৌম সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্র বলিয়া সে ঘোষণা করিল। ব্রিটিশ গবর্নেন্ট এই অধিকার মানিয়া লইয়াছেন। আপাতদৃষ্টে ব্রহ্মদেশের উপর ব্রিটেনের কোন প্রভাব-প্রতিপত্তি রহিল না। কার্যতঃ ফলাফল কি দেখা দিবে তাহা ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত আছে।

ব্রহ্মদেশ ভারতবর্ষের নিকট প্রতিবেশী। আমাদের দেশ-বিভাগ হওয়ার পরেও আসাম-সীমান্ত ব্রহ্মদেশের সীমান্তের সঙ্গে মিশিয়াছে। পূর্ববঙ্গের সীমান্ত ও ব্রহ্মদেশের সীমান্ত প্রায় দুই শত মাইল ব্যাপিয়া পরস্পর সংলগ্ন। প্রকৃতিদত্ত এই নৈকট্যই ব্রহ্মদেশের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধের সৃষ্টি করে নাই। বৌদ্ধযুগের পূর্বে এই প্রতিবেশী দুই দেশের মধ্যে কি সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছে। সে যাহাই হউক, ব্রহ্মদেশ যখন ছীনযান বৌদ্ধধর্ম অবলম্বন করে, তখন হইতে শাক্যমুনির জন্মভূমির সঙ্গে তাহার পরিচয় সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তবে এই প্রাচীন স্মৃতি-কথার উপর বর্তমান যুগের সম্বন্ধের ভিত্তি স্থাপিত হইবে না। ১৮৮৭ হইতে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশ এক শাসন-ব্যবস্থার অধীনে ছিল। এই সময়ের মধ্যে লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী ব্রহ্মদেশে নিজেদের জীবন-যাত্রার পথ খুঁজিয়া পাইয়াছে। ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রায় ১২ লক্ষ ভারতবাসী ব্রহ্মদেশে ছিলেন। জাপানী আক্রমণের ভয়ে তাঁদের অর্ধেক পলাইয়া আসিয়াছিলেন ভারতবর্ষে। ১৯৪৫ সালের যে মাসে ব্রহ্মদেশে ব্রিটিশ-শাসন আবার প্রতিষ্ঠিত হয়। এখন অনেক ভারতবাসী ফিরিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাহাদের অবস্থা ত্রিশছুর অবস্থার সঙ্গে তুলনীয়। তাহারা দুই রাষ্ট্রের নাগরিক হইতে পারেন না। ব্রহ্মদেশ আজ স্বাধীন, সুতরাং ব্রহ্ম-প্রবাসী ভারতবাসীকে একটা বাহিয়া লইতে হইবে। এই কাজ সহজ নয়। জন্মভূমির মায়া কাটাইয়া, সমস্ত সম্বন্ধ ছেদন করিয়া ব্রহ্মদেশের নাগরিক জীবনের গৌরব ও দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয়। নতুবা বিদেশীর মতন ব্রহ্মদেশে থাকিয়া কোন

কোন শিল্প ও ব্যবসায় ক্ষেত্রে ব্রহ্মীদের সঙ্গে জীবিকা উপার্জনের উপায় বুজিয়া লইতে হয়। ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসের পূর্বের মত দেশের চেষ্টা-সম্প্রদায়ের ব্রহ্মদেশের আর্থিক-জীবনে যে প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল, তাহা আজ সম্ভব নয়; ব্রহ্মদেশের হাটে-বাজারে বোম্বাই ও সুরাট বণিক সম্প্রদায়ের যে প্রভাব ছিল, তাহা থাকিতে পারে না; বাঙালী উকিল, ডাক্তার, সরকারী চাকুরীদার সংখ্যা কমিবে; বিহারী, উড়িয়া, বাঙালী, তেলেগু শ্রমিক রেজুন, আকিয়াদের বন্দরে ব্রহ্মদেশে পূর্বের স্থবিধা পাইবে না।

এই পরিবর্তন অপরিহার্য। আমাদের দেশে আমরা যেমন স্বাধীন রাষ্ট্র গড়িতে চাই, সেইরূপ ব্রহ্মদেশের নৃগণিকও এই সংগঠনের কাছে নিজেকে নিয়োগ করিতে চান। গত মহাযুদ্ধে সে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছে ইউ আউঙ্গ-সানের নেতৃত্বে; আবার জাপানীর বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করিয়াছে, ব্রিটিশকে সাহায্য করিয়াছে। মনে হইয়াছিল, নিজের দেশকে বুঝি আউঙ্গ-সান আবার ব্রিটিশ পদানত করিয়া দিলেন। কিন্তু দুই বৎসর যাইতে না যাইতে ব্রহ্মদেশের বৈপ্লবিক নেতৃত্ব আউঙ্গ-সানকে অগ্রণী করিয়া ব্রিটিশের অধিকার ছিনাইয়া লইল। সেই ব্রহ্মদেশ যেদিন স্বাধীনতা ঘোষণা করিল, সেই দিন আউঙ্গ-সান ইহজগতে নাই। আজ ব্রহ্মদেশ এক মহান আদর্শের পথে যাত্রা করিল। ব্রহ্ম-প্রবাসী ভারতবাসীকে ঐ স্বাধীন জাতির সঙ্গে সহযোগিতা করিয়া ব্রহ্মদেশ ও ভারতবর্ষের মধ্যে এক নতুন সম্বন্ধের সৃষ্টি করিতে হইবে। ব্রহ্মদেশের স্বাধীনতা-দিবসে ভারতবর্ষের প্রধান মন্ত্রী, পণ্ডিত জগদ্বলাল নেহেরু যে ভরসা দিয়াছিলেন, তাহা আমাদের সার্থক করিতে হইবে। “বহু যুগ হইতে ভারত ও ব্রহ্মদেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বর্তমান আছে। ভবিষ্যতে উত্তর দেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক স্থাপিত হইবে বলিয়া আমি আশা করি।”

খাতি-সমস্যা সমাধান

পাটনা নগরীতে ভারতীয় বিজ্ঞান পরিষদের পঞ্চত্রিংশ অধিবেশন শেষ হইয়াছে। বিহারের গবর্নর শ্রীজয়রামদাস দৌলভরাম এই অধিবেশন উদ্বোধন করিতে গিয়া “দরিদ্র, নর, ব্যাধিগ্রস্ত” জনগণের প্রতি বিজ্ঞানীদের কর্তব্য সম্বন্ধে নানা কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে ভারতীয় বিজ্ঞানীরা অদূরভবিষ্যতে কি করিতে পারেন, এই বিজ্ঞান পরিষদে তাহার অনেক আলোচনা হইয়াছে। এই উপলক্ষে “খাতি ও বিশ্বের জনসংখ্যা” সম্পর্কিত আলোচনা বৈঠক বসে। ভারত গবর্নমেন্টের খাতি-বিশেষজ্ঞ শ্রীবীরেশচন্দ্র গুহ আলোচনার সূত্রপাত করেন। তাঁহার বক্তৃতার যে বিবরণ দৈনিক সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা পাঠ করিয়া মনে হয় না যে ভারতবাসীর সমাবস্থাপন লোকদের খাতি, বস্ত্র ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উন্নতির আশা অদূর ভবিষ্যতে দেখা দিবে। বর্তমানে

পৃথিবীর জনসংখ্যা ২৫০ কোটি বলিয়া মনে করা হয়, এবং ১৯৬০ সালে তাহা বাড়িয়া যাইবে শতকরা ২০ জন করিয়া। অর্থাৎ ১৯৬০ সালে পৃথিবীর লোক সংখ্যা হইবে ৩০০ কোটি। তাহা হইলে আর্গামী ১২।১৩ বৎসরের মধ্যে খাতি-শস্ত্রের পরিমাণ শতকরা ২৫ ভাগ অন্ততঃ বাড়াইতে হইবে। ডাক্তার বীরেশ গুহ এই বৃদ্ধির নিম্নলিখিত হিসাব দিয়াছেন : খাতি, গম ইত্যাদি শতকরা ২১ ভাগ; মূল ও শিকড়জাত খাদ্যশস্য শতকরা ২৭ ভাগ; শর্করা শতকরা ১২ ভাগ; স্নেহপদার্থ শতকরা ৩৪ ভাগ; ডাল ইত্যাদি শতকরা ৮০ ভাগ; ফল ও শাকসবজি শতকরা ১৩০ ভাগ; মাংস শতকরা ৪৬ ভাগ ও দুগ্ধ শতকরা ১০০ ভাগ। এই বিরাট কার্য সম্পাদন করিতে হইলে জাতীয় বা আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে অগ্রসর হইতে হইবে। ডাঃ গুহ আশা করেন যে এই উপায়ে আমাদের দেশে আর্গামী দশ বৎসরের মধ্যে প্রতি একর (তিন বিঘা) ক্ষমিতে খাতিশস্ত্রের হার শতকরা ৩০ ভাগ বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। তৎপূর্বে আমাদের ক্ষমি বিলি ব্যবস্থার আবুল পরিবর্তন করিতে হইবে। কৃষিজীবীদের সরকারী সাহায্য দিতে হইবে। ব্রিটেন এই খাতে ব্যয় করে ৪০০ কোটি টাকা; আমাদের করিতে হইবে অন্ততঃ ৫০ কোটি টাকা। খাদ্য সম্বন্ধে সনাতন স্বাদ-আবাদও পরিবর্তন করিতে হইবে।

প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন

বোম্বাই নগরীতে গত ১০ই পৌষ তারিখে প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের পঞ্চবিংশ অধিবেশন আরম্ভ হয়। সম্মেলন উদ্বোধন করিতে গিয়া বোম্বাই প্রদেশের প্রধান মন্ত্রী শ্রীবলবন্ত রাও খের বঙ্গভাষায় তাঁহার অভিভাষণ আরম্ভ করেন। তৎপরে অবশ্য ইংরেজী ভাষায় অভিভাষণ শেষ করেন। এই উপলক্ষে তিনি ইংরেজী-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রভাষা শিক্ষার উপর দুই ছোঁর দেন। “ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে এতাবৎ আমাদের কাজ ভাল মতেই চলিয়াছে।” কিন্তু এই ভাষার প্রচলন এত সীমাবদ্ধ যে স্বাধীন ভারতে, জনগণের রাষ্ট্র-ব্যবহার, ইংরেজী ভাষা দ্বারা কাজ চলিবে বলিয়া মনে হয় না। সেইজন্যই তিনি বাঙালীকে “হিন্দী” শিক্ষা করিবার জন্ত আবেদন করেন। এসব কথার মধ্যে কোন বৈশিষ্ট্য নাই। কিন্তু “সমসংস্কৃতি-সম্পন্ন অধিবাসীদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার দাবী” এত উগ্র হইয়া উঠিতেছে যে ভারতের “মূলগত এক্যবোধ” বিপন্ন হইয়া পড়িতেছে। আমরা দেখিতেছি যে “নিজ প্রদেশের প্রতি প্রীতি প্রদর্শন” অস্বাভাবিক প্রদেশের প্রতি ঘৃণা ও অবজ্ঞার পরিণত হইতেছে এবং ভারতবর্ষের এক্যবোধ লোকের মন হইতে বিলীন হইয়া যাইতেছে। এই বিপদের কথা মনে করাইয়া দিয়া বলবন্ত রাও দেশের উপকার করিয়াছেন। ভেদ-বুদ্ধির প্রশ্রয় দিলে আমরা বিনষ্ট হইব, এই কথা জানিয়া ও বুঝিয়াও আমরা এই বিষয়কের মূলে কূঠারাদাত করিতে পারিতেছি না।

• যেতি বলিত। বর্তমান কালেও মি+কোহ বা মিছু (মুসাই জাতি), মি (বা যেই=মাছুষ)+থিরস বা মেইথাই (মণিপুরী জাতি) শব্দ প্রচলিত।

সমস্তল ভূমিতে আসিয়া জ্যোতিষজ্ঞাতির বাজের চাষও করিত। ভারতবর্ষে ইহারাই সর্বপ্রথম বাজের চাষ প্রবর্তন করে। সঙ্গে সঙ্গে কচু, হলদী, পান, সুপারির চাষও করিত। তাহাদের বিশ্বাস ছিল—পৃথিবী হইতে যে সব শস্য উৎপন্ন হয় তাহা পৃথিবীর গর্ভজাত সন্তান, কেননা প্রত্যক্ষভাবে দেখা যায় এইগুলি পৃথিবী ভেদ করিয়া জাত হয়। নারীজাতির গর্ভ হইতেও সন্তান উৎপন্ন হয়; সুতরাং নারী ও পৃথিবী সম্বন্ধী এবং উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। এইজন্য তাহারা নারীদিগকেই কৃষিকার্যে নিয়োগ করিত এবং নিজেরা গৃহের অন্তর্গত কার্য ও পণ্যাদি শিকারে ব্যস্ত থাকিত। বর্তমানেও উত্তর-পূর্ব ভারতে মাধারণ লোকের মধ্যে একটি প্রবল বিশ্বাস আছে যে একজন মেয়েলোক কোনও শস্তের বীজ বপন করিলে উহাতে ভাল ফসল হয়। অণুচি রজ্জ্বলা অবস্থায় কোন নারী কোন কচি বৃক্ষে জল দিলে বা কোনও বৃক্ষের ফল বা পুষ্প চয়ন করিলে ঐ বৃক্ষ মরিয়া যায়।

এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া উহারা নিজের দেশকে মাতৃ-সুশ্রূষা জান করিত। প্রাচীন কামরূপ বা বর্তমান আসামের ভৌগোলিক অবস্থানুযায়ী ইহার মেরুদণ্ড ব্রহ্মপুত্র বা লোহিতা নদ; উত্তর-পূর্ব অঞ্চল সদিয়া হইতে দরং জিলার জরালি নদী পর্যন্ত মণ্ডক; দরং হইতে রূপহি নদী পর্যন্ত কঠ ও বক্ষ; রূপহি নদী হইতে গোহাটীর নিম্নে মানস নদী পর্যন্ত পেট ও কোমর এবং ইহার নিম্নদেশ পদ। এই ভাবে দেশকে নারীমূর্তি করনা করা হইয়াছিল। পরবর্তী কালে এইসব অঞ্চল যথাক্রমে সোমার পীঠ, রত্নপীঠ, কামপীঠ ও জম্মপীঠ নামে পরিচিত হইয়াছিল।

গোহাটী বা দেশমাতৃকার কটদেশে মেরুদণ্ড ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ তীর সংলগ্ন শিলাময় পর্বত হইতে একটি প্রাকৃতিক উৎস নির্গত হইত। যে স্থানে উহা নির্গত হইত ঐ স্থানে এক বিঘত দীর্ঘ, এরূপ অস্থূলি প্রস্থ, নাভিগতীর ত্রিকোণাকার একটি গর্ভ ছিল। গর্ভের ভিতরস্থ শিলাখণ্ডের বর্ণ কিঞ্চিৎ রক্তাক্ত ছিল। আকৃতি, বর্ণ ও অবস্থিতি বিবেচনায় উহা দেশমাতৃকার যোনিদেশরূপে কল্পিত হইয়াছিল। তাহারা নিজেদের ভাষায় উহার নাম দিয়াছিল—কা-মাই-খা (মাতার প্রসবদ্বার বা মাতার স্বাভাবিক জলনির্গমন দ্বার)। এই শব্দই পরবর্তী-কালে সংস্কৃত কামাখ্যা এবং সতীর যোনিপীঠরূপে পরিগণিত হইয়াছে।

আসামে বৈশাখের প্রথম হইতেই কৃষিকর্মের আয়োজন আরম্ভ হয়। সুতরাং সেই সময়ই পৃথিবীকে গর্ভধারণের জন্ত উত্তেজিত করা প্রয়োজন। নারী ও পৃথিবী সম্বন্ধী বিশ্বাস এই সময় পুরুষ-মণি, যুবক-যুগ্মী একত্র মিলিয়া নানাপ্রকার কাম-

ভাবোদ্দীপক নৃত্যগীতে রত হইত। ইহা দ্বারা নারীদিগের জীবোদ্দীপনা হইত এবং কানে কানেই পৃথিবীর ও ঐ ভাব উদ্দীপিত হইত। এই প্রথাই আসামের প্রচলিত বিহীন ও বিহনাচ। বর্তমানে অবশ্য ইহাতে অনেকে অঙ্গীলতা দেখেন, কিন্তু প্রাচীনকালে ইহা জাতীয় মঙ্গলের জঙ্কই বর্ষাচরণরূপে প্রবর্তিত হইয়াছিল।

পৃথিবী কামভাবে উদ্দীপিত হইয়াছেন; এখন তাহার গর্ভাশয় সলল ও সুস্থ করিবার জন্ত যেরূদণ্ড ব্রহ্মপুত্র যোনি-পীঠের নিকট অশোক পুষ্প ও পত্র ভাসাইয়া দেওয়া হইত এবং মেয়েরা নদীর জলে স্নান করিত। অশোক গর্ভাশয়ের সর্ববিধ রোগের শ্রেষ্ঠ ঔষধ। এই আচারটি পরবর্তীকালে অশোকাষ্টমী রূপে পরিণত হইয়াছে। ব্রহ্মপুত্র তিন অঙ্গ নদীতে অশোকাষ্টমী স্নান হয় না।

আষাঢ় মাসে আসামে ষাট বপনের সময়। এই সময়েই পৃথিবীকে প্রকৃতপক্ষে গর্ভধারণ করিতে হইবে। সুতরাং গর্ভধারণের পূর্বলক্ষণ রজঃদর্শন হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। এইজন্য ষাটবপনের পূর্বকালে দেশমাতৃকার যোনিস্থানে—কা-মাই-খা স্থানে পৃথিবীর রজোদর্শন উৎসব করা হইত। এই উৎসব বর্তমানে অনুবাচী নামে পরিচিত। এই সময় চারি দিন পৃথিবীতে কর্ণ নিষেধ। কা-মাই-খা স্থানের তত্ত্বাবধায়ক বর্ষযাজক সম্প্রদায় খা-চাই, খাচাইয়া বা খাসিয়া (খার সন্তান)। বর্তমানে খাসিয়া যুবতীরা এই উৎসবের সময় নানা বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া সাবধানে অতি ধীর পদক্ষেপে এক প্রকার নৃত্য করিয়া আনন্দ প্রকাশ করে। ইহা নরক্রেম (একটি স্থানের নাম) নৃত্য নামে পরিচিত। ধীর পদক্ষেপ দেখিয়া এই নৃত্যকে অনেকে শিল্পবিহীন শিল্পিকা-বধ নৃত্য বলিয়া ব্যঙ্গ করেন। কিন্তু রজ্জ্বলা হওয়ার আনন্দ প্রকাশ করার নৃত্যে উচ্চাঙ্গ পাদক্ষেপ কোনমতেই অসম্ভব নহে।

তারপর শস্য বপন করা হইলে, চার মাস অতীত হইল, বরষী গর্ভধারণ করিয়াছেন; ধানের শীষে ক্ষীর সঞ্চার আরম্ভ হইয়াছে, এখন গর্ভবতীকে সাধ তক্ষণ করান প্রয়োজন। একটি ছোট কদলী বৃক্ষকে সোজা করিয়া দাঁড় করান হইত, এবং তাহার বক্ষে ছুইটি বিজ্জ্বল বাঁধিয়া দিয়া নিম্নভাগে অর্থাৎ উদরদেশে কালকচু, হরিদ্রা, মানকচু, বাজপাছ এবং জম্বতী, দাড়িম ও অশোকের ডাল ও পাতা ধৌত অপরাঙ্কিতার লতা দ্বারা (বিদ্যানিধি মহাশয় রজ্জ্বদ্বারা লিখিয়াছেন) বাঁধিয়া দেওয়া হইত, এবং পরে একখানা মাধারণ কাপড় দ্বারা ঘোমটা দিয়া কদলীবৃক্ষকে একটি লজ্জাবতী গর্ভবতী নারীরূপে সাজান হইত। ইহাই আধুনিক নবপঞ্জিকা বা কলা-বো।

লক্ষ্য করিবার বিষয়—কদলী, কালকচু, হরিদ্রা, মানকচু ও বাজ জ্যোতিষজ্ঞাতির প্রধান কৃষিজাত বস্ত, তাহারা এই সব শস্তেরই চাষ জানিত।

বিজ্জ্বল কোষ্ঠকাঠিভের প্রতিবেদক, জম্বতী স্তনিকার, দাড়িম

ভক্তদোষের, অশোক গর্ভদোষের এবং অপরাধিতা দেহা-বিকোর ঔষধ। সুতরাং গর্ভধারিণী এবং গর্ভস্থ শিশুর মঙ্গলের জন্য এই সব ঔষধি প্রয়োগ করা হইত। তারপর এই গর্ভ-ধারিণীর উদ্দেশ্যে ভাত, কচুর তরকারি ও পোড়া উপল সংগ্রহ দেওয়া হইত। প্রসাধন-দ্রব্যও দেওয়া হইত।

এই নবপঞ্জিকা বা কলা-বোঁ দুর্গাপূজার প্রধান দেবতা। তাঁহারই বোধান এবং বিসর্জন হয়; বহু স্থলে শুধু নব-পঞ্জিকারই পূজা হয়। এই নবপঞ্জিকাকে অনেক স্থানে প্রতিমা বলিয়া অভিহিত করা হয়। অন্যান্য ভোগের সঙ্গে আদিম অধিবাসীদের কচু ও পোড়ামংস্তের তরকারী আধুনিক কালেও একটি অপরিহার্য অঙ্গ।

সুতরাং গর্ভবতী নারীকে ভূতপ্রেতাদি হইতে রক্ষার জন্ত স্ততার বেটনী দিয়া, নাড়ীছেদের ছুরি ও স্তন্যসহ পৃথক বজ্রাবৃত গৃহে ষোমটা দিয়া রাখা অতি হুজিহুজ ব্যবস্থা। শস্ত-গর্ভা ধরিজীদেবী আজ সাধ তক্ষণ করিয়া ঐতুড় ঘরে বাস করিতেছেন। অন্যেরা আজ আনন্দ উৎসব করিতেছে। যে সব কুমারী এখনও রক্তধলা হয় নাই বা গর্ভধারণ করে নাই, তাহারাও পৃথিবীর সমধর্মী ও অংশবরণী, তাহাদের আনন্দ বিধান করিলে তাহাদেরই অপর অংশ—যিনি গর্ভধারণ করিয়াছেন, তাঁহার মঙ্গল হইবে। এইজন্মই কুমারী-পূজার ব্যবস্থা।

উৎসব শেষ হইবার সময় আশেপাশে যত ভূতপ্রেত বা গর্ভস্থ সন্তান নষ্টকারী অপদেবতা আছে তাহাদিগকে পালাপালি দিয়া ও কর্ধম ছিটাইয়া ভাঙান প্রয়োজন। তাহারা মাহুযকেই আশ্রয় করিয়া থাকে, আকাশে বাতাসেও থাকে। সুতরাং বেশক প্রাণ্য তাহার লোকে পরস্পরে পরস্পরের প্রতি ভগলিঙ্গ-বাচক শব্দ প্রয়োগ করিয়া অঙ্গীল বাক্য ব্যবহার করিত, অঙ্গীল নৃত্যগীত করিত এবং কর্ধম ছিটাইত। কালিকা পুরাণ-কার ইহাকে দুর্গাপূজার বিসর্জনের অঙ্গ বলিয়াছেন; কিন্তু ইহাকে শব্দ জাতির উৎসব বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বস্তুতঃ বোধান ভবা দুর্গাপূজাও শব্দ জাতির কৃষি উৎসব।

পার্কণ্য নাগারা আধিন-কাণ্ডিক মালে একটি উৎসব করিয়া গেনা পাণর প্রোথিত করে। ইহা তাহাদের বড় উৎসব। কচু, হলুদ, সীম, ভুটা আদি শস্তের বীজ একত্র করিয়া গরু বা মহিষের রক্তে রঞ্জিত করণান্তর গেনা পাণরের নীচে পুঁতিয়া ফেলে।

ধানপাছে পোকা লাগিলে একজন নারী উলঙ্গ হইয়া অঙ্গীল ভাষার পালাপালি দিতে দিতে হাতকেন্দ্র প্রদক্ষিণ করিয়া আসিলে পোকা ছাড়িয়া যায়, অনাবৃষ্টি হইলে এক-জন নারী উলঙ্গ হইয়া অঙ্গীল নৃত্যগীত করিলে বৃষ্টি হয়—এই বিশ্বাস অজ্ঞাপি অনেক পার্কণ্য জাতির মধ্যে আছে। দেশের ভবিষ্যৎ বিপদাপদ মঙ্গলামঙ্গলের কথা বলিবার জন্ত দেবধর্মী (দেবতার ধর্মী বা নারী) উপর দেবতার আবেশ

হয়। দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত কুমারীর মৃত্যু দেবতা সন্তুষ্ট হয়, সেইজন্মই দেবধর্মী-প্রথা।

গর্ভধারিণীকে সাধ তক্ষণ করান হইয়াছে, তাহার ঐতুড় ঘরের সমস্ত ব্যবস্থাও করা হইয়াছে, বিদ্যাদিত্ত বিমান করা হইয়াছে—সুতরাং গৃহধার্মীর এখন নিশ্চিন্ত মনে পত্ত শিকারে বা শত্রু নিধনে যাওয়া উচিত। এইজন্মই বিজয়ার পর দিবস হুজুজার বিধান। কামরূপের কোনও কোনও অঞ্চলে গ্রামবাসীরা দলবদ্ধ হইয়া শৃগাল বা শূকর বধ করিতে যায়। অতঃপর ধরিজীদেবীর সন্তানপ্রসব পর্ব। পৌষ মাসে বাঙ কাটীয়া ঘরে কসল তোলা হইলেই গর্ভবতী পৃথিবীর সন্তান প্রসব হইল। শেষরাত্রে গৃহস্থ সবজ্ঞে স্নান করিয়া শুচি হইলেন। প্রহতির গৃহে আগ্ন প্রজ্জালিত রাবিবার জন্ত মাঠে-স্থানে স্থানে বড়, পাতা, বাঁশ দ্বারা প্রস্তুত মেজি বা তেড়াঘরে আগুন ধরাইয়া দেওয়া হইল। তারপর সন্তানকে কোলে লইয়া পাড়া-প্রতিবেশীর সহিত পরস্পরে আনন্দ-উৎসব করে, অর্থাৎ কৃষিজাত কসল দ্বারা পিঠাপুলি প্রস্তুত করিয়া একে অপরকে ভোজন করাইয়া পৌষপার্কণ বা পিঠাপার্কণ উৎসব পালন করে।

সুতরাং মেঘা মাইতেছে, মহাবিশুব সংক্রান্তির বিহু উৎসব, আষাঢ়ের অম্বুবাচী, শরৎকালীন নবপঞ্জিকা, পৌষ-সংক্রান্তির পৌষ-পার্কণ—সমস্তই প্রাচীন অষ্টিক বা জোঁহিসু জাতির কৃষি উৎসব। আধুনিক কালেও আসামের পার্কণ্য জাতিরা বিশেষ কোনও নির্দিষ্ট দিবসে ঐ উৎসব পালন করে না। উৎসবের কাল উপস্থিত হইলে গ্রামপতির নির্দেশ অনুসারে সুযোগ-সুবিধামত যে-কোন দিবসে উহা পালিত হয়। প্রাচীন কামরূপে আর্ধ্যকৃষ্টি প্রবর্তিত হইলে তাহাদের জ্যোতিষ শাস্ত্র অনুযায়ী বিষুব দিনে ঐ সব উৎসব প্রতিপালিত হইতে আরম্ভ হয়। সুতরাং আদিম জাতির কৃষি-উৎসবের সঙ্গে আর্ধ্যজাতির জ্যোতিষিক তত্ত্বের সামঞ্জস্য করা সম্ভবপর হইয়া পড়ে।

আসামের সমস্ত ভূমিতে হাতকেন্দ্রের পরম শত্রু বড় মহিষ; ইঁহর এবং পক্ষী। সুতরাং এইগুলিকে বধ করা অথবা বশ করিয়া রাখা আদিবাসী কৃষকদের প্রধান কাম্য ছিল। হুকেরা তীরবহুক দ্বারা পক্ষী তাড়াইত, হাতী দ্বারা হাতকেন্দ্রের ইঁহরের গর্ভ মাড়াইয়া ইঁহর ভাঙান হইত। কিন্তু বড় মহিষকে বল্লম ও বড়গ দ্বারা বধ করা তির উপায়ান্তর ছিল না। সেইজন্ম ধরিজীদেবী নিজে মহিষকে বধ করেন এবং তাঁহার সন্তানগণ ইঁহর ও ময়ুরকে বাহ্যমুখে খবশে রাখেন। ইহাই আদি কল্পনা, পরে আর্ধ্যকৃষ্টি এই কল্পনাকে নানাভাবে রঞ্জিত করিয়া বানানুগ আভ্যুত্রে সজ্জিত করিয়া তুলিয়াছে।

ঈশ্বর প্রথম শতকে বা তাহার কিছু পূর্বে দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে মৈত্রক জাতিরা বলহুকালে একটি বাঁড়ের উদর ছুরিকাবিদ্ধ করিয়া, সেই রক্তে নিধেরা স্নাত হইয়া নীলনীলজি

অর্জন করিত এবং ঐ রক্ত শতক্ষেত্রের উপর ছিটাইয়া দিয়া পৃথিবীর উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি করিত। মৈত্রকগণ পশ্চিম ভারতে আসিয়া বসবাস করার পর ঐ অঞ্চলে বসন্ত ঋতুতে কৃষি আরম্ভ করার পূর্বে ষাঁড় বধের পরিবর্তে, মেঘবলির বিধান প্রবর্তিত করিল এবং রক্তের পরিবর্তে রক্তবর্ণ আবার মাটিতে এবং নারীদের অঙ্গে ছিটাইয়া দিয়া আদিরসাত্মক নৃত্য-গীতের দ্বারা তাহাদিগকে কামতাবোধীপিত করার আয়োজন করিল। ইহাদ্বারা পৃথিবীও উদ্ভীপিত হইতেন। এই প্রথাই হোলিখেলা। ঐক্য যুবতীদিগকে রক্তরাগে রঞ্জিত করিয়া আদিরসাত্মক নৃত্যগীতসহকারে দোল-যাত্রা করেন এবং পৃথিবীকে রক্তধলা করেন। সাত দিন পর

তত্ত্ব হলুদ রঙে রঞ্জিত করিয়া পৃথিবীকে শুচি করা হয়। ইহাই পূর্ণদোল।

দক্ষিণ-ভারতীয় ভাগবতকার শরৎকালে নিজ দেশের কৃষির সময় ঐক্যের রাসলীলার অবতারণা করিয়াছেন। উত্তর-পূর্ব ভারতের শীতগোবিন্দকার বসন্তকালে ঐ উৎসব করিয়াছেন। গুজরাট অঞ্চলের সাধারণ কৃষির সময় চৈত্র-বৈশাখ মাসে বলরাম গোপিনীগণের সহিত জলবিহার করিয়াছেন। ঐ সময় পরঃপ্রণালী দ্বারা জল নিয়াই কৃষি হয়, স্তত্রাং হলদ্বারা যথুনাকে আকর্ষণ করিয়া বলরামকে যুবতীদের সহিত আনন্দোৎসব করিতে হইয়াছিল। কাজেই রাসলীলার মূলও আদিম জাতির কৃষি-উৎসব বলিয়া অনুমান হইবে।

স্বাধীন ত্রিপুরা

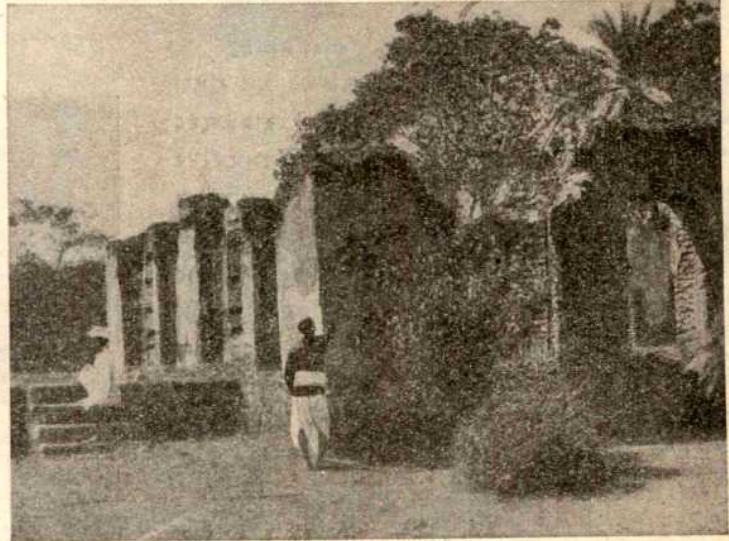
খ্রীস্টনীরপ্রকাশ সোম

ভারতের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অর্জনের অব্যবহিত পরেই ত্রিপুরা-রাজ্য ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করে। তাহার পর হইতেই পূর্ব-পাকিস্থান রাষ্ট্রের মুসলমানগণ এ রাজ্যে নানাপ্রকার অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করিতেছে। এই ত্রিপুরা-

রাজ্য অতি প্রাচীনকালে 'কিরিয়া' বা কিরাতরাজ্য নামে অভিহিত ছিল। ইহা ভারতের পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত। পুরাণ-কারগণ বঙ্গের প্রত্যন্তপ্রদেশস্থ প্রাচীন ত্রিপুরার শৌর্যবীর্ঘ্য ও রাজনীতিবিষয়ক বিবিধ তথ্য বর্ণনা করিয়াছেন। ঐতি-হাসিকগণ জনশ্রুতি ইত্যাদির উপর নির্ভর করিয়া 'রাজমালা' এবং অন্যান্য গ্রন্থনিচয় বাংলা ভাষায় লেখন করিয়া-ছেন, কিন্তু অনেক স্থলেই এই সমস্ত উপাদান নিতুল হয় নাই। যেমন বঙ্গদেশবাসী সকল জাতিই বাঙালী, উড়িষ্যাবাসীরা উড়িয়া, আসাম প্রদেশের অধিবাসীরা অসমীয়া আখ্যাপ্রাপ্ত হইয়াছে—তদ্রূপ ত্রিপুরাবাসী জাতি-সকলকে 'ত্রিপুর' বা 'ত্রিপুরী' আখ্যায় অভিহিত করা হইয়াছে। ত্রিপুররাজ্যের অতীত দৌরবাহিনী ও কৌটিকলাপ

শ্রবণ কুরিয়া ত্রিপুরাবাসিগণ আজও গর্ব অহঙ্কর করে। ত্রিপুরার রাজপরিবার ও ঠাকুর-পরিবারের লোকেরা নিজেদের 'ত্রিপুর ক্ষত্রিয়' নামে আখ্যাত করেন। মহারাজ জিলাচনের পরবর্তী এবং মহারাজ রত্নমাণিক্যের পূর্ববর্তী ভূপতিগণ 'কা' উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। এই 'কা' শব্দের অর্থ 'পিতা'। খ্রীষ্টান-

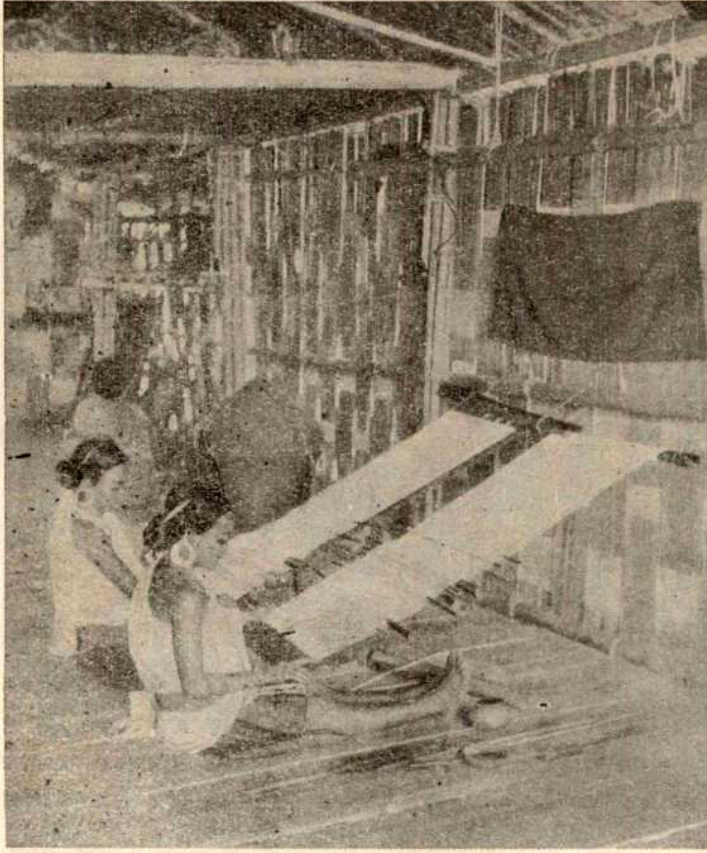
সমাজে বর্ণবাদকে 'কাদার' বলা হয়। তাহার ঈশ্বরকেও কাদার বলিয়া থাকেন। হিন্দু ও বৌদ্ধ সমাজেও এবিধ আখ্যার অভাব নাই। 'কা' শব্দের ব্যবহারও এগুলির অঙ্গরূপ—ত্রিপুরার রাজতন্ত্র প্রকার প্রকারের রাজাকে পিতা



চতুর্দশ দেবতার প্রাচীন মন্দির—উদয়পুর

বলিয়া সম্বোধন করিতেন। মহারাজ রত্নমাণিক্যের সময় হইতে 'কা' উপাধির পরিবর্তে 'মাণিক্য' উপাধি-ধারণ এই রাজবংশে প্রচলিত হয়।

ত্রিপুরারাজ্য পূর্বতঃস্থল বলিয়া অতীতে উক্ত অঞ্চল বিশেষ দুর্গম ছিল। রাজ্যের পশ্চিম ভাগ জলময় থাকার দূরবর্তী



বস্ত্রবয়নরতা কৃকি বালিকাভয়

স্থানে যাতায়াত নিত্যই কষ্টসাধ্য ও বিপজ্জনক ছিল বলিয়া জানা যায়। একতরফা ভাষায় দিনে পার্শ্ববর্তী রাজ্যবর্গের সহিত এখানকার রাজাদের এবং রাজপরিবারের লোকদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হওয়া সম্ভবপর ছিল না। রাজপরিবারে বহুবিবাহ-প্রথা অনেক দিন হইতেই প্রচলিত ছিল। কথিত আছে, মহারাজ জিলোচন শিল্পকলা-মিণুণা ২৪০টি মহিলার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। মহারাজ উদয়মাণিক্যও যে ২৪০টি বিবাহ করিয়াছিলেন তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। জিপুয়ার ইতিহাসে ইহাই সর্বোচ্চ বিবাহসংখ্যা। এতদ্ব্যতীত অজ্ঞাত পরিমাণে আর সকল রাজাই বহুবিবাহ করিয়াছেন। একাধিক মহিষী গ্রহণ না করার দৃষ্টান্ত জিপুয়েশ্বরগণের মধ্যে বিরল।

জিপুয়ার নৃপতিবৃন্দ প্রাচীন কৌলিক প্রথা বজায় রাখিতে সর্বদা সচেষ্ট ও যত্নবান। কথিত আছে, মহারাজ জিলোচনের বিবাহকালে রাজবাটীর বহিঃপ্রাঙ্গণে মনোহর বেদিকার উপর উপস্থাপিত একশটি চন্দ্রাতপ খাটাইয়া তাহার চারি কোণে মাদ্রাল্যচক কদলীবৃক্ষ, কাঠনির্মিত কদলী স্থাপন করা হইয়াছিল এবং বেদিকার চতুর্পার্শ্বে ফল-পুষ্প-পল্লব-প্রশোভিত মঙ্গলখট প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছিল। জিপুয়া রাজপরিবারে বিবাহ-

উৎসবে অদ্যাপি এই সকল নিয়ম যথাবিধি প্রতিপালিত হইতেছে। প্রবাদ আছে, জিলোচনের জন্মকালে তাঁহার ত্রিমেজ লক্ষিত হইয়াছিল। তদবধি রাজপরিবারে পুরুষগণের বিবাহকালে তাঁহাদের ললাটেদেশে চন্দ্রনদ্বারা একটি চক্ষু আঁকিয়া দেওয়ার রেওয়াজ হইয়াছে।

প্রাচীনকাল হইতেই জিপুয়ার রাজপরিবারে লোকদের শিক্ষার প্রতি বিশেষ অগ্রাধিকার ছিল। সেকালে যাতা-য়াতের সুব্যবহার অভাব নিবন্ধন জিপুয়ারাজ্যে শিক্ষা আশাহুত প্রসারলাভ করে নাই বটে, কিন্তু যেটুকু বিদ্যাচর্চা সেখানে ছিল তাহাও নেহাত উপেক্ষণীয় নহে। আর সেকালে সেখানে ক্ষুদ্র যে পুণ্ডিত বিজ্ঞান অধ্যয়ন হইত তেমন নহে। রাজনীতি, সমাজনীতি, আচার্যনীতি, যুদ্ধবিজ্ঞান, সঙ্গীতশাস্ত্র, আধ্যাতিক তত্ত্ব ইত্যাদি সকল বিষয়েরই চর্চা ছিল। শাস্ত্রিক স্বাধ্যের উন্নতি কল্পে মন্ত্র-বিজ্ঞানও অধ্যয়ন করিতে হইত। জিপুয়-চুপতিবৃন্দ বর্ষে বর্ষে বিশেষ উদার মতাবলম্বী ছিলেন; তাঁহারা সকলেই যে একই বর্ণবিশ্বাসের অনুসরণকারী ছিলেন তাহা নহে। কোন কোন রাজা স্বীয় বিশ্বাসানুসারে শৈব, শাক্ত বা বৈষ্ণব



এই কাঁদার বেদার হাতী বস্ত্র হস্ত

মতাবলম্বী হইয়াছেন এমন দৃষ্টান্ত জিপুয়ার ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়। রাজবংশ প্রথমতঃ শৈব ছিলেন, পরে মত

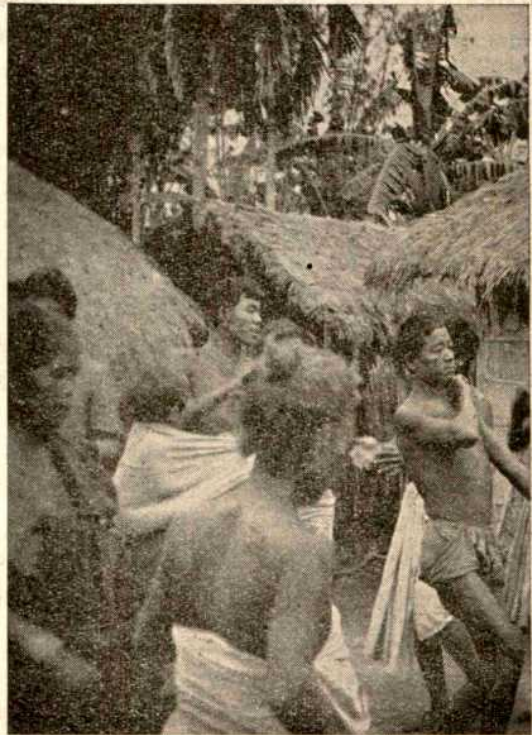


‘কের’ পুজার ত্রিপুরাবাসীদের নৃত্যোৎসব

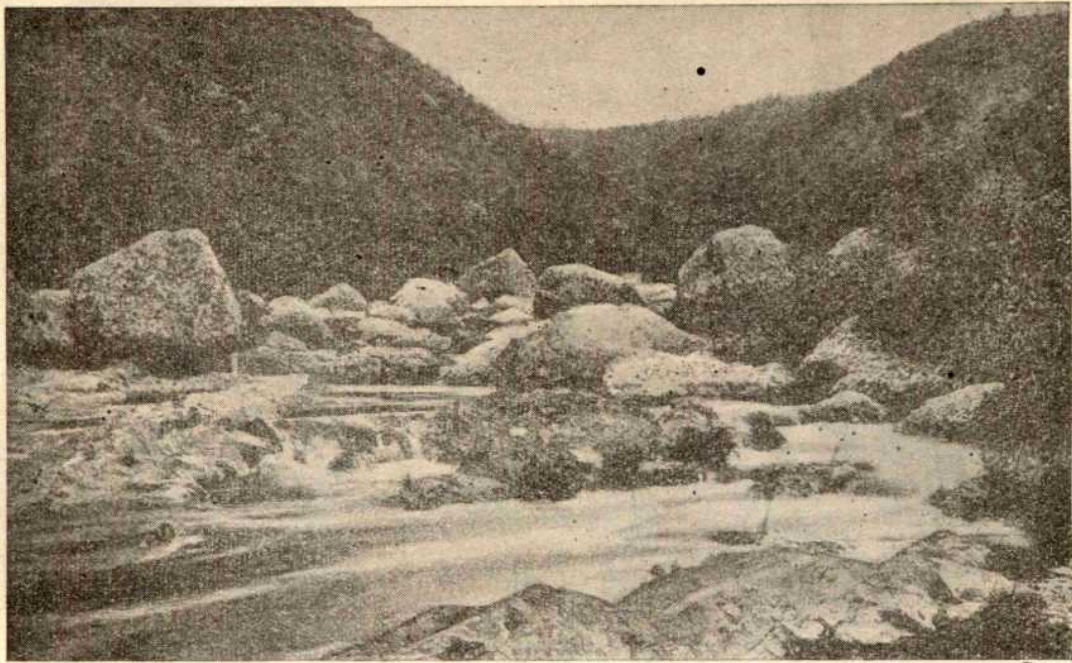
পরিবর্তনের দরুন বৈষ্ণব ধর্ম অবলম্বন করেন। কিন্তু তাঁহারা বৈষ্ণব হইলেও শৈব ও শাক্ত ধর্মের প্রতি চিরদিনই সমান আস্থাবান। তাঁহারা পুরুষাত্বক্ষেপে পীঠাধিষ্ঠাত্রী ত্রিপুরাত্মদেবীর সেবা করিয়া আসিতেছেন; বিবিধিতে ছাগাদি বলিদান দ্বারা এই দেবীর অর্চনা করা হয়। রাজপরিবারে কুলদেবতাদের মধ্যে শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণব সকল সম্প্রদায়ের উপাত্ত দেবদেবী আছেন। এই সকল দেবতার প্রীত্যর্থ আঞ্জিও ছাগাদি পশু বলি দেওয়ার প্রথা আছে। এমন কি রাজার অভিষেক উপলক্ষেও পাঁচা বলি দেওয়া হইয়া থাকে। এ দেশে রাজাদের প্রতিষ্ঠিত শিব ও শক্তিমূর্ত্তি এবং বিষ্ণু-বিগ্রহ অনেক আছে। চিত্রাচারিত প্রথাহুদারে আঞ্জিও শিব তুর্গা ও বিষ্ণু ইত্যাদি বিভিন্ন দেবদেবীর পুজার সমস্ত আয়োজন পাশাপাশিই হইয়া থাকে। রাজা স্বয়ং এই সকল পূজাপার্বণের পৃষ্ঠপোষক—যদিও ব্যক্তিগতভাবে তিনি বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী।

শিল্পকলার ক্ষেত্রে ত্রিপুরারাজ্যের প্রসিদ্ধি আছে। এখানকার বজ্রশিল্প বিশেষ উন্নত ধরণের। একজন বাস্তবিকই ইহারা গর্ব করিতে পারে। প্রাচীনকালেই ত্রিপুরা রাজ্যে শিল্পকলার বিকাশ হইয়াছিল। বজ্রশিল্প প্রথমতঃ ত্রিপুরা রাজ্যপ্রাসাদেই পুষ্ট হয়; পরে উহা রাজ্যময় পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। সুবড়া নামে এক রাজার চেষ্টায় ত্রিপুরার শিল্পকলার বিস্তার উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। কথিত আছে, কার্পাস তন্তুদ্বারা বজ্রবয়নের প্রথা তিনিই সর্বপ্রথম ত্রিপুরায় প্রবর্তন করেন। বজ্র-শিল্প ছাড়া আরও বিভিন্ন শিল্পকলার চর্চা সুবড়া রাজা নিজ রাজ্য-মধ্যে প্রবর্তন করিয়াছিলেন। ত্রিপুরার গভীর অরণ্যবাসী কুণ্ডী

ও টিপরা প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় প্রত্যেক আদিবাসার গৃহেই বাটিকা যুতী বৃদ্ধ সকলকেই তাঁত বুনিতে দেখা যায়। ইহা-



‘করচা’ পুজার নাচ গান

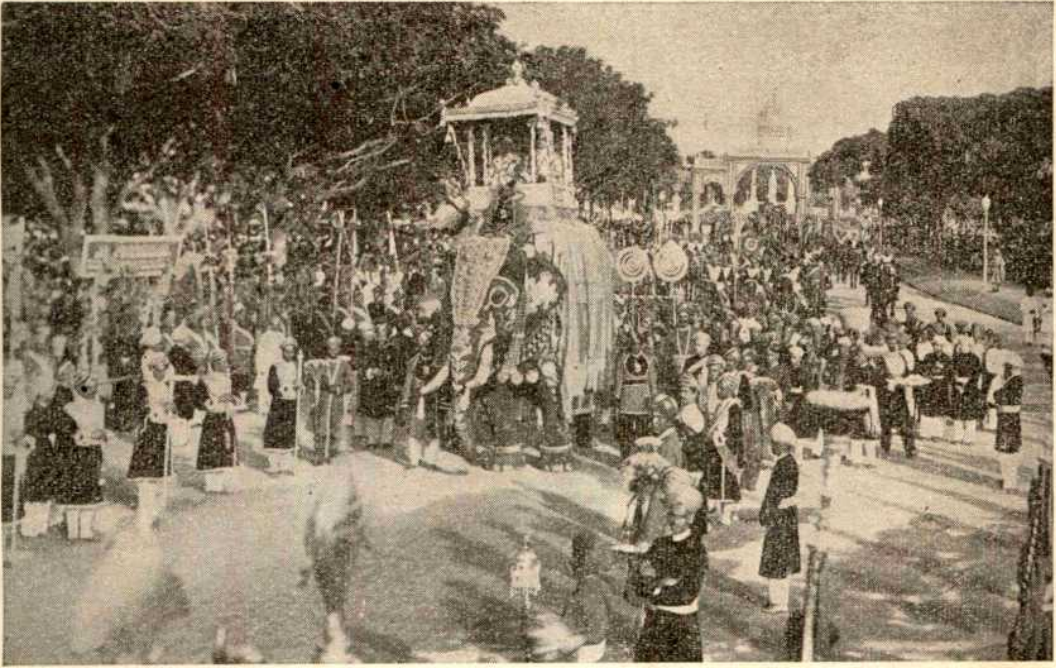


উদয়পুরের পথে

দের বজ্রবয়ননৈপুণ্য প্রশংসনীয়। তাহাদের সমাজে অত্যন্ত গৃহ-
কার্যের জন্য বয়নবিভাগ অবশ্যশিক্ষণীয়। জিপুরায় উপনিবিষ্ট
মণিপুরী সমাজেও বয়ন-শিল্পের বিশেষ প্রচলন আছে। জিপুরায়
বয়নশিল্পের প্রসার কিরণ, নীচেকার হিসাব হইতে তাহা বুঝা
যাইবে। ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দের আদমশুমারী মতে জিপুরারাজ্যে
পার্কৃত্য পদ্ধতিস্থিত গৃহের সংখ্যা ৩৪৮৫৬। এই সকল গৃহে
তাঁতের সংখ্যা দক্ষিণে ৩১৪৮৫। বয়নশিল্প ছাড়া চিত্র-শিল্প,
এবং তক্ষণশিল্পের ক্ষুদ্র জিপুরার খ্যাতি আছে। এমন কি,
বাঁশ, বেত ইত্যাদি দ্বারাও জিপুরাবাসীরা যে সকল দ্রব্য
নির্মাণ করে সেগুলিও উচ্চতর শিল্পনৈপুণ্যের পরিচায়ক।
রাজ-দরকারের সাহায্যে যাহাতে এই সকল শিল্পের উত্তরোত্তর
উন্নতি হয় তাহার চেষ্টা করা দরকার। বর্তমান কালে ভারত
সর্বমোটের স্বতন্ত্র নিয়ন্ত্রণ বিধির (yarn control order)
দ্বারা অতি অল্প পরিমাণে মাত্র এই রাজ্যে আসে। ইহার
ফলে বহুসংখ্যক তাঁতী আজ বেকার এবং দুর্দশাগ্রস্ত। ইহাদের
মধ্যে অনেকেই এখন দুই বেলা পেট ভরিয়া রাইতে পায় না।
রাজসরকার অবিলম্বে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন না করিলে
পরিণামে জিপুরারাজ্যে তাঁত-শিল্পের সমুদ্র ক্ষতি হইবার
সম্ভাবনা।

জিপুরারাজ্যের পূজা-অর্চনাদি হিন্দুশাস্ত্রের বিধান অনুযায়ীই
অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। আষাঢ় মাসের শুক্লাষ্টমীতে এখানে
বিপুল সমারোহে 'বাড়ি' পূজা হয়। ইহা চতুর্দশ দেবতার
একটি প্রধান উৎসব। এই পূজার পূর্বদিবস অপরাহ্নে চতুর্দশ

দেবতাকে মদীতে স্নান করান হয়। এই সময় শহরের
মরনারী নানা বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া দলে দলে দেবতাদের
স্নানযাত্রা দর্শন করে। ইহার পরবর্তী শনি কিংবা মঙ্গলবারে
আর একটি বিশেষ পূজা হয়, তাহাকে 'কের' পূজা বলে। এই
পূজা চতুর্দশ দেবতার পূজার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট।
চতুর্দশ এই পূজার প্রধান কর্তা। পূজা আরম্ভ হইবার পূর্বে
পূজাহীন হিসাবে একটি বিশেষ এলাকা স্থিরীকৃত হয়।
ইহাদের বিশ্বাস অর্চনাকালে সেই এলাকার মধ্যে কাহারও
জন্ম বা মৃত্যু হইলে পূজা পণ্ড হয়। এই ব্যাপারকে তাহার
অত্যন্ত অমঙ্গলজনক বলিয়া মনে করে। একই পূজা আরম্ভ
হইবার পূর্বেই বিশেষভাবে অনুসন্ধান করিয়া আসন্ন-প্রসবা
রমণী বা মৃত্যুশয্যাশায়ী স্ত্রীপুরুষদের এই সীমানার বাহিরে
লইয়া যাওয়া হয়। পূজার সময় মানুষ ও গৃহপালিত পশু
ইত্যাদি বাড়ীর বাহির হইতে পারে না। এই সময়ে কেহই
জায়া, জুতা, বড়ি, পাগড়ী ও ছাতা ব্যবহার করিতে পারে
না। গীতবাজ কোলাহল এমন কি উচ্চরবে কথা বলাও
'কের' পূজার সময় নিষিদ্ধ। স্বয়ং মহারাজাকেও এই নিয়ম
পুরাপুরি মানিয়া চলিতে হয়। এই সময়ে সকলকে এক দিন
দুই রাত্রি নিজ নিজ গৃহে আবদ্ধ থাকিতে হয়। অবশ্য বিশেষ
প্রয়োজনীয় কার্য সম্পাদনার্থে কিয়ৎকালের জন্য নগর-
বাসীদিগকে গৃহসীমানার বাহিরে যাইবার অধিকার দেওয়া
হয়। বহির্গমনের সময়টুকু তোপধ্বনি দ্বারা ঘোষিত হয়। ঐ
সময়ে সকলে বাহিরে আসে এবং ঘে ঘর কাছে লিপ্ত হয়।



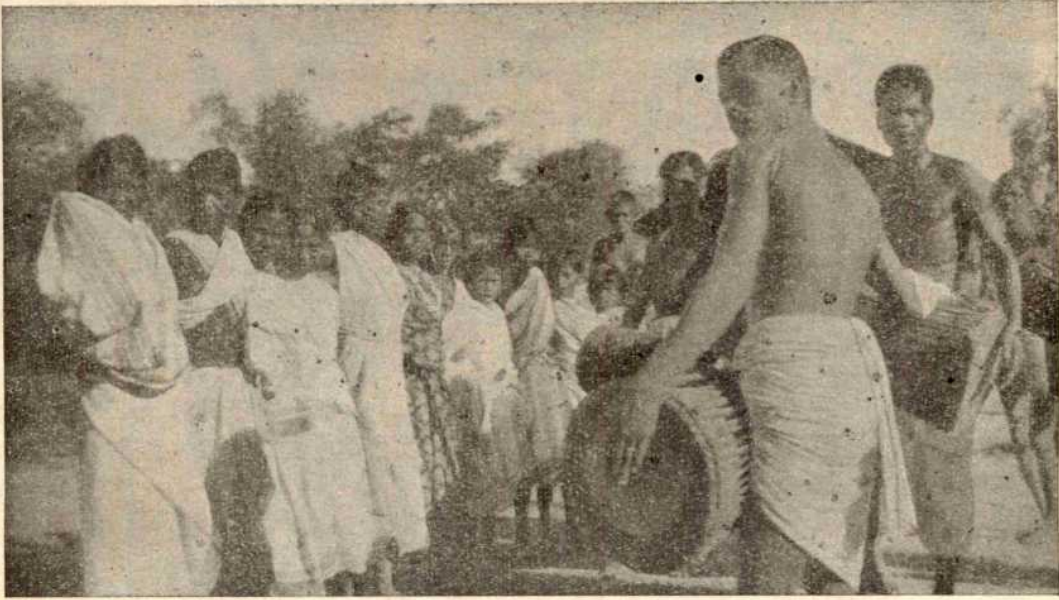
বিক্রম দশমীর মিছিলে হাতীপুঠে ছুতপূর্ব ত্রিপুরার মহারাজা

পুনরীকর ভোপক্ষনি হইলে সকলকেই গৃহে প্রবেশ করিতে হয়। প্রবাদ আছে, এই পূজার ফলে দৈবরূপায় দেশে নিরাপত্তা বিধান হয় এবং এই পূজা নিরীক্রে সম্পন্ন হওয়ার উপর এক বৎসরের জন্য রাজ্যের শুভাশুভ নির্ভর করে। প্রথম বারের পূজায় কোনরূপ বাধাবিঘ্ন ঘটিলে, সপ্তাহমধ্যেই শনি কিম্বা মঙ্গলবারে পুনরীকর বিশেষ সতর্কতার সহিত পূজার অনুষ্ঠান করা হয়। রাজধানীর পূজা নিরাপদে সম্পন্ন হইবার পরে প্রত্যেক পার্শ্বীয় পল্লীতে পুরোজ্ঞ নিয়মে 'কের' পূজা হয়। তৎকালে এই সব পল্লীতে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ।

বর্তমানে স্বাধীন ত্রিপুরা যখন ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদান করিয়াছে তখন এই রাজ্যের আত্মস্বরূপী অবস্থা সহজে দেশবাসীদের সম্যক জ্ঞান থাকা উচিত। বর্তমান কালে যে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাপ্প ভারতবর্ষের ও পাকিস্তানের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে ত্রিপুরারাজ্যে তাহার ছিটেকোটা প্রবেশ করিয়া সেখানকার বাতাসকেও কলুষিত করিয়া তুলিয়াছে। এ রাজ্যের মুসলমানগণ মুসলিম লীগের পক্ষপাতী—যদিও তাহার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার নিন্দা করেন। ত্রিপুরা-রাজ্য ভারতীয় ভোমিনিয়নে যোগদান করায় পূর্ব-পাকিস্তানের মুসলিম লীগ কাউন্সিল অসন্তুষ্ট। ছুতপূর্ব মহম্মদ বীর বিক্রমকিশোর মাণিক্য বাহাদুর সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়কে সর্বপ্রযত্নে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, তাহা সত্ত্বেও কিছু বহিরাগত মুসলমানগণ চক্রান্ত করিয়া এ রাজ্যে নানা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করিতেছে। বর্তমানে ত্রিপুরা



বর্তমানের শিকার অযেযণে কুকি প্রজা



টিপরাদের নৃত্যগীত



দেপাযুড়ার কয়েকটি পাহাড়ী হেলেমেয়ে

রাজ্যের লক্ষ্মী কর্জী হইতেছেন মহারাণী কাকনপ্রভা দেবী। তিনি রিক্লেসি কাউন্সিলের প্রেসিডেন্টরূপে শাসনকার্য পরিচালনা করিতেছেন। তাঁহার পুত্রই রাজ্যের উত্তরাধিকারী—তিনি এখন নাবালক। প্রকাশ, রাজসরকারের কর্মচারীদের বেতন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সামান্য বলিয়া অনেকে উৎকোচ গ্রহণ করিয়া থাকে। সাধারণ কেরাণী হইতে আরম্ভ করিয়া উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী পর্যন্ত প্রজাপ্রাণের নিকট হইতে ভেট লইয়া থাকেন। ফলে শাসনব্যবস্থা উত্তরোত্তর শিথিল হইয়া পড়িতেছে। পাহাড়ী প্রজাদের মধ্যে অধিকাংশই অভ্যস্ত গরীব। তাহাদের মধ্যে অনেকেই পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, পরনের কাপড় জুটাইতে পারে না। ছোট এক টুকরা কাপড় অথবা সূতার গোছা কোমরে জড়াইয়া কোনমতে লজ্জা নিবারণ করে। শহরে অনেক বাঙালীর বাস—তাঁহাদের মধ্যে ব্যবসাদার, উকিল, মোক্তার ইত্যাদির সংখ্যা নেহাৎ কম নয়। এখানকার বেশীর ভাগ বাঙালীই পূর্ববঙ্গ হইতে আগত। এ রাজ্যের অধিকাংশ বাড়ীতে বাঁশের ছাউনি, ঘরের বেড়াও বাঁশের তৈরি। জিপুয়ার অরণ্যে প্রচুর পরিমাণে বাঁশ জন্মে। এখান হইতে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের কাগজের কারখানায় প্রচুর বাঁশ চালান দেওয়া হয়। এজ্জাই এখানকার নদীবক্ষে ভাসমান বাঁশের প্রাচুর্য দেখা যায়। জঙ্গলে এত অধিক বাঁশ থাকিতেও আজ পর্যন্ত এ রাজ্যে কোনও কাগজের কল স্থাপিত হয় নাই। এ বিষয়ে রাজসরকার এক প্রকার উদাসীন বলিলেই চলে।

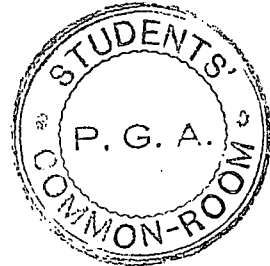
জিপুয়ার অতি সুস্বাদু আনারস প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় এবং দামও বেশ সস্তা। ইছা ছাড়া আম, কাঁঠাল, লেবু ইত্যাদি

অভ্যন্তরীণ ও এখানে বিশ্বের উৎপন্ন হয়। কিন্তু প্রজাসাধারণ অতি দরিদ্র বলিয়া এসব তাহাদের ভোগে লাগে না—বেশীর ভাগই রাজ্যের বাহিরে চালান যায়। ব্যবসায়ীরা এই সব কিনিয় অল্পতর লইয়া গিয়া বেশ ছুপয়সা লাভ করে। জিপুরার প্রচুর ধাতু উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই সব ধান হইতে যে চাউল হয় তাহা অতি সুগন্ধযুক্ত ও সুস্বাদু। এখানে চোরা-কারবার পুরাদমে চলিয়াছে। সেক্ষণ্য চাউলের মূল্য অত্যধিক। মোরাখালির সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামায় বাস্তব-ত্যাগী প্রায় ত্রিশ হাজার নরনারী এ রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। সেই সময়ে ইহাদের দেশান্তর ও ভরণপোষণের ভার এখানকার সিভিল সাপ্লাইজ ডিপার্টমেন্টের উপর পড়ে। বর্তমান লেখক তখন উক্ত বিভাগের ডিরেক্টর রূপে জিপুরারাজ্যে কাজ করিতেছিলেন। রেশনিং প্রবর্তিত করিয়া রাজ্যের মধ্যে সুষ্ঠুভাবে খাজদ্রব্য সরবরাহের ব্যবস্থা করা সত্ত্বেও চোরা-কারবার সম্পূর্ণ বন্ধ করা সম্ভবপর হয় নাই। এ রাজ্যের পুলিশ কনেটবল হইতে আরম্ভ করিয়া রাজ-পরিবারেরও কেবল কেবল নাকি কোন না কোন স্বত্রে এই নিষ্কর্মে ব্যাপারের সহিত জড়িত আছেন বলিয়া ইহা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করা সম্ভবপর হয় নাই। এখানে যে প্রচুর ধান্য উৎপন্ন হয় সে কথা আগেই বলিয়াছি। কিন্তু ইহার বেশীর ভাগই আধাউড়া, উঠিয়াছে।

সুমিলা ও আসাম সীমান্ত দিগা বাহিরে রপ্তানী হইয়া উচ্চ মূল্যে বিক্রীত হয়। জিপুরার মজ্জীমণ্ডলী অনেক চেষ্টা করিয়াও এখন পর্যন্ত এই অপচয় নিবারণ করিতে পারেন নাই। এ রাজ্যের শাসন-প্রথা মুগোপযোগী নহে, ইহা এখনো পুরনো পথ ধরিয়া চলিতেছে, সেইজন্য রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অনেক বিশৃঙ্খলা পরিলক্ষিত হয়। স্বাধীন ভারতের অন্যতম অঙ্গ হিসাবে জিপুরায় আও শাসন-সংস্কার প্রবর্তিত হওয়া প্রয়োজন। সম্প্রতি প্রজাসাধারণের মধ্যে এক অস্তিত্বব রাজ-নৈতিক চেতনার আভাস পরিলক্ষিত হইতেছে। তাহার রাজ-সরকারকে জানাইয়াছে যে তাহাদের আত্মাভিমান প্রতিনিধি-দের মারফত শাসনকার্য পরিচালনা করিতে হইবে। জিপুরা রাজসরকারও এ বিষয়ে বাদপ্রতিবাদ না করিয়া একটা সুনির্দিষ্ট নীতি অবলম্বনপূর্বক রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থার সামঞ্জস্য বিধান করিতে চেষ্টা করিতেছেন। ইহা সত্ত্বেও এ রাজ্যের আভ্যন্তরীণ পোলযোগ এখনও মিটে নাই। ঠাকুর-পরিবার ও রাজপরিবারের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে রেবারেঘি, বিবাদ-বিদ্রোহ, গোপন ষড়যন্ত্র ইত্যাদি লাগিয়াই আছে। ফলে সুষ্ঠুভাবে শাসনযন্ত্র পরিচালনা করা মজ্জীদের এবং উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিয়াছে।

মুখ

শ্রীমণীন্দ্র গুপ্ত



ধু-ধু করা পথ রৌদ্র-ছায়ায় জলছে
ঘুমোনো নগর খোলা-চোখ তবু বন্ধ :
পৃথিবীটা শুধু মুখ বুজে পথ চলছে
রাজি বুঝিবা অস্তিমানে কারো অন্ধ।

তবু এখানে আষাঢ় নামলো একদা
আকাশ ঝরানো কি যে তার নীল মিনতি
চোখ ডুবে গেল—স্মৃতিকা হ'ল বসদা
আজকে সে শুধু স্বপ্ন ঝরাঝরি নিয়তি।

তোমারো হয়তো ভুল হয়েছিল কিছুটা
চির বসন্ত পাবেই ভেবেছো তোমাকে ;

হৃদয় চোখে দেখো নি কো তাই পিছুটা—
তা হলে হয়তো দেখতেই তুমি আমাকে।

তবু প্রতীক্ষা গোপনে করেছি—কেন না
মনে মনে জানি একদা মধুর লয় ;
ফুটেবে জীবনে ফুল হোয়ে ভুল যেন না
তাই তো স্বপ্নে নিছেকে করেছি ময়।

কেন যে এল না আকাশ-ঝরা সে গোপুলি—
কত স্বপ্ন তো ছাই হয়ে গেল বাতাসে
ধু-ধু করা পথে জলছে যে আজ কি ধূলি ;
জ্যোৎস্নার মুখ কত দূরে—সে কি আকাশে ?

প্রাগৈতিহাসিক বাঙলাদেশ

ঐগিরিধারী রায়চৌধুরী •

জাতিতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্ব অধ্যয়নী প্রাগৈতিহাসিক ও প্রাচীন-তম বঙ্গ-বিভাগ এই রকম ছিল বলে ধারণা হয়, যেমন—(১) “রাঢ়” [=প্রাচীন উচ্চারণ, “রাঢ়ে < রাঢ়ে”]; (২) “সুম্বহ” [=প্রাচীন উচ্চারণ বা শব্দ, “সুম্বহের. [=Sumer]> সুম্বহর > সুম্বহ”]; (৩) “ডবাক্” [=প্রাচীন * “ডব্বক”]; (৪) “বদ্” [=প্রাচীন, “ম্যাঙ্ {=Muong}> রাঙ > রঙ”]; (৫) “পুণ্ডু” [=প্রাচীন শব্দ ও উচ্চারণ, “বুণ্ডু” * ও রূপভেদ “মুণ্ডু * > মুণ্ড”]; (৬) পৌড় [“পোড়, * গোঙ < গোঙ * বা গুঙ”=ছিল প্রাচীনতমরূপ]। এই রকম বঙ্গ-বিভাগ ঘটে থাকতে পারে এখন থেকে পাঁচ-ছয় হাজার বছর আগে। অল্পিক জাতির সভ্যতা অধ্যয়নী প্রাচীন বাঙলার বিশেষ কোন অংশ বা অঞ্চল বিশেষ কোন উপজাতির নামাঙ্ক্যাদী আখ্যাত হ’ত। অবশ্য আধ্যমহলেও এরকম নাম-করণ প্রথা ছিল, যেমন—ইরান < ইরান-হ্ < অর্য্য/আর্য্য-নাম” (= “দেশ বাচিহাৎ বাহল্যম্”, যেমন, “উত্তর-কোশলা-নাম”);^৪ “Hellas”=(সং) “হেলয়ঃ” < অর্য্যঃ / আর্য্যঃ। তখনকার দিনের বাঙলার সীমা ও আয়তন কি ছিল-ও কি রকম ছিল তা বলা দু’কর, তবে এখনকার দিনের অঙ্গরূপ ও

অধ্যয়নী যে ছিল না—একথা অনেকটা জোর দিয়েই বলা চলে। বুদ্ধি-তর্কের দ্বারা যতটুকু আন্দাজ করা যেতে পারে সেটা হচ্ছে এই যে, বাঙলার উত্তরে হিমালয় অর্থাৎ প্রাকৃতিক সীমা আজও যেমন আছে, অতীতেও তেমনি ছিল, দক্ষিণের বঙ্গোপসাগরও চিরদিনই বাঙলার দক্ষিণ সীমা। শুধু পূর্ব আর পশ্চিমের সীমা নির্ণয় করাই শক্ত। যুগে যুগে এই দুটো দিকের সীমা পরিবর্তিত হয়েছে। তারপর, পুরোজাত দুটি অংশ বা অঞ্চলের সীমা ও আয়তন কত দূর কি ছিল আজ তার খুঁটিনাটি বর্ণনা করা হুঃসাধ্য; শুধু এইটুকু বরেনেওরা যেতে পারে যে, “বদ্” (অর্থাৎ—“ম্যাঙ্ বা *ম্যাঙ্”) বলতে মধ্যের ঝানিকটা ও দক্ষিণের অনেকটা অঞ্চলই নির্দিষ্ট হ’ত। “রাঢ়” (অর্থাৎ “রাঢ় বা রাঢ়ে”) বলতে ভাগীরথীর উত্তর-পশ্চিম পারের ঝানিকটা অংশ বোঝাত। “পৌড়” (অর্থাৎ “পোড়” বা “গোঙ” * কি “গোঙু” *—“গুঙু”) বলতে বর্তমানের পৌড় ও তার আশপাশের অঞ্চল নির্ণীত হ’ত। “পুণ্ডু” (অর্থাৎ—“বুণ্ডু * বা মুণ্ডু—মুণ্ড”) অঞ্চল ছিল উত্তর বঙ্গের কতকটা জুড়ে, হয়ত পুরাণ-ইতিহাসে বর্ণিত “পৌণ্ডু-বর্জন” রাজ্য কি “পৌণ্ডু-বর্জন-ভুক্তি”^৫। কিন্তু বিভিন্ন যুগে পৃথক পৃথক ভাবে এই সব অংশ বা অঞ্চলের সীমা ও আয়তন কি পরিমাণ হ্রাস ও বৃদ্ধি পেয়েছিল তা বলা দু’কর।

এখন প্রাচীনতম বঙ্গের এই সব অংশ বা অঞ্চলগুলির আখ্যা-যে-কোন লোকের কাছে নতুন বলে মনে হবে, সেজন্য এখানে তার কিঞ্চিৎ আলোচনা করা দরকার। মোটামুটিভাবে ভাষাতত্ত্ব ও নৃতত্ত্বের সঙ্গোঙ্গ জাতিভাত্তিক

* তারকা চিহ্ন অস্থায়ী বোঝায়। যে শব্দের আগে এই চিহ্ন থাকবে, বুঝতে হবে যে সেই শব্দটি অস্থায়ী।

১। হয়ত—“সুম্বহ, সুম্বহর, সুম্বহের” আগলে “সুম্ব, সুম্বর, সুম্বের” ছিল।

২। “ডবাক্” শব্দ থেকেই witch কি sibyl অর্থক বাঙলা “ডাক—ডাকিনী” ও “ডাকু—ডাকাত” শব্দের উৎপত্তি। ডাক—ডাকিনী বাঙলার নিম্ন ও বহু প্রাচীন, তাই শব্দটি অল্পিক বঙ্গেই মনে হয়। কিন্তু “ডাক—ডাকাত”র সঙ্গে এই শব্দের কোন সম্পর্ক নেই। তার সম্পর্ক মূল * “ঢক—ঢকা” শব্দের সঙ্গেই। বলা বাহুল্য যে, বর্তমানের “ঢাকা” নাম ও শব্দ ডবাক্ এরই অবশিষ্ট।

৩। “আর্য্যনাম্”—ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের গবেষণার ফল।

৪। “Hellas” সং-প্রস্তাবিত। হিন্দু বৈয়াকরণেরা শব্দটিকে “হেলয়ঃ” বলে নিয়েছেন—অর্থাৎ দেশ বা দ্বাপ বাচক শব্দটিকে জাতিবাচক হিসাবে। তাতে কিছু যায় আসে না। কিন্তু তাঁরা যে ভাবে শব্দটিকে বিচ্ছিন্ন করে দেখিয়েছেন, যেমন—হে অরয়ঃ=হে অ লয়ঃ>হেলয়ঃ—তা কিন্তু কৌতুক-কর (প্রস্তব্যঃ—নীলকণ্ঠ-সম্পাদিত মহাভারতম্ গ্রন্থের আদি পর্বের “কুরুবাহ” পর্বাব্যায় ও পাতঞ্জলকৃত মহাভাষ্যের প্রথম দিক)।

৫। “অদ্”র সঙ্গে আমরা “বদ্”র সম্পর্ক স্বীকার করি—অর্থাৎ যে ধারণাটা প্রাচীন হিন্দুদের মধ্যে ছিল বলেই আমরা এই রকম কথার দ্বারা প্রমাণ পাই যে—অদ্, বদ্, কলিদ্, রাঢ়, স্কন্দ প্রভৃতি পঞ্চ পুত্র দীর্ঘতম। ঋষি কর্তৃক বলিপত্নী অদেকার গর্ভে উৎপন্ন হয়। তার উৎপত্তি হয়ে থাকতে পারে এ দেশীয় প্রাচীন জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ঐতিহ্য ও কিসদন্তী থেকে যার নিহিতার্থ এই হতে পারে যে, পুরোজাত উপজাতিগুলি পরস্পর জাতি সম্পর্কীয়—তা আমরা মানি। এমন কি, নাগা একটা জাতির নাম যার পূর্বরূপ ছিল * “নগগ < নঙ্ < নঙা < ন্যঙ”—তার ও এই মূল “ম্যাঙ-ম্যাঙ্” উপ-জাতিরই জাতি। সম্ভবতঃ * “উঅঙ, বা, অ্যঙ্” মূল শব্দ থেকে ওই “অদ্” শব্দ উদ্ভূত হয়েছিল।

৬। “ভুক্তি” এখনকার “বিভাগের” অঙ্গরূপ, shire বা “জেলা” চেয়ে বড়।

উপাদান থেকে এই আখ্যাগুলি গৃহীত হয়েছে। “রাচে”^৭ ছিল মূলতঃ বিরাট অষ্ট্রিক-গোঁজীর উপজাতি-বিশেষের-ও তাদের ভাষা কি উপজাতির নাম : মূল “রাচে বা.রাচ” ধ্বনির বিকৃতির ফলে পরবর্তী কালে “রাচ” রূপ ধারণ করেছিল। আবার তা থেকে “র-লম্বোঃ, ড লম্বোরভেদঃ” নিম্নমাহুয়ারী “লাচ”^৮ নামের উদ্ভব হয়। এ একই মূল শব্দ থেকে আবার লাল (=“লালু”) শব্দের উৎপত্তি হয়। পঞ্জাবের অঞ্চল-বিশেষ “লাল” নামে কথিত হয় ও অজরাটে “লাচ” নামীয় অঞ্চল আছে। “সুম্হর-সুম্হের”-ও একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ উপ-জাতি বিশেষের নাম। সুতরাং তাদের ভাষারও নাম বটে। এই একই শব্দ থেকে “সুম্হ” ও “সুমের” শব্দের উৎপত্তি সম্ভবপর। কিন্তু মজা হচ্ছে এই যে, সুম্হ-রা নিঃসন্দেহে প্রাচীনতম বা প্রাগৈতিহাসিক বাঙলার উপনিবেশ স্থাপনকারী একটা উপজাতি, সেই হিসাবে অষ্ট্রিক-গোঁজীর অন্তর্ভুক্ত। দ্রাবিড়দের সঙ্গে এদের এক করে ফেলা চলে না, কারণ তারা আরও পূর্বের যুগের উপনিবেশকারী। কিন্তু সুমের-দের অর্থাৎ Sumerian-দের পণ্ডিতরা অষ্ট্রিক-গোঁজীর উপ-জাতি বলে ঠিক বীকার করেন না—অর্থাৎ কড়কটী সন্দেহ পোষণ করেন। সুমেরদের সঙ্গে দ্রাবিড়দের বহু বিষয়ে বহু মিল দেখতে পাওয়া যায়। যত্ন-কো-দড়োর প্রাগৈতিহাসিক সম্পদরাশিই হচ্ছে মূলতঃ তার প্রমাণ ও নিদর্শন। শব্দের দিক থেকেও যে মিল নেই এমন নয়, যেমন দগর-বাচক সুমেরীয় শব্দ হচ্ছে “উর” (=ur), “আর দ্রাবিড়ীয় (মোটামুটিভাবে) শব্দ হচ্ছে “কুর”^৯—যা ঋণ করে আর্ধ্য-গোঁজীতে “পুর-পুরী” শব্দ বিকাশ পায়। আশ্চর্যের কথা হচ্ছে কিন্তু এই যে, অষ্ট্রিক-গোঁজীর অনেকগুলি উপ-ভাষাতে এই একই “উর” শব্দ নগ্নার্থে ব্যবহৃত হয়। এ ছাড়া এমন আরও অনেক শব্দ আছে যা সুমেরীয় ভাষাতে এবং অষ্ট্রিক-গোঁজীর উপভাষাগুলিতে^{১০} (বা তাদের কোন একটির মধ্যেও) সমান ভাবে মেলে, এবং শুধু যা দেখা যায় তা নগ্নার্থে। সম্ভবতঃ বাঙলার এই সুম্হ উপজাতির শাখাই

পুরাকালে মধ্য এশিয়া ঋণে নাগরিক সভ্যতার পত্তন করেছিল। বলা বাহুল্য, পরবর্তী কালে এই মূল “সুম্হর-ও সুম্হের” শব্দের অন্তর্গত “র”-ধ্বনি অপ্রচলিত হয়ে যাওয়ার “সুম্হ” শব্দের উদ্ভব হয়, আবার তা থেকে প্রাকৃত “সুম্ভ” শব্দের উদ্ভব হয়। মৌলিক *গোঁ-গু-গু-জাতি থেকে বর্তমানে “গোন্দ”-জাতির উদ্ভব। বর্তমানে আমরা তাদের দ্রাবিড় ভাষাভাষী-রূপে দেখতে পাই, সেইজন্য তাদের অনেকে দ্রাবিড় বলে মনে করেন। কিন্তু আসলে তারা কোন অষ্ট্রিক-উপজাতিই—অজা, যেমন, সুম্হ, রাচ, বঙ্গ প্রভৃতির অন্তর্গত। গুও, চও বা হুও (“<হুও”), পুও বা *হুও, বা *হুও (=“হুও”) প্রভৃতি অষ্ট্রিক উপজাতির সম্ভাব্য এই *গোঁ-গু-গু-জাতি (=“গোন্দ”) উপজাতি। এ প্রসঙ্গে এটুকু বলে দেওয়া দরকার যে একেবারে সাম্প্রতিক বা সর্বাধুনিক মতামতময়ী “দ্রুহিট” বা “দ্রুহিল্ট-দ্রুহিল্ট” (=দ্রাবিড়) জাতি মূল অষ্ট্রিক জাতিরই সুম্হ উপনিবিষ্ট শাখা^{১২} বিশেষ। অজা অনেক উপজাতির বহুপূর্বকালে এই দলে-ভারী উপজাতিটি মূলতঃ এক সাধারণ বাসকেত্র থেকে বেরিয়ে পড়ে ভূমধ্যসাগরীয় তীরভূমিতে গিয়ে বসবাস শুরু করেছিল। তার পর আবার তারা এই দ্বিতীয় সাধারণ বাসকেত্র ছেড়ে ক্রমশঃ দক্ষিণ পূর্বের দেশগুলিতে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে উপনিবিষ্ট হতে থাকে। হয়ত মধ্য এশিয়ায় নাগরিক সভ্যতার পত্তন এই মূল জাতিরই কোন শাখা করেছিল।

তারপর সেখান থেকে ক্রমশঃ তারা ভারতের সীমার বহির্ভূত কিন্তু ভারতের উত্তর-পশ্চিম দিকের দেশগুলিতে উপনিবিষ্ট হয় এবং সেখান থেকে ভারতে প্রবেশ করে। বলা বাহুল্য, এই দুই জাতির মধ্যে অমিলের চেয়ে মিল অনেক বেশী। সেই হিসাবে ভারতবর্ষে এমনও বটে থাকতে পারে যে, দ্রাবিড় সারিষ্য ও সংস্পর্শে একভাবে বহু যুগ, বহু পুরুষ ধরে বাস করার কালে “গোন্দ” জাতি নিজের ভাষা ভ্যাগ করে দ্রাবিড় ভাষা গ্রহণ করেছিল। ব্যাপারটা বেহাং আওতার চাপের ফল আর এরকম ঘটনা জগতে মানব সভ্যতার ইতিহাসে একেবারে যে বিরল তাও নয়। তা ছাড়া এখনও পর্যন্ত ভারতের যে প্রদেশে গোন্দরা সবচেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ বলে দৃষ্ট হয়, সে প্রদেশটি হচ্ছে ছোটনাগপুর সমেত মধ্যপ্রদেশ। এই মধ্যপ্রদেশের পাশেই প্রাচীন কলিঙ্গ প্রদেশ। কলিঙ্গ ছিল দ্রাবিড় অধ্যুষিত ও দ্রাবিড় প্রভাবাধিত। সংস্কৃত-কলিঙ্গ শব্দ উদ্ভূত হয়ে থাকতে পারে *কো-১৩

৭। দ্রষ্টব্য—

Pre-Aryans and Pre-Dravidians in India—by Jean Przyluski, Jules Bloch and Sylvain Levi—translated into English by Dr. P. C. Bagchi, page 23

৮। বিহারের “নাচাবন বিহারের” “নাচা,” বাঙলা “নেড়া নেড়ি”র জাতি সম্পর্কীয় যেহেতু একই মূল শব্দ থেকে উদ্ভূত।

৯। সংস্কৃত “কুট, কুটিল” শব্দ ওই একই ‘কুর’ শব্দ থেকে উদ্ভূত। উপরন্তু “কুটিল কুটিল”ও তাই।

১০। দ্রষ্টব্য—

Pre-Aryans and Pre-Dravidians in India—by Sylvain Levi, Jean Przyluski and Jules Bloch—translated into English by Dr. P. C. Bagchi (C. U. pub.) pages 146 & ff.

১১। এই মূল “গোঁ-গু-গু-জাতি” শব্দ থেকে বাঙলা উপাধিবাচক “গোঁড়” ও “গুড়া” শব্দের উৎপত্তি।

১২। জার্মান-মৃত্যুবিজ্ঞানের গবেষণা ও মতামতময়ী দ্রাবিড় জাতি মূলতঃ অষ্ট্রিকদের সঙ্গে অভিন্ন।

১৩। এই প্রসঙ্গে খাসি (Khasi) শব্দ “Ka-lynkor”-এর উল্লেখ করা যেতে পারে যার অর্থ হয় “লাঙ্গল”। দ্রষ্টব্য—

লক্” কি “কো-১৩ লক্”—অনার্য শব্দ থেকে, এবং তার প্রাচীন উচ্চারণ “কো-লিক্” ছিল বলেই মনে হয়। আনার্যিক “কো-লক্-কো-লক্”—শব্দের অর্থ হয়, রাজ-চিহ্ন। “কোল”+“লক্” বা লক্=“কোল-ক্-কোলক্”ও হতে পারে, কিন্তু এক্ষেত্রে তা না হওয়াই সম্ভব। রাজচিহ্ন সম্পন্ন জাতির দেশ অর্থই আমাদের কাছে সম্ভব বলে বোধ হয়। অর্থাৎ দ্রাবিড়রা নিজেদের রাজ্যের জাত বলে মনে করত—অর্থাৎ কিনা উচ্চাঙ্গ সম্পন্ন ছিল; তার প্রমাণ অজ্ঞাত বহু পাওয়া যায়। যাই হোক, অধিক “গোও” বা ১৪গুও—শব্দ কালক্রমে পরিবর্তিত হয়ে সংস্কৃত ভাষায় ‘গৌড়’রূপ ধারণ করে। কেউ কেউ এই গৌড় শব্দকে সংস্কৃত “গৌর” শব্দের অপভ্রংশ রূপ বলে মনে করেন। এমন মনে করারও যথেষ্ট কারণ আছে—কেন না, জায়গা-বিশেষে তা ঘটেছে, যেমন, (নদীর নাম)=“গৌরী” হয়ে দাঁড়িয়েছিল “গৌড়ী” এবং তা থেকে “গোড়ৈ” রূপের উদ্ভব হয়। সাম্প্রতিক যুগে এই অকৃত্রিম “গোড়ৈ”কে অর্থহীন বা কৃত্রিম ধরে নিয়ে পণ্ডিতের দল তার মর্মে—“ইআ”—প্রত্যয় যোগ করে “গোড়িয়া” শব্দ (স্থান-বিশেষের নাম) তৈরি করে নিয়েছেন। এর অর্থ হ’ল “গৌরী” বা “গৌড়ী নদীর তীরবর্তী স্থান, কি গ্রাম। সংস্কৃত “গৌড়ীয়” শব্দ থেকে আধুনিক “গড়িয়া” রূপের উৎপত্তি হয়েছে—এমন যদি কেউ মনে ভাবেন তবে তিনি নির্ধাত ভুল করবেন বলে আমরা মনে করি। তবু গৌড়ের উৎপত্তি যদি কেউ ভাবেন গো-বাচক (বৈঃ-সং) § “গৌর” শব্দ থেকেই হয়েছে, কেন না এ অঞ্চলটিতে বড় গরু খুব বেশী পাওয়া যেত, তা হলেও ভুল হতে পারে। যে হেতু আমরা অজ্ঞাত অংশ বা অঞ্চলগুলির আধ্যাত্মিকভাবে ভিন্ন ভিন্ন উপজাতির নামই পাচ্ছি, সেই হেতু আমরা “গুও”-গোও” শব্দকেই গৌড়-এর প্রজননিত্য বলে ধরে নেওয়া সমীচীন মনে করি। ডবাক শব্দের আধুনিক অবশেষ “ঢাকা” হলেও, ঠিক ঢাকা-অঞ্চলই পূর্বকালে ডবাক নামে কথিত হ’ত কি-না সে বিষয়ে যথেষ্ট মতদ্বৈধ আছে। তাই আমরা ডবাক-অঞ্চল নির্ণয় করতে অশক্ত। “পুও” বা “বুও” বা “মুও” অঞ্চল ছিল উত্তর-বঙ্গের ঝানিকটা, কারণ আর ঝানিকটা ছিল কামরূপ, অন্ততঃ যে অংশটুকুর পরিচয় মহাভারত থেকে লক্ষণ সেনের অহুশাসনে পর্যন্ত পাওয়া যায়, অবশ্য বিভিন্ন যুগে তার হ্রাস-বৃদ্ধি

সম্মত। “পুও” শব্দের ১৫ উল্লেখ বৈদিক সাহিত্যেও আছে, পুনরুক্তির ভয়েও অনেকের জানা আছে বলে এখানে আর তা দিতে চাই না। বোধ হয় “পুও” শব্দের দ্বারা বৈদিক আর্ষ্যরা উপজাতিটিকেই বোঝাত এবং “পৌও” শব্দের দ্বারা জনপদ কি অধিষ্ঠানটিকেই বুঝাত। এই মূল অধিক ধর্মিট সংস্কৃতে “পুও ও পৌও” রূপে গৃহীত হয়েছিল—তার কারণ বোধ হয় অধিক ও-কার ধ্বনি (ঠিক এধবকার মত ও-স্বর না হলেও) সংস্কৃতে ও-কার রূপে গৃহীত হ’ত, তাই “গুও” বা “গৌও” ধ্বনির পরিণতি হয়েছিল গৌড়-এ, “পুও”-এর পরিণতি হয়েছিল পৌও-এ; “চও” বা “চুও”—শব্দ থেকে উদ্ভূত কোন ও-স্বর যুক্ত (হয়ত, “চোড় কি, চুড় কি, চোড়”) শব্দের পরিণতি হয়েছিল “চৌর”-এ। “ম্যঙ” বা “ম্যঙ” (Muong) একটি অধিক-গৌড়ীর উপজাতির ও ভাষা কি উপভাষার নাম। আসলে ভাষা কি, উপভাষার নাম থেকেই আমরা উপজাতির অস্তিত্ব ধরে নিয়েছি। কালক্রমে “ম্যঙ” (-ম্যঙ) ও তার রূপভেদ (=ম্যঙ) “ম্যঙ” যথাক্রমে “মঙ্গ ও বঙ্গ”-এ পরিণত হয়, আবার তাদের সঙ্গে “অল কি, আল” প্রত্যয় যোগ করে “মঙ্গল” (-মোঙ্গল) ও “বঙ্গল-বঙ্গাল” শব্দের সৃষ্টি হয়। আবার এ “বঙ্গল-বঙ্গাল”-রূপে হিন্দু শাসনের শেষভাগ থেকে মুসলমান আমলের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে—আ ও-ই মাঝা-প্রত্যয় (particle) যোগ করে দেশার্থক “বাঙ্গালা” ও “বাঙলা” এবং জাতি-বাচক “বাঙ্গালী” বা “বাঙালী” শব্দের উৎপত্তি হয়। কিন্তু সবার ওপরে আশ্চর্যের কথা হচ্ছে এই যে, “বাঙলা-বাঙ্গালা” আখ্যার দ্বারা নেহাৎ প্রাকৃতিক নির্দোষতার ফলেই রাঢ়-গৌড়-সুহ্ম-ডবাক-বঙ্গ-পুও-সম্মত প্রদেশটি অভিহিত হতে থাকে এবং গোন্দ-সুহ্ম-সুহ্ম-ডবাক-ডোম-বগব বা মগব-বঙ্গ-চও-কাবাড়-বাহনর বা বাহনর-বেকা-সম্মিত অধিক জাতি “বাঙ্গালী” নামে অভিহিত হতে থাকে।

অজ্ঞাত, স্থান ও নদী পরিচায়ক আরও কতকগুলি অধিক শব্দ পাওয়া যায়, যেমন, “কামরূপ” (<“কাম-রক্” <“কম-রক্” <“কম-লক্” = কাম+লিক্), “তমলুক্”, যার সংস্কৃতায়িত রূপ দাঁড়িয়েছিল, “দাম-লিক্” ও “তাম-লিক্”, (তম বা দম+লক্=উপজাতি-বিশেষের বা পত্র-বিশেষের চিহ্ন বা লিঙ্গ।), “দামোদর”^{১০} (<“দামুদাক্”), “কপোতাক”^{১১} (<“কবুদাক্”), ভিভা (<“দিত্তাৎ”^{১২})—যার সংস্কৃতায়িত রূপ হয়েছিল “জি-প্রোতা”, “হগলী”^{১৩}

Pre-Aryans and Pre-Dravidians in India—by S. Levi, J. Bloch and Jean Przyluski—translated into English by Dr. P. C. Bagchi, page 8.

১৪। এই মূল “গোও” বা “গুও” শব্দ থেকেই বাঙলা উপাধি বাচক “গৌড়” শব্দের, “গৌড়া” ও “গুড়া” শব্দের উৎপত্তি হয়েছে।

§ বৈঃ-সং = বৈদিক ও সংস্কৃত এবং বৈদিক বা সংস্কৃত

১৫। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ—অজ্ঞা-পুণ্ড্রী-শবরা-পুলিন্দা-মুত্তিবা ইত্যাদি বহুবো ভবন্তি (৭।১৮) মার্কণ্ডেয় পুরাণ—৫৭, বিষ্ণু-পুরাণ—২।৩।১৫, মহাভারত—৫২।১৬-১৭ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

১৬। আধুনিক প্রাচীন রূপগুলি ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রস্তাবিত।

১৭। মৎপ্রস্তাবিত।

ইত্যাদি। পুরান-মাটি ও নতুন মাটি-বোধক “ভাদড়”^{১৮} ও “বাদড়”^{১৮} শব্দ গ্রাম-বিশেষের নাম হিসাবে ভ্রমতে পাওয়া যায়।

এ ছাড়া আরও বহু বাঙলাদেশের গ্রামের নাম হিসাবে আঞ্চলিক শব্দ প্রচলিত আছে, যেমন :—

(ক) [“অড়া বা আড়া” প্রত্যয়^{১৯} দিয়ে,]

- ১। বোদরা [<বোদড়া <বাদড়া <বাং^{২০} + অড়া = পাখীদের বাসস্থান বা আশ্রয়।]
- ২। যশোর, যশড়, যশড়া [<যস্ + অড়া।]
- ৩। সোমড়া [<সুম্^{২১} + অড়া।]
- ৪। হোমড়া [<হুম্ বা হস্ + অড়া।]
- ৫। নাওরা^{২২} [<নাওড়া <নাও + বালাব্ + অড়া = লাউয়ের স্থান বা ক্ষেত্র।]
- ৬। নেতড়া [<নেদ্ বা নুদ্ + অড়া।]
- ৭। বাশড়া [<বাহ্ + অড়া।]
- ৮। হাওড়া [<হাব্ + অড়া।]
- ৯। বামড়া [<বাহ্ + অড়া।]
- ১০। বাঁকড়ি [<বাগড়ী^{২৩} <বাহ্ + অড়া + ঙ্গ।]

(খ) [ই-আ-প্রত্যয় দিয়ে।]

- ১। বাড়ি [<বাং + ইআ।]
- ২। হেদে, হেডুয়া [<হাং + ইআ, হাং + উআ।]
- ৩। ভদা বা ভাদা [<ভাং + ইআ <বাং + ইআ।]
- ৪। জুঁদে [<জুঁদিআ = জুঁং + ইআ।]

শব্দের দিক থেকে বা ভাষাতাত্ত্বিক দিক থেকে যথেষ্টই পর্যালোচনা করা গেল। এখন দেখা যাক—জাতিভেদ বা নৃতত্ত্বের দিক থেকে কতটা সংবাদ পরিবেশন করতে পারি।

একথা সকলেই বুঝবেন যে কতকগুলি যর নিয়ে যেমন

একটি পাড়া গড়ে ওঠে, কতকগুলি পাড়া নিয়ে আবার যেমন একটি গ্রাম গড়ে ওঠে ঠিক তেমনই ভাবে মানুষের কতকগুলি দল নিয়ে একটা উপজাতি এবং কতকগুলি উপজাতির সমবায়ে একটি জাতি গড়ে ওঠে। আমাদের দেশ প্রাগৈতিহাসিক আমলে কতকগুলি অষ্ট্রিক-গোথীর উপজাতি-দের দ্বারা অধিকৃত ছিল। তাদের অনেকগুলির নাম পূর্বেরই দিয়েছি।

এই উপজাতিগুলি যুগী^{২৪} পুষত, কুহুর^{২৫} পুষত কিন্তু (কোন কোন উপজাতি বা দল) গো-হত্যা করত, পর-জীৱণ করত। বাঙলার মূললম্বানদের মধ্যে এই যে শেষোক্ত অভ্যাসগুলি দেখতে পাওয়া যায় এগুলি কিন্তু তাদের বরাবরের সংস্কার অর্থাৎ বহু প্রাচীন। ময়ূরের^{২৬} সন্দেহ তাদের পরিচয় ছিল। তাদের গণনার বারায় ছিল “গণা” (৪টি) “কুড়ি” ও “কড়া” (২০ ও ১০), “পণ” (৮০) প্রভৃতি বিশিষ্ট সংখ্যার নাম ও স্থান। তারা চান্দ্র মাস ও চান্দ্র বৎসর গণনা করত, তাই আমরা তাদের কাছ থেকে পেয়েছি, “কটাল, গণ, জোয়ার, ভাঁটা” প্রভৃতি শব্দ। চণ্ডী,^{২৭} কালী ছিল তাদের (উপজাতি-বিশেষের) আরাধ্যা দেবী। হুদ্দ, পান, কলা, সিঁহুর ছিল^{২৮} তাদের পণ্য এবং শিল্প-সভ্যতার নিদর্শন। কড়ি ছিল তাদের মূল্য। “কার্পাস” বোধ হয় তাদেরই আবিষ্কার। তাদের সভ্যতা ছিল নদীমাতৃক ও মূলতঃ গ্রামীণ। তাদের রাষ্ট্রিক কাঠামো ছিল প্রাচীন-আর্যদেরই মতন, অর্থাৎ গোষ্ঠী-পতি বা গোত্রপতির অধীনে যেমন এক-একটি দল থাকত, তেমনি কোন সর্দারের অধীনে বিশেষ একটি দল থাকত বা কাজ করত। অস্ত্র-শস্ত্র ছিল তাদের হাঙের ও পাষাণের।

আজ আমরা বাঙালীর মধ্যে যে, “ডোম, কাওরা, পৌড়, বাগ্দী, মালী, মালাকার, পৌড়, পুর-কারহ, পৌড়^{২৮}-কড়িয়

১৮। সংপ্রস্তাবিত ও *Prehistoric India* by P. Mitra, page 72-74 দ্রষ্টব্য।

১৯। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে মূলঃ “অড়ক” প্রত্যয় থেকে “অড়া বা আড়া”র উৎপত্তি হয়েছে।

২০। দ্রষ্টব্য—“ভারতের ভাষা ও ভাষা-সমভা”। ২য় অধ্যায়—১৪ পৃ। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

২১। “সুম্” মূলতঃ “সুম্হ” শব্দও হতে পারে এবং তা যদি হয়, তা হলে অর্থ হয়—সুম্হদের বাসস্থান।

২২। বরেন্দ্র ব্রাহ্মণদের উপাধি “লাহিড়ী” মূলতঃ লাব্ + লাও + অড়া + ঙ্গ = “লাওড়ী > লাহড়ী > লাহিড়ী”; অর্থাৎ লাওড়া বা লাব্ড়া গ্রামের অধিবাসী ও “ভাহড়ী” শব্দ মূলতঃ বাং + অড়া + ঙ্গ = “বাহড়ী > বাদড়ী > বাহুড়ী > ভাহড়ী”—কি না, বাদড়া গ্রামের অধিবাসী।

২৩। অনেকেই ভুল করে “বকরীপ” ও “ব্যাজড়ী”কে এর প্রজনয়িতা বলে মনে করেন।

২৪। অষ্ট্রিক * “ব্রুক্-ব্রুক্” শব্দই তার প্রমাণ। একথা অমূল্য প্রমাণ করেছে। এ মূল থেকেই “ময়ূর” ও “বহু” উৎপন্ন হয়েছে।

২৫। বোধ হয় বৈদিক “কুহুর” শব্দ মূল আর্য ভাষার কোন শব্দ নয়। বিপরীতে অষ্ট্রিক হওয়াই সম্ভব।

২৬। “চুঙ বা চুঙ” উপজাতির দেবী বলেই নাম “চণ্ডী” ও “চণ্ডিকা”—অবশ্য সংস্কৃতে, এবং “বুঙা বা কোল” জাতির দেবী বলেই নাম “কালী ও কালিকা”। এই সব দেবীর পূজার মধ্যে রয়ে গেছে মাতৃকাতন্ত্রের (Matriarchate System) স্মৃতি।

২৭। দ্রষ্টব্য—বাকলা দেশের ইতিহাস—পৃ: ৮-১১ ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার।

২৮। দ্রষ্টব্য—“বাঙলার পুরাতত্ত্ব” (বিশেষভাবে প্রথম অধ্যায়) প্রথমদিক বন্দোপাধ্যায় ও “বাঙালীর পরিচয়” (শেষের দিক) মৌদনাথ বসু।

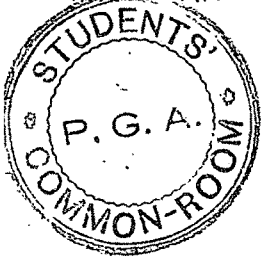
চাউল, হাড়ি, হোড়, চূড়া, মাল, পোদ"—প্রভৃতি উপাধি-বাচক শব্দ দেখতে পাই আসলে সেগুলি পুরোস্ত প্রাণৈতি-হাসিক উপকৃতিগুলির নামের অপভ্রংশ রূপ। সুতরাং বাঙালী অষ্টিক জাতি। আত্মকের জাতি হিসাবে পরিচিত বাঙালীর কেরাটীর মাপ-যোপ অষ্টিক উপকৃতিয়দের কেরাটীর মাপ-যোপের সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। রক্ত পরীক্ষার ফলও এক। সুতরাং বাঙালী "হোমো-আলপিনাস" (Homo-Alpinus)ও নয়, "নিগ্রো-নিগ্রোবটু" (Negro-Negrito)ও নয়, "জাবিত, যোন্, ধোর"—প্রভৃতি পঞ্চজাতির সংমিশ্রণও নয়। সরকারী প্রযুক্তাধীনে শ্রেষ্ঠ বৃত্তাধিকেরা যে প্রাচীন অষ্টিক-গোষ্ঠীর বিচরণ-পথ সম্পত্তি অহুসত্বান করছেন, তার ফলে দেখা গেছে যে তারা আফ্রিকা মহাদেশ থেকে উঠে এসে এশিয়ার নানা দেশ হয়ে ভারতে পঞ্জাবের উপর দিয়ে

এসে বাঙালীর হারিয়ে গেছে। অর্থাৎ তাদের স্থলপথ এখানে এসেই শেষ হয়ে গেছে। তারপর থেকে শুরু হয়েছে জলপথ বিচরণ। তাই বাঙালীর জাতিরা গিয়ে উঠেছে সুর অষ্টিক-লিঙ্গা মহাদীপে, প্রশান্ত-মহাসাগরীয় দীপপুঞ্জে, লঙ্কা, আন্দামান, লাক্ষাদ্বীপ ও মালদ্বীপে।

শেষ কথা হচ্ছে এই যে, বাঙালীর প্রাচীন ইতিহাসের প্রথম সম্বল পাথুরে প্রমাণ এখনও পর্যন্ত যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায় নি, তার কারণ খননের কাজ বাঙালী দেশে জতাল্লই হয়েছে। নেহাৎ যেটুকু পুঙ্খ হুঁড়তে গিয়ে, কি লাদলের যুগে, কি নদীর সোতায় পাওয়া গেছে সেইটুকু বিভিন্ন ধাতুধরে রক্ষিত হয়ে আছে। রাধকলদাস বাবু তাঁর বাঙ্গলার ইতিহাসে ৩৩০ খ্রিঃ ক'টি পাথুরে প্রমাণের উল্লেখ করেছেন সে ক'টির মধ্যে হুগলী জেলার কুনকুনে গ্রামে প্রাপ্ত পাথুরে (Boucher of Celt) প্রমাণটিই একমাত্র বাঙালীর জিনিস।

২৯। দ্রষ্টব্য—"বাঙালীর পরিচয়"—পৃ: ৪২-৪৪ মীননাথ বসু ও "বাঙ্গলা ভাষাভাষার ভূমিকা"—ড: সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও তাঁহার অত্যন্ত প্রবন্ধ।

৩০। বাঙ্গলার ইতিহাস। ১ম বর্ষ, ১ম অধ্যায় পৃ: ৬-৭।



“নিউ ইন্ডিয়ান কালচারাল ড্যান্সারস্”

শ্রীমতীমাধব চৌধুরী

টিপটপে বৃষ্টি ও বিজী কৃষ্ণাসার মধ্যে সসীম লগুন ছাড়িল। দেশে কিরীবার আগে ভাল করিয়া কন্টিনেন্ট বেড়াইবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু কপালভাগে তাহাকে উর্দ্ব্বাসে ছুটিতে হইল কেনোয় যুগে জাহাজ ধরিবার অম্ভ।

সারা ইউরোপ গুখন টগবগ করিয়া ফুটিতেছে। মিউনিকে ফ্রান্স ও রোমে ড্যাচের হস্তার ক্রমে চড়িতেছে। জালাসে মাসে মাসে মন্ত্রিসভার পরিবর্তন হইতেছে। ইংলণ্ডে চেম্বারলেনের ছাতার দিকে সকলে সতৃষ্ণ নরনে চাহিয়া আছে। যাহারা হাতপ্রধান ষাতের লোক তাহাদের যুগেও আসন্ন বটিকার বিজ্ঞান-দগ্ধ বিকাশ দেখিয়া বজ্রহাসির পরিবর্তে কাঠহাসির উদর ও বিলম্ব হইতেছে। ম্যাক্সিমো লাইন, হিওনবুর্গ লাইন, কার্শ্বানীর সময়-প্রস্তুতি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞগণের লম্বা লম্বা প্রবন্ধ বাহির হইতেছে। পোলাণ্ড, চেকোস্লোভাকিয়া, বেলজিয়মে সমরবিশারদ ও কুটমন্ত্রণাবিশারদগণের ছুটাছুটি চলিতেছে। আকাশে বিমানবাহিনী, পথেবাটে ট্যাকবাহিনী, বন্দরে বন্দরে জঙ্গীজাহাজের সারি, জলের তলে সাবমেরিন দিন ও রাত্তি গুলিতেছে। ইউরোপের বারুদগুপ ফুলিদের অপেক্ষার উদ্‌গীৰ্ণ।

সদীমের ভাগ্য ভাল যে বহু চেঁচায় সে জাহাজে স্থান

সংগ্রহ করিতে পারিয়াছে। উজ্জ্বল সূর্য্যকিরণমাত ইতালীয় উপকূল পিছনে ফেলিয়া জাহাজ যখন দক্ষিণ সমুদ্রের পথ ধরিল সসীম স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল।

তাহার বিলাতে প্রবাসজীবনের কথা মনে হইল। কিসের একটা নেশার সময়টা কাটিয়া গিয়াছে। ব্যারিষ্টারী পড়িবার লুভ সে বিলাতে আসিয়াছিল। পড়াশুনা নামমাত্র, মিটিং, ইন্টারভিউ, রিসেপশন, কাগজে লেখা, এই করিয়া দুইট বছর কাটিয়া গিয়াছে। ফরাসী, জার্মান, রুশ, পোল, মিশরী, তুর্কী, নিগ্রো কত জাতির লোকের সঙ্গে, বিশেষ করিয়া হাজ-ছাত্রীর সঙ্গে যে আলাপ-আলোচনা করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। সকলের যুগে এক প্রশ্ন, তোমাদের দেশ কি করিবে?

ইউরোপের রাজনৈতিক আবহাওয়ার দিকে চাহিয়া সে স্পষ্ট অহুত্ব করিয়াছে যে ভারতবাসীর সম্মুখে এক বড় সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। বারম্বার রাসেলের একটা কথা তাহার মনে পড়িত। লোকবল ও প্রাকৃতিক সম্পদে আমেরিকা, রুশিয়া, চীন ও ভারতবর্ষ এই চারিটি মাত্র দেশ আছে পৃথিবীতে যাহারা নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পারে। ঠিক কথা, কিন্তু চীন ও ভারত কোথায়? সবাই তাহাকে বলিয়াছে যে—সুযোগ আজ আসিয়াছে তাহার সদ্যবহার করা সম্ভব হইলে

ভারতবর্ষ শক্তিশালী জাতিসমূহের সভ্য বিজ্ঞের প্রাপ্য আসন অধিকার করিতে পারিবে।

Conte Verde জাহাজে অঞ্চল অবসর, কোন কাজের বালাই নাই। জাহাজের ইতালীয়ান অফিসারদের উদ্ভূত ভাব, জার্মান যাত্রীদের নাটকীয় চালচলন, জাপানীদের হ্রস্ব, মাংসল নান্দিকার নীচে, সুপীরিয়র হাসি, ব্রিটিশদের ঘুতন যুগুতাব, এ সব লইয়া মাথা ঘামাইবার প্রবৃত্তি তাহার ছিল না। নিকর্মী বলিয়া বলিয়া সঙ্গীম নানা রঙের তুলি দিয়া নানা দিক হইতে তাহার কল্পনার ভবিষ্যৎ ভারতের চিত্র আঁকিবার চেষ্টা করিত মনে মনে। প্রদেশে প্রদেশে যে অবস্থাস ও ঈর্ষার দ্বন্দ্ব দেখিয়া গিয়াছিল সে-দ্বন্দ্ব নিশ্চয় মিটিয়া গিয়াছে। প্রাদেশিকতা, সাম্প্রদায়িকতা, ব্যক্তি বা দলগত স্বার্থাঘেষণ জাতির বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা বলিয়া সকলের বোধ হইয়াছে, আত্মকর্তৃত্ব লাভ করিয়া ভারতবাসী ঘরের সমস্তা নিজেরা সমাধান করিয়া লইবার প্রতিজ্ঞায় ঐক্যবদ্ধ হইয়াছে।

বিদেশ ও বিদেশীদের মধ্যে বাগ করিয়া দূর হইতে আর পাঁচটা দেশের সঙ্গে পাশাপাশি নিজের দেশের দিকে চাহিয়া তাহার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হইয়াছিল। আসন্ন সফটের মুখে দেশের লোকের যাহা করা উচিত সরল বিশ্বাসে তাহাই তাহার করিতেছে দেখিবে আশায় সঙ্গীম দেশে ফিরিতেছিল।

দেশে ফিরিয়া তাহার কাজ হইবে আগতগ্রাম নবযুগের বাণী প্রচার করা। বিরল অবসর কর্তব্য জীবনের চিত্র সে আপনার চোখের সম্মুখে তুলিয়া বলিল।

লোহিত সমুদ্র পার হইয়া এডেনের সাঁড়ানী মুখ হইতে বাহির হইয়া জাহাজ আরব সাগরে পড়িল। পশ্চিম-উপকূলের দিকে জাহাজ আগাইতে থাকিলে দেশের শ্রিয়জনদের কথা সঙ্গীমের মনে পড়িতে লাগিল। একটি মুখ প্রায়ই তাহার মনে উঁকি দিতে লাগিল। সে মুখ ডেইজীর নহে। ডেইজীর কথা মনে হইতে আজ হঠাৎ সে ভাবিয়া আশ্চর্য হইল যে গত দুই বৎসরের মধ্যে প্রথম দিকে মাত্র দুই-তিনখানা চিঠি সে ডেইজীর কাছ হইতে পাইয়াছে, তার পর তাহাদের দুই জনের মধ্যে চিঠিপত্র লেখা অলক্ষিতে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। অনেক ভাবিয়াও কে আগে চিঠি লেখা বন্ধ করিল, কি জন্ম বন্ধ হইল সে মনে করিতে পারিল না। তাহার পিতার চিঠিতে এইমাত্র জানিতে পারিয়াছিল যে দেশে ফিরিলেই বিবাহ অনুষ্ঠান শেষ করা তাহার অভিপ্রায়। ডেইজী পিতার নিকরীতি তাহার ভাবী পত্নী।

বোম্বাই বন্দরে যেদিন জাহাজ ভিড়িল সেদিন শহরে কি একটা উপলক্ষে হরতাল। তাকে প্রাইক, সাধারণ যানবাহন বন্ধ। রাস্তায় রাস্তায় সশস্ত্র পাহারা, দোকানপাট বন্ধ, লোকজনের চলার নাই বলিলেই হয়।

এক বছর গৃহে সঙ্গীমের উঠিবার কথা ছিল। তাহার সাহায্যে কোন প্রকারে মালপত্র সহ দে তাহার বাড়ীতে পৌছিল।

বহুটি মারাঠী, এক ইনডিয়ান কোম্পানীর উচ্চপদস্থ চাকরীয়া। বিদেশে আলাপ ও বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। চমৎকার লোক, খাঁটি স্বদেশীভাবাপন্ন। হরতালের পরদিন বন্ধ বলিলেন বোম্বাইতে এক বাঙালী নাচের দল আসিয়া খুব নাম করিয়াছে। সঙ্গীম নাচ দেখিতে ইচ্ছা করিলে তিনি টিকেট সংগ্রহ করিয়া আনিবেন। সঙ্গীম নাচের দলের নাম জিজ্ঞাসা করিলে তিনি সেদিনকার বোধে ক্রনিকেলের বিজ্ঞাপনের পাতা দেখিয়া বলিলেন, Miss Daisy Sen Sarma's Troupe of New Indian Cultural Dancers. Directed by Pandit J. K. Sen Sarma. লেখকের উপরে কাঁচুলী বাঁধিয়া এক হাত মাথার উপরে অপর হাত বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া সম্মুখে প্রসারিত একটি মেয়ের চিত্র।

মিস্ ডেইজী সেন শর্মা নাচ দেখাইতে বোম্বাই আসিয়াছে? সঙ্গীম আপনাকে জিজ্ঞাসা করিল, টিকেট করিয়া একবার ভাবী পত্নীর নাচ দেখিরা আসিবে কি? কথটা মনে আসিতে তাহার খুব হাসি পাইতে লাগিল। তাহার মা নাই, পিতা শেষ পর্যন্ত এই মেয়েকেই তাহার খাড়ে চাপাইবেন ধীর করিয়া রাখিয়াছেন? সাবধান, মারাঠী বন্ধু যেন কিছু না জানিতে পারেন। সে নাচে যাইবে না, চিঠিপত্র লেখার কাজ সারিয়া একটু বেড়াইয়া আসিবে বলিয়া সঙ্গীম উঠিয়া গেল।

বিলাতযাত্রার কয়েক দিন আগে সঙ্গীম ডেইজীদের বাড়িতে গিয়াছিল।

সঙ্গীম কটকের মধ্যে প্রবেশ করিলে দোভালা হইতে স্মিঞ্জা তাহাকে দেখিতে পাইল। ছুটয়া সে বড় বোন ডেইজীর ঘরে ঢুকিয়া চিৎকার করিয়া বলিল,—এই তোম দত্ত সাহেব এসে গেছেন, ভাড়াভাড়ি কর।

ডেইজী তখন আয়নার সম্মুখে সাগরের দোল নৃত্যের মহড়া দিতেছিল। আগামী শনিবারে ইনস্টিটিউটের চ্যারিটি শো-তে প্রথম আইটেম তাহার নৃত্য। সে মহড়া না ঘামাইয়া বলিল,—যে রকম ছড়দাড় করে ধবর দিতে এলি ভাবলেম না জানি কি ধবর আছে। তুই বসাগে যা, আমি আসছি একটু পরে।

স্মিঞ্জা ততক্ষণে দিদির টয়লেট টেবিলের কাছে গিয়া ফিগ্রহস্তে লাজসজ্জার ক্রটি সারিয়া লইতেছিল আর অনঙ্গল বকিতেছিল। সাগরের দোল নৃত্যে তরঙ্গ তখন ফুলিয়া-কাঁপিয়া উঠিতেছে, এই গর্জন করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়ে বুঝি। কোন প্রকার উত্তর দিবার অবসর নাই ডেইজীর। স্মিঞ্জা কাজ সারিয়া নীচে নামিয়া গেল। যুদ্ধ গুলানে কি একটা গানের কলি গাহিতেছিল সে।

সঙ্গীম বসিবার ঘরে ঢুকিয়া একখানি বড় চিত্র মনোযোগ দিয়া দেখিতেছিল। চিত্রের সম্মুখভাগে একটি বড়ের কুঁড়ে ঘর, উহার দাওয়ার নীচে একটি কলাগাছ এবং ডাব ও আত্র

পদ্মব মাধার মাটির ঘর্ট। মধ্যভাগে দীর্ঘকেশ, দীর্ঘ শ্রুঙ্গ নামাবলী গায়ে যোগাসনে উপবিষ্ট একজন লোক। তাহার সম্মুখে ত্রিভুজ বেইনে ত্রিশূলধারিণী জীবন্তি। সঙ্গীত ভাল করিয়া দেখিল, ত্রিভুজ নহে, ত্রিভুজাকার ভারতবর্ষের রেখা-চিত্র। চিত্রের পশ্চাদ্ভাগে মেঘের গায়ে কয়েকটি মুণ্ড। মুণ্ডগুলির সঙ্গে কয়েকজন বহুসন্তানের মুখের সাদৃশ্য আছে, শুরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র পাল, ত্রীঅরবিন্দ। হাঁহাদের আড়ালে দুইটি মুণ্ডকে একটু উঁকি দিবার মত স্থান দেওয়া হইয়াছে। সে দুইটি বালগঙ্গাধর ভিলক ও লক্ষপত রায়ের। চিত্রের নীচে বড় বড় অক্ষরে লেখা, প্রথম লাইনে, ভারতমাতা ও পণ্ডিত জে, কে, সেন শর্মা, দ্বিতীয় লাইনে, আশীর্বাদ।

এই চিত্রের কি অর্থ হইতে পারে-সঙ্গীত চিন্তা করিতেছিল, হঠাৎ পিছনে হাসির শব্দে ফিরিয়া দেখিল ডেইজীর ছোট বোন সুমিত্রা।

—গুড আফটার্ন হুন সঙ্গীতদা, ইউ লুক চার্মিং।

সঙ্গীত হাসিল। সুমিত্রার স্বভাবের কোন পরিবর্তন হয় নাই বরং বাড়িলেও। অবিশ্রান্ত কথা বলা, অসংলগ্ন, অস্বাভাবিক কথা বলা তাহার অভ্যাস। সঙ্গীত তাহার দিকে চাহিয়া দেখিল, বলিল, ওটা আমার বলবার কথা। ইউ লুক চার্মিং সুমিত্রা।

তাহার স্বরটা যেন তাহার নিজের কাছে সম্পূর্ণ পরিহাসের বলিয়া মনে হইল না।

সঙ্গীত হইবার সঙ্গীতে ঠোটে একটা আঙ্গুল চাপিয়া সুমিত্রা বলিল,—চুপ, ডেইজী শুনেলে কুরুক্ষেত্রের বেধে যাবে। আপনাকে একটা টিপ দিচ্ছি, যখন এমনতর কথা বলতে ইচ্ছে যাবে আমার কানে কানে বলবেন, বুঝলেন?

সে হাসিয়া কেলিল।

—ডেইজী কোথায়? তাকে দেখছি না যে?—সঙ্গীত জিজ্ঞাসা করিল।

—কি করে দেখতে পাবেন মিঃ নতু? বহুদূর দেখি ভাল ছেলের মত। বিলেত যাবার আনন্দে দেশের বর্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে কোন খবর রাখেন না। ডেইজীর এখন মন্ত নাম, প্রথম শ্রেণীর গাইয়ে ও নাচিয়ে বলে। সে উপাধি পেয়েছে জলসাত্ত্রী।

—জলসাত্ত্রী কি? কে উপাধি দিয়েছে?

—লোকে বাংলাভাষা ভুলে যায় বিদেশ থেকে ফিরে, আপনি দেখছি বিদেশ যাবার আগে মাতৃভাষা ভুলে গেছেন। গীতত্রী, নৃত্যত্রী, জলসাত্ত্রী, একথাগুলো কোনদিন শোনেন নি? জলসাত্ত্রী মানে যার উপস্থিতিতে জলদার সর্কাদীপ ত্রিযুক্তি ঘটে সেই তরুণী মহিলা। ইজ ইট ক্লিয়ার? উপাধিটা দিয়েছি আমি। বাবার বক্তৃতা শুনেতে যেমন বুড়োর ভিড় করে, দিদি যে জলদার যার সেখানে ছোকরাগুলো তেমনি ভিড় করে। “বাঙালী আত্মবিশ্বস্ত জাতি। বাঙালী জাতির যে বৈশিষ্ট্য

অগণ্য সত্তার তাহাকে উচ্চ সম্মানের আসনের দাবীদার করেছে...” বাবা এই বলে বক্তৃতা শুরু করলেই শ্রোতারা একসঙ্গে হাততালি দিতে, মাথা নাড়তে শুরু করে, কোন কোন বুড়ো আবার কঁচা কঁচা করে কাঁদতে থাকে। আর জলসাত্ত্রী ডেইজী যখন—

সুমিত্রা দাঁড়াইয়া বোধ হয় ডেইজীর নাচের একটু নমুনা দিবার ইচ্ছায় দরজার দিকে মুখ ফিরাইতেই দেখিল পরদা সরাইয়া ডেইজী ঘরে ঢুকিতেছে। বপ করিয়া আসনে বসিয়া পড়িয়া বলিল,—পারলে আসতে এত সকালে? দত্ত-সাহেবের অবস্থা দেখে তোমাকে ডাকতে উঠছিলেম।

ডেইজী কটমট করিয়া বোনের দিকে চাহিল। নৃত্য-ভঙ্গিমার ইন্ডিস্ট্রী তাহার চোখ এড়ায় নাই। সে জানিত সুমিত্রা এতক্ষণ ঘরিয়া সঙ্গীতের সঙ্গে ক্লার্ট করিতেছিল, যে রকম স্বভাবের মেয়ে সে। ডেইজীর স্বাবক জনতা, জনতার মুগ্ধ দৃষ্টি ও প্রশংসা তাহাকে এত উচ্চ আসনে উঠাইয়াছিল যে সে আসন হইতে ব্যক্তিবিশেষের প্রতি নিগ্রহ বা অস্বাভাবিক দৃষ্টিপাত করিবার অবকাশ বা প্রবৃত্তি তাহার হইত না। সুমিত্রার প্রগলভতা তাহার অত্যন্ত ইতর মনে হইত।

ডেইজীর চটবার বাস্তবিক কারণ ছিল। সে বিশ্বাস করিত নাচ ও গান তাহার জীবনের মিশন। নানা সত্তার পিতার বক্তৃতা হইতে তাহার মনে বাঙালীর জাতীয় বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা জন্মিয়াছিল। পিতার সম্পাদিত কাগজের “আমোদ-প্রমোদ” কলামের ব্যাখ্যা হইতে সে বুঝিতে পারিয়াছিল বাঙালীর এই জাতীয় বৈশিষ্ট্যের একটা দিক মূর্ত হইয়াছে তাহার সঙ্গীত ও নৃত্যের মধ্যে। তাহার মাধ্যমে বাঙালী-আত্মার সঙ্গীতময় ও নৃত্যময় অভিব্যক্তি হইয়াছে। এতদ্ব নিজেদের নাচগান সম্বন্ধে হালুকা আলোচনা সে সহ্য করিতে পারিত না। কিন্তু সুমিত্রাটা—ছোট মেয়ে বলিয়া পিতার শাসন তাহার সম্বন্ধে বরাবর আলগা।

সুমিত্রার প্রতি উদগত ক্রোধ দমন করিয়া ডেইজী সঙ্গীতের পাশে বলিল। রওনা হইবার বন্দোবস্ত সম্বন্ধে দুইচারিটা প্রশ্নের পর একটু হাসিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল,—বাবা ও রাই-সাহেব দত্ত মিলে নতুন মাসিক পত্র বের করছেন জান?

সঙ্গীত বিস্মিত হইল, তাহার বাবা কাগজ বাহির করিবেন? আওয়ারসন কোম্পানীর কাজ করিবার সময়ে কি একটা ছুট ফোরকাষ্ট না কি কাগজের ভার তাহার হাতে ছিল জানে। কয়েক বৎসর হইল তিনি অবসর লইয়াছেন। এখন পুঙ্জ করেন ও করাসী বিপ্লবের ইতিহাস পড়েন। কই কোন কাগজের কথা ত শোনে বাই সে। বোধ হয় টাকা জোগাইবার ভারটা শুধু তাঁহার।

—কি কাগজ? সে জিজ্ঞাসা করিল।

সুমিত্রা এতক্ষণ কোন মতে চুপ করিয়া বলিয়া ছিল। দিদির কোন কথা বলিবার অবকাশ না দিয়া সে বলিয়া

উঠিল,—হায় যীশুখ্রীষ্ট! কি কাগজ তাও জানেন না? বাঙালীর বৈশিষ্ট্য, বাঙালীর স্বাভাব্যতা, বাঙালীর বীরত্ব, বাঙালীর শক্তি-উপাসনা, বাঙালীর আরও যেন কি একি এই নতুন কাগজের মারফৎ প্রচার করা হবে। নৃত্য, গীত, হাস্য, লাস্য, বক্তৃতায় বাঙালীর বৈশিষ্ট্য ইন্টারপ্রেট করবে এই কাগজ, বাঙালী-মিন্দুক ভিন্নপ্রদেশীয়গণের ধোঁতা মুখ ধোঁতা করবে—

সুমিলা!—ডেইজী প্রায় ফাটকা পড়িল রাগে।

ডেইজীর কোষ অগ্রাহ্য করিয়া সুমিলা ঝিল ঝিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

সঙ্গী দেখিল ডেইজী ভয়ানক রাগিয়াছে। তাহাকে শাস্ত করিবার অভিপ্রায়ে বলিল,—সুমিলা, এসব সীরিয়াস ব্যাপার নিয়ে তামাশা করা কি উচিত? যদি তোমাদের বাবা ও আমার বাবা আপনাদের মত প্রচার করবার জন্ত বাস্তবিক কোন কাগজ বের করা স্থির করে থাকেন এভাবে বিক্রপ করা তাঁদের অপমান করা নয় কি?

সুমিলা জুড়ুট করিয়া সঙ্গীমের মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিল। তারপর যুহু হাসিয়া বলিল,—এটাকে বড় সীরিয়াস ব্যাপার বলে আপনিও মনে করেন নাকি? না মিস ডেইজীর মন গলাবার জন্ত—

সে উঠিয়া দাঁড়াইল। হুই জনের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া একটু ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি হাসিয়া বলিল,—একটিউজ মি, বিদেশে যাচ্ছেন, নিরুবিলা আলোচনার একটু সুযোগ আপনাদের দেওয়া উচিত।

সে খর হইতে বাহির হইয়া গেল। তাহার গমনপথের দিকে চাহিয়া সঙ্গীম অসম্মত হইয়া কি যেন ভাবিতে লাগিল। তাহার এই অসম্মততা ডেইজীর চোখ এড়াইল না, তাহার মুখে বিরজিত কুণ্ঠিত রেখা দেখা দিল। কিছুক্ষণ পরে সঙ্গীম ডেইজীর দিকে মুখ ফিরাইয়া একটু হাসিল। বলিল,—সুমিলা কথায় তুমি এত চট কেন ডেইজী, ও ত ছেলেবেলা থেকে ঐ রকমের।

—ছেলেবেলায় যা মানিয়ে যেত বড় হলে তা আর মানায় না। তা ছাড়া, বকামি ক’রে ক’রে ভাল জিনিস, বড় জিনিস বুঝবার শক্তিও সে হারিয়েছে। সে কথা যাক। শনিবারে ইনস্টিটিউটে চ্যারিটি শো-তে আসছ ত? টিকিট বোধ হয় শেষ হয়ে গিয়েছে। আমি কর্তৃপক্ষদের বলে রাখবো তুমি গেলে তোমাকে বসিয়ে দেবেন। টিকিটের বাবদ পঁচিশটা টাকা তাঁদের হাতে দিয়ে দিও।

ডেইজী সঙ্গীমের দিকে চাহিয়া মিষ্ট হাসিল। বলিল,—আমার নাচ ও গানের প্রশংসা করে দেশের লোক। তুমি নিজে দেখে শুনে বলবে এই প্রশংসা অতিরঞ্জিত কিনা।

আরও ঝানিকক্ষণ অল্প কথাবার্তার পরে সঙ্গীম চ্যারিটি শো-তে যাইবে কথা দিয়া উঠিল, ডেইজীর মিষ্ট হাসি পাওয়া

একটু ব্যয়শায্য ব্যাপার বলিয়া তাহার মনে হইল কিনা বলা কঠিন।

তাহার পিতার প্রভাব ডেইজীর চরিত্র ও মত গঠনে অনেকখানি কার্যকরী হইয়াছিল। ডেইজীর পিতা পণ্ডিত যুগলকিশোর বা জে, কে, সেনশর্মা প্যাট্রিস্ট, সম্পাদক ও লীডার। বিপিনচন্দ্র পালের লজিক ও ত্রীশ্রবিন্দ্যের ম্যাজিক বা আধ্যাত্মিকতার সমন্বয়ে তাহার রাজনৈতিক মতবাদ গঠিত। হাল আমলের রাজনীতির অভ্যুদয় হইবার পর হইতে তিনি রাজনীতিক্ষেত্রে হইতে অবসর লইয়াছেন, তবে মাঝে মাঝে আলবার্ট হলের হুই-একটা মিটিঙে সভাপতিত্ব করিবার ডাক পড়িলে না করিতে পারেন না।

রাজনীতি হইতে অবসর লইলেও পণ্ডিত সেনশর্মা তাহার অক্ষুর উত্তম ও শক্তি দেশসেবার নিয়োজিত রাখিয়াছেন। ইউরোপের আনুমানিক সভ্যতা ও বস্তুতাত্ত্বিকতা, ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী প্রভুত্ব অপেক্ষা ভারতবর্ষের বড় শত্রু দেশের অনেকের মনে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু তিনি দৃঢ়-ভাবে এ কথা বিশ্বাস করিতেন। তাহার মতে উত্তর-ভারতে সাত-আট শত বৎসর ব্যাপী চুর্কী, আকপান ও চাণ্ডাই-রোদ্রল প্রভুত্ব ভারতবর্ষের যে ক্ষতি করিতে পারে নাই মাত্র হুই শত বৎসরের ইউরোপীয় প্রভুত্ব তাহা অপেক্ষা গুরুতর অনিষ্টের সম্ভাবনা বটাইয়াছে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভের জন্ত কাড়াকাড়ি মারামারি করা অপেক্ষা ভারতবর্ষের প্রাচীন কুপ্তি ও আধ্যাত্মিকতার প্রাণধারাকে বাঁচাইয়া রাখা অনেক বড় কাজ। আধ্যাত্মিকতা ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্য, ভারতবর্ষ পৃথিবীতে এক মাত্র আধ্যাত্মিক দেশ। এই আধ্যাত্মিকতা রক্ষা করিবার গুরুত্বপূর্ণ পণ্ডিত সেনশর্মা আপনাদে প্রবীণ ক্ষেত্রে তুলিয়া লইয়াছেন।

ইহা ছাড়া তিনি বাঙালী জাতির ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে যাহার কথা লিখিত থাকিবে এমন একটি মহামূল্যবান তথ্য-রত্নের পুনরুদ্ধার করিয়াছেন বিশ্বস্তির অস্বকার স্তহা হইতে। সে তথ্যটি এই যে বাঙালী আত্মবিশ্বস্ত জাতি। সভ্য-সমিতিতে, ধর্মের কাগজে, পুস্তকে এই তথ্য তিনি অবিচলিত প্রচার করেন। এই তথ্য হইতে উৎপত্তি হইয়াছে অতি পরিচিত বাঙালীর জাতীয় বৈশিষ্ট্যবাদের। বাঙালীর বৈশিষ্ট্যের গর্ব আঁজ কোন বাঙালী করে না? স্বভাবহীন বাঙালী চরিত্রকে সবল করিবার এই অব্যর্থ টনিক সুলভ ও সহজপ্রাপ্য করিয়া পণ্ডিত সেনশর্মা দেশের ও দেশের কৃতজ্ঞতাজ্ঞান হইয়াছেন।

পণ্ডিত সেনশর্মার অভিমতের বাণ্যবজ্র কল্লোলটোলায় রায় সাহেব কাক্তিকচন্দ্র দত্ত। তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সঙ্গীমের সঙ্গে ডেইজীর বিবাহের কথাবার্তা অনেক দিন হির আছে। বিবাহ হইয়া যাইত কিন্তু রায় সাহেব জিদ ধরেন ছেলে বিলেত ঘুরিয়া না আসিলে বিবাহ হইবে না।

ডেইজী ইতিমধ্যে জুনিয়র কেব্লিঙ্গ পাগ করিয়া ডাইও-

সিসান হইতে বাহির হইল। মিশনারী জুলে না দিলে ছেলে-মেয়ের শিক্ষার বনিয়াদ পোক্ত হয় না এবং ষ্টেটসম্যান কাগজ না পড়িলে রাজনীতির জ্ঞান জন্মায় না—বাংলাদেশের আপার সার্কেলের এই সনাতন মত পণ্ডিত সেনশর্মা পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই।

ডেইজী ডাইওসিসান হইতে বাহির হইল। এক শুভ দুহুর্ভে পূর্ব-ভারতের আকাশে এক এয়ারপেকেটে বসিয়া বসিয়া বিশ্রাম করিবার সময়ে ভগবান নটরাজের দৃষ্টি তাহার উপর পড়িল, তিনি যুহু হস্ত করিলেন। তখন হইতে ডেইজীর জন্মাদ্রা শুরু হইল। খবরের কাগজ, স্কুল কলেজের ভরুণ-বৃন্দ, দরদী মধ্যবয়স্কদিগের পৃষ্ঠপোষকতায় তাহার বিজয় রথ চুর্চুর গতিতে ছুটিয়া চলিল। সসীম বিলাতে তখন বার্গাড শ, প্রোঃ হারল্ড ল্যাকী ও মিঃ ডি জ্যালেয়ার সঙ্গে ইন্টারভিউ, ব্রিটিশের ভারতবর্ষের মঙ্গল করিবার ইচ্ছার মধ্যে কত পার-সেন্টেজ ঝাঁট ও কত পারসেন্ট মেকী তাহা নির্ণয় ও ইণ্ডিয়ান মজলিশে বক্তৃতা করিতে ব্যস্ত।

ডেইজীর খ্যাতি যত বাড়িতে লাগিল প্রবাসী সসীমের কপাল তত ভাঙিবার আগের মচমচ শব্দ করিতে লাগিল। এদিকে ন্যচুনে ভাবী পুত্রবধূকে লইয়া সসীমদের পরিবারে অস্বস্তির হাওয়া বহিতে লাগিল।

সসীমের পিতা রায় সাহেব কার্তিকচন্দ্র দত্ত সামাজ্য বেতনে আভ্যর্থন কোম্পানীর আপিসে চাকুরী আরম্ভ করিয়া সভ্যতা ও অধ্যবসায়ের গুণে জুট-সেক্সনের বড়বাবু হইয়াছিলেন। তিনি শাস্ত্র মতে বিশ্বাসী নিষ্ঠাবান হিন্দু। তাহার বাড়ীতে কালী পূজার সময়ে কোম্পানীর ছোট বড় সাহেবগণ নিমন্ত্রিত হইয়া প্রতিমা দর্শন করিয়া প্রণামী দিতেন এবং মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিতেন। তাহাদের ক্ষুদ্র বড়বাবু বিলাতী ‘কারণে’র ব্যবস্থা করিতেন।

রায় সাহেব সওদাগরী আপিসের চাকুরীয়া এবং সাহেব-ভক্ত হইলেও তাহার পারিবারিক আবহাওয়া ছিল শিক্ষিত ও মার্জিত এবং অনেকখানি স্বদেশীয়ানাপূর্ণ। বাল্যবন্ধু পণ্ডিত সেনশর্মার প্রভাব তিনি অতিক্রম করিতে পারেন নাই। বাঙালী জাতি শক্তি উপাসকের জাতি, বাঙালীর বৈশিষ্ট্য শক্তিসাধনা তিনি দৃঢ়ভাবে এই মত ব্যক্ত করিতেন এবং দৃষ্টান্ত দিবার প্রয়োজন হইলে নিজের দৃষ্টান্ত দিতেন।

রায় সাহেব রাশভারী মানুষ, দেহখানি শক্তি-উপাসকের উপযুক্ত। সকলে তাহাকে সমীহ করিত, তিনি সমীহ করিতেন একটি বাচাল মেয়েকে। এই মেয়েটি তাহার বন্ধুত্বা স্মিত্রা। হাসি ও কৌতুকপ্রিয় এই মেয়েটির সম্মুখে রাশভারী রায় সাহেব রাশ আগাগো করিয়া দিতেন। তাহার নিজের কথা ছিল না। ডেইজীর দর্শন যত হুর্লভ হইতে লাগিল স্মিত্রাকে তত তিনি কাছে টানিতে লাগিলেন। শক্তিসাধনা বাঙালীর বৈশিষ্ট্য আন্তরিক ভাবে এই মতে বিশ্বাস করিলেও বন্ধুর

আধ্যাত্মিকতার বাণী দ্বায় সাহেব বুঝিতেন না, পছন্দও করিতেন না। সম্ভবত এই জায়গার স্মিত্রার সঙ্গে তাহার মিল ছিল।

স্মিত্রা নিজের বাপকে এড়াইয়া চলিত কিন্তু বাপের এই গম্ভীর, কালীভক্ত, বিশালকায় বন্ধুকে চোখা চোখা বাক্যবাণে বিদ্ধ করিবার সুযোগ পাইলে তাহার সদ্যবহার করিতে ক্রটি করিত না। কখন কখন স্মিত্রার সন্দেহ হইত রায় সাহেব লেগ-পুলিং করিতেছেন, অর্থাৎ ইচ্ছা করিয়া উক্কাইয়া দিতেছেন। এ সন্দেহ একেবারে মিথ্যা নয়। প্রকৃতই স্মিত্রাকে চটাইয়া, তাহাকে খোঁচা দিয়া তাহার কথা শুনিতে তাহার আনন্দ বোধ হইত। স্মিত্রার একটা আলাদা দেখিবার ভঙ্গী ছিল, ব্যঙ্গ-বিজ্রপেও তাহার বেশ দখল ছিল। খোঁকের মাধ্যম বকিতে বকিতে এই সন্দেহ একবার মনে উঠিলেই স্মিত্রার বাক্যবাণ-গুলি একেবারে নিভেজ হইয়া যাইত।

স্মিত্রা আসিয়া তাহার কাছে বসিলে তাহার মনের ভাব বুঝিয়া গম্ভীরভাবে ছুই-চারিটা কথায় তিনি তাহাকে উক্কাইয়া দিতেন, দিয়া মজা দেখিতেন। অরণ্যভীত কাল হইতে বাঙালী শক্তিসাধনা করিয়া আসিতেছে এক দিন গম্ভীরভাবে এই মতের ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া শুনিবার পর স্মিত্রা উদবুদ করিতে লাগিল। পণ্ডিত সেনশর্মার একটি প্রবণের কথা রায় সাহেবের অরণ্য হইল। তিনি বলিতে লাগিলেন, দশপ্রহরগহারিণী মহিষমর্দিনী দুর্গা বাঙালী জাতির ইষ্টদেবী, বাঙালী শক্তির সন্তান, আজন্ম শক্তির সাধক। স্মিত্রার বাগধন্য আর বাধা মানিল না। ব্যঙ্গ হাস্য করিয়া সে বলিল,—বাঙালীর শক্তিসাধনা আর কোন শক্তির নয় কাকাবাবু, শুধু বাকুশক্তির সাধনা। চারদিক থেকে পিটিয়ে, ধনেপ্রাণে ইচ্ছতে মেয়ে যখন একশা করে দিচ্ছে ককিয়ে ককিয়ে বাঙালী তখনো মহিষমর্দিনীর স্তব করছে। গায়ের ধুলো ঝেড়ে ভজ্জনী তুলে বলছে, একবার দেখে নোব, আর আফ্রান করছে। আবার দম নিয়ে শক্তিসাধনার বুকনী ঝেড়ে গাঙ্গীজীর অহিংসবাদকে খবরের কাগজে বিজ্রপ করছে। কবে হুঁজুন ছেলে বোমা ফাটিয়ে নিজের হাত পা উড়িয়েছিল গোটা বাঙালী জাতি তাই ভাঙিয়ে ধাচ্ছে আজও।

খন জর নীচে রায় সাহেবের বড় বড় দুই চোখ মিটমিট করিতেছিল। স্মিত্রা নিজের ঝোঁকে বলিয়া চলিল,—দেহে শক্তি নেই, চরিত্রে শক্তি নেই, শক্তির পরিচয় কেবল বাকু বিভ্বারে। এক জন বাঙালী জীবনে বাকু কথায় যে শক্তি ব্যয় করে পাওয়ারে পরিণত করে তাতে বোধ হয় এক ডজন সুপার কোর্টেন হাওয়াই টু ক্যালকাটা ঘন ষ্টপ উড়তে পারে। সাথে কি অল্প প্রদেশের লোকে বলে বাঙালীর আছে শুধু গিকট অব দি গ্যাব? বাঙালীর জাতীয় বৈশিষ্ট্য। বড় বড় কথা, দলাদলি, পরজীকাতরতা, আত্মসন্ত-রিত্য, এই হ’ল বাঙালীর জাতীয় বৈশিষ্ট্য। গোটা ভারতবর্ষের

লোক কেউ নয়, এ খোঁটা, ও মেডো, সে উড়ে, মাহুয কেবল আপনাদের মনিব আভারসন কোম্পানীর সাহেব পোজী আর তাহাদের বশব্দ কেরাণীর জাত বাঙালী। শাশুক চিনেছেন গোপালঠাকুর। আর কোন্ জাত আছে ভারতবর্ষে যাকে ভারতবর্ষের সবগুলো জাতে মিলে কায়মনে ঘৃণা করে?

সুমিয়ার রাগ দেখিয়া রায় সাহেব হাসিয়া ফেলিলেন। বলিলেন,—আমার মনিব আভারসন কোম্পানীকে এর মধ্যে আনছ কেন মা?

—আভারসন, মরিসন, সোরেনসন সব কোম্পানী এক। বাঙালী সাহেব তাদের মুখে। সাহেবরা গেলে কার মন মুগিয়ে কৃতার্থ হবে বাঙালী? ভারতবর্ষের কোন জাত কি আপনাদের দেখতে পারে? কেন পারে না? কোন্‌ভাবে আপনারা তাদের চেয়ে বড়? বুদ্ধি? বুদ্ধির গোড়ায় জল ঢেলে ঢেলে বাঙালী মরছে, সে গাছ বড়ো, ফল আর ধরছে না। বাঙালীর জাতীয় বৈশিষ্ট্যের বুলি নিছক ভণ্ডামি। বৈশিষ্ট্যের বুলি কপছে আর কত দিন ধোঁকা দেবেন? লোকের চোখ নেই? দিন আসছে যখন চোখের জল কেলে হাত ছোঁড় করে চেয়ে থাকতে হবে পশ্চিমে বাংলার বাইরে যে ভারতবর্ষ রয়েছে তার দিকে।

রায়সাহেব হাসিয়া বলিলেন,—বক্তৃতার জোর তোমারও ত কম নয় মেয়ে। রা শুনে পাখীর জাত চেনা যায়।

সুমিয়ার কিছুকণ শুম হইয়া বলিয়া রহিল। তারপর অল্প অল্প হাসিতে লাগিল। বলিল,—না, আপনাদের মধ্যে এক কোঁটা সিরিয়ানসেন নেই। এত বড় মাহুযটা শুধু ধোল, শাস নেই এক বিন্দু।

রায় সাহেব ভিরক্ত হইয়া স্নেহ হাসি হাসিলেন। এই তীক্ষ্ণবুদ্ধি, বাচ্চত্বরা মেয়েটি তাহার বিশেষ স্নেহের পাত্রী হইয়া উঠিতেছিল। বড় বোনের সঙ্গে সুমিয়ার তুলনা করিয়া তিনি মনে মনে একটু আক্ষেপ করিতেন।

এদিকে সঙ্গীমের ফিরিবার সময় নিকটবর্তী হইয়া আসিল। তাবী পুত্রবধূর নৃত্য অভিযান সংঘত করিবার জন্ত রায় সাহেব বন্ধুকে উপদেশ দিলেন। বন্ধু তখন কন্ডার কালচরাল দিগ্বিজয়ের উদ্দেশ্যে ভক্তমণ্ডলীর সহায়তার অল-ইণ্ডিয়া ট্রের পরিকল্পনা করিতে ব্যস্ত। তিনি যুগে আশ্বাস দিলেন ভাবনার কারণ নাই, সঙ্গীম ফিরিলে শুভকার্য শেষ করা তাহার অভিপ্রায়, কন্ডার অভিপ্রায়ও তাহাই।

পণ্ডিত সেনশর্মার পার্টি অল-ইণ্ডিয়া ট্রের বাহির হইয়া গেল। একটু গোল বাধিয়াছিল সুমিজাকে লইয়া। সে বম্বার পিতা ও জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর নৃত্য ও সঙ্গীতমূলক কালচরাল মিশনের প্রতি উদাসীন। তাহার পড়াশুনার বাতিক ছিল। তাহা ছাড়া তাহার মামার বাড়ীর উগ্র ধরণের দেশপ্রীতির প্রভাব বোধ হয় তাহার মনের উপর পড়িয়াছিল। পিতা ও ভগ্নী ট্রের বাহির হইবার আগে সে মামার বাড়ী গিয়া উঠিল।

বেনারস, লক্ষ্মী, এলাহাবাদ, দিল্লী হইয়া পণ্ডিত সেনশর্মার পার্টি ভারতীয় নৃত্যের পৃষ্ঠপোষক এক বিজ্ঞ হাইনেসের আস্থানে মধ্যভারতে গেল। সেখান হইতে বোম্বাই। পার্টির দক্ষ পাবলিসিটি অফিসারের দক্ষতার মিস্ ডেইজী সেনশর্মা সর্বভারতীয় সেনসেশনের পথ্যায় উঠিল।

বোম্বাইতে সেনশর্মা দলের আবির্ভাবের কথা জানিতে পারিয়া সঙ্গীম জন্তেবাস্তে মারাঠি বন্ধুর নিকট বিদায় লইয়া কলিকাতায় চলিয়া আসিল।

গৃহে ফিরিয়া সঙ্গীম দেখিল পিতা শয্যাশায়ী, ভাল করিয়া কথা বলিতে পারেন না। মাস কয়েক আগে সন্ধ্যাসরোণের আক্রমণ হইয়াছিল, কোনমতে এ যাত্রা রক্ষা পাইয়াছেন। তাহার মধ্যম ভ্রাতা অনীমকে শান্তি ও শৃঙ্খলার রক্ষকগণ কোথায় লইয়া গিয়াছে জানা যায় নাই। সে নাকি অপরাধজনক হ্যাণ্ডবিল বিলি করিতেছিল।

পিতা দুঃখ করিয়া জানাইলেন যে বড় ছেলের বিবাহ দিয়া যাইবার সাধ ছিল, সে সাধ আর পূর্ণ হইল না। তিনি এইরূপ ইঙ্গিত করিলেন যে সংসারের দিকে চাহিয়া ডেইজীর সঙ্গে ছেলের বিবাহ দিবার অভিপ্রায় আর তাহার নাই, কিন্তু তিনি কথা দিয়াছিলেন অনেক আগে।

পারিবারিক বিপর্যয়ের চাপে ইউরোপের আসন্ন ঝটিকা অতি দূরের, নিঃসম্পর্কিত ব্যাপার বলিয়া সঙ্গীমের মনে হইল। মনে হইল যে নবযুগের প্রভাতের আশায় সে বিদেশে দিন গুণিতে ছিল সে প্রভাত উদয়ের পথে গুপ্তিত হইয়া গিয়াছে।

সঙ্গীম একটু গুছাইয়া লইয়া কি ভাবে আপনাকে দেশের কাজে নিয়োজিত করিবে তাবিতেছে, বিভিন্ন দলের নেতাদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ, আলোচনা-আলোচনা করিয়া প্রকৃত অবস্থা বুঝিবার চেষ্টা করিতেছে। ডেইজীর কথা ভুলিয়া পিতাকে ইঙ্গিতে জানাইবার চেষ্টা করিয়াছে যে তাহাকে বিবাহ করা বোধ হয় সম্ভব হইবে না।

কয়েক দিন পরের কথা। রায়সাহেব সঙ্গীমকে ডাকিয়া তাহার হাতে একখানা পত্র দিলেন, একটু হাসিয়া বলিলেন,—যুগল লিখেছে, পড়ো।

পত্রে বালাবন্ধুর কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করিয়া পণ্ডিত সেনশর্মা লিখিয়াছেন যে তিনি অতি দুঃখিত যে বন্ধুর নিকটে বহুদিন পূর্বে যে প্রতিক্রিয়া দিয়াছিলেন তাহা রক্ষা করিতে পারিলেন না। ভগবানের ইচ্ছা অন্তরূপ। শ্রীমতী ডেইজীকে আশ্রমজীবন আকর্ষণ করিয়াছে। আধ্যাত্মিকতার সংস্কার তাহার রক্তে রহিয়াছে, শ্রীমতী যন্ত্রমাত্র। তাহার এক আশ্রমে গিয়াছিলেন মহাপুরুষের পূণ্যদর্শন লাভের আকাঙ্ক্ষায়। আকাঙ্ক্ষা আশার অধিক পূর্ণ হইয়াছে। আশ্রমের আনন্দধন আধ্যাত্মিক প্রভাব শ্রীমতীকে গভীরভাবে অভিভূত করিয়াছে, সে আশ্রমবাসিনী হইয়াছে। শ্রীমতীকে ভূমি অত্যন্ত স্নেহ করিতে, আধ্যাত্মিক জীবনলাভের জন্ত তাহার এই ত্যাগ

খীকার ভোমাকে গভীর আনন্দ দান করিবে শব্দে হুই।

কল্লার সম্বন্ধে এই সংবাদ দিয়া পণ্ডিত সেনশর্মা ইহার পর লিখিয়াছেন আশ্চর্য্যবৃত্ত বাঙালী জাতির লুপ্ত স্মৃতি ও পৌরব উদ্ধার করিবার জন্ত জীবনের বাকী কয়টি দিন তিনি যোগ-সাধনায় ব্যস্ত করিবেন। এই উদ্দেশ্যে মহাবলিপুরমের নিকটে সাধনার পক্ষে অশুকুল মনোরম নৈসর্গিক দৃষ্টির মধ্যে ত্রিহারমিটেজ নামে একটি আশ্রম স্থাপন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। এই মহৎ প্রচেষ্টার সাফল্য সাধারণের, বিশেষ করিয়া ভোমার মত প্রাচীন আদর্শের অকৃত্রিম অনুরাগী ব্যক্তি-গণের আশুকুল্য ও দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভর করিতেছে। যৎ-কিঞ্চিৎ সাহায্যও কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত হইবে।

পদ্ম পড়া শেষ করিয়া সসীম পিতার দিকে চাহিয়া হাসিল। পিতার মনে বোধ হয় তখনও একটু আশঙ্কার ভাব ছিল, ছেলের হাসি দেখিয়া তিনি নিশ্চিন্ত বোধ করিলেন। কিন্তু বাল্যবন্ধুর সহিত এই বিচ্ছেদে তাঁহার মনে একটা ব্যথা রহিয়া গেল। এই ব্যথা স্মৃতিজার জন্ত। যোগশয্যায় স্মৃতিজার কথা তাঁহার পুনঃপুনঃ মনে পড়িয়াছে। তাহার কোন ধর তিনি আজকাল পান না। এবার বোধ হয় ধর পাইবার পথও বন্ধ হইয়া গেল।

ডেইজীর আশ্রমজীবন গ্রহণের ব্যাপার লইয়া দিন কয়েক কাগজে নানা প্রকার আলোচনা হইল। কোন কোন কাগজের উৎসাহী নিজস্ব সংবাদদাতারা আশ্রমিকদিগের মধ্যে ধাতনামা ব্যক্তিদিগের সঙ্গে ইষ্টারভিউ করিয়া রিপোর্ট পাঠাইতে লাগিলেন। তাঁহাদের বর্ণনাশ্রমী ও মন্তব্যের সরসতার শুণে রিপোর্টগুলি অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হইত। সাধারণের অবগতির জন্ত অবশেষে ত্রিহারমিটেজ হইতে এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়া পণ্ডিত জে. কে. সেনশর্মা জানাইলেন যে—বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক প্রেরণা ব্যতীত ত্রিমতী ডেইজীর আশ্রমজীবন গ্রহণের মূল আর কোন প্রেরণা নাই। সাধারণে এই বিবৃতিতে সন্তুষ্ট হইয়া ডেইজীকে দ্রুত ভুলিয়া যাইতে আরম্ভ করিল।

সসীম ডেইজীকে ইহার পূর্বেই ভুলিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

ডেইজীকে সসীম যত ভুলিতে লাগিল, বিদেশে যাইবার আগে ডেইজীদের বাড়ীতে এক জনের কৃত্রিম সন্তুষ্টিজনক সঙ্গিত উচ্চারিত একটা কথা তাহার তত মনে পড়িতে লাগিল। করিয়া আসিয়া আর তাহার সঙ্গে দেখা হয় নাই, তাহার কোন ধরও সে জানিতে পারে নাই। তাহার কথাটা অতি হালকা কোতুকের ভঙ্গীতে বলা হইয়াছিল কিন্তু কেন যেন স্বপ্নে শোনা একটা স্তম্ভর গানের কণির মত কথাটা তাহার মনের এক কোণে গুঞ্জনিত হইত। এই গুঞ্জনকে আশ্রয় করিয়া একখানি কোতুকপ্রিয়, মিষ্ট মুখ তাহার মনের আকাশে উঁকি দিত।

এক দিন পুলিশ আপিসে ভ্রাতার সম্বন্ধে অহুসস্থান করিতে

গিয়া সসীম জানিতে পারিল শীঘ্র তাহার ছাড়া পাইবার সম্ভাবনা আছে। যে আপত্তিকরক হাঙবিল বিলি করিবার জন্ত তাহাকে ধরা হইয়াছিল তাহা নাকি বাস্তবিক আপত্তিকরক নহে। অনেকখানি উৎফুল্ল হইয়া সে বাড়ীতে ফিরিল। পিতা সংবাদটি পাইলে আনন্দিত হইবেন।

এ রকম হালকা, উৎফুল্ল মনের অবস্থা অনেক দিন হয় নাই সসীমের। হঠাৎ তাহার জেনোয়া আসিতে ট্রেন হইতে দেখা একটি পল্লীদুত্তের কথা মনে পড়িল। সকাল বেলা। রেল-লাইন হইতে অনতিদূরে অলিঙ্গ ক্ষেতের মধ্যে একটা লাল বাড়ী লতা-পাতা-ফুলের বেষ্টিত মধ্য। পিছনের ক্ষমি ক্ষেয়ে উঁচু হইয়া পাহাড়ের সঙ্গে মিশিয়াছে। পাহাড়ের মাথায় কুয়াশার ছাল। প্রভাতবর্ষার আলো পড়িয়া বাড়ী, ক্ষেত, বাগান, ফুল, পাতা ঝিকমিক করিতেছে। বাড়ীর ফটকে হলুদ রঙের কাঁকর বিছানো পথে দাঁড়াইয়া একটু মেয়ে সকেতুহলে গাড়ীর দিকে চাহিয়া আছে। কালো চুল, অলিঙ্গ রং, অতি সুকুমার যুগের ডোল। গাড়ী দেখিবার জন্ত বোধ হয় বিছানা হইতে উঠিয়া ছুটিয়া আসিয়াছে। প্রভাতের আলোতে সমুজ্জ্বল পটভূমিতে এই বিদেশিনী কিশোরীকে দেখিয়া সসীম মুগ্ধ হইল। তাহার নিজস্বীন রাজের অভিমা পলকে দূর হইয়া গেল। সমগ্র দৃষ্টি ও তাহার নিজের ভাল-লাগা মিশাইয়া একটি অপরূপ চিত্র তাহার মনে অঙ্কিত হইয়া রহিল। সে দেখিয়াছে কোন কারণে মন হালকা ও উৎফুল্ল হইলে এই চিত্রটি তাহার চোখের সম্মুখে স্ফুটয়া উঠে, মনে মনে আনন্দের ছোপ লাগাইয়া দেয়।

পিতাকে ধরটি জানাইবার জন্ত সে উপরে গেল। সিঁড়িতে উঠিবার সময়ে পিতার হাসির শব্দ কানে আসিয়া তাহাকে বিস্মিত করিল। আসিয়া অবধি সে তাহাকে আগের মত হাসিতে দেখে নাই, কথাবার্তাও খুব অল্প ও যুদ্ধ হইয়া আসিয়াছিল। তাহার এতখানি পরিবর্তন আনিল এমন কি ষটিয়াছে ইতিমধ্যে?

ঘরের সম্মুখে আসিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইল। দরজার দিকে পিঠ করিয়া একটু মহিলা পিতার শয্যার পাশে চেয়ারে বসিয়া তাঁহার সঙ্গে কথা বলিতেছেন। ঘর অল্প অন্ধকার হইয়াছে।

একটু ইতস্তত করিয়া সসীম ঘরে প্রবেশ করিল। ছুতার শব্দে মহিলাটি ঘাড় ফিরাইয়া তাহাকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

সসীম তাঁহার যুগের দিকে চাহিয়া ব্যথিত ও বিস্মিত হইল। স্মৃতিজার চেহারা এ কি হইয়াছে? তাহাকে চেনা যায় না। কি অল্প হইয়াছিল? বাহিরে সে উদ্বেগ প্রকাশ করিল না। একটু হাসিয়া বলিল,—কখন এলে স্মৃতিজা? কেমন আছ?

স্মৃতিজা হাসিয়া তাহাকে নমস্কার করিল, কোন উত্তর দিল না।

রায় সাহেব বলিলেন, তোমরা বসো ছ'জন। সুমিত্রা তার মায়ার বাড়ীতে ছিল এত দিন। ও নিজেও অমুহু।

সুমিত্রাকে তিনি বিছানার উপরে বসিতে বলিলেন। সুমিত্রা বসিলে তাহার মাথায় একখানা হাত রাখিয়া বলিলেন,—সুমিত্রা কিছুদিন আমার কাছে থাকবে। ও আমাকে ভাল ক'রে ভুলবে বলছিল।

সসীম সুমিত্রার মুখের ভাব দেখিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহার মুখ রায় সাহেবের দিকে ফিরানো, কিছু দেখা গেল না। সে বলিল, সুমিত্রা কি থাকবেন, বাবা?

রায় সাহেব হাসিয়া বলিলেন,—বাপ ও বড় বোন ছ'জনে দুই আশ্রমে ঢুকেছে। মা নেই। ও কি মায়ার বাড়ীতেই বারো মাস পড়ে থাকবে? তুমি একবার বলে দেখ না?

পিতা রহস্ত করিতেছেন কিনা সসীম বুঝিতে পারিল না। একবার তাহার মনে হইল বোধ হয় দুই জনের মধ্যে ইহার আগে কোন রকম বোঝাপড়া হইয়াছে। কিন্তু সুমিত্রা বাস্তবিক এখানে থাকিবে কেন? পিতা তাকে ঘেঁহু করেন দেহজ্ঞ থাকিবার কথা বলিতেছেন। সুমিত্রাকে কাছে পাইয়া পিতার পরিবর্তন সে চোখে দেখিতেছে। কিন্তু তাহাদের আগ্রহে কি আসে যায়? একটু বিভ্রতভাবে সে বলিল,—আমি বললে যদি সুমিত্রা থাকেন বাবা, আমি আপনার দিকে চেয়ে তাঁর কাছে এক-শ' বার এ অমরোষ করব, কিন্তু এভাবে—

হঠাৎ তাহার কথা জড়াইয়া গেল, মুখ লাল হইয়া উঠিল।

রায় সাহেব ভীক্স দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিলেন। কি বুঝিয়া মনে মনে একটু হাসিলেন। তিনি বলিলেন,—সুমিত্রা, একটু মুখখানা তোল ত মা, হেলে আমার দিকে চেয়ে তোমাকে থাকবার জন্ত এক-শ' বার অমরোষ করতে প্রস্তুত আছে। কথাটা একটু ভাল করে শোন। অনেক গভীর অর্থ আছে বোধ হয় কথাটার মধ্যে। একটু ভেবে দেখ ত মা। ভেবে ওকেই উত্তর দিও। ওর নিজের দিক থেকে কিছু বলবার থাকলে সেটাও শুনে নিও। সসীম, সুমিত্রাকে নিয়ে যাও, হাত-মুখ ধুয়ে ও কিছু খেয়ে নিক। যাও মা।

সুমিত্রা উঠিয়া সসীমের অনুসরণ করিল।

রায় সাহেবের ঘরের পরে একটা প্রশস্ত দালান, তারপর

ছেলেদের ঘর। এ বাড়ীর কোন কিছু সুমিত্রার অপরিচিত নহে। দালানে আসিয়া সসীম বলিল,—সুমিত্রা, একটা কথা বলব যদি কিছু মনে না কর।

সুমিত্রা দাঁড়াইয়া তাহার দিকে চাহিয়া বলিল,—বলুন।

সসীম কথা বলিবার চেষ্টা করিতেছিল, তাহার দুই চোখ ব্যগ্রভাবে সুমিত্রার মুখে চোখে কি যেন খুঁজিতেছিল।

সুমিত্রা নতমুখে দাঁড়াইয়া। সসীম হঠাৎ বাকশক্তি হারাইয়াছে। তাহার ব্যাকুল, মুখর চোখের ভাষা হইতে সুমিত্রা সম্ভবত কিছু অসুমান করিয়া লইল। ধীরে ধীরে তাহার মুখে যত্ন হাসির রেখা দেখা দিল। সসীমের একটু কাছে সরিয়া আসিয়া যত্ন কণ্ঠে সে বলিল,—যে কথা বলতে চাও তুমি, সেটা বলতেও কি আমাকে সাহায্য করতে হবে?

এতক্ষণে সসীমের বাকশক্তি ফিরিয়া আসিল। সে অত্যন্ত উৎফুল্ল হইয়া হাসিয়া বলিল,—ধ্যাক্স সুমিত্রা, একটু সাহায্য কর।

—এবার তোমার নিজের দিক হতে সুমিত্রার কাছে কিছু অমরোষ করবার আছে কিনা বল। আই নো সি ইজ এ জেনারেল ইয়ং লেডী।

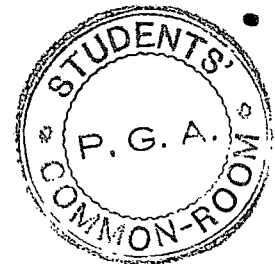
সসীম হাসিল। বলিল,—তুমি টপ দিয়েছ, সেটা কানে কানে বলব পরে।

তাহার টপ দিবার কথা শুনিয়া সুমিত্রা প্রথমটা বিস্মিত হইল। তারপর চকিতে প্রায় তিন বৎসরের আগের এক দিনের কথা মনে পড়িল। তাহার সেদিনকার হাফা পরি-বাস সসীম এইভাবে মনে রাখিয়াছে? তবে কি সসীম তখন হইতে—?

মুখ তুলিয়া সে পূর্ণ দৃষ্টিতে সসীমের দিকে চাহিল। সসীম যত্ন হাসিতেছে। কি জানি কি ভাবিয়া কৌতুকপ্রিয় সুমিত্রার চোখের পাতা একটু ভারী হইয়া আসিল, দুই-একটা ফোঁটা পড়াইয়া পড়িল কিনা বলা যায় না।

সসীম তাহাকে দেখিতেছিল। সে হাসিয়া বলিল,—বাস্ সুমিত্রা, আর নয়। হাত মুখ ধুয়ে এস দিক চট করে। রাজ্যপাটের ভার নাও, অভাগা প্রজার দল ক্ষুধার্ত।

সুমিত্রার মুখে হাসি ফুটয়া উঠিল।



নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮৬১—১৯৪০

জন্ম : বাল্য-শিক্ষা

আত্মমানিক ১৮৬১ সনে বিহারের মোতিহারীতে নগেন্দ্রনাথের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম—মথুরানাথ গুপ্ত, আদি নিবাস হালিশহর ২৪-পরগণা। মথুরানাথ বিহারে সবজজ ছিলেন। তিনি যখন দ্বিতীয় বার মোতিহারীতে বদলি হন, সেই সময়ে তাঁহার পত্নীবিয়োগ হয়; মধ্যম পুত্র নগেন্দ্রনাথের বয়স তখন আট নয় বৎসর। মথুরানাথ দ্বিতীয় বার দারপরি-এক করিয়াছিলেন। নগেন্দ্রনাথের বাল্য ও কৈশোর বিহারের মোতিহারী, ছাপরা, আরা ও ভাগলপুরে অতিবাহিত হইয়াছিল। ছাপরায় অবস্থানকালে, নয়-দশ বৎসর বয়সে, তিনি স্থানীয় ইংরেজী জেলা-স্কুলে বিভা শিক্ষা করিয়াছিলেন। ১৮৭৮ সনের গোড়ায় তিনি কলিকাতায় আসিয়া জেনারেল এসেমরীজ ইন্সটিটিউশনে প্রবেশ করেন এবং ঐ বৎসর এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়া প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। পারিবারিক আবহাওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা লাভে অন্তরায় হওয়ার নগেন্দ্রনাথের ভ্রাত্যে কোন ভিত্তি লাভ ঘটে নাই। জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত (জে. এন. গুপ্ত, আই সি এস) স্মৃতিকথায় ষোষ্ঠ্যতাত-পুত্র নগেন্দ্রনাথের বাল্য-জীবন সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

“আমার মেজদার কথা দু-একটা বলি, ইনি বিখ্যাত সাহিত্যিক নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। কিন্তু যে সময়ের কথা বলছি তখন সাহিত্য-ক্ষেত্রে বড় কিছু করেছিলেন বলে মনে পড়ছে না। জেনারেল এসেমরী কলেজে পড়তেন। জগৎ-আলোক বিবেকানন্দ হয় তাঁর সহপাঠী নয় সেই কলেজের সহাধ্যায়ী ছিলেন। সে কথা মেজদা নিজেই একটা প্রবন্ধে বলেছেন। বাড়ীতে মেজদা এক রকম ডিক্টেটর ছিলেন। আমাদের সকলের অধিনায়ক ত ছিলেনই তাছাড়া যা খুদী তাই করতেন।...আমি মেজদার প্রধান চেল ছিলাম। লেজুরের মত তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়াইতাম। এই সময়ে আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেনের বাড়ীতে দু-এক বার গিয়েছিলাম এবং তাঁদের বাড়ীতে শেক্সপিয়ারের “Merchant of Venice” ট্র্যাগেডিএ “সাইলক”র পাঠ মেজদা নিয়েছিলেন।...মেজদার বিয়ে হবার পর মেজদার স্বস্তরবাড়ী পরগণাটাতে প্রায়ই যেতাম। মেজবৌদি ও তাঁর বোন ‘হেবি’ দুজনকেই খুব ভালবাসতাম। মেজদার একটা কথা নিয়ে একবার আমার মা খুব ঠাটা করেছিলেন—তা খুব মনে আছে। বিয়ের দু-এক দিন পরে যখন মেজদা বৌ নিয়ে বাড়ী ফিরে এলেন—তখন বল্লেন “কাকি, আজ এখানে কেমন ঝাপসা ঝাপসা লাগছে?” মা বল্লেন “তা ভো লাগবেই, বাবা, সেখানে সকলেই সাদা—

সকলেই সাদা, এখানে আমরা সকলেই কালো।” বোধ হয়, এ কথা শুনে মেজদা একটু খুদীই হয়েছিলেন।

“মেজদার সঙ্গে প্রিয়বাবুর বাড়ী অনেক বার গেছি। মেজদা তাঁর কাছ থেকে কত বই যে এনে পড়তেন তার আর ঠিকানা নাই। মেজদার পড়ার বাইটো অসামান্য ছিল। বিটনস্ ডিক্সনারী প্রকৃতি দুই চারিটা মোটা অভিধান আগাগোড়া প’ড়ে প্রায় মুখস্থ করেছিলেন। আর এই সময় অনেক বার জোড়াসাঁকোর রবিবাবুদের বাড়ী যেতেন। আমি প্রায়ই তাঁর সঙ্গে যেতাম। মেজদা ও রবিবাবুর খুব বন্ধুত্ব ছিল। কিন্তু তাঁর কথা রবিবাবু জীবন-স্মৃতিতে কিছু কেন যে বলেন নি—জানি না। মেজদা সাহিত্যচর্চা পরজীবনে অনেক করেছিলেন। তিনি লাহোর, করাচী, বোম্বে প্রভৃতি প্রদেশে বাস করবার সময় ইংরাজী ও বাংলায় অনেক উপভাস, কবিতা ও প্রবন্ধ লিখেছিলেন। মডার্ন রিভিউতে তাঁর লেখা পড়বার ক্ষমতা অনেক উৎসুক হয়ে থাকতেন।” (‘স্মৃতি ও চিন্তা’, পৃ. ৩৪-৩৬)।

সংবাদপত্র-সেবা

বাইশ-তেইশ বৎসর বয়সে, ১৮৮৪ সনে, নগেন্দ্রনাথ অকস্মাৎ কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া ভারতের পশ্চিম সীমান্তে করাচি চলিয়া যান। তথায় তিনি ‘ফিনিজ’ (Phoenix) নামে একখানি ইংরেজী সাপ্তাহিক-পত্রের সম্পাদক হন। কলিকাতায় অবস্থানকালে তাঁহার বিবাহ (ইং ১৮৮২?) ও একটি পুত্রসন্তান হইয়াছিল। করাচিতে পৌঁছিয়া তিনি শিশুপুত্র সহ পত্নীকে আনাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তিনি মাঝে মাঝে কলিকাতায় যে না আসিয়াছেন তাহা নহে। কর্মস্থল হইতে তিনি বহু রবীন্দ্রনাথকে দুইখানি পত্র লিখিয়াছিলেন; উহা “প্রবাসের চিঠি” ও “করাচির চিঠি” নামে জ্ঞানদানন্দিনী দেবী-সম্পাদিত ‘বালকে’ (ভাদ্র, মাঘ ১২৯২) প্রকাশিত হয়। “প্রবাসের চিঠি” রবীন্দ্রনাথের “বর্ধার চিঠি”র (শ্রাবণ ১২৯২) উত্তরে লিখিত। চিঠিগুলিতে সিন্ধুদেশের—বিশেষ করিয়া করাচির সুন্দর বর্ণনা আছে।

সাত বৎসর যোগ্যতার সহিত ‘ফিনিজ’ পরিচালন করিয়া নগেন্দ্রনাথ লাহোরের ‘ট্রিবিউন’ পত্রের সম্পাদন-ভার গ্রহণ করিবার জন্ত ১৮৯১ সনের মে মাসে সিন্ধুদেশ পরিত্যাগ করেন। তাঁহার পূর্বে শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায় ‘ট্রিবিউন’ সম্পাদক ছিলেন। নগেন্দ্রনাথের আমলে পত্রিকাখানি জনমত-গঠনের বিশেষ সহায়ক হইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে ‘ট্রিবিউন’ সম্পাদন করিয়াই তিনি সাংবাদিকরূপে যশস্বী হইয়াছিলেন।

১৮৯৯ সনে তিনি যখন কাঁচাভার ত্যাগ করেন, তখন 'ট্রিবিউন' সপ্তাহে দুই বারের পরিবর্তে তিন বার প্রকাশিত হইত।

লাহোর হইতে কিরিনা নগেন্দ্রনাথ পাঁচ বৎসর কলিকাতায় অবস্থান করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি ব্রহ্মবাহুব উপাধ্যায়ের সহযোগিতায় 'ট্রিবিউনে' 'সেকুন্দি' নামে একখানি ইংরেজী মাসিকপত্র পরিচালন করেন। ১৯০৫ সনে তিনি এলাহাবাদে সচ্চিদানন্দ সিংহ-প্রতিষ্ঠিত 'ইন্ডিয়ান পীপল' (Indian People) নামক সাপ্তাহিক-পত্র সম্পাদন করিবার জন্ত আহুত হন। 'ইন্ডিয়ান পীপল' চারি বৎসর পরে এলাহাবাদের দৈনিক 'লীডার' (Leader) সহিত সম্মিলিত হইয়া যায়। যজ্ঞেশ্বর চিত্তামণির সহিত যুগ্মসম্পাদক-রূপে নগেন্দ্রনাথ সাত মাস 'লীডার'ও পরিচালন করিয়াছিলেন।

১৯১০ সনে নগেন্দ্রনাথ পুনরায় লাহোরের 'ট্রিবিউন' পত্রিকায় যোগদান করিয়া ১৯১২ সন পর্যন্ত ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

১৯১৩ সনে তিনি অল্প দিনের জন্ত লাহোরের 'পঞ্জাবী' পত্রের সম্পাদক হন এবং এই বৎসরের প্রথম ভাগেই সম্পাদক-রূপে সাংবাদিকের কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া কলিকাতা প্রত্যাবর্তন করেন।

সাংবাদিকরূপে নগেন্দ্রনাথের ব্যাতি প্রদানতঃ বঙ্গদেশের বাহিরেই বিস্তৃত ছিল। স্বদেশে তিনি সুসাহিত্যিকরূপেই বিশেষভাবে পরিচিত। মাতৃভাষায় তাঁহার অসাধারণ লিপিকলিতা ছিল। 'ট্রিবিউন' ছাড়িয়া ১৮৯৯ সনে কলিকাতায় অবস্থানকালে তিনি বাংলা সাময়িক-পত্র সম্পাদনে ভ্রমী হন।

'প্রদীপ'।—রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় অবসর গ্রহণ করিলে, ১৩০৬ সালের কাঙ্ক্ষন মাস (ইং ১৯০০), ৩য় ভাগ ৩য় সংখ্যা, হইতে নগেন্দ্রনাথ 'প্রদীপ'ের সম্পাদনভার গ্রহণ করেন। এই সংখ্যায় "সম্পাদকের নিবেদন" প্রকাশ :—

"এই সংখ্যা হইতে প্রদীপের সম্পাদকীয় ভার আমি গ্রহণ করিলাম। রামানন্দ বাবু প্রদীপের সম্পাদকতা পরিত্যাগ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি পূর্বের জায় স্নেহচক্ষে প্রদীপকে দেখিবেন আমরা সে আশা করি এবং সর্বদা তাঁহার পরামর্শ পাইব সে ভরসাও আছে।

বাদালা মাসিক পত্রের ইতিহাসে বহু পরিবর্তন ঘটয়াছে। আমাদের দেশে মাসিক পত্রের যখন প্রথম সৃষ্টি হয় তখন লেখকের সংখ্যা অল্প, সম্পাদককেই পত্রের অধিকাংশ লিখিতে হইত। এখন শিক্ষিত লোকে অনেকে বাদালা পড়েন ও লেখেন, বাদালা ভাষার উন্নতিকল্পে এখন অনেকে ভ্রমী। অজ্ঞাত দেশে সম্পাদককে যাহা করিতে হয় কতক পরিমাণে এখন এদেশেও তাঁহাকে তাহাই করিতে হয়। প্রধানতঃ প্রবন্ধ নির্বাচন করাই সম্পাদকের কর্তব্য। তাহার অধিক বিশেষ কিছু করিতে হইবে না এই ভরসা পাইয়াই আমি এই গুরুতর কার্যে হস্তক্ষেপ করিতেছি। বাহারা এত দিন

প্রদীপকে অগ্রগৃহীত করিয়াছেন, বাহাদের রচনায় এই পত্রের এতাদৃশ উন্নতি হইয়াছে তাঁহারা আমাকেও কৃপা করিবেন ইহাই আমার প্রধান ভরসা।"



নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

নগেন্দ্রনাথ মাত্র চারি মাস 'প্রদীপ'ের সম্পাদক ছিলেন। ১৩০৭ সালের আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশক বৈকুণ্ঠনাথ দাসের এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয় :—

"এত কাল ব্যক্তিবিশেষের হস্তে প্রদীপ সম্পাদনভার ন্যস্ত ছিল। ত্রীমুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও ত্রীমুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় বিশেষ দক্ষতার সহিত প্রদীপ সম্পাদন করিয়া গ্রাহকবর্গ ও সাধারণের ঐতি বর্দ্ধন করিয়াছেন। আমরা সেইজন্য তাঁহাদের নিকট চিরকণ্ঠী। কিন্তু দেখিলাম একের অহুতাগ ও যত্নের উপর নির্ভর না করিয়া যদি প্রদীপ দেশের সমবেত যত্ন ও পরিচর্যা লাভ করিতে পারে, তবে ইহার উন্নতি ক্ষিপ্ততর হইবে। উদ্দেশ্য প্রদীপের উন্নতি, উপায় সময়েই সঙ্গ সঙ্গ পরিবর্তিত হইবেই হইবে। এই উন্নতির উদ্দেশ্যে কয়েকজন সাহিত্যাহুরাদী লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠিত হলেও লইয়া প্রদীপ পরিষদ গঠিত হইল। এখন হইতে প্রদীপ সম্পাদনভার এই পরিষদের হস্তে ন্যস্ত হইল।"

প্রথম তিন বৎসরের 'প্রদীপে' নগেন্দ্রনাথের বহু রচনা—গল্প, প্রবন্ধ, কবিতাদি প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সকল রচনার মধ্যে ১৩০৬ সালের পৌষ-সংখ্যায় প্রকাশিত "মাদ্যাবিনী" নামে গল্পটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

‘প্রভাত’—১৩০৭ সালের বৈশাখ (৭) মাসে নগেন্দ্রনাথের সম্পাদনায় ‘প্রভাত’ নামে একখানি উচ্চাঙ্গের সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেন :—

“তিনি টিবিউনের কাজ ছাড়িয়া [ইং ১৮৯৯] বাংলা দেশে, কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। এখানে তাঁহার প্রেইট্র পৈতৃক গৃহ হইতে ‘সুপ্রভাত’* নাম দিয়া একটি বাংলা সাপ্তাহিক বাহির করেন। ইহাতে রবীন্দ্রনাথের কিছু লেখা বাহির হইয়াছিল, এইরূপ মনে পড়িতেছে। আমি তখন এলাহাবাদে কাজ করিতাম, নগেন্দ্রবাবুর কাগজটির সেখানকার সংবাদদাতা ছিলাম। তাঁহার কাগজে ছাপা আমার দু-একটা সংবাদ-চিঠি (“news-letter”) পড়িয়া তিনি আমাকে ব্যক্তিগত চিঠিতে এই ‘সার্টিকিটে’ দিয়াছিলেন যে, আমার জর্ণালিস্টিক ইনস্টিংক্ট (journalistic instinct) আছে। তাহাতে আমি উৎসাহিত হইয়াছিলাম।” (“নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত” : ‘প্রবাসী’, মাঘ ১৩৪৭)।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সেবা

নগেন্দ্রনাথ পরিষদের বিতাকাজী বন্ধু ও আয়রণ সভ্য ছিলেন। ১৩০৮ ও ১৩১১-১২ সালে (ইং ১৯০১, -৪-৫) কার্যনির্বাহক-সভার সভ্যরূপে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা-কার্যে বিশেষভাবে সহায়তা করিয়াছিলেন। এই সময়ে পরিষদের মাসিক অবিবেশনগুলিতেও তিনি অনেক পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করেন। কয়েকটির উল্লেখ করিতেছি—
 জৌপদী ও সত্যভামা সংবাদ...২১ কার্তিক ১৩১০
 বিজাপতির প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত পদাবলী ৮ ফাল্গুন ১৩১০
 বৈষ্ণব কাব্যে মিথিলার স্থান...১১ ভাদ্র ১৩১১
 বিদ্যাপতি-প্রসঙ্গ...৩ পৌষ ১৩১১
 গোবিন্দ দাস...২৪ পৌষ ১৩১১

শেষ-জীবন : মৃত্যু

পূর্বেই বলিয়াছি, ১৯১৩ সনে নগেন্দ্রনাথ সংবাদপত্র-সম্পাদকের কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া প্রায় আড়াই বৎসর কাল (২৯ মাঘ ১৩১১—১ বৈশাখ ১৩২২) কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের প্রাইভেট সেক্রেটারী-রূপে তাঁহার রাজনীতি-কার্যে সহায়তা করেন। তিনি ‘বেঙ্গলী’র সম্পাদকীয় বিভাগেও কিছু দিন যুক্ত ছিলেন। ১৯১৭ সনে নগেন্দ্রনাথ

টাটার তেল-কলের সেক্রেটারী হইয়া বোম্বাই যাত্রা করেন। ১৯২২ সনে তিনি এই কার্যভার ত্যাগ করিয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল ইঙ্গিত ক্ষাতি-সেবার আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। আত্মমাত্রিক ৭৮ বৎসর বয়সে, ২৮ ডিসেম্বর ১৯৪০, শনিবার প্রাতে, বোম্বাইয়ে তাঁহার মৃত্যু হয়। জীবনের শেষ দশ বার বৎসর তিনি বোম্বাইয়ের বান্দোরায় কাটাইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে এলাহাবাদের ‘সীডার’ সম্পাদকীয় স্তম্ভে লেখেন :—

“We deeply regret the death announced in Sunday morning's *Leader*, of Nagendranath Gupta at the age of 78 at a nursing home in Bombay. Mr. Gupta was a distinguished journalist. He first came to be known to the public as editor of the *Phoenix* of Karachi. But he rose to fame later as editor of the *Tribune* of Lahore, whose proprietor, the late Sardar Dyal Singh Majithia, gave him his full confidence. The *Tribune* became so influential under Mr. Gupta's editorship that once the local Anglo-Indian paper, the *Civil and Military Gazette* asked whether the province was being governed by Sir Dennis Fitzpatrick or by the editor of the *Tribune*! . . . In the autumn of 1905, he was brought over to Allahabad by Mr. Sachchidananda Sinha to edit the *Indian People*. He did so for four years, after which that paper was incorporated with the *Leader*. Of this paper he was the first editor with Mr. Chintamani but he severed his connection with it after seven months. . . . Mr. Gupta had command of a fine literary style and wrote still better on literary topics than on political. He was also a story-writer, poet and artist. Altogether he was one of the most cultured of men and always lived a peaceful life.”

রচনাবলী

শৈশব হইতেই বাংলা-সাহিত্যের প্রতি নগেন্দ্রনাথের অকৃত্রিম অনুরাগ ছিল। কলিকাতায় পাঠ্যাবস্থায় তিনি কাব্য-চর্চা শুরু করেন। ১২৮৯-৯০ সালের ‘ভারতী’তে তাঁহার অনেকগুলি কবিতা স্থান পাইয়াছিল। কবি বিহারিলালের নিকট তাঁহার পভাস্থা ছিল। রবীন্দ্রনাথ ও প্রিয়নাথ সেনের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল। যে স্বল্প-সংখ্যক অন্তরঙ্গ বন্ধুকে বিবাহে রবীন্দ্রনাথ আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, নগেন্দ্রনাথ ও প্রিয়নাথ তাঁহাদের অন্ততম। নগেন্দ্রনাথ কাব্যচর্চা হইতে ক্রমে কথাসাহিত্যে আকৃষ্ট হন। বাংলা-সাহিত্যের আলোচনার জন্য তাঁহাদের একটি সাহিত্য-সমিতিও ছিল; রবীন্দ্রনাথ, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রকৃতি ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

বাংলা-গ্রন্থাবলী—মাতৃভাষায় লিখিত নগেন্দ্রনাথের রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থগুলির একটি কালানুক্রমিক তালিকা দিতেছি। বঙ্গনী-মধ্যে প্রদত্ত ইংরেজী প্রকাশকাল বেঙ্গল লাইব্রেরি-সংগৃহীত মুদ্রিত-পুস্তক-তালিকা হইতে গৃহীত।

১। বিসর্জন (খণ্ড-কাব্য)। (ইং ১৮৮১) পৃ. ৩৪।

চৈতন্য লাইব্রেরিতে আধ্যাপক-বিহীন একখণ্ড ‘বিসর্জন’ আছে।

২। স্বপন-সঙ্গীত (গীতিকাব্য)। ? (১৯ জুন ১৮৮২)। পৃ. ৬৫।

* প্রকৃতপক্ষে পত্রিকাখানির নাম—‘প্রভাত’। ‘মাসিক বহুমতী’তে প্রকাশিত (পৌষ ১৩৪৭) নগেন্দ্রনাথের মৃত্যু-সংবাদে ‘প্রভাত’ নামেরই উল্লেখ আছে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে রক্ষিত রমেশচন্দ্র দত্তের কাগজপত্রের মধ্যে ১০ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭ তারিখের ‘প্রভাতে’ প্রকাশিত তাঁহার একটি প্রবন্ধের প্রতিলিপি দেখিয়াছি; প্রবন্ধটির নাম—‘ভারতবর্ষীয়দিগের দরিদ্রতা ও দুর্ভিক্ষের কারণ’।

বাসবাক্যর 'রীজিং লাইব্রেরিতে একধর 'স্বপন-সঙ্গীত' আছে। 'ভারতী' (বৈশাখ ১২৮৯) সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন :—“লেখকের হাত পাকে নাই। কিন্তু ইহার অনেক স্থানে যথার্থ কবিতা আছে, অনেক স্থানে লেখকের ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়।”

৩। পর্তুগিসিনি (উপন্যাস)। ১২৯০ সাল (ইং ১৮৮৩)। পৃ. ১৩৯। ১২৯০ সালের ফাল্গুন-সংখ্যা 'বামাবোধিনী পত্রিকা'র সমালোচিত।

৪। অমরসিংহ (সিপাহী-বিদ্রোহমূলক উপন্যাস)। (১০ সেপ্টেম্বর ১৮৮৯)। পৃ. ১৭৫।

৫। সংগ্রহ—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপন্যাস। ১২৯৯ সাল (২৩ অক্টোবর ১৮৯২)। পৃ. ২১৬।

সূচী :—চুরী না বাহাদুরী (ভারতী ও বালক, বৈশাখ ১২৯৪); ধরের অলম্বী (ভারতী ও বালক, আষাঢ় ১২৯৬); দুইবার (ভারতী ও বালক, বৈশাখ ১২৯৬); তৈরবী (ভারতী ও বালক, শ্রাবণ ১২৯৬); মিরিয়ম ও সোরাব (সাহিত্য, ভাদ্র ১২৯৯); নতুন বাড়ী (সাহিত্য, বৈশাখ ১২৯৯); মুক্তি (সাহিত্য, অগ্রহায়ণ ১২৯৮); ছায়া 'কাহিনী'।

৬। জীলা (উপন্যাস)। লাহোর ভাদ্র ১২৯৯ (১৫ নবেম্বর ১৮৯২)। পৃ. ২৪৩। ফাল্গুন ১২৯০—আষাঢ় ১২৯১ সালের 'ভারতী'তে প্রথম প্রকাশিত।

৭। উপন্যাস সংগ্রহ ও রচনা। (সেপ্টেম্বর ১৮৯৯)। পৃ. ২২৫।

সূচী :—হীরার মূল্য (প্রদীপ, আশ্বিন-কার্তিক ১৩০৫); বঙ্গ (সাহিত্য, শ্রাবণ ১২৯৯); বোম্বেটে (প্রদীপ, পৌষ ১৩০৫); কাহার ভ্রম (সাহিত্য, শ্রাবণ ১৩০০); কাল বুল্লালাল (সাহিত্য, বৈশাখ ১৩০০); বন্দী (ভারতী, বৈশাখ ১৩০১); রোশিনারা (সাহিত্য, মাঘ ১২৯৯); কাঠুরিয়া (সাহিত্য, আষাঢ় ১৩০০); ছায়া (ভারতী, ফাল্গুন ১৩০০) গল্প ত অল্প (ভারতী, কার্তিক ১৩০১)। রচনা :—চুলের কলপ (সাহিত্য, আষাঢ় ১৩০০); কোঁচার কথা (সাহিত্য, জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯); হিগাবে ভুল (সাহিত্য, আশ্বিন ১২৯৯)।

৮। তমস্বিনী (উপন্যাস)। ১৩০৭ সাল (৫ মার্চ ১৯০১)। পৃ. ২৩৭।

* ১২ আশ্বিন ১৩০৭ তারিখে প্রিয়নাথ সেনকে লিখিত একখানি পত্রে বরীন্দ্রনাথ 'তমস্বিনী' প্রসঙ্গে এইরূপ লিখিয়াছিলেন :—“নগেন্দ্র গুপ্তর তমস্বিনী পড়ে দেখলুম। ঠিক হয় নি। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, বাঙ্গলা উপন্যাসে তিনি উন্মুক্ত Realism এর অবতারণা করতে গিয়েছেন। তাতে আমি কিছুই আপত্তি করি নে। কিন্তু সেটা পারা চাই। যেমন নাচতে ব'সে ঘোমটা সাজে না, তেমনি এ রকম বিষয় লিখতে ব'সে কিছু হাতে রাখা চলে না। সম্পূর্ণ নির্ভীক নগ্নতা ভাল, কিন্তু স্বল্প আবরণ রাখতে গেলেই আঁক নষ্ট হয়। এ বইয়ে তাই হয়েছে। গ্রন্থকার সাহসপূর্বক সব কথা

১৩০১ সালের কার্তিক, অগ্রহায়ণ ও মাঘ সংখ্যা 'স্বপন-ভূমিতে' ৭ম পরিচ্ছেদ পর্যন্ত প্রথম প্রকাশিত।

৯। জীবন ও মৃত্যু (সমর্ভ)। ১৩০৭ সাল (৫ মার্চ ১৯০১)। পৃ. ২৩০

১৩০০ সালের 'সাহিত্যে' প্রথম প্রকাশিত।

১০। বিভাপতি ঠাকুরের পদাবলী (সঙ্কলিত ও সম্পাদিত)। ১৩১৬ সাল (ইং ১৯০৯)। পৃ. ৪৫০ + ৫৫২ + ৫০

“সাধারণ পাঠকের পক্ষে মূল্য হইবে এবং বিভাপতির কবিতার বহু প্রচার হইবে, এই আশায়” নগেন্দ্রনাথ ১৩৪২ সালে বঙ্গমতী-কার্যালয় হইতে বিভাপতি পদাবলীর আর একটি সংস্করণ সম্পাদন করিয়াছিলেন।

১১। নগেন্দ্র-গ্রন্থাবলী, ১ম-২য় ভাগ। (১৬ সেপ্টেম্বর ১৯২৫)। পৃ. ৩১২ + ৩৮৬ (বঙ্গমতী)

সূচী :—জীলা, পর্তুগিসিনি, তমস্বিনী, অমরসিংহ, জীবন ও মৃত্যু, এবং 'উপন্যাস সংগ্রহ' ('হিগাবে ভুল' রচনাটি বাদে) ও 'সংগ্রহ' পুস্তকদ্বয়ের সকল গল্প। পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত নগেন্দ্রনাথের এই গল্পগুলিও গ্রন্থাবলীর দুই ভাগে স্থান পাইয়াছে :—লক্ষ্মীরা (প্রবাসী, কার্তিক ১৩২৯); পুজার পোষাক (বঙ্গদর্শন, কার্তিক ১৩১১); মিলন; মেহের-জান (বঙ্গভাষা, আষাঢ়-শ্রাবণ ১৩১৪); মালবিকা (প্রবাসী, আশ্বিন ১৩২৯); পুঁটেলাম; নির্মলা (মাসিক. বঙ্গমতী, আশ্বিন ১৩২৯); তৈরব মন্দির; অলকা; শাহ নওয়াজ; ব্রাহ্মণাবাদ (বঙ্গভাষা, অগ্রহায়ণ ১৩১৩); টকিয়া শাহ;

পরিকারভাবে শেষ পর্যন্ত বলতে পারেন নি, সেই জন্য তাঁর self-conscious ভাব প্রকাশিত হয়ে রচনাটিকে লজ্জিত ক'রে তুলেছে। নগেন্দ্রবাবু তাঁর ঘটনা-বিন্যাসের স্বাভাবিক পরিণামের পূর্বেই ইচ্ছাং থেমে যাওয়াতে বোঝা যাচ্ছে নিঃসঙ্কোচ নিরাবরণ তাঁর লেখনীর পক্ষে সহজ নয়, ওটা তিনি জবরদস্তি ক'রে করেছেন। ফর ইনষ্ট্যান্স, সেই 'রিধবা মেয়েটার সঙ্গে একজন ছোকাটার ঘনিষ্ঠতার কথা যদি উত্থাপন করলেন তবে তার অন্ত্যেষ্টিসংস্কার না ক'রে ছাড়লেন কেন? ও রকম স্থলে বা হ'তে পারে সেটাকে সরল ভাবে তার সম্পূর্ণ বীভৎস মূর্তিতে পরিস্ফুট করলেন না কেন? এ সব জিনিষ তিনি ছুঁতে ঘৃণা করেন অথচ নাড়তে প্রবৃত্ত হয়েছেন, সেই জন্যে সব কথা ভাল ক'রে প্রকাশ করতেও পারেন নি, ভাল ক'রে গোপন করতেও পারেন নি।” (“পত্রাবলী”: ‘বিখ-ভারতী পত্রিকা’, বৈশাখ ১৩৫০, পৃ. ৫৯৮)

† মুরেশচন্দ্র সমাজপতি ‘বঙ্কিম-প্রসঙ্গে’ (পৃ. ৩৪৯) লিখিয়াছেন :—“বঙ্কিম বাবু বলিলেন...‘নগেন গুপ্তর ‘মৃত্যুর পরে’ উচু দরের লেখা। ‘বঙ্গদর্শনে’ এ রকম প্রবন্ধ ছাপা হয় নাই।’ বঙ্কিমবাবু শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের ‘মৃত্যুর পরে’র বড় পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি চারি বার আমার নিকট উহার প্রশংসা করিয়াছিলেন। নগেনবাবুর style এরও তিনি প্রশংসা করিতেন। ‘মৃত্যুর পরে’ গ্রন্থাকারে ছাপা হইয়াছে।”

চন্দ্রগীড়ের ঐশ্বর্য; কুটিল ফাইনাল (ভারতবর্ষ, আশ্বিন ১৩২০); জমাল-জমিল (বৃন্দদর্শন, শ্রাবণ ১৩২০); মায়াবিনী (প্রদীপ, পৌষ ১৩০৬); প্রতিশোধ (প্রদীপ, মাঘ ১৩০৬); ছোট বোঁ (প্রদীপ, বৈশাখ ১৩০৭); অরুণ কণ্ডর (ভারতবর্ষ, শ্রাবণ ১৩২০) দেবদ্বাত ও প্রসেন; নবনগর (নাটিকা); খেলাঘরে; নিস্তারিণীর রাজনীতি; বিজাট।

১২। জয়ন্তী (উপভাস)। ইং ১৯২৯। পৃ. ১৭৫।

১৩২৯-৩০ সালের 'প্রবাসী'তে প্রথম প্রকাশিত।

১৩। সত্যপীরের কথা—রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য-বিরচিত (সঙ্কলিত ও সম্পাদিত)। ১৩৩৬ সাল (ইং ১৯৩০)। পৃ. ১৪০+৪৭।

১৪। আরাভামা (উপভাস)। ইং ১৯৩০। পৃ. ২৭৯।

১৩৩৪-৩৫ সালের 'প্রবাসী'তে প্রথম প্রকাশিত।

১৫। ব্রজনাথের বিবাহ (উপভাস)। ইং ১৯৩১। পৃ. ১৭৮।

১৩৩৬ সালের 'প্রবাসী'তে প্রথম প্রকাশিত।

১৬। রথযাত্রা ও অজ্ঞাত গল্প। ইং ১৯৩১। পৃ. ২৪৯।

সূচী:—রথযাত্রা (প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৩৬); পদ্ম পিসীমা (মাসিক বহুমতী, বৈশাখ ১৩৩৬); রাজরোষ (প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪); নির্ঝুঁ (মাসিক বহুমতী, আশ্বিন ১৩৩৬); যে দেশে পানী নেই (মাসিক বহুমতী, আশ্বিন ১৩৩০); পতিতের পরাক্রম (প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৩৪); নিষ্কটক (প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩৩৬); না জলে, না স্থলে (প্রবাসী, মাঘ ১৩৩৫); বন্দী (প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৩৭); প্যারীস মাসী (মাসিক বহুমতী, চৈত্র ১৩৩৬)।

পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত বাংলা রচনা।—

পুস্তকাকারে প্রথম নগেন্দ্রনাথের বহু লিখিত প্রবন্ধ, কবিতা ও গল্প-উপভাস বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। এই সকল রচনার অতি অল্পই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত তাঁহার কতকগুলি গল্প-উপভাস ও রস-রচনার নির্দেশ দিতেছি:—

'ভারতী'—১২৯৬ : আষাঢ়—বহিরের বাসনা; জ্যৈষ্ঠ—চিরকুমারী। ১৩০১ : জ্যৈষ্ঠ—অগ্রহায়ণ—চক্র (উপভাস); আশ্বিন—সমুদ্রলবন। ১৩০৮ : জ্যৈষ্ঠ—সোনার কাঠি ও রূপার কাঠি।

'প্রদীপ'—১৩০৬ : চৈত্র—নিফল অপরাধ; মৃত্যু।

'প্রবাসী'—১৩০৮ : জ্যৈষ্ঠ—সন্ন্যাসী; গ্রন্থকারমাহাত্ম্য। ১৩১০ : আশ্বিন—কুমালী; অগ্রহায়ণ—রঘু মাঝি। ১৩১১ : আষাঢ়—ভেড়া সিংহ; আশ্বিন—মাজুকা। ১৩৩৬ : শ্রাবণ—সাঁকা ও বুটী। ১৩৩৯ : আষাঢ়—চৈত্র—স্বাগতা (উপভাস)। ১৩৪০ : আষাঢ়—পুনর্জন্ম।

'সাহিত্য'—১৩২০ : মাঘ—স্বপ্নপথে।

'মানসী'—১৩২০ : শ্রাবণ—ইংরাজ ও পাঠান।

'মাসিক বহুমতী'—১৩৩৯ : আশ্বিন—চতুরে চতুরে; পৌষ—ফাল্গুন ১৩৪০—উইল (উপভাস)। ১৩৪০ : বৈশাখ—গীতোম্মাদ; শ্রাবণ—কেরামৎ। ১৩৪১ : বৈশাখ—চৈত্র—লুপু (উপভাস); জ্যৈষ্ঠ—হরণ; জ্যৈষ্ঠ—ভীতা; কাঠিক—মাগিনী; অগ্রহায়ণ—টরা পাখী; চৈত্র—বিদেশিনী। ১৩৪২ : বৈশাখ—চৈত্র—পরীস্থান (উপভাস); বৈশাখ—ব্যর্থ প্রয়াস; চৈত্র—অনুতাপ। ১৩৪৬ : পৌষ—বিপদ ও বিবাহ।

ইংরেজী রচনা—নগেন্দ্রনাথ ইংরেজী রচনাতেও তুল্য পারদর্শী ছিলেন। 'মডার্ন রিভিউ'র পৃষ্ঠাগুলি অঘেষণ করিলে তাঁহার বহু ইংরেজী রচনার সন্ধান মিলিবে। এই সকল রচনার মধ্যে তাঁহার নিছের ও সমসাময়িকদের সম্বন্ধে ব্যতিকথা (ইং ১৯২৭-৩০) ও A Planet and a Star নামে নুতন ধরণের উপন্যাস (ইং ১৯৩২-৩৪) উল্লেখযোগ্য। তিনি 'মডার্ন রিভিউ'তে রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতার তর্জমাও প্রকাশ করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে 'উর্কশী'র পঞ্চাশবাবটি (জুলাই ১৯২৭) অনেকের নিকট আদৃত হইয়াছিল। ইংরেজীতেও তিনি কয়েকখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন; দৃষ্টান্তরূপ কেশবচন্দ্র সেন, রামকৃষ্ণ পরমহংস ও মহাত্মা গান্ধী সম্বন্ধে তাঁহার পুস্তক-পুস্তিকার উল্লেখ করা যাইতে পারে।

নগেন্দ্রনাথ ও বাংলা-সাহিত্য

নগেন্দ্রনাথ অর্ধ শতাব্দীরও অধিক কাল বাংলা-সাহিত্যের সেবা করিয়া গিয়াছেন। প্রাঞ্জলতা ও প্রসাদগুণ তাঁহার রচনার বৈশিষ্ট্য ছিল। কথা-শিল্পী হিসাবে সাহিত্য-ক্ষেত্রে তিনি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। অপরিচয়ের ফলে আধুনিক বাঙালী তাঁহাকে ভুলিতে বসিয়াছেন। আধুনিক কাল প্রাচীন ও নবীন লেখকগণের রচনা-সমবাহে অনেক গল্প-সংগ্রহ, গল্প-সঞ্চয়ন জমালাভ করিতেছে সত্য, কিন্তু তাহাদের কোনটতেই নগেন্দ্রনাথের নাম বুজিয়া পাওয়া যায় না। অথচ তাঁহার লিখিত "মুক্তি," "হুইবার," "মায়াবিনী," "কুমালী," "জামার কাহিনী" প্রভৃতি যে-কোন গল্প-সংগ্রহের গৌরব বৃদ্ধি বই হ্রাস করিত না। ইহা আক্ষেপের বিষয় সন্দেহ নাই। পদাবলী-সাহিত্যেও নগেন্দ্রনাথের নাম অরণীয় হইয়া আছে। তাঁহার সম্পাদিত বিভাপতি ও পোবিন্দ্রদাস ঝার পদাবলী পাণ্ডিত্যের কীর্ত্তিস্তম্ভ।

নগেন্দ্রনাথ অল্পান্ত কর্ম্মী ও মাতৃভাষার প্রতি অত্যধিক প্রীতিসম্পন্ন ছিলেন বলিয়া ইংরেজী সাংবাদিকতার সঙ্গে ওস্তাদেও থাকিয়াও বাংলা-সাহিত্য ব্যাপারে প্রভুত্ব কাল করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার শ্রেণীর লোকের মধ্যে বর্তমানে এইরূপ সাহিত্যানিষ্ঠা হ্রাস। এই অধুনা-বিস্মৃত সাহিত্য-নাথিকের দৃষ্টান্ত বর্তমান যুগের সাহিত্যিকদের নানা ভাবে অশুকরণীয়।

রবীন্দ্র-চিত্রের ভূমিকা

শ্রীবিমলচন্দ্র চক্রবর্তী

রবীন্দ্রনাথের ছবির সহিত আমাদের যতটুকু পরিচয় আছে তাহাতে তাঁহার শিল্পী-জীবনের ক্রমবিকাশের ধারা নির্ণয় করা চলে না। আমরা বলিতে পারি না তাঁহার শিল্পী-জীবনের ইতিহাস কোথায় আরম্ভ হইয়া কোথায় শেষ হইয়াছে এবং কি ভাবেই বা ভাল পরিণতি লাভ করিয়াছে। শেষ জীবনে সামান্য কিছুকাল তিনি ছবি আঁকেন, সে ছবিগুলি তাঁহার নিপুণ হস্তের পরিচয় দেয়। এ নৈনুপ্য পরিণতশক্তি কুশলী চিত্রকরের পক্ষেই সম্ভব। কিন্তু প্রশ্ন এই, বাঙালী দর্শক কি সেই ভাবেই তাঁহার ছবি গ্রহণ করিয়াছে?

আজ পর্যন্ত তাঁহার ছবির যে স্বল্প সমালোচনা হইয়াছে তাহা দেখিয়া মনে হয় বাঙালী দর্শকের নিকট তাহা যথোপযোগ্য সমাদর লাভ করে নাই। ইহার কতকগুলি কারণ আছে।

প্রথমতঃ, প্রাচীন ভারতীয় পদ্ধতির ছবি আমাদের সুপরিচিত; এই জাতীয় ছবি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে অনেকটা গড়িয়া তুলিয়াছে। কাজেই কোন ছবির সহিত প্রাচীন ভারতীয় ছবির সাদৃশ্য না থাকিলে তাহা আমরা সহজে গ্রহণ করিতে পারি না। শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত ও তাঁহার শিষ্যস্বয়ং কর্তৃক অমূল্য নব্যভারতীয় চিত্রকলার আন্দোলনের মূলে প্রধানভঃ ছিল প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলাকে পুনঃসঞ্জীবিত করিবার আকাঙ্ক্ষা। তাঁহাদের ছবিগুলি আমাদের নিকট সহজেই আবৃত্ত হইয়াছিল। নব্যভারতীয় চিত্রকলার আন্দোলনের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিলেও রবীন্দ্রনাথ যে সময় ছবি আঁকা আরম্ভ করেন তখন সে আন্দোলন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। তাঁহার কোন বৈশিষ্ট্যই তাঁহার ছবিতে পরিলক্ষিত হয় না। এদিক দিয়া তিনি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

দ্বিতীয়তঃ, চিত্রকলার ইতিহাসে যে পদ্ধতিগুলি আমাদের পরিচিত সে রকম কোন পদ্ধতি অমুসারেও তিনি ছবি আঁকেন নাই। এদিক দিয়া গগনেন্দ্রনাথও স্বতন্ত্র, এ বিষয়ে সমসাময়িক চিত্রকরদের সহিত তাঁহার কোন মিল দেখা যায় না। কিন্তু গগনেন্দ্রনাথ নানা পদ্ধতিকে একান্ত ভাবে নিজস্ব করিয়া লইয়া ছবি আঁকিয়াছেন এবং এইখানেই তিনি অনন্ত-সাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ তাহা করেন নাই, তিনি নিজেই স্বকীয় পদ্ধতি উদ্ভাবন করিয়াছেন, কোন প্রচলিত টেকনিকের সহিত তাহার তুলনা করা যায় না।

তৃতীয়তঃ, বিষয়বস্তুর দিক দিয়াও তাঁহার ছবি ভিন্ন ধরনের। তাঁহার অধিকাংশ ছবির বিষয়বস্তুই সাধারণ দর্শকের নিকট ধানিকটী অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়। বাস্তবের

সহিত সাদৃশ্য অত্যন্ত কম বলিয়া তাহার এগুলির প্রতি সহজে আকৃষ্ট হইতে পারে না।

মোটামুটি ভাবে দেখিতে গেলে উপরোক্ত কারণগুলিই সাধারণের পক্ষে রবীন্দ্রনাথের ছবির রম্যোপলব্ধির পরিপন্থী হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু চিত্রকরের কাজ ও ছবির উদ্দেশ্য সহজে অবহিত হইয়া আমরা যদি রবীন্দ্রনাথের ছবির আলোচনা করি তাহা হইলে তাঁহার চিত্রকলার প্রকৃত স্বরূপ আমাদের নিকট উদ্ঘাটিত হইতে পারে। এই প্রবন্ধে আমরা সেই কথাই বলিবার চেষ্টা করিব।

চিত্রকরের কাজ প্রধানতঃ তিনটি। প্রথম, তিনি যে বিষয়ের ছবি আঁকেন, কল্পনায় তাহাকে উপলব্ধি করা; দ্বিতীয়, তুলিকার সাহায্যে তাহাকে ফুটাইয়া তোলা। এই দুইটি কাজ প্রায় একই সঙ্গে চলে। আমরা ঠিক করিয়া বলিতে পারি না, এমন কি চিত্রকর নিজেও নয়, কোথায় একটি শেষ হইয়া আর একটি আরম্ভ হয়। ছবির উৎকর্ষাপকর্ষ নির্ভর করে চিত্রকরের এই উপলব্ধি এবং উপলব্ধিগত বিষয়কে রূপ দান করিবার ক্ষমতার উপর। যেখানে অসুস্থতা ক্ষীণ সেখানে চিত্রকরের প্রকাশ-ক্ষমতা যতই থাকুক না কেন, তাঁহার ছবি দর্শকের তৃপ্তিবিধান করিতে পারে না। আবার যেখানে প্রকাশ-ক্ষমতা দুর্বল সেখানে বিষয়বস্তুর উপলব্ধি যত গভীরই হোক না কেন, আঁকা ছবি চিত্রকরের ব্যর্থতারই পরিচয় দেয়।

চিত্রকরের তৃতীয় কাজ—উপলব্ধিগত বিষয়কে রূপ দিবার সময় এটা দেখা যে, যে ছবিখানি তিনি আঁকিতেছেন চিত্র হিসাবে তাহা স্বয়ংসম্পূর্ণ কিনা এবং দর্শকের কাছে তাহার নিজস্ব একটি আবেদন আছে কিনা। অর্থাৎ ‘কম্পো-জিশন’ এবং রেখা ও রঙের দিক দিয়া তাঁহার ছবির এমন সামঞ্জস্য ও পূর্ণতা থাকা আবশ্যক যাহা অন্যায়সে রসামুগ্ধনানী দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে।

চিত্রকর রবীন্দ্রনাথ চিত্রকর্মের এই তিনটি দিক সম্বন্ধেই সচেতন। এক কথায় তিনি চিত্রকরের সম্পূর্ণ দায়িত্বই মানিয়া লইয়াছেন। তাঁহার যে-কোন ছবি লইয়া আলোচনা করিলেই আমরা দেখিতে পাই, তাহা তাঁহার উপলব্ধিগত বিষয়ের নিখুঁত প্রতিচ্ছবি—তাঁহার সামঞ্জস্য ও পূর্ণতা তাহাকে একটি বিশিষ্টতা দান করিয়াছে। শৃঙ্খল-গুণ সম্বলিত অদ্ভুত আকৃতিবিশিষ্ট মায়াবীর ছবি কিংবা গোপুঞ্জির ছায়াধূসরিত বনানীর ছবি—এককথায় যে ছবিই বরি না কেন আমরা ইহার প্রমাণ পাই।

এখানে বলা আবশ্যক উপলব্ধিগত বিষয়ের সহিত বাস্তবের যে সম্পূর্ণ মিল থাকিবে এমন কোন কথা নাই; কেমনা চিত্র-

করের কাজ ছবি আঁকা, বাস্তবের প্রতিলিপি আঁকা নয়। তাঁহার মনের 'চিত্রশালা' এক এক সময় এক একটি ছবি সুস্পষ্ট হইয়া উঠে, এগুলির অন্তিম তাঁহার মনোভঙ্গিতে অভ্যস্ত সত্য। ইহারাই চিত্রকরের উপলব্ধিগত বিষয় এবং তাঁহার অঙ্কিত ছবির বিষয়বস্তু। বলা বাহুল্য, বাস্তব জগতের নানা দৃষ্ট নানা জিনিষ তাঁহার মানসপটে রূপান্তরিত হইয়া এই সমস্ত ছবি সৃষ্টি করে। বহির্জগতের কোন রূপ যদি চিত্রকরের চোখে না পড়ে, তাঁহার অমুভূতিকে সক্রিয় না করে, তাহা হইলে তাঁহার মনের 'চিত্রশালা' কোন ছবিই ভাসিয়া উঠিতে পারে না। চিত্রকরের অমুভূতিলব্ধ বিষয়গুলির সহিত বাস্তবের সম্পূর্ণ মিল নাই সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া সেগুলি একান্ত অবাস্তবও নয়। ইহার বাস্তব-অবাস্তবের মাঝামাঝি জিনিষ, চিত্রকরের তুলিকায় প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে। এই কথাটি মনে রাখিলে রবীন্দ্রনাথের ছবির বিষয়বস্তুর বিরুদ্ধে যে অভিযোগের কথা শুনা যায় তাহা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলিয়া বোধ হয়। দৃষ্টমান জগৎকে রবীন্দ্রনাথ নানা ভাবে দেখিয়াছেন, তাহার বিচিত্র রূপ তাঁহার মনকে এক এক সময় এক এক ভাবে দোলা দিয়াছে, যাহার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁহার অসংখ্য গানে ও কবিতায়। আবার এই সমস্ত রূপ পরিবর্তিত হইয়া তাঁহার মনের 'চিত্রশালা' যে সকল ছবি স্ফুটাইয়া তুলিয়াছে, তাহা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে রেখায় ও রঙে। বাস্তবের সহিত ইহাদের মিল হয়ত বেশী নাই, কিন্তু ইহার সম্পূর্ণভাবে বাস্তবদম্পর্ক বর্জিতও নয়।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের-রঙের ব্যবহারের উল্লেখ করা প্রয়োজন। রঙ ছবির প্রধান উপাদান। রঙের উপযুক্ত ব্যবহারের উপর ছবির পূর্ণতা অনেকাংশে নির্ভর করে। তাই সকল চিত্রকরই উপযুক্ত রঙের প্রয়োগদ্বারা চিত্রের সৌষ্ঠব সম্পাদনের প্রতি বিশেষ অবহিত থাকেন।

আমাদের দেশে ছবিতে সাধারণতঃ উগ্র রঙের ব্যবহার দেখা যায় না, এক সঙ্গে বিভিন্ন রঙের ব্যবহারও কম দৃষ্ট হয়। আমাদের চিত্রকরগণ প্রধানতঃ কোমল রঙই ব্যবহার করেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ছবিতে তাহার ব্যতিক্রম নজরে পড়ে। তিনি কোমল রঙ খুব কমই ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহার ছবির রঙ উগ্র না হইলেও বেশ উজ্জ্বল, এবং তাঁহার ছবিতে রঙের সমারোহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রঙের উজ্জ্বল এবং সমারোহ তাঁহার উপলব্ধিগত বিষয়কে প্রকাশ করিতে ও তাঁহার ছবির পূর্ণতা সম্পাদন করিতে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে।

আমরা সাধারণতঃ পূর্বধারণার বশবর্তী হইয়া ছবি দেখি, নতুবা ছবি হইতে কোন অর্থ বুঝি। এ ভাবে রবীন্দ্র

নাথের ছবি দেখা অসঙ্গত। এই প্রসঙ্গে তাঁহার নিজের 'উক্তি প্রণিধানযোগ্য' :

"People often ask me about the meaning of my pictures. I remain silent even as my pictures are. It is for them to express and not to explain. They have nothing ulterior behind their own appearance for the thoughts to explore and words desirable and if that appearance carries its ultimate worth then they remain, otherwise they are rejected and forgotten even though they may have some scientific truth or ethical justification."

ভাৎপর্ষ্য : আমার ছবির অর্থ সম্পর্কে সোকে প্রায়ই আমাকে প্রশ্ন করে। আমার ছবির মতই আমি চুপ করিয়া থাকি। আমার ছবির কাজ প্রকাশ করা, ব্যাখ্যা করা নয়। চিন্তা দ্বারা আবিষ্কার এবং ভাষা দ্বারা বর্ণন করিতে হয় এমন কোন গুঢ় অর্থ তাহাদের পিছনে নাই। তাহাদের চরম সার্থকতা যদি তাহাদের মধ্যে নিহিত থাকে তাহা হইলেই তাহারা টকিবে, নতুবা তাহাদের মধ্যে কোন বৈজ্ঞানিক সত্য কিম্বা নৈতিক যুক্তি যদিও বা থাকে তাহা হইলেও তাহারা প্রত্যাখ্যাত ও বিস্মৃত হইবে।

একথা সকল চিত্রকরের ছবি সম্বন্ধেই সমান ভাবে প্রযোজ্য। ছবির পিছনে কোন অর্থ থাকে না। চিত্রকর তৎকথা বলিবার অস্ত ছবি আঁকেন না, রূপসৃষ্টি করাই তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য। তাঁহার যাহা কিছু প্রকাশ করিবার তাহা ছবির ভিতর দিয়াই পরিষ্কৃত হইয়া উঠে। রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় বলিয়াছেন :

"আপন প্রকাশ আপনাতে।

নিজে সাধে নিজে দাঁও দেখা, বচনের মল্লিনাথে

জন্মেরূপ কর না কতু।"

বস্তুতঃ ছবির বড় কথাই হইতেছে এই—"আপন প্রকাশ আপনাতে।" রবীন্দ্রনাথের প্রায় সকল ছবিতেই ইহা পরিলক্ষিত হয়।

তাঁহার ছবি হইতে যদি কোন অর্থ বুঝিতে যাই তাহা হইলে আমরা নিরাশ হইব। আনন্দের প্রেরণায় ছবি আঁকা—এ ছাড়া তাঁহার তুলিকা বারংবার পিছনে অস্ত কোন উদ্দেশ্য নাই। ছবি আঁকা তাঁহার বিচিত্র ব্যক্তিত্বের একটি বিশেষ দিক—গান বা কবিতার ভিতর দিয়া যে দিকের কোন প্রকাশ হয় নাই। যাহা গানে অথবা কবিতায় ব্যক্ত করা যায় না, স্তর কিংবা ছন্দ যাহার পরিচয় দিতে পারে না, রেখায় ও রঙে তিনি তাহাই স্ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার ছবি সম্বন্ধে তাঁহার নিজের কথাই মনে রাখা সমীচীন : "চিত্রকর গান করে না, বর্ণকথা বলে না, চিত্রকরের চিত্র বলে—'অন্নম্ অহম্ ভো'—'এই যে আমি এই'।"—এই আপনার অভ্যেদেই তাঁহার ছবি সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে।

“বলম্ উপাস্ত্ব”

শ্রীবিমলাচরণ দেব

“হজুতে বাংলা” এই কথাটা অনেকেই জানেন। কিন্তু বোধ হয় সকলে জানেন না যে, ঐ দুটি কথা এককালে খুব প্রচলিত একটি প্রবচন-বাক্যের আত্ম অংশের বিকৃত রূপ। আর, বোধ হয়, ঐ প্রবচন-বাক্যের উৎপত্তির কারণও সকলে জানেন না।

পুরাকালের কথা—“বঙ্গাভ্যুত্থায় তরসা” বা বিজয় সিংহের লক্ষ্য জয় প্রভৃতি ছাড়িয়া দিই। অপেক্ষাকৃত অধুনাতন সময়ের কথাই বলি। মুসলমানরা যে সময়ে বাংলায় আধিপত্য স্থাপন করে, তখন ও তাহার পর অনেক কাল পর্যন্ত বাংলা প্রকৃতপক্ষে কয়েকটি অল্পবিস্তর স্বাধীন রাজ্যের সমষ্টি ছিল। অর্থাৎ, সারা বাংলাটা কয়েক জন রাজা ভাগ করিয়া লইয়া যথাসক্তি দখল ও শাসন করিতেন। ইহাদের মধ্যে বেশীর ভাগই কায়স্থ। আইন-ই-আকবরিতে স্বে বাংলা সম্বন্ধে বলা আছে (Gladwin's translation) the zamindars (who are mostly Koits) furnish also 23,330 cavalry, 801,158 infantry, 170 elephants, 4260 cannon and 4400 boats. সীতারাম, প্রতাপাদিত্যের কথা মনে পড়িবে।

এই সব রাজা (যাহাদের আইন-ই-আকবরিতে “জমিদার” বলা হইয়াছে) স্বাধীন ভাবেই চলিতেন। নেহাৎ বাধ্য না হইলে পাঠান বা মোগলের প্রাধান্ত স্বীকার করিতেন না। তাহাও যতদিন শক্তি অপেক্ষাকৃত কম থাকিত। এই কারণে নিত্য বাংলায় হাঙ্গাম লাগিয়া থাকিত। একটা হাঙ্গাম ভাল করিয়া থামিতে না থামিতে আবার একটা হাঙ্গাম আরম্ভ হইত। এইজন্য উক্ত প্রবচনের উৎপত্তি হয়—“হজুত-এ-বাঙ্গালা, হিক্মৎ-এ-চীন”। অর্থাৎ যদি হাঙ্গাম হজুতের কথা বল, তাহা হইলে বাংলাকে হারানো শক্ত, যদি শিল্পীর শিল্পচাতুর্যের কথা বল, তাহা হইলে চীনে কারিগরকে হারানো শক্ত।

বাঙালীর এই যুদ্ধোৎসুক্য বহুকাল বজায় ছিল। যে “লাল পণ্টন” অবলম্বন করিয়া ক্লাইভ মাতামাতি করিয়াছিলেন, সে “লাল পণ্টন” প্রধানতঃ বাঙালীর দ্বারা গঠিত। পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রে যে দুই জন “হুনের মর্যাদা” রক্ষা করিয়াছিল—মীর মদন ও মোহনলাল—তন্মধ্যে মোহনলাল বাঙালী, উত্তর রাঢ়ী ঘোষ কায়স্থ। শান্তিপুরের গোড়গোয়ালদেব যুদ্ধোৎসুক্য বিখ্যাত ছিল। কোনও উৎসব উপলক্ষে একটা “খণ্ডযুদ্ধ” করা তাহাদের প্রথা ছিল, বিশেষ করিয়া চৈত্রসংক্রান্তির দিন। এইরূপে তাহারা

যুদ্ধের মনোবৃত্তি জাগাইয়া রাখিত। প্রাচীন লোকেদের কাছে আমার শোনা যে এই যুদ্ধোৎসুক্যের মূল কুঠারঘাত করেন Blacquire যার নামে কলিকাতায় Blacquire Square. এই ব্র্যাকিয়ার, পিতৃমাতৃহীন ইংরেজ সন্তান, শান্তিপুরে এক ব্রাহ্মণের গৃহে আশ্রয় পান ও কিছুকাল তাঁহার গৃহে পোষ্যরূপে বাস করেন। সেই সময়ে গোড়গোয়ালদেব ভীষণ যুদ্ধ বহু বার দেখেন। পরে তিনি বিলাত গিয়া সেখান হইতে কোম্পানীর চাকুরি লইয়া এদেশে আসেন। তাঁহার সাম্রাজ্যবুদ্ধি ও দূরদর্শিতার প্রশংসা এইজন্য করি যে, তিনি বুঝিয়াছিলেন, এই যুদ্ধপ্রিয়তা সমূলে উচ্ছেদ না করিলে ইংরেজরাজ্য এদেশে স্থায়ী হইবে না। এই বুঝিয়া তিনি নানা কৌশলে এইরূপ “খণ্ডযুদ্ধ” বন্ধ করিয়া দিয়া গোড়গোয়াল ও অপার সমস্ত লোককে “শান্তিপ্রিয়” করিয়া তুলিবার ব্যবস্থা করিলেন। সারা দেশময় এই নীতি অতুহ্যত হইল। কাজেই ক্রমে লোকে “শান্তশিষ্ট” হইয়া পড়িল। বিপদ আসিলে নিজকে রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া পড়িল এবং তখন সম্মত হইল, রাজশক্তির উদ্দেশ্যে “ত্রাহি ত্রাহি” আর্তনাদ। (বর্তমান সময়েও আমরা এইরূপ উপদেশ পাইতেছি—“আততায়ী তোমাকে আক্রমণ করিলে do not take the law into your own hands”) রাজশক্তিও ইহাই চায়। ক্রমে বাঙালীকে non-martial race শ্রেণীভুক্ত করা হইল এবং তাহাকে শুধু সৈন্যবিভাগ নহে, মিলিটারী পুলিশ হইতেও বারিত করা হইল।

ইহার পর আসিল সিপাহী যুদ্ধ।—বিদেশীয় আধিপত্য উচ্ছেদের জন্য ভারতীয়দের প্রথম বড় চেষ্টা। ইংরেজ দেখিল যে, তখনও যুদ্ধোত্তমের ইচ্ছা ভারতীয় মনে বিলুপ্ত হয় নাই। যাহাতে এই ইচ্ছা সমূলে বিনাশ হয়, তাহার জন্য ব্যাপক চেষ্টা আরম্ভ হইল। কূটতম চেষ্টা—স্কুলের সাহায্যে অভিসন্ধিমূলক (propaganda) শিক্ষা। আমাদের দৃষ্টি, আমাদের শ্রোত্র নিরন্তর দেখিতে শুনিতে লাগিল—“তোমাদের দেশে যাহা কিছু ভাল, যাহা কিছু সভ্যতার, দেখিতেছ, তাহা সমস্তই আমরা আনিয়াছি। তোমরা আমাদের পরম কৃপার পাত্র”। “তোমরা আমাদের অপেক্ষা বহু হীন, আমরা তোমাদের বহু উপরে”, “আমরা কখনও কোনও যুদ্ধে হারি নাই এবং কখনও পরাধীন হই নাই। কিন্তু তোমরা বহু বার পরাজিত ও পরাধীন হইয়াছ”, “তোমরা কুসংস্কারে আচ্ছন্ন, আমরা

আলোকে উদ্ভাসিত”, “যে পরিমাণে তোমরা আমাদের অল্পকরণ করিবে, সেই পরিমাণে তোমরা সভ্যতার, তথা মনুষ্যত্বের, উচ্চতর স্তরে উঠিবে” ইত্যাদি।

এইরূপে আমাদের মনে পরাভূত মনোবৃত্তি আনিবার উদ্দেশ্যে অভিসন্ধিমূলক পুস্তক রচনা হইতে লাগিল, বিশেষ ভাবে স্কুলের জ্ঞাত। উদাহরণস্বরূপ দুই-একটি কথা বলিতেছি। ইংরেজ God the Father, God the Son, God the Holy Ghost-এর নাম লইয়া দিৱাজউদ্দৌলার সহিত “আলিপুরের সন্ধি” করিয়া প্রায় সদ্ধে সদ্ধে তাহা অবলীলাক্রমে ভঙ্গ করিয়াছিল—একথা কোনও স্কুলপাঠ্য বা প্রচলিত ইতিহাসে লেখে বলিয়া জানি নাই। মাহাদজি সিন্ধিয়ার হস্তে যে সময়ে ইংরেজ সৈন্যের বিনাশ নিশ্চিত, সে সময় প্রাণের দ্বায়ে বোম্বাইস্থ Carnac নামক ইংরেজদের প্রধান রাজপুরুষ Holmes নামক এক রাজপুরুষকে “invested with full power to conclude a treaty” প্রেরণ করে এবং তদনুসারে মাহাদজি সিন্ধিয়ার সহিত Convention of Wargaum নামক সন্ধি Holmes স্বাক্ষর করে এবং ইংরেজ সৈন্য নিশ্চিত বিনাশ হইতে মুক্তি পায়। কিন্তু সৈন্য মুক্তি পাইবার পরই ইংরেজ এই সন্ধি অস্বীকার করে এবং Carnac বলে “he granted the powers to Mr. Holmes under a mental reservation that they were of no validity”. একথা পুরাতন পুস্তক Grant Duff's “History of the Mahrattas”—এ আছে, কিন্তু কোনও স্কুলপাঠ্য বা প্রচলিত ইতিহাসে আছে বলিয়া জানি না। আবার, Cunningham নামে একজন ইংরেজ পণ্টনের অফিসার তাহার History of the Sikhs-এ লিখিলেন যে ইংরেজ শিখদের সহিত কোন যুদ্ধে হারিয়াছে এবং পঞ্জাব সম্বন্ধে ইংরেজের নীতি অত্যাচার। ফলে সে পুস্তকের সে সংস্করণ বাজেয়াপ্ত হইল ও “দোবী” অংশ বাদ দিয়া নূতন সংস্করণ ছাপিবার হুকুম হইল। উপরন্তু Cunningham-এর চাকরি গেল এবং তিনি ভগ্নহৃদয়ে প্রাণত্যাগ করিলেন। আবার, বরাবর ছেলেরা তাহাদের স্কুলপাঠ্য ইতিহাসে পড়িয়া আসিতেছে যে, ১৮৫৭ সালে কার্তুজের চৰ্চি থাকার কথা (যাহা লইয়া সিপাহী যুদ্ধ আরম্ভ হয়) মিথ্যা। কিন্তু Roberts (পরে Lord Roberts)—যিনি সে সময়ে এদেশে ছিলেন—তাঁহার Forty-one Years in India নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন যে ঐ কথা সত্য। ইহা হইল এক রূপ। অপর রূপ, আমাদের জাতির পরাজয় ও কাপুরুষতার গল্প, কতক নিছক মিথ্যা, কতক অতিরঞ্জিত, আমাদের সামনে ধরা হইল।

এই ভাবে বহু স্থলে সত্যগোপন, তথ্যবিকৃতি ও

মিথ্যাসৃষ্টি দ্বারা আমাদের মনকে অভিভূত করা স্কুল কলেজের মধ্য দিয়া “পীটী দর পীটী” চলিয়া আসিতেছিল।

মিথ্যা বার বার বলিলে তাহা সত্যের আকার ধারণ করে, ইহা সকলেই জানে। এখানেও তাহাই হইল। মিথ্যা প্রচারের পৌনঃপুনিক আঘাতে এদেশের লোকের মন “সমোহিত” হইয়া গেল। আমরা যে অতি দীনহীন এবং ইংরেজের একান্ত রূপাপাত্র, নেহাং Man Friday, ইহা আমাদের মনে বদ্ধমূল হইয়া গেল। আমাদের অতীত নাই, আমাদের ভবিষ্যৎ ইংরেজের পাতৃকাতলে।

এই ভাবে ব্যাপক ও কালব্যাপী চেষ্টার ফলে আমাদের সাহস, আমাদের জাতীয়তাবোধ, ক্রমে অবচেতনে নামিয়া গেল, এবং তাহার পরে অবচেতন হইতেও সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হইয়া যাইবার মত হইল। আমরা একেবারে ইংরেজের “কার্যার ছায়া” হইয়া পড়িলাম। এমনই “সমোহন মন্ত্র” যে, আমরা যেন ইংরাজ ব্যতীত নিজেদের অস্তিত্ব ধারণ করিতে পারিতাম না। ইংরেজের জয় আমাদের জয়, ইংরেজের লাভক্ষতি আমাদের লাভক্ষতি। একেবারে “গর্ভচেষ্টবৎ”, খিদমদগার, খানদামা। “হজুতে বাংলার” এই পরিণাম—যে দেশে নিত্য জপের মন্ত্র “অদীনাঃ শ্রাম শরদঃ শতম্”।

জাতির জীবনে এই বিপদের সময় এদেশে দুই জনের আবির্ভাব—কতকাংশ সমসাময়িক। আমাদের মৃতপ্রায় জাতীয়তাবোধ পুনর্জীবিত ও উদ্ধৃত্ত করিতে তাঁহারা যাহা করিয়াছেন, সে বিষয় মনে করিলে সন্দেহ থাকে না যে, আমাদের জাতীয় জীবনের ইতিহাসে তাঁহাদের নাম অক্ষয় হইয়া থাকিবে।

এই দুই জনের এক জন বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁহার “আনন্দ-মঠ”, “সীতারাম” আমাদের জীবনে দেশমাতৃকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়া দেখাইয়াছে আমাদের শক্তি কোথায়, আমাদের দৌর্বল্য কোথায়; এবং আর কেহ থাক বা না থাক, আমরা এখনও টিকিয়া আছি; এবং থাকিবার মত থাকিতে হইলে, আমাদের কি করিতে হইবে ও কি হইতে সাবধান থাকিতে হইবে। শুধু আত্মপ্রসাদে চলিবে না। তাঁহার পুস্তকগুলি পড়িলে তাঁহার নিজস্ব সংঘতভাবে দত্ত দেশাত্মবোধ বাণী ও সাবধান বাণী পাঠকের সমস্ত সত্যকে নাড়া দেয়।

অপর জন বিবেকানন্দ—যাঁহাকে সে সময়ে Englishman কাগজ নিপুণ ভাবে বর্ণনা করিয়াছিল। মাত্র দুইটি ইংরাজী কথায়—“Militant Sanyasi”.

তিনি সত্যিই “সন্ন্যাসী” ছিলেন। “সন্ন্যাস” অর্থে সম্যক জ্ঞান, সমস্ত নাবাইয়া দেওয়া, ত্যাগ করা। কিন্তু পৃথিবী কর্তৃত্ব, যতক্ষণ দেহ আছে, ততক্ষণ আত্মস্তিক সন্ন্যাস

অসম্ভব। তাই “সন্ন্যাস” অর্থে বুঝিতে হইবে—সমস্ত অমুরাগ, আগ্রহ, আকর্ষণ একটি ব্যতীত সমস্ত বিষয় হইতে সরাইয়া লইয়া পুঞ্জীভূত ভাবে সেই একটি বিষয়ের উপর স্থাপন। একাধারে পূর্ণ, গভীর বিরাগ এবং পূর্ণ, গভীর অমুরাগ। তাই সন্ন্যাসীর সাংসারিক সমস্ত বিষয়ে তীব্র বিরাগ এবং “দেহপাতের সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্ম লীন হইব” এই ভাবনায় তীব্র অমুরাগ। ইহাই ক্রমে “নৈকর্য্য” ও “নৈকর্য্য-সিদ্ধি”তে আসিয়া দাঁড়ায়। ইহাই পৃথিবীতে “সম্ভব” ও সর্বজনপরিচিত ব্রাহ্মণসম্মত সন্ন্যাস।

কিন্তু ক্ষত্রিয় রজোগুণপ্রধান। রজোগুণ নৈকর্য্যের একান্ত পরিপন্থী। এইজন্মই জন্মগত স্ব-ভাব বা বৃত্তি, বিবেচনায় ক্ষত্রিয়ের পক্ষে সন্ন্যাস ও দৈববাদিত্ব নিষিদ্ধ, যেমন যাচঞা নিষিদ্ধ। বিবেকানন্দের মনে যে ব্রাহ্মণ-সম্মত সন্ন্যাসের কথা জাগিত না, তাহা নহে। কারণ তাঁহার পুস্তকাদির মধ্যে একাধিক স্থলে এই ভাবের কথা দেখা যায়।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, মূলতঃ ও স্বভাবতঃ তিনি (তাঁহার গুরুদেবের ভাষায়) “থাপখোলা তলওয়ার”। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে যে প্রকারের সন্ন্যাস সম্ভব, তাহাই তিনি অবলম্বন করিয়াছিলেন, এবং তাহার বিশেষ অমুরাগের বস্তু ছিল তাঁহার দেশ ও জাতি।

নিজ দেশ ও জাতির উপর তাঁহার অমুরাগ কিরূপ গভীর ছিল, তাহা তাঁহার প্রত্যেক লেখনে স্পষ্ট। তাহার মধ্যে বোধ হয় “বর্তমান ভারত”—এর অন্তিম অংশে যাহা পাই, তাহাতে এই ভাব সর্বাপেক্ষা পরিস্ফুট। তাহা এখানে উদ্ধার করি—

হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরানুধাপেক্ষা, এই দাসত্বলত্ব দুর্বলতা, এই যুগিত লব্ধ্য নিঃস্বর্ততা—এই মাত্র সম্বলে তুমি উদ্ধারিকার লাভ করিবে? এই লক্ষ্যকর কাপুরুষতা লহায়ে তুমি বীরভোগ্য স্বাধীনতা লাভ করিবে? হে ভারত, তুলিও না—তোমার-নারী জাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, তুলিও না—তোমার উপাখ্য উমানাথ সর্ব-ভাগ্যী শঙ্কর, তুলিও না—তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন, ইজিরস্বত্বের—নিজের ব্যক্তিগত স্বত্বের জন্য নহে, তুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই “মায়ের” জন্ম বলপ্রদত্ত, তুলিও না—তোমার সমাজ লে বিরাট মহামায়ের ছায়া মাজ, তুলিও না—নীচ জাতি, দুর্ব, দরিদ্র, অজ্ঞ, যুচি, মেঘর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই, বল, দুর্ব ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই; তুমিও কটমাত্র ব্রাহ্মণ হইয়া, সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের

সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার ঘোবনের উপবন, আমার বাধ্যকোর বারাগসী; বল, ভাই; ভারতের যুক্তিকা আমার স্বর্গ; ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ, আর বল দিন রাত, “হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে; আমার মহমুগ্ধ দাঁও; মা, আমার দুর্বলতা কাপুরুষতা দূর কর; আমার মাহুস কর।”

তিনি দিব্যচক্ষে দেখিয়াছিলেন যে আমাদের এই হাতী পাঁকে পড়িয়াছে। সমগ্র দেশ ও জাতি ঘোর তমোগুণে আচ্ছন্ন। এই তমোগুণের প্রভাবে বিকারের রোগীর মত ভুল দেখিতেছে ও বকিতেছে। আংশিক চিকিৎসা বা স্থানীয় ঔষধ প্রয়োগে কিছুই হইবে না। সমগ্র সভা যখন অবসাদগ্রস্ত, রোগগ্রস্ত, তখন অঙ্গবিশেষের চিকিৎসা করা ভুল। পূর্ণ উত্তমে সমগ্র দেশ ও জাতিকে সর্বাঙ্গীণভাবে তমোগুণ হইতে টানিয়া তোলা দরকার। ইহা না হইলে দেশ ও জাতি সেই পাঁকে একেবারে ডুবিয়া মরিবে।

তাই তিনি চাহিয়াছিলেন এ জাতিতে রজোগুণ উদ্বুদ্ধ হউক। তাঁহার “ভাববার কথা” (পৃ. ১৭তে) পাই—

চাই—সেই উত্তম, সেই স্বাধীনতাপ্রিয়তা, সেই আত্মনির্ভর, সেই অটল বৈর্য্য, সেই কার্য্যকারিতা, সেই একতাবদ্ধন, সেই উন্নতিভূকা, চাই—সর্বদা পশ্চাদ্গৃহীত কিংবা স্থগিত করিয়া অনন্ত সমুদ্রসমুদ্রসারিত দৃষ্টি, আর চাই—মস্তক, শিরায় শিরায় সঞ্চার-কারী রজোগুণ।”

কাজেই militant-ও বটে।

রজোগুণের আবাহন অর্থে বলের পূর্ণ উদ্বোধন ও ক্ষুরণ। তাহা না হইলে ব্যক্তি বা সমাজ কাহারও সর্বাঙ্গীণ কুশল হয় না। যাহারা বলে “একাঙ্গীন কুশল করিলেই কাজ হইল এবং পর পর এক এক অঙ্গ ধরিয়া কাজ করিলেই হইবে” তাহারা হয় মূর্থ নয় দুর্ব। একটিমাত্র অঙ্গও যদি রোগগ্রস্ত থাকে, তাহা হইলে সমস্ত শরীরই অসুস্থ হয়, কোন অঙ্গই ভাল থাকে না। ব্যক্তিই বল, আর সমাজই বল, যখন সে সুস্থ থাকে, তখন সে যুগপৎ সর্বাঙ্গীণ সুস্থ থাকে। কোনও অঙ্গ অসুস্থ হইলে সর্বাত্মক উপর দৃষ্টি রাখিয়া যদি প্রতীকার না করা হয়, তাহা হইলে রোগ সর্বদা ব্যাপ্ত হইয়া সমগ্র শরীরকে নাশ করে।

একটু চিন্তা করিলেই দেখা যায় বলের প্রয়োজনীয়তা-কত। বল না থাকিলে বাকি সমস্তই নিরর্থক, “ছেলের হাতে মোয়া” যে কেহ আসিয়া গালে চড় মারিয়া কাড়িয়া লইবে। বলাধান জন্ত আবার সব কিছুকে অগ্রাহ্য করিতে হইবে। গর্তচেতবৃত্তি যাহার মজ্জাগত অর্থাৎ যাহার অবিচ্ছেদ্য মনোবৃত্তি চাকর, খানসামা, বিদমদ্গারের অর্থাৎ সর্বসময়ে এক জন অর্থদাতা “মনিব” আবশ্যক; বা অর্থাহ-সন্ধানবৃত্তি যাহার মজ্জাগত অর্থাৎ যাহার মনোবৃত্তি এই যে এ কাজ করিলে বর্তমান সংসারে আমার যে স্থান আছে বা

অর্থ আছে তাহার হানি হইতে পারে—তাহাদের দ্বারা কাজ ত কিছুই হইবে না, বরং সমূহ অনিষ্ট হইবে। এই রূপ “অর্থকরী রাজনীতিচর্চা”র জায় সর্বনেশে জিনিস আছে বলিয়া ধারণা করিতে পারি না। এইজন্য বলি—সব কিছু পণ রাখিয়া কাজে লাগিতে হইবে। “হতো বা প্রাপ্যাসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষাসে মহীম্”।

এই ভাবের পরিচয় পাইলাম সে দিন যখন পড়িলাম এক জন কুর্দী সর্দার বলিয়াছেন—In the end we shall appeal to the Brother of Allah. এই Brother of Allah আর কেহই নহেন—তলওয়ার। শ্রেষ্ঠ শান্তিদাতা আল্লা; শান্তিদাতা হিসাবে তাঁহার ঠিক নিয়োগ্য তাঁহার Brother. “বুদ্ধা বিক্রমণেন চ”। প্রথমে কিছু চেষ্টা করিবে যদি বুদ্ধিদ্বারা কাজ হাসিল হয়। যদি না হয়, অগত্যা বিক্রম করিবে। অত্থায় শান্তি নাই। এইজন্যই আরবদের মধ্যে একটি প্রবচন আছে—

“Peace dwelleth in the shadow of the sword.”

সত্যই, নিজ তলওয়ারের ছায়া ভিন্ন অন্য কোথাও শান্তির আশা করা ভুল। যাহারা এই পরম ও চরম সত্য ভুলিয়া (বা বুঝিয়াও অপলাপ করিয়া) শান্তিকামী সাজিয়া স্থানে অস্থানে “মেরেছ কলসীর কানা তা” বলে কি প্রেম দিব না” গাহিয়া নিজ জাতিকে আত্মঘাতের পথে আগাইয়া যাইতে উপদেশ দেন, তাহারা (আবার বলি) হয় মূর্থ নয় ধূর্ত।

শান্তি না হইলে অগ্রগতি হয় না। অগ্রগতি না হইলে পশ্চাদ্গতি অবশ্যস্বাভাবী, কি ব্যক্তির, কি সমাজের। পশ্চাদ্গতি অর্থে মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়া। কিন্তু বলী না হইলে শান্তি ও অগ্রগতি অসম্ভব। এই ভাবিয়াই এক জন মনীষী বলিয়াছিলেন—“Force is the midwife of progress, delivering the old pregnant with the new.” অগ্রগতি, শান্তি, স্বাধীনতা, পরম্পর সংস্রুত। বল সকলেরই মূলে।

যাহার চক্ষু, কর্ণ ও কিক্ষিমাত্র বিচারশক্তি আছে, তিনি একটু আশেপাশে চাহিয়া দেখিলেই বুঝিবেন যে, বল কত আবশ্যক (অবশ্য যে লোক আত্মঘাতী হইবে, তাহার পক্ষে ছাড়া)। যে বলী, সেই জীবিত থাকিতে সক্ষম হয়। যে দুর্বল, বলী তাহাকে পরাভূত করিয়া তাহার অস্তিত্ব পর্যন্ত লোপ করে। এইজন্যই জীব মাঝেই, সম্ভব অসম্ভব সর্বস্থলেই, বল আশ্রয় করিয়া থাকে। নিতান্ত অসহায় কীট সম্বন্ধে ইংরেজী প্রবচন মনে পড়ে “Even a worm will turn.” এ অবস্থায় যদি কেহ উপদেশ দেয় “শান্তিকামী হও, তোমার আততায়ীকে প্রেম কর”, কি বলিব? এক জন আমার অস্তিত্ব লোপের জন্য ঘাত

করিতে উদ্যত। পরামর্শ পাইলাম “তুমি প্রতিঘাত করিও না।” এ কথা স্পষ্ট ভাবে বুঝা দরকার—বলের আধান এবং স্থানে বিশিষ্ট ভাবে প্রয়োগ যদি না করিতে পার, তোমার মৃত্যু অবশ্যস্বাভাবী। আমিই যদি মরিলাম, পৃথিবী থাকিল বা গেল, আমার কি আসে যায়?

ইহাতে মনে হইতে পারে, বল বুঝি শুধু জীবন রক্ষার জন্য। তাহা নহে। বল ষাণ্ডীয় কল্যাণের ভিত্তিস্বরূপ। এ কথা বৈদিক ঋষিগণ পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। ছান্দোগ্য উপনিষদে পাই—যখন সর্ববিদ্যাবিশারদ নারদ সনৎকুমারের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন যে, তিনি এত পড়িয়া শুনিয়াও শোক পাইতেছেন, তখন সনৎকুমার বলিলেন যে, নারদ যাহা কিছু পড়িয়াছেন তাহা প্রকৃত সার পদার্থ নহে। তখন নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন তাঁহার জ্ঞাত বস্তু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছু আছে কি না। সনৎকুমার বস্তু-বিশেষের উল্লেখ করিয়া সে প্রশ্নের উত্তর দেওয়ায় নারদ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—তাহারও অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছু আছে কি না? এই ভাবে, একের পর এক, অর্থাৎ পূর্ববর্তী অপেক্ষা পরবর্তী শ্রেষ্ঠ, বলিতে বলিতে সনৎকুমার যখন চরমে আসিয়া পৌঁছিলেন, তখন দেখা গেল যে, সে বস্তু হইতেছে “বল”। তিনি বলিলেন—

বলং বাব বিজ্ঞানাদ্ ভূয়োহপি শতং বিজ্ঞানবতাম্ একো বলবান্ আকম্পয়তে, স যদা বলী ভবতি অধোবাতা ভবতি, উত্তীর্ণন পরিচরিতা ভবতি, পরিচরয় পুনস্তা ভবতি, উপসীদন ঋষ্টা ভবতি, শ্রোতা ভবতি, মন্তা ভবতি, বোদ্ধা ভবতি, কর্তা ভবতি, বিজ্ঞাতা ভবতি। বলেন বৈ পৃথিবী তিষ্ঠতি, বলেনা-হস্তরিক্ষং, বলেন চৌর্বেলেন পর্বতা, বলেন দেবমহম্বা, বলেন পশবন্ত বয়াংসি চ তৃণবনস্পত্যঃ স্বাপদান্যাকীটপতঙ্গ-পিপীলকম্। বলেন লোকত্তিষ্ঠতি বলয়ুগাস্থেতি। (ছান্দোগ্য-উপনিষৎ ৭, ৮, ১)

ঠিক ইহার পূর্বেই তৎকাল পর্যন্ত শ্রেষ্ঠতম বলিয়া সনৎকুমার নাম করিয়াছেন “বিজ্ঞান”—এর অর্থাৎ যাহার দ্বারা বেদ, ইতিহাস, পুরাণ প্রভৃতি সর্ববিধ জ্ঞান এবং অপর সর্ব প্রকার জ্ঞাতব্য বস্তুর এবং এই লোক ও ঐ লোক, এই সমস্তের অন্তরতম তথ্য নিপুণভাবে জানা যায়।

এখন বলিতেছেন—“বল” এই “বিজ্ঞান”—এর অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। কারণ খুবই স্পষ্ট। বলিতেছেন—এক জন বলবান্ ব্যক্তি এক শত জন বিজ্ঞানবান্ ব্যক্তিকে কাঁপাইয়া দেয়। লোক যখন বলী হয় তখন সে উখাতা হয়, অর্থাৎ উঠিয়া দাঁড়ায়, বা তীব্রভাবে সক্রিয় হয়। উখাতা হইলেই সে তাহার গুরুর বিশেষ ভাবে পরিচর্যা করিতে সক্ষম হয়। তাহা হইলেই সে গুরুর নিকটে বসিতে পায়। নিকটে বসিলেই সে সম্যক্ ভাবে সমস্ত দেখিতে ও শুনিতে পায়।

সম্যকভাবে দেখিতে ও শুনিতে পাইয়াছে বলিয়াই শ্রুত ও দৃষ্ট বস্তু সম্বন্ধে সে ঠিক ভাবে মনন করিতে পারে। ঠিক ভাবে মননক্রিয়াদ্বারা সে বস্তুটি বেশ বুঝিতে পারে। ঠিক বুঝিতে পারার দরুন বস্তুটিকে সে কাজে আনিতে সক্ষম হয়। এইরূপে কাজে আনিতে পারায় সে “বিজ্ঞাতা” হয়, অর্থাৎ সে সেই বস্তুর সূক্ষ্মতম তথ্য জানিতে পারে। বল আশ্রয় করিয়াই পৃথিবী বর্তমান রহিয়াছে। বল আশ্রয় করিয়াই অন্তরীক্ষ, দ্যোঃ, পর্বত, দেবগণ, মনুষ্যগণ, পশু, পক্ষী, তৃণবনস্পতি সকল, কীট-পতঙ্গ পিপীলিকা হইতে স্থাপদগণ পর্যন্ত বর্তমান রহিয়াছে। বল আশ্রয় করিয়া লোক (অর্থাৎ সারা সৃষ্টি) বর্তমান রহিয়াছে। বলেরই উপাসনা কর।

এই কথাগুলি কত সত্য, বলা বোধ হয় নিশ্চয়মোজন। বলা বাহুল্য, এই “বল” অর্থে সামর্থ্য নহে, সাহস। সাহসেই সামর্থ্য আনে। সাহসের অভাবে প্রচণ্ড সামর্থ্যও লোপ পায়। মনে পড়ে “ছজুতে বাংলা” বহুকাল পরে একবার স্বরূপ ধারণ করিয়াছিল—যখন ১৯০৫ সালে গোটাকয়েক বাঙালীর ছেলে সৈন্ত-সামন্ত-লোক-লস্কর-চাকর-খানসামা-বিদ্যমংগার-পরিবৃত প্রবল-পরাক্রান্ত সাম্রাজ্যাভিমানী ইংরেজের সহিত প্রত্যক্ষ প্রতিদ্বন্দিতায় অবতীর্ণ হইয়াছিল। দুই পক্ষের মধ্যে “অন্তরং মহদন্তরম্”। ছেলেগুলোর সম্বল শুধু সাহস। এই সাহস মাত্রে ভর করিয়াই Gil Blas-তে বর্ণিত Licentiate Pedro Garcias-এর soul স্মরণ করিয়া বাঙালী স্থির করিল—“ইংরেজ Pedro Garcias-এর জ্ঞাত, তার soul তার পকেটে। সেখানে সর্বপ্রাণেন, সমস্ত সাহস ও তজ্জনিত সামর্থ্যের সহিত আঘাত কর, শত্রু কাবু হইবে। তাহাই হইয়াছিল।

এ স্থানে বিশেষ ভাবে স্মরণীয় একটি কথা—বাংলার এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা তৎকালীন সমস্ত ভারতীয় নেতারা করিয়াছিলেন, এক জন ছাড়া—বাল গঙ্গাধর টিলক। সাথে গোথলে বলেন নাই—“What Bengal thinks today, India will think tomorrow.”

এখন বোধ হয় “বল” আধান করিবার একান্ত আবশ্যকতা সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নাই। আধানের পর বিচার্য বিষয়—“প্রয়োগ”, অর্থাৎ দেশকালপাত্র ও মাত্রা বিবেচনায় বলের ব্যবহার।

বলা বাহুল্য, অস্থানে বা অকালে বল প্রয়োগ করিলে অকল্যাণই হয়। পাত্র ত আততায়ী, ব্যক্ত বা প্রচ্ছন্ন। ব্যক্ত ত বুঝিতে পারি, সে আমার নমস্ত কেন, প্রণম্যও বলিতে পারি, কারণ সে নীচ ভাবে ছেলের আশ্রয় গ্রহণ করে নাই। কিন্তু যে প্রচ্ছন্ন, অর্থাৎ হয় ত আমার

পাশের বাড়ীতে আশ্রয় লইয়া এক জনকে আড়াল করিয়া আমাকে মারিবার চেষ্টা করিতেছে, অথচ সাহস নাই যে প্রত্যক্ষভারে শত্রুতা করে, তাহাকে কি বলিব?

ব্যক্তই হউক, প্রচ্ছন্নই হউক, আততায়ী আমাকে মারিবার উপক্রম করিতেছে, তাহাতেই দেশকালপাত্রের নির্ধারণ হইয়া গেল।

তার পর “মাত্রা”, অর্থাৎ শত্রু তোমাকে যে পরিমাণ আঘাত করিবে, তুমি ফেরত দিবে সহস্র গুণ। যখন ভবভূতির “মহাবীরচরিতম্” পড়িলাম, তখন দেখিলাম যে রামের এই সম্বন্ধে খেদ কত গভীর—

“অনিম্যঃ পৌলশ্যো ব্রহ্মত্ব পরিবাদো মন্তি পুন-
যতো রূঢ়ে বৈরে বহুগুণমনেন প্রতিব্রুতম্।”

অর্থাৎ রাবণ চলিল সর্বপ্রকার নিন্দার অতীত হইয়া, আর যত নিন্দা আমার কপালে! কারণ, শত্রুতা আশ্রয় হইতে আমি তার যা অনিষ্ট করিয়াছি, সে তার বহু গুণ আমার অনিষ্ট করিয়াছে।

রাম বহু সহস্র রাক্ষস মারিয়াছিলেন, কিন্তু রাবণ এক সীতাহরণ দ্বারা যে ঘা দিলে!

এই “মাত্রা”র কথাই পাই বিবেকানন্দের “ভাব্‌বার কথা” পৃঃ ৪২এ, আমার একটা এই ঘটনার বর্ণনান্তর শোনা আছে। মোদ্দা কথা একই, তবে বোধ হয় আমার শোনা বর্ণনান্তরটা একটু কালাও, কথাটা হইতেছে এই—দুই জন পাড়ারগেয়ে রাজপুত (ঠাকুর সাহেব), মাথায় পাগড়ী, হাতে লাঠি, জীবনে প্রথম অসিয়াছে রাজধানী লক্ষ্মী-এ। লড়াই-ই জানে, লেখাপড়া নয়। তখন মহরম চলিতেছে বিখ্যাত ইমামবাড়ায়, সেটা শিয়ারদের। শিয়ারদের মহরম হইতেছে শোকেস পর্ব। হাসেন হোসেনের জগ্ন “মরশিয়া” পড়ে। মড়া কান্নার এমন নকল করে যে আসল বলিয়া ভুল হয়। ঠাকুর সাহেবরা ইমামবাড়ার ভিতর যেতে চাইলেন। পাহারা বললে “এই কাঠের মূর্তিকে যদি পাঁচ জুতা মাঝে, তাহা হইলে ভিতরে যাইতে দিব।” ঠাকুর সাহেবরা আশ্চর্য হইয়া বলিলেন “একে পাঁচ জুতা মারতে হবে কেন? আর, এক কে?” পাহারা বলিল “এটা হ’ল এজিদের মূর্তি, সে হাসেন হোসেনকে মেরেছিল।” ঠাকুর সাহেবরা জিজ্ঞাসা করিলেন “কবে?” পাহারা বলিল “প্রায় হাজার বৎসর আগে।” এমন সময় ভিতর থেকে প্রাণকাঁপানো মড়া কান্না শোনা গেল। ঠাকুর সাহেবরা চমকিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “মরিলো কে?” পাহারা বলিল “এখন কেউ মরে নি।” ঠাকুর সাহেবরা বলিল “তবে কীদে কেন?” পাহারা বলিল “ওরা কীদেছে হাসেন হোসেনের জন্য।” ঠাকুর সাহেবরা আশ্চর্য হইয়া বলিলেন “তার ত মরেছে হাজার

বৎসর আগে।” পাহারা বলিল “হ্যাঁ, তাদের জন্যই কাঁদছে।” তখন ঠাকুর সাহেবরা কোথায় এজিদের মূর্তিকে জুতা মারিবেন, না পাগড়ি খুলিয়া সেই মূর্তির পায়ের কাছে রাখিয়া লাঠি শুদ্ধ মূর্তির পায়ের কাছে দণ্ডবৎ, আর বলেন— “বৈচে থাক, ভাই, এমন মার মেরেছি যে, তোর শত্রুর কামা আজ হাজার বৎসরেও থামে নি।”

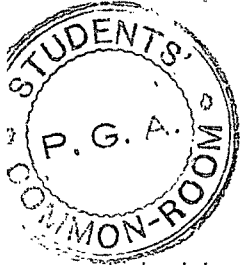
এর নাম “মাত্রা।”

এইখানে বলি একটা কথা—আমরা নাকি “স্বাধীন” হইয়াছি। অত শত “স্বাধীন” কথাটার বিচার না করিয়া বলিতে পারা যায় যে, ইংরেজ আমাদের দেশ আংশিক

ভাবে ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, কতকগুলো বাঙালীর ছেলের বনের আশ্রয় এবং উপযুক্ত স্থানে ও উপযুক্ত মাত্রায় প্রয়োগ করাই এই বাধ্য হওয়ার ভিত্তিতে—এটা অস্বীকার করলে বোধ হয় বিষম অবিচার হইবে।

আর, সেই হজুতে বাংলা এখন কোথায়? এমন কি, এমন বাংলা ভাষা পর্যন্ত ঠাই পাচ্ছে না। মনে হয় “অর্থকরী রাজনীতি”র প্রসার বাংলার জাতীয় জীবনে ঘুণ ধরিয়া দিয়াছে। সে “হজুতে বাংলা” আবার পাকে পড়িবে না কি?

হাওয়ায় ঘেন গুনিতে পাইতেছি—“বলমুপাস্থেতি”।



ইংরেজীর বাংলা অনুবাদ

অধ্যাপক শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

বাংলা ভাষা যুগে যুগে বিভিন্ন ভাষার শব্দসম্পদে সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। এই সম্পদকে সে গ্রহণ করিয়াছে প্রয়োজনমত নিজের উপযোগী করিয়া। পরের জিনিষকে সে আপন করিয়া ধরে আনিয়াছে—তাহার আকৃতি ও প্রকৃতিকে সে এমন ভাবে বদলাইয়া দিয়াছে যে আজ বাঙালীর মধ্যে চলাফেরায় তাহার কোন অসুবিধা নাই—তাহাকে কোথাও বেমানান বলিয়া মনে হয় না। বস্তুতঃ দু-চার জন সদানী পণ্ডিত ছাড়া তাহার বংশের পরিচয় আর কেহ জানে না—জানিবার দরকারও বোধ করে না। অবশ্য এ বিষয়ে বাঙালীর যে কোনও নতুনত্ব বা বৈশিষ্ট্য আছে তাহা বলা চলে না। এই ভাবেই এক দেশের ভাষা ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত অপর দেশের ভাষার সাহায্যে উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া থাকে। ইহার অগুণা হইলে ভাষার স্বচ্ছল গতি ব্যাহত হয়—ইহার সৌন্দর্য্য নষ্ট হয়।

দুঃখের বিষয়, ইংরেজ জাতি ও ইংরেজী ভাষার সম্পর্কে আসিয়া বাঙালী সকল ক্ষেত্রে এই চিন্তাচরিত নীতির সম্যক সদ্ব্যবহার করিতে পারে নাই বা করে নাই। ফলে ইংরেজী ভাষা শিক্ষিত বাঙালী পরম্পরের সঙ্গে কথাবার্তায় অল্প ইংরেজী শব্দ মিশাইয়া যে ভাষা ব্যবহার করে ইংরেজী না জানা লোক তাহার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে যথেষ্ট অসুবিধা বোধ করে। লিখিবার সময়ও অনেক স্থলে ইংরেজী হাবভাব, ইংরেজী ঢঙে বাংলায় প্রকাশ করিয়া সে ভাষাকে কিছুত-কিম্বাকার করিয়া তোলে। সাহেবী বাংলার মত এই বাংলাও বাঙালীর তৃপ্তিবিশান করিতে পারে না। এই বিদেশীয়ানা ভাষার পরিপুষ্টসাধন না করিয়া তাহার বিকৃতি সম্পাদন করিয়া থাকে। প্রত্যেক ভাষারই একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি আছে—বিদেশী উপকরণ গ্রহণ করিবার ও আত্মসাৎ করিবার

একটা বিশিষ্ট শক্তি সকল ভাষারই আছে। কিন্তু নিজের বৈশিষ্ট্য উপেক্ষা করিলে সৌন্দর্য্য বা সম্পদ কোন দিক দিয়াই তাহার লাভ হয় না। তাহা ছাড়া কোন ভাষাভাবীই এ বিষয়ে কোনরূপ ঊদাসীন্য অবলম্বন করিতে রাজী হয় না। ইংরেজ জাতি ও তাহার ভাষা পৃথিবীর প্রায় সকল দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে—বিভিন্ন দেশের সহিত ব্যবহারে ও ভাবের আদান-প্রদানে সেই সব দেশের ভাব ও শব্দ তাহাকে গ্রহণ করিতে হইয়াছে। কিন্তু কোনরূপ বিদেশী ভাব ও শব্দের দ্বারা ইংরেজ তাহার রাজকীয় ভাষাকে (King's English) অভিজুত বা আচ্ছন্ন হইতে দেয় নাই। জীবনের অভ্যাস ক্ষেত্রের মত ভাষার রাজ্যেও ইংরেজ তাহার স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে সর্বদা সতর্ক। তাহার এই স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণ অক্ষুর রাখিয়া কিছু কিছু বিদেশী শব্দ ইংরেজী ভাষা গ্রহণ করিয়াছে সত্য, কিন্তু ভাষার কোনরূপ বিকৃতি ইংরেজ জাতি মানিয়া লয় নাই। বিদেশীর ব্যবহারের ফলে এই বিকৃতি কচিং কখনও ঘটয়া থাকিলে ইংরেজ উহাকে চীনা, ভারতীয় বা মার্কিন প্রয়োগ বলিয়া ব্যঙ্গ বা উপেক্ষা করিতে দ্বিধা বোধ করে না। সকল দেশের ব্যবহারের সুবিধার জন্য ইংরেজীর সংক্ষিপ্ত সংস্করণ (Basic English) প্রবর্তন করিতে ইংরেজের আপত্তি নাই, কিন্তু ইহাকে কখনই সে তাহার জাতীয় ভাষার স্থান অধিকার করিতে দিবে না। বস্তুতঃ দেশায়বোধের মতই ভাষার প্রতি একান্ত মমত্ববোধ ইংরেজ জাতির প্রকৃতিগত।

দীর্ঘকাল ইংরেজের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সত্ত্বেও আমরা তাহার চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য অধিগত করিতে পারি নাই— তাহার বাহ্যিক আচার-ব্যবহারের অনুকরণ করিবার ব্যর্থ প্রয়াস করিয়াছি, কিন্তু তাহার শ্রেষ্ঠত্বের মূল উৎসের সম্ভান

করার প্রয়োজন বোধ করি নাই। আমরা স্বদেশপ্রীতির গুণ-গান করি বটে, কিন্তু দেশের প্রতিটি জিনিষের প্রতি আমাদের মতীর মমত্ব-বোধ নাই—পরস্পরের কতিবৃত্তিতে পরস্পরের প্রাণে বেদনা বা আনন্দের সঞ্চার হয় না। অজান্তে বিষয়ের কথা যাঁহাই হোক না কেন ভাষা সম্পর্কে একথা আমাদের অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

সত্য বটে, আজ আর আমরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখি না—সত্য বটে, আজ আর বাংলা ভাষা পূর্বের মত ক্ষুদ্র গভীর মধ্য আবদ্ধ নয়—উচ্চশিক্ষিত অল্প-শিক্ষিত ছোট বড় সকলেই আজ মাইকেল, বক্সি, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের সাধনাসুন্দর বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গৌরবে গৌরবান্বিত। কিন্তু তথাপি বাংলা ভাষাকে আমরা কার্ধ্যতঃ যথোচিত সম্মান দান করি না। বাংলা ভাষা এতদিন মুখ্যতঃ অন্তঃপুরচারিণীই ছিল—গৃহকার্যের ক্ষুদ্র পরিধির বাহিরে এখনও তাহার স্বচ্ছন্দ চলাচলের দাবি আশাহীন রীকৃত হয় নাই—সকল কার্যে তাহাকে নিম্নস্তর করিতে আমাদের বিধা ও সংকোচের সীমা নাই। কেবলমাত্র বিদেশী শাসনের অজুহাত আমাদের আচরণের সমস্ত কৈফিয়ত বলিয়া মানিয়া লওয়া যায় না। ভাষার প্রতি আন্তরিক অহুসারের অভাব, ইহার শক্তি সহজে আমাদের অবিশ্বাস, সর্বোপরি যথোচিত পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতার অভাবে ইহাকে যথাযথ ব্যবহার করিবার অক্ষমতা—আমাদের এই বিসদৃশ আচরণের জন্ত দায়ী। তাই আমরা অনেক ক্ষেত্রে ইংরেজীর অল্প অহুকরণ করিয়া বাংলার স্বচ্ছন্দ স্বাভাবিক রূপকে বিকৃত করিতেছি—বিশুদ্ধ বাঙালী ধরণেও যে আধুনিক ভাবধারা প্রকাশে কোন অসুবিধা হইতে পারে না এ ধারণা অনেকেরই নাই।

ইংরেজ জাতির সহিত সম্পর্ক স্থাপনের সময় হইতেই আমরা বহু ইংরেজী শব্দকে বাংলায় রূপান্তরিত করিয়া আসিতেছি। কিন্তু তখনও বাংলা ভাষা শিক্ষিত বাঙালীর সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই—তাই কোন শব্দ হৃদয় কি অহুন্দর, মানানসই কি বেমানান সে দিকে কেহ ভেতন নজর দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। আজ বাংলা ভাষার প্রচার ও প্রসার রূঢ়ি পাইলেও ইংরেজীর অহুবাদে আমরা গভলিকা প্রবাহের মত গতানুগতিক পথে চলিয়াছি—কেহ একটি শব্দ চালাইলেই নির্বিচারে তাহাকে আঁকড়াইয়া ধরিতেছি। শব্দটির সঙ্গে বাহার পূর্বপরিচয় ঘটে নাই তিনি ইংরেজী মূল শব্দটির সাহায্যে অর্থ বুঝিয়া লন—ইংরেজী-না-জানা লোকের পক্ষে উহার অর্থ গ্রহণ করা কঠিন। কাল-ক্রমে আমাদের দেশে ইংরেজীর প্রচলন যখন বিপুল বা হ্রাস-প্রাপ্ত হইবে তখন এই জাতীয় শব্দ হ্রাস সাধারণ বাঙালীর নিকট, সংস্কৃতশাস্ত্রজ্ঞ তিব্বতীয়ের পক্ষে সংস্কৃত গ্রন্থের প্রাচীন তিব্বতীয় অহুবাদ যেরূপ হৃদ্যোধ্য—সেইরূপই হৃদ্যোধ্য হইয়া পড়িবে। বস্তুতঃ এখনই ত আমরা বাংলা সংবাদপত্র,

পাশ্চাত্য দর্শন, বিজ্ঞান বা অন্য বিষয়ের বাংলা গ্রন্থ, এমন কি বাংলা সাহিত্যের পাশ্চাত্য রীতি-সম্মত সমালোচনা-গ্রন্থ স্বচ্ছন্দে পড়িতে পারি না—একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। শুধু পারিভাষিক শব্দ নহে ইংরেজী বচনভঙ্গীও ইহার অজ্ঞাতমুখ্য কারণ। চলতি বাংলারও অনেক ক্ষেত্রে ইংরেজী-গম্ভী ভাষা উহাকে গ্রীহীন না করিলেও সাধারণ বাঙালীর নিকট হৃদ্যোধ্য করিয়া তুলিতেছে। ‘নেতৃত্ব দিতে ইচ্ছা করা’ ‘আইন স্বহস্তে লওয়া,’ ‘ঘোড়ার সামনে গাড়ী,’ ‘চাষের বাটতে ডুকান,’ ‘কোন পাখরই ওলটাতে বাকি না রাখা,’ ‘চটবার কারণ দেওয়া,’ ‘পাছকার পদ প্রবিষ্ট করা’—প্রভৃতি প্রয়োগ সাহেবী বাংলার চরম নিদর্শন হইলেও বাঙালীর ব্যবহারযোগ্য নহে। আমরা এখন কেবল ‘পারলোকিক তৃপ্তি’তে সন্তুষ্ট না হইয়া বিদেশী মতে ‘পরলোকগত আত্মার তৃপ্তি’ কামনা করি—অথচ আমরা জানি আত্মার জন্মমৃত্যু নাই, স্থগ্ধুঃ নাই। ‘অরণ্যে রোদন করা’ আমাদের সহিয়া পিয়াছে, ‘স্বর্ণ স্বযোগের’ সন্ধ্যাবহারেও তেমন আপত্তি নাই—কিন্তু ‘উল্লস সত্যকে’ স্বীকার করা বা ‘কুতীরাক্ষ যোচন করা’ আমাদের পক্ষে বিশেষ কষ্টকর। ‘সুপ্রভাতের’ সহিত আমাদের নিত্য পরিচয়, কিন্তু তাই বলিয়া ‘সুপ্রভাতিকে’ও নিত্য ব্যবহারে লাগাইবার চেষ্টা শোভন বা সমীচীন নহে। ‘ফুলশয্যা’তেই আমাদের সমস্ত ঝাকা উঠিত—‘মণ্ডুচন্দ্রিয়ার’ জন্ত লাগানিত হওয়া আমাদের পক্ষে প্রশংসার বিষয় হইবে না। অবশ্য ‘হনিমুনে’র জন্ত কাহারও আগ্রহাতিশয্য থাকিলে বাধা দেওয়া সম্ভব হইবে না।

বস্তুতঃ বাংলার প্রকৃতির দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া, অর্থের অহুসধান না করিয়া আক্ষরিক অহুবাদের রীতিতে অল্পস্ত বিকৃত শব্দের সৃষ্টি ও প্রয়োগ করা হইতেছে। এইরূপেই নলকূপ (tubewell), নামভূমিকা (title-role), আধ্যাপত্র (title-page), অর্ধবাৎসরিক (half-yearly), পাদপ্রদীপ (foot-light), পুনর্মিলন (re-union), পুনর্লিখন (re-write), আন্তর্জাতিক (inter-national), প্রাগৈতিহাসিক (pre-historic), গোল টেবিল বৈঠক (round table conference) প্রভৃতি শব্দের প্রচলন হইতেছে। স্থানবিশেষে আক্ষরিক অহুবাদের প্রয়োজন থাকিলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভাবাহুবাদই সাধারণের পক্ষে গ্রহণযোগ্য—তাহা ছাড়া, হুবহু আক্ষরিক অহুবাদ অনেক স্থলেই বিসদৃশ ও হাস্যকর হইয়া উঠে। উহার সাহায্যে সাধারণ লোকের কোন বিষয় বুঝিবার পক্ষে বিশেষ কোন সুবিধাই হয় না। অহুবাদের মূলীভূত ভাষার কোন শব্দ বা তাহার অংশ অর্থহীন বাক্যালঙ্কার মাত্র হইতে পারে—কোন শব্দের গঠনে ক্রটি থাকিতে পারে। সে সব ক্ষেত্রে আক্ষরিক অহুবাদের চেষ্টা বাতুলতামাত্র। এক দেশের ভাবধারা, রীতিনীতি, বচনবিভাগ-প্রণালীর সহিত অন্য দেশের প্রচুর পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। সেইজন্য এক দেশের

ভাষার শব্দকে অন্য দেশের ভাষায় রূপান্তরিত করিবার সময় এই সমস্ত বিষয়ে বিশেষ অবহিত না হইলে রূপান্তর বা অনুবাদ নিরর্থক ভাবরূপ হইয়া পড়ে। তাই ইংরেজী paying guest-এর আক্ষরিক অনুবাদ হিসাবে 'অর্থদারী অতিথি' বলিলে লোকে হাসিবে। ইংরেজের guest আর বাঙালীর অতিথি এক নয়—অতিথির নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ ভারতীয় সংস্করের বিরোধী অথচ আত্মীয়স্বজনের গৃহে ঝাইখরচ দিয়া থাকে। একেবারে অপ্রচলিত নয়। অনাত্মীয় অপরিচিতের গৃহে এইরূপ ব্যবস্থা এখনও সমাজে প্রচলিত হয় নাই। সুতরাং আত্মীয়ের বা বন্ধুর বাড়ীতে আত্মীয় বা বন্ধু ঝাইখরচ দিয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাকে অর্থদারী অতিথি বলা চলিবে না। 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের চন্দ্রগুপ্তের ভূমিকাকে ইংরেজীর অনুকরণে নামভূমিকা (title-role) রূপে নির্দেশ করার বিশেষ প্রয়োজন দেখা যায় না, (tubewell)-এর সঙ্গে নলকূপের বিধ-প্রতিবিধি সম্বন্ধ থাকিলেও হাল-আমলের ব্যবহৃত 'পাতাল-কল' শব্দ বেশী অর্থজাতক বলিয়া মনে হয়। অর্ধ-বাৎসরিক শব্দ half-yearly-র অর্থ অনুকরণ মাত্র—সাপ্তাহিক শব্দ বাংলাভাষীর নিকট অবিকতর পরিচিত ও স্পষ্ট। প্রাগৈতিহাসিক, আন্তর্জাতিক প্রভৃতি শব্দ pre-historic inter-national-এর অর্থকৃতিগ্রহণ, কিন্তু ভারতীয় ভাষায় রীতিবিরোধী। ইতিহাস-পূর্ব pre-historic-এর স্থান অনান্যদেবে অধিকার করিতে পারে—এই জাতীয় অনান্য শব্দের হলে অর্থরূপ প্রয়োগ চলিতে পারে। নিখিল জাতিনিষ্ঠ বা নিখিল জাতিগত বা চলন্তিকায় নির্ভীক অধিরাত্রী শব্দ অ'ন্তর্জাতিক শব্দের কাজ চালাইতে পারে কিনা সুধীশর্গ বিচার করিয়া দেখিবেন। আন্তর্জাতিকের দৃষ্টান্তে আন্তঃ-প্রাদেশিক, আন্তঃবিভাগীয়, আন্তঃভৌমনিয়ন প্রভৃতি যে সমস্ত বিকটাকার শব্দের আবির্ভাব বাংলাভাষাভাষীকে শঙ্কিত ও ক্রোধ করিয়া তুলিতেছে তাহাদের হাত হইতে উদ্ধার পাইবার একটা ব্যবস্থা করার সময় উপস্থিত হইয়াছে। অবশ্য ভাষার দরবারে যেতুম্ ইহারা জাঁকিয়া বসিয়াছে তাহাতে ইহাদের ঘটান যোটেই সহজ নহে। সম্মেলনকে বাতিল করিয়া দিয়া পুনর্মিলন শব্দের প্রবর্তনের দ্বারা re-union-এর কথকি মধ্যমা রক্ষার চেষ্টা দেখা গুলেও বাংলার পৌরব রক্ষিত হইতেছে না। অনুবাদ হিসাবে বৃহৎ নেতৃত্ব High Command-এর অর্থগত হইতে পারে, কিন্তু মূল কর্তৃপক্ষ বা মুখ্য নেতৃবর্গ বাংলা ভাষায় মান্যম ভাল। মুখ্য সম্পাদক প্রভৃতি যে সকল পদ joint secretary প্রভৃতির অনুবাদ হিসাবে ব্যবহৃত হইতেছে তাহাতে মুখ্যশব্দের পূর্বপদ হিসাবে প্রয়োগ বাংলার রীতিবিরোধী। বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগী সম্পাদক বা সম্পাদকমণ্ডল শব্দ সুবিধামত ব্যবহার করা যাইতে পারে। Home Department, Home Minister প্রভৃতি শব্দে Home-এর প্রতিশব্দরূপে 'স্বরাষ্ট্র'

পররাষ্ট্রের বিপরীত অর্থ প্রকাশ করে কিনা বিবেচ্য। অন্তরঙ্গ শব্দের প্রয়োগ এহলে চলিতে পারে কিনা ভাবিয়া দেখা দরকার। একই শব্দের অনুবাদে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন শব্দের দরকার হইতে পারে—একই প্রতিশব্দ সকল স্থলে চলিতে পারে না। Interesting শব্দের বিভিন্ন প্রতিশব্দ এসম্পদে রবীন্দ্রনাথ ইহার সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। সম্মতি সরকারী ঋণের বিজ্ঞাপনে এই বিষয়ে অনবধানতার একটি চমৎকার উদাহরণ পাওয়া পেল। বিজ্ঞাপনের ভাষায় ঋণ নগদ টাদার পরিবর্তে পাওয়া যাইবে। সাধারণ পাঠক হয়ত বাধীন-তার শুভ সূচনার সরকারকে টাদা দেওয়ার কথা বিস্মিত হইবেন। টাদা দিয়া ঋণ কিরূপে পাওয়া যায় তাহা ভাবিয়া হয়ত বা আতুল হইবেন। কারণ বাঙালী জানে টাদা সাহায্য হিসাবেই দিতে হয়। নগদ টাকার পরিবর্তে ঋণপত্র পাওয়া যাইবে ইহাই লেখকের বক্তব্য—ইংরেজীর ছবৎ অনুবাদ বিরুদ্ধ ধারণা জন্মাইবার কারণ। কলিকাতার অধিবাসীদের রেশন কর্তৃপক্ষ যাকে যাকে তাহাদের কার্ড পুনর্নির্ধারনের জন্য জমা দিতে বলেন—জনসাধারণ বিজ্ঞাপন দেখিয়া নিজেদের কর্তব্য নির্ধারণ করিতে পারেন কিনা সন্দেহ। পুরাতন কার্ডের পরিবর্তে নূতন কার্ড লিখাইতে, কার্ড সংশোধন করাইয়া লইতে বা উহাতে নূতন বিষয় সংযোজন করাইয়া লইতে অনুরোধ করিলে কাহারও বুঝিতে অনুবিধা হয় না। 'হিমকক্ষ' শব্দের দ্বারা refrigerator কোনরূপে বুঝান গেলেও refrigeration, refrigerated প্রভৃতি শব্দের বেলায় অনুবাদায় পড়িতে হয়। শীতকয়ল, শীতন, শীতিত এই তিনটি শব্দের দ্বারা বোধ হয় সংক্ষেপে সকল কার্যাই চলিতে পারে। Martyr-এর স্থানে শহীদ শব্দের বহুল প্রয়োগ চলিতেছে। উহার স্থানে আত্মোৎসর্গ শব্দ ব্যবহার করিতে কেহ সন্মত হইবেন কিনা জানি না—তবে শব্দটির অর্থ বুঝিতে বাঙালী জনসাধারণের বিশেষ আগ্রাস স্বীকার করিতে হইবে না বোধ হয়। Tear-gas-কে কাঁহনে গ্যাস বলিয়া প্রচার করার ভারীভাবিদ ত্রীমুক্ত যোগেশচন্দ্র-রায় মহাশয় আপত্তি করিয়াছেন—কারণ গ্যাস ত কাঁহে না। কাঁহানো গ্যাস বলিলে এ আপত্তি এড়ান যাইতে পারে। হাসানো গ্যাস laughing-gas-এর প্রতিশব্দ হইতে পারে। Air-tight-কে বায়ুরুদ্ধ না বলিয়া বায়ুরোধী বলিলে সঙ্গত ও শোভন হয় না কি? Public health, public instruction প্রভৃতি শব্দে public কথাটির খুব বেশী তাৎপর্য আছে বলিয়া মনে হয় না—থাকিলেও তাহাকে 'জন' দিয়া অনুবাদ করার তেমন সার্থকতা দেখা যায় না—স্বাস্থ্যবিভাগ, শিক্ষা-বিভাগ বলিলে বুঝিবার কোনও অনুবিধা হয় না। রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত লোকশিক্ষা, লোকসাহিত্য শব্দ আজ আমরা বাতিল করিব কি? স্থিতিবস্থা, গণপরিষদ প্রভৃতি কয়েকটি শব্দের আলোচনা প্রবন্ধান্তরে করিয়াছি, কিন্তু সে আলোচনা

অনুকূলতা বা প্রতিকূলতা কিছুই সৃষ্টি করে নাই। ভাষা-বিষয়ে উদাসীন শিক্ষিতসমাজে এ আলোচনাও সেই ভাবেই উপেক্ষিত হইবে বলিয়াই মনে হয়।

তবে দেশ স্বাধীন হইবার পর দেশের ভাষা বিষয়ে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন আবশ্যিক। এত দিন ভাষাকে উপেক্ষা করিলেও বিশেষ কিছু আশিয়া যাইত না। লেখক যাহা খুশী লিখিলেন—পাঠক কতকটা বুঝিল, কতকটা বা অনুমান করিয়া লইল—ভাষাতে কাহারও বিশেষ কিছু ব্যস্ত হইবার কারণ ছিল না। গভীর তত্ত্বালোচনা বাংলা ভাষার মাধ্যমে করিবার প্রয়োজন ছিল না—আইনের খুঁটিনাটি বিচার বাংলার দরকার হইত না—শব্দপ্রয়োগের গুঢ় রহস্য বা অল্প তাৎপর্য বিশ্লেষণের উপযোগিতা বাঙালী পাঠক বা লেখককে তেমন অমুগ্ধ করিতে হয় নাই। কিন্তু এখন অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে। এখন বাংলার মধ্য দিয়া বিভিন্ন বিজ্ঞান অধ্যয়ন করিতে হইবে—দেশের আইন-কানুন বাংলা ভাষায় উপনিবদ্ধ হইবে—বিচার-আচার-ব্যবসা-বাণিজ্য বাংলা ভাষার মধ্য দিয়া চালাইতে হইবে—ফলে প্রতিটি শব্দ ওজন করিয়া বিশেষ তাবিয়া চিন্তিয়া ব্যবহার করিতে হইবে—শব্দের অস্পষ্টতা, ভাষার দুর্বলতা প্রতি পদে নানা অসুবিধার সৃষ্টি করিবে। অনেক শব্দ আমরা ইংরেজী হইতে গ্রহণ করিয়াছি আরও অনেক শব্দ অবিকৃত ভাবেই আমাদের কাছে হইতে হইবে। কিন্তু আধুনিক ভাব প্রকাশের উপযোগী শব্দ গঠনের দায়িত্বও কম নয়—এরূপ অসংখ্য শব্দ আমাদের কাছে গঠন করিতে হইবে। অসীম শক্তি ও অমূল সম্পদের আধার সংকুত ভাষা ও সাহিত্য হইতে এ বিষয়ে আমরা যথেষ্ট সাহায্য পাইতে পারিব। সে সাহায্য যাহাতে সম্পূর্ণরূপে কাজে লাগাইতে পারি সেজন্য আমাদের সংযত ভাবে কাজ করিতে হইবে, নূতন সৃষ্টি শব্দ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইবে—ভাষার বিস্তৃতি ও অর্থ-প্রকাশ ক্ষমতা সম্বন্ধে সাবধান হইতে হইবে। কেবল পারিভাষিক শব্দ সংকলন করিলেই

চলিবে না—দীর্ঘকাল যাবৎ বিভিন্ন পণ্ডিত একক বা সমবেত ভাবে এ বিষয়ে যথেষ্ট কাজ করিয়াছেন—বর্তমানে সরকারের দৃষ্টিও এদিকে পড়িয়াছে। কিন্তু যে অগণিত সাধারণ শব্দ-রাশি আমরা অহরহ ব্যবহার করিতেছি কোন বিশিষ্ট শাস্ত্র বা বিজ্ঞান সহিত যাহাদের বিশেষ যোগাযোগ নাই তাহাদের সম্বন্ধেও উদাসীনতা অবলম্বন করা যুক্তিযুক্ত হইবে না, ভাষার প্রাণসন্ধারে তাহাদের উপযোগিতা ভুলিলে চলিবে না। তাহাদের সুরূচাপে ভাষা যাহাতে বিকৃত ও পচু না হইয়া যায় সেদিকে আমাদের বিশেষ অবহিত হইতে হইবে। প্রসিদ্ধ ভাষাতত্ত্ববিদ গ্রীষ্মক যোগেশচন্দ্র রায় বিজ্ঞান-নির্মিতাংশ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সংবর্ধনার উত্তরদান কালে এই প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছেন তাহার দিকে বাংলা ভাষার অহরহ পরিপুষ্টিকামী জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি—

‘বাঙ্গলা সাহিত্যকে ইংরেজীর আওতায় রাখব না—এ সংকল্প আমাদের গ্রহণ করতে হবে।...ভাষার যাহাতে বিস্তৃতি রক্ষা হয় সে বিষয়ে আপনারা সাবধান হবেন। তবেই এ ভাষা ঠিক থাকবে।...বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ যদি ২৪৪৫ জন লোক নিয়ে ভাষার বিস্তৃতি রক্ষার জন্য সমিতি গঠন করেন ভাল হয়। তাঁরা বানান ঠিক করে দিবেন—অর্থ ঠিক করে দিবেন।...সমিতি মাঝে মাঝে ভুল দেখিয়ে দিবেন। এতে কিছু ক্ষুণ্ণ হওয়ার কারণ হবে না।’

কোন ব্যক্তি বা সমিতির নির্দেশ ভাষার পক্ষে সর্বথা মানিয়া চলা সম্ভবপর না হইলেও উহা উপেক্ষার যোগ্য নহে—যেহেতু এইরূপ নির্দেশই সর্বত্র ভাষাকে উজ্জ্বলতার হাত হইতে রক্ষা করে। তাই স্বাধীনতার উদ্যম আবেগপ্রোতের মধ্যেও আলোকস্তম্ভের মত এই জাতীয় নির্দেশদাতার প্রয়োজন আছে। প্ররোগকারী ও নির্দেশদাতার স্বাভাবিক ভাবেই ভাষার কমনীয় রূপ বিকশিত হইয়া উঠিবে।

ভূমার আবির্ভাব

শ্রীহেমলতা দেবী

ভূমার যাহার স্বপত্তীর শ্রীতি

মাটি ছুঁয়ে তাঁর আনন্দ

চিরদিন যে গো গন্ধ-বিহীন

ভরা তাছে এত সুগন্ধ।

মাটির খেয়েছি মাটিতে শুয়েছি

বৈধেছি মাটির ঘর

মাটি দিয়ে গড়া এ দেহ আমার

লভিছে ভূমার বর।

ভূমা আসি বসি মাটির শিরে

আলো করে কালো মাটি

রাশি রাশি ফুল ফুটায় সবায়ের

সুগন্ধ দেয় বাটী।

গন্ধরাজের আনন্দ মোর

অঙ্গে জড়ায় রস

মাটিতে শয়ন বিছায়ে সে যে গো

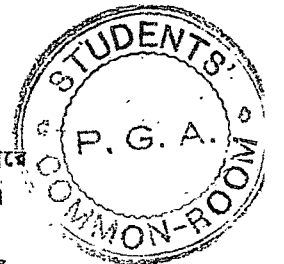
আলোকের কথা কয়।

ক্ষণভঙ্গুর দেহে রহি মোর

চরম পরম লাভ

শয়নে স্বপনে ঘটে ক্ষণে ক্ষণে

ভূমার আবির্ভাব।



ব্রতচারিণী

শ্রীহীলারাগী মুখোপাধ্যায়

এক

সে এক মঞ্চস্থল হাসপাতালের নাস। আজ পাঁচ বৎসর কষ্টভার লইয়া এই হাসপাতালে আছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত কেহ তাহার জীবনকাহিনী জানিতে পারে নাই। কোন দিন তাহার 'ডিউটি' পালনের ব্যতিক্রম হয় নাই। কেহ কখনো কাছে তাহার আলস্য দেখে নাই। রোগীদের প্রতি তাহার এত যত্ন যে দেখিলে মনে হয় যেন সে উহাদের নিভান্ত আপন জন। হাসপাতালের ডাক্তারগণ তাহার নাম দিয়াছেন নাইটমেল। নামটা শুনিলে সে মাথা নীচু করিয়া হাসে, কোন উত্তর দেয় না।

সহকর্মী নাসদের সহিত বাজে গল্প করিয়া কেহ কোন দিন তাহাকে সময় নষ্ট করিতে দেখে নাই। ডাক্তারদের সহিত কাক্সের কথা ছাড়া সে কখনও কালতো কথা কহে না। এই সকল কারণে আড়ালে তাহার সম্বন্ধে আলোচনা হয়। হয়ত সে আলোচনার হই-এক টুকরা কখন কখন তাহার কানেও আসিয়া পড়ে। কিন্তু বিরুদ্ধ সমালোচনা তাহার অটল গাভীর্ঘোর কাছে চূর্ণ হইয়া যায়।

নাসের শুভ্রবেশে রোগীর বিছানার পাশে দাঁড়াইয়া সহানুভূতিপূর্ণ স্বরে যখন সে জিজ্ঞাসা করে, কেমন আছেন—এবং রোগী ধামিয়া ধামিয়া কণ্ঠে উত্তর দেয়, ভাল না, বড় কষ্ট হচ্ছে—সে তখন তাহার মাথার হাত বুলাইতে বুলাইতে দয়ম-ভরা কণ্ঠে বলে, 'ভয় কি? হুইএক দিনের মধ্যেই আপনি সেরে উঠবেন।' রোগী হুই চোখের আকুল দৃষ্টি তাহার মুখে স্থাপিত করিয়া বলে, 'সত্যি বলছেন? আমি ভাল হব?' সে কণ্ঠে জোর দিয়া বলে, নিশ্চয় সেরে উঠবেন। কেন, আপনার কি এমন হয়েছে যে সারবেন না?

ওপাশের বিছানা হইতে মাথা তুলিয়া একটি যুবক তাহাকে ডাকে, 'সুনছেন, এদিকে আসুন ত একবার।' সে ছুটিয়া গিয়া বলে, 'কি বলছেন? কিছু কষ্ট হচ্ছে কি?' যুবক কাতর কণ্ঠে বলে, 'বড় মাথার কষ্ট, একটু যদি টপে দেন।' ছেলেটির মাথার হাত দিয়াই সে চমকাইয়া উঠে। জ্বরের উত্তাপে যেন পুড়িয়া যাইতেছে। তখনই সে আইস ব্যাগের ব্যবস্থা করে। ছেলেটি সুস্থবোধ করিয়া বলে, 'আঃ! আপনার বড় দয়া। এর আগে যিনি এখান দিয়ে যাচ্ছিলেন তাকে কত ডাকলুম, কিন্তু তিনি থমক দিয়ে বললেন, 'চুপ করে শোও।' আচ্ছা, আপনার নাম কি বলুন তো।'

সে গভীর ভাবে কহে, কনক।

—আপনি আমার বড়দির মত দেখতে, আপনাকে আমি দিদি বলে ডাকব।

যুবকের স্নেহোচ্ছ্বাসের উত্তরে কনক বলে, বেশী কথা বলবেন না।

ডাক্তার আসিলেন। কনক সমস্তই উঠিয়া দাঁড়াইল। তিনি প্রত্যেক রোগীকে পরীক্ষা করিয়া টেবিলের নিকট গিয়া চেয়ারে বসিলেন। নাসরা রিপোর্ট দাখিল করিল। কনকের রিপোর্টগুলি পড়িয়া ডাক্তার কহিলেন, বার নম্বর রোগীর অবস্থা ভাল নয়, তার ঠিক কেয়ার নেওয়া হচ্ছে ত?

কি ভাবে কেয়ার নেওয়া হইতেছে কনক তাহা বলিয়া গেল। প্রশংসমান কণ্ঠে ডাক্তার কহিলেন, আচ্ছা, তেতাল্লিশ নম্বর ভাল আছে? পনের নম্বরের পা-টা কি রকম?

এমনিভাবে ব্যাধি আর যত্নের লীলাক্ষেত্রের মধ্যেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইয়াছে কনক। মঞ্চস্থলের হাসপাতাল বলিয়া তাহার শুজ্বার প্রশংসা সুদূরপ্রসারী হইয়াছে। ইহাতে হাসপাতালের বেশ সুনাম বাড়িতেছে। কত রোগী সুস্থ হইয়া কনককে কত ভাল ভাল উপহার দিতে চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু কনক কখনও গ্রহণ করে নাই। মাথা নাড়িয়া বলিয়াছে, সে কি? আমার কর্তব্য আমি পালন করেছি, এতে উপহার দেওয়া অনাবশ্যক। সরকার আমাকে যাইনে দেন, সেই আমার যথেষ্ট। আপনার মা-বোন যখন সেবা করেন, আপনি কি তখন তাদের ভেট দিয়ে গণহুজ্ব হবার চেষ্টা করেন? আমাকেও আপনার তগিনীর আসনে স্থান দেবেন।

কনকের কথা শুনিয়া রোগীর চোখ ছলছল করে। কনক তখন অল্প রোগীর কাছে গিয়া দাঁড়ায়। সকলেই তাহাকে একান্ত আপনার জন বলিয়া মনে করে অথচ সে যেন সকলকার ধরা-ছোঁয়ার বাহিরে।

হুই

বৈকালে ক্রান্ত দেহে কনক নাস-কোয়ার্টারে কিরিল। তখন ঘরে নাসদের বেশ আড্ডা জমিয়াছে। কনককে দেখিয়াই করুণা বলিয়া উঠিল, কনক, তোর কিরন্তে এত দেরি হল? ডিউটি ত অনেকক্ষণ শেষ হয়ে গেছে।

পোশাক ছাড়িতে ছাড়িতে কনক কহিল, একটি নতুন পেসেন্ট এল, অবস্থা খুব সীরিয়াস। টেকে কিনা সন্দেহ। তার কাছে একটু দেরি হল। আচ্ছা, কি কাতরোক্তি তার জীৱ, চোখের জল রাধা যায় না। ভাবছিলাম, মানুষ যদি সব অশ্রু হাত বুলিয়ে আরাধ্য করে দিতে পারত।

কথা শেষ করিতে না করিতেই কনক ক্রান্তিতে একটা ইজি চেয়ারে শুইয়া পড়িল। নীরা হাসিয়া কহিল, হুই দেখছি

সত্যিই অবাক করলি। অত কিসের বাবা, চাকরি করতে এসেছ, জ্ঞান বাঁচিয়ে সরকারকে খুশি কর।

• কনক কহিল, বুঝি সব। কিন্তু চাকরির উপরেও দরদ বলে একটা জিনিস আছে মীরা; যা স্বার্থের দার দারে না এবং যেটা সকলকারই সমান নয়।

হেড নাস একখানা নেট বুনিতে বুনিতে ঘরে আসিলেন। কহিলেন, কি নিয়ে তর্ক হচ্ছে? এই যে কনক এসেছে। আচ্ছ এত দেয়ি?

করুণা কহিল, ও কোন্ রোগীর মাথায় হাত বুলোচ্ছিল আর কীদছিল।

কনক কহিল, তাতে কি অজ্ঞার হ'ল? সকলের হুঃখ কি আমারও হুঃখ নয়?

আচ্ছা কহিল, তোর মত অত দরদী হলে আর চাকরি করতে হয় না, বসে বসে শুধু কীদতেই হয়।

হেড নাস কহিলেন, যাকগে ওকথা। নতুন সিভিল সার্জন আসছেন শুনেছ তোমরা?

করুণা কহিল, হাঁ শুনছিলুম বটে। কি জ্ঞানি বাবা, ইনি আবার কি রকম মেজাজের লোক।

মীরা কহিল, তাঁর মেজাজ নিয়ে-তোব কি হবে? তুই ত থাকবি রোগীর কাছে।

• কে আসিয়া হেড নাসকে ডাকিতেই তিনি চলিয়া গেলেন। করুণা মীরার কথার উত্তরে কহিল, তা থাকলেও, তিনি ত এক জন উপরওয়ালা মনিব।

আচ্ছা কহিল, চাকরিরই উপরওয়ালা, আর ত কিছু নয়। অত ভয় কিসের?

করুণা তাহাকে ধাক্কা দিয়া কহিল, দুই মুখপুড়ী, যা তা বলিস।

মেয়েদের মধ্যে একটা হাসির রোল পড়িয়া গেল। আচ্ছা কহিল, আচ্ছা, মেয়েগুলো বিয়ে করে কেমন করে পরের অধীন হয় বল ত?

সাধনা এতক্ষণ কথা কহে নাই। এইবার সে মুখ তুলিয়া কহিল, তুই যেমন চাকরি করে মনিবের অধীন হয়েছিস তেমনি করেই।

সাধনা বিধবা—স্বামী কি বস্তু তাহা সে জানে। কাজেই কথাটা তাহার গায়ে লাগিয়াছিল।

করুণা কহিল, আচ্ছা, সাধনা-দি স্বামী বেচারিকে নিয়ে অনেক নাড়াচাড়া করেছে কি না, তাই প্রের্টা আঁতে দা দিয়েছে।

মীরা কহিল, আচ্ছা, কনক ত কখনো বলে না তার বিয়ে হয়েছে কি না, বিয়ের প্রসঙ্গ উঠলেই চুপ করে থাকে। জিজ্ঞেস করলেও ত কিছু বলে না।

কনক কহিল, বলব আবার কি? আমার দেখে কি মনে হয়?

করুণা কহিল, মনে হয় বিয়ে করিস নি।

—তবে অত জিজ্ঞেস করিস কেন?

আচ্ছা কহিল, কিন্তু বিয়ে না করলেও, কারও লতে পড়েছিস এ আমি শপথ করে বলতে পারি।

কনক কহিল, বেশ তো, বল না তুই, কেউ তো মানা করেছে না।

আচ্ছা কহিল, আচ্ছা, সত্যি কনক, তুই এতদিন এখানে কাজ করছিস, আমাদের ভালবাসিত ঠিক আপন বোনের মতই, কিন্তু কখনও তোর ব্যক্তিগত কাহিনী আমরা কিছু শুনলুম না। তুই যেন তুইকোঁড় মেয়ে, তোর আঙুলি বলতে যেন কিছু নেই। না তাই?

কনক কহিল, ঠিকই হয়েছিস। আমি তুইকোঁড়ই, আঙুলি বলতে কিছু নেই আমার।

আচ্ছা কহিল, সত্যি, বলবি না?

—আরে বলবার যে কিছু নেই। বাবা-মাকে মনে নেই। একটা আশ্রমে মানুষ হয়েছি। বিয়ে করি নি। হাসপাতালে চাকরি করি। তাদের সহকারিণী। বাস, শুনলি ত? ছোট আমি, তাই তুচ্ছ আমার জীবনকাহিনীও।

তিন

বর্তমান সিভিল-সার্জনের বিদায়-সংবর্ধনা-সভার পরদিনই নুতন সিভিল-সার্জনের অভিনন্দন উপলক্ষে হাসপাতালে একটা উৎসব হইল। নুতন সিভিল-সার্জন ডাক্তার বোসের স্ত্রী সুন্দরী এবং শিক্ষিতা বলিয়া নাস মহলে জোর আলোচনা চলিয়াছে। কনক কোন কথাতেই থাকে না, নিজের কাজ করিয়া যায়।

সকালে নিজের ওয়ার্ডে সে ব্যস্ত ভাবে কাজ করিতেছে, এমন সময়ে ডাক্তার রায়ের সহিত সিভিল সার্জন ডাক্তার বোস রোগী দেখিতে আসিলেন।

প্রত্যেক বেডের পাশে কিয়ৎক্ষণ করিয়া দাঁড়াইয়া ডাক্তার রায় রোগীর বিবরণ দিতে দিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। হলের শেষের দিকে একটা রোগীকে কনক কীডিং-কাপে করিয়া পথ্য খাওয়াইতেছিল। ডাক্তার রায়ের সহিত ডাক্তার বোস সেইখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কনক তাহাদের দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। ডাক্তার বোসের পানে চাহিয়াই কি-জানি-কেন সে কাঁপিতে কাঁপিতে ঘামিয়া উঠিল। তাহার কম্পমান হস্ত হইতে কীডিং-কাপটা মাটিতে পড়িয়া গেল। ঝন্ ঝন্ শব্দ হইতেই ডাক্তার-দ্বয় কনকের পানে চাহিলেন। মনে হইল যেন ডাক্তার বোসের চোখে বিশ্বয় খনাইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু সে ক্ষণেকের জ্ঞ। তাহার পরই তিনি স্তম্ভোখিতের ভায় কহিলেন, ইয়েন্স উত্তর রায়, তারপর?

কনক জরতপদে হস হইতে বাহির হইয়া গেল। ডাক্তার রায় কহিলেন, এই যে নাস টিকে দেখলেন তার, এর বিপুল

সুনাম। রোগীদের এত যত্ন নেয় যে তাতে হস্পিটালেরও
রেকর্ড ভাল হয়।

সিভিল-সার্জনের অফিসনতের মত উদ্বেগহীন ভাবে
কহিলেন, তাই না কি? নাম কি এর?

ডাক্তার রায় তাঁহার পানে তাকাইয়া কহিলেন, কনক
বসু।

ডাক্তার বোস অল্প দিকে চলিতে চলিতে ভিন্ন প্রসঙ্গ
ভুলিলেন। ডাক্তার রায় তাঁহাকে সহসা উদ্যত হইতে
দেখিয়া অরাক্ হইলেন।

কিরংকালের মধ্যে কনক কিরিয়া আসিয়া নুতন কীজিং-
কাপে রোগীকে আবার খাওয়াইতে লাগিল। সহসা রোগী
কনকের হাত ছুইখানা চাপিয়া কাতরস্বরে কহিল, মা, তুমি
আর অম্মে আমার গর্ভবারিণী ছিলে।

কনক তাহার গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিল, ব্যস্ত
হবেন না, কিছু ভয় নেই।

রোগী কহিল, মা, বাড়িতে ভোমারই মত একটি মেয়ে
রেখে এসেছি, তাকে দেখবার কেউ নেই।

এম্ব কাতরোক্তি শুনিলে কনকের চোখে জল আসে।
হার রে অনহার মাহুষ।

আর এক জন বিকারের ঘোরে ভয়ানক টেচাইতেছে।
বৃদ্ধকে সাভুনা দিয়া কনক ছুটিল তাহার কাছে। পাশের
বেডের রোগীকে ধীরে ঠুস খাওয়াইতেছে। কনককে ছুটিয়া
আসিতে দেখিয়া সে বিরজিত্রা কণ্ঠে কহিল, আলিয়ে
মারলে। এমন বিকট টেচাচ্ছে কার মাথি টেকে এখানে।

কনক দেখিল যন্ত্রণায় রোগী দন্তে অধর কাটিয়া চিবুক
আর গওদেশ রক্তে রঞ্জিত করিয়া ফেলিয়াছে। দয়দ-ভয়া
কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, আছা-হা। তাহার পর তিজা বোরিক
তুলায় তাহার মুখ মুছাইতে লাগিল।

চার

সকালে কনক নিজের কাছে ব্যস্ত। সিভিল-সার্জনের
আরদালী আসিয়া সেলাম দিয়া কহিল, ডাক্তার সাহেব
আপনাকে ভলব করেছেন। তিনি আপিস-বরেই অপেক্ষা
করছেন।

কনক কহিল, আচ্ছা, তাঁকে আমার সেলাম দিয়ে বল,
আমি এখন ডিউটিতে আছি, কাজ শেষ হলেই যাব।

আরদালী চলিয়া গেল। একটু পরে প্রবেশ করিলেন
ডক্টর ব্যানার্জি। বয়স ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসর, উজ্জ্বল গৌরবর্ণ
দেহ ছোট-সোট কোট-প্যাঞ্চে সজ্জিত, নাকের উপর সোনার
ফ্রেমওয়াল চশমা। কনকের উপর দৃষ্টি পড়িতেই হাসিয়া
কহিলেন, সুপ্রভাত। তার পর নাইটিংদেল, স্তন্যম নাকি
আপনি পদত্যাগ পত্র দাখিল করেছেন?

কনক অভিবাদন করিয়া কহিল, ঠিকই স্তন্যম,
আপনি।

ডাক্তার রোগী দেখিতে দেখিতে কহিলেন, কিন্তু কারণ
কি?

—কারণ খেয়াল ছাড়া আর কিছু নয়।

যে রোগীকে ডাক্তার পরীক্ষা করিতেছিলেন সে আবুল
কণ্ঠে কহিল, আপনি চলে যাবেন?

কনক কহিল, না, সে এখন নয়, আপনি সুস্থ হয়ে বাড়ি
ফিরে গেলে তার পর।

রোগী আশ্বস্ত হইল। ডক্টর ব্যানার্জি আর এক জনকে
দেখিতে দেখিতে কহিলেন, দেখুন ত, আপনি চলে গেলে
এর প্রাণে কত বড় আঘাত পাবে।

কনক নীরব হইয়া রহিল। ডাক্তার কহিলেন, ছেড়ে
দিন আপনার ও খেয়াল। সেবাত্রতই যখন নিষেছেন, একটা
খেয়ালের বেশে ব্রতভঙ্গ করা ঠিক নয়।

কনক কহিল, ব্রতভঙ্গ ত করছি না, ডক্টর ব্যানার্জি।
এখানে থাকতে আর মন সরছে না, তাই অল্প হাসপাতালে
যাব ঠিক করেছি।

ডাক্তার ব্যানার্জি কহিলেন, আপনার মুখে তো ওকথা
মানার না। আপনার অন্তরে এ হাসপাতালের কত ক্ষতি
হবে তবে দেখছেন কি?

কনক মুখ ফিরাইয়া কহিল, আপনি কাজ শেষ করুন,
বাছে কথার কাজের ব্যাঘাত হচ্ছে।

ডাক্তার হাসিয়া কহিলেন, ও ইয়েস, যতবাদ। কাজের
দেহি হচ্ছে বটে, ঠিক কথা।

তিনি কাজ শেষ করিয়া চলিয়া গেলেন। ডিউটির
শেষে কনক সিভিল-সার্জনের আপিস-কক্ষে উপস্থিত হইল।
আরদালীর হাতে একটা স্লিপে নিজের নাম-লিখিয়া পাঠাইতেই
ভিতরে প্রবেশ করিবার অস্বস্তি আসিল। কনক সিভিল-
সার্জনের সম্মুখে উপস্থিত হইলে, তিনি তাহার শুভ্রবসনা
নিরাশ্রয় গাভীরূপে ক্লান্ত মুক্তির পানে ফণকাল নির্বাকভাবে
চাহিয়া রহিলেন।

কনক অগ্রসর হইয়া অভিবাদনপূর্বক অকম্পিত কণ্ঠে
কহিল, ডার, আমার ডেকেছেন?

ডক্টর বোস গলা কাড়িয়া কহিলেন, হ্যাঁ।

তাঁহার বড় টেবিলের-বিপরীত-পাশের একটা চেয়ার
দেখাইয়া কহিলেন, বোস।

কনক বসিল। কিরংকাল নীরব থাকিয়া সিভিল-সার্জন
কহিলেন, পদত্যাগপত্র দাখিল করেছ কেন জানতে পারি কি?

কনক কহিল, এখানে আর চাকরি করব না, তাই।

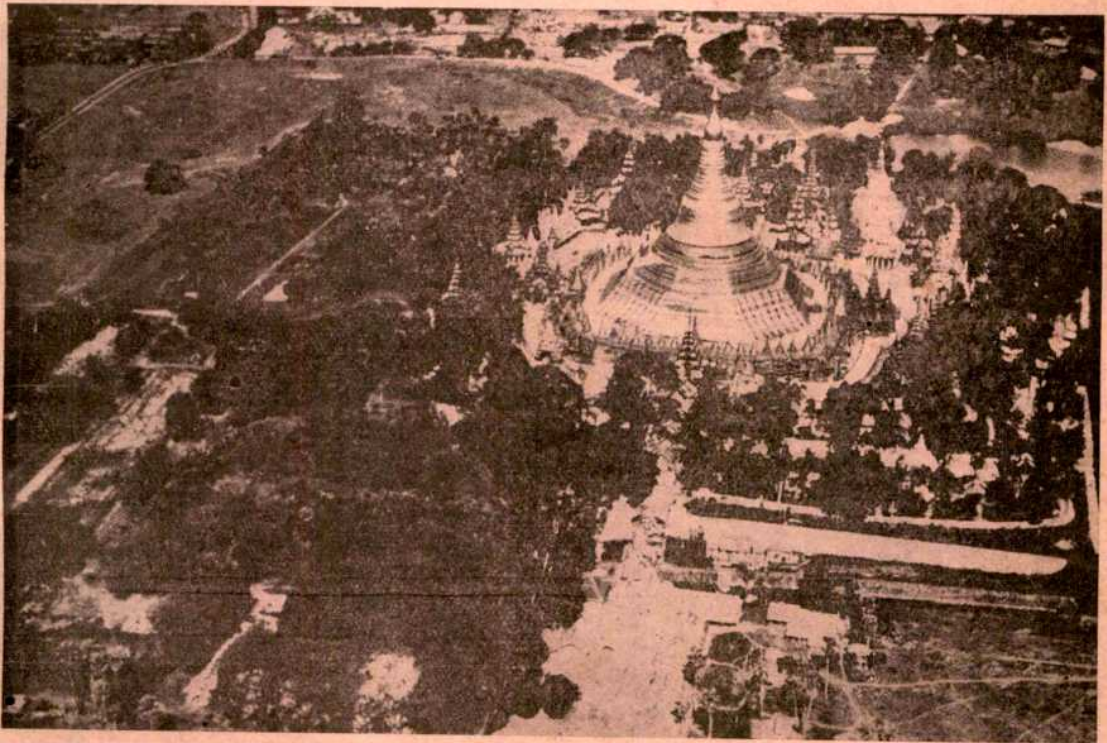
—কেন চাকরি করবে না, তার কারণটাই শুদ্ধিজ্ঞাত।

—মাপ করবেন, কারণ জানতে আমি অক্ষম।

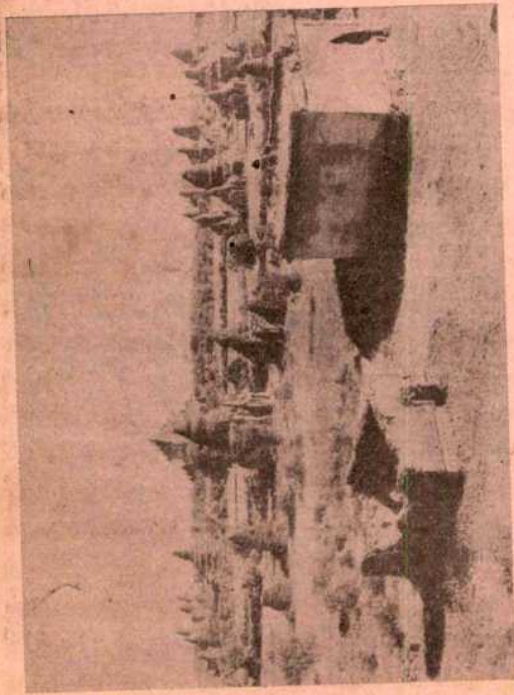
ডাক্তার সাহেব আবার কিরংকাল কনকের পানে নীরবে



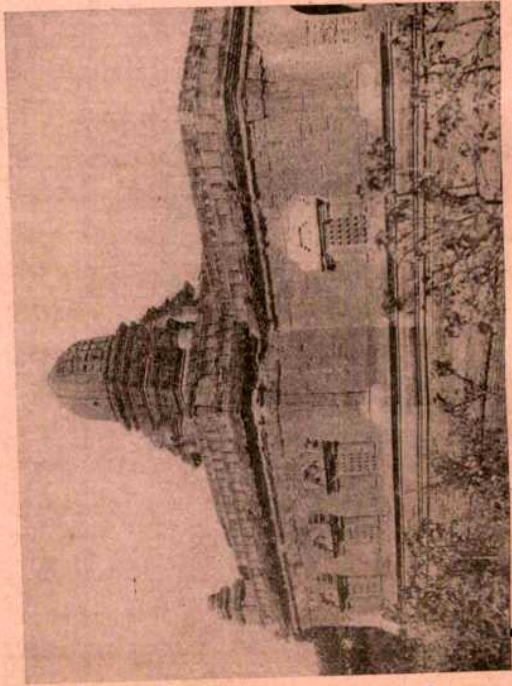
রাভের ওয়াশিংটনের আলোক-সজ্জা



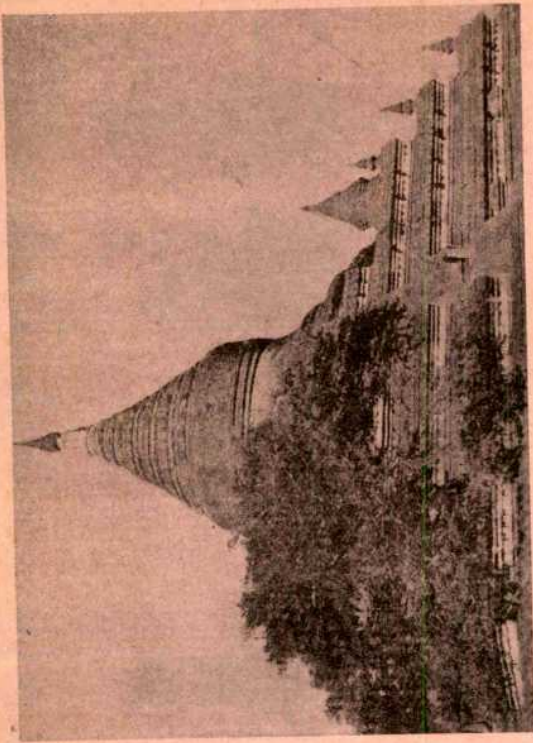
মেহনের স্বর্ণনির্মিত বৌদ্ধমন্দির শায়ে ডাগোপ্যাগোডা



প্রাচীন বঙ্গদেশের প্রথম রাজধানী (খ্রিঃ ২য় হইতে ১৩শ শতাব্দী) পাপানের যৌক্ত মন্দিরবলী



পাপানের মানপায়া মন্দির—একাদশ শতাব্দীতে রাজা মামুদা কর্তৃক
ইহা রাজপ্রাসাদরূপে ব্যবহৃত হইত



রাজা আলাউদ্দিন কর্তৃক ১১৪৪ খ্রিষ্টাব্দে নির্মিত বৌদ্ধমঠ



পাপান নগরীর কেন্দ্র—পিছনে ১৯০১ খ্রিষ্টাব্দে নির্মিত আমল প্যাপোজা

চাখিয়া রহিলেন। তাহার পর সহসা গভীর স্বরে ডাকিলেন, কনক।

কনক চমকাইয়া তাহার পানে চাখিল। মাথা নীচু করিয়া বৃহ কণ্ঠে কহিল, বলুন।

ডাক্তার কহিলেন, কিছু আমি জানি এর কারণ। তুমি আমাকে চিনিতে পেরেছ বলেই এই হাসপাতাল ছেড়ে যেতে চাইছ। তোমার জীবনের সকল ব্যর্থতা যেখানে চরম সার্থকতার ভরে উঠবে বলে মনে করেছিলে, সেইখানেই আমার আগমনে আবার তোমার বৃকে হাফাকার জাগল, নয় কি?

কনক বৃহ কণ্ঠে কহিল, হয় তো তাই। কিন্তু সারা পৃথিবীতে কোথাও কি হাফাকার ঘুচবে না? তা হয় তো ঘুচবে, অন্তত চেষ্টার ক্রটি করব না।

ডাক্তার কহিলেন, কিছু আমি তোমার সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াতে দেব না। আমি তোমার স্বামী, তোমাকে আমি চাই।

কনকের মুখে বিজ্ঞপের হাসি ফুটিয়া উঠিল। কহিল, আর তা হয় না। কনক শুধু স্বামীর উপাধিটার মধ্যোই আরতির চিহ্ন বজায় রেখেছে—আর সব-কিছুতেই সে স্ত্রীমণী। তার নেই কোন কামনা, নেই কোন অভিমান। সে এখন আর্গের বেদনা মুচিয়ে জ্যোতিষ্মর আনন্দ-লোকে বিচরণ করে।

ডাক্তার সহসা উঠিয়া আসিয়া তাহার হাত দুইখানা চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন, কনক মার্জনা কর আমাকে। সত্যি, আমি সুখী নই। তোমার স্থান পূর্ণ হয় নি, হবেও না কোন দিন। যে দিন থেকে তোমার হারাই সে দিন থেকে আমার জীবনের সকল আনন্দ বিদায় নিয়েছে। বাবা তোমার হৃৎকের কারণ, আমি নয়। আমি তখন স্নান রত-কেন্দ্রে জীবন-মৃত্যুর সঙ্ঘর্ষে। তোমার চিঠি যখন পাই তখন আমার উত্তর দেবার অবস্থা নয়। যখন উত্তর পাঠাই তার পর থেকে তোমার কোন সাক্ষা পাই নি। কিরে এসে তোমাকে অনেক বুঁকেছি, কিন্তু কেউ তোমার সংবাদ দিতে পারে নি। পরে জানা গেল, তোমার বাবার মৃত্যুর পর তুমি না-কি কাউকে না জানিয়ে কোথায় চলে গেছ—হয় তো ভুল পথেই। আমি কখনো বিশ্বাস করি নি, কিন্তু বাবা করলেন। তাই তাঁর জেদে এবং পাঁচ জনের অহুরোধে কের বিয়ে করেছি। তবে এই সর্গে বিয়ে করি যে তোমার অবস্থাতে বুঁকে গেলে আবার গ্রহণ করবো আশ্রয় করেই।

কনক কহিল, কেন, তোমার বর্তমান স্ত্রী তো শুনেছি খুব সুন্দরী এবং শিক্ষিত। এঁকে পেয়ে আমাকে তো মনে রাখবার কথা নয়। আমি ঘরের বউ, আমার বাবার একটা নামান্য ক্রটি এত বড় হয়ে উঠল যে তোমার পিতা তোমার অগ্রপরিভিতে বজলে আমার পরিত্যাগ করলেন। একবার জাবলেন না আমি কোথায় পাঁচাব।

ডাক্তার বোসের চোখ হল হল করিতে লাগিল। তিনি কহিলেন, কিরে এস কনক, কমা কর এ ভাগ্যহতকে।

কনক কহিল, আর তা হয় না।

—তা হলে চাকরি ছেড়ে না।

—না, তাও হয় না।

—আচ্ছা, তা হলে তুমি এখানেই থাক, আমি উপস্থিত হুট নিয়ে অল্প হাসপাতালে বদলি হবার চেষ্টা করি।

—তাও হয় না।

ডাক্তার ব্যথিত চক্ষু তুলিয়া কহিলেন, তবে তুমি কি একান্তই আমাকে কমা করবে না?

কনক আর থাকিতে পারে না। অশ্রুবিগলিত নয়নে ডাক্তারের পদপ্রান্তে বসিয়া কহিল, এমন করে অপরাধ বাড়িও না, প্রিয়তম। কনক তার স্বামীকে মনে মনে নিবারণ পূজা করে।

ডাক্তার তাহাকে উঠাইয়া কহিলেন, আমি তা জানি। তোমার লে পূজার গন্ধ নিত্য আমার হৃদয় স্পর্শ করে। আচ্ছ হাসপাতালে সকলেই কান্দছে তোমার জেদে। যেও না, লক্ষ্মীটি।

কনক হাত ছাড়াইয়া লইয়া কহিল, আচ্ছা, এখন তো আসি।

ডাক্তার কিছুই বলিলেন না, শুধু হির তাহে পাঁচাইয়া রহিলেন।

পাঁচ

শুক তারা তখন আকাশে জল জল করিতেছে। উষার শীতল বায়ু প্রাণে কেমন একটা গাভীরোর সকার করে। মার্গ কোয়ার্টার যাহারা আছে তাহারা সকলেই নিমিত্ত, শুধু কনক বিনিমিত্ত রজনী যাপন করিতেছে। সে পিছনে হাত দুইখানা রাখিয়া আমতলিরে তখন দালানে পদচারণ করিতেছে। সহসা মাথা তুলিয়া মনে মনে কহিল, ঐ যে হাসপাতাল আলোকের চক্ষু মেলিয়া আর্গের আতুল ক্রন্দনে বন্ধ করিয়া তুলিতেছে, ঐ ঐ তাহার আনন্দধাম, সুতির তীর্থক্ষেত্র, হৃদয়ের স্বর্গলোক।

সহসা আকাশের পানে চোখ পড়িল। রাত্রি ও প্রভাতের সন্ধিক্ষণে গগন যেন পাণ্ডুর। মনে পড়ে পিতাকে, যিনি এ জীবনে কোন দিন তাহাকে অনাদর করেন নাই। অতালেই সে মাতৃহীনা। মা তাহাকে তুলিয়াছেন, তুলিয়াছে সংসার। কিছুদিন পরে তুলিবে তাহাকে এই হাসপাতাল, তুলিবে সহকর্মীরা। হায়, কাহারো হৃদয়ে তাহার স্থান হইল না।

না, কনক আর ভাবিতে পারে না। শেষে কি পাগল হইয়া যাইবে? বাহিরের প্রকৃতির পানে দৃষ্টিপাত করিয়া সে চমকাইয়া উঠিল। আর অন্ধকণের মধ্যোই প্রভাত হইয়া

পড়িবে। ছয়টা হইতে তাহার ডিউটি। আর দেবি নয়, এখনই সকলে উঠিয়া পড়িবে।

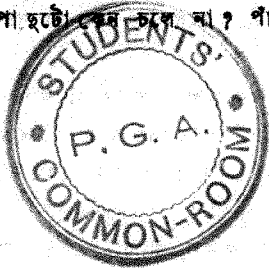
নিঃশব্দচরণে ঘরে পুনঃ প্রবেশপূর্বক বাটগুলার পানে সতর্কপণে তাকাইল। তাহার সুটকেস্টা তুলিয়া লইয়া এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে একবারে রাজপথে আসিয়া দাঁড়াইল। দলিনীরা জানিতে পারিলে গোলমালের সৃষ্টি হইত। করুণা কাল বলিয়াছে ডাক্তার রায় আজ সকালেই তাহাকে 'কল' দিয়া রাখিয়াছেন। ডাক্তার রায়কেই তাহার সব চাইতে ভয়। তাঁহার মুক্তিপূর্ণ বিনয়মধুর বাক্যে যদি তাহার সত্তর ভাসিয়া যায়।

সে ভরিতপদে রাজপথ ধরিয়া চলিল। টাইম-টেবিলে দেখিয়াছে সাত্বে ছয়টার কলিকাতাগামী ট্রেন আছে। কিন্তু পা ছুটো কেন চলে না? পাঁচ বঙ্গবরের সাধনাশ্রম ব্রত-

চারিদিকে হাতছানি দিয়া ডাকিয়া বলে এস, এস, তুমি যে, আঙের পিড়িতের দরদী সেবিকা তাই যোগীর জগৎ ভোমার চায়। ওকি ৬ একে একে মানসপটে ফুটরা উঠিতেছে পাঁচ বছরের দেবা সব যোগীদের মুখগুলি। কে যেন বলে, মা! ঐ কে বলে, দিদি, দিদিমণি।...

না, না—কমক জন্মিবে না। সে প্রায় ছুটির চলিল। কিন্তু পারে না আর চরণদ্বয় তাহার বেদনা-কাতর ক্রোধ দেখে বহন করিতে। কমক হাঁপাইতে হাঁপাইতে কিরিয়া তাকায় হাস-পাতালের পানে। বৃষ্টিধারার মত নয়নাঙ্গারে ভিজিয়া গেল তাহার গওদেশ আর বক্ষস্থল। তখন কে পথে গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে—

ছাড়া পাওয়া নয়রে আমার,
সে যে বাঁধন চাওয়া।



বিমানে ভূ-প্রদক্ষিণ

শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

২৩শে নবেম্বর শনিবার সকালে ত্রিযুত ককিল ও মুখুজে মহাশয়ের সঙ্গে ক্যাপিটল ও হোয়াইট হাউসে গেলাম। হোয়াইট হাউস প্রেসিডেন্টের সরকারী বাসভবন। সেদিন প্রেসিডেন্ট ইন্‌ম্যান ওখানে ছিলেন না। দর্শনপ্রার্থীর বেশ ভিড়। নীচের তলায় একটি ঘরে রুজভেন্টের ছেলেমেয়েদের খেলনা দেখিলাম। দোতলায় পূর্বের হলঘরে পূর্ববর্তী প্রেসিডেন্টগণের বড় বড় ছবি দেয়ালে ঝুলিতেছে। মধ্যস্থলে বড় একটি আলোর বাড়। এটি অত্যর্থনা-গৃহ। ইহার পশ্চিমে পর পর তিনটি সুসজ্জিত খাবার-ঘর। আরও কয়েকটি সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠ দেখিলাম। তিন তলায় দর্শকগণের প্রবেশাধিকার নাই। সেখানে প্রেসিডেন্টের শয়নকক্ষ ও বৈঠকখানা প্রভৃতি। কলিকাতা বা দিল্লীর পর্বণমেন্ট হাউসের তুলনায় হোয়াইট হাউস অনেক ছোট। আর সারি দিয়া লোক পর্বণমেন্ট হাউসে ঘুরিয়া আসিবে একথা ভারতবর্ষে অচিন্তনীয়।

ক্যাপিটলের সু-উচ্চ ঘুংগু গদুগদু বহু দূর হইতে দেখা যায়। এই গদুগুের উপরে একটি বাতি জলে। ভিতরে অনেকগুলি ঘর। একটিতে হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভস্-এর এবং অল্প একটিতে সেনেটের অধিবেশন হয়। চুকিতেই গদুগুের নীচের হলঘরে বহু ছবি টাঙান দেখা যায়। এই ছবিগুলি এ দেশের ইতিহাসের বিশিষ্ট ঘটনাবলী লইয়া অঙ্কিত। ইঁহা-দের বাণীমতা-যুদ্ধের শেষে ইংরেজ সেনাপতি লর্ড কর্ণওয়ালিস যেদিন কর্ণ ওয়াশিংটনের নিকট আত্মসমর্পণ করেন সেদিন ইঁহাদের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। এই 'আত্মসমর্পণের'

একটি খুব বড় ছবি এই ঘরে আছে। এই ঘরের পাশে একটি ছোট ঘর। সেখানে পূর্বে সুলীম কোর্ট বসিত। সেনেটের ৯৬ জন সভ্য। ছোটবড় নির্বিশেষে প্রত্যেক রাষ্ট্রের দুই জন প্রতিনিধি লইয়া সেনেট গঠিত। হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভস্‌ এ জনসংখ্যা অনুপাতে সভ্য নির্বাচিত হয়। সভ্যসংখ্যা অনেক বেশী, খরটও বড়। এই ঘরে যুদ্ধের সময় চার্লিস সেনেট ও হাউসের সভ্যগণকে একত্রে তাঁহার বক্তব্য বিবেচন করিয়া-ছিলেন। দোতলায় একটি বড় হলঘরে প্রত্যেক রাষ্ট্রের সর্গশ্রেষ্ঠ ব্যক্তির মর্ম্মরম্বুটি আছে। কোন্‌ রাষ্ট্রের কাহার বৃষ্টি থাকিবে তাহা সেই রাষ্ট্রই স্থির করিয়াছিলেন। এই ঘরের গঠনকৌশল এইরূপ যে মধ্যস্থলে একটি নির্দিষ্ট স্থানে দাঁড়াইলে ঘরের যে-কোন স্থান হইতে খুব ছোট শব্দও পরিষ্কার শোনা যায়। যেহেতু একখানি নির্দিষ্ট পাথরে দাঁড়াইলে নাকি মনস্তামনা সিদ্ধ হয়। এই ক্যাপিটল ভবন সমগ্র দেশের ঐক্যের প্রতীক এবং জাতীয় মর্যাদা-বোধের দ্যোতক।

পরদিন রবিবার! প্রাতঃরাশ সমাপন করিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। পরিষ্কার আকাশ। বেশ মৌসুম উঠিয়াছে। সোজা ওয়াশিংটন মহামেটে গেলাম। আধ ঘণ্টা পর পর লিক্ট দর্শকগণকে লইয়া মহামেটের দীর্ঘে উঠিতেছে, আবার আধ ঘণ্টা পরে নামাইয়া আনিতেছে। এই শুভটি কর্ক ওয়াশিংটনের জয়ধ্বজার মত আকাশে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। শুভটির উপর হইতে চারিদিকের দৃশ্য পরম রমণীয়। পশ্চিমে লিঙ্কন-মেমোরিয়াল। দক্ষিণে জেকারসন মেমোরিয়াল। পূর্বে

ক্যাপিটল ভবন। উত্তরে হোয়াইট হাউস। সমস্ত শহরটি সরল এবং সমান্তরাল রাস্তাপথশ্রেণীদ্বারা সমভাবে বিভক্ত হইয়া



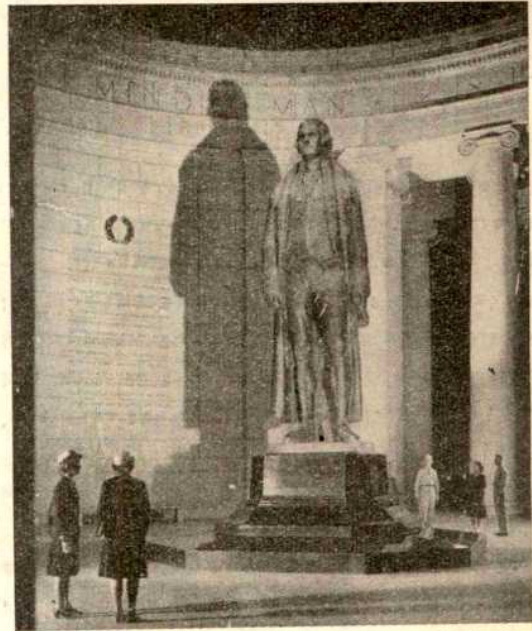
আব্রাহাম লিন্কনের উপবিষ্ট অবস্থার ১৯ ফুট দীর্ঘ মর্ম্মরমূর্তি

সুবিভক্ত উজানের মত শোভমান। পশ্চিমে পটোম্যাক নদী উত্তর হইতে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত। পরপারে দূরে পর্বত-শ্রেণী। শহরটি সত্যিই মনোরম।

লিন্কন মেমোরিয়ালে মর্ম্মরগৃহে লিন্কনের মর্ম্মরমূর্তি রক্ষিত আছে। চতুর্কোণ উচ্চ ভবন। সামনে ভুল স্তম্ভের সারি। উচ্চ লোপানশ্রেণী বাহিয়া গৃহে উঠিতে হয়। গৃহমধ্যে উচ্চ মঞ্চোপরি মর্ম্মরনির্ম্মিত চেয়ারে পূর্ণাবয়ব লিন্কন উপবিষ্ট। উপর দিক হইতে মুখের উপর বৈজ্ঞানিক আলো আসিয়া পড়িয়াছে। মূর্তিটি যেন জীবন্ত। পার্শ্ব-লিখিত কথা কয়েকটির অর্থবাদ এইরূপ: “যে জনগণের জন্ম আব্রাহাম লিন্কন যুক্তরাষ্ট্রকে বাঁচাইয়াছিলেন, তাহাদের মনোমন্দিরের মত এই মন্দিরেও তাহার স্মৃতি চিরতরে প্রতিষ্ঠিত হইল।” চারিদিকের দেয়ালে লিন্কনের গৌরবোৎসর্গ বহুতার অংশ উৎকীর্ণ। জগতে জনগণের স্বার্থে জনগণ কর্তৃক জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ম যে সমস্ত বীর অমেরিকার গৃহযুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন দেন, এই বহুতায় লিন্কন তাহাদের প্রতি তাহার সহজ ওজখিনি ভাষায় অকপটে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছিলেন। মেমোরিয়াল গৃহের পূর্ব দিকে রাস্তার পরপারে দীর্ঘ সরোবর ও সবুজ বৃক্ষশ্রেণী ওয়াশিংটন মহামেট পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

ওয়াশিংটন মহামেটের পূর্বে বৃক্ষশ্রেণী শোভিত ম্যাল নামক রাস্তা ক্যাপিটল ভবন পর্য্যন্ত গিয়াছে। মহামেটের উপরে হোয়াইট হাউস পর্য্যন্ত ধোলা সবুজ মাঠ। মাঠের পরে বিস্তৃত শহর।

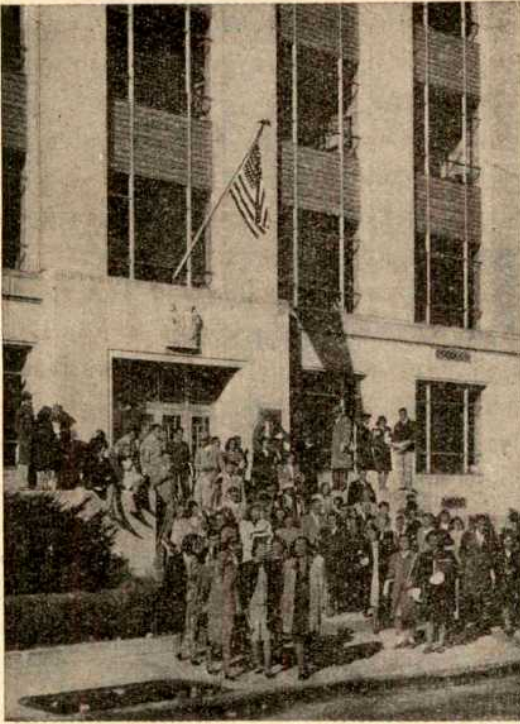
ওয়াশিংটন শহর ক্যাপিটল ভবনকে কেন্দ্র করিয়া চারি ভাগে বিভক্ত। উত্তর-পশ্চিম ভাগই জনবহুল। ঐ দিকেই পটোম্যাক নদী পর্য্যন্ত শহর সম্প্রসারিত হইয়াছে। দক্ষিণ-পশ্চিমে, উত্তর-পূর্বে বা দক্ষিণ-পূর্বে শহর মোটেই বাড়ি নাই। ওসব দিকে বসতি কম। প্রত্যেক অংশে রাস্তাগুলি সরল এবং সমান্তরাল। উত্তর-দক্ষিণে লম্বা রাস্তাগুলির নাম এক, দুই প্রভৃতি পর পর সংখ্যাধারা যথাক্রমে নির্দিষ্ট হইয়াছে। পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা রাস্তাগুলির নাম এ, বি, সি, ডি প্রভৃতি বর্ণাহুক্রমে রাখা হইয়াছে। যে-কোন দুইটি রাস্তার মধ্যে দূরত্ব সমান। কাজেই শহরটি কতকগুলি সমায়তন আয়তক্ষেত্রে বিভক্ত। বড় বড় রাস্তার নামে কয়েকটি এভিনিউ আছে। এগুলি সিধা কোণাকৃতি চলিয়াছে। বাড়ীর নথরগুলিও বেশ কায়াদা করিয়া লাজান। ভারতীয় দূতাবাসের নথর ২১০৭



মর্ম্মর পাদপীঠের উপর দণ্ডায়মান টমাস জেফারসনের

১৯ ফুট উচ্চ প্রতিমূর্তি

ম্যাসাচুসেটস এভিনিউ। অর্থাৎ যেখানে ম্যাসাচুসেটস এভিনিউ ২১ নং ষ্ট্রীটকে ছেদ করিয়াছে সেখান হইতে সপ্তম বাড়ীতে এই দূতাবাস। এইরূপ যেখানে এক ষ্ট্রীট ১৩ নং ষ্ট্রীটকে ছেদ করিয়াছে সেখান হইতে ত্রয়োদশ বাড়ীর নথর ১৩১৩ এক ষ্ট্রিট। এইখানে ওয়াশিংটনের বৃহত্তম বইয়ের দোকান অবস্থিত; নাম ব্রেকটোনো। আমেরিকার সমস্ত



জর্জ ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রনীতির ছাত্রছাত্রীগণ

শহরই এইরূপে সাজান। এখানে পঞ্চ ভুল করিবার সম্ভাবনা একপ্রকার নাই বলিলেই চলে। বাড়ীর নম্বর শুনিলেই বুঝা যাইবে সে বাড়ী আমি যেখানে আছি সেখানে হইতে কতদূরে; কোন্ দিকে এবং কোন্ পথে সেখানে যাইতে হইবে। এখানকার আপিস ও হোটেলের ঘরগুলির নম্বরও অসুস্থরূপে কায়দায় সাজান। সাত তলার পাঁচ নম্বরের ঘরের নম্বর হইবে ৭০৫, ৮ তলার ১১ নম্বরের ঘরের নম্বর হইবে ৮১১, এইরূপ।

ওয়াশিংটন মহুমেন্ট হইতে উত্তর দিকে তাকাইলে সুলভিত শহরের সুলভ রূপটি চোখের উপর আসিয়া উঠে।

মহুমেন্টের ঠিক দক্ষিণে জেকারসন মেমোরিয়াল, এদিকে লোকালয় নাই। মহুমেন্টের পরেই ধানিকটা মাঠ। তারপর প্রশস্ত মন্দির রাস্তা, তারপর শ্রোতোবহা সরোবর। তারপর প্রশস্ত পঞ্চমুখ জড় মন্দিরগৃহে দণ্ডায়মান পূর্ণাবয়ব জেকারসনের মন্দিরমূর্তি, তারপরে আবার ছোট একটি মাঠ, আবার একটি প্রশস্ততর রাস্তা, তার পাশ দিয়া প্রবহমান পটোম্যাক নদী। একটি ষাল নদীর সঙ্গে সরোবরকে সংযুক্ত করিয়াছে। সেই ষালে উপর স্তম্ভ স্তম্ভ। দৃষ্টি পরম রমণীয় জলরাশির খচ্ছতা, মন্দিরের 'নন্দনু্য গজ্ঞতা' এবং দূরদূরান্তের জামলিমা জেকারসনের মহিমময়ী স্মৃতিতে খিরিয়া উদার নীলাকাশতলে যে অপূর্ণ অমৃত রূপ রচনা করিয়াছে তাহার শোভা, সন্ময় এবং

পবিত্র গাভীয়া অতুলনীয়। ওয়াশিংটন মহুমেন্টের উপর হইতে এই দৃশ্য আমার দেহমনকে যুগপৎ আকর্ষণ করিল। মন্ত্রমুগ্ধের মত উপর হইতে নামিয়া সিঁধা মেমোরিয়ালে গেলাম। সরোবরের পাড় দিয়া দীর্ঘ মন্দির সোপানশ্রেণী বাহিয়া প্রশস্ত মন্দিরগৃহে প্রবেশ করিলাম। সম্মুখে জেকারসনের মন্দিরমূর্তি দাঁড়াইয়া। জেকারসন ছিলেন জার্মিনিয়ার অধিবাসী, তিনিই আমেরিকার স্বাধীনতা-বোম্বপাত্রের রচয়িতা। জার্মিনিয়ার ইঁহার সমাধির উপর প্রস্তরকলকে লিখিত আছে, "আমেরিকার স্বাধীনতা বোম্বপাত্রের রচয়িতা, জার্মিনিয়ার ধর্মগত স্বাধীনতা আইনের প্রণেতা এবং জার্মিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা টমাস জেকারসনকে এই স্থানে সমাহিত করা হইয়াছিল।" এই স্মারক লিপি তিনি নিজেই রচনা করিয়া রাখিয়া গিয়া ছিলেন। তাঁহার অসংখ্য কার্যের মধ্যে এই তিনটি কাজের জন্যই তিনি বিশেষরূপে পরিচিত হইতে চাহিয়াছিলেন। জেকারসন আমেরিকার স্বাধীনতার পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। আর জর্জ ওয়াশিংটন এবং পরে এড্রাহাম লিঙ্কন সে পরিকল্পনার রূপ দিয়াছিলেন। ওয়াশিংটন নগরী আজ আমেরিকার একের উৎস, ক্যাপিটল ভবন ও হোয়াইট হাউস ইঁহার গৌরবের প্রতীক এবং জাগ্রত প্রহরীস্বরূপ। ওয়াশিংটন মহুমেন্টের উপর দাঁড়াইয়া এক দিকে জেকারসন-স্মৃতিগৃহ, অপর দিকে লিঙ্কন স্মৃতিভবন এবং অপর দুই দিকে ক্যাপিটল ভবন, হোয়াইট হাউস ও ওয়াশিংটন নগরী দর্শনে মন স্বতঃই জাবে অভিভূত হয়। উপরোক্ত তিন জন মহাপুরুষই ওয়াশিংটন নগরী, ক্যাপিটল ভবন ও হোয়াইট হাউসের সত্যিকারের স্থপতি।

যে স্বাধীনতা-বোম্বপাত্রের রচয়িতা হিসাবে জেকারসন নিজেও গৌরব অমৃত্যব করিয়াছিলেন তাহার বদ্বাহুবাধ এইরূপ—

"স্বভাব এবং স্বভাবের নিয়ন্তা পরমেশ্বরের পরম বিধান প্রত্যেক জাতি বিশ্বের শক্তিপুঞ্জের মধ্যে পৃথক এবং সমান আসনের অধিকারী। অজ্ঞ জাতির সহিত রাজনৈতিক বন্ধনে আবদ্ধ কোন জাতির পক্ষে যখন সে বন্ধন ছিল করিয়া তদীয় স্বতন্ত্র এবং সমান আসন গ্রহণ করা আবশ্যক হইয়া পড়ে তখন বিশ্বের বিচার বুদ্ধির প্রতি কিঞ্চিৎ শ্রদ্ধা থাকিলে যে সমস্ত কারণে জাতি স্বতন্ত্র আসন গ্রহণে বাধ্য হইতেছে সেগুলি বিশ্বের দরবারে নিবেদন করা উচিত।

আমরা এই সত্যগুলি স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া মনে করি :—

- ১। ভগবান সকল মহুমুকে সমান করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন;
- ২। শ্রষ্টা তাহাদিগকে কয়েকটি অবিচ্ছেদ্য অধিকার প্রদান করিয়াছেন;
- ৩। জীবন, স্বাধীনতা এবং সুখায়েষণ এই অধিকারগুলির অন্তর্গত;
- ৪। এই অধিকারগুলিকে নিরাপদ করিবার জন্যই মহুমু-

সমাজে গবর্ণমেন্টের প্রতিষ্ঠা এবং গবর্ণ-
মেন্টের ভাষা শক্তিকল্পি শাসিতের
স্বীকৃতির উপরই প্রতিষ্ঠিত।

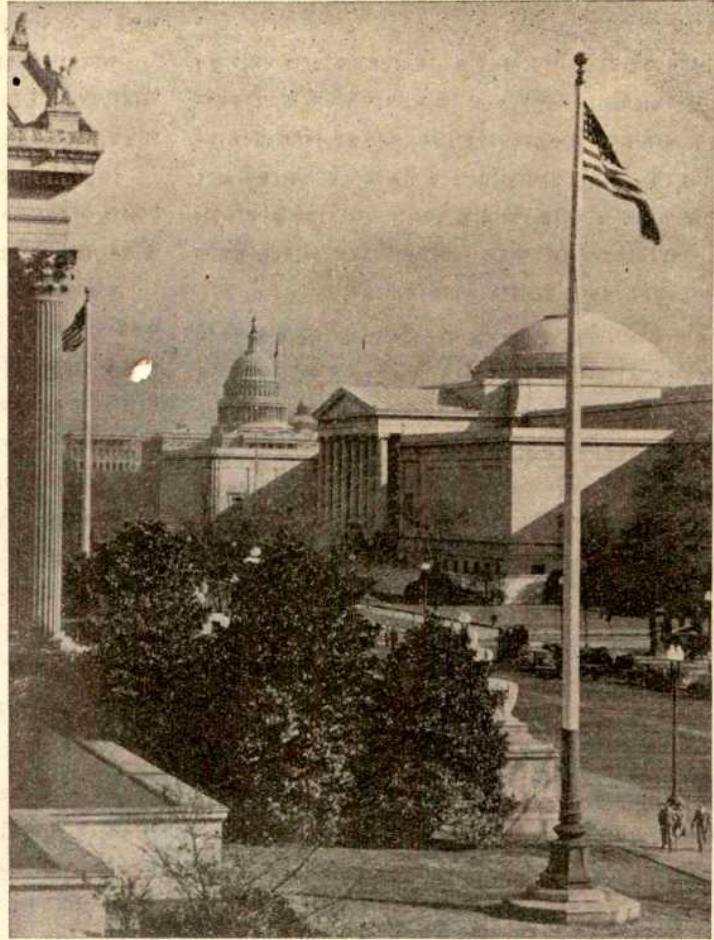
৫। যখন কোন গবর্ণমেন্ট এই
সমস্ত উদ্দেশ্য সাধনের পরিপন্থী হইয়া
উঠে তখনই তাহার পরিবর্তন বা উচ্ছেদ
করিয়া পূর্বোক্ত নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত
নূতন গবর্ণমেন্টের প্রতিষ্ঠা করিবার
অধিকার জাতির আছে। নূতন গবর্ণ-
মেন্টের রূপ ও গঠন এইরূপে নিয়ন্ত্রণ
করিতে হইবে যাহাতে গবর্ণমেন্টের উপর
জন্ত ক্ষমতাগুলি জনসাধারণের সুখ ও
নিরাপত্তা বিধানের সর্বোপেক্ষ উপযোগী
হয়।

সামাজ্য এবং কণিক কারণে দীর্ঘ-
কালের গবর্ণমেন্টের পরি বর্তন অকর্তব্য
ইহাই সুবুদ্ধি ব্যক্তিগণের নির্দেশ। এই
জন্ত সর্বত্রই দেখা যায় যে যত দিন হুঃখ
অসহ না হইয়া উঠে তত দিন মনুষ্যগণ
হুঃখ সহ করিয়াই চলে; তথাপি
চিরন্তন গবর্ণমেন্টের উচ্ছেদসাধন পূর্বক
হুঃখ-প্রতিকারের চেষ্টা করে না। কিন্তু
যখন একই উদ্দেশ্য প্রণোদিত ক্ষমতার
অপব্যবহার এবং অপহরণ পরস্পরার মধ্যে
দেশকে সম্পূর্ণ বৈরতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত
করিবার পরিকল্পনা পরিস্ফুট হইয়া উঠে
তখন উক্ত গবর্ণমেন্টকে অপসারণ করিয়া
অবিষাৎ নিরাপত্তার নূতন প্রহরীর ব্যবস্থা
করা জাতির অধিকার এবং কর্তব্য। এই
উপনিবেশগুলি এইরূপেই বৈষ্যের সহিত

হুঃখ ভোগ করিয়াছে এবং এইরূপ প্রয়োজনেই আজ তাহার।
পূর্বতন গবর্ণমেন্টগুলির পরিবর্তন সাধনে বাধ্য হইয়াছে।
গ্রেট ব্রিটেনের বর্তমান রাজার ইতিহাস এই রাষ্ট্রগুলির
উপর প্রজা-পীড়ন-তন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্যে পুনঃ পুনঃ
অত্যাচার ও অধিকার হরণেরই ইতিহাস। পক্ষপাতশূন্য
অকপট জগতের দরবারে আমরা প্রমাণরূপ এই ঘটনাগুলি
উপস্থাপিত করিতেছি :—

জনহিতে অত্যাচারক আইনে সম্মতিদানে তিনি অস্বীকার
করিয়াছেন।

তিনি শাসকগণকে জরুরী এবং গুরুত্বপূর্ণ আইনগুলিও
তাঁহার সম্মতিলাভ পর্যন্ত চালু না করিতে নির্দেশ দিয়াছেন ;
অথচ শাসকগণ যখন আইনগুলিকে চালু করিবার জন্ত তাঁহার
সম্মতি প্রার্থনা করিয়াছে তখন সেগুলির প্রতি কোন মনোযোগ
দেন নাই।



মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় কলাশালা, 'মেশজাল গ্যালারি অব আর্টের'
পশ্চিম-ভবন (দক্ষিণে), বামে উন্নত ভবনের উপর 'স্বাধীনতা'র প্রতিমূর্তি

আইন-সভায় প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার জাতির পক্ষে
অমূল্য, প্রজাপীড়ক রাজার পক্ষে ভয়াবহ।

এ অধিকার বর্জন না করা পর্যন্ত তিনি বড় বড় জনপদকে
রাষ্ট্রমধ্যে গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছেন।

আইন সভার সমস্তগণকে হস্তরান করিয়া তদীয় ব্যবস্থা
মানিয়া লইতে বাধ্য করিবার উদ্দেশ্যে তিনি আইন সভাগুলির
অধিবেশন প্রণাবিরুদ্ধ, কষ্টদায়ক এবং সরকারী নথিপত্রাদি
যে স্থলে রক্ষিত হয় সেখানে হইতে দূরস্থিত স্থানে আস্থান
করিয়াছেন।

জনগণের অধিকারের উপর তদীয় আক্রমণের দৃঢ়ভাবে
বিরোধিতা করে বলিয়া তিনি প্রতিনিধি-সভাগুলিকে পুনঃ
পুনঃ জাতিয়া দিয়াছেন।

এইরূপে প্রতিনিধি-সভাগুলি জাতিয়া দিয়া বহুদিন পর্যন্ত
তিনি পুনর্নির্বাচনে স্বীকৃত হন নাই। ফলে আনন্দের আইন
প্রণয়নকারী শক্তি জনসাধারণের মধ্যে কিরিয়া আসিয়াছে।

ইতিমধ্যে রাষ্ট্র বহিরাভ্যন্তর বা অন্তর্বিপ্লবে অরক্ষিত অবস্থায় রহিয়াছে।

তিনি এই রাষ্ট্রগুলির জনহুঁদে নিবারণ করিতে স্বাধীনতা চেষ্টা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি বিদেশীদিগকে স্বীকৃত-বিষয়ক আইন প্রণয়নে বাধা দিয়াছেন, আগন্তুকগণকে উৎসাহ-দান বিষয়ক আইন পাশ করিতে অস্বীকার করিয়াছেন এবং নুতন জরি চাষ করিবার বিধিনিষেধগুলি কঠোরতর করিয়া-ছেন। বিচারালয়গুলির ক্ষমতা প্রতিষ্ঠাবিষয়ক আইনে সম্মতি না দিয়া তিনি বিচার-ব্যবস্থার বাধা দিয়াছেন।

কার্যকাল এবং বেতনের পরিমাণ ও প্রাপ্তির ক্ষেত্র তিনি বিচারকগণকে সম্পূর্ণরূপে তাঁহার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল করিয়া তুলিয়াছেন। জনসাধারণকে অস্তঃসারশূন্য করিবার ক্ষেত্র তিনি অসংখ্য নুতন পদ সৃষ্টি করিয়া থাকে নুতন কর্মচারী এদেশে প্রেরণ করিয়াছেন।

আমাদের আইন সভার সম্মতি না লইয়া আমাদের মধ্যে শাস্তিকালে স্থায়ী সৈন্তবল রাখিয়াছেন।

তিনি সামরিক শক্তিকে স্বাধীন করিয়া অসামরিক শক্তির উর্দ্ধে স্থাপন করিয়াছেন—

আমাদের ক্ষেত্রে সুবহুৎ সশস্ত্র সৈন্তবল চাপাইবার ক্ষেত্র;

এই রাষ্ট্রগুলির অবিবাসিগণকে হত্যা করিবার অপরাধ হইতে কপট-বিচারের দ্বারা বাতকগণকে বাঁচাইবার ক্ষেত্র;

বিশ্বের অজ্ঞাত সমস্ত অংশ হইতে আমাদের বাণিজ্যের বিলোপ সাধনের ক্ষেত্র;

আমাদের সম্মতি ব্যতীত আমাদের উপর কর্তার চাপাইবার ক্ষেত্র;

বহুসংখ্য জুরীর বিচার হইতে আমাদের বঞ্চিত করিবার ক্ষেত্র;

মিথ্যা অপরাধে বিচারার্থ আমাদের পক্ষে সমুদ্রপারে প্রেরণ করিবার ক্ষেত্র;

পার্শ্ববর্তী প্রদেশে ব্রিটিশ আইনের স্বাধীন ব্যবস্থা রহিত করিয়া, দৈব শাসন প্রতিষ্ঠা করিয়া এবং সীমানা বাড়াইয়া এই উপনিবেশগুলিতে অসুস্থ শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের উপযুক্ত আদর্শ এবং উপায় স্থাপনের জন্য;

আমাদের অধিকার অপহরণের জন্য, আমাদের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান আইনগুলি প্রত্যাহারের জন্য, এবং আমাদের গর্ববোধগুলির ক্ষমতা আত্ম পরিবর্তনের জন্য;

আমাদের স্বকীয় আইন সভা বন্ধ করিয়া দিয়া আমাদের উপর সর্ববিষয়ে আইন করিবার ক্ষমতা তাহাদের উপর ন্যস্ত হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করিবার জন্য;

আমাদের আইন বহির্ভূত এবং আমাদের কর্মসূচীসমূহ (শাসনভঙ্গ) বিরোধী শাসনব্যবস্থার অধীনে আমাদের পক্ষে আনিবার জন্য;

তিনি অন্য লোকের সহিত যোগ দিয়া তাহাদের প্রীতি কপট আইনে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন।

আমরা তাঁহার রক্ষণীয় নয় ইহা ঘোষণা করিয়া এবং আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইয়া তিনি এদেশের শাসনভার পরিত্যাগ করিয়াছেন।

তিনি আমাদের সমুদ্র লুণ্ঠন করিয়াছেন; সমুদ্রতীর বিক্ষুব্ধ করিয়াছেন, নগরী পোতাধীরা দিয়াছেন এবং জনগণের জীবন নাশ করিয়াছেন।

অসংখ্যকোটি এবং বর্ষের মধ্যে অসংখ্যকোটি নিষ্ঠুরতা ও কপটতার সহিত তিনি যে হত্যা, ধ্বংসলীলা এবং অত্যাচার পূর্বকই আরম্ভ করিয়াছেন তাহা সম্পন্ন করিবার জন্য বর্তমানে দলে দলে ব্যবসাদার বিদেশী সৈন্য আমদানী করিতেছেন।

আমাদের সমসাময়িকগণকে সমুদ্রমধ্যে বন্দী করিয়া তাহাদিগকে বদেশের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে, বন্দু ও ভ্রাতৃ-গণকে হত্যা করিতে অথবা তাহাদের হস্তে নিহত হইতে বাধ্য করিয়াছেন।

তিনি আমাদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ বাধাইয়াছেন এবং নিষ্ঠুর বর্বর নিগ্রোগণ যুদ্ধকালে আবালবৃদ্ধবনিতা নির্বিশেষে সর্বাবস্থার লোকদিগকে নির্বিকারে হত্যা করে ইহা জানিয়াও তাহাদিগকে আমাদের সীমান্তবাসিগণের বিরুদ্ধে লেদাইয়া দিয়াছেন।

এই সমস্ত অত্যাচারের পদে পদে প্রতিকার প্রার্থনা করিয়া আমরা অতি বিনীত ভাবে তাঁহার নিকট আবেদন করিয়াছি। পুনঃ পুনঃ আবেদনের উত্তরে আমরা শুধু বার বার শাস্তিই পাইয়াছি। যে রাজার চরিত্র এতাদৃশ প্রজাপীড়ক কর্মসমূহ দ্বারা কলঙ্কিত তিনি স্বাধীন জাতির শাসক হইবার অযোগ্য।

আমাদের ব্রিটিশ ভ্রাতৃগণের প্রতিও আমরা কম মনোযোগ দিই নাই। তাহাদের আইন সভা আমাদের উপর অন্যায় অধিকার বিস্তার করিবার জন্য যে চেষ্টা করিয়াছে সে বিষয়ে আমরা তাহাদিগকে মাঝে মাঝে সাবধান করিয়া দিয়াছি। আমরা যে অবস্থায় এদেশে আসিয়া বসতি স্থাপন করিয়া-ছিলাম তাহা তাহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছি। তাহাদের সহকর্মী বর্ধিত এবং উদারতার নিকট নালিশ জানাইয়াছি। এই সমস্ত অধিকার হরণ অস্বীকার করিবার জন্য আমাদের ও তাহাদের সমান পূর্ব-পুরুষগণের নামে তাহাদের নিকট আবেদন করিয়াছি। ইহাতে যে আমাদের সম্পর্ক ও আদান-প্রদান বিচ্ছিন্ন হওয়া অবশ্যম্ভাবী তাহাও তাহাদিগকে জানাইয়াছি। কিন্তু তাহাও এই ন্যায় এবং রক্তের আস্থানে বহিরতা অবলম্বন করিয়াছে। এতদবস্থায় আমাদের বিচ্ছেদ ঘটয়িত্তি নিরন্তর স্বীকার করিতে এবং তাহাদিগকে মানবজাতির অন্যান্য অংশেরই মত যুদ্ধকালে শত্রু এবং শাস্তি-কালে মিত্র বলিয়া মনে করিতে আমরা বাধ্য হইতেছি।

অতএব আমরা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণকে

সাধারণ কংগ্রেসে মিলিত হইয়া জগতের পরম বিচারকে আমাদের উদ্দেশ্যের সত্যতার সাক্ষী রাখিয়া সমস্ত উপনিবেশ-বাসী জনগণের নামে ও তাহাদেরই প্রদত্ত অধিকার-বলে দৃঢ় ভাবে প্রচার ও ঘোষণা করিতেছি যে,

(১) এই একতাবদ্ধ উপনিবেশগুলি মুক্ত ও স্বাধীন হইল এবং স্বাধিকার বলে তাহাদের ভাঙ্গন হওয়াই উচিত ;

(২) ব্রিটিশ-রাজের প্রতি সমস্ত আহুগত্য হইতে তাহারা মুক্ত হইল ;

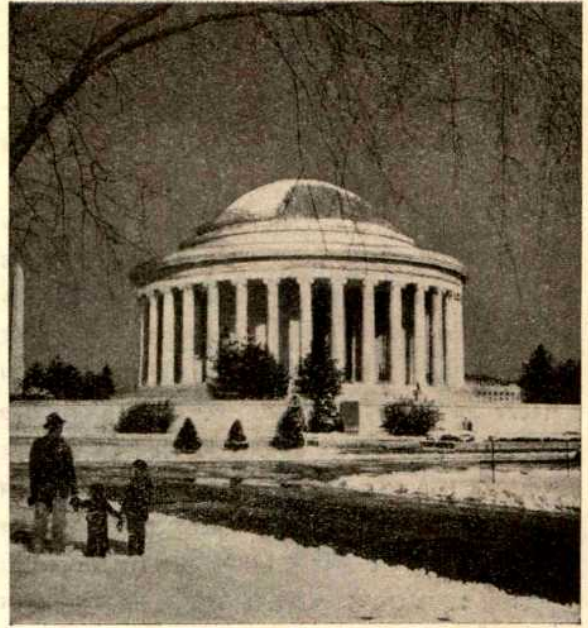
(৩) তাহাদের সহিত গ্রেট ব্রিটেনের সমস্ত রাজ-নৈতিক বন্ধন সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হইল ; এবং

(৪) মুক্ত এবং স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে মুক্ত ঘোষণা, শান্তি স্থাপন, মৈত্রী সম্পাদন, বাণিজ্য-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি স্বাধীন রাষ্ট্রোচিত সর্ববিধ কার্য করিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা তাহারা গ্রহণ করিল।

এই ঘোষণার সমর্থনের জন্ত ঈর্ষের উপর দৃঢ় নির্ভর রাখিয়া আমরা পরস্পরের নিকট আমাদের জীবন, সম্পত্তি এবং পবিত্র আত্মসম্মান আবদ্ধ রাখিতেছি।”

৮ই ডিসেম্বর রবিবার জর্জ ওয়াশিংটনের বাড়ী দেখিতে যাই। বাড়ীটির নাম মাউন্ট ভার্নন। ইহা ওয়াশিংটনের নিজের বাড়ী, জার্মিনিয়া রাষ্ট্রে অবস্থিত। এখানে তিনি সপরিবারে বাস করিতেন। ১৮৫৩ খ্রিষ্টাব্দে মাউন্ট ভার্নন মহিলা সমিতি (লেডিজ এসোসিয়েশন) এই বাড়ীটি রক্ষা করিবার ভার নেন। তদবধি তাহারাই বাড়ীটির রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন। ওয়াশিংটন শহর হইতে ইহার দূরত্ব ১৬ মাইল। বাসে যাতায়াতের ভাড়া ১ ডলার ১৫ সেন্ট।

সকালে প্রাতঃরাশের পর বাহির হইয়া পড়িলাম। দূতাবাসের কর্মচারী খ্রীযুক্ত শিবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সঙ্গী করিলাম। ইনি আমার সমবয়স্ক এবং ওয়াশিংটনে নবাবগত। অল্পদিন হইল দিল্লী হইতে বদলী হইয়া এখানে আসিয়াছেন। ক্ষতিপূরণ বাবদ “বিজয়ী” ভারতবর্ষ বিজিত জাপানের নিকট কি কি সম্পত্তি পাইতে পারে ইনি সে বিষয়ে ভারতের পক্ষে তথ্য দিবার করেন। বড় পোষ্ট আপিসের নিকট হইতে মাউন্ট ভার্ননের বাসে উঠিলাম। জেকারসন মেমোরিয়ালের অনতিদূরে পটোম্যাক নদীর সুবৃক্ষ পল্ল অতিক্রম করিলাম। চমৎকার রাস্তা—নদীর ধার দিয়া বরাবর মাউন্ট ভার্নন পর্যন্ত গিয়াছে। বামে নদী, দক্ষিণে পাতলা জঙ্গল। জঙ্গলে এলুম গাছই বেশী। ছুইট ছোট ছোট শহর অতিক্রম করিলাম। এগুলি নাকি এদেশের খুব প্রাচীন শহর—অর্থাৎ দেড় শত বৎসরেরও বেশী এদের বয়স। পটোম্যাক নদী বেশ বড়। কলিকাতার গঙ্গার মত, কোথাও তার চেয়েও জক্কাই বড় হইতে পারে। নদীতীরে একটি টিলার উপর মাউন্ট ভার্নন অবস্থিত। নদী হইতে বাড়ীর এবং বাড়ী হইতে নদীর দৃষ্ট ভুল্য চিত্তাকর্ষক। বাড়ীটি



টমাস জেকারসনের স্মৃতিস্তম্ভ ওয়াশিংটন

দোতলা, বাংলা ঘরের মত হটকাযুক্ত ছাদ। উপরে নীচে ছুটা করিয়া ঘর। ওয়াশিংটনের সময় যেরূপ ছিল ঠিক সেই ভাবেই রাখা হইয়াছে। ঢুকিতেই বৈঠকখানা ঘর। ক্রান্তের ঘোড়শ লুই ওয়াশিংটনকে একটি কার্পেট তৈরি করাইয়া পাঠাইয়াছিলেন। কার্পেটটি বৈঠকখানায় পাতা রহিয়াছে। যে হার্পিস কর্ডে ওয়াশিংটনের পোষ্য নাতনী গান গাহিত তাহা পাশের ঘরে সেই ভাবেই সাজান আছে। এই ঘরগুলির সামনে বারান্দা। তাহাতে চেয়ার পাতা রহিয়াছে। যেন ওয়াশিংটন ও তদীয় গৃহিণী এখনই আসিয়া বসিবেন। এখান হইতে নদীর দৃষ্ট মনোরম। উপরে যে ঘরে ওয়াশিংটন মারা যান সেটা ঠিক সেদিনকার মত সাজান রহিয়াছে। বিছানাটি একটি হাতের কাজ-করা সুন্দর কাঁধা দিয়া ঢাকা। অনতিদূরে রাস্তাঘর। পেখানে হাঁড়ি, কড়া, মুয়ল, কাহিলচিয়া প্রভৃতি ভদ্রানীজন্য বাসনগুলি পড়িয়া আছে। ওয়াশিংটন-গৃহিণীর হাতের স্পর্শ যেন তাহাতে লাগিয়া আছে। বাড়ীর চারিদিকে অনেক জমি ও বাগান। নামিয়া নদীর ঘাট পর্যন্ত যাইবার পথ আছে। সে গ্রাম্য পথ সেদিন যেমন ছিল আজও তেমন আছে। আমেরিকার সুনিপুণ ইঞ্জিনিয়ারগণ পথটিকে আধুনিক পদ্ধতির করিবার জন্ত ইহার পায়ে হস্তক্ষেপ করে নাই, সশ্রদ্ধচিত্তে পাশ কাটাইয়াই চলিয়া গিয়াছে। ওয়াশিংটন হইতে গ্রাম্য যোগে আসিয়া এই ঘাটে নামা যায়। ঘাটের অনতিদূরে ওয়াশিংটনের সমাধি। বাড়ীটির বাহিরে আসিয়া একটি হোটেলের মধ্যাহ্ন-ভোজন সন্ধ্যাপন করিয়া ইতস্ততঃ পায়চারি করিতেছি। দেখি একটি ছোট এলুম গাছের তলার একঘর

কলকে লেখা আছে যে, ম্যালান্‌সেটল রাষ্ট্রে যে এলুম পাথরের তলার ওয়াশিংটন বিদ্রোহী বাহিনীর সৈন্যপত্নী এবং করিয়া-হিলেন এটি সেই বৃক্কেরই এসোজ।

বৈকালে কিরিবার পথে আমরা আলিগটনে জাতীয় সমাবিক্ষেত্রের নিকট নামিয়া পড়িলাম। বহু লৈচ ও লৈজাধ্যক্ষের সমাবি এখানে আছে। পাহাড়ের গা বাহিয়া সমাবিক্ষেত্র। পাহাড়টি খুব উঁচু নয়। পাহাড়ের উপরে সেনাপতি লি'র বাড়ী। সেনাপতি লি আমেরিকার গৃহযুদ্ধে দক্ষিণের পক্ষে অস্ত্র ধারণ করিয়া পরাজিত হন। ইহারই আশেপাশে তখন অনেক বৃদ্ধ হইয়াছিল—বাড়ীটি এখন মিউজিয়মরূপে রক্ষিত। এই পাহাড়ের উপর হইতে পটোম্যাকের উপরে ওয়াশিংটন শহরের দৃষ্ট পথম রমণীর দেখায়। বন্ধ্যাপাধ্যায় মহাশয় ও আমি ওখান হইতে হাঁটাইয়া ওয়াশিংটনে কিরিলাম। পাহাড়ের অনতিদূরে পটোম্যাক সেতু। সেতু পার হইলেই ওয়াশিংটন শহর। আলিগটন সমাবিক্ষেত্র শহরের পশ্চিমে, পদব্রজে সীকো পার হইবার সময় আলিগটন পাহাড়ের পিছন দিয়া অভাগারী স্বর্ধের শোভা আমাদের উভয়ের মনকেই পিছনে টানিতেছিল।

ওয়াশিংটন নগরী মার্কিন জাতির স্বপ্নিত-বস্ত্রপ; ইহা সমস্ত দেশের জাতীয় ঐক্যের প্রতীক। যে আউচরিশটি রাষ্ট্র লইয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠিত ওয়াশিংটন তাহাদের বহির্ভূত। ইহা সমস্ত রাষ্ট্রের জুলা গৌরবস্থল। এই শহরের জীবিতের অস্ত্র ইহার সর্বদা সচেত। সরকারী ইঞ্জিনীয়ারগণ এখানে শুধুই হিতকারীই নন; রূপকারও বটেন। সরকারী সৌধাবলীর এত শোভা অস্ত কোন দেশে দেখি নাই। সরকারী বাড়ীগুলির চমৎকার ডিক্রাইন; নির্মাণকার্যে নানাবিধ স্বর্ধের ব্যবহার নয়নরঞ্জন। ক্যাপিটল আর্ট গ্যালারী, আর্কাইভ-ভবন ও হোয়াইট হাউসের কথা পূর্বেই বলিয়াছি। ট্রেজারী, টেট ডিপার্টমেন্ট, সুপ্রীম কোর্ট, কংগ্রেসের লাইব্রেরি, প্যান-আমেরিকান ইউনিয়ন প্রভৃতি বাড়ীগুলি সত্যই রূপগৌরবে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। রাজ্যগুলি সরল ও সমান্তরাল; প্রশস্ততা ও মন্থণতার এদের ভুলনা নাই। সুদৃষ্ট সরকারী দৌধপ্রাঙ্গণ বিস্তার এবং গঠন সুপরিকল্পিত। এই আকাশচুম্বী প্রাসাদের ঘেঁষে পাছে কোন কোন বাড়ী অতিরিক্ত উর্ধ্বে উঠিয়া নগরীর বৃদ্ধ-সমতার স্থানি করে সেইজন্য দশ তলার বেশী বাড়ী তৈরি করা এখানে নিষিদ্ধ। নগরীর দৌধ-সমতাই ইহার প্রমাণ বৃদ্ধি করিয়াছে।

একদিন (৭ই ডিসেম্বর শনিবার, ২১শে অক্টোবর) এখানকার চিড়িয়াখানা দেখিতে গিয়াছিলাম। উঁচু নীচু পাহাড়ে জায়গায় চিড়িয়াখানাটি অবস্থিত। ঘুরিয়া কিরিয়া দেখিতে বেশ মনোরম। হাতী, সিংহ, জলহস্তী, গভার প্রভৃতি জানোয়ার এদেশের সাধারণ লোকের নিকট বিষয়কর জীব। আমার কাছে পাখীর বরঙলি সর্বাপেক্ষা ভাল লাগিল।

সংস্করণের রকমারি পাখী; এক একটা ঘরে ঘেন রামধন উঠিয়াছে। আমাদের দেশের কাক কোকিল ও শূন্য শব্দে রক্ষিত হইয়াছে। অতি যত্নেই ঘেন এদের উৎসাহ ও জীবনী-শক্তি সমুচিত হইয়া গিয়াছে। মিসেস মিরানন্দ কোকিলটি পুঁকিতেছে। অদম্য কাকও এখানে দীর্ঘব। এক রকমের কাক দেখিলাম; তার ডাক এবং বুক সাধ। ইংল পাখী ও উটপক্ষী অনেকগুলি দেখিলাম। উটপক্ষীর ডিম একাও; কয়েকটি সাকান রহিয়াছে। কস্তুর নামক খুব বড় একটি মাংসানী পক্ষী দেখিলাম। একটি কক্ষে দক্ষিণ মেরু-নিবাসী পেজুইন পক্ষী রহিয়াছে। ছুই পায়ের উপর ভর দিয়া মাথা ঝাড়া করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সামনের দিকে আরও ছুইটা চামড়া পায়ের মত বুলিতেছে। জলে সাঁতার কাটিবার সময় এই ছুইটা ব্যবহার করিতেছে। শীতের দেশের পাখী বলিয়া ঘরের মধ্যে বিস্তর বরক রাখা হইয়াছে। মাঝে মাঝে সাঁতার কাটিবার জলকুণ্ড। নুতন জানোয়ারের মধ্যে আলপাকা ও লাদা বড় মহিষ দেখিলাম। আলপাকা মেঘজাতীয়; তনে আকার একটু বড় এবং গলা লম্বা। বড় মহিষ অনেক রকমের আছে; তন্মধ্যে একটার সর্বদা চুথের মত সাধ।

আমার ওয়াশিংটনে পৌঁছিবীর কয়েক দিন পরেই দেশ-ব্যাপী কয়লা-ধনির মধুর বর্ষাঘট আরম্ভ হয়। জন লুইস মজুরদের মেতা। মজুরদের মধ্যে তাঁহার অসীর প্রতিপত্তি। পূর্বের একটি বর্ষাঘটের সময় মালিকদের হাত হইতে সরকার বৃদ্ধকালের জন্ত বনিগুলি পরিচালনার ভার বহুতে এবং করেন। সে সময় সরকারের সঙ্গে মজুরদের মাঝিমা এবং অজান্ত বিষয়ে এক চুক্তি হয়। সে চুক্তির মেয়াদ ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত। ১৯৪৬ সালের নবেম্বর মাসেই লুইস বর্ষাঘটকে ১৫দিনের মোটপ দিয়া বলেন যে তাঁহারা পুরাতন চুক্তি পনের দিন পরে বাতিল করিয়া দিবেন। ইতিমধ্যে সরকার যদি নুতন চুক্তি না করেন তবে তাহার পর মজুরগণ বিনা চুক্তিতে কাজে যাইবে না। বনিগুলির পরিচালনার ভার তখনও সরকারের হাতে।

এই বর্ষাঘটে সমগ্র আমেরিকা ও ইউরোপ চকল হইয়া উঠিল। শীত আগন্ত। মধ্য ইউরোপে কয়লা নাই। বিলাতে কয়লার উৎপাদন অগ্রচর। বিলাত, ফ্রান্স ও ইউরোপের অজান্ত দেশ আমেরিকার কয়লার উপর অনেকখানি নির্ভর করিয়া থাকে। কয়লার অভাবে দেশের বহু কারখানার উৎপাদন বন্ধ হইয়া যাইবে। আগন্তপ্রায় শীতে কয়লার অভাব হইলে ত মানুষই জমিয়া যাইবে।

১৯৪৬ সালে আমেরিকার মত বর্ষাঘট হইয়াছে এদেশে এত বর্ষাঘট পূর্বে কখনও হয় নাই। বৃহত্তর পুনর্গঠনের সময় ইহা বাস্তবিক হইলেও সুচিন্তিত ও দৃঢ়নীতির আবশ্যকতা সূচনা করে।

এবরের কানকগুলি তখন এই বর্ষাঘটের আলোচনার ভর্তি।

প্রেসিডেন্ট টম্যান কিরূপ মনোভাব অবলম্বন করিবেন তাহা লইয়া আলোচনা চলিতেছে। তিনি কিছু তখনও নীরব। ইন্ডের সময় দক্ষিণ-পশ্চিমের রাষ্ট্রগুলি হইতে নিউ ইয়র্ক পর্যন্ত হাজার হাজার মাইল বড় ভেলের পাইপ মাটির নীচে বসান হইয়াছিল। সেগুলি তখন বেচিয়া দিবার কথা চলিতেছে। সরকার এখন সেগুলিকে কোন কোম্পানীর নিকট ভাড়া দিতে রাজী হইবেন কিনা এবং যদি হন তবে কোন কোম্পানী ঐগুলি ভাড়া লইয়া পেট্রোলের দ্বারা গ্যাস উৎপাদন করিয়া পাইপ-সাহায্যে সেই গ্যাস নিউ ইয়র্ক পর্যন্ত আনিয়া দেশের নীত এবারের মত নিবারণ করিতে পারিবেন কিনা ইহা লইয়াও আলোচনা চলিতেছে।

মজুরদের কোন কোন বিষয়ে অসুবিধা থাকিতে পারে, কিন্তু তাহারা উচ্চ হারেই বেতন পান। বিশেষতঃ লুইসের সঙ্গে সরকারের চুক্তি বিদ্যমান। প্রায় এই—সেই চুক্তি একতরফা ভাঙ্গিয়া দিয়া কতিপয় ব্যক্তির বার্ষিকির জন্য সহসা সমগ্র জাতির হুঁট টপিয়া বরিবার অধিকার লুইসের কাছে কি না? যদি থাকে তবে আমেরিকার গণতন্ত্রের কি হইল? সমগ্র জাতিতে চাপে ফেলিয়া ও ত্বর দেখাইয়া ব্যক্তিগত বা দলগত বার্ষিকির প্রচেষ্টা ত ক্যানিষ্ট পছন্দ। ইহা দস্যুতার নামান্তর মাত্র। আমেরিকার জীবন্ত গণতন্ত্র ইহা সহিবে কি? যদি সহ না করে তবে ইহার বিরুদ্ধে গণতন্ত্র-সম্মত কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে?

কয়েক দিন নীরব থাকিয়া প্রেসিডেন্ট টম্যান তাহার নীতি ঘোষণা করিলেন। তিনি বলিলেন, জাতির সঙ্গে চুক্তি করিয়া তাহা এক তরফা ভাঙ্গিয়া দেওয়া বে-আইনী। কার্যে যোগদান না করিয়া মজুরগণ বে-আইনী কার্য করিতেছে। অতএব তিনি মজুরদিগকে কার্যে যোগদান করিতে আহ্বান করিলেন। কল হইল না। তখন তিনি আদালতে অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। মালিশ হুইট—(১) বর্ধবটটিকে চুক্তি-বিরুদ্ধ অতএব বে-আইনী ঘোষণা করা; (২) লুইস মজুর-দিগকে বাহাতে এই বে-আইনী কার্যে লিপ্ত হইতে নির্দেশ না দেন তজ্জ্ব তাহার উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করা। লুইস জবাবে বলিলেন—আমেরিকার একটি আইনে প্রত্যেক মজুরের বর্ধবটের অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। এই আইনের বলে তাহার কাজ বৈধ। সরকার পক্ষের মতে সমগ্র জাতির প্রতি-নিধি সরকারের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধাবস্থায় এ আইন অপ্রযোজ্য। যে ক্ষেত্রের নিকট বিচার চলিল, তিনি পূর্বে আইন সভার সভ্য ছিলেন এবং এই আইন প্রণয়নের একজন প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। ইহার পূর্বে লুইস একটি বড় বর্ধবট-সংক্রান্ত মামলায় এই ক্ষেত্রের নিকট জিতিয়াছিলেন। কিন্তু এবার রায় তাহার বিরুদ্ধে হইল। লুইসের উপর এবং ইউনিয়নের উপর দিন হিসাবে করিমানা ধার্য হইল। যত দিন বর্ধবট চলিবে করিমানার পরিমাণ সেই হারে বাড়িবে।

ইউনিয়নের তহবিলে মজুত অর্থের পরিমাণ এবং লুইস ইউনিয়নের নিকট যে বেতন পাইত তাহা আমাদের কল্পনাভীত। আমার যত দূর মনে আছে লুইসের বেতন ছিল বার্ষিক ২৫০০০ ডলার বা ৮০০০০ হাজার টাকার কিঞ্চিদধিক। এই রায়ে উপর সুপ্রীম কোর্টের মতামত আনিবার জন্য সরকার নিজেই সুপ্রীম কোর্টে আপিল দাখিল করিয়া নিবেদন করিলেন যে ব্যাপারটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ এবং জরুরী, বাহাতে সরকার দ্রুত কার্যকরী পছন্দ অবলম্বন করিতে পারেন সেইজন্য তাহারা অবিলম্বে সুপ্রীম কোর্টের মতামত প্রার্থনা করিতেছেন। লুইসের বিরুদ্ধে তখন জনমত বেগ পড়িয়া উঠিয়াছে। মজুরদের বেতনের হার অল্পত ছিল না। অন্ততঃ পৃথিবীর যে-কোন দেশের মজুরদের নিকট সে হার কল্পনারও অতীত। উপরন্তু সরকারের সঙ্গে তাঁদের চুক্তি বিদ্যমান। সে চুক্তির মেয়াদ মাত্র আর কয়েক মাস ছিল। সে অবস্থায় একতরফা চুক্তি ভঙ্গ করিয়া জাতীয় গণতন্ত্রকে অমাত্র করিয়া জাতির উপর জবরদস্তি করা গণতন্ত্র-বিরোধী, অতএব নিষিদ্ধ। সকলেরই প্রায় এই এক মূহ। লুইস তখন সহসা এক দিন সকলকে বিস্মিত করিয়া বর্ধবট প্রত্যাহার করিলেন। বলিলেন—সুপ্রীম কোর্ট বাহাতে বীরে মূহে শান্তিপূর্ণ আবহাওয়ায় এই গুরুত্বপূর্ণ মামলার বিচার করিতে পারেন সেইজন্য তিনি বর্ধবট প্রত্যাহার করিলেন।

আমার ওয়াশিংটন পরিভ্রমণের কয়েকদিন পূর্বেই বর্ধবট প্রত্যাহৃত হইল। জাতি বস্তির নিঃশ্বাস কেলিল। গণতন্ত্রের বিজয় সূচিত হইল। আমার এদেশে অবস্থান করবার অভাবে বস্তিত বা অসুবিধাগ্রস্ত হইবে না—মনে করিয়া আমিও শান্তি পাইলাম। কাগজগুলি তখন লিখিল যে ইহাতে সমস্তার সমাধান হইল না। আলোচনা দ্বারা মজুরদের দাবিগুলির মীমাংসা করিতে হইবে। নচেৎ বর্তমান চুক্তির মেয়াদ ফুরাইলে অর্থাৎ ৩১শে মার্চের পর পুনরায় সমস্তা দেখা দিবে। লুইসের বিরুদ্ধে জনমত সুস্পষ্ট রূপে দেখা দিল। এক ব্যক্তি অন্যায় রূপে বাহাতে জাতির হুঁট টপিয়া না বরিতে পারে তজন্য আইন প্রণয়নের দাবি উঠিল। এ দেশের লোক আলোচনা দ্বারা বিরোধ-মীমাংসার পক্ষপাতী। নিয়োগ-কর্তারা দাবি করিলেন যে, মজুরদের যদি সন্তোষ হইয়া আলোচনা চালাইবার অধিকার থাকে তবে তাহাদেরই বা আলোচনা চালাইবার জন্য সন্তোষ হইবার অধিকার থাকিবেনা কেন। উভয় পক্ষের আলোচনার জন্য এবং আলোচনা বাহাতে কলপ্রসূ হয় তজন্য উপরুক্ত ক্ষেত্র প্রভৃত করাই সরকারের কর্তব্য। সরকারের এই কর্তব্য পালন করিবার জন্য যথোচিত ব্যবস্থা আছে না তাহার সংস্কারের প্রয়োজন? এইরূপ নানাবিধ আলোচনা তখন চলিতে লাগিল।

বাজেট ব্যুরোর উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের সম্মত ব্যবহারে

আমার কার্য ক্ষমতাপ্রতিভা অগ্রসর হইতেছে। প্রত্যেক বিভাগের প্রধান কর্মচারী সম্বন্ধে ও সাদরে আমার কার্যে সাহায্য করিতেছেন এবং পুনঃ পুনঃ আলোচনা দ্বারা আমার সমস্ত দ্বিধা ও প্রবন্ধের নিরসন করিতেছেন। ইঁহারা ইঁহাদের আমেরিকার পোর্ট প্রোগ্রাম স্থির করিয়া সর্বস্থানে কর্মপন্থার নিকট আমাকে সকল প্রকারে সাহায্য করিবার জন্য আয়াস দিলেন।

বাজেট ব্যয়ের কর্ম সমাপনান্তে টেক্সাসে যাই। সেখানে কয়েকদিনের জন্য আমার মূল কর্মস্থল স্থাপিত হইল। আমার বসিবার জন্য যে ঘর নির্দিষ্ট হইয়াছিল তাহার পাশেই হোয়াইট হাউস, মধ্যে একটি রান্ডার ব্যবধান। এখানেও উর্দ্ধতন কর্মচারীগণের মধুর ব্যবহারে আনুষ্ঠান হইলাম। ইঁহাদের কার্য যেমন অশূন্যলাপ্ত তেমনি গভীর। ইঁহারা কোন বিষয়েরই একেবারে মর্শ্বস্থলে প্রবেশ না করিয়া এবং আদ্যোপান্ত না জানিয়া ছাড়ে না। ইঁহাদের ট্যাক্স রিসার্চ ব্রাঞ্চ বা কর বিষয়ক গবেষণা শাখার সঙ্গেই আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইয়াছিল। এক একজন কর্মচারী এক একটি ট্যাক্স বিষয়ে গবেষণার রত আছেন। পৃথিবীর কোণায় কিরূপ পরিবর্তন হইতেছে সে সম্বন্ধে ইঁহারা

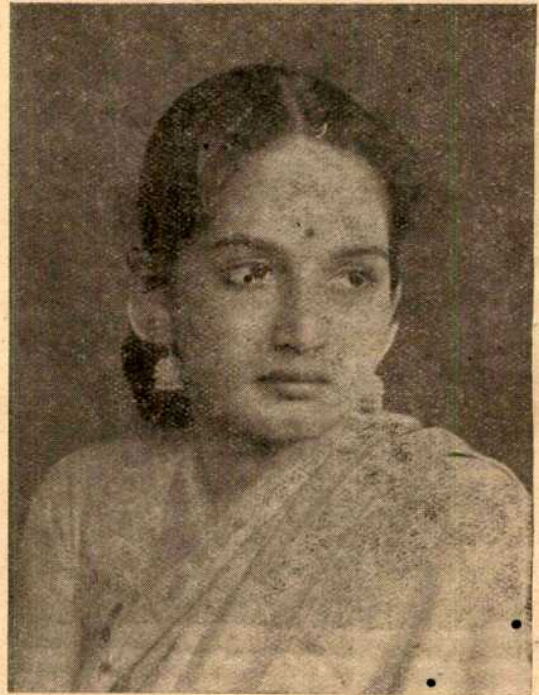
সর্বদা সজাগ। এই কর্মচারিবৃন্দের মধ্যে একজন মহিলাও ছিলেন। তিনি অল্পকরে বিশেষজ্ঞ। এদেশের পুস্তক প্রকাশকগণের প্রচেষ্টাও আমাদের কল্পনাতীত। শিকাগোর কমার্স স্ট্রিয়ারিং হাউস নামক প্রকাশকগণের একটি ট্যাক্স-লার্ভিস আছে। তাঁহারা পৃথিবীর সমস্ত দেশের ট্যাক্স সম্বন্ধে যাবতীয় খবর সংগ্রহ করিয়া গ্রাহকগণকে নিয়মিত রূপে সরবরাহ করেন। সরকারী অপিসগুলিও ইঁহাদের গবেষণালব্ধ বিষয় মাঝে মাঝে সাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করে। যে আপিসেই সিদ্ধান্ত দেধানকার লোকেরাই তাহাদের প্রকাশিত বহু মূল্যবান গ্রন্থ ও রিপোর্ট বিনামূল্যে সাগ্রহে আমাকে দিয়াছে। অনেক সময় আমি সবগুলি নিতে পারি নাই—বাছিয়া লইতে হইয়াছে। ইঁহাদের কার্যপদ্ধতি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি; ইঁহাদের অমায়িক ব্যবহার আমার হৃদয় স্পর্শ করিয়াছে। ইঁহারা নিজেরা ডাকঘরচা দিয়া অনেক পুস্তক নিয়মিত রূপে এখনও আমাকে পাঠাইতেছে।

১০ই ডিসেম্বর সকলের নিকট (২৪শে অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার) বিদায় গ্রহণ করিয়া হোটেল ফিরিলাম। পরদিন ওয়াশিংটন ত্যাগ করিব; আর এখানে ফিরিব না।



মহিলা-সংবাদ

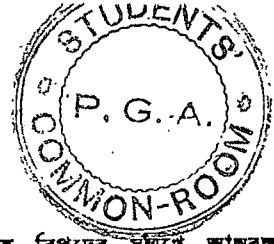
ই, আই হেলের ডেপুটি চীফ কমার্সিয়াল ম্যানেজার ত্রীযতীক্ষনাথ দাসের কন্যা ত্রীমতী কল্যাণী গুহ এ বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইংরেজীতে অনার্স পরীক্ষায় মেয়েদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। ইনি ম্যাট্রিকুলেশন এবং ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া সরকারী বৃত্তি লাভ করেন।



ত্রীকল্যাণী গুহ

পূর্ববঙ্গের হিন্দুর সমস্যা

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত



পূর্ববঙ্গের হিন্দুগণ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন; যুগ যুগে বহির প্রমাণ, পশ্চিমবঙ্গ—বিশেষতঃ কলিকাতা এবং তাহার শহর-তলীর মধুচক্র সকল দ্বিবিয়া পূর্ববঙ্গবাসিগণের ক্রমবর্ধমান কল-শঙ্কনই সেইরূপই এই চাকুলোর প্রমাণ। অন্তরে যাহার যাহাই থাক না কেন, যুগে আমরা অনেকেই এই চাকুলা-প্রসূত পলায়নী মনোবৃত্তির যৌক্তিকতা সহজে সন্দিহান। এই পলায়নী মনোবৃত্তিকে কেহ কেহ অকারণ ভীততা বলিয়া অভিহিত করিতেছি; কেহ কেহ সকারণ অদূরদর্শিতা বলিতেছি, কেহ কেহ গজলিকা মনোবৃত্তি বলিয়া বিদ্রুত করিতেছি। কাহারও কাহারও হৃদয়ে আবার এরূপ একটা ভাবও রহিয়াছে, ‘অ-জাতীয় পরিবেশ’ হইতে যাহারা বীরের মতন ‘জাতীয় পরিবেশে’ চলিয়া আসিতে চায় তাহারা চলিয়া আসুক, যাহারা অপারগ তাহারা আবার বীরের মতন সংগ্রাম করিয়াই পূর্ববঙ্গে সশরীরে অবস্থান করুক। এই গতি এবং স্থিতি উভয় জুড়িয়াই যে একটা অথও বীরত্ব কি ভাবে অমুহ্যত থাকিতে পারে অজ্ঞ জনসাধারণ সেই গভীর রহস্যটির এখন পর্যন্তও মর্শ্বোদঘাটন করিতে পারে নাই; ফলে তাহারা পূর্ব-পশ্চিম জুড়িয়া একটু বৃহৎ দোলায় নিরন্তর হুলিয়া হুলিয়া আরামের বদলে প্রাণ্ডিলাভ করিতেছে।

গভীর গদাভীরে বলিয়া পক্ষিল পদ্মাতীরের অধিবাসিগণ সহজে অনেকেই অনেক গবেষণা করিতেছেন; আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা যদি সত্য হয় তবে এই গবেষণা হইতে যে নির্গলিতার্থটি উপদেশ এবং মন্তব্যাদি-রূপে প্রকাশিত হইতেছে তাহাতে পূর্ববঙ্গের পিতৃ-প্রকাশ বৃদ্ধি পাওয়া ব্যতীত আর বিশেষ তেমন কিছুই খটিতেছে না। গভীরমূল ক্ষতের উপরি-ভাগে অতিশয় উৎসাহসহকারে ধানিকটা-প্রশান্তিকর প্রলেপ ছোরে ছোরে বসিয়া দিবার চেষ্টা করিলে যে ফল হয়; এ ক্ষেত্রেও অনেকখানি সেই জাতীয় ফলই কজিতেছে।

বাহির হইতে আমরা অনেকেই মনে করি, পূর্ববঙ্গের হিন্দুগণের বর্ধমান বিপর্যয় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ফলে একটা আকস্মিক বিপর্যয় মাত্র; একটা উগ্র সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রব্যবস্থা চালু হইবার দরুন সমাজ-জীবন, আর্থিক-জীবন এবং রাষ্ট্র-জীবনে নিষ্পেষিত হইয়া যাইবার আশঙ্কা। ভারতবর্ষের বর্ধমান পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলী লক্ষ্য করিয়া এই আশঙ্কাকে একেবারে অমূলক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া আজ আর সম্ভব নয়। পূর্ববঙ্গে মা-বোনের ইচ্ছাংহানি, বর্ণ-শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্রম-বিলোপের আশঙ্কাজনিত উদ্বিগ্নতাকেও একেবারে অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু সর্বাপেক্ষা বড় প্রশ্ন এই, এই আশঙ্কার সম্মুখে পূর্ববঙ্গের হিন্দুগণ নিজেদের এতখানি অসহায় বোধ করি-

তেছে কেন? সম্ভাবিত বিপদের সম্মুখে আত্মরক্ষার জন্য ঠাড়াইবার সঙ্কল্প না লইয়া অধিকাংশ লোকই পলায়নের সুযোগ বুঝিতেছে কেন? ব্রিটিশ কুশাসনের বিরুদ্ধে যাহারা এই অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া সর্বস্ব পণ করিয়া যুদ্ধ করিতে পারিয়াছে তাহারা আজ সম্ভাবিত কুশাসনের বিরুদ্ধে সম্ভবতঃ হইবার সাহস পাইতেছে না কেন? এই প্রশ্নগুলির যে উত্তর মনে আসে তাহাতেই প্রতীতি জন্মে পূর্ববঙ্গের হিন্দুগণের জীবনে নিশ্চয়ই একাধ একটা দুর্বলতা দেখা দিয়াছে।

আরও ভাবিবার বিষয় এই, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ফলে পূর্ববঙ্গে আনাচে-কানাচে সর্বত্রই যে একটা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বা সংখ্যাগুরু-সম্প্রদায় কর্তৃক আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা খুব প্রবল হইয়া উঠিয়াছে তাহা মনে হয় না। আমাদের সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি, পূর্ববঙ্গের পল্লীর অনেক অঞ্চল বুরিয়াও আমাদের এ কথা মনে হয় নাই যে পল্লীবাসী হিন্দু এবং মুসলমান প্রতিবেশিগণের ভিতরে বহুদিনকার সহকের এমন পরিবর্তন ঘটয়াছে যাহাতে একে অপরের বৈরিতাত্তরে বিনিময় রক্তনদী যাপন করিতেছে। পূর্বে তাহারা প্রতিবেশী রূপে যেরূপ পরস্পর পরস্পরের সহিত দৈনন্দিন জীবনে জড়িত ছিল, এখনও প্রায় সেইরূপই আছে। অনেক শান্তি-সভা বা মিলন-সভার সঙ্কল্প লইয়া বাহির হইয়া মনে হইয়াছে, সত্য ডাকিলে কাহাদের জন্ত? যাহারা দৈনন্দিন জীবনে পদে পদে অতি সহজভাবেই একে অপরের সহিত মিলিত হইয়া রহিয়াছে হঠাৎ নুতন করিয়া মিলন-নভা ডাকিয়া তাহাদের ভিতরে অমিলটাকে খোঁচাইয়া ছুলিয়া লাট কি? কিন্তু মজা এই, এই সাম্প্রদায়িক মিলন সত্ত্বেও এই সকল সুদূর পল্লী অঞ্চলের হিন্দু অধিবাসিগণ একান্তে বা অপ্রকান্তে দেশত্যাগের জন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। এসব স্থানের অধিবাসিগণের সহিত একটু ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার সুযোগ পাইলে দেখা যাইবে, যাহারা বহু পূর্বেই নানা কার্য ব্যপদেশে পশ্চিম বঙ্গে আসিয়া আস্তানা গাড়িতে পারিয়াছে, লোকে তাহাদিগকে বিবাতার বিশেষ নিরীক্ষিত ভাগ্যবান ব্যক্তি বলিয়া মনে করিতেছে; যাহারা এখনও আসিয়া ঘাটে মাঠে বাটে তাঁরু পাটাইয়া কোনরূপে দিন কাটাইতেছে। তাহাদের বুদ্ধিমত্তা সহজে বাহিরে যেই যত সন্দেহ প্রকাশ করুক না কেন; ভিতরে ভিতরে অনেকেই যেন ইহাতেও একটা সার রহিয়াছে, এবং পারিলে হয়ত তাহারাও এই পথের পথিক হইবে; বাদবাকি যে দল এদিকে আসিতে একেবারেই অক্ষম তাহারা হয় নীরবে নিজদিগকে হতভাগ্য বলিয়া শিকার দিতেছে, নতুবা বড় গলায় গাল পাড়িবার চেষ্টায় আছে। আশা করি বলিয়া

দিতে হইবে না যে ইহার সবগুলিই একটি। প্রকৃত দুর্বলতার লক্ষণ।

আমাদের মনে হয়, এই পলায়নী মনোবৃত্তির কারণ সন্ধান করিতে গেলে দেখা যাইবে ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে আর্থিক জীবনের একটি বিরাট বিপর্যয়। বঙ্গবিভাগ এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা আর্থিক জীবনের সেই বিপর্যয়কেই একটি শোচনীয় পরিণতি দান করিয়াছে; আমরা এই প্রত্যক্ষ নিমিত্তটাকেই একমাত্র হেতুর আসনে বসাইয়া সমস্ত সমস্যার বিচার করিতে বসি।

পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের এই আর্থিক বিপর্যয়ের কথা উঠিলেই আমরা একবারো একটি কথা বলিতে শিখিয়াছি—ইহা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠারই প্রত্যক্ষ ফল। আমরা যাহারা আর একটু দূরদর্শিতার পরিচয় দিতে চাই তাহারা আর একটু পিছনে ফিরিয়া বলি, এই দশ বৎসরের লীপ শাসনের ফলেই হিন্দুগণের এই আর্থিক বিপর্যয়। কিন্তু আমাদের ব্যাধি এবং তাহার কারণ এত সহজ এবং এত অলঙ্কালের মনে হয় না। এই আর্থিক বিপর্যয় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার তিন চারি মাসের ভিতরেই ঘটে নাই—লীপ শাসনের দশ বৎসরের মধ্যেও ঘটে নাই—কোন আকস্মিক রাজনৈতিক কারণেও ঘটে নাই; এই বিপর্যয় ঘটয়াছে যুগধর্মের ধীরমহুর আবর্তনে, বিবিধ প্রতি-জিয়াশীল সামাজিক শক্তির নিরন্তর ঝাত-প্রতিঘাতে এবং সেই বিপর্যয় ঘটতেছে প্রায় পঁচিশ বৎসর কাল ধরিয়া। জাতীয় জীবনের আবর্তনের তিতরে যে বিপর্যয়ের বীজ উৎপন্ন ছিল, গত দশ বৎসরের একটা বিশেষ রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং সর্বশেষে পাকিস্তান-প্রতিষ্ঠারূপে একটা একান্ত অপ্রত্যাশিত বিরাট পরি-বর্তন সেই বিপর্যয়কে নানাভাবে সাহায্য করিয়া বর্তমান পরিণতি দান করিয়াছে।

এই কথাটিকে পরিষ্কার করিয়া বুঝিতে হইলে পূর্ববঙ্গের হিন্দুগণের আর্থিক জীবনের কাঠামোটী ভাল করিয়া বিশ্লেষণ করিয়া দেখা দরকার। *পূর্ববঙ্গের হিন্দু বলিতে এখানে আমরা বিশেষ করিয়া মধ্যবিত্ত হিন্দুগণের কথাই বলিতেছি; আর্থিক জীবনে বিপর্যয় হইয়াছে তাহারাও সর্বোপেক্ষা বেশী—এবং বাস্তব্যাগ করিয়া পশ্চিমবঙ্গে আন্তান গাড়িতেছে মুখ্যতঃ ইহারা। একটু ধীরভাবে লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইব, এই মধ্যবিত্ত হিন্দুগণের আর্থিক বিপর্যয় ঘটতে আরম্ভ করিয়াছে বছর পঁচিশেক আগে হইতে—আর তাহাদের বাস্তব্যাগের সম্ভাও আজিকার নয়, এ ক্রিমিষ্টিও আরম্ভ হইয়াছে পঁচিশ বৎসর পূর্বে হইতে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং তজ্জনিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে আজ আমরা একান্ত অসহায় হইয়া পড়িয়াছি বলিয়াই সম্ভাটী আজ এত বড় করিয়া চোখে পড়িয়াছে, স্বকীয় ধীরমহুর রূপে এতদিন সে আমাদের দৃষ্টি এড়াইয়াই চলিয়াছে। বছরদিনের ঝাটটা আজ কেন্দ্রীভূত হইয়া ৩৩ বৎসরপে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে পাকিস্তানের ঝাটায়।

পূর্ববঙ্গের মধ্যবিত্ত হিন্দুগণের আর্থিক জীবনের কাঠামোটী বিশ্লেষণ করিতে গেলে প্রথমেই একটি জিনিস চোখে পড়িবে, পূর্ববঙ্গ কৃষিপ্রধান দেশ; এই বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্তও সেখানে উল্লেখযোগ্য কোন শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও শিল্প-সম্পদ গড়িয়া ওঠে নাই, এমন কি কোন ধর্মিক সম্পদও আবিষ্কৃত হইয়াছে কিম্বা সন্দেহ (এখানে পূর্ববঙ্গ বলিতে আমি বর্তমান পূর্ববঙ্গ অর্থাৎ পাকিস্তান রাষ্ট্রভুক্ত পূর্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের কথাই বলিতেছি)। সুতরাং পষ্টই দেখা যাইতেছে এখানকার অধিবাসি-গণের আর্থিক জীবনের বনিয়াদ মুখ্যতঃ কৃষি-সম্পদের উপরে স্থাপিত। কিন্তু যে উপায়-পদ্ধতিতে পূর্ববঙ্গের বর্ণহিন্দুগণ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে ঠিক সেই উপায়-পদ্ধতিতেই তাহারা আস্তে আস্তে ভূমি-সংস্রববিহীন হইয়া পড়িয়াছে। এইখানে মোড়ারই এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের আর্থিক বনিয়াদে একটা কৃত্রিমতা এবং তাহার ফলে একটা দুর্বলতা দেখা দিল; অর্থাৎ পূর্ববঙ্গের জাতীয় জীবনের আর্থিক ভিত্তির সহিত এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের আর্থিক ভিত্তির যোগ রহিল না। ভূমি-সংস্রব ত্যাগ করিয়া এই সম্প্রদায়টি যদি পূর্ববঙ্গে শিল্প-সম্পদ গড়িয়া তুলিতে পারিত তাহা হইলেও সে পূর্ববঙ্গে শিকড় গড়াইতে পারিত, কিন্তু যে কারণেই হোক, পূর্ববঙ্গের কৃষীগণও তাহাদের শিল্প-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠার বিকাশের ক্ষেত্র পাইয়াছিলেন বা নির্বাচন করিয়াছিলেন পশ্চিমবঙ্গে। আর্থিক বনিয়াদ স্ব-ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত না থাকিবার ফলে এই মধ্যবিত্ত জীবনে একটা ভাঙ্গিয়া যাইবার প্রবণতা আপনা হইতেই আসিয়া গিয়াছিল।

জমির মালিক হইলেও পূর্ববঙ্গের হিন্দুগণ জমির সহিত সম্পর্কচ্ছেদ করিয়াছে অনেকদিন। এখন আমাদের জমির উপরে যাহা মালিকানা-স্বত্ব তাহা শুধু কাগজে-পত্রে, সুতরাং প্রাপ্য যাহা তাহাও আর চর্যচর্য গোচরীভূত কোন পদার্থ নহে, তাহাও নথি-পত্রে। আসলে আমরা জমিকে ভোগ করিবার ক্ষমতা তখনই উৎসাহী হিলাম জমির সহিত যোগ রক্ষায় হিলাম ততখানি উদালীন। যোগবিহীন ভোগের বিরোধটাই আজ মুর্ত্তিমন্ত হইয়া আমাদেরকে দেশের মাটি হইতে দূরে ঠেলিয়া দিতেছে। আমরা অবশ্য আমাদের ছেলেবেলায় ছ'এক ঘর তালুকদার দেখিয়াছি যাহারা খালে জমি রাখিতেন এবং বাড়ীতে হাল-গর রাখিতেন; কৃষকগণকে মজুর খাটাইয়া নিজেদের তত্তাবধানে জমি চাষ করাইতেন এবং নিজেরাই সম্পূর্ণ ফসলের মালিক ছিলেন। বছর পনের পূর্বে এই শ্রেণীটিও নিশেষে বিলুপ্ত হইয়াছে। এখনি আমরা জমি-জমা হয় বলিবন্দোবস্ত করিয়া পণ্ডনি দিয়া 'ভূইঞা' হইয়া বসিয়াছি, নতুবা জমাজমি ধান-কড়ারীতে বা বগীচায়ে চাষ করাই। ফলে আস্তে আস্তে জমির স্বত্ব না হোক—তাহার ভোগস্বত্ব আমাদের জাতে-অজাতে হস্তান্তরিত হইয়া গিয়াছে। যেটা ছিল 'ভূইঞা'-ভজ, কালের আবর্তনে তাহাই আজ দেখা দিয়াছে 'ভূম্য'ভজ রূপে।

এই ভূমি-সংক্রমণের ফলে পূর্ববঙ্গের মধ্যবিত্ত হিন্দু-গণের জীবন-যাত্রা মুখ্যতঃ নির্ভর করিত কতকগুলি মধ্যপন্থার অর্জিত অর্থের বিনিময়ে পরের শ্রম এবং শ্রমজাত দ্রব্যের উপরে। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের এই আয়ের পছন্দগুলিকে ঘোটা-মুটভাবে নিয়ন্ত্রিতরূপে বিশ্লেষণ করা যাইতে পারে,—

(ক) সরকারী এবং বে-সরকারী চাকুরী। ইংরেজ রাজত্ব কালেই হইবার পরে বর্ণহিন্দুগণই অধিকার হইয়া ইংরেজী শিক্ষা ও সংস্কৃতির সুযোগ গ্রহণ করিয়াছিল, ফলে চাকুরীর ক্ষেত্রে তাহাদের ছিল প্রায় একচেটিয়া অধিকার। মুসলমান-গণের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক চেতনা সরকারের ফলে আন্তঃ আন্তঃ অল্প স্বল্প মুসলমান উচ্চশিক্ষিত হইয়া কিছু কিছু চাকুরী অধিকার করিলেও দশ বৎসর পূর্বে পর্যন্ত একে-কো-এ-কো ছিল হিন্দুগণেরই। লীগ-শাসনের আরম্ভ হইতেই একে-কো-কো-কো লাগিয়াছে; পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা এবং তাহার আনুযায়িক কর্মচারী-বিনিময় এই ভাঁটার দুর্নিবার টান লাগাইয়া মধ্যবিত্ত জীবনের বালুচর জাগাইয়া দিয়াছে।

(খ) জমিদারী ও তালুকদারী। এই প্রথা বর্তমান যুগ-ধর্মেরই বিরোধী; তাই যুগধর্মের স্বাভাবিক নিয়মেই এই প্রথা বিনশিত টলিয়া উঠিয়াছিল। বর্তমানে অবশ্য ভারতবর্ষের প্রায় সকল প্রদেশের সরকারই এই জমিদারী ও তালুকদারী প্রথা বিরোধী; কিন্তু এই সরকারী বিরোধ-নীতির বহু পূর্বে হইতেই জমিদারী-তালুকদারী অনেক ক্ষেত্রে একটা ঋণাত্মক ভাবধার হইয়া উঠিতেছিল। বর্তমানে একে জনমত তথা রাষ্ট্রমত জমিদারীর বিরুদ্ধে; তাহার পরে আবার মুসলমান জন-সমাজ বিশেষ করিয়া হিন্দু জমিদার-তালুকদারগণের বিপক্ষে। সুতরাং এই লোকসানের ব্যবসা চলিতেছেও না, কেহ চালাইতে তেমন উৎসাহিতও হইতেছে না।

(গ) এই জমিদারী প্রথাকে অবলম্বন করিয়া অল্প-শিক্ষিত বর্ণহিন্দুগণের ভিতরে একদল চাকুরীজীবীর সৃষ্টি হইয়া আসিতে-ছিল, ইহারা নায়েব-মুজরির দল। পল্লী-অঞ্চলে এই শ্রেণীর চাকুরীয়াই ছিল খুব বেশী এবং পনর-বিশ বৎসর পূর্বে দেখিয়াছি, প্রায়ের স্বাচ্ছন্দ্য এবং সমৃদ্ধি নির্ভর করিত এই শ্রেণীর চাকুরীজীবীগণের উপরেই। কারণ, ইহাদের দেহের দুই পাশে উচ্চ শিক্ষা এবং উচ্চ চাকুরীর ভানা পড়াইয়াছে তাহারা। যে একবার উড়িয়া বহুদূরে চলিয়া গিয়াছেন, আর ফিরিয়া আসেন নাই, ফলে এই সকল 'উপ-ভু-ইঞা' বা ফুদে 'কর্ডা-মশাই'র দলই ছিলেন মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যমণি। বেতন ইহাদের খুব বেশী ছিল না, উর্দ্ধে যাসিক দশ বার টাকা হইতে নিম্নে তিন টাকা পর্যন্ত; কিন্তু তাহাদের নির্ভর ছিল বাজের আদায়ের উপরে, যেটার একটা গাল-ভরা ভর নাম ছিল 'উপরি'। সরল এবং অশিক্ষিত প্রজাগণ ভূমি এবং রাজত্ব-সংক্রান্ত সকল জটিলতা বুঝিতে পারিত না; এই অভ্যাসের সুযোগে উপরি আদায়ের অনেক কলি-

কিরির বাহির হইয়া পড়িত। ফলে একান্ত বার্ষিক ছত্রিশ টাকার আয়কে অবলম্বন করিয়াই ছয় সাত জন লোকের একটি পরিবারের প্রায় তত্ত্বা বজায় রাখিয়া জীবনযাত্রা নিরুদ্বিগত হইত। ইহাদের আর্থিক জীবনের আরও একটি অঙ্গ মহলে প্রবেশ করিলে আরও তথ্য উদ্ঘাটিত হইবে। প্রতাপাবিত্ত জমিদারের প্রতাপ-রশ্মি এই সকল ব্যক্তি-কেন্দ্রের ভিতর দিয়াই প্রজা-সাধারণের সমুখে প্রতিফলিত হইত বলিয়া বাজারে ইহাদের একটা মধ্যদা ছিল, যাহার ইংরেজী নাম হইতেছে 'ক্রেডিট'; উপার্জিত অর্থ ভাড়াইয়া বেশী দিন ধাওয়া না চলিলেও উপার্জিত 'ক্রেডিট' ভাড়াইয়া অনেক দিন চলিত। এই 'ক্রেডিট'র বলেই ইহারা অতি সস্তা দরে ধান চাউল, ডাল, নারিকেল, লাউ-কুমড়া প্রভৃতি তরি-তরকারী 'কালে' সংগ্রহ করিয়া রাখিতে পারিত, তার পরে মূল্য 'যখন প্রায় তখন দেয়'। এই প্রকারের দশ রকম টাল-বাহনার ভিতর দিয়াই দিন একরূপ ভালই কাটিয়া যাইত। কিন্তু 'তে হি নো দিবসা পতাঃ'; অতএব মধ্যবিত্ত হিন্দুর একটি বৃহৎ অংশ যুগ্মহীন।

এই জমিদারী-তালুকদারীকে অবলম্বন করিয়া মধ্যবিত্ত হিন্দুগণের আরও নানারূপ আয়ের পছন্দ ছিল; তাহার সব-গুলির উল্লেখ সম্ভব এবং সঙ্গত মনে না হইলেও কতকগুলির উল্লেখ প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করি। যেমন স্বল্প গুণগ্রাম-গুলির হাড়ড়ে ডাক্তার-কবিরাজ সম্প্রদায়। বড় বড় জমিদারের কাছারীবাড়ীই ছিল ইহাদের আশ্রয়। কাছারীবাড়ীর সংলগ্ন থাকতে স্থানমাহাত্ম্য বশতঃ তাহাদেরও একটা 'ক্রেডিট' ছিল; আরটা সর্বদা ঠিক নগদ টাকার ছিল না; এক সপ্তাহের কুইনাইন মিকচার বা 'অম্বাস্তক-বটিকা'র মূল্য এক সের ধানে বা সাতটি হংসডিম্বও চলিতে পারিত। এইরূপ মাছুকরী যুগ্মিতে যে আয় হইত তাহা সঞ্চিত হইলেই একটা উপজীবিকা পদবাচ্য হইয়া উঠিত। পূর্ববঙ্গের মধ্যবিত্ত হিন্দুগণের অর্থ-নীতিক কাঠামোকে পূর্ণরূপে বুঝিতে হইলে এই সব জমিদারী তালুকদারী-পৃষ্ঠপোষিত ডাক্তার-কবিরাজগণের কথা ভুলিলেও চলিবে না। সমূলে উৎপাটিত বন্যপতির সহিত এই সব ছিন্ন-মূল ব্রতভীর বর্তমান অবস্থা সহজেই অসুমেয়।

(ঘ) মধ্যবিত্ত হিন্দুগণের ভিতরে আর একটি সম্প্রদায় ছিল কুসীদজীবী। এই শ্রেণীটি আন্তঃ আন্তঃ শিকড় প্রসারিত করিয়াছিল সমাজের প্রায় সকল স্তরে। সংসারে যেমন এক জাতীয় বৃক্ষ রহিয়াছে যাহারা অতি শক্ত অবস্থায়ও যদি এক-বার কঠিন-প্রস্তর-নির্মিত অট্টালিকাতেও শিকড় গাড়িতে পারে তবে কালে সেই শক্ত দোণেও কাটল ধরাইবেই, ঠিক তেমনই ছিল এই কুসীদজীবী-মাহাত্ম্য। বাংলা দেশের ছোট ছোট তালুকদারগণের ইতিহাস বুঝিয়া দেখিলে দেখিতে পাইব, তাহাদের শুধু ত্রিবিধ নয়—তাহাদের উদ্ভবও ছিল এই লগী-কারবারের সাহায্যে। বাংলা দেশের কৃষকগণই ছিল

প্রধান ঋতুকসম্প্রদায় এবং তাহাদের সহিত মহাজনপদের নগদ টাকার লেনদেন চলিত—প্রধানতঃ জমাজমির বা ভিটা-মাটির বহুকীতে। এই বহুকী জমি বা ভিটামাটি কিছুদিনের ভিতরে স্রদের জায়গাই হস্তগত হইত। ইহা ব্যতীত জাহাজদৌ বহুকীতেও বেশ একটা তালুকদারী পড়িয়া উঠিত। দেশগোঁয়ে স্রদের হার-ন্যাকলে টাকা প্রতি মাসিক দু' পয়সা হইতে উর্ধ্বে দু' আনা পর্য্যন্ত ছিল; সুতরাং পল্লীস্বদ্যবনের টাকার গোপালকে উত্তমর্ণ গৃহ হইতে আনিয়া অধমর্ণ গৃহে একবার প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলেই দেখিতে দেখিতে তিনি স্রদরূপে কাতিপুটে হইয়া বাড়িয়া উঠিতে পারিতেন। ঋণ-শালিসী বোর্ড স্থাপিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে এই শ্রেণীর উৎখাত হইয়া গিয়াছে।

(ঙ) হিন্দুগণের অর্থাগমের আর একটা পন্থা ছিল ছোট-খাটো ব্যবসায়। পূর্বেই বলিয়াছি, পূর্ববঙ্গে প্রধানতঃ যান-বাহনের অসুবিধা এবং বাণিজ্যক্ষেত্রের অভাবে বড় ব্যবসায় গড়িয়া ওঠে নাই। পূর্ববঙ্গের প্রসিদ্ধ কাঁচামালগুলির আমদানী-রপ্তানিও কলিকাতার মারফতে। কিছু স্থানীয় ছোটখাটো ব্যবসায়গুলি হিন্দুদের হাতেই ছিল। কাপড়ের ব্যবসায়, চাউলের ব্যবসায় সুপারীর ব্যবসায়, অন্যান্য সুদি এবং মনোহারী দ্রব্যসমূহের ব্যবসায় প্রভৃতিতে কিছু কিছু মুসলমান প্রতিদ্বন্দ্বী থাকিলেও এগুলি প্রধানতঃ ছিল বিভিন্ন শ্রেণীর হিন্দুগণের হাতেই। মুড় আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রমোজনীয় পণ্যদ্রব্য কিছু গেল দুপ্রাপ্য হইয়া, কিছু গেল সরকারী নিয়ন্ত্রণের ফলে জন-সাধারণের হাত হইতে চলিয়া। সুতরাং এক্ষেত্রে স্বাধীন ব্যবসায়ের পথ রহিল না। যেটুকু ব্যবসায় চলিতেছিল তাহার পিছনেও আবার সম্প্রতি লাগিয়াছে সংখ্যাগুরুসম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে একটা প্রকাণ্ড-অপ্রকাণ্ড অসহযোগের মনোবৃত্তি; ফলে ব্যবসায়ী তাহার ব্যবসায় গুটাইতে বাধ্য হইতেছে। সরকারী নিয়ন্ত্রণে যে ব্যবসায় চলিতেছে সেখানে হিন্দুগণ দণ্ডমুট করিতে সক্ষম হইতেছে না। তা ছাড়া কতকগুলি পণ্যদ্রব্য দুপ্রাপ্য এবং নিয়ন্ত্রিত হইবার ফলে হিন্দুগণের কতগুলি স্বজাতি-ব্যবসায়ও বন্ধ হইতে বসিয়াছে; হতা-অভাবে তাঁতী বা যোগীর তাঁত চলে না, তিল সরিষা অভাবে তেলীর, ধানি চলে না, মিষ্টির অভাবে ময়রার ব্যবসায় বন্ধ।

(চ) পূর্ববঙ্গের হিন্দুগণের আর কতকগুলি ছিল তথাকথিত 'স্বাধীন ব্যবসায়'। এই ব্যবসায়িগণের ভিতরে ছিলেন উকিল মোক্তার, ডাক্তার, অধ্যাপক, বিদ্যালয়ের শিক্ষক ইত্যাদি। ইহার ভিতরে উকিল মোক্তার ডাক্তার প্রভৃতি সম্বন্ধে দেখিতে পাই, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা পরিবর্তনের ফলে এবং মুসলমান জনসমাজের মধ্যে একটা পৃথক জাতীয়তাবোধের ক্রম-প্রসারের ফলে বিশেষ প্রচার-প্রচেষ্টা ব্যতীতই একটা আর্থিক বর্জন-নীতি দানা বাঁধিয়া উঠিতেছে। ইহার ফলে এই শ্রেণীর স্বাধীন ব্যবসায়িগণের ব্যবসায় ইতিমধ্যেই বানচাল হইয়া

উঠিয়াছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে দেশা যাইতেছে, কতকটা সঙ্গতি-সম্পন্ন অধিকাংশ পূর্ববঙ্গবাসীর অপসারণের ফলে, কতকটা হিন্দু-সংস্কৃতির বিলোপের ভয়ে এবং কিয়ৎ পরিমাণে পূর্ববঙ্গের শিক্ষা-ব্যবস্থার অনিশ্চয়তার আশঙ্কায় ছাত্রগণ স্কুল-কলেজ ছাড়িয়া পলাইতেছে; অতএব স্কুল-কলেজগুলির এবং সেই সঙ্গে অধ্যাপক-শিক্ষক-শ্রেণীর দুরবস্থা অনিবার্য। বাহারা বিদ্যালয়ের শিক্ষক তাঁহারা স্বভাবতঃই গরিব; স্কুলের স্বল্প বেতনের উপরে নির্ভর করা তাহাদের কোন দিনই পোষাইত না। গ্রামাঞ্চলে চলিশ-পঞ্চাশ টাকার উর্ধ্বে শিক্ষকের বেতন খুব কম। সুতরাং ইহাদেরও একটা 'পার্থক্য' ছিল—ইহা গৃহ-শিক্ষকতা। সদতিসম্পন্ন গ্রামবাসিগণ নিজেরা এখন পর্য্যন্ত সম্পূর্ণভাবে গ্রাম ছাড়িয়া না আসিলেও তাহাদের ছেলে-মেয়েদের ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গে পাঠাইতে আরম্ভ করিয়াছেন, সুতরাং গরিব শিক্ষকগণও নিরুপায় হইয়া পড়িতেছেন।

মধ্যবিত্ত হিন্দু-সমাজের আর্থিক জীবনের আরও পরিপূর্ণ চিত্র পাইতে হইলে সমাজ-ব্যবস্থার আরও হুঁটনাটির ভিতরে প্রবেশ করিতে হয়। উপরে যে সকল অর্থাগম-পন্থার আলোচনা করা হইল ইহা ব্যতীত নানা শ্রেণীর হিন্দুগণের ভিতরে কতকগুলি স্বজাতিবৃত্তি এবং তদবলম্বনে অর্থাগমের উপায় ছিল। যেমন, কুমার, নট, ধোপা, নাপিত, ভুঁইমালী, মালাকর প্রভৃতি। ইহাদের আর্থিক জীবন আবার আরও সম্পূর্ণই আবৃত্তিত হইত মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে অবলম্বন করিয়া। হিন্দুগণের বার মাসের ভের পার্শ্ব গর্হব্যবস্থা হইতে সমাজ-ব্যবস্থার সহিতই বেশী ভাবে জড়িত। এই বার মাসের ভের পার্শ্ব, এবং জ্যোৎসব, বিবিধ সংস্করণ-অনুষ্ঠান (অন্নরন্ত, নামকরণ, বিদ্যারন্ত, উপনয়ন প্রভৃতি), বিবাহ, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি এবং ইহা ব্যতীত গৃহপ্রবেশ, বৃক্ষ-রোপণ, বৃক্ষ-বিবাহ, পুঙ্করিণী-অভিষেক প্রভৃতি বিভিন্ন ক্রিয়াকর্মকে অবলম্বন করিয়া মধ্যবিত্ত হিন্দুগণের অর্জিত অর্থ উপরি-উক্ত স্বব্যবসায়-নিষ্ঠ জাতিগুলির ভিতরে বণ্টিত হইত। আমাদের বর্তমান নাগরিক জীবনে এই শ্রেণীসমূহ একান্ত অপরিহার্য নহে; কিন্তু কিছু দিন পূর্ব পর্য্যন্তও পল্লীর সমাজ-জীবনের সমস্ত আচার-অনুষ্ঠানে ইহাদের ক্রিয়া-কর্ম অপরিহার্যই ছিল। একটা বর্ষানুষ্ঠানে কুমার প্রতিমা এবং ঘট-সরা প্রভৃতি না দিলে যেমন চলিত না, তেমনি একজন নট আসিয়া ঢোল না বাজাইলে উৎসব-অনুষ্ঠানের শুধু অসৌষ্ঠব হইত না, একেবারে শাজবিরোধী অঙ্গহানি ঘটিত। আমার একদিনের একটা ঘটনা মনে আছে—সেদিন মালাকর শোলার টোপর দিয়া যায় নাই বলিয়া এক বর বিবাহের জুজু যাত্রাই করিতে পারে নাই; গভীর রাতে সেই টোপরের ব্যবস্থা করিয়া তবে যাত্রার আয়োজন করিতে হইয়াছিল। এই শ্রেণীর লোকেরা নগদ পরসায় কাজ করিত কম, ইহাদের অনেকেরই জায়গীর বা চাকরাণ ছিল। এই জায়গীর ব্যতীত বিভিন্ন সময়ে ইহাদের কাজ-কর্মের বিনিময়ে ইহারা

যথেষ্ট 'ডেট' বা 'সিধা' এবং ইনাম-বকশিস পাইত। এই 'সিধা' জিনিষটী খুব নগণ্য জিনিস ছিল না; তাহাতে চাউল-ডাল, তেল-হুন-লক্ষা, তরিতরকারী, নারিকেল মিষ্টি প্রভৃতির প্রকার-ভেদ বা পরিমাণ কিছু কম ছিল না। এই 'ডেট' বা 'সিধা' যে কালেভদ্রেই প্রাপ্য ছিল তাহা নহে, এই প্রাপ্তিযোগের সুযোগ ছিল প্রায় হামেসাই। মোটের উপরে এই মধ্যবিত্তকে অবলম্বন করিয়া আর তাহারই সঙ্গে আর একটু এটাগেটী করিয়াই এই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা এতদিন স্বাভাবিক ব্যবসায় অবলম্বনে বাঁচিয়া ছিল। মধ্যবিত্ত হিন্দুগণের আর্থিক বিপর্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে এই সকল জাতি হয় স্ব-ব্যবসায়চ্যুত হইয়া পড়িয়াছে, নতুবা হানচ্যুত হইয়া পড়িয়াছে। আমার পরিচিত পূর্ববঙ্গের বহু নাপিতকে কলিকাতায় 'সেলুন' স্থাপন করিতে বা রাস্তায় আস্তানা করিয়া ব্যবসায় চালাইতে দেখিয়াছি; বহু ধোপাকে কলিকাতায় আসিয়া 'ভাইং এণ্ড ক্লিনিং'-এর ব্যবসা বুজিতে দেখিয়াছি।

এই জাতীয় ব্যবসায়ের কথা যখন আলোচনাই করিতেছি তখন আর এক উপ-ব্যবসায়ের কথাও এই প্রসঙ্গে আলোচিত হইতে পারে,—ইহা গুরু-পুরোহিতগিরি। কিছু দিন পূর্বে পর্য্যন্তও এই ব্যবসায় বেশ অর্থকরী ছিল; ব্যবসায়ীর সংখ্যাও নেহাত কম ছিল না। পাঁচ-সাত ঘর শিষ্য-যজমানকে অবলম্বন করিয়াই একটি গুরু-পুরোহিত পরিবার বাঁচিয়া থাকিত। আমাদের জিরাকাও এবং জাঁকজমকযুক্ত ধর্ম্মাচ্ছান-গুলির সহিত বর্ষের সম্পর্ক একান্ত পৌণ; ওগুলি 'ভূঁইঞা'-তন্ত্রেরই বহির্বিকাশ। বহির্বিটর চতীমণ্ডপ, নাটমন্দির বা আটচালা ঘর যজমানের একটি সামাজিক মর্যাদাকেই সূচিত করিত। তাই দেখিতে পাই, সমাজ-জীবনের সেই মর্যাদা রক্ষা করিয়া সেই বিশেষ স্তরে অবস্থান করিবার জন্যই বাস্তব জীবনে অন্তঃসারশূন্য হইয়াও প্রাণপণে মধ্যবিত্ত হিন্দুগণ সেই সকল পাল-পার্কণ এবং জিরাকাওকে প্রাণপণে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে। যে লোক ছ'বেলা অনন্যস্থান করিতে পারে না, সেও কিছুতেই বংসরান্তের দোল-দুর্গোৎসবকে বাদ দিতে রাজী নয়। পূর্বেই বলিয়াছি, এই 'ভূঁইঞা'-তন্ত্রের সমাপি ঘটনা—তাহারই সঙ্গে সহমরণে যাইতে হইতেছে গুরু-পুরোহিতগিরিকেও। এই সব দোল-দুর্গোৎসবের কথা ছাড়িয়াই দিলাম; মেয়েদের ব্রতবিধানও প্রাপ্তিযোগের যথেষ্ট ব্যবস্থা ছিল। দৈনন্দিন শালগ্রাম পূজার নিযুক্ত পুরোহিত ব্রাহ্মণও দশ বাড়ী হইতে দিন দশ ঘর চাউল যোগাড় করিতে পারিতেন। কিন্তু ইতিমধ্যে আতপ চাউল কাঁচকলাও শুধু দুই-তিন নয় দুখাপ্যও হইয়া উঠিয়াছে, বহুক্ষেত্রে শালগ্রাম শিলাও চুরি হইয়া গিয়াছে।

আশা করি উপরের আলোচনা হইতে পূর্ববঙ্গের মধ্যবিত্ত হিন্দুগণের আর্থিক জীবনের একটি মোটামুটি চিত্র পাওয়া যাইবে। এই চিত্রের পটভূমিকার উপরে যোগ করুন

গত চারি-পাঁচ মাস ধরিয়া মণপ্রতি চল্লিশ টাকা হইতে পঞ্চাশ টাকা চাউলের মূল্য। তবেই স্পষ্ট বুঝা যাইবে, পূর্ববঙ্গের হিন্দুগণ কেন বাস্তব্যাগ করিয়া পশ্চিমবঙ্গে বা আরও পশ্চিমে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছে।

ধান-চাউলের দুর্খলাভ এবং দুখাপ্যতার সঙ্গে সঙ্গেই মুসলমানদের কথাও উঠিবে। তাহাদের ভিতরে সকলেই চাষী নয়, সুতরাং সকলের ধরই খাদ্যদ্রব্য কিংবা ধান-পাটের নগদ টাকা নাই। সকলেই কিছু চাকুরীও পায় নাই; কটোলের ক্ষুধাবাজার এবং কৃষবাজারে সকলেরই কিছু সমান স্কীতি-লাভও হয় নাই। মুসলমান এবং তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর ভিতরেও ভূমিহীন এবং চাকুরিহীন লোক যথেষ্ট আছে। তাহাদিগকে ছাড়িয়া বর্তমান আর্থিক বিপর্যয়ের এবং দুর্ভিক্ষের চাপ সবটাই গিয়া মধ্যবিত্ত হিন্দুগণের ঘাড়ে পড়িতেছে কেন?

ইহার জবাব এই, ভূমিহীন অশিক্ষিত মুসলমান ও নিম্ন-শ্রেণীর হিন্দুনা এখন পর্য্যন্ত দৈনিক পরিশ্রম করিতে পারে, আর গত যুদ্ধের পর হইতে ঋণবস্ত্র এবং অত্যন্ত নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যও যেরূপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে, কায়িক শ্রমের মূল্যও তেমনই বাড়িয়া গিয়াছে; ইহার ফলে এই জাতীয় বিত্তহীন শ্রমিকদের ভিতরে একটা আর্থিক লাম্পত্ত আপনা আপনিই আসিয়া গিয়াছে। তা ছাড়া এই শ্রেণীর লোকের ধান-পাট জমাইতে না পারিলেও ফল-মূল, তরিতরকারী, শাক-সব্জী প্রভৃতি অল্প-বিস্তর উপার্জন করিতে পারে, মাছ ধরিতে পারে, গোরু-পাঠা-ছাগল পুখিতে পারে, হাঁস-মুরগী পালিতে পারে; এই সকলের দ্বারা সে নিজের প্রয়োজনও মিটাইতে পারে, অথবা আবশ্যক অনুযায়ী বিক্রী করিয়া কিছু কিছু অর্থলাভ করিতে পারে।

একটা জিনিস লক্ষ্য করা গিয়াছে যে, গত পঞ্চাশের মরশুরে চরম দুর্দশাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল ভূমিহীন শ্রমজীবী সম্প্রদায় এবং বয় উৎপাদনকারীর দল। তাহার কারণ ছিল এই—প্রধান ঋণ চাউলের দাম হঠাৎ যখন বৃহত্তর বাড়িয়া গিয়াছে, তখন ফল-মূল, তরিতরকারী, মাছ-দুধ, মাংস-ডিম প্রভৃতির মূল্য ঠিক সমান অস্থপাতে বাড়িয়া যাইতে পারে নাই; গ্রাম্য দিন-মজুরগণের শ্রমের মূল্যও অসুস্থরূপে ভাবে বর্দ্ধিত হয় নাই। এই আর্থিক অগতিরিহাই এই শ্রেণীর জনসাধারণের চরম দুর্দশার প্রধান কারণ ছিল। কিন্তু গত পাঁচ-ছয় বংসরের ভিতরে একটু একটু করিয়া এই অসুস্থতি অনেকখানি দূর হইয়াছে। তথ্য সংগ্রহ করিলে দেখা যাইবে, আজকাল পল্লী অঞ্চলে চাউলের দাম যখন যতগুণ বৃদ্ধি পায়, অত্যন্ত কৃষিজাত দ্রব্য এবং মাছ-মাংস, দুধ-ডিম প্রভৃতির মূল্যও প্রায় আনুপাতিক সমতা রক্ষা করিয়াই বৃদ্ধি পায়। জন-মজুরের পারিশ্রমিকও অসুস্থরূপে ভাবেই বাড়িয়াছে। আমাদের গ্রামে যখন চাউলের দর চল্লিশ টাকা, অর্থাৎ বাস্তবিক মূল্যের প্রায় আট গুণ হইয়াছে, তখন দেখিয়াছি আমাদের বাড়ী হইতে পাঁচ

মাইল দূরবর্তী গ্রামের ট্রেন পর্যন্ত নৌকাপথে ভাড়া লাগিয়েছে পাঁচ আনার হলে আড়াই টাকা। সুতরাং মোটের উপরে এই সব ভূমিহীন জন-মজুরদের অবস্থার বর্তমানে কোন উন্নতি না হইলেও বিশেষ কোন অবনতিও ঘটে নাই। কিন্তু একজন স্থল-শিক্ষকের কথা ভাবিয়া দেখুন। সাত-আট বৎসর পূর্বে গ্রাম্য স্থলের জন্য বি-এ পাশ একজন শিক্ষক পচিশ টাকাতাই পাওয়া যাইত; এখন সেখানে না হয় চল্লিশ পঞ্চাশ টাকা। আর এই যে আর্থিক অসমর্থন বৃদ্ধি তাহাও তাহার কবল হইতে সবই শসিয়া-পড়িতেছে।

উপরের আলোচনা হইতেই বুঝা যাইবে আর্থিক জীবনে পূর্ববঙ্গে আমরা একটু একটু করিয়া কিরূপে শিথিলমূল হইয়া পড়িয়াছি। বাহির হইতে সকলেই আমাদেরকে যতই সাহস অবলম্বন করিতে বলিতেছে, আমরা ততই যে কেন দুর্বল হইয়া পড়িতেছি এইখানে তাহার মূল কারণের হৃদিস পাওয়া যাইবে। হিন্দুদের পন্ডাজীয়ে বহু দিন পূর্বে হইতে ভাঙন ধরিতেছে, সেই ভাঙনে চড়া পড়িয়াছে গঙ্গাজীয়ে; এবং তাহারই ফলে 'বালিগঞ্জে' পূর্ববঙ্গবাসীদের উপনিবেশ গড়িয়া উঠিয়াছে। আমরা এই ভাঙনকে আগে কোন দিনই ঠেকাইতে চেষ্টা করি নাই; আজ যখন শেষ ভাঙনের ঝড় আসিয়াছে তখন আমরা নিম্নোক্তের দ্বারা বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছি।

অনেক দিন ধরিয়া আস্তে আস্তে যে গাছের মূলের মাটি ক্ষয় হইয়া শিকড় বাহির হইয়া পড়িয়াছে, এবং প্রবল বাতাসের সে যেমন তাহার প্রকাণ্ড কাণ্ড এবং বহুবিহ্বত শাখাবাহ সত্ত্বেও আত্মরক্ষা করিতে পারে না, বরঞ্চ এগুলির দরুন বাতাসের কাপটীটাই আসিয়া বেশী লাগে, বিপর্যস্ত আর্থিক জীবন এবং শিথিলমূল সমাজ-জীবনের উপরে একটা প্রচণ্ড সাম্প্রদায়িকতার বড় আলিয়া সেই তাবই পূর্ববঙ্গের হিন্দুর উপরে আঘাত করিতেছে; কাণ্ডের প্রকাণ্ড এবং শাখাবাহর বহুবিহ্বত তাহাকে আরও অসহায় করিয়া তুলিয়াছে।

কিন্তু এখন বিপদ যে শুধু মধ্যবিত্ত বর্ণহিন্দুরই তাহা নহে; আর্থিক সমস্যার সহিত একটা সাম্প্রদায়িক সমস্যা জড়িত হইয়া পড়িবার ফলে যে জটিল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে বিপদ সমগ্র হিন্দু-সাম্প্রদায়েরই। মধ্যবিত্ত হিন্দুসকল দেশ-ভ্রমণ হইলে কৃষক এবং শ্রমিক হিন্দুগণ আর্থিক প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিলেও হিন্দুসমাজের অভ্যন্তর অঙ্গ হিসাবে আত্মরক্ষা করিতে পারিবে না।

কিন্তু অভিকার কোন পথে? বাস্তব্যাগ এবং দেশভ্রমণকেই একমাত্র পন্থা মনে করিয়া সেই দিকেই উদ্যোগ আরম্ভ চলিতেছে। কিন্তু ব্যাপারটাকে আপাতদৃষ্টিতে যত সহজ সমাধান বলিয়া মনে হইতেছে আসলে সেটা তত সহজ নহে। প্রথমেই আসে নিজের দেশ-গ্রাম বাড়ীঘর পাড়া-প্রতিবেশী আত্মীয়-স্বজনকে অবলম্বন করিয়া একটা তাব-প্রবণতার কথা;

কিন্তু এই রূঢ় বাস্তব পারিপার্শ্বিকের ভিতরে হয়ত এই তাব-প্রবণতা খই পাইবে না। তা ছাড়া এ কথাও সত্য যে মাহুঘের প্রাণরক্ষার প্রকৃতি তাহার সুস্থতার স্বরূপত্ব অপেক্ষা অনেক বেশী প্রবল।

কিন্তু সেই প্রাণরক্ষার দিক হইতে ভাবিয়া দেখিলেও উত্তর এবং পূর্ববঙ্গের সোয়া কোটি হিন্দুকে পশ্চিমবঙ্গে স্থানান্তরিত করিয়া রাখা করিবার সম্ভাব্যতা কতদূর প্রথমে সে প্রশ্ন আসে। দ্বিতীয়তঃ মনে রাখা উচিত, বহু বৎসর যাবৎ মাটি হইতে রস সংগ্রহ ও আলো-বায়ু অবলম্বন করিয়া যে গাছ বর্জিত হইয়াছে তাহার শিথিল মূলে নূতন মাটি ও উপজীব্য প্রদান করিয়া তাহাকে সজীব শাখা যেরূপ সহজ, তাহাকে উপড়াইয়া লইয়া নূতন মাটিতে স্থাপন করিয়া রাখা করা তত সহজ নহে। সর্বোপরি আর একটা কথা মনে রাখা উচিত, আমরা যে মধ্যবিত্ত মনোবৃত্তি এবং জীবনযাত্রার ধারাকে জীয়াইয়া রাখিবার জন্য পূর্ববঙ্গ হইতে পশ্চিমবঙ্গে পলাইয়া আসিতে চাই, পশ্চিমবঙ্গেও তাহা বেশী দিনের জন্য নিরাপদ নহে। আমি পূর্বেই বলিয়াছি, মধ্যবিত্তের এই বিপদ শুধুমাত্র পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ভিতর দিয়া আসে নাই, আসিয়াছে বীরে বীরে যুগধর্মের আবর্তনে, বহু বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণ সামাজিক-শক্তির দ্বাত-প্রতিদ্বাতে। পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুপ্রাধান্তমূলক রাষ্ট্র যদি প্রতিষ্ঠিতও হইয়া থাকে, তবে তাহারও এই মধ্যবিত্ত মনোবৃত্তি এবং জীবনযাত্রাকে আর বেশী দিন জীয়াইয়া রাখিবার সাধ্য নাই। কৃষির মূল্য এবং শ্রমের মূল্য সর্বত্রই বাড়িয়া যাইবে; আরের মধ্যপন্থাগুলিও ক্রমে লোপ পাইবে; তখন আজ যে সমস্যা দেখা দিয়াছে পূর্ববঙ্গে ঠিক সেই সমস্যাই আবার ছুঁদিন পরে আসিয়া দেখা দিবে পশ্চিমবঙ্গে। পলাইয়া পলাইয়া এই মধ্যবিত্ত মনোবৃত্তিকে রক্ষা করার স্থান হইবে না হয়ত কোন রাষ্ট্রেই।

তাই সমস্যার সমাধানের জন্য চাই আমাদের মনোবৃত্তির এবং তৎসঙ্গে আমাদের জীবনযাত্রা পদ্ধতির অনেকখানি পরিবর্তন। নূতন যুগের নূতন বর্গ তাহার চারি দিকে যে সমস্যা লইয়া আসিতেছে পুরানো যুগের মনোভাব লইয়া আমরা কিছুতেই তাহার সম্মুখীন হইতে পারিব না। নূতন যুগে ভূমির সহিত সমাজ-জীবনের অভিন্ন বৈয়োগ স্থাপন করিতে হইবে, শ্রমের মূল্যকে নূতন করিয়া স্বীকার করিতে হইবে, এবং সর্বদা জীবনের সর্বক্ষেত্রে পরের শ্রমকে অবলম্বন করিয়া বাঁচিয়া থাকিবার আদর্শ এবং অভ্যাসকে বদলাইতে হইবে। এই সব কথা শুনিয়া হয়ত অনেকের মনেই আশঙ্কার সঞ্চার হইতেছে যে এখন উপদেশ দেওয়া হইবে, সবাই সকল শিক্ষা-দীক্ষা, সংস্কার-সংস্কৃতি ছাড়িয়া মাঠে নাম, অথবা হাতিয়ার লইয়া জন-মজুর বা কুলি-মজুর হইতে আরম্ভ কর। এই আশঙ্কাটাই মধ্যবিত্ত মনোবৃত্তিক্রান্ত। কৃষি শিল্প বা অজ্ঞাত শ্রমবৃত্তি গ্রহণ করিতে হইলেই যে শিক্ষা-দীক্ষা সংস্কার-সংস্কৃতিকে

বর্জন করিতে হইবে, এইরূপ পুরাতন মনোবৃত্তি পরি-
হার্য্য। কৃষি-শিল্পের সহিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে কোথাও
কোন-বিরোধ নাই, বরঞ্চ একে অজ্ঞেয় পরিপোষক
এইটাই তত্ত্বময় যুগের বাণী। কিন্তু আশ্চর্য্য এই, যাহারা
উচ্চ বৈজ্ঞানিক শিক্ষালাভের পর কৃষিবিজ্ঞান-পারদর্শিতা লাভ
করেন তাহারাও বাঁট মাটির সংশ্রবে আসিতে চাহেন না,
সরকারী কৃষি-বিভাগে চাকুরী ছুঁজিয়া বেড়ান; যে উচ্চ-
শিক্ষিত ব্যক্তি মৎস্যের চাষ শিখিয়া আসেন, তিনিও আসিয়া
চাকুরী বোঝেন, যিনি উদ্ভিদতত্ত্ব শেখেন তিনিও চাহেন বন-
বিভাগে একটা চাকুরী। এইরূপ আমাদের সর্ব্বক্ষেত্রে। আমরা
আমাদের জীবনযাত্রা নির্বাহের সৌকার্য্যার্থে মানব-সমাজের
ভিতরে একটা অজ্ঞ-অশিক্ষিত শ্রেণী পুঙ্খ করিয়া রাখিতে
চাই—আমাদের মতলব, তাহাদেরই স্বত্ব আরোহণ করিয়া
আমরা বরাবর জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা করিব এবং সত্যতা
সংস্কৃতিকে গড়িয়া তুলিব; জগতের নববিধান এই কুব্যবস্থাকে
মানিয়া লইতে যে একেবারেই নারাজ, এ কথাটাকে এখন
স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে ও স্বীকার করিতে হইবে। একথা
বুঝিবার প্রয়োজন শুধু পূর্ববাদের হিন্দুগণের নহে, সমানভাবে
মুসলমানগণেরও, কারণ মধ্যবিত্ত মনোবৃত্তি শুধু হিন্দুর ব্যাধি

নয়, মুসলমান সমাজকেও তাহা হয়ত অধিক ভবিষ্যতেই আক্রমণ
করিয়া বসিবে।

এসকলকমে মনে রাখা উচিত, নবযুগের জাতীয় জীবনে
দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হইতে হইলে শুধু আর্থিক ব্যবস্থার পরিবর্তন করিলেই
চলিবে না, সমাজ-ব্যবহারও অতীতের পরিবর্তন এবং সংস্কারের
প্রয়োজন। বর্তমানে বর্ণহিন্দু বলিতে যে একটা সমাজ-ব্যবস্থা
প্রচলিত আছে তাহার অনেক বিধান যে আধুনিক জীবনের
বাস্তব সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত নহে এবং তাহার ভিতরকার
এমন অনেক বিধান আমরা নির্বিরোধে মানিয়া চলিতেছি যাহা
সাধারণ মানবতারই পরিপন্থী, একথা এখন আমরা বুঝি কিন্তু
প্রকাশ্যে স্বীকার করিতেছি না। সমাজ-ব্যবহার এই ক্রটিময়তা
আমাদিগকে জীবন-সংগ্রামে নিরন্তর দুর্ব্বল করিয়া দিতেছে।
তাই বাঁচিয়া থাকিতে হইলে প্রথমে চাই আত্মতত্ত্ব। তাহাতে
সমস্তার সম্যক সমাধান হইবে কি না বলিতে না পারিলেও
ইহা বলা যায় যে সর্ব্বপ্রকার বিপদের সম্মুখে জীবন-সংগ্রামে
আমরা সবল হইয়া উঠিব,—এবং সকলেরই পৃথিবীতে বাঁচিয়া
থাকিবার অধিকারকে অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করিয়া লইয়া
নিজেরাই বাঁচান-মত বাঁচিব।

সীতাকুণ্ড

শ্রীসূর্য্যপ্রসন্ন বাজপেয়ী চৌধুরী

বর্তমান সময়ে মাগধের কর্ণবহুল জীবনে অবকাশের
নিভাসই অভাব। কর্ণরাস্তা ও পরিভ্রান্ত অবস্থায় তার
যখন একটু অবসর মেলে, তখন সে তার আবাসস্থল ও নিত্য-
পরিচিত পরিবেশ ত্যাগ করে বেরিয়ে পড়ে অজ্ঞ কোথাও
একটু নিশ্চিন্ত হয়ে সময় কাটাতে—যেখানে জীবনধারণের
সমস্তানবুহ থেকে কিছু কালের জেতেও নে রেহাই পাবে,
তার দেহমনের শান্তি বিচিত্র নয়নাভিরাম দৃশ্যাবলী দেখে
অপনোদিত হবে।

দৈনন্দিন জীবনের এমনিবারা একধেয়েমি থেকে মন যখন
মুক্তলাভের জন্যে ব্যাহুল হয়ে উঠেছিল তখন হঠাৎ দিন-
কতকের জন্যে হুদেদের যাবার সুযোগ আমার বটে গেল।

পত ২রা মে টেনে জামালপুর ঠেশে নেমে মোটরযোগে
সাত মাইল পথ অতিক্রম করে হুদেদের গিয়ে পৌঁছলাম।

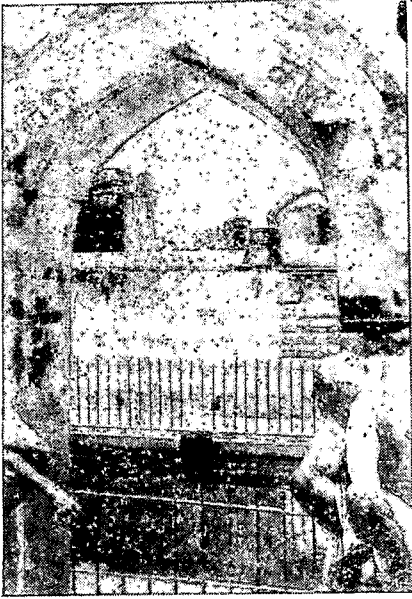
জামালপুর হুদেদের অন্তর্গত একটা মহকুমার হেড-
কোয়ার্টার। বেশ বড় জায়গা বলে বোধ হ'ল। এখানে
এংলো-ইন্ডিয়ান কলোনিও আছে। এটি রেলের একটু বড়
জংসন আর কারবারের জায়গাও বটে।

বাল্যকালে কবি দেবেন্দ্রনাথ সেনের কবিতায় পড়ে-
ছিলাম—“হুদেদের সীতাকুণ্ডে গিয়া কাঁদিলাম আনকীর
হুঃখে।” তখন থেকেই জায়গাটির ওপর কেমন একটা আকর্ষণ
ছিল, এবার এককাল পরে অপ্রত্যাশিত ভাবে তা দেববার
সুযোগ হয়ে গেল।

হুদেদের জেলা ভাগলপুর ডিভিশনের অন্তর্গত। বিহার
প্রদেশের সর্ব্ব হিসাবে পাটনা ও গয়ায় পরেই ভাগলপুরের
স্থান। দক্ষিণ সফটও ভূমিকম্পের পর বেশ দুন্দর ভাবে
গড়ে উঠেছে।

বিহারের প্রত্যন্ত অঞ্চলের ভূমি বাস্তবিকই স্বর্ণপ্রস্থ। প্রচুর
শস্য ও খনিজ দ্রব্যের সমাবেশে এই অঞ্চলটি বিশেষ সমৃদ্ধ।
কয়লা, লোহা, তামা, অল, ম্যাঙ্গানিজ—কত খনিজ দ্রব্য যে
এখানে ভূগর্ভে নিহিত রয়েছে তার আর গুণ নেই।

এই প্রদেশের অধিবাসীর সংখ্যাও এখন তিন কোটির
অনেক উপরে উঠে গিয়েছে। এখানকার শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের
সংখ্যাধিক্য, কলকারখানার প্রসার, মোটর ট্রাক্টোরের
প্রচলন ইত্যাদি দেখে মনে হয় যে প্রদেশটি সময়ের সঙ্গে



সীতাকুণ্ড (মুন্সের)
ফটো : দেবেজ বাজপেয়ী চৌধুরী

তাল রেখে ক্ষত প্রপতির পথে এগিয়ে চলেছে। ট্রেনে যেতে যেতে নজরে পড়ল প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রে ঠিরাপ পাশ্প দিয়ে জল ভুলে সেচের ব্যবস্থা করা হয়েছে। গ্রাম-গুলিকেও দেখে বেশ সমৃদ্ধ বলেই মনে হ'ল। ট্রেনে এক গুজরাতি মুসলমান পরিবারের সঙ্গে আলাপ হ'ল। এই পরিবারের মহিলাদের দেখে মনে হয় না যে তাঁরা পর্দাপ্রাণর মুগে আছেন—বেশ সহজ-সরল ব্যবহার, পর্দার বালাই নেই, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আধুনিক বেশভূষা, হাতে গুজরাতি ভাষার দেওয়ালী সংখ্যা এক অতিকার্য মাসিকপত্র। তাঁদের নিকটে শুধুলায় গুজরাতেও বাংলাদেশের ন্যায় হিন্দু-মুসলমান এক ভাষাতেই অর্থাৎ গুজরাতি ভাষাতেই কথা বলে এবং আঁই তাঁদের উভয়েরই মাতৃভাষা। এঁরা যাচ্ছেন বানবাদে—ঝরিয়াতে এঁদের কয়লার খনি আছে।

মুন্সের সহরটি ছোট হ'লেও ভারি সুন্দর। নদীর তীরেই রেলওয়ে ষ্টেশন। রাস্তাঘাট বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। জিনিস-পত্রের মূল্যও বাংলাদেশের চাইতে ঢের সস্তা।

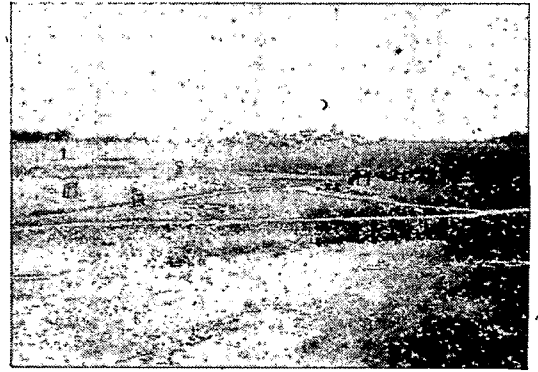
গত বিহার ভূমিকম্পে মুন্সেরের প্রায় সব বাড়ীই ধ্বংস-প্রাপ্ত হয়েছিল, কিন্তু এখন সেই সব ভয়ঙ্কর উপর পুনর্নির্মিত সুন্দর সুন্দর হর্ম্যরাজি সহরের পোতা বহুল পরিমাণে সৃষ্টি করেছে।

মীর কাসিমের বিরাট দুর্গটি এই সহরের অন্যতম প্রকৃষ্ট দৃশ্য। এই দুর্গেই কালেক্টরী, জজ-আদালত ম্যাজিস্ট্রেট ও

পুলিশ-অপারের বাসভবন, উকীল-লাইব্রেরী ও অস্তায় সরকারী আপিস অবস্থিত। ভিতরে সুন্দর পার্ক, ক্রীড়াঙ্গল এবং বেড়াবার স্নায়গাও আছে। কয়েকজন স্থানীয় জমি-দারের বাড়ী এখানে বিদ্যমান। এঁদের মধ্যে দু-এক জন ইংরেজ জমিদারও আছেন।

মুন্সেরে অনেক প্রবাসী বাঙালী আছেন। এঁদের বর্তমান নেতা হচ্ছেন ত্রিনিরাপদ যুবোপাধ্যায় এম-এল-এ ও ত্রিঅধ্বারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। একদিন সৌজন্যসহকারে এঁরা আমাদের বাঙালীদের প্রতিষ্ঠিত সাহিত্য-সভায় ও ক্লাবে নিয়ে গেলেন। সেখানে তখন মধ্যপ্রদেশ ও বেরারের প্রধান মন্ত্রী মাননীয় পণ্ডিত রবিশঙ্কর তরু ও স্থানীয় শ্রেষ্ঠ ব্যবহারজীবী পণ্ডিত ত্রিকৃষ্ণ মিশ্রও গিয়েছিলেন।

বাংলাদেশের, বিশেষ করে পূর্ববঙ্গের অনেক কথাই এঁরা জিজ্ঞেস করলেন। সংক্ষেপে বাংলার বর্তমান পরিস্থিতির কথা তাঁদের নিকটে নিবেদন করে শেষে বললাম যে, বাংলা-দেশে এবং বাংলার বাইরে যত বাঙালী আছেন সকলে



সীতাকুণ্ডের পার্বের দৃশ্য
ফটো : রবি বাজপেয়ী চৌধুরী

সমবেত ভাবে বাঙালী জাতির ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিগত অর্থও বজায় রাখবার জন্ত মনোযোগী না হলে পূর্ববঙ্গকে আসন্ন মহতী বিনষ্টির হাত থেকে রক্ষা করা যাবে না।

সভা ও ক্লাবগৃহটি বেশ সুন্দর। পূজাবাড়ীও রয়েছে। ক্লাবে সাহিত্যালোচনাদি বেশ হয়ে থাকে। প্রবাসে থেকেও যে এখানকার বাঙালীরা নিজেদের দেশ ও সাহিত্যকে ভুলে যান নি, তার পরিচয় পাওয়া গেল।

একদিন আমরা কয়েকজন মিলে সীতাকুণ্ড দেখতে গেলাম। পথে একটা টিলায় (ছোট পাহাড়ের) উপরে এক বাঙালী জমিদারের সুদৃঢ় বাসভবনটি দৃষ্টি আকর্ষণ করল। ঘোঁটার চলাচলের রাস্তাটি একে বেকে উপরের দিকে চলছে। পাহাড়ের গায়ে স্থিত গ্রাহপালা বেয়ে উঠেছে নাশা প্রকারের লতাগুল, রাস্তার দু'পাশে দু'প্রকারী নিবিড় অরণ্যের স্তম শোভা। চারদিকের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য টিলাটির উপরে যেন এক মায়াপুত্রী সৃষ্টি করেছে।

কিছুদূর গিয়েই মোটর থেকে নামতে হল। বড় রাস্তার পাশেই রয়েছে সীতাকুণ্ড ও তৎসংলগ্ন অজ্ঞাত কুণ্ডগুলি। সব কয়টি কুণ্ডই প্রায় চতুষ্কোণ ও প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। ভিতরে যাবার জন্তে বড় দরজা বা ফটক আছে—কুণ্ড পরিষ্কার জন্তে বাঁধানো রাস্তা রয়েছে।

সবমুহু এই পাঁচটি কুণ্ড আছে—রামকুণ্ড, লক্ষ্মণকুণ্ড, ভরত-কুণ্ড, শত্রুঘ্নকুণ্ড ও সীতাকুণ্ড। সব কুণ্ডের জলই শীতল, কিন্তু সীতাকুণ্ডের জল বেশ উষ্ণ—ফুটন্ত জলের ন্যায় কুণ্ডের বুকে বুদ্ধবুদ উঠছে, কুণ্ডের জল যেন টগবগ করে ফুটছে। কুণ্ডের পার্শ্বদেশ লোহার রেগিঙ দিয়ে ঘেরা। হাতে পাত্র নিয়ে জল তুলতে হয়। বহু লোক জল নিয়ে যাচ্ছে। অনেকের বারণা এই জল পান্য করলে পেটের যাবতীয় ব্যারাম আরোগ্য হয়ে যায়। আমিও এক পাত্র জল তুলে নিলাম।

সীতাকুণ্ডটি সব চাইতে বড়। তার জল একটি নালী দিয়ে বাইরে বয়ে যাচ্ছে, ঐ নালীর জলে বহু স্ত্রী-পুরুষ স্নান করছে। অন্যান্য তীর্থস্থানের ন্যায় এখানেও পাণ্ডাদের অত্যাচার বোল আনা, তাদের হাত এড়াবার যো নেই। আমাদের এসে যখন ছেকে ধরলে তখন তাদের কিছু না দিয়ে অব্যাহতি পাওয়া গেল না।

এই কুণ্ডকে কেন্দ্র করে সীতাদেবীর পাতালপ্রবেশ, অস্ত্রপরীক্ষা এই সব নিয়ে লোকমুখে অনেক কাহিনী গড়ে উঠেছে। এখানকার জলে নাকি প্রচুর সালফার আছে। আরো কিছুদূর এগিয়ে আর একটি কুণ্ড দেখলাম। সেটির বাহ্য আকৃতি কুণ্ডের মত বটে, কিন্তু ভিতরটা শুষ্ক—এক কঁটা জল নেই। এই কুণ্ড কাটানোর কাহিনীটি বেশ চিত্তাকর্ষক। কোন এক যেভান্দ—বোধ হয় তার নাম ফিলিপ—এই কুণ্ডটি কাটিয়েছিলেন। তার বারণা ছিল যে সীতাকুণ্ডের নিকটবর্তী স্থানে নূতন কুণ্ড খনন করলে তাতেও ঐ রকম উষ্ণ জল পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু ভূগর্ভ থেকে উষ্ণ জল নির্গত হওয়া দূরে থাকুক, ঠাণ্ডা জলও যথেষ্ট পরিমাণে বেরুল না। অল্পবল্প যা বেরুল তাও বেশী দিন কুণ্ডে স্থায়ী হতে পারল না।

সীতাকুণ্ডের জল কেন সব সময় ফুটন্ত জলের ন্যায় গরম থাকে, আর তার সন্নিবর্তন আরো কয়েকটি কুণ্ডের জলই বা শীতল কেন, তার কারণ সম্ভবতঃ ভবিষ্যতে বৈজ্ঞানিকগণ সর্বসাধারণের গোচরীভূত করতে সক্ষম হবেন। আমরা কিন্তু আপাততঃ এই রহস্য ভেদ করতে না পেরে ফিরে এলাম।

আলোচনা

কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ

অধ্যাপক শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার, এম-এ. পিএচ-ডি

গত অগ্রহায়ণ মাসের “প্রবাসী”তে শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের সমালোচনার উত্তরে আমি যাহা লিখিয়াছিলাম, ভট্টাচার্য মহাশয়ের প্রত্যুত্তরসহ তাহা প্রকাশিত হইয়াছে।

কৃষ্ণবন্দনা দ্বারা তন্ত্রসারের রচনা করা হইয়াছে বলিয়া আমি গ্রন্থকার কৃষ্ণানন্দকে বিষ্ণুমন্ত্রদীক্ষিত অর্থাৎ বৈষ্ণব তান্ত্রিক বলিয়াছিলাম। ভট্টাচার্য মহাশয় প্রতিবাদে বলিলেন যে, শাক্তও কৃষ্ণবন্দনা দ্বারা গ্রন্থারম্ভ করিতে পারে। তাঁহার মন্তব্যে সন্তোষজনক কোন প্রমাণ না পাইয়া আমি উত্তরে লিখিলাম, “কৃষ্ণানন্দ যদি গৌড়া শাক্ত ছিলেন, তবে তিনি কেন কৃষ্ণবন্দনা দ্বারা গ্রন্থরচনা করিলেন, ইহার ব্যাখ্যায় তিনি (ভট্টাচার্য মহাশয়) যে যুক্তি দিয়াছেন তাহার আলোচনা বাহ্যল্যমাত্র।” প্রত্যুত্তরে তিনি লিখিতেছেন, “গৌড়াই হটক আর কোমলই হটক, ‘শাক্ত’ অর্থ শক্তিমন্ত্রদীক্ষিত তান্ত্রিক, বৈষ্ণবমন্ত্রদীক্ষিত তান্ত্রিক নহে।” অর্থাৎ আমি স্পষ্ট করিয়া কৃষ্ণানন্দকে বৈষ্ণব বলা সত্ত্বেও ভট্টাচার্য মহাশয় বলিয়া লইতেছেন যে, আমি তন্ত্রসার রচনিতাকে শাক্ত বলিয়াছি।

আমি মূল প্রবন্ধে যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহার অর্থ এই যে, ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে রামতোষণ সম্ভবতঃ বৃদ্ধবয়সে প্রাণতোষণী রচনা করিয়াছিলেন; সুতরাং তদীয় উর্দ্ধতন সপ্তম পুরুষ কৃষ্ণানন্দ বৃদ্ধবয়সে তাঁহার প্রায় দেড় শত বৎসর পূর্বে ১৬৭০ খ্রীষ্টাব্দের নিকটবর্তী কোন সময়ে তন্ত্রসার রচনা করিয়া থাকিবেন; তবে যদি ১৫৮০ শকাব্দ অর্থাৎ ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে অনুলিখিত তন্ত্রসার পুঁথির বিবরণ সত্য হয়, তাহা হইলে কৃষ্ণানন্দ যৌবনে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে গ্রন্থখানি লিখিয়া থাকিতে পারেন। ভট্টাচার্য মহাশয়ের প্রতিবাদে তন্ত্রসারের প্রাচীনতর পুঁথির উল্লেখ থাকায়, আমি উত্তরে লিখিয়াছি যে, কৃষ্ণানন্দের জীবনকাল যদি ১৫৯৫-১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দ অনুমান করা যায় এবং যদি ধরা যায় যে, তিনি জীবনের প্রথমার্ধে তন্ত্রসার রচনা করিয়াছিলেন, তবে আপত্তি করিবার কিছু নাই। ভট্টাচার্য মহাশয় আমার মূল প্রবন্ধের “যৌবন” এবং “উত্তর”র “জীবনের প্রথমার্ধ” কথা দুটিতে তালগোল পাকাইয়া স্থির করিয়াছেন যে, আমার ঐ সিদ্ধান্তে এক পুরুষের গড়পড়তা ২৫।২৬ বৎসরের বেশী হইয়া পড়ে। কিন্তু তাঁহার লক্ষ্য নাই যে, এই গড়ের হিসাবে রামতোষণের অজ্ঞাত জন্মতারিখটি একটি অভ্যাবশ্যক অঙ্ক। রামতোষণ অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য-ভাগে জন্মিয়াছিলেন বলিয়া যদি ধরা যায় তবে এক পুরুষের গড়ে ২৫।২৬ বৎসরের বেশী হইবে কোন হিসাবে?

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিয়াছেন, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের একধাণি তত্ত্বদার পুঁথির রচনাকাল ১৫৫৪ শকাব্দ। আমি পুঁথিধাণি পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছি যে উহার অল্পষ্ট তৃতীয় এবং চতুর্থ অঙ্কের পাঠ অনিশ্চিত। তাঁহার পাঠকে অনিশ্চিত এবং কাল্পনিক বলা সত্ত্বেও আমি অপর কোন পাঠ দেই নাই, এই বিষয়ের প্রতি তিনি এবার পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। যাহার পাঠ অনিশ্চিত, তাহার যা হোক একটা পাঠ দিলেই কাল্পনিক পাঠের সৃষ্টি হয়। তাহাতে বর্তমান সমাজ সমাধানে কোনই সহায়তা হইবে না।

রঘুনাথ শিরোমণির জ্ঞাতারিখ অজ্ঞাত। আমি অতীতের মতামতাদ্যে ১৪৭৭ খ্রীষ্টাব্দ লিখিয়াছিলাম। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মতে উহা ১৪৬০-৬৫ খ্রীষ্টাব্দে হইবে। কিন্তু এই তারিখও কাল্পনিক, অকাট্য প্রমাণসিদ্ধ নহে। এবার তিনি তাঁহার তারিখটিকে “বিনা যুক্তি বিচারে অগ্রাহ” করার উল্লেখ করিয়াছেন। যাহার পক্ষে বিশেষ কোন যুক্তি আছে বলিয়া আমি মনে করি না, তাহার বিচার করিব কি? বিশেষতঃ আমার প্রবন্ধ ছিল কৃষ্ণানন্দ সম্বন্ধে; রঘুনাথ শিরোমণির তারিখ উহাতে প্রসঙ্গক্রমে উল্লিখিত হইয়াছে।

ভক্তদাসে বর্ণিত পুঁথির সংখ্যাই বেশী। বঙ্গবাসী সংস্করণ ভক্তদাসে ব্যবহৃত সর্বপ্রাচীন পুঁথিতে পূর্ণানন্দ এবং তদীয় ক্রীত চিত্তামণির উল্লেখকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াও

কেন আমি ঐ পুঁথির তারিখের ১৫৮০ শকাব্দ পাঠে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছি, ইহাতে ভট্টাচার্য্য মহাশয় কৌতুক বোধ করিয়াছেন। অথচ লেখবিদ্যাবিৎ পণ্ডিতেরা সকলেই অবগত আছেন যে, সাধারণ লেখার পাঠোদ্ধার যত সহজ, অঙ্কের পাঠোদ্ধার তদপেক্ষা বহুগুণে কঠিন।

পরিশেষে ভট্টাচার্য্য মহাশয় ১৬০১ শকাব্দে অর্থাৎ ১৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দে অমূল্যবিশিষ্ট তত্ত্বদাসের একধাণি পুঁথির তারিখ পরীক্ষার জন্য তদীয় বাসগৃহে আমাকে আমন্ত্রণ করিয়াছেন। সেজন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। কিন্তু এই তারিখ পরীক্ষার লাভ কি? আমার মূল প্রবন্ধে তত্ত্বদাস রচনার যে কাল নিরূপণ করিয়াছিলাম, এ তারিখ ত উহার পরবর্তী। তিনি অপর যে ছুটি পুঁথির উল্লেখ করিয়াছিলেন, উহার তারিখ প্রাচীনতর এবং পণ্ডিতগণের পরীক্ষণীয়। তদ্ব্যতীত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পুঁথিধাণি পরীক্ষা করিয়া উহার তারিখ বিষয়ে আমার বক্তব্য আমি পূর্বেই বলিয়াছি। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পূর্বপুরুষ নরসিংহ বাচস্পতিই নামাঙ্কিত যে তত্ত্বদাস পুঁথির তারিখ তিনি ১৫৬৮ শকাব্দ অর্থাৎ ১৬৪৬ খ্রীষ্টাব্দরূপে উল্লেখ করিয়াছিলেন, সে পুঁথির তারিখ অবশ্য পরীক্ষণীয়।*

* এই সম্বন্ধে আর কোন বাদাম্ববাদ প্রকাশিত হইবে না—প্রবাসী-সম্পাদক।

ঐতিহাসিক খননের কতিপয় সূত্র

শ্রীগোপীনাথ সেন

অনেকেই মনে করেন যেখানে সেখানে খনন করিলেই ঐতিহাসিক কোন নিদর্শন আবিষ্কার করা সহজসাধ্য হইতে পারে। কিন্তু এইরূপ অবৈজ্ঞানিক ভাবে অহুসদ্ধান করিতে গিয়া যে বিফলমনোরথ হইবার সম্ভাবনা আছে সে কথা ভুলিলে চলিবে না। বিশেষ ভাবে অধ্যয়নপূর্বক বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন করিলেই তবে আবিষ্কারকের প্রয়াস সাফল্য-মণ্ডিত হইতে পারে। কেবলমাত্র দৈবের উপর নির্ভর করিয়া খননকার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নয়। আমি নিম্নে কয়েকটি প্রণালীর উল্লেখ করিলাম যাহা খননকারীদের সাহায্যে আসিতে পারে।

(১) গ্রন্থবিবরণী (Bibliography), মানচিত্রাঙ্কন বিভাগ (Cartography), মুদ্রাবিজ্ঞান (Numismatics) এবং যাহুধরের সংগৃহীত বস্তু হইতে প্রথমতঃ খননবিভাগ আরম্ভ করিতে হইবে।

(২) প্রাথমিক ছাত্রগণকে নিকটতর কোন স্থানে খনন-কার্য্য করিবার জন্ত যাইতে হইবে।

(৩) এই খননপ্রকল্পটিকে কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে যে স্থানটি শিক্ষাবিদদের মনে ধরিবে সেই স্থানটি অন্ধান করিয়া ঐ স্থানটির উপর এমন একটি চিহ্ন রাখিতে হইবে যাহাতে উড়োজাহাজের উপর হইতেও পরিষ্কার ভাবে স্থানটি সম্পূর্ণ দেখা যাইতে পারে। যে স্থানটি হয়ত সত্যিই খুঁড়িবার প্রয়োজন ছিল, ভুলবশতঃ দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া গিয়াছে তাহার উপর বিশেষভাবে মনোযোগ দিতে হইবে।

প্রাচীন ধ্বংসাবশেষসমূহের মধ্যে যদি কোন পুরনো দলিল পাওয়া যায় তাহা হইলে ইহার বিশুদ্ধতা, ভাবার্থ এবং প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিশেষ যত্ন ও বৈধ্য সহকারে অহুসদ্ধান করিলে প্রাচীন আমলের অনেক ঐতিহাসিক তথ্য জানিতে পারা যাইবে। প্রাচীন তথ্য জানিতে হইলে প্রাচীন পুঁথি ইত্যাদিও অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করা আবশ্যক।*

প্রাচীন ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলী হইতে খননকারীরা প্রয়োজনীয় সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারেন। সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বিষয় হইতেছে একটি নির্দিষ্ট কোন স্থানের এবং সেখানকার গৃহাদি

নির্মাণের কাল নির্ণয় করা। কোন ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক কিংবা পরিভ্রাজকের বিবরণী হইতে এ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা যাইতে পারে। ধরা যাক, প্রাচীন মহাকাব্যের যুগের কথা। রামায়ণে বর্ণিত আছে রামচন্দ্র অযোধ্যার রাজত্ব করিতেন। সেই কাব্যে রামায়ণী যুগে স্থানটির পারিপার্শ্বিকের যে বর্ণনা আছে তার সঙ্গে হস্ত বর্তমান অযোধ্যার কিছু কিছু মিল আছে। সকল শ্রেষ্ঠ কাব্যে যে সকল স্থানের অতিরঞ্জিত বর্ণনা আছে তার মূলমন্ত্র পাই আমরা সাধারণ বটভলার অল্প-মূল্যের কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে। সিংহল দেশীয় মহাবংশ নামক পালিগ্রন্থের আখ্যান হইতে বহু ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায়। মহাভারতে অঙ্গ, কলিঙ্গ, সুন্দ, পুণ্ড্র, প্রভৃতি বহু দেশের নাম আছে। পৌরাণিক কাব্যের বহু গল্পের মধ্যে ইতিহাসের মালমশলা ভরপুর। ভারতবর্ষের ঐশ্ব্যের বর্ণনা পড়িয়া বৈদেশিক রাজগণ এই দেশ জয় করিবার দোস্ত সংবরণ করিতে পারেন নাই। গ্রীসদেশীয় একজন ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন—“ভারতবর্ষে বহুজাতির বাস, তন্মধ্যে গদ্ধারিড জাতিই সর্বশ্রেষ্ঠ (অথবা সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী)। ইহাদের চারি সহস্র বৃহৎকায় অসজ্জিত রণহস্তী আছে, এই জন্তই অপর কোন রাজা এই দেশ জয় করিতে পারেন নাই। স্বয়ং আলেকজান্ডারও এই সমুদয় হস্তীর বিবরণ শুনিয়া এই জাতিকে পরাস্ত করিবার হুয়াশা ত্যাগ করেন।”

জি, এ, গ্রীয়ার্সন ‘মার্কচন্দ্র রাজার পান’ সংগ্রহ করিয়া উক্ত রাজার দেশ কোথায় ছিল, কারো বর্ণনা অল্পসংখ্য পূর্বক তাহা আবিষ্কার করিবার প্রয়াস পান। তিনি বুকানন-বর্ণিত প্রণালীতে প্রথমে কাছ আরম্ভ করিয়া দেন। সেই কাব্যে লিখিত আছে ‘কোট অর্থাৎ বহু স্থান ব্যাপিয়া যুক্তিকার বৃহৎ একটি গড়’ বিদ্যমান এই কথাটির উপর নির্ভর করিয়া তিনি রংপুরে উপরোক্ত স্থানটি আবিষ্কার করিতে যান। তিনি যাহা পড়িয়াছিলেন সে অল্পযায়ী কোন চিহ্ন সেখানে দেখিতে পাইলেন না। তিনি ময়নামতীর পূর্বে কোন প্রকার খাত কিংবা দরজা দেখিতে পাইলেন না, কিন্তু ইহার চল্লিশ ফুট দূরে এগুলি তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। নদীর মোহনা যেদিকে অবস্থিত বলিয়া কাব্যে বর্ণিত আছে তিনি ঠিক তাহার বিপরীত দিকে সেটি প্রবহমান দেখিলেন। শহরের দুই মাইল দক্ষিণে ময়নামতীর কোট তাঁহার নজরে পড়িল। তাঁহার পুস্তক হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম।

“It is in the form of a parallelogram rather less than a mile from north to south, and half a mile from east to west. The following sketch taken in riding round it, will enable the reader more easily to understand it than my account. The defences consist of a high rampart of earth, which at the south-east corner is irregular, and retires back to leave a space that is much elevated, and is said to have been the house of

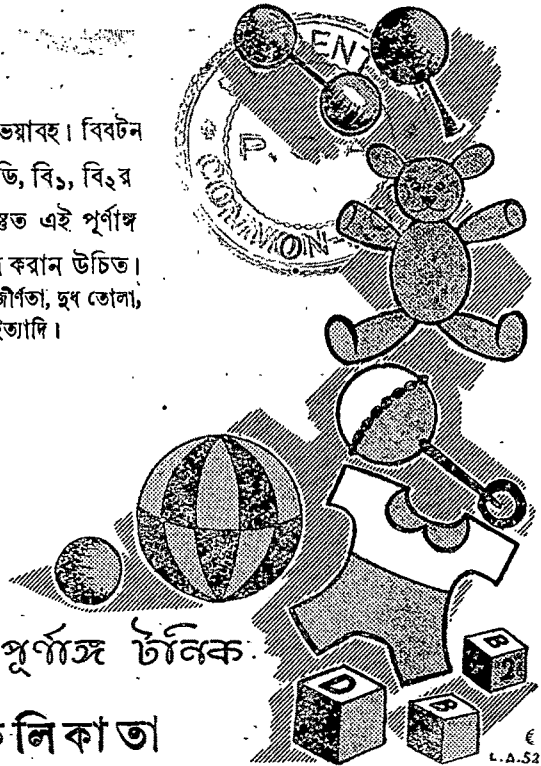
মায়ের কর্তব্য

শিশুপালনের সময়কালের অভাবে এদেশে শিশু-মৃত্যুর হার এত ভয়াবহ। বিবটন শিশুদের দৈহিক সর্বাঙ্গীণ পুষ্টিবিধান করিতে অধিতীয়। ভিটামিন ডি, বি১, বি২ সহিত মূল্যবান উদ্ভিজ্জ ও রাসায়নিক উপাদানের সংমিশ্রণে প্রস্তুত এই পূর্ণাঙ্গ টনিকটি প্রত্যেক শিশুকেই, বিশেষ করিয়া দন্তোদগমের সময়, সেবন করান উচিত। বিবটন নিম্নলিখিত রোগে বিশেষ উপকারীঃ—শিশুদের যকৃতের পীড়া, অজীর্ণতা, দুধ তোলা, পেট ফাঁপা, কোষ্ঠকাঠিন্য, রক্তশূন্যতা, রুগতা, ব্রুসাইটিস, সিকোটস ইত্যাদি।



একটি পূর্ণাঙ্গ টনিক

নিষ্ঠার এটিসেপটিকস্ • কলিকাতা



L.A.S2

the Raja's minister (Divan-Khana). On the east side I observed no traces of a ditch, nor gate, but a ditch about 40 feet wide surrounds the other three faces. In the centre of each of these is a gate defended by out-works, and in these are a good many bricks. At each angle of the fort has been a small square projection, like a sort of bastion, extending however only across the counter scrap to the ditch; and between each gate and the bastion at the corner are some others of similar construction. The earth from the ditch has been thrown outwards, and forms a slope without a covered way. At the distance of about 150 yards from the ditch of the north-east and south sides, are parallel ramparts and ditches which enclose an outer city, where it is said the lower populace resided. Beyond these on the south is another enclosure, in which it is said the horses were kept. Parallel to the west side of the city at about the distance of 150 yards runs a fine road very much raised but its ends have been swept away by changes that have taken place in the rivers." (T. R. A. S. B., 1778, pp. 136).

এই বিস্তৃত বর্ণনা হইতে সাধারণ ধ্বননকারিণি আবিষ্কার করিবার পদ্ধতির হৃদয় পাইতে পারেন।

শিলা, মুদ্রা, মূর্তি অথবা বাতুলকাদিতে উৎকীর্ণ লিপি পুস্তকগুলি (Epigraphic Texts) খুব মনোযোগ সহকারে পরীক্ষা করা প্রয়োজন। শিলালিপি ব্যতীত তাম্রকলক, বা পাহাড়ের গায়ে লিখিত লিপি কিংবা স্থতিস্তম্ভে উৎকীর্ণ

লিপি-পুস্তকে কিছু তথ্য যদি পাওয়া যায় তাহা হইলে পাঠোদ্ধারের ক্ষমতা প্রাপ্তি চেষ্টা করিতে হইবে। মুদ্রাগুলিতে খুব প্রাচীন আমলের রাজাদের সম্বন্ধে বহু তথ্য উৎকীর্ণ থাকে। যেমন অশোকের শিলালিপি হইতে সম্রাট অশোকের প্রজাতন্ত্র-রক্ষণ-প্রযুক্তির কথা জানা যায়। এই সকল শিলালিপি হইতে তৎকালীন দেশের অবস্থা অন্বেষণ করিতে পারি। সম্রাটগণের মুদ্রায় তাঁহার বীণাবাদনরত মূর্তি দেখিয়া স্বতঃই মনে হয় তিনি একজন সঙ্গীতপ্রিয় নৃপতি ছিলেন। গুপ্তরাজগণের শিলালিপি সমূহে বাংলার বহু পরাক্রান্ত নৃপতির নাম পাওয়া যায়। পাহাড়পুরের খোদিত প্রস্তর কিংবা পোড়ামাটির কলক হইতে তদানীন্তন সম্রাটের বহু তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়।

প্রাচীন মুদ্রাগুলি হইতে দেশের সভ্যতার স্বরূপ অবগত হওয়া যায়। গুপ্তযুগের পরে স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন হয়। তৎপূর্বে রৌপ্য এবং তাম্রমুদ্রার প্রচলন ছিল। আধুনিক যুগে প্রাচীন ইতিহাস আবিষ্কার করিবার যে সকল প্রণালী সমৃদ্ধ হইয়াছে তন্মধ্যে শিলালিপিসমূহের পাঠোদ্ধারের বিশেষ গুরুত্ব আছে। এই সকল লিপি যে স্থানে আছে সেই স্থানে কিংবা ত্রিকটবর্তী স্থানসমূহ যত্র সহকারে পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ করিলে উদ্ভেদ্য সিদ্ধ হইতে পারে। সকলপ্রকার শিলালিপি, স্থল নক্সা, মহাদৃশ্যাবলী (panoramas) এবং নানা প্রকার প্রাচীন চিত্রাবলী ইত্যাদি হইতে ধ্বননের সহজ আবিষ্কার করিবার হৃদয় মিলিতে পারে।



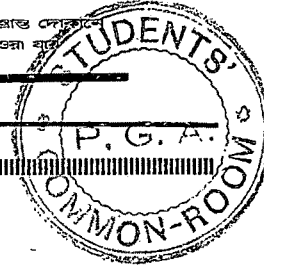
ক্যালকাটা
কেমিক্যাল

দুর্লভ নয় মোটেই -

তরুণদের পেলব কোমলতা ও লাবণ্যমণ্ডিত সৌন্দর্য্য স্বেচ্ছা প্রকৃতির দুর্লভ দান। নিখিল তরুণীর পরম কাম্য-বস্তু রূপের এই ঐশ্বর্য্য। প্রাকৃতিক যুগে নারীর পক্ষে এ সম্পদ দুর্লভ ছিল বটে, কিন্তু একালে 'ক্যাল-কেমিকো'র সম্বন্ধে প্রস্তুত প্রসাধনী দেহের সৌন্দর্য্যকে প্রত্যেক রমণীর হাতের কাছে এনে দিয়েছে।

☆ তুহিনা বিউটিফিক
☆ স্বেচ্ছা চম্পু পাউডার
☆ পাবনা মোএক ক্রীম

প্রাচীন নাবিক এবং বণিকেরা বাণিজ্যব্যপদেশে দেশ-দেশান্তর হইতে এখানে আসিত। তাহাদের কাহিনীগুলি এক দিন ছিল ইতিহাসের বিষয়বস্তু, কিন্তু আজ তাহা ঐতিহাসিক সত্য ও তথ্য হইতে বিচ্যুত হইয়া রূপকথা, লোকসাহিত্য এবং সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত হইয়াছে। এই সমস্ত কাহিনী অনুধাবন করিলে অনেক ক্ষেত্রে খনন-কার্যে বিশেষ সাহায্য পাইতে পারি। চাঁদসদাগর, ত্রীমন্ত প্রভৃতি সওদাগরদের সমুদ্রযাত্রার কাহিনী হইতে একদা যে ভারতের নিকটবর্তী দ্বীপপুঞ্জের সহিত তাহাদের বাণিজ্যিক আদানপ্রদান ছিল তাহা বেশ বুঝা যায়। ইন্দোনেশিয়া, ব্রহ্মদেশ, সিংহলদেশের প্রাচীন কাহিনী পড়িয়া সে যুগে সেই স্থানের সহিত পরিচিত হইবার ক্ষমতা কত ভারত-সন্তান ঘর ছাড়িয়া অজানার উদ্দেশে পাড়ি দিয়াছিল। সেই সকল দেশে প্রাচীন ভারতীয় পদ্ধতিতে নির্মিত মন্দির দেখিয়া অতীত ভারতবর্ষের প্রভাব কতটা বিস্তৃত হইয়াছিল তাহা অনুমান করা যায়। ঐরূপ দেশের নামের তালিকা (toponymy) হইতেও আবিষ্কারের অনেক সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে। এম, রেগে, ডুসাইড বলিয়াছেন— 'toponymy and topology remain useful auxiliary training but are inadequate. It is necessary to call in archæology.' প্রাচীন দেশগুলির নাম আবিষ্কার করা খুবই কঠিন, তাহা হইলেও এই বিষয়ে



নেতাজীর অনুসরণে :—

বাংলার বিখ্যাত স্থত ব্যবসায়ী শ্রীঅশোকচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় ও তাঁহার “শ্রী” মার্কা স্থতের নূতন পরিচয় বাঙ্গলাদেশে নিশ্চয়োজন। আজকাল বাংলার প্রতি গৃহে, উৎসবে, আনন্দে ‘শ্রী’ স্থতের ব্যবহার অত্যাৱশ্যক হইয়া পড়িয়াছে, বাজারে তেজাল স্থতের যেরূপ প্রয়াস দেখা যায়, তাহার মধ্যে শ্রীযুক্ত অশোকবাবুর বিশুদ্ধ স্থত যে খ্যাতি অর্জন করিয়াছে, তাহা স্থত ব্যবসায়ী মাত্রেরই অনুকরণীয়।

স্বাঃ শ্রীমুভাষচন্দ্র বসু

সম্যক ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে হইলে প্রত্নতত্ত্ব পড়া আবশ্যিক। লোকসাহিত্য কিংবা প্রাচীন কাব্যগুলি খুব যত্ন সহকারে গুণ্ঠাগুণ্ঠভাবে অধ্যয়ন করিয়া সেগুলিতে লিপিবদ্ধ বিভিন্ন দেশ এবং অঞ্চলসমূহের নাম এবং বর্ণনা হইতে অহুমানের উপর নির্ভর করিয়া মোটামুটি একটি মানচিত্র আঁকিয়া বর্তমান মানচিত্রের সহিত তুলনা করিলে এ সম্বন্ধে অনেকটা সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছবার সম্ভাবনা আছে। প্রত্নতত্ত্বাদি আবিষ্কারকার্যে স্থানীয় উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রাম্য মোড়ল, কৃষক, সাধুসন্ন্যাসী, পিয়ন, পেয়াদা এবং অভিজ্ঞ বৃদ্ধব্যক্তি প্রভৃতি সকলের নিকট হইতেই নানা ধরনের সংগ্রহ করা যাইতে পারে যায়। যদি কোন স্থানে লোকমুখে তথ্য সংগ্রহ করিবার সম্ভাবনা না থাকে তাহা হইলে শুপ, ভগ্নপ্রাঙ্গণ কিংবা অন্ত কোন স্থল অবলম্বন করিয়া চেষ্টা করা প্রয়োজন। গ্রাম্য লোকদের মুখ হইতে নানা প্রকার তথ্য সংগ্রহ করিয়া তাহাকে ঐতিহাসিক সত্যের আলোকে যাচাই করিয়া লইবার চেষ্টাও করিতে হয়। অবশ্য তাহাদের অনেক অবাস্তব কথা শুনিতেও হইবে, কিন্তু তাহাতে বিরক্তি বোধ করিলে চলিবে না। গল্প শুনিতে শুনিতে স্থানগুলি কোথায় আছে তাহা দেখাইয়া দিবার ক্ষমতা তাহাদের অনুরোধ করা প্রয়োজন। সেইস্থানে ঠিক তাহাদের এক জন হইয়া কাজ করিতে হইবে। তাহাদের সহায়ত্ব আকর্ষণ করিবার ক্ষমতা গ্রাম্য পঞ্চায়েতের বৈঠক ও বিভিন্ন পূজাপার্বণ ইত্যাদিতে যোগদান করিয়া প্রমাণ করিতে হইবে আবিষ্কারপ্রণালী তাহাদেরই এক জন। তাহাকে কিছু কিছু চিকিৎসা-বিজ্ঞা শিক্ষা করিতে হইবে। বিনামূল্যে গ্রাম্য লোকদের চিকিৎসা এবং সেবা-সুস্বাদাদির ব্যবস্থা করিলে তাহারা কৃতজ্ঞতাবশতঃ প্রাচীন ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কারে সাহায্য করিবে।

প্রাচীনকালে সমগ্র এশিয়ার বহু অঞ্চল এবং মিশর দেশের বড় বড় শহর ও গ্রামগুলি ধ্বংসস্থাপে পরিণত হইয়াছিল। এই সমস্ত প্রত্নতত্ত্ব খুবই চিত্তাকর্ষক। আভিন সাহেব

ঐতিহাসিক ধননের নিম্নলিখিত আটটি ধারার উল্লেখ করিয়াছেন :—

- (১) সামারন নগর বা জেলার বিস্তৃত বর্ণনা
- (২) কোন নির্দিষ্ট স্থানের সংকেত
- (৩) ভূতত্ত্বের সংকেত
- (৪) মাহুঘের কার্যপ্রণালী
- (৫) যুদ্ধের বর্ধনের সংকেত
- (৬) ঘরের রং
- (৭) চৌধক সংকেত
- (৮) জীবিতদের সংকেত

ঐতিহাসিকেরা ভগ্ন পাথর-শূণ্যের মধ্যে অতীত যুগের প্রাণম্পন্দন শুনিতে পান, ভগ্নশূণ্য সরাইয়া তাঁহারা অতীত যুগের আত্মাকে উদ্ঘাটিত করেন।

চেষ্টা থাকিলে দুর্গম স্থানেও ধননকার্য করা যায়। জে. ডি. মরগান মরুভূমিতেও কিরূপ প্রাগৈতিহাসিক তথ্য আবিষ্কার করা যায় তৎসম্বন্ধে বলিয়াছেন—

“Prehistoric and primitive cemeteries can be recognized in the desert where the ground shows a quantity of spots, of clear sand very near one another. The spots corresponding to the tombs of which the earth is heaped up are caused by a depression which the wind fills afterwards with fire sand. The tombs show the same external appearance as the vaults of an early historic period, it is necessary to make some investigations, then, once the cemetery is discovered, it is enough to attack all the points in which an iron bar will easily pierce again.”

আবিষ্কারের কতকগুলি মাত্র প্রণালীর উল্লেখ করা হইল। ভূগর্ভে প্রাচীন কুপ্পি ও সভ্যতার অনেক সম্পদ নিহিত আছে। ধননকারীদের স্মরণ রাখিতে হইবে তাহা আবিষ্কার করিতে হইলে বৈদ্য, অধ্যবসায় এবং শিক্ষা এই তিনটির বিশেষ প্রয়োজন।

বাসন্তী স্বত

বিশুদ্ধ দুগ্ধজাত

টেলি:—বাসন্তী বি. ফোন—বি.বি, ৫৭৩৮ পো: বক্স ৬৮৩৬ কলি:

ঘি, সুগারমার্কেটস, এক্সপোর্টার্স, ইম্পোর্টার্স ও
জেনারেল অর্ডার সাপ্লায়ার্স

প্রমথনাথ পাল এণ্ড সন্স

২১, রামকুমার রক্ষিত লেন, কলিকাতা—৭।

পুস্তক-পাঠ্য

স্বর্গাদপি গরীয়সী—(তৃতীয় খণ্ড) ক্রীবিভূতিভূষণ
মুখোপাধ্যায়। জেনারেল প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স লিঃ।
১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—৪১ টাকা।

তৃতীয় খণ্ডে এই সুবৃহৎ উপজ্ঞাস শেষ হইয়াছে। বাংলা ও
বিহারের পটভূমিতে সেকালের সমাজ ও রীতিনীতি-পরিপুষ্ট এক
শুচিশুদ্ধ জননী-মূর্তিকে লেখক পরিপূর্ণ মধ্যাদায় প্রতিষ্ঠিত
করিয়াছেন। এই মহিমময় জীবন বাহিরের সংঘাতে চঞ্চল নহে
—কিন্তু চঞ্চল নহে বলিয়াই যে বৈচিত্র্যহীন তাহাও নহে। বিস্তীর্ণ
ভারতের ক্ষুদ্র এক কোণে শান্তিময় নীড় বাধার মহোৎসব এর
লাগিয়াই আছে। পুষ্পকোরক বৃন্তলয় হইয়াও বাহিরের
আলোককে আশ্রয় করিয়া মগ্নের উত্তাপে যেমন বহু বর্ষরঞ্জিত
হইয়া একদিন আত্মপ্রকাশ করে—তেমনি স্নেহ-প্রীতি-প্রেম-সখা-
সজ্ঞাত-বৃন্তগুলির বৈচিত্র্যে অন্তর-লাবণ্যে উদ্ভাসিত হইয়া প্রকাশ
পাইয়াছেন এই মা। পলাতক কাল পৃষ্ঠে কোন চিহ্ন বহন করে
না—স্মৃতিভারে সে লুপ্ত নয়, কিন্তু স্মৃতি-সৌরভে তার প্রত্যেকটি
মুহূর্ত অভিযুক্ত। নিরবধি কালের পৃষ্ঠপটে মাতৃ-কেলিক বহু
ছবি বহু রীতি-আচার—বহু কাহিনী-সংলাপ ফুটিয়াছে। যে দাগ
জীবনের অস্থিমজ্জায় আঁকা থাকে—সে দাগ এই কাহিনীর
মধ্যে নাই—থাকিলেও এ কাহিনীর উপজীব্য তা নয়। এর
মধ্যে আছে যুগ কমল-সৌরভ—যে কমলের চারিদিকে বিরিয়া
আছে উষ্মকম্পিত জলরাশি—কমলবৃন্তের প্রতি দণ্ডের—কাঁটার
আঘাত অদৃশ্য, জলের দাগও পাপড়িকে ম্লান করে না। তবু
সম্পদে-বৈচিত্র্যে-ভরা এই কাহিনীও হৃদয়ে কোঁতুল জাগায়—
অন্তরকে আচ্ছন্ন করে—এবং মধুর রসে আপ্রাণ্ত করিয়া উর্দ্ধলোকে
লইয়া যায়।

গভীর নিষ্ঠা ও বাস্তববোধের দায়িত্ব লইয়া লেখক স্বর্গাদপি
গরীয়সী রচনা করিয়াছেন। এই রচনা তাঁর সার্থক ও সুন্দর
হইয়াছে।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

নেতাজীর জীবনবাদ—শ্রীঅনিল রায়। প্রেসিডেন্সী
লাইব্রেরী, ৬৪, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ১০৬, মূল্য ১১০।

গাঁচটি অধ্যায়ে সংক্ষেপে অথচ পরিষ্কার ভাবে সুভাষ-
চন্দ্রের আদর্শ ও কর্মজীবনের আলোচনা করা হইয়াছে।
নেতাজী একদিকে যেমন মহাত্মাজীর অহরন্তর হইয়াও ভিন্ন
আদর্শের অনুগামী, অন্যদিকে তেমনি তাঁহার আদর্শ
মার্ক্সবাদ ও নাৎসীবাদ হইতেও পৃথক। তিনি সমাজতন্ত্রবাদ
মানেন অথচ তিনি জাতীয়তাবাদী—নাৎসী সম্প্রদায়ের
মত বিকৃত সমাজতন্ত্রবাদী নহেন। ভারতীয় সংস্কৃতি
ও ঐতিহ্যের প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠাই নেতাজীর জীবনের
অপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। সুভাষচন্দ্রের জীবনবাদকে এজন্য ভারতীয়
সাম্যবাদ বলা চলে। সমসাময়িক সাম্প্রদায়িকতা ও নানা
মতবাদের উর্দ্ধে ও বাহিরে থাকিয়া বাদ্যালী সুভাষচন্দ্র যে
আদর্শ দেশের সমুদ্রে ধরিয়াছেন তাহা জাতীয় জীবনের অমূল্য
সম্পদ। এছকার অতি সুন্দর ভাবে নেতাজীর জীবনবাদ
বাদ্যালী পাঠকের নিকট উপস্থাপিত করিয়াছেন। দেশের
যুবকগণ এই গ্রন্থ পাঠ করিলে উপকৃত হইবেন।

সমাজতন্ত্রীর দৃষ্টিতে মার্ক্সবাদ—শ্রীঅনিল রায়।
পৃষ্ঠা ২১৬, মূল্য ২১০।

দমদম জেলে লেখক যে ব্যক্তিত্ব প্রদান করিয়াছিলেন
তাহাকে ভিত্তি করিয়া বর্তমান গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে।
অনেকে মার্ক্সবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদকে একই জিনিষ বলিয়া ভুল
করেন। মার্ক্সের দর্শন পূর্ববর্তী সকল দর্শন হইতে পৃথক,
ইহা ক্ষুদ্রবাদের এবং ইতিহাসের আর্থিক ব্যাখ্যার উপর
প্রতিষ্ঠিত। শ্রেণীসংগ্রাম ইহার মূল কথা। এবং এই দার্শনিক
মতবাদ অনুসারে শেষ পর্যন্ত শ্রেণীহীন ও রাষ্ট্রহীন সমাজই
মানবজাতির পরিণতি। লেখক বহু যুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা
মার্ক্সবাদের অযৌক্তিকতা দেখাইতে সমর্থ হইয়াছেন। এই

বিশ্বসাহিত্যে
অমর দান

কথামাহাত্ম্যম্

বঙ্গোপন্যাস

(ঠাকুরদাদার বুলি)

সমুদ্র নেত্রী

চারু ও হারু

২১০

—নিখিল-ক্লাসিক বাংলার উপজ্ঞাস— ৪

... বাংলার শাস্ত্র সাহিত্য ...

চিরদিনের রূপকথা

বাংলার ভ্রতকথা

দাদামহাশয়ের থলে

— সমগ্র দেশ-বিদেশ —

— জগতের বাঙ্গালীর —



জাগ্রত-জাতি-গঠন বই ২১০

এই পাঠে এদেশে বর্তমানে বহুল প্রচারিত মাদ্র বাবের প্রকৃত স্বরূপ ও ভারতীয় সভ্যতার উপর উহার প্রতিক্রিয়া কি তাহা সুশ্রদ্ধিত হয়। এক্ষণে পুস্তকের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

ଶ୍ରୀଅନାଥବନ୍ଧୁ ଦତ୍ତ ।

সমাজ, সংস্কার ও সংগঠন—নবভাব লাইব্রেরী,
১নং কাঁকড়াগাছী কাছ লেন হইতে ত্রিজ্ঞানেন্দ্রনাথ বিশ্বাস
কর্তৃক প্রকাশিত। ২৪ পৃষ্ঠা। মূল্য ১/০ আনা মাত্র।

হিন্দু-সমাজকে সংস্কৃত ও শক্তিশালী করিবার ব্রত লইয়া এই পুস্তিকা প্রকাশিত। বর্তমান যুগে যে প্রতিযোগিতার সম্মুখে এই সমাজ পড়িয়াছে তাহাতে বিজয়ী হইতে হইলে অসমর্থ হইতে হইবে, অনেক সময় হইতে হইবে আক্রমণশীল। হিন্দু-সমাজ অনেক দিন হইতেই ছত্র-তপ। এই সমাজকে নতুন ভাবে সংগঠিত করিয়া তুলিবার চেষ্টা আরম্ভ হয় এক শত বৎসর পূর্বে, রামমোহন রায়ের সময় হইতে। আজ স্বাধীন ভারতে সেই চেষ্টায় নতুন করিয়া হাত দিতে হইবে, এই পুস্তক তার সহায়ক হইবে। মোদাখালিতে সম্প্রদায়-বিশেষের বর্ষেরোচিত আক্রমণের পর সে সময়ে রক্ষণশীল হিন্দু-সমাজে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছিল ও এরূপ আপদ নিবারণের জন্য যে ব্যবস্থাদি প্রস্তাবিত হইয়াছিল, ইহাতে তাহার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। এরূপ সংগ্রহের একটা নমুনা আছে।

শ্রীসুরেশচন্দ্র দেব

জনগণ-অধিনায়ক (নাটক)—শ্রীসমর সরকার।
 এইচ, সরকার এণ্ড সন্স। ৩৬, লাইব্রেরী রোড, কলিকাতা।
 মূল্য—দুই টাকা।

দেশের জ্ঞানী, জ্ঞানী, কবি, মনীষী এবং মহান ব্যক্তিত্বকে
কেবল করিয়া জীবনী-নাট্য রচনার পথ প্রদর্শক সম্ভবতঃ
'বনকুল'। 'ঐমথুদন' এবং 'বিভাসাগর' বাংলা নাটকের
বহু দিনের এই অভাব পূর্ণ করিয়াছে। ইতিপূর্বে বাংলার
প্রখ্যাতনামা নাট্যকারেরা জীবনী-নাটককে প্রায় উপেক্ষা
করিয়াই সিঁচাছেন। আনন্দের বিষয় লেখক আমাদের এই

বরণের আর একধানি নাটক উপহার দিয়েছেন এবং বলিষ্ঠ দ্বিধা নাই তিনি সাফল্যলাভও করিয়াছেন আশাতীত রূপে।
বুটশ-শাসনে নিপীড়িত জাতির পরবর্ত্ততার অবশান ঘটাইবার
জন্ত 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' এবং তাহার সর্বাধিনায়ক রূপে
নেতাজী সুভাষচন্দ্রের অলৌকিক বীরত্ব এবং সংগ্রাম-কুশলতার
কাহিনী আজ জনসাধারণের চিতে বিপুল ব্যাধা লাভ
করিয়াছে। ভারতের বাহিরে দেশের মুক্তি-সংগ্রামের এই
অধ্যায়টি গ্রহণকার অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী করিয়া নাটকের
মাধ্যমে পরিবেশন করিয়াছেন। সুভাষচন্দ্রের রাজনীতিক
প্রজ্ঞা, ভবিষ্যদ্বৃত্তি, ধৈর্য্য, সাহস, সংগ্রাম-পরিচালনার তাঁহার
অপূর্ণ দক্ষতা—সৈনিকদের উপর তাঁহার মহান ব্যক্তিত্বের
অতুলনীয় প্রভাব—জাপানের সাহায্যগ্রহণ-সত্ত্বেও 'আজাদ-
হিন্দ-গবর্নমেন্ট'কে জাপানের তাঁবেদার হিসাবে বিনিয়োগ
করিতে না দিবার জন্ত তাঁহার দৃঢ়তা—আপন জীবননাশে
উজ্জ্বল গুণবাতকের প্রতি করুণাপ্রদর্শন প্রভৃতি নেতাজীর
বিরাট ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিক এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের
সংগ্রাম-প্রচেষ্টার উজ্জ্বল রূপটি ছোটখাটো ঘটনা-বিবরণের
সাহায্যে কুশলী নাট্যকার পাঠকের মানসলোকে তুলিয়া
বরিয়াছেন। স্বাধীনতা-যুদ্ধের প্রেষ্ঠ হোতা সুভাষচন্দ্রের
'নেতাজী' রূপটি তিনি সার্থক ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন।
সংলগ্ন মাঝে মাঝে একটু দীর্ঘ হওয়া সত্ত্বেও ভাষার মাধুর্য্যের
গুণে পড়িতে কোথাও বিরক্তিকর মনে হয় না। 'জনগণ-
অধিনায়ক' আপন রসমাধুর্য্যে জনচিতে আসন লাভ করিবে
তাঙ্গা নিশ্চিত।

শ্রীমন্মথকুমার চৌধুরী

তদ্ভাতুরা—শ্রীশচীন্দ্রনাথ মিত্র । প্রবর্তক পাবলিশার ।

৬১ বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা। দাম—৪৫০।

রাজনৈতিক পটভূমিকায় লিখিত, ৩৯৮ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত একখানি
সুবহুৎ উপগ্রাস। নানা প্রকৃতির বহু চরিত্র উপগ্রাসে স্থানলাভ
করিয়াকে, কিন্তু কোন একটি চরিত্রও বিশেষভাবে মনকে নাড়া
দিতে সক্ষম হয় নাই। উপগ্রাসের একটি প্রধান চরিত্র বিষ্ণু—কিন্তু
যে রূপে উপগ্রাসের সূচনায় তার দেখা পাওয়া গিয়াছিল
একটি গুপ্তসমিতির সভাদের সংস্পর্শে আসিয়া, বিশেষ করিয়া

ଶିକ୍ଷା ନୀତି ଓ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀର ବିକାଶ - ତାଲିକା

শিবরামের গল্পের মধ্যে জ্ঞানের কথা,	দেবতার জন্ম	৩১	এতই রস আর রসান যে কেবল পড়ে গেলেই
গভীর তত্ত্ব, জীবনদর্শন, সমাজ-সচেতনতা,	মেয়েধরা ফাঁদ!	২১০	কেমন ক্ষতি লাগে—যদি তার গভীরে
মানুষের দুঃখকষ্ট এবং তার জন্ম কাতরানি,	আত্মীয়তা বজায় রাখা সোজা নয়	২১০	আপনি নাও তলান। তলিয়ে দেখলে হয়তো
প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ এবং প্রকাশ্য দরদ, রহস্য,	প্রেমের বিচিত্র গতি	৩১	বা উপরের ঐশ্বর্যগুলিও আপনার নজরে
বিশ্বয়, কোতুলক, রোমাঞ্চ এবং রোমাঞ্চ এ	মেয়েদের মন	২১০	ঠেকতে পারে—কিছু বিচিত্র নয়। (যদিও
সবই হয়ত আছে, ওতপ্রোতভাবেই রয়েছে	বাড়ি থেকে পালিয়ে	২১	সে এক রসাতল কাণ্ড)।—কিন্তু তাহলেও)
হয়তো—যদিও সেটা সন্দেহস্থল। কিন্তু	বিনির-কাস্তাকারখানা	২১০	এছাড়াও মুখ্য কথা, আপনার অবকাশের
একটি বিষয় একেবারেই সন্দেহাতীত যে	শিল্পাচকরব্রতীর মতো কথা		মুহুর্তগুলি অদ্রুত আনন্দে কাটাতে
তার লেখা বেশ মজাদার—এমনি পড়তেই	বলার বিপদ	২১০	হ'লে শিবরামের এক সেট বইয়ের মতো
এত আমোদের—পড়ে পড়ে এবং ছড়ে ছড়ে			এমন বন্ধু আর কিছুই হতে পারে না।

অ জ ভ্র কা টু ন - না স্থি ত স ব গু লি ই স ন্য ন হা স্য ক র

দি বুক এন্ডো রিয়ার লিঃ-২২১, কনডোআনিস ট্রিট, কলিকাতা-৬

বলার বিপদ ১৭০ 'এমন' বন্ধু আর কিছুই হতে পারে না।

মানবিক ও পরমাণবিক

বিষ্ণু মুখোপাধ্যায়

মানবজাতি নিরোজিত পরমাণু শক্তি সমগ্র পৃথিবীতে কী স্থগীত আশীর্বাদই না বহন করে আনতে পারে। কিন্তু ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ পৃথিবীকে সেই আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত করে আর এক সর্বনাশা যুদ্ধের জন্ত পরমাণু শক্তির একচেটিয়া মালিকানা অধিকারের যে হীন বড়বন্দে লিপ্ত তারই চমকপ্রদ ও তথ্যপূর্ণ বিবরণ। দাম দু টাকা আট আনা

অবরোধ

বিজয় ভট্টাচার্য

ক্ষয়িষ্ণু ধনিক শক্তি আর আগামী সভ্যতার ধারক নবজাগ্রত শ্রমিক শক্তি—এই দুয়ের অন্তর্নিহিত ঘন্থের ওপর ভিত্তি করে লেখা পূর্ণাঙ্গ নাটক। এই লেখকেরই লেখা কৃষক জীবনের অপরূপ আলোখ্য 'নবান্ন' নাটকের পর শ্রমিক সমস্রামূলক এই নাটক নাট্যমাহিতো নতুন পথের নির্দেশ দেবে। দাম দু টাকা আট আনা।

পারীর পতন

ইলিয়া এরেনবুর্গ

স্টালিনপ্রাইজপ্রাপ্ত যুগান্তকারী উপস্থাপনের বঙ্গানুবাদ। গত মহাযুদ্ধ এবং তার আগের ফরাসী সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবনের নিখুঁত ছবি। একটি মহান জাতি ও দেশের মম হৃদয় পতনের কথাচিত্র। অনুবাদ করেছেন : অমল দাশগুপ্ত, রবীন্দ্র মজুমদার, অনিলকুমার সিংহ। দাম প্রতি খণ্ড : ৪, ৩, ৪। একত্রে তিন খণ্ড—দশ টাকা।

আধুনিক চীনা গল্প

লু শুন, লাও চাঅ, তিঙলিঙ প্রভৃতি নিষ্ঠুর বিদেশী শাসকের শোষণ ও অত্যাচারে রক্ত ও বঞ্চিত চীনের সাধারণ মানুষ কি অমানুষিক ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে নতুন মানব-সমাজ গড়ে তুলেছে তা আজ জগতের বিস্ময়। নতুন চীনের জনজাগরণের কাহিনী—“আধুনিক চীনা গল্প”। বর্তমান চীনের শ্রেষ্ঠ লেখকদের আটটি সমাজ-সচেতন গল্পের সংকলন। অনুবাদ করেছেন : অমল দাশগুপ্ত। দাম তিন টাকা আট আনা।

নবজাতক

ম্যাক্সিম গোর্কী

বহু যুগের পুঞ্জীভূত অবহেলায় যারা রান, যারা অবজ্ঞাত, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, হৃৎ-দ্রুতের ওপরে লেখা ম্যাক্সিম গোর্কীর সাতটি শ্রেষ্ঠ গল্পের সংকলন। শক্তিমান ও বিত্তশালীরা বন্ধনা বাদের দাবিয়ে রাখতে পারল না, নতুন কালের গণশক্তির বাহক সেই সব মানুষের রসাতীর্ণ কাহিনী। নীহার দাশগুপ্তের অনুবাদ। দাম তিন টাকা চার আনা।

ছোটদের জন্য

সকল দেশের সেবা

ব্রজেননাথ ভট্টাচার্য

সকল দেশের সেবা কোন্ দেশ? সে তো আমাদেরই ভারতবর্ষ। এ দেশের বহু মণিষী আর আত্মত্যাগী বীর যে ভারতবর্ষকে ধ্যান করে আত্মদান করেছেন, তাঁদের সেই ধ্যানের ভারতবর্ষকে মুষ্টিময়ী করে তোলার কাজে ভবিষ্যৎ নাগরিকদের পক্ষে এ বই অপরিহার্য। ছবি আর সরস লেখায় গল্পের মত মনোরম হয়ে উঠেছে ভারতবর্ষের পরিচয়। দাম দু টাকা চার আনা।

স্বমতাদানী ছড়া

সুকান্ত ভট্টাচার্য, মঙ্গলাচরণ

চট্টোপাধ্যায়, বিষ্ণু দে,

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র

ছোটদের অপরূপ ছড়ার বই। ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রধান কয়েকটি ঘটনার ওপরে ছড়া কেটেছেন চারজন কবি চার রকম ভাবে। পাতায় পাতায় স্বর্ষ রায়ের অজস্র রঙীন ছবি। দাম তিন টাকা।

অনুদাতা

কৃষ্ণ চন্দর

তেরশ পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষলঙ্ঘিত বাংলার মানবতার অপমৃত্যু ঘটাবার জঘন্য ষড়যন্ত্রের কাহিনী। কৃষ্ণ চন্দরের বলিষ্ঠ লেখনীতে পদদলিত জীবনবোধ ও নীতিবাদের বীভৎস বিকৃতির প্রতিফলন। অবস্খী সাহালার অনুবাদ। দাম এক টাকা আট আনা।

পুতুলনাচের ইতিকথা

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

আতকের মানিকবাবুর সমাজ-সচেতন সাহিত্যের মূলস্থল রয়েছে—“পুতুলনাচের ইতিকথা”র জটিল আধুনিক সমাজব্যবস্থার চাপে মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে পদে পদে বাধা পেতে দেখে তাঁর মনে হয়েছিল মানুষ যেন অদৃষ্টের হাতে খেলার পুতুল। সেই যান্ত্রিক মানুষের ভাঙ্গা-গড়ার অপরূপ কথাচিত্র। দাম পাঁচ টাকা।

ইংরেজী ও বাংলা বইয়ের তালিকার জন্ত চিঠি লিখুন

ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশিং হাউস লিমিটেড

৩০, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা—১৬;

শাখা : ‘নতুন বই’ লালদীঘির পাড়, চট্টগ্রাম।

ডি, পি, চ্যাটার্জি, ৭৬০ পার্শ্ব কলোনি, দাদার, বোম্বাই।

পুষ্পের সান্নিধ্য লাভ করিবার পর তার সে চরিত্রবল, ভদ্রতা, সভ্য আচরণ সবই টুটিয়া গেল এবং তার স্থানে আত্মপ্রকাশ করিল নারী-প্রসাদলোভী এক দুর্বলচরিত্র পুরুষ। লেখকের সৃষ্ট নারী-চরিত্রগুলিও উদ্ভূত। সংঘের কল্যাণের জন্য পুষ্প নিজেই দেহকে পর্যন্ত বিসর্জ্য কাছে বিকাইয়া দিতে প্রস্তুত হইয়াছিল। আর বন্দনা—সে তো নন্দমার দুর্গন্ধপূর্ণ আবর্জনা। এই ধরণের নারী-চরিত্র উপস্থাসে কেন যে স্থানলাভ করিল তাহা আমাদের ধারণার অতীত। অথচ উপস্থাসের মধ্যে লেখকের ক্ষমতার পরিচয়ও যে পাওয়া যায় না, তাহা নহে। বজ্রতকে মোটের উপর ভাল লাগিল। লেখকের ভাষা সহজ, বলার ভঙ্গী ভাল।

জাগ্রত-জীবন—রবেন রায়। দেবপ্রী সাহিত্য সমিতি। ৯৯এ, তারক প্রামাণিক রোড, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ১২৭। দাম দুই টাকা।

গ্রাম্য জীবনের কয়েকটি সমস্যা কেবল করিয়া উপস্থাস্থানি লিখিত হইয়াছে। যে সমস্যা গ্রাম্য সামাজিক জীবনে একটা মারাত্মক ব্যাপ্তিরূপে—গ্রন্থকার এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া তাহার বিচার করিয়াছেন। স্থানে স্থানে উপস্থাস্থানি বেশ জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। আগাগেড়া এই গতি অধ্যাহৃত থাকিলে আমরা একখানি ভাল উপস্থাস পাইতে পারিতাম। কিন্তু কতকগুলি অব্যাহিত, অশোভন পরিস্থিতির যষ্টি করাতে রস কিছু ক্ষুণ্ণ হইয়াছে।

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

জনকল্যাণে সোভিয়েট বিজ্ঞান (সচিত্র)—

শ্রীজিতেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। পুস্তকালয়, ২৯ রামানন্দ চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলিকাতা। ১৫৫ পৃষ্ঠা, মূল্য ৩।

কঃ পন্থা—শ্রীধাণ্ডবমিল মুখোপাধ্যায়। বীণা লাইব্রেরী, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। ১৩৬ পৃষ্ঠা, মূল্য ৩।

সোভিয়েট রাশিয়া সম্বন্ধে দুইখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ, কারণ পুস্তক দুই খানি—রাশিয়া সম্বন্ধে যথেষ্ট চিন্তা করিয়াছেন ও উচ্ছাস বা দলগত সংস্কার হইতে বিমুক্ত হইয়া তথ্যপ্রমাণাদি সহযোগে বুঝাইতে চাহিয়াছেন এমন দুই জন অধ্যাপক কর্তৃক লিখিত। আমরা ইউরোপের মধ্যে পূর্বে জার্মানীকে বিজ্ঞান বিষয়ে সমধিক অগ্রসর ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিতাম, কিন্তু বর্তমানে বিজ্ঞানের সাহায্যে রাষ্ট্র, সমাজ ও দেশের বিভিন্ন বিভাগে সোভিয়েট রাশিয়া যে বিপুল ধ্বংসকর উন্নতি ও জনকল্যাণ সাধন করিতেছে তাহা প্রথম গ্রন্থখানি পড়িলে জানিতে পারা যায়। ‘এ নহে কাহিনী, এ নহে স্বপন’, সত্যই রাশিয়ার বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইহার সার্থক প্রয়োগ বিস্ময়জনক ও পড়িতে কোতূহলের উদ্রেক করে। গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে বিজ্ঞান ও সোভিয়েট, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে রাশিয়ার ভৌগোলিক পরিচয় ও বৃহত্তর রাশিয়ার সংস্থান আলোচিত হইয়াছে। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে রাশিয়ার শিল্পের প্রসার, কৃষি-উন্নয়ন, রাশিয়ার সমুদ্র ও মরুপথ, পশুপালন ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতি ও শেষ অধ্যায়ে যন্ত্রাঙ্কসূত্রী কল্যাণী মূর্তি ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সংখ্যাতত্ত্ব ও তথ্যপ্রমাণাদি সহকারে রাশিয়ার বিজ্ঞানের সাহায্যে এই সর্বাঙ্গীন উন্নতিসাধনের কাহিনী পড়িলে মানুষের বিরাট কার্যক্ষমতা ও উত্তমের অনন্ত সম্ভাবনা সম্বন্ধে একটা হৃৎস্পষ্ট ধারণা জন্মে।

দ্বিতীয় গ্রন্থ ‘কঃ পন্থা’ও সোভিয়েট রাশিয়ার বিভিন্ন বিভাগের উন্নতি সম্বন্ধে লিখিত। কিন্তু বইখানির নামকরণ সমাটীন হয় নাই, কারণ ইহা কি কতকগুলি দার্শনিক, সামাজিক অথবা রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক প্রবন্ধের সমষ্টি, তাহা কিছুই বুঝায় না, সোভিয়েট রাশিয়া বা সোভিয়েট সংস্কৃতি বিস্মে,

কঃ পন্থা’ নাম দিলে গ্রন্থকার ভাল করিতেন। এই গ্রন্থে রাশিয়ার সভ্যতার প্রগতি, শিক্ষার বিস্তার ও সংস্কৃতি-বিপ্লবের কথাই মুখ্যতঃ আলোচিত হইয়াছে। প্রথম অধ্যায়ে বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার রূপ-পরিবর্তন, দ্বিতীয় অধ্যায়ে রাশিয়ার বর্তমান রাষ্ট্র-রূপ ও প্রকৃতি, তৃতীয় অধ্যায়ে বহু জাতি-অধ্যুষিত রাশিয়ার জাতি-সমস্যার সাধানের বিষয় আলোচিত হইয়াছে। রাশিয়ার শ্রম-শিক্ষা, কৃষি, বৈজ্ঞানিক উন্নতি ও পুনর্গঠনের প্রসঙ্গে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সম্বন্ধে সংক্ষেপেই আলোচিত হইয়াছে। শেষ অধ্যায়ে কঃ পন্থা অর্থাৎ ব্রিটিশ ও আমেরিকার পুঁজিবাদ বনাম রাশিয়ার বলশেভিজম বা সাম্যবাদ, কোন পথ ‘মহাজনের পন্থা’ তাহাই প্রশ্ন করা হইয়াছে। এই প্রশ্নের উত্তর মহা কাল দিবে। তবে বর্তমানে রাশিয়ার বিস্ময়কর সর্বাঙ্গীন উন্নতি ও রাশিয়া সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের উক্তি—‘রাশিয়ার এসেছি, না এলে এ জন্মের তীর্থ-দর্শন অত্যন্ত অসমাপ্ত থাকত’—এ সম্বন্ধে খানিকটা ইঙ্গিত-করে।

কবিত্বীরের পাঁচালী—শ্রীশচন্দ্র অধিকারী।—আন্তোয়া লাইব্রেরী, ৫ বঙ্কিম চ্যাট্জো স্ট্রিট, কলিকাতা। ১২৪ পৃষ্ঠা, মূল্য ২।

পদ্মার তীরে শিলাইদহের কুঠি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সাধনার পীঠস্থান বা কবিত্বীর বলিয়া আগামীকালের সাহিত্যিকগণের নিকট পরিচিত হইবে, কারণ এখন হইতেই তিনি জমিদারি পরিদর্শন-ব্যপদেশে পদ্মার বক্ষে বোট করিয়া জমিদারির অন্তর্গত নানাস্থানে পল্লীতে পল্লীতে ঘুরিয়া বেড়াইতেন এবং দিগন্তবিস্তৃত পদ্মার ক্রোড়ে ভাসমান বোটের উপর বসিয়া তাঁহার অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ কবিতা, ছোট গল্প, উপস্থাস ও সঙ্গীতাদি রচনার প্রেরণা লাভ করিতেন। গ্রন্থকার মহাশয় ঘটনাস্থলে ঘুরিয়া ও লোকমুখে শুনিয়া ‘বাবু মশায়’ ও

চাঁদা বার্ষিক সভাক : ৮-

বাৎসরিক সভাক : ৪-

বাসিনিক বিশ্ববন্ধু

মুক্তির রঙীন প্রভাতে বিশ্ববন্ধু বিশ্বমৈত্রীর আদর্শ নিয়ে জীবনের নব জরজানে উপস্থিত হচ্ছে।

লিখছেন : ফান্তনী মুখোপাধ্যায়, তারাপদ গঙ্গোপাধ্যায়, অচিন্তাকুমার সেনগুপ্ত, নিশিকান্ত, শিবরাম চক্রবর্তী, বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং আরো বহু বিখ্যাত সাহিত্যিক।

প্রথম সংখ্যা হ’তেই প্রকাশিত হবে ফান্তনী মুখোপাধ্যায়ের নবতম উপস্থাস “জয় হে”!

— স্ববর্ণ সুরযোগ —

যাঁরা মাঘ মাসের শেষ অর্ধে পাঁচ টাকা পাঠাবেন তাঁদের বার্ষিক গ্রাহক করে নেওয়া হবে এবং ঐ সময়ের মধ্যে যাঁরা একসঙ্গে বার টাকা পাঠাবেন তাঁদের তিন বৎসরের গ্রাহক করে নেওয়া হবে।

কাগজের অভাবে নির্দিষ্ট সংখ্যক মুদ্রিত হবে। প্রথম সংখ্যা হ’তে পেতে হ’লে আজই গ্রাহক প্রেরীভূক্ত হোন। এজেক্টর জন্ত সত্বর আবেদন করুন। বিজ্ঞাপনদাতাগণ নবতর আবেদনে বিজ্ঞাপন প্রচারের জন্ত প্রত্যালাপ করুন।

সম্পাদনায় :—

শ্রীস্বপনকুমার দেব ও শ্রীতপনকুমার দেব

ঠিকানা :—কার্যধ্যক্ষ, “বিশ্ববন্ধু”

জাগ্রত-এশিয়া-প্রকাশিকা

৬৮এ, জয়চণ্ডীপুর ট্রাংক স্ট্রোড,

পোঃ বজ্রবজ্র, ২৪ পরগণা।

গান্ধী-পরিকল্পনা

‘দেশের বর্তমান দুঃস্থতার কথা ধার্মী চিন্তা করেন তাঁদের প্রত্যেককে এই টীকা পড়ে দেখতে বলি।’—মহাত্মা গান্ধী

‘বর্তমান গ্রন্থে অধ্যক্ষ আগরওয়াল গান্ধীজী-প্রদর্শিত অর্থনীতির বিভিন্ন দিক আলোচনা করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি পাশ্চাত্য দেশগুলির অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সহিত গান্ধী-পরিকল্পনার তুলনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, উভয়ের মধ্যে প্রভূত পার্থক্য থাকিলেও শেখোক্তটিকে অবৈজ্ঞানিক বলা চলে না। পরন্তু, অহিংস ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ইহাতে সমাজের সর্বজনীন কল্যাণের সম্ভাবনাই অধিক।...গান্ধী-পরিকল্পনার মর্ম অনুধাবন করিতে, যাহারা ইচ্ছুক তাহারা অধ্যক্ষ আগরওয়ালের এই গ্রন্থখানি পাঠ করিলে উপকৃত হইবেন।’—আনন্দবাজার

গান্ধীজীর রাষ্ট্র-পরিকল্পনা

‘পুস্তকখানি রাজনৈতিক গঠন-মূলক কর্মে অনুরাগী, চিন্তাশীল পাঠকমাত্রের অবশ্যপাঠ্য। অনু-ছই টাকা বাদের ছত্রে ছত্রে ভাষার উপর লেখকের আধিপত্যের নিদর্শন রহিয়াছে। একরূপ দুঃস্থ বিষয়ের এমন স্বচ্ছন্দ অনুবাদ কম কৃতিত্বের কথা নহে।’—প্রবাসী

‘In every chapter there are profuse references both pertinent and illustrative to the political and philosophical literature of famous western scholars. All in all, the book may be regarded as an administrative blueprint of the free India of tomorrow.—The Bengali translation is idiomatic, unpedantic, very timely; it speaks well for the translator's sincerity and fidelity’—Hindusthan Standard

‘গান্ধীজীর দর্শন সম্বন্ধে অধ্যক্ষ অগ্রবাল একজন বিশেষজ্ঞ। বর্তমান পুস্তক তাহার বিখ্যাত গ্রন্থের অনুবাদ। অনুবাদ সরল ও মূল্যবান।’—আনন্দবাজার

শিক্ষার বাহন

‘অধ্যক্ষ শ্রীমন্নারায়ণ অগ্রবালের পুস্তকটি সময়োচিত এবং মাতৃভাষার সাহায্যে সর্বোচ্চ শিক্ষাদানের সম্ভাবনা আছে কি না বা তা বাস্তবীয় কি না সে সম্বন্ধে কোন ভয় বা অবিশ্বাস যদি থাকে তবে তাকে দূর করে দিতে যথেষ্ট সাহায্য করবে।’—মহাত্মা গান্ধী

‘Mr. Agarwal believes in education imported through the medium of the native language of the learners. The erudite author's arguments are commencing. Those who are pondering over the post-war educational scheme should do well to go through this excellent volume.’—Amrita Bazar

ছাত্রদের গঠনমূলক কার্যক্রম

‘বইখানি ছাত্রকর্মীদের কাছে অমূল্য সম্পদরূপে বিবেচিত হবে। অনুবাদ যাতে স্বচ্ছ হয় সেদিকে অনুবাদকের দৃষ্টি ছিলো।’—শ্রী হর্ষ

ছদ্মনাম কবিরের

মোসলেম রাজনীতি

‘উনিশ শতকের দার্শনিক আদর্শ-বাদকে খেঁড়ে-মুছে বিংশ পরিবর্তিত দ্বিতীয় সংস্করণ বারো আনা শতকের আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতে ও ঐতিহাসিক জড়বাদের পটভূমিকায় ভারতবর্ষের রাজনীতি, সমাজনীতি ও অর্থনীতি গড়ে উঠছে। বৈষম্যময় অর্থনীতিক কাঠামোকে উৎখাত করে ধর্মনিরপেক্ষ বৈষম্যহীন এক রাষ্ট্রনৈতিক ছকে ভারতবর্ষকে পরাধীনতার পাপ থেকে মুক্ত করাই নূতন সমাজমানসের ডাক। ধর্মের কিংবা সম্প্রদায়ের নামে ঐতিহ্যের শ্লোগান দিয়ে সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা সমাজের মৃত্যুর আবাহন করার নামান্তর মাত্র। সেদিক থেকে বলতে বাধে না যে, ভারতবর্ষের কালান্তরের এই সন্ধিক্ষণে ছদ্মনাম কবিরের ‘মোসলেম রাজনীতি’ সত্যিই আশাশ্রয়ী। একটা বৃহত্তর উদারনৈতিক দৃষ্টি নিয়ে কবির সাহেব সাম্প্রদায়িক আবর্জনা ছড়ানোর বিরুদ্ধে তাঁর অগতিশীল মনের বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন।’

মিনু মাসানির

Socialism Reconsidered পুস্তকের নূতন দৃষ্টিতে প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ। ভারতবর্ষের রাষ্ট্র-নৈতিক মহলে এই বইটির বক্তব্য নিয়ে সমাজতত্ত্ববাদ বাদানুবাদের আর অন্ত নেই। মাসানি বারো আনা তাঁর রচনায় গান্ধীজীর মত ও পথকে শ্রেষ্ঠ বলে প্রতিপন্ন করেছেন।

যুদ্ধকালীন অর্থনীতি কেমন ডাঃ লোকনাথন সম্পাদিত করে যুদ্ধান্তর অর্থনীতিতে যুদ্ধান্তর অর্থনীতি হতে পারে তাই এ গ্রন্থে বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। ভাষার প্রাঞ্জলতা বিষয়বস্তুকে সহজবোধ্য করে তুলেছে। বারো আনা

‘প্রসিদ্ধ’ *Bombay Plan*-এর বঙ্গানুবাদ।...যাহারা ইংরাজী গ্রন্থখানি পড়িবার সুযোগ পান নাই, অথচ ১ম খণ্ড—১৮ ২য় খণ্ড—১৮ বোম্বাই পরিকল্পনার বিষয়বস্তু জানিতে আগ্রহীল তাহারা এই পুস্তকখানি পাঠ করিলে উপকৃত হইবেন।’—আনন্দবাজার

টাটা-বিড়লা প্রভৃতির

বোম্বে-পরিকল্পনা

১ম খণ্ড—১৮ ২য় খণ্ড—১৮ বোম্বাই পরিকল্পনার বিষয়বস্তু জানিতে আগ্রহীল তাহারা এই পুস্তকখানি পাঠ করিলে উপকৃত হইবেন।’—আনন্দবাজার

মিনু মাসানির

খাদ্য

‘গ্রন্থকার আমাদের খাদ্যসমস্যা তথা খাদ্যবস্তুর প্রকৃতি ও রকমভেদ, প্রকৃত খাদ্যের শোচনীয় অভাব ও তজ্জনিত স্বাস্থ্যভঙ্গ এবং ভয়াবহ মৃত্যুর হার প্রভৃতি বিষয়ে মূল্যবান গবেষণা করিয়াছেন এবং কি প্রকারে দেশকে এই শোচনীয় ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করা যাইতে পারে তৎসম্বন্ধে সর্বশেষ আলোচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থের বহুলপ্রচার বাঞ্ছনীয়। ভাষা প্রাঞ্জল ও ছাপা উৎকৃষ্ট।’—আনন্দবাজার

পূর্বাংশ - প্রকাশিত অন্যান্য বই এর তালিকা সংগ্রহ করুন

প্রকাশক :

পূর্বাংশ লিমিটেড—পি ১৩, গণেশচন্দ্র এভেন্যু, কলিকাতা ১৩

পল্লীমাতার বিভিন্ন চরিত্রের যে সকল নক্সা ও চিত্র সহজিয়া ছন্দের কবিতায় বাজ করিয়াছেন তাহা অনবদ্য হইয়াছে, এগুলিকে তিনি সার্থক ভাবে 'কবি ভীষ্মের পাঁচালি' নামে অভিহিত করিয়াছেন। শিল্পচার্য নন্দলাল বসু পদ্মাবক্ষ, পদ্মার চর, ও পদ্মাতীরস্থ পল্লীর যে কয়েকখানি ছবি আঁকিয়াছেন তাহা রবীন্দ্রসাহিত্যে নূতন উপাদান যোগাইবে। পল্লীজীবনের বিভিন্ন দৃশ্য ও চরিত্রের আরও বহু চিত্র কবিতাগুলিকে শ্রীমণ্ডিত করিয়াছে। কবিতাগুলি পড়িয়া দরিদ্র অবজ্ঞাত পল্লীর বৃকে রত্নখনির মত কবি-উপলব্ধি নানা উপাদানের সাক্ষাৎ পাইয়া পাঠক আনন্দিত হইবেন।

জীবন ও যুদ্ধ—শ্রীঅম্বিনীকুমার পাল। প্রবর্তক পাবলিশার্স, ৬১ বহুবাজার স্ট্রিট, কলিকাতা। ১৯১ পৃষ্ঠা, মূল্য ৩।

দিল ডাক—শ্রীপরিমল মুখোপাধ্যায়। বুক স্ট্রাণ্ড, ১১১১এ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলিকাতা। ১৯০ পৃষ্ঠা, মূল্য ৩।

প্রথম গ্রন্থের লেখক ইতিপূর্বে 'মল্লপ্রদীপ' নামক গল্প-গ্রন্থে রেঙ্গুনে জাপানী বোমাবর্ষণের সময় বর্মাপ্রত্যাগত ভারতবাসীর দুর্গম অভিযানের কাহিনী লিখিয়া পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। এই উপস্থাসে তাহারই বিস্তারিত বিবরণ সহ একটি করুণ কাহিনী বাঙ্গালার ১৩০০ সালের পটভূমিকায় রচিত হইয়াছে। বিগত যুদ্ধের সময় জাপানীদের রেঙ্গুন আক্রমণের সময় লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী সর্বস্বান্ত হইয়া যে ভয়াবহ দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে ভারতে কিরিয়া আসিতে সমর্থ হইয়াছিল এবং কিরিয়াও যুদ্ধের অবশ্যতাবী ফলস্বরূপ মুন্সিফাখোর, চোরাবাজার ও লীগ গবর্ণমেন্ট স্ট্রিট ১৩৫-এর দুর্ভিক্ষের কবলে পড়িয়া যে অবর্ণনীয় কষ্ট ও দুর্দশার সম্মুখীন হইয়াছিল, তাহার বর্ণনায় লেখকের লেখনী স্থানে স্থানে ভাবাতিশ্যে উচ্ছাদের মাত্রা অতিক্রম করিলেও মোটের উপর উপস্থাস্থানি স্থখপাঠ্য হইয়াছে। পাখা ও সিন্ধুবোদির রিক্ত মধুর চরিত্র মনে রেখাপাত করে। বিগত সর্বগ্রামী যুদ্ধ ও গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া সর্বহারা অবমানিতা হুঁতামিনী মৃত্যুর জীবনাবসানের বিরোগান্ত করুণ কাহিনী অন্তর স্পর্শ করে।

বিতীয় গ্রন্থ বর্মা ও ভারতবর্ষের সীমান্তে যুদ্ধের প্রয়োজনে গঠিত এক বিরাট সৈন্যশিবিরের পটভূমিকায় রচিত হইয়াছে। 'Women's Auxiliary Corps' ব্যতীত অন্ত এক প্রয়োজনে যুদ্ধক্ষেত্রে বহু ভারতীয় ও অন্তান্ত জাতীয় নারীর সমাবেশ হয়—বখা কর্ণের অবকাশে উচ্চপদস্থ কর্মচারীর অবসর-বিনোদিনী সঙ্গিনী হিসাবে। এইরূপ একটি কর্ণ লইয়া একটি বাঙালীর মেয়ে স্বামীর সহিত বনিবনাও না হওয়ায় এই পরিবেশের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিল এবং রূপের জোলুসে, ফ্যাসানে ও

রাজজ্যোতিষামূলক বলিয়া গভর্ণমেন্ট কর্তৃক 'বাজেয়াপ্ত'

বন্দনা

সঙ্কলক : শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

"স্বদেশী" যুগ হইতে বর্তমান বাঙালার নবযুগ পর্যন্ত দেশের জাতীয় সঙ্গীতের পরিবর্তিত অপূর্ব সঞ্চয়ন। বিখ্যাত জাতীয় সঙ্গীতের পরিপ্রেক্ষিতে বাঙালার তথা ভারতের জাতীয় সঙ্গীতের ক্রমপরিণতির তথ্যসম্বলিত ৫২ পৃষ্ঠাব্যাপী ভূমিকা। খ্যাত, অখ্যাত, অজ্ঞাত ও বিস্মৃত কবিদের অসংখ্য সঙ্গীতে সমৃদ্ধ।

প্রকাশিত হইল

মূল্য পাঁচ টাকা

প্রকাশক—উষা পাবলিশিং হাউস

৩৪নং মহিম হালদার স্ট্রিট, কালিঘাট, কলিকাতা

চট্টলমায় রঞ্জিনীসমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিল। কিন্তু শ্রজাপতির মত তীব্র আলোক, প্রাচুর্য ও ভোগবাসনার বিপুল সমারোহের মধ্যে থাকিয়াও অবশেষে স্বামী ও পুত্রের অন্তর্গত স্মৃতি ও ঘরের মায়া তাহাকে 'দিল ডাক' এবং সব ছাড়িয়া গৃহে কিরিত্ত সে স্বামীর সহিত নৃতন করিয়া ঘর বাঁধিতে মনস্থ করিল কিন্তু আরম্ভেই গোরার গুলির আঘাতে শিশুপুত্র হারাইয়াও বাঁধনহারা জীবনের শ্রোতে পুনরায় দাসিয়া ঘাইতে অধীকৃত হইল। মিতার চরিত্রে গ্রন্থকার মনস্তত্ত্বের সুনিপুণ বিশ্লেষণ করিয়াছেন, সৈন্তাবাসে ইংরেজ, আমেরিকান ও ভারতীয় বহু পুরুষ ও নারী চরিত্রের সহিত মিতার:আলাপ ও সংলাপ উপভোগ্য। কিন্তু যে জন্ত এই পুস্তক প্রশংসার দাবী করে তাহা এই—যে হতভাগিনী নারীগণ বহুর মন যোগাইতে পুরুষের কামনার বহিতে যুদ্ধক্ষেত্রে আত্মাহুতি দিল তাহাদের অন্তরের কোণে গৃহকোণের শ্রুতি, শাস্তিপূর্ণ শান্ত জীবনের শ্রুতি নিরুদ্ধ কামনা এবং বাহিরের উচ্ছ্বল পঙ্কিল ভোগবহল জীবনের শ্রুতি বিভ্রাৎ সময়ে সময়ে রঞ্জিনীগণের জীবনে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে এবং গ্রন্থকার দরদী মনের অন্তর্দৃষ্টি লইয়া তাহা লক্ষ্য করিয়াছেন।

শ্রীবিজয়েন্দ্রকৃষ্ণ শীল

কলিকাতা-নোয়াখালি-বিহার—শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়। জেনারেল প্রিন্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স। ১১৯ ধর্মতলা স্ট্রিট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

কলিকাতা-নোয়াখালি-বিহার এই তিনটি নাম একসঙ্গে উচ্চারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই মানসপটে ভাসিয়া উঠে হিংসা-ঘেমে উত্তম্বত বাংলা ও বিহারের হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায় কর্তৃক অনুষ্ঠিত ধর্মসের তাণ্ডব-লীলা আর নরহত্যার নারকীয় দৃশ্যের ভয়াবহ চিত্রমালা। সভ্য মানুষের এই উল্লস বর্বরতা বহু কবি শিল্পী ও কথাসাহিত্যিকের কলমকে বিচলিত করিয়া তাহাদিগকে সাহিত্যরচনার অনুপ্রাণিত করিয়াছে। বিবৃতিবাবু খাঁটি শিল্পীর নিরাসক্ত মন লইয়া ঘটনাগুলিকে অনুধাবন করিয়াছেন এবং নিজের অভিজ্ঞতা ও অনুভূতিক 'বিবাস', 'প্রায়শ্চিত্ত' এবং 'সত্যগ্রহী' এই তিনটি গল্পে রূপায়িত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। গল্পগুলিতে লেখকের মনের স্বাভাৱ মিশে নাই বলিয়া সেগুলি রসোত্তীর্ণ হইয়াছে। বইখানি শেষ করিলে একটি ছবি যেন জীবন্ত হইয়া চোখের সামনে ভাসিতে থাকে—'বিবাস' গল্পের কাকের-হত্যার প্রধান নায়ক রহমান অগ্নিবেষ্টিত বাড়ীতে বসিয়া দেখিতেছে, তাহার হৃকমে পরিচালিত গুণ্ডাদের দ্বারা সর্বস্বান্ত সভ্য সকল স্বজনবিরোগ-কাতর বাল্যবন্ধু পরেশ তাহারই কন্ঠাকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত হইতে উদ্ধার করিয়া নিরাপদ স্থানে ব্যাকুল বাহুবন্ধনে আশ্রয় দিয়াছে। 'প্রায়শ্চিত্ত' গল্পে সাম্যের মৃত্যুকালীন মর্মান্তিক উক্তি: "আমি মুসলমান—কিরণ নয়—সাম্যেদ—কি হবে—কে প্রায়শ্চিত্ত করবে—" পাঠকের মনে এক অপূর্ণ ভাবাবেগের সঞ্চার করে। সত্যগ্রহী গল্পে লেখক একটি প্রশ্নের উত্তর উচ্চ রাখিয়াছেন। নারীর উপর অত্যাচারকারীকে হত্যা করিয়া মহাত্মার মন্ত্রশিষ্ট, ত্রিশ বৎসর যাবৎ অহিংসাব্রতী রঘুবর সিংহ কি ব্রাত্য হইয়াছিলেন?...এর জবাব নোয়াখালিতে মহাত্মা স্বয়ংই দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, নারীর সতীত্ব রক্ষার জন্ত আততায়ী নিধন প্রায়—অহিংসার কাছাকাছি—"Nearest approach to nonviolence."

এই গল্পপুস্তকখানি শুধু যে রসসঞ্চিত হিসাবেই সার্থক হইয়াছে তাহা নয়, ইহাতে ভাবনার খোঁজও আছে প্রচুর। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বাঁহারই দৃষ্টি সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি দ্বারা আবৃত্ত হইয়া আছে, তিনিই এই পুস্তকে আত্মদর্শন করিবার সুযোগ লাভ করিবেন। এই আত্মদর্শন সাংস্রদায়িকতার অবসান এক দিন হইবেই—এবং এই ধরণের সাহিত্যই আপাত বিচ্ছিন্ন, পরস্পর বিবর্ধমান হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কে বাণীমাল্যের বন্ধনে আবদ্ধ করিবে।

১ চায়নার সেরা কাহিনী—ঐরবীন্দ্রকুমার বসু। কো-অপারেটিভ বুক ডিপো, ৫৪, কলকাতা স্ট্রীট, কলিকাতা—মূল্য তিন টাকা।

ঐরবীন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ শিল্পসমালোচকদের কল্যাণে চীনা চিত্রকলা রসের সহিত আমাদের অনবিস্তর পরিচয়সাধন হইয়াছে, কিন্তু চীনা সাহিত্য সম্বন্ধে বাঙালী পাঠক-সাধারণের অজ্ঞতা অপরিণীত। অথচ চীনদেশে এমন বহুসংখ্যক কথাসাহিত্যিকের আবির্ভাব হইয়াছে যাহাদের রচনা বিশ্বসাহিত্যে স্থান পাইবার যোগ্য। সাম্প্রতিক বাংলা-সাহিত্যের জায় বর্তমান চীনা সাহিত্যেরও চরম উৎকর্ষ তার ছোট গল্পে। সর্বপ্রকার বাহ্যিক-বর্জিত চীনা চিত্রকলা, যেমন স্বপ্ন রং সামান্য দু-একটি রেখার টানে বিশেষ একটা ভাবকে ফুটাইয়া তোলে, চীনা ছোট গল্পও সেই ধরণের—অনাড়ম্বর মিতবাক ও ভাবগর্ভ। ঐরবীন্দ্রকুমার বসু কয়েকটি শ্রেষ্ঠ চীনা গল্প অনুবাদ করিয়া বাঙালী পাঠকদের উপহার দিয়াছেন। বর্তমান পুস্তকে ইয়াও-গুয়ে-ইয়েন, সাই-চিয়েং-হন, সেন-হুং-ওয়েন, চাং-সিয়েন-সি এই চার জন লেখকের চারটি গল্প স্থান পাইয়াছে। তন্মধ্যে সাই-চিয়েং-হনের 'ক্ষয়িত চন্দ্রমা' গল্পটি শুধু চীনা সাহিত্যের নহে, বিশ্বসাহিত্যের অজস্র সেরা কাহিনী বলিয়া সমাদৃত হইবে। গল্পটি আগাগোড়া বার্ষ জীবনের বেদনারসে উজ্জ্বল, অথচ ইহাতে লেশমাত্র আতিশয্য নাই—কক্ষ রসের এমন সংযত প্রকাশ যে-কোনো দেশের সাহিত্যে দুর্লভ। 'হাফ বেকড' আর 'ঘনাক্ষকারে' এই দুইটি গল্পে চীন-জাপান যুদ্ধের নিপুণ আলোচ্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। এগুলির মধ্যে তাহার জাতীয় জীবনের স্পন্দন আয়রা শুনিতে পাইতেছি। চাং-সিয়েন-সির গল্পটিতে চীনাদের সামাজিক পরিবেশের কথকিত্ব পরিচয় পাওয়া যায়। এই গল্প চারটির ভিতর দিয়া চীনের জাতীয় আত্মার স্বরূপ যেন আংশিক ভাবে আমাদের নিকট উল্কাটিত হইয়াছে।

'ইতালির সেবা গল্পের' অনুবাদক রূপে রবীন্দ্রবাবু যে ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছিলেন বর্তমান পুস্তকে তাহার ক্রমবিকাশ, বিশেষতঃ সংলাপের ভাষান্তরকরণে তাঁর কুশলতা আমাদের কাছে আশাঘিত করিয়াছে। যে সকল দিকপাল চীনা সাহিত্যিকের গল্পের অনুবাদ বর্তমান পুস্তকে স্থান পাইয়াছে, ভূমিকার লেখক সামান্য দু'চারটি কথায় তাহাদের সাহিত্য-রচনার মূল স্বত্রটা ধরাইয়া দিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। বইয়ের নামটি সম্বন্ধে কিন্তু আমাদের আপত্তি আছে। চীনের সেরা কাহিনী হইলেই শোভন হইত—'চায়না' শুনিলে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ বিশেষের কথাই আগে মনে পড়ে।

শ্রী শ্রীমঙ্গলচণ্ডী-পূজা ও কথা—ঐউমেশ চক্রবর্তী। প্রান্তিস্থান—১২০১২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা। এইকারের নিকট। মূল্য দশ পয়সা।

ইহাতে সংকটে শ্রী শ্রীমঙ্গলচণ্ডী ভোজ, ধ্যান, প্রার্থনামন্ত্র এবং সরল বাংলায় পয়ার ছন্দে লিখিত মঙ্গলচণ্ডী দেবীর পাচালীকথা সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রত্যেক ধর্মপ্রাণ হিন্দু পরিবারে গৃহপঞ্জিকার ন্যায় এই পুস্তকের আদর হওয়া উচিত।

লে মিজেরাবল—ভিক্টর হিউগো। অনুবাদক—শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়। সাহিত্যিকা, ১২৩ আমহার্ট স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ২১ টাকা।

বাংলাদেশের সাহিত্যরসিকদের নিকট করাসী কথাসাহিত্যিক ভিক্টর হিউগো আর তাঁর অমর উপন্যাস লে মিজেরাবলের মতন করিয়া পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন নাই। পুস্তকখানি বিশ্বসাহিত্যের অজস্র শ্রেষ্ঠ রত্ন হিসাবে কালজয়ী হইয়া আছে। বহুপূর্বে মনোমোহন রায় কৃত ইহার এক-খানি বাংলা অনুবাদ 'লা মিজারাবল' এই ভুল নামে প্রকাশিত হইয়াছিল। সেখানি অক্ষর অনুবাদ। আমাদের দেশের কোন কোন শিক্ষিত মহলেও যে, ঐ ভুল নামই চলিতেছে সম্ভবতঃ উক্ত পুস্তকখানিই সেখান দাবী। যাহা হোক, বর্তমান অনুবাদ যিনি করিয়াছেন বাংলা অনুবাদ-সাহিত্যে তাঁহার প্রতিষ্ঠা আছে। পবিত্রবাবুর কৃতিত্ব এই যে, তাঁহার অনুবাদে মূলের রস ও বৈশিষ্ট্য অক্ষুর আছে, উপরন্তু তাহা সাহিত্যিক সৌন্দর্যে মণ্ডিত হইয়াছে। হিউগোর বিরাট সৃষ্টি তাঁহার হাতে পড়িয়া বিকৃত হয় নাই। এই উপন্যাসের নায়ক কনস্টান্টিন জঁ ভালকঁর বিচিত্র জীবনকে কেন্দ্র করিয়া অপরিণীত দরদ দিয়া হিউগো যে বিরোপান্ত কাহিনী রচনা করিয়াছেন তাহা হুগ হুগ ধরিয়া বিশ্বের সকল দেশের সকল বয়সের পাঠকপাঠিকাদের আনন্দ-বিধান করিয়া আসিতেছে। পবিত্রবাবু-বাংলার কিশোর-কিশোরীদের জন্ত এই সংকলিত অনুবাদ প্রকাশিত করিয়াছেন। ইহার কল্যাণে তাহার হিউগোর শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-সৃষ্টির সহিত পরোক্ষভাবে পরিচিত হইবার সুযোগ লাভ করিবে।

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

দেশ-বিন্দনের কথা

নিখিল-বঙ্গ আবৃত্তি প্রতিযোগিতা

বিগত ৫ই পৌষ উত্তরপাড়া হরিনারায়ণ স্মৃতি পাঠাগারের উদ্যোগে ৩য় বার্ষিক নিখিল-বঙ্গ আবৃত্তি প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হইয়াছে। সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি শ্রীমদ্ব্যমোহন বসু এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন এবং প্রবাসীরা অজস্র

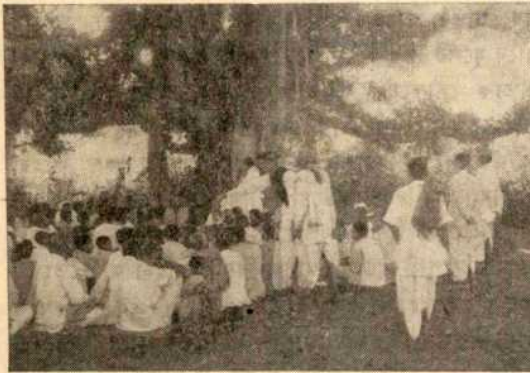
সহকারী সম্পাদক শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র প্রধান অতিথিরূপে ইহাতে যোগদান করেন। পাঠাগার-সম্পাদক শ্রীপাচু মুখোপাধ্যায়ের কথ্যতৎপরতায় অনুষ্ঠানটি বিশেষ সাকল্যমণ্ডিত হয়। সভাপতি মহাশয় এবং নলিনীবাবুর বিচারে সাধারণ বিভাগে পাঁচ সাতাল, ছাত্রবিভাগে অক্ষয় মুখোপাধ্যায়, এবং মহিলাবিভাগে মায়ী মুখোপাধ্যায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন।



ঝাড়গ্রাম সেবায়তন কর্মক্ষেত্রের আংশিক দৃশ্য

ঝাড়গ্রাম সেবায়তন

গত পৌষের উত্তরাহণ সংক্রামণকালে ঝাড়গ্রাম সেবায়তনে ভারতের নানা স্থান হইতে আগত দর্শকমণ্ডলী এবং স্থানীয় সহর



সেবায়তন। উত্তরাহণ উৎসব উপলক্ষে বার্ষিক সভা



সেবায়তন চিকিৎসালয়

ও পার্শ্ববর্তী পল্লীবাসী জনগণের সমাবেশ ছই দিবসব্যাপী বিভিন্ন চিত্তাকর্ষক ও শিক্ষাপ্রদ অনুষ্ঠানসহ বার্ষিক উৎসব হুসম্পন্ন হয়। সাধারণ সভায় সভাপতিত্ব করেন মেদিনীপুর জিলা বোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রীদেবেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য মহাশয়। তিন বৎসর পূর্বে স্বামী প্রেমানন্দ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই আশ্রমে আচার্য স্বামী সত্যানন্দ গিরি কয়েকটি উৎসাহী কর্মীর সাহায্যে ভারতীয় সংস্কৃতি-মূলক আদর্শ ও পদ্ধতি লইয়া বাংলার এই অত্যন্ত অবহেলিত অঞ্চল স্বাস্থ্যকর স্থানে কৃষি, গোপালন, শিল্প, চিকিৎসা, শিক্ষা ও আধ্যাত্মিক সাধনার ব্যবস্থাসহ এই আশ্রম পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন। জনগণের দেহ মন আত্মার উন্নতিবিধায়ক কর্মানুষ্ঠানই এই আশ্রমের উদ্দেশ্য। এই সময়োপযোগী কল্যাণ-প্রদ প্রতিষ্ঠানটিকে যথাসাধ্য সাহায্য করা দেশবাসীর কর্তব্য।

আয়ুর্বেদ সংস্কৃতি পরিষদ

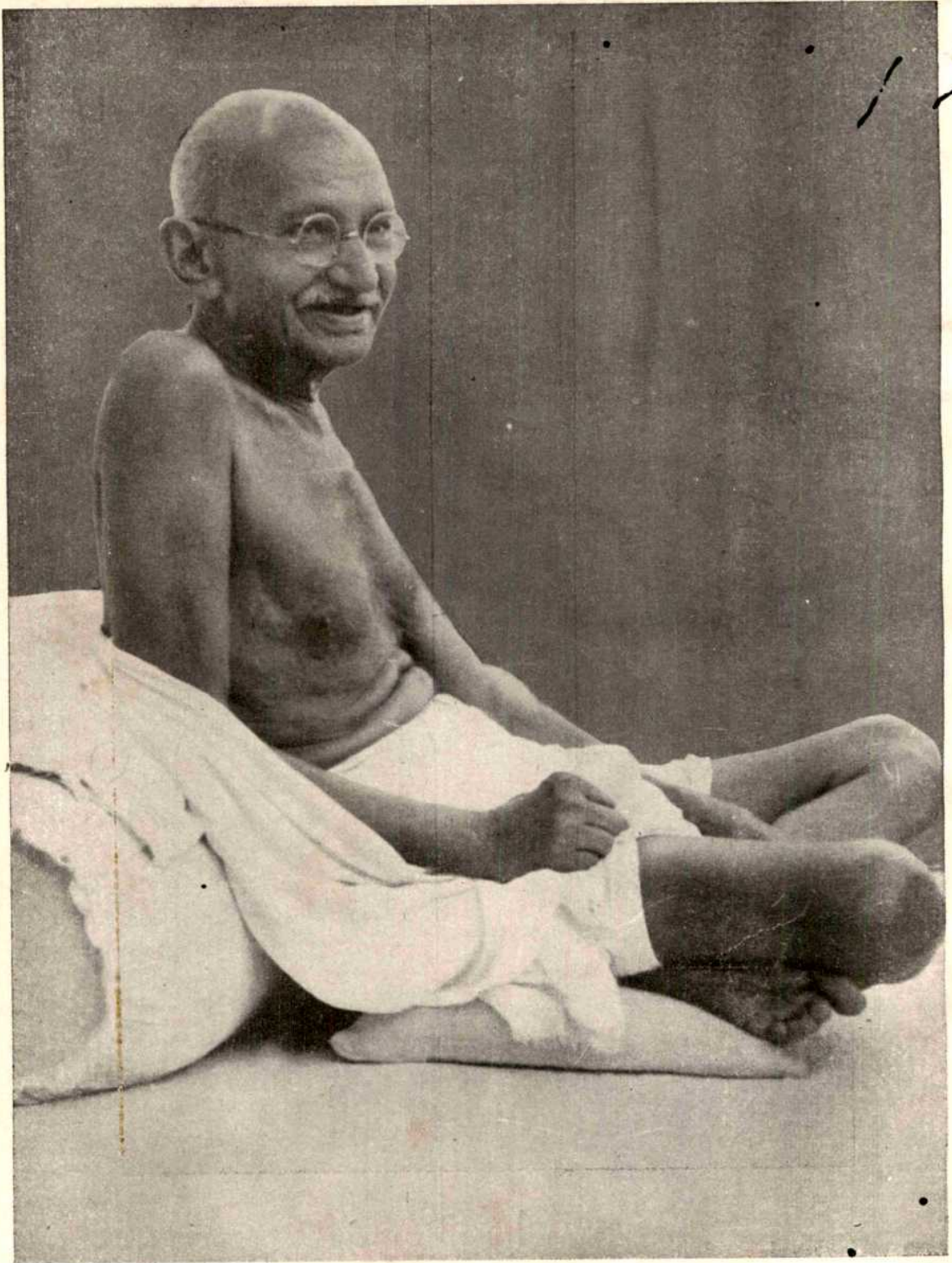
সম্প্রতি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় চিকিৎসা-রূপে আয়ুর্বেদকে সুরক্ষিত করিবার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিয়াছেন। কলিকাতার কয়েকজন বিশিষ্ট আয়ুর্বেদ চিকিৎসকও উক্ত চিকিৎসাশাস্ত্রের পুনরুজ্জীবনকল্পে বিশেষ তৎপরতার সহিত কাজ শুরু করিয়া দিয়াছেন। অষ্টাদশ আয়ুর্বেদের প্রত্যেকটি বিষয় বাহাতে বর্তমান কালোপযোগী হয় ও যথোচিত উৎকর্ষলাভ করে সে উদ্দেশ্যে তাঁহারা “আয়ুর্বেদ সংস্কৃতি পরিষদ” (কাৰ্যালয় ২২৩, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা) নামে একটি সমিতি গঠনে ব্রতী হইয়াছেন। আয়ুর্বেদের প্রচার ও প্রসার ছাড়া একটি আয়ুর্বেদীয় গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করার সঙ্কল্পও তাঁহাদের আছে। সম্প্রতি উক্ত পরিষদ বহু তথ্য সম্বলিত একটি ‘স্মারক পুস্তিকা’ প্রকাশিত করিয়াছেন।

পশ্চিম বাংলা সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিতে পারিলে উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানটি দ্বারা আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধারের বিশেষ সহায়তা হইবে।



প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা)

বাপুজী
শ্রীমন্দলাল বসু



মহাত্মা গান্ধী

অমৃত

“সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্”

নাগমায়া বলহীনেন লভ্যঃ”

৪৭শ ভাগ
২য় খণ্ড

ফাল্গুন, ১৩৫৪

৫ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

গান্ধী মহাপ্রাণ

১৬ই মার্চ, শুক্রবার, ভারতের দুর্দিন। গান্ধীজীকে হত্যা করিয়া নাথুরাম বিনায়ক গডসে প্রমাণ করিয়া দিল যে হিংসার পৃথিবী আজ উন্নত হইয়া উঠিয়াছে, তার প্রভাব ভারতবর্ষেও ব্যাপ্ত হইয়াছে। ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগষ্ট যে রক্তাক্তির সূচনা হয় কলিকাতার বৃকে, তাহা আজ প্রসারিত হইয়াছে চট্টগ্রাম হইতে পেশোয়ারে। ইহার দাপটে কত লোকের প্রাণ গিয়াছে, কত শিশু পিতৃ-মাতৃহীন হইয়াছে, কত সহস্র সহস্র প্রাণলোকের সত্যিকার নষ্ট হইয়াছে এবং কত কোটি টাকার সম্পত্তি লুণ্ঠিত ও দগ্ধ হইয়াছে, তার হিসাব হয় নাই, কখনও হইবে বলিয়াও মনে হয় না। যে ক্ষতি আমাদের হইল, তাহা অর্থের উপর দিয়া গেলে আমাদের মনে কোন ক্ষোভ থাকিত না হয়ত। কিন্তু মুসলিম লীগ প্রবর্তিত এই অমানুষ রাজনীতি যে আমাদেরও পশুর অধম করিয়া দিল, সেই অপমানে ও বিকারের জ্বালায় সতর মাস পুড়িয়া পুড়িয়া গান্ধীজী আমাদের মধ্য হইতে সরিয়া গেলেন; তার গ্লানি আমাদের সামাজিক জীবনকে বহু দিন ক্লিষ্ট করিয়া রাখিবে। গান্ধীজীর শ্রদ্ধের উপলক্ষে যে কর্মব্যস্ততা ছিল, তাহা আজ অবসান হইয়াছে। সমাজের মনে দেখিতেছি একটা অরসাদ।

আমাদের কবি এক দিন আমাদের স্তনাইয়াছিলেন, “মোর তরে না করিও শোক।” গান্ধীজীও তাঁর জীবনে এই শিক্ষাই আমাদের দিয়া গিয়াছেন যে ভগবানের কাজ তিনি করিয়া যাইতেছেন, সেই কাজের প্রয়োজনেই তাঁহাকে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে এবং সেই কাজের প্রয়োজনে যত দিন তাঁহার উপস্থিতি প্রয়োজন, তত দিনই তিনি বাঁচিয়া থাকিবেন। তিনি অবশ্য আমাদের দিগন্তে স্তনাইয়াছিলেন যে এক শত পঁচিশ বৎসর তিনি বাঁচিয়া থাকিতে চান তাঁর কল্পনার ও আকাঙ্ক্ষার ভারতবর্ষকে গড়িয়া তুলিবার জন্ত। সেই কাজ অপরূপ রাখিয়া গেলেন। ইহার কারণ আমরা বুঝিয়া পাই না। একটা কথা আমাদের

যন্ত্রণা দিতেছে। যে হিংসার উদ্‌দান পনের মাস ভারতবর্ষের বৃকে তাঁহাকে দেখিতে হইয়াছে, তাহার ফলে বাঁচিয়া থাকিবার স্পৃহাও তাঁহার মন হইতে শিথিল হইয়া যাইতেছিল। অনেক সময় তাই মনে হয়, নাথুরামকে নিমিত্তমাত্ররূপে ব্যবহার করিয়া তাঁহার প্রাণের ভগবান ভক্তের যন্ত্রণার লাভবান করিলেন কি?

আজ গান্ধীজীর পঞ্চভূতসমষ্টি দেহের অমুকণার ভগ্ন ভারতের নদ-নদীর জলস্রোতের বৃকে ভাসাইয়া দিয়া আমাদের দেশের লোক ফিরিয়াছে পূজামন্দিরে। সাধারণ মানুষ এই দৃশ্যে অভিভূত হইয়া পড়ে। সাধক বাঁহারা তাঁহারা শূন্য মন্দিরে ভাব-মূর্তির প্রতিষ্ঠা করেন; সাধনায় নিমগ্ন হইয়া যান যুক্তিকে প্রাণময় করিতে। আজ ভারতের দিকে দিকে সেই অক্ষুট আকাঙ্ক্ষাই ধ্বনিত হইয়া উঠিবার জন্ত চেষ্টা করিতেছে। ভারতের “মহাত্মা” যে আদর্শের প্রতিষ্ঠার জন্ত আজীবন তপস্বী করিয়া গিয়াছেন, যে প্রেমধর্মের প্রতিষ্ঠার জন্ত জীবনের শেষ কয়েক মাস সীমাহীন আকৃতি এবং অদম্য উৎসাহ লইয়া দিল্লীর প্রাসাদে-প্রান্তরে প্রাণান্ত চেষ্টা করিয়াছেন, সেই ব্রত আজও অপরূপ। বোধন তিনি আরম্ভ করিয়া গিয়াছেন, হিংস্রক তাহার মঙ্গলঘট ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। অসমাপ্ত পূজা আমাদের সমাপ্ত করিতেই হইবে। এই ব্রত ও এই পূজা আমাদের জাতীয় জীবনের মরণ-বাঁচন সমস্তায় পরিণত হইয়াছে। এই সমস্তা সমাধান না করিলে আমাদের নব অর্জিত স্বাধীনতা ব্যর্থ হইবে, অসার্থক হইবে। ভারতের সমাজের বৃকে দ্বন্দ্ব ও অনৈক্য জিয়াইয়া রাখিয়া এই স্বাধীনতা আমরা রক্ষা করিতে পারিব না, এই আশঙ্কায় গান্ধীজী আমাদের আশ্রয় করিতে প্রাণপাত করিয়াছেন। গুপ্ত হত্যাকারীর গুলিতে তাঁহার সেই চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার অশরীরী আশা ভারতবর্ষের এই কর্তব্য নির্দেশ করিতেছে।

আজ এই নির্দেশের কথাই আমাদের নতুন করিয়া ধ্যান করিতে হইবে। গান্ধীজীর উপস্থিতির সময় এই নির্দেশ সম্বন্ধে

আমরা নানা সংশয় প্রকাশ করিয়াছি, এই নির্দেশ লইয়া নানা তর্ক করিয়াছি। এই নির্দেশের ও তার সার্থকতার আলোচনা লইয়া সমাজতন্ত্রের মহাভারত সৃষ্টি হইয়াছে। আজ ভারতবর্ষের হিন্দুকুশ পর্বত হইতে চন্দ্রনাথ পাহাড় বেষ্টিত ভূ-খণ্ডের মধ্যে যে উন্নততার সৃষ্টি হইয়াছে, যে সমাজবিধ্বংসী কার্যকলাপ অল্পস্থিত হইয়াছে, সেই অভিজ্ঞতার আলোকে আমাদের নূতন করিয়া গান্ধীজীর নির্দেশের প্রকৃত মর্ম-কথা বুঝিয়া লইতে হইবে। ১৯১৯ সালের মধ্যভাগে যখন তিনি আসিয়া আমাদের রাজনৈতিক জীবনের পুরোভাগে দাঁড়াইলেন, তখন আমাদের রাজনৈতিক জীবন নানা কারণে ছত্রভঙ্গ। বিপ্লবী ও সন্ত্রাসবাদী প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়া পড়িয়াছে; বৈধ রাজনৈতিক আন্দোলন বন্ধ্যা প্রমাণিত হইয়াছে। দেশের জনগণের মন এই সব ভাবনা চিন্তা সম্বন্ধে নিরুৎসুক; তাহা আপনার ভাবনায় মগ্ন। সেই মন ছিল মূঢ়, ব্লান, মুক; সে ভাবনা সম্বন্ধে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কোন সম্যক জ্ঞান ছিল না। শিক্ষিত সমাজ নিজের অভিজ্ঞতার সাহায্যে, সমাজজীবনের ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্যের তাড়নায়, জনগণ মনের ভাবনা-চিন্তার একটা অর্থ করিয়া তাহা প্রচার করিতেছিলেন। পরদেশী শাসন ও শোষণের ফলেই যে এই দারিদ্র্যের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। শিক্ষিত লোকের মনে অপমানের জ্বালা, দেশের জনসাধারণের মধ্যে দারিদ্র্যের তাড়না—এই ভাবের ও বাস্তবের চাপে একটা বিক্ষোভ ধনীভূত হইয়া প্রকাশের নূতন পথ খুঁজিতেছিল। গান্ধীজী সেই পথ কাটিয়া দিলেন। গোপনতার, বিপ্লবী ও সন্ত্রাসবাদী গোপনতার, বন্ধ ঘরে মানব মন গীড়িত হইতেছিল; গান্ধীজী ভাঙিয়া দিলেন সে গোপনতার প্রয়োজন; রাজপথের মাঝে “প্রকাশ্য ষড়যন্ত্র” (open conspiracy) ঘোষণা করিয়া সকলের মন-বুদ্ধিকে করিলেন মুক্ত; লোকের কর্মপ্রচেষ্টাকে করিলেন সহজ গতিশীল।

সেইজন্ত দেখিতে পাই অসহযোগ আন্দোলনে আবালবৃদ্ধ-বনিতা যুক্তিমানের মতন একটা সহজ আনন্দ লাভ করিয়াছে। “স্বদেশী” যুগে, বিপ্লবী ও সন্ত্রাসবাদী যুগে আমাদের দেশের মেয়েরা নানাভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন নিজের স্বভাবসিদ্ধ আবরণ পশ্চাৎ হইতে অভিভাবকদের অমতে ও অগোচরে। এই গোপনতার মধ্যে ছিল একটা ভয়, একটা উদ্বেগ, একটা অনিশ্চয়তার আশঙ্কা। গান্ধীজী-প্রবর্তিত পথে এই ভয়, উদ্বেগ; আশঙ্কা দূরীভূত হইল। মুক্ত আকাশের নীচে, মুক্ত প্রান্তরে দেশের মেয়েরা নির্ভীক কর্তব্যের একটা সন্ধান পাইলেন। তাহাও ত্যাগের পথ, জীবনব্যাপী সাধনার পথ, নীরব, শান্ত পল্লী-পথের মত।

এই সাধনা আত্মশুদ্ধির; এই সাধনা সংস্কার বর্জনের, যে সংস্কার হিন্দু মুসলমানকে পরস্পর হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে, হিন্দু সমাজের বুকের উপর দিয়া কালি কাটিয়া সর্ব

অবর্ণ ভেদের সৃষ্টি করিয়াছে এবং ভেদকে বিস্তার করিয়া সহস্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গভীতে পরিণত করিয়াছে ভারতের হিন্দু-মুসলমান সমাজব্যবস্থাকে। এই সহস্র গভী ভাঙিবার জন্ত গান্ধীজী আবেদন করিলেন মানুষের ভ্রাতৃত্বের নামে। সাম্প্রদায়িক ঐতিহ্যের ধনি এই আকৃতির বহিঃপ্রকাশ। ইংরেজের ব্যবসায় নীতির কল্যাণে ভারতবর্ষের নানা শিল্প বিনষ্ট হইয়াছে; গ্রহে গ্রহে সেই শিল্প চলিত। এই ধ্বংসের ফলে কোটি কোটি লোক বৃত্তিহীন হইয়া একমাত্র কৃষিকার্যের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়িল, এবং বৎসরের মধ্যে প্রায় চারি মাস কর্মহীন, বেকার জীবনযাপন করিতে বাধ্য হইল। ভারতের প্রাচীন অর্থনীতিক ব্যবস্থায় দরিদ্র, অপুত্রক বিধবার পর্যন্ত একটা বৃত্তি ছিল; “চরকা আমার নাতিপুত্রি” বলিয়া সে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিত। ইংরেজ সে বৃত্তি, সে ভরসা তাহার কাড়িয়া লইল। এই বৃত্তিহীনতার যন্ত্রণার কথা আমাদের কবি গাহিয়াছেন—“তাঁতি কর্মকার করে হাহাকার”—এই-ভাবে ছরবস্তার বর্ণনা করিয়াছেন। এই দেশব্যাপী বৃত্তিহীনতার প্রতিকার চেষ্টা অনেকেই করিয়াছেন কলকারখানার প্রতিষ্ঠা করিয়া। কিন্তু যেখানে চারি-পাঁচ কোটি লোক বৃত্তিহীন, বেকার, সেখানে এক কোটি লোকের নূতন বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া সমস্যার সমাধান হয় না। সেইজন্ত গান্ধীজী চরকা তাঁতের পুনঃপ্রতিষ্ঠার কথা বলিয়া গ্রাম্য শিল্পের প্রতি দেশের শিক্ষিত লোকের কর্তব্যের কথা মনে করাইয়া দিলেন। এই প্রস্তাবে উপার্জন হয়ত প্রচুর নয়, কিন্তু কর্মহীনতার যে ধানি দেশের শরীর-মনকে আচ্ছন্ন করিয়া অপটু করিয়া তুলিতেছিল তাহা ত দূর হইতে পারে। সেইজন্ত আপদ্রব্য রূপেও এই নূতন সংগঠনের জন্ত আহ্বান করিতে গান্ধীজী দ্বিধা করিলেন না। বর্তমান যুগের যন্ত্রদানবের নানা ব্যবস্থার তুলনায় চরকা তাঁত তুচ্ছ হইতে পারে। কিন্তু এই যন্ত্রদানবের কল্যাণে মানুষ এত পরনির্ভরশীল হইয়া পড়িয়াছে যে তাহার আত্মবিশ্বাস ফিরাইয়া আনিতে হইলে তাহাকে হইতে হইবে স্বয়ং-সিদ্ধ, নিজের প্রয়োজন মিটাইবার জন্ত আত্মনির্ভরশীল। এই ব্যবস্থার প্রস্তাব করিয়া গান্ধীজী যুগধর্মকে অস্বীকার করিয়াছেন বলিয়া অনেকে তাহা গ্রহণ করিতে পারিলেন না। শিক্ষিত অশিক্ষিত প্রায় কেহই এই নূতন সত্য মনে প্রাণে গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না।

ইংরেজের শাসন ও শোষণ ব্যবস্থা অসহযোগ আন্দোলনের আঘাতে দুর্বল হইল, কিন্তু তাহার পুরাতন কাঠামোটা প্রায় অটুট থাকিয়া গেল। হিন্দু মুসলমানের মধ্যে এই সময় যে হানাহানি উগ্র হইয়া উঠিল, তাহার পূর্ণ স্বেচ্ছা ইংরেজ গ্রহণ করিতে পশ্চাৎপদ হইল না। প্রায় আট বৎসর ইংরেজের নানা কৌশল আমাদের সংগঠন শক্তিকে আঘাত করিয়াছে। লর্ড বার্কেনহেড ভারতবাসীর প্রতিনিধিকে বাদ দিয়া আমাদের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার উপায় উদ্ভাবনের জন্ত পাঠাইলেন সাইমন

কমিশনকে। ভারতবর্ষের সমস্ত রাজনীতিক দল একত্র হইয়া তাহাতে বাধা দিল; ফুলে সাইমন কমিশনের রিপোর্ট বস্তাপচা হইয়া পড়িয়া রহিল। লাহোর কংগ্রেসে আনুষ্ঠানিকভাবে যখন পূর্ণ স্বরাজের আদর্শ গৃহীত হইল, তখন গান্ধীজী আর একবার রাজনীতিক ক্ষেত্রে নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। লবণ আইন ভঙ্গ করিয়া ইংরেজের রাষ্ট্র শক্তিকে তিনি যে সংগ্রামে আহ্বান করিলেন তাহার মধ্যে দেশের লোকের যে সহযোগিতা পাওয়া গেল তাহা অতুতপূর্ব্ব। অসহযোগের গণজাগরণকে তাহা শ্লান করিয়া দিয়াছিল বলিয়া মনে করিলে ভুল হইবে না। মুসলমান জনসাধারণ ইহাতে তেমন সাড়া দেয় নাই। কিন্তু মুসলমান ষাঁহারা এই আন্দোলনে যোগদান করিলেন তাঁহারা খেলাফত আন্দোলনের ধর্ম্মোদ্বোধন করিলেন না; একমাত্র রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে, রাজনীতিক স্বার্থ উদ্ধারের জন্ত তাঁহারা কারাগার ও অত্যাচার বরণ করিয়া লইলেন। এই সময়েই মুসলমানগরিষ্ঠ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে খান আবদুল গফুর খাঁর নেতৃত্বে এক অপূর্ব্ব গণজাগরণ স্ফূর্ত্ত হইয়া উঠে। স্বভাবতঃ সীমান্তের দুর্ধ্ব পাঠানকে তিনি অহিংসা-মন্ত্রে দীক্ষা দিয়া এক নূতন কর্ম্মধারার সৃষ্টি করিলেন; দেশ তাঁহাকে “সীমান্ত গান্ধী” নামে অভিহিত করিয়া এই নূতন কর্ম্মধারাকে অভিনন্দিত করিল।

গান্ধীজী ও ভারতবর্ষের বড়লাট লর্ড আরউইনের মধ্যে একটা বোঝাপড়া হইয়া এই আন্দোলনের শেষ হয়। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তগত করার পক্ষে এই আন্দোলনের প্রত্যক্ষ কোন সার্থকতা নাই। কিন্তু দেশের লোক গান্ধী-আরউন চুক্তির বলে এই ভরসা পাইল যে তাহাদের সংগঠন শক্তি বাড়িয়াছে এবং অদূর ভবিষ্যতে কংগ্রেসের হাতেই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্ত হইবার পটভূমি প্রস্তুত হইতেছে। লর্ড আরউইনের পরবর্ত্তী বড়লাট লর্ড উইলিংডন কংগ্রেসের এই শক্তিবৃদ্ধির নিশ্চয়তা সহজ মনে গ্রহণ করিতে পারিলেন না। সুতরাং দ্বন্দ্ব আবার ফুটিয়া উঠিল; দ্বিতীয় আইন অমান্ত আন্দোলন আরম্ভ হইল। দমননীতির দাপটে দেশের মনে যে বিদ্রোহের আগুন ধিকি ধিকি করিয়া জ্বলিতেছিল তাহা নূতন পথে আগ্রপ্রকাশ করিল ১৯৩৫ সালের আইন অনুসারে নির্বাচনের উপলক্ষে। এই নির্বাচনে সর্বদল নিরপেক্ষ হইয়া এগারটা প্রদেশের মধ্যে আটটিয় কংগ্রেসের জয়লাভ হইল। কংগ্রেসের প্রভাব এইভাবে প্রমাণিত হইলেও বিরোধের অবসান হইল না। দুই বৎসর যাইতে না যাইতে আবার বিরোধ দেখা দিল।

প্রচারবিধি ইংরেজ মুখে প্রচার করিয়া দিল যে ভারতবর্ষের রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ভারতবাসীর ক্ষমতা লগুন হইতে নিয়ন্ত্রিত হয় না যেমন হয় না কানাডা, অষ্ট্রেলিয়ার রাষ্ট্র ব্যাপারে। এই দুই রাষ্ট্র প্রকৃত পক্ষে স্বাধীন; লগুন-প্রবাসী রাজার নামে শাসনকার্য চলিলেও, কানাডা ও অষ্ট্রেলিয়ার মন্ত্রিসভার কর্তৃত্বে ও পরামর্শে রাজাকে চলিতে হয়। ব্রিটিশ রাষ্ট্রের

মন্ত্রী-সভার এই বিষয়ে কোন কথা বলিবার অধিকার নাই। এই ব্যবস্থার নাম Dominion Status। ইংরেজ বলিল, ১৯৩৫ সালের আইনে এইরূপ অধিকারের কোন ইঙ্গিত না থাকিলেও ভারতবর্ষে Dominion Status in action, ভারতবর্ষে এই স্বাধিকার কার্যতঃ প্রচলিত আছে। এই কথাটা যে কত মিথ্যা তাহা প্রমাণিত হইল যখন বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাধিয়া উঠিল। কানাডা, অষ্ট্রেলিয়ার রাষ্ট্র-সভা আলোচনা করিয়া, তর্ক করিয়া স্থির করিল জার্মানীর বিরুদ্ধে ও ত্রিটেনের পক্ষে তাহাদের যুদ্ধে যোগদান করা উচিত; দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্র-সভায় এই বিষয়ে ভোট লইয়া টায়ে টায়ে ত্রিটেনের পক্ষেই যোগদান বাঞ্ছনীয় মনে করা হইল; আয়ার (দক্ষিণ আয়ারল্যান্ড) ত ত্রিটেনের এই জীবন-মরণ সমস্তায় নিরপেক্ষ থাকাই স্থির করিল এবং ত্রিটেন Dominion Status-এর এই স্বাধিকার মানিয়া লইল। কিন্তু ভারতবর্ষের বেলায় ইংরেজ এই সংঘম দেখাইতে পারিল না। কোনও ভারতীয় নেতাকে বা কেন্দ্রীয় পরিষদকে জিজ্ঞাসা না করিয়াই ত্রিটেন ভারতবর্ষের পক্ষে, ভারতবর্ষের অধিরূপে, জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া বসিল; ভারতবর্ষকে ইউরোপের যুদ্ধে ঠেলিয়া দিল।

কার্যের দ্বারা ইংরেজ প্রমাণ করিয়া দিল যে ভারতবর্ষ তাহার খাস জমিদারী। এই অপমান কংগ্রেস মানিয়া লইতে পারিল না; কংগ্রেস মন্ত্রীমণ্ডলী আটটি প্রদেশের শাসন কার্যের দায়িত্ব ত্যাগ করিল। আবার প্রমাণিত হইল যে ভারতবর্ষের জনমত পদদলিত করিয়া, দেশের জনমতের বিরুদ্ধে ইংরেজ শাসন ও শোষণ কার্য চালাইতেছে। গান্ধীজী এই অপমানজনক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কংগ্রেস মন্ত্রী-মণ্ডলীর পদত্যাগ বাঞ্ছনীয় মনে করিলেও, ত্রিটেনের বিপদের সময় তাহার যুদ্ধ-প্রচেষ্টাকে কোনরূপ বাধা দিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। তাহার ধর্ম্মবুদ্ধি এইরূপ কাজের পক্ষে রীতিমত বিঘ্ন ঘটাইয়া বসিল। বিপন্ন শত্রুর গায়ে হাত তোলা প্রাচীন রণনীতির মতে অধর্ম্ম। এই ভাবাবেশে গান্ধীজী এই সমস্তার সময় তাহার কর্তব্য স্থির করেন নাই; তাহার চক্ষে ত্রিটেন শত্রু ছিল না, জার্মানীও মিত্র ছিল না, সমদর্শী তিনি; কর্তব্য স্থির করিয়াছিলেন ধর্ম্মবুদ্ধির ও প্রেমধর্ম্মের প্রেরণায়। পাণ্ডী অপাণ্ডী সমজান, এই শিক্ষা যুগযুগান্ত ধরিয়া ভারতবর্ষের জনগণকে চালিত করিতেছে এবং সে শিক্ষা জীবনে প্রতিফলিত করিবার জন্ত গান্ধীজী সাধনা করিয়া যাইতেছিলেন। এই সনাতন ঐতিহ্য রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে প্রবর্ত্তন করিয়া এক দ্বিধা ও অনিশ্চয়তার সৃষ্টি করিল যাহা কংগ্রেসের চিন্তা ও কর্ম্মধারাকে অস্বচ্ছ ও জটিলতাসম্বল করিয়া তুলিল। গান্ধীজীর এই মনোভাবের বিরুদ্ধে স্তম্ভাঘাত বহু প্রতিবাদের ধ্বনি তুলিলেন; ইংরেজের বিপদ ভারতবর্ষের সুযোগ—এই বাস্তব বুদ্ধির আলোকে চলিবার জন্ত তিনি ব্যর্থমনোরথ হইয়া দেশ ত্যাগ

করিলেন এবং ইউরোপ ও পূর্ব-এশিয়ায় ইংরেজের বিরুদ্ধে আয়োজন করিয়া প্রমাণ করিলেন যে, ভারতবাসী রাষ্ট্র গঠন করিতে পারে ও সৈন্যবাহিনী পরিচালনা করিতে পারে। “নেতাজীর” চেষ্টা ব্যর্থ হইতে পারে। কিন্তু যখন “আজাদ হিন্দ সরকার” ও “আজাদ হিন্দ সৈন্যবাহিনীর” কথা দেশের লোক জানিতে পারিল, তখন জন-গণ-মনের উচ্ছ্বাস গান্ধীজীর আদর্শের অমূল্য ছিল না, এই কথা স্বীকার করিয়া লইতে হইবে।

গান্ধীজীর মহাত্মভবতার সম্মান ব্রিটিশ শাসক সম্প্রদায় দেখাইতে পারিল না। যুদ্ধ-বিগ্রহের বিরুদ্ধে গান্ধীজীর মনে-ভাব সর্বজনবিদিত। কংগ্রেসের নেতৃমণ্ডলী সকলেই এই মনোভাবের সমর্থক ছিলেন না। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপরিচালনায় ভারতীয় জনগণের অধিকার স্বীকৃত হইলে তাঁহারা ব্রিটিশের বিপক্ষে সাহায্য করিতে পারেন, এই ভাবের প্রস্তাব নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির ১৯৪০ সালের জুলাই মাসের এক অধিবেশনে পাস হইয়াছিল। এই প্রস্তাব গ্রহণের ফলে গান্ধীজী-প্রায় দুই বৎসরের জ্ঞ কংগ্রেসের নেতৃত্ব হইতে সরিয়া দাঁড়ান। কারণ ভারতবর্ষের নামে নৈতিক সাহায্য ছাড়া অত্ৰ কোন প্রকার সাহায্য ব্রিটেনকে দিতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। এই মতভেদের মীমাংসা কখনও হয় নাই; তাঁহার দেহত্যাগের পূর্ব পর্যন্ত রাষ্ট্ররক্ষায় সংগঠিত সামরিক শক্তি প্রয়োগের সীমা কোথায় তাহার কোন মীমাংসা হয় নাই। এই যুদ্ধের সময় কংগ্রেস-নেতৃবর্গ ঘোষণা করেন যে তাঁহারা ইংরেজের হাত হইতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা উদ্ধার করিবার জ্ঞ হিংসা ও বল প্রয়োগের পক্ষপাতী নন, কিন্তু তাঁহারা এই কথা দিতে পারেন না যে স্বাধীন ভারতে রাষ্ট্রের রক্ষার জ্ঞ বল প্রয়োগের প্রয়োজন হইবে না।

ভারতবর্ষের রাষ্ট্রজীবনের উপর ব্রিটিশ কর্তৃত্বের অবসান হয় ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট। তারপর সাড়ে পাঁচ মাস গান্ধীজী বাঁচিয়াছিলেন; নতুন রাষ্ট্রপরিচালনায় তাঁহার পরামর্শ ও উৎসাহ পণ্ডিত জবাহরলাল নেহেরু প্রমুখ কেন্দ্রীয় গবর্নমেন্টের মন্ত্রিন্দ লাভ করিয়াছেন। রাষ্ট্র শাসন ও রক্ষার ব্যাপারে বলপ্রয়োগের প্রয়োজনে যে সমস্ত গান্ধীজীর মতকে কেন্দ্র করিয়া সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার সুমীমাংসা হয় নাই। ইহা স্বীকার্য যে হিংসা ও বলপ্রয়োগ দ্বারা কোন বিষয়ের বা বিবাদের চূড়ান্ত সমাধান হয় না। কিন্তু মানুষের বুদ্ধি, রাজনীতিক বুদ্ধি আজ পর্যন্ত এমন কোন অস্ত্র আবিষ্কার করিতে পারিল না যার প্রয়োগে অবিচারের শেষ হয়। মানুষের দৈনন্দিন জীবনে বলপ্রয়োগের স্থান নাই; ব্যস্তির শারীরিক বল সংযত করিয়াই মানুষের সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সমষ্টির জীবনে এই সংযমের প্রয়োগ হয় না, এই ত ইতিহাসের অভিজ্ঞতা। গত ত্রিশ বৎসর হইতে দেখা যাইতেছে যে সমষ্টির ব্যবহারে একটা অধৈর্য ক্রমশঃ বর্ধিত আকারে প্রকাশ পাইতেছে; ত্রিশ বৎসরের মধ্যে দুইটা বিশ্বযুদ্ধ হইয়া গেল। ব্যস্তির শুভবুদ্ধি বা সমষ্টির অনিচ্ছা তাহা আটকাইতে

পারিল না। এক অশরীরী উম্মাদনা দেশে দেশে বিস্তার লাভ করিয়া মানুষের সহজবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, তাহার বিচারবুদ্ধি ও স্বার্থবুদ্ধিকে হরণ করিয়া লয়। রণদেবতার পায়ে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি লোক নিজেকে বলিদেয়; জাতি-বৈরের আশ্রমে কোটি কোটি লোকের প্রমল্লধন পুড়িয়া যায় বন্দুক কামানের বারুদ ও গোলাবর্ষণে। এই ধ্বংসের সার্থকতা কিছুই নাই, এ কথা মুখেও বোঝে। কিন্তু রাষ্ট্রপতি, ধর্মবেত্তা, চিন্তানায়ক, বৈজ্ঞানিক—কেহুই এই ধ্বংসলীলার অবসানের কোন পথ আবিষ্কার করিতে পারিলেন না।

পরাদীন ভারতবর্ষের একজন লোক এই যুগসন্ধিক্ষণে মানুষের এই ছবুদ্ধি, এই লোভ, এই অপরাধের বিরুদ্ধে জীবনব্যাপী সংগ্রাম করিয়া গেলেন। যে দেশের শাসক সম্প্রদায় ভারতবর্ষের স্বাধীনতা হরণ করিয়াছিল, তাহারা অহিংসায় বিশ্বাসী নয়। তাহাদের সাম্রাজ্য রক্ষার প্রয়োজনে দুই দুইটা মহাযুদ্ধে দুই শত বৎসরের সঞ্চিত তাহাদের ধনভাণ্ডার পুড়িয়া গেল। ভারতবর্ষের উপর প্রভুত্ব অক্ষুর রাশি-বার জ্ঞ তাহারা নানা ভাবে অত্যাচারের বিভীষিকা বিস্তার করিয়াছে। শেষে তাহারা পরাজয় স্বীকার করিয়াছে অবস্থার নিকট, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সীমাহীন ক্ষতির নিকট। মহাযুদ্ধ সমাজের যে আকৃতি মহাত্মা গান্ধীকে অবলম্বন করিয়া প্রকাশ পাইয়াছিল এই নতি স্বীকার তাহার নিকট হইলে পৃথিবী আজ স্বর্গরাজ্যে পরিণত হইত। স্বল্পবিশ্বাসী আমরা আজও ভাবিতে পারিতেছি না যে আমাদের একজন-তাঁহার সাধনার বলে এই অসাধ্য সাধন করিয়াছেন; ইংরেজ অহিংসার নিকট পরাজয় মানিয়া লইয়াছে। একজন বিদেশী সাংবাদিক কিন্তু যুদ্ধোত্তর যুগের সমস্ত ঘটনা পর্যালোচনা করিয়া এই তত্ত্বই প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে গান্ধীজী জয়লাভ করিয়াছেন অর্থবলের সাহায্যে নয়, বলপ্রয়োগ দ্বারা নয়, খুব সুসংগঠিত শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে নয়। একটি বিশ্বাসের প্রয়োগ দ্বারা তিনি বিজয়ী হইয়াছেন; মন মুখ এক হইলে যে শক্তি লাভ করা যায় তাহার সাহায্যেই তিনি জয়লাভ করিয়াছেন; উপায় ও আদর্শের সত্যতা রক্ষা করিলে যে আধ্যাত্মিক শক্তির উদ্ভব হয়, তাহার সাহায্যেই তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অত্যাচারকে শুদ্ধ করিয়াছেন, বিধ্বস্ত করিয়াছেন। লুই ফিসারের “গান্ধী ও ষ্টালিন” এই বইয়ের কথাগুলি অনুধাবন করিলে এই তত্ত্বই প্রতিষ্ঠিত হয় :

“Gandhi stood against the might of the British Empire—and won. He did it without money, without violence, without much organization. He did it with an idea, and through the power that comes from honest means and honest words.”

কংগ্রেস সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধীর শেষ রচনা

“হরিজন” পত্রিকায় মহাত্মা গান্ধী “Congress position” শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লেখেন। এইটাই তাঁহার শেষ রচনা। প্রবন্ধটির মর্ম্মানুবাদ এখানে দেওয়া হইল :

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস দেশের সর্বপ্রাচীন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। কংগ্রেস অহিংস নীতি অনুসরণ করিয়া বহুবার স্বাধীনতা-সংগ্রাম চালাইবার পর বর্তমানে ইহার অস্তিত্ব বিলোপ হইতে দেওয়া চলে না। একমাত্র জাতি নিশ্চিহ্ন হইলেই কংগ্রেস ধ্বংস হইতে পারে। প্রাণবন্ত বস্তু জন্মবর্ধনশীল—অত্যাচার ধ্বংস অবধারিত। কংগ্রেস রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে—আর্থিক, সামাজিক ও নৈতিক ক্ষেত্রে তাহাকে স্বাধীনতা লাভ করিতে হইবে। রাজনৈতিক বন্ধন মুক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠোক্ত ক্ষেত্রগুলিতে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা অধিকতর কঠোর। কারণ, উহা সংগঠনমূলক—উদ্ভাদনা সৃষ্টিকারী বাহাদুরের ইহার মধ্যে কিছুই নাই। প্রকৃত গঠনমূলক পরিকল্পনাকে কার্যকরী করার ক্ষেত্রে দেশের নরনারী নির্বিশেষে সহযোগিতা প্রয়োজন।

লক্ষ্যহলে পৌঁছিবার ক্ষেত্রে অপরিহার্য প্রাথমিক অধিকার মাত্র কংগ্রেস লাভ করিয়াছে। অগ্নিপরীক্ষা এখনও বাকী। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সুকঠোর পথে যাত্রা করিয়া কংগ্রেস কতক দুর্নীতিপূর্ণ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছে। ঐগুলি নামে মাত্র জনপ্রিয় ও গণতন্ত্রসম্মত। এই অবাস্থিত পরিণতি হইতে অগাধ হতাশার উপায় কি?

কংগ্রেসের প্রাথমিক সদস্য-সংখ্যা কোনকালেই এক কোটির অধিক হয় নাই। এক কোটি নরনারী সদস্য হইয়াছেন ইহাও অবশ্য সঠিক ভাবে নির্ণয় করা চলে না। এক্ষণে কংগ্রেস সদস্য-তালিকায় সেই বিশেষ রেজিষ্টারটি অবশ্যই বাতিল করিতে হইবে। বাহাদুরের কোনরূপ পরিচয় জানা যায় না, এইরূপ লক্ষ লক্ষ সদস্যের নামের তালিকা সম্বলিত অজ্ঞাত রেজিষ্টার আছে। ভোটদান ক্ষমতাসম্পন্ন নরনারীর তালিকার অল্পরূপভাবে এক্ষণে কংগ্রেসের রেজিষ্টার তৈরি হওয়া কর্তব্য। উহার মধ্যে কোন ভূমি নাম না থাকে এবং কোন ব্যক্তির নাম বাদ না যায়, তৎপ্রতিই কংগ্রেসকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এই রেজিষ্টারে জাতির সেবকদের তালিকা থাকিবে এবং উক্ত কর্মীদের উপর যখন যে কার্যের ভার প্রদত্ত হইবে তাহা তাঁহারা সুসম্পন্ন করিবেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ বর্তমানে মুখ্যতঃ শহরবাসীদের লইয়া উক্ত তালিকা প্রস্তুত হইবে। তাঁহাদের অনেককেই হয়ত ভারতের পল্লীগুলিতে কাজ করিতে হইবে। পল্লী-সঞ্চল হইতে সংগৃহীত কর্মীর সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিতে হইবে।

উল্লিখিত দেশসেবকদের আইনসম্মতভাবে স্ব-স্ব অঞ্চলের নরনারীর সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। বহু নরনারী ও বহু দল তাঁহাদের খোসামোদে প্রয়ুক্ত হইবেন। খাঁটি কর্মীরাই সফললাভ করিতে সমর্থ হইবেন। যেরূপ দ্রুত-গতিতে কংগ্রেসের মর্যাদা হ্রাস পাইতেছে, একমাত্র উল্লিখিত নীতি অনুসরণদ্বারা ইহা পুনরায় সুপ্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব। কিছুদিন পূর্বে পর্যাপ্ত কংগ্রেস জাতির সেবক ঈশ্বরের ভৃত্য

ছিল। আজ কংগ্রেসকে ঘোষণা করিতে হইবে যে, ঈশ্বরের ভৃত্যদের প্রতিষ্ঠান ব্যতীত ইহা অপর কিছুই নহে। কংগ্রেস যদি ক্ষমতালভের অবাস্থিত দলদলিতে লিপ্ত হয় তাহা হইলে অচিরেই দেখা যাইবে যে, কংগ্রেসের অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছে। ভারতের রাজনীতি-ক্ষেত্রে কংগ্রেস আজ অপ্রতিদ্বন্দ্বী নহে।

এই সম্পর্কিত আলোচনার ইহা ভূমিকামাত্র—শরীর ভাল থাকিলে এবং সময় পাইলে দেশসেবকগণ কিভাবে দেশের পূর্ণবয়স্ক নরনারী নির্বিশেষের শ্রদ্ধাভাজন হইতে সমর্থ হইবেন, সেই সম্পর্কে ‘হরিজনে’ বিস্তারিত আলোচনা করিব।

গান্ধীজীর প্রতি পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুর শ্রদ্ধাঞ্জলি

বিগত ৩০শে জানুয়ারি (১৬ই মাঘ) শুক্রবার বৈকালে আততায়ীর গুলির আঘাতে মহাত্মা গান্ধীর জীবন-প্রদীপ নির্ঝাঁপিত হয়। ঐ দিন সন্ধ্যায় দিল্লীর বেতার-কেন্দ্র হইতে পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু পরলোকগত মহামানবের প্রতি নিম্নোক্ত রূপে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন,—

আমার দেশের ভাই-বোনেরা, এক নিদারুণ দুঃখশোকের অন্ধকার দেশের চারিদিক ছাইয়া ফেলিয়াছে। এই অবস্থায় আমি আপনাদের কি কথা শুনাইব? কেমন করিয়া আমি আপনাদের বলি যে, আমাদের বাপুজী সমগ্র জাতির জনক আর ইহলোকে নাই! আর ত তাঁহাকে চক্ষে দেখিব না। দেশের নানা দুঃখ-দুর্ভোগে আর ত তাঁহার কাছে মন্তগার জয় ছুটিয়া যাইতে পারিব না। দেশের এই পরম দুর্ভাগ্যের কথা চিন্তা করিতেও আমার মন সরিতেছে না। যে অনির্বাণ দীপশিখা সুদীর্ঘকাল সমগ্র পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া ছিল তাহা বর্তমানকে অতিক্রম করিয়া ভবিষ্যতের মাঝে ব্যাপ্ত হইল। সেই আলোকই সত্যের পথে, এই সনাতন ভারতবর্ষকে স্বাধীনতার পথে আগাইয়া দিয়াছে। ভারতের বর্তমান দুঃখসঙ্কুল দিনে মহাত্মাজীর বাঁচিয়া থাকিবার কতই না প্রয়োজন ছিল, অথচ তিনি নাই। এক উদ্ভাদ গান্ধীজীর জীবননাশের কারণ হইল। যাহা হইবার তাহা হইল কিন্তু যে বাণী গান্ধীজী জীবনভোর আমাদের শুনাইয়াছেন তাহাকে সমগ্র জাতীয় জীবনে ফুটাইয়া তুলিতে আমাদের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইতে হইবে। একনিষ্ঠ সৈনিকের দায় তাঁহার দীপবক্তিক লইয়া আমাদের অঙ্গের হইতে হইবে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের মাঝে এমন কোন স্থান যেন না থাকে যাহাতে তাঁহার আত্মা ক্ষুব্ধ বা ব্যথিত হয়। জাতির এই ভীষণ দুর্দিনে হিংসা, ভীষণতা ও সকল ক্ষুদ্র কলহের চিরতরে অবসান হোক।

অনেকে গান্ধীজীর দেহ কয়েক দিন রক্ষা করিবার কথা বলিয়াছেন। ইহাতে ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে

গেষ দর্শনেচ্ছ অগণিত দেশবাসী আসিয়া তাঁহাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করিবার সুযোগ লাভ করিবেন। জীবিতাবস্থায় গান্ধীজী বারবার ইহার বিরোধিতা করিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। সেইজন্য বহু লোকের এই প্রকার অভিলাষ থাকানো সত্ত্বেও গান্ধীজীর অন্তিম ইচ্ছাই পূর্ণ করিতে হইবে। শনিবার সকাল সাড়ে এগারটায় শবযাত্রা যমুনার ধারে নীত হইবে। বিকাল চারটা নাগাদ তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপ্ত হইবে। কোন্ পথ ধরিয়া এই শবযাত্রা যমুনায় পৌঁছিতে তাহার বিস্তৃত বিবরণ পরে জানান হইবে। দিল্লীর লোকেরা, যাহারা গান্ধীজীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে চান, তাঁহারা যেন পথের দুই ধারে নীরবে শান্তভাবে দাঁড়াইয়া থাকেন। বিড়লা ভবনে তাঁহারা যেন অযথা ভিড় না করেন। কোন বিক্ষোভ যেন না দেখান হয়। দিল্লীতে ও বাহিরে সর্বত্র প্রার্থনা ও উপবাসব্রত পালিত হোক। বিকাল চারটা নাগাদ যখন যমুনার তীরে গান্ধীজীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হইবে সেই সময় দিল্লীর বাহিরে লোক যেন নদী অথবা সমুদ্রের তীরে গান্ধীজীর উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানান। যে মহান ব্রত উদ্‌যাপনের জন্ত গান্ধীজী জীবন হারাইলেন তাহাকে অন্তরে গভীরভাবে উপলব্ধি করিয়া জীবনপণ করিতে পারিলেই তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য নিবেদন করা হইবে। আজ আমরা তাঁহার জীবনের সাধনাকে স্মরণ, মনন ও পালন করিব।

সদীর বল্লভভাই প্যাটেলের শ্রদ্ধাঞ্জলি

পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুর পরে সদীর বল্লভভাই প্যাটেল উক্ত বেতারকেন্দ্র হইতে বলেন,—

আপনারা আমার প্রিয় ভাই জবাহরলালের বক্তৃতা এইমাত্র শুনিলেন। আমার বুক ব্যথায় ভরা—কি বলি, কি করি, কি না করি ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। আমার মুখে কথা আসিতেছে না। ভারতের আজ দুঃখ শোক ও লজ্জার দিন।

আজ বিকাল প্রায় চারিটার সময় আমি গান্ধীজীর কাছে যাই। সেখানে তাঁহার সহিত আমার এক ঘণ্টা কাল কথাবার্তা হয়। তিনি ষড়ি বাহির করিয়া বলেন যে, এখন প্রার্থনার সময় হইয়াছে—আমাকে যাইতে দাও। তিনি যখন রওয়ানা হইলেন তখন আমিও বাড়ীর দিকে চলিলাম। বাড়ী পৌঁছিবামাত্র আগেই এক ভাই আমার নিকট আসিয়া বলিল যে, এক হিন্দু যুবক গান্ধীজীকে প্রার্থনার যাইবার সময় পিণ্ডল দিয়া তিন বার গুলী করিয়াছে। তিনি পড়িয়া গেলে তাঁহাকে উঠাইয়া বিড়লা ভবনে লইয়া যাওয়া হইয়াছে।

খবর পাইয়া সেখানে গেলাম। দেখিলাম শান্তি, সৌম্য ও ক্ষমার মধ্যে তিনি শায়িত আছেন। সেই শান্ত চেহারা! হৃদয়ে দয়ার প্রকাশে যে চেহারা তাঁহার দেখা যায়, সেই চেহারাই দেখিলাম। আশেপাশে বহুলোক জমায়েত হইয়াছেন। কিন্তু গান্ধীজী চলিয়া গিয়াছেন।

সম্প্রতি অনশনের ঝুঁকি লওয়ার পরও গান্ধীজীকে বাঁচিয়া

উঠিতে দেখা গিয়াছে। বোধ হয়, ভারতের জন্ত তাঁহার কাজ তখনও অসমাপ্ত। তুলিয়া তাঁহার জীবনান্ত হয় নাই। কিছুদিন হইতে গান্ধীজীর মনে বেদনার ভাব লক্ষ্য করা যাইতেছিল। গত সপ্তাহে এক উম্মাদ হিন্দু যুবক তাঁহার উপর বোমা নিক্ষেপের চেষ্টা করে। তখনও তিনি বাঁচিয়া যান। কিন্তু এবারে এক উম্মাদ যুবকের গুলীতে তিনি চিরবিদায় লইলেন। ইহা লজ্জার কথা যে পৃথিবীর সেরা মানুষটি তাঁহার জীবন দিয়া জাতির পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলেন।

কিন্তু ক্রুদ্ধ হইলে ত চলিবে না। এখন ক্রুদ্ধ হইলে তিনি সারাজীবন ধরিয়া যাহা শিখাইয়াছেন তাহা আমরা তুলিয়া যাইব। গান্ধীজীর জীবিতকালে তাঁহার যে আদেশ আমরা মানি নাই, সে আদেশ তাঁহার মরণের পরে আমাদের অবশ্যই মানা কর্তব্য। আমার প্রার্থনা এই যে যত দুঃখ ব্যথাই হোক, আর যত ক্রোধই হোক, আজ ক্রোধকে সামলাইয়া লইতে হইবে। তিনি তাঁহার সারা জীবনে যাহা শিখাইয়াছেন, তাঁহার মরণের পরে সেই শিক্ষারই পরীক্ষা দিতে হইবে।

শান্তি, ভাল ব্যবহার ও বিনয় সহকারে পরস্পরের সহিত মিলিয়া মাটিতে শক্ত হইয়া দাঁড়াইতে হইবে। আমাদের উপর মহান দায়িত্ব বর্তাইয়াছে। আমাদের এখন কোমর ভাঙিয়া গিয়াছে। হিন্দুস্থানের মহান পুরুষ, আমাদের বিরূপ ভরসা চলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তিনি চলিয়া গেলেও আমাদের সঙ্গে সব সময়েই আছেন ও থাকিবেন। তিনি যাহা দিয়াছেন তাহা যাইবার নহে, তাহা চিরকালই থাকিবে। আগামী কাল চারিটার সময় তাঁহার দেহ মাটি হইতে পারে, কিন্তু তাঁহার আত্মা আমরা কি করিতেছি তাহা দেখিবার জন্ত জাগিয়া থাকিবে। তিনি ত অমর।

যে যুবক পাগল হইয়া গান্ধীজীকে হত্যা করিল সেই যুবকের পাগলামি হইতেই হিন্দুস্থানের যুবক জাগিয়া উঠিবে বলিয়া আশা করি। গান্ধীজীর জীবন বিনিময়ে গান্ধীজীর সাধনাকে সার্থক করিবার জন্ত কে জানে ঈশ্বরই হয়ত এই যুত্যা চাহিয়াছেন।

কিন্তু আমাদের কাজ বাকী রহিয়াছে। আমাদের পিছাইয়া গেলে চলিবে না। একসঙ্গে দাঁড়াইয়া মিলিত ভাবে সকলকে বিপর্যয়কে রোধ করিতে হইবে। যে কাজ হয় নাই, তাহাই করিতে হইবে। ভগবানের কাছে প্রার্থনা, আমরা যেন গান্ধীজীর আরক্ত সাধনাকে সফল করিতে পারি।

ভারতীয় পার্লামেন্টে পণ্ডিত নেহরুর ভাষণ

মহাত্মা গান্ধীর স্বত্বার পর গত ২রা ফেব্রুয়ারি দিল্লীতে ইউনিয়ন পার্লামেন্টের প্রথম অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে ভারতীয় ইউনিয়নের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু এই শোকাবহ হৃদয়নার উল্লেখ করিয়া নিরুপক বক্তৃতা করেন—
এই হৃদয়না (গান্ধীজীকে হত্যা) কোন উম্মাদ ব্যক্তির অনশ-

নিরপেক্ষ কার্য্য নহে। দীর্ঘকাল ধরিয়া, বিশেষভাবে গত কয়েক মাস দেশে যে হিংসা ও বিদ্বেষের বিষাক্ত পরিবেশ বিরাজ করিতেছে এই ঘটনা তাহারই ফল। এই পরিবেশ আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া আছে, ইহা আমাদের বেঠন করিয়া আছে। মহাত্মাজী আমাদের জ্ঞাত যে কার্য্য রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা করিতে হইলে আমাদিগকে এই পরিবেশের সম্মুখীন হইতে হইবে। ইহার সঙ্গে সংগ্রাম করিতে হইবে। হিংসা ও বিদ্বেষরূপ অন্ধলের মূলাংগপাটন করিতে হইবে। গবর্নমেন্টের পক্ষ হইতে আমি বলিতে পারি, তাহারাজ্ঞ কোন চেষ্টারই ক্রটি করিবে না। কারণ আমাদের দুর্বলতা বা অজ্ঞ কোন কারণে আমরা যদি ইহা না করি, এই হিংসা ও বিদ্বেষ প্রচার যদি বন্ধ না করি তাহা হইলে আমরা এই গবর্নমেন্টে থাকিবার যোগ্য নই, তাঁহার অনুগ্রামী হওয়ার যোগ্য নই, যত মহাত্মার প্রতি শ্রদ্ধার বাণী উচ্চারণের যোগ্যতাও আমাদের নাই।

শত শত এবং লক্ষ লক্ষ বর্ষ পরে লোক এই সময়ের কথা মনে করিবে যে জগতে এই ঈশ্বর-প্রেরিত মহাত্মানব বিচরণ করিতেন। তাহারাজ্ঞ হয়ত আমাদের কথাও ভাবিবে যে, যে-পরিব্রজ্যুতে তাঁহার পদাঙ্ক পড়িয়াছে, আমরা যত ক্ষুদ্রই হইলাম কেন সেই ভূমিতে আমরাও বিচরণ করিয়াছি। আমরা যেন এই যোগ্যতা অর্জন করিতে পারি।

বিশিষ্ট ব্যক্তিদের স্মৃত্যুতে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করা, তাঁহাদের জ্ঞাত প্রাশসা বাণী উচ্চারণ করা তাঁহাদের জ্ঞাত শোক প্রকাশ করা এই পরিষদের রীতি। আজ এই দিনে আমার অথবা এই পরিষদের অজ্ঞ কাহারও বিশেষ কিছু বলার যোগ্যতা আছে কিনা, এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত হইতে পারিতেছি না। ব্যক্তিগতভাবে এবং গবর্নমেন্টের কর্ম্মকর্ত্তা হিসাবে আমি বিশেষ লজ্জা অনুভব করিতেছি। জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদকে আমরা রক্ষা করিতে পারিলাম না। ইহা আমাদের বার্ষতা। গত কয়েক মাসে বহু অসহায় নরনারী ও শিশুকে আমরা রক্ষা করিতে পারি নাই। আমাদের পক্ষে অথবা যে-কোন গবর্নমেন্টের পক্ষে ইহা দুঃসাধ্য কর্ত্তব্য হইতে পারে কিন্তু তবুও ইহা বার্ষতা। যে মহাত্মানবকে আমরা অপরিণীম সম্মান করিতাম, ভালবাসিতাম, তিনি যে চলিয়া গিয়াছেন, আমরাই তাহার কারণ। একজন ভারতীয় তাঁহার বিরুদ্ধে হস্ত উত্থিত করিয়াছে সেজ্ঞ ভারতীয় হিসাবে আমি লজ্জিত। একজন হিন্দু এই কার্য্য করিয়াছে, সেজ্ঞ আমি হিন্দু হিসাবে লজ্জা অনুভব করিতেছি। বর্ত্তমান যুগের তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ভারতীয় এবং সর্বশ্রেষ্ঠ হিন্দু ছিলেন।

ঐশ্বর্য ও মহৎ ব্যক্তিগণের স্মৃতিস্তম্ভ ত্রুণ ও মার্কেলে নির্ম্মিত হইয়া থাকে। কিন্তু ঐশ্বরিক শক্তিবিশিষ্ট এই মহাপুরুষ লক্ষ লক্ষ হৃদয়কে তাঁহার জীবিতকালের মধ্যেই এমন ভাবে একাত্ম করিয়া লইয়াছিলেন যে বহুলাংশে ক্ষুদ্র হইলেও আমরা সকলেই যেন সেই একই উপকরণে গঠিত হইয়া গিয়াছি। তিনি

আপনার প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন—রাজপ্রাসাদে নয়, শুধু নির্দিষ্ট স্থানে নয়; জনসমাবেশে নয়; দরিদ্রদের কুঠীরে লাক্ষিত ও নিপীড়িতদের ভবনে তিনি আপনার স্থান করিয়া লইয়াছেন।

গত ৩০ বৎসর ধরিয়া এই দেশকে তিনিই প্রধানতঃ গড়িয়া তুলিয়াছেন। আত্মত্যাগের এত উন্নত স্তরে তিনি উঠিয়াছিলেন যে অজ্ঞ তাঁহার তুলনা বিরল। তিনি সফল হইয়াছিলেন। কিন্তু পরিশেষে অবস্থা এমন দাঁড়াইয়াছে যে তিনি ইহার জ্ঞাত পীড়া অনুভব করিয়াছেন। তাঁহার মুখে যদিও সর্বদা হাসি লাগিয়াই থাকিত, যদিও কখনও তিনি কাহারও প্রতি কঠোর বাক্য প্রয়োগ করেন নাই, তবুও যাহাদিগকে তিনি শিক্ষা দিয়াছেন, তাহাদের ভুলত্রুটির জ্ঞাত পীড়া অনুভব করিয়াছেন কারণ আমরা তাঁহার প্রদর্শিত পথ হইতে বিচলিত হইয়াছি। পরিশেষে তাঁহারই এক সন্তান তাঁহাকে হত্যা করিল, কারণ যে-কোন ভারতীয়ই তাঁহার সন্তানস্বরূপ।

প্রয়াগে পণ্ডিত নেহরুর বক্তৃতা

বিগত ১২ই ফেব্রুয়ারি মহাত্মা গান্ধীর দেহাবশেষ গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর সঙ্গমস্থলে বিসর্জনের পর বিপুল জনতার সম্মুখে পণ্ডিত নেহরু তাঁহার সম্পর্কে এক মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা করেন। ইহাতে তিনি বলেন,—

মহাত্মা গান্ধীর চিত্তাভ্যাস বিসর্জনের সঙ্গে তাঁহার সহিত তাঁহাদের সম্পর্ক শেষ হইয়া যায় নাই, পক্ষান্তরে যোগসূত্র আরও দৃঢ় হইল।

আমাদের সৌভাগ্য যে, মহাত্মা গান্ধীর সমসাময়িক যুগে আমরা এই পৃথিবীতে জন্মিয়াছি এবং তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। পরবর্ত্তী বংশধরগণ তাঁহাকে দেখিতে পাইবেন না, কিন্তু তাঁহারাও আমাদের দ্বারা তাঁহার নিকট হইতে প্রেরণা লাভ করিবেন, তাঁহার মহান ব্যক্তিত্ব অনন্তকালস্থায়ী।

তাঁহার স্মৃতির পূর্বে আমরা সর্বদা তাঁহার নিকট যাইতে পারিতাম এবং তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিয়া উপকৃত হইতাম। এক্ষণে আমরা আর তাহা করিতে পারিব না। আমরা এক্ষণে আর তাঁহাকে আমাদের বোঝার অংশ গ্রহণের জ্ঞাত অনুপ্রাণিত করিতে পারিব না। আমাদিগকে এক্ষণে তাঁহার সাহায্য ব্যতীত সব কিছুই সম্মুখীন হইতে হইবে। কিন্তু তিনি আমাদিগকে যাহা শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, তাহা সর্বদাই আমাদিগকে অনুপ্রাণিত ও পরিচালিত করিবে।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনাকালে গান্ধীজী হিংসা ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধেও প্রচারকার্য্য চালান। কিন্তু ভারতবাসীর স্বাধীনতা অর্জিত হইবার অব্যবহিত পরে তাহার পরম্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল এবং দেশ-ব্যাপী হিংসার তাণ্ডব চলিল। তিনি যেভাবে একটি নিবীৰ্য্য জাতির স্বাধীনতা অর্জনে সহায়ক হন তাহা ইতিহাসে অমৃত-পূর্ণ। কিন্তু সম্প্রতি স্বাধীন ভারতই জগতের সমক্ষে অপদস্থ

হইয়াছে এবং ভারতবাসীর অন্তরাঙ্গা ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে। দেশের বিযাক্ত আবহাওয়ার সাম্প্রদায়িকতা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। জনসাধারণের মধ্যে কয়েকটি সম্প্রদায়-হিংস কর্মতৎপরতা অবলম্বনের প্রতি ঝোক দেয় এবং পরিণামে সর্বাধিক শ্রদ্ধাভাজন বাগুজীই নিহত হইয়াছেন।

এইরূপ হিংসাতৎপরতা বন্ধ না হইলে অর্জিত স্বাধীনতার বিনাশ ঘটবে। কাজেই হিংসার অবসান ঘটাইবার উদ্দেশ্য লইয়া সকলকে গঙ্গাজী হইতে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে। ভারতের বহু যুবক হিংসার পথ আশ্রয় করিয়াছে; তাহাদের এখন নিজেদের অহুসৃত উপায়ের অমৌজিকতা উপলব্ধি করিয়া ভ্রান্ত বুদ্ধি পরিহার করিতে হইবে।

রাজনীতিক প্রতিপক্ষদের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ করিবার যে মনোভাব রহিয়াছে তাহা আমাদের নিকট অপ্রীতিকর এবং আমাদের ভবিষ্যতের পক্ষে বিপজ্জনক। আমাদের দেশে গণতান্ত্রিক গবর্নেন্ট প্রতিষ্ঠিত হইবে বলিয়া আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছি। শান্তির বিঘ্ন না ঘটাইয়াও এখানে প্রত্যেক নাগরিকের স্বীয় অভিমত প্রচারের অধিকার আছে। তবে যে গবর্নেন্ট জনসাধারণের অধিকাংশের বিশ্বাস অর্জন করিবে, তাহারাই শাসনকার্য্য নিরীহ করিবে। এ ধরনের গবর্নেন্ট যাহারা পছন্দ করেন না এবং যাহারা বলপ্রয়োগে সরকারী শাসনযন্ত্র অধিকার করিতে ইচ্ছুক, তাহাদের স্বাধীন ভারতে কোন স্থান নাই।

এদেশে সাম্প্রদায়িক ঘৃণা ও হিংসাত্মক কার্য্যতৎপরতার প্রসার ঘটিল কি করিয়া? জনসাধারণের বিশ্বাসভাজন কতিপয় ব্যক্তি যুব-সম্প্রদায়কে চালিত করিয়া নিজেদের স্বার্থোদ্ধার করিয়াছে। অতীতে হয়ত আমরা ইহার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা করিতে পারিতাম না। কিন্তু আমাদের জাতির জনকের শেষকৃত্য সম্পন্ন হইবার পরও কি কেহ হিংসা ও সাম্প্রদায়িকতার অবসান ঘটাইতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হইবে না?

ইহার পর আমরা বিধাদ্রষ্টা অন্তরে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিব। কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর ছায় বিরাট নেতাকে পাইয়া আমরা যে গর্হরোধ করিতে পারি, এই মনোভাবও আমাদের মর্যাদাসিক বেদনার মধ্যে আনন্দ সঞ্চার করিতেছে। স্বাধীনতার যুদ্ধে তিনি আমাদের নূতন অস্ত্রের সন্ধান দেন এবং উহার ফলে আমাদের সংগ্রাম অহিংস ও শান্তিপূর্ণ হয়। তিনি আমাদের জ্ঞান যাহা করিয়াছেন তজ্জন্ম তাঁহার প্রতি আমাদের কর্তব্য রহিয়াছে। তাঁহার আরও কার্য্য আমাদের সম্পন্ন করিতে হইবে এবং তাঁহার আদর্শ অনুযায়ী ভারতবর্ষ গড়িতে হইবে। ভারতে ধর্মনির্বিশেষে প্রত্যেককে সম-অধিকার দানের ব্যবস্থা হইবে এবং বিশ্ববাসীদের প্রতিও আমরা অনুরূপ মনোভাবে উদ্বুদ্ধ হইব। সর্বমানবের প্রতি সম-আচরণই হইল গান্ধীজীর প্রদত্ত শিক্ষা। আমরা যদি ইহাতে বিফল হই তাহা হইলে বুঝা যাইবে যে, তাঁহার মত

বিরাট নেতা লাভের যোগ্য আমরা ছিলাম না। বিগত ৪০ বৎসরকাল ধরিয়া গান্ধীজীর জয়ধ্বনি করা হইতেছে। গান্ধীজী কখনও ব্যক্তিগত জয় কামনা করেন নাই। প্রকৃতপক্ষে ভারতের জয়ই ছিল তাঁহার কাম্য। তিনি সত্য ও অহিংসার সূচক ভিত্তির উপর ভারতের স্বাধীনতা-সৌধ নির্মাণ করেন; এরূপ অবস্থায় তাঁহার বিজয় সম্পর্কে নিঃসংশয় হইতে হইলে উহাকেই স্থায়ী করিয়া তুলিতে হইবে।

মহাত্মাজীর প্রতি বড়লাটের শ্রদ্ধাঞ্জলি

দিল্লীর বেতার-কেন্দ্র হইতে গত ১২ই ফেব্রুয়ারী ভারতের বড়লাট লর্ড মাউন্টব্যাটেন মহাত্মা গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি বলেন,—

মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যু-সংবাদে সমগ্র সভ্য জগতের লক্ষ লক্ষ লোক ব্যক্তিগত শোকের বেদনায় মুহুমান হইয়াছে। যাহারা সারাজীবন তাঁহার কর্মসঙ্গী ছিলেন অথবা আমার মত যাহারা তাঁহার সহিত অল্পদিনের পরিচিত ছিলেন, কেবল যে তাঁহারাই বহুবিশ্রামের বেদনা বোধ করিয়াছেন তাহা নয়; যাহারা জীবনে গান্ধীজীর সহিত কখনও সাক্ষাৎ করেন নাই, তাঁহাকে একবারও দেখেন নাই কিংবা তাঁহার রচনাবলীর একটি বর্ণও পাঠ করেন নাই তাঁহারাও তাঁহার মৃত্যু-সংবাদে বহুবিশ্রামের বেদনাই অন্তরে অনুভব করিয়াছেন।

“প্রিয় বন্ধু” বলিয়া সর্বদা চিঠিতে আমাকে তিনি সম্বোধন করিতেন, আমিও তাহাই করিতাম। তাঁহাকে সম্ভাষণের ইহা অপেক্ষা যোগ্যতর কিছু যে ছিল না, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই কথাটাই আমার পরিবারের সকলে এবং আমি সর্বদা মনে রাখিব।

গত বৎসর মার্চ মাসে গান্ধীজীর সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। ভারতে পৌঁছিয়া আমার প্রথম কাজই হইয়াছিল গান্ধীজীর কাছে চিঠি লেখা, আমাদের উভয়ের মধ্যে যত শীঘ্র সম্ভব সাক্ষাতের প্রয়োজনের বিষয় উল্লেখ করা। যে দুইটি সমস্যা আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে তাহার সমাধান করিতে হইলে আমাদের ব্যক্তিগত সংযোগ অবিচ্ছিন্ন রাখার বিশেষ প্রয়োজন—ইহা আমরা আমাদের প্রথম সাক্ষাতেই স্থির করিয়াছিলাম। শেষ বার তিনি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন—ঠিক এক মাস আগে; যে প্রার্থনা-সভায় গান্ধীজী বোষণা করেন সাম্প্রদায়িক মিলন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত না হইলে তিনি আমৃত্যু অনশন করিবেন, তাহার কয়েক মিনিট পরেই তিনি আমার কাছে আসেন। তাঁহার অনশনের চতুর্থ দিবসে আমার জীকে লইয়া তাঁহাকে দেখিতে যাই; জীবিত অবস্থায় গান্ধীজীকে উহাই আমার শেষবার দেখিতে যাওয়া। এই দশ মাস ধরিয়া আমরা পরস্পরকে জানিতে পারিয়াছিলাম; নিতান্ত মামুলি ধরনের দেখা-সাক্ষাতের মধ্যেই আমাদের পারস্পরিক আলাপ-আলোচনাগুলি শেষ হইত।

না। সে সব যেন ছিল দুই বছর মধ্যে কথাবার্তা। আমরা উভয়েই উভয়ের প্রতি বিশ্বাস জমাইতে পারিয়াছিলাম। দুই জনই দুই জনকে যেন বুঝিতে পারিয়াছিলাম। ইহার স্মৃতিই এখন আমার কাছে চিরদিনের মত এক মূল্যবান সম্পদ হইয়া রহিল। ভারতের নবলব্ধ স্বাধীনতার দেহে যে মারাত্মক রোগের বীজাণু তাহার সর্বনাশ সাধনে উত্তম হইয়াছে, সেই ধর্মোন্নততার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে গিয়া শান্তির অবতারণা, অহিংসার মূর্ত প্রতীক গান্ধীজী এক জিহ্বাংগুর হাতে প্রাণ দিলেন, শহীদ হইলেন।

জাতিকে গড়িয়া তুলিবার যে গুরুদায়িত্ব রহিয়াছে, সেই ভার লইবার আগে জাতির-দেহ হইতে এই বিষাক্ত বীজাণুকে সমূলে উৎপাটন করিতে হইবে—ইহা তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

আমাদের মহাপ্রাণ প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু চিরস্থায়ী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আদর্শ আমাদের সামনে তুলিয়া ধরিয়াছেন। এই রাষ্ট্রের সর্বলৈই সার্থক ও নব উন্মেষময় জীবন যাপন করিতে পারিবে। এই রাষ্ট্রে যথার্থ প্রগতিশীল সমাজ গড়িয়া উঠিতে পারিবে, যাহার ভিত্তি হইবে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাম্য।

যে স্বাধীনতার ভিত্তি গান্ধীজী তাঁহার জীবদ্দশায় প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার যোগা সম্মান রাখিতে হইলে সেই ভিত্তির উপরে এইরূপ একট সমাজ আমাদের স্থাপন করিতে হইবে। আমাদের হৃদয় মন ও কর্মের পরিবর্তন করিতে হইবে। যে শোকাবহ ও মর্মান্বাজী মৃত্যুতে গান্ধীজীকে আমরা হারাইলাম, সেই শোকের আঘাতে যদি আমাদের সকল বিভেদ দূর হইয়া যায়; যদি এখনই, এই মুহূর্তেই আমরা স্থায়ীভাবে সম্মিলিত চেষ্টায় এক হইতে পারি তবেই গান্ধীজী যাহাদের এত ভালবাসিতেন সেই জনগণের প্রতি তাঁহার চরম সেবার সুযোগ আমরা করিয়া দিতে পারিব।

কেবল এই উপায়েই তাঁহার আদর্শ রূপায়িত হইতে পারিবে, ভারতবর্ষ তাহার পূর্ণ ঐতিহ্যের অধিকারী হইবে।

গান্ধীজীর নির্দেশিত পন্থা ও ভারতবাসীর কর্তব্য

ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু দিল্লীর বেতার কেন্দ্রে হইতে গত ১৪ই ফেব্রুয়ারি জাতির উদ্দেশে একটি বক্তৃতা করেন। ইহাতে তিনি মহাত্মা গান্ধী নির্দেশিত পন্থা ও ভারতবাসীর কর্তব্য সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করেন। এই বক্তৃতার মর্ম এই,—

যে শোচনীয় ঘটনার জন্ত ভারতবর্ষের নাম কলঙ্কিত হইয়াছে তাহার গুর হইতে দুই সপ্তাহ অতিবাহিত হইয়াছে। এই দুইটি সপ্তাহ জাতির জীবনের দুঃখময় অমানিশা, এই দুই সপ্তাহ ধরিয়া ভারতের লক্ষ লক্ষ অধিবাসী বেদনাক্লিষ্ট অন্তরে অশ্রু বিসর্জন করিয়াছে। আমরা মহান নেতার জন্ত যে

অশ্রু বিসর্জন করিয়াছি তাহা দ্বারা কি আমাদের অন্তরের দৌর্বল্য ও মালিষ্ঠ ধৌত হইয়া যাইবে? উহার ফলে কি আমরা তাঁহার এতটুকু উপযুক্ত হইতে পারিব? এই দুই সপ্তাহ ধরিয়া পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের সাধারণ লোক হইতে রাষ্ট্রের অধিপতি পর্যন্ত মহাত্মার স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছেন। এই ভাবাবেগ ধীরে ধীরে হ্রাস পাইবে, কিন্তু তাহা হইলেও আমরা পূর্বের অবস্থা ফিরিয়া পাইব না, কারণ তিনি আমাদের জীবন ও মনের প্রত্যেক স্তরে তাঁহার ছাপ রাখিয়া গিয়াছেন।

তাঁহার জন্ত ব্রোঞ্জ ধাতু অথবা মর্ম্মরের প্রতিমূর্তি অথবা স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের জন্ত অনেকে প্রস্তাব করিয়াছেন। ইহার দ্বারা তাঁহাকে উপহাস করা হয় এবং বাণীর মূল্যকে হীন করা হয়। তাঁহার সম্মানযোগ্য কি স্মৃতিস্তম্ভ আমরা নির্মাণ করিতে পারি। তিনি আমাদের জীবন ধারণের ও জীবন উৎসর্গের পথ দেখাইয়া গিয়াছেন। আমরা যদি সেই শিক্ষার মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে না পারি তবে তাঁহার জন্ত কোন স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ না করাই ভাল; মহাত্মাজী আমাদের যে পথ দেখাইয়া গিয়াছেন, শ্রদ্ধাবনতচিত্তে সেই পথ অনুসরণ করা এবং জীবনে ও মরণে আমাদের কর্তব্যপালন করাই তাঁহার স্মৃতিরক্ষার একমাত্র উপযুক্ত উপায়।

তিনি ছিলেন হিন্দু ও ভারতীয়; বহুকাল তাঁহার ভায় মহৎ লোকের জন্ম হয় নাই। ভারতীয় ও হিন্দু হওয়ার জন্ত তিনি গর্ব্ববোধ করিতেন। ভারতবর্ষ তাঁহার নিকটে অত্যন্ত প্রিয় ছিল, কারণ বহু শতাব্দী ধরিয়া ভারতবর্ষ শাস্ত সত্যের প্রচার করিয়া আসিয়াছে। তিনি ধর্ম্মপ্রবণ ছিলেন এবং জাতির জনক বলিয়া অভিহিত হইলেও সঙ্গীর্ণ ধর্ম্মভাব অথবা সঙ্গীর্ণ জাতীয়তাবোধ তাঁহার মনকে আচ্ছন্ন করিতে পারে নাই। এইজন্যই তিনি আন্তর্জাতিক-মনোভাব-সম্পন্ন ব্যক্তিতে পরিণত হন। তিনি মানুষের ঐক্যে বিশ্বাসী ছিলেন, প্রত্যেক ধর্ম্মের অন্তর্নিহিত ঐক্যে তিনি আস্থারান ছিলেন এবং দরিদ্র মানবের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

তাঁহার স্মৃতির প্রতি অগণিত লোক শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করিয়াছে। ইতিহাসে ইহার তুলনা নাই। পাকিস্থানের অধিবাসীরা যেরূপ স্বতঃস্ফূর্তভাবে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছে—ইহাতে তিনি বোধ হয় সর্বাপেক্ষা আনন্দিত হইতেন। সেই শোচনীয় ঘটনার পরদিন আমরা মুহূর্তের জন্ত সকল তিক্ততা তুলিয়া গিয়াছিলাম, গত কয়েক মাসের বিবাদ ও মতানৈক্য ক্ষণেকের জন্ত আমরা বিস্মৃত হইয়াছিলাম—গান্ধীজী আমাদের মানসনেত্রের সম্মুখে ভারত বিভাগের পূর্বে অথচ ভারতের অবিসংবাদী ও প্রিয় নেতারূপে প্রতিভাত হইতেছিলেন।

মহাত্মাজী ছিলেন ভারতের মিলনকারী; তিনি কেবল আমাদের অপরকে সহ্য করিবার শিক্ষাই দেন নাই—পরস্পর তিনি আমাদের সেই সকল ব্যক্তিকে বন্ধু ও সহকর্মী হিসাবে গ্রহণ করিবার শিক্ষাও দিয়াছেন। তিনি আমাদের ক্ষুদ্র স্বার্থ

ও সংস্কারের উদ্দেশ্যে উঠিতে এবং অস্ত্রের মধ্যে শুভের লক্ষণ দেখিবার শিক্ষাও দিয়াছেন।

তাঁহার জীবনের শেষ কয়টি মাস এবং তাঁহার মৃত্যু হইতেছে একা, উদারতা এবং পরমত সহিষ্ণুতার মূর্ত প্রতীক। তাঁহার মৃত্যুর কিছু পূর্বে আমরা ঐ সকল আদর্শ অনুসরণ করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলাম। আমরা সেই প্রতিশ্রুতি পালন করিব। আমাদের ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ভারতে যাহারা বাস করে তাহারা যে ধর্ম্মাবলম্বী হউক না কেন ভারত-বর্ষ তাহাদের মাতৃভূমি। তাহারা আমাদের মহান ঐতিহ্যের সমান অংশীদার। তাহাদের বাধ্যবাধকতা ও অধিকারও সকলের সমান। সকল বিরাট জাতির দায় আমাদের জাতিও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক লইয়া গঠিত। সঙ্গীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী দিয়া দেখিলে অথবা এই বিরাট জাতিকে ক্ষুদ্র গভীর মধ্যে সীমাবদ্ধ করিবার চেষ্টা করা হইলে তাঁহার শিক্ষার অবমাননা করা হইবে, উহার ফলে বিপদের সৃষ্টি হইবে এবং তিনি যে স্বাধীনতার জন্ত সারা জীবন সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন ও যে স্বাধীনতা তিনি আমাদের জন্ত অর্জন করিয়া গিয়াছেন সেই স্বাধীনতাও নষ্ট হইবে।

অতীতে ভারতের সাধারণ ব্যক্তিরাজ্যে দুঃখকষ্ট সহ্য করিয়াছেন। তাহাদের ত্যাগও গুরুত্বপূর্ণ। তাহাদের দাবিও বিবেচনা করিতে হইবে। কেবল নৈতিক ও মানবতার দিক হইতে নহে, পরন্তু সাধারণ রাজনীতিক জ্ঞানের দিক হইতেও সাধারণ লোকের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন করা এবং তাহাকে উন্নত করিবার সর্ব প্রকার সুযোগ দেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। যে সমাজ-ব্যবস্থায় মানুষ এই সুযোগ লাভ করিতে পারে না তাহার পরিবর্তন করিতেই হইবে।

মহাত্মা জী চলিয়া গিয়াছেন কিন্তু তাঁহার প্রভাব আমাদের অনুপ্রাণিত করিতেছে। কর্তব্যভার এখন আমাদের উপর বর্তাইয়াছে। সাধ্যমত সেই কর্তব্য পালনে সচেষ্ট হওয়াই আমাদের সর্বপ্রথম করণীয়। যে সাম্প্রদায়িকতার জন্ত বর্তমান যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মানবকে জীবন বিসর্জন দিতে হইয়াছে সেই সাম্প্রদায়িকতারূপ বিষকে দূরীভূত করিবার জন্ত সজ্জবদ্ধভাবে আমাদের সংগ্রাম করিতে হইবে। কোন বিপথগামী ব্যক্তির প্রতি বিদ্বেষভাব লইয়া আমরা এই বিষকে দূর করিব না, পরন্তু আমরা ঐ ক্ষতিকর মনোবৃত্তির বিরুদ্ধেই সংগ্রাম করিব। গান্ধীজীকে হত্যা করিয়াই ঐ মনোবৃত্তির নিবৃত্তি ঘটে নাই। গান্ধীজীকে হত্যার পর আনন্দাভূতান আরও কলঙ্কের বিষয়। যাহারা উহা করিয়াছিল অথবা যাহারা ঐরূপ চিন্তা করে তাহাদের নিজেদের ভারতবাসী বলিয়া দাবি করার অধিকারও নষ্ট হইয়াছে।

আমি বলিয়াছি যে, এই সঙ্কট-সময়ে জাতির স্বার্থের জন্ত আমাদের সজ্জবদ্ধ হইতে হইবে এবং যতদূর সম্ভব একাত্মে বাগ-বিতণ্ডা এড়াইয়া প্রয়োজনীয় ব্যাপারে সকলে যাহাতে একমত

হইতে পারি তাহাতেই গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে। এই প্রয়োজনীয় কার্য সাহায্যের জন্ত আমি সংবাদপত্রসমূহের নিকট বিশেষ আবেদন জানাইতেছি। দেশে যাহাতে বিভেদ-মূলক মনোভাবের সৃষ্টি হইতে পারে তাহারা যেন ঐরূপ কোন সমালোচনা করিতে বিরত থাকেন। কংগ্রেসে আমার যে সকল সহকর্মী অনেক সময় ইতস্ততঃ করিয়া মহাত্মাজীর নেতৃত্ব অনুসরণ করিয়াছেন তাহাদের নিকটও আমি বিশেষ ভাবে আবেদন জানাইতেছি।

সংবাদপত্রে ও অগাধ মহলে সর্দার প্যাটেলের সহিত আমার মতানৈক্য সত্ত্বে যে আলোচনা হইয়াছে তাহাতে আমি ব্যথিত হইয়াছি। বহু সমস্ত্র সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে প্রকৃতিগত ও মানসিক পার্থক্য আছে। কিন্তু ভারতবাসীর জানা উচিত—আমাদের জাতীয় জীবনের প্রয়োজনীয় ব্যাপারে আমাদের মতের একা দেই মতানৈক্যকে স্তান করিয়া দিয়াছে এবং পঁচিশ বৎসর অথবা তাহারও অধিক কাল আমরা অনেক বড় বড় কাজ পরস্পর একযোগে করিয়াছি। আমরা পরস্পরের সুখদুঃখের অংশভাগী। জাতির এই সঙ্কটকালে আমাদের পক্ষে কি সঙ্গীর্ণচিন্ত হওয়া অথবা জাতির মঙ্গল ব্যতীত অগ্র কিছুর চিন্তা করা সম্ভব? সর্দার প্যাটেল জাতির জীবনব্যাপী যে সেবা করিয়াছেন কেবল তজ্জ্ঞ নহে পরন্তু তিনি ও আমি ভারত গবর্নমেন্টের কার্য পরিচালনের দায়িত্ব গ্রহণের পর হইতে তিনি যে কাজ করিয়াছেন তজ্জ্ঞ আমি তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতেছি। শান্তি ও সংগ্রামের সময় সর্দার প্যাটেল জাতির একজন সাহসী অধিনায়ক। অল্পে যখন কোন কাজ করিতে ইতস্ততঃ করে তখন তিনি নিঃশঙ্কচিত্তে সেই কাজ সমাধা করেন। তিনি একজন শক্তিশালী সংগঠক। বহু দিন হইতে আমি তাঁহার সংশ্রবে আছি, যতই দিন বাইতেছে ততই আমি তাঁহার গুণমুগ্ধ হইয়া পড়িতেছি এবং তাঁহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পাইতেছে।

সম্প্রতি একটি ঘরোয়া সভায় আমি যে বক্তৃতা করি সংবাদপত্রে তাহা প্রকাশিত হয়, তাহা অনুমোদিত, উহার ফলে লোকের মনে এই ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে যে, আমি পুরাতন বন্ধু ও সহকর্মী শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণের সমালোচনা করিয়া কঠোর ও তীব্র ভাষা ব্যবহার করিয়াছিলাম। ঐ সংবাদ ঠিক নহে। আমি বলিতে চাই যে, সমাজতন্ত্রী দল কর্তৃক অনুসৃত কয়েকটি নীতি আমি সমর্থন করি না এবং আমার বিশ্বাস এই যে, ঘটনার চাপে পড়িয়া অথবা ভাবাবেগের দ্বারা পরিচালিত হইয়া তাহারা ভ্রান্ত পথে চলিয়াছেন। শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণের কর্মশক্তি সত্ত্বে আমার মনে কোন সন্দেহ নাই। তাহাকে আমি বন্ধু বলিয়া মনে করি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, এমন সময় আসিবে যখন ভারতের ভাগ্য নির্ধারণের কার্যে তিনি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিবেন। ভূতাত্ত্বিক বশতঃ সমাজতন্ত্রী দল দীর্ঘ দিন হইতে নেতিমূলক নীতি

অনুসরণ করিতেছে এবং যেসব বিষয়ে সর্বপ্রায়ে বিবেচনা করা প্রয়োজন, সেই সকল বিষয়কে উৎসাহ করিয়া আসিতেছে।

জাতীয় জীবনের পরমতসহিষ্ণুতা ও সহযোগিতা করার জন্ত এবং ষাঁহারা ভারতীয়দের একটি বিরাট জাতিতে পরিণত করিতে চাহেন তাঁহাদের সম্মুখীন হইয়া কাজ করিবার আবেদন জানাইতেছি। সাম্প্রদায়িকতা এবং সঙ্ঘর্ষ প্রাদেশিকতা দূর করিবার জন্ত সচেষ্ট হইতে আমি সকলকে অনুরোধ জানাইতেছি। ভারতবর্ষকে নূতনরূপে গড়িয়া তুলিবার জন্ত শ্রমিক-মালিক বিরোধ বন্ধ করিতে সকলকে আবেদন জানাইতেছি। আমি এই সকল কাজ করিবার সক্ষম গ্রহণ করিয়াছি। আমি বিশ্বাস করি যে, এই জীবনেই আমরা মহাত্মাজীর স্বপ্ন কিয়ৎ পরিমাণে সার্থক করিতে পারিব। ইহা করিলেই তাঁহার স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হইবে এবং ইহাই তাঁহার স্মৃতিরক্ষার সর্বোত্তম পন্থা।

ভারতীয় মুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রবিধি

ভারতের রাষ্ট্রবিধি রচনা কমিটি গণপরিষদের সভাপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের নিকট স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রবিধির খসড়া দাখিল করিয়াছেন। খসড়াটির মোটামুটি বিষয় হইতেছে— ভারতবর্ষ একটি মুক্তরাষ্ট্র হইবে; আপেক্ষিকালীন অবস্থায় প্রয়োজের জন্ত রাষ্ট্রপতির (প্রেসিডেন্ট) হাতে কতকগুলি বিশেষ ক্ষমতা থাকিবে; প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার প্রবর্তিত হইবে এবং প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদসমূহের প্রতি এক লক্ষ্য এক জন করিয়া প্রতিনিধি থাকিবেন; মন্ত্রীমণ্ডল ব্যবস্থা-পরিষদের প্রতি দায়িত্বসম্পন্ন হইবেন। মুক্তরাষ্ট্রের সরকারের এবং প্রদেশসমূহের হাতে কোন্ কোন্ বিষয় থাকিবে এবং কোন্ কোন্ বিষয়ে উভয়েরই ক্ষমতা থাকিবে তাহা পৃথক পৃথক ভাবে বিবৃত করা হইয়াছে। সংখ্যালঘুদের দশ বৎসরের জন্ত পরিষদে আসন সংরক্ষণের সুযোগ দেওয়া হইয়াছে, তার পর উহা উঠিয়া যাইবে। বণিক প্রতিষ্ঠান, জমিদার প্রভৃতির স্বতন্ত্র নির্বাচন তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। রাষ্ট্রবিধি রচনার জন্ত গণপরিষদের যে কমিটি গঠিত হইয়াছিল নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ তাহার সদস্য ছিলেন : ডাঃ আশ্বদকর (চেন্নায়রম্যান), ত্রিগোপালস্বামী আয়েঙ্গার, আল্লাদী কৃষ্ণস্বামী আয়ার, কে এম মুন্সী, এন মাধব রাও, ডি পি খৈতান ও সৈয়দ মহম্মদ সাহুজা।

খসড়ার প্রথম অংশে ভারতীয় মুক্তরাষ্ট্রের এলাকা সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। উহাতে বলা হইয়াছে যে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এবং অন্ত কোন অঞ্চল অধিকৃত হইলে তাহা ভারতীয় মুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইবে। নূতন রাষ্ট্র গঠন ও নূতন রাষ্ট্র ভারতীয় মুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করিবার বিধানও খসড়ায় আছে।

ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের আলোচনা করিয়া উহার শেষে নূতন প্রদেশসমূহের একটি তালিকা প্রস্তুত করা

হইয়াছে। উহাতে অন্ধ্রের নাম নাই। কারণ-স্বরূপ বলা হইয়াছে যে অন্ধ্রকে নূতন প্রদেশরূপে গঠন করিবার পূর্বের কতকগুলি প্রাথমিক ব্যবস্থা অবলম্বন করা আবশ্যিক। কেবল তালিকায় নামোল্লেখ করিয়া লাভ নাই। এ বিষয়ে এই মুক্তি দেওয়া হইয়াছে যে, ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইন অনুযায়ী উড়িষ্যা ও সিন্ধুর বেলায়ও ঠিক এইরূপ ব্যবস্থাই করা হইয়াছিল। তবে কমিটি একটি সীমানা-কমিশন গঠনের সুপারিশ করিয়া বলিয়াছেন যে এই কমিশনে কেবল অন্ধ্রের ব্যাপারেই নহে, ভাষাগত ভিত্তিতে অস্বাভাবিক প্রদেশ সম্পর্কেও প্রয়োজনীয় বিষয়ে অনুসন্ধান করা হইবে। প্রদেশ গঠনের এইরূপ ব্যবস্থায় আমরা সন্তুষ্ট হইতে পারিলাম না। বর্তমান প্রদেশগুলি ইংরেজের দ্বারা তাহাদেরই সুবিধাজ্ঞানে গঠিত হইয়াছিল এবং তাহার নিজের প্রয়োজনানুসারে প্রাদেশিক সীমা অনেক বার রদবদল করিয়াছে। স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রবিধি রচনার সময় ভারতের মানচিত্র হইতে ইংরেজের দেওয়া লাল ও হলদে রং মুছিয়া কেলিয়া ভাষার ভিত্তিতে সম্পূর্ণ নূতন করিয়া প্রদেশ গঠনের ব্যবস্থা হওয়া উচিত ছিল। কংগ্রেসের গঠনভঙ্গ্রে ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন করা হইয়াছে; কাজেই কাজও এ বিষয়ে অনেকটা অগ্রসর হইয়া আছে। বহু দেশীয় রাজ্য ইতিমধ্যেই পার্শ্ববর্তী প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে; সুতরাং তাহাদের স্বাভাবিক হ্রদে রং এখন আর মানিয়া চলিবার প্রয়োজন নাই। খসড়ায় প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার এবং নাগরিকের মৌলিক অধিকার যেখানে স্বীকৃত হইয়াছে সে সকল স্থানে রাজাদের দিক টানিবার প্রয়োজন শেষ হইয়াছে। ইংরেজ আমলে প্রতিক্রিয়াশীলতার স্তম্ভস্বরূপ দেশীয় রাজ্যের রাজাদের এখন পেশন দিয়া রাজ্যগুলিকে সমগ্রভাবে এবং প্রদেশের সহিত সম্পূর্ণ সমান স্তরে মুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করা হইলে প্রজার অধিকারে পূর্ণ স্বীকৃতি হইত। কিন্তু তাহা করা হয় নাই, দেশীয় রাজ্যগুলিকে খসড়ায় সাধারণ প্রদেশ হইতে ভিন্ন করিয়া ধরা হইয়াছে। চীফ কমিশনারের কতকগুলি ছোট প্রদেশ বজায় রাখিবারও কোন আবশ্যিকতা আর আছে বলিয়া আমরা মনে করিতে পারিতেছি না। প্রদেশগুলিকে ষ্টেট আখ্যা দেওয়া হইয়াছে, 'ভারত' উহার বাংলা করিয়াছেন 'অঙ্গরাষ্ট্র'।

রাষ্ট্রবিধির প্রথম অংশে বলা হইয়াছে যে ভারত একটি মুক্ত-রাষ্ট্র হইবে। কমিটি 'ফেডারেশন'-এর পরিবর্তে 'ইউনিয়ন' শব্দ ব্যবহারের পক্ষপাতী। শব্দের প্রকারভেদে কিছু আসে যায় না বটে, তবু কমিটি মনে করেন যে ভারত ইউনিয়ন প্রকৃতপক্ষে কতকগুলি অঙ্গরাষ্ট্রের সমষ্টি হইলেও 'ইউনিয়ন' শব্দ ব্যবহারে একতার ভাব বর্ধিত হইতে পারে।

মৌলিক অধিকারের বিশদ বিবরণ খসড়ায় দেওয়া হইয়াছে। শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্ম ও সম্পত্তির মৌলিক অধিকার

স্বীকৃত হইয়াছে। মানুষে মানুষে ধর্ম বা বর্ণগত কোন ভেদ ভারতে থাকিবে না। অস্পৃশ্যতা দণ্ডনীয় অপরাধরূপে গণ্য হইবে। রাজ্যের স্বাধীনতা, সম্বর্গঠন ও সভা করার স্বাধীনতা, দেশের সর্বত্র অবাধ বিচরণের স্বাধীনতা, সম্পত্তি অর্জন রক্ষা ও দান বিক্রয়ের স্বাধীনতা এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে রত হইবার স্বাধীনতা মৌলিক অধিকাররূপে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। এ বিষয়ে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য এই কথা যে, মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হইলে সুপ্রীম কোর্টে নালিশ করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। গণতান্ত্রিক সমাজে ইহা খুব বড় অধিকার।

ভারত রাষ্ট্রের প্রধান হইবেন ইহার প্রেসিডেন্ট। যাবতীয় শাসনক্ষমতাই প্রেসিডেন্টের থাকিবে এবং তিনি দায়িত্বশীল মন্ত্রীদের পরামর্শানুযায়ী এই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন। পার্লামেন্টের উভয় পরিষদের সদস্য এবং আইন সভার সদস্যগণ লইয়া গঠিত ইলেকটোরাল কলেজের দ্বারা প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হইবেন। প্রেসিডেন্টের কার্যকাল হইবে পাঁচ বৎসর এবং তিনি কেবলমাত্র একবারের জ্ঞত পুনর্নির্বাচিত হইতে পারিবেন। প্রেসিডেন্টের বয়স কমপক্ষে ৩৫ বৎসর হইবে এবং তাহার নিম্ন পরিষদের সদস্য হিসাবেও নির্বাচন-প্রার্থী হইবার যোগ্যতা থাকিতে হইবে। রাষ্ট্রবিধি-বিরোধী কার্য করিলে প্রেসিডেন্টকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া বিচার করা চলিবে। খসড়া রাষ্ট্রবিধিতে একজন ভাইস-প্রেসিডেন্টের পদও রাখা হইয়াছে। তিনি পদাধিকার বলে রাষ্ট্রপরিষদের চেয়ারম্যান হইবেন। উভয় পরিষদের সদস্যদের দ্বারা তিনি নির্বাচিত হইবেন। সংখ্যানুপাতিক একক ভোটের দ্বারা ইহার নির্বাচন হইবে। তাঁহার কার্যকাল হইবে পাঁচ বৎসর। প্রেসিডেন্টের পদ শূন্য হইলে তৎস্থলে ভাইস-প্রেসিডেন্টই প্রেসিডেন্ট হিসাবে কাজ করিবেন। ভাইস-প্রেসিডেন্ট ও প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের বাপারে যাবতীয় গোলযোগের নিষ্পত্তি করিবে সুপ্রীম কোর্ট। এই আদালতের রায়কেই চূড়ান্ত বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে।

খসড়ার মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রিমণ্ডলীর কথাও উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাদের কাজ হইবে প্রেসিডেন্টকে তাহার যাবতীয় কার্যে সাহায্য করা। মন্ত্রিমণ্ডলী মুক্তভাবে জনগণের নিকট দায়ী থাকিবেন। ভারত-সরকারের যাবতীয় শাসনতান্ত্রিক কার্য প্রেসিডেন্টের মারফৎ হইতেছে বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে। প্রেসিডেন্টের প্রয়ে জনানুযায়ী প্রধান মন্ত্রী ইউনিয়নের যাবতীয় কার্যকলাপ ও নূতন বিধান রচনা সম্পর্কে প্রেসিডেন্টকে সংবাদ ও তথ্য সরবরাহ করিবেন।

প্রেসিডেন্ট, রাষ্ট্রসভা ও লোকসভা লইয়া ইউনিয়ন পার্লামেন্ট গঠিত হইবে। রাষ্ট্রসভার সদস্যসংখ্যা হইবে ২৫০। তন্মধ্যে ১৫ জনকে প্রেসিডেন্ট দেশের কলা, সাহিত্য,

বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে কৃতী ব্যক্তিদের মধ্য হইতে মনোনয়ন করিতে পারিবেন। অপর সকলে অঙ্গরাষ্ট্রসমূহের দ্বারা নির্বাচিত হইবেন। লোকসভায় ৫০০ জন পর্যন্ত প্রতিনিধি থাকিবেন। প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারে পাঁচ লক্ষ হইতে সাড়ে সাত লক্ষ লোকের জ্ঞত একজন করিয়া প্রতিনিধি লোকসভায় নির্বাচিত হইবেন। লোকসভা প্রতি পাঁচ বৎসর পর ভাদিয়া যাইবে এবং নূতন নির্বাচনের দ্বারা নূতন করিয়া গঠিত হইবে। রাষ্ট্রসভা এই ভাবে ভাদিবে না; তবে দুই বৎসর পর এক-তৃতীয়াংশ করিয়া সদস্যপদ ত্যাগ করিবেন। কাজেই আর্থিক বিল সম্বন্ধে বর্তমান পদ্ধতি উত্তীর্ণা যাইবে এবং তৎস্থলে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে অনুস্থত পদ্ধতি প্রবর্তিত হইবে।

একজন প্রধান বিচারপতি এবং সাত জন বিচারপতি লইয়া ভারতের সুপ্রীমকোর্ট গঠিত হইবে। প্রয়োজনবোধে প্রধান বিচারপতি যে কোন হাইকোর্টের যে কোন বিচারপতিকে সুপ্রীমকোর্টের কোন মামলার বিচারের জ্ঞত ডাকিতে পারিবেন। কানাডায় এই প্রথা আছে। ব্রিটেন ও আমেরিকার দ্বায় সুপ্রীমকোর্টে মামলার বিচারে হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিদের আহ্বান করিবার ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। সুপ্রীমকোর্ট বা হাইকোর্টে বিচারপতিরূপে কাজ করিবার পর কেহ আর আদালতে ওকালতি করিতে পারিবেন না। সুপ্রীমকোর্ট মূল মামলা ও আপীল-শুনিতে এবং ভারত-সরকারকে পরামর্শও দিতে পারিবেন। কমিটি সুপ্রীমকোর্ট সম্পর্কে একটি বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। আমেরিকার সুপ্রীমকোর্টের বিচারপতিগণ যে কোন মামলার বিচারে উপস্থিত থাকিতে পারেন অর্থাৎ বিচারপতিগণ ইচ্ছা করিলে প্রত্যেক মামলা সকল বিচারপতি লইয়া গঠিত বেকে হইতে পারে। সেখানে ডিভিসন বেক-এর প্রথা নাই। কমিটি প্রস্তাব করিয়াছেন যে আমাদের দেশে অন্ততঃ দুই প্রকার মামলায় এই পদ্ধতি অনুসরণ করা উচিত। যে সকল মামলায় রাষ্ট্রবিধির ব্যাখ্যা-সংক্রান্ত প্রশ্ন উঠিবে সেইগুলির বিচারকালে এবং প্রেসিডেন্ট কোন বিষয়ে সুপ্রীমকোর্টের পরামর্শ চাহিলে তাহার বিবেচনা কালে সকল বিচারপতি উপস্থিত থাকিবার বিধান আমাদের দেশে গ্রহণ করা উচিত। কমিটির সুপারিশ সর্বথা সমর্থনযোগ্য।

প্রদেশ বা অঙ্গরাষ্ট্রের শাসনকার্য পরিচালনার দায়িত্ব একজন গবর্নরের উপর তত্ত্ব থাকিবে। গবর্নর নির্বাচনের জ্ঞত দুইটি প্রস্তাব খসড়ায় করা হইয়াছে। গণপরিষদে এই অর্থে একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল যে প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদ নির্বাচনে যাহাদের ভোটাধিকার থাকিবে তাহাদের ভোটে সাধারণ নির্বাচনের দ্বারা গবর্নর নির্বাচিত হইবেন। এ বিষয়ে কমিটির মত এই যে, গবর্নর এবং প্রধান মন্ত্রী উভয়েই জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন কিন্তু ব্যবস্থা-পরিষদের নিকট দায়ী থাকিবেন কেবল প্রধান মন্ত্রী। এই ব্যবস্থায়

উভয়ের মধ্যে ঠোকাঠুকি হইতে পারে। সুতরাং গবর্ণর নির্বাচনের ব্যবস্থা প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের ব্যবস্থা অপেক্ষা ভিন্ন হওয়া উচিত। তাহাদের প্রস্তাব এই যে প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদ কর্তৃক গবর্ণরপদ-প্রার্থীদের মধ্যে হইতে চারি জনকে নির্বাচন করা হউক এবং প্রেসিডেন্টকে ঐ চারি জনের মধ্যে হইতে একজনকে গবর্ণর পদে নিযুক্ত করিবার অধিকার দেওয়া হউক। গবর্ণরেরা প্রদেশের অধিবাসী না হইলেও চলিবে।

প্রদেশে বা অঙ্গরাজ্যে একজন প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি করিয়া মন্ত্রীমণ্ডলী থাকিবে। গবর্ণর তাহাদের পরামর্শানুযায়ী কাজ করিবেন কিন্তু কয়েকটি বিষয়ে তাহারা নিজ বিবেচনানুযায়ী কাজ করিবার স্বাধীনতা থাকিবে, যথা—ব্যবস্থা-পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করা ও ভাঙ্গিয়া দেওয়া এবং প্রাদেশিক পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান এবং চীফ অডিটর নিয়োগ। প্রদেশের শান্তির কোন মারাত্মক বিঘ্ন উপস্থিত হইলে প্রয়োজনবোধে গবর্ণর মন্ত্রীমণ্ডলী ভাঙ্গিয়া দিয়া স্বহস্তে শাসনভার গ্রহণ করিতে পারিবেন কিন্তু দুই সপ্তাহের অধিক কালের জন্ত তিনি এই ক্ষমতা খাটাইতে পারিবেন না এবং ঐরূপ করিবামাত্র প্রেসিডেন্টকে সকল ব্যাপার জানাইবেন। প্রাদেশিক মন্ত্রীমণ্ডলী এইভাবে ভাঙ্গিয়া গেলে কেন্দ্রীয় সরকার প্রদেশের শাসনভার গ্রহণ করিতে পারিবেন।

গবর্ণর এবং কয়েকটি প্রদেশে দুইটি ও অধিকাংশ প্রদেশে একটি আইনসভা লইয়া প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদ গঠিত হইবে। প্রাপ্তবয়স্কের ভোটে প্রতি এক লক্ষে একজন প্রতিনিধি হিসাবে প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্যসংখ্যা স্থির হইবে, তবে কোন সময়েই ঐ সংখ্যা তিন শতের বেশী বা ষাটের কম হইতে পারিবে না। আসামের কয়েকটি স্বায়ত্তশাসিত জেলায় প্রতিনিধি নির্বাচন সম্পর্কে ভিন্ন ব্যবস্থা হইবে। প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভা সম্বন্ধে এই বিধান হইয়াছে যে উহার সদস্যসংখ্যা ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্যসংখ্যার এক-চতুর্থাংশের বেশী হইবে না। তন্মধ্যে অর্ধেক ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্যেরা নির্বাচন করিবেন এবং অর্ধেক গবর্ণর কর্তৃক মনোনীত হইবেন। ব্যবস্থা-পরিষদের আয়ুষ্কাল হইবে পাঁচ বৎসর কিন্তু ব্যবস্থাপক সভা কখনও ভাঙ্গিবে না, প্রতি তিন বৎসর অন্তর উহার এক-তৃতীয়াংশ সদস্য অবসর গ্রহণ করিবেন।

প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদের অধিবেশন বন্ধ থাকাকালে গবর্ণর মন্ত্রীদের সহিত পরামর্শক্রমে অডিনাল জারী করিতে পারিবেন। পরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হওয়ার ছয় সপ্তাহ পর অডিনালের মেয়াদ শেষ হইয়া যাইবে।

১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইনে অনেকগুলি এলাকাকে শাসনসংস্কার বহির্ভূত অঞ্চলরূপে আলাদা করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদে প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার তাহাদের ছিল না এবং পরিষদেরও তাহাদের উপর কোন ক্ষমতা ছিল না; গবর্ণর স্বয়ং মন্ত্রীদের সহিত পরামর্শ

না করিয়া ঐ সব এলাকার শাসনকার্য পরিচালনা করিতেন। উহার ফল হইয়াছে এই যে, গত দশ বৎসরের এই ব্যবস্থায় সরকারের চেষ্টায় স্থানীয় অধিবাসীদের কোন দিক দিয়া উন্নতি হয় নাই কিন্তু উহাদের মধ্যে কংগ্রেসের প্রভাব ঠেকাইয়া রাখা হইয়াছে। মুসলমানদের ছায় আদিম অধিবাসী ও পার্বত্য জাতিদের লইয়া আর একটি আলাদা শ্রেণীস্বার্থ গড়িয়া তোলার জন্ত এই ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছিল এবং উহার ফল সবেমাত্র ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে। আশ্চর্যের বিষয়, খসড়ায় এই ব্যবস্থা বহাল রাখা হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারের আইন প্রণয়নের অধিকারের ক্ষেত্র গণপরিষদ যে ভাবে নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন খসড়ায় তাহাই রাখা হইয়াছে। তবে কমিটি এই কথা বলিতেছেন যে প্রাদেশিক তালিকাভুক্ত কোন বিষয় যদি এমন গুরুত্বসম্পন্ন হইয়া উঠে যাহাতে ভারতীয় স্বার্থ উহার উপর নির্ভরশীল বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে তবে তাহা আর প্রাদেশিক তালিকাভুক্ত না থাকিয়া কেন্দ্রীয় তালিকার অন্তর্ভুক্ত হইবে। তবে এইরূপ হর্তক্ষেপের পূর্বে কেন্দ্রীয় সরকারকে রাষ্ট্রসভার দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের মত লইতে হইবে। কেন্দ্রীয় পার্লামেন্ট এবং প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদ নির্বাচন যাহাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয় তাহার জন্ত ইলেকশন কমিশন নিয়োগের ব্যবস্থা হইয়াছে। কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টের জন্ত প্রেসিডেন্ট এবং প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদের জন্ত গবর্ণর এই কমিশনের সদস্য মনোনীত করিবেন। নির্বাচন কেন্দ্রের সীমা নির্ধারণের ভার পার্লামেন্টের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

সংখ্যালঘুদের জন্ত কয়েকটি বিশেষ সুবিধা দেওয়া হইয়াছে। কেন্দ্রীয় লোকসভায় এবং প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদে দশ বৎসরের জন্ত মুসলমান, তপশীলী হিন্দু এবং মাদ্রাজ ও বোয়াই-এ ঐষ্টানদের জন্ত আসন সংরক্ষিত থাকিবে। শিক্ষা ও চাকুরিক্ষেত্রে এংলো-ইণ্ডিয়ানরা যেসব সুবিধা পাইয়া আসিয়াছে দশ বৎসরের জন্ত সেগুলিও বজায় রাখা হইয়াছে। অনগ্রসর জাতিদের অবস্থা অগ্রসরমানের জন্ত ইউনিয়ন এবং প্রদেশ উভয়েই একজন করিয়া স্পেশাল অফিসার থাকিবেন। তপশীলী এলাকা ও জাতিসমূহের উন্নতি কতটা হইতেছে তাহা রিপোর্ট করিবার জন্ত একটি কমিশন গঠিত হইবে।

রাষ্ট্রবিধির খসড়ায় যে রিপোর্ট সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা অবলম্বন করিয়া এই পর্য্যন্ত লিখিত হইল। পূর্ণ রিপোর্ট হস্তগত হইলে বিশদ আলোচনা সম্ভব হইবে।

হায়দরাবাদী ব্যবস্থা

নিজাম বাহাদুর নাকি ইতিমধ্যেই এক বৎসর বাপি চুক্তির দায়ে অসুবিধা বোধ করিতেছেন। গত ২৯শে নবেম্বর এই চুক্তি-পত্র স্বাক্ষরিত হয়। স্বাক্ষরকারী ভারত-রাষ্ট্রের পক্ষে লর্ড মাউন্টব্যাটেন, হায়দরাবাদের পক্ষে নিজাম

মীর ওসমান আলী খাঁ। দুই মাস যাইতে না যাইতেই যে অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে এই সংবাদে আমবা আশ্চর্য্যাবিত হই নাই। কারণ নিজাম বাহাদুর যে খেলা খেলিতেছেন পাকিস্তানি পরামর্শদাতাগণের প্ররোচনায়, সেই ইতিহাস বাঁহারা জানেন, তাঁহারা একদা একটা পরিণতির কথাই ভাবিতেছিলেন। নিজাম বাহাদুরের পূর্বপুরুষ—এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বিখ্যাত খাজক মীর কমরুদ্দিন খাঁ—যে সময় মুঘল রাজ্যের ধ্বংসে সাহায্য করেন, তখন হইতে হায়দরাবাদ রাজ্য দাক্ষিণাত্যের জীবনে একটা কাঁটার মতন যন্ত্রণাদায়ক হইয়া আছে। ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার পর হইতে উত্তর-ভারতের সমস্ত মুসলমান ভাগ্যাবেশী এই রাজ্যে আশ্রয় পাইয়াছে এবং এই রাজ্যকে আত্মসমর্পণ মুসলিম স্বার্থের কেন্দ্র করিয়া তুলিয়াছে। এই রাজ্যের জনসংখ্যার মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা শতকরা ১৩ জনের বেশী হইবে না। কিন্তু এমনি হায়দরাবাদী বিধান যে রাষ্ট্রীয় কার্যে এই নগর জনসংখ্যার প্রাধান্য অটুট হইয়া আছে। একটা হিসাবে দেখিতে পাইলাম যে রাজ্যের নানা দফতরে মন্ত্রিবর্গের সংখ্যা ১৯ জন, ইহাদের শতকরা ৮১ জন মুসলমান; নানা দফতরে সেক্রেটারীর সংখ্যা ১৭, ইহাদের শতকরা ৮৩ জন মুসলমান; ম্যাজিস্ট্রেট, মুনসেফি পদে মুসলমানের হার ৮০ জন; পুলিশে শতকরা ৯৫ জন মুসলমান; সৈন্য বিভাগাদিতে মুসলমানের হার শতকরা ৯৫ জন। এই হিসাবেই হায়দরাবাদ রাজ্যের প্রকৃতি ও পাকিস্তানি মতিগতির হৃদিশ পাওয়া যায়।

নারী-উদ্ধারে বিপত্তি

অপহৃত নারীদের উদ্ধারের জন্ত ভারতে এবং পাকিস্তানে চেষ্টা হইতেছে। ভারতবর্ষ হইতে যত নারী উদ্ধার করিয়া পাকিস্তানকে ফেরত দেওয়া হইয়াছে পাকিস্তান হইতে তাহার তুলনায় খুব কম নারী উদ্ধার হইয়াছে। অথচ ভারত হইতে কমপক্ষে পঞ্চাশ হাজার নারী অপহরণ করিয়া পাকিস্তানে লইয়া যাওয়া হইয়াছে ইহা এখন সর্বজনস্বীকৃত। নারী-উদ্ধারের জন্ত একটি উদ্ধার সপ্তাহ ঘোষণা করা হইয়াছিল এবং পাকিস্তানের বড় বড় নায়কেরা বন্ধুতাও অনেক করিয়াছেন। কিন্তু ফল এযাবৎ যাহা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা আশাশ্রিত নহে। যত দূর বুঝা যাইতেছে তাহাতে ইহাই মনে হয় যে পাকিস্তানের মুসলিম সমাজপতিগণ তাঁহাদের কর্তব্য পালন করিতে অগ্রসর হন নাই। এ বিষয়ে পূর্ববঙ্গের একটি ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উহা হইতে হিন্দু-নারী উদ্ধার সম্বন্ধে পাকিস্তান-কর্তৃপক্ষের মনোভাব অতি স্পষ্টভাবে জানা যাইবে। ঘটনাটি দৈনিক ‘ভারত’-এর সম্পাদকীয় রূপে ১১ই ফাল্গুন তারিখে প্রকাশিত হইয়াছে। উহা এইরূপ :

নারী উদ্ধারের একটি মহান প্রয়াসে নিযুক্ত থাকিয়া ফরিদপুরের জননায়ক (রাজনৈতিক নায়ক নহে, সমাজ-সেবক) শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত বসু মহাশয়কে যে নিগ্রহ ভোগ

করিতে হইতেছে, তাহা হইতে মনে হয় নারী-উদ্ধারে সহযোগিতা ও সহায়তা করিবার যে প্রতিশ্রুতি পাকিস্তানের নায়কেরা এবং রাষ্ট্রপরিচালকরা দিয়াছেন, তাহা শুধু কথা কথায়, উহার পিছনে কিছুমাত্র আন্তরিকতা নাই। শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত বসু মহাশয় যে জালে জড়াইয়া পড়িয়াছেন তাহার বিবরণ এই :

গত বৎসর মে মাসে দুইটি নমঃশুদ্ধ ধরামী এক সম্প্রদায় শালী মুসলমানের বাড়ীতে কাজ করিবার সময় একটি অল্প-বয়স্ক মহিলা তাহাদিগকে বলে যে সে হিন্দু। মুসলমানরা তাহাকে মেদিনীপুর হইতে চুরি করিয়া আনিয়াছে। ধরামী দুইটি এই সংবাদ চন্দ্রকান্ত বাবুর গোচর করে। চন্দ্রকান্ত বাবু মুসলমানটিকে ডাকিয়া পাঠাইয়া সংবাদটি সত্য কিনা জানিতে চাহেন। বলা বাহুল্য, মুসলমানটি বলে, সংবাদটি সর্ব্বৈব মিথ্যা, এবং সে সেই রাষ্ট্রেই অপহৃত নারীটিকে পার্শ্ববর্তী গ্রামে আর একটি মুসলমানের আশ্রয়ে রাখিয়া আসে। কিন্তু কথটা জ্ঞানাজ্ঞানি হইয়া পড়ায় পরদিন রহু হিন্দু এবং রহু মুসলমান আশ্রয়দাতা ঐ মুসলমানের বাড়ীতে উপস্থিত হয়। একটা দাঙ্গার উপক্রম ঘটে। তখন উভয় পক্ষই চন্দ্রকান্ত বাবুকে ডাকিয়া পাঠাইলে তিনি মেয়েটিকে ফিরাইয়া দিতে বলেন। মেয়েটিকে জেনানা হইতে বাহির করিয়া আনিয়া চন্দ্রকান্ত বাবুর হাতে সমর্পণ করা হয়।

এই পর্য্যন্ত প্রশংসনীয়ভাবে কাজ চলে। উহা চলিবার কারণ ঐ যে, চন্দ্রকান্ত বাবু হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে সকলেরই কল্যাণকর কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন বলিয়াই ঐ অঞ্চলের হিন্দু-মুসলমান তাঁহার সমুখে কোনরূপ অস্বীয় কাজ করিতে চাহে না। অপহৃত নারীটিকে উদ্ধার করিয়া চন্দ্রকান্ত বাবু নিকটবর্তী গ্রামসমূহ হইতে ৯ জন হিন্দু ও ৯ জন মুসলমান মনোনয়ন করিয়া একটি কমিটি গঠন করেন এবং এই ঘটনা লইয়া যাহাতে কোন প্রকার সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার সৃষ্টি না হয় তাহাই দেখিবার ভার কমিটির উপর অর্পণ করিবার জন্ত একটি জনসভার আয়োজন করেন। উভয় সম্প্রদায়ের জনগণের চেষ্টায় ঘটনাটিকে সম্তোষজনক পরিণতিতে টানিয়া লওয়া সম্ভব হইত, কিন্তু পাকিস্তানী পুলিশ ঘটনাটিকে ধোলাইয়া তুলিল মেয়েটির নামে তল্লাসী পরোয়ানা বাহির করিয়া। শুধু তাহাই নহে, যে মুসলমানটির বাড়ীতে মেয়েটিকে প্রথমে পাওয়া যায় পুলিশ তাহাকে দিয়া এহাহার লিখাইয়া লইল যে, চন্দ্রকান্ত বাবু দুই সহস্র নমঃশুদ্ধ লইয়া তাহার বাড়ী ঘেরাও করিয়া সাত-আট জন সশস্ত্র লোকসহ তাহার বাড়ীতে বলপূর্ব্বক প্রবেশ করিয়া তাহার বৈধ-বিবাহিত পত্নীকে জোর করিয়া হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছেন।

তল্লাসী পরোয়ানা বাহির করিয়াও পুলিশ মেয়েটির সন্ধান পায় না। ওদিকে শান্তিরক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্ত যে সভা আহূত হইয়াছিল দারোগা এবং সাম্প্রদায়িক বিরোধে উৎসাহী

মুসলমানরা সেই সভার অধিবেশনে উপস্থিত হইয়া বলে, মেয়েটিকে সভায় হাজির করা হোক। তাহাকে নিজ মুখে তাহার জীবন-কৃতান্ত প্রকাশ করিতে হইবে। মেয়েটিকে সভায় হাজির করা হয় না। দারোগা তখন বলে :

আজ যদি হিন্দুরা চৌখ রাঙাইয়া মুসলমানের বাড়ী হইতে উপভোগ্য হিন্দু নারীকে উদ্ধার করিতে সাহস পায়, তাহা হইলে দু'দিন বাদে তাহারা যে মুসলমান মেয়েদের ধরিয়া টান দিবে না, তাহাতে বিশ্বাস কি? অতএব পাকিস্তানে হিন্দুদের এই আশঙ্কা সজ্জ করা হইবে না।

পাকিস্তানী পুলিশ তাই চন্দ্রকান্ত বাবুর নামে অপরের বিবাহিতা স্ত্রী বলপূর্বক হরণ করিবার অভিযোগে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির করিল। চন্দ্রকান্ত বাবু দেশত্যাগী হইলেন। অপহৃত মেয়েটির আত্মীয়রা ইহার মাঝে এক সময়ে মেয়েটিকে লইয়া যায়। পাকিস্তানী পুলিশ মেয়েটিকেও পাইল না, চন্দ্রকান্ত বাবুকেও পাইল না। তাহারা ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়া নমঃশুক্রদের উপর উপদ্রব শুরু করিল। এই উপদ্রবের বিবরণ শুনিয়া চন্দ্রকান্ত বাবু গ্রামে ফিরিয়া গেলেন। পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া হাফতে পুরিল। পনের দিন তিনি হাফতে রহিয়াছেন। জামিনে খালাস করিবার সকল প্রয়াস ব্যর্থ হইয়াছে।

পাকিস্তানী পুলিশ, পাকিস্তানী গবর্নমেন্ট যাহা করিয়াছেন, তাহাই সবিস্তারে বর্ণনা করিলাম। এই ঘটনাটি হইতেই বুঝা যায়, অপহৃত নারীর উদ্ধার সাধনের জন্ত পাকিস্তানের পক্ষ হইতে যে সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে তাহা একান্তই অন্তঃসারশূন্য উক্তি।

এরূপ একটি গুরুতর ঘটনা কেবল মাত্র 'ভারত'-এ প্রকাশিত হইল। আর কেহ ইহা লইয়া আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইলেন না কেন আমরা তাহা বুঝিতে পারিলাম না। 'ভারত'-এর ছায়া আমরাও প্রশ্ন করি,—বাংলা গবর্নমেন্ট ও ইউনিয়ন গবর্নমেন্টের এ সম্বন্ধে কোন কর্তব্য আছে কিনা? বাংলা গবর্নমেন্ট এবং ইউনিয়ন গবর্নমেন্ট উভয়েরই চন্দ্রকান্ত বাবুর ঘটনা লইয়া পাকিস্তান গবর্নমেন্টের সহিত আলোচনার দায়িত্ব রহিয়াছে। যদি তাহারা উহা না করেন এবং মিথ্যা অভিযোগের দায় হইতে চন্দ্রকান্ত বাবুকে মুক্ত করিতে না পারেন তাহা হইলে অপহৃত নারী-উদ্ধারের প্রয়াস পদে পদে ব্যাহত হইবে। ভারতবর্ষে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার কথা খুব ঘটা করিয়া শোনানো হয় এবং রামধন জাতীয় সঙ্গীত করিবার কথাও কেহ কেহ বলিতেছেন। কিন্তু তাহারা ভুলিয়া গিয়াছেন বন্দিনী সীতার উদ্ধার না হইলে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা হয় না এবং সীতা উদ্ধারের জন্ত রাম বলপ্রয়োগে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন নাই। পাকিস্তানে বন্দিনী পকাশ হাজার সীতার উদ্ধারের এবং সেই মহৎ কার্যে অগ্রসর হইয়া কেহ বিপদে পড়িলে তাহাকে রক্ষা করিবার শক্তি যে গবর্নমেন্টের নাই, রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা তাহার কার্য্য নহে।

বাংলার বাজেট

পশ্চিমবঙ্গের বাজেট প্রিন্সিপাল সেক্রেটারী ব্যবস্থা-পরিষদে পেশ করিয়াছেন। বাজেটে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট হইতে ১৯৪৮ সালের ৩১শে মার্চ এই সাড়ে সাত মাসের এবং ১৯৪৮-৪৯ সালের হিসাব আলাদা ভাবে দেওয়া হইয়াছে। বাজেট বক্তৃতার প্রথমে অর্থসচিব বঙ্গবিভাগের ফলে পশ্চিমবঙ্গের আয়তন এবং উহার আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। বাংলা দেশের শিল্পাঞ্চলগুলি সবই পশ্চিমবঙ্গে পড়িয়াছে এবং বড় বড় শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা ৬ লক্ষের অধিক। ভারতে যত কারখানায় শ্রমিক কাজ করে তার শতকরা প্রায় ৩০ ভাগ একমাত্র পশ্চিমবঙ্গে পড়িয়াছে। কলিকাতায় ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের লোক আছে এবং জনসংখ্যা এখন প্রায় পঞ্চাশ লাখ। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গে শহরবাসীর সংখ্যা মোট জনসংখ্যার অল্পপাতে ভারতবর্ষের সকল প্রদেশ অপেক্ষা বেশী হইয়া পড়িয়াছে। দামোদর পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত হইলে উহা আরও বাড়িবে।

চলতি বৎসরের সাড়ে সাত মাসে রাজস্ব আদায় হইবে প্রায় ১৭ কোটি টাকা এবং সাধারণ রাজস্বখাতে ব্যয় হইবে প্রায় সাড়ে ১৪ কোটি টাকা। প্রাদেশিক উন্নতির জন্ত কেন্দ্রীয় তহবিল হইতে দুই কোটি টাকা পাওয়া যাইবে। বৎসরান্তে উদ্ধৃত থাকিবে প্রায় আড়াই কোটি টাকা। আয়ের দিকে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় পাট শুল্ক ও আয়কর বাবদ কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে যে টাকা পাওয়ার কথা তাহার পরিমাণ হ্রাস। নিম্নায়র এওয়ার্ড অনুসারে বাংলাদেশ পাট রপ্তানী শুল্কের শতকরা সাড়ে বাষটি ভাগ এবং আয়করের যে অংশ প্রদেশসমূহকে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয় তার শতকরা ২০ ভাগ পাইত। বঙ্গ বিভাগের পর পশ্চিমবঙ্গের ভাগে কত পড়িবে তাহা এখনও পাকাপাকি স্থির হয় নাই, তবে যতটা দেওয়া হইয়াছে তাহা অত্যয় রকমে কম। আগে অবিভক্ত বাংলা এই দুইটি জিনিষই রপ্তানী করিত, সুতরাং তখন উহাদিগকে এক পর্যায়ভুক্ত করিলে ক্ষতি ছিল না। কিন্তু এখন পূর্ববঙ্গ রপ্তানী করে কাঁচা পাট এবং পশ্চিমবঙ্গ চট ও ধলিয়া। অতএব এবার কাঁচা পাট ও পাটের তৈরি জিনিষে তারতম্য করা উচিত এবং তাহা করিলে পশ্চিমবঙ্গের হিসাবে অন্ততঃ এক কোটি টাকা পাওনা হয়। অথচ পশ্চিমবঙ্গ পাইয়াছে উহার অর্ধেক। আয়করের ভাগও পশ্চিমবাংলাকে অত্যয় ভাবে কমাইয়া দিয়া শতকরা ২০ স্থলে শতকরা ১২ করা হইয়াছে। অবিভক্ত বাংলায় যে আয়কর আদায় হইত তার অধিকাংশ উঠিত কলিকাতা হইতে; পূর্ববঙ্গে বা পশ্চিমবঙ্গের মফঃস্বলে খুব কমই আদায় হইত। সুতরাং পূর্ববঙ্গ বাহিরে গিয়াছে বলিয়া আয়করের ভাগ শতকরা ৮ কম করিয়া দেওয়া যুক্তিযুক্ত হয় নাই। পূর্ববঙ্গ

হইতে যে পরিমাণ আয়কর আদায় হইত সেই টাকাটা বাদ দিয়া দিলেই যথেষ্ট হইত। ভূতপূর্ব অর্থসচিব শ্রী অন্নদা চৌধুরী এ বিষয়ে কিছুই করেন নাই বলিয়া ব্যাপারটা বিসদৃশ আকার ধারণ করিয়া রহিয়াছে। শ্রীনলিনীরঞ্জন সরকার বলিয়াছেন যে তাঁহারা এই অধ্যায়ের প্রতিকারের জন্ত চেষ্টা করিতেছেন এবং ভারত-সরকারের সিদ্ধান্ত বদলাইতে পারিবেন বলিয়া আশা করেন। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় স্বয়ং এই আলোচনার জন্ত দিল্লী গিয়াছেন। ১৯৪৮-৪৯ সালে প্রায় এক কোটি টাকা ঋণটি পড়িবে। বাজেটে মিতব্যয়িতার ক্ষেত্র কতখানি রহিয়াছে তাহা ভাল ভাবে দেখা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ভাতা এবং কণ্ট্রোল দিয়া কাজ করাইবার বরাদ্দগুলিতে মিতব্যয়িতা অবলম্বন ও পরিদর্শনের কড়াকড়ি করিলে অনেক টাকা বাঁচিয়া যাইবে ইহা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। কৃষি শিল্প এবং পথঘাট ইত্যাদির নামে প্রতি বৎসর কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ হয় এবং খরচও হয়। বৎসরান্তে খরচের অনুপাতে কাজ কতখানি হয় পরবর্তী বাজেট বক্তৃতায় তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়ার রীতি প্রবর্তন করা উচিত এবং তাহা হইলে অপচয়ও অনেক কমিয়া আসে। যাহাদের হাতে খরচের ভার আছে তাহারা যদি বুঝিতে পারেন যে বৎসরান্তে কাজের হিসাবও দিতে হইবে তাহা হইলে কাজ অস্বস্তঃ এখনকার চেয়ে বেশী অগ্রসর হইবে। স্বাভাবিক অবস্থায় সমগ্র বাংলার তুলনায় এখন পশ্চিমবঙ্গের আয়ই প্রায় তিন গুণ হইবে, তথাপি খরচ কেন কুলায় না তাহা বুঝা কঠিন। গরীব দেশের গরীবের বাজেটে যদি কর হ্রাসের ব্যবস্থা না হয় তবে বাজেট একেবারেই মানুষী বলিয়া মনে হইবে। বর্তমান ক্রয় শুষ্কটি মধ্যবিত্ত সমাজের পক্ষে অভ্যস্ত পীড়নমূলক। বিলাস দ্রব্যের উপর ক্রয় শুল্ক বহাল রাখিয়া বই, কাগজ, কাপড়, জামা, জুতা প্রভৃতির উপর হইতে উহা একেবারে তুলিয়া দেওয়া উচিত। শিক্ষা বিশ্বার যেখানে একান্ত আবশ্যক, সেখানে বইয়ের উপর দুই বার করিয়া ক্রয় শুল্ক আদায় হইতেছে, একবার প্রেসে ছাপানো কর্ম্ম ডেলিভারী দেওয়ার সময়, আর একবার বাঁধানো বই বিক্রয়ের বেলায়। বলা বাহুল্য ছুইটা করই ক্রেতার ঘাড়ে গিয়া চাপিতেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে পাট রপ্তানী শুল্ক ও আয়করের ভাগ আদায় হইলে এবার হইতেই ক্রয় শুল্কের অন্তর্গত বই এবং নিত্যব্যবহার্য্য অবশ্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি বাদ দিয়া অর্থসচিব দেশের নিয়মাবলি সমাজকে একটু স্বস্তি দিতে পারেন। দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধির তুলনায় ইহাদের আয় বাড়ে নাই, এই সামান্য সাহায্যটুকুও তাহাদের নিকট অমূল্য বলিয়া প্রতিভাত হইবে।

মিত্র সেবাসঙ্ঘ

মিত্র সেবাসঙ্ঘ (ফ্রেণ্ডস সার্ভিস ইউনিট) একটি

আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান। আজ ছয় বৎসর হইতে এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি বাপকভাবে ভারতবর্ষের দুর্গত জনের সেবার্থ্য করিয়া যাইতেছেন। ইঁহারা একটি ধর্ম্মগোষ্ঠীর সেবক, যাহার সংখ্যা ২০,০০০-এর বেশী নয়। অথচ ইঁহারা বিশ্বব্যাপী দুর্গতের সেবা করিয়া যাইতেছেন। প্রায় তিন শত বৎসর পূর্বে এই ধর্ম্মগোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা জর্জ কল্লের অনুপ্রাণনায় ইঁহা সেবাত্রত আরম্ভ হয়। এই গোষ্ঠীর একটি কার্য্য-বিবরণিতে এই ইতিহাস দেখিতে পাই। “ফল্গের মতে প্রত্যেক লোকের মধ্যেই ভগবানের অংশ আছে, তা ভাল-মন্দ-গরীব-বড়লোক যাই হউক না কেন।” তাঁহার সম্প্রদায় বলেন,

অন্তরের আলোক যীশুরই নির্দেশ, এবং তা সব কাজেই মেনে নেওয়া উচিত।...অন্তরের আলো মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করিবার নির্দেশ দেয়। এই আলোর বলে সন্তের সভারা যুদ্ধ-বিগ্রহের বিরোধী ... মিত্র (নেবা) সমিতির সভারা পুরোহিতের সাহায্যে পুজায় বিশ্বাস করেন না।...মানুষের তৈরী রং, জাতি ও ধর্ম্মের বৈষম্য তাঁরা মানেন না। এই কারণে মিত্র সমিতির সভারা বরাবরই সাম্রাজ্যবাদের বিপক্ষে। প্রায় এক শ' বৎসর আগে, সিপাহী বিদ্রোহের ঠিক পরেই সমিতির প্রচার-পত্রে নিম্নলিখিত কথাটি প্রকাশিত হইয়াছিল : “সমস্ত পৃথিবীর ইতিহাসের মধ্যে একমাত্র ভারতবর্ষেই এক শ' বছর ধরে সামরিক শাসন ও বাণিজ্য একসঙ্গে চলতে দেখা যায়। সামরিক শাসন ও বাণিজ্য এক্ষেত্রে পরস্পরকে সাহায্য করে। সৈন্যরা দেশ জয় করে বাণিজ্যের সুবিধা করে দেয় এবং বাণিজ্য-লব্ধ টাকায় সামরিক অভিযান চলতে থাকে। এই ধরনের অত্যাচার কেবলমাত্র ভারতেই সম্ভব হয়েছে।”

ইংরেজ শাসনের গৃধুতা এই প্রতিবাদে শিথিল হয় নাই। আজ স্বাধীন ভারতে ইংরেজ ও ভারতবাসীর সম্বন্ধ সহজ ও সরল হইবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। মিত্র সেবা সমিতির সেবার্থ্য এই আদর্শ পথে চলিবার ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতেছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। গত বিশ্বযুদ্ধের সময় নুতন ভাবে এই সন্তের সভ্যগণ ভারতবর্ষে কার্য্য আরম্ভ করেন। জাপানী বোমার আক্রমণে ভারতবর্ষের নাগরিক জীবন বিধ্বস্ত হইতে পারে—সেই আপংকালে মিত্র সেবা সমিতির অভিজ্ঞ সেবার প্রয়োজনে তদানীন্তন গবর্নর জর্জ হাওয়ার নিকট আমন্ত্রণ পাঠান। তার পর আসিল মেদিনীপুরে ঝড় ও বজ্রার ধ্বংসলীলা; সঙ্গে সঙ্গে বাংলা দেশের উপরে ছড়িচ্-রাক্ষসীর অত্যাচারে পঁচিশ-ত্রিশ লক্ষ লোকের প্রাণহানি হয়। এই দুই বিপদে মিত্র সেবা সন্তের সভ্য-সদস্য ও সহায়কগণ যে সেবা করিয়াছিলেন তাহা বাঙালী কখনও ভুলিতে পারিবেন না।

পত্রাবলী

[রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে লিখিত]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতীয় অমৃতিক্রমে প্রকাশিত

ও

শান্তিনিকেতন

প্রদ্ব্যাপদেশ

খাসিয়া বালক ছুটিকে লইতে আমার আপত্তি নাই। ব্যবস্থাপক সভার হাতে আপনার পত্রখানি দিয়াছি তাঁহাদের অধিবেশনে কর্তব্য স্থির হইবে, কোনো বাধা হইবে বলিয়া মনে হয় না। বর্তমানে স্থানাভাব ঘটিয়াছে। ছুটির পরে জায়গা পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করিতেছি।

১৩ই বৈশাখে ছাত্রগণ অচলায়তন অভিনয় করিবে—আপনি আমার মাতাদের লইয়া আসিতে পারিবেন ত? তাঁহাদিগকে আমার বর্ষারম্ভের আশীর্বাদ দিবেন এবং আপনি সম্মীক আমার সাদর সম্ভাষণ গ্রহণ করিবেন। ইতি ৩ বৈশাখ ১৩১৫*

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ত্রিগুণ

ত্রিগুণদীপচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাট

প্রদ্ব্যাপদেশ

কাশ্মীরে আসিয়া পড়িয়াছি—বোধ করি ভালই লাগিবে। এ পর্যন্ত গিরিরাজের সঙ্গ পাইবার অবকাশ পাই নাই—সন্মান সৌজন্মের ব্যর্থ যদি ভেদ করিতে পারি তবে কিছু আনন্দ সঞ্চয় করিতে পারিব বলিয়াই আশা করিতেছি।

ঠিক ঠাওরাইয়াছেন, অনুবাদক আমি; কিন্তু ঢাক-বাদকের হাতে সে কথাটা সমর্পণ করিবেন না। আর কিছুই নয় এই সমস্ত ছোট ছোট ব্যাপারে শাণ লাগিয়া ঈর্ষার মুখ তীক্ষ্ণ হইয়া উঠে। ইহাতে সত্যোচ্চের পক্ষেও ভাল হইবে না, আমার পথও কষ্টকিত হইবে। তা ছাড়া কর্মবন্ধনের আর একটা পাক বাড়িবে। অনেক বন্ধু এবং অবন্ধু আমার কাছ হইতে অনুবাদ সরবে ও নীরবে দাবী করিবেন—সে দাবী পূর্ণ না হইলেই বন্ধুর তটে শিকস্তি হইয়া অবন্ধুর তটে পরস্তি হইতে থাকিবে। এমন করিয়া জীবনের ভার কেবল বৃথা বাড়িয়া চলে। পরশম্বায় ত এতদিন কাটিল, একটুখানি অবসর-শয্যার সন্ধান আছি জুটিবে কি না জানি না কিন্তু শরসংখ্যা আর বাড়াইতে ইচ্ছা হয় না।

● ইং ১৩২১ হইবে। ১। সত্যোচ্চনাথ দত্ত

আপনার শরীর অনেকদিন হইতে খারাপ আছে শুনিয়া মন উদ্বিগ্ন আছে। অবকাশই আপনার একমাত্র পথ্য, কিন্তু জানি তাহা আপনার পক্ষে দুর্লভ। তবু একখাটা মনে রাখা উচিত যে অর্থ সম্বন্ধে দেনা করাটা যেমন অশুচিত প্রাণ সম্বন্ধেও তাই। আপনি কিছুকাল হইতে প্রাণের তহবিলে ঋণের দিকে ঝুঁকিয়া কাজ চালাইতেছেন—এ সম্বন্ধে একেবারে কি কোনো জবাবদিহি নাই?

শান্তা* সীতাকে* আমার আশীর্বাদ জানাইবেন। ইতি আনুমানিক ২০শে আশ্বিন ১৩২২

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ও

প্রদ্ব্যাপদেশ

ছাত্রশাসনের ইংরেজীটা যে তর্জমা সে কথা বাদ দিলে ক্ষতি ছিল না—কেননা ইংরেজীতে কিছু কিছু বদল আছে এবং রচনাটা প্রায়শই আমার।

ঢাক*কে ইতিপূর্বে লিখিয়া দিয়াছি যতদিন Modern Review-তে জীবনমুতির অনুবাদ বাহির হইবে Yeats-কে* একখণ্ড ও Rhy*কে একখণ্ড করিয়া পাঠাইতে। আপনিও তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিবেন। ইতি ১৫ই চৈত্র ১৩২২।

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ও

শান্তিনিকেতন

প্রদ্ব্যাপদেশ

বিষয়ের গুরুত্ব অনুভব করে প্রবন্ধটি আর একবার শোধন করে লিখি। কাল পশু ছুদিন সময় লাগবে বলে বোধ হচ্ছে। প্রবাসীর দেড় ফর্মার বেশি হবে বলে বোধ হয় না। ত্রিশ লাইনের চওড়া কাগজের দশ পৃষ্ঠা ভর্তি হয়েছে—revise করবার সময় আমার ষতটা ছাঁট পড়ে ততটা বাড়তি হয় না। এইজন্তে বলতে পারচিনে কতটা হবে। কাল এখানকার অধ্যাপক সভার পড়েছিলুম—

২। শ্রীশান্তা দেবী ৩। শ্রীসীতা দেবী
+ "Indian Students and Western Teachers", The Modern Review, April, 1916.

৪। ঢাক বন্দ্যোপাধ্যায় ৫। আইরিশ কবি ডবলিউ বি ইয়েটস ৬। রীজ ডেভিডস।

সকলেই নিরতিশয় উৎসাহিত ও উত্তেজিত হয়েছিলেন। যদি আদৌ সভাস্থলে এটা পড়ি তা হলে প্রবাসী বাহির হবার পূর্বেই। পৌষ মাস পর্যন্ত বিলম্ব করলে ভাল হবে না। অত্ৰানেই বাহির হওয়া চাই। Manchester Guardian আমার কাছে ভারতের আধুনিক সমস্তা সম্বন্ধে লেখা আছে। এইটেকেই ইংরেজী করে তাদের দিলে তাদের এবং আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। বোধ হয় এ প্রবন্ধটা কিছু উপকারে লাগতে পারবে সেজ্ঞে আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। আমি চাই ছুটি আপনারা মঞ্জুর করেন না, সেটাতে পরিণামে আত্মপ্রসাদ লাভেরই কারণ ঘটে। কিন্তু তাই বলেই Theistic Conference-এর সভাপতিত্ব আমার কর্তব্যের একটা অঙ্গ এ আমি কোনো মতেই মানতে পারিনে। Social Conference-র চৌকিদারী করবার জ্ঞে পশু দিন ভূপেনবাবুর পত্র পেয়েছিলুম। -তাকে জানিয়েছি কোনো কনফারেন্সের চৌকির মাপে বিধাতা আমাকে তৈরি করেন নি স্ততরাং তাতে আমারও কষ্ট, চৌকিটারও জখমের সম্ভাবনা। স্ততরাং সভাপতিত্ব সম্বন্ধে আমি চিরকৌমার্যে সভাবন্ধ হয়ে পড়লুম—আমাদের দেশে আজকাল কতাবায়ের মতই সভাদায়টা খুব প্রবল হয়ে উঠেছে—অল্প দিনের মধ্যেই অনেকগুলি ঘটকালি আমার কাছে এসেছে—তার মধ্যে প্রথমটি ত লয় পর্যন্ত পৌছলই না অথচ তার ঘটক বিদায় করতে আমার প্রাণ গিয়েছিল আর কি! আমার বয়সে এই সকল বিষয়ে খুবই সাবধান হওয়া উচিত। বোধ হচ্ছে দু'চার দিনের মধ্যে অন্তত দু'চার দিনের জ্ঞে আমাকে কলকাতা যেতে হবে। ইতি ২২ কাঠিক ১৩২৪।

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ও

প্রদ্যাপদে—

আপনি গল্প চান কিন্তু মনে ত হয় আমার বড় গল্প লেখবার শক্তি ফুরিয়ে গেছে। আসল কথা, ক্রান্তিতে আজকাল মনটা যেন বুকে পড়েছে। ইচ্ছা করচে কলমের গোলামী সম্পূর্ণ ত্যাগ করে এখানে ছেলেদের ক্লাশে মাষ্টারিতে ভর্তি হই। দুটো ক্লাশ পড়াতে শুরু করেছি—বেশ ভাল লাগচে। সন্ধ্যার সময় মাছবের ঘরে ফেরবার সময় আসে—তখন বড় সংসারের কাজ আর চলে না। ছোট ছেলেদের মধ্যে আমি সেই ঘরটুকু পাই। আর ত পাল্লিকের হাটে কারবার করতে একেবারেই ভাল লাগে না। আমার একদিন ছিল যখন প্রকৃতির সঙ্গে আমার গভীর একটা মিল ছিল। মাঝে এল লোকালয়। সেখানে প্রায় পঁচিশ বৎসর ধরে হটোপাটি করেছি। আজ আবার দেখছি বিশ্বপ্রকৃতি আমার জানলায়

এসে উকি মারচে। বড় আকাশ থেকে আমার ডাক আসচে। পৃথিবী থেকে আমার বিদায়ের রাজ্য এসে দিচ্ছে কোথায় চলেচে। এখানকার খাতাপত্র বন্ধ করে আবার আমাকে বেরতে হবে। জীবনের আরম্ভে বিশ্ব আমার কাছে এসেছিল, জীবনের পরিণামে আমাকেই সেই বিশ্বের দিকে চলতে হবে, সেই দিকেই আমার কিছু পাবার আছে, কিছু দেবার আছে—হয় ত এখান থেকেই সমস্ত ভাঙা জুড়ে নিয়ে, বেহর সেরে নিয়ে তবে আবার রাজ্য আরেক দরবারে তালিম দিতে পারব।

এদিকে আবার ফেব্রুয়ারি মাসে বম্বাই এবং দক্ষিণ ভারতে আমার যাত্রা স্থির হয়ে গেছে, নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছি। হয় ত মার্চের মাঝামাঝি পর্যন্ত ঘুরতে হবে। এই ভ্রমণের পরে যদি আবার ইঠাং কলমের মুখে জোয়ার আসে বলা যায় না। তা হলে আবার লিখতে বসব। কিন্তু এর মধ্যে বিজ্ঞাপন দেবেন না। এবার টাকাও না। দরকার হবে না। খুব সম্ভব ফেব্রুয়ারি মাসে বিলাত থেকে বইয়ের টাকা আসবে। ওদিকে বম্বিতে কিছু অর্থোপার্জননের আয়োজন চলচে। “কর্তার ইচ্ছায় কর্ম” প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি ছাপতে যদি ইণ্ডিয়ান প্রেস নারাজ হন তা হলে আপনি ওগুলি ছাপিয়ে নেবেন। সীতা আশা করি ভাল আছে। ইতি ২৬ পৌষ ১৩২৪

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ও

প্রদ্যাপদে—

স্বতরাষ্ট্র দুর্ঘোষন সংবাদ ১৩০৪ শালে, স্ততরাং বছর বাইশ পূর্বে, লিখিত।

যথারীতি জন্মোৎসব হয়ে গেল—সেদিন আমার নামের প্রথম অংশ বলবান ছিল—তার পর দিন থেকে দ্বিতীয় অংশ আপন পালা স্বক করেছে। বেশ পেট ভরে বৃষ্টি হয়েছে।

সংযুক্ত্যকে আমার সংযুক্ত আশীর্বাদ জানাবেন। ইতি ২৮ বৈশাখ ১৩২৬

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ও

প্রদ্যাপদে—

ইংরেজি “ঘরে বাইরে”র সমালোচনার cuttings আমার কাছে অনেকগুলি আশিয়াছে। সকলগুলিতেই সাধারণতঃ সাহিত্য ও উপদেশ ও বিচারের তরফ হইতে

* “গান্ধারীর আবেদন”—কাহিনী।

১। শ্রীশান্তা দেবী ও শ্রীসীতা দেবী।

বইখানির বিশেষ প্রশংসা প্রকাশ হইয়াছে। কেবল এক-
খানি মাত্র কাগজে boycott সম্বন্ধে আলোচনা আছে এবং
এই উদ্দেশ্যে গাঁবির চেঁচীর বিরুদ্ধে আমার মত খাড়া করা
হইয়াছে। অনেক কাগজেই একথা বলিয়াছে যে এ বই-
খানিতে প্রকাশিত তত্ত্বগুলি যুরোপের বর্তমান অবস্থা
সম্বন্ধে বিশেষরূপে প্রযুক্ত। বস্তুত “ঘরে বাইরে” বইখানিকে
বাঙালী পাঠক যেরূপ অত্যন্ত সন্মুখ করিয়া দেখিয়াছিল
বিলাতের পাঠকেরা তেমন করিয়া দেখে নাই—ইহাতে
আমি অত্যন্ত তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। আমি আমাদের
দেশের পোলিটিক্যাল অবস্থাকে মুখ্য করিয়া সাহিত্য রচনা
করিতে অক্ষম—যথেষ্ট সেই কুণো দৃষ্টিতে আমার
লেখা পড়িলে পদে পদে উল্টা বুঝিতে হয়। এইজন্যই
“অচলায়তন”কে কেবল হিন্দুসমাজের উপর আরোপ করিয়া
ও বইটাকে অধিকাংশ পাঠক অত্যন্ত বাঁকা করিয়া ধরে।
অচলায়তন যদি সকল দেশে সকল সম্প্রদায়েই না থাকিত
তবে এ বই আমি কখনই লিখিতাম না। “ঘরে বাইরে”র
মূল কথাটি রাষ্ট্রতত্ত্ব সমাজতত্ত্ব আকারে বর্তমান কালের
সকল জাতির মধ্যেই চিন্তায় ও কর্মে ব্যাপকরূপে
সংক্রামিত। সেই কারণেই এ বইটি আমার পক্ষে লেখা
সহজ হইয়াছে। অবশ্য গল্পের মূল ভাবটি যতই সর্বজনীন
হউক না তাহার মূর্তিটি বিশেষ দেশকালকে অবলম্বন না
করিয়া থাকিতে পারে না—সেই কারণে “ঘরে বাইরে”
বাংলা দেশের স্বদেশী আন্দোলন আশ্রয় করিয়া আপন
আত্মীয়িকার কাঠামো বানাইয়াছে। ইহা উপলক্ষ্য মাত্র,
লক্ষ্য নহে।

স্বরেনকে “গোরা” তর্জমা করিতে অহুরোধ করিয়াছি।
কিন্তু ইহার তর্জমা শেষ হইয়া প্রকাশ হইতে অন্তত আরো
দেড় বৎসর লাগিবে। অতএব “ঘরে বাইরে”র প্রতি-
ষেধকরূপে এখনি ফল দিতে পারিবে না। যাহা হউক
স্বরেনকে আর একবার তাড়া দিব।

আশা করি আপনারা ভাল আছেন। ইতি ৭ই ভাদ্র
১৩২৬

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ও

শ্রদ্ধাস্পদেষু

...কে আপনাদের এখানকার কুটীরে বাস করিবার
প্রস্তাবে সম্মতি দিয়াছেন। আমার আশঙ্কা হয় পাছে সে
মনে করে আমরা ব্যাঘাত ঘটাইতেছি এইজন্য এই ঘর-
খানি বিতালনের তবক্ষ হইতে ক্রয় করিয়া দখল করিবার
প্রস্তাব পাকা করিতে পারিতেছি না। ... মনে কষ্ট

৮। স্বরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পায় বা অসুবিধা ভোগ করে ইহা আমি ইচ্ছা করি না।
আপনাকে প্রতিবেশীরূপে পাইবার লোভ মনে প্রবল ছিল
রলিয়াই এই কুটীরটিকে কোনমতে আপনার হাতে
গছাইয়া দিয়াছিলাম—ভাবিয়াছিলাম আপনাকে intern
করা গেল কিন্তু বন্দী করিয়া রাখিতে পারিলাম না। দীর্ঘ-
কাল আপনার অন্তর্ধান বশত যখন সন্দেহ করিতেছিলাম
যে আপনি হয়ত এখানকার মায়া কাটাইলেন তখন আপনার
এই ঘরটাকে, নিকটবর্তী পেয়ারা গাছ সমেত, পুনশ্চ
আশ্রমে খাস করিয়া লইবার প্রস্তাব করিব বলিয়া স্থির
করিয়াছিলাম, কিন্তু পাছে আপনার পুনরাবির্ভাবের কোনো
সম্ভাবনা থাকে এই সংশয়ে দ্বিধা করিতেছিলাম। আমরা
আপনার স্থলাভিষিক্ত কাহাকেও এই জায়গায় প্রতিষ্ঠিত
দেখিতে চাই না—হয় আপনারা, নয় আশ্রম, এই ছিল
আমার কামনা। ঠিক এখনি যদি এই কামনা পূর্ণ না
হয় তবে অন্তত অদূরবর্তী কোনো এককালে পূর্ণ হইবে এই
আশা করি। ইহার মূল্য কি হইতে পারিবে আমাকে
জানাইতে সন্দেহ করিবেন না।

চিঠি লিখিয়া স্বরেনের কাছ হইতে জবাব পাওয়া
কঠিন। যদি কোনো মধ্যাহ্নে তাহার আপিসে চাকরকে
পাঠাইয়া দেন—তবে স্বরেনের কাছ হইতে গোরা তর্জমা
সম্বন্ধে পাকা কথা সে আদায় করিয়া আনিতে পারিবে। এ
সম্বন্ধে আমার সঙ্গে তাহার মোকাবিলায় আলোচনা
হইয়াছে কিন্তু তাহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিবেন না।

Autumn Festival তর্জমার সম্মতি চাহিয়া আমার
কাছে বিস্তর পত্র আসিতেছে। সম্ভবত আপনার কাছেও
আসিয়াছে বা আসিবে—আপনি সম্মতি দিতে কুণ্ঠিত
হইবেন না। ইতি ৯ই অগ্রহায়ণ ১৩২৬

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ও

শ্রদ্ধাস্পদেষু

এবার কংগ্রেসে যে প্রার্থনা মন্ত্র তিনটি পাঠাইয়াছি
মডার্ন রিভিউর জন্য পাঠাইলাম। এবার ছাপিবার সময়
ও স্থান আছে কিনা জানি না। কাল ৭ই পৌষ সমাধা
হইয়া গেল—আপনার দ্বিগকে স্মরণ করিয়াছি। আজও
অতিথি অনেক আছেন—উৎসবের পরিশিষ্ট চলিতেছে।
শান্তা ও সীতাকে আমার আশীর্বাদ জানাইবেন। ইতি
৮ই পৌষ ১৩২৬

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ও

শ্রদ্ধাঙ্গাদেশ

সাংলি হইতে সেখানকার রাণীর ভগিনী ও তাঁহার স্বামী শ্রীযুক্ত পটবর্দ্ধন জাহ্নবীর আরম্ভে আশ্রমে আসিবেন। পটবর্দ্ধন কেশ্বজের গ্র্যাজুয়েট, তিনি আশ্রমের কাজে যোগ দিতে ইচ্ছা করেন। ইহাদিগকে বাসের স্থান দিতে হইবে। এখানে নূতন ঘর নির্মাণ করিতে সাত আট মাস লাগে, বারম্বার ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। সেই জন্ত আপনার পরিত্যক্ত কুটীরটিকে শীঘ্রই তাঁহাদের বাসোপযোগী করিয়া মেরামত করিতে হইবে।

আপনার কুটীরের মূল্য সম্বন্ধে এখানকার অধ্যক্ষদের মত যাচাই করিলাম। তাঁহারা তিন শো টাকা দাম ধরিতেছেন। আপনার কি এই মূল্যে সম্মতি আছে? আপনি যাহা সঙ্গত বোধ করেন বলিয়া পাঠাইবেন। এবং যদি বিক্রয় স্থিরই করেন তবে আপনার আসবাবপত্র সরাইয়া লইবার ব্যবস্থা করিবেন। ৭ই পৌষের পূর্বেই মেরামত সারিতে পারিলে সে সময়ে আপনার এই ঘর কাজে লাগাইতে পারিব। আজকাল এখানে স্থানের এত অভাব যে আমরা আশু প্রয়োজনের জন্ত তাঁবু কিনিবার চেষ্টা করিতেছিলাম। কিন্তু কিছুকাল হইল কানপুর এলগিন মিলে পত্র লিখিয়াও ক্যাটালগ পাই নাই। শীঘ্র যে কোথাও তাঁবু পাওয়া যাইতে পারে তাহার খবরই পাইলাম না। এইজন্য উদ্বিগ্ন আছি। ইতি ১৩ই অগ্রহায়ণ ১৩২৬

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ও

প্রীতিনমস্কারপূর্বক নিবেদন

মহেশবাবু^২র কথা আপনি স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন ইহাতে শাস্ত্রী মহাশয়^{১০} রথী^{১১} এবং অচ্যুত সকলেই

৯। মহেশচন্দ্র ঘোষ। ১০। শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী।

১১। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

উৎসাহিত হইয়াছেন। তিনি এখানে আসিতে সম্মত হইলে আমরা বিশেষ আনন্দিত হইব।

আমার স্বস্তিক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে এইজন্য রামমোহন রায় সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিতে কলম সরিতেছে না। ইতি ২রা আশ্বিন ১৩২৮

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ও

প্রীতিনমস্কারপূর্বক নিবেদন

মহেশবাবু সম্বন্ধে আপনি যে কথা লিখেছেন আমার মনে লেগেছে। তিনি ঠিক বিশ্বভারতীর যোগ্য অধ্যাপক। শাস্ত্রী মহাশয়কে আমি তাঁর কথা বলব এবং তাঁকে আমাদের এখানে পাবার জন্তে চেষ্টা করব।

রামমোহন রায় স্মৃতি সভার সভাপতিত্বে যাব কিনা মনে সংশয় আসছে। কলকাতা আমার পক্ষে অত্যন্ত সঙ্কটের স্থান—আমি শাস্তি ও বিশ্রামের জন্তে অত্যন্ত উৎসুক আছি। আর আমি নানা মিথ্যা তর্কের জালের মধ্যে জড়িয়ে পড়তে ইচ্ছা করিনে। এতে আমার শরীরও ক্লান্ত হয়ে পড়ে, নিজের কাজের ক্ষতি হচ্ছে। মন উদ্ভ্রান্ত থাকতে ভাল করে লিখতেও পারছিনে। হয়ত শেষ পর্যন্ত লেখা হয়েই উঠবে না। মোটের উপর, কলকাতার আবর্ত আমার পক্ষে আয়ক্ষ্যকর। কিছু না কিছু মিথ্যার আঁধি সেখানে সৃষ্টি হবেই। তাই আমি সেখানে কিছুকাল যাব না স্থির করেছি। ইতিমধ্যে লেখা শেষ হলে প্রবাসীতে পাঠাব। ইতি আশ্বিন ১৩২৮

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



তত্ত্বের প্রাচীনতা

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, বিজ্ঞানিধি

ইং ১৯১০ সালে আমি কটকে ছিলাম। সে সময়ে রংপুর-নিবাসী মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় কটকে ছিলেন। তখন তাঁহার একমাত্র পুত্র ১৪।১৫ বৎসরের বালক শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য রুগ্ন। তাঁহার স্বাস্থ্যোন্নতির আশায় তর্করত্ন মহাশয় কটকে তিন-চারি মাস অবস্থিতি করিয়াছিলেন। কটকের দক্ষিণাংশে আমার বাসা ছিল। তাঁহার বাসাও নিকটে। প্রায়ই আমি তাঁহার দর্শন পাইতাম। গ্রীষ্ম ঋতু আদিয়া পড়িল। সন্ধ্যাকালে আমরা দশ-বার বন্ধু কাটজুড়ি নদীর পাশে-বাঁধ ঘাটে বসিয়া দক্ষিণ সমুদ্রের পবন উপভোগ করিতাম, নানা বিষয়ে কথাবার্তা হইত। তর্করত্ন মহাশয়ও সেখানে আসিয়া বসিতেন। একদিন আমি একখানা ইংরেজী বইতে পড়ি, আমাদের দেশের এক বিদ্বানের রচিত, তিনি লিখিয়াছেন, তন্ত্রশাস্ত্র হাজার। বার শত বৎসরের অধিক পুরাতন নহে। আমার বিশ্বাস হইল না। কারণ বেদে যে শাস্ত্রের মূল নাই, সে শাস্ত্র এদেশে আদৃত হইতে পারিত না। আমি আমাদের কাটজুড়ি নদীঘাটের সাক্ষ্য সমিতিতে তর্করত্ন মহাশয়ের মত জিজ্ঞাসা করি। “সে কি? কে এ কথা বলে? না জেনে শুনে মন্তব্য করা উচিত হয় নাই।” ইহার পর তিনি তত্ত্বের প্রাচীনতা ও ব্যাপ্তি বলিতে লাগিলেন, আঁধ ঘণ্টা বলিয়া চলিলেন। আমি অনধিকারী, যথোচিত মন দিয়াও তাঁহার যুক্তি ধরিয়া রাখিতে পারিলাম না। তিনি আমাকে স্নেহ করিতেন। আমার অল্পরোধে “তত্ত্বের প্রাচীনতা” এই নাম দিয়া তিনি কলিকাতার “সাহিত্য-সভা”র মাসিক পত্রিকার ১৩১৭ সালের আশ্বিন সংখ্যায় অর্থাৎ ইংরেজী ১৯১০ সালের আশ্বিন সংখ্যা “সাহিত্য সংহিতা”র প্রবন্ধ লেখেন। তিনি তাঁহার প্রবন্ধের উপসংহারে আমাদের সাক্ষ্য-সমিতির উল্লেখ করিয়া আমার অল্পরোধ এই ভাবে লিখিয়াছেন—“এই অবশ্য জাতব্য বিষয়ের যুক্তিতর্কগুলি আপনি মুখে বলিয়া কাটজুড়ি নদীর প্রবল বায়ুবাশির হিল্লোলে ভাসাইয়া দিবেন না, এই বিষয়ের একটি প্রবন্ধ লিখিয়া সর্বত্র বাহার প্রচার আছে, এইরূপ একখানি পত্রিকায় প্রচারিত করুন, এই আমার অল্পরোধ।” প্রবন্ধটিতে “সাহিত্য সংহিতা”র প্রায় বার পৃষ্ঠা পূর্ণ হইয়াছে।

শুনিয়াছি, Arthur Avalon সাহেব (হাইকোর্টের বিচারপতি উত্তরক সাহেব) তন্ত্রশাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁহার বৃহৎ ইংরেজী গ্রন্থের ভূমিকায় তর্করত্ন মহাশয়ের এই প্রবন্ধের

ইংরেজী অল্পবাদ সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। সাহেব তাত্ত্বিক মতে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। পণ্ডিত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব তাঁহার গুরু ছিলেন। বিদ্যার্ণব বিখ্যাত বৈদান্তিক ও তাত্ত্বিক ছিলেন। ইনি প্রায় ২৫ বৎসর পূর্বে কাশীতে দেহরক্ষা করিয়াছেন। তর্করত্ন মহাশয়ের অগাধ পাণ্ডিত্য সর্বজনবিদিত। সেকালের সংস্কৃত পণ্ডিতেরা এক এক গ্রন্থশালা ছিলেন। তাঁহারা বাহা জানিতেন, সব তাঁহাদের কণ্ঠস্থ থাকিত, আমাদের মতন তাঁহাদিগকে পুখী হাতড়াইতে হইত না। তাঁহার বাদলা রচনাও যেমন যুক্তিপূর্ণ তেমনি মার্জিত ও স্বথপাঠ্য ছিল। “ভারতবর্ষে” তাঁহার কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি হৃদয়-গ্রাহী বক্তৃতাও করিতে পারিতেন। তাঁহার স্মৃতিপূজার নিমিত্ত তন্ত্রসম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ সঙ্কলন করিতেছি।

তন্ত্র এক বিপুল শাস্ত্র। ইহার অপর নাম আগম ও তাত্ত্বিক মত। ইহার সপ্ত লক্ষণ কীর্তিত হইয়া থাকে। যথা—সৃষ্টি, প্রলয়, দেবার্চনা, সর্ববিধ সাধন, পুরস্চরণ (মন্ত্র সিদ্ধির নিমিত্ত ইষ্ট দেবতার পূজা, মন্ত্রজপ, হোম ইত্যাদি), ঘটকর্ম সাধন (রোগশান্তি, বশীকরণ, স্তম্ভন, বিদ্রোহণ, উচ্চাটন, মারণ), ও চতুর্বিধ ধ্যানযোগ। এই সপ্ত লক্ষণের মধ্যে সৃষ্টি ও প্রলয় পুরাণেও আছে। এক প্রকার ধ্যানযোগ পাতঞ্জল দর্শনে আছে। কিন্তু দেবার্চনা বিধি ইত্যাদি পুরাণের বিষয়ীভূত নহে। আমরা দেবার্চনা প্রত্যহ দেখিতেছি, আমরা রোগ ও গ্রহাদির শাস্তি-স্বস্তায়ন বুঝি, আর শুনি, তাত্ত্বিক সাধকদিগের অলৌকিক শক্তি হয়, তাঁহারা স্তম্ভন, বশীকরণাদি ব্যাপার করিতে পারেন। শুনি, তাঁহারা অমাবস্ত্যার রাত্রে শ্মশানে বসিয়া সাধনা করেন। কেহ কেহ শবাসন হইয়া ইষ্ট মন্ত্র জপ করেন। ইদানীং তাত্ত্বিক সাধনা হ্রাস পাইয়াছে। কেহ কদাচিত্ গৃহে থাকিয়া তাত্ত্বিক সাধনা করেন। অধিক দিনের কথা নয়, কাশীতে পূর্ণানন্দ সরস্বতী এক বিখ্যাত তন্ত্রসিদ্ধ ছিলেন। শতবর্ষ পূর্বে অনেকে তন্ত্রসাধনা করিতেন। ভারতের সকল প্রদেশেই তন্ত্রের প্রভাব ব্যাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু বোধ হয়, আসাম ও বঙ্গ যত প্রতিপত্তি হইয়াছিল, তত আর কোনও প্রদেশে হয় নাই। উপনয়নকালে দ্বিজ বালকের বৈদিকী দীক্ষা হয়। ইহা ব্রাহ্মী দীক্ষা। কিন্তু নারী, শূদ্র ও “সামান্য” জাতি বৈদিক মন্ত্রের অধিকারী ছিল না, এখনও নাই। পরম কারুণিক মহেশ্বর জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে সকলের নিমিত্ত তন্ত্রশাস্ত্র বলিয়াছেন, সকলেই তাত্ত্বিক মতে দীক্ষিত

হইতে পারে, হইয়াও থাকে। এমন কি, কিছু বয়স হইলে বৈদিক দীক্ষিত বিদ্র তাঙ্গিকী দীক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই দীক্ষা তিন প্রকার—বৈষ্ণব, শৈব ও শাক্ত। কাহারও ইষ্ট দেবতা বিষ্ণু, কাহারও মহেশ্বর এবং কাহারও মহেশ্বরী। এই তিন দেবতার ভিন্ন ভিন্ন নাম অনুসারে এই তিন সম্প্রদায়ের ইষ্ট দেবতা হইয়া থাকেন। যে তন্ত্রের বক্তা শিব, তাহা শৈব, যাহার বক্তা শিবানী, তাহা শাক্ত। কে বৈষ্ণব তন্ত্রের বক্তা, তাহা আমি অবগত নহি।

তন্ত্রের মন্ত্র বীজসংযুক্ত। অকারাদি বর্ণে অনুস্বারযুক্ত করিয়া বীজ হয়। মন্ত্র, যন্ত্র (লেখা-চিত্র) ও ক্রিয়া—এই তিনের যোগ করিয়া দেবার্চনাদি হইয়া থাকে। সাধন-ক্রিয়া অতিশয় দুষ্কর। এ বিষয়ের শাস্ত্র সন্ধ্যা ভাষায় লিখিত। সন্ধ্যা ভাষাব দুই অর্থ থাকে—লৌকিক ও নিগূঢ়। সাধারণ লোকে লৌকিক অর্থ বোঝে, সাধক নিগূঢ় অর্থ ধরেন, সে অর্থ গুরুমুখ ব্যতীত জানিবার উপায় নাই। গুরুও যে সে নহেন, যিনি সিদ্ধ হইয়াছেন, তিনিই গুরু। গুরুও যাহাকে তাহাকে শিষ্য করেন না। তিনি বিশেষ পরীক্ষা করিয়া তত্ত্ব-সাধনের উপযুক্ত মনে করিলে শিষ্য করেন। পঞ্চাচার, বীরাচার, দিব্যাচার, কিস্বা মন্ত্র, মন্ত্র, মাংস ইত্যাদি পঞ্চ মকার ইত্যাদির অর্থ উপরে যাহা, ভিতরে তাহা নহে। কেবল গুরু সে নিগূঢ় অর্থ জানেন। তন্ত্রশাস্ত্র অতিশয় গুহ্য, “মাতৃজারবং গোপনীয়।”

ভগবদ্গীতায় ভক্তিযোগ, কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগ,—এই ত্রিবিধ যোগের ব্যাখ্যা আছে। হঠযোগ তন্ত্রের বিশিষ্ট যোগ। মন নিশ্চল হয় না, বিষয়ের প্রতি ধাবিত হয়। হঠযোগ দ্বারা চক্ৰল মনকে বলপূর্বক নিশ্চল করিতে পারা যায়। মেরুদণ্ডের দুই পার্শ্বে ইড়া ও পিঙ্গলা, মধ্যস্থলে সুষুমা নাড়ী আছে। তন্ত্রশাস্ত্র বলেন—এই তিন বাত-নাড়ীর ক্রিয়া ইচ্ছাবীন করিতে পারা যায়। সুষুমা নাড়ী মেরুদণ্ডের নিম্ন স্থান হইতে ব্রহ্মতানু পর্যন্ত বিস্তৃত। ইহার ছয়টি বিশিষ্ট স্থান আছে। নাম চক্র। যিনি সেই ষট্চক্র নিরূপণ বা ষট্চক্র-ভেদ করিতে পারেন, তিনি ব্রহ্মের সহিত লীন হইয়া যান। তখন কেবল আনন্দ। প্রাণায়াম-অভ্যাস, অন্তর্ধৌতি প্রভৃতি হঠযোগের অঙ্গ। হঠযোগ অতিশয় দুষ্কর। তন্ত্রশাস্ত্র মতে পবন-রোধ দ্বারা মুক্তি ঘটয়া থাকে।

অনেক বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য্য ছিলেন। মহামহোপাধ্যায় হর-প্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল হইতে “বৌদ্ধচর্যাপদ” নামে একখানি পুথী আনিয়াছিলেন। তাহা তান্ত্রিক সন্ধ্যা ভাষায় লিখিত। মীননাথ গোরক্ষনাথ তান্ত্রিক ছিলেন। আমাদের দেশে যে নাথ-সম্প্রদায় আছেন, তাহীদের গুরু শৈবতান্ত্রিক। এই কারণে সেই সম্প্রদায় যোগী নামে খ্যাত। “সহজ মত”

বা “সহজিয়া মত” তান্ত্রিক মত। শতবর্ষ পূর্বেও বঙ্গ ও আসামে গোপনে কালিকা দেবীর সম্মুখে নরবলি প্রদত্ত হইত। ইহার পূর্বে প্রকাশভাবে দেবার্চনার অনুরূপে নরবলি হইত। তৎকালে বলির নিমিত্ত যুবা কিনিতে পাওয়া যাইত। রাজারা বিপক্ষের রাজ্য হইতে বলি বল পূর্বক সংগ্রহ করিতেন। বোধ হয়, প্রথম প্রথম সে বলির মাংসভক্ষণেরও বিবিধ ছিল। কারণ দেবীর প্রসাদ সাধকের গ্রহণীয় ছিল। অঘোর পন্থীদের শুচি অণুটি ভেদ নাই। অল্প কয়েক বৎসর পূর্বে এই বাঁকুড়া জেলায় ইন্দাস থানার শোনা গিয়াছিল, এক নর-পিশাচ মৃত শিশুর মাংস ভোজন করিত। অবিকাংশ তন্ত্রসাধক অলৌকিক শক্তি লাভের নিমিত্ত সাধনা করিতেন, অগ্নিমা, লঘিমা ইত্যাদি অষ্টমিদ্ধি লাভের মোহে জীবন ক্ষয় করিতেন। বিশেষতঃ বশীকরণ মন্ত্র সিদ্ধ হইলে ধন লাভের ও স্বখ ভোগের পথ উন্মুক্ত হয়। তান্ত্রিকের এক প্রকার দৃষ্টি আছে। দুর্বল-চিত্ত ব্যক্তি সে চক্ষুর দিকে চাহিলে তাহার চক্ষু নত হইয়া পড়ে। চৈতন্যদেব আসিয়া কদাচার তান্ত্রিকের হাত হইতে দেশ উদ্ধারের নিমিত্ত প্রেমভক্তি বিতরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার তিরোভাবের পর শতবর্ষ গত হইতে না হইতে তাহার শিষ্যেরা সহজিয়া তান্ত্রিক হইয়া পড়িয়াছিলেন। মহাত্মা রামমোহন রায় প্রথমে তান্ত্রিক দীক্ষা পাইয়াছিলেন। পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ দেব তাহার ব্রাহ্মণী ভৈরবীর নিকটে তন্ত্র-সাধনা শিক্ষা করিয়াছিলেন। পরে তিনি তোতাপুরী নামক বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর নিকট ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন। যে সিদ্ধি লাভ করিতে তোতাপুরী ৪০ বৎসর কঠোর তপস্বী করিয়া ছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ তাহা তিন দিনে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। অষ্টার তন্ত্র-সাধনা ব্রহ্মজ্ঞান লাভের সহায় হইয়াছিল।

১৩২৫ বঙ্গাব্দের কার্তিক মাসের “সাহিত্য” নামক বার-মাসিক পুস্তকে পণ্ডিত শ্রীগিরিশচন্দ্র বোদান্ততীর্থ “তন্ত্রের ইতিহাস” নামে এক মনোজ্ঞ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তাহাতে পূর্ণানন্দ গিরি প্রণীত তন্ত্রের (১৪২২ শক = ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দ) পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। সে তন্ত্রে আছে, “সংসার-সাগরময় জীবনসমুদ্রের উদ্ধারবাসনায় ভগবান্ পরম শিব পরম দেবতার রহস্তপূর্ণ আরাধনার প্রতিপাদক তন্ত্রের রচনা করিয়াছিলেন। একমাত্র তত্ত্বজ্ঞানই মুক্তির কারণ। যে পর্যন্ত তত্ত্বজ্ঞান না হয়, সেই পর্যন্ত জপ, হোম, পূজা, তীর্থস্নান আবশ্যক। এক সনাতন পরম ব্রহ্মই রসদ্রুপী। তিনি প্রকৃতি দ্বারাই অভিব্যক্ত হন। অতএব প্রকৃতি-সংযোগই শীঘ্র ব্রহ্ম-প্রত্যক্ষের উপায়। প্রকৃতি-ব্যাপার ব্যতীত নিরাকার গুণাতীত ব্রহ্মকে বুঝিবার কোনও উপায় নাই। গুরুর উপদেশ, ধ্যান, ধারণা ইত্যাদি যাহা কিছু

অবগতির উপায়, সমস্তই প্রাকৃতিক ব্যাপার,” ইত্যাদি।

- তত্ত্বশাস্ত্র কত বিপুল হইয়াছিল; তাহা উক্ত প্রবন্ধে লিখিত
- নিবন্ধের নামসমূহ হইতে বুঝিতে পারা যাইবে।

• মহানির্বাণ-তত্ত্ব নামে একখানি প্রসিদ্ধ তত্ত্ব আছে।* এই তত্ত্ব পরমব্রহ্মের উপাসনা বিষয়ে উপদেশ আছে। ইহা দেখিয়া কেহ কেহ মনে করিয়াছিলেন, তত্ত্বখানি আধুনিক, মহাত্মা রামমোহন রায়ের সময়ে কোন ব্রহ্মজ্ঞানীর রচিত। এই অনুমান সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। কারণ, ইহাতে তত্ত্বমতেই ব্রহ্মোপাসনা কথিত হইয়াছে। অবশিষ্ট একাদশ উল্লাসে প্রকৃতি-সাধনের উপদেশ আছে। আরও দেখা যায়, বেকালে বঙ্গদেশে হিন্দু রাজত্ব ছিল, সেই কালের উপযোগী রাজত্ব ও ব্যবহার-বিধি বর্ণিত হইয়াছে। বোধ হয়, সে রাজা শৈব ছিলেন। এক স্থানে হুণ জাতির উল্লেখ আছে। বোধ হয়, হুণ শব্দে তুর্কী জাতিকে বুঝাইয়াছে। কিন্তু এই তত্ত্ব রচনাকালে হুণেরা প্রবল হয় নাই। আরও কতিপয় কারণে মনে হয়, এই তত্ত্ব দ্বাদশ খ্রীষ্টশতাব্দে প্রণীত হইয়াছিল। ইহাতে উল্লেখিত শাল মন্দির ও পাষাণমন্দির হইতে মনে হয় রাঢ়ের পশ্চিমাঞ্চলে প্রণীত হইয়াছিল। ইহার চতুর্থ উল্লাসে প্রকৃতি ও ব্রহ্মের তত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে এবং ব্রহ্ম-সাধক ও শক্তি-সাধক বে একই বস্তু, তাহারও মীমাংসা আছে।

এক্ষণে মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়ের প্রবন্ধ হইতে তত্ত্বের প্রাচীনতার প্রমাণ যৎকিঞ্চিৎ সংকলন করিতেছি। তিনি তত্ত্বের বিরুদ্ধে নব্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আপত্তি খণ্ডন করিয়াছেন। আপত্তিগুলি এই—(১) তত্ত্বের প্রতিপত্তি ভারতের সর্বত্র নাই, একমাত্র বঙ্গদেশে আছে। তখন বুঝিতে হইবে, তত্ত্ব আর্থজাতির প্রাচীন ধর্মশাস্ত্র নয়। উহা বাক্সালীর আদৃত, বাক্সালীর রচিত। (২) বৌদ্ধ মহা-যানদিগের মধ্যে তারা, বজ্রযোগিনী, ক্ষেত্রপাল প্রভৃতির পূজা প্রচলিত ছিল। সেই সেই দেবতার পূজায় ও জপে বীজ-সংযুক্ত মন্ত্র আছে। তত্ত্বও যখন সেই সেই দেবতার পূজা আছে, বীজমন্ত্রের বাহুল্য আছে, তখন তত্ত্ব মহাযান-দিগের ধর্ম-পুস্তকের আদর্শে রচিত। (৩) আদিম নিবাসীরা শক্তির উপাসক এবং ভূত, প্রেত, সর্প ও বৃক্ষ-বিশেষের পূজক ছিল। তত্ত্বও যখন শক্তির উপাসনা আছে, ভূত, প্রেত, সর্প ও বৃক্ষ-বিশেষের পূজা আছে, তখন বলা বাহুল্য, সেই অসভ্যদিগের নিকট হইতেই তত্ত্বের সেই সমস্ত পূজা গৃহীত হইয়াছে। (৪) যোগিনী তত্ত্ব কোচবিহার রাজবংশের

আদি পুরুষের নামোল্লেখ আছে। এইরূপ তিন শত বৎসরের ঘটনা তাহাতে থাকিলে, কি করিয়া তাহাকে প্রাচীন বলিব?

প্রথম আপত্তির বিরুদ্ধে তর্করত্ন মহাশয় বলিয়াছেন, কেবল বঙ্গদেশেই তত্ত্বের প্রভাব নয়, ভারতের সর্বত্রই তত্ত্বের প্রতিপত্তি আছে। শক্তিমন্ত্র, শিবমন্ত্র, বিষ্ণুমন্ত্র তত্ত্বোক্ত। শ্রীরামচন্দ্রের মন্ত্রও একমাত্র তত্ত্বই উল্লেখিত আছে। কামরূপে, মিথিলায়, উৎকলে, কলিঙ্গে, দক্ষিণা-পথে, কাশ্মীরে, বৃন্দাবনে, উত্তর-পশ্চিমে ব্রাহ্মণ ও অগ্র উচ্চ জাতির শাস্ত্র, বৈষ্ণব ও শৈব, এই ভাগত্রেয় বিভক্ত।

দ্বিতীয় আপত্তির বিরুদ্ধে বলিতে পারা যায়, মতদ্বয়ের সাদৃশ্য থাকিলে এক মতের অনুসরণে বা অনুকরণে অপর মত যে সৃষ্ট, তাহার প্রমাণ কই? প্রথমের অনুকরণে দ্বিতীয়ের সৃষ্টি ও দ্বিতীয়ের অনুকরণে প্রথমের সৃষ্টি বলিলে কিছুই বলা হয় না। বৌদ্ধ-সম্প্রদায়-বিশেষের মধ্যে তারা, হয়গ্রীব, বজ্রযোগিনী, ক্ষেত্রপাল প্রভৃতির পূজা, ধ্যান ও বীজ-সংযুক্ত মন্ত্র আছে। তত্ত্বও তৎসমস্ত আছে। এখানে আমরা বলিতে পারি, তত্ত্বের বিষয় লইয়া সেই সম্প্রদায়-বিশেষের সেই সমস্ত পদ্ধতি গঠিত। বৌদ্ধ ধর্মের হৃদয়স্পর্শী ভাবে যদি হিন্দুর মনে উদ্ভাসিত আদিয়া থাকে, আত্মার নির্বাণের জন্ত লালায়িত না হইয়া বৌদ্ধ প্রতিমার আদর্শে গঠিত প্রতিমার নিকটে কৃতাজ্ঞলিপুটে “রূপং দেহি, জয়ং দেহি, যশো দেহি, দ্বিষো জহি” বলিয়া “রূপ দেও, জয় দেও, যশ দেও, শত্রু সংহার কর,” এইরূপ প্রার্থনা করিবে? কোথায় বৌদ্ধ ধর্মে বাসনা-বিলোপের জন্ত তাদৃশযোগ-সাধনা, আর কোথায় বৈদিক ধর্মের মত শত্রু-বিজয় ও ঐশ্বর্য বৃদ্ধির জন্ত আরাধ্য দেবতার নিকটে প্রার্থনা ও কামনা! বৌদ্ধ ধর্মে কামনার উপদেশ, কি নিক্ষেপ ধর্মের উপদেশ আছে? যদি বৌদ্ধ ধর্মে আকর্ষণের কিছু থাকে, তবে তাহা পশু-হিংসা-নিবারণ। সেটি বাদ দিয়া বৌদ্ধ মহাযান-সম্প্রদায়ের কল্পিত দেব-দেবীর পূজা হিন্দুর তত্ত্বশাস্ত্রে গৃহীত হইল, ইহা অপেক্ষা অপসিদ্ধান্ত কি হইতে পারে? শতবর্ষব্যাপী যজ্ঞে দীক্ষিত শৌনকাদি ঋষি সূতের মুখে শ্রীমদ্ভাগবত শুনিতেন ও সেই যজ্ঞে পশু-হিংসা করিতেন। মহাভারতে যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞে অশ্ব আনন্তিত, হত ও ভুক্ত হইয়াছিল। যজ্ঞে পশু-হিংসা হিংসা নয়। পিতৃ-পুরুষের ভূমির উদ্দেশে মুগ্ধায় পশুবৎ হিংসা নয়। “ললিত বিস্তার” শাক্যসিংহের প্রামাণিক জীবন-বিবরণ। তাহাতে আছে (১২ অঃ), নিগম, পুরাণ, ইতিহাস, বেদে সর্বাপেক্ষা তাহার বিশেষত্ব ছিল। নিগম শব্দের অর্থ তত্ত্ব। “ললিত বিস্তারে” (১৭ অঃ) আরও আছে, ভিক্ষুদিগকে শাক্যসিংহ বলিতেছেন, “মুঢ়েরা ব্রহ্মা, ইন্দ্র, কুশ, বিষ্ণু, দেবী, কাক্তিক্য

* মহানির্বাণতত্ত্বম্,—কুলাবধূত শ্রীমৎ হরিহরানন্দ ভারতী-বিরচিত টীকা এবং শ্রীমৎ পূর্ণানন্দ তীর্থনাথ-কৃত বঙ্গানুবাদ ও টীপনী সমেত। কলিকাতা ৩১ নং শিবঠাকুরের লেন। ১৩২০।

কাতায়নী ও গগনপতি প্রভৃতির আশ্রয় গ্রহণ করে ও তাহাদিগকে নমস্কার করে। কেহ কেহ শ্মশান, চন্দ্র আশ্রয়ে তপস্বী করে। পাষাণদিগের আচার উল্লেখ করিতে যাইয়া শাক্যসিংহের মুখ হইতে মণ্ড, মাংস ও স্ত্রীও উল্লিখিত হইয়াছে। এই সমস্ত তন্ত্রোক্ত উপাসনা পূর্বে না থাকিলে শাক্যসিংহ কি করিয়া জানিলেন?

তৃতীয় আপত্তিটুকি অকিঞ্চিৎকর। ভারতের সর্বত্র শক্তিপূজা ও স্থাপিত শক্তিদেবতা দেখিতে পাই। শক্তি-পূজার বিধান আছে বলিয়া তন্ত্রকে আধুনিক বলিলে পুরাণ, মহাভারত, উপনিষৎ, বেদকে আধুনিক বলিতে হয়। মহাভারতে দেবীর স্তোত্র আছে, শ্রীমদ্ভাগবতে উমা পূজার ব্যবস্থা আছে, মার্কণ্ডেয় পুরাণ, স্কন্দ পুরাণ, ব্রহ্মপুরাণ, ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, ভবিষ্য পুরাণ, পদ্ম পুরাণ, দেবী পুরাণ ও কালিকা পুরাণে শক্তিপূজার প্রমাণ আছে। শারদীয়া দুর্গাপূজার উল্লেখ অনেক পুরাণে আছে। যদিও বঙ্গদেশের মত ভারতের অত্র মুন্সী প্রতিমা প্রস্তুত করিয়া আড়ম্বরের সহিত দুর্গাপূজা হয় না, তথাপি ঘটে দেবীর পূজা বা প্রসিদ্ধ স্থাপিত দেবী মূর্তির দর্শন, তাহাতে দেবীর পূজা, নবরাত্রিবাগী ব্রতধারণ, মহাষ্টমীর দিবস উপবাস ও চণ্ডী পাঠ সর্বত্র হইয়া থাকে। কেন, তলবকার প্রভৃতি উপনিষদে ইন্দ্রাদি দেবতা তেজঃপুঞ্জের ভিতরে হৈমবতী উমাকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। ঋগবেদে সরস্বতী-সূক্ত আছে, যজুর্বেদে লক্ষ্মী-সূক্ত আছে, ঋগবেদের দশম মণ্ডলে দেবী-সূক্ত আছে। অগ্ন্যস্ত্র দেশেও শক্তিপূজা প্রচলিত ছিল। শক্তিপূজার সমর্থক বলিয়া তন্ত্রকে আধুনিক বলিতে পারা যায় না। মনসা দেবীর পূজা তন্ত্রোক্ত নয়, পৌরাণিক। তুলসী, বিষ্ণু ও অশ্বখ বৃক্ষের পূজাও তন্ত্রে উল্লিখিত নহে, পুরাণে কথিত।

চৈতন্যদেবের সমসাময়িক স্মার্ত শিষ্যোয়নি রঘুনন্দন ভট্টাচার্যকৃত স্মৃতি-তত্ত্বে ও আগমবাগীশ কৃষ্ণানন্দ তর্করত্নকৃত তন্ত্রমারে যোগিনীতন্ত্র-শারদা-তিলক স্বচ্ছন্দ-সংগ্রহ প্রভৃতি গ্রন্থের নাম আছে। মূল গ্রন্থ-রচনার অনেক পরে সংগ্রহ-গ্রন্থ সৃষ্টি হয়। অন্ততঃ, সহস্র বৎসরের ব্যবধান স্বীকার করিতে হয়। বেদের সাধারণ-মাধ্যমীয় ভাষ্যকার মাধবাচার্য সর্ব-দর্শন-সংগ্রহের পাতঞ্জল দর্শনে তন্ত্রোক্ত দর্শনবিধ সংস্কারের উল্লেখ ও তন্ত্রশাস্ত্রের অনেক বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। ষড়-দর্শনের টীকাকার বাচস্পতি মিশ্র পাতঞ্জল দর্শনের টীকায় তন্ত্রোক্ত দেবতার ধ্যান করিবার উপদেশ দিয়াছেন। ভগবান শঙ্করাচার্যও শারীরক ভাঙ্গে তন্ত্রোক্ত ঘটক্রম উল্লেখ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, এই তিন মহা-পুরুষের মধ্যে একজনও বাঙ্গালী নহেন। শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।৩।৪৭) আছে, তন্ত্রোক্ত বিধান মতে কেশবের অর্চনা

করিবে। ব্রহ্ম পুরাণে আছে, একান্ত কাননে (ভুবনেশ্বরে) বেদোক্ত তন্ত্রোক্ত বিধানে মহাদেবের পূজা করিবে। কুর্ম পুরাণে আছে, অনেক শাস্ত্র করাল ভৈরব ও যামল প্রভৃতি বাম মার্গ অবলম্বনে রচিত। রায়ায়ণে (১২২।১২, ১৩, ১৫) বলা, অতিবলা বিজার উল্লেখ আছে। এই দুই বিজা তন্ত্রোক্ত; তন্ত্রমারে উদ্ধার প্রাণালী লিখিত হইয়াছে। বরাহ পুরাণে আছে, বেদোক্ত বা আগমোক্ত বিবিধারা জনার্দন অর্চনীয়। পদ্মপুরাণের উত্তর খণ্ডে আছে, বৈষ্ণবী দীক্ষা ব্যতীত মনুষ্য কি করিয়া ভাগবত হইবে। নারদ পঞ্চরাত্রের তৃতীয় অধ্যায়ে ঘটক্রমে চিন্তা করিতে বলা হইয়াছে, চতুর্থ অধ্যায়ে “লক্ষ্মীস্ময়া কামবীজম্” ইত্যাদি তন্ত্রোক্ত পারিভাষিক শব্দ আছে। পাতঞ্জল দর্শনে, ভগবদ্দীপায়, মহাভারতের শান্তিপর্বে (২০।১১৭, ১২) তন্ত্রোক্ত প্রাণায়ামের কথা আছে। মহাভারতের শান্তিপর্বে (২৫।৭।৮, ৯) আছে, বেদসমূহ হইতে পুনরায় সর্বতোমুখ (সর্বতোব্যাপ্ত) বেদসমূহ প্রস্তুত হইয়াছে। সেই বেদসমূহ কি? তন্ত্র সর্ব-বর্ণ সাধারণকে সমান অধিকার দিয়াছে। এইজন্য একমাত্র তন্ত্রই সর্বতোমুখ। শান্তিপর্বে (২৮।১২১-১২৪) দক্ষের প্রতি মহাদেব বলিতেছেন, “আমি সাদ্ধ বেদ ও সাংখ্য যোগ হইতে উদ্ধার করিয়া বেদাদি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, মঙ্গলময়, সর্ববর্ণ ও সর্বাশ্রমের অন্তর্কুল পাশ্চপত ব্রত উৎপাদন করিয়াছি।” এই পাশ্চপত শাস্ত্র তন্ত্রগ্রন্থ ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। শান্তিপর্বে (২৮।১৭৪) তন্ত্রের পারিভাষিক শব্দ, “ঘটি, চক্র, চেলী, মিলী-মিলী” গ্রহণ করিয়া মন্ত্রোক্তার প্রদর্শিত হইয়াছে। অল্পশাসন পর্বের মোক্ষধর্মে (৩৫।৩৬-৩৮) “পাশ্চপত ও পঞ্চরাত্রের” উল্লেখ আছে। পঞ্চরাত্র তান্ত্রিক গ্রন্থ। কেবল মহাভারত নয়, সকল পুরাণেই অল্পবিস্তর দেবী-মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। অথর্ব বেদের অন্তর্গত অনেক উপনিষদে তন্ত্রের দ্বায় উপাসনা-প্রাণালী লিখিত আছে। মনুসংহিতার টীকাকার কুঙ্কভট্ট ২।১ শ্লোকের টীকায় হারীত-বচন বলিয়া লিখিয়াছেন, “শ্রুতির্হি বিবিধা বৈদিকী তান্ত্রিকী চ।” [মেদিনীকোষে তন্ত্রশব্দের এক অর্থ শ্রুতির শাখাবিশেষ।] বুদ্ধ হারীত-সংহিতায় তান্ত্রিক দীক্ষা পদ্ধতি, উশনঃ সংহিতায় পঞ্চরাত্র ও পাশ্চপত ধর্মের স্পষ্টতঃ উল্লেখ আছে। কাতায়ন-সংহিতায়, ব্যাস-সংহিতায়, শঙ্খ-সংহিতায় ইত্যাদি সংহিতায় তন্ত্রোক্ত বিবিধ উল্লেখ আছে। সমুদয় স্মৃতি-সংহিতাতেই পুরাণের মত স্পষ্টতঃ ও ভাবতঃও তন্ত্রের উল্লেখ আছে; কিন্তু তন্ত্র স্মৃতি ও পুরাণের নামোন্মেষ্ট নাই।

এইখানে তর্করত্ন মহাশয়ের উদ্ধৃত প্রমাণ সমাপ্ত করি।

তন্ত্রের প্রাচীনতার বহুতর প্রমাণ আছে। একটা দিতেছি। ছান্দোগ্য উপনিষৎ বুদ্ধদেবের জন্মের পূর্বে

প্রণীত হইয়াছিল। কত পূর্বে তাহা আমাদের জানিবার প্রয়োজন নাই। তাহাতে তত্ত্বোক্ত ঘটকের অঙ্কুর দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক উপনিষদে প্রাণায়ামের ব্যবস্থা আছে। ইহাও সত্য, অনেক বৌদ্ধ তাত্ত্বিক ছিলেন। বৌদ্ধেরা এদেশেরই লোক। তাহারা হিন্দুর নিকট হইতে এবং হিন্দুরাও তাহাদের নিকট হইতে “রহস্য” পাইয়াছিলেন।

তত্ত্বশাস্ত্রের বহুল প্রচারের অনেক কারণ ছিল। পূর্বে কয়েকটির উল্লেখ করা গিয়াছে। মাতৃষের সৃষ্টির পর যখন সে ভয় ও ভাবনায় পড়িয়াছিল, তখন সে অসাধারণ দ্রব্য ও কর্ম দ্বারা নিরুদ্বেগ হইতে যত্নবান হইয়াছিল। এমন জাতি ছিল না, এখনও নাই, যে মনি, মন্ত্র ও ওষধির গুণে বিশ্বাস না করিত বা না করে। যথাবিহিত মন্ত্রপাঠ ও পূজা করিলে দেবতা প্রসন্ন হইয়া থাকেন, এই বিশ্বাস সকল জাতির আছে। মানব-চিত্তের স্বাভাবিক কামনা হইতে যাহার উৎপত্তি, তাহার আরম্ভকাল নির্ণয়ের চেষ্টা বাতুলতা মাত্র।

এই কথা স্মরণ রাখিয়া আর্ষ-শাস্ত্র অবলোকন করিলে দেখা যায়, ঋগ্বেদের কয়েকটি স্তোত্রে তত্ত্বযোগ্য মন্ত্র আছে। যথা—বিষঝাড়ার মন্ত্র (১।১২১), শক্রবিনাশের মন্ত্র (১০।১৬৬), সপত্নীবশীকরণের মন্ত্র (১০।১৪৪), গর্তাধান সন্তানলাভের মন্ত্র (১০।১৮০), মৃত-সঞ্জীবন মন্ত্র (১০।৫৮) ইত্যাদি। অথর্ববেদে বিদ্রক (বাতা) রোগ উপশমের নিমিত্ত বাহুতে ওষধি ধারণের বিধি আছে। এই বেদে রহবিধ আভিচারিক মন্ত্রের ও ক্রিয়ার উল্লেখ আছে। তত্ত্বশাস্ত্রে যেরূপ যন্ত্র (চিত্র) নির্মাণের বিধি আছে, সেইরূপ অথর্ববেদেও আছে। জীববশীকরণ মন্ত্রে (৩।২৫), পুরুষ-বশীকরণ মন্ত্রে (৬।১৩০) প্রতিকৃতি লিখিয়া মন্ত্র আবৃত্তি করিবার বিধি আছে। দ্যুত ক্রীড়ায় জয়ী হইবার মন্ত্রের (৭।৫০।৫) ভাঙ্কে সায়ণাচার্য্য চিত্রের উল্লেখ করিয়াছেন।

এ বিষয়ে মহীশূর রাজ্যের পণ্ডিত রুদ্রপট্টন শামশাস্ত্রী মহাশয় ইংরেজী ভাষায় সবিশেষ আলোচনা করিয়াছিলেন। কলিকাতায় “একলিপি বিস্তার পরিষদ” স্থাপিত হইয়াছিল। তাহার মুখপত্রের নাম ‘দেবনাগর’ ছিল। প্রথম বর্ষের দেবনাগরে (কল্যাণ ৫০০৯—১৯০৮ সালের) শামশাস্ত্রী মহাশয়ের ইংরেজী প্রবন্ধের হিন্দী অনুবাদ তিনটি প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়াছিল। আমি এই তিন প্রবন্ধ হইতে কিছু কিছু সঙ্কলন করিতেছি।

ভারতীয় অক্ষরমালার নাম ব্রাহ্মী। অষ্টমাতৃকার এক মাতৃকা ব্রাহ্মী। এই নাম কেন হইল? দেবনাগরী নামই বা কেন হইল?

ইহার উত্তর এই,—বর্তমানকালে যেমন প্রতীকোপাসনা হইতেছে প্রাচীন ভারতে দেবীর চিত্রিত চিহ্ন পূজিত হইত। তৎকালে দেবীকে (প্রকৃতিকে) মাতা বলা হইত, সে

দেবীর সাক্ষেতিক চিহ্ন (প্রতিকৃতি) মাতৃকা নাম পাইয়াছিল। পাণিনি সূত্রে কন্ প্রত্যয় যোগে নিষ্পন্ন রামক, লক্ষ্মণক শব্দের অর্থ রামের চিত্র, লক্ষ্মণের চিত্র। তেমনই মাতৃকা শব্দের অর্থ মাতৃচিত্র, মাতৃপ্রতিকৃতি, অল্পকোন অর্থ হইতে পারে না। পরে একই নামে দেবী ও দেবীর প্রতিকৃতি বুঝাইয়াছে। যেমন অক্ষর শব্দ। দেব দ্বারা দেবী, এবং দেবী দ্বারা দেব জ্ঞান হয়। কারণ দেব ও দেবী অভিন্ন, এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই। পরমাত্মা নপুংসক, স্ত্রী পুরুষ উভয় চিহ্নবিশিষ্ট।

তাম্রপত্রে কিম্বা বৃক্ষপত্রে প্রতীকোপাসনার পূর্বে মণ্ডল বা চক্র এবং ত্রিকোণ লিখিতে হয়। ইহার নাম যন্ত্র। এই যন্ত্রের মধ্যে দেব কিম্বা দেবীর প্রতিকৃতি লিখিতে হয়। এই দুই মিলিয়া নাম ‘দেবনাগর’ অর্থাৎ দেবের বাসস্থান চক্র। ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ তৈত্তিরীয় উপনিষদে (১।২৭) ও তৈত্তিরীয় আরণ্যকে (১।৩১) আছে; যথা—“দেবানাং নগরম্।” কতিপয় দেবনগর চিত্র দেবনাগরী অক্ষরমালায় পাওয়া যায়। তাহা হইতে সমুদয় মালার নাম দেবনাগরী হইয়াছে। যে বর্ণমালা দেবনগর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার নাম দেবনাগরী।

ঋগ্বেদের অন্তিমকালে, অথর্ববেদে ও উপনিষদে এক ঈশ্বর বা ব্রহ্ম ভিন্ন জগতে আর কিছুই নাই। অথর্ববেদে (১।৪।৩২) দেহধারী পুরুষকে (মাতৃষকে) ব্রহ্ম বলা হইয়াছে, কারণ মন্ত্রশ্রুদেহে দেবতার বাস আছে। তত্ত্বের পঞ্চতত্ত্ব মানবদেহে বিত্তমান। শামশাস্ত্রী অনুমান করেন দেবীর প্রতিমা-পূজা প্রচলিত হইবার বহুপূর্বে যন্ত্রে প্রতিকৃতির পূজা হইত। মন্ত্রশ্রুপের অনুরূপ চিত্র করিয়া দেবতার পূজা হইত। পাণিনির পূর্ব হইতে প্রতিমা নির্মাণ ও বিক্রয় হইয়া আসিতেছে। ঋগ্বেদের দেবতার রূপ ছিল, রুদ্র ও মরুৎ দেবতার বর্ণনা পড়িলেই প্রতীতি হইবে। বরুণের বর্ণনা দেখুন। ‘বহুস্থানে তনু, বপু, রূপ, সদৃশ শব্দ আছে। ঋগ্বেদে (৩।৪।৫) ‘নৃপেশস’ মন্ত্রশ্রু রূপধারী। দেবতার সাধারণ নাম “দিবোনরস”—স্বর্গের নর।

অথর্ববেদের দার্শনিক মন্ত্রে (৩।৩৫, ৯২) ‘কাম’ এক আদিবিজ কামমদন। পরবর্তী মন্ত্রে জীববশীকরণ মন্ত্র প্রয়োগে অথর্ববেদীয় কাম আর তত্ত্বশাস্ত্রের চিত্রিত যন্ত্র এক। কামের বাণ দ্বারা হৃদয় বিদ্রক করিবার কথা আছে। এই মন্ত্র উচ্চারণের পূর্বে চিত্র লিখিত হইত, ধ্বংস বাণ ইত্যাদির প্রতিকৃতি করা হইত। দ্যুতক্রীড়ায় জয়লাভের নিমিত্ত ৭।৫০ মন্ত্র আবৃত্তি ও চিত্র করা হইত (৭।৫০।৫)। যাহাকে বশ করিতে হইবে, তাহার চিত্র ও নাম লিখিয়া বশীকরণ মন্ত্র ধ্যান ও আবৃত্তি করা হইত। গোচরোচনা ও বক্ত, পরবর্তীকালে সিন্দুর ও আলতা দ্বারা চিত্র লিখিত হইত।

তন্ত্র বিষয়ে গণ্য পণ্য সূত্রময় অগণিত গ্রন্থ আছে। শিবশক্তির যুগল মূর্তির পূজাই তন্ত্রশাস্ত্রের মুখ্য বিষয়। আদিত্যে শিবলিঙ্গ পূজা প্রচলিত ছিল। কারণ তন্ত্রের প্রামাণিক গ্রন্থে লৈঙ্গিক চিহ্নদ্বারা শিবশক্তি সূচিত হইত। প্রমাণ যথা—কাদিমত, জ্ঞানার্ণব, নিত্যাবোধশিকার্নব, ইত্যাদি।

অভিচার—মারণ উচ্চাটনাদি হিংসাক্রিয়া, বেদের কাল

হইতে চলিয়া আসিতেছে। (ঋগবেদ ৭।১০৪, ১০।৮৪; ১০।১২৮, ১০।১৫৫)। এমন কি উপনিষদেও যেমন বৃহদারণ্যক উপনিষদে (৬।৪।১২ উল্লেখ আছে।

[আমার অনুমানে ঋগবেদের দশম মণ্ডল গ্রীঃ পৃঃ ৩৫০০—২৫০০.অঙ্কে এবং অথর্ববেদ গ্রীঃ পৃঃ ২৫০০—২০০০. অঙ্কে প্রণীত হইয়াছিল। ইহাদের পূর্বে মন্ত্রতন্ত্রে বিশ্বাস নিশ্চয় ছিল।]

রামের টাকা

শ্রীজগদীশ গুপ্ত

মনে হয়, চারিদিকেই পরিপূর্ণতা—

আকাশ পরিপূর্ণ নীল, তার আর চাই না; গৃহে গৃহে পরিপূর্ণতা—সেখানে আরও প্রাইবার ক্ষুধিত ক্রন্দন নাই; পথের দু'ধারে অগণিত পণ্যশালা, দ্রব্যসম্ভারে পরিপূর্ণ—আরও লইয়া রাখিবার স্থান সেখানে নাই; গাছে গাছে ফুল ফুটিয়াছে, আরও ফুটাইবার আকাঙ্ক্ষা তাদের নাই; গৃহচূড়ায় কপোতের কুঙ্কন শুনিয়া মনে হয়, ক্ষুধাহীন পরিপূর্ণতায় তাহা বিহ্বল। শিশুর মুখে পরিপূর্ণ নিঃশব্দতা, বালকের মুখে ক্রীড়াসক্তির পরিপূর্ণ আনন্দ, যুবকের মুখে পরিপূর্ণ স্মৃতি, বৃদ্ধের মুখে পরিপূর্ণ শান্তি। সহস্র সহস্র লোক চলাচল করিতেছে—পরিপূর্ণতার গর্বে তাহারা দৃষ্ট; পরিপূর্ণতার বর্তা পরস্পরকে জানাইবার ব্যগ্রতায় তাহাদের দাঁড়াইবার ধৈর্য্য নাই...

কেবল যত ক্ষুধা রামের উদরে।

রামের হাতের ভিক্ষাপাত্র দেখিয়া লোকে আতঙ্কিত হয়, তাদের মনে হয়, ইহার ভিক্ষাপাত্র এ জীবনে ভরিবার নয়—এই ত সেদিনও দিয়াছি।

কিন্তু সেদিন দিয়াও আজ আবার দিতে চায় এমন গৃহস্থও আছে। তাহাকে দেখিয়া কি কারণে এই গৃহলক্ষ্মীটির মমতা জন্মে তাহা রাম জানে না—‘মা’ বলিয়া ডাক দিয়া ছুঁয়ারে গিয়া দাঁড়াইলেই তিনি মেয়েকে ডাকিয়া বলেন : “মাধু, রামকে দে তো, মা, ছ’মুঠো চাল।”

মাধুই এক দিন জিজ্ঞাসা করিয়া রামের নামটি জানিয়া লইয়াছিল।

মাধু একখানা সরায় করিয়া চাল আনে; রামের ঝুলির ভিতর অতি সাবধানে ঢালিয়া দেয়—একটি চাল মাটিতে পড়ে না। রাম ভাবে, যেমন মা তেমনি মেয়ে—দেখ যেমন স্ত্রী, মন তেমনি কোমল—ইহারা ই স্নেহশীলা অনপূর্ণার সন্তান।

ওদিকে রামভঞ্জন আগরওয়ালার আঁড়তে গিয়া দাঁড়াইলেই তাকিয়ার উপর হইতে বাড় তুলিয়া রামভঞ্জন বলে : “সরকার

ইসকো পরস। দেও একঠো।” আরও ওদিকে গাঙ্গুলীর হোটেল; সেখানে গেলে ভাত থাকিলেই গাঙ্গুলী খাইতে দেয়। কিন্তু যে দেয় তাহারই কাছে নিত্য ঘাইতে লজ্জা করে; যে দেয় না, লক্ষ্মীর ভাণ্ডারগৃহে যে বন্দী, সে যদি দৈবাৎ দেয় এই আশাতেই দানকুঠের সম্মুখেই নিত্য হাত পাতিতে হয়—তাহাতে রামের ভিক্ষাপাত্র ভরে না। কিন্তু আজ রামের প্রাতঃরুখান সার্থক, ভিক্ষা ভালই মিলিয়াছে; মনে হইতেছে, আর চাই না—যে পরিপূর্ণতার আনন্দ চতুর্দিকে তরঙ্গে তরঙ্গে ছুটিতেছে তাহা যেন রামের অঙ্গ স্পর্শ করিয়া ছল ছল করিতে লাগিল।

রাম হঠাৎ সকাল-সকাল ঘরে কিরিতেছিল—এমন সময় সন্দের রাস্তার উপর একটা সুরহং বাড়ীতে উৎসবের কলরব শুনিয়া সে দাঁড়াইল।

যার ভাগ্য ভাল তার এমনিই হয়। নীলকণ্ঠ মজুমদারের বরাত ভাল—সোনার সঙ্গে মাটি মিশিয়াছে, অর্থাৎ জমীপুরের মাতুল-সম্পত্তি তাঁহাতেই বণ্টিয়াছে। সে সম্পত্তির পরিমাণ চের—একটা জমিদারীই। নীলকণ্ঠ নিজে অবসরপ্রাপ্ত রাজ-কর্মচারী; স্বাস্থ্যের আনন্দের উপর মাসিক তিন শত টাকা পেনসন তিনি ভোগ করেন; শহরের বৃকের উপর পাঁচটি ভাড়াটিয়া ইষ্টকালয় তাঁহারই ভাগ্যগর্ভে শির উঁচু করিয়া আছে; এক শত টাকার ডাক না দিলে সকলের ছোটটিও মাল্লুষের; অর্থাৎ নীচের, দিকে দৃষ্টিপাত করে না। নীলকণ্ঠের একটি কন্যার বিবাহ হইয়া গেছে; স্ততরাং যে শুল্কেরা বাঙালীর ভিটায় ঘুঘু ডাকিয়া আনে তার—নীলকণ্ঠের নাই। জামাই পশ্চিমের একটি কলেজের অধ্যাপক; বড় আর মেজ্জ ছেলে যথেষ্ট লেখাপড়া-শিখিয়া লাট-দপ্তরের বড় দুখানি আসনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বসিয়া আছে—শুভ হইলেই

যাইয়া বসিয়া পড়িবে। নীলকণ্ঠ বড় ছেলের বিবাহ দিয়াছেন তাঁর কথার সঙ্গে সেই বৈবাহিক মহাশয় এত বড় ডাক্তার যে, ভিজিট ছ' বৎসরে ষোলগুণ বাড়িয়াও তাঁর বিশ্রামের সময় নাই; মেজ ছেলের স্বস্তর কোন এক স্বাধীন নৃপতির রাজ্য-সচিব—সেই নৃপতি কলিকাতায় আসিলে কেলায় তোপ পড়ে। আরও স্ত্রের বিষয় ইহাই যে, নীলকণ্ঠ শোক পান নাই; তাঁতুড় হইতে আজ পর্যন্ত তাঁর সন্তানেরা ভালই আছে। তার উপর, তাঁর স্ত্রী এবং বড় ছুটি রূপে গুণে উত্তম।

ভাগ্যলক্ষ্মী মানুষকে আর কি দিতে পারে! স্ত্রের উপর সর্বব্যাপী বিশৃঙ্খল স্ত্রের কারণ সম্প্রতি ঘটয়াছে—নীলকণ্ঠের বাড়ীতে আজ প্রাতঃকাল হইতে রত্ননচৌকি বাজিতেছে—তাঁর বড় ছেলে শৈলেন্দ্রের প্রথম পুত্রের আজ শুভ অন্নপ্রাশন। কুটুম্ব আর অভ্যাগতে বাড়ী পূর্ণ হইয়া ভারি সমারোহ লাগিয়া গেছে। নীলকণ্ঠের রান্না-বাড়ী হইতে বাহির-বাড়ী অনেকটা পথ—এতটা জায়গায় লোক একেবারে তাঁসা; দেখিয়া মনে হয় না, এ বাড়ীর বাহিরে আর মানুষ আছে। এক কথায়, পৃথিবীর মর্ম্মগত মহানন্দধ্বনি যেন শত মুখে উৎসারিত হইয়া নীলকণ্ঠের গৃহের চতুঃসীমা পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়িতেছে। উৎসব জমিয়াছে বেশ, এবং খোকা স্বর্ণালঙ্কারে প্রায় আরত হইয়া গেছে।

বেলা প্রায় দুটো। নীলকণ্ঠের বাড়ীতে ভোজ আরম্ভ হইয়া গেছে; কোলাহল-বাস্ততা আর ডাকহাঁক দৌড়াদৌড়ির অন্ত নাই। প্রকাণ্ড আঙ্গিনা আর বারান্দা জুড়িয়া লোক বসিয়া গেছে—সব বড় বড় লোক; ধনে মানে নীলকণ্ঠের সমকক্ষ তাঁরা; তাঁরা সবাই সগোষ্ঠী আর সবাক্বে আসিয়াছেন।

নীলকণ্ঠ একখানা চেয়ার পাতিয়া রাখিয়া তাহাতে না বসিয়া সম্মুখেই দাঁড়াইয়া আছেন; শৈলেন্দ্র তাঁর পাশেই হাজির আছে।

পিতা পুত্র উচ্চকণ্ঠে কেবলি হাঁকিতেছেন : ঐ পাতে, ঐ পাতে...

তাঁরা আরও বলিতেছেন : দাও, ঠাকুর...

আপত্তি দেখিয়া আপ্যায়নের তেজ আরও বাড়িয়া যাইতেছে; বলিতেছেন,—নষ্ট হবে বলছেন? তা হয় হোক। দাও ঠাকুর।

গরম পোলাও ঠাণ্ডা হইয়া অকচি ধরিয়া গেলে, গরম-গরম আরও চার হাতা লইয়া তার তিন হাতাই ঠাণ্ডা করিয়া ফেলিয়া রাখিল—পেটে স্থান কম।

নীলকণ্ঠ যদি বলেন : আর, দুটো দিক?—শৈলেন্দ্র বাড়িয়া বলে : খেয়ে ফেলুন। ঠাকুর আর দুটো দাও।

কিন্তু ঠাকুর দেয় আরও চারটে। লোকে শেষে রস-গোলা প্রভৃতি মিষ্টান্ন চিবাইয়া ঢালিতে লাগিল...

দেখিয়া নীলকণ্ঠ আর শৈলেন্দ্রের আনন্দের সীমা রহিল না—ইহারই নাম লোক-খাওয়ানো। প্রাচুর্যের উল্লাসে উঁদের নাসারক্ত বিস্ফারিত হইল।

এইবার বিদায়ের পালা—নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ কস্ত রীণকুয়ুজ পান লইয়া আর শিশুটিকে আশীর্বাদ করিয়া একে একে দলে দলে প্রস্থান করিতে লাগিলেন।

যাইবার আগে সর্বাগ্রগণ্য রায় বাহাদুর নিরঞ্জনপ্রসন্ন সর্বাধিকারী নীলকণ্ঠকে কাছে ডাকিয়া বলিলেন,—ভায়া একবার ভেতরে চল।

বুঝা গেল, খোকাকে তিনি আশীর্বাদ করিবেন। ঘটিলও তাই; রায় বাহাদুর একটি 'ফুল' গিনি দিয়া খোকাকে আশীর্বাদ করিলেন এবং অধিকন্তু খোকাকে ষ্ট্রালক সম্বোধন করিয়া গৃহিণীকে তাঁহার অঙ্কে সমর্পণ করিবার নির্ধাণ প্রস্তাব করিয়া বসিলেন। তাঁহার সাহস দেখিয়া খোকা বিচলিত হইল না; কিন্তু তাঁহার স্বার্থত্যাগের প্রস্তাবে নীলকণ্ঠ প্রমুখ সকলেই প্রচুর হাস্য করিলেন।

পশ্চিম দেশীয়া ধাই লক্ষ্মীর মা প্রস্থান্তকে "খালাস" করিয়াছিল; সেই গৌরবে সে একখানি হরিদ্রারঞ্জিত বস্ত্র পরিয়া, আর কৃষ্ণবর্ণ ত্বকের উপর খানিক অন্যতরক তেল ঢালিয়া আসিয়াছে...সে কথাও কহিতেছে ঢের; রায় বাহাদুরের কথার পর সে বলিল...ই মাগো; বাবুজীর কি কথা!...বলিয়া সকলের হাসির চতুর্গুণ হাসি সে একা হাসিল।

রায় বাহাদুরের গৃহিণীও সেখানে ছিলেন। খোকার সম্মুখস্থ রৌপ্যপাত্র মামুলি রৌপ্যমুদ্রায় পূর্ণ হইয়া গেছে; কে একজন একটি স্বর্ণাঙ্গুরীয়ক দিয়াছে, তাহার আনুমানিক মূল্য পাঁচ টাকার বেশী নয়; কিন্তু গিনি পড়িল মাত্র ঐ একটি। অধিকা দেবী সেই কারণে হাফ-ঘোমটার আড়ালে গরু অলুভব করিতেছিলেন। খোকার অঙ্কশায়িনী হইতে তিনি মাথা নাড়িয়া রাজী হইলেন।

ইহাতেও সকলে লক্ষ্মীর মায়ের সঙ্গে প্রচুর হাস্য করিলেন।

নীলকণ্ঠের স্ত্রী হৈমবতী একটি ছেলেকে দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, রায় বাহাদুর খোকার একটি পছন্দসই নাম রাখুন লক্ষ্মীর মা সব কথাতেই আছে; বলিল : হাঁ বাবুজী, একটা পয়মন্ত নাম।

রায় বাহাদুরের মুখে চোখে হর্ষ বিকশিত হইল; কিন্তু গিনি দেওয়া যত সহজ, নাম রাখা তত সহজ নহে, অনেক হাতড়াইতে হয়—বলিলেন : দেখে শুনে রাখব একটা। চলো হে। বলিয়া তিনি নত হইয়া ছুটি আঙ্গুলের দ্বারা খোকার চিবুক স্পর্শ করিলেন এবং নীলকণ্ঠকে হাতের একটা ঠেলা দিয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইলেন।

লক্ষ্মীর মা বলিল : পরে রাখবেন, এখন না। বলিয়া এমন আত্মদ্রোহিত হইয়া উঠিল যেন অবলম্বনের জন্ত ঢলিয়া কাহারো গায়ে পড়িতে চায়।

নীলকণ্ঠের বহিরাগতি হইতে রাস্তায় পৌঁছিতে একটা কক্ষ অতিক্রম করিতে হয়। সেটার উপরে নীলকণ্ঠের বৈঠকখানা, নীচেটা ভূতাবর্ণের বিশ্রামকক্ষ। এই কক্ষ দিয়াই যাতায়াতের পথ। পাঁচটা সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উঠান হইতে সেই ঘরে উঠিতে হয়। রায় বাহাদুর নিরঞ্জনপ্রসন্ন সর্বাধিকারী সেই সিঁড়ির দু'ধাপ উঠিতেই অপর যে ব্যক্তি সেই সিঁড়ি দিয়াই উঠানে নামিতে উত্তত হইয়া একেবারে দরজার মুখে আসিয়া দাঁড়াইল তার চেহারার বীভৎস : হাড়ের উপর চামড়া খালি ; মুখে একমুখ দাড়ি গৌফ ; চুলগুলি আন্দাজে আর অপটু হস্তে নিজেই কাটিয়াছে বলিয়া মাথাটা বড় অপরিপাটি হইয়া উঠিয়াছে ; পরিধানে মলিন বস্ত্রখণ্ড ; কাঁধে ভিক্ষার বুলি... অশেষ জীর্ণসংস্কারের দরুন তাহা বিবিধ বর্ণের আর বিবিধ আকারের কাপড়ে কাপড়-ছাটার নমুনার মত দেখাইতেছে ; হাতে একটি বাঁশের লাঠি আছে।

এই মুঠি সম্মুখে পড়ায় রায় বাহাদুর বাধা পাইলেন... সিঁড়ির উপরেই তিনি থমকিয়া দাঁড়াইলেন।

অন্ত্রে যেমন ধার থাকে তেমনি রায় বাহাদুরের পাশেই ছিলেন নীলকণ্ঠ ; তিনি চীৎকার করিয়া প্রশ্ন করিলেন...কে রে তুই ?

রাম বলিল : আজ্ঞে, আমি রাম, ভিখারী।...বলিয়া রাম নিজের পরিচয় সসঙ্কোচে নিবেদন করিল, কিন্তু মতিভ্রম-বশতঃ রায় বাহাদুরকে পথ দিয়া সে শশব্যস্তে সরিয়া গেল না।

নাম-সম্পর্কে পিছন হইতে একটি ইষ্টুলের ছেলে বলিল : তুমি আরে রাম।

এই কথায় একটি হাতধ্বনি উঠিল...

রামের ধূর্ততায় আগুন হইয়া- নীলকণ্ঠ হাতধ্বনিকে আবৃত করিয়া বজ্রকণ্ঠে হাঁকিলেন : তেওয়ারী ?

তেওয়ারী নীলকণ্ঠের দারোয়ান ; সে পোলাও পরিবেষণের শ্রমের পর গায়ের ঘাম-মুছিয়া পৈতারা ঘাম নিংড়াইতেছিল ; আত্মান ধ্বনিত হইতেই 'হুজুর' বলিয়া সাড়া দিয়া সে ভোজ-পুরী বিক্রমে লাফাইয়া আসিয়া দাঁড়াইল। নীলকণ্ঠ তর্জনী নাড়িয়া তাহার কাছে জানিতে চাহিলেন, বেতনভুক্ এত ভৃত্য বিত্তমান থাকিতে রায় বাহাদুরের সম্মুখে এই লোক পড়ে কেন ?

কিন্তু তেওয়ারী কৈফিয়ৎ গড়িয়া তুলিবার পূর্বেই ততক্ষণে কাজ শুরু হইয়া গেছে, অর্থাৎ নীলকণ্ঠের কোচম্যান শিউসেবক আসিয়া প্রশংসনীয় তৎপরতার সহিত রামের গলদেশ চাপিয়া আর টিপিয়া ধরিয়াছে এবং রাম আর্দ্রনাদ করিয়া উঠিয়াছে।

রায় বাহাদুর এতক্ষণে কথা বলিলেন—কোচম্যানকে

রামের গলদেশ হইতে হাত তুলিয়া লইতে আদেশ করিলেন। আদেশ প্রতিপালিত হইল দেখিয়া তিনি মুগ্ধ ফিরাইয়া নীলকণ্ঠকে বলিলেন—আহা শুভ দিনে কেন হাস্যাম করছ।

ফরিয়াদি মামলা তুলিয়া লইতেছেন দেখিয়া তৎক্ষণাৎ বিবাদের নিষ্পত্তি হইয়া শান্তি স্থাপিত হইল, নীলকণ্ঠ রত্নমুক্তি সংবরণ করিলেন।

রায় বাহাদুর রামকে আরও কাছে ডাকিয়া পকেটে হাত দিলেন ; বাগ বাহির করিলেন ; ব্যাগের ভিতর হইতে একটি টাকা বাহির করিয়া তাহার হাতে দিতে গেলেন—

রাম তখন ধন্থধন্য করিয়া কঁাপিতেছিল ; কম্পিত করতল পাতিয়া সে দান গ্রহণ করিল।

রায় বাহাদুর নীলকণ্ঠকে পুনরায় বলিলেন, কিছু খাবার-টাবার দিয়ে একে বিদায় কর। আহা, আজ শুভ দিনে কি মারধোর করতে আছে।—বলিয়া তিনি এবার নির্বিঘ্নে কক্ষ অতিক্রম করিয়া রাস্তায় আর মোটরের কাছে পৌঁছিলেন।

রায় বাহাদুরের ইচ্ছামুগ্ধ ব্যবস্থাই নীলকণ্ঠ করিলেন। টাকার উপর নীলকণ্ঠের ছ'খানা লুচি রাম পাইল।

বুলির ভিতর টাকা আর লুচি লইয়া রাম যখন নীলকণ্ঠের গৃহ হইতে নিষ্কাশিত হইল তখন তাঁর-চিত্ত আনন্দে আবুল ; অশক্ত দেহে অপূর্ণ একটি শক্তি সঞ্চারিত হইয়াছে। জন-শ্রোতের দিকে পুলকিত নেত্রে চাহিতে চাহিতে রাম পথ চলিতে লাগিল...

পৃথিবী কেন আনন্দধাম, এই প্রশ্নের উত্তরটি এবং সানন্দে পথ চলিবার যে গুঢ় কারণটি লুকাইয়া রাখিয়া মানুষ এত দিন তাহাকে ঠকাইতেছিল আজ তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে ; পৃথিবীর অর্দ্রেই মানুষ আহরণ করিতে ছুটিতেছে—অপর অর্দ্রেই আহরণ করিয়া ফিরিতেছে।

কিন্তু যে যতই আহরণ করুক তাহার মতও অমূল্য সঞ্চয়ন কাহারও নহে।...রামের পা দুখানা দ্রুততর চলিতে লাগিল—এ অমূল্য আহরণ, অর্থাৎ টাকারটা, লইয়া ঘরে পৌঁছিতে পারিলেই তাহা যেন তার সত্যকার আপনার হইবে।...তার মনে পড়িতে লাগিল সেই দাতাকে—চমৎকার গৌরবর্ণ ; বয়স সাতচল্লিশ-আটচল্লিশ হইবে ; চুল পাকে নাই, কিংবা প্রচুর চুলের ভিতর সাদা ছ-এক খেঁই তার চোখে পড়ে নাই ; গৌফ ছ-একটি পাকিয়াছে ; গায়ে মূল্যবান কোট বকুবক করিতেছে ; গণ্ডরয় স্থূল, যেন গালের ভিতর গোল আর বড়পান্না কিছু রহিয়াছে ; সুপুষ্ট আত্মলগুলি দেখিতে মোলায়েম ; একটি অঙ্গুলীতে অঙ্গুরীয়ক আছে—তাহার উপর উজ্জ্বল একখানি পাথর বসানো ; পরিধানে জমাট-বোনা মিহি একখানি কৌচানো ধুতি—থাকে থাকে ভাঁজ পড়িয়া প্রহ্নে ক্রমশঃ বাড়িয়া একটি পরিমাণ-পরিপাটে কৌচাট হৃদয় দেখাইতেছে।

—দুর্গাপ্রতিমার কাণ্ডিকের কাপড় ঠিক ঐ রকমই কৌচান থাকে ; বুকে কোটের উপর সোনার মোটা চেন্ন বুলিতেছে—খানিকটা ধনুকের মত বাঁকা, খানিকটা তীরের মত সোজা হইয়া বুলিতেছে—সোজা অংশের সঙ্গে আধুলির আকারের একটি চাকতি রহিয়াছে ; মানুষটির ঠোঁট দুখানি পাতলা, লাল ; নোখ বড়—কিন্তু হাল্ধময় নয়, গভীর, সরু, গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ ; পায়ের জুতা দর্পণের মতো স্বচ্ছ ।

এই সুপুরুষটি জামার পকেটে হাত দিলেন ; ব্যাগ বাহির করিয়া ঢাকা বাহির করিলেন ; তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ঢাকাটা তাহার হাতে দিতে চাহিলেন । তাঁর হাত কাঁপিতেছিল ; পাঁচটি আঙুল জড়ো করিয়া তিনি ঢাকাটা ধরিয়াছিলেন...ঢাকাটা তিনি ছাড়িয়া দিলেন—ঢাকা তাহার হাতের উপর পড়িল—স্পর্শ ঘটিল ; স্পর্শের অপরিমেয় অমুভূতি মস্তিষ্ক হইতে পদতল পর্য্যন্ত সর্বদিকে এক নিমেষে ছড়াইয়া গেল...

ভাবিতে ভাবিতে রামের প্রাণে আনন্দ-রস উদ্বেল হইয়া উঠিল ; কিন্তু বেশীক্ষণ ভোগ করিতে পারিল না—সফল আনন্দ লুপ্ত আর সকল চিন্তাকে উদ্ভাস্ত করিয়া দিয়া হঠাৎ একটা বড় কঠিন কথা রামের মনে পড়িয়া গেল—যে দাতা তাহাকে ঢাকাটা দান করিয়াছে সে-ই আবার ঢাকাটা কাড়িয়া লইতে পশ্চাতে লোক ছুটাইয়া দেয় নাই ত ? এত বড় বস্তু দান করিয়া অকাতর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে এমন ত্যাগী মহানুভব ব্যক্তি পৃথিবীতে নাই বোধ হয় । শঙ্কায় রামের বুক টিপটিপ করিতে লাগিল ; এমন সাহস হইল না যে পিছন দিকে একবার তাকায় ।...এমনও ত অনায়াসে ঘটিতে পারে যে, হিড়হিড় করিয়া টানিয়া লইয়া চোর বলিয়া পুলিশে দিবে । বিশ্বাস নাই—এমন হয় । ত্রাসে অন্ধ হইয়া পলায়নের উদ্দেশ্যে ছুটিতে যাইয়াই রাম বাধা পাইল ; কে যেন কোন দিকে গর্জন করিয়া উঠিল : “এইও”...

সে পৌছিয়া গেছে—দয়ালু লোকটি দানের জন্ত অমৃতপুত্র হইয়া তাহাকে ফিরাইয়া লইতে কি ধরাইয়া দিতে যে বলবানু আর অত্যাচারী ভোজপুরী দারবানু পাঠাইয়া দিয়াছিলেন সে দৌড়াইয়া আসিয়া তাহার নাগাল পাইয়াছে—

কিন্তু তা নয় ; “চাপা পড়লে যে” । বলিয়া সদয় কণ্ঠে ভৎসনা করিয়া একটি বাবু তাহাকে পাশের দিকে টানিয়া লইলেন । রাম দেখিল, সম্মুখেই গরুর গাড়ী—খামিয়া আছে । গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান এবং দু-চার জন দর্শক দাঁড়াইয়া তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া হাসিতেছে...

গরুর গাড়ী চালিয়া গেল ; যাহারা দাঁড়াইয়া পড়িয়াছিল তাহারাও চলিয়া গেল ; কিন্তু তীব্র ত্রাসের বিহ্বালে আহত হইয়া ক্ষণিক মুহূর্ত্তর যে আঘাত সহ্য করিয়া রাম এইমাত্র জাগিয়া উঠিয়াছে তাহার অবসাদ তৈলিয়া সে তখনই নড়িতে পারিল না । কিন্তু শুনিতে আশ্চর্য্য, রামের বুকের এই শুষ্কতা দেখিতে দেখিতে মিলাইয়া গেল—জয়ের কোন কারণই

বিজ্ঞান নাই জানিতে পারিয়াই তাহার কণ্ঠ ঘুচিয়া ক্রান্তি দূর হইয়া প্রাণে পুনরায় স্ফুর্তি দেখা দিল । আবার রাম রওনা হইল ।

ভৃত্যশ্রেণীর একটি যুবক বাটিতে করিয়া সেরখানেক বি, আর পাতার ঠোড়ায় করিয়া সেরদেড়েক ময়দা লইয়া যাইতেছে দেখিয়া রাম তাহাকে ডাকিয়া দাঁড় করাইল—জানিতে চাহিল “যিদের কি দর আজকাল” ?

রামের দিকে চাহিয়া হাসিয়া সেই লোকটি দর জানাইবার পূর্বে জিজ্ঞাসা করিল—মণের দর না সেরের দর ?

রাম বলিল, “সেরের দরই শুনি” ।

—সাত সিকে ।

রাম বলিল, “দাম বেড়েছে” । বলিয়া চলিতে লাগিল ।

রামের আজ কিছুই অপ্রাপ্তব্য নাই—কোন ভোগ্যবস্তু হস্তগত করিবার আশা আর ছুরাশা নয় ।

ঘরখানাকে রাম এখনো বাসোপযোগী মনে করে কি না বলা যায় না, কিন্তু তাহাকে সে ভালবাসে ।

মাইলদেড়েক পথ অতিক্রম করিয়া শহর হইতে ঘরে পৌছিতে আগে তার হাঁটু ভাঙিয়া শরীর ভুগড়াইয়া পড়িত, কিন্তু বুলির ভিতর হ'খানা লুচি আর ঢাকাটা লইয়া সে আজ আপন গৃহে চলিয়াছে—দৈবদণ্ডস্পর্শে রোগমুক্তির মত কি একটা শক্তিমত্তা জাহুর খেলায় আজ তাহার পা কাঁপিল না ।

রাম গৃহে পৌছিল । ছুরারে দাঁড়াইয়া একটা নিঃশ্বাস সে ত্যাগ করিল ; তারপর দরজার শিকল নামাইয়া ঘরে ঢুকিল ; বুলিটা মেঝের মাটিতে নামাইতে যাইয়া তাহার জ্ঞান জমিল, মাটির সঙ্গে লুচি আর ঢাকার স্পর্শ ঘটান সম্ভব নয়—আর একটু আগাইয়া গিয়া রাম মাটির দেয়ালের পেরেকের সঙ্গে তাহাকে ঝুলাইয়া রাখিল ।

তারপর বসিয়া বসিয়া ঘরের চারিদিকে চাহিতে চাহিতে আপন মনেই অনেক হাসিল । ঐ ঢাকাটা যেন মন্ত্র জানে—সে আসিতেই মাটির হাঁড়িটা, সরটা, এনামেলের ফুটা বাটিটা পর্য্যন্ত যেন হাসির রঙ্গতচ্ছটা ছড়াইতেছে ।

কিছুক্ষণ এই হাসিটা উপভোগ করিয়া রাম উঠিল ; বুলিটা পাড়িয়া আনিল ; বুলিটা কোলের উপর রাখিয়া তার মুখ খুলিল ; অতি সন্তপণে তাহার ভিতর হইতে লুচি ক'খানা বাহির করিল ; এক হাতেই লগামছাখানা মেঝের পাতিয়া তাহার উপর ধীরে ধীরে লুচিগুলি নামাইয়া রাখিল—যেন রৌপ্যনির্মিত একটি পরম উপাদেয় দৃশ্য তার পরিভূত আর অপূর্ব্ব একটা আলোকে উজ্জ্বল দৃষ্টির সম্মুখে উদ্ঘাটিত হইয়া রহিল ।

রাম তখন স্তম্ভিত ; কিন্তু লুচির দিকে চাহিয়া চাহিয়া আর ঢাকার কথা ভাবিয়া ভাবিয়া তার দিনব্যাপী ক্ষুধাবোধ অন্তর্হিত হইয়া গেল । বুলির ভিতর হাত ভরিয়া ঢাকাটা

সে বাহির করিয়া আনিল—করতলে লইয়া নির্নিমেষ চক্ষে সেটির দিকে চাহিয়া রহিল : টাকার গায়ে একটা মুখাবয়ব অঙ্কিত রহিয়াছে—মাহুষের মুখ বটে, কিন্তু কোন মাহুষের মুখ তাহা সে স্বপ্নেও জানে না। উল্টাইয়া দেখিল, এদিকেও ছবি রহিয়াছে; অক্ষরগুলিকে অক্ষর বলিয়া সে চিনিতে পারিল না।

একটা লোক, ধর সে-ই, যদি এই রকম একটা টাকা তৈরি করিতে বসে তবে তাহাকে পরিশ্রম করিতে হইবে বিশ্বর—যন্ত্রপাতিও অনেক লাগে বোধ হয়—ভাবিয়া রাম বিস্মিত হইল। টাকাটা অঙ্কিত আর তর্জনীর মাঝে ধরিয়া রাম তাহাকে পরম স্নেহ আর সজ্জমের সহিত একবার কপালে ছোঁয়াইল; তারপর তাহাকে মুষ্টির ভিতর আবদ্ধ করিয়া ক্রমশঃ মুষ্টি দৃঢ়তর করিয়া তাহাকে অল্পভব করিতে লাগিল; হাত গরম হইয়া উঠিল। মুষ্টি খুলিয়া চাহিয়া দেখিল, টাকাটা রহিয়াছে; দেখিয়া নূতন করিয়া আর একবার সে অবাক হইল। পুনরায় মুঠা বাঁধিয়া তার মনে হইতে লাগিল : যদি এইবার হাত খুলিয়া দেখা যায়, একটা টাকা ছুটি হইয়াছে। রামের গা সিরসির করিয়া উঠিল। তাহা কি একে বারেই অসম্ভব। ভগবান দয়ালুর হাত দিয়া একটা টাকা দিয়াছেন—তিনিই পুনরায় দয়াপরবশ হইয়া কি একটিকে দুটি করিতে পারেন না। এমন কি ষটে না? ষটেতে পারে না, ভগবানের রাজ্যে এমন কিছু নাই। অমনি করিয়া টাকা যদি বাড়িতে থাকে। রামের চক্ষু নিমীলিত হইয়া আসিল।

চোখ খুলিয়া ধরের চারিদিকে চাহিয়া রাম হতাশ হইয়া ভাবিতে লাগিল, ধরে এমন স্থান নাই যে অনেক টাকা রাখা যায়। কিন্তু পরক্ষণেই তাহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল : টাকা হইলে সেই টাকাতেই ত ধর হইতে পারিবে, সিদ্ধুকও হইতে পারিবে। রামের মনে অতঃপর টাকার স্রোত বহিতে লাগিল।

এক সময় সে মুষ্টি খুলিয়া দেখিল, টাকা একটাই আছে, দ্বিগুণ হয় নাই, দেখিয়া তার মনে হইল, একটাই যথেষ্ট। তারপর কি মনে করিয়া সে পরম লালসার সঙ্গে জিন্সা বাহির করিয়া টাকাটার এপিঠ ওপিঠ ছবার চাটিল; তারপর তাহাকে লুচির শুপের পাশে অতিশয় যত্নের সহিত নামাইয়া রাখিল।

একটি একটি করিয়া তুলিয়া লুচি ক'খানা গণিয়া দেখিল—ছ'খানা। একখানার এক টুকরা ভাঙিয়া মুখে দিতে যাইয়াই রাম হাত নামাইল; একবার অঙ্গহীন লুচির দিকে, একবার টুকরাটির দিকে চাহিয়া সে সন্তুষ্ট হইয়া রহিল—যেন নিজের হাতে নিজের পায়ে কুঠার মারিতে গিয়াছিল, প্রলোভনের বস্তুকে পরিহার করিতে এমনি শশব্যস্তে সে উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং প্রকৃতিস্থ হইতে তার কিছু সময় লাগিল। তারপর সে লুচি ক'খানার কানা ধরিয়া বহন করিয়া চক্ষুর

অন্তরালে হাঁড়ির ভিতর রাখিয়া দিল—হাঁড়ির মুখে সরিষা চাপা দিয়া, আর টাকাটা খুব মজবুত করিয়া টাকাকে গুঁজিয়া পুনরায় সে ভিক্ষায় বাহির হইল। নূতন হাঁড়ি আর সরিষা কিনিবার পয়সা তাহার চাই।

8

আজ রামের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন—তার দিন আজ সার্থক হইতে কিছু বাকি রহিল না।

বাগডাঙ্গার শ্রীবাস সরকার পুত্রের বিবাহ দিয়া বধূ, বর এবং বহু অনুচর আর প্রচুর প্রাপ্তিসহ দেশে ফিরিতেছেন। তাঁর হিসাবরক্ষক হীরালাল ব্যতীত আর সবারই বিশ্বাস, শ্রীবাস পয়সাওয়ালা লোক; সুতরাং সেই বিশ্বাসটা যাহাতে ক্ষুন্ন না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখিয়া বৈবাহিকের টাকার তিনি বিবাহে খরচা করিয়াছেন আশাতীত।

যাহা হোক, তিনি ফিরিতেছেন এবং বৈবাহিকের ব্যবহারে খুশী হইয়াই ফিরিতেছেন। খানিকটা পথ গো-মানে আসিয়াছেন, খানিকটা পথ রেলগাড়ীতে যাইতে হইবে। তিনি হাতে “কিছু সময়” রাখিয়া গাড়ীর সময়ের বহু পূর্বেই ষ্টেশনে পৌঁছিয়া সম্মতি ধূল ট্রাঙ্কের উপর আসন গ্রহণ করিয়া বিশ্রাম করিতেছেন।

শ্রীবাসের মন সন্তুষ্ট হইয়া আছে। বড়টি স্তন্দরী এবং বৈবাহিক সংলোক, ইহা তিনি পুণঃ পুণঃ স্বীকার করিয়াছেন। আবার ইহাও সত্য যে, লোকে কশ্মিন্‌কালেও বলিতে পারিবে না, শ্রীবাস সরকার গরীবের ঘরের ‘হাভেতে’ মেয়ে আনিয়াছে, কিংবা ধনীর ঘর হইতে কুৎসিত বউ আনিয়াছে।

শ্রীবাসের এ কথায় পুরোহিত দশরথ তর্কবাগীশ, পরামাণিক যুগিষ্ঠির এবং প্রতিবেশী সৃষ্টিধর সম্বন্ধে এবং প্রবল কণ্ঠে সায় দিয়াছে—কদাচ না বলিতে পারে নাই।

সুতরাং শ্রীবাস আরও খুশী হইয়া গেছেন এবং আল্পাকার কোর্টের উপর ফরাসডাঙ্গার চাদর ফেলিয়া সকলের সঙ্গেই হাসিমুখে আলাপ করিতেছেন, আর অতি সামান্য কথাতেই হাস্যবর্ণে তাঁর বোতাম-বাঁটা ভুঁড়ি নাচিতেছে।

রাম ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া তাহারই অদূরে দাঁড়াইয়া ছিল। ভুঁড়ি-নাচানো হাসির শেষে একবার হঠাৎ মুখ ফিরাতেই রাম শ্রীবাসের চোখে পড়িল।

শ্রীবাসের মন প্রফুল্ল ছিল—বলিলেন, হুঁ, বুঝেছি। বলিয়া তিনি পকেটের ভিতর হইতে একটি চতুষ্কোণ ছ'আনি বাহির করিয়া রামের দিকে ছুড়িয়া দিলেন। কিন্তু শৃঙ্খল জিনিস লুকিয়া লওয়ার তৎপরতা রামের নাই, ছ'আনিটা তার হাত এড়াইয়া মাটিতে পড়িল। রাম শ্রীবাসের পদতলে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণত হইল; তারপর ছ'আনিটা কুড়াইয়া লইয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল।

টাকাটা টাকাকে আছে, আর তার অস্তিত্বের অল্পভূতি রামের রক্তে জীবন্ত হইয়া আছে। তার উপর এই ছ'আনি। মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতায় রামের চোখ সজল হইয়া উঠিল।

শ্রীবাসের দেওয়া ছ'আনি ভাঙাইয়া রাম হাঁড়ি আর সরা কিনিল। মনে মনে অনেক তর্কবিতর্ক তোলাপাড়া আর লোভ সংবরণের কথা চেষ্টার পর আধলার তামাক, ঐ মূল্যের টিকে এবং ঐ মূল্যের দিয়াশলাই এবং ঐ মূল্যেরই একটি কলিকা কিনিয়া রাম যখন বাড়ীর দিকে পা চালাইল তার বহু পূর্বেই তার মন যাইয়া পড়িয়াছে হাঁড়ির লুচিতে : যাইয়া দেখিতে পাইব কিনা ঠিক কি।

যথাসাধ্য দ্রুতগদে ঘরে ফিরিয়া রাম সর্বাগ্রে লক্ষ্য করিল দরজার মাথাটা—শিকল চড়ানোই আছে ; শিকল খুলিয়া ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, হাঁড়ির আবরণ ঠিক আছে এবং ঢাকনা তুলিয়া দেখিল, লুচিও আছে।

শান্তির, তৃপ্তির এবং স্বস্তির একটি গভীর নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া রাম বিশ্রাম করিতে বসিল।

রামের দিন যাইতেছে।

চাল সিদ্ধ করিবার নূতন হাঁড়ি আনা হইয়াছে ; কাজেই লুচিগুলিকে স্থানান্তর করিতে হয় নাই। তিন রাত্রি না যাইতেই পরিষ্কার সুখাঙ লুচিগুলি পরস্পরের বুকে পিঠে সংলগ্ন হইয়া একটা নিরেট পিণ্ডে পরিণত হইল ; আগে পচিয়া দুর্গন্ধময়, পরে শুকাইয়া নির্গন্ধ হইল এবং তারপর আরও শুকাইয়া ঝরিয়া ঝরিয়া গুঁড়া হইয়া গেল ; কিন্তু রাম সরা তুলিয়া আর তাহার দিকে চাহিয়া দেখিল না—আছে; তার নিজের স্বেচ্ছা-ভোগ্য হইয়া তাহা মজুত আছে, ইহাই মনে করিয়া রাম ক্ষুধার সময়ও সুখ পায়।

কিন্তু ধাতুনির্মিত মুদ্রাটির দেহ কঠিন—তাহার দেহ পচিয়া উঠিল না।

রাম প্রত্যহই নিয়মিতভাবে ভিক্ষায় বাহির হয় ; বাহির হইবার পূর্বে টাকাটা হাতে লইয়া বহুক্ষণ ধরিয়া একাগ্রচিত্তে নিরীক্ষণ করে—জিব দিয়া আর ঠোঁট দিয়া তার দুই পিঠ বারংবার চাটে ; তারপর তাহাকে আবার খুলিতে ফেলে—আনন্দে তার পা অনায়াসে চলে।

টাকা পচিয়া উঠিল না ; কিন্তু লেহনের ফলে তার দুই পিঠের ছবি আর লেখা ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল।

এমনি মহুর ক্ষয়ের রাহুগ্রাসে পড়িয়া একেবারে নিঃশেষ হইয়া যাওয়া টাকার অদৃষ্টের কথা নয়, কাজেই এক দিন বড় ছদ্মবেশ ধরিয়া গেল। যে পেরেকটার সঙ্গে খুলি টাঙ্গানো থাকিত সেই পেরেকটা খুলি খুলাইবার আর পাড়িবার টানা-

টানিতে নোনা-লাগা মাটির ভিতর কবে ঢিল হইয়া গিয়াছিল রাম তাহা ঘূর্ণাক্ষরেও টের পায় নাই।

খুলি সেদিন ভারী ছিল।

পেরেকে খুলি খুলাইয়া রাখিয়া রাত্রে রাম ঘুমাইয়াছিল ; খুলির ভারে পেরেক খুলিয়া পেরেক সমেত খুলি কখন ভূপতিত হইয়াছে তাহা জানা যায় নাই। সকালে ঘুম ভাঙিয়া চোখ মেলিতেই যে দৃশ্য রামের নজরে পড়িল খুলির ভূতলে পতন তার সবটা নয় ; খুলির কেবল ধরাপৃষ্ঠে পতনের ফলও তেমন সাংঘাতিক নয় ; কিন্তু সাংঘাতিক ব্যাপার এই যে, দেখা গেল, খুলির গা বেঁধিয়া ইঁহরের মাটি রাতারাতি পর্তাকার হইয়া উঠিয়াছে।

রামের শরীর সেদিন ভাল ছিল না। খুলির ভিতর টাকা আছে ; সেই খুলি ইঁহরের গর্ভের মুখে পড়িয়া আছে দেখিয়া আতঙ্কে উদ্বেগে রামের প্রাণ যত দ্রুতবেগে ধড়ফড় করিতে লাগিল তত দ্রুতগতিতে সে গা তুলিতে পারিল না। ধীরে ধীরে গাঢ়োখান করিয়া সে খুলির কাছে আগাইয়া গেল, খুলিটাকে টানিয়া তুলিল—ঝরঝর করিয়া অনেকগুলি চাল ইঁহরের মাটির উপরেই স্তপীকৃত হইয়া পড়িল—রাম তাহা অঞ্জলি ভরিয়া তুলিয়া তুলিয়া পাশের দিকে রাখিয়া দিল।

টাকাটা ছিল চালের নীচে। রাম তাড়াতাড়ি খুলির ভিতর হাত ভরিয়া দেখিল, টাকা নাই; ইঁহরের দাঁতের করা ছিদ্র রহিয়াছে—খুলি হাতড়াইতে যাইয়া ছিদ্রের ভিতর আঙ্গুল ঢুকিয়া আটকাইয়া গেল। খুলির ভিতরটা বাহিরে উল্টাইয়া আনিয়া রাম ছ'হাতে করিয়া সেটাকে বাতাসের উপর আছড়াইতে লাগিল ; চালের গুঁড়া তার চতুর্দিকে উড়িতে লাগিল...তার চোখে মুখে প্রবেশ করিল, কিন্তু টাকা পড়িল না।

রাম খুলি ফেলিয়া পাগলের মত ছুটিয়া বাহির হইল ; তার ভোঁতা দাঁতানা কোথায় পড়িয়া ছিল, সেই দাঁত আনিয়া দুই হাতে ইঁহরের মাটি সরাইয়া মেঝের মাটি খুঁড়িতে বসিয়া গেল।

অল্পক্ষণেই স্তম্ভের মুখ দেখা গেল ; কিন্তু স্তম্ভ কোন্ অতলে প্রবেশ করিয়াছে, দুই হাত গর্ত খুঁড়িয়াও তাহা আবিষ্কৃত হইল না।

ক্লান্তিতে শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল ; দাঁ রাখিয়া রাম অর্দ্ধনিম্নলিত নৈবেদ্য গহ্বরের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল...বিসপিত রেখায় প্রবাহিত হইয়া অসংখ্য স্থানে নিজেকে ভেদ করিয়া সেই স্তম্ভের যেখানে শেষ হইয়াছে সেই অতি দুর্গম দূরে আয়তাতীত একটা অন্ধকার স্থানে মুখিক-বাহিত টাকাটা পড়িয়া ঝকঝক করিতেছে, রাম পুনঃপুনঃ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া অবাধ ঋজু দৃষ্টিতে তাহা যেন স্পষ্ট দেখিতে লাগিল।

সুখ ও স্বস্তি

শ্রীবিজয়কেতু বসু, এম্-বি, বি-এস্‌সি

সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল এ কথা প্রায়ই বলিয়া থাকি। বোধ হয় সাধারণ গৃহস্থ বাঙালীর এই স্বস্তির চেয়ে বেশী আর কিছু আশা করিবার নাই। এখন বাংলাদেশের অবস্থা এমন যে জীবনে সুখ তো নাই-ই, স্বস্তিও মরীচিকার মত ক্রমশঃ মিলাইয়া যাইতেছে। এ দশা কেন? এ প্রশ্নের মীমাংসা করা দরকার। সুখ কি? স্বস্তিই বা কি? কেন স্বস্তি আমাদের কাম্য? শিক্ষা, দীক্ষা এবং পূর্ণাঙ্গ দেহ সত্ত্বেও কেন আমরা লক্ষ্যভ্রষ্ট? এই প্রশ্নগুলি বিচার করিবার সময় আসিয়াছে। শাস্ত্রোক্তি আছে—ভূমিব সুখং, কি অর্থে ইহা বলা হইয়াছে সে তর্ক না তুলিয়া আমরা যদি ধরিয়া লই “প্রাচুর্য্যেই সুখ” খুব বেশী ভুল করা হইবে না। কিসের প্রাচুর্য্য?—কাম্য বস্তুর প্রাচুর্য্য। প্রাচুর্য্য ও অপ্ৰাচুর্য্যের বিচার প্রয়োজনের মানদণ্ডেই হইয়া থাকে। কিন্তু কেবল পর্যাপ্ততায় মানুষ সুখী নয় কেন? কেন প্রাচুর্য্য না হইলে মানুষের মন তৃপ্ত হয় না? তাহার কারণ বাস্তবিক সুখটা প্রাচুর্য্যের মধ্যে নাই, আছে প্রয়োজনীয় বস্তুটাকে ব্যবহার করার মধ্যে। কাজেই প্রয়োজনীয় বস্তু যত সুলভ এবং প্রচুর, তাকে ইচ্ছামত অবাধে খরচ করিবার সুযোগও তত অধিক। প্রয়োজনীয় বস্তু যখন সুলভ তখন তাকে ব্যবহার করিবার সুখ হইতে বঞ্চিত থাকিতে হয়। প্রয়োজন বস্তুটা আবার এমন যে মানুষকে নিশ্চিন্ত থাকিতে দেয় না, তাড়না করে। এই অবস্থায় যদি প্রয়োজনীয় বস্তু কিছু পাওয়া যাহাতে তাড়না হইতে অব্যাহতি লাভ ঘটে, তবেই মানুষ স্বস্তি পায়। যে অবস্থায় মানুষের প্রয়োজনের তাড়না নাই অথচ প্রয়োজনীয় বস্তুকে অবাধে ব্যবহার করার সুখও নাই তাহারই নাম ‘স্বস্তি’।

এবার ‘প্রয়োজন’ কি দেখা যাউক। প্রয়োজন কি তাহা আমরা অনুভব করিয়া থাকিলেও তাহার সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিলে দোষ হইবে না। প্রয়োজনের সঙ্গে প্রাণের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। প্রাণিমাট্রই ক্রিয়াশীল, প্রাণীর জাতি হিসাবে ক্রিয়ার ধরণটা নির্ভর করে বটে, কিন্তু প্রাণ থাকিতে নিষ্ক্রিয় হইবার উপায় নাই। বৈজ্ঞানিকেরা দেখিয়াছেন এই ক্রিয়াশীলতার মূলে প্রেরণা দিতেছে প্রয়োজনের তাড়না। প্রাণীর ক্রিয়াশীলতা বজায় রাখিতে প্রতিবেশ শক্তি সরবরাহ করে। যে সমস্ত বস্তু শক্তির উৎস সেগুলির প্রতি প্রাণী প্রয়োজনের তাগিদেই আকৃষ্ট হয়। প্রয়োজন আমাদের স্বাভাবিক ক্রিয়াশীলতার প্রেরণী অর্থাৎ ইহার পরিবর্দ্ধন এবং পরিস্ফুটনের সহায়ক। মানুষের এই ক্রিয়াশীলতা একান্ত যান্ত্রিক ব্যাপার নহে বরং প্রত্যেক ক্রিয়ার মধ্যেই একটা সুখানুভূতি আছে—এ কথা প্রত্যক্ষদর্শী বৈজ্ঞানিকেরা

বলিয়াছেন। এই সুখের লোভও ক্রিয়াশীলতায় প্রেরণা দেয় অর্থাৎ প্রয়োজনের তাগিদ যেমন মানুষকে সক্রিয় করে, ক্রিয়াজনিত সুখও তেমনি মানুষকে সক্রিয় করে।

ক্রিয়াশীলতার প্ররোচক দুই রকমের উদ্দীপকের কথা বলিলাম। যখন কোন কারণ বশতঃ সুখের লোভে মানুষ সাড়া দেয় না তখন স্বস্তিই একমাত্র লক্ষ্য হয় অর্থাৎ প্রয়োজনের তাড়না হইতে নিষ্কৃতি পাইলেই আমরা নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ি। ইহা স্বাভাবিকতার লক্ষণ নয়, ব্যাধির পরিচায়ক। এই ব্যাধি দুরারোগ্য কিন্তু অধ্যবসায়ের সঙ্গে চিকিৎসা করিলেও আরোগ্য অসম্ভব এমন নয়। সুখ যখন ক্রিয়াশীলতার উদ্দীপক হয় সে অবস্থাই মানুষের পক্ষে আদর্শরূপে কাম্য। প্রত্যেক ক্রিয়াতেই সুখ আছে বলিয়াছি, এমন কি যে ক্রিয়া মানুষের বিনাশকর তাহাতেও সুখানুভব সম্ভব। অর্থাৎ উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে মানুষ যদি নিজের দেহে নিজে অস্ত্রাঘাত করে তাহা হইলেও অবস্থা বিশেষে সুখানুভব তাহার পক্ষে সম্ভব। বাস্তবিক অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিতে পারেন এমন অনেক পর্য্যটক সন্ন্যাসী আছেন যাহারা নিজ দেহে ক্ষত উৎপাদন করিয়া আনন্দ পান। এখানে অবশ্য ক্ষতটা আনন্দদায়ক নয়, ক্ষত উৎপাদনের ক্রিয়াটাই আনন্দের কারণ। ক্ষতটা আসলে কষ্টপ্রদ, কিন্তু তাহাদের কাছে ক্ষত উৎপাদনের ক্রিয়াতে যে সুখ তার আকর্ষণ ক্ষতজনিত কষ্টকেও অতিক্রম করে। উদাহরণটা চূড়ান্ত ধরণের, সাধারণ ক্ষেত্রে এতটা দেখা যায় না, তাহা ছাড়া এই সব মর্ষকামীরা মোটেই স্বাভাবিক নহেন কেননা সকল প্রকার ক্রিয়াতে ইহারা সুখ পান না কেবল এক জাতীয় ক্রিয়াতেই সুখ পান। আদর্শ অবস্থায় সকল প্রকার ক্রিয়াতেই সুখ পাওয়া সম্ভব—দানেও সুখ, গ্রহণেও সুখ, খাইতেও সুখ খাওয়াইতেও সুখ, আঘাত করিতেও সুখ, আহত হইতেও সুখ।

সুখই যদি মানুষের পূর্ণতর লক্ষ্য হয় আমরা কেন নিষ্কৃতির স্বস্তিকে আমাদের লক্ষ্য করিলাম? তাহার কারণ আমাদের কষ্টভীতি ও ক্লেব্য। প্রতিবেশের বৈচিত্র্য বশতঃ সুখের আশায় আমরা যে সমস্ত ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হই তাহাদের কোন কোনটায় অন্তর্নিহিত কষ্টের সম্ভাবনাও কিছু আছে। এখন আমরা যদি এই কষ্টের ভয়ে সুখ প্রাপ্তির চেষ্টা ছাড়িয়া দিই তবে তাহা আমাদের দুঃখভীতি। এই দুঃখভীতি অল্প-বিস্তর মানুষ মাত্রেরই আছে। যতক্ষণ তাহা সাধারণ গভীর মধ্যে থাকে ততক্ষণ তাহা স্বাভাবিক। যখন সাধারণ গভীর অতিক্রম করে তখন মানুষের স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপ বাধা পায় এবং তাহা চিন্তার কারণ। আবার যখন এই দুঃখভীতি

মাহুঘের অজ্ঞাতসারে তাহার বৃত্তি পর্যন্ত বিকল করিয়া দেয় তখন তাহার নাম ক্রৈব্য। এই অবস্থা অতি-আশঙ্কাজনক এবং ইহার পরিণাম সম্পূর্ণ বিনাশ।

যদি এই বিপদ হইতে উদ্ধার চাই তবে স্বস্তির পরিবর্তে সুখকেই লক্ষ্য করিতে হইবে। ক্রৈব্য না গেলে এ লক্ষ্য লাভ করা সম্ভব নয়। দুঃখভীতি না গেলে ক্রৈব্য যাওয়া সম্ভব নয়। দুঃখভীতি মাহুঘের জন্মগত বৃত্তি নয় ইহা সংস্কার-লব্ধ। এই বিষময় সংস্কার অভ্যাস দ্বারা অতিক্রম করা সম্ভব। এই অভ্যাস ছই ধাপে আয়ত্ত করা যায়। যে সকল প্রয়োজনীয় কাজে কষ্টের সম্ভাবনা আছে তাহা করিতে অনিচ্ছা হইলেও অনিচ্ছা চাপিয়া রাখিয়া কাজ করিতে হইবে—ইহা প্রথম সোপান। অনিচ্ছা সত্ত্বেও কাজ করিতে করিতে সেই কাজের মধ্যে সুখোপলব্ধি চেষ্টা করা—ইহা

দ্বিতীয় সোপান। এক মনে যে কোন কাজই করা যায় তাহার মধ্যে একটা আনন্দ পাওয়া যায়। এই আনন্দ চর্চার দ্বারা বাতান সম্ভব।

পরিশেষে বক্তব্য আমরা যদি নিষ্ক্রিয়তা বর্জন করিয়া যে কাজ আমাদের মঙ্গলকারক মনে করি তাহার যতটুকু সম্ভব, তাহা যত অল্পই হউক না কেন, করিয়া যাই তবে নিশ্চয় এই ক্ষয়কর অবস্থা হইতে উদ্ধার পাইব। যদি অনিচ্ছা সত্ত্বেও কাজে নামিয়া কাজের মধ্যে দুঃখের উপাদান যতটা আছে তাহাকে উপেক্ষা করি এবং সুখের উপাদান যতটা আছে তাহা শান্ত চিত্তে গ্রহণ করি, তবে নিশ্চয় অচিরেই আমরা প্রতিকূল ভাগ্যকে বশে আনিতে সমর্থ হইব। হিন্দুর গীতাও এই কথাই বলে যে, দুঃখে কষ্টে লক্ষ্যভ্রষ্ট না হইয়া, কলাফলে সমবুদ্ধি রাখিয়া কর্তব্য সম্পাদনের চেষ্টাতেই শ্রেয়োলাভ হইয়া থাকে।

প্রশান্ত মহাসাগরের আদিম অধিবাসী

শ্রীব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য



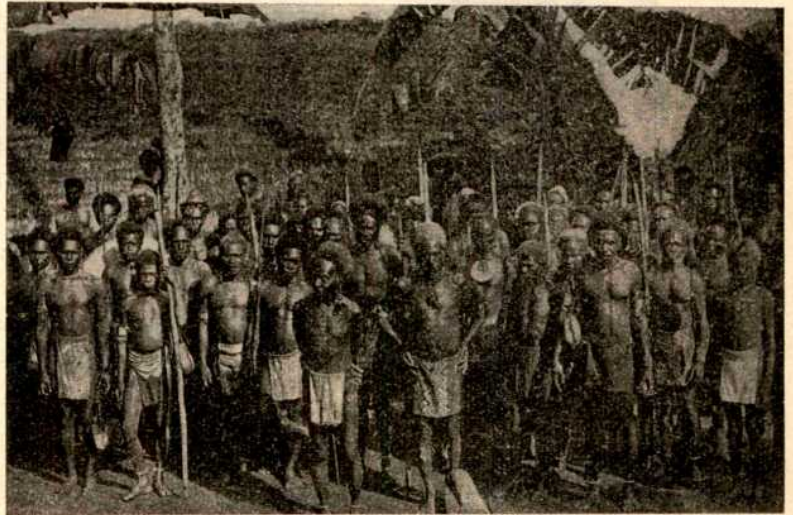
এক কোটি ত্রিশ লক্ষ বর্গ মাইল পরিধিবিশিষ্ট প্রশান্ত মহাসাগরের অগণিত দ্বীপসমূহ লইয়া সাম্রাজ্যবাদীদের কলহের অন্ত নাই। মনোরম নারিকেলবৃক্ষ পরিবেষ্টিত এই সকল দ্বীপের অমূল্য প্রাকৃতিক সম্পদ সকলেরই ঈর্ষার বস্তু। অষ্ট্রেলিয়া ছাড়া এত দিন প্রশান্ত মহাসাগরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইংলণ্ড, স্পেন, ফ্রান্স, পর্তুগাল এবং জাপানের আধিপত্য ছিল। জাপান ১৯৪৫ সালে এই অঞ্চল হইতে অপস্থত হইয়াছে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া অত্যাচারের ভাগ্যবিপর্যায়ও অসম্ভব নহে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অবশ্য ক্রমশঃই জাঁকিয়া বসিতেছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে ভাগাভাগি হইয়া গেল। সেই সাম্রাজ্যবাদী কলহ ও স্বার্থপরতার কাহিনী আমাদের বর্তমান আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নহে।

ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপীয়েরা প্রথম বিস্তৃতভাবে এই সকল দ্বীপে তথ্যাসংগ্রহ করিতে থাকে। তৎপূর্বে শত শত বৎসর আগেও সভ্যতাগর্ভিত ভারতের সঙ্গে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অনেক দ্বীপের যোগাযোগ ছিল।

কিন্তু তাহারও পূর্বে যাহারা প্রথম এই সকল দ্বীপে বাস

প্রশান্ত মহাসাগরের আবিষ্কারের কাহিনী অনুধাবন করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সর্বপ্রথম পর্তুগীজরাই ইহার বৃকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ১৫১১ খ্রীষ্টাব্দে পর্তুগীজ নাবিক এণ্টনিয়ো ডি'এল্ভ ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশ হইয়া পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে গিয়া উপস্থিত হন এবং তথায় পর্তুগীজ পতাকা উত্তোলন করেন। এই কাহিনী ইউরোপে রাষ্ট্র হইলে অজ্ঞাত ইউরোপীয় নাবিকগণও ঐ অঞ্চলে গমন করিতে আরম্ভ করেন। আমেরিকার কথা তখনও ভালভাবে সভ্যজগতের গোচরীভূত হয় নাই। ষোড়শ শতাব্দী হইতে শুরু করিয়া ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভের মধ্যেই প্রশান্ত মহাসাগরের যাবতীয় দ্বীপ



রণসাজে সজ্জিত গুয়াম দ্বীপের এক দল আদিম অধিবাসী



সান্টা ক্রুজ দ্বীপের একজন অধিবাসী। পাশ্চাত্য সভ্যতার
সংস্পর্শে আসিয়া পাইপ টানিতে শিখিয়াছে

করিত সেই আদিবাসীদের সম্বন্ধে এখন আমরা আলোচনা
করিব।

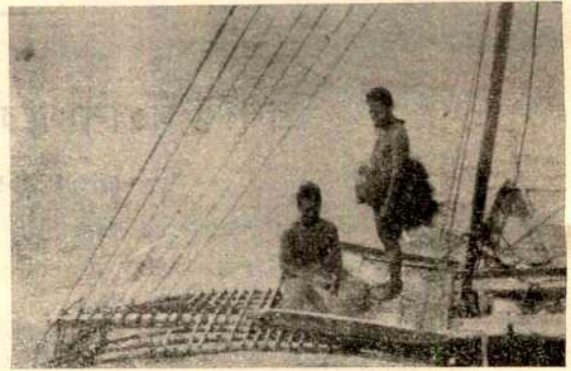
ঐ সকল আদিম অধিবাসীর বীরত্বের কাহিনী পাঠ
করিয়া আমরা বিম্বিত না হইয়া পারি না। বর্তমানে উন্নত
বৈজ্ঞানিক যুগে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নাবিকেরাও প্রশান্ত মহাসাগর
পাড়ি দিতে ইতস্ততঃ করিয়া থাকে। কিন্তু বহু সহস্র
বৎসর পূর্বে ঐ সকল অসুন্নত লোক কাঠের একখানি



আদিম অধিবাসীদের একজন সর্দার

ভেলায়াত্র সঞ্চল করিয়া প্রশান্ত মহাসাগরে হাজার হাজার
মাইল কি করিয়া যে দুরিয়া বেড়াইত তাহা ভাবিলে বিম্বিত
হইতে হয়।

যত দূর জানা যায় প্রাগৈতিহাসিক কালে কৃষ্ণবর্ণ, খর্বাকার,
মাথায় মেঘের লোমের মত কৃষ্ণিত কেশ, চেপ্টা নাক এবং
পুরু ওষ্ঠবিশিষ্ট নিগ্রোজাতির একটি শাখা আফ্রিকা হইতে
আরব, ইরান ও বেলুচিস্থানের উপকূল ধরিয়া ভারতবর্ষে
আসিয়াছিল। ইহারা প্রথম প্রথম ভারতের কোনো কোনো
অঞ্চলে উপনিবিষ্ট হয় এবং ক্রমে দ্বীপময় ভারতে ছড়াইয়া পড়ে।
ইহাদের উৎসাহ ছিল অপরিমিত, উজ্জ্বল ছিল অটুট। ক্রমে ক্রমে
ইহারা নিউ গিনিতে গিয়া হাজির হয় এবং তথা হইতে মেলো-
নেশিয়া, পলিনেশিয়া এবং মাইক্রোনেশিয়া দ্বীপপুঞ্জে গিয়া বসতি
স্থাপন করে। নৃতত্ত্ববিদেরা ইহাদিগকেই প্রশান্ত মহাসাগরের



বংশদ্বারা নির্মিত এক প্রকার নৌকা। পালের সঙ্গে
সংযোজিত রজুগুলি বিহাৎ-বাহী তারের মত
দেখাইতেছে

আদিম অধিবাসী বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। সাম্রাজ্যবাদী
শ্বেত জাতিদের ক্রপায় এই আদিম অধিবাসীরা আজ লোপ
পাইতে বসিয়াছে। অষ্ট্রেলিয়ার মত একটি মহাদেশে
শ্বেতজাতির সংখ্যার মাত্র ৭০ লক্ষ। কিন্তু পাছে কৃষ্ণজাতির
সংস্পর্শে শ্বেতসভ্যতা ধ্বংস হইয়া যায় এই ভয়ে অষ্ট্রেলিয়া হইতে
আদিম অধিবাসীদের প্রায় উচ্ছেদ সাধন করা হইয়াছে। প্রশান্ত
মহাসাগরের দ্বীপসমূহে এখনও কিছু কিছু আদিম অধিবাসী
আছে; তাহাদের কথাই আমরা বলিব।

প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপগুলিকে কতকগুলি অঞ্চলে বিভক্ত
করা হইয়াছে। আদিম অধিবাসীরা প্রধানতঃ (১) মেলো-
নেশিয়া অর্থাৎ কৃষ্ণকায় দ্বীপবাসী; (২) পলিনেশিয়া অর্থাৎ
বহুবর্ণের অধিবাসী এবং (৩) মাইক্রোনেশিয়া অর্থাৎ ক্ষুদ্র
ক্ষুদ্র দ্বীপের অধিবাসী। উপরোক্ত এক একটি অঞ্চলে বহু-
সংখ্যক দ্বীপ রহিয়াছে। তন্মধ্যে মেলানেশিয়ার উল্লেখযোগ্য
দ্বীপ হইতেছে নিউগিনি, নিউ আয়র্লণ্ড, ফিজি, সলোমন
এবং সান্টাক্রুজ; পলিনেশিয়ার—নিউজিল্যান্ড, হাওয়াই,

তাহিটী এবং মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ; আর মাইক্রোনেশিয়ার—
মেরিয়ানা, গুয়াম, মার্শাল, গিলবার্ট এবং কেরেলীন দ্বীপপুঞ্জ।
ইহা ছাড়া প্রশান্ত মহাসাগরের মালয়েশিয়া অঞ্চলে অর্থাৎ
ফিলিপাইন, যবদ্বীপ, বোর্নিয়ো—এক কথায় পূর্ব-ভারতীয়
দ্বীপপুঞ্জেও কিছু কিছু আদিম অধিবাসী আছে। সমগ্র প্রশান্ত
মহাসাগরে এখনও দশ লক্ষ আদিম অধিবাসী বাস করে।

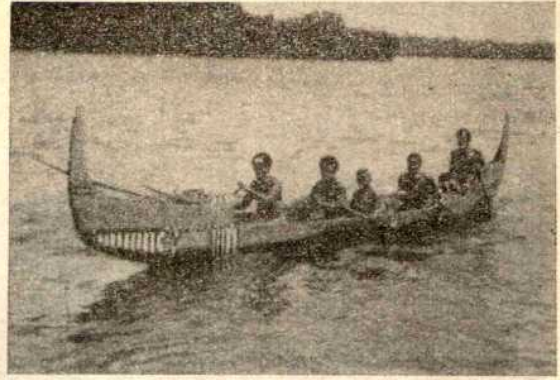
প্রথমতঃ এই সকল আদিম অধিবাসী স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া
তাহাদের নিজ নিজ অঞ্চলে বসবাস করিত। কিন্তু ক্রমে
ক্রমে তাহারা বিভিন্ন দলের মধ্যে বিবাহ প্রভৃতি সামাজিক
সম্পর্ক স্থাপন করিল। ফলে আদিম অধিবাসীদের সহজাত
কুসংস্কারগুলি অনেকটা দূর হইয়া গেল। ইউরোপীয়
শক্তিসমূহ গোড়ায় এই সকল আদিম অধিবাসীকে ‘আপদ-
বালাই’ বলিয়া ভাবিয়াছিল। কিন্তু পরে তাহারা লক্ষ্য
করিল যে, আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তুলিলে এই



মার্শাল দ্বীপপুঞ্জের আদিম জাতীয় দুইটি বালিক।

সকল আদিম অধিবাসীর দ্বারা নিজেদের স্বাধীনতার
সহায়তা হইতে পারে। আমেরিকাবাসীদের কাষা এই দিক
দিয়া খুবই প্রশংসনীয়। তাহাদেরই চেষ্টায় হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের
আদিম অধিবাসীরা আধুনিক মানদণ্ডে অনেকটা উন্নতিলাভ
করিয়াছে।

যে সকল আদিম অধিবাসী এখনও আধুনিক কৈতাদুরন্ত
হয় নাই তাহাদের আচার-ব্যবহার অনেকটা আমাদের দেশের
পাহাড়িয়া জাতিদের মত। ইহাদের মধ্যে অসংখ্য গোষ্ঠীর
পরিচয় পাওয়া যায়। প্রত্যেক গোষ্ঠীর লোকদের এক একজন
করিয়া সর্দার থাকে। এই সর্দারই হইতেছে তাহাদের রাজা,
শাসক, পুরোহিত—সব কিছু। এই সর্দারের নির্দেশই তাহা-
দের নিকট বেদবাক্য। মাঝে মাঝে বিভিন্ন দলের মধ্যে



টাহিটীর কয়েকজন আদিম অধিবাসী কাঠের তেলার

সাহায্যে হস্তের সমুদ্র লঙ্ঘন করিতেছে

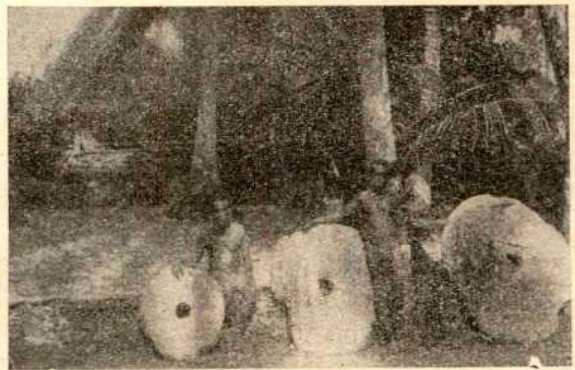
সংঘর্ষ বাধিয়া উঠে। তখন ইহা ঋণাত্মক পরিণত হয়। তীর
ধনুক, বল্লম ও বর্শা এই যুদ্ধের প্রধান অস্ত্র।

আদিম অধিবাসীরা সাধারণতঃ দ্বীপের অরণ্য অঞ্চলে
বাস করিয়া থাকে। স্বচ্ছন্দবনজাত নারিকেল, কলা এবং
নানাবিধ ফল ইহাদের প্রধান খাদ্য। পশুপক্ষী শিকার করিয়া
কাঁচা মাংসও ইহারা খাইয়া থাকে।

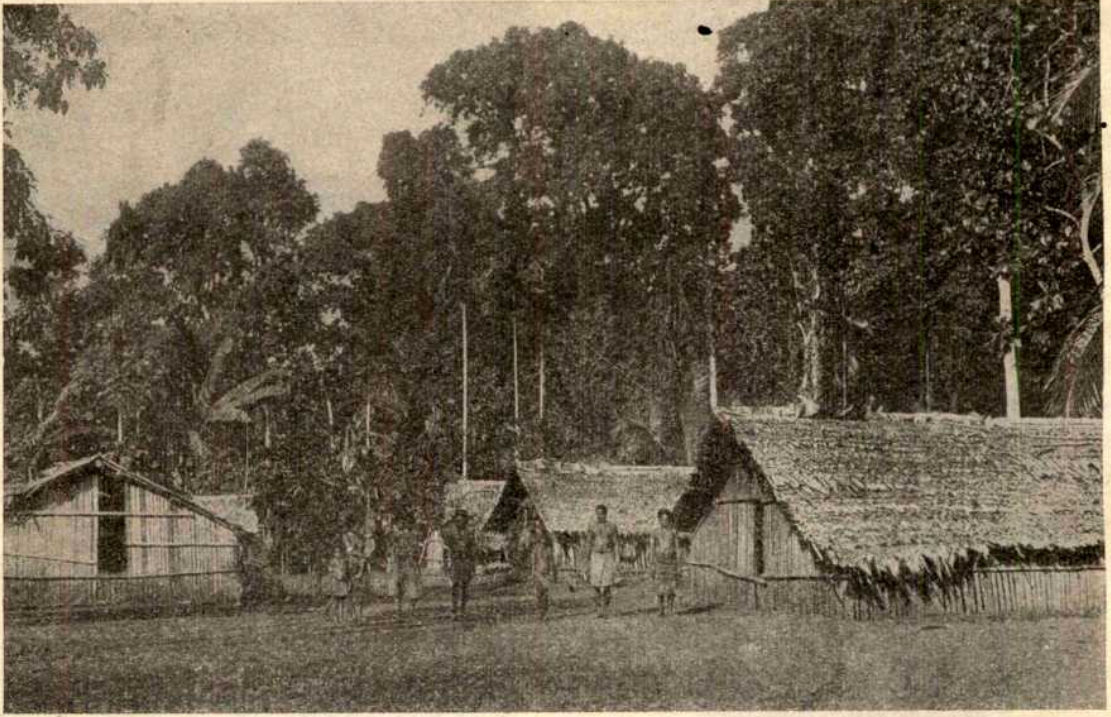
আদিম অধিবাসীরা খুবই সঙ্গীত এবং নৃত্যপ্রিয়। ইহাদের
দ্বারা প্রস্তুত বিভিন্ন ধরনের বাজ্যন্ত্র আছে।

ইহাদের বিবাহপ্রথা বিচিত্র। স্ত্রী সাধারণতঃ ইহাদের
নিকট অস্থাবর সম্পত্তির মত গণ্য হয়। কোন কোন শ্রেণীর
আদিম অধিবাসীর মধ্যে সহোদরা ভ্রাতাকে বিবাহ করিবার
রীতি প্রচলিত আছে।

আদিম অধিবাসীদের দ্বারা অসুস্থত ধর্মের কোনরূপ
সংজ্ঞা দেওয়া খুবই শূন্য। অরণ্য অঞ্চলে এবং সমুদ্রতীরে বাস
করে বলিয়া ইহারা অহরহই নানাবিধ প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য লক্ষ্য
করিয়া থাকে। ইহাদের প্রত্যেকটার মধ্যেই অপদেবতার
অস্তিত্ব কল্পনা করিয়া তাহারা ইহাদের উপাসনা করিয়া
থাকে।



প্রস্তরযুগের মধ্যে হস্তে করিয়া গুপ্তধন রাখা হইয়াছে



মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বেষ্টিত কেরোলীন দ্বীপপুঞ্জের আদিম অধিবাসীদের একটি গ্রাম

প্রশান্ত মহাসাগরের তথ্য পৃথিবীর এই আদিম অধিবাসীদের ভাষা, আচার-ব্যবহার, জীবনযাপনপ্রণালী প্রভৃতি বিষয়ক তথ্য সংগ্রহের জন্ত মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্র বর্তমানে সবিশেষ যত্নবান। এইজন্ত ইহাদিগকে টিকাইয়া রাখিবার জন্ত তাহাদের চেষ্টারও অন্ত নাই। কিন্তু এই চেষ্টা অনেকটা মৃত্যুকালে হরিণাম শ্রবণ করাইবার মত। প্রথমে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা

করিবার জন্ত যাহাদের ধ্বংস করা হইয়াছিল এখন সাম্রাজ্য রক্ষা করিবার প্রয়োজনে তাহাদের ডাক পড়িয়াছে। যাহারা একদা ছিল প্রাণশক্তিতে উচ্ছল, বহুপশুর মত তাড়িত হওয়ার ফলেই আজ তাহারা নিরুজ্জ্বল। কাজেই সাম্রাজ্যবাদীদের আহ্বানে যথোচিত সাড়া পাওয়া যাইতেছে না।

পদ্মানদীর চরে !

শ্রীপিনাকীরঞ্জন কৰ্মকার

পদ্মা নদী ঘাটের পারে ।
উঠছে চাঁদ অন্ধকারে ॥
তারই মাঝে জাগলো মনে ।
ছোট স্থিতি ফুলের বনে ॥
চাদের হাসি গাছপালাতে ।
ঝকঝকিলো জ্যোৎস্নারাতে ॥
জাগছে জোরার ঝড়ের টানে ।
অটহাসির দুর্গি গানে ॥

আবুছা জুদর তেপান্তরে ।
বাউড়ী হাওয়া নৃত্য করে ॥
চলন। রে ঐ দিগন্তরে ।
গাইছে পাখী বাসুর চরে ॥
স্বপ্নলোকের বর্ণা ধারা ।
অন্তরে দেয় পুলক সাড়া ॥

স্বরাজের সাধনা

শ্রী অনাথবন্ধু দত্ত

আমরা ইংরেজের হাতছাড়া কতকটা হইলেও এখনও পূর্ণ স্বরাজ পাই নাই। - দেশের বড় বড় নেতারা বলেন- আমরা পূর্ণ স্বরাজের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়াছি। বামপন্থী নেতাগণ বলিয়া থাকেন যে, স্বরাজ এখনও বহু দূরে—এখনও জনগণের হাতে রাষ্ট্র আসে নাই, প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। তবে ইংরেজের পরিবর্তে দেশবাসীদের হাতে যে ক্ষমতা আসিয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অবশ্য যে ভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হইয়াছে তাহাতে বহু রকমের একটা ওলটপালট হয় নাই। অর্থাৎ কোন বৃহৎ বিপ্লবের ভিতর দিয়া আমরা স্বরাজ লাভ করি নাই। ফরাসী বিপ্লবে (১৭৮৯) বা রুশ বিপ্লবে (১৯১৭) যাঁহা হইয়াছিল এদেশে তেমন কিছুই হয় নাই। এক্ষণে দুঃখ করিয়া লাভ নাই। যদি কোন ধ্বংসমূলক বিপ্লব ব্যতীতই আমরা আমাদের রাষ্ট্রিক, সামাজিক ও আর্থিক কাঠামো চালিয়া সাজিতে পারি তাহাতে ইষ্ট ছাড়া কোন অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই।

ইংরেজ কেবল আমাদের তাড়াখাইয়াই এ দেশ ছাড়িয়া গিয়াছে একরূপ আত্মপ্রসাদ অনেকের মনে জাগিলেও ইহা সম্পূর্ণ সত্য নহে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পতন বহু কারণে হইয়াছে। আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলন অবশ্য ইহার একটি হেতু। আপাত দৃষ্টিতে ব্রিটিশ ভারত ত্যাগ করিয়া গিয়াছে মনে হইলেও ইহা ধরিয়া লইলে ভুল হইবে যে ইংরেজের শাসনভার পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই পূর্বেরকার সমস্ত অমঙ্গল দূর হইয়া গিয়াছে। সোজা কথায়, ইংরেজ ভারত ছাড়িলেও এদেশে যে সকল সমস্তার সৃষ্টি করিয়াছে অথবা ইংরেজের আমলে যে সকল সমস্তার উদ্ভব হইয়াছিল সেগুলির কিছুমাত্র সমাধান হয় নাই। অর্থাৎ আমাদের উপরেই সকল সমস্তার সমাধানের ভার পড়িয়াছে। এই সঙ্কটময় মুহূর্তে যাহারা রাষ্ট্রের পরিচালক হইয়াছেন তাঁহাদের দায়িত্ব কিরূপ গুরুতর ইহা হইতেই বুঝা যাইবে। আজ কাহারও পক্ষে বিরুদ্ধ সমালোচনা করা খুবই সহজ সন্দেহ নাই, কিন্তু সমালোচনা অপেক্ষা আজ কাজের দরকারই বেশী। যেখানে বহুবিধ সমস্তা বিজ্ঞান সেখানে শুধু সমালোচনাতেই কর্তব্য শেষ করা সমীচীন নহে।

অন্যভাবে কথায় ধরা যাক। ইংরেজের ভারত-শাসনের ইতিহাস ভারতে ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য ও দুঃখের ইতিহাস। গ্রামদানী ও রপ্তানী বাণিজ্যের অঙ্ক দেখাইয়া ইংরেজ এতকাল পৃথিবীর লোককে ভারতের ঐশ্বর্য ও উন্নতির ভুল সংবাদ দিয়া আসিয়াছে। এই বিরাট দেশে কোটি কোটি অনাহারী ও অর্দ্ধাহারী নরনারীর চিরদারিদ্র্যের কথা

ইংরেজের বিবরণীতে অতি নগণ্য স্থানই অধিকার করিয়াছে। বাহিরের চাকচিক্য দ্বারা অন্তরের গভীর দুঃখ ও দারিদ্র্য এই ভাবে ঢাকিয়া রাখা হইয়াছে। ফলে যখন পঁচিশ বৎসরের মধ্যে পৃথিবীব্যাপী দুইটি মহাযুদ্ধে ভারতের রাষ্ট্রিক, সামাজিক ও আর্থিক কাঠামো ভাঙ্গিয়া পড়িল তখন ইংরেজের আর এদেশে থাকিবার উপায় রহিল না। নিতান্ত অবস্থার চাপেই তাহাকে নিজ হাতে গড়া সাম্রাজ্যের কর্তৃত্বভার পরিত্যাগ করিতে রাজী হইতে হইল। অবশ্য ইহাও ইংরেজের পক্ষে বাহ্যিক বটে। কারণ ইহাকেই ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের আত্মবিলোপ বলা যাইতে পারে। ওলন্দাজ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে এরূপ আত্মবিলোপ হইলে তাহাদের পক্ষেও ইহা গৌরবের হইত সন্দেহ নাই। যে দেশে একরূপ অনাভাব ছিল না বলা চলে, ব্রিটিশ শাসনের গুণে সে দেশে অনাভাব কয়েম হইয়াছে। যে টুকু বাকী ছিল গত মহাযুদ্ধে তাহা পূর্ণ হইয়াছে। তথাকথিত স্বাধীনতা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতকে শিক্ষাপাত্র হাতে লইয়া পৃথিবীর ঘুরিয়া বেড়াইতে হইতেছে। ‘আরও খাণ্ড উৎপাদন কর’ রব সর্বত্র উঠিলেও খাণ্ড কোথায়? ক্ষুধা বাড়িতেছে, কিন্তু খাণ্ডের বরাদ্দ কমিতেছে। বৎসরে আমাদের ৭৫ হইতে ১০০ কোটি টাকার খাণ্ড আমদানী করিতে হইবে ইহা শুনিলে আমাদের খাণ্ড-পরিস্থিতি বুঝিতে কাহারও আর কষ্ট হইবে না। এই ভবের হাটে কি চড়া দামে আমরা ক্ষুধার অন্ন ক্রয় করিতেছি সে সম্বন্ধে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে কোথাও আমরা প্রচলিত দামের তিন-চার গুণ বেশী না দিয়া খাণ্ড সংগ্রহ করিতে পারিতেছি না। আমাদের দেশের খাণ্ডসঙ্কট বিশ্ব-খাণ্ডসঙ্কটের অংশমাত্র বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ অভিমত প্রকাশ করেন। সে যাহাই হোক, উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া আমাদিগকেই এই খাণ্ড-সমস্তার সমাধান করিতে হইবে। আন্দোলন করিয়া ক্ষুধা বাড়ান যায়, কিন্তু উৎপাদন বাড়াইয়াই প্রকৃত প্রভাবে খাণ্ডসঙ্কটের সমাধান হয়। অথচ আমাদের দেশে যাহারা চিন্তাশীল তাঁহারা একমাত্র আন্দোলনকেই সমাধানের শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া মনে করেন। ফলে কথ্য বাস্তব চলে অথচ অভাব থাকিয়াই যায়—বরং বাড়ি। এইজন্যই “গ্রো মোর ফুড” আন্দোলনে যতটা অর্থ খরচ হইল তাহার বেশীর ভাগই হইল অপব্যয় এবং খাণ্ড-সমস্তার সমাধান হইল খুবই কম। আমাদের কথ্য ও কাজে সামঞ্জস্য অবশ্য আমরা খুবই কামনা করি। কিন্তু তাহা অপেক্ষাও বেশী দরকার কথা কমাইয়া কাজ বাড়ান। সাধারণতঃ যাহারা কথা বেশী বলে তাহার কাজ কম করে। একথা সকল দেশের ও সকল লোকের পক্ষেই প্রযোজ্য। আমরা এতকাল ইংরেজের কাজের

সমালোচনা করিয়াছি। কাজ, অকাজ বা কুকাজ ইংরেজ করিয়াছে বা আমাদের মধ্যকার ভাড়াটিয়া লোকদ্বারা করাইয়াছে। আমাদের এই পুরাতন অভ্যাস বেশ কিছু পাকা হইয়াছে বলিয়া আজ স্বাধীনতার দ্বারপ্রান্তে বসিয়াও বতর্টা সমালোচক হইয়াছি কর্ম্মী ততর্টা হই নাই; এবং কর্ম্মী হই নাই বলিয়াই কর্ম্মের ফলও পাইতে দেৱী হইতেছে। আজ আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত—কাজ। কথা বলিবেন, যাঁরা ষাটাইবেন মাত্র নেতৃস্থানীয় লোকেরা—যাহাদের সংখ্যা খুবই কম হওয়া প্রয়োজন। গুরু অপেক্ষা চেলার সংখ্যা বাড়িয়া গিয়া যে সমস্তার উদ্ভব হইয়াছে তাহার সমাধান করা সর্বোপায় প্রয়োজন।

তার পর বস্ত্র-সমস্যা। হিসাবমত কাপড় ব্যবহার করিতে হইবে কারণ এখানেও অপচর্য। যে দেশে বস্ত্রের উৎপাদন প্রচুর নহে সে দেশে সমস্তার সমাধান এরূপ ভাবেই করিতে হয় নতুবা বিভাবলী ব্যতীত অপরকে নগ্ন রাখিবার ব্যবস্থা ক্রমেই হইয়া বসে। আমাদের দেশে যে পরিমাণ সূতার ও কাপড়ের কল আছে তাহার সংখ্যা এবং হাতে চালিত তাঁতেরও একটা হিসাব অনেকেরই জানা আছে। সুব-গুলিতে কাজ করিলেও আমাদের অভাব মিটে না। এ ক্ষেত্রেও উৎপাদন বাড়াইতে হইবে। দেশের লোকের ক্ষুধা দূর করিলেই চলিবে না, তাহাদের বস্ত্রাভাব দূর করিতে হইবে। আমরা যদি সভ্যতাভিমুখী হই তবে আমাদের সকল 'অভাবকে' জয় করিতে হইবে। সভ্যতার অভিধান হওয়া উচিত অভাব জয়ে, কেবলমাত্র অভাব স্বজনে নহে। কিন্তু বস্ত্র-সমস্তার সমাধান সহজ নহে। বিদেশ হইতে কলকজা আনা হইতে হইলে প্রচুর রপ্তানী-বাণিজ্যের প্রয়োজন, কিন্তু বৎসরে ৭৫ হইতে ১০০ কোটি টাকা রপ্তানী আমদানী করিতে হইলে আমাদের সরুপ সম্ভলতা কোথায়। যদি এতগুলি টাকা খাজের জন্ত বিদেশে না খরচ হইত তবে ঐ অর্থ দ্বারা আমরা কলকজা আমদানী করিয়া বিরাট বস্ত্র-শিল্প ও অত্যন্ত শিল্পের পত্তন ও উন্নতি করিয়া দেশের দুঃখ দূর ও ক্রিয়াক্রান্ত সাধন করিতে পারিতাম। কাজে কাজেই খাজোৎপাদন-প্রচেষ্টা জোর চালাইয়া যাইতে হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে যত দূর সম্ভব এই অমূল্যবান মধ্য কিছু কিছু কলকজা আমদানী করিয়া শিল্পোন্নতি করিতে হইবে। অবশ্য এই সঙ্গে দেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহশিল্প—যাহা এখন পর্যন্ত বাঁচিয়া আছে, তাহারও উন্নতি করিতে হইবে এবং সেগুলি যাহাতে দেশে পুনরুজ্জীবিত হয় এরূপ কর্ম্মপন্থা গ্রহণ করিতে হইবে। সমস্যাটা খুব সহজ নহে। পাশ্চাত্য দেশে বড় বড় ধনতান্ত্রিক শিল্পের চাপে ছোট ছোট কুটীরশিল্প ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। আমরা কিরূপে আবার উত্তরকে রক্ষা করিয়া জাতীয় জীবনে উত্তরকে খাপ খাওয়াইয়া পরস্পরের সহায়করূপে দাঁড় করাইয়া রাখিব ইহা খুবই একটি জটিল প্রশ্ন। গান্ধীজীর অর্থনীতির সহিত বর্তমান জগতের

অর্থনীতির সামঞ্জস্য বিধান সহজ তো নহেই, বরং বেশ কিছু জটিল। আমাদের দেশের চিত্তাশীল জননায়কেরা মনে করেন বড় বড় শিল্পগুলিকে রাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীনে ও নিয়ন্ত্রণে রাখিয়া শোষণের হাত হইতে জনগণকে যেমন রক্ষা করিতে হইবে সেইরূপ কুটীর-শিল্পের সম্প্রসারণ দ্বারা জনগণের পারি-বারিক ও আর্থিক জীবনের পুনর্গঠন করিতে পারিলেই সমস্তার সমাধান সম্ভব। কৃষি ও শিল্পের পুনর্গঠন আজ নূতন সমাজ-জীবনের প্রধান সমস্যা। ইংরেজের সাম্রাজ্যিক শোষণের অন্তরালে যে স্বৈরাচারমূলক ব্যবস্থা বা অব্যবস্থা এত দিন ভারতের জাতীয় জীবনে প্রবল শোভে প্রবাহিত হইতেছিল আজ তাহার পরিসমাপ্তি করিয়া নূতন জীবন-গঙ্গা বহাইতে হইবে। এই মুক্ত মনাকিনীর পুণ্য সলিলে স্নান করিয়া ভারতের জনগণকে স্বাধীন ভারতের মানুষ হিসাবে নূতন ভাবে জীবনযাত্রা শুরু করিতে হইবে।

আমাদের শিক্ষা-সমস্যাও খুবই জটিল। মুক্তরাষ্ট্র, ইংলও প্রভৃতি স্বাধীন দেশে পুরাতন ধরনের শিক্ষা অচল হইয়া পড়িয়াছে এবং দিন দিন এবিষয়ে নূতন নূতন গবেষণা দ্বারা নব নব আলোকপাত করা হইতেছে। আমাদের দেশের শিক্ষা এতকাল ইংরেজের পুরাতন ও পরিত্যক্ত পদ্ধতির অন্ধ অনুকরণ মাত্র ছিল। ইহার উপর আবার ইংরেজী ভাষা শিক্ষার বাহন হওয়ার দরুন এত দিন মুষ্টিমেয় দেশবাসীর কিছু কিছু জানলাভ হইলেও দেশের কোটি কোটি নরনারী অজ্ঞানতার অন্ধকারে থাকিতে বাধ্য হইয়াছে। এই বিজাতীয় শিক্ষা সমাজে নূতন জাতিভেদের সৃষ্টি করিয়া জাতীয় জীবনকে খণ্ডিত করিয়াছে। আজ পুরাতন শিক্ষার রঙীন চশমা খুলিয়া ফেলিতে হইবে তবেই আমরা দেশের প্রকৃত স্বরূপ দেখিতে পাইব। এখন সকলেই স্বীকার করিতেছেন—দেশীয় ভাষার মাধ্যমে বাবর্তীয় শিক্ষা হওয়া প্রয়োজন। আজ সরকারী দপ্তরে দেশীয় ভাষার কদর বাড়িয়াছে। আজ বক্তৃতার ভাষা, পুস্তকের ভাষা—দেশীয় ভাষা। আজ ইহার প্রয়োজন দেশ-বাসীর এবং দেশের, ইংরেজের নহে। তাবিয়া আশ্চর্য্যবিত্ত হইতে হয় যে এই দেশের লোক হইয়াও এতদিন আমরা ইংরেজের চোখেই দেশের চেহারা দেখিয়াছি। ইংরেজের স্বার্থের মাপকাঠিতে নিজেদের প্রয়োজনের পরিমাপ করিয়াছি এবং যেখানেই খটকা বাধিয়াছে অমনি ইংরেজ-গুরুর ব্যবস্থা মানিয়া লইয়া নিজেদের মঙ্গলকে ব্যাহত করিয়াছি। আজ স্বাধীনতার দ্বারে উপনীত হইয়াও, আমাদের মধ্যে যিনি যতটা বেশী ইংরেজী শেখা তিনি নিজেকে ততটা অসহায় মনে করিতেছেন। এখনও তাই মাঝে মাঝে শোনা যায় ইংরেজী ছাড়া, ইংরেজ ছাড়া এটা ওটা কিরূপে হইবে। ইঁহার ভুলিয়া যান যে ইংরেজ চিরকাল এদেশে থাকিবে ইহা বিধাতার বিধান নহে। কাজেই এখন অতীতের মত পরের মস্তিষ্কের সাহায্যে চিন্তা

করিয়া লাভ নাই। আমেরিকার স্বাধীনতাপ্রাপ্ত নিগ্রো দাসদের যত নিজেদের অক্ষম মনে করিবারও স্ত্রোত্র যুক্তিযুক্ত কারণ নাই। কারণ নিগ্রোরা স্বৈতান্দের আনুকূল্যে স্বাধীন হইতে পারিয়াছিল আর ভারতবাসী নিজের চেষ্ঠায় এবং জগতের আর্থিক বিপর্যয়ের সুযোগেই নিজের জন্মগত অধিকার লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

স্বাস্থ্য-সমতা ও আমাদের জাতীয় জীবনের অত্যন্ত প্রধান সমতা। ইহার সমাধানের উপরে জাতীয় কর্মক্ষমতা ও ক্রমোন্নতি অনেকটা নির্ভর করে। শরীরকে গড়িয়া তোলা যেমন দরকার, মনকে গঠন করাও তেমনই আবশ্যক। শিক্ষার অভাবেই আমাদের দেশবাসী দেশের বৃহৎ স্বার্থ সম্বন্ধে সচেতন নহে। দৈনন্দিন জীবনকে আরও সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করিতেও শিক্ষার বিশেষ আবশ্যকতা আছে। শিক্ষাদ্বারা মানুষ যখন নিজেকে প্রকৃত মানুষ বলিয়া বুঝিতে পারিবে, মনুষ্যত্বের মর্যাদা ততই বৃদ্ধি পাইবে এবং তখন মানুষ স্বীয় অধিকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ত স্বেচ্ছায় হইবে। ইংরেজ কেবল সম্পত্তি হরণ করিয়া আমাদের দিগকে নিঃস্ব করে নাই। অশিক্ষা ও কুশিক্ষার দ্বারা আমাদের মানসিক ও নৈতিক শক্তিও অনেকটা বিনষ্ট করিয়া দিয়া গিয়াছে। অবশ্য ভারতের

প্রতিভা নানা অহুবিধা ও কুটিলতার মধ্যেও নিজের শাস্ত্র-সাধনা অগ্নি রাখিতে পারিয়াছিল বলিয়াই আজ সে আবার পৃথিবীর জাতিসমূহের মধ্যে স্থান লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছে। এইখানেই ভারত তাহার অমর আত্মার এবং মরণজয়ী সাধনার প্রমাণ দিয়াছে। এই সাধনার পূর্ণতা আসিবে বিরাটভাবে শিক্ষাবিস্তার দ্বারা জনগণকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায় প্রবৃত্ত করিয়া। শিক্ষাই ভাল চাষী, ভাল কারিগর, ভাল শিক্ষক, ভাল বৈজ্ঞানিক, ভাল শ্রমিক, ভাল নাবিক, ভাল বৈমানিক, ভাল চিকিৎসক এক কথায় সব কিছু উৎকৃষ্ট গড়িয়া তুলিবে। এইজন্য স্বাস্থ্য-সমতা ও শিক্ষা-সমতা অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। এবং দুইয়ের সহিত আবার জাতির কর্মক্ষমতা অচ্ছেদ্যভাবে গ্রথিত।

সরল কথায় স্বাধীন ভারতে আমরা সর্বাঙ্গীণ উন্নতি চাই। এই উন্নতি হইবে সার্বজনীন। কোন শ্রেণী বা সম্প্রদায় বিশেষের উন্নতি আমাদের কাম্য নহে। আমাদের বিশ্বাস ব্যক্তি ও সমষ্টির উন্নতি একমাত্র স্বাধীন দেশের পক্ষেই সম্ভব। এইজন্যই আমরা স্বাধীনতা চাহিয়াছিলাম। আজ এই স্বাধীনতাকে সার্থক করিতে হইলে এই নবলব্ধ শক্তিকে আর্থিক উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে লাগাইতে হইবে। ইহাকে ব্যাহত করিলে চলিবে না। কেহ কেহ বলিবেন স্বাধীনতা মুষ্টিমেয় লোকের হাতে পড়িয়াছে, ইহাকে জনগণের হাতে দিতে হইবে। এই মুষ্টিমেয় লোক জনগণের প্রকৃত প্রতিনিধি কিনা ইহাই বিবেচ্য। কোন দেশেই বিরাট জনগণ রাষ্ট্র পরিচালন করে না, তাহাদের প্রতিনিধিরা করিয়া থাকেন। যত দিন প্রতিনিধিগণ দেশের স্বার্থে রাষ্ট্র পরিচালন করেন ও জনগণের

আস্থাভাজন থাকেন তত দিনই তাহারা রাষ্ট্র পরিচালনের অধিকারী অত্যা নহে।

আমাদের দেশে কংগ্রেস-বর্তমানে কেন্দ্রে ও প্রদেশসমূহে রাষ্ট্র চালনা করিতেছেন। দেশে অত্যা দলও রহিয়াছেন কিন্তু রাষ্ট্রের উপর তাহাদের কর্তৃত্বাধিকার নাই অথচ সকলেই জনগণের প্রতিনিধি বলিয়া নিজেদের দাবি করিয়া থাকেন। গত নির্বাচনে কংগ্রেসই বিপুলসংখ্যক দেশবাসীর সমর্থন লাভ করিয়াছিলেন এবং এইজন্যই ইংরেজ নিজেদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাহাদের উপরেই ভারতের শাসনের দায়িত্ব হস্তান্তরিত করিয়াছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে ইংরেজ হাত বদল করিয়াছে কিন্তু কোন সমস্তারই সমাধান করিয়া যায় নাই। সমাধানের ভার পড়িয়াছে বর্তমান রাষ্ট্র-পরিচালকগণের উপরে। অবশ্য এই সকল সমস্তার সমাধান ইংরেজের পক্ষে সম্ভব ছিল না। স্বাধীন ভারত তাহার নিজের সমস্তার সমাধান করিবে ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তবে সমস্তার বিরাটত্বের কথা ভাবিলে ইহা সময়সাপেক্ষ স্বীকার করিতেই হইবে।

প্রথমেই বলিয়াছি সর্বাঙ্গপক্ষে উৎকট আকারে দেখা দিয়াছে অন্ন ও বস্ত্র-সমতা। অবশ্য অন্নসমতা বস্ত্রসমতা হইতেও গুরুতর। কারণ বস্ত্রের অপ্ৰাচুর্য্য হইলেও বরং ভারতের মত ঐশ্বর্য্যপ্রধান দেশে কিছুকাল খাটিয়া থাকা সম্ভব কিন্তু খাড়াভাবে মনুষ্যজাতেরই মৃত্যু নিশ্চিত। সুতরাং সমস্তার সমাধান একমাত্র উৎপাদন বৃদ্ধিতেই। এখন প্রশ্ন হইতেছে না খাওয়া, না পরিয়া, রোগে ভুগিয়া কিরূপে আমরা খাড়া-শস্ত্রের ও বস্ত্রের উৎপাদনবৃদ্ধি করিব। এই প্রশ্ন লইয়াই বর্তমানে দেশের খাড়া ও বস্ত্রোৎপাদন ক্ষেত্রে নানা শ্রেণীর মধ্যে মন কষাকষি ও সময় সময় সংঘাত চলিতেছে। এক দল বলিতেছেন খাড়া ও বস্ত্রাভাবের অত্যন্ত কারণ দেশে এখনও পুঁজিবাদী ব্যবস্থার প্রচলন। ইহার ফলেই এক দল লোক বিভ্রাটের আর অধিকাংশ গরীব। অবশ্য পুঁজিবাদী প্রথায় ছোট-বড়র তফাৎ থাকিবেই—এজন্য সমাজতান্ত্রিক নীতি দ্বারা পুঁজিপতিদের নিকট হইতে অর্থ-সম্পদ আহরণ করিয়া সমাজে সুষ্ঠুভাবে বণ্টনের ব্যবস্থা করা হয়। এক ব্যবস্থা হইতে অর্থ ব্যবস্থায় যাইতে হইলে কিছু সময়ের প্রয়োজন। হিংসা এবং বিপ্লব দ্বারাও পরিবর্তন আনা চলে, কিন্তু তাহাতে সমাজশৃঙ্খলা বিপর্য্য হইয়া এরূপ সমস্তাসমূহের উদ্ভব হয় যে তাহাতে অনেক সময়ই জাতির কর্মক্ষমতার ও গঠনমূলক কার্যের বহু অপচয় হয়। ইহাতে ধ্বংসের কার্য ব্যাপকভাবে হয়, কারণ কার্যের স্বার্থকে হঠাৎ ধ্বংস করিতে গেলে সেও বেপরোয়া হইয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং ইহাতে এরূপ এক অবস্থার সৃষ্টি হয় যে সাময়িক ভাবে গঠনমূলক কার্যের পরিবর্তে ধ্বংস-মূলক কার্যই চলিতে থাকে। রশদেশে যখন ১৯১৭ সনের বিদ্রোহের পর রাষ্ট্রনায়কগণ ভূম্যধিকারী ‘ক্লাক’-দের উচ্ছেদ করিতে চাহিয়াছিলেন তখন এরূপ এক অবস্থার উদ্ভব হইয়াছিল

এবং ইহার ফলস্বরূপ বহু গৃহপালিত পশুর বিনাশ সাধিত হইয়াছিল, শতোৎপাদনেও তখন প্রভূত ক্ষতি হইয়াছিল। এজন্য লেনিন সাময়িকভাবে এই মূল্য ব্যবস্থা রহিত করিয়া দিয়াছিলেন এবং ক্রমে ক্রমে কুল্যাকগণের সম্পত্তি ও ভূমি জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিয়াছিলেন। আমাদের রাষ্ট্রের কর্ণধার-গণও স্বীকার করিয়া লইয়াছেন যে জমিদারীপ্রথা লোপ করিয়া কৃষককে জমির মালিক করিতে হইবে। বড় বড় শিল্প জাতির কর্তৃত্বাধীন হইবে। বহুং বহুং পুঁজীদারী কারবারকে রাষ্ট্রের কল্যাণে বেশী করিয়া কর দিতে হইবে। এই সকল ও অন্যান্য সমাজ কল্যাণমূলক ও জনহিতকর পরিকল্পনা যাহাতে সহজে এবং সুষ্ঠুভাবে কার্য্যে পরিণত হয় সেজন্য দেশের নেতাগণ মালিক, শ্রমিক ও জনগণের নিকট সাহায্য ভিক্ষা করিয়াছিলেন। কারণ বর্তমান সম্বন্ধে মুহূর্ত্ত জাতির শক্তিকে অপচয় হইতে রক্ষা করিতে হইবে যাহাতে আমাদের অন্ন ও বস্ত্র সমস্তার অচিরে সমাধান হয়।

প্রায়ই শুনা যায় এখানে ওখানে ধর্ম্মঘট হইতেছে। বর্তমানে যে দুর্দ্দিন চলিতেছে এবং দ্রব্যাদির মূল্য দিন দিন যেরূপ বাড়িতেছে তাহাতে লোকের পক্ষে ধৈর্য্য হারান খুব অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু কেবল ধর্ম্মঘটই আমাদের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানের একমাত্র পন্থা নহে। আমাদের সকল রোগের ঐ একই দাঁওয়াই ঝাঁহারা ব্যবস্থা করেন তাহারা ঠিক রোগ ধরিতে পারেন নাই, সুতরাং স্ত্রীচিকিৎসকের গৌরবের অধিকারী নহেন। ধরুন কৃষকেরা রীতিমত অন্নবস্ত্র পাইতেছে না বলিয়া যদি চাষের সময় ধর্ম্মঘট করে তাহা হইলে কি অন্ন বস্ত্র বাড়িবে না তাহাদের ভাগে বেশী পড়িবে। এইরূপ ধর্ম্মঘটের ফল হইবে খাভোৎপাদনে বাধা অর্থাৎ খাদ্য-হ্রাস। ফল আরও অস্বাভাবিক। বস্ত্রোৎপাদনকারী ও অন্যান্য উৎপাদনকারীর পক্ষেও ঐ একই কথা। ঐ উৎপাদনবৃদ্ধি বন্ধ করিয়া নিজেদের ভাগ বাড়াইব—ইহার মধ্যে যেটুকু যুক্তি আছে তাহা এই যে, পুঁজীদারের ভাগ কমাইব—অন্য যুক্তি নাই। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত উৎপাদন ব্যাহত হইলে সকলেরই ভাগে কম পড়িবে ইহা নিশ্চিত। উৎপাদন কমাইয়া সকলের ভাগ বাড়াইব ইহা কোন যুক্তির কথা নয়, রাগের কথা। তবে ঐ কথা ঠিক যেখানে শ্রমিক দুর্দ্দশাগ্রস্ত এবং অন্নবস্ত্রহীন সেখানে উৎপাদন সুষ্ঠুভাবে হইতে পারে না। উৎপাদনবৃদ্ধি সমাজের মঙ্গলের জন্য, বিশেষভাবে কোন শ্রেণীবিশেষের সমাজবিরোধী অতিরিক্ত স্বার্থের জন্য নহে। পুঁজিপতিদের

দেখা উচিত—যত দূর সম্ভব শ্রমিককেও সুস্থ সবল সুখী রাখা আর এই কার্য্যে অবহেলা করিলে রাষ্ট্রের কর্তব্য তাহার বিহিত করা। এজন্য বর্তমানে শ্রমিক-মালিকে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইলে আইনের সাহায্যে সরকার নিরপেক্ষ বিচারক দ্বারা উহার মীমাংসা করিয়া দেন এবং ধর্ম্মঘট এড়াইবার ব্যবস্থা করেন। নিরপেক্ষ বিচারকের নির্দেশমত যাহাতে বিরোধের মীমাংসা হয় এবং উভয় পক্ষ তদনুযায়ী কার্য্য করে সরকারের তাহাও দেখা প্রয়োজন।

বর্তমান সম্বন্ধে জনক অবস্থায় শ্রমিকগণকে দেশের ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া কোনরূপে উৎপাদন ব্যাহত করা উচিত নহে। শ্রমিকগণেরও দেশের মঙ্গলের দিকে চাহিয়া যত দূর সম্ভব শ্রমিকগণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির চেষ্টা করা উচিত। কারণ পরস্পরের সহযোগিতার উপরেই দেশের আর্থিক মঙ্গল নির্ভর করিবে। ভবিষ্যতে আমাদের সমাজে শ্রমিকশ্রেণী যদি আদৌ থাকে তবে দেশ ও দেশবাসীর সেবকরূপেই থাকিবে, দেশের স্বার্থকে ব্যাহত করিয়া বা দেশবাসীকে পীড়ন করিয়া কোন শ্রমিকশ্রেণীই সমাজে থাকিতে পারিবে না। সমাজতন্ত্রের গতি অব্যাহত ভাবে সমাজ ও রাষ্ট্রে চলিয়াছে; ইহাকে ধীরে ধীরে পথ ছাড়িয়া দিতে হইবে নতুবা প্রবল বিপ্লবের ভিতর দিয়া ইহা পথ করিয়া লইবে, কেহ ইহাকে রোধ করিতে পারিবে না।

এইজন্যই এখন রাষ্ট্রপরিচালক, এবং শ্রমিক-নেতাদের দায়িত্ব খুবই বেশী। ক্ষুধা দূর করিতে যাইয়া আহার্য্য নষ্ট করা চলিবে না, বস্ত্রাভাব দূর করিতে গিয়া কারখানার কাজ বন্ধ করিলে চলিবে না এবং উৎপাদনের ক্ষেত্রসমূহে কাজ প্রাণপণ চেষ্টায় চালু রাখিতে হইবে আর এই ব্যাপারে দেশের জনগণকে সহৃদয়তার ও দৃঢ়তার সহিত সাহায্য করিতে হইবে। কেবল হজুগে মাতিয়া সভ্য বাহবা লইলে চলিবে না। রুশদেশ একনায়কত্বের অধীনে কঠোরতার চরম পরীক্ষা দিয়া মহাহুঃখের মধ্যেই তাহার লক্ষ্যে পৌঁছিয়াছিল—আমাদের দেশের পন্থা বিভিন্ন হইলেও লক্ষ্য এক। এই মহৎ কার্য্যে দেশের ও দেশবাসীর সর্ব্বশক্তি নিয়োগের প্রয়োজন। বাহিরের শত্রু ও ভিতরের জড়তা কাটাইয়া উঠিবার একমাত্র উপায় অবিচলিত ভাবে নিজ নিজ কাজ করিয়া যাওয়া। দেশের সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই আমরা যে স্বাধার কড়াগণ্ডা বুদ্ধিয়া পাইতে থাকিব, কারণ আমরা এরূপ স্বাধীন রাষ্ট্রের অংশীদার যেখানে, শোষণ-বর্জিত শাসন কায়েম করাই আদর্শ।

অজ্ঞ—আগামী কাল

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

১৫

এগিয়ে গেলে ফেরা যায় না...। নদীর স্রোত সামনে চলে—
দিন চলে যায় সামনে—আর সব ঘটনার গতিও সোজা।
মানুষের বয়স—শৈশব থেকে কৈশোর—কৈশোরের পেরিয়ে
যৌবন—তার পর বার্দ্ধক্য—সেও সময়ের স্রোতে সামনে
চলছে ভেসে।...পরিবর্তন আসে দেহে—পরিবর্তিত হয় মন।
উনিশ-শো বিয়াল্লিশ আর উনিশ-শো ছ'চল্লিশ এক নয়।
সেদিনকার ক্রীপস দৌত্য নিয়ে ভারতে এসেছিলেন—ব্যর্থ হয়ে
ফিরে গিয়েছিলেন। স-চার্লিল টোরিগোজী আজ ক্ষমতার
শিখর থেকে নেমে পড়েছেন—শ্রমিক গবর্ণমেন্ট সেখানে
সমাসীন। আজও ক্রীপস এসেছেন দৌত্য নিয়ে—তবু উনিশ-
শো বিয়াল্লিশের পটভূমিকায়...কতকগুলি সীমাবদ্ধ ক্ষমতা
প্রদানের সর্ব নিয়ে যিনি এসেছিলেন—সে ব্যক্তির সঙ্গে এ
ব্যক্তির অনেকখানি তফাৎ। 'ভারত ছাড়' এই শ্লোগানের
অন্তর্নিহিত শক্তি উনিশ-শো বিয়াল্লিশে গণ-অভ্যুত্থানে আগষ্ট-
বিপ্লবের মধ্যে সার্থকতার পথ খুঁজেছিল। নেতাহীন সে
বিপ্লব বন্ধুকের গুলিতে বায়ুযান-বাহিত মেসিনগানের মৃত্যু-
বীজ বর্ষণে গ্রাম ধ্বংসের লীলায়—পাইকারী জরিমানার আওতে
কোথায় মিলিয়ে গিয়েছিল। বড় উঠলে সমুদ্রের রক্ত ঢেউ—
কূলে এসে সগর্জনে আছড়ে পড়ে—আবার ফিরে যায় সমুদ্রের
গর্ভে। ফিরে যায় বলেই কি সে লুপ্ত হয়ে যায়? তবু...এই
'পরিবেশে যুদ্ধোত্তর শোণিত-ক্ষরিত অবসন্ন পৃথিবীতে স্বস্তি-
বাচনের প্রয়াস দেখা যাচ্ছে। যাদের মুঠি আলগা হয়ে
পড়েছে—তাদের থেকে যা কিছু পার ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাও—
যুদ্ধকৃত হাতসর্ব্বস্ব রাষ্ট্রগুলির দিকে। যারা পরাধীন তাদের
শোনাও শান্তির ললিতবাণী। যুদ্ধ ভাল নয়—যুদ্ধ রাষ্ট্রকে
করে ধ্বংস, মানুষকে করে নীতিহীন—শক্তিহীন। বিশ্ব-
মৈত্রীর বাণী নিয়েই এসেছেন মন্ত্রী-মিশন—এশিয়ার পুণ্য-ক্ষেত্রে
মানব-মহিমার জয়গান বোষিত হচ্ছে। আজিকার পট-
ভূমিকায় যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনার মধ্যে নিজ নিজ নিরাপত্তার
ব্যবস্থা না করে নিলে পরমাণু-শক্তি তোমাকে ক্ষমা করবে
না। কালের স্রোত সামনে বয়ে চলেছে। ফ্যাসিবাদের
অবসানে—ডিমক্রেসির কাঁধে কাঁধ মেলাতে এত দ্বিধা, এত
সন্দেহ কেন! সুপারিশ না হলে যেমন চাকরি মেলে না—
তেমন মুখ ফেরালে মিলবে না স্বাধীনতা। পিছনে তাকিও
না—হাত বাড়িও না—সামনে যা পাচ্ছ তাই নাও ছুঁহাত
ভরে। অঞ্জলি ক্ষিৎবা মুঠিতে ভরে—বিনা রক্তপাতে—বিনা
বিপ্লবে আরাম-কেদারায় শুয়ে চুরুট টানতে টানতে যদি পেয়ে
যাও এ জিনিষ—পৃথিবীর ইতিহাসে—সে কি অভিনব বলে
সোনার অক্ষরে কোদা থাকবে না?

এই পর্যন্ত লিখে প্রশান্ত থামলে। ও লেখা মিটিঙে পড়া
চলবে না। রঙ্গমঞ্চে পটপরিবর্তন শুরু হয়েছে। তাই ব'লে
হৃদয়-গলার সততা নিয়ে গদগদ রক্তজ্ঞতা প্রকাশ চলবে না।
এত দর কমান্বির পেছনে বণিক-মনোহতির খেলা—কি স্পষ্ট
হয়ে ওঠে নি? নতুন পরিস্থিতিতে সাম্রাজ্যবাদ ভিত্তি দৃঢ়
করতে চাইছে—চতুঃস্বাধীনতাকে আপাতত ভাষায় কীর্তন
করতে ক্ষতি কি।

বাইরে গোলমাল হচ্ছে—কারা যেন আন্দোলন করছে।
কলকাতা শহরটাই কোলাহলে ভরা।

ছপ্পাপ করে সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেল। চাকর,
অতীন আরও অনেকে আসছে বুঝি। লেখাটা সে তাড়াতাড়ি
জামার পকেটে পুরলো।

ওরা বারান্দায় এল—বরে ঢুকল না।

বিস্মিত প্রশান্ত প্রশ্ন করলে, কে?

বাইরে আত্মন!—বাইরে আত্মন! চার-পাঁচটি কণ্ঠস্বর
একসঙ্গে ধ্বনিত হ'ল।

এদের কাউকে প্রশান্ত চেনে না। তবে এরা যে শুভার
মুহুর্ত-গোত্রীয় নয়—এটা বুঝা গেল এদের উত্তেজিত হাবভাবে।
এরা চায় কি?

আপনার নাম কি? আপনি মেয়েটির কে হন? এক
সঙ্গে চার-পাঁচটি স্বর।

প্রশান্ত বললে, একে একে জিজ্ঞাসা করুন...কিন্তু
আপনারা কে আগে তাই বলুন।

আমাদের পরিচয় পেলে খুব খুসি হবে না-যাহ। আর
পরিচয় দিলেও চিনতে পারবে না।

ভদ্রলোকের পাড়ায় বসে খুব মজা মারছে তো। ভাবছ
আইন বাঁচিয়ে চালাকি করে ফুটি করছি যখন কার কি বলবার
আছে।

প্রশান্ত অল্পমানে বুঝলে—ওরা শুভাদের প্রতি প্রসন্ন নয়।
কথাগুলিও ওদের ভদ্রতার সীমা ছাড়িয়েছে। মনে ঘৃণা
জাগল—ক্রোধ হ'ল—কিন্তু এসব প্রকাশের ক্ষেত্র এ নয় ভেবে
সে দৃঢ়স্বরে বলল, পঁরের বাড়ি চড়াও হবার ক্ষমতা কে দিলে
আপনাদের?

যেন ভীমরুলের চাকে ধোঁচা পড়ল। সবাই একসঙ্গে
কোলাহল করে উঠলে, ইস্—আবার রোয়াব দেখ—এ্যাইসা
রদ্দা লাগাব গালপাটী খসিয়ে দেব। 'পাড়ার মধ্যে বেলেলা-
গিরি—এটা কি সোনাগাছি পেয়েছ যাহ।

নিরুদ্ধ ক্রোধে ফুলতে লাগল প্রশান্ত—কোন উত্তর দিলে
না।

ওরই মধ্যে বয়সে প্রবীণ গোছের একজন ভিড় ঠেলে

এগিয়ে এসে বললে, মিতির মশাই আপনাকে ডাকছেন, আসুন।

প্রশান্ত বললে, কিন্তু এ ভাবে অভদ্র গালাগালি করছেন কেন এঁরা।

সবাই হুমকি দিয়ে উঠতেই প্রবীন লোকটি হাত উঠিয়ে একটা ধমক দিলে, এই—চূপ চূপ। একটা কথা কয়েছ কি—যাও নেমে যাও সিঁড়ি দিয়ে—যাও বলছি।

জলের স্রোতের মত ছড় ছড় করে সবাই নেমে গেল। নেমে তারা সঙ্কীর্ণ উঠোনে দাঁড়িয়ে কোলাহল করতে লাগল। প্রবীণ লোকটি বললে, আসুন আমার সঙ্গে।

প্রশান্ত বললে, আপনার মিতির মশাইকে আমি জানি না—

জানেন না। অত্যন্ত বিস্ময়ে সে মিনিটখানেক চোখ কপালে তুলে রইল—তারপর একটু হেসে বললে, এ পাড়ার বলতে গেলে উনিই মাথা। পুলিশে কাজ করতেন—এক একটা জেলা চড়িয়ে এসেছেন। ঠুঁর প্রতাপে বাঘে গরুতে একঘাটে জল খেয়েছে। এখনই না হয় রিটারার করেছেন—তবু পুলিশ কমিশনার...

প্রশান্ত অধৈর্য্যাক্ষে বললে, কিন্তু আমি ঠুঁকে চিনি না—উনিও আমার চেনেন না...

বিলম্বণ। তোমরা ঠুঁকে না চিনতে পার—কিন্তু ঠুঁর চোখ এড়িয়ে কাকে পক্ষীতে কিছু করতে পারে না—তা মানুষ তো মানুষ। আসুন আসুন।

প্রশান্তর দ্বারা দেখা গেল না। ঘরের মধ্যে গিয়ে বসলে সে। বললে, আমায় বোধ হয় আপনি ভুল করছেন—এ বাড়ি আমি ভাড়া নিই নি—ঠুঁর প্রতিবেশীও নই আমি। আমাকে উনি ডাকতেই পারেন না।

এই কথায় লোকটির ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটল। দাঁত মুখ খিঁচিয়ে চীৎকার করে উঠল সে, বটে—ইয়ারকি পেয়েছ। বাড়ি যদি তোমার নয় তো কি সুবাদে এখানে আস বলতে পার বাপু? মজা লুটতে বুঝি?

ঠুঁর চীৎকারে নীচের লোকগুলি কলরব করে উঠল, কি হ'ল মেজদা—আমরা যাব কি?

মেজদা গলা বাড়িয়ে বলল, না। প্রশান্তর পানে ফিরে বললে, সোজা আঙুলে খি ওঠে না জানি। তার ব্যবস্থাও করা আছে। বলি যাবে কি যাবে না?

প্রশান্ত কোন উত্তর দিলে না।

মেজদা গলা বাড়িয়ে বললেন—ওহে কালীপদ—রায় সাহেবকে বল যে বাবু যাবেন না। তিনি যেন এর ব্যবস্থা করেন। আর শোন—পুলিস না আসা পর্যন্ত তোমরা পাহারা দাও—কিছু যেন সরাতে না পারে।

প্রশান্ত বিদ্যুৎবেগে সোজা হয়ে দাঁড়াল। বললে—বাড়ি সার্চ করাবেন মানে?

মানে—রায় সাহেবের পেছন দিকেও ছুটো চোখ আছে। ঠুঁর নাকের দু'ওপর বসে তোমরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করার মতলব আঁটবে—সেটি বড় সোজা কথা নয়। ঠুঁর নিজের একটা দায়িত্ব নেই?

প্রশান্ত বললে, আমি যদি ঠুঁর সঙ্গে যাই তা হলেও বাড়ী সার্চ হবে?

লোকটি আড়চোখে প্রশান্তর পানে চেয়ে মনে মনে হাসলে। হাঁ ঠিক জায়গাতেই পড়েছে আঘাতটা। সে অত্যন্ত উদাসীন ভাবে বলল—বাড়ী সার্চ করা-না-করা রায় সাহেবের ইচ্ছা। তোমার ইচ্ছা না হয় যেও না।

এ বাড়ীর মালিক না আসা পর্যন্ত আমি কোথাও যেতে পারি না—আপনি সার্চ ওয়ারেন্ট নিয়েই আসবেন।

লোকটি এই কথায় দমে গেল—কিন্তু মুখে বলল—আচ্ছা যাহু—তুঁদের মুখে বাঁক কতক্ষণ সোজা না হয় দেখা যাক।

ওঘরের জানালাটার টুক টুক করে শব্দ হতেই লোকটি বললে—গ্যাট হয়ে বসে থেক না যাহু—মেয়েরা ডাকছে তোমাকে।

প্রশান্ত উঠে গেল। শুভার মা উদ্বেগে আকুল হয়ে উঠেছেন—ওকে দেখেই কেঁদে ফেললেন, তাই ত বাবা—কি হবে।

ভয় নেই, কিছুই হবে না। প্রশান্ত ঠুঁকে আশ্বাস দিলে।

না বাবা—তুমি এঁদের জান না। আমাদের অবস্থা খারাপ হওয়া ইস্তক ঠুঁরা কম গভগোল করছেন না। এখন তো বাড়ীতে টিল পড়া বন্ধ হয়ে গেছে তবু।

বলেন কি—এরা আপনাদের প্রতিবেশী।

শুভার মা বললেন—প্রতিবেশীদের মত বন্ধুও নেই—শত্রুও নেই।

ও মশাই—বলি জমে গেলেন নাকি? মেজদার কঁকশ কণ্ঠ শোনা গেল।

শুনছ তো বাবা—আমাদের পুরুষ অভিভাবক কেউ নেই বলে—ওরা যা খুসি তাই অপমান করে। শহরের লোক-গুলো—

প্রশান্ত বললে—দোষ শহরের লোক বলে নয়, এক শ্রেণীর লোক আছে যারা এই ধরনের।

শুভার গলা শোনা গেল—কি চান আপনারা? কাকে চান? বিনা অহুমতিতে বাড়ী চুকেছেন, আইন জানেন না?

ভীড় মনে হ'ল—উঠোন থেকে পথের দিকে সরে গেল। সেই সঙ্গে শাসানিও কানে এল। আচ্ছা—আইন আমরাও জানি। দেখাচ্ছি—দাঁড়াও।

শুভা গলির প্রান্ত থেকে তীক্ষ্ণ গলায় বললে—চলুন তো আপনাদের রায় সাহেবের কাছে—

প্রশান্ত বারান্দায় এসে দেখলে—মেজদা নেই—উঠোনেও

কেউ নেই। সত্যিই কি শুভা রায় সায়েবের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে গেল। এতগুলি লোকের বিরুদ্ধে ও একল যুঝবে কি করে? যাদের ভদ্রতার বালাই নেই—তাদের কাছ থেকে ও কি-ই বা প্রত্যাশা করতে পারে। একটা বিত্তীয় রকমের ব্যাপার না ঘটে।

ও তাড়াতাড়ি নেমে বাড়ীর বাইরে এল।

বাইরের জনতা অভদ্র ভাবে চৌচিয়ে উঠল—মাগিকজোড় দেখেহিস—মাইরি।

শুভা ষাড় ফিরিয়ে বললে—তুমি আবার কেন এলে প্রশান্ত?

রায় সায়েবকে দেখতে। যুহু হেসে সে উত্তর দিলে।

ভাল করলে না। সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়ে শুভা হনু হনু করে এগিয়ে গেল।

১৬

বৈঠকখানা দেখে মনে হয়—রায় সাহেব ছ'হাতে উপার্জন করেছেন। যে লাইনে চাকরি করতেন,...সে লাইনের সততাকে সাধারণে ভুলেও সত্য বলে মনে করে না অথচ সাধারণের চাটুবাদে তাঁর বৈঠকখানা দিন রাত যে মুখরিত থাকে—ক্ষমতার শিখর থেকে নেমে এলেও আজ সে প্রমাণের অভাব হবে না। খেতাব আর চাকরী—ছইই পাখিবি নিরাপত্তার মন্ত বড় সহায়, এ কথাটা সাধারণে বোঝে। তারা আরও বোঝে মরা হাতি লাখ টাকা—এ প্রবাদ বাক্যের সার্থকতা রায় সাহেবের পদমর্যাদায় নিহিত। তাঁর একটি কথা—গুরুত্ব বহুদূরপ্রসারী।

খাটো চৌকির ওপর ঢালা ফরাস পাতা আসর। কয়েকটা তাকিয়া এদিকে ওদিকে গড়াচ্ছে—নক্সা—কাটা ছ'কোদানে একটা ছ'কো—আর একটা ছ'কো ফিরছে—লোকের হাতে হাতে। গড়গড়ার নলটা কখনও রায় সায়েবের হাতে, কখনও বা তাকিয়ার ওপর—পানের ডাবের এক ডাবর সাজা পান আর বড় অ্যাশ-ট্রেটা ফরাসের মাঝখানে, চুরোটের ছাইয়ে প্রায় ভর্তি হয়ে গেছে। কাপ ডিস জমতে পায় না ফরাসের ওপর। সমস্ত মত বেয়ারা ট্রেতে করে কাপ সাজিয়ে নিয়ে আসে—আর চা খাওয়া হয়ে গেলে, কাপ ডিস গুছিয়ে নিয়ে যায়।

সবচেয়ে দেখবার জিনিস হচ্ছে শরের দেওয়াল। নক্সা—কাটা, সবুজ রঙ দেওয়া দেওয়াল। কিন্তু নানান সাইজের ছবির বাছলো, দেওয়ালটা যেন অলঙ্কারভারপ্রাপ্তা সেকুলে গৃহিণীর মত। রায় সায়েবের কর্মজীবনের গৌরব আর ইতিহাস বহন করছে ছবিগুলি। এগুলি দেখলে মনে হবে—মহাবোধি হলের জাতক—কাহিনী। আজ মেদভারবহল ভিটামিন ক্যালসিয়াম-পুষ্টি যে দেখানি তাকিয়া আশ্রয় করে মজলিসের মধ্যমণি-বরূপ শরের শোভাবর্ধন করছে—ছবিগুলি

তারই পূর্ব জন্মের কাহিনীর মতই লাগে। রাজা-রাণীর ছবির নীচেয় লেখা 'গড সেভ দি কিং'। আর সম্প্রতি পশ্চিমের দেওয়ালে একখানি ছবি যুক্ত হয়েছে—ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রাণ-কারী চার্চিলের। প্রমিক গবর্ণমেন্টের চাপে, টোরাগোজীসহ তিনি নেপথ্যে অবস্থিত হলেও—রায় সায়েব আশা করেন, সফট যুহুর্ন্তে আবার তাঁকে মঞ্চাবতরণ করতেই হবে। সব দেশেই এমন একজন দরদস্ত লোক সফট যুহুর্ন্তের পরিপ্রাতা হয়ে দেখা দেয়—বিনাশায় চ ছুহুতায় আর কি। ঈশ্বরকে ধর্মবাদ যে ক্ষমতা হারিয়েও ইনি এখনও বেঁচে আছেন।

বৈঠকখানায় আগেই বহু লোক জমা হয়েছিল। শুভা আসতেই—পিছনেও রীতিমত ভিড় জমল।

শুভা স্পষ্ট কণ্ঠে বললে, আপনিই হরিপদ মিত্র—? নমস্কার।

নমস্কার নয়—মনে হ'ল যুক্ত কর বিচ্ছিন্ন হয়ে সজোরে রায় সাহেবের ছুটি গালে পড়ল। শরের মধ্যে অঞ্চ নিঃশব্দতা।

শুভার কণ্ঠস্বর দেওয়াল থেকে দেওয়ালে প্রতিধ্বনিত হ'ল। সে বললে, শুনি আপনি লোকের অজায়কে শাসন করেন, পাণীকে শাস্তি দেন। জানতে পারি কি—কোন সাহসে পাড়ার লোকে কোন ক্ষতি বা অপরাধ না করা সত্ত্বেও আমাদের ওপর অত্যাচার করেন? একলা মেয়েছেলের ওপর জুলুম করতে তাঁদের বাধে না—কি লজ্জা হয় না?

দেওয়াল-ঘড়িটা টিক টিক করে শব্দ করতে লাগল শুধু—রায় সায়েব পর্যন্ত বাক্যহীন বিষ্ময়ে শুভার পানে চেয়ে রইলেন।

শুভা একজন যুবকের দিকে আঙুল উঠিয়ে বললে, ঐ লোকটি কাল আমায় অভদ্র ইসারা করেছে—আমার বাড়ীর সামনে যখন তখন শিস দেওয়া কি সিনেমার গান গাওয়া এটাও বোধ হয় ভয়ানক ভদ্রতার অঙ্গ।

রায় সাহেব এতক্ষণে জলে উঠলেন। তাঁর মনে হ'ল মেয়েটি ধুষ্ট—অসহ রকমের প্রগল্ভা। কথাগুলি তাঁকেই উদ্দেশ্য করে বলছে—আর তাঁরই ভদ্রতা নিয়ে ব্যঙ্গোক্তি করছে। গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, যারা নির্দোষী কেউ তাদের কোন কথা বলতে সাহস করে না। পাড়ার এত লোক রয়েছে—ভাড়াটে স্থায়ী বাসিন্দা কেউ তোমার মত তেড়ে এসে নালিশ করে নি আমার কাছে।

তাঁদের বাড়ীতে পুরুষ অভিভাবক আছেন তাই তাঁদের আসবার দরকার হয় নি।

না—তা নয়। পুরুষ অভিভাবক তোমারও কম নেই—কিন্তু সন্ত্রাস-মর্যাদা বোধ তাঁদের আছে।

কি বললেন? তীক্ষ্ণ কণ্ঠে শুভা প্রশ্ন করলে।

যা বলেছি—সবাই শুনেছেন। গম্ভীর স্বরে বললেন রায় সায়েব। কথা হচ্ছে কি জান—তোমরা কয়নিষ্ট নয়?

শুভা গ্রীবা উন্নত করে বললে, তাতে কি !

রায় সায়েব বললেন, কম্যুনিষ্টরা সমাজ মানে না ধর্ম মানে না, ঈশ্বর মানে না—

শুভা বললে, যে ঈশ্বর মানুষের অর্থ সঞ্চয়ের নেশাকে বাড়ান—যে ধর্ম একজন মানুষকে দশজন মানুষের মাথায় তোলে—সে সমাজ নিয়ে আমাদের মাথাব্যথা নেই।

কিন্তু আমাদের মাথাব্যথা আছে। এই সমাজের মধ্যে বসে তুমি বা খুশী তাই করতে পার না। রায় সায়েব বিচার নিষ্পত্তির ভঙ্গিতে গড়গড়ার নলটি হাতে তুলে নিলেন।

কিন্তু আমাদের সাধারণ নাগরিককে বাধা দেবার কোন অধিকার আপনার নেই।

তাই নাকি ! ব্যঙ্গ ভরে রায় সায়েব একটু হাসলেন। সং নাগরিক হও—নিজের মর্যাদা নিজে রাখতে জান—সে তো ভালই ! কিন্তু যেখানে পাঁচ জন সং নাগরিক বাস করেন সেখানে ত্রুণের রাখবার আইন নেই...

শুভা চীৎকার করে কি বলতে যাচ্ছিল, পিছন থেকে প্রশান্ত এল এগিয়ে। বললে, কথা কাটাকাটি শক্তি পরীক্ষার পথ নয়। এখানে আর দাঁড়িও না।

রায় সায়েব বললেন, তুমি কে হে ? ওর আত্মীয় ?

মেজদা বললে ভিড়ের ভেতর থেকে, হাঁ—পরমাঙ্গীয়। মাকে বলে—হরিহর আত্মা।

একটা হাসির ঢেউ ধরের মধ্য থেকে বাইরে গড়িয়ে এল।

রায় সায়েব বললেন, সামাজিক অনাচার বাদ দিলেও রাজনৈতিক অপরাধ তোমাদের গুরুতর। বাড়ী সার্চ হলই বোঝা যাবে।

আমাদের অপমান করা...

তোমাদের আবার অপমান। পথের ঘেয়ো কুকুরকে লাঠি পেটা না করলে নিজের বিপদ—জান ত।

আবার একটা হাসির ঢেউ সজোরে আছড়ে পড়ল।

সত্যিই বাড়ীটা সার্চ হ'ল। আপত্তিকর পুস্তিকা ছই এক-খানা পাওয়া গেল—প্রশান্তের পকেট থেকে বেরুল একটু আগে লেখা কাগজখানা। সেটা মারাত্মক প্রমাণ না হলেও প্রমাণ ত বটে। তা ছাড়া সম্পূর্ণ অনাজ্ঞীয় যুবক অভিভাবকহীন মেয়েদের সঙ্গে বাস করলে সামাজিক ও রাজনৈতিক চূর্ণামের ভাগী হতে হবেই।

রায় সায়েবের পাশের বাড়ীতে থাকেন সুনীতি কর—কংগ্রেসের মাথা ঘরা লোক। যদিও তাঁর সঙ্গে রায় সায়েবের আদা-কাঁচকলাজাতীয় সম্বন্ধ—তবু সাক্ষ্য প্রমাণের জন্ত তাঁকেও আহ্বান করা হল।

আহুত হয়ে তিনি বললেন, কংগ্রেসের সঙ্গে ও পার্টির বহু দিন সম্বন্ধচ্ছেদ হয়েছে। উনিশ-শো বিয়াল্লিশে গণ-যুদ্ধের নামে সরকারকে সাহায্য করেছিল ওরা। আগষ্ট বিপ্লবকে

পর্যন্ত ওরা ফ্যাসি ষড়যন্ত্র বলতে, দ্বিধা বোধ করে নি। কংগ্রেসকে ধ্বংস করবার জন্ত সরকারের হাতে হাত মিলিয়েছিল যারা—তারা কি কারণে স্বয়ংরাণীর পদ থেকে সরে এল তিনি বলতে পারেন না। কংগ্রেসের কোন গুপ্তনীতি নেই বলেই রাজনীতির চাতুরী বুঝতে তিনি অক্ষম।

শুভা উত্তর দিলে, তা হলে রাজনীতি না করাই ওঁর পক্ষে মঙ্গলজনক।

রায় সায়েব বললেন, দেশে এত যে ধর্মঘটের প্রসার—এর মূলে এরা।

শুভা বললে, হাঁ—হুভিক্ষে যেমন লক্ষ লক্ষ লোক না খেতে পেয়ে কুকুর শেয়ালের মত পথে পথে মরে পড়ে ছিল অথচ আঙুলটি তোলে নি আজও তাই হলে ভাল হয়। যুদ্ধের আগেকার বাজার ফিরিয়ে, আত্মন না রায় সায়েব।

ফিরিয়ে আনবার মালিক যেন আমরাই।

তবে কম খেয়ে একটু কম চর্পিত জমান দেছে—তাতেও গুটি কয়েক লোক বাঁচবে। একটি ছোকরা ভিড়ের মধ্য থেকে মন্তব্য করলে। হাসির উচ্চরব উঠল।

কণ্ঠল আরম্ভ হয়ে উঠল রায় সায়েবের। পুলিশ অফিসারের পানে চেয়ে বললে, আপনার কাজ করুন—এদের—

পুলিস অফিসার রায় সায়েবকে একান্তে ডেকে চুপি চুপি বললেন, এত অল্প প্রমাণে ওদের অ্যারেষ্ট করা যাবে না। তা ছাড়া—আরও ফিস ফিস করে তিনি কি সব বললেন।

রায় সায়েব বিষয় স্থরে বললেন, যা খুসি করুন। তবে—ভদ্রলোকের পাড়া এটা—সবাই যাতে মান সম্মান নিয়ে বাস করতে পারে...

অবশ্য—অবশ্য, এ ব্যবস্থা নিশ্চয়ই হবে।

ওদের সতর্ক করে—শাসিয়ে ছেড়ে দিলেন তিনি।

এই ঘটনায় আর কিছু না হোক—এদের চারদিকে বাইরের পৃথিবীটার স্বরূপ বুঝতে পারা গেল। প্রশান্ত নিজ চিত্তের দৃঢ়তার সন্ধান পেলে। কোথা থেকে ও শক্তি পেলে অপরিমিত—লাঞ্ছনা অপমান অগ্রাহ করে শুভার পাশটিতে গিয়ে দাঁড়াতে পারলে ? দ্বিধা সন্দেহে ছলছিল মন—অকস্মাৎ উৎপীড়নের আগুনে খাদ নিষ্কাশিত হয়ে ষাঁটি সোনার জ্যোতি প্রকাশিত হ'ল। ছুঁলে পক্ষ নিয়ে অন্যায়ের প্রতিবাদ করা যৌবনের ধর্ম বলেই প্রশান্ত নবীন উৎসাহে সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছিল বুঝি ?

ভিড় পাতলা হয়ে গেলে প্রশান্ত দেখলে শুভার থেকে সে অনেকখানি পিছিয়ে পড়েছে। শুভার কয়েকজন বন্ধু এসেছিল, তাদের যত্নলীন হয়ে ও তর্ক করতে করতে এগিয়ে চলেছে। বাড়ির দিকে না গিয়ে ওরা ভিন্ন পথ ধরলে। প্রশান্ত ওদের অনুসরণ করবে কি ?

একটি ছোকরা তার কাছে এসে বললে, সুনীতি বাবু—আপনাকে ডাকছেন—এ যে—।

অদূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন সুনীতি কর। ওদিকে চাইতেই তিনি হাত উঠিয়ে ডাকলেন তাকে। প্রশান্ত সেই দিকে গেল।

প্রশান্তকে দেখে তিনি বললেন, আমার সঙ্গে একটু আসবেন—মানে আমার বাড়িতে।

প্রশান্তর ইতস্তত ভাব দেখে তিনি হেসে বললেন, ভয় নেই আপনার—আমরা রায় সায়েব-জাতীয় জীব নই—পুলিসের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্কও রাখি না।

প্রশান্ত বললে, পুলিসের সঙ্গে সম্পর্ক রাখলেই বা ভয় করব—এ আপনি ভাবছেন কেন?

না—তাও ভাবি না। আপনাকে ওদের মাঝখানে কেমন মিস্কিটেড মনে হতেই ডাকলাম।

প্রশান্ত অল্প একটু হেসে বললে, চলুন—কোথায় যাবেন। বাইরের ঘরে প্রশান্তকে বসিয়ে সুনীতি কর আর সকলকে বাইরে যেতে বললেন। সকলে বাইরে গেলে বললেন, চা খাবেন?

প্রশান্ত বললে, না—থাক এখন। ঘরের চারদিকে সে কোঁতুহলী দৃষ্টি বুলিয়ে নিলে। তিন-রঙা পতাকা—মহাত্মা গান্ধী, জবাহরলালের ছবি—বল্মোমাতরম্ গানের চার লাইন তুলোর অক্ষরে কাঁচের ফ্রেমে আটকানো—একটা চরকা—একরাশ তুলো—খানিকটা কাটা স্নতো জড়ানো রয়েছে লাটাইয়ে—তার তকলি গোটা কতক পড়ে রয়েছে এলো-মেলো ভাবে। মোট কথা ঘরটাই এলোমেলো—বিশৃঙ্খল।

সুনীতি কর বললেন, আপনি কত দিন হ'ল যোগ দিয়েছেন ওদের পার্টিতে? মাপ করবেন...

প্রশান্ত বললে, এ অত্যন্ত সোজা কথা—জবাবও এর সোজা। খুব অল্পদিন হ'ল...

তার কথা শেষ না হতেই সুনীতি কর সোংসাছে মাথা নেড়ে বললেন, আমি তা অস্বীকার করেছি।

প্রশান্ত বললে, পার্টিতে যোগ দিয়েছি বললে ভুল বলা হবে—ওদের কাজ আমার ভাল লাগে...

সুনীতি কর বললেন, আপনাদের মত দেশভক্ত যুবকদের দেশের কাজ ভাল লাগবেই। কিন্তু কংগ্রেসে যোগ না দিয়ে...

প্রশান্ত হেসে বললে, তাতে আর ক্ষতি কি—ওঁরাও ত ক্যাপিটালিজমের শত্রু।

সুনীতি কর হাসলেন। জানালার ধারে উঠে গিয়ে গলাটা পরিষ্কার করে চেয়ারে এসে বসলেন। বললেন, জাতিধর্ম-নিরীশেষে কংগ্রেসই হচ্ছে একমাত্র প্রতিষ্ঠান যার শক্তিকে শাসকরা স্বীকার করেন।

প্রশান্ত বললে, তাই বা কেমন করে বলি। মুসলিম লীগকে বাদ দিয়ে তা হলে ইন্টারিম গবর্নমেন্ট গঠিত হ'ত।

সুনীতি কর বললেন, কিন্তু একথাও ত এ্যাটিলি ঘোষণা

করেছেন—মেজরিটির অগ্রগতি মাইনরিটি বন্ধ করতে পারবে না।

প্রশান্ত বললে, তা হলে—কংগ্রেস যখন ১৫ই মের ভায় মেনে নিলে—তখন লীগকে এর মধ্যে পুরে দেবার চেষ্টা করছেন কেন?

সুনীতি কর বললেন, এই চেষ্টার মধ্যে আমরা দেখছি ব্রিটিশ ডিম্লেমাসি। গান্ধীজী বলেন—ওদের আন্তরিক ইচ্ছাকে বিকৃত করে ধরা সত্যগ্রহীর নীতিতে বাধে।

আপনি কি মনে করেন?

সুনীতি কর বললেন, ব্যক্তিগত মনে করা-করির কোন মূল্য নেই—আমাদের চেষ্টা যাতে সফল হয়—সমবেত ভাবে সেই চেষ্টা করাই হ'ল ঠিক পথ। একটু থেমে বললেন, তুমি বুদ্ধিমান—একথা নিশ্চয় বুঝে গান্ধীজী আশাবাদী। রাজনীতির ক্ষেত্রে আশাবাদ হ'ল সবচেয়ে দামী কথা।

সুবিধাবাদ বলতে পারেন। প্রশান্ত হাসল।

যাই হোক—এখন কথা হচ্ছে ক্ষমতা যা হাতে পাচ্ছি তা আদায় করে নিয়ে আরও ক্ষমতা লাভের চেষ্টা করা উচিত নয় কি। আর তা করতে হলে—একটি শক্তিশালী দল গড়া উচিত—সব শক্তিকে এক জায়গায় এনে—অর্থাৎ সহযোগিতার দ্বারা ক্ষমতা লাভ...

প্রশান্ত বললে, তা হলে কোন দলকে বাদ দিলে চলবে না। মাইনরিটি বলে কাউকে অগ্রাহ্য করে সর্বভারতীয় শাসন-পরিষদ গড়া যাবে না।

কংগ্রেস ত আপোষের জন্য বহুদূর এগিয়েছে।

বাজারদর কমাক্ষিকি এগুনো বলা ঠিক নয়...

সুনীতি কর বিচলিত কণ্ঠে বললেন, তা হলে—পাকিস্তান কায়ম হোক ভারতবর্ষে এটিই চাইব আমরা। দ্বিতীয় অল্টার কি প্যালেস্টাইন গড়ে ওদের-স্বযোগ দেব অছিগিরি?

প্রশান্ত বললে, মিশরও কত দিন আগে এই শাসন-সংস্কার মেনে নিয়েছিল—কিন্তু ব্রিটিশ সৈন্য অপসারণের কথা উঠলে জাতির নাবালকত্ব নিয়ে আজও তর্কবিতর্ক হয়। মাপ করবেন কর-মশায়—যাঁরা আমাদের সং ছেলে দেখে ভাল চরিত্রের সার্টিকিট দেবেন—কিংবা নাবালক বলে ঘোষণা করবেন—তারা যে জীবন-মরণের স্বার্থে জড়িয়ে আছেন এর মধ্যে। আমরা স্বেচ্ছা হলেও—তাদের নির্বুদ্ধিতা কোন দিন প্রকাশ পাবে না।

সুনীতি কর বললেন, তা হলে বলছ নানান দলে নানান মতে ভাগ হয়ে থাকব আমরা। আমরা যুক্ত করব কিন্তু একতার নীতি মানব না। বলব স্বাধীনতা চাই—অথচ রকম রকম শাসনতন্ত্র রচনা করব। হঠাৎ তিনি বললেন, কংগ্রেসকে শক্তিমান বলে স্বীকার কর কিনা?

করি।

তা যদি কর—হঠাৎ তিনি চেয়ার ছেড়ে প্রশান্তর সামনে

এসে ওর একখানা হাত চেপে ধরলেন; তা হলে কংগ্রেসে যোগ দিতে তোমার আপত্তি কি।

প্রশান্ত কোন কথা বললে না। খানিক নীরবে ওঁর মুখের পানে চেয়ে হাতখানি তার মুক্ত করে নিলে। বললে, আমাকে মেস্জার করে নেবার জন্ত আপনার এই চেষ্টাকে স্নেহ বলেই মানছি—কিন্তু...

এর মধ্যে কিন্তু নেই—তুমি মাত্র অল্পদিন হ'ল এ পাড়ায় যাতায়াত করছ—হুম্মাকে ভয় করতে বলছি না—কিন্তু অসত্যকে ঘৃণা করবে না কেন। সব বাঁধন কাটা মানেই স্বৈরাচার নয় এ যেমন স্বীকার কর তেমনি বাঁধন না কেটেও কল্পিত আবহাওয়ার সৃষ্টি করা যায় এটাও মান তো?

প্রশান্ত কিছুই না বুঝে ওঁর পানে চেয়ে রইল। এ কথা বলার তাৎপর্য কি?

স্বনীতি কর বললেন, ওই মেয়েটির সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছি। রায় সায়েবের মত নীতিবাহীণ আমি নই—তবু ওদের সমর্থন করতে পারি নি।

মানুষের রচনা সব সময়ে সত্য হয় না।

স্বনীতি কর বললেন, প্রমাণ দেওয়াটা আমার পক্ষে শক্ত নয়, তবে সম্মানজনক নয় বলেই তা দেব না। ওদের বাড়ির দুখানা বাড়ি পরে—শৈলেশ্বর বোস থাকেন—তাঁর ছেলে মণ্টু—নিজের কথায় অসঙ্গতি বুঝতে পেরে তিনি সহসা চূপ করলেন।

প্রশান্ত উৎসুক হ'ল যথেষ্ট। শুভা সম্বন্ধে—নিজেই সে নিঃসংশয় গীড়া অনুভব করে কেন? একান্ত করে পাওয়ার মধ্যেই কি এই দ্বীপবাদ লুকানো থাকে। পুরুষের সম্পত্তি নারী—এই পৌরুষ বোধের উগ্রতায় তার যুক্তি হয়েছে আবির্ভাব। নারীচিন্তা জয়ের সাধনা আর কিছুই নয়—ধন সঞ্চয়ের নেশার মতই এক আদিম প্রবৃত্তি।

চোয়ার ছেড়ে উঠতেই তিনি বললেন, কিছু মনে করলে না তো ভাই।

প্রশান্ত মুগ্ধ চোখে তাঁর পানে চেয়ে মাথা নাড়লে। এই মিষ্ট সম্বোধনের পর মনে করাচ লে না কিছু। ইচ্ছে হ'ল পা ছুঁয়ে একটি প্রণাম জানিয়ে আসে। লজ্জায় সঙ্কোচে তাও পারলে না।

১৭

অন্তমনস্ত হয়ে পথ চলছিল প্রশান্ত। মনের মধ্যে বিচার চলছে—কোনটা স্রেয়। উনিশ-শো বিয়াল্লিশের আগষ্টে বোম্বাইয়ে 'কুইট ইণ্ডিয়া' প্রস্তাব পাশ হবার পরমুহুর্তে জেলের ফটক খুলে গিয়েছিল—আন্দোলন চালাবার মত বাইরে ছিলেন না কেউ। গেল বার এমনি সময়ে জার্মেনী ভেঙ্গে পড়েছিল—জাপানের বুক লক্ষ্য করে প্রতিপক্ষ তুলেছিল শক্তিশেল। তার পর আণবিক বোমার প্রথম পরীক্ষা হ'ল হিরো-সীমার অর্ধেক ধ্বংস করে—আর কয়েক লক্ষ প্রাণ আহত

নিয়ে। তার পর নাগাসাকিতে হানা দিল যুড্যদূত; জাপান নতজান্ন হ'ল। জগৎ থেকে ক্যাসিবাদ নিঃশেষিত হ'ল। জার্মেনী হ'ল চার টুকরো—জাপান গেল আমেরিকার উদরে। বিশ্বশক্তি-পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে উন্নীত হ'ল মার্কিন। কংগ্রেস তখন কারা-প্রাচীরের বাইরে। দেশের মধ্যে তার শক্তিও প্রভাব বেড়েই চলেছে দিন দিন। নিক্সাচন-যুদ্ধে কংগ্রেস হ'ল জয়ী। তার পর ইণ্ডিয়ান গ্রাশনাল আশ্মি (আই, এন, এ-র) দিল্লীর লাল কেল্লায় বিচার হ'ল যার নায়কদের। লোকচক্ষুর সামনে থেকে উঠে গেল রহস্যের যবনিকা—দীপ্ত তেজে প্রকাশিত হলেন দেশবন্দিত নেতা সুভাষ বসু। দু'শো বছরের ভুলে-যাওয়া-সুর ফিরে এল কণ্ঠে—অররুদ্ধ কণ্ঠ ফিরে গেল ভাষা—ধ্যানের দেবতা মূর্তিতে উঠলেন জেগে।

কংগ্রেস ঘোষণা করলেন: আমরা স্বাধীনতার দ্বার-দেশে। সাম্রাজ্যবাদ এখনও তৈরি হচ্ছে শেষ আঘাত দেবার জন্ত। শেষ আঘাতই সেটা, কারণ এর নাভিস্থাস হয়েছে। সকলে এক হয়ে, ঠেকাও সে আঘাত, ধ্বংস হোক দানবটা।

দানবের মায়া, সে বড় ভয়ঙ্কর। রাজনীতিতে সততার স্থান কতটুকু সে বিচার ইতিহাস করেছে বার বার। নৈরাশ্র-বাদ রাজনীতির অঙ্গ নয়। আজকের ত্যাগ, আগামী কালের পাওয়ার সঙ্গে, লাভ-ক্ষতির জের টানছে। সে হিসাব-নিকাশের জের, এক পাতা থেকে আর এক পাতায়, এক যুগ থেকে আর এক যুগে, টেনে চলেছে সবাই। তার সাক্ষ্য-প্রমাণও আছে ইতিহাসে। ভারতবর্ষ স্বাধীনতার সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে, পথ বেছে নিতে ভুল করলে সে অতলে যাবে তলিয়ে। বিশ্ব-বিপ্লবের ভূমিকায় আজ যারা প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে, নতুন বিশ্ব রচনার স্বপ্ন দেখছেন, তাঁদের সামান্য-তম ভুলও ক্ষমা করবে না মহাকাল। এক হাতে খপ্পর আর এক হাতে বরাভর শান্তির আশ্বাস জানাচ্ছে। কিন্তু এ বরাভর বিশ্ব-পালিনীর মাতৃপাণি-প্রসূত নয়, এ বজ্র-নিষ্ফেপের ভয় দেখিয়ে শান্তি রক্ষার প্রয়াস-মাত্র। চতুর রাজনীতিবিদ এই শুভ মুহুর্তেই যথাসম্ভব ক্ষমতা বাড়িয়ে নিচ্ছেন; নিরাপত্তার নামে, সাম্রাজ্যের শৃঙ্খলে গাঁবে ফেলছেন, স্বাধীন ভূমি-ও সমুদ্র-স্বয়ং।

ভাবতে ভাবতে চলেছিল প্রশান্ত। মাথার উপর কখন যনিয়ে এসেছে মেঘ, ও টের পায় নি। বর্ষাকালের আকাশ, বিনা সতর্কতার বর্ষণ ওর রীতি। হঠাৎ বৃষ্টি চেপে এল। পথের ধারে বড় মত একটা গাড়ী-বারান্দার নীচের ছুটতে ছুটতে আশ্রয় নিলে, মানুষ আর পশু। বায়ুবেগে বৃষ্টির ছাঁট যতই অগ্রসর হচ্ছে, মানুষ আর পশুতে ততই জমাট বাঁধছে।

কি দাদা, রেলোয়ে ঠাইকটা আর হ'ল না?

না—সাড়ে চার টাকা ইন্টারিম রিলিফ দেবে, এ্যাড-জুডিকেশনে কতক বিষয় যাবে। পয়লা জানুয়ারী থেকে মাইনে বাড়বে।

তবে আর কি, সাড়ে চার টাকায়, সব দুঃখ হরিপাল যাবে তো?

আমাদের পেট্রিয়াল ষ্ট্রাইকের ঠেলাটা বুঝবে। এ আর রেলোয়ে ইউনিয়ন নয়, রীতিমত হাংরি ব্যাচ পরিয়ে ষ্ট্রাইক প্লেটশ দেয়া হয়েছে।

ট্রাম কোম্পানী কি বলে?

সে দিন যুনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে আমাদের মীটিং হবে—কলেজ স্কয়ারে দু'দলে দেখা। খুব ইনকিলাব জিন্দাবাদ করা গেল। ওরা বললে, দাবী ছেড় না ভাই, হুমকি চালাও। লাখ লাখ টাকা কামিয়ে গ্যাট হয়ে বসে থাকবে কোম্পানী, ইয়ারকি আর কি।

হবে কি, রক্তারক্তি কাণ্ড।

এমনিতেই না খেতে পেয়ে মরচি, না হয়—

শুনেছ দাদা, মুসলীম লীগ মন্ত্রী মিশনের খসড়া বাতিল করে দিলে।

কাগজে বেরিয়েছে?

দেখো আমার কথা যদি সত্যি না হয়—

দুস—তোরা সব ক্ষুদ্রে সত্যপীর কিনা! বাতিল করাই উচিত। এ, বি, সি এ প করে ভারতবর্ষকে টুকরো করে ফেলতে পারলেই তো—আরও দুশো বছর রে দাদা।

একটা পাওয়ারফুল সেক্টর—

দুস—পাওয়ারফুল। পলিটিক্স এ আমরা তো নাবালক রে দাদা। ওদের বুঝতে পারবি। বলে এক একটা আইনের ভাষ্য বুঝতেই বড় বড় মাথা সব ঘুলিয়ে যাচ্ছে। দশ-বারো দিন ধরে মীটিং করে তবে রেজলুশন পাশ করছে। আমাদের মত গোলা লোকরা কি করবে শুনি?

বাইরে যাবার উপায় নেই—খোলা গাড়ী বারান্দার নীচে—সাধারণের রাজনীতির বিতর্ক জমে উঠল। বেশিফণ চলল না রাজনীতি। মাছ, আনাড়পাতি, সরষের তেল, আপিসের মাইনে, এইসব স্তরে নেমে এল বাদাছবাদ। প্রশান্ত স্বীকার করলে, এই স্তরেই আলোচনা বাস্তব রূপ পেয়েছে। স্বাধীনতার অর্থ সাধারণে বোঝে এই মাপকাঠির সাহায্যে। যুদ্ধ ক্ষতবিক্ষত দেশগুলিতে প্রাণ ধারণের সমস্তা এমন তীব্র হয়ে উঠেছে কি? হাজার হাজার লোককে বেকার বানাবার আয়োজন চলেছে। তারা বলছে এ কি সর্বনাশ! এ জগতে আমাদের টিকে থাকবার অধিকার দাও। তোমাদের জন্ত আমরা সর্বস্ব দিয়েছি—আর তোমরা—

• বিক্ষোভ এই কারণেই প্রবল হয়েছে।

জীবন বাঁচাবার কোন পথ? পেটে না খেয়ে বিপ্লব আনা সম্ভব কি? মানি—বেয়নেটের সামনে বুক পেতে দিলাম, লাঠি চার্জকে উপেক্ষা করলাম। উত্তেজিত মুহুর্তে প্লোগান আউড়ে গলা ভেঙ্গে ফেলে যুত্বের মুখোমুখি দাঁড়াতে বুক এক-

বারও কাঁপল না। কিন্তু এই যুত্ব—! অন্ন-বঞ্চনার অভিনয় বস্ত্র-বঞ্চনার নীতি অন্তরালে চলছে সমৃদ্ধ জীবন-প্রবাহ কোটিকে মেরে গুটির অতিকায় হবার সাধনা—এর প্রতিকার কোথায়? শুধু মীটিং করে ঈর্ষ্যাত্তক প্লোগান আউড়ে তাল ঠুকে অত্যন্ত অসহায়ের মৃত পথ দিয়ে শোভা যাত্রা করে গেলেই কি ধনিকতাবাদ বিপন্ন হবে?

একদিন শুভার সঙ্গে এই নিয়ে কিছু আলোচনা হয়েছিল। ও বলেছিল, ছলে বলে অথবা কৌশলে—এই নীতি নিতে হবে। উপার্জন প্রাণ বাঁচাবার জন্ত করতে হবে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কাছ থেকে সাহায্য নিয়েছিলে তোমরা।

নিয়েছি তো। পুঁজিবাদ ধ্বংস করবার সঙ্কল্প আমাদের—শক্তি সঞ্চয়ের দরকার নেই?

কিন্তু নীতিবিরুদ্ধ।

আমাদের নীতি হ'ল বেঁচে থাকা ও বাঁচিয়ে রাখা। ক্ষমতা লাভ হ'ল আসল বস্তু। ভাল কথারও দাম থাকে না—জীবনের সঙ্গে যদি তার ভাল না মেলে।

যথা?

‘পরদ্রব্য অপহরণ করিও না’—সর্বোত্তম নীতিকথা। কিন্তু অনাহারগ্রস্তের কাছে এ নীতির কোন দাম নেই।

তা বটে—আমাদের কোন নেতা সেদিন বলেছেন ক্ষুধার্ত মানুষকে ভগবানের নাম দিয়ে ভোলান মিছে। কিন্তু এই ভাবে চোঁচিয়ে ওদের শাসন করতে পারবে?

শুভা হেসেছিল, ভুল বুঝে না প্রশান্ত—প্লোগান আর কিছুই নয়, সকলকে এক করার মন্ত্র। শোভাযাত্রার অর্থও হ'ল ওই। ধনী তার সব ক্ষমতা দিয়েও এ শক্তিকে ঠেকাতে পারবে না।

আমাদের দেশে—ধনীরা এতে কৌতুক বোধ করে না কি?

হাঁ, তাদের আশ্রয়দাতা হ'ল সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। গুলি-গোলা রাইফেল মেশিনগান বোমারু নিয়ে ওদের দস্ত। সংশয় এই নিয়ে তো?

শুধু প্রাণ দিয়ে লাভ কতটুকু...

শক্তি—শক্তি প্রশান্ত।

ওর হাসিতে প্রশান্ত কৌতুক বোধ করেছিল। কিন্তু সে দিন আর এই দিনে তফাৎ অনেকখানি। ময়লা ছেঁড়া ধূতি কামিজ পরে খালি পায়ে এক মাথা রক্ষ চুল উড়িয়ে—শিরা আকীর্ণ-শীর্ণ হাতে নিশান দোলাতে দোলাতে প্রাণ ধারণের দাবি জানিয়ে চীৎকার করতে করতে রাজপথ দিয়ে যায় যে সব ছন্নছাড়া দুর্গতের দল তারা আজ শ্রোতের মুখে ঠাওলা কিংবা ঝড়ের মুখে তুলো নয়। তারা জন্মান্তরের পাপকে অস্বীকার করে. আর অদৃষ্ট মানে না। নিজের কর্মের ফল পুরোপুরি ভোগ করতে চায়। ছাংলা কুকুরের মত ছুঁকরো মাংস বা হাড়ের লোভে লাজ নেড়ে ছুটে আসে না আমাদের

খিড়কীর ছুরোরে। হাঁ, শক্তি ওরা লাভ করবে ক্রমশঃ। ওদের চীৎকারে কেঁপে উঠছে প্রাসাদ-ভিত্তি—মর্ম্মর হর্ম্ম্যর সুখশয্যাশ্রিত লক্ষ্মীর ছুলালরা। ইতিহাসের পাতার সোনার অক্ষরগুলো অস্পষ্ট হয়ে এল। দিন আগত এ।

সামনে দিয়ে একটা ছোট মত শোভাযাত্রা গেল। কোন ময়দাকলের না পটারির শ্রমিকরা অভিযোগ জানাচ্ছে। কুড়ি টাকা মাইনেতে এরা দুদিন আগেও মালিকের সেবা করেছে, মাগুগি ভাতা স্বরূপ চেয়েছিল আর পাঁচটি টাকা। মালিক সাফ জবাব দিয়েছে। যুদ্ধের বাজারে তার এক লাখ দশ লাখে দাঁড়িয়েছে—সুতরাং মাসখানেক কারখানা বন্ধ রেখে এদের দাবিকে নরম করবার আশা সে করবে না কেন। শ্রমের মূল্য শ্রমিকদের জীবন ধারণ করবার জন্ত দেওয়ার রীতি নেই। ওরা বেশী চীৎকার করলে—কারখানার একাংশে একটা ঘরে ভক্তারখানার ব্যবস্থা হয়—একটা ইস্কুল বস্তির মাঝখানে খুলে দেওয়া হয়—আর সামান্য মাত্র কনসেশনে রেশন দেওয়ার প্রথা চালু করা হয়।

ছিটেফেঁটা দাক্ষিণ্যে—আকাশ-জোড়া দারিদ্র্য নিবারণিত হয় না। শ্রমিক দেখায় ধর্ম্মঘটের হুমকি—ধনিক কাগজে বার করে তার দাক্ষিণ্যের সুবিস্তৃত বিবরণ। জনসাধারণ নামক এক তৃতীয় পক্ষের সহায়ভূতি আকর্ষণ করবার জন্ত এই প্রচেষ্টা। জনসাধারণকে ভয় করবার হেতু—ওদের কাছ থেকে তিল কুড়িয়ে এরা তাতে পরিণত হয় পাছে। মুনাফার নেশা যার লেগেছে—তার মোতাতুতু সে ছাড়বে কেন। শক্ত মুঠো খুলবার জন্ত হাতুড়ির বা পড়বে দমাদম—এ যুদ্ধে কেহ নেই উন।

—ছুরিয়ার মজদুর এক হও—ইনকিলাব জিন্দাবাদ।

পথে দেখা হয়ে গেল পুরোনো এক বন্ধুর সঙ্গে। জলে ছপ ছপ করতে করতে কোথায় চলেছে হে? বন্ধু জিজ্ঞাসা করলে।

কোথায় জানে না সে। কলকাতার নতুন রূপ হুঁচোখ ভরে দেখতে দেখতে সে চলেছে। সিনেমার গেটে তেমন ভিড় নেই, দোকানের পণ্যে নেই বৈচিত্র্য—ক্রেতার চোখে নেই ক্রয়ের কৌতূহল। যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর শান্তি—বস্তিবচন উচ্চারণ করলেই আসে না।

বন্ধু ওর পথ রোধ করলে। চল—চা খেয়ে আসি। চলতে চলতে বললে, কোন আপিসে কাজ করিস? রিট্রেক্-মেন্টের কাঁচির পাশ ঘেঁসে আছিস তো?

না—ওসব বলাই নেই।

সাবাস—। ধর্ম্মঘটের পাকে পড়বিনে তা হলে।

ধর্ম্মঘট খারাপ কিসে? ও জিজ্ঞেসা করলে।

খারাপ বলছি।...বন্ধু শব্দ করে হাসলে। ধর্ম্মঘট কারও কারও কাছে শাপে বর। হাসি থামিয়ে বললে, ধর্ম্মঘটের আগে পাচ্ছিলাম আশী—পরে হুঁশো যোগ হয়েছে। অথচ

ধর্ম্মঘটীদের সঙ্গে পথে পথে হল্লা করে বেড়াই নি—ওদের ইউনিয়নে এক পয়সা ঠেকাই নি—

প্রশান্ত বললে, ব্ল্যাক শিপ।

না—তাও নয়। শুধু প্রমাণ করে দিয়েছি—আশী টাকাতেও আমার দিব্যি বলে—ফলে হুঁশো টাকা মাইটন বেড়ে গেল। এটা সত্যি কথা বলার পুরস্কার...আরে ওদিকে কোথায়?

এই দিকেই যার।

চা খাবিনে?

প্রশান্ত ততক্ষণে অনেকখানি এগিয়ে গেছে।

হাঁ, এরাও আছে। বেশী মাত্রায় হয়ত আছে। এরা সর্বদাই সুযোগ খুঁজছে—নিজেকে সংসারে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার সুযোগ। এদেরও নেশা জমেছে। ক্ষমতা-মদের কিংবা ধন-মদের নেশা।

আর একজন বন্ধুকে মনে পড়ল। গেল বার কি যেন এক প্রতিবাদ-সভায় যেতে লাল ঝাঙা ধরে অপরিমিত চীৎকার করতে করতে শহর প্রদক্ষিণ করেছিল সে। তার পর সে হ'ল এক ইউনিয়নের নেতা। তার পরে নিলে রেল আপিসে চাকরি। সেখানকার ইউনিয়নে দাঁড়াল পাণ্ডা হয়ে। এক সপ্তাহ আগে দেখা হয়েছে তার সঙ্গে। পায়ে চকচকে জুতো, পোষাক-পরিচ্ছদ কণ্টোলে কেনা নয়, রীতিমত সূট-পরা নেকটাই জাঁটা, হ্যাট বগলে, যুদ্ধে প্রকাণ্ড বর্ম্মা, হাতে ইংরেজি কাগজ একখানা। নড় করে বলেছিল, একটা শুভ সংবাদ দিচ্ছি...ডিপার্টমেন্টে অ্যাসিট্যান্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট অবজ্ঞা অকসিয়েট করছি চ'—চা খাবি।

চা খাবার প্রস্ততি হয় নি প্রশান্তর, বন্ধু এতকাল যা করেছে—তা নদীপারের আরোজন মাত্র। শ্রমিকরা যা চায়, ও চেয়েছিল তাই। ভাল থাকা, ভাল খাওয়া, পোষাক-পরিচ্ছদে সাজল্যা জীবনের চারিপাশে প্রাচুর্য্য। কিন্তু—প্রস্ততির সীমা টানছে কে? সে অন্তত টানতে পারে নি। সাধারণকে ডিঙিয়ে ও তাই অসাধারণ হতে পেরেছে।

হাঁ এরাও আছে। যাত্রাপথের অনেক বাধা—লক্ষ্যে পৌঁছানোর বিলম্বিত পদক্ষেপ। চলতে চলতে হাতছানি দিয়ে ডাকে প্রাসাদ, মোটর তার সুখাসনের গর্ভে ফুটিয়ে তোলে যাত্রা-বিরতির স্বপ্ন। এরা ভিন্ন জোতে ভিন্ন দিকে ভেসে গেলে কোন ক্ষতি ছিল না—তবে সাধারণ শ্রমিককে প্রচণ্ড আঘাত দিয়ে অবিশ্বাস আর সন্দেহকে খাড়া করে যাত্রা-পথ বিঘ্নিত করে—এই তো ভয়ের কথা।

অবশেষে পুরাতন মেসে ফিরে এল সে। বন্ধুরা অবাক হয়ে বললে, এ ক'দিন ছিলে কোথায় হে?

প্রশান্ত বললে, রান্না না হয়ে থাকে তো ঠাকুরকে বল—খাব এ বেলা। শোবার জায়গা পাব তো?

সুশীল বললে, সেজ্ঞে ভাবতে হবে না—আমার সীটেই কুলিয়ে যাবে খন। একখানা চিঠি এসেছে—ক'দিন আগে।

অজ—আগামী কাল

স্বারামপদ মুখোপাধ্যায়

১৫

এগিয়ে গেলে ফেরা যায় না...। নদীর স্রোত সামনে চলে—
দিন চলে যায় সামনে—আর সব ঘটনার গতিও সোজা।
মানুষের বয়স—শৈশব থেকে কৈশোর—কৈশোর পেরিয়ে
যৌবন—তার পর বার্দ্ধক্য—সেও সময়ের স্রোতে সামনে
চলছে ভেসে।...পরিবর্তন আসে—দেহে—পরিবর্তিত হয় মন।
উনিশ-শো বিয়াল্লিশ আর উনিশ-শো ছ'চল্লিশ এক নয়।
সেদিনকার ক্রীপস দৌত্য নিয়ে ভারতে এসেছিলেন—ব্যর্থ হয়ে
ফিরে গিয়েছিলেন। স-চার্লিল টোরিগোষ্ঠী আজ ক্ষমতার
শিখর থেকে নেমে পড়েছেন—শ্রমিক গবর্ণমেন্ট সেখানে
সমাসীন। আজও ক্রীপস এসেছেন দৌত্য নিয়ে—তবু উনিশ-
শো বিয়াল্লিশের পটভূমিকায়...কতকগুলি সীমাবদ্ধ ক্ষমতা
প্রদানের সর্ভ নিয়ে যিনি এসেছিলেন—সে ব্যক্তির সঙ্গে এ
ব্যক্তির অনেকখানি তফাৎ। 'ভারত ছাড়' এই স্লোগানের
অন্তর্নিহিত শক্তি উনিশ-শো বিয়াল্লিশে গণ-অভ্যুত্থানে আগষ্ট-
বিপ্লবের মধ্যে সার্থকতার পথ খুঁজেছিল। নেতাহীন সে
বিপ্লব বন্দুকের গুলিতে বায়ুমান-বাহিত যেসিগানের মৃত্যু-
বীজ বর্ষণে গ্রাম ধ্বংসের লীলায়—পাইকারী জরিমানার আওতে
কোথায় মিলিয়ে গিয়েছিল। বড় উঠলে সমুদ্রের রক্ত ঢেউ—
কূলে এসে সগর্জনে আছড়ে পড়ে—আবার ফিরে যায় সমুদ্রের
গর্ভে। ফিরে যায় বলেই কি সে লুপ্ত হয়ে যায়? তবু...এই
পরিবেশে যুদ্ধোত্তর শোণিত-ক্ষরিত অবসন্ন পৃথিবীতে স্বস্তি-
বাচনের প্রয়াস দেখা যাচ্ছে। যাদের মুষ্টি আলগা হয়ে
পড়েছে—তাদের থেকে যা কিছু পার ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাও—
যুদ্ধক্ষত হতসর্ধক রাষ্ট্রগুলির দিকে। যারা পরাধীন তাদের
শোনাও শান্তির ললিতবাণী। যুদ্ধ ভাল নয়—যুদ্ধ রাষ্ট্রকে
করে ধ্বংস, মানুষকে করে নীতিহীন—শক্তিহীন। বিশ্ব-
মৈত্রীর বাণী নিয়েই এসেছেন মন্ত্রী-মিশন—এশিয়ার পুণ্যক্ষেত্রে
মানব-মহিমার জয়গান ঘোষিত হচ্ছে। আজিকার পট-
ভূমিকায় যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনার মধ্যে নিজ নিজ নিরাপত্তার
ব্যবস্থা না করে নিলে পরমাণু-শক্তি তোমাকে ক্ষমা করবে
না। কালের স্রোত সামনে বয়ে চলেছে। ক্যাসিবাদের
অবসানে—ডিমক্রেসির কাঁধে কাঁধ মেলাতে এত দ্বিধা, এত
সন্দেহ কেন! সুপারিশ না হলে যেমন চাকরি মেলে না—
তেমনি মুখ ফেরালে মিলবে না স্বাধীনতা। পিছনে তাকিও
না—হাত বাড়িও না—সামনে যা পুচ্ছ-তাই নাও ছুঁহাত
ভরে। অঙ্কুশ কিংবা মুঠিতে ভরে—বিনা রক্তপাতে—বিনা
বিপ্লবে আরাম-কেদারায় শুয়ে চুরুট টানতে টানতে যদি পেয়ে
যাও এ জিনিষ—পৃথিবীর ইতিহাসে—সে কি অভিনব বলে
সোনার অক্ষরে কোদা থাকবে না?

৬

এই পর্যন্ত লিখে প্রশান্ত থামলে। ও লেখা মিটিঙে পড়া
চলবে না। রক্তমাংসে পটপরিবর্তন শুরু হয়েছে। তাই বলে
হৃদয়-গলার সততা নিয়ে গদগদ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ চলবে না।
এত দর কমানাক্ষির পেছনে বণিক-মনোরতির খেলা—কি স্পষ্ট
হয়ে ওঠে নি? নতুন পরিস্থিতিতে সাম্রাজ্যবাদ ভিত্তি দৃঢ়
করতে চাইছে—চতুষ্বাধীনতাকে আপাতত ভাষায় কীর্তন
করতে ক্ষতি কি।

বাইরে গেলিমাল হচ্ছে—কারা যেন আন্দোলন করছে।
কলকাতা শহরটাই কোলাহলে ভরা।

ছপদাপ করে সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেল। চারু,
অতীন আরও অনেকে আসছে বুঝি। লেখাটা সে তাড়াতাড়ি
জামার পকেটে পুরলো।

ওরা বারান্দায় এল—বরে ঢুকল না।

বিস্মিত প্রশান্ত প্রশ্ন করলে, কে?

বাইরে আছেন!—বাইরে আছেন! চার-পাঁচটি কণ্ঠস্বর
একসঙ্গে ধ্বনিত হ'ল।

এদের কাউকে প্রশান্ত চেনে না। তবে এরা যে শুভার
সুহৃদ-গোষ্ঠীয় নয়—এটা বুঝা গেল এদের উত্তেজিত হাবভাবে।
এরা চায় কি?

আপনার নাম কি? আপনি মেয়েটির কে হন? এক
সঙ্গে চার-পাঁচটি স্বর।

প্রশান্ত বললে, একে একে জিজ্ঞাসা করুন...কিন্তু
আপনারা কে আগে তাই বলুন।

আমাদের পরিচয় পেলে খুব খুসি হবে না যাহ। আর
পরিচয় দিলেও চিনতে পারবে না।

ভদ্রলোকের পাড়ায় বসে খুব মজা মারছে তো! ভাবছ
আইন বাঁচিয়ে চালাকি করে ফুটি করছি যখন কার কি বলবার
আছে।

প্রশান্ত অহুমনে বুঝলে—ওরা শুভাদের প্রতি প্রসন্ন নয়।

কথাগুলিও ওদের ভদ্রতার সীমা ছাড়িয়েছে। মনে ঘৃণা
জাগল—ক্রোধ হ'ল—কিন্তু এসব প্রকাশের ক্ষেত্র এ নয় ভেবে
সে দৃঢ়স্বরে বলল, পরের বাড়ি চড়াও হবার ক্ষমতা কে দিলে
আপনাদের?

যেন ভীমরুলের চাকে ধোঁচা পড়ল। সবাই একসঙ্গে
কোলাহল করে উঠলে, ইস—আবার রোয়াব দেখ—এ্যাঁইসা
রক্ষা লাগাব গালপাটা খসিয়ে দেব। পাড়ার মধ্যে বেলেগ্লা-
গিরি—এটা কি সোনাগাছি পেয়েছ যাহ।

নিরুদ্ধ ক্রোধে ফুলতে লাগল প্রশান্ত—কোন উত্তর দিলে
না।

ওরই মধ্যে বয়সে প্রবীণ গোছের একজন ভিড় ঠেলে

এগিয়ে এসে বললে, মিথির মশাই আপনাকে ডাকছেন, আসুন।

প্রশান্ত বললে, কিন্তু এভাবে অভদ্র গালাগালি করছেন কেন এঁরা!

সবাই হুমকি দিয়ে উঠতেই প্রবীন লোকটি হাত উঠিয়ে একটা ধমক দিলে, এই—চূপ চূপ। একটা কথা কয়েছ কি—যাও নেমে যাও সিঁড়ি দিয়ে—যাও বলছি।

জলের শোতের মত হুড় হুড় করে সবাই নেমে গেল। নেমে তারা সঙ্কীর্ণ উঠোনে দাঁড়িয়ে কোলাহল করতে লাগল।

প্রবীণ লোকটি বললে, আসুন আমার সঙ্গে।

প্রশান্ত বললে, আপনার মিথির মশাইকে আমি জ্ঞানি না—

জানেন না! অত্যন্ত বিষয়ে সে মিনিটখানেক চোখ কপালে তুলে রইল—তারপর একটু হেসে বললে, এ পাড়ার বলতে গেলে উনিই মাথা। পুলিশে কাজ করতেন—এক একটা জেলা চড়িয়ে এসেছেন। ঠুঁর প্রতাপে বাঘে গরুতে একঘাটে জল খেয়েছে। এখনই না হয় রিটারার করেছেন—তবু পুলিশ কমিশনার...

প্রশান্ত অধৈর্যকণ্ঠে বললে, কিন্তু আমি ঠুঁকে চিনি না—উনিও আমায় চেনেন না...

বিলক্ষণ। তোমরা ঠুঁকে না চিনতে পার—কিন্তু ঠুঁর চোখ এড়িয়ে কাকে পক্ষীতে কিছু করতে পারে না—তা মানুষ তো মানুষ! আসুন আসুন।

প্রশান্তর দ্বারা দেখা গেল না। ঘরের মধ্যে গিয়ে বসলে সে। বললে, আমায় বোধ হয় আপনি ভুল করছেন—এ বাড়ি আমি ভাড়া নিই নি—ঠুঁর প্রতিবেশীও নই আমি। আমাকে উনি ডাকতেই পারেন না।

এই কথায় লোকটির চৈর্যচৈর্যি ঘটল। দাঁত মুখ খিঁচিয়ে চীৎকার করে উঠল সে, বটে—ইয়ারকি পেয়েছ। বাড়ি যদি তোমার নয় তো কি সুবাদে এখানে আস বলতে পার বাপু? মজা লুটতে বুঝি?

ঠুঁর চীৎকারে নীচের লোকগুলি কলরব করে উঠল, কি হ'ল মেজদা—আমরা যাব কি?

মেজদা গলা বাড়িয়ে বলল, না। প্রশান্তর পানে ফিরে বললে, সোজা আঙুলে খি ওঠে না জানি। তার ব্যবস্থাও করা আছে। বলি যাবে কি যাবে না?

প্রশান্ত কোন উত্তর দিলে না।

মেজদা গলা বাড়িয়ে বললেন—ওহে কালীপদ—রায় সাহেবকে বল যে বাবু যাবেন না। তিনি যেন এর ব্যবস্থা করেন। আর শোন—পুলিস না আসা পর্যন্ত তোমরা পাহারা দাও—কিছু যেন সরাতে না পারে।

প্রশান্ত বিদ্রোহে সোজা হয়ে দাঁড়াল। বললে—বাড়ি সার্চ করাবেন মানে?

মানে—রায় সাহেবের গেছন দিকেও দুটো চোখ আছে। তার নাকের ওপর বসে তোমরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করবার মতলব জাঁটবে—সেটি বড় সোজা কথা নয়। ঠুঁর নিজের একটা দায়িত্ব নেই?

প্রশান্ত বললে, আমি যদি ঠুঁর সঙ্গে যাই তা হলেও বাড়ী সার্চ হবে?

লোকটি আড়চোখে প্রশান্তর পানে চেয়ে মনে মনে হাসলে। হাঁ ঠিক জায়গাতেই পড়েছে আঘাতটা। সে অত্যন্ত উদাসীন ভাবে বলল—বাড়ী সার্চ করা-না-করা রায় সাহেবের ইচ্ছা। তোমার ইচ্ছা না হয় যেও না।

এ বাড়ীর মালিক না আসা পর্যন্ত আমি কোথাও যেতে পারি না—আপনি সার্চ ওয়ারেন্ট নিয়েই আসবেন।

লোকটি এই কথায় দমে গেল—কিন্তু মুখে বলল—আচ্ছা যাছ—তুঁদের মুখে বাক কতক্ষণ সোজা না হয় দেখা যাক।

ওঘরের জানালাটার টুক টুক করে শব্দ হতেই লোকটি বললে—গ্যাট হয়ে বসে থেক না যাছ—মেয়েরা ডাকছে তোমাকে।

প্রশান্ত উঠে গেল। শুভার মা উদ্বেগে আকুল হয়ে উঠেছেন—ওকে দেখেই কেঁদে ফেললেন, তাই ত বাবা—কি হবে!

তয় নেই, কিছুই হবে না। প্রশান্ত ঠুঁকে আশ্বাস দিলে।

না বাবা—তুমি এঁদের জান না। আমাদের অবস্থা খারাপ হওয়া ইন্তক ঠুঁরা কম গণ্ডগোল করছেন না। এখন তো বাড়ীতে ঢিল পড়া বন্ধ হয়ে গেছে তবু।

বলেন কি—এরা আপনাদের প্রতিবেশী।

শুভার মা বললেন—প্রতিবেশীদের মত বন্ধুও নেই—শত্রুও নেই।

ও মশাই—বলি জমে গেলেন নাকি? মেজদার কর্কশ কণ্ঠ শোনা গেল।

শুনছ তো বাবা—আমাদের পুরুষ অভিভাবক কেউ নেই বলে—ওরা যা খুসি তাই অর্পমান করে। শহরের লোক-গুলো—

প্রশান্ত বললে—দোষ শহরের লোক বলে নয়, এক শ্রেণীর লোক আছে যারা এই ধরনের।

শুভার গলা শোনা গেল—কি চান আপনারা? কাকে চান? বিনা অহুমতিতে বাড়ী ঢুকেছেন, আইন জানেন না?

ভীড় মনে হ'ল—উঠোন থেকে পথের দিকে সরে গেল। সেই সঙ্গে শাসানিও কানে এল। আচ্ছা—আইন আধারাও জানি। দেখাচ্ছি—দাঁড়াও।

শুভা গলির প্রান্ত থেকে তীক্ষ্ণ গলায় বললে—চলুন তো আপনাদের রায় সাহেবের কাছে—

প্রশান্ত বারান্দায় এসে দেখলে—মেজদা নেই—উঠোনেও

কেউ নেই। সত্যিই কি শুভা রায় সায়েবের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে গেল। এতগুলি লোকের বিরুদ্ধে ও একা যুঝবে কি করে? যাদের ভদ্রতার বালাই নেই—তাদের কাছ থেকে ও কি-ই বা প্রত্যাশা করতে পারে। একটা বিক্রী রকমের ব্যাপার না ঘটে।

ও তাড়াতাড়ি নেমে বাড়ীর বাইরে এল।

বাইরের জনতা অভদ্র ভাবে চৌচিয়ে উঠল—মাগিকজোড় দেখেছিস—মাইরি।

শুভা ঘাড় ফিরিয়ে বললে—তুমি আবার কেন এলে প্রশান্ত?

রায় সায়েবকে দেখতে। যুহু হেসে সে উত্তর দিলে।

ভাল করলে না। সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়ে শুভা হন্ হন্ করে এগিয়ে গেল।

১৬

বৈঠকখানা দেখে মনে হয়—রায় সাহেব ছ'হাতে উপার্জন করেছেন। যে লাইনে চাকরি করতেন,...সে লাইনের সততাকে সাধারণে ভুলেও সত্য বলে মনে করে না অথচ সাধারণের চাটুবাদে তাঁর বৈঠকখানা দিন রাত যে মুখরিত থাকে—ক্ষমতার শিখর থেকে নেমে এলেও আজ সে প্রমাণের অভাব হবে না। খেতাঁব আর চাকরী—দুইই পার্থিব নিরাপত্তার মন্ত বড় সহায়, এ কথাটা সাধারণে বোঝে। তারা আরও বোঝে মরা হাতি লাখটাকা—এ প্রবাদ বাক্যের সার্থকতা রায় সাহেবের পদমর্যাদায় নিহিত। ওঁর একটি কথা—গুরুত্ব বহুদূরপ্রসারী।

খাটো চৌকির ওপর ঢালা ফরাস পাতা আসর। কয়েকটা তাকিয়া এদিকে ওদিকে গড়াচ্ছে—নক্সা-কাটা হুকোদানে একটা হুকো—আর একটা হুকো ফিরছে—লোকের হাতে হাতে। গড়গড়ার নলটা কখনও রায় সায়েবের হাতে, কখনও বা তাকিয়ার ওপর—পানের ডাবরে এক ডাবর সাজা পান আর বড় অ্যাশ-ট্রেটা ফরাসের মাঝখানে, চুরোটের ছাইয়ে প্রায় ভর্তি হয়ে গেছে। কাপ ডিস জমতে পায় না ফরাসের ওপর। সময় মত বেয়ারা ট্রেতে করে কাপ সাজিয়ে নিয়ে আসে—আর চা খাওয়া হয়ে গেলে, কাপ ডিস গুছিয়ে নিয়ে যায়।

সবচেয়ে দেখবার জিনিস হচ্ছে ঘরের দেওয়াল। নক্সা-কাটা, সবুজ রঙ দেওয়া দেওয়াল। কিন্তু নানান সাইজের ছবির বাছলো, দেওয়ালটা যেন অলঙ্কারভারগ্রস্তা সেকলে গৃহিণীর মত। রায় সায়েবের কর্মজীবনের গৌরব আর ইতিহাস বহন করছে ছবিগুলি। এগুলি দেখলে মনে হবে—মহাবোধি হলের জাতক-কাহিনী। আজ য়েদভারবহুল ভিটামিন ক্যালসিয়াম পুষ্ট যে দেহখানি তাকিয়া আশ্রয় করে মজলিসের মধ্যমণি-স্বরূপ ঘরের শোভাবর্ধন করছে—ছবিগুলি

তারই পূর্ব জন্মের কাহিনীর মতই লাগে। রাজা-রাণীর ছবির নীচেয় লেখা 'গড সেভ দি কিং'। আর সম্প্রতি পশ্চিমের দেওয়ালে একখানি ছবি যুক্ত হয়েছে—ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ত্রাণ-কারী চার্চিলের। 'অমিক গবর্নমেন্টের চাপে চৌরীগোষ্ঠীসহ তিনি নেপথ্যে অবস্থিত হলেও—রায় সায়েব আশা করেন, সঙ্কট মুহূর্তে আবার তাঁকে মক্কাবতরণ করতেই হবে। সব দেশেই এমন একজন দবরদস্ত লোক সঙ্কট মুহূর্তের পরিত্রাতা হয়ে দেখা দেয়—বিনাশায় চ হুহুতাম আর কি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে ক্ষমতা হারিয়েও ইনি এখনও বেঁচে আছেন।

বৈঠকখানায় আগেই বহু লোক জমা হয়েছিল। শুভা আসতেই—পিছনেও রীতিমত ভিড় জমল।

শুভা স্পষ্ট কণ্ঠে বললে, আপনিই হরিপদ মিত্র—? নমস্কার।

নমস্কার নয়—মনে হ'ল যুক্ত কর বিচ্ছিন্ন হয়ে সজোরে রায় সাহেবের ছুটি গালে পড়ল। ঘরের মধ্যে অথও নিশ্চিন্ততা।

শুভার কণ্ঠস্বর দেওয়াল থেকে দেওয়ালে প্রতিধ্বনিত হ'ল। সে বললে, শুনি আপনি লোকের অজ্ঞায়কে শাসন করেন, পাণীকে শাস্তি দেন। জানতে পারি কি—কোন সাহসে পাড়ার লোকে কোন ক্ষতি বা অপরাধ না করা সত্ত্বেও আমাদের ওপর অত্যাচার করেন? একলা মেয়েছেলের ওপর জুলুম করতে তাঁদের বাধে না—কি লজ্জা হয় না?

দেওয়াল-খড়িটা টুক টুক করে শব্দ করতে লাগল শুধু—রায় সায়েব পর্যন্ত বাক্যহীন বিষ্ময়ে শুভার পানে চেয়ে রইলেন।

শুভা একজন যুবকের দিকে আঙুল উঁচিয়ে বললে, ঐ লোকটি কাল আমায় অভদ্র ইসারা করেছে—আমার বাড়ীর সামনে যখন তখন শিস্ দেওয়া কি সিনেমার গান গাওয়া এটাও বোধ হয় ভয়ানক ভদ্রতার অঙ্গ।

রায় সাহেব এতক্ষণে জলে উঠলেন। তাঁর মনে হ'ল মেয়েটি ধুষ্ট—অসহ্য রকমের প্রগল্ভা। কথাগুলি তাঁকেই উদ্দেশ্য করে বলছে—আর তাঁরই ভদ্রতা নিয়ে ব্যঙ্গোক্তি করছে। গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, যারা নিদোষী কেউ তাদের কোন কথা বলতে সাহস করে না। পাড়ার এত লোক রয়েছে—ভাড়াটে স্থায়ী বাসিন্দা কেউ ত তোমার মত তেড়ে এসে নালিশ করে নি আমার কাছে।

তাঁদের বাড়ীতে পুরুষ অভিভাবক আছেন তাই তাঁদের আসবার দরকার হয় নি।

না—তা নয়। পুরুষ অভিভাবক তোমারও কম নেই—কিন্তু সন্ত্রাস-মর্যাদা বোধ তাঁদের আছে।

কি বললেন? তীক্ষ্ণ কণ্ঠে শুভা প্রশ্ন করলে।

যা বলেছি—সবাই শুনেছেন। গম্ভীর স্বরে বললেন রায় সায়েব। কথা হচ্ছে—কি জান—তোমরা কমুনিষ্ট নয়?

শুভা গ্রীবা উন্নত করে বললে, তাতে কি।

রায় সায়েব বললেন, কম্যুনিষ্টরা সমাজ মানে না ধর্ম মানে না, ঈশ্বর মানে না—

শুভা বললে, যে ঈশ্বর মানুষের অর্থ সঞ্চয়ের নেশাকে বাড়ান—যে ধর্ম একজন মানুষকে দশজন মানুষের মাথায তোলে—সে সমাজ নিয়ে আমাদের মাথাব্যথা নেই।

কিন্তু আমাদের মাথাব্যথা আছে। এই সমাজের মধ্যে বসে তুমি যা খুশী তাই করতে পার না। রায় সায়েব বিচার নিষ্পত্তির ভঙ্গিতে গড়গড়ার নলটি হাতে তুলে নিলেন।

কিন্তু আমাদের সাধারণ নাগরিককে বাধা দেবার কোন অধিকার আপনার নেই।

তাই নাকি। ব্যঙ্গ ভরে রায় সায়েব একটু হাসলেন। সং নাগরিক হও—নিজের মর্যাদা নিজে রাখতে জান—সে তো ভালই। কিন্তু যেখানে পাঁচ জন সং নাগরিক বাস করেন সেখানে ব্রতেন রাখবার আইন নেই...

শুভা চীৎকার করে কি বলতে যাচ্ছিল, পিছন থেকে প্রশান্ত এল এগিয়ে। বললে, কথা কাটাকাটি শক্তি পরীক্ষার পথ নয়। এখানে আর দাঁড়িও না।

রায় সায়েব বললেন, তুমি কে হে? ওর আত্মীয়?

মেজদা বললে ভিড়ের ভেতর থেকে, হাঁ—পরমাত্মীয়। যাকে বলে—হরিহর আত্মা।

একটা হাসির ঢেউ ধরের মধ্য থেকে বাইরে গড়িয়ে এল।

রায় সায়েব বললেন, সামাজিক অনাচার বাদ দিলেও রাজনৈতিক অপরাধ তোমাদের গুরুতর। বাড়ী সার্জ হলই বোঝা যাবে।

আমাদের অপমান করা...

তোমাদের আবার অপমান। পথের ঘেঁষা কুকুরকে লাঠি পেটা না করলে নিজের বিপদ—জান ত।

আবার একটা হাসির ঢেউ সজোরে আছড়ে পড়ল।

সত্যিই বাড়ীটা সার্জ হ'ল। আপত্তিকর পুস্তিকা দুই একখানা পাওয়া গেল—প্রশান্তর পকেট থেকে বেরুল একটু আগে লেখা কাগজখানা। সেটা মারাত্মক প্রমাণ না হলেও প্রমাণ ত বটে। তা ছাড়া সম্পূর্ণ অনাচারী যুবক অভিভাবকহীন মেয়েদের সঙ্গে বাস করলে সামাজিক ও রাজনৈতিক দুর্বাসের ভাগী হতে হবেই।

রায় সায়েবের পাশের বাড়ীতে থাকেন স্থানীয় কর—কংগ্রেসের মাথা ধরা লোক। যদিও তাঁর সঙ্গে রায় সায়েবের আদা-কাঁচকলাজাতীয় সম্বন্ধ—তবু সামান্য প্রমাণের জন্ত তাঁকেও আহ্বান করা হল।

আহুত হয়ে তিনি বললেন, কংগ্রেসের সঙ্গে ও পার্টির বহু দিন সম্বন্ধচ্ছেদ হয়েছে। উনিশ-শো বিয়াল্লিশে গণ-যুদ্ধের নামে সরকারকে সাহায্য করেছিল ওরা। আগষ্ট বিপ্লবকে

পর্যন্ত ওরা ফ্যাসি-ষড়যন্ত্র বলতে দ্বিধা বোধ করেনি। কংগ্রেসকে ধ্বংস করবার জন্ত সরকারের হাতে হাতে মিলিয়েছিল যারা—তাঁরা কি কারণে স্বয়ংরাগীর পদ থেকে সরে এল তিনি বলতে পারেন না। কংগ্রেসের কোন গুপ্তনীতি নেই বলেই রাজনীতির চাতুরী বুঝতে তিনি অক্ষম।

শুভা উত্তর দিলে, তা হলে রাজনীতি না করাই ওঁর পক্ষে মঙ্গলজনক।

রায় সায়েব বললেন, দেশে এত যে ধর্মঘর্ষের প্রসার—এর মূলে এরা।

শুভা বললে, হাঁ—ভূভিক্ষে যেমন লক্ষ লক্ষ লোক না খেতে পেয়ে কুকুর শয়ালের মত পথে পথে মরে পড়ে ছিল অথচ আঙুলটি তোলে নি আজও তাই হলে ভাল হয়। যুদ্ধের আগেকার বাক্যের ফিরিয়ে আনুন না রায় সায়েব।

ফিরিয়ে আনবার মালিক যেন আমরাই।

তবে কম খেয়ে একটু কম চর্পিত জমান দেহে—তাতেও গুটি কয়েক লোক বাঁচবে। একটি ছোকরা ভিড়ের মধ্য থেকে মন্তব্য করলে। হাসির উচ্চরব উঠল।

কর্ণমূল আরক্ত হয়ে উঠল রায় সায়েবের। পুলিশ অফিসারের পানে চেয়ে বললে, আপনার কাজ করুন—এদের—

পুলিস অফিসার রায় সায়েবকে একান্তে ডেকে চুপি চুপি বললেন, এত অল্প প্রমাণে ওদের অ্যারেস্ট করা যাবে না। তা ছাড়া—আরও ফিস ফিস করে তিনি কি সব বললেন।

রায় সায়েব বিষন্ন হয়ে বললেন, যা খুশি করুন। তবে—ভদ্রলোকের পাড়া এটা—সবাই যাতে মান-সম্মান নিয়ে বাস করতে পারে...

অবস্থা—অবস্থা, এ ব্যবস্থা নিশ্চয়ই হবে।

ওদের সতর্ক করে—শাসিয়ে ছেড়ে দিলেন তিনি।

এই ঘটনার আর কিছু না হোক—এদের চারদিকে বাইরের পৃথিবীটার স্বরূপ বুঝতে পারা গেল। প্রশান্ত নিজ চিহ্নের দৃঢ়তার সন্ধান পেলে। কোথা থেকে ও শক্তি পেলে অপরিমিত—লাঞ্ছনা অপমান অগ্রাহ করে শুভার পাশটিতে গিয়ে দাঁড়াতে পারলে? দ্বিধা সন্দেহে ছলছিল মন—অকস্মাৎ উৎপীড়নের আঙুনে খাদ নিকাশিত হয়ে খাঁটি সোনার জ্যোতি প্রকাশিত হ'ল। দুর্বলের পক্ষ নিয়ে অন্যায়ের প্রতিবাদ করা যৌবনের ধর্ম বলেই প্রশান্ত নবীন উৎসাহে সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছিল বুঝি?

ভিড় পাতলা হয়ে গেলে প্রশান্ত দেখলে শুভার থেকে সে অনেকখানি পিছিয়ে পড়েছে। শুভার কয়েকজন বন্ধু এসেছিল, তাদের যতলীন হয়ে ও তর্ক করতে করতে এগিয়ে চলেছে। বাড়ির দিকে না গিয়ে ওরা ভিন্ন পথ ধরলে। প্রশান্ত ওদের অনুসরণ করবে কি?

একটি ছোকরা তাঁর কাছে এসে বললে, স্থানীয় বাবু—আপনাকে ডাকছেন—ঐ যে—

অদূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন সুনীতি কর। ওদিকে চাইতেই তিনি হাত উঠিয়ে ডাকলেন তাকে। প্রশান্ত সেই দিকে গেল।

প্রশান্তকে দেখে তিনি বললেন, আমার সঙ্গে একটু আশবেন—মানে আমার বাড়িতে।

প্রশান্তর ইতস্তত ভাব দেখে তিনি হেসে বললেন, ভয় নেই আপনার—আমরা রায় সায়েব-জাতীয় জীব নই—পুলিসের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্কও রাখি না।

প্রশান্ত বললে, পুলিসের সঙ্গে সম্পর্ক রাখলেই বা ভয় করব—এ আপনি ভাবছেন কেন?

না—তাও ভাবি না। আপনাকে ওদের মাঝখানে কেমন মিস্কিটেড মনে হতেই ডাকলাম।

প্রশান্ত অল্প একটু হেসে বললে, চলুন—কোথায় যাবেন। বাইরের ঘরে প্রশান্তকে রসিয়ে সুনীতি কর আর সকলকে বাইরে যেতে বললেন। সকলে বাইরে গেলে বললেন, চা খাবেন?

প্রশান্ত বললে, না—থাক এখন। ঘরের চারদিকে সে কোঁড়হলী দৃষ্টি বুলিয়ে নিলে। তিন-রঙা পতাকা—মুছাঙ্গা গান্ধী, জবাহরলালের ছবি—বন্দেমাতরম গানের চার লাইন তুলোর অক্ষরে কাঁচের ফ্রেমে আটকানো—একটা চরকা—একরাশ তুলো—খানিকটা কাটা সূতো জড়ানো রয়েছে লাটাইয়ে—তার তকলি গোটা কতক পড়ে রয়েছে এলো-মেলো ভাবে। মোটা কথা ঘরটাই এলোমেলো—বিশৃঙ্খল।

সুনীতি কর বললেন, আপনি কত দিন হ'ল যোগ দিয়েছেন ওদের পার্টিতে? মাপ করবেন...

প্রশান্ত বললে, এ অভ্যস্ত সোজা কথা—জবাবও এর সোজা। খুব অল্পদিন হ'ল...

তার কথা শেষ না হতেই সুনীতি কর সোংসাছে মাথা নেড়ে বললেন, আমি তা অনুমান করেছি।

প্রশান্ত বললে, পার্টিতে যোগ দিয়েছি বললে ভুল বলা হবে—ওদের কাজ আমার ভাল লাগে...

সুনীতি কর বললেন, আপনাদের মত দেশভক্ত যুবকদের দেশের কাজ ভাল লাগবেই। কিন্তু কংগ্রেসে যোগ না দিয়ে...

প্রশান্ত হেসে বললে, তাতে আর ক্ষতি কি—ওরাও ত ক্যাপিটালিজমের শত্রু।

সুনীতি কর হাসলেন। জানালার ধারে উঠে গিয়ে গলাটা পরিষ্কার করে চেয়ারে এসে বসলেন। বললেন, জাতিধর্ম-নির্বিশেষে কংগ্রেসই হচ্ছে একমাত্র প্রতিষ্ঠান যার শক্তিকে শাসকরা স্বীকার করেন।

প্রশান্ত বললে, তাই বা কেমন করে বলি। মুসলিম লীগকে বাদ দিয়ে তা হলে ইন্টারিম গবর্নমেন্ট গঠিত হ'ত।

সুনীতি কর বললেন, কিন্তু একথাও ত এ্যাটিলি ঘোষণা

করেছেন—মেজরিটির অগ্রগতি মাইনরিটি বন্ধ করতে পারবে না।

প্রশান্ত বললে, তা হলে—কংগ্রেস যখন ১৫ই মেয় ভাঙ মেনে নিলে—তখন লীগকে এর মধ্যে পুরে দেবার চেষ্টা করছেন কেন?

সুনীতি কর বললেন, এই চেষ্টার মধ্যে আমরা দেখছি ব্রিটিশ ডিপ্লম্যাসি। গান্ধীজী বলেন—ওদের আন্তরিক ইচ্ছাকে বিরুদ্ধ করে ধরা সত্যাগ্রহীর নীতিতে বাধে।

আপনি কি মনে করেন?

সুনীতি কর বললেন, ব্যক্তিগত মনে করা-করির কোন মূল্য নেই—আমাদের চেষ্টা যাতে সফল হয়—সমবেত ভাবে সেই চেষ্টা করাই হ'ল ঠিক পথ। একটু থেমে বললেন, তুমি বুদ্ধিমান—একথা নিশ্চয় বুঝেছ গান্ধীজী আশাবাদী। রাজনীতির ক্ষেত্রে আশাবাদ হ'ল সবচেয়ে দামী কথা।

সুবিধাবাদ বলতে পারেন। প্রশান্ত হাসিল।

যাই হোক—এখন কথা হচ্ছে ক্ষমতা যা হাতে পাচ্ছি তা আদায় করে নিয়ে আরও ক্ষমতা লাভের চেষ্টা করা উচিত নয় কি। আর তা করতে হলে—একটি শক্তিশালী দল গড়া উচিত—সব শক্তিকে এক জায়গায় এনে—অর্থাৎ সহযোগিতার দ্বারা ক্ষমতা লাভ...

প্রশান্ত বললে, তা হলে কোন দলকে বাদ দিলে চলবে না। মাইনরিটি বলে কাউকে অগ্রাহ করে সর্বভারতীয় শাসন-পরিষদ গড়া যাবে না।

কংগ্রেস ত আপোষের জন্য বহুদূর এগিয়েছে।

বাজারদর কষাকষিকে এগুনো বলা ঠিক নয়...

সুনীতি কর বিচলিত কণ্ঠে বললেন, তা হলে—পাকিস্তান কায়ম হোক ভারতবর্ষে এটিই চাইব আমরা। দ্বিতীয় অল্টার কি প্যালেস্টাইন গড়ে ওদের সুযোগ দেব অছিগিরির?

প্রশান্ত বললে, মিশরও কত দিন আগে এই শাসন-সংস্কার মেনে নিয়েছিল—কিন্তু ব্রিটিশ সৈন্য অপসারণের কথা উঠলে জাতির নাবালকত্ব নিয়ে আজও তর্কবিতর্ক হয়। মাপ করবেন কর-মশায়—যাঁরা আমাদের সং ছেলে দেখে ভাল চরিত্রের সার্টিকিফিকেট দেবেন—কিংবা সাবালক বলে ঘোষণা করবেন—তারা যে জীবন-মরণের স্বার্থে জড়িয়ে আছেন এর মধ্যে। আমরা সুবোধ হলেও—তাদের নির্বুদ্ধিতা কোন দিন প্রকাশ পাবে না।

সুনীতি কর বললেন, তা হলে বলছ নানান দলে নানান মতে ভাগ হয়ে থাকব আমরা। আমরা যুদ্ধ করব কিন্তু একতার নীতি মানব না। বলব স্বাধীনতা চাই—অথচ রকম রকম শাসনতন্ত্র রচনা করব। হঠাৎ তিনি বললেন, কংগ্রেসকে শক্তিমান বলে স্বীকার কর কিনা?

করি।

তা যদি কর—হঠাৎ তিনি চেয়ার ছেড়ে প্রশান্তর সামনে

এসে ওর একখানা হাত চেপে ধরলেন; তা হলে কংগ্রেসে যোগ দিতে তোমার আপত্তি কি।

প্রশান্ত কোন কথা বললে না। খানিক নীরবে ওঁর মুখের পানে চেয়ে হাতখানি তার মুক্ত করে নিলে। বললে, আমাকে মেধার করে নেবার জন্ত আপনার এই চেষ্টাকে স্নেহ বলেই মানছি—কিন্তু...

এর মধ্যে কিন্তু নেই—তুমি মাত্র অল্পদিন হ'ল এ পাড়ায় যাওয়ায় করছ—ছনামকে ভয় করতে বলছি না—কিন্তু অসত্যকে ঘৃণা করবে না কেন। সব বাঁধন কাটা মানেই স্বৈরাচার নয় এ যেমন স্বীকার কর তেমনি বাঁধন না কেটেও কলুষিত আবহাওয়ার সৃষ্টি করা যায় এটাও মান তো?

প্রশান্ত কিছুই না বুঝে ওঁর পানে চেয়ে রইল। এ কথা বলার তাৎপর্য কি?

স্বনীতি কর বললেন, ওই মেয়েটির সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছি। রায় সায়েবের মত নীতিবাগীশ আমি নই—তবু ওদের সমর্থন করতে পারি নি।

মাহুঘের রচনা সব সময়ে সত্য হয় না।

স্বনীতি কর বললেন, প্রমাণ দেওয়াটা আমার পক্ষে শক্ত নয়, তবে সম্মানজনক নয় বলেই তা দেব না। ওদের বাড়ির ছুখানা বাড়ি পরে—শৈলেশ্বর বোস থাকেন—তাঁর ছেলে মর্ট—নিজের কথায় অসঙ্গতি বুঝতে পেরে তিনি সহস্রা চুপ করলেন।

প্রশান্ত উৎসুক হ'ল যথেষ্ট। শুভা সম্বন্ধে—নিজেই সে নিঃসংশয় গীড়া অনুভব করে কেন? একান্ত করে পাওয়ার মধ্যেই কি এই ঈর্ষাবাদ লুকানো থাকে। পুরুষের সম্পত্তি নারী—এই পৌরুষ বোধের উগ্রতায় তার যুক্তি হয়েছে আবিল। নারীচিত্ত জয়ের সাধনা আর কিছুই নয়—ধন সঞ্চয়ের নেশার মতই এক অর্দ্রিম প্রবৃত্তি।

চেমার ছেড়ে উঠতেই তিনি বললেন, কিছু মনে করলে না তো ভাই।

প্রশান্ত মুক্ত চোখে তাঁর পানে চেয়ে মাথা নাড়লে। এই মিষ্ট সম্বোধনের পর মনে করাচ লে না কিছু। ইচ্ছে হ'ল পা ছুঁয়ে একটি প্রণাম জানিয়ে আসে। লজ্জার সঙ্কোচে তাও পারলে না।

১৭

অগমনক হয়ে পথ চলছিল প্রশান্ত। মনের মধ্যে বিচার চলছে—কোনটা শ্রেয়। উনিশ-শো বিয়াল্লিশের আগষ্টে বোম্বাইয়ে 'কুইট ইন্ডিয়া' প্রস্তাব পাশ হবার পরমুহুর্তে জেলের ফটক খুলে গিয়েছিল—আন্দোলন চালাবার মত বাইরে ছিলেন না কেউ। গেল বার এমনি সময়ে জার্মেনী ভেঙ্গে পড়েছিল—জাপানের বুক লক্ষ্য করে প্রতিপক্ষ তুলেছিল শক্তি-শেল। তার পর আণবিক বোমার প্রথম পরীক্ষা হ'ল হিরো-সীমার অর্দেক ধ্বংস করে—আর কয়েক লক্ষ প্রাণ আহুতি

নিয়ে। তার পর নাগাসাকিতে হানা দিল যুত্যাচূত; জাপান নতজানু হ'ল। জগৎ থেকে ফ্যাসিবাদ নিঃশেষিত হ'ল। জার্মেনী হ'ল চার টুকরো—জাপান গেল আমেরিকার উদরে। বিশ্বশক্তি-পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হ'ল মার্কিন। কংগ্রেস তখন কারা-প্রাচীরের বাইরে। দেশের মধ্যে তার শক্তি ও প্রভাব বেড়েই চলেছে দিন দিন। নির্বাচন-মুহুর্তে কংগ্রেস হ'ল জয়ী। তার পর ইণ্ডিয়ান কন্সনাল আর্মি (আই, এন, এ-র) দিল্লীর লাল কেল্লায় বিচার হ'ল যার নায়কদের। লোকচক্ষুর সামনে থেকে উঠে গেল রহস্যের স্ববনিকা—দীপ্ত তেজে প্রকাশিত হলেন দেশবন্দিত নেতা সুভাষ বসু। হু'শো বছরের ভুলে-যাওয়া-স্মরণ ফিরে এল কণ্ঠে—অবরুদ্ধ কণ্ঠ ফিরে পেল ভাষা—ধ্যানের দেবতা মূর্তিতে উঠলেন জেগে।

কংগ্রেস ঘোষণা করলেন: আমরা স্বাধীনতার দ্বার-দেশে। সাম্রাজ্যবাদ এখনও তৈরি হচ্ছে শেষ আঘাত দেবার জন্ত। শেষ আঘাতই সেটা, কারণ এর নাতিশ্রাস হয়েছে। সকলে এক হয়ে, ঠেকাও সে আঘাত, ধ্বংস হোক দানবটা।

দানবের মায়্যা, সে বড় ভয়ঙ্কর। রাজনীতিতে সততার স্থান কতটুকু সে বিচার ইতিহাস করেছে বার বার। নৈরাশ্র-বাদ রাজনীতির অঙ্গ নয়। আত্মকের ত্যাগ, আগামী কালের পাওয়ার সন্ধে, লাভ-ক্ষতির জের টানছে। সে হিসাব-নিকাশের জের, এক পাতা থেকে আর এক পাতায়, এক যুগ থেকে আর এক যুগে, টেনে চলেছে সবাই। তার সাক্ষ্য-প্রমাণও আছে ইতিহাসে। ভারতবর্ষ স্বাধীনতার সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে, পথ বেছে নিতে ভুল করলে সে অতলে যাবে তলিয়ে। বিশ্ব-বিপ্লবের ভূমিকায় আজ যারা প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে, নতুন বিশ্ব রচনার স্বপ্ন দেখছেন, তাঁদের সামান্য-তম ভুলও ক্ষমা করবে না মহাকাল। এক হাতে খপ্পর আর এক হাতে বরাভয় শান্তির আশ্বাস জানাচ্ছে। কিন্তু এ বরাভয় বিশ্ব-পালিনীর মাতৃপাণি-প্রসূত নয়, এ বজ্র নিক্ষেপের ভয় দেখিয়ে শান্তি রক্ষার প্রয়াস-মাত্র। চতুর, রাজনীতিবিদ এই শুভ মুহুর্তেই যথাসম্ভব ক্ষমতা বাড়িয়ে নিচ্ছেন; নিরাপত্তার নামে, সাম্রাজ্যের শৃঙ্খলে গেঁথে ফেলছেন, স্বামীহীন ভূমি-ও সমুদ্র-স্বত্ব।

ভাবতে ভাবতে চলেছিল প্রশান্ত। মাথার উপর কখন ঘনিয়ে এসেছে মেঘ, ও টের পায় নি। বর্ষাকালের আকাশ, বিনা সতর্কতার বর্ষণ ওর রীতি। হঠাৎ বৃষ্টি চেপে এল। পথের ধারে বড় মত একটা গাড়ী-বারান্দার নীচেয় ছুটে ছুটে আস্রয় নিলে, মাহুঘ আর পশু। বায়ুবেগে বৃষ্টির ছাঁট যতই অগ্রসর হচ্ছে, মাহুঘ আর পশুতে ততই জমাট বাঁধছে।

কি দাদা, রেলোয়ে ঠ্রাইকটা আর হ'ল না?

না—সাড়ে চার টাকা ইন্টারিম রিলিফ দেবে, গ্র্যাড-জুডিকেশনে কতক বিষয় যাবে। পয়লা জাহ্নুয়ারী থেকে মাইনে বাড়বে।

তবে আর কি, সাড়ে চার টাকায়, সব দুঃখ হরিপাল যাবে তো ?

আমাদের পোষ্টাল ষ্ট্রাইকের ঠেলাটা বুঝবে। এ আর রেলোয়ে ইউনিয়ন নয়, রীতিমত হাংরি ব্যাচ পরিয়ে ষ্ট্রাইক নোটিশ দেয়া হয়েছে।

ট্রাম কোম্পানী কি বলে ?

সে দিন যুনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে আমাদের মীটিং হবে—কলেজ স্কোয়ারে ছুঁদলে দেখা। খুব ইনকিলাব জিন্দাবাদ করা গেল। ওরা বললে, দাবী ছেড় না তাই, হুমকি চালাও। লাখ লাখ টাকা কামিয়ে গ্যাট হয়ে বঁসে থাকবে কোম্পানী, ইয়ারকি আর কি।

হবে কি, রক্তারক্তি কাণ্ড।

এমনিতেই না খেতে পেয়ে মরচি, না হয়—

শুনেছ দাদা, মুসলীম লীগ মন্ত্রী মিশনের খসড়া বাতিল করে দিলে।

কাগজে বেরিয়েছে ?

দেখো আমার কথা যদি সত্যি না হয়—

দুস—তোরা সব ক্ষুদ্রে সত্যগীর কিনা ! বাতিল করাই উচিত। এ, বি, সি এপু করে ভারতবর্ষকে চুকরো করে ফেলতে পারলেই তো—আরও দুশো বছর রে দাদা।

একটা পাওয়ারফুল সেক্টর—

দুস—পাওয়ারফুল ! পলিটিক্স এ আমরা তো নাবালক রে দাদা। ওদের বুঝতে পারবি। বলে এক একটা আইনের ভাষা বুঝতেই রড় বড় মাথা সব ঘুলিয়ে যাচ্ছে। দশ-বারো দিন ধরে মীটিং করে তবে রেজলুশন পাশ করছে। আমাদের মত গোলা লোকরা কি করবে শুনি ?

বাইরে যাবার উপায় নেই—খোলা গাড়ী বারান্দার নীচে—সাধারণের রাজনীতির বিতর্ক জমে উঠল। বেশিক্ষণ চলল না রাজনীতি। মাছ, আনাজপাতি, সরষের তেল, আপিসের মাইনে, এইসব স্তরে নেমে এল বাদানুবাদ। প্রশান্ত স্বীকার করলে, এই স্তরেই আলোচনা বাস্তব রূপ পেয়েছে। স্বাধীনতার অর্থ সাধারণে বোঝে এই মাপকাঠির সাহায্যে। যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত দেশগুলিতে প্রাণ ধারণের সমস্তা এমন তীব্র হয়ে উঠেছে কি ? হাজার হাজার লোককে বেকার বানাবার আয়োজন চলেছে। তারা বলছে এ কি সর্বনাশ ! এ জগতে আমাদের টিকে থাকবার অধিকার দাঁও। তোমাদের জন্ত আমরা সর্ব্ব দিয়েছি—আর তোমরা—

বিক্ষোভ এই কারণেই প্রবল হয়েছে।

জীবন বাঁচাবার কোন পথ ? পেটে না খেয়ে বিপ্লব আনা সম্ভব কি ? ঝানি—বেয়নেটের সামনে বুক পেতে দিলাম, লাঠি চার্জকে উপেক্ষা করলাম। উত্তেজিত মুহুর্তে প্লোগান আউড়ে গলা ভেঙ্গে ফেলে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াতে বুক এক-

বারও কাঁপল না। কিন্তু এই মৃত্যু—! অন্ন-বঞ্চনার অভিনয় বস্ত্র-বঞ্চনার নীতি অন্তরালে চলছে সমৃদ্ধ জীবন-প্রবাহ কোটিকে মেরে গুটির অতিকায় হবার সাধনা—এর প্রতিকার কোথায় ? শুধু মীটিং করে ঈর্ষান্বিত প্লোগান আউড়ে তাল বুকে অত্যন্ত অসহায়ের মত পথ দিয়ে শোভা যাত্রা করে গেলেই কি ধনিকতাবাদ বিপন্ন হবে ?

একদিন শুভার সঙ্গে এই নিয়ে কিছু আলোচনা হয়েছিল। ও বলেছিল, ছলে বলে অথবা কৌশলে—এই নীতি নিতে হবে। উপার্জন প্রাণ বাঁচাবার জন্ত করতে হবে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কাছ থেকে সাহায্য নিয়েছিল তোমরা।

নিয়েছি তো। পুঁজিবাদ ধ্বংস করবার সঙ্কল্প আমাদের—শক্তি সঞ্চয়ের দরকার নেই ?

কিন্তু নীতিবিরুদ্ধ।

আমাদের নীতি হ'ল বেঁচে থাকা ও বাঁচিয়ে রাখা। ক্ষমতা লাভ হ'ল আসল বস্ত। ভাল কথারও দাম থাকে না—জীবনের সঙ্গে যদি তার তাল না মেলে।

যথা ?

‘পরদ্রব্য অপহরণ করিও না’—সর্বোত্তম নীতিকথা। কিন্তু অনাহারওস্তের কাছে এ নীতির কোন দাম নেই।

তা বটে—আমাদের কোন নেতা সেদিন বলেছেন ক্ষুধার্ত মানুষকে ভগবানের নাম দিয়ে ভোলান মিছে। কিন্তু এই ভাবে চেষ্টা করে ওদের শাসন করতে পারবে ?

শুভা হেসেছিল, ভুল বুঝো না প্রশান্ত—প্লোগান আর কিছুই নয়, সকলকে এক করার মন্ত্র। শোভাযাত্রার অর্থও হ'ল শুই। ধনী তার সব ক্ষমতা দিয়েও এ শক্তিকে ঠেকাতে পারবে না।

আমাদের দেশে—ধনীরা এতে কৌতুক বোধ করে না কি ?

হাঁ, তাদের আশ্রয়দাতা হ'ল সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। গুলি-গোলা রাইফেল মেসিনগান বোমারু নিয়ে ওদের দস্ত। সংশয় এই নিয়ে তো ?

শুধু প্রাণ দিয়ে লাভ কতটুকু...

শক্তি—শক্তি প্রশান্ত।

ওর হাসিতে প্রশান্ত কৌতুক বোধ করেছিল। কিন্তু সে দিন আর এই দিনে তফাৎ অনেকখানি। ময়লা ছেঁড়া ধূতি কামিজ পরে খালি পায়ে এক মাথা রক্ষা চুল উড়িয়ে—শিরা আকীর্ণ-শীর্ণ হাতে নিশান দোলাতে দোলাতে প্রাণ ধারণের দাবি জানিয়ে চীৎকার করতে করতে রাজপথ দিয়ে যায় যে সব ছন্নছাড়া দুর্গতের দল তারা আজ শ্রোতের মুখে ঝাঙলা কিংবা ঝড়ের মুখে তুলো নয়। তারা জন্মান্তরের পাপকে অস্বীকার করে আর অদৃষ্ট মানে না। নিজের কন্ঠের ফল পুরোপুরি ভোগ করতে চায়। ছাংলা কুকুরের মত ছুঁচুকরো মাংস বা হাড়ের লোভে লাজ নেড়ে ছুটে আসে না আমাদের

খিড়কীর ছুরোরে। হাঁ, শক্তি ওরা লাভ করবে ক্রমশঃ। ওদের চীৎকারে কঁপে উঠছে প্রাসাদ-ভিত্তি—মর্ম্মর হর্ম্মোর সুখশয্যাপ্রিত লক্ষীর ছালালরা। ইতিহাসের পাতার সোনার অক্ষরগুলো অস্পষ্ট হয়ে এল। দিন আগত ঐ।

সামনে দিয়ে একটা ছোট মত শোভাযাত্রা গেল। কোন্ ময়দাকলের না-পটারির শ্রমিকরা অভিযোগ জানাচ্ছে। কুড়ি টাকা মাইনেতে এরা দুদিন আগেও মালিকের সেবা করেছে, মাগি ভাতা স্বরূপ চেয়েছিল আর পাঁচটি টাকা। মালিক সাফ জবাব দিয়েছে। যুদ্ধের বাজারে তার এক লাখ দশ লাখে দাঁড়িয়েছে—সুতরাং মাসখানেক কারখানা বন্ধ রেখে এদের দাবিকে নরম করবার আশা সে করবে না কেন! শ্রমের মূল্য শ্রমিকদের জীবন ধারণ করবার জন্ত দেওয়ার রীতি নেই। ওরা বেশী চীৎকার করলে—কারখানার একাংশে একটা বরে ডাক্তারখানার ব্যবস্থা হয়—একটা ইকুল বস্তির মাঝখানে খুলে দেওয়া হয়—আর সামান্য মাত্র কনসেশনে রেশন দেওয়ার প্রথা চালু করা হয়।

ছিটেফোঁটা দাক্ষিণ্যে—আকাশ-জোড়া দারিদ্র্য নিবারণিত হয় না। শ্রমিক দেখায় ধর্ম্মঘটের হুমকি—ধনিক কাগজে বার করে তার দাক্ষিণ্যের সুবিস্তৃত বিবরণ। জনসাধারণ নামক এক তৃতীয় পক্ষের সহায়ভূতি আকর্ষণ করবার জন্ত এই প্রচেষ্টা। জনসাধারণকে ভয় করবার বেতু—ওদের কাছ থেকে তিল কুড়িয়ে এরা তাতে পরিণত হয় পাছে। মুনাফার নেশা যার লেগেছে—তার মোতাজুতু সে ছাড়বে কেন। শক্ত মুঠো খুলবার জন্ত হাতুড়ির বা পড়বে দমাদম—এ যুদ্ধে কেহ নহে উন।

—হুনিয়ার মজদুর এক হও—ইনকিলাব জিন্দাবাদ।

পথে দেখা হয়ে গেল পুরোনো এক বন্ধুর সঙ্গে। জলে ছপ ছপ করতে করতে কোথায় চলেছে হে? বন্ধু জিজ্ঞাসা করলে।

কোথায় জানে না সে। কলকাতার নতুন রূপ হুঁচোখ ভরে দেখতে দেখতে সে চলেছে। সিনেমার গেটে তেমন ভিড় নেই, দোকানের পণ্যে নেই বৈচিত্র্য—ক্রেতার চোখে নেই ক্রয়ের কৌতূহল। যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর শান্তি—স্বস্তি বচন উচ্চারণ করলেই আসে না।

বন্ধু ওর পথ রোধ করলে। চল—চা খেয়ে আসি। চলতে চলতে বললে, কোন আপিসে কাজ করিস? রিট্রেক্-মেন্টের কাঁচির পাশ বেঁসে আছিস তো?

না—ওসব বাল্যই নেই।

সাবাস—। ধর্ম্মঘটের পাকে পড়বিনে তা হলে।

ধর্ম্মঘট খারাপ কিসে? ও জিজ্ঞেস করলে।

খারাপ বলছি।...বন্ধু শব্দ করে হাসলে। ধর্ম্মঘট কারও কারও কাছে শাপে বর। হাসি থামিয়ে বললে, ধর্ম্মঘটের আগে পাচ্ছিলাম আশী—পরে দুশো যোগ হয়েছে। অথচ

ধর্ম্মঘটীদের সঙ্গে পথে পথে হলা করে বেড়াই নি—ওদের ইউনিয়নে এক পয়সা ঠেকাই নি—

প্রশান্ত বললে, ব্ল্যাক শিপ।

না—তাও নয়। শুধু প্রমাণ করে দিয়েছি—আশী টাকাতেও আমার দিব্যি বলে—ফলে দুশো টাকা মাইনে বেড়ে গেল। এটা সত্যি কথা বলার পুরস্কার...আরে ওদিকে কোথায়?

এই দিকেই যাব।

চা খাবিনে?

প্রশান্ত ততক্ষণে অনেকখানি এগিয়ে গেছে।

হাঁ, এরাও আছে। বেশী মাত্রায় হত্যা আছে। এরা সর্বদাই সুযোগ খুঁজছে—নিজেকে সংসারে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার সুযোগ। এদেরও নেশা জমেছে। ক্ষমতা-মদের কিংবা ধন-মদের নেশা।

আর একজন বন্ধুকে মনে পড়ল। গেল বার কি যেন এক প্রতিবাদ-সভায় যেতে লাল ঝাণ্ডা ধরে অপরিমিত চীৎকার করতে করতে শহর প্রদক্ষিণ করেছিল সে। তার পর সে হ'ল এক ইউনিয়নের নেতা। তার পরে নিলে রেল আপিসে চাকরি। সেখানকার ইউনিয়নে দাঁড়াল পাণ্ডা হয়ে। এক সপ্তাহ আগে দেখা হয়েছে তার সঙ্গে। পায়ে চকচকে জুতো, পোষাক-পরিচ্ছদ কণ্টোলে কেনা নয়, রীতিমত সুট-পরা—নেকটাই জাঁটা, হ্যাট বগলে, যুখে প্রকাণ্ড বন্দী, হাতে ইংরেজি কাগজ একখানা। নড় করে বলেছিল, একটা শুভ সংবাদ দিচ্ছি...ডিপার্টমেন্টে অ্যাসিট্যান্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট অবজ অফিসিয়েট করছি চ—চা খাবি।

চা ধীরে প্রবৃত্তি হয় নি প্রশান্তর, বন্ধু এতকাল যা করেছে—তা নদীপারের আরোহণ মাত্র। শ্রমিকরা যা চায়, ও চেয়েছিল তাই। ভাল ধাকা, ভাল খাওয়া, পোষাক-পরিচ্ছদে সাজল্য জীবনের চারিপাশে প্রাচুর্য। কিন্তু—প্রবৃত্তির সীমা টানছে কে? সে অস্বস্তি টানতে পারে নি। সাধারণকে ডিঙিয়ে ও তাই অসাধারণ হতে পেরেছে।

হাঁ এরাও আছে। যাত্রাপথের অনেক বাধা—লক্ষ্যে পৌঁছানোর বিলম্বিত পদক্ষেপ। চলতে চলতে হাতছানি দিয়ে ডাকে প্রাসাদ, মোটর তার সুখাসনের গর্ভে ফুটিয়ে তোলে যাত্রা-বিরতির স্বপ্ন। এরা ভিন্ন শ্রোতে ভিন্ন দিকে ভেসে গেলে কোন ক্ষতি ছিল না—তবে সাধারণ শ্রমিককে প্রচণ্ড আঘাত দিয়ে অবিশ্বাস আর সন্দেহকে খাড়া করে যাত্রা-পথ বিদ্রিত করে—এই তো ভয়ের কথা।

অবশেষে পুরাতন মেসে ফিরে এল সে। বন্ধুরা অবাক হয়ে বললে, এ ক'দিন ছিলে কোথায় হে?

প্রশান্ত বললে, রান্না না হয়ে থাকে তো ঠাকুরকে বল—খাব এ বেলা। শোবার জায়গা পাবি তো?

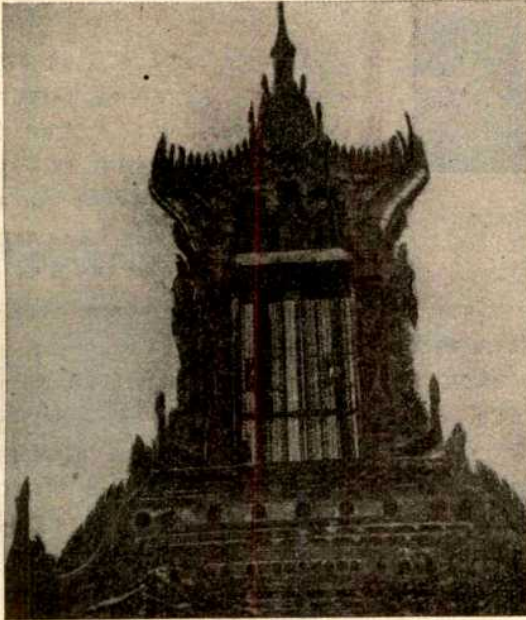
সুশীল বললে, সেজ্ঞে ভাবতে হবে না—আমার সীটেই কুলিয়ে যাবে খন। একখানা চিঠি এসেছে—ক'দিন আগে।

ব্রহ্মদেশের স্বাধীনতা লাভ

শ্রীসুবোধচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

এক শতাব্দীর উর্দ্ধকালের পরাধীনতার নাগপাশ ছিন্ন করিয়া গত ৪ঠা জাহুয়ারী ব্রহ্মদেশ পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। একারণ এই দিনট ব্রহ্মদেশের ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিবস। যে স্বাধীনতা-স্বর্ষা ব্রহ্মদেশের পশ্চিমাকাশে দীর্ঘ ১২৩ বৎসর পূর্বের অন্ত গিয়াছিল গত ৪ঠা জাহুয়ারী তাহা সেদেশের পূর্বাকাশকে নানা বর্ণে ও আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া পুনরায় উদ্ভিত হইয়াছে। এশিয়ার দেড় কোটি নরনারীর অঙ্গ হইতে পরাধীনতার কঠিন ও কঠোর শৃঙ্খল খসিয়া

ভারত ও পূর্ব-এশিয়ায় সাম্রাজ্য বিস্তারে অগ্রসর। ব্রহ্মদেশের ভিতর দিয়াই তখন ভারতবাসী এক দিকে চীন ও অপর দিকে ঞ্চাম ও মালয়দেশের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করিয়া আসিতে-



রাজা থিবোর কাঠ-নির্মিত সিংহাসন

পড়িয়াছে। আজ তারা আনন্দে আত্মহারা। কারা-প্রাচীরের অন্তরালে, ব্রহ্মের যে শুধু আত্মারই অপমৃত্যু হইয়াছিল তাহা নয়, যুটেন ব্রহ্মবাসীর দেহকে পিষ্ট ও নিপীড়িত করিয়া সর্ব-প্রকারে তাহার রস শুষিয়া লইয়াছিল। এই স্বাধীনতা প্রাপ্তিতে ব্রহ্মবাসীর আত্মার মুক্তিলাভ হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার দেহের বিমুক্তি কবে হইবে তাহা এখনও অজ্ঞাত। ব্রহ্মবাসীগণের তৈল ও বনিজ সম্পদ, স্বহং ব্যবসায় ও বাণিজ্য আজ স্বাধীনতা লাভের পরও বিদেশীর করতলগত। তার ঘানবাহন চলাচলের উপরও তার একান অধিকার নাই।

সে আজ প্রায় দেড় শত বৎসর পূর্বের কথা। ভারতের ভাগ্যা-কাশে তখন ব্রিটিশ-রাজ উদ্ভিত হইয়া স্বাধীনতা-স্বর্ষাকে গ্রাস করিতেছে। লর্ড আমহার্স্ট ভারতে ব্রিটিশ শক্তির প্রতীকরূপে



ব্রহ্মের শেষ গবর্নর সার হিউবার্ট রয়াল এবং ব্রহ্মের প্রথম সভাপতি সাও সুই থাইক

ছিল। সেই সময় ব্রহ্মদেশে এক শক্তিশালী রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিতেছিলেন আলোম্প্রা নামে এক রাজা। তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ ব্রহ্মের বাহিরেও রাজ্য বিস্তারে অগ্রসর হন। তাঁহারা একে একে আরাকান, মনিপুর এবং আসাম প্রদেশটিকেও তাঁহাদের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লন। আসাম ও আরাকানের বহু আশ্রয়প্রার্থী ব্রিটিশ রাজ্যে আশ্রয় লইয়া সেখান হইতে ব্রহ্মদেশের উপর চড়াও হইবার উত্তোগ করে। ব্রহ্ম-সেনাপতি মহাবন্দুলও সেই সংবাদ পাইয়া বাংলাদেশ আক্রমণের আয়োজন করেন (১৮২৪)। বাংলাদেশ তখন ব্রিটিশের অধীন। সুতরাং ব্রিটিশ ও ব্রহ্মবাসীর মধ্যে যুদ্ধ বাধিল। ব্রিটিশ সৈন্য আসাম অধিকার করিল, কিন্তু আরাকানে রমু নামক স্থানে তাহাদের পরাজয় ঘটে। কিছুকাল পরে ব্রিটিশ সৈন্য রেঙ্গুন অধিকার করিল এবং ব্রহ্ম-সেনাপতি মহাবন্দুল গুলির আঘাতে নিহত



কংগ্রেস সভাপতি শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদ ব্রহ্মের স্বাধীনতা উৎসবে
যোগদান করিয়াছেন

হইলেন। তারপর ব্রহ্মরাজ ব্রিটিশের সঙ্গে এক সন্ধিস্থত্রে আবদ্ধ হইয়া (১৮২৬) আসাম, আরাকান, টেনেসেরিম উপকূল এবং মার্ত্তাবানের কিয়দংশের অধিকার ব্রিটিশকে দান করিলেন। উপরন্তু যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ এক কোটি টাকা দিলেন। তা ছাড়াও তখনকার ব্রহ্মের রাজধানী আভা নগরীতে একজন ব্রিটিশ রেসিডেন্ট রাখা স্থির হইল। এই ঘটনাই ইতিহাসে প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধ নামে খ্যাত।

ব্রহ্মদেশের সঙ্গে দ্বিতীয় যুদ্ধ যখন বাধে তখন লর্ড ডালহৌসী ভারতের বড়লোক। ব্রহ্মে ব্রিটিশ বণিকসম্প্রদায়ের উপর নানারূপ অত্যাচার ও উৎপীড়ন হইতেছে এই অজুহাতে লর্ড ডালহৌসী নৌ-সেনাপতি ল্যান্সাটকে ব্রহ্ম আক্রমণ করিতে পাঠাইলেন। ল্যান্সাট ব্রহ্মদেশের একখানি জাহাজ দখল করিয়া রেঙ্গুন বন্দর অবরোধ করিয়া বসিলেন। তত্রাপি ব্রহ্মরাজ কিছুতেই ইংরেজের সহিত সন্ধি করিলেন না। তখন কৌশলী ইংরেজ উর্দুর পেণ্ড প্রদেশটি অধিকার করিয়া (১৮৫২) চতুরতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিল।

এতদূর করিয়া ইংরেজের লোভ আরও বাড়িয়া গেল। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মের রাজা ছিলেন থিবো। এবার ইংরেজ সমগ্র ব্রহ্মদেশটি ব্রিটিশ করায়ত্ত করিবার সঙ্কল্প করিলেন। এবারও অজুহাত ব্রিটিশ বণিকের উপর ব্রহ্মবাসীর উৎপীড়ন। তদুপরি সন্দেহ হইল—ব্রহ্মরাজ ফরাসীদের সহিত মিশিয়া ইংরেজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের পরামর্শ করিতেছে। এই অহিলায় লর্ড ডাফরিন ব্রহ্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে

রাজধানী মাদ্রাসায় অধিকৃত হইল ও ব্রহ্ম-রাজ থিবো ভারতে নির্বাসিত হইলেন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে সমগ্র উত্তর ব্রহ্ম ব্রিটিশের করায়ত্ত হইল। সংক্ষেপে ইহাই পররাজ্য-লোলুপ ইংরেজের ব্রহ্ম অধিকারের ইতিহাস।

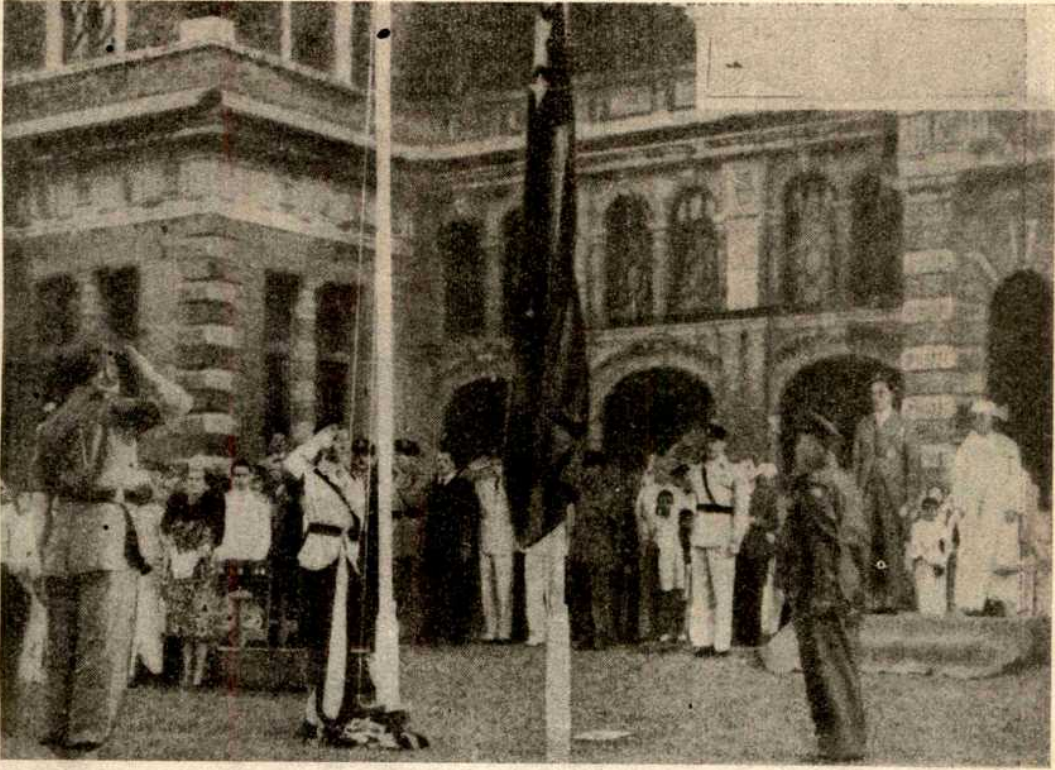
ব্রহ্মদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য, তৈল ও খনিজ সম্পদ, যানবাহন প্রভৃতি যাবতীয় সম্পদ ব্রিটিশ করায়ত্ত করিয়াছিল। সম্প্রতি তাহারা ব্রহ্মের শাসন-ভার পরিত্যাগ করার জনগণের উপর কঠোর নিষ্পেষণের নিবৃত্তি হইয়াছে বটে, কিন্তু ব্রিটিশ শোষণ হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই।

এখানকার প্রচুর ও উৎকৃষ্ট কাঠ-সম্পদ, চাউল ও তৈল-সম্পদ, এখানকার টিন রবার প্রভৃতি প্রথমেই ইংরেজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, তদুপরি এখানকার প্রভূত শিল্পবিষয়ক ও বাণিজ্যিক সম্ভাবনা সম্বন্ধে গোড়ায়ই তাহারা সচেতন হইয়া উঠিয়াছিল। ইংরেজের এই দেশ অধিকার

করার মূল্যে ছিল এদেশের অতুলনীয় খনিজসম্পদ অধিকার করিবার জন্য তাহার লোভ।

ব্রহ্মদেশের জায় এত অধিক পরিমাণ চাউল রপ্তানী পৃথিবীর আর কোন দেশ করিতে পারে না। নদীবহুল ব্রহ্মদেশে ধাতুই প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। কিন্তু অপেক্ষাকৃত রপ্তানী স্থানে গম, বাজরা, ডাল ও তামাক প্রচুর পরিমাণে জন্মে। বনবিভাগ হইতে প্রচুর সেগুন কাঠ বিদেশে রপ্তানী হয়। ব্রহ্মদেশে খনিজ তৈল, টিন, রৌপ্য, সীসা, উলফ্রাস প্রভৃতি পাওয়া যায়। উলফ্রাস যোগে লৌহ হইতে ইস্পাত প্রস্তুত হয়। ব্রহ্মদেশ মূল্যবান প্রস্তর ও মণির জন্মও বিখ্যাত। কিন্তু হুংখের বিষয়, ব্রহ্মের ব্যবসা-বাণিজ্যের শতকরা ৮০ ভাগ আজও বিদেশীয়ে করায়ত্ত। ব্রহ্মদেশ যদি সেই আর্থিক স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে তবেই তাহার প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ হইবে। রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করিয়াও ভারতবাসীর জায় ব্রহ্মদেশ যদি অন্নব্রহ্ম হইয়া থাকে তবে তাহার স্বাধীনতার কোন মূল্যই থাকে না।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে সমগ্র ব্রহ্মদেশ অধিকার করিয়া ব্রিটিশ সরকার ইহাকে ভারতের অঙ্গীভূত করেন এবং ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মশাসনের ভার একজন লেফটেন্যান্ট গবর্নরের উপর অর্পণ করেন। ১৯২৩ সালে ব্রহ্মদেশের শাসনভার পুনরায় ভারত-গবর্নমেন্টের অধীন একজন গবর্নরের হস্তে অর্পিত হয়। তার পর হইতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ভারত ও ব্রহ্মের স্বাধীনতা-সংগ্রাম এক যোগেই পরিচালনা করিয়া আসিতেছিলেন। অ-ব্রহ্ম-ভারত একই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে যুক্তিসংগ্রামে লিপ্ত



গণপরিষদে ইউনিয়ন জ্যাকের অপসারণ ও স্বাধীন ব্রহ্মপতাকা উত্তোলন উৎসব

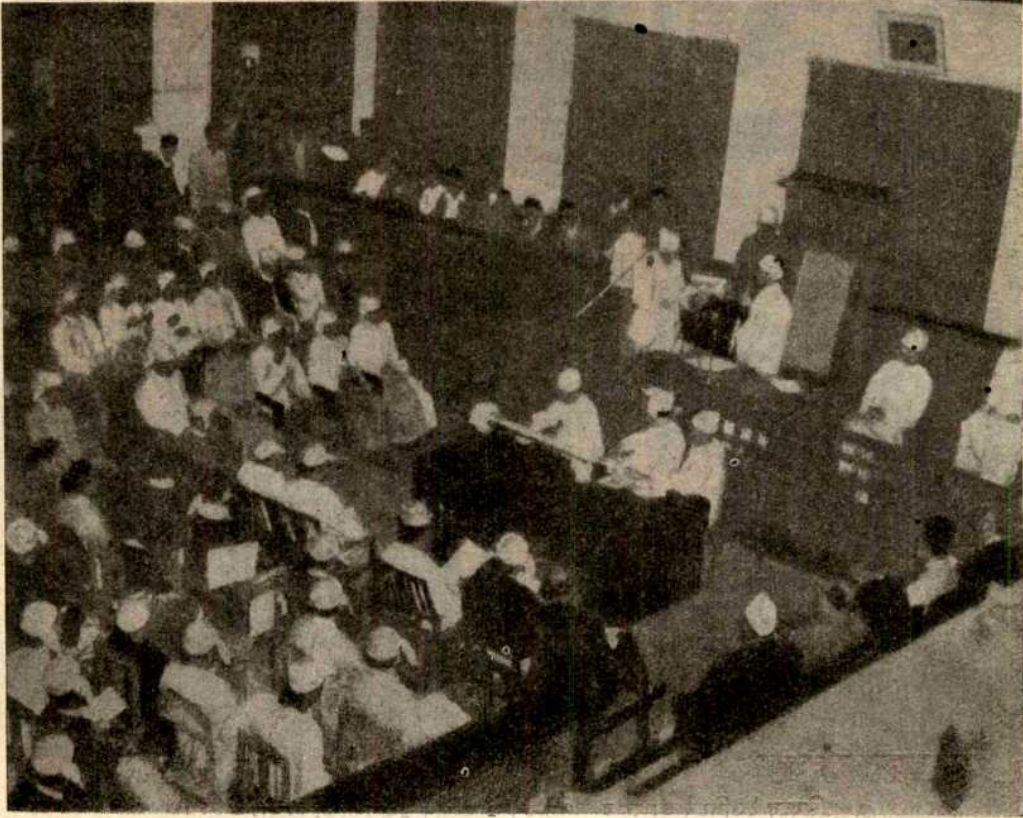
ছিল। পরে ব্রহ্মের একটি রাজনৈতিক দল ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার জন্ত আন্দোলন শুরু করেন। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ ভারতের মুক্তিসংগ্রামকে হীনবল করিবার জন্ত এবং তাহাদের সাম্রাজ্যবাদের আয়ুষ্কাল বাড়াইবার জন্ত ১৯৩৫ সালের শাসন-সংস্কার দ্বারা ব্রহ্মকে ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন করিলেন।

অতঃপর ব্রহ্মদেশ পরাক্রান্ত জাপানের “এশিয়া এশিয়া-বাদীদের জন্ত” এই আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিল। দোবামা আন্দোলনে ব্রহ্মদেশের যুবশক্তি যোগদান করিল; তখন দেখা দিল এক বিরাট গণ-আন্দোলন। জাপান যখন মিত্র-শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে তখন ব্রহ্মের প্রতিনিধি-পরিষদ যুদ্ধ-বিরোধী হইয়া উঠে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রারম্ভে ব্রহ্মের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন মিওচিত দলের নেতা উ স। উ স যখন নিউইয়র্ক হইতে প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন তখন তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া উত্তর-আফ্রিকার উগাণ্ডা প্রদেশে অন্তরীণ করিয়া রাখা হয়। এই অন্তরীণের কারণ—জাপানের সহিত তাঁহার যোগাযোগ আছে এই সন্দেহ। তখন আউঙ্গ সান ছিলেন দেশের সর্বত্র সুপরিচিত ছাত্র-নেতা। তাঁহার সংগঠনশক্তি ও অপূর্ণ দেশপ্রেম তাঁহাকে নেতৃবর্গের শীর্ষস্থানীয় করিয়া তুলিয়াছিল। জাপানের সহায়তায় ব্রহ্মদেশ হইতে ইংরেজকে বিদূরিত

করিবার আশায় তিনি টোকিওতে গমন করেন। সেখানে সামরিক শিক্ষালাভ করিয়া তিনি দেশে ফিরিলেন এবং এক সশস্ত্র সেনা-বাহিনী গঠন করিলেন। তিনি আশা করিয়া-ছিলেন যে, জাপান ব্রহ্মকে ইংরেজের অধীনতাপাশ হইতে মুক্ত করিতে সহায়তা করিবে। কিন্তু তাঁহার সে ভুল ভাঙ্গিয়া গেল। তখন বা-ম ব্রহ্মের প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হন। ১৯৪৩ সালে জাপানীরা ব্রহ্মে জাপ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করেন। তাহাতে জেনারেল আউঙ্গ সান তাহার মুক্তি-ফৌজকে অতি গোপনে ও সূক্ষ্মশীলে গণফৌজে পরিণত করেন। ইংরেজ তখন অত্যন্তে ব্রহ্মদেশ পরিত্যাগ করিয়াছে।

আউঙ্গ সান গুপ্তভাবে দেশের মুক্তিকামীদের সংগঠিত করিতে লাগিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে জাপানী সৈন্যদের অত্যাচার নিবারণের চেষ্টাও করিতে লাগিলেন। জাপানী সৈন্য তখন প্রকাণ্ডে দোকানপাট লুণ্ঠ এবং নারীদের উপর অত্যাচার ইত্যাদি বর্বরোচিত আচরণের অহুষ্ঠান করিয়া চলিয়াছিল। এদিকে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর পুনরায় রেডুন প্রবেশের দুই দিন পূর্বে আউঙ্গ সানের গরিলা সৈন্যবাহিনী উক্ত শহর দখল করিয়াছিল। ব্রহ্মদেশ পুনরায় অধিকারের পর ব্রিটিশবাহিনীর সহিত আউঙ্গ সানের সৈন্যদলের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। আউঙ্গ সান তখন ব্রহ্মদেশের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা। ব্রহ্মের গবর্নর



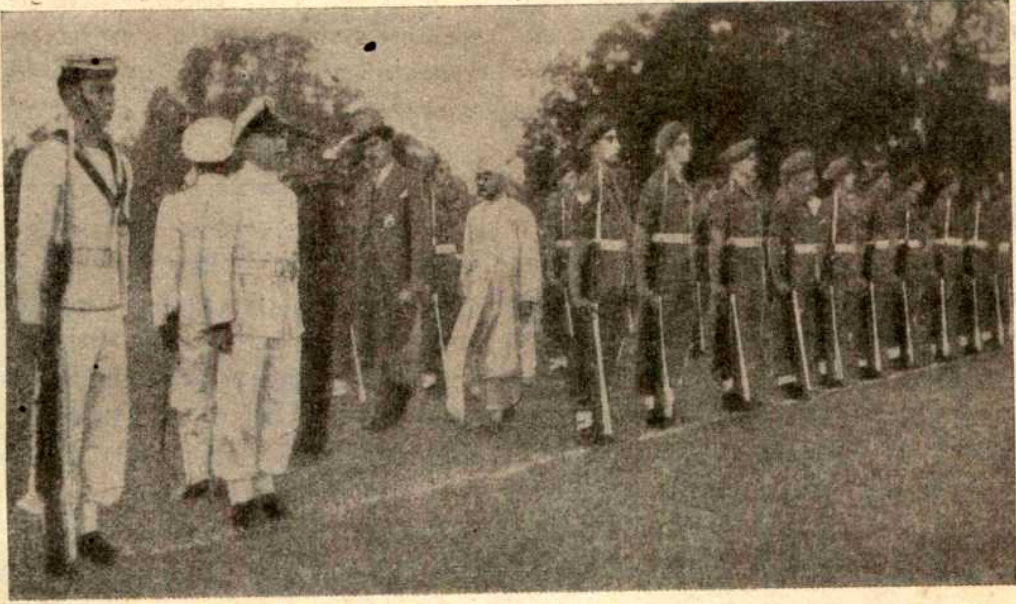
স্বাধীন ব্রহ্মের গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন

ডরমান শিথ ইহা পুনরাধিকারের পর এখানে ফিরিয়া আসেন। তিনি আউঙ্গ সান ও তাঁহার আট হাজার সহকর্মীকে কারারুদ্ধ করিতে মনস্থ করেন। কিন্তু এই সময় পূর্ব-এশিয়ার সৈন্ত-বাহিনীর সর্বাধিনায়ক লর্ড লুই মাউণ্টব্যাটেন গবর্নর ডরমান শিথকে পরামর্শ দেন যে সত্তজাগ্রত ব্রহ্মদেশে ব্রিটিশের মায়াুলি দমননীতি কার্য্যকরী হইবে না। তাঁহারই পরামর্শে ১৯৪৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আউঙ্গ সানের সহিত চুক্তি অমুসারে তাঁহার ফ্যাসীবিরোধী সেনাবাহিনীর এক অংশকে ব্রিটিশ সেনানায়কের অধীন সশস্ত্র ব্রহ্মবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং অবশিষ্ট সেনাবাহিনীকে ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়। যুদ্ধের পর বিলাতে চার্চিল মন্ত্রীসভার পতন হইলে রক্ষণশীল দলের হাত হইতে ক্ষমতা খসিয়া পড়িল। বুটেনে শ্রমিক গবর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হইল। অতএব শান্তিপূর্ণ ভাবে ব্রহ্মের স্বাধীনতা লাভ সম্ভব হইবে এই আশায় আউঙ্গ সান লর্ড মাউণ্ট-ব্যাটেনের প্রস্তাবে সন্মত হইলেন। তিনি আরও মনে করিলেন—তাঁহার সেনাবাহিনীর এক অংশ ত ব্রহ্মবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হইবে।

১৯৪৫ সালের অক্টোবর মাসে ডরমান শিথ শাসন-পরিষদ পুনর্গঠিত করিতে অগ্রসর হইলেন। তিনি শাসন-পরিষদের

১৪টি আসনের মধ্যে আউঙ্গ সানের দলকে ছয়টি আসন দিতে চাহিলেন। আউঙ্গ সান এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন। কৌশলী ইংরেজ গবর্নর তখন অন্তরীণাবৃত উ স-কে লইয়া নূতন শাসন-পরিষদ গঠনে উত্তোষী হইলেন। তখন আউঙ্গ সানের দল ব্রিটিশ কূটনীতির বিরুদ্ধে এক বিরাট আন্দোলন স্বপ্তি করেন। ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট তখন ডরমান শিথের পরিবর্তে হিউবার্ট রাজকে ব্রহ্মের গবর্নর করিয়া পাঠাইলেন। নূতন গবর্নর আউঙ্গ সানের দলকে শাসন-পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রদান করেন। আউঙ্গ সান গণ-পরিষদের সহকারী সভাপতি নির্বাচিত হইয়া ঘোষণা করেন যে, ব্রহ্মের শাসনতন্ত্র রচনার জন্য একটি সার্কিভোম-গণপরিষদ গঠন করিতে হইবে এবং ১৯৪৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে ব্রহ্মকে পূর্ণ স্বাধীনতা (ডোমিনিয়ন স্টেটাস নয়) দিতে হইবে।

এই বিষয়ে ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের সহিত আলোচনা চলিবার জন্য আউঙ্গ সান বিভিন্ন দলের সদস্যগণের সহিত ১৯৪৭ সালের জানুয়ারী মাসে লণ্ডন গমন করেন। সেখানে ইংরেজ জাহাজ্যারী ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ এটলীর সহিত তাঁহার এক চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তিতে ধার্য্য হয় যে ব্রহ্মের শাসন-পরিষদ অন্তর্ভুক্ত জাতীয় গবর্নমেন্ট হিসাবে কার্য্য করিবেন।



শেষ ব্রিটিশ গবর্নর সার হিউবার্ট র্যাল ও ব্রহ্মের প্রথম সভাপতি সাও সুই থাইক সৈন্যগণের অভিযান গ্রহণ করিতেছেন

এপ্রিল মাসে গণপরিষদের নির্বাচনে ২০২টি আসনের মধ্যে আউঙ্গ সানের দল ১৯৬টি আসন লাভ করেন। বাকী ৬টি আসন কমিউনিষ্টরা লাভ করে। ১৯৪৭ সালের ১৬ই জুন গণপরিষদে ব্রহ্মকে পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে ঘোষণা করা হইল। ইহার এক মাস পরে ১৯শে জুলাই যখন আউঙ্গ সান ও তাঁহার সহকারী মন্ত্রিগণ সরকারী ভবনে মন্ত্রণায় নিযুক্ত, সেই সময় তাঁহাদের সহিত ব্রহ্মের এই জনপ্রিয় নেতা আততায়ীর হস্তে অত্যন্ত নিষ্ঠুর ভাবে নিহত হইলেন। এই অপরাধের জন্ত প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী উ স প্রমুখ কয়েকজনকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। এই শোচনীয় ঘটনা যে দিন ঘটে সেই তারিখেই রাত্রিকালে আউঙ্গ সানের সহকারী নেতা থাকিন হু প্রধান মন্ত্রীরূপে ঘোষিত হইলেন।

আজ স্বাধীনতা লাভ করিয়া ব্রহ্মবাসীরা তাহাদের মহান নেতা আউঙ্গ সানকে স্মরণ করিতেছে। তাঁহার নখর দেহ তাঁহার দেশবাসী সসন্মানে সংরক্ষিত করিয়াছে। তিনি আজ ইহলোকে নাই, কিন্তু তাঁহার সাধনা সফল হইয়াছে।

থাকিন হু প্রধান মন্ত্রী হইয়া ইদ-ব্রহ্ম চুক্তি স্বাক্ষর করিতে লণ্ডনে গেলেন। ১৭ই অক্টোবর চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। এই চুক্তি জাহুয়ারী মাস হইতে কার্যকরী হইয়াছে এবং ব্রহ্মদেশ ব্রিটিশ কমনওয়েলথের বাহিরে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করিয়াছে।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ এটলী ও ব্রহ্মের প্রধানমন্ত্রী থাকিন হু-র মধ্য বে চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে তাহার একটি সর্ব এই যে, ব্রহ্মদেশে অসামরিক শাসন-ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তনের জন্য ব্রিটেন যে ব্যয়ভার বহন করিয়াছে তাহার জন্ত সে কোন

দাবি করিবে না। তা ছাড়া ব্রিটেন ব্রহ্মদেশকে যে দেড় কোটি পাউণ্ড ঋণ দিয়াছে, তাহার উপরে ব্রিটেনের কোন দাবিদাওয়া নাই। ইহা ব্যতীত ব্রহ্মদেশের নিকট ব্রিটেনের আর যাহা পাওনা আছে তাহা ব্রহ্মদেশ ১৯৫০ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ২০টি বার্ষিক কিস্তিতে পরিশোধ করিবে এবং এই ঋণের জন্য কোন সুদ দিতে হইবে না।

ব্রহ্মদেশ ব্রিটেনের নিম্নলিখিত প্রাপ্যগুলি পরিশোধ করিবে :—(১) চুক্তি বলবৎ হইবার পর ব্রহ্মের অস্থায়ী গবর্নমেন্ট ব্রহ্মপ্রবাসী ব্রিটিশ প্রজাদের প্রাপ্য পেনসন ও বেতন মিটাইয়া দিবে, (২) ব্রিটিশ সেনা-বিভাগীয় দ্রব্যাদির বিক্রয়-লক্ষ সমুদয় অর্থ ব্রহ্ম-সরকার পরিশোধ করিবে, (৩) বাণিজ্য ও জাহাজ চলাচল সম্পর্কে যথাসম্ভব শীঘ্র উভয় পক্ষ একটি চুক্তি সম্পাদন করিবে, (৪) ক্ষমতা হস্তান্তরের পর যথাসম্ভব শীঘ্র ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট ব্রহ্মদেশ হইতে ইংরেজ সৈন্য সরাইয়া লইবে, এবং ব্রহ্ম-গবর্নমেন্ট ব্রিটেন হইতে নৌ, বিমান ও স্থল-বাহিনী সংক্রান্ত একটি মিশন আমন্ত্রণ করিবে। কিন্তু ব্রহ্মদেশ ব্রিটিশ কমনওয়েলথের বাহিরে কোন দেশ হইতে এরূপ আমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে পারিবে না। পূর্বে সংবাদ দিয়া উভয় দেশের জাহাজই উভয় দেশের বন্দরে প্রবেশ করিতে পারিবে এবং উভয় দেশের বিমান উভয় দেশের আকাশ-পথে চলাচল করিতে পারিবে। ব্রিটেন সম্প্রতি ব্রহ্মদেশকে ৩৭খানি জাহাজ ধারে প্রদান করিবে। দেশরক্ষা সংক্রান্ত চুক্তি ক্ষমতা হস্তান্তরের পর তিন বৎসর বলবৎ থাকিবে, তারপর এক বৎসরের নোটিশে উভয় পক্ষই এই চুক্তি বাতিল করিতে পারিবে। চুক্তির ব্যাখ্যা ও

প্রয়োগ সম্বন্ধে কোন মতভেদ হইলে আন্তর্জাতিক আইন-পরিষদ তাহার মীমাংসা করিবে।

ব্রহ্মের গণপরিষদের শীর্ষে যে ইউনিয়ন জ্যাক এতদিন উজ্জীন ছিল গত ৪ঠা জানুয়ারী প্রভাতে তাহা অপসারিত করিয়া সেই স্থানে সাধারণতন্ত্রের তারকালাঙ্কিত দ্বিবর্ণরঞ্জিত পতাকা উত্তোলন করা হয়। প্রভাত হইবার দুই ঘণ্টা পূর্বে সেই অপশ্রিয়মান ইউনিয়ন জ্যাককে ব্রহ্মের নেতৃবৃন্দ ও বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ অভিবাদন করেন। তৃত্বা, শঙ্খ ও ঢাকানিনাদের মধ্যে ক্ষমতা হস্তান্তরের অহুষ্ঠান ঘোষিত হয়। ১৯৪৭ সালের ১৭ই অক্টোবরের চুক্তি এইদিন ব্রহ্ম ইউনিয়ন পার্লামেন্টে অহুমোদিত হয়। ক্ষমতা হস্তান্তর পূর্ব শেষ হইবার পর গণপরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হয়। ব্রহ্ম সাধারণতন্ত্রের সভাপতি সাও সুই থাইক আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যভার গ্রহণ করেন ও স্বাধীন ব্রহ্মরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করেন।

জাতীয় সঙ্গীতের পর স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রধান নেতা আউঙ্গ সান ও অন্যান্য নেতাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। তারপর প্রেসিডেন্ট থা কিন হু-কে প্রধান মন্ত্রী পদে নিয়োগ করেন।

ব্রহ্মের শেষ গবর্ণর সার হিউবার্ট র্যাল ৪ঠা জানুয়ারী প্রত্যুষে বামিংহাম নামক ক্রুজারযোগে রেঙ্গুন ত্যাগ করেন।

ব্রহ্মের এই স্বাধীনতা-উৎসবে যোগদানের জন্ত ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীমন্ত রাভেন্দ্রপ্রসাদ বিমানযোগে রেঙ্গুন গমন করেন। তিনি সারনাথ হইতে পবিত্র মহাবোধি বৃক্ষের শাখা ও পুত গন্ধোদক সেখানে লইয়া যান। সোয়ে ডাগন প্যাগোডার প্রাঙ্গণে এই বোধিবৃক্ষের শাখা মহাসমারোহে ধর্ম্মাহুষ্ঠানসহ নীত ও রোপিত হয়। উক্ত গন্ধাবারি তদুপরি সিক্ত হয়। দিল্লীতে ভারতের বড়লাট লর্ড মাউন্টব্যাটেন ঘোষণা করেন যে, ব্রহ্মের শেষ রাজা থিবোর কাষ্ঠনির্ম্মিত সিংহাসন ব্রহ্মকে প্রত্যর্পণ করা হইবে।

চকিত চাহনি

শ্রীশিবদাস চক্রবর্তী

যেদিন প্রথম নয়ন স্পর্শে

উদয় লভিলে তুমি,

কচি তুণভারে মুকুলি' উঠিল

মোর মনোমুগ্ধতায়।

হেরিছ তোমাতে গুণে অনামিকা,

কিছু রূপে লিখা, কিছু প্রহেলিকা,

নদী বহে নিতি জলধির পানে

তোমার চরণ চুমি'।

আকাশ যে কথা কহে ইসারায়

বাতাসের কাণে কাণে,

তোমার ভাষণ-সঙ্গীতে তারি

বারতা লভি যে প্রাণে;

তুমি কিছু ভাব, কিছু বা ভাবনা,

কিছু আল্পনা, কিছু কল্পনা,

কখনো সুরের আড়ালে লুকাও,

কভু ধরা দাও গানে।

তোমার আঁখির চপলতা লয়ে

তারি কাঁপে নীলাকাশে,

সাহারা সহসা শিহরিয়া ওঠে

কাঁচা শ্রামা বাসে ঘাসে;

তুমি কিছু ছায়া, কিছু তুমি ছবি,

কিছু ভৈরবী, কিছু বা পূরবী,

তোমার মুখের হাসি চুরি করে

গাছে গাছে ফুল হাসে।

তোমার ললাট-লালিমা-লীলায়

ভোরে ওঠে রাঙা-রবি,

বিধুর বৃকের বাণী ছরি' নিয়া

গান গাছে রাজকবি।

কিছু বা আভাসে, কিছু বা প্রকাশে,

কিছু বা বর্ণে, কিছু বা বিলাসে,

কখনো বা জানে কখনো বা ধানে

তোমার ধারণা লভি।

তোমারি বাসনা-উচ্ছ্বাসে, বায়ু

বসন্তে উত্তরোল,

তটিনীর তট-নীরে ধীরে ধীরে

বাঞ্জে কলকল্লোল;

তুমি কিছু বাণী, কিছু বা বাহার,

কিছু সুর আর কিছু বঙ্কার,

কখনো গতিতে কখনো বাধায়

ছন্দের হিল্লোল।

আমার প্রাণের প্রতিমা—সে যেন

ওব অপরূপ ছায়া,

আমার কামনা-সায়র মধিয়া

তুমি ধরিয়াছ কামা,

তুমি কিছু রূপ, কিছু আকোষণ,

কিছু বা সত্য, কিছু বা স্বপন,

কিছু বা মামুষী, কিছু বা মানসী

কিছু মোহ, কিছু মায়া।

খাদ্য-সমস্যার ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান

ত্রীকস্তুরচাঁদ লালুয়ানী

ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হ'ল এই যে কৃষিপ্রধান দেশ হওয়া সত্ত্বেও খাদ্যভাব আমাদেরই সব চেয়ে বেশী। বিয়াল্লিশের মধ্যস্তর থেকে শুরু করে যে খাদ্য-সমস্যা আমাদের দেশে দেখা দিয়েছে আজ যুদ্ধোত্তর কালেও তার আশাহীনরূপ সমাধান সম্ভব হচ্ছে না। ১৯৪২ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত আমাদের খাদ্য-সমস্যা ছিল মূল্য-সমস্যা মাত্র। অর্থাৎ ১৯২৯ সালের বিশ্বব্যাপী মহাসঙ্কটের ফলে কৃষিসামগ্রীর মূল্য যে ভাবে কমে গিয়েছিল তার দরুন ১৯৪২ সাল পর্যন্ত কৃষি-ব্যবসারে তেজির স্বরূপাত হয় নি। এইজন্যই ১৯৪২ সাল পর্যন্ত কি ভাবে কৃষিসামগ্রীর মূল্য বাড়ান যায় তাই ছিল আমাদের সমস্যা। এখানে একথা বলা আবশ্যিক যে, ১৯২৯ সালের বিশ্বব্যাপী মন্দার প্রতিক্রিয়া পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশে দেখা দিলেও আমাদের দেশেই তা সর্বাপেক্ষা গুরুতর আকার ধারণ করে। কারণ আমাদের দেশে এক দিকে যেমন-মুসলম্যান অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কায়ম করবার উপযোগী শিল্পের অভাব অত্র দিকে ঠিক তেমনি বিদেশী সরকার নিষ্ক্রিয় থাকায় কোন উপযুক্ত অর্থনৈতিক পরিকল্পনাও এদেশে গৃহীত হতে পারে নি। সব দিক থেকেই আমাদের সমস্যা জটিল হয়ে উঠল; ব্যবসারে মন্দা আমাদের আর্থিক ব্যবস্থার পাকাপাকি হয়ে বসল। তাই বলছিলাম, ১৯৪২ সাল পর্যন্ত আমাদের কৃষির প্রধান সমস্যাই ছিল মূল্য-সমস্যা—কি ভাবে কৃষিকে মন্দার হাত থেকে রক্ষা করা যেতে পারে, কি ভাবে আবার কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি করে কৃষি-ব্যবসায়কে সমৃদ্ধ করা যেতে পারে, তাই নিয়েই তখন কৃষিবিদগণ মাথা ঘামাতেন। কিন্তু এর পর যে সমস্যা আরম্ভ হ'ল সে আরও জটিল, আরও ভয়াবহ অদৃষ্ট-পূর্ব এবং অভূতপূর্ব। একথা অবশ্য ঠিক যে, ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অভ্যুদয়ের পর থেকে ছোট বড় অনেক দুর্ভিক্ষের কথাই আমরা ইতিহাসে পাই, অনেক লোকস্বয় তাতে হয়েছে। প্রথম মহাসমরের সময়ও খাদ্য-সমস্যা জটিল আকার ধারণ করেছিল। কিন্তু এসব সত্ত্বেও বিতরণ-ব্যবস্থা মোটামুটি অব্যাহত থাকায় সমস্যা গুরুতর হলেও মাত্রা অতিক্রম করে নি, অন্ততঃ আধুনিকতম অভিজ্ঞতার দৃষ্টিকোণ থেকে যাচাই করলে একথাই আমাদের মনে হয়। অস্বাভাবিক পরিস্থিতির কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। কিন্তু স্বাভাবিক সময়েও আমাদের দেশ খাদ্যশস্য সম্বন্ধে ষোল আনা স্বয়ং-সম্পূর্ণ নয়। বিশেষ করে আমাদের চালের সরবরাহ চাহিদার অনুপাতে কম বলেই যুদ্ধপূর্ব সময়ে স্বাভাবিক অবস্থায়ও আমাদের ব্রহ্ম-দেশ থেকে চাল আমদানী করতে হ'ত। ব্রহ্মদেশ ব্রিটিশের

হস্তচ্যুত হবার পর আমাদের বাইরের সরবরাহেও ঘাটতি পড়ল। সেই সঙ্গে আভ্যন্তরীণ বিতরণ ও যানবাহন ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা দেখা দেওয়ায় আমাদের খাদ্যসমস্যা আরও গুরুতর হয়ে দাঁড়াল।

যুদ্ধ-পূর্বকালে আমাদের খাদ্য সরবরাহ প্রয়োজনের চেয়ে কম হলেও একথা স্বীকার করতেই হবে যে, সারা পৃথিবীর হিসাব ধরলে খাদ্যসরবরাহের তখন ঘাটতি ছিল না বরং কোন কোন দেশে প্রয়োজনাতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপন্ন হওয়ায় বাড়তি মাল জমে উঠছিল। তাই ধারা একথা বলেন যে, পৃথিবীতে কোন দিনই চাহিদার অনুযায়ী পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্য সরবরাহ ছিল না তাঁদের যুক্তি যাচাই করে দেখবার প্রয়োজন আছে। যুদ্ধপূর্বকালে অনেক দেশের পক্ষেই সমস্যা ছিল কি ভাবে বাড়তি সরবরাহ উপযুক্ত মূল্যে বিক্রয় করা যেতে পারে। মার্কিন দেশের কথাই ধরা যাক। মার্কিন দেশ শিল্পপ্রধান হলেও সেখানকার কৃষিসম্পদও উপেক্ষণীয় নহে। প্রথম মহাসমরের পূর্বে মার্কিন দেশে গমের আবাদ মোটামুটি স্থিতিবাহ্য ছিল, ফলে রপ্তানীর পরিমাণ ক্রমশঃ কমে আসছিল। তারপরই এল মহাসমর। ইউরোপের দেশসমূহ রণভাগে এত মেতে উঠল যে তাদের পক্ষে উৎপাদন-ব্যবস্থাকে অক্ষুণ্ণ রাখা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। তাই এই সব দেশের আভ্যন্তরীণ সরবরাহ কমে যাওয়ায় বিদেশ থেকে আমদানী-খাদ্যশস্যের উপর নির্ভর করা ছাড়া আর গত্যন্তর রইল না। এই অবস্থায় গমের দাম বাড়তে আরম্ভ হয়। ১৯১৪ সালে যে গমের দাম ছিল প্রতি বুসেলে ৯৮-৮ সেন্ট, ১৯১৯ সালে তার দাম হ'ল ২৩২ ডলার। সাধারণ মূল্য-হারও এই সময়ে ৬৮-১ থেকে ১৩৮-৬-এ দাঁড়াল। এই যে যুদ্ধকালীন তেজি এর সুবোণে আমাদের প্রসার আরম্ভ হ'ল। ১৯০৯-১৩ সালে যেখানে গমের আবাদী জমির গড় আয়তন ছিল ৪৮০ লক্ষ একর, ১৯১৯ সালে সেই জমির আয়তন হ'ল ৭৩০ লক্ষ একর। ১৯২০ সালের পর থেকে আবার মন্দা আরম্ভ হয় এবং ১৯৩২ সালে এই মন্দা চরম সীমায় পৌঁছে। কিন্তু মন্দার অনুপাতে আবাদ নিয়ন্ত্রণের কোন ব্যবস্থা না থাকায় আবাদী জমির পরিমাণ মোটের উপর অপরিবর্তিতই থেকে যায়। এর ফলে ১৯১৪ সালের আগে মার্কিন দেশে যে পরিমাণ গম উৎপন্ন হ'ত, প্রথম মহাসমরের পর এর পরিমাণ সর্বদাই শতকরা ৩৫ ভাগের চেয়ে বেশী ছিল।

উপরে মার্কিন দেশ সম্বন্ধে যে কথা বলা হ'ল পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেকটি কৃষিপ্রধান দেশের পক্ষেই সে কথা সমভাবে

প্রযোজ্য। পৃথিবীর খাদ্যসমস্তা বিষয়ক যে বিবরণী ব্যবস্থাপক পরিষদ পেশ করেছেন তাতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মজুত করা গম সম্বন্ধে যে তুলনামূলক সংখ্যা সংগ্রহ করা হয়েছে তা নীচে দেওয়া হ'ল। এ থেকে পৃথিবীর মোট বাড়তি গমের পরিমাণ সম্বন্ধে বেশ পরিষ্কার ধারণা করা চলে।

যাকে আমরা খাদ্যশস্যের বাড়তি বলে উল্লেখ করেছি স্বাভাবিক আর্থিক পরিবেশে তা বাড়তির বদলে বরং ঘাটতি বলেই প্রমাণিত হবে। যে হারে আমাদের লোকসংখ্যা বাড়ছে তার জন্তে যদি উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্যের ব্যবস্থা করতে হয় তা হলে আমাদের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ

(হাজার টনের হিসাবে)

কানাডা	আর্জেন্টিনা	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	অস্ট্রেলিয়া	মোট	সারা পৃথিবীর মোট	
					মজুত গম	
১৯২২-২৬ গড়	১০০৭	১৭১৫	৩২৬৬	৭৮৯	৬৭৭৭	১৬৯২৮
১৯২৭-৩১ গড়	২৩৯৫	২৩৯৫	৫৮৭৯	১১৯৮	১২৪১১	২৩৬৫১
১৯৩২	৩৭০১	১৭৬৯	১০৬৪২	১৩৬১	১৭৪৭৩	২৭৮১৫
১৯৩৩	৫৯৩৩	২০৪১	১০৩৯৭	১৪৯৭	১৯৮৬৮	৩০৬১৮
১৯৩৪	৫৫২৫	৩২১২	৭৪৫৭	২৩১৩	১৮৫০৭	৩২২৭৮
১৯৩৫	৫৮২৪	২৩১৩	৪০০১	১৫৫১	১৩৬৯০	২৫৬৩৮
১৯৩৬	৩৪৫৬	১৭৬৯	৩৮৬৫	১১৭০	১০২৬০	২১৩৩৭
১৯৩৭	১০০৭	১৩৮৮	২২৫৯	১১১৬	৫৭৭০	১৫৪৩২
১৯৩৮	৬৫৩	১৭৬৯	৪২১৯	১৩৬১	৮০০২	১৭১৪৬
১৯৩৯	২৮৫৮	৪৮৮৯	৭৪৮৪	১৯০৫	১৭১৪৬	৩২৪৯৬
১৯৪০	৫৫৭৯	৬৩৯৬	৭৪৮৪	২৮৫৮	২২৩১৭	৩৫৭৩৫

উপরের হিসাব থেকে একথা বোঝা যাচ্ছে যে, যুদ্ধ-পূর্বকালে সারা পৃথিবীর মোট মজুত গমের পরিমাণ নিতান্ত নগণ্য ছিল না। ১৯৩৫ থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত আবাদ নষ্ট হওয়ার সত্ত্বেও গমের পরিমাণ পূর্বপূর্ব বৎসরের অনুরূপে কমে গেলেও প্রয়োজনাত্মিক গম কিছু ছিল। ১৯৪২ সাল পর্যন্ত প্রায় এই অবস্থাই চলল। ফলে, এই সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের কোন কোন দেশে গমের দর বজায় রাখার জন্য আবাদের নিয়ন্ত্রণও করতে হয়েছে। আমাদের দেশেও অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছে। আমাদের দেশে খাদ্যশস্যের সরবরাহ চাহিদার অনুরূপে কম হওয়া সত্ত্বেও ১৯৩১ সালের পর থেকে গমের মূল্য আশাতিরিক্তরূপে হ্রাস পায় এবং বিদেশ থেকে আগত খাদ্যশস্যের উপর শুল্ক ধার্য করা হয়। সবচেয়ে দুঃখের বিষয় হ'ল এই যে, যুদ্ধপূর্বকালে একদিকে পৃথিবীতে যখন এই অবস্থা চলেছে তখন পৃথিবীর অনেক অনগ্রসর দেশের লোকই উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে অনশন বা অর্ধাশনক্রিষ্ট হয়ে রয়েছে। এক দিকে হ'ল বিশ্বব্যাপী মন্দার সমস্তা; অত্রদিকে লোকের আয় না থাকায় টাকার অভাবে বাজারের চাহিদা কমে গেছে। এই ভাবে যুদ্ধপূর্ব কালের খাদ্যসমস্তা ছিল সম্পূর্ণ বিভিন্ন রকমের।

উপরের আলোচনা থেকে একথা বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, যুদ্ধপূর্বকালে বাড়তি খাদ্যশস্যের মজুত হওয়ার মূলে ছিল ক্রয়শক্তির অভাব—স্বাস্থ্যরক্ষার উপযোগী খাদ্যের দিক দিয়ে বিচার করলে কিন্তু এই বাড়তি শক্তকে মোটেই বাড়তি বলা চলে না। লোকের যদি যথোচিত ক্রয়শক্তি থাকত, তারা যদি উপযুক্ত খাদ্য আপন প্রয়োজন অনুসারে ক্রয় করতে পারত তা হলে আর এ সমস্তা থাকত না। কিন্তু বর্তমান অর্থ-নৈতিক পরিবেশে তা হতে পারছে না। অর্থাৎ উপরে

বলা যায় যুদ্ধপূর্বকালের খাদ্যসরবরাহের চেয়ে ১৯৬০ সালে যে পরিমাণ খাদ্যসরবরাহ বাড়তে হবে তার শতকরা পরিমাণ হ'ল নিম্নলিখিত প্রকারঃ খাদ্যশস্য শতকরা ৩৯, চিনি ২৫, তৈলজাতীয় উপাদান ১১৩, ডাল ৮৪, ফল ও শাকসব্জী ৩৩০, আমিষ জাতীয় উপাদান ৩০৫ এবং দুগ্ধজাতীয় পদার্থ ৬০। এদিক থেকে যাচাই করলে আমাদের খাদ্যসরবরাহে যে যুদ্ধপূর্বকালেও ঘাটতি ছিল একথা মানতে হবে। ফলকথা হ'ল এই যে, ১৯০০ সাল থেকে আরম্ভ করে আমাদের লোকসংখ্যা বেড়েই চলেছে, কিন্তু ফসলের উৎপাদনে পরিমাণ বৃদ্ধি হতে পারে নি। এই যে মৌলিক সমস্তা, মহাসঙ্কটের চাপে এটা মাথা তুলবার অবসরও পেল না। বাড়তি মজুত অরিক্রীত থেকে সমস্তাটির জটিলতা আরও বাড়িয়ে তুলল।

—এই চাপা পড়া মৌলিক সমস্তা যুদ্ধের সুযোগে নূতন করে দেখা দিলে। এই ন্যূন সমস্তার দুটো দিক আছে। এক দিকে যুদ্ধকালীন মুদ্রাস্ফীতির ফলে এক দল লোকের আয় বাড়ল এবং পণ্যমূল্য একাদিক্রমে অবাধে বেড়ে চলল, অন্য দিকে উৎপাদন ও বিতরণ ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হওয়ার খাদ্যসরবরাহ ব্যৱস্থাও ভেঙে পড়ল। অন্যান্য দেশে এই সমস্তা গুরুতর আকার ধারণ করার আগেই কিছু না কিছু প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছে। ইউরোপে খাদ্যশস্য উৎপাদন ব্যবস্থার উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ এবং নিয়ন্ত্রিত খাদ্য বিতরণব্যবস্থা কায়ম করা হয়, সেই সঙ্গে দেশের উৎপাদন বৃদ্ধিরও যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়। আমাদের দেশে কিন্তু অন্যান্য ব্যাপারের ন্যায় এ ব্যাপারেও অব্যবস্থা চলতে থাকে। ১৯৪২ সাল পর্যন্ত মুদ্রাস্ফীতি এবং সামরিক খরচের জন্য প্রকৃত মূল্য বাড়তে

থাকে; কিন্তু এই অবস্থা যুদ্ধপূর্ব মন্দার প্রতিকার হিসাবে গৃহীত হওয়ায় কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করাই সম্ভবপর হয় নি। কোন কোন খাদ্যশস্যের মূল্যনিয়ন্ত্রণের চেষ্টা অবশ্য করা হয়েছিল; কিন্তু সে চেষ্টা কার্যকরী না হওয়ার সরকার কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়। ১৯৪২ সালে জাপানীগণ কর্তৃক ব্রহ্ম বিজয়ের পর খাদ্যপরিস্থিতি আরও সঙ্কটজনক হয়ে ওঠে। কারণ ব্রহ্মদেশ থেকে প্রতি বৎসর যে ১০ লক্ষ টনেরও অধিক চাল আমদানী করা হ'ত সেই চাল পাবার আর কোনও উপায় রইল না। সারাটা দেশ অব্যবস্থার যে কুফল ভোগ করেছে সে সম্বন্ধে বেশী কিছু বলা নিম্প্রয়োজন। এই সভ্যতাগর্ভী বিশেষ শতাব্দীতে এত বড় একটা মনুষ্যের দেশের বুকের উপর দিয়ে যে অবাধে সংঘটিত হয়ে গেল এর আর তুলনা হয় না।

বহু তর্কবিতর্ক যুক্তিবিচার ও আলোচনার পর ভারত-সরকার ১৯৪৩ সালে খাদ্যশস্য বিষয়ক পরিষদের পরামর্শ অনুযায়ী একটা স্থূল খাদ্যনীতি গ্রহণ করতে বাধ্য হলেন। এই নীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল নিম্নলিখিত প্রকার :—

(ক) বিদেশ থেকে খাদ্য-শস্যের আমদানী যথাসম্ভব বাড়ানো এবং কোন আকস্মিক পরিস্থিতিতে খাদ্য সংস্থান করার জন্য ৫০০,০০০ টন খাদ্যশস্য মজুত রাখা।

(খ) দেশের আবাদ বাড়ানোর জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন—যেমন, খাদ্যশস্যের ফসল বাড়ানোর অনুকূলে উৎসাহ প্রদান, অত্যন্ত কার্যের জন্য জমির ব্যবহার সুগতি রেখে তাতে খাদ্যশস্যের আবাদের বিস্তার, জলসেচন ব্যবস্থা, উৎকৃষ্টতর বীজধানের সরবরাহ, প্রভৃতি।

(গ) কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশানুযায়ী উপযুক্ত মৌলিক পরিকল্পনা গ্রহণ।

(ঘ) বড় বড় শহরে নিয়ন্ত্রিত খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থা কায়ম করা।

(ঙ) আইনদ্বারা খাদ্যশস্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ।

* * *

দ্বিতীয় মহাসমরের অবসান হয়েছে বটে, কিন্তু আমাদের সমস্যার সমাধান হ'ল কোথায়? সত্য বটে, পৃথিবীময় আজ যে খাদ্যসঙ্কট দেখা দিয়াছে আমাদের খাদ্যসমস্যা তারই অঙ্গীভূত; কিন্তু এ কথা মনে রাখতে হবে যে সারা দুনিয়ায় আমাদের সমস্যাই সবচেয়ে জটিল। যুদ্ধোত্তর আমলের প্রথম বৎসরে অনারুষ্টি, জলপ্রাচীন, ও বড়বড় ইত্যাদির দরুন আমাদের খাদ্যসমস্যা গুরুতর হয়ে উঠেছিল। এ সময় বিদেশ থেকে চালের আমদানী একেবারে বন্ধ ছিল; গম ও অত্যন্ত খাদ্য-শস্যের সরবরাহও ছিল খুব নৈরাশ্যজনক। মোটের উপর, জীবনযাত্রার বর্তমান মান অনুসারে আমাদের খাদ্যশস্যের বাট্টিতর পরিমাণ ১৯৪৫-৬ সালে প্রায় ৮০ লক্ষ টন ছিল। পৃথিবীর খাদ্যসমস্যা সম্বন্ধে বিচার-বিবেচনা করার জন্য একটি আন্তর্জাতিক জরুরী খাদ্যপরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই খাদ্য

পরিষদের অধীনে কয়েকটি সমিতি গঠিত হয়েছে। খাদ্য সরবরাহ ও মূল্যনিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে এই পরিষদের কোন হাত নাই; তবে এই পরিষদের অনুমোদন অনুসারে মোটামুটিভাবে খাদ্যশস্যের বিলিব্যবস্থা করা হচ্ছে এবং রুশিয়া ও আর্জেন্টিনা ছাড়া পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেকটি রপ্তানীকারী দেশই এই পরিষদের অনুমোদন অনুসারে কাজ করতে রাজী হয়েছে।

এই সব আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা সত্ত্বেও আমাদের দেশের খাদ্যপরিস্থিতিতে কোন উন্নতি পরিলক্ষিত হয় নি। ১৯৪৬ সালের শেষের দিকে খাদ্যশস্যের অভাবে নিয়ন্ত্রিত খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থা ভেঙে পড়বার জোগাড় হয়েছিল। এই বৎসর আমাদের ৪০ লক্ষ টন বাট্টিতর মধ্যে আমরা মাত্র ১৭ লক্ষ টন বিদেশ থেকে পাই এবং এর জন্তে ভারত সরকারকে বিশেষ ব্যবস্থা করতে হয়। বর্তমান বৎসরেও খাদ্যপরিস্থিতি মোটেই সম্ভোষজনক নয়। এই বিষয় নিয়ে খাদ্য ও কৃষি সংসদ ১৯৪৬ সালের মে মাসে ওয়াশিংটনে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এই সংসদ যে বিবরণী পেশ করেন তদনুসারে সারা পৃথিবীর খাদ্যশস্যের বাট্টিতর পরিমাণ প্রায় ১০০ লক্ষ টন রয়েছে এবং বর্তমান ব্যবস্থা অনুযায়ী এই বাট্টিতর সামান্য অংশ মাত্র পূরণ হওয়া সম্ভব।

ভারত বিভাগের ফলে আমাদের খাদ্যসমস্যা আরও জটিল হয়ে উঠেছে। ফসলের দিক থেকে বর্তমানে ভারতে প্রায় ১৭২ লক্ষ টন চাউল এবং ৪১ লক্ষ টন গম উৎপন্ন হয় এবং পাকিস্তানে এই দুই ফসলের পরিমাণ যথাক্রমে ৫০ লক্ষ টন এবং ২৭ লক্ষ টন। আমাদের প্রয়োজনের অনুপাতে এই ফসলের পরিমাণ অনেক কম। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদের মতে প্রায় ১০০ কোটি টাকার খাদ্যশস্য আমাদের বিদেশ থেকে আমদানী করতে হচ্ছে। যুদ্ধের কয়েক বৎসরব্যাপী অস্বাভাবিক পরিস্থিতির দরুন খাদ্যশস্যের চাহিদা বেড়েছে অনেকখানি; কিন্তু আবাদী জমির আয়তন সে অনুপাতে কিছুই বাড়েনি বরং ফসলের পরিমাণ অনেক কমে গেছে। বিদেশী সরবরাহের উপর বরাবর নির্ভর করা অস্বাভাবিক। এতে নিজেদের অর্থনৈতিক দুর্বলতাই স্মৃতিত্ব হয় এবং মুদ্রাসমস্যার জটিলতা বৃদ্ধি পায়। কারণ বিদেশ থেকে আমরা যখন খাদ্যশস্য আনব তখন আমাদের তার পরিবর্তে কিছু দিতেই হবে। নইলে, বরার বিদেশী মুদ্রার যোগান দেওয়া যাবে কোথা থেকে?

স্পষ্টই প্রতীয়মান হচ্ছে যে আমাদের দীর্ঘ মেয়াদী সমস্যা খুবই জটিল। আমাদের বর্তমান খাদ্যসঙ্কট শুধু বর্তমানেরই সমস্যা নয়। আমাদের লোকসংখ্যা যেভাবে বাড়ছে এবং আবাদের যা অবস্থা তাতে এ সমস্যা যে আমাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাতে কায়ম হয়ে বসেছে তাতে কোন সন্দেহ নাই। বিদেশ থেকে খাদ্যশস্য আমদানী করে এ সমস্যার স্থায়ী সমাধান হতে

পারে না; এর জন্ত চাই আমাদের উৎপাদন ব্যবস্থার উৎকর্ষ সাধন যার ফলে ফসল বাড়বে এবং প্রয়োজনের অল্পপাতে খাদ্যশস্য দেশের মধ্যেই উৎপন্ন হতে পারবে। কৃষিতে উৎপাদনের প্রসার একটা নির্দিষ্ট সীমারেখার বাইরে যেতে পারে না; কারণ কর্ষণযোগ্য জমি প্রকৃতির দান, তাতে

মানুষের হাত নেই। তাই বিধাপ্রতি ফসল উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ানুই হ'ল আমাদের বর্তমান সমস্ত সমাধানের একমাত্র উপায়। এর জন্ত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষ-আবাদ শুরু করতে হবে এবং একে সফল করতে হলে কৃষি-ব্যবস্থার আয়ুল পরিবর্তন করতে হবে।

চীনের সাম্প্রতিক অর্থনীতি

শ্রীশান্তিরঞ্জন চক্রবর্তী

কয়েক বৎসর হ'ল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছে। কিন্তু যে সব দেশ যুদ্ধে নেমেছিল তাদের সবাইকে প্রায় একই স্তরের অর্থনীতিক ছরবছায় এসে পৌঁছতে হয়েছে। যুদ্ধে অপরিস্রম অর্থের প্রয়োজন হয়েছিল, তার যোগান দিতে গিয়ে বহু দেশকেই নিজেদের মুদ্রানীতির স্বাভাবিক এবং সাম্যাবস্থা হারাতে হয়েছে এবং তারই ফলে সে সব দেশের অর্থনীতিক ব্যবস্থায় একটা বিরাট ওলটপালট হয়ে গেছে। চীনের পক্ষে এ অবস্থাটা যেন অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। ১৯৩৬ সন থেকে জাপানের মত একটা বিরাট শক্তির বিরুদ্ধে চীনকে লড়ে আসতে হচ্ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তিতে তারও ইতি হয়েছে, কিন্তু এই সুদীর্ঘ আট নয় বছর লড়াই চালিয়ে যাওয়ার চরম দুর্দশা ভোগ করা সত্ত্বেও আধা সামন্ততন্ত্রী চীনের ভাগ্যে শান্তি আসে নি। বরোয়া বিবাদ এখনও চলেছে। যুদ্ধের প্রয়োজনেই অর্থের প্রয়োজন। এই অর্থ সংগ্রহ করা হয়—সাধারণতঃ সরকারের তরফ থেকে ধার করে, কর বসিয়ে ও নোট ছাপিয়ে বা টাকার পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়ে। তৃতীয় উপায়টিকে যথাসম্ভব এড়িয়ে এবং সবগুলো নীতিই মিলিয়ে মিশিয়ে এই টাকা যোগানোর কাজটা সারতে হয়। কিন্তু সরকারের গাফিলতি, উদাসীনতা ও অকর্মণ্যতার ফলে নানা কারণে সবচেয়ে অপকৃষ্ট ঐ তৃতীয় উপায়টিকে চীন গ্রহণ করেছে; অর্থাৎ সেদেশে অবাধ মুদ্রাস্ফীতি চলেছে এবং প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে জার্মানীরই মত এবার চীন ধীরে ধীরে সর্বনাশের অতলে তলিয়ে যাচ্ছে।

কিছুকাল আগে এক খবরের কাগজে চুংকিঙে প্রচলিত দ্রব্যমূল্যের একটা হিসাব দেওয়া হয়। তার থেকে এই অর্থনীতিক বিপর্যয়ের স্বরূপ খানিকটা বোঝা যাবে। নীচে তালিকাটি দেওয়া গেল।

একটি ফেন্টের টুপি	৬৫০ ডলার
এক জোড়া জুতা	২৬০ "
এক প্রস্থ স্কাট	২৬০০ "
এক বোতল হাইকী	২৪০০ "
এক পাউণ্ড মাখন	২৩০ "
একটা লিপস্টিক	১৩০ "

(রয়টার, ২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৪৪)

সে সময়কার সংবাদপত্রে প্রকাশিত আর একটা খবরও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এক চীনা অধ্যাপক বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পান। তাতে হিসাব করে দেখা যায় যে, তিনি বিপুল পরিমাণ ডলারই পেয়েছিলেন বটে। তবে তার ক্রয়মূল্য আমাদের দেশের মাত্র পঁচিশ টাকার সমান। অর্থাৎ এই নোবেল পুরস্কারস্বরূপ রবীন্দ্রনাথ পান একলক্ষ কুড়ি হাজার টাকা।

বিশেষজ্ঞেরা বলেন গত ১৯৪৪ ও ১৯৪৫ সনে চীনে জিনিষপত্রের দর বেড়েছে ১৯৩৭ সনের মূল্যের চেয়ে ৪১৫ গুণ বেশী। অর্থাৎ বিশাল চীনের অধিকাংশ অধিবাসীই দরিদ্র। আমাদের দেশের মত সে দেশের বেশীর ভাগ লোক পল্লীবাসী। শতকরা প্রায় আশী জনই গ্রামে থাকে, আর তাদের পেশা চাষবাস। গ্রামের হর্তাকর্তা বিধাতা হচ্ছেন দোদীওপ্রতাপ সব জমিদার। এদের অনেকেরই আবার বড় বড় ব্যবসায় আছে; সেই সত্ত্বেও সরকারের সঙ্গে এদের গলাগলি ভাব। সরকার কর্তৃক তাই সাধারণতঃ গরীব চাষীদের কল্যাণকর কাজ বিশেষ হয় না। সত্যি কথা বলতে গেলে, চীনা সরকারের শিল্পনীতি, বাণিজ্যনীতি মুদ্রানীতি—এক কথায় অর্থনীতির অন্তর্ভুক্ত যত নিয়মাদি আছে তার সবগুলোর সাহায্যে গ্রামগুলোকে শোষণ করে দুর্দশার নিয়তম সোপানে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। সেখানে চাষীদের মধ্যে সজ্জ, সমিতি ইত্যাদি তেমন কিছুই নেই। থাকা সম্ভবও নয় যত দিন সামন্ততন্ত্রের প্রতাপ না কমছে। তাই দরদস্তরের সুবিধামত একটা বন্দোবস্ত করারও পন্থা নেই। এরা একদিকে যেমন কম দরে উৎপাদিত শস্তাদি বেচতে বাধ্য হয় অতদিকে তেমনই আবার বেশী দরে সব দরকারী জিনিষপত্র তাদের কিনতে হয়।

১৯৪৫ সনের জাহুয়ারীতে চুংকিঙে এক সিতান (প্রায় দু'মণ) ভাল চালের দাম ছিল ১৬৫০ চীনা ডলার। ফেব্রুয়ারীতে তা দাঁড়ায় ২৪০০ ডলারে আর মার্চে চোরাবাজারে ৫৪০০ ডলার পর্যন্ত দর ওঠে। অর্থাৎ সরকারী নিয়ন্ত্রণ অনুসারে এক সিতানের দর তখন ৪০০০ ডলার। জানা যায় যে, মে মাসে চোরাবাজারে এই দর ৮০০০ ডলার অবধি উঠেছে। এর তুলনায় আমাদের দেশে আর কি হয়েছে? মণপ্রতি দেড়শো হয়েছিল; না হয়, দু'শই ধরা

যাক। তার ষাট্টি সামলানোই দায়। কথা হচ্ছে, আমাদের কতটুকুই বা জায়। সে অল্পপাতেই তো হবে কেনার ক্ষমতা? আর সেদিক থেকে সাধারণ চীনা আর সাধারণ ভারতীয়ের অবস্থা একই। চীনের প্রথা মত জমিদার প্রভৃতি ষাট্টি জমি বণ্টন দেন, তাঁরা খাজনাটা আদায় করেন ধান-চালে। খাজনার হারও খুব বেশী। আজকাল এগুলো প্রায় সবই বিক্রি হয়ে মোটা অঙ্ক হয়ে জমিদারের পকেটে ফিরে আসে। দামও এখন খুব চড়া। ওদিকে সব দিয়ে খুয়ে গরীব চাষী নেজেদের পেট চালানোর জন্তে বড় কিছু থাকে না। এর উপরেও যদি বাজার থেকে কিনে খেতে হয় তবে তার খরচ যোগাতে গিয়ে পরনের কাপড় সংক্ষিপ্ত করতে হয়। পেটের দায় বড় দায়।

বিশেষজ্ঞেরা এ সব নিয়ে নানা রকম তথ্য সংগ্রহ করেছেন ও করছেন এমনি অসুস্থস্থানের ফলে কাঁপা টাকার মহিমা প্রকাশ হয়ে পড়েছে। নীচে তারই একটা নমুনা দেওয়া হল :

উত্তর কোয়াংটুং জেলা (শতকরা হিসেবে)			
	১৯৩৯	১৯৪২	বাড়তি কমতি
জমিদার	১২	১৮	+ ৬
ধনী চাষী	৭	১০	+ ৩
মাঝারি চাষী	৪০	২০	- ২০
গরীব চাষী	৩৫	৪২	+ ৭
দিনমজুর	৬	১০	+ ৪

স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে গরীব এবং বড়লোক দুয়েরই সংখ্যা বেড়েছে। এমন কি, খানিকটা স্বাধীন মধ্যবিত্ত চাষীদেরও প্রায় অর্ধেকসংখ্যককে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবনতির নিম্নতম সোপানে নেমে আসতে হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে এই একটা জেলার হিসাবকে মোটামুটি অষ্টাঙ্গ জেলার নমুনা স্বরূপ বলা চলে।

এরও উপর আছে আর এক মুশকিল। জমি, বারবার হাতবদল হচ্ছে। অসাধুতালব্ধ অর্থ ব্যাঙ্কে থাকিলে ধরা পড়ার সম্ভাবনা আছে। আসবাবপত্র, সোনা-গয়না বা জমিজেরাতে ও সব হান্সামাহুজত কম। তাই সামরিক কর্মচারী ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে জমি কেনার হিড়িক পড়ে গেছে। কাজেই জমির দরও হু হু করে বেড়ে যাচ্ছে। ১৯৩৮ থেকে ১৯৪৩ সনের মধ্যে জমির দর পাঁচ থেকে দশগুণ বেড়েছে। নূতন জমিদার বেশী লাভের আশায় অধিক খাজনায় নূতন লোকের হাতে জমি ছেড়ে দিচ্ছেন। তার কাছে প্রধান কথা হল মুনাফা। সাধারণ চাষীদের তাই দুর্দশার অন্ত নেই। একজন বিশেষজ্ঞের মতে :

“What formerly was assessed at one dollar for land tax, is now assessed at thirty-three cattis (app. a seer) of unhusked rice. Together with land tax an equal amount of grain must be sold to the Government, for which only 30 per cent payment at the official price is given and 70 per cent in exchange for Government Treasury notes to be

paid at some distant date. Thus a major part of the compulsory sale of grain merges into tax proper, and for one dollar of land tax before the war something like fifty dollars must now be paid.”

আগে যেখানে জমির খাজনা ছিল এক ডলার এখন সেখানে নেওয়া হয় প্রায় ৩৩ সের ধান। এর সঙ্গে সরকারকে আবার এই সমান ওজনের ধান বেচতে হয়। তার শতকরা ত্রিশ ভাগের দাম দেওয়া হয় সরকারী নিয়ন্ত্রিত দরে আর বাকী সত্তর ভাগের জন্তে দেওয়া হয় সরকারী বিল। এই ভাবে জোর করে যে পরিমাণ শস্য বিক্রি করানো হয়, তার বেশীর ভাগই আসল খাজনার মধ্যে পড়ে, আর তার ফলে, আগে যেখানে ১ ডলারে সারা যেত এখন সেখানে লাগে ৫২ ডলার।

গ্রাম ছেড়ে শহরে এলেও দেখা যায় একই অবস্থা—শুধু স্থানপরিবর্তন বা পটপরিবর্তন হয় মাত্র। শহরগুলির অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে মনে হয়, চীনের শিল্পের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন। বর্তমান যান্ত্রিক যুগে বড় একটা শিল্প-কারখানা চালাতে হ'লে কয়লা অপরিহার্য। চীনে ১৮৬টা কয়লার খনি আছে। ১৯৪৪ সনের প্রথম দিকটাতে জানা গেল যে এই একশো ছিয়াশিটা খনির মধ্যে চুয়াল্লিশটা খনির কাজ বন্ধ হয়ে গেছে; একশোটা কাজ কমিয়ে দিয়েছে; বাকীগুলি জাতীয় সম্পদ কমিশনের সাহায্য নিয়ে চলছে। এই দুর্দশার একটা কারণ বোধ হয় এই যে, যে সব শিল্পদ্রব্যের উৎপাদনে কয়লার সাহায্যের প্রয়োজন হয় সেগুলির মধ্যে প্রায় পনের আনা জিনিষের দর যখন (১৯৩৭-১৯৪৩) বেড়েছে তিনশো পঁচিশ গুণ, তখন কয়লার দর বেড়েছে মোট একশো আঠারো গুণ। এই বাড়তির অল্পপাতে কয়লার দর যদি অন্ততঃ টনপ্রতি ৩২১৪ ডলার অবধি বাড়তে পারত তো কিছু কাজ ঠিক মত চলতে পারত। কিন্তু সরকার ওদিকে কয়লার দর নিয়ন্ত্রিত করেছেন টন প্রতি ১১১৫ ডলারে। এতে শুধু চুংকিঙের কাছাকাছি চ্যালিঙ নদীর পাশের খনিগুলিতেই মাসিক ক্ষতি হচ্ছে ১,৮০,০০,০০০ ডলার। কয়লা ছাড়া বৃহৎ শিল্পের মধ্যে রইল লোহা আর ইস্পাত নির্মিত দ্রব্যাদি। এই শিল্পে খরচ এত বেড়েছে যে, মাঝারি ধরণের কারখানাগুলি পর্যন্ত বন্ধ করে দিতে হয়েছে। চীনে এখন লোহার কারখানা আছে আঠারোটা। গত ১৯৪৩ সনের এক নবেম্বর মাসেই তার মধ্যে চৌদ্দটার চুল্লী নেবাতে হয়েছে। ইস্পাতের কারখানাগুলির হিসাব নিলে দেখা যায়, ঐ সময়ের মধ্যে চারটে একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে; গোটা তিনেক কোন গতিকে কাজ চালাচ্ছে আর বাকী চারটির মধ্যে দুটি ব্যক্তিগত ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান এবং বাকী দুটি জাতীয় কমিশনের অধীনে থেকে ভাল কাজ করে যাচ্ছে।

তার পর ব্যবসা-বাণিজ্য। উনিশশো তেতাল্লিশ সনে এক চুংকিঙেই এক হাজার দোকান গণেশ উঠিয়েছে। সেই সময়ে হুনানের হেংগিয়াঙ শহরের (ব্যবসা-বাণিজ্যের একটা বড় কেন্দ্র) প্রায় এক তৃতীয়াংশ দোকানেরও একই অবস্থা হয়। এক তৃতীয়াংশ কোন রকমে চলে আর বাকী এক

তৃতীয়াংশ ভাল ভাবেই কাজ চালিয়ে যায়। চোখের ওপর এই সব দেখে শুনে উনিশশো চুরালিশে কি হবে ভেবে না পেয়ে, চীনারা সে বছরটার নাম দিয়েছিল “শোকো নিয়েন” অর্থাৎ “দিন আনি দিন ধাই বছর”। চুংকিঙের সবচেয়ে বড় তিনটে দোকানের একত্রে গড়ে যে লাভ-ক্ষতি হয়, তা থেকে এসব ব্যবসায়ের অবস্থা বোঝা যাবে। ১৯৪৫ সনের প্রথম ছ’মাসে এসব প্রতিষ্ঠানের দৈনিক বিক্রি হয় গড়ে ১১২০০০ ডলার, আর তার অর্ধেক যায় দৈনিক খরচ।

জিনিষপত্রের দর এমনি ভাবে বেড়ে যাওয়াতে ব্যাঙ্ক ব্যবসাতেও পরিবর্তনের চেষ্টা লেগেছে। সূদের মাসিক হার এখন চলছে শতকরা দশ ডলার; অর্থাৎ বছরে একশো কুড়ি ডলার। ফাঁটকা কারবার চলছে পুরোদমে। তাকে ঠাণ্ডা করার চেষ্টা সরকারের বড় একটা দেখা যায় না। নামকা-ওয়াস্তে একটা আইন আছে—তাতে নতুন ব্যাঙ্ক খোলা বা মহাজনী কারবার-গুলোর ভোল বদলান নিষিদ্ধ। কিন্তু এই সামান্য হুকুমদারীতে কি মানুষের মুনাফার লোভকে ঠেকানো যায়? আর এইখানেই মানুষের পাটোয়ারি বুদ্ধির চরম প্রকাশ দেখা গেছে। আইনে ব্যাঙ্ক করা নিষিদ্ধ—বেশ! দেশময় অমনি গজিয়ে উঠল ছাজার বীমা কোম্পানী। গত ১৯৪৪ সনের এক এপ্রিল মাসেই এমনিভাবে এগারোটা নতুন কোম্পানী খোলা হয় শুধু চুংকিঙ শহরে। কিসের এবং কাদের বীমা এরা করে, সে প্রশ্ন উঠতে পারে। কিন্তু তেমন প্রশ্ন করার মত উৎসাহী ব্যক্তি সরকারে নেই। লোকে পুরোনো আইন বাঁচিয়ে কাজ করে যাচ্ছে, তাতেই সরকার খুশী। নতুন আইনের ঝুঁকি পোছায় কে? নতুন আইন বা ‘ছায়’ চীনে তবু আছে এবং বিশেষভাবেই চলছে, আর তার নাম দেওয়া যায় মাংস্ত ছায়। ছোট্ট উবে গড়ে উঠল মাঝারি; আবার কতগুলো মাঝারি লোপ পেয়ে মোটে কয়েকটা বড় বড় কোম্পানী এখন চলছে। অল্প কথায়, সমস্ত সম্পদ এবং শক্তি—যা দেশের লোকের মধ্যে এবং জাতীয় জীবনের নানা স্তরে ছড়িয়ে ছিল তা মুষ্টিমেয় লোকের হাতে গিয়ে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। শুধু মোটা পুঁজি খার আছে, সে-ই এখন ব্যবসায়ে বেশী লাভ করতে পারে। এদের সম্পর্কে চীনারা একটা কথা ব্যবহার করছে। বহুল ব্যবহারে-তা একটা প্রবাদে দাঁড়িয়ে গেছে। কথাটা বাংলাতে তর্জমা করলে দাঁড়ায়—“যার আন্তিন যত লম্বা, সেই তত ভাল নাচে।”

এই তো দেশের অবস্থা। সত্যি বলতে গেলে সরকারের দুর্বলতা আরও বেশী। তার ঘরে বাইরে সব জায়গাতেই হান্ধামা। যুদ্ধ তো চলছেই; তার উপর এসব হান্ধামা এবং রাজনীতিক বিভিন্ন দল ও প্রতিষ্ঠানের হুমকির বিরাম নেই। গত ১৯৪৪ সালের মে মাসে পাঁচটা প্রধান শিল্পসম্মত সরকারের কাছে এক আরজি পেশ করেছে। তাতে দেশের ধন, জন ও জীবনযাত্রার মানরক্ষার জন্ত আকুল আবেদন জানানো হয়েছে। চীনের অস্থায়ী প্রধান রাজনীতিক দল “ডেমোক্রেটিক পার্টি” (সরকারী ও সাম্যবাদী দলের মধ্যপন্থী) এক ফতোয়া জারী করে সরকারকে কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করার প্রয়াস পেয়েছে। ফতোয়াতে দাবি করা হয়েছে যে চীনের পক্ষে

এখন প্রয়োজন হ’ল সব কুচক্রীদের সরিয়ে নতুন করে এবং সত্যিকারের ঈশ্বরপ্রতিষ্ঠা করা। জাতি হিসেবে মহাচীনের চরম অধোগতি হওয়ার আগেই যেন এই সতর্কবাণী সরকারের কানে পৌঁছায় সে ইচ্ছাও জানানো হয়েছে।

সরকারের সত্যিই চেষ্টা হয়েছে কিনা সে প্রশ্ন মনে উদ্ভূত হয়। চীনের সর্বোচ্চ অর্থনীতিক পরিষদের উদ্বোধন করতে গিয়ে সর্বাধিনায়ক চিয়াং কাইশেক বলেছেন,

We must not allow internal disturbances to make us lose sight of the basic need of the Chinese people for a higher standard of living than they have now . . . It is my intention to assume personally the direction of China's economic reconstruction and development. —Reuter, Nov. 26, 1946.

—চীনের জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান যে বাড়ানো দরকার, আমাদের নিজেরদের মধ্যে ঝগড়াঝটিতে সে কথাটি যেন ভুলে বসে না থাকি। আমি ভাবছি কেমন করে চীনকে নতুন করে, উন্নত করে গড়ে তুলতে হবে, সে-পথ আমি নিজেই বাতলে দেব।

নতুন চীন গড়ে তোলার জন্ত চিয়াং কাইশেক ছটি নির্দেশ দিয়েছেন :

(১) দেশময় যানবাহনের স্রবন্দোবস্ত করার একটা কর্ম-পন্থা গ্রহণ করিতে হবে।

(২) চাষ-বাসের উন্নতির জন্ত আরও মনোযোগী হতে হবে।

(৩) চীনা শিল্পগুলোর উৎপাদন যাতে বাড়ি তার ব্যবস্থা এখনই করা হোক। বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে জালানি, কয়লা, কাপড় ও বাতীর তৈরীর শিল্পগুলোর ওপর।

(৪) চীনের বহির্বাণিজ্য বাড়ানোর জন্তে নতুন পথের সন্ধান করা হোক।

(৫) মন্ত্রিপরিষদকে জনস্বাস্থ্যের দিকে বিশেষ নজর রাখতে হবে।

(৬) মন্ত্রী, স্থানীয় কর্মচারী ও উপযুক্ত শিক্ষিতসম্প্রদায় থেকে লোক নিয়ে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার একটা কর্মসূচী এখনই গ্রহণ করা হোক।

কোন বিশেষ কর্মসূচি অবলম্বিত হয়েছে কিনা তার খবর এখনও পাওয়া যায় নি। তবুও বলা যায় যে, কর্মসূচী গ্রহণ করা সহজ—কাগজে কলমে অনেক ক্ষেত্রেই তা করা হয় কিন্তু আসল কাজটুকুই বাদ পড়ে যায়। জাপানী আক্রমণ ব্যাহত করতে গিয়ে চীনের আফিমের নেশা কেটেছে। কিন্তু আত্মঘাতী অন্তর্দ্বন্দ্বের যে সর্বনাশা নেশা চীনকে পেয়ে বসেছে তার অবসান কবে হবে কে জানে? চিয়াং কাইশেক যতই চেষ্টা করুন, একথা অতি সত্যি যে রাজনীতিক হৈযু না এলে অর্থনীতিক কোন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করা যায় না। তাই তাঁর নির্দেশে যে খুব কার্যকরী হচ্ছে এ কথা বলা যায় না। এই সে দিনের কাগজেও দেখা যায়,

China is in the grip of a fast developing trade-slump. Government sources admit that in Tsingtao, an important port of the Shantung peninsula and a former German con-

cession, 80 concerns have closed their doors in the last two months and many more are expected to do so.

- (চীন ব্যবসা মন্দার কবলে পড়েছে। সরকার পর্যাপ্ত স্বীকার করেছেন যে সিংতাও-য়ে (সিংতাও-হুয়ে শান-তুং উপদ্বীপের একটি বড় বন্দর; আগে জাপানিদের দখলে ছিল, গত দু'মাসের মধ্যে আশীটি ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান কাজ বন্ধ করেছে। তা ছাড়াও আরো বেশ কতকগুলোর নান্টিংস উপরে।

বিলাতের মানচেষ্টার গার্ডিয়ান পত্রিকার এক সংবাদদাতা হিসাব করে দেখেছেন যে এক সাংহাইয়েই রকমারি কাজের প্রায় পাঁচশ'টা কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। চুংকিঙের অবস্থাও সুবিধার নয়। এর কারণ নাকি এই যে বিদেশী জিনিষ সস্তায় বিক্রি হয়ে বাজার মাত করে দিচ্ছে। তার উপর জালানির অভাব, কাঁচা মালের অভাব, যানবাহনের অসুবিধা, জিনিষপত্রের চড়া দাম ইত্যাদি ত আছেই। কিন্তু এত সব হাদ্দ্যামা কিসের জেত? তা কি মেটানো যায় না? ইংরেজ সাংবাদিক অল্প কথায় সার সত্যটি সুন্দর ভাবে বলেছেন,

"The majority of these causes could be obvious : stop the Civil War."

(এক কথায় যাবতীয় কারণের মূল কথা হচ্ছে : যুদ্ধ-)

ক্ষীতি—বাড়তি টাকা। আর এর আসল ওমুখ ও জানো আছে—সেটা হচ্ছে, এই ধরোয়া যুদ্ধের অবসান করা।)

তা হলে দেখা যাচ্ছে দু'বছর আগে যে অবস্থা ছিল আজও তার কোন পরিবর্তন হয়নি বরং অবস্থা ক্রমশঃ মন্দের দিকে এগিয়ে চলেছে। বাইরে থেকে সবাই এ সব দেখছে। চীনারা নিজেরাও দেখছে কিন্তু প্রতিকারের চেষ্টা নেই কেন? এ কথার উত্তর দিতে গেলে অর্থনীতির দেউড়ি পেরিয়ে বিশ্বরাজনীতির প্রাঙ্গণে পা বাড়াতে হয়। আর এ ক্ষেত্রে প্রথমেই মোলাকাত হয় আমেরিকার সঙ্গে। রুশ শক্তির বিরুদ্ধাচরণের ও চীনের চল্লিশ কোটি লোকের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গবার দুর্দমনীয় স্পৃহাতেই আমেরিকা অনবরত চিয়াং কাইশেককে অর্থ সরবরাহ করে যাচ্ছে। এমন কি, নানা অছিলায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে চীনের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পর্যাপ্ত দ্বিধা করছে না। চীন আজ আমেরিকার হাতের পুতুল মাত্র। অথচ চীনের খনিজ সম্পদ অতুলনীয়। তার জনসম্পদও প্রচুর। চীনারা যেমন ধৈর্য্যশীল ও পরিশ্রমী, তেমনি কোশলী। এসব সত্ত্বেও চীন সান-ইয়াং-সেনের "সান-মিন-চু-আই"-এর আদর্শ ভুলে যাচ্ছে। সেই আদর্শে প্রণোদিত হয়ে মহাচীন এশিয়াতে তথা পৃথিবীতে তার যথাযোগ্য গৌরবের স্থান অধিকার করুক। ভারত-বাসীরা নিশ্চয়ই এই কামনাই করে।

বঙ্কিমচন্দ্র

শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়

তিমিরায়ত বন্ধুর পথ বন্ধায়ুধের রাত,
নাহি ধ্রুবতারা, কাণ্ডারী-হারা মরণোন্মুখ জাতি।
সহসা রাতের তিমির বিদারি শোনা গেল কার বাণী,
"সাধনা আমার সফল হবে কি? জীবনের পণ মানি।"

শৃঙ্খল বাজে জননীর পায়ে, সন্তান-বুক ফাটে।
বন্ধিতে মায়ে হাজারে হাজারে বীর সন্তান জোটে।
মহা মানবের মিলন-যজ্ঞে জীবন আহুতি দানি,
ঘুচাবে তাহার সজলা সফলা জন্মভূমির গানি।

ছুট দমনে শিষ্ট পালনে-খর্পরধারী নারী।
কামনা শূন্য শুভ্র-সুন্দর অনন্ত-পথ-চারী।
শ্রীকৃষ্ণ পায়ে নিবেদিত সকল দূর করে সংশয়;
এক চোখে তার ধ্বংসের জালা, আর চোখে বরাভয়।

সাহিত্য-রথী, স্বদেশ-প্রেমিক; ব্রাহ্মণ-সনাতন,
স্বাভাবিক তুমি বঙ্কিম, বীৰ্য্যতে নিমগন।
জানদীপ আলি দিয়েছ উজলি নিয়ত আপন পর।
যুগের সারথী, সুরী সন্ধানী, তুমি সে যুগন্ধর।

রূঢ় কষাঘাতে মিথ্যা শাসিয়া সত্য করেছ খাড়া।
নির্জিত এই বাংলার বুক জাগালে তীব্র সাড়া।
কমলাকান্ত অতি প্রশান্ত মিঠে রসিকতা দিয়া,
অমরতা লভি যুগ-সাহিত্যে, জিনেছে সবার হিয়া।

মাতৃভক্ত, শক্তিসাধক, সত্যদ্রষ্টা ঋষি।
তোমার মাতৃ-মন্ত্র মোদের রক্তে গিয়াছে মিশি।
কিন্তু দেবতা, পারি নি ঘৃণাতে মায়ের পায়ের বেড়ি।
ছাড়ি নি চেষ্টা, শিকল ছিঁড়িতে জাণি না কত যে দেবী।

স্বাধীন ত্রিপুরার রাজমালা

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

পূর্বভারতের পূর্বসীমায় অবস্থিত স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্য আজ ভারতের নবযুগারম্ভে অভিনব অরুণালোকে রঞ্জিত হইয়া সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। স্বরণাতীত কাল হইতে আরম্ভ করিয়া যে রাজবংশ প্রায় অবিচ্ছিন্ন ধারায় নানা বিপর্যয় অতিক্রম করিয়া নাতিক্ষুদ্র রাজ্যের স্বাধীনতা আজ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছে তাহার গৌরবোজ্জ্বল কথা প্রত্যেক বাঙালীর হৃদয়ে এখন আনন্দলহরী উৎপাদন করিবে সন্দেহ নাই। ইংরেজ রাজত্বকালে সভ্যতার গতি পশ্চিমাভিমুখী হইয়া পড়িয়াছিল এবং ফলে শিক্ষিত বাঙালী প্রায় সর্বদাই পূর্ব প্রান্তস্থিত ত্রিপুরা রাজ্যকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেন। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে নবগঠিত জমীদার সভার (Landholders' Society) প্রথম অধিবেশনে সভাপতি রাজা রাধাকান্ত দেব বলিয়া ছিলেন কৃষ্ণনগরের রাজবংশই বাংলার প্রাচীনতম জমীদার ("the most ancient landholder in Bengal")। এই অমূলক উক্তির প্রতিবাদে *Friend of India* পত্রের সম্পাদক স্বরণ করাইয়া দিয়াছিলেন যে ত্রিপুরার মানিক্য রাজগণই বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ এবং প্রাচীনতম রাজা সন্দেহ নাই :—"The noblest and most ancient chief in Bengal is, without doubt, the Raja of Tipperah, of the illustrious family of Manick" (*Friend of India*, 29 March 1838)। ত্রিপুরা রাজ্যের ইতিহাস বিষয়ে বাংলার জনসাধারণের অজ্ঞতা বিগত এক শতাব্দীমধ্যে অনেকাংশে দূর হইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও কয়জন বাঙালী অবগত আছেন যে ত্রিপুরার রাজবংশ কেবল বাংলার নহে, পরন্তু সমগ্র ভারতবর্ষের বর্তমান রাজমণ্ডলীর মধ্যেই প্রাচীনতম? এই রাজ্যের প্রত্নসম্পদ এবাবৎ আবিষ্কৃত মুদ্রা, শিলালিপি, তাম্রশাসন, প্রাচীন পুথি ও দলীলপত্রদ্বারা এত প্রচুর পরিমাণে জ্ঞাত হওয়া যায় যে তাহার তুলনা অশ্রদ্ধ আছে কি না সন্দেহ। দুঃখের বিষয়, মহারাজা বীরচন্দ্রমাণিক্যের রাজত্বকাল হইতে আরম্ভ করিয়া বিগত অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যে রাজকোষের সহস্র সহস্র টাকা ব্যয় হইয়া থাকিলেও ত্রিপুরার ইতিহাস বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে এখনও রচিত হয় নাই। ত্রিপুরার ইতিহাসের প্রধান উপাদান "রাজমালা" গ্রন্থ নাতিদীর্ঘ হইলেও সম্পূর্ণ মুদ্রিত হয় নাই—যে তিন "লহর" বৃহদাকার চিত্রাদিশোভিত রাজমালা এবাবৎ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা ক্ষমপ্রমাদে পরিপূর্ণ এবং বহুলাংশে অপ্রামাণিক। তথাপি

গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হইলে ত্রিপুরার ইতিহাসের একটিমাত্র উপাদান ঐতিহাসিকের হস্তগত হইতে পারে। রাজব্যয়ে মুদ্রিত উক্ত গ্রন্থের প্রচারপদ্ধতিও অতি বিচিত্র—ইহা বিনামূল্যে জনৈক রাজপুরুষের অভিকচিমতে বিতরিত হয়, বিক্রয় হয় না। ফলে, যাক্সা করিয়া বহুক্ষেপে ইহা আমাদের সংগ্রহ করিতে হইয়াছে, যদিও আমরা দেখিয়াছি রাজ্যের অযোগ্য ব্যক্তির হস্ত হইতে ইহা মুদ্রী দোকানের ঠোঙায় পরিণত হইয়াছে। ইংরেজশাসনের বিচিত্রবিধানের দেশীয় রাজ্যের রাজারা বহুস্থলেই বিদেশী অর্থগুরু মোসাহেব দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া থাকিত, ত্রিপুরায়ও ইহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। এইরূপ কতিপয় চক্রান্তকারী মুহারাজা বীরচন্দ্র-মাণিক্যকে প্রতারিত করিয়া সংস্কৃতরচনায় সিদ্ধহস্ত এক পণ্ডিত দ্বারা "রাজরত্নাকর" নামক এক কৃত্রিম গ্রন্থ রচনা করাইয়াছিল। দ্বাদশসর্গে সম্পূর্ণ ইহার "পূর্ববিভাগ" ১৩০৫ ত্রিপুরাব্দে (১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে) রাজব্যয়ে মুদ্রিত হয় (নাগরাক্ষরে ১২৭ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ)। গ্রন্থমধ্যে ইহার কৃত্রিমতার বহু অকাট্য নিদর্শন বিদ্যমান আছে। রাজমালার সম্পাদক স্বর্গত কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত মহাশয় অসত্যনিষ্ঠ রাজতত্ত্বের ভয়ে রাজরত্নাকরের কৃত্রিমতা অগ্রাহ্য করিয়া স্থানে স্থানে তাহা হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া নিজগ্রন্থের প্রামাণ্য ব্যাহত করিয়াছেন। আমরা আশা করি বর্তমান নূতন পরিস্থিতিতে ত্রিপুরারাজ্যের প্রকৃত তথ্যমূলক ইতিহাস রচনায় সকল বাধাবিলম্ব দূর করিয়া খ্রীষ্টীয়ুক্তা মহারাণী ও তদীয় মন্ত্রিবর্গ বাংলার ইতিহাসের একটি অভাব পূরণ করিতে সমর্থ হইবেন।

প্রায় ৪০ বৎসর যাবৎ আমরা ত্রিপুরার ইতিহাসের যে সকল উপকরণরাজি সংগ্রহ করিয়াছি তাহা হইতে সারসঙ্কলন করিয়া ত্রিপুররাজবংশের বিবরণের মূলসূত্র লিপিবদ্ধ করিতেছি।

পৌরাণিক যুগ :—ত্রিপুররাজবংশের আদিপুরুষের নাম "দৈত্য"। প্রাচীন রাজমালার মতে তিনি চন্দ্রবংশীয় বিখ্যাত রাজা যযাতির বংশধর ছিলেন :—

চন্দ্রবংশে মহারাজা যযাতি নৃপতি।

নিজবাহুবলে সশাশে সপ্তদ্বিপ ক্ষিতি ॥

তান বংশে জন্মিলেক দত্য নাম বলি।

বিধিমতে মেদিনী সাসিল কুতুহলি ॥

বিধাতা নির্বন্দ হেতু সেই মহাজন।

অগ্নিকোণে দেসপতি হইল রাজন ॥

(রাজমালা ২১ পত্র)

রাজমালার প্রথমার্শ যে ধর্মমাণিক্য রচনা করাইয়াছিলেন তাহার প্রকৃত নাম “দৈত্যখণ্ড।” ১২৩৮ খ্রিপুরাধি-
 দুর্গামণি উজীর প্রাচীন রাজমালা সংশোধন করিয়া অনেক
 ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ বিষয় সংযোগ করিয়াছিলেন। বর্তমানে এই
 সংশোধিত গ্রন্থই মুদ্রিত হইতেছে। ইহাতেই সর্বপ্রথম
 জহ্মুর নাম পরিগৃহীত হয় :—

“জহ্মু বংশে দৈত্য রাজা কিবাতনগর।

অনেক সহস্র বৎসর হইল অমর ॥” (পৃ ৫)

পরে রাজরত্নাকর প্রভৃতি কৃত্রিম রচনাধারা জহ্মু হইতে
 দৈত্য পর্য্যন্ত ৩৮ পুরুষের কালনিক নাম সৃষ্টি করিয়া
 রাজবংশের গোঁরব (?) বদ্ধিত হইয়াছে। প্রাচীন রাজ-
 মালার বহির্ভূত বিষয়মাত্রই প্রমাণবিরুদ্ধ বলিয়া প্রত্যাখ্যান
 করিতে হইবে। দৈত্য হইতে “যুবার ফা” পর্য্যন্ত (৭২
 পুরুষ) ৭৪ জন রাজার কাল অলৌকিক কথায় পরিপূর্ণ
 পৌরাণিক যুগ বলিয়া খ্যাপন করা যায়। ত্রিপুরারাজ্য
 ক্রমশঃ দক্ষিণে প্রসারলাভ করে। দৈত্যের রাজধানী
 ছিল কপিলানদীর তীরবর্তী ত্রিবেগনগরে। তাহার পৌত্র
 ত্রিলোচন শিবের ওরসে “তিন চক্ষু” হইয়া জন্মেন এবং
 যুধিষ্ঠির কর্তৃক সম্মানিত হইয়াছিলেন। তৎপুত্র দাক্ষিণ
 বড়বক্রনদীর তীরে “খলংমা” নামক স্থানে রাজধানী করেন।
 তাহার ভ্রাতা হেরম্মাধিপতির রাজ্য ও বংশ বহুকাল লুপ্ত
 হইয়াছে। বহুপুরুষ পরে প্রতীত রাজা হেরম্মের সহিত
 বিরোধ হেতু খলংমা ত্যাগ করিয়া “ধর্মনগরে” নূতন
 রাজধানী করেন। প্রতীতের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ
 হামতার ফা।

হামতার ফার পুত্র পুনি জুবার ফা হইল।

বহু জন্ম করিয়া সে রাজ্যমাটি লইল ॥

(রাজমালা ১২১১ পত্র)

এই রাজ্যমাটি অর্থাৎ রত্নমুক্তিকাময় অধুনাতন উদয়পুর
 অঞ্চল জয় হইতেই রাজমালার দৈত্যখণ্ডে আধুনিক
 দৃষ্টি-ভঙ্গীতে ঐতিহাসিক যুগ আরম্ভ হইল বলিয়া ধরা
 যায়।

রাজ্যমাটিদেশের লিকা নামক সামন্ত রাজা ও তাহার
 দশ হাজার সৈন্য পরাজিত করিয়া “জুবার নৃপতি তথা হইল
 নরেন্দ্র” (১২১১ পত্র) এবং পরে সেখান হইতে “বঙ্গদেশে”র
 অন্তর্গত বিশালগড় আদি স্থান অধিকার করেন। অর্থাৎ
 যুবার ফার সময় হইতেই ত্রিপুরারাজ্যের মূল্যংশ প্রায়
 অবিকৃত অবস্থায় বর্তমানকাল পর্য্যন্ত বিদ্যমান রহিয়াছে।
 যুবার ফার কালনির্নয়ের একমাত্র প্রমাণ পুরুষগণনা।
 রত্নমাণিক্য যুবার হইতে অধস্তন ২৫ পুরুষ। রত্নমাণিক্য
 হইতে বর্তমানকাল পর্য্যন্ত রাজাদের রাজত্বকাল সুনির্দিষ্ট
 আছে এবং তাহা হইতে রাজত্বকাল ও জয়কাল ধরিয়া

গণনাদ্বারা এক পুরুষের গড়পড়তা পাওয়া যায় ২৭ হইতে
 ৩১ বৎসর। তদনুসারে যুবার ফার রাজ্য আরম্ভ খ্রিঃ
 সপ্তম শতাব্দীর শেষার্ধ্বে কিম্বা অষ্টম শতাব্দীর প্রথম পাদে
 পতিত হয়। রাজমালার পাওয়া যায় যুবার ফার সময়
 হইতেই উদয়পুরে রাজাদের স্থান “বৈকুণ্ঠপুরী” নামে
 পরিচিত হয় এবং যুবার ফার স্থানোপরি মঠ নিশ্চিত হয়।
 এই মঠই ত্রিপুরা রাজ্যে ত্রিপুররাজগণের প্রাচীনতম কীৰ্ত্তি,
 যদিও ইহার ধ্বংসাবশেষ বর্তমানে চিহ্নিত করা অসম্ভব।
 বুঝা যায় রাজমালার দৈত্যখণ্ড রচনাকালে ধর্মমাণিক্যের
 সময়েও প্রাচীরবেষ্টিত এই মঠের চিহ্ন বিদ্যমান ছিল। খ্রিঃ
 ৭০০ হইতে অবিচ্ছিন্ন ধারায় প্রায় ১২৫০ বৎসর ধরিয়া
 একই রাজবংশ এক স্থানে রাজত্ব করিতেছেন, ইহার দ্বিতীয়
 উদাহরণ ভারতের কিম্বা জগতের ইতিহাসে পাওয়া যাইবে
 কিনা সন্দেহ। অথচ আমরা পৌরাণিক যুগের পূর্বতন
 ৭২ পুরুষের নাম বাদ দিতেছি।

রত্নমাণিক্যের বৃদ্ধপ্রপিতামহ “ছেংগু ফার” সহিত
 গোঁড়াধিপতির যুদ্ধ হইয়াছিল এবং সেই যুদ্ধে রাজমহিষী
 স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া অপূর্ণ বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন।
 ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত মেহেরকুল পরগণার চৌধুরী হিরাবল্লভ
 খাঁর সহিত সংঘর্ষে এই যুদ্ধের স্মরণপাত হয়। যদিও খাঁ
 উপাধি হইতে গোঁড়ের স্মরণতানের আভ্যুগত্য সূচিত হয়,
 তথাপি “গোঁড়রাজা” বলিতে রাজমালায় সম্ভবতঃ
 সমতটাদিপতি দামোদরদেব (১২৩১-৪৪ খ্রিঃ) কিম্বা দেব-
 বংশীয় অপর কোন নরপতিকে বুঝাইতেছে। কারণ খ্রিঃ
 ১৪শ শতাব্দীর পূর্বে কোন গোঁড় স্মরণতানের পক্ষে ত্রিপুরা-
 রাজ্য আক্রমণ করা সম্ভব ছিল না। মহারাজা বীরচন্দ্র
 মাণিক্যের রাজত্বকালে বিজয়চন্দ্র রচিত “ত্রিপুরবংশাবলী”
 নামক গ্রন্থানুসারে উক্ত রাজমহিষীর নাম “ত্রিপুরামহেন্দ্রী”
 এবং ৬৫০ খ্রিপুরাধি সেনরাজাদের সহিত ঐ যুদ্ধ হইয়া-
 ছিল। আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, উক্ত গ্রন্থ ভ্রম-
 প্রমাদে পরিপূর্ণ একটি তুচ্ছ বস্তু, ইহার কোন উক্তিই বিনা
 প্রমাণে গ্রহণীয় নহে। উক্ত যুদ্ধের ফলে রাজ্যমাটি “সুস্থির”
 হইল বটে, কিন্তু মেহেরকুল পরগণা ত্রিপুররাজ্যের অধিকারে
 আসে নাই (দুর্গামণি সংশোধিত রাজমালার উক্তি এস্থলে
 ভ্রমাত্মক)। কারণ, রত্নমাণিক্যই সর্বপ্রথম মেহেরকুল
 প্রভৃতি বঙ্গদেশ জয় করিয়াছিলেন, এইরূপ স্পষ্টনির্দেশ পরে
 পাওয়া যায়।

ডাঙ্গর ফার কনিষ্ঠপুত্র রত্নফা সর্বপ্রথম “মাণিক্য”
 উপাধি ধারণ করিয়া ত্রিপুরারাজ্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।
 ১৩১৪ খ্রিপুরাধি (১২০৪ খ্রিঃ) উদয়পুরে মুক্তিকাগর্ভ হইতে
 ৫০টি রৌপ্যমুদ্রা আবিষ্কৃত হয়, তন্মধ্যে ২০টি এই রত্ন-
 মাণিক্যের রাজত্বকালীন বটে। রাজদরবারের ক্রটিতে

ত্রিপুরাধিপতিগণের এই সকল প্রাচীনতম গৌরবচিহ্ন নানা স্থানে নানা লোকের হস্তগত হইয়া বিলুপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা হইয়াছে। আমরা সৌভাগ্যবশতঃ ৪টি মুদ্রা পরীক্ষা করিতে পারিয়াছি। তন্মধ্যে প্রাচীনতম মুদ্রার তারিখ ১২৮৬ শক (১৩৬৪-৫ খ্রীঃ), ইহাই সম্ভবতঃ তাঁহার অভিষেকমুদ্রা। এই মুদ্রায় তাঁহার রাজধানীর নাম “রত্নপুর” অঙ্কিত আছে। বুঝা যায় রাজা নিজ নামানুসারে রাজ্যমাটির নাম পরিবর্তন করিয়াছিলেন। ১২৮৯ শকের অপর একটি মুদ্রায় রাজমহিষীর নাম উৎকর্ণ আছে “শ্রীলক্ষ্মীমহাদেবী”। মুদ্রানুসারে দেবকুপায় তিনি বিজয়ী হইয়াছিলেন (“শ্রীশ্রীহর্গার্বনাপ্তবিজয়ঃ”)। রাজমালা অনুসারে তিনি গোড়েশ্বরের সাহায্যে পিতা এবং ১৭ জন ভ্রাতাকে পরাজিত করিয়া রাজ্য উদ্ধার করেন এবং গোড়েশ্বরই তাঁহাকে “মাণিক্য” উপাধিতে ভূষিত করেন। রত্নমাণিক্যের স্বশাসনে আকৃষ্ট হইয়া বঙ্গদেশের নানা স্থান হইতে ব্রাহ্মণাদি বহু জাতি এবং কতিপয় সম্ভ্রান্ত মুসলমান তাঁহার রাজ্যে আসিয়া অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ইহার বহু নিদর্শন আবিস্কৃত হইয়াছে।

রত্নমাণিক্যের দুই পুত্র প্রতাপ ও মুকুট এবং মুকুট-মাণিক্যের পুত্র মহামাণিক্যের নামোল্লেখমাত্র কুরিয়াই রাজমালার প্রথমার্ধ দৈত্যখণ্ড সমাপ্ত হইয়াছে। ইহাদের রাজত্বকালীন কোন ঘটনা লিখিত নাই। ইহাদের এক-জনের সময়েই রাজা গণেশের পুত্র জালালুদ্দীন ত্রিপুরা জয় করিয়াছিলেন, এইরূপ প্রমাণ আবিস্কৃত হইয়াছে। আমরা বাহুল্যবোধে বিবরণ দিলাম না। মহামাণিক্যের পুত্র ধর্মমাণিক্যের প্রধান কীর্তি সভাসদ বাণেশ্বর ও শুকেশ্বর দ্বারা রাজমালা রচনা। এই গ্রন্থ ১৩৮০ শকের (১৪৫৮ খ্রীঃ) পরে কোন সময়ে রচিত হইয়াছিল। ইহাই বাঙ্গালাভাষায় প্রাচীনতম ইতিহাসগ্রন্থ।

রাজমালার দ্বিতীয়াংশ অমরমাণিক্যের রাজত্বকালে (১৫৭৭-৮৬ খ্রীঃ) রচিত হইয়াছিল এবং ইহার নাম রাখা হইয়াছিল “দুর্জয়খণ্ড” :—

দুর্য্যখণ্ড বলিয়া পুস্তক নাম রাখে।

শ্রীধর্মমাণিক্য হতে রাজা তাতে লিখে ॥

(রাজমালা ৩৩২ পত্র)

বস্তুতঃ এই নামকরণ সম্পূর্ণ সার্থক হইয়াছে, ধর্মমাণিক্য হইতে উদয়মাণিক্য পর্য্যন্ত রাজগণের বৃত্তান্তই ত্রিপুরার ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ বটে। তন্মধ্যে ধর্মমাণিক্যের পুত্র ধত্তমাণিক্য (১৪১২-৪৮ শক) সর্বাপেক্ষা প্রতাপশালী ছিলেন। তাঁহার প্রধান কীর্তি স্বলতান হসেন শাহের সৈন্তগণকে পরাজিত করিয়া তিন বার চাটিগ্রাম অধিকার

করা—প্রথম যুদ্ধ ১৪৩৫ শকে হইয়াছিল। ১৪৪২ শকে তিনি স্বপ্রাঙ্গিষ্ট হইয়া চাটিগ্রাম হইতে আনিয়া ‘ত্রিপুরা-স্বন্দরী’ মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। মূল শিলালিপিতে মন্দির প্রতিষ্ঠার তারিখ ১৪৪২ শক লিখিত ছিল। রামমাণিক্য ১৬০৩ শকে মন্দিরের জীর্ণসংস্কার করিয়া শিলালিপি যোজনা করেন, তাহাতে উল্লিখিত মূল মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকাল (“শাকে বহুক্ষিবেধোমুখধরগণিযুতে” অর্থাৎ ১৪২৩ শক) ভ্রমাত্মক।

ধত্তমাণিক্যের পুত্র ধ্বজমাণিক্যের নাম অলীক, রাজ-মালার কোন প্রতিলিপিতেই ইহা নাই। দেবমাণিক্যই তাঁহার পুত্র ছিলেন। তাঁহার অভিষেকমুদ্রা আবিস্কৃত হইয়াছে, তারিখ ১৪৪৮ শক ও মহিষীর নাম “পদ্মাবতী”। তৎপুত্র বিজয়মাণিক্যের বিক্রমকথা এখন অনেকটা পরিচয় লাভ করিয়াছে। তাঁহার অভিষেকমুদ্রার তারিখ ১৪৫৪ শক এবং দুই মহিষীর নাম “লক্ষ্মীবালা” (লক্ষ্মীবাণী নহে) ও “সরস্বতী”। তাঁহার রাজত্বকালীন একটি তাম্রশাসন সম্প্রতি আবিস্কৃত হইয়াছে। তাহার বিবরণ প্রবন্ধান্তরে লিখিত হইবে।

বিজয়মাণিক্যের নাম আইন-ই-আকবরীতে উল্লিখিত হইয়াছে। তৎপুত্র অনন্তমাণিক্য (অভিষেকমুদ্রা ১৪৮৭ শক, মহিষীর নাম “রত্নাবতী”) সেনাপতির হস্তে নিহত হইলে ত্রিপুরার সিংহাসন ১০ বৎসরকাল রাজবংশের অধিকারচ্যুত হইয়া উক্ত সেনাপতি উদয়মাণিক্য (অভিষেকমুদ্রা ১৪৮৯ শক, মহিষী “হিরা”) ও তৎপুত্র জয়মাণিক্য (অভিষেক-মুদ্রা ১৪৯৫ শক) করতলগত হইয়াছিল। তৎপর বিজয়-মাণিক্যের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা অমরমাণিক্যের (অভিষেকমুদ্রা ১৪৯৯ শক, মহিষী অমরাবতী) প্রবলপরাক্রমে রাজত্ব করিয়া মঘরাজা সেকান্দর সাহার হস্তে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইয়া আত্মহত্যা করেন। তৎপুত্র রাজধরমাণিক্য (অভিষেকমুদ্রা ১৫০৮ শক, মহিষী সত্যাবতী)। রাজধরের পুত্র যশোমাণিক্য (মুদ্রা ১৫২২ শক, মহিষী লক্ষ্মী, গৌরী ও জয়া) মোগলসৈন্তের হস্তে পরাজিত হইয়া রাজ্য ত্যাগ করেন।

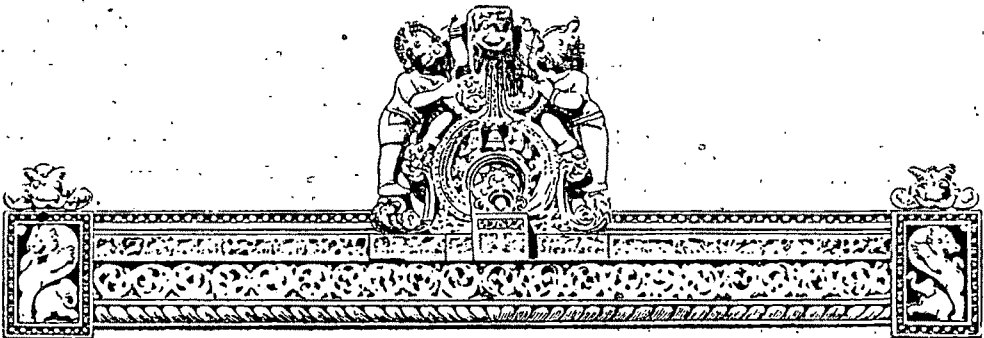
১। শ্রদ্ধেয় ত্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র বর্দ্ধন মহাশয় এই মুদ্রা আবিস্কার করেন। তাঁহার সৌজন্তে তাঁহার নিকট রক্ষিত ত্রিপুররাজগণের নবাবিস্কৃত মুদ্রাগুলি আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, ধত্তমাণিক্যের মুদ্রার তারিখ প্রকৃতপক্ষে ১৪৩৫ শক, ১৪৩৬ শক নহে (আনন্দবাজার, ১৯ পৌষ ১৩৫৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য) এবং রাজমালায় এখানে কোন্ ভুল নাই। প্রাচীন রাজমালার পুঁথি দেখার সুযোগ পাইলে ত্রীযুত বর্দ্ধন মহাশয় দেখিতে পারিতেন যে তাঁহার প্রদর্শিত ভ্রমপ্রমাদগুলির অধিকাংশ মূল গ্রন্থে ছিল না।

এক ধর্মমাণিক্যের ধারা তাহাতেই সমাপ্ত হয়। রত্নমাণিক্য হইতে যশোমাণিক্য পর্য্যন্ত মোট ৯ পুরুষের রাজত্বকাল পাওয়া যায় ২৬০ বৎসর অর্থাৎ একপুরুষের গড়পড়তা হয় ২৯ বৎসর। রত্নমাণিক্যের বয়স অভিষেককালে ন্যূনপক্ষে ২৫ ধরিয়া যশোমাণিক্য (জন্মাব্দ ১৫০১ শক) পর্য্যন্ত গণনা করিয়া একপুরুষের গড়পড়তা হয় ৩০ বৎসর।

১৫২১ শকে (১৬৬৯ খ্রীঃ) গোবিন্দমাণিক্য রাজমালার তৃতীয়াংশ অমরমাণিক্য হইতে কল্যাণমাণিক্য পর্য্যন্ত রচনা করেন—ইহার নাম “উত্তরজুজ্জ্বলখণ্ড”। কল্যাণমাণিক্য (জন্মাব্দ ১৫০২ শক) ধর্মমাণিক্যের ভ্রাতা গগন খাঁর অধস্তন ষষ্ঠপুরুষ অর্থাৎ যশোমাণিক্যের “জ্ঞাতিভ্রাতা” ছিলেন—তাহার পিতার নাম বসন্ত ও পিতামহের নাম ইন্দ্র। উদ্ধতন দুই পুরুষের নাম পাওয়া যায় না। কল্যাণমাণিক্যই রাজবংশের বর্তমান ধারার আদিপুরুষ এবং মোগল বিজয়ের পরে রাজ্যকে পুনরায় স্বাধীন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। রাজমালার রচয়িতা তাঁহাকে জিলোচনের সহিত তুলনা করিয়া অপূর্ব সম্মান দেখাইয়াছেন। তাহার সময় হইতে বর্তমানকাল পর্য্যন্ত প্রত্যেক রাজার বিস্তৃত বিবরণ জ্ঞাত হওয়া যায়, কিন্তু ত্রিপুরার রাজদরবার হইতে তাহা প্রকাশের কোন ব্যবস্থা এযাবৎ হয় নাই। কল্যাণমাণিক্যের অভিষেকমুদ্রার তারিখ ১৫৪৮ শক এবং ১৫৮২ শকে পূর্ণ ৮০ বৎসর বয়সে তিনি স্বর্গী হন। ত্রিপুরা রাজবংশে ঐতিহাসিক যুগে তিনিই সর্বাপেক্ষা দীর্ঘজীবী হইয়াছিলেন। আমরা ইংরেজ অধিকারকাল বাদ দিয়া অধস্তন রাজগণের নামমালা ও প্রকৃত রাজত্বকাল উল্লেখ করিয়াই প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম।

গোবিন্দমাণিক্যের রাজত্বকাল ১৫৮২ হইতে ১৫৯৫ শক। তাহার বৈমাত্রের ভ্রাতা ছত্রমাণিক্য ১৫৮৬ শকে কয়েক

মাস-মাত্র রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহার রাজত্বকাল সম্বন্ধে এযাবৎ মুদ্রিত সমস্ত বিবরণই ভ্রাম্যক। গোবিন্দের পুত্র রামমাণিক্যের রাজত্বকাল ১৫৯৫-১৬০৭ শক, মধ্যে কয়েক মাস নরেন্দ্রমাণিক্য বিদ্রোহী হইয়া রাজত্ব কাড়িয়া লন। রামমাণিক্যের পুত্র রত্নমাণিক্য (১৬০৭-১৬৩২ শক), মধ্যে ১৬১৫ শকে নরেন্দ্রমাণিক্য পুনঃ রাজত্ব অধিকার করিয়াছিলেন। এস্থলেও প্রচলিত গ্রন্থাদির বিবরণ ভ্রাম্যক। ভ্রাতৃদ্রোহী মহেন্দ্রমাণিক্য মাত্র দুই-বৎসর রাজত্ব করেন (১৬৩৩-৪ শক)। অপর ভ্রাতা ধর্মমাণিক্যের (অভিষেক মুদ্রা ১৬৩৬ শক) সময়ে ১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দে নবাব স্বেচ্ছা খাঁ ত্রিপুরারাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন। ধর্মমাণিক্য রাজত্ব দিতে স্বীকৃত হইয়া রাজ্য পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া এক বৎসর জীবিত ছিলেন। তাহার ভ্রাতা মুকুন্দমাণিক্যের রাজত্বকাল ১৬৫১-৬০ শক। তৎপর স্বদীর্ঘ ২০ বৎসর ত্রিপুরারাজ্যের খোরতর অন্ধকার যুগ, তন্মধ্যে ইন্দ্রমাণিক্য, জয়মাণিক্য, উদয়মাণিক্য ও সর্বশেষে বিজয়মাণিক্য সময়ে সময়ে রাজত্ব করিয়াছেন। মধ্যে লক্ষণমাণিক্যকে রাজা করিয়া ডাকাত সমসের গাজিও রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে সমসের গাজি নিহত হইলে মুকুন্দমাণিক্যের পুত্র কৃষ্ণমাণিক্য রাজত্ব অধিকার করেন—তাঁহার অভিষেক মুদ্রার তারিখ ১৬৮২ শক অর্থাৎ ইংরেজ অধিকারের সূত্রপাত বৎসর ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দ। স্বর্গত মহারাজা বীরবিজয়মকিশোরমাণিক্য কৃষ্ণমাণিক্যের ভ্রাতা যুবরাজ হরিমণির অধস্তন অষ্টম পুরুষ এবং কল্যাণমাণিক্যের অধস্তন দ্বাদশ পুরুষ। এস্থলেও রত্নমাণিক্য ও কল্যাণমাণিক্যের জন্মাব্দ হইতে গণনা করিয়া এক পুরুষের গড়পড়তা পাওয়া যায় ৩০ বৎসর। ইহার এক পুরুষে ২৫ বৎসর ধরিয়া গণনা করেন তাঁহাদের মত ত্রিপুরার রাজবংশের ৬০০ বৎসরের ইতিহাস দ্বারা সমর্থিত হয় না।



আশ্রয়প্রার্থী

শ্রীনলিনীকুমার ভট্ট

নৌয়াখালিতে সঙ্ঘাত ভ্রাতৃবিদ্বেষের বিষবাপ্প দেখতে দেখতে পার্শ্ববর্তী ত্রিপুরা জেলায়ও ছড়িয়ে পড়ল। এক শ্রেণীর স্বার্থাধেবী লোকের অপপ্রচারের ফলে নিভৃত পল্লীগ్రামগুলোতে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকের মনে পরস্পরের বিরুদ্ধে সন্দেহ আর অবিশ্বাস জমা হতে লাগল।

নূরপুরের অঘোর রায় ছিলেন বীর্ষবান তেজস্বী পুরুষ। তাঁর পরাক্রমের জেতে লোকে তাঁর আখ্যা দিয়েছিল ‘বাঘা রায়’। তিনি বিপত্নীক, সংসারে তাঁর একমাত্র বন্ধন ষোল বছরের ছেলে টিপু—তাকে নিয়ে প্রকাণ্ড বাড়ীতে তিনি একলা থাকেন—বাড়ীতে অস্ত্র আত্মীয়-স্বজন আর কেউ নেই। অঘোর রায় বিভ্রাট নন, কিন্তু ব্যক্তিত্বের গুণে আর চরিত্র-মাধুর্য্যে গাঁয়ের হিন্দু-মুসলমান সকলেরই শ্রদ্ধাভাজন।

নিজের বাড়ীতে ছুই পক্ষেরই মাতব্বর গোছের লোকদের ডেকে এনে তিনি যা বললেন, তার সারমর্ম হচ্ছে এই যে, ভায়ে ভায়ে স্বগড়া করা চলবে না, নূরপুরের শান্তিকে যেমন করেই হোক অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে।

সকলেই তাঁর কথা অমুমোদন করলে, কিন্তু ছুই দলেই এমন কয়েকজন ছিল বিবাদ বাধিয়ে তোলাই যাদের মনোগত অভিপ্রায়। তারা তাঁকে বিষমজরে দেখতে লাগল।

শান্তি স্থাপন করতে গিয়ে অঘোর রায়কে নানা প্রতিবন্ধকের সম্মুখীন হতে হ’ল এবং অচিরেই তাঁকে এমন এক স্থানে যেতে হ’ল যেখানে সাম্প্রদায়িক কলহ নেই এবং যেখানে চিরশান্তি প্রতিষ্ঠিত।

একদিন সারারাত তিনি আর বাড়ী ফিরলেন না, দু’তিন দিন পরে দেখা গেল যাহুঁকাটা খালের পাড়ে তাঁর দীর্ঘ দ্বিখণ্ডিত দেহ পড়ে আছে।

সকলের সঙ্গে খালের পাড়ে গিয়ে টিপুও পিতার বিকৃত বীভৎস শব্দদেহ দেখে এল।

অঘোর রায়ের অপমৃত্যুর পর গ্রামের স্বাভাবিক জীবন-ধারায় কেমন একটা বিপর্যয় দেখা দিলে। সকলেরই মনে হতে লাগল যে, এটা যেন একটা আসন্ন ব্যাপক দুর্ঘটনার পূর্বসূচনা। ঝড়ের পূর্বকাল প্রকৃতির মত পল্লীর বুকে কেমন যেন একটা ধমধমে ভাব বিরাজ করতে লাগল। নূরপুরে সুর হ’ল নীড় ভাঙার আরোহণ। ভাবী বিপদের আশঙ্কায় বহু লোক ঘরবাড়ী জমিজমা ছেড়ে যেদিকে ছুঁচোখ যায় পালাতে সুরু করলে।...

টিপুর মাধায় আকাশ যেন ভেঙে পড়ল। মাত্র ষোল বৎসর বয়সে তার জীবনে যে দুর্যোগ ঘনিয়ে এল বুঝি তার তুলনা নেই। এ বয়সেই সে হয়ে পড়ল সম্পূর্ণরূপে নিরাশ্রয়—যে নীড় আশ্রয় করে সে এতদিন কাটিয়েছে আজ তা প্রবল

ঝটিকায় ছিন্নভিন্ন হবার মুখে। এখন সে যায় কোথায়—এত বড় সংসারে কোথায় গিয়েই বা দাঁড়ায়। শেষ পর্যন্ত জাতি খুড়ো চক্রশেখর রায়ের কাছে গিয়ে সে পরামর্শ চাইলে।

তিনি তাকে সাহুনা দিয়ে বললেন—“টিপু, তুই এক কাজ কর, চৌধুরীপাড়ার বিনয় আজ যাচ্ছে কলকাতায়, তাঁর সঙ্গে তুই সেখানে তোর মামার বাসায় চলে যা। তাঁর সঙ্গে বিনয়ের আলাপ-পরিচয় আছে। ওখানে গেলে তোর মামা তো তোকে আর ফেলতে পারবেন না।”

মামাকে টিপু দেখেছিল মাত্র একবার মা বেঁচে থাকতে তার ছয় সাত বৎসর বয়সে...তারপর আর তিনি দেশেও আসেন নি, বা তাদের সঙ্গে কোনো যোগও রাখেন নি। তা হোক, তবু তো একটা জায়গার গিয়ে মাথা ঝুঁজবার উপায় হবে—একথা ভেবে টিপু যেন অকূলে কূল পেলে।

নদীর ঘাটে নৌকা বাঁধা। নদীপথে চৌক মাইল উজিয়ে নোয়াপাড়া ষ্টেশনে পৌঁছে টিপুদের কলিকাতাগামী ট্রেন ধরতে হবে।

পৈতৃক ভিটা থেকে চিরবিদায় নিয়ে চলে যাবার সময় বেদনায় টিপু সমস্ত শিরা-উপশিরা যেন টনটন করে উঠল। আশৈশব সে মাতৃহীন—এই বাড়ীতে পিতার স্নেহছায়ায় ষোলটি বছর তার কেটেছে। এ বাড়ীর গাছপালা, বাঁশবাড় পচা পুকুর সব কিছুই সঙ্গে তার নাড়ীর যোগ—এখানকার প্রতিটি ধূলিকণার সঙ্গে মিশে রয়েছে তার পিতৃপিতামহের পদরেণুকণা। টিপু ভাবতে লাগল, তার জীবনের এই সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থভূমি থেকে কার অভিশাপে আজ সে চিরতরে নির্বাসিত হতে চলেছে। অভিমানে বুকখানি তার ভরে উঠল, তারপর ভুঁয়ে লুটিয়ে পড়ে সে একেবারে ছোট্ট শিশুটির মত ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। অজস্রধারায় অশ্রু ঝরে পড়ে তার জন্ম-মাটির বুক ভিজিয়ে দিলে।

ওদিকে বেলা গড়িয়ে যাচ্ছে—বিনয় এসে তাড়া দিলে “টিপু, উঠ ভাই, আর সময় নেই—এখনি নৌকো ছেড়ে দেবে।”

মস্তচালিতের মত দাঁড়িয়ে উঠে সে বিনয়ের অহুসরণ করলে। সে চলে গেল—কিন্তু তাঁর জঘনিকতমের মাটির বুকে মিশে রইল তার অশ্রুধারা—বাতাসে ভেসে বেড়াতে লাগল বাস্তব্যাগী ছেলেটির সক্রণ দীর্ঘশ্বাস।...

বাঁধারায়ের বাড়ীর সীমানা ছাড়িয়ে আমবাগান পেরিয়ে রাণীদীঘির পাড় দিয়ে চলতে চলতে তারা নদীর ঘাটে এসে নৌকায় উঠল—মাঝি নৌকা ছেড়ে দিলে।

ছইয়ের উপর বসে টিপু তিতাস নদীর তটভূমির ক্রমবিলীন-মান ছবিটুকু নিজের নিজের মনের পটে একে নিতে লাগল।

নদীর ঘাটে মালীপাড়ার বৌঝিরা জল নিতে এসেছে—আবক্ষ-
লব্ধিত বোমটা ফাঁক করে তারা কোঁতুলভরা চোখে তাদের
নৌকার পানে তাকিয়ে আছে, এঁদের ভেতরে বাঁশঝাড়ের
ফাঁকে ফাঁকে মঠমন্দিরের চূড়া নজরে পড়েছে। নদীর ওপারে
সবুজ ঘাসে ঢাকা সুবিশীর্ণ প্রান্তরের স্থানে স্থানে সরষে ক্ষেতে
হলুদবরণ অজস্র ফুল ফুটে রয়েছে—স্বর্ণখচিত সবুজ মণ্ডমলের
সাজী পরিহিতা পল্লীলক্ষ্মী যেন রূপের ছটায় বলমল করছেন।
এপারে একক দাঁড়িয়ে আছে একটি সুপ্রাচীন বটগাছ।
শাখাপ্রশাখা তার জলের ওপর ছুঁকে পড়েছে। গাঁয়ের
ছেলেরা এর কোলেপিঠে চড়ে মাছ মাছ। এর কাণ্ডে দোলনা
টাড়িয়ে তারা দোল খায়—এর ডালপালায় পল্লীর দুঃস্বপ্ন
ছলালদের দাপাদাপির আর অন্ত থাকে না। নৌকা যখন
তটভূমি ছেড়ে বেশ খানিকটা দূরে ভেসে এল তখন টিপুর মনে
হতে লাগল এই বুড়ো বটগাছ যেন শত শাখাবাহ প্রসারিত
করে তাকে পল্লীর স্নেহকোড়ে ফিরে আসবার জেজ্ঞে আকুল
আহ্বান জানাচ্ছে।...টিপু আর ওদিক পানে তাকাতে পারে
না, চোখ ছুটি জলে ভরে ওঠে—অবাধ অশ্রুজলে মঠ-মন্দির
বাঁশঝাড় নদীতট বটগাছ সব কিছু ঝাপসা হয়ে যায়।

নৌকা চলে উজান ঠেলে—নদীর এপারে গ্রামতরুশ্রেণীর
শ্রাম সমারোহ—ওপারে শল্যারত প্রান্তরের অনন্ত প্রসার—
নদীমাতৃক পূর্ববঙ্গের অপূর্ণ শোভা।...

সন্ধ্যা নাগাদ ষ্টেশনে পৌঁছে তারা কলিকাতাগামী ট্রেন
ধরলে।

কলিকাতায় পৌঁছে টিপুকে নিয়ে বিনয় তাদের
বৌঝারের মেসে এসে উঠল। মহানগরীতে এসে টিপু কেমন
যেন দিশেহারা হয়ে গেল।

ছ' তিন দিন বাদে এক দিন সন্ধ্যার পরে বিনয় টিপুকে
নিয়ে হরিমোহন সাহা লেনে তার মামার বাসায় এসে হাজির
হ'ল। কড়া নাড়তেই মামা নীচে এসে হাজির হলেন।
ভদ্রলোককে দেখলে প্রথমেই মনে এই অনুভূতি জাগে যে,
“এ বড় কঠিন ঠাই।” চোখে তাঁর তীব্র ক্রকুটি—মনে হয়
ভদ্রলোক সমস্ত বিশ্বের উপর চটে আছেন।

বিনয়ের দেখাদেখি টিপু তাঁকে প্রণাম করলে। মামা
বললেন—“তার পর বিনয়কৃষ্ণ, দেশ থেকে ফিরলে কবে?
দেশের খবর কি বল। আরে, সঙ্গে এটিকে হে? চেনা
বলে মনে হচ্ছে না তো।”

বিনয় বললে—“দেশ থেকে এসেছি ছ' তিন দিন হ'ল—
দেশের বড় ছদ্দিন মামাবাবু। আপনি কোন খবর পান নি
বুঝি? অধোর কাকাকে দিনকতক আগে কারা খুন
করেছে। টিপুকে চিনতে পারলেন না—এ হচ্ছে অধোর
কাকার ছেলে। গাঁয়ের সবাই যে দিকে ছ'চোখ যায় পালিয়ে
যাচ্ছে, কিন্তু এর তো আর যাবার ঠাই নেই, তাই আপনার
এখানে নিয়ে এলাম।”

মামার ভাবান্তর দেখা গেল। দাতব্যুধ খিঁচিয়ে বলে
উঠলেন—“খুব সংকল্প করছ। এদিকে রেশনের ঠেলা আর
দাঁড়ার ঝামেলা সামলাতে সামলাতেই প্রাণ অতিষ্ঠ—
নিজেদেরই না খেয়ে মরবার জোগাড়...তার উপর আবার
পুষ্টিয়ুদ্ধি... (একটু থেমে টিপুর দিকে তাকিয়ে) কি নাম বললে,
টিপু—তা একেবারে স্বয়ং টিপু সুলতানের আগমন, নামের
বাহার আছে বটে—তা তোর মাথায় এত লম্বা চুল কেন রে,
তুই কবি হয়েছিস না সাধু হয়েছিস?”

টিপু চুপ করে রইল—এ কথার কি উত্তর দেবে সে।
মাকে টিপুর মনে পড়ে না...কিন্তু তার মায়েরই তো আপন
ভাই ইনি, কিন্তু এক ধরনের সন্ধ্যাণ।...

যাই হোক, চক্ষুলজ্জার খাতিরে মাতুল মহাশয় অবস্থিত
আত্মীয়কে আশ্রয় দিতে বাধ্য হলেন...বাইরের ঘর থেকে
টিপুকে অন্তঃপুরে চালান দেওয়া হ'ল। সেখানে হ'ল আর এক
পালা অভ্যর্থনা। মামীর বচনবিজ্ঞাস আরও পরিপাটি—তার
স্বাক্ষর অনেক উগ্র...ক্যাটকঁটে কথাগুলো যেন টিপুর
একেবারে মর্মস্থলে কেটে কেটে বসতে লাগল।...

ফণীন্দ্রনাথের সংসার-তরলীর কর্ণধারণ করে রেখেছিলেন
তত্ত্ব গৃহিণী তরঙ্গিণী। ফণীন্দ্রনাথ শুধু টাকারোজগার করেই
খালাস। সেই টাকা কি ভাবে খরচ হবে, কি উপায়ে সংসার
খরচ চালিয়ে ছুটো পয়সা বাঁচবে এই সমস্ত গার্হস্থ্য অর্থনীতির
বিধানকর্ত্রী ছিলেন তরঙ্গিণী। ফণীন্দ্রনাথও সকল ভার গৃহিণীর
হাতে ছেড়ে দিয়ে ‘যথা নিয়ুক্তোহস্মি তথা করোমি’ এই নীতি
অনুসরণ করে চলতেন—সাংসারিক কোন ব্যাপারে সমস্ত
প্রতিষ্ঠার চেষ্টা তিনি করতেন। করেছিলেন এমন অপবাদ তাঁর
শত্রুতেও দিতে পারবে না। টিপুর আগমনের দিনকতক পরে
তরঙ্গিণী এক দিন স্বামীকে বললেন—“বাজার করা, রেশন
আনা এ সমস্ত টেপাকে (তরঙ্গিণীকৃত টিপুর অপজ্ঞা) দিয়েই
হবে—ছোকরা চাকরটাকে ছাড়িয়ে দিই কি বল?”

ফণীন্দ্রনাথ একেবারে সবিনয় নিবেদন হয়ে বললেন—
“এর আর বলা বলি কি তুমি যখন...”

কাজেই তিনি যখন এটা চান তখন তড়িঘড়ি ছোকরা
চাকরটিকে বিদায় করা হ'ল এবং এমন সব কাজের ভার
বিলুকে দেওয়া হ'ল যা সম্পন্ন করতে গিয়ে ভূতটি পর্যাপ্ত
হিমসিম খেয়ে যেত।

তরঙ্গিণী ভেবে দেখলেন, বিলুকে দিয়ে যদি এক বেলা
রান্নার পাট সারিয়ে নেবার ব্যবস্থা করা যায় তা হলে প্রচুর
সময় পাওয়া যাবে। নভেল পড়েই ছোকরা পরচর্চা করেই
ছোক সেই সময়টার বেশ সদ্ব্যবহার করা যাবে। কাজেই
বিলুকে তিনি মহা উৎসাহে রান্নার পাট সম্বন্ধে পাঠ দিতে
সুরু করলেন। কি ভাবে ঘুঁটে সাজাতে হয়, উত্তন ধরাতে
হয়, কত চালে কত জ্বল লাগে—এ সকল বিষয়ে বক্তৃতা আর
হাতে কলমে শিক্ষা চলল সমান তালে। এত সব শিক্ষণীয়
বিষয় যে সংসারে ছিল বিলু কি আর তা জানত।

প্রথম দিন উম্মনে আঁচ দিতে গিয়ে টিপু'র চোখের জলে নাকের জলে এক হ'ল। বহু কষ্টে উম্মন ধরানোর পর ভাত যদি বা সিদ্ধ হ'ল তে ফেন গালতে গিয়ে হাঁড়ি ভ্রুতি ভাত মেঝের ওপর পড়ে গিয়ে সব একশা হয়ে গেল। গৃহস্থালিতে এটা অবস্থা রীতিমত বিপর্যয় কাণ্ড, কিন্তু তরঙ্গিণী হাল ছাড়লেন না—কেননা এখন ধৈর্য ধারণ করলে আখেরে লাভ আছে; ঠাকুর-চাকর না রেখে আর নিজের গতর যথাসাধ্য কম খাটিয়ে সংসার-চক্রটিকে সচল রাখা যাবে। ভাগিনেয়কে পাক-প্রণালীতে পাকাপোক্ত করে তুলবার জন্তে তিনি প্রাণপণে তালিম দিতে লাগলেন। এদিকে টিপু'র অপটু হস্তে স্বাদে-বর্ণে-গন্ধে অতুলনীয় যে-সকল ব্যঞ্জনাদি রন্ধিত হতে লাগল, নিত্য পরমহংস অবস্থা না হলে সেগুলো গলধঃকরণ করা সম্ভবপর নয়। এক দিকের ক্ষতি আর এক দিকে পুষিয়ে নেওয়া যাবে এই ভেবে, মামী সাহসনা পেলেন, কিন্তু বেচারী ফণীন্দ্রনাথের অবস্থা কাহিল হয়ে উঠল, অবশু তরঙ্গিণীর বিধানের বিরুদ্ধে মুখ ফুটে কিছু বলবার মত বুকের পাটা তাঁর ছিল না।

এমনি ভাবে কাটল মাস দুই। টিপু'র মন এখান থেকে দিনরাত শুধু পালাই পালাই করতে লাগল। আশৈশব সে ছিল ভাবপ্রবণ—কাজকর্মে একদম আনাজী। দেশে থাকতে খড়-কুটোটি পর্যন্ত কখনও তাকে নড়াতে হয় নি, আর এখানে এসে সে করছে কিনা বাসা-চাকরের কাজ। সে ভাবলে, নিজের জীবনের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা বিসর্জন দিয়ে শুধু আহা'র আর আশ্রয়ের বিনিময়ে এমন ভাবে দেহের রক্ত তিল তিল করে ক্ষয় করে কি লাভ?

মনে পড়ল বাবার কথা। তিনি তাকে মহাপুরুষদের জীবনী পড়ে শোনাতেন, মহত্তর জীবনের আদর্শে তাকে অনুপ্রাণিত করে তুলবার জন্তে তাঁর চেষ্টার বিরাম ছিল না। তাঁর মুখে দেশের মুক্তি-সাধকদের কাহিনী শুনে শুনে নিজের জীবনকে তাঁদের আদর্শে গড়ে তুলবার জন্তে কি ব্যাকুলতাই না তার মনে জাগত। কিন্তু মহানগরীতে এসে তার জীবনের ও জীবনীশক্তির কি শোচনীয় অপচয়ই না হচ্ছে। এই কি জীবন? এমনি ভাবে বেঁচে থাকার সার্থকতা কি?

অনেক ভেবে চিন্তে সে স্থির করলে মামামামীর আশ্রয় থেকে চলে সে যাবেই—তারপর যা হয়। বিরাট মহানগরীতে মানুষের মত কাঁচবার ঠাই কি তার একান্তই হবে না।

নিজের মনের সঙ্গে অনেক বুঝাপড়া করে নিয়ে ইতিকর্তব্য স্থির করে সে কাজ কর্মে টিলে দিলে। তরঙ্গিণী ফাইফরমাস খাটাবার জন্তে আর তাকে সময়মত ডেকে পান না। সন্ধ্যার সময় সে হেঁদুয়ায় গিয়ে একলা চুপ করে বসে থাকে... রাত আটটা নয়টার সময় ফিরে এসে কোন দিন রান্না চাপায়, কোন দিন বা সটান নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ে। অগত্যা তরঙ্গিণীকে সুখ-শয্যা ছেড়ে ওঠে এসে রান্নার

আয়োজন করতে হয়; ছপুর রাতে শেষ হয় রাতের ভোজনপর্ব...

শুধু তাই নয়, সাত চড়ে যে কথা কহিত না, এখন সে মুখে মুখে জবাব দেয়। তরঙ্গিণীর মেজাজ গরম হয়ে উঠল। ফণীন্দ্রনাথকে একদিন তিনি বললেন—“আপদ বিদেয় কর”। পত্নীর ছকুম তাঁর নিকট বেদবাণ্য, তিনি অতি সংক্ষেপে তাঁর কথার জবাব দিলেন, বললেন—“তাই হবে।”

বিদায়ের পালাও হ'ল অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। শ্রোতের মুখে তৃণের মত ভাসতে ভাসতে টিপু এক দিন মাতুল-পরিবারে এসে আশ্রয় নিয়েছিল, হু'দিন যেতে না যেতেই সে আশ্রয়ও তার টুটল। নিজের ক্ষুদ্র বিছানা আর কাপড়-চোপড়ের পোঁটলাখানা বগলে করে সে পথে বেরিয়ে পড়ল।

মাতুল-পরিবারে স্বল্পকাল থেকে সে দেখে গেল মানুষের স্বার্থপরতার অত্যাশ্রয় রূপ; সঙ্কর করে গেল জীবনের প্রথম তিক্ত অভিজ্ঞতা।

সটান সে বোবাজারি বিনয়দের মেসে গিয়ে হাজির হ'ল। বিনয় তখন আপিসে যাবার জন্তে তৈরি হচ্ছিল, অস্থাবর সম্পত্তি সহ টিপু'র অপ্রত্যাশিত আগমনে সে একেবারে হতভম্ব হয়ে গেল। খানিকক্ষণ নির্বাক থেকে জিজ্ঞেস করলে—“ব্যাপার কি টিপু?” টিপু জোর করে মুখে ঝঁষা হাসি (অবস্থা তা কান্নার চেয়ে করণ) ফুটিয়ে জবাব দিলে—“মামার বাড়ীতে ঠাই হ'ল না বিহুদা, সেখান থেকে চিন্তিতরে চলে এসেছি; আপাততঃ তোমার এখানেই দিনকতকের জন্তে আমার আশ্রয় দাও।” শুনে বিনয়ের মাথা বন বন করতে লাগল। সর্বনাশ; ও যদি এখন তার কাঁধে এসে চেপে বসে তা হলেই হয়েছে আর কি। কাজেই গোড়ার সাবধান হওয়া ভাল। বিরজিপুর বরে সে বললে—“না হে। ও সব আশ্রয়-টাশ্রয় দেওয়া আমা দ্বারা হবে না। বলে, আপনি শুতে পায় না ঠাই শব্দরাকে ডাকে। তোমার ব্যবস্থা তুমি করো বাপু—ওদিকে আমার আবার আপিসের দেলা হ'ল।” বলেই সে হন হন করে চলে গেল। টিপু নিরালস্য বদে বসে নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে লাগল।

নির্দালবাবু বদে এক জুজলোক মেসে থেকে গ্রামো-ফোনের কারবার করতেন। একলা মানুষ, একটা চাকর নিয়ে তিনি থাকেন। তিনি মেসের তিনটে রুম ভাড়া নিয়ে ছিলেন। একটাতে তিনি থাকতেন আর একটাতে তার রান্নাবান্না হ'ত, আর একটা ছিল তার আপিস-ঘর।

টিপু'র অবস্থা দেখে তাঁর দয়া হ'ল। আপিস-ঘরে তিনি তাকে শোবার অনুমতি দিলেন। কিন্তু রেশনের দিনকাল—চাল আটা যা জোটে তাতে নিজেরই হু'বেলা পেট ভরে খাওয়া হয় না। টিপুকে আশ্রয় দেওয়া যদি বা তাঁর পক্ষে সম্ভব হ'ল, তার আহা'র্যের সংস্থান করা যে তাঁর সাধ্যাতীত সে কথা তিনি খোলাখুলি ভাবে তাকে জানিয়ে দিলেন।

কলকাতায় এসে অবধি টিপু কেবল মনুষ্য-প্রকৃতির নিষ্কষ্ট দিকটারই অভিব্যক্তি দেখেছে। এর বিপরীত দিকও যে এখানে আছে এটা তার নতুন অভিজ্ঞতা। এই সামান্য সমবেদনার স্পর্শই তার চোখে জল এল। নির্মল বাবুর কথার কোন জবাব সে দিলে না, উদগত অশ্রু রোধ করবার জন্তে অচুদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলে।...

বিচিত্র মেসের জীবন। ষাট সত্তরটি প্রাণী এখানে বাস করে, সবাইকার জীবন যেন এক হাঁচে ঢালা। সকালে সবাই নাকে মুখে চারটি ভাত শুঁকে আপিসে চলে যায়, ফেরে সন্ধ্যার পর—তারপর শুরু হয় সশব্দে তাস পেটা অথবা বাজে আড্ডা ইয়াকি মারার পাল। আপিস আর মেসের সঙ্গীর্ণ গভীর মধ্যেই আবদ্ধ এদের জীবন—বাইরের বৃহত্তর জগতের সঙ্গে তাদের কারুর কোন সম্পর্ক নেই। দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে, কাজের চাপে আর সংসারের বোঝার ভারে এদের আশ্রয় হয়েছে অপমৃত্যু, পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থেকে থেকে এদের হৃদয়ের স্রুমাঝ রুত্তিগুলো মরে গেছে। ব্যক্তিগত স্বার্থ ছাড়া আর কোন কথা এরা ভাবতে চায় না, পারে না—তাই অপরের দুঃখ এদের মনে সমবেদনার সঞ্চার করে না, এমন কি নিজেদের আশেপাশেই কে বাঁচল আর কে মরল সে সবকিছুও তাদের কোন মাথাব্যথা নেই।

কাজেই পুরা তিন দিন অত্যন্ত অসহায় থেকে টিপু যখন জুধার চোটে একেবারে নেতিয়ে পড়ল তখনো কারুরই দৃষ্টি তার প্রতি আকৃষ্ট হ'ল না—তাদের নির্বিকার ওদাসীভূত সমানই রইল।

মেসে আসবার পর চার দিন কেটে গেল—আজ পঞ্চম দিন, এর মধ্যে পেটে এক কণা খাওয়া পড়ে নি। সন্ধ্যার অন্ধকারে ছাদের উপর একান্তে বসে টিপু আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগল। জুধার জালা যে এত মারাত্মক, এর চেয়ে যন্ত্রণাদায়ক যে সংসারে আর কিছু নেই তা কে জানত। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে রেলিং ধরে ঠায় বসে আছে, মাথা ঝিম ঝিম করছে; সমস্ত শরীর অবশ হয়ে এসেছে। পেটের ভেতরে একটা অসহ্য যন্ত্রণা। তার আর সকল অহুত্ব যেন লোপ পেয়ে গেছে, কেবল একটা কথাই তার মনে জাগছে যে, যেমন করেই হোক খাওয়া তাকে যোগাড় করতেই হবে, কিন্তু কোথা থেকে কি ভাবে তা সম্ভব হবে...হুর্দস মস্তিষ্ক আর চিন্তা করতে পারে না। ভাবতে ভাবতে সব কেমন যেন গুলিয়ে যায়। আচমকা বিহ্বলচমকের মত একটা উপায়ের কথা তার মনের মধ্যে ঝিলিক দিয়ে গেল। সকল ক্লান্তি, সকল হুর্দলতা আর অবসাদ ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সে সোজা হয়ে দাঁড়াল। কিন্তু দাঁড়াবার সঙ্গে মনে হ'ল তার পায়ের তলা থেকে মাটি যেন সরে যাচ্ছে, পৃথিবীটা ছলছে আর সব কেমন যেন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে আসছে। খানিকক্ষণ বারান্দার রেলিং ধরে সে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর শরীরের কাঁপুনি থামলে পর

রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে কলেজ স্ট্রীট ধরে চলতে চলতে সে একেবারে হরিমোহন সাহা লেনে তার মামার বাসার সামনে এসে থামল। সদর দরজা খোলাই ছিল, চাই করে সে ভেতরে ঢুকি পড়ল। নীচের তলায় রাস্তার জায়গা, সেখানটায় ঘুটুঘুটে অন্ধকার। ভাল করে সে এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখলে—কেউ কোথাও নেই, ফগীজনাথ বাড়ী ফেরেন রাত আটটার পরে, ওদিকে পাশের ঘরে তরফিগী নির্বিষ্ট মনে সঙ্গীতচর্চায় রত। সন্তর্পণে পা ফেলে যেখানে চাল ডাল ইত্যাদি থাকত সেখানে গিয়ে অন্ধকারে হাঁটকাতে হাঁটকাতে সে মুঠো মুঠো চাল ডাল পকেটে পুরতে লাগল, তার বুক টিপ টিপ করতে লাগল, সারা গা ঘামে ভিজি গেল; বুকের কাছ থেকে কি যেন একটা গলা পর্যন্ত ঠেলে উঠতে লাগল।...ছুই পকেট চাল ডালে ভরতি করে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে টিপিটিপি সে ঘর থেকে বেরিয়ে রাস্তায় এসে হাঁক ছেড়ে বাঁচল।

বড় রাস্তায় পা দেবার পর তার জংপিঞ্জর গতি স্বাভাবিক হ'ল। একটু ধাতস্থ হবার পর সে ভাবতে লাগল, এ ধরণের ছেয় এবং নিজের স্বভাববিরুদ্ধ কাজ তার দ্বারা কিরূপে সম্ভবপর হ'ল, মনে হ'ল যেন অপ্রকৃতিত্ব অবস্থায় এমন একটা কাজ সে করে ফেলেছে যার জন্তে সারা জীবন তাকে নিজের বিবেকের কাছে জবাবদিহি করতে হবে। উঃ! জুধার তাড়নায় সে অধঃপতনের কোন্ নিম্ন স্তরেই না নেমে গেছে।...

হেছায় অনেকক্ষণ কাটিয়ে যখন সে মেসে ফিরে এল তখন রাত বেশ হয়েছে। নির্মলবাবুর চাকর উমেশ তাদের রাস্তার পাঁচ প্রায় শেষ করে এনেছে। উমেশকে বলে কয়েক সে তাদের উত্থনে চাল ডাল এক সঙ্গে ছুটিয়ে নিলে, তার পর গণাগণ তা মুখে পুরতে লাগল। সেই অখাদ্য তিন দিন উপবাসী তার রসনার নিকট অমৃত্যুহাদনবৎ লাগল।

খাওয়াদাওয়ার পর খুমে তার চোখ দুটি জড়িয়ে আসতে লাগল। নির্মলবাবুদের আপিস-ঘরে মাটিতে নিজের জিন্নি বিছানাখানি জিড়িয়ে সে শুয়ে পড়ল...কেমন যেন একটা স্নিগ্ধ প্রশান্তি তার স্নায়ুগুলিকে আচ্ছন্ন করে ফেললে...আঃ কি আশ্রয়। গভীর তন্দ্রাবেশে তার চোখের পাতা দুটি মুজিত হয়ে এল।

এমনিভাবে চাল চুরির ব্যাপারটা চলল কয়েক দিন যন্দ নয়।...কিন্তু চার পাঁচ দিন পরে টিপু একদিন মামার বাসার সামনে গিয়ে দেখে সদর দরজা ভেতর থেকে বন্ধ; পরদিনও গিয়ে দেখে একই অবস্থা...বুকে টের পেয়ে মাতুলানী সাবধানী হয়েছেন।

কয়েকদিন পেটে কিছু পড়বার পর আবার শুরু হ'ল উপবাসের পাল। একদিন দু'দিন নয় পুরো একটা সপ্তাহ টিপু শুধু জল খেয়ে কাটল। নির্বাক নিঃসহায় নিঃস্বল অবস্থায় টিপু মেসে মৃত্যুরই প্রতীক্ষা করতে লাগল।

এমন সময় মড়ার ওপর পড়ল খাঁড়ার বা। সেদিন দুপুর-বেলা ছাদের একান্তে বসে ক্ষুধার জ্বালায় ধুকতে ধুকতে টিপু তার জীবনটাকে নিয়ে বিধাতার যে নিষ্ঠুর খেলা শুরু হয়েছে তার শেষ পরিণতি কি তাই ভাবছিল এমন সময় নির্মলবাবুর চাকর উমেশ এসে বললে, বাবু তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

অসুস্থ ঘটনার আশঙ্কাই টিপুর মত জন্ম-অভিশপ্ত দুর্ভাগাদের মনে আগে জাগে...তার বুক দুধ দুধ করে কেঁপে উঠল। কেন তার ডাক পড়ল কে জানে! তার অবশ্য পা'ছুটো যেন তার ক্লান্ত দেহটাকে বহন করতে পারছিল না। অতি কষ্টে সে আপিস-ঘরে নির্মলবাবুর কাছে গিয়ে হাজির হ'ল। তিনি তার আপাদমস্তক ভাল করে একবার নিরীক্ষণ করলেন—দারুণ বুজুক্ষার ছাপ তার মুখের প্রতিটি রেখায় পরিস্ফুট। দেখলে মায়ী জাগে, কিন্তু যা দিনকাল পড়েছে মায়ামমতা দেখাবার সময় এখন নয়—“আত্মানং সত্যতঃ রক্ষণং” এইটেই হচ্ছে আজকের দিনের নীতি। একটু ইতস্ততঃ করে তিনি বললেন—“ওহে ছোকরা, আজ দেশ থেকে চিঠি পেলাম, আমার এক আত্মীয় ছ'একদিনের মধ্যেই দেশ ছেড়ে সপরিবারে কলকাতায় চলে আসছেন, আমার এই আপিস-ঘরেই তাঁদের আশ্রয় দিতে হবে। কাজেই এখন তুমি অল্প তোমার ব্যবস্থা কর।” বলেই তিনি সাজ-পোশাক নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

টিপুর চোখের সামনে সমস্ত পৃথিবীটা যেন ঘুরতে লাগল। টলতে টলতে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সে রান্নাঘরের পাশে থপ করে বসে পড়ল। তার পর হাঁটুতে মুখ গুঁজে শুয়ে বসে রইল।

এমনি ভাবে কাটল বহুক্ষণ। টিপু ভাবনার অধৈর্য সমুদ্রে একেবারে তলিয়ে গেছে। ওদিকে রান্নাঘরে উমেশ পাক করছে। রান্নার সুগন্ধ তার নাকে এসে পৌঁছে তাকে পাগল করে তুলছে। মনে হচ্ছে এই আহাৰ্য্য থেকে অন্ততঃ কয়েকটি গ্রাস যদি সে মুখে তুলতে পারত।

রান্নার পাট চুকিয়ে ঘরে শিকল দিয়ে উমেশ বেরিয়ে গেল। বেশ কিছুক্ষণ কাটল—তার পাত্তা নেই। ঘরের ভেতরকার সজ্জাক্রিত খাওয়ার কণা ভাবতে ভাবতে টিপুর রসনা লালায়িত হয়ে উঠল, একটি চিন্তাই শুধু তার সমস্ত সত্তাকে আচ্ছন্ন করে রইল যে তার কিছু খাওয়া চাই—নইলে সে বাঁচবে না—ঘরের ভিতর রকমারি খাওয়ার সজ্জা অথচ আজ সাত দিন সে অভুক্ত। সে আর ভাবতে পারে না—তাকে বাঁচতে হবে, এমন ভাবে না খেয়ে মরা কিছুতেই চলবে না।...ক্ষুধার জ্বালা তাকে কাণ্ডজ্ঞানশূন্য পাগলের মত করে তুলল—সে এদিক ওদিক একবার তাকাল, তার পর গুটিগুটি রান্নাঘরের দিকে এগুতে লাগল। তার জুপিঙ এত জোরে টিপ টিপ করতে লাগল যে মনে হ'ল কে যেন তার বুকের ভেতর সজোরে হাতুড়ি পিটছে। কম্পিত করে শিকল খুলে সে ঘরের ভিতর গিয়ে ঢুকল। হাঁড়িঝুড়ির ঢাকনা

খুলে, হরেক রকম ব্যঞ্জননের দিকে নজর পড়বামাত্রই আনন্দে তার চীৎকার করে উঠতে ইচ্ছা হ'ল। ভাবলে, যেস থেকে বিদায়ের সময় আসন্ন—তার আগে সুযোগ যদি ঘটল তো যতটুকু সম্ভব রসনার তৃপ্তি সাধন করে—পেটে রসদ বোঝাই করে নেওয়া যাক।

ডেকা আর কড়াই থেকে খাবলা খাবলা ভাত তরকারী সে গোত্রাসে গিলতে লাগল। আঃ কি তৃপ্তি! এক সর্ব-গ্রাসী বুজুক্ষা যেন তাকে খাওয়ার নেশায় মাতিয়ে তুলল—ইচ্ছে হ'ল যত খাবার আছে সব নিঃশেষে সাবাড় করে দেয়। খাওয়ার নেশায় সে জগৎ-সংসার ভুলে গেল। উমেশ যে, যে-কোনো মুহূর্তে ফিরে আসতে পারে সে খেয়াল তার রইল না।

ইতিমধ্যে নির্মলবাবু বাইরের কাজ সেরে ফিরে এলেন। উমেশের খোঁজে রান্নাঘরে এসে তিনি দেখেন অপ্রত্যাশিত কাণ্ড। বহুক্ষণ বাইরে বোরাঘুরি করে এসেছেন, ক্ষিধেও পেয়েছিল বেজায়। রাগে আগুন হয়ে তিনি দিলেন টিপুর পিঠে বিরানী সিন্ধা ওজনের এক প্রচণ্ড ঘুষি বসিয়ে, তারপর “চোর চোর” বলে তার ঘরে চৌচামেচি শুরু করলেন।

হটগোল শুনে মেসের আরো অনেকে নির্মলবাবুর রান্না-ঘরের নিকটে এসে জড়ো হলেন। নির্মলবাবু টিপুকে কাণ্ড ঘরে হিড় হিড় করে টেনে বাইরে নিয়ে এলেন। টিপুর অবস্থা অবর্ণনীয়—মুখে একদলা ভাত—গালে হাঁড়ির কালি—জামার বুলে ঝোলার দাগ। দৃষ্টি মাটিতে নিবদ্ধ। পৃথিবীকে দ্বিধা হতে বলবার এর চাইতে গুরুতর প্রয়োজন বোধ করি আর কারো কখনো হয় নি।

নির্মলবাবু টিপুর কাণ দুটো আচ্ছা করে মলতে মলতে গলা সপ্তমে চড়িয়ে বলতে লাগলেন—“হতছাড়া ছোঁড়ার কাণ্ডটা দেখলেন মশাই—র্যাটা ছিঁচকে চোর। দয়া করে আশ্রয় দিয়েছিলাম, তার ফলটা এই—দিলে এবেলার খাওয়াটা ই মাটি করে।”

তার পর চলল কিছুক্ষণ ঘরে নানা জনের নানা মন্তব্য, গালিবর্ষণ, আর পাইকারী হারে প্রহার। টিপু ছ'শব্দটিও করলে না, নীরবে নতমুখে সব সহ্য করতে লাগল। তার মুখের চেহারা এমনি বেদনাকরুণ হয়ে উঠল যে তা দেখলে অতি-বড় পাষাণেরও বোধ করি চোখ ফেটে জল বেরুত। কিন্তু মেসের ভজলোকেরা সবাই তার অনাচারে এত উত্তেজিত হয়েছিলেন যে, তার মুখখানির পানে রূপা দৃষ্টিতে তাকাবার মত মনোভাব কারুর হ'ল না।

ক্রমে উত্তেজনা কমল, মারপিটের পালাও শেষ হ'ল। তখন একজন বললেন—“ভজলোকের মেসে এ সমস্ত চোর বাটপাড়দের আবার জায়গা দেওয়া কেন মশাই। পাজী ছোঁড়ার একগালে কালি তো লেগেছেই—দিন না আরেকু গালে চুণ লেপে রাত্তায় বের করে।” নির্মল বাবু তার গালে

চূণ লেপন করলেন না বটে, কিন্তু এই মুহূর্তে তাকে যেসংখ্যক বেরিয়ে যাবার নোটিশ দিলেন।

পোটলাটি বগলে নিয়ে মাতালের মত টলতে টলতে টিপু সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে গিয়ে মহানগরীর শঙ্কর জমিদার রাজপথে বেরিয়ে পড়ল, তার পর চলতে লাগল উদ্ভ্রান্তের ছায়া লক্ষ্যহীন ভাবে। অপমানের আলা তার সমস্ত শরীরে যেন জ্বলি ধরিয়ে দিয়েছে—সর্বদা কাঁপছে থর থর করে। সংসারে সে যে কত একা আজ সমস্ত অন্তর দিয়ে তা উপলব্ধি করলে।

সে চলতে লাগল কলেক্টর ষ্ট্রট ধরে। সবে সে মেছুয়া বাজারের মোড় ছাড়িয়েছে এমন সময় অনতিদূরে একটা সোরগোল উঠল। একজন পথচারী ছুটে ছুটে এসে বললে, ‘পালাও ভাই, আবার দাঙ্গা শুরু হয়েছে—গলির ভেতর থেকে গুলি ছুটে আসছে।’ সঙ্গে সঙ্গে সবাই দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে যে যেদিকে পারে ছুট দিলে—ঝটপট—দোকানপাট বন্ধ হয়ে গেল।

ভাগ্যিস সামনে একটা প্রকাণ্ড বাড়ীর গেট খোলা ছিল—ফটকে সঙ্গীনধারী গুলি প্রহরীরা দাঁড়িয়ে। টিপু এবং আরো কয়েক জন ভেতরে ঢুকে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গেই ফটক বন্ধ হয়ে গেল। ভেতরে আরো বহুলোক আশ্রয় নিয়েছে।

কিছুক্ষণ পরেই অকুস্থলে এল মিলিটারী লরী—পর পর শোনা গেল কতকগুলো বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ।

ঘণ্টাখানেক পরে গেট খুলে দিলে। গুলি পালিয়ে গেছে। সবাই যে যার বাড়ীতে নিরাপদ আশ্রয়ে যাবার জন্তে দ্রুত পা চালিয়ে দিলে। টিপুও তাদের সঙ্গে সঙ্গে চলল—যদিও কোথায় গিয়ে সে উঠবে তার কিছু স্থিরতা নেই। আশ্রয়ের প্রয়োজন যখন সব চেয়ে বেশী সেই চরম সঙ্কট-সময়ে সে হয়েছে আশ্রয়হীন।

চলতে চলতে শেষে হেঁচকাতে গিয়ে একটা বেঞ্চির সে গুয়ে পড়ল। এদিকটায় দাঙ্গাদাঙ্গামার বালাই নেই—ধীরে ধীরে গভীর নিদ্রায় সে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল—ঘুম যখন ভাল তখন সন্ধ্যা সমাগতপ্রায়।...শহরের বিভিন্ন এলাকায়

সন্ধ্যা আইন জারী হয়েছে...সবাই এর মধ্যে যে যার ধরে চলে গিয়েছে, স্কোয়ার প্রায় জনশূন্য।

স্কোয়ার ছেড়ে টিপু বিবেকানন্দ রোড ধরে মাণিকতলা বাজারের দিকে চলতে লাগল। বাজারের ফটক তালাবদ্ধ, কলকোলাহল এরই মধ্যে নির্বাপিত। বিবেকানন্দ রোড আর সারকুলার রোডের সংযোগস্থলে এসে টিপু থমকে দাঁড়াল। কারফিউর দরুন সারকুলার রোডের ওপর যানবাহন আর লোকজনের চলাচল বন্ধ। রাস্তার এপারে রোয়াকে কেউ কেউ বসে গল্পগুজব করছে, পথ দিয়ে চলছে ছ’একজন পথিকের আনাগোনা—কিন্তু ওপারে অন্ধকারায়ত নিশীথ নগরীর বুকে নেমেছে স্মৃতিপূরীর সুগভীর নিশ্চলতা—যতদূর দৃষ্টি চলে জনমানবের চিহ্ন নেই। তমসাস্থির নিশ্চল নগরী নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে যেন এক চরম দুর্ঘটনার প্রতীক্ষা করছে। এই অন্ধকারের বুকে এখন হঠাৎ চলছে কত গোপন হত্যালীলা, মিলিটারীর গুলিতে কত নিরপরাধ প্রাণ দিচ্ছে, দূরে কোথাও হয় তো মরণাহত অসহায়ের আর্তনাদে মুখরিত হয়ে উঠছে রাত্রির আকাশ। ঠাণ্ডা টিপু মনে হ’ল যেন স্মৃতির অন্ধকারের পটে ভেসে উঠেছে যাহুকাটা খালের পাড়ে পিতার রক্তরঞ্জিত গলিত শবদেহের বীভৎস দৃশ্য...সঙ্গে সঙ্গেই বিহ্বলচমকের মত বাবার কাছেই শেখা একটা প্লোকাংশ তার মনে পড়ল—‘যেনান্ত পিতরো যাতা.....’; বাস্তবিকই কি পিতা যে পথে গিয়েছেন সেই পথেই তারও জীবনের শেষ পরিণতি, অপমৃত্যুই কি তারও অদৃষ্টলিপি? সে ভাবতে লাগল এই নীরব অন্ধকারের বুকেই আছে তার সকল দুঃখ অপমান বুকুফার আলা—সব কিছুর শেষ—গৃহহারা গতিহীনের সকল দুর্গতির অবসান।

এই অন্ধকার যেন দুর্বীরভাবে তাকে স্মৃতি-উৎসবে আহ্বান করতে লাগল, একদিকে বাঁচবার আশা অপর দিকে মরণের নেশা এ দুয়ের দ্বন্দ্ব চলল কিছুক্ষণ—মানিকক্ষণ সে ন যথো ন তথ্যে হয়ে দাঁড়িয়ে রইল...শেষে তার স্নায়ুশূলীতে জ্বাল এক উৎকট উত্তেজনা—তার প্লথকান্ত চরণে সঞ্চারিত হ’ল গতিবেগ।...এক পা এক পা করে সেই সর্বপ্রাণী অন্ধকারের অভিমুখেই সে অগ্রসর হতে লাগল।

চিরন্তনী গীতি

শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ চন্দ্র

সে দিনের চলা পথ পড়িয়া পিছনে
আজিকার পথ-প্রান্তে বাহ প্রসারিয়া
আমারে বাঁধিতে চাহে; চরণে ধরিয়া
পশরোধ করিবারে চাহে ক্ষণে ক্ষণে।
সে দিন বসন্ত-প্রাতে মুকুলে ভরিয়া
রক্ষাখা-বাহ মেলি’ পিক-কলসনে
মধুপগুঞ্জ-ভরা দক্ষিণ পবনে
স্বরা পত্রে বিদায়ের গীতি মধুরিয়া—

চলে গেল, বলে গেল—তবু ভালবাসি
গড়ে-থাকা পিছনের বিস্তৃত সে স্থিতি,
ফুটে-ওঠা পুষ্পে পুষ্পে স্নমধুর হাসি;
ধরা-বক্ষে বিকশিত সে দিনের শ্রীতি
আবার এ পথ-প্রান্তে উঠুক উদ্ভাসি’
মধুরিয়া মধুরে পুনঃ চিরন্তনী গীতি।

ভরত, কথ ও বিশ্বামিত্র

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

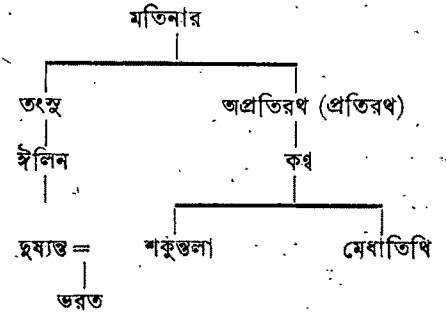
মহাভারতের আদিপর্বের শকুন্তলোপাখ্যানে শকুন্তলাকে বিশ্বামিত্রের ঔরসে মেনকার গর্ভজাত কণা বলা হইয়াছে। ইহা স্পষ্টতঃ একটি উপকথা মাত্র। পুরাণ-ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে শকুন্তলার পক্ষে কণের ঔরসজাত কণা হওয়াই সম্ভব; তিনি কখনই বিশ্বামিত্রের সহিত সম্পর্কিত ও সমকালীন হইতে পারেন না। পাজ্জিটার সাহেব কাশ্যকুঞ্জ বংশের সহিত পুরুবংশের সমকালীনত্ব নিম্নলিখিতরূপে নির্দিষ্ট করিয়াছেন (দ্রষ্টব্য *Ancient Indian Historical Tradition* পৃষ্ঠা ১৪৪-১৪৬) :-

কাশ্যকুঞ্জ	পৌরব
১। হুহোত্র	মতিনার
২। ...	তংসু
৩। ...	...
৪। ...	...
৫। জহু	...
৬। সুত্রহ	...
৭। অষ্টক	...
৮। বলীকাশ	...
৯। ...	...
১০। কুশ	...
১১। কুশাশ্ব (কুশিক)	...
১২। গাধি	...
১৩। ...	...
১৪। বিশ্বামিত্র	...
১৫। ...	...
১৬। অষ্টক	...
১৭। ...	...
১৮। লৌহি	...
১৯। ...	...
২০। ...	...
২১। ...	...
২২। ...	...
২৩। ...	...
২৪। ...	...
২৫। ...	হুয্যন্ত
২৬। ...	ভরত

পাজ্জিটার সাহেবের গণনা অনুসারে বিশ্বামিত্র হইতে হুয্যন্ত ১১ পুরুষ অধস্তন। এইজন্য তিনি মনে করেন হুয্যন্ত বিশ্বামিত্রবংশীয়া শকুন্তলাকে বিবাহ করেন। তিনি

শকুন্তলাকে আদি বিশ্বামিত্রের কণা স্বীকার করেন না। অতঃপক্ষে তিনি তংসু হইতে ২৩ পুরুষ নিম্নে হুয্যন্তকে স্থাপন করিতেছেন। ইহা মহাভারত ও সমস্ত পুরাণের বিরুদ্ধ মত। হুয্যন্ত কিংবা ভরতের জীবনে বিশ্বামিত্রের আর কোনও প্রসঙ্গ দেখা যায় না। কিন্তু কণকে আমরা দেখি শকুন্তলার পালক পিতার অতিরিক্ত ভরতের যজ্ঞের পুরোহিতরূপে, যাহাকে ভরত প্রচুর ধন দান করেন (মহাভারত আদি ৭৪, দ্রোণ ৬৮, শান্তি ২৯ অধ্যায়)। এক্ষণে পুরাণ অনুযায়ী কণের সমকালীনত্ব স্থির করা যাউক।

বাঁয়ু (৯১১৩০-১), বিষ্ণু (৪১১৯২), হরিবংশ (৩২১৭১৮), ভাগবত (৯২০১৬-৭), অগ্নি (২৭৮৫) প্রভৃতি পুরাণে মতিনারের তিন পুত্র তংসু, অপ্ৰতিরথ (প্রতিরথ) এবং সুবাহু (ধ্রুব)। অপ্ৰতিরথের পুত্র কথ, কণের পুত্র মেধাতিথি। মহাভারত (আদি ৯৪১৪-১৯; ৯৫১২৬-২৯) অনুসারে মতিনারের চার পুত্র, তংসু, মহান, অতিরথ, জহু। তংসুর পুত্র ঈলিন, ঈলিনের পুত্র হুয্যন্ত, তন্তু পুত্র ভরত। মহাভারত ও পুরাণ মিলাইয়া আমরা এইরূপ বংশ-তালিকা প্রস্তুত করিতে পারি—



তংসুর পুত্র যে ঈলিন, তাহা মহাভারতে (আদি ৯৫১২৭) উদ্ধৃত প্রাচীন অনুবংশ শ্লোকে উল্লিখিত হইয়াছে।

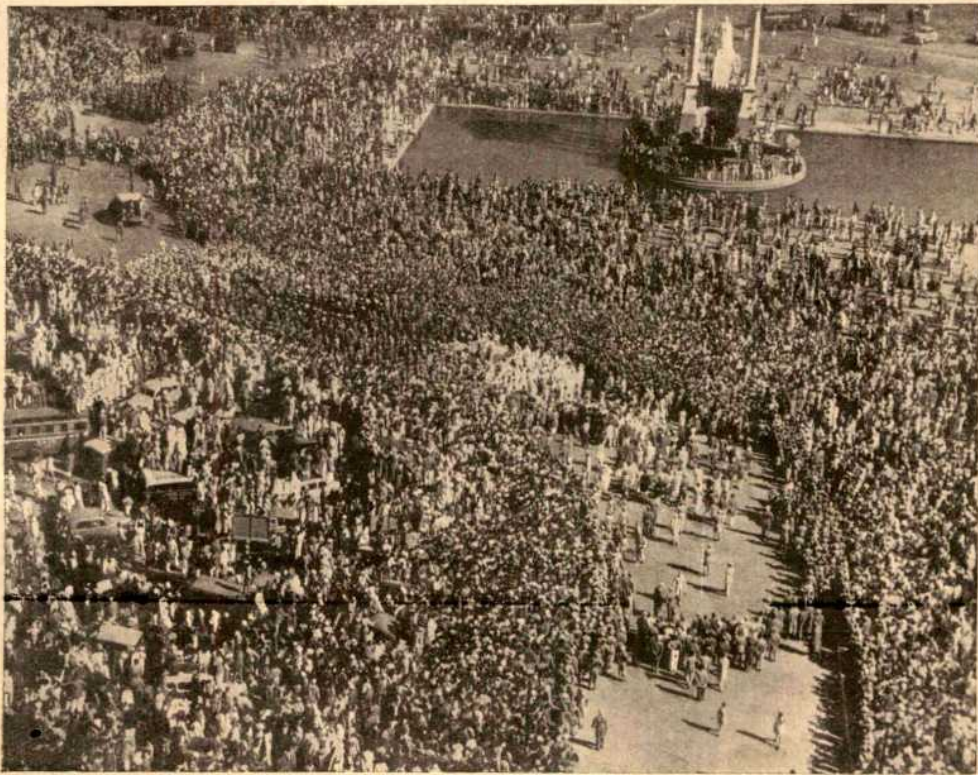
তংসুং সরস্বতী পুত্রং মতিনারাদকীবাণং।

ঈলিনং জনয়ামাস কালিদ্যায় তংসুরান্নজম্॥

সুতরাং পাজ্জিটার সাহেবের পক্ষে পুরুবংশ হইতে ঈলিনকে বাদ দেওয়া সম্ভব হয় নাই। পাজ্জিটার কণকে ভরতের অধস্তন পুরুষ অজমীটের পুত্ররূপে নির্দেশ করেন। তিনি তাঁহার প্রমাণে বাঁয়ু (৯১১৬৯-৭০), মৎস্য (৪৯৪৬-৭), বিষ্ণু (৪১১৯১০) ও গরুড় (১৪০১৯) পুরাণের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা দেখিয়াছি যে বাঁয়ু ও বিষ্ণু পুরাণ আমাদের মতেরও সমর্থন করিতেছে। আমরা মহাভারতের অনুকূল পুরাণের উক্তিই গ্রহণ করিয়াছি। পাজ্জিটারও হুয্যন্তের সমসাময়িক শকুন্তলা-পালক এক কণের কথা স্বীকার



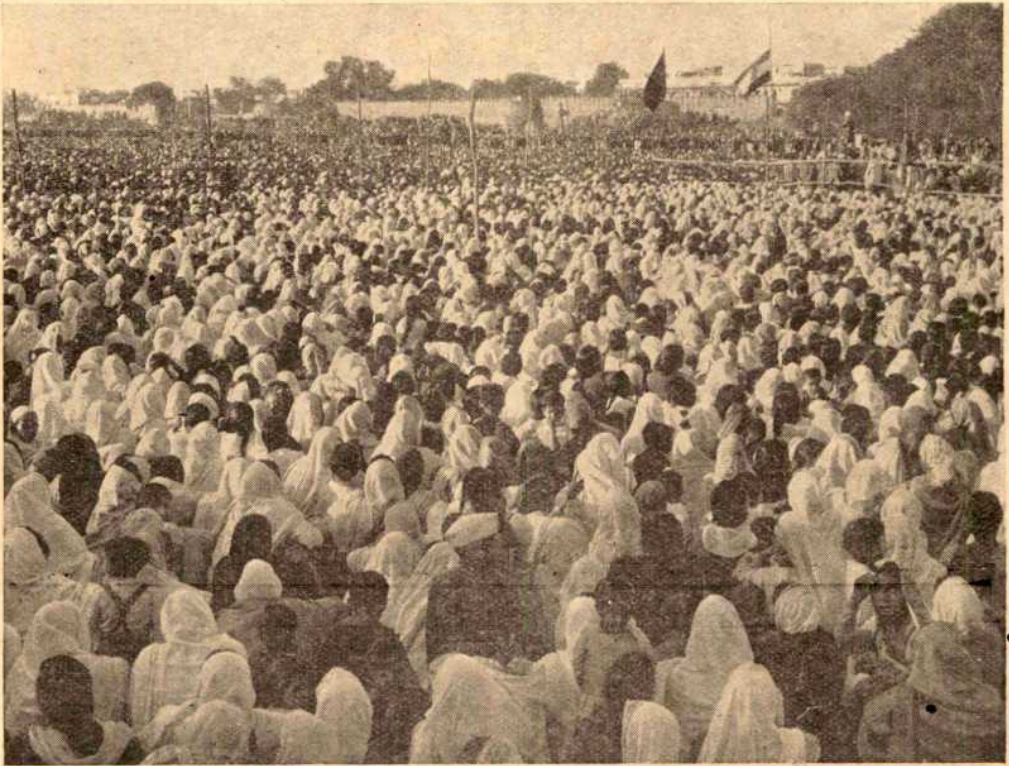
দিল্লীস্থ বিড়লা-ভবনে অন্তিম শয্যায় মহাত্মা গান্ধীর শবদেহ—শিয়রে একজন শিখ পুরোহিত
ধর্মগ্রন্থ পাঠ করিতেছেন



বিড়লা-ভবন হইতে যমুনাতীর পর্য্যন্ত মহাত্মা গান্ধীর শব লইয়া দীর্ঘ পাঁচ মাইলব্যাপী শোকযাত্রা



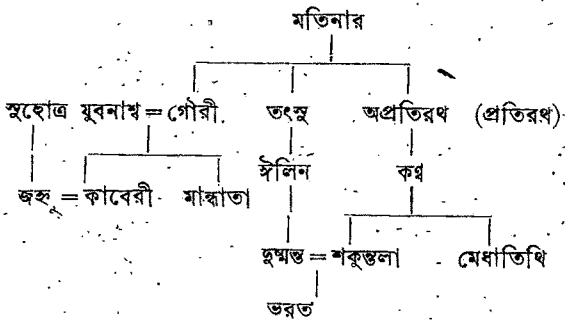
যমুনাতীরে গান্ধীজীর অন্ত চিত। অবলোকনরত (বী দিক হইতে) রাজকুমারী অমৃত কাউর, লেডি মাউন্টব্যাটেন, লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেন, পামেলা মাউন্টব্যাটেন, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ এবং ডাঃ লো চিয়া লুয়েন



গত ২রা ফেব্রুয়ারী দিনীর রামলীলা-প্রদর্শনে মহাত্মা গান্ধীর শোকসভায় পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু বক্তৃতা প্রদান করিতেছেন

করিয়াছেন ; কিন্তু তাঁহাকে কাশ্মপ কথ বলিয়াছেন (পৃ ২২৭)।

পাণ্ডিটার কাশ্মকুজ বংশকে চন্দ্রবংশীয় পুরুষবার পুত্র অমাবসুর বংশজাত নির্দেশ করেন। তাঁহার প্রমাণ-স্বরূপ তিনি সাতটি পুরাণের উল্লেখ করিয়াছেন—ব্রহ্মাণ্ড, বায়ু, ব্রহ্ম, হরি-বংশ, বিষ্ণু, গরুড় এবং ভাগবত (পৃঃ ৯৯, পাদটীকা ১)। অগ্নিপুরাণ মতে (২৭৭।১৬-১৮) কাশ্মকুজ বংশ পুরুষবংশীয় অজমীচের পুত্র জহুর বংশজাত। ব্রহ্মপুরাণ ও হরিবংশের এক মত অগ্নিপুরাণের অনুরূপ।—মহাভারতের আদিপর্বের ৯৪ অধ্যায় এবং অম্বুশাসন পর্বের ৪র্থ অধ্যায়ে কুশিক (কাশ্মকুজ) বংশকে অজমীচের পুত্র জহুর বংশজাত বলা হইয়াছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (৭।৩।৫) এবং শাংখায়ন শ্রৌতসূত্র (১৫।২৫) বিশ্বামিত্রকে ভরতবর্ষ বলিয়াছে।* ইহাতে তিনি যে ভরত-বংশীয় জহুর অধস্তন পুরুষ, তাহাই বুঝাইতেছে। আমরা পুরাণে তিন জন জহুর উল্লেখ দেখি। প্রথম জহু পুরুষবার পুত্র অমাবসুর বংশজাত। ব্রহ্মপুরাণ ও হরিবংশের মতে এই জহু যুবনাথের কন্যা কাবেরীকে বিবাহ করেন। ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণের মতে কাবেরী যৌবনাথের (মাকাতার) পৌত্রী। বায়ুপুরাণের মতে তিনি যুবনাথের পৌত্রী। ইনি সৌহোত্রি (সুহোত্রের পুত্র) জহু। হরিবংশ, মৎস্যপুরাণ এবং বায়ুপুরাণ মতে মতিনারের কন্যা গৌরী যুবনাথের স্ত্রী, মাকাতার জননী ছিলেন। এই মতে বংশ-তালিকা নিম্নলিখিত রূপ :



দ্বিতীয় জহু অজমীচের পুত্র। এই দ্বিতীয় জহুর সহিত প্রথম জহুর গোলযোগে বিশ্বামিত্রকে পুরুষবংশীয় স্থির করা হইয়াছে। তৃতীয় জহু কুরু পুত্র (বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি মতে)।

বিশ্বামিত্রকে আমরা ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলিয়া গণ্য করিব। তিনি ভরতবংশীয় বিখ্যাত রাজা সুদাসের পুরোহিত ছিলেন। ঋগ্বেদ (৩য় মণ্ডল) তাঁহার সাক্ষী। তিনি ৩য় মণ্ডলের ৩৩ সূক্তের ৫ ঋকে নিজকে কুশিকের পুত্র বলিয়া-

* ঐতরেয় ব্রাহ্মণের ষষ্ঠ খণ্ডে বিশ্বামিত্রকে জহু বংশীয় বলা হইয়াছে।

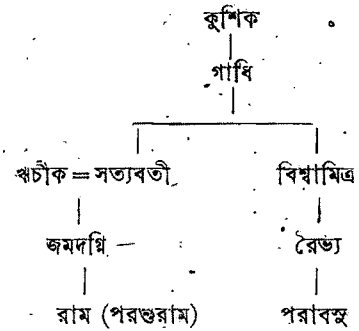
ছেন “কুশিকস্ত স্মৃঃ”। ঐ মণ্ডলের ৫৩ সূক্তের ৯ ঋকে বলা হইয়াছে—

“বিশ্বামিত্রো যদবহং সুদাসমপ্রিয়ায়ত কুশিকেভিরিঙ্গঃ।” অর্থাৎ বিশ্বামিত্র যখন সুদাসের যজ্ঞ করিয়াছিলেন, ইন্দ্র কুশিক-বংশীয়দিগের সহিত প্রিয় ব্যবহার করিয়াছিলেন।

ঐ ৫৩ সূক্তের ১৫ ও ১৬ ঋকে বিশ্বামিত্র জমদগ্নির নাম উল্লেখ করিয়াছেন। দশম মণ্ডলের ১৬৭ সূক্তটি বিশ্বামিত্র ও জমদগ্নি উভয়ের মিলিত রচনা। সেখানে ৪র্থ ঋকে ইন্দের উক্তি আছে—

“সুতে সাতেন যদ্যাগমং বাৎ প্রতি বিশ্বামিত্রজমদগ্নী দমে।”

অর্থাৎ হে বিশ্বামিত্র ও জমদগ্নি! তোমরা সোম প্রস্তুত করিলে আমি যখন ধন লইয়া তোমাদিগের গৃহে আগমন করি, তখন তোমরা উত্তমরূপে স্তব কর। (রমেশ দত্তের অনুবাদ) সুতরাং এই বিশ্বামিত্র সুদাস ও জমদগ্নির সমকালীন। কিন্তু পাণ্ডিটার বিশ্বামিত্র হইতে সুদাসকে ৩৬ পুরুষ অধস্তন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মহাভারত ও পুরাণের সর্ববাদী মতে বিশ্বামিত্র ও জমদগ্নির সম্পর্ক এইরূপ—



বায়ু, ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্ম ও হরিবংশ মতে কুশিক পৌরুহুংসীকে বিবাহ করেন (১৫২ পৃঃ)। পাণ্ডিটার তাঁহার ভ্রাতৃ পৌরাণিক ‘বংশাবলী’র উপর নির্ভর করিয়া এই পৌরুহুংসীকে পুরুহুংসের কন্যা না বলিয়া পুরুহুংসের অধস্তন ষষ্ঠ কন্যা মনে করিয়াছেন। কিন্তু ঋগ্বেদের প্রমাণে পৌরুহুংসি অসদস্য সুদাসের সমকালীন ছিলেন। সপ্তম মণ্ডলের ১৯ সূক্তটি বসিষ্ঠ মুনির রচিত। বসিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র সুদাসের পুরোহিত ছিলেন। সুতরাং এই সূক্তটি একটি সমসাময়িক প্রমাণপত্র। ইহার ৩য় ঋকে উক্ত হইয়াছে।—

স্বং ধুঞ্চা ধুঘতা বীতহব্যং প্রাবো বিশ্বাভিরুতিভিঃ সুদাসং।

প্র পৌরুহুংসিং অসদস্যমাবঃ ক্ষেত্রসাতা ব্রহ্মহত্যোয় পুরুং ॥

অর্থাৎ হে ঋষক! হব্যদাতা সুদাসকে ঋষক (বজ্রের) দ্বারা সমস্ত রক্ষার সহিত রক্ষা কর, যুদ্ধে তুমি লাভের জন্য পুরুহুংসের পুত্র অসদস্যকে ও পুরুকে রক্ষা কর।

(রমেশ দত্তের অনুবাদ)

বেদ, মহাভারত ও পুরাণ আলোচনা করিয়া আমরা নিম্নলিখিতরূপ বংশতালিকা প্রস্তুত করিতে পারি।—

- ১। মতিনার (রাভিনার, অস্তিনার)
- ২। তৎসু (বৈদিক তৎসু)
- ৩। ঈলিন (" উলান)
- ৪। হুঃষন্ত
- ৫। ভরত
- ৬। ভুমহ্য (নামান্তর বিতথ, বৈদিক বিদম্বী)
- ৭। সুহোত্র
- ৮। অজমীঢ়

- ৯। হুঃষন্ত (সুশান্তি) জঙ্কু
- ১০। পুরুজাহ্ন (পুরুজাতি) সিদ্ধুদীপ (সুনহ, সুনত সুহোত্র)
- ১১। তক্ষ (ঋক্ষ, পৃথু, চক্ষুঃ) অজ (অজক)
- ১২। ভূম্যধ্ব (ভদ্রাধ্ব, বাহাধ্ব) বলাকাধ্ব
- ১৩। যুদ্ধল কুশ (কুশাধ্ব, বলভ, বৈদিক ইবীরথ)
- ১৪। ব্রহ্মধ্ব কুশিক
- ১৫। দিবোদাস গাধি (বৈদিক গাধী)
- ১৬। পিজবন বিশ্বামিত্র (বিশ্বরথ)
- ১৭। সুদাস রৈভ্য

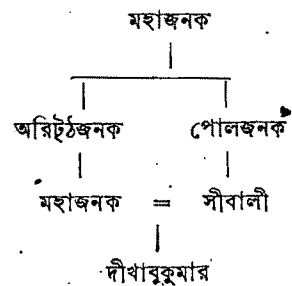
ভরত হইতে ১১ পুরুষ অধন্তন বিশ্বামিত্র কখনও ভরতের মাতামহ বা পূর্বপুরুষ হইতে পারেন না। সুতরাং ইহা অলীক উপকথা মাত্র। ভরতের মাতামহ কথ্য ইহাই ঐতিহাসিক সত্য।

উপরি-উক্ত বংশতালিকা হইতে স্পষ্টতঃ বোধ হইতেছে যে অজমীঢ় হইতে বিশ্বামিত্র নবম পুরুষ অধন্তন। আমরা ইহার পরিপোষক প্রমাণ পাইতে পারি। মহাভারতের শান্তিপর্বে ৪৯ অধ্যায় অনুসারে বিশ্বামিত্রের পৌত্র পরাবত্সর সমকালীন হইতেছেন জামদগ্ন্য রাম, পুরুবংশীয় বিহুৱথ-পুত্র ঋক্ষ এবং

বৃহদ্রথ (মগধরাজ)। ঋক্ষ এবং বৃহদ্রথ উভয়েই অজমীঢ়-বংশীয়। মহাভারত এবং পুরাণ অনুসারে তাঁহাদের বংশ-পরিচয় এইরূপ—

- | | | | |
|-----|-------------|----------|---------|
| ১। | অজমীঢ় | অজমীঢ় | অজমীঢ় |
| ২। | জঙ্কু | ঋক্ষ | ঋক্ষ |
| ৩। | সিদ্ধুদীপ | সংবরণ | সংবরণ |
| ৪। | অজ | কুরু | কুরু |
| ৫। | বলাকাধ্ব | অবিক্ষিৎ | সুধমন্ |
| ৬। | কুশ | পরিক্ষিৎ | সুহোত্র |
| ৭। | কুশিক | জনমেজয় | চ্যবন |
| ৮। | গাধি | স্বরথ | কৃত |
| ৯। | বিশ্বামিত্র | বিহুৱথ | বত্স |
| ১০। | রৈভ্য | ঋক্ষ | বৃহদ্রথ |
| ১১। | পরাবত্স | | |

কথক শকুন্তলার পিতা বলিয়া উল্লেখ না করার কারণ সম্ভবতঃ এই যে পৌরাণিকের নিকট এইরূপ সংগোত্র বিবাহ ধর্মবিগর্হিত বলিয়া গণ্য হইত। কিন্তু বৈদিক যুগে এইরূপ সংগোত্র বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল না। শতপথ ব্রাহ্মণে আছে— “তন্মাদ্ বা সমানাদেব পুরুষদন্ত্য চাতুষ্ট জায়তে। উত তৃতীয় সংগচ্ছাবহৈ চতুর্থে সংগচ্ছাবহৈ।” সেই একই পুরুষ হইতে ভক্ষক (স্বামী) এবং ভক্ষ্য (স্ত্রী) জাত হয়। পৌরাণিক উপাখ্যানে এইরূপ বিবাহের কোন নিদর্শন না থাকিলেও বৌদ্ধজাতকে (৫৩৯ নং) আমরা এইরূপ বিবাহ দেখিতে পাই—



সিদ্ধি কবি শাহ আবদুল লতিফ

এ এন.এম বজলুর রশীদ

সিদ্ধুর অমর কবি ভীট শরীফের বিখ্যাত শাহ আবদুল লতিফের* জীবনকাল ইংরেজী ১৬৮৯ থেকে ১৭৫২ সাল পর্যন্ত। তাঁর জীবন ও লেখার আলোচনার পূর্বে সে সময়কার সিদ্ধুর ইতিহাস কিছু জানা দরকার।

প্রায় চার হাজার বৎসর পূর্বে সিদ্ধু উপত্যকা ও ইরাকের প্রসিদ্ধ বাগদাদ শহরের নিকটবর্তী অতি-প্রাচীন উর শহর ও তার প্রত্যন্তভূমিকে কেন্দ্র করে যে এক সভ্যতা গড়ে ওঠে তারই গুণাবশেষ সিদ্ধুর অন্তর্গত মহেঞ্জোদাড়োতে আবিষ্কৃত হয়েছে। তার বহু পরে অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব ৩২৫ সালে দ্বিধিক্রমী আলেকজান্ডার সিদ্ধুর নিম্নভূমি দিয়ে সিহুনদ অতিক্রম করে ভারত থেকে প্রত্যাবর্তন করেন। ৭১১ খ্রীষ্টাব্দে তরুণ আরবী যুবক মুহাম্মদ বিন কাসিম সিদ্ধু উপত্যকার নিম্নভাগে অবতরণ করে সর্বপ্রথম ভারতভূমিতে ইসলামের বিজয় পতাকা উত্তোলন করেন। তারপর নানা বিপর্যয় ও দুঃখ-বিপদের মধ্যেও সিদ্ধুপ্রদেশ আপন স্বাভাবিক ও স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রেখেছিল।

সিদ্ধুদেশ তখন দু'ভাগে বিভক্ত ছিল।—উত্তর সিদ্ধু উপত্যকা ও নিম্ন সিদ্ধু উপত্যকা। এই দুই ভূমিতে বিভক্ত হয়েও সিদ্ধু প্রদেশের একেবারে হানি হয় নি। পূর্ব দিকের বিশাল মরুভূমি ও পশ্চিমের উত্তুঙ্গ পর্বতমালা দেশটিকে ভারতের অজ্ঞাত প্রদেশ থেকে স্বতন্ত্র ও স্বপ্রতিষ্ঠ করে একটি বিশেষ একক সত্তা দান করেছে। ১৫৪২ সালে শের শাহ কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে হুমায়ুন সিদ্ধুর অমরকোট আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং এই স্থানেই তাঁর পুত্র আকবরের জন্ম হয়। আকবর দিল্লীর বাদশাহ হয়েই ১৫৯২ সালে সিদ্ধু অধিকার করেন। সে সময় তান্তা ও বাখার এই দুই শহরই সমধিক প্রসিদ্ধ ছিল। বর্তমান সিদ্ধুর বিখ্যাত করাচী, হায়দরাবাদ, শিকারপুর ও সুল্লুর শহর অষ্টাদশ ও বিংশ শতকের মধ্যে গড়ে ওঠে।

মোগল শাসনাধীনে এলেও সিদ্ধুপ্রদেশ তার স্বকীয়তা বজায় রাখতে চেষ্টার ক্রটি করে নি। স্থানীয় শক্তিশালী অধিবাসীদের মধ্য থেকেই সিদ্ধুর শাসনকর্তা নিযুক্ত হতেন। দিল্লীর সঙ্গে সিদ্ধুর সম্বন্ধ ছিল রাজস্ব আদায়ের। নিয়মিত খাঁরাজ (ভূমিকর) পেয়েই দিল্লীশ্বর সন্তুষ্ট থাকতেন। কিন্তু

সিদ্ধুর অধিবাসীদের শিক্ষা বা অজ্ঞাত সুখসুবিধা বিধানের জন্ত তিনি এক পয়সাও খরচ করতেন না।

সিদ্ধুর বিখ্যাত কালহোরা বংশ প্রথমে জায়গীরদার রূপে আবির্ভূত হয়ে ধীরে ধীরে দেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে এবং এই বংশের লোকেরাই মোগল বাদশাহ কর্তৃক সরকারের শাসনকর্তা মনোনীত হতেন। ইয়ার মুহাম্মদ কালহোরা এই কালহোরা বংশের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি নিজে হজরত মুহাম্মদের খুন্সাত হজরত আকাসের বংশধর বলে দাবি করতেন। দেশের শাসনতন্ত্র নিয়ন্ত্রণ করা ছাড়া ধর্মের ক্ষেত্রেও এই বংশ বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মোগল সাম্রাজ্যের চারিদিকে নানা বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। অতিমাত্রায় কেন্দ্রীভূত শাসনতন্ত্র ও সাম্রাজ্যের প্রাণকেন্দ্র দিল্লীর সামরিক শক্তি শিথিল হয়ে এল। ইউরোপীয় বণিকদের আগমনে তখন ভারতভূমিতে নতুন ভাবধারা ও নানা অভাবনীয় সমস্যার সৃষ্টি হ'ল। এই নবজাগরণ ও চিন্তাধারার সঙ্গে তাল রেখে চলতে না পারায় মোগল সাম্রাজ্যের পতন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠল। এই সুযোগে ১৭০৭ সাল থেকেই কালহোরা বংশ সিদ্ধুর সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা ঘোষণা করে দেশের পূর্ব-গৌরব ও স্বাভাবিক ফিরিয়ে আনলেন। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সিদ্ধুর বুকে শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হ'ল না। তখন এক যুগ সন্ধিক্ষণ দেখা দিয়েছে—পুরাতনের সঙ্গে নূতনের বিরোধ স্রব্ধ হয়েছে। অশান্তি, অরাজকতা ও আত্মকলহে দেশ উত্তপ্ত হয়ে উঠল। ১৭৩৮ সাল পর্যন্ত কালহোরা বংশ স্বাধীন ভাবে সিদ্ধু শাসন করলেন। ১৭৩৯ সালে নদির সাহের ভারত আক্রমণের ফলে সিদ্ধু আবার স্বাধীনতা হারিয়ে পারস্যের সামন্তরাজ্যে পরিণত হ'ল। ১৭৪৭ সালে সিদ্ধুকে আহমদ শাহ ইরানী কারুলের অধীনে নিয়ে আসেন। ১৭৭৩ সালে আহমদ শাহের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধু আবার বহিঃশক্তির হাত থেকে বিচ্যুত হয়ে আপন স্বাধীন সত্তা ফিরে পেলে। বৈদেশিক শক্তির প্রাধান্য যথাযথ অধীকার করে, বিদেশীদের প্রবেশ নিষেধ করে এবং অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকের নানা প্রভাব থেকে আপনাকে রক্ষা করে চারদিকের দুর্গম অচলায়তনের মধ্যে সিদ্ধু আপনার বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্যকে অক্ষুণ্ণ রেখেছিল। এমন কি ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে বাণিজ্যকূট নির্মাণ করা সত্ত্বেও শাসকদের আত্মকূল্যের অভাবে সিদ্ধু ত্যাগ করে চলে যেতে বাধ্য হয়।

পাঠানদের হাত থেকে মুক্তি পাবার পর—কালহোরা বংশকে আর একটি ক্রমবর্ধমান শক্তির সম্মুখীন হতে হ'ল।

* সিদ্ধি কবি শাহ আবদুল লতিফ বাঙালী পাঠকের কাছে প্রায় অজ্ঞাত। শ্রদ্ধেয় শ্রীক্ষতিমোহন সেন মহাশয় বিশ্ব-ভারতী পত্রিকার এক সংখ্যায় তাঁর জীবনী সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ আলোচনা করেন

একদা শক্তির চরম শিখরে উঠে কালহোরা-রাজ মিয়া মীর মুহাম্মদ উত্তরে অবস্থিত রক্ষ ও অতুর্কর পরীতমালার অধিবাসী বেলুচদের আপন রাজ্যে অতি সমাদরে আহ্বান করেন। শুধু তাই নয়, এই মেঘপালক বেলুচদের তিনি নানা উপহার দিয়ে বিশেষ ভাবে অনুগ্রহীত ও আপ্যায়িত করলেন। তখন তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নি যে এই নিরীহ বেলুচরা এক দিন সিংহুর সামরিক ক্ষমতা লাভ করে তাঁরই বংশের বিলোপ সাধন করবে।

বিদেশী প্রভাব থেকে পরিভ্রাণ পেয়ে কালহোরা বংশের শ্রেষ্ঠ শাসক গুলাম শাহ দেশে আবার শান্তি ও শৃঙ্খলা কতক পরিমাণে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হলেন। ১৭৭১ সালে তাঁর মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ পুত্র সরফরাজ খাঁ সিংহুর সিংহাসনে আরোহণ করলেন। তিনি ছিলেন অদূরদর্শী ও স্বৈচ্ছাচারী। তাঁর প্ররোচনায় বেলুচ তালপুরীদের এক জন নেতা মীর বাহরাম খান তালপুর নিহত হলেন। বেলুচ জাতির অত্যন্ত বিশেষ একটি শাখা এই তালপুররা সিংহুর রাজ-দরবারে অশেষ শক্তির অধিকারী হয়ে পড়ে। এই হত্যা সংঘটিত হবার পর থেকেই কালহোরা ও তালপুরদের মধ্যে এক বিপুল রক্তক্ষয়ী ঘরোয়া যুদ্ধের সূত্র হ'ল এবং তার ফলে অষ্টাদশ শতকের প্রারম্ভে তালপুর-বংশ সিংহুর সিংহাসন অধিকার করে বসল।

এই হ'ল সিংহু প্রদেশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। এখন মূল প্রসঙ্গে আসা যাক। শাহ অবদুল লতিফ ১৬৮৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জীবনকালের আরম্ভ থেকেই সিংহুর শাসনভার মোগলদের হাত হতে কালহোরাদের হাতে এসে পড়ে। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর সময় অবদুল লতিফ ছিলেন আঠার বৎসরের যুবক। তাঁর বয়স যখন পঞ্চাশ তখন নাদির শাহ দিল্লীর ধ্বংস সাধন করে সিংহুকে পারস্তের সামন্তরাজ্যে পরিণত করেন। আটান্ন বৎসর বয়সে তিনি আর একটি বিপুল পরিবর্তন ঘটতে দেখলেন। মরণোন্মুখ দিল্লীর সাম্রাজ্যকে চুরমার করে দিয়ে আহমদ শাহ আধুনিক আফগানিস্তান রাজ্য সৃষ্টি করে সিংহুকে তার অন্তর্ভুক্ত করলেন। এর পাঁচ বৎসর পরে এবং ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যকুঠি নির্মাণের ছয় বৎসর পূর্বে শাহ লতিফ তেঘটি বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন।

উপরের এই বিবরণ থেকে দেখতে পাই, শাহ লতিফের জীবিতকালে সিংহু তথা মোগল সাম্রাজ্যের বুকে নানা বিপর্যয় ঘটে এবং তার দরুন যে বিক্ষোভ ও অরাজকতার সৃষ্টি হয় তার টেউ এসে সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সকলের মনকেই স্পর্শ করে। এতে শাহ লতিফের কবিতা যে বিচলিত হবে তাতে আর বিচিত্র কি! কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, চারদিকের এই তিক্ততা ও অনিশ্চয়তার মধ্যেও শাহ লতিফ অচঞ্চল ও অপ্রমত্ত চিন্তে অসংখ্য গান ও কবিতা রচনা করে সেই পরমহুন্দর এক আল্লাহর প্রতি তাঁর ভক্তি ও প্রেমার্ধ্য নিবেদন করেছিলেন। বাইরের ঘটনাবলি ও পরিবর্তনশীল জীবনযাত্রাকে তিনি

বড় করে দেখেন নি। অন্তরের যে ভাবধারা চিরন্তন, যে সত্য চিরকালের তারই সাধনায় তিনি অন্তর্নিহিত মন নিয়ে এক পরম নিভৃতি রচনা করেছিলেন। কালহোরা বংশের আত্মকলহ, রাজনীতিক্ষেত্রের নানা ভেদ-বিদ্বেষ ও অভিজাত-বিলাসী জীবনের বিকৃত অভিব্যক্তি তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু না হয়ে আল্লাহর ধ্যান ও সহজ বোধময় আনন্দই ছিল তাঁর জীবন-প্রকাশের একমাত্র অবলম্বন ও উপজীব্য।

শাহ লতিফের জীবন ছিল অনাড়ম্বর ও বৈচিত্র্যহীন। কিন্তু তাঁর অন্তরের অপার ঐশ্বর্য্য বিচিত্র ভাবমূর্ত্তিতে রূপান্তরিত হয়ে চিরহুন্দর ও অমর হয়ে আছে।

তাঁর জীবনের অধিকাংশ কাল হায়দরাবাদ (সিংহুর) জেলার উত্তরে অবস্থিত হালা হাবেলি; কোদ্রী এবং ভিটশাহ এই তিনটি গ্রামের গভীর নির্জনতার মধ্যে অতিবাহিত হয়। রাজনৈতিক বা সামাজিক কোন আন্দোলনেই তিনি যোগদান করেন নি।

বাস্তবকে এ ভাবে অস্বীকার করার মধ্যে কোনও পলায়নী মনোভাবের পরিচয় নেই। যারা গভীর জীবনের সন্ধান পেয়েছেন—জীবনের গভীরতাকে স্পর্শ করেছেন তাঁদের চিত্ত বস্তুজগতের চাঞ্চল্য ও পরিবর্তনশীলতার অনেক উর্দ্বৈ বিরাজ করে। স্থায়ী জীবন তাঁদের কাম্য, সঞ্চরী জীবনের আনন্দ-বেদনা তাঁদের মনকে চঞ্চল করতে পারে না।

বাল্যে ও যৌবনে তিনি লোকান্তর প্রতিভার পরিচয় দেন। পীর-দরবেশ ও সাধক-ক্ষীরদের সাধচর্য্য তাঁর ভাল লাগত। নির্জনে চিন্তা করা—সকল কলকোলাহল ও জীবনের সর্বগ্রাণি থেকে বহুদূরে গভীর গোপনে বসে আল্লাহর ধ্যান করাই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র আনন্দ। এক দিন অত্যন্ত মুসলমান সাধকদের মত তিনি দেশভ্রমণে বার হলেন। পথ তাঁকে ডাক দিয়েছিল। স্তূর্দীর্ণ দিনের আকুল প্রতীক্ষা ও অন্তরের একান্ত বেদনাবোধ তাঁকে এক দিন পথের বুকে ডেকে নিয়ে এল। তাঁর অন্তরায়া আল্লাহর উদ্দেশে যেন ব্যাকুল স্বরে বলে উঠল—

‘পাহ তুমি পাহজনের সখা হে—

পথে চলাই সেই তো তোমায় পাওয়া—

যাত্রাপথের আনন্দ গান যে গাহে

তারি কণ্ঠে তোমারি গান গাওয়া।’

শেখ সাদী এক দিন এমনি করে পথে বার হয়েছিলেন। আইন-ই-জাকবরীর বিখ্যাত রচয়িতা আবুল ফজলের পূর্ব-পুরুষ শেখ মুসাও একদিন অজ্ঞানার সন্ধান পথকে বরণ করে নিয়েছিলেন।

বাল্যকালের একটি ঘটনায় তাঁর ভগবৎ প্রেমের এক অপূর্ণ নিদর্শন পাওয়া যায়। আরবী বর্ণমালা শিখবার সময় বালক লতিফ ‘আলিফ’ বর্ণ ছাড়া অল্প কোন বর্ণ শিখতে অস্বীকার করেন। এই আলিফ দিয়েই আল্লাহর পবিত্র নামের সূত্র।

শাহ লতিফ ছিলেন হিরার্টের অধিবাসী এক বিখ্যাত ধর্মপ্রাণ সৈয়দ সাধকের বংশধর। সিদ্ধিতে এই বংশের মহাজনগণ ধর্মগুরু বা গীরের সম্মানজনক আসন লাভ করেছিলেন। শাহ লতিফের পিতার নাম সৈয়দ হাবীব শাহ। প্রাচুর্যের মধ্যে বাস করলেও শাহ লতিফ কোন দিন জীবনের সহজলভ্য আরাম আয়েস বা জাঁকজমক ভালবাসতেন না। তাঁর জীবন ছিল অপূর্বভাবে সংযত। শান্তধীর, মিতভাষী ও সৌজতের আধার শাহ লতিফের প্রাণ ছিল অত্যন্ত কোমল। মাহুম এমন কি ইতার প্রাণীর হৃৎকণ্ঠ পর্য্যন্ত তিনি সহ করতে পারতেন না। সেই সময়কার অভিজাত বংশের উচ্ছৃঙ্খল ও ভোগসর্বস্ব জীবনযাত্রার পরিবেশের মধ্যে থেকেও তিনি যে আত্মসংযমের পরিচয় দিয়েছেন তা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। তাঁর এই সহজ হৃদয় ও নিলিপ্ত সাধক জীবনের প্রতি অনেকেই প্রশংসিত হয়ে পড়ে। এক জন যুবকের এই জনপ্রিয়তা দেখে ব্যবসায়ী ধর্মগুরু ষাঁরা তাঁরা নানাভাবে তাঁর অনিষ্টের চেষ্টা করতে লাগলেন। কালহোরা বংশের উপর সৈয়দদের প্রভাব ছিল অতুলনীয়। তাঁদেরই প্ররোচনায় নূর মুহাম্মদ কালহোরা উদারহৃদয় শাহ লতিফের জীবন অতিষ্ঠ করে তুললেন। কিন্তু আল্লাহর প্রেম ষাঁর কাম্য মাহুমের অসন্তুষ্টি বা অহেতুক রোষ তাঁকে কখনও বিচলিত করতে পারে না। নূর মুহাম্মদ অবশেষে তাঁর ভুল বুঝতে পেরে তরুণ সাধক কবি শাহ লতিফকে বহুদূরে প্রেরণ করেন। নূর মুহাম্মদের কোন পুত্রসন্তান ছিল না। জনপ্রবাদ যে শাহ লতিফের আশীর্বাদেই তাঁর পুত্র গুলাম শাহ কালহোরার জন্ম হয়।

ধীরে ধীরে তিনি সাধনার পথে অগ্রসর হতে থাকেন। আধ্যাত্মিক ভাবাবেগপূর্ণ কবিতা ও গান রচনা করে তিনি জনসাধারণের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কিন্তু জনপ্রিয়তা ও প্রশংসা তাঁর মনকে পীড়া দিতে থাকে। শেষে লোকালয় ত্যাগ করে ভিট (সিদ্ধি শব্দ, অর্থ বালুর পাহাড়) নামক একটি নির্জন স্থানে তিনি তাঁর কুটির নির্মাণ করেন। তার পার্শ্বদেশ দিয়ে কিয়ার হ্রদের স্বচ্ছ বারিধারা প্রবাহিত হয়ে চলেছে, আর তার চারদিকের শ্রামল প্রান্তর ও তরুশ্রেণী সিদ্ধুর রক্ষ প্রকৃতির মধ্যে ব্যতিক্রমের সৃষ্টি করেছে। ভিট শরীফ শাহ লতিফের সাধনার উপযুক্ত স্থানই বটে। ধীরে ধীরে ভিটকে কেন্দ্র করে একটি গ্রাম গড়ে উঠল। শাহ লতিফ নিজের হাতে ধরবাড়ী নির্মাণ করতে সাহায্য করলেন। কিন্তু নির্জনতা চাইলে কি হবে, তিনি যে অধ্যাত্ম-সম্পদের অধিকারী হয়েছেন তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ভক্ত জনগণ দলে দলে ভিট শরীফে জড় হতে লাগল।

শাহ লতিফ ছিলেন সুফী সাধক। পারভের সাধকশ্রেষ্ঠ সুফী কবি মোলানা জালালুদ্দিন রুমী ছিলেন তাঁর অত্যন্ত প্রিয়কবি। শাহ লতিফের গুণমুগ্ধ নূর মুহাম্মদ কালহোরা তাঁকে রুমীর একখণ্ড ‘মসনভী’ কাব্যগ্রন্থ উপহার দিয়ে তাঁর

প্রসন্নতা অর্জন করেন। তাঁর নিত্যসঙ্গী ছিল পবিত্র কোরান গ্রন্থ, একখণ্ড ‘মসনভী’ ও সিদ্ধি কবি শাহ করীমের একখানি কবিতা-পুস্তক। আল্লাহর ধ্যান ও স্মরণে আপনার ব্যক্তিসত্তা ভুলে তিনি দীর্ঘদিন এক রুক্কোটে বাস করেন। এই সময় তিনি বহির্জগৎ থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। শাহ লতিফের এই বহুকষ্টলব্ধ সাধনার অপূর্ব ভাব ও আনন্দরসে তাঁর সমস্ত রচনা রূপায়িত হয়েছে। সাধক-মনের বেদনা ও সন্ধানপরতা চিরকালের বলে তাঁর কবিতা ও গান চিরদিনের সম্পদ হয়ে থাকবে।

১৭৫২ সালে তিনি অনন্তলোকে যাত্রা করেন। ভিট শরীফে তাঁর কবরের উপর গুলাম শাহ কালহোরা বহু অর্থব্যয়ে একটি সুন্দর সমাধিসৌধ তৈরী করে দিয়েছেন। আজও প্রতি শুক্রবার শাহ লতিফের সমাধিস্থানে তাঁর কবিতা আবৃত্তি করা হয় আর তার চারদিকের গভীর নির্জনতা ভেদ করে ধ্বনি ওঠে ‘আল্লাহ—আল্লাহ’।

সুফী কবি শাহ লতিফের কবিতা সঙ্কলন (রিসালে জু মুন্তাখাব) সিদ্ধি ভাষার এক অমূল্য সম্পদ। আজ পর্য্যন্ত তাঁর সমকক্ষ কবি সিদ্ধিতে জন্মগ্রহণ করেন নি। সিদ্ধি ভাষা সংস্কৃত ভাষা থেকে উদ্ভূত। আরবী, ফারসী ও উর্দু ভাষার প্রভাব থেকে মুক্ত করে শাহ লতিফ সর্বপ্রথম সিদ্ধি ভাষার প্রাণশক্তিকে পূর্ণফুর্তি দান করেন। সিদ্ধুর নদী, পাহাড়-পর্বত, রাখাল বালক, কুমোর প্রভৃতি অতি পরিচিত ও সাধারণ বিষয়বস্তু ব্যবহার করে তিনি সিদ্ধি ভাষার শক্তি বৃদ্ধি করেন ও তাকে জনপ্রিয় করে তোলেন। সিদ্ধি জনগণের মুখে ভাষা দিয়ে, নতুন ভাবের ব্যঞ্জনা দিয়ে তিনিই সিদ্ধি ভাষার মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন এবং সর্বত্র তার সৌরভ ছড়িয়ে দিয়েছেন—এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না। বাংলার মরমী সাহিত্যের ভাঙারী পণ্ডিতাগণ্য শ্রদ্ধেয় ক্ষতিমোহন সেন মহাশয় সুদূর ভিট শরীফে গমন করেছিলেন। এই সঙ্গে শাহ লতিফের কয়েকটি কবিতার অনুবাদ দেওয়া গেল।

দুর্গম পথ

আমার দুর্বলতা আমারে দেয় আনন্দ—আল্লাহর কানে কানে ধ্বনিত হয় আমার প্রেমার্জিত বেদনার আর্তনাদ—
ফাঁসীর মঞ্চ-বৃক্ষে করেছি আশ্বাদ (প্রেমের)
দুঃখ আমার জন্ত নিয়ে এসেছে কি অপূর্ব মহত্ব।
ফাঁসী-মঞ্চ আমারে ডাকে—ওগো আমার বহুরা
তোমরা কেউ কি যাবে আমার সাথে?
প্রেমের নাম যারা জেনেছে আসবে শুধু তারাই
প্রেমের দ্বারে।
ফাঁসীর কাঠ—তার প্রলোভন দেয় বিছিয়ে,
ডাকে প্রেমিকদের। পেয়েছ কি সন্ধান—
প্রেম বলে কারে? যাত্রা করো না (সেই দুর্গম রহস্তের পথে)

(তোমার গর্বিত) শিরের মূল্য দিও না কিছু—
তখন কর জিজ্ঞাসা প্রেমের অর্থ কি—তারপর বল কথা।

কাঁসীর কাঁস (বস্ত্র-আবর্তন জালে তার অস্তিত্ব)
অলঙ্কৃত করে প্রেমিকদের। সৈয়দ করে গান—
তারা দেখেছিল প্রেমের বর্ণা—কম্পিত হয়নি তাতে
স্থির পদে দাঁড়িয়ে ছিল তারা।

প্রেম তাদের দিয়েছিল ডাক—তারা আপনাদের করে নি আবৃত
প্রেমই তাদের সেখানে গেছে নিয়ে—প্রেমের আদেশ।
নির্মম হাতে প্রেম যখন নেয় ছুরি—
তা ধারাল নয় মোটে—বরং ধারে নেই তার তীক্ষ্ণতা।
তাই প্রেমাস্পদের হাত অনেকক্ষণ ধরে
চলবে তোমার উপর দিয়ে
প্রেম কেন আসে—কি করে যে আসে জান কি তাহা?
ছুরি পড়ে যায়—মুখে বলো নাক' উছ ও আহা।

কি ক্ষতে তোমার বুক জলে যায় অপার জনে—
বলো না তাহা—মনের বেদনা মনেই রেখো।

সারি সারি দাঁড়ায়েছে প্রেমিকের দল—
মস্তক প্রস্তুত করি—থির অচঞ্চল
ছিন্ন কর শির তাহে না হয় অত্যাধা
হয়ত লভিতে পার তার প্রসন্নতা—
ভুমিতে লুটীয়ে পড়া রক্তমাখা শির
ব্যর্থতায় করিবে না অন্তর অধীর।
প্রেমের শরাবখানে হত্যা অগণন
বন্ধনীন বন্ধ্যাতোতে চলে অম্লক্ষণ।
প্রেমের মদিরা যদি শুধু এতটুক
পান করিবারে চাহ একান্ত উৎসুক—
পানশালা হবে তব একমাত্র নীড়;
পানপাত্র—পার্শ্বে তব পড়ে আছে শির
মূল্য দিয়া কর পান উন্মাদ অধীর।

শিল্পশিক্ষা ও স্বাধীন রাষ্ট্র

শ্রীমণীঅভ্যুদয় গুপ্ত

বাংলার স্বদেশী যুগের গোড়া হইতেই জাতীয় শিক্ষা বলিয়া
একটি কথা উঠিয়াছিল; এবং বাংলার স্থানে স্থানে জাতীয়
বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ১৯২১ সনে মহাত্মা গান্ধীর
নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন প্রবর্তিত হইলে সরকার পরি-
চালিত বিদ্যালয়গুলি হইতে ছাত্রদের চলিয়া আসিতে বলা হয়।
স্বদেশী যুগের আন্দোলন বিশেষভাবে বাংলায় আবদ্ধ ছিল, কিন্তু
অসহযোগ আন্দোলন সারা ভারতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে এবং
ভারতের স্থানে স্থানে জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। জাতীয়তা-
বাদী চিন্তানায়কগণ বলেন যে শিক্ষা আমাদের মনে দাসত্বলভ
মনোবৃত্তির সৃষ্টি করে, তাহা আমাদের জাতীয় জীবনের
বিকাশের পরিপন্থী। ভারত আজ স্বাধীন, আজ বিকাশের
ঐক্য চিন্তাধারার তাৎপর্য আমাদের কাছে অনুধাবন করিতে
হইবে।

আজ আমার আলোচ্য বিষয় শিল্পশিক্ষা, অর্থাৎ আর্ট চিত্র-
কলা ভাস্কর্য প্রভৃতি। আর্ট প্রত্যেক জাতির সাংস্কৃতিক
জীবনে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে; অতএব সে সম্বন্ধে বিশেষ
আলোচনার প্রয়োজন আছে। সাধারণ শিক্ষা সম্বন্ধে বহু
আলোচনা হয়, কিন্তু শিল্পশিক্ষা সম্বন্ধে তেমন আলোচনা হয়
না। এখন স্বাধীন ভারতের উপযোগী আর্ট গড়িয়া তোলার
দরকার যাহাতে দেশের আশা-আকাঙ্ক্ষা, দেশের শিক্ষা,

দেশের সংস্কৃতি আর্টের ভিতর দিয়া একটি হইতে পারে।
এখন আর্ট হওয়া উচিত যুগোপযোগী।

ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে নানা জনের নানা অবদান
আছে। শিল্পীর কোনো অবদান আছে কি? স্বাধীন ভারতে
প্রকৃত মর্যাদা লাভ করিতে পারে, এমন চিত্র সে আঁকিয়াছে
কি? এমন চিত্র সে আঁকিয়াছে কি যাহা হইতে মানুষ প্রেরণা
পাইতে পারে? বহুক্ষেত্রে আমরা শিল্প সৃষ্টি করিয়াছি ধর্মীর
ব্যসনের জন্ত। শিল্প হইয়াছে তার ড্রয়িং-রুমের আসবাবপত্রের
মত। যাহা হওয়া উচিত অন্তরের জিনিষ, তাহা হইয়াছে
বাহিরের ভোগের বস্তু। এক সময়ে আমাদের দেশে সমাজের
সঙ্গে ছিল আর্টের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। আমাদের দেশে সাহিত্য,
সঙ্গীত, নৃত্য, ভাস্কর্য, স্থাপত্য সকলেরই যোগ ছিল সমাজ-
দেহের সঙ্গে। পাশ্চাত্য শিক্ষার আর্ট সে স্থান হইতে
বিচ্যুত হইয়াছে।

আজকাল সাহিত্য-শিল্প-সমালোচকগণ ইউরোপ হইতে
একটি নূতন কথার আমদানী করিয়াছেন, তাহা হইতেছে
সমাজচেতনা, এ জিনিষ কি আমাদের দেশে ছিল না?

আমি আমাদের দেশের বহু শিল্পী বিশেষ করিয়া আর্টের
ছাত্রদের সঙ্গে মিশিয়াছি, অনেক স্থানে তাহাদের ভারতীয়
শিল্প সম্বন্ধে অজ্ঞতা এবং অশ্রদ্ধা লক্ষ্য করিয়াছি। আজ বাংলার

সাহিত্যে, কাব্যে, সঙ্গীতে যে স্বাধীনতার বাণী ধ্বনিত হইয়াছে, চিত্রে তাহা সম্ভব হইবে কি করিয়া? শিল্পীরা আজও তাকাইয়া আছে পশ্চিমের দিকে, তাহাদের মোহ আজও কাটে নাই; নবীন ভারতকে সে আজ কি বাণী দিবে? আজও সে যে আশা করিতেছে—রাজা মহারাজা, রায় সাহেব এবং খান বাহাদুররা তাহাদের পৃষ্ঠপোষকতা করিবে। আটকে শুধু অর্থ উপার্জনের উপায়-স্বরূপ মনে করিলে চলিবে না, আর্টিষ্টের আরও বড় দায়িত্ব আছে; এ কথা আজ তাহাদের স্মরণ করাইয়া দেওয়ার দরকার। কমলা লেকচারে ডাঃ এনি বেসান্ট বহু পূর্বে এ কথা বলিয়াছেন; আজ স্বাধীন ভারতে এই মহীয়সী মহিলার বাণী শিল্পীদের আবার নূতন করিয়া শোনানো প্রয়োজন তিনি বলিয়াছেন—

“Art as I have oftentimes said, must be no longer a luxury for the rich, but the daily bread of the poor. This is part of India's Dharma. For Beauty diversified into Arts is the true refiner and uplifter of Humanity. It is the instrument of culture, the broadener of the heart, the purifying Fire which burns up all prejudices, all pettiness, all coarseness. Without it true Democracy is impossible, equality of social intercourse an empty dream.

অর্থাৎ, “আমি প্রায়ই বলিয়াছি, আর্ট আর ধনীর বিলাস হইবে না, ইহা হইবে গরীবের রোজকার খোরাক। ইহা হইল ভারতীয় ধর্মের অঙ্গীভূত। কারণ সৌন্দর্য যখন আর্টের মধ্য দিয়া বিকীর্ণ হয়, তখন তাহা মানবতাকে বিশোধন ও উন্নয়ন করে। ইহা সংস্কৃতির বাহন এবং ইহা অন্তঃকরণকে উদার করে। ইহার পুত অগ্নিশিখা সকল কুসংস্কারকে, ক্ষুদ্রতাকে, স্থলতাকে দগ্ধ করে। ইহা ছাড়া প্রকৃত গণতন্ত্র অসম্ভব এবং সামাজিক সাম্য একটা মিথ্যা স্বপ্ন।” ডাঃ বেসান্টের এই উক্তির মূল্য আজ সম্বন্ধিক।

ভারতবর্ষের আর্ট স্কুলসমূহে যে সব ছাত্র শিক্ষা পায়, তাহাদের অধিকাংশেরই ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ নাই। বিলাত যাইতে পারিলেই তবে তাহাদের শিক্ষার সার্থকতা—অনেকে মনে মনে কল্পনা করিয়া থাকে। কিন্তু কয়জনের এমন বাসনা মনে জাগে যে, ভারতবর্ষটা ভ্রমণ করিয়া দেখি—অজন্তা, এলোরা, কোনারক প্রভৃতি দেখি। ভারতবর্ষে ভ্রমণ করিয়া শিল্পশিক্ষার কিছু সুবিধা হইবে একথা তাহারা কল্পনা করিতে পারে না। তাহারা ইউরোপীয় চিত্রের পুস্তকই পড়ে, ছবি দেখে; ভারতীয় শিল্প সম্বন্ধে তাহাদের এমন ধারণা যে, তাহা সর্ব রকমে পরিত্যক্ত। আমাদের ছাত্রেরা ইউরোপে গিয়া ইউরোপের চিত্র-কলার সঙ্গে পরিচিত হোক, ইহার বিরুদ্ধ মত পোষণ করা অবশ্য সমীচীন নয়; কিন্তু যে নিজের দেশকে জানে না, তার পরের দেশকে আশ্রয় লাভ কি?

বিদেশে শিল্পশিক্ষার জন্ত ব্যয় আছে, বর্তমানে ইহার কোনো সার্থকতা উপলব্ধি করি না। অন্ততঃ ৫ বৎসরের জন্ত এ ব্যয়

বন্ধ থাকা উচিত। এখন ছাত্রবৃত্তি দেওয়া উচিত ভারত ভ্রমণের জন্ত; শিল্পীরা ভারতের প্রাচীন শিল্পকলার নিদর্শনসমূহ পর্যবেক্ষণ করিয়া জ্ঞান-ভাণ্ডার বৃদ্ধি করিবে। পরে যখন অবস্থার পরিবর্তন হইবে, বিদেশের বৃত্তি পুনঃপ্রবর্তন করিলে চলিবে। বিদেশে যাহারা শিল্পশিক্ষার জন্ত যাইবে, তাহাদের ভারতীয় এবং ইউরোপীয় শিল্পের ইতিহাসের একটা মোটামুটি জ্ঞান থাকার দরকার, তাহা হইলে তাহারা লাভবান হইতে পারিবে। অ্যারি মাটিস এখন ফ্রান্সের জীবিত শিল্পীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; তাঁহার কাছে একজন এদেশীয় শিল্পী শিক্ষালাভ করিতে গেলে তিনি বলিয়াছিলেন “এখানে আসিয়াছ কেন, তোমাদের দেশে বড় আর্ট আছে, সেখানে ফিরিয়া যাও।”

সাহিত্যে, দর্শনে, বিজ্ঞানে রাজনীতিতে ভারত এমন বহু মনীষীর সৃষ্টি করিয়াছে, যাহারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের সঙ্গে সমান আসন লাভ করিবার যোগ্য। কিন্তু সেই স্তরের শিল্পীর সংখ্যা খুবই কম। অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলালকে বাদ দিলে এমন কয়জন শিল্পী আছেন যাহারা ভারতের গৌরবকে পৃথিবীর সম্মুখে উজ্জ্বল করিয়া ধরিতে পারেন?

জবাহরলাল বলিয়াছেন, ভারত বহুকালের পরাধীনতা এবং ঝড়ঝাপটার মধ্যেও টিকিয়া আছে; কি প্রকারে আছে? আছে তার নিজের ঐতিহ্যের জোরে।

সুভাষচন্দ্র বলিয়াছেন,

“There is a continuity, historical and cultural continuity, extending from the ancient till the present day—which is in some ways a remarkable thing in history. Now in order to understand India this fundamental fact should first be understood, namely, that the India of the past is not dead. India of the past lives in the present, and will live on in the future.”*

অর্থাৎ “প্রাচীন কাল হইতে আধুনিক কাল পর্যন্ত ভারতের ইতিহাসের এবং সংস্কৃতির একটি নিরবচ্ছিন্নতা আছে, যাহা ইতিহাসের এক অভিনব জিনিষ। ভারতকে বুঝিতে হইলে গোড়ার এই কথা বুঝিতে হইবে, অতীতের ভারত আজ মৃত নহে, এবং ইহা ভবিষ্যতেও বাঁচিয়া থাকিবে।”

শিশুকাল হইতেই বালকবালিকাদের মনে ভারতীয় শিল্পের প্রতি শ্রদ্ধা জাগাইতে হইবে। চার বৎসর হইতে বার বৎসর বয়স পর্যন্ত—বাল্যকালে—মনে সহজেই সব কিছুর ছাপ পড়ে, তখন মনে যাহা ঢুকাইয়া দেওয়া যাইবে, তাহা স্থায়ীভাবে থাকিয়া যাইবে। এখন স্কুলের দেওয়ালে টাঙানো থাকা উচিত, প্রাচীন ভারতীয় চিত্র, ভাস্কর্য স্থাপত্যের প্রতিলিপি। সরকার হইতে এসকল প্রতিলিপি ছাপানোর ব্যবস্থা করা উচিত। অল্পনা ভারতীয় ইতিহাসে অজন্তা, এলোরা, যবদ্বীপ এবং বৃহত্তর ভারতের উল্লেখ

দেখা যায়; ইহা খুবই সমীচীন। পূর্বের বালকদের বিদ্যালয়-পাঠ্য ইতিহাসে জাতির সাংস্কৃতিক জীবনের পরিচয় থাকিত না বলিলেই চলে, থাকিত শুধু রাজা-বাদশাদের যুদ্ধ-বিগ্রহের কথা। কিন্তু এখন ইতিহাসকে ঢালিয়া সাজা উচিত। ছেলেরা যাহা ইতিহাসে পড়িবে, চোখের সামনে যেসব দেখিলে ভারতের ঐতিহ্য তাহাদের কাছে দেদীপ্যমান হইয়া উঠিবে, ল্যাক্টার্ন-স্লাইড সাহায্যে বিশেষজ্ঞদের দ্বারা মাঝে মাঝে সেই সব প্রাচীন কীর্তিসমূহ সম্বন্ধে বক্তৃতা দেওয়া উচিত। প্রত্যেক বালকবালিকা আর্টিষ্ট হইবে এরূপ আশা করা যায় না, কিন্তু সকলেরই মনে সৌন্দর্য্যবোধ জাগ্রত হওয়া উচিত।

স্কুলে ড্রইং ক্লাস নামে যে ক্লাস থাকে তাহা মোটেই চিত্রাকর্ষক নহে। বর্তমানের শিক্ষাপদ্ধতি এরূপ যে, ড্রইং মাষ্টার ইহাকে চিত্রাকর্ষক করিতে পারেন না; চিত্র সম্বন্ধে ছাত্রদের কোন ঔৎসুক্য জাগে না, তাহারাই এই ক্লাসকে ফাঁকি দিতে পারিলে বাঁচে। যদিও বা কাহারও চিত্র সম্বন্ধে ঔৎসুক্য থাকে ড্রইং ক্লাসের ঐতাকলে পড়িয়া তাহা নষ্ট হইয়া যায়।

ফলে এই হয়, আর্ট স্কুলে যখন ছাত্রেরা ঢোকে, তখন শিল্পকলা শিখিবার জন্ত প্রকৃত আগ্রহ তাহাদের বড় একটা থাকে না। তাহারাই শুধু পাস করিয়া উপার্জনক্ষম হইতে চায়। অবশ্য ইহার ব্যতিক্রম যে নাই, তাহা নহে। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ যে বহু পূর্বে লিখিয়াছিলেন, ‘আগে আর্টিষ্ট হও, পরে আর্ট স্কুলে ঢোক’, কার্যক্ষেত্রে তাহা অনুসৃত হইতেছে কি?

অভিভাবকদের এবং শিক্ষাব্রতীদের এ বিষয়ে অবহিত হওয়ার প্রয়োজন আছে। অনর্থক এক দল আগ্রহ ও ঔৎসুক্যহীন ছাত্রকে আর্ট স্কুলে পাঠাইলে শিল্পশিক্ষা ব্যাহত হয়, তাহাদের আর্ট শিক্ষার জন্ত সময় ও অর্থের অপব্যয় না করিয়া অল্প লাইন বাছিয়া লওয়া উচিত।

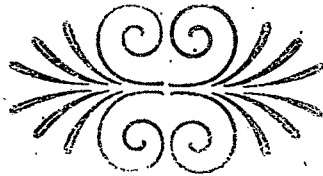
যতিক্ষ, হৃদয় এবং হস্ত এই তিনের সংযোগে শ্রেষ্ঠ শিল্পের উৎপত্তি—অর্থাৎ ইহার ভিতর থাকিবে বুদ্ধিবৃত্তি, ভাবাবেগ এবং টেকনিক বা কলাকৌশল এই তিনের সমন্বয়। শিল্পীদের এই তিনটির দিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত, শুধু টেকনিক বা ব্যাকরণের দিকে দৃষ্টি দিলে চলিবে না।

শিল্পীগোষ্ঠী এবং রাষ্ট্রপরিচালকদের পারস্পরিক সহযোগিতা দরকার। গত যুদ্ধের সময় জাপানী আর্টিষ্টদের যুদ্ধের প্রাচীর-চিত্র আঁকিতে হইয়াছিল। আজ আমাদের শিল্পীরা স্বেচ্ছায় রাজনীতি, শিক্ষা এবং সংস্কৃতি বিষয়ক পোষ্টার আঁকুক না? কংগ্রেস শিল্পীদের সহযোগিতা এতদিন তেমনভাবে প্রার্থনা করে নাই, আজ রাষ্ট্র অথবা কংগ্রেস স্বাধীনতার ও জাতীয় সংস্কৃতির বাণী চিত্রের সাহায্যে ধরে ধরে পৌঁছাইয়া দিক; যাহাতে নিরক্ষরেরাও স্বাধীনতার মর্ম্ম বুঝিতে পারে সেই ব্যবস্থা করুক। শিল্পীরা এতদিন নিজেদের সঙ্গীর্ণ গণির ভিতরে আবদ্ধ ছিল, আজ তাহাদের শক্তি দেশসেবায় নিযুক্ত হোক। জনগণের মধ্যে দেশের মর্ম্মবাণী চিত্রের সাহায্যে পৌঁছাইয়া দিক।

A man does not live by bread alone. স্বাধীন ভারতকে শুধু রুটির ব্যবস্থা করিলে চলিবে না, জনগণের জন্ত চাই সৌন্দর্য্যসৃষ্টি, চাই আনন্দ। ভারতের মুক্ত আত্মা শিল্পের ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করুক।

ফরাসী বিপ্লবের সময় দেখা গিয়াছে, শুধু সাহিত্যে সঙ্গীতে বিপ্লবের বাণী ধ্বনিত হয় নাই, চিত্রেও তাহার প্রতিধ্বনি উঠিয়াছে। নেপোলিয়নের দামামা ধ্বনি, তাহার যুদ্ধবিরতির ধ্বনি শিল্পীর কানে পৌঁছিয়াছে। সেননের বিখ্যাত শিল্পী গইয়া দেশের নিগীড়িত জনগণের বেদনাকে চিত্রে যুঁহ করিয়াছেন।

দিন আগত ঐ, ভারতীয় শিল্পী এখন কোথায়? সে কি লুপ্ত থাকিবে? সকলের পিছনে পড়িয়া থাকিবে? দেশের বিপুল জনসংখ্যের সঙ্গেই যে তাহাকে চলিতে হইবে।



বাপুজী

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

হিংসার সমুদ্র 'পরে শান্তিময় প্রভাত-তপন
তোমার পবিত্র আশ্রয় উজ্জলিত মৃত্যুর আকাশ,
জ্যোতির্মীলা জলে জলে, উদ্ভাসিত নিখিল ভুবন,
তোমার অমৃতবিভা মতে 'আনে স্বরগ-আভাস।

কত দেষ, কত নিন্দা, কত হীন সন্দেহ সংশয়,
তোমার নিমল হাস্য প্রতিদিন গেছে তুচ্ছ করি,
'আপন হৃদয়ে-বলে সর্ববাধা করিয়াছ জয়,
স্থিরলক্ষ্য চলিয়াছ আপন আদর্শ অল্পসরি'।

ক্ষণস্থায়ী বর্তমান, ফেনসম প্রবৃত্তি-সংক্ষেপ,
আমরা তাহারি দাস, মিথ্যা মায়াযুক্ত অল্পক্ষণ,
শক্তিহীন নিষ্ঠাহীন,—আমাদের মূঢ় শক্তি লোভ
স্তীকৃতার পদতলে পূজা-অর্ঘ্য করিছে অর্পণ।

অজ্ঞহীন মহাবীর, অস্ত্ররাজি তব পদতলে
সন্ত্রমে লুটায় পড়ে, মহায়ুদ্ধে চির রণজয়ী।
দেখায়েছ শ্রেষ্ঠ অস্ত্র প্রতিজন পায় মনোবলে,
উত্তম অসির মাঝে চলিয়াছ প্রেম-বাত 'রহি'।

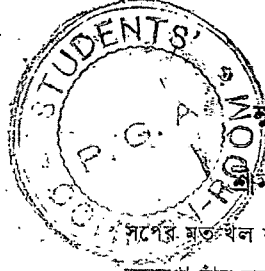
বিদেশীর ষড়যন্ত্র, উন্নত সে হত্যা-আয়োজন
উপেক্ষিয়া চলিয়াছ স্মিত মুখে দক্ষিণাফ্রিকায়,
সহিয়াছ কারাবাস, গুরু দুঃখ করেছ বরণ,
দৃঢ়পদে চলিয়াছ আপন কঠোর সাধনায়।

মানুষ মানুষ হোক, জীবনের একটি কামনা,
অগ্নিদগ্ধ নোয়াখালি তাই তব হ'ল তীর্থভূমি,
ভয়াকুল দেশবাসী রুদ্ধগৃহে করেছে জল্পনা
'আত্মজন ক'টি নিয়ে শূন্যহস্তে ছুটে গেছ তুমি।

মনোবল হ'ল জয়ী। তবু শুনি কত নিন্দাবাদ,
আরাম কেদারাশায়ী তরুণের বীরত্বাভিনয়,
স্বাধাদের নেতা তুমি; তারা ধরে শত অপরাধ,—
বিশৃঙ্খল লক্ষ্যহারা দেশের শক্তির অপচয়।

তুমি নাকি ধনিবন্ধু। দূর দেশে কৃষিক্রান্ত লয়ে
দীনজনসঙ্গে তুমি রচিলে আদর্শ পরিবার,
সংঘ-জীবনের বাণী—বাণী নয়, মৃত সত্য হয়ে
উঠেছে সে দিন হতে সূর্য্যোদয় এ জীবনে তোমার।

আজিকার অপমৃত্যু—আকস্মিক কুজাটিকাঙ্কাল
অকপিল ধন্যে এলো, অশ্রুবাষ্পে আঁধার নয়ন।
'ছিন্ন হবে এ কুহেলি, ব্যাপ্ত করি' সর্বদেশকাল
তোমার মহিমাদীপ্তি উদ্ভাসিবে জীবন-মরণ।



ক্ষমা-সুন্দর

শ্রীমিনোমোহন ঘোষ

পেপের মৃত্যু-খল ষড়রিপু মন্ত্রমোহিত সম
নতকণা ধীর চরণে ঠেকায়ে ফুকায়িল, 'নমোনমঃ'
বিদগ্ধ-জনা ধীর এক-কণা পদরেণু-প্রত্যাশী
বুদ্ধ বীণুর গোত্রীয় সেই কোপিনী সম্যাসী,
নিয়ে হরিজনে মেলা বসাইল ভাঙী-বস্তীর মাঝে
পঙ্ক-মলিন সরসীতে যেন স্বর্ণ-কমল রাজে।
আধো-শতাব্দী ধোলা ছিল ধীর জীবনের খাতাখানি
যার খুসী সেই পড়িয়া জেনেছে জীবনই তাঁহার বাণী।

সে যে নিখিলের মর্ম্মের কোষে মূল্যবিহীন নিধি
ধরিয়া ধীর চরণ-পরশে পবিত্রমানে হৃদি।
ধরণীর ধূলি ধস্ত করিল অমরার জ্যোতি নামি'
বৃকের শোণিতে ধূয়ে মুছে দিতে এ ধরার পাপ, ধানি।
দুশো কোটি লোক ধাঁহা ছায়ায় অর্জনতক ধরি'
ধস্ত হয়েছে; বংশধরেরা যুগে যুগে তাঁরে স্মরি'
জীবনের পথে লভিবে পাথের নিশ্চিত বিশ্বাসে
একধা ভাবিতে নয়নে আমার বাষ্প নামিয়া আসে।

এমন রত্ন সহিতে নারিল যে অভাজনেরা আজি
বিধাতা। তোমার কঠোর করুণা বজ্রদণ্ডে বাজি'
তাদের অন্ধ নয়নে কোটাক্ষ মোহ মুক্তির আলো
শাপ-মোচনের অন্তে তাহারি চিহ্নক মন্ড-ভালো।
যে হৃদয়ে ছিল তাহাদের তরে নিশ্চিত আশ্রয়
অগ্নি-গলিত ধাতু-গুটিকায় তাহারই বটায়ে ক্ষয়
আশ্রয়হারা ভাস্ত পথিক—সে মূঢ়জনেরা শেষে
প্রায়শ্চিত্ত করুক এবার, মানুষ্যেরে ভালোবেসে।
হাত-যোড়-করা ক্ষমা-সুন্দর মৃত্যু-বরণ-ক্ষেপে—
এর চেয়ে বড়ো কোনো অভিশাপ আসেনা আমার মনে।

অস্ত-রবির তমোঘন ক্ষণে এ আমার সান্ত্বনা
তাঁহারে দেখিয়া ধস্ত যাঁহারি আমি তারি এক-জনা।
তাঁর ভাবে যবে ভাসিল ভুবন—প্রেমগঙ্গার বানে
আমিও তখন ছিন্ন ধরণীতে—তাকায়ে সে মুখপানে।

মৃত্যু অমৃত করে দান

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

সেদিন সহসা-সুপ্রভাত মাহুঘের অন্তরে যে আকুল আর্দ্রনাদ হস্তিনার প্রান্তরে ধ্বনিত হ'ল তা রাজধানীর সীমা ছাড়িয়ে, দেশের সীমা ছাড়িয়ে, মহাদেশের সীমা ছাড়িয়ে সারা জগতে ছড়িয়ে পড়ল। ভারতের বেদনা বিশ্ব-বেদনায় রূপান্তরিত হ'ল।

গান্ধীজীর বিচ্ছেদে বিমূঢ় হয়ে পড়েছিলাম, ক্রমে সেই আচ্ছন্ন ভাব সেই বিমূঢ়তা ধীরে ধীরে অপসৃত হচ্ছে। আজ আমরা বুঝতে পারছি আত্মার মৃত্যু নাই, মহাত্মা অমর। দেশের গণ্ডী, কালের গণ্ডী পার হয়ে তাঁর প্রেরণা বিশ্বমানবকে উদ্ধৃত্ত করবে।

গান্ধীজী কি শুধু ব্যক্তি-বিশেষ? তা হলে সারা পৃথিবীর লোক এমন করে সাড়া দিত না।

মহাত্মার সাধনা মুক্তির সাধনা। কিন্তু মোক্ষের সাধনা নয়।

তিনি জনসাধারণের মধ্যে এক জন নন, তিনিই জন-সাধারণ। চল্লিশ কোটি লোকের সঙ্গে তিনি নিজে একীভূত করেছিলেন। জনগণ হতে তিনি অনন্ত। এই তাঁর প্রধান বৈশিষ্ট্য।

জনগণের নানা ধর্ম, নানা ভাষা, বিভিন্ন আচার। তবু তারা ভারতীয়, এত বিভেদের মধ্যেও তারা এক। সেই এক, সেই ভারতের জনগণ মহাত্মার মধ্যে মূর্ত হয়েছিল। তাই মহাত্মা মূর্ত ভারতবর্ষ, ভারতের জনসাধারণের প্রতীক।

ভাষা জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সর্বসাধারণকে নিজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতেন বলেই হিন্দু-মুসলমান শিখ-খ্রীষ্টানের কোন প্রভেদ তাঁর কাছে ছিল না। সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘিষ্ঠ তাঁর কাছে এক হয়ে গিয়েছিল। নানা দ্বিধা, বিভিন্ন ভাব অন্তরে উদ্ভিত হলেও মাহুঘের মন যেমন এক, গান্ধীজীর নিকটেও বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে জনসাধারণ তেমন এক। সেই জনসাধারণ যা মৃত্যু ভাবে আত্ম-অগোচরে অন্তর্ভুক্ত করত মহাত্মা তা সচেতন ভাবে স্পষ্টভাবে পরিস্ফুটভাবে অন্তর্ভুক্ত করতেন। তাই তাঁর লবণ-আন্দোলন। তাই তাঁর অহিংস সত্যগ্রহ। তাই তিনি রাউণ্ড টেবল কনফারেন্সে ভারতবর্ষের একক প্রতিনিধি হয়েছিলেন।

যিনি জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা আনন্দ-বেদনা আপনার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে ছন্দে ব্যক্ত করেন তিনি মহাকবি। যিনি তা কর্মে প্রকাশ করেন তিনি মহামানব। গান্ধীজী মহামানব।

কবি বলে গেছেন, “এই সব মৃত্যু মূক শব্দ মুখে দিতে হবে ভাষা।” কবি ভাষা দিয়েছিলেন, সে অন্তরীকের ভাষা, স্বপ্ন অন্তর্ভুক্তির ভাষা। মহাত্মা ভাষা দিলেন, তা কর্মজগতের ভাষা; মহাত্মার ভাষা জনসাধারণের প্রতিদিনের ভাষা। সঙ্গে সঙ্গে সেই সব প্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বৃকে বিপুল আশা ধ্বনিত হয়ে উঠল।

আমরা স্বাধীনতা-আন্দোলন করেছি—শ্রেণীবিশেষে, বিচ্ছিন্ন

ভাবে। মহাত্মার আন্দোলন সর্বসাধারণকে নিয়ে। সকলের সহযোগে ব'লে অ-সহযোগ আন্দোলন এত বিপুল হয়ে উঠেছিল এবং ভারতবর্ষ সাধারণভাবে হিংসাহীন বলেই সত্যগ্রহ-আন্দোলন অহিংস। হিংসায় উন্নত পৃথিবীতে ভারতবর্ষ চিরদিন হিংসা-বিরত থাকতে চেয়েছে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাজা—সম্রাট অশোক তাই, স্থানের উপর নয়, মাহুঘের মনের উপর সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিলেন। তাই মহাত্মা-প্রবর্তিত মুক্তির সংগ্রামও অহিংস।

শক্তি দু-প্রকার। দুঃখ দেবার শক্তিকে আমরা সহজেই চিনতে পারি। সহনশীলতার মধ্যে যে অসীম শক্তি নিহিত আছে তা আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। জগতের দুই জাতির লোক এই দুই ধরনের শক্তির অধিকারী। পাশ্চাত্য জাতি আক্রমণাত্মক প্রভুত্ব-শক্তির সাধনা করেছে। ভারতবর্ষ সহন-শক্তির ভাণ্ডার। অপূর্বপরিচিত আণবিক শক্তির মত এই বিপুল সঞ্চিত-শক্তিকে জাগাতে পারলে অসাধ্য-সাধন করতে পারা যায়। গান্ধীজী ভারতবর্ষের সেই বিশাল সূক্ষ্ম-শক্তিকে জাগ্রত প্রেরিত করতে পেরেছিলেন। সেই শক্তির আলোড়নে শিথিল-ভিত্তি সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ল।

ভারতবর্ষের জ্ঞানের মধ্যে একটি কথা স্পষ্ট হয়ে আছে তা এই—ব্যবহারিক জগতে কর্ম করতে হবে, কারণ কর্ম ভিন্ন আমাদের গতি নাই, তৎসত্ত্বেও প্রকৃত উপলব্ধিতে জগৎ মায়। মাত্র। সত্যগ্রহ, অসহযোগ এবং আণবিক প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে মহাত্মা এই সত্যই আমাদের মনে প্রতিভাসিত করেছেন যে বিদেশীর শাসন একান্ত মায়, সেই মিথ্যা আমাদের জাতির উপর প্রতিষ্ঠিত, সহযোগিতার অপসারণে সেই অসত্য-সাম্রাজ্য-প্রভাত-কুহেলিকার মত অন্তর্হিত হবে।

প্রথম মহাযুদ্ধে যার আরম্ভ এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যার শেষ সেই নিবিড় অন্ধকার-যুগের নিকষকৃষ্ণ পটভূমিকায় নৈরাজ্য-গীড়িত মানবের আর্ত হৃদয়ে মহাত্মার অহিংসার বাঁতা অমৃত-বর্ষিকার উজ্জ্বল আলোক ফুটিয়ে তুলেছে।

বঙ্কিমচন্দ্র মাতাকে বন্দনা করতে শিখিয়েছেন, গান্ধীজী শিখিয়েছেন, বন্দনা করতে হলে অন্তরকে শুদ্ধ শুচি নির্মল হিংসাহীন অস্থায়ীশূন্য করতে হবে। একদা বাংলার এক সন্ন্যাসী শিখিয়েছিলেন ছুৎমার্গ পরিহার করে দরিদ্রনারায়ণের সেবার মধ্যেই আমাদের সার্থকতা, গান্ধীজী সেই সেবাধর্মের বিরাট যে বাধা অস্পৃশ্যতা তাই দূর করতে আপনার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করেছিলেন।

সকল বিবাদের অবসান হোক। সকল দ্বন্দ্ব দূর হোক। মহাত্মার মধ্যে মুক্ত ভারতবর্ষের মহান আত্মাকে প্রণাম করি। সমস্ত শ্রানিমা এবং শ্রানি বিধৌত করে অক্ষর-অক্ষরকে উজ্জ্বল বিশুদ্ধ করুক। মহাত্মার আদর্শ জয়যুক্ত হোক ও জয়তু গান্ধীজী। মৃত্যু অমৃত করে দান।

বিমানে ভূ-প্রদক্ষিণ

শ্রীবিনয়ভূষণ দাসগুপ্ত

টেনেসি উপত্যকা

১১ই ডিসেম্বর ২৫শে অগ্রহায়ণ বুধবার প্রত্যুষে ওয়াশিংটন বিমান ঘাটিতে পৌঁছলাম। পৌনে ন'টায় বিমান উড়িল। বিমানটির দুইট ইঞ্জিন, ২৪টি আসন। পথে তিনটি ষ্টেশন : লিঙ্কবার্গ, রোয়ানোকে ও জনসন্ সিটি। কুয়াশার জ্বল বিমান শেষেরটিতে নামিল না। নীচে শুধু জনবসতি-বিরল সীমাহীন প্রান্তর। ফসল বিশেষ দৃষ্টিগোচর হইল না। ক্রমশঃ লাল মাটির দেশ ও ছোট ছোট দু-একটা পাছাড় দেখা গেল। বেলা ১২টা ৪৯ মিনিটে নক্সভিল ষ্টেশনে অবতরণ করিলাম। চারিদিকে মাঠ ধু ধু করিতেছে। সেখান হইতে নক্সভিল শহর ১২ মাইল। ট্যাক্সিযোগে নগরে পৌঁছলাম। এখানে টেনেসি উপত্যকা কর্তৃপক্ষের প্রধান আপিস। হোটেলের গিয়া মধ্যাহ্নভোজন সমাপনান্তে টেলিফোনযোগে আমার আগমনবার্তা জ্ঞাপন করিয়া আপিসে উপনীত হইলাম। সেখানে সাদরে গৃহীত হইলাম।

টেনেসি উপত্যকার ভূমি অল্পবর্ষ। বঙ্গুর পর্বত-সঙ্কুল দেশ। মাটি লাল। দো-ফসলী জমি নাই বলিলেই হয়। ভূট্টা প্রধান ফসল। চাষ পশুদ্বারাই হয়। গরুগুলি ক্ষীণ। জনবসতি বিরল। ডিসেম্বর হইতে এপ্রিল পর্য্যন্ত বর্ষাকাল। বার্ষিক বারিপাত প্রায় ৬০ ইঞ্চি। ফসলের পক্ষে বারিপাত প্রচুর। মেঘ কালবর্ষী। জলসেচের দরকার নাই।

দুই শতাধিক বর্ষ পূর্বে যখন ইউরোপীয় জাতি এদেশে প্রথম বসতি স্থাপন করে তখন এ দেশের জমি উর্বর ছিল। জমির পর জমি লাঙ্গলের নীচে আসিল। জঙ্গল কাটিয়া সাক্ষ করা হইল। ভবিষ্যৎ না ভাবিয়া জমির বেহিসাবী ব্যবহার চলিতে লাগিল। ক্রমশঃ টেনেসি নদীতে বহা দেখা দিল। বহায় দেশ ভাসিয়া যাইত। জমির উপরের মাটি বহায় ধুইয়া গেল। বহার জলে মাটি কাটিয়া খাল হইয়া গেল। অনেক জমি চাষের অল্পযুক্ত হইল। দেশ ব্যাপিয়া অল্পবর্ষতার সমস্তা দেখা দিল। যে সব জমিতে সোনা ফলিত তাহাদের এখন নিজ দেহের নগ্নতা ঢাকিবার মত ঘাস জমাইবারও ক্ষমতা রহিল না। নদী বর্ষাকালে বহাশ্রাবিত হইত—গ্রীষ্মকালে শুকাইয়া যাইতে লাগিল। নদীপথে যানবাহনের চলাচল বন্ধ হইয়া গেল। দেশ সর্বতোভাবে দুরিদ্ভোগের সম্মুখীন হইল।

তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলিতেছে। সরকার আলাবামা রাষ্ট্রের মাসুল শোলস নামক স্থানে একটি বারুদের কারখানা স্থাপন করেন। নিকটবর্তী টেনেসি নদীতে একটি বাঁধ নির্মাণ-পূর্বক বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করিয়া এই কারখানা চালাইবার

সিদ্ধান্ত করা হয়। বাঁধ নির্মাণকার্য ১৯১৮ সনে আরম্ভ হইয়া ১৯২৪ সনে শেষ হয়। তখন যুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে। কাজেই কারখানা ও বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন গৃহ একেজো পড়িয়া রহিল। এগুলিকে বিক্রয় করিবার চেষ্টা হইল। কিন্তু উচিত মূল্যের খরিদার জুটিল না। তখন সেনেটের নরিস প্রমুখ কতিপয় দূরদর্শী ব্যক্তি একটি স্বতন্ত্র কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে ইহা পরিচালিত করিবার প্রস্তাব করিলেন। প্রস্তাবিত কর্তৃপক্ষ এই কারখানা ও বাঁধের ভার লইবেন, নদীতে প্রয়োজনমত আরও বাঁধ তৈরী করাইবেন এবং তদ্বারা বহাশাসন, নদীর নাব্যতা সম্পাদন ও বিদ্যুৎ উৎপাদন করিয়া টেনেসি উপত্যকার সর্বতোমুখী উন্নতি সাধন করিবেন। এই কর্তৃপক্ষ সরকারের তত্ত্বাবধানে স্বতন্ত্র ভাবে জনস্বার্থে কাজ করিবেন; লাভের উদ্দেশ্যে কোন কাজ করিবেন না। ১৯৩৩ সনে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের চেষ্টায় 'টেনেসি উপত্যকা কার্যপরিচালনা আইন' পাস হয়। আইনে উক্ত সংসদ প্রতিষ্ঠার নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যগুলি লিপিবদ্ধ আছে; যথা (১) টেনেসি নদীর নাব্যতাসাধন ও বহাশাসন; (২) বন উৎপাদন এবং যে সমস্ত জমি কৃষির অল্পযুক্ত হইতে চলিয়াছে সেগুলির সন্ধ্যবহার; (৩) টেনেসি উপত্যকার কৃষি ও শিল্পের উন্নতি সাধন; এবং (৪) আলাবামায় মাসুল শোলসের বারুদের কারখানার ভার লইয়া দেশরক্ষা বিষয়ে যথোচিত সাহায্য দান।

১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের পর ১৩ বৎসর অতীত হইয়াছে। টেনেসি উপত্যকা কর্তৃপক্ষ বাঁধের পর বাঁধ তৈরী করাইয়াছেন। বর্তমানে নদীতে ২৭টি বড় বাঁধ আছে। ৯টি টেনেসি নদীতে; ১৮টি টেনেসির উপনদীসমূহে। প্রত্যেক বাঁধের পশ্চাতে বৃহৎ সরোবর এবং সম্মুখে নীচে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র নির্মিত হইয়াছে। এই কেন্দ্রসমূহে টারবাইনের বিপুল চক্রের অবিরত আবর্তনে প্রচুর বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন হইতেছে। বর্ষার জল যখন প্রবল বেগে পাছাড় হইতে নামে তখন বাঁধে বাধা পাইয়া পিছনের সরোবরে গিয়া পড়ে। বিপুল জলরাশি তখন উচ্চাম মত্ততা পরিত্যাগ করিয়া সরোবরের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। সারা বছর ধরিয়া জলপ্রবাহ ধীরে ধীরে বাঁধের নীচে দিয়া অপ্রতিহত গতিতে নামিয়া আসে এবং তত্রত্য পাওয়ার হাউসের বিরাটকায় লৌহচক্রকে সজোরে ঘুরাইয়া দিয়া ফেনারিত অবস্থায় ফুসিয়া ফুলিয়া সগর্জনে নদী-খাদে চলিয়া যায়। শক্তি-গৃহের বাহিরেও জল নামিবার একটি পথ থাকে। বেশী জল নীচে পাঠাইবার প্রয়োজন হইলে এই পথটি ব্যবহৃত হয়। এইরূপ পাছাড়ের উপর হইতে নীচে পর্য্যন্ত নদীর ঘাটিতে

বাটিতে বাঁধ। সমস্ত বাঁধ একটি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাবিনীত ব্যবস্থায় হইতেছে। যত জলই পাওয়া হইতে নাযুক না কেন, তাহাদিগকে বিভিন্ন সরোবরে আটকাইয়া রাখিয়া প্রয়োজন মত বিলি করা হইতেছে। রেলের সাহায্যে যেমন ইচ্ছামত যথাস্থানে ও যথাকালে মাল পাঠান যায় এই বাঁধগুলির সাহায্যে তেমনই জলরাশিকে ইচ্ছানুসারে গতিতে যথাস্থানে পাঠাইয়া দেওয়া হইতেছে। টেনেসির বৃহত্তম বাঁধ অপেক্ষাও বড় বাঁধ এই দেশেই আছে। কিন্তু ৪০,০০০ বর্গ মাইল পরিমিত একটি সমগ্র উপত্যকার সমস্ত জলরাশিকে একটি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থার অধীনে নানাবিধ জনকল্যাণে যুগপৎ নিয়োজিত করিবার উদ্যোগ পৃথিবীতে আর নাই।

উপত্যকা-কর্তৃপক্ষের কার্যাবলীকে সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যথা—

- (১) শক্তি উৎপাদন, নদীর নাব্যতা সাধন এবং বন্যাশাসন,
- (২) রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদন,
- (৩) আঞ্চলিক উন্নতি বিধান।

প্রথম শ্রেণীর কার্যাবলী সত্যই বিশ্বয়কর। ইহার কল্পনা-মহিমা, সম্পাদনচাতুর্য, কল্যাণপ্রসূত্ব এবং ব্যাপকত্ব যুগপৎ চিত্তকে অভিভূত করে। যে জলরাশি জমির সার ভাসাইয়া লইয়া সমুদ্রে ফেলিতেছিল এবং বন্যার সৃষ্টি করিয়া দেশকে ধ্বংসের পথে লইয়া চলিয়াছিল আজ তাহা সম্পূর্ণরূপে জনকল্যাণে নিয়োজিত।

১৯৪৫ সনে উপত্যকা-কর্তৃপক্ষ বার শত কোটি কিলোওয়াট ঘণ্টা পরিমিত বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন করেন। অর্থাৎ তাহাদের মাসিক উৎপাদনের পরিমাণ ছিল এক শত কোটি কিলো ওয়াট ঘণ্টা। পৃথিবীর কোন প্রতিষ্ঠানই একক এত বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন করে না।

টেনেসি নদী কেটাকি রাষ্ট্রের পাছুকা নামক স্থানে মিসিসিপি নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। পাছুকা হইতে নিক্সভিল নদীপথে ৬৫০ মাইল। টেনেসি নদীর এই ৬৫০ মাইল খাদে বারমাস নয় ফুট গভীর জল রক্ষা করা উপত্যকা-কর্তৃপক্ষের একটি বিশেষ দায়িত্ব। এই দীর্ঘ পথে বারমাস পীয়ার চলাচলের ব্যবস্থা হওয়ায় বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা হইতেছে।

উপত্যকা-কর্তৃপক্ষ যে সরোবরমালা নির্মাণ করিয়াছেন তাহার জলধারণশক্তি জাম্বুয়ারী মাসে এক কোটি কুড়ি লক্ষ একর-ফুট এবং এপ্রিল মাসে এক কোটি পাঁচ লক্ষ একর-ফুট। এই সরোবরশ্রেণীর দ্বারা টেনেসি রাষ্ট্রের ছাতাভাগ অঞ্চলের বৃহত্তম-বন্যাজলের উচ্চতা অন্ততঃ ১৬ ফুট নামাইয়া দেওয়া সম্ভব। এখন এই অঞ্চলে বন্যা অসম্ভব।

পূর্বেই বলা হইয়াছে মাসুল শোলসের কেমিক্যাল কারখানা লইয়াই উপত্যকা-কর্তৃপক্ষ কাজ আরম্ভ করেন। বর্তমানে এখানে যে সমস্ত রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে তন্মধ্যে ফসফরাস, এমোনিয়াম নাইট্রেট ও ক্যালসিয়াম

কারবাইড প্রধান। উৎপন্ন রাসায়নিক দ্রব্যসমূহ সামরিক প্রয়োজন মিটাইয়া জমিতে সাররূপে ব্যবহারের জন্ত যথেষ্ট। ক্যালসিয়াম কারবাইড কৃত্রিম রবার-উৎপাদনেই ব্যবহৃত হয়।

আঞ্চলিক উন্নতি বিষয়েও উপত্যকা-কর্তৃপক্ষের প্রচেষ্টা বহুমুখী; যথা: (১) কৃষির উন্নয়ন, (২) বনের প্রসার ও উন্নতি, (৩) খনিজ সম্পদের ত্রীভুজ, (৪) বিশ্রাম ও আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা, (৫) জনস্বাস্থ্য, (৬) মাছধরা ও শিকারের ব্যবস্থা, (৭) ভূপৃষ্ঠের উচ্চতার তারতম্য নির্দেশক মানচিত্র নির্মাণ, (৮) বিশেষ গবেষণা।

হস্তশক্তি ভূমির উর্বরতা কিরূপে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা যায় সে বিষয়ে উপত্যকা-কর্তৃপক্ষের কার্য বিশেষ প্রাণসার। শাসন এবং বন প্রতিষ্ঠা পূর্বক ভূমিক্ষয় নিবারণ করিয়া, ফসলের পৌর্যপাধ্য নির্ণয় করিয়া, ভূমির ক্ষয়িত উপাদান যথাসম্ভব বাতাস হইতে আহরণ করিয়া, এবং হিসাব করিয়া জমির ব্যবহার করতঃ কর্তৃপক্ষ কৃষির যথেষ্ট উন্নতি বিধান করিয়াছেন। শুনিলাম জমির প্রয়োজনীয় যাবতীয় নাইট্রোজেন শুধু ফসলের পৌর্যপাধ্য দ্বারাই পাওয়া যায়। সারের মধ্যে শুধু ফসফরাসই ইহার ব্যবহার করেন। জনৈক কৃষি-বিশেষজ্ঞ আমাকে বলিলেন যে, ফসলের পৌর্যপাধ্য নির্ণয়ই যে ব্যয়িত নাইট্রোজেন পুনঃপ্রাপ্তির পক্ষে যথেষ্ট এ ধারণা তাহার প্রাচ্য দেশ হইতেই পাইয়াছিলেন।

উপত্যকা-কর্তৃপক্ষের যুদ্ধকালীন সাহায্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যখন শত্রুপক্ষ এবং মিত্রপক্ষের এরোপ্লেন নির্মাণের আপেক্ষিক দ্রুততার উপর যুদ্ধজয় সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছিল তখন উপত্যকা-কর্তৃপক্ষের চেষ্টায় উৎপন্ন অফুরন্ত বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যেই অসংখ্য এরোপ্লেন ক্ষিপ্ততার সহিত নির্মাণ করিয়া যুদ্ধের গতি ফিরাইয়া দেওয়া সম্ভব হইয়াছিল।

এখানে অফুরন্ত বিদ্যুৎশক্তি ছিল বলিয়াই টেনেসি রাষ্ট্রের ওকরিজ নামক স্থানে আণবিক গবেষণা সম্ভব হইয়াছিল। যে আণবিক বোমা জাপানে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল তাহা এই গবেষণারই ফল।

উপত্যকা-কর্তৃপক্ষের কর্মচারিগণ বিমানগৃহীত ছাত্রাচিত্র হইতে ইউরোপ ও অগ্রান্ত দেশের ভূমির উচ্চতা নির্দেশক মানচিত্র নির্মাণ করিয়া দেন। এই মানচিত্রগুলি আক্রমণ-পরিচালনায় বিশেষ সহায়ক হইয়াছিল।

ছাঁচে ঢালা বাড়ী তৈরীর কার্যে উপত্যকা-কর্তৃপক্ষের অভিজ্ঞতা যুদ্ধের সময় বিশেষ কাজে লাগিয়াছিল।

মাসুল শোলস-এ যুদ্ধের জন্ত প্রচুর রাসায়নিক দ্রব্য তৈরী হইয়াছিল। ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণের জন্ত ডি-ডি-টি ও অগ্রান্ত সরঞ্জাম উপত্যকা-কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে গৃহীত হইয়াছিল।

উপত্যকা-কর্তৃপক্ষকে অনেক দুর্গম-পাহাড় ও জঙ্গলের মধ্যে বাঁধ নির্মাণ করিতে হইয়াছে। সেজন্ত সেইসব স্থানে প্রথমেই

মজুরদের বসতি স্থাপনের ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে। এই উপ-লক্ষ্যেই তাহাদের হাঁচা চালা বাড়ী নির্মাণ এবং ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণের কার্যে বিশেষ মনোযোগ দিতে হইয়াছে।

উপত্যকা-কর্তৃপক্ষের উন্নতিমূলক কার্যাব্যবস্থাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কৃষি প্রভৃতির উন্নতির জন্ত কেন্দ্রীয় সরকার তথা রাষ্ট্রীয় সরকারের নানা বিভাগ বর্তমান। আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষ কদাপি তাহাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করেন নাই; সম্পূর্ণ সহযোগিতা করিয়াই কাজ চালাইয়াছেন। অথচ লোকে এখন নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারিয়াছে যে, সরকারী প্রচেষ্টা হইতে স্বতন্ত্র আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়াস অধিক ফলপ্রসূ।

সমস্ত জগতের উৎসুক দৃষ্টি বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানটির উপর নিবদ্ধ। বিভিন্ন দেশ হইতে ইঞ্জিনিয়ার, কৃষিক্ষপ্তা, একাউন্ট্যান্ট, অর্থনীতিবিদ, শাসনপরিচালক প্রভৃতি নানা শ্রেণীর বিশেষজ্ঞগণ ইহার কার্যপ্রণালী দেখিবার জন্ত নজরভিলে সমাগত হইতেছেন। আমাদের দামোদর উপত্যকা করপোরেশন ইহারই আদর্শে পরিকল্পিত হইয়াছে।

১২ই ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার—প্রাতরাশের পর বাহির হইয়া পড়িলাম। উপত্যকা-কর্তৃপক্ষের আপিসে দুইটি গ্রীক ভদ্র-লোকের সঙ্গে মিলিত হইলাম। তাহারা আমারই মত কর্তৃপক্ষের কার্যাবলী দর্শন-মানসে আসিয়াছেন। তাহাদের নাম মাইকেলিডিস ও পেট্রিয়াস। মাইকেলিডিস ইঞ্জিনিয়ার। পেট্রিয়াস আঞ্চিক, জলবিষয়ক অঙ্কে বিশেষজ্ঞ। আমরা ফণ্টানা বাঁধ দেখিতে যাইব। কর্তৃপক্ষ জনৈক তরুণ ইঞ্জিনিয়ারকে আমাদের সঙ্গে দিলেন। যুবকটি গাড়ী চালাইয়া আমাদের লইয়া চলিল।

সুন্দর মৃৎ রাস্তা। বিশাল প্রান্তরের মধ্য দিয়া চলিয়াছি। মাটি লাল। লোকালয় বিরল। দুই একটি গ্রাম্য নরনারী কচিং দৃষ্টিপথে পতিত হইতেছে। ছুপাশের ক্ষেত হইতে ভুট্টা কাটিয়া লওয়া হইয়াছে। শুকনা ভুট্টার ডাঁটা খাড়া হইয়া রহিয়াছে। কোন কোন ক্ষেত পুনরায় চাষ করা হইয়াছে। চাষে যন্ত্রশক্তির ব্যবহার দেখিলাম না। মাঝে মাঝে গরু বা ঘোড়া চরিয়া বেড়াইতেছে। শীতের প্রকোপ বেশী নয়। তাপ ৪০ ডিগ্রীর কাড়াকাছি হইবে। চমৎকার রোদ উঠিয়াছে। মাঝে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গেল। মনে হইতেছে যেন সাঁওতাল পরগণা বা ভুবনেশ্বরের প্রান্তরের মধ্য দিয়া চলিয়াছি। মেরিভিল ও এলকোয়া নামক দুইটি ছোট শহর অতিক্রম করিলাম। শহর দুইটিতে ‘এলুমিনিয়াম কোম্পানী’ অব আমেরিকা’র কর্মচারিগণের বসতি বিদ্যমান। কোম্পানীর নামের শব্দচতুষ্টয়ের প্রথমংশ সন্নিবেশে দ্বিতীয় শহরটির নামকরণ হইয়াছে। ক্রমশঃ জমি উচু হইতে শুরু করিল। পাহাড়ে উঠিতে লাগিলাম। ছোট টেনেসি নদীর পাশ দিয়া চলিয়াছি—দুইদিকে পাহাড়। রাস্তার পাশ দিয়া নদী নৃত্যচ্ছন্দে

চলিয়াছে। পথে কলডার উড বাঁধ, চিওয়া হ্রদ এবং সেক্টিনেলের একটি পাওয়ার হাউস দৃষ্টিপথে পতিত হইল। টেনেসি রাষ্ট্রের সীমা অতিক্রম করিয়া নর্থ ক্যারোলাইন রাষ্ট্রের মধ্যে পড়িলাম। চারিদিকে পাহাড়। এ অঞ্চলের সর্বোচ্চ পাহাড়ের উচ্চতা নাকি প্রায় ৬০০০ ফুট। তরঙ্গায়িত পাহাড় ভেদ করিয়া চলিয়াছি। প্রায় দু’হাজার ফুট উচ্চ ফাণ্টানা বাঁধ। ফাণ্টানা বাঁধ নজরভিল হইতে ৭০ মাইল। প্রায় দ্বিপ্রহরে তথায় উপনীত হইলাম। ছোট নদীটির উপর একটি ছোট সেতু। সেতুটি সম্পূর্ণ খোলা, ঈষৎ বক্র। প্রায় ১০০০ মাইল ব্যাসার্ধের স্বতপরিধির মত ইহার বক্রতা। এই বক্রতাটুকু সেতুটিকে বেশ সুদৃশ্য করিয়াছে। এপারে উচ্চ পাহাড়। ওপারে পাহাড়ের গায়ে ইঞ্জিনিয়ারগণের আপিস। স্থানকার দুইজন ইঞ্জিনিয়ারের সহিত মিলিত হইলাম। বাঁধের কার্য শেষ হইয়া গিয়াছে। এখন সামান্য টুকটাকি কাজ চলিতেছে। বাঁধটি সম্পূর্ণ কংক্রিটের। ৪৮০ ফুট উচু অর্থাৎ মিশরের পিরামিডের সমান ইহার উচ্চতা। ইহার পিছনে সুবিশাল হ্রদ কাটানো হইয়াছে; সম্মুখে বিরাট পাওয়ার হাউসে সগর্জনে টারবাইন ঘুরিতেছে। স্থানীয় ইঞ্জিনিয়ারগণ প্রথমে চিত্র ও নক্সার সাহায্যে বাঁধের পরিকল্পনাটি আমাদের কাছে বুঝাইয়া দিলেন। কিরূপে এই পর্বতসঙ্কুল নির্জন অরণ্যময় প্রদেশকে ম্যালেরিয়ার কবলমুক্ত করা হইল; কিরূপে হাঁচা চালা সুন্দর সুন্দর বাড়ী আনিয়া বসান হইল; কিরূপে নানাবিধ সুবিধা ও আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থা করিয়া এখানে গ্রাম প্রতিষ্ঠা করা হইল; কিরূপে সেই গ্রামে মজুর ও ইঞ্জিনিয়ারগণের বসতি স্থাপন করা হইল; কিরূপে বাঁধের যাবতীয় উপকরণ এখানে আনিবার ব্যবস্থা করা হইল; স্থানীয় ইঞ্জিনিয়ারগণ এই সমস্ত বিষয় আমাদের কাছে বলিলেন। তারপর আমাদের কাছে পার্শ্ববর্তী সেই গ্রামে লইয়া গেলেন। হাঁচা চালা বাড়ীগুলি দেখিতে বেশ মনোরম। বাড়ীগুলির মধ্যে বাসোপযোগী সমস্ত ব্যবস্থাই আছে। বাড়ীগুলি এখন খালি পড়িয়া আছে। ভ্রমণকারিগণ যাহাতে এ জায়গার প্রতি আকৃষ্ট হয় সেজন্ত কর্তৃপক্ষ চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু এখনও সফল হন নাই। লোকালয় হইতে বহুদূরে এই নির্জন পর্বতময় স্থানে বাস করা আপাততঃ কাহারও মনঃপূত হইতেছে না। গত গ্রীষ্মকালে এক নবদম্পতি নাকি শিকাগো হইতে আসিয়া মাসাধিককাল এখানে অবস্থান করিয়াছিলেন।

গ্রামের কেফিটোরিয়াটি এখনও আছে। খাবার সাজাইয়া বিক্রয়কারিগণ বসিয়া আছেন। ক্রেতা নাই। এখানে আমরা মধ্যাহ্নভোজন সমাপন করিলাম। অল্প কোন ভোজনার্থী দেখিলাম না। আহার ভালই হইল। আহারান্তে বাঁধে উঠিলাম। স্থানীয় ইঞ্জিনিয়ারগণ সোৎসাহে আমাদের সঙ্গে তন্ন তন্ন করিয়া দেখাইতে লাগিলেন। এই জনবিরল-প্রদেশে আমাদের পাইয়া তাহাদের উৎসাহ ও আনন্দের সীমা নাই।

মাইকেলি ডিসের প্রাণে তাঁহাদের উৎসাহ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং আমারও বিষয়টি বুঝিবার অনেক সুবিধা হইল। মাইকেলি ডিস বেশ ইংরেজী বলেন। পেট্রিয়াস ভাল ইংরেজী বলিতে পারেন না, কাজেই তাঁহাকে প্রায়ই নীরব থাকিতে হইতেছে। বাঁধের উপর দর্শকগণের বসিবার জন্ত একটি সুন্দর ঘর আছে। সেটি গোল্ডেন বাক বা স্বর্ণাভ মন্মথের নির্মিত। এ প্রদেশে বহুবিধ মন্মথ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে স্বর্ণাভ মন্মথই সর্বাপেক্ষা সুদৃশ্য। এই কার্যে মন্মথের ব্যবহার শুধু ধনকুবেরের দেশ আমেরিকায়ই সম্ভব। বাঁধের রক্ষী সোৎসাহে তাঁহার বইয়ে আমাদের সহ লইয়া গেল। কলিকাতা হইতে দর্শক আসিয়াছে শুনিয়া তাহার উৎসাহ দ্বিগুণ হইয়াছে। দিনান্তে ক্লাস্ত দেহে হোটেলের ফিরিলাম।

পরদিন শুক্রবার সকালে উপত্যকা-কর্তৃপক্ষের আপিসে পুনরায় হাজির হইলাম। এই দিনের মধ্যে আমার এখানকার কাজ শেষ করিতে হইবে। কাজেই সমস্ত বিভাগ দেখা সম্ভব নয়। বাহিয়া বাহিয়া কয়েকটি বিভাগের কার্য দেখিলাম। প্রথমে বাজেট বিভাগের সি, ডব্লিউ, ফোস মহাশয়ের সঙ্গে ইঁহাদের বাজেট সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করিলাম। পরে চলচ্চিত্রে কর্তৃপক্ষের যাবতীয় কার্যকলাপ ইঁহারা আমাকে দেখাইলেন। মধ্যাহ্নভোজনের পর হিসাব বিভাগ, বাণিজ্য বিভাগ, কৃষি ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ এবং ফুড ড্রিজিং বা খাদ্য জমান বিভাগের কার্যাবলী দেখিলাম। হিসাব বিভাগে জনৈক মাদ্রাজী ভদ্রলোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। ইনি মাদ্রাজের একটি হাইড্রোলেক্টিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। ক্রমে বিদ্যুৎসরবরাহের দাম নির্ণয় করা হয় তাহা দেখিবার জন্ত ইনি এখানে আসিয়া মাসাধিককাল আছেন। ভদ্রলোকটি আবাসবয়সী, এঁদের নিয়মাবলী সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা জন্মিয়াছে দেখিলাম। বৈজ্ঞানিক শক্তিকে সুলভ করিয়া কৃষকের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিকল্পে নিয়োগ করিবার জন্ত ইঁহাদের অক্লান্ত প্রচেষ্টা দেখিলে সত্যই বিস্মিত হইতে হয়। যে কয়েকটি ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হইল সকলেই অমায়িক, সকলেই তাঁহাদের কার্যাবলী আমাকে বুঝাইবার জন্ত উৎসুক। ইঁহাদের মধ্যে কৃষি-ইঞ্জিনিয়ার এল, এন, বেকার হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ জানিবার জন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। তাঁহাকে স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো বক্তৃতা ও সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের “হিন্দু ভিউ অব লাইফ” পড়িতে পরামর্শ দিলাম।

পরদিন শনিবার। আপিস আদালত ছুটি। হোটেলের বসিয়া কিছু কাজ করিলাম। পরে শহর দর্শনে, বাহির হইলাম।

শহরের মধ্য দিয়া টেনেসি নদী প্রবাহিত। তাহারই অনতিদূরে আমার হোটেল। হোটেলটির নাম এণ্ড্রু জনসন। এণ্ড্রু জনসন এব্রাহাম লিঙ্কনের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট। তিনি টেনেসি রাষ্ট্রের অধিবাসী ছিলেন। হোটেলটি ১৭১৮ তলা

হইবে। আমি ১৬ তলায় ছিলাম। শহরটি ছোট। প্রায় ৭৫ হাজার লোকের বাস। ১৭১৮ তলা বৃত্তী আর নাই। ১৬ তলার উপরে বসিয়া আমি নদীর তীর দিয়া বহুদূর বিস্তৃত শহরের সুবিশিষ্ট সৌধশ্রেণী দেখিতাম। সমস্ত আমেরিকান শহরের মত এটিও সরল ও সমান্তরাল রাজপথশ্রেণী দ্বারা পরিশোভিত। হোটেলের সম্মুখ দিয়া যে রাস্তাটি গিয়াছে তাহাই শহরের বড় রাস্তা। দু'ধারে শ্রেণীবদ্ধ দোকান। বড়দিন আগতপ্রায়। তত্পলক্ষে দোকান ও রাস্তা সুসজ্জিত। আলো ও রঙীন কাগজ প্রভৃতির সাহায্যে সুন্দর সজ্জা রচনা করা হইয়াছে। করণাবতার রাস্তা ক্রমের শ্রুতল ছবি সর্বত্র। সান্তা ক্লজ সাজিয়া কেহ বড়দিনে ছেলেপেলেদের উপহার দিবার জন্ত অর্থ সংগ্রহ করিতেছে। ছেলেবুড়ো সকলেই বড়দিনে কিছু কিছু উপহার পাইবে। সর্বত্র আশা ও আনন্দের আভাস।

এখানে ভার্জিনিয়া তামাকের একটি বাজার আছে। কৃষকগণ স্ব স্ব তামাক আনিয়া এখানে নিলামে বিক্রয় করে। সিগারেট প্রস্তুতকারকগণ আসিয়া এই তামাক কিনিয়া লইয়া যায়। এখানে প্রচুর ও রকমারি খাদ্যদ্রব্য পাওয়া যায়।

১৩ সংখ্যাটির প্রতি ইঁহাদের কুসংস্কার নানা ব্যাপারে পরিস্ফুট। হোটেলের ১৩ নম্বরের কোন তলা নাই। বারোয় পরেই চোচ্চ। ১৩ তলায় থাকিলে নাকি ভাগ্যহানি হয়।

ঐদিন রাস্তায় অপর একজন ভারতীয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। ইনি যুক্তপ্রদেশের অধিবাসী। দিল্লীর কৃষিগবেষণাগারে কাজ করেন। কৃষি-গবেষণা সম্বন্ধে ওয়াকিব্বাল হইবার জন্ত এদেশে কয়েকমাস যাবৎ সফর করিতেছেন। ইঁহার বয়স চল্লিশের বেশী হইবে।

পর দিবস রবিবার নম্রভিল ত্যাগ করিয়া শিকাগো রওনা হইব। দুপুরে প্লেন ছাড়ে। কোম্পানীর গাড়ী হোটেল হইতে আমাকে তুলিয়া লইয়া যাইবে। প্রস্তুত হইয়া লাউঞ্জে বসিয়া আছি। সেখানে মাইকেলি ডিস ও পেট্রিয়াসের সঙ্গে অনেক কথা হইল। প্রাচীন কালে সভ্যতার উচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত গ্রীস ও ভারতবর্ষ এই দুই দেশের যোগাযোগের কাহিনী জানিবার জন্ত ইঁহাদের আগ্রহ লক্ষ্য করিলাম। আমাদের তারিখযুক্ত ইতিহাস যে আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণের কাল হইতে আরম্ভ হইয়াছে এবং গ্রীকদূত মেগাস্থিনিসের ভ্রমণবৃত্তান্তই যে তৎকালীন ভারতীয় সমাজ সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা প্রামাণিক গ্রন্থ ইহা শুনিয়া তাঁহাদের আগ্রহ বৃদ্ধিত হইল। কথোপকথনের মধ্যে অলক্ষিতে ইঁহাদের সঙ্গে আমার চিন্তার যোগ স্থাপিত হইয়া গেল।

গাড়ী আসিয়া আমাকে তুলিয়া লইল। গাড়ীতে আর একটি আমেরিকান ভদ্রলোক অথ একটি হোটেল হইতে উঠিলেন। উভয়ে সীমাহীন প্রান্তরের মধ্য দিয়া বিমান ষাটের দিকে চলিয়াছি। ভদ্রলোকটি মধ্যাহ্নভোজনার পর

একটু আলাপেচ্ছ হইয়া উঠিয়াছেন। নানা বিষয়ে কথা বলিয়া চলিয়াছেন, মাঝে মাঝে বলিতেছেন—“আমি বেশী কথা বলিয়া আপনকার বিরক্তি উৎপাদন করিতেছি না তো?” হৃদয়ের রোজ। আকাশ পরিষ্কার। তাপ ৪০ ডিগ্রির কাছাকাছি। ভদ্রলোকটি বলিলেন—“শীতকালে বসন্তের আবির্ভাব হইয়াছে।” উপত্যকা-কর্তৃপক্ষের কথা উঠিল। ভদ্রলোকটি বলিলেন—“পূর্বের লোকে বলিত যে উপত্যকা-কর্তৃপক্ষ পাগলের মত বিদ্যুৎ উৎপাদন করিয়াই চলিয়াছেন। এত

বিদ্যুৎ কোন্ কাজে লাগিবে? যুদ্ধ আসিল। সব বিদ্যুৎ কাজে লাগিয়া গেল। কিন্তু উপত্যকা-কর্তৃপক্ষ এখন এক আত্মঘাতী নীতি অবলম্বন করিয়াছেন। এই বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে ওকরিজে আণবিক গবেষণার ব্যবস্থা করিয়াছেন। যে দিন আণবিক শক্তি সুপ্রতিষ্ঠ হইবে সেদিন তো বৈদ্যুতিক শক্তির দিন ফুরাইবে। আণবিক গবেষণার ব্যবস্থা করিয়া উপত্যকা-কর্তৃপক্ষ নিজেদের মৃত্যুই ডাকিয়া আনিতেছেন।”

ভারতবর্ষে মজুর ধর্মঘট

শ্রীদীনবন্ধু দাস

১৯৪৬ সালে ভারতবর্ষে মজুর ধর্মঘটের বেজায় হিড়িক পড়িয়াছিল। যুদ্ধকালে মূল্যবৃদ্ধির দরুন জীবনযাত্রার ব্যয় অত্যধিক বাড়িয়া গিয়াছিল, কিন্তু মজুরের মজুরি অথবা ভাতা সেই পরিমাণে বাড়ে নাই। যত দিন যুদ্ধ চলিয়াছিল তত দিন মানুষের মনে কেমন যেন একটা ধারণা ছিল যে, যতই হোক মূল্যবৃদ্ধিটা সাময়িক, যুদ্ধ থামিয়া গেলে পরে মূল্যও পুনরায় কমিয়া যাইবে। এই ধারণার কোন সত্য ভিত্তি ছিল না। ১৯৪৫ সালের আগষ্ট মাসে যুদ্ধ শেষ হইয়া গেল—অতঃপর দিনের পর দিন যাইতে লাগিল, পুরাতন বৎসর শেষ হইয়া নূতন বৎসর আরম্ভ হইল, কিন্তু মূল্য কমিবার কোন লক্ষণই দেখা গেল না; বরং মূল্য আরও বাড়িয়া চলিল।

১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসকে ১০০ ধরিলে বোম্বাই শহরে মজুরশ্রেণীর জীবনযাত্রার ব্যয় ১৯৪৫ সালে ছিল ২২৪—সেই স্থলে ১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে ব্যয়স্বতী বাড়িয়া ২৩৫ হয়। জুন মাসে হয় ২৪৭, অতঃপর সেপ্টেম্বরে ২৫৭ এবং ডিসেম্বরে ২৬৬ হইল।

যাহারা এতদিন হৃদয়ের আশায় যুদ্ধশক্তির অপেক্ষা করিতেছিল তাহারা নিরাশ হইল। মজুরেরা আরও বেতন বৃদ্ধির দাবি করিল। কোন কোন ক্ষেত্রে মালিকের নিকট হইতে যৎসামান্য পাইল; ক্ষেত্রবিশেষে তাহাও পাইল না। পেটে ক্ষুধা রহিয়া গেল। তা ছাড়া, যুদ্ধের মধ্যে ছুনিয়ার বিভিন্ন রাজ্য-সাম্রাজ্যের ভাঙা-গড়ার বিচিত্র লীলা প্রত্যক্ষ করিয়া মজুরেরা ইতিমধ্যে অনেক-

খানি চেতনা লাভ করিয়াছিল, তাহারা নিজেদের সম্মুখ সম্মুখে অনেক বেশী প্রত্যয়শীল হইল, নিজেদের মানুষ বলিয়া ভাবিতে শিখিল এবং মালিকের নিকট হইতে তদনুসঙ্গ ব্যবহার পাইবার আশা পোষণ করিতে লাগিল। যেখানেই তাহাদের সেই নবলব্ধ আত্মমর্যাদাজ্ঞানে আঘাত পড়িয়াছে, সেইখানেই তাহারা পাল্টা আঘাত দিয়া নিজেদের দাবি ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছে। এই দিক দিয়া দেখিতে গেলে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী প্রথম শক্তির বৎসর ১৯৪৬ সাল মজুর আন্দোলনের ইতিহাসে বিশেষ স্মরণীয়। [১৯৪৬ সালে ভারতে মজুর ধর্মঘট সম্পর্কিত বিস্তৃত তথ্যাবলী ভারত-সরকারের মজুরদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত “ইণ্ডিয়ান লেবার গেজেট” (ভারতীয় মজুর বিবরণী) নামক মাসিক পত্রিকার ১৯৪৭ সালের জুলাই সংখ্যায় দেওয়া হইয়াছে।]

ধর্মঘট ও ধর্মঘটীদের সংখ্যা এবং ধর্মঘটজনিত ক্ষতি

১৯৪৬ সালে ব্রিটিশ ভারতে ১৬২৯টি ধর্মঘট হয়। '৩৯ সালে ৪০৬টি এবং '৪৫ সালে ৮২০টি ধর্মঘট হয়। অর্থাৎ '৪৬ সালে পূর্ববৎসরের দ্বিগুণ এবং '৩৯ সালের ৪ গুণ ধর্মঘট হয়।

'৪৬ সালে ১,৬২৯টি ধর্মঘটে মোট ১৯ লক্ষ ৬২ হাজার মজুর যোগ দিয়াছিল। পূর্ববৎসর ৭ লক্ষ ৪৮ হাজার মজুর ধর্মঘটে যোগ দেয়। পূর্ব বৎসরের তুলনায় এবংসর ২৫ গুণ বেশী মজুর ধর্মঘট করে।

এক জন মজুরের এক দিনের কাজকে $(1 \times 1 =) 1$ “জন-

বাসন্তী ঘাত

বিশুদ্ধ দুগ্ধজাত

টেলি:—বাসন্তী ঘি ফোন বি.বি. ৫৭৩৮ পো: বক্স ৬৮৩৬ কলি:

ঘি, সুগারমাচ্চেস, একস্পোটারস, ইম্পোর্টারস ও
জেনারেল অর্ডার সামগ্র্যারস্

প্রমথনাথ পাল এণ্ড সন্স

২/সি, রামকুমার বসন্ত লেন, কালকাতা—৭

রোজ” বলিয়া ধরিলে, '৪৬ সালে মজুর ধর্মঘটের ফলে ১ কোটি ২৭ লক্ষ “জন-রোজ” নষ্ট হইয়াছিল। পূর্ব বংসর নষ্ট হইয়াছিল ৪০ লক্ষ ৫৪ হাজার জন-রোজ। '৪৬ সালে পূর্ববংসর অপেক্ষা ৩৬ গুণ বেশী জন-রোজ নষ্ট হইয়াছিল।

যুক্তপূর্ব '৩৯ সালের তুলনায় '৪৬ সালে ধর্মঘটের সংখ্যা ৪ গুণ, ধর্মঘটীর সংখ্যা ৪৬ গুণ এবং জন-রোজ হিসাবে ক্ষতির পরিমাণ ২৬ গুণের কিছু বেশী হইয়াছিল।

'৪৬ সালের মার্চ মাস হইতে ধর্মঘটের সংখ্যা ও ব্যাপকতা বাড়িতে থাকে। জুলাই মাসে ধর্মঘটের হিড়িক চরমে উঠে। আগষ্ট মাসেও আবহাওয়া খুব গরম ছিল, অতঃপর ক্রমে ক্রমে হিড়িক কমিয়া যায়। '৪৬ সালের জুলাই মাসের ভারতবাসী ডাক ও তার বিভাগের কর্মচারীদের ধর্মঘট বিশেষ অরণীয় ঘটনা।

কোন শিল্পে কত ধর্মঘট হইয়াছিল

এবারে কোন শিল্পে কত ধর্মঘট হইয়াছিল, তাহার ফিরিস্তি দিতেছি।

সবচেয়ে বেশী ধর্মঘট হয় বয়ন-শিল্পে। কার্পাস, পশম ও রেশম শিল্পের কারখানায় সর্বসমেত ৬৩১টি ধর্মঘট হয়। এই সব ধর্মঘটে সাড়ে দশ লক্ষ মজুর বোগ দিয়াছিল এবং প্রায় ৫০ লক্ষ জন-রোজ নষ্ট হইয়াছিল। বয়ন-শিল্পে '৪৬ সালের ধর্মঘটের ৩৮.৭ শতাংশ, ধর্মঘট সংখ্যা ৫৩.৬ শতাংশ এবং নষ্ট জন-রোজের ৪১.৭ শতাংশ হইয়াছিল।

বয়ন-শিল্পের পরেই ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের স্থান। এ বংসর ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে ১৩৩টি ধর্মঘট হয়, ১ লক্ষ ধর্মঘটী এই সকল ধর্মঘটে বোগ দিয়াছিল এবং ক্ষতির পরিমাণ হইয়াছিল ২৫ লক্ষ ৩৪ হাজার জন-রোজ। এ বংসরে ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে ধর্মঘটের ৮.২ শতাংশ, ধর্মঘট সংখ্যার ৫.২ শতাংশ এবং নষ্ট জন-রোজের ১৯.৯ শতাংশ হইয়াছিল।

এ বংসর পূর্ব বংসর অপেক্ষা ৩ গুণ বেশী জন-রোজ নষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু খনির কাজে পূর্ববংসরের তুলনায় ৩১ গুণ বেশী জন-রোজ নষ্ট হয়।

কোন প্রদেশে কত ধর্মঘট হইয়াছিল

'৪৬ সালে সবচেয়ে বেশী ধর্মঘট হয় বোম্বাই প্রদেশে, অতঃপর বাংলায়। বোম্বাইয়ে ৫৪২টি ধর্মঘট হয়, বাংলায় ৩৬৯টি, মাদ্রাজে ২৭১টি, মধ্য প্রদেশে ১৩৭টি এবং যুক্ত-প্রদেশে ১০৮টি। এই সকল প্রদেশে যথাক্রমে ৭ লক্ষ ৭৮ হাজার, ৪ লক্ষ ৭৫ হাজার, ২ লক্ষ ২৩ হাজার, ১ লক্ষ ৬৮ হাজার এবং ১ লক্ষ ৫২ হাজার মজুর ধর্মঘট করে।

বোম্বাই প্রদেশে ধর্মঘট সবচেয়ে বেশী হইলেও ধর্মঘটের ফলে জন-রোজ নষ্ট হইয়াছিল সবচেয়ে বেশী বাংলাদেশে। বাংলায় এ বংসর ধর্মঘটের ফলে ৪৬ লক্ষ ৮২ হাজার জন-রোজ নষ্ট হইয়াছিল। বোম্বাইয়ে ৩৩ লক্ষ, মাদ্রাজে ১৩ লক্ষ, যুক্তপ্রদেশে ১১ লক্ষ, মধ্য প্রদেশে ৮৬ লক্ষ জন-রোজ নষ্ট হয়।

নেতাজীর অনুসরণে :-

বাংলার বিখ্যাত স্মৃত ব্যবসায়ী শ্রীঅশোকচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় ও তাঁহার “শ্রী” মার্কা স্মৃতির নূতন পরিচয় বাংলাদেশে নিম্নপ্রয়োজন। আজকাল বাংলার প্রতি গৃহে, উৎসবে, আনন্দে ‘শ্রী’ স্মৃতির ব্যবহার অত্যাৱশ্যক হইয়া পড়িয়াছে, বাজারে ভেজাল স্মৃতির ঘেরাপ্রয়াস দেখা যায়, তাহার মধ্যে শ্রীযুক্ত অশোকবাবুর বিশুদ্ধ স্মৃত যে খ্যাতি অর্জন করিয়াছে, তাহা স্মৃত ব্যবসায়ী মাত্রেই অনুকরণীয়।

স্বাঃ শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু

এ বৎসর ধর্মঘটের ফলে সকল প্রদেশে একত্রে যত জন-রোজ নষ্ট হইয়াছিল, শুধুমাত্র বাংলায় ও বোম্বাইয়ে নষ্ট হয় তাহার দুই-তৃতীয়াংশ।

ধর্মঘটের কারণ

১৬২৭টি ধর্মঘটের মধ্যে ৬০৪টি প্রধানতঃ মাহিনা-বিষয়ক, তা ছাড়া আরও ৭৯টি বোনাস বা লভ্যাংশ সংক্রান্ত। ২৮০টি ধর্মঘট ব্যক্তিবিশেষের আচরণ বা আত্মমুদ্রিক অভিযোগ হইতে উদ্ভূত, ১৩০টি ছুটি এবং কার্যকাল বিষয়ক। বাকী ৫০৪টি ধর্মঘটের উদ্ভব অজ্ঞাত নানা কারণে হইয়াছিল।

'৪৬ সালে মাহিনাসংক্রান্ত ধর্মঘটের অনুপাত ছিল ৩৭'১ শতাংশ, পূর্ববৎসরে ছিল ৪৩'৭ শতাংশ। ব্যক্তি-বিশেষের আচরণসংক্রান্ত ধর্মঘটের অনুপাত এই বৎসর ১৭'২ শতাংশ ছিল, পূর্ববৎসরে ছিল ১৭'৮ শতাংশ। "বিবিধ কারণ"-ঘটিত ধর্মঘটের অনুপাত বাড়িয়া পূর্ব বৎসরের ১৮'১ শতাংশ হইলে এ বৎসর ৩২'৮ শতাংশ হইয়াছিল।

ধর্মঘটের ফলাফল

'৪৬ সালের ১৫৬৫টি ধর্মঘটের ফলাফল বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যায় যে, ২৭৮টি ধর্মঘট সম্পূর্ণ সফল হইয়াছিল, ২৭৪টি অংশতঃ সফল, আর ৬৯৬টি বিফল হইয়াছিল। বাকী ৩১৭টি ধর্মঘটের ফলাফল সম্পর্কে ঠিক করিয়া কিছু বলা চলে না। সফল, অংশতঃ সফল এবং নিফল ধর্মঘটের অনুপাত যথাক্রমে

১৭'৮ শতাংশ, ১৭'৫ শতাংশ, এবং ৪৪'৫ শতাংশ ছিল। ধর্মঘটের ফলাফলের দিক দিয়া পূর্ব বৎসরের সঙ্গে এ বৎসরের অনুপাতের বিশেষ তফাৎ হয় নাই।

ধর্মঘটের স্থায়িত্ব

নষ্ট জন-রোজ সংখ্যাকে ধর্মঘট মজুর সংখ্যা দিয়া ভাগ করিলে ধর্মঘটের গড়পড়তা স্থায়িত্বকাল পাওয়া যায়। এই হিসাবে '৪৬ সালে ধর্মঘটের স্থায়িত্বকাল ছিল ৬'৬ দিন। পূর্ব বৎসরের স্থায়িত্বকাল ছিল ৫'৪ দিন। পূর্ব বৎসরের তুলনায় '৪৬ সালে ধর্মঘটের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছিল, কিন্তু '৩৯ সালের তুলনায় ধর্মঘটের স্থায়িত্ব কমিয়া গিয়াছিল। '৩৯ সালে ধর্মঘটের স্থায়িত্বকাল ছিল গড়ে ১২'২ দিন।

বাংলাদেশেই ধর্মঘটের গড়পড়তা পরমায়ু সবচেয়ে বেশী ছিল। '৪৬ সালে বাংলাদেশে এক একটি ধর্মঘটের স্থায়িত্ব-কাল ছিল গড়ে ৯'৯ দিন, বোম্বাইয়ে ৪'৩ দিন আর মাদ্রাজে ৫'৯ দিন। বাংলাদেশে ইঞ্জিনিয়ারিং-শিল্পে ধর্মঘট সর্বাঙ্গিক দীর্ঘস্থায়ী হইয়াছিল। সমস্ত ভারতে সকল শিল্পে ধর্মঘটের গড়পড়তা পরমায়ু ছিল ৬'৬ দিন, কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে প্রত্যেকটি ধর্মঘটের পরমায়ু ২৫ দিন করিয়া ছিল। খনিশিল্পে ধর্মঘটের স্থায়িত্ব ছিল গড়ে ১০ দিন। ধর্মঘটের পরমায়ু সর্বাঙ্গিক কম ছিল রেল-শিল্পে। '৪৬ সালে রেল-শ্রমিকদের ধর্মঘটের গড়পড়তা পরমায়ু ছিল মাত্র ৩'৭ দিন।



দুর্লভ নয় মোটেই -

তহুদেহের পেলব কোমলতা ও লাবণ্যমণ্ডিত সৌন্দর্য্য স্বপ্নমা প্রকৃতির দুর্লভ দান। নিখিল তরুণীর পরম কাম্য-বস্তু রূপের এই ঐশ্বর্য্য। প্রাকবৈজ্ঞানিক যুগে নারীর পক্ষে এ সম্পদ দুর্লভ ছিল বটে, কিন্তু একালে 'ক্যাল-কেমিকো'র সম্বন্ধে প্রস্তুত প্রসাধনী দেহের সৌন্দর্য্যকে প্রত্যেক রমণীর হাতের কাছে এনে দিয়েছে।

ক্যালকাটা
কেমিক্যাল

★ তুহিনা বিউটিফিক
★ য়েনুকা টয়লেট পাউডার
★ লাবনী স্নো এবং ক্রীম

পুস্তক-পাঠ্য

শেষ বসন্তে—শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য। পুস্তকালয়,
২৯ বাহুড়বাগান রো, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

“শেষ বসন্তে” কাব্যগ্রন্থ। বইখানি কয়েকটি গীতি-কবিতার
সমষ্টি। প্রথম কবিতা ‘শেষ বসন্তে’ যে স্বর উচ্ছ্বসিত হইয়া
উঠিয়াছে তাহাই কাব্যের মূল স্বর।

“বেলা যায়, বেলা যায়,

আপন অজ্ঞাতে তোর জীবনের ঐশ্বর্য হারায়।”

এইটিতে অথবা বসন্ত-প্রয়াণ, অতীত ও বর্তমান, পূর্বে-স্থিতি
বিভিন্নতা প্রভৃতি কবিতায় পশ্চাতে-ফেলিয়া-গাঙ্গা জীবনের জন্ত
নৈরাশ্রীভিত্তি হৃদয়ের যে আত্মধ্বনি শুনিতে পাই তাহাই
কিন্তু কবির শেষ কথা নহে। তিনি বার বার প্রশ্ন করিয়াছেন,

“বসন্তের প্রাণরস নিঙাড়িয়া যে সৌন্দর্য ফোটে

পলক ফেলিতে কেন গর্ভ তার ভূমি পরে লোটে?”

প্রশ্ন করিয়াছেন,

“পাতাল-পুরীর মাঝে যে রূপসী ঘুমাইয়া রহে

মাঝে মাঝে ধরা দেয় যৌবনের মধুর বিরহে,

সে কি লুকাইয়া যাবে একেবারে জনমের মত?”

প্রশ্নের উত্তর কবি ক্রমে নিজের শান্ত অন্তরের মধ্যে পাইয়াছেন।

বেদনা জীবনতন্ত্রী স্পন্দিত করে,

“যুগে যুগে অকারণ বঞ্চনার ব্যথায় কাতর
মানবের অশ্রুজল রচিতছে লবণ-সাগর।”

‘বাতাবী-সৌরভ-ভারে মদ্যালস মধ্যাহ্ন-পবন’ ‘নিকুঞ্জ-
ছায়ার তলে’ আর সঞ্চার করে না, ‘হৃন্দর আত্ম ধূল্য ধূসর
লুপ্তিত’—‘কে বহে সর্বস্বহারা জীবনের সেই বিভ্রমণা?’

সকল জীবনেই এই সমস্যা উদ্ভিত হয়। কেহ সমাধান
পায়, কেহ পায় না। সমস্যা আসে, ‘জীবন সমুখে ধায়, মন
কেন ফিরি চায় পশ্চাতের পানে?’ কিন্তু তাই বলিয়া কি
পরাজয় মানিতে হইবে? না। ‘নির্ভয় জীবন করে অবিশ্রান্ত
রণ।’ হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত হয়, বলিতে হয়, ‘যে দীপ নিভিয়া
গেল নামুক তাহারে ঘেরি বিশ্বিত-আধার।’ কিন্তু সে ত
ব্যথার বাণী। ‘অন্ধকার গভীর হইয়া আসিলে আলোকের
আবির্ভাবের সময় নিকটবর্তী হয়। অভয়ের বাণী শোনা যায়,

“আশা আছে জীবনের শেষে

আবার ভিড়িবে তরী কোনো নব প্রভাতের দেশে।”

‘অনাগত’ কবিতায় কবি বলিয়াছেন,

“নবীন পথিক নূতন তরী আসবে বেয়ে এই দেশে

আমার চলা সাঙ্গ যখন হবে।”

সুতরাং ‘প্রাণভরা দারুণ পিপাসা’ লইয়া ‘বিপুল উৎসব মাঝে-

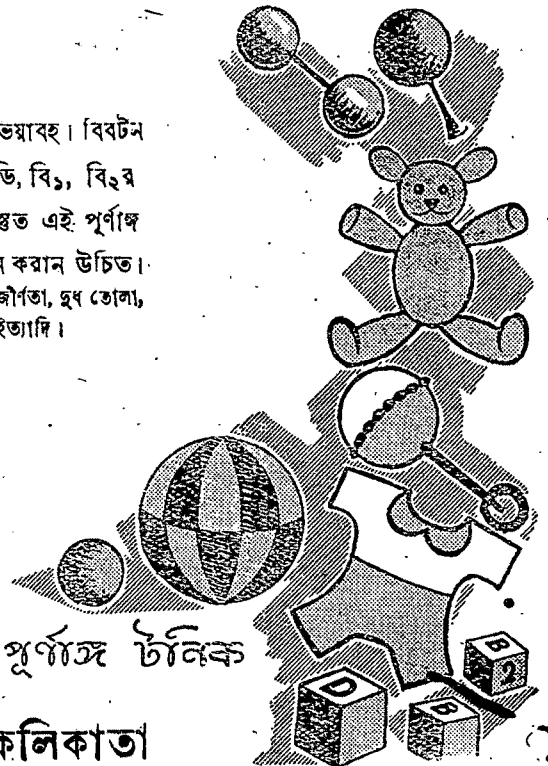
মাথের বক্তব্য

শিশুপালনের সম্যক জ্ঞানের অভাবে এদেশে শিশু-মৃত্যুর হার এত ভয়াবহ। বিবটন
শিশুদের দৈহিক সর্বাঙ্গীণ পুষ্টিবিধান করিতে অদ্বিতীয়। ভিটামিন ডি, বি১, বি২
সহিত মূল্যবান উদ্ভিজ্জ ও রাসায়নিক উপাদানের সংমিশ্রণে প্রস্তুত এই পূর্ণাঙ্গ
টনিকটি প্রত্যেক শিশুকেই বিশেষ করিয়া দশমাসের সময়, সেবন করান উচিত।
বিবটন নিম্নলিখিত রোগে বিশেষ উপকারী :- শিশুদের বকুতের পীড়া, অজীর্ণতা, দুধ তোলা,
পেট ফাঁপা, কোষ্ঠকাঠিন্য, রক্তশূন্যতা, কুগতা, ব্রুকাইটিস, রিকেটস ইত্যাদি।



একটি পূর্ণাঙ্গ টনিক

লিষ্টার এন্টিসেপটিকস্ • কলিকাতা



অবরোধ

বিজয় ভট্টাচার্য

শ্রমিকের দুঃখ-দুর্দশা ও সংগ্রামকে কেন্দ্র করে লেখা পূর্ণাঙ্গ নাটক। ধনতন্ত্রের লোভ ও নিরঙ্কুশ অবিচার শ্রমিকের জীবনের সমস্ত অগ্রগতির পথ রোধ করে যে অবরোধ গড়ে তুলেছে সার্থক নাটকীয় আঙ্গিকে সেই প্রাচীরকে চূর্ণ করার চূর্বীর সংগ্রামের বলিষ্ঠ স্বাক্ষর। দাম ২৫।

মানবিক ও পরমাণবিক

বিষ্ণু মুখোপাধ্যায়

মানব-কল্যাণে নিয়োজিত পরমাণু শক্তি সমগ্র পৃথিবীতে কী স্বপ্নাতীত আশীর্বাদই না বহন করে আনতে পারে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীরা পৃথিবীকে সেই আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত করে আর এক স্বর্বাশা যুদ্ধের ভয়া পরমাণু শক্তির একচেটিয়া মালিকানা অধিকারের যে হীন বডবডে লিপ্ত তারই চমকপ্রদ কাহিনী। দাম ২৫।

ছোটদের বই

সকল দেশের সেরা

ব্রজেননাথ ভট্টাচার্য

ভারতের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের সঙ্গে জন্মভূমির আন্তরিক পরিচয়ের উদ্দেশ্যে লেখা ভারতের অপরূপ কাহিনী। মাতৃভূমিকে একান্তভাবে জানতে হলে এই বই অপরিহার্য। প্রতি পাতায় সূর্য রাধের অজস্র ছবি। দাম ২০।

ঘুমতাড়ানী ছড়া

সুখান্ত ভট্টাচার্য, মঞ্জলাচরণ চট্টোপাধ্যায়,

বিষ্ণু দে, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র

ছোটদের অপরূপ ছড়ার বই। আধুনিক ভারত-ইতিহাসের প্রধান কয়েকটি ঘটনার ওপরে ছড়া কেটেছেন চারজন কবি চার বকম ভাবে। প্রতি পাতায় সূর্য রাধের অজস্র রঙীন ছবি। দাম ৩০।

পারীর পতন

ইলিয়া এরেনবুর্গ

একটি মহান জাতি ও দেশের সাময়িক অবনতির কল্পনা কাহিনী। গত মহাযুদ্ধ এবং তার আগের ফরাসী সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের নিখুঁত ছবি। অনুবাদ করেছেন : অমল দাশগুপ্ত, রবীন্দ্র মজুমদার, অনিলকুমার সিংহ। দাম প্রতি খণ্ড : ৪০, ৩০, ৪০। তিন খণ্ড একত্রে : দশ টাকা।

পুতুলনাচের ইতিকথা

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

আজকের মানিকবাবুর সমাজ সচেতন সাহিত্যের মূলমন্ত্র রয়েছে—“পুতুল নাচের ইতিকথা”। উটিল আধুনিক সমাজ-বাবুস্বার চাপে মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে পদে পদে বাধা পেতে দেখে তাঁর মনে হয়েছিল মানুষ যেন অদৃশ্যের হাতে পেলার পুতুল। সেই মানুষ পুতুলদের জীবন-যাত্রার অপরূপ কাহিনী। দাম ৫০।

সন্দীপের চর

বিষ্ণু দে

বিষ্ণু দে তাঁর কাব্য রচনার প্রতি পদক্ষেপে বিচিত্র ও বিতর্কিত প্রাস্তর পার হয়ে চলেছেন। প্রতিটি নতুন কাব্য-জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজতে গিয়ে তিনি নিজেও প্রকাশ ও বিকাশ করেছেন। তাই তাঁর প্রত্যেকটি কাব্য-গ্রন্থই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের এক-একটি পদক্ষেপ। ‘সন্দীপের চর’ তাঁর সেই সার্থক কবিকর্মের স্বাক্ষর—তাঁর অতিসাম্প্রতিক রচনা-সংগ্রহ। দাম ২০।

বিঃ দ্রঃ—ইডেন গার্ডেন্স-এ নিখিল ভারত প্রদর্শনীর ৬৯ং বুকশেলে আমাদের প্রকাশিত সমস্ত ইংরেজী ও বাংলা বই পাওয়া যাবে

ইণ্টারন্যাশনাল পাবলিশিং হাউস লিমিটেড

৩০, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৬

জীবনী ও মতবাদ

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের

কালমাক্স

স্ববোধ ঘোষের

সিগ্মুণ্ড ফ্রয়েড

অনিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের

ডারুইন

নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের

রুশো

লোকশিক্ষার মধ্য দিয়েই জাতি-সংগঠন সম্ভবপর। অজ্ঞানতার আবরণ সরিষা দিতে পারলেই, মানুষের মন আত্মজিজ্ঞাসায় বাকুল হয়ে ওঠে, জীবন সম্বন্ধে দারিদ্ৰ্য ঈশ্বরের ঘাড়ে দিয়ে বসে থাকে না। রাজনৈতিক পরাধীনতার চেয়েও কলঙ্ককর চেতনাবিহীনতা জবুখু জীবনকীর্তন। মানুষকে মানুষ বলে জানতে হবে।... চিন্তাশীল মনীষীদের সঙ্গে বাংলাদেশের শিক্ষিত জনসাধারণকে পরিচিত করিয়ে দেবার গুরু দারিদ্ৰ্য পালন করার দিন এসেছে। পৃথিবীর সংস্কৃতি ও সভ্যতার যারা পথপ্রদর্শক, যাদের মতবাদ স্থাপু জীবন-ধারাকে বিপ্লবের পথ দিয়ে দ্রুততর উন্নত স্তরে নিয়ে গেছে বাংলাদেশের বন্ধ জলার তাঁরাই স্বাস্থ্যসংযোগ করতে পারেন। এঁদের সম্বন্ধে জানবার, এঁদের সম্বন্ধে ভাববার এবং এঁদের সম্বন্ধে আলোচন-কৃষ্টির প্রয়োজন আছে। প্রতি খণ্ড এক টাকা দু' আনা ৥

গ্রন্থকার আমাদের খাতিসমস্তা তথা স্বাভাবিক প্রকৃতি ও রকমভেদ, প্রকৃত খাতির শৌচনীয় অভাব ও তজ্জনিত স্বাস্থ্যভঙ্গ এবং ভয়াবহ মৃত্যুর হার প্রভৃতি বিষয়ে মূল্যবান গবেষণা করিয়াছেন এবং কি প্রকারে দেশকে এই শৌচনীয় ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করা যায় তাইতে পারে তৎসম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থের বহুলপ্রচার বাঞ্ছনীয়। ভাষা প্রাঞ্জল ও ছাপা উৎকৃষ্ট।—আনন্দ বাজার।

মিনু মাসানির
খাতি

দাম বারো আনা ৥

ডাঃ লোকনাথন সম্পাদিত যুদ্ধের অবসানে ভারতবর্ষ এক অনিশ্চিত আর্থিক সম্ভাবনার সম্মুখীন হয়েছে। ভারতবর্ষ একা নয়, অসংখ্য দেশেরও এ-ধরণের সমস্যা সমাধান করবার দারিদ্ৰ্য এসে গেছে। তাই যুদ্ধকালীন অর্থনীতি কেমন করে যুদ্ধোত্তর অর্থনীতিতে পরিণতি লাভ করতে পারে, সে সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা হওয়া একান্ত প্রয়োজন। এই সমস্যার সমাধানকল্পে আজ পর্যন্ত বা-কিছু চেষ্টা হয়েছে 'যুদ্ধোত্তর অর্থনীতি'র প্রকাশ তাদের অগ্রতম। ভাষার প্রাঞ্জলতা বিষয়বস্তুকে চিত্তাকর্ষক করে তুলেছে। বারো আনা ৥

প্রথম খণ্ড ৥ এই স্মারকলিপিতে সংক্ষেপে ভারতবর্ষের আর্থিক উন্নতি পরিকল্পিত হয়েছে। জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি যে সম্পূর্ণ এবং স্বকীয় উন্নতির কথা চিন্তা করেছিলেন এ স্মারকলিপির ক্ষেত্রে ততটা ব্যাপক না হলেও ওই কমিটির অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই জাতীয় আর্থিক উন্নতির পরিকল্পনা সম্বন্ধে আলোচনা করা সম্ভব হয়েছে। ভারতবর্ষের আর্থিক উন্নতির পরিকল্পনা আলোচনা করবার সময় যে সকল আদর্শের কথা মনে রাখা অবশ্য কর্তব্য তা একটি বিবৃতির আকারে দেশের সমুখে উপস্থাপিত করাই এ-গ্রন্থের উদ্দেশ্য। তাই, কোন্ কোন্ দিকে উন্নতির কথা ভাবতে হবে বা সেজন্য উন্নতির পরিকল্পনা দেশের শক্তি-সামর্থ্যের ওপর কি পরিমাণে চাপ দেবে তা-ই এ বিবৃতিতে প্রকাশ করা হয়েছে। দাম এক টাকা ৥

দ্বিতীয় খণ্ড ৥ ভারতবর্ষের স্থায় যে-দেশে উৎপাদনের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম সেখানে বিশেষভাবে উৎপাদন বৃদ্ধি না করলে অতি-সব্ধ বর্টন ব্যবস্থাও জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে পারে না। কিন্তু এ-কথা সত্য হলেও বৃদ্ধির নীতি যদি উপযুক্ত বর্টন-নীতির ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত না হয় তা হলে তা দারিদ্র্য প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয় না। এই খণ্ডে বর্টন-নীতির ওপর দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে এবং পরিকল্পিত অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের কি স্থান তাও আলোচিত হয়েছে। দাম এক টাকা ৥

টাটা-বিডলা প্রভৃতির

বোম্বে-পরিবর্তন

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড

ধর্মের কিংবা সম্প্রদায়ের নামে ঐতিহ্যের স্রোতান দিয়ে দ্বিতীয় সংস্করণ সংস্কৃতিকে বাচিয়ে রাখার চেষ্টা সমাজের মৃত্যুর আবাহন করার নামান্তর মাত্র। সেদিক থেকে বলতে বাধে না যে, ভারতবর্ষের কালান্তরের এই সন্ধিক্ষণে হুমায়ুন কবিরের 'মোসলেম রাজনীতি' সত্যিই আশাশ্রয়। একটা বৃহত্তর উদারনৈতিক দৃষ্টি নিয়ে কবির সাহেব সাম্প্রদায়িক আবর্জনা ছড়ানোর বিরুদ্ধে তাঁর প্রগতিশীল মনের বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। দাম বারো আনা ৥

মোসলেম রাজনীতি

দ্বিতীয় সংস্করণ

লুই ফিশারের
মহাজিজ্ঞাসা

লুই ফিশারের নাম আজ আর কোনো মহলের কাছেই অপরিচিত নয়, তেমনি অপরিচিত নয় তাঁর 'The Great Challenge' বইটির নামও। 'মহাজিজ্ঞাসা' তাঁরই অনূদিত সংস্করণ। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রনৈতিক তথা সামাজিক বিবর্তন যে গত মহাযুদ্ধের সময় থেকে আজ পর্যন্ত নানাপ্রকার আঁকাবাঁকা পথে এগিয়ে চলেছে তাঁর ইতিহাস জানা প্রয়োজন আজ সকলেরই। কিন্তু বাংলা ভাষায় এই ধরণের গ্রন্থ এখনও প্রচুরভাবে প্রচারিত হয়নি। এই গ্রন্থে লুই ফিশার অত্যন্ত স্পষ্টভাবে তা-ই আলোচনা করেছেন বলে বর্তমান কালে এ-বইয়ের প্রয়োজন অপরিহার্য। বহুস্থ ৥

পূর্বাশা - প্রকাশিত অগ্রাভ্য বই - এর তালিকা সংগ্রহ করুন

প্রকাশক :

পূর্বাশা লিমিটেড—পি ১৩, গণেশচন্দ্র এভেন্যু, কলিকাতা ১৩

নিম্নোক্ত বই চারখানি বাংলা ভাষায় অনূদিত হইয়া
বাংলা সাহিত্যকে সত্যই সমৃদ্ধ করিয়াছে
নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস

গুড আর্থ

রচনা : পাল বাক

অনুবাদ : পুষ্পময়ী বসু

প্রাঞ্জল অনুবাদ, অপূর্ণ গঠনসজ্জা, চমৎকার বাঁধাই। মূল্য পাঁচ টাকা

আমাদের প্রতিদিনের পানীয় চা-কে কেন্দ্র করে
সাহেবী অভ্যাচারের পটভূমিকায় লেখা
এই উপন্যাস সবে প্রকাশিত হলো

দু'টি পাতা একটি কুঁড়ি

রচনা : মূলক রাজ আনন্দ

অনুবাদ : শ্রীনূপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

এই উপন্যাসখানিতে বর্তমান ভারতের দক্ষ অন্তরের হাহাকার আপনা
পেকে উঠছে, এর প্রত্যেকটি ঘটনার মধ্য দিয়ে মূখর হয়ে উঠছে
আহত ভারতের রক্ত-ঝরা অন্তরের কাহিনী, যে-কাহিনীর আড়ালে
পাঠক দেখতে পানেন, আজকের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের নানামুখী
শ্রোতথ্যার সঙ্গে ভারত-স্বাধীন সংঘর্ষ। মূল্য চার টাকা বারো আনা

ব্রিটিশ সরকার যে বই সম্বন্ধে করতে পারে নি বলে
তার প্রকাশ নিষিদ্ধ করেছিল

কুলি

রচনা : মূলক রাজ আনন্দ

অনুবাদ : শ্রীনূপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

ব্রিটিশ শাসনের ফলে ভারতীয় সমাজ কিভাবে ভিতর থেকে ভেঙ্গে পড়েছে,
অরহীন, বজ্রহীন কোটি কোটি ভারতবাসীর কি পরিণতি ঘটেছে তাই এক
ভয়াবহ চিত্র মূলক রাজ ফুটিয়ে তুলেছেন এই উপন্যাসে। সাড়ে চার টাকা

গত যুগের যুরোপের শ্রেষ্ঠ মিস্ট্রিক্ লেখক

মরিস্ মেতারলিঙ্ক-এর

মন্না ভান্না

অনুবাদ : পুষ্পময়ী বসু

প্রেম হ'ল এ কাহিনীর মূল কেন্দ্র। 'যে প্রেম চলিতে চালাতে নাহি
জানেন' সে-প্রেম নয়।...যে-প্রেম সগর্বে বলে, 'আমি আমার অপমান
সহিতে পারি, প্রেমের সহ্য না অপমান'—এ হ'ল সেই চির রক্তময়
হৃদয়ের অগ্রদূত...মানবতার ধানবস্তু। তাই কালিদাসের মেঘদূতের
মতন মেতারলিঙ্কের 'মন্না ভান্না' ভগতের প্রেম-সাহিত্যে মেঘ-চুঁড়ি
হিম-গিরি-শৃঙ্গের মতন বিয়াজ করছে। মূল্য তিন টাকা

— পুস্তক তালিকার জন্য লিখুন —

র‍্যাডিক্যাল বুক ক্লাব : ৬, বঙ্কিম চাট্জোয়ী স্ট্রীট : কলিকাতা

মহাকাব্য — শ্রীকালীদাস চট্টোপাধ্যায়। আন্ততঃ্য

লাইব্রেরী, ঢাকা ও কলিকাতা। পৃঃ ৮৪ ; মূল্য দশ আনা।

ছেলেমেয়েদের পক্ষে সহজবোধ্য করিবায় জ্ঞান গ্রন্থকার
পুস্তকখানিতে কথোপকথনস্থলে মহাকাব্যের গ্রন্থ-নক্সা,
চন্দ্রসূর্য ও অন্যান্য জ্যোতিষমণ্ডলী সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া-
ছেন। ছেলেমেয়েদের পক্ষে বইখানি ভালই হইয়াছে ;
কিন্তু দুই-একটি ক্ষেত্রে গ্রন্থকারের বক্তব্য সম্বন্ধে প্রশ্ন জাগা
স্বাভাবিক। যেমন—২৮ পৃষ্ঠায় পৃথিবীর গোলত্বের প্রমাণ
দিবার জ্ঞান নদীর উপর পালতোলা নৌকার কথা বলা
হইয়াছে। দিগন্তবিস্তৃত সমুদ্রবক্ষে জাহাজের দৃষ্টান্তের স্থলে
নদীবক্ষে পালতোলা নৌকার উদাহরণের একটা মিল
ধাকিলেও বাস্তব ক্ষেত্রে তাহাতে ফলে মিলিবে কিনা পরীক্ষা
করিলেই বুঝা যাইবে।

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

দৌপশিখ — শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ চৌধুরী। 'আত্মমিকা'
বাগোয়ান। খাসমিথুরাপুর, নদীয়া। দাম এক টাকা মাত্র।
ভূমিকায় লেখক বলিয়াছেন, "কবি আমি নই, তবে
কাব্যের মধ্যে যারা খুঁজে পেয়েছে সাধুনা, আমি তাদেরই
একজন।" কারুকৌশলের প্রতি তাঁহার আগ্রহ কম, কিন্তু
আন্তরিকতা গুণে কবিতাগুলি হৃদয় স্পর্শ করে।

জাওয়াহির — ছৈয়দ জহরুল হুসেন। জাশনাল বুক
এম্পোরিয়াম, করিমগঞ্জ, শ্রীহট্ট। মূল্য ১।০।

আধ্যাত্মিক ভাবরসে ঝাঁহার মতিয়াছেন, সাম্প্রদায়িকতার
গতি তাঁহাদের কাছে বিলুপ্ত। বাংলাদেশের জনসাধারণ
দীর্ঘকাল এই ভাবরস আশ্বাসন করিয়া আসিয়াছে বাউল-
ফকিরদের গানে। তেমনি কতকগুলি গানের সমষ্টি এই
বইখানি। হিন্দু-মুসলমান উভয় ভাবধারার এই সঙ্গমক্ষেত্রে
ভাবের তীর্থযাত্রী শান্তিলাভ করিবেন।

কঙ্কর — শ্রীললিত মুখোপাধ্যায়। বুক এম্পোরিয়াম।
২৪ বি, নুরমহম্মদ লেন, কলিকাতা। দাম বার আনা।

কঙ্করের মধ্যেও ফুল ফুটি-ফুটি করিতেছে, ভাল করিয়া
ফুটিতে পারে নাই। ভাব সরল, কিন্তু প্রকাশ সারলীল
নয়। কবি সে বিষয়ে সচেতন ; ভূমিকায় বলিয়াছেন,
"অনুভূতিটুকু এক অপরিমিত রক্ষতায় জড়িয়ে রয়েছে।"
ভাল কবিতা লিখিবার ক্ষমতাও যে তাহার আছে, সে
পরিচয়ও এই গ্রন্থে মাঝে মাঝে পাওয়া যায়।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

দি হার্টলেস উওয়ান : বলজ্যাক — অনুবাদক :

শ্রীমদীন্দ্রনাথ বোষাল। সুধাংশু সাহিত্য মন্দির। ২০৬ নং
কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ৪।

বর্তমানে বাংলাদেশে অনুবাদ-সাহিত্যের কদর বাড়িতেছে।
ইহা আশার কথা। সর্বদেশে সর্বকালেই সার্বক সাহিত্য-
সৃষ্টির সমাদর আছে ; এবং বিভিন্ন দেশের মধ্যে ভাব-
বিনিময়ের প্রয়োজনীয়তাও অনস্বীকার্য। আজিকার দিনে
দেশ-বিদেশের চিন্তাধারার সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ

ধাকা একান্ত আবশ্যক এবং মাতৃভাবার মাধ্যমে তা পরি-
বেশিত হওয়া উচিত।

“বলজ্যাকের” দি হার্টলেস উওয়ায়ান একখানি বিখ্যাত
পুস্তক। ঘোষাল মহাশয় পুস্তকখানির বঙ্গানুবাদ করিয়া
রসরোধের পরিচয় দিয়াছেন। লেখকের ভাষা এবং রচনা-
ভঙ্গী ভাল, কিন্তু মাঝে মাঝে কিঞ্চিৎ ইংরেজী-গন্ধী হইয়া
পড়িয়াছে। ঘোষাল মহাশয় এই দিকে একটু দৃষ্টি দিলে
আরও ঢের বেশী আনন্দ পাইতাম।

পুস্তকের ছাপা ও কাগজ ভাল। প্রচ্ছদপট মনোরম।

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

দ্রঃস্বপ্ন—শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়। জেনারেল প্রিন্টার্স-
এণ্ড পাবলিশার্স লিমিটেড, ১১৯ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
মূল্য আড়াই টাকা।

কয়েক বৎসর পূর্বে ‘গলি গল্প ও গৌরী’ নামক গল্পটি লিখিয়া
রামপদবাবু বাংলাদেশের পাঠক সম্মুখদেশের মন জিতিয়া
লইয়াছিলেন, তারপর বহু গল্প রচনা দ্বারা তিনি পাঠকচিতে
স্বীয় প্রতিষ্ঠাহুমিকে দৃঢ়তর করিয়া লইয়াছেন। ‘দ্রঃস্বপ্ন’
তাহার কয়েকটি ছোট গল্পের সংকলন। ইহাতে রাজমাতা,
বেমানান, বজা, নীতিকথা, দ্রঃস্বপ্ন, সন্ধ্যার পূর্বে, দীপশিখা ও
তৈল, নারী ও পরশু এবং বিনোদ অপেরা পার্টি এই নয়টি গল্প
আছে। পুস্তকের নাম-গল্পটি এবং ‘বজা’, ‘নীতিকথা’ ও
‘সন্ধ্যার পূর্বে’ এই গল্প তিনটি বিগত মহাযুদ্ধের অস্বাভাবিক
পরিস্থিতিতে পটভূমিকা করিয়া রচিত। যুদ্ধ থামিয়াছে,
দ্রঃস্বপ্নের ঘোর ক্রাটিয়া গেছে, কিন্তু তাহার জের আঁধার মিটে
নাই। কন্ট্রোলের লাইনে দাঁড়াইয়া এখনো আমরা ধৈর্যের
চরম পরীক্ষা দিতেছি। উপরোক্ত গল্প কয়টিতে আমরা
মহানগরীর বিপর্যস্ত সমাজ-জীবনের হুবহু প্রতিচ্ছবি এবং
নিজদের রেশন-কন্ট্রোল-কর্তৃকিত বিড়ম্বিত জীবনের প্রতিকল্প
দেখিয়া বিম্বিত হই। রামপদ বাবুর লেখার সবচেয়ে বড় গুণ
দরদ। এই দরদের জন্ত তাহার সৃষ্ট চরিত্রগুলির সহিত
পাঠকের এক গভীর মানসিক আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপিত হয়।
এই পুস্তকের অধিকাংশ গল্পই স্নিগ্ধ করুণরসে আচ্ছাদিত। এমন
কি কৌতুকের পিছনেও যে মানব-হৃদয়ের কত বড় বেদনা
লুকানো থাকিতে পারে তাহার সার্থক রূপায়ন ‘বেমানান’
আর ‘বিনোদ অপেরা পার্টি’ এই দুইটি গল্পে। ‘নারী ও পরশু’
এই গল্পসংগ্রহের শ্রেষ্ঠ গল্প। ইহাতে বীভৎস ও করুণ রসের
এক অপূর্ণ সমন্বয় হইয়াছে। তিন তিনটি জীব উপর
অস্বাভাবিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন সন্দেহপ্রবণ ঘনশ্রামের অমাহুযিক
নির্যাতনের কথা, পরশুদ্বারা তার জীব-হত্যার বর্ণনা পড়িতে
পড়িতে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে, অথচ ঘটনাবিভাস ও
মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের এমনি মুসলীমানা যে তার আচরণকে মোটেই
অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় না। ভাষার তীক্ষ্ণতায় ও বর্ণনা-
চাতুর্যে গল্পের উপসংহারটি যেন ঘনশ্রামের শাণিত পরশুর
মতই ঝক ঝক করিতেছে।

কল্লোল—শ্রীসঞ্জয় ভট্টাচার্য। পূর্বাশা লিমিটেড।
পি. ১৩, গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা। মূল্য ৫ টাকা।

বহু দিন আগে সর আশুতোষ চৌধুরী বলিয়াছিলেন—
“A subject nation has no politics”। সেদিন রাজ-
নীতির সঙ্গে আমাদের দেশের জনগণের প্রত্যক্ষ যোগ ছিল
না। কিন্তু জাতীয় আত্মকর্তৃত্ব লাভ করায় রাজনীতি এখন
ভারতীয় জনগণের অন্তরের বস্তু হইয়া উঠিয়াছে, ইহার সহিত
আপামর সাধারণের গভীর যোগ স্থাপিত হইতে চলিয়াছে।
এই রাজনীতি-সচেতনতা হইতেছে বর্তমান যুগধর্ম। যুগধর্মের
প্রভাবে বর্তমান বাংলা-সাহিত্যের সহিত রাজনীতির মিতালি
ঘটিয়াছে এবং বিগত কয়েক বৎসরের রাষ্ট্রীয় আন্দোলন, এমন
কি রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনাকে পর্য্যন্ত কেন্দ্র করিয়া
বাংলা-সাহিত্যে বহু গল্প উপস্থাপন এবং সাহিত্য-গ্রন্থ (যেমন
‘দৃষ্টিপাত’) রচিত হইয়াছে। বর্তমান ভারতের রাজনৈতিক
জীবনকে বাংলা-সাহিত্যে প্রতিফলিত করিবার সাধনায় ষাঁহার
ব্রতী হইয়াছেন শ্রীসঞ্জয় ভট্টাচার্য তাহাদের অন্যতম। কতক-
গুলি সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ঘটনার উপর কল্পনার রং চড়াইয়া
তিনি বর্তমান উপস্থাস্থানি রচনা করিয়াছেন। কাহিনীর
যবনিকা উন্মোচিত হইয়াছে ২২শে নবেম্বর ওয়েলিংটন স্কোয়ারে
ছাত্রদের উপর পুলিশের গুলিবর্ষণ হইতে। তারপর সোদপুরে
গান্ধীজীর প্রার্থনা-সভার অহুষ্ঠান, নেতাজীর জন্মতিথিতে
কলিকাতায় শাহ নওয়াজের আগমন ইত্যাদি বিভিন্ন ঘটনার
ভিতর দিয়া কাহিনীটি স্তূহু পরিণতির পথে অগ্রসর হইয়াছে।
এই সকল ঘটনা আমরা অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছি। কিন্তু
সঞ্জয় বাবুর চোখ দিয়া এগুলিকে যেন নূতন করিয়া দেখিলাম।
তিনি এই সকল পরস্পরবিচ্ছিন্ন ঘটনাকে দেখিয়াছেন এক
অবগু সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীদ্বারা। এই বিপ্লব বিদ্রোহ বিক্ষোভ
ধর্মঘট রক্তপাত ইত্যাদির ভিতর দিয়া জাতি মুক্তিমান করিয়া
পবিত্র হইতেছে, পুরাতনের ধ্বংসস্থাপ হইতে জন্মলাভ করিতেছে
নূতন পৃথিবী—এই মূল সুরটি উপস্থাস্থানির মধ্যে আগাগোড়া
অনুসৃত। আদর্শবাদ এই উপস্থাস্থানের কাহিনী এবং প্রায় সব-
গুলি চরিত্রের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত। নামক প্রতীপ
সেই আদর্শেরই বৃহৎ বিগ্রহ, নামিকা স্বজাতার নিকট সে
‘পাথরের মূর্তি’। সকলে মিলিয়া যে অভ্যুদয়ী মহিমার অত্যাশ্রিত
আসনে তাহাকে বসাইয়াছিল সেখান হইতে সাধারণ মানুষের
স্তরে নামিয়া আসিয়া জীবনের স্বাভাবিক সহজ দানগুলিকে
উপভোগ করিবার অধিকার হইতে সে চিরতরে বঞ্চিত। সে
মহাজীবনের সারক, তাহার নিঃসঙ্গ একক জীবনের ট্রাজেডিও
বিরাট। প্রতীপ-চরিত্রটি সঞ্জয় বাবুর সার্থক সৃষ্টি এবং তাহার
অশ্রুধ্বন্দ্রের বিশেষতঃ নিঃসঙ্গ নিঃসঙ্গ মুহূর্তে নিজের প্রকৃত সত্তার
সহিত তাহার মুখোমুখি পরিচয়ের বর্ণনায় তিনি মুসলীমানার
পরিচয় দিয়াছেন। কাহিনীটিতে মাঝে মাঝে রোমান্সের রং
ফলিয়াছে এবং লেখকের মনের উত্তাপ বর্ণনাকে আবেগমুগ্ধর
করিয়া তুলিয়াছে বলিয়াই কন্মানিজম, মার্কসবাদ, গান্ধীবাদ
ইত্যাদি গুরু বিষয়ের আলোচনা-সম্বন্ধিত এই হৃদীর্ঘ উপস্থাস-
্থানি রসোত্তীর্ণ হইতে পারিয়াছে। স্বজাতা-চরিত্রটির ক্রম-
বিকাশ লেখক দেখাইতে পারেন নাই। চরিত্রটিকে খুব
জীবন্ত বলিয়া মনে হয় না। সে যেন কতকগুলি মতবাদের
বাহনমাত্র—আগাগোড়া কেবল বড় বড় বুলিই কপচাইতেছে।

বইখানি শেষ করিবার পর একটি প্রশ্নই সবচেয়ে বেশী করিয়া মনে জাগে। ভারতের গণ-জীবনে এই যে মহা কল্লোল-ধ্বনি ঋত হইতেছে তাহা ভবিষ্যতের কোন বিরাট সম্ভাবনার ইঙ্গিত বহন করিতেছে। সে কি জাতির সর্বাঙ্গীণ মুক্তির অগ্রসূচনা নয়? কে সেই নবভগ্নরথ যিনি এই অভিনব মুক্তি-গদ্যকে দেশের বুকের উপর দিয়া প্রবাহিত করাইবেন? উপসংহারে সুজাতা আর প্রতীপের আলোচনা-প্রসঙ্গে লেখক, বলিয়াছেন যে, জাতির সেই মহামুক্তি-সাধক মহাত্মা গান্ধী।

জাতি যদি তাঁহার নির্দেশ না মানিয়া চলে তাহা হইলে চরম ভুল করিবে। প্রতীপ বলিতেছে—“গান্ধীজীর আশা কি আজ ছেড়ে দেওয়া যায়। সুজাতা—তিনি আজ একাই একট প্রতীক।” লেখক যখন এই কথাগুলি লেখেন তখন গান্ধীজী জীবিত থাকিয়া হিন্দু-মুসলমানে সৌভ্রাত, মৈত্রী ও অহিংসার আদর্শ প্রচার করিতেছিলেন।

শ্রী নলিনীকুমার ভদ্র

দেশ-বিদেশের কথা

কৃতী ঐতিহাসিকের সম্মান

সম্প্রতি ‘রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল’ গোয়ার কৃতী ঐতিহাসিক শেভালিয়ে পাণ্ডুরঙ্গ এস. পিহুরলেখকারকে মধ্যযুগীয় ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে গবেষণার জন্য ‘সর যত্ননাথ সরকার স্বর্ণপদক’ পুরস্কার প্রদান করিয়া সম্মানিত করিয়াছেন।



পাণ্ডুরঙ্গ এস. পিহুরলেখকার

এই নবমুঠ পুরস্কার ইনিই প্রথম লাভ করিলেন। উপরোক্ত প্রতিষ্ঠান ইতিপূর্বে ভারতীয় ইতিহাসের প্রাচীন আমল প্রভৃত্য জাতিতত্ত্ব এবং বৈজ্ঞানিক বিষয়সমূহের জন্য পদক ইত্যাদি দিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু গত বৎসর ইহার সভাপতি ত্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা মহাশয়ের প্রযত্নে মুসলমান আমল ও মারাঠা ইতিহাসের (১৩০০ খ্রিঃ-১৮০২ খ্রিঃ) গবেষণার জন্য এই নতুন পদক-প্রদানের ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহার মূল্য ৪০০ টাকা। ইহার একদিকে আছে সর যত্ননাথের আবক্ষ-মূর্তি এবং অপরদিকে পদকলাভকারীর নাম খোদিত। মূল পর্ভুগীজ ভাষায় হস্তলিখিত বিবরণী হইতে শেভালিয়ের পিহুরলেখকারের গবেষণার উপকরণ সংগৃহীত এবং ভারত-বর্ষের সঙ্গে পর্ভুগীজদের সম্পর্ক এবং মারাঠা ও দাক্ষিণাত্যের রাজাদের (এমনকি হায়দর আলি ও টিপু সুলতান পর্যন্ত) সম্বন্ধে পর্ভুগীজ ভাষায় হস্তলিখিত উপকরণ অবলম্বনে যাহার

গবেষণা করিয়াছেন তন্মধ্যে অবিসংবাদিতরূপে তিনিই শ্রেষ্ঠ। তিনি খননকার্য্যদ্বারা গোয়াতে কতকগুলি বিষয়কর প্রত্নসম্পদও আবিষ্কার করিয়াছেন।

যতীন্দ্রমোহন বাগচী

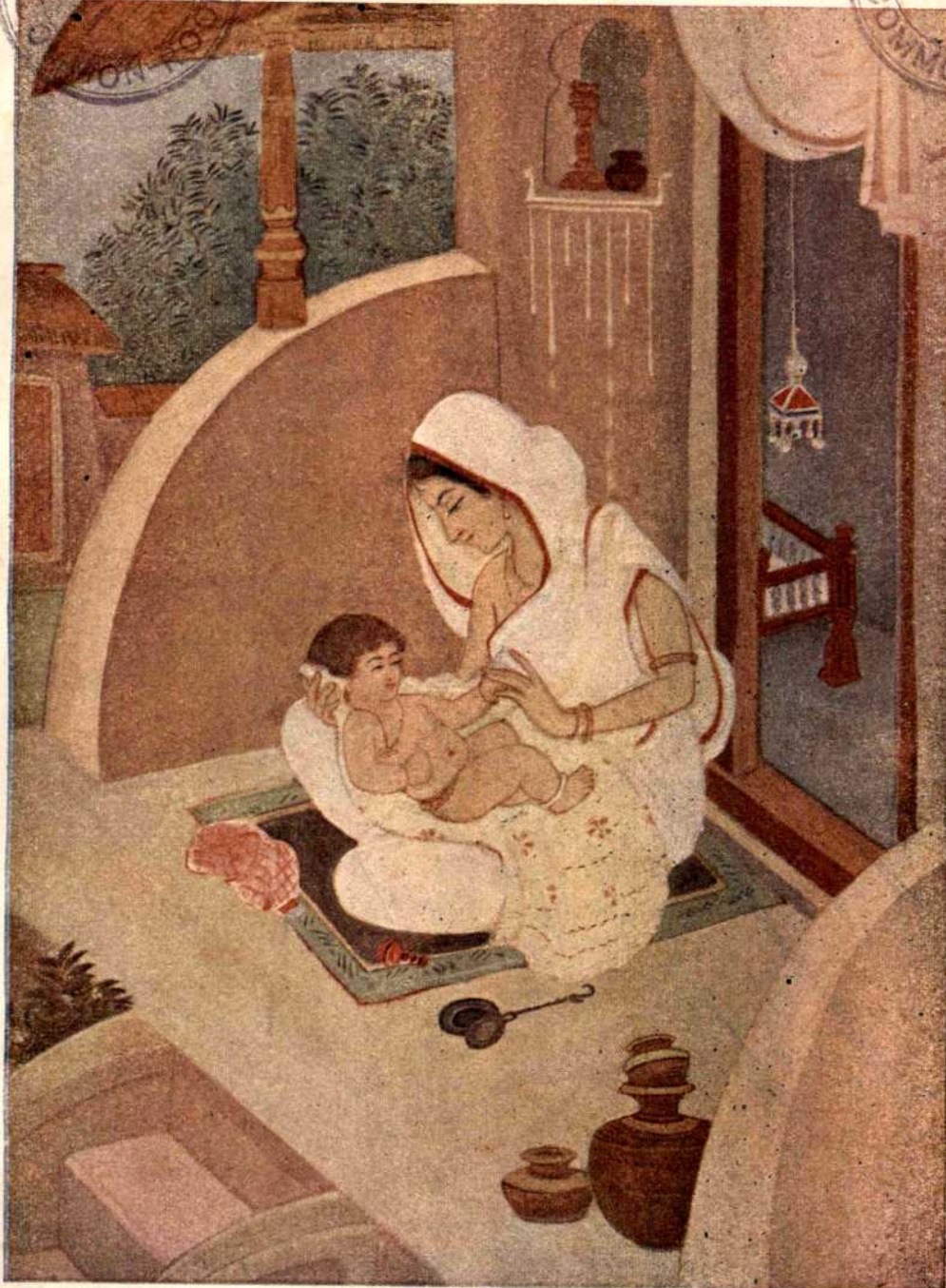
গত ১৮ই মাঘ কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী ৬৯ বৎসর বয়সে তাঁহার কলিকাতাস্থ বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। ১২৮৫ সালের ১২ই অগ্রহায়ণ মুর্শিদাবাদ জেলার বাগড়া গ্রামে যতীন্দ্রমোহনের জন্ম হয়। বহরমপুর এস এম এফ স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষালাভ করিবার পর তিনি উচ্চশিক্ষা লাভার্থ কলিকাতায় চলিয়া আসেন এবং যথাক্রমে কলিকাতা হেয়ার স্কুল হইতে প্রবেশিকা, প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে এফ-এ এবং ডফ কলেজ হইতে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে বি-এ পাস করেন।

যতীন্দ্রমোহনের প্রথম মুদ্রিত কাব্যগ্রন্থের নাম ‘লেখা’। রবীন্দ্র-মুগের কবিদের মধ্যে যতীন্দ্রমোহন একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। গদ্যরচনায়ও তাঁহার হাত ছিল। তাঁহার সর্বশেষ পুস্তক ‘রবীন্দ্রনাথ ও যুগ-সাহিত্যে’ তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

প্রথম জীবনে কয়েক বৎসর তিনি মানসী ও যমুনা পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ইদানীং বৎসরাধিককাল যাবৎ তিনি ‘পূর্বাচল’ নামক মাসিক পত্রিকাখানি বিশেষ কৃতিত্বের সহিত সম্পাদনা করিয়া আসিতেছিলেন। মৃত্যুর পূর্বে পর্যন্ত তিনি ঐ পত্রের সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার মত একজন সুকবি, সুসাহিত্যিক ও সুযোগ্য সম্পাদকের অভাবে বাংলা-সাহিত্যের অপূরণীয় ক্ষতি হইল।

পুষ্পকুন্তলা রায়

কলিকাতা কর্পোরেশনের কিউরেটর যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের পত্নী পুষ্পকুন্তলা রায় গত ২৩শে পৌষ সন্ধ্যায় রোগে পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৪৫ বৎসর হইয়াছিল। স্বীশিল্প ও রন্ধন-বিদ্যায় তাঁহার বিশেষ দক্ষতা ছিল। এ সম্বন্ধে তাঁহার লেখা বহু প্রবন্ধ বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। চিত্রকলারও তাঁহার নৈপুণ্য ছিল। ১৭ বৎসর পূর্বে তাঁহার অমরক বন্ধুবান্ধবেরা ‘পুষ্পকুন্তলা মিলনী’ নামে একটি আলোচনা-সভার প্রতিষ্ঠা করেন। পুষ্পকুন্তলা অধিকাংশ সময়ই পূজা-অর্চনায় কাটাইতেন। দরিদ্রনারীদের সেবায় তিনি বিশেষ আনন্দলাভ করিতেন।



প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

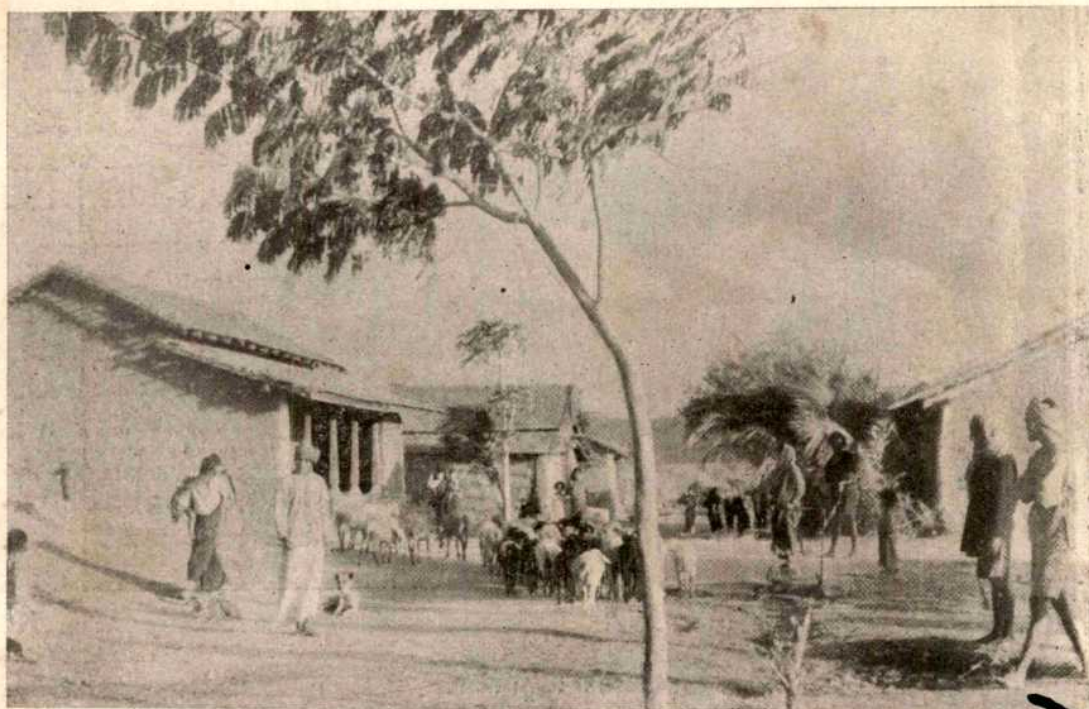
মা ও ছেলে
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়



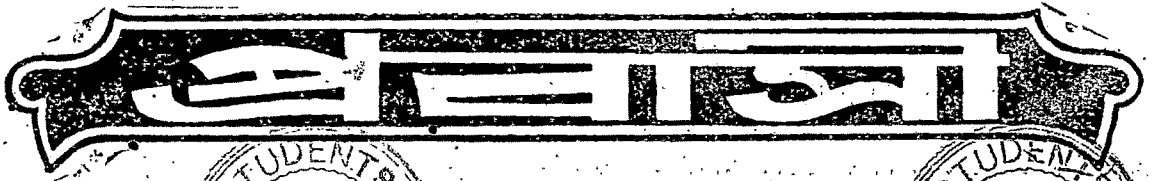
ভারতের পল্লী



একটি পল্লীর গ্রীলোকেরা মনোহর ভঙ্গীতে তুম্ব ঝাড়িতেছে



পল্লীগ্রামের একটি দৃশ্য



“সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মায়া বলহীনেন লভ্যঃ”

৪৭শ ভাগ
২য় খণ্ড

MON-ROE, ১৩৮৪

৬৬ সংখ্যা
MON-ROE

বিবিধ প্রসঙ্গ

পূর্ববঙ্গে হিন্দুর ভবিষ্যৎ

পূর্ববঙ্গের হিন্দু আতঙ্কগ্রস্ত হওয়ার ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে তাহার আন্ত প্রতিকার প্রয়োজন। এই প্রতিকারের দুইটি মাত্র পথ আছে। প্রথমতঃ পূর্ববঙ্গের অমুসলমানের পুনর্বসতি ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং দ্বিতীয়তঃ ভারতরাষ্ট্র ও পূর্ব পাকিস্থানের মধ্যে লোক-বিনিময়। তৃতীয় পন্থা—যাহাকে বিপথ বলা উচিত এবং যাহা বর্তমানে অবলম্বিত হইতেছে—সবন্ধে ইহা মাত্র বলা প্রয়োজন যে ইহা বাঙালী হিন্দুর পতন ও ধ্বংসের চরম পথ। আজ চতুর্দিকে কেবল এই পথেরই কথা চলিতেছে ইহা অত্যন্ত আশ্চর্যের কথা। ইহার ফলে পূর্ববঙ্গের অমুসলমান সব্বাস্ত হইয়া, আত্মসম্মান হারা হইয়া পথে দাঁড়াইবে, পশ্চিমবঙ্গবাসী বিরত ও অতিষ্ঠ হইবে এবং শেষ পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক আগুনে সকলেই পুড়িবে। অথচ পথে ঘাটে, সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় কেবল এই পথেরই আলোচনা চলিতেছে, পরিণামের কথা কেহই ভাবিবার সময় পাইতেছেন না বা বলিবার সাহস রাখিতেছেন না।

সত্য কথা এই যে, এক কোটি ত্রিশ লক্ষ লোকের এক-তৃতীয়াংশেরও পশ্চিমবঙ্গে—শুধু পশ্চিমবঙ্গে কেন সারা ভারত-মুক্তরাষ্ট্রে—পুনর্বসতি হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নাই, যদি-না সেই পরিমাণ লোক এই অঞ্চল হইতে পাকিস্থানে চলিয়া যায়। যাহারা এখনকার লোক না সরাইয়া ওদিক হইতে লোক আনিবার কথা বলিতেছেন বা ভারত-সরকারকে সেইরূপ ব্যবস্থা করিবার কথা লিখিতেছেন, তাহার অপ্রশংসা বিরোধিতা হারা হইয়া ভবিষ্যতে বিষম বিপদ ডাকিয়া আনিতেছেন। ভারত-সরকারকে এখন প্রথমে বিচার করিতে হইবে যে মিঃ জিন্না ও খাজা নাজিমুদ্দিন পরোক্ষভাবে পূর্ববঙ্গের অমুসলমানকে ভিটাঘাট ছাড়িতে বাধ্য করিতে চাহেন কিনা। যদি পশ্চিমবঙ্গ-সরকার এবং ভারত-সরকার এই বিষয়ে নিশ্চিত প্রমাণ দেখেন তবে তাহাদের দৃঢ়তার সহিত স্বাধীনতা ও স্বাধীনতার পথে লোকবিনিময়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে, কেননা অন্য পথ নাই। যে পথে এ কাজ এখন চলিতেছে তাহাতে পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুর ও মুসলমানের মধ্যে অন্তঃকলহ ও বিদ্বেষ জাগিয়া উঠিবে মাত্র।

যদি খাজা নাজিমুদ্দিনের গবর্ণমেন্ট শান্তির পথ চাহেন তবে পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের উচিত শ্রীযুক্ত সতীশ দাশগুপ্ত মহাশয়কে সকল প্রকারে সাহায্য করা। বিগত ১৭ই চৈত্রের ভারতে তাহার লিখিত “পুনর্বসতি কোন পথে” প্রবন্ধ পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের এবং ভারত-সরকারের প্রত্যেক মন্ত্রী বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। আমরা তাহার কিছু অংশ উদ্ধৃত করিতেছি :

“পূর্ববঙ্গ হইতে লোক আতঙ্কেই চলিয়া আসিতেছেন। ইহাদের বেশীর ভাগই মধ্যবিত্ত ভদ্রশ্রেণীর লোক। জমি বর্ণা লইয়া ও চাকুরী বা ব্যবসা দ্বারা উপার্জন করিতেন কিন্তু বর্তমানে পাকিস্থানে সেইভাবে উপার্জন করা সম্ভব নয় বলিয়া তাহার মনে করেন। একতর বাতী ছাড়িয়া পশ্চিমবঙ্গে উপার্জনের জন্ত আসিতেছেন। গবর্ণমেন্টের কোনও কোনও কর্মচারীর অসহায়তারও লীড়িত হইয়া কেহ নিরাশ হইয়া দেশত্যাগ করিতে বাধ্য বোধ করিতেছেন। কিন্তু বাধ্যতার মূল জাগ্রৎ বা প্রহুত্ব ঐ বোধ আছে যে এদেশে আর ডাক্তারী, মোক্তারী ও ওকালতী, বাণিজ্য-ব্যবসা বা মহাজনী করিয়া উপার্জন করার দিন নাই। কাছেই হার মানিয়া দেশ ছাড়িয়া চলিয়া আসিতেছেন। এই প্রক্রিয়া মধ্যবিত্ত শিক্ষিত হিন্দুর পক্ষে স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দেশের উপর ও সমাজের উপর কর্তব্যের প্রশ্ন হইতে বিচার করা হয় না।

“ইহা দোষের। সমাজ ও দেশের হিতাহিত সম্পর্কে বিচার-হীনতাদ্বারা মানুষ নামিয়া যায়। পূর্ববঙ্গের হিন্দু নামিয়া যাইতেছেন। প্রবল স্বার্থবুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া চলিলে সমূহ অমঙ্গলকেই ডাকিয়া আনা হয়। হইতেছেও তাহাই।

“তবে গবর্ণমেন্ট কি করিবে? পূর্ববঙ্গের হিন্দুর দুর্দশার দিকে পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেন্ট চোখ বুজিয়া থাকিবে? ইহাদের হুঁচকি দেখিয়া কোনও প্রতিকার করিবে না? ইহাও ত হয় না। বাংলা ভাগ হইলেও বাংলার হিন্দু মুসলমান ভাই ভাই। পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেন্ট এই পরিস্থিতিকে অগ্রাহ্য করিতে পারেন না। ইহার প্রতিকারই করিতে হয়। কিন্তু প্রতিকার কি? কতককে পশ্চিমবঙ্গে বসতি করাইয়া দিলে সমস্ত আরও জটিল হই যদি হয় তবে করা কি?

“করার রহিয়া গিয়াছে ইহাদিগকে যত অর্থব্যয়ই হউক বসতি করাইয়া দেওয়া, তবে পশ্চিমবঙ্গে নয়—পূর্ববঙ্গে।”

ঢাকায় মিঃ জিন্না

মিঃ জিন্না ঢাকায় আসিয়া প্রায় এক সপ্তাহ কাটাইয়া গিয়াছেন। চট্টগ্রামেও তিনি গিয়াছিলেন। বাংলা ভাষাকে পাকিস্থানের অতঃপর রাষ্ট্র ভাষা করিবার জন্ত পূর্ববঙ্গে যে তীব্র আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল খাজা নাজিমুদ্দীনের গবর্নেন্ট তাহা দমন করিতে পারিতেছিলেন না বরং এই আন্দোলনে তাহার মন্ত্রীমণ্ডল বজায় রাখা কঠিন হইয়া উঠিতেছিল। সম্ভবতঃ এই কারণেই মিঃ জিন্নার পূর্ববঙ্গে আগমন।

ঢাকায় আসিবার অব্যবহিত পরে মিঃ জিন্না এক জনসভায় বক্তৃতা করেন। উহাতে তিনি দৃঢ়কণ্ঠে ইহাই জানাইয়াছেন যে, “উর্দু পাকিস্থানের একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা হইবে ইহাই আমি চাই।” ইহা তাহার প্রধান বক্তব্য হইলেও হিন্দুদের লক্ষ্য করিয়া তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহাও উপেক্ষার বিষয় নহে। পাকিস্থানে হিন্দুরা ভারতীয় ইউনিয়নের মুসলমান অপেক্ষা অনেক জুখে আছে, তাহাদের ঞায়সঙ্গত কোনই অভিযোগ নাই, হিন্দুদের উপর অত্যাচারের যে সব বিবরণ ভারতীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইতেছে তাহা নিছক মনগড়া কল্পনা মাত্র, পূর্ববঙ্গ হইতে বাস্তব্যাগী হিন্দুদের যে সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে প্রকৃত সংখ্যা তাহার তুলনায় নগণ্য, পূর্ববঙ্গে পূজার সময় ৪০ হাজার শোভাযাত্রা বিনা বাধায় বাহির হইতে দেওয়া হইয়াছে ইত্যাদি অনেক কথা মিঃ জিন্না বলিয়াছেন এবং পূর্ববঙ্গের কংগ্রেস নেতারা স্থানীয় গবর্নেন্টের বিরুদ্ধে মিঃ জিন্নার নিকট কতকগুলি অভিযোগ জানাইলে তিনি তাহা ছিন্নমূল্যে উহা অগ্রাহ করিয়া বাহির বিরুদ্ধে অভিযোগ সেই খাজা নাজিমুদ্দীনের নিকটেই প্রতিকারার্থ যাইবার জন্ত বলিয়া দিয়াছেন। ঢাকায় ও চট্টগ্রামে মিঃ জিন্না যে কয়েকটি বক্তৃতা দিয়াছেন তাহাতে এই কথাই নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইয়াছে যে পূর্ববঙ্গে হিন্দুদের অবস্থিতি তাহার কাম্য নহে। নেতৃস্থানীয় হিন্দুদের pressure tactics-এর দ্বারা বিভাঙিত করিয়া অহুন্নত সম্প্রদায়কে মেরুদণ্ডবিহীন করিয়া ফেলিয়া তাহাদিগকে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করিয়া লওয়াই পাকিস্থানী নেতাদের আসল অভিপ্রায়। মিঃ জিন্না স্পষ্ট ভাষাতেই জানাইয়া দিয়াছেন যে পাকিস্থান ঐক্যমিত্তিক রাজ্য হইবে, যে গণতন্ত্র সেখানে প্রবর্তিত হইবে তাহা হইবে ঐক্যমিত্তিক গণতন্ত্র, আধুনিক যুগের ধর্ম নিরপেক্ষ গণতন্ত্র সেখানে চলিবে না এবং পাকিস্থানের প্রত্যেক অধিবাসীকে নিজেকে পাকিস্থানী বলিয়া ভাবিতে হইবে। মিঃ জিন্নার ঢাকার বক্তৃতাটি নিয়ে প্রদত্ত হইল :

“আমাকে যে বিরাট অভ্যর্থনা জানান হইয়াছে তজ্জ্ব আমি এই প্রদেশের জনগণ, অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান ও ঢাকা-বাসীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। ইহা না বলিলেও চলে যে, পূর্ববঙ্গ ভ্রমণে আসিয়া আমি অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। পৃথিবীর অতীত স্থানের তুলনায় একই স্থানে সর্বাপেক্ষা বেশী মুসলমানের বাস হিসাবে পূর্ববঙ্গের গুরুত্ব সমধিক। ইহা

পাকিস্থানের একটি শক্তিশালী অংশ। আমি বহুদিন পূর্বেই পূর্ববঙ্গ সঙ্কল্পে আসিব ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ অতীত গুরুতর প্রয়োজনের বাতিরে আমার আসা হইয়া উঠে নাই। আপনারা এই সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের কিছু কিছু অবগত আছেন। দেশ বিভাগের অব্যবহিত পরেই পঞ্জাবে যে-ভয়ারহ ঘটনা সংঘটিত হয় ও বাহার ফলে পূর্ব-পঞ্জাবের লক্ষ লক্ষ মুসলমানকে নিজ বাসভূমি হইতে উৎখাত হইতে হয়। তাহার কথা আপনারা জানেন। পূর্ব-পঞ্জাবের সঙ্গে দিল্লী ও প্রতিবেশী অঞ্চলসমূহের নিরাশ্রয় মুসলমানদের রক্ষা ও আশ্রয় দেওয়ার দায়িত্ব আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হয়। কোনও নবজাত রাষ্ট্র দক্ষতা ও সাহসের সহিত এইরূপ দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারিয়াছে পৃথিবীর ইতিহাসে এরূপ দেখা যায় না। আমাদের শত্রুরা ভাবিয়াছিল, পাকিস্থান শিশুকে গলা টিপিয়া হত্যা করিবে কিন্তু পাকিস্থান বিহীন ও শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে। ইহা কেবল বাচিয়াই নাই ইহার যে মহৎ উদ্দেশ্য তাহাও ইহা সাধন করিবে।

“আপনাদের স্বাগত সম্ভাষণে এই প্রদেশকে হৃষি ও শিল্পে সমৃদ্ধ করার উপর আপনারা জোর দিয়াছেন। এ সঙ্গে এই প্রদেশের যুবক-যুবতীদের পাকিস্থানের সেনাবাহিনীতে নিয়োগ, চট্টগ্রাম বন্দরের উন্নতিসাধন, পাকিস্থানের অতীত অংশের সহিত এই প্রদেশের সংযোগ সাধন, শিক্ষার সুব্যবস্থা এবং পাকিস্থান সরকারের সমস্ত কার্যে পূর্ববঙ্গের যোগ্য অংশ গ্রহণের কথাও আপনারা উল্লেখ করিয়াছেন। আমি আপনাদিগকে আশ্বাস দিতেছি যে, পাকিস্থান সরকার এই সকল বিষয়ের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করিবেন এবং পূর্ব-পাকিস্থান যাহাতে যথাসম্ভব দ্রুত তাহার সর্বাঙ্গীণ পূর্ণতা লাভ করে তৎপ্রতি সরকার দৃষ্টি দিবেন। এই প্রদেশের লোকেরা যে সামরিক শক্তিসম্পন্ন ইতিহাসে তাহার নজির আছে এবং সরকার ইতিমধ্যেই এই দেশের যুবকদিগকে সামরিক বাহিনীতে গ্রহণোপযোগী শিক্ষা দেওয়ার সুযোগ ও পাকিস্থান প্রশাসন গাভ দলে ভর্তি হওয়ার সুযোগ করিয়া দিয়াছেন। আপনারা নিশ্চিত থাকিতে পারেন যে, রাষ্ট্ররক্ষা কার্যে এই প্রদেশের যুবকদিগকে পূর্ণ সুযোগ দেওয়া হইবে।

“এখন আমি এই প্রদেশের কতকগুলি সাধারণ সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করিতে চাই। গত সাত মাস যাবৎ আপনারা যেরূপ ভাবে কঠোর পরীক্ষার মধ্য দিয়া কাল কাটাইয়াছেন তজ্জ্ব আমি আপনাদিগকে ও আপনাদের সরকারকে অভিনন্দন জানাইতেছি। পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার পরে যে গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় তাহা দমন করিয়া যে ভাবে আপনাদের সরকার একটি কার্যক্ষম শাসনব্যবস্থা চালু করিয়াছেন তজ্জ্ব আমি সরকারী কর্মচারীদের ধন্যবাদ জানাইতেছি। ১৫ই আগষ্ট তারিখে ঢাকায় অবস্থিত প্রাদেশিক সরকারের অবস্থা নিজ বাসভূমে পরাশ্রয়ী মত

ছিল। সরকারকে সঙ্গে সঙ্গেই হাজার হাজার সরকারী কর্মচারীদের জন্ত বাসস্থানের ব্যবস্থা করিতে হয় অথচ দেশ বিভাগের পূর্বে ঢাকা একটি ক্ষুদ্র মফস্বল শহর ছিল মাত্র। সরকার শাসনতান্ত্রিক সমস্তায় যখন সবেমাত্র হাত দিয়াছে ঠিক সেই মুহুর্তেই দেশ বিভাগের ফলে ভারত হইতে ৭০ হাজার রেলকর্মচারী ও তাহাদের পরিবারবর্গ অকস্মাৎ এই প্রদেশে আসিয়া উপস্থিত হয়। ইহা ছাড়া হিন্দুকর্মচারিগণ চলিয়া যাওয়ায় যোগাযোগ ব্যবস্থা সাময়িক ভাবে বিকল হইয়া পড়ে। এই কারণে শাসন-সঙ্কট এড়াইবার জন্ত সরকারকে অবিলম্বে শাসন সংক্রান্ত পুনর্গঠন কার্যে আত্মনিয়োগ করিতে হয় এবং এই কাজ প্রাদেশিক সরকার যথেষ্ট দ্রুততা ও দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করে। অব্যাহত গতিতে সরকারের কাজ চলিতে থাকে এবং সামাজিক জীবনধারায়ও কোনপ্রকার বিঘ্ন জন্মায় নাই। কেবলমাত্র শাসনতান্ত্রিক পুনর্গঠন কার্যই যে দ্রুততার সহিত সম্পন্ন হয় তাহা নহে, এমনভাবে সকল ব্যবস্থা করা হয় যাহা দ্বারা আসন্ন দুর্ভিক্ষের হাত হইতে প্রদেশটি রক্ষা পাইয়াছে। অবশ্য এই কার্যের সাফল্যের জন্ত পূর্ব-বঙ্গবাসিগণ প্রশংসার পাত্র, বিশেষ করিয়া সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের লোককে প্রশংসা করিতে হয় কারণ দেশবিভাগের ঠিক পরেই ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে মুসলমানদের উপর অত্যাচার ও উহাদের নির্যাসের হত্যার সত্ত্বেও ইহারা দারুণ উত্তেজনার মধ্যে শান্ত থাকেন। এই ঘটনা সত্ত্বেও গত পূজার সময় হিন্দু সম্প্রদায় ৪০ হাজার শোভাযাত্রা বাহির করে কিন্তু একটি ক্ষেত্রেও কোনরূপ গোলাযোগ দেখা যায় নাই, এবং সংখ্যালঘুদের উপর মুসলমান সম্প্রদায় একবিন্দু অত্যাচারও করে নাই। নিরপেক্ষ সমালোচকগণ আমার সহিত এ বিষয়ে একমত হইবেন যে, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় পাকিস্থানের সংখ্যালঘুদের অনেক বেশী আন্তরিকতার সহিত রক্ষা করা হইয়াছিল। পাকিস্থানে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষিত হইয়াছে। আমি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে বলিতে চাই যে, কেবল ঢাকাতেই নহে—পাকিস্থানের সর্বত্রই সংখ্যালঘুদের রক্ষা করা হইয়াছে। আমরা একথা স্পষ্ট ভাবেই বলিয়াছি যে, পাকিস্থানে শান্তিভঙ্গ হইতে দেওয়া হইবে না এবং কোন প্রকার গুণ্ডামি সহ করা হইবে না। এই যে শৃঙ্খলাপূর্ণ শাসন-ব্যবস্থার প্রবর্তন, আসন্ন দুর্ভিক্ষ এড়াইয়া লক্ষ লক্ষ লোকের খাদ্য সংস্থান ও শান্তি রক্ষা করা—ইহার প্রতি আমি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই, কারণ অনেকেই বিষয়গুলিকে তত গুরুত্ব দিতে চাহেন না এবং ইহাকে স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া মনে করেন।

• “সমালোচনা করা ও দোষ বাহির করা খুবই সহজ কিন্তু প্রাদেশিক সরকারকে যে পরীক্ষার মধ্য দিয়া যাইতে হইয়াছে তা উপলব্ধি করা প্রয়োজন। আমি বলিতেছি না যে, আপনাদের শাসন-ব্যবস্থা ক্রটিহীন অথবা ইহার উন্নতি

সাধনের প্রয়োজন নাই। যুক্তিপূর্ণ সমালোচনা সর্বদাই বাঞ্ছনীয় কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে আমি দেখিতে পাইয়াছি যে, কেবল অভিযোগ জানান ও দোষ বাহির করা কতিপয় ব্যক্তির কাজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু আপনাদের সরকার দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া যাহা করিয়াছে তাহার জন্ত প্রশংসাসূচক কিছু বলাও ত প্রয়োজন। উহারা যে সকল ভাল কাজ করিয়াছেন তাহার প্রশংসা জানাইয়া উহাদের সমালোচনা করুন। বিরাট শাসন-ব্যবস্থায় ভুলত্রুটি স্বাভাবিক। আপনারা বলিতে পারেন না সবকিছু ক্রটিহীন হইবে—ইহা কখনও হইতে পারে না। আমাদের ইচ্ছা যে, ইহা যথাসম্ভব ক্রটিহীন হউক। সরকারের একমাত্র উদ্দেশ্য হইতেছে জনগণের সেবা করা—উহাদের মঙ্গলসাধনের জন্তই নানারূপ পথ খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। মনে রাখিবেন, সরকার এখন আপনাদেরই হাতে—সুতরাং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিয়া কিছু করিতে যাইবেন না। ক্ষমতা যখন আপনাদেরই হাতে তখন উহাকে কিরূপ ভাবে প্রয়োগ করিতে হয় তাহা শিখুন। শাসনযন্ত্র সম্পর্কে আপনাদের জ্ঞান থাকা চাই। নিয়মতান্ত্রিক ভাবে আপনারা এই সরকার বদলাইয়া অথ সরকার স্থাপন করিতে পারেন, অবশ্য যদি আপনাদের অসন্তোষ ততটা উগ্রই হইয়া থাকে। সমস্ত ক্ষমতা যখন আপনাদের হাতে তখন যাহারা রাষ্ট্র পরিচালনা করিতেছেন তাঁহাদিগের সহিত ধৈর্য ধরিয়া আপনাদের সহযোগিতা করিতে হইবে, তাহাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হইতে হইবে। তাঁহাদের আগদে বিপদে সাহায্য করিতে হইবে, কারণ তাহারাই আপনাদের অভাব-অভিযোগ দূর করিবেন। তাহা না করিয়া আপনারা কি লক্ষ পাকিস্থানকে নিরুজ্জ্বলতার দ্বারা ধ্বংস করিতে চাহেন? (না-না ধ্বনি।) আপনারা কি ইহাকে গড়িয়া ভুলিতে চাহেন? (হ্যাঁ হ্যাঁ ধ্বনি।) তাহা যদি চাহেন তবে নিজেদের মধ্যে একা ও সংহতি সৃষ্টির চেষ্টা করুন।

“আমি আপনাদিগকে বলিতে চাই যে, আমাদের মধ্যে ভাড়াটিয়া শত্রুচর রহিয়াছে। উহারা পাকিস্থানের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিয়া উহাকে নাশ করিতে চাহে। আপনাদিগকে সতর্ক থাকিতে হইবে।

“আমি শুনিয়াছি হিন্দুদের কেহ কেহ এই প্রদেশ হইতে চলিয়া গিয়াছে। অল্প লোকের এই স্থান ত্যাগকে বাড়াইয়া দশ লক্ষের একটা অবিদ্বান্ড সংখ্যারূপে বাড়ী করিয়া ভারতীয় সংবাদপত্রসমূহে প্রচার করা হইতেছে ইহাও আমি দেখিয়াছি। এই সংখ্যা খুব বেশী হইলে ২ লক্ষ হইবে, সরকারীভাবে ইহাই বলা যায়। তবে আমি ইহা জানিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি যে মাইনরিটিদের উপর কোনরূপ অত্যাচার ব্যবহার এই স্থানত্যাগের কারণ নহে। তাহাদের উপর কোন উৎপীড়ন তো হয়ই নাই, বরং ভারতীয় ডোমিনিয়নে মাইনরিটিদের সহিত যে দুর্ব্যবহার

হইতেছে এখানে সেরূপ কিছুই হয় নাই ; এখানকার মাইনরিটিরা ভারতীয় ডোমিনিয়নের মাইনরিটিদের চেয়ে অনেক বেশী স্বাধীনতা ভোগ করিতেছে এবং তাহাদের প্রতি অনেক ভাল ব্যবহার করা হইতেছে। ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ সম্বন্ধে ভারতীয় ডোমিনিয়নের কোন কোন সমরলিপু নৈতার অবিবেচনা প্রস্তুত উক্তি, ভারতীয় ইউনিয়নে মাইনরিটিদের উপর যে সব হুঁকুমাবহার হইতেছে পাকিস্তানে তাহার স্বাভাবিক প্রতিজ্ঞার আশঙ্কা এবং ভারতের কোন কোন নেতা কর্তৃক পাকিস্তানের মাইনরিটির হ্রববহার কাল্পনিক বিবরণ প্রচার এই স্থানত্যাগের প্রকৃত কারণ। এখানে ১ কোটি ২০ লক্ষ হিন্দু শান্তিতে ও সুখে বাস করিতেছে এবং স্থান ত্যাগ করিতে অস্বীকার করিয়াছে, ইহার দ্বারাই বুঝা যায় পূর্ববঙ্গে মাইনরিটির উপর অত্যাচারের কাহিনী কত বড় মিথ্যা। আমি আগে যাহা বলিয়াছি, এখনও তাহারই পুনরুক্তি করিতেছি :— মাইনরিটিদের সহিত আমরা শ্রায়সঙ্গত ও ভাল ব্যবহার করিব। ভারতবর্ষের মাইনরিটিদের জীবন ও সম্পত্তি যতখানি নিরাপদ এখানকার মাইনরিটির জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা তার চেয়ে অনেক বেশী। আমরা শান্তি আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিব এবং জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকল নাগরিকের অধিকার অক্ষুর রাখিব।

“পূর্ববঙ্গের আবাসী মুসলমানদের প্রতি কোন কোনও লোকের মধ্যে একটা বিরাট মনোভাব রহিয়াছে। বাংলা অথবা উর্দু পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হইবে তাহা লইয়াও কিছু উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছে। আমি আমার ছাত্রবন্ধুদিগকে বলিতে চাই যে, আপনারা যদি রাজনৈতিক দল-বিশেষের দ্বারা পরিচালিত হন তাহা হইলে মারাত্মক ভুল করিবেন। মনে রাখিতে হইবে যে, বৈপ্লবিক পরিবর্তন হইয়াছে। আপনারা ইতিপাকিস্তানের ভরসামূল। রাষ্ট্রের হিতার্থে আপনাদের কর্তব্য পড়াস্তনার মনোনিবেশ করা। আপনারা যদি ছাত্রাবস্থাতেই শক্তিকে অথবা ব্যয় করিয়া ফেলেন তাহা হইলে রাষ্ট্রের সেবা করিবেন কিরূপে? শত্রুর প্রাদেশিকতার নামে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করিতেছে। সমাজদেহ হইতে এই প্রাদেশিকতার বীজ দূর করিতে না পারিলে আমরা এক জাতি গঠন করিব কিরূপে? বাঙালী, পাঞ্জাবী, সিন্ধী, বালুচী প্রভৃতি হিসাবে নিজেকে পরিচয় দিলে চলিবে না। ১ হাজার ৩ শত বৎসর পূর্বে আমরা যে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলাম তাহা ভুলিতে বসিয়াছি। আমি বলিতে চাই যে আমরা সকলেই এখানে বিদেশী। বাংলার আদি অধিবাসী কাহার? আজ যাহারা বাস করিতেছে তাহার নহে। সুতরাং ‘আমি বাঙালী’, ‘আমি পাঞ্জাবী’ না বলিয়া বলুন ‘আমি মুসলমান’। ইসলাম আমাদের এই শিক্ষাই দিয়াছে। যেখানে যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন আপনি মুসলমান। আমরা এখন এক বিরাট জাতি, এক বিশাল অঞ্চলের অধিবাসী। ইহা কোনও সম্প্রদায়-

বিশেষের বাসভূমি নহে। ইহা আমাদের সকলের। প্রাদেশিকতার মত সিয়া, মুন্সিফাতীয় ধর্মীয় বিভাগও অস্তিত্ব লাভ বিশেষ। আজ আর আমাদের এই সরকার ইংরেজের হাতে নাই। তাহার ভারতকে যথাসম্ভব শোষণ করিয়া গিয়াছে। বর্তমানে সবকিছু আমাদেরই হাতে। আমেরিকার কথা ধরুন। আমেরিকা যখন স্বাধীন হয় তখন তাহাদের মধ্যে ফরাসী, জার্মানি, ইতালীয় প্রভৃতি কত জাতিই না ছিল। তাহার অনেক বিপদ অতিক্রম করিয়া এক জাতি হইয়াছে। উহার কেবল একটি কথাই বলে আমি আমেরিকান। অল্পরূপ ভাবে আমাদেরও বলিতে হইবে আমি পাকিস্তানী।

“আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ভাষা সমস্যা সৃষ্টি করা হইয়াছে। আমি আনন্দিত—আপনাদের প্রধান মন্ত্রী এই সম্পর্কে কোনও গোলযোগ ঘটতে দিবেন না বলিয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বাংলা এই প্রদেশের রাষ্ট্রভাষা হইবে কি না তাহা নির্ধারিত জন-প্রতিনিধিদের বিবেচ্য বিষয়। আমার কোনও সন্দেহ নাই যে, প্রদেশবাসীর ইচ্ছামুত্বারে যথাসময়ে এই প্রশ্নের সমাধান হইবে। আমি স্পষ্টভাবে বলিতে চাই যে, বাংলা ভাষার ব্যাপার লইয়া আপনাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রার বিপর্যয় ঘটান হইবে—এই অভিযোগের মূলে কোনও সত্য নাই। প্রদেশের ভাষা কোনটি হইবে তাহা আপনাদেরই বিবেচ্য; তবে স্পষ্ট জানিয়া রাখুন যে, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা উর্দু ছাড়া আর কিছুই হইবে না। যাহারা অল্প কিছু করতে চাহেন তাহার পাকিস্তানের শত্রু। পৃথিবীর অজ্ঞাত জাতির ইতিহাস দেখুন। একটিমাত্র রাষ্ট্র ভাষা ছাড়া কোন রাষ্ট্রের সংহতি বজায় থাকিতে পারে না। আমি আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে চাই, ‘আপনারা কি পাকিস্তানে বিশ্বাস করেন?’ (হ্যাঁ, হ্যাঁ ধনি।) আপনারা কি পাকিস্তান পাইয়া সুখী হইয়াছেন? (হ্যাঁ, হ্যাঁ ধনি।) আপনারা কি চাহেন যে, পাকিস্তানের কোনও অংশ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সহিত যুক্ত হয়? (না, না ধনি।) যদি ইহাই আপনাদের অভিলাষ হয় তাহা হইলে শপথ করুন যে, আপনি মুসলিম লীগ দলে যোগ দিয়া যথাসাধ্য পাকিস্তানের সেবা করিবেন।

“অনেকেই বলিয়া থাকেন যে পূর্ববঙ্গ পাকিস্তানের অজ্ঞাত অংশ হইতে বিচ্ছিন্ন। ইহা সত্য যে, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে যথেষ্ট দূরত্ব বর্তমান। কিন্তু ভাবিবেন যে, আমরা ঢাকার ও পূর্ববঙ্গের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াছি। এবার আমি মাত্র এক সপ্তাহের জন্ত এখানে আসিয়াছি কিন্তু রাষ্ট্র-প্রধান হিসাবে আমি এখানে প্রায়ই আসিব এবং বহুদিন থাকিব। পাকিস্তানের মন্ত্রিগণও এখানে সচরাচর আসিবেন ও যোগাযোগ রক্ষা করিবেন। আপনাদের মজীরাও পাকিস্তানের রাজধানীতে গিয়া নানারূপ পরামর্শ করিবেন। ধৈর্য ধরুন। আপনাদের সহায়তায় পাকিস্তান এক বিরাট শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হইবে।

পরিশেষে সকলের মঙ্গলের জন্ত আমি আপনাদিগকে যাবতীয় অভাব অসুবিধা সহ করার জন্ত আবেদন জানাইতেছি। এইভাবে আপনাদিগকে কেবল জনবলের দিক দিয়াই যে পৃথিবীর সর্বস্বৎ রাষ্ট্রে পরিণত করিতে পারিবেন তাহা নহে, পরন্তু ইহা এইরূপ শক্তির আকর হইবে যাহা সকলেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবে। আপনাদের মঙ্গল হউক।”

সাপ্তদায়িক প্রয়োজনে একজন রাষ্ট্রনায়ক কত দূর নির্জলা বাজে কথা বলিতে পারেন, পূর্ববঙ্গের মাইনরিটিদের সম্বন্ধে মিঃ জিমার মন্তব্য তাহারই পরিচয়।

পূর্ববঙ্গের প্রকৃত অবস্থা

পূর্ববঙ্গে হিন্দুদের ৪০ হাজার শোভাযাত্রা নির্ব্বাদে যাইতে দেওয়া হইয়াছে এবং সেখানকার হিন্দুদের ধর্ম্মকর্মে কোন বাধা দেওয়া যে হয় না ইহাই তাহার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ—মিঃ জিমার এই উক্তির অসারতা রাজসাহীর জননায়ক ত্রীপ্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থা-পরিষদের অধিবেশনে দেখাইয়া দিয়াছেন। পূর্ববঙ্গের বর্তমান নেতাদের মধ্যে সবচেয়ে তেজপিতার পরিচয় দিয়া আসিয়াছেন বরিশালের সতীন সেন এবং রাজসাহীর প্রভাস লাহিড়ী। একটি ছাঁটাই প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া লাহিড়ী মহাশয় বলেন যে পূর্ববঙ্গের শাসন-ভার তিনটি শক্তির হাতে রহিয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে, প্রথম গবর্নেন্ট, দ্বিতীয় মুসলিম জাশনাল গাড এবং তৃতীয় গুণ্ডা। তাহার নিজের অভিজ্ঞতা এই যে জাশনাল গাড এবং গুণ্ডারা গবর্নেন্টের চেয়ে অনেক বেশী শক্তিমান। ত্রীমুখ লাহিড়ী কর্তৃক ‘গুণ্ডা’ শব্দ ব্যবহারে পরিষদের জনৈক মুসলিম লীগ সদস্য আপত্তি করিলে তিনি ভীতকণ্ঠে তাহার জবাব দিয়া বলেন যে গুণ্ডা সব সমাজেই আছে। তারপর লাহিড়ী মহাশয় বলেন, “ঢাকার আবহমানকাল প্রচলিত ক্রমাষ্টমীর শোভাযাত্রা গবর্নর, প্রধানমন্ত্রী এবং অত্যন্ত মুসলিম নেতাদের উপস্থিতিতে গুণ্ডারা জোর করিয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছে। তাহার শোভা-যাত্রীদিগকে অগ্নির হইতে দিতে পারেন নাই। রাজসাহীর সরস্বতী নিরঞ্জন শোভাযাত্রাও কয়েকটি গুণ্ডার আপত্তির জন্ত বন্ধ করিয়া দিতে হইয়াছে।

বরিশালে পটুয়াখালি শহরেও সরস্বতী নিরঞ্জন শোভাযাত্রা বন্ধ করিয়া দিতে হইতেছে ইহাও আমি জানি। প্রধান মন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনকে সমস্ত ঘটনা জানানো হইয়াছে, কিন্তু তিনি শোভাযাত্রা লইয়া যাওয়ার ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারেন নাই।”

পাকিস্তানে যাহারা বাস করিতে চাহিতেছে তাহাদের সহিত কিরূপ ব্যবহার করা হইতেছে তার একটি উৎকৃষ্ট বিবরণ দিয়াছেন ত্রীমতী নেলী সেনগুপ্ত। পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থা-পরিষদে চট্টগ্রামের হিন্দুদের উপর উৎপীড়নের নিদর্শন তিনি দিয়াছেন এবং অল্প সমস্ত জিলাতেও উহাই ঘটতেছে।

ত্রীমতী নেলী সেনগুপ্ত বলেন যে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ব্যবসায়ীদের উপর অসম্ভব চড়া হারে আয়কর ধার্য করা

হইয়াছে। যে ব্যবসায়ী গত বৎসর আয়কর দিয়াছেন ৯০ হাজার টাকা, এ বৎসর তাহার উপর চাপানো হইয়াছে ৪ লক্ষ টাকা। আর একজন গত বৎসর দিয়াছেন ৯ হাজার, এবার তাহার উপর কর ধার্য হইয়াছে ৫০ হাজার টাকা। এই অবস্থায় বহু ব্যবসায়ী পলাইতেছেন এবং তাহাদের সম্পত্তি নিলাম করা হইতেছে। সংখ্যালঘুদের যাহাদের নিজের বাড়ী আছে তাহাদের প্রত্যেককে বাড়ী ছাড়িতে বাধ্য করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে একজন গৃহহারা হইয়া আশ্রয় খুঁজিতে খুঁজিতে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া মারা গিয়াছে ইহা তিনি নিজে জানেন। একজন কনট্রাক্টর বহু জনকল্যাণ প্রতিষ্ঠানে টাকা দিয়াছেন, তাহাকেও এক সপ্তাহের মধ্যে বাড়ী ছাড়িতে বাধ্য করা হইয়াছে। ইহাদের মত লোকেরাই যদি এই ব্যবহার পান, তবে সাধারণ লোকের অবস্থাটা কি তাহা সহজেই বোঝা যায়। মুসলমান নেতাদের অনেকেই মুখে বলিতেছেন যে সংখ্যালঘুরা দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যায় ইহা তাহার চাহেন না, তাহাদের আচরণ কিন্তু মুখের কথার সম্পূর্ণ বিপরীত হইতেছে।

পূর্ববঙ্গের দূরস্থিত গ্রামের হিন্দুদের অবস্থা কিরূপ নিম্ন-লিখিত পত্রখানি হইতে তাহা বুঝা যাইবে। পত্রপ্রেরক উৎপীড়িত হইবার আশঙ্কায় নামধাম গোপন রাখা হইল,—

“সন্দীপের পরিস্থিতি বড়ই খারাপ হইয়া পড়িয়াছে। কাল রাত্রে চক্রবর্তী মহাশয়ের বাড়ীর ঘরের কপাট ভাঙ্গিয়া একদল লোক টাকার জন্ত তাহাকে বেদম মারপিট করিয়াছে ও তাহাকে দা দিয়া কোপাইয়াছে। তাহার অবস্থা সংকটাপন্ন। তাহাকে টাউনে আনা হইয়াছে। মাথায় হাতে ও গায়ে বহু জখম হইয়াছে। গোলমাল শুনিয়া ঘটনাস্থলে দৌড়াইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু সেও প্রকৃত হইয়া পুতুরে ঝাঁপ দিয়া প্রাণ বাঁচাইয়াছে।

এই ঘটনার তিন দিন আগে বাবুর (আহত ব্যক্তির) ঘরে সিঁদ দিয়াছিল কিন্তু কিছু নিতে পারে নাই। গত ৫ই মার্চ মুছাপুর গ্রামেও এক দাঙ্গাছুর্গতের বাড়ীতে একদল লোক রাত্রে ঢুকিয়া ঘরের বেড়া কাটিয়া লোকজনকে মারপিট করিয়া সমস্ত জিনিষপত্র লইয়া গিয়াছে। এই ঘটনার দাঙ্গা-ছুর্গতেরা ভীষণ ভয় পাইয়া গিয়াছে। লোকের মনের বল নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

লোকের মনের বল নষ্ট হওয়াই পূর্ববঙ্গের হিন্দুর সর্বনাশের প্রধান কারণ দাঁড়াইয়াছে। পুলিশে এজাহার দেওয়া শুধু নিষ্ফল নহে, অধিকতর বিপদের কারণ হইতে পারে ইহাই সাধারণ লোকের ধারণা। পুলিশ ও উচ্চতর অধিকারীভবণের নিকট প্রতিকারের ক্রমাগত চেষ্টা করা এবং লোকের মনে দলগত সাহসের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা যাহাদের কর্তব্য, তাহার তো সর্বত্রই পলাইয়াছেন। এখন সেই সব পেশাদার “কংগ্রেসী” নেতার বদলে প্রকৃত সত্যপ্রিয় কর্ম্মীর প্রয়োজন, নহিলে ভয়াবহ লোক বিকৃত ও বর্ধিত সংবাদে আরও ভয়াবহ হইতে থাকিবে।

যশোরের প্রকৃত ঘটনা এইরূপ :

গত ১৮ই মার্চ একদল বিহারী মুসলমান লাঠি ও ছোরা লইয়া দিবা বিপ্রহরে বাজারের কতকগুলি দোকান আক্রমণ করে। স্থানটি কালেক্টরীর নিকটে। কিছু বাঙ্গালী হিন্দু ও মুসলমানের দোকান লুণ্ঠ হয় এবং কয়েকজন জখম হয়। পুলিশ আসিলে ইহারা প্রস্থান করে।

ইহার কিছুক্ষণ পরে আর একটি বড় দল কালেক্টরীর সম্মুখে জমা হইয়া লাঠি ও ছোরা লইয়া আক্ষালন করিতে থাকে। -কর্তৃপক্ষ তাহাদের বুঝাইয়া শুধাইয়া ঘরে কিরাইয়া দেন। ইহাদের শায়েস্তা করিবার কোন ব্যবস্থা হয় না।

সন্ধ্যার দিকে ষ্টেশনে বরিশাল এক্সপ্রেস আসিয়া পৌঁছিয়া মাত্র ইহারা আবার আবিভূত হয় এবং বেপরোয়াভাবে লাঠি ও ছোরা চালাইতে আরম্ভ করে। জীলোক ও শিশুসহ ১১ জন জখম হয়, তন্মধ্যে একজন মারা গিয়াছে। বিহারী মুসলমানদের আড্ডা হইতে বেআইনি আয়েয়াস্ত পাওয়া গিয়াছে কিন্তু কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই। ষ্টেশনে পুলিশ ছিল, তাহারাও গুণ্ডাদের বাধা দেয় নাই। ম্যাজিষ্ট্রেট বিহারী মুসলমান, তিনি ঘটনাটা চাপা দিবার চেষ্টা করিতেছেন এবং প্রধান মন্ত্রী নাজিমুদ্দীন সাহেবও সেই চেষ্টাতেই রাস্ত।

পূর্ববঙ্গে যাহারা রহিয়াছেন তাহাদের অবস্থা উপরোক্ত-রূপ। ক্রীসতীন সেন, ক্রীপ্রভাস লাহিড়ী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও কোন প্রতিকার করিতে পারিতেছেন না। প্রধান মন্ত্রী নাজিমুদ্দীন সাহেবও স্বীকার করিয়াছেন যে চুরি, ডাকাতি প্রভৃতি বড় বেশী চলিতেছে কিন্তু উহা বন্ধ করিবার জ্ঞাত কর্তার ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে তিনি অপারগ। ট্যাক্স, বাড়ী দখল প্রভৃতি সম্পর্কে ক্রীমতী নেলী সেনগুপ্তা এবং আরও অনেকে যে সব অভিযোগ করিয়াছেন তাহারও প্রতিবিধান হইতেছে না। উক্ত পত্রখানি হইতে দেখা যাইবে যে হিন্দু নারী নির্ধাতন এবং হিন্দুর বাড়ী ডাকাতি হইলে লোকে ধানায় এক্সাহার দিতেও সাহস পাইতেছে না। অথচ পূর্ববঙ্গে একজন উপায়ুক্ত দৃঢ়চিত্ত ডেপুটি হাই কমিশনার বসাইয়া এই অবস্থার প্রতিকারের চেষ্টাটুকু অন্ততঃ অবিলম্বে আরম্ভ হইতে পারে।

উক্ত হইয়া যাহারা চলিয়া আসিতেছেন বা কার্য-ব্যপদেশে যাহাদিগকে অল্পদিনের জ্ঞাত কলিকাতা আসিতে হইতেছে তাহাদের উপর রেলের ষ্টেশনে ষ্টেশনে অবর্ণনীয় অত্যাচার ও জুলুম আরম্ভ হইয়াছে।

ময়মনসিংহের একজন লোকের অভিজ্ঞতার নিম্নলিখিত বিবরণ 'ভারত'-এ প্রকাশিত হইয়াছে :

ভুক্তভোগী ভদ্রলোক কয়েকজন মহিলাকে লইয়া সিরাজ-গঞ্জের পথে কলিকাতা যাইতেছিলেন। প্রথম জগন্নাথ-গঞ্জে পুলিশ তাহাদিগকে অস্ত্রশস্ত্রের খোঁজে তল্লাস করে। নৌকাযোগে সিরাজগঞ্জে গিয়াই ভদ্রলোক বিপদে পড়েন,

দাঁড়াইবার যায়গা নাই। তিনি একজন এ-এস-এম'কে বলিয়া মহিলাদিগকে একটা ঘরের বারান্দায় বসাইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন এমন সময় অপর একজন আসিয়া গালাগালি করিয়া তাহাদিগকে সেখান হইতে বাহির করিয়া দেয়। টিকেট করিতে গিয়া ভদ্রলোক ইন্টার ক্লাসের টিকেট পাইলেন না। টিকেট করিতে হইল থার্ড ক্লাসের—তাও কলিকাতার টিকেট মিলিল না। দর্শনার টিকেট পাওয়া গেল। ইহার জ্ঞাত অতিরিক্ত দক্ষিণ দিতে হইল ৫ টাকা। মাল বুক করার জ্ঞাত অতিরিক্ত ৫ দিতে হইল। একজন হাসানাল গাভ আসিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি নিলেন ৫ টাকা। তারপর একটু আগে ট্রেনের দরজা খুলিয়া মেয়েদের বসিবার ব্যবস্থা করিয়া দিবার অজুহাতে ট্রেন একজামিনার নিলেন টিকিট পিছু একটাকা করিয়া। ভদ্রলোক অস্থম্য করেন, নানা প্রকারে হাজার টাকার উপরে টাকা আদায় করা হইয়াছে।

ঈশ্বরদীতে অবস্থা আরও খারাপ। আগেই খবর পাওয়া গিয়াছিল যে, সেখানকার অত্যাচার অসহ্য। কয়েকজন যাত্রী গাভ সাহেবকে কিছু টাকা গছাইয়া তাড়াতাড়ি গাড়ী ছাড়িবার ব্যবস্থা করেন, যাহাতে অত্যাচারিগণ বেশী সময় না পায়। কিন্তু গাড়ী ছাড়িবারাত্র কয়েকজন গুণ্ডা শ্রেণীর মুসলমান গাড়ীতে উঠে এবং কথা নাই বার্তা নাই চারটি ট্রান্স তাহাদের গাড়ী হইতে জানালা দিয়া বাহিরে ফেলিয়া দেয়। সেগুলি নাকি খানাতল্লাস করা হইবে। অথচ ঐ লোকগুলি কোন সরকারী লোক নয়। বাস্তবিকের মালিকগণও নামিয়া পড়েন। মহিলা-গণকে একজন পরিচিত ব্যক্তির জিম্মা করিয়া দিয়া যিনি এই বর্ণনা দিতেছেন তিনিও নামিয়া পড়েন। তাহার রাস্তাও নামাইয়া নেওয়া হইয়াছিল।

বে-সরকারী লোকগুলি জিম্মিপত্র রেল পুলিশের নিকট লইয়া যায়। সেখানে একজন দারোগা ছিলেন। তাহাকে সকলেই ছোটবাবু ডাকিতেছিল। ছোটবাবু জানাইয়া দিলেন, যাহারা জিম্মি দাবি করিবে তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া নাটোর পাঠান হইবে। আর যাহারা দাবীদাওয়া না করিবে তাহাদের মাল 'দাবীদার নাই' বলিয়া সরকারে জমা দেওয়া হইবে। আমাদের ভদ্রলোকটি জিজ্ঞাসা করেন পুলিশ নিজেরা জিম্মিপত্র না ধরিয়া বাজে লোক কেন জিম্মি ধরিয়া প্রধান মন্ত্রীর আদেশের অত্যাচার করিতেছে? ফলে ছোটবাবুট একটা রুই দিয়া তাহাকে আদায় করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রধান মন্ত্রী ও ভদ্রলোকের উদ্দেশ্যে কুৎসিত অশ্লীল গালাগালি করেন। ভদ্রলোক তাহার জিম্মিপত্রের মায়া ছাড়িতে পারিলেন না। অনেক অস্থম্য বিনয় করিলেও ছোটবাবুর

কল্পণার উদয় হইল না। তিনি বলেন একটি দিয়াশলাই'র কাটিও ভারতীয় ইউনিয়নে নিতে দেওয়া হইবে না।

একজন অভিযোগ করিলেন, তিনি তিন দিন যাবৎ আটক আছেন। তাঁহার এমন পয়সা আর হাতে নাই যে, তিনি কিছু কিনিয়া মুখে দেন। আমাদের সংবাদ-দাতাটি পুনরুট টাকা ছোটবাবুকে দিয়া আবার ময়মনসিংহে ফিরিয়া আসিবেন, এই সৰ্ত্তে মুক্তি পান। তাঁহাকে ময়মনসিংহের টিকেট কিনিয়া ট্রেনে উঠাইয়া দিয়া ছোটবাবু আশ্বস্ত হন।

এক জঙ্গলোক তাঁহার জিলার ম্যাজিষ্ট্রেটের আফিসের শীল দেওয়া ছাড়পত্র দেখাইয়াও মুক্তি পান নাই।

পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ভারত-সরকার বা পশ্চিমবঙ্গ-সরকার কেহই পরিষ্কার করিয়া কোন কথা বলিতেছেন না। অনিশ্চিত ও সংশয়াকুল অবস্থায় উপরোক্ত পরিবেশের মধ্যে বাস করিয়া মানুষ দিশাহারা হইতে বাধ্য এবং ইহারই ফলে এক দল চলিয়া আসিতেছেন, অথবা মেরুদণ্ড বিহীন হইয়া অত্যাচারীদের হাতে আত্মসমর্পণ করিতেছেন। বলা বাহুল্য এই দুইটাই সমান ক্ষতিকর। এক কোটি কুড়ি লক্ষ হিন্দুর এক পঞ্চমাংশও চলিয়া আসিতে পারিবেন না ইহা নিশ্চিত। আবার তাঁহাদের নেতৃস্থানীয় মধ্যবিত্ত ও সমৃদ্ধিশালী হিন্দুরা চলিয়া আসিলে নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুরা শেষ পর্য্যন্ত মুসলমানধর্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবে ইহাও নিশ্চিত। মোল্লারা এখনই গ্রামে এই উদ্দেশ্যে ঘোরাক্ষেপ আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা নেতারা মানিয়া লইয়াছেন কিন্তু জনসাধারণ মানিয়া লয় নাই। নেতারা মানিয়াছিলেন এই আশায় যে উহাতেই হয়ত সাম্প্রদায়িক বিরোধ এবং হানাহানির অবসান ঘটবে। কিন্তু তাহা হইল না। পশ্চিম পাকিস্তান জয়লাভ করিয়াই তাহার অন্তর্ভুক্ত সমস্ত ভিন্ন ধর্ম্মকে বিভাঙিত করিল এবং কাশ্মীর আক্রমণ করিয়া পাকিস্তানের সীমানা বিস্তারে অগ্রসর হইল। পাকিস্তানের উচ্চতম নেতাদের সঙ্গে আপোষ অসম্ভব ইহা কাশ্মীরের ব্যাপারে প্রমাণিত হইয়াছে।

এখন সমস্ত পূর্ববঙ্গ। পূর্ব বাংলার মুসলমানেরা নিজেদের পাকিস্তানীরূপে জাহির করিয়া পঞ্জাবের দাস হইয়া থাকিতে স্বীকার করিতেছে না, উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা বলিয়া মানিতেও তাহারা রাজী নয়—তাহারা বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষা করিতে চায়। এদিক দিয়া পাকিস্তানের চেয়ে বাংলার সহিত তাহাদের যোগ ঘনিষ্ঠতর। মিঃ জিন্না ঢাকায় আসিয়া বাঙালী মুসলমানদের বাঙালীত্ব তুলাইবার জন্ত অতুলন-বিনয় এবং তর্জনগর্জন সবই করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয় সমাবর্তনে জিন্না সাহেবের বক্তৃতার বিরুদ্ধে বাঙালী মুসলমান ছাত্রেরা কায়েদে আজমের মুখের উপর প্রতিবাদ করায় ইহাই বুঝাইতেছে যে শিক্ষিত মুসলমান তরুণ দল

জিন্না সাহেবের অজ্ঞায় ছকুম এবং জবরদস্তি নতশিরে মানিয়া লইবে না। ঢাকা সমাবর্তনের এই ছোট অশচর্য্য ঘটনাটিকে 'ডন' পত্রিকা হিন্দুদের ষাড়ে চাপাইয়া লিখিয়াছেন যে হিন্দু ছাত্রেরাই কায়েদে আজমের মুখের উপর তাঁহার কথার প্রতিবাদ করিয়া 'না, না' বলিয়াছিল। বঙ্গভাষা আন্দোলনের দায়িত্ব হিন্দুদের ষাড়ে চাপাইয়া তাহাদিগকে পাকিস্তানের শত্রু বলিয়া খাড়া করিবার চেষ্টা খাজা নাজিমুদ্দীন নিজেও করিয়াছিলেন কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সেই মনোভাব চাপা দিতে বাধ্য হইয়াছেন। যশোর শ্রেষ্টেনের ঘটনাও ইহাই বুঝাইতেছে যে হিন্দুদের উপর দোষারোপ করিয়া তাহাদের উপর আক্রমণ চালাইবার প্রধান কারণ মুসলমানদের নিজেদের অন্তর্বিরোধ চাপা দিবার প্রয়াস। পূর্ববঙ্গে হিন্দুদের উপর আক্রমণের অর্থ এত স্পষ্ট যে ভারতীয় ইউনিয়নের তরফ হইতে উহার প্রতিকারের জন্ত এত দিন খুব জোরালো ভাবে রাষ্ট্রনৈতিক চাপ দেওয়া উচিত ছিল। নচেৎ মুসলমানদের প্রত্যেকটি অন্তর্বিরোধ এবং দলাদলি চাপা দেওয়ার জন্ত হিন্দুরা লক্ষ্যস্থানীয় হইয়া উঠিলে সেখানে তাহাদের বাস করা অসম্ভব হইবে। পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের জানা এবং বোঝা দরকার যে তাহারা অসহায় নহে, তাহাদের পিছনে ভারতীয় ইউনিয়নের প্রবল শক্তি রহিয়াছে; মুসলমানেরা ইহা উপলব্ধি করিলে হিন্দুর উপর অত্যাচারে সাহসী হইবে না। দক্ষিণ-আফ্রিকার বা সিংহলের ভারতবাসীদের জন্ত ভারত-সরকার যতটা মনোযোগ দেন, পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের জন্ত সেটুকুও দেওয়া হইতেছে না ইহা বস্ততঃই দুঃখের বিষয় এবং ভারতীয় ইউনিয়নের পক্ষে চরম দৌর্বল্যের পরিচয়।

পূর্ববঙ্গ হইতে বাহারা বাস্তভিটা ছাড়িয়া আসিতেছেন এবং বাহারা আসিতে ইচ্ছুক তাঁহাদের উভয়েরই জানা দরকার যে স্বাবলম্বন ভিন্ন বর্তমান অবস্থায় উপায় নাই, কারণ কেন্দ্রীয় সরকার যে অর্থসাহায্য করিবেন তাহা অকিঞ্চিৎকর। যে কয়েক লক্ষ লোক আসিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে ৫ কোটি টাকা ভাগ করিয়া দিলে জনপ্রতি ২৫৩০ টাকা পড়ে। ১ কোটি ২০ লক্ষ লোক ঐ টাকার উপর ভরসা করিয়া চলিয়া আসিতে চাহিলে জনপ্রতি পাঁচটা টাকাও পড়িবে না। তার পর আছে স্থানভাব। ইংরেজ ষাওয়ার সময় পশ্চিমবঙ্গের আয়তন এমন করিয়া দিয়া গিয়াছে যাহাতে পূর্ববঙ্গের সমস্ত হিন্দু কিছুতেই এখানে না আসিতে পারে। বিহার বাঙালী এলাকা ছাড়িবে না বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ ইহা বুঝাইয়া দিয়াছেন এবং তাঁহার অনুগত সেবক ডাঃ প্রহ্লাদ ঘোষ স্পষ্ট ভাষায় জানাইয়াছেন যে উহা হইবার নহে কারণ ইহাতে ওয়ার্কিং কমিটির মত নাই। বিহারে গিয়া বাঙালীর পক্ষে বাঙালী হিসাবে বাস করা দুঃস্বপ্ন হইয়া উঠিতেছে। আসায় দরজা বন্ধ করিতেছে। এই অবস্থায় ভারত-সরকারের সাহায্য পাইলেও পূর্ব বাংলার হিন্দু ভিন্ন প্রদেশে বসতি স্থাপন করিতে পারিবে

না, প্রাদেশিক সরকারগুলি তাহাদের জীবন নানা ভাবে দুর্ব্বল করিয়া এবং জীবনযাত্রার পথ সঙ্কুচিত করিয়া তাহাদের বাস অসম্ভব করিয়া তুলিবে।

পূর্ববঙ্গ হইতে যাহারা আসিয়াছেন তাহাদের আশ্রয়দানের যথাযথ ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া উচিত এবং ভারত-সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ-সরকার এত দিনে এ বিষয়ে কতকটা অগ্রণী হইয়াছেন। তবে এই সাহায্য অসহায় ও অসমর্থরাই যাহাতে পায় তাহা দেখা প্রয়োজন। পঞ্জাবের ৪০ লক্ষ লোক ভারতে আসায় ভারত-সরকার হিম্মত খাইয়া গিয়াছেন এবং পৃথিবী-ব্যাপী একটা বিরাট হৈ চৈ পড়িয়াছে। এদিকে পূর্ববঙ্গ হইতে লক্ষ লক্ষ বাঙালী পশ্চিমবঙ্গে আসিয়াছেন, কিন্তু কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক সরকার কাহাকেও ইহাতে বিব্রত হইতে হয় নাই, একটি পরসাত্ত্ব তাহাদের খরচ হয় নাই। বাঙালীর সহিষ্ণুতার ইহা কম পরিচয় নহে।

কলিকাতা কর্পোরেশন

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কলিকাতা কর্পোরেশন ভাঙ্গিয়া দিয়া উহার পরিচালনভার একজন এডমিনিষ্ট্রেটরের হাতে অর্পণ করিয়াছেন। এডমিনিষ্ট্রেটর নিযুক্ত হইয়াছেন মিঃ এস, এন, রায়। বলা বাহুল্য প্রধান মন্ত্রী ডাঃ বিধান রায়ের এই কার্যে শহরবাসী মাঝেই সন্তুষ্ট হইয়াছে। মাত্র এক বৎসরের জন্ত কর্পোরেশন এডমিনিষ্ট্রেটরের হাতে গিয়াছে, ইহার মধ্যে উহার অনেক গলদ দূর করিতে হইবে। কর্পোরেশনের দুর্নীতি দূর করিবার জন্ত একটি কমিশন নিযুক্ত হইতেছে। দুর্নীতিপরায়ণ অফিসারদের কর্পোরেশন হইতে বিতাড়ন, ভবিষ্যতে দুর্নীতি বন্ধ করিবার পথ নির্দেশ এই কমিশনের কাজ হইলে লোকে আরও সন্তুষ্ট হইবে। ইতিমধ্যেই কর্পোরেশনের সিটি আর্কিটেক্ট, পলতা পাম্পিং স্টেশনের ওয়াটার ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি কয়েকজন দুর্নীতিপরায়ণ কর্মচারী বরখাস্ত হইয়াছেন।

দীর্ঘকাল যাবৎ কর্পোরেশন নাগরিকদের প্রতি কর্তব্য সম্বন্ধে উদাসীন। জলসরবরাহ নিত্যন্ত অসন্তোষজনক, পরিশ্রুত এবং অপরিশ্রুত উভয়বিধ জলই প্রয়োজনের তুলনায় কম। অথচ এদিকে শহরে লোক বাড়িয়াই চলিয়াছে। কলের জল সরবরাহ বাড়াইতে হইলে পাম্পিং স্টেশনে একটি অতিরিক্ত ফিলটার এবং পলতা হইতে টালা পর্য্যন্ত একটি অতিরিক্ত মেইন পাইপ বসানো একান্ত দরকার, অথচ এ বিষয়ে আজ পর্য্যন্ত কিছুই করা হয় নাই। ফিলটার বসাইতে অন্ততঃ দুই বৎসর দরকার অর্থাৎ এখনই উহার কাজ আরম্ভ হইলে আগামী গ্রীষ্মের পরের গ্রীষ্মে লোকে কিছু বেশী জল পাইবে। বৎসরাধিক কাল যাবৎ এই প্রস্তাব লইয়া কেবল আলোচনাই চলিতেছে, গত বৎসর কাজ আরম্ভ হইলে আগামী গ্রীষ্মেই বেশী জল পাওয়া যাইত, এখন দুই বৎসর অপেক্ষা করিতে হইবে। নূতন মেইন পাইপ না বসাইলে পর্য্যাপ্ত জল সরবরাহ হইতে পারে না, এখন যে তিনটি মেইন পাইপ আছে সেগুলি দিয়া

আর এক গ্যালন জলও বেশী দেওয়া সম্ভব নয়। নূতন মেইন পাইপ বসাইয়া শেষ করিতে প্রায় পাঁচ বৎসর লাগিবে, সুতরাং যত আগে কাজ আরম্ভ করা যায় ততই মঙ্গল। ডাষ্টবিনের জমাট ময়লা পরিষ্কার কিছুতেই নিয়মিত হইতেছে না, পথবাট পরিষ্কার রাখা তো দূরের কথা। আগে ভোর না হইতে রাস্তা জল দিয়া ধুইয়া দেওয়া হইত, লোক পথে বাহির হওয়ার আগে জল শুকাইয়া যাইত। এখন বেলা আটটা-নয়টার জল দেওয়া হয়, ফলে সারাটা রাস্তা ধুইয়া সাফ হওয়ার পরিবর্তে কাদা হইয়া আরও নোংরা হয়, আরও বেশী ধূলা হয়। অধিকাংশ রাস্তারই আলো খারাপ, কতকাল যে মেরামত হয় নাই তার ইয়ত্তা নাই। কোথাও একটা বাল্ব নষ্ট হইয়া গেলে উহা বদলাইতে সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাটিয়া যায়। রাস্তাগুলির অবস্থা অতিশয় শোচনীয়। প্রত্যেক রাস্তায় অসংখ্য গর্ত। গাড়ী চালানো যেমন বিপজ্জনক, বাস যাত্রীদেরও তেমনি নির্দম ঝাঁকুনি সহ্য করিতে হয়। বৃষ্টির দিনে জলময় রাস্তা পার হইবার সময় গর্তে পা পড়িয়া পা ভাঙিবার এবং মচকাইবারও বিলক্ষণ সম্ভাবনা থাকে। রাস্তার পাশের শৌচাগারগুলি নরককুণ্ডে পরিণত হইয়া রোগের বীজাণু ছড়াইতেছে, বোধ হয় এক যুগ ঐগুলিতে হাত দেওয়া হয় নাই। কোন কোন স্থানে মিলিটারী লরীর ধাক্কায় ঐগুলি ভাঙিয়া চূর্ণ হইয়াছে, তৎস্থানে নূতন করিয়া নির্মাণ করা হয় নাই। ভূগর্ভস্থ ড্রেনগুলি ভাল ভাবে পরিষ্কার হয় না, ময়লা জমিয়া ঐগুলির পরিসর ছোট হইয়া আসিতেছে। এইগুলির প্রতিবিধান অনতিবিলম্বে আরম্ভ হওয়া উচিত।

আয়ের অবস্থাও তদ্রূপ। প্রতি বৎসরই অর্থাভাবের কথা বলা হয় এবং বাজেটেও ঘটিত হয়। কিন্তু যে সব টাকা কাউন্সিলার বা তাহাদের আত্মীয়স্বজন ও অহুগৃহীতদের নিকট বাকী পড়িয়াছে তাহা আদায় হয় না। আমাদের বিশ্বাস বাকী টাকার পরিমাণ লাখ পঞ্চাশের কম হইবে না। তার উপর কমাইয়া ট্যাক্স ধরা তো আছেই। প্রথমে যে অ্যাসেসমেন্ট করা হয় একটু তদ্বিরাদি করিতে পারিলেই আপত্তি দিয়া তাহা অনেক কমাইয়া লওয়া যায়। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অ্যাসেসমেন্ট প্রথমেই অত্যন্ত কম ধরা হয়, পরে আপত্তি দিলে আরও কমাইয়া দেওয়া হয়। এই সমস্ত টাকা এখন কর্তোরহস্তে আদায় আরম্ভ হওয়া দরকার।

কর্পোরেশনের অনসংখ্যক কর্মচারী ভিন্ন আর কেহই বড় একটা কাজ করেন নাই, কাউন্সিলারদের তুষ্ট রাখিয়া গতামুগতিকভাবে চাকুরি বজায় রাখিয়াছেন, অনেকে কাজ না করিয়া বা অত্যাঁজ কাজ করিয়াও উন্নতি করিতে পারিয়াছেন। সং ও দক্ষ কর্মচারীরা পদে পদে কাউন্সিলারদের অত্যাঁজ হস্তক্ষেপের জন্ত কর্তব্য পালনে বাধা পাইয়াছেন, অনেক ক্ষেত্রে তাহাদিগকে বাধ্য হইয়া হাত গুটাইয়া থাকিতে হইয়াছে। এই অবস্থার প্রতিকার একান্ত আবশ্যক এবং

সহজেই ইহা করা যায়। আমাদের মনে হয় কর্পোরেশনের চীফ এন্সিকিউটিভ অফিসার, ডেপুটি এন্সিকিউটিভ অফিসার, চীফ ইঞ্জিনিয়ার, সেক্রেটারী, অ্যাসেসর, কালেক্টর, সিটি আর্কিটেক্ট, ওয়াটার ওয়ার্কস ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি গুরু দায়িত্বপূর্ণ উচ্চতম পদগুলি পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সুপারিশক্রমে পূর্ণ করা উচিত। পাবলিক সার্ভিস কমিশন এই সব পদের এক একটির জন্ত দুই তিন বা চার জন প্রার্থী বাছিয়া দিবেন, কর্পোরেশন তাহার মধ্য হইতে একজনকে নিযুক্ত করিবে। চাকুরি বা পদোন্নতির জন্ত ইহাদিগকে কাউন্সিলারদের উপর নির্ভর করিতে না হইলে দুর্নীতির পথ অনেকটা বন্ধ হইয়া আসিবে। কর্পোরেশনের কর্মচারীদের মনোবল ফিরাইয়া আনিবার ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় এবং তাহাদের মনোবল দৃঢ় করিতে না পারিলে কর্পোরেশন কখনও ভাল ভাবে চলিবে না।

কম্যুনিষ্ট পার্টি বেআইনি

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কম্যুনিষ্ট পার্টিকে বেআইনি ঘোষণা করিয়াছেন এবং পার্টির ১২৫ জন কর্মীকে গ্রেপ্তার করিয়াছেন। নামকরা কম্যুনিষ্ট কর্মীরা সকলে ধরা পড়েন নাই, অনেকে আত্মগোপন করিয়াছেন। কিছুদিন যাবৎ কম্যুনিষ্টদের কার্যকলাপের দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছিল যে দেশের স্বার্থ অপেক্ষা বিশেষ একটি বহিঃশক্তির স্বার্থসাধন তাঁহাদের প্রধান লক্ষ্য। কংগ্রেস গবর্নেন্ট দেশে যাহাতে শক্তিশালী হইয়া উঠিতে না পারে তাহার জন্ত ইহার সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন। কম্যুনিষ্টদের প্রধান লক্ষ্য ছিল দ্রব্যমূল্যের বর্তমান হার বজায় রাখা, কারণ ইহাতে লোকে কংগ্রেস গবর্নেন্টের উপর অসন্তুষ্ট হইয়া থাকে। এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্ত কম্যুনিষ্টরা কল-কারখানায় সামান্যমাত্র অছিলায় ধর্মঘট বাধাইয়া উৎপাদনে বাধা দিত এবং ঐ সঙ্গে মজুরী বৃদ্ধিতে মালিককে বাধা করিয়া উৎপাদনের ব্যয় বাড়াইয়া তুলিত। তেভাগা আন্দোলনের নামে কৃষাণদের জমি চাষে নিষেধ করিয়া এবং উৎপন্ন ফসল না কাটিয়া উঠা মাঠে পচাইয়া জমির মালিককে জঙ্গ করিবার নামে উৎসাহ দিয়া তাহারা প্রচুর খাজ নষ্ট করিয়াছে এবং এই উপায়ে খাদ্যসমগ্র্য সমাধানে বাধা দিয়াছে। শস্য সংগ্রহেও ইহার গবর্নেন্টকে প্রবল ভাবে বাধা দিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের চেষ্টা এবং লাল ফৌজকে অস্ত্র চালনা শিক্ষাদানের আয়োজন। তাহারা তিনটি মূলনীতি অবলম্বন করিয়া কাজ করিয়াছে :

(১) দেশের অর্থনৈতিক অসন্তোষ বজায় রাখিয়া জনসাধারণকে কংগ্রেস গবর্নেন্টের উপর ক্রমশঃ বিরূপ করিয়া তোলা, (২) কংগ্রেস গবর্নেন্টের কোথাও কোন ক্রটি-বিচ্যুতি পাইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে বড় করিয়া তুলিয়া কংগ্রেস-বিরোধী আন্দোলন সৃষ্টি এবং নিজেদের জনগণের বন্ধু বলিয়া প্রচার এবং (৩) সুযোগ প্রাপ্তি মাত্র কংগ্রেসকে

বিতাড়িত করিয়া গবর্নেন্ট দখল করিবার জন্ত অস্ত্রশস্ত্র, সুশিক্ষিত ফৌজ ও সুগঠিত দল লইয়া প্রস্তুত থাকা। ইহাদের কার্যক্রমের এই তিনটি দ্বারা ক্রমেই পরিষ্কার হইয়া আসিতেছিল কিন্তু গবর্নেন্ট এ বিষয়ে একেবারেই নির্বিকার ছিলেন। ডাঃ বিধান রায় কম্যুনিষ্ট মুখপত্র ‘স্বাধীনতা’র উপর সামান্য একটি সতর্কতামূলক আদেশ দিয়া দুই দিনের মধ্যে উহা প্রত্যাহার করিলে কম্যুনিষ্টরা উহাকে সরকারের দুর্বলতা বলিয়া প্রকাশে প্রচার করে এবং ইহাতে ডাঃ রায়ের গবর্নেন্টের উপর জনসাধারণের বিশ্বাস অনেকটা আঘাত প্রাপ্ত হয়। ত্রিকিরণশর রায় কঠোর হস্তে কম্যুনিষ্টদের দেশদ্রোহিতামূলক কার্যকলাপ বন্ধ করিতে অগ্রী হওয়ায় লোকে সন্তুষ্ট হইয়াছে। এই কার্য আরও আগে হওয়া উচিত ছিল, এখন তো আর দেরি করিবার কোন উপায়ই ছিল না। বোম্বাই হইতে সোস্যালিষ্ট দল কম্যুনিষ্টদের বিতাড়িত করিয়াছেন; কানপুরে শ্রীহরিহরনাথ শাস্ত্রীর নিকট ইহার পদে পদে হটতে বাধা হইতেছে। এমতাবস্থায় কম্যুনিষ্ট দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয় কলিকাতায় স্থানান্তরিত করিবার আয়োজন হইতেছিল।

এখন একটি বিষয়ে বাংলা সরকারকে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। খাজ বস্ত্র এবং অস্ত্রাশ্রয় নিত্যব্যবহার্য দ্রব্য জনসাধারণের নিকট সহজলভ্য করিয়া দিয়া তাহাদিগকে সপ্রমাণ করিতে হইবে যে কম্যুনিষ্টদের জ্বালাতেই ইহা এত দিন পারা যায় নাই। সমাজের শত্রু চোরাকারবারীরা যদি এখনও অভাব জীরাইয়া রাখিতে পারে তবে সমস্ত দোষ আসিয়া পড়িবে গবর্নেন্টের উপর এবং লোকে কম্যুনিষ্টদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়া পড়িবে। কম্যুনিষ্টদের একটি অতিশয় শক্তিশালী ও বৃহৎ অংশ ধরা পড়ে নাই। তাহারা গুপ্ত সমিতি গঠন করিয়া কাজ চালাইবে। সরকারের প্রতি আপামর সাধারণের বিশ্বাস যদি টলিয়া যায় তবে কম্যুনিষ্ট গুপ্ত সমিতি দ্বারা হইয়া উঠিবে, দেশের সর্বনাশ হইবে। দেশে অসন্তোষের জায়সম্মত কারণ বজায় থাকিলে গুপ্ত সমিতির মোহ হইতে তরুণদলকে রক্ষা করাও অসম্ভব হইবে। গবর্নেন্ট যদি এখন তাঁহাদের কার্যের দ্বারা প্রমাণ করিতে পারেন যে ক্যাপিটালিষ্টদের সহিত তাঁহাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে বলিয়া কম্যুনিষ্টরা যে বদনাম দিয়া থাকে তাহা মিথ্যা কথা, বস্তুতঃ এমন কোন সম্পর্ক তাঁহাদের নাই, কম্যুনিষ্টদের দ্বারা ক্যাপিটালিষ্টদের মধ্যে যাহারা দেশের স্বার্থ বিরোধী আচরণ করিতেছে, তাহাদিগকেও তাঁহারা সমান ভাবে কঠোর হস্তে দমন করিতেছেন তাহা হইলে কম্যুনিষ্ট পার্টির ভবিষ্যতে মাথা তুলিবার সমস্ত পথ নির্মূল হইবে।

হরিণঘাটা পরিকল্পনা

দৈনিক পত্রিকার পৃষ্ঠায় এই বিষয় লইয়া, এই পরিকল্পনার অপব্যয় লইয়া কিছু আলোচনা হইয়াছে। সমস্ত ব্যাপারটা

বুঝিতে হইলে এই পরিকল্পনার জন্ম-বিবরণ জানা থাকা চাই। ১৯৪৪ সালে মিঃ রবার্ট কেসি বাংলার গবর্ণর নিযুক্ত হইয়া আসেন। তিনি বাংলার নানা অভাব দূর করিবার জন্ত চেষ্টা হইয়াছিলেন। বাংলাদেশের কৃষির উৎপাদনশক্তি বর্তমান যুগের অনেক দেশ হইতে কম; বাংলাদেশের গো-জাতি ভারতবর্ষের অত্যন্ত প্রদেশের সঙ্গে তুলনায় অপুষ্টি ও অসুস্থ; বাংলাদেশে ছুঙ্কের আয়োজন প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত অপ্রচুর। কলিকাতা নগরীর ছুঙ্কের প্রয়োজন মিটাইবার জন্ত যে ব্যবস্থা আছে, গরু ও মহিষের খাটাল যেকোনো বিক্ষিপ্তভাবে কলিকাতার স্বাস্থ্যের হানি করিতেছে, তাহা দেখিয়া কেসি সাহেবের মাথায় একটা খেয়াল খেলে। বাংলাদেশের গো-জাতির উন্নতির জন্ত নদীয়া জেলার হরিণঘাটা অঞ্চলে ৭,০০০ হাজার বিঘা জমি লইয়া একটা “গোকুল” তৈয়ার করিবার জন্ত নিউ-জিল্যান্ড দেশ হইতে তিন জন কৃষিবিদ ও গো-বৈজ্ঞানিক আনয়ন করেন। একটা পরিকল্পনার কাঠামো প্রস্তুত হয়। শ্রী-নিকেতনের প্রতিষ্ঠাতা এলম্বার্ট সাহেবের নামও এই উপলক্ষে শোনা যায়; দুই-এক জন বাঙালী আই-সি-এসের কল্পনা-শক্তিও এই উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হইয়াছিল বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে। লাট বাহাদুরের খেয়াল চরিতার্থ করিবার জন্ত অটেল টাকার ব্যবস্থা হইল। সুতরাং হরিণ-ঘাটায় “গোকুলের” জন্ত এই দুই-তিন বৎসরে ব্যয় হইয়াছে ৫৫ লক্ষ টাকা—কিন্তু আজ পর্যন্ত একটি গোরুও ঐ স্থানে দেখা দেয় নাই। ৫৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে কর্মচারী শ্রেণীর ধরবাড়ী-তৈয়ার করিতে, বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনামুযায়ী মাত্র ৫০০ শত গোরু থাকিবার ব্যবস্থা করিতে।

এখন প্রশ্ন উঠিয়াছে—এই ধরবাড়ী, খাটাল লইয়া কি করা যায়। ইহা পশ্চিম বাংলার গলায় কাঁটার মতন ফুটিয়া আছে। ইচ্ছা থাকিলেও ফেলিয়া দিবার উপায় নাই; ৫৫ লক্ষ টাকা জলে ফেলা যায় না। সুতরাং প্রস্তাব হইয়াছে যে এই পরিকল্পনার পূর্ণ রূপ দিবার জন্ত আরও বিশ লক্ষ টাকা ব্যয় করা প্রয়োজন, এবং বাৎসরিক নয় লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া এই স্থানকে “গোকুলে” পরিণত করিতে হইবে। রাজস্ব-মন্ত্রী শ্রীমলিনীরঞ্জন সরকার ইহার জন্ত এই পরিমাণ অর্থের ব্যবস্থা করিয়াছেন, এবং আমরা আশ্চর্য্য হইব না যদি আগামী দুই-তিন বৎসরের মধ্যে এই কাজে এক কোটিও ব্যয় হয়। এই ব্যয়ের সার্থকতা কোথায় এই সংশয় অনেকের মনে দেখা দিয়াছে। কারণ ইংরেজ আমলের বহু ব্যয়সাধ্য পরিকল্পনা আমাদের অদৃষ্টগুণে ব্যর্থ হইয়াছে। এই কথা বুঝিয়াই প্রায় আশি বৎসর পূর্বে বড়লাট লর্ড মেয়ো তাঁর অধীনস্থ কর্মচারিবৃন্দকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁর সময়েই-কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের অঙ্গস্বরূপ একটা ব্যবসায় ও কৃষি-বিভাগ স্থাপিত হয়। কৃষি বিভাগের কার্য সম্বন্ধে লর্ড মেয়ো এই কথা বলেন—

“In connection with agriculture we must be careful of two things. First, we must not ostentatiously tell native husbandmen to do things which they have been doing for centuries. Second, we must not tell them to do things which they can't do, and have no means of doing.”

অর্থাৎ, ভারতবর্ষের কৃষি সম্বন্ধে উপদেশ দিবার সময় দুইটি বিষয়ে সতর্ক হইতে হইবে। প্রথম, খুব বড়াই করিয়া এমন কিছু বলা যা ভারতবর্ষের কৃষক যুগযুগান্ত হইতে করিতেছে; দ্বিতীয়, এমন কিছু বলা যাহা ভারতবর্ষের কৃষকের করিবার সঙ্গতি নাই।

হরিণঘাটার পরিকল্পনা প্রস্তুতিতে লর্ড মেয়ো এই কথাগুলি মনে রাখিলে বাংলাদেশের গলায় এই কাঁটা আটকাইত না। এখন এই কথা লইয়া দুঃখ করিয়া লাভ নাই। ইংরেজ আমলের বহু ব্যবস্থা ও আয়োজনকে আমাদের দেশের অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া লইতে হইতেছে। সেই জন্ত হরিণঘাটায় যে অর্থ ব্যয় হইয়াছে, তাহার পিছনে আরও কিছু অর্থ ফেলিতে হইবে। গো-জাতির উন্নতি না হইলে কৃষির উন্নতি হইতে পারে না। সেই জন্ত হরিণঘাটায় পশ্চিম বাংলার কৃষির উন্নতি-কল্পে সমস্ত কর্ম-প্রচেষ্টাকে কেন্দ্রীভূত করিলে হয়ত নূতন যুগোপযোগী একটা আদর্শ কৃষি-ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে পারা যাইবে। এই পরীক্ষাগারের ফল দিকে দিকে ছড়াইয়া দিতে হইবে; নূতন জ্ঞান চাষীর হৃদয়ে লইয়া যাইতে হইবে; তাহার সঙ্গতি ও সামর্থ্যের পক্ষে সহজসাধ্য করিতে হইবে। এই আশা বাংলাদেশের সরকারী কৃষিবিদ-দিগকে নূতন কর্ম-স্থলে আহ্বান করিতেছে। হরিণঘাটায় ৫০০টি গোরু রাখিলে চলিবে না। কলিকাতায় যে ৩০,০০০ হাজার গোরু-মহিষ আছে, তাহাদিগকে হরিণঘাটার পল্লী পরিবেশের মধ্যে লইয়া যাইতে হইবে। জাত গোয়ালাকে নূতন শিক্ষা দিতে হইবে; নূতন “গোয়াল” শ্রেণীর সৃষ্টি করিতে হইবে। পশ্চিম বাংলার কোন কৃষি বিদ্যালয় নাই। হরিণঘাটায় তাহার প্রতিষ্ঠা হইতে পারে। তার জন্ত চাই এই অঞ্চলের নদী-নালায় উন্নতি; সারা বৎসর যেন এই অঞ্চলে জলের ব্যবস্থা থাকিতে পারে; যমুনা নামে যে নদী মরিয়া গিয়াছে, তাহাকে ভাগীরথীর সঙ্গে আবার সংযোগ করিয়া দিতে হইবে। হয়ত এমনও প্রয়োজন হইতে পারে যে মুর্শিদাবাদ, নদীয়ার নদী-সমূহের জল-স্রোত সংহত ও সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া মধ্য বঙ্গের পূর্বের কৃষি-সম্পদ ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিতে হইবে। তখন হরিণঘাটায় যে অর্থ ব্যয় হইয়াছে, তাহা সাব্যস্ত হইতে পারে। কোন “ভগীরথ” এই পুণ্য কার্যে অগ্রণী হইবেন?

আমাদের জাতীয় জীবনে সর্ব ক্ষেত্রে আজ একটা রিক্ততা ও রুদ্ধতা পরিলক্ষিত হইতেছে। নানা জনে নানা ভাবে তাহার প্রতিকার চেষ্টার কথা চিন্তা করিতেছেন। নানা ভাবে নানা পরিকল্পনার হাটে আমাদের হারাইয়া যাইবার সম্ভাবনা

দেখা দিয়াছে। খাদ্যশস্যের ফসল বাড়াইতে হইবে, শিল্প-ঈশ্বরের উৎপাদন বাড়াইতে হইবে; নূতন নূতন শিক্ষা দিয়া মানুষ তৈয়ার করিতে হইবে; তাহারা হইবে আমাদের নব-লব্ধ স্বাধীনতার ধারক ও রক্ষক। এই তিনটি কর্তব্যের মধ্যে কোনটি প্রথমে হাতে লইতে হইবে, তৎসম্বন্ধে নানা তর্কের উৎপত্তি হইয়াছে। এই তর্কের ধূম্রজাল ভেদ করিয়া রাষ্ট্র-নায়কদের অগ্রসর হইতে হইবে। যাহার নেতৃত্বে আমাদের দেশ ইংরেজের শাসন ও শোষণের পাপ মুক্ত হইয়াছে, তাঁহার মনে এই সম্বন্ধে কোন দ্বিধা ছিল না। তিনি খাওয়া পরার ব্যবস্থার কথা, এই সম্বন্ধে আত্ম-নির্ভরশীল হওয়ার কথা আমাদের প্রথম হইতেই শুনাইয়াছিলেন। নানা সংস্কারের বাধায় আমরা তাঁর নির্দেশানুযায়ী চলিতে পারি নাই। তাঁর তিরোধানের পরেও সেই কর্তব্য অর্পণ হইয়া আছে। হরিণ-ঘাটায় যে কর্ম-প্রচেষ্টার ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে, তাহা সেই অর্পণ কার্যের ইঙ্গিত দিয়া আমাদের সামনে দাঁড়াইয়া আছে। পশ্চিম বাংলার মস্তি-মণ্ডলী, পশ্চিম বাংলার জন-মণ্ডলী মন স্থির করিতে পারিলে পশ্চিম বাংলা খাদ্য-শস্যের জুড়ি বিশ্বের দরবারে হাত পাতিতে যাইবে না। হরিণঘাটায় পশ্চিম বাংলার শক্তি পরীক্ষা হইবে।

পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান

শ্রীকিরণশঙ্কর রায় পশ্চিমবঙ্গের শান্তি রক্ষার ভার পাইয়াছেন; সরকারী ভাষায় তিনি স্বরাষ্ট্র-সচিব; লোকের প্রাণ, মান, ধনরক্ষার দায়িত্ব তাঁহার। পশ্চিমবঙ্গের ১৯৪৮-৪৯ সালের আয়-ব্যয়ের বরাদ্দ লইয়া আইন-সভায় বিতর্ক চলিয়াছে। এই আয়-ব্যয়ের মধ্যে পুলিশের খাতে বিতর্কের সময় তিনি নাকি “আর একদফা আত্মসবাগী শুনাইয়াছেন” সংখ্যালিখিত সম্প্রদায়কে। “ইত্তেহাদ” পত্রিকা এই ভাষাই ব্যবহার করিয়াছেন; পড়িয়া মনে হয় পাকিস্থানী দৈনিক খানি পশ্চিমবঙ্গের স্বরাষ্ট্রসচিবের কথায় “আত্মস” পাইতেছেন না। আমাদের প্রতিবেশী সমাজের মনোভাব বুঝিবার জুড়ি নিম্নলিখিত কথাগুলি উদ্ধৃত করিতেছি। গত ২রা তারিখের সংখ্যায় তাহা প্রকাশিত হইয়াছিল।

ভারত বিভাগের পর উভয় ডোমিনিয়নের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জীবন অত্যন্ত বিঘ্নিত হইয়া পড়িয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় যেমন নিজেদেরকে অসহায় ‘বলীর ছাগ’ বলিয়া ভাবিতেছে, পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ও ঠিক তেমনি নিজেদেরকে নিঃসঙ্গ এবং বিপদগ্রস্ত মনে করিতেছে। দেশের বৃহত্তর রাজনৈতিক জীবনের রাজপথে ভ্রমণ করা ত দুঃস্বপ্নের কথা, দৈনন্দিন জীবনের অলিগলিতেই আজ তাহারা ঠাই পাইতেছে না। তবে পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের এই হতাশাব্যঞ্জক মনোভাব হইতে যদি কেহ মনে করে যে, উভয় বঙ্গে সাম্প্রদায়িক অশান্তির দরুণই

এরূপ ঘটতেছে, তাহা হইলে খুবই ভুল করা হইবে। অত্যন্ত আনন্দের কথা উভয় বঙ্গে সাম্প্রদায়িক অশান্তি আজ নাই, তবু কেন এরূপ ঘটতেছে? সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মান-সিক ভাবধারা আজ যে পর্যায়ে নামিয়াছে, তাহাতে সামান্য খুঁটিনাটি ব্যাপারই তাদের জীবনে শেলসম্বাজিতেছে। ছোটখাটো মানসিক নির্বাতন আজ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জীবনকে দুঃসহ করিয়া তুলিয়াছে।

আমাদের দেশের পাকিস্থানীরা কি মনে করিয়াছিলেন যে তৎকালীন সংখ্যালিখিত সম্প্রদায় কেবলমাত্র ভাগবীটোয়ারার ফলেই খুব শান্তিতে থাকিবে? রাতদিন চীৎকার করিয়া “ইত্তেহাদ”-গোষ্ঠী ত মুসলমানের চক্ষে হিন্দুকে দুঃমন বানাইয়াছিল, এই প্রচারণার ফলে মুসলমানের মনোভাব কৌন্ ধারায় বহিয়াছিল এবং কৌন্ কন্দ-পন্থা তাহারা অবলম্বন করিয়াছিল তাহা আজ সর্জনবিদিত। হিন্দু ও শিখ কলসীর কাণায় রক্তাক্ত হইয়া প্রেম দিতে পারে নাই, ইহা সত্য। ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগষ্ট হইতে দেশে যে তাণ্ডবের সৃষ্টি হইল তার শ্রেষ্ঠ বলি গান্ধীজী। তাঁহার আত্মত্যাগে মুসলমান সম্প্রদায়ের কেহ কেহ তাঁহাদের আত্মঘাতী নীতির ব্যর্থতা বুঝিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু হাত হইতে পাশা চলিয়া গেলে যেমন তাহা ফিরাইয়া আনা যায় না, সেইরূপ পাকিস্থানী ব্যবস্থার পরিবর্তনের কোন আশা নাই। অনেক পাকিস্থানী সংবাদপত্র গান্ধীজীর প্রশংসা পাইয়াছেন তাঁহার দেহত্যাগের পর। তাঁহাদের কায়েদে আদম যে ভাষায় গান্ধীজীর প্রশংসা করিয়াছিলেন তাহা পাকিস্থানী মনোভাবের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পরিচয়। এইরূপ প্রশংসার মধ্যেও হিন্দু মুসলমানের পার্থক্যই ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টার অন্ত নাই। “পাকিস্থান টাইমস্” নামে একখানি পত্রিকা লাহোর হইতে প্রকাশিত হয়। গান্ধীজীর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতে গিয়া যে ভাষায় এই পত্রিকাখানি তাহার মনোভাব প্রকাশ করিয়াছে, তাহা প্রতিধানযোগ্য।

“There have been great heroes in history who lived and fought and died to preserve their own people from dangers that threatened and from enemies lying in wait. It would be hard to name any one who has fallen fighting his own people to preserve the honour of a people not his own. No greater sacrifice could be rendered by a member of one people to another . . .”

এই প্রশংসিতলিখকের মতে ভারতীয় মুসলমান—বাহাদের জুড়ি গান্ধীজী জীবন বিসর্জন দিলেন—তাহারা তাঁহার আপনায় জন নয়; তাহারা প্রতিবেশী হইয়াও পরদেশী। এই কথার মধ্যে যদি কোন সত্য থাকে, তবে ভারতবর্ষের মুসলমান, পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান, কখনও ভারতবর্ষের বা পশ্চিমবঙ্গের আপনায় হইতে পারে না। এবং পূর্ববঙ্গের হিন্দু তার প্রতিবেশী মুসলমানের আপনায় হইতে পারে না, কখনও আপনায় হইতে পারিবে না। “ইত্তেহাদ”-সম্পাদক পূর্ববঙ্গের

ময়মনসিংহ জেলার অধিবাসী। তিনি পশ্চিমবঙ্গে বিদেশী, পরদেশী। পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের পক্ষে ওকালতি করার প্রলোভন ছাড়িতে পারেন না। “পশ্চিমবঙ্গের শাসনযন্ত্রের প্রত্যেক বিভাগে, বিশেষ করিয়া পুলিশ ও সামরিক বিভাগে সংখ্যালঘুদের আয়সঙ্গত দাবি যদি স্বীকৃত হয় তবেই তাহারা উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইবে যে তাহারাও রাষ্ট্রীয় যন্ত্রের সক্রিয় পরিচালক...” যে আপনার জন নয় (“a people not his own”) তার হাতে পুলিশ ও সামরিক বিভাগের ক্ষমতা কি ভাবে দেওয়া যাইতে পারে? পাকিস্তানী মনোভাব যে অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে, তাহারই ফলভোগ পশ্চিমবঙ্গের ষাট লক্ষ মুসলমান ও পূর্ববঙ্গের এক কোটি বিশ লক্ষ হিন্দুকে আজ করিতে হইতেছে।

আজমীর দরগাহ্

প্রায় আট শত বৎসর পূর্বে সাধক খানা মৈনউদ্দিন চিস্তি আজমীর শহরে এক দরগাহ্ স্থাপন করেন, এবং ঐ স্থানে তাঁর দেহ রক্ষা করেন। আজ পৃথিবীব্যাপী মুসলিম সম্প্রদায়ের নিকট এই দরগাহ্ পূণ্যস্থান বলিয়া সম্মানিত যেমন শ্রীহট্টের শাহ্ জালালের দরগাহ্। কালে হিন্দু সম্প্রদায়ের অনেকের নিকট, উত্তর-ভারতের অনেক হিন্দুর নিকট, এই দরগাহ্ পূণ্যস্থান বলিয়া সম্মানলাভ করিয়াছে। গত অক্টোবর মাসে এই দরগাহ্-র শান্তি নষ্ট হয়, যখন পশ্চিম পন্থাবে অনুষ্ঠিত অমাহুদিক অত্যাচারের খবর দিকে দিকে বিস্তৃত হয়। কেবল মুসলমান বলিয়া অনেকে অত্যাচারিত হন, যেমন পশ্চিম পন্থাবে হিন্দু ও শিখেরা হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় গবর্নেন্ট এই উদ্ভাদনা অতি শীঘ্র কঠোরহস্তে দমন করেন। গত ২৯শে ফাল্গুন তারিখের সংবাদপত্রে এই দরগাহ্-র এমাম সৈয়দ গিয়াস-উদ্দিন খাঞ্জা সাহেব এক বিবৃতি দিয়া ভারতবর্ষের গবর্নেন্ট কর্তৃক “দরগাহ্ সন্নিক্ত ও আমাদের খাদেম সম্প্রদায়ের বিশেষ ভাবে যত্ন নিতেছেন” এই কথা স্বীকার করেন। ভবিষ্যতেও এই শান্তি অব্যাহত থাকিবে এই বিশ্বাসে তিনি ঘোষণা করিয়াছেন যে খাঞ্জা সাহেবের “ওরফ” আগামী ২৭শে বৈশাখ (১০ই মে) হইতে আরম্ভ হইবে। এই সম্পর্কে পাকিস্তান গবর্নেন্টের আচরণ লক্ষ্য করিবার বিষয়। “নান-কানা সাহেব” গুরু নানকের জন্ম-স্থান, শিখ সম্প্রদায়ের পবিত্রতম তীর্থ-স্থান। গুরু নানকের জন্ম-দিবস উপলক্ষে বাহিরের কোন শিখকে “নানাকানা সাহেব” শহরে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় নাই। বর্তমানে এই তীর্থ-স্থানের অবস্থা কি তাহা আমরা জানি না; শিখ সম্প্রদায় বিনা বাধায় “নানকানা সাহেবে” যাইতে পারেন কিনা জানি না। “আজমীর সন্নিক্ত ও নানকানা সাহেব” সহজে একটা বোঝা-পড়া করা ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় গবর্নেন্টের কর্তব্য।

পাকিস্তানীর প্রত্যাবর্তন

গত জুলাই মাসে তদানীন্তন ভারত গবর্নেন্ট ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের কর্মচারিয়দেরকে তাঁদের রাষ্ট্র বাহিয়া লইবার অধিকার দেন। তখন ঘির হইয়া গিয়াছে যে ভারতবর্ষে দুইটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইবে। রাষ্ট্র বাহিয়া লইবার অধিকার পাইয়া কর্মচারীরা নিজ নিজ জ্ঞান-বিশ্বাস অনুসারে রাষ্ট্রের সেবা করিয়া নিজ নিজ সার্থকতা লাভ করিবার এই যে অধিকার পাইল, তাহা গণতন্ত্রের নীতি সম্মত। সেই ব্যবস্থা অনুসারে কেন্দ্রীয় গবর্নেন্টের অধীনস্থ প্রায় ৫০,০০০ হাজার কর্মচারী—রেল বিভাগ, ডাক বিভাগ ও তার বিভাগের কর্মচারীই তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ—পাকিস্তান রাষ্ট্র বাহিয়া লয়। এই ব্যবস্থা অনুসারে ৪০,০০০ হাজার কর্মচারী চিরকালের জন্ত পাকিস্তান বাহিয়া লয়, এবং ১০,০০০ হাজার সাময়িক-ভাবে পাকিস্তানে চলিয়া যায়। তাহাদের মত পরিবর্তন করিবার অধিকার থাকে। অর্থাৎ তাহারা ভারত রাষ্ট্রের চাকুরীতেও ফিরিয়া আসিতে পারে। গত ৭ই মার্চ তারিখের একটি সংবাদে জানা যায় যে প্রায় ১২,০০০ কর্মচারী এই ভাবে ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিবার জন্ত প্রস্তুত হইয়া আছে। এই সংবাদে দিল্লীর রাজনীতিক মহলে নানা সমস্তার আলোচনা হইতেছে। এই ১২,০০০ হাজার কর্মচারীর মনোভাব কিরূপ হইবে, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই; ইহাদের ভবিষ্যৎ বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে কেহ কোন নিশ্চয়তা দিতে পারে না। এইরূপ প্রস্তাব করা হইতেছে যে বিশেষ কোন প্রতিজ্ঞা দ্বারা ইহাদের সন্তোষ পরীক্ষা করিতে পারা যায়। এরূপ প্রতিজ্ঞার কোন মূল্য আছে বলিয়া মনে হয় না; কারণ পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রয়োজনে অনেকেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া প্রত্যাবার্তা হইবার জন্ত প্রস্তুত হইবে। ভারতবর্ষের হিন্দু মুসলমান দুই “নেশন” এই তত্ত্বের উপরেই ভারতবর্ষকে ভাগ করা হইয়াছে; কারণ মুসলিম লীগের মতে দুই “নেশন” এক রাষ্ট্রের ছায়াতলে বাস করিতে পারে না। এই তত্ত্ব স্বীকার করিয়া এখন “পাকিস্তানী” ভাবাপন্ন লোকেরা কেন অপর রাষ্ট্রের সেবা করিতে আসিবে, তৎসম্বন্ধে নানা প্রশ্নের উদ্ভব হইতে পারে।

অপর পক্ষে ইহা বলা হইতেছে যে ভারত রাষ্ট্রের কর্মচার-গণ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া আছেন যে ছয় মাসের মধ্যে, ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে, যদি কোন “পাকিস্তানী” কর্মচারী ফিরিয়া আসিতে চায় তবে তাহাকে তাহার পূর্ব-পদে বহাল করিতে হইবে। পাকিস্তান রাষ্ট্র এরূপ কোন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিল কিনা জানি না। মনে হয় না যে, একতরফা ব্যবস্থায় ভারত রাষ্ট্রের শাসক সম্প্রদায় রাজী হইয়াছিলেন। এই উপলক্ষে সেই পরীক্ষাটা হইয়া গলে মন্দ হয় না। পাকিস্তানের অধিবাসী তাহারা ভারত রাষ্ট্রে চাকুরী করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল, তাহাদেরও ইচ্ছা পরিবর্তন

করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছিল। সেইরূপ লোকের সংখ্যা কত তাহা আমরা জানি না। ইহা জানি যে একমাত্র ঐন্ট জেলার অধিবাসী কর্মচারী, যাহারা ভারত রাষ্ট্রে চাকুরি করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল, তাদের সংখ্যা ছিল প্রায় ৬০০ শত জন। ইহাও আমরা জানি পূর্ববঙ্গের গবমেণ্ট তাহাদের আমল দেন নাই এবং ভারত রাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষ এই অবিচারের কোন প্রতিকার করিতে পারেন নাই। ১২,০০০ পাকিস্তানীর প্রত্যাভর্তন উপলক্ষে এই অবিচার স্মরণে একটা হেস্ট-নেস্ট করা উচিত। পূর্ববঙ্গ গবমেণ্টকে চাপ দিতে হইবে। ভারত রাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষ এই কর্তব্য অবহেলা করিলে, লোকমত তাহা সহ্য করিবে না। এই পরিণতির কথা মনে রাখিয়া নেহরু গবমেণ্টকে কর্তব্য স্থির করিতে হইবে। এই মুখ-সন্ধানী পায়রাবাদের সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে।

মাতৃভাষা ও প্রদেশ বিভাগ

মাতৃভাষার ভিত্তিতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশকে বিভক্ত করার নীতি জাতীয় মহাসমিতি বহুদিন পূর্বে, প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্বে, গ্রহণ করিয়াছিল। এই নীতি অধুনারে বিভিন্ন ভাষার ভিত্তিতে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি গঠিত হইয়াছিল। এই সংগঠন ইংরেজ কর্তৃক প্রদেশ বিভাগের ব্যবস্থা অনুসরণ করে নাই। দৃষ্টান্ত-রূপ বলা যায় যে মাদ্রাজ প্রদেশে চারিটি ভাষাভাষী লোকসমষ্টির আকাজক্ষা অধুনারে চারিটি প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি সংগঠিত হয়—যথঃ, তেলুগুভাষী অঙ্গ কংগ্রেস কমিটি, তামিল নাদ (দেশ) কংগ্রেস কমিটি, কর্ণাটক কংগ্রেস কমিটি ও কেরালা কংগ্রেস কমিটি। এই ভাবে মাদ্রাজ প্রদেশে ইংরেজ নিষ্কিষ্ট সীমানার মধ্যে চারিটি স্বয়ংসিদ্ধ প্রদেশের গোড়াপত্তন হয়। সেইরূপ মুরমা উপত্যকার অন্তর্ভুক্ত ঐন্ট ও কাছাড় জেলা ইংরেজী বিধানের আসাম প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল, কিন্তু কংগ্রেসী গঠন-তন্ত্রে এই দুই জেলা বাংলা প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির অধীন ছিল। আজ কংগ্রেসের হাতে শাসনক্ষমতা আসিয়াছে, এবং দেশের লোকে মনে করে যে কংগ্রেসের এই প্রাচীন নীতির রূপ দিবার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় গবমেণ্টের উপর পড়িয়াছে। এই দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করিতে হইলে দেশের চতুর্দিকে নানা প্রদেশের সীমানা পরিবর্তন করিয়া কয়েকটি নূতন প্রদেশের সৃষ্টি করিতে হইবে, এবং কোন কোন পুরাতন প্রদেশের সীমানা পরিবর্তনের প্রয়োজন হইবে। এই পরিবর্তন গণতন্ত্রের মূলনীতি অনুসরণ করিবে—সংস্পর্শ জনগণের আশা-আকাজক্ষা ও স্বার্থবুদ্ধির পরিপোষক হইবে। এই নীতিকে রূপদান করিতে হইলে একভাষাভাষী জনগণের ভাবকে প্রাধান্য দিতে হইবে। আমরা আশা করিয়াছিলাম যে আমাদের কেন্দ্রীয় গবমেণ্ট এই কর্তব্যে করিৎকর্মা হইবেন, নিজের উদ্যোগী হইয়া কোটি কোটি লোকের বহুগুণসঞ্চিত আবেগের প্রতি সম্মান দেখাইবেন।

কিন্তু কার্যতঃ দেখিতেছি যে পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু প্রভৃতি কেন্দ্রীয় গবমেণ্টের কর্তৃপক্ষ এই বিষয়ে টালবাহানা করিতেছেন, এবং নানা স্থানে নানা বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিয়া সকলকে বিভ্রান্ত করিতেছেন। কেন্দ্রীয় আইন সভার অধিবেশনে ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের নীতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়; ডিকাগাপটমে পণ্ডিত নেহরু ঘোষণা করেন যে অঙ্গ প্রদেশের জন্ম অদূরবর্তী। কিন্তু তেলুগু ভাষাভাষী লোকসমষ্টিই কেবলমাত্র এই বিষয়ে আগ্রহীল নহে। তামিল, কর্ণাটক, কেরালা, মহারাষ্ট্র, এই কয়টি প্রদেশ সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতি আছে, এবং নব গঠিত পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের পশ্চিম সীমান্তে বিহার ও উৎকলে অন্তর্ভুক্ত বঙ্গভাষাভাষী লোকের দাবি আজ পর্য্যন্ত বৎসর হইতে অপরূপ হইয়া আছে। অপরূপ আশা-আকাজক্ষা যে বিক্ষোভের সৃষ্টি করে এবং রাষ্ট্রের গঠনমূলক কর্মপ্রচেষ্টাকে বাহ্যত করে, তাহা ভারত-রাষ্ট্রের নেতৃবর্গের অজ্ঞাত নয়। পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু এই বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করিলে এই প্রশ্নের সুমীমাংসা করিবার জন্ত ব্যস্ত হইতেন; নানা উপলক্ষে নানা পরস্পর-বিরুদ্ধ কথা বলিয়া ও কাজ করিয়া জনগণের মনে বিক্ষোভ সৃষ্টির সম্ভাবনাকে এরূপ ভাবে অবহেলা করিতেন না। তিনি বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে তেলুগু, তামিল, বাঙালী মারাঠিরূপে এখন আর ভাবিলে চলিবে না; ভারতবাসীরূপে ভাবিতে হইবে, সকলভারতীয় সমস্তা সমাধানের কথা অগ্রে ভাবিতে হইবে; তাহা হইলে এই প্রাদেশিক ক্ষুদ্রতা অবান্তর হইয়া পড়িবে।

এরূপ কথার না আছে মাথা, না আছে মুণ্ড। তেলুগু, তামিল, মারাঠি, কর্ণাট, বাঙালী ভাবে ভাবুক হইলে ভারতীয় হইবার পথে প্রতিবন্ধক জন্মায় এরূপ অশ্রদ্ধেয় কথার উচ্চারণ আমরা তাঁহার নিকট হইতে প্রত্যাশা করি নাই। গত এক শত বৎসরের ইতিহাস এইরূপ কথার প্রতিবাদ করিতেছে। বাংলা দেশের ইতিহাস বরং তার বিরুদ্ধ কথার সাক্ষ্য দিতেছে। যে পরিমাণে আমাদের বাঙালী, বাঙালী সংস্কৃতির উপর শ্রদ্ধা ও মমতা বৃদ্ধি পাইয়াছে, সে অধুনাতে আমাদের ভারতীয় অহুত্ব সচেতন হইয়াছে। এই সত্য স্বীকার না করিলে আমাদের এক শত বৎসরের ইতিহাস অর্থহীন হইয়া পড়ে; তার মধ্যে কোন সঙ্গতি খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। প্রদেশ গঠন বা পুনর্গঠন কঠিন কার্য হইতে পারে; বর্তমানে এই কার্যে হাত দিবার অবসর নাই বা এই কার্য সমাধোপযোগী নয়, এইরূপ যুক্তিতে কোন লোক কান দিবে না। স্বাধীন রাষ্ট্রের শাসন কার্য কঠিন, তাহা জানিয়া গুনিয়াই আমরা স্বাধীন রাষ্ট্র চাহিয়াছি ও তাহা আদায় করিয়াছি। ভারত রাষ্ট্রের চতুর্দিকে যে সব দেশীয় রাজ্য বিক্ষিপ্ত ভাবে ছড়াইয়া আছে, তাদের নৃপতিবর্গকে ভারত-রাষ্ট্রের সঙ্গে ঋণ ঋণায়িয়া

লওয়া সহজ কাজ ছিল না। এই প্রায় ছয় শত নৃপতির ভ্রম-ভাবনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, শ্রেণী ও বংশের স্বার্থের সমন্বয় সাধন সহজ কাজ ছিল না। আজ শুনিতে পাই তাহা সম্ভব হইয়াছে সর্দার বনভ ভাই প্যাটেলের কৌশলে, এবং বর্তমান কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে এই কৃতকার্যতার জন্ত প্রশংসার দাবী করা হইতেছে।

প্রদেশ গঠন বা পুনর্গঠন এই কাজ হইতে কঠিন নয়। তবুও এই কাজে হাত দিতে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্ট অনিচ্ছুক বা অপারগ কেন, তার পক্ষে কোন যুক্তি আজ পর্যন্ত আমরা শুনি নাই। নব-বঙ্গ সমিতির স্মারকলিপির উত্তরে ভারত রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী বলিয়াছেন যে পশ্চিম বঙ্গ, বিহার ও উৎকলের মধ্যে সীমানা পরিবর্তন করিবার সময় এখনও আসে নাই। কেন আসে নাই, এবং কখন তাহা আসিবে তৎসম্বন্ধে পণ্ডিত নেহেরু নীরব। এদিকে ভারত রাষ্ট্রের গঠন-তন্ত্র প্রস্তুত হইতেছে; তার খসড়া প্রকাশিত হইয়াছে। এবং একপ ধোষণা করা হইয়াছে যে আগামী জৈষ্ঠ বা আষাঢ় মাসের মধ্যে এই খসড়ার আলোচনা শেষ হইবে, এবং ভারত-রাষ্ট্রের গঠন-তন্ত্র চূড়ান্ত ভাবে গৃহীত হইবে। এই খসড়ার ১৫৯ পৃষ্ঠায় দেখিতে পাই কেবলমাত্র অন্ধ্রপ্রদেশের নাম; খসড়া প্রণয়ন কমিটি প্রস্তাব করিয়াছেন যে একটি অনুসন্ধান কমিশন নিযুক্ত করিতে হইবে, তার কর্তব্য হইবে ভাষাগত সাদৃশ্যের উপর ভিত্তি করিয়া নূতন প্রদেশ গঠন বা পুরাতন প্রদেশের সীমানা পরিবর্তন বা পরিবর্তন সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপারের অনুসন্ধান করিয়া নিজের প্রস্তাব করা। এই প্রস্তাব অনুসারে নূতন প্রদেশ গঠন বা পুরাতন প্রদেশের সীমানা পরিবর্তনের উল্লেখ ভারত রাষ্ট্রের গঠনতন্ত্রে স্থান পাইবে। এত সব ব্যবস্থা বাকী তিন মাসের মধ্যে কি করিয়া সম্পূর্ণ করা হইবে তাহা জামি না। প্রদেশ গঠন বা পুনর্গঠন সম্বন্ধে এত দাবী দাওয়া আছে যে তাহার সমাধান সহজ নয়।

একটি মাত্র দাবীর প্রতি মনোযোগ দিলে তাহা স্পষ্ট হইবে। যে বাঙালী অধ্যুষিত স্থানকে ১৯১২ সালে বিহারের মধ্যে ঢুকাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, আজ ৩৫ বৎসরে তার সংশোধন হইল না। ১৯১২ সালের জাহুয়ারি মাসে নব সৃষ্ট বিহার প্রদেশের কয়েকজন নেতৃবৃন্দ লিখিতে পারিয়াছিলেন যে,

“বাংলাভাষাভাষী অঞ্চলগুলি বাংলাদেশের সঙ্গে যোগ করিয়া বাংলাদেশের শাসন-ব্যবস্থার অধীনে আনিতে হইবে; হিন্দীভাষাভাষী অঞ্চল বিহার প্রদেশের শাসনাধীনে থাকিবে। এই ব্যবস্থানুসারে মহানন্দ নদীর পূর্ব তীরের পূর্ণিয়া ও মালদহের অংশবিশেষ...বাংলা দেশে যাইবে...। সেইরূপ সাঁওতাল পরগণার যে সব অঞ্চল বাংলাভাষাভাষী লোকের বাসস্থান তাহা বাংলায় যাইবে...। ছোট নাগপুর সম্বন্ধে এই ব্যবস্থা করা যায়; সমগ্র মানভূম জেলা, সিংহভূম জেলার ধলভূম পরগণা

বাঙালী অধ্যুষিত এবং এই দুই অঞ্চল বাংলাদেশে যাইবে...।”

আর ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে বিহারের নেতা বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ কি উপদেশ দিতেছেন? কোন কৌশলে বাংলা-ভাষাভাষী অঞ্চলকে হিন্দীভাষাভাষী অঞ্চলে রূপান্তরিত করিতে পারা যায় তাহাই ভৎসনার ছলে তিনি বলিতেছেন:

“বিহার হিন্দী সাহিত্য সম্মেলনের অক্ষমতার জন্তই আজ বাঙালীরা সিংহভূম ও ধলভূমের উপর দাবী করিতেছে...সিংহভূম ও ধলভূম অঞ্চলে হিন্দী ভাষার প্রচার করিতে হইবে; তখনই আমরা এই সব অঞ্চল হিন্দীভাষাভাষী বলিয়া দাবী করিতে পারিব।”

বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ কংগ্রেসের সভাপতি। তিনি গান্ধীজী প্রবর্তিত সত্য ও ছায়ের নিষ্ঠাবান সাধক এবং জননায়ক। বিহার হিন্দী সাহিত্য সম্মেলনে প্রদত্ত বক্তৃতার যে অংশ উপরে উদ্ধৃত হইয়াছে, তার উদ্দেশ্য ঠিক সত্য ও ছায়ের অনুমোদিত নয়। বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের মত নেতা যখন এমন কৌশলের উপদেশ দিতে পারেন, তখন প্রদেশ গঠন বা পুনর্গঠনের পথে বাধা কি, তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। তবুও এই কর্তব্য পালন করিয়া যাইতে হইবে। ভারত রাষ্ট্রের গঠনতন্ত্রে এই ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করিয়া লইতে হইবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসব

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাৎসরিক সমাবর্তন উৎসব উপলক্ষে গুজরাটের চিন্তানায়ক ও হায়দরাবাদ রাজ্যে ভারত রাষ্ট্রের প্রতিনিধি ত্রীকানাইয়ালাল য়ুনসীকে সমাবর্তন ভাষণ প্রদান করিবার আমন্ত্রণ করা হয়। তাঁহার মুখে আমরা কোন নূতন কথা শুনিতে পাইলাম না। “সৃষ্টি-মূলক শিক্ষার” (“Creative education”) সম্বন্ধে তিনি ইঙ্গিতে মাত্র কিছু বলিয়াছেন এবং ইংরেজ আমলের শিক্ষাকে নশাৎ করিয়া নূতন কোন পথ দেখাইতে পারেন নাই। ইংরেজ “তার শক্তি জিয়াইয়া রাখিবার জন্ত উকীল, মোক্তার, অফিসার সৃষ্টি করিত”, এই কথা সত্য। কিন্তু ইংরেজী শিক্ষা জবাহরলাল নেহরু, সর্দার প্যাটেল ও “নেতাজী” মতন লোকেরও সৃষ্টি করিয়াছে। এই কথাটাও ঐতিহাসিকের মনে রাখিতে হইবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর ত্রীপ্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নূতন স্কুল কলেজ স্থাপনের সংবাদ দিয়া ও অর্থ-ভাবের কথা নানা ভাবে, নানা সুরে জানাইয়া তাঁর বক্তৃতা শেষ করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃদ্বারা বাৎসরিক ৫০,০০০ হাজার টাকা ব্যয়ে “কৃষি বিষয়ক গবেষণা” ও কৃষির উন্নতিকল্পে একটা আয়োজন চলিতেছে; একজন বদাও ব্যক্তির ৫০,০০০ হাজার টাকা দানে একটি “সদীপ্ত বিদ্যালয়” প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইয়াছে; একজন “বিশিষ্ট সাংবাদিকের” নিকট হইতে “পর্যাপ্ত দানের প্রতিশ্রুতি” পাইয়া বিশ্ববিদ্যালয়

- একটি “সাম্বাদিকতা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের” কার্য আরম্ভ করিবেন আগামী আষাঢ় মাসে।—এই সব সংবাদের মধ্যে আমরা
- কোথাও স্বাধীন ভারতের নাগরিক সৃষ্টি করিবার জন্ত কোন সার্থক আয়োজনের ইঙ্গিত পাইলাম না। গতানুগতিক পরীক্ষা, স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠা, পরীক্ষা শুধু পাঁচ টাকা বৃত্তি—ব্যবসায় বুদ্ধির এই সব কথার মধ্যে উৎসাহ পাইবার কিছু নাই।

ভারতবর্ষের “ঐতিহ্য”

আজ বিজ্ঞানের যুগ। বিজ্ঞানের কল্যাণে নানা শিল্পের কল্পনাতীত উন্নতি হইয়াছে। সেইজন্ত বিজ্ঞান ও শিল্পের কথা বলিতে লোকে আশ্চর্য হইয়া পড়ে, এবং স্বাধীন ভারতের জীবন-যাত্রা পুনর্গঠনের জন্ত বিজ্ঞানের প্রয়োজন, শিল্পের প্রসারের প্রয়োজন—এই কথা বেদ-বাক্যের ছায় আমরা সকলে স্বীকার করিয়া লইতেছি। এরূপ একতরফা আলোচনা কেন্দ্রীয় আইন সভায় প্রায়ই শোনা যায়। গত ২৭শে ফাল্গুন এই বিষয়ে ভারতের শিক্ষামন্ত্রী মোলানা আবুল কালাম আজাদ বিতর্কের উত্তরে অনেক কথা বলিয়াছেন যাহা প্রবিশদযোগ্য,—“বিজ্ঞান ও শিল্প শিক্ষার উপর জোর দিলেই চলিবে না। যুগান্তব্যাপী ভারতীয় ঐতিহ্যকে কোনক্রমে উপেক্ষা করা যায় না।” সঙ্গীত, কলাবিজ্ঞা, স্থপতিবিজ্ঞা, নাটক, নৃত্য, চিত্রবিজ্ঞা এই ঐতিহ্যের বাহ্যিক রূপ। এই রূপকে বর্তমান যুগোপযোগী করিয়া ফুটাইয়া তুলিবার জন্ত গুণী ও জ্ঞানীর প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে লক্ষ্মী শহরের হিন্দুস্থানী সঙ্গীত বিদ্যালয়টিকে সম্প্রদায়িত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে; দক্ষিণ-ভারতে কর্ণাটের সঙ্গীত চর্চার জন্ত আর একটি সঙ্গীত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে। একটি “জাতীয় সংস্কৃতি ট্রাষ্ট” গঠন করিবার চেষ্টা চলিতেছে; তাহার অধীনে তিনটি বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হইবে। বিশ্ব-ভারতীর প্রসার কল্পে ব্যয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে; এই প্রতিষ্ঠানে কলাবিজ্ঞা, হস্তনির্মিত শিল্প, নৃত্য, গীত ও “বুনিয়াদি” শিক্ষার বিরাট পরিকল্পনাকে রূপদান করিবার আয়োজন চলিতেছে। ভারতবর্ষের ঐতিহ্যের প্রামাণ্য ইতিহাস প্রণয়নও অবশ্য কর্তব্য। আচার্য্য সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনকে সভাপতি করিয়া ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রের ইতিহাস প্রণয়ন করিবার জন্ত একটি নূতন কমিটি গঠিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রণয়নের জন্তও আর একটি কমিটি গঠিত হইবে—এই সব সংবাদ মোলানা আবুল কালামের বক্তৃতায় আমরা পাই।

সর্বোদয় সমাজ

গান্ধীজী জীবনে আচরণ করিয়া দেশের জনগণের সগুণে নূতন সমাজ-ব্যবস্থার আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন; তাঁহার তিরোধানের পর তাঁহার ভক্তগণের উপর তৎসম্বন্ধে নূতন দায়িত্ব আসিয়া পড়িয়াছে। এই বিষয়ে তাঁহার অবহিত হইয়া আছেন বলিয়া মনে হয়। গত ১৬ই চৈত্র ওয়ার্দ্ধাগঞ্জে অহুষ্ঠিত সভায় তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

তিন দিন এই সভার কার্য চলিয়াছিল। তাহাতে গান্ধীজী প্রচারিত “সর্বোদয় সমাজের” আদর্শের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা হয়। এই আদর্শানুযায়ী সমাজে ভেদাভেদের স্থান নাই; নিজ নিজ শক্তি অনুযায়ী কর্ম করিয়া সমাজের সেবা-ধর্মের অহুশীলন করিলে জন্মগত শক্তির যে পার্থক্য লইয়া মানুষ জন্মগ্রহণ করে, তাহা এক নূতন একপ্রাণতায় মুছিয়া যায়। এই আদর্শ অনুযায়ী নিজের জীবন গড়িয়া তুলিবার দায়িত্ব ব্যক্তির নিজের; সেইজন্ত ওয়ার্দ্ধাগঞ্জের সভায় স্থির করা হইয়াছে যে গান্ধী-ভক্তবৃন্দের কোন কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান থাকিবে না যাহার চাপে পড়িয়া মানুষের ব্যক্তিত্ব ও স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইতে পারে। একটা বিষয় লক্ষ্য করিয়া আমরা তৃপ্তিলাভ করিয়াছি যে গান্ধীজীকে নূতন দেবতার রূপান্তরিত করিবার সর্বপ্রকার চেষ্টাকে নিরুৎসাহিত করা হইয়াছে; অথচ কত সহজে এই দেশে এক নূতন দেবতার প্রতিষ্ঠা করিয়া নূতন মোহান্ত্রের সৃষ্টি করা যাইত। আর একটা বিষয় লক্ষ্য করিবার যোগ্য। পণ্ডিত জবাহরলাল প্রমুখ কেন্দ্রীয় গবর্নমেন্টের নেতৃবৃন্দ গান্ধীভক্তির সুযোগ গ্রহণ করেন নাই; পণ্ডিতজী এই সভায় ঘোষণা করিয়াছেন যে তাঁহার এই নূতন কাজে—“সর্বোদয় সমাজ” প্রতিষ্ঠার কাজে পাঠ্যচর (camp followers) হইয়া থাকিবেন। এই ঘোষণা দ্বারা এই ভরসা আমাদের মনে উদয় হইয়াছে যে ভারতবর্ষের গঠনাত্মক কর্মপদ্ধতির সেবকবৃন্দ রাজনীতির জীড়নকরূপে ব্যবহৃত হইতে স্বীকার করিবেন না; কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ এরূপ চেষ্টার প্রশ্রয় দিবেন না।

এই সম্বন্ধে যদি সত্য হয় তবে আচার্য্য ভিনোবা ভাবের নেতৃত্বের মধ্যে একটা সার্থকতা লাভ করিবার আশা দেখা যায়। ওয়ার্দ্ধাগঞ্জের সভায় তিনিই গঠনাত্মক কর্মবৃন্দের নেতা বলিয়া গৃহীত হইয়াছেন। কোন নির্দিষ্ট প্রস্তাব পাস করিয়া এই মনোনয়ন অধীকৃত হয় নাই; আচার্য্য ভিনোবা মনোনীত হইয়াছেন আদর্শনিষ্ঠার আকর্ষণে। তিনি এই সম্মেলন উপলক্ষে অহিংসার উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন। ব্যক্তিগত হিংসা-প্রবৃত্তি সংযত হইয়া সমাজ—সমষ্টিগত জীবন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সমষ্টিগত জীবনে, রাষ্ট্রীয় জীবনে তাহা কেন প্রয়োগ করা হইবে না, এই সংবাদের প্রবৃত্তি কেন কাঙ্ক্ষ্য হইবে না, তাহার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ দেওয়া যাইতে পারে না। এই প্রশ্ন ও তাহার উত্তর বর্তমান জগতের বৃহত্তম সমস্যা। বিজ্ঞানের অগ্রগতি মানুষ প্রকৃতির উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছে; প্রকৃতির শক্তিকে প্রয়োগে নানা মারণাস্ত্রের রহস্য সংগ্রহ করিয়াছে। মানুষ এখন ইচ্ছা করিলে সৃষ্টি ধ্বংস করিতে পারে। এই অবস্থায় অহিংসা ছাড়া গতান্তর নাই, এই হইল আচার্য্য ভিনোবার প্রতিপাদ্য বিষয়। ক্ষমতার লোভে মানুষ হিতাহিত জ্ঞান হারাইয়া আপনার বুদ্ধি ও শক্তির অপব্যবহার করিতেছে। এই বিপদ

হইতে উদ্ধার পাইতে হইলে সকল শক্তি বিকেন্দ্র করিতে হইবে। তখনই সম্ভব হইবে সর্বোদয় সমাজের জন্ম।

বি. এস. মুঞ্জে

মহারাষ্ট্রীয় নেতা ডাঃ বি. এস. মুঞ্জে ছিয়াত্তর বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিলেন। টিলক যুগের একজন দিকপাল গান্ধী যুগে বাঁচিয়া থাকিয়া, গান্ধী যুগের ভাব ও কর্ম প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া, অনবনত মস্তকে কর্মক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া গেলেন। বিয়াল্লিশ বৎসর পূর্বে যখন তাঁহার সঙ্গে পরিচয় হয় তখন এই ক্ষান্তধর্মী-ব্রাহ্মণকে যে ভাবের ভারুক রূপে দেখিয়াছিলাম, নাসিকের শিবাজী ভৌসলে সামরিক বিভাগলের প্রতিষ্ঠাতা রূপে তার পূর্ণ পরিণতি লক্ষ্য করিয়াছি। আজীবন তিনি বিশ্বাস করিয়া গিয়াছেন যে ব্রিটিশ রাজশক্তির সম্মোহন নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া যাইতে হইবে—যে নীতি দেশের জনসাধারণকে “ভেড়ার পালে” পরিণত করিতে চেষ্টা করিয়াছে, দেশের মন হইতে সমস্ত সামরিক ঐতিহ্য মুছিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিয়াছে। সেইজন্ম আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাই বুয়র যুদ্ধে—ডাক্তার রূপে সামরিক জীবন সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করিবার প্রয়াসী। মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণকে সামরিক বিভাগের বাহিরে রাখিবার নীতি এই ভাবে কলে কৌশলে অতিক্রম করিয়া যখন তিনি দেশে ফিরিয়া আসিলেন, তখন দেশের মনে নূতন জীবনের স্পন্দন শিহরিয়া উঠিয়াছে। ইহার দুই-তিন বৎসর পরেই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে আশ্রয় করিয়া দেশের মন দুই-তিন বৎসরে পঞ্চাশ বৎসর আগাইয়া গেল। মহারাষ্ট্রের ও বাংলাদেশের বিপ্লবী ও সন্ত্রাসবাদীরা এই যুগ-পরিবর্তনের ধারক ও বাহক ছিলেন। গান্ধী যুগে এই ভাব ও কর্মধারার গতি পরিবর্তিত হয়। মহারাষ্ট্রীয় নেতৃবর্গ এই পরিবর্তনে হ্রদয় দিয়া যোগদান করিতে পারেন নাই; যদিও তাঁহারা গান্ধী-প্রাণ্ডিত সব আন্দোলনে যোগদান করিয়াছেন। ডাঃ মুঞ্জে ১৯৪২র আন্দোলনে যোগদান করেন নাই, কারণ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ইংরেজ দায়ে পড়িয়া ভারতবর্ষের জনসাধারণকে অজবিভূত সামরিক ভাবাপন্ন করিয়াছিল; জ্ঞান অর্জন করিবার এই সুযোগ নষ্ট হইতে দিতে তিনি অনিচ্ছুক ছিলেন; গান্ধীদ্বীর অসহযোগ নীতি এই আপদধর্মের পরিপন্থী ছিল।

ইহার বহু পূর্বে হইতে কংগ্রেসের রাজনীতি মুসলমান সমাজের সংকীর্ণ মনোভাবের চাপে দিশেহারা হইয়া পড়িতেছিল। সাত-আট কোটি লোককে বাদ দিয়া রাজনীতি করা যায় না; আবার এই সাত-আট কোটি লোকের মনোভাব অসুযায়ী চলিতে গেলে দেশের ত্রিশ কোটি লোকের মন হারাইতে হয়। এই দোটানায় পড়িয়া কংগ্রেসের সংগ্রাম নানাভাবে ব্যাহত হইতেছিল। ব্রিটিশ রাজশক্তি আমাদের অন্তর্বিরোধের সুযোগে নিজের খেলা খেলিতে লাগিল; মুসলমান সমাজকে এই খেলায় সহায়করূপে পাঠিয়া কংগ্রেসের দাবি-দাওয়া অধীকার করিতে পারিল। ফলে, কংগ্রেস-নিরপেক্ষ একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের অভ্যুদয় হইল। এই

প্রতিষ্ঠানের (হিন্দু মহাসভার) পুরোভাগে দেখিতে পাই পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়ারকে, লাল লালপং রায়কে, ডাক্তার মুঞ্জেকে ও ভাই পরমহানন্দকে। এই প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের ভাব ও আদর্শকে গ্রহণ করিতে পারিল না; হিন্দু সমাজের একাংশের মনে যে বিক্ষোভ জন্মিয়া উঠিতেছিল ইহা তাহা প্রকাশ করিয়া দিতে পারিল মাত্র। আজ তাঁহার তিরোধান উপলক্ষে সে সকল কথার বিচারের অবসর নাই। আমরা একজন মহারাষ্ট্রীয় দেশপ্রেমিকের দেহত্যাগে আত্মীয়জন বিয়োগব্যথা অনুভব করিতেছি।

ডাঃ বেণীমাধব বড়ুয়া

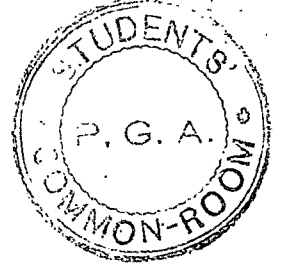
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি সাহিত্য বিভাগের অধ্যক্ষ ডাঃ বেণীমাধব বড়ুয়া অকালে পরলোকগমন করিলেন; বাংলাদেশ একজন পণ্ডিত হারাইল। আমাদের দেশের জীবনে ইতিহাসের নানা পরিহাস অল্পশ্রিত হইয়াছে। যে ধর্ম ও সংস্কৃতি প্রায় হাজার বৎসর দেশের ইতিহাস সৃষ্টি করিল ও তার গৌরব ধারণ করিল তার চিহ্ন আমাদের দেশের জীবনে খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নানা লেখায় প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন যে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির নানা ধারা আমাদের রীতিনীতির মধ্যে লুকাইয়া আছে এমন কৌশলে যে আমরা তৎসম্বন্ধে অবহিত নহি। কেন এমন ঘটিল, কি করিয়া হিন্দুধর্ম এমন করিয়া বৌদ্ধধর্মের নানা বৈশিষ্ট্যকে গ্রাস করিয়া বসিল, তাহা ইতিহাসের এক রহস্য। সিংহল হইতে অনাগরিক ধর্মপাল আসিয়া এই স্মৃতি পুনরুদ্ধার করিতে সাহায্য করিয়াছিলেন। ডাঃ বেণীমাধব বড়ুয়া সেই ধারার শ্রোত অব্যাহত রাখিয়াছিলেন। ইহাই তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ দান। বৈদিক ধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম মিলিত হইয়া বা পরস্পরের দ্বাং-প্রতিদ্বাং কল্পে বর্তমান হিন্দু-ধর্মে রূপান্তরিত হইয়াছে, তার সম্যক পরিচয় এখনও আমরা পাই নাই। সেই যুগের ইতিহাস না বুঝিলে আমরা ভারতবর্ষের জীবনধারার গতি-পরিণতির সন্ধান পাইব না। আমাদের দেশ দক্ষিণ এশিয়ার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। একদিকে পশ্চিমে আমাদের ইসলামের আকর্ষণ; অপরদিকে পূর্বে আমাদের বৌদ্ধ ভাবের আকর্ষণ। একদিকে ২৫ কোটি লোকের নব-জাগরণের আহ্বান; অপরদিকে ৩০ কোটি লোকের আহ্বান; প্রাচীন যুগের সংস্কৃতির স্মৃতি ৩০ কোটি হিন্দুকে আজ এক নূতন জগতের রঙ্গভূমিতে আহ্বান করিতেছে। চীন, জাপান, শ্রীলঙ্কা, তিব্বত, নূতন করিয়া আমাদের নিকটে আসিতেছে প্রাচীন পরিচয় ঝালাইয়া নূতন সম্বন্ধ স্থাপনের জন্ম। এই দুই ভাব-জগতের মধ্যে দাঁড়াইয়া ভারতবর্ষকে কর্তব্য দ্বির করিতে হইবে। মুসলিম জগতের ও বৌদ্ধ জগতের মধ্যে ভারতবর্ষ করিবে দ্বিতীয়ানী। সেই কার্য রত্ন ভাবে সম্পন্ন করিতে হইলে চাই জ্ঞান। ডাঃ বেণীমাধব বড়ুয়া আমাদের বৌদ্ধ জগতের বাগী কিছু কিছু শুনাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করিবে, তাঁহার জন্ম প্রতীক্ষা করিয়া রহিলাম।

পত্রাবলী

[রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে লিখিত]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতীর অল্পমতিক্রমে প্রকাশিত



ও

শ্রদ্ধাস্পদেষু

অল্পকালের মধ্যে যে গল্পের বই পড়িয়াছি তাহার মধ্যে **The Charwomen's Daughter** নামক বইখানি বড় ভাল লাগিয়াছে। গ্রন্থকার একজন আধুনিক কবি এবং তাহার গল্পরচনা ইংলণ্ডের পাঠকসমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। জানি না বাংলায় তর্জমা করিতে হইলে কাহারো অনুমতির প্রয়োজন হইবে কিনা। গ্রন্থকারের নামটি **James Stephen**। রথী^১র কাছে এই বই আছে। রথী রীচি গিয়াছে—ফিরিলে পাওয়া যাইতে পারে। সত্যেন্দ্র^২র চোখ খরাপ নহিলে তাহারই হাতে তর্জমা হইত ভাল। চারুক^৩কে চেষ্টা করিতে বলিবে। আবশ্যক মত কিছু কিছু বাদসাদ দেওয়া দরকার হইতে পারে। গল্পটি ভাল সন্দেহ নাই—কিন্তু যাহারা গল্প পড়ে তাহাদের ভাল লাগিবে কিনা সে কথা বলা কঠিন। **Joseph Conrad** এখনকার কাগজের গল্পলেখকদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়—তাহার ছোট গল্প কিছু কিছু পড়িয়াছি—পড়িয়া ভাল লাগিয়াছে। ইতি রবিবার

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ও

শ্রদ্ধাস্পদেষু

তত্ত্ববোধিনীতে আমার ও বড়দাদা^৪র যে লেখা বাহির হইতেছে চারু তাহা প্রবাসীর জন্ত চাহিয়াছিলেন। সেই প্রবন্ধ দুইটি কতক ছাপানো ফর্ম ও প্রুফ এবং কতক কাপি আকারে পাঠাইতেছি। বৈশাখের তত্ত্ববোধিনীর সঙ্গে সঙ্গেই যদি প্রবাসীতে দিতে ইচ্ছা করেন ত দিবেন। আমার বড় মেয়ে একটি ইংরাজি গল্পের তর্জমা করিয়াছেন পাঠাইতেছি যদি পছন্দ করেন ত প্রবাসীতে দিবেন নচেৎ ভারতী প্রেসে পাঠাইয়া দিবেন।

আগামী ১লা বৈশাখে আমাদের আশ্রমে নববর্ষের উৎসব হইবে সে জন্ত আপনাকে নিমন্ত্রণ রহিল। তখন

Easter-এর ছুটি আছে। মেয়েদের সঙ্গে দেখা হইয়াছিল— তাহার। এই উৎসবে ষোণ দিবার জন্ত উৎসাহিত হইয়াছে— আপনি তাহাদের সহায় না হইলে তাহাদের গতি নাই— এই কারণে আপনাকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিব এইরূপ ভরসা তাহাদিগকে দিয়াছি।

ব্যাকরণের প্রথমাংশ পুনরায় সংশোধন করিয়া লিখিতে হইবে এই জন্ত এবার দেওয়া সম্ভব হইবে না—জ্যেষ্ঠে যাইবে।

বোলপুরে কলেজ স্থাপন সম্বন্ধে আপনাদের সঙ্গে আর একবার আলোচনা করিয়া দেখিব। ইতি মঙ্গলবার

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ও

শ্রদ্ধাস্পদেষু

হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় প্রবন্ধটি সংশোধন করিয়া পাঠাইলাম। বোধ করি সবশুদ্ধ এক ফর্মার অধিক হইবে না। আমার ইচ্ছা প্রবাসীতে এই প্রবন্ধটি ছাপা হইলে সেই সঙ্গে চটি আকারে ইহাকে বাহির করিয়া চার পয়সা দামে বিক্রয় করা হয়। ছাপিবার খরচ বোধ করি বেশি হইবে না— সে খরচটা বিক্রয়ের মূল্য হইতে তুলিয়া লইতে পারিবেন। এইরূপ সাময়িক প্রসঙ্গ লইয়া অ্যামাদের বক্তব্য বিষয়ের আলোচনা স্থলভ চটি আকারে প্রচার করিলে উপকার হইতে পারে। যদি আমার এ প্রস্তাবে আপনার সম্মতি থাকে তবে চেষ্টা করিয়া দেখিবেন। লাভের টাকা এইরূপ স্থলভ পুস্তিকা প্রচারকার্যেই নিযুক্ত করা যাইবে।

এখনো নদীর উপকূল পথ গুল টানিয়া চলিবার পক্ষে সর্বত্র স্বগম হয় নাই অতএব শিলাইদহের নিকটেই পদ্মার চরে বোট বাধিয়া থাকিব। প্রুফ ও পত্রিকা প্রভৃতি “শিলাইদা, নদিয়া” ঠিকানাতেই পাঠাইবেন।

শান্তা^৫ ও সীতা^৬কে আমার অন্তরের আশীর্বাদ জানাইবেন ইতি মঙ্গলবার

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১। শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

৩। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

৪। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫। শ্রীশান্তা দেবী

৬। শ্রীসীতা দেবী

ও

শ্রদ্ধাস্পদেষু

সেই পাঠ্যবহিটর কাপি পাঠাই। ইহার সঙ্গে গোটা দুই তিন গল্প যোগ করিতে হইবে। তাহার মধ্যে “রাসমণির ছেলে” একটি এবং “গুপ্তধন” একটি। গুপ্তধন গল্পটি “আটটি গল্প” পাইবেন, আরও গল্প যদি দেওয়া দরকার বোধ করেন তবে সেই আটটি গল্প হইতে বাছিয়া লইবেন। বলা বাহুল্য যদি এই কাপির মধ্যে কোনো কারণে কোথাও কিছু পরিবর্তন বা পরিবর্জন আবশ্যক বোধ করেন তবে কুণ্ঠিত হইবেন না। বইয়ের নাম কি হইবে যদি ভাবিয়া ঠিক করেন তবে আমি বাচি। নামকরণ আমার আসে না।

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ও

বুধগয়া

শ্রদ্ধাস্পদেষু

চারুর ছুটি শেষ হইয়াছে কিন্তু এখনো তাহাকে আমি ছুটি দিতে পারিতেছি না। সোমবারে এলাহাবাদে যাইব মঙ্গলবারে পৌছিব সেখানে চারুকে আশ্রয় করিয়া ইণ্ডিয়ান প্রেসের কিছু কাজ সারিবার ইচ্ছা আছে। এই দুই তিন দিনের জন্ত প্রবাসীর কাজের যদি কিছু ক্ষতি হয় তবে সে অপরাধে আমাকেই অপরাধী করিবেন এবং ক্ষমাও করিবেন আপনার কাছে এই প্রার্থনা করি। ইতি রবিবার

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ও

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আমার দৌহিত্রের জন্ম উপলক্ষ্যে আমাকে কলিকাতায় আসিতে হইয়াছে।

“রূপ ও অরূপ” বলিয়া একটি লেখা প্রবাসীর জন্ত পাঠাইয়াছিলাম পাইয়াছেন কি?

হেমলতা বোমার কবিতাটি আপনার নিকট পাঠাইবার জন্ত জ্ঞানের নিকট দিয়াছিলাম—পান নাই কি?

আপনার প্রেরিত কাগজগুলি টেনেই পাইলাম স্বতরাং সঙ্গেই আসিয়াছে তাহার একটা সদগতি করিবার চেষ্টা করিব।

গল্প সম্বন্ধে আপনার প্রস্তাব ত আমার কাছে ভালই

ঠেকিতেছে। ১১ই মাঘের পূর্বে গল্প লেখার হাত দেওয়া ঘটিবে না। ইতি শুক্রবার

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ও

শ্রদ্ধাস্পদেষু

দীর্ঘকাল কলার পীড়ার উদ্বেগে Theistic Conference-এর জন্ত “ধর্মশিক্ষা” প্রবন্ধটি লিখিতে পারি নাই। এখানে আসিয়া সেটি লিখিয়াছি। কিন্তু এখানে নিরুদ্বেগ অবকাশ এত বেশি যে প্রবন্ধটি বিনা বাধায় যথেষ্ট দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে। এত বড় বাংলা প্রবন্ধ কনকারেন্স সভায় পাঠ করা সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হইতেছে না। যদি সময় থাকিতে লেখা শেষ করিতে পারিতাম তবে ইংরেজি অন্তর্ভাবের চেষ্টা করিয়া ওটাকে বিদেশীদের কাছে ব্যবহারযোগ্য করিয়া তুলিতে পারা যাইত। কিন্তু আর তাহার সময় নাই। অতএব যদি আমাকে অব্যাহতি দেন তবে লেখাটা আর কোনো সময়ে বাঙালী শ্রোতাদের কাছে পড়িয়া চুকাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। মনে ভাবিয়াছিলাম লেখাটা পাঠাইয়া দিব তাহার পরে আপনারা যা খুশি করিবেন কিন্তু তাহার চেয়ে নিজে উপস্থিত হইয়া পাপক্ষালন করাই ভাল। কাল সন্ধ্যার সময় কলিকাতায় পৌছিতে চেষ্টা করিব। মঙ্গলবার আপনারদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া যথাকর্তব্য স্থির করা যাইবে। কি বলেন? মঙ্গলবার সকালে আপনার সঙ্গে দেখা হইতে পারিবে কি? যদি জোড়াসাঁকোয় ইহার উত্তর পাঠাইয়া দেন তবে কাল সন্ধ্যার সময়েই পাইব। ইতি রবিবার

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ও

শ্রদ্ধাস্পদেষু

কবিতা প্রবাসীর জন্ত পাঠাইলাম। যে খুশি নাম দিবেন। এক একটা লাইন বড় আছে, বোধ হয় দুই কলামকে এক করিয়া যদি এটা ছাপান তবে স্থানাভাব হইবে না। আমার বোধ হয় কবিতা সেইরূপভাবে ছাপানো হইলে গদ্য প্রবন্ধের সহিত তাহার একটু বিশেষত্ব রক্ষা হয়।

মার্কাস অরেলিয়াসের আত্মচিন্তা সম্বন্ধে সংক্ষেপে ছচার লাইনের বেশি লিখিতে পারিব না। মন এখন অল্প কাজে ব্যস্ত আছে এবং বিশ্রামও অত্যাবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে।

আশা করি ভালো আছেন। ইতি ১২ ফাল্গুন

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ও

শান্তিনিকেতন।

শ্রদ্ধাস্পদেষু

এই সঙ্গে একটি ইংরেজি কবিতা পাঠাইতেছি। কবিতাটি আমার বন্ধু Mrs. Seymour-এর রচনা। এটি আমাদের সকলেরই বিশেষ ভাল লাগিয়াছে বোধ হয় আপনারও পছন্দ হইবে সেই আশায় পাঠাইলাম—যদি Modern Reviewতে ছাপান তবে এক কপি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইবেন—

Mrs. Seymour
909 Nevada Street
Urbana, Illinois
U. S. A.

প্রবাসীর জন্ত আমার খাতায় অনেকগুলি গান জমিয়া উঠিয়াছে—কুঁড়েমি করিয়া কপি আর হইয়া উঠে না। শুনিয়াছি চারু পূজার ছুটিতে শান্তিনিকেতনে আসিবেন তিনি পছন্দ করিয়া বাছিয়া লইতে পারিবেন। আশা করি ভাল আছেন—ছুটিতে কি কোথাও যাইবেন?

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ও

শ্রদ্ধাস্পদেষু

কাল রেজিষ্ট্রি ডাকে আপনাকে সেই সংকলিত স্কুল বইয়ের কপি পাঠাইয়াছি। তাহার মধ্যে “রাসমণির ছেলে”র গল্পটা দিতে বলিয়াছি। কিন্তু আমার বোধ হয়

সেটা না দেওয়াই ভাল। কারণ এই নূতন গল্পটি আর একটি বইয়ে ছাপান হইতেছে এবং এ বইটি বিদ্যালয়ের সম্পত্তি ইহা পাঠিশারের হাতে দিই নাই—সে বই হইতে গল্প চুরি করিয়া আমাদের বিদ্যালয় কেন নিজেকে নিজে ঠকাইবে? আপনি আটটি গল্প বই হইতে অনধিকার প্রবেশ, কাবুলিওয়ালা, সাক্ষ্যদান প্রভৃতি তিন চারিটি গল্প বাছিয়া লইয়া এই বইয়ের মধ্যে পুরিয়া দিলে কোন ক্ষতি হইবে না এবং সেই ছোট ছোট গল্প ছেলেদের পড়িবার পক্ষেও সুবিধা হইবে। কি বলেন? জীবনস্মৃতির প্রফটা পাঠাইবেন।

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ও

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আপনার অনুরোধ মত স্বরেন* চোখের বালির প্রথম কিস্তি ওখানে পাঠাইয়াছেন। অত্যন্ত গোলমালের মধ্যে আছি। একবার চোখ বুলাইয়া লইলাম। মাঝে মাঝে ছোটো একটা কথা পেন্সিলের লেখায় পরিবর্তন করিয়াছি মাত্র। মোটের উপর আমারও বোধ হয় ভালই হইয়াছে, আপনি পড়িয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন। আগামী বুধবারে সায়াছে কলিকাতায় পৌছিব। ইতি সোমবার

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯। স্বরেন্দ্রনাথ ঠাকুর

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

প্রতিভা তোমার নহে সাধারণ—জানভূমিষ্ট মন
সাধকের মত ছিল তব আচরণ,
অক্রোধী, শুধু অসত্যে ক্রোধ, শ্রীরের পক্ষপাতী,
ছুরাসা নয়—কপিলের তুমি জাতি।
সহিতে নারিতে অতি প্রবলেকো অসাধুতা অবিচার,
কঠিন-কঠোর সমালোচক যে তার।
রাজহুয়ারেতে কখনো যাও নি চাওয়ার কিছুই নাহি
তুমি নৈতিক অশুদ্ধ প্রতিগ্রাহী।
করিতে চেয়েছ দেশ জাতি ভাষা শুচি ও সমুন্নত
পুত নির্মল করা ছিল তব ব্রত।

ফিরালে জাতির দৃষ্টিভঙ্গী দেখাইয়া ভুলগুলি
বিনয়-বধিরে চোখে দিয়া অঙ্কুলি।
যাহা কুৎসিত, ঘৃণ্য, দুঃখ, সমাজের জঞ্জাল,
সরাইতে তব চেষ্টা যে চিরকাল।
তুমি জ্ঞানযোগী, কর্মযোগী যে, সদা দেহমনে শুচি
বদলিয়ে দিলে তুমিই দেশের রুচি।
সংস্কারক যে ছিলে তুমি বড়, সমনিন্দাস্ততি
জাতিকে দিয়াছ স্বন্দর রসাতলুভতি।
যে ছদ্মবেশে দেবতা আসিয়া অভয়ের বাণী কন
তুমি ছিলে সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণ।



সিন্ধু সভ্যতা ও মেশোপটেমিয়া

শ্রীননীমাধব চৌধুরী

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে মোহেঞ্জোদারো স্থূপের খননকার্য আরম্ভ হইবার বহুপূর্বে মেশোপটেমিয়ার প্রাগৈতিহাসিক আমলের নগরসমূহের ধ্বংসস্থ পুণ্ডলি ইউরোপের বিভিন্ন দেশের প্রত্ন-তাত্ত্বিক পণ্ডিতগণ খনন করিয়া প্রভূত পরিমাণে মূল্যবান নিদর্শন উদ্ধার করিয়াছিলেন। এইগুলি এবং মিশর প্রভৃতি দেশের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহ সম্বন্ধে আলোচনার ফলে মেশোপটেমিয়ার বিভিন্ন যুগের প্রাচীন কৃষ্টিগুলির মোটামুটি ধারাবাহিক ইতিহাস সঙ্কলিত হইয়াছে। মোহেঞ্জোদারোর স্থূপ খনন করিয়া যে সকল নিদর্শন পাওয়া যায় তাহার চিত্র ও বিবরণ দিয়া সরজন মার্শাল বিলাতী কাগজে প্রবন্ধ প্রকাশ করিবার পর মেশোপটেমিয়া, পশ্চিম ও মধ্য-এশিয়া, মিশর প্রভৃতি দেশে প্রত্নতত্ত্বের কাজ ধাওয়া করিয়াছিলেন তাঁহাদের দৃষ্টি সিন্ধু উপত্যকার লুপ্ত সভ্যতার প্রতি আকৃষ্ট হইল। মোহেঞ্জোদারো ও হরাপ্পার নিদর্শনগুলির মধ্যে মেশোপটেমিয়ার নিদর্শনের অল্পরূপ বস্তু কিছু কিছু পাওয়া গিয়াছে। মেশোপটেমিয়ায় প্রাপ্ত কয়েকটি নিদর্শনও সিন্ধু উপত্যকার জিনিস বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। এই প্রমাণের বলে প্রাচীন মেশোপটেমিয়ার সভ্যতা ও সিন্ধু সভ্যতার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল পণ্ডিতগণ এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন।

এ সম্বন্ধে তাঁহাদের মতগুলি পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে প্রাচীন মেশোপটেমিয়া ও তাম্রযুগের সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসীদিগের মধ্যে জাতিগত, বাণিজ্যিক ও কৃষ্টিগত সংযোগ ছিল তাঁহারা এইরূপ মনে করেন; বর্তমান প্রবন্ধে এই তিন প্রকারের সংযোগ সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ কি মত প্রকাশ করিয়াছেন এবং তাহার সমর্থনে কি প্রকারের যুক্তিপ্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন অতি সংক্ষেপে তাহার আলোচনা করা হইবে।

এই তিন প্রকারের সংযোগ সম্বন্ধে আলোচনায় অগ্রসর হইবার পূর্বে আলোচনার পটভূমি রচনা করিবার জন্ত মেশোপটেমিয়ার ইতিহাস ও তাহার প্রাচীন সভ্যতা সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে কিছু বলা আবশ্যক।

মেশোপটেমিয়া ট্রাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর মধ্যবর্তী সমতলভূমি। ইহার উত্তরে আর্মেনীয়া, কুর্দীস্থান ও তুর্কী, পশ্চিমে সিরিয়া ও আরব, দক্ষিণে পারশ্ব উপসাগর এবং পূর্বে ইরান। তুর্ক জাতি এই অঞ্চলের আদিবাসী নহে। তাহাদিগকে বাদ দিলে দেখা যায় পশ্চিমে সেমিটিক আরব জাতি ও উত্তর এবং পূর্বে ইরানী গোষ্ঠীর জাতি

মেশোপটেমিয়াকে বেষ্টিত করিয়া রহিয়াছে। দক্ষিণে মেশোপটেমিয়া ভারত মহাসাগরের সঙ্গে যুক্ত।

প্রাচীন ইতিহাসে ইউফ্রেটিস উপত্যকার দক্ষিণাংশ স্বমের নামে পরিচিত। বাইবেলে দেখা যায় বাবেল, এরেক, আকাদ ও কালনে সিনার বা স্বমেরের অন্তর্ভুক্ত। বলা হইয়াছে যে সিনার হইতে প্রস্থান করিয়া অশ্বর নিনেভে, বেহোবোথ ও কালা নির্মাণ করেন (Gen. 10)। বাইবেলের মতে দেখা যাইতেছে যে উত্তর-মেশোপটেমিয়ায় সভ্যতা দক্ষিণ অঞ্চলের সভ্যতার নিকট স্বামী। বাবিলোন নগর বাগদাদের ৬০ মাইল দক্ষিণে ইউফ্রেটিস তীরে অবস্থিত ছিল। কিন্তু বাবিলোনিয়া বলিতে উত্তরে আসিরীয়া, দক্ষিণে চ্যালডিয়া (কাল্ডু) ও পারশ্ব উপসাগর, পূর্বে এলামের পর্বতমালা (দক্ষিণ-পশ্চিম ইরান), পশ্চিমে সিরিয়া ও আরব,—এই সীমানার মধ্যে অবস্থিত টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিসের মধ্যবর্তী অঞ্চল বুঝাইত। প্রাচীন ম্যাপে সিনারের দক্ষিণে, ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিসের সন্ধিমের উত্তরে, চ্যালডিয়া অবস্থিত। স্বমেরীয় ইতিহাসে বিখ্যাত উর, এরেক প্রভৃতি নগর এই অঞ্চলে। চ্যালডিয়ার অধিবাসীরা চ্যালডু বা ক্যালডু নামে পরিচিত। নাবোপোলাসারের (Nabopolassar, খ্রীঃ পূঃ ৭ম শতাব্দী) আমলে সমগ্র উত্তর ও দক্ষিণ বাবিলোনিয়া চ্যালডিয়া নামে পরিচিত হয়। স্বমেরের উত্তরে বাবিলোন, বাবিলোনের উত্তরে টাইগ্রিসের পশ্চিমতীরে ২০ মাইল ব্যাপিয়া অবস্থিত ছিল প্রথম সারগণের রাজধানী আকাদ বা আগাদ। আকাদের উত্তরে টাইগ্রিসের পূর্বতীরে প্রাচীন অশ্বর নগর। অশ্বর হইতে টিগ্রেথপিলেসরের সাম্রাজ্যের নাম হইয়াছে আসিরীয়া। নিনেভে ছিল এই রাজ্যের রাজধানী। আজারবাইজান ও মিডিয়া পশ্চিমে মেশোপটেমিয়ার উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের নাম আসিরীয়া। কোন কোন পণ্ডিতের মতে প্রাচীন আকাদজাতি পরবর্তীকালে আসিরীয় (Assyrians) নামে পরিচিত হয়।

মেশোপটেমিয়ার ভৌগোলিক অবস্থানের কথা বলা হইয়াছে। বর্তমানে মেশোপটেমিয়া আরবজাতির অধ্যুষিত দেশ। পশ্চিমে আরব ও সিরিয়া হইতে আরব জাতির চাপ মেশোপটেমিয়া বা ইরাকের সীমানা অতিক্রম করিয়া ইরানের খুজিস্থান, লারীস্থান প্রভৃতি অঞ্চলে প্রসারিত হইয়াছে। সেমিটিক গোষ্ঠীর প্রবাহ প্রথমে পশ্চিমের মরু অঞ্চল হইতে আসিয়া সিরিয়া ও প্যালেস্টাইন প্রাবিত করিয়া

• মেশোপটেমিয়ার উত্তর অংশে পৌছায়। অনুমান করা হয় ইহা খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ সহস্রকের ব্যাপার। উত্তর-মেশো-
 • পটেমিয়ায় সেমিটিক প্রাবল্য আসিবার পূর্বে দক্ষিণে
 • সূমেরীয়গণ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। অনুমান করা হয় ইহা
 • খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম সহস্রকে ঘটয়াছিল। দক্ষিণ-মেশোপটেমিয়ার
 • সূমেরীয় সভ্যতা এবং সূমেরের পূর্বে এলামের সভ্যতা
 • প্রায় সমসাময়িক বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন এবং
 • এলামাইট ও সূমেরীয়গণ কোন কোন পণ্ডিতের মতে এক
 • গোষ্ঠীভুক্ত বা সমগোষ্ঠীয় জাতি ছিল।

প্রাচীন মেশোপটেমিয়া বহু গৌরবময় সভ্যতা ও
 • সাম্রাজ্যের জন্মভূমি। উত্তর আশ্রমীয়ের উচ্চভূমি হইতে
 • ক্রমে ঢালু হইয়া দক্ষিণে পারস্য উপসাগর পর্য্যন্ত ও পূর্বে
 • জাগ্রান পর্বতমালার সাহস্রদেশ হইতে ঢালু হইয়া আরবের
 • বালুকারাশি পর্য্যন্ত যে ভূখণ্ড বিস্তৃত সে দেশের মধ্যে এমন
 • কি বিশেষত্ব ছিল যে এতগুলি সাম্রাজ্যের উৎপত্তি সেখানে
 • সম্ভব হইয়াছিল? ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিসের জলে এমন
 • কোন গুণ ছিল যে বিভিন্ন যুগে এতগুলি সভ্যতার উৎপত্তি
 • মেশোপটেমিয়ায় সম্ভব হইয়াছিল? পৃথিবীর সভ্যতার
 • ইতিহাসে প্রথম অধ্যায় আরম্ভ হইয়াছে মেশোপটেমিয়া,
 • মিশর ও সিদ্ধু উপত্যকা লইয়া। ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস,
 • নীল ও সিদ্ধু নদ প্রায় একই যুগে সভ্যতার জন্মদাত্রী
 • হইয়াছিল। তার পরের অধ্যায় দাঁজিয়ান বা প্রাক-হেলেনিক
 • সভ্যতা। তৃতীয় অধ্যায় আরম্ভ হইল ইরাককে লইয়া।
 • আকাদ, বাবিলোন ও আসিরীয়ার সভ্যতাকে সেমিটিক
 • সভ্যতা বলা হইয়াছে। বাবিলোন ও আসিরীয়ার সাম্রাজ্য
 • সেমিটিক গোষ্ঠীর উত্তর শাখাভুক্ত জাতির কীর্তি। এই
 • উত্তর শাখাভুক্ত আরমীয়ান জাতি উত্তর মেশোপটেমিয়া
 • ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী আরম নগরে আপনাদিগকে প্রতিষ্ঠিত
 • করিয়াছিল। প্রাচীন ম্যাপে ও বাইবেলে আরম পদন
 • (Padan Aram) আরম বলিয়া উল্লিখিত। আরমাইক
 • লিপি ও ভাষা বাবিলোন ও আসিরীয়ায় গৃহীত হয়। হিব্রু
 • জাতির এই শাখার সঙ্গে সংমিশ্রণ ঘটয়াছিল। আরবগণ
 • দক্ষিণ সেমিটিক শাখাভুক্ত। সাসানীয়ান আমলের পূর্বে
 • আরবজাতির কোনরূপ বৈশিষ্ট্যের প্রমাণাভাব।

মেশোপটেমিয়ায় প্রাচীন সভ্যতা বিকাশের ব্যাপারে
 • উহার ভৌগোলিক অবস্থানের কিছু পরিমাণে হাত ছিল।
 • মেশোপটেমিয়া ছিল মধ্য-এশিয়া হইতে স্থলপথে ও পূর্ব-
 • এশিয়া হইতে জলপথে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের সহিত
 • বাণিজ্যিক যোগাযোগের পথের মধ্যে। মেশোপটেমিয়ায়
 • প্রাচীন সাম্রাজ্যগুলির অভ্যুদয়ে এই বাণিজ্যিক সংযোগ
 • • যে অনেকখানি সাহায্য করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।
 • মেশোপটেমিয়া ও পারশ্বে আরব অধিকাংশ বিস্তৃত হইলে।

এই বাণিজ্যিক সংযোগ স্বদৃঢ় করিবার জন্য খলিফ ওমর
 • পারস্য উপসাগরের মুখে বসরা বন্দর প্রতিষ্ঠিত করেন।
 • ইরাকের সফাহিদ সম্রাট শাহ আব্বাস ঐ উদ্দেশ্যে বন্দর
 • আব্বাস প্রতিষ্ঠিত করেন। সিদ্ধু সভ্যতার যুগে ভারতবর্ষের
 • সঙ্গে মেশোপটেমিয়ার বাণিজ্যিক সংযোগের কথা পরে
 • বলা হইবে।

প্রাচীন মেশোপটেমিয়ার সংক্ষিপ্ত রাজনৈতিক ইতিহাস
 • পূর্বের এক প্রবন্ধে দেওয়া হইয়াছে। (প্রবাসী পৌষ,
 • ১৩৫২)।

উত্তর মেশোপটেমিয়ার আকাদীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত
 • হয় প্রথম সারগনের দ্বারা। ইহা কোন কোন মতে খ্রীষ্ট
 • পূর্ব ৩৮০০ সনের ব্যাপার। অন্তিমতে খ্রীঃ পূঃ ২৮৭২ সনে
 • আকাদীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সারগনের সাম্রাজ্যকে
 • প্রথম সেমিটিক সাম্রাজ্য বলা হইয়াছে। মেশোপটেমিয়ার
 • দক্ষিণে সূমেরের অভ্যুদয়ের দুইটি যুগ লক্ষিত হয়। প্রথম
 • যুগ আকাদের অভ্যুদয়ের পূর্ববর্তী এই রূপ বলা হয়।
 • পূর্বের এক প্রবন্ধে (সিদ্ধুযুগ হইতে বৈদিক যুগ, প্রবাসী
 • অগ্রহায়ণ, ১৩৫৪) মার্শালের এই মত উদ্ধৃত করা হইয়াছে
 • যে সিদ্ধু উপত্যকার সহিত মেশোপটেমিয়ার সংযোগের
 • যে সকল নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে তাহা সারগনের পূর্বের
 • বা তাহার সমসাময়িক। সূমেরের অভ্যুদয়ের প্রথম যুগ
 • অন্তে উহা আকাদীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ইহার
 • পর সূমেরের অভ্যুদয়ের দ্বিতীয় যুগ আসে। দ্বিতীয় যুগের
 • সূমেরীয় সাম্রাজ্য উত্তর ও দক্ষিণ মেশোপটেমিয়া, পূর্বে
 • এলাম ও উত্তরে এশিয়া মাইনর পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়াছিল।
 • ইহার পরে বাবিলোনীয় সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় হয়। হাম্মুরাবি
 • যখন বাবিলোনের সিংহাসন অধিকার করেন (খ্রীঃ পূঃ
 • ২১২৩) এশিয়া মাইনরের হিটাইটগণ হাম্মুরাবির
 • বংশকে বিতাড়িত করিলে বাবিলোন কাসাইটগণের
 • অধিকারে আসে। কাসাইটগণ পুট-ই-কোহর পার্বত্য
 • অঞ্চলবাসী ছিল কেহ কেহ এইরূপ বলেন। পুট-ই-কোহ
 • লুরীস্থানের লুরীকুচাক বিভাগের মধ্যে। লুরীস্থানের
 • অপর বিভাগ লুরীবুজুর্গের অধিবাসী বকতিয়ারীদিগকে
 • কাসাইটগণের প্রতিনিধি বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন।
 • লুরীকুচাকের পশ্চিমে আসিরীয়ার সমতল ভূমি। বহুকাল
 • বাবিলোনের অধীন থাকিবার পরে খ্রীঃ পূঃ ১১২০ অব্দে
 • আসিরীয়ার টিলেশপিলেসর স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া বাবি-
 • লোন বিজয় করেন। তাহার পরবর্ত্তিগণের আমল আসিরীয়
 • সাম্রাজ্যের এবং মেশোপটেমিয়ার রাজনৈতিক ইতিহাসের
 • গৌরবময় যুগ। মীড ও বাবিলোনীয়দিগের আক্রমণে
 • আসিরীয়ার রাজধানী ধ্বংস হইল খ্রীঃ পূঃ ৬০৭ সনে।

আসিরীয় সাম্রাজ্য ধ্বংস হইবার সঙ্গে মেশোপটেমিয়ার

সৌভাগ্যস্বৰ্ণ্য অন্তৰ্ভুক্ত হইল। পশ্চিম এশিয়ায় সেমিটিক প্রাধান্য লুপ্ত হইয়া ইরাণীয় গোষ্ঠীর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইল। নিনেভে ধ্বংসের সময় হইতে (খ্রীঃ পূঃ ৬০৭) কাদিসীয়া ও নেহাভেনের যুদ্ধে (খ্রীষ্টাব্দ ৬৩৭ ও ৬৪২) সেমিটিক আরব জাতির হস্তে সাসানীয় রাজশক্তি বিধ্বস্ত হইবার সময় পর্যন্ত ইরাণীয় সাম্রাজ্যের রাজধানী পার্সিপোলিস, একবাতানা ও টেসিফোন (Takesiphon) হিন্দুকুশ হইতে হেলস্পন্ট ও পরে ইউফ্রেটিস এবং উত্তরে আর্মেনীয়া, ককেশাস ও কাস্পিয়ান, দক্ষিণে পারস্য উপসাগর পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চলের প্রধান রাজনৈতিক কর্মক্ষেত্র ছিল। আরমিকিডান ও সাসানীয় আমলে রাজধানী ছিল টেসিফোন। পার্সিপোলিস ধ্বংস হইয়াছিল বিজয়ী গ্রীক সৈন্তের হাতে। টেসিফোন ধ্বংস হয় বিজয়ী আরব সৈন্তের হাতে।

হাকিমনি সাম্রাজ্য ধ্বংস হইলে বাল্খ হইতে পশ্চিম গ্রীস পর্যন্ত অঞ্চল গ্রীকদিগের দখলে যায়। সেলুসিড রাজাদের রাজধানী ছিল আসিরীয়া ও বাবিলোনের মধ্যে টাইগ্রিসের তীরে নিশ্চিত সেলুসিয়া নগরী। রোমান আমলে ইউফ্রেটিস ছিল ইরাণীয় ও রোমক সাম্রাজ্যের সীমানা নির্দেশক। আরবদখলে প্রায় হাজার বৎসর থাকিবার পর খ্রীষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীতে মেশোপটেমিয়া তুর্কদিগের দ্বারা বিজিত হয়।

উপরে বলা হইয়াছে মেশোপটেমিয়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের সহিত বাণিজ্যিক সংযোগের পথের মধ্যে অবস্থিত। মেশোপটেমিয়া ভারতবর্ষের এত নিকটে অবস্থিত যে অতি প্রাচীন যুগ হইতে ভারতবর্ষ ও মেশোপটেমিয়ার মধ্যে যে বাণিজ্যিক ও অগ্রবিধ সংযোগ ছিল ইহা অনুমান করা কঠিন নহে। এই সংযোগ সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইয়াছে, এখানে তাহার দুই-একটির উল্লেখ করা বাইতে পারে।

কোন কোন পণ্ডিত মতপ্রকাশ করিয়াছেন যে সিদ্ধ সভ্যতার বাহকগণ মেশোপটেমিয়া হইতে সমুদ্রপথে সিদ্ধ উপত্যকায় উপস্থিত হয়। কেহ কেহ বলেন যে মেশোপটেমিয়ার প্রাচীন স্থমের জাতি ভারতবর্ষ হইতে দক্ষিণ মেশোপটেমিয়ায় গিয়াছিল। রমাংসাদ চন্দ্রের মতে যদু, তুর্কশ, ভরত, পুরু প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ঋগ্বেদীয় গোষ্ঠী সিরিয়া ও উত্তর মেশোপটেমিয়া হইতে সমুদ্রপথে ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়াছিল। একজন পণ্ডিত মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, পশ্চিম-ভারতের সহিত মেশোপটেমিয়ার বাণিজ্যিক সংযোগ খ্রীঃ পূঃ ৪০০০ বৎসরের প্রাচীন, ইহা খ্রীঃ পূঃ ৬০০০ বৎসর অপেক্ষাও প্রাচীন হইতে পারে। খ্রীঃ পূঃ ৩০০০ বা ৪০০০ বৎসর পূর্বে এই দুই দেশের মধ্যে সেগুন কাঠ ও মসলিনের ব্যবসায় চলিত (J. R. A. S. XX. 336,

337; XXI. 204)। এই প্রসঙ্গে বলা বাইতে পারে যে মিশরের খ্রীঃ পূঃ ১৭০০ বৎসরের প্রাচীন কবরে ভারতীয় মসলিন ও নীল (indigo) পাওয়া গিয়াছে (J. R. A. S. XX. 206)। হিন্দুদিগের মধ্যে চান্দ্র মাস গণনার রীতি মেশোপটেমিয়া হইতে আসিয়াছে এইরূপ একটি মত প্রচলিত আছে। অনুমান করা হয় যে চন্দ্রের উপাসনা ও চান্দ্র মাস গণনার রীতি মেশোপটেমিয়া হইতে আসিয়া থাকিলে খ্রীঃ পূঃ ৪০০০ বৎসরের পূর্বে উহা আসিয়াছিল, কারণ সারগণের সময়ে উহা প্রাচীন বলিয়া পরিগণিত হইত। একটি মত অনুসারে “The trade records of the black-headed, perhaps Dravidian-speaking Sumris of the Euphrates mouth prove so close relation with the peninsula of Sinai and Egypt as to make a similar connection with India probable as far back as 6000 B.C.” (J. R. A. S. XXI. 325, 326)। সেইস কতকটা এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। (Hibbert Lectures 33)। সুসীয়ানার সু বা সৌ (Sus or Saus) জাতীয় বণিকগণ বেলুচীস্থানের পথে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া পাতালে (দক্ষিণ সিদ্ধ দেশ) বাস করিতে আরম্ভ করে। পরে ইহার উত্তর গুজরাতে চলিয়া যায়। তাহাদের নাম হইতে সৌরাষ্ট্র নাম আসিয়াছে। স্থদিগের পূর্বে চন্দ্র উপাসক স্থমরীগণ পশ্চিম-ভারতে আসিয়াছিল এইরূপ বলা হইয়াছে।

সে যাহা হউক, মেশোপটেমিয়ার ইতিহাসের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপরে দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতে দেখা যায় যে, প্রাচীন মেশোপটেমিয়ার সভ্যতা বিকাশের যুগকে প্রাক-সেমিটিক ও সেমিটিক এই দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রাক-সেমিটিক সভ্যতার বিকাশ হইয়াছিল দক্ষিণে স্থমেরে, সেমিটিক সভ্যতার বিকাশ হইয়াছিল উত্তরে। সিদ্ধ সভ্যতার বাহকদিগের সঙ্গে মেশোপটেমিয়ার সংযোগের কথা বলিতে প্রধানতঃ দক্ষিণের স্থমেরদিগের সঙ্গে সংযোগ বুঝায়।

স্থমেরীয়গণ কোন্ গোষ্ঠীর জাতি ছিল সে সম্বন্ধে বহু আলোচনা হইয়াছে। সংক্ষেপে বলা যায় যে নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞানীদিগের মত এই যে স্থমেরীয়গণের মধ্যে লম্বা মুণ্ড ও গোল মুণ্ড এই দুই টাইপের লোক ছিল। প্রথম গোষ্ঠীর নাম ভূমধ্যসাগরীয় (Mediterranean) এবং দ্বিতীয় গোষ্ঠীর নাম আর্মেনয়েড (Armenoid)। নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীদিগের মতে লম্বা মুণ্ড গোষ্ঠীর উৎপত্তিস্থান ভূমধ্যসাগরের উপকূল অঞ্চল ও গোল মুণ্ড টাইপের উৎপত্তিস্থান আর্মেনীয়ার মালভূমি। কিন্তু দেখা যায়, যে উচ্চভূমির পশ্চিম প্রান্ত কুর্দীস্থান, আজারবাইজান হইয়া আর্মেনীয়ার পর্বতগ্রন্থিতে মিলিয়াছে, তাহার পূর্বপ্রান্ত ইরান, বাল্খ ও বাদাকসান

হইয়া পামীরের পর্বতগ্রন্থিতে মিলিয়াছে। এই পূর্ব প্রান্তের অধিবাসীরাও গোলমুণ্ড গোষ্ঠীয়। এই গোষ্ঠীকে আলপাইন, পামীরীয় বা ইরাণো-পামীরীয় বলা হয়। গোলমুণ্ড গোষ্ঠীর এবং মোটামুণ্ড এক ভাষা গোষ্ঠীর বিভিন্ন শাখা-ভাষাভাষী দুই প্রান্তের অধিবাসীদিগকে দুইটি গোষ্ঠীর নাম নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীরা দিয়াছেন। ইহা উদ্দেশ্যমূলক অথবা ইহার কোন প্রকৃত কারণ আছে কিনা পরে দেখা যাইবে। দেখা যায় যে বিভিন্ন দেশের প্রাগৈতিহাসিক আমলের স্তূপসমূহ হইতে গোলমুণ্ড গোষ্ঠীর লোকের অস্তিত্বের প্রমাণ যেখানে পাওয়া গিয়াছে সেখানেই ঐ গোষ্ঠীকে আর্মেনয়েড বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। স্বমেরের লম্বা-মুণ্ড গোষ্ঠীকে কেহ কেহ ড্রাবিড় বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। কোন কোন পণ্ডিতের মতে তাহারা সেমিটিক। স্বমেরীয়গণের মধ্যে ভূমধ্যসাগরীয় ও আর্মেনয়েড ব্যতীত অল্প গোষ্ঠীর লোকও ছিল, এইরূপ বলা হইয়াছে। কোন কোন নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীর মতে লম্বামুণ্ড Northern steppe folk অর্থাৎ প্রোটো নর্ডিক এবং পামীরীয় গোলমুণ্ড গোষ্ঠীর লোক স্বমেরে বর্তমান ছিল।

স্বমেরের পূর্বে এলাম। স্বমেরীয় ও এলামাইট কৃষ্টি প্রায় সমসাময়িক এইরূপ মত প্রকাশ করা হইয়াছে। ল্যাণ্ডন এবং আরও কেহ কেহ বলেন স্বমেরীয় ও এলামাইটগণ একই গোষ্ঠীয় এবং এই দুই কৃষ্টি মূলে এক। ডিকসন ও হেমীর (Hamy) মতে প্রকৃত স্বমেরীয়গণ (এবং এলামাইটগণ) গোলমুণ্ড গোষ্ঠীর জাতি।

মোটামুণ্ড দেখা যাইতেছে যে দক্ষিণ মেশোপটেমিয়ার প্রাচীন অধিবাসী স্বমেরীয়গণের মধ্যে বিভিন্ন গোষ্ঠীর জাতি থাকিলেও অনেক নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীর মতে গোল মুণ্ড গোষ্ঠীয় জাতি প্রকৃত স্বমেরীয়ান ও তাহারাই প্রাক-সেমিটিক মেশোপটেমিয়ার সভ্যতার বাহক।

সিন্ধু উপত্যকা ও মেশোপটেমিয়ার প্রাচীন সভ্যতার বাহকদিগের মধ্যে জাতিগত সম্পর্ক সম্বন্ধে যে সকল মত প্রকাশ করা হইয়াছে তাহা দুই ভাগে ভাগ করা যায়। এক দলের মত এই যে লম্বা ও গোলমুণ্ড গোষ্ঠীয় জাতি মেশোপটেমিয়া হইতে সমুদ্রপথে সিন্ধু উপত্যকায় আসিয়াছিল। ডাঃ হার্টন প্রমুখ নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীদিগের মত এইরূপ। অপর দলের মত এই যে স্বমেরীয়গণ সম্ভবতঃ সিন্ধু উপত্যকা হইতে দক্ষিণ মেশোপটেমিয়ায় গিয়াছিল। ডাঃ হল প্রমুখ পণ্ডিতগণের মত এইরূপ। এই দুই মতের মধ্যে প্রথম মতটি বেশী প্রচলিত এবং সাধারণের মধ্যে এই ধারণা প্রচলিত যে প্রাক-আর্য যুগে বিদেশ হইতে আগত ভূমধ্যসাগরীয় আর্মেনয়েড গোষ্ঠীর জাতি সিন্ধু সভ্যতার পত্তন করিয়াছিল।

সিন্ধু সভ্যতার বাহকদিগের মধ্যে জাতি সংমিশ্রণ সম্বন্ধে আলোচনার সময়ে এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে বলা হইবে।

সিন্ধু জাতি এবং স্বমেরীয় ও এলামাইট জাতির মধ্যে বাণিজ্যিক সংযোগের সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে মতবাদের ভিত্তি কৃতকগুলি নির্দেশন। সিন্ধু উপত্যকার বৈশিষ্ট্যসূচক সীলের, অল্পরূপ কয়েকটি সীল স্বমেরের (উর ও কিস) কয়েকটি প্রাগৈতিহাসিক যুগের স্তূপ হইতে পাওয়া গিয়াছে। এই সকল স্তূপ খ্রীঃ পূঃ ৩০০০ বৎসর পূর্বের ধ্বংসপ্রাপ্ত নগরের। সিন্ধু উপত্যকার সীলগুলি ব্যবসায়-বাণিজ্য সম্পর্কে ব্যবহৃত হইত বলিয়া একটি মত প্রচলিত আছে।

প্রাচীন মেশোপটেমিয়া ও সিন্ধু উপত্যকার বাণিজ্যিক সম্পর্কের কথা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে প্রাচীন যুগে মেশোপটেমিয়ার অভ্যুদয়ের অগ্রতম কারণ এই যে, উহা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের মধ্যে বাণিজ্যিক সংযোগের পথে অবস্থিত। একজন ঐতিহাসিক বলিতেছেন, "Babylon and Nineveh owed their greatness to their being entrepots of trade passing from the East to the West."

অতি প্রাচীনকাল হইতে তিনটি পথে পশ্চিম জগতের সহিত ভারতের বহির্বাণিজ্য চলিত, লোহিত সাগরের পথ, পারশ্ব উপসাগরের পথ এবং উত্তরে সিন্ধু-কাম্পিয়ানের পথ। পারশ্ব উপসাগরের পথে যে বাণিজ্য চলিত সেই পথ মেশোপটেমিয়া হইয়া বরাবর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া মাইনরের সিলিসিয়ান উপকূল পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। লোহিত সাগরের পথে যে বাণিজ্য চলিত তাহার ঘাঁটি ছিল মিশরের বন্দর। উত্তরের পথে সিন্ধু উপত্যকা হইতে অক্সাস নদী পর্যন্ত উটের পিঠে মাল চালান হইত। অক্সাস বাহিয়া এই মাল আরল সমুদ্রে পৌঁছিত এবং কাম্পিয়ান ও কৃষ্ণসাগরের তীরবর্তী অঞ্চলে বিলি হইত। গ্রীক আমলে আলেকজান্দ্রিয়া প্রতিষ্ঠিত হইলে লোহিত সাগরের পথ প্রবল ও পারশ্ব উপসাগরের পথ দুর্বল হইয়া পড়িল। ভূমধ্যসাগরীয় দেশসমূহে ভারতের মাল সরবরাহ করিত কার্থেজের বাণিজ্যবাহিনী। রোমের অভ্যুদয় হইলে এই বাণিজ্যের অধিকার লইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হইল; ফলে পিউনিক যুদ্ধ ঘটিল। রোম মিশর ও আলেকজান্দ্রিয়া দখল করিয়া লোহিতসাগরের বাণিজ্যপথ দখলে আনি। তারপর সিরিয়া দখল করিয়া ইউফ্রেটিস পর্যন্ত সাম্রাজ্যের সীমানা প্রসারিত করিলে পারশ্ব উপসাগরের পথও তাহার আয়ত্তে আসিল। রোমের সহিত দক্ষিণ-ভারতের বাণিজ্যিক সংযোগ প্রমাণিত হইয়াছে। কুশান আমলে অক্সাস-কাম্পিয়ান পথেও ভারতের সহিত পশ্চিম জগতের সংযোগ ছিল। ইহার পর আরবগণ মিশর জয় করিয়া

লোহিতনাগরের পথের বাণিজ্যঘাট আলেকজান্দ্রিয়া দখল করিল। পারশ্ব জয় করিয়া খলিক ওমর ট্রাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিসের মোহনায় বসরা বন্দর প্রতিষ্ঠিত করিলেন যাহাতে ভারতীয় বাণিজ্য সম্পূর্ণরূপে অবিকার করা যায়। আলেকজান্দ্রিয়া বন্দর যুরোপীয়গণের পক্ষে বন্ধ হইয়া গেল। দুইটি জলপথ এই ভাবে বন্ধ হওয়ায় আবার উত্তরের স্থল পথের দিকে দৃষ্টি পড়িল।

ইউরোপীয়গণ এই রুদ্ধ জলপথ মুক্ত করিবার চেষ্টায় সাফল্য লাভ করিল খ্রীষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীতে (১৪৯৮ খ্রীঃ অঃ) যখন উত্তমাশা অন্তরীপ অতিক্রম করিয়া ভাস্কোডাগামার পরিচালনায় তিনখানি পর্তুগীজ জাহাজ ভারতীয় সমুদ্রে আবির্ভূত হইল।

সে যাহা হউক, সিদ্ধ উপত্যকার সঙ্গে প্রাচীন মেশোপটেমিয়ার বাণিজ্যিক সংযোগ ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রশ্ন উঠে, এই বাণিজ্য চালাইত কাহার? যে বাণিজ্যিক সংযোগের নিদর্শনের উল্লেখ করা হইয়াছে উহা পাওয়া গিয়াছে কিশ ও উরে। মোহেজ্জোদারো, হরান্সা ও বেলুচিস্থানের বিভিন্ন স্থাপ হইতে স্মেরীয় ও এলামাইট বাণিজ্যের সংযোগের নিদর্শন কি পাওয়া গিয়াছে তাহার উল্লেখ দেখা যায় না। অবশ্য কৃষ্টিমূলক সংযোগের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে পণ্ডিতগণ এ কথা বলেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে মিশরে খ্রীঃ পূঃ ১৭শ শতাব্দীর কবর হইতে ভারতের সহিত বাণিজ্যিক সংযোগের নিদর্শন যে মসলিন ও নীল পাওয়া গিয়াছে তাহাও ভারতের জিনিস। অবশ্য ইহা হইতে এরূপ অনুমান না করিলেও চলে যে এক পক্ষই বাণিজ্য চালাইত। আর একটি কথা স্মরণ করা প্রয়োজন। মোহেজ্জোদারো ও হরান্সা, এই উভয় স্থানই সমুদ্রতীর হইতে দূরে অবস্থিত। ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক সংযোগ রক্ষা করিতে হইলে সিদ্ধুর মোহনায় ঘাট রক্ষা করিবার প্রয়োজন হইত। এই ঘাট এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। এই ঘাট মাত্রাণ উপকূল, কাখিয়াবাড় বা কোঙ্কণ উপকূলেও হইতে পারিত।

সিদ্ধ উপত্যকার সহিত প্রাচীন মেশোপটেমিয়ার কৃষ্টিমূলক সংযোগ সম্বন্ধে কি বলা হইয়াছে এইবার দেখা যাইতে পারে। এই প্রসঙ্গে বলা আবশ্যিক যে, মেশোপটেমিয়ার সঙ্গে সিদ্ধ উপত্যকার কৃষ্টিমূলক সংযোগ সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা করিতে হইলে স্মের, আকাদ, বাবিলোন ও আসিরীয়ার সভ্যতা বিকাশ ও রাজনৈতিক অভ্যুদয়ের যে ক্রম নির্দেশ ও মোটামুটি কাল নির্ণয় করা হইয়াছে তাহা স্মরণ রাখা প্রয়োজন। আরও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কোন কোন পণ্ডিতের মতে আকাদ, বাবিলোন ও আসিরীয়ার কৃষ্টির কাঠাম স্মেরীয়। পণ্ডিতগণের অহুমিত

প্রাচীনত্বের হিসাব করিলে সিদ্ধ উপত্যকার সহিত কৃষ্টিমূলক সংযোগ বলিতে প্রধানতঃ প্রাক্-সেমিটিক স্মেরের সহিত সংযোগ বুঝায়।

এই সংযোগ সম্বন্ধে তিনটি মতবাদের উল্লেখ করা যায়। একটি মত এই যে, স্মেরীয় কৃষ্টি সম্ভবতঃ সিদ্ধ কৃষ্টি হইতে উদ্ভূত। ডাঃ হলের মতের উল্লেখ করা হইয়াছে। তিনি বলেন যে স্মেরীয় কৃষ্টির উৎপত্তি হইয়াছে প্রাক্-আর্য যুগের ভারতীয় কৃষ্টি হইতে। পূর্বের একটি প্রবন্ধে সর জন মার্শালের মতের উল্লেখ করা হইয়াছে। স্মেরীয় প্রাচীন নিদর্শনের অল্পরূপ নিদর্শন মোহেজ্জোদারো ও হরান্সা স্থপের উপরের স্তরগুলিতে পাওয়া গিয়াছে। তিনি বলেন,—কেহ কেহ বলেন স্মেরীয়গণ অল্প স্থান হইতে দক্ষিণ-মেশোপটেমিয়ায় গিয়াছিল। এই মত গ্রাহ্য করিলে ভারতবর্ষ স্মেরীয় কৃষ্টির জন্মভূমি হওয়া আশ্চর্য্য নহে। সর জন মার্শাল সাবধানী পণ্ডিত, ইহার বেশী অগ্রসর হওয়া তিনি সঙ্গত মনে করেন নাই। তাঁহার মত কতকটা এই যে সিদ্ধ কৃষ্টির কতকগুলি অল্প মেশোপটেমিয়া হইতে প্রাপ্ত কিন্তু উহার যথেষ্ট স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ছিল। যাহারা বলেন যে সিদ্ধকৃষ্টি মেশোপটেমিয়া হইতে আমদানী হইয়াছিল তাঁহাদের মধ্যে ডাঃ হাটনের নাম করিতে হয়। তাঁহার মত এই যে, সিদ্ধকৃষ্টির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি মেশোপটেমিয়া হইতে আসিয়াছিল এবং উহা আনিয়াছিল ভূমধ্যসাগরীয় ও আর্মেনিয়েড গোষ্ঠীর লোক।

কৃষ্টিমূলক সংযোগের প্রমাণ হিসাবে যে সকল নিদর্শনের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার দুই-চারটির কথা বলা হইতেছে। সিদ্ধ উপত্যকার স্থাপত্য সম্বন্ধে এখানে কিছু বলা হইতেছে না। মার্শাল ইহাকে সিদ্ধ উপত্যকার নিজস্ব জিনিস বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। ডাঃ ম্যাকে কিশ ও মোহেজ্জোদারোতে প্রাপ্ত পোড়ামাটির তৈজসের (ceramic wares) সাদৃশ্যের উল্লেখ করিয়াছেন। হাম্মুরাবির সময়ের একটি মন্দিরের ধ্বংসস্থপের মধ্যে প্রাপ্ত একটি সীলের সহিত মোহেজ্জোদারো ও হরান্সায় প্রাপ্ত সীলের সাদৃশ্যের কথা তিনি বলিয়াছেন। নাগপুর সেন্ট্রাল ম্যাজিয়মে রক্ষিত বাবিলোনের প্রথম রাজবংশের আমলের একটি সীলের উল্লেখ এই প্রসঙ্গে করা যাইতে পারে। হরান্সায় প্রাপ্ত একটি প্রসাধন বা টয়লেট-সেটের গঠনপ্রণালী উর নগরের ধ্বংসস্থপ হইতে প্রাপ্ত টয়লেট-সেটের গঠনপ্রণালী হইতে অভিন্ন বলা হইয়াছে। এইরূপ আরও কতকগুলি খুচরা জিনিসের নক্সা বা কারুকার্য্যে মেশোপটেমিয়ায় প্রাপ্ত অল্পরূপ বস্তুর নক্সার সহিত সাদৃশ্যের কথা বলা হইয়াছে। তারপর উল্লেখ করিতে হয় কতকগুলি অদ্ভুত জন্তুর মুক্তি খোদিত সীলের।

একটি সীলে মানুষের মুখ কিন্তু ছাগল বা ভেড়ার দেহবিশিষ্ট কাল্পনিক জন্তুর মূর্তি দেখা যায়। আসিরীয় শিল্পের মানুষের মুখ ও সিংহের দেহবিশিষ্ট কল্পিত জন্তুর সহিত ইহার তুলনা করা হইয়াছে। অর্ধেক মানুষ ও অর্ধেক ঘণ্ডের দেহবিশিষ্ট একটি সীলের সঙ্গে সুমেরীয়ার এয়াবনি বা এলিডুর তুলনা করা হইয়াছে। এয়াবনি সুমেরীয় পুরাণের একজন রাক্ষস, গিলগামেশকে বধ করিবার জন্য অকুরা দেবী তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। মোহেঞ্জোদারোর সীলে দেখা যায় এই অদ্ভুত জীব একটি শৃঙ্গধারী সিংহকে আক্রমণ করিতেছে। কতকগুলি সীলে শৃঙ্গধারী মানুষ মূর্তি দেখা যায়। মার্শালের মতে "there is a 'strong presumption for connecting them with the Sumerian hero-god Eabani.'" একটি মূর্তির গাত্রাবরণের নক্সা (trefoil patterning) কতকগুলি সুমেরীয় মূর্তির ("Bulls of Heaven") গাত্রাবরণের নক্সা হইতে অভিন্ন বলা হইয়াছে।

উপরে যে সাদৃশ্যের কথা বলা হইয়াছে সেই ধরণের সাদৃশ্য সিন্ধু উপত্যকা ও মেশোপটেমিয়ার মধ্যে কৃষ্টিমূলক সংযোগের প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য এই প্রকার প্রমাণের বলে ইহার বেশী অগ্রসর হওয়া চলে না, কিন্তু পণ্ডিতগণ অগ্রসর হইয়াছেন। সিন্ধু উপত্যকার ধর্মের আলোচনার সময়ে ইহা বিশেষভাবে দেখা যাইবে। এখানে সংক্ষেপে দুই-একটি কথা বলা হইতেছে।

বেলুচীস্থান ও অন্তর কতকগুলি স্তূপ হইতে বহু ক্ষুদ্র পোড়ামাটির ঘণ্ডের মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। মোহেঞ্জোদারো ও হরাপ্পার কতকগুলি সীলে ঘণ্ডের মূর্তি দেখা যায়। ষণ্ড প্রাচীন মেশোপটেমিয়া, মিশর, ইজিপ্তীয়ান সাগর অঞ্চলে পূজিত হইত। পৌরাণিক হিন্দুধর্মে ষণ্ড শিবের বাহন ও অবতার রূপে পূজিত। স্মরণ্য অল্পমান করা হইয়াছে সিন্ধু উপত্যকায় ষণ্ড উপাসনা প্রচলিত ছিল এবং উহা বিদেশ হইতে আসিয়াছে। বহুসংখ্যক পোড়ামাটির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ত্রীমূর্তি মোহেঞ্জোদারো, হরাপ্পা ও বেলুচীস্থানে পাওয়া গিয়াছে। উপরে উল্লিখিত দেশসমূহে স্ত্রীদেবতার উপাসনা প্রচলিত ছিল, পৌরাণিক হিন্দুধর্মেও স্ত্রীদেবতার উপাসনা রহিয়াছে। অল্পমান করা হইয়াছে এই সকল অদ্ভুত স্ত্রীমূর্তি সকলেই দেবীপ্রতিমা এবং স্ত্রীদেবতার উপাসনা বিদেশ হইতে আসিয়াছিল। সিন্ধু ধর্মের বিভিন্ন অঙ্গের ব্যাখ্যায় মেশোপটেমিয়া, সিরিয়া, মিশর, আনাতোলিয়া, প্যালেষ্টাইন, ক্রীট, সাইপ্রাস প্রভৃতি অঞ্চলের প্রাচীন ধর্মের নিদর্শন প্রমাণ হিসাবে দাঁড় করান হইয়াছে। সিন্ধু ধর্মে স্ত্রীদেবতার উপাসনা সম্বন্ধে প্রচলিত মত শেষ পর্যন্ত এই দাঁড়াইয়াছে যে, গোড়ায়

স্ত্রীদেবতার উপাসনার উৎপত্তি হইয়াছিল আনাতোলিয়ায় (ফ্রিজিয়ায়) এবং সেখান হইতে উহা সিরিয়া ও মেশোপটেমিয়ায় এবং মেশোপটেমিয়া হইতে সিন্ধু উপত্যকায় প্রচলিত হইয়াছিল। পণ্ডিত ডাঃ হার্টন এ সম্বন্ধে এতটা নিঃসন্দেহ সে অঙ্গুলী নির্দেশ করিয়া তিনি বলিয়া দিয়াছেন যে দেবদাসী প্রথা, হিন্দু সামাজিক অনুষ্ঠানে মন্ত্র উপাসনা, সর্প উপাসনা, fire walking বা অগ্নি সঞ্চরণ (যেমন চড়কপূজায়, দক্ষিণ ভারতের কোন কোন অঞ্চলে ধর্মপূজায় এই প্রথা প্রচলিত আছে) প্রভৃতি দ্রাবিড় ভাষাভাষী ভূমধ্যসাগরীয় গোষ্ঠীর দ্বারা এশিয়া মাইনর প্রভৃতি দেশ হইতে আনীত হইয়াছিল। ডাঃ হার্টনের মতে এই গোষ্ঠীর লোকেই সিন্ধু সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছিল। আমাদের অল্পমান করিতে হইবে যে সিন্ধু ধর্মেও এই সকল বৈশিষ্ট্য ছিল এবং অল্প প্রমাণভাবে নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীর কল্পনা-বিলাসকে এক্ষেত্রে প্রমাণ বলিয়া মনে করিতে হইবে।

সিন্ধু কৃষ্টির সহিত মেশোপটেমিয়ার প্রাচীন কৃষ্টির সংযোগ সম্বন্ধে পণ্ডিতসমাজে যে বিতর্ক হইয়াছে উপরের বিবরণ হইতে তাহার যৎসামান্য ইঙ্গিত মাত্র পাওয়া যাইবে। তিন প্রকারের সংযোগ সম্বন্ধে যে সকল মতের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা হইতে বাস্তবিক এই সংযোগ কিরূপ ছিল সে সম্বন্ধে কোন পরিচ্ছন্ন ধারণা করা সহজ নহে। পণ্ডিত সমাজের এই বিতর্কের মধ্যে কয়েকটি জিনিস দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রথমতঃ এই বিতর্কের গোড়ায় যে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিটুকু আছে অতি সহজে পণ্ডিতগণ তাহা অগ্রাহ্য করিতে প্রস্তুত। যদি একথা সত্য হয় যে সুমেরীয় কৃষ্টির সহিত যাহাতে সংযোগ প্রমাণ হয় সেই সকল নিদর্শন মোহেঞ্জোদারো ও হরাপ্পার উপরের স্তরগুলিতে পাওয়া গিয়াছে এবং তাহার নীচে বহু স্তর আছে তাহা হইলে সিন্ধু সভ্যতার উৎপত্তি বিচারের ঐসঙ্গে যে প্রকার প্রমাণের সাহায্য লওয়া হইয়াছে তাহার অনেকখানি অর্থহীন হইয়া যায় এবং বলিতে হয় যে এই সংযোগ সিন্ধু-সভ্যতার শেষ আমলের ব্যাপার। যদি সিন্ধু-সভ্যতার যে কাল নির্ণয় করা হইয়াছে (খ্রীঃ পূঃ ৩২৫০) নানা প্রকার ত্রুটি সম্বন্ধে তাহাই আলোচনার ভিত্তি বলিয়া গ্রহণ করা হয় তাহা হইলেও দেখা যাইবে সংযোগ প্রমাণ করিবার জন্য যে সকল যুক্তি ব্যবহার করা হইয়াছে তাহার বারো আনা অগ্রাহ্য করিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ, যে কোন প্রকারে ইউক সিন্ধু সভ্যতা মেশোপটেমিয়ার নিকট স্থগী প্রমাণ করিবার প্রবল আগ্রহ। আগ্রহের প্রাবল্যে যে ধরণের যুক্তি ব্যবহার করা হইতেছে তাহার অসারতা নজর এড়াইয়া গিয়াছে। সম্ভবতঃ সিন্ধু সভ্যতা ভারতীয় সভ্যতা বলিয়া মত প্রকাশে কোন কোন বৈদেশিক পণ্ডিতের বিবেচনায়

দায়িত্ববোধ লুপ্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। ইহা বৈজ্ঞানিক মনোভাব নহে। তৃতীয়তঃ, সিদ্ধু সভ্যতাকে বৈদিক আৰ্য সভ্যতার পূর্ববর্তী ও প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে দ্রাবিড় সভ্যতা বলিয়া প্রমাণ করিবার প্রয়াস। সিদ্ধু লেখনসমূহের পাঠোদ্ধার করা এ পর্যন্ত সম্ভব হয় নাই কিন্তু সিদ্ধু সভ্যতার বাহক গোষ্ঠীকে দ্রাবিড় ভাষাভাষী বলিয়া প্রচার করিতে অনেক পণ্ডিতের বাধে নাই। এই গোষ্ঠী মেশোপটেমিয়া হইতে আসিয়াছিল, এজন্ত মেশোপটেমিয়াতে দ্রাবিড় ভাষা প্রচলিত ছিল এরূপ অনুমান করা হইয়াছে। সংক্ষেপে বলা যায় যে, বিতর্কের মূল কথা বিভিন্ন পণ্ডিতের পূর্বগঠিত মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করিবার উৎসাহ। এই উৎসাহ প্রায় নিরক্ষুশ।

অপরূপাত পণ্ডিতের বাহুল্য না থাকিলেও অভাব নাই। সিদ্ধু সভ্যতার নিদর্শনসমূহের সহিত খাঁহাদিগের পরিচয় ঘনিষ্ঠ এবং অপরের অপেক্ষা অধিক এইরূপ দুই জনের মতের উল্লেখ করা যাইতেছে।

সার জন মার্শালকে সাবধানী পণ্ডিত বলা হইয়াছে। মেশোপটেমিয়ার কৃষ্টির সহিত সিদ্ধু কৃষ্টির সংযোগের প্রমাণ-গুলির উল্লেখ করিয়া তিনি সিদ্ধু কৃষ্টির বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃষ্টি

আকর্ষণ করিয়া বলিয়াছেন যে, এই কৃষ্টির স্বকীয়তার, অত্যাশ্চর্য প্রাচীন যুগের কৃষ্টির সহিত পার্থক্যের প্রচুর প্রমাণ রহিয়াছে। সিদ্ধু উপত্যকার স্থাপত্য তাহার নিজস্ব জিনিস। উহার সাধারণ স্নানাগারগুলির মত জিনিস। রোমান যুগের পূর্বে আর কোথাও দেখা যায় না। সিদ্ধু উপত্যকার শিল্পের স্বাভাবিকতা তাহার নিজস্ব জিনিস, এলাম, সূমের বা মিশরের সমনাময়িক শিল্পের সঙ্গে উহার কোন মিল নাই। সিদ্ধু উপত্যকার পট্টাবির নক্সা, এখানে তুলার কাপড়ের ব্যবহার, সিদ্ধু উপত্যকার লিপিমালার উৎকর্ষ সিদ্ধু কৃষ্টির বৈশিষ্ট্য। সিদ্ধু ধর্মের সম্বন্ধে যতটুকু খবর পাওয়া যায় তাহাতে সিদ্ধু কৃষ্টির স্বকীয়তার দাবি সম্পূর্ণ সমর্থিত হয়। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা পরে হইবে। সূমের বা বাবিলোনের দেবমন্দিরগুলির স্থাপত্যের মত কোন স্থাপত্যের নিদর্শন সিদ্ধু উপত্যকার পাওয়া যায় নাই ইহা উল্লেখ করিয়া ডাঃ ম্যাকে বলিতেছেন এই এক মাত্র তথ্যের দ্বারা প্রমাণিত হয় সূমেরীয় ও সিদ্ধু জাতির ধর্মের মধ্যে কোন মিল বা সংযোগ ছিল না, ("This alone would, in my opinion, suffice to show that the religion of the Sumerians and of the Indus valley people were dissimilar")।

ব্রিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত পুরাতন বাংলা পত্র-পত্রিকা

শ্রীশান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

অল্পচিন্তায় সাত সমুদ্র ভের নদীর পারে আসিয়া পড়িয়াছি। অবসর মিলিলেই ব্রিটিশ মিউজিয়মে গিয়া তাহার সদ্যব্যহার করিবার চেষ্টা করি। মিউজিয়মে রক্ষিত একটি জিনিসের প্রতি আমার দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে; উহা বাংলাদেশের পুরাতন পত্র-পত্রিকা। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপদেশে, ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসের উপকরণ-স্বরূপ, এই সকল বাংলা সংবাদপত্র হইতে প্রয়োজনীয় সংবাদগুলি সংকলন করিবার বাসনা বলবতী হইয়াছে। বর্তমান প্রবন্ধে তাহার স্মৃচনা করিলাম।

গৌরমোহন আচ্যের ওরিয়েন্টাল সেমিনারি

(‘সমাচার চন্দ্রিকা’, ২২ জুলাই ১৮৩০। ৮ শ্রাবণ ১২৩৭)

বিভালয়। সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে মোকাম গরাংহাটার শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের ডাক্তারখানার দক্ষিণ ৩২৮ নং বাটীতে ওরিয়েন্টাল শিমিনারি নামক বিভালয় ছই বৎসর সংস্থাপিত হইয়াছে তাহা প্রায় অনেকেই জ্ঞাত হইয়া থাকিবেন তথাচ বনি গুণি বিশিষ্টশিষ্ট বর্দ্ধিষ্ণু গুণগ্রাহক

মহাশয়েরদিগের নিকট এই নিবেদন যে এই বিভাগমন্দিরে আপনাদিগের পুত্র পৌত্রাদি প্রভৃতি অনেক ছাত্র ইংরেজী শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছেন এবং এক্ষণে ঐ বিভাগটির লেটিন ভ্রান্স ইংরেজী হিষ্টোরি জিওগ্রাফি এষ্ট্রনমি ফিলাসফি মেথমেটিক্স এণ্ড আলজেব্রারী অর্থাৎ নব্য এবং প্রাচীন রাজ্যের রত্নাস্ত ও ভূগোল রত্নাস্ত এবং জ্যোতিষ বিদ্যা ও পদার্থ বিদ্যা এবং অস্ত্র বিজ্ঞা ইত্যাদি শাস্ত্র পূর্ণরূপ শিক্ষার্থে জার্জ আলগেজেন্ডার টরন-বুল এবং জার্জ এডুয়ার্ড মালিস নিযুক্ত হইলেন এবং ঐ শিক্ষকেরদিগের নাম সকলেই প্রায় ক্রত হইয়া থাকিবেন কারণ ঐ প্রথম ব্যক্তি শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায়ের বিভাগালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি শ্রীযুত মেঠর হের সাহেবের বিভাগমন্দিরের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। পরন্তু ঐ পাঠশালাস্থ বালকেরদিগের তরজমা সদ্যব্যহার এবং সাধু ভাষাদি শিক্ষার নিমিত্তে একজন পণ্ডিত নিযুক্ত হইলেন এবং ঐ সকল বালকেরদিগের মধ্যে যিনি পারসী ভাষা অধ্যয়ন করেন এবং করিতে ইচ্ছুক হইলেন তাহারদের শিক্ষার্থে একজন মুন্সি নিযুক্ত হইবেক ইহাতে ঐ ছাত্রেরদিগের নানাপ্রকার

বিভা উপাধিগ্ৰহণে ন্যূনতা হইবেক না এবং যতপি কোন মহাশয়েরা আপন আপন পুত্র পৌত্রাদি প্রভৃতিকে নিযুক্ত করিতে ইচ্ছুক হইলেন তবে এই পাঠশালাতে পাঠাইলে নিযুক্ত করিতে করা যাইবেক এবং ঐ পাঠশালার নিয়মিত হার ১০৪।৫ টাকা পর্যন্ত ইতি বিজ্ঞাপন প্রাৰণন্ত্রীণেরমোহন আচ্য। সাং শিমলা।

শ্রামবাজার-নিবাসী জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন

(‘সমাচার চন্দ্রিকা’, ১৯ আশ্বিন ১২৩৭)

পণ্ডিতের মৃত্যু। আমরা মহা দুঃখিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে শ্রামবাজার নিবাসী জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য মহাশয় গত ১৫ আশ্বিন বৃহস্পতিবার পরলোক গমন করিয়াছেন ভট্টাচার্যের বয়ঃক্রম অল্পমান ৫৫ বৎসরের অধিক নহে ইনি নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন কিন্তু স্থায় দর্শনে বিশেষ পারগতা প্রযুক্ত তৎশাস্ত্রাধ্যাপনা করিতেন ইহাতে মহাখ্যাতি-পন্ন ও মান্য হইয়া অনেক স্থানে অধ্যাপক নিয়ন্ত্রণ ও বিদ্যায় করণের অধ্যক্ষতায় নিযুক্ত হইতেন অতএব তাঁহার মৃত্যু সংবাদ শ্রবেণ দুঃখিত হইয়াছি এবং অনেকেই খেদিত হইবেন বিশেষতঃ অধ্যাপক মহাশয়েরা তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্যের গুণ স্মরণ করিয়া অবশ্যই চিন্তিত হইবেন।

ওরিয়েন্টাল একাডেমি

(‘সমাচার চন্দ্রিকা’, ১১ অগ্রহায়ণ ১২৩৭)

ওরিয়েন্টাল একাডেমি নামক বিদ্যালয় মেং ই, বি, কেনজি গাহেব বিনয়পূর্বক কলিকাতাস্থ ও তৎ ইতস্তত স্থানস্থিত লোকদিগকে জ্ঞাত করাইতেছেন যে এতদ্দেশীয় বালকদিগের ইংরাজী বিদ্যা অভ্যাসের নিমিত্ত এক্ষণে ওরিয়েন্টাল একাডেমি নামক এক বিদ্যালয় খোলা গিয়াছে তজ্জন্ত হই জন পারগ শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন একজনের নাম মেথিনস ইনি পূর্বে গরাণহাটায় ওরিয়েন্টাল শিমিনরি নামক বিদ্যালয়ে নিযুক্ত ছিলেন অত এক জন সম্প্রতি ইংলণ্ড হইতে আসিয়াছেন। হিন্দু কালেক্টর রীতানুসারে এই পাঠশালা চলিবেক। প্রধান বালকেরদিগের মাসিক বেতন ৩ টাকা অল্প পাঠার্থিদিগের ২ টাকা কিন্তু কেতাব ছাড়া। ঠিকানা হেদোপুষ্করিণীর ধানার নিকট।

শেরবোর্গ সাহেবের ইংরেজী বিদ্যালয়

(‘সমাচার চন্দ্রিকা’, ২ চৈত্র ১২৩৭)

বিজ্ঞাপন। মেং সেরবোর্গ সাহেব ষাঁহার ঘোড়াসাঁকোর ইংরাজী বিদ্যালয় ছিল তিনি এই রাজধানীর তাবৎ বাঙ্গালিদিগকে বিনয় পূর্বক নিবেদন করিতেছেন যে ত্রিশ বৎসর গত হইল তিনি উক্ত বিদ্যালয় বিলক্ষণ রূপে সম্পন্ন করিয়াছেন এবং এক্ষণেও সেই মত চলিবেক সেই বিদ্যালয় এক্ষণে ঘোড়াসাঁকো হইতে বহুবাজারে উঠিয়া গিয়াছে।

কালীপ্রসন্ন সিংহ

(‘সংবাদ প্রভাকর’, ২২ জ্যৈষ্ঠ ১২৭২)

কলিকাতা পুলিশের প্রধান মাজিষ্ট্রেট ব্রান্সন সাহেব অস্থ

হইতে পতিত হইয়া আপাততঃ বিচারালয়ে আগমনে অশক্ত হওয়াতে উপযুক্ত অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁহার কার্য্য করিতেছেন। থিয়োডোর ডিকেন্সের মৃত্যুর পর ব্রান্সন সাহেবের নিয়োগের পূর্বে এই বাবু কিছুদিন পুলিশের প্রধান আসনোপবিষ্ট হইয়া সদিচার বিতরণ দ্বারা বিলক্ষণ প্রশংসাজনক হইয়াছিলেন।

“প্রথম”

(‘সংবাদ প্রভাকর’, মাঘ ১২৮২)

ইংরাজ শাসনে এ পর্যন্ত যে কয়েকটি প্রধান ঘটনা হইয়া গিয়াছে, সমস্ত ঘটনাই ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা সম্পাদিত হইয়া মন্দ উভয়ই সেই ব্রাহ্মণবর্গের দ্বারা সাধিত। আমরা একে একে নিয়ে কয়েকটি উদাহরণ দেখাইতেছি। বঙ্গদেশের প্রথম বাঙ্গালী জজ ব্রাহ্মণ রায় রমাপ্রসাদ রায়। প্রথম গবর্ণমেন্ট উকীল বাবু বেগীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথম ইংলণ্ডগমনকারী রাজা রামমোহন রায়। প্রথম বাঙ্গালী সিবিলিয়ান বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রথম বিখ্যাত বাঙ্গালী গুষ্ঠান বাবু কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথম বিশ্ববাবিবাহকারী বাবু শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন। প্রথম শব্দের অর্থ ব্রাহ্মণ (বৈদ্য) বাবু মধুসূদন গুপ্ত। প্রথম ভারতেশ্বরীর সহিত আহারকারী বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর। প্রথম সি, এস, আই অর্থাৎ ভারতনক্ষত্র উপাধিধারীর নাম প্রসন্নকুমার ঠাকুর। প্রথম রেলওয়ের অধ্যক্ষ বাবু রামগতি মুখোপাধ্যায়। প্রথম ইংরাজের সহিত মিলিত হইয়া “কার ঠাকুর এবং কোম্পানি” নামক বাণিজ্যগার স্থাপন কর্তা বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর। প্রথম ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক স্থাপনকর্তা বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর। প্রথম কৌনসিলের সভ্য বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর। প্রথম গবর্ণর জেনেরেলের সভার সভ্য রাজা রমানাথ ঠাকুর বাহাদুর। প্রথম স্বেচ্ছের নিকট বেদপাঠকারী পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী। প্রথম ইংলণ্ডে শিক্ষিত ডাক্তার স্বরূপকুমার চক্রবর্তী। প্রথম ইংলণ্ডীয় যুবরাজের পাদপূজাকারী পণ্ডিত ভরতচন্দ্র শিরোমণি। প্রথম ভারতের ইংরাজ মিত্রব্রাজ্যের বিচারপতি বাবু নীলাদ্বার মুখোপাধ্যায়। প্রথম বিজাতীয় ধারায় উপস্থাপন লেখক বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। প্রথম ইংরাজী ধরণে “ল্যাণ্ড হোল্ডার্স এসোসিয়েশন” নামক সভার সৃষ্টিকারী বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর। প্রথম শিক্ষাবিভাগের ইনস্পেক্টর বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায়। প্রথম পদচ্যুত সিবিলিয়ান বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথম বাঙ্গলা বিখ্যাত নাটক লেখক পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন। প্রথম অন্তঃপুরের দ্বার উদঘাটন করিয়া বিজাতীয়কে প্রকাশরূপে বঙ্গকুলবতীদিগের মধ্যে আনয়নকারী বাবু জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়। এইরূপ যত ভালমন্দ কর্ম, সকলই ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা সম্পাদিত। [‘সংবাদ প্রভাকর’ প্রথম বাঙ্গালী ব্যারিষ্টার জানেন্দ্রমোহন ঠাকুরের নামোল্লেখ করিতে ভুলিয়াছেন]

আজ—আগামী কাল

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

১৮.

বাড়িটাকে দেখলে মনে হবে—একটা বন্দী-নিবাস। টানা ব্যারাকের মত লম্বা চলে গেছে—গলিটাকে পাকে পাকে জড়িয়ে। আগে ছিল দোতলা—সম্প্রতি উপরে আর একটি তলা উঠেছে—আয়ও বেড়েছে ছ'গুণ। ঠিক ফ্ল্যাট সিষ্টেমে তৈরি হলে—কল, জল, আরও অনেক বিষয় নিয়ে মানুষের সঙ্গে মানুষের অহোঁরাত্রি বিবাদ বাধত না। তা ছাড়া উত্তরের ধোঁয়া—কচি ছেলের কান্না—তার চেয়ে বড় ছেলেদের ঝগড়া মারামারি—দৌরাশ্বা—তা নিয়ে মায়েদের কলহ—তার ওপর রেডিওর বিচিত্র অল্পটানে বহু কণ্ঠের বহু চণ্ডের আবৃত্তি, গান, যন্ত্রসঙ্গীত, সংবাদ পরিবেশন—কি না আছে এখানে। উঠোন নেই, ছাদ নেই, কাপড় শুকোতে দেবার বারান্দা আছে—কিন্তু কাপড় মেলে দিয়ে ঠায় তার দিকে চেয়ে বসে থাকি ছাড়া গতান্তর নেই। এমনি একখানি বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে মলয়।

ভাল আশ্রয় অল্পট মিলত—কিন্তু সূচিরা আজীবন বাড়িতে যেতে চায় নি।

বাড়ি থেকে বেরিয়েছি—আরাম আশা করে নয়। এই তো ভাল।

এ হাটের মাঝে ধর পাততে পারবে? আমার ধর বাইরের কাজ আছে—পা মেলে বেড়াবার অফুরন্ত পথ আর ফাঁকা জায়গা আছে—

আমাকেও তোমার কাজে টেনে নেবে। পারবে না? ভূমি যাবে?

অবশ্য যদি তোমার মর্যাদায় না বাধে। ছুটিমিহুরা হাসি সূচিয়ার ওষ্ঠপ্রান্তে মিলিয়ে গেল।

মলয় বললে—মর্যাদা? কিসের মর্যাদা?

কেন—বাঙালীর অন্তঃপুরের একটি শুচিতা আছে তো?

মলয় উচ্চরবে হেসে বললে—পরীক্ষা করছ? অন্তঃপুর কোথায় যে তার শুচিতা বজায় রাখবার জ্ঞান—

বাঃ রে, যেখানে অন্তঃপুরিকা—সেইখানেই কি অন্তঃপুর নয়? সূচিরা কলকণ্ঠে হেসে উঠল।

মলয় বললে—রহস্য রাধ—সত্যিই কি ভূমি আমার সঙ্গে কাজে নামতে চাও?

না হলে তোমার সঙ্গে এসেছি কেন?

কিন্তু এরও পরীক্ষা আছে।

বেশ, কর পরীক্ষা।

প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা। দুঃখ কষ্ট—এসব সহ করার দৃষ্টান্ত দেব না—কারণ তাতে তোমরা অপরাধের। তবে

সমস্ত শুচিতা—এ সব খুঁতখুঁতনি মন থেকে মুছে ফেলতে হবে। মোট কথা পর্দার মধ্যে গজায় যে সব সংস্কার—হয়ত ভাল—হয়ত মঙ্গলজনক—তাও ত্যাগ করতে হবে।

সূচিরা বললে—মঙ্গলজনক যে সংস্কার তা ত্যাগ করবার প্রয়োজন হবে না। মেয়েদের হাতে দিব্য অস্ত্র আছে—তার সন্ধান তোমরা রাখ না বলেই এত সতর্কতা—উপদেশ বর্ষণ।

সে দিব্য অস্ত্রটি কি?

দিব্য অস্ত্রের সন্ধান অপর পক্ষকে দেওয়া নিষিদ্ধ।

সে তো শত্রুপক্ষকে।

তা হলে যারা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একসঙ্গে ফ্যাসি শত্রু ধ্বংস করলে—তারা দিব্যাস্ত্রের সন্ধান অপর মিত্র পক্ষকে জানাচ্ছে না কেন?

সন্দেহবশত। ভাবছে—নীতিতে যারা ভিন্ন পথের পথিক—

তারা মিত্র হলেও মিত্র নয়—এই তো? এ একটা কারণ বটে—কিন্তু নিজেকে গুরুত্ব গুরুতর করে রাখা মানুষের অন্ততম অভ্যাস—

সে অভ্যাস রাখা চলবে না। বদ অভ্যাস।

ছ'জনেই কোঁতুকে হেসে উঠল।

বল্লপরিসর ঘরে মানিয়ে নিলে সূচিরা।

প্রয়োজনের বাইরে এতটুকু বিলাসকে কোন দিক দিয়ে ও প্রশ্রয় দিলে না। আর ছোট ঘরে রান্না খাওয়ায় অল্প সময়ই তো ব্যয় হয়। কোন কোন বাসিন্দার মত—কর্তারা কার্যক্ষেত্রে চলে গেলে—একখানা নভেল হাতে করে—বিছানায় শুয়ে শুয়ে পড়া—কিংবা ঘুম—তাস খেলা বা গল্প এ সব সময় কাটানো ছফরই ঠেকবে। একখানি ঘরে—রোজকার রোজ—একবেয়ে কাজ—বন্দী জীবনের অহুয়ত্তি ছাড়া কি? যেখানে মাঠ নেই—আকাশ নেই—নিষ্প্রকৃতা নেই—গাছপালা নেই—যেখানে দিনদিন খাওয়া-শোওয়া-গল্প-কলহ চলেছে তো চলেছেই—বাইরের জগৎ কচিং দেখা দেয়—কালীঘাটে পূজো দিতে গিয়ে—দক্ষিণেশ্বরে বা বেলুড় মঠে বেড়াতে গিয়ে কিংবা পর্বোপলক্ষে গঙ্গাস্নানে—পথে ও গঙ্গার ধারে। আর আছে প্রমোদ বিলাসের জ্ঞান মাসে দুটি কি তিনটি দিন—সিনেমা দর্শন।

কোনটিই বন্দীর এক সেল থেকে আর এক সেল—এ যাবার পথ ছাড়া কি? সেই জীড়—সেই কোলাহল—কলহ—ঠেলাঠেলি—মারামারি। পৃথিবী পরিপূর্ণ হয়েছে বন্দী-নিবাসে অথবা জনসংখ্যা বেড়েছে—যাতে সঙ্গীর্ণ হয়েছে তার ভূমি। একটা কথা শোনা গিয়েছিল—যুদ্ধের পুরো যৌবনকালে।

বোমারুর উৎপাতে—অভিজ্ঞানের! কতোয়! দিয়েছিলেন (কোন কোন ক্ষেত্রে কার্য্যত সে উপায় গ্রহণও করেছিলেন) যে, শিল্প-কেন্দ্রগুলিকে ছড়িয়ে দিতে হবে দেশের অভ্যন্তরে। অতি ক্ষীণ দেহের অংশে নিশানা করা সোজা—তার ফলও অল্প আসবে মেলে। এখন যুদ্ধের বিভীষিকা মিলিয়ে গেছে—তৃতীয় মহাযুদ্ধের দুঃস্বপ্ন দেখলেও—আর তা নিয়ে সাবধান বাণী প্রয়োগ করলেও অতি সাবধানীর চিন্তা-উৎক্ষেপ বলে তা কানে তুলছে না কেউ।

মলয়ের পাশটিতে এসে দাঁড়াল স্মৃতি। বাইরের জগৎ বিভীর্ণ এবং বিচিত্রও বটে। এ জগতে দুঃখ যেমন আসে অভাবিত—দুঃখ তেমনি ভেসে যায় নানা কর্ণের প্রবাহে। আজ—কাল—পরশু প্রতিটি দিন—সময়ের দাগে দাগ মিলিয়ে আসে আর চলে যায় না। একক জীবনের প্রবাহে—কখনো শ্রাওলা—কখনো শতদল—কখনো তরঙ্গ—কখনো তুফান—এই বৈচিত্র্য-বৈভবে ভেসে আসে ঘটনা। ভেসে চলে যায় দূরে—কখনো শোভা কখনো বা সৌরভের স্পর্শ দিয়ে। দাগে দাগ মেলে না—কিছুই থাকে না চিরস্থায়িত্বের প্রলোভন দেখিয়ে। আর তাতেই বুঝি মন ওঠে ভরে। সঙ্করকে একটি জায়গায় স্তূপীভূত করলেই না মমতা।...স্রোতের জলকে খালের মধ্যে এনে জমা করা। লক্ষ্মী কৃপাদৃষ্টিতে চান—অদাস্যও ভালবেসে এগিয়ে আসে। সংসারের ঠাই বাঁধলে—জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার সম্ভাবনা প্রচুর। ঘর ছাড়বার পর এই অমুহুর্তি প্রবল হয়েছে স্মৃতির মনে—সম্পূর্ণকে পাওয়ার সাধনা সর্ব্বদা বিলিয়ে দিয়েই করতে হয়।

মলয়কে সে এক দিন বললে—তোমরা কংগ্রেসের সব নীতি মাননা তো?

মানি—কিন্তু সমর্থন করি না। মন্ত্রী-মিশনের সঙ্গে এই আলাপ-আলোচনায় দেশের স্বাধীনতা আসবে না—এটা আমরা বিশ্বাস করি।

স্মৃতি বললে—তবে আলাপ না চালিয়ে দেশকে বিদ্রোহের পথে টেনে আনলেই কি তোমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে।

মলয় বললে—টেনে আনার কথা নয়—কিন্তু এটা সর্ব্বদা মনে রাখা দরকার—আমরা আগুন চাইছি—পাচ্ছি আলেয়া। আর তাতেই ভুলে সব পেয়েছি বলে যদি নিরুত্তম হই তো কোণায় পিছিয়ে পড়ব ভাব কি?

কংগ্রেসের নেতারা কি এ কথা বোঝেন না?

নিশ্চয় বোঝেন। কিন্তু তাঁরা আশাবাদী। তাঁরা হয়ত এ-ও বোঝেন যে যুদ্ধের ধাক্কায় আমাদের সম্বল স্বভাবতই শিথিল হয়েছে কিছুটা। তা ছাড়া বিপ্লব বাধাবার উপযুক্ত সময়ও এটা নয়।

সে কথা কি তোমারও মনে হয় না?

হয়। তবে—এ কথা কি আরও সত্য নয় যে—যুদ্ধের

ইচ্ছাটা—যুদ্ধের কারণ সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন না হওয়া পর্যন্ত জাগিয়ে রাখা কর্তব্য? কারও সং প্রতিজ্ঞায় অবিশ্বাস করি না আমরা—

একটু থেমে হেসে বললে—কি জান—কালজ্ঞা কুটিল গতি। এখন কি পরিবেশ সৃষ্টি করে,—রাজনীতির রঙ্গক্ষেপে পটক্ষেপণ আর পটোভোলন—এ তো সাধারণের মত অনুসারে খটে না।

স্মৃতি বললে—লিখিত সর্ব্ব অবস্থার চাপে এক মুহুর্তে বাতিল হয়ে যায়।

মলয় বললে—বিপ্লব খড়ের আগুন নয়—ওপরের একটু দাছ পদার্থের সংযোগে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলেই তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। মানুষকে রাষ্ট্রসচেতন করতে হলে সমাজ-সংস্কার প্রথমে দরকার।

মোট কথা তোমরা বাম-পন্থী।

রক্ত গাঢ় হলেই মানুষ যে পন্থা নেয়—তা দক্ষিণ পন্থা নয়—ওটা আপোষ-নিষ্পত্তি—বিচার-বিবেচনা মানিয়ে চলার একটু দিক।

মানিয়ে চলাটাই—অর্থাৎ সহযোগিতাই সবচেয়ে বড় কথা নয় কি?

তারও আগে কতকগুলি ধাপ আছে—যা উত্তীর্ণ হওয়া দরকার। তুমি তেতলা থেকে হাত বাড়িয়ে দিলেই আমি একতলা থেকে কিছু সে হাত ধরতে পারি না।

তারই ব্যবস্থা তো হচ্ছে। সিঁড়ি—ইন্টারিম গভর্নমেন্ট হ'ল সেই সিঁড়ি যা দিয়ে এক তলার মানুষ পৌছতে পারে ওপর তলায় কিংবা তেতলার মানুষ নামতে পারে এক তলায়।

মলয় বললে, সিঁড়িটা তাই মজবুত হওয়া দরকার। ও সিঁড়ি যদি পলকা হয় কোন উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হবে না।

তাই বুঝি এত কথা কাটাকাটি—এক একটি ধারার ভাব ভাঙ্গ নিয়ে মাথা ঘামানো চলছে।

ওসব সিঁড়ি তৈরির প্ল্যান—ওটাও দরকার। তার চেয়ে দরকার ভাল মশলার, ভাল কারিগরের। মশলা হ'ল ভারতের সব জাতির একসঙ্গে কাজ করার ইচ্ছা—কারিগর হলেন যারা কাজ করবেন, দায়িত্ব নেবেন—একসঙ্গে আর একমত হয়ে।

তা কি করে হবে। লীগ আপত্তি তুলছে।

কংগ্রেসও তুলেছিল। তবু কিছু ছেড়ে মানিয়ে না নিলে আসল কাজটাই পণ্ড হয়ে যাবে।

তা হলে মানিয়ে চলায় তোমাদের আপত্তি কেন?

আমাদের আপত্তি হ'ল ভারতের খণ্ড সত্য। আমাদের আপত্তি নকল পাথর হীরে বলে আদর করার। স্বাধীনতা পেয়ে গেলেই যে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে লম্বা একটা ঘুম দেওয়া যাবে—ও ধারণা জন্মানোর পক্ষপাতী নই আমরা।

তবে কি করবে ?

কত যুগের জঞ্জাল আমাদের চারদিকে গজিয়ে উঠেছে, তার উচ্ছেদ চাই। স্বাধীনতার প্রথম যুগে আত্ম-উৎসর্গের আয়োজন চাই। আমাদের যুগটা কাটবে—উত্তোগ—শ্রম—বিপ্লব আর গঠনের দায়িত্বে। পরিবর্তনের অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার চেষ্টা করে যারা তাদের ঘুম মানায় না।

কংগ্রেস যদি নরম পন্থায় আপোষ করে ?

আমরা তা করতে দেব কেন।

কংগ্রেস যদি তোমাদের কথা না শোনে ?

সত্যিই হাসালে চিত্রা। কংগ্রেস কি ? নানা জাতির মিলন-প্রতিষ্ঠান মাত্র। জাতি যা চাইবে কংগ্রেস তা অস্বীকার করবে কেন ? তাই ত আমরা কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে সৃষ্টি করব না নতুন দল—

তবু তোমরা নতুন দলই—বামপন্থী। বলে সূচিরা হেসে তর্কের পরিসমাপ্তি করলে।

এক দিন মণীশের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল—প্রজ্ঞানন্দ পার্কে মিটিঙে যাবার মুখে।

সূচিরা মণীশকে লক্ষ্য করেনি। মণীশই প্রণাম করে বললে, মাপ করবেন বউদি—প্রথমটা আপনাকে চিনতেই পারি নি।

অপরাধ মণীশের নয়—এ ধরনের পটভূমিকায় সূচিরাও ও আশা করে নি।

সূচিরা নত নেত্রে বললে, অপরাধ আমারই—

মণীশ বললে, না বউদি—

মলয় বললে, যাক অপরাধতত্ত্ব—কিন্তু কোথায় তুমি গা ঢাকা দিলে এত দিন কোন পাতা লাগাতে পারি নি।

গিনি হাউসে আমাদের আন্তানা—যদি খোঁজ করতে অন্তত—

মলয় বললে, অগ্নিমা কোথায় ?

ঐ যে ডায়ালের একধারে যেখানে মেয়েরা বসে। এস, তোমাদের পেলে ও ভারি খুশী হবে।

মিটিং ভাঙলে—ওরা পার্কের একধারে বৃত্তাকারে বসলে। তারপর চলল আলোচনা। মন্ত্রীমিশন আর কংগ্রেস—ভারতের যুগবিপ্লবী পরিবর্তনের কথা।

মণীশ বললে, আলোচনা আর ব্যাখ্যা এ সবে স্বাধীনতা আসবে বিশ্বাস হয় ?

আলোচনা যদি আন্তরিক হয়—

বাধা দিয়ে মণীশ বললে, বিনা রক্তপাতে স্বাধীনতা লাভ শুনতে সোনার পাখর বাটির মত। তা হয় না—আমাদের তৈরি হতেই হবে।

বাড়ি এসে সূচিরা বললে, ওঁরা তোমাদের চেয়ে এক ধাপ এগিয়ে গেছেন। তোমরা বিশ্বাস কর না আলাপ-আলোচনায় স্বাধীনতার পথ প্রশস্ত হবে—ওঁরাও মনে করেন স্বাধীনতা হাটের জিনিষ নয়।

তা হলে আমরা তো একই হলাম।

না—ওঁরা জানেন হাতে কলমে দেখিয়েও দিয়েছেন সে বস্তু কোন উপায়ে হস্তগত করা যায়—তোমরা দেখছ বিপ্লবের স্বপ্ন। সেদিন স্মিত্রাদির সঙ্গে কথা হচ্ছিল হিন্দু-মুসলমানের মিলন নিয়ে। স্মিত্রাদি বললেন, নাই যদি আসে ওরা আমরাই গণ-পরিষদে আইন তৈরি করব স্বাধীন রাষ্ট্রের। বললাম, সে কি করে হবে ? দেশের সিকি ভাগকে বাদ দিয়ে—। উনি এটিলির উচ্চতি দিলেন সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বাধা জন্মাতে পারবে না সংখ্যাধরিষ্ঠদের কাছে।

সে ভাষ্যও তো বদলেছেন এটিলি। সম্প্রদায় সম্বন্ধে যে নিয়ম খাটত জাতি সম্বন্ধে তা খাটবে না। ও—বুকেছি তোমার কথা। তুমি বলছ বাদ দেওয়া যখন চলবে না কোন জাতিকেই তখন—‘যে আসে আলুক’ এ নীতি চলবে না। আই, এন, এ জাতিধর্মনির্বিশেষে একীকরণের যে দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছে দেশের সামনে—তাই বা স্বাধীন মানুষ নিতে পারছে না কেন। এটি অগ্রগতি মানি কিন্তু ফল হচ্ছে কই।

আর একটি শক্তিশালী দল ফরওয়ার্ড-ব্লক। ওঁরাও আই, এন, এর নীতিতে আস্থাবান—এবং নেতাজীর আদর্শ মেনে চলেন। ওঁরাও বলছেন—দরাদরি করে জিনিষ কেনা যায়, স্বাধীনতা লাভ হয় না।

মলয় বললে, তুমি কি বলতে চাও সূচিরা স্পষ্ট করে বল ত।

সূচিরা বললে, স্পষ্ট করে কি বলব—মন্ত্রীমিশন যা বলছেন তারও মানে যেমন নানা রকম—তোমাদের নানা দলে যে মন্তব্য করছ তাও বিচিত্রধরনের। এই সব দলের মন্তব্য থেকে আমার মনে হয়—অবশ্য সেটি আমারই মত—যে কংগ্রেস রফা-নিষ্পত্তির মনোভাব নিয়ে সদৃষ্টির সঙ্গে এগিয়েছেন—ওদের মনোভাব বদলে দেবেন এই আশায়—তোমাদের বামপন্থী দলগুলি তা বিশ্বাস করছে না। অথচ তোমরা এক ধরনের বিশ্বাস নিয়েও দল আলাদা আলাদা। এটা আশ্চর্য্য বোধ হয় না।

মলয় বললে, সোশ্যালিষ্ট আর কম্যুনিষ্ট পার্টি যেমন... খানিকটা এক হয়েও সবটা এক নয়—আমাদের এই বিভিন্ন দলগুলি—

সূচিরা বললে, আমার আশ্চর্য্য বোধ হয় তোমরা এক হয়ে একটি সাধারণ কর্মপন্থা বেছে নাও না কেন। দল যত বড় হয় তার ক্ষমতাও তত বেশি হয়—এ তো জান।

মলয় উত্তর না দিয়ে মুছ হাসলে। বললে, কিছু খাওয়াবে ? খিদে পেয়েছে।

আমার কথা এড়িয়ে যেতে চাইছ কিন্তু।

তা চাইছি। কারণ সব দলগুলিকে এক করার বিরুদ্ধে ব্যক্তিত্ব আমাদের কারও নেই—আমরা তা পারি না।

সূচিরা বললে, তা হলে তোমরা স্বপ্ন দেখবেই চিরকাল।

না চিত্র। শহরে আন্দোলন করে ছাত্র আর শ্রমিক খেপানো ছাড়া বিশেষ কিছু ফল হয় না, অস্বীকার করি না। —ওটাও গণজাগরণের একটি অংশ। তবে প্রকৃত কাজ আরম্ভ করতে হবে গ্রামে—কৃষক আর মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে নিয়ে। এর জন্য চাই সংগঠন—সমাজকে সুস্থ ও সক্ষম করে গড়ে তোলার কাজ। সে কাজও আরম্ভ করেছি আমরা।

সুচিত্রা বললে, খাবার খেয়ে কিন্তু খুলে বলতে হবে কি ধরণের কাজ আরম্ভ করেছ তোমরা।

১৯

শহরে বিক্ষোভ লেগেই রয়েছে। ডাক ও তার ধর্মঘট চলছে—গ্রেস-ধর্মঘটের নোটিশ দেওয়া হয়ে গেছে। বাটা মজ্জুর ইউনিয়ন চঞ্চল হয়ে উঠেছে। বেজুড়ে লোহা-চালাইয়ের কারখানায় অর্ধভুক্ত শ্রমিকরা করছে ধন ধন মিটিং। পৃথিবীর চার দিক থেকে খবর আসছে ধর্মঘটের। যুদ্ধের জোয়ার সেরে গেছে—দেশপ্রেমের মোহ—জীবন ধারণের সমস্ত সংঘাতে রূপ বদল করছে। যুদ্ধোত্তম মানুষের চিত্তক্ষেত্র অধিকার করে আছে, প্রকৃত যুদ্ধ বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার আয়োজনেই আরম্ভ হ'ল বুঝি।

ইতিমধ্যে কলকাতা বেশি রকম বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। কংগ্রেস মন্ত্রীমিশনের দীর্ঘমেয়াদী সর্ভ মেনে নেওয়াতে—লীগ স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী দুই সর্ভই বাতিল করে দিয়েছে। শুধু বাতিল করেই ক্ষান্ত হয় নি—অন্তর্ভুক্ত গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম করার সঙ্কল্প গ্রহণ করলে। এই সংগ্রাম প্রথম স্তর হবে যোলই আগষ্ট।...নেতারা কেউ কেউ বলেছেন—অহিংস সংগ্রাম আমাদের নীতি নয়। সংগ্রামের আগের দিন ঘোষণা করা হ'ল—এ দিন পূর্ণ হরতাল পালন করা হবে। যারা যোগ দিতে চায়—তারা যোগ দেবে—যারা যোগ দেবে না—তাদের ওপর জুলুম করা হবে না। যথাসম্ভব নিরুপদ্রবে প্রতিবাদ দিবস পালিত হবে। তবে যদিই কোন অপ্রীতিকর ব্যাপার ঘটে এইজন্য এ দিন সরকারী ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে।

ছুটি দেওয়ার বিরুদ্ধে যথেষ্ট বাদ-প্রতিবাদ হ'ল। সিকুর গবর্ণর ছুটির ঘোষণা বাতিল করে দিলেন—বাংলার লাট ভূষ্টিভাব অবলম্বন করলেন। এমন করে যোলই আগষ্ট এল। যোলই আগষ্ট এল অকল্লিত রূপে। সত্যতার পাদনীঠ থেকে গড়িয়ে পড়ল মানুষ। গড়াতে গড়াতে চলে গেল তারা আদিম যুগের আশ্রয়ে। পশু-জগতেও হননরীতির একটি সীমা নির্দিষ্ট আছে—জন্মস্বত্ব পাওয়া পশু-বিবেক বলা যায় তাকে। যোলই আগষ্ট আরণ্য রীতিকেও অতিক্রম করলে অনায়াসে।

শহরের রাজপথ শবে আচ্ছন্ন হ'ল—আকাশে উড়ল চিল আর শকুনেরা। আকাশে উঠল—নিরীহ যে-কোন-নীতি-অনভিজ্ঞ দলনিরপেক্ষ হিন্দু-মুসলমানের মরণ আর্ন্তনাদ, উঠল প্রাসাদ ও বস্তি লেহনকারী আশুনের লকলকে শিখা।

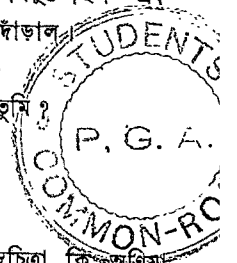
বাতাসে বারুদের গন্ধ—রক্তের গন্ধ—শবের গন্ধ। গুপ্তা-দলের উন্মত্ত চীংকারে মথিত হ'ল বায়ুমণ্ডল। মানুষ নয়—গোটা শহরটাকে হত্যা করা হ'ল। নাদির তৈমুরের কীর্তি ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে আর একবার ব্রিটিশ-শাসিত শহরের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

যোলই আগষ্ট এ তারিখটিতেই নিঃশেষিত হ'ল না—পর পর তারিখগুলি তার জের টেনে চলল। জয় হিন্দ আর আল্লা-হো-আকবর ধ্বনি বায়ুস্তর বিদীর্ণ করে এক প্রান্তের অরাজকতাকে অল্প প্রান্তে বিস্তীর্ণ করে দিলে। মন্ত্রীমিশন তখন বিনাতের ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় দুশ্চিন্তায়ুক্ত চিত্তে স্নানকার আয়োজন করছে।

শহর হুঃস্থগ্নীভূত, পথে ঘাটে লোক চলাচল নেই বললেই হয়। এক সম্প্রদায়ের এলাকা দিয়ে অল্প সম্প্রদায় চলাফেরা তো করেছেই না—সঙ্গীন উঁচানো প্রহরার সামনে পাশাপাশি দুই সম্প্রদায় দোকান খুলতে ভরসা পায় নি। দুধ সজীর অভাবে গৃহস্থের নাকালের অন্ত নেই—প্রচণ্ড আঘাতে শহর মুছা হ'ত। এমন সময়ে মণীশের সঙ্গে মলয়ের দেখা।

রেড ক্রসের গাড়িতে ওরা আর্ন্ত উদ্ধারে নিযুক্ত ছিল—এক পোড়াবস্তির গলিপথে দুখানা মোটর এসে দাঁড়াল।
খবর কি মলয়—তোমাদের পাড়াটা—
হাঁ—স্বরাজ্যে সুস্থ শরীরেই আছি। তুমি?
বাসা বদল করা দরকার।
আসবে আমার বাসায়?
আপত্তি নেই।

বাসায় ওরা কতটুকুই বা থাকে। সুচিত্রা কি অগ্রিম ওরাও অহোরাত্র ধাটছে। কাজের সীমা সংখ্যা নেই। এত রকমের হুঃখ ও হুঃভাগ্য আছে—যা কল্পনাতেও মানুষ আনতে পারে নি। সাম্প্রদায়িকতার বিষ-নিধাসে শহর ঢুলে পড়েছে। কাগজে কাগজে যে কাহিনী পরিবেশিত হচ্ছে—তা সত্য কিংবা সত্য-মিথ্যা জড়িত, অথবা কাল্পনিক এ নিয়ে বিচার নেই মানুষের মনে। মন বিভীষিকায় আচ্ছন্ন, অবিধাসে ও বেদনায় অহুভূতি উগ্র, দৃষ্টিতে ধরেছে তারই রং, বাক্যে প্রকাশ পাচ্ছে উত্তেজনা। সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে যে ক্রতজ্ঞতার বন্ধন—প্রতিবেশীসুলভ সৌভ্রাতৃবোধ—হুঃখে মমত্ব-বোধ ও ঐশ্বর্য্যে প্রীতি প্রকাশ মানব কর্তব্যের অঙ্গ ছিল তা বিলুপ্তপ্রায়। প্রতিবেশী দোষ না করেও পাড়া ছেড়ে পালাচ্ছে—প্রতিবেশী দোষী না হয়েও তাকে ভরসা দেবার সংসাহস দেখাতে পারছে না। পরম্পরের দীর্ঘ দিনের আলাপ আশ্রয়তার মাটি থেকে এককাল রস শোষণ করেছে—এই ক'টি দিনের হাঙ্গামায় সে মাটি শুকিয়ে গেছে; তারা হারিয়ে ফেলেছে সে দৃষ্টি—সে মন। সৈনিক প্রহরায় পাড়া ছেড়ে পালাচ্ছে সেই প্রতিবেশী—জানালা খুলে দেখবার সাহসটুকু নেই প্রতিবাসীর। দু'পক্ষের মাঝখানে অমানবীয়



আচরণ উত্তরঙ্গ সমুদ্রের ব্যবধান সৃষ্টি করেছে। সভ্যতার অগ্রগামী শ্রোত—আদিম কালের গুহায় ফিরে চলেছে। এই লজ্জাকে জয় করা সহজসাধ্য নয়।

এই নিদারুণ লজ্জার মধ্যেই আর এক পরম লজ্জাকর ব্যাপার ঘটল। ব্যাপারটি হ'ল হিসাব-নিকাশ। প্রথম উদ্বেজনা কেটে গেলে সুরু হ'ল বাগবাজার আর ট্রেটবাজারের হিসাব-নিকাশ। মোলালী-মাণিকতলা এরা বড়বাজার আর গ্রামবাজারকে ছাপিয়ে যেতে পেরেছে কি? ভবানী-পুরের সঙ্গে মেটিয়াবুজের পাল্লা দেওয়া চলল। লুণ্ঠিত সম্পত্তির মূল্য হিসাব আর নিশ্চিহ্ন প্রতিবেশীর সংখ্যার গণনা কাগজে আর লোকের মুখে—পথে, বস্তিতে, ক্লাবে, বাড়িতে, আপিসে আর দোকানে প্রতিনিয়ত চলল। শহর গুজবের আবের্ভে পাক খেয়ে ঘুরতে লাগল—স্বাভাবিক অবস্থা ফিরতে হ'ল দেরি।

ইতিমধ্যে দুর্গাপূজা এল—ঈদ সমাধা হল। গুপ্ত ছোরা মারার সংবাদ—সংবাদপত্র খুললেই চোখে পড়ে—কিন্তু ব্যাপক হাঙ্গামা বাধল না। তবে বড় রকমের একটা বিক্ষোভ গাক খেতে লাগল—হিসাব-নিকাশের অন্তরালে। তারপর এল দশই অক্টোবর। শহর থেকে বিক্ষুব্ধ টেউ সবেগে আছড়ে পড়লো নোয়াখালিতে। কলঙ্ক কাহিনীর আর এক পৃষ্ঠা ইতিহাসে সংযোজিত হ'ল। আবার কাগজে কাগজে আর্জনাৎদ হিসাব-নিকাশ। বাংলা থেকে বিহারে আছড়ে পড়ল টেউ। বিহার থেকে তার গতিবেগ প্রবল হয়ে হাজারায় আঘাত করলে—তারপর সৈয়দপুর। গৃহযুদ্ধের পটভূমিকা বিস্তৃত হ'ল।

দোসরা সেপ্টেম্বর কংগ্রেস যোগ দিয়েছে মধ্যবর্তী গবর্ণমেন্টে। দিল্লীর বড় দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়েছে। একটা চুরট মধ্যবর্তী সরকারের—মহামাঘ সদন্তের মোটরে মাত্র নিষ্কিপ্ত হয়েছিল, অগ্নিকাণ্ড ঘটে নি। কিন্তু সে আগুন ছড়িয়ে পড়েছে—রাজধানীর বাইরে। তারপর লীগের সদন্তেরা যোগ দিয়েছেন সরকারে তবু আগুন নেভে নি। একটা গোল বাধল যোলই মে-র ভাষ্য নিয়ে। গণপরিষদে যোগ দেবার প্রতিশ্রুতিতে লীগ নাকি মধ্যবর্তী সরকারে প্রবেশ করেছিল—অথচ লীগ বর্জন করলে গণ-পরিষদ। বড়লাটের মধ্যস্থতার বিবাদ মিটল না—তিনি এ পক্ষের দু'জন আর ও পক্ষের দু'জনকে টেনে নিয়ে গেলেন বিলাতে মোকাবিলা করতে। গণগোলটা ঐপিং সম্বন্ধে। অনিচ্ছুক আসাম বাংলার সঙ্গে হাত মেলাবে না—পঞ্জাবে আর সীমান্ত প্রদেশেও সেই সমস্ত। আর একটা বড় প্রশ্ন উঠল—লীগ যদি গণপরিষদ বর্জন করেই আর তার অল্পস্থিতিতে সেধানকার অধিবেশন চলে ও আইনকাহ্নন বিধিবদ্ধ হয়,—সে আইন লীগ মানতে বাধ্য কি না।

৬ই ডিসেম্বরে এটলি রায় দিলেন : অনিচ্ছুক যে কোন

অংশের ওপর জোর করে শাসনবিধি চাপানো চলবে না। গণপরিষদের অধিবেশন যথাসময়েই বসবে ও যথানিয়মেই চলবে—তবে তার বিধিবিধান গ্রহণ বা বর্জন করার স্বাধীনতা যে কোন দলেরই থাকবে। ১৬ই মে-র দ্ব্যর্থবাচক ঘোষণায় একটি গ্রন্থি পড়ল।

২০

শহরতলীর এ জায়গাটায় আগে ঘন হুর্ভদ্য বাঁশবন ছিল। প্রকাণ্ড—পড়ো জমি—আগাছা—লতাগুহা আর ছোট ছোট ডোবায় ছিল ভর্তি। এখান থেকে এনোফিলিসরা ম্যালেরিয়া বীজ বহন করে আশেপাশের গ্রামে দিত হানা—ম্যালেরিয়ার ডিপো বলে অর্দ্ধমৃত গ্রামগুলি বসতিবিরল হয়ে আসছিল ক্রমশঃ। শুভক্ষণে একাধিক কোম্পানীর নজর পড়ল এদিকে। বাংলায় অনাবাদী জমি কৃষিকর্মে যা এনে দিত সিন্দুকে—ব্যবসায় তা ভরিয়ে দিতে পারবে ব্যাঙ্কের খাতাকে। প্রথমে বড় একটা কাপড়ের মিলের জন্ম কয়েক শ বিঘা জমি লীজ নিয়ে জঙ্গল সাফ সুরু হ'ল। তার দেখা দেখি—আরও কয়েকজন ব্যবসায়ী বুকে পড়লেন এদিকে। ফলে কয়েক বছরের মধ্যে—দুটো কাপড়ের মিল—একটি এনামেল ও একটি গ্লাস ফ্যাক্টরী চালু হয়েছে—আর একটা মিলের জন্ম জমি দখল করা আছে—কাগজে কাগজে শেয়ার বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন বার হচ্ছে। ফলে হাজার হাজার বিঘার জঙ্গল—বাঁশবন পচা ডোবা মশককুল সমেত নিশ্চিহ্ন হয়েছে—আশপাশের গ্রামে নবজীবনের শ্রোত বইছে।

মিল বা ফ্যাক্টরীর অধিকৃত শ্রমিক ব্যারাক ও ম্যানেজার ইনসপেক্টর প্রভৃতির কোয়ার্টার্সও তৈরি হয়েছে। কোয়ার্টারে বৈদ্যুতিক আলো—সংরক্ষিত ট্যাঙ্ক থেকে পাইপবাহী পানীয় জলের ব্যবস্থা এ তো আছেই, যুদ্ধের শেষ ভাগে রেশন ব্যবস্থা চালু হওয়াতে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দোকানও খুলেছে কোম্পানী। ছুটি বাজার প্রত্যহ বসে। আর যেসব দোকান গ্রামের অভ্যন্তরে আছে—সেগুলোরও শ্রী ফিরেছে। বিশেষ করে দেশী মদের দোকানের আয় বেড়ে গেছে অসম্ভবরূপে। শহর পায়ে পায়ে এগিয়ে এসেছে গ্রামের দিকে।

কলকাতার প্রতিক্রিয়া এখানেও হয়ত সুরু হ'ত—মিল কর্তৃপক্ষ ও শ্রমিক ইউনিয়নগুলির চেষ্টায় তা হয় নি। অত্যাচারের তালিকা, নিহতের সংখ্যা নিয়ে তর্কবিতর্ক ও মনোমালিখ যে ঘটে নি তা নয়—তবে সেটা দেশী মদের দোকানের এলাকাতেই নিবদ্ধ ছিল।

দোতলার দক্ষিণ-খোলা বারান্দায় ইজিচেয়ারে দেহ এলিয়ে খবরের কাগজ পড়ছে প্রশান্ত। সন্ধ্যার মুখে এক পেয়াল চা ও টোটো মাখম ডিম জলযোগ করে বিশ্রামের মুহূর্তে কাগজ পড়া তার নেশা। বিশেষ করে আজকালকার অন্তর্বিপ্লবোন্মুখ ভারতবর্ষ যথেষ্ট কৌতূহল সঞ্চার করে মনে। নেতারা বলেন—ছুটি বছর অন্তত অশান্তি হানাহানি

কাটাকাটির মধ্য দিয়ে চললে তবে পরীক্ষার প্রথম ক্ষেত্রটি পার হওয়া যাবে। স্বাধীনতা অমনি আসবে না—মূল্য দিতেই হবে।

প্রশান্ত কাগজ পড়ছিল। শহরে—শহরের চারপাশে এ প্রতিভা ও প্রতিভা ধর্মঘট লেগেই আছে। যারা কলম পিষে দশটা পাঁচটা বজায় করে—তারাও ধর্মঘট করছে। সাম্রাজ্য আপিসের চল্লিশ হাজার কেরানী ছাঁটাই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে এক দিন কলম চালনা বন্ধ করেছিল—ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্ক এই তো সেদিন ধর্মঘট সেরে কাজে যোগ দিয়েছে—পোষ্ট আর টেলিগ্রাফ ওরাও কর্ম দিন কাজ বন্ধ করে বুঝিয়ে দিলে না—যুদ্ধোত্তর যুগের সঙ্গে পা ফেলে চলতে সক্ষম। রেভুন্ড ডক ধর্মঘট তারপর সিদ্ধাপুর—জগৎটা শ্রমিক আন্দোলনে পাক খেয়ে খেয়ে ঘুরছে। নাঃ—একথেকে এই সব খবর ভাল লাগে না।

টিপয়ের ওপর কাগজখানা রেখে টিনের কোঁটো থেকে একটা সিগারেট টেনে নিয়ে ধরালে। শীতকালের আকাশে সাদা সাদা মেঘ ভাসছে। আবহাওয়ার রিপোর্ট বলে—পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গে সামান্য বারিপাত হবে। উড়িষ্যার উপকূল ভাগে মেঘগুলি অভিযান শুরু করছে। বাতাসের কাঁধে চড়ে ভারতবর্ষের কোন্‌দিকে কতদূর ছড়িয়ে পড়বে তার মোটামুটি ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে।

চেয়ারে পা তুলে দিয়ে অলসভাবে একটার পর একটা সিগারেট ধরিয়েই চলেছে সে। সোনালী মেখে সন্ধ্যা নামবে এখনই—ব্রীজের আড্ডা বসবে নীচের হল ঘরে। খেলার সঙ্গে চা—পান—সিগারেট আর গল্প—সন্ধ্যাটা রঙীন আলো ভরা কাহ্নসের মত গভীর রাত্রির দিকে উড়ে যাবে। এই জীবনের তৃষ্ণাই কি তবে সামান্যদের অভ্যন্তরে লুকিয়ে ছিল? হাঁ—সার্থক হতে না পারায় ক্ষোভ সৃষ্টি করেছিল একটি মতবাদ—অক্ষম ঈর্ষার আক্ষেপ কিছুটা—আসলে প্রাসাদের শোভার আর মোটরের পালিসে জড়িয়ে ছিল বাসনা। শৈশবে মা-ঠাকুরমার মুখে রূপকথাপায়ী শিশু যেমন উত্তর জীবনের সমৃদ্ধ ছবি কল্পনায় একে বাসনাকে কথকিং পূরণ করে—বহু কল্পনা সার্থক হলে আনন্দে দিশেহারা হয়—তেমনি একটা ভাব—সার্থক হওয়ার ভাব সিগারেটের প্রতিটি টানে—শিরায় শোণিতে সঞ্চার করে ফেরে আঁজকাল। শুভাকে মাঝে মাঝে মনে পড়ে। ওর সেই চন্দ্র-সূর্য্য-বঞ্চিত বাড়ি—অধর্ম দিদিমা আর রম্মা মা—ছোট ভাইটি ওদের নিয়েই কাটিয়ে দেবে সারাটি জীবন। বেচারী শুভা! পার্টির মিটিঙে ওর শাণিত যুক্তির সামনে প্রতিপক্ষ দাঁড়াতে পারে না—অথচ রায় সায়েবের সামনে ওর মত অসহায় ছুটি নেই। ওদের অত্যাচার উপেক্ষা করবার মনোবল ওর আছে...প্রচুর মনোবলই আছে।

প্রায়ই ইচ্ছা হয় শুভার ওখানে গিয়ে ওকে ভাল করে

বুঝিয়ে দারিদ্র্যের অন্ধরূপ থেকে টেনে নিয়ে আসে এই আলোর পৃথিবীতে। বুদ্ধিমানেরা যদি জগতের সম্পদ সৃষ্টি না করলে তো পৃথিবীর গৌরব কতটুকু। বুদ্ধিমানেরা যদি জানে স্বাস্থ্যে চারুকলায় সংস্কৃতির শিখাকে উজ্জ্বল করে না তুললে তো সভ্যতার উন্মেষ হ'ল কেন? সুখী হবার অধিকার সকলেরই আছে, শুভারও আছে। শুভাকে সে স্বেচ্ছায় দারিদ্র্য থেকে উদ্ধার করবে।

দক্ষিণের বারান্দায় চেয়ারে পা তুলে আধ-বোজা চোখে চুরচুর দীর্ঘশিথিল টানের সঙ্গে চিন্তাগুলি কল্পনার মধ্যে রঙ লাগায়—বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়ালে সেই ধর আর সেই পরিজন আর শুভার সেই দারিদ্র্যবহনের অটল সঙ্কল্প এতটুকু প্রশ্ন দেয় না অলস কল্পনায়। ওর বাঁকা ঠোঁটের কোণে শাণিত এক টুকরা হাসি—বিজ্ঞপে ঝলমল করে সর্বদা। যুক্তির চেয়ে বড়—অহুসনকে টুকরো টুকরো করে দেয় অনমনীয় সেই পাতলা হাসি তার মত মারাত্মক অস্ত্র শুভার ভাগুরে বুঝি বিতর্ক নেই। প্রশান্ত মনে মনে হার স্বীকার করে।

তবু প্রত্যহ মনে হয়—শুভা একবার আসবে না এখানে? প্রশান্তও পৃথিবীকে সৌন্দর্য্যশালিনী করতে পারে—প্রশান্তেরও সৃষ্টিকর্মতা কম নয়। ক'টি মাসই বা এই ফ্যাক্টরীর ভার নিয়েছে সে। চারদিকের আগুনের ছোঁয়াচ থেকে সে যে এটিকে রক্ষা করতে পেরেছে—এ কৃতিত্ব তারই তো। ছ' ছবার ঢেউ উঠেছিল। পুজোর বোনাস আর মাগ'গি ভাতা বাড়ানোর দাবি। মালিক হাল ছেড়ে বললেন, যা ভাল বোঝ'কর—কিছু টাকা মঞ্জুর করে দিচ্ছি।

অর্ন্তেক মাইনে বোনাস—আর ছ' টাকা মাগ'গি ভাতা বুদ্ধি—ধর্মঘটের প্রগাঢ় ছায়া—ফ্যাক্টরীর পাশ কাটিয়ে গেল।

রতন কটন মিলের ম্যানেজার সর্ক্রেখর বাবু বললেন—কাছটা ভাল করলেন না প্রশান্ত বাবু। যি দিলেই আগুন জ্বলবে—বারো মাস যি চালবার ব্যবস্থা করতে পারবেন তো?

প্রশান্ত বললে—অসন্তুষ্ট লোক নিয়ে কাজের পড়তা হবে কেন সর্ক্রেখর বাবু। গো ব্লো ট্যাক্টিক্স—এ ব্যবসা চলে না কখনো।

কিন্তু লাভের মার্জিন কমে এলে—আমাদের অবস্থা কি দাঁড়াবে—

তাও কি ভাবি নি সর্ক্রেখর বাবু। টাকায় টাকা লাভ—এ তো যুদ্ধের বাজারেই সম্ভব হয়েছে, টাকায় সিকি লাভ এ নিয়েও তো না বাঁচবার কথা নয়।

সর্ক্রেখর বাবু রাগ করে কথা বলেছিলেন কিছু, প্রশান্ত রাগ করে নি। লাভের অংশ কমে গেলেই এদের মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ে। এরা ছ' চোখের সীমানায় যতটুকু পড়ে, তারই মাপজোপ নিয়ে ব্যতিব্যস্ত। কিন্তু দৃষ্টির দোষ, অহঙ্কারে আঘাত লাগলেই কেটে যায়, নতুন করে রক্ষা-নিষ্পত্তি করে বেশি লোকসানই দিয়ে বসে এরা। সর্ক্রেখর বাবু

শ্রমিকদের দাবী পুরিয়ে এক দিন দুঃখ করেছিলেন, মিল তুলে দেব, এত কম লাভে ভুতের খাটুনি খেটে পোষায় না।

মিল তুলে দেন নি তিনি। ভুতের কাঁধে চেপে আছেন বলেই ভুতদের নাচের ধকল তাঁকে সহ্যেই হয়।

নীচের হলঘরে আলো জ্বলে উঠল, কোলাহল শুরু হ'ল। চাকর এসে খবর দিলে বাবুরা এসেছেন।

সিগারেটের টিন আর চা নীচের ঘরে পাঠানোর হুকুম দিয়ে প্রশান্ত নেমে গেল।

সর্বোৎসাহ বাবু বললেন, এই শুধু এঁদের মুখে, ব্যাটারী কি বলে।

লক্ষী গ্লাস ওয়ার্কস্-এর ম্যানেজার কমল মিত্র বললেন, টোয়েন্টি-ফাইভ পারসেন্ট পে ইনজীজ গ্লাস টোয়েন্টি পারসেন্ট এ্যালাউন্স। নিন ঠেলা, কি দিয়ে সামলাবেন সামলান।

আচ্ছা, বসুন স্থির হয়ে। একটা পরামর্শ করা যাক।

পরামর্শ আর ছাই। সব ক'টি মিল, ফ্যাক্টরী এক জোট হয়েছে, ইউনিয়নের থু দিয়ে নোটিশ দেবে পনেরো দিনের। একেবারে মোক্ষম কাছিমের কামড়। হতাশ সর্বোৎসাহ টিন থেকে একটা সিগারেট টেনে নিয়ে চেয়ারের হাতলে মাথাটা হেলিয়ে দিলেন।

বেঙ্গল কটন মিলের ম্যানেজার অনন্ত দোবে বললেন, পুরা মাহিনায় ছুটি, ক্যাড্রাল লিভ পনের দিনের, আউর মেডিকেল ট্রিটমেন্ট ভি ডিমাও করছে।

প্রশান্ত বললে, ছুটি তো এ্যাডজুডিকেশনে যাবে, সেদিন মিল ওনাস্ এসোসিয়েশনে ঠিক হ'ল না? আর মেডিক্যাল ট্রিটমেন্ট। কেন ডাক্তার নেই আপনার মিলে?

আরে ডক্টার আছে, দাওয়াই ভি আছে, লেকিন উ আদমী আচ্ছা দাওয়াই মাংতা হয়।

বেশ ত...তাও কিছু রাখবেন। লাভের একটা সামান্য অংশ দিলেই তো ভাল ডাক্তারখানা ও ভাল ডাক্তারের ব্যবস্থা হতে পারে।

সর্বোৎসাহ বাবু মুখ ভার করে বললেন, পারে তো সবুই মশায়...কিন্তু লাভের মার্জিন কমে গেলে...ভুতের ব্যাগার খেটে লাভ।

প্রশান্ত হেসে বললে, ভুতদের যখন ছাড়াই যাবে না, আর আদায় করতে হবে ভাল কাজ, তখন ওদের ভাল থাকা আর ভাল খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে বৈকি?

সর্বোৎসাহ রাগ করে বললেন, আপনার তো ফ্যাক্টরী নয়, কাজেই ও কথা বলবেন বৈকি।

প্রশান্ত বললে, মালিকের মনের ইচ্ছে না জানলে কি এ কথা বলবার সাহস আমার হয়। ভাল খাওয়া পরা আর ভাল থাকার দাবি আমার আপনারা যেমন আছে, ওদেরও তেমনি আছে।

কমল মিত্র বললেন, আচ্ছা সে না হয় যতদূর সম্ভব ব্যবস্থা

করা গেল, কিন্তু পে আর এলাউন্সের দাবি মেনে নিলে, এই সর্বোৎসাহ বাবু যা বলেছেন, ভুতের ব্যাগার দেওয়া ছাড়া, আর কিছুই হবে না।

প্রশান্ত সিগারেটের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে বললে, কাল কি পরশু দুপুর বেলায়—একটা মিটিং কল করা যাক। তার আগে মিলের আয়ব্যয়ের হিসেবটা ভাল করে পরীক্ষা করা দরকার।

অনন্ত দোবে বললেন, আমেরিকা মাল ছাড়লে তো তেজ থাকবে না—বিলকুল ডাউন হয়ে যাবে।

হাঁ—সে হিসেবও মোটামুটি কষতে হবে। তবে যাই বলুন—এ বাজার নামতে এখনও ছ'বছর তো যাবেই।

সর্বোৎসাহ বললেন, তা হলেও তো বাঁচি। বাজার নামলে ব্যবসা তো গুটীতেই হবে। ভাববেন না এককর দাবি বাড়িয়ে আবার তা কমানো যাবে।

প্রশান্ত বললে, ষ্ট্যান্ডার্ড অব লিভিং যেমন তেমনি আয়-ব্যয় চলবে। একটা কম—আর একটা বেশি এ টপসি-টারভি কন্ট্রিশনে পৃথিবী চলতে পারে না।

ব্রিজের আসর বসল—অল্প দিনের মত জমল না। সকাল সকাল খেলা ভেঙে সবাই উঠলেন।

কমল মিত্র বললেন, হিসেব-নিকেশ করতে ছ'চার দিন সময় নেবে—মিটিংটা আসচে সপ্তাহেই হোক।

সর্বোৎসাহ বললেন, তাই হোক—ওরা তো এখনও নোটিশ দেয় নি।

সবাই চলে গেলে প্রশান্ত আপন মনে খানিকটা হাসলেন। মুঠো শক্ত করে রাখবার চেষ্টা কোথায় নেই। চাচ্ছিল, জেনারেল আর্টস্—থেকে চুনাপুঁটি সর্বোৎসাহ বাবু পর্যন্ত। সাম্রাজ্যবাদ আর পুঁজিবাদে আতাত চিরকালের। সাম্রাজ্যবাদ না টিকলে পুঁজিবাদ বাঁচে কি করে। একের সম্পদ-সৃষ্টির মূলে বহুর দুর্দশা ও দাসত্ব—এ কলঙ্ক অপসারিত না হলে পৃথিবী অস্থ হবে না। লোভের ত সীমা নেই—সে চায় আরও। অদূর থেকে পর্বতপ্রমাণ। ষ্টলট্রয়ের সেই গল্পটা মনে পড়ল—একটা লোকের কতটা জমি আবগুক। লোভের বশে স্বর্ঘ্যোদয় থেকে স্বর্ঘ্যাস্ত পর্যন্ত যে সব জমির উপর দিয়ে সে ছুটে ছুটে চলল—মনে করলে সবই তার অধিকারে—তার হুঁশা তাকে সেই প্রতিশ্রুতিই দিয়েছিল। স্বর্ঘ্যাস্তের মুহূর্ত পূর্বে যেখানে সে থামল—চিরদিনের মত—সেই সাড়ে তিন হাত জমিটুকু তার দেহকে দিলে যথার্থ আশ্রয়। প্রয়োজন মিটিয়ে বাইরে হাত বাড়ানোই ত অনধিকার। অথচ পুঁজিবাদ তা স্বীকার করবে না—সাম্রাজ্যবাদ ত যুদ্ধ দেহি বলে দাঁড়িয়েছে।

সুখী হবার অধিকার সকলের আছে—এ কথা স্বীকার করে প্রশান্ত—কিন্তু কারো অর্থ কেড়ে নিয়ে সুখী হওয়া নয়। কারও দাসত্ব নিজের প্রভুত্ব কায়ম করার বাসনাও তার নেই। এগুলি হ'ল দুর্বল—দান্তিক—ক্ষমতালোভীর বর্বর

বাসনা। লাভটাকে সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়া দরকার—হাতের পাঁচটি আঙুল সমান না হতে পারে—একটা রুগু আর একটা

• অত্যন্ত ক্ষতি হবে কেন?

রোজই মোটর নিয়ে সে কলকাতায় যায়। মালিকের সঙ্গে পরামর্শ করে। তিনি ওর কাজে অত্যন্ত সুখী। বলেন আমরা বাণপ্রস্থের যাত্রী—কিছু শুনিও না। কারখানা আর শ্রমিক দুটি পরস্পরের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এটি সর্বদা মনে রাখবে।

আপনার প্রকৃতি কমলে—

ভাষা প্রকৃতি পেলেই যথেষ্ট। আরে যুদ্ধের কথা বাদ দাও—অবশ্য ইনক্লেশনের ব্যাপারটা চট করে নষ্ট হবে না—তবে তোমার হাতে জিনিস নষ্ট হবে না—

কিন্তু আমি ত নতুন।

নতুন বটে—আনাজী নও। আমবায় আর চলতি বাজার ঠাডি করে নিয়েছ—কোন দিন তোমায় ঠকতে হবে না।

একে অগাধ বিশ্বাস বলা যায়। প্রশান্ত নিজের মতামত খাটাতে এতটুকু দ্বিধাবোধ করে না। অর্ধের সুপরিচালনায় মানুষের কল্যাণ। খেয়ে পড়ে সুস্থদেহে সে যদি কাজ করে যায়—যে কাজের ক্রটি কোন দিক দিয়ে কোন মুহূর্তেই প্রকাশ পাবে না। অভাব বোধ হতেই বিকোন্ডের জ্ঞত যে সম্ভাবনা সে উঠতে দেবেই বা কেন?

হেড আপিসটা ঘুরে প্রশান্ত এল শুভাদের বাড়ির সামনে। ঠিক সামনে নয়—কেননা সে গলি পায়ে-হাঁটার গলি—মোটর সেখানে অচল। বাঁধানো গলি চারবার পাক খেয়ে যেখানে শেষ হয়েছে—তারই একপ্রান্তে শুভাদের বাড়িখানা। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল প্রশান্ত।

ভেতরে অনেক কণ্ঠের মিশ্রধ্বনি—যেমন উদ্‌ঘাম আলোচনা চলে প্রত্যহ তেমন চলেছে। শহরের আবর্জনারুপী ওই বাড়ীখানিতে বসে—ভারতবর্ষের অসংখ্য শ্রমিক ও দরিদ্রদের মুক্তি চিন্তা করছে যারা—এ তাদের বিলাস না কেপামি! কয়েকটি মিটিঙে বক্তৃতা করলেই সাম্যানীতি চালু হবে না—কিংবা সিনেমার রূপালী পর্দায় লাখ দেড় লাখ টাকার চুক্তি-নামার স্বাক্ষরকারিণী নায়িকার মুখনিঃসৃত মন-ভাতানো বক্তৃতাও কোন ফল প্রসব করবে না। সে বক্তৃতা করতালির সমর্থনে প্রেক্ষাগৃহ কাঁপিয়ে তুলবে শুধু। কোতুকলোজী পুঁজিবাদীর দল বস্ত্রের টিকিট কিনে মুচকি মুচকি হাসবেন সস্তা ভাব-বিলাসিতার অভিব্যক্তিতে। স্বৈর শাসনের আওতায় বসে আরও বহুকাল মঞ্চে বা ময়দানে এ ধরনের বক্তৃতা শুনে তাঁরা বিনুমাত্র বিচলিত হবেন না। এই সোজা কথাটা শুভারা বুঝতে চায় না। রাজনীতিবিদ মানেই তো যে কোন সুযোগের সাহায্য নেওয়া একথা কত দিন বলেছে শুভা অঞ্চল কার্যক্ষেত্রে সে পিছিয়ে পড়ছে না কি।

কড়া নাড়বে কিনা ভাবছে—ওপর থেকে হাসির হল্লা গলির বুকে আছড়ে পড়ল। দীর্ঘ বিলম্বিত হাসি। হয় তর্কে

কেউ হেরে গেল নতুবা পুঁজিবাদের ওপর কটাক্ষ করে কোন শানিত মন্তব্য বর্ষিত হ'ল।

কে—কাকে চান?

ঠিক মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলে একটি ছেলে। হাতে তার বইয়ের গোছা—জামা কাপড়ে তার সত্যকার পরিচয় লেখা। বইগুলি কলেজের পাঠ্য হতে পারে, কমিউনিষ্ট লিটারেচারও হতে পারে।

প্রশান্ত উত্তর দেবার আগেই সে বললে, বিশেষ সুবিধা হবে না—এটা বুর্জোয়াদের ক্লাব ঘর নয়। সরে পড়ুন।

প্রশান্তর বেশবাস দেখেই ছোকরা আঘাত দেবার লোভ সামলাতে পারলে না। ওর অপরাধ কি—বুদ্ধির অপরিপক্ব অবস্থায় সাম্য-দর্শন স্বভাবতই অসহিষ্ণু ও উগ্র হয়ে থাকে।

ছোকরা চলে গেলে প্রশান্তও ফিরে এল। ঘনের অহমিকায় আর দারিদ্র্যের অহমিকায় তফাৎ কিছু নেই; দুইই দুর্ভেদ্য। আঘাত দেওয়াই হ'ল তার প্রকাশ বর্ষ। মাঝবানের সেতুবন্ধন কেউই স্বীকার করে না। ভালবাসার প্রশ্ন তুললে—পুঁজিবাদী ভাববে এটা সহজাত সেবার প্রবৃত্তি—নিঃস্ব ভাববে ওটা বুর্জোয়া বনবার একটি পরিচিত ভঙ্গি। কিছু দিন আগে তার দৃষ্টিভঙ্গী ও চিন্তারীতি ওই ধরনেরই তো ছিল।

মোটরের কাছে ফিরে এল প্রশান্ত।

একটি সুবেশ যুবক গ্যাসপোষ্টের কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছিল—হয়ত প্রতীক্ষা করছিল প্রশান্তর। প্রশান্তকে দেখে সে এগিয়ে এসে নমস্কার করে বললে, আপনাকে আমি চিনি—বত্রিশ নম্বর বাড়ীটাতে দিন কয়েক আপনাকে দেখেছি। আর একদিন দেখেছিলাম মেয়েটির পক্ষ সমর্থন করে যেদিন রায় সায়েবের সঙ্গে ঝগড়া করলেন।

ঝগড়া।

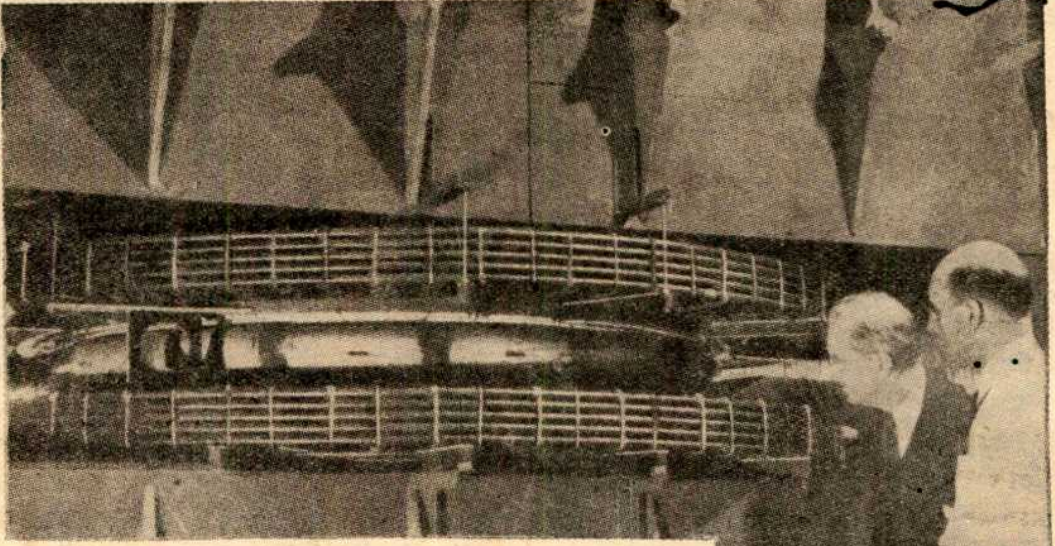
যুবকটি হেসে বললে, রায় সায়েব তো আপনাদের ভদ্রতা রেখে কথা বলেন নি। যাই হোক—ওই মেয়েটির সম্বন্ধে—প্রশান্ত বিরক্ত হ'ল। তৃতীয় ব্যক্তির মুখে শুভাকে নিয়ে আলোচনা করতে সে রাজী নয়। মোটরের ছয়োরটা বুলে নিঃশব্দে সে তার ভেতরে আশ্রয় নিলে।

যুবক এগিয়ে এসে বললে, আপনি রাগ করবেন জানি—তবুও যে সাংঘাতিক মেয়ে সে কি আপনি বুঝতে পারেন নি? না—বুঝতে চাইনে। তীব্র ভৎসনায় প্রশান্ত প্রায় টেচিয়ে উঠল। ড্রাইভার ষ্টার্ট দাও।

যুবক সিগারেট ফেলে দিয়ে হেসে উঠল হো হো করে। সে দিন তো পায়ে হেঁটে এসেছিলেন—আজ একখানা মোটর হয়েছে—তবুও বলছি সাবধান। শৈলেশ্বর বোসের তিন-খানা মোটর আছে—

শৈলেশ্বর বোস। কথাটি চাবুকের মত সপাং করে প্রশান্তর পিঠে পড়ল। স্মৃতিশক্তি তার দুর্বল নয়।

ড্রাইভারের পিঠের দিকে বুকে পড়ে বললে, রাস্তার ওপাশে গাড়ী থামিও তো। এক জনের সঙ্গে দেখা করে আসি। [ক্রমশঃ



বিটাট্রন যন্ত্র—বামপার্শ্বের গোলাকার গবাক্ষপথে এক্স-রশ্মি নির্গত হয়

বিটাট্রন

অধ্যাপক শ্রীজিতেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

পরমাণুর অভ্যন্তরে অপরিমেয় তেজ পুঞ্জীভূত হইয়া রহিয়াছে। অল্পরূপ শক্তির অধিকারী না হইলে তার মধ্যে প্রবেশ করা সম্ভব নয়। পরমাণুর উপাদান ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন—নানা উপায়ে ইহাদের পরমাণু হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায়। কোনও প্রক্রিয়াদ্বারা সংগ্রহ করিয়া ইহাদের কোনটিকে অপর কোন পরমাণুর অভ্যন্তরে প্রেরণ করিতে চাহিলে তাহাকে তেজযুক্ত করিয়া দিতে হইবে, নতুবা পরমাণুরাজ্যের সীমান্ত হইতেই সে বিদায় হইয়া আসিবে। পরমাণুক্ষেত্রের তথ্যাদি সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে ও সেখানকার তেজোভাণ্ডারের চাবিকাঠির সন্ধানমানসে অনেককাল ধরিয়া চেষ্টা চলিতেছে। এই জাতীয় প্রচেষ্টার সবগুলিরই মূল করণীয় ছিল পরমাণুলোকে হানা দিবার জন্ত কণিকাদের অমিত শক্তিশর করিয়া তোলা।

চলন্ত পদার্থের শক্তির পরিমাপ হয় উহার বেগের পরিমাণদ্বারা। কোন বস্তুর বেগ যত বেশী হয় উহাতে সংশ্লিষ্ট শক্তি তত বেশী হইয়া থাকে। মৌলিক কণিকাদের বেগপ্রদান করিয়া উহাদের শক্তিসম্পন্ন করিবার উদ্দেশ্যেই নির্মিত হইয়াছিল পরমাণু বিভাজন যন্ত্র সাইক্লোট্রন। সাইক্লোট্রন আবিষ্কৃত হইবার পর মৌলিক কণিকা প্রোটন ও তৎগোষ্ঠীয় ডিউট্রিয়ন কিংবা আলফা কণিকাকে প্রচণ্ড বেগ

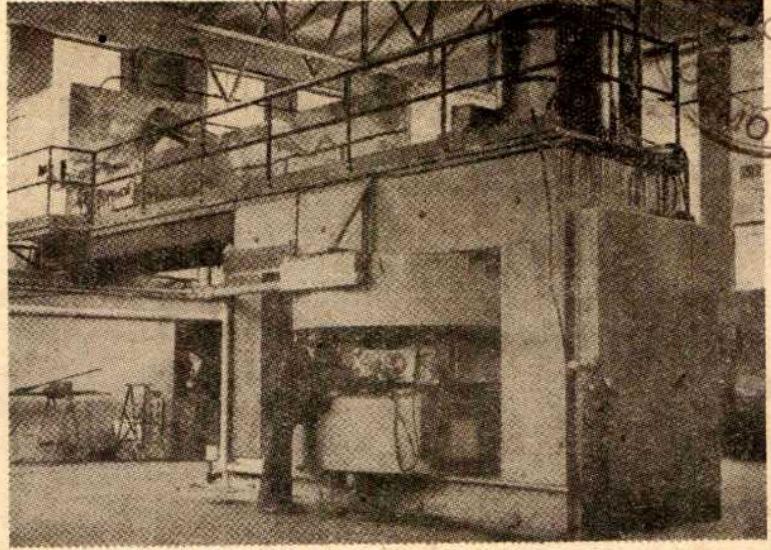
প্রদান করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু এই যন্ত্রও কার্য-কারিতায় সর্বথা উপযোগী নহে। পজিটিভ তড়িৎ-গ্রন্থ ভারী কণিকা ভিন্ন হালকা ও নেগেটিভ তড়িৎ-গ্রন্থ ইলেকট্রনকে এই যন্ত্রদ্বারা বেগযুক্ত করা সম্ভব নহে। তাই সাইক্লোট্রন আবিষ্কারের পরেও মৌলিক কণিকাকে বেগযুক্ত করিবার প্রয়াসের সমাপ্তি হয় নাই। ইলেকট্রনকে অল্পরূপ বেগপ্রদান করিবার জন্ত যে যন্ত্র নির্মিত হইয়াছে তাহারই নাম বিটাট্রন।

আলোর গতি প্রতি সেকেন্ডে এক লক্ষ ছিয়াশী হাজার মাইল, সে গতির স্বরূপ উপলব্ধি করা মানুষের সাধ্যাতীত। অথচ মানুষের হাতেই আজ ইলেকট্রন যে গতি পাইতেছে তাহার পরিমাণ পুরাপুরি এক লক্ষ ছিয়াশী হাজার মাইল না হইলেও অন্ততঃ উহার ৯৯.৯৯% ভাগে পৌঁছিয়াছে। বিটাট্রন যন্ত্রের দুর্গিপাকে পড়িয়া ইলেকট্রন এক সেকেন্ডের আড়াই শত ভাগ সময়ের অবসরেই ঐ গতি পাইয়া থাকে, যাহার ফলে উহার ভর প্রায় দুই শত গুণ বর্ধিত হয়।

তড়িৎ-গ্রন্থ পদার্থ ও চৌম্বকশক্তি এতদুভয়ের মধ্যে একটা নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে। উহারা একে অত্নকে প্রভাবান্বিত করে। তড়িৎ-গ্রন্থ কণিকা যদি গতিশীল হইয়া কোন চুম্বকের প্রভাবে আসিয়া পড়ে এবং চৌম্বকক্ষেত্রের সমকোণে চলিতে থাকে তবে চুম্বকের আকর্ষণে তড়িৎগ্রন্থ কণিকা সরল রেখায় না

চলিয়া যুক্তাকার পথে পরিক্রমণ করে। ইলেকট্রনকে গতিশীল করিয়া চৌম্বকক্ষেত্রে ছাড়িয়া দিলে উহারও অনুরূপ অবস্থা হয়।

সকল পদার্থের ভিতর দিয়া তড়িৎপ্রবাহের চলাচল সম্ভব হয় না। যে পদার্থের তড়িৎসংবহন করিবার উপযুক্ততা আছে তাহাদের পরমাণুর একটি বৈশিষ্ট্য থাকে। উহাতে এমন কতকগুলি শিথিল ইলেকট্রন থাকে যাহারা সহজেই পরমাণু হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। কোন সংবাহক তারের ভিতরে এই জাতীয় ইলেকট্রনগুলি বাহির হইতে কোন প্রেরণা পাইলেই একটা বিশিষ্ট দিকে চলিতে আরম্ভ করে। কয়েকটি উপায়ে এই প্রেরণা সৃষ্টি করা সম্ভব, তন্মধ্যে



সাইক্লোট্রন যন্ত্র (ক্যাফোপিয়া বিশ্ববিদ্যালয়)

তড়িৎকোষের ক্রিয়া অত্যন্তম। তড়িৎকোষের দুই প্রান্ত সংবাহক তার দিয়া জুড়িয়া দিলে প্রবাহ পাওয়া যায়, এই প্রবাহ প্রকৃত পক্ষে তারের ভিতর দিয়া তড়িৎকোষের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে শিথিল ইলেকট্রনদের গমনকার্য বা স্থানান্তর ভিন্ন আর কিছু নহে। একথা এখানে উল্লেখ করা সম্ভব যে, কোন একটি বিশেষ ইলেকট্রন বেগপ্রাপ্ত হইয়া তড়িৎকোষের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে সরাসরি গমন করে না। একটি ইলেকট্রন কোন পরমাণু হইতে নির্গত হইয়া পার্শ্ববর্তী অল্প পরমাণুতে সংলগ্ন হয় আবার এই শেষোক্ত পরমাণুর ইলেকট্রন তৎপরবর্তী পরমাণুতে যুক্ত হয়; এই প্রকার বিনিময়-কার্যের ফলেই এক প্রান্তের ইলেকট্রন অপর প্রান্তে পৌঁছায়, তবে কার্যতঃ আমরা মনে করিতে পারি যেন একটি ইলেকট্রনই তারের ভিতর দিয়া বরাবর চলিয়া আসিল। ইলেকট্রনের এবশ্রকার চলাচল যত দ্রুত হয় প্রবাহের তীব্রতা তত বৃদ্ধি পায়।

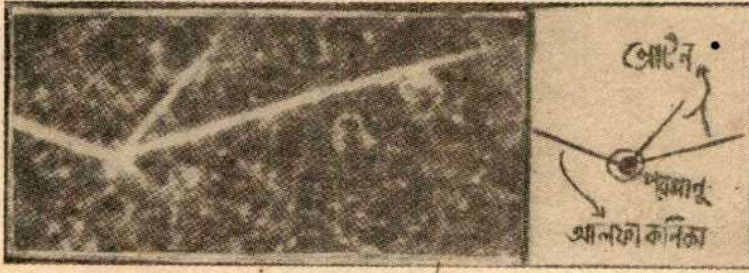
যদি কোন গতিশীল ইলেকট্রন মুক্ত অবস্থায় শূন্যমার্গে একটি নির্দিষ্ট যুক্তাকার কক্ষে পরিক্রমণ করে তবে ঐ গতিশীল একক ইলেকট্রন ও তাহার কক্ষ কার্যতঃ তড়িৎসংবহনকারী তারের কুণ্ডলী (তড়িৎচক্র) বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে।

এই আলোচনা হইতে একথা সিদ্ধান্ত করা চলে যে কোন গতিশীল ইলেকট্রন চৌম্বক ক্ষেত্রে আসিয়া পড়িলে উহা চক্রপথে পরিক্রমণ করিবে এবং তৎকালে উহাকে তড়িৎ-চক্রের সমতুল্য বলিয়া মনে করা চলিবে।

কোন তড়িৎচক্রের ভিতরে যে কারণেই হোক চৌম্বক প্রভাবের পরিবর্তন সংঘটিত হইতে থাকিলে তারের আভ্যন্তরীণ

ইলেকট্রনের গতিশীল হইয়া উঠে এবং তৎকালে চক্রে তড়িৎপ্রবাহের উৎপত্তি হইতে দেখা যায়। ইহার নাম আবেশ। এই কারণে একটি তারের কুণ্ডলী লইয়া উহার ভিতরে একটি চৌম্বকদণ্ড প্রবেশ করাইতে থাকিলে কুণ্ডলীতে তৎকালে ক্ষণস্থায়ী প্রবাহ উৎপন্ন হয়। চৌম্বকদণ্ড কুণ্ডলী-অভিমুখে অগ্রসর বা কুণ্ডলী হইতে নির্গত হইতে থাকিলে চৌম্বকদণ্ড ও কুণ্ডলীর পারস্পরিক দূরত্ব পরিবর্তনে চক্রাভ্যন্তরে চৌম্বক-প্রভাব বৃদ্ধিত বা হ্রাসপ্রাপ্ত হয় এবং ইহার জন্মই উপরোক্ত আবেশের সৃষ্টি হয়। চৌম্বকদণ্ড কোন বিশেষ অবস্থায় (কুণ্ডলীর অভ্যন্তরে বা বাহিরে) স্থির হইয়া থাকিলে কোন প্রবাহ পাওয়া যায় না, কারণ এই সময়ে চক্রাভ্যন্তরীণ চৌম্বকপ্রভাব অপরিবর্তিত থাকে। চৌম্বকপ্রভাবের পরিবর্তনের ক্ষিপ্ততার উপর আবেশোদ্ভূত প্রবাহের তীব্রতা নির্ভর করে। চৌম্বকদণ্ড ব্যবহার না করিয়া অল্প কোন উপায়ে চক্রে চৌম্বক-প্রভাবের পরিবর্তন করিলেও আবেশের উৎপত্তি সম্ভব।

পর্যবেক্ষণে ইহাও দেখা যায় যে, কোন তড়িৎকুণ্ডলীতে তড়িৎ প্রবাহিত হইতে থাকিলে তৎকালে উহা স্বয়ং একখণ্ড চুম্বকের জায় আচরণ করে। কুণ্ডলীতে প্রবাহমান তড়িৎ পরিবর্তনশীল হইলে কুণ্ডলীতে সঞ্চারিত চৌম্বকপ্রভাবও পরিবর্তিত হয়। আবার কুণ্ডলীর অভ্যন্তরে এক খণ্ড লৌহ রাখিয়া দিলে এই চৌম্বকপ্রভাব তীব্রতর হয়। আবেশ সৃষ্টি করিবার জন্য পূর্বে উল্লিখিত কুণ্ডলী সন্নিকটে চুম্বক আনয়ন না করিয়া যদি উহাকে ঘিরিয়া আর একটি লৌহসম্বলিত তড়িৎচক্র স্থাপনা করা হয়, তবে এই শেষোক্ত তড়িৎচক্রে (ইহাকে আত্মপের মুখ্যচক্র বলা



বিটাট্রনের রশ্মিপ্রভাবে পরমাণু চূর্ণীকৃত হইবার পর আলফা কণিকা ও প্রোটন বিপরীত দিকে যাইতেছে (উইলসন প্রকোষ্ঠে গৃহীত ফোটো)

হইবে) পরিবর্তনশীল প্রবাহ চালনা করিলে প্রথমোক্ত চক্রে (গৌণ) আবেশজনিত প্রবাহ পাওয়া যাইবে। একথা এখানে উল্লেখ করা সম্ভব যে মুখ্যপ্রবাহ পরিবর্তিত না হইয়া স্থির থাকিলে গৌণচক্রে প্রবাহ পাওয়া যাইবে না, কারণ মুখ্য চক্রে প্রবাহিত তড়িতের পরিবর্তনের ভিতরেই বহিয়াছে গৌণচক্রাভ্যন্তরে পরিবর্তনশীল চৌম্বকপ্রভাব তথা আবেশ উৎপত্তির হেতু। গৌণপ্রবাহের স্বরূপ সম্পূর্ণরূপে মুখ্য প্রবাহের স্বরূপ ও পরিবর্তনের ক্ষিপ্ততার উপর নির্ভর করে, পরিবর্তনের বদ্ধিত হার আবেশকে তীব্রতর করিয়া তুলে। মুখ্য প্রবাহ ক্রমবর্ধমান হইলে গৌণ প্রবাহও তদনুসারী হইয়া থাকে।

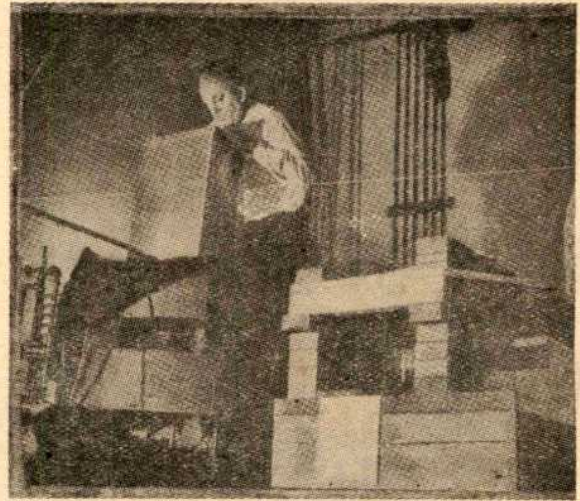
একগে আবেশের উদ্ভবের জন্ম প্রয়োজনীয় পূর্বোক্ত সজ্জাকে একটু বদলাইয়া লইলে অল্প প্রকার প্রতিক্রিয়া পাওয়া যাইতে পারে। মনে করা যাক, গৌণচক্রে ব্যবহৃত তারের কুণ্ডলীর পরিবর্তে বৃত্তাকৃতি কাচের আধারে রক্ষিত ড্রামামাণ ইলেকট্রনকে গ্রহণ করা হইয়াছে। ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে যে তারের কুণ্ডলী ও ড্রামামাণ ইলেকট্রন রচিত চক্রের মধ্যে তড়িৎপ্রভাব বিষয়ক একা আছে। এইরূপ সজ্জা করিয়া লইয়া যদি মুখ্য চক্রে ক্রমবর্ধমান প্রবাহ চালনা করা যায় তবে আবেশবশত 'ড্রামামাণ ইলেকট্রন চক্রে'ও অল্পরূপ গৌণ প্রবাহের উদ্ভব হওয়া সম্ভব, এই স্থলে ইহার স্বরূপ কি হইবে দেখা যাক।

সাধারণ তারের ভিতরে যখন প্রবাহ চলে তখন প্রবাহের বৃদ্ধি হইলেই ইলেকট্রনগুলি তারের অভ্যন্তরে বদ্ধিত বেগে চলিতে আরম্ভ করে। উপরোক্ত ইলেকট্রনচক্রে তড়িৎ-প্রবাহের শক্তিবৃদ্ধি হওয়ার ফলে চলমান ইলেকট্রনের গতি বাড়িয়া যাইবে। কিন্তু এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে, এই চক্রে একই ইলেকট্রন সমস্ত চক্র পরিক্রমণ করিয়া আসিতেছে; (তারের কুণ্ডলী নির্মিত চক্রের সঙ্গে এখানে প্রভেদ রহিয়াছে) —সুতরাং প্রবাহের বৃদ্ধি সেই একই ইলেকট্রনকে বারংবার বদ্ধিত বেগ প্রদান করিবে। তাহা হইলে অবস্থাটা দাঁড়াইতেছে এইরূপ যে, বৃত্তপথে ভ্রমণকালে মুখ্য প্রবাহের দ্রুত পরিবর্তনের জন্ম ইলেকট্রন প্রতি মুহূর্তে বেগবৃদ্ধির প্রেরণা পাইতেছে

এবং এই কারণে একবার ভ্রমণশেষে ইলেকট্রন যখন পুনরায় যাত্রারম্ভস্থলে করিয়া আসিতেছে তখন উহার বেগ বহুগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। যখন মুখ্য-প্রবাহ ক্ষিপ্তগতিতে চরম মাত্রায় উঠিতে থাকে সেই অবসরে যদি ইলেকট্রন বহুবার বৃত্তপথে পরিক্রমণ করিবার উপযুক্ত হয় তবে প্রবাহের চরম বৃদ্ধির মুহূর্তে এই ইলেকট্রন প্রচণ্ড বেগযুক্ত হইবার সুযোগ পাইতে পারে। এই ব্যবস্থায় মুখ্যপ্রবাহের পরিবর্তনরীতি যত ক্ষিপ্ততর হইবে ইলেকট্রনের বেগ

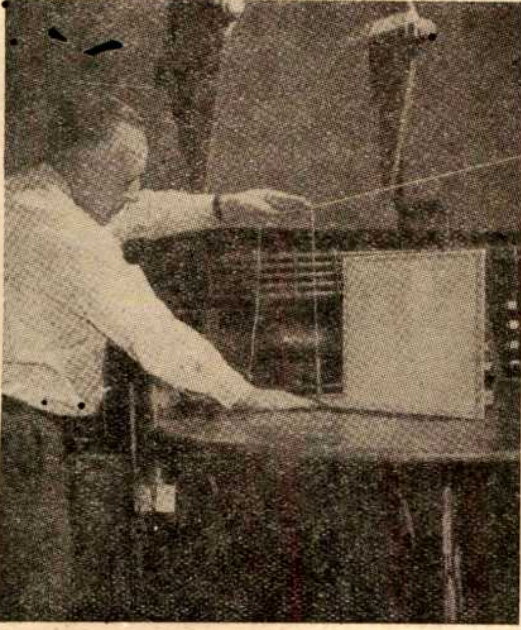
তত প্রচণ্ড হইবে। বিটাট্রন যন্ত্রে এই প্রক্রিয়া দ্বারা ইলেকট্রনকে পূর্বোক্তপ্রকার বেগ প্রদান করা সম্ভব হইয়াছে।

এই পরিকল্পনাকে রূপ দিবার জন্ম বলয়াকৃতি কাঁপা একটি কাচের পাত্র বা নল লওয়া হয়। একটি লাইফ বেষ্টের আকৃতি করিলে এই নলের স্বরূপ উপলব্ধি হইবে। নলের ভিতরটা বায়ু-বর্জিত; ইহার এক পার্শ্বে ইলেকট্রন উৎপন্ন করিবার ব্যবস্থা আছে—বন্দুকের গুলির মতই ইলেকট্রনকে এই যন্ত্র হইতে বেগে ছুড়িয়া বাহির করিয়া দেওয়া হয় বলিয়া ইহার নাম দেওয়া হয় “ইলেকট্রন গান্”। সমস্ত নল বিরিয়া উপরে ও নীচে রহিয়াছে ১৮০ × ৭৬ × ১০৮ ইঞ্চি আকৃতিবিশিষ্ট



বিটাট্রন-সংশ্লিষ্ট উইলসন প্রকোষ্ঠ (পরমাণু চূর্ণীকরণ স্থান) ও আনুষঙ্গিক ফোটো তোলা ব্যবস্থা

লৌহসম্বলিত তারের কুণ্ডলী—১২৫ টন ওজনের ইস্পাত ও তরুপরি জড়ানো সংবাহক তার—যাহার ভিতর দিয়া ২৪ হাজার ভোল্ট উদ্ভূত ১০০ এম্পিয়ার শক্তির পরিবর্তী প্রবাহ চালানো হইতেছে। এই প্রবাহ সেকেন্ডে ৬০ বার



বিটাত্রিন সঞ্জাত রশ্মির ছবি তুলিবার ব্যবস্থা করা হইতেছে

আন্দোলিত হয় অর্থাৎ কমে বাড়ে এবং এক সেকেন্ডের ২৪০ ভাগ সময়ের মধ্যে শূন্য হইতে চরম মাত্রায় পৌঁছায়।

বেগযুক্ত ইলেকট্রন উৎস হইতে মুক্ত হইবার পূর্বে হইতেই নলবেষ্টনকারী কুণ্ডলীতে তড়িৎ চালনা করা হয় যাহাতে কুণ্ডলীর অভ্যন্তরস্থিত লৌহ চুম্বক প্রাপ্ত হয়। নলে প্রবেশ করিয়াই ইলেকট্রন তড়িৎচুম্বকের প্রভাবে পড়ে ও চক্রাকারে নলের ভিতর ঘুরিতে আরম্ভ করে। ইতিমধ্যে কুণ্ডলীতে প্রবাহমান তড়িৎের শক্তি বাড়িতে থাকে এবং আবেশকিয়্যার ফলে নলমধ্যস্থ ইলেকট্রনের বেগও ক্রমে বাড়িয়া যায়। তড়িৎ-প্রবাহের শক্তি যখন চরম মানে পৌঁছায় সেই অবসরে ইলেকট্রন আড়াই লক্ষ বার নল পরিক্রমণপূর্বক এক সেকেন্ডের ২৪০ ভাগ সময়ে ৮০০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া প্রচণ্ড বেগপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।

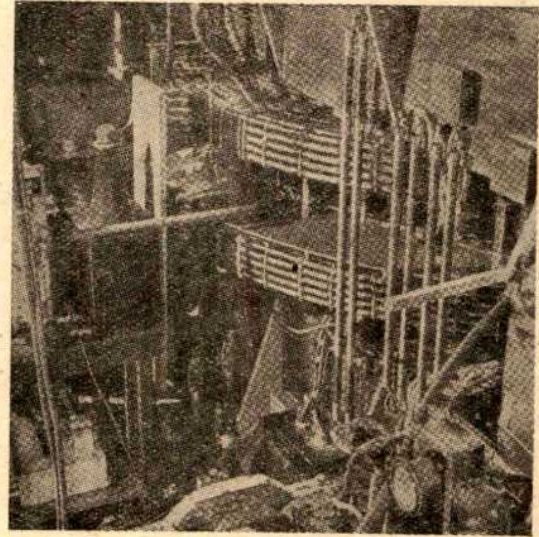
এই অবস্থায় ইলেকট্রনকে সহসা অপর কোন তড়িৎ-ক্ষেত্রের সাহায্যে চক্রপথ হইতে সামান্য বিচলিত করিয়া আনিয়া নিষ্ক্ষেপ করা হইবে নলের এক পার্শ্বে রক্ষিত এক ধাতু-পদার্থের উপর। পরমাণুক্ষেত্রের দিকে এই পদার্থের অগ্রসর হইবার কালে ইলেকট্রনের সঙ্গে পরমাণুকণিকার সংঘর্ষ বাধে, তাহারই ফলে সেখান হইতে এক্স-রশ্মিরূপে অমিত তেজোরশির উদ্ভব হয়।

এই রশ্মি প্রচণ্ড শক্তিসম্মিত। সাধারণ এক্স-রশ্মি নলেও বেগযুক্ত ইলেকট্রনের আঘাতেই এক্স-রশ্মির উৎপত্তি হইয়া থাকে, কিন্তু এই সকল নলে ইলেকট্রনকে কয়েক হাজার

ভোল্ট শক্তির তড়িৎক্ষেত্রের প্রভাবে বেগপ্রদান করা হয়। সে তুলনায় ব্রিটাত্রিন হইতে ইলেকট্রন যে বেগ প্রাপ্ত হয় তাহা দশ কোটি ভোল্ট হইতে উৎপন্ন তড়িৎক্ষেত্রের প্রভাবপ্রাপ্তির সমতুল্য। মাত্র চকিশ হাজার ভোল্ট ব্যবহার করিয়া এই শক্তি পাওয়া যায়। বিটাত্রিনের কার্যকারিতার ফলেই শক্তির এবংপ্রকার অসাধারণ পরিবর্তন সম্ভব হইয়াছে।

মানুষের শরীরে যে শক্তির এক্স-রশ্মির নিরাপদ প্রয়োগ সম্ভব, বিটাত্রিনসঞ্জাত রশ্মি তাহা হইতে পনের হাজার গুণ বেশী শক্তিশালী। রেডিয়াম হইতে যে তীব্রতম গামা রশ্মি উদ্ভূত হয়, বিটাত্রিনের রশ্মি তাহার চেয়ে অন্ততঃ বিশগুণ তীব্রতর। যে কক্ষে এই বিটাত্রিন সঞ্জাত রশ্মির স্পর্শ হয় সেখানে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন না করিয়া প্রবেশ করিলে মৃত্যু অস্বাভাবিক নয়। অমিত তেজস্ক্রিয় এই রশ্মির অনেক প্রকার ব্যবহারিক প্রয়োগ আছে—ছুই-একটির উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই রশ্মির সাহায্যে বার ইঞ্চি পুরু এক খণ্ড ইস্পাতের ভিতরকার সকল অবস্থা মাত্র পাঁচ মিনিটে জানিয়া লওয়া সম্ভব। চিকিৎসাক্ষেত্রে এই রশ্মির প্রয়োগ অনন্তসাধারণ ফলপ্রদ। ইহারই সাহায্যে মানুষের দেহাভ্যন্তরীণ পরীক্ষা কার্যাদি ছুই ও সূক্ষ্মতরভাবে করা সম্ভব।

কিন্তু বিটাত্রিনসঞ্জাত রশ্মির প্রকৃত প্রয়োগক্ষেত্র রহিয়াছে পরমাণু বিষয়ক গবেষণা ব্যাপারে। কস্মিক রশ্মির সঙ্গে যে



বিটাত্রিনযন্ত্র (পিছনের দিক হইতে)

তেজ সংশ্লিষ্ট থাকে বিটাত্রিনসঞ্জাত রশ্মির তেজসম্পদ তাহার সহিত তুলনীয়। কস্মিক রশ্মি সম্পর্কিত ঘটনাবলী পর্যাবেক্ষণ করিবার বিবিধ সার্থকতা আছে, কারণ পরমাণুর গঠন বিষয়ে কস্মিক রশ্মি নবতম সমজ্ঞা আনয়ন করিয়াছে। কস্মিক রশ্মির আঘাতে পরমাণু হইতে যেসোন নামক কণিকা নির্গত

হয়, উহার স্বরূপ আজও রহস্যাবৃত। কসমিক রশ্মির উৎপত্তি নিতান্ত অনিশ্চিত ও দৈবাধীন সেক্ষেপ মেনোনের সাক্ষাৎলাভ করিতে হইলে গবেষণাকারীকে অনির্দিষ্ট কাল যাত্রাদি লইয়া অপেক্ষা করিতে হয়। বিটাইনসম্প্রদায় রশ্মিধারা মেনোনের উৎপত্তি সম্ভব হইবে বলিয়া মনে করা হইতেছে। এই কার্য্য করিবার জন্য বিটাইনকে আরও শক্তিশালী রশ্মি সৃষ্টি করিবার উপায় করা প্রয়োজন বলিয়া অনুভূত হইয়াছে। নবতম পরিকল্পনায় উন্নত ধরনের বিটাইন নির্মাণের নানা উদ্যোগ আরম্ভ হইয়াছে। তদ্ব্যতীত রাশিয়ার ডেব্রলার পরিকল্পিত সিনকোট্রন অল্পতম।

অজ্ঞাত রাজ্য হইতে আগত কসমিক রশ্মির তেজোভাণ্ডার সম্ভ্রতি বৈজ্ঞানিক মহলে ঔৎসুক্যের সঞ্চার করিয়াছে। অদূর ভবিষ্যতে বিটাইন কৃত্রিম কসমিক রশ্মির সৃষ্টি করিলেও বিশ্বয়ের কিছু নাই। কসমিক রশ্মির সমতুল্য তেজস্বীর কৌশল মাছুষের করায়ত্ত হইলে ভাবীকালের পৃথিবী আবার কোন্ নবতম মারণাস্ত্রের সম্মুখীন হইবে কে জানে? বিজ্ঞানের সাফল্য ও মানবের শুভবুদ্ধি অবিচ্ছিন্নভাবে অগ্রসর হইয়া না চলিলে ক্ষমতার দান্তিক প্রতিযোগিতার কবলে পতিত বিজ্ঞানের পরমপ্রাপ্তি হইতেই উদ্ধৃত হইবে মানব সভ্যতার মধ্যান্তিক ও অকরণ চরম পরিণতি।

ভারতীয় সঙ্গীতে সাত স্বরের জন্মকথা

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

ভারতীয় সঙ্গীতে সাত স্বরের জন্মকথার পরিচয় দেবার আগে ‘সঙ্গীত’ শব্দটি সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলা দরকার। ‘সঙ্গীত’ শব্দটির ভেতর তিনটি কলার সমাবেশ পাওয়া যায় ও সে তিনটির নাম নৃত্য, গীত ও বাজ। সঙ্গীতের রূপই এ তিনটি কলার একত্র সমাবেশে সার্থক হয়। কিন্তু ‘সঙ্গীত’ শব্দটির প্রাচীনত্ব ও ইতিকথা যতটুকু আমাদের জানা আছে—মকরন্দকার নারদই বোধ হয় প্রথমে ‘সঙ্গীত’ এই শব্দটি সঙ্গীত-শাস্ত্রে ব্যবহার করেছেন—“গীতং বাজং চ নৃত্যং চ ত্রয়ং সঙ্গীতমুচ্যতে”।^১ মকরন্দকার নারদের আগে নাট্যশাস্ত্রকার ভরত থেকে আরম্ভ করে দত্তিল (বা দত্তিল), ব্রহ্মা, কণ্ঠপ, যাপ্তিক, চূর্ণাশক্তি, কোহল, বিদ্যাধিল, অখতর, বিশ্বাবসু, তুহুদ, শিক্ষাকার নারদ,^২ মতঙ্গ এবং এমন কি পার্শ্বদেব পর্যন্ত এ ‘সঙ্গীত’ শব্দটি তাঁদের সঙ্গীতগ্রন্থের কোথাও উল্লেখ করেছেন বলে মনে পড়ে না। এ ছাড়া প্রাতিশাখ্য ও শিক্ষার যুগে,—ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব এ চার বেদের কোনটির প্রাতিশাখ্যে অথবা নারদী, যাজ্ঞবল্ক্য, মাণ্ডুকী, মনঃসার প্রভৃতি শিক্ষাগুলিতেও ‘সঙ্গীত’ শব্দটি ব্যবহার করা হয় নি। ব্রাহ্মণ, সংহিতা ও ধর্মগ্রন্থের ভেতরেও ‘সঙ্গীত’ শব্দটির কোন উল্লেখ নেই। যা আছে তা বর্তমান সঙ্গীতকে বোঝাবার জন্যে ‘গান’, ‘গীত’ বা ‘গীতি’, ‘গাথা’ অথবা ‘গান্ধর্ব’ শব্দগুলি ব্যবহার করা হয়েছে; অথচ বৈদিক সাহিত্যের সবগুলিতেই বাজযন্ত্র যেমন বীণা, যুদঙ্গ, বেণু প্রভৃতি এবং নৃত্য ও গানের পৃথক পৃথকভাবে উল্লেখ আছে। যজুবেদীর

চারদিকে করতালি দিয়ে নৃত্য অথবা নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে ঋক্ছন্দ গাথিক, সামিক ও স্বরাস্ত্র প্রভৃতি স্বরযোগে গান করার উল্লেখও বৈদিক সাহিত্যে পাওয়া যায়। তবে নাট্যশাস্ত্রকার ভরত নাট্যকলার পরিচয় দিতে গিয়ে “এবং গানং চ নাট্যং চ বাজং চ বিবিধাশ্রয়ম্”^৩ শব্দগুলির উল্লেখ করেছেন যদিও ‘নৃত্যং’ বা ‘নৃত্য’ শব্দের জায়গায় ‘নাট্যং’ শব্দটিই সেখানে তিনি ব্যবহার করেছেন। নাট্যের সার্থকতা আঙ্গিক লীলায়িত গতি ও ছন্দকে নিয়ে, কাজেই ‘নাট্য’ শব্দটির ভেতর ‘নৃত্য’ শব্দটির যে অন্তর্নিবেশ আছে এ কথা ধরে নেওয়ায় কোন দোষ নেই। আর এ ক্ষেত্রেই বলা যায়, ভরত সঙ্গীতের ত্রৌর্বিদ্রিক রূপটির আভাস পাকেপ্রকারে দিয়েছেন যদিও তার স্পষ্ট উল্লেখ কিছু করেন নি। স্পষ্ট উল্লেখ একমাত্র ৭ম থেকে ১১শ শতাব্দীর ভেতর মকরন্দকার নারদই করেছেন বলা যায়।^৪

মোট কথা ৭ম, ১১শ শতাব্দী থেকেই সুস্পষ্ট ভাষায় নৃত্য, গীত ও বাজের সমবেত রূপ হিসাবে আমরা সঙ্গীতের উল্লেখ পাচ্ছি। তার আগেও প্রাতিশাখ্যে ‘গণগীতিভাঃ’, ‘উহগানে’, ‘শ্রোভশ্চ সামাভঃ’ প্রভৃতি এবং শিক্ষাদিতে গান, গীতি, গাথা ও গান্ধর্বগানের উল্লেখ নৃত্য ও বাজের সহমিলনে পেয়ে থাকি। এ ছাড়া আর্যের ও সামবিধানব্রাহ্মণে এবং সামতন্ত্রে অরণ্যেগেয়গান, গ্রামেগেয়গান, উহগান ও শ্রোভ গানের মারফতে সামগানের পরিচয়ও আমরা যথেষ্ট পেয়েছি। তা ছাড়া নাট্যশাস্ত্রে থেকে আরম্ভ করে বৃহৎশী, মকরন্দ,

১। সঙ্গীত মকরন্দ ১৩৩, ২।

২। ‘প্রবাসী’, বৈশাখ ১৩৫৩ (পৃ. ৪৪-৫০) সংখ্যায় লেখকের “সঙ্গীত মকরন্দ ও শিক্ষাকার নারদ” প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

৩। নাট্যশাস্ত্র (কাশী সং.) ২৮।৭

৪। ‘প্রবর্তক’, কার্তিক ১৩৫৩ (পৃ. ৩১৭-৩২০) সংখ্যায় লেখকের “গান্ধর্বশাস্ত্রে সঙ্গীত” প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

রত্নাকর, পারিজাত, রাগবিবোধ, সঙ্গীতদর্পণ-সঙ্গীত ও সময়-সারের সময় পর্যন্ত গীত, বাণ ও নৃত্যের প্রচলন অব্যাহত ছিল ব'লে মনে হয়। কিন্তু বর্তমানে সঙ্গীতের কোঠায় এ তিনটির একত্র সমাবেশ একেবারে অপরিহার্য ব'লে পরিগণিত নয় যদিও নাট্যকলার ভেতর তার প্রচলন এখনো রয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে সঙ্গীতের সম্বন্ধে কোন কথা বলতে গেলে সঙ্গীতের উৎপত্তি বা জন্মকথার পরিচয় দেওয়া আগে দরকার। সঙ্গীতশাস্ত্রকারেরা বেশীর ভাগই সঙ্গীতের উৎপত্তির কথা বলতে গিয়ে বলেছেন “গীতং নাদাত্মকং”, অর্থাৎ নাদ বা শব্দই গীত তথা সঙ্গীতের শরীর অথবা শব্দ থেকেই সঙ্গীতের উৎপত্তি হয়েছে। নৃত্য ও বাণের বেলায়ও তাই—“বাণং নাদবাস্তব্য প্রকাশতে। তদ্ব্যাহুগতং নৃত্যং নাদাধীনমতন্ত্রম্।”^৫ এই নাদ অথবা শব্দকে আদি অথবা স্বস্থ শব্দ বলা হয়েছে যে শব্দের ভেতর শাস্ত্রকার ও দর্শনকারেরা বিশ্বতন্ত্রাণ্ডকেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এই আদি বা স্বস্থ শব্দকে অনাহত ও আহত ভেদে দু'ভাগে ভাগ করে আহত শব্দ থেকেই সঙ্গীতের স্বস্থমূর্তির জন্ম এ কথা সঙ্গীতশাস্ত্রকারেরা বলেছেন।

কিন্তু এ গেল নিছক দর্শনের কথা। কারণ যে কোন শব্দ স্থূলরূপে প্রকাশ পাবার আগে স্বস্থ আকারে নাভিতে প্রথমে, তার পর হৃদয়ে ও কণ্ঠে ও শেষে মুখে স্থূল আকারে প্রকাশ পায়। বাতাসই শব্দের কারণ। শব্দ হবার আগে বাতাস অর্ধে প্রাণবায়ু দেহের ভেতর পাঁচটি স্থানকে অতিক্রম করে স্থূল শব্দরূপে বাইরে প্রকাশিত হয়। এই প্রাণবায়ুকেই দর্শনশাস্ত্রে শব্দরূপ, তন্ত্রে কুণ্ডলিনী, কালী প্রভৃতি বলা হয়েছে।

কিন্তু দর্শনের কথা বাদ দিলে ইতিহাস ও ক্রমবিকাশের দিক থেকে সঙ্গীতের জন্মকথার একটি ইঙ্গিত আমাদের পেতে হবে। সঙ্গীত তথা সঙ্গীতের স্বর, সুর বা রাগরাগিণী একেবারে আকাশ থেকে অকস্মাৎ সৃষ্ট হয় নি। সমাজের মানুষই প্রতিভা ও প্রচেষ্টা দিয়ে সঙ্গীতকে প্রকৃতির অন্তর থেকে আবিষ্কার করেছে—তাও করেছে সকলে ধীরে ধীরে ক্রমবিকাশের ধারাকে অনুসরণ করে। ভারতীয় সংস্কৃতি যেমন প্রাগৈতিহাসিক যুগের বিশাল ক্ষেত্রকে অতিক্রম করে ঋগ্বেদিক যুগে চরম উৎকর্ষ লাভ করেছিল; তারপর বৈদিক যুগেরও পরে ঔপনিষদিক যুগে বাহ্যিক ও অন্তর উভয় দিকেই সংস্কৃতি যেমন আবার বিকাশের পরাকাষ্ঠায় উপস্থিত হয়েছিল, একেবারে নয়, যুগ-যুগান্তের ক্রমোন্নতির ধারাকে অনুসরণ করে, সঙ্গীত-কলাও তেমনি অসভ্য আদিম বিকাশের ভেতর দিয়ে ধীরে ধীরে উন্নত হতে হতে দেশী ও মার্গ-অসংস্কৃত ও সংস্কৃত এ দুটি রূপের ভেতর দিয়ে ক্রমে রাগ, অলঙ্কার, মুহুর্তা, তান ও সঙ্গীতের বিচিত্র রূপভেদের সম্ভারে বর্তমান

উন্নত আকারে এসে উপস্থিত হয়েছে। কাজেই ক্রমোন্নতির ধারাকে অধীকার করার উপায় নেই। সঙ্গীতের পরিপূর্ণ রূপও এই ক্রমোন্নতি বা ক্রমবিকাশের পথে ধীরে ধীরে প্রাগৈতিক ও বৈদিক যুগকে অতিক্রম করে ঐতিহাসিক তথা হিন্দু, মুসলমান ও ইংরেজ রাজত্বের বিভিন্ন যুগে বিচিত্র রূপে প্রকাশ পেয়েছে একথা আমাদের স্বীকার করতে হবে। নারদীশিক্ষা ও রত্নাকরের আর্চিক, গাথিক, সামিক, স্বরাস্তর, ওড়ব, ষাড়ব ও সম্পূর্ণ স্বরগুলির পরিচয় দিলেই সে ক্রমিক স্বরবিকাশের কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়।

একেবারে গোড়াকার দিকে সঙ্গীত একটি মাত্র স্বরকে নিয়েই পরিপূর্ণ ছিল আর সে যুগের নাম ছিল আর্চিক। সঙ্গীতের প্রাণই স্বর। সুর বা রাগ-রাগিণীর রূপও এই স্বরের বিভাস-বৈচিত্র্যের ওপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করে। আর্চিক যুগে স্বর মাত্র একটি ছিল, কিন্তু তা ষড়্‌বা, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ এই সাতটি স্বরের ভেতর কোন স্বরটি ছিল একথা এখনো ঠিকরকম ভাবে আবিষ্কার করা হয় নি। সঙ্গীতের বিকাশযুক্ত ঐতিহাসিক দিকটাও এখনো আমাদের কাছে অজ্ঞাতই বলা যায়। তারপর সঙ্গীত কখন থেকে আমাদের সমাজে প্রবেশলাভ করেছে তারও ঠিক ঠিক ইতিহাস আমরা জানি নি। শুধু আমরাই বা কেন, পৃথিবীর সমস্ত জাতির ইতিহাসেই সঙ্গীতের জন্মকথার তারিখ এখনো পর্যন্ত নির্ণয় করতে পারে নি। পশ্চাত্য সঙ্গীতবিদ এরিক ব্লোমও একথা স্বীকার করে বলেছেন :

“We do not know when music became a consciously cultivated art in England, * * * not can we tell how it first shaped itself.”

রাশিয়ান সঙ্গীতবিদগণ ক্যাভোভাকোরেস্কীও স্বীকার করেছেন :

“As to the music, all that could be said would be merely conjectural.” কেননা, “No actual example of primitive Russian music is known, * * .”

ভারতীয় সঙ্গীতের কথাও তাই। সত্যিকার ইতিহাসও ভারতীয় সঙ্গীতের নাই, কাজেই ব্লোমের মতই আমাদেরও স্বীকার করতে হবে :

“Unfortunately for history music was for centuries transmitted merely by ear and by tradition, and even when some system of notation was in use, it long remained so inexact as to serve merely as a rough remainder of what was already known to the performers from aural teaching.”^৬

যাই হোক, সঙ্গীতের ঐতিহাসিক গবেষণা দ্বারা করেন তাঁদের ভেতর অনেকের অভিমত : মধ্যমই (মা) আদি স্বর যাকে আর্চিকের স্বর ও সুর দুইই বলা যেতে পারে। অনেকে বলেন নিষাদই (নি) আদি স্বর। মিঃ শেষগিরি শাস্ত্রী সামগান নিয়ে আলোচনা করার সময় উদাত্ত, অমুদাত্ত ও স্বরিত স্বর নিয়েই বেশী আলোচনা করেছেন, এবং উদাত্ত, অমুদাত্ত ও স্বরিত স্বর তিনটির জায়গায় নিষাদ, ষড়্জ ও ঋষভ স্বরের পরিচয় দিয়ে বরং সামিক যুগের কথাই টেনে এনেছেন বলতে হবে।^৭

হুগুগার কৃষ্ণচারিয়ারও এই সামিক যুগের কথা তুলে উদাত্ত, অমুদাত্ত ও স্বরিত স্বর সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। তবে সেখানে তিনি গানে একটিমাত্র স্বরের তিন রকম ভাবে উচ্চারণ-ভঙ্গীর ওপরই বেশী জোর দিয়েছেন, তিনটি পৃথক স্বরের কথা কিছুই বলেন নি। উদাহরণরূপে আখলায়ন শ্রীতস্বরের (১১১১) একস্বরীগায়ন বা আর্চিকগায়ন— “একত্রত্যম = একশ্রুতিসত্তমহুজয়াং। পরঃসমিকর্ষঃ।” কথাগুলির উল্লেখ করেছেন।^৮ এখানে শাস্ত্রীজী কিন্তু সাতস্বরের ভেতর কোন স্বরটি এই “fixed one note” হবে তার কোন নামোল্লেখ করেন নি। “সঙ্গীত” পত্রিকায় প্রকাশিত (*Sangeet*) *An Hypothesis of the Origin and Development of the 22 Srutis* প্রবন্ধে বিদ্বাণী শিল্পী রাগিণী দেবীও এই আদি বা প্রথম স্বরকে নিষাদ (নি) বলতে চেয়েছেন, আর এর নজিরও তিনি দেখিয়েছেন সাম-পরিভাষার নাম দিয়ে। তিনি বলেছেন :

“In the Samaparibhasa, the note ‘NI’ is described as the starting point of the Saman scale.”^৯

কিন্তু নারদী-শিক্ষাকার নারদ “যঃ সামগানঃ প্রথমঃ স বেণোর্ধ্যমঃ স্বরঃ” বলে যে মিলনের ইঙ্গিত দিয়েছেন তাতে বোঝা যায়, বৈদিক স্বরের অবরোহণ ধারাকে (descending order) অটুট রেখেও মধ্যমকেই (মা) প্রথম স্বর হিসাবে গণ্য করা যায়। সামবেদের ভাষোপক্রমণিকায় আচার্য সায়ণের মতে আবার প্রথম স্বর হয় ধৈবত (ধা), কেননা সাতস্বরের বিকাশভঙ্গীকে তিনি আরোহণ গতিতে (ascending order) স্বীকার করেছেন।

মিঃ স্ক্রা রাও তাঁর *A Plea for A Rational Interpretation of Sangita Sastra* প্রবন্ধে সাতস্বরের

উৎপত্তি নিয়ে যে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন তাতেও প্রথম স্বর হিসাবে মধ্যম স্বরকেই তিনি গ্রহণ করেছেন।^{১০}

এ ছাড়া *The Rigvedic Culture of the Pre-historic Indus* বইয়ের সুপণ্ডিত লেখক স্বামী শংকরানন্দও বৈকাশিক ধারাকে অনুসরণ করে বৈদিক দেবতাদের উৎপত্তির মতো সাত স্বরের উৎপত্তির একটা দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক যুক্তি দেখিয়েছেন। তিনি বলেছেন : “This evolutionary process of the musical notes is very much the same as that of the Vedic deities in the Arya society.”^{১১} তিনি বৈদিক দেবতাদের ক্রমবিকাশের মতো স্বরের বিকাশ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছেন, বরুণ বা আকাশই স্বর্গের প্রথম দেবতা। ঋগ্বেদসংহিতার প্রথম মণ্ডলের গোড়াকার দিকে এই বরুণ দেবতার উল্লেখই করা হয়েছে, যদিও তা ছ’এক বারই মাত্র। স্বামী শংকরানন্দ বলেছেন :

“* * We find that the Tantric division of the sound reappears in the musical science.”

বরুণ বা আকাশের তান্ত্রিক বর্ণবীজ (code) মধ্যম (মা) অথবা ঋষভ (রে)। কাজেই এখানেও আদিস্বর হিসাবে মধ্যমকেই (মা) পাওয়া যায়। এই মধ্যম স্বরকে সোমনাথ তাঁর রাগবিরোধে স্বয়ম্ভু (‘unborn’ and ‘uncreated’) স্বর বলেছেন।^{১২} শাস্ত্রদেব তাঁর সঙ্গীতরত্নাকরেও (১.৪.৬) বলেছেন : “গ্রামে স্তাদবিলোপিত্বান্ধ্যমস্ত পুরঃসরঃ” এবং কল্লিনাথ তাঁর টীকায় “মধ্যমাত্তবিনাশিত্বমিতি” বলে প্রকারান্তরে মধ্যম স্বরেরই অবিনাশিত্বের তথ্য স্বয়ম্ভুয়ের কথা উল্লেখ করেছেন। ভারতের সমসাময়িক দত্তিল ও একথা স্বীকার করেছেন। টীকাকার সিংহভূপালও দত্তিলের কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন— “মধ্যমস্তাবিলোপিত্বমুক্তং দত্তিলেন—* * অলোপিনং বিজ্ঞানীয়াং সর্বত্রৈব তু মধ্যমম্।” কাজেই সকল অবস্থায় অর্থাৎ ষাড়ব, ওড়ব ও সম্পূর্ণ ঠাঁটের বেলায়ও মধ্যমের লোপ নেই। সিংহভূপালও ‘ষাড়বিত্ত্ব’ উড়বিত্ত্বে চ মধ্যমস্ত লোপো নাস্তি’ বলে একথা সমর্থন করেছেন আর এজ্ঞে প্রশংসার ছলে ‘দেবকুল উৎপন্নত্বাৎ’—দেবকুলে উৎপন্ন কথাগুলিও উল্লেখ করেছেন। আজকাল তাই সম্পূর্ণ ঠাঁটের মাঝামাঝি হিসাবে মধ্যম স্বরকেই আমরা গ্রহণ করে থাকি, আর উত্তরাঙ্গ ও পূর্বাঙ্গ রাগের নির্ণয়ও ঐ মধ্যম স্বরকে ধরে করা হয়। বিস্তৃত আলোচনার ভেতর না গিয়ে সংক্ষেপে সকল দিক থেকে বিচার করলেও দেখা যায়, আর্চিকযুগের স্বর নিষাদ, অথবা

৭। রামচন্দ্রন : *The Ragas of Karnatic Music* (1933), পৃ. ১৩

৮। Vide *The Journal of the Music Academy*, Vol. I, Jan. 1930, No. 1, p. 158.

৯। Vide *Sangeeta*, Vol. June 1931, No. 3, p. 12,

১০। Vide *The Journal of the Music Academy*, vol. IX, 1938, pts. I-IV, pp. 49-61

১১। Vide *Rigvedic Culture of the Pre-historic Indus*, vol II, p. 50.

১২। শুধু মধ্যম স্বরকে নয়, পঞ্চম ও ষড়্জ স্বর দুটিকেও রাগবিবোধকার স্বয়ম্ভু (‘anborn’) স্বর বলেছেন।

ধৈবত না হয়ে মধ্যমই বরং হওয়া উচিত—বিকাশের ধারা ও বিজ্ঞানের দিক থেকে অন্তত।

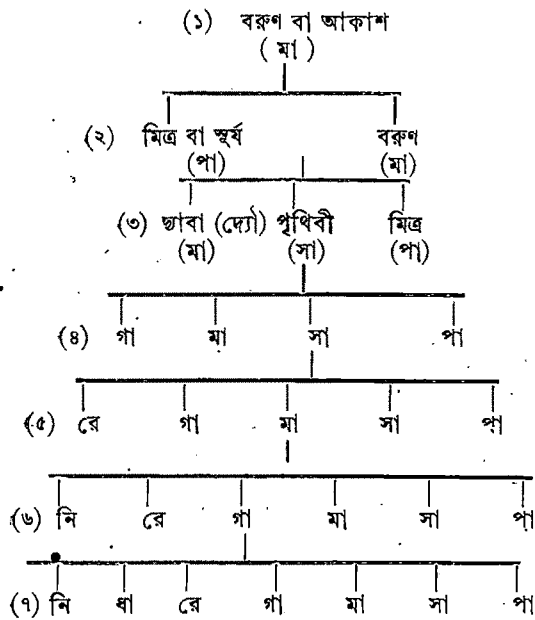
সঙ্গীতে আটিকযুগের পর আমরা পাই গাথিকযুগের বিকাশ। এই গাথিকযুগের স্বর বৈদিক দেবতা মিত্র ও বরুণের মতো পঞ্চম ও মধ্যম (পা ও মা) স্বর দুটি হবে, কেননা মিত্র ও বরুণের বর্ণবীজ হবে পঞ্চম ও মধ্যম স্বর। এই রকম সামিক যুগ বা তিন স্বরের যুগে তিনটি দেবতা দ্যো (আকাশ) পৃথিবী ও মিত্রের বর্ণবীজ অহুযায়ী মধ্যম, ষড়্জ ও পঞ্চম (মা সা পা) স্বরের উৎপত্তি বুঝতে হবে। এই মধ্যম, ষড়্জ ও পঞ্চম অথবা ‘সমপা’ স্বর তিনটিই সোমনাথের মতে স্বয়ম্ভু—

“কিং চ স্বভূবঃ সমপা” অথবা “সমপাঃ ষড়্জপঞ্চমধ্যমাঃ স্বমাদেব ভবন্তীতি স্বভূবঃ স্বপ্রকাশাঃ; নো তু কল্লিতাঃ।” পণ্ডিত হুগার ক্লফচারিয়ারও এটিকে সঙ্গীতের তৃতীয় স্তর ও সামিক যুগ ব’লে স্বীকার করেছেন। তা ছাড়া তিনি বলেছেন:

“** it is clear that the Samic scale was repeated in three ways—from স, ম, প, which are the bases for the higher and lower registers or octaves.”^{১৩} মিঃ স্কলার রাওয়ের স্বীকৃতিও তাই:

“It must be remembered that basic note or *Sadja* was in the centre of the scale, *ma* the upper limit and *pa* the lower limit.”^{১৪} তবে

রাগিণী দেবীর স্বর তিনটির সঙ্গে এই স্বর তিনটির কোন মিল নেই। সামিকের পর স্বরান্তর বা চার স্বরের যুগ আর সে চার স্বর গান্ধার, মধ্যম, ষড়্জ ও পঞ্চম। এর পর ওড়ব, ষাডব ও সম্পূর্ণ স্বরের যুগ। এই স্বরগুলির বিকাশ-পারম্পর্যকে ঠিক এরকমভাবে বোঝান যায়,



১৩। Vide *The Journal of the Music Academy*, Vol. I, April 1930, No. 2, p. 159.

১৪। *Ibid.*, Vol. IX, 1938, pts. I-IV, p. 49.

অবশ্য হুগার ক্লফচারিয়ার ও স্কলার রাওয়ের বিকাশ-পারম্পর্য এই ধারার সঙ্গে ঠিক মেলে না। এই রকম ভাগ ও পারম্পর্য বৈদিক বিকাশের পারম্পর্যকে অনুসরণ করেই করা হয়েছে।

এ ছাড়া বৈদিক স্বর উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিতের (এবং প্রচয়ের) প্রসঙ্গও আসতে পারে। উদাত্ত বলতে উচ্চ স্বর, অনুদাত্ত নিম্ন বা খাদ স্বর আর স্বরিত উচ্চ ও নীচ স্বর দুটির সমতারক্ষক (balancing) স্বর। উদাত্তাদি স্বর তিনটি ইতিহাসের গোড়াকার দিকে স্বর হিসাবে পরিচিত থাকলেও পরে “ত্রীণি মন্ত্রং মধ্যমমুত্তমঞ্চ”—মন্ত্র (খাদ) মধ্য ও তার (উচ্চ) হিসাবে (স্বরোচ্চারণের স্থান বলেই পরিচিত হয়েছিল)। যাঙবাক্য, নারদী, পাণিনীয়, মাণ্ডুকী প্রভৃতি শিক্ষাগুলি আবার উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত এই তিনটি (বৈদিক) স্বর থেকে লৌকিক সাতটি স্বরেরও উৎপত্তির কথা বলেছেন। যেমন,

উচ্চো নিষাদগান্ধারো নীচাঃ স্বভৈবতো।

শেষান্ত স্বরিতা জ্ঞেয়াঃ ষড়্জমধ্যমপঞ্চমাঃ ॥

অর্থাৎ (বৈদিক) উদাত্ত প্রভৃতি তিন স্বর থেকে উৎপন্ন লৌকিক সাত স্বরকে বিভাগ করে দেখালে পাওয়া যায়,

রধা	সমপা	নগা
অনুদাত্ত (মন্ত্র)	স্বরিত (মধ্য)	উদাত্ত (তার)

কিন্তু সাত স্বরের ক্রমবিকাশের রীতিকে লক্ষ্য করলে উদাত্ত ও অনুদাত্তের সমতারক্ষক স্বর স্বরিত তথা ‘সমপা’ স্বরকেই আদিম বা সামিক যুগের স্বর বলা উচিত। ষড়্জ-মধ্যম-পঞ্চম স্বর তিনটিকে সোমনাথ তাঁর রাগবিবোধে স্বয়ম্ভু ও অবিনাশী স্বর ব’লে উল্লেখ করেছেন তা আগেই আমরা উল্লেখ করেছি। কাজেই এক স্বরিত স্বর থেকেই যদি অবিনাশী ও অপরিবর্তনীয় স্বয়ম্ভু তিনটি স্বরের উৎপত্তি সম্ভব হয় তবে স্বরিতকেও স্বয়ম্ভু ও অবিনাশী বলে গণ্য করতে হবে। কিন্তু শিক্ষাকারদের ভেতর কারো ইঙ্গিতেই তার আভাস পাওয়া যায় না; স্বরিত স্বরকে তাঁরা উদাত্ত ও অনুদাত্তের পরে উৎপন্ন স্বর ব’লেই বরং পরিচয় দিয়েছেন। কাজেই শিক্ষাকারদের অভিপ্রায়ে আমরা এখানে রহস্যগূর্ণ ব’লেই মনে করি। সাত স্বরের ক্রমবিকাশের রীতি অহুযায়ী স্বয়ম্ভু স্বর তিনটির ভেতর মধ্যম তথা প্রথম স্বরকেই আমরা প্রথমে উৎপন্ন স্বর ব’লে গণ্য করব। মধ্যমের পর অবরোহণ গতক্রমে পঞ্চম ও পরে ষড়্জ স্বরের জন্মকেই আমরা শাঙ্গ ও বিজ্ঞানসম্মত ব’লে মনে করব। কাজেই শিক্ষাকারদের যদি সত্যিই অভিপ্রায় হয় যে, উদাত্তাদি স্বর তিনটি থেকে লৌকিক সাতটি স্বরের উৎপত্তি হয়েছে তা হলে শাঙ্গের সিদ্ধান্ত অহুযায়ী স্বরিত স্বরকেও সামিক যুগের স্বর ব’লে গণ্য করে উদাত্ত ও অনুদাত্তকে আমরা স্বরিত তথা ‘সমপা’ অথবা ‘পসমা’ স্বর তিনটির অন্তর্নিবিষ্ট স্বর ব’লে মনে করব।

শুকতার

শ্রীরমা সরকার

কার্তিক মাস। শিশিরভেজা ভোরের বাতাসে শীতের অল্প আমেজ দিয়েছে। রিক্ত-বর্ষণ লঘু-শুভ্র মেঘের দল নীল আকাশের কোণে কোণে ক্ষণিক বিশ্রামে মগ্ন। দূরে কাকন-জম্বার রূপালী চূড়া শরতের সোনালী কিরণে বলমল করছে। জেল রোডের ছোট যক্ষা-হাসপাতালের বাগানে ফুটেছে অজস্র গোলাপ, চন্দ্রমল্লিকা; রং-বেরঙের ডানা-মেলে-দেওয়া প্রজাপতির দলের ব্যস্ত আনাগোনার বিরাম নেই।

বেলা আটটা বাজে। ডাক্তারবাবুর পরিচিত, কালো মোটর গাড়ীটা কংক্রিটের আকাবাঁকা পথ দিয়ে উঠে এল হাসপাতালের দরজার সামনে। এংলো-ইণ্ডিয়ান নার্স মিসেস্ সিমসন দাঁড়িয়ে ছিলেন তাঁরই প্রতীক্ষায়—ডাক্তার বাবুকে নিচু গলায় কিছু বললেন। ছ'জনে একটু দ্রুতপদে এগিয়ে চললেন সিঁড়ি বেয়ে তের নম্বর কামরার দিকে। লোহার রেলিং-দেওয়া খাটে শুয়ে ছিল মুদিত স্বৈত কলিকার মত একটি ক্ষীণাঙ্গী মেয়ে। ডাক্তারবাবু ধীরে ধীরে তুলে নিলেন তাঁর হাতের মধ্যে মেয়েটির তুহিনশীতল ছোট হাতখানি। ষ্টেথোস্কোপ দিয়ে ভাল করে পরীক্ষা করলেন—জীবনের কোন স্পন্দন মিলল না কোথাও। ডাক্তার, নার্স ছ'জনেই প্রতিদিনই দেখছেন জন্মমৃত্যুর খেলা—তবু আজ ডাক্তারবাবু কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, প্রোচা মিসেস্ সিমসন পরম স্নেহভরে একটি চূর্ণ অলক সরিয়ে দিলেন মেয়েটির কপালের উপর থেকে। মুহূর্তমিণি, স্বল্পবাক্ এই মেয়েটি যেন তাদের অন্তর স্পর্শ করেছিল। যে কয়দিন সে এখানে ছিল—বেশীর ভাগ সময় আয়ত চোখ দুটি মেলে বাইরের দিকে চেয়ে থাকত, প্রাণ ভরে উপভোগ করত রূপ-রস-গন্ধে ভরা ধরণীর বৈচিত্র্য। বাইশ বছর ধরে প্রকৃতির কোলে হেসে খেলে আজ যখন ঘুমিয়ে পড়ল—সে রেখে গেল না কারও প্রতি কোন অভিযোগ, কোন ক্ষুদ্র অভিমান। হাসপাতালের খাতায় লেখা হ'ল—মালতী সাহার হৃত্যুর কথা।

মালতীর শিথিল হাতের তলায় পড়ে ছিল একটি খাম—সাগরপারের ঠিকানা বহন করে। তাতে ছাপ পড়ে নি কোন ডাকঘরের।

প্রীতিভাজনেয়ু...

আমার এ চিঠি যখন তোমার হাতে পৌঁছবে, তখন আমি জীবনের মেয়াদ শেষ করে অনেক দূরের পথে পাড়ি দিয়েছি। তেল-ফুরিয়ে-যাওয়া প্রদীপের মত জীবন আমার বেশী দিন জ্বলবে না জানি। এ চিঠি লেখার প্রয়োজন হয়ত আজ শেষ হয়েছে—তবুও বাইরের নীল আকাশের দিকে

তাকিয়ে আজ তোমার কথাই বার বার করে মনে পড়ছে। ছ' মাস হ'ল আমি এসেছি এই হাসপাতালে, ডাক্তার এবং নার্সের সব প্রয়াস ব্যর্থ করে দিয়ে আজ দাঁড়িয়েছি জীবনের প্রান্তসীমায়।

সাত বছর আগে এই দার্জিলিঙেই প্রথম দেখা হয় তোমার সঙ্গে। অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক পিতা তাঁর শেষ জীবনটা এখানে কাটাবেন বলে জলাপাহাড়ের উপর ছোট্ট একটি বাড়ী করিয়েছিলেন—“সান্ডানীড” তার নাম। চার-দিকের ঘন পাইনবনের মাঝে আমাদের বাড়ীটা দেখাত হরিৎ সাগরে মাথা-তুলে-থাকা একটি ছোট দ্বীপের মত। কাচের জানালার মধ্য দিয়ে পরিষ্কার দিনে দেখতে পেতাম—বরফের পাহাড়ের চূড়াগুলো। পাশের ‘কটেজ’টা অনেক সময়ই খালি থাকত; কদাচিৎ কোন বিদেশী লোককে দেখা যেত কয়েক মাসের ভাড়াটিয়া রূপে। সেবারও এক দিন দেখলাম, পায়ে চলা পথ দিয়ে পাহাড়ী মেয়েরা পিঠে বেঁধে মোটরবার্ট আনছে। প্রতিবেশী সম্বন্ধে আর কোন কৌতূহল জাগে নি। পরদিন সকালে চায়ের টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে বাবার জন্ম কফি তৈরি করছিলাম। বাবা তাঁর আরাম-কেন্দ্রারায় বসে পড়ছিলেন খবরের কাগজ; মা ছিলেন রান্নাঘরে নিজের কাজে ব্যস্ত। আমাদের জিমি কুকুরটা বাইরে কাকে দেখে ছ-এক বার ডেকে উঠে চুপ করে গেল। এমন সময় রান্নাঘরের দরজার কাছে অপরিচিত কণ্ঠে কে যেন বলে উঠল—“মাসীমা, খুব যে ফোড়নের গন্ধ বেরুচ্ছে। পেটুক মাছষ আমি, আসন পেতে বসে পড়ি এখানে।” মা স্তিমিত্ত স্বরে তাকে বললেন—“বেশ তো।” কাছে এসে দেখি শ্রামবর্ণের একটি ছেলে, বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা হাসিতে উজ্জ্বল। পরিচয় হতে বেশী দেরি হ'ল না। তোমার মধ্যে সবার সঙ্গে সহজ ভাবে মেশবার ক্ষমতা ছিল বিধিদত্ত। তখন গরমের ছুটিতে দাদাদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা দার্জিলিঙে এসেছে—শিশুমহলে “মণিকাকা”র সমাদর সহজেই হ'ল। কখনও দেখতাম তোমাকে বাবার সঙ্গে রাজনীতি নিয়ে তুলত তর্ক করতে; কখনও বা দেখতাম মায়ের কাছে রান্নাঘরে আসন পেতে বসে কি কি তোমার খেতে ভাল লাগে তার লম্বা কব্দ দিতে।

আমাদের পরিবারে তিন ভাইয়ের পর অনেক দিন বাদে জন্মেছিলাম আমি—একটি বোন। আদরের হয়ত অভাব ছিল না, কিন্তু আমাদের পরিবারে উজ্জ্বাসের আতিশয্য জিনিষটা কোন দিন ছিল না। আমি একটু বড় হবার আগে দাদারা সকলেই কৃতবিদ্য হয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, বিদেশের

বৈজ্ঞানিক শিক্ষা স্তম্ভ করেছে তাদের জন্মের পথ। তারা থাকত যে যার কাজের জায়গায়, কোন ছুটিতে হয়ত দেখা হ'ত ওদের সঙ্গে। স্কুলে পড়তাম, কিন্তু আমার কোন বিশেষ বন্ধু ছিল না। কৈশোরের নিঃসঙ্গ দিনগুলো আমার কাটিত বাবার লাইব্রেরিতে। বাবা ছিলেন ইংরেজী সাহিত্যের খ্যাতনামা অধ্যাপক, দেশ-বিদেশের কাব্য-সাহিত্যের বইয়ের অভাব ছিল না বাড়ীতে। অপরিণত কিশোর-মন হয়ত অনেক কিছুই বুঝতে পারত না—তবু কি এক অন্ধ আকর্ষণ অনুভব করতাম ওই প্রাণাঙ্ককার ঘরে আলমারিতে সাজান বইগুলোর প্রতি। তুমিই প্রথম দেখা দিলে, প্রাণের সতেজ চাক্ষুণ্য নিয়ে আমার সরম-কুণ্ডিত জীবনে।

তুমি ছিলে বিজ্ঞানের ছাত্র—পদার্থবিজ্ঞান তোমার পাঠ্য বিষয়। সাহিত্যচর্চা ছিল তোমার অবসর সময়ের চিত্ত-বিলাস। কিন্তু বিদেশী কাব্যসাহিত্যে তোমার গভীর জ্ঞান, তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ-প্রতিভা যে-কোন উচ্চদরের সাহিত্যরসিকের গৌরবের জিনিষ হতে পারত। আমাদের বেড়াতে যাবার কোন নির্দিষ্ট সময় ছিল না। কতদিন মেঘমেঘুর অলস মধ্যাহ্নে বেরিয়ে পড়েছি অকল্যাণ রোড দিয়ে “ঘুমে”র পথে। কখনও বা গিয়ে বসেছি পাহাড়ী ঝরণার ধারে—যেখানে ছ-পাশের লতাপাতা নত হয়ে চঞ্চল জলে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে যাওয়া ঝামছবি ফেলেছে। তুমি পড়ে শোনাতে কোন প্রিয় কবির কবিতা। কখনও বা “ভিক্টোরিয়া ফলস্”—এর রাস্তা বেয়ে নেমে যেতাম পাহাড়ীদের কোন গ্রামের দিকে। কত সন্ধ্যা কেটে গেছে ওদের দেহাতি বাঁশীর সুর শুনে।

স্কুলের পড়া শেষ হ'লে, কলকাতায় কলেজে পড়তে এলাম। তুমি তখন পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। ছুটির দিনে নিয়ে যেতে ট্রামে করে ডালহাউসি, রেড রোড, কিংবা লেকের ধারে। কখনও কখনও বা ছ'জনে বেরিয়ে পড়তাম দক্ষিণেশ্বর, বেলুড়, শিবপুরের পথে। তোমার সঙ্গে থাকত কেক আর ক্লাসে ভরা চা। বোর্ডিঙে আমি কারও সঙ্গে বিশেষ কথা বলতাম না। চিরদিন একলা কাটিয়ে লোকের সঙ্গে ভাল করে মিশতে পারতাম না। মেয়েরা সেটাকে ভাল করত ভাল মেয়ের অহঙ্কার বলে। সহপাঠিনী মহলেও নীরস গ্রন্থকীট বলেই পরিচিত ছিলাম। শুধু তোমার কাছে আমি এত প্রগলভ হয়ে উঠতাম। পথে দেখা কত ছোটখাট জিনিষ নিয়ে, নিজেদের বোর্ডিং এবং কলেজের খুঁটিনাটি ঘটনা নিয়ে অনর্গল বকে যেতাম। মন কোথাও বাধা পেত না।

ছ-বছর পর তুমি প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে উত্তীর্ণ হয়ে গবেষণা স্তর করলে। বিভিন্ন বস্তুর বর্ণচ্ছত্রের অনুশীলন ছিল তোমার বিষয়। সারা দিনই তোমার কাটিত বিজ্ঞান কলেজের লেবরেটরিতে, গভীর রাত্রি পর্যন্ত ব্যস্ত থাকতে নিজের পড়াশুনা নিয়ে। তবু ছুটির দিনটা আমাকে

নিয়ে যেতে কখনও তোমার ভুল হ'ত না। কত সময় শোনাতে তোমার ভবিষ্যৎ কর্তৃপস্থার কথা। মেধাবী ছেলেরা অনেক সময় ভাল চাকরী পেলে গবেষণার পথ ছেড়ে দেয়—এ নিয়ে তোমার মনে ছিল একটা গভীর দুঃখ। তোমার চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হ'ল, তুমি ডি. এস-সি হয়ে বিলেত যাবার জন্য স্টেটস্ স্কলারশিপ পেলে। যাবার সব আয়োজন সারা হ'ল তোমার।

তখন আমি ছিলাম দার্জিলিঙে। এসে সবাইকে শোনাতে তোমার যাবার কথা—সকলেই খুব খুশী হলেন। তারপর এলে তুমি আমার পড়ার ঘরে। প্রাণবন্ত গভীর জ্ঞানতে সেদিন পারলাম না, খবরটা শুনে চুপ করে বসে রইলাম। তুমি টেবিল থেকে একটা মাসিক পত্রিকা তুলে দেখাচ্ছিলে। টুক টুক করে বেজে চলছিল শুধু ঘরে একটা ছোট ঝড়। আমার নিষ্পন্দ ভাব তোমাকে বিম্বিত করেছিল—হঠাৎ মুখ তুলে চেয়ে দেখলে আমার নীরব চোখের জল। কাছে এসে সেই প্রথম সবল ছুটি বাহর আকর্ষণে টেনে নিলে আমাকে তোমার বুকের মাঝে, আমার জলভরা চোখের দিকে তাকিয়ে কি যেন দেখেছিলে। তোমার সদাচঞ্চল চোখে ছিল না সেদিন তার চিরান্তান্ত হাসিটি, তোমার গভীর কালো নয়নে দেখেছিলাম শুধু বেদনার নিবিড় ছায়া। খুব বীরে আমার কপোলে একটি চুম্বন একে দিয়ে বলেছিলে—“দুঃখ করো না—আমি ফিরে আসব।” আমাদের দু'জনের মধ্যে এ ধরণের কোন কথা এর আগে কোন দিন হয় নি, বিচ্ছেদের দিন যখন এগিয়ে এল দুঃসহ বেদনার মধ্যে উপলব্ধি করেছিলাম সেদিন—কত ভাল লাগে তোমাকে। সমস্ত মনপ্রাণ আচ্ছন্ন করে তার স্মৃতি আচ্ছন্ন ভাসে, সেখানে আর কারও আসন হবে না কোন দিন। বেশী কথা সেদিন হ'ল না। আমার ক্ষীণ, ভীর্ণ হাত ছুটি তোমার মুঠোর মধ্যে নিয়ে অনেকক্ষণ বসে ছিলে। তোমার নীরব প্রশ্ন সকল মুখরতাকে অতিক্রম করে অতলস্পর্শ গভীরতার মাঝে নিয়ে গিয়েছিল। পাশের ঘরে রেডিওতে বাঁশী বাজছিল আশাবরীর সুরে। প্রিয় বিরহের কান্নাঝরানো সুরের মূর্ছনা সকালের সোনালী আলোয় বেদনার জাল বুনে চলছিল। তোমার সঙ্গে আর দেখা হয় নি।

তোমার বন্ধনে ধরা দিয়ে, নারীজীবনের চরম সার্থকতা লাভ করতাম এ কথা জানি। কৈশোর-জীবনের ভাবনাবিহীন দিনগুলো কাটে হালকা হাওয়ায় ভেসে-চলা মেঘের মত; আত্মীয়পরিজন ঘিরে থাকে চারদিকে। কিন্তু তারপর মন চায় একজনের নিবিড় সঙ্গ, মিলিত প্রেমে গড়ে তোলে শান্তিনীড়। জানি তুমি আমাকে অপছন্দ করতে না। কত দিন যখন অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছি—আমি এত সাধারণ মেয়ে—কেন তোমার আমাকে ভাল লাগে? তুমি হেসে বলতে—“সাধারণ ছেলের জন্য তো সাধারণ মেয়েই ভাল।” তবু

হুল্লভ্য বাধা ছিল ছ'জনের মিলনের পথে। প্রাচীনপন্থী পিতার একমাত্র সন্তান তুমি। মা হারা ছেলেকে বুকে করে মাছুষ করেছিলেন জননীর স্নেহে। এখনও আমার চোখে ভাসে তোমার বাবার আভিজাত্যমণ্ডিত ব্রাহ্মণ্য মহিমা-দীপ্ত মুর্ত্তিখানি। স্নেহের অভাব তাঁর ছিল না—কথাধিক বাৎসল্য পেয়েছি তাঁর কাছে। আমার মুখে মীরার ভজন শুনতে তিনি খুব ভালবাসতেন। কত দিন আমাকে নিজে পড়ে শুনিয়েছেন উপনিষদের বাণী। তাঁর উদাত্ত কণ্ঠের ধ্বনি আজও আমার কানে বাজে। তবু তিনি কোন দিন আমাকে তোমাদের ধরে বধুৰূপে নিয়ে যাবার কথা কল্পনা করতে পারতেন না। এ শুধু ব্রাহ্মণ্যের অহমিকা নয়—অশিক্ষিত মনের অন্ধ বিশ্বাসও নয়। তাঁর মত বিদ্বান, মননশীল লোক কমই দেখা যায়। কিন্তু তিনি এ কথা প্রাণ দিয়ে মানতেন—সমাজের কল্যাণ ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের অনেক উপরে। তাঁর সমস্ত ব্যক্তিগত গড়ে উঠেছিল এই সংস্কারের উপর। তাঁর জীবনাদর্শের ভিত্তিমূলে নাড়া না দিয়ে আমাদের মিলন সম্ভবপর ছিল না। আর এত বড় আঘাত দিতে আমরা কিছুতেই পারতাম না। কাজেই মিলন আমাদের হ'ল না, তুমি বিলেত চলে গেলে।

ইতিমধ্যে আমাদের সংসারের উপরে দুঃখের কালো মেঘ ধনিয়ে এল। মা হয় ত তাঁর স্নেহপ্রবণ মন দিয়ে আমার মনের কথা বুকেছিলেন। একমাত্র মেয়ের ব্যথায় তাঁর মন ভেঙে গিয়েছিল। কিছুই করবার ছিল না। তার পর কয়েকদিনের সামান্য অসুখে আমাদের চিরদিনের মত ছেড়ে চলে গেলেন। বাবা এ চরম আঘাতের জ্ঞাত প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁর মুখের সদাপ্রসন্ন হাসিটি আর কোন দিন দেখি নি। কয়েক মাসের মধ্যেই মনে হতে লাগল—যেন কত বছর পার হয়ে বার্লুকোর প্রান্তসীমায় পৌঁছেছেন। আমাদের সংসারের সব দায়িত্ব চির দিন বহন করেছেন মা। শাখা-পর্য্যটন শুভ্র কল্যাণহস্তের স্পর্শে আমাদের সংসারে যে অপূর্ণ সৌন্দর্য্য ফুটেছিল—তা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। বাবাও এক বছরের মধ্যে

মায়ের পথ অনুসরণ করলেন। মেয়ের নিরাশ্রয়তার কথা মনে করে শেষ সময়েও তাঁর অশ্রুর বিরাম ছিল না। আমার পায়ের তলা থেকে আশ্রয় সরে গেল। আমাদের আনন্দ-মুখরিত সাক্ষানীড় একেবারে শূন্য হয়ে গেল, কেউ কোথাও নেই, এত বড় পৃথিবীতে নিজেকে একান্ত রিক্ত, ব্যর্থ মনে হ'ল।

দাদারা আমাকে নিয়ে গেল তাদের বাড়ীতে—আমাকে অল্পমনস্ক রাখতে চেষ্টা করল। কিন্তু একক জীবনে অভ্যস্ত আমি তাদের সংসারে একান্ত বেমানান ছিলাম। আগে থেকেই ঘুসঘুসে জ্বর হচ্ছিল। ডাক্তার এসে রোগ নির্ণয় করলেন—উপদেশ দিলেন বায়ু পরিবর্তনের। ভাইয়েরা বললে আলমোড়া, নৈনীতালের কথা—আমি চাইলাম দার্জিলিং যেতে। যেখানে জীবনের সবচেয়ে সুখের দিনগুলো কাটিয়েছি, যেখানে তোমার সঙ্গে প্রথম দেখা হয়—সহস্র সুখস্মৃতি-বিজড়িত সেই দার্জিলিংয়েই যাত্রা করলাম। 'ডি, এইচ, আর'-এর ছোট গাড়ীতে চড়ে সেই চিরপরিচিত পথ দিয়ে চললাম।

তখন এপ্রিল মাস। শৈলশিখরে বর্ষা এসেছে মঞ্জীর-রংগিত চরণে তার নীলাঞ্চল উড়িয়ে। তিস্তা নদীর গৈরিক জলে জেগেছে উদ্গাম কলকল্লোল। সেই পাহাড়ের বুকে আকাবীকা পথ; কাঠগোলাপের বেড়া দিয়ে ঘেরা ছোট ছোট বাড়ী, রেল-লাইনের দু'পাশে দাঁড়িয়ে পাহাড়ী ছেলের দল। মাঝে মাঝে এক একটা ছোট ষ্টেশন। জানতাম, এ পথ দিয়ে আমি কোন দিন ফিরব না।

আজ হাসপাতালে দিনগুলো কেটে চলেছে একধেয়ে ভাবে। বাইরে তাকিয়ে দেখি আকাশের রং বদলায়, প্রকৃতি দেখা দেয় তার নিত্য নবসাজে। ঐ দেখতে পাচ্ছি, রাত্রি শেষ হয়ে আসছে, ভোরের আকাশের শুকতারার স্নান হয়ে এল। তোমারও প্রবাসের দিন শেষ হয়ে আসছে। জানি এক দিন তুমি ফিরবে গৌরবমণ্ডিত হয়ে—আমি সেদিন থাকব না।

মালতী—

বার্ট্রাণ্ড রাসেলের সমাজ-দর্শন

ক্রীটমা সেন

বার্ট্রাণ্ড রাসেল বর্তমান শতাব্দীর অত্যন্ত প্রস্তুত চিন্তাশ্রুত। পাণ্ডিত্যের গভীরতা, চিন্তার স্বচ্ছতা ও যুক্তির তীক্ষ্ণতা তাঁকে দর্শন-জগতে উন্নত আসনে প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছে। বর্তমান শতাব্দীতে নবজাগৃত তরুণদের উদার ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গি গঠন করতে যাদের চিন্তাধারা সবচেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার করেছে, রাসেল তাঁদের মধ্যে একজন প্রধান চিন্তানায়ক।

যুদ্ধোত্তর যুগে সামাজিক পুনর্গঠনের দিনে তাঁর চিন্তা ও বাণী বাস্তবিকই অনুধাবনযোগ্য।

রাসেলের সমাজ-দর্শন বিভিন্ন স্তরে তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধ ও বক্তৃতায় আলোচিত হয়েছে। তবে এ বিষয়ে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হ'ল তাঁর *The Principles of Social Reconstruction* নামক গ্রন্থখানি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আবহাওয়ায়

(১৯১৪-১৮) গ্রন্থখানি রচিত হলেও, সময়ের এই দীর্ঘ ব্যবধানে তাঁর মূল বক্তব্যের মূল্য বিন্দুমাত্রও হ্রাসপ্রাপ্ত হয়নি; বরং পরবর্তী ঘটনাস্রোতের নানা বৈচিত্র্য তাঁর চিন্তাধারার উপর নতুন আলোক-সম্পাত করে তাকে আরও উজ্জ্বল করে তুলেছে।

প্রথমেই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, রাসেল তথাকথিত বস্তুবাদী চিন্তাবীরদের থেকে বহুলাংশে স্বতন্ত্র। তিনি বস্তু, প্রকৃতি ও সমাজের প্রত্যেককে স্বীকার করেও তাদের সর্বময় কর্তৃত্বকে অস্বীকার করেছেন। আর-বার বার একথাই ঘোষণা করেছেন যে, প্রকৃতিতে ও সমাজে শতসহস্র বন্ধন থাকে সত্ত্বেও মানব-মনের স্বাধীনতা ও স্বরাজ বিদ্যমান।* প্রকৃতি তাকে বাধা দিচ্ছে। প্রতি নিমেষে তার স্বপ্ন চূর্ণিত হয়ে যাচ্ছে অন্ধ প্রকৃতির নির্দয় আঘাতে। তবুও মানুষ কল্পলোকে গড়ে তোলে আদর্শের স্বপ্ন আর তাকে বাস্তবে রূপ দিতে বিপুল ভাবে প্রয়াসী হয়। প্রকৃতির বন্ধনের কাছে মানুষ তার আত্মার স্বাধীনতাকে বিকিয়ে দেয় নি, সে নিজেকে প্রকাশিত করতে চেয়েছে অরণ্যভীত কাল থেকে। প্রকৃতির বন্ধন সত্ত্বেও সে বার বার গড়ে তুলেছে তার আদর্শের অল্পকূল অল্পচান ও প্রতিষ্ঠান। সে চেয়েছে বার বার বন্ধন ভেঙে সমুদ্রে এগিয়ে যেতে। কে দিয়েছে ধাক্কা আর কার প্রেরণায় সে ভাঙতে চেয়েছে অগ্রগতি-পথের সহস্র বন্ধন আয়বিকাশের বিপুল উন্মাদনায়? রাসেল এই মূলগত উন্মাদনার সংজ্ঞা দিয়েছেন “Impulse of Growth”। একেই ফরাসী দার্শনিক ব্যরগস বলেছেন “লেন”। জালাভী” অর্থাৎ “জীবনের ধাক্কা।” এই ধাক্কা বা উন্মাদনাই মানুষকে টেনে নিয়ে চলেছে বিবর্তন বা উন্নতির পথে। মানবের উন্নতির মূল চাবিকাঠি হ’ল এখানে। যারা বস্তুবাদী অর্থাৎ যারা জড় থেকে চৈতন্যের বিকাশ হয় এই মতবাদী বা যারা চৈতন্যের চেয়ে জড়ের প্রাধান্য ঘোষণায় তৎপর, রাসেল-দর্শন স্বভাবতই তাদের দার্শনিক মতের সঙ্গোপ নয়।

রাসেল-দর্শনের গোড়াকার কথা হ’ল মানুষ; ও তার স্বাধীন সৃষ্টিধর্মী মন। তাঁর বিচারে বস্তুর চেয়ে ব্যক্তি বড়, অন্ধ প্রকৃতির আধিপত্যের চেয়ে মানব-মনের সজ্ঞান সাধনা বড়। সমাজের গতি অন্ধ বা যান্ত্রিক নয়। মানুষের ইচ্ছা, চিন্তা ও কর্মের দ্বারাই সামাজিক বিবর্তন বা বিপ্লব নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত। প্রকৃতপক্ষে মানুষই শেষ-বিশ্লেষণে ইতিহাসের গতিনিয়ামক, নির্দায়ক ও স্রষ্টা। সমাজের কেন্দ্রস্থলে তার আসন। তাকে কেন্দ্র করেই রচিত হয়েছে আইন ও কাহুন, ধর্ম ও শাস্ত্র, সমাজ ও রাষ্ট্র। এদের সকলের চেয়ে বড় হ’ল মানুষের মহিমাম্বিত

জীবন। প্রত্যেক জীবনের ভেতর স্বকীয় স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। তাকে পরিপূর্ণভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্তই এ বিশ্বের যত কিছু আয়োজন। “The whole theory of the universe is directed unerringly to one single individual—namely to you.” অর্থাৎ, “তোমার মত প্রত্যেকটি নরনারীর জীবনকে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত করে তোলার জন্তই এ পৃথিবীর যত কিছু আয়োজন ও তার সার্থকতা।” ওয়ান্ট হুইটম্যানের এই বাণীর ভেতর রাসেল-দর্শনের মর্মবাণীও স্বচ্ছত হয়ে উঠেছে। মানুষকে বাদ দিয়ে এ সংসারে কোন কিছুর মূল্য কাণাকড়িও নয়। তার কল্যাণের আদর্শের সঙ্গে সবকিছুর মহিমা অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। যা তাকে ক্ষুদ্র থেকে বৃহত্তে, বন্ধন থেকে মুক্তিতে, উপভোগ থেকে সৃষ্টিতে নিয়ে যায় অর্থাৎ যা-কিছু তার অন্তর্নিহিত Impulse of Growth-এর সহায়ক, তাই কল্যাণপ্রদ ও সার্থক। এর ব্যাধাত ঘটলেই সবকিছু ব্যর্থ ও আপন দীনতায় পছু হয়ে যায়।

বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থা, তার পুঁথি ও শাস্ত্র, বিধি ও বিধান, সবকিছুই তার আপন গৌরব থেকে ভ্রষ্ট হয়ে পড়েছে। মানুষকে ছাপিয়ে বড় হয়ে উঠেছে বস্তু, ব্যক্তির চেয়ে বড় হয়েছে সমাজ। মানুষের জন্তই সমাজ, কিন্তু সমাজের জন্ত মানুষ নয়। মানুষ হ’ল লক্ষ্য, আর সমাজ হ’ল উপলক্ষ্য মাত্র। অথচ মানুষের ছুঁত্যা এই যে, লক্ষ্য প্রায়ই উপলক্ষ্যের চাপে গোঁণ হয়ে পড়ে। এ ছুঁত্যা ঘটেছে মানুষের ইতিহাসে বারে বারে। বর্তমানে সেই ছুঁত্যাগের এক অতি বিকট মূর্তি আত্মপ্রকাশ করেছে। বিজ্ঞানের বলে এখন দেশ ও কালের ব্যবধান অনেকখানি অবলুপ্ত হয়েছে, প্রকৃতির উপর আমাদের কর্তৃত্ব বেড়েছে, সম্পদের দিক দিয়েও ঘটেছে আমাদের অভূতপূর্ব বিপুল প্রাচুর্য। তবুও মানুষের যুগ-যুগ সঞ্চিত দৈহ্য ঘুচল না, তবুও মানুষ আজ অসহায় ও অভিশপ্ত জীবন কাটাতে বাধ্য হয়েছে। এ সামাজিক অভ্যবিরোধ কেন? কোথায় রয়েছে জীবনের মধ্যে সেই অপূর্ণতা যার জন্ত মানুষ এত ঐশ্বর্যের মধ্যেও এমন অসুখী ও দরিদ্র? এ হ’ল বর্তমান কালের আদর্শবাদীদের চরম জিজ্ঞাসা। যারা বলেন, ধনবৈষম্যই এর কারণ, রাসেল স্পষ্টতঃ তাঁদের দলভুক্ত নন। ধনবৈষম্য অতীতম কারণ বটে, তবে একমাত্র কারণ নয় বা মূলগত কারণও নয়। মূলগত কারণ, রাসেল সন্ধান করেছেন বাইরের ঘটনাস্রোতের মধ্যে নয়, মানব-মনে। মানব-মনের মধ্যে সহজাত যে অধিকার-মূলক বৃত্তি (possessive impulse) তারই প্রাধান্য সঞ্চার জীবনে ঘটিয়েছে এই নির্দায়ক সর্বনাশ। বাইরের ঘটনাস্রোতের পশ্চাতে রয়েছে মানব-মনের গতি। মনের পরিবর্তনই রূপায়িত হয়ে ওঠে বাইরের পরিবর্তনে। রাসেল-দর্শনের প্রথম বক্তব্য হ’ল সমাজকে হৃদয়ের ভিত্তিতে সৃষ্টিত।

* Bertrand Russell : *A Free Man's Worship* (i.e. *Mysticism and Logic*, Chap. III.)

করবার জন্ত সর্বোচ্চ প্রয়োজন মানস-পটভূমির পরিবর্তন বা বিপ্লব। এ বিষয়ে মণীষী রাধাকৃষ্ণনের সঙ্গে রাসেল-দর্শনের মিল আছে যথেষ্ট।*

মানুষের অন্তরের গহন-গভীরে রয়েছে বিচিত্র আশা ও আকাঙ্ক্ষা, আবেগ ও উদ্ভাদনা। এগুলিই তার জীবনে বৃহত্তর অংশ অধিকার করে রয়েছে। যুক্তি, বিচার, জ্ঞান ও বুদ্ধির সীমানা অত্যন্ত স্নেহ, তাদের শক্তিও অনেক কম। অল্প আবেগ ও উদ্ভাদনাগুলিই কর্মের মূল উৎস বা প্রেরণা। বুদ্ধি-বিচার দিয়ে আমরা তাদের স্বরূপকে নির্ণয় ও বিশ্লেষণ করি—আমাদের কর্ম ও চিন্তাগুলিকে সমর্থন বা সমালোচনা করি। জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তোলার জন্ত বুদ্ধি-বিচারের অশেষ মূল্য নিশ্চয়ই রয়েছে, তবে সেটুকুই চরম নয়। সকলের আগে প্রয়োজন মানসলোকের পরিবর্তন বা psychological revolution। মানসিক বিপ্লব সাধনের পূর্বে মানস-পটভূমি সম্বন্ধে তাই সূক্ষ্ম ধারণা অত্যাৱশ্যক।

মানব-মন স্বল্পভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে এর অন্তর্নিহিত প্রচ্ছন্ন আবেগ ও কামনাগুলি বিচিত্র ও অনেকাংশে পরস্পরবিরোধী। এই কামনা ও আবেগগুলিকে রাসেল দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। এক শ্রেণীর নাম তিনি দিয়েছেন “possessive impulse” বা অধিকারমূলক প্রবৃত্তি আর এক শ্রেণীর নামকরণ তিনি করেছেন “creative impulse” বা সৃষ্টিমূলক আবেগ। যা মানুষকে মানুষ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়, নিজের স্বহং ‘আমি’কে ক্ষুদ্র ‘আমি’র কারাগারে বন্দী করে রাখে, সেটা হ’ল possessive impulse-এর অন্তর্গত। পক্ষান্তরে যা-কিছু, মানুষকে মানুষের নিকট থেকে নিকটতর করে তোলে, যা ক্ষুদ্র থেকে মানুষকে যুক্তি দেয় স্বহং, তাই হ’ল creative impulse-এর অন্তর্ভুক্ত। ক্রোধ, অহংকার, পরত্নীকাতরতা, ক্ষমতাপ্রিয়তা ইত্যাদি হ’ল অধিকারমূলক বৃত্তির বিভিন্ন প্রকাশমাত্র। পক্ষান্তরে ভালবাসা, ত্যাগ, ক্ষমা ইত্যাদি হ’ল সৃষ্টিমূলক বৃত্তির বিভিন্ন রূপমাত্র। অধিকারমূলক বৃত্তির তাড়নায় মানুষের দৈহ্য, ক্ষুদ্রতা ও বন্ধন; সৃষ্টিমূলক আবেগের ধাক্কায় মানুষের ঐশ্বর্য, বিরাটত্ব ও যুক্তি। বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থা কুৎসিত ও কদর্য, কারণ এই প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থায় মানুষের creative impulse-এর থেকে বড় স্বীকৃতি পেয়েছে তার possessive impulse। সমাজ-বিপ্লবীদের ভেতরও যারা cult of power বা শক্তিযোগের পূজারী, তারাও শেষ পর্যন্ত possessive আদর্শেরই উপাসক। রাসেল চান এমন সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে তুলতে যেখানে মানুষের সৃষ্টিমূলক দিকটাই বড় হয়ে উঠবার সুযোগ পাবে। প্রকৃতপক্ষে

জীবনের সৃষ্টিমূলক দিকটার প্রাধান্যের ফলেই আদর্শ সমাজ-গঠনের সম্ভাবনাও হবে জর্যুক্ত।

এই জ্যোতির্ময় ভবিষ্য-সমাজ সৃষ্টির মূল ভিত্তি হবে কিসের ওপর? বিজ্ঞানের ওপর না ঐশ্বর্যের ওপর? এ প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে এই যে, এ দুটির কোনটির উপরেই নয়। কেননা, বিজ্ঞান বা ঐশ্বর্য মানুষের সৃষ্টির পথে উপকরণ মাত্র। তাদের সার্থকতাও বিপুল। তবে মহৎ আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত না হলে তারা অনেক সময় আশীর্বাদের পরিবর্তে অভিশাপই বহন করে আনে। রাসেলের বিচারে ভবিষ্য-সমাজের মূল ভিত্তি হবে অগাধ শ্রদ্ধা-নীতির ওপর। শ্রদ্ধা মানুষকে সত্যদৃষ্টি প্রদান করে আর সে দৃষ্টিতে মানুষ উপলব্ধি করে জীবনের অমর মহিমা। প্রতিটি মানুষের মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে আত্মবিকাশের এক স্মৃতি আকাঙ্ক্ষা, “something sacred, indefinable unlimited, something individual and strangely precious, the growing principle of life, an embodied fragment of the dumb striving of the world”† জীবনের এই মহান দাবিকে শ্রদ্ধার স্বীকৃতি দেওয়া হবে ভবিষ্য-সমাজগঠনকারীদের প্রাথমিক কর্তব্য। শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে যারা জীবনকে দেখতে পেরেছে তাদের পক্ষে অপরের অধিকারের প্রতি,—সামাজিক, আর্থিক ও রাষ্ট্রিক যে-কোন অধিকারই হোক না কেন, তার প্রতি—শ্রদ্ধাশীল হওয়া অতি স্বাভাবিক। এই মূলগত শ্রদ্ধার অভাব ঘটলে কি বিজ্ঞান, কি ঐশ্বর্য কোন কিছুই জীবনে সৃষ্টিমূলক আনন্দের সুর আনয়ন করে না।

বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় ছেলেমেয়েদের মন ও বুদ্ধিকে যে, ছাঁচে ঢালাই করা হয়, যে শিক্ষার বাণী তাদের কাছে পৌঁছিয়ে দেওয়া হয়, তাতে মানুষের সৃষ্টিমূলক ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে না—মানুষ হয়ে পড়ে কর্তৃত্বসম্পন্ন ব্যক্তিদের অল্প অধিকরণের যন্ত্রমাত্র। নিজেকে উপলব্ধি করবার ও আপন ঐশ্বর্যে নিজেকে পূর্ণ করে তোলবার জন্ত অন্তরের যে গভীর কামনা তা হয়ে থাকে শ্রেণী, দল বা রাষ্ট্রের সুপকারে নিদারুণ ভাবে নিঃশেষিত। এরা নিজেদের মন দিয়ে ভাবে না; বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে না, হৃদয় দিয়ে অনুভব করে না। যন্ত্রের মত অল্প অধিকরণের মানসিক পটভূমিতে এদের জীবনের অভিব্যক্তি। এরা সারা জীবন অপরের কাছে নতি স্বীকার করে চলে, অপরের মতবাদকে নিজেদের মতবাদ বলে ঘোষণা করে, অপরের সিদ্ধান্ত ও সত্যকে নিজেদের সিদ্ধান্ত ও সত্য বলে গ্রহণ করে। এখানেই হ’ল বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থার শোচনীয় ব্যর্থতা। মানুষকে অন্তরের দিক থেকে ক্রীতদাস বানিয়ে তার স্বাধীন কল্যাণসাধন অসম্ভব। রাসেল তার *Let the people think* গ্রন্থে এ প্রসঙ্গ নিয়ে বিশেষভাবে আলোচনা

* Sir S. Radhakrishnan : *East and West in Religion* (Chap III : *Chaos and Creation*, pp. 90-92)

† *The Principles of Social Reconstruction*, p. 147

করেছেন। শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য হ'ল মানুষকে আপন স্বাভাবিক হুটিয়ে তোলার পথ প্রশস্ত করা। রাষ্ট্র ও সমাজের অগ্রতম প্রধান সাধকতাও এখানে।

মানসিক দাসত্বের নাগপাশ থেকে মানুষের মনকে মুক্ত করা আজ একান্ত প্রয়োজন। মানুষের অন্তরে শিক্ষার মারফত সঞ্চারিত করতে হবে আজ-স্বাভাবিকের মহামন্ত্র, তার চোখের সামনে তুলে ধরতে হবে স্বষ্টিমূলক আনন্দের জ্যোতির্ষ্য স্বপ্ন। ত্যাগের মধ্যে, ভালবাসার মধ্যেই মানুষের আত্মার যথার্থ আনন্দ। নিঃশূল আনন্দের অভাবেই মানুষের ক্ষুদ্র অশান্ত মন অধিকারমূলক বৃত্তিগুলির তৃপ্তিসাধনে এত বেশী ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এই বৃত্তির প্রাধাত্যের দরুনই দিকে দিকে আজ বর্বরতা, দ্বন্দ্ব ও পরশ্রীকাতরতা এত নয়মুণ্ডিতে প্রকটিত। এই অধিকার-মূলক বৃত্তির প্ররোচনায়ই মানুষ যুক্ত চায়, প্রতিযোগিতা কামনা করে। বিপুল উন্মাদনা ও আলোড়নের মধ্যে সে ভুলে থাকতে চায় তার জীবনের শতসহস্র ব্যর্থতা দুঃখ ও দুর্দশা। এ পথ ভ্রান্ত। আনন্দের উৎসকে আবিষ্কার করতে হবে হৃদয়ের গভীরে। আনন্দ বাইরের কোন বস্তু নয়। ইহা একান্তভাবে আপন অন্তরের ঐশ্বর্য্য। বহু ত্যাগ, তপস্যা ও দুঃখের দুর্গম পথে সংগ্রাম করেই সেই ঐশ্বর্য্যকে আবিষ্কার করতে হয়। সাধনা ছাড়া নূতন স্বষ্টি অসম্ভব। জড়জগতের সম্পদের প্রাচুর্যের মধ্যে জীবনের যথার্থ তৃপ্তি নেই—নিজেকে আপন স্বাভাবিক বিকশিত করে তোলার প্রয়াসেই মানুষের প্রকৃত আনন্দ। রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় লিখেছেন,

"The abiding cause of our misery is not so much in the lack of life's furniture as in the obscurity of life's significance"

অর্থ—আমাদের দুঃখের চিরন্তন কারণ বস্তুর বা উপকরণের অভাব ততটা নয়, যতটা হ'ল জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে উদাসীনতা। এ সুরেরই অল্পরূপ সুস্পষ্ট ধ্বনি রাসেলের *Scientific Outlook* গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে স্তন্যপায়িত। শেষ অধ্যায়টির নাম হ'ল "Science and values"। রাসেল সেখানে বলতে চেয়েছেন যে, প্রকৃতির সম্পদ বা বিজ্ঞানের ঐশ্বর্য্যের মূল্য আছে নিশ্চয়ই; তবে সব কিছুর মূল্যই হচ্ছে বৃহত্তর জীবনস্বষ্টির পথে উপকরণ হিসাবেই, অত্যাধিক নয়। দার্শনিকশ্রেষ্ঠ রাধাকৃষ্ণনও বার বার এই মত ব্যক্ত করেছেন। তাঁর নিম্নলিখিত উক্তি সমূহ প্রাধান্যবোধ্য :

"Science and its inventions are concerned with the outer organisation, not the inward living. They can remove the hindrances to good life but cannot create it. They can diminish illness but cannot tell a man what he shall do with his health. They can remove poverty and cure unemployment but cannot tell a man what he shall do with his wealth and leisure. While science gives us the capacity to control the conditions of life, it does not help us to use these conditions for fine living. We have to go beyond science to get the ideal values.*

এই ideal values-এর স্বপ্ন দৃষ্টির সম্মুখে সদা জাগ্রত না থাকলে বৃহত্তর জীবনস্বষ্টি অসম্ভব। রাসেল তাঁর *Scientific Outlook* গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে এ কথাই তাঁর অনবচ্ছিন্ন ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। তাঁর বিচারে এই ideal values-এর একমাত্র লক্ষ্যই হবে বৃহত্তর জীবনস্বষ্টি—যে জীবনে অধিকারমূলক বৃত্তির পরিবর্তে স্বষ্টিমূলক আবেগের বিপুল প্রাধাত্য থাকবে। এই নব-স্বষ্টির পথে বিজ্ঞানের অফুরন্ত দানকে আমাদের স্বীকার করতেই হবে। বিজ্ঞান দেয় আমাদের বিশেষ জ্ঞান, আর জ্ঞানই শক্তি। তবে সেই জ্ঞানকে করতে হবে প্রেমের সঙ্গে সংযুক্ত,—শক্তিকে করতে হবে সৌন্দর্য্য ও কল্যাণের আদর্শের দ্বারা সক্রিয়। শুধু বুদ্ধির বিপ্লব ঘটলেই যথেষ্ট হবে না। সেই বিপ্লবকে সার্থক ও জয়যুক্ত করে তুলতে হলে সেই সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়বৃত্তির আমূল পরিবর্তন-সাধনও একান্ত প্রয়োজন। বুদ্ধিকে মার্জিত করার সঙ্গে সঙ্গে অন্তরের প্রচ্ছন্ন আবেগগুলিকে পরিমার্জিত করতে না পারলে বহির্জগতের স্থায়ী বিপ্লব কখনই সার্থক হয়ে উঠবে না। বাইরের অহুঁতান ও প্রতিষ্ঠানকে ভেঙে চূরে অভিনব রূপ দেওয়াটাই একমাত্র বড় কথা নয়; "সেই সঙ্গে মানসিক গঠনেরও আমূল পরিবর্তন একান্তভাবে দরকার। সেজন্য যে অভিনব ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন, তারই সুস্পষ্ট সন্ধান পাওয়া যায় রাসেল-দর্শনে।

* Sir S. Radhakrishnan : *Progress and Spiritual Values* (Philosophy, July, 1937.)

সিংহলের স্বাধীনতা লাভ

শ্রীসুবোধচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

বাঙালী রাজপুত্র সাত শ' অহুচর সঙ্গে নিয়ে বাংলাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ বন্দর তাম্রলিপ্ত থেকে এক দিন সমুদ্রে তরী ভাসিয়ে-
ছিলেন। মাসের পর মাস অকূল সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে
এক দিন তাঁরা লঙ্কাদ্বীপে এসে নামলেন। তার পর যক্ষিণী
কুবেরীর সহায়তায় লঙ্কার রাজা কালসেনের বিবাহের রাত্রে
বিজয় সিংহের সাত শ' সখী কালসেনের অহুচরদের তাড়িয়ে
দিয়ে রাজপুরী দখল করে বসল। পরদিন প্রভাতে সমগ্র
দ্বীপে ঘোষণা করা হ'ল বাংলার নির্বাসিত রাজপুত্র বিজয়
সিংহ লঙ্কার রাজা, আর নতুন রাজার নাম অহুসারে লঙ্কা-
দ্বীপের নাম হ'ল সিংহল। সিংহাসনে বসে বিজয় সিংহ
ভারতবর্ষের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত পাণ্ডা দেশের রাজার কাছে
রাজকন্যার পাণি প্রার্থনা করে দূত পাঠালেন। দূত সে রাজ্যে
গিয়ে বিজয় সিংহের জ্ঞাত রাজকন্যা ও সাত শ' অহুচরের
জ্ঞাত সাত শ' সখী প্রার্থনা করলে। রাজা সম্মত হলেন।
অতঃপর বিজয় সিংহ ও তাঁর অহুচরবর্গ বিবাহ ক'রে সিংহল
দ্বীপে মনের আনন্দে স্থায়ী ভাবে বসবাস করতে লাগল।
তা ছাড়া অনেক বাঙালী ব্যবসায়ীও উক্ত দ্বীপে বসতি
স্থাপন করেছিলেন। তাঁদের বংশধররা সকলেই সিংহলবাসী
হয়ে গিয়েছিলেন। সে-দেশে যে সকল প্রাচীন বোধিত লিপি
পাওয়া গিয়াছে তার সঙ্গে প্রাচীন বঙ্গলিপির অনেক সাদৃশ্য
আছে। সুতরাং এই সিংহলের সঙ্গে বাংলার সম্বন্ধ শুধু রক্তের
সম্বন্ধ নয়, বাংলা কৃষ্টি ও সভ্যতার ইতিহাস তার সঙ্গে
মিশে আছে। এইজন্যই সিংহলীদের সঙ্গে বাঙালীদের
আকৃতিগত ও ভাষাগত সাদৃশ্য আছে। প্রাচীন সিংহলী ভাষার
অর্ধেক-শব্দ বাংলা শব্দ। তদুপরি ভারতের সঙ্গে সিংহলের
ধর্মগত সাদৃশ্য যোগসূত্র বিদ্যমান। মহারাজ অশোক তাঁর পুত্র
মহেন্দ্র ও কন্যা সংঘমিত্রাকে সিংহলে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করবার
জ্ঞাত পাঠিয়েছিলেন। বৌদ্ধধর্মই এখনও সিংহলবাসীদের
প্রধান ধর্ম।

কাণ্ডি ছিল সিংহলের প্রাচীন রাজধানী। একটি কৃত্রিম
হ্রদের তীরে সমুদ্র থেকে ২০০০ ফুট উচ্চে এই শহরটি অবস্থিত।
এখানকার প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ মন্দিরটির নাম দালাদা মালিগাওয়া বা
দন্তবিহার। এই বৌদ্ধ তীর্থস্থানটির মাধ্যম্যে অপরিণীম।
পৃথিবীর সব জায়গা থেকে বৌদ্ধগণ এখানে এসে থাকেন। এই
মন্দিরে বুদ্ধদেবের একটি দাঁত সংরক্ষিত রক্ষিত বলে সকলের
বিশ্বাস। বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস-পাঠকেরা জানেন যে,
বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর তাঁর চিত্তাভ্যাস এবং অস্থি, দন্ত বা
কেশগুচ্ছ ইত্যাদি রক্ষা করবার জন্তে তাঁর ভক্তেরা বহু চেষ্টা
ও জ্ঞানাদি নিষ্পত্তি করেছিলেন।

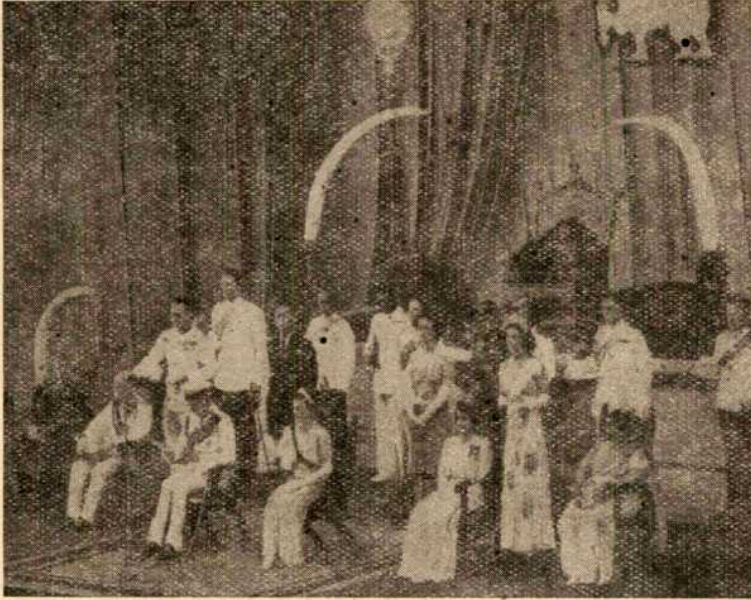
কাণ্ডির এই দালাদা মালিগাওয়া বা দন্তবিহারে বহু
হস্তলিখিত পুঁথি আছে। সিংহলের প্রাচীন আমলের রাজাদের



সিংহলের প্রধানমন্ত্রী মিঃ ডন ষ্ট্রিকেন সেনানায়েক

সিংহাসন আরোহণের সময় এখানকার রাজপুরীতে যে
সিংহাসন ব্যবহৃত হ'ত সেটি লণ্ডনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।
১৯০৪ সালে ডিউক অফ গ্লস্টার যখন সিংহলভ্রমণে আসেন
তখন তিনি এই সিংহাসনটি সিংহলবাসীদের প্রত্যার্ণ করেন।
১৮১৫ খ্রিষ্টাব্দে কাণ্ডি ইংরেজ অধিকারে এসেছিল।

পর্ভুগিজরা ষষ্ঠদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ব্যবসায় সূত্রে কলম্বোতে
আসে। ১৫১৭ খ্রিষ্টাব্দে তারা কলম্বো শহর অধিকার করে।
সেই সময় পর্ভুগিজেরা বিটোফার কলম্বাসের নামানুসারে এই
বন্দরের নাম রেখেছিল কলম্বো। ১৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দে ওলন্দাজেরা
পর্ভুগিজদের কাছ থেকে এই বন্দরটি বলপূর্বক অধিকার করে।
পুনরায় সেই “জোর যার মুক্ত তার” নীতিতেই ইংরেজেরা
১৭৯৬ খ্রিষ্টাব্দে ওলন্দাজদের কাছ থেকে কলম্বো অধিকার
করে। সম্ভ্রতি ১৯৪৮ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী সমগ্র সিংহল
বিনা রক্তপাতে স্বাধীনতা লাভ করেছে। সুতরাং দেখা যায়,
১৫২ বৎসর কলম্বো শহর ইংরেজদের অধিকারে থাকার
পর মুক্ত হয়েছে। কিন্তু এ কথা ভুললে চলবে না যে, কলম্বো-
বাসীরা প্রথম স্বাধীনতা হারিয়েছিল ১৫১৭ খ্রিষ্টাব্দে পর্ভুগিজ



সিংহলের এসেমব্লি হলে ডিউক অব গ্লষ্টার কর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষণা।

বামে উপবিষ্ট প্রথম—প্রধানমন্ত্রী মিঃ সেনানায়ক

দস্যদের কাছে। এ বিষয়ে ভারতবাসীদের অপেক্ষা তাহাদের
ছড়াগ্য অধিক। কয়েক শতাব্দীর পরাধীনতার পর সিংহলের
এই সত্ত্ব শৃঙ্খলমুক্তি ঘটল। পূর্বের ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ ও কলম্বো
এক মহাজাতির অন্তর্গত ছিল। কিন্তু ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-
সংগ্রামের শক্তি উপলব্ধি করে চতুর ও কৌশলী ইংরেজ একে
একে সিংহল ও ব্রহ্মদেশকে ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলল।
এত করেও এদের কাউকেও সে পরাধীন রাখতে পারল না।
গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ব্রহ্মদেশ প্রধান মন্ত্রী থাকিন হুর নেতৃত্বে
পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করেছে। সেই দিন সেখানে ব্রিটিশ পতাকা
অবনমিত হয়ে স্বাধীন ব্রহ্মের পতাকা উত্তোলিত হয়। আর
সেই দিনই ব্রহ্মের ব্রিটিশ শাসনকর্তা সার হিউবার্ট রায়স ব্রিটিশ
পতাকা সঙ্গে নিয়ে ব্রহ্মদেশ পরিত্যাগ করেন। কিন্তু ভারত
ও সিংহলের সে সৌভাগ্য লাভ ঘটে নি। সিংহলের ইংরেজ
শাসনকর্তা সার হেনরি মঙ্কমুর মেসনের গবর্নর উপাধি পরিবর্তিত
হ'ল। তিনি গবর্নর-জেনারেল হলেন। তাঁর বেতন হ'ল বৎসরে
৮০০০ পাউণ্ড। বর্তমান লর্ডপ্রোসাদ “কুইনস্ হাউস” তিনি
অধিকার করবেন। আগামী ১৯৪৯ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী
তিনি অবসর গ্রহণ করবেন এবং আশা করা যায় তাঁর স্থলে
সিংহলের বর্তমান প্রধান মন্ত্রী মিঃ ডন ষ্ট্রিকেন সেনানায়ক
গবর্নর-জেনারেল নিযুক্ত হবেন।

সিংহলের এই স্বাধীনতা-উৎসব সারা দেশময় ছুই সপ্তাহ-
ব্যাপী আনন্দ অহুষ্ঠানের মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। এই
উৎসব উপলক্ষে ডিউক অফ গ্লষ্টার ইংলণ্ড থেকে সিংহলে
আগমন করে ১০ই ফেব্রুয়ারী ডোমিনিয়ন পার্লামেন্টের

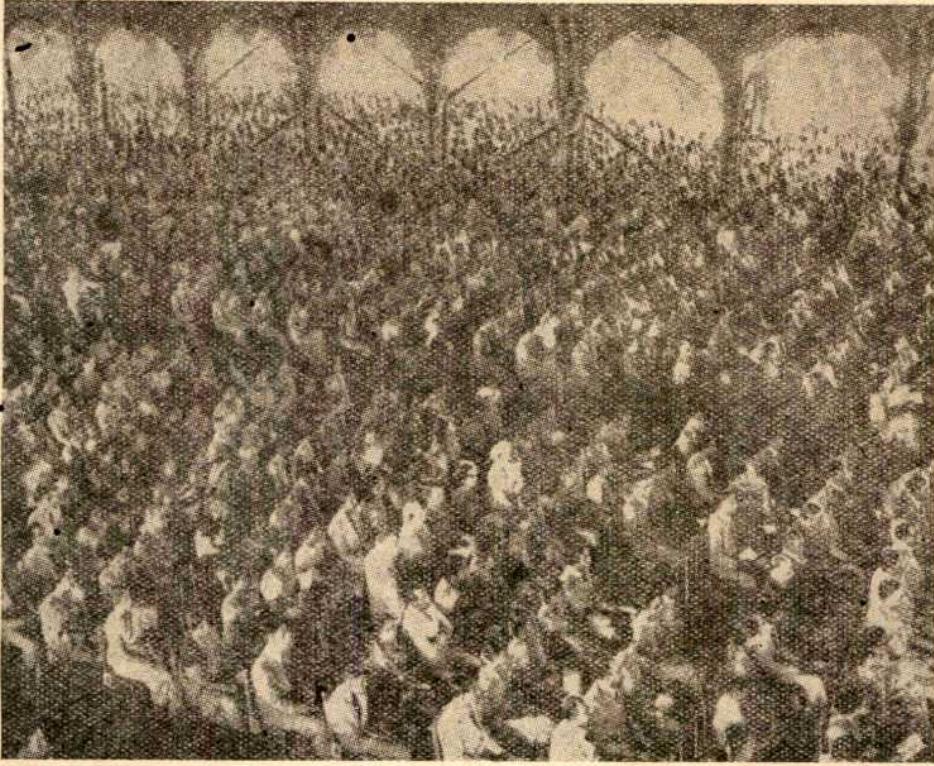
উদ্বোধন করেন। বর্তমান
পার্লামেন্ট ভবনটি এই স্বাধীনতা-
উৎসব যথোচিত ভাবে সম্পন্ন
হওয়ার উপযোগী নয় বলে
টোরিংটন কোয়ারে রিজওয়ে
গল্ফলিঙ্কের উপর এক বিরাট
সভাগৃহ নির্মাণ করা হয়েছিল।
পুরোপুরি প্রাচীন সিংহলী প্রথায়
এর পরিকল্পনা করা হয়।
অম্বরাদিপুত্র, পোলননারয়া
এবং কাণ্ডি প্রভৃতি সিংহলের
প্রাচীন রাজধানীসমূহের দরবার-
গৃহগুলির অমুকরণে এই সভাগৃহ
নির্মাণ করা হয়েছিল।

এই বিরাট দরবারগৃহে
পার্লামেন্টের সভ্যসমূহ, প্রধান
রাজকীয় কর্মচারীগণ, বৈদেশিক
গবর্নমেন্টের প্রতিনিধিবর্গ এবং
বিশিষ্ট অতিথি প্রভৃতি ৬০০০
ব্যক্তির স্থান সঙ্কুলানের ব্যবস্থা

হয়েছিল। এই দরবারগৃহের বাইরে ১২০০০ নিমন্ত্রিত
অতিথির বসবার আসন ছিল। তাদের মধ্যে সমগ্র দ্বীপের
বিভালয়সমূহের ১৫০০ ছাত্রেরও স্থান ছিল। অহুষ্ঠানের পূর্বে
দরবারগৃহের প্রধান প্রবেশ-দ্বারের সম্মুখে কাণ্ডির শেষ রাজা
ত্রিবিক্রম রাজা সিংহের সিংহচিহ্নিত পতাকা উত্তোলন উৎসব
সম্পন্ন হয়। পতাকাটির বর্ণ সম্পূর্ণ লাল—তার ওপর একটি
হরিদ্রা বর্ণের সিংহের ধারায় একটি পতাকা অঙ্কিত আছে।
ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে কাণ্ডির যুদ্ধের পর ইংরেজগণ
এই পতাকাটি ইংলণ্ডে নিয়ে যায়। সাম্প্রতিক স্বাধীনতা
উৎসব উপলক্ষে সেই পতাকাটি সিংহলে পুনরায় আনীত
হয়েছে। যদি সিংহলের সমস্ত রাজনৈতিক দলের একমত
থাকে তবে এটিই সিংহলের জাতীয় পতাকারূপে গণ্য হবে।
কিন্তু এ বিষয়ে বিভিন্ন দলের মধ্যে প্রচুর মতভেদ আছে।

গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী গবর্নর-জেনারেলের বাসস্থান “কুইনস্
হাউস” থেকে ডিউক অফ গ্লষ্টার রাজোচিত সম্মানে
দরবারগৃহে গমন করেন। সেখানে সভারস্ত্রে তিনি ইংলণ্ডের
রাজার বাণী পাঠ করেন। এখানকার কৃতান্ত্রাণে তিনি কলম্বো
থেকে ৭২ মাইল দূরবর্তী মাছাওয়েলি গঙ্গার তীরে অতি
মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে অবস্থিত পার্বত্য
রাজধানী কাণ্ডি গমন করেন। এই দীর্ঘ পথের শোভাযাত্রা
পাঁচ মাইল লম্বা হয়েছিল। সেখানে তিনি সিংহল
বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন হলের ভিত্তি স্থাপন করেন।

এতদুপলক্ষে সিংহলে গত ছুই সপ্তাহব্যাপী বিচিত্র উৎসবদির
অহুষ্ঠান হয়। অনেক সিংহলী দৈত্যাদানবের মুখাবরণ পরিধান



৪ঠা ফেব্রুয়ারি সিংহলের এসেমরি হলের দৃশ্য

করিয়া সারা শহরের রাজপথ পরিভ্রমণ করেন। তার পর আরম্ভ হয় বাজী পোড়ান উৎসব। এই আনন্দোৎসবে সেদিন সিংহলের রাত্রের আকাশ বিচিত্র বর্ণের আলোকে আলোকিত হয়ে উঠেছিল। এই উৎসবের পরদিন আরম্ভ হয় শোভাযাত্রা অনুষ্ঠান। তারপর ১৩ই ফেব্রুয়ারী সিংহলের প্রাচীন রাজধানী কাণ্ডিতে শতাধিক সুসজ্জিত হস্তীর এক শোভাযাত্রা বাহির হয়। হস্তীগুলি স্বর্ণময় কারুকার্যযুক্ত লোহিতবর্ণ অঙ্গাবরণে শোভিত। এই অঙ্গাবরণের সঙ্গে সংযুক্ত শত শত ছোট ছোট বর্টা। এই হস্তী-শোভাযাত্রার পুরোভাগে চলেছিল কাণ্ডির পবিত্র দস্ত-মন্দিরের এক বৃহৎকায় সুশোভিত দ্বিরদ। তার পর রাজপথ দিয়ে সার বেঁধে চলেছিল শতাধিক হস্তী। পথের দুই পাশে সিংহলের অগণিত নরনারী। কত দূরদূরান্তর থেকে, কত পল্লীগ্রাম থেকে তারা এসেছিল তাদের এই স্বাধীনতা উৎসবে যোগদান করতে। সিংহলের স্বাধীনতা দিবস ৪ঠা ফেব্রুয়ারী প্রভাতে প্রাচীন অম্বরাসাপুর নগরীর বহির্ভাগে একটি মহামারুতি হস্তীশাবক ধরা পড়ে। সিংহলবাসিগণ এটাকে শুভলক্ষণ মনে করে এই হস্তীশাবকটিকেও সুসজ্জিত করে হস্তী-শোভাযাত্রার সহিত যোগদান করায়। এই শোভাযাত্রার পশ্চাতে ছিল দৈত্য-দানবের মুখাবরণ পরিহিত চারিশত সিংহলবাসীর শোভাযাত্রা। শত শত ঢাক, বাঁশী ও অঘাঘ

বাদ্যযন্ত্রের তালে তালে এই মুখোস-পর্য নাচ দর্শকদের পরম উপভোগ্য হয়েছিল।

এই শোভাযাত্রার পর আরম্ভ হয় কাণ্ডি সরোবরের মধ্যস্থলে অবস্থিত ক্ষুদ্র দ্বীপে নানা বর্ণবৈচিত্র্যময় আলোকসজ্জা অনুষ্ঠান ও আতসবাজি পোড়ান। ১৩২ বৎসর পরে দালাদা, মালিগাওয়া অথবা দস্তমন্দিরসংলগ্ন আর্ট-কোণ-বিশিষ্ট স্থানে কাণ্ডি-সিংহচিহ্নিত পতাকা উত্তোলন উৎসব সম্পন্ন হয়। বায়ুহিল্লোলে যখন সেই পতাকা পতপত শব্দে আকাশে উড়তে থাকে তখন সিংহলবাসিগণের হৃদয় এক অপূর্ব আনন্দে ভরে ওঠে।

১৩ই ফেব্রুয়ারীর প্রভাতে সিংহলের প্রধান মন্ত্রী মিঃ ডন প্রিফেন সেনানায়ক এই পতাকা-উত্তোলন-উৎসব সম্পন্ন করেন। ডিউক অফ গ্লষ্টার ও গবর্নর-জেনারেল সার হেনরি মন্টগুমেরি মেসন প্রমুখ সকলে সেই উৎসবে উপস্থিত ছিলেন।

এইরূপে দুই সপ্তাহব্যাপী স্বাধীনতা-উৎসব পরম আনন্দময় পরিবেশের মধ্যে মহাসমারোহে সমাপ্ত হয়েছে। তারপর হয়েছে দেশবিদেশে এই অনুষ্ঠানের অহরতি। লণ্ডন, নয়া দিল্লী ও কলিকাতায় এই স্বাধীনতা উৎসব সম্পন্ন হয়েছে। ভারতে সিংহলের বিশেষ প্রতিনিধি মিঃ ডি সিলভা তাঁর নতুন দিল্লীস্থ গৃহে এই উৎসবের আয়োজন করেন। ভারতের গবর্নর-

জেনারেল লর্ড মাউন্টব্যাটেন ও তাঁর পত্নী, পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু, সর্দার প্যাটেল ও কেন্দ্রীয় গবর্নমেন্টের মন্ত্রিবর্গ এই উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। এই সভায় পণ্ডিত নেহরু সিংহলের প্রতি ভারতের শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, ভারত ও সিংহলের অধিবাসিগণ একই রক্তসন্তৃত নিকট আত্মীয় এবং তাঁহাদের মানসিক গড়নের মধ্যেও সাদৃশ্য আছে।

অতঃপর লর্ড মাউন্টব্যাটেন এক বক্তৃতায় বলেন, সিংহল সম্বন্ধে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে। সেইজন্য তিনি সিংহলের এই পতাকা উত্তোলন উৎসবে যোগদান করতে পেরে যথেষ্ট আনন্দ অমুভব করেছেন। বিগত যুদ্ধের সময় দেড় বৎসরকাল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় তাঁর প্রধান খাটি ছিল কাণ্ডিতে। তিনি সে সময় এই দ্বীপের বহু স্থান পরিভ্রমণ করে দেখেছেন; এমন মনোরম স্থান ও প্রাকৃতিক দৃশ্য পৃথিবীতে চুল্লভ।

তিনি আরো বলেন, সৌভাগ্যক্রমে তখন সিংহল যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয় নি। ১৯৪২ সনে কয়েকটি বোমাবর্ষণ ব্যতীত

এখানে আর কোনো ধ্বংসলীলা হয় নি। কাজেই অস্ত্রাণ যুদ্ধক্ষেত্রের দ্বারা সিংহল বিধ্বস্ত হয় নি। সুতরাং ঐশ্বর্য্যকার অর্থনৈতিক পরিস্থিতির বিপর্য্যয় ঘটে নি। তিনি সিংহলের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য প্রার্থনা জানান।

সভার প্রারম্ভে মিঃ ডি সিল্ভা বিনা রক্তপাতে সিংহলের স্বাধীনতালাভে নিরতিশয় আনন্দপ্রকাশ করেন। তিনি বলেন, বহু বৎসর যাবৎ সিংহলবাসিগণ তাঁদের জন্মভূমির স্বাধীনতা-লাভের জন্য চেষ্টা করে আসছেন। পরিশেষে তিনি শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতা নয়, অর্থনৈতিক স্বাধীনতাও তাঁদের লক্ষ্য এই মন্তব্য করে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

সিংহলের ইতিহাসে ৪ঠা ফেব্রুয়ারী এক স্মরণীয় দিন হয়ে থাকবে। এই দিন সিংহল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নাগপাশ থেকে মুক্তিলাভ করেছে। তার অঙ্গ হতে বসে পড়েছে সাম্রাজ্যবাদের কঠিন নিগড়। আজ সিংহল এক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হ'ল : সিংহলের ৬০ লক্ষ নিপীড়িত নরনারী স্বাধীনতা লাভ করল। স্বাধীন সিংহল সমৃদ্ধ হোক।

সাধ

জীবীরেক্ষকৃৎ চন্দ্র

দুর্গম পথে যাত্রী যাহারা লজ্জিল গিরি-বন,
আধার-বন্ধ বিদারি ছুটিল রচিতে মোহন মর্ত্য,
যজ্ঞ-অনলে জীবনের হবি অনায়াসে দিল অর্ঘ্য,
বিজনে বিপিনে জ্বরে গহনে খুঁজিয়া ফিরিল স্বর্গ,
মৃত্যু-শাসনে ব্যাকুল হৃদয় গরজি' জলদ-মন্ত্র,
নাগেরে পাকড়ি' মথিয়া জলধি উচ্চারে মহামন্ত্র,
সেই সাধনার শবাসন হ'তে ভেসে আসে শোনো সুর গো,
দুর্গম পথে যাত্রী চলেছে রচিতে অমর দুর্গ।

উষর মরুর ধূসর ধূলায় তাদের চরণ-চিহ্ন
রঞ্জিত আছে; রক্তের রাগে নিঃসৃত হৃদি ভিন্ন;
সেই পথে তাই নিত্য রবির উদয় এবং অস্ত;
ধীর যুদ্ধ বায় ব্লাইয়া যায় ক্রম পেলব হস্ত;
ধূম্র মেঘের পথ বহি' আসে অঙ্গ-সজল স্রষ্টি
হানি' ধূলি-ভরা ধরণীর বুকে বজ্র-কঠোর দৃষ্টি;
উষর-নাড়ে দুর্জয় জাগে শোন শোন তার সুর গো,
রক্ত চরণ দুর্গম পথে খুঁজিছে অমর দুর্গ।

দিকে দিকে আজ দানব অশুর, জাগিয়াছে শত কংস,
প্রলয়ের স্রোত স্রষ্টির স্রোত করিতে চাহিছে ধ্বংস;
কেগেছে শুভ্র, কাগে নিশুভ্র, জাগিয়াছে মণ্ডকৈট,
মাতিয়াছে তারা হরিয়া লইতে দেবের বিজুতি-বৈভব,
রাক্ষস হেথা হইয়াছে জরী, রচিছে স্বর্ণলতা,
দেবতারা বহে রক্ত-পতাকা, অন্তরে জাগে লতা,
চেয়ে থাকে তারা মন্তোর পানে—ধ্বনিছে কি সেই সুর গো,
মানবের সাধ দানব-বিজয়ী রচিতে অমর দুর্গ।

জাগরণী সুর ধ্বনিতোছে আজ তোমার আমার বকে,
প্রত্যাশা-ভরা চাহনি কি তার দেখ নি চক্ষে চক্ষে?
স্বপ্ন-পাগল মাহুঘের সাধ কখন হয়েছে মিথ্যা?
যুগে যুগান্তে মুর্ছনা তার রণিয়া ওঠে যে চিন্তে।
দেখিয়াছি সেই বাণী বহে চলে তরণ যতেক যাত্রী,
নির্ভয়ে চলে দুর্গম পথে ভেদিয়া তিমির রাত্রি।
ভয় নাই আর, ভয় নাই—শোন, ধ্বনিতোছে সেই সুর গো,
মানবের সাধ ব্যর্থ হবে না, রচিবে অমর দুর্গ।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

১৮৬৩—১৯১৩

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়



জন্ম : শৈশব-শিক্ষা

দেওঘরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দ্বিজেন্দ্রলালকে মুগ্ধ করিয়া

ছিল। “দেবঘরে সন্ধ্যা দেখিয়া” তিনি “শুশান সঙ্গীত” রচনা

১৮৬৩ সনের ১৯ই জুলাই (১২৭০, ৪ঠা শ্রাবণ) নদীয়া জেলার অন্তর্গত কৃষ্ণনগরে দ্বিজেন্দ্রলালের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা—কার্ত্তিকেশচন্দ্র রায়, কৃষ্ণনগরের মহারাজার দেওয়ান ; মাতা—শান্তিপুত্রের অদ্বৈত ঠাকুরের বংশধর কালাচাঁদ গোস্বামীর ভগিনী।

শৈশবেই মেধাবী বলিয়া স্বজনগণ-মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলালের খ্যাতি ছিল। তিনি ১৮৭৮ সনে কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুল হইতে দ্বিতীয় বিভাগে এনট্রান্স, ১৮৮০ সনে কৃষ্ণনগর কলেজ হইতে দ্বিতীয় বিভাগে এফ-এ, ১৮৮৩ সনে ছগলী কলেজ হইতে প্রথম বিভাগে বি-এ, এবং ১৮৮৪ সনে প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে ইংরেজীতে ২য় শ্রেণীর প্রথম স্থান অধিকার করিয়া এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

দ্বিজেন্দ্রলাল শৈশবাবধি প্রায়ই ম্যালেরিয়ায় ভুগিতেন ; এম-এ পরীক্ষা দিবার বৎসর তিনি ম্যালেরিয়ায় শয্যাগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা বায়ুপরিবর্তনের জন্ত তাঁহাকে দেওঘর যাইতে পরামর্শ দেন। সর আস্ততোষ চৌধুরীর জ্যেষ্ঠা ভগিনী প্রসন্নময়ী দেবীর সহিত দ্বিজেন্দ্রলাল দেওঘর যাত্রা করিয়াছিলেন ; তাঁহাদের বাসা নির্দিষ্ট হইয়াছিল রোহিণী গ্রামে। প্রসন্নময়ী লিখিয়াছেন :—

“তাঁর বাবা বলিলেন, ‘দুর্গাদাস বাবুর মেয়ে—তোমার দিদির সঙ্গে তুমিও দেওঘরে যাও।’ আমি, আমার-মাসিমা এবং দিভু, এই তিন জনে এক সঙ্গে গিয়াছিলাম। সেইবার দিভু এম-এ পরীক্ষা দিতেছে। এমন সরল ও শিশুর মত স্বভাব ছিল যে, কোন বিষয়ে কিছুমাত্রও সন্দোহ করিতে জানিত না,—ঠিক যেন . ছোট ভাইটি!...আমরা প্রত্যহ পাছাড়ে পাছাড়ে ঘুরিয়া বেড়াইতাম ; আর সে কোন একটা পাছাড়ের উপর উঠিয়া, বসিয়া বসিয়া গাইত,— ‘জানি না জননি, কেন এত ভালবাসি তোরে’! এ জননী—তাঁহার সেই রোহময়ী মাতা ও জন্মভূমি। এই সময়ে পূজাপাদ রাজ-নারায়ণ বাবুর সঙ্গে তাঁহার প্রথম আলাপ।...আমিই সেখানে দিভুকে তাঁহার সঙ্গে প্রথম আলাপ করাইয়া দিই। তাঁহার পর তিনি সতত আমাদের কাছে আসিতেন, গান-গল্প-আলোচনায় দ্বন্দ্বের পর দ্বন্দ্ব কাটিয়া যাইত...দিভু প্রিয়-দর্শন ও গৌরবর্ণ ছিল, গানে অকণ্ঠ এবং সেই গান আবার নিজেই রচনা করিত। কাজেই রাজনারায়ণ বাবু তাঁহার নিজগুণে তাহাকে বড়ই স্নেহ করিতেন। আমরা তখন ছোট ভাই-বোনে মিলিয়া, এক সঙ্গে বসিয়া ইংরাজী কবিতা পড়িতাম, আর শেলী, বায়রন, কীটস হইতে অনুবাদ করিতাম।” (দেব-কুমার : ‘দ্বিজেন্দ্রলাল,’ পৃ. ৮৩-৮৪)



দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

করিয়াছিলেন ; উহা ১২৯০ সালের অগ্রহায়ণ (নবেম্বর ১৮৮৩)-সংখ্যা ‘নবভারতে’ মুদ্রিত হয়। পরীক্ষার কয়েক মাস পূর্বে তিনি কলিকাতায় ফিরিয়াছিলেন।

বিলাত যাত্রা

দ্বিজেন্দ্রলাল লিখিয়াছেন :—এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার “অব্যবহিত পরেই অর্থাৎ ঐ বৎসরে এপ্রেল মাসে আমি কৃষি-শিক্ষার্থে ষ্টেট স্কলারশিপ পাইয়া ইংলণ্ডে যাই এবং সেখানে এম-আর-এস-এ-ই, এবং এম-আর-এ-সি, এই দুইটি ডিপ্লোমা পাই।”...“বিলাতে গিয়া ইংরাজিতে কবিতা লিখিতে আরম্ভ করি এবং সেই কবিতাগুলি একত্রিত করিয়া আর এডুইন আর্গন্ডকে উৎসর্গ করিবার অহুমতি চাহি এবং তৎসঙ্গে কবিতা-গুলির পাণ্ডুলিপি পাঠাই। তিনি কবিতা প্রকাশ সম্বন্ধে আমাকে উৎসাহিত করিয়া পত্র লেখেন ও সে কবিতাগুলি তাঁহাকে উৎসর্গ করিবার অহুমতি সাগ্রহে দান করেন। তখন সেই কবিতাগুলিকে *Lyrics of Ind* আখ্যা দিয়া প্রকাশ করি [সেপ্টেম্বর ১৮৮৬]।” “তাঁহা হই একখানি বিখ্যাত বিলাতী কাগজে (যেমন *Westminster Review*, *Scotsman* প্রভৃতি) অল্পাধিক প্রশংসিত হয়।...বিলাত প্রবাসকালে আমার মাননীয় ভ্রাতা শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল রায় কর্তৃক

সম্পাদিত 'পতাকা' নামী পত্রিকায় নিয়মিতরূপে বিলাতের চিঠি লিখি।"

বিবাহ; 'একঘরে'

বিলাত হইতে ফিরিবার পর যে স্বদেশে সামাজিক অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে, এ-কথা যাত্রার প্রাক্কালে কার্তিকেশ্বরচন্দ্র পুত্রকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন; তিনি নিজে কিন্তু পুত্রের উচ্চ শিক্ষার পথে বাধা দেন নাই। দ্বিজেন্দ্রলাল বিলাতে অবস্থানকালেই পিতা-মাতাকে হারাইয়াছিলেন। ১৮৮৬ সনের ২৩এ ডিসেম্বর স্বদেশে ফিরিয়া তিনি একঘরে হইলেন—হিন্দুসমাজ বিনা। প্রায়শ্চিত্তে তাঁহাকে অল্পে স্থান দিতে অস্বীকার করিলেন। এই সময়ে কলিকাতার হোমিও-প্যাথি ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের জ্যেষ্ঠা কন্যা সুরবালা দেবীর সহিত হিন্দু মতে তাঁহার বিবাহ হয় (এপ্রিল ১৮৮৭)। কলকাতার যে কয়েকজন সম্ভ্রান্ত হিন্দু তাঁহার ভ্রাতাদের সহিত বরাদ্দগমন করিয়াছিলেন, সমাজের শাসনানিতে তাঁহারা সহসা ফিরিয়া আসেন।

"চীন গেলে জাত যায় না, গোপনে অবাঞ্ছা থাকিলে জাত যায় না—প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না, তখন বিজ্ঞানশিক্ষার্থে বিলাত গেলে জাত যাইবে কেন?" সমাজের এই অসহ্য-তার প্রতি কটাক্ষ করিয়া কোভে ও অভিমানে দ্বিজেন্দ্রলাল 'একঘরে' নামে একখানি নকশা প্রচার করিয়াছিলেন (ইং ১৮৮৯)। তিনি লিখিয়াছেন, "বিলাত প্রত্যাগত হইয়া... আমি 'একঘরে' নামক একখানি সামাজিক পত্র ছাপাই ও তাহার জন্ত শত্রু মিত্র প্রায় সকলের কাছেই গালি খাই।" কিন্তু স্বর্ণহুমারী দেবী-সম্পাদিত 'ভারতী ও বালক' (ভাদ্র ১২৯৭) সমালোচনা প্রসঙ্গে নকশাখানির প্রশংসাই করিয়াছিলেন। সমালোচনাটি এইরূপ :—

"পূর্বে শুনিয়াছিলাম, লেখক এই পুস্তকে হিন্দুসমাজকে অসুবিধা আক্রমণ করিয়াছেন, বইখানি পড়িয়া আমাদের সে ভুল ভাঙ্গিল। ইহাতে হিন্দু সমাজের প্রতি কঠোর প্রয়োগ আছে সত্য কিন্তু তাহা অসঙ্গত অমূলক প্লেষ বাক্য নহে। বইখানি পড়িলে মনে হয় হিন্দুসমাজের শোচনীয় অবস্থায় লেখক মর্ম-পীড়িত হইয়াই এতদূর লিখিয়াছেন, তাঁহার ইচ্ছা গালি দেওয়া নহে, তাঁহার ইচ্ছা সমাজের চক্ষুদান। তবে বইখানিতে বেশ একটু ঝাঁট হাতেরস আছে এবং কলমের কোরও বেশ একটু দেবিতে পাওয়া যায়—ইহার প্রধান কারণ তিনি সত্য কথা বলিয়াছেন।"

সরকারী চাকুরী

বিলাত হইতে ফিরিয়াই দ্বিজেন্দ্রলাল ছোটলাটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তিনি বেকরূপ স্বাধীনভাবে কথাবার্তা কহিয়াছিলেন তাহাতে ছোটলাট অন্তরে খুশী হইতে পারেন নাই। দ্বিজেন্দ্রলাল ভাল চাকরি পাইলেন না—ডেপুটিগিরিতে নিযুক্ত হইলেন। তিনি বিলাতে কৃষিবিজ্ঞান যে অভিজ্ঞতা

সকল করিয়া আসিয়াছিলেন, কার্যক্ষেত্রে তাহারও প্রয়োগ করিবার সুবিধা পান নাই। আমরা তাঁহার রাজস্বার্থের ইতিহাস সরকারী এই হইতে সংকলন করিয়া দিতেছি :—

জমির জরিপ ও রাজস্ব-নিরূপণ কার্য শিক্ষার	
জন্ত মধ্যপ্রদেশে গমন	২৫ ডিসেম্বর ১৮৮৬
কলিন সাহেবের অধীনে, দপ্তর-রক্ষা-প্রণালী	
আয়ত্ত করিবার জন্ত মজুরপুরে গমন	২১ সেপ্টেম্বর ১৮৮৭
(ছুটি : ২২-২-৮৭ হইতে বিনা-বেতনে ২৫ দিন ;	
ডাক্তারের সার্টিফিকেটে ১৭-১০-৮৭ হইতে ২৫ মাস)	
মুন্সের ও ভাগলপুরের অন্তর্গত ক্রীনগর ও বনেলি	
রাজ-এস্টেটের সেটেলমেন্ট অফিসার	১ জানুয়ারি ১৮৮৮
হইতে ১৯ জানুয়ারি ১৮৮৯	
ডেপুটেশনে	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও
	ডেপুটি কলেक्टर
"	(৭ম শ্রেণী)
২৭ অক্টোবর ১৮৮৮	
"	২০ জুলাই ১৮৯১
দিনাজপুর	২ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৩
"	(৬ষ্ঠ শ্রেণী, অস্থায়ী)
৪ মার্চ ১৮৯৩	
বাকিপুর-পাটনা	আবকারী বিভাগের
১ম পরিদর্শক	১৮ আগস্ট ১৮৯৪
ঢাকা	১৮ অক্টোবর ১৮৯৪
"	(৬ষ্ঠ শ্রেণী)
১২ মার্চ ১৮৯৫	
(প্রিন্সিপাল লীড : ২৬-৫-৯৭ হইতে ২ মাস)	
কলিকাতা	বঙ্গীয় ভূমি, রাজস্ব ও কৃষি
বিভাগের সহ-ডিরেক্টর (অস্থায়ী)	১৭ মার্চ ১৮৯৮
"	(৫ম শ্রেণী, অস্থায়ী)
৮ ডিসেম্বর ১৮৯৯	
"	(৫ম শ্রেণী)
৩০ জানুয়ারি ১৯০০	
(প্রিন্সিপাল লীড : ২১-৪-১৯০০ হইতে ২ মাস ২৯ দিন)	
"	২০ জুলাই ১৯০০
কলিকাতা	বঙ্গীয় আবকারী
কমিশনরের পাঁচ সফাল আসিস্ট্যান্ট (অস্থায়ী)	১৩ অক্টোবর ১৯০০
"	ও পশ্চিম-বঙ্গের আবকারী
পরিদর্শক	১৩ নবেম্বর ১৯০০
"	(৪র্থ শ্রেণী, অস্থায়ী)
১ জুলাই ১৯০৪	
"	(৪র্থ শ্রেণী)
১৫ মার্চ ১৯০৫	
(প্রিন্সিপাল লীড : ২০-৪-১৯০৫ হইতে ১ মাস)	
খুলনা	ও পশ্চিম-বঙ্গের আবকারী
পরিদর্শক	৭ নবেম্বর ১৯০৫
(এতদ্ব্যতীত ম্যাজিস্ট্রেটের কার্য ১১-১৬ জানুয়ারি ১৯০৬)	
"	(৫ম শ্রেণী)
১ ফেব্রুয়ারি ১৯০৬	
"	(৪র্থ শ্রেণী, অস্থায়ী)
২১ মার্চ ১৯০৬	
মুর্শিদাবাদ	১৭ এপ্রিল ১৯০৬
"	(৪র্থ শ্রেণী)
২৯ এপ্রিল ১৯০৬	
কাঁদি-মুর্শিদাবাদ	অস্থায়ী ভাবে সব-ডিভিসনের
ভারপ্রাপ্তি	১ মে ১৯০৬
গয়া	২ জুলাই ১৯০৬
জেহানাবাদ	৩০ মে ১৯০৭
গয়া	১৭ জুন ১৯০৭
(কালো : ২৮-৪-১৯০৮ হইতে ১ বৎসর)	
২৪-পরগণা	২৮ এপ্রিল ১৯০৮
(আলিপুর)	

* History of Services of Officers holding Gazetted Appointments under the Government of Bengal.

সরকারী কার্যে দ্বিজেন্দ্রলালের স্থায়ী পুরুষের আশঙ্করূপ উন্নতি হয় নাই। স্বরচিত জীবনীতে তিনি ইহার কারণ যেরূপ নির্দেশ করিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

“বিলাত হইতে ফিরিয়াই সেটলমেন্ট কার্য শিখিবার জন্ত বেঙ্গল গবর্ণমেন্ট আমাকে ভারতের মধ্যপ্রদেশে (Central Provinces) পাঠান। সেখান হইতে ফিরিয়া আমি উক্ত কাজ শিখিতে আবার মোজাকরপুরে প্রেরিত হই। এই দুই কার্য ১৮৮৭ সালের মধ্যে শেষ হইলে, ১৮৮৮ সালে আমি ত্রীনগর ও বনেলি এষ্টেটের অ্যাসিস্টেন্ট সেটলমেন্ট অফিসার হইয়া ভাগলপুর জেলার অন্তর্গত ধাপার পরগণায় যাই। সেখান হইতে মুন্সের ও তথা হইতে পুণিয়ায় উক্ত কাজ শেষ করিয়া ১৮৯০ সালে আমি বর্তমান ষ্টেটে সূজামুটা পরগণায় সেটলমেন্ট অফিসার নিযুক্ত হই। উক্ত কাজ তিন বৎসর কাল করি। উক্ত সেটলমেন্ট সংক্রান্ত একটি ঘটনা ঘটে, যাহাতে বঙ্গদেশে একটি উপকার সাধিত হয়। আমার পূর্ববর্তী সেটলমেন্ট অফিসরেরা জরীপে জমী বেশী পাইলেই খাজনা বেশী ধার্য্য করিয়া দিতেন। আমি সূজামুটা সেটলমেন্টে এই অভিপ্রায় প্রকাশ করি যে, এরূপ খাজনা বৃদ্ধি করা অত্যাচার ও আইন-বিরুদ্ধ। প্রজার সহিত যখন পূর্বের জমী বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হয়, তখন মাপিয়া দেওয়া হয় না, আন্দাজ করিয়া সেই জমীর পরিমাণ হস্তবুদ্ধে লেখা হয়। এমন কি এরূপ সম্ভব যে, সেই জমীই এখন জরীপে তাহা অপেক্ষা অধিক বলিয়া প্রতীত হইতেছে মাত্র। তাহার জন্ত তাহার নিকট বেশী খাজনা চাওয়া অত্যাচার। অতএব রাজ্য যদি বেশী জমীর জন্ত বেশী খাজনা দাবী করেন, তাহার দেখাইতে হইবে যে, প্রজা কোন বেশী জমীটুকু অধিকার করিয়াছে। আরও ডেনেজ খাল বন্ধ হওয়ায় জমীর বাৎসরিক ফসল কম হইয়া যাওয়ার জন্ত আমি প্রজাদিগের খাজনা কমাইয়া দিই। ঐ সময় হইতে জজের নিকট আগীল হয় এবং তাহাতে জজ সাহেব উক্ত রায় উন্টাইয়া প্রজাদিগের খাজনা বৃদ্ধি করিয়া দেন। এই সময়ে স্তর চার্লস এলিয়ট বঙ্গদেশের লেপ্টেন্যান্ট গবর্নর ছিলেন। তিনি উক্তরূপ বিভ্রাট দেখিয়া উক্ত বিষয় তদন্ত করিয়া স্বয়ং মেদিনীপুর আসেন ও কাগজপত্র দেখিয়া আমাকে যথোচিত ভৎসনা করেন। আমি আমার মত সমর্থন করিয়া বঙ্গদেশীয় সেটলমেন্ট আইন বিষয়ে তাহার অনভিজ্ঞতা বুঝাইয়া দিই। ছোট লাট ফুড হইয়া আমার পূর্ব ইতিহাস জানিতে চাহেন ও তাহা অবগত হইয়া কলিকাতায় গিয়া ভবিষ্যতে সেটলমেন্ট অফিসরদিগের কর্তব্য বিষয়ে এক দীর্ঘ মন্তব্য প্রকাশ করেন এবং তাহাই আইনে ঢুকাইয়া দেন। ইত্যবসরে জজের রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আগীল হয়; হাইকোর্ট জজের রায় উন্টাইয়া দিয়া আমার মতের সহিত ঐক্য প্রদর্শন করেন এবং সেই হাইকোর্ট “কলিং” অনুসারে এখন সমস্ত বঙ্গদেশে

সেটলমেন্ট কার্য চলিতেছে। এখন জরীপে জমী বেশী পাইলেই প্রজার অসম্মতিতে আর খাজনা বৃদ্ধি হয় না। ইত্যবসরে হাইকোর্টে আর একটি আগীলে স্তর চার্লসের উক্ত মন্তব্যও নির্দয়ভাবে সমালোচিত হয়। তাহাতে তিনি সেগুলি সেটলমেন্ট ম্যানুয়াল হইতে উঠাইয়া লইতে বাধ্য হন।



কবি-জায়া

উপরে সম্ভবতঃ আমার একটু অহংমিকা প্রকাশ হইল। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এ কথাটি প্রকাশ করিবার প্রবল প্রলোভন অতিক্রম করিতে পারিলাম না। আমি সত্যই ইহা স্লাবার বিষয় বিবেচনা করি যে, আমি এই ক্ষুদ্র ক্ষমতাতেই উক্ত কার্যে নিজের পায়ে কুঠারাঘাত করিলেও সমস্ত বঙ্গদেশবাসী একটি উপকার সাধিত করিয়াছি—নিরীহ প্রজাদিগকে অত্যাচার করত্ব হইতে বাঁচাইয়াছি। ভবিষ্যতে এরূপ কার্য আর যে করিতে পারিব, তাহার আশা নাই।

ঐ সেটলমেন্টের পরে আমি সেটলমেন্ট কার্য হইতে অব্যাহতি পাই ও ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হইয়া দিনাজপুরে প্রেরিত হই। এবং ১৮৯৪ সালে তথা হইতে বঙ্গদেশে আবকারি বিভাগের প্রথম পরিদর্শক (Inspector) নিযুক্ত হইয়া আসি। সেই কার্যে অদ্যাবধি করিতেছি।” (“জন্মভূমি,” কাণ্ডিক ১৩০৪)

পরবর্তী কালে স্বদেশী-আন্দোলনে যোগ দিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল

গবর্ণমেন্টের অধিকতর বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। দেব-কুমারকে লিখিত তাঁহার একখানি পত্রে প্রকাশ :—

“ক্রমাগত transfer (বদলি) আমাকে যথার্থই যেন অস্থির করে তুলেছে। এত বদলি কচ্ছে কেন জান ? আমার বিশ্বাস—স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান, আর ঐ প্রতাপসিংহ নাটকই তার মূল। কিন্তু, কি বুদ্ধি ! এমনি একটু হয়রান কর্ণেই বুঝি আমি অমনি আমার সব মত ও বিশ্বাসকে বর্জন করব ?”

স্ত্রী-বিশ্রোগ

সুরবালাকে লাভ করিয়া দ্বিজেন্দ্রলালের দিনগুলি মুখে স্বচ্ছন্দেই কাটিতেছিল। এই ভাবে ষোলটি বৎসর কাটিবার পর বিনা-মেঘে বজ্রাঘাতের মত অকস্মাৎ একদিন তাঁহার পত্নী একটি মৃত কস্তা প্রসব করিয়া ইহলোক হইতে অন্তর্ধান করিলেন (২৯ নবেম্বর ১৯০৩)। কল্যাণী গৃহলক্ষ্মীকে হারাইয়া, তত্পরি মাতৃহারী শিশুসন্তানদের লইয়া, দ্বিজেন্দ্রলালের যে অবস্থা হইয়াছিল, “হতভাগ্য” কবিতায় তাহার চিত্র আছে। তিনি লিখিয়াছিলেন :—

একখানি তার তরী ছিল বিজ্ঞ শূন্য ঘাটে বাধা ;—

একদিন হঠাৎ ডুবে গেল ঝড়ে ;

একখানি তার ঝুঁড়ে ছিল নদীর ধারে ; পুড়ে গেল

একদিন হঠাৎ আগুন লেগে খড়ে।

একটি ছেলে একটি মেয়ে,—একটি ডাইনে একটি বায়ে,

হাতে ধরে ঘুরে বেড়ায় পাড়ায় ;

সারা বছর ঘুরে বেড়ায় ; জানে না সে হতভাগা

তাদের নিয়ে কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।

... ..

ছেলে মেয়ের ছিল না মা ; চলে গেছে আটটি বছর,

দেশান্তরে—কাল-স্রোতের টানে ;

যে দেশেতে মাছুষ গেলে আর সে কিরে আসে না-ক,

যে দেশ কোথায়—কেহই নাহি জানে।

ভালবাস্তু ছেলে মেয়ে—যেমন সব মা ভালবাসে—

প্রবল, গভীর, বিরাট, খন স্নেহে ;

এখন তাদের রেখে গেছে তাদের বৃদ্ধ বাপের কাছে,

এখন তাদের দেখেও না-ক চেয়ে।

তবে কি না, যাবার সময় রেখে গেছে স্নেহটুকু

ছেলে মেয়ের বাপের কাছে জমা ;

হাতে সঁপে দিয়ে গেছে সর্বস্বধন পুত্রটরে,

দিয়ে গেছে কস্তা প্রিয়তমা।

এখন তাদের বাপই আছে, যে-ই বাবা, সে-ই মা,—

সে-ই তাদের

বাপের চিন্তায়, মায়ের যত্নে রাখে ;—

দিনের বেলায় মজুর খেটে রোজগার করে আনে কড়ি ;

রাতের বেলায় জড়িয়ে শুয়ে থাকে। (‘আলেকা’)

পুনঃ পুনঃ অমরক হইয়াও দ্বিজেন্দ্রলাল দ্বিতীয় বাহু দারপরিগ্রহ করেন নাই। তিনি বহু দেবকুমারকে একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন :—“আমি আবার বিবাহ করিব কি ? এ অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে, আমার মানস-মন্দিরে এখনও আমি সেই অল্পময় স্বর্ণ-প্রতিমার ধ্যান-ধারণা, পূজা ও আরতি করিয়া থাকি। স্থূল-দৃষ্টি এই সব লোক বাহির হইতে তাহার কি জানে—কিইবা বোঝে।”

জীবিরোগের পাঁচ বৎসর পরে দ্বিজেন্দ্রলাল ২ নং নন্দকুমার চৌধুরীর লেনে একখানি সুরমা অটালিকা নির্মাণ করিয়াছিলেন। তিনি পত্নীর নামানুযায়ী এই অটালিকার নামকরণ করেন—‘সুরমাম’। “তীরই যত্ন-সম্মিত অর্ধের পুণ্যমন্দিরে, তীরই শ্রুতির আশ্রয় ছায়ায় শূন্য জীবন কাটাইয়া দিবার” অভিপ্রায়ে দ্বিজেন্দ্রলাল ১৩১৬ সালের ১লা বৈশাখ (১৯০৯, ১৪ এপ্রিল) গৃহপ্রবেশ করেন ; তাঁহার বাকী দিনগুলি প্রধানতঃ সুরমামেই কাটিয়াছিল।

পূর্ণিমা-মিলন

দ্বিজেন্দ্রলাল বহুমুখ্যে সদালাপী ছিলেন। কলিকাতায় অবস্থানকালে, বিশেষ করিয়া পত্নীবিয়োগের পর হইতে, তাঁহার গৃহে বহুবান্ধব ও সাহিত্যিকের সমাগম হইত। তাঁহাদের আনন্দবর্ধনের জন্ত তিনি একটি অমূল্যের পরিকল্পনা করেন। দেবকুমারকে লিখিত তাঁহার একখানি পত্রে প্রকাশ :—

“এক নূতন খেলা মাথায় আসিয়াছে।...আমি (অর্থাৎ আমরা) ইচ্ছা করিয়াছি, প্রতি পূর্ণিমায় দেশ-স্তম্ভ সাহিত্যসেবী ও সাহিত্যানুরাগীদের একত্র করিয়া, এক-এক স্থানে এক-এক বার প্রতি ‘পূর্ণিমা’ উপলক্ষে ‘মিলন’ করা যাইবে। নাম হইবে, “পূর্ণিমা-মিলন”। ইহাতে কলিকাতায় সমুদায় সাহিত্যিকদের মধ্যে অব্যাহতভাবে মেলা-মেশা, ভাব-বিনিময়, ক্রীতি-বর্দ্ধন ও পরিচয়াদি হইবে ; আর তাহার সঙ্গে সেখানে (যেখানে যখন হইবে) গৃহ-স্বামীর প্রযুক্তি ও সামর্থ্যানুসারে, অল্প কিছু জলযোগ,—এই ধর যেন চা, সরবৎ প্রভৃতি ও চুফট তামাকের (সিগারেটেরও) ব্যবস্থা থাকিবে। আগামী দোল-পূর্ণিমার সন্ধ্যায় প্রথমে আমার গৃহে এই মিলন। তারপর প্রতি পূর্ণিমায় (যদি কেহ চান ত তাঁর বাড়িতে নাইলে আমারই এখানে) মাতৃভাষার সেবকগণ—আমাদের জাতভাইরা—একত্র হইবেন।”

১৩১১ সালে দোল-পূর্ণিমার দিন (ইং ১৯০৬) ৫ নং স্কিয়া স্ট্রীটে দ্বিজেন্দ্রলালের আবাসে ‘পূর্ণিমা-মিলন’ের প্রথম অধিবেশন হয়। এই দিন রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন এবং স্বরচিত “সে যে আমার জননী” গানটি গাহিয়া সকলকে মোহিত করিয়াছিলেন। ‘পূর্ণিমা-মিলন’ অনেক দিন চলিয়াছিল।

সঙ্গীত, আয়ত্তি, হাসির গান, রসরচনা পাঠ ইহার একটি প্রধান আকর্ষণ ছিল।

শেষ-জীবন ; মৃত্যু

পত্নী-বিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনের উজ্জ্বল অধ্যায়ে যবনিকাপাত হইয়াছিল ; ইহার পর তিনি যে কয় বৎসর বাঁচিয়া ছিলেন, সে নামেই জীবনধারণ। বহু দেব-কুমারকে তিনি লিখিতেছেন :—

“মাঝে মাঝে মনে হয় যে, আমার জীবনের উজ্জ্বল অধ্যায় শেষ হয়ে গিয়েছে। এখন এ জীবন কেবল ধারণ করা মাত্র। পুত্র-কন্যা যদি না জন্মিত ত হয়ত এক দিন সম্যাসী হয়ে বেরিয়ে যেতাম। নিজের ভোগ-লালসা বড় বেশী নাই—যা আছে তা বোধ হয় বিনা বেশী আয়াসে ত্যাগ কর্তে পারি। তবে সাহিত্যিক যশ—এখনও আমার কাছে অতি প্রিয়, আর সর্বাঙ্গপেক্ষা মণ্টু-মায়ার মায়াই ত্যাগ করা শক্ত। সে টান বিষম টান। তাদের জন্তই আজো এই দাস্ত করছি।—গয়া, ২২ জুলাই ১৯০৬।

“আমি যতই ভেবে দেখছি, বুঝতে পাচ্ছি যে, ‘এ জীবনটা কিছু না।’...এই অসার গল্পময় চাকরি। কোন অর্থ নেই। টিক ‘সোনার তরী’। জীবন-পথে যতই অগ্রসর হচ্ছি, চারি দিক থেকে শুধুই ঔদাস্য আর অবসাদ আমায় যেন ঘিরে ফেলছে। ‘অসার সংসার’ আগে বিচারে ও অনুমানে বুঝতাম,—এখন প্রতি পদে ‘হাড়ে হাড়েই’ বুঝছি। আপন মনের দিকে চেয়ে দেখি, সেখানে এ সংসারের উপরে অবিস্মিত বিতৃষ্ণা ছাড়া আর তো কিছুই খুঁজে পাই না। আসক্তি বা ভোগলিপ্সা তিলার্ক নাই। তবে, কেন—কিসের জন্ত এই পুঞ্জীভূত বিভ্রম নিরন্তর ভোগ ক’রে মরি?” গয়া, ১৩ জানুয়ারি ১৯০৭।

এই ঔদাস্য ও অবসাদ দূর করিবার জন্ত তিনি পরিমিত সুরাপানে অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন ; তিনি বলিতেন, “তোমাদের স্ত্রী আছেন, সংসারে অগ্নান্ত নানারূপ আশ্রয়-অবলম্বন আছে ; কিন্তু আমার তার কোনটাই নাই, কিছুই নাই। এইজন্ত, ভয়ানক ঔদাস্য ও অবসাদ আসিয়া যখন আমার দেহ-মনকে অভিভূত করিয়া, জড়াইয়া ধরে তখন—In order to shake off that lethargy, dullness and depression আমার একটু একটু পান করা দরকার বোধ করি। ওটা যে আমার পক্ষে শুধু একটা support or strength (সহায় ও বল) তা নয়,—Necessityও (প্রয়োজনও) বটে।”

গয়া হইতে কিরিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল প্রায় চারি বৎসর কলিকাতায় অবস্থান করেন। বহুভঙ্গ রহিত হইয়া বিহার-উড়িষ্যা একটি স্বতন্ত্র প্রদেশে গঠিত হইবার প্রাক্কালে তিনি ১৯১২, ২৯ জানুয়ারি বাঁকুড়ায় প্রেরিত হন। তথায় তিন

মাস কার্য করিবার পর যুদ্ধেরে বদলি হন। যুদ্ধের-যাত্রাকালে কলিকাতায় আসিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল সম্যাস রোগে শয্যাগ্রহণ করেন। পীড়ার উপশমের কোন লক্ষণ না দেখিয়া তিনি এক বৎসরের ছুটি লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু শরীর উত্তরোত্তর অপটু হওয়ায় এবং সরকারী চাকুরীতে উন্নতির আশা না থাকায়, তিনি ১৯১৩ সনের ২২এ মার্চ অবসর গ্রহণ করেন।

অবসরগ্রহণের অল্প দিন পূর্ব হইতে দ্বিজেন্দ্রলাল একখানি উচ্চাঙ্গের সচিত্র মাসিকপত্র প্রকাশের উত্তোগ করিতেছিলেন। পত্রের নামকরণ হয়—‘ভারতবর্ষ’ ; গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এও সল ইহার প্রকাশ-ভার গ্রহণ করেন। প্রথম সংখ্যার (আঘাট ১৩২০) জন্ত তিনি প্রবন্ধ নির্বাচন করিয়া, “সুচনা” অংশও লিখিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু উহা প্রকাশিত হইবার অব্যবহিত পূর্বেই তাঁহার ডাক পড়িয়াছিল। ১৯১৩, ১৭ই মে (৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩২০) অপরাহ্নে ‘সুরধামে’ যখন তিনি বাঁধী-সেবায় নিরত, সেই সময় অকস্মাৎ সম্যাস রোগে তাঁহার সংজ্ঞা লোপ পায় ; বিলুপ্ত সংজ্ঞা আর কিরিয়া আসে নাই।

“রোগাক্রান্ত হইবার মাত্র ৪৮ ঘণ্টা পরেই গুরু-দাদাশীর চক্ষরোজ্জ্বল রাত্রি ৯৮ ঘটিকার সময় ‘মহাসিদ্ধুর ওপার থেকে কি সঙ্গীত ভেসে এসে’ সত্যই যেন দ্বিজেন্দ্রকে ‘মধুর তানে কাতরপ্রাণে’ ডাকিল, ‘আয় চ’লে আয়, ওরে—আয় চ’লে আয় আমার পাশে’;—তিনি সেই ঈশ্বিত আহ্বানে ‘মহানন্দে’র স্নেহ-কোড়ে ঢলিয়া পড়িলেন ; তিনি গাহিয়া-ছিলেন ‘এমন চাঁদের আলো মরি যদি সেও ভাল, সে মরণ স্বরগ সমান’ তাঁহার সে সাধ পূর্ণ হইল। তিনি কয়েক বর্ষ পূর্বে তাঁহার লোকান্তরিতা গৃহলক্ষ্মীকে সকাতারে আহ্বান করিয়াছিলেন ‘যখন আমার সাদৃ হবে খেলা, তুমি আমার এসো,’—কে বলিতে পারে—কবি যখন তাঁহার ‘হেথায় যাহা কিছু প্রেম’ তাহা ছাড়িয়া যাইতেছিলেন তখন তাঁহার সেই মহাযাত্রার অজানা আঁধার পথ আলো করিতে সুরবালা ‘সুরধামে’ আসেন নাই। বর্ষদ্বয় পূর্বে হইতে কবি করণ সুরে, আবেগ-কম্পিতকণ্ঠে গাহিতেছিলেন—

পরিহারি ভব সুখ দুঃখ যখন মা শায়িত অন্তিম শয়নে ;
বরিষ শ্রবণে, তব জলকলরব, বরিষ স্তুতি মম নয়নে।
বরিষ শান্তি মম শক্তি প্রাণে, বরিষ অমৃত মম অঙ্গে
মা—ভাগীরথি, জাহ্নবি সুরধ্বনি, কল কল্লোলিনি গঙ্গে ॥*

সাহিত্য-সাধনা

দ্বিজেন্দ্রলাল মাতৃভাষার প্রতি আশৈশব অনুরক্ত ছিলেন। তিনি তাঁহার প্রাথমিক রচনাগুলি সম্বন্ধে বলিয়াছেন :—

“বিলাত যাইবার পূর্বে ‘আর্যদর্শন,’ ‘নব্যভারত’ ইত্যাদিতে লিখিতাম।...বাল্যকাল হইতেই সঙ্গীতে আমার

বিশেষ আসক্তি ছিল। আমার পিতা একজন সুবিখ্যাত গায়ক ছিলেন। প্রত্যয়ে উঠিয়া তিনি যখন ভৈরো, আশোয়ারি ইত্যাদির সুর তাঁজিতেন, আমি অন্তরালে থাকিয়া স্তমিতাম। শৈশব হইতেই আমি গান ও কবিতা রচনা করিতাম। ‘আর্য্যগাথা’র [১ম ভাগ, ইং ১৮৮২] প্রকাশিত নব্বইবিষয়ক গীতটি আমি দ্বাদশ বর্ষে রচনা করি। ১১ বৎসর হইতে ১৭ বৎসর পর্য্যন্ত রচিত আমার গীতগুলি ক্রমে ‘আর্য্যগাথা’ নামক গ্রন্থের আকারে প্রকাশিত হয়। তখন কবিতাও লিখিতাম। কিন্তু তখন কোন কবিতা প্রকাশিত হয় নাই। কেবল “দেবখরে সন্ধ্যা” নামক মংগ্ৰন্থিত একটি কবিতা ‘নব্যভারতে’ [ইং ১৮৮৩] প্রকাশিত হয়।”

১৮৮২ সনে ১ম ভাগ ‘আর্য্যগাথা’ প্রকাশের ১১ বৎসর পরে ১৮৯৩ সনে যখন উহার ২য় ভাগ প্রচারিত হয়, তখন ষিঙ্গেল্লালের “জীবনে যুগান্তর হইয়াছে”...তখন তিনি “আর সেই পাঠাধ্যায়ী, অনুভূত, জগতের দূরদূর-পরিদর্শক বিমিত্ত বালক নাই।

আজ যেন রে প্রাণের মত কাহারে বেসেছি ভাল ;

উঠেছে আজ নুতন বাতাস, ফুটেছে আজ নুতন আলো।”

ইহার পরবর্তী নয় বৎসর তাঁহার দাম্পত্য-জীবন পরম সুখে অতিবাহিত হইয়াছে। জীবনের এই সুখকর অংশেই তাঁহার অধিকাংশ হাসির গান ও ব্যঙ্গকবিতা, চারিখানি প্রহসন (‘কঙ্কি-অবতার’, ‘বিরহ’, ‘দ্র্যাহম্পর্শ’, ‘প্রায়শ্চিত্ত’), ব্যঙ্গকাব্য—‘আষাঢ়ে’, গীতিকাব্য—‘মঙ্গ’, ও তিনখানি নাট্যকাব্য—‘পাষাণী’, ‘সীতা’ ও ‘তারাবাই’ রচিত হয়। ‘তারাবাই’ প্রকাশের দুই মাস পরে পত্নীবিয়োগে যেমন তাঁহার জীবনে সুখ-সুখ্য অন্তর্মিত হয়, অল্প দিকে তেমনি তাঁহার নাট্যগ্রন্থ রচনার ধারাও ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে।

নাট্যকার হিসাবে ষিঙ্গেল্লাল দেশবাসীর নিকট সুপরিচিত। কিন্তু কি কি ব্যাপার তাঁহার নাটক লিখিবার প্রযুক্তির সহায়তা করিয়াছিল তাহা জানিতে মনে স্বতঃই কৌতূহল জন্মে। এ বিষয়ে তিনি “আমার নাট্য-জীবনের আরম্ভ” প্রবন্ধে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা উদ্ধারযোগ্য :—

“বাল্যাবধি কবিতা ও নাটক পাঠে আমার অত্যন্ত আসক্তি ছিল। এত অধিক ছিল যে বিজ্ঞানভ্যাসকালে বাইরনের Manfred ও Childe Harold এর দুই Canto এবং মেঘদূত ও উত্তরচরিতের কাব্যংশ আমি মুখস্থ করিয়াছিলাম। বিলাত গিয়া ক্রমাগতঃ Shelley পড়িতাম এবং তথা হইতে প্রভাগত হইয়া ক্রমাগত Wordsworth ও Shakespeare বার বার পড়িতাম ; ও শেষোক্ত কবির নাটকের যে যে অংশ কাব্যংশে শ্রেষ্ঠ বোধ হইত, মুখস্থ করিতাম।

বিলাতে যাইবার পূর্বে আমি ‘হেমলতা’ নাটক ও ‘নীল-দর্পণ’ নাটকের অভিনয় দেখিয়াছিলাম মাত্র, আর কৃষ্ণনগরের এক সৌখীন অভিনেতৃদল কর্তৃক অভিনীত ‘সধবার একাদশী’

ও ‘গ্রন্থকার’ নামক একখানি প্রহসনের অভিনয় দেখি, আর Addison এর Cato এবং Shakespeare এর Julius Caesar এর আংশিক অভিনয় দেখি। সেই সময় হইতেই অভিনয় ব্যাপারটিতে আমার আসক্তি হয়। বিলাতে যাইয়া বহু রঙ্গমঞ্চে বহু অভিনয় দেখি। এবং ক্রমেই অভিনয় ব্যাপারটি আমার কাছে প্রিয়তর হইয়া উঠে।

বিলাত হইতে কিরিয়া আসিয়া আমি কলিকাতার রঙ্গমঞ্চ-সমূহে অভিনয় দেখি। এবং সেই সময়েই বঙ্গভাষায় লিখিত নাটকগুলির সহিত আমার পরিচয় হয়।...

বিলাত হইতে কিরিয়া আসিয়া বাংলা ভাষায় হস্তরসায়ক কবিতার অভাব পূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে Ingoldsby Legends এর অনুকরণে কতকগুলি হাস্যরসায়ক বাংলা কবিতা লিখিয়া, ‘আষাঢ়ে’ নামে প্রকাশ করি। সেই সময়ে আমি ইংরাজি গান খুব গাইতাম। ইংরাজি গান প্রায় বাঙালী শ্রোতারই ভাল লাগিত না। তখন ইংরাজি গান গাওয়া ছাড়িয়া দিয়া বাংলায় গান রচনা করিয়া গাহিতে আরম্ভ করি। বিবাহান্তে অনেকগুলি প্রেমের গান রচনা করিয়া ‘আর্য্যগাথা’ দ্বিতীয় ভাগ নাম দিয়া ছাপাই এবং কতকগুলি হাসির গানও রচনা করি। এই হাসির গানগুলি অবিলম্বে অনেকের প্রিয় হয় এবং আমি কার্য্যোপলক্ষে কোন নগরে যাইলেই ঐ সকল গান আমায় স্বয়ং গাহিয়া শুনাইতে হইত। সেগুলি একত্রে গ্রন্থাকারে বহুদিন পরে প্রকাশিত হয়।...

প্রথমতঃ প্রহসনগুলির অভিনয় দেখিয়া সেগুলির স্বাভাবিকতায় ও সৌন্দর্য্যে মোহিত হইতাম বটে, কিন্তু সেগুলির অঙ্গীলতা ও কুরুচি দেখিয়া ব্যথিত হই। ঐ সময়ে ‘কঙ্কি-অবতার’ একখানি প্রহসন গদ্যে পদ্যে রচনা করিয়া ছাপাই। পরে আমার পূর্ব্বরচিত কতকগুলি হাসির গান একত্রে গাঁথিয়া ‘বিরহ’ নাটক রচনা করি। এবং ক্রমে সে নাটক ঠার থিয়েটারে অভিনীত হয়। তৎপরে উক্তরূপ ‘দ্র্যাহম্পর্শ’ রচনা করি এবং উহাও ঠারে অভিনীত হয়। পরে ‘প্রায়শ্চিত্ত’ রচনা করি এবং সেখানি ক্লাসিকে অভিনীত হয়।

সঙ্গে সঙ্গে আমার গজীর রচনাও চলিতেছিল। মংগ্ৰন্থিত ‘সীতা’ নাট্য-কাব্য ‘নব-প্রভা’র প্রকাশিত হয়। পরে ‘পাষাণী’ নাটক প্রকাশ করি। তৎপরে আমি ‘তারাবাই’ নাটক প্রকাশ করি।

যে কারণে আমি প্রহসন লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম তাহার অল্পরূপ কারণে আমি নাটক লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। বাংলা ভাষায় নাট্য-সাহিত্যে স্বাভাবিকতা ও আখ্যানবস্তুগঠনে অসাধারণ নৈপুণ্য দেখিতাম, কিন্তু তাহাতে কবিত্বের অভাব বোধ হইত। আমার কাব্যশক্তি (যাহা কিছু ছিল) আমি আমার নাটকে প্রকট করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

প্রথমে Shakespeare এর অনুকরণে Blank Verse এ

নাটক লিখিতে আরম্ভ করি। ‘তারাবাই’ প্রকাশিত হইবার পূর্বে স্বর্গীয় কবি নবীনচন্দ্র সেনকে তাঁহার অঙ্কুরোধে এক

কাপি পাঠাই। তিনি পড়িয়া এই মত প্রকাশ করেন যে এ

নূতন ধরণের অমিত্রাক্ষর—মাইকেলের ছন্দোমাধুরী ইহাতে

নাই—এ অমিত্রাক্ষর চলিবে না। সেই সন্ধে স্বর্গীয় মাইকেল

মধুসূদনের দৈববাণী মনে হইল—যে অমিত্রাক্ষরে নাটক এখন

চলিতে পারে না। দীর্ঘ বক্তৃতা অমিত্রাক্ষরে চলে। কিন্তু

ক্রমত কথোপকথনে কথা ত গদ্যের মত হইতেই হবে।

Shakespeareএর অমিত্রাক্ষর Miltonএর অমিত্রাক্ষর হইতে

পৃথক্। Of man’s disobedience ইত্যাদির একটা স্বাক্ষর

আছে। কিন্তু To be or not to be that is the ques-

tion—ইহা ত গদ্য বলিলেই হয়। তবে কবিতা বলিয়া ইহা

চালান কেন? গদ্যে লিখিলে কি ক্ষতি হইত। কিন্তু

তৎপরেই Who would bear the whips and scorns of

time কথা For in that sleep of death what dreams

may come ইহা দস্তুর মত কবিতা! দেখিলাম যে Shakes-

peareএ ঋণিক গদ্য ঋণিক পদ্য তথাপি দুইট খাপ

খাইতেছে। কারণ ইংরাজি ভাষায় সেরূপ অবস্থা আসিয়া-

ছিল। কিন্তু বাঙ্গলাতে “ভূমি যদি আস সখি, আমি সেখা

যাবো” ইহার পরে “নবীন নীরদ ঞ্চাম নিরুঞ্জবিহারী” এরূপ

রচনা অসহ্য বিসদৃশ বোধ হইবে। কিন্তু গদ্যে একত্রে উভয়ই

চলে। গদ্যের এখন সে অবস্থা আসিয়াছে।

Carlyleএর মতে সামান্য হইতে গভীরতম এমন কোন

ভাব নাই যাহা পদ্য অপেক্ষা গদ্যে সুন্দরতররূপ প্রকাশ করা

না যায়। পদ্যের স্বাক্ষর গদ্যে দেওয়া যায় কিন্তু গদ্যের

স্বাধীনতা ও স্বচ্ছগতি পদ্যে নাই।

বঙ্কিমবাবুর গদ্য অনেক স্থলে ত পদ্য। Schiller,

Lessing, Ibsen, Moliere ইত্যাদি মহা নাট্যকারগণের

বহু মহা-নাটক গদ্যে লেখা আছে, তাহাতে ত তাঁহাদের

মহিমা কমে নাই। Schillerএর গদ্যের ভাষা ও রূপক

অল্পপ্রাণে পদ্যের চৌক্যপুঙ্খ।

তদুপরি নাটক অভিনয় করিবার জিনিষ। অভিনয়-

বটনাগুলি যত প্রত্যক্ষবৎ হয় ততই ভাল। সেইজন্ত উক্তিগুলি

যত স্বাভাবিক হয় (ভাষার মর্যাদা রক্ষা করিয়া অবশ্য)

ততই শ্রেয়। লোকে কথাবার্তা পদ্যে করে না, গদ্যে করে।

অতএব পদ্যে নাটক রচনা করিলে উক্তিগুলি অস্বাভাবিক

ঠেকিবেই।

এই সকল বিবেচনা করিয়া আমি তখন হইতে নাটকগুলি

গদ্যে রচনা করিতে মনস্থ করিলাম। সেইজন্ত আমি আমার

তারাবাইয়ের পরবর্তী নাটকগুলি (রাণা প্রতাপ, ছগীদাস,

সুরজাহান, মেবারপতন ও সাজাহান) যথাক্রমে গদ্যেই রচনা

করি। কিন্তু কবিতায় আমার অত্যধিক আসক্তি থাকায়

আমি গদ্যের ভাষাকে কবিতার আসনে বসাইবার প্রলোভন

পরিত্যাগ করিতে পারি নাই। অথচ যেখানে সংস্কৃত শব্দ অপেক্ষা প্রচলিত শব্দ বেশী জোরের সহিত ভাব প্রকাশ করে বলিয়া বোধ হইয়াছে সেখানে প্রচলিত শব্দই ব্যবহার করিয়াছি।

যখন উক্ত গদ্য নাটকগুলি রচনা করিতেছিলাম তখন এক-

খানি অপেরা (সোরাব রস্তুম) পদ্যে গদ্যে রচনা করি।

কারণ ‘অপেরা’র কথাবার্তা স্বাভাবিক হওয়ার চেয়ে শ্রুতিমধুর

করায় শ্রেয় বিবেচনা করিয়াছিলাম। সে অপেরাখানি

অনেকস্থলে Shelleyর অঙ্কুরণে প্রণয়ন করিয়াছিলাম।

বস্তুতঃ তাহা কবিতায় আমার অত্যধিক আসক্তির ফল। মাঝে

মাঝে কবিতায় দুই একখানা নাটক লিখিবার লোভ সংবরণ

করিতে পারি নাই।” (‘নাট্য-মন্দির,’ শ্রাবণ ১৩১৭)

গ্রন্থাবলী : জীবিতকালে বা মৃত্যুর পরে প্রকাশিত

দ্বিজেন্দ্রলালের গ্রন্থগুলির একটি কালানুক্রমিক তালিকা

দিতেছি। বঙ্গনী-মধ্যে প্রদত্ত ইংরেজী প্রকাশকাল বেঙ্গল

লাইব্রেরি-সঙ্কলিত মুদ্রিত-পুস্তকাদির তালিকা হইতে গৃহীত।

পুস্তকে প্রকাশকাল নির্দেশের অভাব প্রমুখি দ্বারা স্থচিত

হইয়াছে।

১। আখ্যাগাথা (কবিতা ও গান) :

১ম ভাগ। ইং ১৮৮২ (৫ মার্চ)। পৃ. ৯১।

২য় ভাগ। ইং ১৮৯৩ (২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৪)। পৃ. ৬০ + ৪৬।

২। *The Lyrics of Ind.* London, Sep. 1886. pp. 79.

৩। একঘরে (নকশা)। ১ (২ জানুয়ারি ১৮৮৯)। পৃ. ৩৫

৪। সমাজবিভার্টি ও ককি-অবতার (সামাজিক প্রহসন)।

১৩০২ সাল (৯ সেপ্টেম্বর ১৮৯৫)। পৃ. ১০৩।

৫। বিরহ (নাটিকা)। ১৩০৪ সাল (ইং ১৮৯৭)। পৃ. ১০৯

৬। আঘাচে। বা গুটিকতক রহস্য গল্প (ব্যঙ্গকাব্য)।

১৩০৫ সাল (২২ ডিসেম্বর ১৮৯৯)। পৃ. ১৪৮

৭। হাসির গান। ১৩০৭ সাল (১৮ জুলাই ১৯০০)।

পৃ. ৫১।

৮। পাষাণী (গীতি-নাটিকা)। আশ্বিন ১৩০৭ (২৫ সেপ্টেম্বর ১৯০০)। পৃ. ১২২।

৯। ত্র্যম্পর্শ বা সুখী পরিবার (প্রহসন)। ১৩০৭ সাল (২৩ ডিসেম্বর ১৯০০)। পৃ. ৯৬।

১০। প্রায়শ্চিত্ত (নাটক)। ৫ মাঘ ১৩০৮ (১৯ জানুয়ারি ১৯০২)। পৃ. ৯৪।

ক্লাসিক থিয়েটারে ‘বহুং আচ্ছা’ নামে প্রথমে অভিনীত।

১১। মল্ল (কাব্য)। ১৩০৯ সাল (১৯ সেপ্টেম্বর ১৯০২)। পৃ. ১০৪।

১২। তারাবাই (ঐতিহাসিক নাটক)। ১৩১০ সাল (২২ সেপ্টেম্বর ১৯০৩)। পৃ. ১৫৬।

“এই নাটকের উপাদান টিভ-প্রণীত রাজস্থান হইতে গৃহীত।”

১৩। প্রতাপসিংহ (ঐতিহাসিক নাটক)। ? (৮ মে ১৯০৫)। পৃ. ১৬২।

১৩১১ সালের 'নবপ্রভা'র প্রথম প্রকাশিত।

১৪। *The Crops of Bengal*. Cal. 1906 (23 March), pp. 23+184.

১৫। ছুর্গীদাস (ঐতিহাসিক নাটক)। আশ্বিন ১৩১৩ (৫ নবেম্বর ১৯০৬)। পৃ. ১৯৪।

১৬। আলেখ্য (কাব্য)। ১৩১৪ সাল (৮ জুলাই ১৯০৭)। পৃ. ১১২।

১৭। *Lessons in English*:

Pt. i. (20 Dec. 1907), pp. 7+56.

Pt. ii. (2 May 1908), pp. 1+68.

Pt. iii. (20 Jan. 1909), pp. 1+80.

১৮। হুরজাহান (ঐতিহাসিক নাটক)। ? (১ মার্চ ১৯০৮)। পৃ. ১৭৬।

১৯। সোরাব রুস্তাম (নাট্যরঙ্গ)। ১৩১৫ সাল (২৩ অক্টোবর ১৯০৮)। পৃ. ৯২।

“এই নাটকের গল্পটি আমি ফাউন্ডেশনের ‘শাহনামা’ নামক গ্রন্থ হইতে লইয়াছি।”

২০। সীতা (নাট্য-কাব্য)। ? (৬ নবেম্বর ১৯০৮)। পৃ. ১২৮।

ফাল্গুন ১৩০৭—পৌষ ১৩০৯ সালের ‘নবপ্রভা’র ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত।

২১। মেবার পতন (ঐতিহাসিক নাটক)। ? (২৭ ডিসেম্বর ১৯০৮)। পৃ. ১৭১।

২২। সাজাহান (ঐতিহাসিক নাটক)। ? (৮ আগষ্ট ১৯০৯)। পৃ. ১৬১।

২৩। চন্দ্রগুপ্ত (নাটক)। ? (২৪ আগষ্ট ১৯১১)। পৃ. ১৬৭।

২৪। পুনর্জন্ম (প্রহসন)। ? (১৬ সেপ্টেম্বর ১৯১১)। পৃ. ৩৭।

২৫। পরপারে (সামাজিক নাটক)। ? (২৮ আগষ্ট ১৯১২)। পৃ. ১৮১।

২৬। ত্রিবেণী (খণ্ডকাব্য)। ২৫ শ্রাবণ ১৩১৯ (৫ সেপ্টেম্বর ১৯১২)। পৃ. ৮৫+২

২৭। আনন্দ-বিদায় (প্যারডি)। ? (১৬ নবেম্বর ১৯১২)। পৃ. ৬৪।

[মৃত্যুর পূর্বে প্রকাশিত]

২৮। ভীষ্ম (নাটক)। ? (৮ জানুয়ারি ১৯১৪)। পৃ. ২৩৬।

২৯। কালিদাস ও ভবভূতি (সমালোচনা)। ১৩২২ সাল (১০ আগষ্ট ১৯১৫)। পৃ. ১৬৯।

ইহা প্রথমে ১৩১৭-১৮ সালের ‘সাহিত্যে’ ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়।

৩০। গান। ১ আশ্বিন ১৩২২ (২ অক্টোবর ১৯১৫)। পৃ. ১৯৯।

অনুমান ২৩০টি গানের সমষ্টি।

৩১। সিংহল বিজয় (ঐতিহাসিক নাটক)। ২৩ আশ্বিন ১৩২২ (১৩ অক্টোবর ১৯১৫)। পৃ. ২৩৬।

৩২। বঙ্গনারী (সামাজিক নাটক)। ১৩২২ সাল (১০ এপ্রিল ১৯১৬)। পৃ. ১৪১।

“স্বর্গীয় পিতৃদেব এই নাটকখানি তাঁহার মৃত্যুর ২৩ বৎসর পূর্বে প্রণয়ন করেন।...তিনি ইহার এক অংশ লইয়া ‘পরপারে’ রচনা করেন।”

দ্বিজেন্দ্র-প্রহ্লাবলী। বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ:

১ম ভাগ (কবিতা ও গান)। আশ্বিন ১৩৫৩ (ইং ১৯৪৬)। পৃ. ৭৩৬।

স্বরূপী: আর্ষগাথা, ১ম-২য় ভাগ; আষাঢ়ে; হাসির গান; মন্ত্র; আলেখ্য; ত্রিবেণী; গান; *The Lyrics of Ind.*

গল্প-রচনাবলী: সাময়িক-পত্রের পৃষ্ঠায় পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত দ্বিজেন্দ্রলালের বহু গদ্য-রচনা বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। এগুলি সংগৃহীত ও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়া উচিত। এই শ্রেণীর রচনার একটি নির্ভরযোগ্য তালিকা আমি ১৩৫৪ সালের ১ম-২য় সংখ্যা ‘সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা’য় প্রকাশ করিয়াছি।

পত্রাবলী: এম. এ. পরীক্ষাদানের প্রাক্কালে রাজ-নারায়ণ বসু ও তৎপুত্র বোম্বাইনাথ বসুকে লিখিত দ্বিজেন্দ্রনাথের দুইখানি পত্র আমি ১৩৫১ সালের ৩য়-৪র্থ সংখ্যা ‘সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা’য় প্রকাশ করিয়াছি। দেবকুমার রায় চৌধুরী প্রণীত ‘দ্বিজেন্দ্রলালে’ও অনেকগুলি পত্র বা পত্রাংশ স্থান পাইয়াছে।

দ্বিজেন্দ্রলাল ও বাংলা-সাহিত্য

দ্বিজেন্দ্রলাল প্রধানতঃ নাট্যকার এবং হাসির গান ও স্বদেশী গানের রচয়িতা হিসাবে খ্যাত। তিনি জীবিতকালে স্বীয় ব্যক্তিত্বের প্রভাবে কবি-খ্যাতির যে সৌধশিখরে আরোহণ ছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর পর নানা কারণে সে প্রতিষ্ঠাভূমি হইতে তিনি বিচ্যুত হইয়াছিলেন, প্রধান কারণ রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্র-প্রতিভার দীপ্তি অত্যধিক উজ্জ্বল ছিল বলিয়া অপেক্ষাকৃত হীনপ্রভ জ্যোতিষ্কেরা সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারেন নাই। রবীন্দ্রনাথ-দ্বিজেন্দ্রলাল বিরোধের ফলও দ্বিজেন্দ্রলালের পক্ষে ক্ষতিকর হইয়াছিল। দ্বিতীয় কারণ, দ্বিজেন্দ্রলালের অপ্রিয় সত্যভাষণের সর্বনাশা অভ্যাস। তিনি ঋজু মেরুদণ্ডের লোক ছিলেন, অত্যধিক নমনীয়তা বা ছাকামি বরদাশ করিতে পারিতেন না; কঠোর হস্তে ইহার বিরুদ্ধে তিনি কশাঘাত

কুরিয়াছেন, ফলে তাঁহার শত্রুত্বই হইয়াছে। যে কারণেই হউক, ‘আষাঢ়ে,’ ‘মঙ্গ,’ ‘আলেখ্য’ ও ‘হাসির গাঙ্গন’র কবি যে প্রায় অপরিচিত থাকিয়াই বিশ্বৃত হইতে বসিয়াছেন, ইহা বাংলাদেশ ও সাহিত্যের পক্ষে দুর্ভাগ্য সন্দেহ নাই।

দ্বিজেন্দ্রলাল কবিতার ও গানে ছন্দের, ভঙ্গির ও সুরের বিবিধ বৈচিত্র্য সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। সাহিত্যের অনেক বিভাগে তিনি প্রথম পথপ্রদর্শকের গৌরবও দাবী করিতে পারেন। নাটকের গদ্য কিরূপ হওয়া উচিত সে

সম্পর্কে তাঁহার নিজের গবেষণা আছে, এবং এই গবেষণার ফলে তিনি নিজস্ব এক ভঙ্গির প্রবর্তন করিতে পারিয়াছিলেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের একান্ত বৈশিষ্ট্য তাঁহার পৌরুষ। “কাপুরুষতার প্রতি যথোচিত ঘৃণা এবং বিদ্ভাৱের দ্বারা তাহা গৌরববিশিষ্ট।” ইহাই প্রধানতঃ বিপরীত-প্রকৃতিবিশিষ্ট রবীন্দ্র-যুগের বাঙালী সমাজে তাঁহাকে অপ্রিয় করিয়াছিল। আজ যুগপরিবর্তন হইয়াছে। আশা করা যায়, স্বাধীন দেশে দ্বিজেন্দ্রলাল পুনরায় সমাদৃত হইবেন।

আলোচনা

দুর্গাদেবীর বোধন ও বিসর্জন

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, বিজ্ঞানিধি

গত মাসের প্রবাসীতে শ্রীরাজমোহন নাথ শারদীয়া পূজার অঙ্গীভূত দেবীর বোধন ও বিসর্জন সম্বন্ধে আসামের বহু তথ্যপূর্ণ রুতান্ত লিখিয়াছেন। বহুদিন পূর্বে তিনি “ময়নামতী গানে”র কদলীরাষ্ট্র ও বিজয় নগর আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তাহার সেই তথ্যানুসন্ধানে আমি চমৎকৃত হইয়াছিলাম। কামরূপ অমুসন্ধান সমিতির ইংরেজী মাসিক পত্রিকায় তিনি আসামের নানা স্থানের পুরাতন অজ্ঞাতপূর্ব মন্দিরের বিবরণ লিখিয়াছেন। তিনি ইঞ্জিনিয়ার; আসামের নানা স্থানে ঘুরিয়াছেন, সামাজিক আচার-ব্যবহার জানিয়াছেন। সেই জ্ঞানেরই কিঞ্চিৎ মাধ্ব মাসের প্রবাসীতে আমাদিগকে শুনাইয়াছেন।

এই প্রবন্ধে তিনি বহুবিধ কার্যের কারণ নির্দেশ করিয়াছেন। আমি আসামের পুরাতন কিংবা বর্তমান ইতিহাস কিছুমাত্র অবগত নই। কিন্তু তিনি তাহার অমুমানের যে সকল হেতু প্রদর্শন করিয়াছেন, আমার নিকট সে সকল পর্যাণ্ট বোধ হইল না।

১। প্রথমে বোধন দেখি। আশ্বিন শুক্লা বঙ্গীর সাংকালে দেবীর বোধন হয়। যুদ্ধ বিজয়-যুক্ত শাখায় বোধন হয়। পার্শ্বে নবপত্রিকা স্থাপিত হয়। তখন তাহার স্নান, পূজা কিছুই হয় না। সপ্তমীতে নবপত্রিকা স্নানের পর বস্ত্রায়ত করিয়া প্রতিমার পার্শ্বে স্থাপিত ও পূজিত হয়। অতএব সপ্তমী হইতেই নবপত্রিকার প্রয়োজন আসিতেছে। বঙ্গীর সাংকালে স্তূপিকা-গৃহে কে জয়গ্রহণ করে? নাথ মহাশয় বলেন নাই। যে যুদ্ধ ফলযুক্ত বিজয়শাখায় বোধন হয়, সে শাখা নবপত্রিকার অন্তর্গত নয়। দুইটি যুক্ত বিজয়-ফলের প্রয়োজন কি? নবপত্রিকা বা পত্রের মধ্যে রঙা, কচু, হরিদ্রা, মান ও ধাতু—এই পাঁচটি কৃষিজাত। হরিদ্রা খাণ্ডদ্রব্য বলিতে পারি না। অল্প চারিটি,—জয়ন্তী, বিশ্ব, দাড়িম ও

অশোক। নাথ মহাশয় ইহাদের আয়ুর্বেদীয় গুণ উল্লেখ করিয়াছেন। সে সময় আশ্বিন মাসে বিশ্ব পাকে না। অপক বিশ্ব অতিশয় ধারক; কোষ্ঠবদ্ধ করে। দাড়িমও পাকে না। দাড়িমের কষায় রস ধারক। দুইটিই গর্ভবীর হিতকর নয়। অশোকও আয়ুর্বেদে কষায় ও গ্রাহী। জয়ন্তী আমার অজ্ঞাত। আসামের কোন্ জাতি এত দ্রব্যগুণ জানিয়া নবপত্রিকার অন্তর্গত করিয়াছিল তাহা জানিতে কোতুলক হয়। বোধন আশ্বিন শুক্লা বঙ্গীতে হয়, তাহার হেতু কি? সাংকালে হয়, তাহারই বা হেতু কি? দেবীপুরাণে নবপত্রিকা নাই, নবদুর্গা আছে। মনে হয় নবপত্রিকা বিশ্ববাসিনী দেবীর নয় মাসের নয়টি প্রতীক। দেবী নয় মাস গর্ভবতী থাকেন, এইরূপ কোন ভাব হইতে নবদুর্গার উৎপত্তি হইয়া থাকিবে।

২। দেবীর বিসর্জন। প্রতিমার বিসর্জনের সহিত নবপত্রিকারও বিসর্জন হয়। যে সমস্ত রক্ষার জন্ত ভূতাপসরণ হইয়াছে, প্রস্তুতির আবশ্যক ওষধ সংগ্রহ হইয়াছে, সেই নবপত্রিকা তিন দিন পরে জলে নিক্ষিপ্ত হইল, তাহার সম্ভানের দশা কি হইল? ইহার তুল্য নির্ভুর আচরণ আর কিছুই হইতে পারে না। নবপত্রিকা দুর্গাস্থানীয় হইয়া পূজিত হইয়া থাকেন, ইহা বাতুড়ায় শুনিয়াছি। বাহার আবাহন ও বিসর্জন হয় তাহাকে কৃষিকর্মের অঙ্গীভূত করিতে পারি না।

নাথ মহাশয় লিখিয়াছেন, “বস্তুতঃ বোধন তথা দুর্গাপূজাও শবর জাতির কৃষি-উৎসব।” আসামে শবর জাতি আছে কি? আর যদি থাকে, উৎসব আগে না পূজা আগে, তাহা স্পষ্ট না জানিলে কার্য-কারণ সম্বন্ধ বৃদ্ধিতে পারা যায় না। কার্য-কারণ সম্বন্ধ না থাকিলেও দুই-ই সমকালীন হইতে পারে। কে শবর জাতিকে আশ্বিন মাস বলিয়া দিবে? কে তাহা-দিগকে আশ্বিন শুক্লা দশমী বলিয়া দিবে? আরও অনেক তর্ক আছে; একটার উল্লেখ করি। কামরূপের পূর্বনাম জ্যোতিষপুর নয়, প্রাগজ্যোতিষপুর। এই নাম কত বৎসর হইতে আসিয়াছে? কারণ, মহাভারতে ও রামায়ণে এক প্রাগজ্যোতিষপুরের উল্লেখ আছে। সে নগর ভারতের উত্তর-পূর্ব দিকে ছিল না; উত্তর-পশ্চিম দিকে ছিল। ইতি।

নববঙ্গের বয়স্কদের প্রাথমিক শিক্ষার কার্যকরী পরিকল্পনা . .

শ্রীজীবনময় রায়

The measure of illiteracy is no adequate measure of the prevailing ignorance.—M. K. Gandhi.

বাংলাদেশে তথা ভারতে বয়স্কদের ভোটাধিকার লাভ স্বাধীনতার একটি মূল্যবান দান। এই ভোট যাতে মানুষের স্ব-ইচ্ছায়, স্বচ্ছন্দচিত্তে এবং স্ব-জ্ঞানে দিতে পারে, পরম্পরগামী ভোটারগণমন না হয়, তার ব্যবস্থা জাতীয় গবর্ণমেন্টের অর্গেণে করা কর্তব্য। কেন, কার এবং কিসের জন্তে ভোট দিচ্ছি, তাতে কি লাভ বা ক্ষতি হবে, ভোটারের সে বিষয়ে সম্পূর্ণ ধারণা নিজের থাকা দরকার।

কিন্তু আমাদের দেশের জনসাধারণ যে গভীর অজ্ঞানতার অন্ধকারে ডুবে আছে তা প্রায় দুর্ভেদ্য। এই জনসাধারণের মধ্যে লিখতে ও পড়তে অল্পাধিক জানে এমন মানুষও আছে। বোঝবার ক্ষমতা এবং সে বোধকে প্রয়োগ করবার ক্ষমতায় আমাদের দেশের মানুষ কারো চেয়ে কম নয়। কিন্তু এই যে নানা বিষয়ে ঠিকমত যে জ্ঞান, সেই জ্ঞানের অভাবে দেশের লোক সভ্যজগতের সম্পদসম্ভার থেকে বঞ্চিত হয়ে রয়েছে। এ জ্ঞান যে মাত্র সামান্য লেখাপড়া শিখিয়ে দেওয়া যাবে না তা আমাদের লেখাপড়া শেখা মানুষদের পরীক্ষা করে দেখলেই বোঝা যাবে। মহাত্মা গান্ধীর উক্তি “Literacy itself is no education”—যে কত সত্য, কাজ করতে গেলে পদে পদে তা বুঝতে পারা যায়। সুতরাং বর্তমানে এই মোহনিদ্রায় অভিভূত বিপুল জনশক্তিকে জাগিয়ে দেশগঠনের কাজে লাগাতে হলে, তাদের লেখাপড়া শিখিয়ে জ্ঞানের আলোকের রাজ্যে পৌঁছে দিতে অসম্ভব দীর্ঘকাল অপেক্ষা করে থাকতে হবে। চারদিকে শত্রুপরিবেষ্টিত অবস্থায় সে দীর্ঘসূত্রভারপ বিলাসের আমাদের অবসর নেই। সম্প্রতি বয়স্কদের পক্ষে, লেখাপড়াকে গৌণস্থান দিয়ে, তাদের সর্ববিষয়ে অজ্ঞানতা দূর করার প্রয়োজনে শিক্ষা দেওয়া দরকার এবং সে শিক্ষা যদি আমরা মুখে মুখে দিই তা হলে বই পড়িয়ে শেখানোর চেয়ে দশগুণ বেশী এবং খুবই সহজে তা শেখানো যাবে।*

সুতরাং অক্ষর পরিচয় করে, তাদের জ্ঞান দান করবার হুস্বেচনা না করে মুখে মুখে, নিম্নলিখিত নানা উপায়ে তাদের

* “গান্ধীজীর কথায়, “by transmitting such general information by word of mouth, for one imparts ten times as much in this manner as by reading and writing.” M. K. G.—*Harijan* 13: 7. 37.

অজ্ঞানতা দূর করাই প্রথম, প্রধান এবং অর্গেণে কর্তব্য। এর উপর, তাদের নিজেদের উৎসাহ জাগলে, তারা অনেকেই তাদের জন্তে লেখা খবরের কাগজটুকু পড়তে পারে এমন একটু লেখাপড়া শিখতে চাইবে এবং ততটুকু ব্যবস্থা অবশ্য থাকবে।

১। এই শিক্ষা প্রচারের জন্তে জাতীয় গবর্ণমেন্টকে গ্রামে গ্রামে বয়স্ক জনগণের শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রিত প্রশিক্ষণের সঙ্গে যোগযুক্ত করতে হবে। ক্ষুধার্ত, অরুচিপুষ্ট জনগণের ক্ষুধাশান্তি এবং নিজেকে ও পরিজনবর্গকে স্বস্থ রেখে সংসার-যাত্রার ব্যবস্থা করে না দিলে তারা শিক্ষার দিকে মন দিতে পারবে না। এই উদ্দেশ্য নিয়ে এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তন করতে হলে :—

২। কয়েকটি গ্রাম নিয়ে এক একটি মণ্ডল স্থির করতে হবে। প্রতি মণ্ডলের জন্তে একটি করে শিক্ষা প্রচারকের দল থাকবে এবং তাদের এক একজন এক একটি বিশেষ বিষয় সম্বন্ধে শিক্ষা দেবে।

৩। আপাতত প্রধান চারটি বিষয় শিক্ষা দিতে হবে। যথা—

(A) (i) দেশের কথা। তাতে থাকবে (a) দেশের অতীত গৌরবের ইতিহাস। (b) স্বাধীনতা ও কংগ্রেস। (c) দেশের কাজে জনগণের স্থান। (d) দেশের শাসনব্যবস্থা এবং বর্তমান পরিস্থিতি। তার সমস্যা ও তার সমাধানের উপায়। (e) জাতীয় পতাকা এবং তার ইচ্ছুরক্ষায় দেশের জনগণের কর্তব্য। দেশের প্রতি মানুষের মনে দেশের উপর ভালবাসা যাতে হয় এবং একতা ও নিরম্যনবৃত্তি যাতে বাড়ে সে দিকে প্রধান দৃষ্টি দিতে হবে। দেশের সংগঠনে দেশের জনগণই যে প্রধান, সেই বোধটুকু জাগাতে হবে।

(ii) দেশের ভূ-বিবরণ এবং পৃথিবীর কথা মোটামুটি। দেশের উদ্ভিদ, প্রাণী, সম্পদ।

(iii) দেশের শিল্পগঠন ও তাতে দেশের জনগণের লাভ।

(iv) চাষের উন্নতির কথা। বৈজ্ঞানিক উপায়ে ধান ও তরকারির চাষ।

(B) (i) স্বাস্থ্যরক্ষা ও শরীরগঠনের উপায়। পরিচ্ছন্নতা, নিয়মানুবর্তিতা, সময়ের জ্ঞান ও তার সদ্যবহার।

(ii) ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্ত, টাইফয়েড প্রভৃতি থেকে বাঁচবার উপায়।

(iii) নাগরিকের কর্তব্য ও দায়িত্ব।

(iv) সাধারণ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব।

(C) মুখে মুখে দরকারী হিসাব—যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ।

(D) (ii) দেশের প্রধান প্রধান মানুষদের পরিচয়।
জাতীয় সঙ্গীত।

৪। প্রতি গ্রামে আবঙ্গক অস্থায়ী একাধিক রাত-পাঠশালা থাকবে। সেখানে থাকবে জাতীয় পতাকা; পড়া, লেখা এবং হিসাব শেখানোর ব্যবস্থা থাকবে। সাময়িক ডিলের ব্যবস্থাও থাকবে। কাজ শেষ হলে তারা রোজ জাতীয় সঙ্গীত গান করবে পতাকার ভলে সমবেত হয়ে এবং পতাকা অভিবাদন করে বাড়ী যাবে। এই কাজে মণ্ডলের স্কুল ও কলেজের ছেলেরা সাহায্য করতে বাধ্য থাকবে।

৫। (i) প্রত্যেকটি বিষয় চলচ্চিত্র যোগে প্রত্যক্ষ করে শেখানো হবে।

(ii) বিজ্ঞানের প্রত্যেকটি বিষয়ে সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষা করেও দেখানো হবে।

(iii) অতীত ও বর্তমান, প্রধান প্রধান মানুষদের পরিচয় আলোকচিত্র এবং চলচ্চিত্র যোগে বলা হবে।

(iv) দেশের রাজ্যব্যবস্থা চলচ্চিত্রে অভিনয় সহযোগে প্রত্যক্ষ করানো হবে।

৬। দেশের বৈজ্ঞানিকদের এবং নিকীচিৎ লেখকদের সাহায্যে, গবর্নমেন্টের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনায় প্রত্যেকটি বিষয়ে সুনির্দিষ্ট এবং সংক্ষিপ্ত অথচ আবঙ্গক জ্ঞান দেবার মত যথেষ্ট বস্ত্র সন্নিবেশিত করে সরল, সর্বজনবোধ্য ভাষায় বই লেখানো হবে। শিক্ষাপ্রচারকেরা এই বইয়ের সাহায্যে কথকতা করবেন। [এ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকশ্রেষ্ঠ অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে সভাপতি করে এবং বঙ্গীয় বিজ্ঞান-পরিষদকে এ বিষয়ে ভার্যাপণ করে কাজ সুরু করা যেতে পারে। ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটে পরীক্ষিত সরল বাংলা শব্দপুঞ্জ ব্যবহার করে বই লেখা আরম্ভ করা যায়।]

প্রত্যেকটি লেখার মূল সুর হবে দেশের উপর নির্ভা জাগানো। দেশের উপর নির্ভা জাগলেই অজ্ঞাত কাজ সহজ হয়ে আসবে এবং অপরাধপ্রবণতাও কমবে।

৭। গবর্নমেন্ট লোকশিক্ষার উপযোগী করে এবং দেশ ও রাজ্যব্যবস্থা সম্পর্কে জনগণকে ওয়াকিফহাল রাখার এবং দেশের বিষয়ে উৎসাহ জন্মাবার জন্তে সরল সর্বজনবোধ্য বাংলায় বড় বড় অক্ষরে ছাপা একটি খবরের কাগজ (আপাতত সাপ্তাহিক) প্রকাশ করুন। এতে (i) দেশের ঘটনাটুটি খবর, (ii) চাষ-আবাদ, (iii) সরল বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গ, (iv) দেশের প্রশমিল্ল ও বাণিজ্য এবং তাতে জনগণের অংশ ও অধিকার, (v) আদর্শ গ্রাম গঠনের উপায় ও তাই নিয়ে রচিত শিক্ষাপ্রদ গল্প। (vi) বিদেশের কথা ইত্যাদি থাকবে। বঙ্গীয় বিজ্ঞান-পরিষদের উপর এর পরিচালনার ভার দেওয়া যেতে পারে এবং শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ও দেশের শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল লেখকেরা একে উপযুক্ত সংগঠনমূলক মন্তব্য পরিণত করতে পারেন।

..[ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটের “সরল শব্দপুঞ্জ” এ

বিষয়ে কাজে লাগতে পারে; এবং পরে তাকে ব্যবহারের আবঙ্গকে ক্রমে বাড়িয়ে, কমিয়ে পরিবর্তিত করে নেওয়া যেতে পারে।]

৮। ব্যাপক ভাবে ছায়াচিত্র, আলোকচিত্র এবং চলচ্চিত্র দেশের সমস্ত শিক্ষার কাজে ব্যবহার করতে হবে। নইলে জ্ঞান চিরকাল যেমন ছিল তেমনই অবাস্তব থেকে যাবে। অসম্বন্ধ এবং স্পরিকল্পিত ভাবে বিশেষজ্ঞ এবং স্নলেখকদের দিয়ে বই লেখালে তাকে চলচ্চিত্রে রূপ দিতে বেগী সময় লাগে না। [এ সম্বন্ধে, চলচ্চিত্রে প্রচারকার্যে নিপুণ এবং অভিজ্ঞ জ্ঞীযুত পি. এন. রায়কে ভার দিলে কাজ সহজে এবং অল্প সময়ে হবে।]

৯। প্রত্যেকটি নৈশ-বিদ্যালয়ের নিজস্ব ছায়া-ছবির ব্যবস্থা থাকবে। বিশুদ্ধ আনন্দ দান ও ক্রীড়া-কৌতুকের ও নৃত্যগীতেরও ব্যবস্থা থাকবে। রেডিওর ব্যবস্থা রাখতে হবে, এবং গ্রামের লোকের শিক্ষার উপযোগিতাতে বিশেষ প্রোগ্রাম থাকবে।

১০। প্রত্যেকটি গ্রামে যথাপরিমাণে কুটির ও ফাস্ট্রী শিল্পের ব্যবস্থা করতে হবে। যৌথ চাষী ফার্মের ব্যবস্থা করে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষের উন্নতির উপায় শেখাতে হবে।

এইজন্ত পরীক্ষামূলকভাবে আপাতত কলকাতা থেকে প্রায় ৪০ মাইল দূরে দূরে, ব্যাপক বৈজ্ঞাতিক ব্যবস্থা করে, তিনটি উল্লিখিতরূপ মণ্ডলে কাজ সুরু করে দেওয়া হোক। কাজ সুরু করে দিলেই তবে কাজের ক্ষেত্রে বাধাবিপত্তি এবং সুযোগসুবিধার হদিস পাওয়া যায়। ডাঙ্গায় বসে সাতার শিখে জলে নামতে গেলে জলে নামতে দেরি হবে এবং জলে নেমে জলে ডুবতে দেরি হবে না।

গবর্নমেন্টের প্রধান লক্ষ্য থাকবে এবং প্রাথমিক কর্তব্য হবে এইটে দেখা যে পরীক্ষা সংক্রান্ত মণ্ডলে কোনো সক্ষম বয়স্ক (১৬ থেকে উর্দ্ধ) মানুষ (স্ত্রী ও পুরুষ) যাতে বেকার বা অলস না থাকে। তাঁদের দ্বিতীয় কর্তব্য হবে—যাতে প্রত্যেকটি প্রশমিক, তা সে যে ভাবেই হোক; ১। উপযুক্ত মজুরী পায়; ২। আহাৰ্য্য ও বস্ত্র পায়; ৩। সুস্থ থাকবার সুযোগ পায়; ৪। শিক্ষা পায়; ৫। সম্মান পায়। এইজন্ত প্রত্যেক গ্রামে উপযুক্ত সংখ্যক প্রশমিল্ল প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

এই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক মণ্ডলের প্রত্যেকটি ব্যক্তির নাম রেজিষ্ট্রিভুক্ত থাকবে এবং তাদের অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে গবর্নমেন্টকে অবহিত হয়ে সেই মণ্ডলগুলির সমস্ত মানুষকে স্বচ্ছন্দে রাখবার ব্যবস্থা করতে হবে। আবার সেই সঙ্গে তাদের নিয়মানুবর্তী, পরিচ্ছন্ন এবং প্রতিবেশীর প্রতি সহৃদয় থাকার অভ্যাস করাতে হবে।

গ্রামের যে সমস্ত বয়স্কেরা গবর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠিত কলে, ফার্মে বা গৃহশিল্পে নিযুক্ত না হয়ে অজ্ঞত কাজ করবে তারাও প্রত্যেকে রেজিষ্ট্রিভুক্ত থাকবে এবং উক্ত সর্ব বিষয়ে গবর্নমেন্টের অভিভাবকতার আশ্রয় পাবে।

এ মণ্ডলে কোনো সক্ষম মানুষকে গবর্ণমেন্ট বেকার থাকতে দেবেন না। অদূর ভবিষ্যতে, দেশের বিপদ নিবারণ এবং সম্পদবৃদ্ধির জন্তে, ব্যাপকভাবে উৎপাদনের আবশ্যকতা ঘনিষে এসেছে। এখন আর সেই পুরাতন দীর্ঘস্থায়ীতা বা চিরন্তন নিষ্ক্রিয় পরিকল্পনা-বিলাসের সময় নাই। কোমর বেঁধে কাজে এখনি নেমে না পড়লে এত সাধের স্বাধীনতা সমূলে বিনষ্ট। কাজে নামলেই কাজ নিজের পথ দেখাবে।

এ মণ্ডলে ভিক্ষার ব্যবসা একেবারে উচ্ছেদ করতে হবে। দেশের মজাগত আলস্ত এবং নিষ্কর্মতাকে আবশ্যক হলে কঠোর আইন করেও দূর করতে হবে। এই স্বল্পে স্বল্পসম বুদ্ধ এবং যে সমস্ত মেয়ে শ্রমশিল্পে নিযুক্ত হবে না তাদের ঘরে বসে করার মত হাতের কাজের ব্যবস্থা করে দিতে হবে, এবং গবর্ণমেন্ট সেই সব কাজ কিনে নেবেন। নিজের উপার্জনে, আত্মসম্মানে এবং আত্মশক্তিতে নির্ভর করতে শেখাতে হবে।

বহুগুণাবধি পরমুখাপেক্ষী বিশ্বস্ত স্বভাবের অলসচিত্ত জাতিকে কর্মপ্রবৃত্তিতে জাগাতে হলে কঠোর নিয়মানুবর্তিতার আবশ্যক। গবর্ণমেন্ট দেশের ভবিষ্যৎ কল্যাণের দিকে চেয়ে সামরিক বিধানে এ মণ্ডলগুলিকে পরিচালনের ব্যবস্থা করবেন। দেখবেন, অতি অল্পকালের মধ্যেই তারা এই ডিসিপ্লিনে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে এবং এরই অনুকরণে গ্রাম সংগঠনের চাহিদা চারদিকে বেড়ে যাবে।

প্রত্যেক মণ্ডলে: অস্ত্র শিশু, রোগী ও বৃদ্ধদের হুধের ব্যবহার জন্তে গবর্ণমেন্টের অধীনে পরিচালিত গোল্ডাল এবং গোচারণ ক্ষেত্র অবশ্য থাকবে। প্রত্যেক মণ্ডলকে ব্যাধিমুক্ত করতে হবে এবং প্রত্যেক মানুষের জন্ত চিকিৎসার সুব্যবস্থা রাখতে হবে; নইলে সাধারণ ক্ষতির সঙ্গে সঙ্গে প্রমিতশক্তিরও অপচয় ঘটবে।

ছ' মাসের মধ্যে এই শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়ে যাবার কাগজ পড়ার মত বিজ্ঞা তারা পেতে পারবে।

এ জন্তে যে অর্থের আবশ্যক হবে তা অনেক রকমে সংগৃহীত হতে পারে—কয়েকটি প্রস্তাব করছি।

১। কর্মনির্বিশেষে নিয়োজগণ প্রত্যেক মজুরি বাবদ ১০ ছই পয়সা বেশী দেবেন। তাকে মণ্ডলের স্বাস্থ্য চাঁদা বলা হবে। এর দ্বারা উপযুক্ত চিকিৎসাদির ব্যবস্থা হবে।

২। বাংলাদেশের প্রত্যেক বাস ট্রামের টিকিটের মূল্য ৫- এক পয়সা করে বেশী দিতে হবে। তাকে বলা হবে সংগঠন চাঁদা।

৩। গবর্ণমেন্ট বাংলার যুদ্ধ বাজারে পুঁজি করা কোটি কোটি টাকা ধারের জন্তে চাইতে পারেন। উপযুক্ত হুদ কবুল করলে সে টাকাও কম হবে না।

৪। সপ্তাহে অস্ত্রত একদিন ছ' ঘণ্টা মণ্ডলের প্রত্যেক সমর্থ (১৬ থেকে ৪৫) মানুষকে গ্রাম পরিকার পরিচ্ছন্ন করার কাজ করতেই হবে।

এই সঙ্গে বলা দরকার যে ১৮ বছর থেকে ৩৬ বছরের যত মানুষ থাকবে, তাদের সামরিক শিক্ষা দিতে হবে।

কোনো অতিবিরাই পরিকল্পনার জন্তে বসে না থেকে এই রকম ছোট পরিকল্পনা নিয়ে কাজে নামবার উদ্দেশ্যে এখনি প্রস্ততির কাজ শুরু করা হোক। এর জন্তে প্রস্তুত হতে ছ' মাসের বেশী লাগার কথা নয়।

এই স্বল্পে বাংলাদেশ সংগঠনের প্রধান অন্তরায় দূর করার কথা মনে রাখতে হবে। বাংলার চৌত্রিশ হাজার গ্রাম আজ পরিত্যক্ত স্থান। গ্রাম যদি ক্রমে শূন্য হয়ে যায় তবে সংগঠন হবে কাদের নিয়ে? সামান্য কলনশক্তি খাটালেই আমরা দেখতে পাব যে কলকাতাটা সমস্ত বাংলাদেশের দেহে একটা বিষাক্ত কাবাংকুরের মত ক্রমে ক্ষীত হয়ে সমস্ত বাংলার রস রক্ত স্বাস্থ্য বিত্ত এবং খাদ্য আকর্ষণ করে বাংলাদেশকে স্থানে পরিণত করেছে। পাগলের মত সকলে সব নিয়ে ছুটেছে কলকাতার দিকে—টাকা টাকা টাকা। নীতিধর্ম মনস্তত্ত্ব দেশ এবং দেশের কল্যাণ চূলোয় গেল। এমনি করে নানা প্রতিষ্ঠান, ধর্ম ও সংস্কৃতির আধার এই কলকাতাও যে ধ্বংসের মুখে চলেছে তা আমরা চোখ মেলে দেখি না। তারও সমস্তা এবং বিপদ ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এমন কি শয়তানকে আমরা প্রলুব্ধ করে তুলছি একদিন অকস্মাৎ একে হিরোশিমায় পরিণত করতে। দেশ সংগঠন এবং কলকাতার ক্রমবর্ধমান পুঞ্জীভূত সমস্তা সমাধানের প্রধান উপায় কলকাতাকে বিকেন্দ্রিত (decentralize) করা। অর্থাৎ কলকাতা শহরকে সমস্ত বাংলাদেশময় ছড়িয়ে দেওয়া। পাঁচ-সাতটি গ্রাম নিয়ে এক একটি ছোট কৃষি শিল্প শহর (যাতে শহরের আরাম এবং গ্রামের পরিবেশ থেকে কেউ বঞ্চিত না হয়) ক্রমে ক্রমে গড়ে তোলা।

Back to the village—নয়। এ কাজ এখনি শুরু করে দেওয়া দরকার—কেননা এ বিরাট ব্যাপার কাজে পরিণত করতে সময় লাগবে। নইলে হঠাৎ একদিন একটি আণবিক বোমায় “হুংকারে ফাটিবে এই দম্ভমুঞ্চবানি, জলবিধ্বসম।”

সঙ্গে সঙ্গে কলকাতা তথা বাঙালীর খাদ্য ও হুদ সমস্তা, বাসগৃহ ও স্বাস্থ্য, জলসরবরাহ, শহরের পরিচ্ছন্নতা, আদর্শ কলেজ ও স্কুলের জন্ত ভূমি প্রভৃতির সমস্তা এবং কলকাতার ধনিক জমিদারদের চিরদিনের লজ্জা—কলকাতার সর্বরোগ ও পাপের আধার কুঠফতরুণী চার হাজার বস্তি সমস্তা; অপিত নৈতিক, রাজনৈতিক, শাসন ও হুঠের দমন প্রভৃতি আরও অনেক সমস্তার সমাধান সহজ হয়ে আসবে।

কলকাতার বিপদ একলা বাংলার বিপদ নয়, এ বিপদ

নিখিল ভারতের। অতএব কলকাতা বিকেন্দ্রিত করার কাজে সমস্ত ভারতবর্ষ থেকে গণ সংগ্রহ করে এবং অগ্রাঙ্ক উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করে ভারত গবর্ণমেন্টকে অবিলম্বে বাংলা গবর্ণমেন্টের সাহায্যে অগ্রসর হতে হবে। নইলে আসন্ন

তৃতীয় মহাযুদ্ধে ভারতের স্বাধীনতা বিপদগ্রস্ত হবে। মোহ-মুক্ত মন নিয়ে, ভবিষ্যৎ দৃষ্টিকে পরিচ্ছন্ন রেখে স্থিরচিত্তে চিন্তা করে দেখলেই একথা হৃদয়ঙ্গম করতে কষ্ট হবে না।

শিল্পী সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়ের ভাস্কর্য-শিল্প

শ্রীললিনীকুমার ভদ্র

উদীয়মান শিল্পী শ্রীসুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়ের অঙ্কিত বহু ছবি ইতিপূর্বে প্রবাসী ও মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া শিল্পরসিকদের আনন্দদান করিয়াছে। Wilfrid S. Lynch ১৯৪৩-এর ফেব্রুয়ারী সংখ্যা মডার্ন রিভিউতে “Sushil Mukherjee—An Artist” নামক প্রবন্ধে সুশীলকুমারের শিল্পকলার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছিলেন। ১৩৫২ সনের চৈত্র সংখ্যা প্রবাসীতে ‘বর্তমান ভারতীয় চিত্রকলা ও শিল্পী সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়’ নামক প্রবন্ধে এই কুশলী শিল্পী সম্বন্ধে আমরা মন্তব্য করিয়াছিলাম যে, ইঁহার ভবিষ্যৎ বিপুল সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ। সম্প্রতি এই রূপকারের প্রতিভার একটি নূতন দিক খুলিয়া যাওয়ায় আমরা এঁর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অধিকতর আশাবিত্ত হইয়াছি।

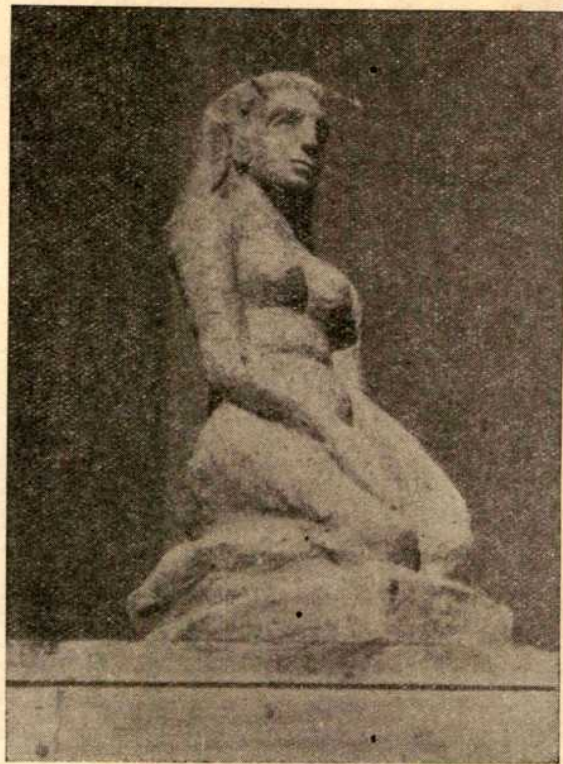
সুশীলকুমারের কর্মক্ষেত্র এককাল ছিল মাত্রাজে। বর্তমানে তিনি সিঙ্গিয়া পাবলিক স্কুলের জুনিয়র বিভাগে শিল্পশিক্ষক-রূপে নিযুক্ত হইয়া গোয়ালিয়রে চলিয়া আসিয়াছেন এবং পাহাড়ের উপরিস্থিত গোয়ালিয়র ছুর্গে বাসা বাঁধিয়াছেন। এই ছুর্গে প্রাচীন ভাস্কর্যশিল্পের যে সমস্ত নিদর্শন রহিয়াছে তাহা এই কলারসিকের বিয়ুজ্ঞ দৃষ্টির সমক্ষে এক অভিনব রূপলোকের দ্বার উল্ঘাটিত করিয়া দেয় এবং তাঁহাকে নব নব রূপসৃষ্টির প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলে—স্বল্পকাল মধ্যেই পাথর কুঁদিয়া তিনি কতকগুলি চমৎকার মূর্তি গড়েন।

ম্যাথু আর্গল্ড বলিয়াছেন, “Without sincerity no vital work in literature is possible”। একথা শুধু সাহিত্য নয়, যাবতীয় কলাবিজ্ঞা সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। যে আন্তরিকতার স্পর্শ সুশীলকুমারের চিত্রগুলিকে এমন প্রাণবন্ত করিয়া তুলে তাহা তাঁহার ভাস্কর্য্যেও সুপরিষ্কৃত। সুশীলকুমারের চিত্রে এবং ভাস্কর্য্যে আরও একটি বিশেষত্ব লক্ষণীয়—সেটি হইতেছে তাঁহার রচনার বলিষ্ঠতা।

বর্তমান প্রবন্ধে সুশীলবাবুর ক্ষোদিত যে তিনটি প্রস্তরমূর্তির প্রতিচ্ছবি প্রকাশিত হইল তাহা হইতে তাঁহার ভাস্কর্য্যশিল্প-নৈপুণ্যের কণ্ঠস্বর আভাস পাওয়া যাইবে।

প্রথম মূর্তি ‘উপবিষ্টা রমণী’তে নারীদেহের গঠনসৌষ্ঠব ও সুধামা অনিন্দ্যভাবে রূপায়িত। মহিলাটির দসিবার দৃঢ়

মনোহর ভঙ্গিটি নয়নমনোমুগ্ধকর। শিল্পীর অপূর্ব দক্ষতা-গুণে নীরস পাথরে নারীর দেহলাবণ্য পরিপূর্ণ মাধুর্য্যে

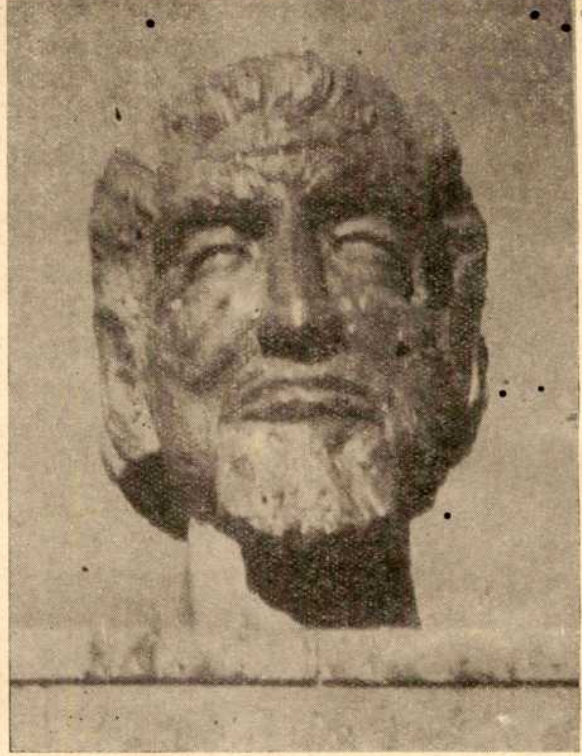


উপবিষ্টা রমণী (১নং)

ফুটিয়া উঠিয়াছে। ‘মুখাবয়ব’ (২নং) মূর্তিটিও চিত্তাকর্ষক। জীলোকটির অন্তর্গত বেদনা যেন তার আননে প্রতিফলিত। ‘ধর্ম্মোদ্ধার’ (৩নং) মূর্তিটির মুখের প্রতিটি রেখায় ধর্ম্মোদ্ধারতাজনিত মূঢ়তা ফুটিয়া উঠিয়াছে। হৃদয়হীনতা, কঠোরতা এবং সঙ্কল্পের দৃঢ়তা এই তিনের সংমিশ্রণ লোকটির চেহারাকে একটি লক্ষণীয় স্বাতন্ত্র্য দান করিয়াছে। আধুনিক কালের সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিসম্প্রাত শোচনীয় বীজংসতার ইতিহাস যেন এই মূর্তিটিকে ছিরিয়া বিরাজ করিতেছে।



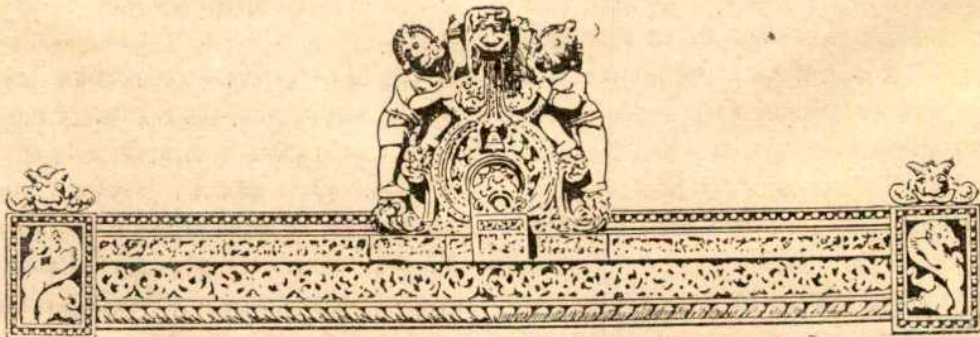
মুথাবয়ব (২নং)



ধর্মোদাদ (৩নং)

ভারতীয় ভাস্কর্যের অতীত ইতিহাস গৌরবময়। ইহার প্রভাব একদা চীন, জাপান, ব্রহ্ম, ইন্দোচীন এবং যবদ্বীপে বিস্তৃত হইয়াছিল। পাল সম্রাটদের আমলে বাংলার ভাস্কর্য্য সুদূর নেপালে পর্য্যন্ত সমাদৃত হইয়াছিল। ছুংখের বিষয় নব্য বাংলার চিত্রকলার তুলনায় ভাস্কর্য্যশিল্পের তেমন উন্নতি হয় নাই। বর্তমান বাংলার কৃত্তী ভাস্করদের মধ্যে দেবীপ্রসাদ রায়-চৌধুরী, সুবীর খাণ্ডগীর, সুনীলকুমার পাল প্রমুখ মাত্র কয়েক-জনেরই নাম উল্লেখযোগ্য। দেবীপ্রসাদ সুনীপুণ ভাস্কর হিসাবে সর্কভারতীয় খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন।

সম্প্রতি বাংলার ভাস্কর্য্যশিল্পের পুনরুজ্জীবনের লক্ষণ দেখা যাইতেছে। ভাস্কর সুনীল পাল নেপালে গিয়া দীর্ঘকাল পরে আবার সেখানে বাংলার ভাস্কর্যের বিজয়-পতাকা উড্ডীন করিয়া আসিয়াছেন। দেবীপ্রসাদের সুযোগ্য শিষ্য সুনীল-কুমারের পাথরে খোদাই করা প্রাথমিক কাজগুলি দেখিয়া মনে হয় ভবিষ্যতে তাঁহার হাতেও তুলির সঙ্গে সঙ্গে ছেনি ও বাটালি সমান তালে চলিবে এবং তাঁহার স্বজনীপ্রতিভার নব নব অবদানে আমাদের দেশের ভাস্কর্য্য-শিল্প-ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হইবে।



সোনার সন্ধ্যা

শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ



সোনিয়াকে আমি ডাকতাম সোনা বলে। এমন একটা সার্থক-
মনা বোধ হয়, পৃথিবীতে কেউ তার প্রেয়সীকে দেয় নি।

সোনিয়ার গায়ের রং ছিল সোনারই মত সুন্দর ও
উজ্জ্বল আভাসে ভরা। সাধারণ রাশিয়ানের মত রঙের
আভাছীন সাদা নয়। কৃষ্ণাগরপারের রোদ তার শুভ্র
সৌন্দর্যকে স্নিগ্ধ সোনালী রঙে রাঙিয়ে দিয়েছিল, আর
তার বিস্তৃত কেশরাশিতে মনে হ'ত বর্ষার ভল্গা নদীর
সুবর্ণধারা ঝরে ঝরে পড়ছে। দেখলেই মনে পড়ে বৈষ্ণব
কবিতার অমর বর্ণনা—থির বিজুরী বরণ গৌরী। সোনার
বরণী ছিল আমার সোনা।

আর সোনীকে এ নাম দিয়েছিলাম আমি—স্বর্ণময় সেন,
যার কথা বাংলাদেশে কারও এই ত্রিশ বছর পরে মনে নেই।
যার বাপ-মা ছেলের এই নাম রাখবার সময় ভাবেন নি
স্বপ্নেও ভবিষ্যতে কত সুবিধা হবে এই নামে। তাদের
সোনার চাঁদ ছেলে—কাঁচা সোনার মত ছিল রং, আমার ও
আমাদের দেশের হিসাবে, আর চাঁদের মতই ছিল আমার
মুখচন্দ্র—সহজেই চীনে বলে বিদেশে নিজেকে চালিয়ে
দিয়েছিল। নামটাও তখন সান ইয়াং সেনের পৃথিবীজোড়া
নামের কল্যাণে চীনে বলেই চলে যেত। আহা বাপ মার
এত আদরের ছেলে হয়ে গেল ভবঘুরে—খর ছেড়ে বেড়িয়ে
গেল বিশ বছর বয়সে, কেবল শুধু অনির্দিষ্ট অজ্ঞাত
এডভেঞ্চারের আলোয়ার পেছনে। সফল রইল শুধু বাঙালী-
হুল্লভ দেহসৌষ্ঠব ও বিদেশী ভাষা চর্চা করে আয়ত্ত করবার ইচ্ছা
ও ক্ষমতা। এই ছোট মূলধন নিয়েই আমি কয়েক বছর
মস্কোতে একটা বিদেশী রাজদূতাবাসে অসুবাদকের কর্ম
নিয়ে ছিলাম। শুধু যে অসুবাদক তা নয়, এত দিন পরে
স্বীকার করতে লজ্জা বা বিপদ নেই যে মস্কোলিয়ান চেহারা
ও সানো মায় সেন এই নামের সুবিধা নিয়ে সেই রাজদূতাবাসের
হয়ে গুপ্তচরবৃত্তিও যে না করতাম তা নয়। ফলে
স্বর্ণময় সেনের পকেটে স্বর্ণের অভাব মস্কোতে কখনও হয় নি।
১৯১৭-১৮তে মস্কোর কোন্ নাচঘর, কোন্ থিয়েটার বা
নাইট ক্লাব সেনস্কিকে না চিনত?

আজ বার্লিনের দুয়ারে দাঁড়িয়ে আমার সমবয়সী স্বদেশী
কাঙালীদের কাছে বাড়ির কোণের পার্কে বসে রোজ বিকেলে
শুনি ওসব দেশের কাফে রস্তোরী, নাচঘর এসবের অসারতা
আর মেকী সোনালী রঙের সমালোচনা। চুপ করে শুনি;
আর চুপ করে শোনে দেবদারু গাছগুলি। ওরা মাথা
ছুলিয়ে নীরবে প্রতিবাদ করে; আমি অতীতের সেনস্কি
তাও করি না। শুধু ভাবি কি যে সোনার সন্ধ্যা পেয়েছিলাম

তা তোমরা স্বর্ণময় সেনের স্বদেশের কোঁকরা শুনেই করতে
পারবে না। তোমরা অন্ধকারেই থাক—আমার সোনার
দীপ্তি আমারই অন্তরকে উজ্জ্বল করে থাক সংগোপনে।

হোটেল মেট্রোপোল সেদিন শনিবার রাত্রিতে উৎসব-
মত্ত হয়ে, আত্মহারা হয়ে আনন্দের স্রোতে ভেসে যাচ্ছিল।
এত আলো, এত রং, এত সৌরভ। ছোট ছোট কোলানো
বারান্দা প্রকাণ্ড হলটাকে ঘিরে রেখেছে; তার কীকে কীকে
দেখা যাচ্ছে ক্যাবিনেট অর্থাৎ নিভৃত কামরাগুলি, যেখানে
সকলের উৎসুক সন্ধানী নয়ন এড়িয়ে রুবল (রাশিয়ার টাকা
তখনকার দিনে ১৫০ আনা আন্দাজ মূল্য ছিল) ও শ্রাপ্পেনের
খেলা চলে, আর তার সঙ্গে ভাড়াটে প্রেমের লীলা।
রেস্তোরার হলে গোলকধাঁধার সৃষ্টি করেছে ছোট ছোট
টেবিলগুলি। চারজনের টেবিলই বেশী; কিন্তু বেশী প্রিয়
হচ্ছে দু'জনের টেবিলগুলি; সেখানেই সঙ্গীত ভেসে আসে
বেশী—যদিও তা কানে ঢোকে না। শ্রাপ্পেন আনন্দ-বুদুদে
মাতোয়ারা হয়ে ওঠে যদিও দু'জনের আত্মহারা আনন্দের
তন্ময়তা অতিক্রম করে সে সুরা মধুরাধরে উঠাবার সৌভাগ্যই
হয়ত পেলো না। কিন্তু রেস্তোরার যত যুঁহু গুঞ্জল সবই ওঠে
ওই টেবিলগুলি থেকে। পানাহারের জন্ত দু'জন ও দু'জনের
জুই পানাহার আসে। সবাই ওদিকে চোরা চাহনিতে
তাকায় যদিও মনে হবে যে তাকিয়ে দেখছে না কেউই।
ঘরের একটা প্রান্তে উঁচু বেদীর ওপর অর্কেস্ট্রা পরিচালনা
করছে এক শিল্পী। দেখে পুলিশ মনে হয়। রাশিয়াতে
বিদেশী না হলে শিল্পীর আদর তখন হ'ত না।

শিল্পেরও আদর হ'ত না বিদেশী না হলে। তাই একটা
যাযাবর-সঙ্গীত বাজান হচ্ছিল; তার করণ মূর্ছনা বেহালার
ছড়ের আঘাতে কেঁদে কেঁদে ঘরময় হুটাইছিল আর আমি
হাতলওয়াল ফুলের সাজির আকারের একটা গরম রঙের
ওপর রাখা দামী “কাভিয়ার” খাচ্ছিলাম। সুরের করণতার
সঙ্গে মিতালি রেখে ঘরটিকে প্রায় অন্ধকার করে ফেলেছে আর
তার মধ্য থেকে ফুটে বের হচ্ছে হীরাজহরতের ছাতি।
চারদিকে রূপসী নারী, তাদের অঙ্গসৌরভ ও দেহসৌষ্ঠব
মদিরার মত সঙ্গীত ও সঙ্গীতের মত মদিরা, আমার সামনে
বিস্তারিত “কাভিয়ার”। স্বর্ণময় সেন তখন কোথায়?
সেনস্কি স্বর্ণময় হয়ে আবেশে চোখ বুজে জিপসী সঙ্গীতের তালে
তালে দামী কার্পেটে পা ঠুকছে সবার অগোচরে। এমন সময়ে
তীব্র আওয়াজ হ'ল রিভলভারের। উপরের এক খুল বারান্দায়
একটা তীক্ষ্ণ আর্জনাড ও তার পরেই সামরিক বৃটের আওয়াজ
সব কোলাহল ও কলকাকলি ছাপিয়ে জেগে উঠল হলটাতে।

পুলিসের ও মিলিটারীর খানাতল্লাসী সুরু হ'ত যথারীতি। ১৯১৭ সালের মস্কোতে মোটেই এটা নতুন জিনিস নয়। ওদের সন্ধানের রূচতা ও ভীষণতা সাধারণ লোকের বেলা যেমন ভাবে ফুটে উঠত অভিজ্ঞত বা রাজপুরুষদের বেলা ঠিক তার বিপরীত। বিদেশী রাজদূতবাসের লোক বলে আমিও নামমাত্র প্রশ্ন ও পরিচয়ের পরেই নিষ্কৃতি পেলাম। কিন্তু পেলে না সোনার বরণী এক তরুণী।

ওই বিরাট হলে শুধু তারই সম্ভাষণক কোন পরিচয় বা ওখানে আসার উপযুক্ত কারণ বুঝে পাওয়া গেল না। পাশের টেবিলেই সে একা বসেছিল, তা দেখেছিলাম; ভীষণ হরিণীর মত চাহনি ছিল তার, সন্ধ্যাতারার মত সুদূর কুতূহলী দৃষ্টি তার এই অনভ্যস্ত অনাস্বাদিতপূর্ব সম্মেলনের উপর নৈর্ব্যক্তিক ভাবে ছড়িয়ে পড়ছিল। প্রলোভন হচ্ছিল যে উঠে তার টেবিলে গিয়ে বসি, পরিচয় করি এই কুণ্ঠিত সলজ্জ বিদেশিনীর সঙ্গে, পরিচয় করিয়ে দিই তাকে এই আনন্দশালার গোপন রহস্যের সঙ্গে। কিন্তু পারি নি। তার কুণ্ঠার অবগুণ্ঠন উন্মোচন করে তপোবনবাসিনী শকুন্তলাকে প্রমোদসভার অনাবরণ বিপণিতে নিয়ে আসার প্রলোভন সংবরণ করেই বসে ছিলাম।

এখন বুঝতে পারলাম যে, রাজনৈতিক গুপ্তহত্যার দায়ে এই নিরপরাধ তরুণী ধরা পড়েছে। অতএব একে পুলিশপোলাও চালান যেতে হবে সাইবেরিয়ায়। ভাবতেই—ওই তুষারের মত চিরশীতল নির্জন নির্বাসনের কথা ভাবতেই মাথা গরম হয়ে গেল। এগিয়ে গেলাম দৃঢ়পদে পুলিশের সামনে।

আমার বিদেশী রাজদূতবাসের মর্যাদা ও তার চেয়ে বেশী কাঙ্ক্ষনমূল্যে সোনিয়া ছাড়া পেল সেই রাতেই। নিরাপরাধ বালিকা বিদেশে ইউনিভার্সিটিতে পড়ে স্কলারশিপের উপর নির্ভর করে। তারুণ্যের অদম্য কৌতুহল তাকে এই নৈশ বিলাসশালায় টেনে এনেছিল এক রাত্রির জন্ত। গোপনে সে একটি বার মাত্র হোটেল মেট্রোপোলের শনিবার রাত্রিটিকে দেখে যাবে; এই অভিসার কেহ জানতে পারবে না এই ছিল তার অভিলাষ। তার পরিবর্তে হঠাৎ এল সাক্ষাৎ শমনের মত সাইবেরিয়ায় নির্বাসনের সম্ভাবনা, নিদেন পক্ষে চারদিকে জানাজানি, স্কলারশিপ হারানো ও ইউনিভার্সিটি থেকে বহিষ্কার। কিন্তু সব কিছুর বদলে তরুণ উষার মত তার নিরুপায় জীবনে উদয় হ'ল সেনসি।

উষার অরুণরাগে ভরে উঠল ছুটি জীবন।

তার পরের দিনগুলির কাহিনী সেই অরুণরাগে রঞ্জিত। একই পৃথিবীতে আমরা দু'জনেই দাঁড়িয়ে আছি। সে যায় কলেজে, আমি যাই আপিসে, কিন্তু সন্ধ্যাগুলি যেন রামধনুর মত বিচিত্র বর্ণে সজ্জিত হয়ে, আকাশকে স্পর্শ করে নেমে আসে আমাদের দু'জনের মধ্যে সেতু রচনা করে। সেই সেতু বেয়েই ত আমরা সারা দিনের দুস্তর বিরহ, দুই দেশের দুই

মনের দুরতিক্রম ব্যবধান সত্ত্বেও দু'জনের কাছে আনাগোনা করি গোপনে। এমন ভাবেই দিনগুলি চলছিল।

অপরাত্তের মিলন নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে আসন্ন সায়াক্ষের পদধ্বনি শুনতে শুনতে শ্লান হয়ে আসে। ক্ষণস্থায়ী সে সুখচঞ্চল চরণে আমাদের নিয়ে যায় নাচঘরে, অপেরায়, রেস্টুরায়। চারুহাসিনী সোনিয়ার মুখে হাসি ফুটে উঠতে না উঠতেই গীর্জার ঘড়ি সচকিত করে তোলে তাকে। উপায়ই বা কি? আমাদের সময় কাটে পথে, না হয় প্রমোদ-গৃহে।

তারই মধ্যে অবকাশ একটু বিস্তৃতি লাভ করে শনিবার-গুলিতে। ছুপুরের পরে আমার কাজ নেই, বিকালে নেই তার ক্লাস। একদিন আমরা শহর ছেড়ে অনেক দূরে চলে গেলাম জিপসী সঙ্গীত শোনবার জন্ত। “ট্রয়কা”য় (আরব বোড়ায় টানা গাড়ী) চড়ে আমরা পাড়ি দিলাম সুদূরে।

সে দিন বিকাল থেকেই বৃষ্টি পড়ছে। সুরধার শীত আর মুষলধার বৃষ্টি ছুয়ে মিলে মনে করিয়ে দিচ্ছে যে যদিও আমি রুশীয় মঙ্গোলীয়ান সানো-মার-সেন, মস্কোতে সেনসি নামে অভিহিত, আমার উর্ধ্বতন চৌদ্ধ পুরুষ বাঙালী।

একটা কাচের প্রাসাদ—বরকে ঢাকা—তার ভিতরে গরম দেশের পামগাছ সাজান। অদ্ভুত, একেবারে প্রাচ্য ব্যাপার। কাঠের গনগনে আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে খোলা ‘ফায়ার প্লেসে’। তার কাছে আমরা বহু দর্শক ও শ্রোতা জমা হয়েছি। এক জিপসী গায়িকার সঙ্গে এল চারজন বেদে রঙীন ট্রাউজার ও শাদা ব্রোকেডের জামা পরে ও চারজন বেদেনী রঙীন রেশমী কুমাল মাথায় বেঁধে। সামনে প্রকাণ্ড লম্বা গ্লাসে ঢেলে দিলে চারোচকা নামে পানীয়। গান শুনতে শুনতে পান করতে হবে এক চুমুকে ও এক নিঃশ্বাসে—কিন্তু কেবল তখনই যখন গায়িকা এসে সামনে দাঁড়াবে। তারপর গ্লাস উপুড় করে রেখে দেখিয়ে দিতে হবে যে একটি বিন্দুও বাকী নেই।

আমার মন কিন্তু ছিল না এ গানে। যদিও দরদী গলায় আদিম বিষাদ ও অনন্ত কারুণ্যে ভরা গান তারা গাইছিল, যদিও স্নান জাতির বিশেষত্ব, বঞ্চিত মানবতার ব্যথা ছবির মত সে গানে ফুটে উঠছিল, আমি মনোযোগ দিতে পারি নি এ গানে। আমি অনুভব করছিলাম যে আনন্দ-সন্ধানের মধ্যে সোনিয়ার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ও এতদিন সাঙ্ঘাতিক হ'ল হয়ত এই জীপসী গানের সুরের মতই শীঘ্রই হবে তার শোচনীয় অবসান। বাইরে যুদ্ধে পরাজয়, ভিতরে খাড়াভাব ও বিরাট অসন্তোষের ফলে রাশিয়ার রাষ্ট্রতরঙ্গী প্রায় বানচাল হয়ে এসেছে। যে-কোন সময়ে উল্টে গেলে আমরা সবাই একসঙ্গে ভুবে যাব।

সত্য কথা বলতে কি, রাশিয়া দেশটাই হচ্ছে বিষাদের দেশ। ওরা জন্ম থেকেই অনুভব করে বিষাদ—যেমন ভাবে আমরা অনুভব করি অবসাদ। কিন্তু যাযাবর গৃহত্যাগী

সেনস্কির তো বর্তমান অবস্থায় বিষাদ বা অবসাদ কোনটাই জরুরি করবার কথা নয়। সোনিয়ার সঙ্গ সোনালী আঙনের উত্তাপে ভরা, সে হচ্ছে আনন্দের প্রতিমূর্তি। তার সঙ্গে পরিচয়ের পর থেকে তো আর বিষাদ বা অবসাদ কোনটারই প্রাবল্য হওয়ার কথা নয়। কিন্তু আমি যখন ওকে ভালবাসতে আরম্ভ করলাম এবং সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারলাম যে সেও আমাকে আগে থেকেই ভালবাসতে শুরু করেছে তখন থেকেই আমি রাশিয়ান বিষাদের প্রভাবে পড়লাম। আজ ভেবেছিলাম যে শহর থেকে অনেক দূরে নতুন রকমের সন্ধ্যা বাপনের মধ্যে, হাসি গান কলরবের মধ্যে এ বিষমতাকে বিদায় দিতে পারব। সে আশাতেই এখানে এসেছিলাম। জিপসীরা একটার পর একটা “চারোচকি” গান গেয়ে যাবে আর স্বহস্তে একটার পর একটা গ্লাস ভরে দিয়ে যাবে চারদিকে। সবাই হয়ে উঠছে মাতোয়ারা; প্রাণে ফুটেবে স্নেহের ফোয়ারা আর চারদিকের ছড়ানো আনন্দ-কাকলির মধ্যে আমরা ডুবে যাব।

গানের দরটি খুব সরগরম হয়ে উঠেছিল; আস্তে আস্তে আমরা ছুঁজনে বাইরে চলে এলাম। ছোট একটা হ্রদের পাশে এই জিপসী প্রানাদ। বাইরের ঠাণ্ডা বাতাসে জলের ধারে আমার মনে আনন্দ ও বেদনা একসঙ্গে দোলা দিতে লাগল। অতি ধীরে সঙ্গপূর্ণে আলগোছে আমার হাতে একটু চাপ দিয়ে সোনা প্রশ্ন করল, ‘তুমি আজ অত কি ভাবছ?’

‘না, কই কিছু ত ভাবছি না।’

না, কিছু ভাবছ না ত করছ কি? বেদের গানে এত কি মজা পাচ্ছ তা হলে যে কথাও কইছ না। তা আমি তো ভেবেছিলাম যে তোমাদের অঞ্চলেও বেদেরা আছে। অনেক আর তাদের গান তোমার কাছে নূতন নয়।’

‘কিন্তু আমি তো মঙ্গোলীয় রুশ নই। আমি ভারতীয় আর কলকাতায় আমার বাড়ী।’

মধুর ভাবে হেসে উঠল সোনিয়া। বললে—সেনস্কি, তুমি বোধ হয় নূতন একটা তামাশা শুরু করলে আমার সঙ্গে। টাগোরের ছবি আমি দেখেছি। তুমি যদি তার দেশের লোক হও তবে আমিও নূতন একটা দেশ বেছে নেব নিজের বলে চালাবার জন্ত।

আমি চঞ্চল হয়ে প্রতিবাদ করলাম। বললাম—জীবনে বহু মিথ্যার আশ্রয় আমি নিয়েছি সোনা। আমার ভবঘুরেরুত্তির তাড়নায়। আমি ভারতীয় এ কথা জানাজানি হলে আমার চাকরি নিয়েও টানাটানি হবে হয়ত এই যুদ্ধের বাজারে। তবু তোমার কাছে আমি সত্য প্রকাশ করবই। আমি রুশীয় নই, ভারতীয়।

চুপ করে রইল সোনা। চুপ করে নিশ্চল হয়ে রইল হ্রদের অচঞ্চল জলরাশি—শুধু আমার হৃদয়ের রক্তস্রোত অধীর চঞ্চল হয়ে সোনার স্নেহের কথার প্রতীক্ষায় উদ্ভূত হয়ে রইল।

খানিক পরে আমিই সে নীরবতা ভাঙলাম। বললাম—সোনা, সোনিয়া, আমার দেশ আমাদের মধ্যে কি কোন ব্যবধান আনল?

কোন উত্তর নেই। শুধু চাঁদের আলো বিরাট ফার গাছগুলির ফাঁকে ফাঁকে বিষাদময় মায়াজাল রচনা করে নীরব হয়ে রইল। আবার ভাললাম, কিন্তু কোন সাড়া নেই।

বুঝলাম যে সে মায়ী লোপ পেয়ে গেছে কোন কারণে; সে বীণার সোনার তার কেটে গেছে হয়ত অকারণে। কিন্তু আজ, আজ আর প্রশ্ন করে লাভ নেই। রাশিয়ান মন আজো আমি বুঝে উঠতে পারি নি। না হলে সোনা শুধু একটি তথ্য আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে এমন করে ভাবলেশহীন হয়ে গেল।

‘ট্রয়কা’তে চড়ে একসঙ্গেই ফিরে এলাম। পথে যেতে যেতে আকাশপাতাল কত কি যে ভাললাম তার ইয়ত্তা নেই। কেন সোনা এত নীরব রইল। সোঁক বিদেশী বলে বিদ্বেষ করবে আমায়? না, রাশিয়ার প্রত্যন্ত প্রদেশগুলিতে প্রায় বিদেশীই বটে আর সে তো আমায় মঙ্গোলীয় বলেই ধরে নিয়েছিল? ভারতীয় কি তার চেয়েও বেশী বিদেশী?

তবে কি ভারতীয় বলে সে আমায় হেলা করলে? তাও ত নয়। যে রবীন্দ্রনাথের ছবি দেখেছে, তাঁর কবিতার অনুবাদ পড়েছে সে ত এ রকম করতে পারে না। আর রাশিয়ানরা তো ভারতবিদ্বেষী মোটেই নয়।

তবে? পুরো একটা সপ্তাহ অভিমান? প্রশ্নাকুল চিত্তে আমি চুপ করে রইলাম। রেষ্টোরী ও রাজপথ দুই-ই ছেড়ে দিলাম; আপিস থেকে বাসায় সোজা চলে এসে ডাকের প্রতীক্ষা করতাম। কিন্তু তার কোন সাড়াই পেলাম না। সারাটা সোনার সন্ধ্যা ব্যাকুল প্রতীক্ষায় থেকে থেকে অধীর হয়ে যখন পোশাক ছেড়ে কালো পাড় দেওয়া লাল রঙের কশাক পায়জামা পরে বিছানায় শুয়ে পড়তাম নিজেকে এত-অসহায় মনে হ’ত। এতদিন প্রেমের কবিতা পড়িনি; ভাবতাম ওসব জিনিষ মানুষের উদ্ভট কল্পনার ছবি। নিজের জীবনে যখন প্রেমের সত্যিকার অনুভূতি এল তখন কবিতা পড়ার সময় বা প্রয়োজন ছিল না। দুই-ই এল তখন যখন প্রেম সোনালী সন্ধ্যার মত জীবন থেকে বিদায় নিয়ে যাচ্ছে।

ভাল লাগত না কিছুই। প্রেমের কবিতাও নয়। শেষে এল অভিমান। বেশ শুধু একটা সত্য কথা, যেটা অগৌরবের নয়, অপকারেরও নয়, তারই প্রকাশে যদি প্রেম উবে যায় কর্পূরের মত, তাকে যেতে দাও। এই রাশিয়ার বরফের মতই যদি তা সত্যের উত্তাপে গলে যায় তবে যাক। বুঝে নিলাম যে রাশিয়ান প্রেম তুষারশীতল, কিন্তু তা গলে প্রাণগগ্নরূপে প্রবাহিত হবার নয়।

কিন্তু হায়, অভিমানে ত মন মানে না। নিয়তির মত

চিরন্তন যে প্রেম তাকে কি এত সহজে মন থেকে সরিয়ে রাখা যায়? সোনিয়া না হয় আর নাই দেখা করতে আসে, আমিও ত আর তার খবর নিই নি। কে জানে সে হয়ত এর মধ্যে আমার সন্ধান করে ফিরে যাচ্ছে কতদিন; সে নিজেও হয়ত কত কষ্ট পাচ্ছে আমার কথা ভেবে, আমি তার খবর নিচ্ছি না বলে। অথবা কে জানে হয়ত তার অস্থখও করে থাকতে পারে সে দিনকার দুরন্ত নীতে নৈশ অভিযানের পর।

এ কথা মনে হবার পর আর চুপ করে থাকতে পারি না। তার সঙ্গে টেলিফোনে কথা কইলাম এবং আবার দেখা হওয়ার বন্দোবস্তও করলাম। যাতে ভাল ভাবে কথাবার্তা হতে পারে এবং তার মন বুঝতে পারার মত প্রচুর সময় পাই তার জন্য একটা ভাল সুযোগও মিলে গেল। আমরাই আপিসের এক বন্ধু ভ্যাসিলি সপরিবারে শহরের বাইরে একটা 'ডাসা'য় সপ্তাহান্ত কাটাতে যাচ্ছিল। তাদের সঙ্গে সম্প্রতি সোনিয়ার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম। বলা বাহুল্য, আমার সামান্য ইচ্ছাতেই ভ্যাসিলি ও তার স্ত্রী সব বুঝে নিলে। তাদের নিমন্ত্রণ সোনিয়া সানন্দেই গ্রহণ করলে। ভ্যাসিলি বড় ভাল লোক আর দরদী বন্ধু।

তারই সহানুভূতির সুযোগ নিলাম আমরা। তারা সন্ধ্যার দিকে বাইরে বেড়াতে গেছে এমন সময় এল ঝড়ঝুড়ি। শুধু সোনিয়া ও আমি মুখোমুখি বসে আছি ছুটো চেয়ারে। এর মধ্যে সেদিনের ব্যাপার সম্বন্ধে কোন কথা হয় নি, যথেষ্ট সময় আমরা পাই নি বলে। আজ আমি সে কথা তুললাম। কিন্তু গৌরচন্দ্রিকা ছাড়া কোন কথাই জরুর করতে সাহস পাই না, বাঁশীতে ফাটল ধরেছে কিনা আগে একটু বাজিয়ে দেখা ভাল।

ঘরটার মাঝখানে দেওয়ালে হেলান দেওয়া একটা আয়নার সামনে ঝড়ের হাত থেকে আশ্রয় নিয়ে বসেছে ছুটো পাখী—চড়াই পাখীর মত দেখতে। বললাম—দেখেছ সোনা, ওদের মধ্যে ঝগড়া হয়েছে; তাই ঠোটে ঠোটে ঠোকাঠুকি করে সরে যাচ্ছে আয়নার সামনে থেকে।

হেসে সে বললে—সেনকি, তুমি বোধ হয় মস্কোর পাখীদের কথা ভাবছ; এরা কিন্তু হচ্ছে বনের পাখী। তাই ঠোটে ঠোটে ঠেকিয়ে আদর করছে; ঠোকাঠুকি নয়।

‘তা হ’লে আয়নার সামনে থেকে সরে যাচ্ছে কেন?’

বাঃ রে, ওদের বুঝি লক্ষ্যসরম নেই; আয়নায় নিজেকেই কাণ্ড দেখে নিজেরাই কুণ্ঠায় সরে যাচ্ছে, কিন্তু দেখ আবার এগিয়ে আসছে।’

ওর কথায় আশা ও আশ্বাসের আভাস পেলাম, বললাম—দেখ এই ঝড়ের মধ্যে পড়ে পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এসে আমরাও হয়েছি ঝড়ের পাখী; আমার সোনা পাখী কিন্তু সে দিন শুধুই সরে গেল, আর এগিয়ে এল না।

‘কে বলে সে সরে গিয়েছিল?’

‘তবে তুমি এমন চুপ করে ছিলে কেন?’

‘বাঃ আমার বুঝি ভাবতে নেই?’

‘আর আমার বুঝি ভাবনাকে ভাগ করে নিতে নেই?’

‘কিন্তু সব জিনিষ ত ভাগাভাগি করে নেওয়া যায় না।’

‘এ জিনিষটা নিশ্চয়ই নেওয়া যায়। আর তুমি ত জিজ্ঞেসও করলে না কেমন ভাবে আমি কাটিয়েছি এই কটা দিন।’

খাঁটি রাশিয়ান প্রকৃতি তার। সে হেসে বললে—যা কাটিয়ে দিয়েছ তার কথা থাক। কি করেছে তুমি তা আমি ভাল করেই জানি। ওই তোমার প্রিয় পুশকিনের কবিতা আওড়েছ। এখনি হয় তো অভিযোগ করে বলবে :

When you're away, I yawn and mope ;
When you are here, I ache and prie :
I recognise by every sign
I 've lost my heart beyond all hope.

অভিমান করে বললাম—থাক থাক, আমি কেমন করে কাটিয়েছি তার কথা থাক। তুমি ত পরমানন্দে আপদ চুকল মনে করে ফ্লোরশিপ পাবার পথটা ভাল করে তৈরি করছিলে। যেমন মনের আনন্দে কবিতা আওড়াচ্ছ তাতেই বোঝা যাচ্ছে।

সে ফুর হ’ল এ কথাতে; কিন্তু ফোভের চেয়ে বেশী তার সহানুভূতি। সরে আড়ষ্টতা নেই একটুও, কিন্তু প্রচুর কারুণ্য ভরে সে বললে—না তা নয়, আমি সব পথই আঁধার দেখছি। আমাদের দেশের চারদিকে যে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে, সমাজে রাষ্ট্রে যে বিপ্লব, নির্ধাত এসে পড়ছে তার মধ্যে কোন আলো, কোন আশা খুঁজে পাচ্ছি না।

ঝড়ের গর্জন আরো প্রবল হয়ে এল; বজ্রগর্জনে মস্কোর আকাশ মুখরিত হয়ে উঠল; বহুদূরে ক্রেমলিন প্রাসাদের নীল ও সোনালী চূড়ার উপর বিদ্যুতের আতসবাজী খেলতে লাগল। সোনিয়া তার চেয়ারটা টেনে এনে একটু নিবিড় হয়ে আমার পাশে বসল।

সে বলতে লাগল—জান, আজ রাশিয়াতে প্রত্যেক অল্প-বয়স্ক বা চিন্তাশীল পুরুষ ও নারী হচ্ছে বিপ্লবী। আমরা এই অত্যাচার, অবিচার ও অনাচার ভরা রাজত্ব উচ্ছেদ করে দিতে চাই। যুদ্ধে আমরা হেরে যাচ্ছি, আমাদের অবস্থাপন্ন লোকেরাও কাশা (সরু চাল ও মাংসের রোল) পর্যন্ত খেতে পাচ্ছে না ওই ঘৃণ্যের ঘৃণ্যের রাষ্ট্র ও সমাজ-ব্যবস্থার জন্য। সব তো তুমি জান; তোমাদের রাজদূতাবাসে কোন খবরই অজানা থাকবে না। একটু থেমে সে আবার বললে—ওই দেখ দূরে ক্রেমলিনের চূড়াগুজের চার পাশে বিদ্যুৎ চমকচ্ছে। আমাদের পার্টির সভ্যরা এই মুহূর্তে লোকদের মধ্যে প্রচার

স্বস্তি পরিষদে কান্মীর-প্রসঙ্গ



স্বস্তি পরিষদের একটি সভার অধিবেশন—(বামদিকে) ভারতের প্রতিনিধি ডাঃ পদ্মনাভ পি পিল্লাই
কান্মীর-প্রসঙ্গে বক্তৃতা করিতেছেন



স্বস্তি পরিষদের একটি সভায় বক্তৃতা প্রদানরত পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত এম. এ. হাসান ইম্পাহানী



কাম্বীরের গিলগিট অঞ্চলে সর্দারদের বার্ষিক সম্মেলনে একটি আন্তর্জাতিক পোলো প্রতিযোগিতা



কাম্বীরের হনজা অঞ্চলে একটি যবের ক্ষেতে শস্য আহরণরত বালিকাছয়

করছে যে ওই বিদ্যুৎ চমকানতেই জার সাম্রাজ্য যে ছারখার যুগের তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দেখা যাচ্ছে।

বললাম—সে সবই ত জানি। চাকরীর খাতিরে আমি নিরপেক্ষ হলেও তোমার মনকে যে এ সুব ব্যাপার তোলপাড় করে তুলবে তাও বুঝতাম। কাকেই বা না করে? কিন্তু তুমি কি লেনিনের দলে সত্য সত্যই ঢুকেছ?

সন্ধ্যাতারার মত উজ্জ্বল অচপল চোখ দুটি আমার দিকে তুলে সে বলল—হ্যাঁ, সম্প্রতি আমি ঢুকেছি আর সেজ্ঞাই আমি তোমায় ভালবেসে কষ্ট দিলাম ও পেলাম। ছাড়াছাড়ি আমাদের মধ্যে ত হবেই।

মান চকল চোখে আমি তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। কি বলব ভেবে পেলাম না। আবেগে উদ্বেগে মনে হ'ল স্বাস্রোধ হয়ে আসছে। সে বলে চলল—আমি ভেবে-ছিলাম, তোমাকেও আমাদের গোপন অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত করে নেব। কিন্তু তোমার যা চাকরী তাতে তোমায় চাকরী ছাড়তে হবে। তা ছাড়া হয় তুমি ত বিদেশী এবং এ মন্ত্রে অবিশ্বাসী; তোমার ও আমার এক পথ নয়।

সে কথা ঠিক। আমি কোনদিনই গোপন অগ্নিমন্ত্রে বিশ্বাস করি নি। ভবঘুরে ডানপিটে হতে পারি কিন্তু গুপ্ত হত্যা ও গোপন প্রচার আমার মেরুদণ্ডে সইবে না। তা ছাড়া ভালবেসে সোনিয়া হয়েছে মরিয়া আর আমি চেয়েছি বাঁচতে, এবং এখন চাই তাকে বাঁচাতে।

তবু বললাম—এখন বুঝছি তুমি সেদিন কেন এমন করে চূপ করে গেলে আমি ভারতীয় শুনে। কিন্তু তাতেই বা কি? তোমাদের মন্ত্র ত শুধু রাশিয়ার জ্ঞান নয়, বিশ্বের জ্ঞান। কাজেই আমি তোমাদের দলে না গেলেও তোমার ভালবাসা ত পেতে পারি। তুমি আর আমি যেমন আছি তেমনই থাকব। তুমি আমার ভালবাসা এমনি করে। মান অথচ বলিষ্ঠ একটা হাসির আভাসের মধ্য দিয়ে তার কথা ফুটে বের হ'ল—তা হয় না সেন্সি। তুমি আমার ভালবাসাবে অথচ আমার পথে আসবে না; আমাদের লোকরা তোমায় জারের বা শত্রুপক্ষের চর মনে করবে। তুমি আমার পথে বিশ্বাস না করেও বিদেশী হয়েও আমাদের সঙ্গে নাম লেখাবে এমন অত্যাঁচ আমি হতে দেব না কিছুতেই। বলতে বলতে আত্মবিশ্বাসের দৃঢ়তা তার মুখে একটা অপক্লপ জ্যোতির আভাস এনে দিল।

সে আভাসে আমারও মন আলোয় ভরে গেল। আমি সোৎসাহে বললাম—কিন্তু আমিও যদি তোমার পথে আসি, তোমার মন্ত্রে দীক্ষা নিই তা হলে ত কোন বাধা নেই।

দৃঢ় ভাবে তার অধর চেপে একটুখানি চূপ করে রইল সোনিয়া; পরে বলল—তাতেও বাধা আছে। আমি তোমায় ভালবাসি এবং সেজ্ঞাই ভালবাসার ব্যভিচার তোমায় করতে দেব না। তুমি আমার ভালবাসা কিন্তু আমার দেশকে নয়, আমার মতকে নয়।

তবে, তবে আমাদের ভালবাসা কি এখানেই শেষ হবে? ব্যাকুল প্রশ্নে আমার একটা হতাশা ও বেদনার সুর ফুটে উঠল।

যে উত্তর পেলাম তার জ্ঞান আমি প্রশস্ত ছিলাম না। ইহ-লোকের বাসনা কামনা সব কিছুকেই আমরা ভারতীয় মনে অতীন্দ্রিয় রূপ দিয়ে পরলোকের হিসাবের কোঠায় তুলে দিয়েছি। সে প্রেমমিলনকে দিয়েছে মাধুরী, বিচ্ছেদকে দিয়েছে সান্দ্রনা; কিন্তু রাশিয়ান চরিত্র অত্ন ধাতুতে গড়া। সোনিয়া তারই প্রাণময় স্মরণ; তারই সবল সহজ বাস্তব বিকাশের ফলে সে আমার ভালবেসেছিল। সে বললে—সেন্সি, তোমাদের টাগোরের প্রেমের কবিতা আমি পড়েছি আগেই; তোমার মনের সঙ্গে তাঁর চিন্তাধারার সামঞ্জস্য আমি অনেক দিন আগে থেকেই লক্ষ্য করেছি। কারণ অবশ্য আগে জানতাম না। তুমি রাগ করো না, দুঃখ করো না। নিরভিমান মন নিয়েই আমি বলছি যে তোমরা আকাশে মাথা তুলে হাঁট আর আমরা মাটিতে পা ফেলে চলি। সবাই এগিয়ে যাই, কিন্তু আদর্শ আমাদের আলাদা।

বেদনার্ত্ত কণ্ঠে আমি বলে উঠলাম—না, না সোনা, আদর্শ কখনো আলাদা হতে পারে না। আমরা ভালবাসি, সেটাই সত্য, আজকের ঝড়, বিপ্লব সবই ত শেষ হয়ে যাবে এক দিন; তোমার মনে রেখো ভালবাসা, আমার মনে রাখব আশা। সেটাকে আমাদের অবলম্বন হতে দাও। বলতে বলতে তার শীতল বিবশ হাত দুটি চেপে ধরলাম।

কড় কড়াং শব্দে একটা বজ্র কাছেই ফেটে পড়ল। বিদ্যুতের আলোয় চকিতের জ্ঞান উদ্ভাসিত তার মুখখানি দেখলাম চোখের জলে ভেসে যাচ্ছে। আর আমি? লোকে বলে পাথরের মত দেহের ভিতরে আমার পাথরেরই মত মন; তা যে একবার মাখনের মত গলে গিয়েছিল তা কেহ জানে না।

সোনা বললে—তুমি নিশ্চয়ই এত দিনে বুঝতে পেরেছ আমার মাটির মাহুষ, আমাদের প্রেম মাটির, যদিও আগুনের আভায় তা সোনা হয়ে ওঠে। আমি তোমার মত ভালবাসার আশা নিয়ে মন বেঁধে বসে থাকায় সান্দ্রনা পাব না। আমার হাত দুটিকে সে সবলে নিজের আয়ত্ত করে বললে, বুঝতে কি তুমি পার না আমার কামনা আকাঙ্ক্ষা সবই পেয়ালার শেষ তলানিটুকু পর্যন্ত আমি পেতে চাই। যাকে ভালবাসি তাকে শুধু হৃদয়ে নয়, গৃহে, শুধু প্রিয়রূপে নয়, স্বামীরূপে পেতে চাই।

আমি মরিয়া হয়ে উঠেছি, ততক্ষণে বললাম আমিও ত বর বাঁধতে চাই, এদেশেই এখানেই হবে আমার ঘর। হও তুমি আমার সহধর্মিণী।

বেদনাজ্ঞ কণ্ঠে সোনা বললে—না না, আমার যে চাই সহকর্মী। যে নিজেকে থেকে নিজের বিবেক নিয়ে আমার

পাশে এসে দাঁড়াবে সে ত ভূমি নও। আর তোমার বদলাবারও সময় নেই, মেঘ জমে গেছে; বজ্রপাত হচ্ছে, ঝড় বইছে ছ'এক দিনের মধ্যেই।

তা আমি জানতাম; কিন্তু এত শীঘ্র যে তা আমি কেন, জার দ্বিতীয় নিকোলস নিজেও জানতেন না। ভ্যাসিনীরা এসে পড়ার সেদিন আর কথাবার্তা হয় নি। ওরা যদি ঘৃণাকরেও সোনিয়ার ইতিহাস জানত তা হলে তাকে পরদিনই ১১ নং লুবিয়ান্কাতে অর্থাৎ মস্কোর 'চেকা' পুলিশের অতিথি হতে হ'ত।

পরদিন সকালেই সরকারী আদেশে আমার চলে যেতে হ'ল একটা প্রাদেশিক শহরে গুপ্ত সংবাদ সংগ্রহের জ্ঞাত। শুধু টেলিফোনে সোনাকে জানিয়ে যেতে পারলাম—আবার যেন দেখা হয়। বুকে তখন আসন্ন ঝঞ্ঝার পূর্বসূচক বইছে, বাজছে গুরু গুরু ডমরু রব।

হ্যাঁ, আবার দেখা হয়েছিল বই কি! দিন সাতেকের মধ্যে আদেশ পেলাম পত্রপাঠ ফিরে আসতে। ফিরবার পথেই দেখলাম জার পদত্যাগ করেছেন ও বিপ্লবীরা নূতন সরকার গড়ছে। আপিসে ছুটে এসে পৌঁছাতেই আদেশ পেলাম যে আমাদের রাজদূতাবাসের কয়েকটি চিহ্নিত লোককে রাশিয়া থেকে বাইরে সরাবার বন্দোবস্ত করা হয়েছে, এখনি আমার মোটর ভ্যানে উঠতে হবে। সময় পেলাম না; বিনীত প্রার্থনা করেও সময় পেলাম না একটি দিন পরে রওনা হবার; এমন কি চাকুরী ত্যাগ করে নিজের দায়িত্বে থেকে যাবারও অল্পমতি পেলাম না। বাকী সবার মঙ্গলের জ্ঞাত আমাকে এ দেশ থেকে হঠাৎ এখনি চলে যেতে হবে।

বাইরে শত শত বৎসরের বাঁধ ভেঙে রাশিয়ার জন-প্রবাহ বিপ্লব বহ্যায় দেশকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। যে লাল চৌকায় (Red Square) আইডান দি টেরিবলের সময় থেকে বলশেভিকদের যে দিবস পালনের সময় পর্য্যন্ত সহস্র নির্যাতন হয়েছে সেখানে ক্রেমলিনের রক্তবর্ণের

উচ্চ প্রাচীরগাত্রের পটভূমিকায় চল্লিশ সহস্র বিপ্লবী সৈন্য সজলক স্বাধীনতা ঘোষণা করে মার্চ করে যেতে লাগিল। তাদের পিছনে চলতে লাগল বৈপ্লবিক বাহিনী, ছাত্র, কেরাণী, আইন-ব্যবসায়ী, শহরে চিন্তাশীলের দল। সবাই তাদের অভিনন্দন জানাচ্ছে টুপী উড়িয়ে; বিজয় গৌরবে, আদর্শের সাকল্যে তাদের মুখ উদ্ভাসিত। আমি কিন্তু প্রাণপণে চোখ মেলে চারদিক দেখছি; কোথায় সোনা। সে যে আশ্বাস দিয়েছিল আবার শীঘ্র দেখা হবে।

পরে দেখা হয়েছিল। বিপ্লবী বাহিনীর অভিযান প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, তাকে দেখতে পাবার আশা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, বুকের মধ্যে একটা ছঃসহ বেদনা মুচ্ছিত হয়ে রয়েছে এমন সময় আমারই ভ্যানের পাশে হঠাৎ সে বাহিনীর গতি ভঙ্গ হ'ল; কে একজন হঠাৎ পড়ে গেল; তাকে পিছনের কয়েক জন তুলে ধরল কিন্তু তার পা চলতে চাইছে না। বুঝলাম সে হয় আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করার জ্ঞাত ইচ্ছা করে অথবা মানসিক উত্তেজনায় সে পা পিছলে পড়েছিল। তার সন্ধ্যাতারার মত দীপ্ত চোখ দুটি আমার দিকে তাকিয়ে আছে। তার পরেই মাটির মেয়ে সোনা তার মর্ত্যের স্বর্গ অভিযুখে আবার মার্চ করে এগিয়ে যেতে লাগল। বুক ফেটে একটা আহ্বান বেরিয়ে আসছিল; কিন্তু মুখ ফুটে তা বের হবার আগেই আমার সহকর্মীরা মুখ চেপে ধরল। নীরবে নতমুখে বিনা প্রতিবাদে আমি বসে পড়লাম। আমার নিজের হৃদয়ের চেয়ে, আমার মানসী প্রতিমার চেয়ে আমার সহকর্মীদের নিরাপত্তার দাম অনেক বেশী।

সে দিন মস্কোর আকাশে কিন্তু মেঘ বা বিদ্যুৎ কিছুই ছিল না। আসন্ন সন্ধ্যার সোনালী আলো লাল চৌকায় লাল দেওয়ালে প্রতিফলিত হয়ে আরও বেশী হৃদয় দেখাচ্ছিল। আর ভল্গার শ্রোতধারার মত সোনার সোনালী কেশরাশি সে আলোয় মার্চের তালে তালে ছলতে ছলতে জনতার মধ্যে শেষবারের মত মিলিয়ে গেল।

শ্রী যোগেশচন্দ্র রায়

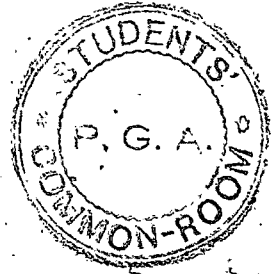
শ্রীগোপাল লাল দে

নগরীর প্রান্তদেশে স্বস্তিপূর্ণ 'স্বস্তিক' ভবনে,
বিজ্ঞা বয়োবৃদ্ধ ঋষি স্বেত শ্রুঙ্গ, স্বেত উত্তরীয়;
তীক্ষ্ণ অবধানী দৃষ্টি জ্ঞানায়িত্তে নিয়ত হবনে,
নিরন্তর ঋষি যজ্ঞে দীপ্ত করে আত্মা ভারতীয়।

বিলাস করেনি স্পর্শ, সম্পদ দিল না মলিনতা,
দর্পহীন বিজ্ঞা তার, দাহহীন জ্ঞান সমুচ্ছল;
খ্যাতির প্রশস্ত ক্ষেত্র রাজধানী হেলি' তাজিল তা',
আদরে পশ্চিম রাঢ়ে আশ্রম রচিল সুবিমল।

স্বস্তিকায় বাস তার, মানস ভ্রমিছে নভোঙ্গনে,
ভাষা কহে আধুনিক, অতীত সাহিত্যে সঞ্চারণ;
অবসরে নিরলস, শিক্ষা দেয় সারস্বতগণে,
রাজ্য আসে নতশিরে বিনীত বিবুধ অগণন।

কৃষক, সরল শিশু জানে তারে বান্ধব স্বকীয়,
বুধগণ জানে তারে পণ্ডিতেরো অনির্করচর্য।



মানুষ ও মুসলমান

প্রাইমারি স্কুল ভট্টাচার্য

উদার এবং নিরপেক্ষ দৃষ্টি সকল ধর্মের মূলেই এক শাশ্বত সত্য দেখিতে পায়। ইসলামের মূলেও এই সত্যের অন্তিম স্বীকৃতি। এই শাশ্বত বস্তু মানবত্বের পরিপোষক, পরিপন্থী নয়। কিন্তু সকল ধর্মেই এবং ইসলামেও এমন সব তথাকথিত ধার্মিক আছেন যাহাদের নিকট এই শাশ্বত সত্য অপেক্ষা ধর্মের বহিঃস্থ আচার, অনুষ্ঠান প্রভৃতির মূল্য বেশী। এইখানেই ধর্ম মনুষ্যত্বকে অতিক্রম করিয়া—‘মুসলমান’ মানুষকে খর্ব করিয়া—বড় হইয়া পড়ে। কিন্তু ইহা একটি ভ্রম,—শুধু ভ্রম নয়, বিপজ্জনক ভ্রম। ইহার ফলে শুধু যে মানুষ হইতে ধর্ম বড় হইয়া পড়ে তাহা নয়, ধর্ম হইতেও সম্ভ্রাদায় বড় হইয়া পড়ে। বর্তমানে মুসলমান-সমাজে—বিশেষতঃ ভারতের মুসলমান-সমাজে এই ভ্রান্তির বিস্তৃতি ও প্রভাব দেখিয়া মনে হয় ইহার উৎপত্তি এবং উৎসাদনের কথা চিন্তার অযোগ্য নয়। সেই জন্যই কথাটা তুলিতেছি। আর মানুষ ও মুসলমানের মধ্যে যে একটা প্রভেদ সম্ভব, এই কথাটার উপরও আমাদের সেইজন্যই জোর দিতে হইতেছে।

ঈশা মুসা কিংবা বুদ্ধ চৈতন্য প্রভৃতির প্রচারিত ধর্ম মানুষের সমাজের বাহিরে যায় নাই, ইহা সব সময় মনে না রাখিলেও আমরা জানি। ইসলামও তেমনই মানুষের বাহিরে কোন উদ্ভিদ বা প্রাণী গ্রহণ করে নাই। স্বর্গের ফেরেশতার ঈশ্বরের আদেশে চলেন এবং তাহার প্রদত্ত ধর্ম অনুসরণ করেন, এরূপ কথা কোন কোন ধর্ম বলে। আর জগতের সকল ধর্মই একথা বলে যে উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রভৃতিও ঈশ্বর-শাসিত। কিন্তু এই সমস্ত কথার অর্থ এই নয় যে, ধর্ম বলিতে যাহা বুঝায় মানুষ ছাড়া আর কেহ তাহা অনুসরণ করিতে পারে। স্তবরাং ইসলামও মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ; অর্থাৎ মুসলমান সকলেই মানুষ।

সঙ্গে সঙ্গে ইহাও মনে করা উচিত যে, সকল মানুষই মুসলমান নয়। অ-মুসলমানকে ‘কাফের’ বলা চলে, এবং অনেক সময় বলা হইয়াও থাকে; কিন্তু তাহাকে অমানুষ বলা চলে না। স্তবরাং মানুষ ও মুসলমানের দুইটি বৃত্ত আঁকিলে দ্বিতীয়টি প্রথমটির একাংশ থাকিবে, উহার সমান হইবে না। মানুষ যাত্রাই মুসলমান নয় বলিয়া উভয়ের মধ্যে একটা প্রভেদও রহিয়াছে; মানুষ ও মুসলমান একত্র অবস্থান করিতে পারিলেও সর্বদাই একত্র থাকে না; স্তবরাং উহার পৃথক-গুণ।

কেহ হয় তা ইহারই মধ্যে বিরক্ত হইয়া ভাবিতেছেন,

ইহা এমন কি একটা গুঢ় তত্ত্ব যে উহাকে লইয়া এত আলোচনা? আমাদের প্রয়োজন এই যে, মাঝে মাঝে মানুষ ও মুসলমানের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়, তখন কোন্টি বড় তাহা প্রশ্ন হইয়া দাঁড়ায়। উভয়ের প্রভেদ জানা না থাকিলে সে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় না। যে যে-ধর্মের অনুসরণ করে, তাহার কাছে সেই ধর্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম, সনাতন সত্য, এবং চরম আবিষ্কার। সেই অনুসারে প্রত্যেক বিশ্বাসীর কাছেই নিজের ধর্মের বাহিরের লোকেরা বিপদ হইলেও মানুষের ষোল আনা মর্যাদার অধিকারী নয়। প্রাচীন ভারতের আর্য অনার্য, ও প্রাচীন ফিলিস্তিনে ইসরায়েল ও ইসরায়েলের বাহিরের লোকদের পরস্পরের প্রতি ব্যবহারে আমরা এই সত্য উপলব্ধি করি। তেমনই বর্তমান ভারতের হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে যাহারা অত্যুগ্র বিশ্বাসী তাহাদের কথায় ও আচরণে আবার এই সত্যের সাক্ষাৎ মিলে। এই মত অনুসারে ধর্মবিশেষ যে অনুসরণ করে সে ভিন্নধর্মী হইতে বড়।

প্রত্যেক ধর্মেরই প্রচারের প্রথম দিকটায় দেখা যায় যে, কতকটা আত্মরক্ষার জন্য এবং কতকটা প্রচারের সুবিধার জন্য সেই ধর্মের অনুবর্তকেরা যথাসম্ভব সজীব হইতে চেষ্টা করে। বৌদ্ধদের মঠের এবং খ্রীষ্টানদের গীজার সংগঠনের ইতিহাসে আমরা ইহা দেখিতে পাই। প্রথম খলিফাদের আমলে ইসলামেও উহা দেখা যায়। এই ভাবে ধর্ম বৃদ্ধি ও প্রসার লাভ করে। তার পরের স্তরে দেখা যায়—ধর্ম রাষ্ট্রের অধিকারী হয়, রাষ্ট্রশাসনের কৌশলও আয়ত্ত করে এবং দায়িত্বও গ্রহণ করে। ইসলামের খলিফারা তাহা করিয়াছেন। বৌদ্ধধর্মের ভিক্ষুরা কিংবা হিন্দু সন্ন্যাসীরা তাহা করেন নাই সত্য, কিন্তু ঐ ধর্মাবলম্বী সম্রাটেরা তাহা করিয়াছেন, যেমন অশোক, চন্দ্রগুপ্ত প্রভৃতি। আর খ্রীষ্টান পোপের রাজশক্তি এখনও একেবারে লোপ পায় নাই।

অতীতে এইরূপ ধর্ম ও রাষ্ট্রের মিলিত ক্রমবিকাশে দেখা যায় যে রাষ্ট্রবোধ প্রবল হইলেই ধর্মের শাসন দুর্বল হইয়া পড়ে এবং ধর্ম রাষ্ট্রীয় ব্যাপাব হইতে ক্রমে সরিয়া পড়ে। আরও পরে ধর্ম স্বয়ং রাষ্ট্রো অধীন হইয়া পড়ে। ইউরোপের ইতিহাসে ইহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই, আর ইসলামের পরবর্তী খলিফারা এবং আরও পরে বিভিন্ন দেশের বাদশাহেরা ধর্মকে অস্বীকার না করিলেও ধর্মের অধীনতাও স্বীকার করেন নাই। তাহারা নিজের ধর্মের

লোকদিগকে অতিরিক্ত স্ববিধা দিলেও অন্য ধর্মের অস্তিত্বও বরদাশ্ত করিয়াছেন এবং সেই সেই ধর্মের লোকদিগকে আশ্রয় দিতে এবং রক্ষা করিতে পরাধু্য হন নাই। ধর্ম অস্বীকৃত না হইলেও ধর্মের ভিত্তিতেই ঠিক রাজ্য প্রতিষ্ঠিত শাসিত হইত না। ধর্মপ্রচারের জন্ত রাজ্য দখল অনেক মুসলমানই করিয়াছেন। খ্রীষ্টানদের মধ্যেও সে জিনিসটা একেবারে অজ্ঞাত নয়। মধ্য যুগে ফিলিস্তিন ও জেরুজালেম মুসলমানদের হাত হইতে ছিনাইয়া লওয়ার জন্ত যে ‘ক্রেজড’ বা ‘জেহাদ’ হইয়াছিল, তাহারও মূলে ঐ আকাঙ্ক্ষা বর্তমান ছিল। রাজ্য বিস্তৃত করিয়া ধর্ম প্রচারের চেষ্টা সকলের অপেক্ষা কম করিয়াছেন বোধ হয় হিন্দুরা ও বৌদ্ধেরা। তাঁহারা ঐ কাজটি করিয়াছেন সন্ন্যাসী, পরিব্রাজক ও ভিক্ষুদের সাহায্যে।

কিন্তু রাজ্য বিস্তারের মূল উদ্দেশ্য বাহাই হউক না কেন, রাজ্য বিস্তৃত হইয়া গেলে পর স্বশাসক মাত্রই পরধর্ম সহ্য করিতে শিখিয়া লইতেন। ভারতের মুসলমান শাসকদের মধ্যে আকবর ইহার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ইসলামের ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত আরও আছে।

ক্রমে মাহুম্ব রাষ্ট্রের উন্নতিবিধানের জন্ত অনেক রকম চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু তাহার মধ্যে ধর্মের স্থানই প্রধান ছিল না। ইংলণ্ডে পার্লামেন্টের সূচনা, রাজ্যের পদচ্যুতি ও মৃত্যুদণ্ড প্রভৃতি অনেক বড় বড় ঘটনা মাহুম্বের অধিকারের দাবিতে—রাজার বিরুদ্ধে সাধারণ মাহুম্বের, উচ্চ শ্রেণীর বিরুদ্ধে নিম্ন শ্রেণীর অধিকারের দাবিতে ঘটিয়াছে, কোন ধর্মবিশেষ বা ধর্মসম্প্রদায়বিশেষের উন্নতির জন্ত নয়। রোমান ক্যাথলিক ও প্রোটেষ্ট্যান্টদের মধ্যে যে মারামারি কাটাকাটি হইয়াছে তাহা আমরা ভুলিতেছি না। তাহার মধ্যেও অনেক সময় রাষ্ট্রীয় অধিকারের কথাও চুকিয়াছিল, কিন্তু খুব বেশী নয়, এবং উহা খুব বেশী দিন ছিলও না। অবশ্যই এখনও কোন রোমান ক্যাথলিক ইংলণ্ডের সিংহাসনে বসিতে পারেন না। কিন্তু এই পর্য্যন্তই। অন্যান্য রাষ্ট্রীয় অধিকারে ধর্ম বা সম্প্রদায় অহুসারে পার্থক্য খুবই কম। স্পেনে এবং ফরাসী দেশেও ক্যাথলিক ও প্রোটেষ্ট্যান্টদের কলহ ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য ঘটনা, এবং ইহাতে জয়-পরাজয় রাষ্ট্রীয় অধিকারেও পার্থক্য ঘটাইয়াছে। কিন্তু ফরাসী ইতিহাসের সর্বাঙ্গপেক্ষা প্রসিদ্ধ ঘটনা যে অষ্টাদশ শতাব্দীর রাষ্ট্রবিপ্লব তাহা ‘মাহুম্বের অধিকারের জন্যই ঘটিয়াছিল—ধর্মবিশেষের স্ববিধা বা সমৃদ্ধির জন্য নয়। আর আধুনিক যুগের প্রকাণ্ড ব্যাপার রুশ বিপ্লব ধর্মকে একেবারে প্রকাশ্যে তিরস্কার ও বর্জন করিয়াই হইয়াছে। এই সব ব্যাপারে দেখা যায় যে, মাহুম্ব ও ধর্মবিশেষের অহুসরণকারীর মধ্যে একটা প্রভেদ আছে, স্তত্রাং মাহুম্ব

ও মুসলমানের মধ্যেও একটা পার্থক্য রহিয়াছে, আর এই পার্থক্য ধর্মী বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, মাহুম্বের চিন্তা মাহুম্বকে ধর্মবিশেষ অহুসরণ করা অপেক্ষা অনেক বড় মনে করিয়াছে।

মাহুম্বের অধিকারের আলোচনায় সকল ধর্মেরই কম-বেশী দান রহিয়াছে। যে ধর্ম যখন আবির্ভূত হইয়াছে, তখন উহা মাহুম্বকে উন্নত করিবার জন্যই আসিয়াছে—তাহাকে খর্ব করার জন্য নয়। পরে যখন ধর্ম ধর্ম-কলহের সৃষ্টি হইয়াছে, তখন ধর্মবিশেষ অন্য ধর্ম হইতে নিজেকে বড় মনে করিয়াছে এবং সেইজন্যই অন্য ধর্মাবলম্বীকে হেয় মনে করিয়াছে। এই ভাবেই কখনও কখনও ধর্ম মাহুম্বের উপরে নিজের স্থান করিতে চেষ্টা করিয়াছে, এবং ঠিক এই ভাবেই ইসলামও মাহুম্ব ও মুসলমানের মধ্যে প্রভেদ করিয়া মুসলমানকে মাহুম্বের উপরে স্থান দিয়াছে এবং এখনও দিতে চায়।

ইসলাম মাহুম্বকে কি কি দিয়াছে, তাহা একটা ঐতিহাসিক প্রশ্ন। মুসলমানেরা সব সময় ভাবিতে না চাহিলেও ঐতিহাসিক ভাবিতে পারেন। তবে, খুব স্বল্প বিচার না করিয়াও ইহা সহজেই স্বীকৃত হওয়া উচিত যে, মানবের বিরাট সভ্যতা-সৌধের সবকিছু উপাদানই ইসলাম দেয় নাই। যেমন শুধু রোম, গ্রীসের সভ্যতাই জগতের সভ্যতা সৃষ্টি করে নাই, অন্যের দানও ইহাতে রহিয়াছে, তেমনই জগৎ শ্রেষ্ঠ বাহা কিছু শিখিয়াছে, সবই ইসলামের কাছেই শিখে নাই; সব কিছু ভাল কোন এক বিশেষ ধর্ম জগৎকে শিখায় নাই, সকলের দানের সমন্বয়ে, সকলের চেষ্টার সমবায়, মানবসভ্যতা নামক বিশাল পদার্থটি উৎপন্ন হইয়াছে।

বর্তমানে ভারতের অনেক মুসলমানই খুব গর্ব করিয়া বলেন যে, ইসলামই জগৎকে ‘ডিমোক্রেসী’ বা গণতন্ত্র শিখাইয়াছে। অহুরূপ উক্তি সকল ধর্মের অহুবর্তকেরাই করিয়া থাকেন। সনাতনী হিন্দু বলিবে, বাহা কিছু সনাতন সভ্যতা, তাহা হিন্দু ধর্মই জগৎকে শিখাইয়াছে। খ্রীষ্টান ধর্মের অহুবর্তকেরাও এরূপ কথা বলিতে অধিকারী। এরূপ মনোভাব ইতিহাসকে অতিক্রম করিয়াই বুদ্ধি পাইতে পারে, অহুসরণ করিয়া নয়। যারা ইসলামের বাহিরে ‘ডিমোক্রেসী’ দেখিতে পান না, তাঁরা ইসলামও বেশী জানেন না, ইতিহাসও পড়েন না। ‘ডিমোক্রেসী’ কথাটার সৃষ্টি হয় ইসলামের জন্মের হাজার বছরেরও বেশী আগে, এবং জিনিসটিও প্রথম গ্রীসের লোকেরাই আবিষ্কার এবং প্রবর্তন করে। তার পর স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর কথা খ্রীষ্টান-জগৎও কম শুনায় নাই। খ্রীষ্টের ধর্মের ভিতরও এ সকলের বীজ নিহিত রহিয়াছে। ইসলাম যদিও জাতি-

ভেদ কিংবা অস্পৃশ্যতা মানে না এবং সেই হিসাবে সব মুসলমানই—সব মানুষ ঠিক নয়—সমান, তথ্যনি মনে রাখা উচিত যে, রাষ্ট্রে গণতন্ত্র বলিতে যাহা বুঝায়—অর্থাৎ জন-গণের ভোটাধিক্যে শাসননীতি নিয়ন্ত্রণ—তাহা ইসলামের ইতিহাসে খুব বেশী দেখা যায় না। ভারতে মুসলমান-শাসনে ঐ জিনিসটি মোটেই ছিল না, ভারতের বাহিরেও কম। এখনও কোন মুসলমান রাজ্যই খাঁটি গণতন্ত্র নয়। কামাল পাশার তুরস্কে যাহা ঘটয়াছিল, তাহা ইউরোপের অনুকরণে, খাঁটি ইসলামের শাসন অনুযায়ী নয়। অবশ্যই ইসলামের প্রবর্তকের চরিত্রে এবং প্রথম খলিফাদের জীবনে এমন সব বস্তু আমরা পাই যাহা ইতিহাস চিরকাল প্রশংসা করিবে। ইহাদের নিকট মানবসভ্যতার ঋণ কোন অনুসন্ধিৎসু কিংবা জ্ঞানীই অস্বীকার করিবে না। কিন্তু তথাপি একখাটা আমাদের সর্বদাই মনে রাখা উচিত যে, কোন এক ব্যক্তি বা কোন এক ধর্ম জগৎকে সব কিছুই দেয় নাই। আরও একটা কথা আমাদের মনে রাখা উচিত যে, মহাপুরুষদের আবির্ভাবের উপযুক্ত প্রতিবেশ সমাজ আগে হইতেই সৃষ্টি করিয়া রাখে। পূর্ববর্তী হিন্দু সাম্রাজ্যের উৎস হইতেই জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের আবির্ভাব হইয়াছিল এবং পুরোগামী যীহুদী ধর্ম ও সমাজের শিক্ষা হইতেই খ্রীষ্টের শিক্ষা উদ্ভূত হয়। ইহা ইতিহাসের সত্য, মহাপুরুষদের প্রতি অগৌরব দেখাইবার জন্য নয়, তাঁহাদিগকে বুঝিবার জন্য, বলা হইতেছে। তেমনই ইহাও ত স্পষ্ট যে, মহম্মদের আদর্শ এবং শিক্ষাও যীহুদী এবং খ্রীষ্টান ধর্মের পরিবেশের মধ্যেই আবির্ভূত হইয়াছিল এবং সেইজন্মই উহা উভয়ের নিকটই কম-বেশী ঋণী। মহম্মদ যাহাদিগকে পরগণ্ডর বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে যীহুদী মুসা প্রভৃতি আছেন এবং ঈসাও রহিয়াছেন; আর প্রথম নর-মিথুন আদম ও হাওয়াকে তিনিও স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং একান্ত মৌলিকত্ব দাবি করিবার অধিকার কোন ধর্মেরই বাস্তবিক নাই। মানুষের চিন্তা হাওয়ায় চলিয়া ফিরে, সমুদ্রের ঢেউয়ের মত কোথাও উহা উদ্ভূত হইয়া উঠে; সেখানেই আমরা দেখি মহাপুরুষ।

সুতরাং নিজেদের ধর্মের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা থাকিলেও মুসলমানদের ইতিহাস অস্বীকার করা উচিত নয়। কিন্তু ইহাই আমাদের একমাত্র বক্তব্য নয়। বর্তমানে আরও একটা চিন্তাব্যবস্থা ও কর্তব্যবদ্ধি নানা জায়গায় আত্মপ্রকাশ করিতেছে যাহা দেখিয়া মনে হয়, মানুষ ও মুসলমানের তুলনায় শেষোক্তটিকেই বড় কল্পনা করা হয়। সোজা বাংলায়, অনেকের মতে মানুষ হওয়া অপেক্ষা মুসলমান হওয়া বড়। মুসলমান হইয়া জন্ম নিলেই কিংবা মুসলমান-ধর্ম গ্রহণ করিলেই কেহ মহাপুরুষ হইয়া যায় না, এবং মুসলমান

নয় অথচ উচ্চ চরিত্রের অধিকারী এমন মানুষ আছে। মানবত্বের উচ্চ গুণ বিরহিত হইয়া শুধু মুসলমান ধর্ম মানিলেই কাহাকেও পূজ্য মনে করা যায় না। কথাটা অতি সরল। কিন্তু এক শ্রেণীর লোক বর্তমানে এদেশে দেখা যায় যাহাদের মতে চরিত্র যেমনই হউক না কেন, শুধু ধর্ম মুসলমান হইলেই তাহার মূল্য যে-কোন অমুসলমান মহাপুরুষ হইতেও অধিক। এরূপ ধারণার অসারত্ব প্রমাণ করার জন্য যুক্তি দেখাইতে গেলে শিক্ষিত লোকের বুদ্ধিকে অপমান করা হয়। কয়েকটা অন্ধ বিশ্বাস গ্রহণ এবং কয়েকটা অর্থ না জানা আচার অনুসরণ করিলেই মানুষ মনুষ্য লাভ করে না। কোনও ধর্মের একান্ত মৌলিকত্ব দাবি যেমন ইতিহাস-বিরুদ্ধ তেমনই ধর্ম অনুসরণ করাটাকে মনুষ্যত্ব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করাও যুক্তি-বিরুদ্ধ।

ভারতে বহু মুসলমান যে অনেক সময় মানুষ হওয়া অপেক্ষা মুসলমান হওয়া শ্রেষ্ঠ মনে করে, তাহার একটা কারণ তাহাদের চিন্তে একটা আহত আত্মাভিমান রহিয়াছে। তাহারা একটা সাম্রাজ্য হারায়াছে, নিজেদের দোষেই হারায়াছে, কিন্তু তথাপি হারায়াছে। যারা শাসক ছিল আজ তারা শাসিতের পর্ষায়ে নামিয়া আসিতেছে। সেই ক্ষোভ তাহাদিগকে বৈরাগ্যের দিকে না লইয়া আরও লুপ্ত করিয়া তুলিয়াছে। ইহার ফল ভাল হয় না। লুপ্ত রোমক গৌরব—রোমান সাম্রাজ্য—পুনর্জীবিত করিবার আকাঙ্ক্ষা সেদিন প্রকাশ পাইয়াছিল মুসোলিনীতে; তাহার সমাপ্তি এখনও আমাদের চোখের সম্মুখে রহিয়াছে। লুপ্ত আর্যমহিমা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছিল-হিটলারে। তাহারও পরিণতি আমরা দেখিয়াছি। কাহারও মহিমা লুপ্ত হইলে তাহার মনে বাসনা দ্বিগুণিত না হইয় বৈরাগ্যও আসিতে পারে, যেমন আসিয়াছিল হিন্দুর মনে। একটি প্রাচীন শ্লোক বলি—

“যত্নপতে: ক গতা মথুরাপুরী ?

রঘুপতে: ক গতা উত্তরকোশলা ?

ইতি বিচিন্ত্য কুরুষ মন: স্থিরং

ন সদিদং জগৎ ইত্যবধারণ।”

বিভিন্ন রাজ্যের পতন দেখিয়া ইহাই সিদ্ধান্ত করা উচিত যে এই জগৎ সং নয়, এ জগতের মহিমা গরিমা চিরস্থায়ী নয়। ভোগের সময়ও এ কথা যে মনে রাখে সে ধীমান; আর এ সকলের লোপের পর বাসনা উদ্ভিক্ত না করিয়া বৈরাগ্যের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িলে হয় বিজ্ঞ। কিন্তু সাধারণ ভাবে ভারতের মুসলমান-মন বাসনার লোপের কথা ত ভাবিতেই পারে না, উহার সংকোচকেও মনে করে কাপুরুষতা। সে চায় লুপ্ত গৌরব উদ্ধারের জন্য দ্বিগুণ উত্তম করিতে। কিন্তু এরূপ উদ্যম কদাচিত্ সফল হয়, প্রায়

সর্বদাই রক্তপাত ঘটায়, এবং মানুষের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিগুলি উদ্ভিক্ত করিয়া তাহাকে নীচের দিকে টানিয়া নামায়। আর মুসলমানশাসনই শ্রেষ্ঠ শাসন, সমাজে মুসলমানের কর্তৃত্বই সহনীয়, এরূপ ধারণার মূলেও রহিয়াছে মানুষ হইতে মুসলমানকে শ্রেষ্ঠ মনে করিবার প্রবৃত্তি।

এই প্রবৃত্তিরই একটা দিক অগ্রভাবে প্রকাশ পায় ‘মুসলিম জগৎ গঠনের’ আকাজক্ষায়। ইহাও ভারতে শিকড় গাড়িয়াছে। জগতের মুসলমান সব এক হও—ইহাই তাহার ধ্বনি। অর্থ কি? দেশ, ভাষা, চেহারা, আচার, পোশাক ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ের প্রভেদ কিছু নয়, শুধু মক্কার দিকে মুখ করিয়া যারা নমাজ করে এবং মহম্মদকে আল্লার পয়গম্বর জানিয়া তাঁহার বিধান মান্ত করে তারা এক, অগ্ণেয়া পৃথক। এই ভাবে মঙ্গোলিয়া হইতে আরম্ভ করিয়া মরোক্কো পর্যন্ত এবং তুরস্ক হইতে আরম্ভ করিয়া মলয় উপদ্বীপ পর্যন্ত যত মুসলমান আছে তাহাদিগকে সমগ্র অমুসলমান জগৎ হইতে পৃথক করিয়া একটা বিরাট সংহতিতে পরিণত করিবার আকাজক্ষা ভারতে এবং ভারতের বাহিরেও অনেক মুসলমানের মনে দেখা দিয়াছে। এই সংহতিই একমাত্র লক্ষ্য নয়। সংহতিবদ্ধ এই বিরাট জনসমষ্টি জগতের অগ্র স্কল মানুষের উপর প্রভুত্ব করিবে, এই ইচ্ছাও অক্ষুট নয়।

শুনিতেছি পাকিস্তানের রাজধানী করাচীতে শীঘ্রই একটা সর্ব-জাগতিক মুসলিম সম্মেলন হইবে। তাহা যদি হয় তবে উহার মূলে ঐ একই আহ্বান—জগতের মুসলমান সব এক হও, রুদ্ধকণ্ঠে আরও একটু ইহার সঙ্গে যোগ করিয়া দিতে হয়—অমুসলমানদের বিরুদ্ধে সংহত হও, সম্ভব হইলে তাহাদের উচ্ছেদ কর অথবা মুসলমান করিয়া লও, এবং ক্রমে এক ধর্মের ভিত্তিতে এক রাষ্ট্র স্থাপন কর।

মুসলমানকে সর্বজগতের মানুষ হইতে পৃথক করিয়া দেখায় এবং সকল মানুষ হইতে শ্রেষ্ঠ মনে করিবার গূঢ় প্রবৃত্তির আর একটা প্রকাশ দেখা যায় ঔরঙ্গজেবের পরে ভারতের সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী মুসলমান মহম্মদ আলি জিন্নার বাক্যে ও কাণ্ডে। জিন্নার জীবন আলোচনার স্থান ইহা নয়, আমাদের প্রয়োজনও নাই। তবে ভারতের মুসলমানদের অনেকের মুখেই শুনি তিনি একজন শ্রেষ্ঠ মুসলমান এবং সেইজন্যই বোধ হয়, এক জন মহামানবও বটেন। প্রকৃত ইসলাম অতি সামান্যই তিনি জানেন, এবং যাহা জানেন তাহাও কাণ্ডে, আচারে, পোশাক-পরিচ্ছদে তিনি অহুসরণ করেন না। তথাপি ভারতের মুসলমানদের ইতিহাসে তাঁহার একমাত্র তুলনা নাকি বাদশাহ ঔরঙ্গজেব। তিনি যে বর্তমান ভারতের মুসলমানদের তীব্র আকাজক্ষা, রাজ্যলিপ্সা, জিগীষা—এবং বলিতে

যাইতেছিলাম, জিহাংসার—মূর্ত প্রতীক, ইহাও তাঁহার নিজের এবং অন্য অনেকের উক্তি হইতেই প্রমাণ করায়। ইসলাম অহিংসায় বিশ্বাস করে না, মুসলমান লড়াই করিতে জানে, ভেড়ার মত শুধু জেলে যায় না, ইত্যাদি উক্তি লীগপন্থী মুসলমানেরা একাধিকবার করিয়াছেন, আর, ইংরেজেরা শক্তিতে বিশ্বাস করে, শক্তির ভক্ত, ইত্যাদি ধরণের বাণী জিন্নার শ্রীমুখ হইতেও নিঃসৃত হইয়াছে। স্বতরাং মানুষ হইতে পৃথক মুসলমানদের বিজয়লিপ্সা জিন্নায় মূর্তি গ্রহণ করিয়াছে, ইহা অস্বীকার করা যায় না।

এই মহা মুসলমান এবং তথাকথিত মহামানব জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব গান্ধীর মৃত্যুতে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে এবং আমাদেরও অল্পধাবন-যোগ্য। যাহাকে জাপানের সম্রাট এবং আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান হইতে আরম্ভ করিয়া শহরের রিক্সা-ওয়ালা পর্যন্ত ‘মহাত্মা’ বলিয়া শ্রদ্ধা দেখাইয়াছে—যাহাকে সমস্ত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের লোক ‘শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ’, যীশুর সমান এবং বুদ্ধের সমান প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছে—কায়দ-এ-আজম জিন্না তাঁহাকে একজন বিশিষ্ট ‘হিন্দু’ নেতার বেশী ভাবিতে পারেন নাই। জিন্নার ইতিহাস বুঝিবার এবং মূল্য মাপিবার শক্তি এত কম যে গান্ধীজী যে হিন্দুদের কত উদ্ধে তাহা তিনি আন্দাজও করিতে পারেন নাই। সে দিন আবার পাকিস্তানের পার্লামেন্টে আরও একটু মুকব্বিয়ানা করিয়া বলিয়াছেন, গান্ধী তাঁহার কর্তব্য পালন করিতে গিয়া মরিয়াছেন। অর্থটা অস্পষ্ট; তবে বোধ হয় এই যে, ভারতের মুসলমানদের রক্ষার চেষ্টা করা ত তাঁহার কর্তব্যই ছিল। ইহার নির্গলিতার্থ এই—পাকিস্তানের অমুসলমানদের রক্ষা করা কাহারোই কর্তব্য নয়—জিন্নার ত নিশ্চয়ই নয়।

জিন্না নিজেকে খুবই যে বড় মনে করেন তাহার প্রমাণ দেওয়া চলে। গান্ধী তাঁহার সমকক্ষ, এ কথা তাঁহার মনের অন্ধকারে কোথাও প্রকাশ পায় না, তিনি গান্ধী হইতে বড়, ইহাই বরং তিনি ভাবেন। কিন্তু একথা আমরা লিখিয়া রাখিলাম, গান্ধী জীবনে এবং মৃত্যুতে জগতের যত্থানি সম্মান ও শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছেন, জিন্না জীবনে তাহা পান নাই, মরিয়াও পাইবেন না। ভারতের ধর্মাত্ম মুসলমানেরা তাঁহাকে বড় ভাবে ঠিক, কিন্তু এক মুসলমান ছাড়া আর ত কিছুই কথা তিনি ভাবিতে পারেন না। তাঁহার সমস্ত উক্তি একত্র করিলেও মানুষের হিতের কথা তিনি চিন্তা করিয়াছেন, এরূপ প্রমাণ মিলিবে না। ইদানীং আবার তাঁহার মুখে মুসলমান ধর্মের কথাও শোনা যায়, কিন্তু মানুষ তাঁহার বাক্য ও চিন্তায় কোথাও স্থান পায় নাই। যেখানে শ্বেত জাতির অ-শ্বেত জাতিদের উপর প্রভুত্ব কিংবা অত্যাচার

করে—যেমন দক্ষিণ-আফ্রিকায় কিংবা ইন্দোনেশিয়ায়—
 যেখানেও তিনি অশ্বত মুসলমানদিগকে অশ্বত অ-মুসলমান-
 দের হইতে স্বতন্ত্র করিয়া লইয়া মুসলমানদের জন্য একটু
 পৃথক্ স্থবিধা আদায়ের কথা ভাবেন এবং সেইরূপ চেষ্টা
 করেন। এই মনোভাব কি ইহাই প্রকাশ করে না যে মুসল-
 মান হওয়ার মত মানুষের পক্ষে শ্রেষ্ঠ অথবা প্রশংসার
 যোগ্য আর কিছু নাই ?

জিনা এবং তাঁহার অনুচরদের মনে আরও একটা গুপ্ত
 আকাঙ্ক্ষা আছে যাহা কথায় এবং কার্যে অনেক সময় প্রকাশ
 হইয়া পড়ে। ইহার ভারতবর্ষকে আবার একটা মুসলমান
 রাজ্যে পরিণত করিতে চান, যেমন ঔরঙ্গজেবের সময় ছিল
 ঠিক তেমনই। এই রাজ্যে অমুসলমানেরা হয় পবিত্র ইসলাম
 গ্রহণ করিবে, না হয় মুসলমানের পদানত হইয়া থাকিবে।
 এই মনোবৃত্তিও প্রমাণ করে যে, মানুষের অধিকার হইতে
 মুসলমানের অধিকার বড়, এবং মুসলমানই মহত্ত্বের
 উপরে।

মুসলমান ধর্মে মেহেদিবাদটা কখনও কখনও দেখা
 গেলেও অবতারবাদ নাই। তথাপি ভারতের বহু মুসল-
 মানের নিকট জিনা পয়গম্বরের সমকক্ষ ত বটেনই, হয় ত বা
 কিছু উপরে। স্ততরাং তাঁহার যে চিন্তা, সেটা মুসলমান-
 সমাজের বহু লোকের চিন্তা, এরূপ মনে করিলে কাহারও
 প্রতি অবিচার করা হইবে না। একটা কথা আছে, 'যথা
 দেব তথা ভক্ত,' অর্থাৎ যে যাহাকে উপাসনা করে, সে
 তাহার গুণাবলীও অনুকরণীয় মনে করে। উপাস্ত দেবতার
 প্রকৃতি হইতে উপাসকের প্রকৃতিও বুঝা যায়। তাই যদি
 হয়, তবে জিনাভক্তদের সম্বন্ধে আমাদের কি ভাবা উচিত ?

পৃথিবী হইতে বর্বর ও বর্বরতা এখনও লোপ পায় নাই
 অর্থাৎ সকল মানুষ এখনও সমান সভ্য হয় নাই। বর্বর
 জাতি প্রাচীন গ্রীসের চারিদিকে ছিল, আর, রোমক
 সাম্রাজ্যকে ধ্বংসও করে উত্তর ও পূর্ব ইউরোপের
 বর্বরেরা। কিন্তু ইউরোপের এই বর্বরেরা খ্রীষ্টানধর্মের
 প্রভাবে সভ্য হইয়া যায়, এবং তাহাদেরই বংশধর বর্তমান
 ফরাসী ও জার্মান জাতি ইউরোপের দুইটি শ্রেষ্ঠ জাতি।
 মুসলমান-ধর্মের প্রভাবে কোন বর্বর সভ্য হয় নাই, একথা
 বলিব না। উত্তর-আফ্রিকায় এবং নিজ আরবভূমিতে
 অজ্ঞান তিমিরে আচ্ছন্ন বর্বরেরা ইসলামের প্রেরণায়
 আলোক দেখিয়াছিল। তার পর পারস্যের আর্ধ্যজাতি
 কর্তৃক গৃহীত হইয়া ইসলাম আরও বিকশিত হইয়া উঠে এবং
 স্পেন হইতে ভারত পর্যন্ত বিরাট ভূখণ্ডে বহু জ্ঞানচর্চার
 কেন্দ্র উদ্ভূত হয়। কিন্তু এসব প্রাচীন ইতিহাসের কথা।
 বর্তমানে ইসলামের একটা প্রকাণ্ড অংশে যে মনোভাব প্রবল
 হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে মানুষকে সভ্য করিবার জন্য

ইসলামের দান অপেক্ষা অমুসলমানের বিরুদ্ধে মুসলমানকে
 উত্তেজিত করার জন্য ইহার ব্যবহার করিবার আকাঙ্ক্ষা
 দেখা যায় বেশী। মুসলমান মানুষ হইতে শ্রেষ্ঠ, এই বিশ্বাস
 হইতেই এরূপ আকাঙ্ক্ষার উদ্ভব হয়। পার্শ্বত্যাগ অঞ্চলের
 বর্বর আফ্রিদি প্রভৃতি জাতিরাও শুধু মুসলমান বলিয়া যে
 কোন অমুসলমান হইতে শ্রেষ্ঠ—আইনস্টাইনের মত যীহুদী
 কিংবা রবীন্দ্রনাথের মত হিন্দু অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ—এইরূপ
 ধারণার আভাস পাওয়া যায় ভারতের অনেক মুসলমানের
 বাক্যে ও কার্যে।

বর্তমান যুগে 'কমুনিজম' বা সাম্যবাদ প্রকাশ্যে ধর্ম-
 বিরোধী। উহার মতে ধর্ম আফিমের নেশার মত—
 মানুষের জ্ঞান ও বুদ্ধিকে আড়ষ্ট করিয়া রাখে। স্ততরাং
 ধর্মকে সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের বেলায় একেবারে বর্জন করাই
 সাম্যবাদের অভিপ্রেত। ধর্মের যে একটা উন্নততা আছে
 তাহার প্রমাণ ইতিহাসে বহু মিলে। ধর্ম সমাজের উপকার
 করিয়াছে, এ কথা অস্বীকার করিব না, কিন্তু অপকারও যে
 করিয়াছে তাহাও আমাদের স্বীকার করা উচিত। সাম্যবাদ
 যে একেবারে ধর্মকে বর্জন করিতে বলে সে মত সকলে
 গ্রহণ না করিতে পারেন, কিন্তু ধর্মোন্মাদদের অনিষ্টকারিতা
 কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। ধর্মোন্মাদ বলিতে
 যাহা বুঝি, এই বিংশ শতাব্দীতে তাহার সাক্ষাৎ ভারতের
 মুসলমান সমাজের বাহিরে কমই মিলে। 'ভারতের' বলি-
 লাম এইজন্য, যে, তুরস্ক, ইরান, ইরাক প্রভৃতি মুসলমান
 দেশে ইহার প্রকাশ তেমন দেখা যায় না।

ভারতের কতক অংশের চিন্তায় এই যে মুসলমানকে
 মানুষের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিবার আকাঙ্ক্ষা দেখা যায়, ইহা
 একটি বিবাক্ত জিনিস, ইহার ভিতর বিপদের বীজ নিহিত
 রহিয়াছে। ইহার প্রমাণ নানা ভাবে গত দুই বৎসরে এই
 হতভাগ্য দেশে দেখা দিয়াছে। ইহা যে অমুসলমানের পক্ষে
 বিপজ্জনক, তাহা প্রমাণ করা সহজ। কিন্তু মুসলমানের
 পক্ষেও যে ইহা নিরাপদ নয়, তাহা চিন্তাশীল মুসলমানেরাও
 স্বীকার করিবেন, আশা করি। ইহা ধর্মোন্মাদেরই একটা
 রূপান্তর, স্ততরাং মানুষের সভ্যতাবুদ্ধির পরিপন্থী।
 মহত্ত্বকে অবহেলা করিয়া শুধু ধর্মবিশেষকে বড় করিয়া
 তোলার অর্থ বর্বরতার দিকে অগ্রসর হওয়া। প্রত্যেক
 ধর্মই তাহার অনুসরণকারীর নিকট সর্বশ্রেষ্ঠ, স্ততরাং
 সকলের সম্মতিক্রমে সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম আবিষ্কার করা সম্ভব নয়।
 যদি তাহা সম্ভবও হইত তথাপি উহাকে মানবধর্ম অপেক্ষা
 বড় মনে করা চলিত না। ধর্ম মানুষের বিকাশের—তাহার
 সভ্যতার একটা অঙ্গ মাত্র, ধর্মই সব নয়। দর্শন, সাহিত্য,
 শিল্প প্রভৃতিও সভ্যতার পরিপোষক। শুধু ধর্মে মানুষের
 পূর্ণ প্রকাশ হয় না। আর, ধর্ম ছাড়াও যে সভ্যতা সম্ভব,

ইহাও আজ মানুষের চিন্তা স্বীকার করে। স্মৃতরাং কোনও একটা বিশিষ্ট ধর্ম সভ্যতার পূর্ণাঙ্গ বিকাশ, এরূপ মনে করার মত সন্ধীর্ণতা আর নাই। কোন ধর্মবিশেষের শাস্ত্র কথায় কথায় অনুসরণ না করিয়া কিংবা উহার বিহিত আচার সব পরিপূর্ণ ভাবে পালন না করিয়াও মানুষ ধার্মিক হইতে পারে। আধুনিক জগতে তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ মহাত্মা গান্ধী। স্মৃতরাং মুসলমানকে মানবত্বের উপরে যাহারা স্থান দেন, তাহারা ভাল মুসলমান হইতে পারেন, কিন্তু পূর্ণাঙ্গব মানুষ নন। মনে রাখা উচিত যে, মানুষের পক্ষে মানুষ হওয়া অপেক্ষা বড় আর কিছু নাই। হিন্দু অথবা মুসলমান হইয়া যেমন মানুষ হওয়া চলে, তেমনই এ উভয়ের একটিও না হইয়াও মানুষ হওয়া চলে এবং উহার কোন একটি হওয়া

অপেক্ষা মানুষ হওয়ার দাম বেশী। যদি প্রশ্ন এই হয় যে হিন্দু হইব না মানুষ হইব, অথবা মুসলমান হইব না মানুষ হইব, তাহা হইলে চিন্তাশীল ব্যক্তিগণেই নির্ভয়ে উত্তর দিবেন; মানুষ হওয়াই শ্রেয়ঃ। অবশ্যই, হিন্দু কিংবা মুসলমানত্ব ও মনুষ্যত্বের মধ্যে এমন কোন বিরোধ নাই যে, উভয়ের একত্র অবস্থিতি সম্ভব নয়। কিন্তু সব সময়েই মনে রাখা উচিত যে, মানবত্বকে অবনমিত করিয়া শুধু ভাল মুসলমান বা ভাল হিন্দু হওয়ার যে ইচ্ছা সেটি ধর্মোন্মাদদেরই নামান্তর, স্মৃতরাং বর্জনীয়। আমাদের ভাবা উচিত যে, মানবধর্ম সকল ধর্মের উপরে এবং মানবজাতি সকল জাতির উপরে, “জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে, সে জাতির নাম ‘মানব জাতি’।”

বিমানে ভূ-প্রদক্ষিণ

শ্রীবিনয়ভূষণ দাসগুপ্ত

মধ্য-পশ্চিম

আমেরিকাকে পূর্ব পশ্চিমে চারি অংশে বিভক্ত করা হইয়াছে। আটলান্টিক উপকূলে নিউ ইয়র্ক প্রভৃতি স্থান পূর্বাঞ্চল। শিকাগো ও তৎপার্শ্ববর্তী স্থানসমূহ মধ্য-পশ্চিমাঞ্চল। তাহার পশ্চিমে পার্বত্য অঞ্চল। প্রশান্ত মহাসাগরের তীরবর্তী প্রদেশ পশ্চিমাঞ্চল। এই চারিটি অঞ্চলে চারি প্রকার সময় অনুসৃত হয়। দুইটি পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মধ্যে সময়ের পার্থক্য এক ঘণ্টা। নিউ ইয়র্কে যখন সকাল-১০টা, তখন শিকাগোতে সকাল ৯টা, পার্বত্য প্রদেশে সকাল ৮টা, এবং পশ্চিম প্রদেশে সকাল ৭টা। আটলান্টিক হইতে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত আমেরিকার বিস্তার ৩০০০ মাইল।

নক্সডিল হইতে শিকাগোর দূরত্ব সিধা পথে বেশী নয়। কিন্তু আমি ওয়াশিংটন হইয়া যাইব। ওয়াশিংটনে বিমান বদল করিতে হইবে।

১৫ই ডিসেম্বর রবিবার বৈকাল আড়াইটায় নক্সডিল বিমানখাতি হইতে বিমান উড়িল। বিমানটি একঘণ্টা বিলম্বে চলিতেছিল। ওয়াশিংটনে গিয়া শিকাগোর বিমান পাইব। কি না সন্দেহ।

সাড়ে চারিটারও পরে ওয়াশিংটন বিমানখাতিতে নামিলাম। শিকাগোর বিমান তখন প্রস্তুত। সোজা সেই বিমানে গিয়া উঠিলাম। পাঁচটার বিমান উড়িল। রাত্রি নয়টা নাগাদ শিকাগো পৌছিবে। দূরত্ব প্রায় ৮০০০ মাইল। এর মধ্যে বিমান কোথাও নামিবে না। সন্ধ্যার অন্ধকারে

পৃথিবী ও আকাশ আবৃত হইল। অন্ধকার ভেদ করিয়া বিমান সগর্জনে ছুটিয়াছে। বাকচতুরা ষ্টুয়ার্ডেস যাত্রীগণের সঙ্গে নানাবিধ আলাপ করিয়া তাহাদের চিত্তবিনোদন করিতেছেন। তাহার ধারণা তাজমহল একটি দেব-মন্দির। ইহা একটি খ্রীলোকের সমাধি-মন্দির শুনিয়া ভারতীয় জীজাতির পোশাক-পরিচ্ছদ ও কাজকর্মাদি সম্বন্ধে বিশেষ কোতূহল প্রকাশ করিলেন। ভারতীয় খ্রীলোকেরা কাজের উপযোগী খাটো কাপড় পরিয়া এরোপ্লেনের ষ্টুয়ার্ডেস হয় কিনা, অভিজাত সমাজের রুচিসম্মত আভূষি-বিলম্বিত পোশাক-পরিবার সুযোগই বা তাহাদের কিরূপ ইত্যাদি নানাবিধ প্রশ্ন করিতেছিলেন। বিমানটি মাঝে মাঝে আলোকোজ্জ্বলিত এক একটি সহর অতিক্রম করিতেছিল। তন্মধ্যে পিটসবার্গের দৃশ্য সত্যই অপরূপ। কি অপূর্ণ আলোকসজ্জা! রঙে ও উজ্জলতায় তাহা অতুলনীয়। রাস্তা ও বাড়ীগুলি স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। রাস্তা দিয়া আলো ছড়াইয়া মটর ছুটিতেছে। স্থানে স্থানে আলোকমালা জ্বলিতেছে ও নিবিতেছে। যাত্রীগণ সে রমণীয় দৃশ্য হইতে চোখ ফিরাইতে পারিতেছেন না। অন্ধকার মহাসমুদ্রে দ্বীপের মত জাগিয়া থাকা ক্লিভল্যান্ড প্রভৃতি আরও কয়েকটি সহর অতিক্রম করিলাম। যেন অনন্ত মহাশূণ্ডের মধ্য দিয়া উড়িতেছি। মাঝে মাঝে এক একটা ব্রহ্মাণ্ড সেই মহাশূণ্ডে ভাসিতেছে। তারকাখচিত আকাশের নীচে তাহাই কচিং কখনো দৃশ্যমান হইতেছে, আবার বিলীন হইয়া যাইতেছে।

সহস্রা পরিষ্কার আকাশে মেঘোদয় হইল। শিকাগোর শিকটবর্তী হইতেছি। ষ্টুয়ার্ডেস্ সকলকে বলিয়া গেলেন যে, শিকাগোতে বরফ পড়িতেছে। সেখানে বিমান নামিতে পারিবে না।

শতাধিক মাইল দক্ষিণে ইণ্ডিয়ানা পলিস্ বিমানঘাটতে বিমান নামিল। যাত্রীগণের মধ্যে অনেকই প্রভাতে শিকাগো পৌঁছিবাব জন্ত উদ্বিগ্ন। বিমানের কর্মচারিগণ খবর লইয়া বলিলেন যে শীঘ্রই শিকাগো যাইবার ট্রেন আছে। যাত্রীগণ দ্রুত স্ব স্ব মাল খালাস করিয়া লইলেন। ঘাটির কর্মচারিগণ ভাড়ার কিয়দংশ যাত্রীদিগকে প্রত্যাৰ্পণ করিলেন এবং বাসে করিয়া তাহাদিগকে ষ্টেশনে পৌছাইয়া দিলেন।

মাল খালাস করিতে যাইয়া দেখি আমার মাল আসে নাই। বুখিলাম ওয়াশিংটনে সময়ভাবে মালের প্লেন বদল সম্ভব হয় নাই। এবার আমার কাগজপত্রের এবং প্রসাধনের থলিঘর হাতেই রাখিয়াছিলাম। মনে করিলাম বড় থলি দুইটি ওয়াশিংটন হইতে পরবর্তী প্লেনে শিকাগো পৌঁছিবে। ভালই হইবে। ঘাটির আপিসে আমার শিকাগোর ঠিকানা লিখাইয়া দিয়া অত্যাশ্রয় যাত্রীগণের সঙ্গে ষ্টেশনগামী বাসে গিয়া উঠিলাম, বাস আলোকোজ্জ্বল নগরীর মধ্য দিয়া ষ্টেশনে পৌঁছিল।

এখানে রেলের প্রধানতঃ দুই শ্রেণী। কোচ্ এবং পুলম্যান্। পুলম্যানের মধ্যে দিনে প্রত্যেককে একটি করিয়া সোফা দেওয়া হয়। একপু সোফাসজ্জিত গাড়ীকে পার্লার কার বা বৈঠকখানা গাড়ী বলে। রাত্রে পুলম্যানের মধ্যে রকমারি বন্দোবস্ত থাকে। কোন গাড়ীতে শুধু শুইবার বার্থ থাকে। নীচের বার্থের ভাড়া কিছু বেশী। দিনের পার্লার কারই রাত্রে বার্থে পরিণত হয়। কোন গাড়ী কতকগুলি বেডরুম বা শয়ন কক্ষে বিভক্ত। এক একটি ছোট ছোট শয়নকক্ষে দুইটি করিয়া বার্থ এবং আলাদা বাথরুম। দিনে এই বার্থগুলি সোফায় পরিণত হয়। সমস্ত ট্রেনে একটি ক্লাব কার বা মিলনকক্ষ এবং একটি রেষ্টুর্যাণ্ট কার বা ভোজনকক্ষ থাকে। ক্লাব কারে যাত্রীগণ একত্র বসিয়া কথাবার্তা বলেন বা পুস্তকাদি পাঠ করেন। গাড়ীর মধ্যে পুস্তক ও মাসিকপত্র ইত্যাদি থাকে। কোচে শুধু বসিবার স্থান। তবে প্রত্যেক আসনেই পুরু ও কোমল গদি আঁটা। বার্থ বা শয়নকক্ষে কোম্পানী সম্পূর্ণ বিছানা দেয়। কোচে কোন বিছানা নাই।

কোচ ভিন্ন অল্প কোন গাড়ীতে স্থান পাওয়া গেল না। কোচের প্রত্যেক যাত্রী দুইটি করিয়া আসন পাইলেন। কোম্পানী কিঞ্চি ভাড়া লইয়া কোচের যাত্রীগণকে বালিশ সরবরাহ করেন। এক ব্যক্তি কতকগুলি বালিশ আনিয়া গাড়ীর মধ্যে ছাঁকিয়া গেল—“ভাল ঘুম, ভাল স্বপ্ন, চাই বালিশ”। একটি বালিশ লইলাম বটে। তবে ভাল ঘুমও হইল না; ভাল স্বপ্নও দেখিলাম না। ট্রেন যখন শিকাগো পৌঁছিল

তখন ফর্সা হইয়া আসিতেছে। ট্যাক্সি লইয়া হোটেলে চলিলাম।

সমস্ত শহর বেশ পুরু বরফে ঢাকা। রাস্তা দিয়া যে মোটর গাড়ীগুলি যাইতেছে তাহাদের উপরে ৪।৫ ইঞ্চি পুরু বরফ। সারারাত্রি জাগিয়া মিউনিসিপ্যালিটির লোক রাস্তার বরফ ঠেলিতেছে। তাহাতে রাস্তার দুই পাশে উঁচু বরফের লাইন সৃষ্টি হইয়াছে। মাঝে মোটর চলিবার মত খানিকটা রাস্তা। তাহাও অবশ্য বরফে আর্দ্র ও পিচ্ছিল। এ বছর এই প্রথম বরফ পড়িল। তবে প্রথম দিনই মাত্রাটা একটু বেশী।

শিকাগো বিরাট শহর। ইহার লোকসংখ্যা ৪০ লক্ষ। সমগ্র আমেরিকার মধ্যে নিউ ইয়র্কের পরেই ইহার স্থান। ব্যবসায়িক হিসাবে নিউ ইয়র্ক অধিতীয় হইলেও শিল্পক্ষেত্র হিসাবে শিকাগোরই প্রাধান্য অধিক। আমেরিকার বড় বড় কলকারখানা এই অঞ্চলে এবং তাহাদের প্রধান কার্যালয় প্রায়ই শিকাগো শহরে। শীতের দিনে আকাশ হইতে পতিত যে রক্তভক্ত হিমকণা শহরটিকে আবৃত করিয়া ফেলে তাহা শীঘ্রই এখানে ধূম্রমলিন হইয়া যায়। ইহা আমেরিকার বৃহৎ বাণিজ্যের একটি শক্তিশালী কেন্দ্র। রিপাবলিকান দলের প্রভাব এখানে খুব বেশী। ইহা ইলিনয় রাজ্যের অন্তর্গত, কিন্তু রাজ্যের রাজধানী অত্যাশ্রয় সরকারী আপিস এখানে বিশেষ নাই। তবে কেন্দ্রীয় সরকারের পাবলিক ডেট আপিস এই শহরে বিদ্যমান। নগরোপকণ্ঠে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরাট হর্ম্যরাজি। শহরের চারিদিক হইতে অনবরত বৈজ্ঞানিক রেলগাড়ীগুলি যাতায়াত করিতেছে। ইহার দ্বন্দ্বনিবিষ্ট ষ্টেশনসমূহে বিপুল জনস্রোত ক্রমাগত কবলিত করিতেছে, আবার উদ্দীর্ণ করিতেছে। যাতায়াতের ইহাই প্রশস্ত উপায়। মাটির নীচে কোন লাইন নাই। এখানে খুব বড় বড় ডিপার্টমেন্টাল ষ্টোরস্ আছে। এই ষ্টোরগুলির ডাকে কারবার যথেষ্ট। বড়দিনের প্রাকালে এগুলির বিক্রয় পুরাদমে চলিতেছিল। এবার যুদ্ধের পর বিক্রয়ের হার খুব বাড়িয়া গিয়াছিল। খবরের কাগজে রোজই এ বিষয়ে তথ্যপ্রকাশ ও আলোচনা চলিতেছিল। এখানকার মার্শাল ফিল্ডের ষ্টোর সমধিক প্রসিদ্ধ। খ্রিঃফিল্ডে এক পদস্থ ব্যক্তি কথাপ্রসঙ্গে আমাকে বলিয়াছিলেন, “এ যেন মার্শাল ফিল্ডের বিল পরীক্ষা করা। ইহার আয় যে স্তরে সেখানে বেশী আমদানী সত্ত্বেও আয়-কর দিয়া কিছুই উদ্ধৃত থাকে না। ইহার বিল পরীক্ষা করিয়া সময় নষ্ট করা মূর্থতা।”

আমি যে হোটেলে ছিলাম তাহার নাম ব্লাকস্টোন হোটেল। হোটেলটি সুপ্রসিদ্ধ; শহরের শ্রেষ্ঠ রাজপথ মিসিগ্যান এভিনিউতে অবস্থিত। হোটেলটি ১৮ তলা। আমি ছিলাম ১৪ তলায়। প্রকাণ্ড হোটেল। ওয়াশিংটন বা নক্সভিলের হোটেল হইতে এই হোটেলের কর্মব্যস্ততা অনেক

বেশী দেখিতেছি। ভোজনকক্ষের শোভা, পরিবেশন-নৈপুণ্য এবং খাদ্যব্যবস্থার প্রাচুর্য তুল্যরূপেই চিত্তাকর্ষক। লাউজ কক্ষটি নীতিবাহক; আসন্ন বড়দিন উপলক্ষে সুসজ্জিত। বড়দিনের সজ্জার দুইটি বিশেষত্ব—খ্রীষ্টমাস তরু ও সান্তারক্কের মূর্তি। মধ্যস্থলে একটি বড় খ্রীষ্টমাস তরু জরি ও আলোকমালা দ্বারা শোভিত। এটা একটা বড় পাইন গাছের ডাল; নীচে তাহার ঘনসবুজ পাতা একটিও পড়ে নাই। পাতার উপর মাঝে মাঝে সাদা রঙের বসান। মনে হইতেছে যেন পাতার উপর বরফ পড়িয়াছে। নানা রঙের আলো গাছের শাখা-প্রশাখায় লগ্ন। গাছটিকে ঘরের মধ্যস্থলে একটি বরফের স্তূপের মধ্যে বসাইয়া রাখা হইয়াছে। অপর কোণে করুণাবতীর সান্তারক্কের সহায় শ্রুতল মূর্তি। নিশাকালে আলোকোদ্ভাসিত মুখখানি স্বতঃই ঈষৎ আন্দোলিত হইয়া যেন আগন্তুকদিগকে স্বাগত করিতেছে। ঘরটি ইতস্ততঃ-সঙ্করমান সুদর্শন নরনারী সমাগমে পূলকোচ্ছল।

ভোজনকক্ষে একটি পরিবেশকের সঙ্গে আলাপ হইল। সে ব্রিটিশ আর্মির সঙ্গে বোম্বাই গিয়াছে; কিছুদিন ব্রিটিশ উপ-নিবেশ ট্রিনিদাদে বাস করিয়াছে। ইহার মতে ব্রিটিশরা যে-হারে বেতন দেয় তাহা তাহাদের মারাত্মক অবিবেচনা ও নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক। এদেশে বর্তমানে দারিদ্র্য-সমস্যা দেখিতেছি না। বেকার কেহ নাই। মজুরীর সর্বনিম্ন হার মাসিক ১৭৫ ডলার বা প্রায় ৬০০ টাকা। শুধু সাধারণ কার্যিক পরিশ্রমেরই এই মূল্য। বাড়ীতে চাকর রাখিবার প্রথা নাই বলিলেই হয়। প্রত্যেকেই নিজ নিজ কাজ করে। তাহাতে লজ্জা বা মর্যাদাহানি হয় না। চাকরের মাহিনা মাসিক প্রায় ২০০ ডলার। সাধারণতঃ শ্রমিকগণ সপ্তাহে ৫ দিনে মোট ৪০ ঘণ্টার বেশী খাটে না। শনি ও রবিবার দুই দিন পূরা ছুটি। অল্প দিন ৮ ঘণ্টা করিয়া খাটিবার নিয়ম। যন্ত্রপাতির ব্যবহার এদেশে খুব বেশী। নিজেরাও যন্ত্রের মত নিয়মাবলী ও কর্তার পরিশ্রমী। অল্প পরিশ্রমে অধিক উৎপাদন করে বলিয়া ইহাদের মজুরীর হার এবং বিশ্রামের সময় উভয়ই খুব বেশী। এদেশের ট্রেড ইউনিয়ন কদাপি যন্ত্রের বিরোধিতা করে না। ইহারা জানে যে যন্ত্র ব্যতীত উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব নয়; আর উৎপাদন বৃদ্ধি না করিয়া মজুরী ও বিশ্রামকাল বৃদ্ধির আশা করা মূর্থতা। বর্ধিত উৎপাদনের উপযুক্ত অংশ হইতে মজুরগণ যাহাতে বঞ্চিত না হয় সে বিষয়ে অবশ্য ইহাদের কড়া নজর। ট্রেড ইউনিয়নগুলি বড় বড় অর্থনীতিবিদ ও সংখ্যাগুরুবিদ নিযুক্ত করিয়া সর্বদা হিসাব রাখে কি হারে মজুরের উৎপাদন-শক্তি বাড়িতেছে। তদনুসারে ইহারা মজুরীর দাবি করে। ১৯৪৫ সালের নবেম্বর মাসে নিউ ইয়র্কের ১৮১৯ নং ব্রডওয়েতে অবস্থিত গ্রাশহাল ব্যুরো অব ইকনমিক রিসার্চ ফার্মিন শিল্পে শ্রমসংক্ষেপ বিষয়ে একটি গবেষণামূলক নিবন্ধ প্রকাশ করেন। নিবন্ধটির নাম “লেবর

সেভিং ইন্ আমেরিকান ইন্ডাস্ট্রি, ১৮৯৯-১৯৩৯”—লেখক সোলোমন ফেব্রিক্যান্ট। তাহার হিসাবমত ১৮৯৯ হইতে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত আমেরিকায় শ্রমিক-পিছু জাতীয় উৎপাদন ৭০ শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই সময়ে সাপ্তাহিক শ্রমকাল উৎপাদন-শিল্পে পঞ্চমাংশ হ্রাস পাইয়াছে। ফলতঃ প্রতি জনের ঘণ্টায় উৎপাদন শত শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে বা ঠিক দ্বিগুণ হইয়াছে। অর্থাৎ এক ব্যক্তি এক ঘণ্টা খাটিয়া ১৮৯৯ সালে যত মাল উৎপাদন করিত ১৯৩৯ সালে করিত তার দ্বিগুণ।

এই দারিদ্র্যহীন দেশে কম্যুনিজমের প্রভাব নাই। ইহারা যে হারে মজুরী দেয় এবং এখানে মজুরগণ সপ্তাহে যত বিশ্রামকাল প্রাপ্ত হয় তাহা রাশিয়ার মজুরদের পক্ষাতিত। শিকাগো পরিভ্রমণ করিবার পর একটি কাগজে দেখিয়াছিলাম যে শিকাগোর জনৈক বড় ব্যবসায়ীকে একটি কাগজে কম্যুনিষ্ট ভাবাপন্ন বলিয়া অভিহিত করায় উক্ত ভদ্রলোকটি কাগজের নামে আদালতে মানহানির মোকদ্দমা করিয়া ডিগ্রি পাইয়াছেন।

শিকাগোর যে বাড়ীটিতে আমার প্রধান কর্মস্থল ছিল তাহা পূর্বে ষষ্ঠীতম প্লটের ১৩১৩ নম্বর বাড়ী। বাড়ীটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনতিদূরে, শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত। এই বাড়ীটিতে সাতটি এসোসিয়েশন্ বা সমিতির মূল আপিস। তাহাদের নাম ও বিবরণ এইরূপ:

১। কাউন্সিল অব গ্রেট গবর্নমেন্ট বা প্রাদেশিক সরকার পরিষৎ। আমেরিকার ৪৮টি গ্রেট গবর্নমেন্ট সম্বন্ধে তথ্যসংগ্রহ, আলোচনা ও গবেষণা চালানই এই পরিষদের কাজ।

২। পাবলিক এ্যাডমিনিস্ট্রেশন সার্ভিস বা সরকারী শাসনপ্রণালীর সহায়ক সমিতি। সরকারী শাসনপ্রণালীর সংস্কার সাধনপূর্বক কিরূপে উহাকে উন্নততর করা যায় তাহাই ইহাদের গবেষণার বিষয়। ইহাদের নিযুক্ত সুনিপুণ তথ্যবিশারদ ও তত্ত্বজ্ঞগণ রহিয়াছেন। গ্রেট গবর্নমেন্ট বা মিউনিসিপ্যালিটিগুলি নিজেদের শাসনপ্রণালীর সংস্কার-মানসে এই সমিতির সাহায্য চাহিলে ইহারা গিয়া সমস্ত বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া রিপোর্ট দাখিল করেন।

৩। ফেডারেশন অব ট্যাক্স অ্যাডমিনিস্ট্রেশন্স বা কর নিয়ামকদের সমিতি। আমেরিকার সমস্ত রাষ্ট্রের কর নিয়ন্ত্রণাদি সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য ও তত্ত্ব এখানে সংগৃহীত হয়।

৪। গ্রাশহাল এসোসিয়েশন অব এসেসিং অফিসার বা করনির্দ্ধারক কর্মচারীগণের জাতীয় সমিতি। আমেরিকার সমস্ত নগরে মিউনিসিপ্যাল কর কিরূপে ধার্য হয় এবং তদর্থে বাড়ীর মূল্য নির্দ্ধারণ কিরূপে করা হয় ইহারা সে বিষয়ে তথ্যসংগ্রহ ও তত্ত্বালোচনা করেন।

৫। সিভিল সার্ভিস এসেসম্রি বা সরকারী চাকুরিয়া সমিতি। সরকারী চাকুরীকে রাজনীতির প্রভাবমুক্ত করিয়া

কিরূপে শুধু গুণমূলক করিয়া তোলা যায় ইংহারা সেই বিষয়ে চিন্তা করেন।

৬। আমেরিকান সোসাইটি অব প্ল্যানিং অফিসিয়ালস বা মার্কিন পরিকল্পনাকারী কর্মচারীগণের সমিতি। সর্বাঙ্গীণ পরিকল্পনা দ্বারা কিরূপে রাষ্ট্রের উন্নতিসাধন করা যায় ইংহারা সে বিষয়ে গবেষণায় রত আছেন।

৭। পাবলিক এডমিনিষ্ট্রেশন ক্লিয়ারিং হাউস বা সরকারী শাসন বিষয়ে সংবাদ সংগ্রহ ভবন। প্রথমোক্ত ছয়টি সমিতি যত এত প্রণয়ন বা নিবন্ধাদি রচনা করেন এই সমিতি সেগুলি প্রকাশ ও বিক্রয় করেন।

প্রত্যেকটি সমিতির সদস্য-সংখ্যা সহস্রাধিক। সরকারী কর্মচারী, অধ্যাপক ও ব্যবসায়ীগণ ইহাদের সদস্য। সদস্য-গণের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও চিন্তা দ্বারা প্রত্যেক বিষয়ের উপর যে আলোকপাত হয় তাহাতে দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইয়া থাকে।

আমেরিকার বাহিরে এই জাতীয় গবেষকমণ্ডলী কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের সহিত তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণের আলোচনা দ্বারা যে-কোন দৈনন্দিন কার্যের উন্নতিসাধন চেষ্টা এদেশের একটি বিশেষত্ব। এই সমস্ত সমিতির কর্মীগণ স্ব-স্ব কার্যে সর্বদা মনোযোগী। প্রত্যেক বিষয়ের খুঁটিনাটি সংবাদ ইংহাদের নখদর্পণে। ইংহাদের সঙ্গে নানা বিষয়ে দিনের পর দিন আলোচনা করিয়া বহু জ্ঞানলাভ করিয়াছি। ইংহারাও আমাকে সমাদরে গ্রহণ করিয়াছেন এবং পরম যত্ন সহকারে আমার সকল প্রশ্নের সমাধান করিয়া দিয়াছেন। কখনও কখনও প্রশ্ন করিয়া ভারতবর্ষ সংক্ষেপে অনেক তথ্য আমার নিকট হইতে জানিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ইংহারা এক দিন আমাকে বলিলেন, “এদেশে বর্তমানে ভারতীয় ছাত্র পূর্বাশ্রয়ী বেনী আসিতেছে। তাহাদের দৃষ্টিভঙ্গী ও পরিবর্তন দেখিতেছি। পূর্বে ইংহারা সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতি পড়িত; এখন কাজ শিখিবার দিকেই ঝোক বেশী।”

১৩১৩ নম্বরের রাষ্ট্রীয় অফিসেই বিরাট বিশ্ববিদ্যালয়। বহুদূর ব্যাপিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সৌধশ্রেণী। এখানে একটি বইয়ের দোকানের শো রুমে জবাহরলালের “ডিস্কভারি অব ইণ্ডিয়া” দেখিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের কেফিটেরিয়ায় প্রায়ই মধ্যাহ্নভোজন করিতাম। আসন্ন বড়দিন উপলক্ষ্যে কেফিটেরিয়ার প্রবেশকক্ষ ক্রীষ্টমাস তরুদ্বারা সজ্জিত।

কয়েকটি ভারতীয় ছাত্র দেখিলাম। ১৩১৩ নং বাড়ীতে তত্ত্বীক মুজেন সাহেবের সঙ্গে আলাপ হয়। ইনি ব্রেজিল নিবাসী পদস্থ সরকারী কর্মচারী। ব্রেজিলের অনেক কথা ইংহাদের নিকট শুনিলাম। মুজেন-পত্নী আমার দশবর্ষীয়া কন্যার সম্বন্ধে প্রায়ই প্রশ্ন করিতেন।

১৯শে ডিসেম্বর রুহস্পতিবার বৈকালে মার্কিন সরকারের পাবলিক ডেট আপিস দেখিতে যাই। যে বাড়ীর একাংশে

আপিসটি অবস্থিত তাহার নাম মার্চাণ্ডাইস মার্ট বিল্ডিং। বাড়ীটি শহরের কেন্দ্রস্থলে—নদীতীরে। সেতু পার হইয়াই ইংহার সদর। অত্যুচ্চ বিরাট বাড়ী—১৮ তলা বিশিষ্ট। অসংখ্য দোকান ও আপিস এই বাড়ীতে অবস্থিত। এই বাড়ীটি পৃথিবীর বৃহত্তম বাড়ী বলিয়া পরিচিত। নিউ ইয়র্কের ১০২ তলা এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিংও নাকি ইহা অপেক্ষা ছোট।

মাত্র ১৮ তলা বাড়ীটি পৃথিবীর বৃহত্তম বাড়ী কিনা সে বিষয়ে আমার মনে অবশ্য কিছু সংশয়ের উদয় হইয়াছিল, কিন্তু এই পাবলিক ডেট আপিস যে পৃথিবীর বৃহত্তম পাবলিক ডেট আপিস সে বিষয়ে কেহ বলিয়া না দিলেও আমি নিঃসন্দেহ হইয়াছিলাম। গত বিশ্বযুদ্ধ চলিয়াছিল আমেরিকার টাকায়। আর সেই টাকা সংগ্রহ করিয়াছিল এই পাবলিক ডেট আপিস। বর্তমানে টাকাসংগ্রহের পর্ব শেষ হইয়াছে। এখন স্বদেব দিবার পাল। শুনিলাম মাসে ৫০।৬০ লক্ষ চেক এই আপিস হইতে বর্তমানে বিলি হইতেছে। স্বদেব কমা, চেক লেখা ও চেকগুলিকে যথানামে প্রেরণ করা এক বিরাট কাজ। তৎসহ খতের মালিকের নাম পরিবর্তন, উত্তরাধিকার লইয়া বিবাদ ইত্যাদি নানাবিধ আনুষঙ্গিক কাজও কম নয়।

মাত্র ৫।৬ হাজার কর্মচারী এই সমস্ত কাজ সুষ্ঠুভাবে নির্বাহ করে। আপিসের সমস্ত কাজেই যত্ন ব্যবহৃত হয়। প্রথমতঃ এত খত রাখিবার স্থান নাই, কাজেই খতগুলির ফটো তুলিয়া ফিল্ম করিয়া কাটিমে জড়াইয়া অত্যন্ত সঙ্গীণ স্থানের মধ্যে রাখা হয়। কোন খত লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইলে ফিল্মটিকে যথাস্থান হইতে বাহির করিয়া বৃহত্তর আকারে পরিণত করিয়া কোর্টে পেশ করা হয়। স্বদের হিসাব তো যত্নে হয়ই, চেক লেখা, সেই করা, খামে পোরা, ঠিকানা লেখা প্রভৃতি সমস্ত কাজই যত্নে হইতেছে। যত্নের বহুল ব্যবহার আছে বলিয়া অল্প লোকে এত বেশী কাজ করিতে পারে। সেজন্য ইংহারা কর্মচারীদের উচ্চ হারে মাহিনা দিয়াও কম খরচে কার্যনির্বাহ করে। নিউ ইয়র্ক ও মণ্ট্রিয়লের বিক্রয়-কর আপিসে দেখিয়াছি বেতনের সর্বনিম্ন হার মাসিক ১৭৫ ডলার হওয়া সত্ত্বেও আদায়-খরচ মাত্র সংগৃহীত করের ২ কি ৩ শতাংশ। আমাদের দেশে বেতনের সর্বনিম্ন হার মাত্র ৩৫ হওয়া সত্ত্বেও আদায়-খরচ তদপেক্ষা অনেক বেশী। শিকাগোর পাবলিক ডেট আপিসের ডিরেক্টর মাইকেল ই. ম্যাক্‌গোগান আপিসের যন্ত্রাধ্যক্ষ ডোলে মহাশয়ের সঙ্গে পরম যত্নসহকারে আমাকে আপিসের যাবতীয় কর্মপদ্ধতি দেখাইলেন। আমি সবিস্ময়ে ইংহাদের কর্মকুশলতা দেখিয়া হোটলে কিরিনাম।

পূর্বেই বলিয়াছি ইণ্ডিয়ানাপলিসে আমার মাল না গাইয়া বিমান কোম্পানীর নিকট আমার শিকাগোর ঠিকানা রাখিয়া আসিয়াছিলাম। একটি মার্কিন যুবক আমার সেক্রেটারীরূপে আমেরিকা ও ক্যানাডায় সর্বত্র আমার সঙ্গে ভ্রমণ করিয়াছিল। যুবকটি যুদ্ধের সময় প্যারিস-বাহিনীতে ছিল। তত্ত্বপলক্ষে

গ্রীস ও রাশিয়ায় গিয়াছে। স্প্যানিশ, গ্রীক এবং রুশ ভাষায় কথা বলিতে পারে। দ্রুত প্রতিক্রিয়ায় খুব নিপুণ। যুবকটি যেমন কর্মঠ তেমনি চরিত্রবান, নাম ওয়েবস্টার। তাহাকে দুই দিন বিমান আপিসে পাঠাইলাম। মালের কোন পাত্তা পাওয়া গেল না। পরদিন খবর লইয়া জানিলাম যে, কোম্পানীর হেড আপিস নিউ ইয়র্ক হইলেও এখানে একটি বড় শাখা আপিস আছে এবং সে আপিসের স্থানীয় অধ্যক্ষ কোম্পানীর ভাইস-প্রেসিডেন্ট। তাহার নাম কিং। ১৮ই ডিসেম্বর সকালে ওয়েবস্টারকে, মিঃ কিংয়ের নিকট পাঠাইলাম। ওয়েবস্টার আসিয়া বলিল “মিঃ কিং শুনিয়া বিশেষ দুঃখপ্রকাশ করিয়াছেন। এবং প্রতিশ্রুত হইয়াছেন যে যেকোনো ছোকরা তিনি আজকের মধ্যে মাল সন্ধান করিয়া হোটেলের পৌছাইয়া দিবেন। তিনি উপহার-স্বরূপ আপনাকে চুরুট ও পানীয় দিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু আপনি খান না বলিয়া আমি উহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছি।” তৃতীয় দিবসেও মাল না পাওয়ায় মিঃ কিংয়ের কথায় খুব আশা স্থাপন করিতে পারি নাই, সারাদিন কাজকর্ম করিয়া সন্ধ্যার পর সংশয়ান্বিত চিত্তে হোটেলের ফিরিলাম। অভ্যর্থনাক্ষে ঘরের চাবি আনিতে গিয়া দেখি সম্মুখে আমার থলিঘর। ওয়েবস্টারকে বলিলাম, “মিঃ কিংকে পরদিন টেলিফোনযোগে বিশেষরূপে ধন্যবাদ দিয়া দিও।” পরে ওয়েবস্টার কিং মহাশয়ের নিকট হইতে জানিয়াছিল যে মাল ডেট্রয়েটের মালগুদামে আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

শিকাগোর কর্মবহুল দিনগুলি দ্রুত কাটিয়া যাইতেছিল। বাহিরে তীব্র শীত। রবিবার বৈকালে যে বরফ পড়িয়াছিল সোমবারের মধ্যে তাহা অনেকটা পরিষ্কার করিয়া ফেলিলেও রাস্তার বাহিরে সর্বত্র বরফ জমিয়াছিল। ১৩১৩নং বাড়ী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঝখানে একটা খোলা জায়গায় বরফের মণ্ডল ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া ছেলেমেয়ে স্কেট করিত। রাশীকৃত বরফ রোটার দিয়া সমতল করিয়া তাহার উপর যুদ্ধারায় জল ছিটাইয়া দিলেই সেই পাতলা জলের পর্দাটা জমিয়া জমাট সিমেন্টের মত শক্ত ও মণ্ডল ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। আর বাহিরে যে তাপ তাহাতে বরফ গলে না। স্কেট-রত বালকবালিকাদের ভিড় দেখিতে বেশ লাগিত। সোমবার ঠাণ্ডা খুব বেশী ছিল না। মঙ্গলবার হইতে খুব শীত পড়ে। তাপ ৫ ডিগ্রি হইতে ১৮ ডিগ্রি পর্যন্ত ওঠানামা করিতেছিল। পরে সর্বোচ্চ তাপ ৩০ পর্যন্ত উঠিয়াছিল। দুদিন বেশ উত্তরে হাওয়াও বহিতেছিল। কাজের চাপ ও বাহিরের আবহাওয়া কোনটাই বাহিরে বেড়াইবার পক্ষে অস্বস্তিকর নয়। কিন্তু আমার হোটেলের নিকটবর্তী মিশিগান হ্রদ আমাকে অনবরত আকর্ষণ করিতেছিল। ১৯শে ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার পাবলিক ডেট আপিস হইতে ফিরিয়াই হ্রদের দিকে গেলাম।

মিশিগান এভিনিউর উপর হোটেল। রাস্তার অপর পারে অদূরে রিরাট সমুদ্রতুল্য হ্রদ। অপর পার

দৃষ্টিগোচর হয় না। হ্রদটি আমেরিকা ও ক্যানাডার মধ্যস্থ মহা হ্রদমালার অন্ততম। হ্রদের পারে বেড়াইবার প্রশস্ত স্থান ও চমৎকার বন্দোবস্ত আছে। সেখানে একটি একোয়েরিয়াম বা জলজন্তু-সংগ্রহ-গৃহ এবং একটি প্লানেটোরিয়াম বা গ্রহঘর আছে। এগুলি প্রথম চিত্তাকর্ষক। কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তি এখানে দেখিলাম না। শীতের আধিক্যে কেহ আর এখানে বেড়াইতে আসে না। গ্রীষ্মকালীন জনসমাগম ও নরনারীর আনন্দ-কোলাহল সহজেই অনুমান করিয়া লইলাম। সীতারের সুন্দর বন্দোবস্ত আছে, কিন্তু এখন লোকজন নাই। শুনিলাম পরদিন গ্রহঘরে একটি বহুতা হইবে।

পরদিবস ১৩১৩ নং বাড়ী হইতে ফিরিয়াই গ্রহঘরে বহুতা শুনিতে যাইব মনস্থ করিলাম। ট্রেন ইহাতে নামিয়া ট্যাক্সির জন্ত অপেক্ষা করিতেছি। গ্রহঘরটি যদিও খুব দূরে নয়, তথাপি সময় অল্প ছিল এবং আমার মত নবাগতের পক্ষে পথ চিনিয়া হাঁটিয়া যাওয়ার সময় বেশী লাগিবার সম্ভাবনা। কিন্তু ট্যাক্সি পাইতেছি না। মাঝে মাঝে দু-একটি ট্যাক্সি যাত্রী লইয়া আসিতেছে। তৎক্ষণাৎ অপেক্ষমাণ জনতার মধ্য হইতে কেহ কেহ তাহাতে চাপিয়া বসিতেছেন। প্রতিযোগিতায় আমার মত নবাগতের সফল হইবার আশা কম। একটি পুলিশ নিকটে দাঁড়াইয়াছিল। সে এই বিদেশী লোকটিকে যথেষ্ট সাহায্য করিল। আমাকে লইয়া বড় রাস্তার ধারে গিয়া চলন্ত ট্যাক্সি থামাইয়া আমাকে চাপাইয়া দিল। আমি বৃক্ষশি দিতে গেলে সিপাহীটি বলিল, “আপনি বিদেশী। আপনার নিকট হইতে বৃক্ষশি লইব না। আপনাকে সাহায্য করিয়াই আমি আনন্দ বোধ করিতেছি।”

গ্রহ-গৃহটি দেখিবার জিনিষ। স্থানে স্থানে আকাশে গ্রহ-উপগ্রহের অবস্থান সুন্দর করিয়া ছবির সাহায্যে দেখান আছে। তটীয় বহুতা সুরু হইল। ঘরের মধ্যে মাথার উপর একটা কৃত্রিম আকাশ তৈরি করা হইয়াছে। সেই আকাশে সত্যিকার আকাশেরই মত গ্রহ-উপগ্রহ চন্দ্র-সুৰ্য ও তারকারাজি উঠিতেছে আবার অস্ত যাইতেছে। মনে হইতেছে যেন সব সত্য। ঋতু অনুসারে এবং কালচক্রের আবর্তনে আকাশে তারকাবলীর সংস্থানের যে যে পরিবর্তন হয় তাহা দেখান হইল। যীশুর জন্মের পূর্বে জ্ঞানিগণ যে একটি উজ্জল জ্যোতিষ্ক দেখিয়াছিলেন তাহার একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাই ছিল অন্ধ্যকার বহুতার বিষয়। বহুতার ভাষা অতি প্রাঞ্জল। বক্তা বলিলেন যে, অন্ধ কন্ডিয়া দেখা যায় যে, যীশুর জন্মের সময় মীন রাশিতে বৃহস্পতি ও শনির মিলন হইয়াছিল এবং মঙ্গল আসিয়া তাহাদের সঙ্গে মিলিয়াছিল। এরূপ ঘটনা ৮০০ বছরে একবার হয়। বৃহস্পতি ও শনির মিলন হয় ১২৫ বছর অন্তর। আর তিন গ্রহের মিলন হয় ৮০০ বছর অন্তর। বহুতার মতে জ্ঞানিগণ হয়তো এই মিলন দেখিয়াই ঐশ্বরিক ব্যাপার মনে করিয়াছিলেন। বহুদিন আসন্ন। এ

সময়ে প্রথম বড়দিনের রাত্রিতে জেরুজালেমে আকাশের অন্ধকারে কিরূপ ছিল এবং সে আকাশে তারকাগুলির সংস্থানই বা কিরূপ ছিল তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া শ্রোতৃবর্গ পুলকিত হইয়াছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দের কর্মক্ষেত্র শিকাগো নগরী ভারত-বাসীর নিকট তীর্থস্থানস্বরূপ। প্রাতঃকালে টেলিফোন গাইড দেখিয়া স্থানীয় বেদান্ত সোসাইটির অধ্যক্ষের সঙ্গে আলাপ করিয়াছিলাম। তাঁহার নাম স্বামী বিশ্বানন্দ। তিনি টেলিফোনে সহসা বাঙালীর কণ্ঠস্বরে বিম্বিত হইয়াছিলেন নিশ্চয়। নৈশ ভোজনের পর তাঁহার আশ্রমে বাইব, কথা হইল। ভোজনান্তে ট্যাক্সিযোগে অত্যুজ্জ্বল আলোকমালা-শোভিত শহরের মধ্য দিয়া আশ্রমের দিকে চলিলাম। এক স্থানে বহু খ্রীষ্টমাস তরু বিক্রমার্থ রাখা হইয়াছে। তাহারই নিকট আশ্রম। নীচে কলিং বেল টিপিয়া। সঙ্গে সঙ্গে উপর হইতে স্বামীজীও একটি বেল টিপিলেন। তাহাতে দরজায় একটি শব্দ হইল এবং তৎক্ষণাৎ দরজার অর্ধমুদ্রিত হইল। তখন ধাক্কা দিতেই দরজাটি খুলিয়া গেল এবং ভিতরে ঢুকিতেই পুনরায় বন্ধ হইয়া গেল। এদেশে সমস্ত ক্লাট বাঙালীতেই উপর হইতে বোতাম টিপিয়া নীচের দরজা খুলিবার যান্ত্রিক বন্দোবস্ত আছে।

স্বামীজীর সহিত আমার পূর্বপরিচয় ছিল না। কিন্তু তাঁহার পরমাশ্রমীর মত ব্যবহারে পরিতুষ্ট বোধ করিলাম। উপরে দুইটি ঘর দেখিলাম। যেটিতে আমরা কথা বলিতেছিলাম সেটি বড় ঘর। স্বামীজীর অনেক বই ঘরের চারদিকে সাজান। একটি বড় তৈলচিত্রে পরম-হংসদেবের সেই সম্মারিষ্য চিরপরিচিত মূর্তি। স্বামীজী বলিলেন, একজন সুইডিস ভক্ত চিত্রটি আঁকিয়াছেন। চিত্রটি খুব ভাল লাগিল। পাশের ছোট ঘরটি পুজার ঘর। সেখানে সন্ধ্যারতি হয়; উৎসব উপলক্ষে এদেশের লোকেরা আসিয়া গৈরিক পরিহিত স্বামীজীর পুজারতি দর্শন করেন। স্বামীজী বলিলেন এদেশে তাঁহাদের মোট বারটি আশ্রম আছে। নিউ ইয়র্ক, বষ্টন ও লস এঞ্জেলসের আশ্রমের কথা বিশেষ করিয়া বলিলেন। দার্শনিক হাক সলি শেষোক্ত আশ্রমের একজন ভক্ত। রাত্রি প্রায় ১১টা পর্যন্ত পরমানন্দে সদালাপে ক্রাটাইয়া হোটেলের দিকে ফিরিলাম। তীর্থ গীতের মধ্যে স্বামীজী আমার সঙ্গে রাত্তি পর্যন্ত আসিয়া ট্যাক্সি ডাকিয়া আমাকে তাহাতে তুলিয়া দিয়া আশ্রমে ফিরিলেন।

মিশিগান হ্রদের দক্ষিণ প্রান্তে শিকাগো শহর অবস্থিত। শহরটি খুব বড় এবং বিস্তীর্ণ। শহরটির একটি বিশেষ রূপ আছে। বিরাট হ্রদ। বিস্তীর্ণ উদ্যান ও বেড়াইবার জায়গা। মিশিগান এভিনিউর উপর শ্রেণীবদ্ধ বিরাটকার ২০২৫ তলা সৌধাবলী। হ্রদ হইতে ক্ষীণকায় প্রোতস্বতী নির্গত হইয়া শহরের মধ্য দিয়া চকল চরণে চলিয়াছে। উভয় পাশে বড়

বড় বাড়ী। বাড়ীগুলির উচ্চতা সুসম। কোন বাড়ী হঠাৎ অল্প সকলকে অসম্ভব রূপে ছাড়াইয়া গিয়া সে সুসমা ভঙ্গ করে নাই। মানুষ সর্বদা কর্ণব্যস্ত। এখানে দক্ষিণের বর্ণ-বৈষম্য নাই। মানুষ মাত্রই এখানে মানুষ। শহরের এই বিশিষ্ট রূপ দেখিতে দেখিতে রাত্রি ১১টার পর হোটেল ফিরিলাম। লিফটের মধ্যে একটি ভদ্রলোক আমার দিকে তাকাইতে তাকাইতে বলিয়াই ফেলিলেন, “আপনি কি ভারতবর্ষ হইতে আসিতেছেন?”

আমি—“হাঁ”

ভদ্রলোক—আমি আপনাকে কয়েকদিন যাবৎ লক্ষ্য করিতেছি; আর আপনি ভারতবাসী কি না একথা জিজ্ঞাসা করিব ভাবিতেছি। আজ প্রশ্নটা করিয়াই ফেলিলাম। আমি বহুবৎসর ভারতে ছিলাম। বহুতে ডাক্তারি করিতাম। আপনি কত দিন এখানে থাকিবেন।

“আমি কাল সকাল ১১টায় এ শহর ত্যাগ করিব।”

“আমার দুর্ভাগ্য। আপনার সঙ্গে বেশী আলাপ হইল না। যদি অন্ততঃ এখন একবার আমার ঘরে আসেন।”

ভদ্রলোকটির আগ্রহ দেখিয়া, নিদ্রাকর্ষণ হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার ঘরে গেলাম। তিনি পরম আগ্রহে ভারতবর্ষের অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। বলিলেন, “ভুলানাইয়ের খবর কি? তাঁহার খবর অনেকদিন পাই না।”

বলিলাম—“তিনি কয়েক মাস হয় মারা গিয়াছেন।” ভদ্রলোক বিম্বিত ও হুঃখিত হইলেন, বলিলেন—“তাই তাঁর খবর পাই না। তাঁর পরিবারের সঙ্গে আমাদের কি সৌহার্দ্যই ছিল। তাহার ছেলেকে আমি কালই চিঠি দিব। আপনার কথা আমি তাঁহাকে লিখিব।”

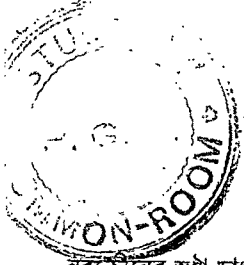
আমি আমার একটি কাড তাঁহাকে দিলাম। তিনিও তাঁহার কাড আমাকে দিলেন। ভদ্রলোকটির নাম ডাক্তার গিলবার্ড একলাও। বর্তমানে আমেরিকার নেভাদা রাজ্যের রাজধানী রেনোতে ডাক্তারি করিতেছেন। তিনি বলিলেন, “আমি পরশু এ স্থান ত্যাগ করিব। এবার রেনোতে বড়দিনে আমাদের একটি পারিবারিক সম্মেলন হইবে। আমরা সমস্ত ভ্রাতাভগিনী বার বৎসর পর একত্র মিলিত হইতেছি।

ভদ্রলোক অনেক কথা বলিলেন। রাজাগোপালাচারীর কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। বলিলেন, “তিনি আমার একজন রোগী ছিলেন।” ভারতবর্ষের রাজনীতির কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা খুব সঙ্গী। বলিলেন, “জিমা যে এত জেদ করিবেন তাহা আমরা কেহই পূর্বে ভাবি নাই।”

ভদ্রলোক একদিনও অন্ততঃ আমাকে ধাওয়াইতে পারিলেন না বলিয়া হুঃখ প্রকাশ করিলেন। তিনি সন্ধ্যাক সিনেমায় গিয়াছিলেন। জী নীচে লাউঞ্জে আছেন। শীঘ্রই

আসিবেন। আমাকে অপেক্ষা করিতে অস্বস্তি করিতে লাগিলেন। ঘুমে চোখ জড়াইয়া আসিতেছিল—কিছুক্ষণ আলাপ করিয়া ঘরে আসিলাম। পরদিন প্রাতরাশের সময়

খাবার ঘরে ভ্রমলোক আমার টেবিলের নিকট উপস্থিত হইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—‘আপনার আজ যাওয়াই কি ঠিক?’—ভ্রমলোকের আশ্রয় দেখিয়া ভাল লাগিল।



মহাচীনের এক দশক (১৯২৭-৩৭)

শ্রীমুখাংশুবিমল মুখোপাধ্যায়

নব্য চীনের শ্রদ্ধা ডাঃ সুন ইয়াই সেন ১৯২৪ সালে তৎপ্রতিষ্ঠিত ক্যুওমিণ্টাঙ দলকে নতুন করিয়া গঠন করেন। এই সময় বরোডিন সোভিয়েট প্রতিনিধিত্বপে চীনে অবস্থান করিতে ছিলেন। তাঁহারই প্রভাব এবং পরামর্শে সুন ক্যুওমিণ্টাঙ দলকে চালিয়া সাজিয়াছিলেন। এই বৎসরই আনুষ্ঠানিক ভাবে চীনের কম্যুনিষ্ট পার্টি অর্থাৎ সাম্যবাদী দল গঠিত হয়। সুন ইয়াই সেন সাম্যবাদীগণের সহিত একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হইলেন। এই চুক্তি অনুসারে কম্যুনিষ্টগণ নিজেদের পৃথক সংগঠন বজায় রাখিয়া ক্যুওমিণ্টাঙ দলে প্রবেশ করিলেন। চীনের মহাবিপ্লবে (১৯২৫-২৭) কম্যুনিষ্টগণ একটি বিশিষ্ট গৌরবময় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কিন্তু মহাচীনের দুর্ভাগ্যক্রমে ১৯২৭ সালের প্রথম দিকে কম্যুনিষ্ট ক্যুওমিণ্টাঙ উভয় দলের সম্মিলিত বাহিনী কর্তৃক সাঙহাই বিজয়ের পর চীনের বিপ্লবী শক্তি দ্বিধাবিভক্ত হইয়া পড়িল। বিপ্লবের অবসানে প্রতিবিপ্লবী শক্তি মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। সৈন্যধ্যক্ষ চিয়াঙ কাইশেক্ নান্‌কিঙে জাতীয় সরকারের রাজধানী স্থাপন করিলেন। এই বৎসর জুলাই মাসে চীনে প্রেরিত সোভিয়েট প্রতিনিধি বরোডিন স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন। সৈন্য-সোভিয়েট এবং কম্যুনিষ্ট-ক্যুওমিণ্টাঙ মৈত্রীবন্ধন ছিন্ন হইয়া গেল। এই ভাবে অতি অল্পকালের মধ্যে চীন-ইতিহাসের পট পরিবর্তিত হইল।

ক্যুওমিণ্টাঙের দক্ষিণ এবং বাম শাখার মধ্যে মিলন ঘটাইবার জন্ত চিয়াঙ কাইশেক্ নান্‌কিঙে সৈন্যধ্যক্ষ এবং রাষ্ট্রপতির পদ পরিত্যাগ করিয়া আগষ্ট মাসে জাপানে চলিয়া গেলেন। ডিসেম্বর মাসে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি ডাঃ সুনের কনিষ্ঠা ঞ্জালিকা মাই-লিঙ সুনদের পাণগ্রহণ করেন। ইহার পর তিনি পুনরায় নান্‌কিঙে সরকারের সৈন্যধ্যক্ষ এবং রাষ্ট্রপতির পদ গ্রহণ করিলেন। কার্যভার গ্রহণ করিয়াই যে সমস্ত রণনায়ক তখন পর্যন্ত জাতীয় সরকারের বখতা স্বীকার করেন নাই, তাঁহাদের শক্তি চূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে তিনি সংগ্রামে অবতীর্ণ হইলেন। ১৯২৮ সালের প্রথম দিকে চীনের জাতীয় জীবনের দুর্ভাগ্য, রণ-নায়কগণের প্রায় সকলেরই শক্তি চূর্ণ হইয়া গেল। মুখ্যতঃ জাপানের

প্ররোচনায় পিকিঙ তখনও আত্মসমর্পণ করিল না। জাপানের ভয়, চীন ঐক্যবদ্ধ হইলে সার্কিউ মুক্‌ডেনে তাহার স্বার্থ বিপর্যয় এবং মর্যাদা নষ্ট হইবে। মে মাসের প্রথম দিকে একই সময় দক্ষিণ এবং পশ্চিম হইতে নান্‌কিঙে বাহিনী পিকিঙে অভিযুগ্মে অগ্রসর হইতে থাকে। ইতোমধ্যে সার্কিউয়ের বন্দর সিউটাওর পথে জাপ সৈন্যের একটি শক্তিশালী দল চীনে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং রেল লাইন ধরিয়া পিকিঙের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। পিকিঙের অল্প দক্ষিণে উভয় বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষে নান্‌কিঙে বাহিনী পরাজিত হইয়া সাময়িকভাবে পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হইল।

এই বিপর্যয়ের পর অল্প কিছুদিনের মধ্যেই পিকিঙের রণনায়ক চ্যাঙ সো-লিন্‌ নান্‌কিঙ সরকারের সহিত সুবিধাজনক সন্ধি আপোষ করিবার আশায় জাপানের সহিত তাঁহার যে মৈত্রীবন্ধন ছিল তাহা ছিন্ন করিয়া সসৈন্তে মাঞ্চুরিয়া চলিয়া গেলেন। চীন-সীমান্ত অতিক্রম করিবার পরই যে ট্রেনে তিনি যাঁহাতেছিলেন বিস্ফোরণের ফলে তাহা ধ্বংস হইয়া যায়। খুব সম্ভব জাপান কর্তৃক এই কার্য অল্পজ্ঞিত হইয়াছিল। তাঁহার পুত্র চ্যাঙ সুন লিয়াঙ জাপানের নিষেধ এবং ভীতি-প্রদর্শন অগ্রাহ্য করিয়া নান্‌কিঙ সরকারের সহিত সন্ধিবন্ধনে আবদ্ধ হইলেন। জুলাই মাসে পিকিঙ আত্মসমর্পণ করিল। পিকিঙের নুতন নাম হইল পিপিঙ।

এইভাবে বাহ্যতঃ চীনে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইল। প্রকৃত পক্ষে কিন্তু আজ পর্যন্তও ঐক্য স্থাপিত হয় নাই। পিকিঙের পতনের পূর্বেই দক্ষিণ-চীনের ক্যান্টনে একটি স্বতন্ত্র সরকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ক্যান্টন সরকার নান্‌কিঙের বখতা স্বীকার করিল না। এদিকে পিকিঙের পতনের পর উত্তর-চীনের কোন কোন রণনায়ক অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব লিপ্ত রহিলেন। ইহার মধ্যে মধ্যে পারস্পরিক মৈত্রীবন্ধনও আবদ্ধ হইতেন। কাগজে কলমে নান্‌কিঙ সরকার ক্যান্টন ব্যতীত সমগ্র চীন শাসন করিতেন। আসলে কিন্তু দেশের অনেক জায়গাতেই এই সরকারের কর্তৃত্ব স্বীকৃত হইত না। এই প্রসঙ্গে দেশের অভ্যন্তরভাগে অবস্থিত কম্যুনিষ্টশাসিত বিরাট একটি অঞ্চলের কথা বিশেষ ভাবেই উল্লেখযোগ্য।

• চীনে সুবিধাভোগী সাম্রাজ্যবাদিকারী শক্তিসমূহের প্রয়োচনায় নান্‌কিঙ সরকার প্রথম হইতেই সোভিয়েট বিরোধী নীতি অনুসরণ করিয়া আসিতেছেন। ১৯২৯ সালে নান্‌কিঙ সরকারের ইচ্ছিতে মাঞ্চুরিয়ার সোভিয়েট দূতাবাস আক্রান্ত হয়। অতঃপর ‘চায়নিজ ইষ্টার্ন’ রেলপথের রুশীয় কর্মচারিদিগকে গ্রেপ্তার করা হইতে থাকে। রুশিয়া এবং চীন এই রেলপথের সমান অংশীদার। নান্‌কিঙের অসম্মত ঔদ্ধত্যের প্রতিকারের জন্ত সোভিয়েট রাষ্ট্র হইতে মাঞ্চুরিয়াতে সৈন্য প্রেরিত হইল। কয়েক মাস বিরোধ চলিবার পর নান্‌কিঙ সরকার ‘চায়নিজ ইষ্টার্ন’ রেলপথের পরিচালনা সংক্রান্ত পূর্ব-ব্যবস্থা বজায় রাখিতে সম্মত হইলেন।

এদিকে কম্যুনিষ্টদের সহিত ক্যুওমিণ্টাঙ দলের বিরোধিতা তীব্র হইতে তীব্রতর হইয়া উঠিতে লাগিল। নান্‌কিঙ সরকারের আদেশে সাম্যবাদী ভাবধারা প্রচার করা এবং সাম্যবাদী দলভুক্ত হওয়া প্রাণদণ্ডযোগ্য অপরাধের মধ্যে পরিগণিত হইল। চীনের জাতীয়তাবাদের দুইটি আদর্শ—সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা এবং গণ-বিপ্লব—প্রকৃত প্রস্তাবে পরিত্যক্ত হইল। নান্‌কিঙ সরকার কর্তৃক অনুসৃত প্রতিক্রিয়া-পন্থী নীতির জন্ত যাহারা এই সময় চীন হইতে চলিয়া গিয়া-ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে মাদাম সুন ইয়াং সেনের নাম সর্বপ্রথমে উল্লেখযোগ্য।

প্রয়োজনীয় অর্থের জন্ত নান্‌কিঙ সরকার প্রধানতঃ সাঙহাই বন্দরের ধনকুবের ব্যাঙ্কারগণের মুখাপেক্ষী ছিলেন। এই সরকারের অনুগত বিভিন্ন সৈন্তাধ্যক্ষের অধীন বিমানবাহিনীগুলি অসহায় কৃষকগুলোর রক্ত শোষণ করিতে লাগিল। বহু প্রাক্তন সৈনিক জীবিকার অবেশে দেশময় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। ইহাদের মধ্যে অনেকেই নিরুপায় হইয়া দস্যুরূপে অবলম্বন করিল। পুরাতন রণ-নায়ক সম্প্রদায়ের স্থলে অভিনব রণ-নায়ক সম্প্রদায় আবির্ভূত হইল। গৃহ-যুদ্ধ এবং ক্রমবর্ধমান কৃষক-আন্দোলন দমনে সরকার সর্বশক্তি প্রয়োগ করিলেন। সহস্র সহস্র সাম্যবাদী এবং কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলন এবং সংগঠনের প্রাক্তন নেতারা সরকারের দমন-নীতির ফলে প্রাণ হারাইলেন। সর্বপ্রকার বিরোধিতার মূলোচ্ছেদ করিয়া একটি মাত্র রাজনৈতিক দলের সর্বময় কর্তৃত্ব (Totalitarian Dictatorship) প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হইতে লাগিল।

চিয়াঙ কাই-শেক পরিচালিত নান্‌কিঙ সরকার ক্রমশঃই শৈল্পিক নীতি এবং আদর্শ হইতে দূরে সরিয়া যাইতে লাগিলেন। জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা এবং জীবনযাত্রার মান অতি-দ্রুত নামিয়া যাইতে লাগিল। পিপিঙ হইতে প্রকাশিত ‘ডেমোক্রেসি’ নামক দৈনিকে, ১৯৩৭ সালের ১৫ই মে তারিখে, প্রকাশিত একটি সংবাদে দেখা যায় যে চীনের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে সেজিতে ৪০০,০০০-এর অধিক, কান্নুতে

১,০০০,০০০-এর অধিক, হোনানে প্রায় ৭,০০০,০০০ এবং কিয়াঙ চারতে ৩,০০০,০০০ জন বুদ্ধি খাড়াবেশে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। ঐ কাগজের একই সংখ্যায় প্রকাশ যে, কিয়াঙ চাঙ প্রদেশে ৬০টি জেলা দুর্ভিক্ষের তাণ্ডবে বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে এবং বিগত এক শতাব্দীর মধ্যে এইরূপ প্রলয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ আর হয় নাই। সরকারী সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান ‘সেন্ট্রাল নিউজ এজেন্সি’ কর্তৃক এই সংবাদ সম্বন্ধিত হইয়াছে।

মার্কিন সাংবাদিক ও গ্রন্থকার এডগার স্নো-র বহুল-প্রচারিত গ্রন্থ ‘রেড ষ্টার ওভার চায়না’ ১৯৩৭ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে তিনি বলিয়াছেন যে, সেচোয়াঙ ও অন্যান্য কয়েকটি প্রদেশে আগামী ৬০ বৎসর বা তাহারও অধিককালের জন্ত রাজস্ব আদায় করা হইয়া গিয়াছে এবং রাজস্ব ও স্ত্রদের হার অত্যন্ত বেশী বলিয়া বহু কর্ষণযোগ্য ভূমি মালিক কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া অকর্ষিত পড়িয়া রহিয়াছে।

একদিকে পল্লী অঞ্চলের দরিদ্র এবং মধ্যবিত্ত অধিবাসিগণ যেমন দিনের পর দিন দেউলিয়া হইয়া যাইতে লাগিল, অপর দিকে তেমনই আবার দেশের যাবতীয় ভূসম্পত্তি এবং নগদ টাকা মুষ্টিমেয় ভূম্যধিকারী এবং কুসীদজীবীর হাতে কেন্দ্রীভূত হইতে লাগিল। ইহারই ফলে আধুনিক চীন-সমাজ হইতে মধ্যবিত্ত শ্রেণী প্রায় নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে।

কম্যুনিষ্ট নেতা মাও সে তুঙের ১৯২৬ সালে প্রদত্ত একটি বিবৃতিতে প্রকাশ যে, সমগ্র চীনের মোট কর্ষণযোগ্য ভূমির শতকরা ৭০ ভাগই জমিদার, সম্পন্ন কৃষক, সরকারী কর্মচারী এবং কুসীদজীবী সম্প্রদায়ের কবলিত হইয়াছে, অথচ পল্লী অঞ্চলের অধিবাসীদিগের মধ্যে শতকরা ৬৫ জনই দরিদ্র কৃষক, রায়ত এবং ক্ষেতমজুর হইলেও মোট কর্ষণযোগ্য ভূমির শতকরা ১৫ ভাগের বেশী তাহাদিগের অধিকারে নাই। নান্‌কিঙ সরকার কর্তৃক সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা পরিত্যক্ত হওয়ার ফলেই পল্লী অঞ্চলের অধিবাসীদিগের অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটয়াছিল। কম্যুনিষ্টগণও এই কথাই বলেন।

এদিকে নান্‌কিঙ সরকার যখন স্বীয় শক্তির দৃঢ়তা সম্পাদনে ব্যাপৃত ছিলেন, কম্যুনিষ্টগণ তখন নিষ্ক্রিয় বসিয়া থাকেন নাই। ১৯২৭ সালে ক্যুওমিণ্টাঙ দলের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন হইবার পর তাঁহারা ইয়াংসি উপত্যকায় কিয়াঙসি প্রদেশে প্রধান কর্মক্ষেত্র স্থাপন করিয়াছিলেন। এই বৎসর নভেম্বর মাসে চীনে সর্বপ্রথম সোভিয়েট সরকার স্থাপিত হয়। কোয়াংটুঙ প্রদেশের অন্তর্গত হাইফেঙ জেলাতে প্রতিষ্ঠিত এই সরকার হাইফেঙ সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র নামে পরিচিত। চার বৎসর পর ১৯৩১ সালে চীন-সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। কিয়াঙসি প্রদেশের সীমান্তে অবস্থিত এই জুই-চিন ইহার রাজধানী হইল। সোভিয়েটশাসিত অঞ্চল ক্রমশঃ বর্ধিতায়তন হইতে থাকে। ১৯৩২ সালের মধ্যভাগে মহাচীনের প্রায় একষষ্ঠাংশ পরিমিত স্থান সোভিয়েট ব্যবস্থায়

শাসিত হইত। এই সময় ইহার আয়তন ২৫০,০০০ বর্গমাইল এবং জনসংখ্যা ৫০,০০০,০০০ ছিল।

১৯২৮ সালে চীনে সর্বপ্রথম লালফৌজ গঠিত হয়, এই সময় ইহার সৈন্য-সংখ্যা ২,০০০-এর অধিক ছিল না। চু-টে এই বাহিনীর অধ্যক্ষ ছিলেন। জাপ-যুদ্ধ কালে ইনিই সুবিখ্যাত 'এইটথ রুট আর্মি'র সর্বাধিনায়ক ছিলেন। চু-টে গোরিলা রণনীতিতে বিশেষ পারদর্শী। তাঁহার সংগঠন-নৈপুণ্যে ১৯৩০ সালের মধ্যে লালফৌজের সৈন্যসংখ্যা ১০ গুণ বর্দ্ধিত হয়। ইহার দুই বৎসর পর ১৯৩২ সালে চীনের লালফৌজের সৈন্যসংখ্যা আরও বাড়িয়া ৪০০,০০০ হইয়াছিল। লালফৌজের সৈনিকদিগকে সামরিক এবং রাজনৈতিক উভয়বিধ শিক্ষাই দেওয়া হইয়া থাকে।

সোভিয়েট ব্যবস্থায় শাসিত অঞ্চলসমূহে নূতন করিয়া জমি বন্টন করা হইল। কৃষকদিগের করভার হ্রাস করিয়া অনেক যৌথ কৃষি এবং শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইল। ১৯৩০ সালের মধ্যে একমাত্র কিয়ুঙসি প্রদেশেই ১,০০০-এরও অধিক সমবায় পদ্ধতিতে পরিচালিত সোভিয়েট গঠিত হইয়াছিল। বেকার-সমস্যার সমাধানের ব্যবস্থা হইল এবং অহিফেন সেবন, পতিতাবৃত্তি, শিঙিদিগের দাসত্ব এবং বাধ্যতামূলক বিবাহ-প্রথার বিলোপসাধন করা হইল। শিক্ষাবিস্তারের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইল এবং চীনের অত্যন্ত অঞ্চল অপেক্ষা লালচীনে অধিক-তর দ্রুতগতিতে শিক্ষার বিস্তার ঘটিল। (১) যে সমস্ত অঞ্চলে যুদ্ধের আগুন ছড়াইয়া পড়ে নাই সে সমস্ত অঞ্চলে শ্রমিক এবং কৃষকদিগের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়নযোগ্য উন্নতি সাধিত হইল।

১৯৩০ সালের জুলাই মাসে কম্যুনিষ্টগণ ছনান প্রদেশ আক্রমণ করিয়া ইহার রাজধানী অবরোধ করিলেন। নান্‌কিংও পৌঁছিবার জন্ত তাহারা এই সময় বিভিন্ন দিক হইতে আক্রমণ চালাইতেছিলেন। চিয়াঙ কাইশেকের বৃত্তিতে বাকী রহিল না যে, কম্যুনিষ্টদল ক্যুওমিন্টাঙের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিয়াছে এবং নান্‌কিংওর সরকারকে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে সমগ্র শক্তি কেন্দ্রীভূত করিয়া কম্যুনিষ্ট দলনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

১৯৩০ হইতে ১৯৩৪ সালের মধ্যে নান্‌কিংও সরকার কর্তৃক চীন সোভিয়েট সাধারণতন্ত্রের বিরুদ্ধে পর পর ৬টি অভিযান প্রেরিত হয়, কিন্তু এত করিয়াও চূড়ান্ত জয়পরাজয় নির্ধারিত হইল না। কম্যুনিষ্টগণের বিরুদ্ধে ষষ্ঠ অভিযানকালে নান্‌কিংও-বাহিনী তাহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া ফেলে। শেষে খাঙ ও লবণের অভাবে চীন-সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র এক ভয়াবহ সঙ্কটের সম্মুখীন হইল। কিন্তু কম্যুনিষ্টগণ তখনই আত্মসমর্পণ না করিয়া কিয়ুঙসি হইতে অধিকতর নিরাপদ কোন স্থানে

সরিয়া যাইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন। কিয়ুঙসি হইতে কম্যুনিষ্টগণের অপসরণ "লং মার্চ" নামে অভিহিত হয়। কিয়ুঙসি শতবর্ষ পূর্বে ১৮৩৬ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বুরর কৃষকগণের উত্তরাভিমুখী অভিযানের সহিত এই "লং মার্চের" খুব নিকট সাদৃশ্য থাকিলেও উভয়ের মধ্যে তুলনায় প্রথমোক্তটি নিঃসন্দেহে নিম্নতর হইয়া পড়ে।

১৯৩৪ সালের ১৬ই অক্টোবর কিয়ুঙসি হইতে উত্তর-পশ্চিমাভিমুখে কম্যুনিষ্টগণের যাত্রা আরম্ভ হইল। মাহুয়ের ইতিহাসে এই অভিযানের তুলনা মিলে না। এই দুঃসাহসী অভিযাত্রীর দলে কেবল মাত্র সৈন্যগণই ছিল না। সহস্র সহস্র কৃষকও সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে যাত্রা করিল। নারী-পুরুষ-যুবক-বৃদ্ধ এবং শিশু সকলের সমবায়ে এই অভিযাত্রী দল গঠিত হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে সকলেই কিছু কম্যুনিষ্ট ছিল না। জুইফিন পরিত্যাগ করিবার সময় কম্যুনিষ্টগণ অজ্ঞাগার হইতে যাবতীয় অস্ত্রশস্ত্র সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন। কারখানা-সমূহ হইতে যাবতীয় যন্ত্রপাতি খুলিয়া লইয়া গাধা এবং ঝরুরের-পিঠে চাপাইয়া দেওয়া হইল। এক কথায় বলিতে গেলে বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারা যায় এমন কিছুই পরিত্যক্ত হইল না। পরে অবশ্য বহু জিনিসই পথে ফেলিয়া যাইতে হইয়াছিল। কম্যুনিষ্টগণ বলেন যে কিয়ুঙসি হইতে কান্সু পথে বিভিন্ন স্থানে পথিপার্শ্বে হাজার হাজার রাইফেল ও মেশিন-গান, প্রচুর যন্ত্রপাতি এবং রৌপ্য ভূগর্ভে প্রোথিত রহিয়াছে।

অবর্ণনীয় দুঃখকষ্ট ভোগ করিয়া, পশ্চাদ্ধাবনকারী শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে করিতে কখনও বা আবার শত্রুর আক্রমণ এড়াইয়া স্বীয় আদর্শে আত্মবান্ এই দুঃসাহসী অভিযাত্রীর দল প্রথমে পশ্চিম দিকে চলিতে আরম্ভ করিয়া সূদূর পশ্চিমে তিব্বত সীমান্তে উপস্থিত হইল। এখান হইতে আবার উত্তর এবং পূর্ব দিকে চলিতে শুরু করিয়া এই দল অবশেষে সেন্সি প্রদেশের উত্তরাঞ্চলে উপস্থিত হইল। সাম্যবাদিগণ এই অঞ্চল নিজেদের অধিকারভুক্ত করিয়া তথায় সোভিয়েট শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত করিলেন। ইয়েনান সোভিয়েট চীনের নূতন রাজধানী হইল। ইয়েনানের ভূমি বন্ধা এবং অর্থনীতির দিক হইতেও ইয়েনান একান্তই অনগ্রসর। কিন্তু রণনীতির দিক হইতে ইহার গুরুত্ব মোটেই উপেক্ষা করিবার মত নহে। ইয়েনানের পশ্চিমেই চীনের মুসলমান-অধ্যুষিত একটি প্রধান অঞ্চল। এইখানে মুসলমানগণ সংখ্যালঘু হইলেও বেশ শক্তিশালী। সেন্সির উত্তরে বিরল-বসতি, অন্তর্মহোলিয়া। ইহার রক্ষণ ব্যবস্থা অত্যন্ত দুর্বল ছিল। জাপ মোটরবাহিনী অল্পায়াসেই এই প্রদেশ অধিকার করিতে পারিত। সেন্সির পূর্ব দিকে শৈলশ্রেণীপরিবেষ্টিত সেন্সি প্রদেশ অবস্থিত। সেন্সি খনিজ সম্পদে অত্যন্ত সমৃদ্ধ। এই সম্পদ গ্রাস করা জাপানের চীন অভিযানের অত্যন্ত প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। সেন্সির ঠিক দক্ষিণে অবস্থিত সিয়ানের বিস্তীর্ণ প্রান্তর চীনের একটি অতিশয় সামরিক গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল।

দুর্গম পথের এই অভিযাত্রিগণ প্রায় ৮,০০০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া যখন সেন্সিতে উপস্থিত হইল তখন যাত্রা

(1) "Mass education made much progress in the stabilized Soviets. In some countries, the Reds attained a higher degree of literacy among the populace in three or four years than had been achieved anywhere else in rural China after centuries. This did not exclude even the Rockefeller-backed *de luxe* mass education experiment at Ting Hsien, run by "Jimonic" Yen. In Hsin-Kuo, the Communists' model hsien, there was a populace nearly 80 per cent literate—much higher than in the famous Rockefeller country." —Red Star Over China by Edgar Snow, pp. 183-84.

যাহারা আরম্ভ করিয়াছিল তাহাদের মধ্যে অনেকেই আর বাঁচিয়া ছিল না। কিয়াদসি, ফোয়াটুঙ, কোয়াডসি এবং হনানের ভিতর দিয়া চলিবার সময় কম্যুনিষ্ট বাহিনীর প্রায় এক তৃতীয়াংশ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল।^১

কম্যুনিষ্টগণের এই অপসরণ নান্‌কিঙ সরকারের শক্তিবৃদ্ধির সহায়ক হইয়াছিল। কোন কোন অঞ্চলের রণনায়ক ১৯৩৪-১৯৩৫ সাল পর্যন্ত নান্‌কিঙ জাতীয় সরকারের আত্মগত্য স্বীকার করেন নাই। এই সমস্ত অঞ্চলের ভিতর দিয়া যখন কম্যুনিষ্ট বাহিনী অগ্রসর হইতেছিল, তখন রণনায়কগণ আত্মরক্ষার গরজে অন্তোপায় হইয়া নান্‌কিঙের সরকারী বাহিনীর সাহায্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইহারই ফলে তাহাদিগকে পরে শাসন এবং অর্থনীতি সংক্রান্ত বিষয়ে নান্‌কিঙ জাতীয় সরকারের কর্তৃত্ব স্বীকার করিয়া লইতে হয়।

এদিকে কম্যুনিষ্ট-ক্যুওমিঙ বিরোধে চীন যখন বিভ্রত, তখন জাপান দেখিল ইহাই তাহার চীনে স্বীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা এবং বিস্তারের সুবর্ণ সুযোগ। কিয়াদসির কম্যুনিষ্টদিগকে দমন করিবার উদ্দেশে ১৯৩১ সালে চিয়াং কাইশেক যখন সর্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন, জাপান তখন মাঞ্চুরিয়া অধিকার করিয়া বসিল। চিয়াং আশা করিয়াছিলেন যে ‘জাতি-সজ্জ’ এই অত্যাচার প্রতিবিধান করিবেন। কিন্তু দুর্বলের পক্ষ সমর্থন করিতে যাইয়া কোন বুদ্ধিমানই প্রবলের অসন্তোষ উৎপাদন করেন না। এই ক্ষেত্রেও এই নিয়মের অত্যাণ ঘটিল না। ‘জাতি-সজ্জ’ প্রবল জাপানকে খাঁটাইতে সাহস করিল না, নান্‌কিঙ সরকার মাঞ্চুরিয়ার উপর হাত অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার কোন চেষ্টাই করিলেন না। ফলে জনমত সরকারের প্রতি কিছু বিরূপ হইয়া উঠিল।

এই সময় হইতেই চিয়াং কাইশেক জাতীয় কেন্দ্রীয় বাহিনীর শক্তিবৃদ্ধি করিয়া তাহার উন্নতি সাধন করিতেছিলেন। বিভিন্ন প্রাদেশিক বাহিনীগুলি এতদিন পর্যন্ত স্থানীয় সৈন্যধ্যক্ষগণের অধীনে শিক্ষালাভ করিয়া তাহাদের দ্বারা পরিচালিত হইত। সৈন্যগণ মনে করিত যে স্ব স্ব প্রদেশের জন্ত যুদ্ধ করিলেই তাহাদের কর্তব্য শেষ হইল। সমগ্রভাবে দেশের প্রতি তাহাদের যে কোন কর্তব্য আছে তাহা তাহারা বুঝিত না। চিয়াং কাইশেক এই বিচ্ছিন্ন সামরিক শক্তিকে কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচালনাধীনে সুসংহত করিলেন অর্থাৎ সমস্ত প্রাদেশিক বাহিনীর সমবায়ে একটি জাতীয় বাহিনী গঠন করিলেন। সৈন্যগণের মনে এই ধারণা স্বরমূল করিয়া দেওয়া হইল, দেশরক্ষার পবিত্র কর্তব্যভার তাহাদেরই উপর হস্ত রহিয়াছে। ঊন্বদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক চীন নাগরিককে যুদ্ধবিজ্ঞা শিখিতে হইত। সরকারী আদেশে বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা পুনঃপ্রবর্তিত হইল। ইউরোপীয় এবং আমেরিকান উপদেষ্টার সহায়তায় অল্পকালের মধ্যেই আধুনিক প্রধায় শিক্ষিত বিরাট একটি বাহিনী গড়িয়া উঠিল। সামরিক

প্রয়োজনে রেলপথ এবং রাস্তাঘাটের উন্নতি সাধিত হওয়ার ফলে যাতায়াতের অসুবিধা বহুল পরিমাণে কমিয়া গেল। সৈন্যবাহিনীর পক্ষে প্রয়োজনীয় বিবিধ পণ্যের উৎপাদনের জন্ত বিভিন্ন শ্রমশিল্প প্রতিষ্ঠানকে সরকারী তহবিল হইতে অর্থ এবং অত্যাধিক সাহায্য করা হইতে লাগিল।

সুসজ্জিত বিমানবহর এবং সুশিক্ষিত বৈমানিকবাহিনী আধুনিক সমর-যন্ত্রের অপরিহার্য অঙ্গ। চিয়াং কাইশেকের আদেশে বিমানবহরের উন্নতির জন্ত একটি ত্রৈবার্ষিকী পরিকল্পনা গৃহীত হইল। বিদেশ হইতে বিমান ক্রয় করিয়া শিক্ষিত বৈমানিক দল গড়িয়া তুলিবার ব্যবস্থা হইল। যুক্ত-রাষ্ট্রের কর্ণেল চিন-চি নান্‌কিঙ সরকারের বিমানবহরের অধ্যক্ষতা গ্রহণ করিলেন।

চিয়াঙের সমর্থকবৃন্দ বলেন যে, ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক যুদ্ধের সময় কাজে লাগাইবার উদ্দেশ্যেই তিনি একটি আধুনিক প্রধায় শিক্ষিত শক্তিশালী বাহিনী গঠন করিতে চাহিয়াছিলেন। নান্‌কিঙ সরকারের পরবর্তীকালের কার্যকলাপ কিন্তু এই মতের পোষকতা করে না।

সমরবিভাগের আধুনিকতা সম্পাদন, সৈন্যবাহিনীর প্রয়োজন মিটাইবার জন্ত বিবিধ শ্রমশিল্পের উন্নতিসাধন, জাতীয় অর্থনীতিক কাঠামোর সংস্কার, বাণিজ্য বিস্তার, বেকার-সমস্যার সমাধান, জনসাধারণকে রাজনৈতিক শিক্ষাদান—এই সমস্তই সময়সাপেক্ষ। যুদ্ধজয়ের জন্ত ইহাদের কোনটিই অদরকারী নহে। চিয়াঙের সমর্থকগণ বলেন যে, সেইজন্তই প্রতিকূল সমালোচনা এবং জাপানের তরফ হইতে পৌনঃপুনিক উত্তেজনা সত্ত্বেও তিনি জাপানের সহিত শক্তিপরীক্ষায় প্রবৃত্ত হন নাই। তিনি নিজেও একাধিক বার বলিয়াছেন যে চীনের দুর্বলতার জন্তই তিনি যুদ্ধবিগ্রহ এড়াইয়া চলিতে চাহেন। তুলনীয় :—“We are still a weak people and we dare not provoke a war. But if we are forced to fight, we shall not stop until the last man has fallen, or until we are victorious.” অর্থাৎ, “জাতি হিসাবে আমরা এখনও দুর্বল, আমরা গায়ে পড়িয়া যুদ্ধ বাধাইতে সাহস করি না। কিন্তু যদি আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেই হয়, শেষ সৈনিকটির দেহে প্রাণ থাকা অথবা জয়লাভ না করা পর্যন্ত আমরা প্রতিনিবৃত্ত হইব না।” কিন্তু একথা বলা সত্ত্বেও জাতীয় দুর্বলতার অজুতম প্রধান কারণ অন্তর্বিরোধ দূর করিবার কোন চেষ্টা করা দূরের কথা, তিনি যে নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহাতে এই বিরোধ না মিটিয়া উত্তরোত্তর বর্ধিত হইয়া চলিয়াছিল।

কম্যুনিষ্ট দলকে নির্মূল করিয়া ফেলিতে চিয়াং কাইশেকের চেষ্টার বিরাম ছিল না, অথচ ১৯৩৬ সালেই জাপানের সহিত একটি আপোষ করিবার উদ্দেশ্যে তিনি বিভিন্ন সময়ে সাত বার আলোচনা চালাইয়াছিলেন, কিন্তু প্রত্যেক বারই আপোষের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়। জাপানের পররাষ্ট্র দপ্তরের অনমনীয় মনোভাবই এই ব্যর্থতার জন্ত দায়ী। জাপ পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ হিরোটা দাবি করেন যে চীন যদি তাহার ‘তিনটি

নীতি' মানিয়া লইতে রাজী হয়, আপোষ হইতে পারে। এই তিনটি নীতি দ্বারা দাবি করা হইল যে—

(১) চীনকে জাপ-বিরোধী যাবতীয় সরকারী এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে এবং পাশ্চাত্য শক্তিপুঞ্জকে জাপানের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিবার নীতি পরিত্যাগ করিতে হইবে;

(২) মাঞ্চুকুও (মাঞ্চুরিয়ার জাপ-প্রদত্ত নাম) এবং জিহোলকে স্বাধীন (১) কিন্তু জাপ-ভাবদার রাষ্ট্র বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে; এবং

(৩) চীনে অবস্থানকারী জাপবাহিনীকে 'কমুনিষ্ট দস্যু'-দিগের দমনে সহযোগিতা করিতে দিতে হইবে।

অত্যাধিক কমুনিষ্ট-বিদ্বেষ সত্ত্বেও চিয়াং তথা নান্‌কিঙ সরকারের পক্ষে এই সর্বগুলি গ্রহণ করা সম্ভব হইল না। আপোষের যাবতীয় প্রচেষ্টা যখন ব্যর্থ হইয়া গেল, তখন আর কাহারও বুদ্ধিতে বাকী রহিল না যে চীন-জাপান সংঘর্ষ অনিবার্য এবং আসন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

এদিকে দেশের জনমত দিনের পর দিন নান্‌কিঙ সরকারের নীতির প্রতিকূল সমালোচনায় মুগ্ধ হইয়া উঠিতেছিল। মহাচীনের ছাত্রসম্প্রদায় বরাবরই আভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়া এবং বৈদেশিক আক্রমণের বিরুদ্ধে জাতীয় আন্দোলনের পুরোভাগে রহিয়াছে। ১৯৩১ এবং ১৯৩২ সালে ছাত্রগণ মাঞ্চুরিয়া এবং সাংহাইয়ের ওপর বৈদেশিক আক্রমণের বিরুদ্ধে স্থানীয় প্রতিরোধ-প্রচেষ্টাকে সহায়তা করিবার জন্ত দেশবাসীর নিকট আবেদন করিয়াছিল এবং দেশময় জাপানী পণ্য-বর্জনের আন্দোলন গঠন করিয়া তুলিয়াছিল। তাহাদেরই আহ্বানে দেশের বিভিন্ন অংশের প্রতিনিধিগণ নান্‌কিঙে সমবেত হইয়া সরকারী জাপ-তোষণ নীতির পরিবর্তন দাবি করিলেন। পররাষ্ট্রসচিব ডাঃ সিং চিং ওয়াঙ একদল প্রতিনিধির প্রস্তাবসমূহের সন্তোষজনক উত্তর দিতে সক্ষম না হওয়ার নিজের দপ্তরখানার মধ্যেই প্রহত হইলেন। ভয় পাইয়া ওয়াঙ পদত্যাগ করিলেন। ছাত্র-আন্দোলন দমন করিবার জন্ত চিয়াং কাইশেক চণ্ডনীতির আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। চীনের ছাত্রগণের পক্ষ হইতে প্রকাশিত একটি বিবৃতিতে দেখা যায় যে ১৯২৭ হইতে ১৯৩৫ সালের মধ্যে নান্‌কিঙ জাতীয় সরকারের আদেশে ৩০০,০০০ তরুণকে গ্রেপ্তার এবং হত্যা করা হইয়াছে। ১৯৩৯ সালের ডিসেম্বর মাসে ছাত্রগণ বিক্ষোভ প্রদর্শন করিয়া দাবি করিলেন যে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে হইবে এবং অবিলম্বে লালচীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বন্ধ করিয়া দেশের সমগ্র সামরিক শক্তিকে সমস্ত দেশের শত্রু জাপানের বিরুদ্ধে নিয়োজিত করিতে হইবে।

১৯৩৬ এবং ১৯৩৭ সালের প্রারম্ভে দেশে এক্য স্থাপন করিয়া জাতীয় শত্রুকে প্রতিরোধ করিবার মনোভাব সমগ্র সমাজদেহে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সমাজের সর্বস্তর হইতেই এই দাবি উত্থাপিত হইল। জাপ-মালিকগণের কাপড়ের কলসমূহের সহস্র সহস্র চীনা শ্রমিক ধর্মঘট করিয়া কাজ বন্ধ করিল। ইহাদিগের সাহায্যের জন্ত বিশিষ্ট এবং সম্ভ্রান্ত

উদারনৈতিক ব্যক্তিগণের একটি কমিটি গঠিত হইল। অবিলম্বে সাংহাইয়ে এই কমিটির সাত জন গণ্যমান্য সদস্যকে গ্রেপ্তার করিয়া 'চীন সাধারণতন্ত্রের নিরাপত্তা বিপন্ন করিবার অপরাধে' অভিযুক্ত করা হইল। এদিকে তাশানাল স্থানভেদন এ্যাসোসিয়েসনও ছাত্র এবং উপরোক্ত ধর্মঘটদিগের দাবির অমূল্য দাবি উপস্থিত করিল। ক্যুওমিণ্টাও বাহিনীও সরকারী নীতিতে ক্রমশঃ ক্ষুব্ধ হইয়া পড়িতেছিল, সৈন্যগণ খুব ভাল করিয়াই জানিত যে জাতির অস্তিত্ব, স্বাধীনতা এবং মর্যাদা রক্ষা করাই সৈন্যবাহিনীর প্রধান এবং একমাত্র কর্তব্য, ফলে কমুনিষ্টগণের সহিত সংঘর্ষের সময় ক্যুওমিণ্টাও সৈন্যদল সাগ্রহে যুদ্ধ করিত না। কখনও তাহারা দলে দলে কমুনিষ্টগণের সহিত যোগদান করিত। কিন্তু জাপানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ইহারা প্রাণপণে জয়লাভের চেষ্টা করিত। ১৯৩৩ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া জেনারেল ফেঙ ইউ সিয়াঙ, জেনারেল ফ্যাঙ চেন্‌ উ এবং জেনারেল চি হুও চাঙের নেতৃত্বে চাহার প্রদেশে অবস্থিত সৈন্যবাহিনী নান্‌কিঙ হইতে আদেশের অপেক্ষার না থাকিয়া জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। এই অপরাধে জেনারেল চি ক্যুওমিণ্টাও সৈন্যের হাতে প্রাণ হারাইলেন। জেনারেল ফ্যাঙ প্রাণভয়ে দেশত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। ১৯৩৪-৩৫ সালে কমুনিষ্টগণের 'লং মার্চ'ের সময় তাহারা চীনের জাতীয়তার নবমন্ত্র—'চীনের অধিবাসিগণের পরস্পরের সহিত যুদ্ধ করা অবিধেয়', 'জাপানকে প্রতিরোধ কর'—প্রচার করিয়া গিয়াছিলেন। এই প্রচার একেবারে নিরর্থক হয় নাই।

আধুনিক চীনের ইতিহাসে ১৯৩৬ সাল একটি স্মরণীয় বৎসর। পিতার অপবাত-মৃত্যুর পর চ্যাং সো লিনের পুত্র চ্যাং সুয়ে লিয়াঙ মাঞ্চুরিয়ায় কর্তৃত্বলাভ করিয়াছিলেন। আমরা পূর্বেই ইহার উল্লেখ করিয়াছি। নান্‌কিঙের আত্মগত স্বীকার করিবার পর তাহাকে চীন সাধারণতন্ত্রের উত্তর-পূর্বে সীমান্ত প্রদেশের সৈন্যধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হইয়াছিল। চ্যাঙের সৈন্যগণের অধিকাংশই মাঞ্চুরিয়াবাসী ছিল। জাপান কর্তৃক ১৯৩১ সালে মাঞ্চুরিয়া-প্রাসের পর হইতে তাহারা স্বদেশের মুক্তিসাধনের জন্ত উৎসুক হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু নান্‌কিঙ-সরকার তাহাদিগকে জাপানের বিরুদ্ধে নিয়োজিত না করিয়া কমুনিষ্ট দমনে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। ইহার ফলে চ্যাঙের অধীনস্থ সৈন্যবাহিনীর মধ্যে ভীত অসন্তোষের সঞ্চার হয়। এদিকে কমুনিষ্টগণের সংস্পর্শে আসিয়া চ্যাঙের সৈন্যদল ক্রমশঃ সাম্যবাদী ভাবধারার সহিত পরিচিত হইতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে অনেকেই ইহার অভিনিহিত শক্তি এবং সত্যের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। কমুনিষ্ট এবং চ্যাঙের বাহিনীর মধ্যে ভাবের আদানপ্রদান হইতে থাকে। চ্যাঙের সৈন্যগণ দেখিল যে সাম্যবাদীগণ রক্তপিপাসু হিংস্র দস্যু মাত্র নহে। তাহাদের দৃষ্টিভঙ্গীতে বুদ্ধিমত্তার সুস্পষ্ট ছাপ রহিয়াছে এবং ব্যক্তিগত লাভ-ক্ষতি বা দলীয় স্বার্থ অপেক্ষা চীনের স্বার্থকেই তাহারা বড় মনে করে।

এদিকে ১৯৩০-৩১ সাল হইতে কমুনিষ্টগণ পুরাতন নীতি

পরিচালনা করিয়া অভিনব নীতি এবং কৌশলের সাহায্যে তাঁহাদের আদর্শকে রূপদান করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন।

- ১৯৩০ সালের পূর্বে চীনের কমুনিষ্টগণ মনে করিতেন যে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পর্যায় হইতে খুব তাড়াতাড়ি সমাজ-তান্ত্রিক বিপ্লবের পর্যায়ের উত্তীর্ণ হওয়া যায় এবং চীনে ইতিমধ্যেই সেই অবস্থান্তর আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। শিল্পের ক্ষেত্রে ইঁহাদিগের সমাজতান্ত্রিক নীতি প্রয়োগ করিবার চেষ্টার ফলে শহরের ছোট ছোট ব্যবসায়ীরা পর্যন্ত বিরোধী হইয়া উঠিয়াছিল। এই ১৯৩০-৩১ সাল পর্যন্ত কমুনিষ্টগণ ক্যাম্পিটাও দল এবং বিপ্লবশীল সম্প্রদায়ের প্রতি অত্যন্ত বিদ্বেষভাবাপন্ন ছিলেন এবং সুযোগ পাইলেই এই দুই প্রতিপক্ষকে পরস্পর করিবার চেষ্টা করিতেন। কিন্তু ১৯৩১ সালে জাপান কর্তৃক মাঞ্চুরিয়া অধিকৃত হইবার পর ইঁহাদিগের ক্যাম্পিটাও বিদ্বেষ জাপান বিদ্বেষে পরিণত হইয়াছিল। কমুনিষ্টগণ এই সময় জাপানকে প্রতিরোধ করিবার জন্য সর্বশ্রেণীর লোককে ক্যাম্পিটাও সরকারের পতাকাতলে সমবেত হইতে আহ্বান করিলেন।

১৯৩৬ সালের শেষের দিকে চীনের জনমতের জাপান-বিদ্বেষী হইয়া উঠিবার কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। গোড়ায় বাঁহারা সাম্যবাদ বিরোধী ছিলেন, তাঁহারাও এতদিনে বুঝিতে পারিয়াছিলেন জাপানই চীনের প্রকৃত শত্রু। কমুনিষ্টগণ তখন দেশের কেন্দ্রস্থল হইতে দূর দূরীত্বের সরিয়া যাওয়ার ফলে এক হিসাবে পূর্বাশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের পক্ষে সমগ্র দেশের রাষ্ট্রতন্ত্র হস্তগত করা তখন আর কোনক্রমেই সম্ভব ছিল না। পক্ষান্তরে জাপান উত্তর-চীন আক্রমণ করিলে তাঁহাদিগেরই আক্রমণের প্রাথমিক বেগ প্রতিহত করিতে হইত।

চ্যাঙ কুয়াইলিয়ার বাহিনী সেন্সি এবং কান্সু প্রদেশের কমুনিষ্টদিগকে চতুর্দিক হইতে অবরোধ করিয়া রাখিয়াছিল। অবরোধকারী বাহিনী অবরুদ্ধগণের প্রতি অহংকুল মনোভাব পোষণ করিত। স্থানে স্থানে উভয়ের মধ্যে প্রীতির সম্পর্কও স্থাপিত হইয়াছিল। উভয় বাহিনীর উচ্চপদস্থ সৈন্যবাহক-গণের মধ্যে একটা অলিখিত আক্রমণ-চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছিল। ফলে সাময়িক শৃঙ্খলা এবং নিয়মাবলী রক্ষা করা একটি গুরুতর সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

এই সংবাদে বিচলিত হইয়া ১৯৩৬ সালের ডিসেম্বর মাসে চিয়াঙ কাইশেক উত্তর-চীনের সিয়ান নগরে গেলেন। সিয়ানে পৌঁছিবার পরই কয়েক দিনের জন্য তিনি শহরতলীতে চলিয়া গেলেন। এখানে আসিবার পরদিন সকালবেলা তিনি অস্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করেন। এমন সময় সদর দরজায় একটা গোলমাল শুনিতে পাইলেন। কতকগুলি লোক হুলাহুলা করিতে করিতে বাহীর ভিতর চুকিয়া পড়িল। চিয়াঙ বুঝিলেন ইহাদের উদ্দেশ্য কি। অসাধারণ প্রত্যাশার মত বলে বিভ্রান্তির দরজা দিয়া পলায়ন করিয়া তিনি নিকটবর্তী 'স্ন্যাক হর্ন হিলে' আশ্রয় করিলেন। শত্রুগণ পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাঁহাকে বন্দী করিয়া সিয়ানে লইয়া আসিল। নান্‌কিং হইতে যে সমস্ত

সেনানী তাঁহার সহগামী হইয়াছিলেন, তাঁহারাও অনেকেই বন্দী হইলেন। চ্যাঙের আদেশেই চিয়াঙকে বন্দী করা হইয়াছিল। চ্যাঙ দাবি করিলেন যে, চিয়াঙ কাইশেককে

- (১) কমুনিষ্ট বিরোধিতা পরিচ্যায় করিতে হইবে;
- (২) নান্‌কিং জাতীয় সরকারকে নতন করিয়া গঠন করিতে হইবে; এবং

- (৩) জাপান আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

চ্যাঙের দাবি মানিয়া লওয়া দূরের কথা, চিয়াঙ তাঁহার সহিত দেখা করাও বন্ধ করিয়া দিলেন। স্বামী বিপন্ন হইয়াছেন এই সংবাদ পাইয়া মাদাম চিয়াঙ কাইশেক বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়স্বজনের নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া নান্‌কিং হইতে বিমানযোগে সিয়ানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। ইহার পর যে বিশদ আলোচনা-আলোচনা চলে, তাহাতে কমুনিষ্টগণের পক্ষ হইতে চোঁ এন্‌লাই চিয়াঙের মুক্তি দাবি করিলেন।

চিয়াঙ মুক্তিলাভ করিলেন এবং সক্রিয় বিমানযোগে নান্‌কিং প্রত্যাবর্তন করিলেন। বলা বাহুল্য চিয়াঙের মুক্তির পূর্বে চ্যাঙ এবং চিয়াঙের মধ্যে একটা আপোষ হইয়াছিল। চ্যাঙের পক্ষ হইতে একটি বিরূতি প্রকাশিত হইল। এই বিরূতিতে ছাত্র-সম্প্রদায়ের শ্রমিকগণের এবং 'জাশনাল জালভেশন এসোসিয়েশনের' দাবি সমর্থিত হইল। এই দাবি-গুলি নিয়ে দেখা হইল—

- (১) জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে হইবে;
- (২) গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটাইতে হইবে;
- (৩) জাপান-বিরোধী রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দিতে হইবে; এবং

- (৪) চীনের অধিবাসীদের পৌর স্বাধীনতা স্বীকার করিতে হইবে।

চিয়াঙ কাইশেককে এই দাবিগুলি মানিয়া লইতে হইল। এই সময় চিয়াঙের সহিত কমুনিষ্টগণের এই মর্মে এক চুক্তি হয় যে, কমুনিষ্টগণ জাপান-বাহিনীর পশ্চাদ্ধাবনে সংগ্রাম চালাইবে এবং কৃষকগণের প্রতিরোধ-শক্তিকে সংগঠিত করিয়া দলে সংগঠিত করিবে। জাপান যুদ্ধকালে দেখা গেল যে জাপানীরা যতই চীনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে লাগিল, কমুনিষ্টগণ ততই বেশী করিয়া ছড়াইয়া পড়িয়া বৈদেশিক আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে জনগণের প্রতিরোধ-শক্তিকে সংগঠিত করিয়া তুলিতে লাগিল। মহাচীনের একটি বিস্তীর্ণ অঞ্চল আজ কমুনিষ্টগণের অধীনে থাকিবার ইহাই মূল কারণ।

চিয়াঙ-কমুনিষ্ট চুক্তির পর কমুনিষ্টগণ ভূস্বামী এবং বিপ্লবানু সম্প্রদায়ের ভূমি ও বিপ্লব বাজেয়াপ্ত করিবার নীতি পরিচ্যায় করিলেন। সাময়িকভাবে হইলেও সমগ্র চীন এত দিনে একত্র হইল। জাপানের দীর্ঘকাল ধোঁষিত অনায়াসে চীন জয়ের আশার মূলে কুঠারাত করা হইল। এই একতা বাহাতে চীনের শক্তিবর্ধনে নিরোক্ত হইতে না পারে সেই জন্য সিয়ানের ঘটনার কয়েক মাসের মধ্যে জাপান চীনের বিরুদ্ধে পূর্ণোচ্চের যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিল (জুলাই ১৯৩৭)।

মহিলা-সংবাদ



শ্রীযুক্তা শান্তা দেবী



শ্রীযুক্তা সীতা দেবী

এবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রতিযোগিতা গল্প ও উপন্যাস লেখিকা শ্রীযুক্তা শান্তা দেবী এবং শ্রীযুক্তা সীতা দেবী যথাক্রমে ভুবনমোহিনী দাসী স্বর্ণপদক (১৯৪৭) এবং লীলা-প্রাইজ (১৯৪৮) লাভ করিয়াছেন। ইহারা উভয়েই প্রবাসী ও মডার্ন রিভিউর প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক পরলোকগত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা।

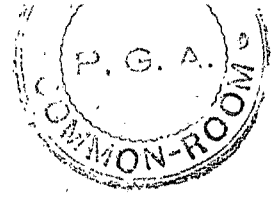
প্রসিদ্ধ সাংবাদিক শ্রীযুক্ত মাধনলাল সেনের কন্যা কুমারী বাসনা সেন এবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সংস্কৃত বিভাগে বেদান্তে প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্থান অধিকার করিয়া এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।



কুমারী বাসনা সেন

‘গোরা’র ভাবের আধুনিকতা

শ্রীগোপাললাল দে, এম-এ



বর্তমান কালে আমাদের দেশে যে সকল প্রধান প্রধান ভাব অতিশয় প্রকট হইয়া প্রতিনিয়ত আমাদের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের উদ্বেক করিতেছে, তাহাদের মধ্যে ‘ব্যক্তিস্বাভাব’, ‘সর্ব-প্রকারের বন্ধন হইতে মুক্তি’, ‘স্বজাতি প্রেম’, ‘স্বাদেশিকতা’, ‘অহিংসা’, ‘সত্যপ্রহ’ প্রভৃতি সর্বপ্রথমে উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের ‘গোরা’ উপন্যাসটিতে এই আধুনিক ভাবধারা-সমূহের কি পরিচয় পাওয়া যায় দেখা যাক। ‘গোরা’ রবীন্দ্রনাথের বৃহত্তম উপন্যাস। ইহা ১৩১৪ সালের ভাদ্র মাস হইতে ১৩১৬ সালের চৈত্র পর্যন্ত ‘প্রবাসী’ পত্রিকাতে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। সুতরাং এই গ্রন্থে নিবদ্ধ ভাবগুণি চল্লিশ বৎসরেরও অধিক কালের পুরাতন।

গোরা ও বিনয় দুই বন্ধু। কালেজে পাস করা যখন একটাও আর বাকী রহিল না তখন তাহারা এক ‘হিন্দু-হিতৈষী সভা’ করিয়া বসিল। আমরা পরে দেখিতে পাইব, এই ‘হিন্দু’ শব্দ কোনও সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। সভার যে সভাপতি তাহার নাম গৌরমোহন; তাহাকে আত্মীয়বন্ধুরা গোরা বলিয়া ডাকে। বিনয় সে সভার সেক্রেটারি। গোরা অত্যুগ্র ও উৎকর্ষ স্বদেশীভাবাপন্ন। তাহার স্বদেশপ্রেম আপাতদৃষ্টিতে দেখায় অনেকটা গৌড়ামির মত। কিন্তু জ্ঞানের অভাবে, বুদ্ধির অল্পতায়, চিন্তার দীনতায় সঞ্জাত যে গৌড়ামি, সে গৌড়ামি গোরা নয়। উচ্চতম পাশ্চাত্য শিক্ষার যে বিপুল প্রভাব শিক্ষিত ব্যক্তিকে স্বদেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত ও স্বাভাভাভিমানের গর্ভিত করিয়া তোলে গোরা সেই ধরণের দেশপ্রেম। ‘স্বরাজ ব্যতীত জীবন দুঃসহ’; যাহারা এই কথা বলিয়া উচ্চপদ, রাজসম্পদ এমন কি জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিয়াছেন, গোরা তাঁহাদের সঙ্গোত্র।

হিন্দু জাতির বহুবিধ হুঁত্যাগের মধ্যে একটি এই যে এতাবৎকাল যাহারা হিন্দু জাতির কোনও সংস্কার করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, তাঁহাদের কেহ কেহ পূর্বাঙ্কেই আপনাকে হিন্দুসমাজ হইতে পৃথক বলিয়া ধরিয়া লইয়া কাজ আরম্ভ করিয়াছেন। হিন্দুসমাজও তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগকে স্বীয় গণ্ডীর বহির্ভূত করিয়া দিয়া তাঁহাদের বিজাতীয় প্রভাব হইতে নিজ দেহকে মুক্ত রাখিতে চাহিয়াছে। ফলে তাঁহারা হিন্দুসমাজের

আশায়ুগ্মপ উপকার করিতে পারেন নাই, আবার অপর দিকে প্রচুর শক্তি সত্ত্বেও নিজেদের বৈশিষ্ট্য হারাইয়া যেন কতকটা ম্লান হইয়া গিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজের প্রথম অবস্থা সম্বন্ধে এই কথা খাটে। এ বিষয়ে গোরা জবানীতে রবীন্দ্রনাথ যাহা বলিয়াছেন তাহা গভীর অর্থপূর্ণ। নব যৌবনের জোয়ারের মুখে গোরা ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে বলিতেছে, ‘ব্রাহ্ম হয়ে বাহ্যদ্বারী করবার সখ যাদের আছে অত্রাহ্মরা তাদের সব কাজেই ভুল বুঝে নিশ্চয় করবে, এইটুকু তাদের সহ্য করিতেই হবে। ইচ্ছামত সমাজ ভেঙে বেরিয়ে যাওয়ার যতগুলো শাস্তি আছে এও তার মধ্যে একটা।’ দোষযুক্ত জাঁনিয়াও দেশের আচারবিচার সম্বন্ধে গোরা বড় সতর্ক; সে বলে, ‘কোন ছুতোয় সূচ্যগ্র ভূমি ছাড়তে আরম্ভ করলে শেষ কালে কিছুই বাকী থাকবে না।’ উপস্থিত কর্তব্য সম্বন্ধে গোরা বলে, ‘এখন আমাদের একমাত্র কাজ এই যে যা-কিছু স্বদেশের, তাই প্রতি সন্মোচনীয় সংশয়হীন সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা প্রকাশ করে দেশের অবস্থাসীদের মনে সেই শ্রদ্ধার সঞ্চার করে দেওয়া। দেশের সম্বন্ধে লজ্জা করে করে আমরা নিজের মনকে দাসত্বের বিষে দুর্বল করে ফেলেছি।’ গোরা বজ্ঞকণ্ঠে একথাও ধ্বনিত হইয়া ওঠে, ‘আমার আপন দেশকে বিদেশীর আদালতে আসামীর মত খাড়া করিয়া বিদেশীর আইন মতে বিচার করিতে আমি দিবই না। বিলাতের আদর্শের সঙ্গে খুঁটিয়া খুঁটিয়া মিল করিয়া আমরা লজ্জাও পাইব না, গৌরবও বোধ করিব না।...দেশের যাহা কিছু তাহার সমস্তই সবলে ও সগর্বের মাথায় করিয়া লইয়া দেশকে ও নিজেকে অপমান হইতে রক্ষা করিব।’ ‘আমরা ভাল কি মন্দ, সভ্য কি অসভ্য তাহা লইয়া জবাবদিহি কারও কাছে করিতে চাই না—কেবল আমরা ষোল আনা অমুদ্রব করিতে চাই যে আমরা আমরাই।’ গোরা স্বজাতিপ্রেম কোন ধরণের এই কথাগুলি তাহার পরিচায়ক।

এই ভাবের প্রণোদনাই তখনকার সেই নিরাকার উপাসনার জয়যাত্রার দিনেও গোরা সাকার উপাসনা সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে বরদাসুন্দরীকে বলিতেছে, ‘আকার জিনিষটাকে বিনা কারণে অশ্রদ্ধা করব আমার মনে এমন

বাসন্তী ঘৃত

বিশুদ্ধ দুগ্ধজাত

টেলি:—বাসন্তী বি ফোন:—বি,বি, ৫৭৩৫ পো: বঙ্গ ৬৮৩৬ কলি:

মি, সুগারমার্কেটস্, এক্সপোর্টারস্, ইম্পোর্টারস্ ও
জেনারেল অর্ডার সাপ্লায়ারস্

প্রমথনাথ পাল এণ্ড সন্স

২সি, রামকুমার রক্ষিত লেন, কলিকাতা-৭

কুসংস্কার নেই।...আকারের রহস্য কে ভেদ করতে পেরেছে?’
‘অন্ত না থাকলে যে প্রকাশই হয় না। অন্ত আপনাকে প্রকাশ
করবার জুই অন্ধকে আশ্রয় করেছেন—নইলে তাঁর প্রকাশ
কোথায়? যার প্রকাশ নেই, তার সম্পূর্ণতা নেই। বাক্যের
মধ্যে যেমন ভাব তেমনি আকারের মধ্যে নিরাকার পরিপূর্ণ।’
‘নিরাকারই যদি স্বার্থ পরিপূর্ণতা হ’ত তবে আকার কোথাও
স্থান পেত না।’

গোরা বলিতে চায়, নিরাকার ও সাকার একই স্রোত
যেন দুইটি দিক।

সাকার-নিরাকারবার সম্পর্কিত এই সকল তর্কাতর্কির উদ্বে
উনার রবীন্দ্রনাথকে বোঝা যায় পরেশ বাবুর স্বল্প কথায়,
‘মতামত কিছুই নয়, অন্তঃকরণের মধ্যে পূর্ণতা, শুদ্ধতা ও
আত্মপ্রসাদ ইহাই সকলের চেয়ে মূল্যবান। প্রাপ্তির মধ্যে যেটা
সত্য সেইটাই আসল।’

ভারতের এই অতি-প্রাচীন আধ্যাত্মিক আদর্শটি পাশ্চাত্য
প্রভাবিত ভারতবাসী যেন ভুলিয়াই গিয়াছিল, আধুনিক
কালে আবার যেন তাহা ভারতীয় মনে স্থান লাভ করিতেছে।
চল্লিশ-বৎসর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ দৃঢ়তার সহিত এই ভাবটি
প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

একদা আলোচনা কালে স্মৃতির তার প্রাণে গোরা-র নিম্ন-
লিখিত কথাগুলি গভীর সাড়া জাগাইয়াছিল, ‘আপনারা যাদের

অশিক্ষিত বলেন, আমি তাদেরই দলে—আপনারা যাকে
কুসংস্কার বলেন আমার সংস্কার তাই। যতক্ষণ না আশ্রয়
দেশকে ভালবাসবেন এবং দেশের লোকের সঙ্গে এক জায়গায়
এসে দাঁড়াতে পারবেন ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার মুখ থেকে
দেশের নিন্দা আমি এক বর্ণও সহ্য করতে পারব না।’ হারাণ
বাবুকে উদ্দেশ্য করিয়া এই কথাগুলি উচ্চারিত হইয়াছিল।
হারাণ বাবু সংশোধনের কথা বলিলে গোরা গর্জিয়া উঠিয়া
কহিল, ‘সংশোধন। সংশোধন টের পরের কথা। সংশোধনের
চেয়েও বড় কথা ভালবাসা, শ্রদ্ধা। আগে আমরা এক হব,
তা হলেই সংশোধন ভিতর থেকে আপনিই হবে।...আমি
কারও চেয়ে শ্রেষ্ঠ হয়ে কারও থেকে পৃথক হব না, এই
আমার সকলের চেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষা।’

ভারতের শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষদের যিনি একজন, তিনি এক দিন
গোরার মুখে নিজের আকাঙ্ক্ষা এমনি ভাবে প্রকাশ
করিয়াছিলেন। গান্ধীজীর হরিজন-আন্দোলনের বীজও যেন
এইখানেই নিহিত আছে।

বিনয় বলিয়াছে, ‘আমার বন্ধু গোরা ভারতবর্ষের সেই
আত্মবোধের প্রকাশরূপে আবির্ভূত হয়েছে।’

কবির সেই ভাবরূপের গূঢ় বিকাশ কি গান্ধীজী? না
জব্বারলাল? না সুভাষচন্দ্র? অথবা এরা সকলেই?

বিনয়, ললিতা, স্মৃতি এবং পরেশবাবু এরা তিনজনেই
ব্যক্তিগতভাবে মূর্তি বিগ্রহ। ব্যক্তিগতভাবে জুই বিনয় পরম
বন্ধু গোরাকে পরিত্যাগ করিতে উত্তম আর ললিতা এবং
পরেশ গৃহ ও সমাজ ছাড়িতে বদ্ধপরিকর।

সমাজ-জীবনে নারীকে উপযুক্ত মর্যাদা না দেওয়ার কুফল
সম্বন্ধে বিনয় বলিতেছে, ‘আমাদের স্বদেশপ্রেমের মধ্যে একটা
গুরুতর অসম্পূর্ণতা আছে। আমরা ভারতবর্ষকে আধখানা
করে দেখি।’ ‘আমরা ভারতবর্ষকে কেবল পুরুষের দেশ বলেই
দেখি, মেয়েদের একেবারেই দেখি না।’ ‘মেয়েরা প্রচ্ছন্ন
ধাকাতের আমাদের স্বদেশ আমাদের কাছে অর্দ্ধ সত্য হয়ে
আছে—আমাদের হৃদয়ে পূর্ণ প্রেম ও পূর্ণ শক্তি দিতে পারছে
না।’ কবি-কথিত সেই অভাব আজ পূরণ হইতে চলিয়াছে।
ইদানীং জাতীয় সরকার প্রদেশের শাসনকর্তা, রাষ্ট্রদূত,
গণপরিষদের সভ্য প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ পদে মহিলাদের নিযুক্ত
করিয়াছেন।

গোরা দেশ ভ্রমণে বাহির হইয়াছে। ‘সমস্ত বন্ধন ছেদন
করিয়া...খোলা রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িবার একটা প্রবল
আনন্দ তাহাকে পাইয়া বসিল।’

চরমোষপুরে নীলকুঠির সাহেবেরা নিরীহ গ্রামবাসী চাষী-
দের উপরে অত্যাচার করিতেছে, তাহার অধিকাংশই
মুসলমান। তাহার প্রতীকারার্থ ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট নিকল
আবেদন করিয়া অবশেষে গোরা বলিল, ‘আমি এখানের

চানপানি বহুবিধ
মারাত্মক ব্যাধির বাহন!
ম্যাজিস্ট্রেট
ডবল ও ডবল ডিউ

তাহাদের
নির্ধাত প্রাণমাতক
আরসোলা, মশা
মাছি প্রভৃতিতেও
কার্যকর
বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে
প্রস্তুত
বিশুদ্ধ কেমিক্যাল
সিঙ্গেল কোম্পানি



সংস্কৃত সমগ্র দেশব্যপী
পাওয়া যায়

লোকদের নিজের চেষ্টায় পুলিশের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্তে উৎসাহিত করব।’

চম্পারণে ও বারদৌলি তালুকে এই কৃষক-সত্যাগ্রহের বিকশিত রূপ আমরা দেখিয়াছি।

উপরোক্ত চরখোষপুরের ঘটনার পরে আমরা গোরাকে হাজতে দেখিতে পাই। কয়েকজন ছাত্রের সহিত সে গ্রেপ্তার হইয়াছে, পর দিন ম্যাজিস্ট্রেটের নিকটে প্রথম এজলাসেই তাহার বিচার হইবে। জামিনে, খালাসের প্রস্তাবে গোরা বলিল, ‘না, আমি উকীলও রাখব না, আমাকে জামিনে খালাসেরও চেষ্টা করতে হবে না।’ ‘দৈবাৎ আমার টাকা আছে আর বন্ধু আছে বলেই হাজত আর হাতকড়ি থেকে আমি খালাস পাব সে আমি চাই না।’ ‘বিচারে যদি উকীলের সাহায্যের প্রয়োজন থাকে ত গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধ পক্ষ কেন নিজের উকীল নিজে জোটীতে বাধ্য হবে? এ কি প্রকার সঙ্গে শত্রুতা? এ কি রকমের রাজধর্ম?’ ‘কোন চেষ্টা না করে যে গতি হতে পারে আমার সেই গতিই হোক। এ রাজ্যে সম্পূর্ণ নিরুপায়ের যে গতি আমারও সেই গতি।’

সুতরাং দেখা যায় বিচারে আত্মপক্ষ সমর্থন না করার নীতির কথা গোরার প্রযুক্ত রবীন্দ্রনাথ বহু পূর্বেই আমাদের শুনাইয়াছেন।

বাহির হইতে খাড়া দিতে চাহিলে গোরা বলিল, ‘বাইরে থেকে আমি কিছুই চাই না। হাজতে সকলের ভাগ্যে যা জোটে আমি তার চেয়ে কিছু বেশী চাই নে।’

জেল হইতে গোরা যাকে পত্র লিখিয়াছে, ‘কারাবাসে তোমার গোরার লেশমাত্র ক্ষতি করিতে পারিবে না।’ ‘আরও অনেক মায়ের ছেলে বিনা দোষে জেল খাটিয়া থাকে, একবার তাহাদের কষ্টের সমান ক্ষেত্রে দাঁড়াইবার ইচ্ছা হইয়াছে।’ ‘আমি ইচ্ছা করিয়াই জেলে যাইতেছি। আমার মনে কোন কষ্ট নাই, কাহারও উপরে রাগ নাই। জেলে আমি আতিথ্য লইতে চলিলাম। ইচ্ছা করিয়া যাহা গ্রহণ করি সে কষ্ট ত কষ্টই নয়। জেলের আশ্রয় আজ আমি ইচ্ছা করিয়াই গ্রহণ করিব।’

আরও লিখিয়াছে, ‘আরাম ও সম্মানকে ধিকার দিয়া, মানুষের কলঙ্কের দাগ বৃকে চিহ্নিত করিয়া বাহির হইব, মা তুমি আমাকে আশীর্বাদ করো।’

ষেচ্ছায় কারাবরণ করায় যে কত আনন্দ গোরার চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ তাহাই ব্যক্ত করিয়াছেন।

• একথা গোরাও লিখিয়াছিল, ‘তোমার দুঃখই আমার দও, আমাকে আর কোন দও ম্যাজিস্ট্রেটের দিবার সাধ্য নাই।’ তাহার বিরুদ্ধে গোরার জৌধ বা বিদ্বেষ ছিল না। ইহাই তো পরিপূর্ণ অহিংস নীতি।

গোরা উপত্যাসকে সত্যাগ্রহ নীতির ভাষ্যরূপ বলা চলে। এই গ্রন্থের সকল পাত্র-পাত্রীই নিজ নিজ ধারণা অমুখ্যায়ী

সত্যাগ্রহের পথে চলিয়াছেন। ললিতা, সূচরিতা, বিনয় সত্যাগ্রহী; বরদাসুন্দরী নিজ জ্ঞানবুদ্ধিমতে সত্যাগ্রহে চলিতে চেষ্টিত আছেন, হরিমোহিনী নিজ শিক্ষাসংস্কার অমুখ্যায়ী সত্যকে আশ্রয় করিয়া অকূলে ভাসিয়াছেন, কৃষ্ণদয়াল নিজ সাধনাশ্রমে রুদ্ধকক্ষে নানা যাগযোগের সাহায্যে সত্যলাভের নব নব পরীক্ষণে রত আছেন, অবিনাশকে মুচ বলা যায় কিন্তু সত্যানুসরণ বিষয়ে তাহাকে কপট বলা চলে না; আর গোরার অন্তরে সত্য আপনার পরিপূর্ণ বিকাশের পূর্বসূর্য্যভূর্তে প্রলয় মগ্ন আরম্ভ করিয়াছে। তাই বিনয় লক্ষ্য করে, ‘সত্যের বাহকদের বাক্যে মনে ও কর্ণে যে একটি সহজ ও সরল শাস্তি থাকা উচিত তাহা গোরার নাই।’ কিন্তু তাহার পূর্ণ আবির্ভাবের আর বিলম্বও নাই; অচিরেই সে যখন আসিয়া পড়িল তখনই পরিপূর্ণতার অতল প্রশান্তির মধ্যে আধ্যাতিকারও যবনিকা পড়িল।

পূর্বাপর সত্যে অবিচলিত শ্রদ্ধা দেখা যায় আনন্দময়ী এবং পরেশবাবু এই দুইটি চরিত্রে। গোরাকে যেদিন হইতে আনন্দময়ী কোলে তুলিয়া লইয়াছেন সেই দিন হইতেই তিনি সকল সংস্কারের উদ্বে উঠিয়া একমাত্র সত্যকেই আশ্রয় করিয়া আছেন; সে সত্য দেশকাল এবং বিশেষ সমাজবন্ধনের গভীর দ্বারা অবচ্ছিন্ন নয়। পুত্র ও পুত্রবধূ তাঁহাকে দূরে সরাইয়া রাখে। স্বামী তাঁহাকে স্পর্শ করেন না, এমন কি গোরাও তাঁহার ছোঁয়া খাইতে দ্বিধা বোধ করে। আনন্দময়ী হাসিমুখে সকলই উপেক্ষা করিয়াছেন, ধরিয়া আছেন শুধু সত্যকে, অথচ এমনি গোপনে যে পৃথিবীর কেহ তাহা জানিতে পারে না; তাঁহার আচারকে অনাচার এবং আচরণকে মূঢ়তা মনে করিয়া করুণা করে।

আর পরেশবাবু? তিনি বলেন, ‘আমি ঈশ্বরের কাছে সর্বদাই এই প্রার্থনা করি যে ত্রাণের সভাতেই হোক আর হিন্দুর চণ্ডীমণ্ডপেই হোক আমি যেন সত্যকে সর্বত্রই নত শিরে অতি সহজেই বিনা বিদ্রোহে প্রণাম করতে পারি—বাইরের কোন বাধা আমাকে যেন আটক করে না রাখতে পারে।’

পণ্ডিত ৩৪মানাথ চক্রবর্তী সঙ্কলিত

শ্রীশ্রীচণ্ডী ১১০ ত্রিসংখ্যা ১০

ভক্তিভীর্থ শ্রীউমেশ চক্রবর্তী প্রণীত ও প্রকাশিত
শ্রীশ্রীমনসাপূজা ও কথা— ১/০

শ্রীশ্রীমঙ্গলচণ্ডীপূজা ও কথা— ১/১০ কলির দ্বন্দ্বিতি

শ্রীশ্রীগঙ্গাপূজা ও কথা— ১/১০ মহাত্মা গান্ধী

শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণপূজা ও কথা— ১/১০ এক টাকা

শ্রীশ্রীশনিপূজা ও কথা— ১/১০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীধর লাইব্রেরী, মহেশ লাইব্রেরী প্রভৃতি এবং
প্রকাশকের নিকট—১২০১২, আপার মারকুনার রোড, কলিকাতা।

‘পরেণবাবু’ চরিত্রটির প্রতি বিদগ্ধ সমালোচকগণও স্রুবিচার করেন নাই। উক্তর স্রুবোধকুমার সেনগুপ্ত বলিয়াছেন— পরেশবাবু আদর্শ কাঠের পুতুল; দুর্বল চিত্ত পরেশবাবুর বহুতা জায়গা জুড়িয়াছে, পরেশবাবু বুঝেন নাই সত্য কোন চরম স্থাবর বস্তু নয়, তা একান্ত ভাবে গতিশীল।

কিন্তু উপরে উক্ত পরেশবাবুর নিজের উক্তি তো এই মত সমর্থন করে না।

উক্তর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ও পরেশবাবুর সম্বন্ধে কিছু অবিচার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, মানুষের মানসিক নমনীয়তার বিচারে পরেশবাবু অস্বাভাবিক, অতিশয় ভাল— অস্তুতঃ মানসিক কোন ভাঙ্গাচোরার বিবর্তন পথে তিনি ঐ অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন তাহা আমাদের কাছে দেখানো হয় নাই।

কিন্তু মনে রাখা উচিত, আমরা পরেশবাবুকে দেখিতেছি তাঁহার জীবনসারাহে, সমস্ত জীবন ব্যাপিয়া অসংখ্য ভাঙ্গা-চোরার পথে তিনি বর্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন। আর অস্বাভাবিক যদি হয়ও, তবু তাঁহার চরিত্র অসম্ভব নয়,

তাঁহার চরিত্রে মহর্ষি দেবেজনাথ ঠাকুরের চরিত্রের কিছু ছায়াপাতও হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। মহাত্মা গান্ধীর মতই পরেশবাবু আত্মসত্যপ্রার্থী। তফাৎ শুধু—পরেণবাবু অনেকটা নিজের ও দ্রষ্টা মাত্র।

সর্বশেষে আসে গোরার সেই জলন্ত দেশপ্রেমের কথা।

গোরা বলিয়াছে, ‘স্বদেশপ্রেম যেদিন আমার সম্মুখে এমনি সর্বাঙ্গীণ ভাবে প্রত্যক্ষগোচর হবে সেদিন আমারও আর রক্ষা নাই—সেদিন সে আমার সমস্তই আকর্ষণ করে নিতে পারবে; স্বদেশের সেই সত্য মূর্তি যে কি আশ্চর্য্য অপরূপ, কি অনিশ্চিত স্রুগোচর, তার আনন্দ তার বেদনা যে কি প্রচণ্ড প্রবল, যা বহার স্রোতের মত মৃত্যুকে এক মুহূর্তে লজ্জন করে যায় তা আজ তোমার কথা শুনে অল্পবয়স্ক অহুভব করতে পারছি।’

পড়িতে পড়িতে মনে হয় চল্লিশ বৎসর পূর্বে গোরার মুখে রবীন্দ্রনাথ যে কথা বলিয়াছেন তাহারই প্রতিধ্বনি উঠিয়াছিল তিন বৎসর পূর্বে ব্রজের অরণ্যপ্রান্তে—নেতাজী স্রুভাষচন্দ্র বসুর মুখে।

নেতাজীর অনুসরণে :—

বাংলার বিখ্যাত স্রুত ব্যবসায়ী শ্রীঅশোকচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় ও তাঁহার “শ্রী” মার্কা স্রুতের নূতন পরিচয় বাঙ্গলাদেশে নিম্প্রয়োজন। আজকাল বাংলার প্রতি গৃহে, উৎসবে, আনন্দে ‘শ্রী’ স্রুতের ব্যবহার অত্যাশ্চর্য্য হইয়া পড়িয়াছে, বাজারে ভেজাল স্রুতের যেরূপ প্রয়াস দেখা যায়, তাহার মধ্যে শ্রীযুক্ত অশোকবাবুর বিশুদ্ধ স্রুত যে খ্যাতি অর্জন করিয়াছে, তাহা স্রুত ব্যবসায়ী মাত্রেরই অনুকরণীয়।

স্বাঃ শ্রীস্রুভাষচন্দ্র বসু

সুপ্তক - পার্শ্বচয়

শরৎ চন্দ্রের পত্রাবলী শ্রীব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক কলিত। বুকলাণ্ড লিমিটেড, ১নং শঙ্কর ঘোষের লেন, কলিকাতা-১, ইঞ্চি, ১৯০ পৃষ্ঠা। মূল্য তিন টাকা।

কীর্তিমানের শ্রেষ্ঠ পরিচয় তাঁর কীর্তি, আর কিছু না জানলেও আমাদের বশেষ কতি হয় না। কিন্তু কীর্তিই সমগ্র পরিচয় নয়, তাঁর আকৃতি প্রকৃতি পছন্দ অপছন্দ প্রভৃতিও লোকে জানতে চায়। বিশেষত যিনি রূপপ্রিয় গল্পলেখক এবং বিচিত্র চরিতাবলীর স্রষ্টা, তিনি স্বয়ং কি রকম স সন্মুখে লোকের কোঁতুহলের অভ্য থাকে না।

সুতরাং ব্যক্তির ঘনিষ্ঠ পরিচয় পাবার শ্রেষ্ঠ উপায় তাঁর চিঠিপত্র। শরৎ চন্দ্রের পত্রাবলী তাঁর গল্পের মতই চিত্তাকর্ষক। এই চিঠিগুলির ভাষা তিনি স্বচ্ছন্দে বিদগ্ধ জনকে লিখেছিলেন, ভবিষ্যতে ছাপা এমন চিত্রা তাঁর মনে ছিল না। সতর্কভাবে লেখা না হলেও এগুলি বিশিষ্ট প্রকৃতিভাষা মণ্ডিত। এই সংকলনে আমরা যে ব্যক্তির পরিচয় পাই তিনি সরল, বন্ধুবৎসল, মেহাকাঙ্ক্ষী, একটু অভিমানী, বিনয়ী ও পরিহাসপ্রিয়। তিনি খোলাখুলি মতামত প্রকাশ করেন, তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ করেন, পরের দুঃখে কাতর হন, বাড়ির পশুপক্ষীর মৃত্যুও সহিতে পারেন না।

প্রায় অস্থখে ভোগেন, ছবি আঁকেন, বিস্তর বই পড়েন, হার্বার্ট স্পেনসারের দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা করতে ইচ্ছা করেন, 'আবগারী ব্যাটারের হার মানিয়েছিলাম' বলে গর্ব করেন, কারও কাছে অপরাধ করেছেন মনে করলে অসংকোচে মার্জনা চান। তিনি জানিয়েছেন যে তিনি ethics বোঝেন, কারও চেয়ে কম বোঝেন বলে মনে করেন না; শুধু গল্প নয়, সকল বিষয়েই তিনি প্রবন্ধ লিখতে পারেন, কেবল পত্র পারেন না। আবার লিখেছেন—'আমার বাঙলা ভাষার উপর দখল নেই বললেই চলে, শব্দসংকল্প খুব কম, কাজেই আমার লেখা সরল হয়; আমার পক্ষে শক্ত ক'রে লেখাই অসম্ভব।' কয়েক জন ছাড়া উচ্চশিক্ষিতা—মহিলাদের উপর তাঁর শ্রদ্ধা নেই। তাঁর ধারণা—মেয়েদের মধ্যে সাড়ে পনের আনা হই কুসঙ্গী, কেবল সাবান পাউডার আর জামা-কাপড়ের দ্বারা আর নাকী খোঁচা গলায় কথা কয়ে বত দূর চলে।

শরৎ চন্দ্রের অনুরাগী মাত্রই এই পত্রাবলী উপভোগ করবেন এবং সংকলনের জন্য শ্রীযুক্ত ব্রজেনবাবুর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবেন।

রাজশেখর বসু



দুর্লভ নয় মোটেই -

তবুদেহের পেলব কোমলতা ও লাবণ্যমণ্ডিত সৌন্দর্য্য সুষমা প্রকৃতির দুর্লভ দান। নিখিল তরুণীর পরম কাম্য-বস্তু রূপের এই ঐশ্বর্য্য। প্রাকৃতিক যুগে নারীর পক্ষে এ সম্পদ দুর্লভ ছিল বটে, কিন্তু একালে 'ক্যাল-কেমিকো'র সম্বন্ধে প্রস্তুত প্রসাধনী দেহের সৌন্দর্য্যকে প্রত্যেক রমণীর হাতের কাছে এনে দিয়েছে।

☆ **ভুইনা বিউটিফিক**
☆ **সেনুকা চম্পোট পাউডার**
☆ **লাবনী স্নো এবং ক্রীম**

ক্যালকাটা
কেমিক্যাল

দা-গৌসাই ও আরো। গল্প—খ্রীষ্টরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত। কালকটাক বুক ষ্টোরস, ৪১৫ সি. হেরষ দাস লেন, কলিকাতা। পৃঃ ১০১। মূল্য তিন টাকা।

শ্রীমোহিনীমোহন রায়, খ্রীষ্টরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও খ্রীষ্টরেশচন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় লিখিত কয়েকটি গল্প এই সংগ্রহে আছে। বাংলা সাহিত্যে লেখকেরা অপরিচিত নহেন—গল্পগুলিও ইতিপূর্বে বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত গল্পমাত্রই রসোত্তীর্ণ এমন কথা বলা কঠিন হইলেও—এই সংগ্রহের গল্পগুলি সুখপাঠ্য। খ্রীষ্টরেশচন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'নাস্তিক সদানন্দ' গল্পটি বহুদিন পূর্বে সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হইলেও পাঠকের মন হইতে মুছিয়া যায় নাই; 'ভক্তি বিলাস' গল্পটি তো পরিণত বয়সের অনবত্ত দান।

গল্প-সংগ্রহখানি রসপিপাসু পাঠকে পরিভূষিত দান করিবে—এ বিশ্বাস আমাদের আছে।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

পথ নির্দেশ—খ্রীষ্টরেশচন্দ্রনাথ দত্ত। ষ্টাণ্ডার্ড বুক কোম্পানী, ২১৬, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ৮৫, মূল্য ১।০।

ভারতবর্ষ-স্বাধীনতা পাইয়াছে বটে, কিন্তু এখন পর্যন্ত উহাকে প্রকৃত স্বাধীনতা বলা চলে না। দেশের নেতারাও একথা স্বীকার করিয়া থাকেন। লেখক কংগ্রেসকর্মীরূপে নিজের জীবনে যে ভিত্তি অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন তাহারই আলোকে স্বদেশের যুবকগণকে নেতাজীর পথে চলিতে অনুরোধ জানাইয়াছেন। তাঁহার সিদ্ধান্ত এই যে, আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করিয়া সর্বদলীয় একতার ভিত্তিতেই ভারতীয় স্বরাজসাধনার সফলতা

আসিতে পারে। লেখক ভারতের অতীত ইতিহাসের শিক্ষায় আত্মবান প্রাচীন ঋষিগণের প্রদর্শিত পথে চলার-সার্থকতায় বিশ্বাসী। লেখক আদর্শ-ভারত প্রাচীনের সঙ্গে নবীনের সামঞ্জস্য বিধান করিবে এবং এক নূতন ভারতবর্ষ রচনা করিবে যাহা শক্তি ও শান্তি উভয়ের প্রাধিকার্য পৃথিবীতে নব যুগ আনয়ন করিবে। লেখক ভারতের প্রাচীন সভ্য ও ঐতিহ্যের ভিত্তিতেই নূতন ভারত গড়িতে চাহেন। কিন্তু ইহা সংগ্রহীয়া গান্ধীর মতবাদ ও আদর্শের সহিত লেখকের মূলগত পার্থক্য হইয়াছে। এই পার্থক্যের স্বরূপ লেখক তাঁহার পূর্বপ্রকাশিত গ্রন্থ 'গান্ধীজীর মত ও নেতাজীর পথ' নামক পুস্তকে ব্যক্ত করিয়া আসাদের বিশ্বাস এরূপ পুস্তক পাঠকের চিন্তার খোরাক যোগাইবে।

শ্রীঅনাথবন্ধু

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত—সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ৬৬ : খ্রীষ্টরেশচন্দ্রনাথ ব

পাধ্যায়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ২৪৩১ আপার সারকুলার কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

সাহিত্যের দিকপাল এই তিন জনের চরিত্র একই গ্রন্থে নিবদ্ধ হইয়া তিন জনের নামই সাহিত্য-জগতে স্থপরিচিত, তিন জনের রচনার পরিচয় নয়, অথচ তিন জনের লেখাই লোকে ভুলিতে বসিয়াছে। দ্বিজেন্দ্র ঠাকুর ও কালীপ্রসন্ন ঘোষ সমসাময়িক। দ্বিজেন্দ্রনাথ ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে কালীপ্রসন্ন ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ একাধারে দার্শনিক, গণিতবিৎ, প্রাবন্ধিক, জাতীয় এবং ব্রহ্ম-সঙ্গীত রচয়িতা, বরেন্দ্রনাথ বর্দলার উদ্ভাবক এবং বাংলার এক শ্রেষ্ঠ গল্পলেখক। কয়েকটি চৈত্রমেলা বা হিন্দুমেলা অনুষ্ঠানের প্রেরণা অনেকটা তাঁহ

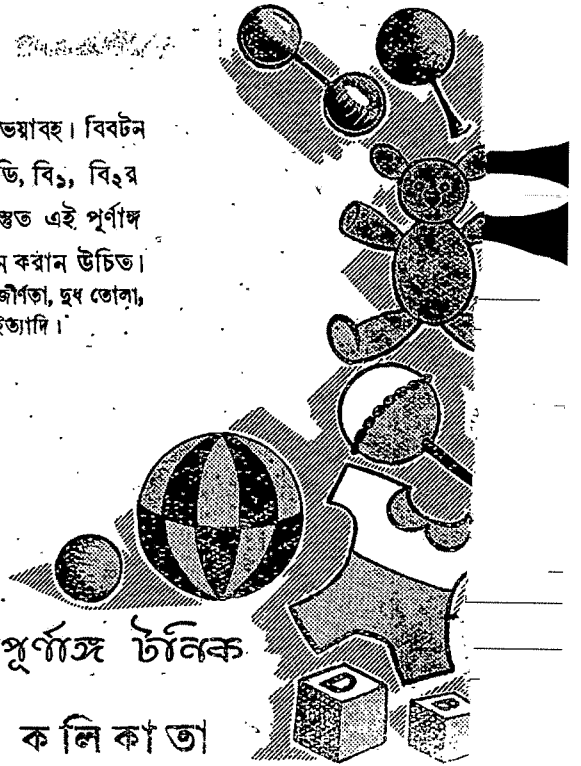
মাতৃের বর্ষব্য

শিশুপালনের সম্যক জ্ঞানের অভাবে এদেশে শিশু-মৃত্যুর হার এত ভয়াবহ। বিবটন শিশুদের দৈহিক সর্বাঙ্গীণ পুষ্টিবিধান করিতে অধিষ্ঠায়। ভিটামিন ডি, বি১, বি২ সহিত মূল্যবান উদ্ভিজ্জ ও রাসায়নিক উপাদানের সংমিশ্রণে প্রস্তুত এই পূর্ণাঙ্গ টনিকটি প্রত্যেক শিশুকেই, বিশেষ করিয়া দশমাসের সময়, সেবন করান উচিত। বিবটন নিম্নলিখিত রোগে বিশেষ উপকারী :—শিশুদের বৃক্কের পীড়া, অজীর্ণতা, দ্রুত তোলা, পেট ফাঁপা, কোষ্ঠকাঠিন্য, রক্তশূন্যতা, রক্ততা, ব্রুইটিস, রিকেটস ইত্যাদি।



একটি পূর্ণাঙ্গ টনিক

লিষ্টার এন্ড সোপার্টিকস কলিকাতা



মানবিক ও পরমাণবিক

বিষ্ণু মুখোপাধ্যায় •

মষ্টিগত বিজ্ঞান-প্রচেষ্টার ফলে যে পরমাণু শক্তির আবিষ্কার, সাম্রাজ্যবাদী শক্তি পৃথিবীব্যাপী সাম্রাজ্য-বিস্তারের লোভে সেই আবিষ্কারের ওপর একচেটিয়া অধিকার কায়ম করে পৃথিবীবিরোধী চক্রান্তে লিপ্ত। এই চক্রান্তের সংঘর্ষে কে জয়ী হবে—পরমাণু শক্তিকে কেন্দ্র করে তার বিভিন্ন দিকের এই বিশদ আলোচনা তার স্থম্পষ্ট নির্দেশ দেবে। দাম ২।০

অবরোধ

বিজয় ভট্টাচার্য

শ্রমিকের দুঃখ-দুর্দশা ও সংগ্রামকে কেন্দ্র করে লেখা পূর্ণাঙ্গ নাটক। নাটকের সাধারণ রক্ষণশীল মনোমিতি ছাড়িয়ে ‘অবরোধ’ অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে। এখানে জনসাধারণ নতুন সম্ভাবনার পথ কাটছে। আপোষের মধ্য দিয়ে নয়, সংগ্রামের মধ্য দিয়ে, এখানে মানুষ বাঁচতে চায় দক্ষিণে প্রত্যাশা নিয়ে নয়—সমানাধিকারের দাবী নিয়ে। দাম ২।০

পারীর পতন

ইলিয়া এরেনবুর্গ

ইলিয়া এরেনবুর্গ-এর যুগান্তকারী উপন্যাসের বাংলা অনুবাদ। আশ্চর্য দক্ষতা ও অনন্যসাধারণ স্নায়ুশক্তি সঙ্গী রূপায়িত একটি জাতির মর্মভেদ অবনতির কাহিনী। তিন খণ্ডে সমাপ্ত। অনুবাদ করেছেন : অমল দাশগুপ্ত, প্রমথ মজুমদার ও অনিলকুমার হা। দাম : ৪, ৩, ৪।

ন খণ্ড একত্রে : দশ টাকা।

পুতুলনাচের ইতিকথা

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

আজকের মানিকবাবুর সমাজ-সচেতন সাহিত্যের মূলস্রোত রয়েছে “পুতুলনাচের ইতিকথা”য়। জটিল আধুনিক সমাজ-ব্যবস্থার চাপে যে মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে পদে পদে বাধা পেতে দেখে তাঁর মনে হয়েছিল তারা অদৃষ্টের হাতে খেলার পুতুল সেই সব মানুষদেরই যান্ত্রিক জীবনের রসোত্তীর্ণ কাহিনী। দাম ৫

● ছোটদের বই ●

সকল দেশের সেরা

ব্রজেননাথ ভট্টাচার্য

ভবিষ্যৎ ভারতের তরুণ নাগরিক যারা তাদের সঙ্গে এই মহান দেশের আন্তরিক পরিচয়ের উদ্দেশে লেখা ভারতবর্ষের অপরূপ কাহিনী। ভারতের সামাজিক অবস্থা, অর্থনৈতিক ভিত্তি, রাজনৈতিক সংগ্রামের ধারা আর তার শাসন-পদ্ধতি গল্পের মতো মনোরম ভঙ্গীতে বলে গিয়েছেন লেখক। প্রত্যেকটি পাতায় সূর্য রায়ের জমকালো ছবি। দাম ২।০

ঘুমতাড়ানী ছড়া

সুকান্ত ভট্টাচার্য ও অন্যান্য

ছোটদের ঘুমভাঙার কাহিনী একালের ছেলে-মেয়েদের হাতে ছড়ার আকারে পরিবেশন করেছেন চার-মেজাজের চারজন আধুনিক কবি। পাতায় পাতায় সূর্য রায়ের অজস্র রঙীন মজাদার সব ছবি। দাম ৩

● কাবতার বই ●

সন্দীপের চর

বিষ্ণু দে

আধুনিক কবিতার সংগ্রহ। দাম ২

ছাড়পত্র

সুকান্ত ভট্টাচার্য

নতুন যুগের সার্বক কবির ঘোষণায় উৎকর্ষ কোটি কোটি মানুষের বলিষ্ঠ আশা। দাম ১।০

রবীন্দ্রনামা

প্রভাত বসু সম্পাদিত

পরমোদিত জনপ্রিয় ও নবীন কবির নামা ছন্দে ও মানান্তরে রচিত ‘কবি প্রশান্তি’। দাম ১।০

ইংরেজী ও বাংলা বইয়ের তালিকার জন্য চিঠি লিখুন

ইণ্টারন্যাশনাল পাবলিশিং হাউস লিমিটেড

৩০, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৬

শিবরাম চক্রবর্তীকে লেখা

একখানি চিঠি

“প্রদ্বাদ্দেবু, আপনাব বইগুলো পড়ে পড়ে পুরনো আর হচ্ছে না। এত আনন্দ আপনি দিয়েছেন যে সেজ্ঞে আপনাকে ধন্যবাদ দেওয়া আমার কর্তব্য। * * * * *

অনিল মিত্র

১, অবিনাশ মিত্র লেন, কলিকাতা
১. ২. ৪৮

কোনো নামজাদা সাহিত্যিক, সম্পাদক বা সমালোচকের প্রশংসা-পত্র নয়, বাংলাদেশের অগ্ণতি বই-পড়ুয়াদের সাধারণ একজনের চিঠি। কিন্তু এই পত্রদাতা যদি লেখকের আগেকার আলাপী না হন এবং এই চিঠি লেখকের প্রবোচনাতেই না লেখা হয়ে থাকে তাহলে স্বতঃপ্রণোদিত এই সামান্য কথাগুলির মূল্যই অসামান্য মনে হবে। যদিও ওই চিঠি বক্তব্যকে অতিশয়োক্তি বলে ধারণা হওয়াই স্বাভাবিক, কেনন, পৃথিবীতে বারবার পড়বার মত একটিমাত্র জিনিসই কেবল আছে, পুনঃপুনঃ পড়লেও যা কখনো পুরনো হয় না—তা হচ্ছে প্রেম। এবং শিবরামবাবুর লেখা বইই উপদেশ হোক নতুন কিবা পুরণো প্রেমের সঙ্গে কখনই তার তুলনা হতে পারে না।

অবশিষ্ট, হাসিও প্রায় প্রেমের মতই জিনিস—যার আবেদনও কখনো ক্রুরোবার নয়। এবং শিবরামবাবুর গল্পে, প্রেম আর হাসি, এই দুটি আদি এবং অনাদিসসকে, আশ্চর্য এক রসায়নিক কোশলে মিলিয়ে-মিশিয়ে একাকার করে যে নতুন ধরণের রস-সাহিত্য সৃষ্টি করা হয়েছে বাংলা ভাষায় তার জোড়া নেই বল্লেই হয়। আর সেই কারণেই—উপরোল্লিখিত বিবৃতির এক শ' ভাগের মধ্যে এক ভাগও যদি সত্যি থাকে—শিবরামবাবুর লেখা একবারও যদি পড়া যায়—আর একবার পড়েই আনন্দ মেলে—তাহলেও আজকের দিনে কিবা আগামীকালে তার দাম নেহাৎ কম নয়। স্মৃতির আলোকে উজ্জ্বল করতে, ছুঁতে বোঝাতে হালকা করতে শিবরামের এক সেট বই, বন্ধুর মতই, একান্ত অপরিহার্য। নিত্য নতুন বসাবাদের জন্ত—প্রিয়জনের মতই তার প্রয়োজন।

= শিবরাম চক্রবর্তীর সম্পূর্ণ গ্রন্থতালিকা =

দেবতার জন্ম—৩।

মেয়েধরা ফাঁদ—২১।

প্রেমের বিচিত্র গতি—৩।

মেয়েদের মন—২১।

আত্মীয়তা বজায় রাখা সোজা নয়—১।

বাড়ী থেকে পালিয়ে—২।

শিবরাম চক্রবর্তীর মতো

কথা বলার বিপদ—১।

অজ্ঞান কাটুন-লাঞ্ছিত সবগুলিই সম্মান হাস্যকর

দি বুক এন্ড পো রি অন্স লিঃ

২২১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা—৬

‘ভারতী’র তিনি প্রথম সম্পাদক। অনেক বিষয়েরই তিনি পথপ্রদর্শক এবং জীবনে বিজেদ্রনাথ একজন খাঁটি বাঙালী। তাঁহার ‘সং’ এক অপূর্ণ কাব্যগ্রন্থ আজ করুণাই বা সেই কাব্যের সহিত পাঁচালী প্রসঙ্গ পূর্ববঙ্গের প্রধান সাহিত্যিক। তাঁহার রচনারীতি অসংখ্য ‘ভ্রান্তি-বিনোদ’, ‘প্রভাতচিন্তা’, ‘নিভৃতচিন্তা’, ‘নিশীথ-চিন্তা’ প্রভৃতি গ্রন্থ এবং তাঁহার সমস্ত প্রবন্ধাবলীর মধ্যেই ভাবগাম্ভীর্য এবং শক্তি। একত্র সমাবেশ দেখিতে পাই। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত এবং সম্পাদিত ‘বঙ্গবন্ধু-মণ্ডল’ যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। তাঁহার বাগ্মিতা-শক্তি ছিল অসাধারণ।

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত বয়সে এই দুই জনের অনেক ছোট, তিনি রবীন্দ্রনাথ সমবয়সী। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার জন্মকাল। নগেন্দ্রনাথের শক্তি বহুমুখী এবং বাংলা রচনায় তিনি সমান দক্ষ ছিলেন। এক শ্রেষ্ঠ সাংবাদিক এবং সম্পাদক রূপে তিনি খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি মিথিলা বিভাগপতির সম্পূর্ণ পদাবলী সংগ্রহ করিয়াছিলেন। উপাচার্য এবং ছোট-গল্প লেখক হিসাবে নগেন্দ্রনাথের দান সামান্য নহে। তাঁহার অনেকগুলি বাংলা-সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান লাভ করিবার যোগ্য। এই স্থলখিত, স্থানিক তারিখ সম্বলিত পুস্তকখানি বহু জাতব্য তথ্যে পূর্ণ।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

অসি বাজে বাম্ বাম্—শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর। প্রগতি প্রকাশ, গটলডাঙ্গা স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১৫০।

ঐতিহাসিক পটভূমিকায় লিখিত, ছেলেরদের উপাচার্য। বাবা এবং চিত্তাকর্ষক ঘটনাসংস্থানই পুস্তকখানির বিশেষ আকর্ষণ। বর্তমান (দ্বিতীয়) সংস্করণে পুস্তকখানি আরও অধিক সমৃদ্ধ হইয়া আশা করি।

বিবর্তন—শ্রীসচ্চিদানন্দ পাঠক। ভারত সাহিত্য ভাণ্ডার, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

গল্প-সংগ্রহ। ইহাতে ছয়টি গল্প স্থান লাভ করিয়াছে। লেখক সাহিত্যক্ষেত্রে নবাগত হইলেও গল্পগুলি মোটামুটি ভাল হইয়া বিশেষ করিয়া “বিবর্তন” গল্পটি এবং “পাগল” শীর্ষক চিত্রটি আকর্ষণীয়। লেখকের ভাষা সহজ ও বেগবান, কিন্তু স্থানে স্থানে উচ্ছৃঙ্খল কিছু বেশী মাত্রায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এদিকে লেখক একটু দিলে গল্পগুলি আরও উপভোগ্য হইতে পারিত।

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

অনাবশ্যক—শ্রীমানিকলাল সিংহ। এস কে পাবলিশিং এন্ড কোং। ৮, শ্রীমাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা মাত্র।

আধুনিক গীতিকবিতা হইতে গীতিস্বর বিদায় লইতে বসিয়াছে। এমন দিনে এই খাঁটি গীতিকবিতা কয়টি পাঁচালী লাভ করিলাম।

“এ যে ভূমি চেউ হয়ে যাও নগর গাঁয়ে গাঁয়ে
সবার সুরে সুর বিলায়ে সবার পায়ে পায়ে”

—জীবনের গতিচ্ছন্দ কবিতায় মধুর সুরে বাড়িয়াছে।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

ফরিয়াদ—মতিউল ইসলাম। আলহামরা-লাইব্রেরী, মুসলমান পাড়া লেন, কলিকাতা। মূল্য ২১০ টাকা।

মহানগরীর বুক সাপ্তাহিক দাঁড়ার ফলে ধ্বংসের যে তাণ্ডবলীলা অমুষ্ঠিত হয়, তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া কবির হৃদয় নিবিড় বেদনায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার সেই অন্তর্গত বেদনাকে তিনি ‘ফরিয়াদ’ কাব্যচ্ছন্দে প্রকাশিত করিয়াছেন। শত শত নিরপরাধ নরনারী

পূর্বাশা

১৩৩৯

মাসিক পত্রিকার জন্ম ১৩৩৯ সালে বাংলাদেশের পূর্বসীমান্তের একটি ছোট শহরে। তখন

কলকাতায় 'কল্লোল' আর 'কালিকলম' নেই—ঢাকার 'প্রগতি'-ও বন্ধ হয়ে গেছে। যে

টা নতুন হাওয়ায় বাংলাসাহিত্যের মন চঞ্চল হয়ে উঠেছিল—মুনে হল, তা যেন পথিকহাওয়া, স্থপতির একটি ক্ষণিক

দব জাগিয়ে দিয়ে উধাও হয়ে গেল। মাটির ফসলের বেলায় তা হঠাত সত্যি কিন্তু এই নতুন হাওয়ার সঙ্গে

হাতের ফসলের সম্বন্ধ তেমন নয়। 'কল্লোল' 'কালিকলম' 'প্রগতি'র পর পূর্বাশার আবির্ভাব তা-ই প্রমাণ

। সবুজপত্রের উত্তরাধিকার যেমন শ্রীযুক্ত স্বধীন্দ্রনাথ দত্ত-সম্পাদিত 'পরিচয়' বহন করেছে তেমনি সাহিত্যের নতুন

পালনের উত্তরাধিকার বহন করেছে 'পূর্বাশা'। ১৩৩৯-৪০-৪১-৪২ এ-চার বছর কুখ্যাত 'আধুনিক সাহিত্যের'

ইচ্ছা ছিল পূর্বাশা। কিন্তু '৪০ সাল থেকে '৪২ সাল পূর্বাশা আর ছোট মফঃস্বল শহরের সঙ্কীর্ণ পরিধিতে পড়ে থাকে

—কলকাতার বিস্তৃত পরিমণ্ডলে 'আধুনিক সাহিত্যের' উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হয়েছে। যেমনি রাজ-

কল্লোল তেমনি ঠিক সাহিত্যের ক্ষেত্রেও আন্দোলন নামক বিষয়টি ব্রিটিশ সরকারের কোপদৃষ্টি কখনও এড়াতে

নি। আধুনিক সাহিত্যের সমর্থনে রচিত শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসুর 'জুজুবুড়ি' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করে ১৩৪০

সংখ্যক পূর্বাশাকে বঙ্গীয় সরকারের হাতে খানিকটা লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছে। কিন্তু এ-লাঞ্ছনা উপেক্ষা করবার

পূর্বাশার ছিল—কেননা সাহিত্যিকদের কাছে যে আন্তরিক সহানুভূতি পূর্বাশা পেয়েছে তার দামের কাছে

লাঞ্ছনার গ্লানি অকিঞ্চিৎকর। বাংলাদেশের সাহিত্য শিল্পীদের স্নেহে ধরা পূর্বাশা এই তিনটি বছরের

অপেক্ষা তুলতে পারবে না। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, শ্রীঅরবিন্দ, প্রমথ চৌধুরী, নরেশচন্দ্র, বিভূতি

চন্দ্র, পাণ্ডিত্য, ভারতীন্দ্রনাথ, মনোজ বসু, শৈলজানন্দ, নজরুল ইসলাম, নলিনী গুপ্ত, দিলীপ রায়,

প্রসাদ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অন্নদাশঙ্কর, স্বধীন্দ্র দত্ত, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, অজিত দত্ত,

গুরুচরিত্র, জগদীশ গুপ্ত, মন্থর রায়, দিনেশরঞ্জন, সুরেশ চক্রবর্তী, অজয় ভট্টাচার্য্য, হুমায়ূন

কাদের, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিষ্ণু দে—এদের সাহায্য লাভ করেছে পূর্বাশা তার দায়িত্ব পালনে কঠিন হয়নি।

যুগের সাহিত্য-প্রেরণাকে পাঠকের কাছে পৌছিয়ে দেওয়া ছাড়াও সে সমস্রকার পূর্বাশা মুদ্রণসৌষ্ঠবে একটি

সুন্দর স্রষ্টার পরিচয় দিয়েছিল। বাংলা অক্ষরের বিচিত্র রূপদান পূর্বাশার মাধ্যমেই আজ জনপ্রিয় হয়ে

ছে—রচনার শিরোনামা এবং অব্যবহৃত দুটি বিভিন্ন অথচ সঙ্গতিপূর্ণ বর্ণে মুদ্রণ ১৩৪১ সালের পূর্বাশাকে অপূর্ণ

করে তুলেছিল। সাহিত্য পরিবেশনে পূর্বাশার সৌন্দর্য্যবোধ তার সাহিত্যের প্রতি নিষ্ঠারই অপর দিক।

কালে বাংলাসাহিত্যের বিশিষ্ট সম্পদ বলে পরিকল্পিত বহু গল্প ও উপন্যাস এসমস্রকার পূর্বাশাতেই

প্রকাশিত হয়—বুদ্ধদেব বসুর 'রাধারাগীর নিজের বাড়ী'—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'হুইসল'—প্রেমেন্দ্র মিত্রের

'পাপপথ', 'ভূমিকম্প'—মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রাগৈতিহাসিক' 'পদ্মানদীর মাঝি'-র নাম উদাহরণত উল্লেখ

যোগ্য। ডি-এইচ-লব্জের সঙ্গে বাংলাপাঠকদের পরিচয় করিয়ে দেবার সৌভাগ্যও পূর্বাশারই হয়েছিল।

১৩৪৩ থেকে ১৩৪৯ সাল পূর্বাশা নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়নি—দেশব্যাপী অর্থসঙ্কট, যুদ্ধ এবং অ'গষ্ট

প্রবই তার মুখ্য কারণ। তবু রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে 'রবীন্দ্রস্মৃতি পূর্বাশা'

র পূর্বাশার একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। এ-অর্থ রচনা করেন বাংলাদেশের বিখ্যাত সাহিত্যিকবৃন্দ।

১৩৫০-সাল থেকে পূর্বাশা আবার নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়ে চলেছে। ভারতীয় সংস্কৃতিকে আজকের

নতুন পরিবেশে নতুন পরিচ্ছদে প্রতিষ্ঠা করবার আদর্শই আজ পূর্বাশার। ভারতীয় রাজনীতি, অর্থনীতি,

জননীতি, ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন এবং সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি আলোচনা করে ভারতীয় ঐতিহ্যকে নতুন

আলোতে উজ্জ্বল করে তোলার আদর্শ নিয়েই পূর্বাশার এবারকার যাত্রা স্বরূপ। ভারতীয় সমাজ-রাষ্ট্র-সংস্কৃতি

পারা-ই নতুনভাবে চিন্তা করছেন—পূর্বাশা তাঁদের চিন্তাধারা পাঠকের কাছে উপস্থিত করে দিতে উন্মুখ।

তার নতুন আন্দোলনের স্পর্শে জন্ম নিয়ে পূর্বাশা আজ নতনের বিস্তৃততর ক্ষেত্রে আত্মপরিণতি লাভ করেছে।

তার জীবনের সঙ্গে বহু সাহিত্যিকের পরিণতির ইতিহাস জড়িত—নতন ভারতবর্ষের নতন মানুষের

মনে যদি পূর্বাশার বিন্দুমাত্র দান থাকে তবে তার চেয়ে বড়ো সার্থকতা পূর্বাশা কল্পনা করতে পারে না।

সামান্য বৈশাখ মাস থেকে একাদশ বর্ষ স্বরূপ হবে। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ধারাবাহিকভাবে লিখবেন 'কল্লোল যুগ'-এর ইতিহাস

বার্ষিক মূল্য মনিষ্যর্ডারে চয় টাকা। * সম্পাদক : সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য * প্রতি সংখ্যা আট আনা

প্রকাশক : পূর্বাশা লিমিটেড, পি-১১, গণেশচন্দ্র এন্ডসন্স, কলিকাতা

অসহায় শিশুর রক্তে রঞ্জিত রাজপথের দৃশ্য দেখিয়া তাহার মর্মস্থল মথিত করিয়া 'করিয়াদ' উদ্ভিত হইয়াছে :—

—“স্বপ্নাতুর শয্যা হতে উঠি
দেখিলাম পুষ্পগুচ্ছে কীটের অকুটি ;
নর-নারী শিশুদের শতখণ্ড অগণিত শব,
বিশ্রুত পথের প্রান্তে ঐশ্বর্য বিভব
রক্তাক্ত নগরী কলিকাতা ।
কোথায় বিধাতা ?”

আজিকার দিনের গভীর দুঃখবেদনা কবির কাব্যে ছায়াপাত করিয়াছে, কিন্তু কবি মানুষের শুভবুদ্ধিতে আস্থাবান । তিনি মর্মে মর্মে জানেন সাম্প্রতিক ভেদবুদ্ধিনগ্নাত বিরোধ সাময়িক বিভ্রান্তি-মাত্র; এই দুর্দিনের অবসান অচিরেই হইবে, এই অন্ধকার ভেদ করিয়া অদূর ভবিষ্যতে নূতন উদার অরণ্যলোকে সারা দেশ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে । তাই তো ব্যবধান-কবিতায় তিনি বলিয়াছেন—

“তবু অন্তরে আছে বিশ্বাস আমাদের হবে জয়
আমরা দেখছি প্রতিদিন প্রাতে আশার সূর্যোদয় ।
আমাদের শত কোটি কঙ্কালে ফুটেব রঙিন ফুল,
সোণালী কঁসলে ফুসোভিত হবে বিজয়ী তরুণ ।”

কবির কণ্ঠে ভাবীকালের মিলনমন্ত্র উদ্ঘোষিত হইয়াছে—তাহার স্বপ্ন সার্থক হইয়া উঠুক ।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব আজই নয় কেন ?—শ্রীনারায়ণ গুপ্ত । প্রকাশক—শ্রীনিরেন লাহিড়ী । প্রগতি প্রকাশ ভবন, গোহাটি, আমাম, মূল্য ১০ আনা ।

লেখক বামপন্থী, বৈপ্লবিক রাজনৈতিক মতাবলম্বী । বর্তমান পুস্তকে

প্রাণ্ডিষশা লেখিকা শ্রীশান্তা দেবীর

ভাবত-মুক্তিসাম্রাজ্য

রামানন্দ ও অর্ধ শতাব্দীর বাংলা

প্রবাসীর আকারে বহু পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, বহু চিত্রশোভিত, বাংলা-সাহিত্যে অতিবহনীয় গ্রন্থ । ইহা একবারে মনীষী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের জীবনী এবং সমসাময়িক বাংলার সাংস্কৃতিক প্রগতির ইতিহাস । বিগত পঞ্চাশ বৎসরের বাংলার সাহিত্যিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ইত্যাদি দ্বাবতীর আলোলনের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করিতে হইলে এই পুস্তকখানি অপরিহার্য । মূল্য ছয় টাকা মাত্র ।

শ্রীশান্তা দেবী ও শ্রীসীতা দেবী প্রণীত

সাতরাজার ধন (ছোটদের গল্প) ২৮

বন্ধুকে নানা রঙের মল্লট, পাতায় পাতায় ছবি ।

শ্রীশান্তা দেবী প্রণীত

অলখ-ঝোরা (উপন্যাস) ৩৮ দুহিতা (উপন্যাস) ১৮

সিঁথির সিঁদুর (গল্প) ১৪০ বধুবরণ (গল্প) ১৬০

সচিত্র হিন্দুস্থানী উপকথা (৬ষ্ঠ সং) ৩৮

প্রাণ্ডিষান—

শ্রীশান্তা দেবীর নিকট—পি-২৬, রাজা বসন্ত রায় রোড,

ডি, এম, লাইব্রেরী—৪২, কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট,

শ্রীশ্রী লাইব্রেরী—২০৪, কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট,

প্রবাসী কার্যালয় ও কলিকাতার অন্যান্য প্রসিদ্ধ পুস্তকালয় ।

তিনি বাহা বলিতে চাহিয়াছেন তাহা নোটামুট এই যে, ভারতীয় কংগ্রেসে জাতীয়তাবাদ ধনতন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং আশু সমগ্র দেশব্যাপী ব্যক্তি-সমাজতান্ত্রিক ক্ষিপ্ত সৃষ্টি করিয়া ধনতন্ত্র তথা বর্তমান রাষ্ট্রতন্ত্রের সাধনপূর্বক মজুর-চাষী বা পঞ্চায়ে-রাজ প্রতিষ্ঠার মধ্যেই দেশের সর্বজন কল্যাণ নিহিত—এবং মজুর-ধর্মঘট প্রভৃতি এই বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার অন্তর্গত । বিষয়টি বিতর্কমূলক—বামপন্থী অনেকেও মনে করেন যে, ধনতন্ত্র আশু উচ্ছেদসাধন না করিয়া বা মণ্ডলক রাষ্ট্রতন্ত্রটি ভাঙিয়া না দিয়া তন্ত্রকেই ধীরে ধীরে সমাজতন্ত্রে রূপান্তরিত করা অসম্ভব নয় । গান্ধীজীর পরিকল্পনায়ও বিবেচ্যকরণের আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত কৃষক-মজুর-রাষ্ট্র প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু সেই ‘রামরাজ্য’ প্রতিষ্ঠিত হইবে রক্তপাত-বিপ্লবের দ্বারা নয়—স্বাভাবিক নিয়মে ক্রমবিকাশের পথ দ্বারা । হোক রাজনৈতিক মত ও পথ সম্বন্ধে মতভেদ—আলোচনার স্থান নহে । তবে একথা সত্য যে, যিনিই পুস্তকখানি পড়িবেন তিনিই লেখক চিন্তার স্বচ্ছতা এবং প্রকাশভঙ্গীর সার্বজনীনতা দেখিয়া মুগ্ধ হইবেন । তাহার যুক্তিগত জোরালো, বক্তব্য এবং ভাষায় কোথাও ভুলপত্র ধোয়াটে ভাব নাই । উচ্ছ্বাসের রাশকে আগাগোড়া টানিয়া তিনি যুক্তিতর্কের উপর নিজের সিদ্ধান্তগুলিকে প্রতিষ্ঠিত করিবার পাইয়াছেন । লেখক সাহিত্য-ক্ষেত্রে নবাগত হইলেও রাজনৈতিক রচনায় যে মূল্যায়ন দেখাইয়াছেন তাহা প্রশংসার ।

বিপ্লবী শরৎচন্দ্রের জীবন-প্রশ্ন—শ্রীশৈল

জ্যোতি প্রকাশালয়, ২০৬ কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট, কলিকাতা । মূল্য

লেখক অপরাঞ্জের কথাশিল্পী শরৎ চন্দ্রের সহিত ঘনিষ্ঠ ভা

এবং তাহার মেহভাজন হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন

হইতে ১৯৩৯ সাল এই আঠারো বৎসর কলিকাতার বিভিন্ন

কলিকাতার বাহিরে বাজে শিবপুর, নবদ্বীপ, কাশী, সিরাজগঞ্জ প্রভৃতি

স্থানে শরৎচন্দ্রের সাহচর্য লাভ করিয়া এই সাহিত্য রথীর ব্যক্তিগত

বহু খুঁটনাটি ঘটনা প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ তাহার হইয়াছিল ।

পুস্তকে তিনি যে সমস্ত ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা শরৎ চন্দ্র

ব্যক্তিত্বের উপর অভিনব আলোকদম্পাত করে এবং শিল্পী শরৎ চন্দ্রের

মানুষ শরৎ চন্দ্র যে অনেক বড় ছিলেন সে কথাই বিশেষ করিয়া

করে । ব্যক্তিগত স্মৃতিকথাকে চিত্তাকর্ষক করিয়া বলিবার একটা

আর্ট আছে । লেখক ইতিপূর্বে ‘চিত্তকথা’ লিখিয়া প্রমাণ করিয়াছেন

সেই কৌশলটি তাহার আয়ত্ত । বর্তমান পুস্তকে তাহার বলার ভঙ্গী

উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে । শরৎচন্দ্রের স্মৃতিকথা লেখক এমনি আন্তরিক

সহিত বলিয়াছেন যে, তাহা পাঠকমাত্রেরই মর্মস্থল স্পর্শ

কিন্তু দুঃখের বিষয় বইখানির কোনো কোনো জায়গায় লেখক শাল

সীমা অতিক্রম করিয়াছেন । ২৬-২৮ পৃষ্ঠায় লক্ষ্মীর টোটে ঘা

জনগণ-অধিনায়ক ২৮

শ্রীসমর সরকার

রূপটি ছোটখাটো ঘটনা-বিশ্বাসের সাহায্যে কুশলী নাট্যকার পাঠকের মানসলোকে তুলিয়া ধরিয়াছেন ।

‘যুগান্তর’ বলেছেন : আলোচ্য নাটকখানি অভিনয়যোগ্য একখানি ছোট মিলনান্ত্র নাটক ।...নাট্যকীর ঘটনা-সংস্থান শ্রীঅপরাজিতা দেবী ও বলিষ্ঠ সংলাপ নাটকখানিকে হৃৎ করিয়া তুলিয়াছে ।

এই চ. স র কার এ ও স জ

৩এ, লাইব্রেরী রোড, কলিকাতা ২৬

জীসম্পর্কিত যে স্তম্ভায়জনক বর্ণনাটি তিনি দিয়াছেন তাহার সঙ্গে চন্দ্রের জীবন অথবা জীবনপ্রশ্নের কোন সম্বন্ধ নাই। কাজেই বর্তমান সে এসবের অবতারণা অবাস্তব হইয়াছে। নবদ্বীপে শরৎ চন্দ্রের জাগরণের কাহিনীটিও তাহার সম্বন্ধে অনেকের মনে ভ্রান্ত ধারণার স্রিস্তে পারে। পুস্তকের একটি দিক হইতেছে ব্যক্তিগত স্মৃতিকথার—আর একটি হইতেছে তাহার জীবনদর্শন সম্বন্ধে আলোচনা। জীবন কোন প্রশ্নের সমাধান তিনি খুজিয়াছিলেন, তাহার সৃষ্ট চরিত্রের সমালোচনাঙ্কলে তারই বিশ্লেষণ লেখক করিয়াছেন। শেষোক্ত দিকটার আলোচনায় তিনি তেমন কৃতিত্ব দেখাইতে নাই। এই ছটাকে গুলাইয়া না ফেলিয়া যদি বর্তমান পুস্তকখানিকে শুধু ব্যক্তিগত স্মৃতিকথার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখিতেন তাহা হইলে আরও দানা বাঁধিত।

রাষ্ট্রপতি কৃপালনী—ক্রীণোপাল ভৌমিক। কংগ্রেস প্রচার কেন্দ্র। ২৩, ওয়েলিংটন স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ৯০ আনা। ক্রমে ১২ বৎসর কংগ্রেসের জেনারেল-সেক্রেটারীরূপে আচার্য্য নী যে নিরল-কর্মক্ষমতার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহার তুলনা নাই। ক্রান্ত-কর্মী দেশসেবককে রাষ্ট্রপতিপদে নির্বাচিত করিয়া জাতি প্রতি চরম শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছিল। বর্তমান পুস্তকে তাহার প্রধান প্রধান ঘটনাবলী সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। তাহার হল জীবন উপন্যাসের মত চিত্তাকর্ষক। লেখক কৃপালনীর বহুমুখী র বিশেষণে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, নানা ঘটনার যাতপ্রতিযাতের দিয়া তাহার ব্যক্তিমানন করিপে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য লইয়া ফুটিয়া হ তাহা বেশ গুছাইয়া বলিয়াছেন—এইজন্য পুস্তকখানি ক্ষুদ্র মূল্যবান।

পতাকা—শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র। পূর্বকাশা লিমিটেড, পি ১৩ ৬ এডিন্‌ব্রু, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

কাল সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত যে দু'একজন শক্তিমান কের ছোট গল্প মনে চমক লাগাইয়া দেয় এবং শুধু লেখকেরই নহে, সাহিত্যেরও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হৃদয়ে আশার সঞ্চার করে শ্রীনরেন্দ্রনাথ হাদের অত্যন্ত। লেখক ইতিমধ্যেই বাংলা গল্পসাহিত্যের আসরে গভ করিয়াছেন, এবং তাহার শক্তির নব নব উন্মেষ আশাদিগকে ত করিতেছে। বৎসর দুই আগে 'অলক' পত্রিকায় তাহার 'সেধুন' নামক একটি গল্প পড়িয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম। যে দরদ মাতা-সংঘত প্রকাশভঙ্গীর পরিচয় তাহাতে পাইয়াছিলাম তাহা বর্তমান সাহিত্যে দ্বন্দ্ব বলিয়াই গল্পটি মনে গাঁথিয়া গিয়াছিল। বর্তমান দেখিতেছি সেই গল্পটি স্থান পাইয়াছে। এ ছাড়া পদক, নাম, কুলপী, পতাকা এই পাঁচটি গল্প ইহাতে আছে। প্রত্যেক গল্পই আমাদের গিয়াছে। তবে যে গল্পের নামে পুস্তকের নামকরণ করা হইয়াছে সেই 'ক' গল্পটির স্বর বেন এই বইয়ের স্রবের সঙ্গে মেলে নাই। সবগুলি গল্প হৃদয় দিয়া লেখা, আর এটির প্রেরণা যোগাইয়াছে লেখকের বিচারপ্রবণ বুদ্ধিজীবী মনে এবং এটির মধ্যে প্রচারও প্রচ্ছদ ভাবে রহিয়াছে। পতাকা ছাড়া অস্ত্রাস্ত্র গল্পগুলি অতি সাধারণ ঘরোয়া ব্যাপারকে কেন্দ্র করিয়া স্ত। কলমের উপর নরেন বাবুর সংযম অসাধারণ। পাঠকের কল্পনাকে সীমিত করিয়া ত্রিক কোথায় থামিতে হয় তাহা তিনি ভালো করিয়া জানেন। মানুষ কল্পনায় যে স্বর্গলোক রচনা করে ন অলঙ্কার কাটল ধরিয়া অকস্মাৎ কত সহজে তাহা ধুলিসাং হইয়া বাইতে পারে তাহা পী বরফ আর ঘূষ এই দুটি গল্পে সার্থকভাবে রূপায়িত করা হইয়াছে। রন বাবুর গল্পে মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণ আছে, কিন্তু তাহা গল্পকে ছাপাইয়া ষ্টেতে পারে না। পুস্তকখানি আধুনিক বাংলা ছোটগল্পের উৎকর্ষের স্তম্ভ উল্লেখ্যযোগ্য নিদর্শন বলিয়া গণ্য হইবে সন্দেহ নাই।

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

নিম্নোক্ত বই চারখানি বাংলা ভাষায় অনূদিত হইয়া বাংলা সাহিত্যকে সত্যই সমৃদ্ধ করিয়াছে নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস

গুড আর্থ

রচনা : পাল বাক

অনুবাদ : পুষ্পময়ী বসু

প্রাঞ্জল অনুবাদ, অপূর্ব গঠনসজ্জা, চমৎকার বাঁধাই। মূল্য পাঁচ টাকা

আমাদের প্রতিদিনের পানীয় চা-কে কেন্দ্র করে সাহেবী অভ্যাসের পটভূমিকায় লেখা এই উপন্যাস সবে প্রকাশিত হলো

দু'টি পাতা একটি কুঁড়ি

রচনা : মূলক রাজ আনন্দ

অনুবাদ : শ্রীনূপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

এই উপন্যাসখানিতে বর্তমান ভারতের দক্ষ অন্তরের হাহাকার আপনা থেকে উঠছে, এর প্রত্যেকটি ঘটনার মধ্য দিয়ে মুখর হয়ে উঠছে আহত ভারতের রক্ত-ঝরা অন্তরের কাহিনী, যে-কাহিনীর আড়ালে পাঠক দেখতে পাবেন, আজকের বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের নানামুখী প্রোতধারার সঙ্গে ভারত-আত্মার সংঘর্ষ। মূল্য চার টাকা বাত্রে আনা

বৃটিশ সরকার যে বই সহ্য করতে পারে নি বলে তার প্রকাশ নিষিদ্ধ করেছিল

কুহনি

রচনা : মূলক রাজ আনন্দ

অনুবাদ : শ্রীনূপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

বৃটিশ শাসনের ফলে ভারতীয় সমাজ কিভাবে ভিতর থেকে ভেঙ্গে পড়েছে, অনাধীন, বস্ত্রহীন কোটা কোটা ভারতবাসীর কি পরিণতি ঘটেছে তারই এক ভয়াবহ চিত্র মূলক রাজ ফুটিয়ে তুলেছেন এই উপন্যাসে। সাড়ে চার টাকা

গত যুগের যুরোপের শ্রেষ্ঠ নিলটিক লেখক

মরিস মেতারলিঙ্ক-এর

মন্না ভান্না

অনুবাদ : পুষ্পময়ী বসু

প্রেম হ'ল এ কাহিনীর মূল কেন্দ্র। 'যে প্রেম চলিতে চালাতে নাহি জানে' সে-প্রেম নয়।...যে-প্রেম সগর্বে বলে, 'আমি আমার অপমান সহিতে পারি, প্রেমের সহ না অপমান'—এ হ'ল সেই চির রহস্যময় মনুষ্যের অগ্রদূত...মানবতার ধ্যানবস্ত্র। তাই কালিদাসের মেঘদূতের মতন মেতারলিঙ্কের 'মন্না ভান্না' কগতের প্রেম-সাহিত্যে মেঘ-চুষ্টি হিম-গিরি-শৃঙ্গের যতন বিরাজ করছে। মূল্য তিন টাকা

— পুস্তক তালিকার জন্য লিখুন —

র্যাডিক্যাল বুক ক্লাব : ৬, বঙ্কিম চাট্‌জো স্ট্রীট : কলিকাতা

দেশ-বিদেশের কথা

ডাক্তার শ্রীহেমেন্দ্রনারায়ণ রায়

কলিকাতা নেশনাল মেডিক্যাল ইন্সটিটিউটের ধাত্রীবিজ্ঞান অধ্যাপক ডাক্তার শ্রীহেমেন্দ্রনারায়ণ রায় সম্প্রতি বিলাতের এফ আর সি ও জি উপাধি লাভ করিয়াছেন। ইহা চিকিৎসকদের পক্ষে শ্রেষ্ঠ সম্মান। ডাক্তার রায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও স্টেট মেডিক্যাল স্কুলের সদস্য। তিনি চিকিৎসা সেবাসদন ও বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন।

শ্রীবিমলাদেবী চক্রবর্তী

বিমলাদেবী চক্রবর্তী ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে লাহোরে এক গঙ্গাবী ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে কিছুকাল বেলুচিস্তানে কাটাইয়া তিনি পিতামাতার সঙ্গে কলিকাতায় আসেন। এখানে আদিবার পর তাঁহাকে একটি বিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়া দেওয়া হয় এবং ক্রমে ক্রমে তিনি



শ্রীবিমলাদেবী চক্রবর্তী

প্রবেশিকা ও আই এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৪৫-এ লেডি ব্র্যাবোর্গ কলেজে বি-এ পড়িবার কালে হৃন্দরবন ল্যাণ্ড হোন্ডাস এসোসিয়েশনের তদানীন্তন সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত মধুসূদন চক্রবর্তীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ঐ বৎসরেই তিনি সাময়িক বিভাগের চাকরিতে যোগদান করেন এবং বোম্বাইয়ে নোবিভাগের কাজে তাঁহাকে নিযুক্ত করা হয়। বৎসরখানেক পূর্বে তাঁহাকে এই কর্ম হইতে অবসর দেওয়া হয়। বিমলাদেবী সম্প্রতি ইংলণ্ড গিয়া উচ্চাঙ্গের ধাত্রীবিজ্ঞান অধ্যয়ন করিবার জন্ত ভারতীয় রেডক্রস সোসাইটি হইতে একটি বৃত্তিলাভ করিতে সন্মত হইয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যে তিনি বিলাত যাত্রা করিয়াছেন। এই আত্মনির্ভরশীল মহিলার উদ্যম ও কর্মশক্তি প্রশংসনীয়।

সিংহলের স্বাধীনতা উৎসবে বাঙালী দান অবদান

২৪শে ফেব্রুয়ারি সিংহলের স্বাধীনতালাভ উৎসব উপলক্ষ্যে পান গবর্নর শ্রীরাজাগোপালাচরীর নেতৃত্বে কলিকাতায় যে সভা হইয়াছে শিল্পী শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত নিজের আঁকা তিনখানি চিত্র সিংহ দান করিয়াছেন। সিংহল গবর্নমেন্টের পক্ষ হইতে এই দান প্রতিনিধি কলম্বোর জাতীয় চিত্রশালার জন্ত গ্রহণ করিয়াছেন। চিত্রের বিষয়বস্তু হইতেছে সিংহলের প্রাচীন ইতিহাস—যাহার মধ্যে যোগ রহিয়াছে। চিত্রগুলির নাম (১) বিজয় সিংহের লক্ষ্য (২) সিংহনালে মহেন্দ্র ও রাজা তিসু, (৩) অনুরাধাপুরে শোভাযাত্রা। এই তিনখানি চিত্রই প্রবাসী ও মডার্ন-রিভিউতে হইয়াছিল।

ভারত ও সিংহল স্বাধীন হওয়ার পর দুই দেশের সাংস্কার স্থাপনকল্পে এই দান উল্লেখযোগ্য।

বাঁকুড়ার ভাটুল গ্রামের শ্মশানঘাটে ম গান্ধীর চিতাভস্ম বিসর্জন অনুষ্ঠান

অন্যন্ত স্থানের ছায় বাঁকুড়া জেলার ভাটুল গ্রামেও গান্ধীজীর বিসর্জন অনুষ্ঠান যথাযোগ্য মর্যাদার সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। বহু আয়াদে গান্ধীজীর পুত্র চিতাভস্ম ক্রয়পরিমাণে সংগ্রহ করি হইয়াছিল। ভাটুল পল্লীমঙ্গল সমিতির যুবকবৃন্দের কর্মতৎপর দিনব্যাপী (১২ই ফেব্রুয়ারী) অনুষ্ঠানটি সন্ধ্যাসম্পন্ন হই স্থানীয় দ্বারকেশ্বর নদীর যে ঘাটে এই পবিত্র চিতাভস্ম নিমজ্জন সেই ঘাটের নাম পরিবর্তন করিয়া “গান্ধীঘাট” রাখা দেওয়া হই শ্রীযুক্ত রণজিৎ সিংহ গান্ধীজীর পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্মশানক্ষেত্রে পাকা ঘর নির্মাণ কুরাইয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

নরেশ্বর ভট্টাচার্য্য

গত ১৬ই মার্চ সুপরিচিত গীতিকার ও ঔপন্যাসিক নরেশ্বর পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ১৪ হইয়াছিল। গত দশ বৎসর যাবৎ তিনি বিভিন্ন গ্রামোফোন সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া বহুসংখ্যক রেকর্ড-সম্মিত রচনা করিয়া শ্রেষ্ঠ গীতিকাররূপে বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিলেন। বাবু ‘চিরকুমার সভা’ ও ‘দেবদাস’কে বিশেষ নৈপুণ্যের সহিত রেকর্ড রূপায়িত করেন।

উপন্যাস-রচনায়ও তাঁহার হাত ছিল। তাঁহার ‘পাণাণপুত্রী’ উপন্যাসখানি সুপাঠ্য। সম্প্রতি তিনি ‘মাতাজী চিত্র’ নামক একটি সিনেমা কোম্পানী গঠন করেন এবং উক্ত জন্ত একটি চিত্রনাট্যও রচনা করেন।

নরেশ্বরবাবু শ্রীহট্ট জেলার বেজুড়া গ্রামের অধিবাসী ছিলেন।